দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

চতুর্থ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

সম্পাদক—

শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
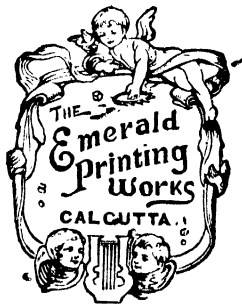
ভারতবর্ষ

চতুর্থ বর্ষ

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড—আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩২৩]

বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক

আলোচনা

ইতিহাস

উপন্যাস

কবিতা

গল্প

জীবনী

জ্যোতিষ

দর্শন

পুরাতত্ত্ব

ভ্রমণ

শোক-সংবাদ—

সাময়িকী—

সাহিত্য-সংবাদ—

সাহিত্য

লেখক-লেখিকাগণের নামানুসারে বর্ণানুক্রমিক

বিধবা

শিল্পী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত —বিধবা

Emerald Ptg Works

আষাঢ়, ১৩২৩।

প্রথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

ত্রিলোক-বরেণ্য নাথ পুরুষের হে পূর্ণ বিকাশ,
পদতলে চিত্তহারা দাস,
ধীরে আঁখি মেলি' যবে সাড়া দিল তোমার কৈশোর,
তব অঙ্গ-গন্ধ লভি' শতজন্ম স্মৃতি করি' ভোর ;
ফুটিল অযুত পদ্ম পারিজাত-স্পর্দ্ধা করি ম্লান ;
হইল প্রথম ধন্য সেইদিন পুষ্পের পরাণ।
পাপদগ্ধ মানবের অশ্রুজলে এলে মূর্ত্তি ধরি,
উঠিল গো মর্ত্ত্যভূমে আর্ত্তজীব বেদন সম্বরি'।
হে শ্রীকৃষ্ণ হরি !
তব সে পরশে বিশ্বে শিরায় শিরায় ;
চৈতন্যের স্রোত বহে যায়।

তনুর মালঞ্চে তব দাঁড়াইয়া যৌবন যেদিন,
বাজাইল আমন্ত্রণ-বীণ।
সেইদিন এ জগতে রূপরাজ্যে প্রথম প্রভাত ;
স্বর্গ হতে অপ্সরীরা নীলাম্বরে করি' নেত্রপাত ;
তোমার সৌন্দর্য্য পূজা ও যৌবন বন্দনার ছলে,—
চন্দ্রমার রশ্মি ছিঁড়ি' অর্ঘ্য দিল ব্যাকুল চঞ্চলে।

বিশ্বের কানন জুড়ি' রাঙ্গা হ'য়ে উঠিল অশোক,
নর-সৌন্দর্য্যের কবি সেইদিন রচে আদিশ্লোক।
ঘিরিয়া ভূলোক,—
রাজটীকা দিল কালো সৌন্দর্য্যের শিরে;
সুন্দরীরা আসি' ধীরে ধীরে।

যবে হে জীবন্ত বংশী বাজাইলে বীজমন্ত্রে ভরি',
উন্মাদন-সুরে পূর্ণ করি'
নীপ-পল্লবের কোলে কাঁপি' উঠে কদম্ব-কেশর,
ছুটিল নির্ঝর-কুল গিরিগাত্রে করি' ঝরঝর।
নদীরাজ্যে সেইদিন যমুনায় বহিল উজান;
স্তম্ভিত সাগর-গর্ভে নাগবালা গাহি' উঠে গান।
তারি মন্ত্র প্রতিধ্বনি প্রাণ লভি' ওঙ্কারের সুরে;
সেই হতে এ বিশ্বের রোমে রোমে ব্যাকুলিয়া ঘুরে।
নিকটে অদূরে,—
আজো জাগিতেছে তারি আকুল আহ্বান,
তারি সুরে ঘেরা সৃষ্টি-প্রাণ।

যেইদিন কুরুক্ষেত্র-রক্তসিক্ত-রণাঙ্গন পরে,
পাঞ্চজন্য ধ্বনিলে অধরে।
কর্ত্তব্যের বজ্রবাণী শঙ্খে তব ছাড়ে সিংহনাদ,
দিক হতে দিগন্তরে ছুটি' যায় নবীন সংবাদ।
উন্মাদ নিঃস্বনে তার কাঁপি' উঠে বাসুকির শির,
খরস্রোতে রক্তধারা নাচি' উঠে বুকেতে মহীর,
ব্যোম-গর্ভে গ্রহ-সঙ্ঘে অঙ্গে অঙ্গে লাগিল সংঘাত,
সুরেন্দ্র সম্বিৎহারা নতশীর্ষে করে প্রণিপাত।
সুন্দর প্রভাত
ফুটেছিল সেইদিন উজলিয়া যুগযুগান্তর
মন্ত্রশ্লোকে ভরি' নীলাম্বর।

ভারতবর্ষের জন্মতিথিতে

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনের মধ্যে যে দিনটা বেশ একটু অভিনব বলিয়া বোধ হয়, সেই দিনে, সেই অভিনব অনুভূতিটুকুকে আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি !

দিনের পর দিন আসে, মাসের পর মাস আসে ; আবার আমাদের অজ্ঞাতে তাহারা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায় ! তাহাদের আগমনের সময় আমরা তাহাদিগকে সকল স্থলে, সকল সময়ে, সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন করিয়া নিজের ঘরে ডাকিয়া লই কি না, তাহা আমাদের তত মনে থাকে না। কিন্তু তাহারা একএক করিয়া যখন আমাদের স্মৃতির উপর আপনাদের অস্তিত্বের দাগ রাখিয়া চলিয়া যাইতে চায়, তখন আমরা আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে, আমাদের অশ্রুপাতের সঙ্গে, তাহাদিগকে বিদায় দিই বটে, কিন্তু বিদায় দিতে প্রাণ চায় না ; কারণ, সে দিনগুলির মধ্যে আমাদের সুখ-দুঃখের অনেক স্মৃতি থাকে ; আমাদের জীবনের পরিচিত ঘটনাগুলি সেই দিন-কয়টিকে আমাদের কাছে প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া তুলে ! তাই আমরা তাহাদিগকে যেমন আনন্দের মধ্যে উপভোগ করি, তেমনি নিরানন্দের মধ্যেও অনুভব করি !

আমরা তাহাদিগকে বিদায় দিতে চাই না, তবু দিই, কারণ তাহারা আমাদের প্রিয় বটে, কিন্তু তাহারা যে আমাদের একেবারেই বশীভূত নয় ! এমনি করিয়া বর্ত্তমানকে আমরা বিদায় দিতে অভ্যস্ত !

সমস্ত অতীত দিনের পর একটা বিশেষ দিন আমাদের চোখের সম্মুখে একটা ইন্দ্রজালের রচনা করিয়া দেয় ! কেন দেয় ?—সেই জানে। সেই ইন্দ্রজালের মধ্যে আমাদের উপভোগ করিবার মত যে মাধুর্য্যটুকু থাকে, তাহা যেন আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই চাহিয়া আসিয়াছি ! আমরা যাহা চাই, তাহার অভাবের তীব্রতা আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে বেশ বুঝিয়া আসিয়াছি !

এই যে বিশেষ দিনটি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য, প্রাণের সকল সাধ পূর্ণ করিবার জন্য, মর্ম্মের সহস্র বেদনা ঘুচাইবার জন্য, বর্ষে বর্ষে আসে, এই দিনটিকেই আমরা প্রাণের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া আসি !—যেন সে আমাদের কত পরিচিত ও বাঞ্ছিত অতিথি !—যেন তাহার জীবনটুকুর মধ্যে আমাদের লক্ষ যুগের অতৃপ্ত বাসনার পরিসমাপ্তি আছে, সহস্র প্রাণের কাম্যধনের সন্ধান আছে, বিশ্বসঙ্গীতের সুর যেন তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আমাদেরই চিরপরিচিত সুরে বাজিতেছে !

আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের উৎসাহ ও কর্ম্মস্পৃহা, আমাদের ভাব ও ধারণা, আমাদের সাধনা ও সিদ্ধির একটা বিচিত্র কথা যেন তাহারই কণ্ঠে শুনিবার জন্য আমরা এতদিন উৎকর্ণ হইয়া ছিলাম ! আজ তাহার শুভাগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা যাহা হারাইয়াছিলাম, তাহা যেন অযাচিতভাবে আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল ; আমরা যাহাকে এতদিন খুঁজিয়া আসিতেছি, সে যেন আজ নিজে আসিয়া ধরা দিল ; আমরা যাহা চাই, তাহা আজ পাইলাম !

আজ এই শুভদিনে সুপ্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গে যে আলোক আমাদের নয়নের তন্দ্রাবেশ ঘুচাইয়াছে, তাহা আজ যেন কত উজ্জ্বল ! এই নবপ্রভাতের যে নবীন সঙ্গীত আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা আজ যেন কত উন্মাদনাময়।

আজ প্রকৃতির গাত্রে দেখি বর্ণবৈচিত্র্যের নয়নানন্দ-দায়িনী সুন্দরী শোভা ! তাহার ভাষায় শুনি কত যুগের কত মহাপুরুষের মনরসায়ন-মধুর সঙ্গীত ! তাহার অঙ্গ-সঞ্চালনে স্বর্গের কমনীয়তা, তাহার মধুর দৃষ্টিতে অপ্সরার শোভাসম্ভার !

আর এই অপার সৌন্দর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য, এই গম্ভীর

উন্মাদনা, বিপুল জাগরণের মধ্যে কি সুন্দর, কি উদাত্ত, কি কল্যাণময় ওই আকুল আহ্বান—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ –
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

"হে অমৃতের পুত্রগণ, যাহারা দিব্যধামে আছে, সকলে শ্রবণ কর—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

এই উদ্বোধনের বার্ত্তা "ভারতবর্ষের!" "ভারতবর্ষ" তাঁহার তপোবনের শান্ত সৌম্য পবিত্রতার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।

আজ "ভারতবর্ষ" তাঁহার জন্মতিথির উৎসবে আমাদের কত অতীত স্মৃতিকে বুকে করিয়া আনিয়াছেন। আজ এই নূতন দিনে পুরাতন জীবনকে যেমনভাবে লাভ করিলাম, নবীনের মধ্যে প্রবীণের সন্ধান পাইলাম, এই সত্যঃস্মৃতির মধ্যে অতীত স্মৃতিকে যেমন আপনার করিয়া অনুভব করিলাম, এমন বুঝি আর কোন দিন পারিব না!—তাই এই দিনের এত আদর; তাই তাহার এত অভ্যর্থনা, তাহার উপযুক্ত সংবর্দ্ধনার জন্য হৃদয়ে বাহিরে এত আয়োজন।

আজ এই যে "ভারতবর্ষের" জন্মদিন—ইহা আমাদের কাছে মহান্ উৎসবের দিন। এ উৎসব আমাদের একার নয়, এ উৎসব সমস্ত ভারতবর্ষের—সমস্ত বিশ্বের উৎসব! এই উৎসবের যে উদ্বোধনসঙ্গীত, তাহার প্রত্যেক সুরটীর সঙ্গে যেন বিশ্বসঙ্গীতের একটা সমন্বয় থাকে!

যিনি 'সত্যং' 'শিবং' 'সুন্দরং'—তাঁহার সত্যকে আমরা আজ চিরন্তনের জন্য বরণ করিয়া লইব, তাঁহার শিবকে আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব, তাঁহার সুন্দরকে আজ আমরা প্রীতির চক্ষে দেখিব! তাঁহার প্রতি অঙ্গের যে জ্যোতিঃ, তাহা আজ সমস্ত বিশ্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; তাঁহার অঙ্গের যে লাবণ্য, তাহা আজ প্রকৃতির গাত্রে উছলিয়া পড়িবে! সমস্ত বিশ্বের জন্য তাঁহার যে স্নেহের আকুল আহ্বান, তাহা আজ "ভারতবর্ষের" জন্মদিনে আমরা শুনিতে পাইয়াছি।

আজ আমরা এই জন্মদিনকে দীক্ষা, শিক্ষা ও সাধনার দিন বলিয়া অভিবাদন করিব। এই দিন আজ হইতে আমাদের জীবনের মধ্যে অতি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। এই শুভদিনের এই যে পুণ্যস্মৃতি—ইহা যেন আমাদের ব্যর্থ জন-রোলের মধ্যে ডুবিয়া না যায়, তুচ্ছ অপকর্ম্মের মধ্যে তাহাকে যেন আমরা না হারাইয়া ফেলি!

জানি, "ভারতবর্ষের" স্মৃতিকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার সময় আমরা অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিব না; তবু সে শোকাশ্রুর মধ্যে গৌরবময়ী কল্যাণ-কীর্ত্তি যে আপনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা!

তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য মহাপুরুষ ভারতের জন্মতিথির প্রথম উৎসবে আপনার হৃদয়ের সমস্ত সাধনা উজাড় করিয়া সিদ্ধির যে প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও তাঁহারই পবিত্র-স্মৃতি বুকে লইয়া সমভাবে জ্বলিতেছে! তিনি যে "ভারতবর্ষকে" হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়া গিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারেন নাই। তাই সমস্ত স্মৃতির মধ্যে তাঁহার স্মৃতি মহিমা ও গরিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে!

সেই মহাপ্রাণের অভাব আজ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি সত্য, কিন্তু মৃত্যুতে তাঁহাকে যেমন হারাইয়াছি, তেমনি লাভও করিয়াছি। মৃত্যু তাঁহার চারিদিকে যে মহান্ অবকাশের রচনা করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমরা তাঁহাকে সমগ্রভাবে লাভ করিয়াছি। আমাদের স্মৃতির মধ্যে তাঁহাকে যে আমরা কণিকা পরিমাণেও হারাই নাই, ইহাই আমাদের পরম সান্ত্বনা!

তাঁহার উদ্দিষ্ট-ব্রতের উদ্‌যাপনের সঙ্গে তাঁহার হইয়া আমরা আনন্দ অনুভব না করিলে, তাঁহার এ মহতী কীর্ত্তিতে কলঙ্কের ছায়া পড়িবে বলিয়া ভয় হয়। তাই বলিতেছি, আজ এই জন্মদিনের উৎসবে আমরা যেন প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণু পরিপূর্ণ দেখি;—"ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণ" দেখি; আজ আমাদের চারিদিকের যে ঘনান্ধকার, তাহা অপসারিত হইয়া যাউক। আজ আমরা যেন প্রত্যেকে পূর্ণানন্দে বলিতে পারি—

"বেদাহং" আমি জানিয়াছি, আমি জানিয়াছি!

আজ আমাদের এই উৎসব-যজ্ঞ অমৃত-যজ্ঞরূপে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, আমাদের বোধশক্তির নিকটে প্রতিভাত হউক! আজ আমরা যেন বিশ্ব-মানবকে আপনার বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, পরমাত্মীয় বলিয়া বুকে টানিতে পারি!

যে অমৃতময় মহাপুরুষ সকলের মধ্যে পরমাত্মারূপে আপনাকে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত করিয়া রাখিয়াছেন

তাঁহাকে যেন প্রাণের সহিত ডাকিতে পারি, হৃদয়ের সহিত প্রণিপাত করিতে পারি! আজ আমাদের স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, গ্লানি, অহঙ্কার—সব আষাঢ়ের প্রথম পাদবিক্ষেপের সঙ্গে দূরে যাউক; সমস্ত অকাজ, সকল অপকর্ম্ম আজ প্রাবৃটের ঘনকৃষ্ণ মেঘান্ধকারের সঙ্গে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ুক! আজ আমাদের ব্যক্তিত্ব বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারার সঙ্গে সমগ্র দুষ্কৃতি ও অপূর্ণতাকে পদদলিত করিয়া বিশ্বের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করুক!

আজ যদি আমরা আমাদের অলস চিন্তা ও অনন্ত অকাজ, বিমর্ষ ভাব ও অমূলক ধারণা, তুচ্ছ দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থ কোলাহলের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখি, তবে দেবতার এই সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইবে! এই নিরপেক্ষতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা শুধু যে আমাদের অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিবে তাহা নহে, আমাদের দুষ্কৃতিকেও অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিবে! আজ যে প্রভাত আসিয়াছে, আমরা যেন তাহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিতে ভুলিয়া না যাই!

ঐ যে নবীন প্রভাত উদয়-শিখরের উপর হইতে নিজেকে প্রকাশ করিল, সে কি বলিতেছে শুনিতেছ কি ?

—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত

এমনি করিয়া বর্ষে বর্ষে নবীন প্রভাতে তরুণ তপনের উদয় দেখিয়া আসিতেছি। নবজীবনের অভ্যুদয়ের যে সঙ্গীত, তাহার সুরও যেন কাণে লাগিয়াছে, কিন্তু তাহা এতদিন শুনিয়াও শুনি নাই, জানিয়াও জানি নাই, দেখিয়াও দেখি নাই!

যে জড় অলস কর্ম্মহীন জীবন বর্ষে বর্ষে এই নয়নাভিরাম দৃশ্যকে অবজ্ঞা করিয়াছে, শ্রুতিমধুর সঙ্গীতকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে, জ্ঞান-বিধায়িনী বার্ত্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে; সে আজ শুধু ব্যর্থতার জন্য খেদ করিতেছে না, তাহার অতীত ব্যবহারের জন্য সত্যই অনুতপ্ত; কিন্তু তবু আশান্বিত! —কেন না সে আজ এমন দিনে সান্ত্বনার ধন অনেক পাইয়াছে! তাহার আশা আছে যে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবে। আসন্ন আবির্ভাবকে সে আজ সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াছে, তাই সে আজ ব্যর্থ হইয়াও সার্থক হইবার আশায় প্রহর গুণিবে, অনুতপ্ত হইয়াও শান্তির আশায় ফিরিবে।

আমরা যে আজ বড়ই দীন তাহা জানি, কিন্তু তবু কি আনন্দ আজ আমাদের!—আজ আমাদের এই রিক্ত-শূন্যতারি মধ্যে, এই সমারোহ-হীন আয়োজন ও অনুপযুক্ত পূজার মধ্যে আমাদের দেবতা আমাদিগকে ভুলেন নাই! তিনি অসহায় দীন সন্তানকে আজ অধিকতর আদরের সহিত আহ্বান করিয়াছেন। প্রভাতের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার আমন্ত্রণ আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে! কার সাধ্য—সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, সে আহ্বান অবহেলা করে! আজ আমরা বিশ্বদেবতার পরিচয়পত্র পাইয়াছি, আজ আমাদের কত আনন্দ! ঐ এক আমন্ত্রণ আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছে পরিচিত করিয়া দিবে। আমরা জানি—"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" সেই একই বিরাট পুরুষ সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন! আমরা সেই মহান্ অদ্বৈত মহাপুরুষের অংশ! আমরা—

"অমৃতস্য পুত্রাঃ"

আমরা আজ সেই জ্যোতির্ম্ময়ের শুভ্র রূপজ্যোতিঃতে সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পাইব! আজ আমাদের এ উৎসব একটা সাময়িক আনন্দের উৎসব নয়! এ উৎসব চিরন্তন আনন্দের উৎসব! এ উৎসব আজ আমাদিগকে বিশ্বে প্রকাশ করিয়াছে।

হে বিশ্ববিধাতৃ, অন্তর্যামিন্, মহাপুরুষ, আমাদের জীবনের এই নবজাগরণের দিনে, নবীন পর্য্যায়ের সঙ্গে আমরা যেন নিজেকে চিনিতে পারি, তোমাকে চিনিতে পারি! আমরা আজ তোমাকে নিত্য-সত্য চৈতন্যপুরুষ রূপে প্রণিপাত করিতে চাই! তোমার অখণ্ড বিধানের মধ্যে তোমাকে শাশ্বতরূপে বরণ করিতে চাই! আজ আমাদের কল্যাণ-কামনা ও মঙ্গল উদ্দেশ্যের মধ্যে শুধু তোমার অভয়-বাণী শুনিতে পাইব কি?

আজ আমাদের দুঃখ ও সুখ, সন্ধান ও লাভ, বিচ্ছেদ ও মিলন, মৃত্যু ও অমরত্বের মধ্যে, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ তোমার করুণার স্নিগ্ধ স্পর্শে আমাদের দৈন্যকে গৌরবময় করিয়া দাও, সত্যকে উজ্জ্বল কর, আমাদের দুঃখকে মহত্ত্ব দান কর। আজ আমাদের স্বার্থকে দীন হীন এবং পরার্থকে মহান্ ও উদার কর। আজ আমরা আমাদের এই পরম আনন্দের মধ্যে, চরম শান্তির মধ্যে তোমাকে, শুধু তোমাকে চাই! তোমার হাতের বন্ধনের মধ্যে চরম মুক্তি লাভ করিয়া শুধু সমস্বরে বলিতে চাই—

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

দেবাসুর-সংগ্রামে জগতের ক্রম-বিকাশ।

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম,-এ, বি,-এল]

এ স্থলে আমরা দেবাসুর-সংগ্রামের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা না বুঝিলে দেবতাদের সহায়ে, পরমা প্রকৃতির সহায়ে, কিরূপে আমাদের ক্রমবিকাশ হয়, কিরূপে আমাদের ধর্ম্মের ক্রমপরিণতি হইতে থাকে, কিরূপে আমাদের তামসিক প্রকৃতি রাজসিক প্রকৃতিতে, এবং রাজসিক প্রকৃতি সাত্বিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে, মানুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির ক্রম আপূরণের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারিব না। অতএব এস্থলে আমরা অতি সংক্ষেপে এই দেবাসুর-সংগ্রাম-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রায় সকল ধর্ম্মে এই দেবাসুর সংগ্রামের কথা কোন-না-কোনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বাইবেলে সয়তান-গণের সহিত দেবদূতদিগের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। সে যুদ্ধের পরিণামে সয়তানগণ স্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া পাতালে বা নরকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর দেব-দূতগণ স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় এই দেবাসুর-যুদ্ধ বিশ্বাস করেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মে—কোরাণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। পারসিক সম্প্রদায়ের জেন্দাবস্তায় আহুরমানের সহিত আহুরমজদের যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সহিত মার ও তাহার সৈন্যগণের যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে ত সর্ব্বত্র এই দেবাসুর-যুদ্ধের কথা আছে। বেদে পুরাণে সর্ব্বশাস্ত্রে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, প্রায় সকল দেশে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে এই দেবাসুর-সংগ্রামের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প লোকেই এই দেবাসুর-যুদ্ধের কথা বুঝিয়া থাকেন, বা বুঝিতে চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই শাক্ত। 'চণ্ডী' তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। অনেক হিন্দুই এই চণ্ডী প্রতিদিন পাঠ করেন। পূজাকালে স্বস্ত্যয়নে ইহা সর্ব্বদা পঠিত হয়। সেই চণ্ডীগ্রন্থে এই দেবাসুরের যুদ্ধের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এ স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা প্রধানতঃ এই মহাগ্রন্থ চণ্ডী অবলম্বন করিয়াই এই দেবাসুর-সংগ্রাম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই দেবাসুর-যুদ্ধ প্রধানতঃ দুইরূপে বুঝিতে হয়। সমষ্টিভাবে জগৎ সম্বন্ধে, এবং ব্যষ্টিভাবে জীব সম্বন্ধে ইহা বুঝিতে হয়। যাহা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম, তাহাই ভাণ্ডের নিয়ম। যাহা সমষ্টির সম্বন্ধে নিয়ম, তাহাই ব্যষ্টিসম্বন্ধে নিয়ম। তাই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়। আবার যাহা ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সম্বন্ধে নিয়ম, তাহাই সাধারণভাবে মানুষের সমাজসম্বন্ধে নিয়ম। অতএব, আমরা অতি সংক্ষেপে সমস্ত জগতে, মানুষ সমাজে এবং প্রতি মানুষে এই দেবাসুর-সংগ্রাম বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই দেবাসুর সংগ্রাম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম (cosmic law)। এই সংগ্রাম হইতেই জগতের ক্রমবিকাশ হয়। ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও লয় হয়। এই সংগ্রামে যতদিন অসুরের জয়, ততদিন সৃষ্টির পরিণতি হয় না। যতদিন দেবতার জয়, ততদিন জগতের স্থিতি ও রক্ষা। আবার অসুরের জয় হইলে জগৎ ধ্বংসের অভি-মুখে নীত হয়। আমরা পূর্ব্বে জগতের প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম বুঝিবার সময় দেখিয়াছি যে, এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক জগতের মধ্যে ঊর্দ্ধের ভুবলোক হইতে সত্য-লোক পর্য্যন্ত সত্ব-বিশাল, মধ্যের ভূ বা পৃথিবীলোক রজো-বিশাল, আর অধঃ সপ্তপাতাললোক তমোবিশাল। এই সপ্তপাতাললোক অসুরদের অধিকারভুক্ত, ঊর্দ্ধলোকের মধ্যে ভুবলোক ও স্বর্লোক দেবতার অধিকারভুক্ত। তদূর্দ্ধে মহদাদিলোক—ব্রহ্মলোক—সিদ্ধগণের অধিকারভুক্ত—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের স্থান। আর মধ্যে পৃথিবীলোক দেবাসুর উভয়ের অধিকারস্থান। দেবগণ প্রবল হইলে পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্রিলোক অধিকার করেন; আর অসুরগণ,

প্রবল হইলে, তাঁহারাও স্বর্গ পর্য্যন্ত ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করেন। অসুরগণ তামসসৃষ্টির অভিমানী দেবতা, আর দেবগণ সাত্বিক সৃষ্টির অভিমানী দেবতা। অথবা প্রকৃতির সমষ্টি তমঃ শক্তি হইতে অসুরগণ প্রথম উদ্ভূত—তাঁহারাই তামসিক লোকের লোকপাল; আর দেবগণ প্রকৃতির সত্বশক্তি হইতে প্রথম উদ্ভূত—তাঁহারাই সাত্বিক লোকের লোকপাল, সাত্বিক জীবের ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তা।

আমরা এক্ষণে জড়শক্তির একত্ব বুঝিতে পারি। সমষ্টিভাবে অগ্নিকে, বিদ্যুৎকে, আলোককে, ধারণা করিতে পারি, আধুনিক জড়বিজ্ঞান আমাদের সে ধারণার সাহায্য করেন। এই জড়-শক্তিবলেই জড় অণুগণ, সংহত, বা বিশ্লিষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্ম করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু জৈবশক্তি আমরা বুঝি না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণশক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে কিন্তু সমষ্টিভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আর সমস্ত জগতের যে চৈতন্য-রূপ নিয়ন্তা আছেন, আর সেই মূল-চৈতন্য হইতে যে নানা ব্যষ্টি চৈতন্য অভিব্যক্ত হইয়া তাহা দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা আধুনিক পণ্ডিতগণ আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা সেই প্রত্যক্ষ হইতে জাত অনুমান-প্রমাণ মাত্র মানেন, জ্ঞান-প্রমাণ মানেন না—শাস্ত্র-প্রমাণ মানেন না—তাঁহারা শাস্ত্রের কথা কিরূপে বুঝিবেন বা বিশ্বাস করিবেন? আমরা এস্থলে কেবল আমাদের শাস্ত্রের কথাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাহা হউক, আমরা শাস্ত্র-অনুসারে জগতের এই দেবাসুর-সংগ্রামতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবাসুর-সংগ্রামে যতদিন অসুরগণ প্রবল থাকে, ততদিন সৃষ্টির উন্নতি হয় না। দেবতার জয়েই সৃষ্টির উন্নতি। অসুরশক্তিকে অভিভূত করিয়া দেব-শক্তির অভ্যুদয় হইলে তবেই জগতের ক্রম-পরিণতি হইতে পারে। প্রথমে সৃষ্টির আরম্ভে যে দেবাসুর-যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিব। প্রথম সৃষ্টি প্রাকৃত-সৃষ্টি। পরম পুরুষের অধিষ্ঠানহেতু মূল প্রকৃতি হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহাকেই প্রাকৃত-সৃষ্টি বলে। প্রকৃতির পরিণাম বা বিবর্ত্তন হইতে এই সৃষ্টি হয়। মূল প্রকৃতি—সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন ভাবযুক্ত। সুতরাং এই প্রাকৃত-সৃষ্টিও এই তিন ভাবযুক্ত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতায় আছে—

"যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২

আমরা দেখিয়াছি যে এই ত্রিবিধ ভাব-বিকার হইতে প্রথম চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। সাংখ্যদর্শনে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই তত্ত্ব-সৃষ্টিকেই প্রাকৃত-সৃষ্টি বলে। এই পরম পুরুষ হইতে প্রকৃতিগর্ভে যে বুদ্ধি-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তাহা হইতেই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। এই সাত্বিক অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, রাজসিক অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, আর তামসিক অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র। বিষ্ণু আমাদের বুদ্ধিতত্ত্বের নিয়ন্তা দেবতা, রুদ্র আমাদের অহঙ্কারতত্ত্বের নিয়ন্তা দেবতা এবং আমাদের মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। রুদ্রের তামস্ ভাব হইতে ভূতসৃষ্টি। শ্রুতিতে আছে "তস্মাদ্ধ এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।১)। বেদান্ত অনুসারে সূক্ষ্ম ভূত সৃষ্টির এই ক্রম। আত্মা হইতে আকাশের সৃষ্টি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে পৃথিবী। তাহার পর এই সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চীকৃত (অথবা ত্রিবৃত) হইয়া স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রথমে তন্মাত্র সৃষ্টি হয়। শব্দ-তন্মাত্র প্রথমে সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র, তাহা হইতে রূপ-তন্মাত্র, তাহা হইতে রস-তন্মাত্র, এবং তাহা হইতে গন্ধ-তন্মাত্র। এই তন্মাত্র হইতে ভূত সৃষ্টি হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজঃ, রস-তন্মাত্র হইতে অপ্, আর গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী। এইরূপে স্থূলভূতের উৎপত্তি। এই তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম-ভূতের, এবং স্থূল-ভূতের যাঁহারা অভিমানী দেবতা—তাঁহারা প্রাকৃত অসুর। ইহাঁরা রুদ্র-সৃষ্টির অন্তর্গত। গৌণকল্পে ইহাঁরা সেই আদিস্রষ্টা পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন। আত্মা হইতেই আকাশের উৎপত্তি। অসুর কথার মূল অর্থ—বল বা শক্তি। ঋগ্বেদের "মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একম্" প্রভৃতি মন্ত্র হইতে এই অর্থ বুঝা যায়। অতএব প্রাকৃত-সৃষ্টির এই অসুরগণ জড়ভূতের শক্তি অথবা এই

শক্তির অধিষ্ঠাতা বা তদভিমানী দেবতা। এই জড়শক্তির উদ্দাম ক্রিয়া সংযত না হইলে জীব-সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য ভগবান স্বয়ং ইহাদের অভিভূত করিয়া জীবসৃষ্টির সহায় হইয়াছেন।

আমরা ইহা হইতে পুরাণে বিবৃত মধুকৈটভবধের কথা বুঝিতে পারিব। প্রলয়ে ভগবান পরম পুরুষ নিদ্রিত থাকেন। প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি নিদ্রা অবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় হিরণ্যগর্ভরূপ হন। তখন প্রাকৃত-তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়া—সেই ব্যক্ত-জগতের অব্যক্ত কারণ মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হন। সেই মহা-কারণাব্ধিশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু নামে অভিহিত। তাঁহা হইতে তখন লোক-পদ্ম সকল কল্পিত হয়।

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" ঐতরেয় উপঃ ১।১। উক্ত তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশ হইতে এই লোক সকল সৃষ্টি হয়। ঊর্দ্ধলোক ভূতগণের অতি সূক্ষ্ম অংশ হইতে সৃষ্ট। নিম্ন-লোকে ভূতগণ আরও স্থূল হয়। তাহার পর সেই হিরণ্য-গর্ভরূপী আত্মা লোকপাল সৃজন করিবার কল্পনা করেন।

"স ঈক্ষতেমে নু লোকপালান্ সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়েৎ।" ঐতরেয় উপনিষদ—১।৩।

অর্থাৎ এই সকল লোক কল্পিত হইলেও সেই সকল লোকপালক সৃজন করিবার জন্য ভগবান কল্পনা করিলেন। এই কল্পনা করিয়া তিনি সেই কারণাব্ধি হইতে এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। ইনিই ব্রহ্ম বা বিরাট্। ইহাই প্রাকৃত-সৃষ্টির প্রথম। তাহার পর এই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ব্রহ্মার জাগরিত অবস্থায় সৃষ্টি থাকে, তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় জগতের নৈমিত্তিক লয় হয়—ত্রিলোক ধ্বংস হয়। ইহাই প্রতিকল্পের সৃষ্টি লয়। এই কাল্পিক লয়কালে ত্রিলোকী ধ্বংস হইলে —তাহার পূর্ব্ব কারণ সেই স্থূল পঞ্চভূতে তাহা পরিণত হয়। সেই কারণাব্ধি মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু শায়িত থাকেন। ঊর্দ্ধ-লোকপদ্ম সকল তাহারই মধ্যে বা নাভিতে অবস্থিত থাকে —এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাতে অবস্থিত হইয়া নিদ্রিত হন। আবার কল্পান্তে সৃষ্টিকালে তিনি জাগরিত হন। ব্রহ্মা—জীবঘন। তিনি জাগরিত হইয়া ক্রমে পূর্ব্ব-কল্প অনুসারে, সেই কল্পের জীবগণের কর্ম্ম বা বাসনা অনুসারে, আবার বৈকারিক সৃষ্টি করেন।

কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রধান অন্তরায় প্রাকৃত অসুরগণ। তাহারা প্রাকৃত মরশক্তির নিয়ন্তা—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রলয়ে যে সকল জীব—বীজরূপে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তাহাদের সংস্কার বিকাশোন্মুখ হইলে, ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া সৃষ্টি-উন্মুখ হইলে, জীবত্ব বিকাশ জন্য তাহাদের শরীর-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। হিরণ্যগর্ভ জীবের প্রাণশক্তি; সেই প্রাণশক্তি হইতেই জীবের সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত জড়-ভূতের সংযোগ হয়, এবং তাহা হইতে জীবশরীর গঠিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই স্থূলভূত উদ্দাম জড়শক্তির দ্বারা —বা তামসিক প্রাকৃত-অনুরাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, ততক্ষণ তাহারা প্রাণশক্তির বশে আসিতে চায় না। যতক্ষণে সে জড়শক্তি সংযত না হয়, নিয়মিত না হয়, প্রাণশক্তির দ্বারা অভিভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই জড়ভূত হিরণ্যগর্ভের প্রাণশক্তির বশে জীবশরীর গঠন-উপযোগী হয় না। এই জন্য তখন সেই জড়শক্তিকে—বা প্রাকৃত অসুরগণকে প্রথমে পরাভূত করিতে হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চভূত প্রাকৃত সৃষ্টি। পরম পুরুষ হইতে তাহারা প্রকৃতিগর্ভে সৃষ্ট। এজন্য ব্রহ্মা তাহাদের নিয়মিত করিতে পারেন না।

আরও এক কথা। কাল্পিক প্রলয়ে ত্রিলোকীর নাশ হইয়াছিল। জড়ভূত হইতে যে ত্রিলোক-পদ্ম সৃষ্টি হইয়া-ছিল—কাল্পিক প্রলয়ে তাহা আবার সেই স্থূলভূতের কারণা-বস্থায় পরিণত হইয়াছিল। সেই কারণাবস্থাকে নীহারিকা বল, আর অতি দীপ্তিমান অণ্ডাকার বল, যাহাই হউক তাহা হইতে আবার 'ভূর্ভুবঃ স্ব' বা স্বর্গমর্ত্ত্য পৃথিবী অথবা সগ্রহ উপগ্রহ এই সৌরজগৎ সৃষ্টি না হইলে, ইহাতে জীবসৃষ্টির বা জীবের বিকাশের সম্ভব হয় না। যতক্ষণ তত্ত্ব হইতে এই লোক সমুদায় সৃষ্টি না হয়, বা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর বিস্তার না হয়, ততক্ষণ জীবঘন-সমষ্টি প্রাণশক্তি বা ব্রহ্মার পক্ষে জীবসৃষ্টি বা বৈকারিক সৃষ্টি অসম্ভব থাকে। সুতরাং ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে ভগবানের 'নাভি কমল' হইতে উদ্ভূত, যে লোকপদ্ম মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, তাহা হইতে এই ত্রিলোকের পুনঃ সৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মা তাহাতে পুনঃ সৃষ্টি করিবার জন্য অবস্থিত হন।

কিন্তু তখনও প্রতিলোকেই বিশেষ ভূলোকে প্রকৃতির জড়শক্তির উদ্দাম ঘোর লীলা চলিতে থাকে, তখনও পঞ্চভূত জীবশরীরোৎপাদক প্রাণশক্তির বশীভূত হয় নাই—তখনও

পৃথিবী সর্ব্বত্র জলমগ্ন। সুতরাং তখনও পৃথিবী জীববাসোপযোগী হয় নাই। তখনও জীবসৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। যতক্ষণ স্বয়ং ভগবান জাগরিত হইয়া অর্থাৎ বিষ্ণুরূপ পরম পুরুষ নিদ্রাবস্থা ত্যাগ করিয়া, হিরণ্যগর্ভরূপ স্বপ্নাবস্থা ত্যাগ করিয়া, বিরাটরূপ জাগরিত অবস্থায় আসিয়া প্রাকৃত অসুরশক্তিকে পরাভূত করিয়া হিরণ্যগর্ভের প্রাণশক্তি দ্বারা জীবশরীর বিকাশের উপযোগী করিয়া না দেন, ততদিন ব্রহ্মার জীবসৃষ্টি সম্ভব হয় না। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবেন কি—সে অতি বলবান ঘোর অসুরগণ তাঁহাকেই নিহত করিতে উদ্যত, তাঁহার সমষ্টি প্রাণশক্তিকে নষ্ট করিতে অগ্রসর। তখন ব্রহ্মা নিরুপায় হইয়া বিশেষ তপস্যা করেন। সেই তপস্যায় ভগবান জাগরিত হইয়া এই অসুর বধ করেন। পুরাণে এই অসুর বধের তত্ত্ব "মধুকৈটভবধ" উপাখ্যানছলে বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে এই মধুকৈটভবধবিবরণ বুঝিতে পারি। চণ্ডীতে আছে—

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবী কৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজং কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ॥"

বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত এই মধু কৈটভ অসুর কাহারা? সমষ্টি-তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত, এবং স্থূলভূতের অধিষ্ঠাতা অথবা অভিমানী দেবতাই এই অসুরগণ, পুরাণে মধু ও কৈটভ নামে অভিহিত। ইহারা বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত। কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মলিন বা তামসিক অংশ হইতে শব্দ-তন্মাত্র সূক্ষ্ম আকারে ভূতের বিকাশ হয়। "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দ-তন্মাত্র হইতেই বা সূক্ষ্ম আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র, (সূক্ষ্ম বায়ু) তাহা হইতে রূপ-তন্মাত্র (সূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্ব), তাহা হইতে রস-তন্মাত্র (সূক্ষ্ম জলতত্ত্ব) এবং তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র (সূক্ষ্ম পৃথিবীতত্ত্ব) সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাকৃত প্রলয়ের পর যখন প্রাকৃত-সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি হয়, তখন এই সকল তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই তন্মাত্রই মধু বা স্থূল ভূতের সার। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধু-ব্রাহ্মণে আছে—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। * * * ইয়া আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, আসাং অপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। * * অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্য অগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। * * * অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানং মধু, অস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" * * ইত্যাদি। ২।৫।১—৪।

অতএব "এই পৃথিবী অগ্নি বায়ু অপ্—ইহারা সমস্ত ভূতের (জীবের বা প্রাণীর) মধু বা কার্য্য (মধু=কার্য্যং—শাঙ্করভাষ্য)। কারণ ইহারা সর্ব্বভূত-নিবর্ত্তিকা, সেইরূপ সর্ব্বভূতও এই পৃথিব্যাদির কার্য্য। আর পৃথিব্যাদিতে যে অধিদৈবত অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, তিনিও সর্ব্বভূতের উপকারক বলিয়া মধু।" এই অধিদৈবত পুরুষই ব্রহ্ম—তিনিই ইহাদের নিয়ন্তা। অতএব পরম পুরুষ হইতে এই প্রথমোৎপন্ন সূক্ষ্ম-ভূতাদি তাঁহার কার্য্য, আর তাহারাই স্থূলভূতের আদি। ইহা হইতে আমরা এই কারণাত্মক ভূতগণকে মধু বলিতে পারি। আর "কৈটভ"—তাহা স্থূলভূতগণ। কৈটভ (কীট+ভা+ঘে+ড) অর্থাৎ যাহা কীট অর্থাৎ কঠিন বা ঘন ও দীপ্তিবান। ইহাদিগকে বিজ্ঞানের ভাষায় নীহারিকা (nebula) বলি, অথবা অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত আকাশাদি ভূতের একত্র সমাবেশ বলি। ইহাই সৃষ্টির প্রথম অবস্থা। ইহাদের অভিমানী বলবান দেবতা এই মধু ও কৈটভ। বলিয়াছি ত, কাল্পিক প্রলয়ে ত্রিলোকী ধ্বংস হইলে, তাহারা এই অবিশেষভাবে পঞ্চভূতে পরিণত হয়। তখন মধুকৈটভের আধিপত্য। তাহার পর সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার পৃথিব্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাহাতেও কেবল সেই উদ্দাম জড়ভূত শক্তির লীলা,—সেই মধু-কৈটভের আধিপত্য। সে অবস্থায় ব্রহ্মা লোকপদ্মে অবস্থান করিয়াও জীবসৃষ্টি করিতে অসমর্থ। ব্রহ্ম যে জীবজাতির কল্পনা সৃষ্টি অনুসারে প্রথম নামরূপে ব্যাকৃত করেন, তাহাকে সৎরূপে বিবর্ত্তিত করিতে হইলে সেই জীবদের স্থূলশরীর গ্রহণ করাইতে হয়। পূর্ব্বকল্পে যে জীবের যতটুকু বিকাশ হইয়াছিল,—তাহার যেরূপ সংস্কার বীজরূপে কল্পান্তে প্রকৃতিতে লীন ছিল, তদনুসারে তাহাদের প্রাণশক্তি দিয়া—তাহাদের সেইরূপ শরীর গ্রহণ করাইয়া ব্রহ্মার সেই বৈকারিক-সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। পূর্ব্বকল্পে জীবনের যতদূর বিকাশ হইয়াছিল, এ কল্পে আবার তাহাদিগকে

শরীর গ্রহণ করাইয়া, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করাইয়া তাঁহাদের আরও উন্নত করাইতে হইবে। এ কারণ ভগবান ব্রহ্মাকে (কার্য্যব্রহ্মকে) আবার কাল্পিক সৃষ্টি করাইবার জন্য প্রবুদ্ধ করেন। কিন্তু যতক্ষণ জড়ভূতের উদ্দাম, উৎকট লীলা, যতক্ষণ ত্রিলোকে মধুকৈটভের প্রভাব, ততক্ষণ ব্রহ্মার এই পূর্ব্বকল্প অনুসারে জীবসৃষ্টির উপায় নাই। যতক্ষণ জড়শক্তি অভিভূত না হয়, যতক্ষণ তাহারা প্রাণশক্তির দ্বারা সংযত ও নিয়মিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূলভূত হইতে জীবশরীর সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জড় ও জড়শক্তি ভগবানের প্রাকৃত-সৃষ্টি বলিয়া ব্রহ্মার অধীন নহে, ব্রহ্মা তাহার নিয়ন্তা নহেন। এই তামসিক প্রকৃতিজ জড় ও জড়শক্তি অধিক প্রবল হইলে, সাত্ত্বিক প্রকৃতিজ বুদ্ধি মন প্রভৃতির অভিভূত হইবার সম্ভাবনা,—সেই বুদ্ধিতত্ত্বের নিয়ন্তার অভিভূত হইবার সম্ভাবনা,—সেই বুদ্ধিতত্ত্বের নিয়ন্তা ব্রহ্মারও অভিভূত হইবার সম্ভাবনা। গীতায় আছে—

"রজস্তমশ্চাভিভূয়, সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।" ১৪।১১

এইজন্য এই জড়শক্তিকে প্রাণশক্তির দ্বারা অভিভূত ও অধীন করিয়া জীবশরীর সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকে উৎকট আরাধনা বা তপস্যা করিতে হয়। চণ্ডীতে আছে, ব্রহ্মা সেই যোগনিদ্রারূপিণী তামসী দেবীকে (মহাকালীকে) স্তবে তুষ্ট করিলে, তিনি ভগবানকে ত্যাগ করেন, ভগবান জাগরিত হন, এবং এই জড়শক্তি বা মধু-কৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিহত করেন। এই সময়ে এ পৃথিবী প্রায় সর্ব্বত্র জলমগ্ন বা কারণ-বারিতে লীন ছিল,

"তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ। চণ্ডী ১।৯৬

এই জন্য এই অসুরগণ ভগবানকে বলিয়াছিল,—

"আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।"

—চণ্ডী, ১।৯৮

অর্থাৎ যে স্থান জলপরিব্যাপ্ত নহে, সেই স্থানে আমাদিগকে বধ করুন। এই জন্য যেখানে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত জলের আবরণ অপসৃত হওয়ায় কঠিন মৃত্তিকা প্রকাশ হইয়া যে অংশ জীবের বাসোপযোগী হইয়াছিল, সেই স্থানে জীবশরীর সংগঠনহেতু হিরণ্য-গর্ভের প্রাণশক্তি-বশে শরীর-গঠনের (organised হইবার) উপযুক্ত হইবার জন্য ভগবান তাহাদিগকে বধ করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের জড়শক্তিক্রিয়া সংযত ও নিয়মিত করিয়া তাহাদিগকে জৈবশক্তির অধীন ও সেই শক্তিক্রিয়ার উপযোগী করিয়া দিলেন। এই মধু-কৈটভের মেদ বা স্থূল অংশ হইতে এই পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ইহার এক নাম মেদিনী। ইহাই পুরাণোক্ত মধু-কৈটভবধ। ভগবান যদি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পঞ্চভূত মধ্যে উদ্দাম, অনিয়ত, ঘোর জড়শক্তি ক্রিয়া সংযত করিয়া না দিতেন, যদি জীবগণ ব্রহ্মার তপস্যায় অথবা সমষ্টি জীবগণের স্ফুটনোন্মুখ প্রাক্তন-সংস্কারবশে পুরুষসৃষ্টির জন্য উদ্রিক্ত উৎকট বাসনার আবেগে, জাগরিত না হইতেন, যদি জীবদের প্রতি করুণা করিয়া এই জড়শক্তি সংহনন জন্য তাহাদের সহিত বহু প্রহরণে বা স্বশক্তিবলে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের অভিভূত না করিতেন, তাহা হইলে আর কাল্পিক সৃষ্টির সম্ভব হইত না, আবার জীব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে যাইতে পারিত না; কল্পপূর্ব্বে যে যেরূপ ও যতটুকু উন্নত হইয়াছিল, সে সেই রূপেই বীজভাবে অবশ হইয়া প্রকৃতিগর্ভে লীন থাকিত। অতএব ইহাই সমষ্টিভাবে জীবকার্য্য জন্য বা দেবকার্য্য জন্য ভগবানের প্রথম আবির্ভাব। ইহাই জীবের প্রতি তাঁহার প্রথম অনুগ্রহ। ইহাই কল্পারম্ভে আমাদের সেই কর্ম্ম-ফলদাতা ভগবানের প্রথম সহায়তা-লাভ!

তাহার পর ব্রহ্মার বৈকারিক-সৃষ্টি। বৈকারিক-সৃষ্টিতে প্রথম ব্রহ্মার তামসি তনু হইতে অসুরগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং তাহার পর ব্রহ্মার সাত্ত্বিক তনু হইতে দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই জগতের সাত্ত্বিক সৃষ্টিসমুদায়ের নিয়ন্তা এই দেবগণ, আর তামসিক সৃষ্টির নিয়ন্তা এই অসুরগণ। ব্রহ্মার রাজসিক তনু হইতে মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সৃষ্টি অন্যরূপেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমে অবুদ্ধি পূর্ব্বক তমোময় স্বর্গ সৃষ্টি করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতমতে ইহাও প্রাকৃত-সৃষ্টির অন্তর্গত। প্রাকৃত সৃষ্টি ভাগবতমতে ষড়বিধ। "মহতের সৃষ্টি প্রথম, অহঙ্কার সৃষ্টি দ্বিতীয়, যাহাতে দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ প্রকাশ হয়। পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূত-সূক্ষ্মের উদ্ভব তৃতীয়। ইহা দ্রব্য-শক্তিমান, ইহাই মহাভূতের উৎপাদক। জ্ঞানেন্দ্রিয়

কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি চতুর্থ। বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং মনের সৃষ্টি পঞ্চম। পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ। তাহার পর ব্রহ্মার বৈকারিক-সৃষ্টি। বৈকারিক-সৃষ্টির মধ্যে স্থাবর সৃষ্টি প্রথম—ইহাই ব্রহ্মার মুখ্য সৃষ্টি। ইহা ষড়বিধ, যথা—বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বীরুধ ও বৃক্ষ। ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টি 'তির্য্যক্‌-যোনি'—ইহারা তমোগুণবিশিষ্ট। গো ছাগ মহিষাদি ভেদে অষ্টাবিংশতি প্রকার। মনুষ্যসৃষ্টি—বৈকারিক-সৃষ্টি মধ্যে তৃতীয়। মনুষ্য রজোগুণপ্রধান। তাহার পর বৈকারিক দেবসৃষ্টি চতুর্থ। ইহা আট প্রকার—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষ, রাক্ষসগণ। ভূত-প্রেতগণ প্রভৃতি সকলই এই সৃষ্টির অন্তর্গত। তাহার পর কুমার সৃষ্টি—ইহাদের সৃষ্টি প্রাকৃত বৈকৃত উভয়াত্মক ; ইহাদের মধ্যে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই আছে।" (ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) * আমরা ইহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বুঝা অতি কঠিন। আমরা কেবল ইহার মধ্যে দেব ও অসুরসৃষ্টির কথা বিবৃত করিব।

আমরা দেখিয়াছি, প্রাকৃত দেবগণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বৈকারিক দেবগণ—বৈকারিক সৃষ্টি মধ্যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবের নিয়ন্তা! এই দেবলোককে প্রধানতঃ দেব ও অসুর, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দেবগণ সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিয়ন্তা, আর অসুরগণ তামসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা। স্থাবর ও তির্য্যকযোনিতে আসুরিক প্রকৃতির প্রাধান্য। আর দেবগণ মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য। আর রাজসিক ভাবে—দেবত্ব ও অসুরত্ব উভয়েরই সংমিশ্রণ আছে। এই জন্য মানুষ মধ্যে দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই বাস করেন ; উভয়েই মানুষকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন। মানুষই এইজন্য দেবাসুর-সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র। প্রতি মানুষের মধ্যে এই দেবাসুর-সংগ্রামের কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব। এই দেবাসুর-সংগ্রামের ফলে অসুরগণের পরাভব ও দেবগণের জয় দ্বারা মানুষের ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জগতে দেবাসুর-সংগ্রামের কথা—সমষ্টিভাবে তাহাতে কিরূপে জগতের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

বলিয়াছি ত, জগতের সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। রজঃ তমঃ হীন কেবল সত্ত্বযুক্ত কিছুই থাকিতে পারে না। সেইরূপ রজঃ ও সত্ত্বহীন কেবল তমোযুক্তও কিছুই নাই।

---

* বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার কাল্পিক সৃষ্টি বা বৈকারিক সৃষ্টিতত্ত্ব যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের সৃষ্টিবিবরণ ঠিক ইহার অনুরূপ। উভয় পুরাণে সৃষ্টিবিষয়ক শ্লোকগুলি একই। ভাগবত হইতে ইহার প্রভেদ সামান্য। সকল পুরাণেই সৃষ্টিবিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সকল বিবরণই প্রায় একরূপ।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত বৈকারিক সৃষ্টি-বিবরণ এইরূপ :—

পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, তাহা এই দেবপ্রভু (ব্রহ্মা) চিন্তা করিতে করিতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় স্বর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। অর্থাৎ তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি সৃষ্টিবিষয়ে ধ্যান করায় অপ্রতিবোধবান বহিরন্ত প্রকাশহীন ও সংবৃতাত্মা নগাত্মক সৃষ্টি পঞ্চধা অবস্থিত হইল। নগ (স্থাবর) সকল ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি ; এইজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ। তাহাকে অসাধক দেখিয়া পুনঃ অন্য সর্গ ধ্যান করিলেন। তাহাতে তির্য্যকস্রোতা উৎপন্ন হইল। এই স্বর্গ তির্য্যক্ প্রবৃত্ত (আহার সঞ্চারে জীবিত) বলিয়া তির্য্যকস্রোতা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবেদী (বেদনাশূন্য) উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত অহম্মান অষ্টাবিংশ বধাত্মক, অন্তঃ প্রকাশ এবং পরস্পর আবৃত—পশ্বাদি। তাহাদিগকেও অনধিক বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে, ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখ প্রীতি বহুল বহিরন্তঃ অনাবৃত বহিরন্ত প্রকাশ। এই সর্গতুষ্টাত্মা ব্রহ্মার দেবসর্গ নামে স্মৃত। তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল। তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদিসম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। সত্যাভিধ্যায়ী তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অব্যক্ত হইতে অর্ব্বাক স্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক অধঃ প্রবিষ্ট আহারে জীবিত) বলিয়া অর্ব্বাক্‌স্রোতা বলা যায়। তাহারা প্রকাশবহুল তমোদ্রিক্ত ও রজোধিক। এই হেতু মনুষ্যের দুঃখবহুল ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মকারী বহিরন্তঃ প্রকাশ ও সাধক।

* ব্রহ্মার রজোমাত্রাত্মক তনু হইতে রজোমাত্রোৎকট, মনুষ্যেরা জন্মিল।

সত্যাভিধ্যায়ী জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রজাগণ জন্মিয়াছে, বক্ষঃ হইতে রজোদ্রিক্ত প্রজাসকল উৎপন্ন, রজঃ ও তম উদ্রিক্তেরা উরুজ। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্য প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য।"

স্থাবরে বা তির্য্যক্‌যোনিতে যে তামসিক ভাবের প্রাধান্য দেখিয়াছি, তাহার মধ্যেও সাত্ত্বিকভাব নিহিত আছে; তাহার মধ্যেও চৈতন্য সুপ্ত বা স্বপ্নযুক্ত থাকেন; তাহার মধ্যেও বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়ের বিকাশজন্য, যতই ক্ষীণ হউক, একরূপ চেষ্টা বা প্রযত্ন থাকে। ইহাই তাহার সাত্ত্বিকভাব—অতি ক্ষীণ, অতি অপ্রকাশিত তামস শক্তির দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত। কিন্তু ইহাই তাহার তামসিকতাকে ক্রমে দূর করিয়া সাত্ত্বিকতার দিকে বা প্রকাশের দিকে লইয়া যায়। এই যে ক্ষীণ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ-চেষ্টা, তামসিক ভাবকে পরাভূত করিয়া বিকাশ-চেষ্টা, ইহাই তাহাদের মধ্যেও দেবাসুর-সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফলে নিম্নজাতীয় স্থাবর উচ্চজাতীয় স্থাবরে পরিণত হইতে পারে, উচ্চ জাতীয় স্থাবর নিম্নজাতীয় তির্য্যক জীবে পরিণত হইতে পারে, আর নিম্নজাতীয় তির্য্যক জীব উচ্চজাতীয় তির্য্যক জীবে পরিণত হইতে পারে। ইহাই প্রকৃতির আপূরণে জাত্যন্তর-পরিণামের এক প্রধান কারণ।

জগতের এই দেবাসুর-সংগ্রাম—এবং সেই সংগ্রামকল্পে জগতের তামসিক সৃষ্টি অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ—নানা শাস্ত্রে রূপক বা উপাখ্যানছলে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-উক্ত দুইটি উপাখ্যানমাত্র উল্লেখ করিব। সে উপাখ্যান কি, তাহা যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, তাঁহারা অবগত আছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই। তবে ইহার গূঢ় অর্থ যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই কেবল এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য। এই দুই উপাখ্যানের "বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" বলিয়া পূর্ব্বে 'চণ্ডীমাহাত্ম্য' প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, জগতে আমরা দুইটি বিপরীত শক্তির ক্রিয়া বরাবর দেখিতে পাই। একটি তামসিক, আর একটি সাত্ত্বিক। একটির পরিণাম অবনতি, আর একটির পরিণাম উন্নতি। একটিতে জড়ত্বের বৃদ্ধি করে, অপরটিতে জীবত্বের বিকাশ করে। জগতের যত ক্রমোন্নতি হয়, তত জড়শক্তি সঙ্কুচিত হয়, জৈবশক্তি প্রসারিত হয়। ইহার ফলে জীবের ক্রমোন্নতি হয়। এই পৃথিবী জীবসৃষ্টির উপযোগী হইলে প্রথমে নিম্নতম জীব মৎস্যাদির সৃষ্টি হয়—পরে সরীসৃপাদির বিকাশ হয়। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভীষণ বন্যপশুদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সকল পশুজাতির কতকটা উচ্ছেদ হইয়া মানবজাতির উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর অসভ্য মানুষের বা নরাকৃতি পশুর ক্রমোন্নতিতে সভ্য মানুষের অধিকার বিস্তার হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করিতে পারি যে, চণ্ডীর এই দুই উপাখ্যানে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আভাষ দেওয়া আছে। মহিষাসুর-বধ উপাখ্যানে—বন্য পশুদের অথবা পাশব শক্তির অভিভবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উপাখ্যানে অসভ্য মানবজাতির রাক্ষস প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া মানবের দেবশক্তির বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে।"

চণ্ডীতে এই উপাখ্যান যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে এই তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উপাখ্যানের অসুরের নাম—মহিষাসুর। তাহার সেনানীগণের নাম,—অসিলোম (অসির ন্যায় লোমবিশিষ্ট বা সজারুর ন্যায় আবরণবিশিষ্ট জীব) বিড়াল, মহাহনু (যাহাদের চিবুকের উপরের হাড় উন্নত—এইরূপ বনমানুষের ন্যায়, গরিলা প্রভৃতির ন্যায় জীব) চিকুর, বানর, উদগ্র, করাল, বাকল, তাম্র, অন্ধক, উগ্রবীর্য্য, উগ্রাস্য ইত্যাদি। অতএব এই দ্বিতীয় উপাখ্যানে জগতের তির্য্যকস্রোত। সৃষ্টি কিরূপে অভিভূত হইয়া উর্দ্ধস্রোত দেবসৃষ্টি ও অর্ব্বাকস্রোত মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এ পৃথিবীতেও কিরূপে পশুগণকে অভিভূত করিয়া মানুষ আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ইহাতে তাহারও উল্লেখ আছে। পৃথিবী যখন শীতল হইয়া—স্থলভাগ অনেক স্থানে প্রকাশ হইয়াছিল, তখন তাহাতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদের বিকাশ হয় এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে পশুগণেরও ক্রমে আবির্ভাব হয়। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগ ভীষণ মরুভূমিতে অথবা ঘোর অরণ্যানীতে পরিব্যাপ্ত ছিল। চারিদিকে ঘোর হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ছিল। মানুষ যখন এ পৃথিবীতে প্রথম বাস করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার প্রকৃতি তামসিক পশুতুল্য। তাহাকে প্রতিকূল প্রকৃতি ও বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্রমেক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। দেবী ভগবতীর অনুগ্রহে, ক্রমে ক্রমে এই পশুগণ অভিভূত হইয়া মানুষের অধীন হয়। তখন মানুষ অগ্রসর হইতে পারে। তখন তাহার তামসিক প্রকৃতি ক্রমে রাজসিক প্রকৃতিতে উন্নীত হয়।

এই রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিযুক্ত মানুষ উভয়কেই আসুরী প্রকৃতিযুক্ত বলে—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সে, অহঙ্কার অভিমান কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি চালিত। সে মানুষদের সমাজও সেইজন্য এই আসুরী প্রকৃতিযুক্ত। সে সমাজে সাত্ত্বিকতার বিকাশ হওয়া বড় সম্ভব নহে। সেখানে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত মানুষের জন্ম বড় সম্ভব নহে। সেখানে সুতরাং ধর্ম্ম-বিকাশের সম্ভব নহে। সুতরাং সেই সমাজের উন্নতি জন্য, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক শক্তি বিকাশ জন্য বা ধর্ম্ম বিকাশ জন্য দেবাসুর-সংগ্রাম প্রয়োজন হয়। আসুরীয় প্রকৃতির সহিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির সংগ্রামের প্রয়োজন। আমরা চণ্ডী হইতে পাই—স্বয়ং দেবী ভগবতীই এই সংগ্রাম করিয়া, আসুরিক প্রকৃতিকে ক্রমে অভিভূত করিয়া দিয়া, সে সমাজে দেবীপ্রকৃতি-বিকাশের বা ধর্ম্ম-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। চণ্ডীর তৃতীয় উপাখ্যান শুম্ভ-নিশুম্ভবধে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। গীতায় যে আসুরী প্রকৃতির বিবরণ আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভ এই আসুরিক প্রকৃতির অবতার। অহঙ্কার ও অভিমান তাহার প্রকৃত স্বরূপ। তাহার সেনাপতিগণও তেমনই—মোহাত্মক ধূম্র-লোচন, লোভাত্মক সুগ্রীব, কামক্রোধাত্মক চণ্ডমুণ্ড, উৎকট কামনারূপ রক্তবীজ। সে অহঙ্কার লোভবশে মহাসরস্বতী দেবীকে বা পরাবিদ্যারূপিণী দেবীকে গ্রহণ করিতে যায়। গ্রহণ করিতে গিয়া তাহাকে একে একে কাম ক্রোধ প্রভৃতি সেনাপতিগুলিকে ত্যাগ করিতে হয়; শেষে আপনাকে পর্য্যন্ত বলি দিতে হয়। ইহাই শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধের গূঢ় অর্থ। সমাজমধ্যে দেবী ভগবতীর সহায়ে এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহাতেই সমাজের সাত্ত্বিকতা বা সত্ত্ব-শক্তির ক্রমবিকাশ হয়, ধর্ম্মের রক্ষা ও ক্রমোন্নতি হয়।

আর এই পৃথিবীর বা এই সমাজের দেবাসুর-সংগ্রামে স্বয়ং ভগবান—দেবী ভগবতীর সহায়। বলিয়াছি ত, শক্তি শক্তিমানে প্রভেদ নাই। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে কোন স্থলে এই দেবাসুর-যুদ্ধ দেবীর কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোথাও ভগবানের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ এই জীবকার্য্য সাধনের জন্য নিজে অবতীর্ণ হন—ইহা অনেক স্থলে বিবৃত হইয়াছে। যখন জগতের প্রথম জীবসৃষ্টিকালে ক্ষুদ্র জলচর জীবের সৃষ্টি হইতেছিল, তখন ভগবান মৎস্য-কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের ধারণ করিয়াছেন। যখন স্থলে পশুগণের সৃষ্টি হইয়া তাহাদের ক্রমবিকাশ হইতেছিল, তখন তিনি বরাহ নৃসিংহাদি রূপে তাহাদের ধারণ করিয়াছেন। তাহার পর মানুষ সৃষ্টি হইলে, ক্রমে বামন, রাম প্রভৃতি রূপে এবং শেষ 'বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণাদি' রূপে তাহাদের ক্রমে তামসিক অবস্থা হইতে সাত্ত্বিক অবস্থায় নিয়মিত করিয়াছেন। ভগবান ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ ও অধর্ম্ম-নাশার্থ যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।—গীতায় আছে,—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

চণ্ডীতেও সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর এইরূপ উৎপত্তির কথা আছে—

> "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং আবির্ভবতি সা যদা।
> উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

চণ্ডীতে দেবী স্বয়ং দেবগণকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—

> "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

চণ্ডীর শেষেও ঋষি মেধস্ এই কথা বলিয়াছিলেন—

> "এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
> সম্ভূয় কুরুতে ভূপ! জগতঃ পরিপালনম্॥"

অতএব জগতের রক্ষার্থ, ধর্ম্মরক্ষার্থ, দেবত্বরক্ষার্থ, জীবের ক্রমবিকাশ জন্য, মানুষের ধর্ম্মে ক্রমবিকাশ জন্য, এইরূপ স্বয়ং ভগবান, এবং তাঁহার আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী এইরূপে জগতে নানারূপে নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হন। ইহাই জগতের স্থিতি সম্বন্ধে মূল তত্ত্ব, ইহাই জগতের দেবাসুর-যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ, ইহাই জগতের মহা নিয়ম, (Great cosmical law)। এইরূপে স্বয়ং ভগবান এবং দেবী ভগবতীর সহায়ে, দেবগণের চেষ্টায় সিদ্ধগণের করুণায় জীবত্বের ক্রমবিকাশ হয়, মানুষের ক্রমোন্নতি হয়, মানুষের ধর্ম্মের ক্রমে পরিণতি হয়। তাঁহারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জড়শক্তিকে সংযত পূর্ব্বক প্রাণশক্তির অধীন করিয়া দিয়া, পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করেন; তাঁহারাই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে অসুরগণ পরাজয় করিবার শক্তি

দিয়া ও সহায় হইয়া জীবের ক্রমবিকাশ করেন; তাঁহারাই মানুষের মধ্যে সমাজ সৃষ্টি করিয়া, স্বয়ং সমাজাত্মা ও সমাজশক্তি হইয়া সমাজের নিম্ন আসুরিক অবস্থা হইতে রাজসিক অবস্থার বিকাশ করিয়া এবং রাজসিক অবস্থা হইতে সাত্ত্বিক অবস্থায় পরিণত করিয়া, অথবা আসুরী-প্রকৃতিপ্রধান সমাজকে দৈবী-প্রকৃতিযুক্ত সমাজে পরিণত করিয়া, তাহার সহায়ে মানুষের ধর্ম্মরক্ষার পথ ও উন্নতির পথ ক্রমে সুগম করিয়া দেন। ইহাই আমাদের প্রকৃত দৈব। এই দৈবী সহায়তা ব্যতীত আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। এই দৈবতত্ত্ব না বুঝিলে আমরা আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, এবং তাহার কিরূপে অভ্যুদয় হয় এবং পরিশেষে তাহা আমাদিগকে কিরূপে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির পথে লইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারিব না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই দেবাসুর-যুদ্ধ প্রধানতঃ দুই রূপে বুঝিতে হয়। এক সমষ্টিভাবে জগৎ সম্বন্ধে, আর এক ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে। সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে —সর্ব্বত্র নিয়ম একরূপ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইজন্য সামান্য ও বিশেষভাবে এই দেবাসুর-সংগ্রামতত্ত্ব বুঝিতে হয়। সামান্য ও বিশেষ কাহাকে বলে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহা পর-সামান্য দেবাসুর যুদ্ধতত্ত্ব তাহাই সমষ্টিভাবে সমস্ত জগতের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে; আর অপর-সামান্যভাবে, আমরা প্রত্যেক-জাতীয় জীবমধ্যে প্রত্যেক মানুষের সমাজ মধ্যে সেই দেবাসুর যুদ্ধতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই দেবাসুর-যুদ্ধ দ্বারা কিরূপে ক্রমে প্রত্যেক জীব-জাতির বিকাশ হয়, তাহার আভাষ দিয়াছি। কিন্তু সে নিম্নশ্রেণীর জীবজাতির বিকাশতত্ত্ব আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। আমাদের কেবল মানুষের ধর্ম্মবিকাশতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষের সমাজে কিরূপে এই দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে থাকে, আমরা তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। ইঙ্গিতজ্ঞ পাঠক ইহার বিস্তারিত তত্ত্ব চেষ্টা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সভ্য অসভ্য, স্বাধীন পরাধীন সমাজ অনেক আছে। ইহার মধ্যে যে সমাজ প্রধানতঃ তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোক দ্বারা সংগঠিত, তাহাই নিম্ন শ্রেণীর সমাজ। যে সমাজ রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত লোক দ্বারা সংগঠিত, তাহা মধ্যম সমাজ। আর যে সমাজ সাত্ত্বিক, বা সত্ত্বপ্রধান লোক দ্বারা পরিচালিত, তাহাই শ্রেষ্ঠ সমাজ। শ্রেষ্ঠ সমাজ ধর্ম্মপ্রধান; শ্রেষ্ঠ সমাজেই মানুষের ধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিরূপে শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক-সমাজে আমাদের ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সমাজের সহায়ে সমাজাত্মা ভগবান ও সমাজশক্তি দেবী ভগবতী কিরূপে আমাদের ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও অভ্যুদয় করেন, তাহা ক্রমে বুঝিব। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিরূপে দেবাসুর সংগ্রাম দ্বারা সাত্ত্বিক ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

স্মরণে

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

নয়ন-আসার গঙ্গার জলে ধুইয়া যজ্ঞতল,
মঙ্গলঘটে সিন্দুর লেপি', আরোপি' পুণ্যফল;
পূর্ণ হৃদয়-ভৃঙ্গার হ'তে মধু-মঙ্গল-রাশি,
সাধন-বেদীতে উজাড় করিলে কালি-কল্মষ নাশি'!
লক্ষ-যুগের বাসনা-গব্যে আহুতি-দৃপ্ত বল,
পঞ্জর ভাঙ্গা হবির কাষ্ঠে জ্বালালে যজ্ঞানল,
বিশ্বহিতের সাধন-মন্ত্র ওঙ্কার সনে উঠি'
অবসাদ আর জড়তা বিষাদ সব নিয়েছিল লুটি'!

ঝঙ্কারি' তব হৃদয়-তন্ত্র গাহিলে কতনা গান,
মরমের সাধ, প্রাণের সাধনা, হৃদয়ে হৃদয় দান!
এত আয়োজন ফেলিয়া সাধক, তুমি আজ
কোথা র'লে?—
তুমি জ্বেলেছিলে যে দীপ সে আজও
তোমারি আশায় জ্বলে!
যজ্ঞ-অনল তোমার স্মরণে ভিজে যায় আঁখি নীরে,
ওগো ঋত্বিক, জ্বালাতে আগুন আর কি আসিবে ফিরে?

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

২৯

এ সংসারে কেবল একজনমাত্র লোকই সৌদামিনীর নিকট বোধ করি কোন জন্মান্তরীণ কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ ছিল, এবং সেই ঋণ কোনপ্রকার ফাঁকি না চালাইয়া যথার্থ কড়ায়-গণ্ডায় শোধের চেষ্টাও করিতেছে ;—সে বেহারি। যেমন প্রথমাবধি—শেষকালেও তেমনি,—সে তাঁহাকে কথায় বা কার্য্যে কোনরূপেই বঞ্চনা-চেষ্টা করে নাই। নিজের প্রতিশ্রুতিমত যথার্থই সে তাঁহাকে শেষের দিন কটায় বস্তু [illegible] দিতে পারিয়াছিল।

এই অবস্থার রোগী লইয়া কলহ করিয়া বাড়ী ছাড়া—দেশছাড়া হওয়ার দুঃসাহস বেহারিকে সকলের কাছে নিন্দিত করিয়াছিল। বিশেষ, পাড়ার মাতব্বরেরা 'কেষ্টধনের' সহিত অপর্ণার বিবাহ না দেওয়ার খবরে মুক্তকণ্ঠেই এই অর্ব্বাচীন প্রৌঢ়কে দুষিয়াছিলেন। কৃষ্ণধনের রূপে বা গুণে না হোক, দেহের বর্ণে তাঁহার অভিভাবক-দত্ত নামের যথেষ্ট অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছিল। আকর্ণবিস্তৃত শুভ্র ওষ্ঠাধর, মনের নূতন স্ফূর্ত্তিতে ও অনেকখানি আভ্যন্তরিক দন্ত-তাড়নায়ও বটে, সর্ব্বদাই বিকশিত। হঠাৎ দেখিলেই মনে হয়, নাচাইবার জন্য দড়ি-বাঁধা ভল্লুককে বুঝি শাঁক আলু খাইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহারই মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু কম, তাহারা সেই সহসা-খুঁজিয়া-পাওয়া-ভার কুঁচের মত রক্তচক্ষু, সপ্তশিরা-বাহির-করা পুরুষপুঙ্গবের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিতেন, আহা সেই মেয়েটির যেন একগাছি দড়ির অভাব না ঘটে।' কিন্তু বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের দল অনায়াসে মন্তব্য করিলেন,—"আরে রামোঃ! ধেড়ে মেয়ের বর যে জুটছিল এই কত, না! এতে আবার এত দ্যামাক্ কেন! মেয়েটার নেহাৎ আর জাতজন্ম রাখবে না দেখছি!" ক্ষ্যান্তমণি আসিয়া কিছু প্রসন্ন কিছু অপ্রসন্ন মুখে অনুযোগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"দেখ ঠাকুর্ঝি, তুমি ভাই অমন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বেস ফেল্‌তে-ফেল্‌তে বাড়ী থেকে বার হয়ো না ভাই! মা বলে ও'তে আমার মন্নি লাগবে। কেন, ভাই আমার অমন্দ করবে তুমি? আমি তোমার কি করেছি?"

সৌদামিনী কষ্টশ্বাস রোধ করিয়া জিভ কাটিলেন; কষ্টে কহিলেন, "সে কি ভাই, আমি রোগে হাঁপাচ্ছি, এতে তোমার অমঙ্গল কেন হবে! না ভাই, আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোমার ছেলেরা ভাল থাক, মেয়েরা তোমার রাজরাণী হোক। তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও।"

ত্রিবেণীর মুক্ত-সঙ্গমের কিছুদূরে আরও দু'চারখানা ছোটখাট বাড়ীর মধ্যে একখানা ছোটরকম বাড়ী মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে ভাড়া লইয়া বেহারি ছত্রিঘেরা গোরুর গাড়ি হইতে যখন প্রায় কোলে তুলিয়া সৌদামিনীকে নামাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল, তখন তাহার আর একদিনের কথা স্মরণ হইতেছিল। কতদিনই বা পূর্ব্বে, সে একদিন পলাসডাঙ্গা হইতে এই রকমই একখানি গোযানে করিয়া এই দুই রমণীকে তাহাদের আত্মীয়গৃহে আশ্রয় দিতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। আজ কিন্তু তা নয়; আজ সেই আশ্রয় হইতে সে-ই তাঁহাদের আবার টানিয়া বাহির করিয়াছে। রামচন্দ্র, শুধু রামচন্দ্রই জানেন, সে কিছু অন্যায় করিল কি না! কিন্তু এখানে, এই একমাত্র সম্পূর্ণ পর বেহারিকে মাত্র আশ্রয় করিয়া, তাহাদের ভাগ্যে আর যত যা-ই থাক, অপমান যে নাই, এইটুকুই শুধু সে নিজে জানে, আর সেইটুকুই শুধু তাহার মনে গ্লানি আসিতে বাধা দিতেছিল।

কে জানে কে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ কোন্ ছলে, কিসের অহঙ্কারের ফলে, সৌদামিনীকে বুঝি 'পুনর্মূষিক' হইবার অভিশাপ দিয়া গিয়াছেন? কিন্তু অভিশাপ তাঁহার নিখুঁত হইয়া ফলে নাই। কেন না, পূর্ব্বে তো এই সেবাপরায়ণ বেহারিটি তাঁহার সহায় ছিল না! এ যে বিধাতার অতিবড়

স্নেহের দান। কখন কোন যথার্থ ভাল জিনিষ তিনি তাহাকে দেন নাই বটে, কিন্তু এই যে একটিমাত্র দিয়াছেন, সেটি মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদের মতই দিয়াছেন। এমন দেওয়া সকলকে তিনি সব সময় দিতে পারেন না।

বেহারির আত্মোৎসর্গের সীমা ছিল না। কেমন করিয়া সে এই মৃত্যুপথবর্ত্তিনীকে একটুখানি সুখে রাখিবে, ইহাই যেন তাহার ধ্যান, জ্ঞান, ইষ্টমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই নূতন গৃহস্থদের পুঁজিপাটা বড়ই অল্প। নগদ টাকা যে ক'টি ছিল, রাহা-খরচ, বাড়ীর এক মাসের অগ্রিম ভাড়া, প্রভৃতিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। এখন শুধু সুদে-পড়া যে কয়খানি গহনা রাধিকাপ্রসন্ন একদিন সৌদামিনীকে রাখিতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "অন্নপূন্নো বেটির রাঁধুনিগিরির এই মাইনে দিলুম" সেই কয়খানি মরাসোণার লবঙ্গফুল, পাঁচপলি, ও মাটা এক খানি বাজু, শুধু এখন এই পরিবারটির ভরসা। হোগ্‌লা-পাকের বালা দুগাছি অপর্ণার হাতে উঠিয়াছে, বিশেষ দরকার হইলে তাও হয় ত নামিয়া আসিতে পারে।

ত্রিবেণী স্থানটি এক সময় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, এখনও তাহার গত-গৌরবের অনেক চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে। তা'ভিন্ন ইহার আশপাশের মত, বিশেষ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া ইহা ততদূর ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় নাই। মাঘ মাসে এখানে স্নানার্থীর সমাগমের সীমা থাকে না। আবার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহত্যাগের লোভও হিন্দুর পক্ষে কম নয়। এততেও যে এই সকল পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসকল শ্মশানবৎ পরিত্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহার জন্য কতকাংশে আধুনিক সহরঘেঁসা সভ্যতা, এবং বহুলাংশে ম্যালেরিয়াই দায়ী। ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে রোগ-পীড়ার জ্বালায় ভিটায় বাস করিতে সমর্থ হয় না।

দু' একখানি আরণ্য লতা ও অশ্বত্থ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন মানব-পরিত্যক্ত গৃহের পাশে যে কয়খানি ছোট কুঠারিযুক্ত বাড়ীটি বেহারি ভাড়া লইয়াছিল, সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যায়। সৌদামিনী বিছানায় শুইয়া জানালা দিয়া সেই দিকে নজর করিতেই তাঁহার মনের ভিতরটা যেন তখনি সেই শান্তশীতল বারিরাশির মতই শান্ত এবং শীতল হইয়া আসিল। মাথাটা উঁচু করিয়া তিনি দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন। কাশীখ্যাচরণ এবং পতিত-পাবনীর উপরও তাঁহার যেন সেই সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় হইল। এমন ধারাটা না ঘটিলে তো তাঁহাকে সেই-খানের ঘরে শুইয়াই মরিতে হইত! আহা! কে তাহারা গো, তাহার বিপক্ষরূপী ভগবান! রাবণ, কংসের মত তাহাকেও বুঝি মোক্ষদানের জন্য সহসা কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া আসিয়াছে!

দিন দুয়েক পরেই যখন তাঁহার বেশি কথা বলিবার সময় এবং সুবিধা এ দুইটাই এক সঙ্গে সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে, নিঃসংশয়ে ইহা বুঝিতে পারা গেল, তখন একদিন সৌদামিনী বেহারিকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাবার সময় যে এমন নিরালা শান্তিতে যেতে পারবো, এ ভরসা আমার মোটেই ছিল না। কেবল তোমায় পাওয়ার পুণ্য-টুকুতেই এই মস্ত বড় সোয়াস্তিটুকু মা-গঙ্গা আমায় দিলেন। মামা, তোমার ঋণ শতজন্মেও আমার শোধ যাবে না।"

বেহারি স্থানীয় একজন কবিরাজকে একটি টাকা দর্শনী দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কবিরাজীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হাল-ফ্যাসানানুসারে তিনি তাঁহার পুত্রটিকে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ছেলেটি সেদিন বাড়ীতে আসিয়াছিল। যন্ত্র-পরীক্ষান্তে সে বাহিরে আসিয়া বেহারিকে বলিল, ফুস-ফুস যন্ত্রটিতে টাকা-আধুলিপ্রমাণ ছিদ্র অনেকগুলিই জন্মিয়াছে, আহারও প্রায় বন্ধ, সময় প্রায় সমীপাগত। বেহারি সেই কথা শুনিবার পর হইতে রোগিনীর কাছ ছাড়িয়া বড় একটা কোথাও নড়ে নাই। অপর্ণা অনেক রাগারাগি করিয়া একবার শুধু বাজারে পাঠাইয়া তাহার দ্বারা সাবুদানা, মিছরি ও দিয়াশালাই আনাইয়া লইয়াছে। এখন সে ছুতা করিয়া ঘরে এটা-সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুরিতেছিল, কোন রকম কাজ কিন্তু তাহাতে যে হইতেছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সৌদামিনীর কথা শুনিয়া তাহার কান্না আসিল। নিজের কাহারও জন্য এ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি তাহাকে না কি কাঁদিতে হয় নাই; তাই তাহাকে এই কোথাকার কে পরগুলির জন্য ভগবান বারেবারে কাঁদাইয়া শোধ তুলিতেছেন।

এ কি সংসার! এ কয়লার খনিতে নামিয়া গায়ে কালি না মাখিয়া উঠিবার যে যো-ই নাই। সে চোখ মুছিতে মুছিতে মুখখানা আলো আঁধারে আধ ঢাকা দিয়া বিছানার নিকটস্থ হইল।

"বারে-বারে কেন ও সব কথা বলো মা! যদি করা'র মতন একটা কাযও তোমার এ অক্ষম ছেলে করতে পারতো, তাহলেও তবু বুঝতাম। এমন ছেলে কেন যে গর্ভে ধরেছিলি মা, কেন যে নুন খাইয়ে মারিস্‌নি, তাই ভেবে অবাক্ হই! পেটে একটু বিদ্যের আঁচড় থাকলেও তো আজ ছেলের রোজগারে—"

বেহারি কি কথা আনিতেছে সৌদামিনী তাহা বুঝিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী অফল, অপ্রিয় আলোচনাটায় এই শেষ-কালটায় তাঁহার কেমন যেন একটা অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল; আর যেন এ সম্বন্ধে ভাবিবার বা শুনিবার ক্ষমতা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না। তাই যেন কতকটা ভীত হইয়াই ঈষৎ মাথা নাড়িয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন "তা' হোক মামা, ছেলে মেয়ের ভাল - মায়ের সব চেয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা, তা জানি। কিন্তু যা হয় না, তা' মায়ের বুক ফাটিয়ে দিলেও হয় না, তা আমার এই ছার জন্মটাতেই আমি খুব দেখে গেলুম। না-ই হোক মামা, আমার তাতে আর কারোকে কিছু বল্‌বার—দোষ দেবার নেই। মানুষ নিজের-নিজের কপাল সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, সে কি কারু চেঁচামেচিতে বদ্‌লাবে? আমারও এই যে তোমার হাতের সেবা নিয়ে গঙ্গাতীরে মরণ, এ'ও অবিশ্যি আমার পূর্ব্বজন্মের পাওনা,—তা' না হলে দাদাবাবু থাকতে-থাকতেই বা আমার মৃত্যু হলো না কেন? তা জানি,—তবু এক-একবার ভয় হয় বেহারি মামা, তোমায় যদি না পেতুম, তো আজ আমাদের কি হতো?"

বেহারি এবার কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "মা, তোমার কি হতো, তা তিনিই জানেন। রামচন্দ্রই তার কিছু না কিছু উপায় করতেন।—কিন্তু আমার যে কি হতো—আমি তাই কেবল ভাবি। মা কেমন ছিলেন মনে নেই মা! তোমায় পেয়ে,—আমি মা পেয়েছিলুম। সত্যি বলচি মা, এই চুণের ঘরে বসে, তোমার সাক্ষাতে বলচি,—গর্ভে জন্মাতে পারিনি বটে, কিন্তু—"

সৌদামিনীর চোকে জল টলটল করিতেছিল। তার উপরই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ওইটুকুই বোধ করি আমার সবচেয়ে পুণ্যের জোর ছিল, বেহারি মামা! এই যে যাচ্ছি, ঐ আইবড় মেয়ে যে তোমার গলায় গেঁথে দিয়ে যাচ্চি,—শুধু ঐ ভরসাটুকুই রইলো,—আর আমার অনুমতিও রইলো,—মাতাল, জোচ্চোরের হাতে দেওয়ার চাইতে, তুমি নিজে—"

"খুব মজার লোক তুমি যা হোক বেহারি-দা! চারটি কাঁচা কাঠ আমায় দিয়ে এসে দিব্যি এখানে বসে আছ! নতুন উনুন, সে কি ঐ জলশুদ্ধ ভিজে কাঠে ধরে? মা কি আজ উপোস কর্ব্বেন?"

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের পরক্ষণেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করা যায়, এই ভয়াবহ আলোচনার হস্তমুক্ত হইয়া সহসা বেহারি যেন বাঁচিয়া গেল। সৌদামিনী কি যে সঙ্কেত করিয়া কোন্ দিকে যে তাঁহার শেষ চিন্তা লইয়া গিয়াছেন, ইহার অতি ভীষণ ইঙ্গিত দিয়া এই ভয়ানক আলোচনাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে গিয়াও বেহারির সর্ব্বশরীর এই শীতের দিনে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিতেছিল। সে সম্মুখে অপর্ণার অপারগতার ক্রোধে ক্ষুব্ধ মুখ দেখিয়া, নিশ্বাস টানিয়া তাহার মুখের দিকে ব্যাকুল করুণায় চাহিয়া মনে মনে বারম্বার করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল "সীতারাম, সীতারাম, রামচন্দ্র তোমায় রক্ষা করুন! মধুসূদন মধুসূদন!" প্রকাশ্যে কহিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি বসো; আমি ভাল দেখে কাঠ এনে দিচ্ছি।"

মা যে আর বাঁচিবে না, তাহা অপর্ণাও জানিত। এ জ্ঞানটুকু হইতে ভাগ্য-প্রতিপালিতাদের বড় বেশি সময় লাগে, কিন্তু তাঁহার অকৃপাপাত্রীদিগের এ খবর ঘরের খবর, এর জন্য অপরের সাহায্যেরও দরকার হয় না।

মা-হারাইবার মত দুঃখ এ সংসারে সন্তানের পক্ষে বড় অল্পই আছে; বিশেষ, মা বই এ জগতে যাহার আর কেহই নাই। কিন্তু এই মায়ের প্রতি টান যদি যথার্থই অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ হয়,—কেন না যথার্থ প্রেমও স্বার্থ ও পরার্থপরতায় দুই শ্রেণীর আছে,—তাহা হইলে সে এই সমাগত মহা-বিচ্ছেদের মহাবেদনার ভিতরও এই টুটা দিককেই না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। নিজের

যে কত বড় যাইবে, তাহার জন্য বুক ফাটিতে না ছাড়িলেও, তাহার মন্দ তপস্বীর মত শান্তভাবেই অনুভব করিতে চাহিবে 'তাঁহার তো ভাল হইবে, তিনি তো এতদিনের সকল জ্বালার হাত এড়াইবেন!' এই যে সম্মুখে এক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত সুখশান্তির মহাপ্রলোভনের ফাঁদ পাতা, ইহারই মোহে শুধু মানুষ এত বড়-বড় ত্যাগের যজ্ঞে প্রাণের প্রাণকেও আহুতি দিয়া বাঁচিয়া থাকে; আবার শুধু তাই নয়, অনেক সময় গৌরব এবং আনন্দও বোধ করে। অপর্ণাও মায়ের জন্য সেই রকম একটি বড় শান্তির আরাম-কুঞ্জ রচনা করিয়া মনে-মনে সেখানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিজের ভিতর একটা তীব্র জ্বালাময় সুখানুভব করিতেছিল। দিন কাছে এগাইয়া আসিতেছে, বুকের মধ্যে প্রাণটা যতই থাকিয়া থাকিয়া খাবি খাইয়া উঠিতে থাকে, ততই সে সেটাকে থাবড়া দিয়া থামাইয়া দিয়া বলে, 'মরেও যে তিনি তোর হাত এড়াইবেন, এতেও তোর বাদ! তোর ঘৃণা করে না!'

সেদিন ফাল্গুনের শেষ সন্ধ্যা। বাতাসের শীত-শিহরণ নাই বলিলেই হয়। আকাশের গায়ে একটু ধূসর মেঘ দেখা গিয়াছে; আজ না হোক দু একদিনের মধ্যে হয়ত একটা বাদল নামিয়া আসিতে পারে। সৌদামিনীর মাথার দিকের জানালা খোলা; কিছুদূরে মা-গঙ্গার প্রশস্ত জলের ধাধা অল্প রৌদ্রে দূর-প্রযুক্ত মনে হইতেছিল, যেন একখানি প্রকাণ্ড রূপার পাত পড়িয়া আছে; কিন্তু একটু কাছে হইলে দেখা যাইত, সে জলে বেশ বীচিবিক্ষেপকারী একটি মৃদু মৃদু গতি ছিল, এবং বাঁধা ও না-বাঁধা ঘাটগুলিতে আবশ্যক কর্ম্ম-কাজের খাতিরে নরনারীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না।

সৌদামিনী চোক মুদিয়া শুইয়া ছিলেন। চোক চাহিয়া গঙ্গার অফুরন্ত রূপরাশি দর্শন করিবার শক্তিও তিনি না কি আর অধিকক্ষণের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন না। শরীরে ও মনে ঘুমের আবল্যের ন্যায়, নেশার আবেগের মত, দারুণ একটা অবসাদ ক্রমেই তাঁহাকে যেন নিজের অতলের মধ্যে তলাইয়া লইতেছিল। এ জীবনের পরপারে আবার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ হইবে, তাহার সহিত, ইহার যোগ-বন্ধনের বিচ্ছেদের ছুরিকা বোধ করি এই শূন্যময়ী বিস্মৃতিই!

অপর্ণা আজ সকাল হইতেই মায়ের কাছ ছাড়িয়া বাহিরে যায় নাই। একবার সেই যা একটু দুধ গরম করিয়া আনিয়াছিল, তাহাই তাহার মাকে বারে-বারে একটু-একটু করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আহার কয়দিন হইতে বড়ই কম, আজ আরও কমিয়া গিয়াছিল। শেষ-বারের দুধটা গলা দিয়া সহজে যেন নামিতেই চাহিল না। চামচশুদ্ধ হাতখানা বিরক্তির সহিত সরাইয়া দিয়া সৌদামিনী মাথা নাড়িয়া খাইতে অনিচ্ছা জানাইলে অপর্ণা তাঁহাকে তখন বিরক্ত করিল না। আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিয়া গায়ের চাদরটা গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। তারপর আবার একটু পরেই সে যখন খাওয়াইতে গেল, মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া সৌদামিনী অসন্তোষের সহিত কহিলেন "আর খেতে পারি নে অপি, রেখে দে।" অপর্ণা মিনতি করিয়া কহিল "একটু না খেলে হবে কেন মা?"

সৌদামিনী হাসিলেন; কহিলেন "কি আর হবে না মা? হবে যা, তাতো বেশ জানতেই পারচো, তবে আর কেন পীড়ন করো!"

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "আমার যা বল্‌তে বাকি, এই বেলা তোকে বলে নিই অপি। বেশি কিছুই বল্‌তে ভগবান আমায় দেন নি, শুধু আজ তোকে এই বলে আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি,—যে এই পৃথিবীতে যতদিন থাক্‌তে পাবি, সুখী হতে হয়, দুঃখ পেতে হয়, যেমন-যেমন তিনি রাখবেন, তেমনি তুমি থেকো; তাঁকে আমার কিছুই বলবার নেই, তোমায় আমি এই বল্‌চি যেন মাথা উঁচু করে তুমি শেষের দিনে এখান থেকে বিদায় নিতে পারো।"

অপর্ণা মায়ের এই অন্তিম আশীর্ব্বাদে চোক বুজিয়া মাথা নিচু করিয়া সেই মাথাটা তাঁহার বুকের পাশে রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তেমনি ভাবেই রহিল। তারপর মাথা তুলিয়া ভাল হইয়া বসিয়া বাষ্পরোধহীন স্বরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই পারি।"

সৌদামিনী তখনও বলিতে লাগিলেন। কথা কহিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে বুঝা যাইতেছিল, তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না; বলিলেন "আমি এ সংসারে এসে যা পেয়েছিলাম, তার জন্য আমি নিজেকেই দায়ী বলে জেনেছি। সেজন্য ঈশ্বরকেও আমি দায়ী করতে চাইনে।

কিন্তু আজ এই যে যাবার সময় এ পৃথিবীর মাটি ময়লা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা খাড়া করে একমাত্র তাঁর সাম্‌নে যাবার অহঙ্কারটুকু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, এর জন্যে তাঁ'কেই হাজারবার নমস্কার করি। তিনি না পারালে শুধু আমার সাধ্যে এ কুলুতো না। এই অহঙ্কার মেয়েমানুষের,—মানুষের,—এই গর্ব্বটুকুই যেন তুমি—যেন সকল মানুষ—সম্বল রাখে—আমার এই আশীর্ব্বাদ, এই প্রার্থনা,—তোমাদের কাছে, আর তাঁরও কাছে।—"

পরদিন সকালবেলাতেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জ্বরটা অকস্মাৎ হু-হু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল, কাশীর সঙ্গে রক্তও অনেকখানি উঠিল। বেহারি মুখ কালী করিয়া কবিরাজ ডাকিয়া আনিলে, তিনি নাড়ি টিপিয়া তাহাকে চোকের ইঙ্গিতে আসল খবর জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তবু কিছু না করা ভাল দেখায় না, তাই বলিয়া গেলেন "কুক্‌সীমার পাতার রসে এক মোড়া মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়াইতে পারো।" বেহারি কবিরাজের পশ্চাতে অনুপান সংগ্রহ চেষ্টায় ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, সৌদামিনী ডাকিলেন "বেহারি!"

তাঁহার গলার স্বর বসিয়া গিয়াছে, খুব কাছে না বসিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। সে কণ্ঠ শুনিয়া অপর্ণা দাঁত দিয়া জোর করিয়া নিজের ঠোঁট চাপিয়া ধরিল। বেহারি স্পষ্ট ডাক না শুনিলেও অস্পষ্ট শব্দটায় মুখ ফিরাইতেই তাহার দিকেই উৎসুক দৃষ্টির অনুসরণে আহ্বান অনুভব করিয়া ফিরিয়া কাছে আসিল। "ওষুধটা ঠিক করে আনি ছোট মা!"

সৌদামিনী তাহাকে ইঙ্গিতে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পালিত হইলে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "ওষুধের দরকার নেই, তা'তো তুমি জানতেই পার্‌চো মামা, আর কেন?—"

অপর্ণা এ ধাক্কাও প্রাণপণে সাম্‌লাইয়া রহিল। বেহারির চোক দিয়া দরদর করিয়া জলের ধারা বহিয়া গেল। সৌদামিনী দুজনকারই মুখের দিকে চাহিয়া তারপর আবার বলিলেন "অপিকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি,—তোমায় কিছুই বলবার দরকার নেই, তা আমি জানি; তুমি এইটুকু শুধু দেখো—যেন হিন্দুর মেয়ে নিজের কুলধর্ম্ম, জাত, মান বজায় রেখে মরতে পারে। তুমি নিজেই ওকে—"

"মা, মা, ছোট মা, চুপ করো, কিছু বলো না মা, না মা, না—"

বেহারি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে গেল। শেষের কথাটায় মরণাহতা তাহাকে যেন একটা জ্বলন্ত লোহার ডাঙ্গস দিয়া পিটিয়াছিলেন। পাছে অপর্ণা ইহা শুনিতে পায়, অর্থবোধ করিতে পারে, বেহারি সেই ভয়ে, শঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িয়া তাই বাধা দিল।

কিছুক্ষণ অমনি কাটিয়া গেল। রোগিণীর শ্বাসকষ্টে যেন বুক চাপিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। একটা কাশীর ধমকের পর সেটা ক্ষণেকের জন্য একটু প্রশমিত হওয়ায় কহিলেন "আজ সবার উপর হ'তেই দুঃখ অভিমান সব ভুলে, সবাইকেই আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, বেহারি মামা,—কিন্তু এ কি আমার মনের পাপ বলো দেখি? শুধু সেই একজনকেই আজ পর্য্যন্ত আমি কোনদিনই ভালরূপে ক্ষমা করতে পারিনি। আর তাকেই শুধু এখনও ক্ষমা করে, আশীর্ব্বাদ করে যেতে পারচিনে। আমার মনে হয়, আমি তাকে মাপ করিনি ব'লে ভগবানও যেন তাকে তাই মাপ করতে পারচেন না। আর এ'ও আমি বুঝতে পারচি, সেই পাপেই আমার এ দেহ থেকে প্রাণ বা'র হয়েও বা'র হচ্চে না। কিন্তু কি করি, হাজার চেষ্টা ক'রেও মনের ভেতর থেকে আমি তাকে ক্ষমা ক'রে যেতে পারলাম না। কেন পারিনি, তা জানো মামা? সেই আমার অপর্ণার বিধিদত্ত বর! সে নিজেই ভগবানের সেই প্রত্যাদেশ নিজের কাণে একদিন শুনেও ছিল; শুনে তা মেনেও ছিল। কিন্তু তারপর! তারপর লোভ! দারুণ লোভ তাকে কি করালে জানো? মহাপাতক! দুঃখী অনাথার সঙ্গে নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতা করালে! তাই মেয়ে আমার কুমারী থেকে গেল।—হয় ত কখন-না-কখন বিয়েও হবে,—কিন্তু তাতে তো ভোগ হবে না! নিজের জন্ম-জন্মান্তরের প্রকৃত স্বামী না পেলে কি হিন্দুর মেয়ের,—কোন সতী-মেয়ের তা ভোগ হয়? তা, হয় না। হিন্দু মেয়েদের এই যে যোগ্যতা-বিচার নেই, দেনা-পাওনার হিসাব নেই, শুধু সেবার জন্য সেবা,—শুধু ভক্তির সুখেই স্বামী-ভক্তি, এ কি মনে করো এক জন্মের শেখা জুটো মুখের কথায় হয়? না বেহারি! এ সম্বন্ধ জন্ম-জন্মের, যুগযুগান্তরের! কোন্ পাপে, কোন্ মহাপাতকে—নরনারীর এ জোড় যে ভেঙ্গে যায়,—তা

কেবল তিনিই জানেন,—কিন্তু এ জোড় না মিল্‌লে, যার যে, তাকে না পেলে, যথার্থ ক'রে পাওয়া হয় না। সে জোড় কেউ জোর করে মেলাতে পারে না। তাই তোমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এতবড় সম্বন্ধে কি কেউ কারুকে জোর করে আন্‌তে পারে? তাই মেয়ে আমার কাঙ্গালিনী, অনাথিনী! জানো বেহারি, এইজন্যেই তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনি, আর এখন পর্য্যন্ত পারচি নে!—"

অপর্ণার দংশিত অধরে রক্ত জমিয়া নীল হইয়া উঠিল, তাহার দুই হাতের অঙ্গুলি পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে বাঁধিয়া থাকিয়া কঠোর পীড়নে কোমল বাহু ব্যথিত করিতেছিল, সে নিজে অনুভব করিতেও পারে নাই।

বেহারি সৌদামিনীকে কখন এত কথা এবং এ ভাবের কথা কহিতে শুনে নাই; তাই সে মহাভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়া বুঝিল এই এতদিনকার ছাই-চাপা ভিতরের আগুন আজ খুব সহজ ফুৎকারে জ্বলিয়া এ সর্ব্বনাশী শিখায় দেখা দেয় নাই! ইহা সমুদয় জীবনীশক্তি ক্ষয়ের শেষে কীটদষ্ট ঘুনের ভিতরকার কীটের মতই সর্ব্বর ধ্বংস করিয়া আজ নিজেকে বাহির করিয়াছে! সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভগবান যাকে দিয়ে যা করান মা, সকলই তো তাঁরই লীলা!"

সৌদামিনী উহারই ভিতর একটু গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "না মামা, ভগবান এ সব করান না,—মানুষেই করে। তবে একটা বিষয়ে আমি তাঁকে শুধু দায়ী করি। তিনি মানুষের মনটা তো গড়েছিলেন; তা সেটাকে এমন কুৎসিত, এমন নোংরা, এমন কুটিল করে কেন সৃষ্টি করলেন? এই মনই যদি সমস্ত ভালমন্দের কর্ত্তা, তবে তাকে শিব না করে বানর কেন তিনি করতে গেলেন? এইটি আমার বড় দুঃখ হয়! তা হোক বেহারি মামা, তিনি যেমন ভাল বুঝেছেন, তাই করেচেন। মানুষকে তিনি মন্দ প্রবৃত্তিও দিয়েচেন, কিন্তু ভাল হতেও তো তাদের তিনি মানা করেন নি। মানুষ যদি ভালটা না নেয়, মন্দ হওয়ার দিকেই মন দেয়, তবে তিনি কর্ব্বেনই বা কি? মন্দ কাজের শাস্তিটা যদি সেই জন্মেই দিতেন, তাতে তো রীতিমত পাপের শাস্তি হতো না, তাই একটা জন্ম ঘুরিয়ে দেন। হয় ত এই ভাল,—তাঁর কাজের আবার ভাল মন্দ কি? হয় ত জগতে ঠিক যেমন যেমনটি হচ্চে, এর সবই ভাল!"

সৌদামিনী এই রোগেরই ধর্ম্মে ক্লান্তি না মানিয়াই বকিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু আর যে বেশিক্ষণ তাঁহার ক্ষত শুষ্ক রসহীন জিহ্বা জাগতিক কোন শব্দই উচ্চারণক্ষম রহিবে না, অপর্ণা ও বেহারি তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছিল।

স্বর ভাঙ্গিয়া ক্ষীণ হইয়া গেল,তবু অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন, "বেহারি, ঐ শোন, কে যেন আমায় বল্‌চে! আশ্চর্য্য কথা শোন! কিন্তু সত্যি, তা সত্যি!—না না, আজ ক্ষমা না করে যাবার আমার উপায় তো নেই! সে যে আমায় মা'বলে ডেকে কোলে উঠবে বলে দু'হাত বাড়িয়ে একদিন আমার কোলের কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল! আমি ডাকিনি, সে আপনি এসেছিল! সে দিনের মত সুখ,—এ পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে অবধি আমায় কেউ দেয়নি। মন্দভাগ্যের বোঝা—নিজের সন্তানরাও না!—আজ তবে যাবার দিনে তার অতবড় অপরাধ ক্ষমা না করেই যদি আমি চলে যাই, তাহ'লে সে মাতৃত্ব আমার যে ক্ষুণ্ণ হবে, লজ্জায় যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে! ক্ষমা, তাকেও ক্ষমা করবো বেহারি, ক্ষমা করেই যাবো। ক্ষমা না করে যেতে পারলুম না।"

সহসা নিশ্বাস বড় দ্রুত বহিল, অর্দ্ধ নিমীলিত চোখের তারা দুটি ক্রমশঃই যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল; কাঁদিয়া উঠিয়া বেহারী কহিল "মা, মা, ছোট মা! তোমার ছেলেকে তুমি কার কাছে দিয়ে যাচ্চো, তাকে আজ যথার্থই মাতৃহীন করে গেলে যে মা!—"

সৌদামিনী ততক্ষণে বোধ করি পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়া উর্দ্ধপানে এক পা উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃ-পরিশূন্য মেঘঢাকা-চন্দ্রছায়াবৎ দৃষ্টিহীন নেত্রতারকা উর্দ্ধের বিশালতা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই যেন উর্দ্ধপানে দৃষ্টি করিল। (ক্রমশঃ)

মুসলমান-আমলে ভারতে শিক্ষা-বিস্তার-ইতিহাসের এক অধ্যায়

[কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম. এ. বি. এল., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার]

ভারতে মুসলমানদের রাজত্বকালে কেবল যে দিল্লীর বাদশাহেরা শিক্ষা-বিস্তার ও বিদ্যোৎসাহে সহায়তা করিতেন, এমন নহে। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র অথচ স্বাধীন মুসলমান রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের তীব্র প্রতাপ সত্ত্বেও মস্তকোন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিল। এগুলিও যে সাধারণ বিদ্যাহবে স্ব স্ব আহুতি দানে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ের বিদ্যাবিস্তার বা উৎসাহের ইতিহাসে দিল্লীর সাম্রাজ্য ব্যতীত অপরাপর রাজ্যগুলি এ বিষয়ে কি করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা না থাকিলে ঐ ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

১। বহমনী রাজ্য

(১৩৪৭—১৫২৬ খৃঃ অব্দ)

বহমনী রাজ্যের কয়েকটী নরপতি শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রভূত উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন এ বিষয়ে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ তোগ্‌লকের সমকক্ষ ছিলেন। যাহা হউক বহমনী বংশের আদি নরপতি বিদ্যাবত্তা বা বিদ্যোৎসাহে আদৌ খ্যাতনামা ছিলেন না। পরন্তু তিনি পার্‌সী জানিতেন এবং নিজ পুত্রগণের শিক্ষায় জন্য যত্ন করিতেন (১)।

মহম্মদ কাসিম্ ফেরিস্তার সময় সাধারণের বিশ্বাস এই ছিল যে "হসন্ গঙ্গু বহমনী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান নরপতির নিকট চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল বেদপাঠ ও ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিতেন। যদিও চিকিৎসক, জ্যোতির্ব্বিদ, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক হিসাবে ব্রাহ্মণেরা ধনী এবং প্রতাপশালী লোকের সহিত মিশিতেন, তথাপি তাঁহারা কখনও প্রকৃতপক্ষে চাকুরি লইতে স্বীকৃত হন নাই। গঙ্গু বহমনীর চাকুরির সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-নরপতিগণ তাঁহাদের রাজস্ব তত্ত্বাবধানের ভার সকল সময়েই ব্রাহ্মণদিগের উপর ন্যস্ত করিতেন (২)।"

হসন্ গঙ্গুর পরবর্ত্তী নৃপতি [১৩৭৫-৭৮ খৃঃ] তুর্কী ভাষায় বেশ কথা কহিতে পারিতেন(৩); কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ্ শাহ বহমনী তাঁহার অপেক্ষা [১৩৭৮—৯৭ খৃঃ] বেশী লেখাপড়া জানিতেন ও বিদ্যাবিস্তারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি পার্সী ও আরবীক ভাষায় অবাধে কথা কহিতে পারিতেন, এবং কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরব ও পারস্য হইতে অনেক কবি তাঁহার সভায় আসিয়া যথোচিত সৎকৃত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মীর্ ফয়জুলা অঞ্জু এই নৃপতিকে একটি গাথা উপহার দেওয়ায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিলেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রভূত সম্মান ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন (৪)। এই নৃপতি দাক্ষিণাত্যে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে অসহায় বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসায় তাহাদিগের অন্নবস্ত্র রাজভাণ্ডার হইতে

---

১ একদিন উক্ত নরপতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে তখন তিনি তাঁহার শিক্ষকের নিকট বোস্তাঁ পড়িতেছেন (ফেরিস্তা ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৬)। বোস্তাঁ যে তখন বালকদের পাঠ্যপুস্তক ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। সিল্‌সিলহি আসফিয়া-প্রণেতা (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১) মোল্লা দায়ুদ্ বিদরীর তুফাতুল—সলাতীন নামক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দায়ুদ্ শাহের এক পুত্র সপ্তাহে তিন দিন, অর্থাৎ সোম, বুধ, ও শনিবারে, ছাত্র পড়াইতেন। এই কয়েকটি পুস্তক তিনি তাঁহার ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন—গণিত শাস্ত্রে 'জাহিদী' 'শরহি—তজ্‌কিরহ্' ও 'তহ্‌রীরি-উক্লিদস্' ('Euclid'); ব্রহ্মবিদ্যায় 'শরহি-মকাশিদ'; এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে 'মুটভ্‌ওয়াল'।

২ ফেরিস্তা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২।

৩ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮।

৪ 'ফেরিস্তা,' ঐ, পৃঃ ৩৪৭।

প্রদত্ত হইত, এবং তাহাদের অধ্যাপনার জন্য সুপণ্ডিত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। (৫)

বিদ্যোৎসাহী বলিয়া ইঁহার যশ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উপরি উক্ত মীর্ ফয়জুল্লা অঞ্জুর দ্বারা তিনি জগদ্বিখ্যাত শীরাজী কবি হাফিজের নিকট সাগ্রহ আমন্ত্রণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, যদি তিনি আসেন তাহা হইলে তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিক দেওয়া হইবে, এবং যাহাতে তিনি নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহারও সমুচিত ব্যবস্থা করা হইবে। এই আমন্ত্রণের সহিত তাঁহাকে উপহার পাঠান হইয়াছিল। ইহা তিনি গ্রহণ করিয়াই অপরকে বিলাইয়া দেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি আসিতে সম্মত হন এবং আগমন-সংকল্পে, দাক্ষিণাত্য হইতে অরমাজে তাঁহার জন্য যে রাজকীয় জাহাজ পাঠান হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করেন। জাহাজ ছাড়িবার কিছু পরেই ঝড় উঠিল; ফলে জাহাজখানিকে বন্দরে ফিরিয়া যাইতে হইল। এই ঝড়ে হাফিজের বিশেষ ক্লেশ হওয়ায় তিনি দাক্ষিণাত্যে আসিবার বাসনা ত্যাগ করেন, কিন্তু কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া ফয়জুল্লার হস্তে নৃপতির নিকট প্রেরণ করেন। এগুলি তাঁহার নিকট পঠিত হইলে পর তিনি হাফিজের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ কবির মনোনীত ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য গুল্‌বার্গার জনৈক পণ্ডিত মহম্মদ কাসিম মশহদীকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। (৬)

এই নৃপতি দরিদ্র ও অসহায়ের পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং অনাথ বালকবালিকাদের জন্য তাঁহার রাজ্যান্তর্গত বিভিন্ন নগরে ও অপরাপর স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া সেই গুলির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ দান করেন। যে যে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি উল্লিখিত হইল; যথা, গুল্‌বার্গা, বিদর, কন্দহার, এলিচপুর, দৌলতাবাদ, চৌল, ও দবুল। (৭)

ইঁহার সুশাসনের জন্য দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইঁহাকে এরিস্‌টট্‌ল্ উপাধি দিয়াছিলেন (৮)। ইঁহার পরবর্ত্তী দুইজন নরপতি গিয়াসুদ্দীন্ শাহ ও শামসুদ্দীন্ শাহ বিদ্যাবিস্তার-কল্পে বিশেষ কিছুই করেন নাই। ইঁহাদের পর ফিরোজ বহমণী সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁনি শিক্ষাবিস্তারাদি কার্য্যে এত উৎসাহী ছিলেন [১৩৯৭—১৪২২ খৃঃ] যে, তাঁহাকে এ বিষয়ে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ তোঘলকের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। তিনি হয় ত সুপণ্ডিত মহম্মদ তোঘলক অপেক্ষাও জ্ঞানী ছিলেন, বহু ভাষা জানিতেন ও ঐ ভাষাগুলিতে কথা কহিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি যে এতগুলি সাহিত্য-সংক্রান্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্যতম কারণ "স্মরণশক্তি"। প্রতি সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে দিবাভাগে বা রাত্রিতে, তিনি জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র ও উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেন। তিনি সুকবি ছিলেন, নানা বিদ্যা জানিতেন ও বস্তুবিদ্যা বিশেষ পছন্দ করিতেন। চারদিন অন্তর রাজকার্য্যে নিরত হইবার পূর্ব্বে কোরাণ হইতে ষোলপাতা স্বহস্তে নকল করিতেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি পুরোহিত, কবি, ইতিহাস-আবৃত্তি-কারী, শাহ-নামা-পাঠক, ও তাঁহার সভাসদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও রসিক ব্যক্তিগণের সহিত থাকিতেন। উপরি উক্ত বিষয়গুলি তিনি এত পছন্দ করিতেন যে, এ-সকলের অধ্যাপনায় তিনি অর্দ্ধরাত্র অবধি নিযুক্ত থাকিতেন। (৯)

ফিরোজ প্রতি বৎসর তাঁহার সভায় জ্ঞানীলোক আনয়ন করিবার জন্য গোয়া ও চৌলের বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে জাহাজ পাঠাইতেন। এরূপ উদ্যম তাঁহারই বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে জ্ঞানী লোক আনাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে খবর বা পরামর্শ লওয়া প্রত্যেক রাজারই কর্ত্তব্য। যে সমস্ত জ্ঞানী লোক তাঁহার সভায় আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা মোল্লা ইশাক্ সারাহিন্দীর নাম পাই। (১০)

ফিরোজ খগোল-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে ভালবাসি-

৫ তারীখ্-ই-কন্দহার-ই-দখ-ন (রচয়িতা মুন্সী মহম্মদ আমীর হামজা) পৃঃ ৪৪।

৬ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭—৩৪৯।

৭ 'ফেরিস্তা', ঐ, পৃঃ ৩৪৯, ৩৫০।

৮ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫০।

৯ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫।

১০ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬।

তেন এবং ১৪০৪ খৃঃ অব্দে সূক্ষ্মরূপে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণাদি করিবার জন্য দৌলতাবাদের গিরিসঙ্কটের সমীপস্থ পর্ব্বত-শিখরে একটি মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। হকীম হুসেন্ গীলানী নামক জনৈক জ্যোতির্বিৎ এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কার্য্যটি সমাপ্ত হয় নাই (১১)।

সায়িদ মহম্মদ গীসু দরাজ নামক এক ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের জন্য প্রভূত খ্যাতি ছিল। ফিরোজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া স্বীয় বুদ্ধি-প্রখরতার বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির যত যশঃ, তদনুযায়ী পাণ্ডিত্য নাই। পরন্তু উক্ত সায়িদের প্রতি তাঁহার ভ্রাতা খাঁ খানানের বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি তাঁহার বাসের জন্য একটি সুন্দর রাজ-প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। (১২)

আহম্মদ্ শাহ বহমণী [১৪২২—৩৫ খৃঃ অব্দ] তাঁহার ভ্রাতা ফিরোজ শাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ পণ্ডিতগণের সম্মান ও তাঁহাদের হিতকল্পে বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত গীসু দরাজকে গুলবার্গার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি নগর ও গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জন্য গুলবার্গার সমীপে একটি বড় মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন (১৩)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আহম্মদ্ শাহ হিন্দুদিগের প্রতি বড় নারাজ ছিলেন এবং বিজাপুর আক্রমণকালে সহরের সন্নিহিত ব্রাহ্মণদের কয়েকটি বিদ্যালয় ধ্বংস করিয়াছিলেন (১৪)।

আহম্মদের পরবর্ত্তী কয়েকটি নৃপতি [১৪৬৩-৮২ খৃঃ অব্দ] বিদ্বান ছিলেন না এবং বিদ্যায় উৎসাহদানকল্পে বিশেষ কিছুই করেন নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে বিদ্যানুরাগী দ্বিতীয় মহম্মদ্ শাহ বহমণী সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি খাজা-ই-জাহানের তত্ত্বাবধানে বিখ্যাত পণ্ডিত সদর-ই-জাহান্ গুস্তরী কর্ত্তৃক শিক্ষিত হন। তিনি প্রভূত বিদ্যা লাভ করেন, ও বিদ্যাবত্তায় বহমণী বংশজাত নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহার আসন ফিরোজ বহমণীর অব্যবহিত পরেই অবস্থিত (১৫)।

ইঁহার রাজত্বকালে মন্ত্রী মহমূদ গাওয়ানের * শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। তিনি নিজে সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি ছিলেন ও গণিতবিদ্যায় তাঁহার প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। দাক্ষিণাত্যে কোন কোন পুস্তকাগারে এখনও তাঁহার রচিত রৌজাতুল্ ইন্শা ও দুই চারিটি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রতি বৎসর খোরাসান ও ঈরাকের অনেক পণ্ডিত মহোদয়কে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন। এই কারণে ঐ দুই স্থানের রাজারা তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মৌলানা আবদুল রহমান মহমূদ গাওয়ানকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মৌলানা আবদুল মন্ত্রী গাওয়ানের স্তুতিবাদ করিয়া একটি কবিতা রচনাও করেন। মোল্লা আবদুল করীম সিন্দী মহমূদ গাওয়ানের জীবনী লিখিয়াছিলেন। (১৬)

কথিত আছে যে, বিদ্যোৎসাহের জন্য তাঁহার দানশীলতা এত অধিক ছিল যে, এমন ছোট বা বড় সহর ছিল না যেখানকার পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট হইতে কিছু-না-কিছু উপকার পান নাই। দাক্ষিণাত্যে অদ্যাবধি তাঁহার অর্থে সাধারণের হিতের জন্য নির্ম্মিত অনেকগুলি সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে বিদরের বিখ্যাত মাদ্রাসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি তাঁহার মৃত্যুর দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (১৭)। ঐতিহাসিক মেডোস্ টেলার ইহার বিষয়ে বলেন, "বিদরে মহমূদ গাওয়ানের নির্ম্মিত মাদ্রাসাটি, সেই সময়ে আর আর যত সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জাঁকাল। ইহা দ্বিতল, ইহার ঘরগুলি প্রশস্ত এবং মধ্যস্থলে সুবৃহৎ চতুষ্কোণ উঠান খিলানে বেষ্টিত। ইহার সম্মুখের দুইটি কোণে অবস্থিত চূড়াগুলির প্রত্যেকটি ১০০ ফিট অপেক্ষা অধিক উচ্চ ও ইহার সম্মুখের দেওয়াল এনামেল টালি দিয়া আচ্ছাদিত এবং এগুলির

১১ 'ফেরিস্তা', ঐ, পৃঃ ৩৮৮।
১২ 'ফেরিস্তা', ঐ, পৃঃ ৩৮৮।
১৩ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮
১৪ 'ফেরিস্তা', ঐ, পৃঃ ৪০২।
১৫ 'ফেরিস্তা', ঐ, পৃঃ ৪৭৭।

* ছবি পৃষ্ঠা দেখুন।

১৬ 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১০—৫১১।

১৭। 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১০। খাফি খাঁর রচিত মুন্তখাবুল লুবাবে, (বিব্লিয়থিকা ইণ্ডিকা) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২, বিবৃত আছে যে এই মাদ্রাসার মসজিদের ইমাম এক সময়ে বজ্রাঘাতে আহত হইতে হইতে সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

উপরে নীল, হরিদ্রা বা লাল রঙের উপর ফুল আঁকা আছে ও কুফিক অক্ষরে কোরাণের বয়েৎসমূহ লিখিত আছে। এইরূপে এই সৌধটি অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। (১৮)

এই কালেজের সংলগ্ন একটি মসজিদ্ ছিল। ইহার সাহায্যে ঐহিক শিক্ষার সহিত ছাত্রদিগকে যে পারমার্থিক শিক্ষাও দেওয়া হইত, তাহা বুঝা যায়। ফেরিস্তার সময়ে সমগ্র মাদ্রাসাটির সৌন্দর্য্য এরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল যে, এটিকে নূতন বলিয়াই মনে হইত; কিন্তু অধুনা ইহার সৌন্দর্য্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। কথিত আছে যে যখন আওরাঙ্গজেব এই স্থান আক্রমণ করেন, তখন তিনি এই সৌধটিতে বারুদ রাখিয়াছিলেন। বারুদে আগুন লাগায় ইহার এক অংশ একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। (১৯)

এই কালেজে ছাত্রদিগের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে তিন হাজার পুস্তক ছিল (২০)।

ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা কত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মহমুদ গাওয়ানের কীর্ত্তি চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। তাঁহার পরমার্থ-সাধনেচ্ছা যতটা বলবতী ছিল, এরূপ সচরাচর কোন ব্যক্তিতে লক্ষিত হয় না। তাঁহার আয় অত্যধিক ছিল। কিন্তু তাঁহার দানশীলতা এত বেশী যে, মৃত্যুর পর তাঁহার ধনাগারে অল্প মাত্র অর্থই অবশিষ্ট ছিল। তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেন; মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করিতেন এবং অনাচ্ছাদিত মাদুরে শয়ন করিতেন।

বহমনী বংশজাত পরবর্ত্তী নৃপতি শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন নাই।

বহমনী রাজগণের আহম্মদ্ নগরে একটি পুস্তকাগার ছিল। ফেরিস্তা এই গ্রন্থাগার দেখিয়াছিলেন (২১)।

জনৈক য়ুরোপীয় মহোদয় বহমনী-বংশভূত নৃপতিগণের লুপ্তকীর্ত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "তৃতীয় এড্ওয়ার্ড হইতে অষ্টম হেন্‌রি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সমসাময়িক রাজগণের সহিত বহমনী রাজগণের তুলনা না হইলেও ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদিগের আদর্শানুযায়ী উচ্চ সভ্যতা বহমনী রাজ্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। মস্‌জিদসংলগ্ন গ্রাম্য-বিদ্যালয়-সমূহের মধ্য দিয়া আরবী এবং পার্সীর শিক্ষাস্রোত যতদূর সম্ভব প্রবাহিত হইত। বিদ্যালয়গুলির স্থিতিকল্পে প্রদত্ত ভূমির আয়ের দ্বারা ঐগুলির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এই উপায়ে ইসলামীয় শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গেসঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মও প্রচারিত হইত; এবং এই প্রণালীর কার্য্যকারিতার চিহ্ন রাজ্যের সর্ব্বত্র অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয় (২২)।"

---

১৮ মেডোস্ টেলার, 'ভারতের ইতিহাস', পৃঃ ১৮৫।

১৯ ব্রিগ্ সাহেব বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আওরাঙ্গজেব বিদর দখল করেন, তখন তিনি এই সুন্দর সৌধগুলিকে বারুদাগার এবং সৈন্যাবাসে পরিণত করেন। হঠাৎ বারুদে আগুন লাগায় মাদ্রাসাটির অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ধ্বংস সত্ত্বেও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে ইহার অতুল সৌন্দর্য্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। চতুষ্কোণ উঠান, কতকগুলি গৃহ এবং একটি চূড়া এখনও নষ্ট হয় নাই।......" 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১০।

কেহ কেহ বলেন যে, জনৈক সৈন্য তাহার এক বন্ধুর উপর বিদ্বেষ করিয়া তাহার কলিকা হইতে জ্বলন্ত গুল লইয়া বারুদের উপরে নিক্ষেপ করে।

পর্য্যটক থেভেনো (Thevenot) যে বিবরণ দেন, তাহা অন্যরূপ। তিনি বলেন যে, জনৈক বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এই কালেজে সৈন্যসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আওরাঙ্গজেবের নিকট পরাজয় মানিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন আওরাঙ্গজেবের সৈন্যগণ সৌধটির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও আওরাঙ্গজেব আক্রমণের সঙ্কেত করেন, তখন উপরি উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুমে বা অপর কোনও প্রকারে বারুদে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়; এবং এই প্রকারে সৌধস্থ সৈন্যগণ আওরাঙ্গজেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অপমানিত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (থেভেনো, 'লিভান্টে পর্য্যটন'; 'টি বেকন', 'ওরিয়েণ্টল এনুয়্যাল' (১৮৪০) পৃঃ ১৮৯, ১৯০; ফার্গুসন্, বিজাপুরের বাস্তু বিদ্যা, পৃঃ ১৩ ও পরবর্ত্তী পৃঃ পৃঃ।

গাওয়ানের মাদ্রাসায় একটি চিত্র বার্গেসের 'পশ্চিম ভারতের আর্কিয়লজিকাল সার্ভের' [৩য় খণ্ড] মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু মেডোস্ টেলার কর্ত্তৃক [১৮৭৫-৭৬] গৃহীত চিত্রটি (ওরিয়েণ্টাল এনুয়্যাল দ্রষ্টব্য) এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।

(২০) 'ফেরিস্তা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৪। মুর্ত্তাজা হুসেন তাঁহার রচিত হদিকাতুল অকালীম্ নামক পুস্তকে বলেন (এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, ওয়ারক ৩৯) যে মহমুদ গাওয়ানের বাটীতে ৩৫,০০০ পুস্তক ছিল। হদিকাতুল একখানি আধুনিক পুস্তক; সুতরাং এই কথাটি কত দূর সত্য বলা যায় না।

২১। ফেরিস্তা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।

স্কটের দক্ষিণাত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

২২। ফার্গুসন, 'বিজাপুরের' বাস্তুবিদ্যা, পৃঃ ১২।

বিদরনগরে মন্ত্রী মহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা (১৪৭৯ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত)

দখল করে। গল্পটি অবিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের অপরাংশে এইরূপ ঘটনার বহু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কাফুর বিজাপুরে যে সকল সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহাদের দ্বারা বিদ্যালয়টি মসজিদে পরিণত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়টি প্রকাণ্ড ও সুন্দর, আয়ত ক্ষেত্রের আকারে বহু স্তরে সুশোভিত ও ত্রিতল; মেরামতের অভাব হইলেও এখনও অক্ষুণ্ণ আছে (২৪)।

হিন্দু রাজগণের পরেও বিজাপুর বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের স্থানাধিকার করিয়া উহার মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছিল।

বিজাপুর মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা [খৃঃ ১৪৮৯— ১৫১০] আদিলশাহ, সাবা নগরীতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং কাব্যের দোষগুণ উত্তমরূপে বিচার করিতে পারিতেন। পদ্য ও গদ্য পরিপাটিরূপে রচনা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার সঙ্গীতে

২। বিজাপুর

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিজাপুর নামটি, বিজয়পুর (City of Victory) শব্দের মতে অপভ্রংশ মাত্র। কিন্তু অন্য ইতিহাসবেত্তার মতে, ইহা বিদ্যাপুরের (City of Learning) রূপান্তর। কথিত আছে যে, বিদ্যাপুর নাম একটি প্রাচীন বিদ্যালয় (College) হইতে উদ্ভুত (২৩)। ঐ বিদ্যালয় এখনও বিদ্যমান আছে এবং কল্যাণের চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের চিরপ্রদত্ত বৃত্তিবলে ইহা পরিচালিত হইতেছে। নিকটবর্ত্তী বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভসমূহে এই দানপত্রের বিষয় খোদিত আছে। খোদিত লিপিগুলি অধিক প্রাচীন নহে। ইহার মধ্যে একটি চালুক্যবংশের (খৃঃ ১১৯২), অপরটি যাদববংশের (খৃঃ ১২৪৯)। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, একদল ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান, মালিক কাফুরের (আলা-উদ্দিনের সৈন্যাধ্যক্ষের) দ্বিতীয় আক্রমণের সময়, মুসলমান সেনার অগ্রগামী হইয়া, বিদ্যালয়ের ব্রাহ্মণ-দিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া, উহা

বিজাপুরে গ্রানাইট-নির্ম্মিত ত্রিতল হিন্দুকলেজ (দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত)

২৩। ফার্গুসনের মতে অগ্রহার শব্দে কলেজ বুঝায়। ইহার মৌলিক অর্থ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি রাজপ্রদত্ত ভূমি।

২৪। ফার্গুসন সাহেবের Architecture at Bijapur গ্রন্থের ৫৮, ৬০, ৬৫, ও ৬৬ পৃষ্ঠায় বিদ্যালয়বাটীর সম্যক বিবরণ লিখিত আছে।

বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁৎকালিক যে সকল সঙ্গীত-বিদ্গণ তাঁহার সভায় আগমন করিতেন, তাঁহারা তাঁহার নিপুণতায় মুগ্ধ হইতেন। তিনি দুই তিনটি বাদ্যযন্ত্র আশ্চর্য্যরূপে বাজাইতে পারিতেন। যখন তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন থাকিত, তখন তিনি সত্বরচিত্ত গান গাহিতে পারিতেন। পারস্য, তুর্কিস্থান ও রুম হইতে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ও সুনিপুণ চিত্রকর তাঁহার সভায় আহুত হইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও পুরস্কৃত হইতেন (২৫)।

আদিলের উত্তরাধিকারী [১৫১০—১৫৩৪ খৃঃ] ইস্মাইল আদিল শাহ্ শাস্ত্র এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া, তাঁহার বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন চিত্র-অঙ্কনে সুনিপুণ ছিলেন, তেমনি রঞ্জন-ক্রিয়া (Varnishing), তীরনির্ম্মাণ এবং চিকনাদি সূচিকার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কবি এবং বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গ ভালবাসিতেন এবং উহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া আপন সভায় রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন। তিনি সুরসিক ছিলেন, এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় রসিকতা প্রায়ই স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা তুরস্ক, এবং পারস্য ভাষা ও সঙ্গীত ভালবাসিতেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার খুড়ী দিল্সাদ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং দিলসাদ তাঁহার পিতার ইচ্ছানুসারে ডেকানবাসীদিগের সঙ্গ হইতে তাঁহাকে পৃথক রাখিয়াছিলেন (২৬)।

১ম ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে রাজকীয় হিসাব পারস্যভাষায় লিখিত না হইয়া হিন্দিভাষায় লিখিত হইত এবং অনেক ব্রাহ্মণ হিসাবসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কারণে তাঁহারা সরকারী কার্য্যে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন(২৭)।

য়ুসুফ আদিল শাহের রাজত্বকালে রাজস্ব-বিভাগে হিন্দুদিগকে অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইত। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, য়ুসুফ, একটি হিন্দুরমণীকে (মারহাট্টা রাজার কন্যাকে) বিবাহ করিয়াছিলেন(২৮)।

ইহাতেই দেখা যায় যে তাৎকালিক মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে পরাজয় করিলেও তাহাদিগের দ্বারা সময়ে পরাজিত হইতেছিলেন, এবং ভাষার আদানপ্রদান ক্রমশঃ সঙ্ঘটিত হইতেছিল।

২য় ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে তারিখ ই-ফিরিস্তাপ্রণেতা মহম্মদ কাসিম [খৃঃ ১৫৭৯-৯৬] নামে জনৈক ঐতিহাসিক তাঁহার সভায় বাস করিতেন।
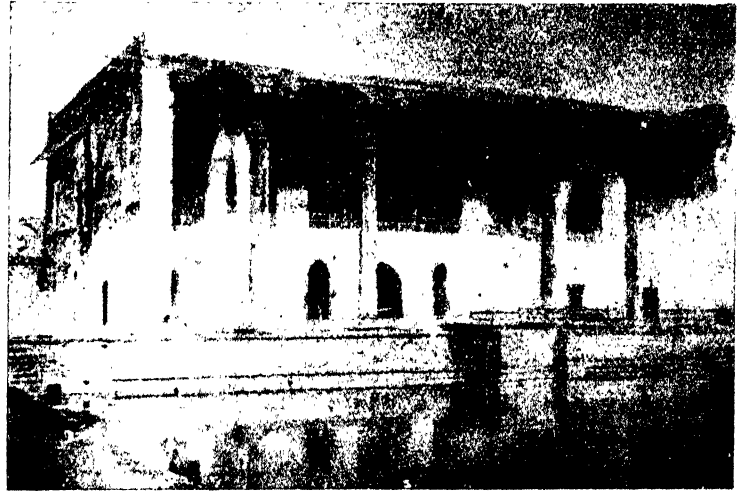
আদিলশাহী পুস্তকালয়

বিজাপুরের আসারি মহলে আদিলসাহী লাইব্রেরীর কিয়দংশ এখনও দৃষ্ট হয়। ফার্গুসন সাহেব বলেন,—লাইব্রেরীর কতকগুলি পুস্তক আরবী ও পারসী সাহিত্যবিদ্গণের বড়ই চিত্তগ্রাহী। কথিত আছে, যে গাড়ী-গাড়ী মহামূল্য হস্তলিখিত পুঁথি বাদশাহ আওরঙ্গজেব এ স্থান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা রক্ষিগণ কর্ত্তৃক বহুমূল্য জ্ঞানে গৌরব ও দুঃখের সহিত প্রদর্শিত হয় (২৯)।

২৫ 'ফেরিস্তা' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮, ৩০, ৩১,

২৬ 'ফেরিস্তা' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৭২।

২৭ 'ফেরিস্তা' ৩য় খণ্ড, পৃঃ৮০।

২৮ 'ফেরিস্তা' ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১।

২৯ ফার্গুসন প্রণীত Architecture at Bijapur পৃঃ ৭০

আব-পতঙ্গ ও আব-কীট

[শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী]

তঙ্গরাজ্যে বিবিধ শ্রেণীর পতঙ্গ দেখা যায়, কিন্তু আমরা :গুলির সহিত তেমন পরিচিত নহি। পরিচিত না হওয়া-:ও আমরা দোষের কিম্বা অবহেলার বিষয় বলি না; :ন না, বিলাতে কীট ও পতঙ্গ-পর্য্যবেক্ষণটাকে সভ্য-াজে বিশেষ একটা প্রাধান্য দিলেও, ভারতে তাহা াধান্য লাভ করে নাই। বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত

আব-পতঙ্গ (ক)

য বিষয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, আমরা কেবল সেই বষয় ও সেই জিনিষকে আমাদের অনুকরণ ও অভ্যাসের াহির-মহলে রাখিয়া দিয়াছি।

কীট ও পতঙ্গতত্ত্ব লইয়া আলোচনা বাঙ্গালাদেশে খুব বেশী হয় নাই, সুতরাং সে বিষয় প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার পাঠক সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালা-দেশে, কীট কিম্বা পতঙ্গতত্ত্ববিদের আবির্ভাবও হয় নাই। অধিকাংশ সময়েই আমরা এ সব বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে কিম্বা অন্য কাহাকেও কিছু বলিতে হইলে, ইংরাজি গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করি। এই সহায়তা গ্রহণ করিয়াও এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া পোকা-মাকড় দেখিয়া সে বিষয়ে জ্ঞাতব্য যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমরা আপাততঃ অত্যন্ত সাধারণ-ভাবে এবং স্বাধীনভাবে অন্য পুস্তকের বিশেষ সাহায্য না লইয়া কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। আমাদের পর্য্যবেক্ষণ যে সকলই নির্ভুল হয়, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না —কারণ, আমরা তেমন পাকা কীট কিম্বা পতঙ্গ-তত্ত্ববিদ্ নহি। তবে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার সাধ্যপক্ষে ত্রুটি হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য দুই শ্রেণীর পতঙ্গসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তন্মধ্যে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে, তাহা শুধু আমাদেরই পর্য্যবেক্ষণের ফল নহে—ইংরাজী কীটতত্ত্ববিদ্গণের পর্য্যবেক্ষণের ফলও আছে।

ইংরাজিতে যে শ্রেণীর পতঙ্গকে (gall fly) গল্ ফ্লাই বলা হয়, আমাদের দেশে সেই শ্রেণীর পতঙ্গকে 'আব-পতঙ্গ' নাম দেওয়া চলে। Gall insect বলিয়া ইংরাজিতে কোন পোকা আছে কি না জানি না, কিন্তু বঙ্গদেশে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তর আব-কীট দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অনেক নরম গাছের শাখার জোড়ে বা জোড়ের কিছু উর্দ্ধে, কিম্বা গাছের অন্য অংশে আব

(gall) থাকে ; কোন কোন মানুষের শরীরে দু-একটি গুল্ম দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, গাছের গায়ে ঐ আবগুলি তাহাদের গুল্ম ; বাস্তবিক তাহা নহে। পক্ষান্তরে উহা গাছের কোন রোগও নহে। বোল্‌তার কামড় যেমন আমাদের দেহের আহত স্থানকে স্ফীত করিয়া তোলে, তেমনি এক শ্রেণীর পতঙ্গ, তরুবিশেষের শাখায় ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহাদের অঙ্গে আবের সৃষ্টি করে। এই ডিম্ব প্রসবের রীতি বড়ই আশ্চর্য্যজনক ও বুদ্ধিসাপেক্ষ। সাধারণতঃ জীব-জগতে দেখা যায় যে, জননী, পাছে সন্তান কোন রকমে ক্লেশ পায় এইজন্য, প্রসব-কাল উপস্থিত হইলে নিরাপদ্ স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকে। ঝড় বৃষ্টি এবং অন্যান্য বিপদের হাত হইতে ডিম্বকে রক্ষা করার জন্য (gall fly) গল্ ফ্লাই বা আব-পতঙ্গ, তাহার অঙ্গের পশ্চাদংশের তীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ অস্ত্র দিয়া, তরু-বিশেষের কোমল অংশে বা দুইটি শাখার সন্ধিস্থলে, একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে, পরে নিজ-দেহ-নিঃসৃত এক প্রকার তরল আঠাল পদার্থ দ্বারা, সেই ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তরুর প্রাণ-শক্তি ঐ ছিদ্রের জন্য কিছুমাত্র বাধা পায় না ; বরং তাহাকে বেষ্টন করিয়া ডিমের চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া তরুর মাংস দিনে দিনে পুষ্ট হইতে থাকে। বলা বাহুল্য ডিমের উপর তরু-মাংস ঐ প্রকার বিকৃত-ভাবে পুষ্ট হওয়ায় তাহা অর্থাৎ এই বিকৃত-ভাবে বর্দ্ধিত মাংস আবে পরিণত হয়। শুনা যায়, উদ্ভিদ্ মাত্রই নাকি নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বাড়িতে থাকে। এই জন্য আফ্রিকা দেশের এক শ্রেণীর কাঁটাগাছের আব (gall fly কর্ত্তৃক সৃষ্ট) বিশেষ বিকৃত ধরণে না বাড়িয়া অনেকটা সেই কাঁটাগাছের কাঁটার গড়নের অনুরূপ গড়নে বাড়িতে থাকে *। কাঁটা গাছ তাহার দেহের কোন একটা স্থান বিশেষের বৃদ্ধিকেও বিশেষ বিকৃত আকার ধরিতে দেয় না। অবশ্য ষোল আনা কৃতকার্য্য হয় না। প্রদত্ত চিত্রের "ক" চিহ্নিত ছবিগুলি আফ্রিকা দেশের কাঁটাগাছের আবের নমুনা দেখাইতেছে। এই রকম ভাবে ডিম্বটী আবের অভ্যন্তরে কিছুকাল থাকার পর তন্মধ্য হইতে, অর্থাৎ ডিমের ভিতর হইতে, পোকা বাহির হয়। এই পোকা, আবের ভিতর কিছুকাল থাকিয়া সেখানে pupa বা গুটীতে পরিণত হয়। গুটীর ভিতরে পোকাটি ধীরে ধীরে পতঙ্গ-তনু প্রাপ্ত হইতে থাকে। যথাকালে
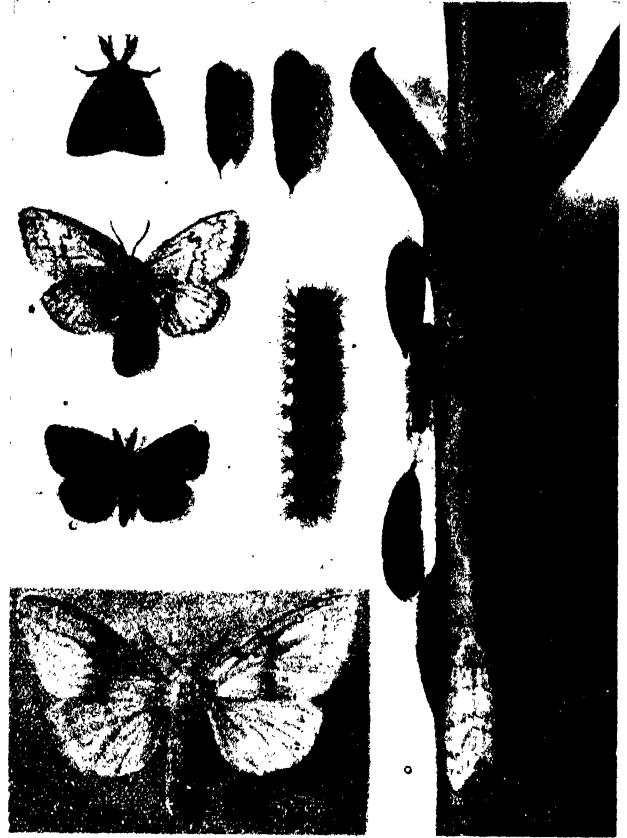
আব-পতঙ্গ (খ)

পোকাটি, গুটীর মধ্য হইতে, আব-পতঙ্গ হইয়া আবের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া আলোক-রাজ্যে আসে।

* "Here it is clear that it is no straining of language to say that the plant was trying to make a hooked thorn, but that by reason of this little parasite it was thwarted in its intention. Still it tried and tried, always wanting of make this sharp hook but never quite succeeding" C. W

"Boys Own Paper" হইতে ইংরাজীটুকু উদ্ধৃত হইল। "খ" চিহ্নিত চিত্রটি Boys Own Paper এ প্রকাশিত সচিত্র "The gall-fly" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ব-পতঙ্গের জীবন-ইতিহাস সংক্ষেপে শেষ করা গেল। ন আব-কীটের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলিব। এইবারকার লোচনায় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে প্রমাণযোগ্য কোন কাব্য-সাহিত্য আলোচনার সময় এই রীতি বিশেষভাবে আদৃত হয়। এ যেন দুর্ব্বল রাজাকে রক্ষা করার জন্য, চারিপাশে সৈন্য-সামন্তের সমাগম। যাহা হউক, আপাততঃ বডিগার্ডবিহীন বক্তব্য বিষয়টিকে সমাবস্থানে নিয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল।

আব-কীট

আমাদের দেশে তিন চারি শ্রেণীর আবকীট পাওয়া গিয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে মাত্র দুই শ্রেণীর আবকীটের বিষয় বলিব। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে, একটি তামাক গাছের অন্যটি জাম গাছের।

আব-কীট ও আব-পতঙ্গের, কীটের বাসকক্ষ ও আচার-ব্যবহার একই ধরণের। প্রভেদ কেবল ডিম পাড়ায়। আব-পতঙ্গ গাছের নরম ডালে ছিদ্র করিয়া ডিম পাড়ে, আর আব-কীট গাছের নরম ডালের উপরেই ডিম পাড়ে। ডিমের ভিতর হইতে পোকা বাহির হইয়া ডালের নরম চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পরে সেই ছিদ্র গাছের নিজের আঠায় বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর যে প্রণালীতে আব-পতঙ্গ পতঙ্গ-জীবন লাভ করে, ইহারাও সেই প্রণালীতে পতঙ্গ-জীবন লাভ করিয়া, আব বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসে।

তামাক গাছে যে সব আব-কীট হয়, তাহারা আয়তনে জাম গাছের আব-কীটের চেয়ে বড়। কৃষকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে,

কথাই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কেন না আজও বিষয়ে কোন ইংরাজী লেখা নজরে পড়ে নাই। হয় ত জন্য দ্বিতীয় পোকাটির জীবন ইতিহাসের সত্যাসত্যতা ম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু কি রিব, উপায় নাই। উপায় থাকিলে দু-একটি ইংরাজী াক্য উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়টিকে সন্দেহহীন করিতে পারিতাম। কেন না, আজকাল এদেশের প্রায় মাসিকেই দেখি, অধিকাংশ সাহিত্য-সেবক, বক্তব্য-বিষয় অত্যল্প হইলেও, তাহাকে বিপক্ষদলের সমালোচনার আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্যও বক্তব্য-বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হয় ত লেখার মধ্যে অনেক জায়গায়, অনেক ইংরাজ সাহিত্যিকদের বাক্যের অনুবাদ করিয়া দেন, কখন বহু বহু ইংরাজী বাক্যটাই উদ্ধৃত করিয়া দেন।

যখনই কোন তামাক গাছের নরম ডাঁটা অস্বাভাবিক রকমে স্ফীত হইয়া উঠে, তখনই তন্মধ্যে আব-কীটের সঞ্চার হয়। আব-কীটের অত্যাচার হইতে গাছ রক্ষা করার জন্য, কৃষকেরা ছুরি দিয়া ডাঁটার ফুলা অংশকে চিরিয়া তন্মধ্য হইতে পোকাটিকে বাহির করিয়া ফেলে। জাম গাছের কচি শাখার গায়ে ছোট ছোট গুল্ম দৃষ্ট হয়। ঐ গুল্মের অভ্যন্তরে আব-কীট বাস করে। একটা শান দেওয়া ছুরি দিয়া কোন একটি জামগাছের গুল্মকে পাশাপাশিভাবে ছেদন করিলে আব-কীটের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে গুল্ম হইতে পোকা বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই গুল্মের বা আবের গায়ে কালো একটি ছিদ্র থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় জাম গাছে আব-কীটের আবির্ভাব হয়; অন্য ঋতুতেও যে হয় না, তাহা নহে।

পারস্যে বঙ্গ-রমণী

[শ্রীশরৎরেণু দেবী]

বম্বে হইতে পারস্য উপসাগর।

(এস্ এস্ —চাকলা)

৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শুনিলাম যে, পারস্য উপসাগরের মেল জাহাজ পরদিন ভিক্‌টোরিয়া ডক হইতে ছাড়িবে। প্রথমে এইরূপ স্থির ছিল যে, আমার স্বামী

লেখিকা ও তাঁহার স্বামী

একাকীই যাইবেন; কিন্তু পরে, আমারও তাঁহার সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল শুনিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলাম; কারণ, কখন সাগরের জাহাজে চড়ি নাই। তার পর বাঙ্গালীর মেয়ের পারস্য-দেশ-ভ্রমণ, ইহাও সচরাচর ঘটে না। অতিশয় উৎসাহের সহিত জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিলাম। আমি রাস্তায় জাহাজের রাঁধুনির রান্না ভাত-তরকারি খাইব না, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে ফল ও মিষ্টান্নাদি লইবার বন্দোবস্তও হইল। দেখিতে দেখিতে সেদিন কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে কয়দিন হইতেই বম্বেতে খুব বৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু, আমাদের যাত্রার দিন, শুক্রবার সকালে, একেবারে বৃষ্টি থামিয়া গেল; আকাশ পরিষ্কার হইল; রোদ উঠিল।

৬ই আগষ্ট শুক্রবার।—আজ সকাল হইতেই জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হইতে লাগিল। আমাদের পাশের ঘরে একটি গুজরাটী পরিবার ছিল। আমরা যাইব শুনিয়া তাহারা বড়ই দুঃখিত হইল। স্বামীর সঙ্গে বহু দূরদেশে যাইতেছি এবং স্বামীর সুখ-দুঃখের সর্ব্বদা অংশভাগিনী হইতে পারিব বলিয়া অনেকে আমাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া উল্লেখ করিল। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সকলেই আমাদের বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিত।

বেলা ১২টার সময় দুইখানি ভিক্‌টোরিয়া করিয়া আমরা 'কালবা দেবী' হইতে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই B. I. S. N. Company'র—সমুদ্রের ধারের আফিসে গিয়া টিকিট খরিদ করিয়া লওয়া হইল। বম্বে হইতে মেহোমেরা ২য়

াণীর একখানি টিকিটের ভাড়া খাদ্য-খোরাকী ১২০৲ কা; আমরা জাহাজের খাবার খাইব না, সেইজন্য মাদের ৯৬৲ টাকা লাগিল। সেথান হইতে আবার মরা গাড়ী করিয়া ডকে আসিলাম। আসিবার য় বম্বের বাড়ীঘরগুলি যেন অতি সুন্দর বলিয়া মনে ইতে লাগিল; বোধ হয় অনেকদিন দেখিতে পাইব না লিয়াই হউক, বা বম্বে ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়াই হউক, ইরূপ মনে হইতেছিল। ১৬নং ভিক্টোরিয়া ডকে, মাদের লইয়া যাইবার জন্য "এস, এস, চাকলা" দাঁড়াইয়া ধ উদ্গীরণ করিতেছিল। জাহাজের সিঁড়ির নিকট াকে লোকারণ্য। কত লোক,—হিন্দু, মুসলমান াহেবের ভিড়। আমাদের মালগুলি গাড়ী হইতে নামান ইল। একজন মুটে বলিল, 'কাষ্টম' আসিয়া আমাদের জিনিসপত্র পাস করিলে তবে মাল উঠান হইবে। আমার ামী কাষ্টম অফিসারকে ডাকিয়া আনিলেন। সাহেব একে-ারে মসীবর্ণ। স্বদেশী সাহেব হইলেও আমাদের হায়রাণ া করিয়াই, মালের উপর খড়ি দিয়া Passed লিখিয়া িলেন; জিনিস পত্র জাহাজে উঠিল; সঙ্গে-সঙ্গে আমিও াহাজে গিয়া উঠিলাম। জাহাজ ছাড়া অবধি উপরে াকিব, সেইজন্য একধারে ডেক-চেয়ার পাতিয়া বসিয়া হিলাম। অনেক সাহেব উঠিল, মেমেরাও তাহাদের াখিতে আসিল; অনেক ফিরিঙ্গি ও গোয়ানিস সাহেবও ঠিল। স্ত্রীলোক খুব কমই উঠিল, মাত্র কয়েকজন মহারাষ্ট্রী ্রীলোক ডেকে উঠিল ও একজন মুসলমান স্ত্রীলোক াপাদমস্তক আল্‌খেল্লায় আবৃত করিয়া জাহাজে উঠিল। য় শ্রেণীতে দেশী কি বিলাতী স্ত্রীলোক একেবারেই ছিল না।

আমাদের জাহাজখানি তিনতলা। একতলায় ডেক-াত্রীগণের ও খালাসীদের থাকিবার স্থান। এবং মেন ডকের মধ্যস্থলে জাহাজের Engine Room ও ২য় শ্রেণীর কামরা ও খাইবার Saloon ও মেন-ফোরডেকে Main foredeck) কতকগুলি সৈন্য যাইতেছিল। ডকের যাত্রিগণকে উপরের Twin deckএ Hatchএর উপর বা foredeckএও যাইতে মানা ছিল না; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের বসিবার বা বেড়াইবার স্থান একেবারেই ছিল না, কারণ দ্বিতীয়শ্রেণীগুলি এঞ্জিন ঘরের পিছনে বলিয়া ভয়ানক গরম। প্রত্যেক ক্যাবিনে তিনটি করিয়া Berth ও একটিমাত্র Port-Hole. ক্যাবিনে থাকা ভয়ানক কষ্টকর। তাহার উপর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন হইলেও ক্যাবিনের ভিতর বৈদ্যুতিক পাখার বন্দোবস্ত ছিল না; বিছানাআদির বন্দোবস্তও অতি জঘন্য। জাহাজের কর্তৃপক্ষের এসব বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্য যাত্রীগণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনগুলি উপরে Twin deckএর উপর। ঐ সকল ক্যাবিনের নিকটেই Engineerদের cabin। আমাদের জাহাজে ৫জন Engineer ও ৫ জন officer ছিল; তাহা ছাড়া দেশীয় লস্কর প্রায় ৭০৷৮০ জন। এরা সকলেই হিন্দু গুজরাটী; জাহাজের কাপ্তেন ও অফিসার-গণের ও ডাক্তারের ক্যাবিন Bridge deckএর উপর। Persian Oil Companyর প্রায় ৬০৷৭০জন কর্মচারী এই জাহাজে যাইতেছিল; সেইজন্য দ্বিতীয়শ্রেণীতে একটিও Berth খালি ছিল না। আমাদের নাম-লেখা Berth-গুলিও অন্য লোক আগে হইতে আসিয়া দখল করিয়া-ছিল। Steward, এমন কি Chief Officerকে বলিয়াও আমরা আমাদের Berth পাইলাম না। বেলা ২টায় জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল; কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটায় জাহাজ ছাড়িল। জাহাজ ছাড়িবার আগে কতকগুলা সাহেব জাহাজের রেলিংয়ের নিকট হুড়াহুড়ি করিতে-করিতে একজনের মাথা হইতে টুপি সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেল। তখন তাহার হাসিখুসি বন্ধ হইয়া গেল; সে মুখ চূণ করিয়া বলিতে লাগিল "আমার টুপির দাম ১৭ টাকা।" অনেক গৌরাঙ্গ ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন, টুপিটা তুলিয়া দিতে কেহই সাহায্য করিলেন না। পরে একজন কালা ভারতবাসী জলে ঝাঁপ দিয়া সাহেবের আর্দ্র টুপিটি তুলিয়া দিয়া একটি আধুলি মাত্র উপার্জ্জন করিল।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমরা ক্যাবিনের Berth পাই নাই; সেজন্য Hatchএর উপর জায়গা করিয়া বসিলাম। Steward বলিয়াছে একটু পরে সে আমাদের ক্যাবিন ঠিক করিয়া দিবে। জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টাখানেক পরে আমার মনে হইল যে, জাহাজ বোধ হয় সমস্ত রাস্তা এই রকম যাইবে, কারণ জাহাজ তখনও একটুও দুলিতেছিল না। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় যাইতাম, তখন

ঐরূপই চলিত; অবশ্য ঢাকার জাহাজ অপেক্ষা এই জাহাজ অনেক বড়। সে জাহাজ পদ্মায় চলিত এবং এই জাহাজ সমুদ্রে চলিতেছে; তথাপি এ জাহাজ দুলিতেছে না। শুনিয়াছিলাম যে, সমুদ্রে জাহাজ খুব দোলে, কিন্তু এ জাহাজ দুলিতেছে না দেখিয়া আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "জাহাজ ত দুলিতেছে না? ইহা ত ঠিক ঢাকার জাহাজের মতই চলিতেছে।" তিনি বলিলেন, গভীর সমুদ্রে যখন আসিবে তখন জাহাজ দুলিবে। দেখিতে-দেখিতে বম্বের পাহাড় ও Reefs আর দেখা গেল না। ক্রমেই আমরা অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা হইল, জাহাজ চলিতে লাগিল। এখনও দুলে নাই। আমার স্বামী আমাকে ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমার গা-বমি-বমি করিতেছে কি না। প্রকৃতপক্ষে তখন আমার গা-বমি-বমি করে নাই; তবে যখন বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের জাহাজ নড়িতেছিল, তখন আমার গায়ের ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমাদের নিকটেই একটি নববিবাহিত গোয়ানিস খৃষ্টান-দম্পতী Mohammerahয় যাইতেছিল। রাত্রিতে হাওয়া বাড়িল; বৃষ্টিও সামান্য দুই-একপসলা হইল। আমি বেশ ঘুমাইলাম। তার পরদিন সকালেও আমাদের ক্যাবিন ঠিক হইল না। আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি নীচে যাইতে পারিব কি না। তখন যদিও আমার গা-বমি-বমি করিতেছিল না, কিন্তু জাহাজ অত্যন্ত দুলিতেছিল বলিয়া চলিবার সময় আমার পা ঠিক থাকিতেছিল না। আমি স্নানাগারে গেলাম। উহা নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনের নিকট। সেখানে অতিরিক্ত গরমের জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক আমার বমি হইল; এবং সেই থেকে Sea-Sickness সুরু হইল। উপরে ডেকে আসিলাম। মাথা খুব ঘুরিতেছে! স্বামী আমায় ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইলেন। দিনের মধ্যে অনেকবার বমি করিলাম। আজ বাতাস খুব বাড়িয়াছে ও জাহাজও দুলিতেছে। আমি প্রায় সমস্তদিন অনাহারে চোক বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। আজও আমাদের Berth পাওয়া গেল না। শুনিলাম, কাল আমাদের জাহাজ করাচি পৌছিবে। রাত্রিতে বাতাসও বাড়িল, বৃষ্টিও হইতে লাগিল। এই রকম ভাবে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। আমরা মনে করিলাম আমরা ক্যাবিনে জায়গা পাইব না। রবিবার সকালে আমার স্বামী আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, আমাদের ২য় শ্রেণীতে বার্থ পাওয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু ক্যাবিনে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না; কারণ ক্যাবিন যে খুব গরম, তা আমি নীচে স্নানাগারে ২।১বার গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার স্বামী আপত্তি শুনিলেন না; আমাকে ধরিয়া-ধরিয়া নীচে ক্যাবিনে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার মাথা অত্যন্ত ঘুরিতে লাগিল; গা-বমি-বমিও বৃদ্ধি পাইল! ক্যাবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই—ক্যাবিন অত্যন্ত গরম। মাত্র একটি পোর্ট-হোল, সমুদ্রের ঢেউ বড় বেশী। পোর্ট-হোল খুলিয়া রাখিলে ক্যাবিনে জল আসে, তাই পোর্ট-হোলটিও বন্ধ। উপরে খুব হাওয়া ছিল। একেবারে বন্ধ ক্যাবিনে আসিয়া শরীর খুব অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম; কয়েকবার বমিও করিলাম। স্বামী আমার নিকটে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। বমি বন্ধ করিবার জন্য নেবু ইত্যাদি শুঁকিয়াও বমির হাত হইতে নিস্তার পাইলাম না। কিরূপে দুই দিন পরে আমাদের ক্যাবিনে জায়গা পাওয়া গেল, পরে আমার স্বামীর নিকট জানিতে পারিলাম। বম্বে হইতে ২৪।২৫ জন গোয়ানিস ও পার্সী ইন্‌জিনিয়ার চাকরী লইয়া মেহোমেরা যাইতেছিলেন। প্রথমে আমি যেখানে ডেকে শুইয়াছিলাম, সেখানে একজন পার্সী আসিয়া আমার স্বামীর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন। ক্রমে অন্যান্য পার্সীর সহিতও আমার স্বামীর আলাপ হইল। খুব সম্ভব, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গী Engineerদের গিয়া আমার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। Mr. Andrews নামক একজন Engineer অগ্রণী হইয়া আমার স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ২টি বার্থ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন এবং তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, আমি ও আমার স্বামী তাঁহাদের বার্থ অধিকার করি। প্রত্যেক ক্যাবিনে ৩টি করিয়া বার্থ। আমাদের ক্যাবিনে অপর একটি বার্থে Mr. Boother নামক একজন মান্দ্রাজী খৃষ্টান ছিলেন। তিনি থাকাতে আমাদের উপকার বই অনুপকার হয় নাই। তা ছাড়া তিনি সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেন এবং রাত্রে গিয়া Bridgeএর নীচের ডেকে শুইতেন। তিনি প্রায়ই আমার খবর

ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। শুধু তিনি নহেন, সকল Engineerই ঠিক যেন আত্মীয়ের ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমার খবর আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ও আমাকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমার স্বামী মাঝে মাঝে আমাকে সোডা ও দুধ চামচে করিয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু খাইবার পর-মুহূর্ত্তেই বমি হইয়া সমস্ত উঠিয়া যাইতে লাগিল। দিন গেল, রাত্রি আসিল, আমার শারীরিক ভাব সেইরূপই রহিল।

সোমবার সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই শুনিলাম যে, আমরা করাচি পৌছিয়াছি। আজ প্রথমে বাথরুমে গিয়া স্নান করিতে পারিলাম ও উপরের ডেকে গিয়া ডেক-চেয়ারে বসিলাম। বেলা ১২টায় আমরা জাহাজ হইতে নামিয়া, ছোট বোটে করিয়া করাচী সহর দেখিতে চলিলাম। জাহাজের গায়ে সিঁড়ি লাগান ছিল। সেই সিঁড়ি দিয়া অনায়াসে নামিয়া নৌকায় উঠিলাম। অন্য সময় হইলে ঐ রকম সিঁড়ি দিয়া নামিতে ভয় হইত; কিন্তু এখন আর আমার ভয়-ডর বেশী নাই। নৌকা করিয়া গিয়া আমরা কিয়ামারী নামক স্থানে নামিলাম। বম্বে ছাড়িবার পর আজ এই প্রথম মাটিতে পা দিলাম। বেলা ১২টার সময় রৌদ্র খুব বেশী; তবে কয়দিনের পর মাটিতে নামিতে বড় আনন্দ হইল। আমরা নৌকা করিয়া এই করাচি বন্দরে আসিতে একখানি cruiser ও অন্য ২।১ খানি জাহাজও দেখিলাম। করাচির বন্দর যে স্থানে, সেই স্থানের নাম কিয়ামারী। এখান থেকে ট্রাম একেবারে সহরের Market পর্য্যন্ত গিয়াছে। ট্রামগুলি ইলেক্‌ট্রিক হইলেও খুব ছোট; চারিদিক খোলা; বসিবার স্থানগুলিও অপরিসর; বম্বে বা কলিকাতার ট্রাম অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট—ভাড়া অবশ্য এক আনা। এখানে আমাদের ভারতবর্ষের মুদ্রা সিকি, দুয়ানি, পয়সা সবই চলে। আমরা একখানি 1st. class Victoria ভাড়া করিয়া সহর দেখিতে গেলাম। বন্দর পার হইয়া কিছুদূরে একটি সুন্দর পোল পার হইলাম। পোলের নীচে খালে সমুদ্রের জল আসে, উহাতে লোকেরা স্নানাদি করিতেছে। বেশ বাঁধান ঘাট আছে। পোল পার হইয়া কতকগুলি সুন্দর বাঙ্গলা দেখিতে দেখিতে 'একটি উচ্চ 'টাওয়ার'এর নিকট আসিলাম। উহার উপরে ঘড়ি আছে। ক্রমে অপরিসর গলি-রাস্তা দিয়া সহরের বাজারে আসিলাম। ছোট ছোট দোকান ও অপরিসর রাস্তা; বাড়ীগুলির জানালা ইত্যাদি অনেকটা আমাদের কলিকাতার ফ্যাসানের। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান দোকানদার ও অধিবাসীর সংখ্যাই যেন বেশী বলিয়া আমার মনে হইল। রাস্তা এত ছোট যে, একখানির বেশী গাড়ী রাস্তা দিয়া যাইতে পারে না। মাঝে-মাঝে দুই-একখানি খাবারের দোকানও দেখিতে পাইলাম। মলিন ছিন্নবাস পরিহিত মিষ্টান্ন-বিক্রেতাকে উপবিষ্ট দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সে হিন্দু ও সিন্ধি। জিনিস-পত্রের দাম এখানে বম্বে অপেক্ষা অনেক বেশী। লেমন-সিরাপ কিনিলাম। দোকানদার অবশ্য উৎকৃষ্ট লেমন-সিরাপ বলিয়াই আমাদের দিল এবং উৎকৃষ্ট লেমনসিরাপের দামও লইল। হ্যারিকেন ইত্যাদি দর করিয়া জানিলাম, বম্বের দ্বিগুণ দাম। ক্রমে গাড়ী করিয়া ফলের বাজারে গেলাম। আঙ্গুর ৫।৬ আনা সের ও বেশ বড় বড়; আমও বম্বের চেয়ে সস্তা। অনেক রকম নূতন ফল দেখিলাম; এ সকল ফল কলিকাতায় বা বম্বেতে দেখি নাই। কিছু ফল কিনিয়া, টোঙ্গা ভাড়া করিয়া পুনরায় কিয়ামারী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ২টার সময় আবার করাচি বন্দরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের নৌকা ঘাটেই ছিল। নৌকায় উঠিয়া আমার স্বামী নৌকা-ওয়ালাকে কোয়ারেণটাইন্ ষ্টেসনে যাইতে বলিলেন। বম্বে হইতে আসিবার সময় আমাদের ডাক্তারী পরীক্ষা হয় নাই, করাচিতে হইবে শোনা গিয়াছিল। কোয়ারেণটাইন্ ষ্টেসনে যাওয়া কিন্তু আমাদের বৃথা হইল; কারণ বেলা ৩টার পূর্ব্বে চিকিৎসক কোয়ারেণটাইন্ ষ্টেসনে আসেন না। আমরা বিফল-মনোরথ হইয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম।

করাচি বন্দর থেকে ফিরিয়া আসিবার পর বেশ ভাল বোধ করিতে লাগিলাম; তবে ক্যাবিনের ভিতর দুপুরের সময় যে অসহ্য গরম! বেলা ৩টায় একখানি ছোট ষ্টীমারে করিয়া জাহাজের খালাসী ও অন্যান্য দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ ও খানসামা, কুক ইত্যাদি সকলে কোয়ারেণটাইন ষ্টেসনে গেল; ডেক প্যাসেঞ্জারদেরও তার পরের বারে ঐ ছোট ষ্টীমারে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য লইয়া গেল। তাঁহারা যখন সকলে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল ডাক্তারী পরীক্ষায় পাসের চিহ্ন-স্বরূপ তাহাদের হাতের এক স্থানে

একটি করিয়া রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ; উহাতে লেখা আছে Passed। করাচি হইতে অনেক লোক জাহাজে উঠিল; ৫।৬ জন পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত পার্সিয়ান গাল্‌ফে যাইতেছে। তাহা ছাড়া অনেক হিন্দুস্থানীও উঠিল; তাহারা অধিকাংশই মজুরী করিতে বসরা যাইতেছে। বিকালে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। আজ আমি আহারাদিও করিতে পারিলাম; রাত্রেও ঘুমাইলাম। আজ আর Sea-Sickness নাই। পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই বুঝিতে পারিলাম যে, জাহাজ চলিতেছে; শুনিলাম ভোর বেলা জাহাজ করাচি থেকে ছাড়িয়াছে। অল্পক্ষণ জাহাজ চলিবার পরই আবার জাহাজ দুলিতে লাগিল, আমিও আবার আগেকার মত বমি করিতে আরম্ভ করিলাম। খাইবার মধ্যে খালি কনডেন্স মিল্ক ও সোডা খাইতে লাগিলাম; তাহাও বমি করিতে লাগিলাম। বিকালে যখন কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার আমার খবর লইতে আসিলেন, তখন তাঁহারা শুনিলেন যে, আমি আজ অনেকবার বমি করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা আমাকে নুন-জল খাওয়াইতে বলিলেন; নুন-জল খাইলে একবার বমি করিয়া আর বমি হইবে না। বমির হাত হইতে নিস্তার পাইব বলিয়া আমি নুন-জল খাইতে রাজী হইলাম। তাঁহারা তখন এক গ্লাস খাঁটী সমুদ্রের নীলবর্ণ নুন-জল আনিয়া দিলেন। তখন Mr. Andrewsও আসিলেন। তিনি এক গ্লাস খাইতে বারণ করিলেন; আমি আধ গ্লাস খাইলাম। তখন কেহ আমাকে অল্প খাইবার, কেহ বেশী খাইবার, কেহ কিছু না খাইবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু Mr. Andrews দুধ ও সোডা খাওয়াইবার জন্য বলিয়া গেলেন। তাহার পর ঘন-ঘন আসিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমি বমি করিয়াছি কি না; কিন্তু আমি নুন-জল খাওয়ার পর হইতে সে দিন ত বমি করিলামই না, তাহার পরদিনও বমি করিলাম না।

১০ই আগষ্ট ভোরে আমরা করাচি ছাড়িয়াছি; ১১ই আগষ্ট বেলা ১১টা-১২টার সময় আমরা মস্কাট বন্দরে পৌঁছিলাম। এ বন্দরটি সুন্দর, যদিও জেটী নাই। নৌকা করিয়া জাহাজে আসিয়া উঠিতে হয়। সমুদ্রের নিকট অনেকগুলি সুন্দর-সুন্দর বাড়ী দেখিতে পাইলাম। আমাদের জাহাজ তীরের নিকটেই থামিল। আমাদের দেশে জেলের ডিঙ্গির চেয়েও কম চওড়া এক-রকম লম্বা-লম্বা নৌকায় করিয়া লোক জাহাজে আসিতে লাগিল। জাহাজের একজন সাহেব ডাকের ব্যাগ লইয়া জাহাজের জালি বোটে করিয়া সহরে গেল। যেখানে আমাদের জাহাজ থামিল, তাহার অনতিদূরেই সমুদ্রতীরে একটি উচ্চ দুর্গের মত প্রাচীর-দেওয়া গম্বুজ। উহার উপরে পতাকা উড়িতেছে। উহা Flag-station মনে করিয়াছিলাম। এখান থেকে ফল কিছু কিনিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু ঐ স্থানে এ সময় কোন ফলই পাওয়া যায় না। মস্কাটী হালুয়া, মাছ, খেজুর ও মদ বিক্রি করিতে পার্সিয়ানরা জাহাজের উপর আসিল। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের গাত্রে খোদিত অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কোন জাহাজ প্রথমবারে মস্কাটে আসিলে ঐরূপ ভাবে জাহাজের নাম খোদা হয়। ঐরূপ অনেকগুলি নাম খোদা আছে। ঐ খোদাই করিবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। ঐরূপ খোদাই করিবার উদ্দেশ্য কি, বুঝিলাম না। করাচি হইতে এক সিন্ধি যুবক ব্যবসা করিবার উদ্দেশে বসরা যাইতেছে। সে আমাদের এক টিনের গোল বাক্সে করা এক বাক্স করাচি-হালুয়া দিল। উহা খাইতে মিষ্টি, তাই খাইতে পারিলাম না। এই যুবক আমাদের প্রতি অতি অল্প দিনেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ও বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ ও যত্ন করিতে লাগিল।

মস্কাট হইতে জাহাজ ৫টার সময় ছাড়িল। এখান হইতে জাহাজের দোলা বন্ধ হইল; সমুদ্রও বেশ শান্ত, আমিও দারুণ Sea-Sickness হইতে আরোগ্যলাভ করিলাম। এইখানে উল্লেখ করা উচিত, অপরিচিত দেশী খ্রীষ্টান ইঞ্জিনিয়ার Mr. Andrews ও অন্যান্য সকলে আমার Sea-Sicknessএর সময় দিনে ৪।৫ বার করিয়া খবর লইতেন। তাঁহারা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁহাদের যত্ন ও সহানুভূতি আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

১৪ই আগষ্ট বেলা ২টার সময় আমরা বুশায়ার নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে ১৪ জন পার্সিয়ান বন্দীকে সশস্ত্র প্রহরীরক্ষিত করিয়া আমাদের জাহাজে আনা হইল। এই কথা শুনিয়া দেখিতে গেলাম। তাহাদের

অধিকাংশই ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক, ২।১ জন নীচজাতীয় লোক; একজন চাকুরীজীবী কেরাণীও উহার মধ্যে ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল। খানিক পরে তাহাদের পুনরায় জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা অন্য জাহাজে করিয়া বসরা চালান যাইবে বলিয়া শুনা গেল। অনেক লোক বুশায়ার হইতে জাহাজে উঠিল। আমাদের ক্যাবিন হইতে উঠিয়াই যে ডেক, সেই ডেকে ডাকের Sorting বিভাগের কর্ম্মচারীরা জাহাজে উঠিয়া ডাক sort করিতে আরম্ভ করিল। ২।১ দিন রাত্রে ক্যাবিনে অসহ্য গরম হওয়াতে আমরা ডেক-চেয়ারে রাত্রি কাটাইয়াছিলাম; কিন্তু এখন উপরের Deck এ এত ভিড় যে, ক্যাবিনে প্রাণ আই-ঢাই করিলেও উপরে এত পুরুষের ভিড়ের মধ্যে যাইয়া বসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

বুশায়ার হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট রবিবার বেলা ৪টার সময় আমরা মেহোমেরা পৌছিলাম। বুশায়ার হইতে আমার স্বামীর খুব জ্বর হওয়াতে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। নামিবার সময়ও তাঁহার খুব জ্বর ও মাথার বেদনা ছিল। আজ সকালে জাহাজের ডাক্তার আসিয়া আমার স্বামীকে ঔষধ দিয়া গেলেন। আমরা ঘুমাইতেছিলাম, ক্যাবিনে দুপুরে আগুনের মত গরমে কোন দিন ঘুমাইতে পারি নাই; কিন্তু আজ এত গরমেও যে আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ইহা খুব আশ্চর্য্যের কথা। যখন জাহাজ মেহোমেরা পৌছে, তখন আমরা নিদ্রিত। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া আমাদের জাগাইয়া বলিলেন যে, আমরা মেহোমেরাতে পৌছিয়াছি। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া, নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার স্বামী জ্বরে ধুঁকিতে-ধুঁকিতেই উঠিলেন। জিনিস-পত্র তার আগেই সিন্ধি যুবকের চাকরের সাহায্যে ঠিক্ করা ছিল। আমার স্বামী নৌকা ও কুলীর ব্যবস্থা করিতে উপরে গেলেন, আমি ক্যাবিনে রহিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে জাহাজের ভোঁ বাজিল। তখন আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম; ভাবিলাম হয় ত আমরা নামিতে পারিলাম না। জাহাজ এখনি ছাড়িয়া দিবে; নীচে হয় ত আমাদের মালপত্রও নামান হইয়াছে; আমার স্বামী নৌকায় নামিয়া গিয়াছেন। এই সব নানা ভাবনায় আমি কাতর হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমার স্বামী আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। জিনিসপত্র সিন্ধি যুবক কতক নিজে কতক কুলি ও জাহাজের বয়ের দ্বারা লইয়া গেলেন। আমার স্বামী নামিবার সিঁড়ির নিকট ছিলেন, দেখিলাম। তাঁহার নিকট জানিলাম যে, তিনি নৌকা ঠিক করিতে পারেন নাই। নামিবার মাত্র একটি সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া ডেক প্যাসেঞ্জার, 2nd class, 1st class প্যাসেঞ্জার ও তাহাদের মালপত্র নামিতেছে; সুতরাং সিঁড়িতে অতিশয় ভিড় ও ঠেলাঠেলি। আমার স্বামীর শারীরিক কাতর অবস্থা দেখিয়া ঐ দয়ার্দ্র-হৃদয় সিন্ধি যুবক আমাদের একখানি নৌকা করিয়া দিয়া, আমাদের জিনিসপত্র নৌকায় নামাইবার জন্য কুলী ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা দুইজনেই ভগবানকে একমনে ডাকিতেছিলাম; বোধ হয় তাহারই ফলে সিন্ধি যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সাহায্য করিতেছিলেন। জাহাজ ছাড়িতে ৫ মিনিট আছে, এমন সময়ে আমরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নৌকায় নামিয়া গেলাম। আমরাও নৌকায় উঠিয়াছি, এমন সময়ে জাহাজের সিঁড়িও উঠাইয়া লওয়া হইল। আর এক মিনিট দেরী করিলে আমাদের জাহাজে থাকিয়া যাইতে হইত। অনেক আরোহী মেহোমেরায় নামিতে পারিল না; একজন গোয়াবাসী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রী নামিতে পারিলেন না। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী একটু দূরে যাইতে না-যাইতেই জাহাজ মৃদুমন্দ-গমনে অগ্রসর হইল। প্রায় ২৫।৩০ জন মেহোমেরাতে নামিবার আরোহী, তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে, নামিতে পারিল না। এখানে নামিবার সময় আমাদের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, আমরা, কি নৌকার মাঝী কি আরব বা পার্সীয়ান কুলী, কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের নৌকা ছাড়িবার সময় Mr. Disa—পূর্ব্বলিখিত গোয়াবাসী ভদ্রলোক—তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে আমাদের নৌকায় লইবার জন্য ইঙ্গিত করায় আমাদের নৌকাওয়ালাকে বলাতে সে আমাদের নৌকা পুনরায় জাহাজের নিকট লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহারা নামিতে পারিলেন না। জাহাজের 2nd officer আমাদের নৌকা

জাহাজের নিকট দেখিয়া শীঘ্র দূরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং নৌকাওয়ালাও কৌশল সহকারে নৌকার গতি ফিরাইয়া জাহাজ হইতে দূরে লইয়া আসিল। যেথানে আমরা নামিলাম, উহা কারুণ নামক নদী, কিন্তু কারুণ ও ইউফ্রেটিসের সঙ্গমস্থান বলিয়া ঐখানে নদী অত্যন্ত গভীর ও নদীর টান প্রবল। বলা বাহুল্য, ঐরূপ নদীর উপর যদি আমাদের ক্ষুদ্র তরণী জাহাজের ধাক্কা খাইত বা পিছনের ঢেউয়ে পড়িত, তাহা হইলে কারুণের জলের ভিতরেই আমাদের চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইত। আমাদের জাহাজের যাঁহারা মেহোমেরাতে নামিয়াছিলেন, সকলেই আমাদের আগে চলিয়া গিয়াছেন। একে বিদেশ, তারপর আরব মাঝীদের কথা এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আমাদের কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহাও জানি না। আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমরা কাষ্টম হাউসে যাইতেছি। ২৫।৩০ মিনিট পরেই হোগলার ছাউনি দেওয়া দুই খানা ঘর দেখা গেল। উহাই কাষ্টম হাউস। আমাদের সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে মাল-পত্র সহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দেখিলাম। সেখানে আসিয়া দেখিলাম সকলের মুখে দারুণ দুঃখের চিহ্ন, সকলেই সহানুভূতি-সূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। পরে উহার কারণ জানিয়া আমরাও সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। জাহাজের যে সমস্ত পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুত্র লইয়া পার্সিয়ান গাল্‌ফে আসিতেছিল, তাহারা জাহাজ হইতে এইখানে অবতরণকালে নৌকার অভাবে একটি জনপূর্ণ বালামে (নৌকায়) উঠিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ ঐ নৌকা একপেশে হইয়া একেবারে উবুড় হইয়া যায় ও নৌকার স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকা জিনিসপত্রের সহিত জলমগ্ন হয়; ঠিক সেই সময় জাহাজের 2nd officer, Postal mail bag পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার জালিবোটের একজন মাল্লা জলে ঝাঁপ দিয়া ২ জন পাঞ্জাবী ও একটি বালককে জল হইতে তুলিয়াছিল; অবশিষ্ট ৩টি স্ত্রীলোক ও একটি ক্ষুদ্র শিশু কন্যা আসবাবপত্রের সহিত জলমগ্ন হয়; তাহাদের নৌকার মাঝিরা সাঁতার দিয়া পলায়ন করে। ঐ হতভাগ্য স্ত্রীলোকগণকে ও ক্ষুদ্র শিশুকে বাঁচাইবার জন্য কেহই চেষ্টা করে নাই। আমাদের জাহাজ তখন নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। ইচ্ছা করিলে জাহাজ হইতে জালিবোট পাঠাইয়া দিয়া বা Life Belt এর দ্বারা চেষ্টা করিলে হয় ত হতভাগিনীরা অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু হায়, কেহই সে চেষ্টা করে নাই। কঠিন নিয়তি সুদূর ভারত-ভূমি হইতে এই সকল হতভাগিনীকে পারস্য দেশে লইয়া আসিয়া "কারুণের" জলে তাহাদের অকাল-মৃত্যু ঘটাইল। ঐ স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে প্রায় ১০০০৲ টাকার স্বর্ণের গহনা ছিল; আমার বিশ্বাস, ঐ অলঙ্কারের ভারে তাহারা হাত-পা, নাড়িয়াও জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে নাই। ঐ ৩ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন নববিবাহিতা বালিকা ছিল; তাহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর। সে তাহার স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। স্বামী রক্ষা পাইল, কিন্তু তাহার স্ত্রী অতলে জীবন বিসর্জ্জন দিল।

আমি ঐ হতভাগ্য পুরুষদিগকে ও বালকটিকে দেখিলাম। গভীর দুঃখ, শোকে আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। খানিক পরেই একজন হ্যাটকোটধারী জীব আসিয়া আমাদের বাক্স-পেটরা খোলাইয়া কাষ্টম লইবার মত জিনিস আছে কি না, দেখিতে লাগিলেন। খানিকটা ঘাঁটাঘাটি করিয়া আমাদের জিনিসপত্র ছাড়িয়া দিলেন, এবং আমার স্বামীকে বলিলেন "তোমাদের প্রত্যেককে ৪॥০ টাকা করিয়া শুল্ক দিতে হইবে।" এটা যে কিসের জন্য, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এ বোধ হয় আমাদের পারস্যে আগমনের শুল্ক। যাহা হউক, আমাদের ঐ টাকা দিতে হইল না। Oil Company হইতে একজন পাঞ্জাবী orderly আসিয়াছিল; সে আমাদের জিম্মাদার হইয়া সমস্ত জিনিস-পত্র একখানি "মহিলাত" (বড় নৌকায়) উঠাইল। সে না আসিলে আমাদের বাক্স ইত্যাদি কাষ্টমে রাখিয়া যাইতে হইত। সেখান হইতে আমরা ছোট নৌকা করিয়া কোম্পানির আপিসে গেলাম। আজ রবিবার, আফিস বন্ধ। কাকস্য পরিবেদনা। বড়সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য একজনকে পাঠান হইল; ইতিমধ্যে আমাদের জল-তৃষ্ণার ঘটা পড়িয়া গেল; সকলেই বলে জল খাইব। সাহেবের খানসামারা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রতি করুণা করিয়া গেলাস-গেলাস বরফ জল আনিয়া আনিয়া আমাদের তৃষ্ণার শান্তি করিল। পরে সাহেবের নিকট হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের আবার বালাম আরোহণপূর্ব্বক Quarantine Station এ

যাইয়া রাত্রিবাস করিতে হইবে। তাই যাওয়া গেল। বালাম হইতে সশরীরে ত ভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম; কিন্তু মাল নামায় কে? লোক নাই, কুলি নাই। আমার সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারগণ নিজেদের বাক্স ইত্যাদি মাথায় করিয়া আনিলেন ও দয়া করিয়া আমাদের জিনিসপত্রও আনিলেন। আমরা Quarantine Stationএর বারান্দার সামনে গাছতলায় আড্ডা গাড়িয়া বসিলাম। এখন রাত্রে থাকিবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সকলে ভাবিয়াছিল যে, আরব-প্রহরীদের বলিলেই সসম্ভ্রমে ঘরের দরজা খুলিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবে; কিন্তু কার্যাতঃ তাহার বিপরীত হইল। ঘরের কথা বলায় তাহারা ঘরের চাবি ত খুলিলই না, বারান্দায় উঠিতেও নিষেধ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে শুইব কোথায়? তাঁহাকে লইয়া গিয়া ঘোড়ার আস্তাবলের মত একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া আধা হিন্দি ও আরবীতে বলিল যে, এইখানেই তোমাদের রাত্রি-যাপন করিতে হইবে। রাত্রিযাপনের স্থান দেখিয়া আমাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। পরে যুক্তি করিয়া স্থির করা হইল যে, Quarantine Stationএর ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে ঘরে থাকিবার হুকুম লইয়া আসিবার জন্য আমাদের একজন যাউক। একজনকে পাঠান হইল, হুকুমও মিলিল; কিন্তু আরব-প্রহরীরা ২টা ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াই পদচারণা আরম্ভ করিল। আমাদের মধ্য হইতে একজন গিয়া বলিলেন যে, সকলের জন্যই ঘর চাই; অতএব সব ঘরের চাবি খোলা আবশ্যক। প্রহরী জবাব দিল, "ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন যে, সাহেবদিগকে থাকিবার জন্য ঘর খুলিয়া দিবে, তোমাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সাহেব আছে; তাহাদের জন্য দুইখানা ঘর খুলিয়া দিয়াছি"। আমাদের সঙ্গী বলিলেন যে "আমরাও ত সাহেব।" প্রহরী তখন অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল "তোমরা ত কালা, সাহেব কোথায়?" বলা বাহুল্য, আমাদের সঙ্গীটির গাত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে শুভ্রবর্ণের চামড়া ছিল না; কাজেই তাঁহাকে বিরস-বদনে ফিরিতে হইল। আমরা আবার ডাক্তার সাহেবের নিকট লোক পাঠাইলাম। এবার সব ঘর খুলিয়া দিবার জন্য আম-হুকুম মিলিল। ক্ষুণ্ণ মনে আরব প্রহরীরা ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে আলো দিতে লাগিল, কারণ তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

একএকটি ঘর খুলিতে-না-খুলিতেই দখল হইয়া গেল। আমার স্বামী ও আমি গাছতলায় বসিয়াছিলাম। একজন বৃদ্ধ সাহেব আমার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি এই সময় একটা ঘর দখল করিয়া জিনিষপত্র লইয়া যাও; তাহা না হইলে খালি ঘর পাওয়া দায় হইবে।" 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' স্মরণ করিয়া আমরা একখানি ঘর দখল করিলাম। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিস্কার, আমাদের দেশের মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ও ধূলা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ ডাক-বাঙ্গলার মত নহে। ঘরে আসবাবপত্রও যথাস্থানে স্থাপিত। দুইখানি Dining Chair, একটি আরসী, একটি Washing basin ও Stand; ঘরের পশ্চাতেই বাথরুম। ঘরে Matting পাতা; জানালা দুইটা ও দুইটি দরজা। যদিও ঘর পাওয়া গেল, কিন্তু সে গরমে ঘরে শোয় কার সাধ্য। সকলেই বাহিরে বিছানা করিয়া শুইলেন, কেবল আমি ঘরে শুইলাম। শুইবার আগে খাইবার কথা একটু বলি। সকলেরই ভয়ানক ক্ষুধা, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এখানকার হাটবাজার এমন কি দোকানপত্রও সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বাজারে যাইয়া যে কিছু কিনিয়া আনিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়া যাইবে, তাহার উপায় নাই। আমার নিকট এক টিন Biscuit ছিল ও কিছু মৈসুর ছিল। বেচারীরা ডাহা উপবাসে রাত্রি কাটায় দেখিয়া, Biscuitএর টিন ও খাবার দিলাম। তাঁহারা ষ্টোভে চা ও কোকোয়া তৈয়ারি করিলেন ও আমাদেরও দিলেন। কতক জাগিয়া কতক ঘুমাইয়া রাত্রি কাটান গেল। সকলে উঠিয়া আমার স্বামীর শীত-শীত বোধ হইতেছিল; সেইজন্য তিনি কুইনাইন খাইলেন। তাহার পরেই তাঁহার ভয়ানক পেটের যন্ত্রণা হইতে লাগিল; দাস্ত ও বমি হইতে লাগিল। ৩।৪ বার বমির পর তিনি উঠিতে পারিলেন না। আমার বড়ই ভয় হইল। আমি Engineer Mr. Andrewsকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আমার স্বামীকে ধরিয়া বাথরুম হইতে ঘরে তুলিয়া শোয়াইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গীগণ সকলেই আসিয়া আমাদের ঘরের সম্মুখে একত্র হইয়া চিন্তান্বিত হৃদয়ে, আমার স্বামীর খবর লইতে লাগিলেন। সেই দিনের কথা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই অপরিচিত স্থানে যদ্যপি ঐ ভদ্রলোকগণ এইরূপভাবে

আমার স্বামীর জন্য চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে আমাকে অকূল পাথারে পড়িতে হইত। তাঁহাদের যাঁহার কাছে যে ঔষধ ছিল, সকলে বাক্স খুলিয়া সে সমস্ত বাহির করিয়া আনিলেন ও খাওয়াইতে লাগিলেন। Mr. Andrews ও Mr. Boother নামক দুইজন ভদ্রলোক হামেহাল থাকিয়া আমার স্বামীকে দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। বাতাস ও মাথায় জলপটি ইত্যাদি দেওয়ার পর তিনি কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন। বেলা ১১।১২টার সময় দুইজন পারসী ইঞ্জিনিয়ার Mr. Billimoria ও Mr. Mistry আমার জন্য ভাত তরকারি রাঁধিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাঁধিয়া খাওয়াইয়া তাঁহাদের উপকারের কতক প্রতিদান করিব, তাহা না হইয়া তাঁহাদের কষ্টে প্রস্তুত অন্ন খাইতে বড়ই লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের জেদ এড়াইতে না পারিয়া সামান্য খাইতে হইল। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখন বেশী ছিল না। তারপর Mr. Andrews ও Mr. Boother আমার জন্য রুটি তরকারি পাঠাইয়া দিলেন। আবার তাঁহাদের জিনিস নষ্ট করিব, সেইজন্য তাঁহাদের সেই আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। দেশে আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত প্রতিবেশীরাও প্রতিবেশীর জন্য এরূপ যত্ন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এই ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকগণ আমাদের সঙ্গী না থাকিলে আমাদের কষ্টের অবধি থাকিত না।

বৈকালে আমার স্বামী বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন যে, Oil Companyর Head Clerk নায়ার সাহেবের বাড়ীতে আমরা গিয়া থাকিব। আমাদের সঙ্গীরা পৃথক জায়গায় চলিয়া গেলেন ও আমরাও সন্ধ্যার সময় নায়ার সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম ও সেখানে আট দিন থাকিয়া 'আওয়াজ' রওনা হইলাম।

কবীর-কসৌটী

[শ্রীযামিনীকান্ত সোম]

হমনে হৈঁ ইস্ক মস্তানা
হমন কো হোশিয়ারী ক্যা।
রহেঁ আজাদ য়া জগ সে
হমন দুনিয়া সে য়ারী ক্যা॥
জো বিছুড়ে হৈঁ পিয়ারে সে
ভটকতে দর বদর ফিরতে।
হমারা য়ার হৈ হম মেঁ
হমন কো ইন্তিজারী ক্যা॥
খলক সব নাম অপনে কো
বহুত কর সর পটকতা হৈ।
হমন গুরু নাম সাঁচা হৈ
হমন দুনিয়া সে য়ারী ক্যা॥
ন পল বিছুড়েঁ পিয়া হম সে
ন হম বিছুড়ে পিয়ারে সে।
উন্হীঁ সে নেহ লাগী হৈ
হমন কো বেকরারী ক্যা॥
কবীরা ইস্ক কা মাতা
দুই কো দূর কর দিল সে।
জো চলনা রাহ নাজুক হৈ
হমন সর বোঝ ভারী ক্যা॥

প্রেমেতে উন্মত্ত আমি, আমার হুঁসিয়ারী কিসের,
জগৎ থেকে পৃথক্ আমি, আমার আনুরক্তি কিসের?
প্রিয় থেকে ভিন্ন যে, সে মরছে দ্বারে দ্বারে ফিরে,
আমার প্রিয় আমাতেই রন, আমার প্রতীক্ষা কিসের?
জগৎ জুড়ে সকল লোকে খুঁড়ছে মাথা নামের তরে,
আমি সত্য-নাম পেয়েছি, জগৎ আমার মিত্র কিসের?
পলের তরেও পৃথক্ নহেন প্রিয় আমার আমা হ'তে,
আমিও নই পৃথক্ কভু আমার প্রিয়তম হ'তে,
তাঁরই সনে লেগেছে ডোর আমার অশান্তি কিসের?
কবীর যখন মত্ত প্রেমে, দূর কর মনের দ্বিধা,
হোক্ না কেন রাস্তা কঠিন, হোক্ না শিরে ভারী বোঝা॥

মন্দানিল

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়]

১

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত।

ধীরে—ধীরে—ধীরে, শিবানীর প্রাণের স্তিমিত প্রদীপ-শিখা নিভিয়া গেল। বলো হরি, হরিবোল্!

সধবার মরণ! জয়, শাঁখা-খাড়ু-সিঁদুরওয়ালার জয়! শিবানীর হাত, পা, কপাল, সিন্দুরে সিন্দুরে লালে-লাল হইয়া গেল। ভাগ্যবতী মেয়েটাকে টকটকে রাঙা করিয়া লইয়া গাঁওয়ালী শ্মশান-বন্ধু সকলে বহির্দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই হরিধ্বনি করিয়া উঠিল—বলো হরি হরিবোল্!

খান্-খান্ নানা খান হইয়া গেছে। শিবসুন্দর বাবু তখন তাঁহার বুকখানি খুব জোরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া—কামড়ে-কাটা পাকা কালোজামের মত টস্-টসে লাল চোখে চাহিয়া শিবানীর শ্বশুরবাড়ীর এই দরোজার একধারে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কন্যার মহাযাত্রা নিরীক্ষণ করিলেন। ধীরে—ধীরে—ধীরে, শবদেহ শ্মশান-অভিমুখে অপসারিত হইয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, মৃতের প্রতি পিতা একবারও চাহেন নাই। যখন একেবারেই আর দেখা যাইতেছে না, তখন শিবসুন্দর দক্ষিণের সেই মাঠের রাস্তার দিকে চাহিলেন। মাঠ পার হইয়া যে জঙ্গল, তারপরে শ্মশান—সে সেইদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। চক্ষে অশ্রু নাই; চক্ষু শুষ্ক; ফাটে বুঝি—ফট্ করিয়া একটি বুদ্বুদের মত ফাটিয়া মণিটি কোন্ অনন্তে এই বুঝি ছুটিয়া যায়!

কিন্তু কিছুই হইল না। ভদ্রলোক নীরবে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শিবানীর বাবার কাণে-কাণে একটি 'বলো হরি, হরি বোল্' রোল হাউয়ের মত ছুটকিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের ন্যায় একটু ঝলক্ দিয়া—আবার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যাওয়ার মতনই, ঠাকুরবাড়ীর শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের ধ্বনি এই মাত্র থামিয়া গেছে। পিতার প্রাণ—শবযন্দিরের প্রতিক্ষণেই অন্তর্ভেদী ভীষণ বিপ্লবের মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল, অন্ততঃ 'শিবানী-শিবানী' বলিয়াও সুদীর্ঘ চীৎকার-পরিপূর্ণ একটা আর্ত্তনাদ উৎসর্গ করিয়া, দুই চারি মুহূর্ত্ত যা পারেন—না হয়, গোটা কয়েক নিশ্বাস ফেলিয়াও খানিক বাঁচিয়া লন। আহা, কিন্তু কিছুই হইল না।

হইবে কি!—এ সংবাদ যে ভয়ঙ্করই। খুঁজিয়া-পাতিয়া ভাল ঘর-বর দেখিয়া একমাত্র সংসার-সম্বল কন্যাকে গৌরীদানে সম্প্রদান করিয়াও তাঁহার অদৃষ্টে তৎপ্রতিফলে এ কি সর্ব্বনাশকর পরিণাম সঙ্ঘটিত হইল? শ্বশুর-ঘরে বালিকা, কিশোরকাল পর্য্যন্ত নানা অপমান ও কুৎসিৎ গঞ্জনার অত্যাচার সহ্য করিতে-করিতে সেদিন অসাবধানভাবে কোথায় যেন নাক হইতে তা'র সোনার বুলাকখানি হারাইয়া ফেলিয়া, শ্বশুরের ভর্ৎসনায় সারাদিন উপবাসের পর শাশুড়ীর নিদারুণ প্রহারে হত-চৈতন্য অবস্থায় দিনদুই শয্যাশায়ী পড়িয়া থাকিয়া, গোপনে-গোপনে প্রচারিত 'হিষ্টিরিয়া' এই জনরবের ভিতরে খাঁচা হইতে অচিন্ পাখীকে উড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে!! সান্ত্বনা—কিসের নাম? মার খাইয়া মরিয়া গিয়াছিস্ মা তুই! উঃ!!! ঈশ্বর, তোমার এই জঘন্য সৃষ্টি ফিরাইয়া নাও! —পারো কি? সর্ব্বশক্তিমান!

সর্ব্বশক্তিমানই বটে!—দেখি দেখি, ছুঁড়ীর শেষ চিঠি আর একবার পড়ি—অভাগী এখনো পুড়িয়া ছাই হয় নাই—এইবার দেখি।

আলমারীর মাথার উপরে লেফাফার একধার দেখা যাইতেছে। শিবসুন্দর আল্‌গোছে তাহা ধরিয়া টান দিলেন। নীচে, মাটিতে পড়িয়া গেল আর একখানি চিঠি, সেটা ঐটার তলাতেই ছিল।

সারা শরীর কাঁপিতেছে;—রাগে, ঘৃণায়, শোকে, দুঃখে থরথর কাঁপা হাতে তিনি পাতার পর পাতা উল্টাইয়া,

পড়িয়া যাইতেছেন।...হা—হারে নিষ্ঠুর, হা পাষাণ সমাজ! তোমার অগ্নিগর্ভ গণ্ডী-মণ্ডলীর অন্তর্বিধিকে কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া এই বরলাভ! হাঁ, কুলীনে কুল-কার্য্যই করা হইয়াছিল বটে! হাঁ, বংশের সুনাম অক্ষরে-অক্ষরেই ঠিক রাখা হইয়াছে—ঐ 'মহত্ত্বের' বিশুষ্ক 'কঙ্কাল'খানিকে অন্তহারা লয়ের গহ্বরে উড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা আসিবে না কি?—হায় কবে!

"দাও বাবা দাও, ভাঙ্গো বাবা ভাঙ্গো, তোমার পণ। জনে-জনে জোড়ায়-জোড়ায় গরদের থান দাও, চাকর-চাকরাণীর প্রণামীর টাকা দাও, ননদ-পুঁটুলীর তোরঙ্গ ভরিয়া বিলাস-সামগ্রী পাঠাইয়া দাও।"

উত্তর দিয়া শিবসুন্দর মেয়েকে কি লিখিয়াছিলেন?

"জানি, শিবানী, এগারো জোড়া গরদ, চাকর-চাকরাণীর বক্‌সীস্ ও ননদ-পুঁটুলীর মূল্য সবশুদ্ধ আড়াই হইতে তিনশোর মধ্যে কুলাইয়া যাইবে। মা, তোর বাপের বাক্সে টাকা একেবারেই না থাকুক, তোর স্বর্গীয়া জননীর বুকের নেকলেস্‌টি এখনো সযত্নে সিন্ধুকে তোলা আছে। তাও সর্ব্বশেষে বিকাইয়া দিয়া তোর শ্বশুর-শাশুড়ীর তর্পণ করিতে পারি। কিন্তু মা শিবানী, সব বিলাইয়াছি; বাড়ী ঘর জোত-জমা রেহানে আবদ্ধ করিয়াছি, সুদ-সংস্থানে দিয়াছি; শেষ—ঐ স্মৃতিটুকু আর বেচিতে পারিতেছি না। দেখা যাক্, ঠাকুর কি করেন। সহিয়া থাকি, দুঃখ চিরদিন থাকিবে না। যাঁর হাতে তো'মে দিয়া দিয়াছি, তার স্নেহ কুড়াইয়া নিবি। সে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। তুইও কুশ্রী গুণহীন নহিস্। এবং সৎকুলেই তোর জন্ম। তা'র কাছে তোর অনাদর হইবে না।"

হাত হইতে পত্র মাটিতে পড়িয়া গেল।

সাম্‌নে, ঐ—সিন্ধুক। শিবসুন্দরের ইচ্ছা হইল যে ওটার পেট চিরিয়া নেকলেস্ ছড়া ও তাঁ'র মনের ভিতর হইতে স্মৃতির মোমবাতিটি একটানে উপড়াইয়া লইয়া দুই পায়ে দলিয়া দলিয়া তাহা একেবারে বিদলিত করিয়া শেষ করিয়া দিবেন।.....শিবানী—শিবানী, মা আমার! তোর বালিকা-জীবনের মূল্যে দুর্ভর-স্মৃতি ক্রয় করিতে হইল!

চিঠির পাতাগুলা কুড়াইতে আর সাহস কৈ হে? থাকুক—ঐরূপে, ঐখানে ওগুলি সব! উত্তপ্ত কাগজ—আর ছোঁয়াই যাইবে না। রক্ত-মাংসের হাতে কি অত তাপ সহা যায়? কাজ নাই অসমসাহসিকতায়!

তবে ঐ যে আর একখানি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে—ওখানা—ও, ও যে গুরুদেবের লেখা পোষ্টকার্ড। শিবসুন্দর তাহাও স্পর্শ করিলেন না; মাত্র পা'র উপর ভর দিয়া বসিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া বড় তৃষাতুরের মত সেখানা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। অগাধ অশ্রুর ঘন আবর্ত্তন ভেদ করিয়া সে পত্র পড়া—না-না, জগৎ অন্ধকার! পোষ্ট-কার্ডের সেই পুরাতন ছাঁদের জড়াহাতের লেখাগুলি কি করিয়া পড়া যাইবে এমন অবস্থায় গো! গেল না। ওঃ হো, সর্ব্বনাশ! দেখি দেখি, না; সময় উৎরিয়া যায় নাই। এখনো রাত্রি নয়টা হইতে আধঘণ্টা দেরী। রওনা হওয়া যাক্। শিবানী গেছে; সংসার তো আছে। সে—শূন্য। তা' হউক। শূন্য হইল তো বহিয়া গেল আর কি! শূন্যই যে সমুদায়। শূন্যই যে সত্য। 'মহামায়া,—অর্থ তার মহামিথ্যা'—কি বলে পাগল! এখনো সমাজ আছে, প্রাণ আছে, এক শিবানী না থাকিলে কি হইল।

গুরু লিখিয়াছেন—"আগামী কল্য একটু জরুরী কার্য্যে বাহুরভাগ হইয়া হরিহাট যাইতে হইতেছে। তোমার ওখানে নামিবার ফুরসুৎ করিতে পারিলাম না।......তোমার বার্ষিকী লইয়া আমার সঙ্গে ষ্টেসনেই সাক্ষাৎ করিবে। মা তোমার মঙ্গল করুন।"

কন্যা-শোকাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। না, তাও—যায় না। সেটা কি জগদ্দল পাথরখানির মত ভারী—কঠিন এত? ইঃ! মা মঙ্গল করিবেন? করুন। প্রাণ বাহির হওয়াই একমাত্র বাকী তো—? সেই শেষ মঙ্গলের বিন্দুদান আর বাকী রাখিও না, মা, প্রক্ষেপ করো! জরের তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা—সন্তানের আকণ্ঠ বিশুষ্ক!......হরি হরি, নয়টা যে বাজে। বাহির হই, গুরু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অভিমুখে প্রধাবিত হই। তা'পর যা করো মা জগদম্বা!

(২)

লাইন বাহির হইয়া বিষণঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে; তাই চৌধুরীপাড়া—জঙশন্।

জন্মাষ্টমীর অজগরের মত ট্রেণখানি—কৃষ্ণতিক্ত উগ্র বিষাক্ত নিয়তির গতিতে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে বেগে চলিয়া আসিতেছে; শিবানীর বাপ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন। অস্থিচর্ম্মসার সমাজের হাতখানা হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া তা'র কলিজার স্থানটুকু ঐ রেলগাড়ীটার সাম্‌নে পাতিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল; যাউক মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে উচ্ছন্নে—একেবারে জাহান্নমে।······

আর দেরী করা নয়। অত ভাবিলে ভাবনার থেই হারাইয়া যাইবে। 'জলবিম্ব প্রায়' জীবন, আজ অত করিয়া খাইলে আগামী কল্য যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উপবাসে মাথা কুটিতে হইবে। আজ আর নয়; সঞ্চয় থাকুক কিছু। ধীরে ধীরে—!

* * * *

কি কর্ব্বো মশাই, চাবি দে'য়া; যায়গা হবে না—যায়গা হবে না। দেখুন আমরাই কি কষ্টে রয়েছি; এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি মশায় দেখ্‌ছেন, তবু—; নেহি, হিঁয়া আউর যায়গা কাঁহা মিলেগা সা'ব্! আঁখ্ নেহি?—লুটিস্ মাফিক্ যোলা আদমী পুরা হো গায়া—প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়া জনৈক ভদ্রলোক অবশেষে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর নিকট আসিলেন।

কাঁচা-পাকা-লম্বা-চুল-দাড়ী এক বৃদ্ধ যোড়াসনে বসিয়াছিলেন, ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া বলিলেন—"আসুন, এখেনে যায়গা হবে।"

'ন স্থানং তিল ধারণং', বেঞ্চিখানার প্রান্তে বৃদ্ধ অতি কষ্টে বসিয়া' ছিলেন; আসন ত্যাগ করিয়া ভদ্রলোককে বসিতে অনুরোধ করিলে তিনি উভয়ের বয়স-পার্থক্য উল্লেখ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দাঁড়াবার যায়গা পেয়েছি, শোবার যায়গাও হ'য়ে যাবে অম্‌নি ক'রে, দেখ্‌বেন। কারণ, মানুষ পাথরের জাত নয়। পাষাণ হিয়া গলবেই। কি মশায়, শিববাবু যে! ষ্টেসনে কি ক'র্ত্তে হঠাৎ আজই—!"

বৃদ্ধ মুখ বাহির করিয়া শিবসুন্দরকে দেখিতে পাইলেন। দৃষ্টিচতুষ্টয় সম্মিলিত হইতে—তিনি গললগ্নীকৃত বাসে করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাগল-পাগল চেহারা, মলিনতা না বিমর্ষতা—কিসের সঙ্গে যেন অদল-বদল হইয়া গিয়াছে।

তাহার মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার আকৃতির ভাবান্তর লক্ষ্য কর্চ্ছি। হয়েছে কিছু? এখনো তুমি প্রণাম করো নি।"

ভদ্রলোক। আঃ মশায়, সে আর বল্‌বেন না। ওঁর কি আর হুঁস-পবন কিছু ঠিক আছে? জানেন, ওঁর কি হয়েছে? আজ উনি পথের কাঙাল; ওঁর আর আপনার বল্‌তে কেউ নেই। একমাত্র কন্যা ছিল, আজই তা'র মৃত্যু হয়েছে।

বৃদ্ধ। মৃত্যু হয়েছে!

শিবসুন্দর। তা' ছাড়া আর কি বল্‌ব? বল—'মরে গিয়েছে'?

বৃদ্ধ। তা'তে ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন? মরে গিয়েছে—বেশ হয়েছে। বেঁচে বিয়ের সময় তোমায় ভাবিয়ে তুল্‌তো। বর মিল্‌তে টাকা মিল্‌তো না। যা টাকা মিল্‌তো, তা'তে ভাল বর পেতে না। বেশ হয়েছে।

শিবসুন্দর। হাঁ, বেশ হয়েছে।

ভদ্রলোক। তবে সর্ব্বস্ব বেচে উনি মেয়েটার বৈ' পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন;—এই। আমি ওঁর বেহাইবাড়ীর নিকটে থাকি; সব জান্তাম। সে মেয়েটা তা'র পিতার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন ক'রেও দামোদর শ্বশুরটির তৃপ্তি দিতে পারে নি—এই অপরাধে, কি নির্য্যাতনই না সহ্য ক'রে, আহা, অপঘাতে প্রাণ দিয়েছে; তা যদি জান্তেন, তবু কি বল্‌তে পার্ত্তেন, যে, 'ঘাবড়াচ্ছ কেন'?—'বেশ হয়েছে'? এই আপনার সমাজ মশাই। উল্লুকের সমাজ।

অগ্নুত্তপ্ত লৌহদণ্ডের মত বৃদ্ধের প্রখর দৃষ্টি—দেখ-দেখ, আরো কি প্রখর; যেন ঠিক্‌রাইয়া শিবসুন্দরের দিকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তিনি অল্পকালই সে দিকে চাহিয়াছিলেন! সহসা ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া, শীর্ণ হস্তে অথচ দৃঢ়ভাবে তার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"না-না, তবু তা'রে গালাগাল দিতে দেব না। সে আমাদের গোড়ার ভারতবর্ষের মত বড় আদরের সমাজ। মিনতি করি, তা'র রোগের সময়, তা'র প্রতি রূঢ় না হ'য়ে—পাঁচটা কুবাক্য, মন্দ না বলে, কি শাসন না ক'রে, স'য়ে স'য়ে ভালবেসে শুশ্রূষা করুন।"

ভদ্রলোক। অতি আদর ও সোহাগে-ভালবাসায় প্রায় ছেলেই গোল্লায় যায়—জানেন তো?

বৃদ্ধ। জানি এবং গিয়েওছে। তবু যে-ভালবাসার সাপে তা'কে কামড়িয়ে মেরেছে, ওঝার মতে, সেই সাপ দিয়েই আবার বিষ তুলিয়ে তা'কে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। প্রেম—সে কি পদার্থ গো! ফাটা ভাঙ্গা জুড়তে, আর সাত যায়গা থেকে আর সাতখানা ইট পাথর নিয়ে এসে এক সঙ্গে ক'রে ফেল্‌তে, প্রেমের মত অমন অমৃতমাখা সুরকী তো দুটি নেই। এই শিক্ষাই আমাদের নিতে হ্যান।... শিবসুন্দর, তোমায় সান্ত্বনা দিতে এখেনে রইতে পাচ্ছি না—এ একটু আপশোষ থেকে যাচ্ছে সত্যই। কিন্তু, যা'ক্—কর্ত্তব্যের পূর্ব্বে তোমার সান্ত্বনার মূল্য নেই।..ভাল কথা, গাড়ী ছাড়ছে, আমার বার্ষিকী?

—ওই যাঃ। আসলেই ভুগ রাখিয়া শিব বাবু ষ্টেশনে পৌছিয়াছেন। কিছু সঙ্গে আনা হয় নাই। উপায়!

বৃদ্ধ। দেরী করো না।

শিব। আমি যে কিছু সঙ্গে আনি নি—ভুলে!

বৃদ্ধ। গর্হিত কার্য্য করেছে। সঙ্গত হয় নি। এ রাস্তায় আর সকালে ঘুরতে পার্চ্ছি ব'লে তো মনে হয় না। কিছুই নিয়ে আসো নি কি সঙ্গে? কিছু?

শিব। ট্যাঁকে মাত্র এই একটি নিজ ব্যবহার্য্য হত্তুকী ছাড়া এখেনে সঙ্গে আর কিছু নেই।

বৃদ্ধ। বেশ, ঐ হত্তুকীই দিয়ে দাও।

ভদ্রলোক। তবু এ নিতেই হবে? ছি!

বৃদ্ধ। তবু এ নিতেই হবে; নইলে চল্‌বে না।

ভদ্রলোক। কেন—বলুন দিকি?

বৃদ্ধ। 'I have the honor to be' না লিখ্‌লে চলে কি? আমি যত উচ্চেই, সমাজের যে-কোন আফিসেই যে-কোন দামের চেয়ারে ব'সে কাজ করি না কেন—একটা Discipline আছে তো......!

ভদ্রলোক। খট্‌কা গেল না।

বৃদ্ধ। আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জান্‌তে চান—লোক আছেন, শুনতে পাবেন;—তাঁ'রা বল্‌বেন। সমাজের আচার-নিয়ম প্রতিপালন সম্বন্ধে, দয়া ক'রে, আমার কাছে, আমার কথা শুনুন। আচার-বৈচিত্র্য মানেন কি?

ভদ্রলোক। যদি না মানি?

বৃদ্ধ। ধর্ম্ম?

ভদ্রলোক। মানি না।

বৃদ্ধ। বেশ করেন। আচ্ছা... পিতা—? ও! না; তিনিও মূর্খ হ'তে পারেন; ঠিকই তো। বংশ মানেন? ...আপনার বংশ-পরিচয় কি? কত পূর্ব্বপুরুষের নাম বল্‌তে পারেন আপনি?

ভদ্রলোক। বংশ মানি। অন্ততঃ আমার বত্রিশ পুরুষের নাম আমি বল্‌তে পারি—তাঁদের আদিতে 'পীতাম্বর' বলে একজন ছিলেন।

বৃদ্ধ। ও, আপনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ভালো, যা'ক্—সে দিয়ে আমার দরকার নেই। আপনার বংশের ঊর্দ্ধতন, সেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পীতাম্বরও 'প্রণতোস্মি দিবাকরম্' ব'লে জড়-সূর্য্যকে প্রণাম ক'রে গিয়েছেন। আর, একটা সচল চেতন দেহকে প্রণাম ক'রতে কেন আপনার অনিচ্ছা হবে? আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে, সেই তাঁদের একটা স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা; এই। অচল পাথরে অক্ষর লিখে, কি তাম্র-লিপি গড়ে, কি প্রশস্তি-স্তম্ভ গেঁথে রেখে দিন, ঠিক রইল;—সে নড়ে না, চড়ে না;—আবিষ্কারে ও বহু তপস্যায় কথা কয় কি না কয়, এমনি। আর, আমাদের এই সামাজিক নিয়ম প্রতিপালনে, পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষার এই যে প্রকরণ, এ, মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেরই কাণে-কাণে সদাসর্ব্বদা স্মৃতির বার্ত্তা ব'য়ে এনে-এনে, পরিবেশন করে হ্যায়। কারণ, এখানে পাথর-ধাতুর সঙ্গে মানুষের যোগ নয়, যা, কালের ঘর্ষণে ক্ষ'য়ে যায়;—এ মানুষেরই সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। এ, সেই স্মৃতির খবর এমন সুন্দর ক'রে লবকুশের মত রামায়ণের সুরে গায়, যে, মাথা কোথা থেকে আপনা হতেই নুয়ে আসে, সে ধর-বার যো নেই। ....এই দেখুন, হত্তুকী দান গ্রহণ ক'রে তা'র প্রতিদানের কি চেষ্টা করি। শিবসুন্দর, তুমি কামাখ্যা গিয়ে, মহাপীঠে গায়ত্রী-সাধনা ক'রে এসো, শ্যামা-মা তোমায় শান্তি দেবেন।

গুরুর মুখে শান্তি শব্দোচ্চারণ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই শিব-সুন্দর পৃথিবীর বায়ুকে ব্যবহারের অনুপযোগী অত্যন্ত ঘন বলিয়া অনুভব করিলেন।

ভদ্রলোক। কিন্তু, এই অভ্রান্ত গুরুবাদ—

বৃদ্ধ। হাঁ, তাঁর বাক্য অভ্রান্ত, এ যদি স্বতঃসিদ্ধই হয়, তা' আপনি মানতে বাধ্য। তবে আপনার অর্থও বুঝ্‌তে

পারা গেছে। তা দেখুন, আমাদের এই গুরুশ্রেণী Gypsyদের মতই ব্রাজক জাতি। এঁরা ঘুরে বেড়ান। নানাবিধ বৈচিত্র্যের খবর এনে, গৃহী-শিষ্যের কাণে সেই মন্ত্র দিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য তৎপ্রতি তা'কে নিয়োগ করেন।—এই তো; এ ছাড়া আর বেশী কিছু নয় তো!

ভদ্রলোক। তীর্থ ক'রেই ইনি শান্তি পাবেন?

বৃদ্ধ। (বুক ঠুকিয়া) নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক। পরীক্ষা ক'র্ত্তে হয়েছে। শিববাবু, যথা-সময়ে আপনার সঙ্গে আমি দেখা কর্ব্ব।

ট্রেণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। উঃ—শিবানীর বাবা দেখিতেছেন, এঞ্জিনের চোঙ্ দিয়া সুন্দর কালো রঙের বুক-ভাঙ্গা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস হুস্‌হুস্ করিয়া অনর্গল বাহির হইয়া যাইতেছে—উঃ!

(৩)

'কামাক্ষে বরদে দেবী নীলপর্ব্বতবাসিনী।'

সামনেই সৌভাগ্য-কুণ্ড। কামাখ্যা-মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত। অভ্যাগতকে প্রবেশ-উন্মুখ দেখিয়া পাণ্ডা-বালক জিজ্ঞাসা করিল—"এঃ, কুঠা যাস্থ?"

"মা'র পীঠ-দর্শনে।"

"টোমার পাণ্ডা আস্থি—পাণ্ডাঠাকুর ঠিক করিস্থি?"

"না, আমার পাণ্ডা নাই।"

উপর হইতে 'দলৈ' (প্রধান ব্যক্তি) হাঁকিয়া কহিল, "দর্শনার্থীকে পাণ্ডার সাহায্য লইতে হইবে।"

"নইলে দর্শন মিল্‌বেই না?"

"না।"

যাত্রী, সুদূর উপরের নীলিমার দিকে চাহিয়া—চাহিয়া চাহিয়া নীরব! কণ্ঠ হইতে তাহার ওষ্ঠ পর্য্যন্ত কিন্তু একটি গভীর চীৎকার আনা গোনা করিতেছে। শিবানী মা! মরিয়া গিয়াও যদি তোর কিছু অবশেষ থাকে, তা'র চোখ যদি করুণ হয়, তবে সেই তরুণ রৌদ্রের আলোময় 'অরুণ তপন' চোখেও একবার চা'; দাহ-দিগ্ধ দেহে খানিক শান্তির আবেশ ছড়িয়ে দে! নহিলে, হা, পাথরে সে রস কোথায়?

ধীরে ধীরে, ঠুক্-ঠুক্ করিয়া শিবসুন্দর নটপাড়া দিয়া নামিয়া চলিয়াছেন। উপবাস-ক্লেশ তা'র মোটেই অনুভূত হইতেছে না। আত্মজা ও অর্দ্ধাঙ্গিনী—দুই দুইটা আস্ত মানুষ চিবাইয়া চিবাইয়া খাইয়া আসিয়াই কি আর অত শীঘ্র বুভুক্ষা জাগিতে পারে?

তিনি শিবমন্দির, ধর্ম্মশালা ছাড়িয়া আরো নীচে চলিলেন। কিন্তু—তিনি পরিশ্রম-খিন্ন; কতদূর চলিবেন?

বামে পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ সিন্দূর-খিলেপিত গণেশ-মূর্ত্তি। তৎপার্শ্বস্থিত খোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি। বৌদ্ধ-শিল্প, ধর্ম্ম-বিপ্লব ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পুরাণ-রচনা প্রভৃতি তত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকের রাহাখরচের সংকুলান হইতে পারে; শিবসুন্দরের কালিমা-লিপ্ত আঁখি-তারায় কিন্তু তদ্রূপ নির্জ্জন স্থানেও, সিন্দূরের অলক্তরাগ দর্শনে লৌহ-মর্ম্ম সমাজের রুধিরাঙ্কিত বিভীষিকার নির্দ্দয় রূপ-প্রভা প্রতিফলিত হইয়া, শুধু কেবল শিহরণ-শীৎকৃতিরই জন্ম-মৃত্যু হইতে লাগিল! উঁহু, না-না, এখানে টেঁকা যাইবে না।

পাণ্ডার সাহায্য চাই—পুরোহিতের সাহায্য চাই।··· বিনা উকীলে, আদালতেও ঠাঁই মিলে। সে, মানুষ-হাকিমের এজলাস্। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। হাড়ে, রক্তে, মাংসে,—মানুষের গঠন। পাথরের উপাদান তা' নয়। তা' হইলে, হৃদ্‌পিণ্ড থাকিত। পাথর বন-চাঁড়াল হইয়া, মাহাত্ম্যই একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। ভাগ্যে তা' হয় নাই, রক্ষা তাই!

বাজারের কাছে কুমারীগণ তাঁ'কে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। সঞ্চয় উজাড় করিয়া দিয়া তা'দের হাসিমুখ দেখিবার জন্য শিবানীর বাবা একটি কুমারীকেও বুকে ধরিতে ছাড়েন নাই। দূর-দূর, সর—সর; এরা যে পিপীলিকা গো, স্মৃতির। বুকে লইয়া যে কুমারীর মুখের দিকে তিনি চান,—দ্যাখেন, ঐ যে হাসি,—ও শিবানীর;—শ্বশুর-বাড়ীর;—কর্কশ, কঠোর!—দংশন করে,—প্রাণের ফুটন্ত শোণিতের ধারা-গুলি টানে-দোহনে চুষিয়া শুষিয়া লয়.....দূর—দূর, সর—সর!

'মনের কামনার সিদ্ধি হো'বে' বলিয়া যে মালাকর-কন্যা সকলের আগে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া—'পয়সা'র জন্য হাত পাতিয়াছিল, কৈ খুঁজিয়া আর সে রাঙা মেয়েটিকে—সে পাষাণের বেটিকে পাওয়া গেল না। গেলে, তা'র কালো-কালো গোছা-গোছা চুলের মুঠি আঁটিয়া ধরিয়া শিবানীর পিতা পুছিতেন—কৈ লো পোড়া-কপালী, এখানে

নাকি পাষাণ ফাটিয়া উৎস ছুটিয়াছে,—দেখা হইল না তো! হোঃ হোঃ হো!—লুপ্ত ইতিহাস, ঋষির সে এক গোপন-গূঢ় তন্ত্র-মন্ত্র—তা'র ক্ষীণতম কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে খল্ খল্ হাসিয়া কহিতেছে—হাঁ-হাঁ, তা' উৎসই বটে, তবে তা' রক্তোৎস। রাখ্—রাখ্, থা'ক্—থা'ক্, দূর—দূর, সর—সর, ছাই। গুরুদেব, কি আদেশ করিয়াছ?

সবুজ, শ্যামল, জঙ্গলে-ঘেরা, পানায় ঢাকা ছোট এক পুকুর রাস্তার ডান ধারে আছে। শিবসুন্দর আর পারেন না।

বাঁয়ে গুহা। কে যেন বেশ করিয়া সেটা লেপিয়া-পুঁছিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক তা'র ছাদের পালিস-করা পাথরখানির উপর বসিয়া, পরে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ছায়ার মৃদু তরঙ্গে শান্তির স্পর্শ আছে—ঈষৎ।

বৈকালের রঙ্‌চঙে আকাশ। মেঘে-মেঘে হর-গৌরীর প্রণয়াভিনয়। বনে-বাতাসে বৃন্দাবনের নিবিড় বিলাস—দূচ্ছাই! ছাই-ছাই!

মানুষের কথা কাণে গেল।

প্রথম ব্যক্তি। আজ না কাট্‌লে কি চলবে না, রজত-গিরি ঠাকুর? ফিরতে যে সাঁজ লেগে যাবে। বাছাই হ'য়ে রইলই তো,—রাত্রে—বাঁশের গোড়ায় কাটারীর কোপ দে'য়াটা বামুণের ছেলের উচিত হবে কি?—

রজতগিরি। ওরে তুই থা! তোর আর ম্যালাই বক্তৃতা ক'র্ত্তে হবে না। কখন কি ক'র্ত্তে হয় না হয়, সে আমি জানি। দরকার বল্‌লে রাত্রে গাছ কাট্‌বো না, আর ব'সে ব'সে তোর সঙ্গে কুড়ের মত তাস পিট্‌বো—আ ম'রে যাই রে! যা, শীগ্‌গির ফিরে আসবি—চট্‌পট্;—বুঝ্‌লি? রাত হবে কেন?

পিছনে—কিছু উপরেই বাঁশঝাড়। সঙ্গীকে বিদায় দিয়া কেজো বাঁশগুলা বাছিতে-বাছিতে রজতগিরি ঠাকুর শিবসুন্দরের কাছে আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি পাণ্ডার বাড়ী না গিয়া এখানে এমন করিয়া পড়িয়া আছেন কেন?

শিবসুন্দর শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিলেন্ যে, সরভোগ হইতে পাণ্ডুনাথ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি, কলহ, গণ্ড-গোল, দেবীর নামের দোহাইয়ের অপব্যবহার—এমন কি, মক্কেল হাত করিবার নিমিত্ত ঘৃণ্য অভিসম্পাত বর্ষণ প্রভৃতি হীন বৃত্তিতে যাহারা পটু, সর্ব্বপ্রথম এই কারণেই পাণ্ডাদিগের আশ্রয়-গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

রজতগিরি শর্ম্মা প্রত্যুত্তরে বলিল, আজি-কালিকার সভ্য-শিক্ষা-হীনতার জন্যই, পৌরাণিক সাধু বৌদ্ধের বংশধর-গণ তা'দের চিরাগত প্রথার প্রতি একটু প্রবল মাত্রায় ঢলিয়া পড়াতেই বর্ত্তমানে এবম্প্রকার স্তরে তাহারা অবতীর্ণ। নতুবা দেবতাপ্রসাদে কেহই অসঙ্গতিসম্পন্ন নহে। তবু তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার কিছু নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত উকীলবৃন্দও ব্যবসায়ের খাতিরে এবম্বিধ নমুনা প্রদর্শনে এই পাণ্ডাদের চেয়ে কোন অংশেই পশ্চাৎপদ নহেন, মনে হয়। পক্ষান্তরে, একটি গুণে কামাখ্যার পাণ্ডা বিশ্রুত-কীর্ত্তি; সে এদের অতিথি-সৎকার। পরকে আপন ঘরে এমন করিয়া কে আপনার করিয়া লইতে পারে? সেবায়, চর্য্যায়, কে এতাদৃশ নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করিতে পারে?

শিব। তবু, ওকালতনামা না দিলে যদি মা-ছেলের সাক্ষাৎ না-ই ঘটে, নমস্কার ঠাকুর মশায়, সে মাকে আমার দূর থেকে নমস্কার।

রজতগিরি। না; যজমানের পাণ্ডার প্রয়োজন আছেই। বাবু, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আমাকেই পাণ্ডা ব'লে মাত্র স্বীকার করুন, যদি অভিরুচি হয়। ফের্‌বার দিন, যদি প্রমাণ ক'রে দিয়ে যেতে পারেন যে পাণ্ডার কোন প্রয়োজন ছিল না……!

(৪)

প্রবেশ দ্বার; পূর্ব্বরায়।

দলৈ। অলপ্ আগেই আমি কো'শো টুমাক্ পাণ্ডা না হুলে টুমি মোঙ্গুবে যাবা ন্নারা—বিন্তা পাণ্ডায় পীঠ-ডর্শন না হয়।

রজতগিরি। বাবু—আমার পাণ্ডা চোরিস্তি।…… যান্ আপনি এগিয়ে ভেতরে ঢুকে যান।

শিবসুন্দর ভিতরে যাইতেই জনৈক পাণ্ডা অন্যতর সহযোগীকে জনান্তিকে বলিল যে, যাত্রীর জাতিবর্গের পরিচয় লওয়া উচিত। কারণ, রজতগিরি বি-এ, পাশ করিয়া অনেকটা কেমন খৃষ্টানী-খৃষ্টানী হইয়া গেছে; উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞান আর তাহার মোটেই নাই।

কৃষ্ণকালী

কন্যাশোকাতুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বৈতরণীর এ পারের প্রমত্ত অন্ধকার ভূষণ্ডী-কাকের মত তা'র দুইখানি নিভাঁজ কাল অমাবস্যাময় ডানা মেলিয়া মন্দিরের নিরীহ অভ্যন্তরটুকুকে ঈগল পাখীর প্রতাপে পাইয়া বসিয়া আছে। পীঠস্থানের দুই পার্শ্বে ক্ষীণ প্রদীপ দুইটি রক্তবর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ের মত মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ব্যস্‌—আর কিছু দেখা যাইতেছে না।......একি একি, কোথায় আসিলাম। হেথা কি শান্তি মিলিবে? মন্দিরোদরের দূষিত বিষাক্ত বায়ু-পরিপূর্ণ নিরেট্‌ শূন্যতার পরমাণু-কণা মহাকালের ঝুলিঝাড়া প্রমথ-প্রেতের ন্যায়, প্রলয়-কালীন কন্দুক-ক্রীড়নকের মত—আপনাতে আপনিই তালে-বেতালে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। হেথা কি সিদ্ধি মিলিবে?

অব্যক্ত উদ্বেলনে শিবসুন্দরের হৃদয় দলমল দলমল করিয়া দুলিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। না, গুরু, এখানে না। এ যে আলোকের হত্যা-উৎসব-মন্দির—মশানের আবেষ্টন। কিছু নাই—এখানে কিছুই মিলিবে না।

পার্শ্বস্থিত পাণ্ডা কহিল—"প্রণাম করুন, মন্ত্র বলুন—!" কিন্তু নীরবে, ধীরে ভদ্রলোক পাণ্ডার পাশ কাটাইয়া হাতড়াইতে-হাতড়াইতে বাহিরে পৌছিয়া হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।—ঐ, সম্মুখে বলি-দালান।......কা'র কাম পূর্ণ হইয়াছে; সে পাঁঠা-পায়রায় মার পূজা দিবে; ঐ।......

সংহার-লীলার মহাসমারোহ! উৎসর্গ-করা ভেজা পাঁঠাগুলা থর্‌ থর্‌ কাঁপিতেছে; মা-মা করিয়া নিরুপায়—আর্ত্তনাদ করিতেছে! পায়রাগুলি হতাশভাবে একটির পর একটি—তারপর আর একটি, এমনি করিয়া—আপনাদের অগত্যা-আত্মদান ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে—আশ্চর্য্য বৈধ-হিংসা স্বেচ্ছাচারীদের। ওরে! ওরে! শুধু কেবল নিরবচ্ছিন্ন পাথুরে হাড়েই তোদের আগাগোড়া তৈরী? তা'তে কি শোণিতাপ্লুত মাংস-পিণ্ড জড়িত নাই?......ঐ রক্ত-খাওয়া রক্তে-ধোয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে খাঁড়াখানা উৎকট নির্য্যাতনের মত একেবারে পরিষ্কার খাঁটি। ইস্পাতে গড়ানো তর্‌তরে ত'ার ধার—এ যে কচিখুকীর ঘাড়-ভাঙ্গা শৃগালী, কি ব্যাঘ্রিনী, কি প্রেতিনীর তরতাজা রক্তমাখা দাঁতের মত!......হাড়কাঠের সিঁন্দুর-লেপা লাল ওষ্ঠ দু'খানা চেড়ী ত্রিজটা-রাক্ষসীর লোলুপ আলজিভের মত ক্ষুধাতুর। কালসর্পের লক্‌লকে জিহ্বা লইয়া দুর্ব্বল ছাগশিশুর দিকে লোভের যাদু ছড়াইয়া দিয়া ডাকিনীর চাহনীতে একদৃষ্টে চাহিয়া-চাহিয়া সে হাসিতেছে।......চারিদিকে আপ্তকাম কুকুর-শকুনির কিলিবিলি——বেশ গুরু, খুব আদেশ করিয়াছ;—আচ্ছা শান্তির ঠাঁই নির্দ্দেশ করিয়াছ!

রজতগিরিকে সৌভাগ্যকুণ্ড হইতে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া শিবসুন্দর বড় আবেগে ক্ষ্যাপার মত একটানে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ঠাকুর, ঠাকুর, এই কি বিশ্বমাতা? এই তাঁ'রি মন্দির? এইখেনেই তিনি আছেন? এই জঘন্য ব্যভিচার তিনি সহ্য ক'চ্ছেন? নিরীহের আর্ত্ত কণ্ঠ, মৌনাবগুণ্ঠনে ব'সে ব'সে—শুনে যাচ্ছেন? তাঁর সিংহাসন কেঁপে উঠ্‌ছে না? পাহাড় ফেটে তাঁ'র ক্রোধ অগ্নিগিরির গরম তরলতা বমি ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে উথলিয়ে উঠ্‌ছে না? এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে বলো! কন্যা-শোকাতুরকে কি দেখাতে নিয়ে এসেছ গো!......

টুপ্‌-টাপ্‌ টুপ্‌-টাপ্‌—মেয়েহারা পাগলের অশ্রুর কল্পতরু হইতে মুক্তাবিন্দুগুলি ঝরিয়া-ঝরিয়া গড়াইয়া-গড়াইয়া পড়িতেছে।..... দুল্‌-দুল্‌-দুল্‌—দুল্‌-দুল্‌-দুল্‌-দুল্‌ পায়ের নীচে পাহাড়খানি দুলিয়া উঠিল।*

রজত। কন্যা-শোকাতুর! কি বলেন! কে তবে এখেনে আপনাকে আস্‌তে যুক্তি দিয়েছে?

শিব। যুক্তি নয়—যুক্তি নয় গো, গুরুর আদেশ।

রজতগিরি, কিয়ৎকাল কি যেন ভাবিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দির মধ্যে পীঠ-দর্শন আপনার সারা;—কেমন?"

শিব। না, সে যে ভয়ানক অন্ধকার! না, কিছুই পেলুম না সেখেনে।

প্রখর দৃষ্টিতে শিবসুন্দরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া যুবক রজত-পাণ্ডা প্রৌঢ়কে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল—"আসুন আমার সঙ্গে; হাঁ, এখেনে মা'কে পাওয়া বড়ই দুষ্কর বটে। কিন্তু কি করা! তালগাছের সেকড়, বড়ই নীচে নেমেছে। সহজে তা'কে উন্মূলিত করা,—হয়ে উঠ্‌বে না। তা' বলে 'ঈশ্বর' কি তাঁর 'এই জঘন্য সৃষ্টি ফিরিয়ে'

* কামরূপ অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে।

নেবেন? না। একেই সন্ধ্যেবেলা ধুয়ে-মুছে তাঁর মাতৃ-ক্রোড়ে স্নেহে তুলে নেবেন;—এ অতি সুনিশ্চয়।... আসুন—প্রকৃত শ্যামা-কালী দেখ্‌বেন; এখেনে না। শোকেরও শান্তি রয়েছে। নইলে কি চল্‌তো, বলুন?"

(৫)

'আগে যায় ভাগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।' পাণ্ডা রজত-গিরি শর্ম্মা আগে-আগে; পিছনে শিবসুন্দর।

বড় দেউড়ি অতিক্রম করিয়া দলৈ পাড়ার ভিতর দিয়া উভয়ে চলিয়াছে।......এইবার চড়াই ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হইল।......বৃহৎ-বৃহৎ খণ্ড-খণ্ড পাথর, তাহার প্রত্যেকখানির উপর পা দিয়া উঠিতে হইবে। যেমন হৃদয়-হীন সমষ্টি তা'র ব্যষ্টির বুকের উপর দিয়া বিনা প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে;—ঠিক তেমনি।

... ..ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে, এইবার,—ঐ যে!... .....বা! আবার কুলুপে আবদ্ধ এটি যে!

"শিবঠাকুর, এখেনেও যে ফের তালা চাবি বন্ধ দেখি!"

রজত। বলুন খুলে দিচ্ছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বল্‌ছি, লোহার তালা খুলে ফেলে ভিতরে গিয়ে সেইরূপ আঁধারের মধ্যেই কালো পাথরের পীঠ অনুভব কর্ব্বার কি এখনো আরো আপনার সাধ বাকী আছে?

শিব। ও গো, শুধু দেখলেই চল্‌বে না। গায়ত্রী-সাধনা কর্ত্তে হবে, তবে গিয়ে শ্যামা-মা আমায় শান্তি দেবেন।

রজত। বুঝি এও আপনার গুরুর আদেশ—?

* * * *

রজত উপরে চাহিয়া ভূমাকে প্রণাম করিল। কে এই ভদ্র-সন্তানের গুরু! শোক-পাগলকে, কে তিনি এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন? গায়ত্রী-সাধনায় শ্যামা-মা শান্তি দিবেন, শিষ্যের প্রতি সান্ত্বনা-বাক্য কি ইহা! গায়ত্রী-সাধনা—এবং—শ্যামা-মা—বিষম সমস্যা।

পাণ্ডা ফিরিয়া অতি দূরে তাহার স্থূল দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিল; এবং একাগ্রভাবে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিয়া ভাবিল, একি—একি, কি সে দ্যাখে! চুপ্‌, কিছু না। এখন না।

উভয়ে মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়া ঘুরিয়া গিরিচূড়ার এক প্রান্তে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের নিকট অগ্রসর হইল। পাণ্ডা রজতশর্ম্মা দৃঢ় মুষ্টিতে শিবানীর পিতার হস্ত ধারণ করিয়া অকম্পিত নিথর কণ্ঠে উচ্চারণ করিল—"আমাকে মনে মনে বরণ করুন! আমি এখেনে আপনার তীর্থগুরু। ......বসুন, যোগাসনে, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে,—হাঁ, ঐখেনে, ঐ পাথরটার ওপর;—বেশ।" জপ করুন—

'ভুবনেশীং মহামায়াং সূর্য্য-মণ্ডল-রূপিনী
নমামি বরদাং শুদ্ধাং কামাখ্যারূপিনীং সিদ্ধাম্‌॥'

মনে মনে শ্লোক পাঠ করিয়া প্রণামের নিমিত্ত হাত তুলিবে, শোকোন্মাদ এ আবার কি দেখিতেছে রে! চুপ্‌-চুপ্‌, সে 'তত্ত্ব' যে 'নিহিত', এবং 'গুহায়াম্‌'। তা' হউক; ভদ্রলোকের শির তো আর নত হয় না—শুধু—প্রাণ, তার কিছু বলিতে যা-কিছু আছে সব লইয়া সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে। মিথ্যার মধ্যেও সত্যবতী হে মহামায়া ভুবনের রাণী ঠাকুরাণী, সৌর-মণ্ডলের অগাধ বিভায় সিদ্ধ শুদ্ধ রূপের ডালি লইয়া কামনার তপস্যার বর প্রদান করিতে চাহিতেছ, হে কামিনী মঙ্গল-ঘরণী, তোমাকে প্রণাম করিব কি দিয়া? হারাইয়া গেছে গো, ফকিরের কিছু নাই!

রজতগিরি কহিল—"এইবার ব্যাহৃতি, বাবু। আহরণ করুন—যে শূন্য ব্যোম-মণ্ডল অবস্থার সঙ্গে কালকে যোগ-বন্ধনে অনবরত বেঁধে দিচ্ছে, সম্মুখের ঐ দিগন্ত-প্রসারিত বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য-রাশির অন্তস্তলের মধ্য দিয়া ছেড়ে দিন আপনার মনকে; দিয়ে, সেই যোজকের সাথে এক ক'রে ইহ-পর-লোকের সমুদায় স্মৃতিকে, সুস্থির চিত্তে আহরণ করুন। শক্ত লাগছে কি? দিশেহারা বোধ কচ্ছেন কি? বোধ কর্ত্তেন—সে মন্দিরের মধ্যকার অন্ধকারে। কিন্তু সামনে ঐ দেখুন, কি জলজ্জীবময়ী শুদ্ধাসিদ্ধা শ্যাম-ধরণী-দেবতা তাঁর বরদ কর সঞ্চালনে আয়্‌ আয়্‌ আয়্‌ ব'লে আপনাকে ডেকে যাচ্ছেন! এঁর আলোকে তাঁর ধ্যান করুন।

সহিষ্ণু শিবসুন্দরের বক্ষ ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠিতেছে। উন্নত সরল গ্রীবায়, উন্মীলিত পরিচ্ছন্ন নয়নে কে তা'র দৃষ্টিটুকুকে পুরোভাগে সম্প্রসারিত করিয়া দিল।...... চমৎকার! ......অক্ষি-গোলকের ক্ষুদ্র শক্তি সম্যক্‌ নিয়োজিত হইয়াছে।......মন-রস-পানে বলোদ্ধত সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্মুখের দিক-পথ বহিয়া প্রধাবিত হইতেছে। পর্ব্বত-

নিকরে প্রহত হইয়া হইয়া সে যখন সংযমের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইল, তখন তা'র আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—ললিত-সন্ধ্যায় কান্তিময়ী কামাখ্যা-সুন্দরীর মোহিনী স্বর্ণাভা। ঊর্দ্ধে ঐ অসীম অব্যয় নির্মেঘ নভো-নীলাঞ্চল। বামে—অববাহিকা- নদী--মাতৃক -প্রদেশ--সমূহের অচল-নিস্পষ্টবারি-বিধৌত অনূপ-ভূমি। নিম্নে—সুচারু তরু-রাজি-পরিশোভিত শ্যামল-বক্ষ ভূচিত্রাবলী, চলায়তন হইতে সুদূর অনন্তের তীর্থযাত্রায় চলিয়া চলিয়া, আগামী নিশাশঙ্কায়, ক্লান্ত-অবশ তনুখানি এলাইয়া দিয়া, বিশ্রাম-সম্ভোগ করিতেছে। পাষাণ টুটিয়াছে রে, পাথর ভাঙ্গিয়াছে! সলিলাকারে কঠিনের হৃদয়-নির্য্যাস—নৃত্যে, পুলকে, গীতে, মুখর; কলুষহর-তরঙ্গ-প্রতিম ব্রহ্মপুত্র—নিবারিত-অম্বুবাচী তিথির যৌবন-যোগীর ন্যায় নীলাদ্রি অভিমুখে শ্লোকোচ্চারণ করিতে করিতে সবেগে আসিতেছে। দেখ দেখ সে বেগের গতি কি সুন্দর! গতি-বালিকা বসুমতী মাতার চিরানুলিপ্ত স্নেহানুরঞ্জিত অঙ্কোপরে জ্যোৎস্নাকুমারীর মত উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, কখন্ কে তাহার অশান্ত আবেগে বিক্ষোভ তুলিয়া কান্ত, মধুর, অস্ফুট কলস্বনে সন্তরণে-সন্তরণে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, কিছু ঠিক নাই। পর্ব্বতে, সমতলে, নীলিমায়, শুভ্রতায়, তিমিরে আলোতে, সুখে দুঃখে, বিরহে মিলনে—উন্নতিতে অবনতিতে একেবারে মাখা-মাখি। নাই—অসম্ভবের লেশমাত্র, লোকায়তিকতার ক্ষীণতম রেখাটি!... কোথায় হে মহা-ভারতবর্ষ-বিধাতা দেব-দেব মহাদেব শশাঙ্কাঙ্কিত-শেখর পার্ব্বতীনাথ উমানন্দ! কোথায় আর তুমি কোন্ ভস্মাচলের সংক্ষিপ্তকায় দ্বীপটুকুর মধ্যে তমিস্রা-বৃত ক্ষুণ্ণ পাতালের তল-বেদিকায় নিবিড় ধ্যানে পড়িয়া রহিয়াছ? না প্রভু, না প্রভু, এতদ্ব্যতীত তোমার শান্তম্ অদ্বৈত শিব-মূর্ত্তির আর কোন বিহ্বল সমাধির পরিকল্পনা হইতে পারে না।

রজতশর্ম্মা বলিল—"এবারটি একবার ত্রিলোক-প্রসবিত্রী দেবতার বরণীয় ধ্বান্তারি তেজকে অন্তরে ধারণ করুন দেখি; পার্ব্বেন, যদি ব্যাহৃতির সৌভাগ্য-কুণ্ডে আপনার গঙ্গাস্নান সারা হ'য়ে গিয়ে থাকে। সেই নবলব্ধ দিব্যজ্ঞানে কি বুঝতে পাচ্ছেন না যে, আমাদিগের প্রতি অহরহঃ ধারণার শক্তি প্রেরণ করা হ'চ্ছে—? যিনি কচ্ছে'ন, তাঁরি তেজকে চিন্তা করুন। এ যে দয়া গো মহাশয়, হীন নিরুপায় ক্ষুদ্রতমের কর্ণে বৃহত্তমের অযাচিত করুণার সংবাদ দিয়ে, তা'কে যোগাভিনিবেশের ক্ষমতা উৎসর্গ ক'রে ধনী ক'রে দে'য়া—বড় দেওয়া—বড় দয়া, ওগো!

সাধনার বিঘ্ন অপসৃত।

শিবসুন্দর একোন্মুখী অন্তর্দৃষ্টিতে শ্যাম্-সোহাগিনী বসুধার প্রতি চাহিয়া, দয়ার সঞ্জীবনীসুধা পান করিতে-করিতে মাতাল না হইয়া পুঞ্জ-পুঞ্জে অমরত্ব উপার্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে গায়ত্রী সূত্র প্রাণ-যোগে অভিধ্যান করিতে লাগিল।......কামদুঘা কামাখ্যা শ্যামা......অয়ি কতকাল অটল থাকিবেন?......আকাশে ঐ গৌরবর্ণ শান্তির পদ্ম-পতাকা হস্তে উড়িয়া আসিতেছেন।.. জয় গুরু—জয় গুরু!

শিবসুন্দর। কিন্তু, ঠাকুর, এত দূরে আস্তে গেলুম কেন? বাড়ীতে—

রজত গিরি। হাঁ, বাড়ীতেও হো'তো। তীর্থ নাকি তা'রি উদ্বোধক। ভুলে থাকি যে।

শিবসুন্দর তখন বস্ত্রের ভিতর হইতে নেক্লেস্—না, স্মৃতি গো;—শিবানীর মাতার ইহা অবশিষ্ট প্রত্যক্ষ স্মৃতি—শিবসুন্দরের সমুদ্রযাত্রার অবলম্বনীয় সম্বল একমাত্র ধ্রুবতারা নেক্লেস্-ছড়া বাহির করিয়া যখন পাণ্ডাকে ভাঙ্গা গলায় বলিলেন—"এই—শেষ, নি'ন্! এই আমার 'সফল'।"

শর্ম্মা তাহার চক্ষু দুইটার দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া হাসি মুখে উত্তর দিল—"পেয়ে গেছি; আর কেন?"

শিব-সুন্দর দেখিল। দেখিল, রজতগিরির চোখের পাতা আনন্দ ও রূপামৃতে ভরিয়া, রসে ঢল ঢল করিতেছে।

কল্পনা ও ছোটগল্প

[শ্রীসতীশচন্দ্র বাগ্‌চী বি-এ, এলএল-ডি]

ছোটগল্পের উপর আজকাল রোমান্‌টিসিজমের প্রভাব খুব বেশী। ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলিতেছেন যে, তাহাতে ছোটগল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তুরগেনেভ যখন তাঁহার কাব্য-গল্প প্রকাশিত করেন, তখন সমজ্‌দারেরা একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, ছোটগল্পের মনস্তত্ত্বঘটিত প্রশ্নাবলীর উত্থাপন ও কখন-কখন তাহাদের সমাধানই যথেষ্ট। তারপর যখন ফরাসী লেখকেরা দলে-দলে কল্পনা-বহুল ছোটগল্পের সাহায্যে এক নূতন ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখা গেল যে, অনেকেই রোমান্‌টিসিজ্‌মের গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন- কল্পনাই ছোটগল্পের প্রাণ বলিয়া একটি সূত্র প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ছোটগল্প-লেখকেরা, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, কল্পনা-পুষ্ট ছোটগল্পের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। কল্পনা শিল্পসৃষ্টির প্রধান উপাদান নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই কল্পনা কতখানি বস্তুমূলক এবং কতখানি অবাস্তব হইতে পারে তাহা ঠিক না করিতে পারিলে ছোটগল্পের সৃষ্টিচাতুর্য্য উপলব্ধি হওয়া কঠিন। গীদ্ মো পাঁশা তাঁহার কল্পনা-সাহায্যে পদার্থ-রহস্য, চরিত্র-রহস্য এতখানি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন যে, তাঁহার ছোটগল্পগুলি সকলই সত্যঘটনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার উদ্ভাবিত জগতের আলো-ছায়ার নিয়ম ইন্দ্রিয়বোধ্য জগতের অনুরূপ; সেইজন্য তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি আমাদের প্রত্যক্ষ-জগতের প্রতিকৃতির মত, প্রকৃত প্রতিকৃতির মত (real-image) দেখায়। সাহিত্যের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি কেমন অতর্কিত-ভাবে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, তাহা আজকালকার ফরাসী, রুষীয় ও ড্যানিশ লেখকদের গল্পগুলি বেশ দেখাইয়া দিতেছে। জগতের সৃষ্টি-বিকাশের ভিতর এমন একটি একত্র-সম্বদ্ধতা আছে যে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ সমস্ত শিল্পের ভিতর অনুভূত হয়। জগতের শৈশবে শক্তির প্রথম পরিণতি একমুখী না হইয়া বিভিন্নমুখী হইয়াছিল বলিয়াই জগতের অভিব্যক্তিও নানা-মুখী; আর সেই অভিব্যক্তির ফলও এক নয়—অনেক। কিন্তু সকল অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, সকল পরিণতির ভিতর দিয়া, প্রকৃতিবহুল সৃষ্টির ভিতর দিয়া, একটি অভিন্ন ধারা প্রবাহিত। সেই ধারার ভিন্নভিন্ন অংশ ভিন্নভিন্ন আকারে দেখা দেয়; কিন্তু কল্পনাসাহায্যে সেই আকারের উপরের আবরণ সরাইয়া তাহার অপরিবর্ত্তনশীল কেন্দ্রস্থলে পৌছাইতে পারিলেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রথম উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়া উঠে। সেইজন্যই হাজার চেষ্টাতেও নীল আকাশের ফটোগ্রাফ-সাহায্যে নীল আকাশের সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। আকাশের সৌন্দর্য্য আকাশেরই স্বরূপ; তাহার ভিতর এমন একটি শক্তির প্রভাব আছে, যাহা শুদ্ধ গণিতের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, যাহাতে গতি-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সমানভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই সৌন্দর্য্য-বিকাশ কল্পনা-মূলক,—বাস্তব-কল্পনা-মূলক। নিম্ন-উদ্ধৃত একটি ইউরোপীয় গল্প বোধ হয় এই কথাটি বুঝিতে সাহায্য করিবে।

ফিয়র্ডের নীল জল অন্ধকার করিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। ঢেউগুলি একটু যেন অলস,—সমস্তদিন পথ হাঁটিয়া আর চলিতে পারিতেছে না। সারস পাখীগুলি দলেদলে বাসার দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

নববিবাহিত দম্পতি এই সন্ধ্যা-আকাশের নীচে, খোলা বাতাসের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। তাহাদের নূতন জীবনের প্রথম অবসর কাটাইবার জন্য সহরের গোলমাল ছাড়িয়া তাহারা জলের ধারে, বন ঝোপের পাখীর মত বসিয়া আছে। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ ঘুমন্ত প্রকৃতির নিশ্বাসের মত বহিতেছিল। যুবক-যুবতী এই ধীর স্থির নিস্তব্ধ অভিনয়ের ভিতরের রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। খানিক পরে যুবক বলিল "হাঁ, ঠিক এখানেই বাড়ী করিব। এই আমাদের থাকিবার জায়গা। বাড়ীটি ছোট-খাট

একটি বরফের গাদার মত দূর থেকে ঝক্ ঝক্ করিবে। কোটা বাড়ী নয়, খ'ড়ো ঘর। চারিধারের দেওয়াল 'আইভি' লতায় ছেয়ে দে'ব। বেশ হবে, নয়?"

যুবতী। হাঁ, সেই ভাল, তবে দুয়ারগুলি সবুজ রংএর, আর জানালা সব কাঁচের সার্সিওয়ালা হওয়া চাই। আর দুয়ারের মাথায় বড়-বড় হরিণের শিংএর ব্রাকেট লাগাতে হবে। আর সারসগুলি সন্ধ্যাবেলায় এসে চালের মট্‌কায় বস্‌বে। আমি সারসের নাচ দেখতে বড় ভালবাসি। কেমন পাখা ঝাপ্‌টায়, বোধ হয় যেন উল্টে পড়ে গেল।

যুবক। আচ্ছা, সারসপাখী আসে তাতে ক্ষতি নাই, তবে ছেলেপিলেতে কাজ নাই। ছেলেপিলে হ'লেই বড় খরচ। শুধু একটা বড় সবুজ রংএর টিয়াপাখী পোষা যাবে। আমরা যেই কফি খেতে ড্রয়িংরুমে ঢুকব, অমনি পাখীটি বলবে 'কিগো, ভাল ত' ?

যুবতী। টিয়েপাখী তো পুষিবেই ; কিন্তু একটি ছোট ছেলে চাই, খুব ছোট্ট একটি ছেলে।

যুবক। আচ্ছা, ছোট্ট একটি ছেলে, কিন্তু খুব ছোট।

যুবতী। "হাঁ, এই এতটুকু একটি ছেলে।" এই বলিয়া কত ছোট, তাহা যুবতী দেখাইয়া দিল।

যুবক। আমাদের ডাইনিংরুম আর ড্রয়িংরুমে ভাল-ভাল প্যানেলের দুয়ার থাকবে। জানলাগুলি এমন হ'বে যে, জানলার কাছে বসে আমরা দূরের পাহাড় আর ফিয়র্ডের নীল জল দেখিতে পাইব। আর একটা দূরবীণ দিয়া যে সব জাহাজ দূর দিয়া যাইবে, তাহাদের গতিবিধি আমরা মধ্যে-মধ্যে লক্ষ্য করিব। জাহাজ দেখিলেই আমার মনে হয়, জগতের সকল অধিবাসীরাই যেন কুটুম্ব, কেবল দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে।

যুবতী। আমাদের ড্রয়িংরুমের একপাশে আমার শেলাইয়ের কলটি থাকিবে।

যুবক। ড্রয়িংরুমের পাশে আমার বসিবার ঘর থাকিবে। ছোট একটি ঘর। সেখানে একটি আলমারীর পিছনে একটি লুকান দুয়ার থাকিবে। সেই দুয়ার দিয়া মাটীর নীচে একটি ঘরের ভিতর যাওয়া যাইবে। সেখানে গেলেই মনে হ'বে, কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই বদ্ধঘরে আমাদের কোন বিশেষ আত্মীয় আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। পৃথিবীর সব সম্পর্ক শেষ হইয়া গেছে। আমরা দুজনায় সৃষ্টির কেন্দ্রমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। দেশ ও কালের পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। জড় ও জীবিতের পার্থক্য লোপ পাইয়াছে। আমরা চিরন্তনের সহযাত্রী হইয়া পড়িয়াছি।

যুবতী। তাই হ'বে।

তখন আকাশে সন্ধ্যাতারা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যুবক আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল "এইবার বাড়ী ফিরতে হবে। মা আমাদের জন্য বসিয়া আছেন। ওঠা যাক্। সঙ্গে তো বেশী টাকা নাই, চল থার্ড ক্লাস গাড়ীতেই ফেরা যাক্।"

যুবতী বলিল "তাই ভাল ; আজ ট্রেনে বেশী ভিড়ও হ'বে না।"

এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কল্পনামূলক একটি চিত্র প্রকৃত ঘটনার মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মূলমন্ত্রটি লেখক বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রভাবের ভিতরে মানুষের স্বভাবটি একেবারে ডুবে যায় নি। সকল মানুষেরই কল্পনাজগৎ বাস্তবজগৎকে ছাড়াইয়া যায়। পকেটে হয় ত একটি টাকা মাত্র নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া মনের গতিবিধি অর্থক্লিষ্ট হইয়া উঠে না। প্রকৃতির স্বরূপ যে আপেক্ষিক নয়, তাহা সকল নরনারীই একবার-না-একবার বোধ করে ; কিন্তু সেই বোধটি শিল্পীর কাছেই বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। সেইজন্য শিল্পের বিষয় কখনই আপেক্ষিক নয়। ইংরাজীতে যাহাকে absolute বলে, যে সত্য কোন বিশিষ্ট অনুসন্ধানপ্রণালীর উপর নির্ভর করে না, সেই অনাপেক্ষিক সত্যই শিল্প-কলায় প্রতিভাত হয়। ছোটগল্প তখনই সৌন্দর্য্যবহ, যখন অনাপেক্ষিক সত্য ইহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহুত্বের ভিতর একত্ব আনিয়া দেয়। সেই একত্বই ইহার জীবন।

অনাবিল সৌন্দর্য্য জীবনী-শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেই জন্যই মৃত্যুর সৌন্দর্য্য-প্রভাব একটি অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের আকারে দেখা দেয়। হয় ত মৃত্যুর একটি সৌন্দর্য্য আছে ; কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ জীবনের মধ্যে দেখা যায় না। জড়জগতের বোধশক্তি হয় ত আছে ; কিন্তু সে বোধের প্রকৃতি জীবিতের বোধশক্তির মত নয়। তাই কল্পনার সাহায্যে জীবনের গতিবিধি স্পষ্ট দেখাইতে পারিলেই উপভোগ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়। জীবনের

একটি সম্পূর্ণতা আছে, যাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখান যায় না। জ্ঞানের সমগ্রতার সঙ্গে জীবনের সমগ্রতা ওতঃপ্রোত-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রসাহায্যে জীবনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বুঝিতে পারেন না। বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আংশিক, কারণ সমগ্র সত্য পূর্ণ আকারে বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দেয় না। বিজ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়বোধ্য জগৎ ছাড়িয়া কল্পনার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে, তখনই সে কতকটা অনাপেক্ষিক সৌন্দর্য্যের আভাস পায়। তখনই বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয়, যখন তাহারা ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা স্থলবিশেষের উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও পদার্থ-তত্ত্ব ছাড়িয়া মনস্তত্ত্বের সাহায্য লওয়া বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে। নরওয়ের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সোফস্ লী একবার বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত প্রকৃতি একটি অপরিবর্ত্তন-শীল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলি, তাহা সেই সূত্রেরই আংশিক বিকাশ। সেই মূল সূত্রটি বাহির করিতে হইলে, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ্য জগতে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। বাস্তব-কল্পনার সাহায্য ভিন্ন বিজ্ঞানের ভিতরকার রহস্য-উদ্ঘাটন অসম্ভব।

সমস্ত সৌন্দর্য্য জীবনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে—যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ছোটগল্পের সৌন্দর্য্যও বৈজ্ঞানিক-সৌন্দর্য্যের মত জীবনের অভ্যন্তরে নিহিত। জীবনের উপরের আবরণ সরাইয়া ভিতরকার সত্তাটিকে দেখাইতে হইবে। সেইজন্যই বাস্তব কল্পনা-সমৃদ্ধ ছোটগল্প এত সুন্দর, এত জীবন্ত বোধ হয়।

ছোটগল্পের পরিপূর্ণতা তখনই দেখা দেয়, যখন জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূলমন্ত্রটি ছোটগল্পের ভিতর ধ্বনিত হয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর এমন সামঞ্জস্য থাকিবে, এমন প্রকৃষ্ট যোগ থাকিবে যে, জীবনের বিশিষ্টতা তাহার মধ্য দিয়া অক্লেশে, অবাধে চলিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু সেই বিশিষ্টতারহিত বলিয়াই অধিকাংশ ছোটগল্প শ্রীহীন। লেখক একটুকরা সময়ের উপর গল্পটিকে দাঁড় করাইয়া দেন। অনন্ত সময়ের সঙ্গে সেই সময়ের টুকরাটুকুর যে যোগ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের অভিজ্ঞতাটিকেই চোখের সম্মুখে লইয়া আসেন। কিন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির, জীবন সৃষ্টির ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। অনন্তের সঙ্গে সান্তের যোগে সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট হয়। জীবন অনন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুই অনন্ত বোধহীন।

জীবনের গতি কল্পনাসাহায্যে পরিস্ফুট করা ছোটগল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। জীবনের গতি আবার চিরপ্রবহমান সময়ের সঙ্গে জড়িত বলিয়া, জীবন ও সময়ের সম্বন্ধটী বুঝাইবার জন্য ছোটগল্পের মধ্যে খানিকটা কার্য্য-পরিণতি ও চরিত্র-পুষ্টি আপনাআপনিই আসিয়া পড়ে। সময়ের প্রবাহ কিন্তু প্রকৃত, কাল্পনিক নয়। এমন কি বার্গস্ঁ বলেন, সময়ই জীবনের মূল সত্য; জীবন সময়ের ভিতর দিয়া নিজের পথ করিয়া লইতেছে মাত্র। সেইজন্য জীবনের বিকাশ সময়সাপেক্ষ—সময়ের বিকাশ পূর্ণরূপে জীবনসাপেক্ষ নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, সত্য-বিকাশের ভিতর দিয়া সময় চলিয়া যাইতেছে। ছোটগল্পও সেই সময়-প্রবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ জীবনের সকল বিকাশের স্বরূপ বহুমুখ হইয়াও প্রকৃতপক্ষে একমুখ;—এই কথাটি কার্য্যতঃ ছোটগল্পে দেখান হয়। কাজে-কাজেই ছোটগল্পে কল্পনার সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে, অনন্ত সময়-প্রবাহ অন্য কোন উপায়ে বাস্তবতার মধ্যে আনা যায় না। সেইজন্যই ছোটগল্পের ধারা ও ইতিহাসের ধারা বিভিন্নমুখী। ইতিহাস—জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া সময়ের যে প্রবাহ চলিয়াছে—সেই প্রবাহের উপর দৃষ্টি রাখে না, তাহার কায জীবন ও মৃত্যুর বাহ্য-সম্বন্ধ লইয়া। তাই ঐতিহাসিক সময়কে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া নিজের কাযে লাগাইতে পারেন; কিন্তু গল্পলেখক সময়ের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে ছোটগল্প একটি ছোট ইতিহাস হইয়া পড়ে। তাহার স্বভাব ভিন্নভাবে পরিণত হয়। তাহার যেটি মুখ্য উদ্দেশ্য—জগতের শক্তি-বিকাশের ভিতর হইতে সময়ের বাস্তবতাকে বাহিরে আনয়ন করা—সেটি সম্পূর্ণ বিফল হয়।

ছোটগল্পের প্রকৃতি ইহার আকৃতিসাপেক্ষ নহে। ইহার আয়তনের চেয়ে ইহার ঘনত্ব অনেক বেশী। ইহার প্রকৃতি সেই ঘনত্বের সঙ্গে জড়িত। কারণ ইহার ঘনত্ব শুধু ঘটনা-সমষ্টির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ইহার জীবনী-শক্তির উপর। সেই জন্যই বোধ হয় বাস্তব-কল্পনা-পুষ্ট ছোটগল্প এত খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আর সেই জন্যই ছোটগল্পের নির্ম্মাণ-কৌশল আয়াস-লভ্য নয়।

প্রাকৃত কবিতা

[শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী]

প্রাকৃত ভাষার উপাদেয়তা-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়বধ (গউর-বহ) কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতি (৯২-৯৩) বলিয়াছেন যে, নব-নব বিষয় ও সুকুমার শব্দসংযোগে সমৃদ্ধ রচনা ভুবন-সৃষ্টি হইতে নিবিড় ভাবে এক প্রাকৃত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত জলই যেমন সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সমস্ত ভাষাও সেইরূপ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন এবং প্রাকৃতেই প্রবিষ্ট হয়।*

প্রাকৃত কাব্যের ভিতরে ও বাহিরে হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্ফুরিত হয়। এই আনন্দে নয়নযুগল কখন সঙ্কুচিত, কখন বা বিকসিত হইয়া উঠে।

কর্পূরমঞ্জরীকার রাজশেখরও বলিয়াছেন (কর্পূর—১।৮), সংস্কৃত রচনা কঠোর, আর প্রাকৃত রচনা সুকুমার; স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে যে প্রভেদ, সংস্কৃত ও প্রকৃতের মধ্যে সেই প্রভেদ।

কালক্রমে প্রাকৃতের আলোচনা দেশে নিতান্তই কমিয়া গিয়াছে, লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য এখনো উপযুক্তরূপে আলোচিত হইতেছে না। ইহা ছাড়া আরো অনেক প্রাকৃত সাহিত্য আছে। পাঠকেরা ইহার মধ্যে অনেক উপভোগ্য বিষয় দেখিতে পাইবেন। আজ আমি এখানে পাঠকগণের ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের আশায় কয়েকটি প্রাকৃত কবিতা দুই একখানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সাহিত্য-রসিকগণের প্রাকৃত আলোচনায় কিঞ্চিৎ অনুরাগও জন্মাইতে পারে। পাঠকগণ ইহার ছন্দ, ভাষা ও ভাব লক্ষ্য করিবেন।

প্রাকৃতপিঙ্গলে বর্ণিত ছন্দের উদাহরণরূপে উক্ত হইয়াছেঃ—কবি দশাবতাররূপে নারায়ণের স্তুতি করিতেছেন—

জিনি বেঅ ধরিজ্জে মহিঅল লিজ্জে
পিট্‌ঠিহি দন্তহি ঠাউ ধরা।
রিউবচ্ছ বিআরে ছলতণু ধারে
বন্ধিয় সত্তু পআল ধরা॥
কুলখত্তিয়কম্পে দসমুহ কট্‌ঠে
কংসঅকেসি বিণাস করা।
করুণে পঅলে মেচ্ছহ বিঅলে
সো দেউ ণরায়ণ তুম্‌হ বরা॥

যিনি (মীনরূপ ধারণ করিয়া প্রলয় জলধি মধ্য হইতে) বেদের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং (কূর্ম্মরূপে) পৃষ্ঠদেশে ও (বরাহরূপে) দন্তের উপর ধরণীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি (নৃসিংহরূপে) রিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি কপট (বামন) তনু ধারণ করিয়া (দেব-) শত্রু (বলিকে) পাতালে বন্ধন করিয়াছিলেন, যিনি (জামদগ্ন্য মূর্ত্তিতে) ক্ষত্রিয়কুলকে কম্পিত করিয়াছিলেন, যিনি (রামরূপে) দশমুখ রাবণকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন, যিনি (কৃষ্ণাবতারে) কংশ ও কেশীকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি (বুদ্ধমূর্ত্তিতে) করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং (কল্কিরূপে) ম্লেচ্ছকে বিদলিত (করিবেন), সেই নারায়ণ তোমাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করুন!

আর একটি কবি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া নারায়ণেরই স্তব করিতেছেনঃ—

জিণি কংশ বিনাসিঅ
কিত্তি পআসিঅ
মুট্‌ঠি-অরিট্‌ঠ-বিনাস-করু
গিরি হত্থ ধরু।
জমলজ্জুন ভঞ্জিঅ
পঅভরগঞ্জিঅ—
কালিঅকুল জস ভুবন ভরে।*

* টীকাকার ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃতই হউক বা অপর অপভ্রংশ, পৈশাচিকাদিই হউক, এই সমস্তকেই প্রসিদ্ধতম প্রাকৃতেরই দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। অথবা কবির (বাক্‌পতির) মতে প্রাকৃত শব্দব্রহ্মই প্রকৃতি, এবং সংস্কৃত প্রভৃতি ইহারই বিকার বা বিবর্ত্ত।

* ইহার পরের কয়েকটি শব্দ নির্ণয়-সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

চাণূর বিহণ্ডিঅ
নিঅকুলমণ্ডিঅ
রাহামুখমহু পান করে
জিমি ভমরবরে।
সো তুম্হ ণরায়ণ
বিপ্পপরাঅণ
চিত্ত হি চিন্তিঅ দেউ বরা
ভউভীতিহরা ॥ ১।১৫৫

যিনি কংস, মুষ্টিক ও অরিষ্ট অসুরকে বিনাশ করিয়া কীর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, যিনি হস্তে পর্ব্বত ধারণ করিয়া, যমলার্জ্জুন ভগ্ন করিয়া ও পদভরে কালিয়কুলকে গঞ্জিয়া যশে ভুবনকে পূর্ণ করিয়াছেন, যিনি চানূরকে খণ্ডিত করিয়া নিজের বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ও ভ্রমরের ন্যায় রাধার মুখমধু পান করিয়াছেন, এবং যিনি চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভবভীতি হরণ করিয়া থাকেন, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণ তোমাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করুন!

একজন কবি কাশীরাজের বিজয়যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন—

ভয়ভজ্জিত বঙ্গ, ভঙ্গু কলিঙ্গা, তেলঙ্গা রণ মুক্তি চলে
মরহট্টা ধিট্টা লগ্‌গিঅ কট্‌ঠা, সোরট্‌ঠা ভঅ পাঅ পলে।
চম্পারণ কম্পা, পব্বঅঝম্পা, উত্থী উত্থী জীবহরে
কাসীসর রাণা কিঅউ পয়াণা, বিজ্জাহর
ভণ মন্তিবরে ॥১।১১৬॥

মন্ত্রিবর বিদ্যাধর বলিতেছেন, কাশীশ্বর রাজা যখন গমন করেন, তখন বঙ্গ ভয়ে পলায়ন করে, কলিঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়, তৈলঙ্গ রণত্যাগ করিয়া ফেলে, ধৃষ্ট মহারাষ্ট্র দিগন্তে লাগিয়া যায়, সৌরাষ্ট্র ভয়ে পায়ে পতিত হয়, চম্পারণ্যবাসীদের কম্প উপস্থিত হয় এবং পার্ব্বতীয়গন উপর্য্যুপরি জীবগণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এক জন ধনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন:—

তাব বুদ্ধি, তাব সুদ্ধি, তাব দাণ, তাব মাণ, তাব গব্ব,
জাব জাব হত্থ তল্ল ণচ্চ সব্ব বিজ্জুরেহ রঙ্ক দব্ব।
এত্থ অন্ত অপ্পদোষ, দেব্বরোস, হোই নট্‌ঠ সোই সব্ব
কোই বুদ্ধি কোই সুদ্ধি কোই দাণ কোই মাণ কোই
গব্ব ॥ ২।২৫৬

যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্ততলে বিদ্যুদ্‌রেখার ন্যায় চঞ্চল কোন কটি দ্রব্য নৃত্য করিতে থাকে, ততক্ষণই বুদ্ধি, ততক্ষণই শুদ্ধি, ততক্ষণই দান মান এবং ততক্ষণই গর্ব্ব থাকে। আর যখনই ইহার অভাব হয়, তখনই আত্মদোষ ও দৈব-রোষ উপস্থিত হয়, সেই সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়; তখন আর বুদ্ধিই বা কি, শুদ্ধিই বা কি, দানই বা কি, মানই বা কি, গর্ব্বই বা কি।

রঙ্ক নামে একজন ভোজন বিলাসী বলিতেছেন:—

সের এক্ক যদি পাবউঁ ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাবউঁ নিত্তা।
টঙ্ক এক্ক যদি সেন্ধব পাআ
যো হউ রঙ্ক সোই হউ রাআ ॥ ১।১০৪ ॥

প্রতিদিন যদি একসের করিয়া ঘি, কুড়িটা করিয়া মণ্ডা, একটাকা পরিমাণ সৈন্ধব লবণ, পাওয়া যায়, তাহা হইলে রঙ্ক যে-ই কেন হউক না, সে রাজা।

আর একটি রসিক প্রার্থনা করেন:—

ওগরভত্তা রম্ভঅপত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধসজুত্তা
মোইণিমচ্ছা নালিচগচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুণমন্তা ॥ ২।৯৪॥

কলার পাতায় শালি চাউলের ভাত, গাওয়া ঘি, দুধ, মোইণি (?) মাছ আর নাল্‌চে শাক, এই সকলকে প্রেয়সী প্রদান করেন, আর পুণ্যবান্ লোকে ভোজন করেন।

একব্যক্তি কুরূপা স্ত্রী লাভ করিয়া দুঃখ করিতেছেন:—

ভোহা কবিলা উচ্চা নিঅলা
মজ্ঝে পিঅলা ণেত্তাজুঅলা।
রুক্খা বঅণা দন্তা বিরলা
কৈসেং জিবিআ জাকী পিয়লা ॥ ২।৯৮॥

ভ্রূদ্বয় কপিল, ললাট উচ্চ, নেত্রযুগল (বিড়ালের চক্ষুর ন্যায়) মধ্যে পীত, বদনমণ্ডল রুক্ষ, এবং দন্তপঙ্‌ক্তি বিরল, যাঁহার প্রিয়ার রূপ এই প্রকার, সে কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

একজন নিজ সংসারের অবস্থা বলিতেছেন:—

রাআ লুদ্ধ, সমাজ খল,
বহু কলিহারিণি, সেবক ধুত্তউ।
জীঅণ চাহসি সুক্খ যই
পরিহরু ঘর তই বহুগুণ জুত্ত ॥

রাজা লুব্ধ, সমাজ খল, গৃহিণী কলহকারিণী, এবং সেবক ধূর্ত্ত। অতএব হে বহুগুণযুক্ত পুরুষ, যদি তুমি সুখকর-জীবন চাও, তবে গৃহ পরিত্যাগ কর।

আর এক ব্যক্তি পৃথিবীকেই স্বর্গ দেখিতেছেন :—

গুণা যস্স সুদ্ধা বহূ রূপমুদ্ধা।
ঘরে বিত্ত জগ্গা মহী তস্স সগ্গা॥ ২।৫৪॥

যাহার গুণসমূহ বিশুদ্ধ, গৃহিণী সুন্দরী, এবং গৃহে প্রচুর বিত্ত, পৃথিবী তাহার পক্ষে স্বর্গ।

ইঁহারই ন্যায় আর একজন বলিতেছেন :—

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধনা
ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হক্ক তরাসই ভিচ্চগণা
কো কর বব্বর সগ্গ মণা॥ ২।৯৬॥

যদি পুত্র বিশুদ্ধচরিত্র হয়, প্রভূত ধন থাকে, গৃহিণী বিশুদ্ধহৃদয়া ও ভক্তিমতী হন, এবং ডাক শুনিলেই চাকরেরা ভয় পায়, তাহা হইলে কোন্ বর্ব্বর, স্বর্গলাভে মন করে?

বর্ষাসময় উপস্থিত দেখিয়া কোন প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা দুঃখ করিতেছেন :—

গজ্জউ মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভম্মর।
এক্কউ জীঅ পরাহিণ অম্মহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥ ২।১৯২॥

মেঘ গর্জ্জন করুক, বা অম্বর শ্যামল হউক, বা কদম্ব প্রস্ফুটিত হউক, অথবা ভ্রমর গুঞ্জন করুক; আমাদের জীবন ত পরাধীন, প্রাবৃট্‌কালই হউক, বা মন্মথই হউক, যে-কেহ এই জীবনকে নিপীড়িত করুক!

একজন শারদ-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া কহিতেছেন :—

ণেত্তানন্দা উগ্গে চন্দা
ধবল চমরসমসিঅকরবিন্দা
উগ্গে তারা তেআ হারা
বিঅসু কমলবণ পরিমলকন্দা।
ভাসা কাসা সব্বা আসা
মহুরপবণ লহলহিঅ করন্তা
হংসা সদ্দ ফুমাবন্ধ
সরঅ সময় সহি হিঅঅ হরন্তা॥ ২।২০৮॥

হে সখি, শরৎসময় হৃদয় হরণ করিতেছে। দেখ, নয়নানন্দ চন্দ্র উদিত হইয়াছে এবং ইহার কিরণসমূহ শ্বেত চামরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রজনীর মুক্তাহারের ন্যায় তারকাসমূহ দেখা যাইতেছে। পরিমলের কন্দস্বরূপ কমলবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দিক্‌সমূহে কাশকুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধুর পবন মন্দ-মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে, এবং হংসসমূহ ডাকিয়া উঠিতেছে।

এইবার কবি বাক্‌পতির কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করিব। কবি লক্ষ্মীর স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন :—

তং খলু সিরীএ রহস্সং জং সুচরিঅমগণেক্কহিয়ওবি।
অপ্পানমোসরন্তং গুণেহি লোও ণ লক্‌খেই॥ ৮৬০॥

ধনলক্ষ্মীর একটি অনির্ব্বচনীয় রহস্য এই যে, লোক যদিও সৎকার্য্যে আবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে ঐ ধনবৈভবে আস্তে-আস্তে যে সদ্‌গুণকলাপ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না।

পেচ্ছহ বিববীয়মিমং বহুয়া মইরা মএই ন থোবা।
লচ্ছী উণ থোবা জহ মএই ণ তহা ইর বহুয়া॥ ৮৬৪॥

দেখ, ইহা একটা বিপরীত কার্য্য। যদি অধিকমাত্রায় পান করা যায়, তাহা হইলেই মদিরা লোককে মত্ত করে, অল্পমাত্রায় তাহা মত্ত করে না; কিন্তু লক্ষ্মী অল্পমাত্রাতেই যেরূপ লোককে মত্ত করে, অধিকমাত্রা হইলে সেরূপ করে না।

যাঁহারা অন্যের দারিদ্র্য নিজের উপরে গ্রহণ করেন, কবি তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

যে গণ্হন্তি সয়ংচিয় লচ্ছিং ণ হু তে-ণ গারবট্‌ঠানং॥
তে উণ কেবি সয়ংচিয় দালিদ্দং যেপ্পয়ে জেহিং॥

যাঁহারা নিজের গুণবল প্রভাবে লক্ষ্মীকে উপার্জ্জন করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা যে গৌরবের পাত্র নহেন, তাহা নহে; কিন্তু যাঁহারা নিজে ইচ্ছা করিয়া পরের বিপদ্ উদ্ধারের জন্য দারিদ্র্যকে গ্রহণ করেন, তাঁহারা অসাধারণ পুরুষ।

সুখাসক্তি কিরূপ লোকের হৃদয়কে অনুসরণ করে, কবি তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন :—

সুহসঙ্গো সুহবিণিবত্তিএক্কচিত্তাণ অবিরঅং ফুরই।
অঙ্গুলি পিহিয়াণ রবো অব্বোচ্ছিন্নো ব্ব কণ্ণাণং॥

বৈষয়িক সুখ হইতে চিত্তকে বিনিবর্ত্তিত করিলেও হৃদয়ে তাহা অবিরত স্ফুরিত হইতে থাকে,—যেমন কর্ণের ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করিলেও তাহার মধ্যে শব্দ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না।

কবি বন্ধুজন-বিয়োগ বর্ণনা করিতেছেন :—

পহরিসমিসেন জাহো যং বন্ধুসমাগমে সমুত্তরই।
বোচ্ছেয়কায়রাইং তং নূণ গলন্তি হিয়য়াইং॥

বন্ধুজন-সমাগম হইলে যে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে থাকে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন বিচ্ছেদকাতর হৃদয়ই গলিয়া যাইতেছে।

প্রসঙ্গতঃ বাক্‌পতির কয়েকটি গাথা আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম, কিন্তু তাঁহার অত্যুপাদেয় কবিত্বের কিছুই ইহাতে দেখান হইল না। পাঠকগণ মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। বাহুল্যভয়ে আমরা ইহার বেশী আর উদাহৃত করিতে পারিলাম না।

অরণ্য-বিহার

[কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১লা এপ্রিল, ১৯০২।—১লা এপ্রিল ইংরাজদের মতে "All fools' day"—এ দিন শিকারে বাহির হইয়া কোন কারণে বোকা বনিয়া যাওয়া অপেক্ষা, বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করা ভাল মনে করিয়া, বেলা নয়টার সময় আমরা 'ধুনি' দেখিতে তাঁবু হইতে যাত্রা করিলাম।—যাত্রী আমি আর শৈলেন। কাকার কাছে শুনিয়াছিলাম—ধুনি এখান হইতে অধিক দূর নহে, তিন মাইল মাত্র দূরে। সুতরাং আমরা খাদ্য-সামগ্রী বা পানীয় জল প্রভৃতি কিছুই সঙ্গে লইলাম না। শৈলেন সঞ্চয়ী লোক, গোপনে পকেটে কয়েকখানি বিস্কুট লইয়াছিল, তাহাও ফিরিয়া আসিয়া উদর-দেবকে অর্ঘ দানের কথা।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সুরসিং' নামক একটি অন্ধ হস্তীতে বাবার হাওদা কষা হইত। হাতীটি দেখিতে সুশ্রী, উচ্চও মন্দ নহে—দশ ফিটের উপর উচ্চ। কিন্তু তাহার অন্ধ হইবার কারণ পূর্ব্বে বলি নাই। তাহার দাঁত কাটিবার সময় মাজ কাটা পড়ায় চক্ষু দুটি অন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চক্ষুষ্মান হস্তী অপেক্ষা সে শিকারে সুদক্ষ। আজ বাবা শিকারে না যাওয়াতে 'সুরসিং'এর পিঠে চাপিয়াই আমরা ধুনি দেখিতে চলিলাম। একে অন্ধ হস্তী, তাহার উপর মাহুত পথ চেনে না, আমাদের অবস্থাও তথৈবচ! সুতরাং আমরা ১লা এপ্রিলের তারিখ-মাহাত্ম্য অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলাম। পথ তিন মাইল, কিন্তু বেলা নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত চলিলাম!

বেলা বারটার সময় মাহুতকে বলিলাম, "কোথায় যাচ্ছ? ধুনি ত এত দূরে নয়!" এতক্ষণ পরে সে স্বীকার করিল, সে ধুনির রাস্তা চেনে না, অনুমানে নির্ভর করিয়া চলিতেছে! সুতরাং অগত্যা পুনর্ব্বার ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া পথের কথা জানিয়া লইয়া চলিতে লাগিলাম। ধুনিতে উপস্থিত হইতে বেলা তিনটা বাজিল।—ভাগ্যে শৈলেন বুদ্ধি খরচ করিয়া পকেটে বিস্কুটগুলি লইয়াছিল! নতুবা ১লা এপ্রিলের মাহাত্ম্য বেশ টের পাইতাম।

প্রথমেই ধুনির জলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।—জলের বর্ণ ঠিক দুধের মত সাদা, কিন্তু জলের আস্বাদন ভাল—ইঁদারার জলের মতই সুপেয়। বস্তুতঃ বাজারের দুধ ও ধুনির জল—ইহাদের বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। একটি ইঁদারার মধ্যে এই জল দেখিতে পাইলাম।

ধুনিতে সাধুর পূজার উপকরণ সজ্জিত ছিল, ধুনিও জ্বলিতেছিল। খানিকটা স্থান খুঁড়িয়া সেই গহ্বরের চতুর্দ্দিকে মাটির বাঁধ দেওয়া আছে; বাহির হইতে একটি আস্ত কাঠ ধুনির ভিতর আসিতে পারে—এইরূপ একটি নালা আছে। একটি আস্ত কাঠ ধুনির সঙ্গে সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ক্রমে তাহা পুড়িয়া নিঃশেষিত হইলে, আর একটি আস্ত কাঠ পুরিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম গুরু নানকের সময় হইতেই এইভাবে ধুনি জ্বলিয়া আসিতেছে! প্রবাদ, যখন এখানে জনমানবের সমাগম ছিল না, সেই সময় বন্যহস্তীরা আসিয়া ধুনিতে কাঠ যোগাইত। এখন ভক্তদের নিকট হইতে কিছু-কিছু প্রণামী আদায় হয় বলিয়া ধুনিতে সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। মুদ্রার কি আকর্ষণী শক্তি। রূপচাঁদ এখানেও সংসার-বিরাগী, বৈরাগ্য মার্গাবলম্বী সাধুকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া আনিয়াছে! আমরা একজন নানকসাহী সন্ন্যাসীকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিলাম। ইনিই বোধ হয় ধুনির বর্ত্তমান 'সেবাইৎ'। ধুনিতে মোহনভোগ প্রসাদ পাওয়া যায়; ভক্তেরা ভক্তি বিগলিত-হৃদয়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করে। কিন্তু যে কারণেই হউক—আমরা সে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম না। ধুনিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখিলাম না। তবে স্থানটি নির্জ্জন, তপস্যার যোগ্য স্থান বটে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ তীর্থস্থানই কর্থো-

পার্জ্জনের এক-একটি আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম-লাভের জন্য অর্থব্যয় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বেলা সাড়ে চারিটার সময় তাঁবুতে প্রত্যাগমন করিলাম। কাকা ও সাহেবেরা আজও শিকার করিতে গিয়াছিলেন। কাকা একটি ছোট 'গাউজ' এবং ওয়েদারল সাহেব একটি ময়ূর ও দুইটি চিতল হরিণ মারিয়াছিলেন। লী সাহেব আজ পুনর্ব্বার পুর্ণিয়ায় যাত্রা করিলেন।

২রা এপ্রিল,—আজ আমি শিকারে যাই নাই, আমি ভিন্ন আর সকলেই গিয়াছিলেন। শালের জঙ্গলকে এ দেশের লোক 'কাঁঠাল' বলে, আমরা বলি "চালা"। আজ শিকারে অল্প একটু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। শিকারের সময় বাইদের ভিতর হইতে আচম্বিতে একটা বাঘিনী বাহির হইয়া একটি হাতীকে ঘা'ল করিয়া অক্ষতদেহে প্রস্থান করে; তাহাকে মারিবার সুবিধা পাওয়া যায় নাই। হাতীটির চোখের নীচে ব্যাঘ্র-নখাঘাতে খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। বাঘিনীটি হঠাৎ হাতীকে আক্রমণ করিয়া তাহার মাথার কাছে উঠিয়া চোখের পাশে ছিঁড়িয়া দিয়া গেল, অথচ মারা পড়িল না, ইহা বড়ই আপ্‌শোসের কথা। কিন্তু বাঘিনীর অব্যাহতি-লাভের কারণ ছিল। বাইদে বাঘ আছে স্থির করিয়া তাহাকে মারিবার জন্য তাঁহারা যে ভাবে ঘিরিয়াছিলেন, সেই ঘেরটা তেমন সাবধানে হয় নাই, সুতরাং বাঘিনীটা সুযোগ পাইয়া হাতীটাকে আহত করিয়া পলায়ন করে। আস্তে-আস্তে সাবধানে ঘিরিলে বোধ হয় শিকারটা হাতছাড়া হইত না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি হইয়াছিল, তাহা আমি সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না, কারণ আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম না। উইলিয়মস্ সাহেব আজ পুর্ণিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

৩রা এপ্রিল,—অদ্য আমরা উত্তরদিকে কুশী নদী পর্য্যন্ত গমন করি। আজ ঠিক অরণ্য-বিহারের জন্যই যাত্রা। আজ শিকারাদি কিছুই হয় নাই। ভ্রমণে যাইবার সময় অরণ্যে বহুসংখ্যক ময়ূর-ময়ূরীকে সানন্দমনে বিচরণ করিতে দেখিলাম। নির্জ্জন কাননে কত ময়ূর সুদৃশ্য পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে! অরণ্যের কি উদার গম্ভীর শ্যামল শোভা! বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ও সেইরূপ দলে দলে ময়ূর দেখিলাম। এক পাল চিতল হরিণও আমাদের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইয়াছিল।

'শালগড়ে' ভ্রমণ বড়ই তৃপ্তিকর। সুবিশাল শালবৃক্ষ-সমূহ সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখা ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া ধ্যাননিরত নিস্তব্ধ যোগীর ন্যায় কতকাল হইতে এই সকল অরণ্যের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? গাছের পর গাছ,—সেই বৃক্ষশ্রেণীর যেন অন্ত নাই! এই সকল বিশালবপু শালতরুর তলদেশ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, মুনি-ঋষিগণের আশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী। বিশেষতঃ, দুইটি চালার ব্যবধানস্থিত 'বাইদ' গুলি বড়ই নয়নরঞ্জন। আবার যখন প্রবলবেগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, সে সময় এই 'বাইদ'গুলি বৃষ্টির জলে পূর্ণ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের আকার ধারণ করে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শালবনের প্রান্ত-স্থিত খালের জলের ন্যায় বিপুল জলরাশি প্রকৃতির মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কলকল ছলছল শব্দে অবিরাম দূর-দূরান্তরে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে। কোথাও তাহার উপর শ্যামল বনানীচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কোথাও বা বৃক্ষ-পত্রান্তরালে, মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল গগনপ্রান্ত হইতে উজ্জ্বল সৌরকররাশি স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে শুভ্র হীরকদীপ্তি প্রতিফলিত করিতেছে, এবং এই নববসন্তে ধারা-পাত-দর্শন-বিমুগ্ধ ময়ূরের দল তরুশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক হর্ষভরে মিশ্রকণ্ঠে কেকাধ্বনি করিতেছে, আর বিশ্বশিল্পীর অপরূপ কারুকার্য্য-খচিত প্রসারিত ময়ূরপুচ্ছে শত ইন্দ্রধনুর বিচিত্র শোভা বিকশিত হইতেছে,—সে দৃশ্য যে কি মনোলোভা, তাহা বলিয়া প্রকাশ করি, এরূপ আমার শক্তি কোথায়?

৪ঠা এপ্রিল,—অদ্য আমরা 'নিশান টাপু' হইতে 'বাবিয়া'য় আসিলাম। গত বৎসর বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শিকারের জন্য এই স্থানটি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা যে মৃগয়ার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ বড়লাটের মৃগয়ার জন্য নির্ব্বাচিত স্থানটি নিশ্চয়ই অরণ্যবিহারের অত্যন্ত উপযোগী হইবে, এই বিশ্বাসেই আমরা এখানে উপস্থিত হইলাম। 'নিশান টাপু' হইতে এই স্থানের দূরত্ব চারি মাইলের অধিক নহে। তবে জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবার তেমন সুবিধা নাই, কারণ ইহার সন্নিকটে নদী নাই; নদী কিঞ্চিৎ দূরে। সেখান হইতে নৌকার জিনিসপত্র উঠাইয়া বহিয়া আনা বিশেষ অসুবিধাজনক; তাহার উপর এই কার্য্যে সময় নষ্ট হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা পূর্ব্বেই

স্থির করিয়াছিলাম, এখানে শিকার করিলেও আমাদিগকে তাঁবুতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যাহা হউক, যদি আমরা এখানে বাঘ পাই, এই আশায় বহুক্ষণ ধরিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু ব্যাঘ্রের সন্ধান মিলিল না। অগত্যা তিনটি হরিণ শিকার করিয়াই আমাদের দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে হইল। হরিণগুলি বড়ই ধূর্ত্ত; তাহারা গুলি খাইতে সহজে রাজী হয় না। আমরা যে সময় ব্যাঘ্রের সন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলাম, সে সময় অসংখ্য হরিণ দলবদ্ধভাবে অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে আমাদের হাতিগুলির দিকে চাহিতেছিল। বোধ হয় তখন তাহারা কোনপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা করে নাই। তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছিল তাহাদের শিকার করা কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য নহে। কিন্তু ব্যাঘ্রের দর্শনাশায় নিরাশ হইয়া যখন আমরা হরিণ-শিকার আরম্ভ করিলাম, তখন তাহারা দূর হইতেই ঊর্দ্ধমুখে পলাইতে লাগিল। ইহা বোধ হয় তাহাদের জন্মগত সংস্কারের ফল।

৫ই এপ্রিল।—আজ সমস্ত দিন তাঁবুতেই কাটিল। আজ আর আমরা শিকারে বাহির হইলাম না।

৬ই এপ্রিল,—অদ্য প্রভাতে সাতটার সময় আমরা হরিণ-শিকারে যাত্রা করিলাম। আমাদিগকে একটি 'খাড়ি' (ক্ষুদ্র শাখানদী) পার হইয়া যাইতে হইবে। আমরা সেই 'খাড়ির' পাড়ে উপস্থিত হইলে সেখানে মহিষের যে 'বাথান' ছিল, সেই বাথানের গোয়ালা সংবাদ দিল, নিকটে একটা বাঘ আছে।

সুসংবাদে আশ্বস্ত হইয়া আমাদের সঙ্গী ভোলা ঠাকুরকে ব্যাঘ্রের সন্ধানে পাঠাইয়া আমরা হরিণান্বেষণে অগ্রসর হইলাম। আজ খুব ঘটা করিয়া হরিণ-শিকার করা গেল। প্রায় দুই ঘণ্টা শিকারের পর ভোলা ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, হাঁ, বাঘ আছে বটে! আমরা তখন মৃগয়ানন্দে উন্মত্ত, প্রথমে কথাটায় আমরা বড় কেহ কর্ণপাত করিলাম না। এই দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বত্রিশটি হরিণ মারিয়াছিলাম। ঘণ্টা দুই সময়ের মধ্যে বত্রিশটি হরিণ-শিকার শিকারের ইতিহাসে নগণ্য ব্যাপার নহে। এই সময়ের মধ্যে আমরা আরও অধিক সংখ্যক হরিণ শিকার করিতে পারিতাম; কিন্তু যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছি, তাহাকে মারিয়াছি, পাঠক এরূপ মনে করিবেন না; অনেক বাছিয়া শিকার করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ হরিণী-শিকার নিষিদ্ধ। আর প্রকৃত প্রস্তাবে হরিণী-শিকার কর্ত্তব্যও নহে, কারণ তাহাতে তাহাদের বংশক্ষয় হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এই অল্প সময়ে বত্রিশটি হরিণ শিকার করিয়া আমরা সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। সুতরাং কাহারও কাহারও সেদিন বাঘ দেখিতে যাইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। ভোলা ঠাকুরের খবরটা মাঠে মারা যায় আর কি? সে বাঘের খবর আনিয়াছে, আর আমরা তাহার বাহাদুরী-লাভের অবসর দিব না। ইহাতে সে বোধ হয় কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে বলিল, যেখানে বাঘ আছে সে জঙ্গলটি অতি সামান্য বন, সুতরাং সেদিন না যাইলে সুযোগটি নষ্ট হইতে পারে, রাত্রে বাঘের সে বন হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যাওয়াই সম্ভব। সুতরাং পিতাঠাকুর মহাশয় ও বড়কুমার সেই দিনই ব্যাঘ্রদর্শনে যাত্রার পক্ষপাতী হইলেন। তখন আর কেহ সে প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। আমরা হরিণ শিকার ছাড়িয়া ব্যাঘ্রের সন্ধানে চলিলাম।

জঙ্গল দেখিয়াই কিন্তু আমাদের ভক্তি চটিয়া গেল। আমার মনে হইল, এরূপ সামান্য জঙ্গলে বাঘ থাকিতেই পারে না। আমাদের অঞ্চলে বাঘ ত দূরের কথা, এরূপ জঙ্গলে খরগোস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। মানুষের হাঁটুর সমান উঁচু কেশেবন, তাহারও মধ্যে-মধ্যে ফাঁকা; বিশেষতঃ চড়াটিও তেমন বৃহৎ নহে; বোধ হয় ৪০।৫০ বিঘা জমী। কেবল এই কাশক্ষেত্রের প্রান্তভাগে যে সকল কেশে ছিল, সেইগুলি একটু বড়; কিন্তু তাহাও সেই চড়ার একধারে ভিন্ন অন্য দিকে ছিল না। জঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, এ জঙ্গলে খরগোসের কাণ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়! সুতরাং এ জঙ্গলে বাঘ আছে, এ কথা আদৌ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অনেক সময় অঘটন-ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেদিকে নদী আছে, সেই দিকে বড় বড় কেশেগুলির মধ্যে হাতী লইয়া যাইবামাত্র দুইটি ব্যাঘ্র সবেগে একেবারে গর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল! তাহাদের দুর্ভাগ্য—তাহারা যে লুকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে, তাহার স্থানটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। সেখানে কেশেগুলি এত ক্ষুদ্র যে, বাঘ বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি অতিক্রম

করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা গর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়াই ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মদন দাদা ও নরনাথবাবুর বন্দুকের গুলিতে উভয়েই ব্যাঘ্রলীলা সংবরণ করিল। ভোলা ঠাকুরের আনন্দই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল, কারণ সে খবর আনিয়া না দিলে ত ব্যাঘ্রবধ হইত না, সুতরাং প্রশংসাটা সর্ব্বাগ্রে তাহারই প্রাপ্য।

ব্যাঘ্র-শিকারের সময় আমিও মদনদাদার পাশেই ছিলাম। তিনি গুলি করিবার পর আমিও গুলি চালাইতে পারিতাম; কিন্তু ঐ প্রকার অসম্ভব স্থানে বাঘ দুটিকে দেখিয়া, বিশেষতঃ মুক্ত প্রান্তরে তাহাদের লম্ফ-ঝম্ফ ও ব্যাঘ্রদৌড় নিরীক্ষণ করিয়া আমি এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, আমি শিকার করিতে আসিয়াছি এবং আমার হাতে বন্দুক আছে—এ
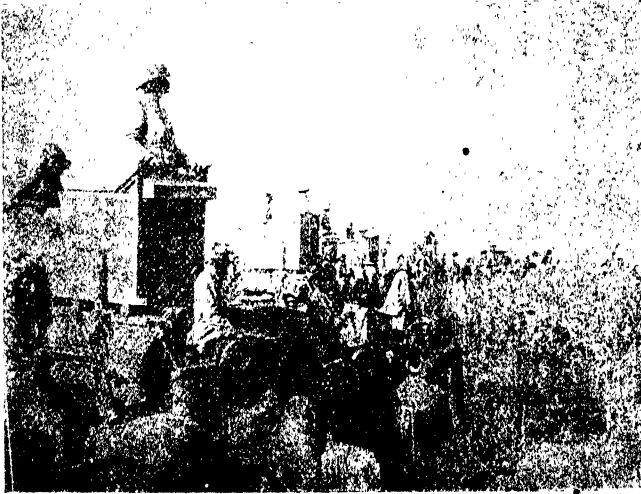
লাইনে হাওদাসহ শিকারীদের জঙ্গলে প্রবেশ-উদ্যোগ

কথা আমার মনেই ছিল না। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, শ্রীমান্ শশাকান্ত ভায়া একবার শিকারে গেলে, এইরূপ ব্যাঘ্রলীলা দেখিয়া তাঁহার গুলি মারিতে ভুল হইয়াছিল। আজ আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বুঝিলাম এরূপ আত্মবিস্মৃতি কথন-কথনও অস্বাভাবিক নহে। যাহা হউক শিকারীদ্বয়ের বন্দুকের অব্যর্থ গুলিতে ব্যাঘ্রদ্বয় ধরাশায়ী হইলে আমার মনে পড়িল, তাই ত, আমারও যে গুলি করা উচিত ছিল! সত্য কথা বলিতে কি, আমার একটু আপশোষও হইল। কিন্তু আজ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে আর কখনও দেখিতে পাইব কি না, সন্দেহ। ব্যাঘ্র-শিকারের পর আমরা সকলে মহানন্দে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আজ একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বত্রিশটি হরিণ ও দুইটি ব্যাঘ্র শিকার করা হইল; অনেকের এক মাসের চেষ্টাতেও এতগুলি শিকার হস্তগত হয় না। কতবার আমাদের ভাগ্যেও ত এরূপ হয় নাই। আনন্দে, উৎসাহে গল্পে সেদিন আমাদের তাঁবু সরগরম হইয়া উঠিল।

৭ই এপ্রিল,—আজ আমরা আর একটি বাঘের খবর পাইয়া উহা দেখিতে চলিলাম। কিন্তু আমাদের পরিশ্রমই সার হইল, বাঘ পাওয়া গেল না। আমাদের ও অঞ্চলে আর এ অঞ্চলে বাঘের খবর লওয়ার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, এখানে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি।

আমাদের অঞ্চলে 'খুঁজি'রা বাঘের খবর আনিতে হইলে, হয় 'মড়ি' দেখিয়া বাঘের সন্ধান করে, না হয় এমন কিছু দেখিয়া আসে—যাহাতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, নিকটে কোথাও বাঘ আছে। অনেক সময় বাঘের গন্ধে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। কখন-কখনও তাহারা বাঘ দেখিতেও পায়। জঙ্গলে হাতী প্রবেশ না করিলে, বা লোকে বিরক্ত না করিলে, তাহারা বনের ভিতর অসঙ্কোচে নিদ্রা যায়। আর জাগিয়া থাকিলেও, দুই একজন লোককে সম্মুখে দেখিলে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। এমন কি, তাহারা অনেক সময় মানুষের গন্তব্য পথের উপর আসিয়াই শয়ন করিয়া থাকে, পথের উপরেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যায়, এবং গরু-ঘোড়ার মত সেই পথ দিয়াই ইচ্ছানুরূপ স্থানে সচ্ছন্দে যাতায়াত করে। কেবল যখন তাড়া খায়—তখনই জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্তুতঃ, যতদিন পর্য্যন্ত ইহারা নরশোণিতের স্বাদ না পায়—ততদিন ইহারা মানুষ দেখিলে যেন একটু লজ্জিতই হয়। আর তাহাদেরই বা দোষ কি?—এই দো-পেয়ে জানোয়ারগুলা পদমর্য্যাদায় তাহাদের অপেক্ষা হীন হইলেও, অন্য কোন বিষয়ে ত ন্যূন নহে, ইহা বোধ হয় তাহারা বেশ বুঝিতে পারে; তাই স্বভাবতঃই মানুষ দেখিলে তাহাদের কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হয়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একবার তাহারা কোন প্রকারে মানুষের-শোণিতাস্বাদনের সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কিরূপ ভীষণ-প্রকৃতি ও নরশোণিত

লোলুপ হইয়া উঠে, তাহা বর্ণনাতীত। নরমাংস-ভোজনে অভ্যস্ত হইলে তাহারা মানুষকে এমন পূর্ণমাত্রায় হজম করিয়া বসে যে, মনুষ্যের বুদ্ধি পর্যান্ত যেন কতকটা তাহাদের সহজাত-সংস্কারের মত হইয়া উঠে। নরশোণিত-পানে অনভ্যস্ত স্বজাতি অপেক্ষা তাহারা শতগুণ অধিক চতুর ও ফন্দীবাজ হয়; তাহাদের বুদ্ধি ও চাতুর্য্য অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করিলে উভয়ে যে একজাতীয় জীব, এরূপ ধারণাই হয় না। তখন তাহাদের মুখে মানুষের স্বাদ লাগিয়াই থাকে; মানুষ ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর মাংসাহারে তাহাদের রুচি থাকে না। তাহাদের রুচি এতই উৎকর্ষ লাভ করে যে, আমাদের এদেশের লোকের নিকট সুমিষ্ট আম্র ও নির্জ্জলা ঘন দুগ্ধ সহযোগে ফলাহার যেমন রুচিকর, ইংরাজের নিকট 'প্লাম-পুডিং' যেরূপ উপাদেয়, মগের নিকট যেমন 'নাপ্পি', অথবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট যেমন নস্য, নরমাংস ও নরশোণিতেরও তাহারা সেইরূপ পক্ষপাতী হয়। পাঠক ইহা অতি-শয়োক্তি মনে করিবেন না; কারণ 'মানুষ-খেকো' বাঘগুলা (man-eaters) মানুষকে ঐ প্রকার উপাদেয় সামগ্রীই মনে করে। আর না করিবেই বা কেন? গরুটা ছাগলটা আক্রমণ করিতে হইলে অন্ততঃ তাহাদের দুটো শিংএর খোঁচা লাগিবার আশঙ্কা আছে, তাহাদের লোমগুলিও চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়; কিন্তু মনুষ্য সম্বন্ধে সে সকল হাঙ্গামা কিছুই নাই। ধরিলে ঘ্রাণেই অর্দ্ধেক ভোজন; যেটুকু বাকি থাকে, ভয়েই সেটুকু শেষ হইয়া যায়।

এই জঙ্গলে দুইটি লেপার্ড পাওয়া গেল। পিতৃদেবের অব্যর্থ সন্ধানে দুইটিই নিহত হইল। লেপার্ড বধের পর আমাদের তাঁবুতে ফিরিবার সময়, এক পশলা বৃষ্টি আসিল। অগত্যা পথিমধ্যে আমরা এক গোপগৃহে প্রবেশ করিলাম। বৃষ্টি থামিলে আমরা তাঁবুর অভিমুখে রওনা হইয়াছি, এমন সময় একজন লোক আর একটা বাঘের খবর লইয়া আসিল। আমাদের উৎসাহ তখনও শিথিল হয় নাই। আমরা পুনর্ব্বার সেই জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক জঙ্গল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু বাঘের দর্শন মিলিল না। তখন খবরটা মিথ্যা বলিয়াই সন্দেহ হইল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইবার জন্য অনেক সময়েই শিকারীদের দ্বারা ফাঁকি দিয়া জঙ্গল ভাঙ্গাইয়া লয়। কারণ, জঙ্গল ভাঙ্গা থাকিলে সে বনে প্রায়ই জানোয়ার আসে না। বিশেষতঃ, জঙ্গল একবার ভাঙ্গা হইলে গ্রামবাসীরা তাহার মধ্যে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া বর্ষাঋতুর পুনরাবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত তাহা পরিষ্কার রাখে। ইহাতে তাহারা অনেকটা নির্ভয় হয়। যাহা হউক, অনর্থক খানিকটা পরিশ্রম করিয়া আমরা তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

৮ই এপ্রিল,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, প্রাতঃকাল হইতেই অল্প-অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির মধ্যে আর

জঙ্গলের ভিতর লাইন

আমাদের বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। অনেকেই বাহির হইলেন না।—কিন্তু বড়কুমারের ও কাকার অদম্য উৎসাহ। তাঁহারা 'কাঁঠালে' শিকার করিতে চলিলেন, এবং কয়েক ঘণ্টা পরে একটি লেপার্ড ও একটি হরিণ মারিয়া ফিরিলেন; সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহাদের যাত্রা শুভ। শুনিলাম তাঁহারা একটি বাঘও দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু 'রোখ' (Position) ভাল ছিল না বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি মারেন নাই। ভাল রোখে পাইবার আশায় তাঁহাদিগকে উপস্থিত ত্যাগ করিতে হইল; বাঘটিও তাঁহাদিগকে সুযোগ-দান না করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল।

৯ই এপ্রিল,—আজ আমরা একটি বাঘের খবর পাইয়া তাহার সন্দর্শনমানসে যাত্রা করিলাম। কিন্তু বৃহল্লাঙ্গুলের সন্ধান মিলিল না; কয়েকজন শিকারী নিরুৎসাহ-

চিত্তে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সোৎসাহে হরিণ-শিকারে চলিলাম। হরিণ-শিকারে ব্যাঘ্র-শিকারের অভাব কতকটা পূর্ণ হইল। কারণ আজ মোট একান্নটি হরিণ আমাদের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিল। সে এক বিরাট ব্যাপার—ঠিক যেন মৃগমেধ-যজ্ঞ!

১০ই এপ্রিল,—অদ্য আমরা বাবিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক মতিটাপুতে যাত্রা করিলাম। যাত্রাকালে আমরা হরিণ-শিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। চারিদিকে অসংখ্য হরিণের পাল। আমাদের গন্তব্য পথেই ত্রিশটি হরিণ মারা পড়িল। আজ আমি একটি হাওদা পাইয়াছিলাম,—চারিটি হরিণ আজ আমার গুলিতে ইহলীলা সংবরণ করিল।

১১ই এপ্রিল,—আজ মতিটাপু হইতে আরচা-ঘাটে আসিলাম। আজ আমরা পূর্ণিয়ার পথে। পূর্ণিয়ায় ফিরিয়া যাইতেছি।

১২ই এপ্রিল,—আমরা পূর্ণিয়ায় উপস্থিত হইলাম। আজ প্রায় একমাস পরে পরম মুখরোচক বাঙ্গলা তরকারী প্রভৃতি সহযোগে অন্নাহার করিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। গত একমাস যেন উপবাসী ছিলাম,—সুদীর্ঘ একাদশীর পর আজ যেন দ্বাদশীর পারণ হইল। বৈচিত্র্যেই আনন্দ। বৈকালে আসদ রেজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ওয়েদারঅল সাহেবের সহিত দেখা করা গেল। ওয়েদারঅল কুমারদের বাড়ীতেই বাস করেন। আসদ রেজারা পূর্ণিয়ার পুরাতন অধিবাসী, বহুদিন হইতেই তাঁহারা পূর্ণিয়ায় বাস করিতেছেন।

১৩ই এপ্রিল,—আমরা বেলা ১টার ট্রেণে পূর্ণিয়া হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে কাটিহারে উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া আমরা যে যেদিকে যাইব, তদনুসারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইলাম। শিকারে ব্যাপৃত থাকিবার সময় ৺ কাশীধাম হইতে আমার পূজনীয়া পিতামহী দেবীর টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে ৺ কাশীধামে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং আজ আমি কাশীযাত্রী। কোথায় হিমাচল-পদপ্রান্তে নেপাল-সীমান্তে মৃগয়া—আর কোথায় শঙ্করত্রিশূলসংস্থিত বারাণসীধামে মোক্ষলাভের সন্ধানে যাত্রা! নলিনীদলগত জলবৎ চপলং মনুষ্যজীবনও এইরূপ পরিবর্ত্তনের অধীন।

আজ সন্ধ্যার সময় আমরা কাটিহার ত্যাগ করিয়া রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সাহেবগঞ্জে উপনীত হইলাম। সেখানে একটি দীর্ঘ নিদ্রার পর পুনর্ব্বার ট্রেণে উঠিলাম। পূর্ব্বে আর কখনও 'টুনেল' দেখা হয় নাই, বলিয়া মনে করিলাম—এবার এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না; সেই জন্য জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু জাগিয়া থাকাই সার হইল, রাত্রি বলিয়া টনেলের মহিমা কিছুই উপলব্ধি হইল না। টনেলের ভিতর দিয়া ট্রেন চলিতেছে, এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম। অন্ধকার রাত্রিটাই ত রেলের যাত্রীর পক্ষে এক অনন্ত-বিস্তৃত টনেল। অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট বায়ুবেগে ছুটিতেছে। পাহাড়ের টনেল্ শীঘ্রই পার হইলাম, কিন্তু রাত্রির অবসান না হইলে আর প্রকৃতিদেবীর নৈশ অন্ধকারাবগুণ্ঠনের টনেল্ পার হওয়া যায় না। দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখিলে—আমাদের মানব-জীবনও বিচিত্র কর্ম্মভোগের টনেলের ভিতর দিয়া অহর্নিশি মুক্তির পথে ছুটিতেছে!—জানি না, এই জীবনব্যাপী টনেলের শেষপ্রান্তে কবে, কোথায়, কি ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমরা শাখা-রেলপথ অতিক্রম করিয়া প্রভাতে মোকামায় উপস্থিত হইয়া পঞ্জাব-মেল ধরিলাম।

১৪ই এপ্রিল,—আমরা ৺ বারাণসীধামে উপস্থিত হইলাম। এ বৎসরের মত আমাদের অরণ্য-বিহারের শেষ হইল। কাশীতে আসিয়া শুনিলাম, পূজনীয়া, পিতামহী দেবী বদরীনারায়ণ দর্শনে যাত্রা করিবার জন্য সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের তাঁহার সঙ্গে যাইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু উত্তর-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ-সন্দর্শনের এই প্রলোভন সংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। এ সুযোগ ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। অনেক অনুনয়-বিনয়, মান-অভিমান, এমন কি, ভয় প্রদর্শনের পর পিতামহী দেবীকে রাজী করিয়া তাঁহার সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলাম। শিকারযাত্রা হইতে একেবারে তীর্থযাত্রা! শিকারে পশুহত্যায় যদি পাপ হইয়া থাকে—তাহা হইলে আশা করি তীর্থ দর্শনের পুণ্যে সে পাপ ক্ষয় হইবে; পাপ-পুণ্যের ত একটা জমা-খরচ আছে; অন্ততঃ এই আশাতেই আমরা অনেকেই পুণ্যসঞ্চয় করি।

(ক্রমশঃ)

নবীন ভাস্কর

[শ্রীজলধর সেন]

আমরা আজ এক নবীন ভাস্করের কথা 'ভারতবর্ষে'র পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। এই ভাস্করের নাম শ্রীযুক্ত বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকার। বোম্বাই সহর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী সাসাভনি

নবীন ভাস্কর শ্রীযুক্ত বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমারকার

নামক গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। শ্রীযুক্ত কারমারকার ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্য শিক্ষার কোন সুযোগই তিনি এতদিন প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত ও চিত্র অঙ্কনের দিকে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অনুরাগ ছিল; বালক বিনা শিক্ষাতেই সেই সময়ে অতি সুন্দর সুন্দর পুতুল প্রস্তুত করিতেন এবং কোন বাড়ীর দেওয়াল ভাল চুনকাম করা দেখিলে সেই দেওয়ালে ছবি আঁকিতেন। গ্রামে একটী দেবালয় ছিল; বালক কারমারকার সেই দেবালয়ের দেওয়ালে অনেক ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এই দরিদ্র বালকের সৌভাগ্যের সূচনা হইল। কোলাবার এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর সিবিলিয়ানপ্রবর মিঃ ওটো রথফিল্ড (Mr. Otto Rothfield I. C. S) সেই সময়

দেকানী

একদিন ঐ গ্রামে আগমন করেন এবং দেবালয়ের দেওয়ালে অঙ্কিত ঐ সকল চিত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি চিত্রগুলি দেখিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তখনই অনুসন্ধান করিয়া বালক চিত্রকরকে ডাকিয়া পাঠান। তাহার সহিত কথোপকথনে তিনি

শ্রীমতী কেশমাবাই ২াউ

পরলোকগত মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে

মহাশ্বেতা

শ্রীমতী এনি বেসান্ত

জানিতে পারেন যে, দারিদ্র্যহেতু এই বালক কোন আর্ট স্কু
শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছেন না; কেহ যদি সাহায্য করেন, তাহ
হইলে তিনি শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। বালক যে সুন্দ
মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারেন, এই কথা শুনিয়া সাহেব তাঁহাে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ প্রদান করিয়া একটি মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলেন। বালক কারমারকার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাহেবের যে মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা দেখিয়া সাহেব অতীব আশ্চর্য্য বোধ করেন এবং তিনি মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে বোম্বাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কারমারকার এই বিদ্যালয়ে যে চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন, তাহাতে তিনি প্রতি বৎসরের পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেয়ো মেডেল প্রাপ্ত হন। তাহার পর বোম্বাইতে অন্যত্র যে কোন প্রদর্শনীতে তিনি তাঁহার নির্ম্মিত মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন, সেইস্থানেই তিনি মেডেল ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। বিগত বৎসরে তাঁহার উৎসাহ-দাতা মিঃ রথফিল্ড তাঁহাকে য়ুরোপে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু সেই সময়েই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই নবীন ভাস্করের য়ুরোপগমন আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। তিনি এখন বোম্বাই সহরে অতি ছোট একটা বাড়ীতে থাকিয়া অনেকের মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছেন। আমরা এস্থানে তাঁহার কয়েকটী মৃন্ময় মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম। ইহা দেখিলেই এই নবীন ভাস্করের গঠননৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যে মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার চিত্রও আমরা প্রকাশ করিলাম। আমাদের দেশে কত স্থানে কত যুবকের প্রতিভা যে, দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে মুকুলেই শুকাইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? এই দরিদ্র, অসহায় কারমারকার যদি শ্রীযুক্ত রথফিল্ড সাহেবের ন্যায় প্রকৃত গুণগ্রাহী, উদার হৃদয় মহাশয় ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারিতেন, যদি ঘটনাক্রমে দেবালয়ের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সাহেব মহোদয়ের দৃষ্টিপথে না পড়িত, তাহা

সার দোরাবাজ টাটা

পরলোকগত গিরিশচন্দ্র ঘোষ

হইলে এই নবীন ভাস্করের নামও হয় ত কেহ জানিতে পারিত না; হয় ত তাঁহার জীবন সেই ক্ষুদ্র পল্লীর দরিদ্রের কুটীরেই অতিবাহিত হইত; হয় ত গ্রামের ছেলেদের পুতুল গঠনেই তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত।

দাও

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

অমৃতে ভরিয়া দাও জীবন আমার,
দূরে যাক আজ যত মনের আঁধার।
তোমার করুণাধারা স্নিগ্ধ মন্দাকিনী,
আমার হৃদয় মাঝে বয়ে যাক্ স্বামী।
তোমার সঙ্গীত-রব বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে,
আমার হৃদয় মাঝে উঠুক বাজিয়ে।
তোমার আশীষ মাখা মলয় বাতাস,
পরশি আমার শির জুড়াক হুতাশ।

এতদিন লক্ষ্য হারা পথিকের মত,
উদ্‌ভ্রান্ত ছিলাম দেব; মিছা কাযে রত।
অতৃপ্ত বাসনা মোহে জ্বলেছে পরাণ,
কর গো আজিকে তার মহা অবসান।
মুছে নাও মলিনতা তব পদ স্পর্শে,
জাগাও সুষুপ্ত হৃদি আনন্দের হর্ষে।

উইলিয়ম্ আর্ভিন, আই-সি-এস্

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম, এ, পি-আর-এস্]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

উইলিয়ম্ আর্ভিন স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশীয় একজন আইন-ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে এবার্ডিন সহরে তাঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তিনি লণ্ডন মহানগরীতে উপস্থিত হ'ন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ঊনবিংশ বৎসর, সেই সময়ে তিনি রণপোত-সচিবের বিভাগে কর্ম্মলাভ করিয়া, এই কর্ম্মে প্রায় দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, তিনি লণ্ডনের কিংস্ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সিভিল্-সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন।

উইলিয়ম আর্ভিন

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতে উপনীত হইয়া, পরবর্ত্তী জুন মাসে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিভিল্ সার্ব্বিসে শাহারাণপুরের এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হ'ন। তথায় একবৎসর অতিবাহিত করিবার পর, তিনি মুজাফরনগরে বদলী হ'ন এবং সেখানে চারি বৎসর কার্য্য করেন (এপ্রিল ১৮৬৫—জুলাই ১৮৬৯)। ইহার পর দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিয়া তিনি দুই বৎসরের অধিককাল ইংলণ্ডে অবস্থান করেন (১৮৭২—৭৩)। তৎপরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি ফরাক্কাবাদে কর্ম্ম করেন, এবং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হ'ন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাস, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহার লিখিত ফরাক্কাবাদের বঙ্গাশ্-বংশীয় (পাঠান) নবাবদিগের অমূল্য বিবরণ ১৮৭৮—৭৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। Atkins সাহেব-সম্পাদিত, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *Gazetteer of the Farukhabad District* গ্রন্থেও তাঁহার লিখিত কয়েকটী মূল্যবান্ অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ঘাজিপুর জেলাতেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদিন—সাত বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। এইস্থানে তিনি প্রথমে সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার ও পরে কালেক্‌টারের কার্য্য করেন। *The Settlement Report of Ghazipur District, 1886* নামক সরকারী পুস্তকে (Blue-Book) তিনি তাঁহার গভীর অনুসন্ধিৎসা ও প্রগাঢ় বিজ্ঞাবত্তার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের *Calcutta Review* পত্রে প্রকাশিত *Canal Rates versus Land Revenue* নামক প্রবন্ধ এবং *The Rent Digest or the Law of Procedure relating to Landlord & Tenant, Bengal Presidency, 1869* নামক পুস্তক হইতে রাজস্বকার্য্য বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও অতিসূক্ষ্ম বিষয়ে অভিনিবেশ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব-কর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি সিভিল্ সার্ব্বিসের কোন বাঞ্ছনীয় উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বভাবতঃই উচ্চপদের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন; কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। এই কারণে তিনি 'পেন্‌সেন্' লাভ করিবার সময় উপস্থিত হইবামাত্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণকালে তিনি শাহারাণপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জেলাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হ'ন। তিনি যে ২৫ বৎসর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশকাল তিনি ছুটিতে অতিবাহিত করেন।

ইংল্যাণ্ডে ইতিহাস-সেবা

রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর ছিল। সুতরাং তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বহুদিন নিরাময় থাকিয়া, অবসরপ্রাপ্ত-জীবন ইতিহাস-চর্চ্চায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন কার্য্য,—ফার্সী পাণ্ডুলিপি-পাঠ, তিনি বিনা আয়াসে করিতে শিখিয়াছিলেন। মুঘল শাসনকালের ইতিহাস-সম্বলিত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত ও 'লিথো' পুস্তকাদি ব্যতীত, ফার্সী পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ কার্য্যেও তিনি পূর্ব্ব হইতেই ব্যাপৃত ছিলেন। রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কালে, বহু ভারতীয় ভদ্রসন্তান, তাঁহার ভারতীয় ইতিহাস-অনুসন্ধানে বিশেষ অনুরাগের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহাকে বহু ফার্সী পাণ্ডুলিপি উপহার দিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি বহু পুরাতন পাণ্ডু-লিপি স্বীয় অর্থে ভারত ও ইউরোপ হইতে ক্রয় করেন। অধিকন্তু যে সমস্ত ফার্সী পাণ্ডুলিপি অর্থ বিনিময়ে বা অনুরোধে সংগৃহীত হইবার নহে, তাহার সন্ধান করিয়া সেগুলির প্রতিলিপি লইবার জন্য, তিনি ঘাজিপুর জেলার অন্তর্গত ভিটুরি সৈয়দপুর-নিবাসী এক লিপিকুশল মৌলবীকে বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বার্লিনের Royal Libraryতে রক্ষিত, তাঁহার কার্য্যের সহায়তাকারী যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ফার্সী পাণ্ডুলিপি ছিল, তাহার প্রতিলিপিও আর্ভিন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে বিশেষ যুগের ইতিহাসালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ের ইতিহাস-সম্পর্কিত এরূপ মূল পাণ্ডুলিপি সমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যাহা ইউরোপের কোন বিখ্যাত সাধারণ বা রাজকীয় পুস্তকালয়েও একস্থলে পাইবার উপায় নাই।

একটি উদাহরণ দিতেছি। হামিদুদ্দীন খাঁ নিমচা রচিত(?) "আহ্‌কাম্-ই-অলম্‌গীরি" নামক আওরংজীবের কাহিনী-সম্বলিত দুইখানি পাণ্ডুলিপি তাঁহার অধিকারে ছিল। ইহা ভারতের বা ইউরোপের কোনও সরকারী পুস্তকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না; এমন কি ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও ঐতিহাসিকগণের নিকট অবিদিত ছিল। অথচ সম্রাট্ আওরংজীবের জীবনের চরিত্র-প্রকাশক অনেকগুলি ঘটনা ও মতামত ইহাতে থাকায় ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি ইহার অংশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নকল তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। আর একবার, আমি একমাত্র খুদাবক্স লাইব্রেরীতে রক্ষিত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণাদি-মূলক 'চাহার গুলশান্' নামে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হই—ইহাই আমার ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *India of Aurangzib* গ্রন্থের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু আর্ভিনের নিকট 'চাহার গুলশানে'র তিনখানি পাণ্ডুলিপি ছিল—ইহার দুই-

খানি তিনি তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পর হইতেই যখনই, আমি ভারতেতিহাস-সম্পর্কীয় কোন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাইয়াছি, তখনই তিনি আমার নিকট হইতে তাহার নকল লইয়াছেন। এইরূপে আমি মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের পত্রাবলী ('হফ্‌ত্‌ অন্‌জুমান্‌'); 'ফয়াজুল-কওয়ানীন্‌' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট শাহ্‌জহান্‌ ও তাঁহার পুত্রগণের পত্র সমূহ; আওরংজীবের খাস্‌ মুন্‌শী এনায়েতুল্লা কর্ত্তৃক সংগৃহীত, আওরংজীবের বৃদ্ধ বয়সের আদেশাদি-সম্বলিত 'আহ্‌কাম্‌-ই-অলমগীরি' এবং পারস্যরাজ দ্বিতীয় শাহ্‌ আব্বাসের পত্রাদির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাঁহার পাঠাগারের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলাম। এই সংশ্রবে তিনি আমাকে লেখেন :—

"What you tell me about your various finds of Mss. makes my mouth water, and I shall be very grateful if you can engage any one to copy for me Inyatullah Khan's *Ahkam* and the various fragments you have of Hamiduddin's collection. The *Haft Anjuman* seems to be a valuable and most unexpected discovery. I have scolded Abdul Aziz [his retained scribe] whose special hunting ground is Benares for not having discovered it !!" (*Letter*, 13 Nov., 1908).

"শেষ মুঘল-সম্রাটগণ" (*Later Mughals*)

স্বীয় অধিকারে এইরূপ মূল ফার্সী উপাদান থাকাতে এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তির ফলে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসীদের East India Records এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের পত্রসমূহ [বিশেষতঃ *Society of Jesus* এর পত্রাবলী] পড়িতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি মুঘল-রাজত্বের অধঃপতন বিষয়ে '*Later Mughals*' নাম দিয়া একখানি অতি প্রামাণিক ইতিহাস লিখিবার কল্পনা করেন। ইহাতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ (আওরংজীবের মৃত্যু) হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ (ইংরেজগণ কর্ত্তৃক দিল্লী-অধিকার) পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারী আমাকে লেখেন :—

"I have first to finish the history from 1707 to 1803 which I began twelve years ago. At present I have not got beyond 1738, in my draft, though I have materials collected up to 1759 or even later."

কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি এরূপ ধীর বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতেন—এরূপ বহুবিধ উপাদান তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং প্রমাণগুলি (references) এত অধিকবার পরীক্ষা করিতেন যে একশত বৎসরের ইতিহাস রচনার বাসনা করিয়া তিনি জীবদ্দশায় মাত্র চৌদ্দ বৎসরের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। *Later Mughals* এর অধ্যায়গুলি প্রধানতঃ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ও সময়ে সময়ে *Indian Antiquary*তে প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত পত্র লিখিবার পাঁচবৎসর পরে তিনি তাঁহার *Later Mughals*এর শেষ-প্রকাশিত অংশের পরিশিষ্টে এই বিদায়বাণী (*L'envoi*) লিখিয়াছেন :—

"With the disappearance of the Sayyid brothers the story attains a sort of dramatic completeness, and I decide to suspend at this point my contributions on the history of the Later Mughals. There is reason to believe that a completion of my orginal intention is beyond my remaining strength. I planned on too large a scale, and it is hardly likely now that I shall be able to do much more··· The first draft for the years 1721 to 1738 is written. I hope soon to undertake the narrative of 1739, including the invasion of Nadir Shah. It remains to be seen whether I shall be able to continue the story for the years which follow Nadir Shah's departure. But I have read and translated and made notes for another twenty years ending about 1759 or 1760."

এই কথাগুলি আর্ভিন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লিখিয়াছিলেন; ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী

পাঁচ বৎসরে তাঁহার কার্য্য আদৌ অগ্রসর হয় নাই। একমাত্র নিকোলা মানুষীর মুঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ-কাহিনীর বিবরণই তাঁহাকে *Later Mughals* রচনাকার্য্য স্থগিত রাখিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এই বিরাট্ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে তাঁহাকে সুদীর্ঘ সাত বৎসরকাল বিপুল আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফার্সী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষার যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দের অভিধান *Army of the Indian Mughals* গ্রন্থরচনা কার্য্যও *Later Mughals* অসম্পূর্ণ রাখিবার অন্যতম কারণ। জর্ম্মানীর প্রাচ্যবিদ্যাপারদর্শী Dr. Paul Horn ভারতে মুসলমান-শাসনকালের প্রারম্ভ ভাগের ঠিক এই ধরণের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। পাছে পল হর্ণের গ্রন্থ তাঁহার অগ্রে বাহির হয়, এই ভয়ে আর্ভিন অতীব তৎপরতার সহিত নিজ বহু অধ্যয়নের ফল *Army of the Indian Mughals*তে একত্র করিয়া ছাপিয়া ফেলেন। আর্ভিন *Indian Antiquary, Journal of the Moslem Institute* (Calcutta) এবং *Journal of the Asiatic Society of Bengal* পত্রেও অন্যান্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। যে কার্য্যেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা তিনি পাণ্ডিত্যের চরমসীমায় উপনীত করিতেন—এইজন্যই টীকা-টীপ্পনী দেওয়ার মত সামান্য কার্য্যেও তাঁহার অত্যধিক সময় ব্যয়িত হইত।

কার্য্য অসমাপ্ত রহিল

Storia ও *Army of the Indian Mughals* পুস্তকদ্বয়ে হস্তক্ষেপ করায়, আর্ভিন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত *Later Mughals*এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই; এজন্য ভারতেতিহাস-আলোচনাকারিগণ আক্ষেপ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ১৭৫৬ অব্দের পর হইতে ফার্সী উপাদানের আর সেরূপ অধিক [illegible] নাই; কারণ আমরা ইংরেজী পুস্তক, কাগজপত্র [illegible] সম্পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই সমস্ত ফার্সী উপাদান সংগ্রহ করিতে—সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে—বিন্যাস করিতে, আর্ভিন জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে লোকে তাঁহার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার হইতে বঞ্চিত হইল। আর্ভিন যদি অন্য কোন দিক লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল *Later Mughals* রচনায় মনোনিবিষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকালের মধ্যে মুঘল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহার বহুবর্ষ অধ্যয়নের ফল সাধারণকে দিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে আর কেহ যে, তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও অক্লান্তকর্ম্মা হইয়া সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান বিশেষভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এইজন্য আর্ভিনের মানুষী-সম্পাদনভার গ্রহণ করায়, সাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

জীবনের শেষ ৮ বৎসর আর্ভিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই, এবং তাঁহার জীবনের প্রিয়কার্য্য *Later Mughals* প্রণয়ন অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। পত্রের পর পত্রে তিনি আমাকে আমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছেন; তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয় ত তিনি জীবদ্দশায় ইহা দেখিয়া যাইতে পারিবেন না:—

"At my age I cannot afford to lose any time, as I fear not surviving to finish the long and heavy tasks I have on hand." (18th March, 1904)

"I see every reason to believe that your edition of the Alamgir letters will be a thorough good piece of work,—but I trust it will not be too long delayed,—for I am getting old and shall not last very much longer." (16 Jan., 1906)

I hope that your first volume of Aurangzib may appear before I leave the scene." (29 Jan. 1909)

অবশেষে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কল্পনামত কার্য্য শেষ করিবার সামর্থ্য আর তাঁহার নাই; এবং তৎপূর্ব্বে যে অধ্যায়টী প্রকাশের জন্য প্রেসে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার অধিক বোধ হয় তিনি আর লিখিয়া উঠিতে পারিবেন না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মঋতুতে তিনি অপেক্ষাকৃত একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তখন আমাকে লেখেন:—

Thanks for your enquiries about my health. Decay has not come on so rapidly as I thought it would. The complaint I suffer from is under control and apparently no worse than it was five years ago,—and considering I was 70 three days ago, I have a fair amount of activity, bodily and mental, left to me. In fact I am contemplating this next winter writing out my Bahadur Shah chapter (1707—1712) and sending it to the Asiatic Society of Bengal."

কিন্তু এ আশা মরীচিকা মাত্র - ঐ বর্ষের শেষ দিনে তিনি আবার একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং শরীরে যেন অল্প অল্প বল অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩ এ আগষ্ট তারিখে তিনি আমাকে লেখেন :—

"I am coming downstairs once a day for 4 or 5 hours...I am working on quietly and happily. My upper part—heart, lungs and liver, are declared by the specialist to be quite clear, and likely to go on [doing their] work so long well that I may reasonably [hope for] a continued life of five to ten years. So it is worth while going on as I shall be able to finish one thing or [another.]"

এই অপেক্ষাকৃত সুস্থতা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। শরতের প্রারম্ভে তিনি ক্রমে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, এবং বুঝিলেন যে শীতঋতু পর্য্যন্ত বোধ হয় আর বাঁচিবেন না। তিনি তাঁহার বহুদিনস্থায়ী পীড়া অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর, শুক্রবার অমরধামে চলিয়া গেলেন।

'শেষ মুঘল-সম্রাটগণ' অসম্পূর্ণ রহিল। ইতিহাসের ক্ষেত্রে আর একবার এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট-রাজকালীন ইংলণ্ডের ইতিহাস রচয়িতা সেমুয়েল রসন্ গার্ডিনার মৃত্যুশয্যায় "আমার গ্রন্থ! হায়, আমার গ্রন্থ—যে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলাম না!" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু গার্ডিনারের এক সান্ত্বনা ছিল যে অধ্যাপক ফার্থের মত দক্ষ ছাত্র তাঁহার গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া ইতিহাসটি পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিবেন। আর্ভিনের মৃত্যু-নিমীলিত চক্ষে সেরূপ সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী দেখা দেয় নাই! এই তাঁহার পরিতাপ।

(ক্রমশঃ)

পূর্ণকাম

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

সে চাহিবে ত্রিভুবনে কোন্ অলঙ্কার
অলঙ্কার তুমি যার নাথ!
সে করিবে এ জগতে কার পূজা, ধ্যান
ধ্যান যার তুমি দিনরাত;
সে সহিবে এ জীবনে কিবা দুখ আর,
তুমি যার সুখ-সিন্ধু প্রিয়!
সে বহিবে হৃদিমাঝে কি নিরাশা-ভার
তুমি যার পরাণে অমিয়;
কারে আর আবরিবে কিবা সে আঁধার
হৃদে যার তুমি পূর্ণশশী;
তারে আর কি অতৃপ্তি করিবে চঞ্চল
শান্তি যার তুমি মহীয়সী।

তার কিবা দুর্ভাবনা সুখে দুখে সদা
তুমি যার লক্ষ্য মাত্র সার,
তার কি গৌরব নাথ! তব সেবা-ব্রত
জীবনের আকাঙ্ক্ষা যাহার;
তার কাছে কিবা কোটী রাজ-সিংহাসন
তুমি যার রাজরাজেশ্বর;
তার কাছে কিবা কোটী কুবের-ভাণ্ডার
তুমি যার ঐশ্বর্য্য আকর;
তার কি মাধুরী প্রাণে প্রেমের মন্দিরে
তুমি যার দেবতা, বল্লভ!
তার কি সার্থক জন্ম—তব পদধূলি
স্বর্গ যার বাঞ্ছিত, দুর্লভ!

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর আমি সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালো বাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ীর যে কঠিন শাসন-পাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্য্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া, অকর্ম্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, এখনও সে কথা আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। তার পরে, অনেকদিন সেও আমার সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতেই পাই নাই। কিন্তু, আমার এই "যেন"টা আমাকেই ত শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত! ছেলে-মহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল-ক্রিকেটের দলে কর্ত্তা, জিমন্যাষ্টিক আখ্‌ড়ার মাষ্টার। তাহার বত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়! তবে,—কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রর উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য্য গল্প সুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিম্বা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্ত্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে-দেখিতে "বন্ধু" প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব-পাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া, লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি। যাক্ সে কথা।

তিন-চারিমাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা' বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক্—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

সরকারদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাড়ার সখের থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। মেঘনাদ বধ হইবে। ইতিপূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশী চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। ষ্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির গোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয় ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্তদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম; রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই অপ্রসন্ন

হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা যায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার-সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। অনেকদিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এম্‌নি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড়-মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট লাইটের গোটা-পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু, ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিৎ! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটী প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপি-চুপি কহিল, "আয় শ্রীকান্ত—দিদি একবার তোকে ডাক্‌চেন।" তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। "কোথায় তিনি?"

"বেরিয়ে আয় না—বল্‌চি।" পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, "আমার সঙ্গে আয়।" বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দু'জনে শাহ্‌জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি রাত্রি আর বেশি বাকী নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালাইয়া উঠানে দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটাকে ধরিয়া যাহা বক্‌সিস্ পায়, তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়; খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পূরিবার সময় মদের ঝোঁকে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্‌জীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হল যে, সময় আর বেশী নেই। বল্লেন, 'আয়, তবে দু'জনে একসঙ্গেই যাই,' বলে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরে, দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে-টেনে ঐ অতবড় করে ফেলে দিলেন। তার পরে দু'জনেরই খেলা সাঙ্গ হল।" বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যাক্, ভালই হল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।"

আমরা উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া দিদি পুনরায় বলিলেন, "তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই, ভাই; তাই এই ভিক্ষে করি, এঁর একটু তোমরা উপায় করে দিয়ে যাও।" আঙুল দিয়া কুটারের দক্ষিণদিকের জঙ্গলটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওইখানে একটু যায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ! আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই। সকাল হলে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই—অনেক কষ্টই এ জীবনে ভোগ করে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।"

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, "শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?"

দিদি বলিলেন,—"মুসলমান, দিতে হবে বই কি ভাই!"

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, "দিদি, তুমিও কি মুসলমান?"

দিদি বলিলেন,—"হাঁ, মুসলমান বৈকি!"

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম, এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভাল বাসিয়াছিল। তাই বোধ করি মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে তিনি হিন্দুকন্যা নহেন।

বাকি রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল; এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্‌জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষশয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০।২৫ হাত নীচেই জাহ্নবী মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয় বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর, আর একজন আমাদেরই কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কাণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশে-পাশে বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল-আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এম্‌নি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষ মুহূর্ত্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণ-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও যায়গা নেই।" তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দু'দিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চাহিল, একবার আকাশের পানে চোখ তুলিল, তারপরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তাঁরই মত আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেল্‌বেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে, চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।"

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেম্‌নি-ভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটি দিয়া সিঁথার সিন্দুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কুটারে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্‌জী তাঁর স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু, তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি!"

দিদি বলিলেন, "হাঁ, বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন!"

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া কহিল, "জাত দিলেন কেন?"

দিদি বলিলেন, "সে কথা ঠিক জানিনে ভাই! কিন্তু

তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বই ত নয়। নইলে, আমি নিজে-হ'তে জাতও দিইনি—কোনদিন কোন অনাচারই করিনি।"

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, "সে আমি দেখেচি দিদি! সেই জন্যেই আমার যখন-তখন এই কথাই মনে হয়েচে,—আমাকে মাপ কোরো দিদি—তুমি কি করে এর মধ্যে আছ,—তোমার কেমন করে এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল! কিন্তু, এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।"

দিদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; পরে, মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ!"

"কেন পার না দিদি?"

দিদি বলিলেন, "আমি জানি; তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।"

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে আমিও জানি। তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা। কিন্তু তোমার তাতে কি? কাঁর সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আট্‌কায় দেখি একবার।"

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, "ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক করে রাখ্‌বে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ! সে পাওনাদারকে তুমি কি করে বাধা দেবে ভাই? তা হয় না। আজ তোমরা বাড়ী যাও—আমার অল্প-সল্প যা কিছু আছে,বিক্রী করে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি—কাল পরশু একদিন এসো।"

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, "দিদি, আমার কাছে বাড়ীতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আস্‌ব?" কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া, মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "না দাদা, আর এনে কাজ নেই। তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখ্‌ব ভাই। আশীর্ব্বাদ করে যাই, তোমার বুকের ভিতরে বসে ভগবান চিরদিন যেন অম্‌নি করে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন।" বলিতে-বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে সেদিন তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রর একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলুম বটে, কিন্তু, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে-মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।"

ইন্দ্র কে, তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতে মন সরচে না।—আমার কি জানি কেন, কেবলি মনে হচ্ছে, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না।"

দিদি জবাব দিলেন না—সহসা মুখ ফিরাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না- তেম্‌নি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ, কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে-মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইসারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল—"দিদি নেই—কোথায় চলে গেছেন।" আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা

পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে” বলিয়া একখানা ভাঁজকরা হল্‌দে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লিখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, “শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু, আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি ; কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে তাহা নয় ; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম। অথচ কেন যে বলি নাই—বলি বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না ; কিন্তু পরজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলা তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিদায় হইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ এই লেখাটুকুর শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতেও পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হ'ন। এ দুষ্কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক্, বল ত, শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড় ? এ লজ্জা কি মর্ম্মান্তিক ! তবুও তোমার দিদি, সব সহিয়াছিল। কিন্তু, স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক্ সে কথা। তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছা কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই—পিতাকে চিনিতাম ; তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে ? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা'ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড়রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদির দোকান আছে, তাহার কর্ত্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু, তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পূরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ, শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিয়ো না। মনে করিও, তোমাদের দিদি যেখানেই থাকুক ভালই থাকিবে ; কেন না দুঃখ সহিয়া-সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাঁকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি অন্নদা।”

(ক্রমশঃ)

মনোবিজ্ঞান।

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম, এ]

উপক্রমণিকা।

এই বিশাল জগতের এ পর্য্যন্ত কেহ সীমা-নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। একদিকে দূর-হইতে-দূরতর বস্তু-দর্শন-সহায় অতি প্রবল দূরবীক্ষণ, অপরদিকে সূক্ষ্ম-হইতে-সূক্ষ্মতর বস্তু-দর্শনোপায় অণুবীক্ষণ নানা দেশ ও নানা স্থানে নিয়ত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত নির্ণয় করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। তথাপি ইহার তথ্যসমূহ যেমন একদিকে দূর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে, অপরদিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আমাদের জ্ঞানের অগোচর রহিয়া যাইতেছে। অনন্ত বস্তু লইয়া এই জগৎ। ইহার মধ্যস্থ প্রত্যেক বস্তুই পুনরপি অনন্ত-গুণ সম্পন্ন ও অসীম-ক্রিয়াশীল। দৃশ্যতঃ,এই অনন্তের মধ্যে প্রত্যেক বস্তু স্বীয় গুণাবলি ও ক্রিয়াবলি দ্বারা অপর সকল বস্তু হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছে ও প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পথে যেন অপর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া চলিতেছে। সর্ব্বত্রই স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বত্রই অকথনীয় বিশৃঙ্খলা! অল্পসংখ্যক ব্যক্তি একত্র থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কাহারও কার্য্য সম্পন্ন হয় না; কিন্তু অনন্ত ব্যক্তি, অনন্ত দ্রব্য, অনন্ত শক্তি, একত্র সমাবিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব গন্তব্যপথে চলিতেছে, তথাপি প্রত্যেকের কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে; কোন গণ্ডগোল নাই। ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সহজেই ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, বাহ্যতঃ যে স্বাতন্ত্র্য এমন কি বিরোধভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার অভ্যন্তরে পারতন্ত্র্য ও বিরোধাভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং রহিয়াছে বলিয়াই এই অনন্ত "ঠেলা-ঠেলির" মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর-জগৎ সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গন্তব্য পথ খুঁজিয়া লইয়া চলিতে সমর্থ। প্রত্যেক বস্তুই যেমন বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন, আবার তেমনি অনেক বস্তুই অনেক বস্তুর সদৃশ। সদৃশতাবর্জ্জিত বিভিন্নতা আমরা দেখিতে পাই না। বিভিন্নতাবর্জ্জিত সাদৃশ্যও আমাদের নয়নগোচর হয় না। দুইটি আম্রফল, দুইটী মনুষ্য—বিসদৃশ হইয়াও সদৃশ, সদৃশ হইয়াও বিসদৃশ। সদৃশতার অভ্যন্তরে বিসদৃশতা ও বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সদৃশতা আমরা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করি। বিসদৃশতার অভ্যন্তরে সদৃশতা রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। আমরাও ক্ষুদ্র মানব জীবনরক্ষাপূর্ব্বক গন্তব্যপথে চলিতে সমর্থ হইতেছি। স্থূলতঃ, বিসদৃশ দ্রব্যের মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। একটি আতাফল ও একখণ্ড প্রস্তরের সাদৃশ্য দর্শনে নিউটনের দিব্য-জ্ঞানের আভাষ হয়। জলনিমগ্ন স্বশরীরের অনায়াসে ভাসমান অবস্থার সহিত অপর ভাসমান দ্রব্যের সাদৃশ্য-অনুভূতি আর্কিমিডিসের জ্ঞান-বিকাশের হেতু। সাধারণ মনুষ্য, যাহারা আপন-আপন সঙ্কীর্ণ জীবনপথে চলিয়া যায় ও যাহাদের পথের এদিক-ওদিক অথবা অধিকদূর অগ্রপশ্চাৎ দর্শন করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ থাকে না—তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসমূহের মধ্যে জীবনধারণের জন্য আবশ্যক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য মাত্র জানিতে পারিয়াই সন্তুষ্ট। দৃশ্যতঃ, সদৃশ পদার্থের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য গুপ্ত রহিয়াছে কি না, অথবা কোন বিসদৃশ পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য গুপ্ত রহিয়াছে কি না, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন, অবকাশ বা সামর্থ্য নাই; অথবা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহাদের জীবন-যাত্রার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই ভাবিয়া উহা প্রণিধান করিয়া দেখিতে উদাসীন। ইষ্টকখণ্ড ও আম্রফলকে ঊর্দ্ধ হইতে ভূতলে পতিত হইতে সকল মনুষ্যই পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং অনেকেই জানিত যে দুইটিই ভারি বস্তু। কিন্তু আম্র ও প্রস্তরখণ্ড এই দুই বিসদৃশ দ্রব্যের মধ্যে মহানুভব নিউটন যে সাদৃশ্য অবলোকন করিলেন, তৎপূর্ব্বে তাহা আর কেহ অবলোকন করে নাই। অপরদিকে, একটি লঘু পালক, প্রস্তরখণ্ড বা আম্রফলের

ভাবে ভূতলে পতিত হয় কি না—এই অসদৃশ দ্রব্যের মধ্যে কোন গূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না—নিউটনের পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিবার প্রয়াস পায় নাই। এইরূপ কত অসংখ্য দ্রব্য—যাহা বিজাতীয় ও বিসদৃশ বলিয়া লোকে জানিত, তাহা এক্ষণে স্বজাতীয় ও সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বানর ও মনুষ্য, এমন কি বানর অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন পশু ও সৃষ্ট-জীবের রাজা মনুষ্য, এত বিসদৃশ হইয়াও সদৃশ ও একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। দীর্ঘকায় বংশদণ্ডের সহিত তোমার চরণদলিত দূর্ব্বাঙ্কুর, তোমার খাদ্য, জীবনোপায় ধান্য গোধূমের সহিত চটকাদির আহার্য্য তৃণাদির সাদৃশ্য সহজ-সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, এমন অনেক দ্রব্য রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা ভাল করিয়া দেখি নাই বলিয়াই অপর জিনিষ হইতে পৃথক বা এক মনে করি। ঐ সকল বস্তুকে ভাল করিয়া দেখিলে উহাদের একত্ব বা পৃথকত্ব বোধগম্য হইয়া থাকে। লোষ্ট্র ও আম্রফল নিশ্চিতই পৃথক বস্তু। প্রথমটির আস্বাদনে আমাদের জিহ্বার তৃপ্তি হয় না, অথবা উহা বৃক্ষোপরি ফুল হইতে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অচিরদিনে ফলাকারে পরিণত হয় না। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও উহারা দুইই মূলতঃ এক; কারণ বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি ব্যতিরিক্ত উভয় দ্রব্যেরই আরও বহুসংখ্যক গুণ রহিয়াছে; আমাদের প্রয়োজন মত যখন যে গুণটি আবশ্যক, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনে দ্রব্যদ্বয়ের প্রকৃত একত্ব বা পৃথকত্বের কিছু হানি হয় না। যে গুণ বা ক্রিয়া আজ প্রয়োজনে আইসে, এতাবৎ অজ্ঞাত গুণবিশেষ কা'ল তাহা অপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনে আসিতে পারে; অথবা এতাবৎ অপ্রকাশ্য গুণ-বিশেষের জন্য উহা একবারেই অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতে পারে। এই প্রকারে বিষ অমৃত হইতেছে ও অমৃত বিষ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

পথের পথিকও, বাহ্যতঃ পৃথক বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া এক মনে করিয়া না লইলে পথ চলিতে সক্ষম হয় না। যে কূপের জল পান করিয়া পূর্ব্বে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছ, সেই কূপের সেই সময়ের সেই জল পুনরায় পাওয়া অসম্ভব। যে অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছ, আর সে অন্ন পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? নূতন অন্ন নানা প্রকারে পৃথক হইলেও অন্ন; নূতন পানীয় পূর্ব্ব পানীয় হইতে পৃথক হইলেও পানীয়—এই বিশ্বাস জীবনধারণের মূল। বাহ্যতঃ পৃথক হইলেও বৃক্ষমাত্রেই বৃক্ষ, ফল মাত্রেই ফল, পানীয়মাত্রেই পানীয়। তদ্রূপ, বাহ্যতঃ সদৃশ হইলেও একটী ফল প্রাণধারক, অপরটি প্রাণসংহারক।

দুই বা ততোধিক বস্তুর মূলতঃ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ঐ বস্তুগুলিকে "এক" করিয়া লই। এই একীকরণের পর সদৃশগুণাতিরিক্ত অন্য গুণ আমরা তত গ্রাহ্য করি না। আম্র বলিলেই আমরা কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক গুণ ইহাতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি ও সেই বিশ্বাস-অনুযায়ী কার্য্য করি। আমরা জানি আম্র খাইলেই আমাদের ক্ষুধা শান্তি ও মিষ্টরসাস্বাদ হইবে—উহার বর্ণ, আকৃতি ও অন্যান্য গুণ যাহাই হউক না কেন। আবার, আমাদের দেশজাত নহে ও অপরিচিত, অন্য কোন ফল—যাহার সহিত আম্রের দৃশ্যতঃ কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতেছি না, এরূপ ফল খাইতে আমাদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হইবে। কারণ, যে গুণ আম্রমাত্রেই প্রত্যক্ষ করি বলিয়া বিনা সঙ্কোচে আম্র ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি, এই অপরিচিত ফলে সেই গুণের অভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা আরও ভাল করিয়া নূতন ফলটিকে প্রত্যক্ষ করি, যদি সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত গুণাবলির সহিত আমাদের সুপরিচিত আম্রফলের গুণাবলির একত্ব উপলব্ধি করি, তাহা হইলেও নূতনেও পুরাতন দেখিতে পাইব ও দৃশ্যতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদ্বয়কে "এক" করিয়া লইতে পারিব। প্রথমতঃ একটি আম্র জানিলাম; তাহার পর ঐ আম্রটির সহিত উহার সদৃশ অন্য আম্রের "একতা" অনুভব করিলাম; ক্রমে বর্ণ, আকার ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও আম্রমাত্রই "এক" করিয়া লইলাম। পরে আম্রের সহিত আম্রাতিরিক্ত ফলের "একতা" আমাদের অনুভূত হইল। এই প্রকারে ফলমাত্রের সহিত আমাদের অন্যান্য খাদ্যবস্তুর একতা প্রতিপন্ন হইতেছে। দুগ্ধ এবং আম্রফল কত পৃথক; কিন্তু এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, খাদ্যের হিসাবে উভয়ের মধ্যে এমন সাদৃশ্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, এত বিভিন্ন গুণসম্পন্ন দ্রব্যদ্বয়ও আমরা এক করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করি না।

একটি আম্রফলকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মানবের খাদ্যবস্তুর সাধারণ গুণের অবস্থিতি উপলব্ধি করা যায়; কিন্তু আম্রটির সহজবোধ্য কয়েকটি মাত্র গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ ও তদতিরিক্ত গুণাবলির বিশেষ পরীক্ষা করতঃ বিসদৃশ গুণসকল ত্যাগ পূর্ব্বক সদৃশ গুণসমূহ গ্রহণ করিতে পারিলে এই একটি ফলের মধ্যে যাবতীয় মনুষ্য-খাদ্য ফলের গুণ বর্ত্তমান আছে, দেখিতে পাইব। তখন আম্রকে মানব-খাদ্য বলিব ও অপর খাদ্যের সহিত "এক" করিয়া লইব। এইরূপ জ্ঞান "বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত। সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান হইতে ইহার পৃথক জাতি নাই। জ্ঞান একই। বৈসাদৃশ্যে সাদৃশ্য-জ্ঞান সকল জ্ঞানেরই প্রকৃত মূর্ত্তি। বিভিন্ন বস্তুর একীকরণ জ্ঞানের ব্যাপার। এই একীকরণ যখন বিশেষ প্রযত্ন, পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন দ্বারা বিশদভাবে ব্যক্ত, তখনই সেই সাধারণজ্ঞান 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যতঃ এই জগৎ স্বতন্ত্র অসংখ্য দ্রব্যজাতপূর্ণ। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দৃশ্যতঃ বিভিন্ন-গুণ-যুক্ত বহুদূরান্তর্বর্ত্তী দ্রব্যজাতের অভ্যন্তরেও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ও সেই সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া আমরা কত দৃশ্যতঃ বিভিন্ন-গুণাবলম্বী বস্তুকে "এক" করিয়া লইয়াছি ও লইতেছি; এমন কি স্পর্দ্ধা করি যে, জগতের জড়-চেতন প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য মূলতঃ এক— আমরা ইহা বুঝিব ও বুঝাইতে পারিব। যদি কতকগুলি দ্রব্য মূলতঃ এক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী। যে গুণ বা ধর্ম্ম একটিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অপরটিতেও তাহা প্রত্যক্ষ করিব। একপাত্র জলে তরলতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, জলমাত্রেই তরলতা বিদ্যমান। জলমাত্রের এই সাধারণ প্রকৃতিগত স্বধর্ম্মের বিশদজ্ঞান বিজ্ঞান; এবং বিশদভাষায় এই বিজ্ঞান সন্নিবেশিত হইলে উহাকে প্রকৃতির অন্যতম "নিয়ম" বলা হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর কোন বস্তুই একেবারে সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে; প্রত্যেকেই পরতন্ত্র; অন্যথা, প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন। এই নিয়মাবলীর আবিষ্কার "বিজ্ঞানের" কার্য্য। বিজ্ঞানবিৎ সাধারণ লোকের উপর সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া চলেন; কারণ, যেখানে সাধারণ লোকে বিশৃঙ্খলা মাত্র দর্শন করে, তিনি তথায় সুশৃঙ্খলা দেখেন; সাধারণ লোকে যেখানে মাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ করে, তিনি সেখানে পারতন্ত্র্য এবং সাধারণ লোকে যেখানে কোলাহল ও গণ্ডগোল মাত্র শ্রবণ করে, তিনি সেখানে সুনিয়মবদ্ধ সুসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

জগতে কোন বস্তুই নিরালম্ব নহে। ঐ বৃক্ষটি ধরিত্রীর উপর দণ্ডায়মান। এ আশ্রয় না থাকিলে বৃক্ষটি থাকিতে পারিত না। ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা দ্বারা বৃক্ষটির জীবন ভূগর্ভস্থ জলকণাসমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রসবাহী মূলগুলি ঐ জলকণাসমূহকে খুঁজিয়া লইয়া প্রাণধারণ করিতেছে; পত্র দ্বারা অদৃশ্য উপায়ে বায়ুমণ্ডল হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। আলোক ও উত্তাপ ব্যতিরেকে বৃক্ষের জীবনরক্ষা হইতে পারে না। অতএব এই বৃক্ষটি যে মস্তক উন্নত করিয়া স্বাধীনভাবে গর্ব্বের সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বহু বস্তুর উপর নিজের শরীররক্ষার জন্য এবং পোষণের জন্য নির্ভর করিতেছে। সুদূর সূর্য্যমণ্ডলের তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ও গম্ভীর তমোময় ভূগর্ভের রস-সঞ্চারের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ইহার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধগুলি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণাটিও এই জগতের অগণিত সূক্ষ্ম-স্থূল পদার্থের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ, জীবন-যাপনের জন্য মোটামুটি কয়েকটি মাত্র বস্তুর মধ্যগত সম্বন্ধ জ্ঞান যথেষ্ট মনে করিয়া থাকি। বিজ্ঞান তাহার প্রশস্ততর ও গভীরতর দৃষ্টিতে সাধারণ মনুষ্যের অগোচর সাদৃশ্য উপলব্ধি করতঃ অননুভূতপূর্ব্ব, এমন কি অচিন্ত্য-পূর্ব্ব সম্বন্ধসকল নির্ণয় করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। তাহার অভ্যন্তরস্থ ব্যাপার ও দ্রব্যজাত অসীম। ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান এই অনন্ত ব্যাপার ও পদার্থগুলিকে আয়ত্ত করিতে সম্যক অসমর্থ। দিনের পর যতই দিন অতিবাহিত হইতেছে, জগতের বৈচিত্র্য ও অসীমতা মানবনয়নে ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। দুর্ব্বলচিত্ত আমরা বাধ্য হইয়া এই অনন্ত অসীম ব্যাপারসকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রত্যেকেই এক-একটি খণ্ডজগৎ নিজ জীবনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল।

"কৃষ্ণকান্তের উইল—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।"

করিয়া লইতেছি। যে সকল ধীমান ব্যক্তি এই নিজ ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারাও অনন্ত অসীমকে আয়ত্ত করা অসম্ভব জানিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। তথাপি ক্ষুদ্র ঐহিক জীবনের সীমার মধ্যে আমাদের মন আবদ্ধ থাকিতে চায় না। সেইজন্য জ্ঞান-বিস্তারের পিপাসা এবং বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি। ব্যক্তি-বিশেষের প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে এই অনন্ত জগৎ নানা ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সমগ্র জগতের অনন্ত বস্তু, অনন্ত ক্রিয়া, অনন্ত গুণ এক বা দুই জীবনে কোন মানব কখন নিজ বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই বা পারিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক-একটি বস্তু কত অনন্ত শক্তি ও অনন্ত গুণের আধার। সমগ্র জাগতিক বস্তু দূরে থাক্, ইহার এক অংশেরও সম্যক গুণ-ক্রিয়া ও সম্বন্ধনির্ণয় অনন্ত সময় ও অনন্ত শক্তিসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। যদি বিশেষ সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে কতক পরিমাণে নিজের মত করিয়া ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে সমর্থ হই, হয় ত তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানপিপাসা কতক পরিমাণে নিবৃত্ত হইবে। প্রাণিজগৎকে উদ্ভিদ-জগৎ হইতে পৃথক করিয়া, কেহ উদ্ভিদতত্ত্ব, কেহ প্রাণিতত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যাপৃত হই। কেহ বা মানব-ইতিহাস, কেহ বা স্থূল পদার্থ, কেহ বা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী লইয়া নিজ-নিজ মন ও শক্তি উহাদের তথ্যনির্ণয়ে নিয়োজিত করিয়া জ্ঞানপিপাসা শান্ত করিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিশেষ গ্রহণ সকল প্রকার জ্ঞানের মূল-স্বরূপ। যত প্রকার তরু-গুল্ম-তৃণ বর্ত্তমান রহিয়াছে বা ছিল, তাহাদের সংখ্যা অনন্ত; প্রকার ও গুণের ভিন্নতারও ইয়ত্তা নাই। সাদৃশ্য ও বৈষম্য অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণোযোগী না করিতে পারিলে আমাদের মনের শান্তি হয় না। সেইজন্য ব্যক্তি ছাড়িয়া দিয়া আমরা জাতির আশ্রয় লই। বৈষম্যের স্থানে সাম্যের স্থাপনা করি। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থান দিতে যত্নশীল হই। এই প্রকারে উদ্ভিদ-বিদ্যা নামে একটি বিশেষ বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং এই প্রকারে প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু ও ব্যাপারসকলের মধ্যে পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের পর্য্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। এই পর্য্যবেক্ষণ অনেকস্থলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত হয় না। আরও, পর্য্যবেক্ষণ নিখুঁত ও নির্ভুল করিতে হইলে এক প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। মাত্র সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ শক্তি চালনা পূর্ব্বক তথ্যনির্ণয়ে যত্নশীল হইতে হয়। এই উপায় অবলম্বনে আমরা প্রকৃত সাদৃশ্য ও বৈষম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া নানা বস্তুকে "এক" করিয়া লইতে সক্ষম হই। একেবারে সকল বস্তুকে এক করা সম্ভব হইলেও সহজ নয়। সেইজন্য প্রথম অবস্থাতে আলোচ্য দ্রব্যগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লই। পরে আরও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়া প্রথম শ্রেণীগুলির সংখ্যা কম করিয়া আমাদের জ্ঞান অধিকতর বিস্তৃত করি। জ্ঞানবিস্তারের জন্য এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সাদৃশ্য নির্ব্বাচন প্রচুর নহে। উপরে লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বহু বস্তুর সহিত নিকট ও দূরভাবে সম্বদ্ধ। যে সম্বন্ধ আমার হস্তস্থিত জল ও অম্লজান অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে, অন্য জলও ঐ দুই বাষ্পের সহিত সেইরূপ সম্বদ্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ জলমাত্রই এই দুই বাষ্পের বিশেষ সংমিশ্রণে উৎপন্ন—যতক্ষণ আমার জ্ঞান এতদূর বিস্তৃত না হইল, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল ও কথিত বাষ্পদ্বয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বকাল, দেশ ও ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, এই জ্ঞান আমার না হইল, ততক্ষণ আমার বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইল না। এইরূপ একটিমাত্র জ্ঞান লইয়াও বিজ্ঞান-শরীর গঠিত হয় না। পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয় মাত্র জল নহে। অন্যান্য অনেক পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল আলোচ্য বস্তুর মধ্যে এইরূপ সাধারণ জ্ঞান স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ বিজ্ঞানের ক্রিয়া অসমাপ্ত থাকে।

সুস্পষ্ট জ্ঞানের সহিত বিশদ ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলিপ্ত। যখনই সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিকাশ হইল, তখনই দেখিবে উহা তদনুরূপ ভাষায় আকার ধারণ করিয়াছে। যে জ্ঞানের এ আকার নাই; সে জ্ঞান বিশদ জ্ঞান নহে। জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহা একটি অতিবিস্তৃত জ্ঞান। যখন এতাদৃশ কিংবা ইহা অপেক্ষাও অল্পবিস্তৃত জ্ঞান উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে প্রকৃতির নিয়ম

হয়। এই সকল নিয়ম বস্তুবর্গের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ াশ করে। জগতের অংশবিশেষের মধ্যে সুসংস্থাপিত মাবলীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ উপযুক্ত শব্দের আকার ণপূর্ব্বক বিশেষ বিজ্ঞানের শরীর-গঠন করে।

বিজ্ঞানদ্বারা দ্রব্যের তথ্য-নির্ণয় করিতে হইলে, মাত্র নার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। ধর্ম্ম বা সংস্কারের হাই কার্য্যকরী হইবে না। শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজ-গত া ও সংস্কার, নিজের লাভালাভ ও ভালমন্দ সকল দিকে রাখিয়া, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাধিষ্ঠিত অনুমানের ায্যমাত্র অবলম্বন করিয়া তথ্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে বে। কেবল সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিব। সমাজ, ধর্ম্ম ৃতি সকলই সত্যের নিকট অবনত-মস্তক—ইহাই জ্ঞানিকের মূলমন্ত্র।

উল্লিখিত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মনুষ্যকে ইতর জন্তু তে, সভ্যকে অসভ্য হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে। মান যুগে প্রকৃতির উপর মনুষ্যের প্রাধান্যলাভের এই জ্ঞানই একমাত্র কারণ। শুষ্ক কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিলে গ্ন উৎপন্ন হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ ও অগ্নির মধ্যে এই সম্বন্ধ ছে জানি বলিয়াই কাষ্ঠের সাহায্যে, প্রয়োজন হইলে, অগ্নি পাদন করিতে পারিব—এই বিশ্বাস আমার হইয়াছে; ং আমি, প্রয়োজনমত, এই উপায়ে যাহারা অগ্নি উৎপাদন রতে পারে না, তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে র্থ হইয়াছি। অম্লজানবাষ্পের সহিত মানবের শ্বাস-াসের ও জীবনধারণের সম্বন্ধ অবগত হইয়াছি বলিয়া, য়োজনবিশেষে, উক্ত বাষ্প-প্রয়োগদ্বারা মুমূর্ষুর জীবন-া করিতে সমর্থ হই। এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের ন্ধ নির্ণয় করিয়া উহাদ্বারা ভবিষ্যৎ নিরূপণ বিজ্ঞানের র্য্য। জলের সহিত তৃষ্ণার সম্বন্ধ জানি বলিয়াই তৃষ্ণা ইলে জল পান করিতে উদ্যত হই; অথবা অগ্নির সহিত পের সম্বন্ধ জানি বলিয়াই অগ্নির সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত রি। অগ্নি ও বাষ্প, জল ও তৃষ্ণা-নিবারণের মধ্যে কার্য্য-রণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত জাগতিক দ্রব্য লের মধ্যে অপরাপর সম্বন্ধও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষ-শেষ সম্বন্ধ অসীম। বিজ্ঞানবিদেরা সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ-লিকে কয়েকটি সম্বন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তন্মধ্যে র্য্য-কারণসম্বন্ধই বিজ্ঞানের চক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বস্তুমাত্রই কার্য্য বা কারণ। সকল কার্য্য-কারণই নিয়মের অধীন। কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অবগত হইলে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতে সক্ষম হই। কার্য্যবস্তু এবং কারণবস্তুর মধ্যে পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ। পূর্ব্বে কারণ পশ্চাতে কার্য্য—একটির পর একটি। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধ জাগতিক বস্তু-সকলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। দুইটি দ্রব্য বা বস্তু একই মুহূর্ত্তে ঘটিতে বা থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি আর একটির পরে না হইয়া দুইটিই একসঙ্গে বা যুগপৎ সংঘটিত হয়। এই সম্বন্ধকে যৌগপদ্য সম্বন্ধ বলা হয়। যাবতীয় বস্তু কাল ও দেশে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুর পারম্পর্য্য লইয়া কাল, এবং যুগপৎ অবস্থান লইয়া দেশ। সুতরাং কোন সম্বন্ধই এই দুই সম্বন্ধ ব্যতীত থাকিতে পারে না। পরন্তু অপর যে কিছু সম্বন্ধ দ্রব্যসকলের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা-দিগকেও এই দুইটি সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান যৌগপদ্য সম্বন্ধের একটি বিশেষ রূপকে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া থাকে—এটি দ্রব্য ও গুণসম্বন্ধ।

জগৎ বলিতে সাধারণতঃ আমার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষলতা নদী পর্ব্বত গ্রহ নক্ষত্রাদির সমষ্টিমাত্র বুঝিয়া থাকি। এই অনন্ত জগতের মধ্যে ক্ষুদ্র মানব বিন্দুমাত্র স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানব সামান্য বালুকণার ক্ষুদ্রতম অংশ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমার গতি-বিধি আমার চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে। আমি যাহা খাই, যাহা করি, সকলই এই বিশাল জগতের বস্তু। আমি এই সকল বস্তু দর্শন করি, শ্রবণ করি, আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি এবং স্পর্শ করি। এই দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদির বস্তু লইয়াই আমার জীবন। অর্জ্জিত রৌপ্যখণ্ড, স্বীয় পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, গৃহসজ্জাদি, পশু পক্ষী ভূমি ইত্যাদি লইয়াই আমার জীবন। আর আমিও এই সার্দ্ধ-তিন-হস্ত দীর্ঘ গৌরবর্ণ চক্ষু নাসিকা ইত্যাদিযুক্ত চলনশীল অপরের প্রত্যক্ষ বস্তু। এই জ্ঞান সাধারণ। সাধারণ মনুষ্য, ইহা ছাড়া অন্য কিছু আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনে করে না। দৈবাৎ এতদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান হইলে উহা স্বপ্নবৎ পরিত্যক্ত হয়। প্রবুদ্ধ মানব প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু লইয়া ব্যাপৃত। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যও শরীরে কণ্টকবেধজনিত ক্লেশকে কথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে স্থান দেয় না। রোগে অঙ্গ জর্জ্জরিত

হইলে রোষের স্থান কোন অজানিত অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রদেশে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই এইপ্রকারে কতকগুলি ব্যাপারের অস্তিত্ব মানিয়া থাকে—যদিও ইহাদিগকে চোখে দেখা যায় না, বা কাণে শোনা যায় না, বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু এই ব্যাপারগুলির সংখ্যা কত, তাহাদের প্রকৃতিই বা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপারগুলি স্বভাবতঃই চঞ্চল। ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—কষ্টসাধ্য ত বটেই। মানব-মন সহজেই উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষণস্থায়ী অন্ধকারময় সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, ইত্যাদির প্রতি সহজে ধাবিত হয় না। সেইজন্য মানব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির আলোচনাতে সর্ব্বপ্রথমে ব্যাপৃত থাকে। ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র লভ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া ধারণা হয়।

কিন্তু, কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারগুলিও সংখ্যায় বড় কম নহে। এমন কি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিতই একটি অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সূর্য্যালোকের সহিত সূর্য্যালোকের জ্ঞান ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখ সংশ্লিষ্ট। কণ্টকের সহিত তজ্জনিত বেদনা সংযুক্ত। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর সহিতই এক-একটি অন্য ব্যাপারের সংস্রব রহিয়াছে। যদি তাহাই হইল, তবে এই সকল ব্যাপার লইয়াও আর একটি প্রকাণ্ড জগৎ রহিয়াছে কি ?

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত এই অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের সংস্রব আছে সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের কোন সাদৃশ্য নাই। কণ্টকবেধের সহিত তজ্জনিত বেদনার সংস্রব আছে, কিন্তু বেদনাটি কোন প্রকারেই কণ্টকের সদৃশ নহে। তাহা হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হইল যে, এই বৃহৎ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও উহার সঙ্গে-সঙ্গে রহিয়াছে। ইহার ঘটনাবলী আমরা যদিও ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারি না, তথাপি কি জানি কি উপায়ে প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুধু তাহাই নহে; এই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপারগুলি আমাদের সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। বৃহৎ জগতের ব্যাপারসকলের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আমরা এই ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপার দ্বারাই পরিমাপ করিয়া থাকি।

তরু, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি কত বড়, কত গুরু, তাহারা কোন্ দিকে বা কোথায় অবস্থিত—আমরা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু আমার হিংসা, স্নেহ বা কল্পনা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, লঘু কি গুরু, ঊর্দ্ধে কি নিম্নে ইত্যাদি প্রশ্ন ইহাদের সম্বন্ধে উঠে না বা উঠিতে পারে না। অতএব বৃহৎ জগতের সকল ব্যাপারেরই কাল ও দেশ রহিয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র জগতের ব্যাপার সকলের কাল আছে কিন্তু দেশ নাই—নাই বলিয়াই ইহাকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ক্ষুদ্র জগৎ নহে—ইহার বিস্তার বৃহৎ জগৎ অপেক্ষাও অধিক। ইহার ঘটনাবলীও বৃহৎ জগতের ঘটনাবলী অপেক্ষা সংখ্যায় বা বৈচিত্র্যে কম নহে। সুখ—সুখের অনন্ত প্রকার, দুঃখ—দুঃখের অনন্ত প্রকার; বুদ্ধি—বুদ্ধির অসীম রূপ; ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি ব্যাপার অসংখ্য—ইহাদের বৈচিত্র্যও অনন্ত।

বৃহৎ জগৎকে বাহ্য বা জড়জগৎ এবং ক্ষুদ্র জগৎকে আন্তর বা মনোজগৎ বলা হয়। জড়জগতের কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি দ্রব্য হইতে মনোজগতের লোভ, অহঙ্কার, ভক্তি, কল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারের আরও একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। লোষ্ট্রখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডের অবস্থা যেন আমাদের নিদ্রিত অবস্থার ন্যায়। আমাদের ন্যায় উহাদের জাগ্রত অবস্থা আছে বলিয়া সহজে অনুমিত হয় না। আমরা রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি আলোকে উদ্ভাসিত। উহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা তমসাচ্ছন্ন। আমাদের মনোজগতের ব্যাপার সকল চৈতন্যময়। একটির পর একটির উদয় হইতেছে। একটির পর একটির অস্ত হইতেছে। কিন্তু সকলগুলিই প্রকাশমান ও চৈতন্যময়।

বিজ্ঞান বাহ্যজগতের ব্যাপার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। যে বিজ্ঞান বাহ্যজগতের বস্তুসকলের পক্ষে সম্ভব, অন্তর্জগতের ব্যাপারসকলের পক্ষে সে বিজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া এতাবৎকাল বিদ্বজ্জনগণের ধারণা ছিল। বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া অনুমানই প্রাকৃত বিজ্ঞানের প্রধান উপায়। মানসিক ব্যাপারে এরূপ

বেক্ষণ, পরীক্ষা এবং অনুমান অসম্ভব; সুতরাং মনো-
ানের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া যে কার্য্য-
ণসম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞান জন্মলাভ
ত এই সুস্পষ্ট দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ,
: প্রভৃতিতে সেই প্রকার কার্য্যকারণের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়
। উহাদের উদয়, অস্ত বা স্থিতি কোন সাধারণ নিয়মের
ন নহে। প্রথমতঃ, মানসিক ব্যাপারসমূহের সম্যক
: বা বিচার অতি দুরূহ; দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত ব্যাপার
ন সাধারণ নিয়মের অধীন নহে—সুতরাং ঐ সকল
পারের কোন বিশেষ বিজ্ঞান হইতে পারে না। মনকে
টিমাত্র বস্তু ধরিয়া লইলে ত কথাই নাই, কারণ, একটি
র্থের আর বিজ্ঞান কি হইবে! তবে মনকে একটি
াণ্ড জগৎ বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ লোভ, মোহ, ইচ্ছা,
ল্ল ইত্যাদি মনের ব্যাপার-সমষ্টিকে গ্রহণ করিলে বিচার্য্য
ত পারে যে, এই মনোজগতের অন্তর্গত বস্তুসমূহের
ান সম্ভব কি না।

পুরাকালে দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়ের বিচারের সহিত
সিক ব্যাপারেরও বিচার আনুসাঙ্গিকভাবে হইত।
ারণ মনুষ্য, পরস্পরের সহিত ব্যবহারে মানসিক ব্যাপার-
াও যে নিয়মে বদ্ধ, তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। বিনা
ে তোমার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিলে তোমার রাগ
ব, ইহা সকলেই জানে। তুমি একটি লোককে স্থল-
াষে দেখিয়াছ। সেই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলে বা উহার
া মনে হইলে ঐ ব্যক্তিও তোমার স্মরণ-পথে উদিত হইবে,
া সকলেই স্বীকার করে। সুখের পর দুঃখ অতি তীব্র-
ব অনুভূত হয়, ইহাও সকলের অভিজ্ঞাত। অভ্যাসবলে
ি সুগম হয়, ইহাও সাধারণ-প্রত্যক্ষ। এই প্রকার
াসিক ব্যাপারের নিয়মাবলী সাধারণ জ্ঞানের বিষয়।
এব বোধ হইতেছে যে, জড়জগতের দ্রব্যজাতের ন্যায়
াজগতের ব্যাপারগুলিও নিয়মের অধীন। যদিও ইন্দ্রিয়-
া এ ব্যাপারগুলি আমাদের গোচর হয় না, তবুও
াদিগকে আমরা জানিয়া থাকি; উহাদের প্রকৃতি, উদয়,
তি ও লয় প্রত্যক্ষ করি এবং অপরকে বাক্য দ্বারা জ্ঞাপন
র। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের জন্য আমাদের যে উপায়
লম্বনের প্রয়োজন, মানসিক ব্যাপারেও সে উপায় অবলম্বন
রিতে পারি। এখানেও প্রত্যক্ষদর্শন ও তদধিষ্ঠিত অনু-
মানের উপর নির্ভর করিয়া বিচিত্র, বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক
ব্যাপারগুলিকে এক করিয়া উহাদের নিয়মগুলি নির্দ্দেশ
করিতে ও বিশদ ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ।

প্রাকৃতবিজ্ঞান যন্ত্রাদির সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে
জড়পদার্থসমূহকে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করিয়া উহাদের
গুহ্যতম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ আবিষ্কার পূর্ব্বক
জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে। একপাত্র জলকে একটি
বাষ্পকণায় পরিণত করতঃ উহাকে আবার বিদ্যুৎ-সাহায্যে
বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে অম্লজান ও অজ্ঞানের তিনটি
কণার আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই অম্লজান ও অজ্ঞান-
কণার ক্ষুদ্রতম অংশকে একটি অণু বলা হইয়া থাকে।
আরও বিশ্লেষণদ্বারা সপ্রমাণ হইবে যে, এই তথাকথিত
অবিভাজ্য অণুটি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাঙ্গে একভাবাপন্ন একমাত্র
গতিশীল পদার্থ নহে। সুখ-দুঃখাদি মানসিক ব্যাপারের
এইরূপ বিভাগ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হইলে জড়বিজ্ঞানের
পার্শ্বে মনোবিজ্ঞান স্থান পাইতে পারে। কিন্তু কোন
মানসিক ব্যাপারের এরূপ বিভাগ অসম্ভব। তুমি একটি
জলকণাকে অন্য জলকণা হইতে পৃথক স্থানে রাখিতে পার,
অথবা উহার উপাদানভূত বাষ্পদ্বয়কেও পৃথক স্থানে রক্ষা
করিতে পার; কিন্তু তোমার ভক্তি ও স্নেহকে জলের ন্যায়
খণ্ড-খণ্ড করিতে বা উহার উপাদানগুলিকে পৃথক করিয়া
পৃথক স্থানে রক্ষা করিতে পার না; সুতরাং জড়পদার্থের
যে সম্যক দর্শন ও বিচার সম্ভব, মানসিক ব্যাপারের তাহা
সম্ভব নহে। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণদ্বারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের
বিস্তৃতি হয়। বিশ্লেষণদ্বারা বস্তুবিশেষের উপাদান সকল
জ্ঞাত হইয়া অন্য বস্তুতে ঐ সকল উপাদান দেখিতে পাইলে
উভয় বস্তু সদৃশ বা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যদি
মানসিক ব্যাপারের সংশ্লেষণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে যে
সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের অন্যতম অবলম্বন, তাহাও অসম্ভব হইবে।
সত্য বটে, জড়পদার্থের ন্যায় মানসিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ ও
সংশ্লেষণ সম্ভব নহে—ইহার অংশ পৃথক করা যায় না—
কিন্তু একপ্রকার সংশ্লেষণ আছে, যাহা মানসিক ব্যাপার
এবং জড়পদার্থ—উভয়েই প্রযুজ্য। এই প্রকার সংশ্লেষণে
দ্রব্যবিশেষের অংশসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন
করিয়া বিভিন্ন স্থানে রাখা হয় না। যেমন একটুক্‌রা
চা-খড়িকে সম্মুখে রাখিয়া একবার উহার শ্বেতবর্ণ মাত্র

মনোমধ্যে ধারণা করি—উহার অন্য কোন গুণে মনোনিবেশ করি না; আবার অপর ক্ষণে উহার শ্বেতবর্ণটি একেবারে অন্তরালে রাখিয়া উহার গুরুত্বের দিকে মনোনিবেশ করি ও তৎপরক্ষণেই অন্য সকল গুণ হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার উপাদানমাত্র মনোমধ্যে ধারণা করি—বর্ণ হইতে গুরুত্ব বা গুরুত্ব ও বর্ণ হইতে উহার উপাদান প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন করি না, মাত্র বিভিন্ন মনোযোগের ক্রিয়ার দ্বারা পৃথক পৃথক মুহূর্ত্তে পৃথক-পৃথক গুণকে ধারণা করি; সেইরূপ কোন একটি মানসিক ব্যাপার, যথা, ভ্রাতৃস্নেহ বা ঈশ্বরভক্তি, মনোমধ্যে ধারণা করিয়া বিভিন্ন মনোযোগের ক্রিয়ার দ্বারা উহার ভিন্ন ভাব ও গুণকে ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে চিন্তা করিতে পারি। এইরূপ বিভাগ জড়পদার্থের অংশ-বিচ্ছেদ হইতে পৃথক হইলেও, ইহার দ্বারা কোন সংযুক্ত বস্তুকে বিভাগ করিয়া উহার পৃথক-পৃথক গুণ ও ক্রিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ বিশ্লেষণকে মানসিক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন মনোবৃত্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও উপাদান জ্ঞাত হইয়া পুনরায় মানসিক বৃত্তিসমূহের সংশ্লেষণ করিতে সমর্থ হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্যক দর্শন, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, একীকরণ যেমন জড়জগতে সম্ভব, তেমনি অন্ততঃ কতক পরিমাণে মনোজগতেও সম্ভব। উক্ত ক্রিয়াসকলের নিয়োগের তারতম্য অনুসারে অবশ্য বিজ্ঞানবিশেষের উন্নতিরও তারতম্য হইবে। এই জন্যই মনোবিজ্ঞান কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উহার কার্য্যাবলীও যেন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানবিদেরা মনোরাজ্যের গুহ্যতম ব্যাপার পরিদর্শনের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে সম্প্রতি সমর্থ হইয়াছেন। পরীক্ষার সাহায্য ব্যতীত কেবল পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সম্যক জ্ঞানলাভ হয় না। জড়জগতে যে বিষয়গুলি আমরা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই সকল বিষয়েই আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। আর যেখানে কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, বিজ্ঞান সেখানে তত অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিজশক্তি ও কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রকৃতির গূঢ় তথ্যসকল জোর করিয়া বাহির করিয়া লইতে পারিলে জ্ঞানের প্রসার যেমন বৃদ্ধি পায়, নিশ্চেষ্টভাবে প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চাহিয়া থাকিলে তেমন হয় না। মনোজগতের ব্যাপার ও তাহার উৎপত্তি, লয় বা উপাদান ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় নাই বলিলেই হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদেরা মনোজগতের ক্রিয়াসমূহকে ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণের এক উপায় হস্তগত করিয়াছেন। মনোবৃত্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এমন কোন মানসিক ব্যাপার নাই, যাহা আমাদের শরীরের কোন-না-কোন অংশের ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ নহে। মনোমধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হইলে চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধর কম্পিত ও হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়; ভক্তিরসের উদ্রেক হইলে চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টি ও শরীরের মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অঙ্গুলি কীটদষ্ট হইলে মনের মধ্যে যন্ত্রণার উদ্রেক হয় বা শরীর অবসন্ন হইলে মনেরও অবসাদ ঘটিয়া থাকে। যদি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে যন্ত্রাদির সাহায্যে অথবা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা অথবা উভয় উপায়ে আয়ত্ত করিয়া ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে তত্তৎ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ তত্তৎ মানসিক ব্যাপারগুলিকেও পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইব। যে মানসিক বৃত্তি পূর্ব্বে একটি অবিভাজ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইত, শারীরিক-ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতঃ তাহার বিভিন্ন উপাদান বা বিভিন্ন গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া উহা একটি সংযুক্ত পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিব। যে মানসিক ব্যাপারের উৎপত্তি ও লয় পৃথকরূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইত, উপরি উক্ত প্রকারে শারীরিক ক্রিয়ার ইচ্ছামত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব। মনোবৃত্তির সহিত আমাদের শারীর বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু শারীর-বৃত্তিমাত্র জড়পদার্থের ক্রিয়া বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা মনোবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাধীন পর্য্যবেক্ষণের বিষয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত বিজ্ঞানের পার্শ্বে দাঁড়াইতে সমর্থ! অদ্য এইস্থানেই বিশ্রাম। অতঃপর আমরা মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিব।

বৈকুণ্ঠের উইল

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জয়লাল মাষ্টারকে গোকুল গোপনে আশি টাকা ঘুস দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমন ধারা একটা আভাসও বাড়ীশুদ্ধ সকলের চোখে মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ীর গাড়ী বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া ষ্টেসন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছল্যভরে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, "আর কি কলকাতার গাড়ী নেই যে, তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরোগে যা।" কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, "আরো দু'খানা আছে বটে; কিন্তু ঘোড়া দানা-পানি পায় নাই বলিয়াই চলিয়া আসিতে হইল।" গোকুল এক নিমিষেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল—"ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আস্‌তা হ্যায় কি না, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানা-পানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।" কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্ত্তী বহুদিনের কর্ম্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, "ছোটবাবু এলে গাড়ী ভাড়া করেও আস্‌তে পারবেন। আপনি সে-জন্যে কেন ব্যস্ত হচ্চেন, বড়বাবু?" রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি ব্যস্ত হ'ব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তি মশাই? বাড়ীতে মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না করলে, আমি ত তাকে বাড়ী ঢুক্‌তেই দিই নে। গোকুল মজুমদার রাগ্‌লে বাপের কুপুত্তুর—হাঁ।"

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কাণ দু'টা তাহার গাড়ীর চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহু দূরে একটা ভারি গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্ত্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল—"ওরে এগিয়ে দেখ ত রে, আমাদের গাড়ী কি না। ঘোড়া দু'টোকে হায়রাণ করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বল্‌লুম, আর বেটারা কি না সত্যি মনে করে গাড়ী নিয়ে ইষ্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্যে আবার গাড়ী পাঠাতে হবে! সংমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দু'টোকে মেরে ফেলা যায় না!" রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি-গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল, "তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা যা, বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীকে বল্‌গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্ত্তি! কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফাটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস্—হাঁ। সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়! একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না, তা' বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাওগে চক্কোত্তি মশাই; পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে, তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেতো; এখন আর একটি পয়সা না। বাড়ী ঢুক্‌তেই ত তাকে দেব

বলিয়া গোকুল হন্ হন্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক্ খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবা-মাত্রেই গোকুল তড়াক্ করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যায়নি যে রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও যাও, ওসব আমীরি চাল্ আমার কাছে খাটবে না।" লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাটের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোন-রকম অসুখ বোধ হচ্চে,গোকুল?" গোকুল যেমন শুইয়া ছিল,তেম্‌নিভাবে জবাব দিল—"না।" ভবানী বলিলেন,—"না, তবে যে কিছু খেলিনে,—হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়লি?" গোকুল কহিল, "পড়লুম।"

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালেও আর সময় হবে না বাবা। গোকুল ঠিক তেম্‌নি করিয়া জবাব দিল—না হয় নাই হবে।"

ভবানী কিছু বিস্মিত, কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন,"ছি, গোকুল, এ সময়ে ও রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্ত ঠিক করে দেব।"

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সাথে কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোন দিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশকণ্ঠে কহিল, "তোমার যে মৎলব শোনে সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুন্‌ব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব কোন জাঁকজমক্ করব না।" বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভবানী শান্ত-স্বরে কহিলেন, "ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন ক'রে কথা কইতে আছে!" গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "এ রকম করলে, লোকে কি বল্‌বে বল্ দেখি বাছা। যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেম্‌নি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।" গোকুল তেম্‌নিভাবে থাকিয়াই কহিল, "রটাক্‌গে শালারা। আমি কারো ধারিনে যে, ভয়ে মরে যাব।" ভবানী বলিলেন, "কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তার মত কাজ না করলে ত তিনি সুখী হবেন না।" ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন। গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "খরচের কথা কে বল্‌চে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু, যত দিন যাচ্চে, ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল, মা, আমি একলা কি করে কি করব?" বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভবানী নিজেও আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি এ খবর পেয়েছে, গোকুল?" গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, "পেয়েছে বই কি মা।" "কে তাকে খবর দিলে?"

কে যে তাহাকে বাড়ীর এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাষ্টার মশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া সে যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ী আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, "খবর সে পেয়েছে, মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হা হা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে, মা, সব জেনেচে।"

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই

অশ্রুগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজ কণ্ঠে বলিলেন, "গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে, অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস্‌নে। মনে কর্‌, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ কায করতেও বাড়ী আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।"

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, "ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেছেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। ৩।৪ দিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেল্‌লেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর,—আর কেউ হলে—" টান্‌টা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত, তাহা খুলিয়া বলা এক্ষেত্রে বড়বৌ বাহুল্য মনে করিল। কিন্তু, ভবানী মনে-মনে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে, শ্বশুর বর্ত্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোন দিন বলে নাই; এমন কি, শাশুড়ীর সাম্‌নে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল—"শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।" প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু, আরও একটুখানি সবলকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া, বলিল, "দ্যাখো, যা বল্‌বে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।" জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঠিক যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বউমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা। যাও, নিজের কাযে যাও।" বউমা কহিল, "কথা আমি কোন দিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাট্‌তে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু, উনি যে খেতে-শুতে-বস্‌তে—আমার চারটে পাশকরা ভাই, আমার পাঁচটা পাশকরা ভাই, করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু, ভাই ত বাড়ী এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-সরম থাক্‌লে কি আর কথা বল্‌বার দরকার হয়?" বলিয়া সে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুম্‌-গুম্‌ পায়ের শব্দে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড়বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু, বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া—পুনরায় বলিল, "যখন্‌-তখন্‌ শুধু রাশ-রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখেচি ত। কিন্তু, সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগ্‌ত। তা' বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হ'তে থাক্‌লে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকাল্‌টা মুখ্‌বুজে থাক্‌তে পারিনে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে তত ঠকিয়েছে। ঠকাগ্‌, আমার কি? ওর নিজের ছেলে-মেয়েই পথে বস্‌বে।" বলিয়া এইবার বড়বৌ সত্য-সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। "কি! আমি মুখ্যু? কোন্‌ শালা বলে? এ সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ করতে পারি, তা জানিস্‌? আমি মুখ্যু? বাড়ী ঢুক্‌লে দরওয়ান দিয়ে ওকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে!" এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত কি সে অবিশ্রাম চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী সেই যে

নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া, এক সময়ে ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেলেন।

৬

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু, সেইরাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্ম্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্ম্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকি রহিয়াছে, সেকথা বাড়ীশুদ্ধ সকলকে পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কাণে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, "নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল, সে মরে গেছে।" তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ, এই সোজা কথাটা কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে, এবং, গোকুল যে কোন-কৌশলেই হোক্, ষোলোআনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলেবুড়া মেয়ে-পুরুষে যখন এক-বাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ,ভ্রাতৃবৎসল,ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন, আর মনে মনে বলিয়াছেন—আরে,—সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কস্মিন কালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে! সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই! "এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলোর সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কি না!" কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও যখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রাজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইতে হইল; এবং দেখিতে-দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে-মুখে প্রচার হইয়া গেল। অথচ, গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কহিতেন। তাহাতে, কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা এক সময়ে স্বামীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া এই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, "মার ভাব-গতিক দেখ্‌চ?" গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "না। কি হয়েছে মার?" মনোরমা তাচ্ছল্য-ভরে বলিল, "হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে আর কথা কন্ না। তোমার সঙ্গে কথা-টথা কইচেন ত?" গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, "না, আমার সঙ্গেও না।" মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরো নীচু করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে মজা। যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাক্‌লে ত আমাদেরই থাক্‌ত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেছেন। আমাদের তিনি সর্ব্বনাশ করবেন—আর সে কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত মা মা করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?"

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালীবর্ণ হইয়া গেল। কোনরকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, "ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক্, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বই নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়ে-মানুষের সহ্য হয়? না না, আমার সব কথা অমন করে তোমায় উড়িয়ে দিলে আর চল্‌বে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে—অমন মা মা করে গলে গেলে

সব দিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্চি। বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।"

গোকুলের বুকের ভিতরটায় অভূতপূর্ব্ব শঙ্কায় গুর-গুর করিয়া উঠিল—সে বিবর্ণমুখে ফ্যাল্‌-ফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, "আমরা মেয়ে-মানুষ, মেয়ে-মানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষ-মানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো।" বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া,কতটা কায হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া, বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, "আর, ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনধারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চল্‌বে না। তাঁকে লেখা-পড়া ত তুমি আর কম শেখাওনি। এখন যাহোক্ একটু চাক্‌রি-বাক্‌রি করে মাকে নিয়ে, বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে ত তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখ্‌তে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথাগুঁজে দাঁড়াবার যাহোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও, যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোকে যেন না বল্‌তে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখ্‌লে না। বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি—যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বল্‌তে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়।" বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি-সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কাণের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল, তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারা-দিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে দু'তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে; কিন্তু, তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া, সে-সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু, এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এইসমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মা'র সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল,—"এমনধারা মুখভার করে কায-কর্ম্মের বাড়ীতে বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না মা।" ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, "তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ-রাশ টাকা নষ্ট করচে! বাবা তাঁর বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করগে—আমাদের ওপর রাগ করতে পারবে না, তা' বলে দিচ্চি।"

ভবানী মর্ম্মাহত হইয়া ধীরেধীরে বলিলেন, "আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি, গোকুল,—কারো সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে চাইনে।" "যদি চাও না, ত ওরকম করে থাক্‌লে চল্‌বে না। বিনোদকে বোলো, সে যেন চাক্‌রি-বাক্‌রি করে। আমার বাড়ীতে তার যায়গা হবে না।" "সে ত হবেই না গোকুল—এ আর বেশি কথা কি।" বলিয়া ভবানী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া বকিতে-বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাক্‌রি-বাক্‌রি করে যা ইচ্ছে করুক, আমি কিছু জানিনে।"

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিস্‌-ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লেন উনি?" গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল—"বল্‌বেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!" বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল—"তবু, তবু?" গোকুল তেম্‌নি করিয়াই কহিল, "তবু আর কি! তাঁকে স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে, না, বিনোদের এ বাড়ীতে থাকা চল্‌বে না।" তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল "এ ষোল আনা রাগের কথা, তা' বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দু'চক্ষের বালি।" গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা' আর বুঝিনি? আমার কাছে কি চালাকি চলে?"

বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্ত্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, "বলি, একটা নতুন খবর শুনেচ, চক্কোত্তি মশাই? এতকাল এত কোরে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের

বিষ। কথাবার্ত্তা আর আমাদের সঙ্গে কন না; সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।" চক্রবর্ত্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"না না, বল কি বড়বাবু?" "কি বলি?—ওরে ও হাবুর মা, শোন্ শোন্"। বাড়ীর বুড়া ঝি কি কাযে বাহিরে যাইতেছিল; মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্ত্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, "এই জিজ্ঞেসা করে দেখ। কি বলিস্ হাবুর মা, মাঁকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখ্‌চিস্? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?"

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাযে চলিয়া গেল। "সত্যি মিথ্যে শুন্‌লে ত?" বলিয়া চক্রবর্ত্তীর প্রতি একটা ইসারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল। সে দিন পাড়ার যে কেহ দেখা-শুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃ পুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে—"আমি সতীন-পো বই ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি।"

সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার এত দায় পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে ছোট পিসিমাদের আন্‌তে যাব।— এত গরজ নেই—আস্‌তে হয়, তিনি নিজে আসবেন।" ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "সেটা কি ভাল কায হবে, গোকুল?"

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, "ভাল মন্দ জানিনে। দু হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ কোরো না, তা' বলে দিচ্চি।"

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাযে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"আনো বল্‌লেই ত আর আন্‌তে পারিনে মা। ধারকর্জ্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।" ভবানী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে!"

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল—"এখন থেকে আমাকে বুঝ্‌তেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি মলেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকাকড়ি বুঝেসুঝে খরচ করা দরকার! নিজের মা ত নেই!" বলিয়া চলিয়া গেল। তাহার টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এত বড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল,— "আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বল্‌লে—'গোকুল, তোর পিসিমাদের লোক পাঠিয়ে আনা,—আর আজ বল্‌চ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে আমাকে এম্‌নি করে জব্দ করা? লোকে বল্‌কে—গোকুল বুঝি সত্যিসত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!" তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত এক মুহূর্ত্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা!" গোকুল অকস্মাৎ দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল,—"তোমার কোন্ হুকুমটা শুনিনে, মা, যে তুমি আমাকে এম্‌নি করে বল্‌চ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্চি। বেন্দা লজ্জায় ঘেন্নায় বাড়ী-ছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব। থাক্ তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে" বলিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

৭

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে-চেঁচাইতে আসিল—"কাকা এসেছে মা, কাকা এসেছে।"

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়া ছিল। সে ধড়ফড় করিয়া তাহার কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, "কখন এল রে তোর কাকা?" মেয়ে কহিল, "অনেক রাত্তিরে মা।" মা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি কচ্চে?" মেয়ে কহিল, "এখনও ওঠেননি। তিনি—নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন—" তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাযে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "তোর ঠাকুরমা তাকে কি বল্‌লে রে হিমু?" হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জানিনে ত,

বাবা।" গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, "খুব বক্‌লে বুঝি রে ?"

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল—"হুঁ—" গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল—"তোর ঠাকুরমা কি কি সব বল্‌লে—বল্‌ত মা হিমু ?"

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, "জানিনে ত বাবা।" গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "এই যে বল্‌লি জানিস্। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না ? আমি কাউকে বল্‌ব নারে, তুই বল্ না।" জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, "বল্‌ত মা, কি কি কথা হ'ল ? মা বুঝি বল্‌লে, 'বেরিয়ে যা তুই বাড়ী থেকে ?' এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস্" বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল। হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, "হুঁ বল্‌লে।" "তারপর ? তারপর ?" হিমু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "তার পরে ত জানিনে বাবা।" গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, "জানিস্, জানিস্ বৈ কি। তোর কাকা কি বল্‌লে ?" "কিচ্ছু বল্‌লে না।" গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, "একেবারে কিছুই বল্‌লে না ? তা' কি হয় ?" পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"জানিনে বাবা।"

"ফের জানিস্‌নে ? হারামজাদা মেয়ে !" বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে একটা চড় কষাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যা, দূর হ।" মেয়ে কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল "তা' বেশ করেচ। সে বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই নানারকম করে লাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ,—আমার ওপরে যাতে তার ম'ন ভেঙে যায়—এই ত ? সে সব আমার কিছু আর শুন্‌তে বাকি নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে ; তা' বলে দিয়ে যাচ্চি" বলিয়াই তেম্‌নি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে নানা লোক নানা কাযে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল "ও হাবুর মা, বলি ভায়া যে বাড়ী এসেচেন,—শুনেচিস্ ?" ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোট-বাবু বাড়ী এলেন।"

গোকুল কহিল, "সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হ'ল ? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে ? বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—" ঝি বাধা দিয়া কহিল, "না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি ; যদু তাঁর ব্যাগটা নিয়ে এলে, আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুক্‌লেন, আর ত বার হ'ন নি।" গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, "কেন ঢাক্‌চিস্ ঝি ? আমি যে সব শুনেচি।"

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল "অমন কথাটি বোলো না, বড়বাবু। আমি সব্বোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাযকর্ম্ম করে দিলুম—তিনি মাকে ডাক্‌তে নিষেধ করে বল্‌লে 'ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা।' আহা! চোখ মুখ বসে গিয়ে একেবারে যেন কালীবর্ন হয়ে গেছে। গোকুলের চোখদুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কহিল, "তা আর হবে না! তুই বলিস্ কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখ্‌তে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্য্যন্ত পেলে না—তার মনে-মনে যা' হচ্ছে তা সেই জানে! বাবাকে সে কি ভালই বাস্‌ত, তা' তোরা সব জানিস্ ? কি বলিস্ হাবুর মা ?" বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। হাবুর মা অনেক দিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, "তা' আর বল্‌তে, বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল যে! তবে কি না বড় বড় লেখাপড়া কর্‌তে-কর্‌তে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—"

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, "তাই বল্ না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না ? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে! অনার গ্রাজুয়েট্! বলি,

এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে ক'টা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কই দেখিয়ে দে দেখি? লাট সাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজি-পেঁজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভদ্দরলোককে বলগে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুর বাড়ীর দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা' জানিস্? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিন্‌তে পারলে? মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে দেখ্‌লি? না রে?" ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মুখখানি দেখ্‌লে চোখে আর জল রাখা যায় না, বড়বাবু।"

গোকুলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, "তুই তাকে মানুষ করেচিস হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিন্‌তে পেরেছিস্। আহা! চিরটা কাল তার হেসে-খেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েছে, বল্ দেখি! আর উইল করে বিষয় দেব না বল্‌লেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে, ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল্ দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ করলে আমাকে যে বাবা বলে অর্দ্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুল চিরে ভাগ করে দিতে হবে—তা' জানিস্!" ঝি সায় দিয়া বলিল, "তা' দিতে হবে বই কি, বাবু!"

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল "তবে, তাই বল্ না। আর এই মা-টি! তুই মেয়ে মানুষ, মেয়ে-মানুষের মত থাক্ না কেন? তুই কেন উইল করার মৎলব দিতে গেলি! এইটে কি তোর মায়ের মত কাব হ'ল? ধর্ম্ম নেই? তিনি দেখ্‌চেন না? নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারি বিষয়! আজ-বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ আট্‌কাতে পারবে না,—তখন কি করে রাখ্‌বি তার বিষয়? এ সব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে না! এখন স-মানে না দিলে তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!"

হাবুর মা খুসি হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল টুইল তাহার একেবারেই ভাল লাগে নাই; কহিল, "আচ্ছা, বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না, যে, 'তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে'। তুমি দিলে'ত আর কারু না বলবার যো নেই।" কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খট্‌কা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ্ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোন্‌কে চিঠি লিখেচে—তা'হলে জেল খাট্‌তে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বৌ রাজী হয়, তখন বটে।" হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাযে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল, হিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কাকা উঠেচে রে?" হিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, "হুঁ—উঠেই তাঁর বসবার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।"

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজী-ধরণে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নীচে মেজের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরণ দেখিয়াই গোকুলের দু'টি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোট-ভায়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, "বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ্দটা"——গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, "এ সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়ানো, চক্কোত্তি মশাই।" মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েচেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্য্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন!—আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না চক্কোত্তি মশাই।"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "কিন্তু, ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে উঠেন নি।" গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, "ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রে আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—যে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে 'বড়বাবু, ছোটবাবুর মুখের পানে চাইলে আর চোখে জল রাখা যায় না—এম্নি চেহারা হয়েচে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালীমাড়া হয়ে গেছে।'" বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "গিয়ে দেখগে—সে ঠাণ্ডা মাটীর উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখ্‌লে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তি মশাই?"

চক্রবর্ত্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ্দ লইয়া যাইতেছিল; গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞেসা করি, আমি থাক্‌তে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয় ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস, তেম্নি চলুক।" চক্রবর্ত্তী নিরুৎসাহ-ভাবে কহিল, "না পারলে—" কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল,—"পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু, ওর ত তা' নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমাদের দেহতে তুমি তুলনা করে বস্‌লে? কে আছিস্ রে ওখানে—ভূতো? যা'ত একবার, চট্ করে আমাদের ভশ্চায্যি মশাইকে ডেকে আন্। না হয়, যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা' বলে ত আর মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেল্‌তে পারব না। ওকে আমি আলোচালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ করতে পারব না, এতে যিনি যাই বলুন।" চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, "সে ত ঠিক কথা, বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বল্‌বে—" "আরে লোকে কি বল্‌বে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেল্‌ব? তোমার এ সব কি বুদ্ধি হ'ল, বল ত চক্কোত্তি মশাই? না, না; ফর্দ্দ-টর্দ্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করবার দরকার নেই। মুখে যা'হোক্ একটু-কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক্" বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৮)

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু, সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছুকিছু কথাবার্ত্তা কহিল বটে, কিন্তু, বড়-ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ, সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্ত্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাযের ঝঞ্চাটে হঠাৎ সেই দিকেই আসিয়া পড়ে। এম্নি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্ণ বেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বসিয়া ছিল, —একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল, "কলকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাসা আর কি!" বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্ক-হাসির অভিনয় করিয়া কহিল—"তা' তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্য্যন্ত দেওয়া নেই;—তা' যাক্, সে সব হবে অখন—কাযটা চুকে যাক্—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝ্‌লে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজেখরচ হয়ে যাবে—বুঝ্‌লে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানই ত সব—বুঝ্‌লে না ভাই —তা' সে সব কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়েরই রইল; এ একটা শুধু বুঝ্‌লে না— তা' যাক্—সে জন্যে কিছুই আট্‌কাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই, ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখো। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু, আমার ত এমন ফুরসৎ নেই যে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দু'টো পরামর্শ করি—" বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙিয়া অবধি এই কথাগুলাই সে মনে-মনে মক্স করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া

দিয়া কহিল, "আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না — এ সব আমি ছোঁবো না।"

এক মুহূর্ত্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারাদিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, "ছোঁবে না? কেন?" বিনোদ কহিল, "আমার আবশ্যক কি! আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্য এসেচি—দু'দিন পরেই চলে যাব।" গোকুল কহিল "চলে যাবে?" বিনোদ বলিল, "যেতেই ত হবে। তা' ছাড়া এ সব টাকা-কড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী। হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয় ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।"

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দু'টা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পরে সে হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁক-জমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ, আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচাচেঁচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। "তোমার কি অসুখ করচে?" গোকুল উদাসভাবে কহিল, "না, বেশ আছি।" "তবে, অমন করে শুলে যে?" গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা টথা কিছু হ'ল?" গোকুল কহিল, "না।" তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল, "ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্ছে শুনেচ?" গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরও একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল, "বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে—হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!"

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, "ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?" মনোরমা বলিল, "আমি? আমি ন্যাকা? একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেও করিনে।" কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ, চারটে পাশ-করা কুলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু, আজ নাকি তাহার বুক-জোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু, সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেক রকম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিছুতে কাণ দিয়ো না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাযও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়ীতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচ্‌বে না।" গোকুল উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তোমার বাবা কি আস্‌বেন?" "আস্‌বেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সাম্‌লাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু, তা' বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!" গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুসি এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"তোমার দোকানপত্র যা' কিছু, সব ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখ্‌তে হবে? শুধু বল্‌বে, আমি জানিনে বাবা জানেন। বাস্‌! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝ্‌লে না?" বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না; কিন্তু, সে হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল-ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্‌মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল।

সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, "মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?" ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, "কই, না।" চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু, সে মনে-মনে অনেক মৎলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়াসম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া

উঠিবেন। কিন্তু, মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে-আস্তে কহিল, "কি জানি; সে-ই কোথায় রাখ্‌লে, না আমিই কোথায় ফেল্‌লুম!" ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়ীতে সিন্দুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না, এবং, এই তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন, সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসারসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "শম্ভু আর দরবারী পিসিমাদের যে আন্‌তে গেল, কই, তারাও ত এখনো এসে পড়ল না।" ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "কি জানি, বল্‌তে পারিনে ত।"

গোকুল বলিল, "ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে, মা। এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু, আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কায করো মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—" ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোট ভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, "ইটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট।" বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়-ভাইয়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজিতে আলাপ কচ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম, হুজুর; ওঁদের কি বাঙলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুন্‌লেই বা তোমাকে বল্‌বে কি!"

আশপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটি বাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

"একটা কথা শুনুন" বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, "দাদা আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ রকম করলে ত আমি একদণ্ডও টিক্‌তে পারিনে।" গোকুল ভীত হইয়া কহিল "কেন? কেন ভাই?" "কতদিন বলেচি, আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ করা লোক গলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্চে যে!" বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে-বলিতে গেল, এরূপ কর্ম্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ ঘণ্টা পরেই বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকেরই কাণে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোণার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটি বাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

[অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-আর-এস]

বিগত কলিকাতা অধিবেশনে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনকে চারিটী শাখায় বিভক্ত করা হয়, তখন অনেকের এ বিষয়ে আপত্তি ছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন্ বিভাগেই এখন পর্য্যন্ত এত অধিক-সংখ্যক বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হয় নাই যে, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সভায় উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি এই স্বতন্ত্র অধিবেশনের সমর্থন করিয়াছিলেন।

নবপ্রচলিত নিয়মানুসারে তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এক্ষণে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে শাখা-অধিবেশনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইতিহাস-শাখার আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করিব।

বিশেষজ্ঞের অধিবেশনসম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলেই, প্রথমে বিশেষজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গের মধ্যেও কোন স্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। অনেকের বিশ্বাস, ইতিহাসসম্বন্ধে যিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনিই ইতিহাস-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এই বিশ্বাস আমাদের সাহিত্য-রথীবৃন্দের মধ্যে কতদূর প্রচলিত, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—যশোহরের সাহিত্য-সম্মিলন। এ বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক।

"বিশেষজ্ঞ" শব্দের ন্যায়-শাস্ত্রানুগত সংজ্ঞা প্রদান করা কষ্টকর হইলেও, মোটামুটি এমন কয়েকটি গুণের নাম করা যাইতে পারে, যাহার অভাবে কোন ব্যক্তিই বিশেষজ্ঞ পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। যিনি জগতের সাধারণ ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত হইতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেন নাই, বর্ত্তমানকালে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইউরোপে ইতিহাস-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহার মূল নীতির বিষয়ে যিনি সম্যক অভিজ্ঞ নহেন, এবং ঐ সমুদয় মূলনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাথমিক আদি উপকরণগুলির সাহায্যে যিনি ইতিহাস গঠন ও পঠনে যত্নবান হইয়া ঐতিহাসিক চর্চ্চাকে জীবনের অন্যতম ব্রতরূপে অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাকে কখনও ইতিহাস-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না। অধিকসংখ্যক পুস্তক লিখিলেই যে বিশেষজ্ঞের দাবী জন্মে না, তাহার প্রমাণ দেওয়া অতি সহজ। সম্প্রতি আমাদের দেশের দানবীর রাজা-মহারাজার কৃপায় যে সকল বৃহদাকার ঐতিহাসিক-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "পৃথিবীর ইতিহাস" অন্যতম। আশা করি এই বাঙ্গালাদেশেও এমন আনাড়ি কেহ নাই, যিনি এই গ্রন্থগুলিকে বিশেষজ্ঞের লিখিত বলিয়া ভ্রম করিবেন।

বাঙ্গালাদেশে ইতিহাস-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পদলাভে কোন রূপ দাবী আছে, এরূপ মনস্বীদিগের তালিকা সংগ্রহ করা বিশেষ দুঃসাধ্য নহে; কারণ তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ, বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বাবু রাধাগোবিন্দ বসাক, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ব্যতীত আর কেহ বিশেষজ্ঞের দাবী করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালাদেশে যাহা-কিছু প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতেছে, তাহা প্রায়শঃ এই সমুদয় মনস্বী-গণেরই চেষ্টার ফল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনকে যাঁহারা চারি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রতিবৎসর ইতিহাসের বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের বর্ষব্যাপী অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফল সর্ব্বসমক্ষে নিবেদনপূর্ব্বক পরস্পরের আলোচনার দ্বারা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সুযোগ পাইবেন এবং বহু ইতিহাসসেবী একত্র

হওয়ায় সকলেই উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্যও হয় ত কাহারও-কাহারও মনে ছিল। ইউরোপে যেমন কোন দুরূহ, সমস্যাপূর্ণ গ্রন্থ দুই, তিন বা ততোধিক পণ্ডিতের সাহায্যে সুসম্পন্ন হয়, ভবিষ্যৎকালে এই বিশেষজ্ঞগণের অধিবেশনের ফলে সেইরূপ সহযোগিতার পথ হয় ত সুগম হইবে।

এই আশা ও উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, গত তিন বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস তদ্বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

ইহার মধ্যে প্রথম বৎসরের অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইতিহাস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের পদ দাবী করিতে পারেন, এরূপ অনেকে এই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে যে-যে বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেছিলেন, তাহার ফলাফলজ্ঞাপন বা তদ্বিষয়ক বিশেষ কোন আলোচনা এই সভাস্থলে হয় নাই। তবে এইরূপ আলোচনা যে সম্ভব এবং এই আলোচনায় যে কি সুফলের প্রত্যাশা করা যায়, তাহার কিছু-কিছু নমুনা এই সভাস্থলেই পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছিলেন যে, নন্দবংশের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই, এবং 'সাম্রাজ্যবাদ'—জিনিষটি প্রাচীন ভারতবাসিগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। "Fundamental Unity of India" নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঐ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবাসীর মনে একটি সুস্পষ্ট ঐক্যের আদর্শ বিদ্যমান ছিল—এবং সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-দ্বারা এই ঐক্যের আদর্শ কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল—এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি বহু অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন। তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশের প্রতিবাদ করেন। সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় এই দুরূহ বিষয়টির মীমাংসার জন্য এ বিষয়ে অনেকেরই মতামত আহ্বান করেন। ফলে, এবিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হয়; এবং যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সমুদয় আলোচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

এই তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা ব্যতীত বিশেষজ্ঞের অধিবেশনের আর কোন সার্থকতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতা-অধিবেশনে পরিলক্ষিত হয় নাই এবং তাহার সম্ভাবনাও অল্পই ছিল। কারণ, কলিকাতাতেই এইরূপ শাখা-বিভাগের প্রথম সৃষ্টি হয়; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। পর বৎসর যখন বর্দ্ধমানে সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় যাহার সূত্রপাত হইয়াছে, এইবার তাহার প্রসারলাভ হইবে। সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করায় এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু, নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক সরকার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকায়, ইহা যে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে অগ্রসর হইতেছিল, তিনি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; সুতরাং এই নূতন পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে, তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে ঐ পথ হইতে ফিরাইয়া পুনরায় পুরাতন পথে টানিয়া আনিয়াছেন। সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতা-অধিবেশনে দেখা গিয়াছিল যে, ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পরস্পর আলোচনাই পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে গঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের বিশিষ্টতা—এবং এই আলোচনা যত অধিক পরিমাণে হইবে, ততই সাহিত্য-সম্মিলনের নবপ্রতিষ্ঠিত আদর্শের সার্থকতা হইবে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় স্বয়ং এইরূপ আলোচনার অনুষ্ঠান করা ত দূরের কথা, ঘটনাক্রমে যেখানে এইরূপ আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানেও তিনি কোনরূপ আলোচনার অবসর দেন নাই।

সাহিত্য-সম্মিলনের যে আদর্শ বর্দ্ধমানে এইরূপভাবে পরিত্যক্ত হইল, যশোহরে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হওয়া ত দূরের কথা, বর্দ্ধমানেও অধ্যাপক সরকার মহাশয় যতটুকু আদর্শ বজায় রাখিয়াছিলেন, যশোহরে তাহাও কোন-কোন অংশে ক্ষুন্ন হইয়াছে। নানা কারণে যশোহরের ইতিহাস-শাখার সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধির 'সম্বোধনে'র সমালোচনা করা আমি সমীচীন মনে করি না;—কিন্তু কোন-কোন গুরুতর বিষয়ে তিনি আদর্শ হইতে কিরূপ

ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাহার পরিচয় না দিলে আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন্ নূতন পথে সাহিত্য-সম্মিলন চালিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কিন্তু এখানে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার উদ্দেশ্য **বাঙ্গালীর ইতিহাস আলোচনা**"।

"প্রাচ্য ভারতের মেরুদণ্ড বঙ্গদেশে * সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতির দিক দিয়া যাহা হইয়াছে, **তাহারই** আলোচনা এই শাখার আলোচ্য।" (মুদ্রিত সম্বোধন—পৃঃ ১০)

সুতরাং সভাপতি মহাশয়ের মতে বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করা সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নহে। ভবিষ্যতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিবেন কি না, জানি না—কিন্তু যশোহর-সম্মিলনের পূর্ব্বে যে এই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল, এবং তৎকালে অন্ততঃ সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্মিলনের অলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের আদর্শ অনুসৃত হইলে, বঙ্গদেশে ইতিহাস-চর্চ্চার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহাও বোধ হয় বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু যশোহরের ইতিহাস-শাখার সভাপতি মহাশয় কেবল ইতিহাসের গণ্ডী-নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও ইতিহাস কিরূপভাবে গঠিত হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "সমসাময়িক লিপির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া উপযুক্ত উপকরণ-সংগ্রহের এখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই। এখন যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি বংশের কতকটা রাজমালা প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইলে, হয় উপযুক্ত সমসাময়িক লিপি আবিষ্কারের আশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে; নয় যে কয় দিক দিয়া আলোচনা চলিতে পারে—উপযুক্ত অনুসন্ধান দ্বারা তাহারই ফল লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে হইবে। আমি মনে করি, বর্ত্তমান কালে শেষোক্ত পথই অবলম্বনীয়।" (মুদ্রিত সম্বোধন, ২৬ পৃঃ)।

ইহার ভাবার্থ এই যে, সভাপতি মহাশয় সমসাময়িক লিপি-আবিষ্কারের আশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে, যাহা-কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহারই সাহায্যে ইতিহাস-রচনার পক্ষপাতী। এই যাহা কিছু যে বঙ্গদেশের বিশাল কুলশাস্ত্র, তাহা তাঁহার অভিভাষণ ও তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বসুজ মহাশয়ের মতে সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার আদর্শ কুলশাস্ত্রের সাহায্যে বঙ্গদেশের বা বাঙ্গালীর ইতিহাস উদ্ধার করা। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

বিগত তিন বৎসরে সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার আদর্শ কিরূপে ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যাঁহারা বঙ্গদেশে ইতিহাস-চর্চ্চার কল্যাণ-কামনা করেন, তাঁহাদের এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। ভুল, ত্রুটি, অপরাধ যতই কেন হউক না, বাঙ্গালা দেশের কোন সুসন্তানের পক্ষেই ত ইহার উন্নতি-কামনা পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। যাহা জাতীয় সম্পত্তি, শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আশা করি, এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং, গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, এই বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত।

যে আশা ও উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-সম্মিলনকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তাহা যে এপর্য্যন্ত সফল হয় নাই এবং সফলতার পথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয় নাই, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বরং, ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সাহিত্য-সম্মিলন প্রাথমিক আদর্শ হইতেও

* মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ্র, গুপ্ত প্রভৃতি রাজ্য বা সাম্রাজ্যের কালে প্রাচ্য ভারতের কেন্দ্রস্থল ছিল পাটলিপুত্র। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের বিকাশ, এবং শিখধর্ম্মেরও কিয়ৎ পরিমাণে অভিব্যক্তি বিহারে—বঙ্গে নহে। এমতাবস্থায় ধর্ম্ম ও রাজনীতির দিক দিয়া বঙ্গদেশকে কিভাবে প্রাচ্যভারতের মেরুদণ্ডরূপে বর্ণনা করা যায়, আশা করি প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় তাহা অন্যত্র বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন। উপরিউদ্ধৃত অংশের কয়েকটি কথা বুঝিবার জন্য আমি মোটা অক্ষরে দিয়াছি।

ভ্রষ্ট হইয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই-ভাবে আরও কিছুদিন চলিলে যে সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখা উপহাসের বস্তুরূপেই পরিগণিত হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা চাই। দুই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালিত হইতে পারে। প্রথমতঃ—ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিভাগসম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দেশের মধ্যে প্রচার করা, এবং দেশের লোক যাহাতে এই সমুদয়ের অনুশীলন করিতে পারে, তাহার সুযোগ প্রদান করা। দ্বিতীয়তঃ—যাহাতে সাহিত্যের নানাবিভাগে নূতন-নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য-ভেদে কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যই সাহিত্য-সম্মিলনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মিলনের গত তিন বৎসরের বিবরণ বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় এক অখণ্ড সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য; এবং এই সম্মিলনে ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়ের উৎকৃষ্ট, সাধারণের বোধগম্য, সুললিত ভাষায় লিখিত, প্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সাহিত্য-সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেবল চারি শাখায় বিভক্ত থাকিলেই চলিবে না; কলিকাতায় সভাপতি মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক যে প্রণালী আরব্ধ হইয়াছিল, সেই প্রণালীর সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞগণের কথা বলা হইয়াছে। যাহাতে এই বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করেন, পরস্পরের মতবাদের আলোচনা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে স্বতন্ত্র শাখার অধিবেশনের উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি ঐতিহাসিক সমস্যা লইয়া খণ্ড-বিখণ্ডভাবে আলোচনা চলিতেছে। যদি সাহিত্য-সম্মিলনে এই সমস্যাগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও উপকার হয় এবং শিক্ষিত উপযুক্ত শ্রোতৃগণেরও জ্ঞানলাভ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

(১) পাল ও সেনরাজগণের কালনির্ণয়।—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় এ বিষয়ে তাঁহাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এতৎ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। (২) বঙ্গদেশের শিল্পকলার ইতিহাস।—কাহারও মতে ইহার মূলনীতি বরেন্দ্র-ভূমিতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। (৩) বৌদ্ধধর্ম্ম।—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "নারায়ণ" নামক মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে এমন কতকগুলি মত প্রচার করা হইয়াছে, যাহা অনেকে স্বীকার করেন না। (৪) বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব।—এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। (৫) কুশানরাজগণের কালনির্ণয়।—এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। (৬) আদিশূর ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন।—এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ সুপরিচিত। (৭) বটুভট্টের দেববংশ, হরিমিশ্রের কারিকা প্রভৃতি কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা।

সম্মিলনের ৫।৬ মাস পূর্ব্বে যদি এইরূপ কয়েকটি বিষয় স্থির করিয়া আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয়, তবে অনেকেই প্রস্তুত হইয়া সম্মিলনে যাইতে পারেন—বিশেষজ্ঞগণও যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়া বিষয়টির নানা দিক হইতে আলোচনা করিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন।

বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত আর একদল সাহিত্যসেবী আছেন, যাঁহারা অবসরমত ইতিহাস-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের চর্চ্চার ফলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

ইতিহাস-শাখার অধিবেশন কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা লিপিবদ্ধ করিলাম। ইতিহাস-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ যে মহাশয়গণের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে স্বীয় মত লিপিবদ্ধ করিলে ভবিষ্যতে সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখা পদোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এই ভরসাতেই ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন হইয়াও আমি এইরূপ লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

ত্রিপুরার রাজ-চিহ্ন

[শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ]

বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে ত্রিপুরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই রাজ্য মহাভারতের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, বহুবিধ বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত বক্ষে লইয়া, অদ্যাপি স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ত্রিপুরার প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল বাহিনী বারংবার জয়ন্তীয়া, কাছাড়, আরাকাণ ও বঙ্গের সিংহাসন কম্পিত করিয়াছে (১) ত্রিপুর রাজশক্তি কতবার ক্ষত্রিয়, কুকি, মগ, মোগল ও পাঠান শক্তির সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছে—কতবার জয় ও পরাজয় ঘটিয়াছে, কিন্তু কোন কালে কাহারও সহিত এই শক্তি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, ইহা ত্রিপুরার এক অম্লান গৌরব। বৃটিশ সাম্রাজ্যেও এই গৌরবের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। (২)

---

(১) ত্রিপুরার বিজয়ী সেনাদল সুন্দরবনের পূর্ব্ব, ব্রহ্মদেশের উত্তর ও পশ্চিম, কামরূপের দক্ষিণ—এই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে বারংবার আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সেকালে ত্রিপুরার সামরিক বলও নিতান্ত কম ছিল না। কিঞ্চিন্নূন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে (৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে) মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল-ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভাটি প্রদেশের সন্নিহিত স্থানে তিপ্‌রা (ত্রিপুরা) নামে একটি রাজ্য আছে। তাহার অধিপতির নাম বিজয় মাণিক। * * * এই রাজার সৈনিক বিভাগে দুইলক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে, অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক নহে।"

মন্তব্য।—মহারাজ বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণকালে (ত্রৈপুরী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে) ছাব্বিশসহস্র পদাতি, পাঁচসহস্র অশ্বারোহী, পাঁচসহস্র রণতরী এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন, সুতরাং অশ্বারোহীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। (প্রবন্ধ লেখক)।

* * * *

(২) "The British Government has no treaty with Tipperah."

* * * *

Treaties, Engagement and Sunnuds.

Edition 1862, Vol. I, Page 77.

ত্রিপুর-রাজ্য বঙ্গের গৌরব। ত্রিপুরার অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গনিচয় গর্ব্বোন্নত শির উত্তোলন করিয়া, হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিতেছে,—ত্রিপুরার পুণ্যসলিলা গিরিনির্ঝরিণীকুল, কুল-কুলনাদে হিন্দুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধীরমন্থর গতিতে বঙ্গের বক্ষের উপর দিয়া একটানা স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। ত্রিপুরার স্নিগ্ধ শ্যামলা উপত্যকাসমূহ অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিধায়িনী কমলার লীলাক্ষেত্র; ত্রিপুরার সুবিস্তীর্ণ গিরিগর্ভ মহামূল্য রত্নরাজির অক্ষয় ভাণ্ডার; ত্রিপুরার নিভৃত গিরি-কানন চিরশান্তিময়ী প্রকৃতির রম্যকুঞ্জ;—ত্রিপুরার নগণ্য ভিখারীটি পর্য্যন্ত অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত! তাই বলিতেছিলাম, ত্রিপুর-রাজ্য বঙ্গের গৌরব।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস রাজমালিকা, রাজমালা, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা ও রাজরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় সাহিত্যকাননের অম্লান পারিজাতস্বরূপ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থের একখানিও—অদ্যাপি জন-সমাজে প্রচারিত হয় নাই। এ জন্যই পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় রাজমালার সংগ্রহ উপলক্ষে নানাবিধ কাল্পনিক ও অযথা উক্তি দ্বারা ত্রিপুরার ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বিশ্বকোষে' নানাবিধ ভ্রমাত্মক বাক্য-যোজনা দ্বারা সেই ইতিহাসকে আরও অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন! এতদ্বিষয়ক আলোচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বারান্তরে সে বিষয়ে চেষ্টা করা যাইবে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাভিমানের দিনেও আমাদের দেশের অনেকে দেশীয় রাজ্যসমূহের তত্ত্ব জানিতে বড় বেশী ইচ্ছুক নহেন। এমন কি, বঙ্গবাসিগণের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিপুর রাজ্যের সংবাদ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেখা যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—"ত্রিপুর-রাজ্যে কি বৃটিশরাজ্যের ন্যায় আইন-আদালত আছে?" কেহ প্রশ্ন করেন "ত্রিপুরার মহারাজ কি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদানে ক্ষমবান?" এবম্বিধ অনেক প্রশ্ন অনেক সময় শুনিয়াছি; শুনিয়া ভাবিয়াছি, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ত্রিপুর-রাজ্যের বিবরণ যতটুকু পারি, সাধারণ্যে প্রচারের চেষ্টা করিব। অনেক কালের পর আজ সেই সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিলাম; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই প্রবন্ধে কেবল

মীন-মানব

যাঁহার মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ (শ্বেত) সুবিমল ছত্র শোভা পাইতেছে, তিনি আমাদের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম।

কবি শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন ;—

"নলঃসিত ছত্রিত কীর্ত্তি-মণ্ডলঃ
স রাশি বাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ।"

— নৈষধীয় চরিতম্—১ম সঃ, ১ শ্লোকার্দ্ধ।

মহারাজ নলের মস্তকে ধৃত শুভ্র আতপত্রকে তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তিমণ্ডলরূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উক্ত বচনসমূহ আলোচনায় জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় ভূপতিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ত্রিপুর-নৃপতিবৃন্দও কৌলিক প্রথানুসারে এই ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। দ্রুহ্যুর অধস্তন ২৫শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দ্দন রাজধানী ত্রিবেগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারে ত্রিপুরার রাজপাট স্থাপন-কালে শ্বেতছত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। রাজরত্নাকরে মহারাজ প্রতর্দ্দনের ত্রিপুরায় গমন বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;—

তত্রানিলয়ে পুরতো বিধুবংশ মৌলিঃ
ছত্রং সিতং শশিনিভং পৃক্ষু চামরঞ্চ।"

—রাজরত্নাকর—১২শ সঃ, ৮৯ শ্লোকার্দ্ধ।

পূর্ব্ব রাজধানী (ত্রিবেগ-নগরী) হইতে চন্দ্রবংশীয়গণের শীর্ষ-স্থানীয় (প্রতর্দ্দন) শ্বেতছত্র ও শ্বেত চামর নব-বিজিত রাজ্যে (ত্রিপুর রাজ্যে) আনয়ন করিয়াছিলেন।

ছত্রতুইয়া সম্প্রদায়ের লোক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে এই চিহ্ন ধারণ করে।

শ্বেতছত্র
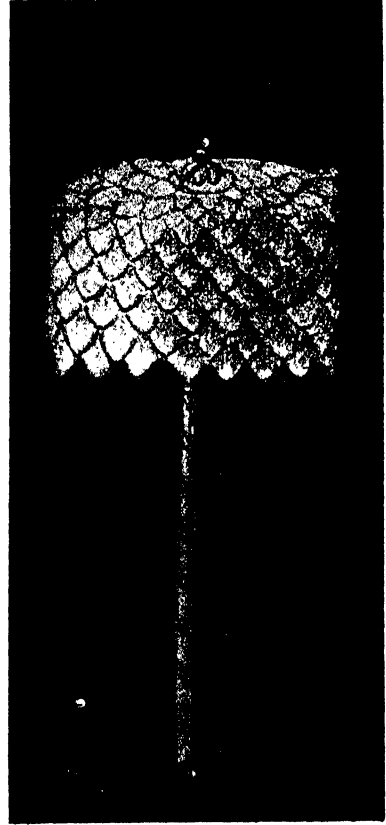
৫। আরঙ্গী—ইহা শ্বেতবস্ত্রবিনির্ম্মিত ব্যজনবিশেষ। এই চিহ্নও রাজ্যস্থাপনের কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ ত্রিপুরের বিবাহযাত্রাকালেও এই চিহ্ন সঙ্গে ছিল ;—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্রমিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল॥"

—রাজমালা।

এই চিহ্ন ছত্রতুইয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে হইয়া থাকে।

৬। তাম্বুলপত্র (পান) ;—এই চিহ্ন রৌপ্যনির্ম্মিত। 'বাছাল'-(৪) সম্প্রদায়ের লোক এই চিহ্ন ধারণের অধিকার পাইয়াছে। ইহা সিংহাসনের বামপার্শ্বে ধারণ করা হয়।

হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ তাম্বুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের শান্তিবিধাতা এবং মঙ্গলদাতা। ত্রিপুর-ভূপতি এই অবশ্যপালনীয় রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সতত তৎপর; এই চিহ্ন তাহারই পরিচায়ক।

আরঙ্গী

৭। হস্ত-চিহ্ন (পাঞ্জা);—এই চিহ্নটিও রৌপ্যনির্ম্মিত। এই চিহ্নধারিগণ বাছাল-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহা সিংহাসনের বামপার্শ্বে ধারণ করা হয়।

জগন্মাতা আদ্যাশক্তির অভয়মুদ্রা হইতে এই চিহ্ন গৃহীত হইয়াছে। রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র ভরসার স্থল। রাজা সতত তাহাদিগকে অভয়দানে তৎপর; এই চিহ্নদ্বারা তাহাই জ্ঞাপন করা হইতেছে।

৪ পার্ব্বত্য-জাতির মধ্যে বাজত এক সম্প্রদায় 'বাছাল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৮। রাজ-চিহ্ন (Coat of Arms);—এই চিহ্নের সর্ব্বোপরি ত্রিশূলধ্বজ, তন্নিম্নে চন্দ্রধ্বজ, তাহার দুই পার্শ্বে চারিটি পতাকা ও দুইটি সিংহ এবং মধ্যস্থলে ঢাল (Shield) অঙ্কিত রহিয়াছে। উক্ত চিহ্নের প্রতিকৃতি স্থানান্তরে প্রদান করা হইল।
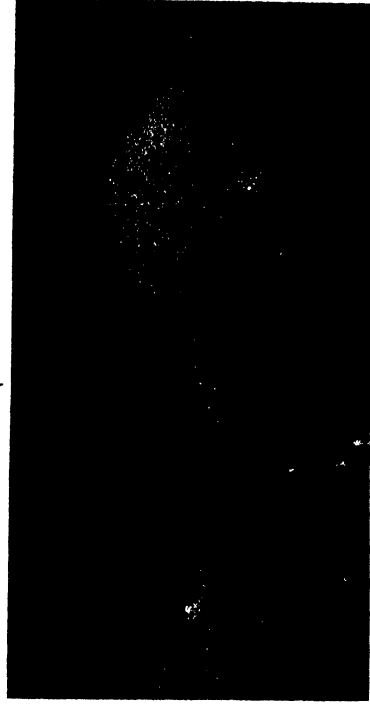
তাম্বুল পত্র

অঙ্কিত চিহ্নগুলির মধ্যে ত্রিশূলধ্বজ ও চন্দ্রধ্বজের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সিংহদ্বয় ক্ষাত্র-বীর্য্যের পরিচয়জ্ঞাপক। (৫) মধ্যস্থলে অঙ্কিত ঢালকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে—মীন-মানব, এক ভাগে পান, এক ভাগে পাঞ্জা ও অপর ভাগে—পাঁচটী তারা অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহার তিনটি চিহ্নের বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তারা পাঁচটি পঞ্চশ্রীসমন্বিত রাজ-শ্রীর পরিচায়ক।

ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের নামের পূর্ব্বে পাঁচটি 'শ্রী' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজার পূর্ণ নাম লিখিতে হইলে—"বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য

(৫) পতাকাচতুষ্টয় হস্তী-আরোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি —এই চতুর্ব্বিধ বাহিনীর নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। ত্রিপুর-রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট বোল্‌টন্ সাহেব (Mr. C. W. Bolton) অনেককাল পূর্ব্বে একবার এই Coat of Arms-এর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনিও পতাকাসম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাহাদুর" এইরূপ লিখিত হয়। লিপি-সংক্ষেপার্থে সচরাচর শ্রেণীবদ্ধরূপে পাঁচটি শ্রী না লিখিয়া, 'পঞ্চ-শ্রী' লিখিত হইয়া থাকে। যে যে অর্থে পাঁচটি শ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে,—

হস্ত চিহ্ন (পাঞ্জা)

(১) শ্রী ;—ইহা রাজার ঐশ্বর্য্য-শ্রীর নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

(২) শ্রী ;—জ্ঞান-গরিমার পরিচায়ক-রূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) শ্রী ;—ইহা রাজার অঙ্গ-শ্রীর পরিচায়ক।

(৪) শ্রী ;—এতদ্দ্বারা সুবিমল রাজ-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করা হইতেছে।

(৫) শ্রী ;—ইহা রাজ-শক্তির প্রভুত্বজ্ঞাপক।

উক্ত রাজচিহ্নের নিম্নভাগে একটি সংস্কৃত বাক্য (Motto) অঙ্কিত আছে,—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"। ইহার তাৎপর্য্য—"বীর্য্যকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে।" এই সুদৃঢ় নীতিবাক্যের উপর ত্রিপুররাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত। এই বাক্য অবলম্বন করিয়াই ত্রিপুরা স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীয় বীর্য্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের (১৩১২ সাল) ১৭ই আষাঢ়, রাজধানী আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা-সভার সভাপতি কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সারগর্ভ Motto অবলম্বনে গভীর গবেষণাপূর্ণ 'দেশীয় রাজ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।(৬) তাহার আলোচনা করিলে এই অমূল্য বাক্যের তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

৯। সিংহাসন ;—ইহা ষোলটী সিংহধৃত অষ্টকোণ-বিশিষ্ট আসন। ত্রিপুররাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই আসন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে আটটী সিংহ কর্ত্তৃক উক্ত আসন ধৃত হইয়াছে,—ক্ষুদ্রাকারের অপর আটটী সিংহ উপলক্ষ মাত্র। স্থানান্তরে ইহার প্রতিকৃতি প্রদান করা হইল।

সিংহাসনসম্মুখে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ এবং যথানিয়মে উক্ত আসনের অর্চ্চনা হয়। তৎসহ কতিপয় শালগ্রামও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

এই সিংহাসন দর্শন করিলে হৃদয় স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। অসংখ্য ভূপতি এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিপুল বিক্রমে রাজ্যশাসন করিয়াছেন; কত পরাক্রমশালী বীরের গর্ব্বোন্নত শির এই সিংহাসন মূলে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

৬। ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।
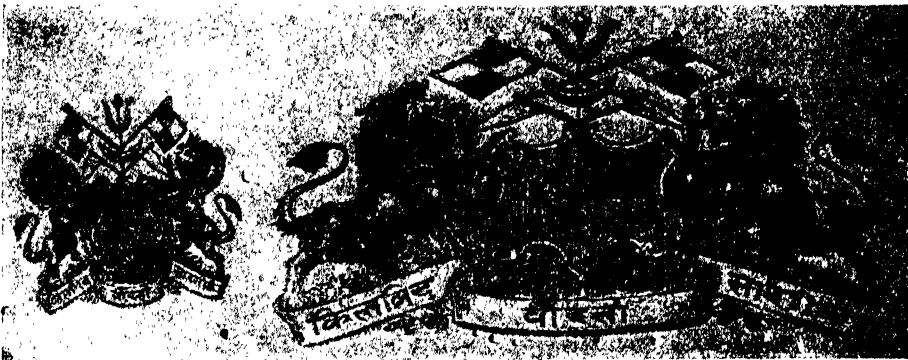
রাজ চিহ্ন

রাজা, রাজ্যাভিষেকসময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রবংশের নিয়মানুসারে রাজাকে অভিষেকের পূর্ব্বদিন—অধিবাস, সংযম এবং ভূমিতে শয়ন করিতে হয়। রাজার দুইটী নাম লক্ষ্য করিয়া দীপাধারে দুইটী দীপ জ্বালান হয়। যে নামে দীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, সেই নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভূপতি অভিষেকদিনে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন করেন। স্থাপিত নবঘটে গণেশ, বিষ্ণু, শিব, পার্ব্বতী এবং ইন্দ্রের অর্চ্চনার পর হোম সমাপনান্তে সিংহাসনের অর্চ্চনা করা হয়। অতঃপর ভূপতি, পর্ব্বতশিখরস্থ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক, সপ্ততীর্থের বারিদ্বারা স্নাত হইয়া নবোপবীত ও রাজপরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি উপবেশন করেন। তৎপর ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণঘটস্থিত শান্তিবারি সেচন দ্বারা রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অভিষেককালে নৃপতির মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করা হয়। হনুমানধ্বজ, দণ্ড, চন্দ্রবাণ, ত্রিশূলবাণ, ছত্র, আরঙ্গী, মীন-মানব তাম্বলপত্র (পান), হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা), শ্বেতচামর ও ময়ূরপুচ্ছ
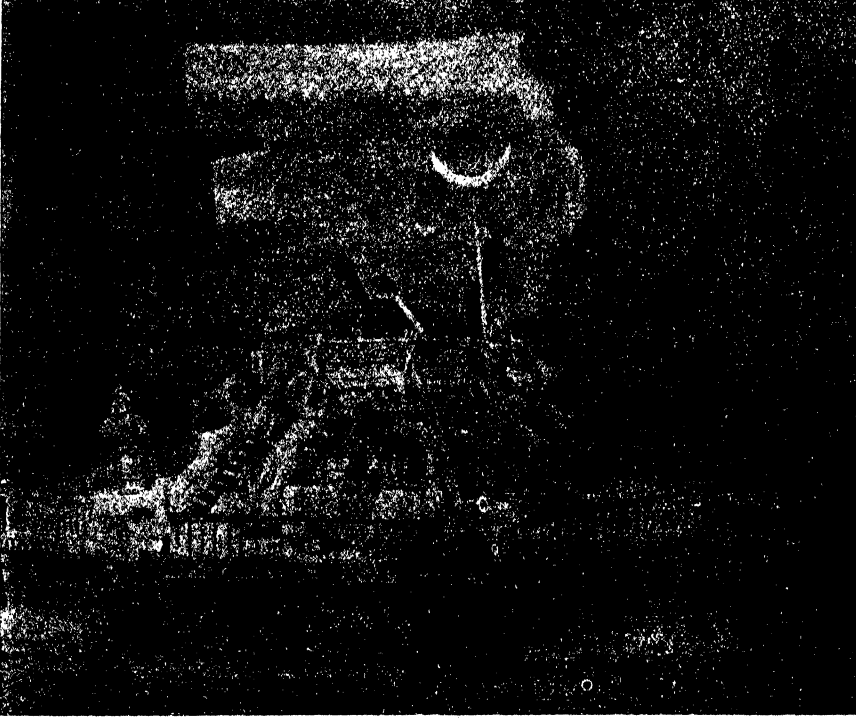
সিংহাসন

বল্মীকাগ্রস্থ মৃত্তিকা (৭) দ্বারা কর্ণদ্বয়, মনুষ্যালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা বদন, ইন্দ্রালয়ের মৃত্তিকা দ্বারা দক্ষিণ ভুজ, সরোবরের মৃত্তিকা দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ, যজ্ঞস্থানের মৃত্তিকা দ্বারা উরুদ্বয়, গো-শালার মৃত্তিকা দ্বারা জানুদ্বয়, অশ্বশালার মৃত্তিকা দ্বারা জঙ্ঘাদ্বয় এবং রথচক্রোত্থিত মৃত্তিকা দ্বারা চরণদ্বয় মার্জ্জন ও শৌচ করিয়া, পঞ্চগব্য দ্বারা মস্তক সিক্ত করেন। তৎপর ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ লইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিক হইতে, দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য-ঘট লইয়া ক্ষত্রিয় দক্ষিণ দিক হইতে, দধিপূর্ণ তাম্রকুম্ভ লইয়া বৈশ্য উত্তর দিক হইতে এবং জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘড়া লইয়া শূদ্র পশ্চিম দিক হইতে, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও বারি দ্বারা রাজাকে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর রাজা গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ইত্যাদি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের লোকগণ সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে, এবং উক্ত আসনের সন্নিহিত পুরোভাগে ষট্‌ত্রিংশৎ শালগ্রাম স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত চিহ্নগুলি ব্যতীত আশা ও সোঁটা, এই দুইটি চিহ্নও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই দুইটি চিহ্ন মুসলমান বাদসাহের প্রদত্ত উপহার; কিন্তু কোনও গ্রন্থে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। রাজ-দরবারে এতদুভয় চিহ্ন মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে; তাহাদের উপাধি 'চোপদার' ও 'সোঁটাবরদার'। অভিষেক-মণ্ডপে এই চিহ্নদ্বয় ব্যবহৃত হয় না; এতদ্দ্বারা চিহ্ন দুইটি মুসলমানের প্রদত্ত বলিয়া আভাস পাওয়া যায়।

সিংহাসনের ন্যায় প্রথমোক্ত পাঁচটি চিহ্ন (চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, ত্রিশূল, মীনমানব, শ্বেতছত্র ও আরঙ্গী) প্রতিদিন অন্ন-ব্যঞ্জনাদির

৭ এই মৃত্তিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করা হয়, জানি না।

ভোগদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকে, এবং দুর্গোৎসব, চতুর্দ্দশ দেবতার (৮) খারচি পূজা, (৯) ও কের পূজা, (১০) এবং গঙ্গাপূজা প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে দুইটি করিয়া পাঁটাবলি দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়।

মাণিক্য-উপাধি ;—ত্রিপুরেশ্বরগণ পূর্ব্বে 'ফা' উপাধি ধারণ করিতেন। মহারাজ রত্নফার সময় হইতে উক্ত উপাধির পরিবর্ত্তে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

আসা

সোঁটা

৮। চতুর্দ্দশ দেবতা ত্রিপুররাজবংশের কুলদেবতা। মহারাজ ত্রিলোচনের সময় হইতে শিবের আজ্ঞানুসারে এই সকল দেবতা অর্চ্চিত হইতেছেন। চতুর্দ্দশ-দেবতা এই ,—

হরোমা হরিমা বাণী কুমার গণপা বিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখীকামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ ॥

শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, বিরিঞ্চি, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, প্রদ্যুম্ন ও হিমাদ্রি এই চতুর্দ্দশ-দেবতা।

৯। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে চতুর্দ্দশ-দেবতার একটি বিশেষ অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই পূজাকে খারচি পূজা বলে। চতুর্দ্দশ-দেবতা স্থাপনের আদেশপ্রদানকালে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন,—

"চতুর্দ্দশ দেবপূজা করিবে সকলে।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে ॥"—রাজমালা।

১০। খারচি পূজার পর চৌদ্দদিবস অতীত হইলে শনি কিম্বা মঙ্গলবারে কের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা-উপলক্ষে একদিন দুই রাত্রি সাধারণের গৃহের বাহির হওয়া এবং জুতা ও ছাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজও এই সকল নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। উক্ত নির্দ্ধারিত সময়মধ্যে সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য দিবসে দুইবার বাহির হইবার অধিকার প্রদান করা হয়। তোপধ্বনি দ্বারা বাহির হইবার ও পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

মহারাজ রত্নফা মৃগয়া-উপলক্ষে পর্ব্বতে যাইয়া একটি সমুজ্জ্বল ভেক-মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১১) তিনি সেই মণি ও কতিপয় হস্তী

১১। কথিত আছে ত্রিপুররাজ্যের কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত

দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান করেন। সম্রাট সেই দুষ্প্রাপ্য মহার্ঘ মাণিক্য সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, ত্রিপুরেশ্বরকে বংশানুক্রমে 'মাণিক্য' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালিকা গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"ততঃ স মণিমাদায় রাজা দিল্লীমুপাগতঃ।
দিল্লীশায় মণিং দত্বা নত্বা স্তুত্বা পুরঃস্থিত॥
দিল্লীশস্তং মণিং প্রাপ্য দৃষ্ট্বা বিস্ময় মানসঃ।
প্রশস্যচ মহীপালং চিন্তয়ামাস বিস্তরং॥
অমুষ্মৈকং প্রদাস্যামি প্রতিরূপং ধরাতলে।
মাণিক্য ইতি বিখ্যাতিং দত্বো চ নৃপং প্রতি॥
সর্ব্বে মাণিক্য নামানস্তব বংশোদ্ভবাঃ ইতি।
ততঃ প্রভৃতি খ্যাত্যো সৌরত্ন মাণিক্য নামকঃ॥"

রাজমালা-লেখক এস্থলে এক বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, উক্ত মণি ও কতিপয় হস্তী গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান করায়—"রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বর দিল।"

এই গৌড়েশ্বর শব্দ লক্ষ্য করিয়াই পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মহারাজ রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বর তুগ্রল খাঁকে ভেক মণি উপহার প্রদান করিয়া মাণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন। রত্ন মাণিক্য ৬৯২ ত্রিপুরাব্দে (১২০১ শকে) সিংহাসনারোহণ করেন। তুগ্রল খাঁ ১১৯৯ শকে লক্ষ্মণাবতীর মালিক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা সমসাময়িক সাব্যস্ত হইলেও রাজমালিকার উক্তি দ্বারা দিল্লীশ্বরকে মাণিক্য উপঢৌকন প্রদান করার কথা জানা যাইতেছে। এই গ্রন্থ রাজমালা অপেক্ষা বহু প্রাচীন এবং অধিকতর প্রামাণ্য। রাজমালার রচয়িতা সম্ভবতঃ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দিল্লীশ্বরকেই গৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রত্ন মাণিক্যের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে তৎপরবর্ত্তী পাঁচবৎসরকাল সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তুগ্রল খাঁ তাঁহারই কৃপায় লক্ষ্মণাবতীর মালিক পদ প্রাপ্ত হয়েন। এরূপ স্থলে দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া এবম্বিধ একটি মহার্ঘ মণি স্বয়ং গ্রহণ করা তুগ্রল খাঁর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। এই সকল কারণে পূর্ব্বকথিত মণি সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনকে উপঢৌকন প্রদান করা হইয়াছিল,—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

রাজা পূর্ব্বোক্ত সুসজ্জিত চিহ্নধারিগণে পরিবৃত হইয়া যখন দরবারে উপবেশন করেন, তৎকালে আপন-আপন পদোচিত দরবারের পরিচ্ছদধারী দরবারিগণ দুইটি সারি বাঁধিয়া নীরবে ও সসম্ভ্রমে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। দরবার-গৃহের সে কালের গাম্ভীর্য্যের কথা ভাষায় পরিব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। নীরব জনাকীর্ণ কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া মাঝে-মাঝে নকীব সুললিত সুরসংযুক্ত গম্ভীর স্বরে রাজার মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা সেই গাম্ভীর্য্যের মাত্রা যেন আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। তখন দরবার গৃহ দেবালয় অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র এবং মহিমান্বিত বলিয়া মনে হয়।

ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দ আবহমান কাল হইতেই কৌলিক প্রথা ও রাজনিয়ম পালনপক্ষে যত্নবান আছেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগেও সেই সকল নিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, ইহা সামান্য আনন্দের কথা নহে।

হিন্দুনরপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় স্থল। ত্রিপুরেশ্বরগণ স্মরণাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সংরক্ষণ জন্য সমভাবে যত্ন করিয়া আসিতেছেন, এ কথার প্রমাণ অনেক আছে। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই সুদুর্লভ গুণের নিমিত্ত কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক 'ধর্ম্মার্ণব' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। (১২) বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর শ্রীযুত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও এই কৌলিকগুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন ;

'মাণিক ভাণ্ডার' নামক স্থানে উক্ত মণি পাওয়া গিয়াছিল, তদবধি এই স্থানের 'মাণিক-ভাণ্ডার' নাম হইয়াছে।

১২। স্বস্তি বিবিধ বিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নত-মহারাজাধিরাজ ক্ষত্রিয়কুলতিলক-চন্দ্রবংশাবতংশ-ত্রিপুরাধিপতি-বিষমসমর-বিজয়ি শ্রী-শ্রীশ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্ম্মবাহাদুর-মহোদয়-শ্রীশ্যাম-সুন্দর চরণারবিন্দমকরন্দমধুকরেষু—

বারাণসেয় বিবুধবৃন্দানাং শুভাশীরাসঃ সমুল্লসন্ততরাম্।

মহারাজ, কালবশাদিদানীং ক্ষীণপ্রায়েষু বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু নষ্টপ্রায়েষু চ দ্বিজকুলপালনৈকব্রতেষু রাজন্যবর্গেষু ভবানেবৈকঃ ক্ষত্রিয়কুলসুধাসলিল-নিধেঃ শীতরশ্মি-বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণপরায়ণঃ পরিদৃশ্যতে। অতঃ স্মর-হরনগরীনিবাসিনো বয়ং ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচরণাম্বুজলোলুপতাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণতৎপরতাঞ্চ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়াঃ সন্তো বিবিধগুণগণাভি-রামং ভবন্তং "ধর্ম্মার্ণব" ইত্যুপাধিনা ভূষয়ামঃ।

আশাস্মহে চ সপরিজনস্য শ্রীমতো মহারাজস্য সকুশলং দীর্ঘমায়ু-রিতিশম্। সম্বৎ ১৯৬৫ চৈত্র কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াম্।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন
" শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি।
" শ্রীশিবকুমার মিশ্র।
" শ্রীগঙ্গাধর শাস্ত্রী সি, আই, ই।
" শ্রীদামোদর শাস্ত্রী।
" শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী।
" শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী।
" শ্রীভাগবতাচার্য্য।
কাশীরাজের সভাসদ্ শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন শর্ম্মা।

এবং তিনিও এই অতুল গুণের নিদর্শনস্বরূপ ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল-সংসৃষ্ট কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে "ধর্ম্ম ধুরন্ধর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। এরূপ অল্প বয়সে ধর্ম্মানুরাগের নিমিত্ত এবম্বিধ উপাধির অধিকারী হওয়া সামান্য আনন্দ বা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। মহারাজ নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্য ও ধর্ম্ম পালন করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বর-সদনে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

কাশীরাজের সভাপণ্ডিত কাশীধর্ম্মসভাধ্যক্ষ
শ্রীপ্রিয়নাথ তর্করত্ন শর্ম্মা।
কাশী রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক
শ্রীবামাচরণ তর্কভূষণ শর্ম্মা।
কাশী রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যক্ষ
শ্রীতাত্যা শাস্ত্রী।

অনুবাদ।

বারাণসীস্থ পণ্ডিতবৃন্দের আশীর্ব্বাদরাশি অতিশয় প্রভাববিশিষ্ট হউক।

মহারাজ, কালপ্রভাবে ইদানীং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমের ধর্ম্ম) প্রায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং দ্বিজগণের পালনকে যাঁহারা প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন, এরূপ ক্ষত্রিয়কুল প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, (এরূপ সময়ে) ক্ষত্রিয়কুলরূপ অমৃতসাগরে সঞ্জাত চন্দ্রস্বরূপ একমাত্র আপনাকেই আমরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী দেখিতেছি। অতএব কন্দর্পের সংহারকের নগরাধিবাসী (৺কাশীধামের অধিবাসী) আমরা, আপনার শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চরণকমলে আসক্তি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে তৎপরতা দর্শনে সন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া নানাবিধ গুণের দ্বারা মনোহর মহারাজকে "ধর্ম্মার্ণব" এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলাম।

আমরা, পরিজনবর্গের সহিত শ্রীমন্মহারাজের কুশল এবং দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি, ইতি। শম্ (মঙ্গল) হউক। সম্বৎ ১৯৬৫ চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

বিবিধ প্রসঙ্গ

চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ

[রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ]

কীর্ণহারে চণ্ডীদাসের সমাধি আছে,—এই প্রবাদ এখন অনেক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা কেহ-কেহ বলেন,—এই প্রবাদের সৃষ্টি কীর্ণহারের কেহ-কেহ সম্প্রতি করিয়াছেন। সাতটি সমৃদ্ধ নগর হোমারের জন্মস্থান বলিয়া গৌরবের দাবী করিতেছে, কিন্তু একদা অন্ধ হোমার এই সাতটি নগরের পথে-পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।

নান্নুরের প্রবাদ অন্যরূপ। এই প্রবাদটি আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা কবিবর অক্ষয়বড়ালকে বলিয়াছি। তিনি তাঁহার নূতন নাটক 'চণ্ডীদাসের' একটি অধ্যায় বাড়াইয়া সেই প্রবাদের জন্য স্থান করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভূমিকা লেখার সময় এই প্রবাদের খোঁজ পাইয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমার নিকট হইতে তৎসম্বন্ধে একটি নোট লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন।

প্রবাদটি এই,—চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশের নবাব তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান করেন। যাঁহার রচিত গান শুনিয়া এখনও শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, সেই কবির শ্রীমুখের গীতি শুনিয়া প্রাসাদের যাবতীয় লোক একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নবাবের বেগমের উপর সেই গীতের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইল। এই ঘটনার পর হইতে রজনীর অন্ধকারে কিংবা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় যেখানে পল্লীপ্রাঙ্গণে চণ্ডীদাসের দল কীর্ত্তন গাহিতেন, বেগমসাহেবা ছদ্মবেশে অভিসারিকা সাজিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সজল নেত্রে সেই গীতি শুনিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িতেন। এই অপূর্ব্ব অভিসারের কথা নবাবের নিকট অবিদিত রহিল না; কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বেগম সাহেবার এই রোগ দূর করিতে পারিলেন না।

তখন একদিন শ্যামসন্ধ্যায় চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন হইতেছিল,—কীর্ণহারে নহে, নান্নুরে। তখনও ছদ্মবেশিনী বেগম সাহেবা আসেন নাই, তাঁহাকে নবাব অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাশুলী দেবীর মন্দিরসংলগ্ন বিশাল নাট্যশালায় কীর্ত্তন জমিয়া উঠিয়াছিল, চণ্ডীদাসের করুণ কণ্ঠ শ্যাম-আগমনের পূর্ব্বভাষ গাহিয়া স্বীয় আকুলতা শ্রোতৃবর্গের প্রাণে ঢালিয়া দিতেছিল। তাঁহারা চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় সাশ্রুনেত্রে সেই দেবোপম গায়কের কণ্ঠ-সুধা পান করিতেছিলেন। শ্যাম আসিবেন, রাধা নিজের হৃদয়ে তাহার পূর্ব্বাভাষ বুঝিয়াছেন। আজ তাঁহার চিকুর স্ফুরিত হইতেছে, অকারণে হিয়ার হার দুলিয়া উঠিতেছে, অপূর্ব্ব আবেশে নীবিবন্ধন খুলিয়া পড়িতেছে এবং বাম অঙ্গ ও বাম আঁখি সঘনে নৃত্য করিতেছে। আজ বহুদিন যাঁহার পথ পানে চাহিয়া আছেন, তাঁহার নূপুরের শব্দ শোনা যাইতেছে; আজ বক্ষ জুড়াইতেছে, কৃষ্ণ অঙ্গের পরিমল আসিয়া রসসঞ্চার করিয়া দিতেছে,

এমন সময় ভুম ভুম শব্দে নাট্যশালার স্তম্ভ কাঁপিয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত পরে নবাবের নিযুক্ত সৈন্যের তোপের গোলায় মন্দির সহ উহা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শ্রোতৃবর্গ সহ চণ্ডীদাসের দল প্রোথিত হইলেন। এই ঘটনার বহু বৎসর পরে বাশুলীদেবীকে খুঁড়িয়া উঠান হয়, এবং এখনও সেই ভিটার মৃত্তিকা খনন কালে নরকঙ্কাল উত্থিত হইয়া থাকে। কেহ কি এমন আছেন যিনি চণ্ডীদাসের অস্থি তথা হইতে বাছিয়া বাহির করিয়া দিবেন?

চণ্ডীদাস প্রেমসম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—প্রেমসম্বন্ধে এত বড় কথা আর কেহ বলেন নাই। "পীরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে. সাধন অঙ্গ পায় না সে।" যতই অত্যাচার, অবিচার হউক না কেন—যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যদি ছাড়, তবে প্রেমের সাধনা তোমার হইবে না। প্রেম পার্থিব কুটীরের সামান্য জিনিষ নহে, উহার দ্বারা যদি সাধনা না করিলে তবে ত উহা সামান্য ভোগের জিনিষ হইয়া রহিল,—তোমাকে তাহা হইলে পৃথিবী হইতে স্বর্গে ধরিয়া উঠাইবে কে?

আর একটি কথা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—যাঁহারা লোকের মর্ম্ম জানেন না, তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিতে নাই। "মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা। কায নাই সখি তাদের কথায়. বাহিরে রহুন তাঁরা।" মর্ম্মের বেদনা যে বোঝে, সেই ভব-রোগের ঔষধ জানে, যে তাহা মায়া বলিয়া অগ্রাহ্য করে, তাহাকে দিয়া আমি দুঃখী-তাপী কি করিব?

রজকিনী রামীর কথা বলিতে যাইয়া চণ্ডীদাস বুঝাইয়াছেন, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য—ইহারা স্বতন্ত্র নহে। পিতামাতার স্নেহ ও প্রণয়িনীর প্রেম—ইহাদের উপাদান বিভিন্ন নহে। তিনি রজকিনী-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তুমি রজকিনী আমার ঘরণী, তুমি হও পিতৃ-মাতৃ; ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী" অর্থাৎ প্রেম এক অখণ্ড সত্য পদার্থ, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া এটা বাৎসল্য, এটা মধুর, এরূপ করিয়া বুঝাইতে পার, কিন্তু উহা এক। যখন আনন্দে এই বিচিত্র ভাবের মিলন হয়, তখন উহা একই জিনিষ। তখন বাৎসল্যে ও মধুরে প্রকৃতিগত ভেদ থাকে না।

কেহ কেহ বলেন চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মত পণ্ডিত ছিলেন না। এটা তাঁহাদের ভুল; তাঁহার ভ্রাতা নকুল তাঁহার পাণ্ডিত্য লইয়া গৌরব করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রতিভাত হইতেছে। একটা সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত আছে, শাস্ত্র হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শাস্ত্র ধ্বংস পায়; যেরূপ ফুল হইতে ফল হয়, কিন্তু ফল হইলে আর ফুল থাকে না। চণ্ডীদাস শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া শেষে যখন প্রেমিক হইয়াছিলেন, তখন বৃথা পাণ্ডিত্যা-ভিমান আর তাঁহার ছিল না। তিনি উপমা দিতে যাইয়া দেখিতেন, অলঙ্কার শাস্ত্র শিখাইতে পারে এমন কিছু উহার ভাণ্ডারে নাই। এজন্য ধাকুকের প্রেমসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—আলঙ্কারিকগণ বলেন. ভানু ও কমলের প্রেম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা কেমন করিয়া হয়? শীতকালে "হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রয়।" ইঁহারা বলেন, কুসুম ও ভ্রমরের প্রেম শ্রেষ্ঠ, তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? "না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল"—চকোর ও চান্দের প্রেমের কথা কবি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন- দুই জন সমান না হইলে কি কখনও প্রেম দাঁড়াইতে পারে? কবি-প্রসিদ্ধিগুলির টিকি ধরিয়া তিনি এমনই জোরে নাড়া দিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রের ঊর্দ্ধে এমন এক জায়গায় উঠিয়াছিলেন, যেখানে বাহিরের উপমা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। এই জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা।"

ব্যাক্টেরিয়া
(BACTERIA)

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল. এম. এস]

ব্যাক্টেরিয়া শব্দটি শুনিলে সাধারণের মনে কেমন একটা ভয়ের উদয় হইতে দেখা যায়। ইহাদের বিশ্বাস ব্যাক্টেরিয়ামাত্রেই আমাদের শুধু অপকারই করিয়া থাকে; আমাদের ভাল করিতে পারে—এমন ব্যাক্টেরিয়া বুঝি একটিও নাই। বাস্তবিক ব্যাপার তাহা নয়; অধিকাংশ ব্যাক্টেরিয়াই আমাদের পরম মিত্র। মিত্র ব্যাক্টেরিয়ার তুলনায় শত্রু ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বলিলেই হয়। ব্যাক্টেরিয়া না থাকিলে এ পৃথিবী এক মুহূর্ত্তও বাসের উপযোগী হইত কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বে কোটি কোটি জীবের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, ব্যাক্টেরিয়া তাহাদের পচাইয়া, অণু-পরমাণুতে পরিণত করিয়া ধূলার শরীর ধূলায় মিশাইয়া দিতেছে। ব্যাক্টেরিয়া যদি এ কাজটা না করিত তাহা হইলে, মৃত দেহ পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত জগৎটাকে জুড়িয়া বসিত—আমাদের পা ফেলিবার মত স্থানটুকুও থাকিত না। সহরের জঞ্জাল, ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতিকে ম্যুনিসিপাল স্ক্যাভেঞ্জার (Municipal Scavanger) যদি তফাৎ না করিত সহরে বাস করা তাহা হইলে যেমন অসম্ভব হইত,—ব্যাক্টেরিয়া না থাকিলে, এই বিপুল বিশ্বেরও কতকটা সেই রকম দশারই সম্ভাবনা হইত। মাটিকে উর্ব্বর করা—সেও ব্যাক্টেরিয়ার কায—ব্যাক্টেরিয়া না হইলে জমিতে শস্য হওয়া এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিত। দুধকে দই করা, চিনি হইতে মদ করা এ সকলও ব্যাক্টেরিয়ারই কায! ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিবার জন্যও ব্যাক্টেরিয়ার সাহায্য আবশ্যক হয়। অতএব ব্যাক্টেরিয়া যে কেবল আমাদের অনিষ্টই করে, ইষ্ট করে না, সেটা কোন কথাই নয়। যদিচ কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আমাদের বিশেষ অনিষ্ট করে বটে,—তথাপি পৃথিবী হইতে যদি সমস্ত ব্যাক্টেরিয়াকে দূর করা হয়, তাহা হইলে আমাদের লাভের অপেক্ষা ক্ষতির অঙ্কই যে অধিক হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের হিতকারী ব্যাক্টেরিয়া সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, এ স্থলে আমাদের শত্রু ব্যাক্টেরিয়া—যাহাদের কায আমাদের দেহে রোগ উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহাদেরই সম্বন্ধে দু চারিটা কথার উল্লেখ করিব।

অনেকে মনে করেন, পোকা মাকড় কি আরশোলা যেমন জীব, ব্যাক্টেরিয়া বুঝি সেই রকমই জীব। আসলে কিন্তু তাহা নহে। ব্যাক্টেরিয়া সর্ব্বনিম্নশ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহারা কতকগুলি কোষ (cell) মাত্র—এত ছোট যে, অনুবীক্ষণ না হইলে, দেখিতেই পাওয়া যায় না। ২৫,০০০টি ব্যাক্টেরিয়াকে পাশাপাশি সাজাইলে এক ইঞ্চ মাত্র স্থান অবরোধ করিতে দেখা যায়। ইহাদের আকার অনেকটা কমা, ড্যাস, প্রভৃতিদের মত।

ব্যাক্টেরিয়া আপনার দেহকে বিভক্ত করিয়া সাধারণতঃ বংশবিস্তার করিয়া থাকে। বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে ইহারা দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে এবং ইহাদের দেহের ঠিক মাঝখানটিতে একটা খাঁজ (depression) পড়ে। এই খাঁজটা ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া ব্যাক্টেরিয়ার দেহটাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে; এবং এই খণ্ড অংশ দুইটা শেষে একএকটা স্বাধীন ব্যাক্টেরিয়া হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আবার ঠিক মধ্যস্থলে বিভক্ত না হইয়া, অনিয়মিতভাবে কতকগুলা অংশে বিভক্ত হয় এবং এই বিভক্ত অংশগুলি শেষে কতকগুলি কোষে (cellএ) পরিণত হয়। কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আবার তাহাদের দেহের মধ্যে কতকগুলি spores বা বীজাণু উৎপন্ন করে—এই বীজাণুগুলি তাহাদের মাতৃদেহ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আর এক-একটা পৃথক ব্যাক্টেরিয়াতে পরিণত হয় spores বা বীজাণুগুলি নষ্ট করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রৌদ্রে ও ইহাদের কিছুই করিতে পারে না। খুব বেশি উত্তাপ ও শৈত্য প্রয়োগেও ইহাদের অনেক সময় জীবিত থাকিতে দেখা যায়। যে সব ব্যাক্টেরিয়া spores উৎপন্ন করিয়া বংশ বিস্তার করে, তাহাদের বিনষ্ট করা যত কঠিন, এমন অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়ার বেলায় নহে। কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়া আছে যাহারা জন্মের পর ২০ মিনিটের মধ্যেই আপনাদের দেহকে দ্বিখণ্ড করিয়া দুইটা পৃথক ব্যাক্টেরিয়াতে পরিণত হইতে পারে। তাহা হইলে একটা ব্যাক্টেরিয়া যদি ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, তাহা হইলে, তাহা হইতে ১৬, ৭৭৭, ২১৬টি ব্যাক্টেরিয়া না জন্মাইতে পারে এমন নয়। এরূপ অসম্ভব যাহাদের বংশ-বিস্তৃতি, তাহারা যদি বিষ উদ্গীরণ করে, তাহাতে যে রোগ জন্মাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

ব্যাক্টেরিয়া আণুবীক্ষণিক-সূক্ষ্ম পদার্থ। অণুবীক্ষণ না হইলে ইহাদের কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না। শুধু অণুবীক্ষণের সাহায্যে ইহাদের অনেক সময় চিনিয়া উঠা যায় না। বিবিধ বর্ণের aniline-dye (এনিলিন্ ডাই) দ্বারা রঞ্জিত করার আবশ্যক হয়। এবিষয়ে ইহাদের একটা ভারি বিশেষত্ব আছে। এক এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ রঙ দ্বারা রঞ্জিত করা যায়। অন্য রঙ দিয়া পারা যায় না। এই বিশেষত্বটি থাকায় ইহাদের আকার গঠন প্রভৃতি বুঝা অনেকটা সহজ হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকার ব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের স্বতন্ত্র ভাবে কর্ষণ ও চাষ করিলে ইহাদের জীবনেতিহাস, বিকাশ, ব্যাপ্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দিতে যে সকল প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাও তাহাদের মধ্যে একটি। ইহার জন্য আমরা প্রধানতঃ জর্ম্মাণ মনীষী Robert koch (রবার্ট কচ) এর নিকট বিশেষ ঋণী।

ব্যাক্টেরিয়ার উৎপত্তির জন্য কতকটা জল, তাপ ও পরিপোষক পদার্থের আবশ্যক। এগুলির সংযোগ না হইলে ব্যাক্টেরিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সূর্য্যালোক ব্যাক্টেরিয়ার উৎপত্তির পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। শৈত্য প্রয়োগেও ইহাদের বংশ বিস্তার বন্ধ হইতে দেখা যায়। শৈত্য প্রয়োগে সকল ব্যাক্টেরিয়াই যে মরিয়া যায়, এমন নয়, কতকগুলি ব্যাক্টেরিয়ার জীবন এত কঠিন ও দৃঢ় যে শৈত্যে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু তাপ সংযোগে প্রায় সকল ব্যাক্টেরিয়াকেই বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। এইজন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে তাপকে একটা খুব শক্তিশালী Germicide (জীবানুনাশক) বলা হইয়াছে। রোগোৎপাদক যত প্রকার Germs (বীজানু) বা ব্যাক্টেরিয়া আছে, তাহাদের প্রায় সকলকেই, জলকে ফুটিত করিতে যতখানি তাপের আবশ্যক হয়, তাহার অনেক কম তাপেই বিনষ্ট হইতে দেখা যায়।

একটা বিশেষ জাতীয় ব্যাক্টেরিয়া যে কোন একটা বিশেষ রোগের মূল কারণ, সেটা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতে হইলে চারিটা বিষয় দেখার আবশ্যক।

১ম।—ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ মধ্যে কিম্বা তাহার মল মূত্রাদিতে উক্ত বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যায় কি না?

২য়।—যদি পাওয়া যায়, তাহাকে পৃথক করিয়া লইয়া, মাংসের ব্রথ্ এগার-এগার (agar-agar) প্রভৃতির মধ্যে উহার চাষ ও কর্ষণ সম্ভব কি না?

৩য়।—এইরূপে উৎপন্ন ব্যাক্টেরিয়া কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করাইলে, তাহার সেই রোগটি হয় কি না?

৪র্থ।—যদি রোগ জন্মায়, তাহা হইলে উক্ত রুগ্ন ব্যক্তির দেহে উক্ত ব্যাক্টেরিয়া দেখিতে পাওয়া যায় কি না?

বীজাণুমূলক (bacterial) রোগ মাত্রেই উক্ত চারিটি বিষয় ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

কোন বিশেষ রোগের সঙ্গে কোন বিশেষ ব্যাক্টেরিয়ার সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইলে, পরে দেখিতে হইবে ব্যাক্টেরিয়া কি উপায়ে রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ব্যাক্টেরিয়া ঠিক সাক্ষাৎভাবে যতটা না হউক পরোক্ষভাবে রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহারা এমন সব বিষ উৎপন্ন করে, যাহার দ্বারা রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে। রোগোৎপাদক ব্যাক্টেরিয়া যে বিষ উদ্গীরণ করে, তাহাকে টক্সিন্ (toxin) বলে। টক্সিন্ (toxin) কে মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর toxin (বিষ) তত মারাত্মক নয়। ইহারা জ্বর আর প্রদাহ (inflammation) পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়। আর

এক প্রকার toxin ভারী বিষ। ইহাদের মত বিষ আর নাই বলিলেই হয়। আফিঙের বীর্য্য যে মর্ফিয়া, আর কুঁচিলার বীর্য্য যে ষ্ট্রিক্‌নিয়া, বিষ হিসাবে ইহাদের কাছে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবারই যোগ্য নহে।

ব্যাক্‌টেরিয়া হইতে উৎপন্ন বিষ দ্বারা শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারই নামান্তর সংক্রামক ব্যাধি বা infectious disease। তাহা হইলে সংক্রামক রোগকে একপ্রকার বিষ-ক্রিয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? মাংস জাতীয় (nitrogenous) পদার্থের উপর ব্যাক্‌টেরিয়ার ক্রিয়া দ্বারা ptomains (টোমেন্‌স্) নামক পদার্থসমূহের উদ্ভব হইতে পারে। টোমেন (ptomain) মাত্রেই বিষ। কতকগুলি টোমেন্ ত ভয়ঙ্কর বিষ। মাংস পচিলে অনেক সময় ptomain (টোমেন্) উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই মাংস খাইয়া অনেক সময় প্রাণবিয়োগ সম্ভব হয়। এই কারণে, পচা মাংস কি পচা মৎস্য খাইতে পারি না। কেন না, উহাদের মধ্যে যে টোমেন্ উৎপন্ন হয় নাই, সে কথা কে বলিতে পারে? দুধের উপর বিশেষ এক রকম ব্যাক্‌টেরিয়ার ক্রিয়া দ্বারাও টোমেন্ উৎপন্ন হইতে পারে—ইহাও ভয়ঙ্কর বিষ। গ্রীষ্মকালে আইস্‌ক্রীম্ (ice-cream) খাইয়া মধ্যে মধ্যে বিষাক্ত হওয়ার সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—তাহা এই টোমেনেরই কায। দুধটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করাতেই এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়। টোমেন্ বিষের লক্ষণ অনেকটা কলেরা বা সেঁকো বিষেরই মত।

ব্যাক্‌টেরিয়াদের আকৃতি অনুসারে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—bacillus (ব্যাসিলাস্) ইহাদের আকার অনেকটা দণ্ডের মত।

২য়—spirilum (স্পাইরিলাম্) ইহারা ব্যাসিলাস্ অপেক্ষা দীর্ঘাকার—বাব্‌রীওয়ালা চুলের মত পাকবিশিষ্ট। ৩য়—coccus (কক্‌কাস্); ইহারা গোলাকার—দেখিতে একটু বিন্দুর মত।

ব্যাক্‌টেরিয়াদের জীবনযাপনের ধরণ অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ম—saprophyte (স্যাপ্রোফাইট্) বা স্বাধীনজীবী। ২য়—parasite (প্যারাসাইট্) বা পরজীবী। প্রথম শ্রেণীর ব্যাক্‌টেরিয়ার উৎপত্তির জন্য কোন জীবিত আশ্রয়দাতা বা পালকের আবশ্যক করে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তাহার একান্ত আবশ্যক করে। যে সকল ব্যাক্‌টেরিয়া আমাদের হিতসাধন করে, তাহারা প্রায় সকলেই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

ইংরাজী blood-poisoning (ব্লাড্ পইজনিঙ্গ) শব্দটার আজকাল খুবই প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা অনেকের জানা আছে বলিয়া মনে হয় না। শরীরের কোন স্থানে যদি একটা স্ফোটক হয়, তাহার জন্য জ্বর হইতে দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার blood-poisoning. এক্ষেত্রে ব্যাক্‌টেরিয়া যে বিষ উৎপন্ন করে, তাহা ঐ স্ফোটকস্থান হইতে শোষিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে, তাহারই জন্য জ্বর হয়। এ স্থানে ব্যাক্‌টেরিয়া স্ফোটক স্থানটিতেই আবদ্ধ থাকে, রক্তে কি শরীরের অভ্যন্তরে যাইতে পারে না। এরূপভাবে রক্ত দূষিত হওয়াকে ইংরাজীতে toxamia (টক্‌সেমিয়া) কহে। আবার spcticæmia সেপ্‌টিসেমিয়া নামক রোগকেও blood poisoning বলে। এস্থলে সমস্ত শরীর ব্যাক্‌টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, রক্তের মধ্যে ও শরীরের নানা স্থানে ব্যাক্‌টেরিয়াকে থাকিতে দেখা যাইবে। ডিস্‌পেপসিয়া বা অজীর্ণ রোগে আমাদের পেটের মধ্যে বিষ উৎপন্ন হইয়া তাহার দ্বারাও blood-poisoning ঘটিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে blood-poisoning শব্দটি নানা অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের মূল কারণ যে বিশেষ বিশেষ ব্যাক্‌টেরিয়া, ইহা না হয় মানিয়া লওয়া গেল; কিন্তু ইহা হইতে কি এমন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ব্যাক্‌টেরিয়া যাহারই শরীরে প্রবেশ করিবে তাহারই রোগ দেখা দিবে? না—কথনই নয়। এই যে ব্যাক্‌টেরিয়া ইহাদের ধর্ম্ম, অনেকটা বীজেরই মত। এইজন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে "বীজাণু" বলিয়া থাকেন। বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিতে হইলে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করার আবশ্যক। বীজ যদি রাস্তায় পড়ে তাহা হইলে, তাহা মোটেই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। যদি কঙ্করময় ভূমিতে পড়ে, তবে তাহা অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যদি কাঁটাবনে পড়ে, কাঁটাগাছ তাহাদিগকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু যে সকল বীজ উপযুক্ত কর্ষিত ক্ষেত্রে পড়ে, তাহাদের সকলগুলি হইতেই গাছ হয় এবং কালক্রমে তাহাতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শস্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার জমির আবশ্যক সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাক্‌টেরিয়ার উৎপত্তির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের আবশ্যক। এই কারণে চিকিৎসকগণ ব্যাধির দ্বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক হইতেছে—predisposing cause বা ক্ষেত্রমূলক কারণ; অপরটি হইতেছে—exciting cause বা বীজমূলক কারণ। শুধু বীজ হইলেও হয় না, শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্র হইলেও হয় না—দুইয়ের সম্মিলন আবশ্যক। রোগোৎপত্তির জন্য predisposing cause বা উপযুক্ত ক্ষেত্রের যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কি কি অবস্থা ঘটিলে ক্ষেত্রটা ঠিক উপযুক্ত হয় তাহা বলা বড় কঠিন। এখন ত প্রায় দেখা যায় কোন জীব বা পশু যতক্ষণ সুস্থ অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহার শরীরের মধ্যে রোগ বীজ প্রবেশ করাইয়া কোন ফল হয় নাই। কিন্তু তাহাকে অনাহারে রাখিয়া, কিংবা পূর্ব্বে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত করিয়া যদি পরে রোগবীজ প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে রোগটি দেখা দিতে কালবিলম্ব হয় না। অতএব খালি পেটে রোগাক্রমণের বেশি সম্ভাবনা—সাধারণের যে এই একটা বিশ্বাস আছে, সেটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। শ্রান্তি ও ক্লান্তিকেও রোগের predisposing cause বলা যাইতে পারে। Heredity বা বংশানুক্রমেরও রোগের উপর কম হাত নাই। কতকগুলি রোগই যে বংশক্রমে দেখা দেয়, ইহা আমরা সকলেই জানি। এস্থলে সন্তান তাহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে ঠিক রোগটা পায় না—

রোগপ্রবণতা পায় মাত্র; অর্থাৎ তাহার শরীরের এমন একটা অবস্থা ঘটে, যাহাতে রোগবীজ সহজেই কায করিতে পারে। কোন বিশেষ রোগসম্বন্ধে বংশগত প্রবণতা বা দৌর্ব্বল্য খুবই আছে,—সত্য, জমি খুবই উর্ব্বর বটে; কিন্তু বীজ না হইলে ত গাছ হইবে না। রোগ বীজাণু বা ব্যাক্‌টেরিয়া চাই, তবেই রোগ দেখা দিবে—নচেৎ নয়।

ব্যাক্‌টেরিয়া যে সময়ে দেহটিকে আক্রমণ করে, দেহ যে সে সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা নহে; দেহও ব্যাক্‌টেরিয়ার রোগোৎপাদনের চেষ্টাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে—দেহেরও অসম্ভব রোগ প্রতিরোধ শক্তি আছে। অবশ্য এ শক্তিটি সকলের সমান নয়। ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিশেষত্বের উপরও ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পাকাশয়ের অম্লরস অনেক রোগবীজকে নষ্ট করিয়া থাকে। রক্তের মধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদের দ্বারা ব্যাক্‌টেরিয়া বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শরীরের এই শক্তির একটা সীমা আছে—এই সীমা ছাড়াইয়া গেলে, রোগ না হইয়া যায় না। স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ শক্তি ত আছেই, ইহার উপর রোগপ্রতিরোধশক্তি আবার বাহির হইতেও অর্জ্জন করা যাইতে পারে যেমন টিকা দিলে বসন্তরোগ হয় না। অর্জ্জিত রোগ প্রতিরোধ-শক্তিসম্বন্ধে অনেকে অনেক পরীক্ষা করিতেছেন। সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে প্রায় দ্বিতীয়বার হইতে দেখা যায় না, কিংবা কিছুদিনের জন্য রোগীর দেহে এমন একটা অবস্থা বিদ্যমান থাকে, যাহাতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য উক্ত রোগটি তাহার দেহে প্রকাশ হইবার সুবিধা করিতে পারে না।

ব্যাক্‌টেরিয়া মাত্রই উদ্ভিজ্জাতীয়; কিন্তু কতকগুলি আণুবীক্ষণিক কীটাণু আছে তাহারাও রোগ উৎপন্ন করিতে পারে—যেমন plasmodium malaria (প্ল্যাজ্‌মোডিয়াম্‌ ম্যালেরিয়া) নামক ম্যালেরিয়া কীটাণু ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

নিরক্ষর কবি—ঈশান ফকির

[শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহের মধ্যে "গুরুসত্য" সঙ্গীত এবং বাদাযাত্রী অর্থাৎ সুন্দরবনে কাঠ কাটিবার লোকসমূহের মধ্যে "নলে গীত" নামে দুইটি সঙ্গীত-প্রথা প্রচলিত আছে। ঈশান ফকির এই দুই সঙ্গীত-কবিত্বের কবি। এই ব্যক্তি পূর্ণ নিরক্ষর, জাতিতে সাহা। নড়াইল মহকুমার "চাঁচাড়ি পুরুলিয়া" গ্রামে ইহার জন্ম।

ঈশান চিরকুমার। আমি কিশোর-জীবনে ইহাকে দেখিয়াছি। অদ্যাপি ঈশানের সেই পূর্ণ প্রশান্ত বৈরাগ্য-মাখা শ্যামমূর্ত্তি আর সুচিক্কণ পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশরাশি স্মরণ হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের পবিত্র ছবি পূর্ণরূপে মনে আইসে।

আমার যেন স্মরণ হয়, আমার কিশোর বয়সের সঙ্গী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার শিকদারের সহিত আমি ঈশানের আশ্রমে গুরুসত্য গীত শুনিতে যাইতাম। একদিন সন্ধ্যায় আমি একটি কৃষি পল্লীতে বসিয়া পৈত্রিক খাজনা আদায় করিতেছিলাম—সেস্থানে ঈশান ফকির উপস্থিত হইয়া নিম্নের "নলে গীতটি" গাইয়া আমাকে বাদাযাত্রীগণের কিছু গল্প বলিয়াছিল। সেই বহু দিন পূর্ব্বে শ্রুত সঙ্গীতটি এই—

১। গুম্বজে ঠেকেছে মাথা সোণার মুকুট পরা
* * * আগুন পানির গড়া মানুষ
কোমরে ঝুলে আঁটা—ওরে মানুষ খুন করা।
আচ্ছা চেয়ারা ধরলি তুই না বেটি কি বেটা
মর্ত্তের মা আসমানের বাপ চেনা যায় না তোরে এই বড় ল্যাঠা।
হাওয়ার মাঝে পরাণ রেখে চড়ে হাওয়ার পীঠে
আসমান জমী পাতার কুলে বেড়াস হাওয়ায় জলে উঠে।

আর একটি গীতের প্রাথমাংশ আমার স্মরণ হয় বটে, কিন্তু তাহার মাঝে তত কবিত্ব বা ভাব নাই, তাই উদ্ধৃত করিলাম না। নিম্নের সঙ্গীত দুইটি ঈশানের নিকট একখানি অপরিষ্কার কাগজে পাইয়াছিলাম—

২। কি জানি কিসের জোরে প্রাণ করে আনচানরে—
ও তার জগতজোড়া নামের গুণে বাস করে
নয় দ্বারের মাঝের থানরে।
তার হয় না কিছু জানা জ্ঞানে ভেতর বাহির আদি স্থানরে।
সে যে সকলের সকল কাজে করেরে আপনার টান রে।
আমার আর কেহ নাই এই ঘরেতে মাঝে দিছি তারে স্থান।
তাইতে ফকির ঈশান কয়, আমি করি সদা তার গানরে।

৩। কি আর দেখিস্‌ কাণা হাতড়ে তোর আঁধার ঘরে—
মনের কালি মুছে আলো জ্বাল্‌লে পাবি তবে তারে।
সে যে আলোর ছবি আলোর ঘরে আলো বিনা তাঁরে পাবি না,
সে আলোর তেজে তোর কাণা চোক ফুটে যদি—
তাই ভেবে অলোকনাথে ডাকে ঈশান নিরবধি।

তাহার পর এই ফকিরের গুরুসত্য সঙ্গীত যথেষ্ট শুনিয়াছি। কিন্তু তখন মনে হয় নাই যে উহা লিখিত ভাবে কখনো প্রকাশ করিব। তাই লিখিয়া রাখি নাই। স্মরণও নাই যে, সকল গুরু সত্য সঙ্গীত উদ্ধৃত হইবে। উহার প্রস্তুত প্রণালী অনুযায়ী এক কি দুই চরণ মাত্র উদ্ধৃত করিব। যেহেতু এই গীতের প্রস্তুত প্রণালী প্রায়ই দুই চরণে সম্পূর্ণ। গুরু সত্য গীতের বিশেষত্বই এই।

যাহা উদ্ধৃত হইবে তাহা যেন কেমন আধভাঙ্গা আধভাঙ্গা বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু এই গীতের বিশেষত্ব এই যে দুই এক চরণ কবিতায় গুরুসত্য প্রথা প্রবর্ত্তক নিরক্ষর কবিগণ, বাহ্য প্রকৃতির এক মহীয়সী অচিন্তনীয় শক্তির সংঘাতে মহান বিরাট সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়া পুরাকালের শিক্ষিত ঋষি কবিগণের ন্যায় তাহাতেও জগতে এক অভিনবরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশান গাইল—

৪। অকুল দরিয়ার পরে দয়াল আমি
না জানি সাঁতার - না জানি সাঁতার আমি, না বুঝি ব্যাপার।
কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবা রাতি—আমি এক চোখে
দেখে তাই করি যে বসতি - দয়াল আমি করি যে বসতি। * *
তোমারে দেখিব বলে এবার পড়েছি পাথারে দয়াল পড়েছি পাথার।

আহা, এইরূপ একপ্রাণতা এইরূপ তন্ময়তা লইয়া নিরক্ষর ঈশান গুরুসত্য সঙ্গীত গান করিয়া আর প্রস্তুত করিয়া এই সমাজের মধ্যে অমর হইয়া গিয়াছে। ধন্য ঈশান! ধন্য তোমার ভাবময় কবিত্বকে।

একদিন চৈত্র মাসের দিবা অবসান সময়ে আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিঙ্গাশুলপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একটি দশবর্ষ বয়স্ক নমঃশূদ্র শিশু গুরুসত্য গীত গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। গীত শুনিয়া আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার সহিত চণ্ডাল পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় শুনিয়াছিলাম—ফকির ঈশান এই কৃষিপল্লীতে গুরুসত্য গীত গাইয়া প্রায় গ্রামশুদ্ধ কৃষকগণকে শিষ্যরূপে উন্নত পথে পরিচালিত করিতেছে। বালক গাইয়াছিল—

৫। আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার—
দয়াল ফুটেছে আখির।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে
হাজির রে—সম্মুখে হাজির।
ফুল ঝরে পাখি উড়ে পাতায় শিশির
গলেরে রোদের তাপে আলোক নিশির
দয়াল আলোক শরীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান বড় যাতনা গভীর রে
বড় যাতনা গভীর। ইত্যাদি।

একে বালকণ্ঠ, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর সরল প্রাণতলস্পর্শী স্নিগ্ধ সুরের ঝঙ্কার; তাহার উপর ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বর্ণনায় আমাকে প্রকৃতই ক্ষণেক সময় তন্ময়ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্য সঙ্গীতের গায়কগণের এক জন প্রকৃত ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

নিরক্ষর ঈশানের এই উচ্চ অঙ্গের সার্ব্বজনীন বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য-স্পৃহা অনুভব করিয়া তাহাকে একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিয়া সম্ভ্রম করিতাম। যাহাদের অসংস্কৃত হৃদয় হইতে এই সকল স্বাভাবিক শক্তি বিকশিত হইয়া সেই মহান বিরাট্ সৌন্দর্য্যসেবায় নিয়োজিত আছে তাহারা এই অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন্ গূঢ় তত্ত্ব জানিতে বাকি রাখিয়াছে? অশিক্ষিত পটু হৃদয়ই মহিমময়ী প্রকৃতির নিত্যসঙ্গী; আর সেই হৃদয়ই একমেবাদ্বিতীয় উপাস্যের সর্ব্বময় শক্তির কেন্দ্রভূমি। বিশ্বাস সে হৃদয়ে ঘনীভূত; ভক্তি সে হৃদয়ে শতমুখী। ধন্য প্রকৃতির প্রিয় পুত্র ঈশানকে! আর শত ধন্য এই কাব্য মাধুরী প্রিয় ভক্তিরসগ্রাহী ভাবুক গুরুসত্য প্রথাবলম্বী নিরক্ষর শিষ্যগণকে।

এইরূপ নিরক্ষর বহু কবি বঙ্গ সমাজে ছিল এবং আছে। এই জন্যই কবির সেই উক্তি প্রকৃত উক্তি বলিয়া মনে হয় যে—কত শত কালিদাস ডুবে আছে আঁধারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (মীরাট-শাখা)

বিগত ৩রা বৈশাখ রবিবার সাড়ে-পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রী৺দুর্গা-বাটী-মন্দিরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ (মীরাট শাখার) ১ম বর্ষ অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মীরাটপ্রবাসী প্রবীণ ও স্বনামখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যের প্রারম্ভে ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত মুলচাঁদের সহায়তায় মূল পরিষদের সদস্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সেন, এল এম্‌-এস, মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সেন কর্ত্তৃক তৎকালীন উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর যে আলোক-চিত্র গৃহীত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সভারম্ভে মীরাটপ্রবাসী প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক "জননী লহ তুলে বক্ষে" গানটি সুললিতস্বরে সুরসংযোগে গীত হইলে পর, শাখা-পরিষদের সুযোগ্য উৎসাহশীল সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা-বিনোদ-বিদ্যারত্ন-সাহিত্যভূষণ-তত্ত্বনিধি মহাশয় বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অতঃপর, মূল পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত "হিমালয় দর্শনে" শীর্ষক একটি উচ্চভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েন। তৎপরে শাখাপরিষদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়, বি-এ, এফ-আর-এস এল, (লণ্ডন) মহাশয়ের সুশিক্ষিতা কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী কমলা রায় বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে সুরসংযোগে অমর কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল বিরচিত "জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান" এই গানটি গাহিয়া সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায় মহাশয় "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺বোপদেব গোস্বামী, তাঁহার বংশ ও জাতি" সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমতঃ প্রবন্ধলেখক মহাশয় মুগ্ধবোধ ও কবিকল্পদ্রুম গ্রন্থাদি হইতে নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করেন যে বোপদেব "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ" বৈদ্য ছিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি মনুসংহিতা, জন্মাষ্টমী ব্রত-কথা মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ অধ্যাহৃত করেন। অতঃপর তিনি বোপদেবের বাঙ্গালীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া কবিকল্পদ্রুম হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করেন:—

"ইত্যাচার্য্য চক্রচূড়ামণি শ্রীবোপদেব গোস্বামী বিরচিতঃ কবিকল্প-দ্রুমনাম ধাতুপাঠ সমাপ্তঃ।" তৎপরে তিনি বোপদেবের "গোস্বামী

মীরাট বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ

উপাধিপ্রসঙ্গে বলেন যে উক্ত উপাধি কেবলমাত্র বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য (বৈষ্ণব দীক্ষাদাতা)-দিগের মধ্যেই প্রচলিত,—ভারতবর্ষীয় অন্য সমাজে এরূপ উপাধির প্রচলন নাই। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, বাঙ্গলাদেশেই প্রচলনবহুল ও ইহার টীকাকারগণ সকলেই বাঙ্গালী। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ করিতে বলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে মীরাট-শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ তত্ত্বনিধি মহাশয় মূল পরিষদের ২১শে চৈত্র তারিখের পত্রোল্লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনবার্ত্তা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জ্ঞাপন করেন।

সম্পাদক মহাশয়ের সমবেদনাসূচক প্রস্তাব পঠিত হইলে পর, শাখাপরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় মৃত মহাত্মার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া প্রস্তাবটির সমর্থন করেন। তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈশাখ সংখ্যক "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ব্যোমকেশ মুস্তফীর শোকসভায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, পি-আর এস, মহোদয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করেন। তৎপরে শাখাপরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হারাধন তত্ত্বনিধি মহাশয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনে "শোকোচ্ছ্বাস" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব ও "শোকোচ্ছ্বাস" কবিতাটি মূল পরিষদে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলে পর, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পরিশেষে সুমিষ্ট সঙ্গীত গীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।

চীন দেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

(এডিনবরা রিভিউ হইতে গৃহীত)

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

আধুনিক ইউরোপের সংগ্রামক্ষেত্রে সভ্যজগতের প্রায় সমুদয় জাতিই অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু চীনসাম্রাজ্য অদ্যাপি যুদ্ধব্যাপারে নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্ততার কারণ কি? উত্তর এই যে, চীনের সভ্যতা সামরিক সভ্যতা নয়,—অতিপ্রাচীনকাল হইতে চীন সমরবিদ্যায় অনভিজ্ঞ। পশ্চিম দেশীয় যাজকসম্প্রদায় ও রাজনৈতিকগণ কতবার বলিয়াছেন, চীনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে

চীনদেশীয় সৈনিকগণের উন্নতি আবশ্যক ; কিন্তু চীন এ কথায় কখনও কর্ণপাত করে নাই, ফলে চীনসেনার উন্নতিও সাধিত হয় নাই।

চীনের এই সৈন্যবলের অভাব ও দেশবাসিগণের তেজোহীনতাই পরোক্ষে চীন-সাম্রাজ্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে। এই প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয় বিশেষত্ব চীনদেশমধ্যে অন্তর্বিপ্লবের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চিরশান্তি আনয়ন করিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈদেশিকগণের প্ররোচনায় চীনদেশে যে বিপ্লব ঘটে, ও যাহার ফলে পেকিনে (Peking) প্রজাতন্ত্রের (Republic) প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা কিছুদিনের জন্য স্বীয় প্রভাবও বিস্তার করিয়াছিল, সত্য ; কিন্তু তাহা চীনদেশবাসিগণের বিচক্ষণতার পরিচায়ক নহে।

এই দারুণ বিপ্লবের মধ্যে, এই ঘোর অরাজকতার দিনে রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন—একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী রাষ্ট্রনৈতিক ; ইঁহার নাম য়ুয়ান্-সি-কাই (Yuan Shih Kai)। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, চীন-সম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; ইহা হইতে ঘোর অরাজকতার উৎপত্তি হইবে। বিপুল উৎসাহে যখন চীনের জনসঙ্ঘ 'স্বাধীনতা' চাই 'স্বাধীনতা' চাই বলিয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছিল, যখন বৈদেশিকগণ চীনের পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রাচীন সভ্যতার পরিবর্ত্তে নব্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তখন এই দূরদর্শী পুরুষসিংহ চীন রাজ-সিংহাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ; কিন্তু যখন দূরদর্শী য়ুয়ান্ দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার কেহই নাই, তখন তিনি এমন ভাব দেখাইলেন যে, যেন তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষই সমর্থন করিতেছেন।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ছয় মাস না যাইতে যাইতেই চীনের জনসাধারণ বেশ বুঝিল যে, প্রজাতন্ত্র চীনদেশের প্রকৃতির অনুযায়ী নয়।

কিরূপে এই প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহা যে য়ুয়ানের (Yuan) কীর্ত্তি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। চিলির রাজপ্রতিনিধির (Viceroy of Chilli) পদে অধিষ্ঠিত হইয়া য়ুয়ান স্বীয় মন্ত্রণাবলে প্রজাতন্ত্রের প্রধান প্রধান নেতৃগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিলেন, এবং অর্থের দ্বারা প্রধান প্রধান সৈনাধ্যক্ষগণকে করায়ত্ত করিলেন। রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ প্রভৃতি অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারই য়ুয়ানের হস্তে থাকায়, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা প্রজাতন্ত্র দলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং তিনি প্রজাতন্ত্রদলের (National Assembly র) উচ্ছেদসাধন করিলেন। পরে ১৯১৩ খৃঃ অব্দে তিনি জনসাধারণের নিকট স্বীয় রাষ্ট্রীয় মত প্রচার করিয়া (Administrative Conference) নামে শাসনসংক্রান্ত এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি ঐ সমিতির সভাপতিত্বে বরিত হইলেন।

প্রকৃতপক্ষে য়ুয়ান'ই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তিনি ক্রমে-ক্রমে দেশের পূর্ব্বসংস্কার ও প্রাচীন রীতিনীতির পুনঃপ্রচলন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রজাবর্গের মতামত পরোক্ষে অবগত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রজাবর্গের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের কল্যাণ। জনসাধারণ এক্ষণে আর প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী নহে ; তাহারা য়ুয়ানকেই তাহাদের প্রকৃত সম্রাট বলিয়া অকপটে গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার সকল কার্য্য যদিও সকল সময়ে বৈদেশিকগণের অনুমোদিত হয় নাই, তথাপি দেশবাসিগণের চক্ষে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপই প্রশংসনীয়। 'য়ুয়ান' চীন সাম্রাজ্যের জন্য এমন কি কি কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে প্রজাবর্গ প্রীতিলাভ করিয়াছে, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৯১১ খৃঃ অব্দে মাঞ্চু রাজবংশের (The Muanchas) পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে তিনি কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃঃ অব্দে তিনি এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে রাজশক্তির হ্রাস করিয়াও যদি মাঞ্চুরাজবংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারা যায়, তাহাও কর্ত্তব্য। চীনদেশের ভিতরে বিদেশীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রচার ও অনুশীলনকল্পে তিনিই অগ্রণী। বিদেশের জ্ঞানমন্দিরে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় ও রাজ-জননীর (Empress Dowager) যত্নে অধুনা চীনদেশে অহিফেনের ব্যবসায় লুপ্তপ্রায় বলিলেও হয়।

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণও য়ুয়ানের গুণমুগ্ধ। স্বনামধন্য লায়াঞ্চিচে (Lian-chi-ch'ao) প্রমুখ লেখকগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ।

যাহা হউক, চীন সাম্রাজ্যের আধুনিক ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইলে ও চীনের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে, একজন শক্তিমান্ রাজপুরুষের হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সৌভাগ্যবশতঃ, চীন য়ুয়ানকে রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্ণধার করিয়া এইরূপ একজন শক্তিধরের হস্তেই সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়াছে, মাঞ্চুবংশের প্রায় সকলেই তাঁহাকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত।

প্রজাতন্ত্র দলের শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত চীনদেশের যে স্থানে পূর্ব্বে মাঞ্চুরাজগণ অবস্থান করিতেন, য়ুয়ান অধুনা সেই স্থানে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। ঐ মাঞ্চু বংশেরই রাজকুমার, সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, পলিনকে (Pu. Lun) তিনি তাঁহার একটি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে চীনের বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—চীনের গৌরবরবি রাষ্ট্রীয় অন্ধকার দূর করিয়া নূতনযুগে আবার নূতন কিরণ বিকীরণ করিতেছে।

ব্যোমপথ-পরিদর্শন

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমেরিকান ভলাণ্টিয়ার ফ্রেড্রিক সি হাইল্ড (Fredrick C Hild) ব্যোমপথ পরিদর্শন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা তিনি স্ফিয়ার পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় এভিয়েসন্ রিজার্ভের (The Second Aviation Reserve) কর্ম্মচারী কাউণ্ট ডুপারণের (Count Duperron) নিকট শীঘ্র কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া, ফ্রেড্রিক সে হাইন্ড বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে ফরাসী সেনাদলে ভর্ত্তি হ'ন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রসদ বিতরণসম্বন্ধে আকাশচারী ও সাধারণ সৈন্যগণের মধ্যে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই। দেখিলেন, ধনী ও নির্ধন সকলকেই এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতে হয়, সকলকেই একসঙ্গে একই গৃহে নিদ্রা যাইতে হয়; বস্তুতঃ গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে সকলকেই সাধারণ ফরাসী সৈনিকের মতই চলিতে হয়।

ফ্রেড্রিক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রাতে যথারীতি ৬॥০ ঘটিকার সময় 'বিউগিল' বাজিয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়াই অদূরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র নদীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া হাজিরা দিবার নিমিত্ত ফ্রেড্রিক উপস্থিত হইলেন। ইহার পরে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে অভিবাদন করা একটি বিশেষ গুরুতর কার্য্য। ফ্রেড্রিক ক্রমশঃ ইহাতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অভিবাদনের পরেই প্রাতর্ভোজন। তিনি নিকটবর্ত্তী জনৈক কৃষকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে রুটী, মাখন, ও চকোলেট ক্রয় করিয়া প্রাতর্ভোজন সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে, কৃষকগৃহেই তাঁহাকে প্রত্যহ যাইতে হইত।

এই ভাবে কয়েকদিন গত হইল। ফ্রেড্রিকের এই সময়ে বিশেষ কোন কর্ত্তব্য ছিল না। কারণ নূতন আকাশ-যান তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু ৫০ অশ্ব-শক্তিবিশিষ্ট যন্ত্রেই নবাগতগণ প্রথম শিক্ষা লাভ করিবে—ইহাই ঐ সৈন্যদলের একটি নিয়ম ছিল। এই নিয়মানুসারেই তিনি জনৈক বন্ধুর সাহায্যে প্রথমশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন।

পরদিন এক মনোপ্লেনে চড়িয়া ফ্রেড্রিক ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিলেন।

চতুর্দ্দিকে বহুদূরব্যাপী প্রান্তরমধ্যে গ্রামগুলি চিত্রবৎ দৃষ্ট হইল; এই স্বভাবের শোভায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু এ সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে অধিকক্ষণ ঘটিল না; কারণ, অর্দ্ধঘণ্টা মাত্রই তাঁহার আকাশ-ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট সময়।

পরদিন আকাশ-ভ্রমণের জন্য কোনও নূতন এরোপ্লেন নাই। ফ্রেডরিক দেখিলেন দূরে একটি ব্লেরিয়ট (Bleriot) মনোপ্লেন উঠিতেছে। অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে ঐ যানে আরোহণপূর্ব্বক ফ্রেড্রিক প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যোমপথে পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু অদ্য এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। প্রায় ১৫০০শত ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া ফ্রেড্রিক দেখিলেন যে, তাঁহাদের মস্তকের উপরে আরো ৩৫০০ ফিট ঊর্দ্ধ হইতে একটি নিউপোর্ট (Nieuport) মনোপ্লেন ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে নামিতেছে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাঁহার এই ভয় হইতে লাগিল যে, দুইটি মনোপ্লেনে বুঝি বা সংঘর্ষণ হয়। প্রথমতঃ, ফ্রেড্রিক উহার নামিবার পথ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় দেখিয়া তিনি স্বয়ং নীচে নামিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নিউপোর্ট যানের গতি অতি দ্রুত। এই ভীষণ সঙ্কটকালে দুইখানি ব্যোমযানের সংঘর্ষণ হয়-হয়, এমন সময়ে সিদ্ধহস্ত নিউপোর্ট-চালকের বুদ্ধিবলেই ফ্রেডরিক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন; সংঘর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নিউপোর্ট মনোপ্লেনখানি সহসা একটু সরিয়া গেল—উহার পশ্চাৎভাগ ফ্রেডরিকের মনোপ্লেনের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। বায়ুরাশিতে তরঙ্গ তুলিয়া যখন ঐ মনোপ্লেনখানি চলিয়া গেল, তখন সেই তরঙ্গের আবর্ত্তে, ফ্রেডরিকের মনোপ্লেনখানি একপার্শ্বে হেলিয়া পড়িল।

উক্ত দুর্ঘটনার দুই দিন পরেই ফ্রেডরিক আর একখানি অশীতি-অশ্ব শক্তি মনোপ্লেন লইয়া কয়েক হাজার ফিট উঠিবামাত্রই ভূতলে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কারণ সেদিন তাঁহার ব্যারোমিটার-যন্ত্রটি হঠাৎ বিকল হইয়া পড়িল।

এইরূপে প্রত্যহ আকাশ-ভ্রমণে অভ্যস্ত হইবার পর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এতদিনে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অনুমতি পাইলেন। চারিজন অনুচরের সহিত মনোপ্লেনে আরোহণ করিয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যেক অনুচরেরই একএকখানি মনোপ্লেন ছিল। একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বহু নিম্নে অসংখ্য পদাতিক সৈন্য পিপীলিকার ন্যায় সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। তিনি ৭০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া একঘণ্টাকাল মনোপ্লেন চালাইতেছেন—নিম্নে নানাজাতীয় অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র ধূমরাশি উদ্গীর্ণ করিতে-করিতে বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে, গর্জ্জনের পর গর্জ্জন কর্ণের পটহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই গভীর ধূম-সমুদ্রের অন্তরালে থাকিয়া তিনি শত্রু-পক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে ফ্রেডরিক দৈনন্দিন পরিদর্শনকার্য্যে বহির্গত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে ৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে একদল জার্ম্মাণসেনা বৃহৎ অজগরের ন্যায় মন্থর গতিতে চলিয়াছে। তিনি এই সঙ্কটকালে নিকটবর্ত্তী একখণ্ড মেঘের অন্তরালে মনোপ্লেন চালাইয়া নিরাপদে স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

শ্যাকল্‌টনের অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর-যাত্রা

('নেচার' পত্রিকা হইতে গৃহীত)

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

গত মে মাসে বিষম ঝড়বৃষ্টির উৎপাতে 'অরোরা' জাহাজ (The Aurora) প্রায় দেড়মাসকাল হিমশিলামধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। এক্ষণে উহা নাকি 'নিউজিলাণ্ড' অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তারবিহীন টেলিগ্রাফে প্রকাশ যে ঐ 'অরোরা' জাহাজের দশ জন কর্ম্মচারী 'রস' সমুদ্রের উপকূলে 'ইভান্স' অন্তরীপের নিকটে এক্ষণে অবস্থান করিতেছেন। কাপ্তেন ম্যাকিন্টোস্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহারা সকলেই এখন স্যার আর্ণেষ্ট শ্যাকল্‌টনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দক্ষিণ জর্জ্জিয়ার সংবাদে জানা যায় যে, প্রতিকূল বায়ুতে নীত হইয়া শ্যাকল্‌টন এক্ষণে কোন অজ্ঞাত সমুদ্রে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সুনিপুণ সমুদ্রচারিগণের পক্ষেও সুকঠিন।

'ওয়েডেল' সমুদ্রবক্ষে 'এণ্ডিয়োরেন্স' জাহাজেরও বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শ্যাকল্‌টন যথার্থই এণ্টার্কটিক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, অথবা 'ওয়েডেল' সমুদ্রেই আছেন, এ বিষয়েও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শ্যাকল্‌টন শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে পারেন, এই আশায় এণ্ডিয়োরেন্স জাহাজের কর্ম্মচারীরা হয় ত 'ওয়েডেল' সমুদ্রেই অপেক্ষা করিতেছেন।

আশা করি ভগবান তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিধবা

[শ্রীজলধর সেন]

(১)

পিতার মৃত্যুর তেরদিন পরে একমাত্র জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যোগেশকে নিমতলার মহাশ্মশানে চিরবিদায় দান করিয়া রমেশ বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, তাহার বৌদিদি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্র তাহার পার্শ্বে মলিনবদনে বসিয়া আছে। রমেশ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "বৌদিদি!"

আজ দশ বৎসর কমলা এই 'বৌদিদি' ডাক শুনিয়া আসিতেছে; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন রমেশের মাতা মারা যান, তখন ত রমেশ এমন করুণকণ্ঠে 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকে নাই; তেরদিন পূর্ব্বে যখন রমেশের পিতা চির-দিনের জন্য চলিয়া গেলেন, তখনও ত রমেশ এমন স্বরে তাহার বৌদিদিকে ডাকে নাই; কিন্তু আজ সে দাদাকে হারাইয়া, একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিল; তাহার যে আজ বৌদিদি ভিন্ন ডাকিবার আর কেহ নাই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আজ সে আর কোন আশ্রয়ই দেখিল না। তাই সে আজ এমন হৃদয়ভেদী স্বরে ডাকিল 'বৌদিদি!'

রমেশের স্ত্রী লক্ষ্মী কত কাঁদিয়া 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া চীৎকার করিয়াছে; রমেশের একমাত্র পুত্র নারায়ণ, —কমলার কত আদরের, কত সোহাগের নারায়ণ তাহার জেঠাইমাকে কত ডাকিয়াছে; কোন উত্তরই তাহারা পায় নাই;—কমলা মৃতপ্রায় ধরাসনে পড়িয়া ছিল; কিন্তু রমেশের সেই আকুল হৃদয়ের আর্ত্তনিনাদ,—সেই অসহায় অবস্থার মর্ম্মভেদী 'বৌদিদি' ডাক তাহার হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিল। কমলা মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরক্ষণেই রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া কমলা দেখিল, সেই সুন্দর মুখে কে যেন কালী মাখাইয়া দিয়াছে, সেই পদ্মপ্রফুল্ল নয়নদ্বয় যেন জ্যোতিহীন হইয়াছে। কমলা তখন নিজের হৃদয়ভেদী শোকের আবেগ অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর রমেশের দিকে চাহিয়া বলিল "ঠাকুর-পো, এস।"

এই সম্বোধন শুনিয়া রমেশ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—এমন সম্বোধন ত সে আজ দশ বৎসর কমলার মুখে শোনে নাই;—সে যে কমলার বড় আদরের 'হারাধন!'—"বৌদিদি, আজ তোমার হারাধনকেও দাদার সঙ্গেই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি গো!" রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না, আর দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। সে কমলার নিকট বসিয়া পড়িল।

কমলা তখন নারায়ণকে টানিয়া লইয়া রমেশের কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, "ভাই হারাধন, তুমি যে আমারই হারাধন!" তাহার শোকের সিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল; তাহার আর কথা বলিবার শক্তি থাকিল না।

লক্ষ্মী কমলার এই ভাব দেখিয়া অতি ধীরে বলিল, "দিদি, ওগো তুমি চেয়ে দেখ, তোমার নারায়ণ যে শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি স্থির না হ'লে যে সব যায় দিদি!"

কমলা লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "আর কি যাবে বোন! আর কি আছে! তাঁর ইচ্ছা হয়, হারাধন আর নারায়ণকে—ওগো, আর যে ভাবতে পারি নে, আর যে সইতে পারিনে।"

লক্ষ্মী বলিল "কি করবে দিদি! তোমাকে আর কি ব'লে বোঝাব। তুমি আপনি শান্ত না হ'লে ত আমাদের আর উপায় নেই! সবাই যে চ'লে গেলেন দিদি!"

চারি বৎসরের ছেলে নারায়ণ এতক্ষণ কথা বলে নাই। কথা বলিতে শিখিয়া অবধি, যতক্ষণ সে না ঘুমাইত, ততক্ষণ তাহার কথা থামিত না। আজ এই সকল কান্নাকাটির মধ্যে এতক্ষণ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল; সে বোধ হয় কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তাহার মায়ের কথা শুনিয়া এতক্ষণ পরে তাহার মুখে কথা আসিল; সে বলিল "না, না জেঠামশাই চ'লে যাবে না,—দাদামণিকে আনতে গিয়েছে, না মা? জেঠাইমা, চুপ কর, জেঠামশাই এসে বক্‌বে। আমি যে কিছু খাইনি জেঠাইমা! বাবা, তুমি আর বেড়াতে যেও না। বুক্কু বলে 'তোমার বাবা মদ খায়'; বুক্কু ভারি মিথ্যা কথা বলে, না জেঠাইমা? জেঠামশাই এলে ব'লে দেব। তা, জেঠামশাই কাউকে কিছু বলে না, সুধু হাসে। জেঠামশাই অত হাসে কেন, জেঠাই-মা! বাবা কিছু পড়ে না, জেঠামশাই খুব পড়ে। আমিও পড়ি। বই আন্‌ব জেঠাইমা! সেই যে—বল না জেঠাইমা, সে কি বই! ঐ যে—"

নারায়ণের কথায় বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল "নারায়ণ, চুপ কর বাবা! তোমার জেঠাইমার যে অসুখ করেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র নারায়ণ পিতার কোলের কাছ হইতে উঠিয়া কমলার নিকট আসিল এবং তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল "উঃ, গরম যে। জেঠাইমা, আজ তুমি কিছু খেতে পাবে না। জ্বর হোয়েছে। বুক্কু বুক্কু, জেঠামশাইকে ডেকে আন্, জেঠাইমার যে জ্বর হয়েছে। তুমি শুয়ে থাক জেঠাইমা। বাবা, আজ আর কোথাও যেয়ো না।"

কমলা নারায়ণকে কোলের মধ্যে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "না বাবা, আমার জ্বর হয় নি। চল, তোমাকে খেতে দিই গে! আহা, বাবা আমার এতক্ষণ কিছু খায় নাই।" এই বলিয়া নারায়ণকে কোলে করিয়া কমলা ঘরের বাহির হইয়া গেল। রমেশ ও লক্ষ্মী বসিয়াই রহিল।

লক্ষ্মী বলিল "এখন উপায় কি হবে? এ সংসার কি ক'রে চল্‌বে?"

রমেশ বলিল "এতদিন ত তা ভাবিনি লক্ষ্মী! মাথার উপর বাবা ছিলেন, দাদা ছিলেন; আমি কিছুই করিনি। এমন যে হবে, তা ত স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন কি করব, তাই বল।"

লক্ষ্মী বলিল "যা হবার, তা হ'য়ে গিয়েছে। এতদিন যে ভাবে কাটিয়েছ, তা সব ভুলে যাও। কতদিন তোমার পায়ে ধরে কেঁদেছি, কত কথা বলেছি; কতদিন কত অন্যায় কথাও বলেছি। তুমি সে সকল কথা কাণেই তোল নি। আর, তোমাকে কিছু বল্‌লেই দিদি অমনি মুখ ভার করতেন, আমাকে বকতেন; আমি চুপ করে যেতাম। আর সে সব ভেবে কি হবে? কিন্তু এখন কি করবে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?"

রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "লক্ষ্মী, এতদিন কি ভুলই করেছি। মনে করেছিলাম, এমনই করেই বুঝি দিন যাবে। কুসঙ্গে পড়ে লেখাপড়া শিখ্‌লাম না, পাজী বদমায়েস হ'য়ে গেলাম। বাবার মলিন মুখ, বৌদিদির উপদেশ, তোমার কথা, কিছুতেই আমাকে ফিরাতে পারে নাই। তাই বুঝি বাবা চ'লে গেলেন, দাদা চ'লে গেলেন; মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমি থাক্‌লাম। এখন কি করব? কেমন ক'রে সংসার চল্‌বে? বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল, তাঁর বাক্সে মোটে সাড়েতিনশ টাকা ছিল।"

লক্ষ্মী বলিল "কর্ত্তা কি করবেন? তিনি পঞ্চাশ টাকা পেন্সন পেতেন বই ত নয়। বড়বাবু যে দেড়শ টাকা কলেজের মাইনে পেতেন, সে সবই এনে কর্ত্তার হাতে ধ'রে দিতেন। একটা পয়সার দরকার হ'লে কর্ত্তার কাছে, কি দিদির কাছে চেয়ে নিতেন। অমন মহাদেবের মত মানুষ কি আর হয়! তাই, আমাদের অদৃষ্টে সইল না।"

রমেশ বলিল "সবই বুঝতে পারছি; কিন্তু বড় বিলম্বে বুঝলাম। আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাবা কি কম চেষ্টা করেছেন। আমার তখন কি কুবুদ্ধিই হয়েছিল, সেকেণ্ড ক্লাস থেকেই পড়া ছেড়ে দিলাম। দাদা এম, এ পাশ করলেন; তারপর এই চার বছর প্রফেসারী করে যা পেয়েছেন, সবই বাবাকে দিয়েছেন। বাবা তাই দিয়ে সংসার চালিয়েছেন; এই বাড়ীখানি করতে পাঁচ হাজার টাকা ধার হয়েছিল, তার তিন হাজার শোধ দিয়েছেন। এখনও দুই হাজার টাকা ধার আছে। সে ধারই বা কি ক'রে শোধ হবে, আমরাই বা কি ক'রে বাঁচব।"

লক্ষ্মী বলিল "এই কথাই ত কতদিন বলেছি। লেখা-পড়া কি সকলেই বেশী শেখে, না সকলেই এম, এ পাশ করে। তোমার মত লোকে কি আর দশ টাকা আন্‌ছে না। কর্ত্তা ত তাঁর আফিসের সাহেবদের ব'লে তোমার চাকরী করে দিয়েছিলেন; তুমি ত তা রাখ্‌তে পারলে

হরলাল বলিল "চাহিয়া দেখ, হাড় কাটিবে না।"

"কৃষ্ণকান্তের উইল—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।"

না। তা হ'লে কি আজ আর ভাবনা ছিল। যাক্, সে সব কথা থাকুক। আমার ভাবনা হয়েছে, দিদি আমাদের ফেলে বাপের বাড়ী না যান। তিনি বড়মানুষের মেয়ে, তাঁর কি এত কষ্ট সহ্য হবে। আর তাঁর বাপ-ভাইয়েরা কি তাঁকে আর এখানে রাখ্‌বেন। মাসে মাসে তিনি যা হাতখরচ বাপের বাড়ী থেকে পেতেন, তার একটি পয়সাও ত তোমরা দুই বাপ-বেটায় রাখ্‌তে দেও নাই। তুমি যত পার নিয়ে উড়িয়েছ, আর তিনি নারায়ণের জন্য সব খরচ করেছেন। বড়বাবুও এমনি ছিলেন, তিনি কোন দিন একটি কথাও বলেননি। দিদি যদি একটু শক্ত হতেন, তা হলে কি তুমি এমন হতে পারতে। আমি কতদিন এই কথা দিদিকে বলেছি; তিনি হারাধন বল্‌তেই অজ্ঞান। এখন যে সবই গেল।"

রমেশ বলিল "লক্ষ্মী, তুমি বৌদিদিকে চেন না; তিনি আমাদের ছেড়ে যেতেই পারেন না; নারায়ণ যে তাঁর সব।"

লক্ষ্মী বলিল "এমন ভাই, এমন বৌদিদি পেয়েও তুমি যে অমন হয়ে গিয়েছিলে, তাই ভেবেই আমার কান্না আস্‌ত।"

রমেশ বলিল "সেই পাপের ফল ভোগবার জন্যই ত বাবা দাদা আমাকে ফেলে এমন করে চলে গেলেন। আর সে কথা ভেবে কি হবে; যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে।"

(২)

সেইদিনই অপরাহ্ণকালে কমলার দাদা মোহিতবাবু আফিস হইতে ফিরিবার সময়ই রমেশদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের এটর্নী। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারী আফিসে উচ্চ বেতনে কর্ম্ম করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হরিমোহনবাবুর পুত্র মোহিত ও কন্যা কমলা ব্যতীত আর সন্তান নাই। তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল। কলিকাতায় তিনচারিখানি বাড়ী আছে; কোম্পানীর কাগজ ও অনেক কারবারের অংশে যথেষ্ট টাকা আছে; মোহিতবাবুর আফিসও খুব ভাল। মোহিতবাবু কনিষ্ঠা ভগিনী কমলাকে বড়ই ভালবাসেন; প্রতি মাসে তাহার হাতখরচের জন্য ৫০টী করিয়া টাকা দেন এবং কমলা যখন যাহা চায়, দাদার নিকট হইতে তাহাই পায়।

মোহিতবাবুকে দেখিয়া রমেশ বলিল "আপনি আজও আফিসে বেরিয়েছিলেন?"

মোহিতবাবু বলিলেন "কি করি ভাই, বড় একটা 'কেস' ছিল। সেই তোমাদের সঙ্গে ঘাট থেকে বেরিয়েই বাড়ী যেতে হোল, এখানে আর আস্‌তে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়ে কাপড় ছেড়েই আফিসে যেতে হয়েছিল। শরীরটাও বড় ভাল নেই।"

রমেশ বলিল "তা ত হতেই পারে। সেইজন্যই ত কা'ল রাত্রিতে আপনাকে শ্মশানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। আপনি ত সে কথা শুনলেন না।"

মোহিতবাবু বলিলেন "রমেশ, যোগেশকে যে আমি কত ভাল বাসতাম, তা আর কি বল্‌বো; যোগেশ আমার ভাইয়ের অধিক ছিল; কমলা যে আমার বড় আদরের বোন রমেশ! সব শেষ হয়ে গেল। এত করেও যোগেশকে বাঁচাতে পারলাম না। কমলাকে যে কি বলে প্রবোধ দেব, ভেবে পাচ্ছিনে। তোমাদের ত খাওয়া হয়েছে? মাকে আস্‌তে বলেছিলাম, আমার স্ত্রীরও আস্‌বার কথা ছিল; তাঁরা এসেছিলেন ত?"

রমেশ বলিল "মা আর আসেন নি, আপনার স্ত্রী এসেছেন; তিনি এখনও যান নাই। আমাদের কি আর খাওয়া আছে দাদা! বৌ-দিদির ত আজ উপবাস। তিনি কি আর আছেন?"

মোহিতবাবু বলিলেন "আমার আর ভিতরে যেতে ইচ্ছে করে না, এইখানেই বসি।"

রমেশ বলিল "না, না, আপনি বাড়ীর মধ্যে চলুন। আপনাকে দেখলেও বৌ-দিদি মনে বল পাবেন; একবার চলুন।"

মোহিতবাবু কি করেন, রমেশের সহিত বাড়ীর ভিতর গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কমলা "দাদা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোহিতবাবু কমলার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কি তিনি বলিবেন? কি বলিয়া তিনি কমলাকে প্রবোধ দিবেন? তাঁহার কি তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল; তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই ঘরে নারায়ণকে কোলে করিয়া বসিয়া ছিলেন।

মোহিতবাবু কমলাকে কিছু না বলিয়া রমেশের সহিত

কথা বলাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি অতি কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "রমেশ, এখন ত আর তোমার চুপ ক'রে বসে থাকলে চল্‌বে না। অবস্থা ত সবই জান্‌তে পেরেছ। আমার মনে হয়, রসিক মল্লিক বাকী দুইহাজার টাকার জন্য দুইএকদিনের মধ্যেই তাগাদা করবে। আর কি সে টাকা ফেলে রাখ্‌তে চাইবে? কার ভরসাই বা ফেলে রাখ্‌বে। তার কি করা যায়? আর তোমাদেরই বা চলবার উপায় কি হবে? যোগেশ নেই বলে ত তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ উঠে যায় নাই, যাবেও না।"

রমেশ আর সে রমেশ নাই; এই বিপদে পড়িয়া দুই-দিনের মধ্যে সে একেবার সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল "আমি ত সংসারের কিছু বুঝি না মোহিত দাদা! এতদিন বাবা ছিলেন, দাদা ছিলেন; আমি কিছু ভাবিও নাই, কিছু করিও নাই। লেখাপড়াও জানিনে। আমি কি করবো? আপনিই এখন আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান, আপনিই আমাদের বন্ধু। আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই করব।"

মোহিত বাবু বলিলেন "আমি কা'ল রাত্রি থেকেই ভাবছি, তোমাদের কি করা যায়। আমার পরামর্শ এই রমেশ, যে, তুমি কা'ল থেকেই আমার অফিসে বেরুতে আরম্ভ কর। তোমার হাতের লেখা ভাল আছে; ঐতেই আমাদের কাজ চ'লে যাবে। এখন তোমাকে আমরা মাসে গুটিত্রিশেক টাকা দেব। তারপর মন দিয়ে ভাল ক'রে কাজ করলে, পরে মাইনে আরও বাড়বে। তারপর দেনার কথা। আমি বলি কি, তোমাদের আর এখন এত বড় বাড়ীর দরকার কি! বাড়ীটা নূতন বল্‌লেই হয়। অবশ্য এখন বেচ্‌লে, তোমাদের যা-খরচ হয়েছে, তা উঠবে না; তবে আমি চেষ্টা করলে ১৪।১৫ হাজার টাকায় বাড়ীটা বেচে দিতে পারব। ধর, চোদ্দ হাজার টাকাতেই বাড়ীটা বেচলে। তার থেকে দুহাজার টাকা দেনাশোধ দিলে; রইল বার হাজার টাকা। ঐ টাকাটা দিয়ে যদি মিউনি-সিপাল ডিবেঞ্চার, কি ঐ রকম কিছু 'সেয়ার' কেনা যায়, তা হ'লে যেমন করে হোক মাসে ৭০৲টা টাকার সংস্থান আমি করে দিতে পারব, এ ভরসা রাখি। তা হলে মাসে তোমার সব জড়িয়ে একশ টাকা আয় আপাততঃ হোল। ছোট একখানা বাড়ী ভাড়া করে, তুমি যদি তোমার স্ত্রী ও ছেলেটি নিয়ে থাক, ঐ টাকাতেই বেশ চ'লে যাবে। কমলা আমাদের কাছেই থাক্‌বে। তারপর, তোমার ছেলে যদি মানুষ হয়, তখন বাড়ী কিন্‌তে, কি বাড়ী করতে কতক্ষণ। আসল টাকা ত আর নষ্ট হচ্চে না। আমার ত এই পরামর্শ। তুমি কি বল?"

রমেশ বলিল "আমি আর কি বল্‌ব। বৌদিদি যদি এই করতে বলেন, তাই হবে!"

কমলা নীরবে তাহার দাদার কথা শুনিতেছিল। রমেশ যখন কমলার উপরই ভার দিল, তখন সে বলিল "দাদা, তুমি ও কি কথা বল্‌ছ? আমাদের বাড়ীখানি বিক্রয় করতে হবে? সে কিছুতেই হবে না দাদা! তা কিছুতেই পারব না। এ বাড়ী কি ছাড়তে পারি। এ কি বাড়ী দাদা! এ যে আমার দেবমন্দির! তুমিই ত আমাকে এ কথা শিখিয়ে দিয়েছিলে দাদা! তোমার কাছে উপদেশ পেয়েই ত আমি এ বাড়ীকে স্বর্গ বলে মনে করে নিয়েছি। না দাদা, যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন এ বাড়ী আমি ছাড়তে পারব না; ভিক্ষে করে খেতে হয়, তাও স্বীকার, তবুও এ বাড়ী—দাদা! এ যে আমাদের বাড়ী। এ বাড়ীর সব তাতে যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি দাদা! না, না, অমন কথা তুমি মনেও কোরো না। যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাতেও রাজী আছে; আমি এই বাড়ীর মাটী কামড়ে পড়ে থাক্‌ব। ঐ উঠানে দাদা, ঐ উঠানের ঐখানটায় আমি শেষ নিশ্বাস ফেলব। তুমি ত আমাকে জান দাদা! ধারের কথা বল্‌ছ। তোমরা ত আমাকে কত দিয়েছ, আমার দুইতিন-খানি অলঙ্কার বিক্রয় করলেই ও দুহাজার টাকা ধার শোধ হয়ে যাবে। তারপর যা অদৃষ্টে থাকে, তাই হবে। তুমি মনে কিছু কোরো না দাদা! আমি তোমাদের বাড়ী যাবো না—যেতে পারব না; আমি এই বাড়ীতেই থাক্‌ব। হারাধন ও নারায়ণের ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তিনি যে ওদের আমার হাতে—" কমলা আর কথা বলিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্না দেখিয়া নারায়ণ মোহিতবাবুর স্ত্রীর কোল হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কমলার মুখের উপর পড়িয়া বলিল "জেঠাইমা, কেঁদো না। জেঠামশাই এসে যে বকবে। বাবা, তুমি বড় দুষ্ট, শুধু-শুধু জেঠাইমাকে কাঁদাও। দাদামণি বাড়ী এসে ব'লে দেব। চল জেঠাইমা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। ওরা শুধু কাঁদায়, না জেঠাইমা?"

কমলা নারায়ণের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "না বাবা, আমি আর কাঁদব না।"

নারায়ণ বলিল "জেঠাইমা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, না! তুমি কিছুই খেলে না, আমাকেও খেতে দিলে না।"

কমলা বলিল "একটু বোস বাবা, এখনি তোমাকে খেতে দিচ্ছি, গোপাল আমার!" মোহিতবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল "দাদা, তুমি হারাধনকে কা'ল থেকেই আফিসে নিয়ে যাও। তুমি যা দেবে, আমরা তাই হাত পেতে নেব। আর দেখ, কা'ল একবার তুমি এসো; তোমার হাতে গয়না দেব; তাই বেচে তুমি আমাদের ধারটা শোধ করে দিও।"

মোহিতবাবু বলিলেন "কমলা, তুই কি সব ভুলে গেলি বোন! তোর গয়না বিক্রী ক'রে ধার শোধ দিতে হবে। ভগবান! এ কথাও আজ শুনতে হোলো। ও সব কথা আর বলিস্‌নে কমলা! তোর দাদা এখনও দুই হাজার টাকা দিয়ে ধার শোধ দিতে পারে। তুই কাঁদিস্‌নে বোন! আমারই ভুল হয়েছিল। আমি না বুঝে তোকে বড়ই ব্যথা দিয়েছি। না, কমলা, তোকে কোথাও যেতে হবে না। তুই এখানেই থাকবি—এই বাড়ীতেই তোকে থাকতে হবে। আমি বড়ই অন্যায় কথা বলে ফেলেছিলাম। কমলা, এত শোকের মধ্যেও আমার মনে যে কি হচ্চে, তা আর তোকে কি বল্‌ব। তোর মত বোনের ভাই ব'লে আমার যে প্রাণে কি বল আস্‌ছে কমলা, তা আমি বল্‌তে পারছি নে।" রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভাই রমেশ, তুমি কা'ল সকালে একবার আমাদের বাড়ীতে যেও; দুজনে গিয়ে তোমাদের ঐ ধারটা কা'লই শোধ করে দিয়ে আস্‌ব। আর তুমি কা'ল থেকেই আফিসে বেরিও। আর একটা কাজ কর না ভাই; গাড়ীতে আমার ব্যাগটা আছে; সহিসকে বল ত যে, ব্যাগটা নিয়ে আসে।"

রমেশ চলিয়া গিয়া একটু পরে নিজেই ব্যাগটা হাতে করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার হাতে ব্যাগ দেখিয়া মোহিতবাবু বলিলেন "তুমি আবার ওটা বোয়ে আন্‌লে কেন? সহিসকে বল্‌লেই হ'ত।" "তাতে কি" বলিয়া রমেশ মোহিতবাবুর সম্মুখে ব্যাগটা নামাইয়া রাখিল। মোহিতবাবু ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "ওগো, তুমি আমার সঙ্গে পাশের ঘরে এস ত!"

মোহিতবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে যাইয়া বলিলেন "দেখ, আমি যতদূর জানি, তাতে বোধ হয় কমলার হাতে টাকা কিছু নেই। আমি তাকে এখন কিছু দিতে পারব না। তুমিও তার হাতে কিছু দিও না। আমি তোমার কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে যাচ্ছি; তুমি চুপ করে রমেশের স্ত্রীর হাতে দিও; আর তাকে বলে দিও, কমলা যেন-এ কথা কিছুতেই এখন না জান্‌তে পারে। আর আমি বাড়ীতে গিয়ে সন্ধ্যার পর গাড়ী পাঠিয়ে দেব; মা যদি আসেন, তবে তাঁকেও পাঠিয়ে দেব; তুমি সেই গাড়ীতে যেও। কমলাকে বাড়ী নিয়ে যাবার কথা কেউ মুখে এনো না; আমি বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে মাকেও সে কথা ব'লে দেব।" এই বলিয়া মোহিতবাবু ব্যাগ খুলিয়া ৫০৲ টাকা তাঁহার স্ত্রীর হাতে দিলেন। তাহার পর, কমলা যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে যাইয়া বলিলেন "কমলা, আমি তা হলে এখন আসি। আমি না গেলে ত মা আস্‌তে পারবেন না। আমি কাল সকালে যদি না পারি, ত আফিস-ফেরত আসবই! তুই মন স্থির কর কমলা! তোকে আমি আর কি বল্‌ব বোন!"

কমলা দাদার মুখের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; মোহিতবাবু মলিনমুখে চলিয়া গেলেন।

(৩)

বিপদ একাকী আসে না, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু রমেশের জন্য যে এত বিপদ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এবং একটির পর আর একটি এত শীঘ্র আসিবে, ইহা হয় ত কেহই মনে করেন নাই। রমেশের পিতা গেলেন; তাহার তের দিন পরেই কাল ওলাউঠা আসিয়া সংসারের একমাত্র অবলম্বন বড়ভাই যোগেশকে লইয়া গেল। ইহাতেই বিপদের শেষ হইল না। যে দিনের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইদিন রাত্রিতে নারায়ণকে কোলের কাছে করিয়া কমলা শয়ন করিয়া আছে। নারায়ণ ঘুমাইতেছে; কিন্তু কমলার চক্ষে নিদ্রা নাই। সে কত কি ভাবিতেছে। হয় ত বাহিরের অন্ধকারের মত তাহার হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; হতভাগিনী বিধবা সেই ঘোর অন্ধকারে পথ পাইতেছে না, সামান্য একটু আলোক-রশ্মির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। এমন সময় নারায়ণ 'জেঠামশাই' বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। কমলা তখন তাড়াতাড়ি

'ষাট, ষাট' বলিয়া নারায়ণকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "বাবা, নারায়ণ, কি হয়েছে বাবা!" নারায়ণ পুনরায় 'জেঠামশাই' বলিয়া আরও উচ্চ চীৎকার করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 'বাবা, বাবা, নারায়ণ, কি হয়েছে বাবা!' বলিয়া কমলা নারায়ণকে কোলে করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘরে আলোক নাই, ঘোর অন্ধকার! নারায়ণের কি হইল বুঝিতে না পারিয়া কমলা তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আনিয়া পুনরায় ডাকিল "বাবা, নারায়ণ!"

নারায়ণ তখনও কাঁপিতেছিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কমলার ভয় হইল; সে তখন চীৎকার করিয়া ডাকিল 'ও হারাধন, ও ছোটবৌ, শীগ্‌গির উঠে এস।" তাহার সে কণ্ঠস্বর, সে আর্ত্ত-ভীত চীৎকার যে শুনিল, সেই কাঁপিয়া উঠিল। রমেশ ও লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। লক্ষ্মী বলিল "দিদি, কি হয়েছে? তুমি অমন করছ কেন?" কমলা বলিল "ওরে শীগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আয়। বাবা, বাবা নারায়ণ, বাবা গো!"

লক্ষ্মী সেইখানেই বসিয়া পড়িল, তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। রমেশ দৌড়িয়া গিয়া লণ্ঠন লইয়া আসিল। তখন সকলে দেখিল যে, নারায়ণ কাঁপিতেছে, তাহার মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার চক্ষুতারকা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। 'ওগো, আমার কি হোলো গো' বলিয়া কমলা নারায়ণকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই গোলমাল শুনিয়া নীচে হইতে বৃদ্ধ ভৃত্য বুদ্ধু উপরে আসিল।—তাহাকে দেখিয়া রমেশ বলিল "বুদ্ধু, দৌড়ে রাম ডাক্তারের কাছে যা। গিয়ে বল্, খোকার কি হয়েছে। এখনই আস্‌তে হবে, একটুও যেন দেরী না হয়। ডাক্তারকে খবর দিয়েই মোহিত বাবুদের বাড়ী যাবি;—তাঁদেরও এখুনি আস্‌তে বল্‌বি। দেরী করিস্‌নে বুদ্ধু!" বুদ্ধু বলিল "ভয় নেই মা, মুখমে জল দেও। আমি ডাগ্‌দার আন্‌তে যাচ্ছি।" এই বলিয়া বুদ্ধু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

রমেশ তখন কি করে; তাড়াতাড়ি খানিকটা জল আনিয়া নারায়ণের মুখে-চোখে ছিটাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু ছেলের সাড়া নেই; সেই একভাবেই সে কাঁপিতে লাগিল, শরীর যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল! কমলা ও লক্ষ্মী কত ডাকিল; কিন্তু নারায়ণ চক্ষুও ফিরাইল না। রমেশ এক-একবার দৌড়িয়া বাহিরে যায়—ঐ বুঝি ডাক্তার আসিতেছে;—আবার ভিতরে আসে!

রাত্রি বোধ হয় চারিটার সময় এই ব্যাপার হইয়াছিল। ডাক্তার আসিতে আসিতেই ভোর হইয়া গেল। ডাক্তার নানারূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'কোন চিন্তা নেই; হঠাৎ ভয় পেয়ে ছেলের এমন হয়েছে। রমেশবাবু, আপনি দৌড়ে আমার ডিস্পেন্সেরীতে গিয়ে এই যন্ত্রটা নিয়ে আসুন! আর এর জন্য যা-যা দরকার সে সব গুছিয়ে এখনি নিয়ে আস্‌তে আমার কম্পাউণ্ডারকে বল্‌বেন। কম্পাউণ্ডার যদি না এসে থাকে, তা হলে দরোয়ানকে পাঠাবেন না, আপনি নিজেই পাশের গলিতে ১৭ নম্বর বাড়ীতে গিয়ে শশীকে ডেকে আন্‌বেন। লোক পাঠালে তার আস্‌তে দেরী হতে পারে। যান, এখনই যান।" রমেশ একটুও বিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

একঘণ্টার মধ্যেই যন্ত্রপাতি আসিল; আরও একজন বড় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া মোহিতবাবু আসিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দুইঘণ্টা ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও ডাক্তারেরা নারায়ণের জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারিল না। তখন সকলেই বুঝিল, জীবনের আর আশা নাই।

কমলা এতক্ষণ নারায়ণকে কোলে করিয়াই ছিল। মধ্যে কেবল ডাক্তারদের কথামত দুই একবার বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছিল; আবার ডাক্তারদের কাজ হইয়া গেলেই নারায়ণকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল।

বেলা যখন নয়টা, তখন নারায়ণকে লক্ষ্মীর কোলে দিয়া কমলা ধীরে-ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই বিপদের সময় বিপদবিনাশনকে ডাকা ছাড়া আর পথ নাই। সে তখন গৃহসংলগ্ন একটু অনাবৃত স্থানে যাইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সকল বিঘ্নবিনাশনকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু সে যাহাকে ডাকে, তাঁহার কথা ত তাহার মনে হয় না। তাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে যোগেশেরই স্বর যেন তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। তখন কমলা ডাকিতে লাগিল "ওগো, তোমাকেই আজ আমি ডাকৃছি। এতকালের মধ্যে ভগবানকে ডাকি নাই, তাঁকে চিনি নাই। বার বৎসর বয়সের সময় থেকে তোমাকেই চিনেছিলাম, তোমাকেই ডেকেছিলাম। আজও তোমাকেই ডাক্‌ছি প্রভু, আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার

নাম ত করতে পারি না ; তোমার নাম ত মুখে আনি নাই— তবুও গোপনে তোমাকেই ডেকেছি। তোমারই চরণ মনে-মনে পূজা করেছি। আমার ত আর কোন দেবতা নাই ; তুমিই আমার দেবতা। তুমি যেখানেই থাক, যে দেশেই থাক, আজ আমার প্রার্থনা শোন, ওগো শোন! তোমাকে শুন্‌তেই হবে। আজ এই দশ বৎসর তোমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করি নাই, স্বধু তোমার মুখই দেখেছি ; আর ত কিছু আমার প্রার্থনার ছিল না। আজ আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর। আর কোন দিন কিছু চাইব না ; শোন প্রভু, নারায়ণ তোমাকেই ডেকেছে ; সে বাপ-মার নাম করে নাই। তোমারই নাম করে অসহায় শিশু কেঁদে উঠছে। শোন, একবার শোন। তুমি যে ওকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছ। আমার যে এখন এক নারায়ণ, আর তোমার নামই সম্বল! ওকে তবে নিয়ে যেতে চাও কেন? আমার প্রার্থনা, নারায়ণকে নিয়ে যেতে পারবে না—নিয়ে যেতে পারবে না। তাকে আজ ভিক্ষা দিতে হবে— আর কোন দিন কোন ভিক্ষা চাইব না ; এই আমার শেষ ভিক্ষা।"

এই বলিয়া কমলা চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় স্বতই অবনত হয়—আর সতীর মহিমা, বিধবার প্রার্থনার বল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বিধবা কমলার যেন মনে হইল, যোগেশ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সেই পবিত্র স্পর্শে কমলার হৃদয় অপূর্ব্ব পুলকপূর্ণ হইল ; তাহার সমস্ত অবসাদ যেন চলিয়া গেল।

তাহার পর যোগেশ বলিল "কমল, ভয় পাইও না। এই ঔষধ লও। নারায়ণকে এই ঔষধ বেঁটে খাইয়ে দেও। তোমায় নারায়ণকে দিয়ে গেলাম।" তাহার পরক্ষণেই সব অন্ধকার!—সব অন্ধকার!

কমলা সবিস্ময়ে চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তাহার যুক্তকরের মধ্যে একখণ্ড শিকড় রহিয়াছে। কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "প্রভু, তোমার এত দয়া! এত দয়া!" এই বলিয়া সে দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া লক্ষ্মীকে বলিল "লক্ষ্মী, দিদি, শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে শিল ধুয়ে নিয়ে আয় ত ; শিগ্‌গির যা। শিগ্‌গির যা।"

লক্ষ্মী নব-বস্ত্র পরিয়া শিল লইয়া আসিল। কমলা তখন গঙ্গাজল দিয়া সেই শিকড় বাঁটিয়া অতি কষ্টে নারায়ণের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। ডাক্তারেরা কত নিষেধ করিতে লাগিল, সে কাহারও কথা শুনিল না।

একটু পরেই নারায়ণ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া ডাকিল "জেঠাইমা"।

ক্ষুদ্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

আমরা 'ছোট'র গরব জানি, রুদ্রকে তাই ক্ষুদ্র করি,
উঠলো জেগে শ্যামের গীতি বাঁশীর ছোট ছিদ্র ধরি।
বিশ্বপিতা এলেন হেথা মাখনচোরা গোপাল হয়ে,
রাম বাঁধিলেন সাগর দেখ, কাঠবিড়ালী বানর লয়ে।
ক্ষুদ্র বামন পাঠিয়ে দিলে প্রবল রাজায় ভূতল-তলে,
বালক ধ্রুব আনলে টেনে হরিরে তার ডাকের বলে।
বিদুরের খুদ্ ক্ষুদ্র বটে, কৃষ্ণ তাতেই তৃপ্ত জানি।
হেরলে কানুর কচি মুখেই বিশ্বখানা নন্দরাণী।
ক্ষুদ্র শাক ও অন্নকণা ধরায় কত তুচ্ছ বল?
দশসহস্র শিষ্য সহ দুর্ব্বাসারে তৃপ্তি দিল।
'দীনবন্ধু দাদার' দেওয়া ছোট্ট ভাঁড়ে প্রচুর দধি,
গল্প নহে সত্য ওগো, দেখ্‌তে পাবে অদ্যাবধি।
বীজেতে রয় বিশাল তরু, পঙ্কজ রয় তুচ্ছ পাঁকে,
অগ্নি রহে গর্ভে শমীর, বিন্দুতে হায় সিন্ধু থাকে।
ক্ষুদ্র প্রণব ওঙ্কারেতে চতুর্ব্বেদের শক্তি রটে,
মহাশক্তি আসেন নেমে আবাহনের ক্ষুদ্র ঘটে।
ক্ষুদ্র মোদের শালগ্রামেতে বিরাট পুরুষ লুকিয়ে রাখে,
তুলসীপাতা সবার ছোট, ভাল বাসেন দেবতা তাঁ'কে।
শিব মাগাদেব ভিক্ষা করেন, বনেতে শ্যাম চরাণ গাভী,
শ্যামার নাহি বসন জোটে, ছোটর সেথা বড্ড দাবী।

প্রাচীন ভারতের কর্ম্মকাণ্ড

[ডাক্তার শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার]

প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ও সংকীর্ণ ধারণা প্রচলিত আছে। উহার নিরাকরণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই ধারণা অনুসারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন হিন্দুর আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। তাহার উন্নতির ধারা কেবল একদিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল—সর্ব্বতোমুখী হইয়া নহে। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুসমাজ পূর্ণাঙ্গ পরিণতি এবং সর্ব্বাবয়ব-বিশিষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

যাঁহারা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত একটু পরিচয় রাখেন, তাঁহারা মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুর অসাধারণ প্রতিভা ও কৃতিত্ব কখনই অস্বীকার বা সন্দেহ করিতে পারেন না। যাঁহারা আমাদিগের বিরাট-সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবেন যে, যে সভ্যতা এবং সামাজিক উন্নতি ও আদর্শ উক্ত সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার স্থান বিশ্বমানবের উন্নতির ইতিহাসে অতি উচ্চ। বাস্তবিক আমাদিগের প্রাচীন সাহিত্যে সামাজিক-ব্যবহার, ব্যবস্থা-বিধান, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রীতি-নীতির যে বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদিগের প্রাচীন সমাজ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল; এবং সেই উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ়, গভীর ও সুবিস্তৃত। পাশ্চাত্য প্রদেশে সংস্কৃত-সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটী বৃহত্তর আবিষ্কার হইয়াছিল। সেটী, জগতের সভ্যতার ইতিহাসে হিন্দুর চিন্তার, হিন্দুর কর্ম্মের প্রকৃত স্থাননির্ণয়। তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুর চিন্তার ধারা মানবজাতির চিন্তাধারাকে যে কি ভাবে এবং কিরূপে কতটা পুষ্ট করিয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার অবসর পান নাই। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারে প্রাচীন হিন্দুজাতি যে অক্ষয় ও অমূল্য উপকরণ প্রদান করিয়াছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার উপায় প্রতীচ্যে তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদিনে ইউরোপ আমেরিকায় প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংস্কৃত আলোচনার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সমাজ ধারণা করিতে পারিয়াছেন যে, মানবের আধ্যাত্মিক সম্পৎ হিন্দুর চিন্তাদ্বারা কত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। জগতের রঙ্গমঞ্চে হিন্দুরা যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহার বিশেষত্ব এবং প্রকৃত মর্ম্ম এতদিনে পরিস্ফুট হইতেছে এবং যথোচিত সমাদর লাভ করিতেছে।

ফলতঃ, চিন্তা-জগতে অসাধারণ কৃতিত্ব-নিবন্ধন ভারতবর্ষ আজ জগতের সম্মানার্হ। প্রাচীন ভারতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চ্চা ও উন্নতি কেহই এখন অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেই কারণে অনেকের ধারণা যে, ভাবরাজ্যে ভারত যেরূপ উচ্চাধিকারী, বাস্তব-রাজ্যে এবং সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সেই অনুপাতে নিম্নাধিকারী এবং বিশেষভাবে অপটু। তাহাদিগের মতে হিন্দুর প্রতিভা একাভিমুখী। উহার কৃতিত্ব কেবল দর্শনে—বিজ্ঞানে নহে। প্রাচীন হিন্দু পারলৌকিক ব্যাপারেই সুপটু, কিন্তু লৌকিক-কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য।

কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রথমতঃ—উহা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। মানব-সমাজ-বিজ্ঞান সমাজ-জীবন সম্বন্ধে যে সকল মূল তথ্য ও সত্যের নির্দ্ধারণ করিয়াছে, যে স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা সমাজের গতি ও উন্নতি নিয়ন্ত্রিত এবং গঠিত হয়, উক্ত সিদ্ধান্ত তাহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ—উহা ঐতিহাসিক সত্য-বিরুদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে যে, বৈষয়িক উন্নতি-সাধন ব্যতীত কোনও জাতিই মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ব্যক্তির জীবনে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, দৈহিক প্রাকৃত অভাব গুলির তীব্রতাড়না অগ্রে উপশমিত না হইলে উচ্চ অঙ্গের কোনও চেষ্টা এবং কর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে পারে না, জাতির জীবনেও তদ্রূপ।

পেটে ক্ষুধা থাকিলে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিও কোনরূপ উচ্চ চিন্তার অবসর পাইতে পারেন না। অনশনক্লিষ্ট দেহী দৈহিক অভাবেই অভিভূত। তাহার মন এবং আত্মা বিকাশ পাইবার অবকাশ পায় না, বরং দেহের রক্ষাকার্য্যে তাহাদের শক্তি প্রযুক্ত হয়। দেহাত্মবোধ ব্যক্তির দৈহিক অভাব পূরণ না হইলে অন্য কোনও অভাবেরই বোধোদয় হয় না। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি তাহার বৈষয়িক অবস্থা-সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি অশন বসন ও আশ্রয় এই ত্রিবিধ প্রাকৃত অভাব মোচনের উপায় সংগ্রহ করিতে সারা জীবন, দিনের পর দিন এবং বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত করে, সেই ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং মনের উৎকর্ষ সাধন কিম্বা আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধান সম্ভবপর হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের যে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক নিঃসন্দেহ অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার মূল কারণ আমাদের বৈষয়িক দুরবস্থা। যে দেশে শতকরা ৯০ জনের অধিক সংখ্যক লোক কেবলমাত্র প্রাণধারণ করিবার জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়, সেই দেশের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন যে একেবারে রুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে যে নিয়ম, জাতীয় জীবনের সম্বন্ধেও তাই। জাতি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র।

সুতরাং প্রাচীন ভারতের যে সর্ব্ববাদিসম্মত বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতিসাধন হইয়াছিল, তাহা বৈষয়িক সমৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জগতের সমক্ষে আমাদের এখন প্রমাণ করিতে হইবে যে, হিন্দুর প্রতিভা শুধু চিন্তারাজ্যেই অসাধারণ আধিপত্য স্থাপন করে নাই; সেই প্রতিভা বাস্তব জগতে, জড় জগতের স্থূল এবং জটিল ব্যাপারেও যথেষ্ট কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল। আমাদিগকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে যে, হিন্দুর শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিধি, ব্যবস্থা, কেবল কর্ম্মবিমুখ সংসারত্যাগী উৎকট বৈরাগীর দল সৃষ্টি না করিয়া, জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে সক্ষম ছিল। আমাদের এখন দেখাইতে হইবে যে, হিন্দু যেমন পরকালের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, ইহকালের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং অকর্ম্মণ্য ছিলেন না; অতীন্দ্রিয়ের দিকে তিনি যেমন মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়াযত্তের উপরেও তাঁহার যথাযোগ্য অধিকারলাভ হইয়াছিল; অনন্ত জীবনের সন্ধানে তিনি যেমন নশ্বর জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নশ্বর জীবনের বিধি-নিষেধ এবং শাসনপ্রণালী সম্বন্ধেও তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল।

এই নিগূঢ় ও উপেক্ষিত বিষয়টি সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমানকালে মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবন ক্ষণভঙ্গুর, বিদ্যা বহু, কর্ম্মী অল্প, কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল। এতদবস্থায় আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রদ হয় এবং তাহার কোন অপচয় না হয়, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। জাতীয়-জীবনগঠনে সহায়তা করাই যদি ইতিহাস আলোচনায় মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইতিহাস-ক্ষেত্রে বিষয়নির্ব্বাচন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন বলিয়া গিয়াছেন যে, সকল বিদ্যার মূল-লক্ষ্য ও সার্থকতা দেশ এবং সমাজের সেবা। যে বিদ্যায় সমাজসেবার উপযোগিতা নাই, সে বিদ্যার তত আদর হইতে পারে না। ইতিহাস সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত বলিয়া সমাজ-কল্যাণসাধনে তাহার প্রধান উপযোগিতা। এই উপযোগিতার মাপকাটি লইয়াই ঐতিহাসিক গবেষণার মূল্য ও সার্থকতা নির্দ্ধারিত হয়। জগতের ঐতিহাসিক-সাহিত্যে যে সকল পুস্তক অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই আপন-আপন দেশের ও জাতির বিশেষভাবে কল্যাণসাধন করিয়াছে।

বৈষয়িকক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দু যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান আছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সমাজ-শাসন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যে যে বিস্তৃত এবং সুগভীর আলোচনা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনার অংশ স্বল্পই। বস্তুতঃ, বাস্তবকে মুখ্য বিষয় করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যে পুস্তকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। তৎ-সম্বন্ধে উপকরণ কোনও বিশেষ গ্রন্থে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু সকল শাস্ত্রের পুস্তকাবলীতে উহা অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের অন্তর্গত বেশীসংখ্যক পুস্তক অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন ভারতের শিল্প পরিচয় আমরা সকল প্রকারের সাহিত্যে ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য

বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যকে মন্থন করিয়া এই বিক্ষিপ্ত উপকরণ ও প্রমাণাদি এক এক বিষয়ের আলোচনায় অঙ্গীভূত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা। বাস্তবরাজ্যে প্রযুক্ত হিন্দুর প্রতিভা পদার্থবিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে যে কি অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে, তাহার যথোচিত পরিমাণ করা আমাদিগের মৌলিক গবেষণার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত।

ঐতিহাসিক গবেষণা এই নূতন দিকে চালনা করিলে যে বিশেষভাবে সুফলদায়িনী হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। অদ্যাবধি এই বিষয় লইয়া দেশে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফল যথেষ্ট আশাপ্রদ। বাস্তবক্ষেত্রে চিকিৎসা, শল্যবিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুর চিন্তাশক্তি যে কৃতিত্ব ও সাফল্যের সর্ব্বজনসম্মত পরিচয় দিয়াছে, তাহা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে সকলেই অবগত আছেন। বহু বর্ষ ধরিয়া প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিশদ আলোচনার ফলে আমরা এখন বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, বাস্তবিদ্যা, ভাস্কর্য্যবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ভৈষজ্যবিদ্যা, রঞ্জনবিদ্যা প্রভৃতি সাংসারিক অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেও প্রাচীন হিন্দুর অধিকার নিন্দনীয় ছিল না। আমরা আরও জানি যে, প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষই ব্যবসায় এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং সেই অগ্রগণ্য নেতৃত্বের পদে শত-শত বর্ষ ধরিয়া অধিষ্ঠিত ছিল। অনেকানেক প্রাচীন জাতি উক্ত ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু তাঁহার প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার বলে স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকার বহুকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও সম্যক্‌ভাবে জানা নাই যে, বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের সেই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠার মূলে তাহার পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণের অসাধারণ সাধনা এবং নৈপুণ্য ছিল। ব্যবহারিক-রসায়নে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ যে অসাধারণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং হস্ত-শিল্পে শ্রমজীবিগণের যে নৈপুণ্য অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই ভারতে নানারকমের বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত হইত; সে সকল তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কারখানায় প্রস্তুত হইতে পারিত না। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া রোমকরাজ্য যে ভারতজাত দ্রব্যনিচয় দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ অনেক বর্ণনা করিয়াছেন; এবং কেহ কেহ ইহাও আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ভারতসাম্রাজ্য রোমকসাম্রাজ্যকে বিলাসদ্রব্য বিক্রয় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার সুবর্ণসম্পৎ লুণ্ঠন করিয়াছে। বাস্তবিকই একদিকে যেমন ভারত হইতে বাণিজ্যসামগ্রী রপ্তানির স্রোতে বহির্গত হইয়া নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, অপরদিকে বিক্রীত দ্রব্যবিনিময়ে ক্রেতাদেশসমূহ হইতে ধনস্রোত নির্গত হইয়া ভারতের দিকে প্রবাহিত হইত এবং তদীয় ধন-ভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিত। বর্ত্তমানকালে অনেকেই ভারতের "ধন-স্রাব" লইয়া গবর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত বিষয়ে যাহাই সত্যাসত্য হউক, প্রাচীনকালে ভারতের যে বিপরীত অবস্থা ছিল, সেই বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন বাণিজ্যজগতে ভারতবর্ষ যে কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছিল, তাহার মূল কারণ বাস্তবশাস্ত্রের চর্চ্চা, পদার্থবিজ্ঞানসমূহের অনুশীলন এবং বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়া-প্রসূত শ্রমজীবীর কার্য্যকৌশল। কিন্তু তাহার এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণ ছিল। পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে জাতি প্রাচীনকালে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেই জাতি স্বকীয় নৌ-শিল্পেও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। জাতীয় নৌ-বাহিনীর উপরই জাতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। যে দেশকে স্বজাত-দ্রব্যের রপ্তানির জন্য অন্য দেশের নৌ-যানের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেই দেশ কখনই বাণিজ্যে অগ্রসর হইতে পারে না। তদ্রূপ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিদেশ হইতে আমদানি করিবার সুবিধা না থাকিলেও রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হয় না। দেশীয় বহির্বাণিজ্য দেশীয় নৌ শিল্পের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ প্রাচীনকালে বিদেশীয় জাহাজ ভাড়া করিয়া দেশীয় বাণিজ্য চালান একরূপ অসম্ভব ছিল। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ অনু-মিত হইতে পারে যে, প্রাচীন ভারতের অসাধারণ বাণিজ্য-বিকাশে দেশীয় নৌ-শিল্প বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও এই অনুমান সম্যক্‌রূপে সমর্থন করিয়াছে। নৌ-বিদ্যা এবং নৌ-শিল্পের নৈপুণ্যে

ভারতের যে শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল, তাহা নহে; বহির্জ্জগতের সহিত দ্রব্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বিনিময়ও বিশেষভাবে চলিয়াছিল এবং তাহার ফলে ভারতের বাহিরে নানা প্রদেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া সেই সেই কেন্দ্র হইতে ভারতীয় ভাব, চিন্তা এবং ধর্ম্ম সমগ্র এসিয়া মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের বাহিরে যে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। নৌ-বিদ্যা ও শিল্পে এতাদৃশ সাফল্য বাস্তবের ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতিভার যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভারতের বৈষয়িক উন্নতি বিবিধ ধারায় প্রবাহিত হইয়া জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধন করিয়াছিল। সেই সর্ব্বতোমুখী উন্নতির প্রত্যেক প্রকাশ অথবা ধারা অবলম্বন করিয়া আমাদিগের এক একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা উচিত। সেই ইতিহাসের উপকরণ নানা শাস্ত্রে, নানা প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। উহার প্রকৃত উদ্ধারসাধন বহু পরিশ্রম এবং বিশেষ পাণ্ডিত্য-সাপেক্ষ। সম্প্রতি জগদ্বিশ্রুত পণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার 'Positive Sciences of the Ancient Hindus' নামক নব-প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানুশীলনের উপযুক্ত পরিচয় দিয়াছেন। রসায়ন, জড়-বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু কতদূর প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতবর সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া অকাট্য প্রমাণপুঞ্জদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুর বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে বঙ্গের সুসন্তান অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ও তাঁহার 'Positive Back-Ground of Hindu Sociology' নামক বিপুল গ্রন্থে সুগভীর এবং সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্র সুবিশাল—আরও কর্ম্মীর প্রয়োজন।

বাস্তবিক বৈষয়িক উন্নতি নানা শাখা প্রশাখায় বিকসিত হইয়াছিল। তাহার পরিচয় এবং সন্ধান আমরা সহজেই পাইতে পারি। নবাবিষ্কৃত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইতে তৎকালে ভারতের বৈষয়িক অবস্থা এবং উন্নতি সম্বন্ধে আমরা প্রচুর পরিচয় পাই। চতুঃষষ্টিকলার কথা সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপরিচিত। একজন টীকাকারের মতে কলার সংখ্যা ৫১৮। তিনি কিন্তু সংখ্যামাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কলাগুলির নাম করিয়া যান নাই। ৬৪ মূলকলা ছাড়া নানাবিধ উপকলা প্রচলিত ছিল; যথা:—কর্ম্মাশ্রয় (২৪) দ্যূতাশ্রিত (২০) পাঞ্চালিকী (৬৪) ঔপায়িকী (৬৪), প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চতুঃষষ্টিকলার নাম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক কলার স্ব স্ব শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। এবং এখনও অনেক কলার শাস্ত্র খুঁজিলে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্র সুবিপুল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ভুবনানন্দ কবিকণ্ঠাভরণ হিন্দুদিগের অষ্টাদশ বিজ্ঞান লইয়া যে বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থে সঙ্গীতাচার্য্যগণের ধারাবাহিক বহু নাম উল্লেখ আছে। কোহলের নৃত্যশাস্ত্রে নৃত্যকলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধেও কোহল সম্পূর্ণ ইতিহাস ও বিবরণ দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নাট্যশাস্ত্রচর্চ্চায় প্রাচীন ভারত বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিল। কোহল নিজে বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর লোক; কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় নাট্যশাস্ত্রশাখার পরিচয় দিয়াছেন। সেই সকল শাখার প্রত্যেকেরই আপন আপন শিক্ষাপ্রণালী এবং শাস্ত্র ছিল; এবং প্রত্যেক শাখা-শাস্ত্রের যথাবিধি সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক, নিরুক্ত, সংগ্রহ ও কারিকা ছিল। কোহলের গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভরতই একমাত্র নাট্যশাস্ত্রকার ছিলেন না। কোহলের গ্রন্থে রঙ্গমঞ্চের বিবিধ রূপ এবং মঞ্চ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও নানা জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অধ্যক্ষপ্রচারশীর্ষক অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে যে সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় সংস্কৃত-সাহিত্যের কোনও একটী গ্রন্থ বিশেষে পাওয়া যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ও শুক্রনীতি ঐ জাতীয় আরও দুইখানি গ্রন্থ। উহারা ভারতের বৈষয়িক অবস্থার দর্পণ বিশেষ।

প্রবন্ধ বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বোধ হয় কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। আশা করি যে নূতন ক্ষেত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, উহা ঐতিহাসি-

কর্ম্মবীরগণকে সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিতে পারিবে। প্রাচীন ভারতের বৈষয়িক ইতিহাস অপেক্ষাকৃত তমসাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার যিনিই অপনয়ন করিবেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশসেবক এবং জাতীয় জীবনগঠনের প্রধান সহায়ক হইবেন। তাঁহার শ্রম প্রমাণাভাবে ব্যর্থ হইবে না। চিন্তা এবং আধ্যাত্মিক জগতে হিন্দুর যেরূপ সমুন্নতি প্রতিপাদিত হইয়াছে, বাস্তবরাজ্যে, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অবশ্য সপ্রমাণিত হইবে। প্রমাণের সন্ধান সংক্ষিপ্তভাবে প্রবন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেই আরও প্রচুর সন্ধান এবং নানা গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

ভারতমাতা যথার্থই রত্নগর্ভা। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর প্রসব করিয়াছেন, আর একদিকে তিনি তেমনি কর্ম্মবীরও প্রসব করিয়াছেন। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, তপোনিষ্ঠ ঋষি, সিদ্ধপুরুষের জন্য ভারত যেমন বিশ্ববিশ্রুত, তদ্রূপ কর্ম্মবীর ক্ষত্রিয়, বিচক্ষণ শিল্পী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ, আদর্শ মন্ত্রী, আদর্শ শাসক এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে সিদ্ধহস্ত ও সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌ প্রভৃতির জন্যও চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিবার যোগ্য। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ, কপিল, পাণিনি কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নাম আমাদের জাতীয় কীর্ত্তি, স্পর্দ্ধা, উৎসাহ এবং আশার যেরূপ চিরন্তন কারণ হইয়াছে, সেইরূপ কি চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত, অশোক-সমুদ্রগুপ্ত, চরক-সুশ্রুত, প্রভৃতি কর্ম্মবীর ধুবন্ধরগণ আমাদের জাতীয় গর্ব্ব ও ভরসাস্থল নহেন? আশা করি, হিন্দুর আদর্শ, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা অনতিবিলম্বে যথার্থ পরিচয় প্রকাশদ্বারা সংশোধিত হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল্‌, প্রণীত। চারিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য—কাগজের মলাট ১৸৹, বাঁধাই ২৲ দুইটাকা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় খণ্ডাকারে গীতা প্রকাশিত করিতেছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার চারিখণ্ড পাইয়াছি; আরও চারিখণ্ড প্রকাশিত হইলে এই গ্রন্থ শেষ হইবে বলিয়া বসু মহাশয় আশা করিতেছেন। গীতার সমালোচনা করিতে নাই; তাহার পরিচয়ই বা হিন্দুর দেশে, হিন্দুর নিকট দিতে হইবে কেন? সে সকলের মোটেই আবশ্যক নাই। আবার যিনি এই গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই দার্শনিক পণ্ডিত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়েরও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে হইবে না; যাঁহারা বিগত ২৫ বৎসর বাঙ্গালা সাময়িক পত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেবেন্দ্রবাবুর নাম জানেন এবং তাঁহার গভীর দার্শনিকতার সহিত পরিচিত। উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যাহা হয়, এই গীতাও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে মূল, তাহার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সংস্করণের দুইটী বিশেষত্ব আছে; প্রথমতঃ, দেবেন্দ্রবাবু ইহাতে 'বিজয়ব্যাখ্যা' নাম দিয়া নিজের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, গীতার এই সংস্করণ কেমন উপাদেয় হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে প্রায় সকলেই গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, অন্ততঃ একএকখানি ঘরে রাখিয়া থাকেন; তাঁহারা যদি দেবেন্দ্রবাবুর এই গীতাখানি মধ্যে মধ্যে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সময়ব্যয় সার্থক হইবে। তবে লোকে গীতার মর্ম্ম এই পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিবেন কি না, সে কথা কেহই বলিতে পারেন না; কারণ গীতা বুঝিতে হইলে শুধু বিদ্যার প্রয়োজন নহে, সংযম ও সাধনারও প্রয়োজন।

উল্কা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত; মূল্য একটাকা মাত্র

দুইটী বড় গল্প এই পুস্তকে আছে; প্রথমটীর নাম উল্কা, দ্বিতীয়টীর নাম সাজ্‌ঘী। এই দুইটী গল্পই যথাক্রমে 'মানসী' ও 'ভারত-মহিলায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। উল্কা গল্পটীর আখ্যানভাগ অতি সুন্দর, সকল দিক না দেখিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিলে, কেবল উপর উপর দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে যে, সময় সময় কি বিষময় ফল হয়, তাহা এই গল্পে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। মন্মথ ও শৈলেনের চরিত্রাঙ্কন বেশ হইয়াছে; মন্মথর মত মানুষ এখনকার শিক্ষিত সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শৈলেনের মত একবারে বিরল হইতেছে। 'সাজ্‌ঘী' গল্পটীও বেশ হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন এবং দুইচারিজন শিক্ষালাভও করিতে পারেন। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই ভাল।

বিবাহ বিপ্লব

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত; আট আনা

এই পুস্তকখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের 'আট আনা সংস্করণ' গ্রন্থাবলীর পঞ্চম গ্রন্থ। 'বিবাহ-বিপ্লব প্রথমে 'প্রবাহিনী' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার পর গ্রন্থকার পত্রিকার বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠা হইতে একত্রে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি আট আনা সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানি ডিটেক্‌টিভ গল্প; কিন্তু ডিটেক্‌টিভ গল্প নাম শুনিয়াই যাঁহারা মনে করিবেন যে, ইহা বিলাতী কোন গল্পের অনুবাদ, তিনি ভ্রমে পড়িবেন। ইহা কোন বিলাতী গল্পের অনুবাদ বলিয়া ত আমাদের মনেই হয় না; এ দেশের, আমাদের মধ্যের ঘটনা লইয়াই এই গল্পটি লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশব বাবু নিপুণ শিল্পী; তাঁহার হাতের তৈয়ারী জিনিস যে মন্দ হইতে পারে না এ কথা সকলেই বলিবেন। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

য়ূরোপে তিনমাস

[মাননীয় ডাক্তার শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম. এ., এল্. এল্. ডি., সি. আই. ই]

(উপসংহার)

উজ্জ্বল আলো—উঁচু সুরের গ্রামোফোন ঠিক সময়োপযোগী বোধ হইল না। ভুক্তভোগীদিগের অনভিমতেই বোধ হয় কোন হিতৈষী বন্ধু এ 'উচ্চ', আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, তখন অন্য পরদায় বাঁধা। 'বেসুর,' আলো, 'বেসুরা' সুর বন্ধ করাইয়া প্রাণ হাঁপ ছাড়িল। মাতৃ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদনার্থ প্রাণ নিভৃত খোঁজে ;—নিস্তব্ধতায় নিচু সুরেই তার আনন্দ !

রেলগাড়ীর প্রথম প্রথম পাহাড়ে পথে যে মন্দ গতি ছিল, বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া অবধি সহানুভূতি প্রদর্শনচ্ছলেই যেন প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

"ধাবত্যামী মৃগ-যবাধময়েব রথ্যাঃ"

একদিন বড় বাহাদুরীর কথা ছিল। "মৃগ-যব ও "রথ্যাযবে"র গর্ব্ব একদিন "বড়মা" খর্ব্ব করিয়াছিল। নকাকাবাবুর মোটরগাড়ী প্রথম যে দিন তাহাকে বায়ুবেগে সার্কুলার রোডে নূতনবৌদিদির পিত্রালয়ে লইয়া যায়, স্তম্ভিত হইয়া সে অনেকক্ষণ বাক্যব্যয় করে নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিল :—"আচ্ছা মোটরগাড়ী ত মানুষ, গরু, বাছুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ীর (অর্থাৎ কলিকাতার কলঙ্ক-কীর্ত্তি সার্কুলার রোডের ময়লাফেলা রেলগাড়ী) চেয়েও জোরে চলেছে। কিন্তু আমি যত মনে করি, তার চেয়েও জোরে যেতে পারে কি ?"

ইহার বৎসরেক পূর্ব্বে মেঘ ডাকিলে সে জিজ্ঞাসা করিত, "ভগবান বুঝি গাড়ী তৈয়ারী কর্ত্তে হুকুম দিয়েছেন—তাঁর গাড়ী বুঝি আস্তাবল থেকে বাহির কচ্ছে ?" বিদ্যুৎ হানিলে জিজ্ঞাসা করিত "গাড়ীর বাতি জ্বাল্‌বার দেশলাই বুঝি ভিজে গিয়েছে, তাই ভাল জ্বলছে না"। পুরীধামের তরঙ্গভঙ্গের "হাসি 'কান্না', 'রাগ,' 'আহ্লাদ' প্রভৃতি নিপুণচিত্তে, তন্ময় হইয়া অধ্যয়ন করা যাহার সনাতন আনন্দ ছিল এবং সাগর-রাণীর মানসিক প্রত্যেক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রিপোর্ট যাহার প্রতি জাগ্রত মুহূর্ত্তের কাজ ছিল, তাহার পক্ষে এ প্রশ্ন অদ্ভুত নয়। কিন্তু তাহার সদুত্তর তখন আমার বুদ্ধির অতীত !

পাঁচ বছরের মেয়ের এ 'পাকা' কথা চাপা দিয়াছিলাম, হাসিয়া, ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বিস্তর ঔৎসুক্য ও কৌতূহল নিবারণে অক্ষম বয়স্ক মাত্রেরই ইহাই শ্রেষ্ঠ দুর্গ।

আজ বালি ধুলা কাঁকর কয়লা উড়াইয়া "ভৌতিক হাওয়ার" বেগে ওভারল্যাণ্ড মেল মেদিনী কাঁপাইয়া যখন ছুটিয়াছিল, তখন "আমি যত মনে করি, তাহার চেয়েও জোরে গাড়ী যাইতে কেন; পারে না", বড়মার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য শীঘ্র হইতে শীঘ্রতর চেষ্টা কেন করে না, প্রবাসের শেষ কয়েক মাইল পথে সহস্রবার সে প্রশ্ন মনে উদয় হইয়া, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন এবং "ডাক্তারত্বের" অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

সেই বড়মা,—বড়মার দাদা, দিদিমা, দিদি, কাকা ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়া পরিবেষ্টিতা সেই বড়মা সম্মুখে ;—মালা ফুল আলো গ্রামোফোনের সময় তখন নয়। বিরহ-ব্রত দীর্ঘ মাসত্রয় যখন বর্ষত্রয়ের তুল্য মনে হইতেছিল, তখন এ সকল আড়ম্বরের প্রত্যাখ্যান প্রয়োজন।

দশমীর চাঁদ ডুবিয়াছে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুদ্ধ-আঁধারের মাঝে যাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি অস্পষ্ট, আঁধারেই তাহাদের সহিত মিলন-প্রয়াসই স্বাভাবিক। কলহাস্য, উচ্চ স্বর, জ্বালাময়ী আলোকমালার সেখানে স্থান নাই। এ আঁধারের একটা বিশেষত্ব আছে, মাধুর্য্য আছে, সামঞ্জস্য আছে—যেন স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান আছে। "উজ্জ্বলে মধুরের" তালিকা সঙ্কলনের সময় বঙ্কিমবাবুর এ কথা মনে পড়ে নাই বলিয়া সে তালিকা অসম্পূর্ণ। অথবা মহকুমা হইতে সদরে বদলী হইবার সময়, কিম্বা

কলিকাতা হইতে কাঁঠালপাড়া যাইবার সময় অঘটন-ঘটন অসম্ভব নহে, বলিয়াই বুঝি এ মধুর তালিকা অসম্পূর্ণ।

সে হাওড়ার প্লাটফর্ম্মে আলোক-ঝটিকার প্রবল আঘাতে, স্নেহ-ভক্তিভরে প্রণত ভ্রাতা ও পুত্রগণের অস্পষ্ট মুখচ্ছবি একটা বিষম ঝাপ্‌সার ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলাম। রাত্রি অধিক, আলোক অধিক, কিম্বা পথশ্রম অধিক, বলিয়া কি সে ঝাপ্‌সা বড় ঘন বোধ হইতেছিল? না, অন্য কারণে? স্নেহোৎফুল্ল বান্ধবগণ যখন আদরভারে ও আদর-পরিচায়ক ফুলমালার ভারে নিপীড়িত করিতেছিলেন, তখন কাহারও মুখ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। সেই পীড়ন, নির্যাতন তির্য্যগ্‌দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ও জাহাজের সহচরগণ 'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে' নিশি বঞ্চনার পর 'দশ দিকে গমন' পন্থা অবলম্বন করিয়া যখন আমায় আংশিক অব্যাহতি দিলেন, তখনও সে ঝাপসা কাটে নাই। কাহাকে দেখিলাম, কাহার সম্ভাষণের কি উত্তর করিলাম, কিছু মনে পড়ে না। ফুলমালা, আলো, জনসঙ্ঘ, বান্ধবকণ্ঠে সমুচ্চারিত জয়গীতি একাকার হইয়া মিশাইয়া গেল। সুরেশের দ্রুতগামী মোটরও যেন সে দিন আদর-সোহাগে শ্লথগামী। বাড়ী পৌছিয়া আবার কয়েকজোড়া ঝাপ্‌সা চোখের সান্নিধ্যে দৃষ্টি-... বিশেষ শ্রীসম্পন্ন হইল বোধ হয় না। যাইবার সময় শাসাইয়াছিলাম "যতগুলি চোখে যত ফোঁটা জল পড়িবে, প্রবাস-দৈর্ঘ্য তত মাস বাড়িবে"। আজ বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। সে বাধা আর মানে কে? আর সে শাসনই বা করে কে?

প্রবাস-অবসরে গৃহস্থের অবকাশ-প্রাচুর্য্য, শিল্পনৈপুণ্য-প্রাচুর্য্য এবং কবিত্ব-প্রাচুর্য্যের প্রমাণের অভাব দেখিলাম না। অভ্যর্থনা, প্রত্যুদ্গমন, সম্ভাষণ-পরিচায়ক অশন-বসন-আসন-বৈচিত্র্যে সহস্র "স্বাগত" প্রকটিত। বালক বালিকাগণের স্বহস্ত-সমৃদ্ধ কারুকার্য্যে গৃহভিত্তি খচিত। স্বয়ং বাগ্দেবী পশমের হরফে, কাষ্ঠের ফ্রেমে, কাঁচের হাজতে বন্দী। কিন্তু চোখের কোলের কালী সমস্ত যত্ন সমাহৃত সম্ভারের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মামলা ফাঁসাইয়া দিল। আসনের আদর হইল বটে, কিন্তু যাইবার দিনের মত অশন অস্পৃষ্ট রহিল। শত ধন্য সেই, যাহাকে প্রবাস মোচনে প্রাণকাটা ভাষায় স্বভাব-সরল উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রাণে বরণ করিয়া লয়! ইংরাজী বাঙ্গলা সংস্কৃত ভাষায় অনেক কবিতা, গীতি ও বক্তৃতায় প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে ও পরে অসংখ্য সভাসমিতি মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ গীতি, কবিতা ও বক্তৃতা সেই চোখের কালীর অধিক মর্ম্মস্পর্শী?

ঝাপ্‌সা না কাটিতে-কাটিতে প্রাচীমূল তরুণাভ। জয় জগদীশ হরে—জীবন-প্রভাত!

বহুদূর বিস্তৃত, বহু পুরাতন, অথচ চির-নবীন এবং চিরপ্রিয় জননীর কর্ম্মক্ষেত্রের যবনিকা ধীরে-ধীরে উত্তোলিত হইল। যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, লইয়া আসিলেন; যাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম নিপুণতার সহিত সংসাধন-কল্পে এত আয়াস, এত ক্লেশ, এত আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলময় শ্রীপদে আত্ম-নিবেদন, কর্ম্ম নিবেদন, সর্ব্ব-নিবেদন করিয়া "যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম"।

প্রভাতসূর্য্যের সহিত কত বান্ধব, কত আত্মীয়, কত স্নেহাস্পদ জন আসিয়া কত আদর, কত আশীর্ব্বাদ, কত মঙ্গল-সাফল্য কামনা করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। সেই দিন হইতে কত দিন কত সভা-সমিতি-সমারোহে সে সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা পুঞ্জীকৃত হইল, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া কত সম্বর্দ্ধনা-কার্য্যবিবরণ পাঠক-শ্রেণীবিশেষের ধৈর্য্যচ্যুতি করিল, তাহার পুনরুক্তির স্থান ইহা নহে। হৃদয়স্পর্শী কবিতা, গীতি, বক্তৃতায় নগণ্য অধমের নগণ্য কার্য্যকলাপ-ব্যাখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, মাদকতা-নিবারিণী সভা, ধূমপান-নিবারণী সভা, কলিকাতা হাইস্কুল, ইণ্ডিয়া ক্লাব, এটর্ণীর এসোসিয়েসন, সঙ্গীত-সমাজ প্রভৃতির বৈধ কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিল, তাহার সবিস্তার বিবৃতির স্থান এ প্রবন্ধ নহে।

একটি কথা লিপিবদ্ধ না করিলেই নয়। জাত মারিবার, একঘরে করিবার চেষ্টা ঘরে-বাহিরে নিতান্ত কম হয় নাই। যাইবার পূর্ব্বে সে বিভীষিকা সাফল্য-লাভ করে নাই বলিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনের পরও সৎসাহসীবৃন্দের উদ্যোগের ত্রুটি হয় নাই। কোন কুটুম্ব কুটুম্বান্তরের বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ-বন্ধের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেহ বা নিমন্ত্রণ করিয়া, পাছে দেরি হইলে কষ্ট হয় বলিয়া স্বতন্ত্র পাতার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কেহ বা যথার্থই স্নেহভরে সামাজিক-সম্মান-রক্ষার জন্য

'প্রায়শ্চিত্ত'-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সকল বাদানুবাদের উত্তরে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহে সমবেত দ্বিসহস্রাধিক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির পদরজে মুরি লেনস্থ 'প্রসাদপুর' পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অনেক পরে, ইহার উত্তরে যোগী ও সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারী যজ্ঞগৃহে পূর্ণাহুতির সময় সমবেত সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নিজহস্তে সর্ব্বপ্রথমে এই অধমের ললাটে যজ্ঞফোঁটা পরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার উত্তর বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জগন্নাথদেব ও তারকেশ্বরের মন্দিরের মহান্ত, পাণ্ডা ও পূজকগণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও পরে। সঙ্গে-সঙ্গে ইহার উত্তর নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলার আশ্রমে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পৌছিবার পর দিন বৈকালে গুরুকল্প গুরুদাস বাবুকে প্রণাম করিতে গেলাম। পিতৃবন্ধু, পিতৃস্থানীয়, মহাজন আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া প্রেমালিঙ্গনে প্রবাসের সকল ক্লেশ ভুলাইয়া দিলেন। নিজের ঘরে বসাইয়া জলযোগ করাইয়া সব প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য সমাধা করাইয়া দিলেন। নারিকেলডাঙ্গার সে দিনের ব্যবহৃত তৈজসপত্র ফেলা গিয়াছিল, শুনি নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্য আত্মা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যেন সমুত্থ হইয়া স্নেহ আদর এবং অখণ্ড আশীর্ব্বাদের সহিত "ঝাঁকের পাখীকে" "ঝাঁকে" টানিয়া লইলেন।

বাড়ী ফিরিলেই প্রবাস শেষ হয় না। প্রবাসান্ত এত সহজে হয় না—ইহা বলিবার ও বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়, পূর্ব্বে দীর্ঘ প্রবাসের পর "দাড়া গোপালের ভোগ", "তীর্থ-প্রত্যাবর্ত্তন শ্রাদ্ধ" ও আনুসঙ্গিক ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। প্রবাস শেষ হইলেই প্রবাস কাহিনী শেষ হয় না। কথা কি ফুরায়! তিন মাসের ভ্রমণ কথা' 'ভারতবর্ষে'র 'স্তম্ভে' ক্ষোদিত হইতে লাগিল তিন বৎসর। একজন রসিক (রসিকা?) পাঠক (পাঠিকা?) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যাত্রাটা কি গো যানে হইয়াছিল?" যাহা হউক "আমার কথাটি ফুরাল";—গাছ কিন্তু মুড়ায় না। দুপুরে মাতনের পর, কিম্বা আট প্রহর হরিনামের নগর-সংকীর্ত্তনের পর বাড়ী ফিরিলেই গৃহস্থ যেমন তাল ঠাণ্ডার জন্য দধি-কাদার আয়োজন করেন, "ভারতবর্ষের" 'গৃহস্থ'ও সেই আয়োজনের পক্ষপাতী। সৌভাগ্যক্রমে প্রবন্ধ এত ধূলা মাটী আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ যে, প্রয়োজনীয় কর্দ্দমসম্ভার স্বল্পায়াসেই আহৃত হইতে পারে। 'কর্দ্দমশেষ' প্রবন্ধের শেষ হইলেই পাঠক ও মুদ্রারাক্ষস উভয়েরই বিরাম! বিজ্ঞ সম্পাদক ও সাহিত্যিক দণ্ডপাণি জলধর বাবু কিন্তু সহজে পরিত্রাণ পাইতে ও দিতে প্রস্তুত নহেন। বিয়োগান্ত অভিনয় করিয়া গৃহস্থগৃহে "কুশীলব" পূর্ব্বে পরিত্রাণ পাইত না; বিয়োগকে মধুর মিলনে পর্য্যবসিত না করিলে যাত্রাওয়ালার সিধা-বক্‌সীস বাজেয়াপ্ত হইত। সিধা-বক্‌সীসের বিশেষ কি উদ্যোগ আছে, না জানিয়া 'গৃহস্থ' জলধর বাবুর ফরমাইসমত উপসংহার বা মিলনাঙ্কের অবতারণা বড় সহজ নয়। আব্‌দারও তাঁর অনেক। গয়াধামে পিতৃকৃত্যের পর এবং ভারত মহাসাগর বক্ষে প্রভু যে ভাবে ক্ষণেকের তরে হৃদয় অনুপ্রাণিত করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন, সেই ভাব পুনরুদ্দীপিত করিয়া জলধর বাবু ফরমাইস তামিল করিতে হইবে—ইহাই নির্দ্দেশ। ফরমাইস-মত এ ভাবের অবতারণা সম্ভব হইলে, 'পৈত্রিক গুরু'র স্থান অধিকার করা দুঃসাধ্য হইত না। 'যুগে যুগে' প্রয়োজনমত অসারতম হৃদয়েও প্রভুর 'সম্ভব' অসম্ভব নহে। তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। মুহূর্ত্তের জন্য সে কৃপাকণা জীবনে একবার বা একাধিকবার পাইয়া যে ধন্য হইয়াছে, তাহাকে কৃপণের ধনের মত সে রতন সঞ্চয় ও রক্ষা করিতে হয়। ফরমাইস, বা প্রয়োজনমত উদয়-কল্পের বস্তু তাহা নহে। "জলধর-পটল-সংযোগ" হইলেই যদি জলদবরণের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের দৈন্য, ক্লেশ, লজ্জা সব নিবারিত হইত! সে যে অনেক সাধনের ধন। চকিতে দেখা দিয়া সে চকিতে পলায়। Storage battery'র মত ধরিয়া রাখিয়া, অবসরমত যে খরচ করিতে পারে, সে যথার্থ মহাজন। শ্রীক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত মহাপ্রসাদের কণিকার ন্যায় সাবধানে ব্যবহৃত হইয়া সে মহাধন বংশপরম্পরায় জীবন, চরিত্র, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে। চাহিলেই জোটে কই?

"য়ুরোপে তিনমাস" পরিপূর্ণ হইল। বহুদিন-কল্পিত, বহুদিন-প্রতিজ্ঞাত ব্রত উদযাপন হইল! দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক, শিখিলাম অনেক; বুঝি ভুলিলামও অনেক।

কিন্তু সবটাই লাভ। টাকার দিক হইতে না দেখিলে, এ তিনমাসের কারবারটার ষোল-আনাই লাভ। ইংরাজের মধ্যে দেবতা দেখিয়াছি, ঋষি দেখিয়াছি, বীর দেখিয়াছি,

সহৃদয় লোক দেখিয়াছি,—বানরও দেখিয়াছি। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, সাধনা, আতিথেয়তা, সমাজপ্রিয়তা, অভিমানবশে যাঁহারা এ দেশের একচেটিয়া করিতে চাহেন, তাঁহাদের মাঝে মাঝে এ রূপ তীর্থ-পর্য্যটন প্রয়োজন। ইংরাজকে বুঝিতে এবং ভারতবাসীকে ইংরাজের নিকট বুঝাইতে, এ দেশের ভাল লোকের সে দেশে, সে দেশের ভাল লোকের এ দেশে আসা-যাওয়া যত বাড়ে, ততই উভয়ের মঙ্গল। বিধি-নিয়মে উভয়েই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরস্পরের যাথার্থ্য সরজমীন তদারকে পরস্পরের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পকলার অর্জ্জনজন্য বিলাত-যাত্রার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ-প্রয়োগ-সাপেক্ষ নহে—পরস্পরকে চিনিবার, জানিবার ও বুঝিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহারও সম্যক লাভের জন্য এ আদান-প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ মহান উদ্দেশ্যের অন্তরায় সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল-সাধন হইতে পারে না; "জাতমারার" দল সে অন্তরায়-সাধন আর করিতে পারিতেছে না, পারিবে না। সেজন্য চিন্তা নাই; কিন্তু পল্লবগ্রাহী লোকের যাওয়া-আসায় ফল নাই—বরং বিঘ্ন। মানুষের মত মানুষ একটু পরিণত বয়সে যাইলে সকল দিকেই মঙ্গল। বিলাত যাইবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে বা পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে হয় না; স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, নিয়ম-সংযম ত্যাগ করিতে হয় না; বিদেশী ভেক ধরিতে হয় না; বরং নিজ স্বাতন্ত্র্য ভদ্রভাবে রক্ষা করিতে পারিলে সুবিধা হয় ও উপযুক্ত স্থানে সম্মানভাজন হওয়া অসম্ভব নহে, একথা বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিয়াছি। ইংরাজ (স্কচ, আইরিস ইহাতে বাদ পড়ে না) নরনারীর চরিত্রের ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়; তাহাদিগকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়, ভালবাসিতে হয়—একথা বহু স্থানে বহুবার বলিয়াছি; অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় পিতামহ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিজ 'তীর্থ-যাত্রায়' ষাট বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপশ্চিম-ভারতের যে সজীব চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, সেরূপ চিত্র আঁকিবার সাধ্য আমার নাই। বাঙ্গালা ভাষার 'অসংস্কৃত'-অবস্থায় চলতি, ব্যাকরণ-দুষ্ট এবং গ্রাম্য-প্রায় কথায় তাঁহার ওজস্বী লেখনী ও চিন্তাশীল পর্য্যবেক্ষণনিরত মস্তিষ্ক যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছে, তাহার নমুনা সাহিত্য-পরিষদের কৃপায় সাহিত্যিক-মণ্ডলী শীঘ্র পাইবেন—ভরসা করা যায়। এ প্রবন্ধ সে শ্রেণীর নয়; —রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কুমার সরকার শ্রেণীর নয়। 'ম্যাক্স ওরেলের' অনুবাদ-শ্রেণীরও নয়। সাহিত্যের ধার কখন যে ধারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ-প্রকাশ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অপরাধ লেখকের নয়। যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ভাবিয়াছি ও বুঝিয়াছি—তাহারই অতি সামান্য অংশ প্রিয়-জনের অবগতির জন্য দিনে-দিনে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া-ছিলাম। ছাপার হরপে কখন তাহা উঠিবে বা তৎসাহায্যে আধুনিক, সহজ, প্রণালীসঙ্গত সাহিত্যিক স্থান অধিকার করিবে, এ দুরাশায় প্রবন্ধ বলিয়া প্রবন্ধ লিখি নাই। যে অবস্থা-পরম্পরায় সে নগণ্য পত্রাবলী 'ভারতবর্ষের' রুচির দেহ কলঙ্কিত করিবার অধিকার পাইয়াছে, প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় তাহার প্রচুর পরিচয় আছে। এখন পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কাহারও কাহারও কোন কোন অংশ ভাল লাগিয়াছে, শুনিয়াছি। তাই বোধ হয় 'ভারতবর্ষের' কর্ম্ম-কারকেরা স্থান-পূরণ কল্পে এত দিন এই প্রবাস-কাহিনীকে আতিথ্য-সৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ও 'ভারতবর্ষের' অচ্যুতধৈর্য্য পাঠকগণ আমার অসংখ্য ধন্যবাদভাজন। চটি-জুতা, গামছা মগ, চাপকান, চোগা পাগড়ী সাহায্যে যদি কেহ সমর শেষে বিলাত-গমন-প্রয়াসী হয়েন, এই কাহিনী পড়িয়া তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণ আশা-ভরসার সঞ্চার হইলেও হইতে পারে। হ্যাট না পরিলে কুকুরে কামড়াইবে বা রাস্তার ছেলেরা ঢিল-কাদা মারিবে, মদ্য, গো-মাংস, শূকর-মাংসের শ্রাদ্ধ না করিলে ভদ্রগৃহে বা প্রকাশ্য হোটেলে স্থান পাওয়া যায় না, সর্ব্বস্বান্ত না করিলে ও না হইলে বিলাত যাওয়া হয় না এবং বিলাতের সব ভাল, আমাদের সব মন্দ কিম্বা আমাদের সব ভাল, বিলাতের সব মন্দ, এ সকল "পর্ব্বত সমান" ভ্রমের "দেউল" যে সকল পবন-নন্দনেরা "ক্রোধে জলে ফেলে" না দিয়া উত্তরোত্তর বাড়াইতেই থাকেন—তাঁহাদের এ কাহিনী রুচিকর হইবে না। কিন্তু এ দেউলের বৃদ্ধিতে দেশের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। গিবন তাঁহার অমর কথা শেষ করিয়া সুরম্য সুইস হ্রদের তীরে নিতান্ত "সঙ্গীশূন্য ভাবে" বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অমর কথার তুল্যমূল্য-প্রায় কাহিনীর পরিচ্ছেদ-শেষে লেখকের ও প্রকাশকের কি ভাব সম্ভব, তাহা সহৃদয়, ক্ষমাশীল, পক্ষপাতশূন্য পাঠকের হস্তে।

হেয়, উপাদেয়, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ]

আমাদের জীবনের স্রোত, চেষ্টার স্রোত, চিন্তার স্রোত, দুইটি কূলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; তাহার একটী হেয় ও অপরটি উপাদেয়। বেগবতী নদী যেমন এককূল ভাঙ্গিয়া অন্যকূল গড়িয়া বহিয়া যায়, তেমনই আমাদের ইচ্ছা ও প্রযত্ন হেয়কে বর্জ্জন করিয়া ও উপাদেয়কে আলিঙ্গন করিয়া পরিপুষ্ট হয়; হেয়কে বর্জ্জন ও উপাদেয়কে গ্রহণ করিয়াই জীবনীশক্তি প্রতিষ্ঠা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেখানেই জীবনীশক্তির ক্ষুদ্র স্পন্দনটুকু বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেখানেই এই হেয়-উপাদেয়ের সমস্যাটি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ শম্বুক তাহার কম্বু গৃহ হইতে গ্রীবাটি প্রলম্বিত করিয়া দিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তখন সে তৃণলতাগুল্মকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না; আর সম্মুখে কোনও বাধা উপস্থিত হইলে, তাহার পথ রুদ্ধ হইলে, কত যত্নপূর্ব্বক সে তাহা বর্জ্জন করিয়া আপনার সুরক্ষিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে এই যে হেয় পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি, ইহাকে নির্ব্বাচনীশক্তি বলে। এই নির্ব্বাচনীশক্তি ইহার ধর্ম্ম। সংসারে এই বিচিত্র লীলাময়ী নির্ব্বাচনী-শক্তি দেখিয়াই শোপেনহাওয়ার প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে এক অন্ধ অচেতন ইচ্ছাশক্তির লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে শক্তি প্রবোধিত হইয়া মানবের মনে চেতনাময়ী ইচ্ছাশক্তিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা এই হেয়োপাদেয়ের ব্যবহার লইয়া। আমরা একান্ত বাধ্য হইয়া যে কোনও কাজ করি, তাহা আমাদের স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত নহে, ইহা আমরা স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যেখানে স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা পরিচালিত হই, সেখানে যাহা হেয়, তাহার বর্জ্জন ও যাহা উপাদেয়, তাহার গ্রহণ থাকিবেই থাকিবে। অবশ্য একজন যাহাকে হেয় বা উপাদেয় বলিয়া মনে করে, অপরে তাহা নাও করিতে পারে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যাহাকে কোনও ব্যক্তি হেয় বলিয়া মনে করে, সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে, এবং যাহা উপাদেয়, রমণীয় এবং উপভোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহা পাইবার জন্য লালায়িত হয়। হেয়কে ত্যাগ ও উপাদেয়কে বরণ করাই ইচ্ছা-শক্তির ধর্ম্ম।

ইচ্ছা বা প্রযত্ন কোথায় ক্রিয়া করিতেছে এবং কোথায় ক্রিয়া করিতেছে না, তাহার বিচার করা বড় কঠিন। এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কোথায়ও জড়বস্তু যেন আপনার ইচ্ছামত, আপনার গতিতে অবলীলাক্রমে চলিতেছে, আবার কোথায়ও মানব স্বেচ্ছাপ্রসূত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত জড়ের মত দিনের পর দিন একই ভাবে, একই বর্ত্মে চলিয়া যাইতেছে, এরূপও দেখা যায়। এরূপস্থলে জড় ও চেতনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেখাটি রহিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা একান্তই কঠিন। ইচ্ছার পরিচায়ক স্বরূপ যে কয়েকটি লক্ষণ সচরাচর গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা এই—নির্ব্বাচন, সাধন-সংকলন, এবং অনুক্রমিকতা। কয়েকটি সম্ভাবনা যে স্থলে যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার অন্যতমকে গ্রহণ করার নাম নির্ব্বাচন। এই স্থলেই যন্ত্র ও জীবনের পার্থক্য। যন্ত্র একভাবেই কাজ করিয়া যায়, তাহার অন্যথা বা বিকল্প নাই; জীবনের ধর্ম্ম, এই যন্ত্রবদ্ধতা পরিহার করিয়া নির্ব্বাচনী-শক্তির দ্বারা নিজের গতি ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লওয়া। দুইটি পথের মধ্যে অন্যতর অনুসরণ করা, দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটিকে অবলম্বন করা, এবং অন্যগুলিকে পরিত্যাগ করা কেবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন জীবেরই ধর্ম্ম। যন্ত্র বা জড়ে কোথায়ও এ শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঊর্দ্ধে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, সে ভূতলে আসিয়া পড়িবেই; অথবা একটি বটবৃক্ষের শাখা যখন কালবশে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ঝড়ের দুর্দ্দিনে সে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হয়। ইহার মধ্যে সে লোষ্ট্র বা শাখার নির্ব্বাচন করিবার কিছুই নাই। এইখানেই তাহাদের

জড়ত্ব। জীবও অবশ্য এমনি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় এবং সেই নিয়ম সম্বন্ধে যখন জীবের ইচ্ছার কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, তখন জীব জড়েরই ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। তোমাকে কেহ ধাক্কা দিল, তুমি যদি সে বেগ সামলাইতে না পার, তবে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। তাহাতে তোমার নির্ব্বাচনী-শক্তি নাই। শরীর জীর্ণ হইলে, জীবের অবসান হইবে, ইহা ধ্রুব। জীব সেখানেই জড়, যেখানে তাহার ইচ্ছা-শক্তির কিছুমাত্র ক্রিয়া নাই। আবার জড় সেখানেই চৈতন্যোপহত বলিয়া মনে হয়, যেখানে তাহার কার্য্যকলাপের মধ্যে একটি অনির্দ্দেশ্য, অপরিলক্ষিত, গূঢ়, উদ্দেশ্য হেয়োপাদেয়ের সমস্যার সমাধান করিয়া সমগ্র জড় প্রকৃতিকে একটি অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়।

কথাটা বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড় ও চেতনের মধ্যে যে অস্পষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। আমরা সাধারণতঃ প্রকৃতিকে জড় ও চেতন এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকি। জড়ের যাহা ধর্ম্ম, তাহা চেতনে নাই এবং চেতনের যাহা ধর্ম্ম, তাহা জড়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সৃষ্টির এই দুইটি অংশ এমন ওতঃপ্রোতঃ ভাবে মিশামিশি করিয়া রহিয়াছে যে, যাহাকে এক সময়ে আমরা কেবল জড় বলিয়া চিনিয়া রাখিয়াছি, তাহারও মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাশক্তির প্ররোচণা দেখিতে পাই। বর্ষার নববারি-সম্পাতে সমস্ত ধরণী যখন শষ্পাঙ্কুর-সম্ভারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে অমৃতের ধারা বিন্দু-বিন্দু করিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠে, তখন কি মনে হয় না যে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ করিবার জন্যই কোনও অদৃশ্য ইচ্ছাময়ী দেবতা বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এবং শিশুকে বাঁচাইবার মঙ্গলময় উদ্দেশ্যেই জননীর বক্ষে পীযুষধারা বহে? এই সকল হইতে একদিকে যেমন জড়ের চৈতন্য কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়, অপরদিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, আমরা যাহাকে চেতন বলিয়া অভিহিত করি, তাহার অধিকাংশই জড়োপাদানে রচিত। এই দুরপনেয় জটিলতার জন্যই বেদান্ত নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় ব্রহ্মের পার্শ্বে অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন মায়াকে দাঁড় করাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং সাংখ্যকার সমস্ত জড়-প্রকৃতিকে এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষের ছায়ায় চৈতন্যোদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। এস্থলে আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, জড় ও চেতনের সীমা-রেখা অতি সংকীর্ণ হইলেও লোক-ব্যবহারের জন্য আমরা তাহাকেই চেতন নামে অভিহিত করিয়া থাকি, যাহা হেয়োপাদেয়ের বিচার-সমন্বিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রবোধিত।

ইচ্ছাশক্তির অপর দুইটি লক্ষণ সাধন-সংবলন ও আনুক্রমিক পারম্পর্য্য। কথা দুইটি শুনিতে কঠিন হইলেও বোধ হয় বুঝিতে তত কঠিন হইবে না। নির্ব্বাচনী-শক্তির প্রভাবে আমরা যখন দুইটি জিনিসের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লই, তখন তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অল্প বা বহু সাধনসাধ্য। ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য এই যে, যে-কোনও একটি উদ্দেশ্যকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানা 'উপায়' অবলম্বন করে। এই নানাবিধ উপায়ের মধ্যে আবার কতকগুলি হেয়, কতকগুলি উপাদেয়। উদ্দেশ্যের সাধন-ভূত যে উপায়গুলি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ উপাদেয়, তাহার সংহতির নাম সাধন-সংবলন। আমার ইচ্ছা হইল যে বৃক্ষ হইতে আম্র পাড়িয়া খাইতে হইবে। এস্থলে আম্রলাভ যে সাধন-সাপেক্ষ, তাহা বলাই বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যের অনুকূল যে সকল উপায়, তাহার মধ্যে সকলগুলিই উপাদেয় নহে। মনে করুন, একটি সম্ভবপর উপায় এই যে বৃক্ষারোহণে আমি যদি অক্ষম হই, তবে অপর কাহারও দ্বারা আমটি পাড়া যাইতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি হয় ত পারিশ্রমিক হিসাবে আমটি আত্মসাৎ করিতে পারে। অতএব ঐ উপায়টি ত্যাজ্য। এখন নিজে আম পাড়িতে হইলে, ঢিল ছুঁড়িতে হয়। সুতরাং কয়েকটি ঢিল এবং যদি ঢিল লক্ষ্যে পৌছিতে না পারে, এই আশঙ্কায় হয় ত একখানি আকর্ষীও সংগ্রহ করিলাম; ইহার নাম সাধন-সংবলন।

আর একটি বিষয় হইতে আমরা ইচ্ছার ক্রিয়া অনুমান করিয়া লইয়া থাকি; তাহার নাম অনুক্রমিকতা। (Gradation) যখন আমরা কোনও বস্তু লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন তাহা, একান্ত অনায়াসসাধ্য না হইলে, বহু কর্ম্মপরম্পরার দ্বারা সংসাধিত করিতে হয়। আমার কিছু অর্থোপার্জ্জনের কামনা আছে। সেই কামনাকে একদিনে কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ। হয় ত বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টার

ফলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে সকল কার্য্যের দ্বারা উদ্দেশ্যটি পরিণামে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেকটিই একটি স্বতন্ত্র কর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মটিরই একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে। বস্তুতঃ সেই সকল উদ্দেশ্য পৃথক নহে; এই সকল ছোট ছোট উদ্দেশ্য একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হইয়া পরস্পরকে সার্থক ও সফল করে মাত্র। একটি লক্ষ্য অপর একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইরূপে লক্ষ্যের পর লক্ষ্য, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্যের মধ্য দিয়া বৃহত্তম লক্ষ্য সাধিত হয়। এই যে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া স্তরানুক্রমে, একটি লক্ষ্যের সূত্র প্রলম্বিত হয়, ইহার নামই অনুক্রমিকতা। প্রথমে হয় ত অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে আমি কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিলাম। পরে সেই ব্যবসায় বাড়াইয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্যয়সংক্ষেপ এবং আয়ের নানা পথ আবিষ্কারের দ্বারা ক্রমে শত, শত হইতে সহস্র এবং সহস্র হইতে লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিলাম। এই যে ক্রিয়া-পরম্পরার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য-গ্রথিত অনুবন্ধিতা রহিয়াছে, যাহার ফলে একটি নহিলে অপরটি হয় না, ইহা ইচ্ছারই ধর্ম্ম এবং এই স্তর-বিন্যস্ত কার্য্যপরম্পরার মধ্যেও হেয় ও উপাদেয়-ব্যাপারের পরিচয়ই প্রকৃষ্টভাবে পাওয়া যায়। অনেকগুলি কর্ম্ম যেখানে একটি কর্ম্মের অন্তর্গত, অনেকগুলি উদ্দেশ্য যেখানে একটি উদ্দেশ্যের বিভিন্ন স্তরমাত্র, সেখানে প্রত্যেক কর্ম্মটি, প্রত্যেক লক্ষ্যটি অবলম্বন করিবার সময় তাহা উপাদেয় কি না, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুতরাং ইচ্ছা বা প্রযত্নকে যে ভাবেই আমরা বিশ্লেষণ করি না কেন, ইহার ভিতরে আমরা দেখিতে পাই যে, হেয়ের বর্জ্জন ও উপাদেয়ের গ্রহণই মুখ্যভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অনেকের মতে এই হেয় উপাদেয় আমাদের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত। প্রত্যেক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরই একটি উদ্দেশ্য থাকে; এবং সেই উদ্দেশ্যটি অবলম্বন করিবার সময় অপর যত কিছু সম্ভাবনা উদ্দেশ্য-পদবীর প্রার্থী থাকে, সে সকলগুলিকে পরিবর্জ্জন করিতে হয়। এই যে কতকগুলির মধ্যে অন্যতমের নির্ব্বাচন, ইহা সুখ দুঃখের দ্বারাই প্রণোদিত। যাহা আমরা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা সুখমূলক এবং যাহা হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করি, তাহা দুঃখমূলক। আমাদের যত কিছু উদ্দেশ্য আছে বা হইতে পারে, তাহা সুখ-স্পৃহা-সম্ভূত। প্রকৃত পক্ষে সুখ হউক বা না হউক, কর্ম্মফল ফলিবার পূর্ব্বে, তাহা সুখপ্রদ বলিয়া ধারণা না হইলে ইচ্ছার প্রেরণা আসিতে পারে না। এই সকল মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে ইচ্ছা সুখান্বেষণের বা দুঃখ পরিহার-প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র। ইঁহারা বলেন যে, যাহাই আমরা ইচ্ছা করি না কেন, তাহা পরিণামে সুখ বাহী হইবে বলিয়াই করি। আমার সুখ বাড়িবে, অথবা দুঃখ কমিবে, এই আকাঙ্ক্ষাই আমার সমস্ত প্রযত্ন, সমস্ত প্রচেষ্টার মূল। সুখ লাভ করিবার প্রযত্নকে আমরা ইচ্ছা (desire) বলিয়া থাকি, এবং দুঃখকে দূরে পরিহার করিবার প্রযত্নকে দ্বেষ (aversion) বলা যায়। অতএব ইচ্ছা এবং দ্বেষ উভয়ই প্রযত্নসম্ভূত এবং সমস্ত প্রযত্নের মূলেই সুখের সাধ রহিয়াছে। সুখবাদীরা বলেন যে, জীব-প্রবাহের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সুখলিপ্সা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ইচ্ছা পরিস্ফুট নহে (implicit), সেখানেও অন্ধ সুখ লালসা; আবার মানব-জীবনের পূর্ণগরিমময়, পূর্ণবিকাশশীল (explicit), বিচার বিতর্কপূর্ণ নির্ব্বাচনী-শক্তিতেও সুখ লালসা। স্বার্থান্বেষণেও সুখ আছে, স্বার্থত্যাগেও সুখ আছে। জননী যখন ব্যাধিবিধুর পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনশনে, জাগরণে কত দীর্ঘ দিন, কত অকূরন্ত রজনী কাটাইয়া দেন, এবং নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া সন্তানের আরোগ্য-কামনা করেন, তখন সুখবাদী মনে করেন যে, মাতার সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ-পরতার মধ্যেও সুখের লিপ্সা রহিয়াছে। আর, একজন যখন নিজের বিপদকে বরণ করিয়া অন্যের জীবন-রক্ষার জন্য তৎপর হয়েন, তখনও সুখবাদী তাহার সুখের মাত্রা পরিমাপ করিতে ব্যস্ত থাকেন। হেয়োপাদেয়ের মধ্যে ইঁহারা সুখের তারতম্য ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পান না। বড় সুখের নিকট ছোট সুখ হেয়; দুঃখ সর্ব্বত্রই হেয়। উপাদেয় অর্থে উপভোগ্য, সুখদায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অনেকে সুখবাদীদিগের এই প্রকার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইচ্ছার সহিত সুখের যে অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু সুখই কি একমাত্র উপাদেয়? সুখের লাগিয়াই এই সংসার?

অন্যের জীবন-রক্ষা বা দেশের কল্যাণ-কামনায় যে নিজের জীবন অবলীলাক্রমে উৎসর্গ করিতেছে, সে কি কেবল সুখেরই জন্য? ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা যশের কামনা করিয়া থাকি, অর্থের কামনা করিয়া থাকি, দারা-পুত্র পরিবারের মঙ্গল কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি; কিন্তু যশে কত সুখ, অর্থে কত সুখ, পুত্রকলত্রের বিরহে কত দুঃখ, তাহাদের কল্যাণে কত সুখ, কত তৃপ্তি, তাহা আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়া থাকি। আবার বাঁচিয়া কত সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে কত সুখ, তাহাও ত আমরা জানি। নিজের পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে যে যাতনা, তাহার তুলনায় কত সুখ আমরা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হই; আর সেই আমরা অর্থ-পুত্র-কলত্র ভুলিয়া, জীবনের মায়া তুচ্ছ গণিয়া, সকল ভুলিয়া বিপদের লোলশিখায় যখন আপনাকে আহুতি দিতে প্রস্তুত হই, তখন কি সে সুখ, যাহার উন্মাদনা তীব্র সুরার মত, আমাদের শিরায়-শিরায় আত্মত্যাগের এমন প্রাণান্তিক আগ্রহ বহাইয়া দিতে পারে? কিন্তু পারে, তাহা আমরা জানি। জানি বলিয়াই আমাদের হৃদয় সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া, সেই সকল নরনারায়ণের পদে ভক্তিভরে প্রণত হয়। লোকের ভক্তি অর্জ্জন করিব, যশের ধ্বজা উড়াইয়া দিব, প্রাইসুরী-হিন্দ্ মেডেল লাভ করিব, এরূপ কল্পনায়, এরূপ আকাঙ্ক্ষার বশে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা চলে, অল্প-স্বল্প বিপদকে আলিঙ্গন করাও চলে, চাঁদার খাতায় সহী করাও চলে; এমন মরণ-পণ আত্মোৎসর্গ করিয়া চিরপূত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা চলে না।

আমরা ইচ্ছার মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রথমতঃ হেয়-উপাদেয়-নির্ব্বাচন লইয়াই ইচ্ছা-শক্তি জন্মলাভ করে। দ্বিতীয়তঃ সুখ দুঃখের প্রকৃতিগত বৈষম্য বুঝিবার পূর্ব্বেই, হেয়-ত্যাগ ও উপাদেয়-লাভের প্রবৃত্তি বা অন্ধ-সংস্কার জীবজগতে দেখা দিয়া থাকে; এবং তৃতীয়তঃ হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়-গ্রহণ ইচ্ছার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিলক্ষিত হইলেও, ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য্য করিয়া থাকে; ইহা কেবল যে সুখপিপাসা এবং দুঃখ-ত্যাগেচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হয়, এমন নহে। সুখের অনুকূল বলিয়া যদি কোনও উদ্দেশ্য অবলম্বন করা যায়, তবে তাহার সাধনের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন্‌টি অধিক কার্য্যকরী, কোন্‌টি অধিক সহজ-সাধ্য, কোন্‌টি আমাদের প্রবৃত্তি ও মানসিক গঠনের সমধিক অনুকূল, এই সকল বিচারই মনে আসে। একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে স্তরানুক্রমিক কার্য্যপরম্পরার প্রয়োজন হয়, তাহা প্রথমতঃ সুখের স্ফুট বা অস্ফুট ধারণা হইতে প্রবৃত্ত হইলেও পরে সুখ-লালসা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে; তখন আর সুখের কথা মনেই আসে না। পরীক্ষার্থী ছাত্র যখন পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া পাঠাভ্যাস করে, তখন সে প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবে না যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার মনে কি বিপুল আনন্দ হইবে। তখন পাঠাভ্যাসই তাহার লক্ষ্য, সুখের কথা ক্বচিৎ কখনও বিস্মৃত সুরের মত থাকিয়া-থাকিয়া মনে পড়ে মাত্র।

আমরা এইটুকু বোধ হয় বুঝিতে পারিলাম যে, হেয় উপাদেয়ের নির্ব্বাচনে একদিকে যেমন অন্ধ-সংস্কার, অপর দিকে তেমনি সুখ-দুঃখের ধারণা জীবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কার ও সুখলিপ্সা ব্যতীত মানবজীবনে আর একটি বিষয় দেখিতে পাই, যাহার জন্যই মানবজীবনের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব। জীবনের প্রথম সোপানে সংস্কার ক্রিয়া করে; দ্বিতীয় স্তরে—সুপ্রশস্ত সমতলে—সুখলালসা ক্রিয়া করে; এবং সর্ব্বোচ্চ শিখরে—অর্থাৎ মানবজীবনে—"শ্রেয়ঃ"-জ্ঞান বিরাজ করে। শ্রেয়ঃ-জ্ঞান শুধু মানবেই সম্ভবে। এই শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইতে অনেক হেয় উপাদানের জন্ম হইয়া থাকে। আমরা এমন অনেক কর্ম্ম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহা সুখের আকর নহে, পরন্তু দুঃখবাহক; কিন্তু তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়াই গ্রহণ করি। অনেক সময়ে যাহা প্রিয়, তাহাই শ্রেয়ঃ রূপে দেখা দেয়। যাহাতে দেহ মন প্রফুল্ল হয়, হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়, সংসারের দুঃখের মাত্রা কমিয়া গিয়া, পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, মানবজাতির মধ্যে সুখের নব নব উৎস উৎসারিত হইয়া, জীবনকে স্নিগ্ধ ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলে, তাহা শ্রেয়ঃ নয় ত কি? বাস্তবিকই তাহা কামনার বস্তু। কিন্তু প্রিয়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিলেই শ্রেয়ের সবটুকু শেষ হইল না। সুখ ছাড়া, প্রিয় ব্যতীত, শ্রেয়ের মধ্যে আর একটি উপাদান আছে, যাহা মানবমনের নিতান্তই আপনার বস্তু, নিতান্তই নিজস্ব। সুখ দুঃখের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না।

তাহা বিরাট, ভূমা, সীমাহীন। কাণ্ট যখন বলিলেন যে, সুখলিপ্সাবিরহিত হইয়া শুধু কর্ত্তব্যের অনুসরণ কর, তখন তিনি সেই সুখাতীত, দুঃখাতীত এক মহান্, মহনীয় শ্রেয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সুখ দুঃখের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে শ্রেয়ের অনুষ্ঠান হয় না, ইহাই কাণ্টীয় চারিত্রনীতির প্রতিজ্ঞা। সুখবাদী বলিলেন, সুখই একমাত্র কাম্য, সুখই কর্ম্মের অনন্ত প্রস্রবণ। জীবন-সমুদ্র মন্থন করিতে হইবে এই সুখামৃতের সন্ধানে। কিন্তু সে সমুদ্র-মন্থনে শেষে গরল উঠিবার আশঙ্কা আছে। তাই সুখ জীবনের মুকুট-মণি বলিয়া গ্রহণ করিলে সংসারে দ্বন্দ্ব, কলহ, কোলাহলের সৃষ্টি হয়; যাবতীয় স্বার্থপরতার সংকীর্ণতা ও মলিনতা বৃদ্ধি পায়; জীবনে দুঃখের মাত্রাই কেবল বাড়িয়া যায়। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় ভগবান কর্ম্ম-ফলেচ্ছা পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্ম ফলে কামনা করিও না। কর্ম্ম ফলের কামনা করিতে গেলেই সুখের বাসনা আসিবে। সুখের বাসনা আসিলে, দুঃখেরই সৃষ্টি হইবে মাত্র। আমাদের অধিকাংশ সুখই বাসনামূলক। আমি যে জিনিষটি প্রার্থনা করি, তাহা পাইলেই সুখী। যে সে জিনিষের কামনা করে না, তাহার পক্ষে সে সুখ সুখই নয়। প্রচুর আহারের পরে যেমন ভোজ্য বস্তু আর লোভ জন্মাইতে পারে না, তেমনই কামনাপূরণের পরে আর সে বস্তু সুখ প্রদান করে না। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সুখ বাসনা-সাপেক্ষ। বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে দুঃখের উচ্ছেদ সাধন করা যায় এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ। এইটি হিন্দু চারিত্রদর্শনের মূল কথা।

সুখের অতিরিক্ত যে শ্রেয়ঃ বলিয়া কিছু আছে, তাহা সুখবাদী স্বীকার করিতে চাহেন না। সুখের সহিত শ্রেয়ের মিলন হওয়া অসম্ভব, ইহাই কাণ্টের অভিমত। ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই গীতোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ। কাণ্ট স্বীকার করেন যে, অধিকাংশ কর্ম্মই আমরা সুখের বাসনাবশেই করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি বলেন যে, এতদতিরিক্ত একটি গুণ মানব জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জ্ঞানের ধর্ম্ম। আমি তাহাকেই শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত করিয়াছি। প্লেটো ইহাকে "the good" বলেন। অনেক জিনিষ আমাদের নিকট সুখাবহ হইলেও হেয়, যেহেতু তাহা শ্রেয়ঃ-বিরোধী। আবার অনেক বস্তু দুঃখাশ্রিত হইলেও তাহা উপাদেয়, যেহেতু তাহা শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ের ভিত্তি জ্ঞানে। সুখের ভিত্তি বেদনে বা অনুভূতিতে। শ্রেয়ঃ আর প্রিয় এক বস্তু নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনেক বস্তু প্রিয় বলিয়াই শ্রেয়ঃ। কাণ্ট এইটি স্বীকার করেন না। তিনি প্রিয় এবং শ্রেয়ঃ যে বিভিন্ন উপাদানে রচিত তাহাই প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। প্রিয় মানব-জীবনের অযোগ্য, শ্রেয়ঃ মানবের বরণীয়। যাহা প্রিয়, সুখকর, আপাত-মনোরম, তাহা ইতর পশুপক্ষী প্রাণিকুলকে মোহিত করে, বশীভূত করে। প্রিয়ের সন্ধান ত পশুবৃত্তি মাত্র। এইরূপে সুখকে নির্ব্বাসিত করিয়া মানব-চরিত্রকে রক্তমাংস-বিবর্জ্জিত করিয়া কাণ্ট কঙ্কালে পরিণত করিলেন। সুখবাদী অবলীলাক্রমে দেখাইয়া দিলেন যে, জীবনে সুখসম্পর্কশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিরল। কর্ম্ম করিতে হইলে, লক্ষ্য চাই; লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই; নহিলে কর্ম্ম হয় না। জীবের ধর্ম্ম কর্ম্ম করা,—

"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্ম্ম ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।"

কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগই বা ঘটিয়া উঠে কৈ? কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে যে কর্ম্মের উপর আসক্তি চলিয়া যায়। কর্ম্মে রতি না থাকিলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না। তুমি যদি তোমার পীড়িত বন্ধুকে শুশ্রূষা করিতে যাও, তবে তাহার প্রতি তোমাকে স্নেহ-পরবশ হইতে হইবে, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। স্বাস্থ্যের কামনা না থাকিলে ঔষধে রুচি হয় না, ঔষধে রুচি না হইলে জীবনরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। মুক্তির কামনা না থাকিলে, শ্রেয়ের অনুষ্ঠান করিবার উপযোগী সামর্থ্য হয় না, শ্রদ্ধা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না।

ইহা হইতে আমরা শ্রেয়ের আর একটি রূপ পাইতেছি। শ্রেয়কে কঠোর কর্ত্তব্যে পরিণত করিলে তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। শ্রেয়ঃ কঠোর নীরস শুষ্ক সূত্র মাত্র নহে। শ্রেয়ঃ সুখাতীতও বটে, সুখাধীনও বটে। যাহা সুখদায়ক, তাহাই যে সব সময়ে শ্রেয়স্কর, তাহা নহে। সুখলাভ কখনও কখনও উপাদেয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু সুখ ব্যতীতও অন্য উপাদেয় আছে। সুখকে যখন আমরা শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য করি

তখন সে সুখ বলিয়া নহে, তাহার উপাদেয়ত্ব অন্য বিষয়ে। এখানে শ্রেয়ঃ এবং সুখের বিরোধ মিটে না। বরং শ্রেয়ঃকে সুখের সংস্রব-রহিত ভাবেই আমরা দেখিতে চাই। তাহার ফলে শ্রেয়ঃকে সুখসম্পর্কশূন্য, বৈরাগ্য-লক্ষণযুক্ত, কঠিন কর্ত্তব্য নামে অভিহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু আর এক স্তর ঊর্দ্ধে আমরা শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ ভাবে পাইয়া থাকি। শ্রেয়ে যখন শ্রদ্ধা জন্মে, গন্তব্যস্থান যখন নিশ্চিত, নির্দ্দিষ্ট হইয়া আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত ভালবাসিতে হয়। ব্রজগোপীর নিকটে তাই ব্রজের রজঃ চন্দনানুলেপের মত স্নিগ্ধ হইয়াছিল। সুখের আশা থাকিলে শ্রেয়ের অনুষ্ঠান হইল না সত্য বটে ; শ্রেয়ের অনুষ্ঠান নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, বন্ধ-রহিত ভাবে করিতে হইবে, তাহাও সত্য। কিন্তু ঐ দেখ দূরে, তোমার বরণীয়, তোমার চিরবাঞ্ছিত, সুন্দর, কল্যাণ-ময়, রমণীয়রূপে তোমাকে ভুলাইতেছে। তাই ত সকল ভুলিয়া, শ্রেয়ের দিকে মনপ্রাণ ছুটিতে চাহে। বাধা বিঘ্ন ছুটিয়া যায়, বন্ধন টুটিয়া যায়, মোহপাশ ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়ে। অনন্ত আকাশের পাখীর মত দূরাগত সঙ্গীর ডাক শুনিয়া পথশূন্য, দিক্‌শূন্য, আবরণ-শূন্য বিমানে পাগলের মত ছুটিয়া যায়। শ্রেয়ঃ যদি প্রেয়ঃ না হইত, তবে এমন ভুলাইতে পারিত কি ?

শোক-সংবাদ

৺রায় উমাচরণ বসু বাহাদুর

ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সর্ব্বজন-প্রিয় জননায়ক রায় উমাচরণ বসু বাহাদুর তাঁহার কলিকাতার ভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ভাগলপুরের বাঙ্গালী ও বেহারিগণ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সামান্য পদে সরকারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর স্বকীয় কার্য্যদক্ষতার অনন্যসাধারণ প্রভাবে কর্ত্তৃপক্ষের গুণগ্রাহিতায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় লোকগণনার কার্য্যে সাঁওতালগণ সহসা উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে। উমাচরণ বাবু স্বীয় সুধীর বুদ্ধিমত্তায় অতি সহজে এই বিদ্রোহের উদ্যোগ প্রশমিত করেন। বনেলী রাজষ্টেট যখন নানা প্রকার মকদ্দমায় ও তজ্জনিত ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়ে, তখন গবর্ণমেণ্ট এই সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীকে উক্ত ষ্টেটের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থার সুফলে বাবু উমাচরণের সুবন্দোবস্তে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বনেলী ষ্টেট অচিরে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। তিনি ভাগল-পুর ভূম্যধিকারী সমিতির সদস্য ছিলেন। স্থানীয় লেডি ডফরিণ ফণ্ড কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সদস্যপদে এবং কিছুদিন উক্ত বোর্ডের সহকারী সভাপতির পদেও যোগ্যতা সহকারে কার্য্য-সম্পাদন করেন। তাঁহার নানাবিধ গুণগ্রাম, কর্ম্মনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশের মঙ্গলসাধন প্রভৃতি কার্য্যকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদানে সম্মানিত করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি এল, ভাগলপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল।

অভিনবপ্রণালীর বর্ণবোধ

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার পাণ্ডুলিপি]

(সচিত্র, অতএব নক্সা)

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
বর্ণবোধং প্রকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥

পাঁচ-পাঁচ বৎসর অন্তর শিক্ষা-সম্বন্ধে এক-একখানি নীল-মলাটে মোড়া লম্বা ধাঁচের সরকারী রিপোর্ট বাহির হয় এবং এইরূপ পাঁচ-পাঁচ বৎসর অন্তর নিম্নশিক্ষার একটি করিয়া নিউ স্কীম (নূতন মতলব!) জাহির হয়। প্রতিবারেই সরকার-বাহাদুর জনসাধারণকে আশ্বাস দেন, এইবার যে প্রণালী আবিষ্কৃত হইল, এতদনুসারে শিক্ষালাভ করিলে দেশের সব গো-গর্দ্দভ মানুষ হইয়া যাইবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নির্ব্বাচন, পরিদর্শক-নিয়োগ ও শিক্ষক-তালিমের ধূম পড়িয়া যায়। তাহার পর—যথাকালে দেখা যায়, সকল প্রণালীই 'মুখস্থং ব্রহ্মাস্ত্রং'এর হাতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় এবং ছাত্রগণ 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রহিয়া যায়। ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট্-টনী-মার্টিন গিয়াছেন, পেড্‌লার-কুক্‌লার গিয়াছেন, ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মে হর্ণেল-শিঙ্গেল আসিয়া দেখা দিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষার দরিয়ায় কোম্পানীকা মাল যতই ঢাল, হরেদরে বরাবর হাঁটুজলই থাকিয়া যাইতেছে (এও একটা hydrostatical paradox বলিতে হইবে)। লাভের মধ্যে, ঢাকের কড়িতে সময়ে সময়ে মনসা বিকাইয়া যায়! তবে 'লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন'—এই যা' রক্ষা।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কিছুতেই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। তাই 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির' যে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাথা ঘামাইব। বিস্তর গবেষণা করিয়া প্রথম-শিক্ষার একটা অভিনবপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি। অদ্য শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে *—বিদ্যারম্ভের প্রকৃষ্ট কালে—ইহা সাধারণের গোচর করিলাম। বলা বাহুল্য, পরোপকারই আমার একমাত্র লক্ষ্য। 'পরোপকারায় সতাং জীবনং'। (এই জন্যই সংস্কারকগণ সমাজের মঙ্গলের জন্য সদাই ব্যস্ত থাকেন।)

আমার বিদ্যার দৌড় বেশী দূর নহে—যোগে-যাগে গুরুমশায়ের পাঠশালে শিশু-বোধক ও শুভঙ্করী সায় করিয়াছিলাম। তাহাতেই বিদ্যার খতম। তাহার পর, দ্বারে-দ্বারে বটতলার * 'ভাল-ভাল গল্পের বই, গানের বই' ফিরি করিয়া বেড়াই,—অবসর পাইলে বইগুলি বাণান করিয়া একটু-একটু পড়ি। বই লইয়া চলাফেরা, বসা-দাঁড়ান, সুতরাং ভিতরে-ভিতরে যে বিদ্যার একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। লোহাও যে চুম্বক-সংস্পর্শে বেশীদিন থাকিলে চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়! ইহা ছাড়া, দেখিয়া ও ঠেকিয়া বিস্তর শিখিয়াছি। শুনিয়া-শুনিয়া অনেক ইংরাজী গৎ রপ্ত করিয়াছি; মেসের ছোকরা-বাবুদের কৃপায় ইংরাজী কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞানেরও বুলি ঝাড়িতে পারি; এমন কি, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশীয় প্রভৃতি ভাষারও কিছু-কিছু সংবাদ রাখি। এখন, এই বিদ্যার বোঝা লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছি, নামাইতে পারিলে বাঁচি। তাই প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি সামান্য ব্যক্তি, আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না, সুতরাং সম্পাদক মহাশয়ের আড়ালে আশ্রয় লইলাম। কেন না, 'সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥' আর দুনিয়ার গতিই এই; লড়ে পাইক, নাম

* ছবি সংগৃহীত ও তৈয়ারী হইতে বিলম্ব হওয়াতে প্রবন্ধটি বিলম্বে ছাপা হইল। অনেক উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রের বিলম্বে প্রকাশের না কি ইহাই কারণ। অতএব নজীর রহিয়াছে।

* বটতলার নামে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন না। বাঙ্গলা ভাষার গুরুবিগণ এখন স্বীকার করিতেছেন যে, পরিষদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বটতলাই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

হয় সর্দ্দারের। অনেক পাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তকের প্রণয়ন-রহস্য (প্রণয়-রহস্য নহে) না কি এই প্রকারই।

আরও কথা আছে। আমার সহায়-সম্পদ্ নাই, সহি-সুপারিশ নাই, পেটের চিন্তায় সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াই, এমন সময় নাই যে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচক সমিতির সভ্যগণের দ্বারে ধন্না দিই। তবে এই ভরসা,—তোমরা-চোমরা বি এ, এম্-এ-দের বই চলে না, আমাদের মত 'মৎস্যরক্কা না পড়ে'-পণ্ডিতের বই-ই চলে। যাহা হউক, আমি প্রণালীটি সম্পাদক মহাশয়ের গোচর করিলাম। তাঁহার গুরুদাস বাবুর সহিত খাতির আছে ; তিনি উক্ত প্রকাশক মহাশয়ের ঘর হইতে এই প্রণালীতে পুস্তক লিখিয়া বা লিখাইয়া চালাইবার চেষ্টা করুন। যদি কৃতকার্য্য হন, ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে কিছু দস্তরি ধরিয়া দিবেন। অনেক দরিদ্র সাহিত্যসেবী গুরুদাস বাবুর নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। আমিই কি বঞ্চিত হইব ?

বনিয়াদ পাকা না হইলে ভাল ইমারত গড়া যায় না। সেইরূপ প্রথম-শিক্ষা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না হইলে উচ্চশিক্ষা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আমাদের বাল্যকালে 'কএ করাত খএ খরগোস' ইত্যাদি সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরশিক্ষা দেওয়া হইত। আজকাল তাহাই ঝালাইয়া, 'ঝাঁদেতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি' চলিতেছে। কিন্তু এ সব অকেজো ছড়া মুখস্থ করিয়া শিশুদের মগজ খারাপ হয়, স্মৃতিশক্তির বাজেখরচ হয়, মনের প্রকৃত উন্নতি বাধা পায়, অক্ষরের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলা জানোয়ারের নাম যুড়িয়া দিয়া শব্দব্রহ্মের অবমাননা করা হয়, শিশুকেও পশুতে পরিণত করিবার পথ প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে 'সুকুমার শিশুকাল—শিক্ষার সময়' বৃথা নষ্ট হয়।

আমার নবোদ্ভাবিত প্রণালীতে—সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমোদ ত হইবেই, পরন্তু অক্ষরশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুশিক্ষা হইবে, বর্ণবোধের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, কলাতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইবে। ফল কথা, আমার এই একখানি পুস্তকে শত শত পুস্তকপাঠের ফল হইবে। স্যার গুরুদাস কি সাধে বলেন, পড়ার মত পড়িতে জানিলে একখানি বই পড়িয়াই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হওয়া যায় ? প্রহ্লাদ যে ক-অক্ষর দেখিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন! তবে, তেমন বই লিখিতে পারে কয়জন ? আর তেমন সদ্গুরুই বা কোথায় মিলে ? আর তেমন মেধাবী ছাত্রই বা পাওয়া যায় কোথায় ? যাহা হউক, আমার এই প্রণালীতে শিক্ষা পাইলে, সকল শিশুই রাতারাতি বিদ্বান্, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী হইয়া উঠিবে, দেশে আর গণ্ডমূর্খ থাকিবে না, ইহা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি।

আমার প্রণালীর প্রধান সঙ্কেত—এক-একটি অক্ষরের সঙ্গে এক বা দুইজন আদর্শ মানুষের নাম সংযুক্ত থাকিবে এবং তাঁহাদিগের জীবনচরিত ও কীর্ত্তিকথা মুখে মুখে শিক্ষা দিতে হইবে! সেই সকল সদ্দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইলে ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে শৈশব হইতেই মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইবে। শিশু এই সব মহাপুরুষের ছবি চোখে দেখুক, মহজ্জীবনের আখ্যায়িকাবলি কাণে শুনুক,—সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐরূপ মহত্ত্বের অনুকরণ করিবেই করিবে। মার্কিণ কবি বলিয়া গিয়াছেন—

> Lives of great men, all remind us
> We can make our lives sublime.

ও বাঙ্গালী কবি 'অনুবাদ' করিয়াছেন,—

> মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে' গমন,
> হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
> সেই পথ লক্ষ্য করে' স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
> আমরাও হ'ব বরণীয়॥

(এইরূপ ছবি ও কথা ফরাসী দার্শনিক কোঁতের Calendar of Great Men অপেক্ষাও ফলোপধায়ক হইবে)। প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যাচ্ছলে ধর্ম্ম, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-নীতি, ইতিহাসের ধারা, শিল্পকলার মূল সূত্রগুলি শিক্ষা-দিতে হইবে। এরূপ শিক্ষারীতি অবলম্বন করিলে, সমাজ ও দেশ দ্রুতবেগে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে, আজ যে শিশু, কাল সে যুবা, পরশ্ব সে-ই গৃহপতি।

অভিনবপ্রণালীর নমুনা

অমৃতলাল বসু

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

অ

অকারের বাঙ্গালায় দুইরূপ উচ্চারণ আছে, সেইজন্য দুইটি নামই চাই (যথা অমর, অমৃত)। আর তা' ছাড়া উভয়েই নটরাজ, উভয়েই থিয়েটারের শিরোমণি, কা'কে ফেলে কা'কে লই? ছবির সঙ্গে-সঙ্গে ইঁহাদিগের অভিনয়নৈপুণ্য, নাটক-নির্ম্মাণ-কৌশল, নাট্যপ্রতিভা, রঙ্গালয়ৈকগতপ্রাণতা সম্বন্ধে বাচনিক উপদেশ দিতে হইবে। যাহাতে বালকবালিকাগণ ইঁহাদিগকে স্বচক্ষে * দেখিতে পারে,—কেন না একজন ওস্তাদ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, Things seen are mightier than things heard, অর্থাৎ শোনা-কথার চেয়ে দেখা-জিনিস জবর—ইঁহাদিগের হাবভাব, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ঘন-ঘন থিয়েটার দেখাইতে হইবে। এইরূপে তাহারা স্বাভাবিক উপায়ে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা উচ্চারণ (খাস কলিকাতার উচ্চারণই বিশুদ্ধ) শিখিতে পারিবে, রেঢ়ো বা বাঙ্গালে টান আর থাকিবে না। তাহারা ঠিক শিখিল কি না, হাতে-কলমে তাহার পরখ করিবার জন্য, তাহাদিগের দ্বারা স্কুলে-স্কুলে সখের নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। কলিকাতার কলেজে-কলেজে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে। কিন্তু বয়ঃ-প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে ঐ কার্য্যে হাতে-খড়ি দেওয়াইলে তেমন সুফল হয় না। শৈশব হইতে তালিম করা দরকার। কথায় বলে, 'কাঁচায় না নুইলো বাঁশ, পাক্‌লে কর্‌বে ট্যাঁস ট্যাঁস।' ফল কথা, থিয়েটার দেখিলে শিশুদিগের গীত, বাদ্য, লাস্য, বক্তৃতা এই চারি বিষয়ে সমষ্টিভাবে অভিজ্ঞতা জন্মিবে; পরন্তু, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য বোধও হইবে। অতএব, ইহার প্রভূত উপকারিতা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথমেই থিয়েটারের কথা তুলিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতা, এই কুসংস্কার যাহাতে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের মনে প্রবেশ না করে, সেইজন্যই আমি গোড়া বাঁধিয়া কাজ করিতে চাহিতেছি। দেখুন, প্রাচীন কালে শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে কেন, গ্রীস রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে, এমন কি খ্রীষ্টান ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত, রঙ্গালয় ও নাটক-অভিনয় লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। এখনও দেখুন, পল্লীগ্রামের লোক কোন সুযোগে কলিকাতায় আসিতে পারিলে, প্রথমে যায় কালীঘাটে মা-কে দর্শন করিতে, আর তাহার পরই যায় থিয়েটারে (জানি না কাহাকে দর্শন করিতে)! আসল জাতীয় প্রকৃতি, প্রকৃত অকৃত্রিমতা, পল্লীগ্রামের সরল-স্বভাব লোকের ভিতরেই দেখা যায়। অতএব পল্লীগ্রামের লোকের এই দুইটি কার্য্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, থিয়েটার দেখা, দেবতায় ভক্তির ন্যায়, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির মজ্জাগত। যাহাতে এই জাতীয় ভাব শিশু-হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, সঙ্কীর্ণচেতাঃ রুচিবাগীশদিগের প্ররোচনায় শিথিলমূল না হয়, তদ্‌বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তবে যদি বেশ্যার কথা তোলেন, তাহার উত্তরে বলিব, যতদিন আমাদের দেশে, অন্ততঃ আমাদের সমাজে, ভদ্রঘরের মেয়েরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, বক্তৃতা না করেন, ততদিন এ অসুবিধাটুকু ভোগ করিতেই হইবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুণ্যধাম স্বর্গেও স্বর্বেশ্যা আছে; ইহারা যে উন্নত সভ্যতার অচ্ছেদ্য অংশ! সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কালী দর্শন

* প্রবন্ধরচনাকালে অমরেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন।

প্রথা উঠিয়া যাইবে, কিন্তু থিয়েটার-দেখা অভ্যাস থাকিয়া যাইবে; কেন না ইহা উদার, শাশ্বত, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌম; ইহাতে জাতিভেদের, বর্ণভেদের, লিঙ্গভেদের, ধর্ম্মভেদের সঙ্কীর্ণতা নাই। জয়, থিয়েটারের জয়!!

আ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি (সার)

(ইহা ছাড়া ইংরাজী বর্ণমালার প্রায় সব অক্ষরগুলি ইঁহার নামের পশ্চাতে উপাধিচ্ছলে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে) আঁ-এর উচ্চারণ 'অ'ও হয়, 'ও'ও হয়; কিন্তু আঁ-এর বেলায় এক উচ্চারণ। আশুতোষও একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। কেন না এই নাম উচ্চারণ করিলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, ৺আশুতোষ বিশ্বাস, ৺আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), (কাশ্মীরের) ৺আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি কোন আশুতোষকেই মনে পড়ে না বা মনে ধরে না, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এই বিরাট বপুর পেষণে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। ৺সরস্বতী পূজার দিনে এই মূর্ত্তিমান্ সরস্বতীর (একটা ব্যাকরণ বিভীষিকা হইল!) কথা কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? বাস্তবিক, সার আশুতোষের কথা 'বঙ্গে যথাতথা লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ।' তাঁহাকে চেনে না জানে না, দেশের আবাল বৃদ্ধ-বণিতার মধ্যে এমন কে আছেন? মিল্টনের মহাকাব্যের ন্যায় তিনিও সদর্পে বলিতে পারেন—Not to know me argues yourselves unknown.

এই মহাপুরুষের নামকীর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, জগতে কিরূপে বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, ধনবল, জনবল, সম্মান, সম্ভ্রম লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে হয়, শিশুচিত্তে সেইদিকে প্রেরণা দিতে হইবে। 'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা। কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।' এ সব সেকেলে শ্লোক এখন বাতিল। এখন বাঙ্গালা দেশে পুত্র জন্মিলেই মাতাপিতা আশা করেন, পুত্র ইংরাজী বিদ্যায় লায়েক হইয়া একটা হাকিম বা উকীল হইবে। ইহাই বাঙ্গালী জীবনের চরম সার্থকতা। আবার হাকিমের মধ্যে হাইকোর্টের জজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উকীলের মধ্যে হাইকোর্টের ভ্যাকীল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (যেমন ইলিশের মধ্যে গঙ্গার ইলিশ!)। দেখুন, ট্রামগাড়ী শ্যামবাজার হইতেই ছাড়ুক আর শিয়ালদহ হইতেই ছাড়ুক, তাহার গন্তব্য স্থান হাইকোর্ট; বাঙ্গালীর জীবন-শকটও পল্লীগ্রাম বা সহর যেখান হইতেই চলিতে আরম্ভ করুক, তাহার চরম লক্ষ্য হাইকোর্ট। যে উকীল বা হাকিম হইতে না পারিল, সে নিতান্ত পক্ষে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়া পার্টিশ্যান সুট করিতে-করিতেও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিবে!

'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি,
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজ্বলন্তি।'

এমন যে হাইকোর্ট, তাহার ভূতপূর্ব্ব ভ্যাকীল ও বর্ত্তমান জজ সার আশুতোষ যে আদর্শ পুরুষ, কর্ম্মজীবনে সাফল্যের

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তিনি আবার শুধু হাইকোর্টে জজিয়তি করেন না, শিক্ষা-বিভাগে ডিক্রী-ডিসমিস করাও তাঁহার হাতে।* রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' তাই সার আশুতোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষক না হইয়াও শিক্ষক, ছাত্র, পরীক্ষক, গ্রন্থকার প্রভৃতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। শিশুগণ এ হেন আশুতোষের জলন্ত দৃষ্টান্ত হইতে জীবনের আলোক সংগ্রহ করুক, ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করুক, এইভাবে উপদেশ দিতে হইবে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, বিচক্ষণতায়, কর্ম্মকুশলতায়, কৃতিত্বে, যেন তাহারা এই কর্ম্মবীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতে হইবে। জয় (সার) আশুতোষের জয়!!

ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)
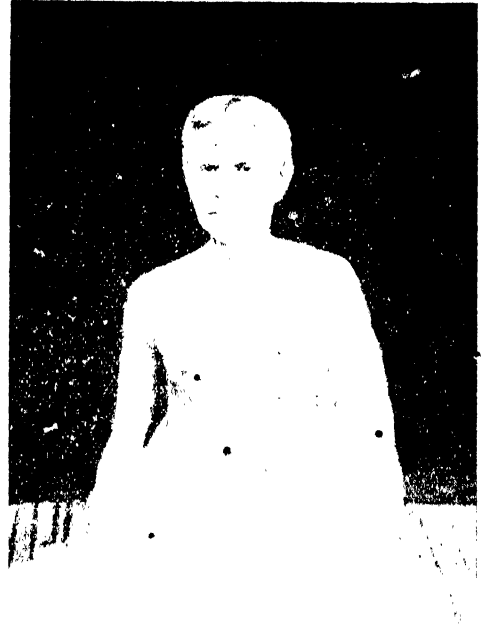
আশুতোষের কর্ম্মজীবন হইতে, কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া যশোমান লাভ করিতে হয়, শিশুগণ এই কার্য্যকরী শিক্ষা পাইবে; ইন্দ্রচন্দ্রের বেলায়, কিরূপে অর্থব্যয় করিয়া কীর্ত্তি রাখিতে হয়, শিশুগণ তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে। তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী শিক্ষক মহাশয় শিশুগণকে মুখে মুখে শিখাইবেন। 'বিস্তর বলিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।' যাহাতে দু' পয়সা উপায় করিতে শিখিয়া তাহারা পঞ্চতন্ত্রের শৃগালের মত অতি-সঞ্চয়ী হইয়া না পড়ে, তৎকল্পে প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। নতুবা শেষে যে 'অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' হইয়া পড়িবে!

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, ইন্দ্রচন্দ্র যে অর্থ অকাতরে দান-খয়রাত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত নহে, সুতরাং এ উদাহরণে শিশুদিগের তাদৃশ উপকার হইবে না। আচ্ছা, তাহা হইলে—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশুতোষ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ মফঃস্বল কোর্টে (বৰ্দ্ধমানে) ঐ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। (একা যাব বর্দ্ধ-

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মান করিয়া যতন। যতন নহিলে কভু মিলয়ে রতন।) উভয়ত্রই বাঙ্গালী-জীবনের সেই চরম লক্ষ্য অটুট রহিল। ইন্দ্রনাথের বেলায় উপার্জ্জনে ও সদ্ব্যয়ে সমতা দৃষ্ট হয়। এতৎ প্রসঙ্গে তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বদেশানুরাগ, সমাজ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থ চতুষ্পাঠী স্থাপনাদি সৎকার্য্য, ও দুর্নীতি কদাচারের প্রতি পঞ্চানন্দবেশে বিদ্রূপ-কশাঘাত প্রভৃতিতে সূচিত চরিত্রবৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে হইবে। যিনি ব্যঙ্গের রাজা, তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশকালে শ্লেষবাক্য ব্যবহার করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। তাই যাহা বলিবার ছিল, সাদা কথায় বলিলাম। জয় 'পঞ্চানন্দে'র জয়!!

এইবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—অর্থাৎ গুপ্ত কবি। কবি যখন গুপ্ত, তখন ছবিতে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা কমই ছিল। আর তখনকার দিনে কবির বাল্যের ছবি, কবির যৌবনের ছবি, কবির প্রৌঢ় বয়সের ছবি, প্রভৃতি রকমারি ছবি তোলাইবার রেওয়াজ ছিল না। তাই গুপ্তকবির নানা-বয়সের ছবি নাই। প্রথম শিক্ষার বই লিখিতে গেলে অনেক গুপ্ত-সন্ধান রাখিতে হয়; তাই অনেক অনুসন্ধানে

* অশিক্ষিত লোকে আজিও ভারতবর্ষকে কোম্পানীর মুলুক বলিয়া জানে। আমাদের বটতলার ফেরিওয়ালা আজও আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বলিয়া জানেন। কথাটা বড় মিথ্যাও নহে! —সম্পাদক।
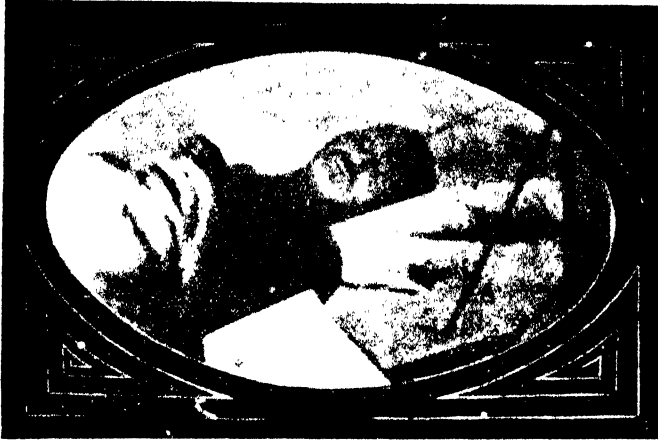
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গুপ্তকবির শেষ শয্যার একখানি ছবি ব্যক্ত করিলাম। ইহাতে যদি কাহারও মন না উঠে, তাই—অধিকন্তু ন দোষায়, বলিয়া গুপ্তের সঙ্গে ব্যক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দিয়া 'ঈ'কে আরও দীর্ঘ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা নহে, এমন পুস্তকেও তাঁহার ছবি থাকে, ইহার বহু নজির আছে। আর এ পুস্তক যখন বর্ণপরিচয়, তখন 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বনে লিখিত' ইহা মানিতেই হইবে; অতএব তাঁহার ছবি দিব না কেন?

এই প্রসঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তি-কথা কেন কীর্ত্তন করিলাম না, তৎসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আবশ্যক। তাঁহার কথা বলিতে গেলে ভাষার চটুকা-চটক লোপ পায়, রসিকতার কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত হয়, তরল সাহিত্যরস জমিয়া কাঠ হইয়া যায়। পুরীতে সাগরের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন জগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রার পেটের ভিতর হাত-পা সাঁধাইয়া গিয়াছে, এই সাগরের গর্জ্জন শুনিলে আমাদেরও সেই দশা হয়। তাই তাঁহার কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার ছবি দিয়া ধন্য হইলাম।

গুপ্তকবি আমাদের শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। এখনকার কবিদিগের মত ইংরাজের নকলনবিশ নহেন। এই সনাতন প্রথার ও পুরাতন কথার আদরের দিনে, শিশুদিগকে সেকেলে কবির আদর করিতে শিখাইতে হইবে; এই স্বদেশীর দিনে এই খাঁটি স্বদেশী ভাবটা শিশুদিগের চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত করিতে হইবে; 'প্রভাকরে'র কবির হাস্যরস ও অনুপ্রাস যাহাতে আবার দেশের ও দশের সকাশে সম্মান সমাদর সম্প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 'গুড়গুড়ে'র সঙ্গে তাঁহার যে কবির লড়াইএর মত সংবাদ-পত্রের লড়াই লাগিত, তাহার বিশদ বিবরণ দিতে হইবে। কেন না, শিশু বয়সকালে যদি সাহিত্যচর্চ্চা করে, তাহা হইলে গোড়া হইতে এই লড়াইএর উপযোগী গুণ অর্জ্জন করিতে না পারিলে তাহার সাহিত্যসেবা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সাহিত্যক্ষেত্রে দু' ঘা' খাইতেও হইবে, দু' ঘা' দিতেও হইবে। বাঙ্গালীর লড়াই তৃষ্ণা যে এই আকারেই মিটে। শিক্ষা পাকা করিবার জন্য 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে'র অনুকরণে 'স্কুলীয় কবিতা-যুদ্ধের' প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা ইন্টার-স্কুল ম্যাচ অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ হইবে। কলেজে-কলেজে কলেজ-ম্যাগাজিনের ন্যায় স্কুলে-স্কুলে স্কুল-ম্যাগাজিন * স্থাপনা করিতে হইবে। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে, অসিযুদ্ধের নহে, মসীযুদ্ধের উপযোগী ম্যাগাজিন হইবে।

আর এক কথা। গুপ্তকবির লঘু, গুরু, মধ্যম, অনেক প্রকারের কবিতা আছে। তাহার মধ্যে মুখরোচক 'পাঁঠা' 'তপ্‌সী মাছ', ও 'পৌষপার্ব্বণ' এ তিনটি কবিতা শিশু-

* এই প্রবন্ধ রচনার পর হিন্দু ও হেয়ার স্কুল এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছে।

দিগকে মুখস্থ করাইতে হইবে এবং যাহাতে বর্ণিত পদার্থগুলি তাহারা উদরস্থ করিতে পারে, সঙ্গে-সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা প্রচলিত শিক্ষার ন্যায় এই অভিনবপ্রণালীর শিক্ষাও একপেশে হইয়া যাইবে।

কোন-কোন দোষৈকদর্শী সমালোচক এই কবিতা তিনটিতে প্রকৃত কাব্যরস আছে, তাহা স্বীকার করেন না। চোখে জল আনিলে যদি করুণরস হয়, তবে জিভে জল আনিলে তাহাও যে একটা রস, ইহা অস্বীকার করিবে, এমন বেরসিক কে আছে? বরং চোখ নিতান্ত বাহিরের জিনিষ, জিভ ভিতরকার জিনিষ; এই হেতু জিভে জল আনায় বাহাদুরী বেশী। যদি প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ না থাকে, তাহা হইলে বুঝিব আলঙ্কারিকগণ চার্ব্বাকের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই মহাবাক্যের মাহাত্ম্য বুঝেন নাই। আমার মনে হয়, বিরহের যেমন দশম দশা ইহাও তেমনি (নবরসের অতিরিক্ত) দশম রস (দশমীরস)। একাদশীর পূর্ব্বরাত্রে হিন্দু বিধবাগণ ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করেন। হায়! এই শ্রীপঞ্চমীর দিনে খিচুড়ী ও ভাজার গুণগান করিবে, এমন গুপ্ত কবি কি বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্ত হইবে না? সেই আপশোষেই বলিতেছি, জয় গুপ্তকবির জয়!!

[উকারে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি দিতে পারিতাম, কিন্তু দিলে কোন ফল নাই, কেন না ইংরাজী করিয়া ডবলিউ, সি বোনার্জ্জি না বলিলে ত তাঁহাকে কেহ চিনিবে না।]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই মাথা-কামান উড়িয়া চেহারার পর, সেই সুদৃঢ় পুরুষ-চরিত্রের পর, উর্ব্বশীর ন্যায় নিখুঁত সুন্দরী অপ্সরার, রমণীরত্নের চিত্র মানাইবে ভাল। এইবার (aesthetic culture) সৌন্দর্য্য-বোধের পালা। এই শক্তির উন্মেষ না হইলে শিক্ষাই ব্যর্থ। কেন না, এই শক্তি-প্রভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবক ভবিষ্যতে বিবাহ-কালে ডানাকাটা পরীর বাহানা ধরিবে। থিয়েটার দেখিয়া (অকারের প্রসঙ্গ দেখুন) এই শক্তি অঙ্কুরিত হইবে, এক্ষণে তাহা বিকসিত হইবে। বিলাতী কবি বলিয়াছেন:—

To look on noble forms
Makes noble through the sensuous organism
That which is higher.

উর্ব্বশী

বিলাতী বলিয়া এই স্বদেশীর দিনে নজিরটি অগ্রাহ্য করিবেন না। স্বয়ং 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় এক সময়ে ইহা 'প্রবাসী'র মুখপত্র করিয়াছিলেন। ইহার উপর আর আপীল চলে না।

ছবির সঙ্গে-সঙ্গে শিশুদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতাটি আবৃত্তি করিতে শিখাইতে হইবে। (আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী); তাহা হইলে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিবে। সুন্দরী রূপসী উর্ব্বশী 'নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ', অতএব 'আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়'; এই তত্ত্বটি সুকুমার শিশুহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে হইবে এবং উর্ব্বশীর উপলক্ষে রীতিমত নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে হইবে।

কেহ-কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতির নাম করিলে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কুসংস্কারেরও পোষকতা করা হয়। ইহা একটা মস্ত ভুল। উর্ব্বশী যদি অশ্লীল বা কুসংস্কারের কারণ হইবে, তবে ঋষি রবীন্দ্রনাথ উর্ব্বশীকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা লিখিবেন কেন? যুধিষ্ঠির, শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষ-চরিত্র-চর্চ্চায় উল্লিখিত দোষ আছে, স্বীকার করি;

কিন্তু উর্ব্বশী, চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী ইত্যাদি নারী-চরিত্র-চর্চ্চায় কোন দোষ অর্শে না। শাস্ত্রেও আছে, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। অতএব কুসংস্কার ও অশ্লীলতার 'ধাপার মাঠ' হিন্দুশাস্ত্র হইতে 'ক্ষীরগ্রাহী নীরত্যাগী' আধুনিক কবি স্ত্রীচরিত্রগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইবেন।

উ—

উডরফ সাহেব (হাইকোর্টের বিচারপতি, সার)

[বাঙ্গালায় 'কী' ছাড়া আর কোথাও দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ নাই, শুনিতে পাই; কিন্তু ইংরাজী করিয়া ডবলিউ ডবল-ও ডি-আর ও-ডবল-এফ ঈ বাণান না করিয়া বাঙ্গালায় ডবলিউ, ডবল ও বাণানে দীর্ঘ-উকার না হইয়াই যায় না।]

তন্ত্র অশ্লীল, তন্ত্র কুরুচিপূর্ণ, তন্ত্র আদিরসপ্লাবিত, তন্ত্র বীভৎস, তন্ত্র ভয়ানক, 'অনাগোর কালী' তান্ত্রিকের উপাস্য দেবতা, ইত্যাদি ধিক্কার ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে অনবরত ধ্বনিত হইতেছিল। বাঙ্গালার উচ্চ ব্রাহ্মণবংশের পনরআনা লোক শাক্ত; অথচ তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের এই লাঞ্ছনা হইতেছিল। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া, যে শাখায় আসীন সেই শাখাই স্বহস্তে ছেদন করিতেছিলেন,—এমন সময় আমার আভালন (লোকে বলে মিষ্টার জাষ্টিস্ উডরফ) তাঁহাদিগের জারীজুরী ভাঙ্গিলেন, তন্ত্র-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, আর ইংরাজীওয়ালা বাবুলোকসব চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন! হাইকোর্টের রায়ে তন্ত্র বাহাল থাকিল। ধন্য তুমি ইংরেজ! কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব পর্য্যন্ত যাহা পারেন নাই, তুমি তাহা করিলে। অথবা ইহাতে নূতনত্বই বা কি? গোরা-মিস্ত্রী না লাগাইলে আমাদের কোন্ কাজটা হয়? হিউ কন্‌গ্রেস করিলেন, আমরা পেট্রিয়ট সাজিলাম। হিন্দুধ[র্ম্ম] আবর্জ্জনাময় বলিয়া আমরা বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলা[ম]; সাত-সমুদ্দুর-তের-নদী পার হইয়া কর্ণেল অলকট, ম্যাডা[ম] ব্ল্যাভাট্‌স্কী ও বিবি বেশান্ত এই ত্রিমূর্ত্তি আসিয়া হাঁচি টিকটিকির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে[ন] আর আমরা 'নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং' বলি[য়া] দলে-দলে থিয়সফিষ্ট সাজিলাম।

এহেন উডরফ সাহেবের প্রসঙ্গে সাহেব জাতি যে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম আচার-অনুষ্ঠান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কষ্টিপাথর, না না, পরশপাথর তাঁহারা যাহা স্পর্শ করিবেন তাহাই সোণা হইয়া যাইবে ('সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে') এই সারতত্ত্ব শিশুচিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। ইহা হইতে প্রকৃত রাজভক্তি জন্মিবে।

ঋ—

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

[ঋ, র, য, একই গোত্রের, ণত্ববিধান দেখুন।]

রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ নাটককার, রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক, রবীন্দ্রনাথ সমাজ তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক; কি[ন্তু]

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তাঁহার ঋষিত্ব। মনীষী শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের 'চরিতকথা'য় পড়িয়াছি, তাঁহার একটি শিশুকন্যা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বাবা! ইনি কি খুব রাগী?' আহা, বেচারার অপরাধ কি? সে মহর্ষি বলিতে দুর্ব্বাসা, অষ্টাবক্রের কথাই ভাবিত! রবীন্দ্রনাথ শিশুচিত্ত হইতে এরূপ কুসংস্কার বা অন্ধ ধারণা দূর করিবার জন্যই ঋষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহেন, ঋষি বলিলেই জটাজূটধারী 'তৈল বিনা রুক্ষকেশ', গৈরিকবসন বা দিগম্বর, জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটিকুটিলং মুখং বুঝায় না। 'সোণার গৌরাঙ্গ' হইলেই যে গৈরিকধারী হইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। কেশবচন্দ্র যেমন 'কমলকুটীর' নির্ম্মাণ করিয়া এই তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন যে, কুটীর বলিলেই উটজ বা পর্ণশালা বুঝায় না, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ ঋষিরূপ ধারণ করিয়া এই তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন যে, ঋষি বলিলেই 'নিরাহার নিরালম্ব' সমাধিস্থ পুরুষ বুঝায় না। ইঁহারাই প্রকৃত যুগাবতার। আমাদের শাস্ত্রের কথাও তাই—কলিতে ধর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য নহে। শিশুদিগকে ঋষি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ধর্ম্মের এই সার-তত্ত্বটি বেশ করিয়া বুঝাইতে হইবে। (তজ্জন্যই আমরা ঋ-কারে ঋষভদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, ঋচীক প্রভৃতি সেকেলে ঋষির বা ঋতধ্বজ, ঋতপর্ণ, ঋতম্ভর প্রভৃতি সেকেলে রাজার নাম দিই নাই।)

৯

(মৌলবী) ল্যাকত হোসেন

সংস্কৃতমূলক ৯কারাদি শব্দ পাইলাম না। সেইজন্য মৌলবী সাহেবের শরণ লইলাম। হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ করিবে না, শিশুকে সঙ্কীর্ণতাবর্জ্জন করিয়া এই উদারতা শিক্ষা দিবার জন্যও মৌলবী সাহেবের প্রয়োজন। উক্ত মহাপুরুষ স্বদেশীর জন্য যে অদম্য উৎসাহ দেখাইয়া আসিতেছেন, জ্বলন্তভাষায় শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগকে তাহা বুঝাইবেন। শিশুচিত্তে স্বদেশীর ভাব ফুটিলে, দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

তবে যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ স্বদেশীর নাম শুনিবা-মাত্র পুলিশের ভয়ে আঁতকাইয়া উঠেন, তিনি সরকার বাহাদুরের নিমকের—শ্রীবিষ্ণুঃ—চায়ের হালালী করিয়া ৯প্‌টনের চায়ের গুণগান করুন।
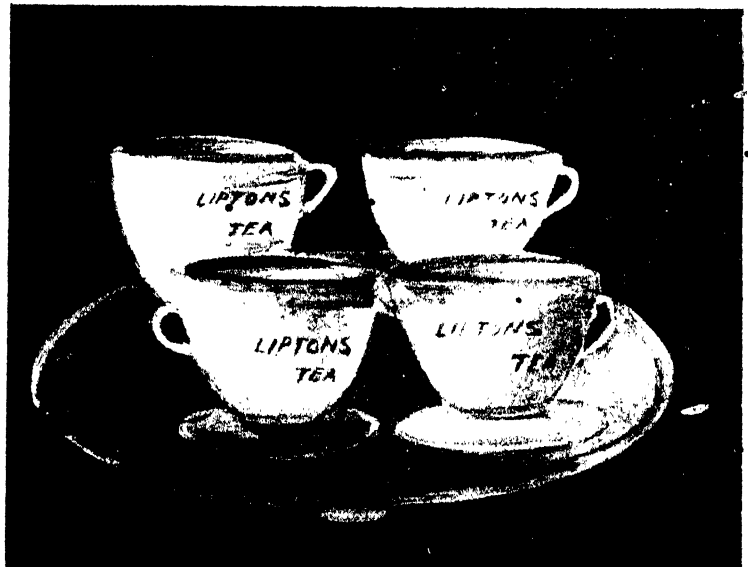
৯প্‌টনের চা

এক্ষেত্রে সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের গান 'শুধু এক পেয়ালা চা' শিশুদিগকে সুরতাল-সংযোগে গায়িতে শিখাইতে হইবে। তাহারা চা-বাটীতে চাম্‌চের মৃদু

আঘাত করিয়া তাল রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে গলা শুকাইলে এক-এক চামচে চা খাইবে। ইহা কিণ্ডারগার্টেন কম্ম-সঙ্গীত-অপেক্ষাও মনোরম হইবে। চা-পান অভ্যাস এখন হইতে না করিলে তাহারা সভ্যভব্য হইতে পারিবে না, দশজনকে আদর অভ্যর্থনা করিতেও শিখিবে না।

ত্রৈ

এলোকেশী—নবীন

[দেব একলিঙ্গ বা একদন্ত অথবা বীর একলব্যের নাম দিতে পারিতাম ; কিন্তু এগুলি কুসংস্কার ও কুরুচি-ব্যঞ্জক। তাহা ছাড়া, ক্রমাগত কাঠখোট্টা পুরুষের দৃষ্টান্ত দিলে শিশুচরিত্র কঠোর, নীরস হইয়া পড়িবে। সুতরাং মধ্যে-মধ্যে নারীর নাম দিয়া শিশুচরিত্রে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সরসতা আনিতে হইবে। দ্বাদশটি স্বরের মধ্যে কেবল দুইটি নারীর দৃষ্টান্ত দিলাম ; ইহাতেও যদি পাঠক-সমাজ লেখকের উপর নারীর প্রতি অযথা পক্ষপাতের আরোপ করেন, তবে নাচার।]

ত্রৈলোকেশী ও মোহন্তঘটিত ব্যাপার শিশুদিগের নিকট বিশদভাবে বর্ণন করিতে হইবে। সুরুচির দোহাই দিয়া এসব কথা চাপা দিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যিনি একাধারে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ কবি, তিনি শিশু-পাঠ্য কবিতাপুস্তকে উপগুপ্তের নিকট বাসবদত্তার 'অভিসার' বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তবু বাসবদত্তা পতিতা, এলোকেশী কুলস্ত্রী। আর নিতান্ত অশ্লীল বোধ হইলে বিদ্যাসুন্দরের বা চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলেই লেঠা চুকিয়া যাইবে। 'ওঃ কিছু নয় দাদা!' এলোকেশী নামের সূত্র ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করাও সহজ।

এই কুৎসিত বৃত্তান্তের সঙ্গে-সঙ্গে বিষের প্রতিষেধক রূপে, Religious Endowment Billএর উপকারিতা শিশুদিগকে বুঝাইতে হইবে।

[কন্‌গ্রেসের প্রসঙ্গ পরে উঠিবে। এখানে Social Conferenceএর তরফে একটু গাহিয়া রাখিলাম।]

ঐ

ঐক্যতানবাদন।

গানাৎ পরতরং নহি—ইহাই আমাদের শাস্ত্রের বাণী। শেক্‌সপীয়রের বাধাগৎ আওড়াইয়া আর বিদ্যা জাহির করিতে চাহি না। অকার শিক্ষাকালে থিয়েটারী ব্যাপারে সমষ্টিভাবে নৃত্যগীত বাদ্য বক্তৃতাসম্বন্ধে শিশুদিগের স্থূল-জ্ঞান হইয়াছে। পরে উর্ব্বশীর প্রসঙ্গে নৃত্যগীতের, ঌপ্‌টনের প্রসঙ্গে কোরাস্‌-সঙ্গীতের, মৌলবী ঌয়াকত হোসেনের প্রসঙ্গে বক্তৃতার, এবং এক্ষণে ঐকতানবাদন-প্রসঙ্গে বাদ্যের ব্যষ্টিভাবে সূক্ষ্মজ্ঞান জন্মিবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও শিশুদিগকে শুধু থিয়েটারে লইয়া গিয়া কন্‌সার্ট শুনাইলে চলিবে না। (তাহা ত এক কাণ দিয়া শুনিবে, অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে); তাহাদিগের ছোট-ছোট দল বাঁধিয়া তালিম করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে করিৎকর্ম্মা হওয়া চাই ; অর্থাৎ তাঁহার নৃত্য, গীত, বাদ্য, বক্তৃতায় চৌকস হওয়া চাই। সেকালের গুরুমহাশয়ের মত শুধু ছেলে লেখাইতে ও চাবুক চালাইতে পারিলেই চলিবে না।

ও—

ওয়াজিদ আলি শা (লক্ষ্ণৌএর নবাব)

ঔ

ঔরঙ্গজেব (বাদশা)

এই প্রসঙ্গে নবাবী বিলাসের চূড়ান্ত উদাহরণ ও তাহার শেষ পরিণামের চিত্র শিশুদিগের চক্ষের সমক্ষে ধরিতে হইবে। বুঝাইতে হইবে যে, এই চিত্র 'যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী' ইত্যাদি শ্লোকের মুসলমানী সংস্করণ। শিশু-দিগকে কোম্পানীর বাগান দেখাইবার ছলে গঙ্গার এপারে মুচিখোলার বিরাট ভবন দেখাইতে হইবে। আর পূজার ছুটী বা বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ সহরে লইয়া গিয়া নবাব-বংশের কীর্ত্তিসৌধগুলি তন্ন-তন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। দেশভ্রমণ আধুনিক শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এই জন্যই বিলাতে না গেলে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আবার বিলাতের লোক অন্য বিদেশে গিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন।

[শিশুগণ যাহাতে সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ করিতে না শিখে, তৎকল্পে শেষ দুইটি অক্ষরে মুসলমান নবাব বাদশার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। এই কারণেই পূর্ব্বে 'চরিতাবলী' প্রভৃতি পুস্তকে বৈদেশিকগণের জীবন-বৃত্তান্ত শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দুকে যে 'বসুধৈব কুটুম্বকং' এই মূলমন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে; কেন না হিন্দু উদারচরিত, আতিথেয়তাপরায়ণ।]

[ঔর্ব্ব ঋষির নাম না দিয়া ঔরঙ্গজেব বাদশার নাম দিলাম, কেন না বাদশার ক্রোধানল বাড়বানল হইতেও বিষম। ইংরেজ কবি-সম্রাট্ শেক্স্পীয়রের নামের যেমন ছত্রিশ রকম বাণান হইত, ছাত্রপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সেইরূপ এই বাদশার নামের আরংজেব, আরংজীব, আরাঞ্জীব আওরঙ্গজেব ইত্যাদি নানান বাণান দেখা যায়। আমি সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাণান বাহাল রাখিলাম— ঔরঙ্গজেব।]

ঔরঙ্গজেবের প্রসঙ্গে সমস্ত মোগল-ইতিহাস গল্পচ্ছলে শিশুদিগকে শুনাইতে হইবে; আকবর ও ঔরঙ্গজেবের রাজনীতির তুলনায় সমালোচনা করিতে হইবে; ঔরঙ্গজেবের শাসননীতির দোষে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হইল, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে। শিশু যখন ভবিষ্যৎজীবনে উকীল-ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে কন্গ্রেস আদি ঘটাইবে, তখন গোড়াগুড়ি রাষ্ট্রনীতি-তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন বিফল রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনেই পর্য্যবসিত; অতএব আমিও এইখানে শেষ করিলাম। বাঙ্গালী জীবনের আদ্যলীলা থিয়েটারে, মধ্যলীলা সাহিত্যের আসরে কবির লড়াইএ, অন্ত্যলীলা কন্গ্রেস-মণ্ডপে।

মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন॥
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে॥

বীণার তান

[অধ্যাপক শ্রীরসিকলাল রায়]

সংস্কৃত

শারদা, চৈত্র, মার্চ্চ, ১৯১৬,—(১) 'শঙ্করাচার্য্যঃ কদা বভুব' ? লেখক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী 'আর্য্যবিদ্যাসুধাকর' নামক গ্রন্থে এই মত বা কিম্বদন্তী সংগৃহীত করিয়াছিলেন। 'শঙ্করমন্দার সৌরভ' গ্রন্থ-প্রণেতা নীলকণ্ঠ ভট্ট লিখিতেছেন—

"প্রাসূত তিষ্যশরদামতিয়াত বত্যাম্,
একাদশাধিকশতোনচতুঃ সহস্র্যাম্।"

এতদনুসারে কলিযুগের ৩৮৮৯ অব্দ গতে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর-সাম্প্রদায়িকেরা বলেন,—

নিধিভাগে ভবহ্ন্দে বিভবে মাসি মাধবে,
শুক্লেতিথৌ দশম্যান্তু শঙ্করার্য্যোদয় স্মৃতঃ।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ রাও কির্লোস্কর

ইহাও পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করে। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য যে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সুরেশ্বরাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ও সমকালিক ছিলেন। সুরেশ্বরের এক শিষ্য চালুক্যরাজের সময়ে 'সংক্ষেপ শারীরক' নামক বেদান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার আপনাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অক্ষতশাসক মনুকুলাদিত্যের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চালুক্যবংশের রাজগণ মনুকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। চালুক্যবংশের দ্বিতীয় রাজা পুলুকেশী বিক্রমাদিত্য নামে, তৎপৌত্র বিনয়াদিত্য নামে এবং প্রপৌত্র বিজয়াদিত্য নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ঐ বংশের প্রথম রাজা আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ আদিত্যের সময়েই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এমন কি, বিনয়াদিত্যের সময়ে রচিত হইলেও, উহার কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ। শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয়ই তাহারও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণানুসারে তিনি বলবর্ম্মণ ও জয়সিংহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। কানিংহাম সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত পাঞ্জাব প্রদেশের মেরুবর্ম্মার শিলালেখ অনুসারে মেরুবর্ম্মার পিতা ছিলেন দিবাবর্ম্মা; দিবাবর্ম্মা ছিলেন বলবর্ম্মার পৌত্র। শিলালিপির কাল অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী। হুয়েন্‌সাঙ্গ-বর্ণিত পূর্ণবর্ম্মাও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। অতএব শঙ্করের সময় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকালে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সকল আলোচনা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ ৬৫০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(২) ভট্ট অকলঙ্কদেব। লেখক কুসুমাকর ভট্ট। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে মান্যখেট নামক নগরে শুভতুঙ্গাভিধান নামক রাজা ছিলেন। পুরুষোত্তম নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। অকলঙ্ক ও নিষ্কলঙ্ক নামে তাঁহাদের দুই পুত্র ছিল। পুত্রদিগের বয়স যখন যথাক্রমে ১০ ও ৮ বৎসর, তখন একদা মন্ত্রী ৺পুরুষোত্তমধামে গমন করিয়া জিন-মন্দিরে চিত্রগুপ্ত মুনির নিকট সপুত্রক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া নান্দীশ্বর পর্ব্বোৎসব সম্পাদন করিলেন। উৎসবান্তে কয়েক বৎসর পরে মন্ত্রী পুত্রদিগের বিবাহ স্থির করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া পুত্রেরা উভয়েই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আমরা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, এখন পরিণয় করিব কিরূপে ?' পিতা বলিলেন, 'সে ত কেবল উৎসবের জন্য।' যাহা হউক পুত্রেরা বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন না। সুতরাং মন্ত্রী তাহাদের উভয়কে এক জৈনোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। অকলঙ্ক ও নিষ্কলঙ্ক সংকল্প করিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধমতের নিরসন ও জৈনমতের প্রচার করিবেন। তদনুসারে তাঁহারা বৌদ্ধবেশ পরিধান করিয়া গয়াক্ষেত্রে বৌদ্ধবিদ্যা-মন্দিরে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এক দিন অধ্যাপকের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা ধরা পড়িলেন এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের

উভয়েরই প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া অকলঙ্ক কাঞ্চী প্রদেশে রত্নসঞ্চয়পুর নামক নগরের সমীপে এক অরণ্যে বহু-শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই নগরের রাজা হিমশীতল বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহিষী মদনসুন্দরী জৈন ছিলেন। রাণী জৈনোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে রাজগুরু তাহাতে বাধা দিতে জৈনপণ্ডিতদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। রাণীর অনুরোধে অকলঙ্কদেব তাঁহাকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজা এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

হিন্দী

১। **সরস্বতী**, এপ্রিল ১৯১৬। সম্পাদক শ্রীমহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী। অঙ্কুরবটের মন্দির; লেখক শ্রীবালকৃষ্ণ শর্ম্মা। ধর্ম্মভাব ও অধ্যাত্মবলই প্রাচীন হিন্দুজাতির উন্নতির ও গৌরবের কারণ ছিল। কাম্বোজ (Cambodia) দেশের অন্তর্গত অঙ্কুরবট নামক স্থানের মন্দিরে প্রাচীন হিন্দুর এই ধর্ম্মভাব সজীব রহিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কতিপয় আর্য্যসন্তান বঙ্গদেশ হইতে এক সমুদ্র পোতে আরোহণ করিয়া সাগরপারে মেকঙ্গ (Mekong) নদীমুখে প্রবেশ করিয়া, উহার তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া খমের (khmer) নামক এক বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত এই ঔপনিবেশিক রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। এই দেশেও মন্দির-নির্ম্মাণ-কলা-বিদ্যা উৎকর্ষের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

একাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয়, শ্যামী ও লাওশান জাতিরা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমে খমের রাজ্য ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হইয়া অবনতির পথে ধাবিত হয়। ফ্রেঞ্চ কোচিন চীনের রাজধানী সৈগোন সিঙ্গাপুর হইতে প্রায় দুই দিনের পথ। সৈগোন হইতে ৪৮ ঘণ্টায় অঙ্কুরবটে পৌঁছিতে পারা যায়। পথে ষ্টীমারের দৃশ্য অতি সুন্দর। খমের রাজ্যের রাজধানী অঙ্কুরের ধ্বংসস্তূপে অঙ্কুর থোম দর্শনীয়। উহার মধ্যস্থলে বায়োনের অপূর্ব্ব মন্দির। এই মন্দির খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার ৫১টী চূড়া ছিল এবং প্রত্যেক চূড়ায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি খোদিত ছিল। মন্দিরে প্রবেশের নিমিত্ত ১৬টী দ্বার আছে। এখন মন্দিরের উপর এক বিশাল বৃক্ষ জন্মিয়া মন্দির বিদীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। অঙ্কুর থোমের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীন খমের রাজ্যের অনেক স্মারকচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বরাইকুণ্ড, প্রাহখন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে পাহাড়ের উপর বা-পেঙ্গের মন্দির এবং "মাঠে অত্যাশ্চর্য্যজনক, ভীমকায়, মনুষ্য-শিল্পের অদ্ভুত নমুনা, অঙ্কুরবটের সুবিশাল মন্দির।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, ইহা দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা চতুষ্কোণ, ১৩০ গজ দীর্ঘ এবং ৮৬৬ গজ প্রশস্ত। মন্দিরের দ্বার পশ্চিম মুখে। সম্মুখে চৌতারা, তাহাতে সিংহ ও নাগমূর্ত্তি। মন্দিরমধ্যে প্রাচীরে নানাবিধ ভাবপূর্ণ চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কোথাও হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতির শোভাযাত্রা, কোথাও রামরাবণের ঘোর যুদ্ধ, কোথাও

অঙ্কুরবট মন্দির

অঙ্কুরবট মন্দিরের এক কোণ

স্বর্গ-সুখ ও নরক-যন্ত্রণা প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মন্দিরের উপর এখন বিশাল বৃক্ষসকল উৎপন্ন হইয়া উহার ধ্বংস-সাধন করিয়াছে। উহার অভ্যন্তরে এখন বৌদ্ধ গুরুদেরও আশ্রয় স্থান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই মন্দির ভারতীয় হিন্দুর অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের-কীর্ত্তিস্তম্ভের স্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

২। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, দিসম্বর ১৯১৫। সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র বর্ম্মা। প্রয়াগের ষষ্ঠ হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর দাস বি-এ মহাশয়ের বক্তৃতা—হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য বহু সভা, সমাজ থাকা সত্ত্বেও হিন্দী সাহিত্যের পুর্ত্তি, হিন্দী ভাষার বৃদ্ধি এবং দেবনাগরী অক্ষরের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রচারের জন্য হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন সুসঙ্গত ও নিতান্ত আবশ্যক। লখনউ নগরে পঞ্চম সম্মেলন-কালে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র পঞ্জাবের পক্ষ হইতে লাহোরে ষষ্ঠ সম্মেলনের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটে নাই। ভগবানের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। বীজ হইতে প্রকাণ্ড তরুর উৎপত্তি হয়। সেইরূপ অসভ্য আদিম অবস্থা হইতে ক্রমে মানব সভ্য-সমাজে উন্নীত হইয়াছে। আদর্শ সভ্যতা তাহাকেই বলে যাহাতে প্রত্যেক মানুষের মনে এইরূপ ধারণা জন্মে যে, আমার কোন কাজ করিবার যতটুকু অধিকার, অপরেরও ততটুকুই অধিকার আছে। এই ভাব যে জাতির মধ্যে যত অধিক, সে জাতি তত সভ্য ও উন্নত। এইরূপ সামাজিক ও সভ্যতার অবস্থা না আসিলে মস্তিষ্কের বিকাশ হইতে পারে না। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেও এরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের বিকাশ বিষয়ে সাহিত্যের স্থান অতি উচ্চে। বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবনতত্ত্ব বা প্রাণরসের (প্রোটোপ্লাজম্) অংশ আদি জীব বা জীবাণু (প্রোটোজোআ) প্রথমে শরীরের সকল অংশ দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে। পরে বাহ্য পঞ্চভূতের প্রভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয়। সেইরূপ সমাজ-মস্তিষ্কের সংগঠন বা বিনাশ সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্কের বিকাশের ও বুদ্ধির প্রধান উপায় সাহিত্য। সামাজিক মস্তিষ্ক আপন পুষ্টির নিমিত্ত যে ভাবসামগ্রী বাহির করিয়া সমাজের ক্রোড়ে সমর্পণ করে, তাহারই সঞ্চিত ভাণ্ডারের নাম সাহিত্য। অতএব কোন জাতির সাহিত্যকে উহার সামাজিক শক্তি বা সভ্যতার নির্দ্দেশক বলা যাইতে পারে। শরীরের পুষ্টির ও রক্ষার জন্য যেরূপ অনুকূল আহারের প্রয়োজন, সেইরূপ মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশের, ভূমির উর্ব্বরতা, জলবায়ুর মৃদুতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আমাদিগকে হয় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন করে, অথবা বিলাসপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার অধীন করিয়া ফেলে। এইজন্যই এ দেশের সাহিত্যে ধর্ম্মভাব ও শৃঙ্গাররসের এত প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য এবং ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে মানব-জীবনের সামাজিক গতি নিয়মিত করিতে সাহিত্যের প্রভাব কত অধিক তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সাহিত্য যদি

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর দাস, বি-এ

আমাদের বর্ত্তমান জীবনের গতি অনুসরণ না করে, অথবা আমাদের জীবনস্রোত যদি আমাদের সাহিত্যের ধারা হইতে স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইতে পারে না। এতদিন এদেশের সাহিত্য আমাদের জীবনযাত্রার সহায়ক হয় নাই; কারণ, এ দেশ বহুবিস্তীর্ণ ও একান্তে একপ্রান্তে অবস্থিত এবং ইহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য অপার। কিন্তু এই সকল কারণ এখন অন্তর্হিত হইয়া তীব্র জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আশা আছে, এখন সাহিত্য আমাদের মস্তিষ্ককে প্রোৎসাহিত ও ক্রিয়াশীল করিয়া জীবনপথে সহায়ক হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদেশে আজকাল এরূপ সাহিত্যের প্রয়োজন, যাহা মনের বেগ পরিষ্কার করিতে পারে, সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, চরিত্র সুন্দরভাবে গঠন করিতে পারে এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য পরিমার্জ্জিত, সরস ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রস্তুত হওয়া উচিত। সমস্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দীই মাতৃভূমির সেবার জন্য একমাত্র উপযুক্ত ভাষা। গুজরাতী, মরাঠী, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্য হিন্দী অপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইলেও উহাদের প্রাচীন সাহিত্য হিন্দীর তুলনায় হীন। হিন্দী অন্যান্য ভাষার ন্যায় ভারতের কোন প্রান্ত বা স্থানবিশেষে আবদ্ধ নাই, সমস্ত ভারত ভূমিতেই ইহার অবিস্তর আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দী মাতামহী সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। এই সকল কারণে হিন্দী ভারতে রাষ্ট্রভাষা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং হিন্দী হইতে ভারতের রাষ্ট্রনির্ম্মাণ-কার্য্যে অমূল্য ও বাঞ্ছনীয় সহায়তা লাভ হইতে পারে। ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্রীয়

মনোরঞ্জন, বসন্ত অঙ্ক, ১৯১৬।

কির্লোস্কর বন্ধু বত্যাচা' কারখানা—লেখক শ্রীযুক্ত প্রো কেশব রামচন্দ্র কনিটকর এম-এ, বি-এস সী।

সরকার-বাহাদুর নূতন বর্ষারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণরাও কির্লোস্কর মহাশয়কে 'কাইসার-ই-হিন্দ' রৌপ্যপদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। লক্ষ্মণরাও সরকারী কর্ম্ম করেন না, লোকনায়ক বক্তা নহেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র নহেন, পরোপকার বা জনহিতকর কার্য্যেরও অনুষ্ঠাতা নহেন; তথাপি সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। তিনি এই অনুগ্রহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং তাঁহার গুণরাশি সরকার-বাহাদুরের নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণরাও কির্লোস্করের পিতার নাম কাশীনাথ পন্ত। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র পন্ত। মধ্যম ভ্রাতা বাসুদেব রাও শোলাপুরের ডাক্তার। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এম্-এস্। কির্লোস্করের আদি নিবাস মানবণ তালুকের অন্তর্গত কির্লোসী। কির্লোসী হইতে লক্ষ্মণরাও কির্লোস্কর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মণরাও দরিদ্রের সন্তান, তাঁহার পিতার অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। তিনি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া হাইস্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। স্কুলে ড্রইং (অঙ্কনে) বিদ্যার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। স্কুল ছাড়িয়া তিনি বোম্বাই যান এবং তথায় জিজীভাই আর্টস্কুলে চিত্রকলা শিক্ষা করেন। চিত্রবিদ্যায় তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তৎপর ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ড্রইং মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েই যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্মণরাওয়ের কৌতূহল জন্মে। তিনি বিদেশ হইতে বাইসিকেল্ ও অন্যান্য মাল আমদানী করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে বিক্রয় করিয়াও লাভবান্ হইতেন। ১৮৯২ সনে তিনি বোম্বাই সহরে অয়েল এঞ্জিন আমদানীর বন্দোবস্ত করেন এবং সর্ব্বপ্রথম এদেশে ক্যাটালগে এঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির চিত্রসহ বর্ণনা প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ সনে বোম্বায়ে প্রথম প্লেগ দেখা দেয় এবং সেই সময় যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে লক্ষ্মণরাও সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার উপায় চিন্তা করেন। ১৮৯৯ সনে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বোম্বাই ছাড়িয়া বেলগাঁও নামক স্থানে বাইসিকেল মেরামতের দোকান করেন। ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত তিনি প্রায় ৩০০ লোককে সাইকেলে চড়িতে শিখাইয়াছিলেন। ১৯০৭ সন পর্য্যন্ত এই দোকানে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইল। কিন্তু কেবল অর্থোপার্জ্জনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না, সঙ্গে-সঙ্গে স্বদেশ-সেবা ও স্বদেশের শিল্পোন্নতি-সাধনও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এজন্য তিনি এইসঙ্গে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্যে প্রয়োজনীয় লৌহ-যন্ত্রাদি তিনি প্রথমে বিদেশ হইতে ও বোম্বাই হইতে আনাইতেন। পরে কামারশালা স্থাপন করিয়া লাঙ্গল প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। ১৯১০ সন পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র কারখানার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইল।

১৯১০ সনে তাঁহাকে বেলগাঁও ছাড়িতে হইল। মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহার কারখানার স্থান দখল করিয়া তাঁহাকে নোটিস দিয়া উঠাইয়া দিল। এই বিপদে বিধাতা তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি উদার-চরিত শ্রীমন্ত বালাসাহেবের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। বালাসাহেব তাঁহার অধিকারে লক্ষ্মণরাওয়ের কারখানার এবং কর্ম্মচারী ও মজুর-দিগের বাসস্থানের স্থান দিলেন। মান্দ্রাজ সাদার্ণ মরাঠা রেলের লাইনের ধারে কুণ্ডলরোড ষ্টেশনের নিকট এখন লক্ষ্মণরাওয়ের প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লক্ষ্মণরাও এক নূতন বসতি স্থাপন করিয়া তাহার নাম কির্লোস্কর বাড়ী রাখিয়াছেন। গত ১৯১১ সনে এই নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখন উহাতে প্রত্যহ ৯৫ জন লোক খাটিতেছে। এই কারখানায় এখন নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, কৃষিযন্ত্র ও ইঞ্জিনের অংশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। লৌহশালায় প্রত্যহ প্রায় দুই টন লোহা গলাইয়া রেলগাড়ীর চাকা প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবসায়ের জন্য কাচা মাল, কারিগর মজুর ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণরাওয়ের ন্যায় উৎসাহী, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট কারখানা পরি-চালকের প্রয়োজন।

গুজরাতী

সমালোচক, জানুয়ারী ১৯১৬। তন্ত্রীরাও অম্বালাল বুলাখীরাম জানী বি-এ ও রাওচন্দ্র শঙ্কর নর্মদা বি-এ, এল্, এল্-বি—

গুজরাত মাঁ ইস্লামী উপদেশক—লেখক রাও কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝবেরী এম-এ, এল্, এল্-বি,—

হজরত মহম্মদ কাফেরদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে 'ফরমান' করিয়াছিলেন বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা অমূলক। কোরাণ সরিফের স্থানে স্থানে অজ্ঞানকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার কথা আছে (৩, ১৮ কোরাণ শরীফ দ্রষ্টব্য)। এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে 'সমশের' (তরবারী) লইয়া ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের যে কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কোরাণের কোথায়ও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কোরাণ উপদেশ করিয়াছেন "ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও উপর জোর জবরদস্তি করিও না" (প্রকরণ ২, ২৫৬)। উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া রাজি করিয়াই সাধারণতঃ মুসলমানধর্ম্মের প্রচার করা হইয়াছে, জোর-জুলুম করিয়া নহে।

বুঝাইয়া, স্বার্থের লোভ দেখাইয়া, জোরজুলুম করিয়া এবং অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্মেরও প্রচার হইয়াছে। এদেশে লালিয়া ও প্যারিয়া প্রভৃতি জাতি সামাজিক কঠোরতাহেতু খৃষ্টধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করিতেছে। সেইরূপ পূর্ব্বে অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পীর ও ফকিরদিগের ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া মহম্মদের ধর্ম্ম স্বীকার

করিয়াছিল। তের চৌদ্দ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মুসলমান-বিজয় আরম্ভ হইতে গুজরাতে জোর জুলুম আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া বিজেতারা প্রলোভন দেখাইয়া কৌশলে লোককে মুসলমান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফেরোজসাহে তুঘলখ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুপ্রজাগণকে জজীয়া কর হইতে মুক্ত করিবার ও উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন।

সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে আরব হইতে মুসলমান বণিকগণ ভারতের মালাবার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারক। তৎপর প্রায় ঐ সময়েই মুসলমানেরা সিন্ধু, কাঠিয়াবাড়, খম্ভাত, ভরুচ প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান ও নগর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে সিন্ধু, মুলতান, কচ্ছ ও গুজরাতে মুসলমান ধর্ম্মের আমদানী হইয়াছিল।

তখন গুজরাতের হিন্দু নরপতি হিন্দু-মুসলমান এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু এই সকলের প্রতিই সমান ভাব দেখাইতেন। এই কারণেই গুজরাতে অণহীলবাড়, খম্ভাত প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে সহস্র-সহস্র মুসলমানের বাস এবং মন্দির ও মসজিদ পার্শ্বে পার্শ্বে শীর্ষ উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কথিত আছে, রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সময়ে (১০৯৪—১১৪৩) হিন্দু, পারসী, জৈন ও মুসলমান-দিগের মধ্যে কলহ হইয়া মুসলমানদিগের মসজিদ অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজা অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া তাহাদের অর্থ দ্বারা মসজিদ পুনঃ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

যে সকল প্রধান প্রধান মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে খাজা মইনুদ্দীন চীস্তীর (১১৫৫) নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এখনও আজমীরে ইঁহার দরগাহ রহিয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী গঞ্জশকর, শেখ জলাল ইমাম শাহ ও সৈয়দ মহম্মদ জুণপুরী বিনা জুলুমে হিন্দুস্থানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে শাহ আলম, শাহ তাহের প্রভৃতি পীরের নামও উল্লেখযোগ্য। মলেক আবদুল লতীফ উফ দাবলশাহ পীর অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। প্রখ্যাত ফারসী ইতিহাস লেখকেরা ভারতেতিহাসের অন্তে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের চরিত্র আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মিরাতে অহমদী নামক গুজরাতের ফারসী ইতিহাসেও পীর ও শেখদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

এইরূপে বহু হিন্দু জাতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৮০। কিন্তু তন্মধ্যে চার পাঁচটী প্রধান যথা, মেমণ, খোজা, বোরা, মতীয়া অথবা আঠীয়া, মোলে সলাম, কসবাতী ও মলেক। নিম্নলিখিত জাতি সকল হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—তাই, বঙ্গীয়, দুধওয়ালা, পথালী, হজাম, হীজড়া, থাউকী, মাৎবক্ক, সলাট, সোনী, মণিয়ার, লুহার, সুতার প্রভৃতি।

বোগদাদের প্রসিদ্ধ পীর মৌলানা অবদুল কাদর মোহীউদ্দীন গীলানীর বংশধর সৈয়দ রসুকউদ্দীন রাজা রায়রায় ধণের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশের টট্টানগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন। তিনি সাতশত লোহাণ জাতি ও তাহাদের নেতা মালেক জীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই জাতি সাধু সন্ন্যাসী ও পীর ফকিরকে এখনও তুল্য শ্রদ্ধা করে।

"খোজা সম্প্রদায়ের মুর্শিদ," বিখ্যাত আগাখাঁর পূর্ব্বাধিকারীদিগের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। অলী হজরত মহম্মদের ও তাঁহার জামাই হজরত আলীর মৃত্যুর পর মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নী এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। আলী ও বিবি ফতেমার পুত্র হসন-হুসেন নৃশংসভাবে নিহত হন। ইঁহাদের বংশে ৭ম ইমাম ইস্মাইল। কথিত আছে, ইনি মিসর দেশে কেরো সহরের প্রতিষ্ঠা করেন। হুসন সত্থা পশ্চাৎ মিশর হইতে ইরানে আসিয়াছিলেন। ইহারই পদপ্রাপ্ত বংশধর আগাখান। এই বংশের নুরসতগুরু (নুরদীন) ১০০১ খৃঃ ভারতে আসিয়া পঞ্জাব, কাবুল, চিত্রল ও পরে কাশ্মীরে ধর্ম্মপ্রচার করেন। 'বেতামণ' নামে যে সকল শ্লোক পাওয়া যায় তাহাতে নূতন দশাবতারের মধ্যে নুরসতগুরুর নাম আছে।

আবদুল্লা নামক এক ধর্ম্মোপদেশক শিয়া সুন্নীর বিবাদহেতু আরব পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধের পথে মিশরে যাইতেছিলেন। তিনি অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখাইয়া গুজরাতে খম্ভাত নগরে রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে এবং বোরা সম্প্রদায়কে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন (১০৬৭)। গুজরাতে মৌসমে বহার নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহা ফারসী অক্ষরে বোরা-গুজরাতীতে লিখিত। তাহার পদ্যের নমুনা একটু উদ্ধৃত হইল—

অলীনা নামসে অলিম্ পলে ছে,
অলীনা নামসে লোহ গলে ছে,
অলীনা নামসে দুশমন জলে ছে,
অলীনা নামসে মুস্কেল টলে ছে,
অলীনা নাম জিলতনা কিয়ারা
অলীনা নাম ছে রখনা পিয়ারা।

ইসমাইলী পীর সদরুদ্দীনের পৌত্র ইস্মামবাহি মুলতান হইতে গুজরাতে আসিয়া মতীয়া সম্প্রদায়কে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। "শ্রীইমাম-শাহ খাবানা প্রছা" নামক পুস্তকে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ইঁহারা অনেকেই নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞান হিন্দুদিগের নিকট অলীকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুরা হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া যতটুকু মুসলমান ধর্ম্ম বুঝিতে ও আরম্ভ করিতে পারিয়াছিল, তাঁহারা ততটুকুই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আজকাল পাদরী সাহেবেরাও অনেক স্থানে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। সৈয়দ মহমদ জোনপুরী নামক একজন উপদেশক 'মাহদবী' মত প্রচার করিয়াছিলেন (১৪৯৭)। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বিস্তারিত বর্ণনা মিরাতে সিকন্দরী নামক ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

ওড়িয়া

উৎকলসাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২৩, সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কর।—

নারীপ্রতিভা।—সুযোগ ও সুবিধা পাইলে নারী, কি বৈদিক, কি

মানসিক, সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বকালেই নারী আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়া মানব সমাজকে বিস্মিত করিয়াছে। তথাপি নারীজাতি সম্বন্ধে সকল দেশের পুরুষেরাই নানাপ্রকার কুসংস্কার মনে পোষণ করেন। এমন কি, সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেও বর্ত্তমান মহাসমরের অব্যহিত পূর্ব্বে নারী-জাতির রাজনৈতিক অধিকার লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। আজ সেখানে নারীগণ সকল আন্দোলন ভুলিয়া দেশ-সেবাব্রতে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্য দেশে নারীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। সামান্য মাত্র অধিকার পাইলেই নারী আপন প্রতিভার অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়া পুরুষের স্পর্দ্ধাকে লজ্জিত করিতেছেন। এই ভারতভূমিতেও আজ নারী নানা বিভাগে স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে ছাড়েন নাই। জনৈকা বঙ্গমহিলা প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উক্ত ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। আর একটী বৈদ্যবংশীয়া বালিকা সুকঠিন সাংখ্য দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উপাধি লাভ করিয়াছে। আপনার অত্যাচার দ্বারা পরের অক্ষমতার উপর তালি দিতে মনুষ্য চিরদিনই অগ্রসর!

আসামী

আলোচনী, চত্র ১৮৩৭, সম্পাদক শ্রীদুর্গানাথ চাংকাকতী,—

অসমীয়া সাহিত্যের উন্নতির অর্থে,—ইংরাজী Dictionary of Phrases and Fables পুস্তকের মত কোন অভিধান এ পর্য্যন্ত আসামী ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। আসামী ভাষায় যে সকল পুরাতন প্রাসঙ্গিক কথা আছে, যেমন 'পিঠিত বাবরি ফুল বাছা, শিশুপাল খেদা' প্রভৃতি, তাহা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। অনেক অসমীয়া পুথির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাঠান্তর আছে। তাহা সংগৃহীত হইয়া পুথির আকারে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। অসমীয়া মহাভারত অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অসমীয়া মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। পরম উৎসাহী স্বদেশপ্রেমিক স্বর্গীয় লক্ষেশ্বর শর্ম্মা বহু পরিশ্রম ও ধন ব্যয় করিয়া মহাভারতের মাত্র কয়েকটি পর্ব্ব প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমেরিকার বেপটিষ্ট মিশনে যখন শিবসাগরে প্রথম অসমীয়া সংবাদ-পত্র 'অরুণোদয়' প্রকাশিত হয়, তখন সেই মিশন-সমাজ হইতে অনেক ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তকের আসামী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি এখন সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মুদ্রিত করা উচিত। আসামে প্রাচীন কালে এবং আধুনিক সময়েও অনেক সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। আসামী ভাষায় যে সকল বিশেষ বিশেষ বাক্‌ভঙ্গী ও idiom (রং-ধেমালি) আছে, তাহার ব্যাখ্যা সহ সচিত্র পুথি প্রকাশ করা আবশ্যক। আসামে একটি প্রাদেশিক মিউজিয়াম বা যাদুঘর স্থাপন করা বিধেয়। তথায় আসামের প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত আসামী পুথি যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে সরকার-বাহাদুরকে অনুরোধ করা উচিত।

প্রতিধ্বনি

ইন্দ্রযব

গ্রীষ্মকালে বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন শীতকালেও কলেরার আবির্ভাব দেখা যায়। ইন্দ্রযব এই বিষম রোগ নিবারণের অন্যতম ঔষধ। ইহা "এন্থেলমিণ্টিক" অর্থাৎ ক্রমিঘ্ন। সুতরাং কৃমিজনিত কলেরায় ইন্দ্রযব আরও বিশেষ কাজ করিয়া থাকে। ভারতের লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম, ডি, প্রথম সিবিল সারজন বারাকপুরনিবাসী পরলোকগত মহাত্মা ডাক্তার ভোলানাথ বসু একমাত্র ইন্দ্রযব ব্যবহার করিয়া বহুসংখ্যক বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রযব আর কিছুই নহে, ইহা কুরুচির ফল মাত্র। ইহার গঠন শশার বিচির মত। বাজারে সর্ব্বদা বেণের দোকানে পাওয়া যায়। দুই পয়সার ইন্দ্রযব বেণের দোকান হইতে আনিয়া তাহা হইতে মিশ্রিত অন্যান্য কাটাকুটীগুলি ফেলিয়া দিয়া তাহা পরিষ্কৃত জলের সহযোগে বাঁটিতে হয়। পরে ঐ বাটা ইন্দ্রযব এক সের পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোয়া জল থাকিতে নামাইতে হয়। নামাইবার পর ঐ জল শীতল হইলে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্রের নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচা ঐ জল খাওয়াইতে হয়। দাস্ত শীঘ্র শীঘ্র হইলে ঐ ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। ছোট শিশুর কলেরা হইলে অতি ছোট চামচার এক চামচা, পূর্ণবয়স্কের বড় চামচার এক চামচা। ইন্দ্রযব, ডাক্তার বসুর বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ। গবর্ণমেণ্টও এই ঔষধ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ডাক্তার বসুর একখানি রিপোর্ট আছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার সমস্ত ফরিদপুর জেলায় এপিডেমিক কলেরা হয়। সে সময় তাঁহার ব্যবস্থামত ইন্দ্রযব প্রয়োগে বহুসংখ্যক কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তিনি সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণকেও কলেরা ও রক্তামাশয় রোগে ইন্দ্রযব দিবার ব্যবস্থা করিতেন। ডাক্তার বসু ন্যূনাধিক পনর-ষোল বৎসর ফরিদপুর জেলার সিবিল সারজন ছিলেন। ডাক্তার বসুর ইচ্ছানুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে

ঐ জেলায় রাখিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের বঙ্গদেশের স্যানিটারী কমিসনরের রিপোর্টে ডাক্তার বসুর ইন্দ্রযব প্রভৃতি দুই একটী দেশীয় ঔষধের নাম উল্লেখ আছে। গ্রীষ্মকালে গৃহস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই ইন্দ্রযব সংগ্রহ করিয়া গুঁড়া করিয়া রাখা উচিত। কলেরার সময় বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐ পাউডার বড় উপকারী। ইন্দ্রযবের পাউডার অল্পপরিমাণ জলের সহিত মুখে ফেলিয়াও সেবন করা যাইতে পারে, কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল হইলে ইন্দ্রযবের গুঁড়া সুবিধা নহে। ইন্দ্রযবের সিদ্ধ জলই প্রশস্ত।

আমাদের বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইন্দ্রযবের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, ধারক, কটুরস, শীতবীর্য্য, অগ্নি প্রদীপক এবং জ্বর, অতিসার, বমি, বীসর্প কুষ্ঠ, অর্শরোগ, গণ্ডদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক।—হিতবাদী।

নারী-শিল্পাশ্রম

অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দান করা এবং তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা ও নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্য শিক্ষাদান করিয়া উপার্জ্জনের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া—নারী-শিল্প আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে এখানে দর্জ্জির কাজ, কৃত্রিম ফুল, জমাট দুগ্ধ, সাবান, মোমবাতি, চিরুণী ও বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে; পরে শিক্ষালয়ের উন্নতি হইলে আরও নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই শিক্ষালয়ের জন্য বাড়ী ভাড়া মাসিক ৮০৲ টাকা, দর্জ্জির বেতন ৩০৲ টাকা, একজন পিয়নের বেতন ১০৲ টাকা, বোর্ডিংএর জন্য একজন ঝি অথবা চাকরের বেতন ১০৲ টাকা ও অন্যান্য খরচ ২০৲ টাকা—মোট ১৫০৲ টাকা আবশ্যক।

যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তবে একখানি গাড়ীর বন্দোবস্ত রাখিয়া স্থানীয় মহিলাদিগকেও এখানে আনিয়া শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

এককালীন কতকগুলি টাকা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া কতিপয় লোকের নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য লইয়া এবং এক-একজন অর্থশালী লোকের নিকট হইতে এক একটী বিধবার খরচ বাবদ মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য গ্রহণ করতঃ এই স্কুল চালাইতে মনস্থ করিয়াছি। ইহাতে একটী সুবিধা এই যে, যতদিন স্কুল চলিবে তত দিবস তাঁহাদিগের টাকার সদ্ব্যবহার হইবে। ভবিষ্যতে যদি স্কুল উঠিয়াও যায় তাহাতে সাহায্যকারীগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। তবে শিক্ষাদানের উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপকরণ এবং বোর্ডিংএর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদের নিমিত্ত এককালীন কিছু সাহায্যেরও প্রয়োজন। ইহার কার্য্যকারিতায় লোকে সন্তুষ্ট হইলে তৎপরে ইহাকে স্থায়ী করিব জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট একটি বি[শেষ] অনুরোধ এই যে, প্রত্যেক মাসের চাঁদা নিয়মিতভাবে দিবে[ন] কারণ ঠিক সময়ে সাহায্য না পাইলে স্কুলের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাই[বে] এবং বোর্ডিংএর মেয়েদের অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে, সঙ্গে-স[ঙ্গে] আমিও বিশেষ বিপন্ন হইব। শ্রীমনোরমা মজুমদার।—'বাঙ্গালী'।

Percentএর প্রতিশব্দ

One Percent, Two percent প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা কি আমি যতদূর জানি, সহজ কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব্দ আমাদে[র] নাই। ডাক্তারী পুস্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার করিতে হয় কেহ কেহ বাঙ্গালা অক্ষরে "ওয়ান্ পারসেণ্ট", "টু পারসেণ্ট" লিখি[য়া] গোলমাল এড়াইয়াছেন; কেহ বা খাঁটী বাঙ্গালা লিখিতে গি[য়া] "শতকরা এক-ভাগ দ্রব্য, শতকরা দুই-ভাগ দ্রব্য" ইত্যাদি লিখিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার না থাকায় আয়ুর্ব্বেদী পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে "One percent, Two percent" প্রভৃতির একটি সুন্দর প্রতি শব্দ আছে। কথাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব করিতে ব্যবহৃ[ত] হয়। এক শত টাকা মূল্যে ক্রীত জমীর বার্ষিক আয় ৫৲ টাকা হইলে ঐ ক্রয়কে "পাঁচোত্তরা" ক্রয় বলে। এইরূপে "চারোত্তরা, সা[ড়ে] সাতোত্তরা" প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি কোন জমীর আ[য়] চারি টাকা হয় ও মূল্য ৯০৲ টাকা হয়, তবে তাহা প্রায় "সাড়ে চারো ত্তরা" হইল। "এই জমী কি দরে কেনা হইয়াছে", এই প্রশ্নের উত্ত[রে] "পাঁচোত্তরা কিনিয়াছি" কিংবা "ছয়োত্তরা কিনিয়াছি", এই পর্য্য[ন্ত] বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তরদাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতা কাহার[ও] বুঝিবার বাকী থাকে না। কমিশন কষিবার সময়ও ঐরূপ। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমা বা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মধ্যবর্ত্তী সম্পাদক (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়া থাকেন, তাহা তায়দাদের উপর "আধোত্তরা, একোত্তরা" বা ততোধিক হিসাবে কষা হইয়া থাকে; অর্থাৎ মোকদ্দমা বা বেচা-কেনার Value (তায়দাদ) এর উপর একটা শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে পাইয়া থাকেন। "উত্তর" শব্দের গ্রাম্য ব্যবহারে "উত্তরা" শব্দের উৎপত্তি। "একোত্তর, দুয়োত্তর" লিখিলে যেমন সুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণশুদ্ধও হয়। এই শব্দটি সাহিত্যিকেরা গ্রহণ করিলে ভাষার একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ যত্নশীল আছেন। সম্প্রতি যাহাতে মেডিকেল স্কুলসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষৎ অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সুন্দর শব্দটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্দ্র যোগ।—

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।"

সাময়িকী

'ভারতবর্ষের' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আজ তিন বৎসর আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই তিন বৎসর আমরা তাঁহার বড় সাধের ভারতবর্ষ যথাসাধ্য সম্পাদন করিলাম; আজ 'ভারতবর্ষ' চতুর্থবর্ষে পদার্পণ করিল। আজ বারবার দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আমাদের মনে হইতেছে; তিনি বাঁচিয়া থাকিলে 'ভারতবর্ষে'র আজ কি উন্নতি হইত তাঁহা মনে করিয়া আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা ভাবিতেছি। কিন্তু, তাঁহাকে ত আমরা আর পাইব না; তাঁহার উপদেশ ত আমরা আর শুনিতে পাইব না; তাঁহার কণ্ঠ ত আর 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি' গায়িবে না। আজ 'ভারতবর্ষে'র চতুর্থবর্ষে প্রবেশসময়ে, তাঁহারই নাম বারবার স্মরণ করিতেছি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা যেন আমাদিগকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রদর্শিত পথে পরিচালন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এ বৎসর এতদিনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভার কোন আয়োজনই দেখিতে না পাইয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছিলাম। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার গুণমুগ্ধ, তাঁহারা যে কেন এখনও নীরব রহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাঁহারা নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিলেও আমাদের যুবকসমাজ নিশ্চেষ্ট হন নাই। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার 'মিরজাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরীর, (Phœnix Union Library) সদস্যগণ দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, মনীষী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিতেছেন। তিনি তাহারই একটি অধ্যায় এই সভায় পাঠ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথাই এই অধ্যায়ে ছিল। প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীমান দিলীপকুমার তাঁহার পিতার রচিত দুইটি গান করেন; গান দুইটি শুনিতে শুনিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা সকলেরই মনে হইয়াছিল—ঠিক সেই কণ্ঠস্বর, ঠিক সেই গম্ভীর ধ্বনি! ফিনিক্স লাইব্রেরীর যুবকগণ দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভার আয়োজন করিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। কথাটা এই যে লিখিবার ভাষা ও বলিবার ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিবে কি না? সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতেও এই কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে; সভাসমিতিতেও এ কথা উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির হওয়া যে কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিলে বাঙ্গালা ভাষা অরাজক নহে, সহস্ররাজক হইয়া পড়িবে। এই উপলক্ষে 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য-সম্মিলনীর' তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি মহোদয় অতি সুন্দর কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ভাষা ও সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার একটি দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধটুকু ছিন্নভিন্ন হইতে কেহই সম্মতি দিতে পারেন না। অখণ্ড বঙ্গভাষা শতখণ্ডে বিভক্ত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্প্রসার খর্ব্বীকৃত হইবে, এবং সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালা। উহার ঢাকাই-রঙ্গপুরী, শ্রীহট্ট যশোহরী সংস্করণ নাই। সাহিত্য হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা সরাইয়া ফেলিয়া অখণ্ড বঙ্গভাষার উপাসনা করাই বঙ্গসাহিত্য সেবকের ধ্রুব লক্ষ্য। বঙ্গভাষার উপাসনায় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পাশ্চাত্য মন্ত্রটি স্মরণ রাখিতে হইবে—'There is neither Greek nor Jew but Christ is all'—অর্থাৎ খ্রীষ্টভক্তের গ্রীক-য়ীহুদী নাই—সব খৃষ্টান। বঙ্গভাষারও 'শ্রীহট্ট-নদীয়া নাই—অখণ্ড বঙ্গভূমি যুড়িয়া সব বাঙ্গালা।" প্রত্যেক

জেলার লোক যদি সেই জেলার বলিবার ভাষাতেই বই লেখেন, তাহা হইলে ব্যাপার অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়, অথচ আজকালকার দিনে স্থানবিশেষের প্রাধান্য কেহই স্বীকার করিবেন না। এ ব্যাপারের কি একটা মীমাংসা হইবে না? বাঙ্গালা ভাষার উপর দিয়া কি সকলেই নিজ নিজ খেয়ালমত চৌঘুড়ি চালাইবেন?

সেদিন কলিকাতা 'সাহিত্য-সভার' বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন; কথাটি সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। মহারাজ বলিয়াছেন "হে নবীন! বিধি-নিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একেবারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই, সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোন বিধি-নিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই, শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধি-নিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পায়ে পরিয়াছে। সেইদিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।" মহারাজ তাহার পর বলিয়াছেন "আমি অতিরিক্ত বিধি-নিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস, নবীন-প্রবীণ মিলিয়া একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, সমাজের জন্য কোন্‌টি প্রয়োজনীয়, কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ব্যবস্থা প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্তু এ কার্য্যে সহানুভূতি চাই;—অসহিষ্ণুতা একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে।" কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক। আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব; তুমি যাহা ভাল মনে করিবে, তাহাই করিবে; আমার বা তোমার রুচি অনুসারেই কাজ হইবে; ইহা কখনও ভাবিতে নাই; দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যাহা চলা কর্ত্তব্য, তাহাই মিলিয়া-মিশিয়া করিতে হইবে; যাহা কিছু পুরাতন তাহাই বর্জ্জনীয়, আর যাহা কিছু নূতন আমদানী, তাহাই গ্রহণীয়, এ কথায় সমাজ সায় দিতে পারে না; নূতন ও পুরাতনের মিলনেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে; পুরাতন বিধি-নিষেধকে একেবারে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেও চলিবে না, আবার উচ্ছৃঙ্খলতাতেও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, একটা সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের মিঃ লিট্‌ল্ অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে তর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পণ্ডীচেরীর ফরাসী গবর্ণর এম, মার্টিনু তত্রত্য ফরাসী সরকারী দপ্তরের পুরাতন কাগজপত্র অনুসন্ধান করেন। তদানীন্তন সম-সাময়িক ফরাসী দলিল-দস্তাবেজ হইতে অন্ধকূপ-হত্যার সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে কি না, তাহা বাহির করাই তাঁহার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল। সেই অনুসন্ধানের ফল একটি প্রবন্ধের আকারে "বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" নামক ঐতিহাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাসী দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া এম, মার্টিনু কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। পত্রগুলি ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পণ্ডীচেরীর কাউন্সিল কর্ত্তৃক চন্দননগরের কাউন্সিলকে এবং চন্দননগরের কাউন্সিল কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত। তন্মধ্যে পাঁচখানিতে আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। ইহাদের মধ্যে আবার দুইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এই পত্র দুইখানির মধ্যে একখানি মিঃ লিট্‌লের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে এবং অপর খানিতে ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পত্রখানি চন্দননগরের তদানীন্তন সুপীরিয়র কাউন্সিলের অধ্যক্ষ এম, রেনল্ট কর্ত্তৃক ২৫শে জুন তারিখে মসলিপট্টমের ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে সিরাজ-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক ৫০০০০ সেনাসহ কলিকাতা অবরোধের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ২৫শে জুন তারিখে কলিকাতার পতন ঘটে। পরদিন ফরাসী গবর্ণর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মসলিপট্টমের ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষকে আর একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি অবরোধের ও কলিকাতার পতন সংবাদের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টবাক্যে লিখিয়াছিলেন যে, নবাব বন্দী ইংরেজদের উপর কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। কেবল তাহাদের জিনিসপত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন এবং প্রধান প্রধান নাগরিকগণকে বন্দী করিয়া রাখেন। এম, মার্টিনু পত্রখানির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনার পরদিনে লিখিত এই পত্রে অন্ধকূপ-হত্যার প্রসঙ্গমাত্র নাই। সুতরাং পত্রখানি মিঃ লিট্‌লের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে। পরবর্ত্তী পত্র ২৫শে আগষ্ট তারিখে লিখিত। ইহা হইতে

জানা যায় যে, নবাব যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং ইংরাজের কলিকাতার ফ্যাক্টরী ফিরিয়া পাইবার জন্য নবাবের সহিত যুক্তি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এম, মার্টিনু দেখাইয়া দিয়াছেন যে কলিকাতা অবরোধের ঠিক দুই মাস পরে লিখিত পত্রেও অন্ধকূপের কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই। ইহার তিনদিন পরে, ২৯শে আগষ্ট তারিখেও এম, রেনল্ট অন্ধকূপ-হত্যার ন্যায় কোন লোমহর্ষণ ঘটনার কথা উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে এম, রেনল্ট সুরাটের ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ মিঃ লিভেরিয়াবকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বপ্রথম অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর উল্লেখ করেন। পত্রখানির সার মর্ম্ম এই যে, নগর অধিকারের পর নগরের লোকেরা ইংরাজদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। প্রায় দুইশত লোক বন্দী হইয়াছিল। তাহাদিগকে একটি গুদামঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং রাত্রির মধ্যে প্রায় সকলেরই শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। হতাবশিষ্ট লোকদিগকে, বিশেষতঃ প্রধান প্রধান নাগরিকগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুকসুদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়; পরে তাহাদিগকে অতি শোচনীয় অবস্থায় ফরাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফরাসীরা তাহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ইহার পর, ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে Ile de France-এর কাউন্সিলের নিকট পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল পত্র হইতে এম, মার্টিনু কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি অন্ধকূপহত্যার কথা একেবারে উড়াইয়া দেন নাই বটে, কিন্তু লিট্‌লের ন্যায় তিনিও প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমন একটা গুরুতরকাণ্ডের কথা সাধারণে জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অন্ধকূপহত্যার ঘটনায় সন্দেহ করিবার অবকাশ যথেষ্ট আছে। অথচ দুই মাস কি আড়াই মাসের মধ্যে শুদ্ধ কল্পনাবলে এরূপ ঘটনার জনরবের সৃষ্টি করাই বা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? সুতরাং এই কাহিনীটাও একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য যে নৈশসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মিঃ লিট্‌ল্ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়দ্বয় অন্ধকূপের বিরুদ্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ ওটেন অন্ধকূপের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মোনাহান মহোদয় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত ফারমিন্‌জার মহোদয় কোন কথাই বলেন নাই। তাহার পর এই বর্ত্তমান আন্দোলন।

সম্প্রতি ফ্রেণ্ড্‌স সানরাইজ লিটারারী ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশনে মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার জন উডরফ সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, যুবক ছাত্রবৃন্দ সরলচিত্ত এবং আশাপ্রবণ বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উচ্চাভিলাস ও নৈরাশ্যের ফলে মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠে। যুবকগণের উপর কেবল আশা-ভরসা নহে, তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। ইদানীং ছাত্রগণ বিলক্ষণ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ছাত্রগণের তাহাতে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পৃথিবীতে কোন বস্তুই নিখুঁত নয় এবং কিছুই একেবারে অপদার্থ নহে। প্রত্যেক সদ্‌গুণেরই কিছু না কিছু ত্রুটী আছে। তবে কোন কিছুতে গুণ বা দোষের পরিমাণের তারতম্যানুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরাও একেবারে দোষশূন্য নহে (দোষ নাই কাহার?)। কিন্তু তাহাদের উদ্যম এবং আত্মসম্মানজ্ঞান প্রশংসার্হ। অবশ্যই সকলেই বলিবেন—দোষগুলি না থাকিলেই ভাল; অথবা যতটা কম হয়, ততই ভাল। ছাত্রগণের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতীতি হইতেছে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল ও গৌরবপূর্ণ। তবে তাহাদের কর্ত্তব্যপথ স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। ছাত্রগণের সভাসমিতি সকল ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ-জীবন ও চিন্তাকেন্দ্র এবং শক্তির উৎস হওয়া উচিত। এই পৃথিবীই ঐশীশক্তির ব্যক্ত নিদর্শন; মানব সেই শক্তির অংশ বলিয়া, প্রত্যেক মানবই শক্তির এক একটী কেন্দ্র। ঈশ্বরের কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া মানবে পরিণত। এই কল্পনা যাহাতে সিদ্ধ হয়, মানুষকে তাহাই করিতে হইবে অর্থাৎ মানুষকে মানুষই হইতে হইবে। ছাত্রগণ যেন বিদেশীদের অনুকরণ না করে, তাহারা যেন

থাঁটি ভারতবাসীই হয়। তাহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সাহিত্য, কলা, দর্শন ও ধর্ম্ম অনুশীলন করিলেই তবে যথার্থ ভারতবাসী হইতে পারিবে। পিতৃঋণ স্বীকার করিয়া তাহা পরিশোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য; নচেৎ পিতৃপুরুষেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বিরত থাকিবেন। আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইলে অপর অপর সম্মানার্হ ব্যক্তিগণকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। সার জন উডরফ সম্প্রতি কোন বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা দেখিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—তাহাতে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে বুঝা যায় যে, বিদ্যালয়টী ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষার স্থান। বিদেশের বিবরণ পাঠ বা বিদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা মন্দ নহে; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের দেশকে ভুলিলে চলিবে না। অপর দেশের নিকট হইতে যেটুকু লইতে হইবে,তাহা যেন বিদেশীর বেশেই আমাদের মধ্যে না থাকে। তাহাকে আমাদের দেশের উপযোগী ও নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রেরই বিশ্বাস থাকা চাই যে, তাহার মধ্যে তাহার নিজের স্বতন্ত্র একটী শক্তি আছে; আপনাকে সেই শক্তির কেন্দ্র মনে করিয়া তাহাকে দৃঢ়চিত্তে অখণ্ড বিশ্বাসে তাহার স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিতে হইবে। শক্তি বলিতে বক্তা কেবল শারীরিক শক্তির কথা কহিতেছেন না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তিনি যে সকল কথা বলিতেছেন, গত পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরিয়া সেই আত্মবোধ সম্বন্ধে চর্চ্চা হইতেছে এবং তাহাতে ফলও ফলিয়াছে। এই ২৫ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ছাত্রের দেহে ও মনে তিনি এই ভাবের অভিব্যক্তি স্পষ্টই পরিস্ফুট দেখিতেছেন।

বিশ্বদূত

ময়মনসিংহে বৈদ্য-সম্মিলন

সনাতন-ধর্ম্ম কলেজ

লাহোরের "সনাতন ধর্ম্ম কলেজ" এতদিন পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। সম্প্রতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেট সনাতন-ধর্ম্ম কলেজকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে উচ্চশিক্ষা দান করিবার অধিকার দিয়াছেন। (১) আগামী সেশনে প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে ষাট জনের অধিক ও তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে ত্রিশ জনের অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না; (২) রাবীর অপর পারে কলেজের স্থায়ী ভবন নির্ম্মিত হইবে; (৩) কলেজ-কমিটী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কলেজ-ভবন-নির্ম্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিবেন। কমিটী এই তিন প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন; এবং কলেজ-পরিচালনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলেজের নামে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। শ্রীযুত অনরেবল রামশরণ দাস মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে সনাতন-ধর্ম্ম কলেজের সুখস্বপ্ন সফল হইল। তাঁহার নেতৃত্বে ও পাঞ্জাবী হিন্দু দেশহিতৈষীদিগের সাহচর্য্যে কলেজ কমিটী সফল হইবেন, হিন্দুর এই অনুষ্ঠানটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে,—সে বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালার বাহিরে অঙ্কুরোদ্গমে বিলম্ব হয়, কিন্তু পাটের অভাবে প্রায়ই তাহা শুষ্ক বা বিনষ্ট হয় না। নিষ্কাম কর্ম্ম ও দোকানদারীতে প্রভেদ আছে। আমরা তাহা ভুলিয়াছি। পাঞ্জাবের হিন্দুদের এখনও সে সংস্কার আছে। তাঁহাদের বেদনা-শক্তি এখনও জাগ্রত; বিশেষতঃ; অনবরত বাহিরের আঘাতে তাহা আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।—স্বামী দয়ানন্দের জীবন হোম-বহ্নির মত এখনও পঞ্চনদের যজ্ঞশালায় উজ্জ্বল-শিখায় জ্বলিতেছে। আমরা পবিত্র অগ্নির উদ্দেশে বলিতেছি,—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥" —বাঙ্গালী।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্য

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি সার টমাস হল্যাণ্ড বিলাত হইতে গতপূর্ব্ব শনিবার ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে তিনজন ভারতবাসী—সার দোরাব টাটা, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়—আছেন। সার টমাস হলাণ্ড এখন সিমলায়। ভারতে পদার্পণ করিয়াই তিনি রক্ষা-শুল্ক সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিছু কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে; যুদ্ধ শেষ হইলে এ বিষয়ের আলোচনার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাইবে। তবে অবাধ-বাণিজ্য ও রক্ষা-শুল্কের সুবিধা-অসুবিধার সম্বন্ধে সার টমাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুর ভারতের শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রশ্ন-সম্বন্ধে বিশেষ

আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। সুতরাং সার টমাস হল্যাণ্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কমিশনের তদন্তফলে অবাধ বাণিজ্য বা রক্ষা-শুল্ক এবং ভারতের শিল্পোন্নতিসংক্রান্ত অন্য সকল বিষয়েরই একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্থির হইয়াছে, কমিশন কয়েকদিন সিমলায় থাকিয়া, পরে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিবেন এবং হাতে-হেতেরে সকল কল-কারখানা ও শিল্পাগারের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। বলা বাহুল্য, এই কমিশনের তদন্ত-ফলের উপর ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের শুভাশুভ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।—দর্শক।

বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান

যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমাদের যে কয়জন মুসলমান সাহিত্যিক সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া রিপোর্টারের মুখে অবগত হইলাম। প্রবন্ধগুলির নকল না পাওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে সমালোচনা করা যায় না। সে যাহা হউক, মৌঃ শেখ হবিবর রহমন সাহেবের "জাতীয় সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান" নামক প্রবন্ধটী পরিত্যক্ত হওয়াতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কতকগুলি অনৈতিহাসিক 'রাবিস'পূর্ণ প্রবন্ধ সম্মিলনে পঠিত হইতে পারিল, আর শেখ সাহেবের এমন গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটী পরিত্যক্ত হইল, ইহার কারণ কি? আমরা যতদূর বুঝিতেছি, সাহিত্যসংক্রান্ত মুসলমানের অভাব-অভিযোগ ঐ প্রবন্ধে যথেষ্ট ও যথাযথভাবে আলোচিত হওয়াতেই প্রবন্ধটীর শিরোদেশে মোটা মোটা অক্ষরে Rejected লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "বাণীর পূজা-মন্দিরে" ও সব অপবিত্র মুসলমানী ভাবের স্থান নাই। মুসলমানের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা তাঁহারা শুনিতে চাহেন না; সাহিত্যের বাজারে তাহাদের কোন প্রকার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে নারাজ। আজ বলিয়া নহে, ১৭বৎসর হইতে ভারতীয় জাতীয়তার স্বপ্নের বিকারে এমন অনেক অপ্রীতিকর সত্যের পরিচয় পাইয়াছি—যাহার ফলে মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রতিকূল ব্যবহারের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রথম জীবনের উৎসাহ-উদ্যম নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কিন্তু আমরা হতাশ হই নাই, ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। মুসলমানদিগকে আপনাদের মত করিয়া সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, আপনাদের জন্য আপাততঃ একটা স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী সাহিত্যসজ্ঞা গঠন করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে আপনাদের প্রবল অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া দেখাইতে হইবে যে, বঙ্গের ২৪০ কোটী মুসলমান নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র নহে। ইহাই হইতেছে, এ রোগের একমাত্র প্রতিকার; ইহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা আবশ্যক।—"মোহাম্মদী।"

ব্যবসা ও বঙ্গবাসী

"বাঙ্গালী কখনও ব্যবসায়ী হইবে না"—এরূপ কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের মতে বাঙ্গালী খাটিতে জানে না। দেখা যাউক একথা কতদূর সত্য। দরজী সমস্ত দিন সেলাই করে, চাষা সমস্তদিন দারুণ রৌদ্রে গরু ঠেঙ্গাইতে পারে, পিয়ন সমস্ত দিন ডাকের থলে ঘাড়ে করিয়া ছুটিতে পারে; কিন্তু ব্যবসার জন্য যেরূপ পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বাঙ্গালী জানে না। ব্যবসায়ের পরিশ্রমে শরীরের রক্ত শুষ্ক হয়, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। কিন্তু মজুর-বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অভাব; মস্তিষ্কবান বাঙ্গালী পরিশ্রম করিতে জানে না। কাজেই বাঙ্গালীর ব্যবসাশিক্ষা বড়ই কঠিন সমস্যা। যে দুই একজন বড় বড় ব্যবসায়ী বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে পটু। কাজেই তাঁহারা ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়াছেন। বাঙ্গালীর এক অংশের মাথার অভাব, এবং অন্য অংশের বাহুর অভাব। আমাদের দেশের অবস্থা কাজেই শোচনীয়। কাজেই বঙ্গদেশে বিদেশী ব্যবসা করে, মাড়োয়ারী বড় লোক হয়, ইহুদি ঘর বাড়ী তৈয়ারী করে, সাহেব কারখানা চালায়, আর বাঙ্গালী মজুরী খাটে। আমাদের এত অসম্পূর্ণতাতেও আমাদের মনে ধিক্কার আসে না। দুঃখের বিষয় আমরা বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হই না। আমাদের মাল মসলা লইয়া অপরে বড় লোক হয়, আর আমরা ঘরের কোণে বসিয়া অমুক কিরূপ বড় লোক তাহার সমালোচনা করি, অথবা গান-বাজনায় মত্ত হই, অথবা থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিই। কলিকাতায় কত রকমের লোক বাস করে, কিন্তু রঙ্গালয় বায়স্কোপ ইত্যাদি কেবল বাঙ্গালীতেই পূর্ণ হয়। দেশের অবস্থা কিরূপে ফিরিবে?—"বিজ্ঞান"

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত 'পুরীতীর্থ'—ভ্রমণকাহিনী—প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণা একটাকা মাত্র।

সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ, মহাশয়ের 'ব্রজবেণু' ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দশ আনা ব্যয় করিলেই বেণু-রবে পাঠকের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নূতন উপন্যাস 'জল-প্লাবন' মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল; এক্ষণে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে প্লাবনের গর্জ্জন পাঠকের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে। মূল্য একটী রজত-মুদ্রা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুরের 'পল্লীস্বাস্থ্য' মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন লাইব্রেরীর সান্ধ্য অধিবেশনে বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ লইয়া এই পুস্তক রচিত। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায়, এম্-এ, উপন্যাসের আকারে "বেণী রায়ের" কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া সেকালের সমাজের একাংশের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। পাঁচসিকা মূল্যে 'বেণীরায়' সংগৃহীত হইতে পারে। রায় মহাশয়ের গল্পপুস্তক—'স্নেহের ঋণ'ও পাঁচসিকাতেই পাওয়া যাইবে।

বসন্তাপগমে—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দোষের অসময়ের "কাকলী" মন্দ শুনাইবে না। 'দর্শনী' অর্দ্ধমুদ্রা।

গল্প-সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোট গল্প—'গল্পবীথি' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তক-পরিচয়

নূরজহান্

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ]

নূরজহান্—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, (১৩২৩)। প্রকাশক—মিত্র কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা। মূল্য ৮০ আনা। প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। নূরজহান্ বেগমের জীবন-কাহিনী ব্যক্তিগতভাবে বিচার করিলেও অতি উপাদেয়, অতি অপূর্ব্ব। নূরজহানের জীবনের ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র, এতই অদ্ভুত এবং romantic যে, তাহা লইয়া একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইতে পারে! মেহেরউন্নিসার জন্মবৃত্তান্ত এতই আশ্চর্য্যজনক যে, তাহার নিকট উপন্যাসও হারি মানে। পিতা হঠাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজৈশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হইলেন; সৌভাগ্যের অন্বেষণে যখন তিনি ভারতবর্ষের অভিমুখে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে কান্দাহারের সন্নিকটে ধুসর

জাহাঙ্গীর

নূরজহান্

প্রান্তরের মধ্যে গিয়াস-পত্নী লোক-ললামভূতা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। সে সময়ে মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনিত হয় নাই, পুরললনার আশীর্ব্বচন বর্ষিত হয় নাই; তথাপি এই দুর্দ্দিনে প্রসূত কন্যা ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যবিধাত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মুসলমান-সম্রাজ্ঞী হইতে পারিয়াছিলেন। ইহারই কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে পলায়নপর হুমায়ুনের দুর্দ্দিনকে আরও বিপদজাল-সমাচ্ছন্ন করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট্ সিন্ধুর মরুভূমিতে জন্মলাভ করেন। বিধাতা সময়ে-সময়ে বোধ হয় মানুষেরই মত উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন; নহিলে মেহেরউন্নিসার অলৌকিক জন্ম, আগ্রার রাজান্তঃপুরের সহিত অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পরিচয়, আলিকুলীর সহিত বিবাহ, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রেমোদ্দীপনা এবং পরিশেষে তাঁহার সহিত পরিণয়, প্রভৃতি ইতিহাসের আলেখ্যে এমন নানাবর্ণ-বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, যে, মেহেরউন্নিসার জীবন-চরিত ইতিহাস-পাঠকের নিকট চির-উপভোগ্য, চির-রসসিক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবার মেহেরউন্নিসা প্রকৃত পক্ষে ভারতের শাসনকর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে, নূরজহান্ তাঁহার অলোকসামান্য রূপের জন্য, চতুরতার জন্য হয় ত—জাহাঙ্গীরের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী হইতে পারিতেন, কিন্তু ভারতের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিবার সুযোগ তাঁহাতে কদাচ হইত না। নূরজহানের অসামান্য প্রতিভা ছিল। সে প্রতিভা লোকচরিত্রাভিজ্ঞ সম্রাটের অগোচর ছিল না। তাই তিনি মেহেরউন্নিসার নিকট একেবারে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। সম্রাট্‌পুত্র শাহরিয়ারের সহিত স্বীয় কন্যার (শের অফগনের ঔরসজাত) বিবাহ দিয়া, জাহাঙ্গীরকে রূপের শিখায় দগ্ধ করিয়া, সুলতান খসরুকে নির্য্যাতন করিয়া, মহবতকে দমন করিয়া নূরজহান্ যে প্রভুত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ইতিহাস (১৬১১ হইতে ১৬২৮) নূরজহানের জীবন-কাহিনীতে পরিপূর্ণ বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এক দিকে তাঁহার রূপের ফাঁদে রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত ধরা দিয়াছিলেন, অন্য দিকে তাঁহার চতুরতায় রাজ্যের আমীর উমরাহগণ আগরার সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। বস্তুতঃ, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ রমণী-চরিত্র অত্যন্ত বিরল। ব্রজেন্দ্র বাবু নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে অতীব উপাদেয় করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালার বেগম (ইংরেজিতে ও বাঙ্গালায়) ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার যশঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে সকল মনস্বী ইতিহাস-লেখক সযত্নে উপকরণ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসের অধ্যায়গুলির পুনর্গ্রন্থনের চেষ্টা করিতেছেন, ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অন্যতম। নূরজহানের কৌতূহলময় জীবনের রহস্য ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে নাই। আইন-ই-আকবরী, ইকবলনামা, মাসির-উল-উমারা, এলিয়ট এবং ডাউসনের গ্রন্থে নূরজহানের চরিত্র চিত্রিত হইলেও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবন-চরিত তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে নূরজহানের সহিত সম্রাটের প্রেমঘটিত ব্যাপারের উল্লেখের বিরলতা হেতু মেহেরের জীবন-রহস্য আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ডাউ ম্যানুচি প্রভৃতি ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর আশ্রয় লইয়া তাহাতে স্ব স্ব কল্পনার রঙ ফলাইয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু নানা গ্রন্থের সাহায্যে ইতিহাসের সেই অন্ধকার পৃষ্ঠায় আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয় ব্রজেন্দ্র বাবুর চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গবেষণা, শ্রমশীলতা, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ব্রজেন্দ্র বাবুর "নূরজহান্" বঙ্গের ইতিহাস-সাহিত্যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
c/o Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

পরলোকগত ফিল্ড মার্শাল আরল কিচেনার, জি, সি, বি ; জি, সি, এস, আই ;
জি, সি, আই, ই ; জি, সি, ভি, ও।

Emerald Ptg. Works.

শ্রাবণ, ১৩২৩

প্রথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

লর্ড কিচেনার

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

হে বীরেন্দ্র ! ব্রিটিশের বীর-চূড়ামণি,
কি হেতু ডুবিলে আজি কাল-সিন্ধুজলে ?
সাধিতে কি মহাকার্য্য জলধি অতলে,
আহ্বান করিল তোমা বরুণ আপনি ?
এ কাল-সমরে তোমা বৃহস্পতি গণি'
ইংরাজ করিল রাজ-মন্ত্রীত্বে বরণ ;
শুনি তব অকস্মাৎ অকাল মরণ,
পড়িল ব্রিটনবুকে প্রচণ্ড অশনি !
দেখালে 'সুদানে' শক্তি দুরন্ত আহবে,
জিনিলে 'বুয়র' সেনা অপূর্ব্ব কৌশলে,
ছিলে শ্রেষ্ঠ-সেনাপতি ভারতে গৌরবে,
নানা দেশে নানা কীর্ত্তি রাখিলে স্ববলে !
যেন সুরাসুর-যুদ্ধে জয়-কুতূহলে
গেলে কার্ত্তিকেয় সম ত্রিদিব-মণ্ডলে !

ঋগ্বেদে সৌর-বৎসর নির্ণয়

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ]

প্রাচীন বৈদিকযুগে সূর্য্যের অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার বর্ষ-প্রবেশকাল নির্দ্ধারিত হইত; ইহা প্রদর্শন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ষাঋতুর নাম হইতে বৎসরের বর্ষ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদের কালে, বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইতেই যে নূতন বৎসরের সূচনা হইত, ইহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক যুগে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সম্মান ছিল। তাহার নিদর্শন আমরা আর্য্য নামে দেখিতে পাই। কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ বর্ষাকালের উপর নির্ভর করে। এই নিমিত্ত ঋতুদিগের মধ্যে বর্ষাঋতুই প্রধান ঋতুরূপে গণ্য হইবার বিশেষ উপযুক্ত। ঋগ্বেদে শরৎ ও হিমঋতু দ্বারাও বৎসর বুঝাইত। মনে হয়, যে দেশে শীতকালে বর্ষণ হইয়া কৃষির উপকার করিত, সেই স্থানের লোকের নিকট "হিম" বা শীতঋতুই শ্রেষ্ঠ ঋতুরূপে গণ্য হইত; সেই জন্য তাহারা বৎসরকে "হিম" নাম প্রদান করিয়াছিল। পাঞ্জাবে প্রকৃত-প্রস্তাবে দুইটী ঋতু বর্তমান বলা যাইতে পারে। একটী গ্রীষ্ম, অপরটী শীত। তথায় শীতকালে যে বর্ষণ হয়, তাহাতে গম প্রভৃতি শস্যের উৎপত্তি নির্ভর করে। (১)

ঋগ্বেদে আমরা দ্বাদশ মাসযুক্ত বৎসরের উল্লেখ দেখিতে পাই। কোন স্থানে এই বার মাসের ৫ মাস শীত ও বর্ষা এবং সাত মাস গ্রীষ্ম—এইরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হই। যথা—

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথে মে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরপিতম্॥ ১।১৬৪।১২।

অর্থঃ—দিবালোকের দূর অর্দ্ধে (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে স্থিত), দ্বাদশ আকৃতি (অর্থাৎ মাস) যুক্ত পিতার (অর্থাৎ বৎসরের) পঞ্চ অংশকে পুরীষী কহে; উহাদের উক্ত অংশগুলিকে বিচক্ষণ (বলে)। (পিতাকে) ছয় অরযুক্ত সপ্তচক্রে অর্পিত বলা হইয়া থাকে।

[যখন সূর্য্য দক্ষিণায়ণে অবস্থিত, তখন ৫ মাস সূর্য্য কুয়াসায় ও মেঘে আবৃত থাকে। অতএব এস্থলে শীতকালে বৃষ্টি হয়, দেখা যাইতেছে। অপর ৭ মাস সূর্য্যকে বিচক্ষণ বলা হয়; অর্থাৎ সে কালে সূর্য্য উজ্জ্বল থাকে। ইহাই গ্রীষ্মকাল। যে ঋষি বৎসরকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় পাঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক। তবে তিনি শুনিয়াছেন যে, বৎসরে ৬টী ঋতু আছে এবং উহা ৭টী চক্রে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি অধিক পড়ে না বলিয়া, সূর্য্য ৭ মাসের অধিকাংশ সময় উজ্জ্বল থাকে। তবে মোটের উপর গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির পরিমাণ শীতকালের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু শীতকালে মেঘ ভিন্ন কুয়াসায় সূর্য্য অধিকাংশ সময় আবৃত থাকে।]

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে। নিম্নে উদ্ধার করা গেল।

ষড্ভারাঁ একো অচরন্বিভর্ত্যৃতং বর্ষিষ্ঠমুপগাব আগুঃ।
৩।৫৬।১।

অর্থঃ—এক (বৎসর) ৬টী ভার (অর্থাৎ ঋতু) স্থির থাকিয়া ধারণ করে; গোসকল (অর্থাৎ মাসসকল) বর্ষণশ্রেষ্ঠ ঋতকে (অর্থাৎ বৎসরকে) প্রাপ্ত হইয়াছিল। (এই

---

(১) The cold-weather rainfall is small in absolute amount in Northern and Central India, but is nevertheless of great economic importance over the larger part of that area, as it is upon this rainfall that the wheat and other cold-weather crops of the non-irrigated districts in Northern India depend.........Including the greater part of Rajputana, Sind, Central India and parts of the Punjab and United Provinces, such cultivation as there is, largely depends upon the amount and time distribution of this limited rainfall.

—Imperial Gazetteer of India, Vol. I, pp. 140—141.

বৎসর বর্ষাঋতুপ্রধান, হিমপ্রধান নহে।) সেকালে ৬টী ঋতুর নামকরণও হইয়াছিল। পরে দেখান যাইবে। অতএব পাঞ্জাব হইতে বহুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বদেশে, যেখানে ছয় ঋতু বর্ত্তমান, সেখানেও ঋষিগণ বাস করিতেন—ইহা যুক্তি-যুক্ত হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদের যুগে আর্য্যগণ যে পাঞ্জাবেই আবদ্ধ ছিলেন না, অন্যান্য প্রমাণ ব্যতীত ইহাও এক প্রমাণ। এক্ষণে আমরা দেখাইতেছি, সংবৎসর পূর্ণ হইলে বর্ষাকাল উপস্থিত হইত।

৭।১০৩

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্রমণ্ডূকা অবাদিষুঃ॥

অর্থ—সংবৎসর ধরিয়া তপস্যাকারী, ব্রতচারী ব্রাহ্মণ-গণ মণ্ডূক (রূপে) পর্জ্জন্য-প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

যদীমেনান্ উশতো অভ্যবর্ষীৎ তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াম।
অক্খলী কৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপবদন্তমেতি॥
৩।

অর্থ—প্রাবৃটকাল আসিলে কামনাযুক্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, এই সকলকে (অর্থাৎ মণ্ডূককে) বৃষ্টিজল যখন অভিসিঞ্চন করে, তখন শব্দকারী একটা (অর্থাৎ ভেক) অপরের (অর্থাৎ জলের) নিকট গমন করে—যেমন "অক্খল" শব্দ করিয়া পুত্র পিতার নিকট গমন করে।

ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রেন সোমে সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সংবৎসরস্য তদহঃ পরিষ্ঠয়ন্ মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব॥ ৭।

অর্থ—অতিরাত্র সোমযজ্ঞে যেমন ব্রাহ্মণসকল (পর্য্যায়ক্রমে) অপূর্ণ সরোবরের মধ্যে (স্তোত্রসকল) বলিতে থাকেন; হে মণ্ডূকগণ! সংবৎসরের সেইদিন আসিয়াছে (যেদিন) প্রাবৃট্ (বা বর্ষাকাল) হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্মকৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
অধ্বর্য্যবো ঘর্মিনঃ সিষ্বিদানা আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ॥৮

অর্থ—সোমযজ্ঞকারী সাংবৎসরিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ-গণ স্তোত্র করিয়া বাক্যকে সংস্কৃত করিয়াছেন। সোমকলস-উত্তপ্তকারী ঋত্বিক্‌গণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। আর কেহ লুক্কায়িত নাই।

দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্রমিনন্ত্যেতে।
সংবৎসরে প্রাবৃষ্যা গতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্॥

অর্থ—নেতাগণ (অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ) দেববিধান রক্ষা করিলেন। দ্বাদশ (মাসের) ঋতুকে তাঁহারা হিংসা করেন না। সংবৎসর পূর্ণ হইলে প্রাবৃটকাল আসিলে গ্রীষ্ম দ্বারা পীড়িতগণ মুক্তি প্রাপ্ত হন।

[এই সূক্তে স্পষ্টই রহিয়াছে যে, সংবৎসর পূর্ণ হইলে বর্ষাকাল আগমন করে। তাহা হইলে বর্ষাঋতুই নূতন বৎসরের প্রথম ঋতু। গ্রীষ্মঋতুর পর বর্ষাঋতু হইত। কোন্ দিন প্রাবৃটকাল আরম্ভ হয়, তাহা ঋষিগণ জানি-তেন। কিন্তু চান্দ্র-বৎসর প্রচলিত থাকিলে ঋতু ও মাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। বর্ষাঋতু কবে আরম্ভ হইবে, বৈদিককালে তাহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইত, ইহার অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ১২ মাসে সংবৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষাঋতু আগমন করে। অতএব এই বৎসর সৌর-বৎসর।

যে সময়ে বর্ষা আরম্ভ হয়, সূর্য্য রুদ্রদিগের প্রদেশে আগমন করেন এবং স্বর্গের যে দেশে জল আছে সেই স্থানে উপস্থিত হন। সূর্য্যের ভ্রমণের জন্য বরুণ আকাশে একটি বিস্তৃত পথ করিয়া দিয়াছেন। এই পথ অতিক্রম করার শক্তি সূর্য্যের নাই। এই পথের যে দুই সীমা আছে, তাঁহা সকলে দেখিতে পায় না। ঋগ্বেদের মধ্য এবংবিধ ভাবযুক্ত ঋক্ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতেপৃথুজ্রয়ঃ।
ইন্দ্রংমনীষা অভ্যর্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং সখ্যায়
হবমহে॥ ১।১০১।৭

অর্থ—বিচক্ষণ (অর্থাৎ সূর্য্য) রুদ্রদিগের দিকে আসিয়াছেন; রুদ্রদিগের সহিত যোষা (অর্থাৎ মেঘগর্জ্জন রূপ বাক্‌রূপী সরস্বতী) বহুদূরব্যাপী শব্দ-বিস্তার করিতে-ছেন; মনীষিগণ (অর্থাৎ ঋত্বিকগণ) বিখ্যাত মরুৎগণ-যুক্ত ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিতেছেন ও সখ্যের জন্য ডাকিতেছেন।

[মরুৎগণ ইন্দ্রের সৈন্য ও রুদ্রের পুত্র। ইহারা সংখ্যায় ৭ জন। (২) মরুৎগণকে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ

(২) সপ্তমে সপ্তশাকিনঃ একং একাশতাদদুঃ।
৫।৫২।১৭, ঋগ্বেদ।

প্রত্যেক সপ্তম (এরূপ) সাতজন শক্তিমান (মরুৎ) এক-একজন (আমাকে) একশত প্রদান কর। (অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে ছোট-বড় নাই।)

বলিয়া অনুমান করি। কারণ এই নক্ষত্রপুঞ্জের ৭টি নক্ষত্র চক্ষে দেখা যায়। Great-bear নক্ষত্রপুঞ্জের ৭টি নক্ষত্র মরুৎগণ নহে। দেবলোকের ৭টি অঙ্গিরা ঋষিই ঋগ্বেদে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিয়া বিখ্যাত। বিশ্বকোষে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, "বেদাঙ্গ জ্যোতিষে কৃত্তিকা হইতে প্রথম নক্ষত্র গণিত হইয়াছে।" (খগোল পৃঃ ৭ পাদটীকা)। ইহাতে আমাদের অনুমান সমর্থিত হইতেছে।]

আসূর্য্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণোবৃক্ত যদ্ধরিতো বীত পৃষ্ঠাঃ।
উদ্না ন নাব মনয়ন্ত ধীরা অশৃণ্বতীরাপো অর্বাগতিষ্ঠন্ ॥

৫।৪৫।১০

অর্থ—সূর্য্য কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্বদিগকে (রথে) যোজন করিয়া উজ্জ্বল উদকের দিকে আরোহণ করিয়াছেন। উদকের দ্বারা নৌকার মত (তাঁহাকে) ধীরগণ (অর্থাৎ দেবগণ) আনয়ন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া (স্বর্গীয়) বারিসমূহ নিম্নমুখ হইয়াছে।

[স্বর্গের একদিকে সমুদ্র আছে, ঋষিগণ অনুমান করিতেন। সেই জন্য সূর্য্য যখন সেই দিকে আগমন করেন, তখন বৃষ্টি হয়। স্বর্গে বৃত্র নামে এক দানব আছে। সে স্বর্গের জল আবৃত করিয়া রাখে। তাহাতে মনুষ্যগণ বৃষ্টি-বারি হইতে বঞ্চিত থাকে। পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হইবার ইহাই কারণ, আর্য্যগণ মনে করিতেন। দানবগণ কেবল আত্মসুখ অন্বেষণে রত; অপরের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি করা তাহাদের স্বভাব নহে। কিন্তু দেবগণের স্বভাব তাহার ঠিক বিপরীত। দেবগণ পরদুঃখে কাতর এবং পরের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। সেইজন্য যখন বৃত্র স্বর্গীয় জল আবরণ করিয়া থাকে, তখন দেবগণ মনুষ্যের দুঃখে কাতর হইয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইন্দ্র ভিন্ন সকলেই বৃত্রের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। ইন্দ্রই বৃত্র-বধ করিয়া বৃষ্টিরূপে স্বর্গীয় জল মানবগণের জন্য আনয়ন করিয়া থাকেন। ইন্দ্র ও বৃত্রে বর্ষাকালেই যুদ্ধ হইয়া থাকে। এই বৃত্র-যুদ্ধে মরুৎগণ, অগ্নি ও সরস্বতী ইন্দ্রের সাহায্য করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, বৃষ্টি পতিত হইবার সময় প্রবল ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইতে থাকে, দেখা যায়। মরুৎগণ ঝটিকার দেবতারূপে, বিদ্যুৎ অগ্নি-দেবতারূপে, মেঘগর্জ্জন বাক্‌রূপিনী সরস্বতী দেবীরূপে এবং বজ্রপাৎ বজ্রী ইন্দ্ররূপে কল্পিত হইত। এই যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য ঋষিগণ তাঁহাকে সোম পান করাইতেন। অতএব বর্ষাঋতুর আরম্ভেই সোম-যজ্ঞ করা তাঁহারা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিতেন। সোম-রসই ঋষিদিগের নিকট অমৃত বলিয়া গণ্য হইত। ইন্দ্রকে সোম পান করাইতে যাহাতে বিলম্ব না ঘটে, সে জন্য যে দিন হইতে বর্ষাঋতু আরম্ভ হয়, তাহা অবগত হওয়া তাঁহাদের নিকট অতীব প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ দিন ঠিক কি করিয়া জানা যায়, তাহার জন্য তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি। আমাদের উল্লিখিত মন্তব্য সমর্থনের জন্য নিম্নে ঋগ্বেদ হইতে ঋক্ উদ্ধার করিতেছি।

বি যদহে রধত্বিষো বিশ্বদেবাসো অক্রমুঃ।
বিদন্ মৃগস্যতাঁ অমঃ ॥ ৮।৯৩।১৪

অর্থ—অনন্তর যখন অহির তেজ হইতে (ভীত হইয়া) সকল দেবতা স্বস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, মৃগের ভীতি তাঁহা-দিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

[বৃত্রের নাম অহি, মৃগ, দানব, বৃত্র, অমানুষ, প্রভৃতি]

এবাত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র বিশ্বে দেবাসঃ সুহবাস উমাঃ
মহামুভে রোদসী বৃদ্ধমৃষ্বং নিরেকমিদ্‌ বৃণতে বৃত্রহত্যে ॥

৪।১৯।১

অর্থ—হে বজ্রি ইন্দ্র!—সুন্দর আহ্বানযুক্ত, রক্ষক দেবতাসকল এবং দিব্যলোক ও পৃথিবী উভয়ে, এই যজ্ঞে গুণে শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় একমাত্র তোমাকেই বৃত্রবধের জন্য বরণ করেন।

সপ্তানাং সপ্তঋষ্টয়ঃ সপ্তদ্যুম্নান্যেষাম্।
সপ্তো অধিশ্রিয়োধিরে ॥ ৮,২৮,৫, ঋগ্বেদ।
সপ্তগণাবৈ মরুত ইতি শ্রুতেঃ। তৈঃ সং ২।২।৫

সপ্তমরুৎগণের সাতপ্রকার ঋষ্টি (বা আয়ুধ), সাতপ্রকার আভরণ সাতপ্রকার শ্রী (বা ধন) আছে।

৮।৮৫ (বা ৯৬)। ৮ ঋকে মরুৎগণকে ৬৩ সংখ্যা বলা হইয়াছে—

ত্রিঃষষ্টিস্ত্বামরুতো বাবৃধানা উস্র৷ ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।

তোমাকে (অর্থাৎ ইন্দ্রকে) যজ্ঞীয় ৬৩ জন মরুৎ গো-যুথের মত বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

যদিও এখানে মরুৎগণকে ৬৩ বলা হইল, বৈদিকযুগের দেবতাদিগের সংখ্যার সহিত কিন্তু এই সংখ্যার মিল নাই। কারণ তাঁহারা মোট ৩৩টি।

অবাসৃজন্ত জিব্রয়ো ন দেবা ভুবঃ সম্রাড়িন্দ্র সত্যযোনিঃ।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণঃ প্রবর্তনীররদো বিশ্বধেনা ॥

৪।১৯।২

অর্থ—হে সত্যলোকবাসী ইন্দ্র! বৃদ্ধদিগের মত দেবগণ (তোমাকে যুদ্ধে) প্রেরণ করিয়াছেন; (তুমি) সম্রাট হইয়াছ। উদক (আবৃত করিয়া) শায়িত অহিকে সংহার করিয়াছ; বিশ্বের সুখদায়িকা নদীসকল খনন করিয়াছ।

অক্ষোদয়চ্ছবসা ক্ষামবুধ্নং বার্ণ বাত স্তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
দৃঢ়ান্যৌভ্নাদুশমান ওজো বাভিনৎ ককুভঃ পর্বতানাম্ ॥

৪।১৯।৪

অর্থ—বায়ু যেরূপ বল দ্বারা জল বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ ইন্দ্র বল দ্বারা মূলশূন্যকে (অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে) ক্ষীণ-জল করতঃ পেষণ করিয়াছিলেন। তেজ (প্রকাশ করিতে) ইচ্ছুক (ইন্দ্র) মেঘসকল ভগ্ন করিয়াছিলেন, পর্বতসকলের পক্ষভেদ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রোমহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো

অস্যবজ্রাৎ॥ ২।১১।৯

অর্থ—মহান্ সিন্ধুতে শায়িত মায়াবী বৃত্রকে ইন্দ্র সংহার করিয়াছেন; এই পৌরুষযুক্ত (ইন্দ্রের) গর্জ্জনশীল বজ্র হইতে দ্যাবা পৃথিবী ভীতা হইয়া কম্পিত হইয়া থাকে।

[আকাশে যে Milky-Way আছে, সম্ভবতঃ তাহাই স্বর্গীয় সিন্ধু অনুমান করা হইত]

অরোরবীদ্বৃষ্ণো অস্য বজ্রো মানুষং যন্মানুষো নিজূর্বাৎ।
নিমায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ পপিবান্ সুতস্য ॥

২।১১।১০

অর্থ—মনুষ্যের হিতসাধক (ইন্দ্র) যখন অমানুষকে (অর্থাৎ মনুষ্যের অহিতকারী বৃত্রকে) সংহার করেন, তখন এই পৌরুষযুক্ত (ইন্দ্রের) বজ্র গর্জ্জন করিয়া থাকে। অভিষুত সোম পান করিয়া (ইন্দ্র) মায়াবী দানবের মায়া ধ্বংস করিয়াছিলেন।

পিবা পিবেদিন্দ্র শূর সোমং মন্দন্তু ত্বামন্দিনঃ সুতাসঃ।
পৃণন্তস্তে কুক্ষী বর্ধয়ন্ত্বিত্থাসুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব ॥

অর্থ—হে শূর ইন্দ্র! এই সোম পান কর, পান কর। মদকর অভিষুত সোমসকল তোমাকে মত্ত করুক। তোমার উদর পূর্ণ করিয়া বর্দ্ধিত করুক; এই প্রকারে উদরপূর্ণকারী অভিষুত ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক।

সুতস্যাস্য মদে অহিমিন্দ্রো জঘান। ২।১৫।১

অর্থ—ইন্দ্র অভিষুত সোমের মত্ততায় অহিকে সংহার করিয়াছেন।

তং বৃত্রহত্যে অনুতস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা ইন্দ্র মবাতা অহ্রুত

প্সবঃ। ১।৫২।৪

অর্থ—(শত্রু) শোষণকারী, শত্রুশূন্য, শোভনরূপযুক্ত, রক্ষক (মরুৎগণ) বৃত্রযুদ্ধে সেই ইন্দ্রের নিকট ছিলেন।

চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহণা উতস্থঃ।
তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃসোমস্য বৃষণা

বৃষেথাম্॥ ১।১০৮।৩

অর্থ—হে ইন্দ্রাগ্নি! (তোমাদের) কল্যাণকর নাম সংযুক্ত করিয়াছ; এবং হে বৃত্রহন্তাদ্বয়! (বৃত্রবধে) তোমরা একত্র অবস্থান করিয়াছিলে। সেই দুইজন কামনা-পূরক ইন্দ্রাগ্নি একত্র উপবেশন করতঃ তেজস্কর সোমের (রস) সেবন করুন।

সরস্বতি দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য

মায়িনঃ। ৬।৬১।৩

অর্থ—হে সরস্বতি! দেবনিন্দকদিগকে (ও) ব্যাপক, মায়াবী বৃসয়ের (অর্থাৎ ত্বষ্টার) পুত্রকে সংহার করিয়াছ।

[বৃত্র ত্বষ্টার পুত্র। অতএব সরস্বতী যে বৃত্রের বধে যোগদান করিয়া থাকেন, তাহা জানা যাইতেছে।]

উদ্ধৃত ঋক্ দ্বারা আমরা দেখাইলাম যে, বর্ষাকালে সোমযজ্ঞ করিয়া ঋষিগণ প্রধানতঃ ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন। কারণ সেই সময়ে বৃষ্টিপাতের বাধক বৃত্রকে সংহার না করিলে মনুষ্যগণ বৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হইবে। ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণ, অগ্নি, ও সরস্বতী দেবীও আহূত হইতেন। যেদিন সূর্য্য বর্ষপ্রবেশ করিতেন, অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তিতে (Summer Solstice) উপস্থিত হইতেন, সেইদিনে ইন্দ্র স্বর্গলোক হইতে মর্ত্তালোকে আগমন করিতেন, ঋষিদিগের এইরূপ ধারণা ছিল। ঐ দিবস আর্য্যগণ কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতেন, এক্ষণে আমরা ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। ত্রিত, গোতম, বন্দন, রেভ, কুৎস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋষি, কূপ হইতে দেবতাদিগের স্তব করিতেছেন, ঋগ্বেদে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।

অশ্বিদ্বয় বা মরুৎগণ কোন ঋষিকে ঊর্দ্ধতল, নিম্নমুখ ও তির্য্যক্‌ কূপ প্রেরণ করিয়া বহুধন ও প্রচুর জলের অধিপতি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এইরূপও লিখিত আছে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন বৈদিক যুগে সূর্য্যের বর্ষপ্রবেশ-দিন নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, ঋষিগণ ঊর্দ্ধতল, নিম্নমুখ এবং তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত কূপ গুপ্তভাবে খনন করিয়া রাখিতেন। কূপের ঊর্দ্ধস্থিত তলদেশে একটী ছিদ্র থাকিত। ঋষি নিম্নে মুখের নিকট বসিয়া থাকিতেন। যখন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসিত, তখন ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি ঋজুভাবে কূপের তলে আগমন করিত। ঐ দিবসের পূর্ব্বে সূর্য্যরশ্মি কূপের গাত্রে আসিয়া পড়িত এবং নিম্নস্থিত লোকের নিকট উহা বক্র বোধ হইত। আর্য্য ঋষিগণ পর্য্যবেক্ষণদ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য যে পথে সংবৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করেন, তাহা সীমাবদ্ধ। ঐ সীমা অতিক্রম করিবার শক্তি তাঁহার নাই। এই পথ বরুণদেব সূর্য্যের ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই পথের উত্তর দিকের শেষ সীমায় সূর্য্য যখন উপস্থিত হয়, তখনই নূতন বর্ষের উৎপত্তি হয়। সেই সময়ে নূতন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে।

১ম ত্রিত ঋষি।

ত্রিত নামে এক ঋষি কূপে থাকিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন;—ঐ ঋষি নিজের এই অবস্থা ও দেবাহ্বানরূপ স্তোত্রসকল একটী সূক্তে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১০৫ম সূক্ত। সেই সূক্তটী পাঠকদিগের জন্য নিম্নে উদ্ধার করিতেছি এবং উহার যে সরল অর্থ হইতে পারে, তাহাও প্রদান করিতেছি।

চন্দ্রমা অপ্‌স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো বিত্তং
মে অস্য রোদসী ॥ ১

অর্থ—দিব্যলোকে সুন্দর রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা জলের অন্তে ধাবমান হইতেছেন; তোমাদিগের (অর্থাৎ দেবতাদিগের) হিরণ্যনেমিসকল (অর্থাৎ হিরণ্যচক্রযুক্ত রথসকল) বিদ্যুতের স্থান (অর্থাৎ মেঘলোক) প্রাপ্ত হয় নাই। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

[ত্রিত ঋষি কূপে বসিয়া আকাশ দর্শন করিতেছেন। আকাশে মেঘাদি নাই; বৃত্র-যুদ্ধের জন্য দেবগণ মেঘলোকে এখনও অবতরণ করেন নাই। চন্দ্র উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়া অন্তরীক্ষে দ্রুত গমন করিতেছেন। সম্ভবতঃ রাত্রে ত্রিত পর্য্যবেক্ষণে রত। কারণ, যেদিন হইতে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইত, সেই দিন হইতে প্রায় দশদিন কূপে থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ শেষ করা হইত। প্রায় দশদিন যে এইরূপে থাকিতে হইত, তাহা পরে জানা যাইবে।]

মোষুদেবা অদঃ স্ব রবপাদি দিবস্পরি।
মা সোমাস্য শম্ভুবং শুনে ভূম কদাচন ॥ ৩

অর্থ—সুদেবগণ (ও) ঐ স্বর্গ দিব্যলোক ভ্রষ্ট না হউন; সোমযজ্ঞের মঙ্গলকারীগণ! (আমি যেন) কদাচ (যজ্ঞ) শূন্য না হই।

[বৃত্রযুদ্ধে দেবতাগণ যেন পরাভূত হইয়া স্বর্গচ্যুত না হন, এই প্রার্থনা হইতেছে। সোমযজ্ঞ না হইলে বৃত্র-বধ হইবে না এবং বৃত্রবধ না হইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি উৎপন্ন হইবে। অতএব জগৎ সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।]

যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং সতদ্‌দূতোবি বোচতি।
ক ঋতং পূর্ব্যং গতং ক স্তদ্বিভর্তি নূতনো…॥ ৪

অর্থ—আমি যজনীয় অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করি; সেই দূত তখন বলেন, পূর্ব্ব ঋত (যজ্ঞ বা বৎসর) কোথায় গিয়াছে, কে নূতনকে (অর্থাৎ নূতন বৎসরকে) ধারণ করে?

অমী যে দেবা স্থন ত্রিষ্বারোচনে দিবঃ।
কদ্বঋতং কদনৃতং ক প্রত্না ব আহুতি ..॥ ৫

অর্থ—ঐ দেবগণ দিব্যলোকের তিনটী স্থানে (অর্থাৎ ত্রিদিবে) আছেন, তোমাদের ঋত (অর্থাৎ ইন্দ্ররূপী সত্য) কোথায়? কোথায় অনৃতরূপী (বৃত্র)? তোমাদের পুরাতন আহুতি (বা দেবযজ্ঞ) কোথায়?

[স্বর্গে দেবগণ অগ্নিকে হোতা করিয়া যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। নূতন বৎসর আসিতেছে; স্বর্গেও নূতন যজ্ঞ করিতে দেবগণ আবির্ভূত হইবেন। তাহারই অনুকরণে ঋষিগণ পৃথিবীতে যজ্ঞ করেন।]

কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণম্‌।
কদর্য্যম্ণো মহস্পথাতিক্রামেম দুঢ্যো…॥ ৬

অর্থ—কোথায় তোমাদের যজ্ঞের ধারক (ইন্দ্র)? কোথায়

বরুণের অনুগ্রহ-দৃষ্টি ? অতিক্রম করিতে দুঃসাধ্য অর্য্যমার মহৎপথ কোথায় ?

অহং সো অস্মি যঃ পুরাসুতে বদামি কানিচিৎ।

তং মাব্যন্ত্যাধ্যো বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং...৭॥

অর্থ—আমি সেই জন, যে পূর্ব্বে সোমযজ্ঞে কতকগুলি সূক্ত বলিয়াছি। সেই আমাকে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ জন্য মনোদুঃখ ব্যথা দিতেছে, যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগকে ব্যাঘ্র (কষ্ট দেয়)।

[যতক্ষণ না সূর্য্য-পর্য্যবেক্ষণ শেষ হয়, ততক্ষণ সোমযজ্ঞ আরম্ভ হইতে পারে না। যখনই সূর্য্যকে কর্কট ক্রান্তিতে দেখা যাইবে, অমনি যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। যদ্যপি ঐ সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আবৃত করে, তবে যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এইজন্য ঋষির মনে যজ্ঞের জন্য বড়ই দুর্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন মৃগ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানে গমন করিলে ব্যাঘ্রভয় তাহাকে কষ্ট দেয়, সেইরূপ সোমযজ্ঞ করিতে সকল উদ্যোগ থাকিলেও সূর্য্যাবস্থান পর্য্যবেক্ষণে বাধা উপস্থিত হইতে পারে, এই ভয়ে ঋষিগণ ব্যাকুলচিত্ত হয়েন। মনে রাখিতে হইবে, সেকালে সোমযজ্ঞে কোন বাধা ঘটিলে ঋষিগণ কি ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেন !]

সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।

মূষো ন শিশ্নাব্যদন্তিমাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো ॥৮

অর্থ—(কূপের) পার্শ্বদেশ সপত্নীর মত আমাকে চতুর্দ্দিকে ক্লেশ দিতেছে ; হে শতক্রতো ! তোমার স্তবকারী আমাকে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ জন্য মনোদুঃখ, ইন্দুর যেমন শিরা চর্ব্বণ করে, সেইরূপ কষ্ট দিতেছে।

অমী যে সপ্তরশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা।

ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি ..॥৯

অর্থ—ঐ যে সপ্তরশ্মি (অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি) তাহাতে আমার নাভি সংবদ্ধ রহিয়াছে ; আপ্ত্যবংশীয় ত্রিত তাহা জানে ; সে (অর্থাৎ ত্রিত) জ্ঞাতিত্বের জন্য স্তব করিতেছে।

[ত্রিত সূর্য্যবংশীয় ঋষি ; সেইজন্য সূর্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্ব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সূর্য্যবংশীয়গণ সৌর বৎসর অনুসারে যাগ-যজ্ঞ করিতেন।]

অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ।

দেবত্রা নু প্রবাচ্য সধ্রীচীনা নিবাবৃতু...॥১০

ঐ যে পাঁচটি বৃষ (অর্থাৎ দেবতা) মহৎ দিব্যালোকের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন ; দেবতাদিগের মধ্যে অগ্রে প্রশংসার যোগ্য ; একত্র বা যুগপৎ আবর্ত্তন করিতেছেন।

সুপর্ণা এত আসতে মধ্য আরোধনে দিবঃ।

তে সেধন্তি পথো বৃকং তরন্তং যহ্বতী রপো...॥১১

দিব্যালোকের আবরণের মধ্যে এই সকল সুন্দর রশ্মিযুক্ত (দেবগণ) ছিলেন ; তাঁহারা মহতী বারিতরণশীল বৃককে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) পথ হইতে (দূরে যাইতে) নিবারণ করেন।

[এই ঋকের মধ্যে "বৃক" শব্দ সায়ণ ও যাস্ক যেরূপ অর্থে লইয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে।

ত্রিত কূপে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়া একটি আরণ্য কুকুর (বৃক) তাহাকে খাইবার জন্য, বড় নদী পার হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু পথে সূর্য্যরশ্মি দেখিয়া এখন অবসর নয় ভাবিয়া নিরস্ত হইল। সায়ণ।

কিন্তু যাস্ক বলেন, জল (আপ) অর্থে অন্তরীক্ষ ; বৃক অর্থাৎ চন্দ্র, সেই অন্তরীক্ষ পার হইয়া আইসে ; কিন্তু সূর্য্য-কিরণ সেই চন্দ্রকে নিবারণ (বিলুপ্ত) করে।

রমেশ দত্তের ঋগ্বেদ ; পৃঃ ১৫২। পাদটীকা।

দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে যাস্ক কতক প্রকৃত অর্থের আভাষ পাইয়াছিলেন। কিন্তু "বৃক" চন্দ্র নহে, উহা সূর্য্য। সূর্য্য বর্ষাকালে আকাশের জলের দিকে আগমন করেন। কিন্তু তাহার পথ সীমাবদ্ধ। ঐ সীমা সূর্য্য অতিক্রম করিতে পারেন না। যদি অতিক্রম করিতে যান, অমনি দেবতাগণ নিবারণ করেন। পরে সূর্য্যের সীমাবদ্ধ পথের বিষয় এই সূক্তেই বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে।]

নব্যং তদুক্থ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনম্।

ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্যং তাতান সূর্য্যো.. ॥১২

হে দেবগণ ! স্তুতিযোগ্য, শোভন প্রশংসাযোগ্য, মঙ্গলকর, সেই নূতন ঋতকে (দিব্য) সিন্ধুসকল প্রেরণ করিতেছেন, সূর্য্য সত্যকে বিস্তার করিতেছেন।

[স্বর্গেই নূতন বৎসরে নূতন যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। দিব্যলোকের নদীগণ নূতন ঋত প্রেরণ করেন, আর সূর্য্য তাহা বিস্তার করিয়া দেন।]

অগ্নে তব ত্যত্নুক্থ্যং দেবেষস্ত্যাপ্যম্।

সনঃ সত্তো মনুষদা দেবান্যক্ষি বিদুষ্টরো…॥১৩

হে অগ্নি! দেবতাদিগের মধ্যে তোমার প্রসিদ্ধ, প্রশংসনীয় বন্ধুত্ব আছে; জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই (অগ্নি) আবির্ভূত হইয়া দেবতাদিগকে, আমাদিগের মনুর মত হব্য প্রদান করিতেছেন।

সত্তো হোতা মনুষদা দেবাঁ অচ্ছা বিদুষ্টরঃ।

অগ্নি র্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো…॥১৪

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, হোতা, দেবতাদিগের মধ্যে মেধাবী, দেব-অগ্নি আবির্ভূত হইয়া, মনুর, দেবতাদিগের অভিমুখে হব্য সুন্দররূপে আহুতি দিতেছেন।

ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে।

ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং…॥১৫

বরুণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ স্তোত্র) করিতেছেন। সেই পথজ্ঞকে প্রার্থনা করি। হৃদয়ে স্তুতিপ্রকাশ করিতেছেন। নূতন ঋত (অর্থাৎ যজ্ঞ) উৎপন্ন হউক।

[উপরিউদ্ধৃত ঋক্‌গুলিতে নূতন সৌর-বৎসর যে আরম্ভ হইতেছে, তাহার লক্ষণ ত্রিত পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতেছেন। স্বর্গের নদী হইতে জল আসিতে আরম্ভ হইয়াছে; সূর্য্য তাহা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ, আকাশে মেঘসঞ্চার দেখিতেছেন। তাহাতে বিদ্যুৎ দেখা দিয়াছে; অতএব অগ্নি হোতা হইয়া স্বর্গে নববর্ষের যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। বরুণদেব স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। এই সকল লক্ষণ ত্রিত স্বর্গে নববর্ষের যজ্ঞ-আরম্ভসূচক মনে করিতেছেন।]

অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।

ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্তাসো ন পশ্যথ…॥১৬

দিবালোকে ঐ যে পথ আদিত্য বিখ্যাত করিয়াছেন, হে দেবগণ! তিনি (অর্থাৎ আদিত্য) অতিক্রম করেন না। তাহাকে (অর্থাৎ পথকে) মর্ত্ত্যগণ দেখিতে পায় না।

[সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যবর্ত্তী পথে বিচরণ করেন। তিনি তাহার বাহিরে গমন করেন না। উত্তর-ভারতে উত্তরায়ণের সময় সূর্য্য প্রায় মস্তকের নিকট আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার সীমা ঠিক্ কোন্ পর্য্যন্ত, তাহা ত চিহ্নিত নাই যে, মনুষ্য ধরিতে পারিবে! সেইজন্য ঋষিগণ তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতেন। সূর্য্য যে ঐ সীমা অতিক্রম করেন না, তাহা বহুবৎসরব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফল বলিতে হইবে। ঋগ্বেদের অন্য স্থলে এই পথের উল্লেখ আছে; যথা—

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মন্বেত বা উ।

১।২৪।৮

অর্থ—রাজা বরুণ সূর্য্যের গমনের জন্য বিস্তীর্ণ পথ করিয়াছিলেন।]

ত্রিতঃ কূপেবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে।

তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু…॥১৭

ত্রিত কূপে থাকিয়া দেবতাদিগকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মহৎ বৃহস্পতি কূপ হইতে (উত্থিত) স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথাযন্তং দদর্শ হি।

উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী॥১৮

লোহিতবর্ণ ব্যাঘ্র (অর্থাৎ সূর্য্য) পথে যাইতে-যাইতে একবারমাত্র সেই (অর্থাৎ তদ্রূপ অবস্থায় অবস্থিত) আমাকে দেখিয়াছিলেন। যেমন ছুতার (অনেকক্ষণ কাজ করিতে করিতে) পৃষ্ঠে ক্লেশবোধ করিলে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, (সেইরূপ বৃক আমায়) দেখিয়া (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন)।

[বৃক অর্থে সূর্য্য। যেদিন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থান করেন; সেদিন সূর্য্যরশ্মি কূপের তলদেশে ঋজুভাবে গমন করিয়া থাকে। অপর দিনে সূর্য্যরশ্মি কূপের গাত্রে গিয়া পড়ে। এই চিহ্ন দ্বারাই ঋষি জানিতে পারিতেন, কোন্ দিন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসেন। তবে ঐ কূপ-খননে বুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। কারণ উত্তর-ভারতে সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি আসেন না। অতএব কূপকে তির্য্যক্ (অর্থাৎ Slanting) ভাবে কাটা আবশ্যক। ঋগ্বেদের অপর স্থলে তির্য্যক্ কূপের কথাই লিখিত দেখিতে পাই। পরে উদ্ধার করা যাইতেছে। এই ঋকের "যন্তং" শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে। যথা, যন্+তং। ঋকের পদবিচ্ছেদ এইরূপ করা গিয়াছে। অরুণোবৃকঃ পথা যন্ তং মাং সকৃৎ দদর্শ হি। এই সূক্তের ৭ম ঋকে "অহং সো অস্মি" ও "তং মাং" অংশে দেখিতে পাই যে, এই সূক্তের ঋষি "সেই আমি" ও "সেই আমাকে" এই প্রকার রচনায় অভ্যস্ত। ৮ম ঋকে "মা স্তোতারং" অর্থাৎ "স্তবকারী

আমাকে" লিখিয়াছেন। ১৫ঋকে "গাতুবিদং তং" ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৬শ ঋকে "অসৌ যঃ পন্থা" অর্থাৎ "ঐ যে পথ;" ঋষি "যে পথ" বা "ঐ পথ" বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। অতএব বলিতে পারা যায়, এই ঋষির রচনার এইরূপ বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্ব ধরিয়া ১৮শ ঋকের "মা পথা যন্তং" অংশের উল্লিখিতভাবে অর্থ করা গিয়াছে।

যাস্ক অরুণো। মাস। কৃৎ। বৃকঃ। পথা। যন্তং। দদর্শ হি—এইরূপ ভাবে ভাগ করিয়া বৃকের চন্দ্র অর্থ করিয়াছেন। কারণ চন্দ্রই "মাস" করেন। এরূপ অর্থ করিলে পরবর্ত্তী পদের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। আর ঋকের পদপাঠেরও মিল থাকে না।]

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, নালিকাদণ্ড ব্যবহার করিয়া সময়াদি নির্ণীত হইত। তাহাতে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"আষাঢ়ে মাসি নষ্টচ্ছায়ো মধ্যাহ্নো ভবতি।" ২য় অধিকরণ, ৩৮ প্রকরণ।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নকালে (নালিকাদণ্ড) নষ্টচ্ছায়া হইয়া থাকে। সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আগমন করিলে নালিকাদণ্ডের ছায়াশূন্যতাই তাহার নিদর্শন হইত। প্রাচীনভারতে নালিকাদণ্ডের ব্যবহার, অনুমান করি, প্রাচীনতর বৈদিক যুগের কূপ হইতে সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণের উন্নত প্রণালী। অতএব নালিকাদণ্ডের আবিষ্কার ভারতেই হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

২য় গোতম ঋষি।

অশ্বিদ্বয় গোতম ঋষিকে কূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ঋক্ উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতেছে।

পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জিহ্মবারম্।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য॥
১।১১৬।৯

অর্থ—হে নাসত্যদ্বয়! কূপকে প্রেরণ করিয়াছ; উহার) তলদেশ উচ্চ (এবং) দ্বার তির্য্যক্ করিয়াছিলে। ষিত গোতমের পানের নিমিত্ত, সহস্র ধনের নিমিত্ত যেন হা জলক্ষরণ করিয়াছিল।

[এই কূপ হইতে যে জল ক্ষরণ হইত, তাহাতে গোতম ষির কেবল তৃষ্ণা-নিবারণ হয় নাই, তাঁহার সহস্রধনও াভ হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয়, এই কূপ সাধারণ কূপ ছিল না। ইহা দ্বারা বর্ষাঋতু নির্ণীত হইত। অতএব এই কূপের সাহায্যে যে জল পাওয়া যাইত, তাহাতে গোতম ঋষির কৃষিকার্য্যে সমূহ সুবিধা হইত এবং সেই জন্য তিনি বহু ধনের ঈশ্বর হইতে সমর্থ হইতেন। এই কূপ তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত, বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উহা Slanting telescopic tubeএর মত ছিল।]

ঋগ্বেদের ১।৮৫।১০।১১ ঋকে, মরুৎগণ গোতম ঋষির জন্য একটি কূপ দূরদেশ হইতে তুলিয়া, তির্য্যক্ ভাবে স্থাপন করেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ঊর্দ্ধং নুনুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বিপর্বতম্। ১।৮৫।১০

অর্থ—তাঁহারা (অর্থ মরুৎগণ) শক্তির দ্বারা কূপকে উর্দ্ধে উঠাইয়াছিলেন ও প্রবৃদ্ধ পর্ব্বতকে ভগ্ন করিয়াছিলেন।

জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়াদিশা সিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আগচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্তধামভিঃ॥
১।৮৫।১১

অর্থ—কূপকে সেই দিকে তৃষ্ণার্ত্ত গোতমের নিমিত্ত উৎস সিঞ্চন করিতে, বক্র করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। রক্ষার সহিত আগমনকারী বিচিত্র রশ্মিগণ বিপ্রের কামনাকে উদক দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিল।

[এই দুই ঋক্ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, মরুৎগণ পর্ব্বতের গাত্র ভগ্ন করিয়া, তির্য্যক্ ভাবে উৰ্দ্ধতল ও নিম্নমুখ কূপকে স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার মধ্য দিয়া রশ্মি আসিয়া ঋষিকে উদক প্রদান করিত। সায়ণ "চিত্রভানবঃ" অর্থে মরুৎগণ করিয়াছেন। কিন্তু অত্রি ঋষির সূক্তে আমরা দেখিয়াছি, সূর্য্যরশ্মি কূপের মধ্যে প্রবেশ করিলে সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসিতেন, জানা যাইত; এবং তখন বর্ষাঋতু আরম্ভ হইত। এখানেও দেখিতেছি যে, রশ্মিসকল বিপ্রের জলকামনা চরিতার্থ করিয়াছিল। অতএব কূপের মধ্য দিয়া যেদিন সূর্য্যরশ্মি নিম্নে আসিয়া পড়িত, সেই দিন বর্ষাঋতুর আগমন গোতম ঋষি জানিতে পারিতেন এবং তাঁহার অধীন প্রজাগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিত। তাহাতেই গোতমের তৃষ্ণার শান্তি হইত। সায়ণাচার্য্য মনে করেন, গোতম ঋষি কোন সময়ে মরুভূমিতে গিয়াছিলেন। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অশ্বি বা মরুৎগণের স্তব করেন। তাঁহার

স্তবে ইষ্টদেবগণ তুষ্ট হইয়া কোন স্থান হইতে কূপ উঠাইয়া জলপাত্রের মত নিম্নমুখ করিয়া ধরেন। তাহাতে গোতম মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান।]

৩য় বন্দনঋষি।

অশ্বিদ্বয় বন্দনঋষিকেও কূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে কূপের বিশেষত্ব কি ছিল, নিম্নোদ্ধৃত ঋকে তাহা জানা যায়।

তদ্বাং নরাশংস্যং রাধ্যং চাভিষ্টি মন্না সত্যা বরূথম্।
যদ্বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূঢ়মুদ্দর্শতা দূপথূর্বন্দনায় ॥

১।১১৬.১১

অর্থ—হে নেতা নাসত্যদ্বয়! তোমাদিগের সেই প্রশংসনীয়, আরাধনীয় ও বরণীয় (কার্য্য আমাদিগের) সাহায্যার্থ হউক; যাহা বিদ্বান্ (তোমরা) গুপ্তধনের ন্যায় লুক্কায়িত (রাখিয়াছ); বন্দনঋষির নিমিত্ত উর্দ্ধ-দর্শন জন্য বপন করিয়াছিলে।

সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্যং ন দস্রা তমসি ক্ষিয়ন্তম্।
শুভেরুক্মং ন দর্শতং নিখাত মুদূপথুরশ্বিনা বন্দনায় ॥

১।১১৭।৫

অর্থঃ—নির্ঋতির ক্রোড়ে সুপ্ত (পুরুষের) মত, অন্ধকারে অবস্থিত সূর্য্যের মত, হে দস্রদ্বয়! সুবর্ণ কুণ্ডলের মত কূপকে, হে শোভন অশ্বিদ্বয়! তোমরা বন্দন ঋষির নিমিত্ত উর্দ্ধদিকে দর্শন করিতে বপন করিয়াছিলে।

[দেখা যাইতেছে, অশ্বিদ্বয় গোতম ঋষির নিম্নমুখ, উর্দ্ধতল কূপের মত একটি কূপ, বন্দনঋষিকেও প্রদান করিয়াছিলেন। এই কূপের মধ্য দিয়া উর্দ্ধে দেখা যায়। কি দেখা যায়? ইহা দ্বারাই কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থিত সূর্য্যাবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করা হইত। সাধারণে এই প্রক্রিয়ার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিত না। কারণ অতি গোপনে এইরূপ কূপ বা গর্ত্ত খনন করা হইত। ঐ কূপকে সুবর্ণ কুণ্ডলের মত বলায় ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।]

কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো ন পাতা বৃষণা শয়ুত্রা।
হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাত মুদূপথু দর্শমে অশ্বিনাহন্ ॥

১।১১৭।১২

অর্থ—হে দিব্যলোকের পুত্র! হে (কামনা) বর্ষকদ্বয়! কাব্যের (অর্থাৎ কাব্য নামে ঋষির) শোভন স্তুতি (শ্রবণ করিতে) কোন্ শয্যা ত্যাগ করিয়াছ। হে অশ্বিদ্বয়! দশম দিনে হিরণ্যের কলশের সদৃশ কূপকে উন্নত (করিয়া) বপন করিয়াছিলে।

[অশ্বিদ্বয়ের কূপ হিরণ্যের কলশ সদৃশ। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ইহা হিরণ্যনির্ম্মিত নলের মত কিম্বা ইহার দ্বারা হিরণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঋকে দশম দিনের উল্লেখ রহিয়াছে। এই দশ দিন কি? চান্দ্র-বৎসর ও সৌর-বৎসরে যে ন্যূনাধিক্য আছে, তাহাই এখানে প্রকাশিত হইতেছে, অনুমান করি। চান্দ্র-বৎসর চন্দ্র দ্বারা সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রতি পূর্ণিমায় এক মাস পূর্ণ হয়। একটি চান্দ্র-বৎসর পূর্ণ হইতে প্রায় ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট লাগে। অতএব সৌর বৎসর এবং চান্দ্র বৎসরে ১০ দিন ২২ ঘণ্টা অন্তর হইয়া পড়ে। উদ্ধৃত ঋকে যে দশম দিনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঐ চান্দ্র-বৎসর পূর্ণ হইবার পর দশম দিন বুঝাইতেছে, অনুমান করি। যে সূক্তে ত্রিত ঋষির সূর্য্য-পর্য্যবেক্ষণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সূক্তের প্রথম ঋকেই চন্দ্রের অবস্থান ও গতি লক্ষিত হইতেছে, বুঝা যায়। কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, সূর্য্যের অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণ উদ্দেশ্য হইলে, রাত্রিতে চন্দ্র-পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হয় না। আমরা অনুমান করি, ঋষি, সাধারণের নিকট ঐ বিষয় গোপন রাখিবার জন্য, ঐ কয় দিবস দিনরাত্রি কূপে অবস্থান করিতেন। অতএব, যতদিন না সূর্য্যকে কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থিত দেখেন, ঋষিকে ততদিন কূপমধ্যে অবস্থান করিতে হইত। মনে হয়, বৈদিক যুগে সৌর ও নাক্ষত্র বৎসর পরিদর্শন করিতে ঋষি কূপে অবস্থান করিতেন। চান্দ্র-বৎসর আরও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত।]

৪র্থ রেভ ঋষি:—

দশরাত্রী রশিবেনা নবদ্যূন বনদ্ধং শ্নথিতম প্স্বন্তঃ।
বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্ত মুন্নিন্যথুঃ সোম বিস্রুবেণ ॥

১।১১৬।২৪

অর্থঃ—দশরাত্রি ও নয়দিন দুঃখ ভোগ করতঃ জলের (অর্থাৎ কূপমধ্যগত জলের) মধ্যে আবৃত ও বদ্ধ, ঘর্ম্মজলে প্লুত রেভ (ঋষিকে) তোমরা (অশ্বিদ্বয়) স্রুবের দ্বারা সোমের মত উঠাইয়াছিলে।

[সময়ে সময়ে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণে বিপদ ঘটিত। যদ্যপি এই সময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি পড়িত, তবে ঋষিকে জলেই অবস্থান করিতে হইত। কারণ, কার্য্য শেষ না হইলে, বাহিরে আসিবার নিয়ম ছিল না। রেভ ঋষিকে এইরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। দশরাত্রি, নয়দিন গত হইলে রেভ ঋষিকে উঠান হইয়াছিল। দশরাত্রি কূপমধ্যে থাকায় দেখা যাইতেছে, এই পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইত রাত্রিতে। অত্রি ঋষিও চন্দ্রের গতিই প্রথম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখা গিয়াছে। আর রাত্রিতে ঋষিকে জল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। অতএব রেভ ঋষি পরদিনে সূর্য্যের কর্কট ক্রান্তি অবস্থান দেখিতে পান নাই।]

রেভ ঋষি সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য অনুমান করেন, শত্রুগণ তাঁহাকে সংহার করিবার জন্যই এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছিল।

৫ম কুৎস ঋষি :—

ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাঢ় ঋষি রহ্বদূতয়ে। ১।১০৬।৬

অর্থ—কূপে অবস্থিত কুৎস ঋষি বৃত্রহা শচীপতি ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

[ইন্দ্রকেই বর্ষাগমে বৃত্রবধে আহ্বান করা হয়। কুৎস ঋষি কূপে বসিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বৎসরের সূচনা কবে হইবে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই পর্য্যবেক্ষণ শেষ হইলেই ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ হইত, অনুমান করি।]

বৈদিক-যুগে সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র বৎসর যে প্রচলিত ছিল, ঋক্ উদ্ধার করিয়া তাহা দেখান যাইতেছে।

বেদ মাসো ধৃত ব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥ ১।২৫।৮

অর্থ—ব্রতধারী (বরুণ) প্রজাযুক্ত দ্বাদশ মাস জানেন। যাহা নিকটে জন্মায় (অর্থাৎ অধিক মাস) তাহা জানেন।

["য উপজায়তে" ইহার অর্থ সায়ণাচার্য্য "ত্রয়োদশোধিক মাস" করিয়াছেন। দ্বাদশ মাস যদ্যপি চান্দ্রমাস হয়, অধিক যাহা জন্মায়, তাহা কিরূপে জানিতে পারা যায়? অতএব সৌর-বৎসরের সহিত সামঞ্জস্য করিতে অধিক (মাস) হইয়া থাকে, এই অর্থ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, অধিকটা ঠিক একমাস নহে—মাত্র ১০ দিন—২২ ঘণ্টা। মলমাসের theory ঋগ্বেদের যুগে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "মলমাস" শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বাত্রিংশৎ মলমাসঃ। ২য় অধিকরণ, ৩৮ প্রকরণ।

৩২শ মাসকে মলমাস বলে। অতএব ১৩ মাসে এক মাস মলমাস হইতে পারে না। এইজন্য বলিতেছি, পরবর্ত্তী যুগের মলমাসের জ্ঞান তখন উদ্ভূত হয় নাই। নাক্ষত্র মাস ধরিলে বৎসরে ১৩টী নাক্ষত্র মাস থাকে। কিন্তু ১৩টী নাক্ষত্র মাসে সৌর বৎসর পূর্ণ হয় না (৩৫৫ দিন ও ৪ ঘণ্টা হয়)। তাহাতে ১০ দিন যোগ দিলে সৌর বৎসর পূর্ণ হয়। চান্দ্র বা নাক্ষত্র যে মাসই ধরা যায়, দেখা যাইতেছে, ঋষি সৌর-বৎসরের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যই এরূপ বলিতেছেন; নচেৎ বার বা তের সংখ্যার কোন সার্থকতা থাকে না। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি, এক বৎসরে যে তের মাস আছে, তাহা বৈদিক যুগে জানা ছিল।

সাকং জানাং সপ্তথমাহু রেকজং ষড়িদ্যমা ঋষয়ো দেবজাইতি। ১।১৬৪।১৫

অর্থ—একত্র উৎপন্নদিগের ৭ম একাকী জন্মিয়াছে বলে। ছয়জন যমজ, ঋষি ও দেবজাত।

[এখানে ১৩ মাসের মধ্যে একমাস একক এবং ১২টি দুইটী দুইটী করিয়া। এইগুলি একত্র জন্মে—ইহার অর্থ কি? নিশ্চয়ই এক সৌর বৎসরের মধ্যে জন্মায় বলিয়া একত্র জন্মে, বলা হইয়াছে। অতএব ইহারা যে নাক্ষত্র মাস, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুমান হয় যে, যে দিন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থান করেন, সেই দিন চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিত, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করা হইত। পরে ঐ নক্ষত্রে যে দিন ১৩টী নাক্ষত্র-মাসের শেষে চন্দ্র আসিত, সেই দিন হইতে কূপে সূর্য্য-পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইত। ইহার ১০ দিন পরে সূর্য্যকে কর্কট ক্রান্তিতে আসিতে দেখা যাইত। ঐ সময়ে চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিত, আবার তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে সৌর-বৎসর এবং নাক্ষত্র-বৎসরের

সামঞ্জস্য-বিধান করা হইত। ঋত-চক্রে ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি আছে, এইরূপ উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। যথা—

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনা সো অত্র সপ্তশতানি বিংশতি-
শ্চতুস্থুঃ॥ ১।১৬৪।১১

অর্থঃ—বারটী অরযুক্ত ঋতের (অর্থাৎ বৎসরের) চক্র দ্যুলোকের চারিদিকে ঘুরিতেছে; তাহা জরাগ্রস্ত হয় না। অগ্নির ৭২০ মিথুনপুত্র ইহাতে আছে।

[একটী বৎসরকে একটী চক্রের সহিত তুলনা করা হইতেছে। এই চক্রে যে বারটী অর (বা radius) আছে, তাহাতে চক্রনেমি (বা Circumference) বার ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে আমরা মাস বলিতে পারি। এই চক্রনেমিকে ৭২০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ৩৬০ দিবা ও ৩৬০ রাত্রি ইহাতে বর্তমান। এই চক্রটী যেমন ঘুরিতে থাকে, অমনি দিনের অংশ পৃথিবীর দিকে থাকিয়া পৃথিবীতে দিবা আনয়ন করে। পরে রাত্রির অংশ আসিয়া রাত্রি উৎপন্ন করে। এইরূপ কল্পনা করিয়া ঋষি রাত্রি ও দিবার উৎপত্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এখানে ৩৬০ দিন ধরা হইল কেন? সম্ভবতঃ ৩০ দিনে যে মাস হয়, তাহা ধরিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই কয় প্রকার মাসের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

ত্রিংশদহোরাত্রঃ প্রকর্ম মাসঃ।
সার্ধ সৌরঃ।
অর্ধন্যূন শ্চান্দ্রমাসঃ।
সপ্তবিংশতির্নক্ষত্র মাসঃ।
দ্বৌ মাসাবৃতুঃ। ২য় অধিকরণ, ৩৮ প্রকরণ।

Thirty days and nights together make one work-a-month (prakarmamásah).

[Foot-note. Savanah' trimsadahoratrah, a Savana month consists of 30 days and nights.—Com.]

The same (30 days and nights) with an additional half a day makes one solar-month (Saura).

The same (30) less by half a day makes one lunar month (chandramása).

Twenty-seven (days and nights) make a sidereal month (nakshatramása).

Two months make one ritu (season).

Translation by R. Shama Sastry. pp. 134—135.

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সৌর-বৎসরের পরিমাণ ভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে মাসদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু ঋতুদিগের লিখিত নামগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা হিম, শরৎ, বসন্ত, গ্রীষ্ম, প্রাবৃট।

যৎ পুরুষেণ হবিষাদেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০.৯০.৬

অর্থ—যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; তখন **বসন্ত** ঘৃত হইল, **গ্রীষ্ম** কাষ্ঠ হইল, **শরৎ** হব্য হইল।

ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয়
ভেষজেভিঃ। ২।৩৩।২

অর্থ—হে রুদ্র! তব দত্ত কল্যাণকর ভেষজদিগের সহিত শত **হিম** ব্যাপ্ত কর।

সংবৎসরে প্রাবৃষ্যা গতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে
বিসর্গম্॥ ৭।১০৩।৯

সংবৎসর পূর্ণ হইয়া প্রাবৃট আগত হইলে, গ্রীষ্ম (দ্বারা) পীড়িতগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ১২ মাসের নাম আমরা প্রাপ্ত হই। নিম্নে উদ্ধার করিয়া দেখান গেল।

শ্রাবণঃ প্রৌষ্টপদশ্চ বর্ষাঃ।
আশ্বযুজঃ কার্ত্তিকশ্চ শরৎ।
মার্গশীর্ষঃ পৌষশ্চ হেমন্তঃ।
মাঘঃ ফাল্গুনশ্চ শিশিরঃ।
চৈত্রো বৈশাখশ্চ বসন্তঃ।
জ্যেষ্ঠা মূলীয় আষাঢ়শ্চ গ্রীষ্মঃ।
শিশিরাদ্যুত্তরায়নম্।
বর্ষাদি দক্ষিণায়নম্।
(২য় অধিকরণ, ৩৮ প্রকরণ)

দেখা যাইতেছে, অর্থশাস্ত্র রচনাকালে শ্রাবণ হইতে

বর্ষাকাল ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত, অর্থাৎ তখন সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থিত হইতেন। বর্ত্তমানকালে আষাঢ় মাসের প্রথমে সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আগমন করেন ও বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। তাহা হইলে, ঐ সময় প্রায় একমাস পিছাইয়া আসিয়াছে। শ্রাবণ মাসের ঠিক কোন্ তারিখে সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসিতেন, তাহা এখানে বলা নাই। বর্ত্তমান বৎসরে ৭ই আষাঢ় সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে আসিবেন। যদ্যপি আমরা ৭ই বা ৮ই শ্রাবণ সেকালে সূর্য্যের কর্কট ক্রান্তিতে আগমনের সময় ধরিয়া লই, তবে প্রায় ৩০° বা ৩১° তফাৎ দেখিতে পাই। প্রত্যেক ৭২ বৎসরে ১° precession ধরিলে কৌটিল্যের সময় ৭২×৩০ বা ৩১ = ২১৬০ বা ২২৩২ বৎসর পূর্ব্বে দেখা যায়। অর্থাৎ ২৪৪ বা ৩১৬ খৃঃ পূঃ হইতেছে। এই সময় সম্বন্ধে শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয়ের মত নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

From Indian Epigraphical researches it is known beyond doubt that Chandragupta was made king in B. C. 321 and that Asókavardhana ascended the throne in B. C. 296. It follows, therefore, that Kautilla lived and wrote his famous work, the Arthasastra, somewhere between B. C. 321 and 300.

Preface to the translation of Kautilya's Arthasastra by R. Shama Sastry (pp. v-vi).

তৎপরে মাসগুলির নাম হইতে দেখা যাইতেছে যে, উহারা চান্দ্রমাস। কারণ যে নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয়, সেই নক্ষত্রের নাম হইতেই আর্য্যগণ মাসের নামকরণ করিয়াছেন। যথা, বিশাখা নক্ষত্রে চন্দ্র আসিলে যদি পূর্ণিমা হয়, তবে তাহাই বৈশাখ মাস নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি। যদ্যপি ঋগ্বেদে মাসগুলির নাম থাকিত, আর বৈদিকযুগে যে মাসে সূর্য্য কর্কট ক্রান্তিতে গমন করিতেন তাহার উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে আমরা precessionএর নিয়ম দ্বারা বৈদিক যুগের কালনির্ণয়ে সমর্থ হইতাম। নক্ষত্রদিগের নাম জানিলেও কালনির্ণয় করা যায়। আমরা দেখিয়াছি, রুদ্রদিগের সহিত সূর্য্য উদিত হইলে বর্ষাঋতু আগমন করিত। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জই যদি রুদ্রপুত্র মরুৎগণ হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাসের শেষে বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বর্ষাঋতু হইত। এক্ষণে আষাঢ় মাসের প্রথমে এবং চাণক্যের সময় শ্রাবণ মাসের প্রথমে Summer Solstice হইত। অতএব precessionএর নিয়ম ধরিলে ১১×৭২×৩০=২৩, ৭৬০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলিবার অধিকার এখনও আমাদের হয় নাই। তবে বৈদিকযুগে যে কর্কট ক্রান্তিতে (Summer Solsticeএ) সূর্য্যের আগমন-কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইত, তাহা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি; এবং ঐ সময় হইতেই যে বৎসর সূচনা হইত, তাহাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার হিন্দু কেমিষ্ট্রি দ্বিতীয় ভাগ xliii পত্রাঙ্কের পাদটীকায় নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন:—

দক্ষিণে দেবযানৌ তু পিতৃযান তথোত্তরে।
মধ্যমে তু মহাযানং শিবসংজ্ঞা প্রজীয়তে॥

Catalogue of Plam-leaf and selected paper MSS. belonging to the Durbar Library, Nepal, by H. P. Sastri (1905), Lxxviii, et. seq.

উদ্ধৃত শ্লোকের সম্ভবতঃ ইহাই অর্থ হইবে:—(সূর্য্যের) দক্ষিণদিকে (গতিকে) দুইটী দেবযান পথ এবং উত্তরদিকে গমনকে পিতৃযান (বলে); মধ্যম প্রদেশে (অর্থাৎ বিষুব রেখায়) গমনকে মহাযান বলে; (এইরূপ গমনে) শিব আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

অনুমান করি, ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, কোন লোক দক্ষিণায়নে মৃত হইলে দেবলোকে যায়; উত্তরায়ণে মৃত হইলে পিতৃলোকে যায়; কিন্তু যে দিন দিবস ও রাত্রি সমান হয়, সেদিন মরিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই যুগে সূর্য্যের বিষুবরেখায় অবস্থান পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে এবং উহাকে লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। (৩) সূর্য্যের বিষুব প্রদেশে গমন হইতে যে বর্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে প্রচলিত হইয়াছে।

---

(৩) Of surpassing interest is the discovery of a Tantra belonging to the extinct school Kubjikamata, written in Gupta characters and copied about the sixth century A. D. This school, though itself very ancient, presupposes the existence of other schools and we have distinct mention of the Mahayana.

Dr. P. C. Ray's Chemisty, vol. II, pp. xii, xiii.

সাহিত্য-সমালোচনার মাপকাটি

[অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার]

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে রস ও বস্তু লইয়া অনেক দিন হইতে তর্ক চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই আসল কথাটা—সাহিত্যের সাধনা কি—তাহাও উঠিয়াছে। রবীন্দ্রবাবু, সবুজপত্রের প্রমথবাবু, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সকলেই এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন।

"মানসীতে" শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এই মতামতকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি,—এই তর্কের বিষয় বহুকাল হইল নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আমি একটা চির ও অভ্রান্ত সত্যের প্রতিবাদ করিয়া শুধু বুদ্ধির ডিগ্‌বাজী খেলিয়াছি; আর "সবুজ-পত্রের" সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়,—যিনি অন্ততঃ কিঞ্চিৎ চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া আঠার পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ আমার উত্তরে লিখিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে প্রিয়নাথবাবুর অভিযোগ, তিনি তর্কের নেশায় লিখিয়াছেন, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, অবান্তর কথায় প্রবন্ধ বড় করিয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে গেলে, এতক্ষণ তর্কটা হইতেছিল বেশ সহজভাবে, স্পষ্ট কথায়। রবীন্দ্রবাবু ত সোজাসুজি, স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলিয়াছেন। আমার প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না। আর প্রমথবাবু, তিনি ত অতি সহজ ভাষায়, সরল পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তাঁহার "সাহিত্যের খেলা" প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচনায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর আনিয়াছেন প্রিয়নাথ বাবু নিজেই। ইংরাজী ও ফরাসী বুকুনি ও উদ্ধৃত বচন এত বেশী, ও রচনাপদ্ধতি এরূপ যে, সময় সময় মনে হয় বুঝি ইংরাজী লেখা পড়িতেছি। যাহাই হউক, বাক্যবলিরাশির মধ্যে আসল কথাটা চেষ্টা করিলে খুঁজিয়া যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।

প্রিয়নাথবাবু একটা আসল কথা সুন্দরভাবে ধরিয়াছেন। সেটা হইতেছে, রস ও বস্তুর বিচার, সাহিত্যের সহিত রস ও বস্তুর সম্বন্ধ-নির্ণয়। প্রিয়নাথবাবু রবিবাবুর মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, রসই নিত্য-বস্তু, তাহা লইয়াই কাব্য। বস্তুর মধ্যে সে নিত্যতা নাই; সাহিত্যে বস্তু-সমাধান অপেক্ষা রসের প্রাচুর্য্যই লক্ষ্য-বস্তু।

আমার বক্তব্য হইতেছে, বস্তুর মত রসও অনিত্য। যুগে-যুগে বস্তুর মত রসেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে রসেরও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এটা ঠিক নহে—রবিবাবু যাহা বলিয়াছেন—মান্ধাতার আমল হইতে আমরা একই রস উপভোগ করিতেছি।

রসের মধ্যে ধরুন প্রেম,—যাহা সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ,

সাহিত্য রসের মধ্যে যাহা প্রধান। যুগে-যুগে, দেশ-কাল পাত্রভেদে এই প্রেমের কত না বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্লেটো ও সক্রেটিসের যুগের হেটায়রা-শ্রদ্ধা, মধ্যযুগের চিভালরি ও আধুনিক কালের ইবসেনিজম্‌, এক পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধে ইউরোপীয় সমাজে কত না বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম—যে প্রেম সমাজধর্ম্মের নিকট বলি প্রদত্ত হইল,—মৃচ্ছকটিকে নায়কের প্রেম,—চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম—বর্ত্তমান যুগে নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে সুরমার প্রেম, এবং রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "ঘরে বাহিরে" উপন্যাসে যে প্রেম চিত্রিত করিয়াছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রসেরও যুগ বা জাতি আছে ;—ঐতিহাসিক যুগে যাহা, আধুনিক যুগে তাহা নহে; হিন্দুর নিকট যেরূপ, পাশ্চাত্য সমাজের নিকট সেরূপ নহে। অনেকে বলিতে পারেন, এ ত সেই প্রেমই রহিয়াছে, প্রেমের প্রকার না হয় বিভিন্ন হইল। তাহা বলিলে আমি বলিব, মানুষও ত সেই মানুষ রহিয়াছে, যুগ বা জাতি অনুসারে তাহার না হয় প্রভেদ দেখা গেল, দেশকাল-পাত্রের অভাব-অনুসারে বাস্তবের না হয় প্রভেদ দেখা গেল; তবুও যে অভাব, সেই অভাব ত চিরকাল রহিয়াছে, যে বস্তু সেই বস্তুই ত নিত্য সনাতন। আমরা যখন প্রেমের কথা বলি, তখন দেশ, যুগ বা জাতি অনুসারে রসের বিশিষ্ট প্রকাশ মনে আসে ; যখন মানুষের কথা বলি, বস্তুর কথা বলি, তখন বিশেষ যুগ বা জাতির মানুষ ও মানব-সমাজ মনে আসে।

সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া একটা অফুরন্ত উদ্দাম রসস্রোত আবহমান কালের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। অবিরাম স্রোত চলিতেছে। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল তট হইতেছে বাস্তব ; দেশকালপাত্রভেদে তাহার কত না বিচিত্র শোভা-সম্পদ। এই রসস্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে, ডুবিতে-ডুবিতে সনাতন পুরুষ ও সনাতন নারী আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া চলিয়াছে। স্রোতের কত না বিচিত্র ধ্বনি, নব-নব সাহিত্যের কত না বিচিত্র প্রকাশ। স্রোত নিঃস্বন হইতেছে, সাহিত্যের ঝঙ্কার। তরঙ্গমালা হইতেছে, সাহিত্যের ভাবোচ্ছ্বাস! কোথায় আবর্ত্ত, কোথায় ঘূর্ণীপাক, কোথায় একটানা প্রবাহ ; দেশকালপাত্রভেদে সাহিত্যের কত না বিচিত্র গতি। সাহিত্যে নিত্য নূতন রসের সৃষ্টি করিয়া, নিত্য নূতন বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া, মানুষকে সেই বিশ্বমানব মনের অগাধ আনন্দ-সঙ্গম তীর্থে পৌছাইয়া দিতেছে।

ঐ সঙ্গমতীর্থ হইতেছে—আসল রস সমুদ্র। সাহিত্যের চরম-সাধনা হইতেছে—মানুষকে ঐখানে পৌছাইয়া দেওয়া। সেইখানেই দেশকালপাত্রের অনিত্য রস ও অনিত্য বস্তু নিত্যের সন্ধান পাইয়াছে। সেখানে রসস্রোতের আর সঙ্কীর্ণতা নাই, অসীম সাগরে তাহার লয় হইয়া গিয়াছে। দুই তটও সেখানে আপনাদের খুঁজিয়া পায় না,—ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্করেখার মত তমালতালিবনরাজিনীলা, দিগন্ত-বিস্তৃত বেলাভূমিতে দুই তট আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়াছে। সাহিত্য সেখানে নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া দেশকালপাত্রকে অতিক্রম করিয়াছে ; সাহিত্য সেখানে সার্ব্বজনীন হইয়াছে ; কোন দেশ, জাতি বা যুগের না হইয়া, সাহিত্য সেখানে বিশ্বমানবের হইয়াছে,—সর্ব্বদেশের, সর্ব্বযুগের হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম, নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। সাহিত্য নিত্য রস ও নিত্য বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে ; বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য—তাহা ধ্বসিয়া পড়ে; একটা সুন্দর মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। শুধু তাহা নহে। রসের মধ্যে যাহা কিছু বিকৃত ও ঘৃণ্য, তাহাও ঝরিয়া যায়। বিচিত্র, সুন্দর ও মধুর রসের উদ্বোধনে বিকৃত রসসমূহ আর থাকে না। সাহিত্য এরূপে হেয় বাস্তব ও বিকৃত রসের মধ্যে একটা মহনীয় বাস্তব গড়িয়া তুলে, বিচিত্র ও মধুর রসের উদ্বোধন করে।

এরূপে নূতন বাস্তব গড়িয়া তুলিয়া ও নূতন রসের সৃষ্টি করিয়া সাহিত্য মানবের শিক্ষার ভার লইয়াছে। কাব্যের বর্ণিত বস্তু ও উদ্ভাবিত রস—বর্ত্তমানের বিকৃত বস্তু ও রস যে অনিত্য ও অসুন্দর তাহা দেখাইয়া—মানবকে সত্য ও সুন্দর, মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে।

কাব্যে একই সঙ্গে সত্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়। যে কাব্য শুধু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করে, আর কিছু করে না, তাহা নিম্নস্তরের কাব্য। সে কাব্যই কুৎসিৎ। আসল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সত্য-প্রকাশ ছাড়া হয় না। শুধু ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পনৈপুণ্যে চমক লাগে, আসল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না।

যাঁহারা কাব্যকে শুধুই রসোদ্ভাবনের দিক হইতে দেখিতেছেন, কাব্যে সত্য-প্রকাশের দিককে উপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে একটা খাপছাড়া জিনিষ করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যের ইতিহাস হইতে বাছিয়া-বাছিয়া কাব্য লইয়া যদি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, রসের গুণে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সে সকল কাব্যের গৌরব, তাহা হইলে তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। আমি 'যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমুদয় অনুপম সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে চরম সত্যের সহিত সেই দেশ, যুগ বা জাতির পরিচয় স্থাপন করিয়াছে। কাব্যের মহত্ত্ব শুধু আর্টের উপর নির্ভর করে না। চাতুরী দেখাইয়া কেহ কখনও বড় কবি হন নাই। কবির অন্তর হইতে তাঁহার জাতি ও যুগ, বাহিরের সমাজ সম্বন্ধে একটা চরম সত্য প্রতিভাত না হইলে তিনি কখনও বড় কাব্য লিখিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমালোচকগণ কাব্যের মধ্যে সত্যকে উপেক্ষা করিয়া শুধু সুন্দরকে খুঁজিতেছেন।

কোলরিজের Ancient Marinerএর বস্তুগৌরব নাই! কি আশ্চর্য্য কথা! এক বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবি নিজেই ত উহার (moral) উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানবের সহিত বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিশ্লেষণে Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনারহিত। প্রাকৃতিক-দৃশ্য ও ঘটনা-সংস্থানের সহিত নাবিকগণের অন্তর-প্রকৃতির যে যোগাযোগ আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা কি শুধু ভাষার বৈচিত্র্য ও শিল্প-চাতুরীকেই লক্ষ্য বস্তু করিব?

Tempest ও মেঘদূত, ইহারা কি কবি-প্রতিভার শুধুই অনুপম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি? মধুময় মোহ ও উজ্জ্বল কল্পনার উপাদানে গঠিত হইয়া ইহারা কি কোমল শ্যামদূর্ব্বাশীর্ষে নীহারবিন্দুর মত শুধুই কমনীয়, মনোমুগ্ধকর; আর কিছুই নহে! শকুন্তলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, স্বয়ং রবীন্দ্র বাবু ত বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ বিচারে—সেক্স-পীয়ার Tempestএ যে অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক Tempest নাটক ও নগ্ন-প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত শিশুমানবের সহিত কঠোর বাস্তব ও বাহিরের সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের একটা জ্বলন্ত ছবি। আর মেঘদূত। আমি ত মেঘদূত সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শকুন্তলার যেমন মিলনে বিরহ, মেঘদূতে সেরূপ বিরহে মিলন। যে প্রেমের সহিত সমাজের ও বিশ্ব-প্রকৃতির বিরোধ নাই, সেই প্রেমই সত্য; সে প্রেমে বিঘ্ন নাই, হিন্দু কবি কালিদাস ইহাই দেখাইয়াছেন। বিরহী যক্ষ যখন অসীম বিরহবিধুরা বর্ষা-প্রকৃতির সহিত আপ-নাকে মিলাইয়া দিল, তখন আর বিচ্ছেদ দুঃখ রহিল না। বিরহেই মিলন হইল, যখন বিরহ শুধু আপনার অন্তরে নহে, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে অনুভূত হইল। মেঘদূত বড়; কারণ, ইহা আকাশ-কুসুম নহে। এই সংসারের অন্তঃস্থল হইতে উদ্গত কবির অভিজ্ঞতায় আশ্রিত ইহা সুন্দর পদ্মের মত।

আমরা দেখিলাম, সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রত্যেকে প্রত্যেককে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। ফুলের যেমন সৌরভ ও সৌন্দর্য্য—গন্ধ ও শোভা, ইহাদের মধ্যে কোন্-টার প্রাধান্য স্বীকার করিব? ফুলের উদ্দেশ্য কি? শুধু কি বন আলো করিয়া বসা? ফুল যে চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত করে, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা কি শুধু শোভাই দেখিব? সাহিত্যে সেরূপ সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য স্বীকার করা ভুল হইবে।

এটা ঠিক যে, যাহা পরম সুন্দর, তাহাই চরম সত্য; কিন্তু সাধারণ আলোচনায় এই সার কথাটা ভুল হয়। ভুল না হইলে সাহিত্য-মন্দিরে বাস্তবকে অমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে 'প্রবেশ নিষিদ্ধ' বলিয়া কেহ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাহিত্য বস্তুই সত্য-প্রকাশের আশ্রয়।

মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করিতে যাইয়া, আমরা আমাদের অন্তরে আদর্শ-মানুষ সম্বন্ধে ধারণার আশ্রয় লই। সেই আদর্শ-মানুষ, যাহা আমাদের কল্পনা—তাহাই আসল সত্য ও নিত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতর কমবেশী অনু-সারে সেই আসল আদর্শ-মানুষটি ফুটিয়া আছে;—কিন্তু কোথাও পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া নাই।

শুধু মানুষ নহে, জড়প্রকৃতি—চেতনরাজ্য, সকল স্থানেই এই বিচার-পদ্ধতি খাটে। জড়, চেতন, মানুষ, সমাজ, ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, বর্ত্তমান ও অতীত—সব ক্ষেত্রেই একটা কল্পিত মাপকাটি দ্বারা আমরা বিচার করিয়া থাকি। মানস আদর্শই নিত্য, সত্য; অন্য সব অনিত্য ও মিথ্যা।

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই একই

বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ব্যক্তি, সমাজ, ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতি ও ভগবানের সম্বন্ধ—ইহাই হইতেছে সাহিত্যের বাস্তব। সাহিত্য জড় ও চেতন, ব্যক্তি ও সমাজের বহির্জগতের কোন-না-কোন বিশেষ সম্বন্ধের সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করে। সাহিত্যের বাস্তবের সহিত এই পরিচয়-স্থাপন-প্রয়াসকে বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, সাহিত্য ফটোগ্রাফের মত হুবহু নকল না করিয়া মানস-আদর্শের সৃষ্টি করিতেছে কি না। কবির মন ক্যামেরার মত নহে, কাব্য ফটোগ্রাফ নহে। কবি বাস্তবের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করে। নিত্য বস্তু হইতেছে Ideal Reality—বাস্তব সম্বন্ধে মানস-আদর্শ। তাহাই বাস্তবের স্বরূপ, তাহাই সত্য। আর এই বাস্তব অনিত্য, মিথ্যা। ফটোগ্রাফি সূর্য্যকিরণের অধীন, কিন্তু কাব্য প্রাকৃতিক আলো হইতে তাহার আদর্শ চিত্রিত করে না, সে আলো শুধু কবির অন্তরেই প্রতিভাত।

The light that never was on sea and land
The consecration and the Poet's dream.

সে আলো ভিন্ন কাব্যের বস্তু চিত্রিত হয় না। নিত্য বস্তু ও অনিত্য বাস্তবের প্রভেদ পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস বা সংবাদপত্রের কোন প্রভেদ থাকিবে না। আর্টের সেইখানে ব্যর্থতা।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালিতে" যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে শুধুই রক্তমাংস—ইন্দ্রিয়-লালসার নগ্ন ও কুৎসিত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব এখানে রক্তমাংসের, ভোগ-লালসার; সুতরাং ইহা অনিত্য, মিথ্যা ও সমাজ-দ্রোহী। রসের হিসাবেও বলা যায়, কোন রসই ইহাতে বিকাশ লাভ করে নাই। রসাভাস হইয়াছে,—সুতরাং শিল্প-কলার দিক হইতেও ইহা অসুন্দর।

পক্ষান্তরে "গোরা"। চরিত্র-অঙ্কনের দিক হইতে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, গোরার বাস্তব অলোকসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন কবির মানস আদর্শ বাস্তব। রসবৈচিত্র্য বেশী নাই; তবুও ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিগত নীতি ও সমাজধর্ম্ম, প্রভৃতির সম্বন্ধ-বিকাশে কবির প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা নিত্য ও সত্যানুসন্ধান-প্রয়াসে সফলকাম হইয়াছে।

আমাদের সাহিত্যে "গোরার" কল্পিত আদর্শ বাস্তব অপেক্ষা "চোখের বালির" হেয়, জঘন্য ও অসত্য বাস্তব অধিক পরিমাণে দেখা দিতেছে। জোলা, ডডে, ফ্লবেয়ার একটা ঝুটা বাস্তবের ধূয়া লইয়া আমাদের সাহিত্য-আসরে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। আদর্শ ছাড়িয়া সাহিত্য সাধারণ বাস্তব-কেই আশ্রয় করিতেছে। হেয় ও ঘৃণ্য বাস্তব সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাদের নগ্ন ও বীভৎস রূপ—আদর্শের মহিমা ও সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই।

কয়েক মাস হইল, 'নারায়ণ' পত্রে কতকগুলি কথা-নাট্য প্রকাশিত হইয়াছিল। চরিত্র-উন্মেষ ও আদর্শ-কল্পনা অপেক্ষা একটা ঘৃণ্য বাস্তবের উদ্দাম ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসার ছবি নাটকগুলিতে মুখ্য বস্তু হইয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর "ঘরে বাহিরে" কোন কল্পিত আদর্শ বা কোন নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুধু পাওয়া গিয়াছে, উদ্দাম কাম-প্রবৃত্তির পোষাকী রূপ। চরিত্র-বিশেষের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে যে বিশেষ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা জঘন্য বাস্তব। কল্পনা বা আদর্শ অথবা নিত্যবস্তু ছাড়িয়া উপন্যাসখানি জঘন্য বাস্তবকে আশ্রয় করিয়া আপনার মর্য্যাদা হারাইয়াছে। শুধু আদর্শের দিক দিয়া নহে, সাধারণ ও সার্ব্বজনীন নৈতিক জীবনের মাপ-কাটিতেও রবিবাবুর বাস্তব একেবারেই হীন, অসঙ্গত।

সাহিত্যে বাস্তব ও নিত্য বস্তুর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, অনিত্য ও নিত্য রস-উদ্বোধনে সেই একই বিচার-পদ্ধতি খাটে। সাহিত্যে নিত্য বস্তুর উপেক্ষা ও অনিত্য বাস্তবের প্রতিষ্ঠার মত রসাভাস অথবা রসের বিকারও আর্টের হিসাবে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়।

সাহিত্যের আদর্শ লইয়া অনেক দিক হইতে কিছু কিছু কথা বলা হইল। কোন গোলমাল যাহাতে না হয়, তাহার জন্য, সার কথাটা আর একবার খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

(ক) আসল সাহিত্য একই সঙ্গে সত্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সত্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করা ভুল হইবে।

(খ) সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেশ, যুগ বা জাতি অনুসারে বিভিন্ন হয়।

(গ) সুতরাং কোন দেশের বা যুগের সাহিত্য, যুগ ও জাতি-ধর্ম্মানুযায়ী সত্য-প্রকাশ ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করে।

(ঘ) সাহিত্য যুগধর্ম্ম অবলম্বন করে বলিয়া, ইহা লোক-শিক্ষা ও সমাজগঠনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

(ঙ) সাহিত্যে সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়—নিত্যবস্তু ও নিত্যরস উদ্ভাবনের দ্বারা।

(চ) বাস্তবের মানস-আদর্শই নিত্য বস্তু; তাহাই সাহিত্যের অবলম্বন। আধুনিক নব-নাগরিক সাহিত্য তাহা আশ্রয় না করিয়া জঘন্য বাস্তবের পূতিগন্ধে বিভোর হইয়া এক শ্রেণীর ফরাসী-সাহিত্যের আংশিক অনুকরণে অনিত্য বস্তু ও অসত্যের প্রকাশ ও রসাভাসের প্রশ্রয় দিতেছে; অথবা শুধু অলীক কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া অবাস্তব হইয়াছে।

(ছ) নিত্যবস্তুর উপেক্ষা ও বাস্তবকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া নব-নাগরিক সাহিত্যের চেষ্টায় আর্টের অবনতি ও সমাজের অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে।

(জ) নব-নাগরিক সাহিত্য যে শুধু নিত্য বস্তুকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা নহে; রসাভাস অথবা রসানুভূতির বিকারসাধনের জন্য সাহিত্যের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে বার্ণার্ড শ, জোলা, ডডে, ষ্ট্রীনড়বার্গ প্রভৃতির আদর্শের অনুকরণে আমাদের সাহিত্য নিত্য বস্তু, নীতি ও সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অসত্য ও সত্যাভাসের সৃষ্টি করিতেছে! এই গেল সাহিত্যে বস্তুর হিসাবে কথা। রসের হিসাবে আমরা আমাদের সত্য ও প্রত্যক্ষ রস ত্যাগ করিয়া কল্পিত ও সমূর্ত্ত রস লইয়া চটক লাগাইতেছি।

এই দুই কারণে আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম, কল্পনা-প্রসূত, বস্তুতন্ত্রহীন হইয়াছে।

অনুকরণের মোহ দূর না করিলে আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। ইবসেন, বার্ণাড শ, জোলার কল্পিত ভাবের দ্বারা অভিভূত থাকিলে চলিবে না। দেশের সাহিত্য এই দেশের ও যুগের বাস্তবের মানস-আদর্শকে নিত্য বলিয়া বরণ করুক, সত্যের উপর আপনার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করুক। বিদেশী কল্পিত রস ছাড়িয়া আপনার অনুভূতিকে অবলম্বন করুক। সত্যের প্রতিষ্ঠা, আসল প্রত্যক্ষ রসের সৃষ্টি, আর্টের বিকাশ, সাহিত্যের দেশ, যুগ বা জাতিধর্ম্ম বিচার ও বিশ্লেষণ ও আপনার ভাবুকতার দ্বারা তাহার মধ্য হইতে নিত্য বস্তু ও নিত্য রস সন্ধানের অপেক্ষা করিতেছে। যতকাল আমাদের সাহিত্য আমাদের দেশ ও যুগের অন্তরের নিত্য বস্তু ও নিত্য রসের সন্ধান না পায়, ততকালই আমাদের মধ্যে সাহিত্যের সহিত নীতি ও ধর্ম্মের—আর্টের সহিত সমাজের—শিল্পকলার সহিত শিক্ষা ও সাধনার, বিরোধ থাকিবে; আর ঐ বিরোধ লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা, নিন্দাবাদ, প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

হেমন্তের সেই স্নিগ্ধ হেম-সুপ্রভাতে,—
শুভ্র, শ্যাম-স্বচ্ছ, সেই অম্লান শোভাতে,
তটিনীর 'তর-তর' তরঙ্গ-সঙ্গীতে,
অম্লান আকাশতলে,—একান্ত নিভৃতে
মনে পড়ে—সেই যবে তোমায় আমায়
প্রথম মিলন হ'ল হিয়ায় হিয়ায়?
সেদিন সে নবারুণ তরুণ কিরণ
ক্ষণে ক্ষণে ঝলকিল, দিব্য সঞ্জীবন
জীয়াইয়া তুলেছিল সুপ্ত বিশ্বপ্রাণ;—
সেই স্মৃতি-সুখে আজ চিত্ত কম্পমান!

সে সৌম্য মাহেন্দ্রক্ষণে ওই নীলাম্বর
সোহাগে গলিয়া গিয়া, আবেশ-মন্থর
সমীর-হিল্লোলে আসি' দোঁহাকার দেহে—
স্ফূর্ত্তি আনন্দের সম, অনুপম স্নেহে
স্পর্শবশে সর্ব্ব শ্রান্তি দিল অপসারি'!
অজানা কুলায় হ'তে তখনি ঝঙ্কারি'
উঠিল অমৃত পিক! শিহরি কি সুখে
তখনি, আমরা দোঁহে দোঁহাকার বুকে
ঝাঁপায়ে পড়িনু মৌন আত্ম-নিবেদনে;
সে হ'তে অমর মোরা মিলন মরণে!

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩০

মানুষের মনকে যতখানি ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া বিশ্বাস, যথার্থ কিন্তু তা নয়। ভগবান তাঁহার সৃষ্ট এই ক্ষুদ্র মানব-জীবনকে দিয়া যাহা সহ্য করান, আর কোন জীবিত বা অপ্রাণ বস্তু তাহার অর্দ্ধেকও বোধ করি সহিতে পারে না। মানুষের প্রাণে যতখানি সহ্য হয়, ততখানি আঘাতে পাথর ভাঙ্গে, ততখানি তাপে লোহা ফাটে, ততখানি টানে চর্ম্ম ছিন্ন হয়; কেবল মানুষই,—একমাত্র মানুষই শুধু অভগ্ন, অক্ষত, অচ্ছিন্ন থাকিয়া এই আঘাতের ব্যথা, তাপের জ্বালা, সমুদয় দেবদত্ত বজ্রঘাতই সহিতে পারে। বুঝি এই শক্তির জন্য মানুষ সৃষ্টির মধ্যে প্রধান আসন পাইয়াছে। এইটুকুই বোধ করি মানুষের মানুষত্ব বা মনুষ্যত্ব?

ধীরার সেই যে দিন কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পরও সে বাঁচিয়া রহিল। ক্রমে-ক্রমে তাহার শরীরের লুপ্ত-শক্তি, এমন কি মনের স্বাভাবিক বৃত্তিসকল ধীরে ধীরে আবার প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল; ধীরা বাঁচিয়া উঠিল এবং বাঁচিয়াই রহিল। দিনও কাটিয়া যাইতেছিল। এ কথাও স্বীকার্য্য যে, যদি মানুষের মনের অবস্থার সহিত সময়ের গতির কোন প্রকার বাধাবাধকতা থাকিত, তাহা হইলে হয় ত মানুষের জন্য অনেক সময় তাহাকে অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তা কিছুই নাই; —তাই সে তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই দিন, পক্ষ, মাসে নিজেকে অতিবাহিত করিতে থাকে। কাজেই সুখীরও দিন কাটে; দুঃখীর দিনও না কাটিয়া পড়িয়া থাকিতে পায় না। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান হারাইবার পরেও তা মাকে বাঁচিতে হয়; খাইতে হয়, উঠিতে হয়, হয়তো খাবার খাটিতেও হয়। তবে ধীরাই বা কেন বাঁচিবে না?

খুব একটা বড় রোগ হইতে বাঁচিয়া উঠিলে যেমন প্রায়ই তাহার দক্ষিণা-স্বরূপ রোগীকে একটি ইন্দ্রিয়শক্তি হারাইতে হয়, ধীরাও যখন মরিতে পারিল না, তখনি সে যেন নিজের অক্ষত্ব ভাল করিয়া অনুভব করিল। সে যে কতখানি পরাশ্রিতা, এইবারে তাহার প্রকৃত পরিচয় সে পাইল। এ পৃথিবী এতদিন তাহার নিকট ঠিক আপনার জনের মতই সুপরিচিত না থাকিলেও, তাহাদের পরস্পরের সেই অপরিচয়ের মধ্যে কোন আড়াআড়ির ভাব ছিল না। কিন্তু আজ এ পৃথিবী তাহার নিকট একটা অন্ধকারময় প্রহেলিকামাত্র! ইহার সকল রসই যেন নীরস হইয়া গিয়াছে!

তা নির্ম্মলের মনের যে রকম অবস্থায় তাহাকে সে যে রকম যত্ন দেখাইতেছিল, তাহাতে তাহাকেই বা দোষ দিবার কি আছে? কিন্তু 'যত্ন দেখান' একটা জিনিষ, সেটা যাহারা, তাহারই সঙ্গে একরকম অবস্থার মানুষ, তাহারাই দেখিতে জানে; অন্ধ ধীরা ইহা তো দেখিতে পায় না! এই নব-বিবাহিত তরুণ স্বামীটিকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে হয় ত তাহার সে 'যত্ন'টাও সার্থক হইত! কিন্তু অতদূর বুঝিবার শক্তি, সাধারণতঃ কাহারও থাকে না। বিশেষতঃ, কল্পনাতেও আপনার কাছে যে অবস্থাটা অজ্ঞাত—সেইটাকে অনুভবে আনিয়া, তাহারই অনুবর্ত্তীভাবে চলা যে বড়ই কঠিন! মানুষ দেবতার বা রাক্ষসের যে কল্পনা করে, তাহা নিজেরই অঙ্গে-দৃষ্ট বস্তুর সর্ব্বোত্তমতা, বা সর্ব্বাধমতার আরোপ করিয়াই;—তাহার বাহিরে যে কল্পনাশক্তিও বন্ধ্যা!

যত দিন যাইতে লাগিল, ধীরার প্রাণের অভাব-অনুভব ততই প্রবল হইতেছিল। আবার নির্ম্মলের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত যেমন একটু গুছাইয়া আসিল, তাহার পর নিজের মনে দারুণ অশান্তি-অনলও অমনি প্রবলবেগে জ্বালা আরম্ভ করিয়া দিল।

সে মিথ্যাবাদী! অতি হীন বিশ্বাসঘাতক সে! অর্থ-লালসায়, পদের ও প্রতিষ্ঠার লোভে নিজের প্রতিজ্ঞা সে ভাঙ্গিয়াছে! প্রতিজ্ঞার বাণী অর্দ্ধোক্তিতে বাধা পাইলেও তাহা প্রতিজ্ঞা, এ কে না বলিবে? সে নিজেই কি এ কথা অস্বীকার করিতে পারে? প্রতিজ্ঞার চেয়েও যদি বড় কিছু থাকে, তাহা হইলে সেদিনের সেই যে প্রতিশ্রুতির অর্দ্ধোক্তি, তাহা তদপেক্ষাও অধিক! নিজের মনের কাছে এবং মনুষ্যত্বের নিকটে তাহার অপরাধের পরিমাপ কতখানি, তাহা অবশ্য ঠিক বলা দুষ্কর; কিন্তু তাঁহাদের কাছে, তাঁহাদের চক্ষে সে তো আজ অমানুষিক অপরাধে অপরাধী!

দুঃখে মানুষ শুধু বুক ফাটিয়া মরে না, তাই নয়; দুঃখকে সে জয়ও করে। কিন্তু মানুষকে যিনি দুঃখ দেন, তিনিই আবার তাহার প্রতিকারেরও উপায় করিয়া রাখেন। সে শুধু যদি এই ঐশ্বর্য্যস্রোতে অবগাহিত থাকিয়া, এই অপ্রতিবিধেয় লজ্জাযুক্ত চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ করি অনুক্ষণ ইহার অত্যন্ত ক্লান্তিকর সংস্পর্শে সে এই যৌবনের তারুণ্য হারাইয়া বার্দ্ধক্যের পানে ইতঃমধ্যেই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকিত। ইচ্ছা করিয়াই তাই সে নিজের পরিশ্রমের কাজ পরিত্যাগ করিল না। অংশী হিসাবে এবং তাহার উপর কার্য্যাধ্যক্ষরূপে, সে সেই বিপুল কারবারের অনেকখানি দায়িত্বই নিজের মাথায় চাপাইয়া লইয়া, তাহারই মধ্যে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিল। নহিলে একটু অবসর পাইলেই যে শতযোজন দূরবর্ত্তী এক পল্লীগৃহের দৃশ্য তাহার চিত্তদর্পণে নিজের বড় পরিচিত মুখের মতই, অমনই নিকটে, অতই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে! সে চিত্রে সে একখানি বড় সুন্দর, বড় তেজপূর্ণ মুখের ছবি দেখিতে পায়। এই মুখই সে এতদিন বড় আপনার বোধে নিজের বুকের ভিতর আঁকিয়া রাখিয়াছিল। এত দূরে থাকিয়াও স্বপ্নের চেয়ে অনেক স্পষ্ট তাহারই কথা, তাহারই হাসি কত সময়ই না সে শুনিতে পাইয়াছে। সে মুখ দেখিয়া, সে কথা শুনিয়া আর তো সুখ পাইবার উপায় নাই; বরং তাহার বুকের ভিতর অতিদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসগুলাই বুকটাকে চাপ দিয়া পীড়ন করিতে থাকে। হায়, সে যে এ স্থানে অনধিকারপ্রবেশকারিণী! তাহার কথা মনে করা এখন নির্ম্মলের পক্ষে অপরাধ!

শুধু যদি অপর্ণাকে হারাণই এ লোকসানের একমাত্র মূল হইত, তাহা হইলে হয় ত নির্ম্মলের পক্ষে তাহা এতবড় অসহ্য হইত না। অপর্ণাকে সে নভেল পড়িবার পর খেয়ালের বশে ভালবাসিয়া ফেলে নাই। যদি অপর্ণার মা তাহার বিবাহ সম্বন্ধে অতটা হাল ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বদাই হা হতোঽস্মি না করিতেন, যদি না তিনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিজাতি'-গোছ অতটা উদার অভিমত জ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও হয় ত অপর্ণাকে বিবাহ করিবার কথা ছাড়িয়া, সে ইচ্ছার একটা কণাও তাহার মনের কিনারায় স্থান পাইত না। কিন্তু, যখন বিপন্নদের প্রতি বড় দয়া করিতে গিয়া সে নিজেকে তাঁহাদের কাছে সঁপিয়া দিল, তখন হইতেই এই 'দয়ার' কেন্দ্রটিকে শুধু কৃপার চক্ষে দেখা তাহার পক্ষে অবশ্য সঙ্গত নয় বলিয়াই সঙ্গত হয় নাই। যদি আজ অপর্ণার পক্ষ হইতে কোন শুভঘটনা ঘটিয়া এ বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইত, তাহাতে তাহার মনেও হয় ত এতটা ঘা দিতে পারিত না। শুধু তাহার পক্ষ হইতে অপর্ণাকে সে ত্যাগ করিল, তাই নয়, —তাহার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের মনের নিকট হইতে তাহার যে কিছু সম্মান, তাহা চিরজন্মের মতই যে মুছিয়া গেল! না, বুঝি তাও গেল না, মুছিলে বুঝি এর চেয়ে একটু ভালই হইত। জাগিয়া রহিল—বড় ঘৃণার অক্ষরেই সে নাম—তাহারই নিজের নাম- তাহার এখনকার জীবিত মানুষদের মধ্যে সেই সর্ব্বপ্রধান শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্রীদের বক্ষের মধ্যে চিরদিনের মতই জাগিয়া রহিল। সে কি নাম? তাহা নীচ বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্কিত নাম!

দুই একবার এমনও মনে হইয়াছে, এর চেয়ে হয় ত দেনার দায়ে জেল হইলেও তাহাতে তাহার পক্ষে লজ্জা কম ছিল। কিন্তু তখনি সে চিন্তা জোর করিয়া মন হইতে সে বিদায় দিয়াছে। তাহার ইহাতে যাই হোক, তাহার সহিত তাহার স্বর্গীয় পিতৃনামও যে জড়িত ছিল। ভগবান তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গ দান করুন! পিতৃঋণে সে নিজেকে এবং নিজের সুনামকে শুদ্ধ বিক্রয় করিয়াছে, এইটুকুই এখন তাহার সান্ত্বনা! শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

সে কে? সে কি? তাহার সুনাম? সে এমন বড় কিছু নয়, যা'র জন্য পাওনাদার ফাঁকে পড়ে!

সেগুনকাঠ চালানের ঋতুতে এবার সে নিজেই জঙ্গলে গাছ দেখিতে যাইবে স্থির করিল। এখানে সহরে বসিয়া সর্ব্বদা লোকসঙ্গ করা তাহার আর যেন সহ্য হইতেছিল না। কাজের খাতিরে যেটুকু করিতে হয়, সেটুকু বরং কোনরূপে সহিয়া যায়, কিন্তু অনর্থক যে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া, মনের আগুনচাপা দিয়া, পাঁচটা বাজে-কথা কহিয়া মিথ্যা হাসি হাসিতে হয়, মানসিক এই অবস্থা যে বড়ই অসহ্য। মানুষ মাত্রেই একএকজন অভিজ্ঞ নট। মনের মধ্যে এক ভাব রাখিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে আর একজনের অভিনয় করিয়া বেড়াইতে হয়। নহিলে, মানুষের মনের যথার্থ সরল ভাব যদি যথাযথরূপে প্রকাশ আধুনিক মানবসমাজে, শিক্ষিত সমাজে কেহ করে, অপর দশজনে তাহাকে পাগল বলিয়া গায়ে হয় ত ধূলা দেয়। যে সমাজ যত উন্নতির অহঙ্কারে অহঙ্কৃত, কৃত্রিমতাও সেইখানে তেমনই প্রবল;—সেইখানেই মানুষের রূপযৌবন হইতে আচার ব্যবহার, কান্না হাসি সমস্তই ততবড় মিথ্যা!

আজকাল ভগিনীপতির উপর ব্রজ'র বিদ্বেষের বিষ একটু ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল। সে তাহার একজন অন্যতা ভাগীদার হইয়া বসিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ম্মল তাহার 'সমান' হইয়া উঠিল না! যেমন বিনীত চাকর ছিল, জামাই ও অংশীদার হইয়াও ঠিক তেমনই রহিল! কাজেই ব্রজ তাহার উপর কাঁহাতক আর একা-একা রাগ করিবে? বুঝি আরও একটা কারণ ছিল! এথেল তাহার চেয়ে দেখিতে সুপুরুষ ও অল্পবয়স্ক নির্ম্মলকে সুনজরে দেখিতেছে বোধে, নির্ম্মলের প্রতি তাহার মনে যে ঈর্ষা আসিয়াছিল, এথেলের স্বজাতি-বিবাহে মনের সে দ্বন্দ্ব কাটিয়াছে। ইংরাজের লাভের দিন; তাহারা যতই পাউক, তাহাতে তো কাহারও কোন দুঃখ নাই; নিজের দেশের লোককে প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করিলেই চোক টাটায়, মন কড়্‌কড়্‌ করে। বিশেষতঃ, নির্ম্মল যখন তাহাকে বৈষয়িক বা সাংসারিক বিষয়ে না ভাবাইয়া, নিজেই সব দিক বজায় রাখিতে লাগিল, তখন তাহার উপরে বরং কিছু খুসী হইয়াই সে তাহার বিখ্যাতা সুন্দরী বর্ম্মী-বন্ধু মাপোর সহিত নৌকা-ভ্রমণে, অথবা যেখানে তাহাদের খুসী,—ইচ্ছাসুখে বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। এথেলের বিবাহের পর হইতে এই সৌন্দর্য্যখ্যাতিসম্পন্না বর্ম্মী-যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়া সে তাহার প্রতি নিজের অবজ্ঞা দেখাইতে চাহিয়াছিল; এখন নাকি তাহাকেই ঘরণী করিতে মনস্থ করিয়াছে, এইরূপই দেশশুদ্ধ গুজব!

ধীরা অন্ধ। অন্ধ ঠিক এ পৃথিবীর মানুষ নয়। সে যেখানে থাকে, সেখানে তাহার চতুর্দ্দিকে তাহার অন্তরের নিবিড়াবৃত ছায়া ফেলিয়া তেমনিই শান্ত, তেমনই গভীর, একটি ধ্যানলোকের সৃষ্টি করিয়া, তাহারই মাঝখানে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত রাখে। পৃথিবীর মানুষ ইহার পাশ দিয়া তাহার দিকে কৃপাকটাক্ষে চাহিয়া চলিয়া যাইতে হাজারবার পারে; কিন্তু এই লক্ষণের গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে—এমন সাহস তাহারা রাখে না। এ যে তাহার চারিদিকে কিশোরী, তপস্বিনী উমার ন্যায় একটি মৌনতার তপস্যাগ্নি সে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। স্বয়ং মহাদেবকেও ইহার নিকট ছদ্মবেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নির্ম্মল এই নিরুদ্ধ হৃদয়দ্বারের বাহিরে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সেখানে প্রবেশের পথ সেও পায় নাই। সে যদি তাহার স্বভাবের চেয়ে একটুখানি সাংসারিক অভিজ্ঞতাযুক্ত, চালাক চতুর হইত, তাহা হইলে বোধ করি সেই স্তিমিতান্ধকার বিজনালয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়াও সে এক-রকম মানাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু নির্ম্মল স্বতন্ত্রধরণের লোক। ডাক-হাঁক করিয়া নিজের দেওয়াটাকে দশের চক্ষে তুলিয়া দেখাইয়া দেওয়া তাহার রীতি নয়,—তা' না-দেওয়া জিনিষ ফেরত দেওয়ার ভাণ করা তো দূরের কথা। ধীরাকে না দিবার কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না; তাহাকে অনেকখানি দিতেই সে আসিয়াছিল; দেওয়ার সুযোগ না পাইয়া মনে মনে উদ্বেগ ক্ষুণ্ণও হইতেছে; অথচ ঠিক কেমন করিয়া দিতে হইবে, সেইটুকুই সে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

তাহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-সকরুণচিত্ত এই যুবকটির পরিবর্ত্তে সে যদি সংসারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একজন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব লোকের হাতেও পড়িত, তাহা হইলেও হয় ত তাহাকে এমন করিয়া দিন কাটাইতে হইত না। অন্ধ হোক্, আতুর হোক, স্ত্রীর কাছে সকল স্বামীই কিছু দাবী রাখে। নব-বিবাহিত দম্পতির মধ্যে স্বামীর দিক্ হইতে স্ত্রীর একটি,

না তোষামোদ এবং তাহার শেষে আবার কত অভিমানের অবিচার, কত ভালবাসার অত্যাচার! কোথাও আবার, কোন নূতন বিবাহের কনে এমন করিয়া তাহার নীরব উপাসক স্বামীর নিকট হইতে কেবল অঞ্জলি ভরাভরা পূজার অর্ঘ্য লাভ করিয়া থাকে—তা সে পূজাও আবার প্রতিমার অঙ্গে নয়—ঘটে। পাছে তাহার এই পূজার প্রতিমায় পুষ্পস্পর্শে ব্যথা বাজে, তাই হয় ত তাহার এই অতিসাবধানতা! কিন্তু সে প্রতিমা তো সর্ব্ব-প্রত্যক্ষ-শক্তিধারিণী নহেন;—এইখানেই যে সমস্ত গোল হইয়া যায়!

নির্ম্মলদের এই বিবাহ-ব্যাপারটায় ঠিক এই পূজ্য-পূজক ভাবটাই আনিয়াছিল। সে তাহার এই প্রতিমার মত ভাবশূন্য, জীবনমুক্ত স্ত্রীটিকে দেবীর আসন দিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু উপাসনা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া রাজসিক ধরণে না করিয়া মানসভাবে, সাত্ত্বিক ধরণেই করিল। কাজেই সেটা সে নিজেই শুধু জানিল, আর কেহ তেমন করিয়া জানিল না। সত্যসত্যই নির্ম্মল তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল। সে শুধুই যে তাহার অন্ধত্বে দয়া করিত, তা নয়; তাহার এই সত্যকার দেবীর মত স্থির, প্রশান্ত মুখখানি, তাহার অসীম ধৈর্য্য, তাহার ক্ষুদ্র মমতাময় চিত্ত—সে সবই সে দেখিয়াছিল,—দেখিয়া বুঝিয়াছিল; তাই শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াও গিয়াছিল। অপর্ণার প্রতি তাহার যে ভাব, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, একতোলে চাপাইলে, কোন্‌টা যে উঁচু হইত, ঠিক বলা যায় না। এই দুইটা ভাবের মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। ধীরার প্রতি তাহার যে প্রেম, তাহার মধ্যে কোথাও কোন স্বার্থগন্ধ নাই। নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ ভক্তি-অবদানের ভারে আপনাকে নত করিয়া, যেন সে প্রেম-মন্দাকিনী আপনার গতিপথে নিয়ত-প্রবাহে বহিয়া যায়, বর্ষা উচ্ছ্বসিত নদীর বন্যাপ্লাবনের ন্যায় চারিপার্শ্বকে প্লাবিত করে না! কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে জলের গভীরতা-হানির আরোপ করা যায় না; বরং ইহাতে নদীগর্ভের গভীরতারই সাক্ষ্য দেয়। নির্ম্মলের মনে ধীরার প্রতি ভালবাসার অভাব একটুও ছিল না; অভাব ছিল সেই ভালবাসার মধ্যে আত্ম সুখেচ্ছার—অভাব ছিল—তাহার মধ্যে কামনায় তীব্র-তরঙ্গের! তাহা সখী, সঙ্গিনী, গৃহিণীর প্রতি বাসন্তী স্বপ্নপূর্ণ প্রণয়ের উচ্ছ্বাস নয়,—প্রিয়শিষ্যার, স্নেহপাত্রীর প্রতি স্নিগ্ধ, পবিত্র প্রেম;—ইহা মানবীয় নয়, স্বর্গীয়!

৩১

নির্ম্মলের যদি ইহাতে দোষ না থাকে, ধীরা বেচারীকেই বা দোষ দিলে চলিবে কেন? সে তাহার স্বামীকে চোকে দেখে নাই, তাহার স্পর্শ পায় নাই, কাণে শুধু তাহার দুচারিটি মিষ্ট, সংযত বাক্যমাত্র, সহৃদয়তার উত্তাপবিহীন একটুখানি সহানুভূতি—তাহার পিতার পুরাতন ভৃত্য পাঁচ-কড়ি, অথবা দাসী ক্ষমার মাও যেটুকু দিতে পারে—সেইটুকুই না হয় একটু মার্জ্জিত ভদ্রতার ধরণে, সে স্বামীর নিকট হইতে পাইয়াছিল। হইতে পারে তাহার মনে তাহার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমের মন্দার প্রস্ফুটিত আছে! কিন্তু হায়, মানুষ যে পৃথিবীর জীব! সেই স্বর্গের পারিজাতের চেয়ে মর্ত্ত্যের ধূলিকণাও অধিকতর লুব্ধ! স্বর্গের জিনিষ দেবতাদের উপভোগ্য বস্তু,—মানুষের তাহা শ্রদ্ধারই—ভোগের নয়।

সেদিন অসময়ে অকস্মাৎ বড় ঘোর করিয়া বাদল নামিল। নির্ম্মল টম্‌টম চড়িয়া যখন একটা কাজে বাহির হয়, তখন আকাশে একটু মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্তও ছিল না। সেই জন্য এ বিষয়ে সে সাবধান হয় নাই। সহরের বাহিরে থাকিতেই হঠাৎ খুব মেঘ করিয়া বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটার পর, খুব চাপিয়া বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। গাছের তলায় গেলে গাছের জল গায়ে ঝরিয়া পড়ে; তেমন ঘনশাখ বৃক্ষও সেদিকে অধিক নাই। অগত্যা সেই মুষলধারার মধ্যে সে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। সহরের মধ্যে চারিদিকে কাঠের দোকানগুলিতে ব্যতিব্যস্ততা জাগিয়া উঠিয়াছে;—দস্যু আসিলে লুঠ-তরাজের ভয়ে মানুষ যেমন ব্যস্ত হয়, তেমনি করিয়া বর্ম্মী সুন্দরীরা তাঁহাদের বিপণি-সজ্জিত সামগ্রীসকল বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই ব্যস্ততার মধ্য হইতেও কেহ-কেহ একবার তাঁহাদের ক্ষুদ্র সফরিবৎ চটুল চক্ষের বক্র-কটাক্ষে সকৌতূহলে সেই বৃষ্টিধারার মধ্যবর্ত্তী গাড়ি, ঘোড়া ও আরোহীর প্রতি চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মল কোন দিকে চাহিয়া দেখে নাই; সে সেই অবিশ্রান্ত বারিপাতের ভিতর মুহুর্মুহু বিদ্যুচ্চমকে সচকিত তেজী ঘোড়াকে প্রাণপণে রাশ

টানিয়া-টানিয়াও ঠিক রাখিতে পারিতেছিল না। ঘোড়ার ক্রমাগতই চেষ্টা ছিল, লাফাইয়া উঠিয়া আরোহিসমেত গাড়িখানা পিঠ হইতে কাৎ করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার দিকে। ঊর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে খুসী, ছুটিয়া গিয়া কোথাও একটা নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া পড়িবার মতলবও যে মনের মধ্যে তাহার জাগে নাই, তাহাও বলা যায় না। নির্ম্মল নিজে পাকা সওয়ার নহে; ঘোড়ার উপদ্রবে সে বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিল। একবার মনে করিল, নামিয়া হাঁটিয়াই বাড়ী যাই, অথবা এই দোকানগুলার কোনটায় উঠিয়া দাঁড়াই; সহিস ঘোড়াকে যা পারে করুক। কিন্তু বাড়ী এখনও অনেক দূরে; এই বৃষ্টিতে হাঁটিয়া যাওয়ায় বিলম্ব হইবে। আর দোকানে?—যদি অন্য দেশের মত এই সকল দোকানে কর্ত্রীর পরিবর্ত্তে কর্ত্তা থাকিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই তো ছিল না; কিন্তু এই পুরুষপ্রকৃতি পরুষ-মূর্ত্তি সুন্দরীদিগের আতিথ্য-গ্রহণের চেয়ে তাহার পক্ষে গাড়ি-চাপা পড়াও অনেক সহজ বোধ হইল। মাথায় কাপড় দেওয়া, শান্তদৃষ্টি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক হইলেও, 'মা' সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের কাছে বরং দুদণ্ড দাঁড়ান চলে; কিন্তু এই স্তূপাকারে রচিত বেণীর চারিধার পুষ্পভূষণে খচিত করা, রেশমের বিচিত্র পোষাক-পরা, লজ্জা-সঙ্কোচের গণ্ডী কাটান বিদেশী মেয়েদের যে দৃষ্টি পুরুষের সাক্ষাতে নত হয় না, সেখানে তাহার যেন প্রবেশপথই নাই। ইঁহাদের সহিত কথা কহার ভয়ে হাজার প্রয়োজনীয় জিনিষের সাম্‌নে দিয়া চলিয়া গেলেও সে নিজে কখন একবার দর করিয়া দেখে নাই।

বৃষ্টির যেন থামার দিকে লক্ষ্যই নাই। রাস্তার দুধারে ড্রেণের মধ্য দিয়া কলকল শব্দে প্রবল জলস্রোত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে; জলপ্রপাতের মতই তাহার ভীষণ গর্জ্জন ও শুভ্র ফেনা! সন্ধ্যাও প্রায় হয় হয়; চারিদিক অন্ধকারে প্রায় আবৃত হইয়া আসিয়াছিল। সহসা চোক ধাঁধিয়া দিয়া বিদ্যুৎচমকের অব্যবহিত পরেই ভয়ানক শব্দে একটা বজ্রাঘাত হইল। সেটা বোধ হয় মুরলীধরের বাড়ি হইতে বেশি দূরে পড়ে নাই;—কেন না, সেই দিক হইতেই পড়িবার সময়কার আগুন সুস্পষ্টরূপেই দেখা গিয়াছিল। সেই আলোয় ও শব্দে ঘোড়াটা আরও 'ঘাবড়াইয়া' গিয়া অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠিতেই নির্ম্মলের হাত হইতে রাশটা খসিয়া পড়িল এবং আল্গা পাইয়া উন্মত্ত জানোয়ারটা দিক্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্যবৎ কোথা দিয়া যে ছুটিয়া চলিল, তাহার ঠিক রহিল না।

৩২

সেই ঝড়-বৃষ্টির দিন বিকাল বেলা, ধীরা নিজের বসিবার ঘরে জানালার নিকট বসিয়া ছিল। জানালা খোলা, তাহার নীচে ফুলবাগানে, সদ্য-ফোটা সুগন্ধি কুসুমের দল বিকশিত, অর্দ্ধ বিকশিত, নেত্র তুলিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া যেন তাহাদেরই মত আর একখানা মুখ খুঁজিতেছিল। সূর্য্যাস্তের বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত আকাশে আজ গোধূলির উৎসব-নিশান আকস্মিক মেঘে ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। তাই ঊর্দ্ধপথে উড়ন্ত পাখীর দল ভীতত্রস্তপক্ষে নিম্নাভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছে। ধীরা বাতাস পাইবার আশাতেই শুধু জানালার কাছটিতে আসিয়া বসে, দাঁড়ায়; নতুবা তাহার পক্ষে ঘরে-বাহিরে প্রভেদ কি? বাতাসের আর্দ্রতায় সে বুঝিতে পারিল—বৃষ্টি আসন্ন। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল,—তাহার অদূরে গাছপালা সর-সর সর শব্দে বৃষ্টিকে আহ্বান করিতেছে। ঝর্‌ঝর্‌, ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া অভ্যাগতও আহ্বান-কারীদের স্বাগত-অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল। তারপর ক্রমেই উভয়ের আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আবার কথায়-কথায় তর্কের কোলাহলও আসিয়া পড়িল। থাকিয়া-থাকিয়া দর্শক-দল হইতে প্রবল করতালি-শব্দের ন্যায় হুহু-ধ্বনি করিয়া ঝড় বহিতেও আরম্ভ করিল, এবং পরিতুষ্ট দর্শকসমূহের মুখ-নিঃসৃত জয়ধ্বনিবৎ মুহুর্মুহু মেঘগর্জ্জনে আসর যেন জমকাইয়া উঠিল। ধীরা বহুক্ষণ সেই ঐক্যতান শুনিতে লাগিল। কিন্তু সহসা কোন স্মৃতির ব্যথায় তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি বুঝি আলোড়িত হইতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াতে, সে তাহার ক্ষুদ্র দুখানি হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অনেক-ক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। আজ এই জলের সঙ্গে-সঙ্গে একবার খুব ডাক-ছাড়িয়া তাহার যেন বড় কান্নাই কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। জীবনে কখন হয় ত তেমন করিয়া সে একবার কাঁদিবারও অবসর পায় নাই! আবদারের বয়সে আবদার করিবার প্রয়োজন ছিল না, অযাচিতভাবে সে পাইয়াছে। তা ভিন্ন, কিসেরই বা আবদার সে করিবে? সে ত এ পৃথিবীকে দেখে নাই।

ইহাতে কি আছে,—কি সে পায় নাই, সেও যে তাহার কাছে অজ্ঞাত! তারপর? অশ্রুবিন্দুপরিশূন্য গভীর শোকে তাহার বুকটা মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জ্জন দিবার কেহ না থাকিলে কি কান্না আসে? বুকের মধ্যে পাথর হইয়া ও চোকের ভিতর আগুন হইয়া যে সে জলের ধারা জমিয়া শুকাইয়া যায়! আজ প্রকৃতি নিজে ঐ অমন করিয়া হাহাকার করিতেছে,—আজ সেই বরফ-জমা প্রাণের ক্রন্দন যেন তাহারই সেই সকরুণ বিলাপের মূর্চ্ছনায় গলিয়া-গলিয়া একটা বিপুল বন্যা-জলের সৃষ্টি করিতেছিল। বুক ফাটিয়া "বাবা গো" "বাবা গো" বলিয়া ডাকিয়া-ডাকিয়া একবার বড়-রকম একটা কান্না কাঁদিতে পারিলে, তবেই হয় ত তাহার এই অহর্নিশি-পাষাণ-ভারে-ভারাক্রান্ত হৃদয় একটু শান্ত হইতে পারে! কাঁদিতে পারাও যে অনেক সময় বড় সুখের, বড় শান্তির! সহসা কড়কড় শব্দে জলস্থল, বাড়ী, ঘর এবং জীবজন্তুর বক্ষ কম্পিত করিয়া অল্পমাত্র দূরে একটা উচ্চশীর্ষ নারিকেলের মাথায় বাজ পড়িল। সেই শব্দে আকস্মিক ভয়ের তাড়নায় ধীরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া অসহায়ভাবে ছুটিয়া দ্বারের দিকে গেল। "বাবা! বাবা!" উচ্চকণ্ঠে এই চিরদিনের সর্ব্ব-ভয়দুঃখের একমাত্র আশ্রয়-স্থলকে সভয়ে আহ্বান করিয়া ফেলিয়াই তাহার স্মরণ হইয়া গেল, আজ আর সে পিতা তাহার পাশের ঘরে নাই, যে, এই মুহূর্ত্তেই তাহার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিয়া আসিবেন;—সবেগে সেই সর্ব্বদুঃখহরা প্রশস্ত বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে নিজের হৃদয় মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শত চুম্বনে তাহার সমস্ত ভয়টাকে কোথায় সরাইয়া দিয়া, তখনি আবার হাসাইবার জন্য কত বিষয়েরই না অবতারণা করিবেন। মেঘ কি—সে কেন গর্জ্জে, কেন বর্ষে, এই সকল কথা কত যত্নে কত পরিশ্রম-সহকারেই তাহাকে বুঝাইবেন! এমন পিতৃহারা হইয়াও সে আজও বাঁচিয়া রহিল! হা'রে পাষাণ প্রাণ!

ক্ষমা, রমা ছুটিয়া আসিল। "ওমা তাই তো! দিদিমণি, তুমি একাটি রয়েচ গা! আমি বলি, জামাই বাবু তোমার কাছে রয়েচেন। ভয় পেয়েচ বুঝি? পোড়ার দশা আমার! বামুনটা যে সং,—না দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে কিছুই যে সে পারে না।"

নির্ম্মল যে আজ এখনও আসে নাই, এতক্ষণ সে কথা ধীরার মনেও ছিল না; নিজের দুঃখভারে তাহার মন এতই ভরা যে, কাহারও কথা তাহার মনেই হয় না। ক্ষমার মা কাছে বসিয়া তাহাকে পাঁচ কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে যে এই বজ্রপাতে ভীত হইয়াছে, তাহা তাহার মুখেই লেখা ছিল। সে নিজের অতীত জীবনের কাহিনী আনিয়া, এমন আকস্মিক বৃষ্টির দিনে—তাহাদের 'মিন্‌ষে' যখন ভিজা বলদ সঙ্গে ভিজিয়া ঘরে ফিরিত—তখনকার গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিয়া, সে তাহার জন্য নিজের হাতে তামাকু ছিলিমটি সাজাইয়া, যখন তাহাতে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, আহা! তখন কি আহ্লাদেই যে 'ক্ষমার বাবা'র চোক দু'টি ছলছল করিতে থাকিত! সে কথা স্মরণে আজও প্রৌঢ়া 'ক্ষমার মা'র নিজের চোখে জল আসে। সে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিল। "মিন্‌ষে বড্ড ভাল ছিল গো, দিদিমণি! এত আদর ভদ্দর লোকেও তাদের পরী-পরী ইস্তিরিকে করতে পারবেক্ নি। এমনি যত্ন-ছেদ্দা করতো—মুড়কির মো' একটি পেলে তার আধখানি আমায় না খাইয়ে নিজের দাঁতে দিত নি।" ধীরা তাহার চোখের জল দেখিতে পায় না—সেই নিঃশ্বাসই সে শুধু শুনিল। শব্দের বিভিন্ন রূপ তাহার কাছে বড় সত্য! সেই অকৃত্রিম ব্যথিত নিঃশ্বাস সে চিনিয়াছিল,—তাই সেই সঙ্গে নিজের অজস্র জমা-করা রুদ্ধশ্বাসের মধ্য হইতে একটি মিলাইয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোর কি বাবা ছিল না, ক্ষমার মা? কই, তাঁর কথা তো কোন দিন তুই বলিস না?"

ক্ষমার মা একটু হাসিয়া কহিল, "ও মা! বাবা আবার কার'না থাকে ভাই? তা দিদি, তিন বছর বয়সে 'ওণা'র ঘরে এয়েছিলুম, পৌণে আঠার গণ্ডা টাকা দিয়ে উনি আমায় বে করে আনে; আর-তো কখন বাপ-মায়ের ঘর-মুখো হইনি। তাদের আমি তা'তে দুষিনি,—তারা দুঃখী মানুষ,—কোথায় থেকে দূরের পথে মেয়ে আনবে, নেবে—বলো? তা ওঁনার যত্নয় সে দুঃখু আমার মনের কোণায়ও ছেলো না।" ধীরা বড় বিস্মিত হইল। সেই বিস্ময়ের বেগেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, স্ত্রীরাও কি তা'হলে তাদের স্বামীদের ভালবাসে? সব্বাই কি বাসে?" "তা আর বাসে না! তোমাদের ভদ্দর

লোকের ঘরের কথা ছেড়েই দাও,—এই সেদিন অবধি তো তাঁরা সহমরণে মরে সতী হতেন। আমাদের ছোট লোকের ঘরেই হাজারের মধ্যে যদি কদাচ একজনা না বাসে, তো জানিনি। সব্বাই-ই বাসে। সোয়ামি নাকি সকল দেবতার ওপোরকার দেবতা! তোমার মা বল্‌তো—তাই শুনিছি ভাই! নৈলে আর কার কাছে শুন্‌বো বলো!"

"আচ্ছা বাপের মতন কি অত বেশি আর কাকেও ভালবাসা যায়? তা বোধ হয় যায় না; না?" "তা যাবে না কেন দিদি, যায়। এই তোমার গে, বাপ মা' ভাই সোয়ামি সন্তান এ সবই এক রকম" "সন্তান—ছেলেকে?" 'হ্যাঁ এই ছেলে-মেয়ে। দেখনি, বাবু তোমায় কি ভালটাই বাসতো!"

ধীরার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিয়া নত হইয়া আসিল। সে কতক্ষণ পরে আপনাকে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া বড় মৃদুস্বরে কহিল, "দেখেচি। কিন্তু স্বামী—"

ক্ষমার মা তাহাকে বহুকাল পরে এমন করিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতে দেখিয়া মনে মনে একটু খুসী হইতেছিল, জোর দিয়া বলিল, "সোয়ামী কারু চেয়ে তুচ্ছু নয় দিদি। আমাদের দেশে থাক্‌তে একবার দক্ষযজ্ঞের যাত্রাগান শুনেছিনু। তা'তে সোয়ামির নিন্দে শুনে দক্ষরাজার কন্যে সতী নিজের প্রাণত্যাগ করেছিলো। আর ঐ বল্‌তো, তা আগে আর বামুনের ঘরের বিধবারা হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে, মরা সোয়ামির চরণ ধরে তাঁদের চিতেয় পুড়ত, সোয়ামীর সঙ্গে স্বর্গে যাবে বলে!"

ধীরার আজ এই সব আলোচনা কে' জানে কেন ভাল লাগিতেছিল। এসব তাহার কিছুই জানা জিনিষ নয়—সম্পূর্ণ নূতন কাহিনী। তাও বটে; তা ভিন্ন হয় ত এর ভিতর আরও কিছু,—তাহারও নিকট এখন পর্য্যাপ্ত অজ্ঞাত, অপর কোন কারণও থাকিতে পারে, যাহাতে স্বামী সম্বন্ধীয় এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ে তাহাকে উৎসুক করিয়াছে। ক্ষমার মার কাছে একটুখানি ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল "আচ্ছা সব্বার স্বামীই কি স্ত্রীকে খুব ভালবাসে রে ক্ষমার মা?"

ক্ষমার মা এইবার একটু রসিকতা করিতে গেল; কহিল, "কে না বাসে জামাইবাবুর দেখে জান্‌তে পারচোনি"

"আমি কি কিছু দেখ্‌তে পাই রে?" এমন সরল সহজ-ভাবে অন্ধ বালিকা এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিল যে, বুড়া দাসী ইহার মধ্যস্থ তিরস্কার-প্রচ্ছন্ন ব্যথিত সুরে বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ ধীরা কহিয়া উঠিল, "দক্ষরাজার মেয়ে সতীর গল্পটা আমায় বল্।" গল্প শুনিতে শুনিতে শেষকালটায় তাহার অশ্রুহীন নেত্র যেন ঈষৎ সলিলার্দ্র হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময় কে জানে কিসের জন্য বারে-বারেই নিম্মলের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। একটু উদ্বেগের সহিত মনে হইল,—'সে আজ এখনও কেন আসিল না?' ক্ষমার মার গল্প যখন শেষ হইয়া গেল, তখন বৃষ্টির শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না; ঝড়ের হাওয়া গাছপালার গাত্রবসন এলোথেলো করিয়া দিয়া কেবল তাহাদের সলজ্জ তিরস্কার লাভ করিতেছিল। ধীরা নীরবে একাগ্রচিত্তে সেই মর্ম্মস্পর্শী সতী-লীলা শ্রবণ করিতেছিল। দাসী কথাশেষে চুপ করিলে, তখন তাহার হুঁস হইল। আঁচলে চোক মুছিয়া সে সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "ঐ রকম আর কোন গল্প বল্ না ভাই, ক্ষমার মা,—"

"আচ্ছা, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলবো'খন। এখন রান্নাঘরে একবার দেখে আসি কতদূর কি হলো। জামাই-বাবু কেন এখনও এলো না? যাই, দেখি গিয়ে—কি কর্‌চেন। তাঁকেই একবার পাঠিয়ে দিইগে।" ধীরা এ কথার আর প্রতিবাদ করিল না। তাহারও অকস্মাৎ কেমন ইচ্ছা হইল, প্রতিদিনের মত আজও নিৰ্ম্মল যেন তাহার নিকট আসে। এমনি সময় বাহির হইতে পাঁচু ডাকিল "মাসি, শোন গা!"

"কিরে পাঁচকড়ি, কি বল্‌ছিস্?" বলিতে বলিতে ক্ষমার মা বাহির হইয়া আসিল। পাঁচুর বড় ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বড্ড বিপদ হয়ে গেছে, মাসি। জামাই বাবু গাড়ি উল্টে কোথায় বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন, রাস্তার মানুষরা চিন্‌তে পেরে পাল্কি করে, বাড়ী এনেচে। ডাক্তার এয়েচেন। ভাঁড়ারের চাবিটা খুলবে চল দেখি, একটা ইয়ে চাই—"

"এ কি কথা রে! ওমা এ আবার কি হলো"

"এসো তবে আমি চল্লাম, ষ্টোভে গরমজল চড়াতে হবে—"

ক্ষমার মা একটু অগ্রসর হইতেই ধীরা দ্রুতপদে আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল "আমায় সেখানে নিয়ে চল্ ক্ষমার মা, আমিও যাবো।"

ক্ষমার মা নিজেই বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল "তুমি এখন একটু থাকো দিদি; এখন তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো, এসে তখন—"।

ধীরা তাহার ধৃত হস্তখানা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িল; গাঢ়স্বরে কহিল "এই না তুই বল্লি, সতী স্বামীর নিন্দায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন! আমি যাবোই। আমি তাঁকে খুব ভালবাস্‌বো। আমার যে আর কেউ নেই।"

(ক্রমশঃ)

চিত্রলেখা

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ]

(নববর্ষা)

বৃষ্টি ; কেবলি বৃষ্টি। সমস্ত আকাশ ঘোলাটে। সবুজ গাছ পালার উপর বৃষ্টিধারার ঝাপ্সা ধূসর পর্দ্দা ঝুলছে—গাছগুলি যেন একটার সঙ্গে অন্যটা লেপ্টে গেছে। আকাশ আর পৃথিবীর ব্যবধানটাও বৃষ্টির আবির্ভাবে ছাই-রংএর হয়ে গেল। সামনের পুকুরের বুকের উপর যতগুলি ছায়া সটান শুয়ে ছিল, সব কোথায় অন্তর্দ্ধান! এখন অবিরাম বারিবিন্দু-পতনে কত রকমের আঁকা-বাঁকা লেখা তার উপর জেগে উঠেছে। কিন্তু জলের লেখা কতক্ষণ থাকে? আবার সব চারিদিকে বিছিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের নিশ্বাসে সমস্ত পুকুরটা শিউরে উঠছে, কেঁপে-কেঁপে জল সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাঠের সবুজ ঘাসের মাঝে-মাঝে, গঙ্গার ঢলনামা জলের মত গেরুয়া জল জমেছে। চারিদিক হতে একটি গম্ভীর শব্দ উঠছে,—"যাও," "যাও"। কেবল দালানের শানের উপর জোরে যে বৃষ্টি বিন্দুগুলি পড়ছে, তারি মধ্যে একটি হাল্কা তাল বাজছে—তুড়ি দিয়ে তাল দিলে যেমন হয়, তেমনি!

বৃষ্টি ছাড়ল। আকাশের ধোঁয়াটে মেঘের মাঝে মাঝে সাদা আলোর ফাঁক দেখা যাচ্ছে। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি চুপি-চুপি কথা কইছে। গাছপালা আবার সব আল্‌গা হয়ে দাঁড়াল। জলে ভিজে তালগাছের কাণ্ডটা একেবারে নিবিড় কালো; খেজুরও কতকটা তাই; তবে তার গায়ে শতেক খাঁজ-কাটা; বছর বছর কত রস তার গা কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে—সেই সব খাঁজে-খাঁজে কালো আরো নিবিড়। নারিকেল-সুপারির গায়ে সাদা-সাদা শেওলা জমেছে,তাই তারা কালো না হয়ে ধূসর হয়ে গেছে। পুকুরের বুক শান্ত হয়ে এল; আবার সব ছায়া দেখা যাচ্ছে। তবে কাঁপুনিটা একেবারে শেষ হয়নি, শিউরে শিউরে উঠছে,তাতে করে ছায়ার সোজা গায়ে ঢেউ খেলান রেখা দেখা দিচ্ছে।

বিদায়ের "যাও" "যাও" শব্দ নিস্তব্ধ। দু'একটি পাখী মৃদু সুরে ডাকাডাকি করছে। গাছের বড়-বড় পাতা বেয়ে দু'চারটে বড় বড় ফোঁটা ঝপ-ঝপ করে, থেকে থেকে হঠাৎ খসে পড়ছে! ঐ একটা বুলবুলি উড়ে এসে, ঝুঁটি নাড়িয়ে নাড়িয়ে কি বলে গেল! লেজ নাড়িয়ে মশা তাড়িয়ে গরু আবার ঘাস খেতে আরম্ভ করল, এতক্ষণ তটস্থ হয়ে দাড়িয়ে ভিজছিল!

বৃষ্টি, অনবরত বৃষ্টি—তার আর বিরাম বিশ্রাম নাই। কখনো নিঃশব্দ অশ্রুজলধারার মত, কখনো বা বিপুল আবেগে, ঝর্ঝর ধ্বনিতে প্রবল বাতাসে গাছপালা অস্থির করে, আকুল ক্রন্দনে! ভিজে ঘাসের উপর গাঙশালিক কতকগুলি কি খুঁটে খাচ্ছিল, কে জানে? জোরে বৃষ্টি আসবামাত্র উড়ে পালিয়ে গেল। খেজুরগাছের ঝোপের মত মাথার পাতার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলে। আকাশে একটি পাখীকেও উড়তে দেখা যাচ্ছে না; কেবল নিবিড় বনের মধ্যে দাঁড়কাক থেকে-থেকে খাঁ-খাঁ করে ডাকছে। আকাশের জমাট মেঘের গায়ে কোথাও কোন ছিদ্র নাই; এত যে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, তবুও কোনখানে হাল্কা হয়ে আসেনি।

বাতাস উঠল। বৃষ্টির বেগ কমে গিয়েছে। গাঙশালিকেরা সবাই আবার বেরিয়ে এল। একটি ছেলেমানুষ কাঠ্‌ঠোক্‌রা তার নরম ঠোঁট দিয়ে নারিকেল গাছের গায়ে ঠোকর দিচ্ছে। কোন ফলই হচ্ছে না দেখে, ঝুঁটি নাড়া দিয়ে, হতাশ হয়ে উড়ে চলে গেল। তার রঙীন পাখার আনন্দটুকু রামধনুকের বিচিত্র আলোর মত আমার চোখের উপর খেলিয়ে দিয়ে গেল। একটি কালো মোটা-সোটা গোল-গাল মেয়ে মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে, পিতলের কলসী কাঁকে করে নাইবার জল আনছে; কতবারই পুকুরে আর ঘরে আনা-গোনা করছে। যখন প্রথম জল আন্‌তে নেমেছিল, তখন অধিক বৃষ্টি ছিল না; তাই মাথার কাপড় আট্‌কে রাখবার জন্যে দাঁত দিয়ে একটা খুঁটু চেপে ধরে রেখেছিল।

এখন অবিশ্রাম বৃষ্টিতে ঘোমটা ভিজে একেবারে তার মাথার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

এত জলে ভিজে-ভিজে বাগানের ফুলের তেমন দুর্দ্দশা হয়নি। কল্‌কে ফুলের সোণালি পেয়ালাগুলি যে কতবার জলে ভরে উপ্‌চে গিয়েছে, তার ঠিক নাই; তবু ত খাড়া আছে, নেতিয়ে ঝরে পড়েনি। রঙ্গন ফুলের গুচ্ছ তো বৃষ্টিকে মোটে আমলই দিচ্ছে না; তারা বেশ গুমরেই ফুটে আছে। কাবু হয়ে পড়েছে কেবল বেচারী মধুমালতীর দল; সুকুমার কচি ছোট্ট ফুল আর পাতলা জিরে-জিরে পাতাগুলি ঝড়-বৃষ্টির এ দাপট কিছুই সহ্য করতে পারছে না, একেবারে আকুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের দেহ-মনের কোথাও যেন আর এতটুকুও প্রাণশক্তি নাই, একেবারেই মরণাহত!

এমন আঁধার-করা বৃষ্টি-ঝরা নিরুপায় দিন, তবুও জীবন তো চলছে। বৃষ্টি যেম্নি একটু কম হয়ে আসছে, অম্নি পাখীরা গাছের আশ্রয় ছেড়ে খাবার খুঁজতে নামছে। গাছগুলি ডালপালা নাড়া দিয়ে, বৃষ্টির বোঝা ঝরিয়ে, নিজেদের একটু শুক্‌নো করে নিচ্ছে। বাগানের কুলি মজুর বৃষ্টির অত্যাচারে ঘরের দাওয়ায় উঠে বসেছিল, আবার নেমে কাজ আরম্ভ করে দিলে। মেয়েটি সমানে জল তুলেই চলেছে।

আবার ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি নেমে এল। পাখীরা সব পালিয়েছে। একটি বক তার অমন শুভ্র পাখা ছড়িয়ে সুমুখ দিয়ে উড়ে গেল। সে যে এতক্ষণ কোন্‌ গাছের মাথায় পাতার ঝোপে লুকিয়ে বসে ছিল, বুঝতেও পারা যায়নি। ছোট্ট একটি টুন্‌টুনি পাখী রঙ্গনের ঝাড় হতে বেরিয়ে এসে, বৃষ্টির বাড়াবাড়ি দেখে তাড়াতাড়ি আবার লুকিয়ে পড়ল। এম্নি জোরেই বৃষ্টি এসেছে—এম্নি দ্রুত বড়-বড় ফোঁটা যে, কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক জলে জলময় হয়ে গেল। বনের সীমানায় গাছেরা অদৃশ্য হয়ে পড়েছে; মনে হচ্ছে, মেঘই বুঝি নেমে এসেছে!

আজ সারাদিন ধরে খুব ছোট-ছোট ফোঁটায় অবিরল বৃষ্টি ঝরে পড়েছে। আর প্রবল ব্যাকুল বেগে গাছপালা সব তোলপাড় করে, পুকুরের বুকে ঢেউ তুলিয়ে দিয়ে, নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি গাছের পাতায়-পাতায় আঘাত করে, হাহাকার তুলে, বাতাস কেবলি ছুটে চলেছে। কচিৎ কখনো আলো ভয়ে-ভয়ে দেখা দিয়েছে, আবার লজ্জায় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছে। সারাদিন ধরে যেন আকাশ-পৃথিবীর উপরে একটা শোকের অভিনয় চলছে। এতে প্রাবল্য আছে, গভীরতা নাই। এই বুক চাপড়ান, এই হায়-হায়, এই আছড়ে-পড়া, আবার সব স্থির। এ যেন অসভ্য বর্ব্বরের দুঃখ-প্রকাশ; প্রকাশই অধিক, শোকের বাস্তব অস্তিত্ব স্বল্পই।

আজ আবার ঝড় উঠেছে; সূর্য্য ওঠেননি। আকাশে ধূসর ম্লান মেঘের তরঙ্গ অবিরাম উঠে-পড়ে চলেছে— কোথাও একটুও নীলিমার ফাঁক নাই। বাতাস গাছপালার উপর উৎপাত করছে। নারিকেল সুপারির লম্বা লম্বা পাতা এলো রুক্ষ চুলের মত আকাশে উড়্‌ছেন পুকুরের স্থির জল অধীর হয়ে দুল্‌ছে— তারি ব্যাকুল আবেগে পদ্মপাতাগুলি জলে ভরে গেল!

আজ মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, আর মাঝে মাঝে আলোর অভিনয় চলেছে। কখনো মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন; চারিদিক অন্ধকার করে, প্রবলবেগে বৃষ্টিধারা সব অদৃশ্য করে দিচ্ছে। বাতাসের উদ্দাম বেগে গাছপালা পরিত্রাহি শব্দ করছে। আবার কখনো বা মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃষ্টিস্রোত নিবারিত হয়ে, আকাশের ধূসর ম্লানিমা ধুয়ে গিয়ে, নীল আকাশ অবারিত হয়ে পড়্‌ছে; স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করছে। পুকুরের জলে আজ তিনটি রাঙা কমল দেখা দিয়েছে। ঝড়, বৃষ্টি, আলোতে তারা বারংবার মুগ্ধ, চমকিত আর বিস্মিত হচ্ছে। আলো উঠ্‌লে, বৃষ্টি নিরস্ত হলে, নীল আকাশের ছায়া পড়ে' পুকুরের ঘোলা জল ঘন গভীর নীল দেখাচ্ছে। কিন্তু বাতাস যখন এসে জোরে সেই জল ধরে বার-বার দোলা দিচ্ছে, তখন তার ধূলির বর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়্‌ছে; আকাশের ছায়ার কাছে ধার-করা নীল আর টিঁক্‌ছে না। এই কতক্ষণ বৃষ্টিতে সব অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আবার উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোতে চারিদিক পরিষ্কার সুন্দর দেখাচ্ছে। ভিজে ঘাসের বিন্দু-বিন্দু জলের উপর সূর্য্যকিরণ পড়ে' কত হীরক ঝলমল করছে। পাতার গা-বেয়ে কত তরল মুক্তা রামধনু-বর্ণের অভিনয় করে ঝরে পড়ছে।

আজ রোদ নাই, খালি মেঘ আর বৃষ্টি। পুকুরের উজ্জ্বল বুকের উপর বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা খসে পড়ে, অসংখ্য বৃত্ত রচনা করে, কত লেখা লিখছে। স্বর্গ হতে ঝরে-পড়া

করুণার এই অভিষেক, পৃথিবীর ধূলাকাদায় মলিন জলের উপর, কোন্ দেবতার সান্ত্বনার আশ্বাস বহন করে আন্‌ছে? পৃথিবীর যা-কিছু সে আপন মন একাগ্র করে, সব চাঞ্চল্য পরিহার করে, বুকের উপর স্থাপন করেছিল, সে শুধু ছায়াই মাত্র, আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে বৃষ্টির অশ্রু সেচনে সমস্তই জলের লেখার মত একেবারেই ধুয়ে-মুছে গেছে, কিছুরি অস্তিত্ব নাই। যে কমল, সুদীর্ঘ মৃণাল পুকুরের বুকের গভীরে বিদ্ধ করে, উপরে বিকাশের আয়োজন করেছিল, তার বিকাশোন্মুখ রক্তকোরকটি আলোর অর্চ্চনা না পেয়ে, আজ রুদ্ধ, মৌন, লাবণ্যশূন্য, সুগন্ধ-প্রত্যাখ্যাত!

বৃষ্টিও ঝরছে, আলোও ফুটেছে। কিন্তু এ সে আলো নয় যে, মেঘের আবরণ ভেদ করে, বিচ্ছুরিত হয়ে, বৃষ্টিধারার উপর এসে পড়ে, আকাশে ইন্দ্রধনুকের সপ্তবর্ণের তোরণ রচনা করতে পারে। এ আলোর ধার নেই, এ যেন ঘষা-কাচের ফানুষের মধ্যে দিয়ে আসা ভোঁতা আলো। কিছু ভিন্ন করবার, কোন কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি এর নাই।

এবারে ধারাল আলো দেখা দিয়েছে, কেটে-কেটে আলো ছায়া ভিন্ন করে দিচ্ছে। এ সেই মেঘের বুকে নেতিয়ে-পড়া এলান আলো নয়। এ একেবারে তরতরে আলো, শাণ দেওয়া ঝক্‌ঝকে তলওয়ারের মত লিক্‌লিক্ করে কাঁপছে। যেখানে গিয়ে তার কিরণ স্পর্শ করছে, সেখানে এতটুকুও কোন কালিমার অস্তিত্ব আর তিষ্ঠতে পারছে না। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি যদি থাকৃত, তা'হলে তার শুভ্র উজ্জ্বল তরলতাকে ভোগ করে, কেটে-কেটে, শূন্য আকাশের গায়ে সাত-রংএর মীণার কাজকরা ভূষণ পরিয়ে দিতে পারত।

আজ সকালের আকাশে কি চমৎকার রংএর লীলা প্রকাশিত হয়েছিল। সবুজে নীলের গায়ে ছেয়ে—বেগুনি, তারি উপরে ঢেউ খেলান, আগুনের মত রাঙা। আমি প্রথম চোখ খুলে দেখে ভুলেই গিয়েছিলাম, কোথায় আছি! তারপর আলো যখন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌তে লাগল, তখন আস্তে-আস্তে সব রং মিলিয়ে গেল। এখন তো নিস্পন্দ ধূসর আকাশের নীচে, নিস্তব্ধ ঘনশ্যাম স্তম্ভিত বনশ্রেণী স্থির হয়ে আছে। কোথাও কোন শব্দ, কোন চাঞ্চল্য নাই।

বসে-বসে আকাশই দেখি। কেমন করে সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল নীল আকাশকে ধূসর মেঘ এসে গ্রাস করে বসে, মেঘের ভিজে নেতা দিয়ে সব আলো মুছে নেয়। চারিদিকে রেখার বৃত্তে রংয়ের যে আল্‌পনা ছিল, কিছুই আর দেখা যায় না। শুধু দেখতে পাই, ম্লানমুখ ধরণী, আর তার আর্দ্র ঘন সমান সবুজবর্ণের পট্টাম্বরখানি। বাতাস যদি ওঠে, তবেই বৈচিত্র্যের দেখা পাওয়া যায়। তা না হলে, শুধুই আকাশের ধূসর ওড়না, আর মাটীর সবুজ শাড়ী।

আলো ফুটেছে। ধূসর মেঘ তুলোর মত সাদা হয়েছে, চারিদিকে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে খানিকটা করে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাস উঠেছে; গাছপালা দুল্‌ছে। আর শুধুই নিছক ধূসর, আর নিবিড় সবুজ নাই। বর্ণের মধ্যে বিভিন্নতার সঞ্চার হয়েছে, তারতম্য প্রকাশ পাচ্ছে।

আজ বৃষ্টি-বাদল নাই। মেঘ আছে, তাও হাল্কা; আলোকে আড়াল কর্‌তে পারছে না। ঘাসের উপর, আর ঘাসের-রংএর জলের উপর আলো-ছায়ার খেলা চলেছে। বাতাস এম্নি আস্তে চলেছে, যে গাছের ডাল-পালা নাড়া দিয়ে মর্ম্মর শব্দ জাগাতে পারছে না। শুধু ঘুঘু কেবল ডাক্‌ছে। বাতাস যখন জোরে চলে, তখন তার চলার দাপটে তাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই; ডালপালা দোলে, জল ওঠে, পড়ে; আমরা বুঝি, পবনদেব বায়ুসেবনে বাহির হয়েছেন, বিশ্বভুবন তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছে, স্বাগত জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। আবার বাতাস যখন লঘুগতিতে সৌখীন ফুলবাবুটির মত চলেন, তখন দোদুল উত্তরীয়ের মৃদুস্পর্শে আর মধুসুগন্ধে তাঁর শুভাগমন জ্ঞাপন করে যান। আজ বাতাসের গতি বড় সৌখীন!

রুদ্র আর সুকুমার দুই ভাবেই বাতাসকে জান্‌তে আনন্দ হয়। প্রলয় মূর্ত্তিতে, হুহুঙ্কার করে, "মেঘের জটা উড়িয়ে" যখন সে ছুটে আসে, যখন বনের অগণ্য বৃক্ষরাজি, অযুত উদ্যত শাখা, কোটি কোটি পত্রাবলি করজোড়ে কেবলি বলে, "সংহর প্রভো, ক্রোধ সংহর"; যখন পল্বল, সরসী, দীর্ঘিকা, হ্রদ, তড়াগ, উৎস, নদী, সমুদ্রের জল পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে আছড়ে পড়ে বলে "পরিত্রাহি, পরিত্রাহি"; যখন সমস্ত দিগন্ত-ছাওয়া নিবিড় কালো মেঘ, উদ্‌ভ্রান্ত মাতঙ্গযূথের মত গর্জ্জন করতে-করতে ব্যাকুল শুণ্ড উত্তোলন করে চারিদিকে প্রধাবিত হয়, তাদের গণ্ড ভেদ করে মদধারা বৃষ্টিপ্রবাহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করে,

বিদ্যুতের বৈজয়ন্তী ছিন্নবিছিন্ন হয়ে দশদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন সে বিরাট অভিনয়, সেই প্রবল প্রলয়-তাণ্ডব দেখে মন যে সব-পথ-ভোলান, অতীত-লোপ-করা, অপার অপূর্ব্ব আনন্দের স্বাদ লাভ করে, দেহ-পঞ্জর ভগ্ন, চূর্ণ, ধূলিসাৎ করে, স্বাধীনতা-প্রয়াসী প্রাণ যে ব্যাকুল আবেগে পরিপূর্ণ হয়, সে অনুভূতির সঙ্গে কিছুরি তুলনা করা কঠিন। কাল-বৈশাখীর সময় পবনের এই ভীম মূর্ত্তি কখনো-কখনো আমরা দেখ্‌তে পাই। আর সৌখীন মূর্ত্তিটি মূর্ত্তিমান বসন্ত-রাগের মত আমরা দেখি ফাল্গুনের প্রথমে, আর শরৎ যখন পীত রৌদ্রের স্মিত-হাস্যে উত্তর বাতাসের সুখ-শীতল উত্তরীয়-স্পর্শে আমাদের মুগ্ধ করে সরে আস্‌বার আয়োজন করছে।

আজ মেঘও আছে, সূর্য্যও আছেন; মেঘবাহন আর অরুণবাহনে রেশা-রেশি চলেছে—কে কতখানি আকাশ অধিকার করে নিতে পারেন। অনেকবার মেঘেদেরই জয় হচ্ছে; কেন না, তারা সূর্য্যের অনেক নীচে আছে। যখন তারা জমাট দল বেঁধে দাঁড়াচ্ছে, তখন সহস্র-রশ্মি অজস্র তীর-বর্ষণ করেও তাদের ভেদ করতে পারছেন না। আলোর নীচে অন্ধকারই রাজত্ব করছে। কিন্তু বাতাস একবার উঠলে হয়। তখনি মেঘরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় কে পালাচ্ছে, তার আর দিক-বিদিক জ্ঞানই থাকচে না। তখন সূর্য্যদেব চারিদিকে নির্ম্মল প্রসন্ন আলোক বিস্তার করে দিয়ে হতাশ্বাস মেঘরাশিকে বলছেন,—'যাও, তোমরা; অবাধ আকাশের পথে আমার আলোকের আশীর্ব্বাদ ললাটে ধারণ করে—যাত্রা তোমাদের শুভ হোক।'

কবীর-কসৌটী

[শ্রীযামিনীকান্ত সোম]

মহরম হোয় সো জানৈ সাধো
ঐসা দেস হমারা॥
বেদ কতেব পার নহিঁ পাবত
কহন সুননসোঁ ন্যারা।
জাতি বরন কুল কিরিয়া নাহীঁ
সন্ধ্যা, নেম অচারা॥
বিন জলে বূঁদ পড়ত জহঁ ভারী
নহিঁ মীঠা নহিঁ খারা।
সুন্ন মহল মেঁ নৌবত বাজে
মৃগঙ্গ বীন সিতারা॥
বিন বাদর জহঁ বিজলী চমকৈ
বিন সূরজ উঁজিয়ারা।
বিনা নৈন জহঁ মোতী পোহৈ
বিন সুর শব্দ উচারা॥
জো চল জায় ব্রহ্ম জহঁ দরসৈ
আগে অগম অপ্সরা।
কহৈঁ কবীর বহঁ রহন হমারী
বূঝৈ গুরমুখ প্যারা॥

গুপ্তভেদীর গোচর শুধু, এমনিধারা আমার দেশ।
বেদ-কোরাণে অন্ত না পায়, বাক্য-শ্রবণ পায় না শেষ॥
বর্ণ বা কুল নাইক সেথা, নাইক সেথা জাতির বিচার।
ক্রিয়া করম নাইক সেথা, সন্ধ্যা, নিয়ম, বিধি, আচার॥
জল ধারা নাইক, তবু ঝরছে বারি অবিরত।
অপূর্ব্ব সে মুক্তধারা নয় ক মধুর নয় ক তিত॥
শূন্যমহল ঝুলছে, যথা নহবতের বাদ্য বাজে।
ঝঙ্কারিছে বীণা, সেতার, মৃদং যেথা সদা গাজে॥
চমকিছে তড়িৎ-ছটা বিনামেঘে অবিরাম।
সূর্য্য বিনা উজ্জ্বল সেই রমণীয় দিব্যধাম॥
নয়ন বিনা দৃষ্টি তথায়, শব্দ বিনা মধুর রব।
ব্রহ্ম যথায় বিরাজিত অগম, অপার, ব্রহ্ম সব॥
কবীর বলেন রহি হেথা, এই ত হ'ল আমার স্থান।
বুঝতে পারে দরদী যে— বুঝতে পারে প্রেমিক জন॥

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

(২)

"মনের মাঝে সবার সেরা মন্দির থাকতে থাড়া
তন্দ্রা-আতুর পূজক কেন বাইরে মাথা খোঁড়া" ?

তুমি একটি ঘড়ি ক্রয় করিলে। যখন তুমি ঘড়িটি ক্রয় করিলে, তখন উহা বেশ চলিতেছিল; কিন্তু আজ উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘড়ির যন্ত্রসম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। ঘড়ি কিরূপে নির্ম্মিত, তাহা তুমি জান না। কেনই বা উহা এতক্ষণ চলিতেছিল, আবার কেনই বা বন্ধ হইয়া গেল, তাহাও তুমি জান না। তুমি ঘড়িটি চালাইবার জন্য চেষ্টা করিলে। তোমার চেষ্টা বিফল হইল। হয় ত ঘড়িটি একবারে নষ্ট হইয়া গেল। তোমার মনে তখন বড়ই দুঃখ হইল। কিন্তু তুমি যদি জানিতে, ঘড়িতে কেমন করিয়া দম দিতে হয়, তাহা হইলে ঘড়িটি আবার চালাইতে পারিতে; তোমার জিনিষটি অত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইত না। আবার, যদি তুমি ঘড়ির যন্ত্রাবলির বিষয় জানিতে; কোন্ যন্ত্রটির সাহায্যে কোন্ ক্রিয়া হইতেছে, যন্ত্রগুলি কিরূপ-ভাবে সজ্জিত, কেমন করিয়া একটি আর একটির সহায়তা করিতেছে—ইত্যাদি জ্ঞান যদি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঘড়ির আরও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতে। ইহা আরও অধিক দিন স্থায়ী হইত। নষ্ট হইলেও তোমাকে কোন বিশেষজ্ঞের আশ্রয় লইতে হইত না। তুমি নিজেই উহার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিতে।

আমরা প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্রের পরিচালক। এ যন্ত্রটি ঘড়ি কিংবা অন্য কোন যন্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। এ যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালী আমরা জানি বা না জানি, যন্ত্রটিকে আমরা অহরহঃ চালাইতেছি। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইহা অনেক পরিমাণে আপনা-আপনি চলিতেছে। বিশেষ মনোযোগের অভাব হইলেও ইহার ক্রিয়া বন্ধ হয় না। আমাদের অজ্ঞাতসারেও ইহা ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাহা হইলেও, যন্ত্রটিকে যদি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে না রাখা যায়, তবে ইহা বিকল হইতে পারে এবং বিপথগামী হইয়া অনেক বিপদের সৃষ্টি করিতে পারে। এই যন্ত্রটি আমাদের মন। ইহাকে সুপরিচালিত করিতে হইলে, ইহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া আবশ্যক।

"মনের কুহু,—মনের কেকা, অনাদি তার মূর্চ্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।"

আমি এখন মনোবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা লিখিতেছি; কিন্তু এ সময় আমার গোলাপ ফুলের কথা মনে হইল কেন? সম্মুখে ত আমি গোলাপ ফুল দেখিতেছি না; তবে গোলাপের কথা আমার মনে হয় কেন? ইহা এতক্ষণ কোথায় ছিল? ইহা কোথা হইতে আসিতেছে? কোন্ শক্তি ইহাকে আকর্ষণ করিল? ইহা কি আপনা-আপনি আমার মনে উদয় হইল? মানুষের মন একটি ক্রীড়াক্ষেত্র। এখানে কত ভাবের, কত চিন্তার, কত ইচ্ছার উদয় হইতেছে, আবার লয় হইতেছে। ইহাদের অনেকেই আপনা-আপনি আসিতেছে, আবার আপনা-আপনি যাইতেছে।

ইহাদের উন্মেষ, বিকাশ এবং লয়, কোনটিই অকারণ সম্ভূত নহে, কোনটিই নিয়ম-বহির্ভূত নহে। আমরা যদি এই সকল কারণ, এই সকল নিয়ম অবগত হই, তাহা হইলে আমাদের কত সুবিধা হয়! মনোরাজ্যে যেখানে বিশৃঙ্খলা, সেখানে শৃঙ্খলা আনিতে পারি; যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, সেখানে শান্তিস্থাপন করিতে পারি। তুমি পাঠাগারে বসিয়া পাঠ-অভ্যাস করিতেছ, এমন সময়ে, তোমার চাকরের প্রয়োজন হইল। তুমি একবার দুইবার, বারংবার ঘণ্টাধ্বনি করিলে; কিন্তু তোমার নিকট একটি চাকরও আসিল না। কেন তোমার নিকট কোন চাকর আসিতেছে না, ইহা তোমার জানা উচিত নয় কি? তোমার মন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তুমি কোন একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তোমার শত

চেষ্টা সত্ত্বেও মীমাংসার সাহায্যকারী কোন চিন্তারই উদয় হইতেছে না—পরন্তু অনেক অবান্তর ভাবের উদয় হইতেছে। কেন এমন হইতেছে? কেন তুমি তোমার মনকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে অক্ষম?

আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাগণকে জ্ঞান-উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকি। শিক্ষক মহাশয়েরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু চেষ্টানুরূপ ফল হয় না কেন? শিক্ষার্থীদের কত শক্তির অপব্যবহার হইতেছে, কত উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে। মনের গঠন সম্বন্ধে—বিশেষতঃ শিশুদের মনের গঠন সম্বন্ধে—শিক্ষকদের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অপচয় এবং অপব্যবহারের কারণ। আমার দান করিবার ক্ষমতা আছে—আমি তোমাকে দান করিতে পারি, সত্য; কিন্তু তুমি দানের প্রকৃত পাত্র কি না, তাহা আমার জানা উচিত নয় কি? তোমার কোন্ জিনিষের অভাব এবং এই অভাবের মাত্রা কতটুকু,--ইহা কি আমার জানা উচিত নয়? তোমার অভাব থাকিতে পারে; কিন্তু কি উপায়ে তোমার অভাব পূরণ করিলে তোমার বাস্তবিক উপকার হইবে, আমার তাহা জানা উচিত। বিদ্যাদান শিক্ষকের কর্ত্তব্য, কিন্তু দান করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার ক্ষমতা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। যেখানে সেখানে বীজ বপন করিলে, সে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। পৃথক-পৃথক বীজের পৃথক-পৃথক ক্ষেত্র; সুতরাং ক্ষেত্র বুঝিয়া বীজ বপন করা উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই যে সে বীজের পূর্ণ-বিকাশ হইবে, এমনও নহে। জল, বাতাস এবং উত্তাপের সাহায্যে ইহার বিকাশের সহায়তা করিতে হইবে এবং, আরও দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি যেন কমিয়া না যায়;—বরং যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিদ্যার ক্ষেত্র মন। সকলেরই মন একপ্রকার নহে; সুতরাং সকলেই এক বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে না। শিক্ষককে ক্ষেত্র বাছিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্র-বিশেষে বীজ বপন করিতে হইবে; উপ্ত বীজের স্ফূরণে সহায়তা করিতে হইবে। মনের স্ফূর্ত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু এই সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, মন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

মানুষ পদে-পদে ভুল করিতেছে। কিন্তু এ ভুলের মূল কি? তুমি তোমার অন্তঃপ্রকৃতির বিষয় কিছুই জান না; তুমি তোমার মনের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বিষয় অনুধাবন করিতে চেষ্টা কর নাই। সেই জন্য তোমার এত ভ্রান্তি; সেই জন্য আত্মশক্তি-বোধ-বিমূঢ় হইয়া মোহান্ধকারে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছ। তুমি যাহা তোমার পক্ষে ভাল মনে করিয়াছিলে, এখন তাহা মন্দে পরিণত হইল; তুমি যাহা মন্দ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, তাহাই তোমার পক্ষে মঙ্গলকর ছিল। এইরূপে না তুমি কতবার—

"যে প্রদীপ আলো দিবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ"।

তুমি যাহাকে শত্রু মনে করিতেছ, হয় ত সে তোমার পরম মিত্র; এবং যাহাকে মিত্র মনে করিতেছ, হয় ত সে তোমার শত্রু। তুমি উপযুক্ত হইয়াও নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করিতেছ; আবার কখনও বা অনুপযুক্ত হইয়াও নিজেকে উপযুক্ত মনে করিতেছ। এইরূপে নিজের নিরয়ের পথ নিজেই পরিষ্কার করিতেছ। তুমি তোমার ঘরের সংবাদ রাখ না বলিয়াই তোমার এত প্রমাদ। তুমি তোমার নিজের মনের ভাষা বুঝিতে পার না; তাই তোমার এত বিড়ম্বনা, তাই তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির করিতে পার না। যদি তুমি তোমার ইচ্ছাবৃত্তিকে সংযত করিতে চাও, যদি জীবনকে উপযুক্ত কর্ত্তব্যপথে চালাইয়া সুখী হইতে চাও, তবে নিজের মনকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর। মনের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তখন তুমি তোমার মনের উপর আধিপত্য গ্রহণ করিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে—কোন্ পথ তোমার অবলম্বনীয় এবং কোন্ পথ পরিহার্য্য। গন্তব্য পথ স্থির হইলে, প্রলোভন সহজেই পরাভূত হইবে, প্রমাদ অন্তর্হিত হইবে, বাসনার তৃপ্তি হইবে, এবং কৃতকার্য্যতা পুরস্কার হইবে।

মনোবিজ্ঞান

"মনোবিজ্ঞান" কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে "মন" এবং "বিজ্ঞান" এই দুইটি বিষয়ের পৃথক আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ মন বলিতে আমরা কি বুঝি?

তুমি যখন কোন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হও, তখন তোমার মনে একটি ভাবের উদয় হয়; তোমার মন তখন অবস্থা-

স্তর প্রাপ্ত হয়। তুমি এই ভাবকে, মনের এই অবস্থাকে সুখ বল। আবার তুমি যখন তোমার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে, তখন তোমার মনে অন্য ভাবের উদয় হইল, তোমার মনের অবস্থা আর এক প্রকার হইয়া গেল। তুমি এই ভাবকে, মনের এই অবস্থাকে, দুঃখ বল। সুখ এবং দুঃখ মনের অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থাবিশেষের নাম অনুভূতি। মনের আরও একটি অবস্থা আছে। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রথমোক্ত অবস্থাটি সুখ এবং দ্বিতীয়টি দুঃখ। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক। এই প্রকারে, আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, তখনই আমি সেই ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি। একটি অবস্থা অন্য অবস্থা হইতে পৃথক, এ জ্ঞানও আমার হইতেছে। শোককে শান্তি বলিয়া, ভয়কে ভালবাসা বলিয়া, দ্বেষকে দয়া বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, স্বার্থকে সহানুভূতি বলিয়া আমার ভুল হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের বিবিধ অবস্থার পার্থক্য-জ্ঞান আমার আছে। এই পার্থক্য-জ্ঞানের নাম চিন্তা। মনের আরও একটি অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুখকর বস্তু অর্জ্জনে এবং দুঃখকর বস্তু বর্জ্জনে তুমি প্রয়াস পাও। প্রয়াসে শক্তির প্রয়োজন। তোমার মন এ শক্তি-প্রয়োগে সমর্থ। একটি গোলাপ ফুল দেখিলে, এবং হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক সেটিকে গ্রহণ করিলে। অদূরে একটি সর্প দেখিলে এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিলে। হস্ত-সঞ্চালনে এবং পদ-ক্ষেপণে শক্তির প্রয়োজন। মনই এ শক্তির নিয়ন্তা। প্রলোভনকে পরাজয় করিতে, রিপুর দৌরাত্ম্য দমন করিতে, স্বার্থের চিন্তা নির্ম্মূল করিতে, পরহিতব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে, সুন্দর, সৌম্য, শুদ্ধ আদর্শের, অনুসরণ করিতে - মানসিক শক্তির প্রয়োজন। এইরূপ সংযমনে, এইরূপ আত্ম-সম্বরণে, এইরূপ মহাসাধনায় মহাশক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির নাম ইচ্ছা। অতএব, প্রধানতঃ মনের এই তিনটি অবস্থা—একটি ভাবের অবস্থা, একটি জ্ঞানের অবস্থা এবং আর একটি শক্তি বা ক্রিয়ার অবস্থা। মনের সুখ-দুঃখের অবস্থা অনুভূতি; মনের বিবিধ অবস্থার পার্থক্য-জ্ঞান ভাবনা বা চিন্তা। মনের ক্রিয়াশক্তির নাম ইচ্ছা। মনের যাবতীয় অবস্থাকে এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি অনুভূতির অন্তর্গত। ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, মনন ইত্যাদি ভাবনার অন্তর্গত। বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায় ইত্যাদি ইচ্ছার অন্তর্গত।

অনুভূতি, ভাবনা এবং ইচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক অবস্থা-নিচয়ের সমষ্টির নাম 'মন' বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে কত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং হইতেছে; কত চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল এবং হইতেছে; কত প্রকারের ইচ্ছা করিয়াছি এবং করিতেছি। এইরূপে কত ভাব-ভাবনার আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইতেছে। এখন যাহা অন্তর্হিত মনে করিতেছি, তাহার পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব নহে। এখন যাহা বিস্মৃত হইয়াছি মনে হইতেছে, পুনরায় তাহা স্মৃতিপটে উদিত হইতে পারে। অতএব মন বলিতে কেবল বর্ত্তমান অবস্থা বুঝায় না, অতীত অবস্থাও বুঝায়। অতীত এবং বর্ত্তমান যাবতীয় মানসিক অবস্থা-সমষ্টির নাম মন।

কিন্তু মনের এমন অর্থ করিলে যেন মনের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইল না, মনে হইতেছে। বস্তু ব্যতীত বর্ণ থাকিতে পারে না; অবস্থাও থাকিতে পারে না। অনুভূতি, ভাবনা, ইচ্ছা ইহারা অবস্থা মাত্র। কিন্তু কিসের অবস্থা? যেখানে অনুভূতি আছে, ভাবনা আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে এমন "কিছু" আছে যাহা অনুভব করে, ভাবনা করে, ইচ্ছা করে। অবস্থার অন্তরালে কিছু আছে বলিয়াই অবস্থার স্থিতি সম্ভব। এই "কিছু"টি বাদ দাও, অবস্থাও বাদ পড়িবে। মানসিক অবস্থাও কোন "কিছুর" অবস্থা। সুতরাং মানসিক অবস্থা-সমষ্টিকে মন না বলিয়া, ইহারা যাহার অবস্থা তাহাকেই মন বলা উচিত। আমি অনুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি, ইচ্ছা করিতে পারি। আমার 'যাহা' অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, তাহাই মন। ইচ্ছা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের ব্যাপারে 'যাহার' প্রকাশ হয়, তাহাই মন।

বস্তু ব্যতীত যেমন অবস্থা থাকিতে পারে না, তেমনি অবস্থা ব্যতীত বস্তুও থাকিতে পারে না। অবস্থাতেই বস্তুর বিকাশ এবং প্রকাশ হয়; এবং বস্তুই অবস্থার আধার, বস্তুই বিবিধ অবস্থার সামঞ্জস্য এবং সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুতরাং মন বলিতে "অবস্থা" এবং "বস্তু" দুই-ই বুঝিতে হইবে। "বস্তু" এবং "অবস্থা" একই জিনিষের দুই দিক মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দুইটি অর্থই অসম্পূর্ণ; কিন্তু একত্র দুইটিই আবার সম্পূর্ণ। সুতরাং যাবতীয় মানসিক ব্যাপার এবং এই ব্যাপারে যাহার প্রকাশ হয়, তাহাই মন।

এখন দেখা যাউক, "বিজ্ঞান" কাহাকে বলে। বহু দূরে একটি পদার্থ দেখিতেছি। পদার্থটি সচল বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে, ইহা ক্রমশঃ আমাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। প্রথমতঃ বুঝিতে পারিলাম না, পদার্থটি সজীব কি নির্জীব। কিয়ৎক্ষণ পরে যাহা হউক ঠিক করিলাম যে, এটি সজীব পদার্থ; কিন্তু এখনও বলিতে পারি না, ইহা পশু কি মানুষ। পরে যখন ইহা আরও নিকটবর্ত্তী হইল, তখন বুঝিলাম যে, ইহা একটি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ, অবশেষে স্থির করিলাম যে এই চতুষ্পদ জন্তুটি অশ্ব। অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, সংশয় সত্যে পরিণত হইল। এই প্রকারেই জ্ঞানের বিকাশ এবং বিস্তৃতি হয়। কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই এই একই প্রণালীতে জ্ঞানোন্মেষ হয়। প্রথমতঃ, আমাদের জ্ঞান অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অসংলগ্ন এবং সঙ্কীর্ণ থাকে; এবং যতই আমাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদের জ্ঞান পরিস্ফুট, স্পষ্ট, সুশৃঙ্খল এবং বিস্তৃত হয়। সকলেই জানেন, জল একপ্রকার তরল পদার্থ এবং ইহাদ্বারা আমাদের তৃষ্ণার শান্তি হয়। কিন্তু এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান, সম্যক জ্ঞান নহে। জল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানিতে হইবে জলের উপাদান কি? কোন্ উপাদানটির পরিমাণ কি? কোন্ উপাদানটির কি কার্য্য? যখন অভিজ্ঞতার সাহায্যে জলসম্বন্ধে এই তিন প্রকার জ্ঞানলাভে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের জ্ঞান সম্যক হইল। এই সম্যক জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলে। কোন জিনিষের "মোটামুটি" জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না; কিন্তু ঐ জ্ঞান যখন পরিবর্দ্ধিত এবং পরিমার্জ্জিত হয়, তখনই বিজ্ঞানে পরিণত হয়। একজন ভাস্কর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ-মানসে একখণ্ড প্রস্তর-ফলক লইয়া কল্পিত মূর্ত্তির আয়তন অনুসারে প্রস্তরখানি অস্ত্রের সাহায্যে গঠনোপযোগী করিল। এখন এই প্রস্তর-ফলকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কল্পিত মূর্ত্তির আভাষমাত্র মনে হয়। এখন কোন অঙ্গই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। পরে ভাস্কর একটি-একটি করিয়া সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই ফুটাইয়া তুলিল—যেখানে যেটি যেমনভাবে আবশ্যক, তেমনি করিয়াই গঠন করিল। এখন তুমি আর-একবার ঐ প্রস্তরফলকে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, বুঝিবে, এটি কোন্ মূর্ত্তি এবং কেমন মূর্ত্তি। আমাদের অনেক জিনিষেরই আভাষ-জ্ঞান আছে, কিন্তু এরূপ আভাষ-জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না। কোন জিনিষের বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ঐ প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সেই জিনিষের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক উপাদানের বিষয় জানিতে হইবে; এবং আরও জানিতে হইবে, ঐ উপাদানগুলি কেমনভাবে সজ্জিত এবং কি নিয়মে সমন্বিত। প্রস্তর মূর্ত্তির অঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ যদি না দেখা যায়, তবে মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তেমনি, কোন বস্তুর প্রত্যেক অংশের কেবল পৃথক-পৃথক জ্ঞান লাভ করিলেই হইবে না, কেমনভাবে সেই সকল অংশের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, ইহাও দেখিতে হইবে। বস্তুবিশেষের উপাদান-নির্ণয়, উপাদানাবলির কার্য্য-নির্ণয় এবং তাহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ—বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রয়াস

[শ্রীগণেশচন্দ্র রায়]

আজিকে পরাণ ভ'রে কাঁদিব কেবল;—
আঁখিতে হৃদয়খানি করে টলমল্!
যে গান মরিয়া গেছে, যে হাসি শুকা'য়ে
বেদনার অশ্রুজলে তুলিব জাগা'য়ে।
তুমি যদি থাক শুধু দাঁড়া'য়ে অদূরে
প্রসন্ন নয়নপ্রান্তে চাহিয়া মধুরে,
অশ্রুজলে হৃদিখানি গ'লে গিয়া হায়
ভরিয়া উঠিবে চিত্ত আনন্দ-আভায়!
নয়ন-সলিল-ভরা হৃদয়-সরসে
ফুটিবে একটি পদ্ম মধুর-হরষে;
তোমারি চরণ-পদ্ম-পরশ লাগিয়া
মেলিয়া প্রশান্ত দল রহিবে জাগিয়া।
বেদনা-করুণ অশ্রু-ভরা আঁখি দু'টি
আনন্দ-উজ্জ্বল হাস্যে উঠিবে গো ফুটি

হিমাচলের অপর পার

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ]

(১) চীনের রাজবংশ

চীনে আজকাল (১৯১৬ খৃঃ-অঃ) রাজরাজড়া নাই। প্রজারাই দেশ-শাসন করে। অর্থাৎ লোকেরা স্বয়ংই এক-সঙ্গে রাজা ও প্রজা। যখন ইহারা দল বাঁধিয়া আইন করিতে বসে, তখন ইহাদিগকে রাজা বলিতে পারি। আর যখন দল ছাড়িয়া ইহারা ঘরে আসিয়া বসে, তখন ইহাদিগকে প্রজা বলিতে পারি। এখানে প্রত্যেক লোক নিজেই নিজের রাজা; আবার নিজেই নিজের প্রজা। এই ধরণের দেশ বা সমাজ-শাসনকে জনগণের "স্বরাজ" বলা চলে। ইংরাজিতে "রিপাব্লিক" শব্দ প্রচলিত। সাধারণতঃ গণ-তন্ত্র বা প্রজা-তন্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই ধরণের গণ-তন্ত্র বা স্বরাজ য়ুরোপে আছে মাত্র দুই দেশে—ফ্রান্সে এবং সুইজর্ল্যাণ্ডে। আর আমেরিকা-খণ্ডেরও সকল দেশেই লোকেরা একসঙ্গে রাজা ও প্রজা। এই দেশসমূহের সংখ্যা বিশ। তাহার মধ্যে উত্তর-আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল ও চিলি এই চারি দেশ প্রসিদ্ধ। উত্তর-আমেরিকার ক্যানাডা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ—তাহার শাসন-প্রণালী স্বতন্ত্র।

পৃথিবীতে গণ-তন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়, উত্তর-আমেরিকার ইয়াঙ্কি সমাজে (১৭৮৫ খৃ-অঃ)। তাহার কয়েক বৎসর পরে ফরাসী-সমাজে এই শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (১৭৮৯ খৃঃ অঃ)। আজকাল গণ-তন্ত্র, স্বরাজ বা প্রজা-তন্ত্রের কথা উঠিলে, আমরা সর্ব্বপ্রথমেই ইয়াঙ্কি যুক্ত রাষ্ট্র এবং ফরাসী রিপাব্লিকের কথা মনে আনি। এই দুই দেশেও রিপাব্লিকপ্রথা বহুকাল গণ্ড-গোলের ভিতর চালিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এই প্রথা দুই সমাজেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয় এবং ইয়াঙ্কি-স্থানেও গৃহ-বিবাদের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

এই ৪৬ বৎসর কাল স্বরাজ-প্রথা জগতে নির্ব্বিবাদে টিকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু খাঁটি ঐতিহাসিকভাবে কথা বলিতে হইলে বলিব যে, স্বরাজ-প্রথা আরও প্রাচীন। কেন না, য়ুরোপের সুইজর্ল্যাণ্ড আজকালকার দেশ নয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুইসরা প্রবলপ্রতাপ অষ্ট্রীয়ান সম্রাটকে পরাজিত করে (১৩১৫)। তখন হইতে সুইজর্ল্যাণ্ড একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়েষ্টফেলিয়া সহরে (১৬৪৮) এক বিরাট য়ুরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে সুইস্ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই সুইস-সমাজে গণ-তন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং স্বরাজ আজ ঠিক ছয়শত বৎসরের প্রাচীন শাসন-প্রণালী।

কিন্তু সুইজর্ল্যাণ্ড অতি নগণ্য রাষ্ট্র। কতকগুলি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া য়ুরোপের প্রবল রাষ্ট্রপুঞ্জ মুরুব্বির ন্যায় সুইজর্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। য়ুরোপের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে সুইস রাষ্ট্র যোগ দিতে আইনতঃ অপারগ। আবার য়ুরোপের কোন রাষ্ট্রও সুইজর্ল্যাণ্ড আক্রমণ করিবেন না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ আছে। সুইজর্ল্যাণ্ডের মত আইনরক্ষিত, অভিভাবক-প্রতিপালিত রাষ্ট্রকে "নিউট্র্যা-লাইজড্" বা চির-উদাসীনীকৃত রাষ্ট্র বলে। এই জন্য সুইজর্ল্যাণ্ডের নাম বেশী শুনিতে পাই না। এই কারণেই স্বরাজ-প্রথা সুইসদিগের আবিষ্কাররূপে জগতে রটিতে পারে নাই। এই শাসন-প্রণালী ইয়াঙ্কি-ফরাসীদেরই "পেটেণ্ট" বা মার্কা-মারা ভাবে বাজারে চলিতেছে।

চীনারা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই ইয়াঙ্কি-ফরাসী মাল স্বদেশে আমদানি করিয়াছে। সেই সময়ে চীনে রাজ-তন্ত্র বা "মণার্কি" ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।' চীনা-রাজতন্ত্রের সমান

প্রাচীন ও দীর্ঘজীবী রাজতন্ত্র জগতে আর ছিল না। অন্ততঃ চারিহাজার বৎসর ধরিয়া রাজতন্ত্র চীনে চলিয়া আসিয়াছে। চীনা-রাজতন্ত্রের নামডাকও খুব বেশীই ছিল। ভারতবর্ষে আমরা অনেক সময়ে কথার কথা বলিয়া থাকি, সম্রাট্ ত সম্রাট্—রুশ সম্রাট্! সেইরূপ সম্রাটের পরের সম্রাট্—চীন-সম্রাট্! আজ চারিবৎসর ধরিয়া সেই চীন-সম্রাটের সিংহাসন খালি—চীনের রাজমুকুট মাথায় দিবার কোন লোক নাই!—অথচ রাজতক্তে বসিবার উপযুক্ত রাজপুত্র সশরীরে চীনের বড় সহরেই বিদ্যমান! ইহা একটা ঘোর বিপ্লব নহে কি? কোথায় চীনেশ্বরের অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা উঠিবে বসিবে—না, তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি, পাঞ্চয়তীর বৈঠক, আর বারোয়ারিতলার শাসন! এই কিম্ভূত-কিমাকার বারোয়ারি-শাসন বা স্বরাজ-প্রথার যুগটাকে আমাদের পারিভাষিক শব্দে "কল্কী যুগ" বলিতে পারি। চীনে কলিযুগের পর একটা মস্ত যুগান্তর হইয়া গেল বলিলে অন্যায় হইবে কি?

চারিহাজার বৎসরের রাজ-রাজড়াদের নাম মনে রাখা ভয়ানক কথা। রাজবংশগুলির সংখ্যাই ছোটয়-বড়য় প্রায় ত্রিশ। সর্ব্বপ্রথম চীনা নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০৫ সালে রাজা হন। অত প্রাচীন সন, তারিখ ভারতীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা মহাবীর ও শাক্যসিংহের সমসাময়িক শিশুনাগবংশীয় রাজা বিম্বিসারের তারিখ পাই ৫৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। এই সময় হইতে পশ্চাতে ঠেলিয়া বড় জোর ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় সন, তারিখের সীমানা পাইতে পারি। মৎস্যপুরাণের হিসাব-অনুসারে বোধ হয় সেই সময়ে শিশুনাগবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনাসম্বন্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু চীনা ইতিহাসে তাহার পূর্ব্বেকার অন্ততঃ ১৬০০ বৎসরের প্রমাণ বা প্রমাণাভাষ পাওয়া যায়। এমন কি, তাহারও পূর্ব্বেকার ৬০০ বৎসরের কথা সন, তারিখ সমন্বিতভাবে প্রচারিত হইতে পারে। চীনা ইতিহাসের সর্ব্বপুরাতন বা সর্ব্বপ্রথম বর্ষ ২৮৫২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। এই বৎসর ফু-হি (Fuh-hi) রাজা হইয়া ১১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব খৃষ্টান বাইবেলপ্রসিদ্ধ "ডেলিউজ" বা "মহা-প্লাবনে"র (খৃঃ পূঃ ৩১৫৫) ৩০৩ বৎসর পরে প্রাচীনতম চীনা আমলের খুঁটি ফেলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলিতেন, মহা-ভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ৩১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের পরে ফু হির রাজ্যলাভ। এই হিসাব সত্য হইলে, চীনা সন-তারিখের সীমানা মিশরীয় সন-তারিখের সীমানা হইতে নবীনতর। কারণ, মিশরীয় ইতিহাসের প্রথম খুঁটি ৪০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ; আর তদপেক্ষাও প্রাচীন তথ্য মিশরীয় কাহিনীতে পাওয়া যায়।

এই ত গেল সন-তারিখওয়ালা ইতিহাসের সীমানা। এই পর্য্যন্ত অকাট্য প্রমাণ আছে। অথবা চলনসই প্রমাণ বা অনুমান বা আন্দাজ চলিতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বেকার কথা চীনাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেগুলি মান্ধাতার আমলের কথা। বস্তুতঃ তাহাকে "সত্যযুগে"র কথা বলাই সঙ্গত।

পৃথিবীর সকল জাতিরই এই ধরণের একটা সত্যযুগ আছে। সেই যুগ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক বা আজ-গুবি গল্প প্রত্যেক নরসমাজেই প্রচলিত। গ্রীক, হিন্দু, চীনা কেহই এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়।

(ক) সত্যযুগ

আমাদের শাস্ত্র-অনুসারে কোটি কোটি বর্ষে এক-এক "কল্প" সম্পূর্ণ হয়। চীনাদের কল্পনা অতদূর পৌঁছিতে পারে নাই। চীনা সত্যযুগ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বৎসরেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই যুগের প্রধান কথা দুইটি।

(১) পান্‌-কু (Pan-Ku) চীনাদের আদি-মানব। ঠিক আমাদের অতি-বৃদ্ধ মনু। পান্‌কু হাতুড়ি-বাটালি দিয়া জগৎ গড়িয়াছেন—তাঁহার গায়ের পোকা হইতে মানব-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি আঠারহাজার বৎসর এই কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

(২) সুই-জিন (Sui-jin) অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাকে চীনাদের প্রমিথিউস বলা যাইতে পারে। বোধ হয় ইনি রন্ধন বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক।

(খ) ত্রেতাযুগ (খৃঃ পূঃ ২৮৫২ — ২২৫

ভারতীয় যুগ-বিভাগই রক্ষা করিয়া যাইতেছি। চীনা ত্রেতাযুগকে সাধারণতঃ "পঞ্চ নৃপতি"র যুগ বলা হয়। এই

যুগটা সত্যসত্যই "মান্ধাতার আমল"। চীনা-সমাজে এই আমলকে high antiquity বা মহাপ্রাচীনকাল বলা হইয়া থাকে। এই যুগে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়—বাদ্য-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়—লিপি-প্রণালী প্রচলিত হয়—তুঁতের চাষ এবং রেশম-কীট-পালন সুরু হয়—ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা প্রথম ব্যবহৃত হয় ইত্যাদি। অধিকন্তু অতি বিখ্যাত দুইজন নরপতিও এই যুগেই আবির্ভূত হন। পরবর্ত্তী কালে কন্‌ফিউশিয়াস সেই দুই ব্যক্তিকে "আদর্শ-পুরুষ" বা "নর-নারায়ণ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুগেরই মাঝামাঝি হইতে চীনের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক ছি-মা-চিয়েনের (Sze-Ma Tsien) সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৯০) সুরু হইয়াছে।

আমাদের ত্রেতাযুগ রামচন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। হিন্দুমতে আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য। কন্‌ফিউশিয়াসের দেশে দুইজন রামচন্দ্র আছেন। একজনের নাম য়াও (Yao)। আর একজনের নাম শুন্ (Shun)। আমরা জন্মিয়া অবধি মুখস্থ করি—"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।" চীনারাও জন্মিয়া অবধি য়াও ও শুন্ এই দুইজন পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির নাম জপ করে। এমন কি, চীনাভাষায় সম্পাদিত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রেও বোধ হয় প্রতিদিন অন্ততঃ একবার এই দুই নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকির হাতে রামচন্দ্র অমর হইয়াছেন, গ্রীক হোমারের হাতে ইউলিসিস অমর হইয়াছেন। সেইরূপ কন্‌ফিউশিয়াসের হাতে য়াও ও শুন্ অমর হইয়াছেন।

(গ) দ্বাপর যুগ (খৃঃ পূঃ ২২০৫—২৪৯)

এইবার দ্বাপরে আসা যাউক। রাজবংশের নামগুলি সহজে মনে রাখিবার জন্য এই যুগ-বিভাগ করা যাইতেছে। কোন অবতারের আবির্ভাব-কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(১) হিয়া (Hja) রাজবংশ (খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০৫—১৭৬৬)। এই বংশের প্রথম রাজা য়ু-(Yu) ও আর একজন "আদর্শ নরপতি।" কন্‌ফিউশিয়-সাহিত্যে য়ুকে দেব-চরিত্র-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বংশের শেষ নরপতিকে ঠিক তাহার উল্টা দেখান হইয়াছে। নরাধম বা মানবে পশুত্বের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই নাম চীনা-সমাজে আজও প্রচলিত।

(২) শাঙ্ (Shang) রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ১৭৬৬—১১২২)। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাঙ্ (Tang) কন্‌ফিউ-শিয়-সাহিত্যে ভূরি প্রশংসা পাইয়াছেন। ইনি তাঁহার স্নানাগারে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন—"নিত্য নূতন জীবন যাপন করিবে"। অর্থাৎ "প্রতিদিনই যেন কিছু-না-কিছু উন্নতি হইতে থাকে"। তাঙ্ একবার দেশের দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত ছিলেন। এমন সময়ে সাত বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৩) চাও (Chou) রাজবংশ (খৃঃ পূঃ ১১২২—২৪৯)। এই যুগের কথাকে খাঁটি ঐতিহাসিক কথা বলা চলে। এই যুগেই লাওট্‌জে এবং কন্‌ফিউশিয়াসের নিকট চীনারা শিক্ষালাভ করে। তাঁহাদের বাণীই আজ চীন-সমাজের অনুশাসন। এই দুই ধর্ম্ম-প্রচারক আমাদের মহাবীর ও শাক্যসিংহের সমসাময়িক। চাও আমলকে প্রাচীন চীনের শেষ স্তর বিবেচনা করিতে পারি। এই আমলের বৃত্তান্ত না জানিলে চীনা-সভ্যতার গোড়ার কথা অজানা থাকিবে। এই যুগের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরেই পরবর্ত্তী চীনা-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান চীনের মাথা চাও-আমলে। এইখানে দ্বাপর শেষ করিলাম।

(ঘ) কলিযুগ (খৃঃ ২৪৯—১৯১২ খৃঃ অঃ)

এই বার "কলি"—আজকালকার নর-নারীর সুপরি-চিত যুগ। এই ২১৫০ বৎসরের কথা যেন সেদিনকার কথা—অতি আধুনিক; বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না। কলিকাল পাপের যুগ নয়! কলিযুগই শ্রেষ্ঠ যুগ—কেন না, এই যুগে আমরা বাঁচিয়া আছি। আবার যখন কল্কীযুগে আমাদের জন্ম হইবে, তখন কল্কীযুগই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ যুগ হইবে। চীনে সেই কল্কীযুগ আজকাল চলিতেছে।

চীনের কলিযুগে ২৩।২৪টা রাজবংশ চীনেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই সমুদয়ের মধ্যে চীনারা (১) চিন (Tsin), (২) হ্যান্ (Han), (৩) তাঙ্ (Tang), (৪) সুঙ (Sung), ও (৫) মিঙ (Ming) এই পাঁচ বংশের নামে গৌরব অনুভব করে। এই পাঁচটি নাম বিদেশীয়গণেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য। এই পাঁচ বংশ চীনের খাঁটি স্বদেশী বংশ। এই জন্যও চীনাদের বিশেষ গৌরব। মিঙ বংশের পূর্ব্বে মোগলবংশ এবং পরে মাঞ্চুবংশ রাজত্ব করে। এই

"হয়। সে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে?"

কৃষ্ণকান্তের উইল তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

Emerald Ptg. Works

দুই বংশই বিদেশী। এই দুই আমলে চীনারা বিজিত জাতি ছিল। এই কারণে চীনা-সমাজে এই দুই নামের আদর নাই। কিন্তু চীনা-রাজবংশের তালিকায় এবং চীনা সভ্যতার ইতিহাসে মোগলবংশ এবং মাঞ্চুবংশ উভয়ই প্রসিদ্ধ। ফলতঃ, চীনা-রাজবংশসমূহের মধ্যে পাঁচটা স্বদেশী এবং দুইটা বিদেশী বংশ দুনিয়ায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।

এই সঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখা আবশ্যক।—প্রথমতঃ,ভারতীয় রাজবংশাবলীর নামে আর চীনা-রাজবংশাবলীর নামে কিছু প্রভেদ আছে। আমাদের মৌর্য্যবংশ, গুপ্তবংশ, পালবংশ, সেনবংশ এবং অন্যান্য বংশগুলি নরপতিগণের বংশ বা গোত্র বা পদবী-অনুসারে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু চীনা-রাজবংশের নামে কোন গোত্র বা জাতি বা উপাধিই বুঝা যায় না। এইগুলি প্রদেশের নাম। হান-রাজবংশ বলিলে বুঝিতে হইবে হান প্রদেশের বাসিন্দা নরপতিগণের বংশ। সেইরূপ তাঙ, সুঙ, চীন ইত্যাদি সবই প্রদেশের নাম। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নবাব বা জমিদারেরা চীনের অধীশ্বর হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলির নাম-অনুসারে রাজবংশের নাম পরিচিত হইয়াছে। বিলাত এক সময়ে ফরাসী দেশস্থ নরম্যাণ্ডি প্রদেশের জমিদারগণের অধীন ছিল। তখন বিলাতের বিজেতা রাজবংশের নাম ছিল নরম্যান বংশ। এই নামকরণ চীনাদের অনুরূপ। সেইরূপ ফরাসী দেশীয় য়্যাঞ্জু প্রদেশের জমিদারেরাও এক সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। সেই সময়কার বিলাতের রাজবংশের নাম য়্যাঞ্জেভিন। চীনা-কায়দায় বিলাতী রাজবংশের নামকরণ আরও আছে। এই কায়দায় ভারতীয় রাজবংশের নামকরণ হইলে, মৌর্য্যবংশকে বলিব, মগধবংশ; বর্দ্ধনবংশকে বলিব কান্যকুব্জবংশ, পালবংশকে বলিব বরেন্দ্রবংশ, সেনবংশকে বলিব রাঢ়বংশ; ইত্যাদি।

চীনা স্বদেশী-রাজবংশের মধ্যে একমাত্র মিঙবংশের নামকরণ এই কায়দায় হয় নাই। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোন স্থানের জমিদার বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। তিনি একজন বৌদ্ধ-পুরোহিতমাত্র ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি বিদেশীয় মোগল-রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের ধুরন্ধর হন। অবশেষে তিনিই রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার বংশ কোন প্রদেশের নামে অভিহিত হইতে পারে না। "মিঙ্" শব্দের অর্থ "উজ্জ্বল" বা "গৌরবময়"। ভিক্ষুক সেনাপতি সাম্রাজ্যের ভার পাইবার পর এই উপাধি গ্রহণ করেন। জাপানের বিখ্যাত মিকাডোর শাসনকাল এই ধরণের এক শব্দে পরিচিত হইতেছে। ইহাকে মীজি-যুগ বলা হয়। "মীজি"র অর্থ "উন্নতি" "গৌরব" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, তাঙ্‌বংশও চীনের স্বদেশী; আবার চীনবংশ, হান্‌বংশ, সুঙ্‌বংশ ইত্যাদিও চীনের স্বদেশী। কিন্তু নৃতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদির হিসাবে এইগুলিকে এক গোত্রের অন্তর্গত করা সম্ভবপর নয়। খাঁটি স্বদেশী চীনা-রক্তের সঙ্গে বিদেশী রক্তের সংমিশ্রণ যথেষ্টই হইয়াছিল। চীনের প্রাচীনতম সভ্যতাই গঠিত হইয়াছে বিদেশীয়গণের আগমনের পর। সেই সত্যযুগের "বর্ব্বরাগমন" হইতে বহুশত বর্ষকাল পর্য্যন্ত দেশী-বিদেশী সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। মোগল, তাতার, হুন, য়ুয়েচি, শক, কুশান, ইত্যাদি নানা নামে এই সকল বিদেশীয়গণ অভিহিত। চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই সমুদয় জাতির প্রভাব কখনই চাপা পড়ে নাই। এদিকে ইয়াংসির দক্ষিণস্থ জলপথের বন্দরগণও নবাগত সভ্য চীনাদিগের জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফলতঃ, চীনবংশই বলি, বা তাঙ্‌বংশই বলি, বা মিঙবংশই বলি—সকল বংশই ন্যূনাধিক দো-আঁসলা বা মিশ্রিত জাতি। "খাঁটি চীনা" শব্দের প্রয়োগ বিজ্ঞানে চলিতে পারে না। ভারতবর্ষের রাজবংশগুলির কথাও এইরূপ। শিশুনাগবংশ রক্তহিসাবে কোন্ গোত্রের অন্তর্গত বলা সম্ভবপর কি? সেইরূপ মৌর্য্যবংশেরই বা রক্ত কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্ন পাল, সেন, চোল পর্য্যন্ত সকল বংশ সম্বন্ধেই তোলা যাইতে পারে। মোটের উপর, সংক্ষেপে বলা চলে যে, ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় (অর্থাৎ হিন্দু এবং অহিন্দু) অথবা আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুই রক্ত প্রায় সকল বংশেই বিদ্যমান। ভারতীয় ইতিহাসের এই কথাগুলি মনে রাখিলে চীনা-রাজবংশের বৃত্তান্ত সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। মৌর্য্যবংশও হিন্দু বা ভারতীয়, আবার চোলবংশও হিন্দু বা ভারতীয় এবং সেনবংশও হিন্দু বা ভারতীয়। কিন্তু মৌর্য্য, চোলে আর সেনে পার্থক্য কত? ঠিক এই পার্থক্য চীনা স্বদেশী-বংশসমূহের মধ্যেও দেখিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে আলোচনা বিস্তৃতরূপে হওয়া আবশ্যক। চীন তত্ত্ব-

প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্বন্ধ

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মণ, বি-এস-সি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উদ্ভিদদেহে ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব

অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, আমাদের দেহে যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, তদ্রূপ উদ্ভিদদেহেও (মানবেন্দ্রিয়ের তুলনায় অতি প্রাথমিক বা অসম্পূর্ণ বিকশিত) কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায়। কোন কোন হীন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ (যথা বৃন্তাগ্রভাগ, মূলাগ্রভাগ ও বিচরণশীল Zoospores ইত্যাদি) অনেক সময়ে সাধারণ প্রাণীসমূহ অপেক্ষা, এমন কি মনুষ্যাপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্মভাবে আলোক ও অন্ধকারের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে পারে। নিম্নে দুই-একটি উদাহরণ দ্বারা উক্ত বিষয়টি সহজে বোধগম্য করার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, আমরা যেমন চক্ষু-সাহায্যে আলোক ও অন্ধকারের তারতম্য বুঝিতে পারি, তদ্রূপ উদ্ভিদ-দেহেরও কোন কোন অংশের কোষবিশেষের এমন শক্তি আছে, যদ্দারা উদ্ভিদসমূহ ঐ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারে বলিয়া প্রতীতি হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে সকলেই সহজে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কোন ঘরের ভিতরের একটি ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্বার, বাতায়ন ইত্যাদি আলোক-পথ রুদ্ধ করিয়া, ঐ অবশিষ্ট মুক্ত বাতায়নের অদূরে গৃহমধ্যে একটি উপযোগী পাত্রে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকার মধ্যে ২।৪টি সর্ষপ, ধান্য বা বীজ প্রোথিত করিয়া রাখিলে এবং আবশ্যকমত ২।৪ বার জল-সেচন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ২।১ দিবসমধ্যে ঐ সর্ষপ বা ধান্যবীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতেছে এবং সমস্ত অঙ্কুরের অগ্রভাগই জানালা অভিমুখে এমনভাবে অবস্থিত আছে, যেন উহারা আত্মহারা হইয়া অনিমেষনয়নে নূতন জগতের বাহিক দৃশ্য অবলোকনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। (৫ম চিত্র 'ক' দেখুন।) ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে—বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পক্ষে মৃত্তিকানিহিত খাদ্যসামগ্রী ও বায়ুর যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ নাতিপ্রখর সূর্য্যালোকেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্ভিদ-শিশুগণের বা উদ্ভিদকাণ্ডের বর্দ্ধিষ্ণুভাগের (Growing point) স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, যে পথ দিয়া আলোক আসে, সেগুলি সেই আলোকপথের দিকে আগ্রহের সহিত আবর্ত্তিত হইয়া আলোকরশ্মিসমূহকে যেন সদাই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়। সূর্য্যমুখী ফুলের বৃন্তাগ্রভাগ "সদ্যস্নাতা সূর্য্যব্রতাবলম্বিনীর ন্যায়" দিবাভাগে সতত সূর্য্যের মুখপানে অবলোকন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, ইহা কে না জানেন? অন্যদিকে উদ্ভিদ-মূলাগ্রভাগের এমন শক্তি আছে যে, তাহারা সর্ব্বদাই আলোক হইতে দূরে, অর্থাৎ আলোকপথের বিপরীত দিকে ধাবমান হয়। (৫ম চিত্র 'খ' দেখুন।) অধিকন্তু, যাঁহাদের ভাল অনুবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তাঁহারা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কতিপয় নিম্নশ্রেণীর জলজ উদ্ভিদের সম্মিলিত স্ত্রী ও পুংকোষসমূহের (Zoospores) (১১শ চিত্র দেখুন) প্রকৃতিদত্ত এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, যখন সূর্য্যের তেজ বেশ প্রখর হয়, তখন তাহারা জলের নিম্নভাগে প্রস্তর বা অন্য কোন অস্বচ্ছ পদার্থের অন্তরালে (যেন স্বকীয় বুদ্ধি বলে) আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যতক্ষণ না রৌদ্রতেজ খর্ব্ব হয় ততক্ষণ পুনরায় ভাসমান হয় না। প্রখর রৌদ্রতেজে উদ্ভিদগাত্রস্থ সবুজ রং (ক্লোরোফিল) নষ্ট হয়; লুক্কায়িত থাকিলে ঐ রং নষ্ট হয় না। ছত্রক-(Fungus) জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। (৫ম চিত্র 'ক' 'খ' ও ৬ষ্ঠ চিত্র দেখুন।)

কর্ণ ও নাসিকার (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) অনুরূপ কোন অংশ উদ্ভিদদেহে আছে কি না, তাহা আজও জানা যায় নাই। রসেন্দ্রিয় জিহ্বা দ্বারা আমরা রস বা স্বাদ

৫ম চিত্র(খ)।

গ্রহণ করিয়া থাকি। উদ্ভিদেরও যে স্বাদগ্রহণ-ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন পাত্রে নীরস কোন পদার্থের (যথা কাষ্ঠ-গুঁড়িকার) একাংশে বা নিম্নে যথেষ্ট জল দিয়া তদুপরি বীজ বপন করিলে ঐ বীজোদ্ভূত অঙ্কুরসমূহের মূলগুলি সেই জলের আস্বাদ সম্যক গ্রহণার্থ অতি দ্রুতভাবে ক্রমশঃ যে দিকে জল আছে, সেই দিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ অবস্থা দর্শনে মনে হয়, যেন উদ্ভিদ-শিশুটি উপরে জলাভাব-বশতঃ পিপাসান্বিত হইয়া পাত্রনিম্নস্থ প্রচুর জলপানার্থ লোলজিহ্বাবৎ মূলাগ্রভাগ প্রসারিত করিয়া দিতেছে (১)। (৭ম চিত্র দেখুন।)

প্রাণীসমূহের, বিশেষতঃ, মনুষ্যের অঙ্গুলাগ্রভাগ, চিবুক ইত্যাদি অংশের ত্বক যেমন তীক্ষ্ণ স্পর্শজ্ঞানলাভে সহায়তা করে, তদ্রূপ উদ্ভিদেরও স্থানবিশেষের ত্বক (তত সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণভাবে না হইলেও) স্থূলভাবে তাহাদের স্পর্শজ্ঞান লাভে সহায়তা করে। অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উদ্ভিদের লতাতন্তুসমূহ (Tendrils বা আঁকড়া অর্থাৎ যে অংশবিশেষদ্বারা লতাসমূহ পার্শ্ববর্ত্তী নির্ভরোপযোগী বস্তু সমূহকে অবলম্বন এবং বেষ্টন করতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) উদ্ভিদের (আকর্ষণ, অবলম্বন এবং বেষ্টন বিষয়ে) হস্তের ন্যায় কার্য্য করে এবং ঐ লতাতন্তুর কোন অংশ কোন কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে উহারা স্বভাবতঃ সেই পদার্থকে বেষ্টন করিবার জন্য ক্রমশঃ সেই দিকে বক্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের দেশীয় যে কোন লতার জড়ি বা তন্তু লইয়া ইহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তবে কোন কোন লতায় ক্রিয়া দ্রুতভাবে সাধিত হয়, কোনটিতে একটু বিলম্বে হয়। উদ্ভিদ-ত্বকের কোষগুলি প্রাণীদেহাবরক চর্ম্মকোষের ন্যায় চেপ্টাকৃতি এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ এখানে তন্তুসমূহের কার্য্যাবলী বিবৃত করিতে পারিলাম না। ডারুইন লিখিত "Climbing Plants" দেখুন।
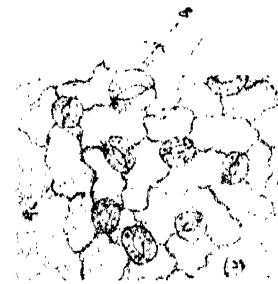
আমাদের গাত্রত্বকের সকল অংশে যেমন সমান স্পর্শানুভব-শক্তি নাই অর্থাৎ কোন স্থানে অধিক (যথা জিহ্বাগ্রে) কোন স্থলে অল্প (যথা পাদমূলে), তদ্রূপ উদ্ভিদত্বকেরও স্পর্শানুভবশক্তি অতি প্রখর; কিন্তু কাণ্ড-ত্বকে ইহার বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে জড়ি অভাবে সম্যক লতাটিই নির্ভরোপযোগী বস্তুকে বেষ্টন করিয়া থাকে। (৮ম চিত্র দেখুন।)

(১) Reynolds Green's Vegetable Physiology.

উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া

শ্রেষ্ঠ জীবমাত্রেরই যেমন জীবিতাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নাসারন্ধ্র (nostrils) শ্বাসনালী (Bronchi) ও ফুসফুস (Lungs) সাহায্যে সংসাধিত হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া [অর্থাৎ বায়ু ও বায়বীয় পদার্থ (যথা অঙ্গারাম্লজান CO_2 অম্লজান O_2 ইত্যাদি) অবস্থাভেদে ত্বক ও পত্রদ্বারা অথবা শুধু পত্রাবলী দ্বারা গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয়। বিশুদ্ধ বায়ু যেমন আমাদের নাসারন্ধ্র ও বায়ুনালী দ্বারা ফুসফুসে প্রবেশলাভ করতঃ আমাদের দূষিত (Venous) শোণিতকে স্বীয় অম্লজান (Oxygen) দান করতঃ শোধিত করে (Arterialise) এবং তদ্দ্বারা আমাদের শারীরিক ক্রিয়া ও পুষ্টি সম্পাদনে সহায়তা করে, তদ্রূপ উদ্ভিদেরও পত্রাবলী এবং গাত্রত্বকস্থিত সূক্ষ্মছিদ্র (Stomata) সমূহের মধ্য দিয়া বায়ু উদ্ভিদের অভ্যন্তরস্থ কোষে প্রবেশ লাভ করতঃ স্বকীয় অঙ্গারাম্লজান ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ দান করিয়া উদ্ভিদের পরিশোধন ও বর্দ্ধন বিষয়ে সহায়তা করে। (৯ম চিত্র (১) দেখুন।)

আচার্য্য বসু মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যেমন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে প্রাণিদেহের শ্রমাপনোদন ও নববল-সঞ্চার হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ বায়ুসংস্পর্শে উদ্ভিদেরও সাড়া দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

উদ্ভিদের পরিপাকশক্তি।

প্রাণীসমূহ, বিশেষতঃ মনুষ্যেরা, যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহা অবশেষে জীর্ণ হইয়া শরীরের পোষণ ও বর্দ্ধন-বিষয়ে সহায়তা করে। উহাই অবশেষে শোণিত, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও মাংস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। উদ্ভিদ-সমূহও জল, বায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি হইতে যে যে পদার্থ স্বীয় দেহের নানা অংশের (ত্বক, পত্র ও প্রধানতঃ মূলের) মধ্যদিয়া গ্রহণ করে, সে সমস্তকে অবশেষে পরিপাকশক্তির সাহায্যে খাদ্যে পরিণত করিয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। মনুষ্যেরা নানাদ্রব্য (যথা শাক, শব্জী, আমিষ ইত্যাদি) হইতে নানা উপায়ে সুখাদ্য ও মুখরোচক আহার্য্য প্রস্তুত করণানন্তর আহার করে; কিন্তু উদ্ভিদসমূহ অপরিবর্ত্তিত খাদ্যদ্রব্য শরীরস্থ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে ঐ সমস্তকে খাদ্যে পরিণত করতঃ স্বকীয় পুষ্টিসাধন ও বর্দ্ধন-বিষয়ে নিয়োজিত করে। উদ্ভিদগণ সাধারণতঃ নিরামিষাশী, কিন্তু দুই-একটী আমিষ-ভোজী উদ্ভিদও দেখা যায়। ড্রসেরা (Drosera) ডোনিয়া (Dionea) এবং ইয়ুট্রিকুলেরিয়া (Utricularia) প্রভৃতি উদ্ভিদের আমিষপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাহারা কোন এক বিশেষ শক্তিবলে তাহাদের গাত্রোপরি উপবিষ্ট মশকাদি ক্ষুদ্র কীট, এমন কি স্থানবিশেষের উপরিভাগে রক্ষিত অন্য জীবের মাংস প্রভৃতি অবলীলাক্রমে তাহাদের শরীরস্থ কুপবৎ ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ জীর্ণ করতঃ রসাস্বাদ গ্রহণ করে। বঙ্গদেশের স্থানে-স্থানে জলাশয়োপরি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভাসমান মূলহীন এক প্রকার জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ দেখা যায়, সাধারণ ভাষায় তাহাদিগকে ঝাঞ্জী (Utricularia stellaria) বলে। ইহারাও পত্রাবলীমধ্যস্থ কুপবৎ

প্রাণিশরীরে যেমন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াজনিত প্রায় দুই ডিগ্রি তাপবৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। (৯ম চিত্র (২) দেখুন।) চিত্রানুযায়ী যন্ত্র স্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিলেই তাপ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইতে পারে।

ফাঁদে মক্ষিকাদি আবদ্ধ করতঃ অবশেষে বিনাশ করিয়া রস গ্রহণ করে। (২)

মনুষ্য-শরীরে যেমন খাদ্যদ্রব্যস্থ শর্করা (sugar; রসায়ন শাস্ত্রে sugar বা শর্করা শব্দে সাধারণ চিনি ব্যতীত আরও অনেক বস্তুকে বুঝায়) যকৃতাভ্যন্তরে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণী-শ্বেতসার (Animal Starch)-রূপে ভবিষ্যতে বিভিন্নাংশের প্রয়োজন সাধনার্থ সঞ্চিত থাকে, তদ্রূপ উদ্ভিদ-কোষসমূহের অভ্যন্তরেও শর্করা উদ্ভিজ্জ-শ্বেতসার (Vegetable Starch)-রূপে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। অত্যধিক আহারের পরে মানুষ যেমন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং বিশ্রাম করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদের মধ্যে অতিরিক্ত জল চালিত করিয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় দেখিয়াছেন, তাহাদেরও সেই অবস্থাই হয়; অর্থাৎ তখন আর তাহাদের সাড়া দেওয়ার শক্তি থাকে না। আবার ঔষধ-সাহায্যে ভুক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারিলে, মানুষ যেমন পুনঃ কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে এবং কার্য্যক্ষম হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদও পুনঃ সাড়া দিতে থাকে।

উদ্ভিদের বর্দ্ধিষ্ণুতা
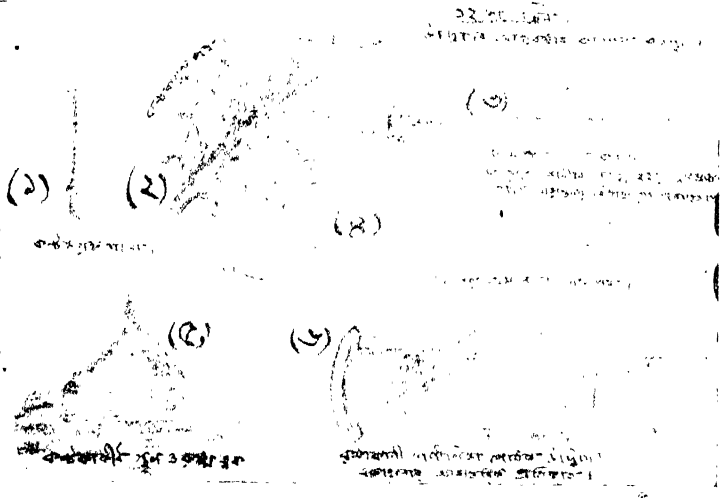
প্রাণীর শিশু যেমন মাতৃগর্ভে বা অণ্ডমধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং প্রসূত হওয়ার পর হইতে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়ার সময়ের মধ্যে, অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে যথাসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উদ্ভিদ-শিশুও বীজাভ্যন্তরে নিহিত থাকার অবস্থা হইতে বিশাল তরুতে পরিণত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যথাসম্ভব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনুবীক্ষণ ও অক্সোনোমিটার (Auxanometer) নামক যন্ত্রদ্বয়-সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি চাক্ষুষভাবে পরীক্ষা করা যায়। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি-পরিমাপক ক্রেস্‌কোগ্রাফ (Crescograph) নামক অধিকতর সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। মানবশিশুর স্থূলতা, গুরুত্ব, বল ও শৌর্য্যাদি যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তদ্রূপ উদ্ভিদশ্রেষ্ঠ বৃক্ষেরও শাখা-প্রশাখার স্থূলতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৩।৪ বৎসরাধিককাল অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উদ্ভিদসমূহ বিশেষ বিশেষ সময়ে অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হয়; সেজন্য উহারা ঐ সময়বিশেষকে "অতিবর্দ্ধনের সময়" (Grand period of growth) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু সাধারণতঃ বৃক্ষসমূহ এত অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, মৃদুগামী শম্বুকের গতির সহিত বৃক্ষের বৃদ্ধির গতির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শম্বুকই ২০০০ গুণ অধিক দ্রুত যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই হিসাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একটী বৃক্ষের পক্ষে এক মাইল (৫২৮০ ফিট) লম্বা হইতে ২০০ বৎসর লাগিবে। কিন্তু বৃক্ষের বৃদ্ধির গতি এত অল্প হওয়া সত্ত্বেও আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র-সাহায্যে বৃক্ষের প্রতিমুহূর্ত্তের বৃদ্ধির পরিমাণকে একলক্ষগুণ বড় করিয়া দেখাইয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তাংশের বৃদ্ধির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

উদ্ভিদের চলচ্ছক্তি ও সঞ্চালনশক্তি

স্পঞ্জ (Sponge) ইত্যাদি কতিপয় হীন প্রাণী যেমন চিরকাল সমুদ্রগর্ভস্থ প্রস্তরখণ্ডাদির সহিত সংলগ্ন হইয়া

(২) Darwin's Insectivorous plants দেখুন।

বর্দ্ধিত হয় বলিয়া চলচ্ছক্তিবিহীন, তেমনি কোন কোন হীন উদ্ভিদের (যথা ইডোগোনিয়াম্ (Edogonium) এবং সচরাচর বৃক্ষাদিরও চলচ্ছক্তি নাই। আবার অধিকাংশ প্রাণীর যেমন চলিবার শক্তি আছে, তদ্রূপ কোন কোন উদ্ভিদের (যথা—Diatom, Desmid, Oscillaria প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহের) এবং হীন-উদ্ভিদ-প্রজনন-শক্তিসম্পন্ন Zoospores ইত্যাদির মধ্যে ঐ শক্তির অস্তিত্ব অনুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে প্রত্যক্ষীভূত হয়। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জলাশয়ের কাদা এবং জল পরীক্ষা করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটীর প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। (একাদশ চিত্র দেখুন।)

আকুঞ্চন

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় নানা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরে চিম্টী কাটিলে বা তাপাদি উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে যেরূপ সাময়িক আকুঞ্চনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রতি উদ্ভিদ-শরীরেই ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা বিজ্ঞান-জগতে অজ্ঞাত ছিল। অধ্যাপক বসুর এ আবিষ্কারে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। (৩)

প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

মানুষ আত্মরক্ষার জন্য সদাই সচেষ্ট। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও এ চেষ্টার ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু ইতর প্রাণীগণ উন্নত বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে সময়-সময় অপ্রত্যাশিত শত্রুর হস্তে নিপতিত হয়। মানুষ শারীরিক বলের দ্বারা যে স্থলে নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন দ্বারা নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে, নতুবা আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। আদিযুগে মানবসমাজ যখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তখন ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় মানুষও আইনের অভাবে বলের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইত (৪)। উদ্ভিদের মধ্যেও আত্মরক্ষার জন্য নানা চেষ্টার উদাহরণ পাওয়া যায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ বুদ্ধিবলে যাহা সমাধা করিতে পারে, উদ্ভিদসমূহ বুদ্ধির অভাবে প্রকৃতিদত্ত শক্তি-প্রভাবে নানারূপ বর্ম্মবৎ অংশ পরিপোষণ ও বর্দ্ধন দ্বারা আত্মরক্ষাকার্য্য সম্পাদন করে। উদ্ভিদের এরূপ অংশের উদাহরণ নিম্নলিখিত উদ্ভিদাংশসমূহে পাওয়া যায়।

যথাঃ—

১। সাধারণ কণ্টক। ১২শ (১) চিত্র দ্রষ্টব্য।

১২শ নং চিত্র। বনচাঁড়ালের (Desmodium) চিত্র।
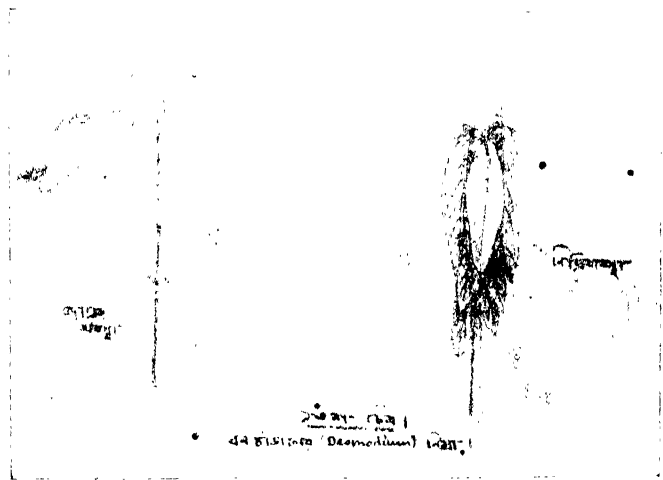
২। বিষাক্ত রসবাহী কণ্টক। ১২শ (৩) চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩। তীক্ষ্ণ ও অমসৃণ প্রান্তযুক্ত পত্রাবলী। ১২শ (২) ও (৪) চিত্র দ্রষ্টব্য।

৪। কণ্টকাকীর্ণ ত্বক। ১২শ (৫) চিত্র দ্রষ্টব্য।

৫। স্থূল ও রুক্ষ ত্বক। ১২শ (৫) চিত্র দ্রষ্টব্য।

৬। প্রদাহকর বিষাক্ত রসযুক্ত মূল, পত্র, ইত্যাদি।

৭। রক্ষাকারী সেনাবৎ পিপীলিকা-পোষণার্থ অংশ। ১২শ (৬) চিত্র দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় প্রণীত "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের "আবিষ্কার" দেখুন।

(৪) Holland's Jurisprudence দেখুন।

এই সমস্ত অংশের সাহায্যে উদ্ভিদ কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ—গোলাপ, খেজুর ইত্যাদি বৃক্ষের কণ্টক থাকাতে তৃণভুক্ প্রাণীগণ ও অন্যান্য অনিষ্টকারী শত্রুগণ সহজে ইহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। কারণ শত্রুগণ ইত্যাকার অংশের সংস্পর্শে আসিলেই কণ্টকাঘাতে
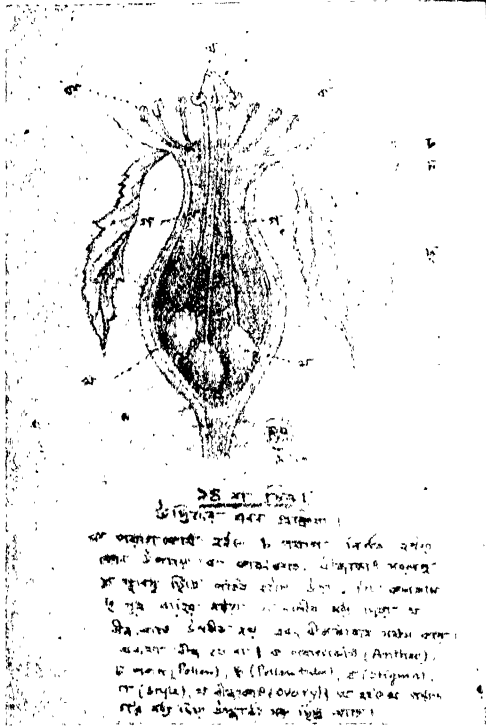
ক্ষত-বিক্ষত হয়। এইজন্যই গোলাপে এত কণ্টক, মৃণালেও ইহার অভাব নাই। নতুবা বোধ হয় সুন্দর ও কমনীয় জিনিষের পক্ষে সংসারে তিষ্ঠান ভার হইয়া পড়িত। (১২ শ (১) চিত্র দেখুন।)

দ্বিতীয়তঃ। বিষাক্তরসযুক্ত কণ্টকসম্পন্ন উদ্ভিদও সাধারণ কণ্টকের ন্যায় খাদক ও অনিষ্টকারীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া এবং বিষাক্তরস শরীরে সঞ্চারিত করিয়া শত্রুকে তীব্রজ্বালায় জর্জ্জরিত করতঃ আত্মরক্ষা করে। বিছুটী গাছের গাত্রে এরূপ কণ্টক দেখা যায়। (১২শ (৩) চিত্র দেখুন।)

তৃতীয়তঃ। তীক্ষ্ণ ও অমসৃণ প্রান্তযুক্ত পত্রাবলী অনিষ্টকারীদিগের গাত্রসংস্পৃষ্ট হইলে উহাদের গাত্রচর্ম্মে ক্ষত উৎপন্ন করিয়া এবং রক্তক্ষয় করিয়া উদ্ভিদের আত্মরক্ষা বিষয়ে সহায়তা করে। পত্রমধ্যস্থ বালুকাবৎ সূক্ষ্ম সিলিকা-(silica) কণাই এরূপ অমসৃণ হওয়ার কারণ। ধান্যাদি উদ্ভিদের পত্রাবলীতে এরূপ অমসৃণ পত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়। (১২শ (২) (৪) চিত্র দেখুন।)

চতুর্থতঃ। উষ্ণপ্রদেশের অরণ্যে Acacia sphaerocephala, Cecropia adenopus এবং Myzmecodia ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়। অন্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উদ্ভিদভেদে এইগুলি নানা প্রকার পিপীলিকার আবাসোপযোগী হইয়া থাকে এবং খাদ্য সরবরাহ করে। ঐ সমস্ত পিপীলিকা নিয়তঃ উহাদিগকে বাহিরের শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করে এবং হয় ত উহাদের পরাগ গর্ভকেশরে নিষিক্ত করিয়া বংশবৃদ্ধি বিষয়েও সহায়তা করে। (১২শ (৬) চিত্র দেখুন।)

উপরিউক্ত অন্যান্য অংশসমূহও এইরূপ নানা উপায়ে উদ্ভিদসমূহের আত্মরক্ষা বিষয়ে সহায়তা করে।

প্রত্যাখ্যান

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, এম-এ]

ধেয়ে তুমি আস্‌ছ কাছে বাড়িয়ে তোমার দুটি হাত,
জড়িয়ে গলা দেবে চুমা এই ত তোমার মনের সাধ?
চুমায় তোমার ঝরে সুধা, মধুর তোমার আলিঙ্গন;
তোমার হাসি, সোহাগ বাণী, ধরায় সে যে অতুলন।
তোমার দুটি হাতে ধরি, বারণ করি, তোমায় আজ;
থাক্‌গে তোমার আদর চুমা আলিঙ্গনে নাইক কাজ।

বারণ শুনে জানি, প্রিয়, নয়ন তোমার ভরবে জলে,
বারণ কর্‌তে আমারো যে ব্যথা ঘনায় হৃদয়-তলে।
খোকন্, তবু বারণ করি, আদর তোমার থাকুক আজ;
তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আছে আমার অনেক কাজ।
রসগোল্লা খাচ্ছ তুমি, মুখটি তোমার রসে ভরা;
চুমো তাইতে থাকুক আজ, আপিস যেতে বড়ই ত্বরা।

দুর্ব্বলের বল

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বি-এল]

১

মথুরাপুরের কাছারি-বাড়ীতে আজ বড় ধুম। নূতন জমিদার আজ প্রথম জমিদারি পরিদর্শনে আসিয়াছেন। মথুরাপুর পূর্ব্বে দেবীপুরের রায়-চৌধুরীদের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। তিন বৎসর হইল, ভৈরবচন্দ্র এই জমিদারি ক্রয় করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মথুরাপুরে আগমনের সুযোগ ঘটে নাই, সুতরাং নূতন "মহালে" নূতন জমিদারের এই প্রথম আগমন।

এমন সময়ে একখানি হাস্যোজ্জ্বল ছোট মুখ জানালার অবকাশ হইতে বলিল,—"টু"

বাবু ভৈরবচন্দ্র সিংহ কাঞ্চনপুরের অমিতপ্রতাপ জমিদার। কঠোর তেজস্বিতা এবং দুর্দ্ধর্ষ দৃঢ়তার জন্য সকলেই তাঁহাকে "যমের মত" ভয় করিত। তাঁহার বিশাল পেশীবহুল দেহের কোন অংশে যে দৈবক্রমে হৃদয় বলিয়া কোন একটা কোমল পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে, এমন সন্দেহও সহজে লোকের মনে উদিত হইত না। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাস্রোত দুর্দ্দমনীয় নদীস্রোতের মত দুর্ব্বার বেগে প্রবাহিত হইত এবং কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইলে, নদীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গেরই মত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া বাধাপ্রদানকারীকে সবলে অতলে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। ইহাতে আত্মীয়-পর বিচার ছিল না।

ভৈরবচন্দ্র অপুত্রক। তাঁহার দুইটিমাত্র কন্যা সৌদামিনী ও সুহাসিনী। উভয়েই পতিপুত্রসহ পিতৃগৃহ বাসিনী। তাহাদের প্রতিও ভৈরবচন্দ্রের বিশেষ প্রীতিবাহুল্য দেখা যাইত না। দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা তাঁহার আরক্ত চক্ষু দেখিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিত এবং ইচ্ছা করিয়া তাঁহার "ত্রিসীমার" মধ্যে পদার্পণ করিত না। ভৈরবচন্দ্রের পত্নী জীবিতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের লক্ষণ বড় একটা দেখা যাইত না। সূর্য্যের কলঙ্কবিন্দুর ন্যায় স্বামীর দুঃসহ তেজঃপ্রভার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াই থাকিতেন। তাঁহার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের কথা কেহই জানিতে পারিত না।

কোন নূতন জমিদারিতে প্রথম গমনের সময় রীতিমত সমারোহের ব্যবস্থা করা ভৈরবচন্দ্রের জমিদারনীতির অন্তর্গত ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শাসনের প্রারম্ভে জমিদারের অমোঘ প্রতাপের কথা একবার নূতন প্রজাদের ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিলে, উত্তরকালে জমিদারি-শাসনের বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং ক্ষুদ্র পল্লী মথুরাপুর আজ জমিদারের হস্তী, অশ্ব, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতির আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

পল্লী-মহিলারা "ঘাটে" যাওয়া বন্ধ করিয়া জমিদারের অমিত ঐশ্বর্য্যের নিপুণ সমালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। ছেলেরা হস্তীশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই অতিকায় জন্তুর আকৃতি-প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণে নিরত হইয়াছিল, এবং বয়স্ক পুরুষেরা নায়েবের আদেশে করজোড়ে, কাছারি-বাড়ীতে জমিদারের আদেশ-প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছিল।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমের মেঘশিশুগুলি বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া আকাশের আলোকিত ক্রীড়াঙ্গনে খেলা করিতে আসিয়াছে। তরুশিরে কিরণের স্বর্ণ-মুকুট শোভা পাইতেছে—এবং কুলায়গামী বিহঙ্গ-কণ্ঠে বিশ্ববিধাতার স্তুতিগাথা গীত হইতেছে। ভৈরবচন্দ্র সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

কাছারির সম্মুখে বিশালকায় হস্তী সুসজ্জিত-বেশে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বালক-বালিকারা অনিমেষ-লোচনে ইহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী এবং সাজসজ্জা অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিতেছিল।

কোন কোন সাহসী বালক "হাতি, কলা খাবি?" বলিয়া মাতঙ্গবরের সঙ্গে রহস্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং তাহার ঈষৎ শুণ্ডাস্ফালন মাত্রেই "ওরে বাবারে" বলিয়া শতহস্ত দূরে ধাবমান হইতেছিল। বালিকারা বিচিত্র সুরে ইহার উদ্দেশে নানা স্তুতিগাথা উচ্চারণ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ইহার আদর্শে ইন্দ্রের ঐরাবতের একটা অস্পষ্ট ধারণা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল।

"ভৈরবচন্দ্র গম্ভীরভাবে হস্তীর দিকে অগ্রসর হইলেন"

এমন সময়ে সহসা চারিদিকে সসম্ভ্রম, বাণী উচ্চারিত হইল, "ওরে, রাজা আস্‌চেন!" শুনিবামাত্র যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। যাহারা নিতান্ত সাহসী, তাহারাই কেবল দূর বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া ভয়ে-ভয়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদ-শোভিত ভৈরবচন্দ্রের প্রতি গোপন-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ভৈরবচন্দ্র গম্ভীরভাবে হস্তীর দিকে অগ্রসর হইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ

করিয়া শিশুকণ্ঠে বলিল "দাদা, আমি আতি চ'বো।" ভৈরবচন্দ্র মুখ ফিরাইয়া গোধূলির অরুণালোকে দেখিলেন, অকলঙ্ক পুষ্প-কলিকার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দর শিশু তাহার বিশাল নয়ন মেলিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে! ভৈরবচন্দ্র শিশুর দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন "হাতী চড়্‌বে?" বালক তাহার ক্ষুদ্র বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কহিল "আতি!" ভৈরবচন্দ্র বালকের হাত ধরিয়া বলিলেন "এস।" বালক সানন্দে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই দাদা?" ভৈরব হাসিয়া বলিলেন "হাঁ! এস।"

ভৈরবচন্দ্র শিশুকে হস্তীপৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। বালক আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের দাসী "রাজাবাবুকে" দেখিয়াই দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। খোকাকে জমিদারের কাছে যাইতে দেখিয়া সে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। হাতী চলিতে লাগিল। বালক কখনো হাসিয়া আনন্দে করতালি দিল, কখনো ভয়বিবর্ণ মুখে ভৈরবচন্দ্রের বক্ষে মুখ লুকাইল। কখনো অস্পষ্ট ভাষায় ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে আদিঅন্তহীন গল্প জুড়িয়া দিল।

শিশুর মধুর আকৃতি, চরিত্র এবং আচরণ ভৈরবচন্দ্র যত দেখিতে লাগিলেন, ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীতহীন হৃদয়ে থাকিয়া-থাকিয়া কি-যেন অস্পষ্ট মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিতে লাগিল। ভৈরবচন্দ্র ধীরে-ধীরে অজ্ঞাত আবেগে শিশুকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। সন্ধ্যার সময় ভ্রমণ শেষ করিয়া ভৈরবচন্দ্র আবার কাছারিতে ফিরিয়া আসিলেন। খোকার দাসী ব্যাকুল-উদ্বেগে তাহার জন্য কাছারির নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। খোকাকে ফিরিতে দেখিয়া সে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দ্রুতবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শিশু হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া ঝাঁপাইয়া দাসীর কোলে পড়িল। ভৈরবচন্দ্রের দিকে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল "দাদা, মা যাই।" ভৈরব হাসিয়া বলিলেন, "কাল আবার এসো। আবার বেড়াতে যাব।" তার পর কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "একে রোজ সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসিস্।"

দাসী গভীর আনন্দ গোপন করিয়া নীরবে সম্মতি জানাইয়া গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কি-জানি কেন সে রাত্রে ভৈরবচন্দ্রের ভাল নিদ্রা হইল না। বহুকালের বিস্মৃত একটি নিষ্ঠুর ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি থাকিয়া-থাকিয়া তাঁহার সবল চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শিশুর সুকুমার মুখের সঙ্গে সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারই উৎপীড়নে নির্ব্বাসিতা এক কিশোরী বালিকার মুখের যেন কিছু সাদৃশ্য ছিল।

২

তিন দিন মাত্র থাকিবেন বলিয়া ভৈরবচন্দ্র মথুরাপুরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার তথায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল; তথাপি তিনি মথুরাপুর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র শিশু ধীরে-ধীরে তাঁহাকে যেন কি এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছিল। নিজের অবিশ্বাস্য দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভৈরবচন্দ্রের অত্যন্ত হাসি পাইত, এবং এই হাস্যকর দুর্ব্বলতা দূরীভূত করিবার জন্য তিনি সময়ে-সময়ে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া স্তূপাকার খাতাপত্র লইয়া বসিতেন। কিন্তু "নিকাসের" ঠিক দিতে দিতে নিতান্ত অকারণে সেই সহাস্য শিশুমুখ সহসা তাঁহার মানসচক্ষে উদিত হইয়া তাঁহাকে উন্মনা করিয়া দিত। ভৈরবচন্দ্র হাসিয়া, খাতা ফেলিয়া, চক্ষু মুদিয়া, ধূমপানে মনোনিবেশ করিতেন।

আজ মধ্যাহ্ন হইতে আকাশ ধীরে ধীরে নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আজ আর ভৈরবচন্দ্রের ভ্রমণে বাহির হওয়া ঘটিল না। তিনি কাছারিঘরের বারান্দায় সুখাসনে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে-করিতে নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির বর্ষণোৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। দূরে যমুনার তীরবর্ত্তী তরুশ্রেণী বৃষ্টির অস্পষ্টতায় দিগন্তের নয়নতটে শ্যামকজ্জলরেখার মত দেখাইতেছিল। মস্তকের উপর ধূসর আকাশ দামিনীর তীক্ষ্ণ হাস্যে থাকিয়া-থাকিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং আর্দ্র বায়ু অশ্রুসিক্ত দীর্ঘনিশ্বাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরণীর শীতলবক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

ভৈরবচন্দ্র হৃদয়ের অন্তর-প্রদেশে আজ যেন এক বিশাল শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহারও হৃদয় যেন ধীরে-ধীরে নিরানন্দের নিবিড় মেঘে ঘনান্ধ-

কার হইয়া আসিতেছিল এবং তাঁহার উজ্জ্বল নয়নে অশ্রুর আভাষ অজ্ঞাতে আর্দ্রতা সঞ্চার করিতেছিল।

সে দিনও প্রকৃতির এমনি প্রাবৃটোৎসব। চারিদিকে বৃষ্টি ও বায়ুর উন্মাদ নৃত্য। এমনি দিনে তিনি এক অসহায়া দরিদ্র বিধবাকে তাহার কিশোরী কন্যার সহিত এক-বস্ত্রে দেশত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাইবার সময় মর্ম্ম-পীড়িতা বিধবা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "যদি ভগবান থাকেন, তাহা হইলে একদিন ইহার সুবিচার করিবেন। আমি সেই আশায় বাঁচিয়া থাকিব।"

কাজটা কি ভাল হইয়াছিল? কিন্তু—কেন সে হতভাগিনী তাঁহার ইচ্ছাস্রোতে বাধা দিতে চেষ্টা করিল? তাহার দশ কাঠা "বাস্তভিটা"র জন্য তিনি অন্যত্র তাহাকে চতুর্গুণ ভূমি দিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি মূঢ়া তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইল না! বলিয়া পাঠাইল, "আমার শ্বশুরের ভিটা আমার বক্ষের পঞ্জর। প্রাণ থাকিতে আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারিব না।" মূঢ়া একবার ভাবিল না যে, কার্য্যোদ্ধারের জন্য বক্ষের পঞ্জর টানিয়া বাহির করিতেও ভৈরবচন্দ্রের দ্বিধামাত্র নাই!

তথাপি আজ প্রকৃতির করুণ মিনতির দিনে ভৈরবচন্দ্র মনকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। থাকিয়া-থাকিয়া তাঁহার অপ্রসন্ন হৃদয় করুণসুরে বলিতেছিল "কাজটা ভাল হয় নাই!"

বালকের কথা মনে পড়িল। এত বৃষ্টিতে আজ আর সে আসিবে না। ভৈরবচন্দ্রের সবল হৃদয়ের কোন গোপন তন্ত্রী যেন সহসা গভীর বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া তেজস্বী ভৈরবচন্দ্র নিজের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "নায়েববাবু!" নায়েব উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলেন, "সকলকে প্রস্তুত হইতে বল, আমি কাল প্রত্যুষেই বাড়ী ফিরিব।" নায়েব ভয়ে ভয়ে বলিল "এই বৃষ্টি-বাদল—" ভৈরবচন্দ্র তাহাকে বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন "যাও!" নায়েব নীরবে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভৈরবচন্দ্রের মনে বালকের সুকুমার মূর্ত্তি আবার ধীরে-ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ভৈরবচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির করুণ মূর্ত্তির দিকে শূন্যমনে চাহিয়া রহিলেন। প্রত্যুষে গ্রাম হইতে বিদায় লইবার সময় ভৈরবচন্দ্রের হৃদয়-তন্ত্রী আবার তীক্ষ্ণ বেদনায় বাজিয়া উঠিল। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার ছেলেটিকে দেখিয়া যাইবেন না? আবার কত দিনে দেখা হইবে, কে জানে? নাঃ—আর না। চীৎকার করিয়া ভৈরবচন্দ্র ডাকিলেন "রামা!"

রামচন্দ্র উপস্থিত হইলে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বিস্তর কাপড় চোপড়, খেলানা ইত্যাদি তাহাকে দিয়া বলিলেন "যা, এসব মাষ্টার মশায়ের ছেলেকে দিয়ে আয়। আর—। নাঃ যা; শীগ্‌গির ফিরে আসিস্, আমরা এখুনি বেরুবো।"

অনুসন্ধান করিয়া ভৈরবচন্দ্র জানিয়াছিলেন, ছেলেটি গ্রাম্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পুত্র।

মাষ্টার মহাশয়ের বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় ভৈরবচন্দ্রের আকুল চক্ষু আর একবার কাহার অনুসন্ধান করিল। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। সুধীর তখন ভৈরবচন্দ্র প্রেরিত নূতন খেলানাগুলির সযত্ন পর্য্যবেক্ষণে গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিল।

৩

একমাস না যাইতেই ভৈরবচন্দ্র আবার মথুরাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মথুরাপুরের আয় অতি সামান্য। এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রতি জমিদারের এত "টান" দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কেহ বলিল "মহালটা নূতন কি না, তাই বোধ হয়, ভাল ক'রে দেখবার-শুনবার জন্য এসে থাক্‌বেন।" কেহ বলিল "এখানকার জলহাওয়া বোধ হয় খুব পছন্দ হ'য়েচে। যমুনার জল ত নয় – যেন মিছরির সরবৎ। লোহা খেলে হজম হ'য়ে যায়।"

কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল অনুমানের একটারও সার্থকতা দেখা গেল না। ভৈরবচন্দ্র কেবল বসিয়া-বসিয়া তামাকু সেবনই করিতে লাগিলেন এবং যমুনার জল খাইয়াও তাঁহার ক্ষুধা যথেষ্ট কমিয়া গেল। এবার আসিয়া ভৈরবচন্দ্র সুধীরের সাক্ষাৎ পাইলেন না; সুধীর তাহার মাতার সঙ্গে তাহার দিদিমার কাছে গিয়াছিল। সুধীরের দিদিমা জামাইবাড়ী না থাকিয়া তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগিনী-কন্যার নিকট গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। জামাতা খরচ দিতেন এবং কন্যা মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। সুতরাং এবার ভৈরবচন্দ্রের আশা পূর্ণ

হইল না এবং কর্ম্মচারীদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই নৈরাশ্য ক্রোধ ও বিরাগে পরিণত হইল। চাকর-বাকর তাঁহার তর্জ্জনে তটস্থ হইয়া উঠিল। নায়েব গোমস্তা সংকল্প করিয়া লক্ষ দুর্গানাম লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রজাদের লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। সকলেই ব্যাকুল-চিত্তে ভাবিতে লাগিল, বিঘ্নবিনাশন কবে এই বিঘ্ন বিনাশ করিবেন!

আহারান্তে ভৈরবচন্দ্র তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় ধূমপান করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে একখানি হাস্যোজ্জ্বল ছোট মুখ জানা-লার বাহিরে হইতে বলিল "টু!" ভৈরবচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। সুধীর হাসিয়া বলিল "দাদা!" ভৈরব সাগ্রহে বলিলেন "এস দাদা, এস।" সুধীর হাসিতে হাসিতে তাঁহারই প্রদত্ত একটি বৃহৎ পুত্তলিকা লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৈরবচন্দ্র বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে সাগ্রহে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তারপর সমস্ত মধ্যাহ্ন ধরিয়া "দাদা ভাইয়ে" গল্প চলিল। অপরাহ্ণে তাহাকে লইয়া ভৈরবচন্দ্র বেড়াইয়া আসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যা হইতে প্রভুর প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তন দেখিয়া কর্ম্মচারীবৃন্দ একান্ত বিস্মিত হইল। পক্ষান্তে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে গভীরতর সংশয় বহন করিয়া ভৈরবচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

নানা কারণে এবার ভৈরবচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, সুধীরচন্দ্র উৎপীড়িতা দত্ত-গৃহিনীর দৌহিত্র। বাড়ী আসি-য়াই তিনি কন্যা সুহাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর ওপাড়ার দত্ত-গিন্নিকে মনে পড়ে?" সুহাসিনী বলিল "মনে পড়ে বৈ কি। তাদের বাড়ী ভেঙেই ত আমাদের বাগান বড় করা হয়েচে।" কথাটা ভৈরবচন্দ্রকে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন "তার একটি ছোট মেয়ে ছিল, তার কি হ'ল জানিস?" সুহাসিনী বলিল, "সেদিন কমলার মা বল্‌ছিল যে, তার নাকি মথুরা-পুরে বিয়ে হ'য়েচে। জামাই শুনেছি সেইখানকার ইস্কুলের মাষ্টার।" শুনিয়া ভৈরবচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। তিনিও এইরূপ সন্দেহই করিতেছিলেন। সুহাসিনী বলিল "কেন, তুমি তাদের কি কোন খবর পেয়েচ?" অন্যমনস্ক ভৈরবচন্দ্র বলিলেন "না।"

সুহাসিনী চলিয়া গেল। ভৈরবচন্দ্র নির্জ্জন উদ্যানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নীরবে পাদচারণা করিলেন।

৪

কঠিন প্রস্তরে সহজে দাগ পড়ে না; কিন্তু একবার দাগ পড়িলে তাহা আর উঠে না। ভৈরবচন্দ্রেরও তাই হইয়াছিল। সুধীরের স্মৃতি লইয়া তিনি বড় বিপদে পড়িয়া-ছিলেন।

যে তেজস্বী ভৈরবচন্দ্র জীবনে কখনো কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, সামান্য একটা শিশুর জন্য সেই ভৈরবচন্দ্র আজ তাঁহারই দ্বারা উৎপীড়িত দরিদ্র বিধবার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিবেন? এরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে ভৈরবচন্দ্রের মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সুধীরের বিরহ বক্ষ-বিদ্ধ কণ্টকের মত ক্রমাগতই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। তাই ভৈরবচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টায় সুধীরের স্মৃতিকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

বাটীতে বিস্মৃতি-লাভে অসমর্থ হইয়া ভৈরবচন্দ্র অবশেষে সুসজ্জিত বজরায় আরোহণ করিয়া নদীবক্ষে ভ্রমণে বাহির হইলেন।

নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন লোকালয়ের বিচিত্র নরনারী, নদীতীরবিহারী পশুপক্ষীর নিত্যনবীন রূপের মধ্যে তিনি শান্তির অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতে লাগিলেন।

তথাপি যেদিন আকাশপ্রান্তে প্রকৃতির দীর্ঘ বেণীর ন্যায় নীল মেঘ দেখা দিত, আর্দ্র বায়ু কাঁদিয়া কাঁদিয়া নদীবক্ষে লুঠাইয়া পড়িত, সুগভীর স্তব্ধতা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের গভীর বিষাদ সূচিত করিত, সেদিন ভৈরবচন্দ্রের ব্যথিত হৃদয় সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর জন্য গভীর বেদনায় কাতর হইয়া উঠিত। যেদিন অবিশ্রাম জলধারায় চারিদিক ধূসর হইয়া উঠিত, জলেস্থলে কোন প্রভেদ বুঝা যাইত না, তীরবর্ত্তী ম্লান তরুগুলি অশ্রুসজল দেহে নিরুপায়ভাবে মস্তক অবনত করিয়া প্রকৃতির সহস্র উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিত, সেদিন সপ্তবর্ষ পূর্ব্বের কিশোরী-কন্যামাত্রসহায়া দরিদ্র বিধবার নির্ব্বাসনচিত্র সহসা যেন তাঁহার চক্ষে তাহার নগ্ন ভীষণতায় প্রকট হইয়া উঠিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বর্ষণসিক্ত আকাশের দিকে শূন্যমনে চাহিয়া থাকিতেন।

পূর্ণিমার রাত্রি। রজতশুভ্র চন্দ্রকরে চারিদিক আলোকিত। ভৈরবচন্দ্র বিনিদ্রনয়নে প্রকৃতির সুপ্ত সুষমা অবলোকন

করিতেছিলেন। হীরকশীর্ষ তরঙ্গরাজি বিদীর্ণ করিয়া সুসজ্জিত তরণী দ্রুতবেগে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছিল। নীলাকাশে স্নিগ্ধ সুন্দর পূর্ণচন্দ্র দেখিতে-দেখিতে, থাকিয়া থাকিয়া আর একখানি সুন্দর শিশুমুখ ভৈরবচন্দ্রের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইতেছিল। তিনি তাহাকে ভুলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু পারিতেছিলেন না।

সহসা দূরাগত বিহগকাকলি ভৈরবচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, সমুচ্চ কোলাহল করিতে-করিতে দলে-দলে চক্রবাকমিথুন আকাশের রজত সরোবরে মনের আনন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে।

ভৈরবচন্দ্র প্রসিদ্ধ শিকারী। কি জানি কেন, তাঁহার অন্তরনিহিত শিকার-প্রবৃত্তি আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে বন্দুক উঠাইয়া তিনি একটী চক্রবাককে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আহত চক্রবাক ছটফট করিতে-করিতে নদীসৈকতে লুটাইয়া পড়িল। মাঝিরা নৌকা থামাইল। অন্যান্য পক্ষী দ্রুতবেগে চারিদিকে পলায়ন করিল। কিন্তু আহত চক্রবাকের সঙ্গিনী তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। সে করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল। কখনো আবেগভরে চঞ্চু চুম্বন করিয়া তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল, কখনো বক্ষে বক্ষ মিলাইয়া তাহার উপর স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল, কখনো বা হাহাকার করিয়া নদীসৈকতে লুটাইয়া লুটাইয়া আপনার হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিল।

এই বিরহ-বিধুর চক্রবাকের করুণ আর্ত্তনাদে সহসা যেন সুধীরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভৈরবচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। দ্রুতবেগে তীরে নামিয়া চন্দ্রালোকে দেখিলেন, হস্তীপৃষ্ঠে গমনকালে শঙ্কিত সুধীরের সরল নেত্রে মধ্যে-মধ্যে যে ভীতির ছায়া অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন, আহত চক্রবাকের করুণ নেত্রে যেন তাহারই অবিকল প্রতিবিম্ব!

ভৈরবচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী সহসা যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল—বেদনার তীক্ষ্ণ আঘাতে তাঁহার শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া আসিল! তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া ভৈরবচন্দ্র বলিলেন, "নৌকা ঘুরাও।"

বাটী ফিরিয়া, যেখানে বিধবা দত্তগৃহিণীর "বাস্তভিটা" ছিল, ভৈরবচন্দ্র সেইখানে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। ভয়ে ভয়ে প্রধান কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি বাগানবাড়ী হবে?" গম্ভীরভাবে ভৈরবচন্দ্র বলিলেন "না, বসতবাড়ী।" বিস্মিত কর্ম্মচারী আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ভৈরবচন্দ্রের নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাটী প্রস্তুত হইল। তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কক্ষ মনের মত করিয়া সাজাইলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইলে ভৈরবচন্দ্র অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কাহার জন্য এই অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, সে সম্বন্ধে লোকে নানা জল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না।

ভৈরবচন্দ্র প্রত্যহ নিজে দাঁড়াইয়া অট্টালিকার সমস্ত জিনিস-পত্র পরিষ্কার করাইতেন এবং সময়ে সময়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই বাটীর চারিদিকে নীরবে পাদচারণা করিতে দেখা যাইত।

* * * * *

তিন বৎসর পরে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর ভৈরবচন্দ্রের উইল পড়িয়া সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, তিনি তাঁহার নবনির্ম্মিত অট্টালিকা এবং বিশাল জমিদারির অর্দ্ধাংশ সুধীরের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন!

বিধাতা সুবিচার করিলেন। দুর্ব্বলের জয় হইল। দশবৎসর নির্ব্বাসনের পরে দত্তগৃহিণী তাঁহার শ্বশুরের "বাস্তভিটায়" আবার ফিরিয়া আসিলেন।

আদর্শ জীবন-স্মৃতি

[শ্রীকপিঞ্জল]

সম্পাদক মহাশয়,

পূজনীয় প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর, গণ্য, নগণ্য, অগণ্য জীবনস্মৃতি দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। আমার এই অমূল্য বৈচিত্র্যময় জীবনের স্মৃতি যে কেন এতদিন লোক-লোচনের অগোচর রহিয়াছে, তাহা আমিই বুঝিতে পারি না—কুতো মনুষ্যাঃ। হায়—

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear.

আমা-হেন রত্নও কি সংসার-জলধির অতল তলে চির-নিমজ্জিত থাকিবে? এ রত্ন যে রাজশিরে শোভা পাইবার যোগ্য। যাহা হউক, আমি কালবিলম্ব না করিয়া আমার জীবন-স্মৃতি প্রকাশের অনুমতি আপনাকে দিলাম। প্রকাশের আয়োজন করুন। ইতি—

আপনাদের গৌরব
শ্রীকপিঞ্জল।

আদ্যলীলা।

আমি বহু-বহুদিন পূর্ব্বে এক বৎসর ২৭শে বৈশাখ বেলা ৪টার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াই 'ওঁয়া' 'ওঁয়া' করিয়া কাঁদি। সূতিকাগৃহে দুইজন দাই ছিল। আমার জন্মগ্রহণ-কালে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। আমার 'আটকৌড়ের' দিন কড়ি এবং পয়সা ছড়ান হয়। সে কড়ির দুই-এক কড়া নাকি এখনো কাহারো-কাহারো বাড়ী আছে। ষষ্ঠী-পূজার পর আমি অন্য একটা ঘরে গেলাম। সেখানে দিদিমার কোলে আমি দিন-রাত কাঁদিতাম, বোধ হয় পৃথিবীর নশ্বরতা ভাবিয়া।

ছয়মাস পরে আমার অন্নপ্রাশন হয়। অন্নপ্রাশনে অনেক ব্রাহ্মণ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। কি কি সন্দেশ হইয়াছিল, তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। সকলেই আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবং আমার ভাবী মহত্ত্বের 'ভবিষ্যৎবাণী' করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আমি দুগ্ধ ছাড়িয়া অন্নের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে লাগিলাম। পৃথিবীর অন্নে শরীর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পায়ে চারগাছি 'মল' ও কোমরে 'কোমরপাটা' ছিল। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এইবার আমার হাতেখড়ি পড়িল। হায়, হাতেখড়ি কি হাতেদড়ি বুঝিতে না পারিয়া আমি কাঁদিয়াছিলাম; তজ্জন্য মাতাঠাকুরাণী 'মুখ' করিয়াছিলেন। তারপর সেই পাঠশালা—সেই ভীষণ পাঠশালা—সেই প্রথমভাগ। পৃথিবী যে কারাগার, তাহা আমি ভাববাহুল্যে পাঠশালে গিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

Heaven lies in our infancy!
Shades of the prison house begin to close
upon the growing boy.

আমার প্রাণ সুদূরের জন্য কাঁদিয়া উঠিত। পণ্ডিত মহাশয় তজ্জন্য বেত্রাঘাত করিতেন। আমি অক্ষর পরিচয়ের সময় 'ঘ' ও 'য' এ প্রভেদ করিতে পারিতাম না, 'খ' ও 'থ' গোল বাধাইত। যৌবনে যে সমদর্শী হইব, বোধ হয় ইহাই তাহার সূচনা।

দশমাস দশদিনে 'প্রথম ভাগ' শেষ করিয়া 'দ্বিতীয় ভাগ' ধরিলাম। 'কষ্টাৎ কষ্টতরং' ইত্যাদি দন্তস্ফুটদমন বাক্যাবলী আমার কাণে কামানের গোলার ন্যায় ভীষণ লাগিত। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'পারিপার্শ্বিক' প্রভৃতি দুর্ভেদ্য শব্দ-দুর্গ আয়ত্ত করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। এই সময়ে আমি গাছে উঠিতে, ও কুসঙ্গে পড়িয়া বার্ডসাই খাইতে শিখি। পাঠশালে আমি ৭ বৎসর ছিলাম। বাঙ্গলা লেখাপড়া ছাড়া, 'সাঁতার কাটা' 'ঘোড়ায় চড়া' এবং 'তামাক খাওয়া' এইখানেই অভ্যাস করি।

ইহার পর আমাদের গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে একটী এনট্রান্স স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম। আমাদের ক্লাসের মাষ্টার মহাশয়টী ঠিক মারহাট্টা, বোধ হয় বর্গীর হাঙ্গামের সময় এ দেশে আসিয়া এইখানেই রহিয়া গিয়াছিলেন।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার বেত্র অনবরত চলিত। আমার পিতৃপিতামহের পুণ্যে সে প্রহারাদি অতিক্রম করিয়া, কোন ক্লাসে দুইবৎসর, কোন ক্লাসে তিনবৎসর থাকিয়া, অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, বিংশ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে উপস্থিত হইলাম।

এই সময় আমার বিবাহ হইল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় হইতেই আমাদের মাষ্টার মহাশয়ের দেখাদেখি আমি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং অনেকগুলি বাঙ্গলা নভেল ও কবিতাপুস্তক পাঠ করি।

এইবার Test পরীক্ষার পালা—'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন?' ডিসেম্বর মাসের সকালবেলা, ১০টার সময়, আমাদের পরীক্ষা বসিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্বর আনিতে পারিলাম না। পরীক্ষা দিতে হইল। বিবাহ হইয়া অবধি আমার মন উড়ু-উড়ু করিতেছিল, কল্পনাবধূ দিনরাত মাথায় ঘুরিতেছিল, পড়াশুনায় আর তেমন মনোযোগ ছিল না। আমি পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে ফেল হইলাম। নিষ্করুণ হেড মাষ্টারের হাতে-পায়ে ধরিয়াও allow হইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, পড়াশুনা ত্যাগ করি। কিন্তু Robert the Bruceএর গল্প পড়া ছিল; কাজেই 'Try again'—পুনরায় চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

আমি কবিতা-লেখা ছাড়িলাম না। এনট্রান্স পাসকে লক্ষ্য করিয়া একটা কবিতা লিখিলাম। তাহার শেষ দুই লাইন এখনো মনে আছে—

আমি রাধা, তুমি শ্যাম, পেতে চাই তোমা,
পরীক্ষা-যমুনা মাঝে! একি দেখি ওমা!

আমার সহপাঠী ও সমদুখী Test-ফেল বন্ধুগণ আমার কবিতা পড়িয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। বলিতেন, এ সকল কবিতা প্রথম শ্রেণীর কবিতা, একেবারে উচ্চ অঙ্গের। যখন বন্ধুগণ আমাকে কবিতা ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন, আমি সগর্ব্বে বলিতাম "কোন ক্রমেই ছাপাইব না, লিখিয়া রাখিব। যদি ইহার কিছু মূল্য থাকে "Posterity will not willingly let die."

দেখিতে-দেখিতে দ্বিতীয়বার Test পরীক্ষা আসিল। এবার অধিকতর শোচনীয়ভাবে অধিক নম্বরের জন্য ফেল হইলাম। ফেল হইয়া এবার কিছুমাত্র দুঃখিত হইলাম না,—ভাবিলাম—'Universities are the graves of talents'। স্কুলের পড়া ছাড়িয়া দিয়া, বাড়ীতে টেনিসন সেলি, বার্ণ, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পড়িতে লাগিলাম। এই সময়েই আমার এক কন্যারত্ন হইল।

মধ্যলীলা।

পড়া ছাড়িয়া আমাকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। আমার মাতুল মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতায় সরকারী ছাপাখানার একটী কার্য্য জুটিল। আমি মামার বাসায় খাই ও চাকুরী করি। এইখানে আমার কয়েক-জন বন্ধু ও একটী "দাদা" জুটিল। তিনি সে পাড়াটীর দাদা ছিলেন। এই সময়ে আমাদের বাসার কাছেই একটী বাড়ী হইতে 'অলোকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। আমার চোখে চশমা, ও রবিবাবুর মত চুল দেখিয়া, অনেকেই আমাকে 'কবি' বলিয়া ডাকিত। আমি যে সত্য-সত্যই কবি, ভিতরে-বাহিরে কবি, তাহা অনেকেই জানিত না। বিধির নির্ব্বন্ধে আমি "অলোকার" সম্পর্কে আসিলাম। প্রথম প্রথম প্রুফ দেখিয়া দিতাম, ২।১০ জন গ্রাহকও সংগ্রহ করিয়া দিতাম। পরে staffএর একজন বলিয়া গণ্য হইলাম। ইহাতেই আমার প্রথম কবিতা 'তানপুরা' প্রকাশিত হইল। কবিতাটীর শেষ কয় লাইন এখনো মনে আছে—

"কত তান ভরা আছে বক্ষে তোর, ওরে 'তানপুরা';
ভবে যত বাদ্য আছে, তুই যে রে সবাকার সেরা।
কখনো পুলকে তুই আলাপিস্ সাহানার সুর,
কভু মেঘমল্লারেতে হৃদি তোর হয় ভরপুর।
'পূরবী'র ঝঙ্কারেতে দূর-স্মৃতি আনিস্ রে মনে,
করুণ বেহাগ সুরে কাঁদিস্ রে নিশীথিনী সনে।
কল্পনা-কালিন্দীকূলে শুনি তোর মধুর ঝঙ্কার,
মনে হয় ব্রজে বুঝি এলো বঁধু শ্যাম সে আমার।

কবিতাটীর খুব সুখ্যাতি হইল। 'অলোকার' সম্পাদক সতীন্দ্রবাবুর সহিত মেশামিশি একটু বেশী হইল। আমার প্রিয়বন্ধুগণ বলিলেন, "দশবৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষায় ত এমন কবিতা বাহির হয়-ই নাই, অন্য ভাষার কথা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।"

এইখানে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধে একটা কথা না

বলিলে আদর্শ জীবনস্মৃতি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে ; ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখক বড়ই গোলে পড়িবেন। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে —প্রথমে গোঁড়া হিন্দু ছিলাম ; কলিকাতায় আসিয়া একটু ব্রাহ্ম tendency হইয়াছিল এবং একটু Love affair ও হইবে-হইবে হইয়াছিল ; কিন্তু খুব সামলাইয়া গিয়াছিলাম। 'অলোকার' সম্পাদক 'থিওজফিষ্ট' (Theosophist) কাজেই আমিও থিয়োজফির গর্ত্তে পড়িলাম। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের 'ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা' আমায় লক্ষ্য করিয়া লেখা কি না, জানিনে।

সতীন্দ্র বাবু বি-এ ফেল, অবস্থা ভাল। ইনি 'অলোকার' সম্পাদন-কার্য্য ব্যতীত 'Indian' নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রের Reporter ছিলেন। Indianএ প্রায়ই 'অলোকা'র সমালোচনা প্রকাশিত হইত।

আমি সতীন্দ্রবাবুকে ভাল মুরুব্বি ধরিলাম। তাঁহাকে মাঝে-মাঝে নানা দ্রব্য উপহার দিতে আরম্ভ করিলাম। দেশের মিহিদানা প্রায়ই তাঁহার জন্য লইয়া যাইতাম। তিনি আমাকে কবিতা লেখায় বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 'অলোকায়' আমি অক্লান্তভাবে লিখিতে লাগিলাম। দেশে ১৫।২০ জন গ্রাহকও জুটাইয়া দিলাম। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তদানীন্তন সাহিত্যরথী ভূতেশ বাবুর সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি আমায় বড়ই স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আমার ৬।৭ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় মাহিনাও বাড়িয়া ৪০ চল্লিশ টাকা হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও একটু খ্যাতি-প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছে। ভূতেশ বাবুর কৃপায় আমি অনেকের সহিত পরিচিত হইতেছি। অনেক উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রে লিখিতেছি। দিন সুখেই কাটিতেছে। ভূতেশ বাবু সামান্য মাসিকে লিখিতেন না , আমার অনুরোধে 'অলোকা'য় গল্প ও কবিতা দিতে আরম্ভ করিলেন ; 'অলোকা' উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। আমি ইহার 'মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার' ভারও লইলাম। আর যে সকল পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হইত, মাসিক সমালোচনায় আমার ও সেই কবিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতাম। ভূতেশ বাবুর চেষ্টায় অন্যান্য কাগজেও আমার কবিতার সুখ্যাতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমার কবিতার সমালোচনা নিজেই লিখিয়া ভূতেশবাবুর নামে অন্য কাগজে পাঠাইতাম এবং 'অলোকার' মাসিক সমালোচনায় অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কবিতা উদ্ধৃত পর্য্যন্ত করিয়া দিতাম। অন্যান্য প্রতিভাবান নবোদিত কবির প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাতেই আমার প্রকাশিত, অপ্রকাশিত কবিতার ছায়া ধরাইয়া দিতাম। যে কাগজ আমার কবিতা না ছাপিত, তাহার গ্রাহক ভাঙ্গাইতাম এবং তাহার কঠোর সমালোচনা করিতাম। এইরূপে বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আমার সাহিত্য-সেবার দশবৎসর অতীত হইতে চলিল, তথাপি আমার কোন কবিতাপুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না—ইহাতে বন্ধুগণ দুঃখিত। কাজেই আমার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'তবলা' প্রকাশিত হইল। ইহাতে আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ৪০টা কবিতা সন্নিবেশিত হইল। ভূতেশ বাবু সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া আমায় সাধারণে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিলেন। 'তবলা'র প্রথম কবিতাটী সকলে ছন্দে এবং ভাবে অতুলনীয় বলিত। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

তবলা আমি ভবের মাঝে,
　　তোরা আমায় ডিঙ্গিয়ে যা।
বাজবো আমি ভাবটা যখন
　　ধীরে এসে মারবে ঘা।
　　বাজবো আমি লয়ের তালে,
　　বাজবো আমি 'সোমে'র কালে,
　　যখন আমি ছিন্ন হ'ব
　　　মুখে আমার থাকবে না রা—
　　　তা ডুম্ ডুম্ ডিঙ্গিয়ে যা।

বলা বাহুল্য, কবিতাটী পুস্তকের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছিল। চারিদিকে তোষামোদের এবং জোগাড়ের বাহুল্যে 'তবলার' সুখ্যাতি প্রকাশিত হইল। সকলেই একবাক্যে উচ্চ সুখ্যাতি করিলেন ; কেবল একটা নিরেট মূর্খ ডাংপিটা-গোছের সম্পাদক 'তবলার' 'পৌষ' নামক কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিয়া নীচতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি কি না ?

পৌষ

এসো পৌষ বন্ধুবর করি কোলাকুলি
তুমি আন ধান্য পুণ্য ছাতু পিঠা পুলি।

তুমিই নবান্ন আন, আন খেজুর-রস,
চিঁড়ের লাড়ু মুড়ির লাড়ু দিয়াই কর বশ।
হাস্যে তোমার কমল ফুটে, মলয় বহে বেগে;
চকাচকী কাঁদে শুধু সারা রাতটা জেগে।
শিরীষ ফুলের গন্ধভরা ওগো মধুমাস
তোমার মুখে দেখি আমি বিধুদেবের হাস।

কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক লিখিলেন—

"লেখক একটী প্রকাণ্ড হস্তীমূর্খ। ইহার না আছে জ্ঞান, না আছে পর্য্যবেক্ষণ। পৌষ মাসে না হয় বিকল্পে নবান্নই হইল, ছাতু আসিবে কোথা হইতে? পৌষ মাসে কি কমল ফুটে, মলয় বহে, শিরীষ গন্ধ আসে? ইহার কি কেহ অভিভাবক নাই যে, ইহাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করে? ধন্য বাঙ্গলা মাসিকপত্র! তোমরা এই সকল কবিতাও প্রকাশ কর, এ অখাদ্যও উদরস্থ কর! চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।"

আমি ত সমালোচনা পড়িয়া তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলাম। ভূতেশ বাবু ও সতীন্দ্র বাবু ইহার প্রতীকার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

আমি এখন 'অলোকার' কর্ণধার;—আমি যা' করি, তাই হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ কত লেখক অনুকূল সমালোচনার জন্য আমার দ্বারস্থ। আমার কবিত্বশক্তি এখন পূর্ণ বিকসিত। এক বৎসর না যাইতেই আবার একখানি পুস্তক প্রকাশের আয়োজন করিতে লাগিলাম। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—

"উদীয়মান ও অস্তমান কবিগণের শ্রেষ্ঠতম, যুগান্তরকারী 'তবলা' কাব্যের সর্ব্বজনপ্রিয় মহাকবির অপূর্ব্ব মহাকাব্য

জয়ঢাক

পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কবিবরের "লাঞ্ছিতি' ও 'ধ্বস্তিতি' নামক মনোহারী গাথা ত থাকিবেই, অধিকন্তু থাকিবে সেই অনন্ত প্রেমরসপূর্ণ 'চিমটি' নামক সনেটটি।

অন্ত্যলীলা

'জয়ঢাক' প্রেসে দিয়া পূজার বন্ধে বাড়ী আসিলাম। দেখিলাম, প্রিয়ার মুখ ভার। তিনি বলিলেন,"তুমি কি সত্যই পাগল হইয়াছ? মেয়ের বিবাহ দেবে না, লোকে বলবে কি? আর এদিকে যে দেনা সুদে-সুদে ফেঁপে উঠলো। তুমি ত 'তবলা' 'জয়ঢাক' বাজাইতেছ। এদিকে যে 'ডুগডুগি' বাজিবার উপক্রম হইয়াছে! পাওনাদারেরা নালিশ করিবে—আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিবে?" আমি দেখিলাম, তাই ত; নীহার বড় হয়েছে—তার বিয়ে না দিলেই নয়। পাওনাদারগণও পীড়াপীড়ি করিতেছে। হায়, কবি সত্যই লিখিয়াছেন—

যে জন সেবিবে ও রাঙা চরণ
সেই সে দরিদ্র হবে।

হায়, কোথায় কবিতার ফুলবন, আর, কোথায় দারিদ্র্যের কঙ্করস্তূপ! হঠাৎ স্বর্গ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলাম। কবিতা-সায়রের 'কমলে কামিনী' অদৃশ্যা হইলেন। "সুখের সাগর দৈবে শুখায়ল।"

প্রকাশককে 'তবলা' বিক্রয়ের দরুণ যে টাকা হইয়াছে, পাঠাইতে লিখিলাম। ভাবিলাম, যাহা হউক, শতখানেক টাকা এ সময় পাইলে অনেকটা দাঁড়াইতে পারিব। প্রকাশক উত্তরে কমিশন বাদে ৩৸৶০ আনা পাঠাইয়া দিলেন; লিখিলেন, "আপনি যাহা যোগাড় করিয়া কিনাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া এক কাপিও বিক্রয় হয় নাই।" আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। হায় এত মাথা-কুটাকুটি, রাত্রি-জাগরণ, তোষামুদী, লেখালিখি, তার এই পরিণাম! সত্যই আমি হস্তিমূর্খ।

সেই দিনই প্রেসে পত্র লিখিয়া 'জয়ঢাক' ছাপিতে নিষেধ করিলাম। পৈত্রিক সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ ও ঋণদায় হইতে মুক্ত হইলাম।

আমার একজন আত্মীয়ের চেষ্টায় মানভূমে কয়লার খনিতে ৬০ ষাট টাকা মাহিনার একটী চাকুরী জুটিল। আমি সাহিত্য-সেবাতে জলাঞ্জলি দিয়া মানভূম রওনা হইলাম। কবিতা ছাড়িয়া মন দিয়া কার্য্য করিতেছি।

কবি বলিয়াছেন—

"যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া
শুধু স্মৃতিটুকু ফিরে দেব না।"

কিন্তু আমি জীবনটুকু রাখিয়া, স্মৃতিটুকু আপনাদিগকে দান করিলাম, সদ্ব্যবহার করিবেন। সাহিত্য-জগতের কোন খবর রাখিনে; কিন্তু কেন জানিনে—মাঝে মাঝে

'মনে পড়ে রে মোর সেই ব্রজধাম।'

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দুগ্ধজাত খাদ্য

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন, বি-এল]

দধি

বাঙ্গালীর নিকট দধির পরিচয় অনাবশ্যক। ইহা আমাদের সামাজিক ভোজের একটি প্রধান উপকরণ। "দধি না হইলে ভোজই মিথ্যা"। কেবল বঙ্গদেশে কেন, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দধির প্রচলন আছে। দধির প্রচলন এদেশে নূতন নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে উহা চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু-মণ্ডলে যে সমুদায় উদ্ভিদাণু বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে "ল্যাক্‌টিক এসিড্ ব্যাসিলি" নামক লম্বা আকৃতি বিশিষ্ট, অথবা "ষ্ট্রেপ্‌টোককাই" নামক গোলাকার উদ্ভিদাণুসমূহ কোন উপায়ে দুগ্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, উহা জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার মধ্যস্থ দুগ্ধ-শর্করার কিয়দংশ দুগ্ধাম্ল (lactic acid) নামক অম্লরসে পরিণত হয়। এই অম্লরসবিশিষ্ট জমাটবাঁধা দুগ্ধকেই আমরা দধি বলি; এবং ঐ উদ্ভিজ্জাণুগুলিকে দধিবীজ বলি। এই দুই প্রকার দধিবীজের মধ্যে যে কোন প্রকার দধিবীজের দ্বারা অথবা উভয়ের সহযোগে দুগ্ধ জমাইয়া দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। উত্তমরূপে ঘন-করিয়া-জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থাতেই দধি বসাইবার পাত্রে ঢালিয়া ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইতে দিবে। পরে "কুসুম-কুসুম" গরম থাকিতে সর না ভাঙ্গিয়া যায় এরূপভাবে এক পার্শ্ব হইতে উহাতে দধিবীজ অথবা "সাজা" দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ছয় সাত ঘণ্টা মধ্যে উহা জমিয়া ঘন দধি হইবে। একটি বাঁশের শলাকার মাথায় করিয়া সাজা দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ পূর্ব্ব দিনের দধি সামান্য পরিমাণে লইয়া "সাজা" বা "দম্বল" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুকূল অবস্থায় পাঁচসের পরিমাণ দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ-ছয় রতি পরিমাণ "সাজা" উহা জমাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ল্যাক্‌টিক এসিড্ ট্যাবলেট (lactic acid tablet) নামক একপ্রকার দধিবীজ বাজারে পাওয়া যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একপ্রকার দধিবীজ আবিষ্কার করিয়াছেন; উহার দ্বারা উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত হইতে পারে। উহা ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ৮০° ডিগ্রী উত্তাপ দধি বসাইবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল; কারণ, ঐ অবস্থায় উদ্ভিজ্জাণুগুলি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অতিশয় শীতল স্থানে বীজাণুগুলি বৃদ্ধি পাইতে পারে না; এই নিমিত্ত দধি সহজে বসে না। "সাজা দেওয়া" দুগ্ধ না জমিলে উহা কিছু সময় গরম উনানের পার্শ্বে রাখিয়া দিলে সহজে বসিয়া যায়। দই পাতিবার পূর্ব্বে দুগ্ধের মধ্যে অল্প পরিমাণে চিনি ও খড়ির গুঁড়া উত্তমরূপে মিশাইয়া দিলে দই খুব শক্ত হইয়া বসে এবং অধিক টক হয় না। এইরূপে প্রস্তুত দধির মধ্যে খড়ি ও ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ বা দুগ্ধাম্ল সহযোগে ক্যালসিয়ম্ ল্যাক্‌টোফস্‌ফেট এবং ক্যালসিয়ম্ ল্যাক্‌টেট্ বা দুগ্ধ-চূর্ণ নামক এক প্রকার স্নায়ু, অস্থি এবং বিধান-তন্তু পোষক পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা অধিকতর বলকারক, এবং অজীর্ণ, উদরাময়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অস্থি-বিকৃতি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। এই দধি অন্য দধি অপেক্ষা লঘুপাক এবং "ক্যালসিয়ম্ ল্যাক্‌টেট" শীঘ্র রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া আশু ফলদায়ক।

দধির উপাদান।—দধির মধ্যে দুগ্ধের অন্তর্গত সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে; অধিকন্তু দুগ্ধাম্ল বা ল্যাক্‌টিক এসিড্ নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। এই অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ বিদ্যমান থাকাতেই দধি অম্লাস্বাদ হয়। দুগ্ধের তরল অন্নসার বা পনিরময় অংশ দধিতে চাপ বাঁধিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয় বলিয়া দুগ্ধ অপেক্ষা দধি গুরুপাক। দুগ্ধের মধ্যস্থিত দুগ্ধ-শর্করার কতকাংশ দুগ্ধাম্লে (lactic acidএ) পরিণত হয়; অবশিষ্ট অংশ অবিকৃত অবস্থায় থাকে; মেদময় অংশ বা মাখনের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; লবণময় উপাদান এবং জলীয়াংশেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। খাঁটি গোদুগ্ধের উপাদানসমূহের তুলনায় গব্যদধির উপাদানসমূহ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

উপাদান	খাঁটি গোদুগ্ধ	উত্তম দধি।
অন্নসার বা পনিরময় পদার্থ ও দুগ্ধ প্রভৃতি	৪·২৮	৪·৭৭
মেদময় পদার্থ	৩·৫০	৩·৫৭
লবণময় উপাদান	·৯৮	·৬২
দুগ্ধশর্করা	৩·৯০	২·৮০
দুগ্ধাম্ল (ল্যাক্‌টিক এসিড)	নাই	·৪০
জল	৮৭·৩৪	৮৭·৮৪
	১০০·০০	১০০·০০

দধি যত অধিক সময় রাখা যায়, ততই দুগ্ধাম্ল বা ল্যাক্‌টিক এসিডের পরিমাণ বাড়িতে এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুগ্ধশর্করার পরিমাণ কমিতে থাকে। এই নিমিত্ত সদ্য দধি অপেক্ষা বাসি দধি অধিক টক হইয়া থাকে। উহা যত অধিক সময় রাখা যায়, তত অধিক টক হয়। দধি অধিক টক হইলে তাহার মধ্যস্থিত উদ্ভিদাণুগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ায় উহার উপকারিতা নষ্ট হইয়া যায়, এবং উহা বাত প্রভৃতি রোগ আনয়ন করে। টক দধি অনিষ্টকর। এইরূপ দধি কাপড়ে করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে উহার জল নির্গত হইয়া যায়; তাহার পর উহা নামাইয়া সোডার জলে ধুইয়া পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইলে উহার দুগ্ধাম্ল বা ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ এবং তাহার সহিত উহার টক আস্বাদ কমিয়া যায়। এইরূপ জলঝরা শুকা দই অপকার করে না। ইহার সহিত অল্প পরিমাণে লবণ ও চিনি মিশাইয়া লইলে বেশ অম্লমধুর রসযুক্ত ও সুস্বাদু হয়।
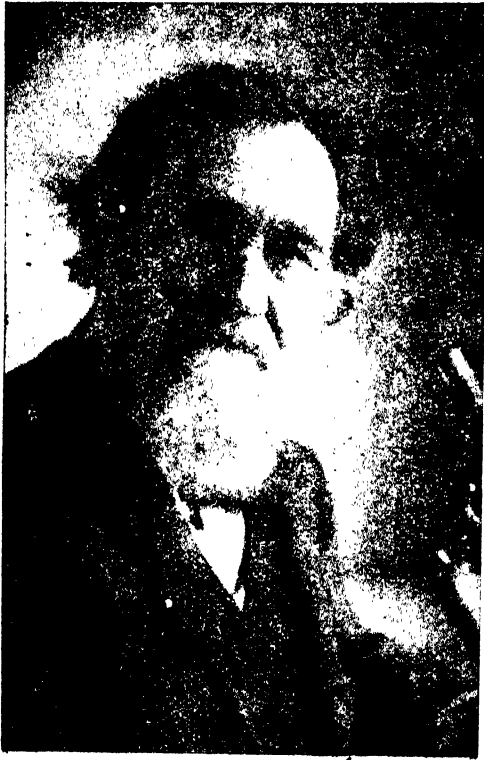
ডাক্তার মেচ্‌নিকফ্

পাশ্চাত্য মতে দধির উপকারিতা।—সুপ্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার মেচ্‌নিকফ্ (Metchnikoff) বলেন, আমাদিগের অন্ত্রের মধ্যে বহু উদ্ভিদাণু বিদ্যমান আছে। তাহারাই অন্ত্রমধ্যস্থ ভুক্তদ্রব্যের পচন-ক্রিয়ার এবং মাতিয়া উঠার (fermentation) কারণ। তাহারা অন্ত্র-মধ্যে যে বিষাক্ত ক্লেদ উৎপন্ন করে, তাহা রক্তমধ্যে শোষিত হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে এবং ইহাদের দ্বারাই জরা বা বার্দ্ধক্য আনীত হয়। এইরূপে ইহারা আমাদের শরীরকে ক্ষয় করিয়া অকালবার্দ্ধক্য আনয়ন করে। সাধারণতঃ বৃহদন্ত্রমধ্যে ইহারা অধিক সংখ্যায় বাস করে। এই নিমিত্ত যে সমুদায় জীবের বৃহদন্ত্র অথবা colon নাই তাহারা অতিশয় দীর্ঘজীবী। কাক, বাজ প্রভৃতি পক্ষী প্রায় ২৫০ আড়াইশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি জীব, যাহাদের বৃহদন্ত্র নাই, তাহাদিগকে বহুকাল বাঁচিতে দেখা যায়। অন্ত্রাশ্রিত এই সমুদায় উদ্ভিদাণু দধিবীজের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত নিয়মিত দধিভোজী বুলগেরিয়াদেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে অনেককে শতাধিক বর্ষজীবী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদায় কারণে বুলগেরিয়ার দধিবীজ পৃথিবীময় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। মূত্রাশয়ের রোগে, অন্ত্রপীড়ায়, এবং অন্ত্রপীড়াঘটিত যকৃতের পীড়া প্রভৃতি রোগে দধির ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্যোজাত দধি অর্থাৎ যাহা বিশেষ টক হয় নাই, তাহার মধ্যে দধিবীজাণুগুলি সতেজ অবস্থায় থাকে বলিয়া কেবল তাহাতেই এই সমুদায় গুণ বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন বুলগেরিয়ার দধিবীজ হইতে প্রস্তুত দধি অপেক্ষা ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দধিবীজ হইতে প্রস্তুত দধি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। দধির অনেক গুণ থাকিলেও সর্ব্বরোগে, ক্ষেত্রনির্বিশেষে দধিপ্রয়োগ কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। আজকাল অনেক স্থলে উহার অপব্যবহার দেখা যাইতেছে। নিম্ন-লিখিত রোগগুলিতে দধি প্রয়োগে প্রায়ই কুফল ফলিয়া থাকে।

(১) ম্যালেরিয়া জ্বর—ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি দধি ভোজন করিলে তাহাকে পুনরায় রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

(২) সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি থাকিলে দধি ভোজন করা উচিত নহে।

(৩) দধি ধারকগুণবিশিষ্ট পদার্থ; সুতরাং যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পান, তাঁহাদের পক্ষে দধি হিতকর নহে।

(৪) সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগে দধি অনিষ্টকর, উহাতে ক্ষতের পুঁজ বৃদ্ধি করে, ক্ষতস্থান আরোগ্য হইতে দেয় না।

(৫) সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে দধি বিশেষ অনিষ্টকর।

(৬) অম্লরোগে দধি সামান্য পরিমাণেও অনিষ্টকর।

(৭) রক্তপিত্তরোগে দধি অনিষ্টকর।

আয়ুর্ব্বেদমতে দধির গুণ ও প্রয়োগ :—দধির মধ্যে গব্যদধি, মহিষ ও ছাগদধি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কেবল উহাদেরই গুণাবলি এস্থলে প্রদত্ত হইল।

দধির সাধারণ গুণ ও ব্যবহার

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসংগুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্রশোথমেদঃ কফপ্রদম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥

অর্থাৎ দধি উষ্ণবীর্য্য, জঠরানলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অম্লবিপাক এবং ধারক। ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফ-বর্দ্ধক; কিন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে, সর্দ্দিতে, শীতজ্বরে, বিষমজ্বরে, অতিসারে, অরুচিতে ও কৃশতায় প্রশস্ত। ইহা বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

গব্যদধি

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যংরুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎপবনাপহম্।
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্॥

গব্যদধি অতিশয় স্বাদু, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, ও বায়ুনাশক। অশেষ প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

রাজ-নির্ঘণ্টকার বলেন

দধিগব্যমতিপবিত্রং শীতং স্নিগ্ধংচ দীপনং বলকৃৎ।
মধুরমরোচক হারি গ্রাহিচ বাতাময়ঘ্নঞ্চ।

অর্থাৎ গব্যদধি অতিশয় পবিত্র, শীতল, স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, বলকারক, মধুররস, অরুচিনাশক, ধারক, এবং বায়ুরোগনাশক।

মহিষ দধি

মাহিষংদধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
স্বাদু পাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্র দূষকম্।

মহিষদধি সুস্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিত্তনাশক, স্বাদু, অভিষ্যন্দি (রসনির্গত করিতে সমর্থ) শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং রক্তদূষক।

ছাগদধি

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষ ত্রয়াপহম্॥
শস্যতে শ্বাস কাসার্শঃ ক্ষয় কার্শ্যেষু দীপনম্॥

অর্থাৎ ছাগদধি অতিশয় ধারক, লঘু, ত্রিদোষনাশক এবং অগ্নিদীপক; ইহা শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় এবং কৃশতা রোগে প্রশস্ত। দধি চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। চিনিমিশ্রিত দধি শ্রেষ্ঠ। ইহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত এবং দাহনাশক।

"সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।"

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না; ভোজন করিতে হইলে ঘৃত এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে।

"ননক্তংদধি ভুঞ্জীত"

শস্যতে দধি নোরাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বু ঘৃতান্বিতম্।
রক্তপিত্ত, কফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈবতৎ॥

অর্থাৎ রাত্রে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত এবং কফজরোগে দধিব্যবহার করা উচিত নহে। জলঝরা শুক্‌না দধি ধারক, কিন্তু দধির জল বিরেচক।

পুস্তকের উপর আক্রোশ

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন]

হিংসার মত মানবের শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। ইহার জ্বালাময়ী শিখায় মানবের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়। হিংসা মানুষকে পশুর অধম বানাইয়া ছাড়ে—পিশাচেরও হেয় করিয়া শ্মশান-ভূমিতে নাচায়। মানুষ আজও পশুর মত হিংসাতাড়িত হইয়া কামড়াকামড়ি, ছেঁচড়াছেঁচড়ি এবং শকুনি-গৃধিনীর মত অপরের মাংস-রুধির-লালসা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার সভ্যতা-গর্ব্ব কি শূন্যগর্ভ নহে?

প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে, যুদ্ধজয়ী মানবের উন্মাদনাবশে বিজিত জাতির সাহিত্যের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। মানুষ শত্রুর হাড় মাংস পিষিয়া উষ্ণ শোণিত স্রোতে স্নাত হইয়াও তৃপ্ত হয় নাই; তাহারা পুরুষপরম্পরাগত যত্নার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের উপরও চড়াও হইয়াছে।

রোমীয়েরা ইহুদীদিগের, খৃষ্টানদিগের এবং দার্শনিকদিগের গ্রন্থ-রাজি বহুবার ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ইহুদীরা খৃষ্টানদিগের পুস্তক পোড়াইয়াছিল। ঐতিহাসিক গীবন কুসংস্কারান্ধ খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক মিশরস্থ আলেকজান্দ্রা সহরের ভুবনবিখ্যাত বিদ্যামন্দির ধ্বংসের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ-সহকারে বলিয়াছেন—"বহুমূল্য লাইব্রেরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে, ইহার শূন্য পুস্তকাধারসমূহ ধ্বংসকালের পরবর্ত্তী বিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে ক্লেশের সঞ্চার করিত। সহস্র-সহস্র বৎসরের অর্জ্জিত মানবের জ্ঞান ও শ্রমের নিদর্শনস্বরূপ পুস্তকগুলিকে নির্দ্দয়তাসহকারে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। হায়! যদি আলেকজান্দ্রার বিদ্যাগারের এ দশা না হইত, তাহা হইলে প্রাচীনতম যুগের কত অন্ধকারে নিহিত রত্নরাজি আমাদের জ্ঞানানন্দ-বর্দ্ধনে সহায়তা করিত। বিজিত দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া কি ধর্ম্মান্ধদিগের দ্বেষানলের নিবৃত্তি হয় না?"

ইহুদীগণের প্রাচীন ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র তালমুদগুলি পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য খৃষ্টানদিগের বেজায় রোখ ছিল; পোপগণ এবং খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের খাড়া হুকুম ছিল, এগুলি যেখানে পাওয়া যাইবে—পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ইহুদীরা বহু কষ্টে তালমুদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইতে দেয় নাই। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ক্রেমোনা সহরে এই পুস্তকের বিংশতিসহস্র খণ্ড দগ্ধ করা হয়। জন্ রেউচলিন এই কার্য্যে বাধা দিতে যাইয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। যাহাতে পুঁথিগুলি ধ্বংস না হয়, সেজন্য তিনি রোমের দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রার্থনায় তালমুদধ্বংস কিছুকালের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বিজেতৃগণ প্রথমতঃ দ্বেষবশে জিতদেশের প্রাচীনতম ইতিহাস ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়। আইরীশগণের প্রাচীন ইতিবৃত্তসমূহ জেতৃহস্তে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আদিম কেল্টিক সাহিত্যও এক-

প্রকার লোপ পাইয়া গিয়াছে, আর তাহারা তাহা পাইবে না। মেক্সিকোরও সেই দশা। মেক্সিকোর যে প্রাচীন ইতিহাসগুলি খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে, তাহার অভাবে নবাবিষ্কৃত জগতের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইবে না। প্রাচীন মেক্সিকোতে চিত্রবিদ্যার বিশেষ আলোচনা হইত, সমস্ত বিষয় চিত্রাকারে বিবৃত থাকিত; খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ইহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইয়া চিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেগুলি পুনরায় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দেশবাসিগণ ঘৃণা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে কোনরূপে সাহায্য করে নাই।

কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন, খলিকা ওমর মিশরের আলেকজান্দ্রা সহর অধিকারপূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাগারের ৪০০০ হস্তলিখিত পুঁথি আরবে লইয়া যান এবং সেগুলি রন্ধনকার্য্যের জ্বালানি-স্বরূপ ব্যবহার করিতে আদেশ দান করেন। ছয়মাস ধরিয়া এই গ্রন্থরাজি চুল্লীবিবরে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ওমরের নাকি দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, এক কোরাণের দ্বারাই জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতে পারে। কোরাণ একমাত্র জ্ঞানভাণ্ডার। তদ্ব্যতীত অন্য কোন মানবশাস্ত্র জগতে প্রবর্ত্তিত হইতে দেওয়া ইসলাম-বিশ্বাসীর ধর্ম্মবিরুদ্ধ। গীবনাদি কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক—ওমরচরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ বলিয়া—ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু কাল-ধর্ম্মানুরোধে এরূপ আদেশ দেওয়া ওমরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে খোরাসানের অধিপতি আবদুল্ল্যা যখন পারস্যের অন্তর্গত নিশাপুর নগরে গমন করেন, তৎকালে তত্রত্য জনমণ্ডলী তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত কবি নশীর্ব্বানের প্রণীত একখানা হস্তলিখিত কাব্যগ্রন্থ প্রদান করেন। আবদুল্ল্যা এই উপহার ত সাদরে গ্রহণ করেনই নাই, পরন্তু তিনি আদেশ করেন, একমাত্র কোরাণ ব্যতীত দেশ এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে অন্য কোন পুস্তকের প্রয়োজন নাই। তিনি তৎসমক্ষেই উক্ত পুস্তকের সমগ্র সংখ্যা ভস্মীভূত করিতে আদেশ দান করেন। এই সঙ্গে পারসীক কবিগণের অনেক সুন্দর-সুন্দর কাব্য-গ্রন্থও নাকি উক্ত গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কার্ডিনাল সিমেনী গ্রানাডা অধিকার করিয়া পাঁচ হাজার কোরাণ অগ্নিসাৎ করেন। মুর যুদ্ধে স্পেনীয়গণের সেণ্ট ইসিডোরের ধর্ম্মপঞ্জী একরকম সবই সাবাড় হইয়া গিয়াছিল; কেবল বাকী ছিল টলেডো নামক সহরের পুঁথি কয়েকখানি। উক্ত সহরে ছয়টি গির্জ্জায় লোকে স্বেচ্ছাক্রমে ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিত। কিছুকাল পরে স্পেনীয়গণ মুরদিগকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। স্পেনরাজ ষষ্ঠ আলফোন্সাস্ হুকুম করেন যে, রোমীয় ধর্ম্মপঞ্জী ছাড়া কেহ অন্য কিছু ব্যবহার করিতে পারিবে না। স্পেনবাসীরা দেখিল, যে সরিষায় ভূত ছাড়িবে, সেই সরিষাই ভূত। টলেডোবাসীরা কিছুতেই রাজ-ব্যবস্থার স্বীকৃত হইল না। ইহাতে রাজমতাবলম্বী ও টলেডো মত-সমর্থক—এই দুই দলের সৃষ্টি হইল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে বিবাদের মাত্রা এত উচ্চে চড়িয়া গেল যে, দ্বৈরথ-যুদ্ধের সাহায্যে ইহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হইল। লড়াই বাধিবামাত্র টলেডো-পক্ষভুক্ত পালোয়ানের এক জবর ঘুষির চোখে রাজপক্ষের বীর ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু আলফোন্সাসের এ বিচার মনঃপূত হইল না। একটা ষণ্ডা জোয়ানের হাতের গুঁতোতে এত সত্বর এমন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, একদিন আগুন জ্বালিয়া উভয় পুঁথি পোড়াইতে হইবে। যাহার কেতাব সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, প্রাধান্য হইবে তাহারই। নির্ব্বাচিত দিবসে রাজার দল ও টলেডোর দল—এই উভয় দলে খুব পূজা আচ্চার ধুম পড়িয়া গেল; ভগবানকে আপনাদের দলে টানিয়া লইতে যতদূর করিতে হয়, কোন বিষয়ে কাহারও ত্রুটী রহিল না। এবারও টলেডোর পুঁথি বাজী জিতিল; কারণ তাহার পাতা সহজে পুড়িয়া গলিয়া যাইবার নহে—সেগুলি সব ধাতু নির্ম্মিত।

ধর্ম্মগোঁড়াদের উত্তেজনায় এইরূপে অনেক প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বহু গ্রন্থের অঙ্গহানি ত ঘটিয়াছেই; কারণ, এমন দেখা যায়, যে সমস্ত বিষয় প্রাচীন পুস্তকে ছিল অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তাহা নাই, মাঝে মাঝে টিকাটিপ্পনী জুড়িয়া ও নূতন মত ঢুকাইয়া দিয়াও পুস্তকের সততা নষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের পুরাণগুলি এমন কি রামায়ণ মহাভারতও এ দোষ-বিবর্জ্জিত নহে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

পোপ সপ্তম গ্রেগরীর হুকুমে প্যালেষ্টাইনের সারস্বত-মন্দির পোড়াইয়া দেওয়া হয়। অনেক রাজা বংশপরম্পরাক্রমে ইহার সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার খাড়া হুকুম ছিল,—পোপ-পুরোহিত-সভা যে সকল পুস্তক মঞ্জুর করিবেন, লোকে তাহাই পড়িবে; তদ্ব্যতীত অপরাপর পুস্তক বিষবৎ পরিত্যজ্য।

সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড কর্ত্তৃক প্রেরিত যেশুইটগণ (Jesuits) বোহিমিয়া দেশে লুথারমত ধ্বংস করিতে যাইয়া উক্ত দেশটাকে একেবারে শ্মশানভূমি করিয়া ফেলে। জাতীয় সাহিত্য নষ্ট হইয়া গেলে, বিজিত জাতি যতই কেন সভ্য হউক না, জেতৃদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার পক্ষে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

যেশুইটগণের অত্যাচারে বোহিমিয়া-সাহিত্য একেবারে উৎখাত হয়। কেহ জাতীয় ইতিহাস পড়িতে পাইত না, জাতীয় ভাষায় বই লিখিতে পারিত না, মাতৃভাষা নানা উপায়ে উপেক্ষিত হইত। এইরূপে আপনার সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বোহিমিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল।

অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে যে ধর্ম্ম-সংস্কার হয়, তাহার ফলে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিক লেখক জন বেল (Bale) এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। লাইব্রেরীর প্রাচীন পুস্তকগুলির দ্বারা লোকের বাসন মাজার কাজ চলিত এবং লোকে

সেগুলি অকেজো কাগজের সামিল করিয়া, পোঁটলা বাঁধিতে, দোকানদারের নিকট বিক্রী করিত; অথবা দেশে স্থানাভাব হইলে জাহাজে বোঝাই দিয়া বিদেশী দপ্তরিদের কাছে পাঠাইয়া দিত। পাছে কেহ ধ্বংস করে, এই ভয়ে অনেকে সাধের পুস্তকগুলি মাটিতে গর্ত্ত করিয়া অথবা দেওয়ালের গায়ে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া রাখিতেন। সংস্করণ-যুগে (Reformation) যে সকল পুস্তকের টাইটেল পেজে লাল অক্ষর থাকিত এবং যে পুস্তক নানারূপে সাজান গোছান থাকিত, সে গুলির আর পরিত্রাণ ছিল না, কারণ, সেগুলি যে পোপীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? পিউরিটানগণ (Puritans) ইহার ধ্বংসকার্য্যে খুব পটু ছিলেন। যাহাতে পোপীয় ভাবের একটু নাম গন্ধ থাকিত, তাহা ভ্রমক্রমেও তাঁহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত না। ইঁহাদের অনেক ধর্ম্মবীর কালাপাহাড়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতিমার নাক কাণ কাটিয়া টুণ্ডা করিতেন এবং ছবি খুঁড়িয়া উঠাইয়া ফেলিতেন। ইঁহাদের একজনের ডায়েরী হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"আমরা সানবেরীতে দশটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দেবদূত-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। বারহেমের গির্জ্জাঘরে বার জন সাঙ্গোপাঙ্গের মূর্ত্তি, চৌদ্দখানি কুসংস্কারপূর্ণ ছবি এবং একটি পৃষ্ঠে ক্রুশচিহ্ন-যুক্ত মেষশাবক-মূর্ত্তি গুঁড়া করিয়া আসিয়াছি। ইহা ছাড়া, মাটি খুঁড়িয়া সিঁড়ির ধাপের নীচে হইতে কয়েকখণ্ড পিত্তলফলক উঠাইয়াছি। শ্রীযুক্তা ক্রসের বাড়ীতে একখানা ঈশ্বরের পিতৃমূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তি, পবিত্রাত্মা এবং শয়তানের ছবি দেখিলাম। আমাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুক্তা সেগুলি নামাইয়া ফেলিবেন বলিলেন। অন্যত্র আমরা ছয়শত কুসংস্কার-ব্যঞ্জক ছবি, আটটি পবিত্রাত্মা ও তিনটি মানবপুত্রের ছবি নষ্ট করিয়াছি। এইরূপে আমি এবং আমার অনুচরবর্গ সর্ব্বসাকল্যে ন্যূনাধিক দেড়শত ধর্ম্মমণ্ডলের (Parish) সংস্কারসাধনে সমর্থ হইয়াছি।"

ইংলণ্ডে বারংবার গৃহবিবাদে তদ্দেশীয় বহু হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ধ্বংসসাধন ঘটিয়াছে। ফুলার বলেন, "আমি বেশ বলিতে পারি, আধুনিক ছয় বৎসরের গৃহবিবাদে জাতীয় সাহিত্যের যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ইয়র্ক এবং ল্যাঙ্কাসায়ারের ষাটি-বর্ষব্যাপী যুদ্ধেও তাহা হয় নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মাদনার বিষময় ফল ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্পষ্টতররূপে অনুভূত হইবে।

ইংলণ্ডীয় ক্যাথলিক মতের সমর্থক পুস্তকের স্বল্পতার প্রধান এবং স্থূল কারণ রাজরোষ। এমন কি ক্যাথলিকেরা রাজভয়ে নিজেরাই নিজেদের সযত্নরক্ষিত গ্রন্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সুইডেনের বিশ্ববিখ্যাত প্রোটেষ্টাণ্ট বীর গষ্টভাস (Gustavas Adolphus) যখন ব্যাভেরিয়া আক্রমণ করেন, তৎকালে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্যাভেরিয়ার ডিউকের সুন্দর প্রাসাদ ও গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি উহা সম্পূর্ণ অননুমোদন পূর্ব্বক বলিলেন "আমাদের নিরক্ষর পিতৃ-পুরুষগণ শক্রর প্রতি যে তীব্র হিংসাজ্বালা পোষণ করিতেন, তৎ-তাড়নায় তাঁহারা মানব-প্রতিভার উপরও বিষদন্ত বসাইতে ছাড়েন নাই। আমরাও কি তাঁহাদের কার্য্যের অনুসরণ করিয়া জগতে বর্ব্বরযুগের ভোগকাল বাড়াইয়া দিব?"

অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাও উন্মাদনা-প্ররোচিত জনতার হস্ত হইতে আর্ল ম্যানস্ফিল্ডের মূল্যবান হস্তলিখিত পুঁথিখানি রক্ষা করিতে পারে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় সহরেই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গায় ক্ষিপ্ত জনমণ্ডলী উক্ত পুস্তকখানি ভস্মীভূত করে।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের পুস্তকের দোকানগুলি বেশ একরকম ঝাড়াই হইয়া গিয়াছিল। যে সকল বড় বড় লেখকের উপর তাঁহাদের কেতাব পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম জারী হইয়াছিল, ওয়ারটন তাহার একটা লম্বা তালিকা দিয়াছেন। যেখানে পাও—চোর-ডাকাতের মত বইগুলিকে চুরী করিয়া বাহির করিয়া পোড়াইয়া ফেল। বিলম্বে শাস্তি। ইহা ছাড়া আরও আদেশ ছিল, কেহ ক্যাণ্টেরবেরীর আর্চবিশপ এবং লণ্ডনের বিশপের আদেশ ব্যতীত কোন সমালোচনা, নাটক এবং ছড়া ছাপাইতে পারিবে না। উপন্যাস, আখ্যায়িকা, গল্প, এগুলিও প্রিভিকাউন্সিল কর্ত্তৃক মঞ্জুর করিয়া লওয়া চাই। যেখানে যে পুস্তক পলাতক হইয়া আছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া লণ্ডন হাউসে দাখিল করিতে হইবে। তেজিঃতং সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"—মানব কবে এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে? *

আন্তর্জাতিক মহানীতি

বা

International Law

[শ্রীঅতুল চৌধুরী, এম-এ]

(বর্দ্ধমান-সাহিত্য-পরিষদ-শাখায় পঠিত)

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। সেটি "আন্তর্জাতিক মহানীতি" (International Law)। য়ুরোপে আজ যে ভীষণ কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছে, তাহাতে International Lawএর ধারাগুলা ওলট্-পালট্ হইয়া গেলেও, আমাদের যে তাহাতে কিছুই যায়-আসে না, এ কথা আজ আর নিশ্চিতভাবে বলিবার উপায় নাই। যুদ্ধ ব্যাপারটা যে কি—প্রত্যহ প্রাতঃকালে খবরের কাগজ পাঠ করিয়াই আমরা তাহা অনুভব করিতেছি। যুদ্ধসম্বন্ধে যে সকল

* D'israeliর সাহায্যাবলম্বনে লিখিত—লেখক।

মতামত আজকাল অবাধে চলিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা গোলযোগের কেন্দ্র হইতে যথাসম্ভব দূরে আছি ভাবিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবার আমাদের উপায় নাই। যাহাতে সাধারণে বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যাপারটা International Lawএর দর্পণে ফেলিয়া সঠিকভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমার মত লোক কেবল এ বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিতে পারে; ইহার বিশদ আলোচনার ভার বিজ্ঞতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হউক, ইহাই আমার বাসনা।

International Law কয়েক বৎসর মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল দুই-চারিজন সখ্ করিয়া এ বিষয়ে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতায় আজ Prize Court স্থাপিত হইয়াছে, নতুবা, ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যেও এ বিষয় জানিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

এরূপক্ষেত্রে, সাধারণ লোকে বর্ত্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বুঝিতে যে পদে-পদে ভুল করিতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আজিকার এই ভীষণ সমরে বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে কে এই নীতি মানিয়া চলিল, কেই বা ইহা লঙ্ঘন করিল, তাহার মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে, এতদ্বিষয়ে আমাদের বিচার-শক্তি বিকৃত হইবারই সম্ভাবনা। এই অবসরে যদি International Lawএর বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়, তবে তাহা যে শুধু সাধারণের কৌতূহল নিবারণ করিবে, তাহা নহে, তাহাদিগকে অনেক অসম্ভব কল্পনা ও আজগুবি জল্পনার হাত হইতে অব্যাহতি দিবে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব, এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। আমার আজিকার প্রবন্ধ কেবল তাহার ভূমিকা।

International Lawএর বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়া প্রথমেই কথা-দুইটি লইয়াই একটু গোলে পড়িতে হয়। International Law বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই দুইটি কথার দ্বারা ভাল বুঝা যায় না। অধ্যাপক Lawrence, International Lawএর পরিবর্ত্তে Inter-State Law বলিতে চাহেন; আবার Austin সাহেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণের মত এই যে, যাহাকে International Law বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা International Morality; কারণ, Lawএর যাহা প্রধান উপকরণ, সেরূপ ইহাতে নাই। কেহ এই নীতি অমান্য করিলে অপরাধীকে দণ্ডনীয় করিবার জন্য কোনও চরম বিচার-পদ্ধতির পশ্চাতে কোনও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বর্ত্তমান নাই। ইহা কেবল নৈতিক নিয়মাবলী। ঔচিত্যের খাতিরে সকল জাতিরই এই সকল নৈতিক অনুজ্ঞা মানিয়া চলা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু যদি কেহ তাহা না মানে, তবে তাহাকে শাসন-দণ্ডে বিনত করিবার ক্ষমতা কাহারও উপর ন্যস্ত হয় নাই এবং তাহা হওয়াও সম্ভবপর নহে। Austin সাহেবের এই মত এক্ষণে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। বিশেষতঃ, Law কথাটা এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবার কোনও হেতু নাই। সমাজের মূলেও যেমন কোনও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বর্ত্তমান নাই, যথেচ্ছাচারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য প্রচলিত প্রথা ও ব্যক্তিগত মতের সমষ্টিই যেমন যথেষ্ট, প্রত্যেক রাজশক্তিকে ব্যক্তিবিশেষ ধরিয়া এই রাজন্য সমাজও সেইরূপ লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ, কিংবা সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের কোনও দণ্ডবিধি নাই, অথচ, ন্যায় কি অন্যায় বিচার না করিয়া, সমাজের এই নীতি সমাজস্থ সকলে পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রচলিত প্রথা এতাবৎকাল সমভাবে পালন করিয়া সমাজ যে ব্যক্তিবিশেষ হইতে একটি পৃথক মন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার শাসন ক্ষমতার নিকট অতি-বড় বিদ্রোহীর মস্তকও নত হইয়াছে।

Law জিনিষটা কাগজ-কলমের ব্যবস্থা। মানুষ 'আইন' মানিয়া চলে—তাহার কারণ ইহা নয় যে, তাহা 'আইন'; তাহা মানিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই তাহা 'আইন'। আইন ও বিচারালয় কেবল মানুষের এই চলিবার ব্যবস্থা সংযত ও সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রচলিত মনোভাবের উপরেই আইনের ইষ্টক-কারাগার প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ বহুশতাব্দী ধরিয়া যে রাষ্ট্র-সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহারও মূলে এই শক্তি বিরাজ করিতেছে। এই সমাজ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও এক সামাজিক 'মন' গঠিত করিয়াছে; এবং ইহা প্রত্যেক রাজশক্তির ব্যক্তিগত মত হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই সামাজিক মতের অনুজ্ঞাও প্রত্যেক জাতি নতশিরে বহন করিতে বাধ্য। তদ্ব্যতীত, এই সমাজের ব্যবস্থা এখন আর কোনও শিথিল মতামতের উপর নির্ভর করে না। ইহার বিধি-ব্যবস্থা এক্ষণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং ১৯০৭ খৃঃ অব্দে Hague নগরে একটি চরম বিচারালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজিকার এই যুদ্ধ না বাধিলে, অচিরাৎ শাসন-বিভাগও (Executive organ) গঠিত হইত। Austin সাহেব আন্তর্জাতিক নীতির এই শুভ পরিণতি দেখিয়া যান নাই। এক্ষণে এই নীতি অমান্য করিলে অপরাধীকে শাস্তি লইতে হয়। সত্য বটে, কোন-কোন জাতি সময়ে-সময়ে এই নীতি অমান্য করে ও করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই নীতিকে Law না বলিবার কোনও কারণ নাই। সমাজেও চোর-ডাকাইতে আইন মানে না; কিন্তু তাই বলিয়া আইন-আদালত বন্ধ হইয়া যায় নাই; কারণ, সকলে আইন মানিলে আর আইনের কোনও প্রয়োজন থাকে না। Souvain ভস্মে পরিণত করিয়া Germany আজ আইন মানিল না, কিন্তু তাই বলিয়া Hague Conferenceএর যে ধারা ইহাকে দণ্ডনীয় বলিয়াছে, তাহা ভস্মীভূত হইল না। Germanyকেও বর্ত্তমান যুদ্ধের সমস্ত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। পরাক্রান্ত "যুক্তরাজ্যের" জনৈক কাপ্তেন "ভেনেজুলার" সমুদ্র-সীমানার মধ্য দিয়া যাইবার সময় "ভেনেজুলা" গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে সম্মানসূচক তোপধ্বনি করে নাই বলিয়া, আন্তর্জাতিক বিচারে, "যুক্তরাষ্ট্রের" "প্রেসিডেণ্ট" উক্ত অপরাধী কাপ্তেনকে ভেনেজুলা গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া-

ছিলেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ সেনাপতি স্বয়ং যাইয়া ভেনেজুলার সমুদ্র-সীমানায় যুক্তরাজ্যের পতাকা নষ্ট করিয়াছিলেন। আজ সমগ্র য়ুরোপ-জুড়িয়া যুদ্ধ না বাধিলে, Germanyকেও তাহার নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য হাতে-হাতে ফলভোগ করিতে হইত। Hall সাহেব ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে আন্তর্জাতিক-মহানীতির নিয়মাবলী আরও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে, তাহার বিচার পদ্ধতি, ও শাসন-কার্য্য আরও সুনিয়মিত করিতে, একটি দেশব্যাপী সমরের প্রয়োজন এবং সেরূপ সমরও অনিবার্য্য। প্রত্যেক যুদ্ধের পরই আন্তর্জাতিক-নীতির পরিণতি দেখা গিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধ প্রণালী কিরূপ লোকক্ষয়কর ও বাণিজ্যের কিরূপ ক্ষতিকারক—তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত রাজ-শক্তি আপনাপন কর্ম্মের দ্বারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক মহানীতির এই শিথিলতা অপরিহার্য্য। Hall সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এক্ষণে আশা করা যায়, এই ভীষণ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। আন্তর্জাতিক নীতি Sanction of Warএর পরিবর্ত্তে Sanction of Judicatureকেই প্রাধান্য দিবে।

আমরা যে নীতির আলোচনা করিতে বসিয়াছি, প্রাচীন ভারতে তাহা কি ভাবে ছিল, অথবা ছিল কি না—সে গবেষণা প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের উপর ন্যস্ত হউক। আধুনিক "আন্তর্জাতিক নীতি"র জন্ম-স্থান য়ুরোপ। এ সম্বন্ধে সমুদায় গ্রন্থই বৈদেশিক ভাষায় লিখিত। ইদানীং একজন এসিয়াবাসী জাপানি কেবল এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার নাম Takahasi; পুস্তকের নাম—International Law, as applied to Russo-Japanese war। সুতরাং বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক মহানীতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে হইলে, সঠিক বঙ্গানুবাদ একরূপ অসম্ভব। অনুবাদে যথাসম্ভব ভাব বজায় রাখা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমি সেই চেষ্টাই করিয়াছি।

প্রথমেই, International Lawএর বাংলা অনুবাদ করিতে হইলে, Nation অর্থে কি বুঝায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ইংরাজিতে যাহাকে Nation বলে, সেই ভাবটি স্পষ্ট বুঝাইতে পারে, বাংলায় এরূপ কোনও প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাই না। আমরা যাহাকে 'জাতি' বলি, তাহা ঠিক্ Nation নহে। জাতি বলিতে Nation, race, caste এই তিনই বুঝায়।

দ্বিতীয়তঃ, Lawএর পরিবর্ত্তে "আইন" এই ফারসি কথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আইন কেবল Municipal Law। Law অর্থে নীতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু নীতি শব্দটিও বহু অর্থ-বোধক। সুতরাং আমি International Lawএর অনুবাদে "আন্তর্জাতিক মহানীতি" বলিয়া যে ভ্রমে পড়িতে পারি, তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। তবে International Lawএর পরিবর্ত্তে "আন্তর্জাতিক মহানীতি" বলিলে কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। "মহানীতি" বলিয়াছি, তাহার কারণ, সমস্ত রাজশক্তি যে নীতি মানিয়া চলিতেছে, এইরূপ একটা বিশেষণ দিয়া তাহাকে অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়া না দিলে ভাবের গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় না।

এক্ষণে এই "আন্তর্জাতিক মহানীতি" কি? বহুসংখ্যক "সভ্য" রাজশক্তি, পরস্পরের সহিত রাষ্ট্র-ব্যবহারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল প্রথার অনুসরণ করে এবং যে সকল নীতি মানিয়া চলে, তাহার সমষ্টিকে "আন্তর্জাতিক মহানীতি" বলে। সংজ্ঞাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

"সভ্য" রাজশক্তি বলিলাম; কারণ, যে কোনও রাজশক্তি এই রাজন্যমণ্ডলে (Concert of Nations) প্রবেশাধিকার পাইবে না। যে রাজশক্তি তাহার রাষ্ট্র-ব্যবহারের দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারে যে, সে আধুনিক আন্তর্জাতিক সভ্যতায় শিক্ষিত, কেবল তাহাকেই এই রাজন্য-সভার সভ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। তুরস্ক ১৮৫৭ সালের পর তবে এই মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। চীন ১৯০৭ সালে রাষ্ট্র-দূতের সহিত আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া, তাহাকে এই মণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে কয়েকটি জাতি আজিও এই মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পায় নাই, মণ্ডলস্থ জাতিসকল তাহাদের সহিত রাষ্ট্র ব্যবহারে আন্তর্জাতিক-নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

দক্ষিণ-আমেরিকার স্বাধীন খণ্ডদেশগুলির মধ্যে অনেকে এখনও এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহাদের রাষ্ট্র-ব্যবহার আন্তর্জাতিক মহানীতির সীমা অতিক্রম করিতেছিল বলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই সকল রাজ্যের অভিভাবক হইয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিনও বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ সাহেব এইভাবে একটি আসন্ন বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন। মোট কথা, এই রাজন্য-মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পাইবার উপযুক্ত শিক্ষা ও সভ্যতা অর্জ্জন না করিলে, এখন আর কোনও জাতির কল্যাণ নাই। যেহেতু মণ্ডলস্থ জাতিসমূহ, মণ্ডল-বহিভূর্ত জাতির সহিত যথেচ্ছব্যবহার করিতে কুণ্ঠা-বোধ করে না।

বহুসংখ্যক জাতি—"অধিকাংশ ক্ষেত্রে"—রাষ্ট্র-ব্যবহারে যে নীতির অনুসরণ করে, কেবল সেই সকল নীতিই 'আন্তর্জাতিক মহানীতি'র অন্তর্গত। পক্ষান্তরে, যে সকল নীতি এখনও অধিকাংশ জাতি অনুসরণ করে না, কিংবা যে সকল নীতি দুই-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা নৈতিক বা অন্য কোনও কারণে সম্মানযোগ্য হইলেও, তাহা এখনও আন্তর্জাতিক মহানীতি বলিয়া গণ্য হইবে না। কোন কোন নীতি হয় ত প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অধিকাংশ জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাপন রাষ্ট্র-ব্যবহারে, অথবা সন্ধি-পত্রের দ্বারা, উহা আন্তর্জাতিক প্রথা বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইবে, ততক্ষণ তাহা নৈতিক হিসাবে আদর্শস্থানীয় হইলেও, আন্তর্জাতিক নীতি নহে। আন্তর্জাতিক নীতির গ্রন্থকারদের উচিত, প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবহারের সম্মুখে আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবহার-চিত্র দেখান; কিন্তু তাহা কেবল আদর্শ। যতক্ষণ না এই আদর্শ ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রচলিত বা সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে, ততক্ষণ

উহা এই মহানীতির মধ্যে স্থান পাইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে,—আন্তর্জাতিক "শিষ্টাচার" আন্তর্জাতিক "মহানীতি" নহে। প্রচলিত রাষ্ট্র-ব্যবহারই এই মহানীতির প্রধান সম্বল। ইহাই Hall, Lawrence, Wheaton প্রমুখ গ্রন্থকারদের মত। আন্তর্জাতিক নীতির স্থষ্টিকর্ত্তা Grotiusএর মতে এই নীতি আর কিছুই নহে, কেবল বিচ্ছিন্ন মানব-সমাজ জাতীয়তার স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সমাজে শান্তিস্থাপনকল্পে যে সকল প্রথা মানিয়া চলিত, প্রত্যেক জাতিকে ব্যক্তিবিশেষ ধরিয়া আজ যে রাজন্য-সমাজে গঠিত হইয়াছে, ইহাও সেই সমাজের ও সেই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। এই মহানীতির উদ্ভব কোথা হইতে, রাষ্ট্র-সমাজের এই সামাজিকতা ও লৌকিকতার মধ্যে প্রত্যেক রাজশক্তি আপনাপন বিবেক-শক্তি-পরিচালিত হইয়া কোনও নৈতিক অনুজ্ঞা মানিয়া আসিতেছে কি না, আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরূপ গবেষণার স্থান সঙ্কুলান হইবে না। মোটামুটি আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজে বাস করিতে হইলে যেমন কতকগুলি প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হয়, এই মহাসমাজে বাস করিতে হইলেও, সেইরূপ কতকগুলি রীতি-নীতির অনুসরণ করিতে হয়। যদি কোনও জাতি কোনও বিশিষ্ট বা বিভিন্ন প্রথা অনুসারে চলিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, ঐরূপ প্রথা ঐ জাতির মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; নতুবা তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

"আন্তর্জাতিক মহানীতি" প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত :—

১ম—শান্তি-নীতি। এক জাতি শান্তিকালে অন্যান্য জাতির সহিত রাষ্ট্র-ব্যবহারে যে রীতি-নীতির অনুসরণ করে, তাহা শান্তি-নীতি (Law of Peace)।

২য়—বিগ্রহ-নীতি। এক জাতি বিগ্রহকালে অপর জাতির সহিত রাষ্ট্র-ব্যবহারে যে প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ করে, তাহা বিগ্রহ নীতি (Law of War)।

৩য়—নিরপেক্ষ-নীতি। কোন যুদ্ধকালে-নির্লিপ্ত জাতি যুদ্ধ-প্রবৃত্ত জাতির সহিত রাষ্ট্র-ব্যবহারে যে নীতির অনুসরণ করে, তাহা নিরপেক্ষ-নীতি (Law of Neutrality)।

Lawrence সাহেব আবার "শান্তি-নীতি"কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা:—

১। জাতীয় স্বাধীনতাসংক্রান্ত অধিকার ও কর্ত্তব্য।
২। জাতীয় বিষয়-সম্পত্তিসংক্রান্ত অধিকার ও কর্ত্তব্য।
৩। জাতীয় প্রভুত্বসম্বন্ধীয় অধিকার ও কর্ত্তব্য।
৪। জাতীয় সাম্যসম্বন্ধীয় অধিকার ও কর্ত্তব্য।
৫। দৌত্য-কর্ম্মসংক্রান্ত অধিকার ও কর্ত্তব্য।

শান্তিনীতি

জাতীয় স্বাধীনতাসংক্রান্ত অধিকার ও কর্ত্তব্য

আন্তর্জাতিক মহানীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সমাজভুক্ত সকল জাতিই সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব জাতীয়-জীবন গঠন করিতে এবং তদনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই অধিকার সীমা অতিক্রম করিয়া অপর জাতির এই একই অধিকারের অন্তরায় হয়, ততক্ষণ অন্যান্য জাতি তাহার এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে এবং অন্য জাতির জাতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইবে, তখনই অন্যান্য জাতি আত্মরক্ষার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তাহা নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফরাসী জাতি এই অধিকার অনুযায়ী স্বকীয় জাতীয়-জীবন পুনর্গঠিত করিবার জন্য, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল, ততক্ষণ তাহার এই অন্তর্বিপ্লবে অন্যান্য জাতির হস্তক্ষেপ করিবার কোনও বৈধ কারণ ছিল না। কিন্তু যখনই নেপোলিয়ন, "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" পতাকা উড্ডীন করিয়া অপরাপর জাতিকে এই নবপ্রচারিত মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখনই তাহা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইল, তৎপূর্ব্বে নহে। আজিকার এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ Austriaর যুবরাজের হত্যাকাণ্ড নহে; প্রকৃত কারণ এই যে, ক্ষাত্র-সভ্যতার পক্ষপাতী জার্ম্মান-রাজশক্তি তাহার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, তাহার দেশাত্মজ্ঞানে, বৈশ্য-সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজশক্তি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ জাতীয়-জীবন গঠন করিতে, এবং এই জাতীয় উন্নতির অছিলায় অন্যান্য জাতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। য়ুরোপ আজ আত্মরক্ষার জন্যই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। আজিকার এ যুদ্ধ শুধু জার্ম্মানীর সহিত য়ুরোপের যুদ্ধ নহে, ক্ষাত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে বৈশ্য-সভ্যতার যুদ্ধ; ক্ষমতাপ্রিয়তার বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয়তার যুদ্ধ; বাহুবলের বিরুদ্ধে নীতিবলের যুদ্ধ; রাজশাসনের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের যুদ্ধ, এবং সর্ব্বশেষে, এক-জাতীয় আদর্শের বিরুদ্ধে অপর এক স্বতন্ত্র-জাতীয় আদর্শের যুদ্ধ। সুতরাং Serazevoর হত্যাকাণ্ড না হইলেও য়ুরোপীয় রাজশক্তিসমূহের যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

কিন্তু আত্ম-রক্ষার্থ পরকীয় রাষ্ট্র তন্ত্রে এইরূপ বাধা দিবার অধিকার আধুনিক আন্তর্জাতিক মহানীতি সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে; এবং ইহাকে একটি স্বতন্ত্র অধিকার না বলিয়া জাতীয় স্বাধীনতার অধিকাররূপ সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। সত্য বটে, ইতিপূর্ব্বে দুই-এক ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মহানীতি 'বাধা প্রদানের অধিকার' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে, ক্ষেত্রবিশেষে এই অধিকার মানব-উন্নতির পক্ষে সুফলপ্রদ হইলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে ইহা অন্যায় ও অত্যাচারেরই নামান্তর। ক্ষমতাশালী রাজশক্তি এই অধিকারের দোহাই দিয়া অনেক সময় স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধবোধ করে নাই; এবং সেইজন্য আধুনিক মহানীতি এই অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। যথা:—

১। যদি কোনও জাতি সন্ধিপত্রের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তবে সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে কেবল তাহাদের মধ্যেই এই অধিকার গ্রাহ্য হইবে।

২। যখন কোনও জাতি আন্তর্জাতিক মহানীতি অমান্য করে, তখন যে কোনও জাতি অপর সকল জাতির সম্মতিক্রমে তাহার এই কার্য্যে বাধা দিতে পারে।

৩। যখন কোনও জাতি অপর জাতির স্বাধীনতার অধিকারে বাধা দেয়, তখন সকল জাতি একযোগে, কিংবা একজাতি অন্য সকলের সম্মতি ক্রমে তাহার এই কার্য্যে বাধা দিতে পারে।

Oppenheim সাহেবের মতে উক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাধীনতায় বাধা দিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ আন্তর্জাতিক মহানীতি স্বীকার করে না। তাঁহার মতে, জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার একটি সর্ব্বপ্রধান অধিকার। বাধা দিবার অধিকার কোন অধিকার নহে। ইহার মূলে ক্ষমতার প্রাধান্য বিরাজ করিতেছে। নিয়ম অমান্য করিবার এইরূপ সুবিধাজনক নিয়ম যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

হইতে পারে, Oppenheim এর এই মত সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু আন্তর্জাতিক মহানীতি যদি প্রচলিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই নীতি এখনও আজিকার মহানীতি নহে, কারণ উক্ত তিন ক্ষেত্র ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বাধা দিবার অধিকার সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্বীকার করা হইয়াছে। যথা:—

১। যখন কোনও রাজশক্তি প্রতিবেশি রাজশক্তির অন্তর্বিপ্লবে স্বকীয় রাষ্ট্রতন্ত্র বিপদসঙ্কুল মনে করে এবং বিপদ আসন্ন জানিয়া বাধা প্রদান করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ Canada ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য বিপ্লব ঘোষণা করিলে, প্রতিবেশি রাজশক্তি United States ঘোষণা করিয়াছিল যে, England ও Canadaর অন্তর্বিপ্লব তাহার রাষ্ট্র-তন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক ও সেই কারণে আত্মরক্ষার জন্য সে যে কোনও পক্ষে যোগ দিবে।

২। সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের পক্ষে বাধা প্রদানও দুই এক ক্ষেত্রে স্বীকার করা হইয়াছে।

গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ (Greek War of Independence) একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড ও রুসিয়া এই যুদ্ধে গ্রীসের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া সমগ্র ইউরোপের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছিল।

৩। ক্ষমতার সাম্য-রক্ষা-কল্পে বাধা প্রদান (Balance of Power)। ইতিহাসে এ অধিকারের দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মোট কথা, জাতীয়-জীবন গঠন করিতে ও তদনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে, প্রত্যেক জাতির স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার, একটি সর্ব্বপ্রধান অধিকার। যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত কোনও এক জাতি অন্যের এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে আন্তর্জাতিক মহানীতি ইহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লয়। কেবল যখন সকল জাতি একযোগে আন্তর্জাতিক সমাজে অন্য এক জাতির স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্য নিবারণের জন্য তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তখনই তাহা ন্যায়সঙ্গত। "স্বাধীনতার অধিকার" ও "বাধা-প্রদানের অধিকার" এই দুইটি পরস্পর বিপরীত অধিকার। ইহাদের মধ্যস্থিত পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। নেপোলিয়ন স্বকীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন, তখন তিনি এই "স্বাধীনতার অধিকারের" অবমাননা করিয়াছিলেন। আবার যখন নেপোলিয়নের পতনের পর, রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া রাজশাসনের প্রচারকল্পে নেপোলিয়ন-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র ধূলিসাৎ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, তাহারাও এই "বাধা দিবার অধিকারের" অবমাননা করিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধ এই দুইটি বিপরীত অধিকারের কিরূপ অনুবাদ অথবা প্রতিবাদ করিয়াছে, সেই বিষয়ে দুই-চারি কথা বলিয়া আমি আমার আজিকার বক্তব্য শেষ করিব।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মূল কারণ যে, দুইটি পরস্পর-বিরোধী সভ্যতার আদর্শ লইয়া—তাহা আমরা য়ুরোপের ইতিহাস হইতেই দেখিতে পাই। জার্ম্মাণীর জপ-মন্ত্র Militarism; ইংলণ্ড, ফ্রান্সপ্রমুখ জাতির জপ মন্ত্র—Industrialism। এই দুই সভ্যতা,—ক্ষাত্র ও বৈশ্য-সভ্যতা,—যে পরস্পর-বিরোধী, তাহা উভয় পক্ষই স্বীকার করেন। জার্ম্মান জাতি মনে, চরিত্রে, দেশাত্মজ্ঞানে, অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং militarismই তাহার যথার্থ স্বাভাবিক পরিণতি; অপর পক্ষে Industrialismই অন্যান্য জাতির ইতিহাসের স্বাভাবিক উপসংহার। এই দুই আদর্শের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্য কি, তাহার আলোচনা করিলেই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

Cherbuliez বলিয়াছেন, "Most countries, which have grown in size, have started with a compact territory and increased it by absorbing the adjacent lands, but that Germany began with her frontiers and afterwards filled in between them. The whole map of Germany, as it stood in the last century, was a mass of patches of different color, mingled together in bewildering confusion. The result was that Germany was divided in a most fantastic way among several hundred Princes, who, owed, it is true, a shadowy allegiance to the Emperor, as head of the Holy Roman Empire; but, for all practical purposes, were virtually independent."

যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি অগ্রগণ্য জাতি জাতীয় একতা লাভ করিয়া তদনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন জার্ম্মান জাতি পরস্পর-বিরোধী শতশত খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। জার্ম্মান সম্রাটও এই জাতীয় একতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ফলে জার্ম্মান জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কাব্য-দর্শনে ও কলাবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হইলেও রাষ্ট্র-শক্তিতে সকলের অপেক্ষা হীনবল

ছিল ; এবং দেশাত্মজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা জার্ম্মান জাতির ধারণার অতীত ছিল। নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান না হইলে জার্ম্মানির ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিত। যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান দৈব-ঘটনার উপর জার্ম্মানির রাষ্ট্র-জীবন নির্ভর করিতেছিল, তাহা নেপোলিয়নের ন্যায় শত্রুর এবং বিস্মার্কের ন্যায় মিত্রের অভ্যুত্থান। নেপোলিয়ন Jena যুদ্ধে পরাজিত হইয়া Confederation of Rhineরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত জাতিকে তাঁহার ভীষণ অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা দেশাত্মজ্ঞান ও একতার মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে বিসমার্ক "রক্ত ও লৌহে"র দ্বারা অষ্ট্রীয়াকে পরাভূত করিয়া উত্তর-জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করিয়া দক্ষিণ-জার্ম্মানীর যোগসাধন করেন ; অর্থাৎ বর্ত্তমান জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। Colonel Malleson তাঁহার Refounding of the German Empire নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Napoleon prophesied that within fifty years, all Europe would be either Republican or Cossack. One of the chief causes of the failure of this prediction has been the creation of a United Germany which Napoleon himself, unwittingly, helped to bring about."

ফরাসী-বিপ্লবের এই কঠোর শিক্ষা জার্ম্মান খণ্ডরাজ্যসমূহ অস্থিমজ্জায় উপলব্ধি করিয়াছিল। স্বাধীন খণ্ডরাজ্যসমূহের নৃপতিবৃন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই অকিঞ্চিৎকর স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া সমগ্র জার্ম্মানীর জাতীয় সত্তায় বিলীন করিয়া দিতে না পারিলে, তাঁহারা য়ুরোপীয় রাজশক্তির সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। বিসমার্ক এই জার্ম্মান জাতিকে বেশ ভালরূপেই চিনিতেন। বিসমার্ক জানিতেন, জার্ম্মানীর প্রজাপুঞ্জের মনে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী দেশাত্মজ্ঞান জন্মে নাই। বিস্মার্ক জানিতেন, কেবল সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে জার্ম্মানীর বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি জাতীয় পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রয়োজনের কারণ চিরস্থায়ী করিতে পারিলেই তবে জার্ম্মানীর বিচিত্র মনোভাব একমুখী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, নতুবা নহে। বিস্মার্ক বাহিরে জার্ম্মানীর শক্তি যেরূপ তরবারির দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন, ভিতরেও সেইরূপ জার্ম্মানীর স্বাধীন নৃপতিবৃন্দকে ও বিভিন্নমতাবলম্বী প্রজাপুঞ্জকে শাসনতন্ত্রের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিস্মার্ক জানিতেন, তৎকালীন য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্র জার্ম্মানীর পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। কারণ জার্ম্মান জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত উপাদানে গঠিত। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ A. L. Lowell বলিয়াছেন, "The Germans are too little homogeneous, and their traditions of thought are too diverse, to allow any large part of the people to work together for a common end. One is constantly struck by the contradictions in the different phases of German character. Side by side, with the dreamy mystical turn of mind, there is a talent for organisation and a submission to discipline, that have made them the first military people of the day. Again, we are apt to attribute to German scholarship a peculiarly agnostic tendency, and yet no rulers in Christendom have the name of God so constantly on their lips as the German Emperor. Nor is there the least affectation or cant about this, for, the Germans are at the same time one of the most religious and one of the most skeptical of races. The fact is, that the people are divided into strata—social and intellectual—which are very different from one another in character and tone of thought." সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি Henreich Heine বলিয়াছেন "If twelve Germans were gathered together, they would form as many separate parties, for, the German has a strong love of intellectual independence and dislikes the idea of subordinating his opinion to that of another man."

এ হেন জার্ম্মানজাতি লইয়া বিস্মার্ক জার্ম্মানীর রাষ্ট্রতন্ত্র সৃষ্টি করিতে যাইয়া দেখিলেন, রাজশক্তির প্রাধান্য না থাকিলে কখনই জার্ম্মানী একরাট্ হইবে না ; বিচ্ছিন্ন প্রজাশক্তিকে শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রাখিলে আবার তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তরবারির অগ্রভাগে যেমন জার্ম্মানীর অভ্যুদয়, তেমনই তরবারির দ্বারাই তাহাকে একত্র রাখিতে হইবে এবং তরবারির সাহায্যেই তাহাকে আপনার উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে হইবে। তাই, যখন সমগ্র য়ুরোপ মধ্যযুগের সমরলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হইল, তখন জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-প্রাঙ্গণে আবার মধ্যযুগের ন্যায় অস্ত্রের ঝনৎকার শুনিয়া বৈশ্যযুগের য়ুরোপ চমকিয়া উঠিল। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব যেমন জার্ম্মানীকে সমরনিপুণ করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে য়ুরোপকে স্বায়ত্ত-শাসনের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। একদিকে জার্ম্মানী রাজশাসনের দ্বারা জাতীয় উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ ক্ষাত্র-সভ্যতাকে বরণ করিয়া আনিল, অন্যদিকে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত য়ুরোপ বৈশ্য সভ্যতাকে মানবোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া গণ্য করিল।

এই পর্য্যন্ত হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই দুই সভ্যতা বিপরীত-মুখী হইলেও জার্ম্মানীর এবংবিধ জাতীয় জীবনে ও তদনুযায়ী রাষ্ট্রতন্ত্রে, আন্তর্জাতিক মহানীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিল না ; এবং ইংলণ্ডপ্রমুখ বৈশ্য রাজশক্তি আত্মরক্ষার্থে লৌহবর্ম্ম পরিয়াও জার্ম্মানীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিত। কিন্তু জার্ম্মানী তাহার এই নবলব্ধ ক্ষাত্রনীতি স্বকীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। এই ক্ষাত্রনীতিই যে আদর্শ

নীতি, তাহাই সম্রাট, রাজনীতজ্ঞগণ ও দেশহিতৈষিগণ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। Emperor William ইতিহাস-শিক্ষা-প্রণালীসম্বন্ধে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা Valhert সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "The present method of teaching history is all wrong. Instead of beginning with Greece and Rome, and coming down to recent times, we ought to begin with the present century and then go backwards.........In my opinion, the object of education is to teach politics, to create obedient subjects and loyal supporters of the crown, and the constitution which is the best possible form of Government, namely a military monarchy."

অধ্যাপক Sritschke বলেন "The unity of the fatherland has been brought about by means of the drill-sergeant and hence the nation is to be ruled by his methods." জার্ম্মাণী য়ুরোপের বৈশ্য সভ্যতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, এবং তরবারির অগ্রভাগে ক্ষত্রিয় সভ্যতার জয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এই দিগ্বিজয়-কল্পনা যে শুধু আদর্শের প্রতি অনুরাগবশতঃ, তাহা নহে। সে জানে, তাহার জাতীয় জীবন মাত্র ৫০ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। এত বিলম্বে আসিয়া শিল্পবাণিজ্যে সকলের উপর উঠিতে হইলেও প্রতিযোগিতা তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই সে বাহুবলের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চায়। য়ুরোপও জার্ম্মানীর এই উচ্চাভিলাষ ও সমরায়োজন দেখিয়া ত্রস্ত হইয়াছিল, এবং বাহিরে যতই শিষ্টাচার দেখাক, ভিতরে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য জানিয়া প্রস্তুতও হইতেছিল। সেদিন পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় সকল জাতি জার্ম্মানীর এই স্বাধীনতার অধিকারে বাধা দিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু সে জানিত তাহার বৈশ্য-সভ্যতা, স্বায়ত্ত-শাসন ও জাতীয় মনোভাব বজায় রাখিতে হইলে, এই নববলদৃপ্ত উচ্চাভিলাষী ক্ষত্রিয়রাজশক্তির সহিত একবার বাহুবল পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যায় নাই। গত ১৯১৩ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে য়ুরোপের এই আগ্নেয়গিরি যখন ধূমোদ্গীরণ করিয়া উঠিল, তখনও ইংলণ্ড ইতস্ততঃ করিতেছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জার্ম্মান-বাহিনী নিরপেক্ষ বেলজিয়মের সীমানায় পদার্পণ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই ইংলণ্ড তাহার এই কার্য্যে বাধা দিবার অধিকার ঘোষণা করিল; কারণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সন্ধিপত্রে বেলজিয়মকে নিরপেক্ষ করিয়া রাখা হইয়াছিল। য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশে জার্ম্মনীর অভ্যুদয়ে যে জটিল সমস্যার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সুচারু মীমাংসার জন্য, য়ুরোপে চিরশান্তি স্থাপনের জন্য, এবং আন্তর্জাতিক নীতিকে প্রবল করিবার জন্য, যে এইরূপ একটা ভীষণ পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মশক নিবারণ

[শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়]

মশকেরা প্রায়ই শব্দ ও বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গুন্ গুন্ স্বরে গীত গাহিয়া মশককে আকৃষ্ট করা যায়। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল, একবার তারকেশ্বর অঞ্চলে জনৈক উচ্চবংশসম্ভূত ও শিক্ষিত ব্যক্তি নিম্নস্বরে হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া প্রায় দেড় হাজার মশক আকর্ষণ করেন। অনেক সময়ে মাঠে দেখা গিয়াছে যে, পাঁচ ছয় জনের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক কথা কহে, তাহার মস্তকের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশক আসিয়া একত্র হয়।

মশকেরা গাঢ় নীলবর্ণের বড় ভক্ত—কিন্তু হরিদ্রাবর্ণের উপর বিশেষ বিরক্ত। নীলবর্ণের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে একটা ঘর একেবারে মশকপূর্ণ হয়। একদিন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ নীলবর্ণের একটি বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করেন ও পরে সকালে উঠিয়া দেখেন যে, ঘরটি একেবারেই মশক পরিপূরিত। এক সময়ে আমি এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে অবগত হই যে, একদিন এক নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তি একখানি নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করে। গভীর রাত্রে এত অধিক মশক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে যে, তাহাকে গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য করে; কিন্তু মশকদল সঙ্গ ছাড়িল না, তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সে পার্শ্বস্থ জনৈক গৃহস্থ ব্যক্তির বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু সেখানেও মশক তাহাকে আক্রমণ ও দংশন করে। সে দংশনের জ্বালায় অস্থির হইয়া সারারাত্রি সমস্ত গ্রামখানি ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা অদ্ভুত বটে!

একজন সৈনিক আফ্রিকা দেশে গিয়াছিল। সে মশক নিবারণার্থে নিজে কাফিপোষাক পরিধান করে ও একস্থানে নীলবর্ণের অনেক বালিশ একত্র করিয়া রাখে। মশকগণ সৈনিক ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া নীলবর্ণের নিকট একত্র হইল।

ব্যাক্টি ও লজিকেল পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,—

নীলবর্ণে	১০৪
গাঢ় হরিদ্রাবর্ণে	নাই
গাঢ় রক্তবর্ণে	৯০
ঈষৎ সবুজবর্ণে	৪
ঈষৎ নীলবর্ণে	৩
শ্বেতবর্ণে	২
কমলা লেবুর বর্ণে	১

তাঁহারা বহু গবেষণার পর ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ইহা বহুবার পরীক্ষার দ্বারা স্বতঃপ্রমাণ করিয়া দেন।

একবার কতকগুলি ইংরাজপুরুষ বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা মশকবৎ ধ্বনি উৎপাদন করায় শতসহস্র মশক এই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি হরিদ্রাবর্ণের মোজা পরা যায় ও

বাক্য বন্ধ করিয়া থাকা যায়—তাহা হইলে মশক দংশন হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মশকগণ প্রায়ই পায়ে দংশন করে। হরিদ্রাবর্ণের মোজা ব্যবহার এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। স্ত্রী মশকেরা দংশন করে ও পুংমশকেরা শব্দ উৎপাদন করে।

নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ।

মহারাজপুর-কাঠগড়া ও "বালোসা" রাজার গড়

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ]

খনন কার্য্য ভিন্ন প্রত্নসম্পদের উদ্ধারের আশা অনেক স্থলেই বৃথা জানিয়াও কেবলমাত্র ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আলোচ্য বিষয়ে আকর্ষণের জন্য আমার এই প্রয়াস। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কাঠগড়াতে সংগৃহীত ইষ্টক প্রদর্শন উপলক্ষে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম। সাধারণের অবগতির জন্য সে আলোচনা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিলাম।

সম্প্রতি নদীয়াজেলাতে "বালোসারাজার গড়" নামে এক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষ অবশ্য আমি তৈয়ার করিয়া নদীয়া জেলার গণ্ডীর ভিতরে ফেলি নাই। এই গড় কৃষ্ণনগরের নয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থিত। গত পূজার অবকাশে একদিন এই গড় দেখিতে পদব্রজে রওণা হই। গড়ে যাইবার পথে মহারাজপুর নামে একটি গ্রাম অতিক্রম করিতে হয়।

মহারাজপুর অতি প্রাচীন গ্রাম। অনেক পুরাতন গ্রামের ন্যায় এগ্রামও জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রামের উত্তর অংশে "রাজার দীঘি" নামে একটি মজা সরোবর দেখা যায়। ইহার চারি পাড়ে গভীর বন। সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বটগাছের তলে একটি পাতলা "আদ্রা ইটের" ঢিপি মহারাজপুরের রাজার বাড়ীর অবশেষ বলিয়া অধুনা নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থানটি জলঙ্গী নদী হইতে মাইলখানেক দূর। এখানে বড় বাঘের ভয়। কোন গ্রামের পুরাতত্ত্বের আলোচনার সহিত গ্রামের নামের উৎপত্তির আলোচনাটাও থাকার আবশ্যক, জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের এইরূপ মত। শুনা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে স্থানীয় কোন বিস্মৃতনামা নরপতির সংস্রবে গ্রামের মহারাজপুর নাম হইয়াছে। একজন কৃষক দীঘির উত্তরের মাঠে ধান কাটিতেছিল। সে বলিল, রাজার কাছারীবাড়ী ও কেল্লার নিকটে কাঠগড়া গ্রামে ছিল। এ কথায় কতখানি সত্য আছে, জানি না। শুনিলাম, মহারাজপুর হইতে দেপাড়া পর্য্যন্ত প্রায় ১২ মাইলের মধ্যে ১২৮টী মজা ও তাজা পুকুর দেখা যায়। গ্রামের মধ্যেও বহু পুষ্করিণী মজা অবস্থাতে দেখিতে পাইলাম। নগরীর জন্য বহুল জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে দেখা যায়।

এখন কাঠগড়ার গড়ের কথা আলোচনা করা যায়। পরিখা খননের সময় তাহার একধারে যে মাটি স্তূপীকৃত করা হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই গড় বলে, আবার কখন কখনও পরিখাকেও লোকে গড় বলিয়া থাকে। কাঠগড়া গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটি প্রায় চতুষ্কোণ ও অনুন্নতশীর্ষ মালভূমি বিশেষ দেখা যায়। ইহাই আলোচ্য গড়। ইহার উচ্চতা ৭।৮ হাতের বেশী নয়। গড়ের উপরিভাগে যে সকল গৃহের ভিত দেখা যায়, তাহা প্রায় তিনহাত চওড়া। উপরে পদক্ষেপে নাকি ভিতরে গম্ গম্ শব্দ হয়! ভিতগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে "আয়ত" আকারের প্রকোষ্ঠের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ গুলিতে বোধ হয় প্রহরী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। পাটনা খননকার্য্যেও ও প্রোথিত প্রাচীরে এইরূপ "প্রহরীর খোপ" পাওয়া গিয়াছে, শুনিয়াছি। গড়ের উপরে নক্সার ইটও দুএকখানি পাওয়া যায়। এরূপ একখানি ইট বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইষ্টকের উপরে ভুজঙ্গ-দামবেষ্টিত একটি পদ্মফুল অঙ্কিত দেখা যায়। ইহা কাহারও মতে নারায়ণের অনন্ত-শয্যার জ্ঞাপক। গড়ের পূর্ব্বে পুষ্করিণী ও দক্ষিণে ইন্দারার চিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। (প্রাচীনদের মুখে শুনা যায়, তাঁহাদের বালককালে যখন ইন্দারাতে জল ছিল, তখন উহাতে একটি কুম্ভীর ও একজোড়া মাছ থাকিত; কুম্ভীর ও মাছের মাথাতে সিন্দুর ঢালা ছিল!) গড়ের উত্তর দিয়া "কলিঙ্গের বিল" বাহিত। Bengal Revenue Settlement এর Record এ কলিঙ্গের নীচে বাহিত একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নদীর চূর্ণীর সহিত যোগ ছিল। বিলের কাঁদায় খনন-উপলক্ষে সময়ে সময়ে নৌকার খোল, মহিষের গাড়ী, কুম্ভীরের কঙ্কাল প্রভৃতি প্রোথিত অবস্থাতে পাওয়া গিয়াছে, কলিঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার হালদার বি-এ, মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়াছি। বিলের উত্তরদক্ষিণের মাঠকে "ঝন্‌ঝনে করালী" ও বিলের অপরপারের মাঠকে "করালী ডেঙা" বলে। গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ এখনও "গড়ের মাঠ" বলিয়াই পরিচিত। গ্রামের নাম হইতে অনুমান হয় যে কাঠগড়াতে পূর্ব্বে কোন কেল্লা ছিল।

গড়ের এক মাইল দক্ষিণে "দমদমাপোতা" নামে একটি নাতি-উচ্চ ভূমি আছে। দমদমাপোতা ইটাবেড়িয়া গ্রামের লাগাও। এখানে পূর্ব্বে পুকুর ছিল। পরে পুকুর মজিয়া বিল হয়। মাটির নীচে এখনও বাঁধাঘাটের চিহ্ন পাওয়া যায়; পুকুর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দমদমার বিলের জল অতি সুপেয়।

কাঠগড়ার ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই স্থানটির প্রাচীনত্বের বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার ইতিহাস এখন কেহই অবগত নহে। তবে এখানে বহু পূর্ব্বে কোন রাজা ছিলেন, তাহা অশীতিপর বৃদ্ধেরাও শুনিয়াছেন। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন স্থানের ন্যায় আলোচ্য স্থানটিও কিংবদন্তী বিজড়িত; ও বর্গির হাঙ্গামা বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবাদ-বাক্যের হাত হইতে এড়াইতে পারে না। এখানে প্রচলিত আর আর কিংবদন্তীগুলি ন্যূনাধিক অস্বাভাবিক। স্থানের পূর্ব্বগৌরব

না থাকিলে তাহার উপরে এই অলৌকিক বিষয়ের আরোপ সম্ভবপর হইত না। তাই বলিয়া আমি কিংবদন্তীগুলির মূল্য অধিক দিতেছে না।

গড়ের বিষয়ে একটী বড় করুণ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গোরু "বাথান দেওয়া"র উপলক্ষে চাষারা মাঠে যাইত। ইহাদের মধ্যে এখনও জীবিত মুরুব্বি লোকের মুখে শুনা যায় যে, তাহাদের বালককালে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একটি অলৌকিক দৃশ্য তাহাদের নয়নগোচর হইত। সকলে "নিষুতি হইলে" একখানি তাঞ্জাম গড় হইতে উঠিতে দেখা যাইত। ইহা ১৬ জন বেহারায় বহিত ও ইহার সম্মুখে দুজন ও পিছনে দুজন মশাল ধরিয়া যাইত। আর আগেপিছু উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত চলিত। ঘোর রজনীতে এই মিশিল গড়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া কলিঙ্গের বিল বাহিয়া তাহার পশ্চিম বাঁকের কাছে কোথায় অদৃশ্য হইত; সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়া যাইত; সে অসংখ্য পাদক্ষেপ আর দেখা যাইত না—যেন নদীর বাঁকে, আসিয়া সব ফুরাইত - কেবল এক অপার্থিব বিলাপের রোল আকাশে উঠিতে থাকিত!

স্থানটির সহিত কোন বিষাদময় ব্যাপারের সংস্রব আছে কি না, আমরা জানি না। সাধারণের ধারণা যে, গড়ের ইষ্টক লওয়া বা উহার সম্পর্কে আসাও বিপজ্জনক! বাঁশবেড়িয়ার এক সাহেব কয়েক গাড়ী ইট লইয়া গিয়া না কি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আর, এই গড়ে "বামার করাতে" না কি কাঠগড়ার লোকের নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছিল!

অনুসন্ধানক্রমে "দোয়ের (দহের) খালের" নিকটে জাবাতে আসিয়া জনৈক বৃদ্ধা "দেয়াসীনের" মুখে শুনিয়াছিলাম যে, উক্ত গড় "বালোমা" রাজার বা "বাল বাদশার"। বালোমা রাজার বিষয়ে সে অধিক কিছুই জানে না। এই বালরাজার বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।

উক্ত জাবার পূর্ব্বভাগে "দম্‌দমা" নামে একটি উচ্চ ভূমি আছে। শুনিলাম, এখানে পূর্ব্বে কোন মহাপুরুষ (নেড়া হরিদাস?) চেলাগণকে ভোজ দিয়াছিলেন। এই দমদমার দক্ষিণে "মুক্তোদার" উত্তরে "ফেনজোলা" ও কিছু পশ্চিমে দয়ের খালের দিকে "জোড়াপুকুর" নামে বিল আছে। শুনিলাম ঐ ভোজ উপলক্ষে জোড়াপুকুরে পাক হয়; ফেনজোলাতে ফেন ফেলে, দমদমাতে ভাত ঢালে ও মুক্তোদাতে মুখ ধোয়। লোকের মুখে শুনা যায়, রান্নার পর যে ছাই জমা হইয়াছিল, তাহার ঢিপি, আর যেখানে সাধু মহাপুরুষ ভাতের কাটি পুঁতিয়াছিলেন সেখানে, মাধবীকুঞ্জ এখনও দেখা যায়। দমদমাতে প্রতি মাঘীপূর্ণিমাতে মেলা হয়। হুদোর রামভদ্র পালের কোন ধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষ ইহার প্রবর্তন করেন।

আলোচ্য মহারাজপুর, দম্‌দমা ও কাঠগড়া স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পরিদর্শনের বিষয়। এইরূপ পরিদর্শনে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি, ও শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

এ বিষয়ে রীতিমত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আবশ্যক। এস্থানে কোন শিলালিপি বা মুদ্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই বলিয়া ইহাকে সামান্য ঢিপি বিবেচনায় অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস এস্থানে খনন করিলে ঐতিহাসিক উপাদান মিলিতেও পারে। আশা করি, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আলোচ্য গড়ের উপর পড়িবে।

ঝটিকা-তত্ত্ব

[শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত]

আধিদৈবিক বিপদের মধ্যে ঝড় অন্যতম। যে পবন জগতের প্রাণ-স্বরূপ, তিনিই আবার সৃষ্টিধ্বংসের প্রধান কারণ। যে পবনদেবের মৃদুমন্দসঞ্চালনে তাপিতের ও শ্রম-পীড়িতের প্রাণ শীতল করে, যাহার মধুর হিল্লোলে চন্দ্রমা-চুম্বিত কুমুদ-কহ্লারের প্রমুদিত অঙ্গ শিহরণ ও মধুময়ী প্রকৃতি মধুরিমায় গরিমময়ী হইয়া উঠে, সেই পবনদেবেরই বিক্রম প্রকাশে প্রলয় উপস্থিত হয়,—প্রকৃতির রাক্ষসীতালে ভীষণ নৃত্য, পৈশাচিক ভাষায় গুরুগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি সমুত্থিত হয়! পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার যত ক্রোধ বৃক্ষদের উপর পতিত হয়, সুতরাং তাহাদের কাহাকেও কবন্ধ, কাহাকেও হস্তহীন, কাহাকেও বা পদহীন করেন! তাঁহারই উত্তেজনায় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। একা ঝড়ের বিক্রমই অসহ্য, তার উপর যখন দুই ভাই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করেন, তখন কে সহিতে পারে বল? বৃক্ষেরা তখন বার-বার ভূতলে প্রণত হইয়া যেন বলে, 'প্রভো! আর না, নিরস্ত হউন, যথেষ্ট দুর্দ্দশা হইয়াছে।' কে শোনে সে কথা?

কি কারণে পবনদেব উত্তেজিত হইয়া উঠেন, তাহা এখনও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। বায়ুচাপবৈষম্য ঝটিকার উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু কি কি কারণে উক্ত বৈষম্য হইয়া থাকে, তাহা স্থির নির্দ্ধারিত করা যায় নাই। যে কারণেই হউক, পবনদেব উত্তেজিত হইলেই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং যদি পূর্ব্বাহ্ণে পবনের উত্তেজনার সম্ভাবনা জানা যায় ও সাবধান হওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবী বিপদের প্রতীকারে বহুল পরিমাণে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে। যদিও ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানা স্থানে আবহ-মানমন্দির (Meteorological Observatory) স্থাপন করিয়াছেন, এবং যদিও তাহাতে কতক পরিমাণে উপকার সাধিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের ফল বিশেষ সন্তোষজনক নহে। অনেক সময়ে বড় জোর দুই বা তিন দিন পূর্ব্বে ভাবী ঝড়ের সম্ভাবনা অনুমান করা যায়; কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না; এবং বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। এত অল্প সময়ের পূর্ব্বে সাবধান হওয়া—বিশেষতঃ যে সমস্ত জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রবক্ষে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে—এক প্রকার অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে আবার ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাধান্য স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, যদি এরূপ দেখান যায় যে, রাশিচক্রে গ্রহদিগের কোন বিশিষ্টভাবে বা পরস্পর বিশিষ্ট সম্বন্ধে অবস্থিতিদ্বারা ঝটিকা সূচিত হয়, তাহা হইলে সহজে গ্রহদিগের উক্তরূপ অবস্থিতি গণনাদ্বারা অবগত হইয়া বহুপূর্ব্বে ভাবী ঝটিকাদি সম্বন্ধে স্থির করা যাইতে পারে।

যে বিষয় আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, তাহা ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, অথচ তাহার প্রমাণ দেওয়া সহজ নহে ; আবার কোন কোন বিষয় একজনের নিকট সত্য বলিয়া অনুমিত হয়, অন্যের নিকট মিথ্যা বোধ হইতে পারে। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এই প্রকার যুক্তি চলে না। সকলের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ফল ব্যতীত কোন অনুমান বা যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক মত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি গ্রহদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন বিশেষ ভাবে অবস্থিতির সহিত বাতাবর্ত্ত, বৃষ্টিপাত, আবহের উষ্ণতা, চাপ ও আনুসঙ্গিক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সুভিক্ষাদির সম্বন্ধ স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে গ্রহদিগের স্থিতি অনুসারে পার্থিব ব্যাপারের পরিণাম গণনা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ঘটক মহাশয় এই সম্বন্ধে "ভারতবর্ষে" "মেঘবিদ্যা নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মে ফল তদ্রূপ সুন্দররূপে মিলিতে দেখা যায় নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের আবহ-মানমন্দির হইতে নির্দ্ধারিত ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় সুপ্রসিদ্ধ Indian Daily News নামক সংবাদপত্রে ইহার আলোচনা হয়। বৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে এক মাসের ভাবীফল প্রকাশ করি। আমার প্রকাশিত ফলসমূহ অনেকাংশে বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল। আবহবিদ্যা সম্বন্ধে "Weather Forcasting" নামক পুস্তকেও বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঝটিকাদিসম্বন্ধে গ্রহগণের প্রভাব, অভাব আলোচনা করা যাউক।

গ্রহদিগের বিশেষভাবে অবস্থিতি ও পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিতে হইলে রাশিচক্রে গ্রহদিগের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হইবে। সমগ্র রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত, সুতরাং একটি গ্রহস্ফুট হইতে অন্যগ্রহস্ফুট বাদ দিলে তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান-অংশ জানা যাইবে। সাধারণতঃ প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে গ্রহস্ফুট জানা যাইতে পারে। কেবল ইন্দ্রগ্রহের (Uranus) স্ফুট এবং গ্রহসমূহের ক্রান্ত্যংশ (Declination) ও চন্দ্রের অয়নান্তবৃত্তে (Solistitial Colure) অবস্থিতি জানিতে হইলে নাবিক পঞ্জিকা (Nautical Amanac) হইতে স্থির করিতে হইবে। স্থূলভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে, শেষোক্ত কয়েকটী বিষয় বাদ দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

যখন কোন গ্রহ নিরক্ষবৃত্তে (Equator) অবস্থান করে, তখন তাহার ক্রান্ত্যংশ কিছুই থাকে না। যখন গ্রহরাজ রবির সাময়িক গতিই সরিৎসাগরমণ্ডলা শস্যশ্যামলা ধরণীর ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ, তখন আবহের পরিবর্ত্তনাদি রবির সহিত অন্যান্য গ্রহগণের সম্বন্ধবিশেষেই ঘটিবার সম্ভাবনা। যখনই কোন ঝড় বা বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়, তখন, শনি, ইন্দ্র বা বুধগ্রহ হয় নিরক্ষবৃত্তে, নতুবা রবির সহিত একত্রে, সমক্রান্ত্যংশে, বা রবি হইতে ৬০, ৯০, ১২০ কিংবা ১৮০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, শনি, ইন্দ্র এবং বুধগ্রহ বাতাবর্ত্তকারক। সুতরাং প্রবরগ্রহসমূহের (superior planets) মধ্যে দুইটি গ্রহ উক্তরূপ একত্রে, সমক্রান্ত্যংশে বা পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দূরব্যবধানে অবস্থিত ; ও তন্মধ্যে একটির সহিত উক্ত বাতাবর্ত্তকারক গ্রহদিগের অন্ততঃ একটি বিশেষতঃ বুধগ্রহ উক্তরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও ঝটিকার আবির্ভাব হইতে পারে।

আবার দেখা গিয়াছে, কোন প্রবর গ্রহের সহিত বুধগ্রহ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং তৎসহ চন্দ্রও উক্তপ্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট বা নিরক্ষ-বৃত্তের নিকটস্থ কিংবা অয়নান্তবৃত্তে অবস্থিত থাকে,—বিশেষতঃ সেই সময় পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিকট হইলে,—ভীষণ ঝটিকাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্রের উক্তরূপ সম্বন্ধ গ্রহদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সমাপ্তির অনুসারে ঝটিকাদি দুইচারি দিবস শীঘ্র বা দেরীতে হইয়া থাকে।

উপরে যে কয়টি নিয়ম দেওয়া হইল, তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। নিয়মগুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ কি না, জানিবার জন্য, চিরস্মরণীয় আশ্বিনের ঝড় হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান প্রধান বাতাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, তৎসমুদায়েই ইহাদের পরীক্ষা করা যাউক।

বিগত ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চমীতে চারিঘণ্টাকাল স্থায়ী প্রলয়-সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুঙ্কারে বঙ্গদেশ রসাতলগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা প্রৌঢ়েরা অনেকেই অবগত আছেন। এই ভীষণ বাতাবর্ত্তে অতি অল্পলোকেরই গৃহাদি রক্ষা পাইয়াছিল ; বৃক্ষবল্লী সমুদায় সমভূম হইয়াছিল,—কত জনক-জননী পুত্রকন্যা-বিয়োগে হাহাকার করিয়াছিলেন,—কত বালক-বালিকার পিতৃমাতৃ-বিয়োগজনিত সকরুণ রোদনধ্বনিতে পাষাণ-হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক করিয়াছিল,—কত স্বামীশোকবিধুরা বরাঙ্গনার মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাসের সহিত বনের আশ্রয়হীন পশু, নীড়চ্যুত বিহঙ্গও কাঁদিয়াছিল। ধরিত্রীগাত্রে এবং নদনদীবক্ষে গতাসু নরদেহ দর্শনে দুঃসাহসিকেরও আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। কতলোক সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী হইয়াছিল। এই বিষম বিপৎপাতে হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় লক্ষাধিক লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছিল।

কত শারদীয়া পঞ্চমী আসিতেছে ও যাইতেছে ; কিন্তু সেই পঞ্চমীতেই উক্তরূপ ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানের কারণ কি?

গ্রহদিগের বিশিষ্টভাবে অবস্থিতি ভিন্ন অন্য কারণে ইহা সজ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। উক্ত দিবসের পরদিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করিতেছিল এবং তাহার পরদিবস বৃহস্পতি হইতে বুধগ্রহের ৬০ অংশ দূরব্যবধান সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বৃহস্পতি ও বুধের উক্তরূপ দূরব্যবধান বাতাবর্ত্তসূচক। কিন্তু তৎপূর্ব্ব দিবস চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে গমন করাতে উক্ত ব্যবধান সম্পূর্ণ হইবার দুই দিবস পূর্ব্বেই এই ভীষণ বাতাবর্ত্তের আবির্ভাব হয়।

ইহার তিন বৎসর পরে ১২৭৪ সালের ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রে ভীষণ ঝড় হয়। এই ঝড়ে প্রায় ৩০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল; অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি ডুবিয়াছিল, এবং হাজারের উপর লোকের প্রাণসংহার হইয়াছিল। সাতক্ষীরা, বসিরহাট, গোবরডাঙ্গা, বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক গ্রাম একবারে উৎসন্ন হইয়াছিল; ও সর্ব্বত্রই বহু শস্যহানি হইয়াছিল। এই দিবসেও চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে অবস্থান করিতেছিল এবং ইহার পূর্ব্বদিবসে মঙ্গল ও শনি দুইটী প্রবরগ্রহ একত্রে অবস্থান করিতেছিল। সুতরাং আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ইহা হইতে ভীষণ ঝটিকা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

তৎপরে ১২৮১ সালের ৩০ ও ৩১শে আশ্বিন শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে এক ভীষণ বাতাবর্ত্তের অভ্যুত্থানে মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান বিভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় ১৮,০০০ গৃহপালিত পশু এবং ৭ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং প্রায় ৩০ হাজার গৃহ ধ্বংস হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত গির্জ্জার চূড়া ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছিল এবং খানা জংসনের নিকট যাত্রীসহ রেলগাড়ী রেল লাইন হইতে বহুদূরে নীত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দিবসেও চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে অবস্থিত ছিল এবং বুধ, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র এবং ইন্দ্রগ্রহ পরস্পর ৯০ অংশ বা ৬০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং বুধ ও ইন্দ্রগ্রহ উভয়ে সমক্রান্ত্যংশে অবস্থান করিতেছিল।

ইহার দুই বৎসর পরে ১২৮৩ সালের ১৬ই কার্ত্তিক রাত্রে এক ভীষণ ঝটিকায় সন্দীপ ধ্বংস হয়। নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, চাটগাঁ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ক্ষতি ও প্রাণনাশ হয়। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় লক্ষ লোকের জীবননাশ হইয়াছিল। এই দিবসেও রবি এবং শনি সমক্রান্ত্যংশে, বুধ এবং ইন্দ্রগ্রহ ৬০ অংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

১২৮৭ সালের ৭ই আশ্বিন প্রাতঃকালে উড়িষ্যার উপকূলে ভীষণ ঝটিকায় প্রায় পঞ্চসহস্র লোকের জীবনহানি এবং দেড়শতাধিক গ্রাম ভূমিসাৎ হইয়াছিল। উক্ত দিবসে মঙ্গল ও ইন্দ্র দুইটি প্রবর গ্রহ পরস্পর ৬০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং তৎপূর্ব্ব দিবসে রবি ও ইন্দ্রগ্রহ সমক্রান্ত্যংশে ছিল।

১২৯৪ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ সাগর উপকূলে ভীষণ বাতাবর্ত্তে বহুযাত্রীপূর্ণ দুইখানি প্রধান জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল। এই ঝটিকার প্রভাব সমুদ্রেই লক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহার দুই তিন দিবস পরেও কোন জাহাজ সমুদ্রে যাইতে অগ্রসর হয় নাই। এই দিবসে চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে ও রবি এবং বুধগ্রহ একত্রে অবস্থিত ছিল।

উক্ত সালের ২৬শে চৈত্রে ঢাকা প্রদেশে এক ভীষণ ভ্রমি (Tornodo) উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দিবসে বুধগ্রহ ইন্দ্রগ্রহের সহিত সমক্রান্ত্যংশে এবং তৎপূর্ব্ব দিবস রবি ও মঙ্গল উক্তভাবে অবস্থিত ছিল।

১৩০৪ সালের ৮ই কার্ত্তিকের চট্টগ্রামের ভীষণ বাতাবর্ত্তের কথা এখনও সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। উক্ত দিবসে শনি বৃহস্পতি হইতে ৬০ অংশ ব্যবধানে ইন্দ্রগ্রহের সহিত একত্রে অবস্থিত ছিল।

১৩০৯ সালের ১৮ই বৈশাখ ঢাকা প্রদেশে এক ভয়ঙ্কর ভ্রমির আবির্ভাব হয়। উক্ত দিবসে বুধ বৃহস্পতি হইতে ৯০ অংশ দূর ব্যবধানে অবস্থিত ছিল।

বিগত ১৩১৬ সালের ২রা কার্ত্তিক বঙ্গদেশে যে ভীষণ ঝটিকা হয় তাহাতে কিরূপ ক্ষতি ও জীবননাশ হইয়াছিল, তাহা এখনও কেহই বিস্মৃত হয় নাই। এই দিবসে চন্দ্র অয়নান্তবৃত্তে, বুধ ও শনি সমক্রান্ত্যংশে অবস্থিত ছিল।

উপরে যে কয়েকটী প্রধান-প্রধান ঝটিকার উল্লেখ হইল, তাহাদের সমস্তগুলিতেই পূর্ব্বকথিত নিয়মগুলির সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। গ্রহদিগের মধ্যে প্রায়ই উক্তরূপ ব্যবধান ও অবস্থিতি দৃষ্ট হওয়া যায় এবং তাহার ফলে ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের প্রভাব পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ সময়ে পরিলক্ষিত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণে এখনও সমর্থ হওয়া যায় নাই। দেশভেদে উহাদের প্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন সময় হইয়া থাকে; বঙ্গদেশে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই বড় বড় ঝটিকার সময়। এ সমস্ত বিষয় স্থির করিতে হইলে আমাদিগের আরও বিশেষ অভিজ্ঞতা আবশ্যক করে। যাহাতে সহজে সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন, এরূপ ভাবেই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, সুতরাং আশা করা যায় এ বিষয়ে সকলের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে।

শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া বুড়া মুদী একটি ছোট ন্যাক্‌ড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দু'টি সোণার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, "বহু মাক্‌ড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া শাহ্‌জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না।" এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ মুখেমুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, "যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল।" অর্থাৎ, বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার এই স্নেহাস্পদ বালক দুটি, তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় কাহাকেও জানিতে পর্য্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ, নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্ব্বে কতদিন কত আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রর কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যা আমি দিব, তাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র। ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত? যে, সে যেথানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রর কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক্ সে কথা।

তারপরে অনেক যায়গায় ঘুরিয়াছি; কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেমনিই দেখিতে পাই। তাঁহার দুঃখের কথা, তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান্! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ তাহা জানি। তাঁদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারী জাতিকে কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এত বড় বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর এমন গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়, স্বজন, শত্রু, মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া! বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এই সব আত্মীয়, স্বজন, শত্রু, মিত্র, এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেথানে যত দূরেই হোক, এ দেশের বাহিরে হইলেও, হয় ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের

অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী। তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকাল বেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে, আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন, সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তারপরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙ্গি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু, আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেউ আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সে কথাটাই বলিব।

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব একপশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, "—তে থিয়েটার হবে, যাবি?" থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, "তবে কাপড় পরে শীগ্‌গীর আমাদের বাড়ী আয়।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ীর গাড়ী করিয়া ষ্টেসনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, "তা' নয়। আমরা ডিঙিতে যাব।" আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ, গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয় ত বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, "ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুন দা' কলকাতা থেকে এসেচেন; তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।"

যাক্, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুন দা' আসিয়া ঘাটে পৌছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

"তোর নাম কি রে?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কল্‌কে রাখ্‌লি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!"

ওরে বাবা! মানুষ, চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর্, আমি তামাক সাজ্‌চি।"

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাসতুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী, এবং সম্প্রতি এল্-এ পাশ করিয়াছেন। কিন্তু, মনটা আমার বিগ্‌ড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন মুখে টানিতে-টানিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস্ কোথায় রে, কান্তে? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্‌চে—পেতে দে দেখি, বসি।"

"আমি দিচ্চি, নতুন-দা'। আমার শীত করচে না—এই নাও" বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন দা, এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল—হাওয়া পড়ে গেল। আর ত পাল চল্‌বে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।" কলিকাতাবাসী নতুন দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই, নতুন দা, এই স্রোত ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আন্‌লি কেন হতভাগা? যেমন করে হোক্ তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেচে।" ইন্দ্র কহিল, "তাঁদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আট্‌কাবে না।"

"না! আট্‌কাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম! চল্, যেমন করে পারিস্ নিয়ে চল্।" বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজ্‌না পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে-আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণটেনে নিয়ে গেলে হয় না?" কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, "তবে যাও না, টানোগে না হে! জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্চে কেন?"

তারপরে, একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া, এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁসিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে-মাঝে বাবুর তামাক-সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, "না খুলে—"

"হাঁ!—দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে—যা করচিস্ কর।"

বস্তুতঃ, আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ, আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে এক্‌ফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ,—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল; এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রাম বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দু'টা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, "হাঁরে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্র কহিল, "সাম্‌নেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুন দা। সব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐঃ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র, বল্ না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।"

ইন্দ্র কিম্বা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম তেমনিভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা

দরকার।" অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র-সৈকতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ, বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ, তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, "চল না, নতুন দা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।"

নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ভয়! আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা' বলে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।" অথচ, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁহার ব্যবহারে মনে-মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিতেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন,—
"ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা—"

আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি সুরের সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিতে-শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে-মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে-কহিল, "এরা কলকাতার লোক কি না, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!"

আমি বলিলাম, "হুঁ।"

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে-দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি-এ, পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিম্বা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন, পাইয়াছেন. না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে-মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় না কি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোন কালে নয়। অথচ, ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই, যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে;—না হইলে, বহু পূর্ব্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু, যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলের পথ ঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী, নিষ্কর্ম্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়া-নাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, এবং যতপ্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জ্জি-পাড়ার' চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"নতুন-দা', ও নতুন-দা'!" কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সুউচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল।

এ অঞ্চলে মাঝে-মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারের' জ্বালায় সময়ে-সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল—"বাঘে নিলে না ত রে!" ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এত বড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সুর এক-পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারেই শুইয়া পড়িল—"শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না।" তখন ধীরে-ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন, এই দিকের কুকুরগুলাও যে সমবেত আর্ত্ত-চীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ-প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয় মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব।" আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—"তুমি পাগল হয়েচ ভাই!" ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া, খুলিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক্, শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দিস—আমি চল্লুম।"

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটা জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক, শূন্য আস্ফালন নয়, যে, হাত ধরিয়া দু'টো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া, বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা'হোক্ একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "তুই ক্ষেপেচিস্, শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, "তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?"

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমারও দোষ নেই, ভাই, আমিও নতুন দা'কে আনতে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু, আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ, পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলাম! ইন্দ্র কহিল, "বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার সে চেষ্টা করিস্‌নে। জলে গিয়ে পড়বি।"

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ৫।৭ টা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া, বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল—"নতুন-দা'!"

নতুন দা' একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"এই যে আমি।"

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি;—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে, সেই যে তিনি হাততালি দিয়া "ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা"

"রোহিণী বলিল, 'কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।'"

কৃষ্ণকান্তের উইল— তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিল্পী— শ্রীভবানীচরণ লাহা।

Emerald Ptg. Works.

ধরিয়াছিলেন খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীত-চর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহা মানিত ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা দূর ছুটিয়া আসিয়াও, আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, "আমার একপাটি পাম্প?"

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তারপরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য, একে-একে পুনঃ-পুনঃ শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ সব কখনো চোখে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে-বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্ব্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে-করিতে, পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনাইতে-শুনাইতে ইন্দ্রর থানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া, আজ নৌকা-চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম। লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়েই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা, একটির পর একটি, শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলিই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই—কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না। কে তবে নূতন করিয়া এ সব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা পিষিয়া গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবারই কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না। ছেলে-বেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে; এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব, বলিবার সময়েও ঠিক তাই ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ, কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে, এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি। সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ, জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্য্যন্ত, চেহারাটা

মিথিলা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এল]

মিথিলা বাহুবলের জন্য কখনও খ্যাতিলাভ করে নাই বটে, কিন্তু মানসিক উৎকর্ষে ও জ্ঞান গরিমায় এদেশ একদিন ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে মিথিলারাজ্য আর্য্য সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল। বৌদ্ধযুগের প্রথমাবস্থায় মিথিলার সীমান্ত নগরী বৈশালিতে বৌদ্ধ জ্ঞানী ভিক্ষুদিগের প্রধান বিহার ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানের পরে, এমন কি, ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশ হিন্দুদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার প্রধান আশ্রয়ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। মজঃফরপুরের জরীপ ও বন্দোবস্তের কর্ত্তা মিঃ সি, জে, ষ্টিভেনসন মুর বড় দুঃখের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন যে, "যে দেশের উৎসারিত জ্ঞান-প্রবাহ এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছে, এখন সেই স্থানের আধুনিক জনসমাজে সেই প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যার সামান্য চিহ্নবিশেষ দর্শনের প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা। আধুনিক সমাজে প্রাচীন দর্শনাদির প্রভাব যেন প্রতিকূল বেগে অবনতির দিকেই ধাবমান।"

যাঁহারা এ দেশে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কথাগুলির সত্যতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ প্রবন্ধে আমি এ দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। এই বিষয়ে আমি কেবল সংগ্রাহক মাত্র; সুতরাং এ প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদিগের নিকট নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। তবে আমার কৈফিয়ত এই যে, বিশেষজ্ঞ নহেন এরূপ পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, এবং এ প্রদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

ভৌগোলিক বিবরণ।—প্রাচীন মিথিলা বর্ত্তমান ত্রিহুত ও ভাগলপুর বিভাগের উপগাঙ্গ অংশের কতকটা লইয়া গঠিত ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে যখন আর্য্য-সভ্যতা উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বিস্তৃত হয়, তখন ইহা বিদেহ বা মিথিলা সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মিথিলা নগরী এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজ্যের সীমা ছিল,—পূর্ব্বে কুশী নদী, পশ্চিমে গণ্ডকী নদী, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে গঙ্গা। এই ভূখণ্ডে এখন বর্ত্তমান চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গা জেলা, এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশ অবস্থিত। তারপর এই বিদেহরাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তে বিশালা রাজ্য গঠিত হয়। রামায়ণে এই রাজ্যের রাজধানী বিশালা নগরীর উল্লেখ আছে। এই বিশালা নগরী পরে বৌদ্ধযুগে লীচ্ছবিদিগের রাজধানী বেশালী নামক মহানগরীতে পরিণত হয়। মজঃফরপুর জেলার পরগণা 'বিসারা' বিশালা শব্দেরই অপভ্রংশ; এবং ঐ পরগণার অন্তর্গত মজঃফরপুরের ২৩ মাইল পশ্চিমদক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান 'বসাঢ়' গ্রামই রামায়ণোক্ত বিশাল রাজার গড় ও রাজধানী বিশালা নগরী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; এবং এখানে খননাদি দ্বারা বহু প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রদেশ গুপ্ত সম্রাটগণের সময় (খৃঃ ৩য়, ৪র্থ শতাব্দী) হইতে বঙ্গের পাল ও সেন রাজগণের রাজত্বকাল (খৃঃ ১২শ শতাব্দী) পর্য্যন্ত যে 'তীরভুক্তি' বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, 'তীরভুক্তি' হইতেই ত্রিহুত বা তিরহুত শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। আর একটি প্রবাদ এই যে, রাজর্ষি জনক এ দেশে তিনটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া, এ প্রদেশের নাম ত্রিহুত। যদিও ত্রিহুত বিভাগ বর্ত্তমান ছাপরা, মতিহারী, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা লইয়া গঠিত, কিন্তু এখনও স্থানীয় লোকেরা খাঁটি 'ত্রিহুত' বলিলে সাধারণতঃ চম্পারণ বা মতিহারী জেলার পূর্ব্ব-উত্তরাংশ এবং মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলার উত্তরাংশকেই বুঝেন। সেইরূপ মিথিলা বলিলে সাধারণতঃ দ্বারভাঙ্গা জেলার উত্তরাংশকেই এবং কখন-কখনও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ মজঃফরপুর ও ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশকে লইয়া সেকালের মিথিলাদেশ বুঝায়।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কিংবদন্তী।—পাশ্চাত্য মতে ভারতবর্ষের ইতিহাস একরূপ আরম্ভ হইয়াছে—

বুদ্ধদেবের সময় হইতে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তির তারিখ অথবা সময় নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক সাহিত্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছু-কিছু যে না পাওয়া যায়, এমন নহে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের পুরাবৃত্তসম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহলজনক কিংবদন্তী এ দেশে প্রচলিত আছে। নিম্নে সেগুলি বিবৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, সীতাদেবীর জন্মস্থান লইয়াই দুইটী নিকটবর্ত্তী স্থানের বিরোধ। এক পক্ষ বলেন, মজঃফরপুর জেলার সবডিভিসন্ সীতামাটি নগরই সীতার জন্মস্থান এবং এইস্থান হইতে ২।৩ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত পনৌরা গ্রামে সীতাদেবীর জন্ম হয় বলিয়া অপর পক্ষ নির্দ্দেশ করেন। উভয় স্থানেই জানকী মন্দির ও সংলগ্ন পুষ্করিণী বা কুণ্ড বিদ্যমান; এবং এই কুণ্ড হইতে সীতাদেবী উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সীতামাটিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন স্থান বলিয়া মনে হয়। কারণ সীতামাটি নামটি বহু প্রাচীন; আর জনশ্রুতিই সাক্ষ্য দেয় যে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রচার করেন যে, পনৌরা গ্রামেই সীতার প্রকৃত জন্মস্থান, তদবধি তথায় মন্দির স্থাপিত হয়। সীতামাটির বর্ত্তমান মোহান্ত বলেন যে, তাঁহার নিকট প্রমাণ আছে যে, তাঁহার মঠ ও মন্দির বহু শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রমাণগুলি প্রকাশ করার সুযোগ তাঁহার এখনও হয় নাই। যাঁহারা বলিতে চান যে, 'সীতা' লাঙ্গল-পদ্ধতি বা কৃষিবিদ্যার রূপকমাত্র, তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, এখনও প্রতি বৎসর কৃষিচর্চ্চার উন্নতিকল্পেই হউক, বা রামসীতার স্মরণার্থই হউক, রামনবমীতে সীতামাটির মন্দিরের নিকট কৃষিকর্ম্মের প্রধান সহায় গো-মহিষাদির একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে। স্থানটিও অতি উর্ব্বরা, ধান্যাদি শস্যও প্রচুর উৎপন্ন হয়। সীতাদেবীর পিতার বাসভবন, অথবা রাজর্ষি জনকের রাজধানী মিথিলা নগরী কোথায় অবস্থিত ছিল, এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ বলেন মতিহারী জেলার অন্তর্গত চান্‌কিগড় বা জানকিগড়ে; কেহ বা বলেন দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত বেনীপটি থানার পূর্ব্বোত্তরে ফুলহর গ্রামে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও সর্ব্বজন-বিদিত মত এই যে, দ্বারভাঙ্গা জেলার উত্তরে জয়নগর ষ্টেসন হইতে ১৩ মাইল দূরে পশ্চিমোত্তর কোণে এখনকার নেপাল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত বর্ত্তমান জনকপুর নগরই প্রাচীন মিথিলা নগরী। রামোপাসকগণের চেষ্টায় এখন এই জনকপুরে বহু সুরম্য ও প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং প্রতি বর্ষে ভক্ত তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে

বটে; কিন্তু শুনা যায় যে, এ স্থানের আবিষ্কার ১০০ বৎসরের পূর্ব্বে হয় নাই। জনকপুর হইতে ৭।৮ মাইল দূরে তরাই-য়ের জঙ্গলে, ধনুখা নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড পড়িয়া আছে; তাহাকে লোকে এখনও ভগ্ন হরধনুর এক খণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করে। রামচন্দ্র, তাড়কা-বধান্তে মিথিলা যাইবার পথে, শোনপুরের নিকটে গঙ্গা ও গণ্ডকী-সঙ্গম পার হইয়া শিবপূজা করেন। তদবধি সেইস্থান হরিহরক্ষেত্র বাল্মীকিকেও কিংবদন্তী এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। এক শ্রেণীর মতে তাঁহার আশ্রম ছিল—মজঃফরপুর জেলার পূর্ব্বোক্ত সীমান্তে সুরসণ্ড গ্রামের নিকট, অপর শ্রেণীর মতে চম্পারণ জেলায় গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকট, নারায়ণী-তীরে সংগ্রামপুর গ্রামে। রামচন্দ্রের সহিত লবকুশের এখানেই সংগ্রাম হওয়ায় এস্থানের নাম সংগ্রামপুর হইয়াছে। চম্পারণ জেলার নামকরণ প্রাচীন চম্পকারণ্য হইতেই

বৈশালীর অশোকস্তূপের ভগ্নাবশেষ

বলিয়া পরিচিত এবং তথায় ভারতবিখ্যাত হরিহরছত্রের মেলা বসে। প্রাচীন মুনিঋষিগণের অনেকেই এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। দ্বারভাঙ্গা জেলার কমতৌল ষ্টেসনের সন্নিকটস্থ অহিয়ারি গ্রামে অহল্যা ও গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল; এবং উক্ত গ্রাম-সংলগ্ন জগবন গ্রামে ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। তথাকার অহল্যা-মন্দিরস্থিত কল্পিত রামপদ-চিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড, গৌতমকুণ্ড এবং তথাকথিত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আশ্রমবটবৃক্ষ এখনও বহু তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে। মধুবনি সবডিভিসনের নিকটস্থ ককৃরৌল গ্রামে মহর্ষি কপিলদেবের আশ্রম ছিল এবং সেখানকার 'কপিলেশ্বর মহাদেও' নাকি তাঁহারই স্থাপিত। দ্বারভাঙ্গা জেলার যমুনা ও কমলা নদীর সঙ্গম-স্থলে জৈমিনী ঋষির তপোবন ছিল। তমসা নদীর তীর-বিহারী কবিগুরু হইয়াছে। শালগ্রামি, নারায়ণী ও গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বতটস্থিত এই অরণ্য বৈদিকযুগ হইতেই মুনি ঋষিদের পুণ্য আশ্রম-ভূমি ছিল। আরণ্যকাদি শ্রুতি এই অরণ্যেই রচিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি। পরে বৌদ্ধযুগে এই বনকে মহাবন বলা হইত। রাজর্ষি ভরত, শালগ্রামের জন্মস্থান গণ্ডকী নদীতীরে তপস্যা করিতে আসিয়া হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হন। ধ্রুবও নাকি এই অরণ্যে তপস্যা করিতেন। চম্পারণ জেলার 'দুহো সুহো' তপ্পার নাম ধ্রুবের বিমাতা ও মাতা, রাজা উত্তানপাদের মহিষী—দুরাণী ও সুরাণী সুনীতি ও সুরুচির অবদানস্মরণ করিয়াই হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। দিনাজপুরকে বিরাট রাজার দেশ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু এখানেও চম্পারণ জেলার রামনগরের নিকটস্থ বৈরাটিগ্রাম বিরাট রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কেসরিয়া থানার নিকট

বেন রাজার রাজধানী ছিল এবং মতিহারীর ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সাগরডিহ্ গ্রাম সগররাজার রাজধানী ছিল, শুনা যায়। যে স্থানে শালগ্রামি ও গণ্ডকী নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বৃটিশ রাজ্য-সীমায় প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানকে ত্রিবেণী ঘাট কহে। ত্রিবেণী হইতে কিছুদূর উত্তরে গেলেই গণ্ডকীর পাষাণময় উপকূলে স্থানে স্থানে বৃহৎ গর্ত্ত লক্ষিত হয়। সেগুলিকে লোকে

পনৌরা গ্রামে সীতাদেবীর জন্মস্থান

পুরাণোক্ত বিখ্যাত গজ ও কচ্ছপের পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধকালীন তাহাদের কর্দ্দমে অঙ্কিত পদচিহ্নগুলি কাল ক্রমে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। এই কিংবদন্তীগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

বৌদ্ধযুগের বর্ত্তমান নিদর্শন। ঐতিহাসিক যুগের—যে যুগের কথা এখনও মানবস্মৃতির অতীত হয় নাই--সে যুগের ঘটনা ও নিদর্শনগুলির সম্বন্ধেও এখানকার লোকের যেরূপ অদ্ভুত ধারণা হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কিংবদন্তী যে কাল-ক্রমে কিরূপ বিচিত্র আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যায়। গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে পরলোকগত Dr. Bloch এবং Dr. Spooner ভূগর্ভ হইতে অনেক নিদর্শনের আবিষ্কার করিয়া অনেক যুক্তিদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মজঃফরপুরের ২২।২৩ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত বর্ত্তমান বসাঢ় বা বালিয়া বসাঢ় গ্রামই প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বৈশালী নগরী ছিল এবং তাহার উপকণ্ঠস্থিত কোল্‌হুয়া (প্রাচীন কোল্লগ) গ্রামে একটী স্তূপের ভগ্নাবশেষ ও একটী অশোক স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান। *

উক্ত ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত একটী প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছেন। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম বলিয়া এখন পূজিত হইতেছেন এবং অশোকস্তম্ভটী 'ভীমসেন কা লাঠি' বলিয়া পরিচিত। উক্ত স্তূপ হইতে কিছুদূরে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটী মৃত্তিকার ঢিবি বা স্তূপের মত আছে। তাহাকে লোকে 'ভীমসেন কা পাল্লী' বা 'ভীমসেন কা টুক্‌রী' বলে। এ কিংবদন্তী শুনিলে মনে হয়, হয়ত কালক্রমে মজঃফরপুর সহরের প্রধান দর্শনীয় বস্তু সাহুদের সুবিখ্যাত সুদৃশ্য রামসীতার মন্দিরটী (যাহার বয়ঃক্রম প্রকৃতপক্ষে ৭০।৮০ বৎসরে অধিক হইবে না) রামায়ণের যুগের বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইবে। কারণ, যত্ন ও মেরামতের অভাবে এখনই দেখিলে উহা ১৫০ বৎসরের

* See Report of Archaeological Survey of India 1903-4, 1911-12.

প্রাচীন বলিয়া মনে হয়; এবং ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ এখনই উহার বয়স শতশত বৎসর পিছাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, মজঃফরপুর ও বিশেষতঃ চম্পারণ জেলায় বৌদ্ধযুগের ও পরবর্ত্তী যুগের নিদর্শন যথেষ্ট আছে।
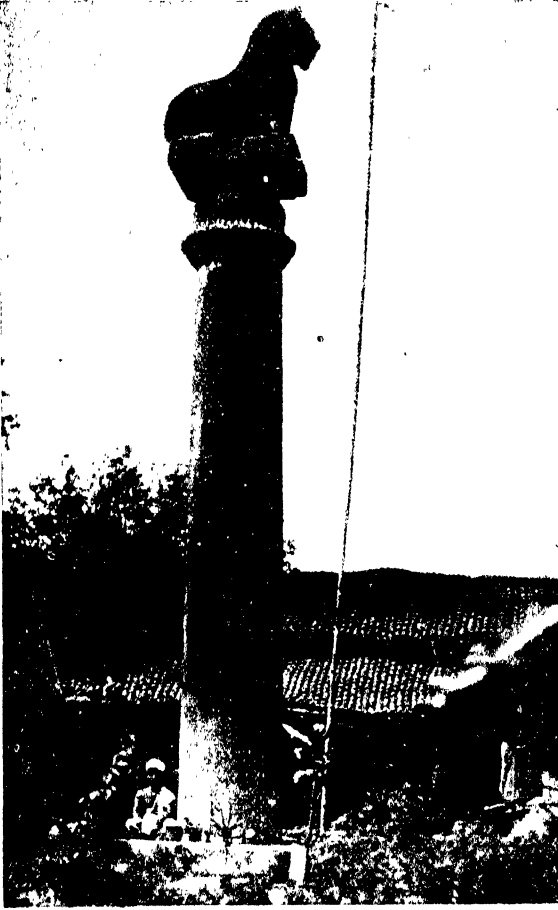
বৈশালী—অশোকস্তম্ভ

এরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শনবহুল স্থান ভারতে অল্পই আছে। কোল্‌হুয়ার উক্ত অশোকস্তম্ভ ছাড়া চম্পারণ জেলায় তিনটী অশোকস্তম্ভ বিদ্যমান। একটী লৌরিয়া অরুরাজ গ্রামে, অপরটী লৌরিয়া নন্দনগড়ে এবং আর একটী হিমালয়ের নিকটস্থ রামপুরওয়া গ্রামে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সম্রাট অশোক নেপাল ও কুশীনগর তীর্থে যাইবার পথে বুদ্ধদেবের স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্য স্থানসমূহে এই স্তম্ভগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শেষোক্ত স্থানে ভূগর্ভ হইতে একটী সিংহমূর্ত্তি ও একটী বৃষভমূর্ত্তি ১৯০৯ সালে পাওয়া যায়। তাহা এখন কলিকাতার মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। "ভারতবর্ষের" ফাল্গুনের সংখ্যায় ইহার ছবি বাহির হইয়াছে। লৌরিয়া নন্দনগড়ে একটি মৃত্তিকাস্তূপে একটী মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার বলিয়াছেন। বসাঢ়েও সেইরূপ গুপ্ত-সম্রাটগণের সময়ের বিভিন্ন নামাঙ্কিত

কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত পদ্মপাণিমূর্ত্তি

প্রায় ১৫০০ মৃণ্ময় সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ কত যে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ নিদর্শন এ দেশে মৃত্তিকাগর্ভে লুক্কায়িত আছে, কে বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অতি সামান্য চেষ্টাই করা হইয়াছে। বঙ্গের সেন-রাজগণের পর এ দেশে যে সিমরৌণের রাজবংশ রাজত্ব করেন, তাহাদের রাজধানীর কীর্ত্তিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ এখনও নেপালরাজ্যে সিমরৌণগড়ে বর্ত্তমান। মুসলমান যুগের কীর্ত্তিচিহ্ন হাজিপুরে এখনও আছে। সম্প্রতি কোল্‌হুয়া স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের একটী পোলের ভিত্তির নিকট মাটী খুঁড়িতে-খুঁড়িতে একজন কুলী কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ছোট মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তাহা এখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু 'গিরিকাহিনী,' 'আহোমসতী' প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আছে। তাঁহার অনুমতিক্রমে মূর্ত্তিটির ফটো ও তাহার পশ্চাতে অঙ্কিত লিপির ফটো প্রকাশিত হইল। মূর্ত্তিটির অয়ত-

ফটোর সমান। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মতে এই মূর্ত্তিটি পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি এবং ইহা শেষ পালরাজাদের সময়ের। লিপির অক্ষরও খৃঃ একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর হইবে। ইহার পাঠ এইরূপ।

১ যে ধর্ম্মা হেতু প্রভ

২ বা হেতু [ং] তেষাং তথা

৩ গতো হ্যবদত্তে

সীতাদেবীর জন্মস্থান সীতাকুণ্ড ও জানকী মন্দির

৪ ষাং চ যো নিরোধ
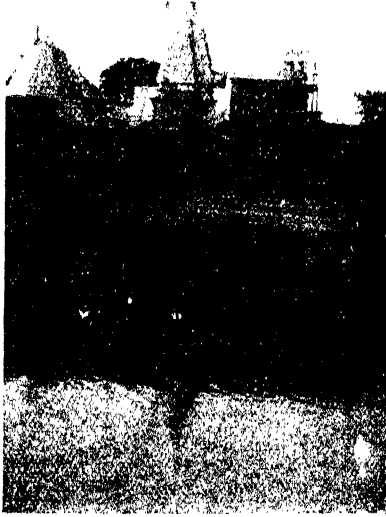
৫ এবং বাদী মহা

৬ শ্রমণঃ

বুদ্ধদেবের স্তুতিমূলক এই শ্লোকটী সুপরিচিত এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ।—এইবার ইতিহাসসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইহারও অনেক কথা প্রমাণসাপেক্ষ। মিথিলায় আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারের কথা আমরা সর্ব্বপ্রথম 'শতপথ ব্রাহ্মণে' পাই। ঋগ্বেদে সরযূ নদীর পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। তাহার পূর্ব্বে আর্য্যাবাসের আভাস পাওয়া যায় না। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে, বিদেহ-মাধব (রামায়ণ ও পুরাণকথিত মিথি জনকের বংশধর) সরস্বতী তীর হইতে তাহার পুরোহিত ঋষি গোতম রাহুগণের সহিত বৈশ্বানর অগ্নিকে মুখে করিয়া আনিতে-ছিলেন এবং সেই অগ্নি মুখ হইতে পতিত হইয়া, পূর্ব্বাভি-মুখে দহন করিতে-করিতে চলিলেন; কেবল সদানীরা নদীকে দগ্ধ করিলেন না। সেজন্য তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন না; এবং সে দেশ 'অক্ষেত্রতর' ও 'শ্রাবিতর' (অকর্ষিত ও জলপ্লাবিত) ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞ দ্বারা বৈশ্বানরকে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ আস্বাদন করাইলেন। তখন হইতে সে ভূমি আর অকর্ষিত রহিল না। সেই নদী দারুণ গ্রীষ্ম সময়েও জলকল্লোলময়ী এবং সীতা (সুশীতলা) থাকিত। বৈশ্বানর অগ্নি প্রথমে বিদেহদিগকে সেই নদের পশ্চিমে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই নদ এখন পর্য্যন্ত কোশল ও বিদেহরাজ্যের সীমা। ইহাই বর্ত্তমান গণ্ডকী নদী। এই গল্পদ্বারা একটা ঐতিহাসিক সত্য স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, 'শতপথ ব্রাহ্মণ' রচনাকালের বহুপূর্ব্ব হইতেই আর্য্যেরা সরস্বতী-তীর হইতে মিথিলা অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য এই দেশের লোক ছিলেন, এবং এই স্থানেই তাঁহার শুক্ল যজুর্ব্বেদ সঙ্কলিত হয়। রাজর্ষি জনক তখন এ দেশের সম্রাট। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' তিনি সম্রাট-পদবাচ্য হইয়াছেন। সমসাময়িক কুরু, পাঞ্চাল, মদ্র, কোশল, কেকা প্রভৃতি দেশীয় নৃপতিগণ তাঁহার নিকট নিষ্প্রভ। কাশীরাজ কাশ্য অজাতশত্রু তাঁহার যশ ও ক্ষমতাকে ঈর্ষা করেন; (বৃঃ আ উপনিষদ ২অ ১, ১)। জনকের সভা বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল। তাঁহার পুরোহিত অশ্বল, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, আরুণেয়, গার্গ্য, বালাকি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষি বচকু-তনয়া গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা বিদুষী রমণীর জ্ঞানপ্রভায় বিভাসিত। রাজর্ষি জনকই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের বেদবিদ্যার অভিমান চূর্ণ করিয়া তাঁহা-দিগকে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত করেন। 'জনক' শব্দ মিথিলা-রাজগণে বংশগত উপাধি ছিল। এই আদি জনক এবং রামচন্দ্রের শ্বশুর সীরধ্বজ জনক যে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক যাজ্ঞবল্ক্য খুব

সম্ভব এক বংশীয় বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এবং উভয়েই মিথিলা দেশীয় ছিলেন।১

এদেশে এখনও উলুখড়ের বনে ও জঙ্গলে বিস্তর 'নীল গাই' ও 'ঘোড়পরাল' নামে একজাতীয় বৃহদাকার স্বল্প শৃঙ্গ কৃষ্ণাভ মৃগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া রাত্রিতে ক্ষেত্রে যাইয়া শস্যের বড়ই অনিষ্ট করে। দেখিতে পাইলেন।৩ বর্ত্তমান শোন দানাপুরের কিছু পশ্চিমে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান পাটনার নিকটই রামচন্দ্রের পক্ষে গঙ্গা পার হইয়া হাজিপুর ও শোনপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবতরণ করাই খুব সম্ভব। জনশ্রুতিও সেইরূপ নির্দ্দেশ করে। সোনপুরে গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমস্থলে তিনি (হরি) মহাদেবের (হরের)
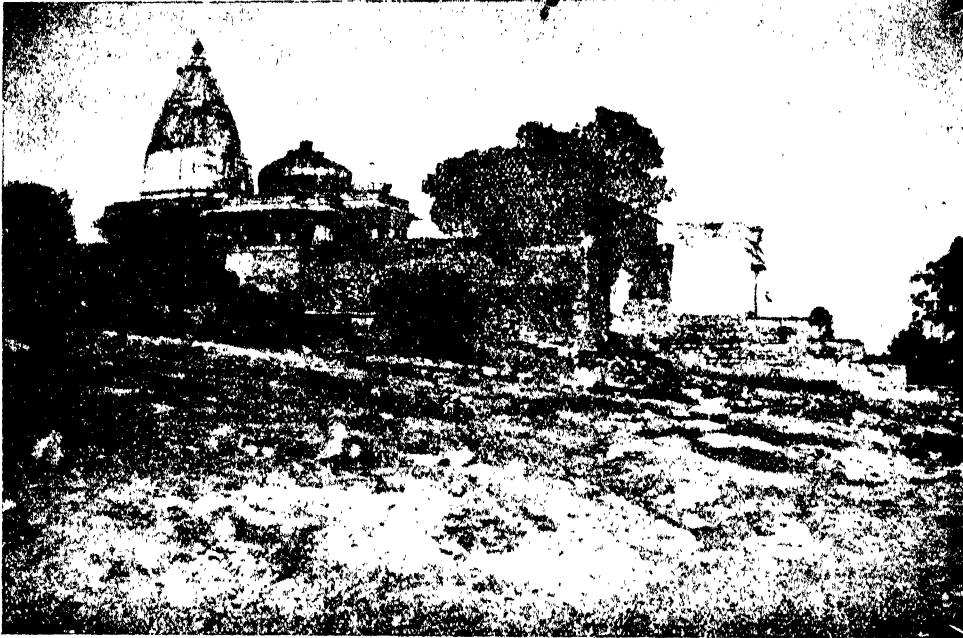
বৈশালী

স্থানীয় লোকের ভুল বিশ্বাস যে, এগুলি গো অথবা ঘোটক-জাতীয়; কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেগুলি স্বভাবে ও আকারে সম্পূর্ণ মৃগজাতীয়।

বৌদ্ধযুগের বৈশালি যে রামায়ণের যুগের বিশালা নগরী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণের আদিকাণ্ডে২ রাম চন্দ্রের বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলা-যাত্রার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা তাড়কা বধান্তে শোনা পার হইয়া অর্দ্ধদিবস যাইয়া, পরে গঙ্গানদী পার হইয়া, গঙ্গার উত্তর কূল হইতে "বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা" পূজা করেন বলিয়া, এই স্থানে হরিহরক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ স্থান হইতে বর্ত্তমান বসাড়—প্রাচীন বিশালা—১৫।২০ মাইল হইবে। গণ্ডকী তীর হইতে বর্ত্তমান বসাড় ৪।৫ মাইল হইবে। তখন হয় ত বিশালা গঙ্গার আরও সন্নিকটে ছিল। রামচন্দ্র প্রত্যূষে গঙ্গা পার হইয়া সম্ভবতঃ সন্ধ্যার সময় বিশালায় পৌছেন। ৪ বিশালায় তাঁহারা এক রাত্রির জন্য রাজা বিশালের বংশধর সুমতির অতিথি হন। ৫ পরদিবস গৌতম ঋষির শূন্য আশ্রমে যাইয়া অহল্যাকে উদ্ধার করেন। বর্ত্তমান 'অহিয়ারি' গ্রাম 'অহল্যা' হইতে হইয়াছে; এবং তাহা বসাড় হইতে

১ "মিথিলাস্থঃ স যোগেন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥" যজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।২

২ বৃঃ আঃ উপনিষদ ২য় অ ১, ১,

৩ রাঃ আদিঃ ৩৫।১.৬

৪ রাঃ আদিঃ ৪৪।৯।১০ সর্গ

৫ রাঃ আদিঃ ৪৫।৫

সোজাসুজি প্রায় ৫০ মাইল। তাঁহারা বিশালারাজের নিকট হইতে দ্রুতগামী রথ লইয়া গিয়াছিলেন—এইরূপ কল্পনা না করিলে, এতটা পথ একদিনে অতিক্রম করা সম্ভবপর হইতে পারে না। গৌতমাশ্রম মিথিলা-পুরীর উপকণ্ঠে ছিল।[1] সে স্থান হইতে প্রাগুত্তর দিকে যাইয়া তাঁহারা মিথিলা নগরী ও জনকের যজ্ঞবাটিকায় উপস্থিত হন।[2] উক্ত 'অহিয়ারি' হইতে বর্ত্তমান জনকপুর পূর্ব্বোত্তর কোণে ১৫।২০ মাইল দূর হইবে। প্রাচীন সমৃদ্ধ পুরী প্রায়ই খুব বিস্তৃত থাকিত। বৌদ্ধ বৈশালিপুরীও যে ৮।৯ মাইলব্যাপী ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব বর্ত্তমান জনকপুর প্রাচীন মিথিলাপুরী হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈশালিরাজ্য লীচ্ছবি ও বৃজ্জিবংশীয় পরাক্রান্ত রাজগণের অধীন ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিদেহগণের রাজাও লীচ্ছবিদের রাজাভুক্ত ছিল, মনে হয়। ইঁহারা কবে ও কিরূপে এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহা এখনও অজ্ঞাত। লীচ্ছবি ও বৃজ্জি দিগের মধ্যে কতকগুলি আচার ও ব্যবহার দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঁহারা শকজাতি হইতে উৎপন্ন; কিন্তু বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাসণের সময় ইঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেন;[3] এবং মগধ, কোশল, কোশাম্বী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় দেশের রাজগণের সহিত বিবাহাদি সূত্রে সম্বদ্ধ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে কেহ রাজা হইতে পারিতেন না; অভিজাত-বংশের একটি সমিতি হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া রাজা কোনও গুরুতর কার্য্য করিতে পারিতেন না। লীচ্ছবিদের মধ্যে এইরূপ রাষ্ট্রতন্ত্রের শাসন বৈশালিরই বিশেষত্ব ছিল না। এইরূপ oligarchy অন্যান্য প্রদেশেও ছিল। কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে আছে, "লিচ্ছিবিক-বৃজিক-মল্লক-মদ্রক ককবকুরু পাঞ্চালাদয়োঃ রাজশব্দোপজীবিনঃ।" রাজশব্দ নির্ব্বাচিত অর্থে ব্যবহৃত হইত, এইরূপ theory আছে। বৈশালি তিন বিষয়ের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ, ইহা শেষ জৈন-তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মস্থান। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধদেবের স্মৃতি ও চরণধূলি; কুশীনগরে যাইবার পথে তিনি তিনবার এই বৈশালীতে পদার্পণ ও অবস্থান করিয়া অনেক উপদেশাদি প্রচার করেন। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধদেবের তিরোধানের ১০০ বৎসর পরে এখানে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাধর্ম্ম-সঙ্গতির অধিবেশন হয়।

জৈন শেষতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী বা বৰ্দ্ধমানস্বামীর তিরোধান আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫২৬ অব্দ, কি এইরূপ সময়ে হয়। সাধারণতঃ, ইনি জৈনধর্ম্মের একরূপ প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু জৈনশাস্ত্র-মতে ইহাঁর পূর্ব্বে ঋষভদেব হইতে পার্শ্বনাথ পর্য্যন্ত আরও ২৩ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।* তন্মধ্যে ঊনবিংশসংখ্যক মল্লি-(মল্ল) নাথ এবং একবিংশ সংখ্যক নমিনাথ মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সমেতশিখরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে মহাবীরের ২৩০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতিভ্রাতা বলিয়া উক্ত। মহাবীরের জন্মস্থান বৈশালি নগরীর অংশবিশেষ কোল্লগ গ্রামে। Dr. Bloch অনুমান করেন, প্রাচীন কোল্লগ গ্রাম বর্ত্তমান কোলহুয়া; সেখানে অশোকস্তম্ভ ও স্তূপ, মর্কট হ্রদ প্রভৃতির নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। মহাবীর স্বামী বৈশালিরাজ চেতকের ভগ্নী ত্রিশলা এবং সিদ্ধার্থের পুত্র। এই চেতকের কন্যা বৈদেহী চেল্লনের সহিত মগধরাজ বিম্বসার বা বিম্বিসারের বিবাহ হয় এবং অজাতশত্রু ইঁহারই গর্ভজাত। মহাবীরস্বামী রাঢ়দেশে দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন; এবং নির্গ্রন্থ জৈনদের আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইঁহার অপর নাম বৰ্দ্ধমানস্বামী। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে ইহাকে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র বা জ্ঞাতৃপুত্র অথবা "নাতপুত্ত" বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের সুবিখ্যাত শিষ্য এবং পারিষদ মোগ্গলায়ণ এবং উপালী প্রথমে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন, পরে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন।*

১ রাঃ আদিঃ ৪৭।১৯

২ রাঃ আদিঃ ৪৮।১১

৩ রাঃ আদিঃ ৫০।১

৪ রাঃ আদিঃ ৬৭।৭

৫ মহাপরিনিব্বাণ সুত্র ৬।৫১

৬ এই বৃজ্জিদের ভাষাই প্রাচীন মিথিলার ভাষা। ইহা পরে বঙ্গের, কাব্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। বৃজ্জি বুলির পরিবর্ত্তে ইহা পরে ভ্রমক্রমে বঙ্গে ব্রজবুলি বলিয়া পরিচিত হয়।

* জৈন হরিবংশ। মধ্যে মণিকার কৃত ধর্ম্মপরীক্ষা, ১৮ অধ্যায়।

বিশ্‌করমের পূজা

[শ্রীরেবতীমোহন সিংহ]

'তারপর কি হবে ?' এই ভাবিয়া অনেক সময় আমরা আকুল হইয়া পড়ি ; কিন্তু, মানুষের ব্যর্থ আকুলতা বিশ্বদেবতার কাছে পৌছায় কি না, জানি না। তাই পাড়ার রামজীবন নাথ যখন মৃত্যুশয্যায় গড়াগড়ি দিতেছিল, তখন সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিয়াছিল, "জীবন নাথ যদি ম'রে যায়, তবে তার ছেলেটির কি হবে ?" প্রতিবেশীর ব্যর্থ শোকের গভীর নিশ্বাস শুধু মুমূর্ষু রামজীবনের যন্ত্রণাই বাড়াইয়া তুলিল। যা' হবার, তা' হ'য়ে গেল। সংসারের বিরাট ঘূর্ণিপাকে তৃণের মত ১০ বছরের পুত্র নবীনকে ফেলিয়া রামজীবন চক্ষু বুজিল। তাহার একমাত্র পুত্র নবীন। পাড়ার লোকে তাহাকে নবিনা বলিয়াই ডাকিত। নবিনা ছেলেটি ছিল বেশ—পড়ায় বেশ, চরিত্রে বেশ। রামজীবনের একান্ত ইচ্ছা ছিল পুত্রকে লেখাপড়া শিখায়। অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও ইহারই মধ্যে সে নবিনাকে হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিল।

নবিনা তাহার শিশু-হৃদয়ে যে সমস্ত সুন্দর-সুন্দর, আশার সম্মোহন ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছিল, পিতার মৃত্যুতে সবগুলিই এলোমেলো হইয়া গেল। নবিনা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া ঘরে আসিল। সংসারে তাহার একমাত্র মা। সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া নবিনা যখন চারিদিকে অন্ধকার দেখিত, তখন ভীতিবিহ্বল বালকের ন্যায় তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইত ; কিন্তু বিধাতা তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে সৃষ্টি করেন নাই।

নবিনা নেহাৎ গরীব,—প্রাণে গরীব, বিদ্যাবুদ্ধিতে গরীব। যতদিন পারিয়াছিল, দুঃখিনী মা তাহাকে আবরিয়া রাখিয়াছিল। নিজে একবেলা খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইত। অভাগিনী প্রায়ই উপবাস করিয়া থাকিত ; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাহার ক্ষুধা নাই। কিন্তু বিধবা বুঝিয়াছিল, এমন দিন আসিতে পারে, যখন ক্ষুধা থাকিলেও পেটে দিবার কিছু থাকিবে না। দুর্ভিক্ষে চারিদিক গ্রাস করিতে বসিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে এই বালককে রক্ষা করিবার জন্য উপবাস করিয়াও ভাণ্ডার কথঞ্চিৎ পূর্ণ রাখিত। এবাড়ী হইতে একমুষ্টি ক্ষুদ, ওবাড়ী হইতে দুটি চিড়ে, আনিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিল। গ্রামে নবিনার কোন আপন-পর ছিল না, শত্রু-মিত্র ছিল না। তাহার সবই সমান, সে সকলের বাড়ীতেই পাত বিছাইত। প্রতিবেশী রামার মা, হরির মা, নবিনার মাকে দুটি ভাত খাইতে বলিয়া যাইত। অভাগিনী সারাদিন তাহাদের বাড়ী কাজ করিয়া নবিনাকে লইয়া এক পেট খাইয়া আসিত। যে কোন তের-পরবে প্রতিবেশীরা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিত। বিধবা নিঃসঙ্কোচে সকলের বাড়ী খাটিয়া, কাজ করিয়া, খাইয়া বেড়াইত। গরীবের আবার কিসের সঙ্কোচ ?

যেদিন গ্রামের সকল 'নাথ' মিলিয়া ঠিক করিল, কায়স্থ-বাড়ী ভাত খাওয়া হইবে না—নবিনা তখন তাঁতের ঘরে। কয়েকজন প্রতিবেশীর সাহায্যে নবিনা একটু বয়স্ক হইয়া তাঁতের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। সারাটি দিন সে তাঁত বুনিত, তাহার মা জিনিসপত্র যোগাইয়া দিত। কতদিন দেখিয়াছি, নবিনার কাঁধে জলের কলস। ১২।১৩ বছরের বালক নদী হইতে জল আনিয়া মায়ের সাহায্য করিত। সারাদিন তাঁত বুনিয়া সন্ধ্যার সময় একবার খেলার মাঠে সমবয়স্ক বালকদের নিকট দেখা দিত। না জানি তাহার প্রাণটি কেমন করিত! এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্যেও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার উপর সারল্যের হাসি ফুটিয়া উঠিত।

ধনা আসিয়া ডাকিল—"অ—নবিনা, তর্ মা কই ?"

নবিনা তাঁতের গর্ত্ত হইতে উত্তর দিল—"কি-অ-কেন্ ?"

ধনা—"দেখিছ্ তোরা নি কায়স্থবাড়ী খেতে বছ।" নবিনা কিছুই বলিল না। ঘরের ভিতর হইতে শুধু একটি অস্পষ্ট শব্দ হইল। নবিনার সঙ্গে আবার দল-ফল কি। দু' একদিন গিয়া নবিনার মা নাথপাড়ার ধনা মনার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া বুঝাইয়া বলিল, "নবিনা গরীব মানুষ; পরের বাড়ী মাগিয়া খায়; তার সাথে আর একটা কথা কি।" ধনা- মনা সকলেই বলিল, "না তা' হবে না, যদি আমাদের মধ্যে থাক্তে হয়, তবে আমাদের মতই চল্তে হবে।"

গরীব বেচারা নবিনার কি আর দল-টল করা চলে—চলিবেই বা কিরূপে? গ্রামের কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে মেয়ের বিবাহে নবিনার মা নবিনাকে লইয়া খাইয়া আসিল। তারপর কি হইল? নাথ-সমাজের গণ্ডীর ভিতর হইতে নবিনা বহিষ্কৃত হইল। স্ব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্বের মতই তাহারা কায়স্থ বাড়ী আসা-যাওয়া করিতে লাগিল।

আর কোন পূজা করিতে পারুক না পারুক, বৎসরের প্রথম দিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজা দেওয়া শিল্পীদিগের একটা অপরিহার্য্য প্রধান অনুষ্ঠান। এ পূজায় ছোট বড় নাই, ধনা গরীব নাই; যে যেরূপে পারে, বিশ্বদেবতার পূজা করিয়া থাকে। আজ সেই শুভদিন। সকলেই,—যার যেরূপ শক্তি—পূজার আয়োজন করিয়াছে। নবিনার মাও করিয়াছে। সে যেমন পারে, তেমনই করিয়াছে। একমুষ্টি আতপ চাউল, দু'টী কলা, আর এক পয়সার চিনি, এই তার সর্ব্বস্ব—এই তার প্রাণপণ, এই তার যথেষ্ট। প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহের আসবাবপত্র ধুইয়া, স্নান করিয়া, পূজা পাতিয়া, নবিনার মা বসিয়া আছে। নবিনাও স্নান করিয়া, নূতন কাপড় পরিয়া,পুরোহিত-ঠাকুরের অপেক্ষা করিতেছে। আসে-আসে করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গেল; বেলা বারোটা বাজিল—পুরোহিতের কোনই সাড়া শব্দ নাই। নবিনা দেখিয়া আসিল, সকলের বাড়ীই পূজা হইয়া গিয়াছে—হয় নাই শুধু তাহার। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খুঁজিয়া ধনার বাড়ী গিয়া শুনিল, নবিনার জল অস্পর্শ্য—পুরোহিত তাহার বাড়ী পূজা দিতে পারিবে না। পুরোহিত পূজা দিবে না শুনিয়া নবিনার মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তবে কি এবার আর বিশ্‌করমের পূজা হইবে না? তখন বেলা ১টা। ৪ মাইল দূরে আর একঘর নাথের ব্রাহ্মণ ছিল। নবিনা তাড়াতাড়ি কাঁধে চাদর ফেলিয়া সেইখানেই ছুটিল। বৈশাখ-রবির বিকট হাসি উত্তপ্ত ধূলিকণাগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত পা দগ্ধ করিতেছিল। সেই দুপুরবেলা ক্ষুধাতুর নবিনা, হতাশ নবিনা, মুখখানা মলিন করিয়া মাঠের উপর দিয়া দৌড়িয়া চলিল। অমন করিয়া বালক আর কতটুকু হাঁটিতে পারে? তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইয়া গেল। প্রায় তিন মাইল আসিয়া নবিনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এ দিকে নবিনার মা, ঐ দেখ, একবার ঘরে আসে—একবার বাহিরে যায়। শুধু পথপানে চাহিয়া দেখে—ঠাকুর আসিল কি না, নবিনা ফিরিল কি না। অভাগিনী ক্ষুব্ধচিত্তে ডাকিতে লাগিল—হে বিশ্বের দেবতা, সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া কি আজ তুমিও ত্যাগ করিলে? হে পরমেশ্বর, বছরে একবার তোমার পূজাটা—তাও কি করিতে পারিব না? দীনবন্ধু, নবিনা তোমার নিকট কোন্ অপরাধে অপরাধী।

এবারের মত আর বিশ্‌করমের পূজা হইল না দেখিয়া, নবিনার মা বাহির হইতে ঘরে আসিয়া, আঁচল পাতিয়া মাটীতে পড়িয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার নবিনাই বা কোথায়? এতক্ষণ সে শুধু পুরোহিত ঠাকুরের জন্য ভাবনা করিতেছিল—এখন নবিনার জন্যও তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠিল। নবিনার মা উদাসপ্রাণে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিল; এমন সময় পুরোহিত আসিয়া বলিল 'মা, এখনও সময় যায় নাই, তাড়াতাড়ি পূজার আয়োজন করে দাও। আমি সব ছাড়িয়া নবিনাকে লইয়াই থাকিব।" নবিনার মা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, ঘরের দ্বারেই তাহার পুরোহিত—পশ্চাতে নবিনা।

নবিনা যখন জ্ঞান লাভ করিল, তখন সন্ধ্যার আঁধারে রবির কিরণ ম্লান করিয়া দিতেছিল। আর ব্যর্থ প্রয়াসে কাজ নাই ভাবিয়া সে বাড়ী ফিরিল। তাহার মা বলিল, "সারাদিন উপোস [illegible] আবার পুরুতের সঙ্গে তুই গেলি কেন?" নবিনা অবাক্! সে বলিল, সে ত বাড়ী আসে নাই। তখন তাহার মা; পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার আগমন, পূজার কথা বলিল। নবিনার মা গলবস্ত্র হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "বাবা বিশকরম দেখা দিলে—কিন্তু চিন্‌তে দিলে না বাবা!"

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১২)

পত্নী, পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশীয় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন, ক্যাণ্ডিয়া (S. S. Candia) নামক জাহাজে মধুসূদন য়ুরোপ-যাত্রা করিলেন। যে ইংলণ্ড-গমনের উৎকট বাসনা আশৈশব তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, বিধাতার বিধানে সে আকাঙ্ক্ষা, সে তৃষা, এতদিনে নিবৃত্ত হইতে চলিল। নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প-সাধনে দৃঢ়ব্রত মধুসূদন কিছুতেই পশ্চাদ্‌পদ হইবার পাত্র ছিলেন না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও গন্তব্যপথে উপনীত হইতে কখনও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। যখন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই তিনি সেই উদ্দেশ্যকে ধ্রুবতারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেন; হিমাদ্রি-সদৃশ বাধাবিঘ্ন গন্তব্যপথ অবরোধ করিলেও, বজ্রতেজদীপ্ত মধুসূদন পাষাণবক্ষ-নির্ম্মুক্ত রুদ্ধ নির্ঝরের ন্যায় কানন-কান্তার ভেদ করিয়া, স্বীয় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতেন! সেই প্রচণ্ড প্রবাহকে অন্যপথে ফিরাইতে কাহারও সাধ্য ছিল না।

য়ুরোপে গিয়া ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষা, এবং য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার, বহুদিন হইতেই মধুসূদনের আন্তরিক স্পৃহা ছিল। কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তিনি এতদূর নিমগ্ন ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন যে, কিছুকালের জন্য সে বাসনা প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন না করিয়া তিনি অন্য কিছুই করিবেন না, এমন অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অর্ণবপোতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

"You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat."

ভারতের প্রবাল-উপকূল ও স্বর্ণরেণুনিভ বালুকাময় বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া অর্ণবপোত 'ক্যাণ্ডিয়া' উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল সুনীল সাগরে আসিয়া পড়িল! তাঁহার চির-পরিচিত মান্দ্রাজের বিচিত্র উপকূল অতিক্রম করিয়া যখন জাহাজ সিংহলের নারিকেল-কুঞ্জকাননশোভিত বন্দরে রাত্রিতে নঙ্গর করিয়াছিল, তখন মধুসূদনের কবি-হৃদয় বৈদেহীর দুঃখস্মৃতিতে করুণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল— রামায়ণের পুণ্যকাহিনী তাঁহার চিত্ত বিলোড়িত করিয়াছিল। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। এই স্মৃতির উল্লেখ করিয়া তিনি 'রামায়ণ'-শীর্ষক কবিতায় পরে লিখিয়াছিলেন;—

> "সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
> স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধরূপ ধরি,
> বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
> গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
> যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!"

ক্রমে কত সমুদ্র ও বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া জাহাজ য়ুরোপাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চিরবসন্তময় মনোরম মাণ্টা দ্বীপ অতিক্রম করিলে সুহৃদ-বৎসল মধুসূদন S. S. Ceylon নামক জাহাজ হইতে আবাল্য-সুহৃদ গৌরদাসকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন;—

S. S. Ceylon, off Malta,
11th. July, 1863, Friday.

My dear Gour,

I sit down to scribble a few lines to you, my good old friend, from on board the good steamship 'Ceylon'—quite a fairy-castle afloat, my boy. You have no idea of the magnificence that characterises almost everything on board. The saloon is worthy of a palace; the cabins fit for Princes. But of all that by and bye—when I am in England, and able to afford time for an elaborate description of the voyage. I am at this moment floating down the famous Mediterranean sea with the rocky coast of north Africa in view! Yesterday we were at Malta, last Sunday at Alexandria. In a few days more, I hope, we shall be in England. Just 32 days ago, I was in Calcutta! Is not this travelling with wonderful rapidity? But the journey has its dark side also. Patience, my friend, and you will hear everything. I intend drawing up a long account of the trip for the 'Indian Field' and asking the Editor to send you a copy of his paper, in case you are no subscriber to it. What are you doing with yourself, old fellow? I wish I had half a dozen of our countrymen on board. We would form a party by ourselves. Do you know where our Hary is? If so, kindly remember me to him. Don't reply to this till you hear from me from England. As soon as I get there, I shall give you my address; then you can fire away to your heart's content, though, I fear, I shouldn't have much time to devote to my friends, for, I am bent upon learning my profession and winning honours.

পাঠক! এই পত্রে দেখিতে পাইবেন যে, মধুসূদন তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রে লিখিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; আমরা যতদূর অবগত আছি, তিনি তাঁহার সমুদ্র-যাত্রা-কাহিনীর কতকাংশ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

ক্রমে ভূমধ্যস্থসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ এবং নীলোর্ম্মিচুম্বিত স্পেন দেশের উপকূল অতিক্রম করিয়া জিব্রাল্টার অভিমুখে গমনকালীন মধুসূদন উক্ত পত্রখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন;

Off the coast of Spain,
Sunday.

I have suffered this letter to lie idle these two days; but I must finish it to-day. We expect to be at Gibralter to-morrow morning, and I must despatch it from that station. You cannot imagine how calm the sea is to-day; it is, for all the world, like our own Hooghly. The weather is somewhat like the middle of November with us, neither very cool nor very hot. I thought we should find it much colder. But people say, it will be different when we get into the Atlantic and the famous Bay of Biscay! As for news, I have scarcely any to give you now, though I hope to satisfy you when I get to London. I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land of which I have thought so much even from my boy-hood. But truth is stranger than fiction!—Let me now hasten to conclude, but not before I have assured you, how sincerely,

I am, my dear Gour, ever yours
affectionately
Michael M. S. Dutt.

ক্রমে পর্ত্তুগালের রাজধানী চিত্রপ্রতিম লিস্‌বন নগরী, বাত্যা-ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিস্কে উপসাগর, (Bay of Biscay)

আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষার্দ্ধভাগে মধুসূদন ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার আশৈশবপোষিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হইল।

প্রথম-প্রথম নিঃসঙ্গ ইংলণ্ড-প্রবাসে তিনি বড়ই নির্জ্জনতা বোধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন কোন ইংরাজ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "The wildness of solitudes in London is more appalling than that of a desert."

ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায় শিক্ষার অভিপ্রায়ে মধুসূদন তথাকার গ্রেজ ইন্ (Gray's Inn, Inner Temple) নামক ব্যারিষ্টার-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) অধ্যয়নে নিরত হইলেন; এবং কিছুদিন শান্তচিত্তে একাকী সুদূর প্রবাসে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্ববিধাতা মধুসূদনের ভাগ্যে শান্তি ও সুখ লিখেন নাই। ধনীপুত্র ও বাগ্দেবীর বরপুত্র হইলেও, তাঁহার সমগ্র জীবনে অভাব ও অনাটন কখনও ঘুচে নাই। কত সময়ে কত টাকা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শান্তচিত্ত হন নাই। বাহিরে হর্ষোৎফুল্ল ও সতত আমোদপ্রিয় হইলেও, অন্তরে বিষম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তিনি অধীর হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাস চিরউদ্বেগময় করিবার নিমিত্ত এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধুসূদনের তালুকের পত্তনীদার ও প্রতিভূগণ ব্যবস্থামত, মধুসূদনকে নিয়মিত অর্থ য়ুরোপে প্রেরণ করিবেন এবং কলিকাতায় তাঁহার পত্নী-পুত্র-কন্যাকে মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুদিন নিয়মমত কার্য্য করিয়া মধুসূদনকে আর অর্থ প্রেরণ করিলেন না; তাঁহার পত্নীকেও নির্দ্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রদান করিলেন না। সুদূর ইংলণ্ডে মধুসূদন, এবং ভারতে তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, পুত্রকন্যাসহ মহাবিপদে পতিত হইলেন। অভাগিনী হেন্‌রিয়েটা ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে কোন উপায়ে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া, পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন ইংলণ্ডে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই আকস্মিক ব্যয়বাহুল্যে মধুসূদন অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

মাইকেল মধুসূদন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সপরিবারে ফ্রান্স রাজ্যের ভরসেল্‌স নগরে গমন করেন। ইংলণ্ডের অপেক্ষা ফরাসী দেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল বলিয়া, এবং য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষা শিক্ষার সুবিধা হইবে ভাবিয়া, মধুসূদন আইন অধ্যয়নের অবকাশকালে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রায় দেড়বৎসরকাল ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার য়ুরোপের ব্যয়-নির্ব্বাহের নির্দ্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে, মধুসূদনের বিপদের অবধি রহিল না। সেই স্বজনবর্জ্জিত দেশে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? দোকানদারগণ তাহাদের প্রাপ্য অর্থ না পাওয়াতে, তাঁহার আহার্য্য প্রভৃতি প্রেরণ করিল না! তিনি প্রথমতঃ উপায়ান্তরের অভাবে গৃহসজ্জোপকরণ, পত্নীর আভরণ, পুস্তকাদি, তৈজসপত্র প্রভৃতি, এমন কি তাঁহার রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর পানপাত্রটি পর্য্যন্ত সরকারী বন্ধকী-আফিসে প্রেরণ করিয়া পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়াছিলেন। শেষে যখন কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন নানাস্থান হইতে ঋণ করিয়া বিষম ঋণজালে বিজড়িত হইলেন; ক্রমে ঋণও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে, শোণিত-শোষক অভাবে প্রপীড়িত হইয়া, তিনি কোন কোন দাতব্য সমিতিরও দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

পত্তনীদার ও প্রতিভূগণ কেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রেরণ করিতেছেন না, তাহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, মধুসূদন, তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রধান প্রতিভূ বাবু দিগম্বর মিত্রকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন। যখন উপর্য্যুপরি আটখানি পত্র লিখিয়া কোন উত্তরই পাইলেন না, তখন মহানৈরাশ্যে প্রত্যুৎপন্নমতি মধুসূদন, ভরসেল্‌স নগর হইতে 'বঙ্গকুলচূড়া' দয়ারসাগর, পণ্ডিত-কুল-শিরোমণি, সুহৃত্তম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়কে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন নিজের বিপন্ন অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মর্ম্মন্তুদ পত্র লিখিলেন!

মাইকেল মধুসূদন সুদূর য়ুরোপে অর্থাভাবে যে লোমহর্ষণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশবাসীর ধারণা করিবার শক্তি নাই। অসীম সহিষ্ণু, অমিত শক্তিশালী, প্রতিভাবান পুরুষ বলিয়াই তিনি সপরিবারে কোন উপায়ে দুস্তর বিপদ-সাগর পার হই[illegible]

কূলে উঠিয়াছিলেন। সপরিবার ত দূরের কথা, একলা হইলেও যে-কোন ভারতবাসী সেই বিপদ-সঙ্ঘাতে ধূলি-ধূসরিত ও চূর্ণ হইয়া যাইত! যখন তিনি তরুণ যুবক, যখন বিশপস্ কলেজে তাঁহার পিতা তাঁহার মাসিক অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন মধুসূদন স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডেকে, তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এবং স্বদেশবাসী কাহারও সহানুভূতি না পাইয়া অভিমানী মধুসূদন একাকীই ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত সুদূর মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন, তখন পশ্চাতে ফিরিয়া কাহারও দিকে লক্ষ্য করেন নাই। আর আজ এই সুদূর অপরিচিত য়ুরোপে সেই মধুসূদনই বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের নব্য কবিকুলের শিরোমণি—তিনি কাহারও নিকট অপরিচিত ছিলেন না। বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচিত অনেক ধনকুবের রাজা-মহারাজারও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু মহাপ্রাণ মধুসূদন একমাত্র মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই 'শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণ' জানিয়াই সকলকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

দয়াবতার বিদ্যাসাগর মাইকেল মধুসূদনের পত্র পাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত স্বদেশী বন্ধু সুদূর য়ুরোপে ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কি বিদ্যাসাগর কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের বিপন্মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিভূদিগের সহিত হিসাব-নিকাশ করিয়া অর্থ-সংগ্রহে বিলম্ব ঘটিবে বুঝিয়া, তিনি নিজে ব্যবস্থা করিয়া, প্রথমে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া, মধুসূদনকে আসন্ন-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। পরে ক্রমাগত অর্থপ্রেরণ করিয়া, মধুসূদনের সঙ্কল্পসিদ্ধি করাইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন।

মধুসূদন যে অর্থাভাবে সেই সুদূর প্রবাসে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার লিখিত পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান মধুসূদন লিখিতেছেন,—

"I send this letter to you through Pran Kissen Ghosh of Police office, for misfortune and suffering have made me suspicious; and, who knows, if my last two letters have found you? Alas! my dear friend, I cannot possibly expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you? If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself; for, there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded. God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

* * * *

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।'

* * * *

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagar, but Karunasagara (করুণাসাগর) also."

নিজের শোচনীয় আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবৃত করিয়া মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। নিজের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া তিনি কিরূপ অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন—কিরূপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় প্রবাস-যাপন করিয়াছিলেন, এই সকল

বিষয়ের কিয়দংশ পাঠক-পাঠিকার অবগতির নিমিত্ত আমরা কতকগুলি অপ্রকাশিত পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া, মহাকবির মহাযন্ত্রণাময় প্রবাসের মর্ম্মন্তুদ বিবরণ প্রদান করিব। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্টের পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—

"You cannot imagine how unhappy I am! Alas, the men I have left behind, are in the emphatic language of the Bible, "a generation of Vipers! * * * you must save me my dear Vidyasagara; for, if you do not send me *all* the money I want by October next, I shall lose another Term and remain buried in France as I am at this moment.

* * * *

In his letter of the 20th June, Digumber promised to send us a thousand Rupees in a month's time. All the mails of July reached Europe without a line from him, and we are drifting back again to the dangerous shore we had left behind! Surely Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as safe to send money to Europe as it is to send money from one room to another in his own house! * * He sends me Rs. 800 and then shuts shop perhaps for months to come! This is intolerable, by God!

I have 1000 Rs. in the Alipore Court. B. N. Mitter wrote to me in February last to say that he would send me that money "অতি ত্বরায়"। This is August, and not a penny.

One Hurry Bannerjea of Kidderpore owes me 500 Rs.—not a word about that money from any one! What am I to do!

* * * *

God help me!' my great hope now is in you, and, I am sure, you will not disappoint me. If *you* do, I must work my way back to India to commit one or two murders—*wilful* premeditated murders—and then be hanged!"

18th. August, 1864.

"The money, with which I have bought postage stamps for this letter, has been raised from a Pawn-Broker's office!"

আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"I hope, my dear friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than anybody else, and I assure you, I must have money raised on my property without delay."

এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত অনেক পত্র তাঁহার বিপন্ন-অবস্থা, পত্তনীদার ও প্রতিভূগণের নিয়মিত অর্থ প্রেরণে ঔদাস্য ও অবহেলা, সময়োচিত অর্থ-সাহায্য প্রেরণে কাতর ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহার তালুক ও আবাদ পত্তনিদারের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া Land Mortgage Societyর নিকট বন্ধক রাখিয়া প্রয়োজন মত ১৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ, নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার—প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূর্ণ। সে সকল বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে সে সকল পত্রে মধুসূদনের সমসাময়িক অনেক প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক কথা আছে। সুতরাং তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি উক্তি নির্ব্বাচন করিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন;—

18th. August, 1864.

"I suppose, poor Monu will have to take to the Bar *; but then, the question is—has

---

* মনোমোহন, ঘোষ মহাশয় প্রথমে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। শেষে ব্যারিষ্টার হইবার কল্পনা করেন।

he abilities enough to succeed in that? Does he know English enough to address an English jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down? I question very much even if Master Gnanendra Tagore can do it—though a better educated, more experienced and older man. I hope he will never return to India; for, if he does, he will be laughed at. * * I am truly sorry for Monmohun, and have written to him to come to us in France, and try and pick up some French and Italian."

ফ্রান্স রাজ্যের ডাকঘর ও পুলিসের সুব্যবস্থাসম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন ;—

"I am sure, I need scarcely tell you, that money is always safe if sent in a registered letter and that there are fewer thieves and rogues in France than in any other country under the sun. The Police is so wonderfully clever and strict. Adieu!

কিছুদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র না পাইয়া, চিন্তিত হইয়া, মধুসূদন লিখিতেছেন,—

2nd. Dec., 1864.

"I can scarcely describe to you how anxious and troubled I feel at this moment. All recent news from Calcutta is apt to appal even the stoutest heart and your long and unexpected silence makes matter worse for me. * * Am I destined to experience again the horrors to which I was exposed by the merciless silence of Digumber Mitter about the beginning of the year? The idea is frightful! But do not fancy for a moment, that I presume to reproach you. Far from it! I know how wise, thoughtful and kind and considerate you are; and how precious your time is. But you must allow me to deplore my bad luck. I have lost a whole year in Europe; and that is no trifling loss to a man, in my time of life, going to begin a new career."

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন ;—

"I esteem the gentleman you name, and as they are not "great", they will feel for a "*little*" man like me. The gentleman, who has offered to assist me, ought to know that men like you and me are above dirty actions, and that (humanely speaking) we are both still too young to bid adieu to this wicked world!"

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে মধুসূদন লিখিতেছেন—

"Remember, my dear friend, that by the time I receive a reply from you, it costs me about 750 Rs. to live—if not more! I pray you, make one great effort to free me and then go on at your ease."

উপরিউদ্ধৃত পত্রাংশগুলি পাঠ করিয়া,—তৎকালে অর্থাভাবে মধুসূদনের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল,—পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; নিম্নে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—

একবার বাটীভাড়া দিতে না পারায়, তাঁহার বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে বিষম উত্যক্ত করিয়াছিল। কিন্তু দৈবযোগে রেলগাড়ীতে একটি ফরাসী যুবতী মধুসূদনের সহিত আলাপ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, স্বয়ং মধুসূদনের সহিত তাঁহার বাড়ীওয়ালার নিকট গমন করিয়া, তাহাকে মধুসূদনের লণ্ডনস্থ কোন বন্ধুর জামিন লইতে রাজী করাইয়া এবং স্বয়ং অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিয়াছিলেন।

আর একদিন কঠোর অনশনে প্রপীড়িত হইয়া, মধুসূদন, ভরসেল্‌সের জনৈক ইংরাজ পাদরীর নিকট হইতে ২৫ ফ্রাঙ্কস্ ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আর এক সময়ে নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় কাতর হইয়া মধুসূদন প্যারিসের ব্রিটিশ দাতব্য-ভাণ্ডারের নিকট দুই শত টাকা ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;—

"Things, alas ! are getting on very badly with us. I have had to apply to the "British Charitable Fund in Paris" for the loan of 200 Rs. (500 Francs). You cannot imagine how degraded I felt, when I had to appear before the committee. Such a lot of ragged and stinking devils were these ! But as the proverb says, "Adversity makes us acquainted with strange bed-fellows." The members, I am bound to say, treated me with great consideration--especially Sir Joseph Oliffe (brother of the late Roman Catholic Bishop of Calcutta) and Lord Degray."

তিনি য়ুরোপ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে, তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির ভারার্পণ করিবার জন্য, ওকালতনামা (Power of Attorney) লিখিয়া পাঠান ; কিন্তু লেখাটা ঠিক রীতি অনুযায়ী না হওয়ায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় তাঁহাকে আর একটি ওকালতনামা লিখিয়া পাঠাইতে বলেন। মধুসূদনও পুনর্ব্বার প্যারিসের কোন এটর্নী দ্বারা ওকালতনামা লিখাইয়া একখানি পত্রসহ প্রেরণ করেন। সেই পত্রের শেষাংশে লিখিত আছে—"Should the new 'Power' fail to satisfy, you must send me a Telegraphic message and then write your letter in English and get me a certificate, (duly attested) from the Head Office of the French Bank at Calcutta in French to say that I am a man of property and not a penniless adventurer. If you cannot or do not do all this, I shall be in the greatest distress imaginable ! Why does not Chatterjea pay and settle his account ? Kindly ask I. C. Bose & Co. to send me a *'Punjika'* for I have no notion of Bengali dates. Please, tell them to address here."

অর্থাভাবে নির্ম্মম যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইয়া, এবং ঋণদায়ে নিপীড়িত হইবার আশঙ্কায়, মধুসূদন কিছুকাল প্যারিসের একটি নিভৃত অংশে গোপনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় ফরাসীদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক এবং পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে গুপ্তভাবে থাকিতে দেখিয়া সিপাহী বিদ্রোহের নেতা নানা ধুন্দুপন্থ অর্থাৎ নানা সাহেব, ফ্রান্সে পলাইয়া আসিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয়ে তাঁহাদের সেই ভ্রমাত্মক সংশয় নিরসিত হইয়াছিল।

সেই প্যারিস নগরীতেই মধুসূদন, আর এক সময়ে অভাব-অনাটনে এতদূর নিপীড়িত হন যে, কোন প্রকারে শিশু দু'টির আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া স্বামি-স্ত্রীতে হয়তো কোন কোন দিন উপবাস করিতেন। প্রতিবেশীরা তাঁহার এই নিদারুণ অবস্থার বিষয় তাঁহার পরিচারিকার মুখে শ্রুত হইয়া, মধুসূদনের অগোচরে,তাঁহার গৃহদ্বারে একটি টেবিলের উপর তাঁহাদের নিমিত্ত আহার্য্য সামগ্রী এবং শিশুগণের জন্য দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রাখিয়া আসিতেন।* পাছে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় মধুসূদন তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী প্রত্যাখ্যান করেন, এই জন্য তৎসঙ্গে একটি কার্ডের উপর তাঁহারা ফরাসী ভাষায় লিখিয়া দিতেন ; "মহাশয়, আপনি এই দ্রব্যগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব।" কে কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে আহার্য্য রাখিয়া যাইতেছেন, মধুসূদন প্রথমতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। শেষে যখন মহানুহৃদয় ফরাসী জাতির এই অপূর্ব্ব অযাচিত করুণার বিষয় তিনি জানিতে পারিলেন, তখন অসীম কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশী,

---

* "When he was in Paris, he was so much reduced for want of money, that starvation looked at him broadly in the face, till his neighbours heard of his helplessness and gave him food, though without his knowlege, which enabled him to look up and return to London.—"Lives of Eminent Men of Bengal."

তথাকথিত, বন্ধুগণের ব্যবহার—যাহা সেই সমুদ্রপারবর্ত্তী সুদূর প্রবাসে তাঁহার জীবনান্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, —আর অপরিচিত আগন্তুকের প্রতি সেই বিজাতীয়গণের এই দেব-আচরণ—ভাবিয়া, মধুসূদনের চিত্তে হর্ষবিষাদের যে কি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকা অনুমান করিয়া লউন। চিরকৃতজ্ঞ কবি তাঁহার

য়ুরোপে মধুসূদন

(প্যারিসে প্রস্তুত ফটো হইতে গৃহীত)

'সাংসারিক জ্ঞান' নামক কবিতায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সাংসারিক জ্ঞান।

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
"সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
"কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
"মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
"স্ব-তরীতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
"সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
"কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র থায়ে,
"ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?

কিন্তু হায়, এই অরুন্তুদ যন্ত্রণাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই—তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনও সাংসারিক-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন ;

"উদাসীন-দশা তার সদা জীবপুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !"

মহাকবি মধুসূদনের যদি "উদাসীন-দশা" না হইত, তাহা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হইলে কি তিনি জীবনে কখনও এত ক্লেশভোগ করিতেন ? তাঁহার বৈষয়িক-জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব,—একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশুরও অর্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে, বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য মধুসূদনের সে জ্ঞানটুকুও ছিল না। য়ুরোপে তিনি কি ক্লেশই না ভোগ করিয়াছিলেন! তাঁহার যে টাকা ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসেই সুখসচ্ছন্দে তাঁহার সমগ্র য়ুরোপ-প্রবাস যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু হইল কি ? অর্থসম্বন্ধে অবিবেচনার ফলে তিনি ঐশ্বর্য্যবান্

হইয়াও, প্রচুর অর্থ থাকিতেও য়ুরোপে অভাবের প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে চূর্ণপ্রায় হইয়াছিলেন; তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার ভূ-সম্পত্তি (তালুক ও আবাদ) বিক্রয় করিবার নিমিত্ত পুনঃ-পুনঃ আকুল-অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা একটি কথা গৌরদাস বসাক মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

He (Madhu) was reckless, extravagant, improvident and an woeful spendthrift. But

৺মনোমোহন ঘোষ

when he was thrown overboard by—, he was worth 30000 Rs. and no wonder that he should insist on Vidyasgara to sell his property and save him. Vidyasagar could have easily sold that *Abad* which Mahadeb held in Patnee but refrained from doing the extreme step in hopes of leaving Madhoo free to do what he liked or thought best on his return to this country. * * * That *abad* is now yielding the Proprietor Rs. 8000 a year * * * He (Madhu) could have lived like a Raja if he had not been in a hurry to run up in debts and sell all to gratify his extravagant habits."

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণ কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিয়া মধুসূদন আর পরিশোধ করিতে পারেন নাই। য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মধুসূদন ছয় বৎসর পরেই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, তাঁহার অসীম করুণা ও স্নেহের কথা, তাঁহার প্রদত্ত ঋণের কথা, কিছুতেই বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী হইয়া গিয়াছেন। য়ুরোপে থাকিতে-থাকিতেই তিনি দুইটি কবিতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার য়ুরোপের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলিব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

জহাঙ্গীর

জহাঙ্গীর আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজা বিহারীমল কাছওয়াহ্‌র কন্যার গর্ভে, ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখে ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা 'মিরিয়ম-উজ্জ্‌ মানি' (বা তৎকালীন মেরী) নামে পরে

মহবৎ খাঁ

আখ্যাত হইয়াছিলেন। আকবর জহাঙ্গীরকে সুলতান সেলিম নাম প্রদান করেন; কিন্তু দরবেশ সলিম চিশ্তির আশীর্ব্বাদে জহাঙ্গীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে সাধারণতঃ 'শেখুবাবা' বলিয়া ডাকিতেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ অক্টোবর তারিখে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সুলতান সেলিম, 'নূরুদ্দীন জহাঙ্গীর পাদশাহ্‌' নাম ধারণ করেন। মৃত্যুর পর জহাঙ্গীর 'জিন্নৎ মকানী' (অর্থাৎ যাহার আবাসস্থল স্বর্গে) আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। তিনি ২২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে লাহোর প্রত্যাবর্ত্তনকালে, রাজাওর নামক স্থানে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮এ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। রাবি নদীর দক্ষিণ তীরে লাহোরের সন্নিকটে, শাহ্‌দারায় তিনি সমাহিত হ'ন; তাঁহার সমাধির অনতিদূরেই তাঁহার প্রিয়তমা বেগম নূরজহান্‌ শায়িত আছেন।

জহাঙ্গীরের গুণরাশির মধ্যে তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং ন্যায়বিচারপরায়ণতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে, তিনি অত্যধিক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার ন্যায়বিচার পরায়ণতার অপব্যবহার করিয়াছিলেন। পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের ন্যায় জহাঙ্গীরও নানারূপ নেশার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং মদ্যপান ও অহিফেন সেবন করিয়া, নিজ জীবনকে ধ্বংসের মুখে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত এক ছায়াস্নিগ্ধ বীথিকা (avenue) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। জহাঙ্গীর স্বীয় রাজত্বকালে কোন নূতন প্রদেশ অধিকার করিয়া, সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই; বরং তাঁহার রাজত্বের ১৭ বর্ষ কালে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ তাঁহার হস্ত হইতে কন্দাহার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার শান্তপ্রকৃতি অথবা আলস্যপরতন্ত্রতাই তাঁহাকে তাঁহার রাজত্বে বহু রক্তপাত হইতে নিরস্ত করিয়াছিল।

যুবরাজ সেলিম পিতার উজীর আবুল ফজল্‌কে হত্যা করাইয়াছিলেন। তিনি এত অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়-সেবায় নিরত হইয়াছিলেন যে, আকবর তাঁহার পরিবর্ত্তে খসরুকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীও হইয়াছিলেন, এবং বোধ হয় পিতৃস্নেহ অপেক্ষা আলস্য ও ভীরুতাই তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

দুঃখের বিষয়, আকবর সেলিমকে যৌবনে নূরজহানের পাণিগ্রহণ করিতে দেন নাই। তৎকালে এই বিবাহ
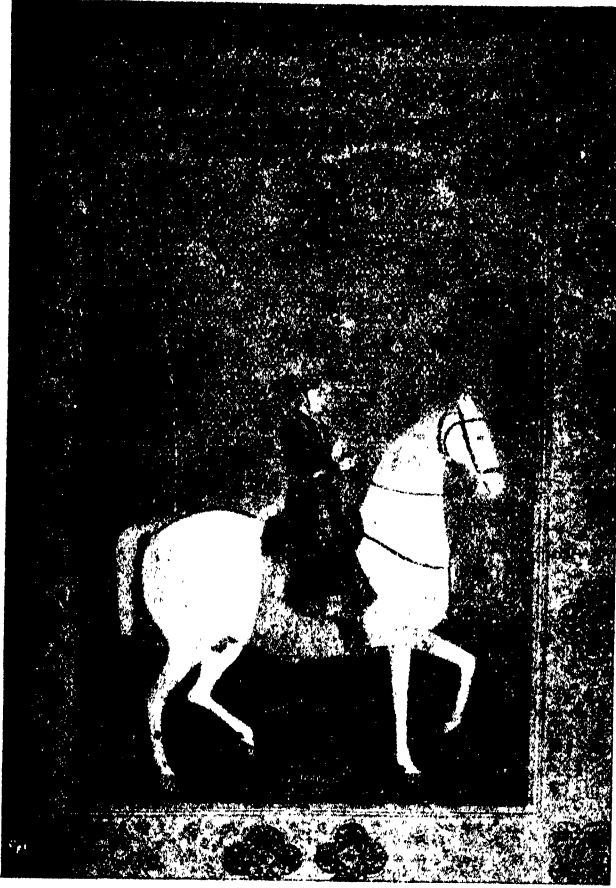
সেলিম (জহাঙ্গীর)

সংঘটিত হইলে বোধ হয়, সেলিমের উপর নূরজহানের প্রভাব মঙ্গলময় হইত। পরে সম্রাট্ হইয়া জহাঙ্গীর নূরজহানকে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এই বিবাহ করিতে তাঁহাকে শের অফ্‌কনের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। নূরজহানের গর্ভে জহাঙ্গীরের কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জহাঙ্গীর যখন তাঁহাকে বিবাহ করেন, তখন বেগম একজন বয়স্থা রমণী। শেরের ঔরসজাত নূরজহানের এক কন্যা ছিল। বেগম জহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া, জামাতার স্বার্থসিদ্ধির প্রতি তৎপর হওয়ায় এবং শাহ্‌জহানের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায়, ভারতে বিষময় ফলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ব্যাপার 'মাসির-উল্-উমারা' গ্রন্থে (Pers. Text, i, 133) বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর জহাঙ্গীর বড়ই দুঃখে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ যক্ষ্মা ও অন্যান্য পীড়ায় তিনি অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় কর্মচারী মহবৎ খাঁ কর্তৃক ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী হ'ন—

হিন্দুরাও-এর গৃহে নৃত্যগীত

প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। পরিশেষে নূরজহানই তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন।

জহাঙ্গীরের পাঁচ পুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে বিদ্রোহী হ'ন; কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং বহুদিন বন্দীভাবে থাকিবার পর দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতান পরবেজ মধুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। সুলতান খুররম্ (পরে শাহ্‌জহান্) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে

জর্জ্জ টমাস্

বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান জহান্দার জন্মাবধি মূর্খ ছিলেন। সুলতান শাহ্‌রিয়ার জহাঙ্গীরের পুত্রগণের মধ্যে একেবারে অধম ছিলেন,—লোকে তাঁহাকে 'ন-সুদনি' (বা অকর্ম্মণ্য) বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জহাঙ্গীর আত্মজীবনচরিত 'তুজুকে-জহাঙ্গীরি' লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা বেশ চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান্ গ্রন্থ। রাজত্বের ১৭ বর্ষকাল পর্য্যন্ত আত্মকাহিনী তিনি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন মৃত্যুসময় পর্য্যন্তের ঘটনাবলী লিখিবার জন্য তিনি খাস্‌মুনসী মুতামদ খাঁকে লিপিকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই মুতামদও পারস্যভাষায় 'ইক্‌বাল্‌নামা-ই-জহাঙ্গীরি' নামে জহাঙ্গীরের একখানি জীবন-চরিত রচনা করিয়া-ছিলেন। বেভ্‌রিজ সাহেব 'তুজুকে-জহাঙ্গীরি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নানা টীকাটিপ্পনী ও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়া যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছেন। 'তুজুকে'র অপর একখানি ইংরেজী অনুবাদও আছে; কিন্তু তাহা ন্যনাধিক পরিমাণে বিকৃত। ইহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে Royal Asiatic Society হইতে প্রকাশিত, মেজর প্রাইস্ কর্তৃক সম্পাদিত 'তুজুকে-জহাঙ্গীরি'। আলিগর-

বেগম সমরু

নিবাসী স্যর সৈয়দ অহমদ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে তুজুকের ফার্সী মূল প্রকাশিত করেন—পুনরায় তিনি আলিগরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দেও ইহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা একেবারে ভ্রমপ্রমাদ-বিরহিত নহে। 'তুজুকে'র অধিকাংশই Elliot & Dowson এর *History of India* গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে। স্যর টমাস রোর *Journal* ও তাঁহার পুরোহিত টেরীর (Terry) গ্রন্থ

হইতেও জহাঙ্গীরের সম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়।*

ঘিয়াস বেগ (ইৎমাদুদ্দৌলা)

ইঁহার প্রকৃত নাম মীর্জ্জা ঘিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ। ৯৮৪ হিজিরায় পিতা খাজা মুহম্মদ শরীফের মৃত্যু হইলে, ঘিয়াসের দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়; এই কারণে তিনি ভাগ্য-পরিবর্ত্তনার্থ স্ত্রী আস্মাৎ বেগম ও পুত্রকন্যা লইয়া পারস্য ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আগমন করেন। কান্দার মধ্যে কপর্দ্দকহীন ঘিয়াসের এক কন্যার জন্ম হয়। মেহের নাম্নী

রাজা বীরবল

ভ্রমণে সেলিম

এই কন্যাই উত্তরকালে রাজেন্দ্রাণী হইয়াছিলেন। কিরূপে ঘিয়াস মালিক মাসুদ নামে আকবরের পরিচিত এক ব্যক্তির চেষ্টায়, সম্রাট্-সকাশে আনীত হইয়া বাদশাহের কর্ম্মচারি-দলভুক্ত হ'ন, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রই অবগত আছেন।

জহাঙ্গীরের সহিত নূরজহানের বিবাহের পর, ঘিয়াস প্রধান সচিবের (বকিলে কুল) পদলাভ করেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় চারিমাস পরেই ১৬২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাগে ঘিয়াসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি আগ্রায় সমাহিত হ'ন।

ঘিয়াস একজন সুকবি, সাধারণের প্রিয়পাত্র এবং বড় শান্তপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। জহাঙ্গীর বলিয়াছেন যে, তাঁহার সাহচর্য্য সহস্র *mufarrih-i-yaqut* অপেক্ষা শ্রেয়। ঘিয়াস একজন কর্ম্মঠ লোক ছিলেন—তাঁহার হৃদয়ও দয়ার প্রস্রবণ ছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোককেও তিনি অনেক সময়ে দয়াপরবশ হইয়া বাঁচাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার একটা দোষ ছিল যে, তিনি লোকের নিকট হইতে অসঙ্কোচে উৎকোচ লইতেন।

মীর্জ্জা আবুল হাসান—আসফ্ খাঁ *

ইনি ঘিয়াস বেগের জ্যেষ্ঠ পুত্র। নূরজহানের বিবাহের পর ইনি ইতিমাদ খাঁ উপাধি লাভ করেন এবং 'খান-সামানের' (Steward) পদে উন্নীত হ'ন। জহাঙ্গীরের রাজত্বের ৭ম বর্ষে (১০২০ হিঃ, ১৬১১ খৃঃ) তাঁহার কন্যা মুমতাজ মহলের সহিত কুমার খুররমের বিবাহ হয়। রাজত্বের নবম বর্ষে আবুল হাসান 'আসফ খাঁ' আখ্যা লাভ করেন। তিনি 'আসফজা' বা 'আসফজাহী' নামেও অভিহিত হইতেন।

* Encyclopaedia of Islam, Vol. I; Tuzuk-i-Jahangiri, Rogers & Beveridge, Vol. II, Preface দ্রষ্টব্য।

* See Maasir-ul-umara (Eng. trans.) pp. 287—29; Ain-i-Akbari, Blochmann, i, 511.

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মহবৎ খাঁর বিদ্রোহের মূল কারণই ছিলেন অসফ্ খাঁ। কিরূপে অসফ্ খাঁ, জহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর চতুরতা অবলম্বন করিয়া শাহ্‌জহানকে সিংহাসন প্রদান করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শাহ্‌জহান্ সম্রাট্ হইয়া তাঁহাকে 'আমেনুদ্দৌলা' (সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত) উপাধি প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর অসফ্ খাঁই জহাঙ্গীরের উজীরের পদলাভ করেন। এই অসফেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঙ্গালার সুবিখ্যাত শাসনকর্ত্তা মীর্জ্জা আবুতালিব শায়েস্তা খাঁ।

অসফ্ খাঁ

১০৫১ হিজিরায় (১৬৪১ খৃঃ) লাহোরে উদরী রোগে অসফ্ খাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তথায় জহাঙ্গীরের সমাধির সন্নিকটে সমাহিত হ'ন।

অসফ্ ৪০৫০,০০০ টাকা বেতন পাইতেন; ইহা ব্যতীত তাঁহার ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের জাগীরও ছিল। মৃত্যুকালে তিনি ১২৫ লক্ষ টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যান। ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি লাহোরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা কুমার দারা শুকো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু রাও-এর গৃহে নৃত্যগীত

এই চিত্রের বিষয়, হিন্দুরাও-এর গৃহে নৃত্যগীতের মহলা। হিন্দু রাও, গোয়ালিয়রের দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার পত্নী বাইজা বাই-এর ভ্রাতা। তিনি দিল্লী-প্রবাসী ইংরেজগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

রাজা বীরবল (বীরবর)

ইঁহার নাম মহেশ দাস—বদায়ূনী ইঁহাকে ব্রাহ্মণদাস বলিয়াছেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ভাটের কার্য্য করিতেন। মহেশ দাস অতি হীন-অবস্থাপন্ন ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত হ'ন এবং রঙ্গ ও ব্যঙ্গের জন্য আকবরের একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া সম্রাটের নিকট হইতে 'কবরায়' (Poet Laureate) উপাধি লাভ করেন। আকবর তাঁহার সাহচর্য্য বড়ই ভালবাসিতেন।

আকবরের রাজত্বের ১৮ বর্ষে নগরকোটের রাজা জয়চাঁদ সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ায় কারারুদ্ধ হ'ন। ইহাতে জয়চাঁদের পুত্র বুধচাঁদ বিদ্রোহী হইলেন। নগরকোটে কবরায়ের জাগীর ছিল—এক্ষণে, সম্রাট্ কবরায়কে জয়চাঁদের রাজ্য প্রদান করিলেন এবং পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেনকুলী খাঁকে আদেশ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে সৈন্যসামন্ত লইয়া বুধচাঁদের নিকট হইতে নগরকোট অধিকার করিয়া কবরায়কে প্রত্যর্পণ করেন। সম্রাট্ কবরায়কে 'রাজা বীরবল' উপাধি প্রদান করিয়া লাহোরে প্রেরণ করিলেন। হুসেনকুলী নগরকোট আক্রমণ করিলেন বটে; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইব্রাহিম হুসেন মীর্জ্জার উৎপাত দমন করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, তাঁহাকে নগরকোট অধিকার হইতে বিরত হইতে হয়। বীরবল জাগীর পাইলেন না।

বীরবল অধিকাংশ সময়ই রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজত্বের ৩০ বর্ষে (৯৯৪ হিঃ, ১৫৮৬ খৃঃ) জৈন্ খাঁ কোকা ইউসুফজাইদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হ'ন। তিনি বাজোরে ইউসুফজাইদিগকে এক্‌প্রকার উচ্ছেদ করিয়া পেশোয়ারের দক্ষিণে ও বাজোরের উত্তরে সোয়াটে উপস্থিত হ'ন; কিন্তু অনেক শৈলরাজি অতিক্রম করিতে হওয়ায়, জৈন খাঁর সৈন্যগণ ক্লান্তপরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে জৈন্ খাঁ সম্রাটের নিকট একদল সৈন্য-সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করিলেন। বিশেষ অনিচ্ছা-

সত্ত্বেও আকবর বীরবলকে এই অভিযানে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ বীরবলের সহিত হাকিম আবদুল ফতের অধীনে একদল সৈন্যও প্রেরণ করিলেন।

জৈন্ খাঁর সহিত বীরবল বা হাকিম আবদুল ফতের কোন দিনই সদ্ভাব ছিল না। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা অনৈক্য উপস্থিত হওয়ায় বীরবল অন্যপথ দিয়া ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। আফগানেরা সম্রাট্‌পক্ষীয়

ইৎমাদুদ্দৌলা

সৈন্যগণকে ফিরিতে দেখিয়া প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল—বহুলোকের প্রাণনাশ ঘটিল—সঙ্গে সঙ্গে বীরবলেরও মৃত্যু হইল।

বীরবলের মৃত্যুতে আকবর দুই দিন কোন আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি খাঁনখানান্ আবদুর রহিমকে বীরবলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, বীরবল সম্রাটের হৃদয় কতটা অধিকার করিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই পত্রখানি আবুল ফজলের 'মক্‌তুবাৎ' গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আকবর প্রথমে বীরবলের প্রশংসা করিয়া ও তাঁহার প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া, লিখিয়াছিলেন :—

"Alas a thousand times that the wine of this wine-cellar has become lees, and that this sugarcane has become poison. The world is a deceiving and thirst-producing mirage, and a station full of heights and hollows. Crapulousness follows the drinking at this feast. Some obstacles have prevented me from seeing the body with my own eyes so that I might testify my love and affection for him. (Maasir-ul-umara, p. 422 3)

বদায়ূনী একটী জনশ্রুতির কথা লিখিয়াছেন। হিন্দুরা সম্রাট্‌কে বীরবলের শোকে মুহ্যমান দেখিয়া প্রচার করিয়া দেন যে, বীরবলকে নগরকোটের পার্ব্বত্য প্রদেশে যোগীসন্ন্যাসীদের সহিত পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। আকবর ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, বীরবল হয় ত বা ইউসুফজাইদিগের হস্তে পরাজিত হওয়ায় রাজসভায় উপস্থিত হইতে লজ্জিত হইয়া থাকিবেন। সম্রাট্ এই কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একজন 'আহাদী'কে নগরকোটে প্রেরণ করেন এবং অবগত হ'ন যে জনরব সম্পূর্ণ অলীক। ইহার পরও একবার আকবর সংবাদ পান যে, বীরবলকে কলিঞ্জরে দেখা গিয়াছে; কিন্তু ইহাও যে ভিত্তিহীন, পরিশেষে সম্রাট্ তাহা অবগত হইয়াছিলেন।

দানশীলতা, বদান্যতা ও কবিপ্রতিভার জন্য বীরবল বিখ্যাত ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বদায়ূনী, শাহ্‌বাজ খাঁ ও অন্যান্য ধার্ম্মিক মুসলমান বীরবলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, বীরবলই আকবরকে ইসলামধর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত

করাইয়া ছিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বীরবর কাল্পির অধিবাসী ছিলেন। জনশ্রুতি যে, আকবর না কি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

বেগম সমরু

যাহারা দানাদি পুণ্যকার্য্যে ভারতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বেগম সমরু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে সম্মান ও ক্ষমতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। সমরু বেগমের জীবন-কাহিনী এরূপ বৈচিত্র্যময়, যে তাহা অল্প পরিসরের মধ্যে 'যৎকিঞ্চিতে' লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিব।

ওয়াল্টার রেণার্ড ওরফে সমরুর নাম ইতিহাসজ্ঞের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সম্ভ্রান্ত মুঘলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যাই বেগম সমরু নামে ইতিহাসে পরিচিত। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বেগমের জন্ম হয়। সমরু বেগমের বংশ পরিচয় লইয়া নানা মতভেদ আছে। *North West Provinces Gazetteer*এ আ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, সমরু বেগম মিরাট জেলার অধিবাসী আমেদ খাঁ নামক জনৈক আরবের রক্ষিতার গর্ভজাতা। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তিনি এক সৈয়দের কন্যা,—আবার কাহারও মতে বেগম একজন কাশ্মীরী নর্ত্তকী ছিলেন।

বেগমকে সমরু যে যথারীতি মুসলমানমতে বিবাহ করিয়াছিল, এবং তিনি যে সমরুর রক্ষিতা ছিলেন না, তাহার প্রমাণ আছে। সার্দ্ধানা হইতে Capuchin Fathers কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে স্পষ্ট লিখিত আছে —সমরু লতিফ আলি নামক একজন আরবের কন্যা এবং "She was united to him (Sumroo) in marriage by all the forms considered necessary by Mahomedans, when married to different religion from their own" (*Sardhana*, p. 8) আরও একটি কথা, Col. Francklin স্বয়ং বেগমের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; তিনিও লিখিয়াছেন "Sumroo *married* the daughter of a Mogul nobleman" (*Shah Aulum* p 146)।

বেগমের বংশ-পরিচয়, যাহাই হউক, তিনি যে একজন নির্ভীক রমণী ছিলেন এবং পুরুষোচিত ক্ষমতা ও গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন, ইতিহাসে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সমরুর মৃত্যুর পর তাঁহার বেগম দিল্লীশ্বরের নির্দ্দেশমত স্বামীর জাগীর—সার্দ্ধানার অধিকারিণী হ'ন। সমরুর অপর এক উন্মাদ-রোগগ্রস্তা মুসলমান পত্নী ও তাহার গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে বেগম ও তাঁহার সপত্নী-পুত্র আগ্রায় Rev. Father Gregorio কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। এই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণকালে বেগম "জোয়ানা নোবিলিস" নাম গ্রহণ করেন।

সমরু বেগম দিল্লীশ্বর শাহ্‌ অলমকে একাধিকবার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

নাজফ্‌ কুলী বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্‌ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে বেগম স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ টমাসের সহিত সম্রাটের সাহায্যার্থ তাঁহার সেনাদলে যোগদান করেন। মুঘল সৈন্য যখন নাজফ কুলীর আশ্রয়স্থল গোকুল গড় অবরোধের চেষ্টায় তৎপর, সেই সময়ে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে মুঘলসৈন্য পলায়নপর হয়। শত্রুরা যখন সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত, সেই সময়ে বেগম সমরু শিবিকারোহণে অবিলম্বে জর্জ্জ টমাসের সহিত গমন করিয়া সম্রাটের উদ্ধারসাধন করেন। শাহ্‌ অলম্‌, বেগমের এই সময়োচিত সাহায্যের জন্য, প্রকাশ্য দরবারে বেগমকে "জেবুন্নিসা" (অর্থাৎ রমণীকুলশিরোমণি) উপাধি প্রদান করেন।

আর একবার বিদ্রোহী গোলাম কাদের সম্রাটের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয় এবং তাঁহার উপর নানা নির্যাতন করে। সে সময়েও বেগম অত্যাচারীর শাস্তিবিধান মানসে সম্রাটের উদ্ধার-সাধনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগমের সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ টমাস তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করেন এবং লুভাসুল্‌তনামক একজন ফরাসী কর্ম্মচারী এই পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। ঠিক এই সময় বেগম

* বীরবল সম্বন্ধে Blochmann, Ain-i-Akbari, p. 404; Maasir-ul-umara (Eng. trans.) pp. 420-23. দ্রষ্টব্য।

লুভাসুল্‌তকে রোমাণ ক্যাথলিক মতে বিবাহ করেন; এই বিবাহ না কি গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপে বেগমের অসন্তুষ্ট সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠে—তাঁহার সপত্নীপুত্র জাফর ইয়ার তাঁহার শত্রুতাচরণ করেন ও কিরূপে লুভাসুল্‌ত আত্মহত্যা করেন, তাহা ইতিহাসে বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত আছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী সাদ্ধানায় বেগমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি বহু সৎকর্ম্মে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার কয়েকটী দানের একটী তালিকা করিলাম :—

১। সাদ্ধানায় তিনি যে গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সংস্কার ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা।

২। রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের শিক্ষার্থ সাদ্ধানায় একটী Seminary প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ টাকা।

৩। স্থানীয় দরিদ্রদিগের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় ৫০ হাজার টাকা।

৪। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ক্যাথলিক প্রচারমণ্ডলীর জন্য ১ লক্ষ টাকা।

৫। আগ্রায় রোমাণ ক্যাথলিক প্রচারমণ্ডলীর জন্য ৩০ হাজার টাকা।

৬। মিরাটে একটী গির্জ্জা সংস্থাপনের ও তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য—১২ হাজার।

৭। কলিকাতার দরিদ্র প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট বালকদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতার বিশপকে—৫০ হাজার।

অধিকন্তু বেগম রোমের পোপকে তাঁহার ইচ্ছামত সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য ১ লক্ষ টাকা ও ক্যানটারবেরীর আর্চ্চ-বিশপকে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। কলিকাতার দুঃস্থ ঋণীদিগের সাহায্যকল্পেও বেগম ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত আরও নানা সৎকার্য্যে বেগম অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় নগদ ৬০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান; ইহার অধিকাংশই তাঁহার সপত্নীপুত্রের দৌহিত্র ডাইস্‌ সম্বার পাইয়াছিলেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্‌টিঙ্ক বেগমকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বেগমের বদান্যতা ও পরোপকারিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :—

To Her Highness the Begum Sumroo. My esteemed Friend,—I cannot leave India without expressing the sincere esteem I entertain for your highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands, have excited in my mind sentiments of the warmest admiration; and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England; and my prayers and best wishes attend you, and all others who, like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,
With much consideration,
Your sincere friend
Sd. M. W. Bentinck.

CALCUTTA,
March 17th, 1835.

বঙ্কিমচন্দ্রের শিশু-চরিত্র

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌, সরস্বতী]

বঙ্কিমচন্দ্র শিশুচরিত্র অঙ্কনে যে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে কেহই তাহা দেখাইতে পারেন নাই। 'আলালের ঘরের দুলালের' বাল্যজীবনের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের শিশুচিত্রগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী বটে, কিন্তু এই চিত্র বা এতদনুরূপ অন্যান্য দুই-একটি চিত্র আংশিকভাবে শিশুজীবন প্রদর্শন করিয়াছে। নিজের নিপুণ দর্শন ভিন্ন, কেবল কল্পনার সাহায্যে, শিশুচরিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। শৈশবে শিশুদিগের কথোপকথন, আচার-ব্যবহার, বিশেষ-রূপে লক্ষ্য না করিলে, শিশুচরিত্র অঙ্কনে সাফল্য লাভ করা যায় না। ভিক্টর হিউগো তাঁহার 'নাইন্‌টিথ্রি' নামক উপন্যাসে তিনটি বালকবালিকার ক্রীড়ার যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহার ভূয়োদর্শন নিহিত। বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজের সকল স্তরের শিশুদিগের চরিত্র নিপুণ-ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বিভিন্ন শিশু চরিত্র অঙ্কন হইতেই আমরা বুঝিতে পারি।

সমাজের নিম্নস্তরের বালক-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক-বার অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা মুচিরামের চরিত্রই প্রথমে অবলম্বন করিলাম।

"মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে 'মা', 'বাবা', 'দু', 'দে' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখি-লেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক-বৎসর পার হইতে না-হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতে গুরুভোজন-দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন।" [মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ১ম পরিচ্ছেদ।]

শিশু নীচ-সংসর্গে বর্দ্ধিত হইলে যে ফল হয়, মুচিরামের মাতৃপিতৃ সম্বোধনেই তাহা প্রকাশ। পল্লীগ্রামে অশ্লীলভাষী উদ্দাম নিরক্ষর বালকের যে স্বভাব, বঙ্কিম্‌ মুচিরামের চরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন।

"মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে 'পরা অপরা চ', গাছে ওঠা, জলে ডোবা এবং সন্দেশ চুরি।"......"কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত। শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।" [মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ১ম পরিচ্ছেদ।]

মুচিরামের নিত্যকার্য্যের পরিচয় নিম্নলিখিত পংক্তি হইতে প্রকাশ।

"পরদিন মুচিরাম, গালাগালি, মারামারি বা চুরি, মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।"

কিন্তু ঈদৃশ বালকের প্রতিও মাতার মমতা অল্প ছিল না। মাতার নিকট সন্তানের এই সমস্ত দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। মুচিরাম যখন যাত্রার দলে প্রবেশ করিতে চাহিল, তখন তাহার মাতা "যশোদা বড় কাঁদাকাটা আরম্ভ করিল। সবে একটি ছেলে। আর কেহ নাই। কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে?" হায়, অপত্যস্নেহ!

মুচিরামের বুদ্ধিহীনতায় সে যাত্রার দল হইতে বিতাড়িত হইল। যাইবার সময় তাহার ব্যবহার তাহার নীচ সংসর্গের পরিণাম দেখাইয়া দিতেছে।

"মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ অস্ফুট স্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ করিতে লাগিল।......মুচিরাম...অধিকারীকে নানাবিধ অব্যক্ত কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল। এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধ কবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে গিয়া শয়ন করিল।"

বাল্যজীবন যাহার এই প্রকার, তাহার পরিণত জীবন যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে

পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Child is father of the man এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুচিরামের চরিত্র হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পরবর্ত্তী জীবনের দুষ্ক্রিয়াসকল তাহার বাল্যজীবন দেখিয়া অনেকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

মুচিরামের মাতার পরিণাম তিনচার-পংক্তিতে বিবৃত হইলেও, অতি করুণ। দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের উপর মমতাময়ী জননী "অনেকদিন হইতে ছেলের কোনও সংবাদ না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।"

আর একটি সমাজের নিম্নস্তরের বালকের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন। তাহাতে বালক নিজ আহার্য্যের অংশ সদয় হৃদয়ে কুক্কুরকে দিতেছে।

"শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল।......তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল।...... কুক্কুর দেখিল, কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক —কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল।......কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা **উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া** কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল।" [কমলাকান্তের পত্র, ২য় সংখ্যা।]

বালকের দয়া এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্যশূন্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি লিখিতেন 'বালক মাছের কিয়দংশ কুক্কুরকে দিল' তাহা হইলে তাহার দয়ার জন্য আমরা হয় ত তাহাকে সাধুবাদ করিতাম ও বালকপাঠ্য পুস্তকে এইরূপ দয়ার দৃষ্টান্ত তুলিতাম। কিন্তু তাহা সাধারণতঃ ঘটে না; তাই বঙ্কিমচন্দ্র জীবন্ত স্বাভাবিক চিত্র দেখাইলেন, "মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া" যখন তাহাতে আর কিছু-মাত্র সার নাই বুঝিল, তখন তাহা কুকুরকে খাইতে দিল। কি স্বাভাবিক বর্ণনা!

তাহার পর বালক যথার্থ ই নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া কুকুরকে নিজ আহার্যের কিয়দংশ ভাত দিল। তাহার ভোজন-বর্ণনাটিও কেমন স্বাভাবিক। কুকুর "দেখিল, বালক আপন মনে গুড়তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে, কুকুরপানে আর চাহে না।......অতঃপর কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিল।......তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই। একমুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল।" [কমলাকান্তের পত্র, ২য় সংখ্যা।]

পল্লীরমণী মুচিরামের মত দুর্দ্দান্ত বালকের প্রতি যে রীতিমত উত্তমমধ্যমের ব্যবস্থা করেন, এবং এই প্রহার যে অপত্যস্নেহের বিরোধী নয়, নিম্নলিখিত পংক্তিতে বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন—যে মাগী "ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া ধেড়ে-বৌ দেখিতে চলিল।" [দেবী চৌধুরাণী, ৩য় খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ।] "কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন।" [বিষবৃক্ষ, ১ম পরিচ্ছেদ।]

পল্লীবালক পাঠশালাকে বড় ভয় করে, তাই তাহাদের প্রধান উৎসব পাঠশালার ছুটি।

"বালকমণ্ডলে ঘোর পর্ব্বাহ বাধিয়া গেল। অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।" [বিষবৃক্ষ, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।]

পল্লীবালকের আর এক বিশেষত্ব, অদম্য কৌতূহল। "পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। ··· ··· ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।" [বিষবৃক্ষ, ৩৭ পরিচ্ছেদ।]

উপদ্রবপরায়ণ বালকবালিকার আর একটি চিত্র—

"বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে। কাদা মাখিতেছে। পূজার ফুল কুড়াইতেছে। সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানমগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে।" [বিষবৃক্ষ, ১ম পরিচ্ছেদ।]

এইরূপ দুর্দ্দান্ত বালকেরাই

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি॥
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে লুড়ি॥
কাঁটাল খায় দেড় বুড়ি"

"রামচাঁদ দোবে, সন্ধ্যাবেলা শোবে
চোর এলে কোথায় পালাবে ?"

প্রভৃতি ছড়া আবৃত্তি করিয়া অক্ষম বৃদ্ধা হইতে বলবান্ দ্বারবান্দিগকে পর্য্যন্ত ত্যক্ত করে। [বিষবৃক্ষ, ৪১ পরিচ্ছেদ।]

উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র পল্লীগ্রামের বালকবালিকার কিরূপ সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন! এখন আমরা তাঁহার ধনাঢ্য মধ্যবিত্ত পরিবারস্থ বালকবালিকার চিত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিব।

ধনাঢ্যের অন্তঃপুরের চিত্র বিষবৃক্ষে আছে। বহু বালকবালিকা। "বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন" "ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে বসিয়া আছে।" এইরূপ সাধারণ চিত্র ব্যতীত ধনাঢ্যের গৃহের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত বালকবালিকার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করিতে ভালবাসিতেন না। তাই তাঁহার উপন্যাসসমূহে মধ্যবিত্ত পরিবারের সরলপ্রাণ বালকবালিকার চিত্রই অধিক।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে সুভাষিণীর অস্ফুটভাষী পুত্রের চিত্রটি কেমন সুন্দর! "সুবোর সঙ্গে একটি তিনবছরের ছেলে, সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, পড়িতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।" [ইন্দিরা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

সুভাষিণী বলিল 'আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি।' মাঝখান থেকে ছেলে বলিল "মা, আমি দাদি।"

ছেলে বলিল 'আজ্জি। ও আজি।'
মা বলিল 'তুই পাজী।'
ছেলে বলিল 'আমি বাবু, বাবা পাজী।'

[ইন্দিরা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

"সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়া ছিল। ছেলে বলিল 'আমি কলা কতা বল্‌ব।'

আমি বলিলাম 'বল দেখি।'
সে বলিল 'কলা, চাতু, হালি, আল্ কি মা ?'
সুভাষিণী বলিল 'আর তোর শ্বাশুড়ী।'
ছেলে বলিল, 'কৈ ছাচুলী ?'" [ইন্দিরা অষ্টম পরিচ্ছেদ।]

"সুভাষিণীর ছেলে···বুড়িকে দেখিয়া বলিল 'মা বুলী, পিচী হাঁলি কেয়েচে।'······শেষে আমার সেই তিনবৎসর বয়সের জামাতা একখানা রাঁধিবার চেলা কাঠ লইয়া গিয়া বুড়ীর পিটে বসাইয়া দিল। বলিল 'আমাল্ চাচুলী।' [ইন্দিরা ৯ম পরিচ্ছেদ।]

ইন্দিরায় আর একটি চরিত্র আছে—সেটি সুভাষিণীর কন্যা। অল্পবয়স্কা অনেক বালিকা অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ও স্মৃতিসহায়তায় সময়ে-অসময়ে সেগুলি আবৃত্তি করে। সুভাষিণীর কন্যা হেমা এইরূপ এক বালিকা।

"সুভাষিণীর পাঁচবৎসরের একটি মেয়ে ছিল।...... সে বলিল 'বেশ! বেশ গো বেশ!' মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত। সে আবার বলিল, "বেশ গো বেশ,

রাঁধ বেশ বাঁধ কেশ বকুল ফুলের মালা।
রাঙ্গা সাড়ী হাতে হাঁড়ী রাঁধছে গোয়ালার বালা॥"

[ইন্দিরা অষ্টম পরিচ্ছেদ।]

মেয়েটি আবার একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া শ্লোকগুলি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে জ্বালাইতে ভালবাসিত। সে রাঁধুনীকে ক্ষেপাইল—

"যে ডাকে যমে,
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই
বুড়ী মরে যা না ভাই।"

[ইন্দিরা নবম পরিচ্ছেদ।]

বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরায় বালিকা-জীবনের আর একটি খণ্ড-চিত্র আঁকিয়াছেন। সেটিও উল্লেখযোগ্য—

"সেইদিন সেইখানে দুইটি মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখন ভুলিব না! মেয়ে দুইটির বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। তবে সাজিয়াছিল ভাল। কানে দুল, আর হাতে গলায় এক একখানা গয়না। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্গ করা শিউলি ফুলে ছোবান দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে

গায়িতে নামিল।......তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা।" [ইন্দিরা পঞ্চম পরিচ্ছেদ।]

ইন্দিরার এই তিনটি চিত্রই বিশেষত্বযুক্ত। সুভাষিণীর ছেলের অনুরূপ চিত্র 'রজনী'তে বামাচরণ। সেও অস্ফুট-ভাষী, আবদারপরায়ণ।

"কালীচরণ বাবুর একটি চারিবৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল 'ও কে ও?' আমি বলিলাম 'ও বর'। বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল। 'আমি বল হব।' তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম 'কাঁদিস্ না, তুই আমার বর।' এই বলিয়া একটা সন্দেশ হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেমন, তুই আমার বর হবি?' শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সংবরণ করিয়া বলিল 'হব।'

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, 'হাঁ গা, বলে কি কলে গা?' বোধ হয় তাহার ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম 'বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।' বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।" [রজনী প্রথম পরিচ্ছেদ।]

এইরূপ চিত্রই আবার বিষবৃক্ষে দেখিতে পাই। শ্রীশ-চন্দ্রের পুত্র সতীশও "ইংরাজী সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।" তারপর "সতীশবাবু একটা ফুলদানী ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতে-ছিলেন।" পরে "পিতার সুবর্ণময় পেন্সিলটি দেখিতে পাইয়া অপহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্সিলটি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" [বিষবৃক্ষ ১৩ পরিচ্ছেদ।]

অন্যত্র দেখি, সতীশবাবু বসিয়া মুখে অনেকপ্রকার শব্দ করিতেছেন এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশবাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া একটা মৃণ্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

সতীশও অস্ফুট কথোপকথন করিতে পারে।

"কমলমণি বলিলেন 'অ সতু বাবু! মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার?'

সতুবাবু বলিলেন 'ইলি-লি-ল্লি।'

কমল। সতুবাবু, কখনও আপিসে যেও না।

সতু বলিল 'হাম্।'

কমল। তোমার হাম্ করার ভাবনা কি?...আপিসে গেলে বৌ দুপুরবেলা বসে কাঁদ্‌বে।

সতুবাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন, কেন না কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে বৌ আসিয়া মারিবে। সতুবাবু এবার উত্তর করিলেন, 'বৌ মাবে।'" [বিষবৃক্ষ ২৫ পরিচ্ছেদ।]

আপনমনে খেলা করিতেছে, এরূপ অল্পবয়স্কা বালিকার চিত্র আনন্দমঠে আছে। এই ক্রীড়ার বর্ণনাটি অতি নিপুণ দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

"এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল এটি বেশ খেলিবার জিনিষ। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল। তারপর ডানহাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তারপর দুইহাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল। বড়ীটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল— সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এ আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়ীটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়ীটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তি-মাত্রেণ ভোক্তব্যং—সুকুমারী বড়ীটি মুখে পুরিল।

'কি খাইল। কি খাইল। সর্ব্বনাশ।' কল্যাণী ইহা বলিয়া কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন।.. সুকু-

মারী তখন একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া (সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে) মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।" [আনন্দমঠ ১ম খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।]

এই সুকুমারী যখন নিমাই কর্তৃক পালিতা হইয়া শেষে পিতৃগৃহে যাইবার জন্য জীবানন্দ কর্তৃক আহূতা হইল, তখন "নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ী, খেলার পুতুল, ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "'হাঁ, মা, কোথায় যাব মা?' নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল।" [আনন্দমঠ, ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।]

অতি অল্পবয়স্ক আর এক শিশুমূর্ত্তি 'রজনীতে' আমাদের নয়নগোচর হয়। সে রজনীর পুত্র অমরপ্রসাদ। "এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পর ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল 'দা' (যা!")
[রজনী, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।]

বাঙ্গলা উপন্যাসের প্রধান বিষয় প্রায়ই প্রণয়। নায়ক-নায়িকা, যুবকযুবতী, তাহাদের মানসিক বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে প্রণয়ের সাফল্য বা বিফলতাই সাধারণতঃ উপন্যাসে চিত্রিত হয়। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে প্রণয়ের জন্য আত্মত্যাগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনাবলী প্রচুর; কিন্তু প্রণয় ব্যতীত অপত্য-স্নেহ বা অন্য কোনও বৃত্তিকে মূলীভূত করিয়া অতি অল্প ঘটনাই হইয়া থাকে। শুধু বাঙ্গলা উপন্যাসই বা বলি কেন, অন্যান্য ভাষার উপন্যাসগুলিরও প্রধান অবলম্বন—প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী বা দেবীচৌধুরাণীতে শিশুচরিত্র নাই। উপন্যাসে না হইলেও ছোট গল্পে শিশুচরিত্র ও অপত্যস্নেহ সুন্দররূপে ফুটাইতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পে কিরূপ নিপুণভাবে শিশুচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। সুধীন্দ্রনাথও বর্ত্তমান বাঙ্গালা গল্প লেখকদিগের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণীকে যদি উপন্যাসের সম্মান না দিয়া ছোট গল্পের বা অন্ততঃ মাঝারি গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা যায়, তাহা হইলে দুঃখিনী বালিকা রাধারাণীর চরিত্রই যে ইহার সবটা জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বালিকার প্রতি স্নেহই রুক্মিণীবাবুর প্রণয়ের হেতু।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শিশুচরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের মধ্যে প্রধান নহে। উপরে আমরা যে কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ স্থল গ্রহণ করে নাই। কিন্তু একটি উপন্যাসে ইহার ব্যতিক্রম আছে। তাহা—সীতারাম। সীতারামে রমার অপত্যস্নেহ হইতে ভীষণ ফল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক।

শিশুচরিত্রের সহিত জননীচরিত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অপত্যস্নেহ না থাকিলে রমণী অনেক সময় নির্ম্মম হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে—নির্ম্মল নিজ সতীনপুত্রকে কাছে রাখিতে অসম্মত- এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া নির্ম্মলের প্রতি আমাদের চিত্তকে বড়ই বিরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

নির্ম্মল বলে "একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন "মেয়ে না হয় এখানে আনিলে?"

নির্ম্মল বলিল "সে ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ এখানে কাজ নাই। একটা পাতান রকম পিসী আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।" [রাজসিংহ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এই নির্ম্মলের সঙ্গে আনন্দমঠের নিমাইয়ের তুলনা করিলে বুঝিতে পারি, নিমাই নির্ম্মল অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ। সুকুমারী পরের মেয়ে, তাহাকে নিমাই সাদরে পালন করিতে লাগিল। তাহার অন্তঃকরণ স্নেহের নির্ঝর। এই চিত্রটি দেখুন—

"নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকত জল পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল।"

মাতৃস্নেহের কি সুন্দর আলেখ্য। নিমাই পরের মেয়েকে চাহিয়া লইয়া পালন করিতে লাগিল, আর নির্ম্মল নিজ

স্বামীর কন্যাকে অপরকে পালন করিতে দিল। নিমাইয়ের নিকট হইতে জীবানন্দ যখন সুকুমারীকে চাহিতে গেল,তখন সেই পালিতা কন্যার উপর নিমাইয়ের এত অনুরাগ যে সে —"প্রথমে ঢোক গিলিল। একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তারপর একবার ঠোট নাক ফুলিল। তারপর সে কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর বলিল, 'আমি মেয়ে দিব না।'" [আনন্দমঠ, ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।]

কি প্রবল স্নেহ! নির্ম্মল কূটনীতিবিশারদ আওরঙ্গজেবের মাথা ঘুরাইয়া দিক্, আমরা তাহার চেয়ে মূর্খ নিমাইকে উচ্চতর স্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না। নির্ম্মলের রমণীহৃদয়ে যে স্নেহের অভাব, মাণিকলালের পুরুষহৃদয়ে তাহার প্রখর স্রোত বহিতেছে। মাণিকলালের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যই তাহার প্রমাণ—

"আমি মরিতে ভীত নাহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে। সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই। কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি। আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে। আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।" [রাজসিংহ, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।]

সন্তান না হইলে রমণীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। মাতৃত্বই রমণীজীবনের প্রধান গৌরব। গার্হস্থ্য-জীবন এই মাতৃত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কপালকুণ্ডলা বনে বনে বেড়াইতে ব্যাকুলা। তাহাকে গাহস্থ্যজীবনে বদ্ধ করিবার উপায়স্বরূপ শ্যামাসুন্দরী বলিল—

সোণার পুতলী ছেলে দিব তোর কোলে ফেলে
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।"

[কপালকুণ্ডলা, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

আবার রমণী দারুণ দুঃখে সন্তান হইতেই সান্ত্বনা পায়। গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ভ্রমর তখন তাহার সূতিকাগারে-মৃত পুত্রকে স্মরণ করিয়া "কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সাতদিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল 'আমার ননীর পুতলি, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজ তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা, কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্। এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না।'" [কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড ৩১ পরিচ্ছেদ।]

ঠিক্ এইরূপ দশা রমারও হইয়াছিল। সীতারাম যখন রমার নিকট আসা-যাওয়া বন্ধ করিলেন, তখন দুঃখে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও ছেলের মুখ চাহিয়া সে সব সহ্য করিত।

"একবৎসর হইল রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল।" [সীতারাম, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।]

সন্তানের প্রতি প্রবল অনুরাগ রমাকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা করিয়াছিল। তাহার নিজের প্রাণের ভয় নাই, কেবল ছেলেকে কিসে বাচাইবে এই চিন্তা। সে "আপনার ভাবনা ভাবিল, ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তারপর ছেলের ভাবনা ভাবিল, ছেলের কি হইবে।" এই ছেলের জন্য সে গঙ্গারামকে নিশীথে ডাকাইল। নগর মুসলমান-হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিল। তখন সে বুঝে নাই, কত বড় অন্যায় কার্য্য করিতেছে। পুত্রস্নেহে আত্মহারা হইয়া সে যে বিপথে ছুটিয়াছে তাহা একবারও ভাবে নাই। শেষে যখন কলঙ্ক রটিল, সহস্র সহস্র দর্শক-সমক্ষে প্রকাশ্য দরবারগৃহে গিয়া রমাকে যখন নিজ কার্য্যের কথা বলিতে হইল, তখন ছেলেকে দেখিয়াই সে বুক বাঁধিল। লাজভয়ে সঙ্কুচিতা রমা ছেলের মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। পূর্ব্বেই সে নন্দাকে অনুরোধ করিয়াছিল 'যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।'" [সীতারাম, ৩য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।]

গঙ্গারামের বিচারার্থ আহূত দরবার-দৃশ্যে মাতৃস্নেহের যে লহরীলীলা বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আর কোথাও দেখি নাই। লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কোচশীলা অসূর্য্যম্পশ্যা রমা প্রকাশ্য দরবারস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্য সময় হইলে ইহাতেই হয় ত তাহার মৃত্যু হইত। কিন্তু

আজ বিষম পরীক্ষা। রমা সভায় আসিয়া আর কিছু দেখিল না, কেবল—

"রমা দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তথন রমা সর্ব্বশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।

"প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত রমা বলিতে লাগিল। সকলে শুনিতে পাইল না।...ক্রমে আরও স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট। তার পর যথন রমা পুত্রের বিপদাশঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল, যথন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রুবিপ্লুত হইয়া মাতৃ-স্নেহের উচ্ছ্বাসের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তথন পরিষ্কার, স্বর্গীয় অপ্সরোনিন্দিত তিনগ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃগণের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তারপর সহসা রমা ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল 'মহারাজ, আপনার আরও সন্তান আছে, আমার আর নাই। মহারাজ, আপনার রাজ্য আছে, **আমার রাজ্য এই শিশু**। মহারাজ, তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি **আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই**—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন।" [সীতারাম, ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।] মোটা অক্ষরে আমরাই দিলাম। মাতৃহৃদয়ের যথার্থ পরিচয় ঐ মোটা অক্ষরে মুদ্রিত বাক্যগুলিতেই সম্যক্ পাওয়া যায়। এই রমার চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের যাবতীয় জননী-চরিত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। মৃত্যুকালে—

"রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন 'ওকে একবার কোলে নাও।' সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তথন রমা সকাতরে ক্ষীণস্বরে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিলেন 'মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা।'" [সীতারাম, ৩য় খণ্ড, ১২ পরিচ্ছেদ]

জীবনের শেষ-নিশ্বাসের সহিত পুত্রের জন্য মাতার এই প্রার্থনা নির্গত হইল। রমার জীবন ফুরাইল।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন শিশুচরিত্রগুলি শিশুচরিত্র অঙ্কনে পরবর্ত্তী লেখকগণকে উৎসাহিত করে। যথনই আমরা বর্ত্তমান কোনও গ্রন্থে জননীচরিত্র বা শিশুচরিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হইতে দেখি, তথনই আমাদের মানসপটে বঙ্কিমচন্দ্রের শিশুমূর্ত্তিগুলি সমুদিত হয়। কথনও দেখি, বৈশাখের প্রদোষে কুসুমিত উপবনে মাল্যগ্রন্থনরতা 'জীবন্তকুসুমরূপিণী কুসুমলতা' কমলাকান্তের গা ঠেলিয়া বলিতেছে "কমলকাকা, ওঠ, বাড়ী যাই। রাত হয়েছে।" কথনও বা দেখি 'ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে' বসিয়া প্রতাপ, পদতলে শায়িতা শৈবলিনী। কথনও দেখি অমলা ও নির্ম্মলা গান গাহিতে-গাহিতে সোপান অবতরণ করিয়া জল লইতে নামিতেছে; কথনও বা দেখি অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া হেমাঙ্গিনী শ্লোক বলিতেছে। কথনও দেখি সন্তানবৎসলা জননীমূর্ত্তি কমলমণির ক্রোড়ে সতুবাবু, সুভাষিণীর ক্রোড়ে খোকা, নিমাইয়ের ক্রোড়ে সুকুমারী, রজনীর হাঁটু ধরিয়া অমরপ্রসাদ। আবার কথনও বা দেখি মাতৃবৎসল সন্তানমূর্ত্তি—অবিশ্রান্ত ধারাপাতে সিক্তকায়া রাধারাণী, রুগ্না মাতার পথ্যের জন্য পিচ্ছিল পথের উপর দিয়া এক পয়সার বনফুলের মালা বিক্রয় করিতে চলিয়াছে।

বৈকুণ্ঠের উইল

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটিতে এক মুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন; এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্ম্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয় বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়েজামাইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর মশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অম্‌নি একটু টানিয়া দিয়া, সৎশাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি-চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুর মশায় ক্ষীরের বাটিটা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া, চোখ তুলিয়া কহিলেন, "বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি, হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফস্‌কে গেলে কি আর ফেরানো যায়?"

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, না।"

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু স্নিগ্ধগম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, "তবে?"

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না,—চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে-ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন; কহিলেন, "বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধরতে ডেকে আন্‌লে,—তা' হাল আমি ধরতে পারি; ধরবোও—কিন্তু তোমাদের ত ছট্‌ফট্ করলে চল্‌বে না, বাবা। যেখানে বস্‌তে বল্‌ব, যেখানে দাঁড়াতে বল্‌ব, ঠিক তেম্‌নিটি করে থাকা চাই। তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ বাবাজী হাজারিবাগে ছিলেন, এই যে সব এলোমেলো কথা যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্চে এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য করতে পারচ না?"

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদগদ হইয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, "হচ্চেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেছি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বল্‌বে, যা কর্‌বে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত কর্‌ব না, তুমি কি কর্‌চ না কর্‌চ।"

পিতা খুসী হইয়া কহিলেন, "এই ত আমি চাই মা। মাম্‌লা মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস। শোননি মা, লোকে গাল দেয় তোর ঘরে মাম্‌লা ঢুকুক। সেই মাম্‌লা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা; তাই সাহস করচি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক্। একটি-একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়।" বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমন ধারাই করিলেন যে, ওয়াটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অত বড় গর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "মা, মনু, এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অম্‌নি একটু

বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে টেঁতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ'ল শত্রু পুরি।"

মনোরমা যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার শ্বশুরের প্রতি, চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মাম্‌লা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্ব্বনাশ হইল—প্রভৃতি ইসারা ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। নিমাই কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বাবাজী; একটু স্থির হয়ে বোসো—দুটো কথাবার্ত্তা হয়ে যাক্‌।"

গোকুল সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই তোমাদের সুসময়। যা' করে নিতে পার বাবা—এই ব্যালা। কিন্তু একটা সর্ব্বনেশে মকদ্দমা যে বাধ্‌বে, সেও চোখের উপরেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা' বাধুক্‌, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুন্‌লে বড় বড় উকিল বালিষ্টার কৌঁসুলির মুখ শুকিয়ে যায়—তা' এতো এক ফোঁটা ছোঁড়া—না' হয় দু'পাত ইংরিজিই পড়েচে।"

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "আপনি কার কথা বল্‌চেন? কাদের মোকদ্দমা?"

এবার অবাক্‌ হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল "দেখ্‌লে বাবা, যা' বলেছি তাই। জিজ্ঞেসা করচেন কার মোকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বল্‌চি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্ব্বস্ব নেবে, সে কি বেশি কথা? তুমি এসেচ এই যা ভরসা, নইলে, সোমবচ্ছরের মধ্যে দেখ্‌তে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাত্‌কুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।"

নিমাই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তাই বটে। তা' যাক্‌, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু, তোমাদের আড়তের ঐ সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্চে—বরের মাসি কনের পিসী-বুঝ্‌লে না, মা। ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয়, ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখ্‌লে তার মনের কথা বল্‌তে পারি!" বলিয়া নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি, দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, "এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি! আমি আর' জানিনে বাবা, সব জানি। জেনেশুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুসি রাখো, যাকে খুসি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।"

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোট ভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে! অথচ, ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্ব্বোধের মত সেই ছোট ভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে-পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু, ঐ একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল,—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, "টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝ্‌লে না বাবাজী।" গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না' তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিয়া দিল। অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ; এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু, এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায় মশায়ের উৎসাহের প্রাখর্য্যটা যেন ঝিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, "আচ্ছা, সে সব পরামর্শ কাল

পরশু একদিন ধীরে-সুস্থে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী; হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিনই—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোকুল হঠাৎ উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায় মশায় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বাবাজী ত কথাই কইলে না। টাকা ছাড়া কি মাম্‌লা মকদ্দমা করা যায়? বিপক্ষের সাক্ষী ভাঙিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাবু! ভয় করলে চল্‌বে কেন?" নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের কথা টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁর মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে! কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না,—এমন কি কুণ্ডুদের আড়তের কাজটা গেলেও ত তাঁর পশ্চাৎপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত, তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লগিলেন।

১০

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারা রাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার বিমাতার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়াই কহিল, "ওঃ—সৎমা যে কেমন তা' জানা গেল।" একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃ পুনঃ কহিতেছে; তাহাতে অন্যান্য নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজেরও স্বাভাবিক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয় কুটুম্বেরা তখনও না কি বাটীতে ছিল, তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "কি হয়েচে?"

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, "হবে কি? কি করতে পার তোমরা? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না, তা' বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায় সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।"

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ নালিশ করবে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?"

গোকুল কহিল, "সবাই বল্‌লে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে।"

ভবানী বলিলেন, "কই আমি ত জানিনে।"

"আচ্ছা, জান কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি" বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়ীতে রাখতে পারিনে।"

কিন্তু কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সম্মুখ হইতে ভয়ার্ত্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে; তাই সেদিন সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরি তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্ব্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজনসত্ত্বেও সমস্ত বাড়ীটা সেই রূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও, চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত, ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দু'দিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে-একে বিদায় লইলেন। পিসিমা তাঁর ছেলে-মেয়ে লইয়া বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরের বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া-পলাইয়া বেড়ায়
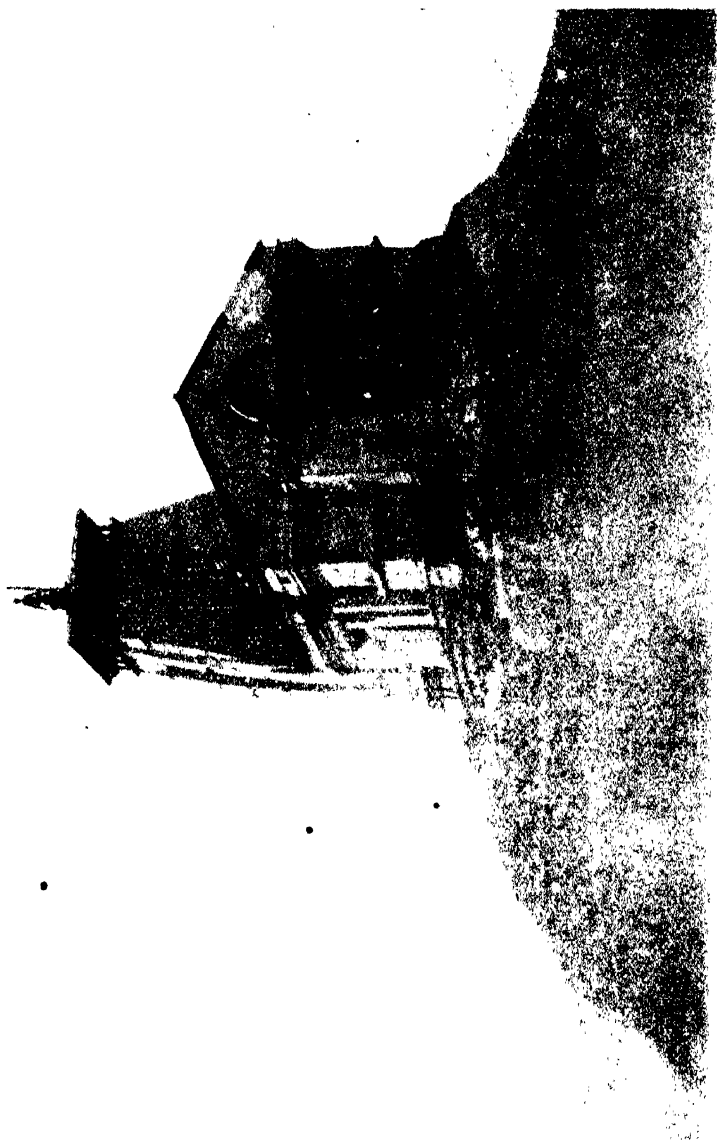
—ভিতরে-বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারিদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা ছাড়া এ বাড়ীতে আর যেন কোন মানুষই নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন; সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডদের অকুল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে-তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু, সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন অতি প্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়ীটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইঁহাদের বৈঠক বসিল, এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্ত্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিক মত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল, এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, "আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।"

চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, "বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্ত্তামশাই আমাকে জান্‌তেন।"

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায় মশায়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিচাইয়া কহিল, "তোমার কর্ত্তা মশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ হ্যা? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়।"

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্ত্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—"

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"সে ত আছেই চকোত্তি মশাই; আরও যদি—"

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমি থাম না, বাবাজী।" চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, "বাবু উনি নয়, বাবু আমি। আমি যা' করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো।"

চক্রবর্ত্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্দার মাখাইয়া দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয়, সব্বাইকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব।"

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় সুখে, গর্ব্বে, গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ আধ স্বরে কহিল, "আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দ-দুলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?"

নিমাই বলিলেন, "তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশি দিন এখানে থাক্‌তে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা'হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আস্‌বার যো ছিল, মা,—বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেই চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লেন, 'রায় মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে।' তাই মনে করচি, মা, আমার নন্দদুলালকেই দেখিয়ে শুনিয়ে, শিখিয়ে পড়িয়ে, রেখে যাব। আর যাই হোক্, ও আমারি ত ছেলে!"—

"তাই করে যাও, বাবা। আমি সেই জন্যেই ত—"

হঠাৎ মনোরমা মাথার আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ

করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, "বাবু, মা এসেচেন—"

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ ৭।৮ দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ কণ্ঠে ডাকিলেন, "গোকুল!"

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, "কেন মা?"

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনি পরিষ্কার কণ্ঠে কহিলেন, "এ সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে? চক্রবর্ত্তী মশাই অনেক দিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি, খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।"

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি লোকে এত আশ্চর্য্য হইত না। ভবানী একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আর একটা কথা। বেয়াই মশাই দয়া করে এসেছেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন, দেখুন-শুনুন; কিন্তু, দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নেই। চক্রবর্ত্তী মশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান্। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়া-চাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান্।" বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া ভবানী চলিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "একেই বলে, 'পরের ধনে পোদ্দারি।' হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখ্‌লে বাবাজী।"

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল, তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, "এ তো জানা কথাই, বাবা। তুমি থাক্‌লে ত আর চুরি চল্‌বে না! বলিহারি হুকুমকে!"

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "তাই বটে।" এবং চক্রবর্ত্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙ্গাত, বিদায় হও না। আবার ডেকে আনা হয়েচে! নেমক-হারাম! জেলে দিলুম না কি না, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে কর্‌ছিলুম—যাক্ মরুক গে; যা' করেচে তা করেচে; না হয় দু পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু, আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্ত্তব্য ছিল আমার!"

কিন্তু, মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তেম্‌নি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্ত্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, "তাহ'লে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চল্লুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।" গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্ত্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া হাসি চাপিয়া ফেলিয়া তুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালী ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্যা হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন, অনুনয় বিনয় এবং পরিশেষে মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতকল্পপ্রায় শুইয়া পড়িল। গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জান্‌ব?"

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্ বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা করচেন—আমার কি কোথাও থাক্‌বার জো আছে? তা' ছাড়া, দরকার কি আমার—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলে-পিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সেত দাঁড়াতেই হবে, চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা' বলে দিয়ে যাচ্ছি—তা' মেয়েই

হও আর জামাতাই হও।" বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখনই আবার প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এখনো বেঁকে বসিনি বটে, কিন্তু, বেঁক্‌লে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা' তোমরা দু'জনে একবার গোপনে ভেবে দেখ। বাবা, নন্দদুলাল, আড়াইটে বেজেচে; সাড়ে তিনটার গাড়ীতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জান ত' তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উল্‌টে গেলেও হবার জো নেই।" বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে জামাইকে ভাবিবার একঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা ত অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও, গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিয়া কি করিবে, তাহা কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

১১

নিমাই যখন দেখিল, তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল; এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে, তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুণ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যে মশায়কে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্ব্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া, তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, "কি করব মাষ্টার মশাই, মা যে তাঁকে বাড়ীতে রাখ্‌তেই চান না। চক্রবর্ত্তী মশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্য্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।"

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন, "কারবার, বিষয়-আশয় তোমার, না, তোমার মায়ের, গোকুল? তা' ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?"

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে, বাঁড়ুয্যে মশাই খুসি হইয়া বলিলেন, "তবে, পাগলামি ক'রো না ভায়া; রায় মশাইকে বিষয়-আশয় ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে দিয়ে, চুপ্‌টি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ তল্লাট খুঁজলে পাবে না।"

গোকুল কহিল, "সে ত জানি, মাষ্টার মশাই; কিন্তু, মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিষেধ করে গেছেন।"

বাঁড়ুয্যে মশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই ত হ'ল না! নিষেধ শুন্‌তে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা' বল?" গোকুলের তরফে এ সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায় মশায় নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায় মশায় আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনিও সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করচি, গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথা-সর্ব্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত আমরা লাগ্‌তে দেব না। কি বল রায় মশাই?"

রায় মশাই আনন্দে বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখ্‌তেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ বাড়ীতে একটি দিনও থাক্‌তে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি, বাঁড়ুয্যে মশাই। তা' তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন্, আর ভাই-ই হোন্। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে আছিস্ রে ওখানে? ব্যাটা

বামুণকে ডেকে আন্ দোকান থেকে।" বলিয়া রায় মশায় ইহারই মধ্যে ষোল-আনা ছাপাইয়া সতর-আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদু স্বরে কহিল, "না না, এখন তাঁকে ডাকাবার আবশ্যক নেই।"

বাঁড়ুয্যে মশাই দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, গোকুল, এসব চক্ষু-লজ্জার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখ্‌তে পার্‌ব না—কোন মতেই না। তার বড় আস্পর্দ্ধা। আমরা তাকে চাইনে, তা বলে দিচ্চি।" প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু, মা তাঁকে চান্। তিনি যাঁকে বাহাল করেচেন, তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারু নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি।" বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যে মশাই প্রশ্ন করিলেন, "তা' হলে সে থাক্‌বে বল?"

গোকুল কহিল, "আজ্ঞে, হাঁ। চক্কোত্তি মশায়ের ওপর আমার আর কোন হাত নেই।"

বাঁড়ুয্যে মশাই সভয়ে বলিলেন, "তা'হলে রায় মশায়ের কি রকম হবে?" গোকুল কহিল, "উনি বাড়ী যান্। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখ্‌তে চান্ না। আর চাক্‌রি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েচে, সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব।" বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায় মহাশয় আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট দশ দিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না, এবং সরজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশি তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেম্‌নি প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বউমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়ীতে থাকি?"

বউমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল। ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, "বেশ, তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, বাপকে দিয়ে, আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?"

অথচ, গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে, এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবার মনেও হইল না।

কিন্তু বধূ আর ত সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, "অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, আমার বাপ ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর, একজনের জন্যে আর একজনের সর্ব্বনাশ করাটাই কি ভাল?"

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন "আমি কা'র সর্ব্বনাশ করেছি, মা?"

বধূ কহিল "যাদের করেচ, তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মার্‌লেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ কর্‌লে ত চলে না মা।" বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেক দিনের পর আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আর কোনমতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্ব্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত

ঐশ্বর্য্য গোকুলকে লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক্, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাক্‌রি যোগাড় করিয়া লইয়া, এবং সহরের এক প্রান্তে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা—এ অপমান আমি আর সইতে পারিনে। তুই যেমন করে রাখ্‌বি, আমি তেমনি করে থাক্‌ব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে।" বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতেই পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুল কাছে আসিলে কহিল, "কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।"

গোকুল অবাক্ হইয়া কহিল, "নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই বাসা করা হয়েচে না কি?" বিনোদ কহিল, "হাঁ।"

"এম-এ পড়া তা'হলে ছাড়লে বল?"

বিনোদ কহিল, "হাঁ।"

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোট ভায়ের এই এম-এ পাশের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই, গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম-এ, পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোট ভাই বিনোদের' অনার গ্রাজুয়েটের কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায়-কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোণার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মকমলের বাক্সশুদ্ধ জিনিষটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল, স্যাক্‌রা ডাকাইয়া এই দুর্ল্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয়; এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগ্‌লামি করিলে সে সমস্ত টান্ মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল, এম-এ'র মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কি ভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ হেন এম-এ পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া, গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, "তা বেশ, কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?"

"সে দেখা যাবে" বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী। যে সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ীর ভিতরে পা দিতে-না-দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জ্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ী থেকে যাচ্চি।" সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তোমার পায়ে ত আমরা কেহ দড়ি দিয়ে রাখিনি, মা। যেখানে খুসি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি—" বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, "হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারবে না, বলে দে।"

হাবুর মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বড় বাবু?" গোকুল কহিল, "আজ দশমী না? ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি; আজ গেলে গেরস্থর অকল্যাণ নয়? আজ আমি

কিছুতে বাড়ী থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয়, কাল যাবেন—আমি গাড়ী ফিরিয়ে দিয়েচি।" বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, "যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?"

এ কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভ্যাঙাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আট্‌কালুম, আমার খুসি। বাড়ীর গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ী থেকে গেলে ছেলে-পিলেগুলো পট্‌পট্‌ করে মরে যাবে না?" বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

"রকম দ্যাখো!" বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া রহিল।

১২

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, "তুমি যার খাবে, তারই সর্ব্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।"

মনোরমা সেদিন ধমক্‌ খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল। নিমাই আসিয়া কহিলেন, "এটা ত ভাল কাজ হচ্চে না বাবাজী!" গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল। কহিল, "কোন্‌টা?"

"বেয়ান ঠাকুরুণ তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্চেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।"

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, "পাড়ার লোক শুন্‌লে আমার অখ্যাতি করবে।"

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখ্‌তে পাইনে।"

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, "আপনার দেখ্‌বার ত কোন প্রয়োজন দেখিনে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বস্‌ সাফ্‌ কথা। যে যা পারে আমার করুক্‌।"

গোকুলের এই সাফ্‌ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ী ফেরৎ দেওয়ায় সে মনে-মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না।"

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, "আজকে ত হতে পারবে না।" বিনোদ কহিল, "খুব পারবে। আমি এখনি নিয়ে যাচ্চি।"

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "নিয়ে যাচ্চি বল্‌লেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে গেছেন, —তোমাকে দেন নি। আমি কোথাও পাঠাব না।"

বিনোদ কহিল "সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন, দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হত না। মা, বেরিয়ে এসো। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে" বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে-পিছনে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, "এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা' বলে দিচ্চি মা।"

ভবানী জবাব দিলেন না; বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?"

গাড়ীর চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল গোকুল কোঁচার খুটে চোখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহার অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন; কিন্তু খানিকপরে, সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া

তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এবং নির্ব্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ্ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেম্নি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যে দিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুসি হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ সখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভাল বাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল। গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, "সে সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে। রেঁধে খাওয়াবে কে?" মনোরমা অভিমানভরে কহিল, "রাঁধ্‌তে কি শুধু মাই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি?" গোকুল কহিল, "সে তোমার বাপ ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।"

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ শাশুড়ী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দু' চারি দিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল; এবং কর্ণধার হইয়া তিনি দৃঢ়হস্তে হা'ল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্ম্মে দুইচারি দিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর-মা'র ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাল-মন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানে কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাস কাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্যসত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোট ভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তারপরেই সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না; রাত্রে বাড়ীতেও থাকিত না; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন, দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার মুখের প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এই মাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরী করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই। কারণ, গোকুল স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এম্নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। আজ বৈশাখী সংক্রান্তী। প্রতিবৎসর এই দিনে ভবানী ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথাপ্রসঙ্গে বিনোদকে বার দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যুষে ভয়ানক ডাকাডাকিতে হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি ময়দা বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, "আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমতন্ন করে এসিচি—সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখ্‌তে

পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেননি বুঝি? যাই, কাজ-কর্ম্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিইগে। যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কা'রো চাড় ই নেই, যেন আমারই বড় মাথা-ব্যথা! মাকে খবর দিগে হাবুর মা, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসচি"—বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্রই অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ী ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল। হাবুর মা'র কাছে সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'ত! আমার যে এতে অপমান হয়!" ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না! কাজকর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে বাঁড়ুয্যে মশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বোস।" আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া সে দিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুণ সে দিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশী বাজিয়াছিল। সর্ব্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "বলি ভায়া, দাদার আজকের চাল্‌টা টের পেয়েচ ত?"

কথার ধরণে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বিনোদ সংক্ষেপে কহিল "না।" বাঁড়ুয্যে মশাই মৃদুগম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, "তবেই দেখ্‌চি মকদ্দমা জিতেচ! বি-এ, এম্-এ পাশ করলে, ভাই, আর এটা ঠাওর হল না, যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল্। তাঁর ওপরেই যে মকদ্দমা!"

গোকুল চোখ মুখ কালীবর্ণ করিয়া "কখ্‌খনো না মাষ্টার মশাই,—কখ্‌খনো না" বলিতে-বলিতে বেগে প্রস্থান করিল। বাঁড়ুয্যে মশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, "এখানে ঢুক্‌তে দিয়ো না ভায়া, সর্ব্বনাশ করে তোমার ছাড়্‌বে।" এ কথাটাও গোকুলের কানে গিয়া পৌছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহা দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই, বাঁড়ুয্যের কথাগুলা শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল —মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখ ভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায় মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন; এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা হিমুকে কাছে লইয়া পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায় মশায় কহিলেন, "বাবাজী, নির্ব্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল?"—একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারা দিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত! অভিযোগের ধরণটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মনোরমা ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আর যদি কোন দিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায় মশায় অধিকতর গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "সে মাগী কি সোজা—"

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—"চোপ্‌রাও বল্‌চি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব।" বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায় মশাই ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের মত পরস্পরের

মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

১৩

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল, যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেক দিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যে হেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোষে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, "বয়াটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক।" কিন্তু এত বড় বিষয়ের জন্য মাম্‌লা রুজু করিতে একটু বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতে কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সেই আর্ত্ত ছবিটা সে কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল,—অন্যায় অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে আর কোন দিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাষ্টার মশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ—তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকাল বেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাসা কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে-একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়া ছিল, বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল, "কইরে হাবুর মা, খাওয়া দাও চুক্‌ল?" বলিয়া প্রবেশ করিল। হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, "না বড় বাবু, এখনো শেষ হয়নি।"

"হয়নি?" বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, "এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হায়রাণ হয়ে গেছি। মা কইরে?"

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন; কিন্তু সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না। বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত। কহিল, "সব মিথ্যা হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল,—আর কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, বাবা, গোকুল, এই নাও তোমার মা। আমি ভালমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে! কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারিনে? বাবার এই হ'ল আসল উইল—তা জানিস্ হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।"

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্ত্তী

আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বড়বাবু এখনো বাড়ী যান্‌নি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন ?"

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে ত এখানে খায়নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।"

চক্রবর্ত্তী কহিল, "এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্ম-তিথি। বাড়ী থেকে ঝগড়া করে বলে এসেছে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি। তা' হলে সারাদিন খাওয়াই হয় নি দেখ্‌চি।" শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্ত্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাসা করিয়া কহিল, "কি চক্রবর্ত্তী মশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকুরি হচ্চে কেমন ?" চক্রবর্ত্তী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "নিমাই রায় ? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুক্‌তে পারে না কি ?"

বিনোদ বলিল, "শুন্‌তে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে ?"

চক্রবর্ত্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, "উনি বেঁচে থাক্‌তে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্ব্বস্বর মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু, মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাচড়ামি করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, নইলে, দোকানে হাত দেবার জো নেই।" বলিয়া চক্রবর্ত্তী সে দিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, "বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কি না, লোকের প্যাচসাঁচ ধরতে পারে না। কিন্তু তা' হলে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সেই যে বল্‌লেন মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা' এত কাঁদাকাঁটি ঝগড়া-ঝাঁটি—না, কিছুতে না। আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্ত্তা ছিলুম—তেম্‌নি আছি ছোটবাবু।"

বিনোদের দু' চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিল "এমন বড় ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। 'আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি।' লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, 'চক্কোত্তি মশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়! আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এম্‌নি বোকাই ঠাউরেচে শালারা।'" একটু থামিয়া কহিল, "এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোণার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচশ টাকা বড় বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতে শুন্‌লেন না; বল্‌লেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম্‌. এ. পাশ করে—যায় যাক্‌ আমার পাঁচশ টাকা।"

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, "কত লোক যে আমার নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেছি চক্কোত্তি মশাই।"

চক্রবর্ত্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, "এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েচে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া।" বলিয়া সে কর্ত্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁহার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্ত্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু, সারা রাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন যে এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে এ ভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্ত্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

* * * *

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকাল-বেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরীশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে এক ধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্য ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যে মশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে-দেখিতে গোকুলের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "ওঃ তাই এত লোক! যান্ আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।"

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, বাঁড়ুয্যে মশাই ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আট্‌কাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জুচ্চুরি করে উইল লিখে নাওনি, তার প্রমাণ কি?"

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "জুচ্চুরি করেচি? আমি জোচ্চোর? কোন্ শালা বলে?"

গিরীশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "গোকুল বাবু, অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।"

বাঁড়ুয্যে মশাই পুরাণো দিনের অনেক কথাই না কি জানিতেন, তাই চোক ঘুরাইয়া কহিলেন, "তা'হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল!" তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—"কি—আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নিগে যা তোরা সব বিষয় আশয়—নিগে যা—আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে,—মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হ'ব।"

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, "আহা হা, থাম না গোকুল। কর কি, কি সব বল্‌চ?"

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের মুখের সম্মুখে ডান পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেম্‌নি চীৎকারে কহিল, "আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল্—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই, ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নয়।"

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—"আহা হা, কর কি বাবাজী! করুক না ওরা নালিশ,—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ সব দিব্যি-দিলেশা কেন? চল চল, বাড়ীর ভেতরে চল" বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল। গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,—"না, আমি এক পা নড়ব না।" উপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বাবা শুন্‌চেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কি না, গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা কিছু পাওনা। ওপর থেকে বাবা দেখ্‌চেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগ্‌লে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আস্‌বে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাক্‌চি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয় এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এঁদের সাম্‌নে বলে যা, তোর বড় ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েচে।"

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক্ হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যে মশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান্ দিয়া বলিলেন—"বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?"

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না, এমন সুযোগ আর পাব না।" বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "তোমার পা ছুঁতে বল্‌ছিলে, দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই, দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি, দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বল্‌তে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বল্‌চি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তোমার ছোট ভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি।" বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

(সমাপ্ত)

কল্পতরু

তাম্রকূট ও ধূম্রপায়ীর বিশ্ববৈঠক

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ]

সার আইজাক্ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্করণের জন্য, তিনি তাম্রকূটের নিকট, সামান্যাংশে হইলেও, ঋণী ; কেন না যদি তাঁহার 'রোজনাম্চায়' লেখা থাকিত, তবে আমরা হয় ত দেখিতে পাইতাম যে, যখন তিনি আরামকেদারায় হেলান দিয়া আরামে ধূমপান করিতেছিলেন, তখন একটি সুপক্ক আপেল ফলকে, তাঁহার সিগার-নির্গত কুণ্ডলায়মান ধূমরাশির ভিতর দিয়াই, সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষ হইতে ভূমিতলে পতিত হইতে, লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে তাম্রকূট বহুকাল হইতেই আদর পাইয়া আসিতেছে। সেখানকার সাহিত্যরথী টেনিসন, থ্যাকারে, স্পেন্সর, কার্লাইল প্রভৃতি সকলেই এই তাম্রকূটের সুঘ্রাণে প্রাণের ভিতর একটা অভিনব 'প্রেরণার' স্পন্দন অনুভব করিতেন। এই তাম্রকূটের অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তবে আজ আমরা পৃথিবীর অধিকাংশ মনীষিবৃন্দের মস্তিষ্ক-প্রচালনের অত্যদ্ভুত ক্ষমতার কোন পরিচয় পাইতাম কি না সন্দেহ।

য়ুরোপে বর্ত্তমানে যে কয়জন বিশ্ববিশ্রুত-গৌরবে গৌরবান্বিত বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত আছেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিক ও কবি রাডিয়াড কিপলিঙ্ (Rudyard Kipling) এবং জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার (Kaiser William II) ধূমপানের অতিবড় পক্ষপাতী বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত।

আমাদের পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও তাম্রকূটের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কথাও শোনা গিয়াছে যে, মাথার রাজমুকুট পর্য্যন্ত তিনি অনায়াসে বিনাবাক্যব্যয়ে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু সিগার হাতছাড়া করিতে পারিতেন না। তিনি যে সিগার ব্যবহার করিতেন, জনসাধারণ তাহার ঘ্রাণটুকুও পাইত না। তাহাদের সেই সিগারের আশা করা দুরাশা মাত্র ; কারণ, হাভানা হইতে বাক্সবন্দী হইয়া সেই সিগার বিস্তীর্ণ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইত ; এবং অন্য কোথাও না উঠিয়া, রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বার পার হইয়া, একদম্ অন্দরমহলে প্রবেশ করিত। এক হাজারের কম সংখ্যক কোনবারই প্রস্তুত হইয়া আসিত না। দিন-কয়েকের মধ্যেই সমস্ত সিগার ভস্মসাৎ হইবামাত্র আবার হাজার করিয়া নূতন চালান আসিত। তাঁহার সিগারের জন্য সুমিষ্ট, সুগন্ধি সর্ব্বোত্তম যে তামাকের পাতা, সেগুলিই কেবল ব্যবহৃত হইত। কিউবা দ্বীপের হাভানা সহরে সিগারের কারখানা ছিল। যে-সে লোক আবার তাঁহার সিগার প্রস্তুত করিতে পারিত না ; কারখানায় যাহাদের হাত পাকা, তাহারাই কেবল রাজার সিগার তৈরী করিত। একটি সিগার প্রস্তুত করিবার জন্য শুধু পারিশ্রমিকরূপে এক শিলিং করিয়া দেওয়া হইত। হাভানায় ঐ সিগার প্রস্তুত করিতে প্রত্যেকটিতে প্রায় চারি শিলিং করিয়া খরচ পড়িত।

সম্রাট খুব বেশী ধূমপান করিতেন বলিয়াই কেহ মনে করিবেন না যে, তিনি উঠিতে-বসিতে সকল সময়ই সিগার মুখে করিয়া থাকিতেন। ধূমপানের ভিতরও একটা নিয়ম ছিল ; ইংরেজী রীতি অনুসারে মধ্যাহ্নভোজের পরই তিনি প্রায়শঃ ধূমপান করিতেন। তা'ছাড়া, চিঠি লিখিবার সময়, কিম্বা প্রাসাদে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের সময়ই, তাঁহাকে সিগার টানিতে দেখা যাইত। কিন্তু রাত্রিতে ডিনারের পর তিনি কখনো তাহা হাতেও করিতেন না। তবে যদি কোন থিয়েটারে কিম্বা মহিলাদের সম্মুখে যাওয়ার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি সিগার না লইয়া যাইতেন না।

এই সিগার-প্রিয় সম্রাটের সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি যখন রাজকুমার,(Prince of Wales) তখন একবার ভ্রমণোপ-লক্ষে কানাডায় গিয়াছিলেন। কয়েকজন বন্ধুসহ বেড়াইতে-বেড়াইতে একদিন তাঁহারা জনমানবহীন বিস্তীর্ণ 'প্রেইরী'তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমেরিকার 'প্রেইরী' এক-একটা প্রকাণ্ড দিগন্তপ্রসারিত উন্মুক্ত মাঠ—সে মাঠে ঘাস ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বৃক্ষলতা জন্মায় না। সেই ঘাসগুলি আবার এত বড় হয় যে, তাহার ভিতরে বন্য মহিষ, ঘোড়া, সিংহ প্রভৃতি বড় বড় জন্তু পর্য্যন্ত অনায়াসে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। প্রিন্স এডওয়ার্ড সেই প্রেইরীতে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন—"ধূমপান করা যাউক"। বন্ধুদের সকলেই তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সকলের পকেট খুঁজিয়া একটি মাত্র দেশলাইর বাক্স পাওয়া গেল—তাহাতেও একটি মাত্র কাটী বর্ত্তমান !

উন্মুক্ত মাঠে হু হু করিয়া ভীষণ বাতাস বহিতেছিল। এ অবস্থায় জ্বলন্ত কাটী যদি একবার ফস্‌কিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া যায়, তবে আর রক্ষা নাই—মাঠময় আগুনে ছাইয়া যাইবে, পলাইবার উপায়ও থাকিবে না। তারপর আবার, মাত্র একটি কাটী বর্ত্তমান—তাহাও যদি হঠাৎ নিভিয়া যায়, তবে আর ধূমপান-সুখ-অনুভব করাই হইবে না। এ অবস্থায়, এই উভয়-সঙ্কটে এ হেন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার কে গ্রহণ

করিতে চায়? স্বেচ্ছায় কেহই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে 'লটারি' করা হইল—সিগারে আগুন ধরাইবার ভার পড়িল, প্রিন্স এডওয়ার্ডের উপর! সকলে চক্রাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া বাতাস প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অতি সতর্কভাবে, কম্পিতবক্ষে তিনি তাঁহার এই কঠিন কাজ সুসম্পন্ন করিয়া লইলেন। পরে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তখনকার ঐ সময়টা তাঁহার জীবনের পক্ষে একটি চিত্তবিক্ষেপকারী স্মরণীয় মুহূর্ত্ত গিয়াছে।

আর একদিন সপ্তম এডওয়ার্ড স্যান্ড্রিংহামের নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন গলির ভিতর দিয়া একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার ধূমপান করিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, দেশলাই নাই! পথের পাশেই একটি কৃষকের কুঁড়েঘর ছিল। তিনি যাইয়া সেই কুঁড়েঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে—ভিতর হইতে একটি রমণী বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাহার নিকট হইতে একটি

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড

[চিঠি লিখিবার সময় তাঁর হাতে একটী সিগার থাকা চাই-ই।]

দেশলাই চাহিলেন। রমণী সম্রাটকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল; এবং কি ভাবে যে তাঁহাকে সম্মান দেখাইবে, তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে ছুটিয়া বাটীর ভিতরে গেল—কিন্তু হায় রে কপাল! একটিমাত্র দেশলাই যা ঘরে ছিল, তাহাও যে তার স্বামী মাঠে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এখন উপায়? স্বয়ং সম্রাট আজ তাহার কুটীর-দ্বারে সমাগত—একটি দেশলাইয়ের কাঙাল তিনি! এই সামান্য সাহায্যটুকু দান করিয়াও সে তাহার নগণ্য নারীজীবনকে ধন্য করিতে পারিল না। লজ্জায় সঙ্কোচে রমণী একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। এডওয়ার্ড তখন দেখিলেন, নিকটেই একটা থস্তার উপর একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পড়িয়া আছে। তিনি পকেট হইতে একটুকরা কাগজ লইয়া দুইহাতে পাকাইয়া শক্ত করিয়া ঐ কয়লা হইতে আগুন জ্বালাইলেন। তারপর মনের আনন্দে সিগার টানিতে-টানিতে আপনার গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন।

আর একটি গল্পে আমরা সম্রাটের সদন্তঃকরণের পরিচয় পাই। গল্পটি এইরূপ;—একবার মার্‌ল্‌বরো হাউসে দুইজন চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালবেলা তাহারা দেখিতে পাইল, সম্রাট একটি প্রাতঃকালীন সিগার মুখে করিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছেন। তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, তিনি যে হাত হইতে নিঃশেষপ্রায় সিগারটা তাহাদেরই সম্মুখে মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেদিকে তাঁহার খেয়ালই ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিঃশেষপ্রায় উচ্ছিষ্ট পুরস্কারটি সংগ্রহ করিবার জন্য দুই চিত্রকরের মধ্যে ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। গণ্ডগোল শুনিয়া এডওয়ার্ড ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলেন—পশ্চাতে লড়াই বাধিয়া গিয়াছে! তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাদের আগ্রহব্যাকুল নয়নসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রকরদ্বয়ের লড়াই একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ নয়নে একবার মাটির দিকে ও একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হে! ব্যাপার কি?' কিন্তু উত্তর দেওয়া কাহারও সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভয় নাই; ব্যাপারখানা কি, তাই বল।" অবশেষে একজন সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিয়া ফেলিল—তাহারা তাঁহার সদ্যপরিত্যক্ত সিগার অংশটুকু সংগ্রহ করিবার জন্যই ঐরূপ কাড়াকাড়ি করিতেছিল। কথা শুনিয়া সম্রাট একটু হাসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে গিয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"তোমাদের জন্য কিছু ভাল জিনিস আনিয়াছি, ঐ পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টটা স্পর্শ করিও না; মালী আসিয়া উহা ঝাড়িয়া ফেলিবে।" কথা শেষ করিয়াই সম্রাট দুইজনের হাতে দুইটা জিনিস প্রদান করিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বোকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়েই বিস্ময়-পুলক-কম্পিত নেত্রে দেখিতে পাইল, তাহাদের হাতে সম্রাটের নামাঙ্কিত হাভানায় প্রস্তুত দুইটা অতি উৎকৃষ্ট সিগার অর্পিত হইয়াছে; তাহার প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ইঞ্চি—মোটা যেন একটি মর্ত্তমান কলা!

একথা বলা বাহুল্য যে, তাহারা ঐ দুইটি সিগার জীবনে কোনদিন আস্বাদন করিয়া দেখে নাই, উহা তাহাদের পরিবারের একটি গৌরবের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সাত-রাজার ধন-মাণিক দুটি তাহাদের নিকট সোণার চেয়েও অধিক মূল্যবান বিবেচিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

বর্ত্তমান যুরোপ-বিপ্লবের প্রধান নায়ক জার্ম্মাণীর সম্রাট কাইজারও একজন প্রধান ধূমপায়ী। এডওয়ার্ডের মত তিনিও ধূমপানের জন্য সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার সিগারও হাভানা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে এবং সৌগন্ধে ও মিষ্টতায় এডওয়ার্ডের সিগার হইতে সেগুলি কোন অংশেই হীন নয়; তবে দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ ছোট বটে এবং সেজন্যই এগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। এডওয়ার্ডের মত তিনি অত্যধিক ধূমপান করেন না সত্য, তবে রাজকার্য্যের গুরুভার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার পর বিশ্রামের সময়ই তাঁহাকে প্রায়শঃ প্রাণ

ভরিয়া ধূমপান করিতে দেখা যায়। সপ্তম এডওয়ার্ডের মত কাইজারও একদিন সঙ্গীহীনভাবে একাকী বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে তাঁহারও সেই অবস্থা; সিগার ধরাইবেন—পকেটে হাত দিয়া দেখেন—দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাটিও নাই। তখন দেখিলেন সেই রাস্তা দিয়া এক ছোকরা চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া থামাইলেন এবং তাহার মুখের কাছে নিজের

সিগার হস্তে জার্ম্মাণ-সম্রাট কাইজার। (২০ বৎসর পূর্ব্বে)

মুখ নিয়া জ্বলন্ত চুরুটের অগ্রভাগে সিগার লাগাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইলেন। এই সামান্য সাহায্যটুকুর পরিবর্ত্তে সেই ছোকরা এতবড় জার্ম্মাণ-সম্রাটের কেবলমাত্র একটু ধন্যবাদ পাইয়াই যে বাড়ী ফিরিয়াছিল তাহা নহে—কাইজার তাহাকে ২০ মার্ক স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

দুনিয়ার প্রায় সকল রাজা-বাদশারাই ধূমপান করিয়া থাকেন। অষ্ট্রিয়ার বৃদ্ধ সম্রাট—যিনি বর্ত্তমান সংগ্রামে সংলিপ্ত রহিয়াছেন, ইটালীর রাজা, রুষিয়ার জার, এমন কি, রোমানিয়া এবং পর্ত্তুগালের মহারাণীদ্বয় পর্য্যন্ত অহরহঃ ধূমপানে প্রাণারাম তৃপ্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। রাজাবাদশাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী ধূমপান করিতেন, পরলোকগত পারস্যের শাহ। তাঁহার বেশী ধূমপান করার একটা কারণ ছিল। তিনি অন্য কোনরূপ বিলাসিতায় অর্থব্যয় করিতেন না—সেইজন্যই ধূমপানের খরচটা তাঁর কিছু বেশী ছিল।

ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে পুরুষের মধ্যে সকলেই ধূমপান করিতে অভ্যস্ত। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ চুরুট এবং সিগার উভয়ই খুব পছন্দ করিয়া থাকেন।

জার্ম্মাণ রাজনীতিবিদ্ বিসমার্ক একজন ভীষণ তাম্রকূটসেবী ছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত তিনি বিনা-সিগারে কাটাইতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"সিগার মুখে না থাকিলে জটিল রাজ-নৈতিক বুদ্ধিগুলি মাথায় ভালরূপ খেলে না।"

সাহিত্যব্রথীদের মধ্যেও প্রায় অনেককেই ধূমপানাসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন একজন প্রধান ধূমপায়ী ছিলেন। একবার তিনি ইটালী-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—উভয়ের মুখেই জ্বলন্ত সিগার ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তা হে টেনিসন! এবারকার ছুটিটা কেমন উপভোগ করলে?' টেনিসন সংক্ষেপে শুধু উত্তর করিলেন—'এই একরকম।' ইহাতে বন্ধুটী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"একরকম! সে কি কথা?' তখন কবিবর গম্ভীর-ভাব ধারণ করিয়া উত্তর করিলেন—"ছুটিটা তেমন উপভোগ করা যায়নি; তার কারণ, ইটালীতে মোটেই ভাল সিগার পাওয়া যায় না—আর সিগারই যদি না থাকল, তবে সকলি বৃথা। যত সুন্দর চিত্রাবলিই হোক, যত অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষই হোক, আর যত চিত্ত-বিমোহনকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই হোক—মুখে যদি একটি ভাল সিগার না থাকে, তবে সে সকল বস্তুর কোন সৌন্দর্য্যই মানুষের চোখে ফুটিয়া উঠিতে পারে না।"

কিন্তু কবি সুইনবার্ণ (Swinburne) ছিলেন ঠিক তাঁর বিপরীত। সিগারের গন্ধ সহ্য করা ত দূরের কথা, নামটুকু তিনি শুনিতে পারিতেন না। বহুবৎসর পূর্ব্বে একবার পেলমেল্ আফিসের (The Pall Mall office) কোন বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাস্থলে হঠাৎ তাঁহার কবিমস্তিষ্কের ভিতরে গীতিকাব্য লিখিবার একটা আকস্মিক প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটি

মার্ক্ টোয়েন

পেন্সিল ও এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া লইলেন—কিন্তু হায় রে হায়! লিখিবেন কোথায় বসিয়া? একটি নিরিবিলি কোঠাও যে আর খালি নাই—প্রত্যেক ঘরেই একজন না একজন ধূমপানে নিমগ্ন। এদিকে সকলের সিগারনির্গত অপর্য্যাপ্ত ধূমরাশি তাঁহার এই আকস্মিক ভাবের প্রেরণাকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় এঘর ওঘর ছুটাছুটি করিলেন। শেষকালে তাঁহার মস্তিষ্কের

নিষ্পত্তি ঘটিল—ছন্দে গাঁথিয়া সুললিত ভাষায় পদ্য লেখা আর হইয়া উঠিল না, ওজস্বিনী গদ্য ভাষায় তাঁহার সমস্ত মনোগত বিদ্বেষ পেন্সিলের দুই খোঁচায় তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

মার্ক টোয়েন্ তামাকের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন—পোষ্যপুত্রকে তাহার মাতা যেমনভাবে আদর যত্ন করে এবং সান্ত্বনা দেয়, তামাকও শৈশবে তাঁহাকে ঠিক তেমনি সান্ত্বনা দিয়াছে এবং প্রাপ্তবয়সে পরিচালকের মত পথ দেখাইয়া দিয়াছে। প্রতিদিন ১০০ একশত করিয়া মাসে ৩০০০ তিন হাজার সিগার তিনি অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারিতেন!

এই সিগারেও তাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইত না—ইহা তাঁহার নিকট সামান্য জলপানের মত মনে হইত। তামাক সেবনের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—তিনি যাহা দ্বারা ধূমপান করিতেন তাহার নাম ছিল কর্ণকব্‌পাইপ (corncob pipe) এই কর্ণকব পাইপেই তাঁহার প্রকৃত আরাম এবং তৃপ্তি হইত। প্রথমতঃ এই নূতন পাইপ দ্বারা ধূমপান করিয়া বিশেষ আরাম পাইতেন না; তাই তিনি শেষকালে একটি লোক ভাড়া করিলেন; সেই লোকের কাজ ছিল শুধু তামাকের মালমশলা গুঁড়া করিয়া পাইপে দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া। আগুন যখন ধরিয়া আসিত, তখন তিনি একটি নূতন নল লাগাইয়া আরামের সহিত দমটানা সুরু করিয়া দিতেন; টানিতে টানিতে যখন তামাকের কিছু থাকিত না—সবই ছাই হইয়া যাইত, তখন তিনি মুখ হইতে তাঁহার অতিপ্রিয় কর্ণকব্ পাইপ্ ধীরে-ধীরে নামাইয়া আনিতেন।

রাড়িয়ার্ড কিপ্‌লিং

কবি রাড়িয়ার্ড্ কিপ্‌লিংও (Rudyard Kipling) মার্কটোয়েনের এই কর্ণকব্ পাইপের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গুজব কথিত আছে যে, এই তামাকের আগুন ধরাইবার জন্য তিনি তাঁহার অনেক অসম্পূর্ণ কবিতার কাগজ পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছেন।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি কোন পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেই পত্রিকার সম্পাদক তাঁহাকে নানাদেশের বিবিধ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৭ সনে তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

পৃথিবী-পরিভ্রমণের সময় রাড়িয়ার্ড্ কিপ্‌লিং যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি একদিন মার্কটোয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মার্কটোয়েন তাঁহাকে আদর করিয়া তাঁহার ঘর দেখাইতে লইয়া গেলেন এবং কোন কার্য্যোপলক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন। কিপ্‌লিং একা-একা সেই ঘরে বসিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। কত বই, কত ছবি, কত আল্‌মারী, টেবিল ঘরে সজ্জিত ছিল—কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সেগুলিতে পড়িল না, সকলের আগেই তাঁহার নজর পড়িল—সেই 'কর্ণ-কব্' পাইপের উপর! নজর পড়িবামাত্র মনের ভিতরে লোভের সঞ্চার হইল—শয়তান আসিয়া মনকে বলিতে লাগিল—'চুরি কর, চুরি কর'। কিন্তু ঠিক সেই সময় মার্কটোয়েন সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যের বিষয় ভদ্রসন্তানের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আর চৌর্য্যাপরাধের কলঙ্কছাপ পড়িতে পারিল না!

গাই বুথবী

গাই বুথবিও (Guy Boothby) একজন বিশেষ সিগারভক্ত। উপন্যাস লিখিবার সময় তাঁহার বামহাতে একটি জ্বলন্ত সিগার থাকা চাই-ই। খেলোয়াড় বলিয়াও তাঁহার খুব সুখ্যাতি আছে—খেলার মাঠে তাঁহাকে সিগার-ছাড়া দেখিয়াছে—এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না।

সেক্সপিয়রের ত্রি-শতাব্দ-উৎসব

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

সেক্সপিয়রের মৃত্যুর পর তিন শত বৎসর চলিয়া গেল। এপ্রিল মাসে ঈষ্টার উৎসবের সময় তাঁহার জন্ম হয়। যে অদ্বিতীয় মহাকবি ও

সেক্‌স্‌পিয়রের জন্মস্থানে প্রদর্শনীক্ষেত্র

নাট্যকারের কিরীট-ছটায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত, এই জীবন-মৃত্যুর সঙ্কট-সমস্যার দিনে, য়ুরোপব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যেও, ইংলণ্ডবাসী তাঁহাদের সেই জাতীয় কবি-প্রতিভার পূজা করিতে বিস্মৃত হয় নাই।

অতীত গৌরবের স্মৃতিই ভবিষ্যৎ যুগে আশার বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দেয়। সাহিত্য-জগতে সেক্সপিয়রের আসন অতি উচ্চে। মানবের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করিতে, তাঁহার শক্তি অতুলনীয়। এই সেক্স-পিয়র-স্মৃতির উদ্বোধন-লগ্ন স্বদেশভক্ত সৈন্যসম্প্রদায়ের মেরু-মজ্জার মধ্যে আত্মসম্মান-বোধের এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতির সঞ্চার করিয়াছে; সঞ্জীবন-মন্ত্রে তাহাদিগকে অপরাজেয় করিয়া তুলিয়াছে। মানসিক অস্ত্রই সমর-ক্ষেত্রে অমোঘ অস্ত্র—ইহা কবিগুরু সেক্সপিয়রেরই উক্তি।

ইতঃপূর্ব্বে জার্ম্মাণ সাহিত্যসেবিগণ সেক্সপিয়রকে জার্ম্মাণীতে আশ্রয়-প্রাপ্ত কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—অর্থাৎ ইংলণ্ড নাকি দিন-দিন সেক্সপিয়রকে ভুলিয়া যাইতেছে, আর জার্ম্মাণী তাঁহার গৌরবরক্ষা করিতেছে। ইংরাজজাতি যে সেক্সপিয়রের কিরূপ ভক্ত, তাহা বৈদেশিকগণ কি করিয়া বুঝিবে? ইংলণ্ডের প্রাণের তন্ত্রী কি সুরে বাজিয়া উঠে তাহা জর্ম্মাণি বুঝিতে পারে না। ইংলণ্ডের সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কবি উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছেন:—

England bound in with the triumphant sea
Whose rocky shore beats back the envious siege
Of watery Neptune.

... ...

Let us be backed with God and with the seas
Which he hath given for fence impregnable,
And with their helps only defend ourselves;
In them and in ourselves our safety lies.

আবার, ইংরাজ-কবি ভিন্ন ইংলণ্ডের মাতৃমূর্ত্তিকে এরূপ ভাষায় কে চিত্রিত করিতে পারে?—

সেক্‌স্‌পিয়রের মহানাটক 'পঞ্চম হেনরী' 'এভন'তীরস্থ ষ্ট্রেটফোর্ডে নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত নাটকের অন্তর্গত পাঁচটী চরিত্রের অভিনয়সজ্জা

এভন নদীতীরে ষ্ট্রেটফোর্ডে সেক্সপিয়রের জন্মভবন (১৭৬৯)

ষ্ট্রেটফোর্ডে সেক্সপিয়রের পুষ্পাস্তীর্ণ সমাধি

This royal throne of kings, this sceptred isle
This fortress built by nature for herself,
Against infection and the hand of war ;
This happy breed of men, this little world ;
This precious stone, set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands ;
This blessed spot, this earth, this realm, this
England !

এই উৎসব উপলক্ষে সেক্সপিয়রের জন্মস্থানে স্যার সিড্‌নে লি এক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করেন। ঐ স্থানে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐগুলি হইতে মহাকবির জীবনের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

স্যার সিড়নে লি বলিয়াছেন যে, সেক্সপিয়র যখন 'এভন'তীরস্থ ষ্ট্রেটফোর্ডে বাস করিতেন, সেই সময়ের নিদর্শনগুলি সমস্তই এই প্রদর্শনীগৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র-বিকাশের পরিচায়ক তাঁহার দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন, পারিপার্শ্বিক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, তাঁহার পিতার ভূসম্পত্তি রক্ষা, বন্ধুবান্ধবগণের সংসর্গ ও প্রভাব, ধর্ম্মাধিকরণে বিচার-প্রার্থনা, উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি-

লাভ প্রভৃতি সমস্তবিষয়ই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

সেক্সপিয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এই উৎসব উপলক্ষে জন-সাধারণকে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক বিতরণ করিয়াছেন। এই পদকের উপর একপিঠে সেক্সপিয়র ত্রি-শতাব্দ উৎসব ও উল্টা পিঠে সেক্সপিয়রের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সম্রাট স্বয়ং ঐ পদক ধারণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন।

পূর্ব্বচিত্রে প্রদর্শিত জন্মভবনের আর একটি চিত্র (১৮৪৯)

আর্ত্তসেবিকা L. A. Rattrayএর চিত্র। ইনি Marqueth জাহাজে জলমগ্ন হন।

শুশ্রূষাকারিণী M. H. Rast ইনি Newzeland Hospital Unitএর একজন সদস্য। গত October মাসে ২৩শে তারিখে Marqueth জাহাজডুবিতে ইনি জলমগ্ন হন।

আর্ত্তসেবিকা Catherine Fox—ইনিও Marqueth জাহাজে জলমগ্ন হন

শার্লোট ব্রণ্টের শতাব্দ-উৎসব।

ইয়র্কশিয়রের অন্তর্গত থর্ণটন্ নগরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল শার্লোট ব্রণ্ট্ জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে আমরা তাঁহার জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক নহি। উনচল্লিশবর্ষব্যাপী জীবনে বহু বিঘ্ন-বিপত্তিসত্ত্বেও কিরূপে তিনি সাহিত্য-জগতে প্রভূত যশের অধিকারী হইলেন, এস্থলে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহার জীবন-কথা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Mrs. Gaskell অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রণ্ট্-রচিত Jane Eyre, Shirley, এবং Villette, এই তিনখানি উপন্যাসই তাঁহার লীলাময়ী প্রতিভার পরিণত ফল। রস-বৈচিত্র্য, কলা-সৌন্দর্য্য, বাস্তব-জীবনের চরিত্র-চিত্রণ-গুণে এই তিনখানি উপন্যাসই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার রচনার এমন এক মোহিনী শক্তি আছে যে, কয়েক ছত্র পড়িবামাত্রই, পাঠকের চিত্ত রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কিন্তু বাল্যকালে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ সমাদৃত হয় নাই। তাঁহার

বাল্যজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালেই যাপিত হইয়াছিল। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্রসেলস্' নগরে অবস্থান করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

দুই বৎসর পরে তিনি তাঁহার পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'দি প্রফেসার' (The Professor) কোন প্রকাশকই মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ Jane Eyre ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। এই পুস্তক-পাঠে পাঠক সমাজ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে 'শার্লি' (Shirley) ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 'ভিলেট' (Villette) প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Rev. A. B. Nichollsএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শার্লোট ব্রণ্টের মৃত্যু মুখে পতিত হন।

শার্লোট ব্রণ্ট

কালের নিকষ-শিলায় শার্লোটের প্রতিভার কাঞ্চনপ্রভা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অকপট সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইয়াছে।

ইয়র্কশিয়রের অংশবিশেষ ব্রণ্ট-কাণ্ট্রি (Bronte Country) নামে পরিচিত। এই স্থানে উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট জন-সম্মিলন হয়। Sir Sidney Lee, Mr. Arthur প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের লিখিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিয়া Mr. Butler Wood শার্লোট ব্রণ্টের স্মৃতিগ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশিত করিবেন।

লণ্ডনে হোয়াইট টাওয়ার

লণ্ডন নগরীর White Towerএর অংশবিশেষে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এক্ষণে ঐ White Towerএর Little Ease প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কারাকক্ষের দ্বার দর্শকগণের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। Sir Thomas More এবং Guy Fawkes এই দুইজন মহাপুরুষের স্মৃতিই এই স্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। 'বেকের' ধর্ম্মযাজক Gundulfএর পরিকল্পনায় সম্রাট্ উইলিয়ম কঙ্কারার (William, the Conqueror) এই 'টাওয়ার' নির্ম্মাণ করেন। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যগুলি পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হয়।
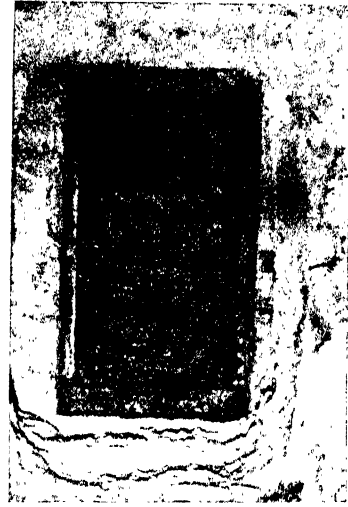
লণ্ডন টাওয়ারের প্রাচীনতম অংশ। এই স্থানেই ১২৮২ খ্রীঃ অব্দে ইহুদীগণকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানেই Sir Thomas More কারারুদ্ধ হন।

White Towerএর অভ্যন্তরে Torture Chamber, এইখানেই Anne Askew মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শত্রু হস্তে ডাক্তার কেরোলিন—তাঁহার আত্মকথা

বেলা ১টা। বেলগ্রেড্ ষ্টেশন সুসজ্জিত সৈন্যে পরিপূর্ণ। সেই ভীষণাকার দৈত্যগুলি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে,—সকলেই সেনা-পতির আজ্ঞাপালনে তৎপর। এই গভীর জনতামধ্যে অদূরে এক-জন ইংরাজ দাঁড়াইয়া ছিলেন;—তাঁহার নাম ডাক্তার কেরোলিন

দেখ। সকলেই মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি উৎসুক নয়নে চাহিতেছিল। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, 'ইংরাজের চর' 'ইংরাজের চর' এই শব্দ- ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে-মুখে ছুটিতেছে। ভয়ে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল; কিন্তু ইংরাজ ভীত হইবার পাত্র নহে,—জার্ম্মাণগণকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি হৃদয়ে নববল সঞ্চার করিলেন। শীঘ্রই ডাঃ কেরোলিন জার্ম্মাণ-সেনাপতি Vis-a-Visএর নিকট নীত হইলেন। তিনি একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। ডাঃ কেরোলিন তাঁহার পার্শ্বে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেনাপতির দৃষ্টি কেরোলিনের উপর পতিত হইল; তিনি বলিলেন হাঁ,"তুমি একজন ছোট খাট শত্রু।"

এই কথাবার্ত্তার পর একজন প্রহরী কেরোলিনকে লইয়া ষ্টেশনের অফিসঘরের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন সৈন্যের পর সৈন্যশ্রেণী গম্ভীর জনতা ভেদ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'হার' নামক একজন ধীর-প্রকৃতি জার্ম্মাণের সহিত কেরোলিন কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াই চলিয়া গেল।

Dr. Caroline Mathews 'Serbian Red cross uniform' পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন

প্রহরীর সহিত 'কেরোলিন'কে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিতে হইল। সেনাপতি কখনও তাঁহাকে দৃষ্টি বহির্ভূত করেন নাই। দুরন্ত শীতে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর দিয়া গো-শকটে তাঁহাকে পথ অতিবাহন করিতে হইয়াছিল। অনেকদিন প্রহরীর অপরিস্কৃত গৃহে তদপেক্ষাও হীন সঙ্গীগণমধ্যে তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে অতি কষ্টে 'কেরোলিন' [illegible] ক্রমাণ্ডতে উপস্থিত হইলেন। সার্জ্জেনের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে 'বেলগ্রেড' নগরে গভর্ণরের নিকট লইয়া যাইবার কথা ছিল। কেরোলিনের যে একটু বিশ্রামলাভের প্রয়োজন. তিনি তাহা শুনিলেন না; তাঁহাকে বেলগ্রেড্ নগরে প্রেরণ করিতে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এই উপলক্ষে সার্জ্জেনের সহিত 'হারে'র বচসা হইল। পরে তাঁহারা উভয়ে দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় কেরোলিন আপনাকে বন্দীরূপে পরিচয় দিয়া রাত্রিতে একটি বিশ্রামগৃহ পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। এস্থলে কর্ম্মচারীদিগের উত্তর পাঠকবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। যাহা হউক, অপর একটি বৃদ্ধ সেনাপতির সাহায্যে কেরোলিন একটি সামান্য হোটেলে একটী শয়ন-কক্ষ পাইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। অতি প্রত্যূষে প্রহরী 'কেরোলিন'কে 'গভর্ণমেণ্ট হাউসে' লইয়া গেল। একজন সুন্দর যুবা তাঁহাকে একটি গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিলেন—প্রহরী দ্বারে বসিয়া রহিল। যুবকের নিকট তিনি শুনিলেন যে,তাঁহাকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। কি ভয়ানক অভিযোগ! যৌবনে কেরোলিন যে সকল পুস্তকে গুপ্তচর-দিগের হত্যাকাণ্ডের বিষয় পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কথা এখন তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার মন একটু বিচলিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন, 'ভাগ্যে যাহাই থাকুক, জার্ম্মাণরা ইংরাজকে কখনও ভীত দেখিবে না।'

পরে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ গৃহে প্রবেশ করিলেন। সার্জ্জেন কেরোলিনের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পাঠ করিলেন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী পরে বলিলেন "তুমি ইংলণ্ডে আমাদিগের কি গুপ্ত সংবাদ লইয়া যাইতেছ? তুমি এখানে কি করিতেছিলে? সত্য বলিও, নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।" কেরোলিন নিস্তব্ধ রহিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, এরূপ ভয়ানক শত্রুর নিকট স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করা অসম্ভব। কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। তখন কেরোলিন বলিলেন—'আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারাই বলুন আমি গুপ্তচর কি না?'

এই প্রকার উত্তরে সমবেত জার্ম্মাণগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কেরোলিন কি করিবেন? কি উত্তর দিবেন? তিনি বলিলেন "ইংলণ্ড জানে যে, আমি এখানে আছি।"

এই কথা শুনিয়া সার্জ্জেন কেরোলিনকে বিদায় দিলেন—কেরোলিনকে পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। ঐ দিন তিনি 'সেলিম' নগরে এক হোটেলে গমন করিলেন। এক্ষণে আর তাঁহার নিকট প্রহরী ছিল না; হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষই তাঁহাকে নজরবন্দী রাখিবার ভার লইয়াছিলেন। বোধ হয় জার্ম্মাণদিগের সন্দেহ দূর হইয়াছিল; হয় ত তাহারা ভাবিয়াছিল প্রকৃত চর হইলে তিনি নিজ নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে অধিক চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক তিনি হোটেলে আসিয়া কতকটা মুক্তি পাইলেন।

হোটেলের প্রাঙ্গণ অতি [illegible]

কেরোলিন ঐ প্রাঙ্গণ পার হইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাতে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, একজন জার্ম্মাণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর। দুইজনে কিয়ৎক্ষণ মল্লযুদ্ধ হইল। কেরোলিন সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলেন না, কারণ চতুর্দ্দিকেই শত্রুপুরী। কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই স্থানে জমাদার স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপরেই কেরোলিনের রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি কেরোলিনের পক্ষ সমর্থন করিয়া আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ে শীঘ্রই তাহাকে পরাস্ত ও দূর করিয়া দিলেন। দুরাত্মা রক্তাক্ত-কলেবরে পলায়ন করিল। কেরোলিনের মস্তকও ঘুরিতেছিল। পরে হোটেলের কর্ত্তা তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিলেন। ঐ স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কেরোলিন রেল গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাকে পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পর, একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র হোটেলে লইয়া গেল; সে তাঁহাকে বলিয়া দিল যে, বিনা অনুমতিতে তিনি এক পাও নড়িতে পারিবেন না। হোটেলটী ক্ষুদ্র হইলেও বাবস্থা উত্তম।

কেরোলিন হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তকাদি বা হাতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় তাঁহার দিনযাপন করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। সেই জন্য তিনি প্রায়ই 'পাবলিক রুমে' (Public Room) উপস্থিত থাকিতেন। একদিন কেরোলিন হোটেলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন জার্ম্মাণ আসিয়া ইংরাজ জাতিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল। এই সকল কথা শুনিয়া কেরোলিনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন 'এ স্থানে কি কোন হাঙ্গেরিয়ার সৈন্য নাই?' রক্তবর্ণের পোষাক-পরিহিত কয়েকজন সৈনিক অগ্রগামী হইল। জার্ম্মাণগণও অগ্রসর হইল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় একজন রক্তবর্ণ 'ক্রশ'-চিহ্নধারী ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, সকল বিষয় অবগত হইয়া, সেই দুরাত্মা জার্ম্মাণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পুস্তক-পরিচয়

নব্য জাপান (সচিত্র)

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-সি-ই, এম-আর-এ এস প্রণীত; মূল্য সাধারণ সংস্করণ একটাকা, কাপড়ে বাঁধাই পাঁচ সিকা]

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় অনেক দিন জাপানে বাস করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেখানে শুধু বিদ্যার্জ্জনই করেন নাই, জাপানীদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন; তাহারই ফল তাঁহার এই 'নব্য জাপান' গ্রন্থ। জাপানের ইতিহাস পাঠ করা এখন সকল সভ্য দেশবাসীরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা উক্ত ভাষায় লিখিত অসংখ্য ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা এই 'নব্য জাপান' পুস্তকখানি পাঠ করিলে জাপান সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রায় সকল কথাই জানিতে পারিবেন। মন্মথবাবু সুলেখক; তিনি এই পুস্তকে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর না করিয়া সংক্ষেপে জাপান সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চিত্রালি

[শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এল প্রণীত, মূল্য আটআনা।]

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রকাশিত 'আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার' ষষ্ঠ পুস্তক। লেখকের পরিচয় অনাবশ্যক। সুধীন্দ্র বাবুর ছোট গল্পগুলি অনেকেই পড়িয়াছেন, এবং সকলেই একবাক্যে তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি এই 'গ্রন্থমালায়' তাঁহার কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প 'চিত্রালি' নাম দিয়া প্রকাশিত করিলেন। এই আট আনা গ্রন্থমালা অতি অল্পদিনেই পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে; বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে। গল্প কয়েকটির লিখনভঙ্গী যেমন সুন্দর, আখ্যানভাগও তেমনই মনোহর ও প্রাণস্পর্শী।

গল্পবীথি

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দেড়টাকা মাত্র।]

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বাবু ইদানীং মাসিক পত্রিকাদিতে যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রভাত বাবু ছোট গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত; তাঁহার বর্ণনা-কৌশল, তাঁহার ভাবোদ্দীপন, তাঁহার ঘটনা-সংস্থান, সর্ব্বোপরি তাঁহার সুন্দর ভাষা, তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এই গল্পবীথিতে সেই পাকা হাতের মুন্সীয়ানা ষোল-আনা বিদ্যমান; গল্পগুলি একেবারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পুস্তকের বা পুস্তক লেখকের পরিচয় নিতান্তই অনাবশ্যক; আমরা শুধু পুস্তক-প্রকাশের সংবাদ দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত ; মূল্য আটআনা।]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নামক পুস্তক সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' নামে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা 'ভারতবর্ষ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন ; সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলার এমন সুন্দর বিশ্লেষণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত ললিত বাবু এই পুস্তকে তাঁহার অতুলনীয় সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের কেন, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকারের পুস্তকের এরূপ সমালোচনা করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। যাঁহারা কপালকুণ্ডলা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই 'তত্ত্ব' পাঠ করা উচিত।

হেঁয়ালি

[শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য একটাকা]

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় জোর করিয়া বইখানির নাম রাখিয়াছেন 'হেঁয়ালি'। আমরা বলিতে পারি যে, এই পুস্তকের প্রচ্ছদ-পটের নামের চিত্রটি একটু হেঁয়ালি-রকমের হইলেও বইখানির মধ্যে যতগুলি কবিতা আছে, তাহার একটিও হেঁয়ালি নহে ; কোনটিই অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য বা আজকালকার অনেক কবির কবিতার মত ধোঁয়া-ধোঁয়া নহে। আরও এক কথা ; কবি যখন দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তখনকার দুই-একটী কবিতা একটু-আদটুকু সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির বোধগম্য ; কিন্তু তিনি দৃষ্টিহীন হইবার পর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে সমুজ্জ্বল। কবির বাহিরের দৃষ্টি লোপ হইয়াছে, কিন্তু ভিতরের দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি যে বিষয়েই যাহা বলেন, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ; এই 'হেঁয়ালি'ই তাহার অকাট্য প্রমাণ। অন্ধ কবির কোন্ কবিতা রাখিয়া কোন্‌টার কথা বলিব ? সবই যে সুন্দর। দুই লাইন শুনুন—

"নিশার ভোরে, ঘুমের ঘোরে, ডাক শুনেছি, আবার ডাক।
(আমার) আঁখির কোলে আলো ঢেলে, আবার বল—জাগ, জাগ।"

কি সুন্দর, কি প্রাণস্পর্শী ! এই বইতে এমন অনেক রত্ন আছে !

পল্লী-স্বাস্থ্য

[শ্রীচুণীলাল বসু প্রণীত, মূল্য চারিআনা মাত্র।]

যাঁহার যে কথা বলিবার অধিকার আছে, তিনিই সে কথা বলিয়াছেন। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, প্রগাঢ় বিজ্ঞানবিৎ, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তিনি রামমোহন লাইব্রেরীতে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে ছাপিয়াছেন। এখন আমাদের দেশে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া ; ঘরে ঘরে নানা ব্যাধি। এই সকল ব্যাধির হস্ত হইতে কিসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পল্লীবাসী সকলেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; আর শুধু পাঠ করিলেই হইবে না, সকলকেই চুণী বাবুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার প্রদর্শিত পথও সোজা। তিনি বলিয়াছেন—

'নিজগৃহ, আশ পাশ, রাখ পরিষ্কার,
গ্রামখানি ছবিসম দেখাবে আবার।'

রামায়ণ

[শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত, মূল্য দেড়টাকা।]

এখানি প্রথম খণ্ড, ইহাতে আদিকাণ্ড হইতে সুন্দরাকাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ নহে ; হেমন্ত বাবু মহর্ষি বাল্মীকির আদিকাব্যের পদ্যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। কবি কৃত্তিবাস রামায়ণের আখ্যানভাগ সুললিত পদ্যে লিখিয়া অমর হইয়াছেন ; তিনি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নাই। পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন ৺রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় ; কিন্তু তিনি মূল শ্লোকগুলির যথাযথ অনুবাদ করিয়াছিলেন ; হেমন্ত বাবু তাহা না করিয়া মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ বেশ হইয়াছে; এবং সেই সেকেলে পয়ার ত্রিপদীতে অতি সরল ভাষায় অনুবাদ করায় আরও বেশ হইয়াছে।

মধু-স্মৃতি *

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

মহাকবি, মহাপ্রাণ, হে বঙ্গভূষণ,
আকাশ চুম্বিছে তব কীর্ত্তির কেতন !
প্রভাত জাগিল তব প্রতিভা লীলায়,
ভাসাইলে মাতৃভূমি মধুর ধারায়।
সঁপিলে অমৃত অর্ঘ্য বাণীর দেউলে,
আনন্দেরে বন্দী করি' রত্নাকর কূলে।
বিরাট তূলিকা স্পর্শে বঙ্গ ভাষা-পটে
মহান্ আলেখ্য আঁকি' জ্যোতির্ম্ময় মঠে
কালেরে করিলে জয়। অর্ণব গম্ভীর
উদাত্ত তোমার তূর্য্য। দিব্য রাগিণীর
রসমূর্ত্তি-উদ্বোধনে, কাব্য-হিমালয়ে,
ভাস্বর কিরীট তব মনঃসূর্য্যোদয়ে,
উদ্ভাসিয়া হেমচ্ছটা যুগযুগান্তর,
নন্দিত করিছে তব ভক্তের অন্তর।

সাময়িকী

মিস এগেনস এভারেষ্ট নাম্নী এক বিলাতী মহিলা ভারতবর্ষে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই মহিলার সহিত ভারতবর্ষের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা জানি না; বিশেষতঃ, সম্বন্ধ থাকিলেই, বা অর্থ থাকিলেই যে, সকলে ভারতীয়দিগের শিক্ষার জন্য এমন ভাবে দান করিয়াছেন, তাহাও আমরা অবগত নহি। ভারতের হিতাকাঙ্খিনী এই মহিলা যে প্রকৃতই আমাদের প্রশংসার অধিকারিণী, সে বিষয়ে মত-ভেদ নাই। কিন্তু এই দান-উপলক্ষে তিনি যে একটি সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহাই আমাদের এবং যাঁহারা আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের বিধাতা, তাঁহাদের ভাবিবার বিষয়। কুমারী এগেনস এভারেষ্ট বলিয়াছেন যে, কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিবেন না, ভারতের লোকেই তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহার একমাত্র কথা এই যে, তাঁহার প্রদত্ত অর্থে ভারতবাসী ছাত্রগণের জন্য যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার শিক্ষাভার ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে; কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক বা ব্যবস্থাপক ভারত-বাসী ব্যতীত বিদেশীয় কেহই হইতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, তখন তিনিও উপরিউক্ত সর্ত্ত করেন। তাঁহার এই সর্ত্ত সম্বন্ধে হয় ত কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, দেশের শিক্ষিত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য এবং আরও অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্যই তিনি এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে বিদেশিনী মহিলা ঐ সর্ত্তে টাকা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার মনে ত এ ভাবের উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এ প্রকার সর্ত্তের কারণ কি?

ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ চিন্তা বা গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি মন খুলিয়া কথা বলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, যে দেশের ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষকও সেই দেশীয় হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, দেশীয় শিক্ষিত অধ্যাপকের দ্বারাই দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধান করিলে সুফলপ্রসূ হয়। অবশ্য ইংরাজীভাষা বা ফরাসীভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ইংরেজ বা ফরাসী শিক্ষকই প্রয়োজন। বিদেশীয় ভাষা বিদেশীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিলে যেমন শিখিতে পারা যায়, অপরের নিকট তেমন শিক্ষা হয় না; কিন্তু ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় দেশীয় লোকের দ্বারাই সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বিদেশ হইতে শিখিয়া আসিতে হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়েরই শিক্ষক ও অধ্যাপক মিলিতে পারে এবং মিলিয়াও থাকে। বিষয়-বিশেষে হয় ত এই সকল অধ্যাপকের কেহ কেহ বা অনেকেই তাঁহাদের বিদেশীয় অধ্যাপক বা সহকর্ম্মীদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় বা অভিজ্ঞতায় কিছু হীন হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উপর অধ্যাপনার ভার প্রদত্ত হইলে তাঁহারা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা খ্যাতনামা অধ্যাপক হইবেন। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন প্রথম কলেজ খোলেন, তখন অনেকে বলিয়াছিলেন যে, ভাল অধ্যাপক মিলিবে না; কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই; তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে ভাল অধ্যাপক প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের দেশীয় লোকের দ্বারা পরি-চালিত সকল কলেজেই সকল বিষয়ই অধ্যাপনা করিবার জন্য যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন এবং এমন কি সরকারী কলেজ সমূহে যে সকল দেশীয় অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা কোন বিষয়েই বিদেশীয় অধ্যাপকগণের অপেক্ষা হীন নহেন। পাছে কেহ উপরিউক্ত কোন আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই জন্য সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় আরও একটি সর্ত্ত দিয়াছিলেন যে, যদি কোন বিষয়ের উপযুক্ত অধ্যাপক দেশীয়গণের মধ্যে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে

তাঁহার প্রদত্ত অর্থ হইতে বৃত্তি প্রদান করিয়া এদেশীয় কোন যুবককে বিদেশ হইতে সেই বিষয় শিখাইয়া আনিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ এ দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার ভার এ দেশীয় শিক্ষিত অধ্যাপকগণের হস্তেই ন্যস্ত করিতে হইবে, কেন না স্যর রাসবিহারী বুঝিয়াছেন এবং বিশ্বাস করেন, এ দেশের ছাত্রগণের শিক্ষা এ দেশীয়দিগের দ্বারা হওয়াই মঙ্গলজনক। বিদেশিনী মহিলা মিস এভারেষ্টও তাহাই বুঝিয়াছেন এবং তাহাই বিশ্বাস করেন। তাই তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অর্থে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবস্থাও এদেশীয় ভদ্রলোকেই করিবেন এবং অধ্যাপনার ভারও এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই উপলক্ষে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। যে দেশের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে যদি সেই দেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা যেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করিলে কিছুতেই তেমন পারে না। অধ্যাপক প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান সময়ে প্রায়ই বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহার করেন এবং তিনি বলেন যে, তাহাতে ছাত্রেরা শিক্ষণীয় বিষয় অতি অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। বহুকাল পূর্ব্বে আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন কলিকাতার ফ্রিচার্চ কলেজে পরলোকগত মহাত্মা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না। আমরা অনেক সময় ঐ কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে যাইতাম। তিনি দর্শন ও সাহিত্য পড়াইবার সময় বাঙ্গালা করিয়া যে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘকাল পরে এখনও তাহা আমরা ভুলিতে পারি নাই, সে ব্যাখ্যাসকল পাষাণাঙ্কিত রেখার মত আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্যই আমরা বলি, কলেজে দেশীয় অধ্যাপকগণের দ্বারা অধ্যাপনা করাইলে ক্রমে তাঁহারা যদি দেশীয় ভাষায় অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশেরও অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং অধীত বিষয়গুলি কেবল পাশ করিবার বোঝা-স্বরূপ না হইয়া, সে সকল বিষয়ই প্রকৃত জ্ঞানলাভের কারণ হইবে। তাহা হইলে তত্তৎ বিষয়সম্বন্ধে ক্রমে দেশীয় ভাষায় পুস্তকাদিও লিখিত হইবে এবং ভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইবে।

নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে এক্ষণে আমাদের দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট নারী জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি সারকুলার প্রচার করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মত চাহিয়াছেন এবং আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মন্তব্য যাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছে, সে সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে। এদিকে কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষিত মহাশয়গণ মহিলাদিগকে কি প্রকার শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা একরূপ স্থির করিয়াই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষণে ভারতীয় মহিলাগণ যে ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাহাই ভাল; এই কথা ধরিয়া লইয়াই বোম্বাই অঞ্চলে মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ছাত্রীরা যে ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত একই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া, একই পরীক্ষায় যে ভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছেন, তাহা বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা একটি বিদুষী মহিলার মত উদ্ধৃত করিতেছি। এই মহিলার নাম শ্রীমতী সত্যবালা দেবী। ইনি য়ুরোপে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, সে সকল দেশের মহিলাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞানলাভ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় পাশ্চাত্য-বিদ্যায় পারদর্শিনী, পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শিনী মহিলার মত উপেক্ষণীয় নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। 'শিখ রিভিউ'

(Sikh Review) নামক মাসিক পত্রে সেদিন শ্রীমতী সত্যবালা দেবী মহিলা-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন "Now after comparing all these notes and taking a mental review of all I have seen in foreign countries, I have come to be of opinion that India possesses the best material in its womankind that could be moulded into a very efficient national asset or wealth. We have to profit by the experiments made by other nations" তাঁহার উপরিউক্ত কথার সার মর্ম্ম এই যে, তিনি অনেক দেশ দেখিয়া শুনিয়া এবং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় মহিলা-বৃন্দের মধ্যে খাঁটী ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান আছে; তাহাকে বেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে, আমাদের জাতীয় সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। অন্যান্য জাতি মহিলা-শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাই দেখিয়া আমাদের গন্তব্যপথ স্থির করিতে হইবে। তাহার পরই শ্রীমতী সত্যবালা বলিতেছেন যে, "Europe has committed a great mistake in giving the same kind of education to both men and women" অর্থাৎ "পুরুষ ও স্ত্রীজাতিকে একই রকমের শিক্ষা প্রদান করিয়া য়ুরোপ একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন।" আমাদের দেশেও যাহারা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ছাত্রগণের মধ্যে ছাত্রীদিগকেও অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর ঐ কথাই প্রযুজ্য, এবং আমরাও তাঁহারই মতের সমর্থন করি।

আমরা স্পষ্টবাক্যে বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মহিলাবৃন্দের শিক্ষার অনুকূল ত নহেই, ইহা তাঁহাদের মাতৃত্বের বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের ছাত্রগণের পক্ষেই অনুকূল কি না, সেই কথাই এখন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মহিলাগণেরকথা ত দূরে থাকুক। আমাদের সামাজিক অবস্থা বুঝিয়া দেখিলে এ শিক্ষা যে মহিলাবৃন্দের কোন প্রকার উন্নতিই করিতে পারে না, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশের যে সমস্ত মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আমরা অসম্মান করিতেছি না। কিন্তু আমাদের সমাজে তাঁহাদের এই পরিশ্রম, এই যত্ন চেষ্টা কোন ফলই দিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। তাঁহারা যে সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগিতেছে না, লাগিবেও না। আমাদের দেশের যুবকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভ করিবার পর বাহির হইয়া সর্ব্বদিকেই অন্ধকার দেখিতেছেন; কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহারা পথ পাইতেছেন না, যাহা পাঠ করিয়া এতকাল কাটাইয়াছেন, তাহারও কোন রসাস্বাদন করিতে পারেন নাই; কারণ, তাহা যে উপাধিরই জন্যই প্রয়োজন, উপাধিলাভের পর ত তাহার আবশ্যকতা নাই। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় যিনি এম-এ হইয়াছেন, কি ভূবিদ্যায় যিনি এম-এসসি হইয়াছেন, তিনি আদালতের উকিলগৃহে উপস্থিত হ'ন। সেখানে তাঁহার অধীত বিদ্যার সার্থকতা কি? তেমনই রসায়নশাস্ত্রে এম এ পাশ করিয়া আমাদের মহিলাগণ অন্তঃপুরের কি কাজে লাগিতে পারেন, বাহিরের কোন্ কাজেই বা অগ্রসর হইতে পারেন? এ অবস্থায় বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে মহিলাগণের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নহে, এ কথা আমরা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি।

তাহার পর স্ত্রী-পুরুষভেদে শিক্ষার যে তারতম্য হওয়া প্রয়োজন, তাহাও আমরা স্বীকার করি। এ সম্বন্ধে, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল, এম, এস মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি। ডাক্তার বাগচী অন্যান্য অনেক কথার পর আমাদের দেশের মহিলাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"স্ত্রী ও পুরুষের যেমন দেহগত স্বাভাবিক পার্থক্য আছে, সেইরূপ মনোগত পার্থক্যও যে না আছে, এমন নহে। পুরুষের মনোভাব ও নারীর মনোভাব এবং তাহাদের প্রকাশ রীতি অনেক সময় ঠিক একরূপ নয়। বুদ্ধিবিষয়েও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রমণী যাহা বুঝে, তাহা চট্ করিয়া বুঝে; পুরুষের পক্ষে তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয়। কোন বিষয়ে ধীর-ভাবে, যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা চিন্তা

করিয়া দেখা নারীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। সে যুক্তি-প্রমাণ না পাইয়া একেবারে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। এই কারণে নারী কোন বিষয়ে যত শীঘ্র সিদ্ধান্ত করিতে পারে, পুরুষ তাহা পারে না। রমণীর ইচ্ছা-শক্তি ও মনের শক্তি পুরুষের তুল্য প্রখর নহে। স্ত্রীপুরুষের শরীর ও মনে যদি এতটা পার্থক্য, তাহা হইলে এক প্রকার শিক্ষাপ্রণালী স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পক্ষে কি করিয়া উপযোগী হইতে পারে? পুরুষোচিত শিক্ষা দিলে, নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৎ গুণগুলি কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে না। নারী স্ত্রী-প্রকৃতি পুরুষকে ও পুরুষ পুরুষ-প্রকৃতি নারীকে ভালবাসিতে পারে না। শিক্ষাদানকালে এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। যে শিক্ষায় নারীর নারীত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা নারীর পক্ষে কদাপি উপযোগী হইতে পারে না। পুরুষের মত নারীর দেহের ও মনের পরিণতি করিতে চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার স্বাভাবিক লালিত্য ও সুকুমার ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব পুরুষোচিত ব্যায়াম ও মানসিক শ্রম নারীর পক্ষে ব্যবস্থা করা কখনও উচিত নয়।"

যাহা কর্ত্তব্য নহে, তাহা ত বলা হইল। এখন কর্ত্তব্য কি? মহিলাদিগকে কি ভাবে শিক্ষাপ্রদান করা উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করা চাই। আমরা মনে করি, মহিলাদিগের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র। পুরুষেরা যে ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, মহিলাদিগের ক্ষেত্র তাহা নহে। তাঁহারা জননী; তাঁহারা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী; তাঁহাদিগকে পালন-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতে হইবে; তাঁহারা জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ পালন করিবেন। তাহারই জন্য, সেই মাতৃত্বের বিকাশের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। পুস্তকের শিক্ষা চাই বই কি? হৃদয়কে উন্নত করিতে হইলে, মাতৃ-রূপিণী হইতে হইলে মেয়েকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু এখন যাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কি ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে? মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অন্তঃপুর-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে শিক্ষায় তাঁহাদের মাতৃত্বের বিকাশ হয়, তাঁহাদের হৃদয় উন্নত হয়, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া মহিমময়ী হন, সেই শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে; তাহা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'সমসাময়িক ভারত' নামে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিতেছেন। তাহার উনবিংশতি খণ্ড অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক জে, এন, দাসগুপ্ত, মহাশয়। অবশ্য অধ্যাপক দাসগুপ্ত মহাশয় ইংরাজী ভাষাতেই ভূমিকা লিখিয়াছেন। তিনি এই ভূমিকায় একটি অতি সুন্দর ও সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "A few years ago, while addressing the University of Calcutta, I had occasion to state that if the reconstruction of the past of our home-land is to be a successful undertaking, part at least of the materials for that reconstruction should be sought in the pages of our Bengali poets. In special reference to Bengal in the 16th century, I ventured to explain that our Mukundram's pages, for example, throw a flood of light on the political, social, and economic condition of Bengal in the latter half of the century." উপরিউদ্ধৃত কথার মর্ম্ম এই যে, আমাদের দেশের অতীতকালের সামাজিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক অবস্থার বিবরণ যদি সঙ্কলন করিতে হয়, তাহা হইলে সে সময়ের বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থাবলীতে তাহার প্রচুর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার সর্ব্ববিধ অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে মুকুন্দরামের গ্রন্থ হইতে প্রচুর সহায়তা লাভ করিতে পারা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতির নাম শুনিলে ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন; ঐ সকল পুঁথির মধ্যে যে কোন ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এখন সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদিগের পুরাতন কবিদিগের আদর করিতে শিখিয়াছেন। আরও এক কথা; মুকুন্দরাম যে সময়ের কথা বলিয়াছেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যে পাশ্চাত্য-ভ্রমণকারীদিগের লেখায় পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং মুকুন্দ-রামের কথা ত আর ঠেলিয়া ফেলিবার যো নাই। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় রাল্‌ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক একজন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ফিচ্ সাহেব এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ের অবস্থা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মুকুন্দরামের বর্ণনার সহিত তাহার অমিল নাই; সুতরাং মুকুন্দরামের বর্ণনাকে বিশ্বাস করিয়া লইতে আমরা বাধ্য। এমন করিয়াও যদি আমাদের পুরাতন কবিগণ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমরা কৃতার্থ হইব।

উইলিয়ম আর্ভিন, আই-সি-এস্

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম,-এ,পি-আর-এস]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আর্ভিন-সম্পাদিত মানুযীর ভ্রমণ-কাহিনী

আর্ভিনের অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা "মানুযীর মুঘল-সাম্রাজ্যে ভ্রমণ" *Travels of Manucci* (*Storia do Mogor*) পাশ্চাত্যজনগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পুস্তক হইতেই তিনি বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর এলাহাবাদের "পাইওনিয়র" পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইবে :—

"At home Mr. Irvine's name outside a small circle of students must have been, as nearly as possible, unknown when first two volumes of his Manucci appeared in 1907 and were at once recognised as the most valuable and important work of the kind that had seen the light since the publication of Col. Yule's *Marco Polo.* ... ... His reputation as a scholar had been already established, and it stands on an enduring basis ... ... It is not likely that any other English edition of Manucci's work will ever be forthcoming to supersede that of Mr. Irvine."

এই গ্রন্থে আর্ভিনের গভীর বিদ্যাবত্তা ও অধ্যবসায়ের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। কেমন করিয়া একা তিনি এত বড় সম্পাদন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইজন্যই একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন,—The notes appearing to have been written by a *syndicate of scholars* instead of by one man only." আর্ভিনের রচিত পাদটীকা ও পরিশিষ্টগুলি যে মানুযীর মূল অপেক্ষাও অনেক বেশী মূল্যবান্, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ইহা হইতে শাহ্‌জহান, আওরংজীব ও শাহ্ আলমের রাজত্ব-কালের একটা বিশুদ্ধ নিখুঁত চিত্র,—যাহা পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় ভাষায় পাইবার উপায় ছিল না—তাহা আমরা পাইয়া থাকি। অধিকন্তু, আর্ভিন ইহাতে যথার্থ তারিখ, প্রামাণিক গ্রন্থের পত্রাঙ্ক প্রভৃতি যথাযথ উল্লেখ করিয়াছেন। যিনিই একবার মানুযীর পুস্তকের এই সংস্করণের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, আর্ভিন কি অমূল্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে আর্ভিন ১৬৫০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতেতিহাসের এমন কোন অংশ রাখিয়া যান নাই, যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। যাহাতেই তিনি একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারই অন্ধকারে তিনি উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। যে সমস্ত ভারতেতিহাসলেখক ফার্সী অবগত নহেন, তাঁহারা যে *Storia* গ্রন্থে আর্ভিনের পাদটীকা ও *Later Mughals* পাঠ করিয়া প্রভূত উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু আর্ভিনের এই সমস্ত অমূল্য উপাদান হইতে তাঁহারা নিজের লিখিত বিষয়ের ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

আর্ভিন, বার্লিন ও ভিনিসে মানুযীর গ্রন্থের আদি পাণ্ডুলিপির পুনরাবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে, এই ইতালীয় ভ্রমণকারী কেবলমাত্র কত্রুর (Catrou) চুরিকরা, ভ্রমপূর্ণ, ফরাসী ভাষায় রচিত বিবরণ হইতেই জগতে পরিচিত ছিলেন। মানুযীর গ্রন্থের ভাগ্যবিপর্য্যয় পাঠ করিলে উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র বলিয়া মনে হয়।

মানুযীর পাণ্ডুলিপির ইতিহাস

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে

নিকোলা মানুষী মাতৃভূমি ভিনিস নগর ত্যাগ করেন। জাহাজ-ভাড়া দিবার মত অর্থসঙ্গতি না থাকায় তিনি জাহাজে লুক্কায়িত থাকিয়া, ঐ শহর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে পৌছিয়া তিনি প্রথমে কুমার দারা শুকো ও পরে শাহ্ আলমের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি চিকিৎসকের কার্য্যও করিতেন; বলা বাহুল্য, চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নানা ঘটনাচক্র ও ভাগ্যপরিবর্ত্তনের পর অবশেষে মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে মানুষী ভারতে প্রায় ৬০ বৎসরের অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

মানুষী তাঁহার মুঘলগণের ইতিহাস *Storia do Mogor* কখন পর্ত্তুগীজ, কখন ফরাশী, আবার কখন ইতালীয় ভাষায় রচনা করিতেন। গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ তিনি নিজের মাতৃভাষা ইতালীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পর্ত্তুগীজ (এবং অংশতঃ ফরাশী) ভাষায় পুনর্লিখিত হইয়াছিল। মানুষীর গ্রন্থ পাঁচভাগে বিভক্ত :—

(ক) গ্রন্থকারের ভিনিস হইতে আগ্রা-যাত্রা এবং বাবর হইতে আওরংজীব পর্য্যন্ত মুঘলসম্রাট্‌গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(খ) আওরংজীবের শাসনকাল ও গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত ইতিহাস।

(গ) মুঘল দরবার, রাজ্যশাসন পদ্ধতি, রাজস্ব; ইহার সহিত মানুষী ইউরোপীয় কোম্পানীগণের কথা মিশ্রিত করিয়া, নানা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, ভারতীয় জীবজন্তু; ভারতে ক্যাথলিকগণ, ইত্যাদি।

(ঘ) ১৭০১ খৃষ্টাব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যে মুঘল শিবিরের ঘটনাবলী এবং জেসুইট্ ও ক্যাথলিকগণের কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ।

(ঙ) ১৭০৫ ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী; নানা স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের উপাখ্যানাবলীর উল্লেখ।

মানুষী তাঁহার গ্রন্থের প্রথম তিনভাগ, ফরাশীরাজ চতুর্দ্দশ লুই-এর অর্থানুকূল্যে প্রকাশের আশায়, ফরাশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী M. Boureau Deslandes-এর নিকট ১৭০১ খৃষ্টাব্দে প্যারি নগরে প্রেরণ করেন। Deslandes সাহেব ফ্রান্সিস্ কত্রু (Catrou) নামে একজন জেসুইট্‌কে মানুষীর এই হস্তলিপি পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। কত্রু ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে, অন্যান্য নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া, ফরাশী ভাষায় মানুষীর গ্রন্থের এক বিকৃত, অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ সংস্করণ বাহির করেন। ইহাতে আওরংজীবের রাজ্যারম্ভ (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ইতিহাস আছে। কত্রু কর্ত্তৃক প্রকাশিত মানুষীর এই সংস্করণের দুইখানি ইংরাজী অনুবাদও গত ১৫ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে কত্রু মানুষীর দ্বিতীয় ভাগ প্রায় আগাগোড়া চুরি করিয়া আওরংজীবের রাজত্বকালের একখানি ইতিহাস প্রকাশ করেন। ইহা অদ্যাবধি ইংরেজীতে অনূদিত হয় নাই, কিন্তু ইহা হইতে অর্ম্ম, টড্ ও ডাউলার প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেন, এবং ইহাই বঙ্কিমের "রাজসিংহের" অনেক গল্পের ভিত্তি।

মানুষীর পাণ্ডুলিপির যে অংশ প্রথমে ইউরোপে প্রেরিত হয়, তাহা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্যারি নগরে, জেসুইট্‌দিগের পুস্তকাগারে রক্ষিত ছিল; পরে ঐ ধর্ম্মযাজকগণের মঠ বিনষ্ট হওয়ার পর উহা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত বিক্রীত হইয়া বার্লিনের রাজকীয় পুস্তকালয়ে (1887) উপস্থিত হয়। ইহার বিবরণ *Berlin Codex* Phillipps 1945এ প্রদত্ত হইয়াছে,—পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত তিন বাল্যুমে সম্পূর্ণ, কিন্তু তিন স্থলে যে অংশ বাদ ছিল, তাহা পরে ফরাশীতে পূরণ করা হইয়াছে। আর্ভিন এই হস্তলিপিই অনুবাদ করিয়া চারি বাল্যুমে বাহির করেন।

ভারতে অবস্থানকালে মানুষী যখন শুনিলেন যে, কত্রু তাঁহার গ্রন্থ হইতে চুরি করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনি ইতালীয় ভাষায় লিখিত *Storia* গ্রন্থের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (ইহা সর্ব্বসময়ে তাঁহার নিকট থাকিত), ফরাসী ভাষায় লিখিত ৪র্থ খণ্ড এবং ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত ৫ম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ভিনিসের মন্ত্রি-সভার নিকট পাঠাইলেন (১৭০৬)। তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আবেদন করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পর্য্যটক, ধর্ম্মযাজক ও বণিক্‌দিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে, ইত্যাদি। মানুষীর এই পাণ্ড-

লিপি Zanettiর ক্যাটালগে *Venice Codex* XLIV সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম খণ্ডের একমাত্র সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক মূল পাণ্ডুলিপি কাউণ্ট কাতিয়েরা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ হইতে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার হস্তলিপি *Venice Codex* XLV নম্বর।

ইউরোপে গুণীগণের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া এইরূপ ধারণা ছিল যে, মানুষী ভিনিসীয় Senateকে তাঁহার গ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন, তাহা নেপোলিয়নের ঐ শহর আক্রমণের সময় হারাইয়া গিয়াছে; কিন্তু নেপোলিয়ন (১ম) ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র মদন কুমার ও দরবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ৫৬ খানি সমসাময়িক চিত্র লইয়া গিয়াছিলেন। এই চিত্রগুলি ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, মানুষীর আশ্রয়দাতা শাহ্ আলমের চিত্রকর মীর মহম্মদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল এবং মানুষী Senateকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা প্যারিস নগরীর National Libraryর *O. D. No. 45*. এই মূল্যবান্ চিত্রগুলি আর্ভিন সম্পাদিত *Storia* গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু দেবতা, ধর্ম্মবিষয়ক উৎসব—অনুষ্ঠান প্রভৃতির আরও [illegible] খানি চিত্র মানুষী ঐ সময়ে ভিনিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন —তাহাও তথায় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিচক্ষণ ইতিহাসজ্ঞেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরিয়া মানুষীর মূল পাণ্ডুলিপিগুলির অনুসন্ধানে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অথচ সেই সময় উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে—ভিনিসের Saint Markর পাঠাগারে, রক্ষিত ছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর্ভিন তথায় উহার পুনরাবিষ্কার করেন এবং তিন বৎসর পরে স্বীয় ব্যবহারার্থ উহার নকল গ্রহণ করেন। সদাশয় ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট আর্ভিন যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত মানুষী ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে 'Indian Text Series'এ চারিখানি সুবৃহৎ খণ্ডে, ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইরূপে মানুষীর গ্রন্থের যথার্থ অবিকৃত অনুবাদ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইল, —প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ, অনিশ্চিত বিষয়, প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছিল, তাহা এতদিনে বিদূরিত হইল। ইহাই আর্ভিনের কীর্ত্তি।

আর্ভিনের মহানুভবতা

আর্ভিনের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল, যে কেহ তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ে গবেষণা করিতেন, তাঁহাদের তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। পাশ্চাত্যবিদ্যাগুণী যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে দেখেন এবং বিষময় বাদ প্রতিবাদ করিয়া লোক হাসান, আর্ভিন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। অন্যান্য বহু ভারতেতিহাস আলোচনাকারীর সঙ্গে আমিও যখনই কোন উপদেশ বা কোন কিছু জটিল অজ্ঞাত বিষয়ের উপর আলোকপাতের জন্য আর্ভিনের শরণ লইয়াছি, তখনই তিনি অম্লানবদনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যদি তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার জন্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানী হইতে নানা উপাদান যথা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া ও নকল করাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমার রচিত আওরংজীবের রাজত্বের মৌলিক ইতিহাস প্রকাশিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। অধিকন্তু তিনি তাঁহার নিজ পুস্তকালয় হইতেও আমাকে নানা হস্তলিপি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন এবং বিলাতের লাইব্রেরী হইতে ফার্সী হস্তলিপির এক প্রকার সস্তা ফটো (Rotary Bromide print) লইবার জন্য ফটোগ্রাফারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে বসাইয়া দিয়াছিলেন। যখনই আমি কোন সংশয় বা সন্দেহে পড়িয়া তাঁহাকে লিখিয়াছি, তখনই তিনি অন্তরের সহিত আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌবাসী একজন নবাবের নিকট একখানি ঐতিহাসিক-গ্রন্থের একটি সংগ্রহ ছিল। আমি ঐ নবাবের অনুমতি লইয়া উহার নকল লইবার জন্য নিজ খরচে একজন লিপিকর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবাবের কর্ম্মচারীরা নানা মিথ্যা আপত্তি করিয়া আমার নিয়োজিত লোককে নকল লইতে দেয় নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া, আমি এ বিষয় আর্ভিনের গোচর করিয়াছিলাম। তিনি এলাহাবাদের একজন উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান বন্ধুকে এ বিষয়ে লেখেন। তাঁহার বন্ধু আবার নবাবকে লেখেন। এক্ষণে এ পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী নিজ ব্যয়ে উহা নকল করাইয়া, নকলটী রেশমী কাপড় ও মরক্কো চামড়ায় বাঁধাইয়া, আর্ভিনকে উপহার দেন! আর্ভিন উহা প্রাপ্তিমাত্র আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি আমার 'আওরংজীবের ইতিহাসের' প্রথম পাঁচ অধ্যায় অতীব যত্নের সহিত পাঠ করিয়া, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়া দেন।

প্রকৃত পক্ষে আর্ভিন এত অধিক পরিমাণ সময় অপরের সাহায্যকল্পে নিয়োজিত করিতেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার নিজ কার্য্যের ক্ষতি করিয়া, তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতে আমি লজ্জিত হইতাম। আমার রচিত *India Aurangzib of* অর্থাৎ মগল-সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে আমি অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া ছিলাম যে, প্রাচীন ইজিপ্টের ন্যায়, প্রাচীন ভারত বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইলে, ভারত অপেক্ষা ইউরোপীয় রাজধানীতে গমন করিলে উপকরণ পাওয়া সহজ। আর্ভিন ইহার উত্তরে আমাকে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতীয় ভৌগোলিক বিবরণ সম্বলিত "চাহার গুলশানে"র তিনখানি ফার্সী পাণ্ডুলিপি স্বেচ্ছায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দয়ার এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

তথাপি তিনি এরূপসাধুপ্রকৃতি সম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, যে কেহ তাঁহাকে অতি সামান্য সাহায্যও করিয়াছেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থের পাদটীকা ও পরিশিষ্টে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি আমাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন; তথাপি তিনি মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষে লিখিয়াছিলেন: "আপনার নিকট হইতে আমি যে নানা সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন" ("Thanks for all the help of many sorts I have received from you").

ঐতিহাসিক আর্ভিন

ঐতিহাসিক আর্ভিনের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব ছিল। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেন এবং যাহা লিখিতেন, তাহা নির্ভুল হইত। এই দুই গুণে তিনি কোন জর্ম্মান পণ্ডিত অপেক্ষা লেশমাত্র হীন ছিলেন না। তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চ ছিল:—

"A historian ought to know *everything* and though that is an impossibility, he should never despise any branch of learning to which he has access." (*Letter to me*, 2 Oct. 1910).

আর্ভিন তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উপর নানা দিক্ দিয়া আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। ফার্সী, ইংরাজী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ বিবরণাদি, ভারতে জেসুইট মিশনরী-দের পত্রাবলী, ভ্রমণ-কাহিনী, সমবর্ত্তী সাহিত্য (Parallel Literature)—এ সমস্ত হইতেই তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার *Storia* ও *Army of the Indian Mughals* পুস্তকদ্বয়ের পরিশিষ্টে যে প্রমাণ-পঞ্জী দিয়াছেন, তাহাতেও যথেষ্ট শিখিবার জিনিস আছে। তিনি সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ের নজীর প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে আমার মনে হয়, আমাদের দেশের ইতিহাস-লেখকগণ যেন তাহার *Later Mughals* অধ্যয়ন করেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক পদ্ধতির আদর্শ এবং মানসিক তপস্যার (Intellectual discipline) উপায়স্বরূপ অনুকরণ করেন।

কেহ কেহ আর্ভিনকে "ভারতের গিবন" এই নামে অভিহিত করিতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, আর্ভিন কেবল ঘটনার বিবরণই প্রদান করিয়াছেন। গীবন তাঁহার রোম সাম্রাজ্যের পতনের মহা ইতিহাসে (*Decline and Fall*) যে মতামত ও গবেষণা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসকে উচ্চ দর্শন এবং আদর্শ সাহিত্য-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছে—সে প্রকার চিন্তা ও দর্শন আর্ভিনের ইতিহাসে নাই। কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক একটা কথা ভুলিয়া যান। কথাটি এই যে,—গীবন যখন রোমের ইতিহাস লিখেন, তখন সে দেশের ইতিহাসের ঘটনা-পারম্পর্য্য, সাহিত্য ও দর্শনের বিবরণ বিশুদ্ধ ও বিস্তৃতভাবে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল; কিন্তু আর্ভিন যখন মুঘল-ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন ভারতেতিহাস-লিখনের আদিম যুগই কাটে নাই। আমাদের এখনও অনেক বিবরণ সংগ্রহ ও সুসম্বদ্ধ করিতে হইবে—এখনও আবশ্যক ভিত্তি গঠন করিতে হইবে;—অগ্রে অবিসম্বাদিত সত্য নির্দ্ধারণ করিলে তবেই সেই পাষাণ-ভিত্তির উপর চিন্তা বা ঐতিহাসিক দর্শনের অট্টালিকা নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। আমরা এই বুনেদ গাঁথিয়া যাইব। তাহা যদি খাঁটি হয়, তবে আমাদের পরবর্ত্তী যুগে সৌভাগ্যবান্ ইতিহাস লেখকগণ ইতিহাসের দার্শনিকতার সুরম্য-হর্ম্ম্য নির্ম্মিত করিতে পারিবেন। অবিশ্বাস্য প্রবাদমূলক সংবাদও বিসম্বাদী ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া অপরিপক্ক দার্শনিক গবেষণা আরম্ভ করিলে, কেবল কতকগুলি জঞ্জালপূর্ণ মত এবং অতীতের কাল্পনিক ইতিহাসের ভিত্তি নির্ম্মিত হইবে। ইহার সাক্ষীস্বরূপ হুইলার সাহেবের ভারতেতিহাসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দোষে উহা বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ব্যর্থফল হইয়াছে এবং বিস্মৃতির গর্ভে কোন্ দিন লীন হইয়া গিয়াছে। আর কেহ যেন এইরূপ পণ্ডশ্রম না করেন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

ভারতী—আষাঢ়, ১৩২৩।

চলতি ভাষা—

এই সংখ্যার 'ভারতী' কাগজখানি পড়িবার সময় রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলাই কেবল মনে হইয়াছে যে, "অন্যদেশ অপেক্ষা আমাদের এদেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা 'প্রথম শ্রেণীর' ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়।"

কথা কয়টা মিথ্যা নহে।—বাস্তবিক বেদনা-বোধ আমাদের থাকিলে, লেখা জিনিষটাকে সুগভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিলে, এই সংখ্যায় প্রকাশিত "চলতি ভাষা," "ভালো মন্দ" ও "স্মৃতি" প্রভৃতি রচনাগুলি কোন মাসিকের মারফতে কখনও পাঠক সমীপে আসিত কি না সন্দেহ। তাহার উপর, গদ্যের ও পদ্যের অত্যাচার-উপদ্রব যাহা আছে, সে কথা ভাবিতে গেলে এদেশের পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্য-শক্তিকে নমস্কার না করিয়া থাকা যায় না!

ভুল লিখিলেও তাহা একপ্রকার সহ্য করা যায়, অসার ও যুক্তিহীন হইলেও সবল কথা শুনা যায়, কিন্তু মার পবিত্র মন্দিরে মিথ্যার পক্ষ লইয়া মিথ্যা ওকালতী, কেবল কথার ভেল্কী, ন্যাকামীর রঙ্গ-ভঙ্গ কিছুতেই সহ্য হয় না। "চলতি ভাষা" ও "ভালো মন্দ" প্রবন্ধ দুইটি শুধু যুক্তিহীন নহে—অসত্য উক্তিতে পূর্ণ। "চলতি ভাষা" প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক লিখিয়াছেন,—"বাংলা সাহিত্য চলে, এতে অনেকের আপত্তি দেখা যাচ্চে। অর্থাৎ তাঁরা বলচেন, সাহিত্যের বাহন ভাষা যেন চলতি না হয়।"

ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ মন-গড়া কথা।—যে কথা কেহ বলে না, সেই কথা অনেকে বলিতেছে বলিয়া লেখক একটা নূতন অসত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা বঙ্কিমের আমল হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে জীবন্ত ভাষা বলিয়া জানিয়া আসিতেছে, ইহার গতি ও বেগ লক্ষ্য করিতেছে, তাহারা আজ 'বাংলা সাহিত্য চলে' শুনিয়া কেন তাহাতে আপত্তি করিতে যাইবে? বঙ্কিম বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার লিখিত-ভাষা কথিত ভাষার নিকট দিয়া যাইতে পারিলেই তাহার জীবনী শক্তি বাড়িবে। তারপর অক্ষয়চন্দ্রও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—"ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত-ভাষায় কথিত-ভাষায় অধিকতর সাদৃশ্য রাখিতে হইবে।" তারপর সেদিনও বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির আসনে বসিয়া শাস্ত্রী হরপ্রসাদও বলিয়াছেন,—"আমি বলি, যাহা চলতি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চলতি নয়, তাহাকে আনিও না।"—অতএব, ভাষার চলা শুনিয়া আজ যে কেহ শিহরিয়া উঠিবে, এমন মনে করি না!—বাঙ্গালীও আজ এ কথা নূতন শুনিতেছে না!

শুধু মনীষীর মুখে শুনা কথাও নহে। ভাষা মন্দাকিনী আমাদের সম্মুখ দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে। সাধারণভাবে, যাহার দৃষ্টি শক্তি আছে, তিনিই দেখিতেছেন যে, কখনও ইহাতে বন্যা আসিতেছে, কখনও চল নামিতেছে, কখনও বা পাশ কাটিয়া, আঁকিয়া বাঁকিয়া বক্রগতিতে ইহা বহিয়া চলিয়াছে।—জীবন্ত ভাষা মাত্রেরই এইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে আমাদের ভাষার যে সঙ্কীর্ণ ধারাটি ছিল, তাহা মৃত্যুঞ্জয় ও মিশনরিগণের যত্নে ও চেষ্টায় একটু প্রশস্ত হইয়া উঠে। পরে রাজা রামমোহনের সময় শুধু উহা প্রশস্ত নহে—একটি

গভীরও হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যাসাগরাদি আসিয়া উহার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাগর তেজ-ধারিণী ভাষায় আপন প্রবল প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া উহার স্রোতঃ পথকে আরও গভীর আরও প্রশস্ত করিয়া তুলেন। ভাষা এইরূপে পুরুষে পুরুষে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, তোমরা যে বলিতেছ 'বাঙ্গালা সাহিত্য চলে, এতে অনেকের আপত্তি' সে কথা তোমাদের ঠিক ভুল নহে—উহা তোমাদের মনগড়া কথা—মিথ্যা কথা!—জানিয়া-শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া ভুল বলাকে ঠিক ভুল বলা যায় না! উহা সত্য গোপনের চেষ্টা মাত্র।

বাস্তবিক, ভাবের ঘর চুরি এইখানেই। আসল কথা হইতেছে, আমরা যাহাকে 'চলতি' বলি, এই লেখকেরা তাহাকে 'চল্তি' বলিতে চাহেন না। তাঁহারা কলিকাতার 'খেঁদুর' 'গেদুমের' সঙ্গে 'পুষ্পিত' 'পল্লবিত' শব্দ মিশাইয়া, একটা বিটকেল ভাষার সৃষ্টি করিয়া, তাহাকেই 'চল্তি' নামে চালাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। অথচ, যেটা বাস্তবিক চলিতেছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার গতিকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন,—"আমাদের সমাজের মধ্যে যেমন, ভাষার মধ্যেও তেমনি একটা অচলতা আছে।" কিন্তু একথাও লেখকের সত্য নহে। আমাদের ভাষা যেমন নিজের মূল প্রকৃতি বজায় রাখিয়া একটানা গন্তব্য পথে চলিয়াছে, আমাদের সমাজও তেমনি নিজের বাঁধা ঠাট্‌কে ঠিক রাখিয়া আস্তে আস্তে সম্মুখের দিকে পা ফেলিতেছে। এই বাঁধা ঠাটকে বাঁচাইয়া রাখার নাম স্থিতি।—উহা অচলতা নহে। উহা জীবনেরই ধর্ম্ম। যেখানে উন্নতির কামনা, সেখানেই উহার অস্তিত্ব। ঐটুকু হারাইলেই জাতির সর্ব্বস্ব লোপ পায়। আর, আমাদের ভাষাপ্রবাহের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার গমন-ভঙ্গী যেমনই হউক, সে সম্মুখের পথেই নিয়ত প্রবহমান।—উত্তরবাহিনী কখনও দক্ষিণবাহিনী হয় নাই। তাহা হইতেও পারে না। যে নদী হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িতেছে, সে কি আর হিমালয়ে ফিরিয়া যাইতে পারে?

কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্যই 'চল্তি ভাষা'র লেখক ওকালতী করিয়াছেন। শুনিতে পাই, নেপোলিয়ান নাকি আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'আমাদের সম্মুখে আল্পস্ থাকিবে না।' এই লেখকেরা কিন্তু নেপোলিয়ানের চেয়ে বড়। ইঁহারা উত্তরবাহিনীকে দক্ষিণবাহিনী করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ভাষার যে ঠাট ও কায়দা প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া একভাবে আছে, তাহাকে ইঁহারা 'চলা'র নাম করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের ভাষা—যাহা কথোপকথনের ভাষাও নহে, লিখিবার ভাষাও নহে,—সেই কিম্ভূত-কিমাকার ভাষা চলা ত দূরের কথা, যে ভাষা সত্যসত্যই কথোপকথনের ভাষা, তাহাও এদেশে চালাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও চলে নাই। হুতোমের ও টেকচাঁদের লেখার সুখ্যাতি করিলেও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' লিখিয়া-ছিলেন, "সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত কোন পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে কলিকাতার ভাষা অপেক্ষা দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ভাষার ব্যবহার করাই বিধেয় বোধে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহারই অবলম্বন করেন। ইহার অন্যথায় বাচনিক ভাষায় পুস্তক লিখিলে ত্বরায় এমত এক স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা, যাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র অবোধ্য হইবে। অপর, বঙ্গদেশের লোকেরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আপন পল্লীর বাচনিক ভাষায় পুস্তক রচিত করিলে বঙ্গদেশে যত জেলা আছে তত সংখ্যক নূতন ভাষা হইবে।" তারপর বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়াই বলেন—"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন! কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।" "টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমিভাষার এক পৈঠা উপর। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহার কেহই আদর্শভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে

উপস্থিত হওয়া যায়।” তারপর সেদিন অক্ষয়চন্দ্রও লিখিয়াছেন,—“আমাদের এতদঞ্চলের কোনও কোনও খ্যাতনামা লেখক নাকি ‘করচি’ ‘যাচ্চি’ শব্দের এরূপ আকার চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি সর্বান্তঃকরণে এই চেষ্টার প্রতিবাদ করি। Do not যোগ হইয়া অর্থাৎ শীঘ্র উচ্চারিত হইয়া Don't এই আকৃতি ধারণ করে; কথা কহিবার সময় অনেক সাহেব সুবাই Don't বলিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি কোনও গম্ভীর প্রবন্ধে কেহ Don't এইরূপ পদ ব্যবহার করিবেন? তাহা কখনই করিবেন না।—এখানে ভাষার পার্থক্যের কথা হইতেছে না, বরঞ্চ ধরিতে গেলে বানানের পার্থক্যের কথাই হইতেছে। ক্বচিৎ কখনও প্রাদেশিক সংক্ষেপ বিধান গ্রাহ্য হয় বটে, তাই বলিয়া কি লিখিত ভাষার উপর জবরদস্তি করিয়া কথিত ভাষার সংক্ষেপ বিধান চালাইতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না।”—আসল কথা দেখা যাইতেছে, ‘ভাষা চলে,’ ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু প্রাদেশিকতাকে বর্জ্জন সকলেই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। যিনি হুতোমী ভাষা লিখিয়াছিলেন, তিনিই আবার ‘মহাভারত’ রচনাকালে লিখিত-ভাষার শরণাপন্ন হন। যিনি টেকচাঁদী ভাষার সৃষ্টি করেন, তিনিই আবার তাঁহার রামারঞ্জিকা,’ ‘এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা’ প্রভৃতি রচনায় যথাসম্ভব প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঔদ্ধত্য জিনিসটা এমনই আত্মক যে, সে মনীষী-পরম্পরাগত বিচার বিশ্লেষণের নিকট—প্রত্যক্ষের নিকট কিছুতেই মস্তক অবনত করিতে চাহে না।

ঔদ্ধত্য বা পাগলামীকে অনেকে অনেক সময় ‘প্রতিভা’ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। এই লেখকও তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—“সাহিত্য কার ইঙ্গিতে চলে? এক-একজন প্রতিভাবান্ এসে সারথি হন, তাঁরাই সাহিত্যকে গতি দান করেন। আজকের দিনে কল্‌কাতার রাজ-পথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাঙ্গলাদেশ সেইদিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে।”

‘সমস্ত বাঙ্গালা দেশ অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে’ কথাটা শুধু মিথ্যা নহে, বিলক্ষণ হাস্যজনকও বটে। বাঙ্গালা দেশ যে ‘ভারতী’ ও ‘সবুজ পত্রের’ অফিসের চেয়ে অনেক বড় এ কথা লেখককে কে বুঝাইয়া দিবে? আর কি যে দুঃসময় পড়িয়াছে, যিনি এ দেশে কলম ধরেন, তিনিই প্রতিভাশালী! কিন্তু কোন বিষয়ে কিছু শক্তি থাকিলেই তাহাকে ‘প্রতিভা’ বলে না। খেয়ালকে প্রতিভা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেও ঐ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। প্রতিভা প্রয়োজন বুঝিয়া পুরাতনের সংস্কার-সাধন করে—নূতন আকার দেয়। আর খেয়াল জিনিষটা আগু-পিছু না তাকাইয়া, যা’ তা’ করিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকারের সৃষ্টি করে। বঙ্কিম বাবু প্রতিভাশালী ছিলেন। তাই তিনি প্রয়োজন বুঝিয়া, ভাষা-প্রবাহের গতি বুঝিয়া তাহার সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। আর এখনকার অসার সংস্কারকেরা ‘একটা নতন কিছু করিতে হইবে’ মনে করিয়া শুধু খেয়ালের বশেই ভাষার উপর বল প্রয়োগ করিতেছেন।

লেখক এই প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—“চল্‌তি ভাষা ব্যাকরণের কোনো ধার ধারে না। ব্যাকরণ না পড়েও তুমি চল্‌তি ভাষা শিখ্‌তে পার। কিন্তু যে ভাষা চলচে না তার জন্যে তোমার ব্যাকরণ চাই।”—কথাটা আন্‌কোরা নূতন বটে, তবে অত্যন্ত উদ্ভট রকমের! ইংরাজী ভাষার মত জীবন্ত চলন্ত ভাষা অতি অল্পই আছে; কিন্তু সে ভাষা শিখিবার জন্যও রীতিমত ব্যাকরণ পড়িতে হয়। ঠিক ভাবে ভাষা শিখাইবার জন্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি, এবং এই কথাটা প্রত্যেক ভাষার প্রায় প্রত্যেক ব্যাকরণের প্রথমেই লেখা আছে।

যাউক, এমন বাজে কথা এই প্রবন্ধে আরও অনেক আছে—সে সমস্ত উক্তির উত্তর দিয়া রচনাকে আর ভারাক্রান্ত করিব না, ইহার মূল কথা সম্বন্ধে যাহা বলিবার, তাহাই বলিলাম। ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি অনুসারে ভাষা যে গড়া যায় না, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

ভালো-মন্দ—

এ রচনাটি সম্ভবতঃ সম্পাদকীয়; কারণ, ইহার নীচে কাহারও নাম নাই। ‘রবিশ্’ হিসাবে এ লেখাটিও ‘চল্‌তি ভাষা’র সহিত একাসনে বসিতে পারে।—উভয়েরই যুক্তি-তর্কের দৌড় অনেকটা একই ধরণের!

গত বৈশাখের ‘ভারতী’তে রবীন্দ্রনাথ “এখন ও তখন” নাম দিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখেন, এই “ভালো মন্দ”

তাহারই এক প্রকাণ্ড সার্টিফিকেট। আমরা জ্যৈষ্ঠের 'নারায়ণে' রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণে পুনরুক্তি বাঁচাইয়া উহার সম্বন্ধে আরও গুটিকয়েক কথা বলিব। কারণ, "ভালো-মন্দে"র বাক্-চাতুরীতে কেহ কেহ হয়ত প্রবঞ্চিত হইতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছেন,—"যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।" কারণ, "বাংলা সাহিত্যের বয়স এখন কাঁচা।" কিন্তু কথাটা কি সত্য? প্রাচীন যুগের বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিই, আধুনিক যুগে যে সাহিত্যের কাব্য-কানন মধুসূদন, হেম, নবীন, বিহারী, ঈশান, রবীন্দ্র ও অক্ষয় প্রভৃতির সঙ্গীত-লহরীতে মুখরিত, যে সাহিত্যের উপন্যাসজগৎ বঙ্কিম, তারক, শিবনাথ, রমেশ, সঞ্জীব ও শ্রীশ প্রভৃতির আবির্ভাবে আলোকিত, যে সাহিত্যের নাট্য-রাজ্য দীনবন্ধু, গিরিশ, দ্বিজেন, অমৃত, ও ক্ষীরোদ প্রভৃতির প্রভায় উজ্জ্বলীকৃত, সে সাহিত্যের বয়স কি এতই কাঁচা যে, তাহা শাসনের উপযুক্ত হয় নাই? বঙ্কিমের উপন্যাস যাহারা পাঠ করিয়াছে, তাহারা কি বিনা আপত্তিতে 'প্রতিভাসুন্দরী'র তিক্তরস পান করিতে পারে? যাহারা 'বিল্বমঙ্গল' 'ভ্রান্তি' প্রভৃতি নাটক পড়িয়াছে, তাহারা কি বর্ত্তমান 'ভারতী' সম্পাদকের 'রুমেলা' পড়িয়া খুসী হইতে পারে? যাহারা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের রসাস্বাদন করিয়াছে, তাহারা কি মুখ বুজিয়া 'ভারতী'র এই সংখ্যায় প্রকাশিত "কালো-ছায়া" গল্পের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে? যাহারা ভূদেব-বঙ্কিমের সন্দর্ভ পাঠে অভ্যস্ত, তাহারা কি আজ এই 'চল্তি ভাষা' 'ভালো'-মন্দ' প্রভৃতি 'রবিশ' নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতে পারে?—তাহা পারে না! পারে না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর কঠোর সমালোচনার অভাব-বোধে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্য-ক্ষেত্র জঙ্গলে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মধ্যে সংযমের, সৌন্দর্য্যের, শিষ্টতার এবং উচ্চ আদর্শের আবশ্যক কেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন না, স্বাভাবিক বিচার শক্তির সহিত নিরপেক্ষভাবে দণ্ডপুরস্কার বিধান করিবার কেহই নাই, পত্রে এবং সংবাদপত্রে উৎসাহ অত্যন্ত মুক্তহস্তে বিতরিত হইয়া থাকে এবং রাজকোষের শূন্য অবস্থায় কাগজের নোট যেরূপ অজস্র অথচ অনাদৃত হইয়া উঠে, এই সকল প্রাচুর্য্য বিশিষ্ট সমালোচনাও সাধারণের নিকট সেইরূপ প্রায় বিনামূল্যে বিক্রীত হয়।" তারপর 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্র বাবু বীরত্ব সহকারে বলেন,—"আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ, এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য, আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়।"—এই সব কথার উত্তরে 'ভারতী'র লেখক—যিনি রবীন্দ্রবাবুর বাক্যকে বেদ-বাক্য বলিয়া মনে করেন,—তিনি কি বলিতে চাহেন, তাহাই একবার শুনিতে ইচ্ছা করে? তিনি রবীন্দ্রনাথের দেখা-দেখি বাঙ্গালা-সাহিত্যকে 'শিশু' 'শিশু' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, অথচ এই রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে বঙ্গসাহিত্যের বন্ধ্যা দশা ঘুচিয়াছে।—'ভারতী'র লেখক বুঝাইয়া দিতে পারেন কি, 'শিশু'র বন্ধ্যা-দশা কেমন করিয়া ঘুচে?

শুধু ইহাই নহে। যে অভিমত, যে উদ্দেশ্য লইয়া 'ভারতী' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেও সে আজ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ১২৮৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভারতী'র জন্মদাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"দুঃখের বিষয় এই যে, ইদানিন্তন গ্রন্থ সমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরলভাবে সমালোচন করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্র মাত্রই নব উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী-বিপ্লবপ্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজী সাহিত্যে ড্রাইডেন ও পোপ কর্ত্তৃক নবপ্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্ড ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল; তবুও ঐ সকল অশুভ অপরিত্যাজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য নবজীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া অন্যায় নহে।"—এই সব দেখিয়া

শুনিয়া মনে হইতেছে, বৃদ্ধবয়সে 'ভারতী'র বুঝি বা 'ভীমরতি' হইল!

আরও হাসির কথা এই যে, যে সংখ্যার 'ভারতী' কাগজখানি সমালোচনায় অপ্রিয় সত্য দূর করিবার জন্য এত উপদেশ দিয়াছে, এত বকিয়াছে, সেই সংখ্যারই 'ভারতী'র সমালোচনার পৃষ্ঠায় দেখিলাম 'রিক্তা' নামে একখানি কবিতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"এত ছাপ আঁটা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায় বা ছন্দে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। পঙ্গু ছন্দ, আড়ষ্ট ভাব ও নির্জ্জীব ভাষাই চোখে পড়িল। সেই মামুলি ভালবাসা আর 'প্রভু আমি অধম'—ইহারই ধুয়া চলিতেছে।"—জিজ্ঞাসা করি, এই দুএকয়টি কি 'প্রিয় কথা'র পুষ্পাঞ্জলি? 'ভারতী'র উপদেশের মর্ম্ম বোধ করি এই যে, 'আমি যাহা বলি, তাহাই কর। আমি যাহা করি, তাহা দেখিও না।' কিন্তু এ আব্দার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমার্জ্জনীয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাটিই অমূল্য—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

স্মৃতি—

"স্মৃতি" লিখিতেছেন কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন। 'স্মৃতি কথা' লেখাটা এদেশে সংক্রামক হইয়া উঠিল।—রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' বাহির হইবার পর হইতে ছোট-বড় মাঝারি কত রং-বিরংএর স্মৃতি-কথা যে দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এই স্মৃতি কথার উপদ্রবে কত মৃত মনীষী বা কবির সম্বন্ধে কত মিথ্যা কথা যে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বলা যায় না। মৃত বড়লোকের মুখ দিয়া নিজের সুখ্যাতি প্রকাশ করিবার এমন উপায়, এমন সুবিধা বুঝি দ্বিতীয় নাই।

'স্মৃতি' লেখাটা যে নিন্দনীয়, এমন বলিতেছি কেহ মনে করিবেন না। মিষ্ট করিয়া সত্য কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিলে, উহা খুব ভাল জিনিষই হয়। কিন্তু মিষ্ট করিয়া লেখাটাই বড় কঠিন কাজ। পাঠককে কতটুকু জানাইতে হয়, এবং কতটুকু জানাইতে নাই, এ পরিমাণ-সামঞ্জস্য-জ্ঞান অনেক লেখকেরই দেখিতে পাই না। ফলে, অধিকাংশ স্মৃতি-কথাই অপাঠ্য হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, দেবেনবাবুর 'স্মৃতি'টিও এবার তাহাই হইয়াছে।

সেন-মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত "স্মৃতি" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"অশেষগুণসম্পন্না শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গুণ-কীর্ত্তনে আমার নগণ্য রচনাও মহিমান্বিত হইয়াছে।" এইটুকু বলিয়া তিনি এবারেও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার রচনাকে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না; তবে ইহা পাঠকালে পাঠকেরা যে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব ছাড়িয়াছেন, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। কারন বাঙ্গালার পাঠকমাত্রেই ত কবি দেবেন সেন নহেন!

কবি বলিতেছেন,—"স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুমোদিত স্ত্রী স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতার নাম-গন্ধ নাই। এই দেবী কর্ম্মযোগিনী। গীতোক্ত কর্ম্মযোগ যাহাতে কামনার লেশমাত্র নাই—তাহার আদর্শ।"—এই সব পড়িয়া স্বয়ং স্বর্ণকুমারী দেবী নিশ্চয়ই লজ্জিতা হইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস। কারণ, আমরা তাঁহাকে বুদ্ধিমতী বলিয়াই জানি।

রচনাটির আগাগোড়াই এইরূপ। ইহার শেষাংশে কবি লিখিতেছেন,—"একটা অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপার দেখিয়া আমি যার-পরনাই বিস্মিত হইয়াছিলাম। 'সরোজ পাকা পেপে খেতে ইচ্ছা করচে।' মহাশয় বলিব কি? মুখের কথা না খসিতে খসিতে এক থাল সুরসাল পেপে আসিয়া উপস্থিত। 'সরোজ, এক পিয়ালা গরম চা খেতে ইচ্ছা করচে।' আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! চক্ষের নিমেষে একটা প্লেটে মাখন মিছরি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের মত উষ্ণ এক পেয়ালা চা আসিয়া হাজির!"—কিন্তু এ খবরটুকু না জানা থাকিলেও বাঙ্গালার পাঠক-জাতি মারা যাইত, এমন বোধ হয় না। বৎসরের কোন্ তারিখে, কোন্ ক্ষণে, কোন্ দেবেন্দ্রবাবুর পাকা পেপে খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, একথা শুনিবার জন্য বাঙ্গালার পাঠককুল এখনও ব্যাকুল হয় নাই। শুনিতে পাই, সহানুভূতি-গুণ না থাকিলে কবি হওয়া যায় না। দেবেনবাবু কেমন করিয়া কবি হইলেন, তাহা ভাবিবার কথা! কারণ, পাঠক-জাতির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখিলাম না!

সিন্ধু গুপ্ত—

ইহা মৌলিক রচনা নহে,—একটি প্রতিবাদ। প্রবন্ধ

না পড়িয়া, না বুঝিয়াও কেমন করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হয়, এ রচনা তাহার এক উজ্জ্বল উদাহরণ!

গত জ্যৈষ্ঠের 'নারায়ণ' কাগজে "নিধুগুপ্ত" প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত হইয়াছিল,—"এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও তাঁহার (নিধুগুপ্তের) ও অন্যান্য কবি-ওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।"—এবং এই কথার প্রমাণ স্বরূপ সেই সঙ্গে নিধুবাবুর ও রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গীতের কয়েকটি এক ধরণের লাইনও উদ্ধৃত করা হইয়াছিল।—ইহাই 'ভারতীর' ক্রোধের কারণ। এইটুকু পড়িয়াই 'ভারতী'র লেখক মহা চটিয়া লিখিয়াছেন,—"এ অত্যন্ত ভুয়ো কথা।...প্রতিভাকে অস্বীকার করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু প্রতিভার আলো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না।—লেখক যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা চলে না।"

কিন্তু 'নারায়ণে'র "নিধুগুপ্ত" প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা' হইয়াছে, তাঁহার 'প্রতিভাকে অস্বীকার করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা' হইয়াছে, এসব সত্য 'ভারতী'র লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? প্রতিভাকে অস্বীকার করিলে কি রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্ব্বে "শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা" কথাটা বসাইতে পারা যাইত? এ সামান্য কথাটাও লেখকের মাথায় ঢুকিল না?—ক্রোধে কি এতটাই আত্মহারা হইতে হয়? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কোনও লেখকের উপর অন্য কোন লেখকের প্রভাব পড়িয়াছে বলিলে কি পরবর্ত্তী লেখকের প্রতিভাকে অস্বীকার করা হয়? পৃথিবীতে ঋণী নহেন কে? 'পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকগণকে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট কিছু না কিছু ঋণী হইতেই হয়। ইহা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ত সামান্য!—অমন যে প্রতিভার অবতার সেক্সপীয়র, তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, তাঁহার রচিত 'Henry VI, নামক তিনখণ্ড গ্রন্থের সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৪৩ লাইনের মধ্যে ১৭৭১ লাইন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের লেখা হইতে অক্ষরে অক্ষরে গৃহীত। তা' ছাড়া, ২৩৭৩ লাইন অপর লেখকের লেখার ভাবা লম্বনে লিখিত। কিন্তু ইহাতে কি সেক্সপীয়র ছোট হইয়া গিয়াছেন? তাঁহার উপর অপরের প্রভাব বুঝাইবার জন্যই ঐ সকল কথার আলোচনা হইয়াছে,—তাহার প্রতিভাকে অস্বীকার করিবার জন্য নহে। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। রবীন্দ্রনাথের নাম দেখিলেই যাহারা দিশেহারা হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে কিছু বুঝানো অসম্ভব।

সলিল-লীলা

(Goethe হইতে)

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল]

উচ্ছ্বাস ভরে বরষার নদী
বাঁধন টুটি',
কল্লোল তুলি সম্মুখ পানে
চলেছে ছুটি।
পান্থ একেলা বসি' সেথা তীরে
শীকর-পরশ-স্নিগ্ধ সমীরে,
সলিলের লীলা হেরিছে মেলিয়া
নয়ন দুটি।'
চঞ্চল জল তরঙ্গ হতে
দিব্য বেশে
উঠিল সহসা রমণী মূরতি
সিক্তকেশে।
মধুর কণ্ঠে কহে—"নদী কূলে
হে মানব, আছ কোন্ মোহে ভুলে?
মরণের বানে নিমেষে কোথায়
যাইবে ভেসে!
দেখ চাহি চির- শান্তি-নিলয়
সলিল তল,
উল্লাসে সদা করে বিচরণ
মীনের দল।
হেথা নেমে এস—রহিবে না আর
সন্তাপ যত কঠিন ধরার;
মিলিবে শান্তি—মিলিবে স্বস্তি—
নূতন বল।
সিন্ধুর জলে বিশ্রাম লভে
রবি ও শশী,
নাচে তারারাজি— চপল ঊর্ম্মি—
শিখরে খসি'।
আকাশের স্থির নীলিমা উদার
শিশির খচিত মাধুরী উষার,
হেরিবে, মানব, উচ্ছল নীল
সলিলে পশি'।"
উচ্ছ্বাস ভরে ছুটে বারি রাশি
সুদূর পানে
মুগ্ধ পথিক — সে মায়া-নারীর
মধুর গানে।
চির জনমের প্রিয়ার আহ্বান
আকুল করিল যেন তার প্রাণ;
নমি' জলতলে কোথা গেল সে যে
কেহ না জানে।

বীণার তান

[অধ্যাপক শ্রীরসিকলাল রায়]

সংস্কৃত

শারদা, জানুয়ারী ১৯১৬—

অনুরণুর্মাত্মা বিভুর্বা, লেখক কন্হৈয়ালাল, ব্যাকরণ-তর্ক-বেদতীর্থ,—

জীবাত্মা বিভু কি অণু, এই বিষয় লইয়া আবহমানকাল পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা কোনই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মাধ্বাদি চারি সাম্প্রদায়িকেরা অণুবাদী। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও অণুত্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন জীবতত্ত্বনিরূপণ নামক গ্রন্থে অণুত্ববাদই সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রের বোধায়নবৃত্তিতে শ্রীমৎ বোধায়নাচার্য্য জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও জীবাত্মার অণুত্ববাদই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকেরা তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রে জীবের বিভুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিত্যবস্তুর গতি দ্বিবিধা—বিভুত্ব বা অণুত্ব। উভয়পক্ষই অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়া আপন-আপন মত সমর্থন করিয়াছেন। লোকহিতরত শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিদিগের প্রদর্শিত পক্ষদ্বয়ের যে-কোনও মার্গ অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু বেদ যাহা প্রতিপন্ন করেন নাই, এবং ঋষিরাও যাহা অনুমোদন করেন নাই, এমন নূতন পথে চলিতে গেলে, আমরা দোষভাজন হইব। অতএব আমরা বিচারপূর্ব্বক, জীবাত্মার অণুত্ব অথবা বিভুত্ব—ইহার যে-কোনও মত গ্রহণ করিলে, তাহা গর্হনীয় বা দোষজনক হইবে না।

হিন্দী

১। চিত্রময় জগৎ, এপ্রিল ১৯১৬,—

ডাঃ হরীসিংজি গৌর, এম-এ, এলএল-ডি —

ডাঃ হরীসিংজি কেবল ভারতবর্ষে নহে, বিদেশে দেশ-দেশান্তরেও খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি সুবক্তা, সাহিত্যসেবী, বিদ্বান, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বদেশভক্ত এবং একজন সাহসী সমাজসংস্কারক। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইনি মধ্যপ্রদেশে সাগরজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রারম্ভিক শিক্ষা জব্বলপুরে হইয়াছিল। [illegible] হওয়াতে ইঁহার বিদ্যাধ্যয়নে কিছু বাধা পড়ে। [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স এবং এফ-এ, পরীক্ষায় [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন— বি-এ, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই ইনি বিলাত গমন করেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কেম্ব্রিজে নীতি, দর্শন ও [illegible] তিনি প্রশংসার সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজের ইউনিয়ন সোসাইটিতে ইনি সুবক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন,
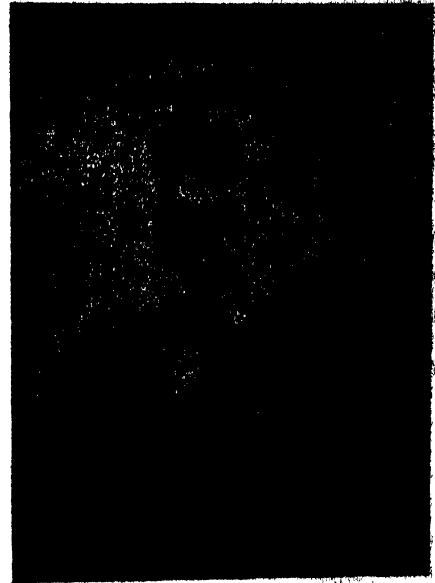
ডাক্তার হরীসিংজি গৌর এম,এ,এল,এল, ডি

এবং কয়েকখানি কাব্য-পুস্তক রচনা করিয়া বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইনি 'রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচারের' ফেলো এবং ন্যাশনাল লিবরাল ক্লাবের মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস কমিশনে নিযুক্ত হইয়া ভাণ্ডারায় প্রেরিত হন। কিন্তু তিনমাস কর্ম্ম করিয়াই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভাণ্ডারায় স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি রায়পুরে ব্যারিষ্টারী করিতে যান। তথায় শীঘ্রই ইঁহার খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। আইন সম্বন্ধে ইঁহার রচিত দুইখানি পুস্তক প্রসিদ্ধ। যথা—Transfer in British India এবং Penal Law of British India. ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক। সমাজসংস্কার বিষয়ে ইনি যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সচরাচর বিরল।

২। সরস্বতী, এপ্রিল ১৯১৬,—

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী—

শ্রীধরস্বামী কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। টীকা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, উহা শঙ্করাচার্য্যের পরে লিখিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য দুইজন ছিলেন—আদি শঙ্করাচার্য্য ও শারীরকভাষ্যপ্রণেতা শঙ্করাচার্য্য। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতানুসারে শঙ্করাচার্য্যের সময় ৩০০ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। স্বর্গীয় আপ্তে তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে ৭৮৮-৮২০ খৃষ্টাব্দ শঙ্করাচার্য্যের সময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গীয় তৈলঙ্গ ও ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে শঙ্করাচার্য্য খৃঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য মত স্বীকার করিলেও, শ্রীধরস্বামী অষ্টম শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে; তিনি শ্রীধর স্বামীর টীকা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীধরস্বামী ৮০০ হইতে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবেও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার টীকার যেরূপ প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় শ্রীধরস্বামী নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পাটলিপুত্রে ইরাণী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন—

কুম্‌হার, নালন্দা, প্রভৃতি স্থানে ডাঃ স্পুনারের তত্ত্বাবধানে খননকার্য্য হইতেছে। মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত ইট পাথর কাঠের দুর্গ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ডাঃ স্পুনার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলিপুত্রে পূর্ব্বে ইরাণীদিগের আধিপত্য ছিল, পাটলিপুত্রের প্রাচীন প্রাসাদ ইরাণী (পার্শী) রাজাদিগের রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল; এমন কি মৌর্য্যশব্দও ইরাণী ভাষার শব্দবিশেষের অপভ্রংশ মাত্র ইত্যাদি। আজ পর্য্যন্ত একাধিক পণ্ডিতগণ ডাঃ স্পুনারের উক্তি এবং মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল খণ্ডন কিছু দুর্ব্বলভাবেই হইয়াছিল। অল্পদিন হইল উহার এক সবল খণ্ডন প্রকাশিত হইয়াছে—এতদূর সবল যে, উহাতে ডাঃ স্পুনারের মত, প্রমাণ ও দলীল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডাঃ স্পুনারের প্রবন্ধ লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খণ্ডনও ঐ পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। খণ্ডনকার সুপণ্ডিত ইংরাজ মিঃ কীথ। ডাঃ স্পুনার ময়দানবকে পার্শী অহুরমজ্‌দার সহিত এক করিয়াছিলেন, মৌর্য্যশব্দ ইরাণী মৌর্ব্বশব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, চাণক্য পণ্ডিত পার্শী মৌজি বা মৈগী (মাগাবী) জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন এবং মগধের সহিত ইরাণের মগ অথবা মঘার সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল মত, উক্তি ও যুক্তি কীথ সাহেব নির্দ্দয়তার সহিত নির্ম্মূল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে ভারত অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইরাণের নিকট ভারতকে ঋণী সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে, সবিশেষ অনুসন্ধান-সহকারে আপনার উক্তি সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য।

সার চিনুভাই মাধবলাল সি-আই-ই,—

আহমাবাদে সর্ব্বপ্রথম সূতার ও কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীমান রনছোরলাল ছোটেলাল, সি-আই-ই, পরে তাঁহার অনুকরণে অন্য ধনিগণও কল স্থাপন করেন। এখন আহমদাবাদকে হিন্দুস্থানের লাঙ্কাশায়ার বলিলেও চলে। সার চিনুভাই মাধবলাল রনছোরলালের পৌত্র ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার স্বর্গবাস হইয়াছে। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন
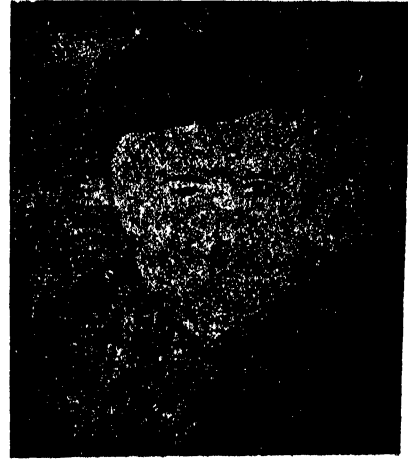
সর চিনুভাই মাধবলাল সি, আই, ই

পাশ করেন। তৎপরে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া পিতামহের Spinning and weaving millএ ব্যবসায় শিক্ষা করেন। পিতামহের এবং পিতার মৃত্যুর পর ব্যবসায়ের সমস্ত ভার ইঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। এবং ইনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আহমদাবাদের Mill-Owners Associationএর সভাপতি ছিলেন এবং কিছুদিন আহমদাবাদ মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০৭ সনে সরকার বাহাদুর ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৯ সনে ইনি 'সার' উপাধি পাইয়াছিলেন। উদারতা এবং সৌজন্যের গুণে ইনি এতদূর লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, ইঁহার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহমদাবাদের সমস্ত দোকান, ইস্কুল এবং কল বন্ধ হইয়াছিল।

৩। শ্রীবৈষ্ণব, ১ম বর্ষ, প্রথমাঙ্ক। সম্পাদক—অধিকারী শ্রীজগন্নাথদাস, ভরতপুর।

শ্রীবৈষ্ণব-সম্মেলন—

কলিকাতায় এক বৈষ্ণব-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। ইহার প্রথমাধিবেশন গত চৈত্র শুক্ল ১৩ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন বৈষ্ণবদিগের সুপরিচিত পূজনীয় ১০০৮শ্রী শ্রীতিবাদি ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য স্বামীজি মহারাজ। সম্মেলনের

ব্যবস্থাপক ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ প্রয়াগবাসী। প্রতিনিধির সংখ্যা নামমাত্র হইয়াছিল। সহানুভূতিসূচক তার মাত্র তিনটি। প্রধান বক্তা ছিলেন বাচস্পতি পণ্ডিত দীনদয়ালুজি।

(শ্রীমৎ অনন্তাচার্য্য স্বামী মহাপ্রভু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও শরণাগতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় সুললিত বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ১১ই জুন রবিবার উক্ত কলেজে সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন প্রভৃতি বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সমবেত হইয়া স্বামীজিকে বেদান্ত বারাংনিধি উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছেন।)

মহারাষ্ট্রী

বিবিধজ্ঞানবিস্তার, আণি মহারাষ্ট্র সাহিত্য পত্রিকা মে ১৯১৬—

ভাস কী আভাস, লেখক রাও রাও রঙ্গাচার্য্য।

নিম্নলিখিত শ্লোক মহাকবি ভাস বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—

দগ্ধে মনোভববরৌ বালাকুচকুম্ভসম্ভৃতৈরমৃতৈঃ।
ত্রিবলীকৃতালবালা জাতা রোমাবলী বল্লী॥
তীক্ষ্ণং রবিস্তপতি নীচ ইবাচিরাঢ়ঃ
শৃগং রুরুস্ত্যজতি মিত্রমিবাকৃতজ্ঞঃ।
তোয়ং প্রসীদতি মুনেরিব চিত্তমন্তঃ
কামী দরিদ্র ইব শোষমুপৈতি পঙ্কঃ॥
বালা চ সা বিদিতপঞ্চশর প্রপঞ্চা
তন্বী চ সা স্তনভরোপচিতাঙ্গযষ্টিঃ।
লজ্জাং সমুদ্বহতি সা সুরতাবসানে
হা কাপি সা কিমিব কিং কথয়ামি তস্যাঃ॥
কপোলে মার্জ্জারঃ পয় ইতি করাংল্লেঢি শশিন-
স্তরুচ্ছিদ্রপ্রোতাম্বিসমিতি করী সঙ্কলয়তি।
রতান্তে তল্পস্থাহরতি বনিতাপ্যংশুকমিতি
প্রভামত্তশ্চন্দ্রো জগদিদমহো বিপ্লবয়তি॥
কঠিন হৃদয়ে মুঞ্চ ক্রোধং সুখপ্রতিঘাতকং
লিখতি দিবসং যাতং যাতং যমঃ কিল মানিনি।
বয়সি তরুণে নৈতদ্যুক্তং চলে চ সমাগমে
ভবতি কলহো যাবত্তাবদ্বরং সুভগে রতম্॥
দুঃখার্ত্তে ময়ি দুঃখিতা ভবতি যা হৃষ্টে প্রহৃষ্টা তথা
দীনে দৈন্যমুপৈতি রোষপরুষে পথ্যং বচো ভাষতে।
কালং বেত্তিকথাঃ করোতি নিপুণা মতসংস্তবে রজ্যতি
ভার্য্যা মন্ত্রিবরঃ সখা পরিজনঃ সৈকা বহুত্বং গতা॥
অস্যাললাটে রচিতা সখীভিঃ
বিভাব্যতে চন্দন পত্রলেখা।
আপাণ্ডুরক্ষাম কপোলভিত্তৌ
অনঙ্গবাণ ব্রণপট্টিকেব॥ প্রভৃতি
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী॥

এই সর্ব্বজনপরিচিত শ্লোকটিও ভাসরচিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভবে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাইয়াছি।

অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ॥

কালিদাস ভাসের পরবর্ত্তী কবি। ইহাতে কালিদাসের মৌলিকতা স্বীকার করিলে, উদ্ধৃত শ্লোক ভাস-বিরচিত হইতে পারে না। (কালিদাস যে ভাসের আভাস লইয়া কুমারের এই শ্লোকটি রচনা করেন নাই, তাহা কে বলিবে ?)

বিশ্বদূত

বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোর।

গত ৪ঠা আষাঢ় রবিবার সকালে এম্বুল্যান্স কোরের কয়েকজন সেবক মেসোপোটামিয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় নামক একটী যুবক কুত-অল-আমারাতে জেনারেল টাউনসেণ্ডের সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ দলের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেলা ১০টা ৪০ মিনিটের সময় ট্রেন আসিয়া হাবড়া ষ্টেসনে পৌঁছে। বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ৭ নং প্লাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এবং নবগঠিত সেবকদলও ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। উচ্চকণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। প্রাইভেট বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের গলায় মালা দিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অশ্বতর ও অশ্বের মাংস এবং ঘাসসিদ্ধ খাইয়া তাঁহাকে সময় সময় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। তিনি পীড়িত হইয়া পড়ায় একজন তুর্কি বন্দীর পরিবর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন। অপর আট ব্যক্তির কার্য্যকাল এক বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সকলের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা মোটর গাড়ীতে চড়িয়া "রাজমন্দিরে" (শিবনারায়ণ দাসের গলিতে, বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোরের আশ্রমে) আগমন করেন। সেখানেও তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা হইয়াছিল।—'দশক'

ভারতের খনিজ-সম্পদ

ভারতের খনিজ-সম্পদের তুলনা নাই। ভারতের প্রকৃতি রত্নপ্রসূ। মা লক্ষ্মী— কত সমৃদ্ধি লইয়া উদ্যোগীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা অন্ধ, দেখিতে পাই না। আমরা পঙ্গু; প্রান্তর, কান্তার, গিরি লঙ্ঘন করিয়া মার গুপ্ত-ভাণ্ডার খুঁজিতে পারি না। আমরা পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য; সম্মুখে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য, পুরুষকার-প্রয়োগে তাহার অধিকারী হইতে পারি না। 'যা নাই ভারতে, তা নাই জগতে' বলিলেও ত অত্যুক্তি হয় না। ভারতে কত ধাতুর আবিষ্কার হইতেছে। সম্প্রতি গয়া জেলার নওয়াদা মহকুমার নিকটে বানুথাপ পাহাড়ে 'পিচ-ব্লেণ্ডে'র আবিষ্কার হইয়াছে। এই 'পিচ-ব্লেণ্ডে' যে পরিমাণে 'র‍্যাডিয়ম' আছে, জগতের অন্য কোথাও কোনও দেশের 'পিচ-ব্লেণ্ডে' সে সমৃদ্ধি নাই। 'র‍্যাডিয়ম' বহুমূল্য ধাতু। ইহার মূল্য এত অধিক যে, ইহা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'র‍্যাডিয়ম' বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। জগতের নানাক্ষেত্রে 'র‍্যাডিয়ম' ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার চাহিদা এত অধিক, ইহার উৎপত্তি এত অল্প যে, পৃথিবীর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে সেই র‍্যাডিয়ম-গর্ভ ধাতুর আবিষ্কার হইল। "পায়োনীয়র" বলিতেছেন,—শীঘ্র এমন দিন আসিবে, যখন ভারত জগৎকে রীতিমত র‍্যাডিয়ম যোগাইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যক প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য র‍্যাডিয়মের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। ভারত কালে সেই অভাব পূর্ণ করিবে। —"পায়োনীয়রে"র লেখনীতে ফুল-চন্দন পড়ুক। কিন্তু প্রশ্ন এই, র‍্যাডিয়মের ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে?—আমরা কি এই 'পিচ-ব্লেণ্ডের" খনি আয়ত্ত করিতে পারিব? আমরা কি এই সমৃদ্ধি জাতীয় সম্পদে পরিণত করিবার অবকাশ পাইব? আমরা কি এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া উদ্যম, উৎসাহ ও পুরুষকারের প্রয়োগে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা করিব? অথবা আমরা চাহিয়া থাকিব, আর উদ্যোগী পুরুষ-সিংহেরা এই প্রাকৃতিক সম্পদের ফলভোগ করিবে? শুনিতে পাই, বিহারীরা মানুষ হইয়াছেন, স্বতন্ত্র হইয়াছেন, তাঁহারা কি 'পিচ-ব্লেণ্ডে'র খনির কাজ দেশবাসীর আয়ত্ত করিয়া সমগ্র ভারতের আদর্শ হইতে পারিবেন না?—নিজের কাজ আমরা কবে নিজে করিব? কবে 'আমরা যেমন তেমন চাকরী—'ঘি-ভাত' ভুলিয়া লক্ষ্মীলাভে জীবন পণ করিব? কবে আমরা রত্নভূমির রত্নরাজি আপনারা আহরণ করিতে শিখিব? কবে আমরা 'আপনাদের ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পাঁজি নিয়ে!'—ভুলিয়া আমাদের জন্মগত অধিকার সার্থক করিতে পারিব?—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী:—লক্ষ্মীলাভের এই মূলমন্ত্র স্মরণ করিয়া জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইব!— "বাঙ্গালী"

৺বেদানন্দ স্বামী

মেধসাশ্রমের আবিষ্কারক স্বনামখ্যাত বেদানন্দ স্বামী কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদটি যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়ায় আমাদের যে গুরুতর ত্রুটি হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জানি না কি কারণে এরূপ একটা বিস্মৃতি আমাদের ঘটিয়া গিয়াছে। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শীতলচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। বহু দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। শুনিয়াছি, কলিকাতার সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত লোক তাঁহার নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতরূপেই তিনি তীর্থদর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে চন্দ্রনাথের পাদমূলে বসিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তাহার কিছু দিন পরে তিনি মেধসাশ্রম আবিষ্কার করেন। মেধসাশ্রমে

যোগগৃহ নির্ম্মাণার্থ কাশীমবাজারের ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন চট্টগ্রাম সহরেই স্বামীজি দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্থানীয় সহৃদয় সদাগর ও জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও বিশেষ আনুকূল্যে মেধসাশ্রমে লইয়া গিয়াই স্বামীজিকে সমাধিস্থ করা হয়। নানাস্থানে স্বামীজির শিষ্য ও ভক্তেরা আছেন। তাঁহার সমাধিগ্রহণের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা অর্থ প্রেরণ করেন। যথাসময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে তাঁহার ভাণ্ডারা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। মেধসাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর অধিকাংশ সময় স্বামীজি বেনারসে থাকিতেন। এদিকে আশ্রমের ভার শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সর্ব্ববিদ্যা মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিদ্যা মহাশয়ও যথেষ্ট ত্যাগ, কঠোর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

—'জ্যোতিঃ

অন্ন-সমস্যা।

আমাদের দেশে অনেকেই এক্ষণে বলিয়া থাকেন, অর্থাভাবই আমাদের দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অন্তরায়। এ কথাটা কতদূর সত্য, তাহা পাঠক-বর্গের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন, পল্লীগ্রামের লোকের অর্থের আগম এবং উপায় অত্যন্ত কম এবং তদুপযুক্তভাবে তথায় দ্রব্যাদির মূল্যও কম। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পল্লীবাসীকে কঠোর দুর্ভিক্ষের দিনে যেরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সেরূপ অনুপাতে সহরের লোককে করিতে হয় না। ইহার প্রধান কারণ অর্থের আগম—উহা পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব। সহরে আট দশ টাকা চাউলের মন বিক্রয় সতত্তই প্রায় হয়; কিন্তু তাহাতে লোকের দৃকপাত নাই, কিম্বা কেহই অনশন বা অর্দ্ধাশনে থাকে কি না সন্দেহ। পল্লীবাসীর এইরূপ অবস্থায় অনাহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সহরের লোক যিনি যাহাই করুন, কেহই নিশ্চেষ্ট নহেন; কিন্তু পল্লীবাসী সাধারণতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন কারণ বশতঃ শস্য না জন্মিলে তাহাদের বিশেষ কষ্টের কারণ জন্মে। শস্য বিনিময়ে অর্থও তখন তাহারা লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতভাবে দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পল্লীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে যাহাতে পল্লীবাসীর চেষ্টা ও যত্ন পর্য্যবসিত না হয়, তৎপ্রতি সমাজহিতৈষী মনীষীগণের দৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয়। পল্লীসমাজে একমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্য করিলে দেশের কিছুতেই মঙ্গল সাধিত হইবে না। এই পন্থার নিরাকরণকল্পে জাতিবর্ণনির্ব্বিরোধে নানাশ্রেণীর কর্ম্ম-সম্পাদন শিক্ষা আবশ্যক। অল্প অল্প মূলধনে দৈহিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত সাংসারিক নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদির প্রস্তুতকরণ শিক্ষা দেওয়া পল্লীসমাজে নিতান্ত আবশ্যক এবং এই উপায় অবলম্বন করিতে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক, তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। কিন্তু এই প্রথার প্রবর্ত্তকের অভাব। যখনই কোন যৌথ-কারবার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তখনই তাহার নানারূপ আকস্মিক ও তৎসহ স্বার্থপর কার্য্যের দোষে অঙ্কুরেই লয়প্রাপ্তি ঘটিতেছে। সুতরাং আজও আমাদের দেশে সমবায় অর্থদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন শিক্ষার উপায় জন্মে নাই। সমাজে প্রত্যেকে স্ব স্ব অর্থ ও শক্তির দ্বারা এই কার্য্য সাধনের চেষ্টা না করিলে ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

—'স্বরাজ'

গম রপ্তানি

গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে সিমলা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবরমেণ্ট এদেশ হইতে গম রপ্তানি সম্বন্ধে গত বৎসর মার্চ্চ মাসে যে কড়াকড়ি আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ তাঁহারা কতকটা শিথিল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। উল্লিখিত আইনের ফলে এদেশে গমের দর অনেকটা হ্রাস হইয়াছে, বিশেষতঃ বিলাতে ভারতীয় গমের টান আর তেমন নাই। কাজেই গত বৎসরাবধি গবরমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্টগণের মারফতে বিদেশে গম চালানের যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আপাততঃ বন্ধ হইবে, অর্থাৎ এখন হইতে যে কেহ 'গমকমিশনার'গণের ছাড়পত্র লইয়া বিদেশে গম চালান দিতে পারিবেন। তবে রপ্তানি গমের পরিমাণ এখনও গবর্মেণ্ট বাঁধিয়া দিবেন এবং তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন যে, ঐ আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন্ কোম্পানি যত গম বিদেশে রপ্তানি করিতেন, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিতেছেন কি না। বিগত ১লা মে হইতে এই নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হইবার কথা। ইহার ফলে যদি গমের দর পুনরায় চড়ে অথবা এদেশ হইতে গমের রপ্তানি আবার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গবরমেণ্ট গত বর্ষের ন্যায় গমের রপ্তানি যে কোন সময়ে বন্ধ করিতে পারিবেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, এই নূতন ব্যবস্থার ফলে এদেশ হইতে গমের রপ্তানি বাড়িবে বুঝিয়া বোম্বাইয়ের দেশীয় মহাজনেরা গমের দর হন্দর প্রতি তিন আনা চড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ সাহেব ব্যবসাদারেরা বলিতেছেন, আজকাল জাহাজের ভাড়া, বীমা খরচ প্রভৃতি এত বাড়িয়াছে যে, অধুনা এদেশ হইতে মাল পাঠাইয়া কিছুই লাভ থাকিবে না। কাজেই মহাজনেরা যে আশায় গমের দর চড়াইয়াছেন তাহার সাফল্য সম্ভাবনা অতি অল্প।—'কৃষক'

পাট

পাট বা তৎসদৃশ কোনও পণ্যের জর্ম্মণীতে রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথচ পাট নহিলে চলে না। এই জন্য পাটের অনুকল্পের অনুসন্ধান হইতেছে। জর্ম্মণীর "এগ্রিকলচরল সোসাইটি"র জর্ণ্যালে প্রকাশ—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এই নীতির অনুসরণে পাটের কাজ তাহার অনুকল্পেও চলিতে পারে। পূর্ব্বে জর্ম্মণরা উইলোর

ছাল হইতে পাটের মত তন্তু প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহা বাগানের কাজে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উইলো পাট দুর্ম্মূল্য বলিয়া তদপেক্ষা সুলভ 'রাফিয়া'র তন্তু তাহার স্থান অধিকার করে। মার্কিণের সংবাদে প্রকাশ,—কিউবা দ্বীপেও পাটের অনুকল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম 'মালভা।' কিউবায় এগার রকম মালাভা পাওয়া যায়। কিন্তু 'মালভা ল্যাক্কা'—বৈজ্ঞানিক নাম, 'Urena lobata' হইতেই উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, ইহা পাটের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। 'মালভা ল্যাক্কার' মোটা সুতায় চিনির 'বোরা' বা বস্তা প্রস্তুত হইতে পারিবে। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট তন্তু দ্বারা পরিধেয় বসনাদিরও বয়ন চলিবে।— অনেক দিন হইতে এই পরীক্ষা চলিতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহা সফল হইয়াছে। এখন কিউবায় মালভা-তন্তু প্রস্তুত হইতেছে, এবং হাবানার বাজারে এই নূতন পণ্যের রীতিমত ক্রয়-বিক্রয়ও চলিতেছে। হাবানায় শ্রমজীবীরা 'আলপার্গাটা' নামক ন্যাকড়ার জুতা ব্যবহার করে। মালভার তন্তু হইতে উৎপন্ন কাপড়ে এখন "আলপার্গাটা" প্রস্তুত হইতেছে। মালভার তন্তু পাটের সহিত মিশাইয়া এই জুতার তলা প্রস্তুত হয়। গত বৎসর ত্রিশ টন মালভা-তন্তু প্রত্যেক পাউণ্ড বা আধ সের তিন পেন্স দরে বিক্রীত হইয়াছে। বাজারে চাহিদা ছিল, কিন্তু মাল ছিল না। মালভা-ওয়ালারা বলে,— আমরা বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে উৎপাদন করিয়াও দেড় পেন্স দরে বেচিতে পারি। ওয়াশিংটনের কৃষিবিদ্ মনীষীরা বলিতেছেন,— কিউবার মালভার তন্তু ঢাকার পাটের মত মজবুৎ, ও পাট ও শনের মাঝামাঝি। বীজ-নির্ব্বাচন ও চাষের উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা মালভা আরও উন্নত হইতে পারে। ইতিমধ্যেই বীজ-নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। বন্য অবস্থায় মালভা বিশ ফুট লম্বা হয়। কৃষিক্ষেত্রে সাধারণ জমীতেও মালভা ছয় ফুট হইতে দশ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এক বৎসরে দুইবার মালভার চাষ হইতে পারে। কিউবায় প্রতি বৎসর ২০,০০০,০০০ চিনির বস্তা আবশ্যক হয়। মালভা যদি তাহার যোগান দিতে পারে, তাহা হইলে কিউবা ফাঁপিয়া উঠিবে -এবং বাঙ্গালার চাষার কপাল পুড়িবে।—'বাঙ্গালী'

শোক-সংবাদ

৺উমেশচন্দ্র দত্ত

গত ২১শে জুন রাত্রিশেষে কৃষ্ণনগরনিবাসী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উমেশবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান; কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায়বলে ক্রমোন্নতি লাভ করেন। স্কুলে তাঁহার সমকক্ষ বালক বড় বেশী ছিল না। তিনি নিরতিশয় কৃতিত্বের সহিত তদানীন্তন সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। সে সময় তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল না বলিলেই হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। উমেশবাবু হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডি. এল, রিচার্ডসনের ছাত্র। কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্রমাত্রেই শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদান যেমন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, উমেশবাবুর পক্ষেও এই সনাতন রীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এমন কি, শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ, আগ্রহ অনন্যসাধারণ ছিল। শিক্ষাবিভাগে পদোন্নতি লাভ করিতে-করিতে উমেশবাবু ক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই পদে থাকিতে-থাকিতেই রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। কৃষ্ণনগরের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সংযোগ ছিল। বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বিচারপতি মিঃ ধ্রালমোহন দাস এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ তাঁহার ছাত্র। উমেশবাবু অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বার্ষিক চারি সহস্র টাকা হিসাবে সরকারী বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল কৃষ্ণনগর নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত

য়ুয়ান-সি-কাই

নবগঠিত চীন-গণতন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্র-নায়ক য়ুয়ান-সি-কাই সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে চীনদেশে তাঁহার তুল্য তীক্ষ্ণধী,ক্ষমতাশালী,রাজনীতি-চতুর ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন না। তিনি প্রেসিডেণ্টের পদে নির্ব্বাচিত হইয়া এবং মহাচীনের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যেমন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব লোপ করিয়া স্বয়ং ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক একটি স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, য়ুয়ান-সি-কাইও কতকটা সেইরূপভাবে চীনদেশের সম্রাট হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের গুণমুগ্ধ ফ্রান্সবাসিগণ যেমন একবাক্যে নেপোলিয়নকে নিজেদের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, চীনদেশের অধিবাসীরা য়ুয়ান-সি-কাইয়ের অভিপ্রেত-সাধনে তদ্রূপ সহায়তা করে নাই; বরং তাহারা তাঁহার বিরোধীই হইয়াছিল। ফলে, চীনের কয়েকটি প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং প্রায় সকল স্থলেই রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয়। অবশেষে য়ুয়ান-সি-কাই সম্রাট হইবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চীনদেশ শান্তভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইহজগতের কর্ম্ম শেষ হয়। প্রথমে সংবাদ আসিয়াছিল, শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিরা চক্রান্ত করিয়া য়ুয়ান-সি-কাইকে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে। পরে জানা যায় যে, বিষ-প্রয়োগের সংবাদ সত্য নয়; তাঁহার স্বাভাবিক পীড়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চীনা ও ফরাসী ডাক্তারেরা তাঁহার রোগ সম্বন্ধে একমত হইতে না পারায় তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

য়ুয়ান-সি-কাই

বৈদেশিকী

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ—এই প্রবচনের সার্থকতা বেলজিয়ামের প্রতি নগরে ও গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবসাদারের জাতি বলিয়া, বেলজিয়ানের সৌন্দর্য্যবোধ কণামাত্র হ্রাস হয় নাই। ব্রুজেস (Bruges), এন্টোয়ার্প (Antwerp) লিয়েজ (Liege) প্রভৃতি নগরের বণিক-সমাজের গৃহগুলি সৌষ্ঠবে অলকার সমান। এন্টোয়ার্পের রেলওয়ে-ষ্টেশন দেখিলে প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়। বেলজিয়ান জাতি লক্ষ্মীকে ব্যাঙ্কের খাতায় ও লোহার সিন্দুকে কয়েদ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই।' ("The Belgians not only realise the beauty of utility, but also the utility of beauty"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী"।

শিশু ও সহরের গোদুগ্ধ

বিখ্যাত 'ল্যান্সেট' পত্রিকায় জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসক প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন যে, ৮.৯ মাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে গো-দুগ্ধ পান করিতে দেওয়ায় যত কুফল হয়, পান করিতে না দিলে তত কুফল হয় না; শিশুর যক্ষ্মা ইত্যাদির প্রধান কারণ গো-দুগ্ধ। যাহাদের গৃহে গাভী আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু কলিকাতার বাজার হইতে যাহাদিগকে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের দুগ্ধ ব্যবহার করা অপেক্ষা না করা ভাল। বাজারের দুগ্ধ মাটা-তোলা জল-মিশ্রিত, শর্করা-মিশ্রিত বা এইরূপ কোনও ভাবে প্রায়ই দূষিত করা থাকে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, ল্যাক্টোমিটার (Lactometer) দ্বারা পরীক্ষা করিলেই দুগ্ধের বিশুদ্ধতা জানা যায়। কিন্তু তাহা নিতান্তই ভুল। মাটা-তোলা দুগ্ধে জল মিশাইলে ল্যাক্টোমিটারে ধরা যায় না। জল মিশ্রিত দুগ্ধে শর্করা মিশাইলে তাহাও ধরা যায় না। যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ প্রচুর থাকে, তাহা হইলে গো-দুগ্ধ ব্যবহার করিবার কোনও আবশ্যকতা হয় না। ৭।৮ মাস বয়সের পর জল মিশ্রিত, বা মাটা তোলা দুগ্ধে তত অপকার করে না। চিকিৎসকগণ বলেন যে, ভারতের গাভীর যক্ষ্মা নাই। কাজেই গাভী হইতে যক্ষ্মা শিশুতে আসে না বটে, কিন্তু জলীয় দুগ্ধ বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত দুগ্ধ পানে শিশু দুর্ব্বল, রুগ্ন হইয়া পড়ে। পেটের পীড়া, আমাশয় ইত্যাদিতে শিশু প্রায় মারা পড়ে।—'বিজ্ঞান'

সাহিত্য-সংবাদ

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের "আবেগ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "তাপসী" প্রকাশিত হইল। ইহা কয়েকটি পুণ্যবতী মহিলার চরিত্র চিত্র। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

চিত্রময় "রাজ সংস্করণ বিষবৃক্ষ" প্রকাশিত হইয়া দেড়টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। একে বঙ্কিম, তায় সচিত্র—সোণায় সোহাগা।

ইংরেজী উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "বার্লিনের বন্দী"কে খালাস করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। এগার আনা ব্যয় করিলেই তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প-কুসুম একত্র গ্রথিত হইয়া "চিত্রালী" নামে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আটআনা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মহাকবি কপিঞ্জলের "চূণ ও কালি" ভাটি ও রসায়নাগারের অন্ধকূপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকলোচনের গোচর হইবার উপক্রম হইয়াছে। পাঠকেরা গাল শানাইয়া রাখুন।

সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের "বীথি" প্রকাশিত হইয়াছে। বারআনা ব্যয় করিলেই বীথি-পরিক্রমণ করিতে পাইবেন। কবি মল্লিকের "বন-মল্লিকা" যন্ত্রস্থ; যথাসময়ে পাঠক মল্লিকের মল্লিকার গন্ধে তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের "রবিরামা" যন্ত্রস্থ; পাঠক ইহাতে লেখকের মুন্সিয়ানা দেখিয়া অবাক হইবেন। "Please watch the date." অর্থাৎ "তারিখ দেখহ"।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অনেকগুলি বহুবর্ণ চিত্রিত ছবিসহ "আশীর্ব্বাদ" যন্ত্রস্থ। বুড়া সাহিত্যিকের এই পেটেন্ট-করা 'আশীর্ব্বাদ' পূজার প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য সকলেই সংগ্রহ করিয়া রাখুন

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works.

বসুধারা

Emerald Ptg. Works.

ভাদ্র, ১৩২৩

প্রথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

বিমূঢ়তা

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

সুখের পরিবর্ত্তে কভু দুঃখলাভ ঘটে যদি,
কেন ক্ষুব্ধ হই ?
দুঃখের রাজ্যে মহীয়সী শিক্ষা করার নাই কি কিছুই ?
শুধু নৈরাশ্যই !
নিষ্ফলতাই সুখের সেতু, পরমেশে কৃতজ্ঞতার
প্রধান বর্ত্ম নহে ?
মর্ম্মব্যথার অরুন্তুদ আর্ত্তনাদেই এ সংসারে
প্রশান্তি-স্রোত বহে।
দুঃখে যদি থাক্‌ত কেবল অন্তর্দাহের অন্তঃশূন্য
জ্বালা দাহকারী,
মনের যত মলিনতা ধৌত করে দিয়ে যেতে
পার্ত্ত দুঃখবারি ?
অবিমিশ্র সুখের রাজ্যে বাস করা কি নহে একটা
মহা অভিশাপ ?
এটা নাহি ভেবে করি মূঢ় তৎপরতায় ধাতার
ন্যায়ের পরিমাপ।
দুঃখের মহান্ প্রবল বহ্নি মনের অবিশুদ্ধ খাদে
যায় দাহ করি,
ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা দানে, চরিত্র গাম্ভীর্য্য আনে
নবোৎসাহে বরি ;
সুখের ক্রোড়ে লালনপালন শিখায় শুদ্ধ চপলতা,
আত্মাদর-নীতি,
শি[illegible] না ক অনুভূতি, পরের তরে প্রাণের স্পন্দন,
পরের সুখে প্রীতি ;
চরিত্রের বিশুদ্ধতা সুখের মধ্যে বাঁচিয়ে যদিও
রাখা যেতে পারে ;
হয় না তাহে শিক্ষা কভু দুঃখের সেই মহানীতি—
অশ্রু পরের তরে।
দুঃখে না লালিত [illegible] জন, না বুঝে সে মর্ম্ম তাহার,
আর্ত্ত জন 'পরে
হৃদয়ের সে স্নিগ্ধকরী প্রীতির প্রস্রবণ-ধারা
বর্ষিতে না পারে ;
অভিশাপা বিধাতারে—পৌরুষ কিছুই নাহি তাহে
গালি দেওয়ায় তাঁরে,
অবিচারক, অত্যাচারী বলে' সদা রুষ্টভাবে
দুঃখের মহাভারে।

বিপদের অভিঘাতে হারায় যে জন জ্ঞান ও বুদ্ধি
হয়ে' অভিভূত,—
মানুষ-পদ-বাচ্য নয় সে, স্বনির্দ্দিষ্ট পথ হ'তে
হয় যেই চ্যুত,
শোকের বন্যায় অধীরতা, দুঃখে হওয়া দিশেহারা,
মূঢ়তা ভয়েতে,
নিজদোষে নিষ্ফলতার জন্য দোষা অদৃষ্টেরে
সাজে রমণীতে;
জীবনসংগ্রামে ক্ষোভ নিষ্ফলতার নীতিশিক্ষা
নহে মূল্যহীন,
বিঘ্নবাধা স্রোতস্বিনীর বাড়ায় মাত্র তেজস্বিতা,
করেনাক ক্ষীণ।
এ সংসারে কত শত মহাত্মা ও অধিরাজের
ভাগ্য-বিপর্য্যয়
ঘটেছে ও ঘট্‌ছে না কি বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায়
চলৎ-কর্ম্মময়
এ সংসারে? কত মহাজাতির নিত্য অভ্যুত্থান ও
পতন দুর্নিবার,
দেখ্‌ছি নাকি চ'খের সাম্‌নে পুরাণে ও ইতিহাসে—
মোরা ত কোন্ ছার!
কত শত সাম্রাজ্যেরই গর্ব্বোচ্ছ্রিত সৌধচুড়ার
ধূলায় পরিণতি,
ক্ষমতার তাণ্ডব-নৃত্যের, নিরীশ্বর বিলাসিতার
ভীষণ অধোগতি;
ধর্ম্মের নামে নৃশংসতা, ধর্ম্মীর আত্মবিসর্জ্জন
কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে,
একের পাপে শতের মহাশোচনীয় দুঃখকষ্ট
দেখ্‌ছি পৃথিবীতে;
একটা ভ্রমে কত রাজ্যের রোমহর্ষণ অধঃপতন
হয়ে গেছে ভবে,
দুর্দ্ধর্ষ বীরেরও যুদ্ধে শত্রুহস্তে পরাজয়
হয়েছে ও হবে;
প্রবল, মহাপরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজেরও
মাননাশ ও পতন,
শিরশ্ছেদ, নির্ব্বাসন, অন্ধতম কারাগারে
স্থিতি সারা জীবন;
করালবদন ব্যাদান করে দুর্ভিক্ষ মড়কের দেশ-
ব্যাপী হাহাকার,
জলোচ্ছ্বাসের মহাপ্লাবন, সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পের
ভীষণ অত্যাচার,
জ্বালাময়, সংহারমূর্ত্তি পর্ব্বতের সে অগ্ন্যুদ্গারে
শত বনগ্রাম,
সভ্যতার আলোকে দীপ্ত বিলাসদৃপ্ত নগরীর সে
দারুণ পরিণাম;
কালের করাল গর্ভে কত বিরাট্ ব্যাপার হচ্ছে হবে
বিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষে বুদ্বুদের প্রায়,
বুঝি নাক কি সে মহান্ নিয়মেতে নিয়ন্ত্রিত
এ বিশ্বসংসার, স্রষ্টার কি বা অভিপ্রায়;
সসীম বুদ্ধি নিয়ে কর্ত্তে যাই অসীম স্পর্দ্ধাভরে
অবোধ্য, অনন্ত, মহান্ শক্তির পরিমাপ,
মহাসৃষ্টির মূলসূত্র, তন্ত্র, মন্ত্র নাহি জেনে
রুষি নিয়ন্তার প্রতি পেলে দুঃখ-তাপ।
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমাঝে কত ক্ষুদ্র সৃষ্টি মোরা,
মোদের সুখটা কত তুচ্ছ নাহি ভেবে মনে,
ভাবি বিশ্বশক্তির আদিকারণ কর্ত্তে বন্দোবস্ত
মোদের সুখ-তৃপ্তির জন্য বাধ্য প্রাণপণে।
আশ্চর্য্য এক যুক্তিবলে নিছক সুখটাই প্রাপ্য ভেবে
প্রভু! তোমার ন্যায়ান্যায়ের বিচার কর্ত্তে যাই,
সুখে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ্য না উৎসৃজি তোমায়
দুঃখপাতে উচ্চকণ্ঠে বলি—তুমি নাই।

শ্রুতি-উল্লিখিত আধ্যাত্মিক দেবাসুর-সংগ্রাম

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্‌-এ, বি-এল]

দেবাসুরা হটে যত্র সংযত্তিরে।”

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌।

এই দেবাসুর-সংগ্রাম যেমন জগতের মহাতত্ত্ব, প্রতি জীব ও মানুষ সম্বন্ধেও তাহা সেইরূপ মহাতত্ত্ব! যেমন জগত পরস্পর দুই বিপরীত শক্তির লীলাভূমি, যেমন তাহার একদিকে সত্ত্বশক্তি ও তাহাদের নিয়ন্তা দেবগণ, এবং আর একদিকে তমঃশক্তি ও তাহাদের নিয়ন্তা অসুরগণ, যেমন ইহাদের মধ্যে নিয়ত পরস্পর পরস্পরকে অভিভব-চেষ্টায় জগতে নিত্য দেবাসুর-যুদ্ধ চলিতে থাকে; তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের মধ্যেও এই সত্ত্ব ও তমোরূপ দুই পরস্পর বিপরীত শক্তির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ত চলিতে থাকে। মানুষের মধ্যেও তাহার তামসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা অসুরগণ, তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিয়ন্তা দেবতাগণ। তাহাদের মধ্যেও নিয়ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইহাই আধ্যাত্মিকভাবে দেবাসুর-যুদ্ধ। এই দেবাসুর-সংগ্রাম-ফলে মানুষের তামসিক প্রকৃতি ক্রমে উন্নত হইয়া রাজসিক প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং তাহার পর তাহার রাজসিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে উন্নীত হয়।

আমরা জগতের এই দেবাসুর-সংগ্রাম-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, কাল্পিক সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া দেখিতে পান যে, বিষ্ণুর কর্ণমল বা শ্রোত্র-শক্তির তামসিক অংশ হইতে শব্দতন্মাত্র ক্রমে উদ্ভূত পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূতাভিমানী ‘মধু’দৈত্য এবং তাহা হইতে উদ্ভূত পঞ্চস্থূল ভূতাভিমানী ‘কৈটভ’দৈত্য উভয়ে এই জড় ও জড়শক্তি দ্বারা জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ব্রহ্মার তপস্যায় ভগবান জাগরিত হইয়া, যেখানে পঞ্চীকৃত ভূত হইতে ভূর্ভুবস্ব-র্লোক সৃষ্টি হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী সৃষ্টি হইলে তাহা ক্রমে জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে, সেখানে তিনি সেই মধু ও কৈটভকে নিহত করিয়া, এই জড় ও জড়শক্তিকে অভিভূত করিয়া, হিরণ্যগর্ভের প্রাণশক্তি রূপে জীবশরীর সৃষ্টির উপযোগী করিয়া দেন। জীব-সৃষ্টি হইলে, উদ্ভিদ ও নিম্নজাতীয় জীবে বৈকারিক অসুরগণেরই নিয়ন্তৃত্ব থাকে। তাহার পর মানুষ সৃষ্ট হইলে প্রকৃতপক্ষে দেবগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ন্তা হ’ন। পশুর শরীর উপযুক্ত নহে বলিয়া ও তাহাতে অসুরগণের প্রাধান্য দেখিয়া, তাঁহারা আরও উন্নত জীব-দেহ আকাঙ্ক্ষা করেন; এবং তদনুসারে প্রজাপতি মানুষ-শরীর সৃষ্টি করিয়া দিলে, তাহা সুন্দর দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন। শ্রুতি-উক্ত এই তত্ত্বের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঐতরেয়-উপনিষদে এ রহস্যের ইঙ্গিত আছে। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এ জগৎ পূর্ব্বে এক আত্মামাত্র ছিলেন। আর কিছু ছিল না। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোকসকল সৃষ্টি করিব। * * * তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিয়া ঈক্ষণ করিলেন, ইহাদের লোক-পালগণকে সৃষ্টি করিব। তিনি চিন্তা করিলেন (অভ্যতপৎ)। তাহাতে ...... বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইল—তাহা হইতেই ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ...উৎপন্ন হইলেন।

দেবগণ সৃষ্ট হইয়া মহা-অর্ণবে (সংসারে বা কারণ-সমুদ্রে) পতিত হইলেন। সেই স্রষ্টা তাঁহাদিগকে ক্ষুৎ-পিপাসাযুক্ত করিলেন। তখন তাঁহারা স্রষ্টাকে বলিলেন, আমাদের আশ্রয় দিন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি। তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকট এক গো (গো-আকৃতিযুক্ত শরীর বা form) আনয়ন করিলেন। দেবতারা বলিলেন, ‘ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।’ তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকট এক অশ্বপিণ্ড আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।...’

তখন তিনি তাহাদের নিকট এক পুরুষ (বা নরাকৃতি পিণ্ড) আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইহা বড়

সুন্দর (সুকৃতং—সুন্দররূপে গঠিত)। তখন স্রষ্টা দেবতাদের বলিলেন, "ইহাতে যথাস্থানে প্রবেশ কর।" তখন অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন; সূর্য্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন; ওষধি ও বনস্পতিগণ লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন; চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন।.........তৎপরে স্রষ্টা ঈশ্বর কেশবিভাগস্থান বিদীর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া পুরুষ-শরীরে প্রবেশ করিলেন।

ঐতরেয়-উপনিষদ্, প্রথম অধ্যায়।

এ পৃথিবীতে মানব শরীর ব্যতীত আর কোন জাতীয় জীব-শরীরে জ্ঞানময় আত্মার ও এই সাত্ত্বিক প্রাকৃত দেবগণের উপযুক্ত অধিষ্ঠান-স্থান হয় নাই। মানব-শরীরই উপযুক্ত হওয়ায় তাহাতে দেবগণসহ স্বয়ং ভগবান অন্তর্যামীরূপে পরা-প্রকৃতির সহিত অধিষ্ঠিত হন। এজন্য মানুষকে হিরণ্যগর্ভের অনুগ্রহ-সর্গ বলে। একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, দেবগণ মানব-শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অসুর ও রাক্ষসগণ তাহা অধিকার করিয়া আছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক বৈকারিক সৃষ্টিকালে এই অসুর ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "ব্রহ্মা স্বীয় জঘনদেশ হইতে অসুরগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা অত্যন্ত লম্পট হইল এবং লাম্পট্য-প্রযুক্ত মৈথুন নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রতিই ধাবমান হইল। * * ব্রহ্মা এই দেহত্যাগ করিলেন। ইহাতে সায়ন্তনী সন্ধ্যা হইল। * * লম্পট অসুরগণ স্ত্রী কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইল।" তৃতীয় স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়। অতএব অসুরগণের প্রবৃত্তি এই নীচ কামমূলক। জীবের মধ্যে, মানবের মধ্যে, এই কামপ্রবৃত্তি—এই প্রচণ্ড মোহভাব—আসুরী। এই অসুরগণের চালনায় মানুষ কামমোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হয়। সেইরূপ "তামস-সৃষ্টি হইতে যে যক্ষ-রাক্ষসগণ জন্মিয়াছিল, তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল।" শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ২০ম অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সৃষ্ট হইলে স্রষ্টা তাঁহাদিগকেও ক্ষুৎ-পিপাসাযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্রষ্টাকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের আশ্রয় দিন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি।" তাঁহাদেরই আশ্রয় জন্য ভগবান মনুষ্যশরীর সৃজন করেন, এবং দেবগণ, সুন্দর দেখিয়া, তাহাতে প্রবেশ করেন। স্রষ্টা ভগবান ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে বলিয়াছিলেন, "এই সকল দেবতাতেই আমি তোমাদের স্থান ব্যবস্থা করিব, তোমরা ইহাদের ভাগী হইবে।" ঐতরেয় উপনিষদ্ ২।৫।

পরে স্রষ্টা ভাবিলেন "এই সকল লোক ও লোকপালগণের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব। তাঁহার তপস্যা (চিন্তা) হইতে মূর্ত্তি (আদি জড়) উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্ন। তিনি মুখস্থিত অধোগামী অপান-বায়ুর দ্বারা তাহা গ্রহণ করিলেন। এই বায়ুই অন্নের গ্রাহক। ঐতরেয় উপনিষদ্ ৩।১-২, ১০।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ বা আহরণ করা যায়, তাহাই আহার।* দেবগণ ইন্দ্রিয় ও মনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অধিদেবতারূপে, ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের শাস্ত্রসম্মত বিষয় গ্রহণে সহায়তা করেন। এ আহার সাত্ত্বিক। আর আমাদের মধ্যে অবস্থিত দারুণ আসুরী প্রকৃতির যে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আহার, তাহা এই যক্ষ রাক্ষসদের দ্বারা নিয়মিত। তাহাদের এই সর্ব্বগ্রাসী প্রকৃতি গীতায় ১৬শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের কামনা দুষ্পূর; তাহারা দম্ভবল মদান্বিত; তাহারা কাম-উপভোগসর্ব্বস্ব, কাম-ক্রোধ-পরায়ণ।

অতএব দেব ও অসুর (এবং উক্ত রাক্ষস ও যক্ষগণ) উভয়েই মানব-শরীরে প্রবেশ করিয়া—উভয়েই মানুষকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। এই অসুরগণ হইতে আমাদের আসুরী প্রকৃতি, আমাদের কুপ্রবৃত্তি বা কুমতি; এবং দেবগণ হইতে আমাদের দৈবী-প্রকৃতি, আমাদের সুপ্রবৃত্তি বা সুমতি। অসদুপায়ে অগ্রহণীয় বিষয় গ্রহণ আমাদের এই আসুরী-প্রবৃত্তিমূলক; আর সৎ উপায়ে আমাদের শ্রেয়ঃ ও গ্রহণীয় বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি এই দেবগণ হইতে প্রাপ্ত দৈবী-প্রকৃতিমূলক। দেবগণ আমাদের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সকলকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সৎপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন; আর অসুরগণ আমাদিগকে অশাস্ত্রীয়, অশ্রেয় পথে নিয়মিত করেন। দেবগণ আমাদিগকে শুভপথে, অভ্যুদয়ের পথে, ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে লইয়া

* গীতার 'নিরাহারস্য দেহিনঃ' ও তাহার শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যাইতে চেষ্টা করেন; আর অসুরগণ আমাদের অশুভ পথে, অবনতির পথে, অধর্ম্মের পথে, প্রেয় পথে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন। দেবগণ আমাদের পুণ্য-প্রবৃত্তির নিয়ন্তা, আর অসুরগণ আমাদের পাপ-প্রবৃত্তির পরিচালক। দেব হইতে ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রকৃত সুখ, অভ্যুদয়; আর অসুর হইতে অধর্ম্ম, পাপ, দুঃখ ও অবনতি।

যাহা হউক, এই দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উপর আধিপত্য লাভের জন্য পরস্পর বিপরীত-ভাবে চেষ্টা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে দেবগণই আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি বা সেই শক্তির নিয়ন্তা ও প্রকৃত অধিদেবতা। এই সমষ্টি দেব-শক্তি হইতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়; ব্যক্তি মানুষের নিজ চেষ্টায় তাহা সম্ভব হয় না। এই দেবগণই ক্রমে এই অসুরগণকে পরাভূত করিয়া—জড় ও জড়শক্তিকে নিয়মিত করিয়া—আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমে পূর্ণ-বিকশিত করিয়া দেন। আমরা উল্লিখিত শ্রুতি হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ (অর্থাৎ এই স্থূল অগ্নি প্রভৃতির মধ্যবর্ত্তী পুরুষ অথবা তদভিমানী চৈতন্যযুক্ত দেবতাগণ) কেবল আমাদেরই ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা নহেন; যেথানে যে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়, এই দেবগণই তাহার কারণ। তাঁহারাই প্রত্যেক জীবের মধ্যে তাহার ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। তাঁহাদের নিয়ন্তৃত্বে সকল জীবেরই ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ হয়। নিম্নজীবে জড়ত্বের অথবা তামসিক ভাবের আধিক্য হেতু, ইন্দ্রিয়গণের উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। কেবল মানুষ-দেহেই মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। এ কারণ, পশুদেহে এই দেবতাদের উপযুক্ত স্থান হয় নাই। তাঁহারা কেবল মানুষের শরীরকেই তাঁহাদের অধিষ্ঠানের বিশেষ উপযুক্ত দেখিয়াছিলেন,—কেবল মানুষের দেহেই, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যেরূপ ভগবানের আদর্শ-কল্পনা, ইন্দ্রিয়-শক্তি-নিয়ন্তা তাঁহাদের দ্বারা, তদনুরূপ ইন্দ্রিয়-বিকাশের উপযুক্ত বুঝিয়াছিলেন। এইজন্য এই প্রাকৃত দেবগণ, মানুষের মধ্যে তাঁহারা বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিশেষভাবে বিকাশ করিয়া, সেই ইন্দ্রিয়গণ বা তাহাদের অধিষ্ঠাতারূপে তাহাদের নিয়মিত করেন। তাহারাই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্মশক্তি। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হেতু, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে, আমাদের সেই বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হেতু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের মধ্যে বাহ্য-বিষয়জাত অনুকম্পনের যে প্রতিঘাত হয়, তাহা হইতে আমাদের জ্ঞান সেই বাহ্যবিষয়াকার ধারণ করিতে পারে; তাহা হইতে আমাদের বাহ্যবিষয়ের রূপ, আকার, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতির জ্ঞান সম্ভব হয়; স্থূল জড়ের অনুকম্পন বৃত্তিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। এই দেবগণের অধিষ্ঠান হেতু, ক্রমে এই বিষয়-জ্ঞান স্পষ্ট, শুদ্ধ, নির্ম্মল, প্রকাশাত্মক, সাত্ত্বিক ও সুখপ্রদ হয় ও তাহার অপ্রকাশাত্মক, অস্ফুট, নির্ব্বিশেষে মোহাত্মক বা দুঃখাত্মক অবস্থা ক্রমে দূর হইয়া যায়। এই দেবগণের অধিষ্ঠান হেতু, ক্রমে আমাদের স্বাভাবিক তমঃ বা রজঃ অভিভূত ভাব ত্যাগ করিয়া "শাস্ত্রোদ্ভাষিত" হইতে থাকে, সাত্ত্বিক হইতে থাকে। এ কথা পরে উল্লিখিত হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মধ্যে এই ইন্দ্রিয় বিকাশের প্রধান অন্তরায় উল্লিখিত অসুরগণ। যক্ষ রাক্ষসগণকেও সাধারণভাবে অসুর বলা যায়। প্রকৃত অসুরগণ তামসিক প্রকৃতিযুক্ত; আর রাজসিক অসুরগণ রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত। তামসিক অসুরগণ দেবগণের ইন্দ্রিয় বিকাশে বাধা দেয়। এজন্য তমঃ-প্রধান পশুতে ও ইতর জীবে—ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। এই পশুদেহ দেবগণের ইন্দ্রিয় বিকাশ করিবার উপযুক্ত স্থান হয় নাই। মানুষ প্রধানতঃ রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত। এজন্য তাহাতে যক্ষ, রাক্ষসগণের প্রভাব বা আধিপত্য অধিক; ইন্দ্রিয়-বিকাশে তাহারা বাধা দেয় না। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় দেবগণ দ্বারা বিকশিত হইলে, এই অসুরগণ দেবতাদের পরাভব করিয়া, ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্তা হইতে চেষ্টা করে—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাদের নিয়ন্তা হইতে চেষ্টা করে। সেইজন্য তখন ইন্দ্রিয়জ বিষয়-জ্ঞান মোহাত্মক, অপ্রকাশাত্মক, অস্ফুট ও দুঃখাত্মক হয়। এই অসুর-প্রভাব ক্ষীণ হইলে বা অভিভূত হইলে তবে তাহা শুদ্ধ, নির্ম্মল, প্রকাশবহুল ও সুখাত্মক হয়। এই অসুরগণ আমাদের উপযুক্তরূপে বিষয়-গ্রহণে বাধা দেয়। এই দেবাসুর উভয়ের অবস্থান হেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সঙ্কল্প, বাক্য, হস্ত-পদাদির ক্রিয়া প্রভৃতি সমুদয় সুখজ বা পুণ্যযুক্ত, বা দুঃখাত্মক বা পাপযুক্ত হয়। এই দেবাসুর উভয়ের অবস্থান জন্য আমাদের "মাত্রাস্পর্শ" সমুদায় সুখাত্মক ও দুঃখাত্মক হয়।

দেবতাদের প্রভাবাধিক্যে তাহারা সুখাত্মক ও অসুরদের প্রভাবাধিক্যে তাহারা দুঃখাত্মক অথবা মোহাত্মক হয়। দেবতারা এই ইন্দ্রিয়ের অসুরজ দুঃখ-মোহাত্মক ভাব দূর করিয়া তাহাদের সুখ ও প্রকাশাত্মক করিতে চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়গণকে শাস্ত্রোদ্ভাষিত করিতে চেষ্টা করেন। অসুরগণ তাহাতেও বাধা জন্মায়। সে বাধাও দূর করিয়া দেবগণ ইন্দ্রিয়দিগকে পূর্ণরূপে শাস্ত্রোদ্ভাষিত করিলেও তাঁহারা আমাদিগকে সে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব কি ব্রহ্মতত্ত্ব দিতে পারেন না। নৈনদ্দেবাঃ প্রাপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। ঈশোপনিষদ্, ৪।

এক্ষণে আমরা শ্রুতি হইতে এই দেবাসুর-যুদ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই দেবাসুরের কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ।
ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সাঃ অসুরাঃ ত এষু লোকে ষস্পর্দ্ধন্তে।" ১।৩।১

অর্থাৎ প্রজাপতির সৃষ্টি দেব ও অসুরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে দেবগণ কনিষ্ঠ ও অসুরগণ জ্যেষ্ঠ। অসুরগণ তাই লোকসমুহ মধ্যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। আমরা পুরাণ হইতে ইহার আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক (Cosmic) অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ইহার এই আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝাইয়াছেন। তাহা এই—

" 'হ'—ইতি পূর্ব্ববৃত্তাবদ্যোতকো নিপাতঃ। বর্ত্তমান প্রজাপতেঃ পূর্ব্বজন্মনি যৎ বৃত্তম্ তদেব দ্যোতয়তি হ শব্দেন প্রাজাপত্যাঃ—প্রজাপতে বৃত্তজন্মাবস্থস্য অপত্যানি।

কে তে দেবতাশ্চ অসুরাশ্চ। তস্যৈব প্রজাপতেঃ প্রাণা বাগাদয়ঃ। কথং পুনস্তেষাং দেবাসুরত্বম্ উচ্যতে—শাস্ত্রজনিত জ্ঞান কর্ম্মভাবিতা দ্যোতনাৎ দেবা ভবন্তি। ত এব স্বাভাবিক প্রত্যক্ষঃ অনুমানজনিত দৃষ্ট প্রয়োজন কর্ম্মজ্ঞান ভাবিতা অসুরাঃ। স্বেষেবাসুষু রমণাৎ সুরেভ্যো বা দেবেভ্যো ২ন্যত্বাৎ। যস্মাচ্চ দৃষ্ট প্রয়োজন জ্ঞানকর্ম্ম ভাবিতা অসুরাঃ।

ততস্তস্মাৎ কানীয়সাঃ·········জ্যায়সা অসুরাজ্যায়াং সোঽসুরা স্বাভাবিকী হি কর্ম্মজ্ঞান প্রবৃত্তিঃ মহত্তরা।··· কনীয়স্বং দেবানাং শাস্ত্রজনিত প্রবৃত্তেরল্পত্বাৎ। অত্যন্ত যত্নসাধ্যা হি সা।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই,—"প্রজাপতির অপত্য—দেব ও অসুর। তাহারা সেই প্রজাপতির বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। * * * দেব শব্দের অর্থ দ্যুতিমান—যাহারা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা জ্ঞানযুক্ত হয় ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রদ্যোতিত হয়, তাহারাই দেব শব্দে অভিহিত। আর এই ইন্দ্রিয়গণ যখন প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা ইহলৌকিক প্রয়োজন-সাধক জ্ঞান ও কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা অসুর। এই ইহলৌকিক প্রয়োজন-সাধক জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অধিক বলিয়া ইহারা জ্যেষ্ঠ; শাস্ত্রার্থ জ্ঞান ও শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রযত্নে সাধিত হয় বলিয়া ইহা অল্প, ও এজন্য দেবতারা কনিষ্ঠ। এই হেতু অসুরগণ লোকেতে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। এই স্পর্দ্ধা করিবার অর্থ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বুঝাইয়াছেন—

তে দেবাশ্চ অসুরাশ্চ প্রজাপতি শরীরস্থা এষু লোকেষু নিমিত্ত ভূতেষু স্বাভাবিক ইতর কর্ম্মজ্ঞানসাধ্যেষু স্পর্দ্ধাং কৃতবন্তঃ। দেবানাঞ্চ অসুরানাঞ্চ বৃত্তি উদ্ভব অভিভবৌ-স্পর্দ্ধা। কদাচিৎ শাস্ত্রজনিত-কর্ম্মজ্ঞান-ভাবনারূপা বৃত্তিঃ প্রাণানাং উদ্ভবতি। যদা চ উদ্ভবতি তদা দৃষ্ট প্রয়োজনা প্রত্যক্ষানুমানজনিত কর্ম্মজ্ঞান ভাবনারূপা তেষামেব প্রাণানাং বৃত্তিরাসুর্য্যভিভূয়তে। স দেবানাং জয়ঃ অসুরানাং পরাজয়ঃ কদাচিৎ তদ্বিপর্য্যয়েন দেবানাং বৃত্তিঃ অভিভূয়তে অসুর্য্যা উদ্ভবঃ। স অসুরানাং জয়ঃ দেবানাং পরাজয়ঃ। এবং দেবানাং জয়ে ধর্ম্মভূয়স্ত্বাৎ উৎকর্ষ আ প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তে অসুরজয়ে অধর্ম্মভূয়স্ত্বাদপকর্ষ আস্থাবরত্ব প্রাপ্তেঃ। উভয় সাম্যে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিঃ।"

ইহার ভাবার্থ এই:—"প্রজাপতির শরীরস্থিত সেই দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত লোক বিষয়ে স্পর্দ্ধা হইয়াছিল। স্পর্দ্ধার অর্থ উদ্ভব ও অভিভব। কখন শাস্ত্রজন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম-ভাবনা রূপ বৃত্তি উদ্ভূত হয়, সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞান ভাবনারূপ আসুরিবৃত্তি অভিভূত হয়। এই অবস্থায় দেবতাদের জয় ও অসুরের পরাজয়। আবার কখন উক্ত আসুরীবৃত্তির উদ্ভব হয়; দৈবীবৃত্তির অভিভব হয়। তখন অসুরদের জয় ও দেবতাদের পরাজয় হইয়া

থাকে। দেবতাদের জয় হইলে ধর্ম্মের আধিক্য হয়, এবং তাহা হইতে প্রজাপতি বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পদলাভ হইতে পারে। আর অসুরের জয় হইলে অধর্ম্মের বাহুল্য হয়; তাহাতে স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপকর্ষ লাভ হইতে পারে। ধর্ম্মাধর্ম্মের সমতা হইলে অর্থাৎ দৈবীবৃত্তি ও আসুরীবৃত্তি উভয়ে প্রায় সমান বলবান হইলে মনুষ্যযোনি লাভ হয়।

ইহাই দেবাসুর-যুদ্ধের গূঢ় মর্ম্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতেও আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারি। তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।—

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযতিরে। উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ। ১।২।১

ইহার শাঙ্করভাষ্য এইরূপ ঃ—

দেবী দীপ্যতে দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ। স্বেষ্বেবাসুষু বিষপ বিষয়াসু প্রাণন ক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্যস্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। ....সংযতিরে সংপূর্ব্বস্য যততে সংগ্রামার্থ ত্বমিতি চ সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্ত্যাভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্য স্তমোরূপা ইন্দ্রিয় বৃত্তয়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থ বিষয় বিবেক জ্যোতিরাত্মনোদেবাঃ স্বাভাবিক তমোরূপা সুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা। ইত্যন্যোন্যাভি ভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর সংগ্রামঃ অনাদিকাল প্রবৃত্তঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

"স ইহশ্রুতি আখ্যায়িকারূপেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি বিবেক বিজ্ঞানায় কথ্যতে।"

উভয়েঽপি দেবাসুরাঃ প্রজাপতেরপত্যানীতি প্রাজাপত্যাঃ। প্রজাপতিঃ কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতঃ পুরুষঃ।

আনন্দগিরি ইহার টীকায় বলিয়াছেন "ইতি অধ্যাত্মং" ইহাই আধ্যাত্মিক দেবাসুর-যুদ্ধের অর্থ। "দেবাঃ সত্ত্বাত্মকা"। আর শ্রুতিতে যে বিরোচনাদি অসুরের কথা আছে, তাহা স্বতন্ত্র।

"ইহার শাঙ্কর ভাষ্যের সংক্ষেপ অর্থ এইরূপ ঃ—

দ্যোতনার্থক দিপ্ ধাতু হইতে দেব। শাস্ত্রোদ্ভাষিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণই এই দেবতা। অসুরগণ তাহার বিপরীত। স্বাভাবিক প্রাণশক্তিবলে তাহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ও প্রাণক্রিয়ায় ভক্ষণ বমন করে। তাহারা তামসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর সংগ্রাম করেন। স্বাভাবিক তমোরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অসুরগণ শাস্ত্রীয় প্রকাশবৃত্তিকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। আর তাহার বিপরীতে শাস্ত্রার্থ বিষয়ে বিবেকজ্যোতি-আত্মক দেবগণ স্বাভাবিক তমোরূপ অসুরগণকে পরাভব করিতে চেষ্টা করেন। এই যে একের দ্বারা অন্যের অভিভব বা উদ্ভবরূপ সংগ্রাম হইল,ইহাই সর্ব্বপ্রাণীতে,প্রতিদেহে দেবাসুর-সংগ্রাম। ইহা অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত।"

এই দেবগণের দ্বারা এবং অসুরদের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কিরূপে নিয়মিত, কিরূপে আমাদের এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে থাকে, তাহাও উপনিষদ হইতে পাওয়া যায়। আমরা তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লিখিত "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযতিরে" এই উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবগণ অসুরদের অভিভূত করিবার জন্য উদ্গীথ উপাসনা আরম্ভ করিলেন, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন—এই যজ্ঞ ও উদ্গীথ উপাসনা (অথবা প্রাণসৃষ্টিতে প্রণব বা ব্রহ্মের উপাসনা) দ্বারা তাহারা অসুরদিগকে পরাজয় করিবেন। প্রথমে দেবগণ প্রাণের দ্বারা চেতনাযুক্ত ঘ্রাণশক্তিকে উদ্গীথ উপাসনা করিতে বলিলেন। ঘ্রাণ উদ্গীথ উপাসনা আরম্ভ করিলে অসুরগণ তাহাকে আসক্তিরূপ পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। এইরূপে পাপবিদ্ধ হইয়া ঘ্রাণশক্তি দুর্গন্ধের গ্রাহক হইল। সেইজন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ উভয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে দেবগণ সকলের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া চক্ষুঃ-অধিষ্ঠিত দেবতা, শ্রবণাধিষ্ঠিত দেবতা, মনের অধিষ্ঠিত দেবতা, বাক্যের অধিষ্ঠিত দেবতা, একে একে অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা একে একে উদ্গীথ উপাসনা করিলেন। কিন্তু প্রত্যেকের এই উদ্গীথ উপাসনা-কর্ম্মে—অসুরগণ তাঁহাদিগকে আসক্তিরূপ পাপবিদ্ধ করিয়া দিল।

"তংহ অসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ।

এই কারণে সকল ইন্দ্রিয়ই পাপবিদ্ধ হইল। নাসিকা দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতে লাগিল। চক্ষু কুদৃশ্য দেখিতে লাগিল, বাক্ মিথ্যা বলিতে লাগিল, জিহ্বা কুরস গ্রহণ করিতে লাগিল, কর্ণ পাপযুক্ত অশ্রবণীয় শুনিতে লাগিল, মন পাপযুক্ত অন্যায় সংকল্প করিতে লাগিল। এইরূপে অসুর-

দিগের দ্বারা পাপে অনুবিদ্ধ হইয়া চক্ষুরাদি দেবতাগণ পরাস্ত হইলেন। কিন্তু যখন অসুরগণ মুখ্য প্রাণকে পাপ-বিদ্ধ করিতে গেল, তখন তাহারা পরাস্ত হইল। (ছান্দোগ্য উপনিষদ ১।২।২-৮)

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও প্রায় এইরূপ উল্লেখ আছে। তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই—"দেবতারা অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যজ্ঞে উদ্গীথার্থ কর্ম্ম দ্বারা অসুরগণকে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তাহাদের প্রেরণায় বাক্ উদ্গীথ কর্ম্ম করিলেন। অসুরগণ তাহাতে স্বার্থাভিনিবেশ-রূপ ছিদ্র পাইয়া তাহাকে পাপযুক্ত করিল। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ বাক্য কহাই পাপ। এইরূপে অসুরগণ ঘ্রাণকে পাপ-বিদ্ধ করিল। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ঘ্রাণকর্ম্মই পাপ। পরে তাহারা চক্ষুকে পাপবিদ্ধ করিল। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ দর্শনই পাপ। তাহার পর অসুরগণ শ্রোত্রকে পাপবিদ্ধ করিল। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ শ্রবণই পাপ। পরে তাহারা মনকে পাপবিদ্ধ করিল। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ সংকল্পই পাপ। এইরূপে অসুরেরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপবিদ্ধ করিল। পরে যখন মুখ্য প্রাণ নিঃস্বার্থভাবে উদ্গীথ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তখন অসুরগণ তাহাকে পাপবিদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন দেবতারাই জয়লাভ করিলেন। এই মুখ্য প্রাণ আত্মা। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন আশ্রয় নাই। তিনি আমাদের মুখমধ্যস্থিত আকাশে অবস্থান করেন। "১।৩।২-৭

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বৈদিক-কর্ম্মমধ্যে যাহা সকাম, যে কর্ম্মে কামনা থাকে ফলাভিসন্ধি থাকে, তাহা আমাদের দেবতাগণ দ্বারা নিয়মিত হইলেও তাহাতে অসুরের সংস্রব থাকে। সেই কামনা বা ফলাভিসন্ধি থাকায়, দেবগণ সেস্থলে অসুরগণ দ্বারা ক্রমে পরাভূত হন, অথবা পাপবিদ্ধ হন। আর নিষ্কামভাবে, কর্ত্তব্য ভাবিয়া, যদি এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত হয়, তবেই তাহা আর এ অসুরগণ পাপবিদ্ধ করিতে পারেন না। অতএব যজ্ঞাদি দান তপস্যা প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি সকামভাবে কৃত হয়, তবে তাহা হেয় ও পাপবিদ্ধ। নিষ্কামভাবে তাহার আচরণেই আমাদের প্রকৃত দেবত্বের বিকাশ হয়। শ্রুতিতে অন্যত্র আছে "তদ যথা ইহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোক ক্ষীয়তে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১।৬) মুণ্ডক উপনিষদে আছে (১।২।৭)—

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।"

অতএব এই সকাম যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ়, তাহাতে সংসার-সাগর পার হওয়া যায় না। গীতায়

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচ্যাং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

* * * * * *

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। (২।৪২-৪৪)

এই স্থানে সকাম বৈদিক কর্ম্মকে বিশেষরূপে হেয় বলা হইয়াছে। আমাদের কেবল কর্ম্মে অধিকার—তাহার ফলে অধিকার নাই। কর্ম্মে আসক্তি হেয়, (২।৪৭) ইহা গীতায় বিশেষ করিয়া বুঝান আছে। কেবল যজ্ঞার্থ বা ঈশ্বরার্থ যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যবোধে চিত্তসিদ্ধির জন্য আমাদের পালনীয়। ইহা আমাদের সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ। অতএব কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিষ্কামতা, অনাসক্তি আমাদের দেবত্ব; আর সে কর্ম্মে সকামতা, আসক্তি, ফলাভিসন্ধি—মানবের অসুরত্ব।

যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতে যেমন সমষ্টিভাবে দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে থাকে, তেমনই ব্যষ্টিভাবে প্রতি মানুষেও এই দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে থাকে। যখন আমাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সমুদায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে, ধর্ম্মের পথে, সাত্ত্বিকতার পথে, প্রকৃত অভ্যুদয়ের পথে, চলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই অসুরগণ তাহাদের আবার তামসিক ও রাজসিকভাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে। তখনই প্রকৃত দেবাসুর-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সাত্ত্বিকতার সহিত তামসিকতার, হিতজ্ঞানের সহিত অহিতজ্ঞানের, বিবেকের সহিত অবিবেকের, সুমতির সহিত কুমতির সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দৈবী-প্রকৃতির সহিত আসুরী-প্রকৃতির সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে প্রত্যেক মানব এই দেবতা ও অসুরগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। মানবের প্রকৃত পক্ষে ইহাতে হাত নাই। সে জগতের এই মহানিয়ম দ্বারা বদ্ধ। সে এই বিরাট জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। তাহার সাধ্য নাই যে, সে নিজে কিছু করিতে পারে। সে জগতের এই দুই দেবাসুর নামক দুই পরস্পর

বিপরীত [illegible] অভিমানী দেবতার প্রভাব অধীন। এই নিরত দেবাসুর সংগ্রাম দ্বারা অসুরগণকে অভিভব করিবার নিরত চেষ্টার দ্বারা তাহার ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। পরে কোন মানুষের মধ্যে যদি অসুরগণ একেবারে পরাভূত হইয়া যায় ও দেবগণের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়, তখন তাহার সমুদায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, তাহার আত্মবুদ্ধিমন, তাহার ইন্দ্রিয়গণ—সমুদায় অতি আশ্চর্য্য জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। শাস্ত্র-দৃষ্টি বিকশিত হয়। তখন সে এই স্বাভাবিক চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় দেখিতে পায়—সে ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বদর্শী হইতে পারে, তাহার নিকট দেব-সিদ্ধগণের আবির্ভাব হয়, সে স্বাভাবিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর অন্য শব্দ শুনিতে পায়, তাহার সকল ইন্দ্রিয়ই আশ্চর্য্য বিকাশযুক্ত হয়। যাউক সে কথা,—সে ধর্ম্মের বিশেষ বিকাশের কথা—এস্থলে প্রয়োজন নাই।

আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, স্বর্গে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র। ইন্দ্র আমাদেরও সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—আমাদের অন্তরের স্বর্গ রাজ্যের রাজা। আর অসুরগণের অধিপতি বিরোচন। শ্রুতিতে অনেক স্থলে এই ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ আছে। "ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে দেবগণ ও অসুরগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে গিয়াছিলেন। বিরোচন প্রজাপতির উপদেশ হইতে দেহাত্মজ্ঞানমাত্র লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র অনেক দিন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া শরীর ব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব জানিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উপনিষদ, অষ্টম অধ্যায়, ৭ হইতে ১২ খণ্ড দৃষ্টব্য। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও এই ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ আছে)। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যাহারা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা দেহাত্মবাদী; তাহারা [illegible] এবং উদর ও কামপরায়ণ হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, আমাদের প্রতিদেহে এই যে দেবাসুর-যুদ্ধ চলিতে থাকে তাহাতে আমাদের হৃদয়াধিষ্ঠিত পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিই নিয়ন্তা। তাঁহাদের নিয়ন্তৃত্বে এই দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণ যথাসময়ে অসুরগণকে পরাজিত করেন, আমাদের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক করিয়া দেন। [illegible] পরমা প্রকৃতির অনুগ্রহেই দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণের জয় হয়, কেনোপনিষদে ইহার [illegible]

"[illegible] দেবতাদিগের জন্য অসুর জয় করেন। সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন, এ বিজয় তাঁহাদেরই, এ মহিমা তাঁহাদেরই। ব্রহ্ম ইহা জানিয়া দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু এই যক্ষ বা অদ্ভুত আবির্ভাব কাহার, তাহা দেবগণ জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, এই পূজ্যস্বরূপ কে, জানিয়া এস। অগ্নি তাঁহার নিকট যাইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কে? তোমার কি শক্তি আছে? অগ্নি বলিলেন, 'আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি দগ্ধ করিতে পারি।' ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, 'ইহা দগ্ধ কর।' অগ্নি সমুদায় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও তাহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। পরে দেবতারা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম বায়ুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন 'আমি বায়ু; পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি গ্রহণ করিতে পারি।' ব্রহ্ম একগাছি তৃণ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'ইহা গ্রহণ কর।' বায়ু সম্পূর্ণ বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না।......তখন দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আপনিই জানিয়া আসুন।' তিনি ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই আকাশে (হৃদয়াকাশে) শ্রীরূপিনী-পরম সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী 'উমা' ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সেই পূজনীয় স্বরূপ কে?' দেবী বলিলেন 'উনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়েই তোমরা এইরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ।' তখন ইন্দ্র ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন। সেই পরাবিদ্যারূপিনী দেবীর নিকটই ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্র প্রথম লাভ করেন বলিয়া দেবগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। (কেনোপনিষদ্ ১৩–২৮)।

এইরূপে যখন আমরা তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করি, তখন প্রথমে আমাদেরও অভিমান হয়—আমরা নিজ চেষ্টায় এইরূপ উন্নত হইয়াছি, আমরা ধার্ম্মিক হইয়াছি, শাস্ত্রদর্শী হইয়াছি। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ হয়। তখন ক্রমে এ অভিমান দূর হইতে থাকে। আমরা ক্রমে বুঝিতে পারি যে, দেবী ভগবতীর [illegible]

দেবগণ আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদের প্রবৃত্তিকে, আমাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণকে শাস্ত্রীয় পথে পরিচালিত করিয়া, আমাদিগকে অসুরদের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞানের আরও বিকাশ হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবগণের এই শক্তির ও এই চেষ্টার মূল ব্রহ্ম। দেবগণ তাঁহারই ভয়ে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করেন, ও সে কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হন। আমরা পরাবিদ্যার প্রসাদে এ মূল সত্য লাভ করিতে পারি। যদি সেই পরমা বিদ্যারূপিনী দেবী ভগবতী কখন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার এই সাম্ভবী-বিদ্যা আমাদের দান করেন, তবেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মকে ও তাঁহার পরাশক্তিকে বা পরমাপ্রকৃতিকে জানিতে পারি। এই ব্রহ্মশক্তি—ব্রহ্মস্বরূপিনী সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁহাতে ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। এই শক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম নির্গুণ, জগদাতীত প্রপঞ্চোপশম শব। আর এই শক্তি সহিত তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণ—জগতের জীবের নিয়ন্তা পরম করুণাময় মঙ্গলময় পরমেশ্বর শিব। এই পরমা দেবী ভগবতীই আমাদের মধ্যে এই দেবাসুর-সংগ্রামের নিয়ন্ত্রী; তিনিই সমষ্টিশক্তি, কখন তামসা শক্তিরূপিনী মহাকালী, কখন সাত্ত্বিক শক্তিরূপিনী মহালক্ষ্মী। যেথানে যখন যে ভাবে এই শক্তির বিকাশের প্রয়োজন, তখন তিনি সেখানে সেই ভাবেই প্রকাশিত হন। যখন মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বিকাশের সময় আসে, যখন দেবগণ অসুরের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হ'ন, তখন তিনি তামসিক শক্তি সংহত করিয়া অসুরগণকে পরাভূত করিয়া—দেবত্ব বিকাশের বাধা দূর করিয়া দেন। যখন আমাদের এইরূপে দেবত্বের বিকাশ হয়, যখন আমাদের সমুদায় বৃত্তি, সমুদায় ইন্দ্রিয়, শাস্ত্রোদ্ভাসিত হয়, তখন আমাদের ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা হয়; তখন আমরা পরাবিদ্যার প্রসাদে সেই ব্রহ্ম ও তাঁহার সেই পরমাশক্তি তত্ত্ব জানিতে পারি। যাউক সে কথা, এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এই দেবী ভগবতী কর্ত্তৃক অসুর-জয়-তত্ত্ব আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রসাদে বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। এ স্থলে সে তত্ত্ব বিস্তারিত বুঝিবার প্রয়োজন না থাকিলেও সংক্ষেপে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন আছে। দেবকার্য্য-সিদ্ধ্যর্থ কিরূপে দেবীর আবির্ভাব হয়, কিরূপে দেবী দানবোত্থিত বাধা দূর করিয়া জগৎ পরিপালন করেন, মানুষের ক্রম বিকাশ করেন, তাহা আমরা চণ্ডী হইতে অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। চণ্ডীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাখ্যানে তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম উপাখ্যানের নাম মহিষাসুর বধ; আর দ্বিতীয় উপাখ্যানের নাম শুম্ভ নিশুম্ভ বধ। পুরাণে উপাখ্যানচ্ছলে বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক অর্থে আমাদের পুরাণগুলি বেদোক্ত-ধর্ম্মের ব্যাখ্যাপুস্তক। উপাখ্যান দ্বারা ধর্ম্মব্যাখ্যার রীতি শ্রুতিমূলক। ইহাই কঠিন বা জটিল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার প্রাচীন ও সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও সরল পন্থা। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত দেবাসুর-যুদ্ধ উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিবার কালে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "স ইহ শ্রুতি আখ্যায়িকারূপেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি বিবেক-বিজ্ঞানায় কথ্যতে।" ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব আমাদের এই ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি বিজ্ঞান জন্য আমরাও এই মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে উক্ত উপাখ্যান বুঝিতে চেষ্টা করিব। চণ্ডীতেই এই প্রকৃত দেবাসুর-যুদ্ধতত্ত্ব প্রথমে বিস্তারিত রূপে বুঝান আছে। এই ব্রহ্মশক্তি দেবী ভগবতী যে দেবতাদের অধিকার স্থাপন জন্য অসুরগণকে পরাজয় করেন, দেবতাদের নিজশক্তিতে, আমাদের নিজ শক্তিতে তাহা সম্ভব হয় না—তাহা চণ্ডীতেই প্রথমে ও পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই মূলতত্ত্ব চণ্ডীতে আছে বলিয়াই চণ্ডী আমাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ—হিন্দুর প্রত্যহ-পাঠ্য পুস্তক।

সিমলা

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ কোথায় কাটাই, কোথায় কাটাই, ভাবিতেছি—এমন সময় আমার এক বন্ধুবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি যত নাম মনে আসিল, সকল স্থানে যাওয়ারই প্রস্তাব উঠিতে লাগিল; কোন প্রস্তাবই 'ভোটে' টিকিল না। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে (সর্ব্ব কিন্তু

বড়লাটের প্রাসাদ

আমরা দুইজন) স্থির হইয়া গেল, গ্রীষ্মকালটা একেবারে হিমালয়ের উপর কাটাইয়া আসিব; অর্থাৎ সিমলায় যাইব। এত স্থান থাকিতে সিমলাই আমরা পসন্দ করিলাম কেন, তাহাও বলিতেছি। আমার পিতৃদেব তখন সিমলায় অবস্থান করিতেছিলেন। পিতৃ-দর্শন, দেশভ্রমণ এবং নিরাপদে অবস্থান—এমন সুযোগ কি সহজে হয়? তখনই দিন স্থির হইয়া গেল। আমরা নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথা-সময়ে হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ৯-১৫র সময় প্লাব মেল ছাড়িয়া দিল। আমিও নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলাম। পথের কথা বলিয়া আমি আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে চাহি না; কারণ পথের কথা বলিবার জন্য ত লিখিতে বসি নাই—সিমলার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তবে কাল্কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত পথের একটু—অতি সামান্য বর্ণনা করিব।

কাল্কা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির শেষ ষ্টেসন। দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে গাড়ী যখন কাল্কায় পৌছিল, তখন বেলা ৮॥০টা। গাড়ী একঘণ্টা দেরীতে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ী বদল করিয়া কাল্কা-সিমলা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। দার্জ্জিলিঙ্ যাইতে দার্জ্জিলিঙ্-হিমালয়ান রেল অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা তাহারই দ্বিতীয় সংস্করণ। তবে দার-জিলিঙের রেলের অপেক্ষা ইহার বন্দোবস্ত অনেক ভাল।
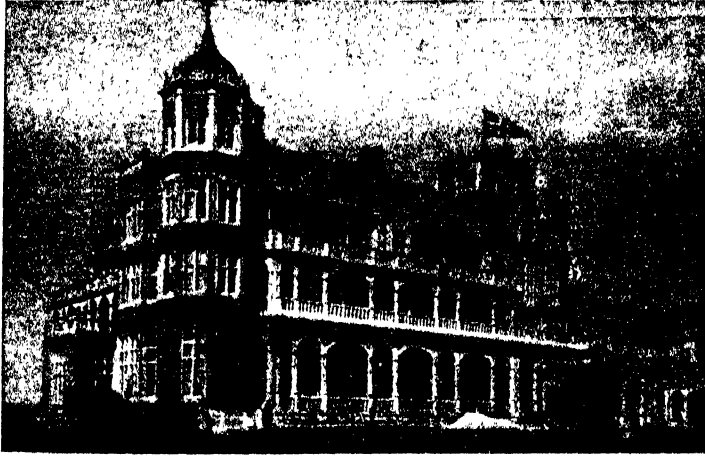
এক কোয়ার্টার পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী ধীরে-ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। এই লাইন ৬০ মাইল বিস্তৃত। এই

যাক্কুর মন্দির

৬০ মাইল পথ চলিয়া গাড়ী কিন্তু ৫,০০০ ফিট উচ্চে উঠিল। পথের মধ্যে আবার ১০৩টী সুড়ঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি সুড়ঙ্গ বেশ বড়। বরোগের সুড়ঙ্গ (দৈর্ঘ্যে ৩,৭৫২ ফিট)—ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কাল্কা হইতে গাড়ী কেবল 'লুপ' দিয়া ধরমপুরে উঠে। এই স্থানের উচ্চতা ৪,৮১৮ ফিট। পথে অনেক স্থলে রেলের লাইন cart-road-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। রেল খুলিবার পূর্ব্বে এই cart-road ই কাল্কা হইতে সিমলা যাইবার একমাত্র রাস্তা ছিল। এই পথ দিয়া টোঙ্গা চলিত বলিয়া, ইহার সাধারণ নাম 'টোঙ্গা রাস্তা' বা "গাড্ডী সড়ক"।
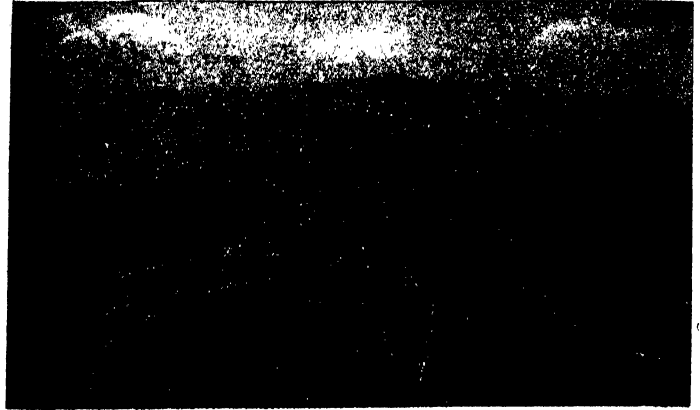
জতুগ পাহাড়

বরোচ ষ্টেসন—কাল্কা-সিমলা রেলওয়ে

সিমলার পথেই কোসৌলী। সকলেই জানেন যে, সমস্ত ভারতের মধ্যে এইখানেই কেবল কুকুরে কামড়াইবার চিকিৎসা হয়। রেল হইতেই Pasteur Institute দেখা যায়। আমরা দেখিয়াই রাখিলাম—কোনদিন অতিবড় শত্রুরও যেন ওখানে আশ্রয় লইতে না হয়। এই ভাবে আমরা যখন সিমলার নিকট পৌঁছিলাম, তখন বেলা ৩টা। আমরা সিমলায় না নামিয়া 'সামার হিল' এ নামিলাম। পূর্ব্বেই পিতৃদেবকে খবর দিয়াছিলাম। তিনি ষ্টেসনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাসা খুঁজিয়া লইবার জন্য কষ্ট পাইতে হইল না। স্নানাহারের পর বিশ্রাম করিয়া আর সেদিন বেড়াইবার অবসর মিলিল না।

সিমলায় কি দেখিলাম, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, এই স্থানের ইতিহাসটা অতি সংক্ষেপে বলি। ১৮১৬ সালের গুর্খা-যুদ্ধের পর সিমলা বৃটিশ-করতলগত হয়। ১৮১৯ সালে Ross (রস্) সাহেব সিমলায় প্রথম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং ১৮২৭ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট এখানে প্রথমে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পর হইতে সিমলা শৈলাবাস বলিয়া মনোনীত হইয়াছে।

লক্কড় বাজার

সিমলার আয়তন ৮১ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে যাক্কু হইতে পশ্চিমে জতগ অবধি সিমলা বিস্তৃত।
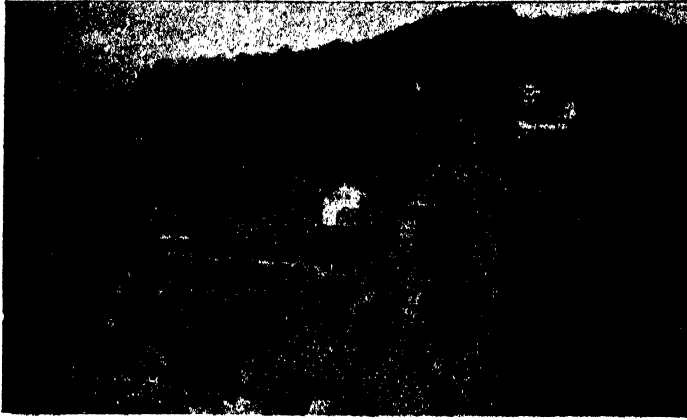
কইথু পাহাড়

সিমলা প্রধানতঃ কয়েকটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ; তন্মধ্যে যাক্কু, Elysium Hill, Observatory Hill, Summer Hill, Prospect Hill এবং জতগর পাহাড়ই প্রধান। যাক্কু এখানকার সর্ব্বোচ্চ স্থান। শুনিলাম, সিমলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এখানেই বরফ পড়ে। ইহার উচ্চতা প্রায় ৯,০০০ ফিট। শিখরদেশে হনুমানজীর মন্দির। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি যখন এখানে পূজা পাইয়া থাকেন, তখন তাঁহার অনুচরগণও যে এখানে দলে-দলে বাসা বাঁধিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি! তাই এখানে যথেষ্ট বাঁদর আছে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, উজির প্রভৃতি নামে তাহাদের কয়েকটী দলপতি আছে। শুনিলাম এখানকার বাঁদরের সংখ্যা সহস্রাধিক। আগন্তুক আসিবামাত্র তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসে। কিছু ছোলা উপঢৌকন না দিলে নিস্তার নাই। তবে কতকগুলি বাঁদর কেবল গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। তাহারা বোধ হয় বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে! মন্দিরের মধ্যে হনুমানজীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। মন্দিরের পার্শ্বেই জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য একটি reservoir ঘর আছে। পূর্ব্বে ইহার মধ্যে জল সঞ্চিত থাকিত। এখন নূতন জল-সরবরাহের কল বসন্তপুরে হওয়াতে আর ইহার ব্যবহার হয় না। বসন্তপুর আমার দেখা হয় নাই; কারণ ইহা সিমলা হইতে ২০ মাইল দূরে।
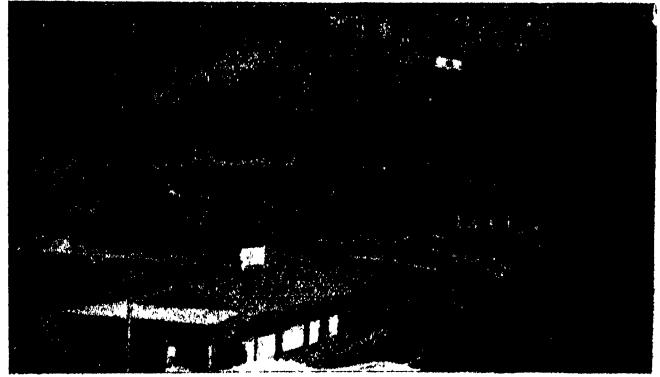
তারাদেবী ষ্টেসন—কাল্কা-সিমলা রেলওয়ে

যাক্কুর শিখরের পথে ধোলপুরের মহারাজের কুঠী আছে। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর 'বাঙ্গলা' আছে। এই পাহাড়ের মধ্যদেশে সিমলা সহর অবস্থিত। যাক্কুর শিখরে যাইবার পথ নামিয়া আসিয়া সহরের মধ্যে পড়িয়াছে। সিম্লার মধ্যে Mall খুব বড় রাস্তা। ইহারই উপর সেক্রেটারী

ফরেণ আপিস

আফিস, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, Army Head Quarters এবং তার ঘর বা টেলিগ্রাফ আফিস। 'মলের' উপর সাহেবি দোকানগুলি এখানকার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই (Mall) 'মল্' ধরিয়া বরাবর পূর্ব্বদিকে গেলে ছোট সিমলা। মলের নীচে মধ্যবাজার (বা Middle Bazar)। এখানে সারি-সারি ঘড়ির দোকান, দরজির দোকান ইত্যাদি অবস্থিত। মধ্যবাজারের নীচে, নীচের বাজার (বা Lower Bazar)। শাক-শবজী, মাছ-মাংস, খাবার প্রভৃতি নীচের বাজারে পাওয়া যায়। নীচের বাজারের বাড়ীগুলা বড় ঘিঞ্জি। এখানে সিমলার সাধারণ লোকের বাস।
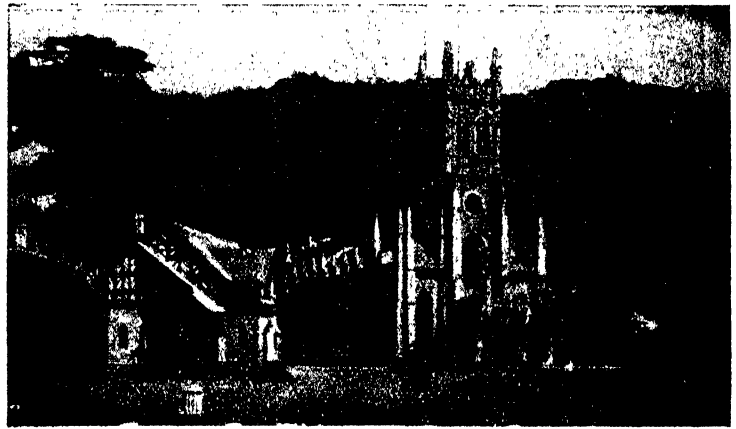
গির্জ্জাঘর

সামার হিল

ছোট সিমলা যায়গাটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। চারিধারে ঝাউ, পাইন প্রভৃতি গাছ; তাহার মধ্যে-মধ্যে এক-একখানি বাড়ী। দূর হইতে নাট্যশালার পটে আঁকা বাড়ী বলিয়া মনে হয়।

ছোট সিমলার পথ ধরিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে কুসুমটির বাজার। এইখানে সিমলার বিখ্যাত বাঁশের লাঠী তৈয়ারি হয়। সিমলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে লক্কড়-বাজার এবং সিজৌলী। লক্কড়-বাজার কাঠের কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। সৌখিন কাঠের খেলানা, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি লক্কড়-বাজারে তৈয়ারি হয়। কারিকর সবই শিখ,—জলন্ধর, সাহারাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী। লক্কড় বাজারের উপরেই (Carstorphan's Hotel) কারস্টরফানস্ হোটেল। লক্কড় বাজারের আরও দূরে সিজৌলীর পথে Ladies' Walk অতিক্রম করিতে হয়। সিজৌলী যাইতে সিমলার মধ্য দিয়া

লরিজ হোটেল

স্নো-ডাউন প্রাসাদে জঙ্গীলাটের আবাস

সাহেব মোসোব্রায় যাপন করিয়া আসেন। মোসোব্রার নীচে 'সিপারি' বা 'সিপি'। প্রতি বৎসর বৈশাখ-সংক্রান্তিতে এখানে খুব বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলাতে সিমলার বহুদূরের লোকও আইসে। আমার ভাগ্যে এই মেলা দেখা হয় নাই। এই সকল স্থান বাক্কুর পাহাড় এবং তাহারই নিকটস্থ উপ-পাহাড়ের (Spur) উপর অবস্থিত।

সিমলা ছাড়িয়া পশ্চিমদিকে আসিতে প্রথমে চওড়া ময়দান।

একটি সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিবারাত্রি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। পথে Commander in Chief বা জঙ্গীলাটের কুঠী আছে। লক্কড় বাজার হইতে পৃথক একটি পথ Elysium Hill বেষ্টন করিয়া মোসোব্রায় গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে নন্দনকানন-তুল্য বাগানযুক্ত অনেক বাটী আছে বলিয়া ইহার নাম Elysium Hill। মোসোব্রায় লাট সাহেবের বাড়ী আছে। কলিকাতার কাছে যেরূপ বারাকপুর লাট সাহেবের বিশ্রামের স্থান, সিমলায়

সিসিল হোটেল

নামই চওড়া ময়দান; কোথাও চওড়াও দেখিলাম না, ময়দানও দেখিতে পাইলাম না—অত উচু পর্ব্বতের উপর ময়দানের স্থান কি আছে? তবে ইহার বহু নীচে Annandale বা কইথুর মাঠ। কইথুর পুরাতন রাস্তা, চওড়া ময়দান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চওড়া ময়দানে Cecil Hotel নামক বিখ্যাত Hotel এবং Foreign Office আছে। Cecil Hotel সিমলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাড়ী, ১০ তোলা উচ্চ; Cart-road হইতে আরম্ভ হইয়া 'মল' পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একই

ইলিসিয়াম পাহাড়

তেমনি মোসেব্রা। প্রায় প্রতি শনিবার, রবিবার লাট

হোটেলের নীচে রেলওয়ে ষ্টেসন। ষ্টেসনের কাছে 'নাভা হাউস' এবং টুটিকাণ্ডি। 'নাভা হাউস' পাঞ্জাবের নাভার রাজার বাসস্থান। তাহারই কাছে অনেক বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছে। বাড়ীগুলির অধিকাংশই নাভার রাজার অধীন। 'নাভা হাউস' এবং টুটিকাণ্ডি, এই দুই স্থানেই অনেক বাঙ্গালীর বাস। সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলো গিয়াছে। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে কইথু। কইথু যাইবার অপর একটী রাস্তা 'মল' হইতে নামিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাতেই কইথুর অধিকাংশ বাটী এবং জেলখানা পড়ে। কইথুর মাঠ

সিমলা—সাধারণ দৃশ্য

আপার 'মল'—গির্জ্জা ও পোষ্ট-আপিস

সিমলা হইতে প্রায় ১০০০ ফিট নিম্নে। এই মাঠে সিমলার ঘোড়দৌড়, 'পোলো', ফুটবল প্রভৃতি খেলা হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড়ের দিনে এখানে বহুলোক আসিয়া জমায়েত হয়। চওড়া ময়দান সিমলার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। জতুগ এবং ছোট সিমলা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় সমান।
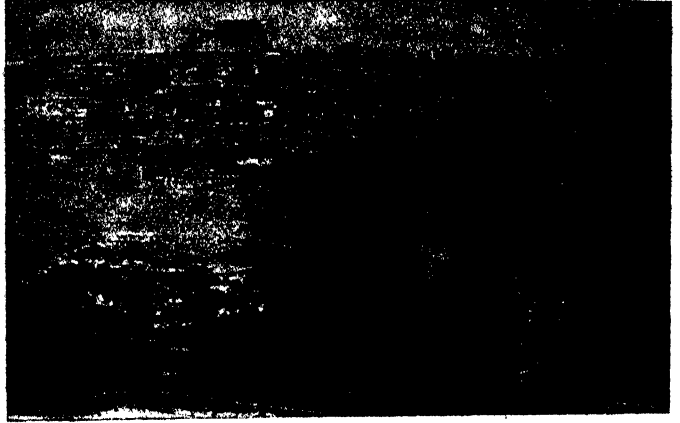
চওড়া ময়দানের পর Observatory পাহাড়। ইহারই শিরোভাগে রাজ-প্রতিনিধির আবাস। পাহাড়ের চারি পাশ হইতে রাস্তা গিয়া লাট সাহেবের বাড়ী উঠিয়াছে। শুনা যায়, এই পাহাড়ের শিরোভাগে Ross সাহেব তাঁহার Observatory রাখিয়াছিলেন বলিয়া তদনুসারে পাহাড়ের নাম হইয়াছে। পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া দুই পাশ দিয়াই রাস্তা গিয়াছে। প্রথমটা পূর্ব্বদিক দিয়া বালুগঞ্জে এবং দ্বিতীয়টা পাহাড়ের অপর পার্শ্ব দিয়া 'সামার হিলে' গিয়াছে। পরে দুইটি রাস্তা Prospect এবং Observatory পাহাড়ের সংযোগস্থলে একত্র মিশিয়াছে। বালুগঞ্জে বাঙ্গালীর বাস একরকম একচেটিয়া। সিমলার নীচের বাজারের মত এখানকার বাড়ীগুলি

কাল্কা ষ্টেসন
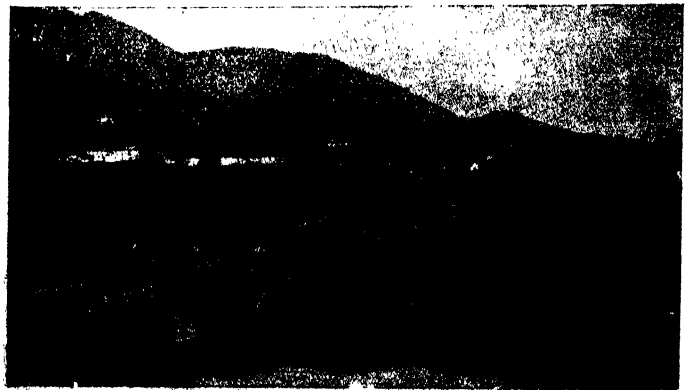
বড় ঘিঞ্জি। গত বৎসর আগুন লাগিয়া ইহার কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে। সামারহিলে সুন্দর-সুন্দর অনেক 'বাঙ্গালা' আছে। এ অঞ্চলের সাধারণ নাম 'চৌলি'। আমাদের মাননীয় সার রাসবিহারী ঘোষ সামারহিলে অবস্থান করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই এখানকার পুরাতন অধিবাসী। হরনাম সিংহ, কপূরতলার মহারাজা, কাবুলের আমীরের envoy প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসীরও আবাস এই সামারহিলে। সামার-হিলের চতুর্দ্দিকে একটী নূতন রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে। সামারহিলের খুব নিকটেই Potter's Hill বা কুমোরদেব পাহাড়। ইহার সাধারণ নাম টাল-পাহাড়।

Observatory Hill বা Summer Hillএর মত Prospect পাহাড়েরও চতুর্দ্দিক দিয়া একটা রাস্তা গিয়াছে। Prospect পাহাড়ে কেবল তিনখানি বাড়ী আছে। Prospectএর শিখরে কামনা দেবীর একটী জীর্ণ মন্দির আছে। Prospect এর শিরোভাগ হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ভূগোলে যে শতদ্রু, বিপাশা প্রভৃতি নদের নামে পড়িয়াছিলাম, তাহা এই Prospectএর শিখর হইতে দেখা যায়। দূরস্থিত তুষারাবৃত পশ্চিম-হিমালয়ের শিখরগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। তুষারের উপর রৌদ্র পড়িয়া সেগুলিকে সুবর্ণের পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। তখন চীৎকার করিয়া গায়িতে ইচ্ছা হয়—

"কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে
সোহাগ ঝুঁটি বেঁধে দেছে ;
আবার রে চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায়
হীরের টোপর পরায়েছে।"

চতুর্দ্দিকেই পাহাড়ের পর পাহাড় গিয়া নানাভাবে দিগন্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তারাদেবীর পাহাড় দেখিলে মনে হয়, যেন একটী ঐরাবত শয়ন করিয়া আছে। রেলের রাস্তা এবং cart-road আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর অবধি গিয়াছে দেখা যায়।—এখান হইতে চলন্ত গাড়ী দেখিলে মনে হয় যেন কেহ ছোট ছেলেদের খেলাঘরের রেল গাড়ীতে দম দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। শতদ্রুর উপর সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্য অপরাহ্নকালে অনেক লোক সমবেত হয়। চক্ষে যাহা এখান হইতে দেখিয়াছি, তাহা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। সিমলার শোভা দেখিবার এমন স্থান আর নাই। যাক্কু Prospectএর শিখর অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত হইলেও, যাক্কুর আশে-পাশে ঘন বন বলিয়া শোভা দেখিবার তত সুবিধা হয় না।

Prospect পাহাড়ের আরও পশ্চিমে জতুগ। জতুগ কাল্কা-সিমলা রেলওয়ের দ্বিতীয় ষ্টেসন। রেলে সিমলা হইতে জতুগের দূরত্ব ৫ মাইল।—কিন্তু হাঁটাপথে জতুগ ৭ মাইলের কম নহে। জতুগে একটা পাহাড়ের মাথায় কেল্লা অবস্থিত। কেল্লাটা তত বড় নহে। এখানে Sussex Mountain Artillery নামক একটা গোরার দল আছে। কেল্লার কাছে একটা মাঠ আছে। তাহার উপর তারহীন বার্ত্তাবহের (Wireless Telegraphy) কয়েকটা খুঁটা আছে। জতুগ সিমলার পশ্চিমদিকে শেষ সীমানা। জতুগের পরবর্ত্তী সকল স্থানকে হিন্দীতে "বার পাওর কা বাহার" বলে। জতুগ হইতে কাংড়া যাইবার হাঁটারাস্তা গিয়াছে। জতুগের পরের ষ্টেসন তারাদেবী। সিমলায় আসিবার সময় এখানে আগন্তুকের নাম, ধাম, আসিবার উদ্দেশ্য ইত্যাদি সব লিখিয়া লয়। তারাদেবী পাঞ্জাব প্লেগ-Inspectionএর একটা বড় আড্ডা।

আনানডেল—সিমলা

সামারহিলের বহু নীচে 'চ্যাডউইক' জলপ্রপাত।— আমরা একদিন 'চ্যাডউইক' দেখিতে গিয়াছিলাম।—

যাইবার রাস্তা ভাল নাই ; অনেকস্থলে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। তাহার উপর, পথে বন্য-কুক্কুরের উপদ্রব আছে। সামারহিল হইতে চ্যাডউইক প্রায় ২,০০০ ফিট নিম্নে। Potter Hill অর্থাৎ টাল পাহাড় এবং সামার-হিল সেই যায়গায় একত্র মিশিয়াছে। জল প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ হইতে পড়ে। বর্ষাকালে ঝোরার শব্দ তিন, সাড়ে-তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায়।—আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন গ্রীষ্মকাল ; কাজেই জল খুব সামান্য ছিল, এবং ঝির-ঝির করিয়া পড়িতেছিল। ইহাই সিমলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঝোরা। ঝোরার কাছে একটী গ্রাম আছে। শুনিলাম, এই ঝোরার জলেই পাঞ্জাবের 'গাগর' নদী কতক-পরিমাণ পুষ্ট হয়।

চওড়া ময়দান—সিমলা

সিমলায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, এক এক করিয়া তাহা সব বলিয়াছি। এখন আর দুই-চারিটা কথা বলিয়া আমি প্রবন্ধ শেষ করিব। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যার কিছু স্থিরতা নাই। সিমলা-Seasonএর সময় লোকসংখ্যা ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্রের ন্যূন নহে। তবে বরফের সময় লোকসংখ্যা ১০,০০০ হইবে কি না সন্দেহ। নিম্নশ্রেণীর প্রায় সকল লোকই কাঙড়ার অধিবাসী ; তবে কুলি কিছু 'ল্যাজকী' আছে। চিরকেলে অধিবাসীর সংখ্যা খুব কম। বাঙ্গালীরা এখানে ছোট রকম উপনিবেশ করিয়া বসিয়া গিয়াছেন। বালুগঞ্জ, সিমলা, এবং নাভা হাউসে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী।

রেল হইবার পূর্ব্বে দূরদেশে যাইবার একমাত্র যান ছিল টোঙ্গা। এখন রেল হইয়া টোঙ্গা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। বিশ-পঁচিশখানা মোটর-কার ও টোঙ্গা রাস্তায় চলে। এখানকার সাধারণ যান রিকসা এবং অশ্ব।—রিকসা বোধ হয় অনেকেই কলিকাতায় দেখিয়াছেন। এখানকার রিকসাগুলা কলিকাতার রিকসার চেয়ে বড় এবং অধিক ভারী ; এজন্য প্রতি রিকসায় তিন চারিজন কুলি আবশ্যক হয়। কোনও ভারী জিনিস লইয়া যাইবার জন্য অশ্বতরের খুব ব্যবহার হয়।

চাষের মধ্যে গম, ভুট্টা এবং আলু প্রধান। শীতকালটায় গমের চাষ হয়। বৈশাখ মাসে গম কাটা হইলে আলু এবং ভুট্টার চাষ হয়।

ফলের মধ্যে আপেল, নাসপাতি, পিচ, আপ্রিকট, আতু, এবং আখ্‌রোট প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং খুব সস্তা। এখানে দেখিয়াছি, বাঙ্গালার চেয়ে অল্প আয়াসেই উত্তম চাষ-আবাদ হয়। এ সব দেশে Terraced Cultivation বা স্তবকে স্তবকে চাষ হইয়া থাকে। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি এবং তুষারপাত ১০ ইঞ্চি।

সিমলা এবং দার্‌জিলিঙের মধ্যে কোন যায়গার দৃশ্য অধিক মনোরম, তাহা আমার পাঠক-পাঠিকাগণ মীমাংসা করিয়া লইবেন। অবশ্য দুই স্থানের দৃশ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যাঁহারা দুইটী যায়গাই দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে ভাল বিচার করিতে পারিবেন। আমি অতি সংক্ষেপে সিমলার কথা বলিলাম। সকল দৃশ্যের বর্ণনা করিতেও পারি নাই—সে সামর্থ্যও নাই। লেখার ত্রুটি ছবির দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বোঝাপড়া করিবেন।

হিমালয়ের অপর পার

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ]

(২)

চীন-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ ইয়াঙ্কি-স্থানের সাম্রাজ্য হইতে অপসৃত হন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বোর্বোঁ রাজবংশ সিংহাসন হইতে তাড়িত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার হাপ্‌স্‌বুর্গবংশ ইতালী এবং জার্ম্মাণি এই দুই প্রদেশকে হাতছাড়া করিতে বাধ্য হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনা গণ-শক্তির প্রভাবে মাঞ্চু সম্রাট্ এই ধরণের শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছেন। চীনের শেষ সম্রাট তখন নাবালক শিশু মাত্র।

মাঞ্চুবংশ (১৬৪৪—১৯১২) যখন চীনে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন মোগল-ভারতের গৌরবযুগ। মাঞ্চুরা মুক্‌ডেন হইতে পিকিঙে আসেন। যে বংশ ধ্বংস করিয়া মাঞ্চু বীর সম্রাট্ হন, তাহার নাম মিঙ্‌বংশ (১৩৬৮—১৬৪৪)। মিঙ্-বংশের স্থাপয়িতা একজন সাধারণ লোক মাত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মোগলবংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। মোগলবংশের কাল ১২৬০ হইতে ১৩৬৮ পর্য্যন্ত। এই বংশের প্রবর্ত্তক কুব্‌লা খাঁ সুপ্রসিদ্ধ। মোগলেরা ভারতবর্ষে মুসলমান, কিন্তু চীনে বৌদ্ধ। ভারতীয় বাবর, আকবর, আওরঙজেব ইত্যাদি সম্রাটগণ কুবলা খাঁর নিকট-আত্মীয়। মোগলবংশে ৯ জন রাজা হইয়াছিলেন, মিঙবংশে ১৭ জন রাজা হইয়াছিলেন। মাঞ্চুবংশের রাজসংখ্যা ১০। এই তিন বংশেরই প্রবর্ত্তকগণ রণ কুশল নেপোলিয়ন পদবাচ্য ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মাঞ্চু-সম্রাট কাংঘি (Kanghi) আমাদের আওরঙজেব ও য়ুরোপের চতুর্দ্দশ লুইয়ের সমসাময়িক।

মিঙ্-বংশ প্রবর্ত্তক তাই-চু বিদেশীয় মোগলবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেইরূপ বর্ত্তমানে সান্-য়াৎ-সেন বিদেশীয় মাঞ্চুবংশ ধ্বংস করিয়াছেন। মিঙ্-বংশ প্রবর্ত্তক তাই-চু একজন নগণ্য লোক—রাজরাজড়াদের রক্ত তাঁহার ধমনীতে একবিন্দুও ছিল না। সানের জন্মও অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারেই হইয়াছে। তাই চু সম্রাট হইয়াছিলেন; সান্ অল্পকালের জন্য স্বরাজের সভাপতি বা পঞ্চায়তের মণ্ডল মাত্র ছিলেন। তাই-চুর মোগল ধ্বংস আর সানের মাঞ্চুধ্বংস এক শ্রেণীর অন্তর্গত। এই কারণে মাঞ্চুবংশ সিংহাসন হইতে সরাইবার পরসান্ মিঙ্ সম্রাটগণের গোর-স্থানে গমন করেন। সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশী সম্রাট্‌গণের প্রেতাত্মার নিকট সান্ এবং তাঁহার সহযোগিগণ বর্ত্তমান স্বদেশোদ্ধারের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। সান্ স্বয়ং খৃষ্টান—কিন্তু দেশের কাজে জনগণের চিরাভ্যস্ত কনফিউশিয় প্রথা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন প্রথমবার বিদেশীয়-গণের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর-ভারতও মুসলমান-দিগের হস্তগত হইয়াছে—দক্ষিণ-ভারতে তখনও মুসলমান-অধিকার বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীনে এবং ভারতে জনগণের স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতার আমলে দুই ভূখণ্ডেই যুগে-যুগে ক্রমিক উন্নতি দেখা দিয়াছিল। এই উন্নতির বেগ কখনই বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। রাজবংশের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সত্য, স্বাধীন চীন এবং স্বাধীন ভারত বহুবার বহু খণ্ড চীনে এবং খণ্ড-ভারতে বিভক্ত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ধারা এবং চীনা সভ্যতার ধারা সুপ্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমবিস্তৃতি ও ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছিল। চীনা সভ্যতার চরম বিকাশ দ্বাদশ শতাব্দীর সুঙ্ আমলেই দেখিতে পাই।

আর সমসাময়িক বঙ্গের সেন আমলও স্বাধীন হিন্দু-সভ্যতার এক গৌরবযুগ। সাহিত্য-হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দী সমগ্র ভারত ভরিয়াই ভারতবাসীর অগষ্টান "এজ" বা স্বর্ণযুগ। চীনের দ্বাদশ শতাব্দীকেও লোকেরা অগষ্টান

"এজ" বলে। এই ক্রমবিকাশের ধাপগুলি এখন বুঝা যাউক।

চাও আমলে চীনের দ্বাপর শেষ ও কলির আরম্ভ দেখিয়াছি—এক্ষণে কলির শেষ দেখিলাম। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৯ হইতে খৃষ্টীয় ১২৬০ পর্য্যন্ত দেড় হাজার বৎসর। এই দেড় হাজার বৎসরের কথাই চীনা-জাতির গৌরবের কথা। এই গৌরবেই চীনের গৌরব। চীনা সভ্যতা বলিলে আমরা সাধারণতঃ এই দেড় হাজার বৎসরের চীন-কথাই বুঝিয়া থাকি।

(১) চীনবংশ (খৃঃ পূঃ ২৪৯-২১০)। চাও আমলে বর্ত্তমান চীনের আধখানামাত্র সভ্য-গণ্ডীর অন্তর্গত ছিল। হোয়াং-হো এবং ইয়াংসি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জনপদে সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইয়াংসির দক্ষিণে অর্থাৎ চীনের "দাক্ষিণাত্যে" তখনও "বর্ব্বরমণ্ডল" বিরাজমান। আর উত্তরে মঙ্গোলিয়া এবং পশ্চিমে তুর্কীস্থান ত চীনা "আর্য্য"-গণের ধারণায় "দস্যু"জাতীয় শত্রুগণের আবাসভূমি! এই বর্ব্বর-সমাবৃত "ভূ-মধ্য" দেশে চাও রাজবংশ বাদশাহী করিতেন—কিন্তু তাঁহাদের এক্তিয়ার বড় বেশী ছিল না। তাঁহাদের সেনাপতি, লাঠিয়াল, জমিদার এবং কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব স্থানে একপ্রকার স্বাধীন নরপতি হইয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরণের স্বাধীন রাষ্ট্রকেন্দ্র কোন সময়ে শতাধিক, কোন সময়ে পঁচাত্তর, কোন সময়ে পঞ্চাশেরও অধিক ছিল। কাজেই "মাৎস্যন্যায়ের" অবাধলীলা চাও-আমলে প্রকটিত হইয়াছিল।

অবশেষে একটি প্রদেশ সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। তাহার নাম চীন (Tsin)। চীনের জমিদার অন্যান্য সকলকে কাবু করিয়া চাওবংশের উচ্ছেদ-সাধন করেন। সমগ্র চীনমণ্ডল এতদিনে প্রথমবার ঐক্যবদ্ধ হইল। এই ঐক্য-সংস্থাপক কর্ম্মবীর চীনের "সর্ব্বপ্রথম একরাট্" উপাধি গ্রহণ করিলেন। (খৃঃ পূঃ ২২১)। চীনা ভাষায় এই উপাধি শি-হোয়াংতি (শি=প্রথম, হোয়াংতি=সম্রাট্)। এতদিনে দেশের নাম "চীন" হইল। পূর্ব্বে নাম ছিল "ভূম-ধ্য" (দুনিয়ার মধ্যবর্ত্তী) দেশ। ইংরাজিতে "মিড্‌ল কিংডম"—চীনাতে "চুং-কুয়া"।

চীনেশ্বরগণ সম্রাট হইবামাত্র এক-একটা উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আসল নামে তাঁহারা পরিচিত হন না। ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যেও কেহ-কেহ এইরূপ উপাধি গ্রহণ করিতেন। বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য, বালাদিত্য, নরেন্দ্রাদিত্য ইত্যাদি শব্দ সম্রাটগণের উপাধিবাচক, নামবাচক নয়। চীনাদের দস্তুর এই যে, কোন সম্রাটই তাঁহার নিজ নামে পরিচিত হইবেন না। যতগুলি চীন সম্রাটের নাম আমরা জানি, সবগুলিই উপাধিমাত্র। বর্ত্তমানে স্বরাজ-সভাপতি য়ুয়ান্-শি-কাইও সম্রাট হইতে চেষ্টা করিবার সময়ে প্রথমেই একটা উপাধি লইয়াছিলেন। তাঁহার কপালে উহার ভোগ হইল না।

সমগ্র চীনমণ্ডলের প্রথম অধীশ্বর ঘোষণা করিলেন—"ওহে ভূমধ্যদেশের অধিবাসিগণ, আমার পূর্ব্বে তোমাদের কোন একরাট্ ছিলেন না। আমাকেই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম রাজরাজেশ্বর বলিয়া জানিও। আমার পূর্ব্বেকার সকল ইতিহাস ভুলিয়া যাও। আমি এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিলাম। আমার জন্মভূমি চীন জেলার নাম হইতে এই যুগের নামকরণ হইবে। তোমাদের দেশটাও আগাগোড়া আমার জন্মভূমি অনুসারে চীন নামে পরিচিত হইবে। আজ হইতে তোমরা সকলে চীনা; তোমাদের দেশের নাম চীন, এবং এই যুগের নাম চীন-শি-হোয়াংতির যুগ। আমার পরবর্ত্তী সম্রাটগণ দশহাজার পুরুষ পর্য্যন্ত এই যুগ হইতেই কালগণনা করিবেন। আমার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় শি-হোয়াংতি নামে পরিচিত হইবেন—তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় শি-হোয়াংতি হইবেন। এইরূপ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ চলিবে। ইহাই আমার আদেশ।"

আমাদের মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত (খৃঃ পূঃ ৩২২—২৯৮) এইরূপ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের নাম হইত মগধ, আর ভারতবাসীরা পরিচিত হইত মগধ সন্তান বলিয়া, আর চন্দ্রগুপ্তের নাম এবং উপাধি হইত মগধ-শি-হোয়াংতি বা মগধ-প্রথম-সম্রাট। বঙ্গের পালবংশ আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল বা দেবপালের চীনা খেয়াল চাপিলে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের নাম হইত বরেন্দ্র; কেন না, বরেন্দ্রী পালরাজগণের পিতৃভূমি। আর গোপাল বা ধর্ম্মপালের নাম হইত বরেন্দ্র-শি-হোয়াংতি বা বরেন্দ্র-প্রথম-সম্রাট। সেইরূপ বিজয়সেন ইচ্ছা করিলে গোটা বাঙ্গালাদেশকে "রাঢ়" নাম দিতে পারিতেন এবং নিজের নাম দিতে পারিতেন রাঢ়-

শি হোয়াংতি বা রাঢ়-প্রথম-সম্রাট। কারণ রাঢ় সেন-বংশের জন্মভূমি।

শি-হোয়াংতি চীনের "দাক্ষিণাত্য" দখল করিতে আসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বোধ হয় মুখে ফার্ম্মাণ জারি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর-দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। মোগল বর্ব্বরদিগের আক্রমণ হইতে চীনমণ্ডল রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী চাও আমলে "বিরাট প্রাচীরের" কিয়দংশ স্থানে-স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শি-হোয়াংতি সেই প্রাচীর সম্পূর্ণ করেন। লোকেরা শি-হোয়াংতিকেই বিরাট্ প্রাচীর নির্ম্মাণের ষোল আনা বাহবা দিয়া থাকে।

শি-হোয়াংতি নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ডেঁপো কন্‌ফিউসিয় পণ্ডিতগণের বাক্-বিতণ্ডায় তাঁহার কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছিল। এই কারণে চীনের পণ্ডিতবংশ ধ্বংস করা তাঁহার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি। চীনের কোথাও এক পংক্তি প্রাচীন সাহিত্য আর থাকিল না। মান্ধাতার আমল হইতে যত রচনা নামিয়া আসিয়াছিল, সকলগুলিকে অগ্নিসাৎ করিয়া শি-হোয়াংতি ঠাণ্ডা হইলেন। নেপোলিয়ান বা আলেক্-জাণ্ডার এই চীনা নেপোলিয়ানের নিকট হার মানিবেন, সন্দেহ নাই। সকল দিক হইতেই শি-হোয়াংতি চীনে একটা নবযুগ আনিলেন।

শি-হোয়াংতি (খৃঃ পূঃ ২৪৯-২১১) আমাদের অশোকের (খৃঃ পূঃ ২৭০-২৩০) সমসাময়িক। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয় ইতিহাসের শি-হোয়াংতি বা সর্ব্বপ্রথম একরাট্। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা চীনের মতই ছিল। মাৎস্যন্যায় দূর করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতেশ্বর হন। অতএব চীনের চন্দ্রগুপ্ত এবং ভারতের শি-হোয়াংতি অর্থাৎ এশিয়ার দুই সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়ান প্রায় একসময়কার লোক। উভয়েই দিগ্‌বিজয়ী আলেক-জাণ্ডারের পরবর্ত্তী। খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য দিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, ভারতীয় শি-হোয়াংতির প্রায় শত বর্ষ পরে চীনা শি-হোয়াংতির কাল। আর আলেক্‌জাণ্ডারের ঠিক পরেই ভারতীয় প্রথম নেপোলিয়ানের অভ্যুদয়।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে—সেই বৎসরই চন্দ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট্ হন। চীনের চন্দ্রগুপ্ত শি-হোয়াংতি হন ২২১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সুতরাং ভারত সাম্রাজ্য চীন-সাম্রাজ্য অপেক্ষা শতবর্ষ প্রাচীন। বস্তুতঃ কাল-হিসাবে আমাদের চন্দ্রগুপ্ত দুনিয়ার সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্। প্রাচীনতম কালের মিশর ও ব্যাবিলনের কথা সম্প্রতি ভুলিয়া যাইতেছি। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ম্যাসিডন-বীর আলেক্‌জাণ্ডারই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁহার দিগ্‌বিজয়ের ফলসমূহ ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; অথচ সেই সময়ে হিন্দু নরপতি সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হন। তখনও চীনে চাও আমলের মাৎস্যন্যায় চলিতেছে; আর সুদূর পশ্চিমে রোমাণ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কেহ করিতে অসমর্থ। কাজেই হিন্দু-সাম্রাজ্যকে জগতের সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্য বলিতে দ্বিধা নাই।

চীনে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, শি হোয়াংতি ভারতীয় মৌর্য্যবংশের লোক। এই গল্পের কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের সঙ্গে চীনের কোন প্রকার লেনদেনই চৌন-আমলে (খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে) বোধ হয় সাধিত হয় নাই। এমন কি চীনেরা স্বদেশ ছাড়িয়া মধ্য-এশিয়ায় আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। এখন পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বাহির হয় নাই। মধ্য-এশিয়ায় চীনাদের কারবার সম্বন্ধে আন্দাজ চলিতে পারে মাত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষ এই আমলে এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ম্যাসিডনীয়া, গ্রীস, এশিয়া-মাইনার, সীরিয়া, ও মিশর এই কয়দেশেও অশোকের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ সকল জনপদের অধিবাসি-গণের সঙ্গে ভারতবাসীর লেনদেন অনেক হইত। অশোকা-নুশাসনে তাহার পরিচয় পাই; বিদেশীয় সাহিত্যেও তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু চীনের সংলগ্ন মধ্য-এশিয়ায় অশোকের প্রভাব কতখানি ছিল,তাহা সবিশেষ জানিতে পারা যায় না।

অশোক দুনিয়ার সর্ব্বত্র নিজের নাম ও নিজ সাম্রাজ্যের নাম জাহির করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে চীনের শি-হোয়াংতি ব্যতীত জগতে তাঁহার সমান নরপতি আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীর রাষ্ট্রমণ্ডলে অশোকের নাম-ডাক শি-হোয়াংতি অপেক্ষা বেশী ছিল। বস্তুতঃ শি-হোয়াংতিকে চীনের বাহিরে কেহ জানিত না। আর ভারতীয় অশোক দুনিয়ার রাজ-রাজড়ামহলে সম্মানিত হইতেন।

ভারতের কনসাল, রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী দুনিয়ার বড় বড় নগরে বসবাস করিতেন। জগতের প্রভাব ভারতে এবং ভারতের প্রভাব জগতে ছড়াইয়া পড়িত। আমাদের পাটলিপুত্র-নগর সেই সময়ে বর্ত্তমান লণ্ডনের মর্য্যাদা পাইত। বিভিন্ন দেশের নানাভাষা-ভাষী কন্সাল, য়্যাম্বাসেডার, রাষ্ট্রদূত, দার্শনিক, চিকিৎসক ও ব্যবসাদার পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। অশোক এক বিরাট বিশ্ব-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাকে একজন বৈরাগ্য-ব্রতধারী, কামকাঞ্চনকীর্ত্তিবর্জ্জনকারী, নির্লোভ ধর্ম্ম-প্রচারক বিবেচনা করা নিতান্ত ভুল। অশোককে যশাকাঙ্ক্ষী প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্রবীররূপে না দেখিলে খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতেতিহাস বুঝা অসম্ভব। পরবর্ত্তীকালে প্রশিয়ার ফ্রেডারিক-দি-গ্রেট, রুশিয়ার পিটার দি গ্রেট, এবং জাপানের মুৎসুহিতো-মিকাডো ঠিক অশোকেরই আদর্শানুযায়ী প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রবীর হইয়াছেন। ইঁহারা কেহই "প্রতিষ্ঠা"কে "শূকরী-বিষ্ঠা"র ন্যায় বর্জ্জনীয় বিবেচনা করিতেন না।

(২) হান্‌বংশ (খৃঃ পূঃ ২১০-খৃঃ অঃ ২২০)।

(ক) পশ্চিম হান্‌বংশ (খৃঃ পূঃ ২১০-খৃঃ অঃ ২৫)। এই বংশে কতিপয় ক্ষমতাবান সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সভ্যতার সকল বিভাগে এই যুগে চীনের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এইজন্য চীনেরা অনেক সময়ে "হান্-সন্তান" বলিয়া গৌরব বোধ করে। ষষ্ঠ নরপতি উ-তি (Wu-Ti) সর্ব্বপ্রসিদ্ধ হান্ সম্রাট্ (খৃঃ পূঃ ১৪০-৮৭)। উতি শব্দের অর্থ "দিগ্‌বিজয়ী"। অনেক চীন-সম্রাটের এই উপাধি দেখা যায়। এই রাজত্বকালের দুইটি কথা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ মধ্য-এসিয়া এবং প্রতীচ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত চীনেরা তাঁহার আমলে অভিযান পাঠাইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ১০৫-৯০ বর্ষের মধ্যে কতিপয় সেনাপতি এইসকল অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাতার জাতীয় হুনদিগের সঙ্গে সংঘর্ষ এইসকল অভিযানের কারণ। ইতিপূর্ব্বে চীনারা চীনমণ্ডল ছাড়িয়া কখনও বাহিরে আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। উ-তির আমলের দ্বিতীয় কথা হিন্দু সাহিত্যসেবিগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। খৃঃ পূর্ব্ব ৯০ অব্দে ছি-মা-চিয়েন (Sze-Ma-Chien) চীনের ইতিহাস রচনা করেন। এই ধরণের ইতিহাস-গ্রন্থ সংস্কৃত-সাহিত্যে একখানাও নাই। ছির ইতিহাস চীনের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এজন্য গ্রন্থকারকে চীনের "হেরোডোটাস" বলা হইয়া থাকে। হেরোডোটাস গ্রীসের সর্ব্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৩৪ জন্ম)।

"পশ্চিম হান্‌বংশের আমলে ভারতবর্ষে কোন প্রবলপ্রতাপ নরপতির রাজত্ব ছিল না। তাতার জাতীয় শক এবং য়ুয়েচিগণ মধ্য-এশিয়ার গ্রীক-রাষ্ট্রপুঞ্জ ধ্বংস করিতে-করিতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা তাতারজাতীয় হুনগণের আক্রমণে ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই য়ুয়েচিদিগের সাহায্যেই হান্ সম্রাট উতি হুন-বন্যা হইতে চীন-সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

এই যুগে য়ুরোপে রোমীয় বীরগণ দিগ্‌বিজয় করিতেছিলেন। পরে তুমুল ঘরোয়া লঙ্কাকাণ্ডের পর রোমাণ জাতির "স্বরাজ"প্রথা বিনষ্ট হয় ; এবং তাহার স্থানে "সাম্রাজ্য"-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। অগষ্টাস সীজার "সাম্রাজ্যের" প্রথম অধীশ্বর হন (খৃঃ পূঃ ২৭-১৪ খৃঃ অঃ)। এই যুগকে রোমীয় (ল্যাটিন) সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সম্রাট অগাষ্টাসের নাম অনুসারেই জগতের যে কোন স্বর্ণযুগের নাম দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পারিভাষিক অনুসারে আমাদের বিক্রমাদিত্যের আমলকেও অগাষ্টান "যুগ" বলা হইবে।

(খ) পূর্ব্ব হান্‌বংশ (খৃঃ অঃ ২৫-২২০ খৃঃ অঃ)। এই আমলে রাজধানী পূর্ব্বদিকে স্থানান্তরিত হয়। পশ্চিম হান্‌বংশের সাম্রাজ্য-গৌরব এই দুইশত বৎসর চীনারা ভোগ করে নাই। অশান্তি, বিদ্রোহ, দুর্ব্বলতা চীনে সর্ব্বদা বিরাজ করিত।

এই বংশের সম্রাট্ মিঙ্-তি একটা স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্ন অনুসারে তিনি মধ্য-এসিয়ায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের ফলে সংস্কৃত পুঁথি, বুদ্ধমূর্ত্তি এবং শাক্যসিংহের মত চীনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় (খৃঃ অঃ ৬৭)।

মধ্য-এশিয়া এই সময়ে ভারতবর্ষের একটা প্রদেশমাত্র ছিল, বলা যাইতে পারে। ভারতের ভাষা, লিপি, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, ধর্ম্ম, টোল, সবই মধ্য-এশিয়ায় সুপ্রচলিত ছিল। আর মধ্য-এশিয়ার লোকজন এবং উত্তর-ভারতের লোকজন একই গোত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহারা সকলেই তাতার জাতীয়। অথবা অন্ততঃ তাতার রক্ত-মাংসে গঠিত।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সকল অঞ্চলে তাতারগণের উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে য়ুয়েবি (ইণ্ডো-তাতার) বা কুষাণ নরপতি কাণিষ্ক (খৃঃ ৭৮-১২৩?) এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। কাণিষ্কের সন তারিখ এখনও সুনির্দ্ধারিত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ এই নরপতির প্রভাবে কাশগর, ইয়ারকন্দ ও খোতান ইত্যাদি জনপদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। কাণিষ্কের সাম্রাজ্যের বাহিরেও য়ুয়েবি অথবা অন্যান্য তাতার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। সেই সমুদয়েও কাণিষ্কের প্রভাব বিস্তৃত হইত। সুতরাং তাতার জাতির সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবর্ষের আয়তন সত্যসত্যই বাড়িয়া গিয়াছিল। চীনাদের "পূর্ব্ব হ্যান্" আমলে মধ্য-এশিয়ায় "বৃহত্তর ভারতে"র প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের এক প্রধান কথা। এই কার্য্যে তাতার বা মঙ্গোলিয় জাতির কৃতিত্বও বিশেষ স্মরণীয়।

হিন্দু তাতারগণের গৌরব-কথা এতদিন মরুভূমির বালুকার ভিতর লুকাইয়া ছিল। সম্প্রতি ষ্টাইনের (Stein) "Ruins of Desert Cathay" বা "মরু চীনের ধ্বংসাবশেষ" গ্রন্থে তাহার বিবরণ বাহির হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য্য হইয়াছে এবং হইতেছে। আবিষ্কৃত তথ্যসমূহের কিয়দংশ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই সময়ে দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্ররাজবংশের (খৃঃ পূঃ ২০০ খৃঃ অঃ ২২৫) প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দু কুষাণ এবং অন্ধ্র উভয়েই রোমীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে কারবার চালাইতেন। সুতরাং স্থলপথে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ ছিল, আর স্থলপথে এবং জলপথে রোমানজাতির সঙ্গে হিন্দুদিগের কারবার চলিত। ট্রাজানের (Trajan) আমলে (খৃঃ অঃ ৯৮-১১৭) রোমীয় সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি হইয়াছিল। স্থলপথের কারবারে মধ্য-এশিয়ার স্থান সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য। কুচা এবং খোতানের বাজারে-বাজারে রোম, ভারত এবং চীনের সকল প্রকার দালাল ও ব্যাপারীরা সম্মিলিত হইতেন। মধ্য-এশিয়ার হাটে আদার ব্যাপারী হইতে আধ্যাত্মিক মালের আড়তদার পর্য্যন্ত সকল ব্যবসায়ীরই লেনদেন চলিত। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের বিনিময় এই মধ্য-এশিয়ায়ই প্রধানভাবে সাধিত হইত। এই যুগে মধ্য এশিয়া নগণ্য জনপদ ছিল না—এখানকার মেলায় এশিয়া-য়ুরোপের সকল মাল কেনা-বেচা হইত। বর্ত্তমান যুগে এই কথা বুঝিতে পারা অতি দুরূহ। কিন্তু হ্যান্-আমলে চীন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা ছিল, আবার চীন হইতে এসিয়া-মাইনারের রোমাণ সাম্রাজ্য পর্য্যন্তও বাণিজ্য-পথ ছিল। কাজেই গ্রীক, রোমাণ, মিশরীয়, সীরিয়, পারশী, হিন্দুস্থানী, চীনা, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শৈব, কণষ্ঠিশিয়া ইত্যাদি ছত্রিশ জাতির সম্মিলন ঘটিতে পারিত।

(৩) মাৎস্য-ন্যায়ের যুগ (খৃঃ অঃ ২২০-৫৮৯)।

(ক) প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০ খৃষ্টাব্দে হ্যান্ বংশের লোপ হয়। এই সময় চীনে এক সঙ্গে তিন বংশ রাজত্ব করেন। হ্যান-বংশের প্রভুত্ব সঙ্কীর্ণ জনপদে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরে উই (wei) বংশ এবং দক্ষিণ উ (wu) বংশ স্থাপিত হয়। ২৬৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনটা খণ্ড-চীনের আমল।

(খ) "পশ্চিম-চীন" বংশ (খৃঃ অঃ ২৬৫—৩২২)। হুনেরা এই আমলে চীনের নানা অঞ্চল দখল করিয়া বসে। অখণ্ড চীনের সম্রাট্ এই বংশে কেহ ছিলেন না বলিলেই চলে। খাঁটি চীনারা ইয়াংসির দক্ষিণে কোনমতে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

(গ) "পূর্ব্ব-চীন"বংশ (খৃঃ অঃ ৩১৩—৪১৯)। এই আমলে ফাহিয়ান ভারতে আগমন করেন। ভারতমণ্ডল হইতেও বহু প্রচারক চীনে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধের নাম কুমারজীব। ভারতবর্ষে তখন দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের যুগ। এই যুগে চন্দ্রবর্ম্মা নামক একজন ভারতীয় নেপোলিয়ানের দিগ্‌বিজয় কথাও অবগত হওয়া যায়। রোমাণ সাম্রাজ্য এই সময়ে দুই-টুকরা হইয়াছে (৩৯৫ খৃঃ অঃ)। পুরাতন অংশের রাজধানী রোমেই রহিল—নূতনের রাজধানী হইল রুম বা কনষ্টান্টিনোপলে। পূর্ব্ব চীন বংশের শেষ ভাগে হুণ সেনাপতি য়্যাটিলা (Attila) রোমাণ সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সূত্রপাত করেন (৪১০)।

(ঘ) "উত্তর-সুঙ্বংশ (খৃঃ অঃ ৪২০—৭৯)। মাৎস্য-ন্যায়ের এবং বিদেশীয় আক্রমণের সকল লক্ষণই এই যুগে বিরাজমান। হুণেরা উত্তর-চীন বা চীনা "আর্য্যাবর্ত্তের" নানাস্থানে নূতন-নূতন রাজ্য-গঠন করিয়া বসিয়াছেন। ভারতবর্ষে গুপ্ত-সম্রাটগণের গৌরব-যুগ চলিতেছে। য়ুরোপে রোমাণ সাম্রাজ্যের পুরাতন অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে (খৃঃ ৪৫৫—৭৬)।

(ঙ) চি-(Tsi) বংশ (৪৭৯—৫০২)। নান্‌কিঙে এই বংশের রাজধানী ছিল। এই সময়ে হুণ উপদ্রব চীনে ত ছিলই, ভারতেও দেখা দিল। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর (৪৫৫) হইতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরব কমিতে সুরু হইয়াছে। য়ুরোপে নব নব রাষ্ট্র-গঠনের উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। টিউটনেরা প্রদেশে-প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতেছে।

(চ) লিয়াঙ্‌ (Liang) বংশ (৫০২—৫৭)। এই আমলে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান প্রচুর পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। চীনের "দাক্ষিণাত্যে" অর্থাৎ ইয়াংসির দক্ষিণে এই বংশের কর্তৃত্ব ছিল। প্রসিদ্ধ নরপতির নাম উ-তি। ইনি যৌবনে কন্‌ফিউশিয়াস-ভক্ত ছিলেন—প্রৌঢ় বয়সে ভারতীয় মহাত্মার শরণাপন্ন হন। তিনি গুপ্ত-সম্রাটের নিকট লোক পাঠাইয়া স্বদেশে বৌদ্ধ-সাহিত্য আমদানি করেন। তাঁহার অভিযান জলপথে প্রেরিত হইয়াছিল। সিংহল দ্বীপে তখন চীন ও ভারতের জল-বাণিজ্যের প্রধান আড়ত ছিল। দক্ষিণাত্যের রাজপুত্র বোধিধর্ম্ম এবং উজ্জয়িনীর পণ্ডিত পরমার্থ উ তির রাজত্ব-কালে জলপথে চীনে উপস্থিত হন। দুইজনেই ক্যাণ্টন বন্দরের ষ্টেশনে জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন। বোধি-ধর্ম্ম চীনা বৌদ্ধ-মহলে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ধ্যান ধারণা এবং অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনা চিত্রকলায়ও বোধিধর্ম্মের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। লিয়াঙ্‌ আমলে ভারতীয় গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কমিলেও কীর্ত্তি কমে নাই। য়ুরোপের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে তখন জাষ্টিনিয়ান (৫২৭—৬৫) প্রবল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। জাষ্টিনিয়ানই (Justinian) এই যুগের রাষ্ট্রমণ্ডলে সর্ব্বপ্রধান নরপতি। তাঁহার মাথা একসঙ্গে নানাদিকে খেলিত। য়ুরোপীয় আইন সঙ্কলনের জন্য জাষ্টি-নিয়ান প্রসিদ্ধ।

(ছ) চিন (Chin) বংশ (৫৫৭—৮৯) নামে-মাত্র এই বংশের কর্ত্তৃত্ব ছিল। চীনের সমগ্র "আর্য্যাবর্ত্তে"ই বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া হুণ রাজ্য চলিতেছে। হুণ আমলে চীনের সঙ্গে উত্তর-এশিয়া, প্রাচ্যতম এশিয়া এবং প্রতীচ্য এশিয়া নানাসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। কোরিয়া হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত চীনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কুষাণদিগের আমলে যেমন হিন্দু-প্রভাব মধ্য-এশিয়ার তাতার-মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে—সেইরূপ হুণদিগের আমলে চীনের প্রভাব সমগ্র এশিয়ার তাতার-মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুণ-মণ্ডল এশিয়ার সকল জন-পদেই বিস্তৃত ছিল। চীন, ভারতবর্ষ, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য সর্ব্বত্রই হুণপ্রতাপ বিরাজ করিত। চীনে হুণ-সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব করিতেন উই (Wei) বংশ (খৃঃ অঃ ৩৮৬—৫৩৪)। ভারতে হুণ-সাম্রাজ্যের রাজধানী পঞ্চনদের সাকল নগর (বর্ত্তমান সিয়ালকোট)। তোরমাণ (৫০০) এবং মিহিরগুল (৫১০—৪০ ?) ভারতীয় হুণগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মিহিরগুল ৫২৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাট্‌ নরসিংহ বালাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন। ভারতীয় হুণেরা শৈব ছিলেন।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২২৫ অব্দ পর্য্যন্ত অন্ধ্র রাজগণ কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। এই যুগ চীনা হ্যান্‌ বংশের যুগ। তাহার পর তিনশত বৎসরের কোন কথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং চীনা মাৎস্য ন্যায়ের যুগের দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস অলিখিত রহিয়াছে।

চীনের এই রাষ্ট্রীয় চঞ্চলতার যুগ সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা কথা পাওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ, তাতার বা মোগল জাতীয় লোকেরা হ্যান-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়াছে। এই জাতীয় লোকেরাই তাহার পূর্ব্বে ভারতীয় মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের শেষ নিদর্শন লুপ্ত করিয়াছিল। আবার এই জাতীয় লোকেরাই পরবর্ত্তীকালে রোমাণ সাম্রাজ্য-ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। কালানুসারে জগতের প্রথম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ৩২৩)—দ্বিতীয় সাম্রাজ্য চীনে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ২২১)—তৃতীয় সাম্রাজ্য রোমে স্থাপিত হইয়াছিল (খৃঃ পূঃ ২৭)। ঠিক এই ক্রমানুসারেই তাতারজাতি কর্তৃক সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংস-সাধনও হইয়াছে। কুষাণেরা ভারতে সর্ব্বপ্রথমে তাতার-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হুণেরা তাহার পর চীনে তাতার-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পর হুণ সেনাপতির আক্রমণে টিউটন জাতি রোমাণ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাতার জাতির ইতিহাস-কথা এশিয়া এবং য়ুরো-পের সর্ব্বত্রই আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গিবন (Gibbon)

প্রণীত "Decline and Fall of the Roman Empire" অর্থাৎ "রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমপতন" নামক গ্রন্থে তাতার বা মোগল বা সীথিয় বা হুণ বা শ্বেতহুণ জাতিসম্বন্ধে চিন্তা-কর্ষক বিবরণ আছে। এতদ্ব্যতীত (Howarth) হাওয়ার্থ-প্রণীত "History of the Mongols" বা "মোগল জাতির ইতিহাস" নামক বিরাট গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, চীনমণ্ডল যখন নানা খণ্ড চীনে বিভক্ত, ভারতবর্ষ তখন দিগ্‌বিজয়ী হিন্দু নেপোলিয়ানগণের অধীনতায় ঐক্যবদ্ধ। এই সময়ে রোমাণ সাম্রাজ্য গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় বিক্রমাদিত্যগণের সমান নামডাক এই যুগে দুনিয়ার কোন নরপতির ছিল না। মৌর্য্য আমলে প্রথমবার ভারত-বর্ষের এই মর্য্যাদা হইয়াছিল—আবার গুপ্ত আমলেও হিন্দুগণ সেই গৌরবের অধিকারী হইল। পাটলিপুত্র এই দুই যুগেই জগতের শীর্ষস্থানীয় নগর। কন্‌ষ্টান্টিনোপলে জাষ্টিনিয়ানের আমলে প্রাচ্য য়ুরোপের গৌরব বাড়িয়া-ছিল—কিন্তু তখনও গুপ্ত সম্রাট্‌গণের কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই। বরং শক-বিজয়ী এবং হুণ-বিজয়ী ভারতীয় রাজগণ নূতন উদ্যমে রাষ্ট্রগঠন করিতে তৎপর ছিলেন। প্রাচীনকালের ইতিহাসে পাটলিপুত্র সত্য-সত্যই এক "ইটার্ন্যাল সিটি" বা অমর নগর। তৃতীয়তঃ, এই যুগের সমগ্র এশিয়ায় তাতার-প্রভাবে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভিন্ন-ভিন্ন নামে তাতারজাতীয় লোকেরা চীন, মধ্য-এশিয়া ভারতবর্ষ পারস্য ইত্যাদি দেশে বসতি ও উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের রক্তসংমিশ্রণ বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছিল। তাহারা ধর্ম্ম, সাহিত্য, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব কিছু আনে নাই। চীনে তাহারা চীনা হইয়াছিল—ভারতে তাহারা হিন্দুস্থানী হইয়াছিল। কিন্তু রক্তের প্রভাবে সমগ্র তাতার-মণ্ডলে নানা ক্ষেত্রে লেন-দেন, বিনিময় ও আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইয়া-ছিল। বর্ত্তমানকালে এশিয়াবাসীদিগের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঐক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইলে, এশিয়ায় মোগল-প্রভাব ধরা পড়িবে। মৌর্য্যবংশের ধ্বংসের-পর হইতে প্রায় এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে শক, কুষাণ ও হুণজাতীয় লোকের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে;—তাহারা হিন্দু, বৌদ্ধ, সৌর, শাক্তদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সেইরূপ চীনেও হ্যান্ সম্রাট্‌গণের আমল হইতে মাৎস্যন্যায়ের যুগের অবসান পর্য্যন্ত, হুণ-আক্রমণ অথবা হুণরাজ্য-স্থাপন বন্ধ হয় নাই। হুণেরা চীনাদের আবেষ্টনে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়াছে, কনফিউশিয় হইয়াছে, তাও-ধর্ম্মী হইয়াছে। কিন্তু তাও-পন্থী চীনা তাতারের জীবনে এবং সৌরপন্থী হিন্দু তাতারের জীবনে অনেক সাম্য আছে। চতুর্থতঃ, এই যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মুখ্যতঃ, ধর্ম্মের ব্যাপারীরাই আসা-যাওয়া করিতেন। বীল্ (Beal) প্রণীত "Buddhist Literature in China" অর্থাৎ "চীনের বৌদ্ধ সাহিত্য" গ্রন্থে এইরূপ কয়েকজনের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে গৌণভাবে অন্যান্য বিষয়েরও আদান-প্রদান এই দুই জাতির মধ্যে যথেষ্টই হইয়াছিল। ভারত-প্রভাব মৌর্য্য আমলে পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে; কুষাণ আমলে মধ্য-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে; গুপ্ত আমলে চীনে বা পূর্ব্ব-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। পঞ্চমতঃ, চীনে যাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলা হয়—তাহা শাক্যসিংহ-প্রচারিত নির্ব্বাণ নয়—তাহা অশোক প্রতিষ্ঠিত "ধর্ম্ম"ও নয়। উহা বর্ত্তমান ভারতের তথাকথিত "হিন্দু" নামক ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই উনিশ-বিশ মাত্র। সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সাহিত্য সংস্কৃতে লিখিত, 'পালি'তে নয়। এই ধর্ম্মের "বুদ্ধ" একজন দেবতা—ধর্ম্মপ্রচারক মানুষ ন'ন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত। প্রতিমা-পূজা তাহার বিশেষ লক্ষণ। এই ধর্ম্ম হিন্দু-তাতার নরপতি কণিষ্কের আমলে তাতার-মণ্ডলের প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই কেন্দ্র হইতেই উহা মধ্য-এশিয়ার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছিল। মধ্য-এশিয়া হইতে হ্যান্-সম্রাট মিংতি এই মাল চীনে আমদানি করেন। হ্যান্ আমলের পর তাতার সম্রাটগণই বিশেষভাবে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত হইতে নবশক্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম তাতার-মুলুকে উৎপন্ন হইয়া তাতার-মণ্ডলে প্রসার লাভ করিয়াছে—সাধারণভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে।

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৩)

নির্ম্মলের আঘাত খুব মারাত্মক না হইলেও, তাহা খুব সামান্যও নয়। তাহার স্বাস্থ্য অমন অটুট, এবং বয়স অত অল্প না হইলে, হয় ত ঐ ধাক্কা সামলান তাহার পক্ষে আরও কঠিন হইত। বাম হস্তে এবং মাথায় প্রধানতঃ চোট লাগিয়াছিল। হাতের উপর কাৎভাবে পড়াতেই মাথাটা বিশেষ আহত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সারারাত্রি সে বেহুঁষের মতই রহিল। অসুখে এবং ওষুধে—দু'রকমেই এ আছন্ন ভাবটা ঘটাইয়াছিল। ধীরা ঘরের একপাশে সশঙ্কচিত্তে অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা-পত্নীর উপযুক্ত লজ্জার স্থান তাহার চিত্তে ছিল না। এরূপ সময়ে এই সম্বন্ধে যে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাহার অজ্ঞাত। আর শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেও যে ভাবটা মানুষের মনে আপনা-আপনি জাগে, সেটা প্রধানতঃ চোকের দৃষ্টি হইতেই জন্মায়। ধীরা কাহারও দৃষ্টি দেখে না; কাজেই তাহার এই অন্ধকার চিত্ত-গহনে ঐ বস্তুটাও দিশা হারাইয়া প্রবেশ-পথও পায় নাই! সে যে নির্ম্মলের কাছে না আসিয়া অত দূরে রহিল, তাহা লজ্জাজনিত নহে, সঙ্কোচ মাত্র! পিতার ঘর-দ্বার, খাট-বিছানা, জানলা-টেবিল সমস্তই তাহার চোখে দেখার মতই পরিচিত ছিল; কিন্তু এ ঘরে সে হয় ত জীবনেই কখন আসে নাই। কোথায় কি আছে—কেমন করিয়া সে বুঝিবে?

মধ্যরাত্রে ক্ষমার মা তাহাকে জোর করিয়া নিজের ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া শয়ন করাইল। সে নিজের কাণেই ডাক্তারদের বলাবলি করিতে শুনিয়াছে—"জ্বর না আসিলে আর কিছু ভয় নাই।"

ঘরে ফিরিয়াই ধীরা দাসীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর স্বামার অসুখ করেছিল কখন?"

"তা করেছিল বই কি। অসুখ আবার কাউকে ছেড়ে কথা কয়, তা যতই জোয়ান হোক না কেন। এই দেখ না, জামাইবাবু,—আহা মুখখানিতে যেন হাসিটি লেগেই আছে! কি মিষ্টি কথাগুলি—শুনলে যেন কাণ জুড়িয়ে যায়। তা আজ একটিবার চোকদু-টি মেলেও তাকাচ্চে না।" কোথাকার জের কোথা! ধীরা সহসা তাহার বক্ষস্থলে অত্যন্ত বেগে একটা একটা আঘাত খাইল। তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দু'খানি আকস্মিক ভয় ও বিস্ময়ের তাড়নায় ঈষৎ খুলিয়া গেল; ভাবশূন্য বৃহৎ চক্ষু দুইটি বৃহত্তর দেখাইল। সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "একবারও চাইচেন না? তবে কি হবে, ক্ষমার মা?"

সেই মুহূর্ত্তে তাহার পদতলে যেন পৃথিবীর জমি কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল। সেই "তবে কি হবে?"—সে যে কি গভীর নৈরাশ্যে, কি মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদের স্বরেই উচ্চারিত হইল, তাহা বুঝিবার লোক সেখানে ছাড়িয়া এই পৃথিবীতেই ক'জন আছে, তাহা বলা যায় না। এই তিনটি কথায় সেই পিতৃমাতৃহীনা, সোদরস্নেহ-বঞ্চিতা, অসহায়া অন্ধ বালিকার কতখানি হতাশা যে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়!

"কি হবে, ভাল হয়ে যাবে। ভয় কি?"

ভয় নেই! সত্যই কি ভয় নেই? বড় আগ্রহের সহিতই সে এই অভয়-মন্ত্রটি জপ করিতে চেষ্টা করিয়া বিছানায় গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কোনমতেই তাহার চোকদুটিতে ঘুম ছাড়িয়া একটু তন্দ্রাও আসিল না। এপাশ-ওপাশ করিয়া ক্রমাগতই সে শিহরিয়া-শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কেবলি মনে হইতে লাগিল, যদি বাবার মত ইনিও চলিয়া যান! আমার তবে কে থাকিবে? এতদিন যে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াও সে একবিন্দু চোকের জলের সন্ধান পায় নাই, আজ অনাহুত অশ্রুপ্রবাহে তাহার উপাধান সিক্ত হইয়া গেল।

মানুষ যেটাকে সহজ ভাবে, হয় ত তাহার বুদ্ধিকে

উপহাস করিবার জন্যই, অনেক সময় ঠিক তাহার উল্টাটাই ঘটিয়া দাঁড়ায়। ভোরবেলায় নির্ম্মলের সেই যে জ্বর আসিল, তাহা লইয়া পাঁচ-সাত দিন ধরিয়া সে তাহার পরিজনবর্গকে বড় মন্দ খাটাইল এবং ভাবাইল না। মা, শাশুড়ি, ভ্রাতৃজায়া বা দিদি—এ ধরণের কেহ থাকিলে, তাহার সেই অর্দ্ধসংজ্ঞা-হীন অবস্থায় কতই না ভয় পাইয়া কান্নাহাটি লাগাইতেন। তাহার কপালক্রমে তাহার রোগশয্যায় শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইবার মত কেহই ছিলেন না। একজন যে ছিল, সেও নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী—নিজে দেখিয়া ভালমন্দ অনুমান করিবে, এমন শক্তি তাহার নাই।

তা না থাকিলেও কিন্তু সেজন্য এ ক্ষেত্রে বড় একটা আট্‌কায় নাই। লোকে অবশ্য ধীরাকে শুনাইয়া যখন 'ভাল নয়' তখনও ভাল খবরই দিয়া গিয়াছে; সেও বিশ্বাস করিবার ভাণ করিতেছিল। কিন্তু মন তাহার সে সব কথা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে নাই; তাই ইহা হইতে কোন রকম আশ্বাসও সে পায় নাই। ঊষার প্রথম অরুণরেখার মত নবপ্রেমের সোণার আলো সেই যে গভীর অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে অলোয় যে চর্ম্মচক্ষের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। সেই স্বামীভক্তির ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করিয়া আজ এই পৃথিবীর শক্তিহীনতায় বিশ্বের করুণার্হ ধীরা তাই তাহার দেবীত্বের সর্ব্ব শক্তি দিয়া চোখের দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট দেখিয়াছিল, তাহার বামহস্তের সরু লোহাগাছি, লৌহ ধাতুর কঠিনত্ব সত্ত্বেও ফাটিয়া পড়ে-পড়ে হইয়াছে। নির্ম্মলের ঘরেই সে দিনরাত্রির মধ্যে অধিককাল যাপন করে; কিন্তু তাহার বেশী কাছে সে ঘেঁষিতে পারে না। সেখানে অন্য লোক থাকে; তাহারা সকলেই হয় ত পুরুষমানুষ; কে কি বলিবে, হয় ত বা তাহাকে বাধাই দিবে। তাই কাছে গিয়া সাধ্যমত একটু সামান্য সেবা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও সে সেই দূরেই থাকে। কিন্তু দূরে থাকে বলিয়া, সে এমন দূরে থাকে না যে, সেখান হইতে তাহার স্বামীর প্রবল জ্বরের কম্পিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, যন্ত্রণাযুক্ত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের চেষ্টার অস্থিরতা, মধ্যে-মধ্যে দু' একটা অসংলগ্ন প্রলাপ তাহার কর্ণমধ্যে প্রবেশপথে বাধা পায়। সে সব সময় তাহার সেই ক্ষুদ্র হইলেও স্থৈর্য্যে ও ধৈর্য্যে অচপল, প্রেমে-পূজায় মহত্তর প্রাণটি, খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত তাহার চক্ষু-পিঞ্জরে চঞ্চুর আঘাত করিতে থাকে। নিজের অক্ষমতার লজ্জায় দুঃখে সে যেন আপনি আপনার গলা চাপিয়া ধরিতে চায়।

স্বামীর সহিত চিরবিচ্ছেদের একটি অতি তীব্র অথচ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভীতি এই স্বামি-মুখ-দর্শনে-বঞ্চিতা কিশোরীকে অকস্মাৎ অত অল্পকালের মধ্যেই স্বামীর প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধায়, এমনি মধুর ঐকান্তিকতায় পূর্ণ করিয়া তুলিল, যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে হয় ত নিজেই সে নিজের মনের ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে পারিত। তাহার বাত্যাহত কদলীবৃক্ষবৎ যে প্রাণটা ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মরিবার পথে শুকাইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একদণ্ডের বৃষ্টিতে সে যেন আবার তাজা হইয়া উঠিয়া বাঁচিবার লক্ষণ—নূতন পত্রোদ্গম করিল! তা যে যাই বলুক, 'একদণ্ড' জিনিষটিকে ছোট বলিয়া কেহ অবজ্ঞা করিতেও পারেন না। এই একদণ্ডের মধ্যেই বন্যার জল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতে সমর্থ; এই একদণ্ডে কামানের মুখে হাজার গোলা হাজারটা প্রাণের অর্ঘ্য পৃথিবীর বুকে সাজাইয়া দেয়; এই একদণ্ডের একটি মিথ্যায় ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্রকে যে সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করে, সে বড়কে চেনে না। সাপের চাইতে সাপের সলুয়ে না কি বড় বেশী বিষ! আরও শোনা যায়, এই অসংখ্যের আধারস্থল এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এও না কি এক সময়ে নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত একটি একাক্ষরযুক্ত শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল; এবং তৎপরে ক্রমশঃ অণু-পরমাণু দ্বারাই ইহার সংগঠন হইয়াছে। তবে সামান্য ক্ষণ বা ক্ষুদ্র ঘটনাকে অগ্রাহ্য করা যায় কিরূপে?

ঋষিরচিত রূপকে ঢাকা বহুল পরিমাণে গোপন-অর্থ-সম্পদে আশ্চর্য্যরূপে ঐশ্বর্য্যবান ক্ষুদ্র শ্লোকটি যেমন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টির বাহিরে অর্থহীন চাষার গান বই আর কিছু নয়, ধীরার এই গভীর পাতিব্রত্য-প্রেমে-মণ্ডিত নিরুপায় হৃদয়টুকুরও তেমনি সাধারণের নিকট বড় বেশী দর দাম ছিল না। চোক ভরিয়া যে প্রিয় মূর্ত্তি দেখিলামই না, তাহার উপর মর্ম্মান্তিক একটা প্রাণের টান কোথা দিয়া আসিতে পারে, এ কথা বিশেষজ্ঞেরাও বুঝিবেন কি? কিন্তু সংসারে এমন কতকগুলা জিনিষ আছে, তাহা অপর লোকের বোঝা-না-বোঝা, দেখা-না-দেখার অপেক্ষায়

বসিয়া থাকে না ; জলের উপর কমলের মত আপনা হইতেই তাহারা জন্মায় এবং নিজেই বর্দ্ধিত হয়। ধীরার শূন্যচিত্তে এই যে বিপদের ঝড় সে দিন সত্যকার ঝড়ের সঙ্গে সড় করিয়া, এই নূতন চিন্তার সহিত নূতন আবিষ্কারটা করিয়া বসিল, ইহাতে তাহাকে অবসন্নতার নিদারুণ ক্লান্তি হইতে জাগ্রৎ করিয়া যেন প্রাণের উপর আছাড় মারিল। সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই সে জানিতে পারিয়াছে, এই স্বামীই এখন তাহার সব,—আর তাহার সেই স্বামীই আজ হয় ত না বাঁচিতেও পারে !

(৩৪)

সংসারের পরিচালনা-চক্র যাঁহার হস্তে, সেই মহা-কালরূপী চক্রী এ রকম অবস্থায় প্রায় যেটা করেন না,—সেইটেই যে তিনি না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। কয়েকদিনের পর নির্ম্মলের জ্বরের ঘোর কাটিয়া জ্বর কমিল, সেই কমার পর হইতেই প্রত্যেক দিন এবেলা-ওবেলা করিয়া কমিয়াই আসিতে লাগিল। ধীরা কাণখাড়া করিয়া তাহার সেই কোণটিতে কেদারাখানির উপর বসিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া, আর সেই প্রখর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিতে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকেও তেমনি উতলা করিয়া তোলে না। মধ্যে-মধ্যে অস্ফুট প্রলাপ-বাক্যের সহিত 'অপর্ণা' 'অপর্ণা' শব্দ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া অকস্মাৎ তাহাকে শরীর এবং মন চম্‌কাইয়া ফেলে না। স্থির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দে সে অনুমানে জানিতে পারে, রোগের সহিত যুঝিবার পর ক্লান্ত রোগী শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া সে বিষম শ্রান্তি অপনোদিত করিতেছে। তাহার বিজন বক্ষে কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে আশার রাগিণী মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয়! ভগবানের এমন আশীর্ব্বাদ সে তাহার অভিশপ্ত জীবনটিতে যেন একদিনও কল্পনা করিতেই পারে নাই! লুকাইয়া দুটি চোখ আঁচলে মুছিয়া, নিজের বামহস্তের সেই সরু লোহার বালাগাছির উপর ধীরে ধীরে তাহার মাথাটি আপনি নত হইয়া পড়ে। সেই কৃতজ্ঞতা-স্বীকারটুকু, সে যে কাহার উদ্দেশ্যে দেওয়া, তাহার কোন সুস্পষ্ট অনুভূতি তাহার মনেই হয় ত থাকে না। হয় ত যিনি তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিয়া, তাহাকে পাথারে তলাইয়া যাইতে দেন নাই, তাঁহাকেই সে প্রণাম ;—না হয়, সেই যিনি মরণের হলাহলকে দূর করিয়া দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ে মৃত্যুঞ্জয়-রূপে তাহাকে ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছেন—সেই স্বামীরই চরণোদ্দেশ্যে সেই প্রণিপাত ! সে চরণ দুটিকে সে, না চোখের দৃষ্টিতে, না হাতের স্পর্শে, প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে ; তবু ত সে তাহারই স্বামীর পা ! তাহারই পূজার জিনিষ !

যে দিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল, সেই দিন নির্ম্মলকে ঘুমাইতে দিয়া সেবা করিবার লোকেরা সবাই যখন চলিয়া গিয়াছিল, তখন ধীরা সাহস করিয়া অনুভবে-অনুভবে ঘরের মাঝখানে নির্ম্মলের খাটের বিছানার নিকটে আসিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে জানু পাতিয়া মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িল। ঘুমন্তের নিঃশ্বাস একভাবেই চলিতেছে।—হাত বাড়াইতেই একখানা হাতপাখাও হাতে ঠেকিল। সে বিধাতার এই স্বেচ্ছাদানে যেন অতিবিস্ময়ে এবং পরম উল্লাসে একসঙ্গে চকিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই জিনিষটাই যে সে মনে-মনে খুঁজিতেছিল ! সানন্দে পাখাখানা তুলিয়া লইয়া সে সেইখানে সেইভাবে বসিয়াই তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। খাটখানায় হাত দিয়া সে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লইয়াছিল। প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও খাটের উপরকার মানুষটাকে অঙ্গুলিদ্বারাও স্পর্শ করিতে সে সাহস করিল না।

কিছুপরেই ঘুমভাঙ্গার পূর্ব্বলক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত ও দ্রুত হইয়া আসিল। ধীরার একবার মনে হইল পাখা রাখিয়া উঠিয়া যায়।—কেন তাহার কোন ঠিকানাই নাই ; কেমন যেন একটু লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহার কোন কারণ না পাইয়া সে পাখা থামাইল না। লজ্জা-করা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বড় অল্প।

"কে, অপর্ণা ?—না না ; কি বল্‌তে কি বলে ফেলেচি। ধীরা ?"

নির্ম্মল আজ চারদিন পরে এই প্রথম সহজভাবে কথা কহিল। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারদের প্রশ্নে 'হাঁ' 'না' ছাড়া আর কিছু কথা কহিতে শোনা যায় নাই। জ্বরের সময় সেই যা বেঠিক, অসংলগ্ন কথা।

সহজ ভাবে বটে,—কিন্তু গোড়াতেই একটা অতবড় ভুল ! আর তা' ছাড়াও অসুখ ভুগিয়া তাহার স্বাভাবিক কোমল স্বর এমন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহা শুনিবামাত্র ধীরার দুটি চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে নেত্র দুটি নত করিয়া পাখার বাতাসে ঈষৎ জোর দিল ; উদ্বেলিত চিত্তভাব

অপ্রকাশ রাখিবার জন্য, একটা-কিছু না করিলে শরীর-মনে যে হিল্লোলটা আসিয়াছে, সেটা কোথা যাইবে?

"তুমি কেন বাতাস করচো ধীরা, পাখা রেখে দাও,—না না, থাক্ থাক। কিছু দরকার নেই, সত্যি দরকার নেই, রেখে দাও।" নির্ম্মল হাত বাড়াইয়া তাহার হাত হইতে পাখাখানা টানিয়া লইতে গেল, কিন্তু নাগাল না পাইয়া যেন সে কি-একটা বড়ই অপরাধজনক জঘন্য ছোট কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ইহা হইতে এই মুহূর্ত্তে তাহাকে নিবৃত্ত না করিলে, তাহার স্বামিধর্ম্মে পর্য্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে,—এমনি সন্ত্রস্তভাবেই সে তাহাকে বারবার করিয়া বাধা দিতে লাগিল। ভালবাসার যে সম্বন্ধ শুধু নারী ও পুরুষকে কেন—সকলের সহিত সকলের প্রাণে এবং মনে যোগ করিয়া দেয়, তাহাতে যখন কোন অপূর্ণতা, কোন ফাঁক না থাকে, তখনই তাহা একজনকে অন্যের সহিত যথার্থ সংবদ্ধ করিয়া সার্থক হয়। যাহাকে আমি দু'হাতে তুলিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছি, তাহারই নিকট হইতে আমি লইবারও দাবী রাখি। কিন্তু যাহাকে যতখানি দিবার কথা ছিল, তাহা দিতে না পারিয়া, নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া আছি, তাহার নিকট হইতে নিজে এতটুকুও গ্রহণ করিতে যাইব কোন্ মুখে?

নির্ম্মলকে এতখানি ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ধীরার মনে একটু ব্যথা বাজিয়াছিল। তাহার পিতার রোগশয্যায়, তাহার কত বিনিদ্ররাত্রিশেষে প্রভাতের পাখী গাহিয়া উঠিয়াছে, পিতা তাহা হইতে তাহাকে বারণ করিয়াছেন, কিন্তু বাধা দেন নাই। কেন না, তিনি জানিতেন, ঘুমাইয়া সে যে স্বস্তিটুকু না পাইবে, ঘুম তাড়াইয়া জাগিয়া বসিয়া, সে অনায়াসে তদপেক্ষা কিছু বেশীই আদায় করিতে সমর্থ। কিন্তু নির্ম্মল ত তাহাকে জানে না। অথচ এই 'কিছু-না-জানা' মানুষটিই আজ তাহার সব! সে তাহার এই পূজা,—বড় দৈন্যেরই এ পূজা,—লইতে না চাহুক, মুখ ফিরাক,—তবু সে-ই তাহার পূজার দেবতা। সে আজ বুঝিয়াছে, দেখিবার, শিখিবার, অপেক্ষা না রাখিয়াই, নিজের কাছেই এ শিক্ষা তাহার আপনা-হইতে হইয়াছে যে,—এই পূজা করার সুখের চেয়ে মেয়েমানুষের জীবনে আর কিছুই সুখের নাই। আর সেই পূজা যে করিতে পাইয়াছে, সে নিজেও সেই সঙ্গে পূজিত হইয়াছে, আর কোন রকমেই নয়।

নির্ম্মল এবার একটু মাথা উঁচু করিয়া, ঝুঁকিয়া ধীরার হাতের পাখাখানা ধরিল। তারপর পাখাখানা তাহার হাত হইতে খসিয়া আসিলে—সেটা দুর্ব্বল হস্তে বারকয়েক নাড়িয়া, তাহারই অঙ্গে হাওয়া দিতে-দিতে বলিতে লাগিল, "আমার জন্য, ধীরা, তুমি নিজেকে একটুও ব্যস্ত করো না। আমি এই দেখ্‌তে-দেখতে সেরে যাবো; কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে আমার ভাবনা ভেবে, আমার জন্য কাজ করে, ঐ দুর্ব্বল শরীরে অসুখে পড়ো,—তা' হ'লে আমি নিজেকে সেরে তুল্‌বার সময় দিতে পারবো না।"

নির্ম্মলের এই অবিবেচনায় অর্দ্ধস্ফুট বিদ্রোহ মুখে না ফুটাইয়াই নিষ্ফল সেবা-চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ধীরা কিছুক্ষণ সেইখানেই বসিয়া থাকিল। তারপর অনেকক্ষণ বদ্ধ-ঘরে থাকায় তাহার মাথা-ধরার ভাবনায় স্বামীকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিয়া, সেখান হইতেও শেষে উঠিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার কান্না আসিতে লাগিল। তাহার আজ মনে হইল,—সে যদি চোখে দেখিতে পাইত, তা হইলে তো তাহাকে আর এমন করিয়া অপরের দৃষ্টির মধ্যস্থলে গিয়া দ্রষ্টব্যকে দেখিতে হইত না। কোথাও নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াই, তাহার দূর হইতে দেখার সুখ চরিতার্থ হইতে পারিত। এমন সুখেও তুমি এত বড় বাদ সাধিলে কেন, ঠাকুর!

নিজের ঘরে ফিরিয়া—ক্ষমার মা আসিলে, ধীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কাণা হওয়া বড় খারাপ, না ক্ষমার মা?"

ক্ষমার মা উত্তরে কহিল "না হাঁা, তা দিদি, তোমার এতই বা কষ্ট কিসের?"

"কষ্ট নয়; কাউকে দেখ্‌তে পাইনে, কিছু করতে পারিনে; এর চেয়ে আর কষ্ট কিছু আছে? আচ্ছা, তুইই বল্‌তো, আছে?"

"হাঁা-অ্যা,—কত! তোমার আর কি কষ্ট দিদি! একই নেই; আর সবই তো তোমায় ভগবান কিছু অল্প দেননি। রাজা বাপ,—অমন সোয়ামি, আহা, বেঁচে থাকুন। জামাইবাবু তোমায় বড্ড ভালবাসেন, দিদিমণি! তুমি মাটিতে হেঁটে গেলে যেন তাঁর বুকে ব্যথা বাজে।" তবে কি ভালবাসারই ইহা লক্ষণ! অত্যন্ত ভালবাসাতেই তাহার স্বামী তাহাকে তাঁহার জন্য কিছু করিতে দেন না? সে একটু আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিল। কিন্তু তারপরই আবার অবসাদে তাহার সে ক্ষণিকের টানিয়া-আনা আনন্দ ছায়ার মতই

মিলাইয়া আসিল। সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু, এমনি করে চিরদিন কি থাকা যায় ?"

"এম্‌নি করে' কেন ? দুদিন বাদে আবার তোমার রাঙা খোকা হবে, তখন আবার তাকে নিয়ে—"

ধীরা এবার বিছানার মধ্যে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, যেন তাহার এই পুরাতন দাসীটির গলার সুর চুরি করিয়া কোন দেবতা তাহাকে বর দিতে আসিয়াছেন! সে জীবনে একবার একটিমাত্র খোকাকে নিজের কোলে তুলিতে পাইয়াছিল,—সে স্পর্শ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। তাই কাঙালের মত ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া সে কহিয়া উঠিল "কাণাদের নিজের খোকা কি হয় রে ক্ষমার মা ?"

"কি যে তুমি বল, ধীরা দিদি! কেন হবে না ? কাণা কি আর মানুষ নয় ?" "তারা কাণা হয় না তো ?" এ বিষয়ে ক্ষমার মা কখনই মাথা খাটায় নাই। কিছু না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিল, "উঁহু ; তা' কেন হতে যাবে।"

পরম উল্লাসে ধীরার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া যেন সেই বহুদিনের, সেই তাহার পিতৃ-বন্ধুর একটি শিশুর অতীত স্পর্শটুকু তাহার সমস্ত শরীর-মনে বসন্ত-বায়ুর হিল্লোলের মত হিল্লোল তুলিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে লোভাতুর চিত্তে সেই শুভদিনের পানে মনের ভিতর শত-চক্ষু হইয়া চাহিয়া দেখিতে গেল। কিন্তু হায় রে ভিখারীর টাকার থলির দুঃস্বপ্ন! পরক্ষণেই আবার মন হইতে সকল আনন্দের জোয়ারটুকু ভাঁটার টানে সরিয়া গেল। সুগভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে শুইয়া পড়িয়া যেন আপনাকেই আপনি বলিয়া উঠিল "না, না ; আমার খোকা চাইনে, আমি তো তাকে এই রকমই দেখতে পাবো না! তার চেয়ে, আমার কিছুই চাই না, আমি এমনই থাকবো!"

(৩৫)

ব্রজের মত লোক সংসারে অনেকগুলি জন্মাইলে, ভগবানের এই সৃষ্টিটার বিশৃঙ্খলা ঘুচাইতে-ঘুচাইতে তাঁহারই হয় ত ব্যাজার ধরিয়া যাইত—মানুষের যে ধরিবে, সে আর বেশী কথা। কিন্তু সে একটা-না-একটা কিছু উলোট-পালোট না করিয়া দুটো দিনও চুপচাপ থাকিতে পারে না। সেই বর্ম্মী রূপসী ব্রজর এখন ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নারীজন-অনুচিত একান্ত লজ্জাহীনতা, ব্রজের চক্ষে পূর্ণ উন্নতিরই লক্ষণ। খাদ্যাখাদ্যের অবিচারে, বিবাহসম্বন্ধে বিশ্বজনীন উদারতায়, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে দ্বিধাহীনতায় এত বড় উন্নত তো য়ুরোপীয়েরাও ন'ন। মাপোর চোক দুটি সাধারণ বর্ম্মি চোকে চেয়ে কিছু বড়, গায়ের বর্ণ ও মুখের গঠনেও মঙ্গোলিয় এবং ককেশিয়ের মিশ্রণ দেখা যায়। সকল জাতীয়কে বিবাহ করা ও সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার কল্যাণে বর্ম্মিদের বড়ঘরেও 'সঙ্করের' অভাব বড়-একটা নাই। ব্রজ মনে করে, তা হোক, অসভ্য বাঙ্গালীর মেয়ের চেয়ে অনেক ভাল! নাক-কাঁদা, ঘোমটাটানা বাঙ্গালিনীর শ্যামল মূর্ত্তি স্মরণে যে ঘৃণার উদ্রেক করে, এই ভবিষ্য কুটুম্ব বর্ম্মাবাসীর সখের খাদ্য নাপ্পির গন্ধও তেমন করে না!

বিবাহ হয়-হয়, এমন সময় কোথা হইতে নির্ম্মল গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বাড়ীতে একটা সঙ্গীন ব্যাপারের জোগাড় করিয়া তুলিল। পৃথিবীকে না জানাইয়া, চুপেচাপে এতবড় বীরত্বের কাজটা করা ব্রজর মতলব নয়। সে তাই তখনকার মতন বিবাহ বন্ধ রাখিয়া, উৎসবের আয়োজনে মনোযোগী হইয়াছিল।

ডাক্তার একদিন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, ব্রজর সহিত দেখা করিয়া, খবর দিলেন, নির্ম্মলের জন্য আজ বিশেষ ভয়ের কারণ আছে।

ব্রজ প্রথম যখন নির্ম্মলের গাড়ী হইতে পড়ার খবর পাইয়াছিল, তখন উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিল,—"হবেই তো! বাবার বিচার না থাকিলেও প্রকৃতির তো একটা আইন আছে!" কিন্তু নির্ম্মলের এই ক'দিনের অসুখেই অফিসের লোকেরা ব্রজর মতামত, তাহার সহি, লইবার জন্য তাহাকে যখন-তখন পাকড়াও করিতে আরম্ভ করিল ; সরকার তাহার নিকট খরচের টাকা চাহিয়া বসিল এবং এইরূপ অনেক প্রকার উপদ্রব দেখা দিল,—তখন তাহার মনে হইল "না বাপু ; এ সব আমার কর্ম্ম নয় ; নির্ম্মল শীঘ্র-শীঘ্র আরাম হইয়াই উঠুক!"

ডাক্তারকে সে উত্তর দিল—"আমায় সে ভয়ের ভাগটা আর কষ্ট করে দিতে এলেন কেন ? আমি তো আপনার চাইতে বড় ডাক্তার নই। আপনারাই ওকে ভাল করে দেখা-শোনা করুন না। কিন্তু দেখবেন, যেন

বেঁচে ওঠে। ও মারা পড়লে আমার পক্ষে ঐ অফিস চালানো বড় মুস্কিল হবে, দেখ্‌তে পাচ্চি।”

ডাক্তারের অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। তিনি কহিলেন,—“আপনার অফিসের জন্য যত না হোক, ধীরার জন্য আমি আমার যথাসাধ্যই করবো। আমি তাকে আমার নিজের মেয়ের মতই মনে করি। কিন্তু আপনাকে এই জন্য একবার জানিয়ে রাখা যে, যদি না পারি—এর পর যেন 'আপনাকে জানাইনি' বলে দুষবেন না।” তিনি চলিয়া গেলেন।

* * *

নির্ম্মল ভাল হইয়া উঠিবার অব্যবহিত পরে একদিন, নিজে খবর পাঠাইয়া ব্রজর সহিত সাক্ষাৎ করিল। ব্রজর এ পর্য্যন্ত সে সুযোগটা ঘটিয়া উঠে নাই।

“এই যে নির্ম্মল, বেশ উঠে-হেঁটে বেড়াতে পেরেচ! আঃ, বাঁচা গেল। কবে থেকে তুমি অফিসে বস্‌তে পারবে বল দেখি? কাল-পরশুর মধ্যেই তো? অঁ্যা, কি বল?”

নির্ম্মলের শরীর এখনও বিলক্ষণ দুর্ব্বল। ডাক্তারের আদেশ—সে এখন কিছুদিন মস্তিষ্ক পরিচালনার কোন কাজই করিতে পারিবে না। তাই কিছু বিপন্নভাবে তাহাকে বলিতে হইল “সেটা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক করিতে হইবে।”

এ কথা শুনিয়া ব্রজ বিশেষ কোন ভরসা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। বরং সে ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই কহিয়া উঠিল, “তবেই হয়েছে! ডাক্তার আবার কোথায় কবে রোগীকে হাত থেকে সহজে ছাড়তে চায়! ওরা এখনই বলে বসেই আছে,—‘এখন কিছুদিন ‘রেষ্ট’ নাও; তারপর একবার চেঞ্জে যাও; আরও দু’চার শিশি টনিক খাও’। ওদের মত নিয়ে চল্লে আর কাউকে ওদের গণ্ডীর বাইরে পা দিয়ে চলতে হয় না।”

নির্ম্মলের মনে যে কোন প্রশ্ন ছিল—সে তাহার মুখের চেহারাই বলিয়া দিতে পারে। ব্রজর বুদ্ধি বিশেষ কোন কাজে লাগে নাই বলিয়াই, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না যে, সে জিনিষটা তাহার মধ্যে নাই। বুদ্ধি থাকিলেই যে সেটা সুবুদ্ধি হইতে হইবে—বুদ্ধিদাতার সহিত তো এ রকম কোন বন্দোবস্ত নাই। কি সে প্রশ্ন—সে কথাও সে মনে-মনে বিলক্ষণই বুঝিয়াছিল এবং সেইজন্যই নির্ম্মলকে কাণ লাল করিয়া ঠোঁট খুলিতে গিয়াও মুখ চাপিতে দেখিয়া সে গোপনে-গোপনে বড় হাসিটাই হাসিতেছিল।

এই সময়ে আচমকা নির্ম্মল তাহার জিজ্ঞাস্যটা কোন-মতে বলিয়া ফেলিল। বলিতে গিয়া লজ্জা ও ঘৃণা যে তাহাকে চুপ করিতে আদেশ করিতেছিল, তাহা তাহার গলার সুরেই প্রমাণ করে,—“একটা আশ্চর্য্য গুজব উঠেচে, শুনতে পাচ্চি।”

ব্রজ সকৌতুকে তাহার মুখের দিকে চাহিল। “কি রকম?”

“আপনি না কি—নাঃ, সেটা হয় তো মিথ্যে খবরই হবে। সে কথা শুনে কিন্তু ধীরা ভারি কাঁদচে।”

“তাতো কাঁদচে। আমি না কি,—কি? ওঃ! বর্ম্মি বিয়ে করচি,—এই না? কেন, তাতে কি দোষ?”

এই কথা জিজ্ঞাসার পর আর ‘দোষ’ দেখাইবার জন্য তর্ক তোলা যায় না। সে তবু অনেক কষ্টে একটু কি বলিতে যাইতেছিল; ব্রজ তাহার পিঠে হাত দিয়া হাসিয়া বলিল “থাক্, তুমি যা’ যা’ বলবে, তার গোটাকতক আমিও বল্‌তে পারি। ওরা মঙ্গোলিয়ান্, আমাদের সঙ্গে একজাতি পর্য্যন্তও নয়; হিন্দু তো নয়ই—আরো ঢের,—কিন্তু আমিও বলি,—অন্ধের চেয়ে সে পাত্রী-হিসাবে খুব মন্দ হবে না। আর যতই তার খুঁৎ থাক, শুভদৃষ্টিটা হতে পারবে।” এই নিষ্ঠুর পরিহাসের আঘাতে ব্যথাহত চিত্তে নির্ম্মল ফিরিয়া গেল।

এবার কিছুদিনের জন্য তাহাকে কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সত্য-সত্যই সহর ছাড়িয়া বাহির হইতে হইল। নিজের জন্য যত না হোক,—ধীরার পক্ষেও এ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা যখন তাহাদের পরম হিতৈষি ডাক্তারবাবু উল্লেখ করিলেন, সে তখন আর ‘না’ বলিতে পারিল না। মুরলীধরের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বজরা ইরাবতীর বক্ষে বাঁধাই ছিল; তিনি মধ্যে-মধ্যে ধীরাকে সঙ্গে লইয়া জলপথে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। নির্ম্মলও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে নদী-ভ্রমণের ব্যবস্থাই সানন্দে গ্রহণ করিল।

(৩৬)

ব্রজর আর ত্বরা সহিতেছিল না। মাগৌংকে ঘরে আনিয়া তাহার ঘরের ঘরণী করিবার জন্য সে এতই উৎসুক

হইয়া আছে যে, সেই বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকিয়া আজকাল নিত্যই তাহার স্নানাহারেরও নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যাইতেছিল। বিবাহেরই বা আর দিন কই? প্রচুর খরচপত্র করিয়া ভোজের সভা সাজান হইয়াছে। বিবাহের পর 'মধু-বাসর' যাপন জন্য এক নূতন ষ্টীমার অজস্র টাকা খরচ করিয়া কেনা এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। এখন বাকি শুধু বিবাহ।

সেদিন সারা বিকালটা মোটরে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কতকগুলি জিনিষ পছন্দ করিয়া কেনা হইলে গাড়ী আসিয়া কনের বাড়ীর দরজায় থামে-থামে—এমন সময় পথে একজন চীনার সহিত ব্রজর ভাবী পত্নীর চোখোচোখি হইল। গাড়ী তখনই থামিতেছিল,—চীনা গাড়ীর শেষ গতিতে যে ক' পা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এগাইয়া আসিয়া খুব হাসিয়া ব্রজকে ছাড়িয়া তাহার সঙ্গিনীকে নিজেদের প্রথায় অভিবাদন করিল। মাপোও তখনি পাশের দিকে ঝুঁকিয়া, তাহার অভিবাদনের, হাসির, এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু চীনে ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্রজ ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাহার তখন মনে হইতেছিল, এতবড় উদ্ভট ভাষা আর এ পৃথিবীর ভাবরাজ্যে কখনও প্রবেশাধিকার পায় নাই! কেবল "চ্যাং চুচু, চিংচু" এমনি একটা একান্ত হাস্যরসের সৃষ্টিকারী বিকট শব্দমাত্র অতিকষ্টে বোধগম্য হইতেছিল।

লোকটা চলিয়া গেলে, নিজে নামিয়া, সঙ্গিনীকে নামাইতে-নামাইতে ব্রজ ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি অত বলাবলি করে হেসে কুটিকুটি হচ্ছিলে? আমার দিকে আঙুল দিয়ে চীনেটা দেখাচ্ছিলই বা কেন?"

বাগ্দত্তা বধূ ভাবী স্বামীর কর গ্রহণ করিয়া চলিতে-চলিতে, ক্ষুদ্র রক্তাধরে মধুর মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর দিল,—"ও আমার দ্বিতীয়বারের স্বামী ছিল কি না।—ওকে আমি ত্যাগ করেছি। তবে ওর মেয়েকে, দিনকতকের জন্য ও নিজের দেশে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাওয়াতে, আমি তাকে যেতে দিয়েছিলুম। আজ দেশ হ'তে ফিরে আমায় মেয়ে দিতে এসেছে। তাই তোমার পরিচয় জানতে চাইছিল।"

ব্রজ চলিতে-চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল,—"তোমার দ্বিতীয় স্বামী! প্রথমটি কে?"

চঞ্চল চটুল চক্ষে হাসির বিদ্যুৎ ফুটাইয়া সুন্দরী তাচ্ছল্যভরে কহিলেন "সে একজন য়ুরোপিয়ান—ইটালীতে তার বাড়ী। সে অনেক দিনের কথা,—লোকটা সম্ভবতঃ মরে গ্যাছে। এখান হ'তে অসুখ হয়েই সে নিজের দেশে যায়। তার ছেলেটিও কিছুদিন হ'লো মারা গ্যাছে।"

ব্রজ ভাবী পত্নীর হাত ছাড়িয়া দিল,—"আমি—আমি বুঝি তৃতীয়? তারপর? চতুর্থ স্থানে কে আসিবে সেটা ঠিক হয়েচে কি? শনি না বৃহস্পতি! মাপো!—"

সে কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা পড়িল। এই সময় বাড়ীর ভিতর দিক হইতে তাহাদের সাড়া পাইয়া বিচিত্র চায়না-সিল্কের পোষাক-পরা একটি ক্ষুদ্র বালিকা উচ্চ আনন্দ-চীৎকারের সহিত ছুটিয়া আসিয়া মাপোকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। বর্ম্মী ভাষায় সে মুখে বলিতেছিল "মা মা, আমি তোমার কাছে ফিরে এসেচি, মা আমায় কোলে নাও।"

ব্রজ অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদাবসানে মাতাপুত্রীর মধুময় মিলন-দৃশ্য ব্যঙ্গমিশ্রিত তীব্রতার সহিত চাহিয়া দেখিয়া পিছন ফিরিল। গাড়ী তখনও সরাইয়া লয় নাই। নিজেকে তাহারই একটা আসনে নিক্ষেপ করিয়াই সে বিস্ময়-মূঢ় সোফারকে চাপ্পা করিয়া দিয়া ডাকিয়া বলিল "বাড়ী।"

* * * * *

ব্রজর সকল কাজেই সমান ত্বরা। যখন যে দিকে সে নিজের ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, একটু রাশ টানিয়া রাখিয়া সংযতভাবে চালায় না। তাহার চিত্তরথী মনরূপী আরবী ঘোড়াকে পবনবেগে ছুটাইয়া দিতেই চিরাভ্যস্ত। আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

পূর্ব্বোল্লিখিত কাণ্ডের অব্যহিত পরেই গরীব আলোকনাথ ঘোষালের কাঠের ঘরের সাম্নে অকস্মাৎ একটা বন্যাপ্লাবনেরই ন্যায় আবির্ভূত হইয়া ব্রজ একটা শঙ্কিত-বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার মোটরের অভদ্র তর্জ্জনে সশঙ্কচিত্ত আলোকনাথ যেমন ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ভৌতিক যান হইতে ভূতের মতই ত্বরিৎ নামিয়া পড়িয়া কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই, সে একনিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তোমার একটি আইবড় মেয়ে আছে না? তার কি বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে?"

ব্রজর পিতার অনেক দিনের পুরাতন কর্ম্মচারী আলোকনাথ ঘোষাল মনে করিল, হয় ত নির্ম্মলের কাছেই সে তাহার সাংসারিক দুঃখদারিদ্র্যের এই উপরন্তু দুঃখ কন্যাদায়ের খবরটা জানিয়া, তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে! হয় ত এ মাস হইতে তাহার বিশটি টাকার উপর আর পাঁচটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে,—না হয় তাহার বাপের মত কিছু নগদ সাহায্যই সে তাহার কন্যার বিবাহের কাঁটা নামাইতে দিতেও পারে। তা না দিবে কেন? হাজার হউক সেই বাপেরই ছেলে তো। সে বিমর্ষমুখে জবাব দিল,—"আজ্ঞে কিছুই হয়নি। একে পয়সা নেই, তাতে মেয়ের অঙ্গে বিধাতা একটু রূপও দেননি; এ বিদেশে কেমন করেই বা আর বিকুবে?"

ব্রজ কহিল "আমার হাতে যদি কন্যা-সম্প্রদান কর, তা হলে কি তোমার জাতে-ঠেলা হবার কিছু ভয় আছে?"

"আ—আজ্ঞে?"

"বলিতেছি কি? আমায় মেয়ে দিলে, তোমাকে লোকে কিছু বলবে না তো? জানো তো, আমি এতদিন খুব শুদ্ধাচারী ছিলাম না। তা, সে ভয় যদি না থাকে তো, আমি তোমার মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজী আছি।"

এ রকম কথা লক্ষপতি মনিবের মুখে শুনিলে, তাহার অফিসের কুড়িটাকা বেতনের কেরাণীর মুখের হাঁ বুজিতে সময় লাগে কি না?

ব্রজর বিলম্ব সহিতেছিল না; দেরি সহই বা হইবে কেন? একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া তো ফেলা চাই। লোকটার হতভম্ব ভাব দেখিয়া তাহার হাসিও পাইল, বিরক্তিও ধরিল। সুর একটুখানি চড়াইয়া বলিল,—"আমার দেরি করবার সময় নেই,—হ্যাঁ—কি না, একটা বলো,—তারপর পাঁজিখানা আনো; এখনি আমি দিন ঠিক করে ফিরে যাব।"

আলোকনাথ এইবার কথা খুঁজিয়া পাইল,—"গরীব বলে আপনি আমায় তামাসা কল্লেন, বাবু! পেটের দায়ে মান-অপমান রাখিনে বটে, কিন্তু স্ত্রী-কন্যা সম্বন্ধে—"

"ভাল জ্বালা। কি করলুম বাপু, যে তুমি নাকে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে? অপরাধের মধ্যে—তোমার যে মেয়ের রূপের জন্য আর রূপোর জন্যে বিয়ে হচ্চে না,—তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছি। বিয়ে না দাও—স্পষ্ট বলো, কনে আমার জুটবেই।"

"আমার সেই কালো মেয়ে?" আলোকনাথের তবুও বিশ্বাস হইতেছিল না।

ব্রজ হাসিয়া উঠিল; কহিল; "হলোই বা কালো মেয়ে; কালো বলেই তো তোমার মেয়ে বিয়ে করতে চাইচি; তা না হলে হয় তো আর কারও দোরে যেতাম—তোমার কাছে আস্‌তাম না। আমি কালোই চাই। কালোর মনে রূপের গর্ব্ব থাকবে না। কালো আমায় কালো বলে তাচ্ছিল্য না করাই সম্ভব। আমাদের কালোই ভাল।"

আলোকনাথ কণ্ঠস্বর রোধ করিয়া বুঝিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেছিল। একটু-কিছু যেন এতক্ষণে বুঝিয়াছে, এমনই তাহার মনে হইতে লাগিল;—কহিল "আচ্ছা, আমার মেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন, আমি তাকে আন্‌চি। আপনি আমাদের অন্নদাতা প্রভু, আপনার কাছে বার হতে তার লজ্জা নেই। কোথায়ই বা বস্‌বেন? এই ভাঙ্গা বেঞ্চিটুকুই আমার বৈঠকখানা। ভিতরে মোটে দুটি কুঠরি; তাও আবার—"

"থাক থাক—আমি এইখানেই বসচি। মেয়ে দেখাবার দরকার কিছুই ছিল না, কিন্তু দেখিলেই তোমার মনের যদি তৃপ্তি হয়, তা না হয় একবার দেখাই যাক। কিন্তু একটুও দেরি করো না।"

দেরি হইল না। রং-পাউডারের কৃত্রিমতা এ বাড়ীতে ছিলই না; আর, থাকিলেও সেই অকৃত্রিম কালোর নিকট তাহারা পরাভবের লজ্জায় মাথা হেঁট করিত। ছিল না, সেই তাহাদের পুণ্যবল! বাপের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিয়া মেয়েটি ব্রজর পাম্পসু পরা পায়ের গোড়ায় ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। সেদিন ব্রজ ধুতী পরিয়াই বাহির হইয়াছিল। সে মেয়েটির আপাদমস্তকে একবার পরীক্ষা-দৃষ্টি হানিয়া তাহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বেশ মেয়ে! তোমার নাম কি?" এ কথাটা অবশ্য মেয়েটিকেই বলা।

মেয়েটি ভূমিসংলগ্ন-নেত্রে দাঁড়াইয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছিল। প্রথমটা উত্তর দিল না; পরক্ষণেই পিতার হাতের ঈষৎ ঠেলায় তাঁহার আদেশ পাইয়া, মৃদুস্বরে কহিল, "প্রিয়ম্বদা।"

"বাঃ বাঃ, ঠিক ঐ জিনিষটিই তো আমি চাচ্চি! তুমি লেখাপড়া কিছু জানো, প্রিয়ম্বদা?"

এবারকার প্রশ্নের উত্তরটা পরীক্ষার্থিনীর পক্ষে বড় সহজ ছিল। সে ঘাড় নাড়িয়াই জবাব দিতে পারিল—"না।"

"আরো ভাল! তোমার তো অমত নাই, আলোকনাথ? আচ্ছা, আমি তা'হলে কথাটা পাকা কর্ব্বার জন্য এক্ষণি কন্যা আশীর্ব্বাদটা সেরে যেতেই চাই। সরে এসো তো প্রিয়ম্বদা! ধান-দূর্ব্বা আমি পকেটে করে এনেছিলুম। আচ্ছা, তুমিও এই থেকে দুটো নিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ফেলো না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। সব্বাই একেবারে শুনে অবাক হয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্কার করি, তোমাকে—আপনাকে। প্রিয়ম্বদা, এই আংটিটি তুমি পরো, আর আশীর্ব্বাদ করি যেন নিজের মিষ্টি নামটি জীবনে সার্থক করে তুলিতে প্যারো। তা হলে এখন আসি। এই মাসের ২৩শে ঐ যে দিনটা আছে, সেই দিনটাই ঠিক করবেন। আমি কোন কাজে দেরি হওয়া পচ্ছন্দ করিনে।"

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর-যাত্রা *

[শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা]

(২)

দিনের দেখা পাওয়ামাত্র, আর আমরা দেরী করিলাম না। কেন না, আমাদিগকে আজই শ্রীনগর পৌঁছিতে হইবে। চলিতেই দেখি, সেই সেবাপরায়ণা শৈল-সুতা আপনার কোমল বক্ষোপরি এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধ ধারণ করিয়া, এপারের

সিন্ধুনদের উপত্যকার উপরে

যাত্রীদিগকে ওপারে লইয়া যাইতেছেন। সেতুবন্ধের পদভরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তথাপি কল্লোলিনীর ভ্রূক্ষেপ নাই। সাধে কি আর সিন্ধুরাজ দূর দূরান্তর হইতে ইঁহাদের প্রতি চিরআসক্ত হইয়া আছেন!

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণীষু নচলিঙ্গোনচ বয়ঃ"।

এপারের যাত্রী হইয়া ওপারের মহিমা বর্ণনা করিব, সে ক্ষমতা রাখি না। সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন কেবল দুইটী চক্ষুরূপে পরিণত হইয়া গেল; তবু তৃপ্তি নাই। কিন্তু নিশ্চিন্তমনে এই নৈসর্গিক শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিব— সাধ্য কি? যেখানেই উদ্ধ আর অধঃতে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা, সেখানেই উদ্ধগাকে চির-অপরাধীর মত একপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীচগামীর পথ করিয়া দিতে হয়। কেন না, নিম্নগতির প্রবলবেগ সামলাইবার শক্তি কয়জনে রাখে?

এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ নিম্নগামী যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে লাগিল। কোথাও বাহক অশ্বিনীনন্দন, আপনাদিগের গলদেশের ভূষণধ্বনিতে পাষাণকে মুখরিত করিয়া কলভাষিণী রাজনন্দিনীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া চলিয়াছে; দেখিয়া অন্য বাহক বৃষগণ যেন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাদের গ্রীবার ঘণ্টারবে কর্ণজ্বর জন্মাইতেছে। কোথাও আবার বাষ্পীয় শকটের হুঙ্কারশব্দে সংকটিয়া স্থানে হৃদকম্প উপস্থিত করিতেছে। এদিকে প্রকৃতিদেবীর মায়ার দিকে তাহার শোভন সজ্জা দেখিতেই হইবে! এখন আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীরা করি কি? অগত্যা নীচগামীদিগের প্রতি সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং নিজেদের মনস্কামনায় উদাসীন্য দেখাইতে-দেখাইতে দেবার ইঙ্গিতমত উপরে উঠিয়া

বেরামুলা দৃশ্য

* ভারতবর্ষের তৃতীয় বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যার মহিলা সংবাদ অনুসৃত।

কাশ্মীর ঝাউ-বীথি

চলিলাম। কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়। দোমেইল নামক স্থানে আসিয়া পৌছিতেই আবার যাত্রাভঙ্গ হইল। এবারে ভাবনায় ধরিল বটে! বারংবার এভাবে কল বিগড়াইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা গণিলাম। সঙ্গে সোফেয়ার ভিন্ন অন্য লোক নাই যে, সাহায্য করিবে। কি করি! সন্তানের কথামত মাতাজিরা কিছু ক্ষণের জন্য আবার মাটিতে পা দিলেন। আশেপাশে এত লোক জড় হইল যে, সেখানে তিষ্টান অসম্ভব হইয়া পড়িল। সম্মুখেই কয়েকখানা সিঁড়ী দেখিলাম। তদবলম্বনে নীচের দিকে নামিয়া, লোকচক্ষু হইতে আপনাদিগকে অন্তরাল করিতে গিয়া, যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, এ দৃশ্য না দেখাইয়া হরিরাম আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে না; তাই তার রথচক্র-ভঙ্গের ভাণে আমাদিগকে এস্থানে আটক করিল। এই জনমানবশূন্য স্থানে জগন্মোহিনীর এ বিলাস কেন? দেখিলাম, কোথাও চরণের অলক্তরাগে ধরিত্রীকে রঞ্জিত করিয়া তাহার অভিসারের পথ সূচনা করিতেছে। কোথাও সে তনুমধ্যার লোলগমনে নিতম্বের মেখলা মুখরিত হইয়া উঠিতেছে; কোথাও তাহার পীত বক্ষের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দুই কূল উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। বলিব কি! সে লোচনগ্রাহিনী অলক্ষিতে আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে চঞ্চল করিয়া দিয়া, চলৎশক্তিকে অবরোধ করিয়া রাখিল। আমাদের দুই চক্ষু তড়িৎ-গতিতে, সকল মধুরিমা পান করিতে করিতে চলিয়াছে। আবার দেখিলাম এক দৃঢ়পদ সেতুবন্ধ রঙ্গভরে তরঙ্গিনীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া। আহা! কত অনুনয়-বিনয়! এবারে আর গরব নয়। সে জানে, শরণাগত জন সদাই কৃপাপাত্র। তা'ছাড়া চতুর্দ্দিকে স্বজনগণ মস্তক উন্নত করিয়া প্রহরা রহিয়াছে, তাহার অপমান করে হেন সাধ্য কার!

আমরা এ-হেন বিচিত্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছি, এমন সময়ে আমাদের সারথি আসিয়া বাকি পথ যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অনিচ্ছার সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, আবার যাত্রা সুরু করিলাম। বেলা দুই-প্রহরের পর আমরা "চা কুঠি"তে আসিয়া পৌছিলাম। নাম শুনিয়াই কেহ মনে করিবেন না যে, এস্থানে শুধু চা পানেরই ব্যবস্থা। এখানকার সৃজনকৌশল দেখিয়া মনে হইল, যেন সদর মহল ছাড়িয়া, প্রাচীর-পরিবেষ্টিত

কাশ্মীর শ্রীনগর—ঝিলম নদীবক্ষে

এক অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলাম। কাহার জন্য এ অবরোধের ব্যবস্থা, বুঝিলাম না।

পরে আদুরে রাজনন্দিনীর কলহাস্য শুনিয়া বুঝিলাম, এ ব্যবস্থা তাহারি জন্য; কিন্তু অবরোধ বা অনুরোধ মানিয়া চলিবার অবস্থা তাহার নয়—তাহাকে পথ করিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে। বাহিরের বাধা-বিঘ্ন শুধু তাহার গতিকে আরো সুদৃঢ় করিয়া দিবার জন্য। তাহার ত্বরা দেখিয়া আমরা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না; কেবল ভাবিলাম, কবে এ গতিতে আপন গম্য-স্থানে পৌছিবার পথ করিয়া চলিতে পারিব। কিছুকাল বিশ্রামের পর আহারাদি সমাপন করিয়া আরো বিচিত্রতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঊর্দ্ধে অরুণদেব এবারে দেবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিল। দেবীও তাহাদের দর্শন মানসে ক্ষণে সমতল-ভূশয্যাশায়িনী, ক্ষণে তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গবাহিনী। সুতরাং তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদলিত করিয়া চলা ভিন্ন অগ্রসর হইবার আমাদের উপায়ান্তর ছিল না। দেবীর কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; কেন না, তিনি যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী! দূরে দেখিলাম, সন্তানেরা মাতৃবক্ষ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আপনাদের উদর পূরণের ব্যবস্থা করিতেছে; সে লাঙ্গলের ফাল মায়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে। আর অমনি মা সে শোণিতধারায় ক্ষুধার অন্ন সৃষ্টি করাইয়া, অঞ্চল ভরিয়া ঢালিয়া দিয়া সন্তানকে তৃপ্ত করিতেছেন। সর্ব্বত্র একই মাতৃলীলা! একই ভাবে সন্তানের আহারের আয়োজন! দেখিয়া অবাক হইলাম, ভাবিয়া আনন্দ উপভোগ করিলাম। পথে আর কোন পান্থশালায় পদার্পণ করিলাম না। কিন্তু তথাপি রাত্রি যাপন পান্থশালাতেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। ক্রমে সন্ধ্যা-সুন্দরী আসিয়া আমাদের গতির মুখে দাঁড়াইল! তাহার নিবিড় নীল অঞ্চলের আবরণ ছাড়াইয়া চলিবে, সামান্য সারথির সাধ্য কি?—বিশেষ গিরিসঙ্কুল পথে। তখন বেরামুলা নামক ডাক-বাঙ্গলার দর্শন পাইয়া তথায় রাত্রি-যাপন স্থির করিয়া নামিয়া পড়িলাম; এবং দুইটী কামরা অধিকার করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। অতঃপর ধূলায় ধূসরিত দেহের কিঞ্চিৎ গতি করিয়া, চন্দ্রালোকে বাহিরে আসিয়া দেখি—শৈলজা সঙ্গেই আছেন। বলিহারি আতিথেয়তা! বক্ষে পান্থজনের নিবাসের ভার বহন করিয়া, কল-কলভাষে তাহা-দিগকে আহ্বান করিতেছে। স্থলপথের যাত্রীদিগের এ প্রলোভন সংবরণ সহজ নয়। এই house-boat জলযানে শ্রীনগর পৌছিতে যদিও দুই দিন লাগে, কিন্তু এই জলপথ চলাটুকু নাকি অতীব আরামপ্রদ ও সুখকর। আমরা নর-বিবর্জ্জিতা মহিলারা এ সুখ সম্ভোগে সাহসী হইলাম না দেখিয়া, গিরিবালা যেন ব্যঙ্গভরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তা সকলে ত আর রাজদুহিতার স্পর্দ্ধার অধিকার রাখে না! কি করা যায়! তা'ছাড়া, আমরা হরিরামের আশ্রিতজনেরা, কেমন করিয়াই বা অন্যের অনুসরণ করি বল? এখানকার নৈসর্গিক শোভা সম্পদ যখন আমাদের প্রাণ-মনকে তনু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উধাও করিয়া লইয়া চলিয়াছে, এমন সময়ে কে যেন চিরপরিচিতের মত আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, এক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান আমাদের সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া দিতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, আজ শ্রীনগর পৌছিতে পারিলাম না বলিয়া, তথা হইতে আমার এক আত্মীয় তারযোগে ইঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন, যেন ইনি অনুগ্রহ করিয়া এই ঘোর বিদেশে আমাদের একটু তত্ত্ব-তালাসি করেন। সেই সৌম্য যুবকের এ-হেন সৌজন্য দেখিয়া আমরা বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। আমাদের জন্য এই শীতের রাত্রে তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া কিছুই করিতে হইবে না; যথাসম্ভব সকল রকম সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলাতে, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিস্তব্ধ নিশায় শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলাম, কে সঙ্গে থাকিয়া নিরাপদে এতদূর লইয়া আসিল! কে বক্ষে করিয়া সকল বাধা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিল! কার এ করুণা? কেন এ করুণা?

যিনি এই তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা, যিনি আপনার মহিমায় আপনি এই বিশ্বচরাচরের সমগ্র শোভাসম্পদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত, তিনিই কি আবার এই ক্ষুদ্র চক্ষুর অন্তরালে আসিয়া, মানবকে নৈসর্গিক মাধুর্য্য উপভোগ করাইয়া নিজে তৃপ্ত হইতেছেন? দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিদ্রাদেবীর দৌরাত্ম্যে বেশীক্ষণ এ চিন্তা সজাগ রাখিতে পারিলাম না; তিনি চকিতে আসিয়া আমার চৈতন্যকে কাড়িয়া লইয়া আমার প্রাণবায়ুর সঙ্গে কৌতুক করিতে লাগিলেন; প্রত্যুষে আবার প্রাণের কাছে চৈতন্যকে বুঝাইয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। কেন না সূর্য্যদেবের

কৃষ্ণকান্ত। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।"

কৃষ্ণকান্তের উইল—একাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

Emerald Ptg Works

রুদ্র নেত্রপাতকে তিনি বড় সম্‌জিয়া চলেন; তখন আর জীবলোকের সঙ্গে রঙ্গ-তামাসা চলে না।

আমরাও চেতনাকে পাইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিক্ষিপ্ত বস্তুজাত সংগ্রহ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ দেখিলাম। বাহিরে আসিতেই দেখি, আমাদের শকট প্রস্তুত এবং হাস্যবদনে সোফেয়ার বাবাজি মাতাজিদিগের যানে আরোহণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া।

আমাদের ক্লান্ত, শ্রান্ত, বাষ্পীয়-যানের কায়িক অবস্থা দেখিয়া, বাকি পথ নির্ব্বিঘ্নে চলার আশায় আশঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। তখন পুত্রকে প্রশ্ন করিতেই, সে মধুর হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "মাজি! কুচ্‌ ডর্‌ নেই।" কিন্তু পুত্র "ডর্‌ নেই" বল্লেই ত আর মায়েদের ডর যাতা নেই! তাদের মুখ যে বিমলিন সেই বিমলিন! এখনও আরো ঘণ্টা-দুইএর পথ বাকি! এবারে পথ সোজা, আর চড়াই নাই—এই যা মনের সান্ত্বনা। তা ছাড়া দিনমণির আলোক সঙ্গেই আছে। পথের দুই ধারে সরল পপলার-বৃক্ষগণ সারি বাঁধিয়া আমাদিগের সম্যক্‌ অভ্যর্থনার্থ দাঁড়াইয়া। আজ বুঝিলাম মর্ত্তধামে যারা নিতান্ত নগণ্য, সুরলোকে তারাই বিশেষ গণ্য-মান্য। এইরূপ চিন্তায় অন্তরমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব গৌরব অনুভব করাতে, অলক্ষিতে ভয়-ভাবনা দূরে পলায়ন করিল। চলিয়াছি এবার দ্রুতগতিতে।

কিন্তু হে হরি! এ কি তব লীলা নেহারি! আবার কেন গতিরোধ? আবার কেন কল বিগাড়িল? তবে কি ভূস্বর্গে পৌছান তোমার মোটেই ইচ্ছা নয়! তাই পথিমাঝে অসহায়া, করুণার পাত্রীদিগের সঙ্গে কৌতুক! এবারে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলাম; অথচ এতে সুসার কিছু নাই বুঝিলাম! বিধির মঙ্গল-বিধানে বিশ্বাস কেমন টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল, এবং তদবস্থায় ভূমিতে অবতরণ করিতে হইল। রথের জীর্ণ-সংস্কার আরম্ভ হইল, এবং সংস্কারকের মুখে আবারও সেই দিলাশার বুলি—"মাজি! আভি সব ঠিক হো যায়েগা"। কিন্তু "আভি" যে আর আসে না, এই ত দুঃখ। সঙ্গের মেরামতির সরঞ্জাম অতি সামান্য; তাতে সে একক, অশিক্ষিত, দরিদ্র ক্ষত্রিয়;—এই অচলকে সে চলৎশক্তি দিতে পারিবে কি? কিন্তু ভগবান যাকে বুদ্ধিমান করিয়া সৃজন করিয়াছেন, সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। প্রমাণ ছাড়িয়া প্রত্যক্ষই তাহা দেখিলাম। তাহারি হস্তের কৌশলে অবিলম্বে আমাদের রথচক্র বায়ুভক্ষণে বলসঞ্চয় করিয়া শীর্ণদেহকে স্ফীতাকার ধারণ করাইয়া পূর্ব্বগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীনগর যখন ধরধর, তখন পর্য্যন্ত পপ্‌লারগণ একইভাবে দণ্ডায়মান। সরকারের রেজিমেণ্টের সংখ্যা আছে, কিন্তু এরা অসংখ্য। দূর হইতেই দেখিলাম শ্রীনগর একটী প্রশস্ত উপত্যকাভূমি; কিন্তু নগরীর নিজের বিশেষ "শ্রী" না থাকিলেও আশেপাশের শ্রীতে শ্রীমন্ত। রাজার-ঝি ঝিলমের এখানে অবাধ গতি—তাই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি হইতে ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক পর্ব্বত-প্রাকারে পরিবেষ্টিত দেখিলাম।

বর্ষায়

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ]

বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি ঝরে বনেরে আকুল করে'
বহি আনে ভাষা,
আকাশে ভাবনা-রেখা মেঘের ধূসরে লেখা
গূঢ় ভালবাসা!
ঝরিছে করুণা ধারে স্বর্গ হতে ধরাপরে
বারতা নূতন,
উষর উর্ব্বর হয়, পাষাণ বাহিয়া বয়,
স্নেহ-আবাহন।

সরসীর শান্ত বুক আজি ভুলিয়াছে সুখ
বর্ষণ-আঘাতে,
ছায়া মায়া পুরাতন কোথা আজি নিমগন
আঁধার প্রভাতে!
ছিল যা বাহিরে ভাসি, আজিকে অন্তরবাসী
আলোক বিরাগী,
যেথায় নীরব-ধ্যানে প্রেম শুধু আছে প্রাণে
ভাব-অনুরাগী।

তীর্থদর্শন

[শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ.]

শ্রীমতী হেমলতা দেবী

যে ব্রিষ্টল নগরে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি রাধানগর রাজাকে স্মরণ করাইবার নিমিত্ত কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করে না—এই বলিয়া আজ ৮৩ বৎসর ধরিয়া তাঁহার দেশবাসী কেবল দুঃখ করিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে, যখন স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি সমভিব্যাহারে ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে যান, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাজার স্মরণার্থ কোন উপযুক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ যদি ঐখানে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তিনি দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। কিন্তু নর-দেবতার উদ্দেশে স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ—বাঙ্গালীর ইতিহাসের সেই যুগের অপেক্ষা করিতেছিল, যে যুগে বাঙ্গালী শুধু মৃতের উদ্দেশে পূজা করে না, জীবিতকেও সম্মান করিতে শিখিয়াছে—যে যুগে বাঙ্গালী কৃত্তিবাসেরও স্মৃতিরক্ষা করে, আবার রবীন্দ্রনাথের সংবৰ্দ্ধনা করে।

স্বর্গীয় হরিমোহন রায়ের ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ ও রামমোহন লাইব্রেরির সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র-নাথ পালের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় গত গুডফ্রাইডের ছুটীতে রাধা-নগরে রামমোহন মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হইয়াছে; এবং যে মহাত্মা সতীদাহের যুগে মৃত হিন্দু-সমাজকে 'পূজার্হা গৃহ দীপ্তয়ঃ' কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ একজন হিন্দু মহিলা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বোধ হয় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শুক্রবার বেলা ৮টার সময় ৭০জন লোক তীর্থ-যাত্রার উদ্দেশ্যে তেলকল-ঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হন। ট্রেণ ছাড়ে-

রাজা রামমোহন রায়ের গৃহের ভগ্নাবশেষ

তীর্থে সমাগত ভদ্রমণ্ডলী

ছাড়ে এমন সময় ঘাটে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি শোনা গেল। দ্বিজেন বাবু ষ্টেসন-কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিলেন, ট্রেনটা দু'চার মিনিট দেরী করিয়া ছাড়িতে হইবে—ঐ ষ্টীমারে যদি আমাদের কেহ থাকে। তাহাই হইল; দেখা গেল, সে ষ্টীমারে আমাদের কেহ নাই। ষ্টেসন-মাষ্টার তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এইবার ট্রেণ ছাড়িব কি?" "আচ্ছা ছাড়ুন।" গাড়ী তখন চলিল। বোলপুরে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় যাইবার জন্যও ট্রেণ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল,—সেটা কিন্তু ছিল স্পেশাল; আর এটা সাধারণ প্যাসেঞ্জার গাড়ী।

বড়গেছে বলিয়া একটি ষ্টেসনে গাড়ী অনেকক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। সেখানে সকলে নামিয়া ডাব খাইতে আরম্ভ করিলেন। যতগুলি ছিল, একে একে সব নিঃশেষ করা হইল। দেখা গেল, মোট ৩৮টি খরচ হইয়াছে। হিসাব করিয়া দাম দেওয়া হইতেছে, এমন সময়, একটি যুবক আসিয়া বলিল যে, দাম লইতে ষ্টেসন-মাষ্টার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, দাম তাহারা লইবে না। বলিতে-বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চেনা নাই, পরিচয় নাই; ভবিষ্যতে আলাপের কোন সম্ভাবনা নাই—অথচ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া অযাচিতভাবে সেবা করিয়া গেলে—একটা ধন্যবাদেরও অবসর দিলে না; জানি না তুমি কে, চিনি না তোমায়; তবে এটা বুঝিয়াছি, সমস্ত বাংলা দেশের যুবকবৃন্দের প্রতিনিধি তুমি,—অর্দ্ধোদয় যোগে, দামোদরের বন্যায়, যাহারা নিজেদের একবার দেখা দিয়াছিল,—তুমি তাহাদেরই একজন।

কিছুদূর যাইলে, ট্রেণ যখন একটা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন 'জয় রামমোহন রায়ের জয়' ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। ষ্টেসনে পৌছিলে দেখা গেল, স্থানীয় গ্রামসমূহের বালকেরা একত্র হইয়া জয়ধ্বনি করিতেছে। ষ্টেসনটি একটি ছোট চালা-ঘর; গাড়ী দাঁড়ায় সেখানে একমিনিট। সেই এই মিনিটের মধ্যে সেই সকল বালক ছাড়ান পেঁপে ও ডাব গাড়ীতে-গাড়ীতে দিতে লাগিল। ট্রেণ ছাড়িলে আবার তাহারা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ভক্তের প্রণাম—পথকে হউক, বা রথকে হউক, বা মূর্ত্তিকে হউক—তাহা অন্তর্যামীর চরণপ্রান্তে পৌছায়। তীর্থযাত্রীর এই সহৃদয় সেবা কি তীর্থদেবতার নিকট পৌছিবে না?

স্মৃতিস্তম্ভের স্থানে

বেলা সাড়ে-বারটার সময় ট্রেণ চাঁপাডাঙ্গায় পৌছিল। সেইটাই ঐ লাইনের শেষ ষ্টেসন;—সেখানে আমাদের নামিতে হইবে। দেখি, শতাধিক ভলেণ্টিয়ার নিশান হাতে দাঁড়াইয়া রামমোহন রায়ের জয়ধ্বনি করিতেছে।

বিস্তর কনেষ্টবল, চৌকিদার, দফাদারও উপস্থিত দেখিলাম। এত কনেষ্টবল-চৌকিদার কেন? শুনিলাম, আমাদের সঙ্গে এখানকার ভূতপূর্ব্ব পুলিসের একজন বড় কর্ম্মচারীর যাইবার কথা ছিল—এ অভ্যর্থনা তাঁহারই জন্য। নিকটেই ডাকবাঙ্গলা। সেখানে ও গাছের তলায় বিশ্রাম করিবার জন্য সকলে সমবেত হওয়া গেল। প্রচুর জলযোগ এবং ততোধিক প্রচুর ভলেন্টিয়ারদের পরিচর্য্যা পাওয়া গেল। এখান হইতে যাইবার জন্য তিন রকম যানের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিলাম—পাল্কী, হাতী ও চরণ। আমাদের দলের প্রায় ৪০ জন—অধিকাংশই যুবক—ঐ শেষ যানেরই আশ্রয় লইল। সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইতে হইলে, মাঝে-মাঝে সুকিয়া ষ্ট্রীটটা হাটিয়া গিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম ধরি; সুতরাং হাঁটিয়া যাইবার দুরাশা একেবারে ত্যাগ করিলাম। এখন পাল্কীতে যাই, না হাতীতে চড়ি। ভাবিয়া দেখিলাম, পাল্কী তো একবার চড়া হইয়াছে—টোপর মাথায় দিয়া,—কিন্তু হাতীতে তো কখন উঠি নাই; তাই হাতীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু পরে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হাতী হইতে নামিয়া যখন দেখিলাম, মাথাটি বেশ ঘুরিতেছে, গা বমিবমি করিতেছে—কাপড়খানি উল্টাইয়া যখন দেখিলাম স্থানে স্থানে মচকাইয়া গিয়াছে—এবং এই elephant-Sicknessএর জন্য যখন রাত্রের ভূরিভোজন হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিলাম এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম, তখন চাণক্য পণ্ডিতের 'হস্তি-হস্তসহস্রেণ' বাক্য সম্যক উপলব্ধি করিলাম; স্থির করিলাম, বরং ছাতু খাইব, তিনটা বিবাহ করিব—কিন্তু হাতী! আর না! মাহুতের হাতে একটি লোহার ডাণ্ডা দেখিলাম—সেইটা দিয়া বুড়ো হাতীটাকে ক্রমাগত পিঠিতেছে। এইটার নাম বুঝি অঙ্কুশ। একবার ইচ্ছা হইল, মাহুতের কাছ হইতে সেইটা কাড়িয়া লইয়া আসি—আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকের জন্য কাজে আসিতে পারে।

শোনা ছিল, রাধানগর চাঁপাডাঙ্গা হইতে ৮ মাইল। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, হাতীর উপর থাকা অসম্ভব মনে করিয়া, যখন নামিয়া পড়িলাম, তখনও শুনি রঘুনাথপুর আরও তিন মাইল এবং রঘুনাথপুর হইতে রাধানগর আরও এক মাইল। সেইখানেই হাতী ছাড়িয়া দিলাম; অবশিষ্ট পথটা হাঁটিয়া যাইব স্থির করিলাম। পথ বরাবর মেঠো,—মাঝে-মাঝে দু'-একখানা গ্রাম; আর যেখানেই গ্রাম, সেখানেই দেখি, ৫।৭টি ভলেন্টিয়ার নিশান হাতে দাঁড়িয়ে—আর ডাব-সরবতের বন্দোবস্ত। হাতী হইতে নামিয়া যেখানে আমরা বিশ্রাম করিলাম, সেটা একটা দাতব্য-চিকিৎসালয়—গ্রামটীর নাম বুঝি হেলেন। এমন প্রকাণ্ড সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দাতব্য-চিকিৎসালয় পূর্ব্বে কোন পাড়াগাঁয়ে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। স্থানটী যেমন রমণীয়, আহারাদি ও খাতির-যত্ন তেমনি প্রচুর। Shakespeare বলিয়াছেন "Helen's cheek but not her heart"। কিন্তু আমাদের এই Helenএর cheekএর সঙ্গে-সঙ্গে heartএরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। সেখান হইতে সন্ধ্যার সময় পদব্রজে আমরা রঘুনাথপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এই রঘুনাথপুরে ৺হরিমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের বাটী—আমরা সেখানকার অতিথি। রাধানগর নদীর ওপারে; সেইখানে রাজার জন্মস্থান। রাত্রি ৯টার সময় আমরা রঘুনাথপুরে পৌছিলাম। শুনিলাম, যাহারা বরাবর হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহারা আমাদের তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে পৌছিয়াছে। আদর-অভ্যর্থনার কথার আর পুনরুক্তি করিব না;—আহারাদির ব্যবস্থার কথা পাড়িয়া, যাঁহারা যান নাই, তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিব না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা রাজার পৈতৃক ভগ্ন বাটী—তাঁহাদের পৈতৃক গৃহ-বিগ্রহ—রাজার প্রতিষ্ঠিত সরোবর—ভগ্ন দোলমঞ্চ—যেখানে তিনি উপাসনা করিতেন—সেই শ্মশানগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া যেখানে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন—এক্ষণে যাহা কাছারী-বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে—এই সব দেখিয়া বেড়াইলাম। এ সবই ঐ দারুকেশ্বর নদের এপারে। যেখানে রাজার ভ্রাতৃজায়া সহমরণে যান—যে দৃশ্য দেখিয়া তিনি সহমরণপ্রথা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, সেখানে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল; এক্ষণে সমস্ত নদগর্ভে। বাসায় ফিরিয়া আসিলে বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সমবেত বালিকাদিগকে দুই-চারিটা প্রশ্ন করিলেন—'কি বই পড়' 'অমুক কে ছিল' 'অমুকের বাপের নাম কি'—মেয়েরা যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। 'আচ্ছা

রামমোহন রায়ের নাম শুনিয়াছ?'—'না'। "তিনি কোথায় জন্মেছিলেন জান?"—'না'। নিকটে প্রাণকৃষ্ণবাবু বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন "ওরা তো ছেলেমানুষ; ওদের বয়সের উপর আরও ১৫।২০ বছর যোগ করে, তাদের জিজ্ঞাসা করুন—তারা রামমোহন রায়ের নাম কখন শুনেছে কি না।" বৈকালে সকলে নদী পার হইয়া রাধানগরে যাওয়া হইল। সামিয়ানার নীচে বিরাট সভা; প্রায় দুই-হাজার লোক একত্র সমবেত। সকালবেলার অভিজ্ঞতার ফলে এই জনসংখ্যার মধ্যে কতজন হুজুক দেখিতে এবং কতজন বা রাজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আসিয়াছিল—বলা শক্ত। সঙ্গীত, উপাসনা, বক্তৃতা ও অভিভাষণের পর শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রামমোহন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করিলেন। রাত্রি ৮টার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল—যে যার বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিতে-না-উঠিতে শুনি, আহার্য্য প্রস্তুত—খাইয়া তখনি রওনা হইতে হইবে। খাওয়া শেষ হইলে খবর পাইলাম, হাতী দুইটারই অসুখ—যাইতে পারিবে না। পাল্কীর অভাবে, ফিরিবার সময়ও বোধ হয় আবার হাতীর ব্যবস্থা হইবে, এ আশঙ্কা বরাবরই ছিল;—হাতী আর যাইবে না শুনিয়া, যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলাম। বড় ইচ্ছা হইল, মাহুতের নিকট হইতে বাঙালীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান গৌরব হস্তী-চিকিৎসাটা শিখিয়া লই; কিন্তু তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইল—সেটা আর ঘটিয়া উঠিল না। পরে, একবার পাল্কী, একবার শ্রীচরণ—খানিক রথে, খানিক চ'লে—বেলা ২টার সময় চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তারপর যথাসময়ে ট্রেণে উঠিয়া হাওড়া-ময়দান ষ্টেসন ও অতঃপর ট্রামে চড়িয়া বাড়ী পৌছিলাম। তেরস্পর্শে বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম, তবুও নির্ব্বিঘ্নে, সুস্থশরীরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম। পুণ্যস্থান, তীর্থস্থান দর্শন করিলাম, সর্ব্বত্র আদর-অভ্যর্থনা লাভ করিলাম। সঙ্গে বিছানা লই নাই, মশারিও নাই; দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তিন দিন রাজভোগে আহার করিয়াছি—হাতী চড়িয়াছি, পাল্কীতে উঠিয়াছি, ট্রেণে চাপিয়াছি, ট্রামে গিয়াছি, ষ্টীমারে গঙ্গাপার হইয়াছি। বাড়ী ফিরিয়া মণিব্যাগ খুলিয়া মিলাইয়া দেখি—এ তীর্থযাত্রার যাতায়াতের খরচ হইয়াছে—মোট নগদ চৌদ্দ পয়সা—ট্রামভাড়া ও গঙ্গাপার হওয়া বাবদ।

অপরাধ-ভঞ্জন

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ]

মোর অপরাধ ক্ষমা কর দয়াল হরি!
মন প্রাণ সব দিয়ে
তোমারে পূজিতে গিয়ে,
কামনার অঞ্জলি দিয়েছি ভরি;
তোমারে তোমার লাগি
পূজিনি যামিনী জাগি,
ভিক্ষা চেয়েছি শুধু জীবন ধরি;—
মোর অপরাধ ক্ষমা কর দয়াল হরি!
দুখেতে বিপদে ভয়ে
পড়িয়াছি লুটাইয়ে,
সলিলে ভিজায়ে পদ দিয়াছি মরি,
সুখেতে ভুলেছি ত্বরা
ও মূরতি দুখহরা,
রোষে ক্ষোভে ফাটে মুখ সে কথা স্মরি;—
মোর অপরাধ ক্ষমা কর দয়াল হরি!

ও পদে যে দেছি মালা,
সে যে এ হিয়ারি জ্বালা,
শোক-দুখ পাদপীঠ দিয়াছে গড়ি,
সাধন ভকতি নাহি,
মুখে তব নাম গাহি,
কত যে কপট আমি ভাবিতে ডরি;—
মোর অপরাধ ক্ষমা কর দয়াল হরি!
নীরস পরাণ মোর
তপত নয়ন-লোর,
প্রেম-ফুল মুকুলেই পড়ে যে ঝরি,
চেয়েছি কেবল আমি,
দিই নাই কিছু স্বামী,
বলিতে পারিনে কিছু সাহস করি;—
মোর অপরাধ ক্ষমা কর দয়াল হরি!

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সকালে সোর-গোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশী। সঙ্গে জনদশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পোনরটা—তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধ-শুকনো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড়-বড় শিমুল গাছ—ওপারে বালুর উপর স্থানে-স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পোনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুলগাছে-গাছে ঘুঘু গোটাকয়েক দেখিলাম. মরানদীর বাঁকের কাছটায়ও দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে-করিতে সবাই দুই-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়াছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, "কিহে কান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক রেখে দিলে যে!"

"আমি পাখী মারি না।" "সে কি হে? কেন, কেন?"

"আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।"

কুমার সাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

স্বরযুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "চিড়িয়া শিকারমে কুছ সরম হ্যায়?"

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না; সুতরাং জবাব দিলাম, "সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়।" যাক্, আমি তাঁবুতে ফিরিলাম; "কুমার সাহেব—আমার শরীরটা ভাল নেই" বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর-এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি,—বেহারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?"

"তা' জানিনে।" "তুমি কে?"

"আমি বাইজীর খানসামা।" "তুমি বাঙ্গালী?"

"আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।"

"বাইজী হিন্দু?"

রতন হাসিয়া কহিল "নইলে থাক্‌ব কেন বাবু?"

আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পরদা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী, যেই হোক, বাঙালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ী পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়-গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, "বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা আর খাবো না—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?"

রতন আসিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল,

"তুমি তামাক খাও, তা' জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য যায়গায় যা' কর, তা কর; কিন্তু, আমি জেনে-শুনে এই সত্যিক জাতের এঁটো গুড়গুড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে। আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্চি—ওরে ও—"

"থাক্, থাক্; চুরুটে কাজ নেই। আমার পকেটেই আছে।"

"আছে? বেশ, তা' হলে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো, ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে!"

"ভালো লাগ্‌ল না।"

"না লাগ্‌বারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা করে কি আমোদ পায়, তা' তারাই জানে। বাবা ভালো আছেন?"

"বাবা মারা গেছেন।" "মারা গেছেন? মা?"

"তিনি আগেই গেছেন।"

"ওঃ—তাইতেই" বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল, তাহার চোখ দুটি যেন ছল-ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয় ত আমার মনের ভুল। কিন্তু, পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য-সত্যই মৃদু এবং আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, "তা'হলে যত্নটত্ন করবার আর কেউ নেই, বল। পিসীমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাক্‌বেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চি। পড়াশুনা করচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ করে দিয়েচ?"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটায় কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "আচ্ছা কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি বলেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইচই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?"

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল, "লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা, ভালবাসাটাসা কি কিছু নেই? আমার নাম পিয়ারি,—কিন্তু আমার মুখ দেখেও যখন চিন্‌তে পারলে না, তখন, ছেলেবেলার ডাক-নাম শুনেই কি আমাকে চিন্‌তে পারবে? তা' ছাড়া আমি তোমাদের—ও গ্রামের মেয়েও নই।"

"আচ্ছা, তোমাদের বাড়ী কোথায় বল?" "না, সে আমি বোলবো না।" "তবে তোমার বাবার নাম কি বল?"

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, "তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারি?"

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, "তা' যদি না পারো, আমাকে চিন্‌লে কি করে, সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?"

পিয়ারি আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, "না, তাতে দোষ নেই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?" "বলেই দেখ না?"

পিয়ারি কহিল, "তোমাকে চিনেছিলাম, ঠাকুর, দুর্ব্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাগ্যি সূর্য্যিদেব তা' শুকিয়ে নিয়েচেন; নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাক্‌তো। বলি, বিশ্বাস করতে পারো কি?"

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু, সে আমারই ভুল। কিন্তু তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে পিয়ারির ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাসা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য-সত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে, কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থাটা যেন সাম্‌লাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, "না, ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলুম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গী, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস করতে পারে নি। তা' এতই যদি বুদ্ধিমান, তবে মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এ চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না! যাও, চট্‌পট সরে প'ড়।"

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে

দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম—"চাকরি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বসে না থাকি ব্যাগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে করে বস্‌বে।"

পিয়ারি কহিল, "কর্‌লে সে তো তোমার সৌভাগ্য, ঠাকুর! এ কি আর একটা আপ্‌শোষের কথা?"

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধু-মহলে, কুমার সাহেবের দরবারে, প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয় ত ফিরে যেতে পারে।"

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য্য পরিহাস আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া, এক পেয়ালা চা খাইয়া, চুরুট ধরাইয়া, মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম,—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্য্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু, অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ, এ আমাকে বেশ চিনে। পিসীমার কথা পর্য্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ, যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু, কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায়-কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসাটাসা কি কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়াও আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথা-বার্ত্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটা আমাকে যেন অবিশ্রাম মর্ম্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম, ৮টা ঘুঘুপাখী মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ারির গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিনচারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারির অভিশাপ ফলিল না কি? প্রাণীহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ, আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পালাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীটির প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল;—সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া তবে স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারো সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ, সে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার সহিত চোখোচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

সে দিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে, যে যেখানে ছিল, আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছল্যভরেই শুনিতেছিলাম; কিন্তু শেষে উৎগ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন, একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেতযোনিতে যদি কাহারো সংশয় থাকে—যেন আজকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হৌন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রের মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার

ঘোর রাত্রে সেই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার কাছে আসুন।" আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনি বিশ্বাস করেন না?" "না।" "কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?" "না।" "তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেচেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ, বাঙালীরা ত নাস্তিক—ম্লেচ্ছ।" কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম, "দেখুন, এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, ম্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।"

ভদ্রলোক খপ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।"

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "আপ সেখি মৎ করো বাবু" বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা-ভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের খল্‌খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরও' হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে;—এম্‌নি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে, দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া-খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন্ এক সময়ে কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া 'বসিয়াছে; এবং কথাগুলা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্ব্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেয়া বাবু সাহেব, আপ যায়েগা?"

"যায়েগা বৈকি।"

"যায়েগা? আচ্ছা, আপ্‌কা খুসি। প্রাঁড় জানেসে—"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নাই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমিও শুধু-হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।"

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না; তাহারা মুরগী খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্য্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁত-কপাটি লাগে;—এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলে, আমাদের রাজারাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাঁহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাঁহারাও দু'কথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্ত্তা।

ইহাঁদের দলে শুধু একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল,—সে শীকার করিতে জানে না; এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদটাও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সেও কোন দিন ভূত দেখে নাই। অতএব, আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না। বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ভূত মান না?" "একেবারে না।" "কেন মান না?"

"মানি না, নেই বলিয়া" এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা

একেবারেই মানে না, তাহারাও ভয়ের যায়গায় আসিয়া পড়িলে, ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বন্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, "শ্রীকান্ত বাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন; কিন্তু, আমার হাতে এই লাঠি থাক্‌তে, ভূতই বল, আর প্রেতই বল—কাউকে কাছে ঘেঁস্‌তে দেব না।" "কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?" "ঠিক থাক্‌বে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।"

দেখিলাম তাহার আগ্রহটা একটু যেন অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পাইচারি করিয়া এই ব্যাপারটাই মনে-মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য, তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটা রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, "শ্রীকান্ত মনে-মনে রাম নাম কর্; ছেলেটা আমার পিছনে বসিয়া আছে"—সেই দিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, —আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত; কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে-মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছম্‌ছম্‌ যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া, আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সে দিনটাও এম্‌নি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা-রোগে আক্রান্তা হইয়া ছয়মাস ভুগিয়া-ভুগিয়া মরেন, তখন সে মৃত্যু-শয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটীর ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্ব্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ-পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালীর সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ, শান্তস্বভাব এবং সুনির্ম্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকেও তাঁহাকে বড় কম ভালোবাসিত না। কিন্তু, সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল, এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটীর সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকেই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্ম্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং, যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিমশয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে, নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া, শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যেখানে চলিয়া গেলেন, তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে কোনো স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই।

আমার পিসীমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়া ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসীমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে-শোকে গিয়ে দেখিস্; এই ছুঁড়িটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস্ না।" সেই অবধি আমি মাঝে-মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসীমার পয়সায় এটা—ওটা—সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই। বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সে দিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ;—আমি খাটের অদূরে বহুপ্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া

আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া, ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকান্ত, তুই বাড়ী যা।" "সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?" "তা' হোক। প্রাণটা আগে।" ভুল বকিতেছেন ভাবিয়া বলিলাম, "আচ্ছা যাচ্চি—জলটা একটু থামুক।" নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা' ভাই যা'—আর এতটুকু দেরি করিস্‌নে—তুই পালা।" এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে আমার বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, "আমাকে যেতে বল্‌ছ কেন?"

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখ্‌ছিস্‌নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো-কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস্ বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?"

তার পরে সেই যে সুরু করিলেন—"ঐ খাটের তলায়! ঐ মাথার শিয়রে! ঐ মারতে আস্‌চে! ঐ নিলে! ঐ ধরলে!" এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে, যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই। বোধ করি বা যেন কি সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন সেই অমাবস্যার ঘোর দুর্য্যোগ তুচ্ছ করিয়াও বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদিদির কালো-কালো সেপাই-সান্ত্রির ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

"বাবু?"

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন। "কি রে?"

"বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।"

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেম্‌নি বিরক্ত হইলাম। এত-রাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমান-কর স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারি দিনের উভয় পক্ষের ব্যবহার-গুলা স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, "আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।"

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, "বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আস্‌বেন বল্‌লেন।" কি সর্ব্বনাশ! এই তাঁবুতে? এত রাত্রে, এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, "তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোন মতেই যেতে পারব না।" রতন কহিল, "তা' হলে তিনিই আস্‌বেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আস্‌চি, বাবু, বাইজীর কোন দিন এতটুকু কথার কখনো নড়-চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।"

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ্ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, "আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আস্‌চি।" তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই চারিজন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুটটা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল। হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে-সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারি সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার-বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই, রুদ্ধ-স্বরে বলিয়া উঠিল—"শ্মশান-টশানে তোমার কোন মতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।"

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—"কেন?"

"কেন আবার কি? ভূত প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা'হলে আর ফিরে আস্‌তে হবে!" বলিয়াই পিয়ারি অকস্মাৎ ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। (ক্রমশঃ)

আক্‌বার বাদশাহ কি নিরক্ষর ছিলেন ?

[কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, বি-এল, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার]

আক্‌বার বাদশাহ সম্বন্ধীয় নানা ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কৃত ও সঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার বিষয়ে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকগণ বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেকগুলির আভ্যন্তরীণ প্রামাণিকতা থাকায় কেহ সেগুলি প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে গোড়া হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। আক্‌বার বাদশাহ যে সংখ্যা ও বর্ণ-মালায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা দ্বিতীয়োক্ত তথ্যগুলির ন্যায়, য়ুরোপে বিনা তর্কে গৃহীত হইয়াছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের একটি সভায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্‌ট্‌সেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ আক্‌বার বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি আক্‌বারের পূর্ব্বকথিত অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছিলেন [১]। সভায় বহু য়ুরোপীয় ও মুসলমান মনীষী উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েকটি বিষয় লইয়া মতভেদও হইয়াছিল। কিন্তু আক্‌বারের নিরক্ষরতা-বিষয়ক মতের কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

যে যে প্রমাণের উপর এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, তাহা এই :—

(১) এঃ মন্‌সেরাট্‌ (Monserate) নামক একজন ক্যাথলিক্‌ ধর্ম্মপ্রচারক লিখিয়াছেন, "তিনি (আক্‌বার) লিখিতে কিংবা পড়িতে পারেন না। কিন্তু তিনি বড় অনু-সন্ধিৎসু ও সর্ব্বদাই বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত থাকেন। এই মনীষিগণ নানাবিষয়ে তর্কবিতর্ক করেন, এবং তাঁহাকে বহুবিধ গল্প বলেন [২]।"

(২) জেরোম জেভিয়ার (Jerome X'avier) নামক অপর এক ক্যাথলিক্‌ মিসনারি বলেন, "বাদশাহের (আক্‌-বারের) অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি; যদিও তিনি লিখন-পঠনে অনভিজ্ঞ, তথাপি পণ্ডিতগণ যাহা কিছু কথোপকথন করেন, কিংবা যাহা কিছু তাঁহার নিকট পাঠ করা হয়, তাহা সমস্তই তাঁহার স্মৃতিতে জাগরিত থাকে [৩]।"

(৩) আবুল্‌ফজ্‌লের "আক্‌বার-নামায়" লিখিত আছে যে, আক্‌বার বাল্যকালে অলস ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। যে শিক্ষকের নিকট তিনি পঞ্চমবর্ষ বয়সে প্রথম লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন, সে শিক্ষক নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন। পায়রা উড়ানতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি থাকায়, তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয়। ইহাঁর পর আরও কয়েকটি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আক্‌বারকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কিন্তু যদিও আক্‌বারের অক্ষর-পরিচয় হয় নাই, তথাপি এইরূপ শ্রবণ করিয়া, তিনি বাল্যকালেই "হাফিজ্‌" ও "রুমি"র কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন [৪]।

(৪) "তুজকি-জাহাঙ্গীরী" নামক গ্রন্থে আক্‌বারকে "উম্মি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ও এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদগুলিতে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "নিরক্ষর" [৫]।

১। Asiatic Review, July 1, 1915.

২। "Father A. Monserate's Account of Akbar (26th Nov., 1582)" edited and translated from Portuguese by Rev. H. Hosten, S. J., in J. A. S. B., 1912, P. 194. See also Memoirs of A. S B. (ed. by Rev. H. Hosten, S. J.), vol. III, No. 9, P. 643, for the Latin text of the passages. Compare J. B. Peruschi, S. J., Informatione del Regno e stato del gran Re di Mogor......, Brescia, P. M. Morchetti, (1597) which contains extracts from various letters and is based for the greater part on Monserate's Relacam do Equebar, Rei dos Mogores. (See Memoirs of A, S. B., vol. III, No 9, P. 540.)

৩। "Father Jerome X'avier" by H. Beveridge, in J. A. S. B., 1888, P. 37, giving an extract from a letter of Jerome X'avier dated 1598 A. D. It has been utilized by F. D. Maclegan in J. B. S. B., 1896, p. 77.

৪। Akbar-Namah, vol. I (Beveridge), P. 518 n.; Asiatic Review, July 1, 1915, P. 43, 44; Elliot, vol. IV (Lubbut-Tawarikh), P. 294: Ferishta, Vol. II, P. 280.

৫। E. J. Rogers and Beveridge's transl. P. 33; Lowe's transl. Fasc. I, (Bibl. I[illegible]ca), P. 26.

এখন উপরিউক্ত কয়েকটি যুক্তির প্রতিবাদে কি বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে দিতেছি :–

(ক) এঃ মন্‌সেরাট্‌ আক্‌বারের নিকট ১৫৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। জেরোম জেভিয়ার্‌ও কয়েক বৎসর মোগল-সম্রাটের অতিথি হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও সম্মানের যোগ্য। কিন্তু যদি তাঁহাদের চিঠি কিংবা পুস্তকে এমন কোনও মন্তব্য থাকে, যাহা অনেকগুলি ঘটনা ও তথ্যের পুঞ্জীকৃত প্রমাণে বাধিত হয়, তাহা হইলে ঐ মন্তব্যের গুরুত্ব একবার ভাল করিয়া পরিমিত হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে দেখা কর্ত্তব্য, কিরূপে গ্রীসদেশীয় ভারত-পর্য্যটকগণের সাক্ষ্য ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ও কীথ্‌ (Profs. Macdonell and Keith), সে সময়ের ভারতীয় রাজাদের ভূ-স্বত্ব কি প্রকার ছিল, এ বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, "ইহা দুঃখের বিষয় যে, এ সম্বন্ধে গ্রীক লেখকদের সাক্ষ্যের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করা বিপজ্জনক; কারণ, তাঁহারা এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুসন্ধানে হয় ত কম অভ্যস্ত ছিলেন ও তাঁহাদের উক্তিগুলি অপ্রচুর তথ্যের উপর স্থাপিত।" [৬] গ্রীক্‌ দূত মেগাস্থিনিসের "সপ্ত সামাজিক শ্রেণীর" বর্ণনা ঐতিহাসিক ব্যবহারের জন্য কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌সের (Prof. Hopkins) মন্তব্য অপর এক দৃষ্টান্ত। (J. A. O. S., Xiii, P. 87, 88, foot-note দ্রষ্টব্য।)

এখন দেখা যাউক, উপরিউক্ত ক্যাথলিক্‌ ধর্ম্মপ্রচারকদ্বয়ের পক্ষে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করা কতদূর সুবিধাজনক ছিল। তাঁহারা মোগল-বাদশাহের আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন বটে; তথাপি, বৈদেশিক ও বিধর্ম্মী হওয়ায়, তাঁহারা সন্দেহের চক্ষেই দৃষ্ট হইতেন। অধিকন্তু, মোগল-বাদশাহদের যেরূপ আদবকায়দা ছিল ও যেরূপ আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহারা থাকিতেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত তথ্য জানা বড় সুসাধ্য ছিল না। আর, যখন তাঁহারা সভায় অপর লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তখন কোন কিছু লিখিবার বা পড়িবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কর্ম্মচারী বা অন্য লোকের দ্বারাই সাধিত হইত। সুতরাং এ বিষয়ে ক্যাথলিক্‌ মিসনারিগণের উক্তিগুলি শ্রুত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই বোধ হয়। মন্‌সারেট নিজেও বলেন না যে, তিনি তাঁহার পুস্তকে যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। তিনি বলেন, "চেঙ্গিজ্‌ খাঁ, টাইমুর বেগ, সিথিয়ান্‌ মোগলদিগের সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে কিছু সম্রাট্‌ জেলালুদ্দিনের নিকট, কিছু টাইমুরের নিকট, কিছু ক্যাষ্টিলের চতুর্থ হেন্‌রি কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী হইতে, ও অবশিষ্ট কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে জানিয়াছি।"

এতদ্ব্যতীত, ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, ক্যাথলিক্‌ ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যে সমস্ত বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলির সমস্ত উক্তিই একেবারে নির্ভুল নহে। রেভারেণ্ড হষ্টেন (Rev. Hosten) মন্‌সারেটের বৃত্তান্তের অনেকগুলি ভ্রম দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম, যথা :—

(১) "লোকেরা সম্রাটের পদে মস্তক অবনত করিল" ইহার পরিবর্ত্তে "লোকেরা সম্রাটের পদচুম্বন করিল" লিখিত আছে (J. A. S. B., 1912, P. 202, f. n. 4); (২) "নর্ম্মদা নদী আহম্মদাবাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত" (*Ibid*, P. 206, f.n. 4); (৩) "চম্বল সিন্ধুনদীর শাখা" (*Ibid*, P. 206, f. n. 5); (৪) "টাইমুরের সময় দিল্লীতে খ্রীষ্টান রাজগণের শাসন বর্ত্তমান ছিল" (*Ibid.*, P. 207, f. n. II); (৫) "আক্‌বারের সামরিক-প্রতিষ্ঠানে ১২০০০ কিংবা ১৪০০০ সংখ্যক সৈন্যের নেতৃত্ব" (*.Ibid*, P. 210, f. n. 3)।

পক্ষান্তরে, আবুল্‌ ফজ্‌ল যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ সুতরাং প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবার উপযুক্ত। তিনি সম্রাটের সমধর্ম্মী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সম্রাটের নিকট উপস্থিত থাকিবার তাঁহার অনেক সুযোগ ছিল। সুতরাং আক্‌বারের ধরণ-ধারণ, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি তিনি অনেক জানিতেন। তাঁহার "আইনি-আক্‌বরী"তে

৬ Vedic Index of Subjects and Names vol. II, P. 214.

৭ Memoirs of A. S. B., vol. III, No. P. 9520.

তিনি বলেন যে, আক্‌বার প্রত্যহ বেতনভোগী পাঠক কর্ত্তৃক গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন ও পাঠককে পঠিত পৃষ্ঠার সংখ্যা-হিসাবে পারিশ্রমিক দিতেন; এবং কতগুলি পৃষ্ঠা পঠিত হইল, তাহা আক্‌বার স্বহস্তে স্বকলমে শেষ পৃষ্ঠার উপর সংখ্যা-লিপিযোগে লিখিয়া দিতেন। এই সংখ্যা দেখিয়া পাঠকের পারিশ্রমিক স্থিরীকৃত হইত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেইস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হইত [৮]। এই উক্তি দ্বারা আক্‌বারের যে সংখ্যালিপির জ্ঞান ছিল ও তিনি যে প্রত্যহ ইহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় লিখিতেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই স্থলে এই সাধারণ রীতিটী মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন বালককে শিক্ষা দিবার সময়, তাহাকে অক্ষরমালার সঙ্গে-সঙ্গে কিংবা তাহার পরে সংখ্যালিপির শিক্ষা দেওয়া হয়। আক্‌বার যে অপর কোন রীতিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। সে যাহা হউক, উপরিউক্ত উক্তি দ্বারা আক্‌বার যে অন্ততঃ সংখ্যালিপি লিখিতে পারিতেন, তাহা বুঝা যায়।

(খ) আরও কয়েকটী বিষয় এস্থলে দেখা আবশ্যক। আক্‌বারের পিতা বিদ্বান্ ছিলেন এবং সাহিত্যানুরাগী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি যে আক্‌বারকে জানিয়া-শুনিয়া নিরক্ষর হইতে দিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁহার পিত্রোচিত ও রাজকীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে আক্‌বারের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে যখন আক্‌বারের বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে খড়ী দিবার সময়), তখন তিনি মৌলানা আজামুদ্দিনকে আক্‌বারের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন [৯]। তৎপরে মৌলানা বায়জিদ্ ঐ পদ প্রাপ্ত হন [১০]। ইহাঁর পর আরও কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে মীর আবদুল লতীফ্ [১১] পীর মহম্মদ [১২], এবং হাজী মহম্মদের [১৩] নাম আমরা জানি। ইহাঁরা ব্যতীত, আক্‌বারের জন্য রণ-শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যথা মুনিম্ খাঁ [১৪]।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল উপরিউক্ত কয়েকটি শিক্ষক ধরিলেও আক্‌বারকে লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন ১৫৪৭ খৃঃ অব্দে আরব্ধ হইয়া ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে হুমায়ুনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এবং তৎপরে অভিভাবক বায়রামের সময়েও কয়েক বৎসর বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ের মধ্যে আট বৎসর (১৫৪৭-১৫৫৫) হুমায়ুন জীবিত ছিলেন ও স্বয়ং তাঁহার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তৎপরে পাঁচ বৎসর এই ভার বায়রামের উপর পড়িয়াছিল। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে আক্‌বরের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, অনেকবার বহালী শিক্ষককে অবসর দিয়া নূতন শিক্ষক আনা হইয়াছিল। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, হুমায়ুন ও বায়রাম উভয়েই আক্‌বরের শিক্ষার বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। এ অবস্থায়, এমন কি যদি আমরা মানিয়াও লই যে, আক্‌বার অলস ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন, তাহা হইলেও, ইহা আমাদের বিশ্বাস করা কঠিন যে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক তাহার অভিভাবকদিগকে দশ বার বৎসর ধরিয়া এমন বাধা দিয়া আসিয়াছে যে, তাঁহারা সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্তও, করাইতে পারেন নাই; এবং ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বা চৌদ্দবর্ষীয় বালক নিজের খেয়ালমত তাহার শিক্ষক কর্ত্তৃক

৮ *Ain-i-Akbari* (Bibl. Indica) Bk. I, Ain 34, P. 115, lines 11, 12 :—"Wa har ruz ke badan ja rasad, ba *sh*umār-i-an, hindisah baqalam gauhorbār naq*sh* kunand. Wa báadad owfaqā *kh*wānandah rā naqd az surk*h* wa sujaid ba*kh*s*h*is*h* s*h*auwad". ব্লকম্যান তাঁহার "হিন্দিসাহ" (অর্থাৎ সংখ্যালিপি) শব্দটীর অর্থ পরিস্ফুট করেন নাই। (Blochman's *Ain-i-Akbari P. 103;* গ্লাডুইনের (Gladwin's trans. p, 88). অনুবাদে লিখিত আছে যে, আক্‌বার উপরিউক্ত শেষ পাতায় মাসের তারিখ লিখিতেন।

৯ Abul Fazl's *Akbar-Namah*, vol. I, ch. 44, p. 518. (Beveridge's transl.)

১০ Noer's *Akbar* (trans. by Anette S. Beveridge) vol. I, p. 125.

১১ *Ibid*, p. 127.

১২ *Ferish*, vol. II, pp. 173, 201.

১৩ *Ibid*, p. 194.

১৪ Noer's *Akbar*. Vol. I, p. 125.

লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের আরবির অধ্যাপক মৌলানা মহম্মদ হুসেন্ আজাদ্ কর্ত্তৃক রচিত "দরবার-আক্‌বরী" (pp. 140-142) নামক উর্দ্দূ গ্রন্থে উপরোক্ত চারটি শিক্ষকের নাম আছে ও তদ্ব্যতীত আর একজন মৌলানা আব্দুল্ কাদের নামক শিক্ষকেরও উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত পুস্তক হইতে এই সকল সংবাদ গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ নাই।

পুস্তকপাঠ মাত্র শুনিয়া নিজেকে শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা অভিভাবককে বাধ্য করিয়াছিল। আক্‌বারের বুদ্ধি বড় প্রখর ছিল। যদি তিনি স্বেচ্ছায় কিংবা তত্ত্বাবধায়কদের ভয়ে অন্ততঃ দুই চারি মাস শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলেও সংখ্যাক্ষরমালা নিশ্চয়ই তিনি শিখিতে পারিতেন। ইহা শিখিতে স্থূলবুদ্ধি বালকেরও বেশী দিন লাগে না।

(গ) "তুজকি-জাহাঙ্গীরী"তে লিখিত যে উক্তিটি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অপর এক অর্থ হইতে পারে। ঐ উক্তির মধ্যে "উম্মি" কথা ব্যবহৃত আছে, ও ইহার মানে করা হইয়াছে "পড়িতে বা লিখিতে অক্ষম"। কিন্তু "মুহী-তুল-মুহীৎ" নামক প্রামাণিক অভিধানে (vol: I. p. 40) "উম্মি" কথাটির অনেক অর্থ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "al qalīlu'l kalām" অর্থাৎ "অল্পভাষী" ইহার অন্যতম অর্থ, ও এই অর্থ পূর্ব্বকথিত উক্তির আবেষ্টনের সহিত খাপ খায়। এই অর্থ করিলে ঐ উক্তিটীর এইরূপ অনুবাদ হইবে,— "আমার পিতা (আক্‌বার) সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের সহিত, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানের মনীষিগণের সহিত মিশিতেন। যদিও তিনি অল্পভাষী ছিলেন; তথাপি এইরূপ মিশিয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি যখন তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন; তখন কেহই তাঁহাকে অল্পভাষী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। গদ্য ও পদ্যের সৌন্দর্য্য গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় আর কেহই ছিল না।......"

উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, যদি আক্‌বার যথার্থই সংখ্যাক্ষরে অজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভাবলে প্রাচ্যের প্রসিদ্ধ নিরক্ষর সম্রাট্‌দিগের ন্যায় সুন্দরভাবেই রাজ্যশাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তিনি এই নিরক্ষর সম্রাট্‌দের দলভুক্ত ছিলেন না। পুনরুল্লেখ হইলেও আবার বলিতেছি, তিনি সাহিত্যিক রচনার সৌন্দর্য্য ও তন্নিহিত জটিল স্থলগুলি খুব ভালরকম হৃদয়ঙ্গম করিতেন। মনীষিগণের সহিত দুর্জ্ঞেয় বিষয় লইয়া তর্কালাপ করা, হাফিজ্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করা, এবং পদ্য রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। ইতিহাসেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। এই সকল বিষয় জানিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন; সুতরাং এই সকলের জ্ঞান থাকায়, স্বভাবতঃই মনে হয়, আক্‌বার নিরক্ষর ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার অক্ষর-জ্ঞান ছিল। অপরাপর প্রমাণ যাহা উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা এই মতেরই সমর্থন করে।

মানসী-বধূ

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

গন্ধে রূপে ছন্দে তাহার
মাতিয়ে তোলে মর্ম্মেরি তার,
মুহুর্ম্মুহু আশায় সে কা'র
শিউরে ওঠে হেন ?

মর্ম্মরিয়ে কানন-বাসে
বাতাস, যবে করুণ শ্বাসে,
চম্‌কে, মরি, কি আশ্বাসে
চায় সে ফিরে' কেন ?

জ্যো'স্না-হাসি আকাশ ছে'য়ে
গড়ায় যবে জগৎ বেয়ে,
তখন কেন সে মুখ চে'য়ে
চাঁদটি রহে চাহি' ?

পাপিয়ার ওই পাগল গানে,
তটিনীর ওই তরল তানে
কেন রে ওর কপোল পানে
অশ্রু পড়ে বাহি' ?

কুঞ্জে কুসুম সগৌরবে
স্ফুরে মোহন গর্ব্বে যবে,
কেন তখন মহোৎসবে
গুঞ্জে অলি আসি' ?

—জাগা'তে তা'র সুপ্ত স্মৃতি
এতই কেন আকুল ক্ষিতি ?
ভুবনভরা বিকাশ নিতি,
আভাস রাশি রাশি !

* * *

ঘট্‌কালির এই ঘটার মাঝে
ঘোমটা টেনে, নীরব লাজে,
বসে' ও সেই সোহাগ-সাজে
স্বয়ম্বরা কে ?

প্রাণটি তাহার আশায় ভরা,
হৃদয় ভালবাসায় গড়া,
লুকিয়ে সে রয়, কোথাও ধরা
যায় না যে তা'কে !

গোস্বামী-প্রসঙ্গ

(ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা)

[শ্রীমনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা]

(বরিশালের প্রবীণ ব্রাহ্ম ও রসিক-কবি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্র)

ইং ১৯০৫ সালে আমি বরিশাল হইতে আলিপুরের এডিসনাল্ সবজজের সেরেস্তাদার হইয়া প্রায় এক বৎসরকাল কলিকাতায় ছিলাম। এই সময় প্রথমে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে মনোরঞ্জনের বাড়ীতে, এবং তাঁহার সপরিবারে হাজারীবাগে গমনের পরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে (সুকিয়া ষ্ট্রীটে) ছিলাম। এই শেষ অংশে, শিবনারায়ণ দাসের লেনে, কুন্তলীন ফ্যাক্‌টরীতে, শ্রীযুক্ত এইচ্ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ চা খাইয়া, আমাকে এমনই চা-রোগে ধরিয়াছিল যে, একবেলা না খাইলেই কষ্ট হইত। একদিন বসু মহাশয়ের বাড়ী গিয়া দেখিলাম যে, তখন তাঁহাদের চা-পান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার যাইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, আমি সে দিন আর যাইব না; সুতরাং আমার জন্য চা রাখেন নাই। তাঁহারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া, অতি যত্নে আমাকে চায়ের পরিবর্ত্তে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। কিন্তু আমার মধুর পিপাসা জলে মিটিল না। রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিলাম, এখন এই অসময়ে চা খাইতে কাহার বাড়ী যাইব? ভাবিয়া চিন্তিয়া, অসঙ্কোচে, গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে (৪৫ নং হেরিসন রোড) উপস্থিত হইলাম। উপরে উঠিয়া দেখি, গোঁসাইজী চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ আছেন। অন্য কেহই তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আমার পায়ের শব্দে তিনি চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চন্দ্রবাবু কোত্থেকে?" আমি বহুদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই। নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আজ আমি আপনাকে দেখিতে আসি নাই, একটি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি। আজ সকালবেলা আমার চা খাওয়া হয় নাই। ভাবিলাম, আর কোথায় যাইব? আপনার এখানে আসিলেই চা পাইব।"

আমার এই কথা শ্রবণমাত্র, গোস্বামী মহাশয় হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া, গভীর আনন্দে প্রায় ১৫ মিনিটকাল নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমি ত দেখিয়া অবাক্! এ কি ব্যাপার! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। চা খাওয়ার কথা বলাতে এ ভাব কেন? পরে জানিতে পারিলাম, আমি যে সত্য কথা বলিয়াছি, তাহা শুনিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। আমি ভাবিলাম, সত্য এবং সরলতার প্রতি কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! আমি যদি সেখানে সঙ্কোচ করিয়া, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য গোপন করিয়া, কিছুকাল আলাপাদি করিতাম; এবং তাঁহাকেই দেখিতে আসিয়াছি, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া, শেষে চায়ের কথা পাড়িতাম, তবে কখনই তাঁহার এরূপ আনন্দ হইত না। হঠাৎ কোন ব্যক্তির অঙ্গ তাড়িৎ-স্পৃষ্ট হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, সত্য ও সরলতার স্পর্শে তিনি সেইরূপ উন্মত্তপ্রায় হইলেন! এরূপ সত্যানুরাগ আমি কখনও কোথাও দেখি নাই। এই ঘটনাটী আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য মুদ্রিত রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে আমার বহু বন্ধুলোকের নিকট এই কথা বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি ও করিতেছি।

ইহার পরে তিনি তাঁহার পুত্র যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "চন্দ্র বাবুকে চা এবং উৎকৃষ্ট মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, এবং বড়বাজার হইতে আমার জন্য যে উৎকৃষ্ট সন্দেশ আসিয়াছে, তাহা দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক চা-পান করাও।" বলা বাহুল্য যে, তাঁহার আদেশ অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল এবং আমিও তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

বরিশাল

২৪ শে শ্রাবণ, ১৩২২।

(স্বাঃ) শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

(নবদ্বীপবাসী রামপুরহাট-প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি)

নবদ্বীপ। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন হইয়া গিয়াছে, এমন সময় পুজনীয় গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি শিষ্য-ভক্ত সঙ্গে নবদ্বীপে আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি আনন্দিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। কিন্তু অসময়ে এতগুলি লোক দেখিয়া, আমার মনে বিশেষ চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এখন আমি ইঁহাদের উপযুক্ত সেবা করিতে পারিব কি না ? খরচপত্রের ভয়ে নয়, পাছে কোন ত্রুটি হয়, ইহাই ভয়ের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু গোঁসাইজী প্রথমেই বলিলেন যে, তাঁহারা এখানে আহার করিবেন না ; গঙ্গার তীরে আহারের আয়োজন হইতেছে ; সঙ্গে আরো অনেক লোক আছে ; আমাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যই তিনি আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, আপনি আমার মনের ভাব কিরূপে বুঝিলেন ? এতগুলি অতিথি অসময়ে উপস্থিত হওয়ায়, আমি সত্যই একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম।

গোঁসাইজীর সঙ্গের ভক্তগণ আমার আদর-আপ্যায়নের অপেক্ষা না করিয়াই অঙ্গনের মাঠে আপনাপন ইচ্ছামত যে যাহার বসিয়া গেলেন, এবং কেহ-কেহ মাটিতেই শয়ন করিলেন, মনে হইল যেন তাঁহাদের নিজেরই বাড়ী। আমি আমাদের পাড়ার সমাগত কয়েকটি যুবককে ভক্তগণের জন্য কিছু জলখাবারের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী ভক্তিবিহ্বলা হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। গোঁসাইজী বাধা দিয়া বলিলেন যে, "আপনার পুত্র আমার ভাই, আপনি আমার মা, আপনি কখনও আমাকে প্রণাম করিবেন না। আপনার প্রণাম আমি সহ্য করিতে পারিব না।" আমার মা বলিলেন, "আমি যে আপনাকে মহাদেবের মতন দেখিতেছি।" গোঁসাইজী বলিলেন, "আপনার মহাদেবকে আপনি ঐ স্থানে প্রণাম করুন ; আমি আমার মাকে এখানে প্রণাম করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি মাকে প্রণাম করিলেন। আমার স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিলে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কিছু উপদেশ দিলেন।

আমি একটি নূতন ঘর করিয়াছি, তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের শুভাগমনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। আজ আমি তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে একাকী পাইয়া বহুকালের একটি অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। আমি বলিলাম "একবার রামপুরহাটে কীর্ত্তনান্তে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক।' এটি হিন্দু-বিবাহের মন্ত্র। কিন্তু আমি আজ কোথায় রহিয়াছি ; কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত (আধ্যাত্মিক) হইয়া আছি, তাহা আপনি দেখিতেছেন না। আমাকে চুট্‌কী রকম এমন কিছু সাধন বলিয়া দিন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমি উপকার পাইতে পারি। বেশী শক্ত হইলে আমি করিতে পারিব না।"

গোঁসাইজী বলিলেন "আচ্ছা, যাহা বলিব, তাহা সহজও বটে, শক্তও বটে।" আমি বলিলাম—"সহজও বটে, শক্তও বটে, এই কথার অর্থ কি বুঝিলাম না। তিনি বলিলেন "শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন। সংপ্রতি "ওঁকার" সাধন করুন। ওঁকার অর্থ অ, উ, ম, অর্থাৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। বাড়ী-ঘর, বৃক্ষ-লতা, মাতা-পত্নী, জীব-জন্তু যাহা কিছু দেখিবেন, তাহাতেই "ওঁকার" স্থাপন করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, এটা (এই বস্তু) ছিল না, এটা আছে, এটা থাক্‌বে না। ইহাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। যা চক্ষে পড়বে, তাতেই এই ভাব স্থাপন কর্‌বেন। এই অভ্যাসে, যাহা দেখ্‌বেন, তা যে থাকবে না —এই বিশ্বাস খু'লে যাবে। এতে এই উপকার হবে যে, আপনি যে নানা প্রকারের বস্তু ঠাকুরঘরে (হৃদয়ে) রেখেছেন, সে সকলের প্রতি মমতা নষ্ট হওয়ায়, সেগুলি ক্রমশঃ সরে যাবে। এইরূপে ঠাকুরঘরের আবর্জ্জনা পরিস্কার হবে ; কেন না জিনিষ থাকে না—এই বিশ্বাস দাঁড়ালে, তার প্রতি মমতাও থাকে না। তখন মনে হবে, আমার এ কি হলো ? আমি যে আগে ছিলাম ভাল। তখন একটা অভাববোধ হবে—থাকা (স্থায়ী) জিনিষের জন্য আকাঙ্ক্ষা হবে। এমন কিছু চাই, যা থাকে,—এই অনুসন্ধান আস্‌বে। এইরূপে ঠাকুরঘর পরিস্কার হলে, তখন মন্ত্র গ্রহণের সময় আসবে, তখন ঠাকুর বসাবার সময় হবে।" এই সকল কথার পরে, তিনি আমাদিগকে লইয়া হরিসভায় গেলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য

বহুলোকের সমাগম হইল। সেখানে খুব কীর্ত্তন হইল। গোস্বামী মহাশয়ের নৃত্য ও হরিধ্বনিতে ভাবের নেশায় সকলে মত্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে গঙ্গাতীরে বালুকার উপরে সকলে ভোজনানন্দ সমাপ্ত করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের এক-এক দিনের এক একটি চিত্র প্রাণে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

একবার রামপুরহাটে এক জ্যোৎস্না রজনীতে গোঁসাইজী একাকী উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মৃদুমৃদু বাতাস বহিতেছিল। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, তিনি যেন সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছেন,—মুখে, বুকে, মাথায়, পিঠে, পেটে পুনঃ পুনঃ কি মাখাইতেছেন। আমি ভাবিলাম, রাত্রে তৈল মাখিতেছেন কেন? আমি যখন নিকটে গেলাম, তখন তৈল মাখা বন্ধ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি করিতেছিলেন কি"? তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন "ও কিছু নয়। চমৎকার জ্যোৎস্নাটা উঠিয়াছে—এটিকে গায়ে মাখাইতেছিলাম।" ইহাকেই বলে "মধুবাতাঋতায়তে।"

(স্বাক্ষর) শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭ই মাঘ ১৩২২।

সেবকের নিবেদন।

একদিনের একটা ঘটনা মনে হইতেছে। গোস্বামী-মহাশয় যখন তাঁহার শেষ যাত্রায় (৩০ বৎসর পূর্ব্বে) বরিশালে যান, তখন কয়েকজন ধর্ম্মার্থী মহিলার বিশেষ অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতার বাসা-বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেখানে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের সমাগম হইয়াছিল। অনেকে অনেক প্রশ্ন করিলেন, গোঁসাইজী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন; নিজে সাধিয়া কোনও উপদেশ দিলেন না। বসন্তবাবুর বালবিধবা পিসিমাতা তখন পরিণতবয়স্কা ব্রহ্মচারিণী। তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্র-প্রভায় পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল—উভয়কুল উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার নাম শিবঠাকুরাণী। শিবঠাকুরাণী আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তিনি একখানা থালায় করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া একটি-একটি করিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে লোকের ভিড় হইল। মনে হইল, গোঁসাইজী যেন বালক হইয়া গিয়াছেন, আর মা যশোদা স্নেহের গোপালের হাতে ক্ষীর-ননী তুলিয়া দিতেছেন। গোঁসাইজী দুইখানি হাতে অঞ্জলী করিয়া "মা দাও, দাও মা" বলিয়া চাহিয়া লইতেছেন, স্নেহময়ী ব্রহ্মচারিণী একটি-একটি করিয়া হাতে তুলিয়া দিতেছেন। গোস্বামী মহাশয়ের দুই চক্ষের ধারা কপোল বহিয়া পড়িতেছে; বলিতেছেন "জয় মা, আনন্দময়ী!" শিবঠাকুরাণীর চক্ষের জলে গণ্ড প্লাবিত হইতেছে। তিনি একদৃষ্টে তাঁহার গোপালের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইতেছেন। ভক্তগণের মুখ হইতে মৃদুস্বরে "হরিবোল" ধ্বনি উঠিতেছে। সমস্ত ঘরটা আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সে যে কি দৃশ্য, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না!

গোস্বামী মহাশয়ের একদিনের যে অবস্থাটির কথা উল্লিখিত হইল, শুধু দৃষ্টান্তের জন্য উহার উল্লেখ করিলাম। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ানন্দ লইয়া নানাভাবে নানারূপে তিনি প্রতিনিয়তই ব্রহ্মানন্দে এবং ভগবৎলীলায় নিমজ্জিত থাকিতেন। প্রেমবিহ্বলা নায়িকা তাহার প্রিয়তমের যে-কোনও বস্তু দেখিয়া যেমন শিহরিয়া উঠে, পুত্রশোকাতুরা জননী গৃহের যেদিকে তাকায় সেই দিকেই তাহার বুকচেরাধন প্রাণপুতলীর চিহ্ন দেখিয়া যেমন বিহ্বলা হয়, সেইরূপ ভক্তগণও তাঁহাদের পতি অপেক্ষা প্রিয়তম, পুত্র হইতেও প্রিয়তম যে ভগবান, তাঁহার চিহ্ন যাহা দেখেন, তাহাতেই বিহ্বল হইয়া পড়েন। প্রকৃতিদেবী সখীরূপ ধারণ করিয়া, হাতে ধরিয়া, ভক্তকে ভগবানের অন্তঃপুরে লইয়া যান। তখন সমস্ত সৃষ্টি প্রিয়তমা ও মধুময়ী হইয়া উঠে। এই সকল কথা আমরা শাস্ত্রকারদিগের মুখে শুনিয়াছি এবং গোস্বামী মহাশয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

উল ও উলীবস্ত্র

[শ্রীমতীহেমন্তকুমারী দেবী]

সংযুক্ত-প্রদেশে যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই শীত,—উভয়ই সমান। বঙ্গদেশে আমরা বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত হইয়া শীত কাটাইয়াছি; কিন্তু এখানে সেটী আর চলে না। গরম কাপড় ভিন্ন, কাহার সাধ্য যে শীত সহ্য করে। এই শীত কাটাইবার জন্য, এতদ্দেশীয় লোকেরা তুলাভরা জামা ও উলী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। তুলাভরা জামা যদিও সস্তা এবং শীতের পক্ষে অতি উত্তম বস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু দেখিতে অতি কদর্য্য। উলী কাপড় দেখিতে সুন্দর অথচ শীতের অরি। কিন্তু উলী কাপড়ের একটী মহৎ দোষ আছে, সেটী কেবল তাহার মহার্ঘতা। যাহা হউক, উল বা উলী কাপড় সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে, উল পশুলোমজাত। পশুও নানা প্রকার আছে; তবে ভেড়া, ছাগ, উট—ইহারাই মানবের উলী বস্ত্রের প্রধান অবলম্বন। এই প্রকাণ্ড সংযুক্ত-প্রদেশটাতে সত্তের লক্ষ ভেড়া আছে। প্রত্যেক ভেড়া হইতে যদি তিন পোয়াও উল পাওয়া যায়, তবে বৎসরে ৩২ হাজার মণ উল সঞ্চিত হইতে পারে। রেলের অনুকম্পায় দেশে অবশ্য আমদানি-রপ্তানি আছে। তজ্জন্য উল সংযুক্ত-প্রদেশে আসিতেছে এবং তথা হইতে চলিয়াও যাইতেছে। আমরা এখন উলের আমদানির কথাই বলিব। ১৯১০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংযুক্ত প্রদেশে নিম্নলিখিত পরিমাণে উলের আমদানী হইয়াছে।

বোম্বাই ১মণ, সিন্ধুদেশ ১, বঙ্গদেশ ৯.৬ পাঞ্জাব ১ ৪৫৭ মধ্যপ্রদেশ ৫ পূর্ব্ববঙ্গ ৮৮ রাজপুতনা. ৬২২৭ মহীশূর ৭০৭২ কাশ্মীর বম্বাইবন্দর ৯৬০ করাচি ১৪ কলিকাতা ৫৬৭৬; সর্ব্বশুদ্ধ ২৪৪৯৪ মণ।

যদি এই উলটা পূর্ব্বকথিত উলের সংখ্যায় যোগ করা যায়, তবে কে বলিবে যে সংযুক্ত-প্রদেশে উল কম। অন্যান্য বৎসরের সহিত তারতম্য করিয়া দেখিয়া, আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সংযুক্ত-প্রদেশে উলের আবশ্যকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যেমনই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, অমনি তৎসঙ্গে-সঙ্গে উলের আবশ্যকতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু কতটা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কারণ, বহির্দ্দেশ হইতে যে উলের আমদানি হইয়া থাকে, কানপুর মিল তাহার পাঁচ ভাগের চার ভাগ লইয়া থাকে।

উল দুই প্রকার; যথা, শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত উল, যাহা পাঞ্জাব হইতে সংযুক্ত-প্রদেশে আসিয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ "ফজলীক" নামক সহর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সহরটী বিকানীরের উলের কেন্দ্র। কেবল ইহাই নহে ভারতবর্ষ মধ্যে এই সহরটীকেই উলের কেন্দ্র বলিতে হইবে। এ প্রদেশে যে পাঞ্জাবের কাল উল দেখিতে পাই, তাহা কৈতাল, রেবাড়ি এবং রাওলপিণ্ডি হইতে আইসে।

তিব্বত যে এ প্রদেশকে উল দেয় না, তাহা নহে। হলদোয়ানির পথ দিয়া তিব্বতি উল এ প্রদেশে প্রবেশ করে। তিব্বতি উলের আমদানি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে যে সময় তিব্বতের পথ তুষারপাতে অগম্য হইয়া পড়ে, অথবা যখন ভেড়াদিগের পীড়া হইয়া থাকে, তখনই তিব্বতি উলের আমদানি কিছু কমিয়া যায়।

পূর্ব্বে যে আমরা এ প্রদেশপ্রসূত বত্রিশ হাজার মণ উলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার স্থানীয় আমদানি এ অঞ্চলে কম। আগরা, কানপুর, মিরাট, মজঃফরনগর, বিজনোর, মোরাদাবাদ, মির্জ্জাপুর ও গাড়োয়ালে ন্যূনাধিক পরিমাণে বহির্দ্দেশ হইতে উল প্রবেশ করে। তন্মধ্যে মিরাট ও মজঃফরনগরে যে উল আইসে, তাহা পাঞ্জাব বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে।

কানপুরে উলের মিল আছে বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতেই এখানে উলের আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়। কানপুর কাঁচা উলের একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। মির্জ্জাপুরে দরির (সতরঞ্চি, কার্পেট প্রভৃতি) কারখানা আছে; কিন্তু তথাকার সহরের উল পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে, হামিরপুর, ফতেপুর এবং জালৌন হইতে উল লইতে হয়।

তিব্বত হইতে গাড়োয়ালে ১২ হাজার মণ উল আসিয়া থাকে। কিন্তু কানপুর উলেন মিলের এক কর্ম্মচারী তথায় থাকাতে গাড়োয়ালি লোকদিগের, ভুটিয়াদিগের নিকট হইতে উল পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। এই আমরা উলের আমদানির কথা বলিলাম। এখন স্থানীয় উলের কথা বলিব। এ প্রদেশে আগরা, ঝাঁসী, জালৌন, ফতেপুর, হামিরপুর, এবং মির্জ্জাপুর উলের জননী।

ভূয়োদর্শনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে উত্তম উল যদ্দ্বারা শীত-বস্ত্রাদি তৈয়ারি হয়, তাহা নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশেই হইয়া থাকে।

ভারতের পার্ব্বত্যস্থান ব্যতীত, অন্যান্য সকল স্থানই উষ্ণ। এই উষ্ণতানিবন্ধন উল কড়া এবং শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া সাধারণত ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হইয়া থাকে। আমার মতে ভেড়া পালনে অনবধানতই ইহার মুখ্য কারণ। উল নিকৃষ্ট হইলে, তাহার মূল্যও কমিয়া যায়।

তিব্বতের জলবায়ু শীতল। সুতরাং তথাকার উল লম্বা, কোমল এবং স্থিতিস্থাপক। তিব্বতি উলের আর এক সুবিধা এই যে, উহা বক্র হওয়াতে বস্ত্রবয়ন উত্তমরূপে হইতে পারে।

ভেড়াজাতির উন্নতি।

গাড়োয়াল, আলমোড়া এবং নাইনিতাল ব্যতীত সংযুক্ত-প্রদেশে একই প্রকারের ভেড়া দৃষ্ট হয়। ভেড়াজাতির উন্নতির জন্য, বাহির হইতে ভেড়া লইয়া আসিয়া আগ্রা ও দেরাদুনে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু মে এবং জুনমাসের ভয়ানক গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালের আর্দ্রতা ভেড়া সহ্য করিতে অক্ষম হওয়াতে, সে প্রযত্ন বিফল হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ভেড়াজাতির উন্নতির উপর কাহারও লক্ষ্য নাই। যদি কোন প্রকার লক্ষ্য থাকে, তবে কিসে ভেড়া উত্তমরূপে লড়িতে পারে তাহারই উপর। এই জন্য বড় বড় শৃঙ্গবিশিষ্ট ম্যাড়া লোকে সযতনে পালিয়া থাকে। যদি দেশের উন্নতি-কামনা লোকদিগের থাকিত, তবে কি স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে দুস্থব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত!

পূর্ব্বে যে তিনটী পার্ব্বত্য দেশের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তিন প্রকারের ভেড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা—

(১) "হুলিয়া"; ইহাদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ। ভুটিয়াগণ ভার-বহনের জন্য এই জাতীয় ভেড়া পালিয়া থাকে। ইহাই উচ্চশ্রেণীর ভেড়া বলিয়া পরিগণিত।

(২) "জুর্মলি" এবং (৩) "ধরণ"; ইহাই নিকৃষ্ট জাতীয় ভেড়া। পার্ব্বত্য প্রদেশের নিম্নে এই জাতীয় ভেড়া দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকটি হইতে তিন পোয়া নিকৃষ্ট উল পাওয়া যায়।

ভুটিয়াগণ এখন উত্তমরূপে বুঝিয়াছে, উল যতই উৎকৃষ্ট হইবে, মূল্যও ততই বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু দেশীয় "গাড়ারিয়াগণ" উলের ওজন বাড়াইবার জন্য কিছু-না-কিছু মৃত্তিকা নিশ্চয়ই মিলাইবে। দেশীয় গাড়ারিয়ার যেন ইহা স্বধর্ম। বাঙ্গলার গাড়ারিয়া জাতি গয়লা শ্রেণী-ভুক্ত। পশুপালন ইহাদিগেরই জাতীয় ধর্ম।

সমতল প্রদেশে প্রায় সমুদয় কাল উল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে নানাপ্রকারের উল আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হইয়া থাকে।

ছাগলোম।

আমরা জানিতাম যে, ছাগদুগ্ধই আমাদিগের ব্যবহারে লাগে; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তাহার লোমও আমাদিগের কার্য্যকরী। সংযুক্ত-প্রদেশে ছাগলোম প্রতি বৎসর ছয়হাজার মণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা পার্ব্বত্য প্রদেশেই সীমাবদ্ধ। সমতল প্রদেশে, যথা মির্জ্জাপুরেও ছাগলোমচ্ছেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পাহাড়ের যে যে স্থানে ছাগলোম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের নাম, "লকোতা" "বারত্তি" ও "কলোচা"।

উষ্ট্রলোম।

উষ্ট্র মরুবাসী জীব। তাহার লোমও মানবের অব্যবহার্য্য নয়। চিত্রকরের সূক্ষ্ম তুলিকা প্রধানতঃ উষ্ট্রলোম হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সংযুক্ত প্রদেশে উষ্ট্রলোম কত পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন।

উল।

লক্ষ্ণৌ সহরের কাশ্মীরিগণের শালবয়নই উপজীবিকা ছিল। শাল বুনিবার জন্য তাহারা পঞ্জাব হইতে উল লইয়া আসিত। কিন্তু তাহাদিগের ব্যবসা লোপ পাওয়াতে তাহারা আর উল ক্রয় করে না। দেশে সৌখীন লোক আর বেশী নাই। অল্পস্বল্প যাহারা আছে, তাহারা স্বদেশজাত দ্রব্যের জন্য নহে; সুতরাং ক্রেতাও নাই, বিক্রেতাও নাই।

লোমচ্ছেদ।

বৎসরের মধ্যে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাস ভেড়ার লোমচ্ছেদের কাল। গাড়োয়ালনিবাসী ভুটিয়াগণ বৎসরে তিনবার ভেড়ার, এবং দুইবার ভেড়ীর লোমচ্ছেদ করে। বসন্ত ঋতুতে লোমচ্ছেদই প্রশস্ত। এই সময়ের লোম (উল) সাধারণতঃ উত্তম বলিয়া পরিগণিত। ফাল্গুন মাসের লোম শ্বেত বা ধূসরবর্ণ। কার্ত্তিক মাসের লোম আবিল এবং আষাঢ়ী লোম সর্ব্বাপেক্ষা ময়লা হইয়া থাকে।

লোমচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে সন্নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণীতে ভেড়া-গুলিকে স্নান করাইয়া উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জনা করিতে হয়। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে এ প্রথা নাই। বড়-বড় কাঁচি দ্বারা লোমচ্ছেদ করা হয়। কোনকোনও স্থানে হাঁসিয়াও কার্য্যে আইসে। হাঁসিয়াকে বাঙ্গালা ভাষায় "কাস্তে" বলে। কাস্তে দ্বারা লোমচ্ছেদে ভেড়ার যে অতিশয় কষ্ট হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

একদিনে ১৫ হইতে ২০টা ভেড়ার লোমচ্ছেদ সাধ্যায়ত্ত। লোম-চ্ছেদক যদি মেষপালকের কোন আত্মীয় হয়, তবে তাহাকে একটা ভোজ দিতে হয়। এই ভোজের হিন্দুস্থানী নাম "মুর্কা"। যদি অন্য কোন ব্যক্তি লোমচ্ছেদ করে, তবে তাহাকে লোমের ভাগ দিতে হয়। অনেক সহরে মেষের লোম কাটাই হয় না—ছিঁড়িয়া লওয়া হয়। কসাইলোক এই কাজ করিয়া থাকে; এবং তাহারাই উলীবস্ত্র প্রস্তুতকারকের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে।

ছাগ বা উষ্ট্রের লোম।

ছাগলোম বৎসরে একবার মাত্র কাটা হয়। তাহাতে কেবলমাত্র অর্দ্ধসের লোম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উটের লোমও বৎসরে একবার মাত্র কাটা হয়। উষ্ট্র হইলে এক হইতে চারি পাউণ্ড এবং উষ্ট্রী হইলে পোয় অর্দ্ধসের লোম পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, উটের লোম এত কম হইবার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, উটের পৃষ্ঠ ও গলদেশের লোম কাটা হয় না।

উলের মূল্য।

রোমচ্ছেদ করা হইলে, বাণ্ডিল বাঁধিয়া উহা বিক্রয় করা হইয়া থাকে। উলের মূল্য উত্তম বা অধম অনুসারে কম-বেশী হইয়া থাকে। গড়ে আড়াই সের উল এক টাকায় পাওয়া যায়। বিকানীরে সাদা উল পাতলা অনুসারে ২০৲র নীচে হইতে ৩৫৲ টাকার ঊর্দ্ধে একমণ পাওয়া যায়। তিব্বতি উলের একমণের দাম ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা। ছাগলোম টাকায় ১০ হইতে১২ সের এবং উষ্ট্রলোম টাকায় ৫ সের পাওয়া যায়।

করার প্রথা নাই। প্রক্ষালনকালে সাবানের প্রয়োজন হয় না। কারণ, ক্ষারের সংযোগে উলের অপকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে।

উঠান—যে সকল উল জমাট বাঁধিয়া যায়, তাহা হস্তদ্বারা পৃথক করিতে হয়। স্ত্রীলোকেই এই কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের দৈনিক বেতন এক আনারও কম। সমতল প্রদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ মেষে জমাটবাঁধা উল বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ধুনাই—তুলা-ধুনা এবং উল-ধুনাইয়ে কোন পার্থক্য নাই। ধুনিবার যন্ত্রটি দেখিতে ঠিক ধনুকের মত। জ্যা তাঁতের। স্তূপীকৃত উলের

ধুনকী
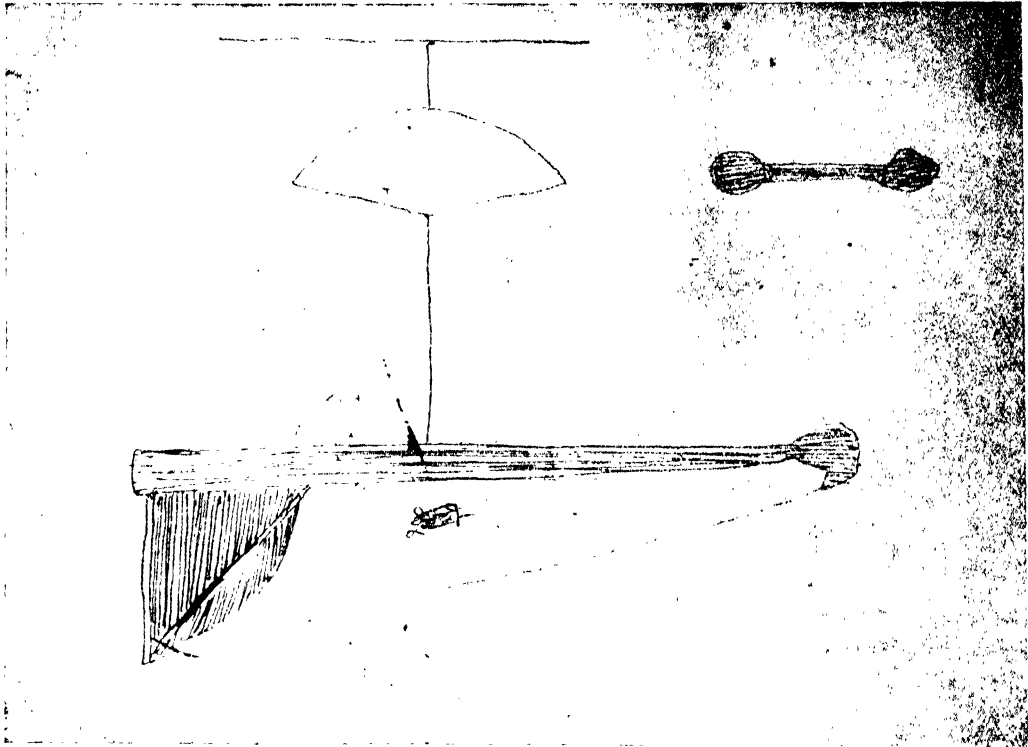
এক্ষণে উলীবস্ত্র তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া করা হইয়া থাকে, আমরা তাহার বর্ণনা করিব। বাছা, ধোয়া, উঠান, জমাট-বাঁধা লোমকে হস্তদ্বারা পৃথক্ করা, ধোনা, এবং পাঞ্জা, করা এই ক্রিয়ার অন্তর্গত। পাহাড়ে যে সকল ক্রিয়া করা হয়, তাহা হইতে সমতল প্রদেশের ক্রিয়া পৃথক।

বাছাই—কাল হইতে সাদা অথবা অন্যান্য সংমিশ্রণ পৃথক করাকেই বাছাই বলে। ইহাতে যে নিকৃষ্ট উল পাওয়া যায়, তাহা ঘোড়ার জীনে ভরা হইয়া থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য কার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধৌতকরণ—গাড়োয়াল ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে উল ধৌত

উপর জ্যা রাখিয়া কাঠ নির্ম্মিত ডাম্বেল দ্বারা জ্যার উপর আঘাত করিলেই উল ধোনা হইয়া থাকে। এই ধুনাইয়ের মজুরি অর্দ্ধআনা হইতে একআনা। অধিক উল ধুনিতে হইলে, "বেহলার" আবশ্যক। "বেহলা" জাতিতে মুসলমান। তাহারা ধুনিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহাকে "ধুনকি" বা "পিঞ্জা" বলে। এই ধুনকির আকৃতি উপরে দেওয়া হইল।

পাঞ্জাকরণ—লম্বা তিব্বতি উল ভিন্ন অন্য উলকে পাঞ্জা করার প্রথা নাই। গাড়োয়ালেই পাঞ্জা করা হইয়া থাকে। পাঞ্জা অর্থে আঁচড়ান। ইহার জন্য লৌহ-চিরুণী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূতাকাতা—সূতাকাটিতে হইলে চরকির আবশ্যক। এখানে

যে সুতার কথা বলিতেছি, উহার অর্থ উলি সুতা বুঝিতে হইবে। চরকি দেখিতে এইরূপ যথা—

চরকী

চরকিতে দুইটি চক্র সমান্তরালে অবস্থিত। ইহার পরিধি সুতা দ্বারা সংযোজিত। চক্রের উপর সুতা যাইয়া "তকুয়ায়" বেগ দান করিয়া থাকে। "তকুয়াকে" বঙ্গভাষায় 'টেকো' কহে। পুনি অর্থাৎ সুতার খেই টেকোয় লাগাইয়া দিয়া সুতা তৈয়ার করা হয়। যেমনি সুতা তৈয়ার হইতে থাকে, অমনি "পুনিকে" টানিয়া লওয়া হয়। টেকো হইতে মোচাকার ক্ষেত্রের আকারে অর্থাৎ "কুকরি"-আকারে সুতাকে পৃথক করা হইয়া থাকে। "কুকরিটি" পার্শ্বের চিত্রের মত—

বাঁদা জেলা ও পাহাড়ে "চেরনা" বা তকুলি দ্বারা উল কাতা হয়। 'তকুলি' কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, তাহার আকৃতিটা চিত্রে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে ধীবরগণের হস্তে এইরূপ কাষ্ঠ-যন্ত্র আমরা দেখিয়াছি। সুতাকাতা হইলে গোলা করা হয়। অনন্তর এই গোলা হাতের মুষ্টির উপর জড়ান হইয়া থাকে। শেষে গোলার শেষাংশ তকুলি নামক যন্ত্রে জড়াইয়া তকুলিকে জঙ্ঘোপরি রক্ষা করিয়া হস্তদ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিতে হয়। তকুলি ঝুলিয়া পড়িয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে। এইরূপে সুতার গোছা তৈয়ারী হইয়া থাকে।

চরকায় যে সুতা তৈয়ারী হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়। তকুলিতে কিন্তু সেরূপটি হয় না। তবে তকুলির সুবিধা এই যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই, সকল অবস্থায়, এমন কি চলিতে চলিতে, তকুলি ব্যবহার করিতে পারে।

সুতাকাতা স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। মজুরি অত্যন্ত কম। মির্জ্জাপুরে ষোল সের সুতার হিসাবে এক টাকা দেওয়া হয়। গড়ে প্রত্যেক দিনে প্রায় ১ আনা করিয়া পড়ে।

'কুকরি' করার পর 'লাটিয়া' করা হয়। লাটিয়া এক প্রকার সুতা ভাঁজাকে বলে। পায়ের উপর রাখিয়া সুতাকে হস্তদ্বারা ঠিক করিতে হয়। এই লাটিয়া অবস্থায় রং করা হয়। তারপর লাটিয়াকে পুনরায় খুলিয়া ভাঁজিতে হয়। পরে "কুবলি" করিয়া সুতা রাখিতে হয়। "কুবলি," অর্থে এক প্রকার তাল বাঁধিয়া রাখা।

"কুকরি" সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেই খুলিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রত্যেক সের হিসাবে এক পয়সা পারিশ্রমিক দিতে হয়। "লাটিয়া" এবং "কুবলি" তাঁতিরা স্বয়ং করিয়া থাকে।

মাড় লাগান—মাড় নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। গমের ও আটার মাড় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কোন-কোন স্থানে "জোয়ার" এবং চাউলের গুঁড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তানাকে মাড়ে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। তদনন্তর খস্‌খস্ নামক ঘাসের কুঁচি অর্থাৎ বুরুস (Brush) দ্বারা ঝাড়িতে হয়। এই সকল ক্রিয়া হইলে পরে কাপড় বুনা হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে গোলের মাড় লাগানর প্রথা আছে। ময়দার পরিবর্ত্তে গানওয়ারার বিচি, মজঃফরনগরে "সনি," বিজনৌরে কুলসিন্ধ,
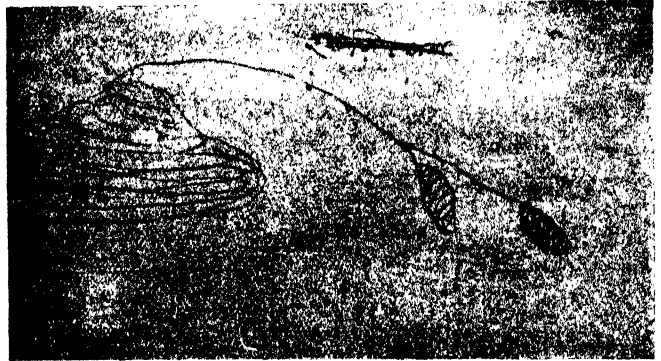
কুকরী

সীতাপুরে, সিসমবৃক্ষের পাতার ক্বাথ বেরিলিতে, ধানদয়াল গাছের ক্বাথ মোরাদাবাদ এবং নাইনিতালে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে মাড় লাগাইবার প্রথা নাই। সুতাকে শক্ত করা মাড় লাগানর উদ্দেশ্য হইলেও মুখ্যকল্পে তানায় সুতা যাহাতে জড়াইয়া না যায়, তাহরই ব্যবস্থা মাত্র।

কাপড় বুনা হইলে তাহা কঠিন এবং ঢিলা থাকে। সুতরাং তাহাকে ঠিক করিবার জন্য কতকগুলি প্রক্রিয়ার আবশ্যক। তাহার বর্ণনা আমরা নিম্নে করিতেছি।

প্রত্যেক কম্বলে দুই ছটাক তৈল দিয়া গরমজলে ডুবাইয়া দিতে হয়। গরমজলটা মাটির নাদে থাকে। পরে তাহা হইতে কম্বল উঠাইয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ হস্ত ও পদ দ্বারা ঠেলিতে হয়। অনন্তর পুষ্করিণী বা জলাশয়ের কৃষ্ণমৃত্তিকা যাহা "কুসর" ঘাসের জনয়িত্রী তাহা লইয়া বাবলা ছালের সহিত উত্তমরূপে পাক করা হইলে পর তাহাতে কম্বল কএকদিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয় ও মধ্যে ২ উঠাইয়া বাতাসে শুষ্ক করিতে হয়।

তকুলি

এই প্রকার করিলে কম্বলের রং উত্তম হইয়া থাকে। পরে সাবান বা রিঠা দ্বারা ধৌত করা উচিত।

কোন কোন স্থানে কম্বলে আটার ও গমের মাড়ি বা বেলের শাঁস লাগান হয়। গাড়োয়ালে কম্বলে ধুম লাগাইয়া প্রস্তরে ঠেসিবার প্রথা দেখা যায়।

নামদা-প্রস্তুতি—না বুনিয়া যে বস্ত্র তৈয়ার করা যায়, তাহার নাম নামদা। নামদায় বিছানা অথবা ঘোড়ার জীন তৈয়ার হইয়া থাকে। প্রায় সকল স্থানেই নামদার কিছু না কিছু কাজ দেখা যায়। পরন্তু বরৌচ সহরের নামদা সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা প্রস্তুত করিবার বিধি নিম্নে বলা যাইতেছে।

একটা গদির উপর এক থাক উল সমান করিয়া এরূপভাবে বিছাইয়া দেওয়া হয়, যেন গদিটা সহজে গুটাইতে পারে। উলের থাকের স্থূলতা, যেরূপ নামদা তৈয়ার হইবে তাহার উপযুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু উল চারান যেন সমান ভাবে হয়। পরে উলকে জলসিক্ত করিয়া সাবধানের সহিত হাত বা পা দিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ঠেসিতে হইবে। এই একবার ঠেসাই যথেষ্ট নহে। প্রথম থাকের উপর দ্বিতীয় থাক রাখিতে ও ঠেসিতে হইবে। কেবলমাত্র জলদ্বারা ঠেসিয়া উল জমাইতে হইলে উত্তম উলের আবশ্যক হয়। ভারতবর্ষের উল অত্যন্ত কঠিন বলিয়া উত্তমরূপে জমে না। সুতরাং জমাট বাঁধিবার জন্য অন্যান্য বস্তুর সংযোগ আবশ্যক।

সাধারণতঃ সাবান বা রিঠার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নামদার কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু খোল, ময়দা, গোবর, প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর সংযোগে নামদার যে অনিষ্ট হয় না, একথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

বরৌচের নামদা একই রঙ্গের তৈয়ার হইয়া থাকে। নামদা কখনও ধৌত করা হয় না এবং তাহার রংও স্থায়ী নহে।

নামদায় চিত্রাদি করিতে হইলে, প্রথমে তাহার নমুনা করিয়া লইতে হয়। পরে তাহাকে কাটিয়া বিস্তৃত উলের সহিত রাখিয়া ঠেসিতে হয়। পাতা লতা, পুষ্প এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রাদি নামদার চিত্রের বিষয়ীভূত। মুসলমানের মধ্যে জুলাহা আখ্যাধারী ব্যক্তিরাই নামদা তৈয়ার করিয়া থাকে।

নামদা ওজন-হিসাবে বিক্রয় হয়। এক সের সাদা নামদার মূল্য ১২ হইতে ১৪ আনা। রঙ্গিন হইলে সের হিসাবে এক টাকা আট আনা দাম হইয়া থাকে। দুইদিন কাজ করিলে গড়ে চারি আনা লাভ হইতে পারে সুতরাং নামদার কাজ লাভজনক নহে।

সূর্য্য

[শ্রীআদীশ্বর ঘটক]

আকাশে যত তারা দেখা যায়, তন্মধ্যে সূর্য্যকে আমরা প্রচণ্ড তেজোময় দেখি। আকাশমণ্ডলের অসংখ্য তারকার মধ্যে সূর্য্যও একটি তারা। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, অথবা ধূমকেতুর শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। পৃথিবীর উপর সূর্য্যের একাধিপত্য—শুধু পৃথিবী নয়, আমাদের এই সৌরজগতের অন্তর্গত সকল গ্রহ, উপগ্রহ এবং ধূমকেতুর উপরও সূর্য্যের আধিপত্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই পৃথিবীতে আমরা যে সকল শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, এই সৌর-জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, অথবা প্রলয়াত্মক যাহা কিছু হইতেছে,—ঐ প্রচণ্ড তারা হইতেই সকল শক্তির বিকাশ হইতেছে। বহু পূর্ব্বকালে আমাদের মুনি-ঋষিগণ এ কথা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের এই পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সূর্য্যের অতি সামান্য তেজের অংশ আবশ্যক হইয়া থাকে—দুইশত ত্রিশকোটি ভাগের একাংশ মাত্র! গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ছাড়া যে সকল তারকা দেখা যায়, সে সকলি একএকটি সূর্য্য। নভোমণ্ডলের কোটি-কোটি তারকার মধ্যে, আমাদের এই সূর্য্য একটি তারকা মাত্র! অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা সূর্য্য আমাদের নিকটে অবস্থিত বলিয়াই, উহার আকৃতি আমরা বৃহৎ এবং তেজোময়ী দেখিতে পাই। আমাদের এই সূর্য্যের সঙ্গে অন্যান্য তারকার লক্ষণের অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব এই সূর্য্যবিষয়ক সকল কথা বুঝিতে পারিলেই, বহুদূরস্থিত অন্যান্য তারকারও অনেক কথা বুঝা যাইবে।

সূর্য্যের আকৃতি ঠিক গোলাকার। খালি চক্ষু দ্বারা চাহিয়া দেখিলেই সূর্য্যের আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সুসূক্ষ্ম পরিমাণ যন্ত্র (micrometer) দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যবিম্বের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ সকল দিকেই এক প্রকার। এই প্রমাণ অনুসারে স্বীকার করিতেই হয় যে, সূর্য্যের আকৃতি সম্পূর্ণ গোলাকার। নানা প্রকার পরীক্ষাদ্বারা ইহাও স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্য নিয়মিতভাবে নির্দ্ধারিত সময়ে আপন অঙ্গের একটা আবর্ত্তন করিতেছেন।

পৃথিবী আপন কক্ষায় ভ্রমণ করিবার কালে শীতকালে সূর্য্যের নিকটে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হয়। এইজন্য শীতকালে সূর্য্যের আকৃতি গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা কিছু বড় দেখায়। এই সকল প্রভেদ

বুঝিতে হইলে, যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয়। পৃথিবী হইতেই যখন সূর্য্যের আকৃতি ছোট-বড় দেখায়, তখন আমাদের এই সৌরমণ্ডলস্থ ভিন্ন-ভিন্ন গ্রহ হইতে যে সূর্য্যের আকৃতি বিভিন্ন প্রকার দেখাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? বুধগ্রহ হইতে সূর্য্যের আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বড় দেখায়, এবং নেপচুন গ্রহ হইতে সূর্য্যকে নক্ষত্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯৭,২৯৮,৭৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। কেবল ঐ প্রকার মাইল-সংখ্যা দ্বারা এই দূরত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। এইজন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অন্য প্রকারেও এই দূরত্ব বুঝাইয়াছেন। আমরা সেই প্রকার উদাহরণ দ্বারাও এই দূরত্ব পাঠকবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়া যে সকল দ্রুতগতিবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান লাভ করি, তন্মধ্যে আলোকের গতির ক্ষিপ্রতা অতিবিচিত্র। আলোক পদার্থের গতি এমন দ্রুত যে, এক সেকেণ্ড মধ্যে জ্যোতি-রেখা এই পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ-রেখা এক সেকেণ্ড সময়ে ১,৯২০০০ এক লক্ষ দ্বিনবতি সহস্র মাইল গমন করিতে পারে। আলোক এত দ্রুত-গতিবিশিষ্ট হইয়াও সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট ১৭ সেঃ অতিবাহিত করে।

ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ এরাগো লিখিয়াছেন, কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এক সময়ে সূর্য্য এবং পৃথিবীর তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। কিন্তু এই কথা তাঁহার ছাত্রগণ বুঝিতে না পারায়, তিনি /২সের গম ওজন করিয়া ছাত্রদিগকে গণনা করিতে দিয়াছিলেন। ছাত্রেরা গণিয়া দেখিল, /২সের গমে ১০,০০০ বীজ আছে। এই হিসাবমত অর্দ্ধমণ গমের বীজ সংখ্যা ১০০,০০০ একলক্ষ, এবং চৌদ্দলক্ষ গমের বীজ একত্র করিলে সাতমণ ওজন হয়। শিক্ষক সাতমণ গম একটা স্তূপাকার করিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "ঐ যে সাতমণ গম দেখিতেছ, উহাকে যদি সূর্য্যের আকৃতি মনে করা যায়, তাহা হইলে একটি গমের দানা পৃথিবীর আকার হইবে।" প্রকৃত প্রস্তাবেই সূর্য্যের প্রকাণ্ড আকারের নিকট পৃথিবী একটি কণা মাত্র।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে—অর্থাৎ চন্দ্রের উপরিভাগে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সূর্য্য-বিম্ব মধ্যেও যে ঐ প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা অনেকের পক্ষে নূতন হইলেও পারে। একখণ্ড কাচে কিয়ৎপরিমাণ কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জলের মধ্য দিয়া সূর্য্যবিম্ব দৃষ্টি করিলে, সূর্য্যবিম্বটি সিন্দুরবর্ণের দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং অনেক সময় গোলাকার সূর্য্যবিম্বমধ্যে নানা প্রকার কৃষ্ণবিন্দুবৎ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা নিম্নে একটি চিত্র দিলাম।

সূর্য্য-বিম্ব মধ্যে ঐ প্রকার চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল চিহ্ন বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, উহারা প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে সরিয়া যাইতেছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা ঐ সকল চিহ্ন অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌরকলঙ্ক

দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, সূর্য্যবিম্ব মধ্যে একাধিক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোনও একটি চিহ্ন প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম দিবস যে চিহ্নটি সূর্য্যবিম্বের এক-পার্শ্বে ছিল, তাহা পরদিন সরিয়া ঈষৎ বামদিকে আসিয়াছে; তথাপি
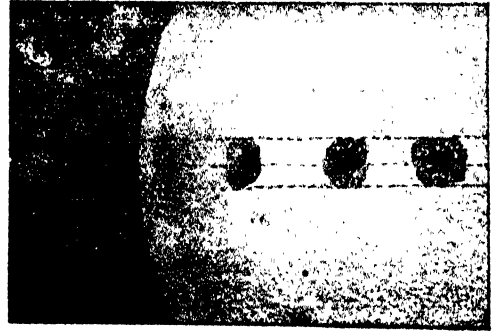
সূর্য্যবিম্বমধ্যে সৌরকলঙ্কের দৈনিক গতি

তাহা বেশ চিনিতে পারা যায়। তৃতীয় দিবসে তাহা আরও সরিয়া গিয়াছে। এই প্রকারে সূর্য্যবিম্বের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া অবশেষে কয়েক দিবসের মধ্যে উহা সূর্য্যবিম্বের বামভাগে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যমধ্যস্থ যে চিহ্নটি এই প্রকারে লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, সেইটিতেই ঐ প্রকার গতি লক্ষ্য হয়। এক-একটি চিহ্নের সূর্য্যের দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে আসিতে প্রায় চতুর্দ্দশ দিবস লাগে; এবং চৌদ্দদিবস পরে ঐ সকল পুরাতন চিহ্ন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া, আবার সূর্য্যবিম্বের দক্ষিণ দিকে প্রকাশিত হয়।

সৌরকলঙ্কসকলের ঐ প্রকার নির্দ্দিষ্ট গতি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ

পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য প্রায় অষ্টাবিংশতি দিবসে আপন অক্ষাবর্ত্ত সমাপ্ত করে।

সার্দ্ধত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে কোপারনিকস্ নামক গণিতবিৎ পণ্ডিত এই সৌরজগতের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য গ্রহগণের কক্ষার কেন্দ্রীভূত হইয়া স্থির রহিয়াছেন। সূর্য্যের কোনও প্রকার গতি, অথবা অক্ষাবর্ত্তের কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া একটি রেখার কল্পনা করিয়া যেমন পার্থিব বিষুবন্ নাম দেওয়া হয়, সেই প্রকারে, সূর্য্যেরও মধ্যস্থল দিয়া একটি রেখার কল্পনা করিয়া, তাহাকে সৌর-বিষুবন্ আখ্যা দেওয়া হয়।

অমব্রা এবং পেনম্ব্রা সমেত বৃহদাকার সৌরকলঙ্ক

এই সৌর-বিষুবণের কিছু দূর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে সৌরকলঙ্কচিহ্ন সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সৌরকলঙ্ক সকল সূর্য্যবিম্ব মধ্যে প্রস্তুত হইয়া, কয়েক দিবস পরে মিলাইয়া যায়; চন্দ্রের কলঙ্ক চিহ্নের ন্যায় উহা স্থায়ী নহে। ঐ সকল চিহ্নের সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় আকারের দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, উহাদের মধ্যে কতকাংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়; আর কতকগুলি ঈষৎ ছায়াযুক্ত দেখায়। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অংশগুলিকে 'অমব্রা' (Umbræ), এবং ঈষৎ ছায়াযুক্ত অংশগুলিকে 'পেনম্ব্রা' (Penumbræ) নাম দেওয়া হয়।

পার্থিব বায়ুমণ্ডলে যেমন মেঘ, ঝড়, অথবা স্থানে স্থানে কুয়াসা, বরফ, ইত্যাদি ব্যাপার হইয়া থাকে, সূর্য্যের আকাশমণ্ডলে ঐ প্রকার কোনও ব্যাপার হইতেই কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সকলের আবির্ভাব হয়, ইহা আধুনিক সকল বৈজ্ঞানিকের মত। কিন্তু, এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, সূর্য্যের উপরিভাগের যে প্রকার উত্তাপ, সেই উত্তাপে স্বর্ণ, লৌহ, নিকেল, প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতুও বাষ্পাকারেই সৌর আকাশমণ্ডলে অবস্থিত। বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্র দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সৌরআকাশে লৌহধাতু বাষ্পাকারে রহিয়াছে। পৃথিবীর উপরে ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি জলীয় বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সৌরমণ্ডলের ঝড় বৃষ্টি লৌহ ধাতুর বাষ্প হইতেই হইতেছে। পার্থিব বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন্ হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন, কার্ব্বনিক্ এসিড প্রভৃতি নানা প্রকার গ্যাস্ সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; ঠিক সেইভাবেই বোধ হয়, লৌহ, নিকেল, প্লাটিনন্ প্রভৃতি ধাতুর বাষ্পরাশি অদৃশ্য হইয়া সৌর-আকাশের বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলের এই সকল ব্যাপার চিন্তা করিলে, মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ক্রমশঃ বলিব।

সৌরকলঙ্কমাত্রেই সৌর-আকাশমণ্ডলের এক-একটা ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত —বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন। ঐ প্রকার এক-একটা আবর্ত্তের এত বিস্তার যে, সময়ে-সময়ে আমাদের এই পৃথিবীর মত সুবৃহৎ কলঙ্ক দেখা গিয়াছে। স্ক্রটার্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটা ঐ প্রকার আবর্ত্ত পৃথিবীর ষোড়শগুণ বৃহদায়তন হইয়াছিল। ১৭৭৯ অব্দে স্যার্ উইলিয়ম্ হার্সেল দেখিয়াছেন যে, একটা সৌরকলঙ্কের আকৃতি প্রায় ৫০,০০০ মাইল বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৩৯ অব্দে ক্যাপ্‌টেন্ ডেভিস্ একটা সৌরকলঙ্কের বিস্তার ১৮৬,০০০ মাইল হইতে দেখিয়াছেন।

সূর্য্যবিম্বের উপরিভাগের এই সকল আবর্ত্ত কৃষ্ণবর্ণের দেখায় কেন? পদার্থসকলের উত্তাপের তারতম্যেই উহা পঞ্চভূতের অন্যতম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন বরফ, জল, এবং ষ্টিম। বরফ কঠিন, সুতরাং উহাকে পৃথ্বি; জল তরল, একারণ উহা অপ; ষ্টিম অদৃশ্য সুতরাং উহাকে বায়ু, বলা যায়। একই পদার্থের বিভিন্ন উত্তাপ বশতঃই স্বতন্ত্র মূর্ত্তি হইতে পারে, এবং উত্তাপ বশতঃই একই পদার্থের পৃথক মহাভূত সংজ্ঞা হইতে পারে। সেই ভাবেই আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা যে সকল বস্তুকে 'ধাতু' বলিয়া জানি, ঐ সকল বস্তু সূর্য্যের উপরিভাগে তরল অথবা বাষ্পাকার হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের উপরিভাগে যাহা বাষ্পাকারে রহিয়াছে, সেই সকল পদার্থের বিস্তৃতি সৌর-আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য হইতে অধিক দূর উপরে উঠিলে, ঐ সকল ধাতুময় বাষ্পের উত্তাপ কিছু কমিবার সম্ভাবনা; উত্তাপ কমিলেই উহা মেঘাকার ধারণ করে, এবং পার্থিব আকাশের অদৃশ্য জল সমুদ্রে যেভাবে কুয়াসা অথবা মেঘ হয়, উত্তাপাংশ পরিত্যাগ করিয়া জলীয় বাষ্পরাশি প্রবল ঝড়ের উৎপত্তি করে। সেই প্রকারেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ ধাতুময় বাষ্পরাশি কিঞ্চিন্মাত্র শীতল হইয়া, পার্থিব মেঘাপেক্ষা শতশত গুণ বৃহদাকার ধাতুময় মেঘ এবং পার্থিব ঝটিকা প্রবাহ অপেক্ষা প্রবলতর ঝটিকা উৎপাদিত করিয়া থাকে। এই প্রকার প্রবল ঝটিকা এবং মেঘ আমরা এই পৃথিবী হইতে সৌরকলঙ্ক রূপে দেখিতে পাই।

গ্যালিলিও, ফেবরিসিয়স্ এবং সেইনার নামক ব্যক্তিত্রয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সৌরকলঙ্কসকল প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। উক্ত চিহ্ন

সকলের গতি দৃষ্টে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সূর্য্যও আপন অঙ্গের আবর্ত্তন করিতেছেন। সূর্য্যবিম্বের মধ্যস্থলের চিহ্নগুলি ঘুরিয়া আসিতে পঞ্চবিংশতি দিন লাগে; এবং পার্শ্বস্থ চিহ্নসকল ঘুরিতে প্রায় অষ্টাবিংশতি দিবস অতিবাহিত হয়। যদি স্বীকার করা যায় যে, সূর্য্যের মধ্যস্থল অনেকটা কঠিন, এবং সৌরকলঙ্ক (ঝটিকার আবর্ত্ত)-সকল মেঘের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে ভাসমান, তবেই কলঙ্কচিহ্ন সকলের দুই প্রকার গতির কারণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। পার্থিব আকাশে মেঘাদির অবস্থিতি যে প্রকার, সৌর-আকাশমণ্ডলে সৌরকলঙ্কসকলের অবস্থিতি নিশ্চয়ই সেই প্রকার লক্ষণাদি দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

১১$\frac{1}{9}$ বৎসরে, অর্থাৎ ১১ বৎসর, ৪০ দিন ১২ ঘণ্টায় সৌরকলঙ্কসকলের একটা বর্ষচক্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার বর্ষচক্রের প্রকৃত কারণ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কোন-কোনও জ্যোতির্বিদ বলেন, বৃহস্পতিগ্রহের বর্ষচক্রের সহিত সৌরকলঙ্ক সকলের সম্পর্ক আছে। কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা বলেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ যে সময়ে সূর্য্যের খুব নিকটে থাকে, তখন সৌরকলঙ্কসকলের যে প্রকার বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে, বৃহস্পতিগ্রহ সূর্য্য হইতে বহু দূরে থাকিবার কালেও সৌরকলঙ্কের সেই প্রকার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সূর্য্য হইতে মাঝামাঝি দূরত্বে বৃহস্পতি থাকিলেও সৌরকলঙ্কের সেই প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? ১১$\frac{1}{9}$ বৎসর যে সৌরকলঙ্ক সকলের বর্ষচক্র অনুমিত হয়, তাহাও বোধ হয় অভ্রান্ত নহে। গ্যালিলিও প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্কের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সময়ে-সময়ে বিংশতি বৎসর অন্তরও সৌর-কলঙ্কসকলের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আমাদের সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই ১১$\frac{1}{9}$ বৎসর অন্তর সৌরকলঙ্ক সকলের বর্ষচক্র হইতেছে, দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, পার্থিব বৈদ্যুতিক স্রোতের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু ফরাসীদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন নাই, এবং স্বীকার না করিবার হেতুও আছে। পার্থিব বৈদ্যুতিক-স্রোত দশবৎসর অন্তর সমান হয়, এবং সৌরকলঙ্ক সকলের ১১ বৎসর অন্তর একভাব দেখা যায়। তাহা হইলে হিসাবমত ৬০ বৎসরান্তরে উহাদের উল্ট-পাল্টা হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু সে প্রকার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। এই জন্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, পার্থিব বৈদ্যুতিক-স্রোতের সহিতও সৌরকলঙ্কের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে ইহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

সূর্য্যমধ্যে কি প্রকার পদার্থের সন্নিবেশ আছে, ইহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। শুধু আমাদের সূর্য্য কেন, অন্যান্য বহুদূরস্থিত তারকাসকলের পদার্থ-সমষ্টি অনেকটা বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে যন্ত্রদ্বারা এই সকল কথা আমরা বুঝিতে পারি, এই স্থানে তাহার একটু বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

স্যার্ আইজাক্ নিউটন্ আলোক-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ত্রিকোণাকার কাচখণ্ড (prism) দ্বারা সূর্য্যের আলোক সপ্তধা ভিন্ন হইয়া সপ্ত বর্ণ প্রকাশ করে।
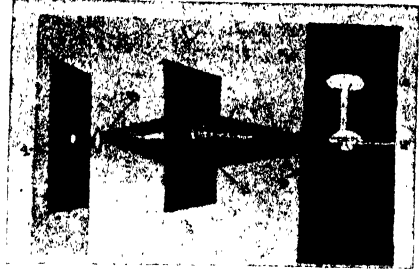
প্রিজম্ আলোকের সপ্তবর্ণাত্মক বিভাগ এবং পুনর্ব্বার ঐ সপ্তবর্ণকে লেন্স দ্বারা একত্র করিয়া শ্বেত বর্ণ আলোক উৎপাদন

এই পরীক্ষাদ্বারা ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সপ্ত বর্ণ একত্র হইলে পুনরায় শ্বেতবর্ণের আলোকের উৎপত্তি হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইহা অতি অদ্ভুত রহস্য।

আমরা এই চক্ষুদ্বারা অনেক সময়ে নানাপ্রকার ভ্রান্তি দর্শন করি, সূর্য্য রশ্মির শ্বেতবর্ণ তাহার একটি উদাহরণ। নিউটন এই বিষয়ে যে প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নের চিত্রদ্বারা বুঝাইলাম।—

কোনও অন্ধকার গৃহমধ্যে ক নামক ছোট ছিদ্রপথে সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হইয়া খ নামক প্রিজম দ্বারা সপ্তবর্ণে (গ) বিভক্ত হইয়াছে। পুনর্ব্বার ঘ নামক লেন্স দ্বারা ঐ সপ্তবর্ণ একত্রিত হইয়া চ নামক শ্বেত বর্ণ আলোকের উৎপত্তি করিয়াছে।

এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা নিউটন্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রিজম্ দ্বারা আলোকের বিভাগ করিতে পারা যায়, এবং প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ বর্ণ সকল সূর্য্যরশ্মিমধ্যেই অবস্থান করিতেছে।

সৌর ট্রম এবং ফ্রণ্‌হফার্ লাইন

উপরের চিত্রদ্বারা আমরা সূর্য্যরশ্মির বর্ণবিভাগ দেখাইলাম। প্রিজম্‌দ্বারা সূর্য্যরশ্মি উপরের চিত্রানুযায়ী বিভক্ত হইলে উহাকে 'স্পেক্‌ট্রম্' নাম দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের সহিত অনুবীক্ষণ যোগ করিলে সৌর-স্পেক্‌ট্রম্ মধ্যে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রনহফার্ নামক বৈজ্ঞানিক ঐ সকল রেখা চিহ্নিত করিবার জন্য A, B, C, D, E, F, G, H, অক্ষরগুলি দ্বারা রেখাসকলের নাম করিয়া-

ছেন। বর্ণবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সপ্ত বর্ণে বিভক্ত হইলেই, ঐ সকল রেখা যথাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও প্রদীপের অথবা বাতীর আলোক ঐ যন্ত্রদ্বারা বিভাগ করিলে, সপ্ত বর্ণের বিকাশ হয়; কিন্তু তাহাতে ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণের রেখা দৃষ্ট হয় না। তবে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে ঐ সকল রেখা দেখিতে পাওয়া যায় কেন? বর্ণবীক্ষণদ্বারা দীপালোক পরীক্ষা করিলে রেখা-বর্জ্জিত 'স্পেক্‌ট্রম্' দেখিতে পাওয়া যায়; এ কারণ উহাকে 'অঙ্গারজ্যোতিঃ (Carbon spectrum) নাম দেওয়া হইয়াছে। দিবামাত্র নীলবর্ণ মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই প্রকার বর্ণবীক্ষণদ্বারা নানা পদার্থ বুঝিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক ফ্রনহপার এই উপায়ে Spectrum-মধ্যস্থ রেখার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। ঐ রেখাগুলি সেই কারণে অদ্যাবধি তাঁহারই নামে অভিহিত হইতেছে। *

ইহার পরে লক্‌ইয়ার নামক বৈজ্ঞানিক বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের নানাপ্রকার সজ্জা করিয়া সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকলের আলোক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকলে লৌহ, সীস্, তাম্র, কোবাল্ট,

সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণকালে সৌরমুকুটের আংশিক আকৃতি।

নিকেল্ হাইড্রোজেন, সোডিয়ম্, ম্যাগনেসিয়ম্ প্রভৃতি ধাতু বাষ্পাকারে রহিয়াছে। দীপালোকে লবণ প্রয়োগ করিয়া D লাইন সমুজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষিত হইলে, ঐ রেখা কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়। ইহার কারণ কি? অন্ধকার গৃহমধ্যে একটা বাতী জ্বালিলে, ঘরে সকল বস্তুর ছায়া পড়িবে, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় ছায়া পড়ে না। ঐ গৃহে যদি একটা আরও তীব্র আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই গৃহমধ্যে অগ্নিশিখারও ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ দীপালোকে যদ্যপি একটু সাধারণ ব্যবহার্য্য লবণ দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ঐ রেখাবিহীন অঙ্গার জ্যোতিমধ্যে D নামক রেখা তীব্র আলোকময় দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই কারণে বলেন যে, সোডিয়ম্ ধাতু হইতেই D নামক রেখার উৎপত্তি হয়। দীপশিখার মধ্যে যতক্ষণ লবণের কিছুমাত্রও থাকিবে, ততক্ষণ ঐ সোডিয়ম্ ধাতুজনিত D লাইন বেশ দেখিতে পাওয়া

লবণসংযুক্ত বাতির আলোকে বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সোডিয়ম লাইনের পরীক্ষা।

যায়। লবণ নিঃশেষিত হইলেই রেখাবর্জ্জিত অঙ্গার-জ্যোতিঃ পুনঃ-প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে দীপ শিখাতে হীরাকশ Sulphate of Iron প্রয়োগ করিবামাত্র নানাবর্ণের জ্যোতিঃ-মধ্যে প্রায় ত্রিশতাধিক উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ সকল রেখার সহিত লৌহধাতুর সম্বন্ধ বুঝা যায়। তুঁতিয়া Sulphate of Copper

উপরিউক্ত পরীক্ষাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সূর্য্যরশ্মিমধ্যস্থ সোডিয়ম্ ধাতুর রেখা এবং অন্যান্য ধাতুর রেখাগুলি কৃষ্ণবর্ণের দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়, সূর্য্যমণ্ডলের তীব্রতর আলোকের নিকট সকল ধাতুর বাষ্পজনিত রেখাসকল মলিন দেখায়। যে ভাবে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকের নিকটে দীপশিখার ছায়া পড়ে, সেইভাবেই সূর্য্যমণ্ডলস্থ ধাতুসকলের বাষ্পাবস্থাহেতু স্পেক্‌ট্রম মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের রেখা দেখা যায়। ঐ জন্যই সূর্য্যবিম্বের উপরিভাগের আবর্ত্তসকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কচিহ্নরূপে দেখা যায়।

আমরা খালি চক্ষুর্দ্বারা সূর্য্যের যে আকার দেখিতে পাই, তাহার বাহিরেও সূর্য্যের আকৃতি বহুদূরবিস্তৃত। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ইহা নিম্নলিখিতভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। সূর্য্য-গ্রহণকালে সময়ে-সময়ে সমস্ত সূর্য্যবিম্ব চন্দ্রদ্বারা ঢাকা পড়ে। ইহাকেই পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ

* Fraunhoper lines.

বলা হয়। ঐ প্রকার সূর্য্যগ্রহণ হইলে, ক্ষণকালের নিমিত্ত সূর্য্যের বহির্ভাগে অদ্ভুত এক বায়ুমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। তেজোময় সূর্য্য বিম্বের উপর বর্ণবীক্ষণ দ্বারা যে সকল ধাতব বাষ্পীয় রেখা কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়, সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের এই বায়ুমণ্ডলের উপর বর্ণবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে, ঐ সকল রেখা দীপ্তিমান্ দেখা যায়। অতএব, ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সূর্য্যের বহির্ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত ধাতুসকল বাষ্পাকারে রহিয়াছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, সেই সময়ে প্রোফেসর সি, এ, ইয়ঙ্গ সাহেব প্রথমতঃ এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তাঁহার কথায় প্রথমতঃ কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অন্যান্য সূর্য্যগ্রহণের সময় পরীক্ষা করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা ঐ কথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপরিউক্ত সকল প্রমাণ হইতে এই কথাই স্থির হইয়াছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর বহির্ভাগে যেভাবে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনিক এসিড্ প্রভৃতি বাষ্পাকারে রহিয়াছে, এবং উহার সহিত জলীয় বাষ্পও অদৃশ্য হইয়া আছে, সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলে লৌহ, তাম্র, এবং সীস ধাতু সেই প্রকারে অদৃশ্য হইয়া বাষ্পাকারে রহিয়াছে। সূর্য্যের এই বায়ুমণ্ডল দৃশ্যমান্ সূর্য্য-পরিধি হইতে পাঁচ অথবা ছয় হাজার মাইল অবধি বিস্তৃত। ইহার উপরে আবার প্রজ্বলিত হাইড্রোজেন বাষ্পের অপর একটি স্তর আছে। পার্থিব আকাশে যেমন অনেক দূর পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে মেঘ ঠেলিয়া উঠে, সৌরগগন-মণ্ডলেও সময়ে সময়ে নানা পদার্থের বাষ্পময় মেঘ বহুদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে জ্যোতিঃশৃঙ্গ (Solar Prominences) বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ সকল জ্যোতিঃশৃঙ্গ বৈদ্যুতিক ব্যাপারমাত্র; কোনও পদার্থের বাষ্প যে লক্ষ মাইল উপরে উঠিয়া ঐ প্রকার জ্যোতিঃ-শৃঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, উহা বাস্তবিক কোনও গতিশীল পদার্থই বটে।

উপরিউক্ত ব্যাপারসকল দেখিয়া অবশ্যই স্থির করিতেই হয় যে, সূর্য্যের চারিদিকে অন্ততঃ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত নানা প্রকার বাষ্পীয় আবরণ আছে। প্রোফেসর ইয়ঙ্গ্ দেখিয়াছেন, ঐ প্রকার একটা জ্যোতিঃশৃঙ্গ বহুদূর উঠিয়া পরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। উহার গতি এক সেকেণ্ডে একশত মাইলেরও অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ঐ সকল জ্যোতিঃশৃঙ্গ যে সূর্য্যের সর্ব্বশেষ আবরণ, তাহা নহে। ঐ সকলের উপরেও একটা আলোকমণ্ডল দৃষ্ট হয়। তাহাকে সৌরমুকুট (Solar Corona) নাম দেওয়া হয়। সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইলেই, ঐ সকল সূর্য্যাবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নানাপ্রকার অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হইয়া ঐ প্রকার সৌর-মুকুট দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই অনেকের মত।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ এইসকল উল্কারাশিও অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণকালে ঐ সৌরমুকুট হইতেও পৃথিবীতে কিছু পরিমাণ উত্তাপ আসিয়া থাকে; এডিসন্ কৃত টাসি-মিটার্ নামক যন্ত্রদ্বারা সেই উত্তাপের পরিমাণ করিতে পারা যায়।

১৮৬৯ অব্দে যে সর্ব্বগ্রাস্ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, সেই সময়ে জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছিলেন যে, করোণার কতকটা আলোক প্রজ্বলিত গ্যাস হইতে আসিতেছে। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রমধ্যে সেই সময় একটী নূতন হরিৎ বর্ণের রেখা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ রেখা যে কি পদার্থের, তাহা এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। ১৮৭০ অব্দে সৌর-মুকুটের প্রথম ফটোগ্রাফ প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে ১৮৭১ অব্দে আবার কতকগুলি ফটোগ্রাফ হয়; ঐ সকল ফটোগ্রাফ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সৌরমুকুটের আলোক সূর্য্যের প্রতিফলিত রশ্মি মাত্র; কারণ উহাতে সৌর-স্পেকট্রম্ এবং তাহার কৃষ্ণবর্ণ রেখাসকল দৃষ্ট হইয়াছিল।

সূর্য্য হইতে প্রায় দুইলক্ষ মাইল দূরে এই সৌরমুকুট দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও সূর্য্যের শেষ সীমা নহে। Zodiacal light নামক যে আলোক সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম গগনে দৃষ্ট হয়, সেই আলোকটা সূর্য্যেরই অঙ্গ,—এ কথা প্রক্টার্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিলেন; কিন্তু, অনেকে তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। সূর্য্য হইতে ৮০ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত Zodiacal Light এর বিস্তার রহিয়াছে। ঐ আলোক এবং সৌরমুকুট (corona) যে এক বস্তু, প্রক্টার তাহাই বলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যেমন গ্রহণকালে চন্দ্রকর্ত্তৃক সূর্য্য সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইলেই সূর্য্যের চারিদিকে জ্যোতিঃশৃঙ্গ এবং করোণা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইমত, যদি কোনও প্রকারে করোনার আলোক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে, উহার বাহিরে আরও অনেক-দূর পর্য্যন্ত সূর্য্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রক্টার নামক জ্যোতির্ব্বিদের এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য এমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে প্রোফেসর নিউকোম্ব কথিত মত করোণা আবৃত করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৮৭৮ সালে প্রোফেসর নিউকোম্ব্ পুনরায় চেষ্টা করিয়া, সূর্য্য হইতে ৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটী মাইল পর্য্যন্ত করোনার বিস্তার দেখিতে পাইয়াছেন। তবেই, Zodiacal Light এবং করোণা যে একই বস্তু, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে অল্প আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্য্যেরই অংশ, ইহা বিজ্ঞান-শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা সূর্য্যদেবের যে দীপ্তিমান্ গোলাকার দেহটুকু দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত সূর্য্যের এক বিন্দুমাত্র!

Zodiacal Light গোলাকার বস্তু নহে। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রানুযায়ী Spheroid। উহার দৈর্ঘ্য একশত ষাট কোটী মাইল, এবং উহার প্রস্থ বিংশতি কোটী মাইল। ইহাই আসল সূর্য্যের আকৃতি!

দীপ্তিমান্ যে সূর্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহার বাহিরে সূর্য্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কষ্টে বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ দীপ্তিমান্ পিণ্ডের অভ্যন্তরে যে কি অবস্থা, তাহা বুঝিবার পক্ষে

আমাদের কোনও উপায় নাই। ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস্ কোনও সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, যাহা জানিতে পারি নাই, তাহাই অসীম!"

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য চতুর্দ্দশলক্ষ গুণ বৃহৎ;—সে কেবল দৃশ্যমান্ তেজোময় পিণ্ডটি মাত্র। দৃশ্যমান্ তেজোময় পিণ্ডের বাহিরের জ্যোতিঃশৃঙ্গ, সৌরমুকুট, এবং Zodiacal Light ইত্যাদি যাহা সূর্য্যের বহিরঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিলাম, ঐ সকল একত্র করিয়া সূর্য্যের আকৃতি কি ভীষণ! অঙ্কশাস্ত্রবলে আমরা যে তাহার পরিমাণ করিতে পারিতেছি, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।

বাঙ্গালা তারিখে, লা, রা, ঠা, ই, এ যোগ

[শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ]

কয়েকমাস পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত পত্রে, বাঙ্গালা তারিখে লা, রা, ঠা, ই, এ প্রত্যয়ের বিষয় উল্লেখ করেন। 'সাহিত্য-সংবাদ' নামক মাসিক পত্রে ঐ পত্র-সম্পর্কে এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই-এক জন সংস্কৃতনবীশ ভিন্ন আর কাহারো দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা গেল না।

শ্রীযুক্ত সারদা বাবু মনে করেন যে, বাঙ্গালা তারিখের সহিত এই যে লা, রা, ঠা, ই, এ যোগ করিবার প্রথা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, লোকপ্রসিদ্ধ 'বোধোদয়' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থে, সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতে ভাষার গতি যখন phonetic decay-এর দিকে, তখন অনাবশ্যক প্রত্যয়গুলির প্রত্যাহার আবশ্যক। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তথাপি বঙ্গভাষাবিৎ সুধীবৃন্দ এ বিষয়ে তাঁহাদের রায় প্রকাশ করিলেন না।

তারিখের সংখ্যার সহিত এই অক্ষরগুলি যোগ করিবার প্রথা রহিত করা উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। তবে 'বোধোদয়ে' ইহার উদ্ভব কি না, তাহা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। বোধোদয়ে 'গণন—অঙ্ক' শীর্ষক পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কের পর, পহিলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচুই, উনিশে ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক। যথা,—

পহিলা	দোসরা	তেসরা	চৌঠা	পাচই	উনিশে	ইত্যাদি
১লা	২রা	৩রা	৪ঠা	৫ই	১৯শে	... ...

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাবাচক অঙ্কের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অক্ষগুলির যোজনা করিয়াছিলেন, সেগুলি কথিত বাঙ্গালার পহিলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, উনিশে প্রভৃতি শব্দের অন্তিম অক্ষর। 'বোধোদয়' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই পহিলা, দোসরা প্রভৃতি শব্দগুলি, লিখিত ও কথিত উভয়বিধ ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং পূরণবাচক শব্দাংশগুলি 'বোধোদয়ে' নূতন প্রচারিত হয় নাই। অঙ্কের সহিত সেগুলির যোজনা যে লিখিত-ভাষায় শিষ্টপ্রয়োগ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে ও 'বোধোদয়ের' কল্যাণে, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইস্থলে, লিখিত ভাষায়, অঙ্কের সহিত পূরণবাচক অক্ষর-যোজনার প্রণালী সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ, আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'বোধোদয়ে' তিনি লিখিয়াছেন—"১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণ অর্থে লিখিত হয়, তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পূরণ-বাচক শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করিয়া দেওয়া উচিত, তাহা হইলে অর্থবোধের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না; যেমন, ১ম, ২য়, ৪র্থ ইত্যাদি। এইরূপ অঙ্কের সহিত 'ম' প্রভৃতি অক্ষর যোজিত থাকিলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বুঝাইবেক। ঐ ঐ অক্ষরের যোগ না থাকিলে, এক, দুই, তিন, চারি—কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ—ইহার স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যদি কেহ এরূপ লেখে, 'আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম,' তাহা হইলে, তিন দিবসে অথবা তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবে না। কেহ এরূপ বুঝিবে,—ঐ কর্ম্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল; কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কার্য্য করা হইয়াছিল। ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি,—ইহার নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু, ৩ এই অঙ্কের পর যদি 'য়' এই অক্ষরের যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবেক।"

কার্য্যতঃ কিন্তু, বিদ্যাসাগর মহাশয় 'পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা' দেখাইবার সময় প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলি গ্রহণ করিলেন; আর তারিখ লিখিবার প্রণালী দেখাইবার সময় পহিলা, দোসরা, তেসরা প্রভৃতি চলিত বাঙ্গালা শব্দগুলিকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। কথিত শব্দগুলির শেষাংশ মাত্র সংখ্যাবাচক অঙ্কগুলির সহিত জুড়িয়া দিয়া প্রকারান্তরে লিখনসংক্ষেপও করিলেন। এইরূপ করিতে গিয়া তিনি ভাষাবিজ্ঞানের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন কি না, তাহা পরে আলোচনা করিব। তবে ঐ পূরণবাচক সংখ্যা অঙ্কনে তিনি যে আমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাহা হইলে, পূরণবাচক দুই রকম অঙ্কের প্রচলন হইল। এক ১ম, ২য়, ৩য়, প্রভৃতি হইল সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য; আর ১লা,

২রা, ৩রা, ৪ঠা, ইহা মাত্র তারিখ লিখিবার সময় ব্যবহারের জন্য। পূরণবাচক অঙ্কের এই দুই প্রকার ভেদের আদৌ কোনও আবশ্যকতা আছে কি না, তাহার বিচার করা যাউক। তারিখ লিখিবার সময় ১লা বৈশাখ না লিখিয়া ১ম বৈশাখ লিখিলে একই অর্থ বুঝাইবে। তবে কথিত ভাষার সহিত মিল থাকিবে না; কারণ আমরা মুখে বলি, পহিলা বৈশাখ, প্রথম বৈশাখ বলি না। সর্ব্বত্রই যে কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। সেরূপ মিল থাকা যে আবশ্যক, তাহাও বিচারসাপেক্ষ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, অর্থজ্ঞাপকতার হিসাবে, ১লা বৈশাখ ও ১ম বৈশাখে যখন কোনও পার্থক্য নাই, তখন দুই রকম লেখার আবশ্যকতা নাই। যাহা চলিত আছে, তাহাই গ্রাহ্য।

তারিখ লিখিবার ও বলিবার প্রণালীতে যে একটি বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আদি কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। অনেকে মনে করেন, পহিলা, দোসরা প্রভৃতি শব্দ ইংরাজীর First, Second এর অনুকরণে সৃষ্ট। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, সংস্কৃত প্রথম, দ্বিতীয় ইংরাজীর বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। বাঙ্গলা ভাষার এই শব্দগুলি—প্রথম দ্বিতীয়ের অনুকরণ গঠিত, না হিন্দী ও উর্দ্দু হইতে গৃহীত—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমার মনে হয়, এগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ এবং বহুদিন যাবত আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীতে পহিলা, দোসরা প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

তারিখ শব্দটি আরবী হইতে উর্দ্দুর মারফতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালী হইয়াছে। অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও গ্রাম্য-ভাষায় তারিখের পরিবর্ত্তে 'দিন' শব্দটির প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে, 'আজ মাসের কোন্ তারিখ, জিজ্ঞাসা করিবার সময় 'আজ মাসের ক' দিন বা আজ মাসের কয় এইরূপ বলে। তারিখ শব্দটির অর্থও 'দিন'। তবে ইংরাজী Date শব্দের বাঙ্গালাতে 'দিন' প্রতিশব্দ সম্পূর্ণ অর্থবোধক নহে। 'তারিখই' Date এর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিশব্দ। 'তারিখ' আমাদের শিক্ষিত চলিত ভাষায় যে প্রকার আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে দীন 'দিনের' সাধ্য নাই—তাহাকে হঠাইয়া নিজেকে স্থাপিত করে; তাহার আবশ্যকতাও নাই।

আজিকার তারিখ প্রকাশ করিতে হইলে, তিনটি জিনিষের দরকার। সন বা বৎসর, মাস ও দিন; বারটা উপরন্তু; সেটা সাপ্তাহিক বলিয়া, ইহার তাদৃশ খাতির নাই। তবে সন, মাস, দিনের নিশ্চয়তাহেতু উহার একটি না থাকিলে তারিখ সম্পূর্ণ হয় না। 'আজ ২৯শে বৈশাখ' মুখে বলিলে সনের আবশ্যকতা হয় না। তবে লিখিতে গেলে, সনের উল্লেখ খুব প্রয়োজনীয়। লিখিবার সময় আমরা লিখি—

(১) সন ১৩২৩ সাল, ২৯ শে বৈশাখ

(২) ২৯ শে বৈশাখ, ১৩২৩ সাল

(৩) ইংরাজীর অনুকরণে ২৯।১।১৩২৩

(৪) সংক্ষেপে ২৯ বৈশাখ। ১৩২৩

(৫) প্রাচীন মতে সন ১৩২৩ সাল (বঙ্গাব্দ) মাহ বৈশাখ ২৯ দিন বা রোজ—

(৬) প্রাচীন অনুরূপ—সন ১৩২৩ সাল, মাহ ২৯ বৈশাখ

ইংরাজিতে লিখিতে গেলে রাজকীয় ঘোষণাপত্র, আইন-কানুন প্রভৃতিতে দেখা যায়—

This the thirteenth day of May in the Year of our Lord Nineteen hundred and sixteen.

(২) অন্যান্য সরকারী চিঠি ও কাগজপত্রে

Dated the 13th May, 1916.

সংক্ষেপে 13th May, 1916.

(৩) সাধারণ চিঠিপত্রে 13th May, 1916.

অথবা May 13, 1916.

অথবা খুব সংক্ষেপে 13-5-1916.

ইহার মধ্যে 13th May 1916 ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ও শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য। সংস্কৃতে প্রকারভেদ নাই। কথিত-সংস্কৃতে —অধুনা মাত্র মন্ত্রাদিতে—কেবল দিন হইলেই চলে না; কারণ আমাদের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তিথি-নক্ষত্রাদিও আবশ্যক।

(১) বৈশাখস্য ঊনত্রিংশ দিবসে

(২) বৈশাখে মাসি ঊনত্রিংশ দিবসে

সংস্কৃতে তিথিতে এই দুই রকমে লিখা যায়।

হিন্দীতে

(১) বতারিখ সন ১৩২৩ সাল, মাহ ২৯ বৈশাখ,

(২) বতারিখ ২৯, মাহ বৈশাখ, সন ১৩২৩,

(৩) সন ১৩২৩ বৈশাখকা ২৯ রোজ

(৪) ২৯ শা বৈশাখ সন ১৩২৩

ইহার মধ্যে লিখিত ভাষায় ২য় প্রণালীই সমধিক প্রচলিত।

বাঙ্গালায় দিন লিখিতে হইলে উক্ত ছয় প্রকার প্রণালীর মধ্যে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে গত ১৫০ বৎসর ধরিয়া আমরা কি ভাবে তারিখ লিখিয়া আসিয়াছি, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি অনেক দলিলাদি দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের প্রণালীর নিদর্শন নিম্নে লিখিত হইল।

(১) সনন্দ, কোবালা, প্রভৃতি—১১৭০ সাল হইতে ১২০৩ পর্য্যন্ত, প্রণালী—সন ১১৭৪ সাল ৭মাঘ

(২) কোবালা, নাদাবী, মোকদ্দমার রায় প্রভৃতি ১২০৩ সাল হইতে ১২০৫ পর্য্যন্ত প্রণালী—(ক) সন ১২৪১ সাল, তারিখ ১৪, মাহ কার্ত্তিক—(খ) বতারিখ ৬ মাহ আষাঢ় সন ১২৪৮ বাঙ্গালা রোজজুম্মা

(৩) কোবালা, নাদাবী, আদালতের রায়, রসিদ প্রভৃতি ১২৫১

হইতে ১২৯০সাল পর্য্যন্ত প্রণালী—(ক) সন ১২৬৩ সাল তারিখ ২৮ফাল্গুন —(খ) সন ১২৬২ বারসউ বাসট্টিসাল বিলায়িতি তারিখ ২ চৈত্রী

(গ) সন ১২৬৩ বারসউ তেষট্টি সাল তারিখ ৭ সাতাই মাঘ

(ঘ) সন ১২৮৪ বারশত চৌরাশি সাল তারিখ ২৯ উনত্রিশ চৈত্র

(ঙ) সন ১২৭৬ বারশত ছেয়ত্তোর সাল তারিখ ২৫ পঁচিশ পৌষ

(চ) সন ১২৬৭ বারশত সাতষট্টি সাল তারিখ ২১ একইসা পৌষ

(ছ) সন ১২৮৭ সাল তাং ১৭ ভাদ্র

(জ) সন ১২৮৮ সাল তাং ১৯ ভাদ্র শুক্রবার

(ঝ) সন ১২৮৮ সাল তারিখ ১৮ আষাঢ়

(ঞ) সন ১২৮৭ সাল ৩২ চৈত্রী শনিবার

(ট) আদালতের রায় প্রভৃতিতে ইংরাজী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত—

বাঙ্গালায় লিখিত

(ক) বিতারিখ ইয়াজসহম মাহযচতুয়নী সন ১৮১১ ইস্‌রী

(খ) সন ১৮৩৮ সাল তারিখ ২৩ আগষ্ট

(গ) ১৮৬৪।৩০ এপ্রেল

(ঘ) ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯

(ঙ) অদ্য সন ১১৮০ সালের ১০ জানুয়ারী তারিখে

আমার অনুসন্ধানের ফলে দুটি বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। ১ম, বোধোদয় প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই (ক) চলিত বাঙ্গালায় লা, রা, প্রভৃতি প্রচলিত ছিল; (খ) দলিলপত্রে অল্পে অল্পে তাহা লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ২য়, ইংরাজী তারিখ লিখিবার প্রণালীতেও দেশীয় প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজীর অনুকরণে আমাদের পূরণবাচক তারিখের অঙ্কের সূত্রপাত হয় নাই।

এক্ষণে কি প্রণালীতে আমরা তারিখ লিখিব? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তির অবসর নাই; কারণ আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে 'বৈশাখের ২৯ দিবসে' লিখিও না, বলিও না। ২৯শা বৈশাখই বহুল প্রচলিত। এখন কথা এই যে, phonetic decay অর্থাৎ 'উচ্চারণের লোপ' নামক ভাষা-বিজ্ঞানের বিধি অনুসারে আমরা কথিত ও লিখিত ভাষায় এই লা, রা, ঠা'র, লোপ করিব কি না? Phonetic decay একটি মস্ত বড় কথা। অদ্য ইহার আলোচনা স্থগিত রাখিলাম। তবে আমার বক্তব্য এই যে, বেঙাচির লেজ আপনি খসে। যাহা অনাবশ্যক, আপনিই তাহা লোপ পাইবে। যুক্তির দ্বারা ও পরামর্শ করিয়া শাব্দিক উচ্চারণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই লা, রা, ঠাই যখন আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি, তখন জোর করিয়া উহাদের বিলোপ সাধনে লাভ কি? *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—মেদিনীপুর শাখার বৈশাখের মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ]

প্রথমে যখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, অনেক হিন্দুসন্তানই তখন শব-ব্যবচ্ছেদ ও ও তজ্জনিত জাতিনাশের আশঙ্কায় মেডিকাল স্কুল বা কলেজে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কিন্তু এই পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও হকিমী-ব্যবসায়কে পদদলিত করিয়া আজ আমাদের দেশে অবাধ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। ইহাদ্বারা আমাদের বিশেষ কোন হিত সাধিত হইতেছিল বলিয়াই, আমাদের দেশে ইহা যে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যে ক্ষমতাবলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রাচ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও তাহার সেই ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায়ই অটুট রহিয়াছে, বা তাহার কিছু অপচয় হইয়াছে, এবং দেশের সর্ব্বসাধারণ অধুনা ইহাদ্বারা কতটা উপকৃত হইতেছে, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অস্থিকঙ্কালসার দেশে বর্ত্তমানে তাহার কার্য্যকারিতা কতটুকু, এই সব বিষয় বুঝাপড়া করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটু আলোচনা আবশ্যক। চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রধান উপাদান ঔষধ। এই ঔষধ সাধারণতঃ উদ্ভিদ, ধাতব ও খনিজ পদার্থ, এবং জীবাদির দেহ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ ও হকিমী শাস্ত্রে, দুই বা ততোধিক উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া, ভস্ম, চূর্ণ বা কাথ প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে; এবং বৈদ্য বা হকিমগণ তদনুসারে আপন-আপন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা নিজেই একাধারে চিকিৎসক, ঔষধ-সংগ্রাহক, প্রস্তুতকারক ও ঔষধ-বিক্রেতা। প্রাচীন য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণও আমাদের দেশীয় বৈদ্যদিগের মতই স্বয়ং ঔষধ-সংগ্রাহক, ঔষধ-সংমিশ্রক ও ঔষধবিক্রেতা ছিলেন। পরে রসায়ন-শাস্ত্রের অনুগ্রহে ঔষধপ্রস্তুতরূপ আয়াসসাধ্য কার্য্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ চিকিৎসক হইয়া দাঁড়াইলেন। কেমিষ্ট্ ও ড্রাগিষ্টের দল ভেষজ-দ্রব্যাদি হইতে আরক বা টিংচার ও চূর্ণ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন; এবং কম্পাউণ্ডারগণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা বা প্রেস্‌ক্রৃপ্‌সন অনুসারে, ঐ সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া, রোগীকে সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এইখানেই এলোপ্যাথির বিশেষত্ব, এইখানেই তার প্রভুত্ব। ইহার উপর আবার রোগ-পরীক্ষার জন্য ষ্টিথেস্‌কোপ ও থার্‌মোমিটর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার ইহাকে প্রাচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপরে আরও উচ্চতর আসন প্রদান করিল। মোট কথা, রোগ-পরীক্ষার উপযোগী নানাবিধ

যন্ত্রে এবং রসায়ন-শাস্ত্রের যাদুমন্ত্রের বলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিল।

বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার পর, বড়-বড় ডাক্তার মহারথীরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের চিকিৎসা-প্রণালীটা ক্রমেই পুরাতন হইয়া পড়িতেছে, তখন তাঁহারা নিত্য নূতন ঔষধ, অথবা নূতন ব্যবস্থাপ্রণালী উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল !

ফলে, যিনিই যখন 'নূতন কিছু' উদ্ভাবন করিতে পারিলেন, তখনই তিনি খুব বাহবা পাইতে লাগিলেন, লোকসমাজে তাঁহার আদর বাড়িয়া গেল, ক্রমে বহু শিষ্যও জুটিতে লাগিল। কিন্তু দশ, বিশ, বা ত্রিশ বৎসরের পর অভিজ্ঞতার অগ্নি-পরীক্ষায় যখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই টিঁকিয়া থাকিতে পারিলেন না, তখনই আবার অন্য একদল তাঁহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আর এক পন্থা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই পরিবর্ত্তন-নীতি গত শতাব্দী হইতেই বিশেষ প্রবলভাবে অনুসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই নিত্য-নূতন মত, এই নিত্য-নূতন ব্যবস্থা, ক্রমশঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, কি বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে, কি একস্থানে থাকিয়াই বহুরূপীর মত নিত্য-নূতন রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে। কর্ত্তৃপক্ষের মনেও যে একটা সংশয়ের ভাব একেবারেই জাগিয়া উঠে নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলি ! এই সেদিন (বিগত ৩১শে মে) দিল্লী আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানী টিব্বিয়া কলেজের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে দিল্লীর চিফ্ কমিশনার The Hon'ble Mr. Hailey তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

That he remembered, that two years ago, when he presided at a similar function, he had said, that Western Science was by no means definite. It was continually throwing off old ideas for new ones. No one could say, that Western Science was better than Eastern Science. For this reason the Eastern Science deserved encouragement. * * * . Since then he had found that Government had taken the same view and confirmed it by a grant.

(The Bengalee, June 2, 1916)

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-জগতের এই পরিবর্ত্তনটা না হয় দ্রুত পাদ-বিক্ষেপে ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই ধাবিত হইতেছে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও, সর্ব্বসাধারণের তাহাতে যে বিশেষ কোন লাভ হইতেছে, এরূপ ত মনে হয় না। বরং চিকিৎসাপ্রণালী যতই অভিনব হইতেছে, চিকিৎসার মূল্যও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার উপর আবার নানাবিধ ডিপার্টমেণ্ট ও বিশেষজ্ঞের (Specialist) সৃষ্টি করিয়া চিকিৎসা-ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তোলা হইতেছে। ধরুন, কাহারও রক্তামাশয় রোগের চিকিৎসা করান আবশ্যক। প্রথমতঃ একজন উপযুক্ত ডাক্তারকে দিয়া দেখাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উপদেশ-অনুসারে একজন ভাল জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌কে (Bactriologist) দিয়া রোগীর মল পরীক্ষা করাইতে হইবে। (ইহার মজুরীও নিতান্ত কম নয়!) তাহার পর ইন্‌জেক্‌সনের পালা। কতবার ইন্‌জেক্‌সনের পর যে রোগের বীজাণু অদৃশ্য হইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই ; কিন্তু প্রতিবারেই ডাক্তারের ফি ও ঔষধের মূল্য (বড় কম নয়!) যথারীতি প্রদান করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। ইহার উপর আবার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানের এত ঘটা যে, এক রোগীর পরিচর্য্যায় পরিবারশুদ্ধ লোককে চব্বিশঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। রক্তামাশয় রোগের চিকিৎসায় এত ঘটা ও এত অর্থব্যয় জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব কি? এরূপ চিকিৎসা কেবল ধনবান ব্যক্তিদিগেরই শোভা পায়। সুতরাং চিকিৎসা-প্রণালীর উন্নতি যদি এই অনুপাতে দিন-দিন বাড়িয়া চলে, তবে তাহাতে দেশের বা দশের লাভের আশা কতখানি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অথচ এই রক্তামাশয় রোগ বহু সহস্র বৎসর হইতেই মানবসমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ইন্‌জেক্‌সন ব্যতীতও অনেকেই কেবল ঔষধ সেবন করিয়াই আরোগ্যলাভ করিয়া আসিতেছেন !

আধুনিক জীবাণুতত্ত্ব কতকগুলি ব্যাধিকে এতই ভয়াবহ ও সংক্রামক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে যে, তাহাতে এত সহস্র বৎসরেও মানবকুল পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই কেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ! কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা—মানবকুল ধ্বংস করিবার জন্য ভগবানের এতগুলি ফৌজ পাঠাইবার ত কোনই আবশ্যকতা বুঝিতে পারি না। ইহার যে কোন একটি রাক্ষস রহিয়া-সহিয়া একসহস্র বৎসরেই মানব-সমাজকে ধরাতল হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিত ! এই জীবাণুতত্ত্বটা চিকিৎসা-প্রণালীর সহায়তা করিতে পারিলেও, মানবসমাজের পক্ষে অনুকূল মোটেই নয়। কারণ, জীবাণুজনিত ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিকে আহারে বিহারে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে ; আর এই ব্যাধির হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হইলে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরিবারস্থ ও নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে, এমন কি পশুপক্ষী মশামাছি ইত্যাদিকেও সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যেহেতু, তাহারা স্বয়ং রোগাক্রান্ত না হইলেও রোগের বীজ অথবা জীবাণুবাহক (Germ-Carrier) হইতে পারে ত? রোগের নিদান সম্বন্ধে এইরূপ থিয়রি (Theory) লইয়া মানবসমাজে বাস করা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই ত মনে হয়। থিয়রিটা যে ভ্রমাত্মক, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই ; কিন্তু সময়-সময় মনে একটা খট্‌কা লাগে যে, কলিকাতায় যখন কলেরা বা বসন্তের পূর্ণ প্রকোপ দেখা যায়, তখন সহর ও সহরতলীর মেথর ও রজককুল বাঁচিয়া থাকে কি করিয়া? আর এই শতাধিক বৎসরেও তাহাদের বংশ কলিকাতা হইতে লোপ পাইতেছে না কেন? দশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ণার্ড শ (Bernard Shaw)

তাঁহার 'Doctor's Dilemma' নামক নাটকের ভূমিকায়ও এই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন।

"It was plain from the first that if this (microbe-theory) had been approximately true, the whole human race would have been wiped out by the plague long ago, and that every epidemic instead of fading out as mysteriously as it rushed in, would spread over the whole world. It was also evident that the characteristic microbe of a disease might be a symptom instead of a cause

* * * *

when there was no bacillus, it was assumed that, since no (such ?) disease could exist without a bacillus, it was simply eluding observation. When the bacillus was found, as it frequently was, in persons who were not suffering from the disease, the theory was saved by simply calling the bacillus an impostor, or pseudo-bacillus."

বড়-বড় ডাক্তারের এই সব বড়-বড় মত অভ্রান্ত সত্য হইতে পারে, এবং তাঁহাদের চিকিৎসায় ও ব্যবস্থানুসারে দেশের ধনীসন্তানগণই বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন; কারণ,"His (A doctor's) promotion means that his practice becomes more and more confined to idle rich," কিন্তু দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, যাহারা এত বড়-বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার সুযোগ আদৌ পায় না, তাহারা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কি করিয়া জীবনধারণ ও বংশরক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! অথচ, দেশীয় বৈদ্য, হাতুড়ে চিকিৎসক ও অধুনা পল্লীগ্রামের নেটিভ্ ডাক্তার ব্যতীত তাহাদের জীবনরক্ষা করিবার কিন্তু আর কেহই নাই! অবস্থার অতিরিক্ত পয়সা খরচ করিয়া যাহারা বড়-বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু দেশের জনসাধারণকে এইসব 'কোয়াক্'দের মুখ চাহিয়াই জীবনধারণ করিতে হইবে। "The distinction between a quack doctor and a qualified one is, mainly, that only the qualified one is authorised to sign death-certificates, for which both sorts seem to have about equal occasion." বার্ণার্ড শ'র উপরিউক্ত কথাগুলি তীব্র শ্লেষপূর্ণ হইলেও নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

ফলে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র theory ও practiceএ বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে যতটা অগ্রসর হইতেছে, দেশের জনসাধারণ তাহাতে ততটা লাভবান্ হইতে পারিতেছে না, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং চিকিৎসা-জগতের একটা অভিনব মতের বা পথের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকদিগের আনন্দধ্বনি ও করতালিতে যোগদান করিলে আমাদের বিশেষ লাভের আশা দেখিতে পাই না। পরন্তু আমরাই প্রকারান্তরে চিকিৎসক-মণ্ডলীকে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কারের নেশায় মাতোয়ারা করিয়া তুলি এবং তাহার ফলেই "Medical theories are so much a matter of fashion, and the most fertile of them are modified so rapidly by medical practice and biological research". এ বিষয়ে শুধু ডাক্তারদিগের প্রতি দোষারোপ করিলে ত চলিবে না, দেশের লোকও যে পুরাতনকে পায়ে ঠেলিয়া নূতনত্বের চাকচিক্যেই আকৃষ্ট হইতে চায়! বার্ণার্ড শ তাঁহার উল্লিখিত ভূমিকার একস্থলে ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"Suppose, for example, a royal personage gets something wrong with his throat, or has a pain in his inside. If a doctor effects some trumpery cure with a wet-compress or a peppermint lozenge, nobody takes the least notice of him. But if he operates on the throat and kills the patient, or extirpates an internal organ and keeps the whole nation palpitating for days whilst the patient hovers in pain and fever between life and death, his fortune is made."

সহরের বড় একজন সার্জ্জন যে ক্ষতটাকে দুইমাসের চেষ্টাতেও সারাইতে পারেন নাই, একজন নগণ্য 'হাতুড়ে' হয় ত সামান্য লতা-পাতা বা মলম ইত্যাদির সাহায্যে তিন চারি সপ্তাহে তাহা করিয়া দিল। এই রকমের দুই-একটা ঘটনা জীবনে কেহ যে না দেখিয়াছেন বা না শুনিয়াছেন, এরূপ লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। এইরূপ অবিমৃষ্যকারী হাতুড়েদিগকে লোকসমাজে নাককাটা (disqualified) করিবার জন্য সমধিক সচেষ্ট না হইয়া, যদি চিকিৎসকগণ হাতুড়ে বৈদ্যের সেই লতাপাতাগুলির প্রকৃত কার্য্যকারিতা বা উপকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানপরায়ণ হইতেন, তবে জগতের জনসাধারণের পক্ষে সেটা অধিকতর মঙ্গলজনক হইত না কি? আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নিত্য নূতন মত বা পথ উদ্ভাবনের নেশাটা এবং একই রোগের চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের সৃষ্টি করিয়া চিকিৎসা ব্যাপারটাকে অধিকতর আড়ম্বর-পূর্ণ ও জটিল করিবার বাসনাটাকে আপাততঃ সংযত করিয়া যাহাতে অল্পায়াসে রোগ নিবারিত হয়, এরূপ কোন পন্থা বা ঔষধ আবিষ্কারে যদি চিকিৎসক-সম্প্রদায় মনোনিবেশ করিতেন এবং উদারনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক যদি utility ও economyর দিক দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকে উন্নত করিতে যত্নবান্ হইতেন, তবে দেশের জনসাধারণ সমধিক উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই।

দুই ভগিনী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

প্রথম খণ্ড।

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ.]

কাব্যে নাটকে নায়িকার সমদুঃখসুখ সখীজনের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবজীবনেও, কুমারী কন্যা বা বিবাহিতা নারী, সই, মিতিন প্রভৃতির নিকট মনের কথা, সংসারের সুখের দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করেন, তাঁহাদিগের নিকট সান্ত্বনা ও সমবেদনা লাভ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান, ইহা বিরল নহে। কিন্তু ঘরের কথা পরের কাণে তোলা সকল সময়ে ঠিক সুবিবেচনার কার্য্য নহে। সুতরাং পাতান সইএর পরিবর্ত্তে যদি বালিকা বা যুবতীর আত্মীয়াদিগের মধ্যে সমবেদনাময়ী বিশ্বাসপাত্রী পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল দিকেই ভাল হয়। তাহা স্বাভাবিকও হয়, পরন্তু তাহাতে কাব্যের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়। গৃহস্থঘরে সমবয়স্কা যা, ভাজ, ননদ ও ভগিনীর নিকট সুখের দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলা অসঙ্গত নহে। আবার সপত্নীর সখীত্ব বিরল হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। তবে সপত্নীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তজ্জনিত ঈর্ষ্যার অবসরই অধিক। একান্নবর্ত্তি-পরিবারে অনেক সময় যা, ভাজ ও ননদের সহিত স্বার্থের সঙ্ঘাত ঘটিতে পারে; পরন্তু তাঁহাদিগের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জাসঙ্কোচও হইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত সখীত্ব-ঘটনের পথেও বাধা আছে। কিন্তু সহোদরা বা নিকটসম্পর্কীয়া ভগিনীর সহিত সখীত্ব সহজ, স্বাভাবিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গালীজাতির ইতিহাসে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' প্রবাদবাক্য কতদিনের পুরাতন তাহা জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে, হিন্দুর অমূল্য ধর্ম্মসাহিত্য রামায়ণ-মহাভারতে রাম-লক্ষ্মণাদির, যুধিষ্ঠিরাদির, দুর্য্যোধনাদির, (এমন কি, 'পঞ্চোত্তরশত' কৌরব-পাণ্ডবের) সৌভ্রাত্রের অতি সুন্দর, অতি মহৎ দৃষ্টান্তাবলি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভগিনীতে ভগিনীতে সদ্ভাব ও একাত্মতার কোন বিবরণ, যতদূর মনে পড়ে, সংস্কৃত বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। (১) অযোধ্যার রাজপুরীতে সীতা-উর্ম্মিলা-মাণ্ডবী-শ্রুতকীর্ত্তির সদ্ভাব-সম্প্রীতি সম্বন্ধে আদিকবি বাল্মীকি নীরব। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে একথাও বলা যায় যে, 'সৌভ্রাত্রে'র ন্যায় 'সৌভাগিন্য' পদ সংস্কৃতভাষায় কখনও রচিত হয় নাই।

ইহা হইতে অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসা হিন্দুগৃহে অভাবনীয় ঘটনা। আসল কথা, আমাদের সমাজে সাধারণতঃ বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে ভাই ভাইএর ন্যায় ভগিনীতে ভগিনীতে শৈশবে ভিন্ন অন্যবয়সে বহুদিন একত্রবাসের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, তজ্জন্যই ভগিনীতে ভগিনীতে সৌহার্দ্দ-সাহচর্য্যের চিত্র সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অঙ্কিত হয় নাই এবং 'সৌভ্রাত্রে'র ন্যায় 'সৌভাগিন্য' পদ রচিত হয় নাই। কুলীনের ঘরে বয়ঃস্থা কুমারী বা নাম-মাত্র বিবাহিতা ভগিনীদিগের চিরজীবন একত্রবাস ঘটিত এবং এখনও হয়ত কোন কোন স্থলে ঘটে। ধনিগৃহে ঘরজামাই রাখিলেও ভগিনীগণের এরূপ একত্রবাস ঘটে। কিন্তু এগুলি আমাদের সমাজে সাধারণ বিধি নহে—বিশেষ বিধি, exception rather than the rule; এই জন্যই 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক

---

(১) 'রত্নাবলী'র শেষ অঙ্কে ('অবন্তিদৃপাত্মজা') বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তা, স্বামীর প্রণয়পাত্রী সাগরিকা অর্থাৎ রত্নাবলীকে (সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর কন্যা) ভগিনী (সহোদরা নহে) বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রণয়ের প্রতিযোগিনী হইলেও তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাত্যাগ করিয়া 'প্রিয়বহিনী' বলিয়া স্নেহ ও বহুমান প্রদর্শন করিয়াছেন—এই একটিমাত্র স্থলে ভগিনী-স্নেহের সামান্য উল্লেখ আছে।

১৩২০), বাঙ্গালী নারীর পক্ষে নিজের ভগিনী অপেক্ষা স্বামীর ভগিনীর সহিত একত্রবাসের সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং বোনে বোনে সখ্য-সদ্ভাব অপেক্ষা ননদ-ভাজে সখ্য-সদ্ভাবের সুযোগ অধিক, এবং সমাজের কল্যাণকল্পে, গার্হস্থ্য-জীবনের সুসঙ্গতির পক্ষে, ননদ-ভাজের সখ্য-সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তাও অধিক।

পক্ষান্তরে, বিলাতী সমাজে নারীগণ নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহিত হইয়া পতিগৃহে যান না, তাঁহারা যৌবনেও অনূঢ়া থাকেন, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে চিরজীবন কুমারীব্রত পালন করেন, সুতরাং সে সমাজে দুই ভগিনীর অধিক বয়সেও অবিচ্ছিন্ন একত্রবাস বিরল নহে এবং দুই ভগিনীর সখ্য-সদ্ভাবের দৃষ্টান্তও কি সমাজে কি সাহিত্যে বিরল নহে। আবার ননদ-ভাজের একত্রবাস উক্ত সমাজে অত্যন্ত বিরল, সুতরাং উভয়ের সখ্য-সদ্ভাবের দৃষ্টান্তও কি সমাজে কি সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে শেষোক্ত কথার আলোচনা করিয়াছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের অনুরূপ (এবং বাস্তবজীবনেরও অনুরূপ) সখীর ব্যবস্থা বহুস্থলে আছে। আবার বাস্তবজীবনের নজীরে আত্মীয়াদিগের সহিত সখীত্বন্ধনের ব্যবস্থাও বহুস্থলে আছে। ইহার সাধারণ সূত্র এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, নায়িকা অনূঢ়া হইলে সখীর ব্যবস্থা, বিবাহিতা হইলে ননদ, ভাজ, সতীন (২) প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সহিত সখীত্বের ব্যবস্থা। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও আছে এবং তাহার সঙ্গত কারণও আছে। যথা, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' ও 'মৃণালিনী'তে নায়িকা বিবাহিতা হইলেও গ্রন্থশেষে স্বামীর সহিত মিলিতা, স্বামিগৃহে গৃহীতা ; সুতরাং তাঁহাদিগের যা, ননদ, ভাজ প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সহিত সখীত্বের সুযোগ ঘটে নাই, অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি আখ্যায়িকায় ('কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠে') ননদ-ভাজ সম্পর্কের সুন্দর চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২১) দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুইখানি আখ্যায়িকায় ('দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে') সোণার সতীনের সুন্দর চিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে অনুসন্ধান করিব, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কি না।

এইখানে একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিবার প্রয়োজন আছে। সহোদরায় সহোদরায় গভীর স্নেহপ্রীতি বড় স্বাভাবিক, সুন্দর ও শোভন। কুলীনসম্প্রদায় মেলবন্ধনের আঁটাআঁটিতে বাধ্য হইয়া বোন-সতীনের সৃষ্টি করিয়া এই প্রকৃতিমধুর স্নেহসম্পর্ককে তিক্ত (৩) করিয়া তুলিতেন, ইহা বড়ই নিন্দনীয় ও শোচনীয়। কিন্তু যে সকল আখ্যায়িকাকার দুই ভগিনীকে এক নায়কে অনুরাগিণী করিয়া এমন মধুর স্নেহসম্পর্ককে ঈর্ষ্যাবিষময় করিয়া ফেলেন, বিশেষতঃ বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ভগিনীপতির প্রতি প্রণয়শালিনীরূপে চিত্রিত করিয়া দাম্পত্যজীবনের সুখস্বর্গে কামের নরক সৃষ্টি করিয়া বসেন, তাঁহাদিগের কার্য্য তদপেক্ষাও গর্হিত নহে কি? ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কিরণ হিরণ দুই বোন, দুই শরীরে এক মন' হইলেও দুই সহোদরা এক নায়কের প্রতি প্রেমে প্রতিযোগিনী হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইলেন। পরে যদিও কিরণময়ী অনুজার প্রতি স্নেহের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জন দিলেন ও ছদ্মবেশে বিপৎসঙ্কুল স্থান হইতে অনুজার উদ্ধারসাধন করিলেন, তথাপি তিনি নায়কের সহিত পরজন্মে পরিণীতা হইবেন, এই আশায় অনূঢ়া থাকিলেন, ইহাতেই তাঁহার ভগিনীপতির প্রতি অনুরাগ কতদূর বদ্ধমূল তাহা বুঝা যায়। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত 'দুই ভগ্নী'তে বিধবা যুবতী শ্যালিকাকে ভগিনীপতির প্রতি প্রসক্তা করিয়া স্বামিসোহাগিনী পত্নীর 'হাড়ে হাড়ে আগুন জ্বালাইয়া' শান্তিময় সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন। বালবিধবা অষ্টাদশী যুবতী জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলিনী সধবা

(২) 'শাশুড়ীবধূ' প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২০) বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র যায়ের চিত্র কোথাও অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে নায়কগণ প্রায়ই এক মায়ের এক ছেলে। দুই এক স্থলে একান্নবর্ত্তি-পরিবারে সহোদর (রজনীতে) বা খুড়তুত জ্যেঠতুত (কৃষ্ণকান্তের উইলে) ভ্রাতা থাকিলেও যায়ের প্রসঙ্গ নাই।

(৩) মেয়েলি ছড়ার বলে :—

নিম তিত নিসিন্দে তিত তিত মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিত বোন-সতীনের ঘর॥

কনিষ্ঠা ভগিনী বিনোদিনী সম্বন্ধে মুখে বলিতেছেন, 'আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি', অথচ ভগিনীপতির প্রতি অবৈধ প্রণয়ে অন্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, 'বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক, আমার বাসনার অন্তরায়, সে আমার পরম শত্রু'। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় ও (মাধী ঝি মন্থরার প্ররোচনায়) ষড়যন্ত্র করিয়া ভগিনীর সর্ব্বনাশ-সাধন করিলেন। ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার সধবা 'ইন্দু'কেও সহোদরা ভগিনীর স্বামীর প্রতি অনুরাগবতী করিয়াছেন। সম্প্রতি মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পে জনৈক জাঁদরেল লেখক যুবতী বিধবা শ্যালিকাকে ভগিনীপতির আলিঙ্গনবদ্ধা ও চুম্বনলাঞ্ছিতা করিয়াছেন এবং 'বৈষ্ণবীভাবে' বিভোর হইয়া গুরুদেবের মুখ দিয়া অভয় দিয়াছেন যে চুম্বন-আলিঙ্গনে বিধবার কম্পপুলকাদি 'সাত্ত্বিকী বিকারে'র সঞ্চার হইলেও তিনি অপাপবিদ্ধা! ইহার পরেও শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে। গল্পটি আজও শেষ হয় নাই, জানি না আরও কতদূর গড়াইবে। (এস্থলে ভগিনীরা সহোদরা নহেন।) ছোটগল্পের মধ্যেও এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে; তাহার প্রমাণ দুইজন নামজাদা সম্পাদকের লিখিত দুইটি ছোটগল্পে পাওয়া যায়। (একটীতে ভগিনীরা সহোদরা, অপরটিতে সহোদরা নহেন।) উভয়ত্রই শ্যালিকা বিধবা, তবে একটীতে বিধবা শ্যালিকা ও বিপত্নীক ভগিনীপতি পরিণত বয়সে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। যাহা হউক, এই শেষের উদাহরণটীতে উভয়েই 'সংযমে'র পরিচয় দিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে অবশ্য ভগিনীতে ভগিনীতে ঈর্ষ্যার অবসর নাই। আবার দুইজন খ্যাতনামা লেখক দুইখানি আখ্যায়িকায় শ্যালিকা-ভগিনীপতির ব্যভিচারের ব্যাপার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য বাঙ্গালীর ঘরে, বাস্তবজীবনে, এরূপ শ্যালিকাপ্রেম ঘটা অসম্ভব নহে; ইহার জন্য বিলাতী আখ্যায়িকা-কার চার্লস্ ডিকন্‌সের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিয়া নজির খাড়া করিবার প্রয়োজন নাই; সুতরাং উল্লিখিত লেখকসম্প্রদায় বাস্তব (realistic) চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এই অজুহত দিতে পারেন। তথাপি বাস্তবতার (realism) দোহাই দিয়া এরূপ কদর্য্য ব্যাপার বিবৃত করা যে সমাজ ও সাহিত্যের অকল্যাণকর, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। তবে, ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পের লেখক ভিন্ন অন্য কয়েকজন লেখক এবংবিধ জুগুপ্সিত ব্যাপারের বর্ণনা যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিয়াছেন এবং প্রায় সকলেই এই পাপাচরণের বিষম পরিণাম প্রকটিত করিয়া, 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—শ্রীবিষ্ণুঃ—সীতাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন শূর্পণখাদিবৎ—সৎকাব্যে অনুসরণীয় এই সুনীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, একথা অকপটে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইঁহারা অনেকেই, স্বামিসুখবঞ্চিতা হইয়াও সধবা ভগিনী বিধবা ভগিনীকে স্নেহ করিয়াছেন, তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এবং লালসার শান্তি হইলে বিধবা ভগিনী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছেন, এই ভাল দিক্‌টাও দেখাইয়াছেন। আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র কুত্রাপি এই অস্বাস্থ্যকর (unhealthy) কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন নাই, এই স্নেহ-সম্পর্কের এরূপ উৎকট পরিণাম প্রকটিত করেন নাই, প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর বিমল প্রীতিস্নেহকে এরূপ কামগন্ধদুষ্ট ও ঈর্ষ্যাকলুষিত করেন নাই। (৪)

এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় কোথায় দুই ভগিনীর অবতারণা করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে

(৪) বিলাতী কবি টেনিসনের 'The Sisters' নামে দুইটি কবিতা আছে। একটা তাঁহার প্রথম বয়সের, অপরটি শেষবয়সের রচনা। প্রথমটিতে ভগিনীহত্যার জন্য অপরা ভগিনী ভগিনীঘাতককে বধ করিয়া, প্রতিশোধ লইয়াছে। এই নৃশংস রক্তপাত নারীজনোচিত ও ধর্ম্মানুগত না হইলেও ভগিনীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। [illegible] প্রণয়ী দুই যমজ ভগিনীকে চকিতের মত এক লহমা দেখিয়া একটিকে ভালবাসিয়াছিল; কিছুদিন পরে আবার তাহাদিগের একটিকে দেখিয়া পূর্ব্বপ্রণয়পাত্রী-ভ্রমে তাঁহাকে প্রেমজ্ঞাপন করিল; আরও কিছুদিন পরে যথার্থ পূর্ব্বপ্রণয়পাত্রীর দর্শন পাইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রেমজ্ঞাপন করিল ও বিবাহ করিল। এই যুবতী কিন্তু, পূর্ব্বে যে তাঁহার প্রণয়ী ভগিনীর প্রণয়ী ছিল, তাহা জানিলেন না। অপরা ভগিনী ভগ্নহৃদয়া হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন বিবাহিতা ভগিনী [illegible] নিকট সকল কথা শুনিয়া পতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। এই কবিতায় উভয় ভগিনী এক নায়কে বদ্ধপ্রণয়া হইলেও ও এক নায়ক (ভ্রমক্রমে) উভয়কেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রেমজ্ঞাপন করিলেও ভগিনীদ্বয়ের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি (কিরণময়ী হিরণ্ময়ীর মত) ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয় নাই—ইহাই কবিতাটির আখ্যানবস্তুর বিশিষ্টতা। আমাদের দেশের কল্পনাপ্রবণ লেখকগণ এই বৃত্তান্ত অবলম্বনে একটি ছোটগল্প লিখিতে পারেন না কি? তাহাতে যথেষ্ট করুণরসের অবসর হয়, অথচ দুর্নীতি বা কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

তিলোত্তমার মাতা ও বিমলা সহোদরা না হইলেও ভগিনী—উভয়েই শশিশেখর ভট্টাচার্য্য ওরফে অভিরামস্বামীর ঔরসজাতা। (সে কুৎসিত কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিতে চাহি না। পুস্তকের ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ—'বিমলার পত্র'—দ্রষ্টব্য।) তিলোত্তমার মাতা বরাবর জীবিতা থাকিলে বিমলার বোন-সতীনের ঘর হইত। কিন্তু সুখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র বোনে বোনে পতি-প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কল্পনা না করিয়া বিমলার সহিত বীরেন্দ্রসিংহের প্রণয় ও পরিণয় ঘটিবার পূর্ব্বেই তিলোত্তমার মাতাকে জগৎ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। অতএব এক্ষেত্রে উভয় ভগিনীর একত্রাবস্থানের অবসর নাই।

'মৃণালিনী'তে, নায়িকার মাতার সহিত 'অরুন্ধতী মাসি'র অবশ্য বোন-সতীন সম্পর্ক ছিল না। পরন্তু তিনি মৃণালিনীর মাতার সহোদরা নহেন, দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী। গ্রন্থের কথাগুলি এই:—'অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালন-পালন করিয়াছিলেন।' [৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।] এক্ষেত্রেও গ্রন্থকার দুই ভগিনীর একত্রাবস্থানের উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থপাঠে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে মৃণালিনীর মাতা গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই পরলোকগতা এবং তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মাসিই মৃণালিনীকে মানুষ করিয়াছিলেন।

'রজনী'তে স্পষ্টই আছে, রজনীর মাতার মৃত্যু হওয়াতে তাহার মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। 'তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল...এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' অতএব এক্ষেত্রেও উভয় ভগিনীর একত্রাবস্থানের অবসর নাই। তিলোত্তমার মাতা, মৃণালিনীর মা ও মাসি, রজনীর মা ও মাসি ইহাঁরা সকলেই নিতান্ত অপ্রধানা পাত্রী। সুতরাং এসকল স্থলে দুই ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত করিতে গেলে গ্রন্থকারের সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হইত না। 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' দাসী অমলার কয়েকটি কন্যার উল্লেখমাত্র আছে (৫ম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

'কপালকুণ্ডলা'য় নায়ক নবকুমারের দুই ভগিনী ছিল। 'জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না, দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা। কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।' [২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] গ্রন্থকার যখন জোর-কলমে লিখিয়াছেন, জ্যেষ্ঠার সহিত আমাদের পরিচয় হইবে না, তখন এক্ষেত্রে দুই ভগিনীর একত্রাবস্থান হইলেও তাঁহাদিগের সদ্ভাব বা অসদ্ভাবের চিত্রে আমরা বঞ্চিত হইলাম; শ্যামাসুন্দরীর যে দুই একবার দেখা পাইব, তাহাতে ননদ-ভাজের সদ্ভাবের চিত্রেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আসল কথা, এই গ্রন্থে শ্যামার দুঃখে দুঃখিনী ভাজকে সান্ত্বনাদায়িনী ও সাহায্যকারিণী সখীর ভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াই গ্রন্থকার শ্যামার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, তাহার প্রতি বড়দিদির স্নেহ-সমবেদনার প্রয়োজন বুঝেন নাই।

'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরী ও রূপসী দুই ভগিনী। 'সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন।......সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকিত।' [২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] উভয় ভগিনীকে কেবল একবার একত্র দেখা যায়, তখন সুন্দরী শৈবলিনীর উদ্ধারার্থ ভগিনীপতিকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভগিনীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। যদিও সুন্দরী "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি" এই অজুহত দেখাইলেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগিনীপতির সহিত সাক্ষাৎকার। 'রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সাদরে গৃহে লইয়া গেল।' প্রতাপকে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধানে পাঠাইয়া 'সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল।......রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।" [২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] অবশ্য, দিদিকে 'তুই' বা 'কুঁদুলী' বলায় রূপসীর দিদির প্রতি বিরাগ প্রকাশিত হইতেছে না, দিদিকে 'সাদরে' গ্রহণ করায় বরং ভালবাসাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে দুই ভগিনীর এই চিত্রে আমাদের তৃপ্তি হয় না। এ ক্ষেত্রেও আসল কথা, গ্রন্থকার শৈবলিনীর সহিত সুন্দরীর সখীত্ব-সম্পর্ক পরিস্ফুট করিতেই, ননদ-ভাজের সদ্ভাব-সম্প্রীতি চিত্রিত করিতেই ব্যগ্র, দুই ভগিনীর স্নেহ-সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য প্রয়াসী নহেন।

'দেবীচৌধুরাণী'তে নিতান্ত অপ্রধানা পাত্রী ফুলমণি-

কমলমণি দুই ভগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার ভগিনীযুগলকে আমাদের সম্মুখীন করিয়াছেন। [১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ।] সেখানে, গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রফুল্লের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে একটি আজগবী বিবরণের সৃষ্টি করা। এইজন্য, 'সীতারামে' 'ডাকিনী' শ্রীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের কথোপকথনের ন্যায়, উভয় ভগিনীর কথোপকথন এই গ্রন্থে বর্ণিত। ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসা চিত্রিত করা এখানে গ্রন্থকারের আদৌ অভিপ্রেত নহে। এই নিতান্ত নগণ্য চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত পরিচ্ছেদের শেষার্দ্ধ পাঠ করিতে পারেন। ইতর লোকের বাস্তব (realistic) চিত্র হিসাবে ইহা উপভোগ্য এবং অজ্ঞলোকের হৃদয়ে অদ্ভুত (marvellous) ব্যাপারের কিরূপে উদ্ভব হয় তাহার দার্শনিক দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা শিক্ষাপ্রদ। (তবে এক্ষেত্রে ফুলমণি নিজেকে বাঁচাইবার জন্য 'রচাকথা'র, মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং ঠিক bona fide দার্শনিক দৃষ্টান্তও বলা যায় না।)

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে অপ্রধানা পাত্রীদিগের বেলায় কোথাও কোথাও ভগিনীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সব স্থলে ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিত্র হয় আদৌ অঙ্কিত হয় নাই, অথবা নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হওয়াতে তাহা মোটেই সুন্দর ও তৃপ্তিকর নহে।

নায়িকা ও প্রতিনায়িকাদিগের বেলায় দেখা যায়, প্রায় সকলেই এক মায়ের এক মেয়ে, অন্ততঃ তাঁহাদিগের ভগিনী থাকার কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত নহে। (৫) তিলোত্তমা, আয়েষা, মৃণালিনী, মনোরমা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শৈবলিনী, দলনী, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, রজনী, ললিত-লবঙ্গলতা, হিরণ্ময়ী, রাধারাণী,—আর কত নাম করিব?—সকলেরই এই দশা।

যাহা হউক, একটু ধীরচিত্তে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কেবল দুইখানি আখ্যায়িকায় নায়িকার ভগিনীর প্রসঙ্গ আছে, শুধু প্রসঙ্গ কেন, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার সুন্দর চিত্র আছে। 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরার কামিনী-নাম্নী ভগিনী আছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের যামিনী-নাম্নী ভগিনী আছে। গ্রন্থ দুইখানি হইতে ইহারা সধবা কি বিধবা কি কুমারী তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা যামিনী বিধবা এবং ইন্দিরার কনিষ্ঠা কামিনী সধবা কিন্তু পিত্রালয়বাসিনী। কামিনী সম্বন্ধে ইন্দিরা বলিয়াছেন:—'আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।' [২০শ পরিচ্ছেদ।] ইন্দিরা যখন উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিল, তখন গ্রন্থারম্ভ (১ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে কামিনী তখন সতের বৎসরে পড়িয়াছে, অতএব অবশ্যই বিবাহিতা। ধনগর্ব্বিত পিতা যে কারণে ইন্দিরাকে এতদিন শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই, সম্ভবতঃ সেই কারণেই কামিনীকেও এতদিন শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই।

স্থলতঃ উভয়ত্রই গ্রন্থের শেষার্দ্ধে নায়িকার ভগিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইন্দিরার শ্বশুরবাড়ীযাত্রা-কালে (অর্থাৎ ১ম পরিচ্ছেদে) কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। তাহার পর, মহাস্ফূর্ত্তিতে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়া ইন্দিরা যখন পিতৃগৃহ ও পতিগৃহ হইতে চ্যুতা, প্রবাসিনী, পরান্নজীবিনী পরাবসথশায়িনী, স্বামীর সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই দুর্দ্দিনে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী সতত-শুভানুধ্যায়িনী সখী সুভাষিণী তাঁহার সান্ত্বনাদায়িনী ও পরমসহায়। যখন তাঁহার সুদিন আসিল, তখন কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনী তাঁহার সুখে সহচারিণী ও সহকারিণী। পক্ষান্তরে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের সুখের দিনে, স্বামিসৌভাগ্যের দিনে, সখীর প্রয়োজন নাই—গোবিন্দলালের প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপূর যে, তিনি সখীর অভাব অনুভব করেন না, ননদের সহিত মাথামাথিরও প্রয়োজন বুঝেন না! কিন্তু তাঁহার ঘোর দুঃখের দিনে—সুভাষিণীর মত সখীর ও কমলমণির মত ননদের অভাব জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী দ্বারা পূর্ণ হইল। (এই বৈচিত্র্যসংসাধনের জন্যই গ্রন্থকার ভ্রমরের ননদ শৈলবতীর চিত্র 'বিষবৃক্ষে' কমলমণির চিত্রের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেন নাই।) 'ইন্দিরা'র দুঃখে আরম্ভ, সুখে অবসান—'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সুখে আরম্ভ, দুঃখে

(৫) শেক্স্পীয়ারের নাটকেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা। সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও বড় ব্যতিক্রম দেখি না। মিরান্ডা, ডেস্‌ডেমোনা, জুলিয়েট, পোর্শিয়া, ওফেলিয়া, জেসিকা, শকুন্তলা, মালতী, কাদম্বরী, প্রভৃতি কাহারও ভগিনী নাই।

অবসান। 'ইন্দিরা'য় দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র সুখের চিত্র, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র দুঃখের চিত্র। 'ইন্দিরা'য় সুখের সময়ে নর্ম্মসখী কনিষ্ঠা ভগিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুঃখের দিনে সান্ত্বনাদায়িনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এই বৈচিত্র্যও কবির কলাকৌশলের পরিচায়ক।

এই অনুসন্ধানে দেখা গেল যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল দুইখানি আখ্যায়িকায় নায়িকার ভগিনীর অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের সমাজে যখন বাস্তবজীবনে ননদভাজে একত্রবাসের তুলনায় বোনে বোনে একত্রবাসের সম্ভাবনা অল্প, তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্ব-প্রণীত আখ্যায়িকাবলিতে ননদভাজের ভালবাসার চারিটি চিত্র ও ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার দুইটি মাত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিমাণজ্ঞানেরই (Sense of proportion) পরিচয় দিয়াছেন।

এক্ষণে এই দুইটি চিত্রের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

(৵০) 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরা ও কামিনী—সুখের চিত্র।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইন্দিরার বিবাহিতা অবস্থায় পিত্রালয়-বাসকালে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। ইন্দিরা যখন ধনগর্ব্বিত পিতার বিবেচনার দোষে পূর্ণযৌবনেও পিতৃগৃহবাসিনী, স্বামিসন্দর্শনের জন্য লালায়িতা, তখন তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলে স্বাভাবিক ও শোভন হইত। কিন্তু ইন্দিরা নিজ মুখেই কবুল করিয়াছে, 'আমি অত্যন্ত মুখরা।' [১৪শ পরিচ্ছেদ।] ইন্দিরায় চরিত্রের এই বিশিষ্টতাটুকু প্রথম হইতেই ফুটাইবার জন্য গ্রন্থকার তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর কাছে হৃদয়বেদনা প্রকাশ না করাইয়া সরাসরি স্নেহময়ী মাতার কাছে বলাইয়াছেন :—"মা, টাকা পাতিয়া শুইব।" [১ম পরিচ্ছেদ।] এখানে ভগিনীর সখীত্বের বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া গ্রন্থকার নায়িকার ভগিনী যে নায়িকার প্রায় সমবয়স্কা ও যুবতী একথা প্রকাশ করিলেন না।

তাহার পর, এই প্রথম পরিচ্ছেদেরই শেষভাগে শ্বশুর-বাড়ী-যাত্রাকালে যখন ইন্দিরার 'প্রাণটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল,' তখন সেই সুখের দিনে কামিনীর সামান্য একটু প্রসঙ্গ আছে। 'আমার ছোট বহিন, কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল; বলিল, "দিদি! আবার আসিবে কবে?" আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম। কামিনী বলিল, "দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন, তাহা কিছু জানিস্ না?" আমি বলিলাম, "জানি সে নন্দনবন" ইত্যাদি। কামিনী হাসিয়া বলিল, "মরণ আর কি?"' এই কথাবার্ত্তার ভাবে দুই ভগিনীর ভালবাসার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দিরা কর্ত্তৃক কামিনীর গাল টিপিয়া ধরা অত্যাচারের চিহ্ন নহে, আদরের লক্ষণ—সুভাষিণী কর্ত্তৃক ইন্দিরাকে সোফা হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়ার মত (১৩শ পরিচ্ছেদ) স্নেহের নিদর্শন। আবার কামিনীর মুখ-নিঃসৃত 'মরণ আর কি?' গালি নহে, সুভাষিণীও সময়বিশেষে 'মরণ আর কি!' 'আ ম'লো!' ইত্যাদি গালি দিয়াছে। ইহা সোণার মার 'হারামজাদী' গালির মত আন্তরিক বিরাগের সাক্ষ্য নহে, ইহা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমার বিমলার প্রতি প্রযুক্ত "তুমি নিপাত যাও" অভিসম্পাতের মত, ভালবাসার পরিচায়ক। 'কামিনী বড় রঙ্গ ভালবাসে' (২০শ পরিচ্ছেদ) —তাহা এই সামান্য কথাবার্ত্তা হইতে, তাহার ক্ষুদ্র প্রশ্ন দুইটি হইতে বুঝা গেল। ইহা সূচনা-মাত্র। পরে গ্রন্থের শেষভাগে তাহার রঙ্গপ্রিয়তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ফূর্ত্তির প্রাণে ভরাযৌবনে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিয়া ইন্দিরা যখন ঘোর বিপদে পতিতা হইয়া অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে পিত্রালয় ও পতিগৃহ হইতে বহুদূরে অবস্থিতা, তখন তাঁহার সমদুঃখসুখা সখী সুভাষিণী। পিত্রালয় হইতে বহুদূরে অবস্থানকালে সহোদরা ভগিনীর সখীত্ব অবশ্য অসম্ভব। তাহার পর শুভানুধ্যায়িনী সখী সুভাষিণীর সহায়তায় তিনি 'পতি-উদ্ধার' করিলেন এবং পতিপ্রেমলাভে কৃতার্থা হইয়া পিত্রালয়ে পৌছিয়া পতির সহিত বন্দোবস্তমত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সুখের দিনে আবার আমরা নায়িকার কনিষ্ঠা ভগিনীর দর্শন পাই এবং দুই ভগিনীর প্রীতিসম্পর্ক ও একাত্মতার পূর্ণ পরিচয় পাই।

ইন্দিরা বলিতেছেন :—'সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম।...সে বলিল, "দিদি! যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাঁকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?" আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।" তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম।' [২০শ পরিচ্ছেদ।] বাপ-মায়ের কাছে ইন্দিরা নিজে সব কথা বলিলে

নির্লজ্জতার চূড়ান্ত হইত, তাই সে ভার কামিনীর উপর পড়িল। 'বাপ-মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই। সেটা এইখানে হইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব।' ইত্যাদি। বুঝা গেল, এখন প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর সহিতই নায়িকার সকল মন্ত্রণা, ভগিনীই তাঁহার পরম সহায়। ভগিনীও সাহ্লাদে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে তৎপর। এখন উভয়ে সমপ্রাণ হইয়া রঙ্গরসে প্রবৃত্ত হইবে, সেইজন্য গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন যে ভগিনী নায়িকার প্রায় সমবয়স্কা ও যুবতী।

যথাসময়ে উপেন্দ্র বাবু আসিলে পরামর্শমত কার্য্য হইল। কামিনী রহস্য গোপন করিয়া মিত্রজাকে বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে এক আজগবী গল্প বলিল এবং কোন্ স্থানে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল তাহাও দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল। "এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগে তুই যা। তা'রপর আলো নিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে লইয়া যাইব।" আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেণ্ডায় বসিয়া রহিলাম। সেইখানে আলো ধরিয়া কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল।...কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি! উঠে আয়। ও মিন্‌সে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।" তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?" কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোননি?" এই বলিয়া দুষ্টা কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল।...কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, "...এ কুমুদিনী না,—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে!!! তোমার পরিবার! আপনার পরিবার চিন্‌তে পার না?" দুই ভগিনীতে কেমন সোৎসাহে একযোগে কায করিতেছে, কামিনী দিদির সুখে কেমন গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা গেল।

পর-পরিচ্ছেদে মিত্রজার সহিত 'বাগ্‌যুদ্ধে' রঙ্গপ্রিয়া কামিনীর রঙ্গের অন্তরালে দিদির সুখে সুখবোধ স্পষ্ট প্রতীয়মান। মিত্রজার সহিত রঙ্গের মধ্যে মধ্যে "ও দিদি! মিত্রজার একটু বুদ্ধিও আছে দেখিতে পাই," "কামিনী তুই বড় বাড়ালি?" ইত্যাদি বাক্যে উভয় ভগিনীর হৃদ্যতার সুন্দর চিত্র ফুটিয়াছে। তাহার পর যখন মেয়ে-মজলিস বসিল, তখন উভয় ভগিনী রঙ্গপ্রিয়া ও মুখরা হইলেও এই সব 'নির্লজ্জ' ব্যাপারে যোগ দিলেন না, তবে মধ্যে মধ্যে উভয়েই 'একবার একবার উকি মারিলেন,' কখনও বা দুই বোনে কুঞ্জের দ্বারবান্ সাজিলেন এবং দুই একটা টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িলেন না। ইহা হইতেও দুই ভগিনীর একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিরণ-হিরণ দুইবোন, দুই শরীরে এক মন' বাক্যটি এই দুই ভগিনী সম্বন্ধে বলিলেই সুপ্রযুক্ত হয়। যাহা হউক, এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত রসিকতার নমুনা দিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। আশা করি, রুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচক পরিচ্ছেদটি লুকাইয়া পড়িয়া উপভোগ করিয়া প্রকাশ্যে গ্রন্থকারকে ঘোরতর কুরুচির জন্য গালি দিবেন। (৬)

এই ভগিনী-যুগলের, এই মাণিকজোড়ের কথা এই-খানেই শেষ করি। কেননা শেষ পরিচ্ছেদে দেখি, ইন্দিরা 'স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী' গেলেন। বিদায়-কালে কেমন করিয়া 'বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন, আঁচল ধরিয়ে' সে বেদনার দৃশ্য গ্রন্থকার এই সুখাবসান আখ্যায়িকায় দেখান নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থে অঙ্কিত দুই ভগিনীর চিত্র সুখের চিত্র। 'উপসংহারে' সখী সুভাষিণীর সহিত কয়েক বৎসর পরে পুনর্ম্মিলনের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দুই ভগিনীতে 'আবার কবে দেখা হবে' তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব। আমরাও আর কামিনীর রঙ্গ দেখিতে পাইব না বলিয়া ক্ষুণ্ণ। তাই গ্রন্থকারের উদ্ধৃত শেলীর বাক্য কামিনীর উদ্দেশে পুনরুদ্ধৃত করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়:—

Rarely, rarely, comest thou,
Spirit of Delight!

(৬) এই আখ্যায়িকার ও 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে এবং রবীন্দ্র-নাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' শ্যালী-ভগিনীপতিতে কৌতুকের বাড়াবাড়ি দেখিয়া যাঁহারা 'কুরুচি' বলিয়া আপত্তি করিবেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, ইহা খাঁটি স্বদেশী জিনিষ, ইহাতে 'কুরুচি' থাকিলেও 'দুর্নীতি' নাই। পক্ষান্তরে শ্যালী-ভগিনীপতিতে অবৈধ প্রণয়—যাহা কোন কোন আখ্যায়িকাকার বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা নিতান্ত কুৎসিত এবং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয়। বঙ্কিম-দীনবন্ধু-রবীন্দ্রনাথ এই তিনজন প্রতিভাশালী লেখকের কেহই ঐরূপ আখ্যান রচনা করিয়া নিজেদের লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই।

Wherefore hast thou left me now
Many a day and night ?
Many a weary night and day !
'Tis since thou art fled away.

(৵০) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর ও যামিনী।—দুঃখের চিত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভ্রমরের দুঃখের দিনেই কেবল জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর স্নেহ-সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সুখের দিনে, স্বামিসৌভাগ্যের দিনে, স্বামীই তাঁহার সর্ব্বস্ব, স্বামীর প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপূর যে সুখদুঃখভাগিনী সখী, ননদ, ভগিনী, কাহারও প্রয়োজন হয় নাই, তিনি কাহারও অভাব অনুভব করেন নাই। এইটুকু বুঝাইবার জন্য কবি ভ্রমরের সুখের দিনে সখী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন নাই। (যেমন ভবভূতি সীতার সুখের দিনে বাসন্তী সখীর ব্যবস্থা করেন নাই, কেননা তখন সমদুঃখসুখা সখীর প্রয়োজন নাই।)

তাহার পর, যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেশত্যাগ করিতে অসম্মত দেখিয়া রোহিণীর রূপ ভুলিবার জন্য জমীদারী-পরিদর্শনে গেলেন, তখন বিরহিণী ভ্রমর একাকিনী; এই প্রথমবিরহেও তাঁহার সমবেদনাময়ী সখী, ননদ বা ভগিনীর উল্লেখ নাই (বরং 'ননদের সঙ্গে কোন্দল' করার কথাই আছে) কেননা তখনও তাঁহার স্বামীর উপর ষোলআনা বিশ্বাস। [১ম খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।] তাহার পর, যখন রোহিণীঘটিত কলঙ্ক-কথা মিথ্যা হইলেও ক্ষীরি চাকরাণীর প্রসাদাৎ গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার সখী, ননদ বা ভগিনীর উল্লেখ নাই। ক্ষীরি চাকরাণী তাঁহার প্রতি সমবেদনাময়ী নহে; 'বিনোদিনী, সুরধুনী, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী প্রভৃতি অনেকে, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে দুঃখিনী বিরহ-কাতরা বালিকাকে জানাইল যে, 'ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে'; ইহারা ভ্রমরের দুঃখে দুঃখবোধ করে নাই, ঈর্ষ্যাপরিতৃপ্তিজনিত সুখবোধ করিয়াছে। তখনও ভ্রমর স্বামীর উপর বিশ্বাস হারান নাই, তিনি মনে মনে 'সন্দেহভঞ্জন' 'প্রাণাধিক' স্বামীকেই স্মরণ করিলেন; হৃদয়ভার লঘু করিবার জন্য, স্বামীর উপর সন্দেহের কথা কোন আত্মীয়ার কর্ণগোচর করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং এখনও পর্য্যন্ত কবি তাঁহার সখী, ননদ, বা ভগিনীর সমবেদনার ব্যবস্থা করিলেন না। [১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ।] তাহার পর যখন রোহিণীর ব্যবহারে স্বামীর উপর সন্দেহ দৃঢ়তর হইল, তখন তিনি স্বামীকে নির্ম্মম পত্র লিখিলেন এবং স্বামী গৃহে ফিরিবেন সংবাদ পাইয়া দগ্ধপ্রাণ মায়ের কোলে জুড়াইবার জন্য মাকে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু মা-ভগিনীর কাছে আসল কথা ভাঙ্গিলেন না। এ লজ্জার কথা, স্বামীর এ কলঙ্কের কথা, পতিপ্রাণা সতী কিরূপে তাঁহাদিগের কাছে প্রকাশ করিবেন? তজ্জন্য তাঁহার সুখের দিনের অবসান হইলেও তখনও সমবেদনাময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আবির্ভাব হয় নাই। [১ম খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ।] তাহার পর, যখন স্বামী ও শাশুড়ী তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, উভয়েই তাঁহার কাতর-ক্রন্দন উপেক্ষা করিলেন, গোবিন্দলাল সরলা মুগ্ধাকে 'তোমাকে ত্যাগ করিব' এই নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেন, শাশুড়ী 'তোমার বড় ননদ রহিল' শুধু এই আশ্বাসটুকু দিলেন, তখনও ননদ বা ভগিনীর সমবেদনার কথা নাই, ভ্রমর এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা পরিত্যক্তা হইয়া তাঁহার মৃতপুত্রের জন্য কাঁদিলেন। [১ম খণ্ড, ৩১শ পরিচ্ছেদ।] এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে প্রথম খণ্ডের শেষ। তাঁহার দুঃখের নিশার আরম্ভে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই।

এই দ্বিতীয়বার বিরহকালে ভ্রমর ননন্দার শরণ লইয়া শাশুড়ীর নিকট হইতে স্বামীর সংবাদ আনাইতেন, ক্রমে 'আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন।' [২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।] কখন পিত্রালয়ে কখন শ্বশুরালয়ে থাকেন, কোথাও স্বস্তি নাই। এই অবস্থায় তাঁহার ননদের সামান্য উল্লেখের পরে পিতার স্নেহের প্রথম উল্লেখ; পিতা মাধবীনাথ কিরূপে ভ্রমরের দুঃখ ঘুচাইবার, কণ্টক দূর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্টক-দূরীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াও (গোবিন্দলাল রোহিণীকে খুন করাতে) ভ্রমরের নূতন বিপদ্, নূতন দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট ঘটাইলেন, পরবর্ত্তী নয়টি পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ আছে। ভ্রমরের কণ্টক উদ্ধার করিতে যে ভাবে চেষ্টা করার প্রয়োজন, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের

কার্য্য, কোমলহৃদয়া নারীর কার্য্য নহে; সুতরাং এ ব্যাপারে স্নেহময় পিতার অবতারণা করিতে হইয়াছে, স্নেহময়ী ভগিনী দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হইত না। এই সব ঘটনার পরে ভ্রমরের দারুণ মনঃকষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময়ে, ঘোরান্ধকারা দুঃখ-যামিনীতে তাঁহার স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী শুশ্রূষাকারিণী সান্ত্বনাদায়িনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর প্রথম আবির্ভাব। ইহা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী। 'উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়া ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে'। 'মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল।' [২য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।] ভগিনীর দ্বারা এই নিদারুণ সংবাদ দেওয়া গ্রন্থকারের সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, মাতাপিতার অপেক্ষা ভগিনীর মুখ দিয়া এরূপ সংবাদ শোনা মন্দের ভাল। কেননা তাঁহার সহিত এ বিষয়ে অসঙ্কোচে আলোচনা করা যায়। তাহাতে হৃদয় কতকটা শান্ত হয়। বস্তুতঃ ইহার পরেই দুই ভগিনীর ঐরূপ আলোচনা বিবৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে দুই ভগিনীর সখীত্বের প্রথম দৃশ্য প্রদর্শিত। প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে সমগ্র কথোপকথন উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু দিলাম।

'যামিনী। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব —তথাপি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগায়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যামিনী। কি বিপদ ভ্রমর?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন?"

যামিনী। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্রমর। আহ্লাদ দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে!

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানসচক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।'

[২য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।]

এক্ষেত্রে একটি রহস্য প্রণিধানযোগ্য। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সমবেদনাময়ী সান্ত্বনাদায়িনী, কিন্তু ভ্রমর তাঁহার কাছেও স্বামীর উপর অশ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখী যেরূপ অকপটে স্বামীর ভগিনীর কাছে স্বামীর আচরণের কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, ভ্রমর সেরূপ অকপটে নিজের ভগিনীর কাছে স্বামীর চরিত্র আলোচনা করিতে পারিলেন না। স্বামিকর্ত্তৃক এত অপমান ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়াও যে অভিমানিনী সকল কথা ভগিনীর নিকট খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা।

এই বিশিষ্টতার জন্যই, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়া ভ্রমরের পিতার তদ্বিরে খালাস পাইয়া আবার গা-ঢাকা দিলে, স্বামিস্ত্রীতে যে পত্রব্যবহার হইল, তাহা যামিনীর অজ্ঞাতে। অভিমানিনী ভ্রমর এসব কথা ভগিনীকে জানাইতে নারাজ। (আর সে সময়ে ভ্রমর শ্বশুরালয়ে, সুতরাং তাঁহার ভগিনীর এ সব কথা জানিবার সম্ভাবনাও নাই।) [২য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর, ভ্রমরের দীর্ঘ দুঃখনিশার শেষ যামে আবার আমরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনীর দেখা পাই। দুর্ভাগিনী ভগ্নহৃদয়া সাংঘাতিকপীড়াগ্রস্তা শয্যাশায়িনী ভ্রমরের 'যখন দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল', তখন যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ভগিনীদ্বয়ের কথোপকথন বড়ই মর্ম্মান্তিক।

'ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না। দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস্‌ না। রোগে হউক, অন্তরটিপনীতে হউক,—ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল।···ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন,—"আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল—"দিদি—আজ শেষদিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা, আজি কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল--কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল—"আর একটি ভিক্ষা--তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি রাত্রি কি জ্যোৎস্না?"

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্রমর। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাতবৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল ওখানে ফুলবাগান ছিল। বেমেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর ভ্রমর বলিলেন "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না আজি আবার আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাসদাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দেও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড় হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, একদিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম। একদিনে দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল—"কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা!"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।' ইত্যাদি [২য় খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ।]

এই বিষাদময় দৃশ্যে দুই ভগিনীর প্রীতিসম্পর্কের চিত্র অন্ধকারমধ্যে বিজলীর ন্যায় কি ভীষণোজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে!

ইহার পর যামিনীর আর দেখা পাইব না। (তবে দুইবার গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সাধের পুষ্পোদ্যানের প্রসঙ্গে

তাঁহার নামোল্লেখ আছে।) ভ্রমরের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহময়ী ভগিনীর কার্য্য শেষ হইয়াছে।

স্বামী নিষ্করুণ, স্নেহপরায়ণ জ্যেঠশ্বশুর স্বর্গগত, শ্বাশুড়ী আত্মপরায়ণা ও বধূর প্রীতি বীতরাগা, ননদ থাকিয়াও নাই, সখীর সমাগম নাই; এই মরুভূমিতে পিতৃস্নেহ ও ভগিনী-স্নেহই অভাগিনী ভ্রমরকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যতদূর মনে পড়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভগিনীর ভালবাসার যে দুইটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রাচীন সাহিত্য হইতে আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বা ঈষৎ পূর্ব্ববর্ত্তী আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ চিত্র আছে কি না।

'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলীনের ঘরের চিত্র আছে। কুলীনের ঘরে কুমারী বা সধবা কন্যাদিগের বহুদিন ধরিয়া অবিচ্ছেদে একত্র থাকিবার কথা, অতএব তাঁহাদিগের সদ্ভাব-সম্প্রীতির যথেষ্ট অবসর আছে। এই নাটকে চারিটি 'কুলীন-কুমারী অনূঢ়া অবলা' 'জাহ্নবী শাম্ভবী আর কামিনী কিশোরী' পিতৃ-গৃহবাসিনী—কেহ বালিকা, কেহ নবযুবতী, কেহ বা বিগতযৌবনা। কিন্তু কৈ, তাহাদের সদ্ভাব-সম্প্রীতির বিশেষ কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। ষষ্ঠ অঙ্কে কয়েক ভগিনীর কথাবার্ত্তায় যেটুকু পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সাহিত্যের কথা তুলিলে স্বতঃই তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলির কথা মনে পড়ে। 'জামাইবারিকে' ঘর-জামাই রাখার ব্যাপার বর্ণিত, এই নাটকে বিবাহিতা কন্যা সকলেই পিতৃ গৃহ-বাসিনী, সুতরাং ইহাতে ভগিনীগণের সদ্ভাব-সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত করিবার সুন্দর সুযোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নাটকের একটি দৃশ্যে বরং ননদ-ভাজকে এক নিমেষের জন্য পরস্পরের সংস্পর্শে আনা হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীদিগকে কোথাও একত্র দেখা যায় না। ধনিকন্যারা প্রত্যেকে যেমন এক একটি ঘর-পাইয়াছিলেন, তেমনই বোধ হয় সেই খাসকামরায়ই তাঁহাদিগের বসবাস ছিল, ভগিনীদিগের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। কামিনী তিনবার তিন ভগিনীর কথা তুলিয়াছেন; একবার 'সতী-লক্ষ্মী মেজদিদি'র পতির অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হওয়ার প্রসঙ্গে 'মেজদিদি'র প্রতি কামিনীর প্রীতি-সমবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]—এইটুকুই ভগিনীপ্রীতির বিন্দুমাত্র নিদর্শন; একবার 'সেজদিদি'র স্বামিসুখের কথা আছে [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক], আর একবার 'নদিদি'র স্বামীকে লাথি মারার কথা [৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]। বস্! কামিনীও 'ন-দিদি'র নজীর অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, ইহাকে যদি ভগিনীতে ভগিনীতে সমপ্রাণতা বলেন, বলিতে পারেন!

'লীলাবতীতে' নায়িকা যৌবনস্থা হইয়াও কুমারী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারা ওরফে অহল্যা, বিবাহিতা, পতিগৃহ-বাসিনী। কিন্তু তাহাদিগের ভগিনী-সম্পর্ক নাটকের শেষ দৃশ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সুতরাং এই নাটকেও ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার চিহ্ন নাই।

পক্ষান্তরে, 'বিয়েপাগলা বুড়ো'য় দুইটি বিধবা ভগিনী পিত্রালয়-বাসিনী; (তাঁহাদিগের সধবা ভগিনীটি স্বামিগৃহ-বাসিনী, তাঁহার এক আধবার উল্লেখ আছে।) এই দুইটি বিধবা ভগিনী রামমণি ও গৌরমণিকে দুইটি দৃশ্যে [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক; ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক] একত্র দেখা যায়: ইহার প্রথম দৃশ্যে উভয়-ভগিনীর স্নেহ-সমবেদনার একটি সুন্দর চিত্র আছে। এটি দুঃখের চিত্র।

'নবীন-তপস্বিনী'তে মল্লিকা-মালতী রামমণি-গৌরমণির ন্যায় সহোদরা নহেন, মামাত-পিসতুত ভগিনী। (৭) ইহারা পিতৃ-গৃহ-বাসিনী নহেন, কিন্তু এক নগরে পতি-গৃহ বলিয়া সর্ব্বদা দেখা-শুনা হইত। ইঁহাদিগের দুজনে গলায় গলায় ভাব, ইঁহারা আমোদে প্রমোদে একপ্রাণ, একাভিসন্ধি। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে এবং অন্য বহু স্থলে উভয়ের সখ্য প্রীতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। এটি সুখের চিত্র।

তাহা হইলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয় বন্ধুই

(৭) জলধরের লাম্পট্যলীলা ও মল্লিকা-মালতী-কর্তৃক তাহার শাস্তি-বিধান শেক্স্পীয়রের Merry Wives of Windsor এ Falstaff এর বৃত্তান্তের অনুকরণে লিখিত। কিন্তু শেক্স্পীয়রের নাটকে Mrs Page ও Mrs Ford ভগিনী নহেন, প্রতিবেশিনী মাত্র।

দুই ভগিনীর সদ্ভাব-সম্প্রীতির দুইটি করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং উভয় বন্ধুরই একটি সুখের চিত্র, অপরটি দুঃখের চিত্র। তবে দীনবন্ধুর নাটকদ্বয়ে অপ্রধানা পাত্রীর স্নেহময়ী ভগিনীর চিত্র আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাদ্বয়ে নায়িকার স্নেহময়ী ভগিনীর চিত্র আছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ-বউ'এ ননদ-ভাজের সদ্ভাবের চিত্র আছে, কিন্তু শ্যামা-বামা দুই ভগিনীর সদ্ভাবের চিত্র নাই। ('কপালকুণ্ডলা'য় শ্যামা কনিষ্ঠা ভগিনী, এখানে শ্যামা জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তবে উভয় শ্যামাই কুলীন-পত্নী, সুতরাং পিতৃগৃহবাসিনী। 'কপাল-কুণ্ডলা'য় দুই ভগিনীর সদ্ভাব-অসদ্ভাব কোন কথাই নাই। এখানে বরং একটু অসদ্ভাবের কথা আছে।) বামার মৃত্যু হইলে শ্যামা একবার 'বামা, কোথায় গেলি রে' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, এই মাত্র ভগিনীস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়!

৺রমেশচন্দ্র দত্তের শেষবয়সে রচিত 'সংসারে' বিন্দু ও সুধা দুই সহোদরা ভগিনীর এবং বিন্দু ও উমাতারা দুই জ্ঞাতি-ভগিনীর প্রীতি-সম্পর্কের সুন্দর পূর্ণায়তন চিত্র আছে। বিশেষতঃ উমাতারার দুঃখের দিনে বিন্দুর সেবা ও সমবেদনা, ভ্রমরের দুঃখের দিনে যামিনীর সেবা ও সমবেদনার মতই আন্তরিক ভালবাসার নিদর্শন। তবে উমাতারা ভ্রমরের ন্যায় গ্রন্থের নায়িকা নহেন, অপ্রধানা পাত্রী। যাহা হউক, রমেশচন্দ্রের এই আখ্যায়িকা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরে প্রকাশিত। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া থাকেন, তবে রমেশচন্দ্রই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ করিয়াছেন।

বিন্দু ও সুধার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে চাহি। সুধার বিধবাবিবাহ-ব্যাপারে বিন্দুর সম্মতিদান হিন্দুর চক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকে বটে; সে বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের বিবেচনার দোষ দিতে পারি। কিন্তু ভগিনীপতি হেমচন্দ্র যে বিধবা শ্যালিকা সুধাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া আধুনিক কোন কোন আখ্যায়িকা ও ছোটগল্পের নায়কের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রেমে পড়েন নাই, এই সুবিবেচনার জন্য গ্রন্থকার শ্রদ্ধার পাত্র, সন্দেহ নাই। এই স্থলে এ কথা বৃথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' চারিটি ভগিনীর (এক জন বিধবা, একজন বিবাহিতা ও দুই জন অনূঢ়া যুবতী কুলীনকন্যা) সখী ও পরস্পরের প্রতি স্নেহ অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত অবশ্য এই পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পরে রচিত। (৮)

এই অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভগিনী ভালবাসার চিত্র অঙ্কন করিয়া আমাদিগের সাহিত্যে একটি নূতন ও সুন্দর আদর্শ প্রচার করিয়াছেন এবং এ জন্য তিনি (অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ৺দীনবন্ধু মিত্রের সহিত একযোগে) বাঙ্গালীজাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি, বিলাতী সমাজে দুই ভগিনীর যৌবনে একত্রাবস্থান দুর্ঘট নহে, সুতরাং বিলাতী সমাজে ও বিলাতী সাহিত্যে দুই ভগিনীর সদ্ভাব-সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষণে, বিলাতী সাহিত্যে এই শ্রেণীর চিত্র কি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

এই প্রসঙ্গে বিলাতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকাবলি স্বতঃই মনে আসে। সেই অমর কবির তুলিকায় অকৃত্রিম স্নেহশালিনী ভগিনীদিগের চিত্র কি বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, জানিতে কৌতূহল হয়। নিজের অবলম্বিত ব্যবসায়ে শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যের আলোচনা সর্ব্বদাই করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে পাঠক-সমাজকে ছাত্র-সম্প্রদায়-ভ্রমে লম্বা লেক্‌চার না দিয়া সংক্ষেপে বিষয়টির আলোচনা করিব। জানি না, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাকেও পাঠকবর্গ লেখকের জাত-ব্যবসার কথা (talking shop) বলিয়া উপহাস করিবেন কি না।

সকলেই জানেন, বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক (Tragedy) King Lear এ তিন সহোদরার বৃত্তান্ত আছে। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা দুঃশীলা, কনিষ্ঠা সুশীলা। সুশীলা কনিষ্ঠা ভগিনী হয়ত জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমার প্রতি একেবারে প্রীতিশূন্যা ছিলেন না, কিন্তু পিতৃসম্পত্তি-বিভাগ-কালে এবং পিতৃ-ভবন হইতে বিদায়কালে পিতার অবিমৃষ্য-কারিতা ও ভগিনীদিগের রাজ্যলোভ, উচ্চাভিলাষ,

(৮) এই পুস্তকে শ্যালিকা, বিশেষতঃ বিধবা শ্যালিকার সহিত ভগিনী-পতির রঙ্গরস যথেষ্ট আছে, অথচ অবৈধ প্রণয়ের কুৎসিত চিত্র নাই।

কপটাচার প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সেই বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ভগিনীদ্বয়কে দুচারিটি স্পষ্ট কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা প্রথমে পিতাকে ভুলাইয়া রাজ্যলাভ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এবং পরে পিতার উপর অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে একযোগে এক-পরামর্শ হইয়া কার্য্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা প্রগাঢ় প্রীতিজনিত হৃদ্যতা নহে, স্বার্থসাধনের উপায় মাত্র। পরে ইহারা একই উপপতির প্রতি গুপ্তপ্রণয় বশতঃ পরস্পরের প্রতি-দ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠা বিদ্বেষবশে বিষপ্রয়োগে মধ্যমার প্রাণনাশ করিয়াছিল। আবার জ্যেষ্ঠা উপপতির সহিত পরামর্শ করিয়া কনিষ্ঠাকেও গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়াছিল। ফলতঃ এই নাটকে তিন সহোদরার বিরোধের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। তবে ইহা সাধারণ গৃহস্থঘরের কথা নহে, রাজারাজড়ার ঘরের কথা। পুত্রাদপি ধন-ভাজাং ভীতিঃ, তা ভগিনী ত দূরের কথা।

মিলনান্ত নাটক (Comedy) Taming of the Shrewতে দুইটি সহোদরা আছেন। (বোধ হয় এই নাটকখানি সাধারণ পাঠকের তেমন সুপরিচিত নহে।) এখানেও জ্যেষ্ঠা (Katherine the Shrew) দুঃশীলা, কনিষ্ঠা সুশীলা। উগ্রচণ্ডা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার প্রতি প্রীতি-শূন্যা, পরন্তু তাহার উপর শারীরিক অত্যাচার পর্য্যন্ত করে; শান্তপ্রকৃতি কনিষ্ঠা কিন্তু এরূপ দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠাকে ভালবাসে ও মান্য করে। উভয়েই গ্রন্থারম্ভে অবিবাহিতা। একস্থলে কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যায়, উভয়ে এক প্রণয়ভাজনের প্রতি অনুরাগিণী নহে, সুতরাং তাহারা পরস্পরের প্রতিযোগিনী হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবতী নহে। এ বিষয়ে King Learএ বর্ণিত জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ভগিনী এবং আমাদের সাহিত্যে বর্ণিত হিরণ্ময়ী-কিরণময়ী প্রভৃতি ভগিনীদ্বয়ের সহিত তাহাদিগের সম্পূর্ণ প্রভেদ। উভয় ভগিনীর বিবাহিত অবস্থার যেটুকু চিত্র আছে, তাহাতেও তাহাদের সদ্ভাব-সম্প্রীতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব King Learএর চিত্রের মত এ চিত্রেও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য নাই।

মিলনান্ত নাটক Comedy of Errorsএও দুই সহোদরার প্রসঙ্গ আছে। জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা স্বামিগৃহবাসিনী, কনিষ্ঠা অনূঢ়া, যুবতী, ভগিনী-ভগিনীপতির গৃহেই থাকেন। এখানে দুই সহোদরার প্রীতিসম্পর্ক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। (বোধ হয়, এই নাটকখানিও সাধারণ পাঠকের তেমন সুপরিচিত নহে কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যায়িকা-কারে অনুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মারফত ইহা বহু বাঙ্গালী পাঠকের পরিচিত।) প্রথমেই (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্যে) যখন আমরা দুই ভগিনীকে দেখি, তখন জ্যেষ্ঠা Adriana কনিষ্ঠা Lucianaর নিকট স্বামীর অবহেলার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, স্বামীর প্রণয় হারাইয়াছেন এই সন্দেহে দুঃখ ও অভিমান প্রকাশ করিতেছেন; তিনি ভ্রমরের ন্যায় ভগিনীর নিকট কোন কথা চাপিতেছেন না, নিঃসঙ্কোচে সকল কথা ভগিনীর কর্ণগোচর করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতেছেন। ভগিনীও তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জানাই-তেছেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তাহাতে রসান দিতেছেন না, তাঁহাকে স্বামীর বিরুদ্ধে আরও উত্তেজিত করিতেছেন না, বরং ইন্দিরা স্বামীর রীতি-চরিত্র দেখিয়া স্বামীর নিন্দা করিলে সুভাষিণী যেমন পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নহে, 'আমরা দাসী না ত কি?' (১৩শ পরিচ্ছেদ) এই তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনীও ঠিক সেই ভাবে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নহে, কি ইতর প্রাণী কি মনুষ্য, সর্ব্বত্র পুরুষ স্বাধীন, নারী পুরুষের অধীন, এই তত্ত্ব শিখাইয়া জ্যেষ্ঠাকে ঈর্ষ্যা ও অভিমান ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, নিজে বিবাহিতা না হইয়াও তিনি পতির দুর্ব্যবহারে পত্নীকে যেরূপ 'ক্ষেমা-ঘেন্না' করিবার পরামর্শ দিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি সুশীলা ও শান্তপ্রকৃতি এবং আশা করা যায় যে তিনি বিবাহিত জীবনে আদর্শপত্নী হইবেন। তাঁহার বিবাহ-বিষয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই প্রসঙ্গে একটু কৌতুক করিতেও ছাড়েন নাই। এই একটি দৃশ্যেই দুই ভগিনীর অন্যোন্যানুরাগ এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর সমবেদনা ও হৃদ্যতা সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্যে (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে) যখন স্বামীর যমজ ভ্রাতাকে স্বামিভ্রমে Adriana অবহেলার জন্য ভৎর্সনা করিতেছেন, তখন কনিষ্ঠা Lucianaও সেই ভৎর্সনায় যোগ দিলেন। ইহাও তাঁহার জ্যেষ্ঠার সহিত সমপ্রাণতার নিদর্শন। (৯) ইহার পরে যখন জ্যেষ্ঠা ভগিনীর

(৯) দুই ভগিনীর কাণ্ড দেখিয়া এই ব্যক্তি বারংবার বলিয়াছে, এটা

অনুপস্থিতিতে নকল ভগিনীপতির সহিত কনিষ্ঠার সাক্ষাৎ হয়, তখনও তিনি দিদির প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করিতে ছাড়িলেন না, এবং এসম্বন্ধে বুদ্ধিমতীর মত সৎপরামর্শ দিলেন। (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য।) এই অবসরে নকল ভগিনীপতি তাঁহার প্রতি প্রণয়প্রকাশ করিলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং বেশী বাড়াবাড়ি দেখিয়া দিদিকে ডাকিতে গেলেন। পরে একটি দৃশ্যে দেখা যায়, (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে) তিনি সত্য-সত্যই দিদিকে এই কথা জানাইলেন; দিদি যেমন নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে দিদির নিকট তাঁহার স্বামীর কীর্ত্তিকথা প্রকাশ করিলেন। (বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে উভয় ভগিনীই ভ্রান্ত; এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্যেষ্ঠার স্বামী নহেন, স্বামীর যমজ ভ্রাতা)। (১০)

ইহার পরেও দুইটি দৃশ্যে দুই ভগিনীকে একত্র দেখা যায়। (নাটকের প্রায় সর্ব্বত্র এই কৌশল দৃষ্ট হয়, যেখানেই জ্যেষ্ঠা উপস্থিত, সেখানেই তাঁহার পার্শ্বে সমবেদনাময়ী কনিষ্ঠা উপস্থিত।) মাতাজী (Lady abbess) যখন স্বামী পত্নীর দুর্ব্যবহারেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া পত্নীকে তিরস্কার করিলেন, তখন কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার পক্ষ লইয়া সে কথা অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে জ্যেষ্ঠা কখনই স্বামীর প্রতি কঠোরতা দেখান নাই; জ্যেষ্ঠা নিজে এইরূপ একরার করিলেও কনিষ্ঠা সে কথাকে আমল দিলেন না। ইহাও তাঁহার ভগিনীর প্রতি ভালবাসার সুন্দর নিদর্শন। মাতাজী স্বামীকে আটক রাখিলে তিনিই ভগিনীকে স্বামিদখলের জন্য রাজার নিকট নালিশ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নালিশ রুজু হইলে উৎসাহের সহিত দিদির পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। (৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। এ সমস্তই তাঁহার ভগিনীর সহিত সমপ্রাণতার পরিচায়ক। ফলতঃ এই নাটকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মনোবেদনায় সহানুভূতি, সান্ত্বনা, সৎপরামর্শ, সাহায্য, সাহচর্য্য প্রভৃতির সমবায়ে কনিষ্ঠা ভগিনীর চরিত্র-চিত্র বড়ই উজ্জ্বল বড়ই সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, ভগিনীর সখীত্ব অতি মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে হয়ত এই নাটকে যমজভ্রাতাদিগের ব্যক্তিত্ব লইয়া নানালোকের ভ্রমবশতঃ যে সমস্ত কৌতুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সেই দিকেই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; সুতরাং ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার এই সুন্দর সুশোভন চিত্র সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আখ্যায়িকায়ও নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির প্রেমের বর্ণনায় সাধারণ পাঠক এত বিভোর হন যে ননদ-ভাজ, বা দুই ভগিনীর ভালবাসার চিত্রগুলি লক্ষ্য করেন না।

শেক্‌স্‌পীয়ারের আরও দুইখানি মিলনান্ত নাটকে —*As you Like It* ও *Much Ado About Nothing* —দুই ভগিনীর ভালবাসার সুন্দর বিবরণ আছে, তবে তাঁহারা সহোদরা নহেন, Cousin-সম্পর্কিতা। কিন্তু Cousin হইলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতি সহোদরার প্রীতি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। (শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায়—'Whose loves are dearer than the natural bonds of sisters') (১১) দুইটি চিত্রই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। (এ দুইখানি নাটক *King*

যাদুকর-যাদুকরীর দেশ এবং ইহারা ডাকিনী (witches)। ইহা ইন্দিরার কামরূপের ডাকিনী বা বিদ্যাধরী সাজার এবং তাঁহার স্বামীর ভ্রমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(১০) পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে আখ্যায়িকায় ও ছোটগল্পে শ্যালিকা-প্রেমের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এই নাটকে নকল ভগিনীপতির উক্তি:—

> Your weeping sister is no wife of mine,
> Far more, far more, to you do I decline.
>
> *　　*　　*　　*
>
> She, that doth call me husband, even my soul
> Doth for a wife abhor; but her fair sister
> Hath almost made me traitor to myself. (III. ii)

ঠিক আমাদের ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার শ্যালিকা-প্রেমিক ভগিনী-পতির মনোভাবের অনুরূপ, তবে পরবর্ত্তী দুই ছত্রের সংযম এই জাতীয় আখ্যায়িকায় দেখা যায় না।

> But lest myself be guilty to self-wrong,
> I'll stop mine ears against the mermaid's song.

বলা বাহুল্য, শেক্‌স্‌পীয়ার এক্ষেত্রে বাস্তবিক শ্যালিকা প্রেমের জয়-গান করেন নাই। উদ্ধৃত উক্তির পাত্রী প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃবধূর ভগিনী, অতএব ৺দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় 'করণীয় ঘর'। এই মিলনান্ত নাটকের শেষে উক্তিকারী সত্যসত্যই তাঁহাকে বিবাহ করিয়া যমজভ্রাতার ভায়রাভাই হইলেন, ইহার আভাস পাওয়া যায়।

(১১) As you like it, I. ii.

১। ভার্জ্জিল ২। হোমর ৩। দান্তে ৪। ওভিদ ৫। মধুসূদন ৬। পেত্রার্ক ৭। মিল্টন ৮। টাসো
৯। বায়রণ ১০। সেক্সপীয়র

Emerald Ptg. Works

Lear এর ন্যায় সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত না হইলেও পূর্ব্বকথিত দুইখানি মিলনান্ত নাটক অপেক্ষা সুপরিচিত; বিশেষতঃ *As you Like It* কবির একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক, সুতরাং সুপরিচিত হইবার কথা।)

*Much Ado*তে (Hero) হীরো ধীরা, অল্পভাষিণী; (Beatirce) বীয়াট্রিস্ প্রগল্ভা, বহুভাষিণী, রঙ্গব্যঙ্গে সুদক্ষা; কিন্তু দুই ভগিনীর প্রকৃতির এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় এবং উভয়ের হৃদয় পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ। তাহারা পরস্পরের নিত্যসঙ্গিনী, প্রায় সর্ব্বত্র উভয়কে একত্র দেখা যায়। বীয়াট্রিস্ হীরোকে (২য় খণ্ড ১ম দৃশ্যে) হাসিতে হাসিতে প্রণয়ীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যে পরামর্শ দিলেন, (১২) তাহাতে তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীস্নেহের আভাস পাওয়া যায়। ঐ দৃশ্যেই উচ্চবংশজ গুণবান্ বর হীরোর নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলে, বীয়াট্রিস্ হীরোকে যে মধুমাখা কথাগুলি বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি ভগিনীর ভাবী স্বামিসৌভাগ্যের জন্য কত আনন্দিতা, ভগিনীর কত শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আবার যখন ঐ দৃশ্যেই বীয়াট্রিসকে তাঁহার সম্বাংশে উপযুক্ত বরের সহিত প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার সলা-পরামর্শ হইল, তখন অল্পভাষিণী হীরো সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শুভকার্য্যসিদ্ধির জন্য নিজ সামর্থ্যমত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ভগিনী যেমন তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তিনিও সেইরূপ ভগিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। উল্লিখিত কৌশল সফল হইলে তিনি ভগিনীর কোথায় ব্যথা জানিয়া অন্যান্য রঙ্গপ্রিয়া পাত্রীদিগের ন্যায় তাঁহাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধা করিলেন না (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য।) ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম ভগিনী-প্রীতি ও সমবেদনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরের একটি দৃশ্যে বীয়াট্রিস্ হীরোর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও সমবেদনার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এইটি নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।) হীরো ও তাঁহার ভাবী বর ভজনালয়ে পবিত্র উদ্বাহ-বন্ধনের জন্য উপস্থিত, আত্মীয়বর্গ সমবেত, এমন সময় বিষম ষড়যন্ত্রের প্রভাবে (১৩) প্রতারিত বর কর্ত্তৃক কন্যা কলঙ্কিনী বলিয়া অবমানিতা, প্রত্যাখ্যাতা, ধিক্কৃতা। তৎক্ষণাৎ বীয়াট্রিসের হাস্যময়ী কৌতুকময়ী মূর্ত্তির একেবারে তিরোভাব হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার অশ্রুময়ী সমবেদনাময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। (বঙ্কিমচন্দ্রের কমলমণি-সুভাষিণী এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।) বীয়াট্রিস সর্ব্বাগ্রে ভগ্নহৃদয়া ভগিনীর মূর্চ্ছিতা অবস্থা দেখিতে পাইলেন, প্রাণনাশের আশঙ্কায় অস্থির হইলেন, এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে ও সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইলেন। যখন স্নেহময় পিতা পর্য্যন্ত আত্মজার কলঙ্ককথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া হতভাগিনীর মৃত্যুকামনা করিতেছেন, তখনও বীয়াট্রিসের ভগিনীর নির্দ্দোষিতায়, কলঙ্ককাহিনীর অলীকতায় অবিচলিত বিশ্বাস। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার ভগিনীর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কত গভীর ও কেমন অকৃত্রিম। তিনি সুযোগ পাইলেই যে ব্যক্তির সহিত কথা-কাটাকাটি করিতেন, এখন সেই ব্যক্তিকে এই দারুণ বিপদে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় লজ্জায় নারীসুলভ কোমলতা বিস্মৃত হইয়া ভগিনীর পাণিপ্রার্থী বিশ্বাসঘাতকের রক্তদর্শন করিতে চাহিলেন এবং এই কার্য্য সাধন করিলে উল্লিখিত ব্যক্তি (Benedick) যে তাঁহার প্রতি প্রকৃতপক্ষে অনুরাগী ইহা বিশ্বাস করিবেন, এরূপ আভাস দিলেন। এই কার্য্যগুলিও যে তাঁহার গভীর ভগিনীস্নেহের নিদর্শন, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না।

পঞ্চম অঙ্কে এই ব্যাপারের সুখময় পরিণাম ঘটিলে, যখন যোড়া বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছিল এবং বীয়াট্রিসের বিষয়ে যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া সকলে রঙ্গ করিতেছিলেন, তখন হীরোও সেই রঙ্গরসে যোগ দিলেন, কেননা তখন তাঁহার হৃদয় নিজের ও ভগিনীর সুখসম্পদে ভরপুর। নাটকে এই সুখের চিত্রে দুই ভগিনীর প্রীতিসম্পর্কের বর্ণনা শেষ হইয়াছে।

এই নাটকেও Benedick-Beatrice এর বাগ্‌যুদ্ধ, তাঁহাদিগকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার জন্য কৌতুকাবহ কৌশল এবং হীরোর অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা সাধারণ পাঠকের চিত্ত হরণ করে, সুতরাং ভগিনীদ্বয়ের প্রীতি-সম্পর্কের এই সুন্দর চিত্র হয়ত অনেকের চোখে পড়ে না।

*As you Like it*এ Celia ও Rosalind খুড়তুত-

(১২) Speak, cousin; or if you cannot, stop his mouth with a kiss, and let not him speak neither.

(১৩) এই ষড়যন্ত্র ৺মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকে অনুকৃত হইয়াছে।

জ্যেঠতুত ভগিনী; সিলিয়ার পিতা রোজালিণ্ডের পিতাকে (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে) রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্য দখল করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু কন্যার বাল্যসখী ভ্রাতৃকন্যাকে নিজ কন্যার মুখ চাহিয়া নির্ব্বাসিত করেন নাই। (১৪) এই অবস্থায় নাটকের আরম্ভ। রাজবংশে জন্মিলেও তাঁহাদিগের Goneril Regan এর মত রাজ্যলোভ ও বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। বিশেষতঃ পিতার প্রকৃতি সিলিয়ার প্রকৃতিতে একেবারেই সংক্রমিত হয় নাই। দুই ভগিনীতে শৈশব হইতে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র নিদ্রা, একত্র জাগরণ, একত্র পাঠ, একত্র ক্রীড়া(১৫)—সুতরাং উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়। তাঁহারা পরস্পরের সহচারিণী ও সহকারিণী, পরস্পরের নর্ম্মসখী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী। পূর্ব্ব-কথিত নাটক দুইখানির ন্যায় এখানিতেও প্রায় সর্ব্বত্র যে দৃশ্যে এক ভগিনীকে দেখা যায়, সে দৃশ্যে অপর ভগিনীকেও তাঁহার পার্শ্বে দেখা যায়।

উভয় ভগিনীই রঙ্গপটু, কিন্তু নাটকের আরম্ভে (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্যে) রোজালিণ্ড পিতার নির্ব্বাসনে বিমর্ষা; তাঁহার বিষাদ দূর করিবার জন্য স্নেহময়ী সিলিয়া ভগিনীকে বলিলেন যে ভগিনীর পিতা যদি তাঁহার পিতাকে নির্ব্বাসিত করিতেন, তাহা হইলে তিনি ভগিনীর সাহচর্য্যে পিতার নির্ব্বাসন ভুলিতেন; ইহা তাঁহার আন্তরিক কথা। এই কথা বলিয়া তিনি ভগিনীকে লজ্জা দিলেন, এবং ভগিনীর ভালবাসা তাঁহার ভালবাসার মত প্রগাঢ় নহে বলিয়া অনুযোগ করিলেন। রোজালিণ্ড এই কথায় লজ্জা পাইয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া ভগিনীর সুখে সুখবোধ করিলেন এবং তাঁহার সহিত নর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্বল্প কথোপ-কথন হইতে দুই ভগিনীর ভালবাসার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

---

(১৪) For the Duke's daughter, her cousin, so loves her, being ever from their cradle bred together, that she would have followed her exile, or have died to stay behind her—I. i

(১৫) We still have slept together,
Rose at an instant, learn'd, play'd, eat together;
And wheresoev'er we went, like Juno's swans,
Still we went coupled, and inseparable—I. iii.

এই দৃশ্যেই উভয় ভগিনী একযোগে একজন অপরিচিত যুবককে পরিণামবিষম মল্লযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিলেন, তাহার মঙ্গলকামনা করিলেন, তাহাকে উৎসাহ দিলেন, তাহার জয়ে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাহাকে সাধুবাদ করিলেন। পরেও অনেক দৃশ্যে তাঁহারা একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। (৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্য, ৩য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। ইহা ইহাতে তাঁহাদিগের একাত্মতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী দৃশ্যে (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) সিলিয়া উক্ত যুবকের প্রতি রোজালিণ্ডের পূর্ব্বরাগলক্ষণ দেখিয়া পরিহাস করিতে ছাড়িলেন না, কিন্তু সেই পরিহাসের ভিতরেও তাঁহার সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঐ দৃশ্যেই যখন রাজা হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোজালিণ্ডকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন, তখন সিলিয়া ক্রোধান্ধ পিতার ক্রোধোপশান্তির জন্য যে ঐকান্তিক চেষ্টা করিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তাঁহার ভগিনীর সহিত স্নেহবন্ধন কত দৃঢ়। পিতাকে এই হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তিনি স্নেহপাত্রী ভগিনীর উপর অত্যাচার অবিচারের জন্য পিতার প্রতি বিরাগবতী হইলেন এবং ভগিনীর বিপদে বিপদ্‌জ্ঞান করিয়া নিজের পিতার রাজভবন ত্যাগ করিয়া মহারণ্যে ভগিনীর নির্ব্বাসিত পিতার নিকট ভগিনীর সহিত একযোগে পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভগিনী-স্নেহের নিকট পিতৃভক্তি পরাজিত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায়, দুই ভগিনীতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতেছেন এবং পরস্পরের সাহচর্য্যে সুখ বোধ করিতেছেন।

যে মহারণ্যে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে রোজালিণ্ডের প্রণয়ভাজন যুবকও (Orlando) তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রণয়ব্যাপারে গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত সিলিয়া রোজালিণ্ডের সমদুঃখসুখা সখীর কার্য্য করিয়াছেন; প্রয়োজন হইলেই নায়ক-নায়িকার প্রেম-পরিণামে সহায়তা করিয়াছেন, সাহায্যের প্রয়োজন না হইলে পার্শ্বে থাকিয়া প্রণয়িযুগলের মিলনে (ললিতার ন্যায়) আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। তিনিই দৈবগত্যা অর্ল্যাণ্ডোর দর্শন পাইয়া ভগিনীকে বার্ত্তা আনিয়া দিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা

দূর করিলেন, এ বিষয়ে ফষ্টিনষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। আবার তিনি রোজালিণ্ড বালকবেশে সাজিয়া প্রণয়ীর সহিত যে কৌতুক করিতেন, তাহাতে সানন্দে ও সোৎসাহে যোগদান করিতেন, (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য); প্রণয়ীর অদর্শনে রোজালিণ্ডের পলকে প্রলয় উপস্থিত হইলে হাস্য-পরিহাসে ও সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিতেন (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য); প্রণয়ীর সহিত মিলনকালে উভয়ের মিষ্টালাপে আনন্দলাভ করিতেন। প্রণয়ীর বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া যখন রোজালিণ্ড মূর্চ্ছিতা হইলেন (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য), তখন সিলিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় তৎপর, সঙ্গে সঙ্গে সত্যগোপনে (রোজালিণ্ডের বালকবেশ) যত্নবতী। এই দৃশ্যে তাঁহার গভীর সমবেদনা পরিস্ফুট।

এইরূপ দৃশ্যের পর দৃশ্যে রোজালিণ্ডের দুঃখের দিনে সিলিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ স্নেহময়ী মমতাময়ী ছিলেন, তাহার চিত্র আছে। কিন্তু যখন রোজালিণ্ড পিতা ও পতির সহিত মিলিতা হইলেন, তাঁহার পিতা হৃতরাজ্য ফিরাইয়া পাইলেন, সিলিয়াও অভীষ্ট বরে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই সুখের দিনে দুই ভগিনী পরস্পরের সুখে কেমন সুখবোধ করিলেন, সে চিত্র নাটকে প্রদর্শিত হয় নাই। দুই ভগিনী পরস্পরের যা হইলেন, এই শুভসংযোগে কবি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত লেখক ল্যাম্ব এই নাটক-অবলম্বনে যে গল্প আখ্যান লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠতাত হৃতরাজ্য ফিরাইয়া পাইলেও জ্যেষ্ঠতাতকন্যা রাজপাটের উত্তরাধিকারিণী হইলে সিলিয়া নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিতা হইলেন না, বরঞ্চ জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাতকন্যার সুখে আনন্দপ্রকাশ করিলেন। ইহা সিলিয়ার চরিত্রানুগত সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্স্পীয়ার নাটকের শেষে সিলিয়ার মুখ দিয়া এ কথা স্পষ্ট করিয়া বাহির করেন নাই। ইহা ভাবগ্রাহী ল্যাম্বের অনুবৃত্তিমাত্র।

অন্য নাটকের বেলায় যাহাই হউক, এই নাটকখানি পাঠ করিবার সময় পাঠক প্রেমের কাহিনীতে যতই বিভোর হউন না কেন, ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই করিবে।

ইংরেজী সাহিত্যে অন্য কোথায় কোথায় দুই ভগিনীর চিত্র আছে, তৎসমুদয়ের সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অযথা স্ফীত করিবার প্রয়োজন দেখি না।*(১৬) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজকবির অঙ্কিত তিনটি চিত্রের উল্লেখ করাই যথেষ্ট বিবেচনা করি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ লেখকগণ বিলাতী সাহিত্যক্ষেত্র হইতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নভেলরূপ 'বিষবৃক্ষ' রোপণ করিয়াছেন, এবঞ্চ বিলাতী সমাজের দর্পণ বিলাতী সাহিত্য হইতে অনেক বিকৃত আদর্শ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, ইংরেজী শিক্ষালাভ ও ইংরেজের চাকরী করিয়া নিমকের গোলাম হইয়া নিমকহালালী করিবার জন্য হিন্দুর পবিত্র সাহিত্য-সরস্বতীতে বিলাতী নোনাজল ঢুকাইয়াছেন, নিপুণ সমালোচকগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রবন্ধে আলোচিত ভগিনীতে ভগিনীতে ভালবাসার আদর্শ বঙ্কিম দীনবন্ধু সংস্কৃত বা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পান নাই। কিন্তু সাহিত্যে না থাকিলেও ইহা আমাদের সমাজে অপ্রাপণীয় নহে। অতএব হিন্দু লেখক এই আদর্শ নিজের ঘরে না পাইয়া পরের ঘর হইতে আমদানী করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ নাই। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই করা যায় যে বঙ্কিম-দীনবন্ধু এই সুন্দর আদর্শ-স্থাপনে বিলাতী কাব্য-নাটকের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাতেই বা দোষ কি? বিদেশীয় ভাব ও আদর্শের অনুকরণ-মাত্রই নিন্দনীয় নহে। দেশীয় ভাব ও আদর্শের প্রতিকূল না হইলে এরূপ অনুকরণ ও অনুসরণ সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক, নূতন অথচ বিশুদ্ধ আদর্শের প্রবর্ত্তক, মধুর ভাবের প্রণোদক, সুন্দর চিত্রের উদ্ভাবক, অতএব প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। ফলতঃ অন্যত্র যাহাই হউক, এক্ষেত্রে ইঁহারা এই সকল চিত্র দ্বারা আমাদের সাহিত্যকে দূষিত না করিয়া ভূষিত করিয়াছেন, ইহা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি। এই সুন্দর আদর্শ-প্রচারের জন্য আমরা পুনর্ব্বার বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

*(১৬) প্রসঙ্গক্রমে গোল্ড্স্মিথের বিখ্যাত আখ্যায়িকায় ওলিভিয়া ও সোফিয়া দুই সহোদরা এবং জর্জ্জ এলিয়টের সাইলাস মার্ণারে Nancy ও Priscilla Lammater দুই সহোদরার উল্লেখ করা যায়।

নিষ্কৃতি *

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(গল্প)

ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্ত্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ ও হরিশ, এবং খুড়তুত ছোট ভাই রমেশ। পূর্ব্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী ও বিষয়-সম্পত্তি, রূপনারায়ণ নদের তীরে হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয্যের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে রূপনারায়ণ এম্‌নি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবানীর জমি-যায়গা, পুকুর-বাগান গিলিতে সুরু করিলেন, যে, বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশেষে, সাত-পুরুষের বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া, এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া, নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে সব অনেক দিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকিল হইয়াছেন, বিস্তর বিষয়-আশয় অর্জ্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন,—এক কথায়, যাহা গিয়াছিল, তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন বড় ভাই গিরীশের বাৎসরিক আয় প্রায় ২৪।২৫ হাজার টাকা, হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই রমেশ। তবে, একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বারদুই-তিন সে আইন ফেল করিতে পারিয়াছিল, এবং সম্প্রতি কি-একটা ব্যবসায়ে বড়দার হাজারতিন-চার লোকসান করিয়া, এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবৌ ও ছোটবৌয়ে কিছুতেই আর বনিবনাও হয় না। হরিশ এতকাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে মফস্বলে থাকিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিতেন। তখন মাঝে-মাঝে দু'দশ দিনের বাড়ী আসা-যাওয়ার অল্প সময়টুকু এই দুটি নারীর বিশেষ সদ্ভাবে না কাটিলেও, কলহ-বিবাদের এরূপ প্রচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাসখানেক হইল, হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন।

বাড়ী হইতে সুখশান্তিও পলাইবার উপক্রম করিতেছে। তবে, এবার আসিয়া পর্য্যন্ত, দুই জায়ের মন-কসাকসি ব্যাপার এখনও উঁচু পর্দ্দায় উঠে নাই; তাহার কারণ, ছোট বৌ, এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের স্ত্রী শৈলজা, তাহার একমাত্র পুত্র পটল, ও সপত্নী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন পাঁচ-ছয় হইল ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়ীতে শাশুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়-বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এই জন্যই বোধ করি পাড়ায় তাঁহার অখ্যাতি সুখ্যাতি দুই, একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশী দিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না, মাসখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ী আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেম্‌নি প্রাতঃস্নান করিতে লাগিলেন, এবং কিছুতেই কুইনাইন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই চারিদিন যায়—জ্বরে পড়েন, আবার ওঠেন, আবার পড়েন। ফলে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন,—এম্‌নি সময়ে শৈল বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধে অত্যন্ত পীড়াপিড়ি সুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে

* এই গল্পের অল্পাংশ 'ঘরভাঙ্গা' নামে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল; সম্পূর্ণ গল্প প্রকাশ করিবার জন্য সে অংশটিও প্রকাশিত হইল।

বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিম্বা আর কেহ তাহা পারিত না। আরো একটা কারণ ছিল। মনে-মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারী ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ, এবং এমনি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার সুরু করিলে, তিন দিন কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না—এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল। শৈলর মাসীর বাড়ী পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর নিরামিষ রান্নার আবশ্যক নাই,—তাই, সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজ ছেলে হরিচরণের উপর ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া, সে সেইখানে গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-দুই হইল, সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভাল করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টা তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন; এবং এই শয্যার উপরেই তিন-চারিটি ছেলে-মেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল, প্রদীপের আলোকের সুমুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ, বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োমুড়ি দেখিতেছিল। ওধারের শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিৎ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাশের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচা-চেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল, ইহারা সকলেই মেজকর্ত্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ আমার ডান দিকে শোবার পালা, না বড়মা?" কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, "না, বিপিন, তুমি না। বড়মার ডানদিকে আমি শোব যে।"

বিপিন প্রতিবাদ করিল, "তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা!"

"কাল শুয়েছিলুম? আচ্ছা, আজ তবে বাঁ দিকে!" যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল। সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁ-দিক ঘেঁসিয়া পড়িয়া ছিল। বে-দখল হইবার সম্ভাবনায়, অমন হুড়োমুড়িতে পর্য্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে!"

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "পটল! বড় ভায়ের সঙ্গে তর্ক করোনা বল্‌চি! মাকে বলে দেব।"

পটল বেচারা অত্যন্ত বে-গতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, "বড়মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে!" কানাই ছোট ভায়ের স্পর্দ্ধায় চোখে পাকাইয়া "পটল্" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল, "ওরে বাপ্‌রে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে!"

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন! ও বিছানার হরিচরণ পাঠ্য-পুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া, এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যার আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল—'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি'—আর, সব চেয়ে আশ্চর্য্য ওই শিশুর দলটি। ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে এক মুহূর্ত্তে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এই মাত্র ফিরিয়া বড়জা'র জন্য এক বাটী গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকের হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতি চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে সে 'আনন্দ-মঠ' পড়িতেছিল; তাহার ভবানন্দ, জীবানন্দ ছোট-খুড়ীমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না! এবং, তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে' 'ওই বিস্তীর্ণ জলরাশি', এতক্ষণ হচ্ছিল কি ?"

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত-কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, "আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।" কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক-ডানদিকের মোকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিলেন, "কাউকে ত দেখচিনে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে।"

এবার কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, "কেউ পালায়নি মা, সব ঐ লেপের মধ্যে ঢুকেচে।" তাহার কথা ও মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিলেন। দূর হইতে তিনি ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবার, বড়জা'কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি, খেয়ে ফেল্‌লে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা—বেরো, চল্ আমার সঙ্গে।"

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন; এখন মৃদু-কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, "ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকেই বা খেয়ে ফেল্‌বে কেন, আর, তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সাম্‌নে কাউকে তোর মার ধর কত্তে হবে না। যা, তুই এখান থেকে—লেপের ভেতরে ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠ্‌চে।"

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি শুধুই মার-ধর করি দিদি?"

"বড্ড করিস্ শৈল!" ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, "তোকে দেখ্‌লে ওদের মুখ যেন কালীবর্ণ হয়ে যায়—আচ্ছা যা না বাপু, তুই সুমুখ থেকে, ওরা বেরুক্।"

"আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবা-রাত্রি জ্বালাতন করলে তোমার অসুখ সারবে না। পটল সব চেয়ে শান্ত, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুতে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে", বলিয়া শৈলজা জজসাহেবের মত রায় দিয়া বড় জায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি এখন ওঠো—দুধ খাও—হাঁরে হরি, সাড়ে ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?" প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উদ্ধার করিতেছিল, তুচ্ছ ঔষধ-পথ্যের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওষুধ-টষুধ আর আমি খেতে পারব না শৈল!"

"তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর", বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোকে জিজ্ঞেস কচ্চি, ওষুধ দিয়েছিলি?" তিনি ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীত কণ্ঠে বলিল, "মা খেতে চান্ না যে!"

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিলেন, "ফের্ কথা কাটে! তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল্।"

খুড়ির কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কেন তুই এত রাত্তিরে হাঙ্গামা কত্তে এলি বল্ ত শৈল? ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে যানা শীগ্‌গীর কি ওষুধ-টষুধ আমাকে দিবি!" হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শয্যার অপর প্রান্তে নামিয়া পড়িল, এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছিপি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিলেন, "গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হ'ল, না রে হরি! জল চাইনে, মুখে দেবার কিছু চাইনে, না? এই ব্যাগার ঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বার কচ্চি।"

ঔষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাৎ ভরসা হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার মত কাটিয়া গেল। কিন্তু, এই 'মুখে দিবার কিছুর' প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিরুপায়ের মত এদিকে-ওদিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "কোথাও কিছু নেই যে খুড়ি মা!"

"না আন্‌লে কোথাও কিছু কি উড়ে আস্‌বে রে?"

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, "ও কোথায় কি পাবে, যে দেবে? এসব কি পুরুষমানুষের কাজ? শৈলর

যত শাসন এই ছেলেদের ওপরে। নীলিকে বলে যেতে পারিস নি? সে মুখ-পোড়া মেয়ে তুই আসা পর্য্যন্ত এঘর একবার মাড়ায় না—একবার চেয়ে দেখে না, মা মরেচে কি বেঁচে আছে।"

"সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় গিয়েছিল যে।"

"কেন গেল? কোন্ হিসাবে তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি? দে, হরিচরণ তুই ওষুধ ঢেলে দে—আমি অমনি খাবো" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনুপস্থিত কন্যার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ঔষধের জন্য হাত বাড়াইলেন।

"একটু থাম্ হরি, আমি আন্‌চি" বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবিআনা শিখিয়াছিলেন। ছেলেদের তিনি বিলাতি পোষাক ছাড়া বাহির হইতে দিতেন না। আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিকে বসিয়াছিলেন, কন্যা নীলাম্বরী ঔষধের তোড়-জোড় সুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "দিদি, দরজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।"

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জামার দাম কুড়ি টাকা?"

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ আর বেশী কি দিদি? আমার অতুলের এক-একটি সুট তৈরি করতে ৬০।৭০ টাকা লেগে গেছে।" সুট কথাটা সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিলেন, "কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই—এই সব আমরা সুট বলি।"

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষুব্ধভাবে মেয়েকে বলিলেন, "নীলা, তোর খুড়িমাকে ডেকে দে, টাকা বার করে দিয়ে যাক্।"

নয়নতারা বলিলেন,"চাবিটা দাও না—আমিই বার করে নিচ্চি।"

নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—সে-ই বলিল, "মা কোথা পাবে, নোয়ার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়িমার কাছে থাকে," বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিলেন, "ছোট বৌ এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিনকতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি?"

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক করিতে সুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন অতুলের নূতন কোট লইয়া রীতিমত আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। অতুল কোট্‌টা গায়ে দিয়া ইহার কাট-ছাঁট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মা ও হরিচরণ মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া ফ্যাসান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। অতুল বলিল, "ছোট খুড়িমা, তুমি দেখ ত, কেমন তৈরি করেচে।"

শৈল সংক্ষেপে 'বেশ' বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া কুড়িটা টাকা গণিয়া তাহার হাতে দিল।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া, নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোর তোরঙ্গভরা পোষাক, তবু তোর আর কিছুতেই হয় না।"

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, "কতবার বল্‌ব মা, তোমাকে? আজকালের ফ্যাসান এই রকম কাট্ ছাঁট্, অন্ততঃ একটাও এ রকমের না থাক্‌লে লোক হাস্‌বে যে!" বলিয়া টাকা লইয়া বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া বলিল, "আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে। এখানে ঝুলে আছে, ওখানে কুঁচ্‌কে আছে—ছি ছি, কি বিশ্রীই দেখায়!" তারপর হাসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক যেন একটি পাশবালিশ হেঁটে যাচ্চে!"

ছেলের ভঙ্গি দেখিয়া নয়নতারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; নীলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

হরিচরণ করুণ চক্ষে ছোটখুড়ির মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

সিদ্ধেশ্বরী নামে মাত্র আহ্নিক করিতেছিলেন, ছেলের মুখ দেখিয়া ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, "সত্যিই ত! ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাক্‌তে নেই শৈল? দে না, বাছাদের সব দুটো জামাটামা তৈরি করিয়ে।"

অতুল মুরুব্বির মত হাত নাড়িয়া বলিল, "আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তুরমত

তৈরি করিয়ে দেব,—বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবার জো নেই।"

নয়নতারা পুত্রের হুঁসিয়ারি সম্বন্ধে কি একটা বলিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমাকে জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। ওদের জামা তৈরি করবার লোক আছে।" বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিলেন, "দিদি, ছোট বোর কথা শুন্‌লে? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি?"

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু, শৈল শুনিতে পাইল। সে দু'পা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোট বোর কথা দিদি অনেক শুনেচে,—তুমিই শোননি। অতুল ছোট ভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিল্ খিল্ করে হাসলে,—ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌তুম।" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘর শুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দিদি, আজ আমার অতুলের জন্ম-বার, আর ছোট বৌ যা মুখে এল তাই বলে তাকে গাল দিয়ে গেল।" সিদ্ধেশ্বরী ছোট দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন। নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি নিজে কিছু না করে দিলে, আমাদের যাহোক্ একটা উপায় করে নিতে হবে।" তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মিনিট দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মেজ বৌ?"

নয়নতারা কহিলেন, "সেই কথাই জান্‌তে এসেচি। আমি কারু খাইনে পরিনে, দিদি, যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।"

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীত-ভাবে বলিলেন, "ঝাঁটা মারবে কেন মেজ বৌ, ওর ঐ রকম কথা। তা' ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু—"

"শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁত্‌তে চেয়েছিল। আর আমি খিল্ খিল্ করে হাসি! শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি —আবার ঝাঁটা লোকে কি করে মারে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন ওঠে নি?"

সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া গেলেন। আস্তে-আস্তে বলিলেন, "ওকি কথা মেজ বৌ? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?"

মেজ বৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতে-ছিলেন, উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন, "সে তুমিই জান। কেউ কারো মন জান্‌তে যায় না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বল্‌তে হয়। আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদ বালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বল্‌লেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?"

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, তিনি বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজ বৌ অধিকতর কঠোর স্বরে কহিলেন, "আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু, এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলেই ত দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই। উঃ—উনি শুন্‌লে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। যা'কে তা'কে বলে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুণ মানুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুর-দেবতা!"

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এমন অপবাদ আমাকে শত্তুরেও দিতে পারে না মেজ বৌ! এ সব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার কত আহ্লাদ—আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—"

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আহ্নিক হয়েচে?—একটু দুধ খাও দিদি।"

সিদ্ধেশ্বরী কান্না ভুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "বেরো আমার সুমুখ থেকে—দূর হ্যে যা।"

হঠাৎ শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "তোর যা মুখে আসবে,-তাই লোককে বল্‌বি কেন ?"

"কা'কে কি বলেচি ?"

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেম্‌নি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাকে বলে-বলে তোর বুক বেড়ে গেছে—কে তোর কথার ধার ধারে না? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস? দূর'হ আমার সুমুখ থেকে।"

শৈল সহজ ভাবে বলিল, "আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্চি। এ বাটিটায় আমার দরকার!"

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন, "খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ী থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই—দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না।"

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, "আমি এই সে দিন এসেচি দিদি, এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাকগে—কাছেই গঙ্গা—অম্‌নি বার কার নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় কচ্চ বল ত? জ্বরে জ্বরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েচে, ওঁকে কেন বিঁধচ? আমি যদি দোষ করে থাকি, আমাকে বল্‌লেই ত হয়—কি হয়েচে বল ?"

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আজ অতুলের জন্মদিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বল্‌লি!"

শৈল হাসিয়া উঠিল, "ওঃ এই? কিছু ভয় করো না মেজ্‌দি,—তোমার মত আমিও ত তার মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেম্‌নি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি; আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌চি—নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি,।"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, "আচ্ছা তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই ওকেও মন্দ বলেচিস্‌।"

"আচ্ছা, মান্‌চি" বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, "যদি অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ কর—আমি ঘাট মান্‌চি।" নয়নতারা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া, চুম্বন করিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া, চুপ করিয়া রহিলেন।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারি বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে, আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোট জায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজ জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ পাগ্‌লির কথায় কোন দিন রাগ করো না মেজবৌ! এই, আমাকেই দেখ না—ওকে বকিঝকি কত গাল-মন্দ করি; কিন্তু, একদণ্ড দেখ্‌তে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে—এত দুধ ত খেতে পারব না দিদি ?"

"পারবে, খাও।"

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্তটা খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করিস, শৈল।"

"এক্ষণি করচি" বলিয়া শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৩)

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদর যত্নে লালিত পালিত; বাপ-মা কোনদিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এতবড় অপমান তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর। কারণ, তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে—তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা—তাহাকে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু, সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু, অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ, অপমানটাই এক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাসান, অনেক কোট-প্যাণ্ট-নেক্‌টাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোট খুড়িমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যায়-যায় দেখিয়া, সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল

হইয়া উঠিল। হরিদা'কে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, "আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা! এ শর্ম্মা অতুল চন্দর,—রেগে গেলে ওসব ছোট খুড়ি-টুড়ি কাউকে কেয়ার করে না!"

হরিচরণ এদিকে-ওদিকে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল—"আমিও করিনে—চুপ্, কানাই আস্‌চে।" পাছে নির্ব্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে, এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, মোগল বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, "'বড়দা', 'মেজদা', মা ডাক্‌চেন—শীগ্‌গীর্।" হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, "আমাকে? আমি কি করেচি? আমাকে কখ্‌খন্ নয়—যাও অতুল, ছোট খুড়িমা ডাক্‌চেন তোমাকে।"

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, "দু'জনকেই—দু'জনকেই—এক্ষণি অ্যাঁ, মেজদা', তোমার নতুন কোট মাটীতে ফেলে দিলে কে?" প্রত্যুত্তরে মেজদা' শুধু সেজদা'র মুখের পানে চাহিল, এবং সেজদা'—মেজদা'র, বড়দা'র মুখের পানে চাহিল। কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমিই বলেচ, ছোট খুড়িমাকে কেয়ার কর না—"

"আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ" বলিয়া অতুল সগর্ব্বে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। ভাব্‌টা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্যকথা প্রকাশ করিয়া দিবে। হরিচরণের চেহারা আরও খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোট খুড়িমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে, তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইল না। এদিকে হাজিরির সময় নিকটতর হইয়া আসিতেছে,—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া, বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোট খুড়িমাকে বাড়ীশুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সম্বাদ লইয়া জানিল, ছোট খুড়িমা নিরামিষ-রান্নাঘরে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত, সে এই ছোট খুড়িমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে, ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়ার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া-পাইয়া, তাহার মা, খুড়ি, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইঁহাদিগের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কায পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে পারা চাই। তাহা হইলেই ইহাঁরা সায় দেন, অন্যথা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে, তাহাকে চিরকাল ঠকিয়া মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশ-ভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া, এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র, নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোট খুড়িমার তাড়া খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা—কোন প্রকার জবাবই মুখে যোগায় নাই—হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; এমন কি, মুখ তুলিলেই তিনি অতুলকে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু, রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দও শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল। নিমিষ মাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জেঠাইমার নয়,—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক্, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি নামিয়া গেল, এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্য্যন্ত সাহস

হইল না—কোন রকম সাড়া দিয়া ছোট খুড়িমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজ-দা'র পায়ের দিকে চাহিয়া, সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ-পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল, জুতা পায়ে দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোট খুড়িমার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল, নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল জুতা জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু, ছোট বোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত না, এবং স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু, পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে, তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটা কায করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত, বিবর্ণ মুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও, সে অভিমানী দুর্য্যোধনের মত সূচ্যগ্র ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, "অতুল এসেচিস্? দাঁড়া বাবা—ও কিরে, জুতো পায়ে? নীচে যা—নীচে যা—" বাড়ীর আর কোনো ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত; কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আস্‌তে নেই অতুল, নীচে যাও।" অতুল শুষ্কমুখে ক্ষীণস্বরে কহিল—"আমি ত চৌকাটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি?"

শৈলজা ধম্‌কাইয়া উঠিল—"দোষ আছে যাও।" অতুল তথাপি নড়িল না; সে মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"আমরা চুঁচ‌্‌ড়ার বাড়ীতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাটের বাইরে দাঁড়ালে কিচ্ছু দোষ নেই।"

ইহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া শৈলজা অসহ্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডম্বেল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাহিরে যাইতেছিল; শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে খুড়িমা?"

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়া ছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিছুতে নাব্‌ছে না।"

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল—"এই—নেবে আয়।"

অতুল গোঁ-ভরে বলিল, "এখানে দাঁড়াতে দোষ কি! ছোটখুড়ি আমাকে দেখ্‌তে পারে না বলে শুধু যা—যা কচ্চে।"

মণীন্দ্র তড়াক্ করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল—" 'ছোট খুড়ি' নয়—'ছোট খুড়িমা'; 'কচ্চে'—নয় 'কচ্চেন' বল্‌তে হয়,—ইতর কোথাকার!" "একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক, তাহাতে চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্ত-ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটা ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতা-বাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, আঁচড়াইয়া, কাঁমড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া, জাটতুত-খুড়তুত ভায়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব! সে বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণি মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে, এবং বয়সে ছোট ভাইদের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড় ভায়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। এ বাড়ীতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ

যে এই সমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া লাথি মারিয়া-মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা রৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জ্জনে ঘরে বসিয়া গোটাদুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্‌যোগ করিতে-ছিলেন—গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীল-বর্ণ হওয়া গেলেন। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া, মড়াকান্না তুলিয়া, ঝাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। সমস্তটা মিলিয়া এম্‌নি একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্ত্তারা কাযকর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল 'মণি, তুই বাইরে যা।' বলিয়া পুনরায় নিজের কাযে মন দিলেন। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতাও মজ বউমার উন্মত্ত ভঙ্গী দেখিয়া, লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারি ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন। অতুল কাঁদিতে-কাঁদিতে ছোট খুড়ির প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল, "ও বড়দা'কে মারতে শিখিয়ে দিলে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। হরিশ চীৎকার করিয়া বলিলেন "ছোট বৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?"

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোট খুড়ির হইয়া জবাব দিল—"সেজদা' কথা শুনেন নি, আর বড়দা'কে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।"

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিলেন—"তবে আমিও বলি ছোট বৌ—তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেল-ছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে; নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়।" "নয়ই ত!" বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন—"তোর ছোট্ খুড়িকে জিজ্ঞাসা কর্ নীলা, উনি কে যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনেছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হ'ল? আমরা উপস্থিত থাকৃতে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?"

নীলা এই তিন্ তিন্‌টা প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না। সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত, এ সংসারে তিনি ছেলে-পিলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না; কারণ, তাঁহার মনে-মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট এবং ছোট বৌ করিয়াও রাশি-প্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবার্ত্তা কহিতে, রোগে শোকে চতুর্দ্দিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে রাঁধিতে, বাড়িতে, সাজাইতে, গুছাইতে, ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্ত্তা কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন। সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরেই বলিয়া ফেলিলেন—"বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে নিজে শাসন করছ কেন? মা বেঁচে, আমি বেঁচে—ঝিবৌকে শাসন করতে হয়, আমরা কোরব। তুমি পুরুষ-মানুষ, ভাসুর,—ও কি কথা—বাইরে যাও। লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি!"

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"তুমি সব দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে ভাব্‌না কি বৌঠাকরুণ! তা'হলে কি একজন আর একজনকে বাড়ীর মধ্যে হত্যা করে ফেল্‌তে পারে?" বলিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই, তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন—"বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি ঝিবৌকে কেমন শাসন করেন।" হরিশ সে কথার আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৪)

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজ গিন্নীদের জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিটখানেক

নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আজ এসব কি হচ্ছে মেজ বৌ ?"

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিলেন—"দেখতেই ত পাচ্চ।"

"তা' ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে ?"

নয়নতারা তেম্‌নিভাবে কহিলেন—"যেখানে হোক্‌।"

"তবু, কোথায় শুনি ?"

"কি করে জান্‌ব দিদি, কোথায় ? উনি বাসা ঠিক করতে বেরিয়েচেন, ফিরে না এলে ত বল্‌তে পারিনে।"

"তোমার ভাশুর শুনেচেন ?"

"তাঁকে শুনিয়ে কি হবে ? যাঁর শোনা দরকার সেই ছোটগিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।" এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকাল বেলাটায় নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না—সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, 'দেখ মেজ-বৌ, এই ভাশুরের মান-মর্য্যাদা তোমরা বুঝ্‌লে না ; কিন্তু, বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুন্‌তে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।"

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমরা সে কথা কি জানিনে দিদি ? দুজনে দিবারাত্রি বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা মেলে। তোমার বাড়ীতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরের মত থাক্‌তে পারি ; কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও বাস করে পারব না।"

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বরে এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এ আমার বাড়ী ত নয়, মেজবৌ, বাড়ী তোমাদেরই। কোন মতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না।"

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন—"যদি কখন ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তা'হলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাক্‌ব ; কিন্তু, এখানে একটি দিনও আর থাক্‌তে বোল না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল ; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা মেজ বৌ ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে কি সেই কথা মনে রাখ্‌তে আছে ? অতুল আমাদের ছেলে—"

কথাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন—"কোন কথা মনে রাখতে পারিনে বলে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হ'ল, তখনই হাউমাউ করে কেঁদে-কেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না। আমি ত সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম ; কিন্তু,—রাগ করতে পাবে না দিদি,—তুমি যতই বল, আমাদের ছোট বৌ সহজ মেয়ে নয়। বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুণ করে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেসা করে শুন্‌তে পেলুম। না দিদি, এখানে আমাদের থাকা চল্‌বে না। এক বাড়ীতে থেকে ছেলে আমার অমন মনগুম্‌রে-গুম্‌রে বেড়ালে ব্যামোতে পড়বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে যাওয়াই সব দিকে মঙ্গল। তারও হাড় জুড়ায়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি।" বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া যে দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজ বৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারিতেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাছা রে ! বাড়ীতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, মেজ'বৌ ?" নয়নতারাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করেই দেখ না দিদি।"

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—"ও ছোট-লোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা ? বড়দা'কে যা মুখে আসে তাই বলে। ছোট খুড়িমাকে গালাগালি দেয় !"

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, "যা হয়ে গেছে, তার আর উপায় কি হরি; যা ডেকে কথা কইগে।"

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল—"ওর কথা বলবার ভাবনা নেই, মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে; সেইখানে যাক্, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।"

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোর মুখও ত নেহাৎ কম নয়, হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস্? আচ্ছা সেই ভাল; আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলা-মেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধে-ছেঁদে নিক্।"

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মল্‌বে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা কব। তা' নইলে ছোট খুড়িমা—না, মা, সে আমরা কেউ পারব না।" বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মেজ-বৌ মৃদু কণ্ঠে কহিল "কিন্তু ছোট বৌ একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা'হলে সমস্ত গোলই মিটে যায়।"

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা' যায়।" মেজবৌ কহিলেন, "তবেই দেখ দিদি। এই সব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মান্‌বে, না, ভালবাস্‌বে? বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা—নিজের ছেলে-মেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্চে, কিন্তু আমার অতুলটতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বল্‌লে, সাধ্যি কি তারা এমন করে ঘাড় নেড়ে, তেজ করে, বেরিয়ে যায়! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।"

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন—"তা বটে। এ বাড়ীর মণি থেকে পটল পর্য্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বশে। সে যা বল্‌বে, যা করবে, তাই হবে—কেউ আমাকে মানেও না।"

"এটা কি ভাল?"

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন "কোন্‌টা? ওরে ও নীলা, তোর খুড়িমাকে একবার ডেকে দেত মা।"

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিলেন না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জিনিসপত্তর বাঁধা হয়েচে—এরা তবে চলে যাক্?"

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, 'কেন?"

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "তা' বই কি—কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কয় না—কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি? আর নিজের ছেলের দিবারাত্রি শুক্‌নো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস করে? তুই এদের তা'হ'লে এ বাড়ীতে রাখতে চাস্‌নে বল্?"

নয়নতারা চিম্‌টি কাটিয়া কহিলেন—"তাহলে হয় ত সব দিকেই ছোটবৌর হয় ভাল।"

শৈলজা একথা কানেও তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, "অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ীর কোন ছেলেকেই মিশতে দিতে পারিনে, দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা' মুখে বলা যায় না।"

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"হতভাগী, মায়ের মুখের সাম্‌নে তুই অমন করে ছেলের নিন্দে করিস! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খোসে যায়।"

"আমি ইচ্ছে করে কখনো তোমার ঘর মাড়াইনে মেজদি। কিন্তু তুমি এম্‌নি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ।" বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ্চ; কিন্তু, ছোটবৌর এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ বাড়ীতে থাকি।"

সিদ্ধেশ্বরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "ওরা যা

বল্‌চে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি, মেজবৌ।”

“আমি কি বল্‌চি—সে ভাল কাজ করেচে, দিদি? জ্ঞান বুদ্ধি থাক্‌লে কেউ কি বড় ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায়ে নাকখ্‌ত দিচ্চি,” বলিয়া নয়নতারা মাটীতে সজোরে নাক ঘসিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—“তাকে তোমরা মাপ কর দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে—”বলিয়া নয়নতারা আর-একবার বোধ করি মাটীতে নাক ঘষিতে যাইতেছিলেন—সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া-কহিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “তোর মনের কথা খুলেই বল্ না শৈল, মেজ বৌরা চলে যাক্।”

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাউনি সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল—বলিলেন, “আপনার মারপেটের ভাই ভাজকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চুণকালী দিক্। আমার সংসারে বনিয়ে না চল্‌তে পার, যেখানে সুবিধে হয় সেইখানে তোমরা চলে যাও—আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার নও!” বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি তাঁহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতাবেড়ী নাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্ত্তা আহারে বসিলে, সিদ্ধেশ্বরী পাথার বাতাস করিতে করিতে দুঃখ অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন; কহিলেন, “মেজ বৌদের আর ত এবাড়ীতে থাকা পোষায় না দেখচি। আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্চে!” গিরিশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, “তা বই কি। এম্‌নি ত ছোট-বোর সঙ্গে তিলার্দ্ধ বনে না, তার ওপর ছোট বৌ বাড়ীর সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে,—কেউ অতুলের সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক'য় দিনে শুকিয়ে যেন অর্দ্ধেক হয়ে গেছে—”

এই সময়ে শৈলজা দুধের বাটী হাতে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটী রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, “এই যে ছোট-বৌ”—বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। ওপক্ষের দোষ যতই হোক অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না। দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন। বলিলেন, “এই যে শৈল এখন থেকেই ভায়ে-ভায়ে অসদ্ভাব করে দিচ্চে, বড় হলে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি করে বেড়াবে—এটা কি ভাল?”

কর্ত্তা ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া বলিলেন—“বড় খারাপ।” সিদ্ধেশ্বরী কহিতে লাগিলেন, “ওর জন্যেই ত মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙালে। আচ্ছা, সে-ও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েচে—চুকে-বুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ করে দেওয়া! আজ তুমি মণি-হরিকে ডেকে বলে দিয়ো—তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে। নইলে ওরা চলে গেলে যে পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চুণকালী দেবে। সত্যিই ত আর ছোট বৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না।”

“তা ত নয়ই” বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন। আচ্ছা, ছোট ঠাকুরপো কি কোনদিন কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবে না? এম্‌নি করেই কি চিরটা কাল কাটাবে?”

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্ত্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এই সকল প্রসঙ্গ সে কোনদিন শুনিত না; এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার মনে-মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অথচ, সত্যকেই সে আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয়ই হোক, বা অপ্রিয়ই হোক, বলিতে বা শুনিতে কোনদিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে সে তাহার এই স্বভাবটিকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা সুকঠিন।

(ক্রমশঃ)

প্রাণময় জগৎ

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ পি, আর, এস]

পুরাণে না কি গল্প আছে, প্রজাপতির প্রাণী সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, এবং তিনি কয়েকটি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। উহারা জন্মিবামাত্র খাই-খাই করিয়া উঠিল, এবং আর কিছু না পাইয়া, অবশেষে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই খাইতে উদ্যত হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা বিপদ দেখিয়া বহুতর প্রাণী সৃষ্টি করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, "তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর"। তদবধি প্রাণীরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, কেহ কাহাকেও খাতির করে না।

এবার প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করিব, এইরূপ আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত আছি। গণ্ডগোল পরিহারের জন্য গোড়ায় বলিয়া রাখি,—প্রাণী আর জীব, এই দুইটি শব্দ আমি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিব। ইংরেজীতে যাহাকে living being বা living organism বলে, প্রাণী বলিতে আমি তাহাই বুঝিব। উদ্ভিদ্ এবং জন্তু, vegetable and animal, সমস্তই প্রাণীর পর্য্যায়ে পড়িবে। আর জীব শব্দটি আমি কেবল চেতন জন্তু, conscious animal, এই সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঁধিয়া রাখিব। উদ্ভিদের অথবা নিম্নশ্রেণীর জন্তুর চেতনা আছে কি না, এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা না পাইয়াও, মোটামুটি আমরা চেতন এবং অচেতন, এই দুই শ্রেণীতে যাবতীয় প্রাণীকে ফেলিয়া থাকি; চেতন ও অচেতন বলিলে কি বুঝিব, তাহার স্থূল ধারণাও আমাদের একটা আছে। সেই স্থূল ধারণা লইয়াই এখন আমাদের কাজ চলিবে। ধরিয়া লইলাম,—প্রাণ এবং চেতনা, এই দুইটা স্বতন্ত্র concept। বহু প্রাণীর চেতনা আছে বটে, কিন্তু প্রাণীমাত্রেরই চেতনা না থাকিতে পারে। ইংরেজীতে প্রাণের তর্জ্জমায় life এবং চেতনার তর্জ্জমায় consciousness রাখা যাইতে পারে।

জড় জগৎ লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষতঃ উহা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক। তদ্ব্যতীত, জড়ের সহিত কারবারে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত একটা বিরোধের বা resistanceএর প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমরা পাইয়া থাকি। এই resistanceএর অনুভূতিকেই পণ্ডিতেরা জড় পদার্থের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া থাকেন। কেন না, যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ে বঞ্চিত, যে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, যাহার আস্বাদনের বা ঘ্রাণের ক্ষমতা নাই, যে শীতোষ্ণতা বুঝিতে পারে না, তাহারও muscular sensation থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সে জড় পদার্থকে একটা resisting something-রূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। এই অনুভবের ক্ষমতাটুকু হারাইলে তাহার পক্ষে জড় পদার্থের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ফলে, আমাদের মত সাধারণ চেতন জীবের পক্ষে রূপরসাদির অতিরিক্ত এই প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতিই জড় পদার্থের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। বিজ্ঞানবিদ্যা কিন্তু সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া, extension এবং motion এই দুই মনগড়া conceptএর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়া থাকেন। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের আর দরকার নাই। প্রত্যক্ষ perceptionএর দিক দিয়া, আর কল্পিত conceptionএর দিক্ দিয়া, জড় পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার আমি চেষ্টা করিয়াছি; এবং আমার চেষ্টা যদি নিতান্তই ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদেরও সে বিষয়ে কতকটা ধারণা জন্মিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে বাগ্-বাহুল্য করিয়া আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিব না। আপনারা জানেন, প্রাণীমাত্রেই একটা দেহ ধারণ করে, এবং প্রাণীদের সেই দেহ জড় দ্রব্যেই নির্ম্মিত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাবতীয় প্রাণীর দেহকে কাটিয়া ছাঁটিয়া চিরিয়া পোড়াইয়া নানারূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু পরিচিত জড় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের সন্ধান পান নাই। জড় জগৎ হইতেই মসলা সংগ্রহ করিয়া প্রাণিদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণী আছে কি না, জানি না; থাকিলেও তাহাদের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল

প্রাণী আছে, তাহারা দেহ গড়িবার সময় জড় জগৎ হইতেই মসলা লয়; তবে একটু বাছাই করিয়া লয়। এ বিষয়ে, তাহাদের একটু বিশিষ্ট রুচি আছে। আপনারা জানেন, যাবতীয় জড় দ্রব্যের মধ্যে তাহারা carbon বা কয়লা, আর হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন, এই চারিটা দ্রব্যকেই বাছিয়া লয়, এবং এই চারিটার সহিত যৎকিঞ্চিৎ গন্ধক বা ফস্ফরস্ বা আর কিছু যোগ করিয়া আপনাদের দেহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মসলা তৈয়ার করিয়া লয়। অন্য কোন সামগ্রী গ্রহণ করে না; অথবা, উপস্থিত হইলে, অন্য সামগ্রী বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে। এই কয়টা জিনিসে যে মসলা প্রস্তুত হয়, পণ্ডিতেরা তাহার নাম দিয়াছেন, প্রোটোপ্লাজম্। এই প্রোটোপ্লাজমই প্রাণিদেহ গড়িবার মসলা, ইহাকেই প্রাণি-পদার্থ বলিব। এই জিনিষটা ইট, কাঠ, লোহার মত শক্তও নয়,আবার তেল জলের মত নিতান্ত তরলও নয়। উহা না কঠিন, না তরল; পরন্তু, কোমল, নমনীয়, flexible। আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের laboratoryতে বসিয়া নানা রকমের সামগ্রী তৈয়ার করিতেছেন; কিন্তু কয়লার সহিত হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন মিলাইয়া এই প্রোটোপ্লাজম এ পর্য্যন্ত তৈয়ার করিতে পারেন নাই। চেষ্টার অন্ত নাই; কিন্তু যাবতীয় চেষ্টা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। কেহ বা এখনও আশা রাখেন, কেহ কেহ বা হাল ছাড়িয়া বলিতেছেন, যে laboratoryতে আমরা প্রোটোপ্লাজম কখনই প্রস্তুত করিতে পারিব না। প্রাণীরা কিন্তু স্বভাবতঃ প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং প্রাণীদের মধ্যে যেগুলাকে vegetable বা উদ্ভিদ বলা যায়, তাহাদেরই আবার এই ক্ষমতা অত্যন্ত পরিস্ফুট। উদ্ভিদেরা জড় জগৎ হইতে কয়লা, আর অক্সিজন হাইড্রোজন নাইট্রোজন টানিয়া লয়, এবং তাহাদিগকে মিলাইয়া আপনাদের দেহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মসলা,—ঐ যে প্রোটোপ্লাজম,—তাহা প্রস্তুত করে। এই কাজের জন্য উদ্ভিদ-গুলাকে বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সূর্য্যদেব নয়কোটী মাইল দূরে থাকিয়া যে রাশি-রাশি উত্তাপ এবং আলো প্রায় সম্পূর্ণ অকারণে চারিদিকে ফেলা-ছড়া করিতে-ছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় করিয়া উদ্ভিদেরা প্রোটো-প্লাজম প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং তদ্দারা আপনাদের দেহ গড়িয়া দেহের মধ্যে উহা সঞ্চিত রাখে। জন্তুগুলা চতুর; তাহারা উদ্ভিদের নিকট ঐ প্রোটোপ্লাজম ধার করিয়া লয় অথবা কাড়িয়া লয়, এবং সেই তৈয়ারী মসলাকেই একটু খাঁটিয়া লইয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করে। ফলে, আপনারা জানিয়া রাখুন, যে, প্রাণীমাত্রেরই—উদ্ভিদ ও জন্তু এই উভয়বিধ প্রাণীরই—দেহ প্রোটোপ্লাজমে নির্ম্মিত। এই প্রোটোপ্লাজম জড় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা একটু বিশিষ্ট রকমের জড় পদার্থ। অন্যান্য দ্রব্যকে বর্জ্জন করিয়া কয়েকটা বিশিষ্ট দ্রব্যে এই প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ কয়টা দ্রব্যই কেন বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। হার্বাট স্পেন্সার বলিতেন যে, ঐ কয়টা বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বন বা কয়লা অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য; উহার তরলতাপাদন দুঃসাধ্য। আর হাইড্রোজন, অক্সি-জন, নাইট্রোজন—এই তিনটা দ্রব্যের কাঠিন্য সম্পাদন, এমন কি, তরলতাপাদনও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সে দিন পর্য্যন্ত উহারা permanent gas নামেই পরিচিত ছিল; সম্প্রতি অতি কষ্টে উহাদিগকে জমাট বাঁধান গিয়াছে। এই অতি কঠিন কয়লার সহিত এই অতি চঞ্চল গ্যাস কয়টিকে কোন-রূপে মিলাইয়া যে না-কঠিন না-চঞ্চল প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রাণীদিগের কোমল কমনীয় দেহ নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বথা উপযোগী। স্পেন্সারের এই কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব; বুদ্ধিবলে কত অঘটন ঘটাই-তেছে; এখনও কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারে নাই। বুদ্ধিবলে ইহা ঘটাইতে পারা যায় নাই বটে, কিন্তু গাছপালার মত একেবারে বুদ্ধিহীন অচেতন প্রাণী কিরূপে সূর্য্যের আলোকে খাটাইয়া লইয়া এই প্রোটো-প্লাজম প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞান-বিদ্যার এখনও কল্পনায় আসে নাই। বিজ্ঞানবিদ্যা কোনরূপ conceptual formulaয় উহার কোনরূপ বিবরণ বা description দিতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনা এখনও একটা রহস্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। মানুষের Reason বা প্রজ্ঞা এখানে অদ্যাপি প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা প্রজ্ঞা-দেবীর পরম ভক্ত, প্রজ্ঞার ক্ষমতার সীমানা টানিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহারা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, একদিন-না-একদিন এ রহস্যের ভেদ হইবেই। ক্রমাগত experiment করিতে-করিতে একদিন আমরা বাহির করিতে

পারিবই যে, কিরূপ ঘটনাচক্র, কিরূপ ঘটনার পরিবেশ, কিরূপ circumstances, কিরূপ conditions, উপস্থিত করিতে পারিলে কয়লা, হাইড্রোজন প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রোটোপ্লাজমের উৎপাদন করিবে। সেই ঘটনাচক্র কৌশলক্রমে উপস্থাপিত করিবামাত্র ঐ দ্রব্যগুলা পরস্পর মিলিত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ হইতেছে, সেই ঘটনাচক্রের আবিষ্কার। হাইড্রোজন ও অক্সিজন একত্রে মিশ্রিত করিয়া আগুন দিবামাত্র উহা জলে পরিণত হয়। লোহাকে সোঁতা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে, উহা মরিচায় পরিণত হয়। সেইরূপ, সেই ঘটনাচক্র আবিষ্কার করিতে পারিলেই, উত্তাপ বা আলো বা তাড়িত বা X— ray বা আর কিছুর প্রয়োগ দ্বারা আমরা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারিব। কোন্ পথে চলিলে সেই ঘটনাচক্র আবিষ্কৃত হইবে, এখন খোঁজ সে পথ। এখন সম্পূর্ণ আঁধার দেখিতেছি; কিন্তু একদিন-না-একদিন পথ আবিষ্কৃত হইবেই। প্রজ্ঞা তখন আপনার দীপশিখা জ্বালিয়া সেই পথে চলিতে-চলিতে প্রাণি-পদার্থ নির্ম্মাণের formula গড়িয়া লইবে এবং তৎ-সাহায্যে design করিয়া প্রাণি-দেহের মসলা বানাইবে এবং হয় ত সেই মসলা হইতে প্রাণিদেহ গঠনেরও উপায় উদ্ভাবন করিবে। অতএব হতাশ না হইয়া খোঁজ সেই পথ। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠের স্তর অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতীতকালে এমন এক দিন ছিল, যখন ভূপৃষ্ঠে কোন প্রাণী বিদ্যমান ছিল না। হয় ত ভূপৃষ্ঠ তখন এত তপ্ত ছিল যে, সেই তপ্ত অবস্থায় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় নাই। অথবা, তখন বায়ুমণ্ডলের বা অন্তরিক্ষের এমন অবস্থা ছিল, যাহাতে কয়লার সহিত অক্সিজন, হাইড্রোজন প্রভৃতির সংযোগ-সাধন সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে, ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, অথবা অন্তরিক্ষের অবস্থা-বিকৃতি ঘটিয়া একদিন এরূপ ঘটনাচক্র উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে আপনা হইতেই কয়লার সহিত অক্সিজন প্রভৃতির যোগ ঘটিয়া গেল এবং প্রাণি-দেহের মসলা প্রস্তুত হইল। নতুবা, ভূস্তর অন্বেষণ করিয়া এরূপ দেখা যায় কেন, যে পৃথিবীতে প্রাণী এককালে ছিল না, সহসা একদিন প্রাণীর আবির্ভাব হইল, এবং সেই আবির্ভাবের পর হইতে প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিল? তখন যে ঘটনাচক্র উপস্থিত হইয়াছিল আমরা যদি laboratoryতে বসিয়া যন্ত্রযোগে, বুদ্ধিবলে, সেইরূপ ঘটনাচক্র ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে এখনই বা সেই প্রাণি-পদার্থ প্রস্তুত হইবে না কেন? অতএব খোঁজ খোঁজ, কেবলই পথ খোঁজ। হতাশ হইও না।

অপর পক্ষের লোক, যাঁহারা laboratoryতে প্রাণি-পদার্থ এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা বলিতে চাহেন, আমাদের যন্ত্র-তন্ত্রের যতই উন্নতি হউক, আমরা কৌশলে বা বুদ্ধিবলে কখনই প্রাণি-পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারিব না। এই প্রাণ বা life একটা কিস্তূতকিমাকার অপরূপ পদার্থ—যাহা কখনও প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করিবে না। কখনই আমরা বুদ্ধিবলে উহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব না। যে প্রাণী, যাহার প্রাণ আছে, সেই প্রাণী,—প্রাণহীন জড়-পদার্থকে, non-living dead matterকে, প্রাণিপদার্থে—living matterএ—পরিণত করিবার স্বভাবতঃ ক্ষমতা রাখে। অতি সামান্য অচেতন উদ্ভিদ-কণিকার পক্ষে যাহা সাধ্য—স্বভাবতঃ সাধ্য, বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধিকৌশলে তাহা সাধ্য নহে। আমাদের চোখের সামনে ছোট-বড় গাছগুলা—তৃণ হইতে বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত গাছগুলা—আকাশের অভিমুখে সবুজ পাতা বিছাইয়া দিয়া, সূর্য্যের আলোকে খাটাইয়া লইয়া, বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে; এবং সোঁতা মাটীর ভিতর শিকড় চালাইয়া লোণা জল সঞ্চয় করিতেছে; এবং সেই লোণা জলের সহিত কয়লা সংযোগ করিয়া প্রাণি-পদার্থ স্বভাবতঃ প্রস্তুত করিতেছে; এবং সেই মসলায় আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লইতেছে। ঐ গাছ-গুলার যে ক্ষমতা আছে, এত চতুর জন্তু-গুলার সে ক্ষমতা নাই। এমন কি, এত বড় বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক মানুষেরও সে ক্ষমতা নাই। শুধু নাই নহে; সে ক্ষমতা তাহাদের পাইবারও কোন আশা দেখি না। তাহাদিগকে চিরকালই সেই গাছপালার নিকট হইতে খাদ্যসামগ্রী ধার করিয়া লইয়া, অথবা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ এবং দেহ রক্ষা করিতে হইবে। গাছপালার এই প্রাণ আছে বলিয়াই সে dead matterকে living

matterএ পরিণত করিতে পারে। এই প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ভূ-পৃষ্ঠে একদিন এই প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, এবিষয়ে ভূ-বিদ্যার সাক্ষ্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। একদিন সহসা কি-জানি-কিরূপে ধরাতলে এই প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তদবধি ইহার স্রোত চলিতেছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু প্রাণের আকস্মিক আবির্ভাব কিরূপে হইল, কিরূপ ঘটনাচক্রে হইল, তাহা এখন জানি না। জানিয়াও বিশেষ লাভ হইবে না। আমরা laboratoryতে যন্ত্র-তন্ত্র-যোগে সেই ঘটনাচক্র ঘটাইতে পারিলেও, প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে পারিব না। উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ, একটা অপরূপ অদ্ভুত পদার্থ, যাহা কিছুতেই আমাদের formulaর মধ্যে ধরা দিবে না, কিছুতেই আমাদের হুকুম মানিবে না। এই প্রাণের আবির্ভাব, ইহা হয় ত বিধাতা-পুরুষের একটা খেয়াল, ইহা তাঁহার special creation; একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হউক, অমনই জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হইল। অমনই খানিকটা প্রাণহীন জড় দ্রব্য প্রাণময় প্রোটোপ্লাজম পদার্থের উৎপত্তি ঘটাইল। তদবধি সেই প্রোটোপ্লাজমই জড় জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, নূতন প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতেছে; তাহাতে প্রাণের ধারা অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। বিধাতা-পুরুষ নিরুদ্বেগ হইয়া আপনার কেরামতি দেখিতেছেন, অথবা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, সেই creation কার্য্য এখনও চলিতেছে। বিধাতা-পুরুষ ঘুমান নাই, এখনও তিনি আমাদের অজ্ঞাত দেশে অজ্ঞাত উপায়ে প্রাণি-পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন, আমরা তাহার কোন সন্ধান রাখি না।

Creation-বাদীরা এইরূপে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে নিরস্ত করিতে চাহেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা যতদিন প্রাণ-পদার্থকে আয়ত্ত করিতে না পারিবেন, যতদিন laboratoryতে বসিয়া প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, ততদিন প্রতিপক্ষকে একবারে নিরুত্তর করিতে পারিবেন না। তবে বিজ্ঞানবিদ্যা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, আমরা এতকাল খেজুরের রস এবং আখের রস হইতে চিনি পাইতাম,—এখন যখন laboratoryতে বসিয়া চিনি তৈয়ার করিতে পারিতেছি, তখন একদিন খেজুরের গাছ এবং আখের গাছ গড়িয়া তুলিতে পারিব না কেন? পরাজয়-স্বীকার বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাব নহে।

আপনারা Vitalist বা প্রাণবাদী এবং Mechanist বা জড়বাদী বা যন্ত্রবাদী, এই দুই দলের দ্বন্দ্বের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। এই দ্বন্দ্ব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং শীঘ্র মিটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। British Association সভায় এক বৎসরের প্রেসিডেণ্ট mechanistic থিয়োরির জয় গান করেন। পর বৎসরের সভাপতি vitalismএর ধ্বজা তোলেন। উভয় পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার মূল কোথায়, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। Mechanistরা বলেন, প্রাণি দেহ একটা যন্ত্রমাত্র। ক্লক ঘড়ি বা ষ্টিম এঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন একটা যন্ত্র, সেইরূপ একটা যন্ত্রমাত্র। ইহার জটিলতার অন্ত নাই বটে, কিন্তু তথাপি ইহা একটা যন্ত্রমাত্র। ঘড়ির কিম্বা এঞ্জিনের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব কি কাজ করে এবং কিরূপে কাজ করে, তাহা আমরা জানি। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব, আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারি এবং যথাস্থানে স্থাপন ও সন্নিবেশ করিয়া যন্ত্রকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গগুলি কোন্‌টায় কি কাজ করে, তাহা আমরা সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে আজিও পারি নাই। কিরূপে কাজ করে, তাহাও অধিকাংশ স্থলে বুঝিতে পারি নাই। আমাদের রাসায়নিক পণ্ডিতেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এখনও গড়িয়া তুলিতে পারেন না। যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া সাজান-গোছান, তাহাও এখন সার্জনদের পক্ষে অসাধ্য। কাজেই ঐ দেহ-যন্ত্র আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারিতেছি না। কিন্তু Physiology এবং Chemistry বিদ্যা এই সকল তথ্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি। কালে সমস্তই হয় ত বুঝা যাইবে। তখন এখন যাহা অসাধ্য, তাহা অসাধ্য থাকিবে না। এই যে গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত প্রকাণ্ড সৌর-জগৎ ইহা আমরা স্বহস্তে গড়ি নাই, বা কখন গড়িতে পারিবও না। তথাপি ইহাও ত একটা যন্ত্রমাত্র। এই সৌর-জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবিধি for-

mulaর ভিতর ফেলিয়াছি। সেই formula-র প্রয়োগে উহাদের গতিবিধির সূক্ষ্ম গণনা আমাদের সাধ্য হইয়াছে। সেইরূপ দেহযন্ত্র কখন আমরা গড়িতে না পারিলেও উহার যাবতীয় গতিবিধি আমাদের formulaর মধ্যে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় ধরা দিবে। সৌরজগৎ যেমন Mechanics-বিদ্যার আয়ত্ত হইয়াছে, দেহ-যন্ত্রও সেইরূপ Mechanics বিদ্যার আয়ত্ত হইবে। খাঁটি Mechanicsএর আয়ত্ত না হ'ক, Physics এবং Chemistry-বিদ্যার আয়ত্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোন হেতু দেখি না। প্রাণহীন জড় জগতেও সর্ব্বত্র আমরা mechanical description দিতে পারি নাই। একটা steam-engine বা একটা dynamoর আমরা সম্পূর্ণ mechanical description দিতে পারি না;—Physics এবং Chemistry-র আশ্রয় লইতে হয়—তাপ-বিদ্যা, তাড়িত-বিদ্যা, এবং রসায়ন-বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যাও নূতন নূতন স্বতন্ত্র formula গড়িয়া steam engineকে এবং dynamo-যন্ত্রকে আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। Physics এবং Chemistry-র আরও উন্নতি হইলে প্রাণি-দেহের মত জটিলতর যন্ত্রকেও আয়ত্ত করিতে না পারিব কেন? এই কয় বৎসরের মধ্যেই Physiology-বিদ্যা প্রাণি-দেহের অনেক তথ্যকে mechanical, physical এবং chemical formula-য় ফেলিয়াছে। হতাশ হইও না, হাল ছাড়িও না, কেবল পথ খোঁজ। দেহ-যন্ত্রের জন্য কোনরূপ mysterious vital forceএর অবতারণা করিতে হইবে না।

গণ্ডগোল হয় এই vital force নামটা লইয়া। একপক্ষ প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এই vital force-এর অবতারণা করেন; বলেন যে, mechanical physical বা chemical forces প্রাণের স্বরূপ-নির্ণয়ে কুলাইবে না। যেখানে কুলায় না, সেইখানেই তাঁহারা বলেন, 'ওঃ, এটুকু ত vital force-এর কাজ'। এই vital force নামটি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত তৃপ্তি দেয়, তাঁহাদের মনে পরম শান্তি আনয়ন করে। 'এটা vital forceএর কাজ'—এই বলিলেই তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত হ'ন। যেন আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহাদের এইরূপ আচরণে ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না। ' বিজ্ঞানবিদ্যা vital force নামটা শুনিলেই চটিয়া যান; বলেন, এ আবার কি উৎপাত? আমি mechanical, chemical, physical force বুঝি; এই কিম্ভূতকিমাকার vital force এর উৎপাত আমার পক্ষে অসহ্য। প্রকৃত পক্ষে vital force নামটার উপর এরূপ চটিবার সম্যক হেতু দেখি না। জড় জগতের mechanical description দেওয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার চরম লক্ষ্য বটে। গ্যালিলিও, নিউটন এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরা এই পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-বিদ্যা জড় জগতের যাবতীয় ঘটনাকে mechanical formula-য় ফেলিতে পারেন নাই। যখনই দরকার হইয়াছে, তখনই নূতন নূতন non-mechanical concept গড়িয়া নূতন নূতন forceএর আশ্রয় লইয়াছেন। Electric force magnetic force, chemical force ইত্যাদি নূতন নূতন non-mechanical concept-এর আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ, প্রাণের তথ্য বুঝাইতে গিয়া যদি একটা নূতন conceptর আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার vital forceই নাম দেওয়া যায়, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার চটিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা নিজেই তাহা করিয়া আসিতেছেন। আসল বিরোধটা নাম লইয়া নহে; বিরোধ—ভাব লইয়া, তাৎপর্য্য লইয়া। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা vital force বলিতে এমন একটা-কিছু বোঝেন, যাহা কস্মিন্‌কালে formula-র মধ্যে ধরা দিবে না, যাহা গণনার আমলে আসিবে না, যাহা Reason-এর বা প্রজ্ঞার বশীভূত হইবে না, মানুষের Intelligence যাহাকে খাটাইয়া কোন কাজে লাগাইতে পারিবে না; কোন কর্ম্মসাধনে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। এইখানেই বিজ্ঞান-বিদ্যার আপত্তি। বিজ্ঞান-বিদ্যা vital force নাম প্রয়োগ করিতে স্বচ্ছন্দে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন যে, electric force, বা magnetic force, বা chemical force-এর মত এই vital force-কেও একদিন আমি formula-বদ্ধ করিতে পারিব। হয় ত শেষ পর্য্যন্ত Matter এবং Motion-এর অথবা extension ও inertia-র terms এ ইহার বিবরণ দিতে পারিব। আজি না পারি, শত বর্ষান্তে পারিব। আজিও আমি electric, magnetic ও chemical force-কে একটা mechanical formula-য়

ফেলিতে পারি নাই। কিন্তু উহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন non-mechanical formulaয় আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। সেইরূপ এই vital force একদিন-না-একদিন formula-য় বাঁধা পড়িবে। উহার দ্বারা প্রাণি-দেহরূপ জটিল যন্ত্রের যাবতীয় ঘটনা আমার গণনা-সাধ্য হইবে। সৌর জগৎ বা ষ্টীম এঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন আমার গণনার আমলে আসিয়াছে, দেহ-যন্ত্রেরও যাবতীয় ব্যাপার সেইরূপ আমার গণনার আমলে আসিবে।

এখন আপনারা দেখিতেছেন, Vitalist এবং Mechanist-দের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কোথায়। দ্বন্দ্বের মূল নামে নহে, দ্বন্দ্বের মূল নামের তাৎপর্য্যে। Vitalist-রা বলেন, এই যে vital force, ইহা কখন গণনার বশ হইবে না। Mechanist রা বলেন, যদি কখন গণনার বশ হয়, তবেই উহাতে আমার কাজ চলিবে, নতুবা এই উহা আমার অগ্রাহ্য; একটা মিছানামে আমি লোকের চোখে ধূলা দিতে চাহি না। কথাটা ভাল করিয়া বুঝুন। কোন ঘটনা গণনাযোগ্য হইলেই যে সর্ব্বদা আমরা উহা গণিতে পারি, এমন নহে। দৃষ্টান্ত লউন। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়,—অন্তরিক্ষ-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা, atmospheric phenomena,—অন্তরিক্ষবিদ্যা বা meteorology বিদ্যা ইহাদের গণনায় নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক রাজ্যে গবর্ণমেণ্ট বহুত টাকা খরচ করিয়া এক একটা meteorological department পুষিতেছেন। বড় বড় পণ্ডিত গণনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কত সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়া তাঁহারা দিবারাত্রি অন্তরিক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অথচ meteorologist-দের forecast-এ—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গণনায়—লোকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে? ইহার মানে কি? অন্তরিক্ষ-সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা জড় জগতের ঘটনা, physical phenomena। সমস্তই Mechanical এবং Physical Science-এর আলোচ্য। ইহার অধিকাংশ formula-ই আমরা গড়িয়া ফেলিয়াছি। অথচ সেই সকল formula আমরা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলে একখানা মেঘোৎপত্তির factor এতগুলা যে, সমুদয় factor-এর হিসাব লইয়া formulaর প্রয়োগ করিয়া আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি না। সমাধান করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা সমাধানযোগ্য—fully determinate—সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহার কোন স্থলে কোন রহস্য, কোন mystery নাই। সমস্ত factorগুলার সমস্ত dataগুলার হিসাব লইতে পারিলে, অন্তরিক্ষঘটিত প্রশ্নের অঙ্কপাত করিয়া একটা না একটা উত্তর মিলিবে; একটা বই দুটা উত্তর হইবে না। সমস্ত factor-এর হিসাব লইতে পারি না বলিয়াই আমরা যে উত্তর পাই, তাহা অত্যন্ত মোটা হয়, অত্যন্ত approximate হয়। এত মোটা হয় যে, গণনা-ফলের সঙ্গে দৃষ্টফলের গরমিল দেখিয়া লোকে বিদ্রূপ করে। এটা বিজ্ঞানবিদ্যার অপূর্ণতার এবং অক্ষমতার পরিচয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অন্তরিক্ষবিদ্যাকে কেহ physical science-এর বাহিরে ফেলিতে চাহিবেন না। বস্তুতই গণনা কার্য্যটা বড় বিষম কার্য্য। অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনা এত জটিল, যে, উহার সমস্ত dataর, সমস্ত factorএর, হিসাব লওয়া কঠিন। Formulaগুলাও এখনও সর্ব্বত্র পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাহার উপর গণনা-বিদ্যা বা mathematics-বিদ্যা গণকের হাতে একমাত্র অস্ত্র; উহা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র হইলেও অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় এখনও পরাঙ্মুখ। ধরুন না জ্যোতিষশাস্ত্র। দুইটা জড় দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহার formula নিউটন দিয়া গিয়াছেন। সে formulaটিতে কোন অপূর্ণতা আছে বলিয়াই মনে হয় না। যে কোন দুইটা দ্রব্যের মধ্যে উহা অক্লেশে প্রয়োগ করা চলে; এবং গণনাফলে ও দৃষ্টফলে কোন ভেদ হয় না। সূর্য্যের সম্মুখে পৃথিবীর গতিবিধি বা পৃথিবীর সম্মুখে চন্দ্রের গতিবিধি অক্লেশে গণিতে পারা যায়। যে-কোন স্কুলের ছেলের পাটীগণিতে একটু জ্ঞান আছে, সেই অক্লেশে ইহা গণিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটার উপরে তিনটা দ্রব্য হইলেই,—সূর্য্যের পাশে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়কে রাখিয়া হিসাব করিতে গেলেই,—গণনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তখন পাটীগণিতে কুলায় না, Problem of Three Bodies সমাধান করিতে লাপ্লাসের মাথা আবশ্যক হয়। আর Problem of Four Bodies, চারিটা দ্রব্যের পরস্পরের সম্পর্কে গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে লাপ্লাসের মাথাতেও কুলায় না; তখন approximate solutionএ—মোটা উত্তরেই—তৃপ্ত থাকিতে হয়। অথচ formula সেই একটি, নিউটন যাহা

বাঁধিয়া দিয়াছেন। ত্রুটি নিউটনের formulaর নহে; ত্রুটি গণিত-বিদ্যার। একালের গণিত-বিদ্যা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র। কিন্তু জটিল জগদ্‌যন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিতে গিয়া উহাকেও পরাহত হইয়া আসিতে হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থায়, বর্ত্তমান অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে, সূক্ষ্ম গণনা সর্ব্বত্র সাধ্য না হইলেও, জড় জগতের ঘটনাবলী যে সম্পূর্ণ নিয়মবদ্ধ, উহার কোন স্থানে কোন ফাঁক নাই, উহার সর্ব্বত্র determinism, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহমাত্র করেন না। প্রাণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা Mechanist, তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন যে, প্রাণের সমুদায় তত্ত্বও fully determinate;—সম্প্রতি আমরা formulaয় ফেলিতে পারি আর না পারি, গণনা করিতে পারি আর না পারি, প্রাণসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা জড় জগতের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় সমাধানযোগ্য; উহা স্বভাবতঃ indeterminate নহে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা Vitalist, তাঁহারা এইটুকু মানিতে চাহেন না। তাঁহারা জোরের সহিত বলিতে চাহেন—প্রাণি-দেহ যখন জড় পদার্থে নির্ম্মিত, যখন উহাতে সাধারণ জড়-ধর্ম্মগুলি বিদ্যমান আছে, তখন উহার কিয়দংশ physical science-এর বা mechanical scienceএর আলোচ্য হইতে পারে বটে; এখনও আলোচ্য হইতেছে, এবং পরে আরও হইবে, ইহা স্বীকার করি বটে; কিন্তু প্রাণের যাহা বিশিষ্টতা, যাহাতে প্রাণের প্রাণত্ব, তাহা কখনই physical science-এর আমলে আসিবে না, কখন formula-য় ধরা দিবে না, কখনও গণনাযোগ্য হইবে না। উহা স্বভাবতই গণনার অযোগ্য, স্বভাবতই indeterminate এবং incalculable; উহাতে কোন নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারিবে না; উহা চিরকালই খেয়ালের সামগ্রী থাকিবে। উহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম freedom। প্রাণবাদীরা এই গণনার অযোগ্য, বিধিবহির্ভূত, ব্যাপারেরই নাম দিয়াছেন vital force; তাঁহাদের মতে উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য অন্যান্য forceএর সজাতীয় নহে।

আপনারা creation আর evolution এই দুইটা কথা শুনিয়াছেন। বাঙ্গালায় evolution-কে অভিব্যক্তি বা পরিণতি বলা যাইতে পারে এবং creation-কে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। আমি এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছি। সর্ব্বদা অতি সাবধানে প্রয়োগ করিয়াছি। সর্ব্বত্র উহাকে এই creation অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই creation বা সৃষ্টি বস্তুতই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, nothing হইতে somethingএর উৎপত্তি। আপনি হয় ত বলিবেন, এই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি unthinkable, চিন্তার অগম্য। অতএব উহা বাজে কথা। বাজে কথা হ'ক আর না হ'ক, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি, অধিকাংশ মাঝারি মানুষ, আপনি যাহাকে চিন্তার অগম্য বলিতেছেন, তাহা অবলীলাক্রমে মানিয়া আসিতেছে। ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদের সমুদয় শাস্ত্রটা এই creation তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুই ছিল না, বিধাতা-পুরুষের খেয়ালে একদিন সবই হইল, ইহাই ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদের সৃষ্টিতত্ত্ব। সূক্ষ্মভাবে সন্ধান করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমাদের ব্রাহ্মণের শাস্ত্রেও এই সৃষ্টিতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা creation-তত্ত্বের পাশাপাশি evolution-তত্ত্ব বা পরিণতি-তত্ত্বও আছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। সৃষ্টিবাদে বলে, অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে; পরিণতিবাদ বলে, অসৎ হইতে সৎ হয় না; সতের বিকারে, সতের পরিণতিতে, সতের মূর্ত্তি বদল হয় মাত্র। যাহা ছিল তাহাই থাকে, তবে মূর্ত্তি বদল করিয়া রূপান্তরিত হইয়া থাকে। Evolution ব্যাপারটা যাহা ছিল তাহারই নূতন করিয়া সাজান-গোছান ব্যাপার, একটা re-arrangementএর ব্যাপার মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই পরিণতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। উহার ধ্রুবত্বে সংশয় করিলে, বিজ্ঞান-বিদ্যা দিশাহারা হইয়া যায়, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যায়। Re-arrangement ব্যাপারে নিয়মের আবিষ্কার চলে—creation কেবলই খেয়ালের ব্যাপার। এই পরিণতিবাদ বুঝাইতে গিয়া বলা হয়, ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা, chain of causation-এর দ্বারা আবদ্ধ। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের বাঁধা সম্পর্ক দেখা যায়। পূর্ব্বতন কারণ হইতে পরবর্ত্তী কার্য্যকে উৎপন্ন দেখা যায়। উৎপন্ন হয় না-ই বা বলিলাম। কার্য্য কারণকে অনুসরণ করে, এইরূপ দেখা যায়। কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা

পর্য্যবেক্ষণে পাওয়া যাইবে। ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণে তাহার সন্ধান মিলিবে। প্রত্যুত, দেখা যাইবে, আজি যে কারণের পর যে কার্য্য উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতেও সেই কারণের পর সেই কার্য্য উপস্থিত হয়। ইহাকেই ইংরেজীতে বলে uniformity of nature। আমাদের দেশে বলে নিয়তি। আর একটি সুন্দর নাম আছে, তাহার নাম ঋত; অর্থাৎ orderly sequence of phenomena in Nature। অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য কেন উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞান-বিদ্যা করেন না। তবে কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা অবধানের সহিত দেখিয়া, সেই কারণ ও কার্য্যের পরম্পরাকে সূত্রবদ্ধ, formla-বদ্ধ, করিবার চেষ্টা করেন। এ কথাগুলা নূতন কথা নহে। পূর্ব্বেই আমি ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এই নিয়তির শৃঙ্খলা, এই determinism, গোড়ায় মানিয়া লইতে বিজ্ঞান-বিদ্যা কেন বাধ্য, ইহা মানিয়া না লইলে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ কেন অচল হয়, তাহা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই। প্রাণের সমস্যা বৈজ্ঞানিকের formulaর মধ্যে ফেলিতে হইলে কিরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাচক্রে পরবর্ত্তী প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সেই ঘটনাচক্রের একবার সন্ধান পাইলে বৈজ্ঞানিক জোরের সহিত বলিতে পারিবেন, আমি বুদ্ধিবলে সেই ঘটনাচক্র উপস্থাপিত করিয়া প্রাণের উৎপাদন করিব। এক কথায়, বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিতে চাহেন, একবার আমাকে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাণোৎপাদনের formulaগুলি গড়িতে দাও, এবং প্রাণ-প্রবাহের formulaগুলি গড়িতে দাও, এবং সমস্ত data সংগ্রহ করিতে দাও, তাহা হইলে, কোন্ তারিখে, কোথায়, প্রথম প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ত বলিবই। উপরন্তু, কাইসার উইলিয়ম লড়াই-এ হটিয়া কোন্ তারিখে prussic acid খাইয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহাও নিঃসংশয়ে বলিয়া দিব।

যাঁহারা creation-বাদী, তাঁহারা বলিবেন, হাঁ হাঁ, ব্যাবহারিক জগতের কিয়দংশ নিয়মবদ্ধ, সূত্রবদ্ধ করিতে পারিব, কিন্তু সমস্তটা পারিব না। ব্যাবহারিক জড় জগতের অভ্যন্তরেও স্থানে স্থানে খাপছাড়া miracle দেখা যাইবে। উহা কোন formulaয় আবদ্ধ হইবে না। কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার মাঝে মাঝে ছাঁট দেখা যাইবেই। আগাপিছার সহিত সেখানটার কোন স্থায়ী সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে না। সমস্ত antecedents দেওয়া থাকিলেও ঐ consequent ঘটিবে কি ঘটিবে না, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। তাঁহাদের মতে বস্তুতই ব্যবহারিক জগতের স্থানে-স্থানে ঐরূপ কাট-ছাঁট আছে। সেইখানেই miracle, সেইখানেই special creation, সেইখানেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি। কেন না, উহার আবির্ভাব সম্পূর্ণ একটা অভিনব ঘটনা। কোনরূপ পূর্ব্বতন ঘটনা হইতে গণনাদ্বারা উহার নির্দ্দেশ হয় না। তাঁহাদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঐরূপ একটা special creation, বিধাতা-পুরুষের সম্পূর্ণ একটা খেয়াল। কেবল আবির্ভাবটাই খেয়াল কেন, প্রাণের যেটুকু বিশিষ্টতা, তাহাও আগাগোড়া খেয়াল। সার অলিভার লজের মত ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকও এক-ঘ'রে হইবার ভয় পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমের কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন,—হাঁ হাঁ; প্রাণীর দেহে যাবতীয় জড়ধর্ম্ম বিদ্যমান বটে। ধর না কেন, conservation of energy। কোন দ্রব্য কোনরূপেই এই energyর পরিমাণে কণিকামাত্র বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। প্রাণীরাও এক কণিকা energy উৎপাদন করিতে বা ধ্বংস করিতে পারে না। অথচ দেখা যায়, energyর পরিমাণে তারতম্য না ঘটাইয়াও energyকে ভিন্ন মুখে পরিচালন করিবার স্বাধীন ক্ষমতা প্রাণীর আছে। এই যে প্রাণ, ইহা স্বাধীনভাবে energyকে guide করিতে পারে, direct করিতে পারে, উহার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ free, কোনরূপ বাঁধা নিয়মের বশ নহে।

আপনারা মানুষের free will সম্বন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়াছেন। প্রুসিয়ার বিধাতা-পুরুষ ইচ্ছা করিলে প্রুসিক এসিড খাইতে পারেন, অথবা না-ও পারেন; এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি খাইবেন, কি খাইবেন না, তাহা কেহ কস্মিন্ কালে কোনরূপে পূর্ব্বে গণিয়া বলিতে

পারিবে না। আপনাদেরও বোধ করি তাঁহার এ বিষয় স্বাধীনতায় কোন সংশয় নাই। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞানবিদ্যা এই স্বাধীনতা মানিতে চাহেন না। বিজ্ঞানবিদ্যা বলিবেন, কাইসারের মাথার খুলির ভিতর অণুপরমাণু-ইলেক্‌ট্রণগুলা কিরূপ অবস্থায় কিরূপে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে আমি গণিয়া বলিব, তাঁহার স্নায়ুযন্ত্র তাঁহার মাংস-পেশীকে সঞ্চালন করিয়া প্রুসিক এসিডের শিশি তাঁহার মুখে তোলাইবে কি না। তিনি প্রুসিক এসিড খাইবেন, কি না খাইবেন, তাহা তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থা সাপেক্ষ, এবং তৎকালে বাহির হইতে মগজে যেরূপ উত্তেজনার ধাক্কা পড়িতেছে, তৎসাপেক্ষ; সে বিষয়ে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই বলিয়া আমি এখন গণিতে পারিতেছি না। অবস্থা জানিলেও তদুপযোগী formula আজিও গড়িয়া উঠিতে পারি নাই। নতুবা, কাইসারের চিত্তে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের মত বিশ্বদ্রোহী বল থাকিলেও, নিয়তি-নির্ম্মিত পাষাণস্তম্ভ হইতে কোন্ নরসিংহ নির্গত হইয়া তাঁহার কুক্ষিবিদারণ করিবে, তাহা কাগজে কলমে কষিয়া গণিয়া দিতাম। বিজ্ঞানবিদ্যার বর্ত্তমান অক্ষমতা সেই অপূর্ণতাসাপেক্ষ। বিজ্ঞানবিদ্যাকে পূর্ণ হইতে দাও, হতাশ হইও না। পথ খোঁজ। কোথাও কোন freedom এর অস্তিত্ব দেখিবে না।

আপনারা দেখিতেছেন, উভয় পক্ষের বিবাদ শেষ পর্য্যন্ত freedom এবং determinism লইয়া। প্রাণ-পদার্থ নিয়তির অধীন বটে কি না, তাহা লইয়াই ঝগড়া। যদি প্রাণ পদার্থ সর্ব্বতোভাবে নিয়তির অধীন না হয়, যদি উহাতে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর আবির্ভাব একটা creation, একটা miracle; এবং ভূপৃষ্ঠে যে প্রাণের প্রবাহ, তাহাও একটা perpetual miracle। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণে এমন কোন বিশিষ্টতা আছে কি না, যাহাকে জড় ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, যাহা স্বভাবতঃ জড় ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, যাহাকে কখনও কোন formulaতে ফেলিতে পারা যাইবে না। আসুন, একবার সেই পথে চলি।

গোড়াতেই আমি বলিয়াছি, জগতে আবির্ভূত হইয়াই প্রাণীগুলা খাই খাই করিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে প্রশ্ন তুলিয়াছি, যদি তাহার উত্তর সম্ভব হয়, হয় ত এইখানেই উত্তর মিলিবে। এই খাই-খাই করাটাই প্রাণের বিশিষ্ট লক্ষণ। বস্তুতই প্রাণ এই ক্ষুধা লইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। কিছুতেই ইহা মেটে না, এবং কোন কালেই ইহা মিটিবে না। যদি কখন মেটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইয়াছে। ধরিয়া লইলাম, প্রাণ একদিন হঠাৎ জড় জগতে আবির্ভূত হইল। আবির্ভূত হইয়াই দেখিল যে, জড়জগৎ আপনার বিশাল প্রাণহীন কায় লইয়া সম্মুখে উপস্থিত আছে। প্রাণ সেই জড় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে চায়। জড়েরই কিয়দংশ লইয়া আপনার দেহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই দেহে কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি অর্পণ করিতে চায়। প্রাণ প্রাণহীন জড় পদার্থকে প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করে। প্রোটোপ্লাজমের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। উহাকে আমি প্রাণি পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। তদ্ভিন্ন জড় পদার্থকে আমি জড় পদার্থই বলিব। প্রাণ দেখিল,—এই জড় পদার্থকেই হজম করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে, জড় পদার্থকেই প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিতে হইবে। সেই ক্ষমতা সে রাখে। ইহাই তাহার বিশিষ্টতা। যদি miracleই বলিতে হয়, ইহাই miracle। প্রাণ সমস্ত জড়জগৎকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, এই প্রাণি পদার্থে পরিণত করিতে চায়; সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া একটা প্রাণময় জগতে পরিণত করিতে চায়;—ইহাই তাহার ক্ষুধা। এই ক্ষুধা মিটিলে তাহার অন্য কোন কাজই থাকে না। কাজেই এ ক্ষুধা মিটিবে না। সমস্ত জড় জগৎ যতক্ষণ প্রাণময় না হইবে, ততক্ষণ প্রাণীর এই ক্ষুধা মিটিবে না। আবির্ভূত হইয়াই প্রাণ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; যেন সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়াই দেখে, একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। সমস্ত জড় পদার্থকে সে হজম করিতে পারে না। জড় পদার্থের কিয়দংশ তাহাকে বাছিয়া লইতে হয়। কয়লা আর অক্সিজন, হাইড্রোজন, আর নাইট্রোজন অতি তুচ্ছ পদার্থ। হীরা জহরত আপনি কোটি মূল্যে খরিদ করেন। অথচ বদরীদাস মোকিম বাহাদুরও হীরা জহরতকে সিন্ধুকের মধ্যেই রাখিয়াছেন—চুনি-পান্না উদরসাৎ করিতে সাহস করেন নাই। তুচ্ছ

কয়লা আর অক্সিজন পাইবার জন্য তিনি চব্বিশ ঘণ্টা বদন ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছেন। পৃথিবীর বাহিরে যদি কোথাও প্রাণ থাকে, তাহার আচরণ কিরূপ আমি জানি না। মঙ্গল গ্রহে যদি প্রাণী থাকে, সে হীরা-জহরত হজম করিতে পারে কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে প্রাণের সহিত আমরা পরিচিত, সেই প্রাণের ক্ষমতা এখানে ঐরূপে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণের ক্ষমতা এখানে যে সীমাবদ্ধ, তাহা স্বীকার্য্য। এই স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা হেতু প্রাণ জড় জগতের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারে। অপর অংশকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। কিয়দংশ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই উপাদেয়। অপরাংশ বর্জ্জন করিতেছে, তাহাই হেয়। এই উপাদেয় গ্রহণে এবং হেয় বর্জ্জনে প্রাণের চেষ্টা চলিতেছে। বর্জ্জনীয় অংশ সমীপে উপস্থিত হইলে, উহাকে চেষ্টাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হয়। এইখানে একটা বিরোধ। কিন্তু ইহার অপেক্ষায় আরও গুরুতর বিরোধ আছে। প্রাণ যেমন জড়কে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, জড়ও তেমনই অবিরাম প্রাণিপদার্থকে জড় পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা যুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে জড় পদার্থের উপাদেয় অংশ প্রাণের কবলে আসিয়া নূতন প্রাণিপদার্থ উৎপাদন করিতেছে। অন্যদিকে জড়ের চেষ্টায় প্রাণি-পদার্থ সর্ব্বদা জড় পদার্থে পরিণত হইতেছে। নিরন্তর এই যুদ্ধ চলিতেছে। এই বিরোধের ধারাই প্রাণের প্রবাহ। প্রাণিপদার্থের জড়ত্বে পরিণতির নামান্তর মৃত্যু; এই মৃত্যুই প্রাণের পরাজয়। প্রাণ পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। জড়ও ছাড়িবার পাত্র নহে; প্রাণকে একদিন পরাজয় করিবেই। অন্ততঃ, একালের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের পরাজয় হইবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাণ ছিল না। প্রাণ থাকিলেও তাহা গুপ্তভাবে ছিল। প্রাণের আবির্ভাবের হয় ত চেষ্টা ছিল, কোনরূপ গুপ্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইবার হয় ত চেষ্টা ছিল; কিন্তু জড় তাহাকে আবির্ভূত হইতে দেয় নাই। যেরূপেই হ'ক, সহসা একদিন প্রাণের আবির্ভাব হইল; তদবধি উভয়ের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। জড় উহাকে পিষিয়া মারিয়া লুপ্ত করিবার বা গুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রাণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া, অবহিত থাকিয়া, সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়া, সহস্র অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, লড়াই চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন আসিবে, যখন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবপর হইবে। সমুদয় প্রাণিপদার্থ আবার প্রাণহীন জড়ে পরিণত হইবে। মৃত্যু আসিয়া সমস্ত প্রাণকে লুপ্ত করিবে। বিজ্ঞানবিদ্যার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণ একদিন ছিল না, অথবা থাকিলেও অস্পষ্ট বা গুপ্ত অবস্থায় ছিল,—ইহা যখন নিশ্চয়, তখন ভবিষ্যতে প্রাণ আবার থাকিবে না, অথবা পুনরায় গুপ্ত হইবে, ইহাতে চমকাইবার হেতু নাই। শেষ যাহাই হ'ক, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন বিলম্বিত করিবার জন্যই প্রাণের যাবতীয় চেষ্টা। এই চেষ্টার ইতিহাসই প্রাণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ব্যাখ্যানই Biology বা প্রাণবিদ্যা। ব্যাপারটা কি, ভাল করিয়া বুঝুন। প্রাণ চায় সমস্ত জড়কে আত্মসাৎ করিতে; আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় করিতে। সমস্তকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কতকটা গ্রহণ, বাকিটা বর্জ্জন করিতে হয়। তজ্জন্য একটা প্রয়াস, একটা বিরোধ, স্বীকার করিতে হয়। জড় কিন্তু প্রাণকে বিনাশ করিতে চায়। এ বিষয়ে সে একবারে নিষ্ঠুর, তাহার করুণামাত্র নাই। আমরা প্রাণী, পদে পদে সেই নিষ্ঠুরতার ভুক্তভোগী। প্রাণ বলে, আমি জড়কে প্রাণময় করিব। জড় বলে, তুমি আমাকে প্রাণময় করিবে কি, আমি তোমাকে পিষিয়া মারিব। প্রাণ বলে, আচ্ছা দেখা যা'ক; আমি থাকিব, আমি কিছুতেই যাইব না। প্রাণের যেন একটা সঙ্কল্প আছে, একটা will আছে। ইহা তাহার will to live; যেমন করিয়াই হ'ক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। কোন-না-কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। আপনাকে রক্ষা করা, আপনাকে বাঁচান, তাহার একমাত্র স্বার্থ। তদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোন অর্থ নাই। ইহাতেই তাহার সার্থকতা; ইহাই তাহার একমাত্র কর্ম্ম। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতাই প্রাণের বিশিষ্টতা—এই কথাটুকু আপনাদিগকে আমি অত্যন্ত জোরের সহিত

বলিতে চাহি। এইখানেই ডারুইন-তত্ত্বের ভিত্তি। জড়ের এই অবিরাম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাণ আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই; প্রত্যুত, আপনাকে সর্ব্বত্র বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

একবার জড়ে নামিয়া আসুন। জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর বিরোধের মত কতকটা দেখিতে পাইবেন। একটা জড়দ্রব্য অন্যকে ধাক্কা দেয় এবং নিজে ধাক্কা লয়। যেখানে ঘাত, সেইখানে প্রতিঘাত। জড় দ্রব্য নিজে বিকৃত হয়, অন্যকেও বিকৃত করে। গ্রহ উপগ্রহ পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, চুম্বকের কাঁটা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, অণু পরমাণু, electron পরস্পর ঠেলাঠেলি করে। কাজেই জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর একটা বিরোধের মত আছে। তা'ত থাকিবেই। গোড়াতেই বলিয়াছি, জড়ের ধর্ম্ম impenetrability; একটা জড়দ্রব্য আর একটা জড়দ্রব্যে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, হইয়া উভয়ে ষোল আনা মিশিয়া যাইতে পারে না। মিশিতে পারিলে তাহাদের অস্তিত্বই ব্যর্থ হইত। পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া দেখুন। সমাকার আকাশকে বিষমাকারে চিহ্নিত করাতেই যখন উহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা, তখন আকাশের এই চিহ্নগুলি পরস্পর মিশিয়া গেলে তাহাদের কোন চিহ্নত্বই থাকিত না। দুইটা জড় দ্রব্য যখন মিশিবে না, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিবেই। সেই ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তাহাদের গতিবিধি। সেই ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পাদনই উহাদের ঠেলাঠেলি, উহাদের বিরোধ। কিন্তু এই যে বিরোধ, ইহা formula-য় ফেলা চলে। কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধের মাত্রা, ঠেলাঠেলির মাত্রা, কতটুকু হইবে ইহা গণিয়া বলা চলে। ইহা বাঁধা-ধরা আছে। ইহার মধ্যে অণুমাত্র element of incalculability বা uncertainty নাই। কোনরূপ chance এর বা gambling এর element নাই। আপনারা দুই পালোয়ানের কুস্তি দেখিতে বসিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে গোপনে যদি বন্দোবস্ত থাকে, যে আমরা উভয়ে এইরূপে হাত-পা নাড়িব এবং আমাদের এতটুকু হার-জিত হইবে, সে লড়াইএ আপনার কোন কৌতূহল থাকে কি? তাহারা যে লড়াই করে, নিতান্তই উদাসীনের মত লড়াই করে। বাহিরে একটা লড়াইএর অভিনয় হয় বটে, কিন্তু ভিতরে কোন আন্তরিকতা থাকে না। যে হারে, সে নিতান্ত উদাসীনের মত হারে। যে জিতে, সে নিতান্ত উদাসীনের মত জিতে। জড় দ্রব্যের পরস্পর লড়াই—সেইরূপ উদাসীনের লড়াই। একবারে ধরা-বাঁধা কাটা-ছাঁটা। ইহাতে কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই। নতুবা ক্রিকেট বলের বা বিলিয়ার্ড বলের অঙ্ক Dynamics এর বহিতে স্থান পাইত না। হিমাচল যখন ভূগর্ভের ঠেলা পাইয়া গা তুলিয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে উঠিয়াছিলেন। যতটুকু ধাক্কা পাইয়াছিলেন, তাহাতে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক্ ততটুকুই উঠিয়াছিলেন। যদি বা পাল্টা ধাক্কা দিয়া থাকেন, তাহাও ঠিক সমুচিত মাত্রা মত। আবার তিনি যে বহু লক্ষ বা বহু কোটী বৎসর ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি তুষারে বুক পাতিয়া বসিয়া আছেন, শত স্রোতস্বিনী বুক চিরিয়া তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, তাঁহাকে গুঁড়া করিয়া মাটি করিতেছে, তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, কোন দুঃখ নাই, আত্ম-রক্ষার কোন চেষ্টা নাই। যদি কিছু বাধা দেন, তাহার পরিমাণ পাটীগণিতের অঙ্কে ধরা পড়িবে। জড় দ্রব্যের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে, সেই বিরোধের মধ্যে এই ঔদাসীন্য। বিরোধটাকে যখন formula য় ফেলা চলে, তখন এই ঔদাসীন্য না থাকিয়া পারে না। জড় দ্রব্যে আত্ম-রক্ষার, আপনার বিশিষ্টতা রক্ষার, আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিবার, কোন উদ্যমেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। বিকারের হেতু আছে, অথচ বিকৃত হইব না, এরূপ কোন স্পষ্ট উদ্যম জড় দ্রব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আপনাদিগকে বলিয়াছি, প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিতে চায় বটে, কিন্তু আত্মসাৎ করিতে গিয়া জড়ের কিয়দংশকে গ্রহণ করে, কিয়দংশকে বর্জ্জন করে। প্রাণের একটা বাছাই করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আছে; ইহা যেন preferential choice। জড়দ্রব্যেও এইরূপ একটা কিছু দেখা যায়। প্রত্যেক রসায়নবেত্তা পণ্ডিত তাহা জানেন। অক্সিজন হাইড্রোজনকে বাছিয়া লইতে চায়, নাইট্রোজনকে বর্জ্জন করিতে চায়। ইহাও একটা preference এর ব্যাপার, নির্ব্বাচনের ব্যাপার। এই বাছাই করিবার প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই জড় জগতে যৌগিক পদার্থের লক্ষ রকমের প্রকারভেদ।

কিন্তু এখানেও সেই ঔদাসীন্য। এই choiceএর মাত্রাও সর্ব্বত্র পরিমিত; একবারে কাটা-ছাঁটা, formulaবদ্ধ; একটু এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। কোনরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির পরিচয় নাই। অক্সিজেনে হাইড্রোজন মিশাইয়া আগুন দিবা মাত্র উহাকে বিকৃত হইয়া জলে পরিণত হইতেই হইবে; কোনরূপ দ্বিধা করিলে চলিবে না; আট ভাগের সহিত এক ভাগকে মিলিতেই হইবে; দ্বিধা করিলে চলিবে না। এই বিকারে উহা সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন। জড় দ্রব্য অন্য জড় দ্রব্যকেও এক হিসাবে হজম করে এবং আত্মসাৎ করে। অন্য দ্রব্যকে বিকৃত করে এবং নিজেও বিকৃত হয়। জল চিনিকে এক রকম হজম করিয়া ফেলে। সালফিউরিক এসিড তামা-দস্তা হজম করে। আত্মসাৎ করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু অন্যকে বিকৃত করিতে গিয়া আপনাকে অবিকৃত রাখিতে পারে না, আত্মরক্ষা করিতে পারে না, আপনার বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে পারে না। কোন্‌টার কতটুকু বিকার হইবে, প্রত্যেক chemist তাহা জানেন; এবং জানেন বলিয়াই, তাহাদের দ্বারা স্বকর্ম্ম সাধন করাইয়া লন। এখানেও formula বাঁধা আছে। জড়ের যে ক্ষুধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উদাসীনের ক্ষুধা। জড় পদার্থ উদাসীন সন্ন্যাসী—মার তাহাকে, রাখ তাহাকে, তাহার কোন চাঞ্চল্য নাই—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। যদি হাসে, তাহাও বাঁধা হাসি; যদি কাঁদে; তাহাও বাঁধা কাঁদা;—জড় পদার্থ একবারে উদাসীন মহাদেব।

আপনারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরার কথা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। বাহিরের উত্তেজনায় জন্তুর দেহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাহির হইতে ডাক পড়িলে জন্তুদেহ সাড়া দেয়। উত্তেজনার মাত্রাধিক্যে চাঞ্চল্য অবসাদে পরিণত হয়; অধিক অবসাদে মৃত্যু আনে। আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের দেহেরও ঠিক এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা আছে। উত্তেজনার ফলে চাঞ্চল্য; মাত্রাধিক্যে অবসাদ, অবশেষে মৃত্যু;—উদ্ভিদেরও এই সকল আছে। হয় ত নিতান্ত প্রাণহীন জড় ধাতু দ্রব্যেরও—তামা-দস্তার মত ধাতু দ্রব্যেরও—এইরূপ চাঞ্চল্য, অবসাদ, মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোফরমে, আলকহলে, আফিমে যেমন আমাদের মগজের ভিতর কিলবিল করিয়া চাঞ্চল্য আনে বা অবসাদ আনে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ ঘটে; হয় ত ধাতুখণ্ডেও ঘটে। এ সকল নূতন তথ্য আগে কেহ জানিত না। এখন হয় ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, প্রাণিদেহ যখন জড় পদার্থেই নির্ম্মিত, জড় দ্রব্য মাত্রই যখন আঘাতে প্রতিঘাত দেয়, তখন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ঠিক কথা; বিস্ময়ের বিষয় নাই বটে, কিন্তু জন্তুদেহে যে চাঞ্চল্য, যে ছটফটি, অতি সামান্য উত্তেজনায় যে ধুকধুকনি, প্রতিনিয়তই আমাদের পরিচিত, দুই চারিটা স্থল ব্যতীত উদ্ভিদের দেহে এরূপ চাঞ্চল্য এ পর্য্যন্ত কে জানিত? পৃথিবীর যাবতীয় শরীরবিদ্যাবিৎ ইহার সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, কই কেহ ত এ পর্য্যন্ত সন্ধান পান নাই। ধাতুদেহেও ঐরূপ উত্তেজনায় যে ঐ জাতীয় চাঞ্চল্য আসিতে পারে, তাহা বোধ করি কল্পনারও অগোচর ছিল,—এখন উহা প্রতিপন্ন না হইলেও অন্ততঃ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। ঐরূপ চাঞ্চল্য বা অবসাদ দেখিয়া যদি প্রাণের অস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেও প্রাণ আছে কি না, তাহা আলোচনাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি,—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যাবতীয় জড়দেহে চৈতন্যের আবিষ্কার করিয়াছেন,—লোক-মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, যাঁহারা নিরুপম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, যে পূজনীয় আচার্য্য সেরূপ কিছুই করেন নাই। কোন দ্রব্যে চেতনা আছে কি না, বিজ্ঞানবিদ্যা—Physical Science—সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারে না; উহা বিজ্ঞানবিদ্যার অধিকারবহির্ভূত ও সাধ্যাতীত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক—তিনি প্রাণিদেহ ও জড়দেহ এই দুইয়ের মধ্যে উত্তেজনার সহিত চাঞ্চল্যের ও অবসাদের সম্পর্ককে formula-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে কেহ formula বাঁধিতে পারে নাই, সেখানে তিনি formula বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাণিদেহের অতি-সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাঙ্গের মত তাঁহার আদেশে মাত্রে পরি-চালিত হইতেছে; তিনি বাজিকর; বন-মানুষের হাড় ঠেকাইয়া তিনি যাহাকে যেরূপে নাচাইতেছেন, সে সেই-

রূপেই নাচিতেছে। তাঁহার আদেশে প্রাণ তাহার উগ্র স্বাধীনতা সংযত করিয়া জড়তার শিকলে বাঁধা পড়িতেছে; এবং আচার্য্য সেই শিকল ধরিয়া বসিয়া আছেন। একদল পণ্ডিতে জন্তুদেহে ও উদ্ভিদের দেহে, প্রাণিদেহ ও জড়দেহের মধ্যে, দেওয়াল তুলিয়া উভয়কে দুই স্বতন্ত্র কোঠার মধ্যে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; তিনি সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন, যে সেরূপ কোন প্রাচীর তোলা চলিবে না; উভয়কেই শেষ পর্য্যন্ত এক কোঠায় রাখিতে হইবে। জড় দ্রব্যে চেতনার আবিষ্কার দূরের কথা, জড় দ্রব্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণের আরোপও তিনি করেন নাই; বরং প্রাণিদেহের সংযমহীন আচরণকে তিনি জড়তার শৃঙ্খলায় বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কাজই তাহাই; যেখানে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, সেখানে শৃঙ্খলা স্থাপন, যেখানে নিয়ম ছিল না, সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা। জড় দ্রব্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ আছে কি না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিবেন না; প্রাণের আচরণকে জড়তার শৃঙ্খলে কতটা বাঁধা যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিক তাহাই দেখিবেন। বৈজ্ঞানিকের প্রতিজ্ঞা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রাণিমাত্রকে automaton বা স্বয়ঞ্চল যন্ত্ররূপে দেখিবেন, ইহার অভ্যন্তরে কোন mysterious পদার্থের স্থাপন করিতে দিবেন না। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা এস্থানে আর একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, মানিয়া লইলাম যে একখণ্ড তামা বা দস্তা একটা জন্তুর মত বা একটা গাছের পাতার মত বাহিরের তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে; উত্তেজনার আতিশয্যে অবসন্ন হইতে পারে; মদের নেশায় অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও গূঢ়তর প্রশ্ন এই, যে এইরূপ উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার কোন প্রয়াস জড়দ্রব্যের পক্ষে আছে কি না? জন্তু এবং উদ্ভিদ, অর্থাৎ প্রাণী মাত্র, বাহিরের ধাকায় চঞ্চল হয় বটে এবং অবসন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই উত্তেজনা এড়াইবার জন্য ভিতর হইতে তাহার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেই উত্তেজনা বা অবসাদ যদি তাহার পক্ষে হানিকর হয়, তাহা হইলে সেই উত্তেজনা বা অবসাদ এড়াইবার জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করে। তদুচিত নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করে। সঙ্গে সঙ্গে এড়াইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে এড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাণীমাত্রেরই এটা সাধারণ ধর্ম্ম। বাহিরের উত্তেজনা যদি তার পক্ষে শুভ হয়, তাহা হইলে সে উত্তেজনা তাহার উপাদেয় হয়। যদি অশুভ হয়, তাহা হইলে তাহা হেয় হয়, সে তাহা এড়াইতে চায়। উত্তেজনা গ্রহণে বা বর্জ্জনে প্রাণী কখনও উদাসীন হয় না। উদাসীন হইলে প্রাণিজগতে অভিব্যক্তি,—evolution—সম্ভবপর হইত না। এ প্রবৃত্তি প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। প্রাণীর যেন একটা স্বার্থ আছে। আত্মরক্ষাই সেই স্বার্থ। তাহার যাবতীয় চেষ্টা সেই স্বার্থরক্ষার অনুকূল! প্রাণহীন জড়দ্রব্যে এইরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কিছু আছে কি না,তাহাই হইল গুরুতর প্রশ্ন। সহসা ইহার উত্তর দেওয়া চলে না। প্রাণীর একটা স্বার্থ আছে। খাঁটি জড়ে সেরূপ স্বার্থ বলিয়া কিছু আছে কি? প্রাণী আপনাকে বাঁচাইতে চায়। প্রাণহীন জড়ের পক্ষে সেরূপ উক্তি চলে কি? আঘাতে চঞ্চল হওয়া, আঘাতের মাত্রাধিক্যে অবসন্ন হওয়া, এটা খাঁটি জড়ধর্ম্ম, তাহাতে সংশয় নাই। যে কোন স্থিতিস্থাপক দ্রব্যে—elastic bodyতে—ইহা দেখা যায়। ধাক্কা খাইয়া elastic body স্বভাবচ্যুত হয়। উত্তেজনার অপগমে আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। কিন্তু limit of elasticity পার হইলে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাকেই জড় দ্রব্যের অবসাদ বা মৃত্যু বলা যাইতে পারে। ইহা জড়দ্রব্যমাত্রেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। Dynamics বিদ্যা তাহা জানেন। জড়ধর্ম্মী প্রাণিদেহে বাহিরের উত্তেজনায় চাঞ্চল্য বা অবসাদ যতই জটিল হ'ক, তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই। এই চাঞ্চল্যেই হয় ত তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি এবং এই অবসাদই তাহার ব্যাধি। অবসাদটা স্থায়ী হইলেই তাহার মৃত্যু। প্রাণিদেহ চঞ্চল হয়, অবসন্ন হয়, পরিশেষে অগত্যা মরিয়া যায়,ইহা সত্য বটে। স্বীকার করিলাম, ইহার ষোলআনাই জড়ধর্ম্ম; চাঞ্চল্য এবং অবসাদ এবং মৃত্যু সমস্তই নিয়মবদ্ধ জড়ধর্ম্ম। কিন্তু এই মরণকে এড়াইবার, এই মরণকে জয় করিবার, যে একটা উৎকট চেষ্টা প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান আছে, তামার কি দস্তার টুকরায়, ইটে কি পাথরে, তাহার কোন পরিচয় আছে কি? তাহার পরিচয় পাইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে কি? প্রাণিপদার্থে যে আছে, সে বিষয়ে ত কোন সংশয় নাই। আছে বলিয়াই ত প্রাণের এই বিচিত্র বিকাশ। এই প্রবৃত্তি

যদি না থাকিত, তাহা হইলে Biology বিদ্যার আলোচনা-যোগ্য ত বিশেষ কিছু থাকিত না। সমস্ত জড় জগৎ প্রাণকে নষ্ট করিবার জন্য দিবানিশি অবিরাম নিযুক্ত আছে। অসংখ্য প্রাণী দিবানিশি মরিতেছে; কিন্তু প্রাণ ত লুপ্ত হইতেছে না। এ যে রক্তবীজ। এক ফোঁটা রক্ত-কণিকা হইতে সহস্র কণিকা উদ্গত হইয়া, সহস্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, কত নূতন রকমের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, পুনরায় জড় জগতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রাণী মরিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণ ত এ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। এই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, এই যে আত্মবর্দ্ধনের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা, এই যে সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় জগতে পরিণত করিবার চেষ্টা, ইহা ত চোখের উপরে দেখিতেছি। প্রাণের সহিত জড়ের এই যে যুদ্ধ, ইহা ত প্রত্যক্ষ ঘটনা, ইহা ত অস্বীকারের উপায় নাই। উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ত আছেই। এই বিরোধটাই ত প্রাণের বিশিষ্টতা। জড়ের সহিত জড়ের ঘাত-প্রতিঘাত আছে বটে, কিন্তু সে ত formula-র বাঁধা ব্যাপার। তাহাতে নিত্য নূতনত্ব কই? দূর অতীতে যাহা ছিল, দূর ভবিষ্যতেও ত ইহা সেইরূপ থাকিবে। ইহা ত সনাতন ব্যাপার। একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনঃপুনঃ তাহা ঘটিতেছে, এবং পুনরায় তাহা ঘটিবে। ইহার history কোথায়? যাবতীয় History-তে যে বৈচিত্র্য আছে, যে নিত্য নূতনের অবতারণা আছে, যাহা formula-য় বাঁধিতে গেলেও পরক্ষণেই formula অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, জড় জগতে সেই history কোথায়, সেই নিত্য নূতনত্ব কোথায়? প্রশ্নটা অতি গুরুতর। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞানবিদ্যা যখনই অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের সহিত গাঁথিয়া একই সূত্রে, এক formulaয়, বাঁধিয়া ফেলেন, তখনই অতীত তাহার পুরাতন ইতিহাস হারাইয়া ফেলে, ভবিষ্যতের অভূতপূর্ব্ব নূতন কাহিনী শুনিবার জন্য কেহ কেহ কৌতুহলের সহিত প্রতীক্ষা করে না! সবই ত formulaর মধ্যে নিবদ্ধ আছে। কাজেই প্রশ্নটা গুরুতর। প্রশ্নটা তুলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম। উত্তর দিতে আমি অক্ষম; প্রাণকে একবারে জড়তার নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিয়া উহার History লোপ করা চলিবে কি না, কোনরূপ a priori যুক্তিতে তাহার উত্তর মিলিবে না। কোনরূপ a priori যুক্তি আশ্রয়ের প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা রাখিনা; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যাবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য। বিজ্ঞানবিদ্যা ভবিষ্যতে কি উত্তর দিবেন, তাহার প্রতীক্ষায় আমি বসিয়া থাকিব। যিনি জগতের এতগুলি আঁধার কুঠরির মধ্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া অলোকিত প্রবেশ-পথ বাহির করিয়াছেন, হয় ত তাঁহার কাছেই ইহার উত্তর পাইব।

প্রাণবাদীদের মতে প্রাণের যেন একটা স্বার্থ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা purpose আছে, একটা will আছে। প্রাণ থাকিতে চায়, টিকিতে চায়, আপনাকে বর্দ্ধন করিতে চায়, আপনাকে প্রসারিত করিতে চায়, বিশ্বমধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, বিশ্বকে গ্রাস করিতে চায়। এ বিষয়ে সে পদে পদে বাধা পায়; পদে পদে বিরোধ পায়। কিন্তু সেই বিরোধকে সে এড়াইতে চায়, অতিক্রম করিতে চায়। বিরোধের মধ্য দিয়া আপনাকে বর্দ্ধিত করিতে চায়। বিরোধকেও আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করিয়া আপনার স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে চায়। এই স্বার্থ কেবল টিকিয়া থাকা। কেবল টিকিয়া থাকা নহে, বিরোধ সত্ত্বেও আপনাকে বর্দ্ধিত করা। বিশ্ব তাহার বিরোধী। কিন্তু বিশ্বগ্রাসে সে উদ্যত। এই বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা তাহার অতৃপ্ত। বোধ করি, কোন কালে তৃপ্ত হইবে না। হইলে, সেদিন আর প্রাণ বলিয়া কিছু থাকিবে না।

আপনি হয় ত বলিবেন যে, যন্ত্রমাত্রের মধ্যেই ত একটা উদ্দেশ্য আছে। অত্যন্ত প্রাণহীন যন্ত্রেরও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত—steam engine-এর মধ্যে safety valve। বাষ্পের চাপ মাত্রা ছাড়াইয়া বাষ্পের হাঁড়িকে ফাটাইবার উপক্রম করিবামাত্র হাঁড়ির কপাটখানা বাষ্পের চাপে আপনা-হইতেই খুলিয়া যায়। খানিকটা বাষ্প বাহির হইয়া গেলে বাষ্পের চাপ কমিয়া যায়। এঞ্জিনটাও আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই ত সেই এঞ্জিনের আত্মরক্ষা। ব্যাপারটা আপনা-হইতেই ঘটিয়া যায়। উহা সম্পূর্ণভাবে automatic। প্রাণিদেহও সেইরূপ automatic যন্ত্রমাত্র। পার্থক্য

কেবল জটিলতায়। বাহিরের শক্তির আক্রমণ হইতে প্রাণিদেহ সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিতেছে। তাহার দেহাবয়বে কতকগুলা automatic যন্ত্র আছে বলিয়াই, সে আত্মরক্ষার সমর্থ হইতেছে। কাজেই প্রাণিদেহে এবং যন্ত্রদেহে কোনরূপ জাতিগত পার্থক্য নাই। কিন্তু এখানেও আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক যন্ত্রাঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রাঙ্গের প্রয়োজনও কতিপয় উদ্দেশ্য সাধন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আপনার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, আপনাকে রক্ষা করিবার উপযোগী, যন্ত্রাঙ্গ আপনা-হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছে কি? আপনা-হইতে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে কি? যন্ত্রাঙ্গগুলি যন্ত্রের কর্ম্মসাধনের উপযোগী। কিন্তু সেই উপযোগিতা অনুসারে যন্ত্র আপনার অঙ্গগুলি আপনি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারে কি? যন্ত্র আপনি আপনাকে মেরামত করিতে পারে কি? কোন ষ্টীম এঞ্জিন তাহার safety valve নিজে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে কি? সেই safety valve উদ্ভাবনের জন্য বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিতে হয় নাই কি? একজন intelligent designer এবং একজন intelligent artist ডাকিয়া আনিতে হয় নাই কি? Engine ত নিজের safety valve নিজে গড়িতে পারে না। নিজে মেরামত করিয়া লইতে পারে না। প্রাণিদেহ যন্ত্র বটে, কিন্তু কোন প্রাণীকে এজন্য কোন বাহিরের লোকের সাহায্য ত লইতে হয় নাই। সে নিজের যন্ত্র নিজেই গড়িয়া লইয়াছে। নিজের আপন্নিবারণের উপায় নিজেই উদ্ভাবিত করিয়াছে। শিল্পী তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রমধ্যে যে কয়টি আপদ নিবারণের উপায় করিয়াছেন, তাঁহার হাতে-গড়া যন্ত্র সেই কয়টি আপদের অতিরিক্ত কোন নূতন আপদের প্রতীকার করিতে পারে না। তখন আবার শিল্পীকে নূতন যন্ত্রাঙ্গের উদ্ভাবন করিতে হয়। কিন্তু প্রাণিদেহ তাহা ত নিয়তই করিতেছে। নিত্য নূতন আপদের জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আপনার ব্যাধির প্রতীকার আপনিই করিতেছে। প্রাণী ত কোন্ শিল্পীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। মজার কথা এই, যাঁহারা অবৈজ্ঞানিক, তাঁহারাই প্রাণে এই অদ্ভুত ক্ষমতা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারাই দেহযন্ত্র গড়িবার জন্য, দেহযন্ত্রে এই আপন্নিবারণের উপযোগী যন্ত্রাঙ্গ বসাইবার জন্য, বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিয়া আনিতে চান। একজন Intelligent Designerকে, একজন বিধাতা-পুরুষকে, এজন্য ডাকিয়া আনিতে চান, কল্পনা করিতে চান। আর যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোন কাল্পনিক বিধাতা-পুরুষের নাম শুনিলেই আঁতকাইয়া উঠেন এবং খাঁটি জড়ে যে ধর্ম্ম দেখিতে পান না, প্রাণময় জড়ে সেই ধর্ম্ম অর্পণ করিয়া প্রাণের এবং জড়ের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য দেওয়াল গাঁথিয়া তৃপ্তিলাভ করেন!

Argument from Design বলিয়া একটা যুক্তি আছে। শিল্প-মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। বিশিষ্ট কর্ম্মে উপযোগিতা আছে। একখানা রূপার চাকৃতি হয় ত রূপার খনি হইতেই মিলিতে পারে। উহাতে কৃত্রিমতা না থাকিতে পারে। কিন্তু রূপার চাকৃতির এক পিঠে যদি রাজার মুখ অঙ্কিত দেখা যায়, অন্য পিঠে যদি তাহার মূল্য খোদাই করা থাকে, এবং সেই মূল্য অনুসারে সকলেই উহা গ্রহণ করিতেছে এইরূপ দেখা যায়, তখন বুঝিতে হয়, উহা কৃত্রিম দ্রব্য। কোন খনির মধ্যে উহা পাওয়া যায় নাই। উহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন intelligent designerএর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং কোন শিল্পীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এঞ্জিনের মধ্যে safety valve দেখিলে সেইরূপ শিল্পীর কৃতিত্ব মনে করিতে হয়। জন্তুর দেহে নানারূপ কর্ম্ম সাধনোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা দেখিয়াই অবৈজ্ঞানিকেরা—একজন বাহিরের Designer, বাহিরের Artist—কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ কল্পনায় অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণপদার্থেই সেই ক্ষমতা অর্পণে বাধ্য হইয়াছেন। আমি কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিব, সে কথা এখন নাই বা তুলিলাম। প্রাণে যে ক্ষমতা দেখিতে পাই, খাঁটি জড়ে তাহার পরিচয় পাই না, ইহা যেন উভয় পক্ষই মানিয়া লইতেছেন।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা Dynamics-বিদ্যার খোঁজ রাখেন, তাঁহারা principle of stability নামে একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন। Stability অর্থে স্থিতিশীলতা—স্থাস্নুতা। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোন কারণে ভ্রষ্ট হইলেও যাহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরিয়া আসে, সেই জিনিসটা stable বা স্থিতিশীল। পেন্সিলটাকে

তাহার ডগার উপর খাড়া করিয়া রাখা যায় না; ঐ অবস্থায় উহা স্থিতিশীল নহে। উহাকে শোয়াইয়া রাখিলে স্থিতিশীল হয়। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা নড়াইয়া দিলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। কয়েকবার দুলিয়া আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব পেণ্ডুলাম স্থিতিশীল। অবস্থাভেদে একই দ্রব্য বা দ্রব্য-সমষ্টি স্থিতিশীল হইতে পারে, বা না পারে। Dynamics বিদ্যা সেই অবস্থাভেদের, সেই conditions of stabilityর নির্দ্ধারণ করিতে চান এবং তাহাকে formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। সৌর জগতের stability সম্বন্ধে লাপ্লাস্ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহ-উপগ্রহ কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌরজগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার ভয় নাই। পক্ষান্তরে সার জর্জ্জ ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই stability নির্দ্ধারণ দ্বারাই কোন্ কালে চন্দ্রমণ্ডলটা পৃথিবী হইতে ছটকিয়া পড়িয়াছিল এবং কবে আবার উহা পৃথিবীতে আসিয়া ঢুসা দিবে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। Willard Gibbsএর পর হইতে রসায়নবিদ্যার ভাঙ্গাগড়া বিকৃতি পরিণতি ঐ স্থিতিশীলতার আঁকে গণিত হইতেছে। স্যার জোসেফ টম্‌সন্ পরমাণুর ভিতরে electronগুলার conditions of stabilityর আলোচনা করিয়া রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুর ভাঙ্গাগড়া আলোচনা করিতেছেন। রেডিয়ম ধাতুর অস্থায়ী পরমাণুগুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন নূতন stable configurationএ আসিয়া নূতন নূতন ধাতুর উৎপাদন করিতেছে, ইহা ত আজকাল আমরা চোখের উপরে দেখিতেছি। এই সমস্ত ঘটনা এখন বিজ্ঞানবিদ্যার প্রায় আয়ত্ত অর্থাৎ প্রায় formulaবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। জীয়ন্ত প্রাণিদেহেরও stability বা স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা চলিতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীকে আপনার environment বা পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। এই পরিবেশ বা environment নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। প্রাণীদেহকেও আপনার stability অনুসারে সেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আপনাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন মূর্ত্তি দিয়া, নূতন configurationএ আনিয়া, বদলাইয়া লইতে হয়। প্রাণের এই বিবিধ মূর্ত্তিগ্রহণ জড় পরমাণুগুলার বিবিধ মূর্ত্তিগ্রহণের মত। সকল রকম মূর্ত্তির স্থায়িত্ব সমান নহে। যেগুলা conditions of stability মানিয়া চলে, সেইগুলাই টিকিয়া যায়। যেগুলা মানে না, সেগুলা হয় লোপ পায়, অথবা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন form, নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে। পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটায় প্রাচীনকালের ম্যামথ মাষ্টোডন আপনাকে বজায় রাখিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীনতর আরসুলা বহুতর পরিবর্ত্তন মধ্যেও আপনাকে জীয়ন্ত রাখিয়াছে। প্রাণবিদ্যার আলোচ্য সমস্ত evolution ব্যাপারটা এইরূপে কেবল stability-ঘটিত অঙ্কে পরিণত করিতে পারা যাইবে কি না, এ কালের অনেক বৈজ্ঞানিক তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। যদি পারেন, তাহা হইলে সমস্ত evolution ব্যাপারটা হয়ত dynamicsএর অঙ্কের মধ্যে আলোচিত হইবে। হয় ত একদিন প্রাণপদার্থ stability ঘটিত formulaয় বাঁধা পড়িবে—পৃথিবীর কোন্ অবস্থায় কোন্ প্রাণীর থাকা উচিত, কোন্ প্রাণীর থাকা উচিত নয়, কাগজে কলমে আঁক কষিয়া আমরা বলিয়া দিব। কোটি বর্ষান্তে যখন পৃথিবীর অবস্থান্তর ঘটিবে, যখন ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা এতটা কমিবে, অথবা অন্তরিক্ষে কার্বনিক এসিডের পরিমাণ এতটা বাড়িবে, তখন কোন্ নূতন প্রাণীর অবতারণা ঘটিবে, অথবা বর্ত্তমান প্রাণীকে কিরূপে মূর্ত্তি বদল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহাও আমরা কাগজে কলমে কষিয়া দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত formula প্রয়োগে কোন্ পিতা মাতার কয়টা সন্তান কিরূপ হইবে, আজ কাল কাগজে কলমে কষিয়া বলিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং তদনুসারে প্রাণীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক Eugenicsবিদ্যা বা প্রাণি-উৎপাদন বিদ্যা formula প্রয়োগে নূতন পরিবেশের অনুযায়ী নূতন প্রাণী উৎপাদনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। হয় ত একদিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে;—নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাণিদেহের নূতন মূর্ত্তিদানে সমর্থ হইবে—প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, যদি কখনও সেই শুভদিন আসে, সেদিন প্রাণের প্রাণত্ব থাকিবে কি না? নিয়তির নিগড়ে প্রাণপদার্থ শৃঙ্খলিত হইলে প্রাণের প্রবাহও রুদ্ধ হইয়া যাইবে কি না? প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইবে কি না? প্রাণ তাহার বিচিত্র ইতিহাস—তাহার history—হারাইবে কি না?

ভবিষ্যতে যাহাই হউক, সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রাণের প্রবাহ জড়তার বন্ধনে ধরা দিতে চাহিতেছে না। জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া কূল ছাপাইয়া দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন্ কোন্ পথে চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান্, তরঙ্গিত, আবর্ত্ত-সঙ্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে। জড়ের সহিত প্রাণের এই বিরোধ—উভয়ের মধ্যে এই টানাটানি ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি মারামারি। আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি, প্রাণের ইতিহাস এই বিরোধেরই ইতিহাস। প্রাণের এই সনাতন ক্ষুধা—এই খাই-খাই প্রবৃত্তি—সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত, এই বিরোধের ইতিহাস। আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়া বিশ্বগ্রাস করিবার যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই নিত্য বিরোধের ইতিহাস। সম্প্রতি প্রাণের এই বিচিত্র, নিত্য নূতন, চমৎকার-জনক, ইতিহাস বা history আছে। এই ইতিহাসই প্রাণের বিশিষ্টতা—এবং এ কালের জীববিদ্যা বা Biology এই বিরোধেরই কাহিনী।

এই ইতিহাসের মোটা কথাগুলা বলিতে হইবে। আমাকে এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ আওড়াইতে হইবে। আজি এই পর্য্যন্ত। আপনারা সাহস দিলে বারান্তরে অগ্রসর হইব।

খেয়াঘাটে

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম, এ]

ডাক্ এসেছে দাঁড়াবার আজ,
ওপারের ওই রাজতোরণের তলে,
ঘাটের পারে বসে আছি, "দয়াল মাঝি, পার করগো" বলে;
সঙ্গে আমার এনেছি সব টাকা কড়ি বুকচেরা ধন পুঁজি,
তাইতে আমি, হে কাণ্ডারি,
আজকে তোমার অভয়বাণী খুঁজি।
সাগর আজি ক্ষুব্ধ অতি ঊর্ম্মিরাশি বুভুক্ষু মুখ তোলে,
সহস্রশির নাগের মত; প্রেতের মত ঝড়ের হাওয়া দোলে;
আজ যে প্রভু, হয় না সাহস
উঠ্‌তে তোমার ছোট্‌টো ভাঙ্গা নায়ে,
পরাণ কাঁপে, চড়তে নারি, বসে পড়ি অলস অবশ পায়ে।
ক্ষমা করো, আজকে আমি পারবো না
এই আঁধার তুফান রাতে,
পাড়ি দিতে সাগর ঢেউয়ে, ভাঙ্গা নায়ে, মাঝি, তোমার সাথে।
ফিরে এসো যে দিন সন্ধ্যা উজল হবে সোনার কিরণ মেখে,
সে দিন আমায় পার ক'রোগো,
সে দিন নিয়ো তোমার নায়ে ডেকে।

* * * *

কে রে আসে এমন রাতে ছুটে যেন ব্যাকুল হাওয়ার মত?
কে রে ডাকে এমন স্বরে মিলিয়ে কণ্ঠে ধরার কান্না যত?
উঠিস্‌নে রে, ভাঙ্গা তরী, তলিয়ে যাবে কোন্ অতলের তলে;
কাঁদ্‌বে মা তোর, পাগলপারা
"কোথা আমার বুকের মাণিক" ব'লে।
আয় রে ফিরে, কোলে তুলে
ফিরিয়ে নে'যাই মায়ের বুকের মাঝে,
উঠিস্ নে রে ওরে পাগল, ভাঙ্গা নায়ে এমন মরণ-সাঁঝে।

* * * *

"এ যে আমার চেনা মাঝি, পার করেছে কত আপন জনে,
"বাবা আমার, দিদি আমার গেছে ওপার এই মাঝিরি সনে;
"বাবার কাছে যাচ্ছি বলে,
মা যে আমার মুছ্‌লো চোখের জল;
"বল্‌লে" বাবা, দু'দিন পরে আস্‌ছি আমি, তুই এগিয়ে চল্।"

* * * *

"ও গো মাঝি! ফিরিয়ে আনো,
ভিড়াও ঘাটে তোমার ভাঙ্গা নাও,
"তোমারি ওই ডিঙ্গির পরে শিশুর সাথে বস্‌তে আমায় দাও।
পার হব ওই ভাঙ্গা নায়ে, ভয় ভেঙ্গেছে, ভার হব না মাঝি!
ফেলে দিলাম পথের ধূলায়
মাণিক সোণা সাজানো মোর সাজি।
ফিরে এসো! এসো ফিরে,
পার কর গো প্রভু, আমায় আজ,
কেমন করে, এমন ঝড়ে ঘাটে আমার কাটবে মরণ-সাঁঝ?"
সেদিন হতে পারের পথে চেয়ে চেয়ে কত সন্ধ্যা কাটে;
আমার তরে ফেরেনি'কো
ভাঙ্গা তরী, আজো খেয়া ঘাটে।

অপরিচিতা

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

সেদিন রবিবার। আফিস, আদালত সব বন্ধ। হাতে বিশেষ কোন কাযকর্ম্ম ছিল না। দিনটা আর কা'টতেই চায় না। ঘুমিয়ে, নভেল পড়ে, কোনরকমে দুপুরটা কাটান গেল। বিকেলবেলায় একটু বেড়াতে যা'ব বলে, কাপড় পরে, মনিব্যাগটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লুম। বসন্তকাল; দিব্য ফুর্‌ফুরে বাতাস দিচ্ছিল। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলায় একটা সজীবতা সাড়া দিয়ে উঠেছে। বেলা ৬টা বাজে। প্রকৃতিদেবী যেন ফুলের গহনা সর্ব্বাঙ্গে পরে', লাজনম্রা নববধূর মত সন্ধ্যার ঘোম্‌টা মুখে দিয়ে ধীরে-ধীরে প্রিয়ের উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ট্রামে আরোহী খুব কমই ছিলেন। আমি একখানা বেঞ্চ অধিকার করে বসেছিলুম। গাড়ী জগুবাবুর বাজার, জলটুঙ্গি ছাড়িয়ে ক্রমশঃই অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু, আমার সেদিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। আমি তখন বসন্ত প্রকৃতির শোভাদর্শনে মুগ্ধ। কিন্তু থিয়েটার রোডের মোড়ে হঠাৎ আমার ধ্যান-ভঙ্গ হয়ে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, একটি সজীব বসন্ত-মূর্ত্তি আমার সুমুখের আসনে এসে ব'সলেন। সংস্কৃতে 'সঞ্চারিণী লতেব' পড়েছিলুম; কিন্তু, চক্ষে দেখ্‌বার সুযোগ ও সুবিধা এ পর্য্যন্ত হয়নি; আজ কিন্তু কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি করলুম। তরুণীর বয়স তের-চৌদ্দ হ'বে, দিব্য ছিপ্‌ছিপে গড়ন। নাক, মুখ, চোক যেন তুলি দিয়ে আঁকা,--বিশেষতঃ চোখ দুটি। আর সবার উপর তার রঙ্‌টা। সেটা চাঁপাফুলের মতনও নয়—তবে দুধে-আলতার রঙ্‌ বল্লে অনেকটা এগিয়ে যায় বটে।

আমি প্রথমটা হতভম্ব হয়ে, হাঁ করে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলুম; কিন্তু মেয়েটি আমার মুখের উপর চোক দুটি তুলে এমন করে রাখ্‌লে যে, আমি চোক ফিরিয়ে নিতে পথ পেলুম না। বলেছি তো যে, সে চোক দুটিতে কি একটা জ্যোতিঃ আছে, যা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। সে চোকে একটা নীরব ভৎর্সনা না থাক্‌লেও, একটা আত্মমর্য্যাদার ভাব যে ছিল, তা' আমি বুঝেছিলুম। মেয়েটিকে দেখে তার উপর একটা সম্ভ্রমের ভাব গোড়া থেকেই আমার মনে উঠেছিল। সেই সম্ভ্রমের যে তিনি সম্পূর্ণ অধিকারিণী, সে বিষয়ে বোধ হয় কোন তর্কই উঠতে পারে না।

একটু পরে কণ্ডাক্টার টিকিট দিতে এলে, তরুণী হাতে-ঝোলান ব্যাগ খুঁজ্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। আমি ভাবলুম, বোধ হয় পয়সা কম পড়েছে,—তাড়াতাড়ি একটা টাকা বার করে দেব ভাবছি, এমন সময় টং করে কি একটা শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখি, তরুণী জানলার ফাঁকের মধ্যে মুখ দিয়ে দেখ্‌ছেন, আর কণ্ডাক্টারটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কণ্ডাক্টারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, তাঁকে বল্লুম, "সিকিটা কি জানলার মধ্যে পড়ে গেছে?"

"আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া তরুণী একটু সরে দাঁড়ালেন। আমিও জানলার মধ্যে মুখ দিয়ে একবার দে'খবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। পরে ধীরে-ধীরে বল্লুম, "যদি কিছু মনে না করেন—তা' হ'লে ভাড়াটা--আমি দিই,—বোধ হয় আপনার পয়সা কম পড়েছে?"

"না—না, আপনি কেন দেবেন?" বলিয়া তরুণী ব্যাগটি আবার খু'লিলেন; কিন্তু খুলেই তাঁর মুখখানি যেন কেমন হয়ে গেল। একটি সিকি বা'র করে কণ্ডাক্টারকে দিয়ে বল্লেন, "তাই ত; আমার হাণ্ড্‌গিনিটী ওর মধ্যে পড়ে গেছে; ওটা বা'র করে দিতে পার না?"

"আজ্ঞে ও তো এখন বা'র করা যাবে না, ডিপোয় গাড়ী গেলে তবে পেতে পারেন।"

"না—না; তা' হ'লে তো হবে না; আমি তো ততক্ষণ থাক্‌তে পারব না,—একেই দেরী হয়ে গেছে।"

"আজ্ঞে অন্ততঃ ধর্ম্মতলায় গেলেও না হয় চেষ্টা করে

দেখা যেতে পারে; তার আগে তো কিছু করে উ'ঠতে পারা যাবে না।"

"তা' হ'লে কি হবে? আমার যে ভারী দরকার।" তরুণী উৎকণ্ঠার সহিত কথা কয়টি বলে, এদিক-ওদিক চাইতে লাগিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ বোঝবার মত মনের অবস্থা বোধ হয় আমার সে সময় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম, "যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে এইরকম ক'রলে হয় না? ডিপোয় যেতে বা ধর্ম্মতলায় গিয়া হাপ্‌গিনিটা নিতে আমার কোনই অসুবিধা হবে না—তা' হ'লে আপনি যদি আমার এই সাড়ে সাত টাকা গ্রহণ করেন—তা' হ'লে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে ক'রব।"

"আপনি আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার ক'রবেন?"

"না—কষ্ট আর কি—আপনার যদি উপকার হয়—আর আমি তো ঐ দিকেই যাচ্ছি। তবে একটু দেরী হবে। তা আমার বিশেষ তড়াতাড়ি নাই। তা হ'লে—" বলে আমি টাকা কয়টি তরুণীর হাতে দিলাম।

লজ্জায় তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। পরে, একটু ইতস্ততঃ করে তিনি টাকাগুলি ব্যাগে ফেলে বল্লেন, "দেখুন দিকি; আমার নিজের অসাবধানতার জন্যে আপনাকে কত কষ্ট ভোগ ক'রতে হ'ল। সিকিটা দেবার সময় যদি একটু দেখে দিই, আর তাও যদি কণ্ডাক্টারের হাতে দিই; তা না—একেবারে জান্‌লার মধ্যে—এমন অন্যমনস্ক ছিলুম। টাকারও আমার বিশেষ দরকার। আপনার এই উপকার চিরকাল মনে থা'কবে।"

তাঁ'র কথা শেষ হ'তে না হ'তে, গাড়ী পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে এসে পৌছুল। তরুণী ধন্যবাদ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করে, তাড়াতাড়ি একখানি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলেন। আমার চোকের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

তরুণী চলে গেলে দেখ্‌লুম, আরোহীগণের সকলেরই দৃষ্টি আমার উপর। বুঝলুম, এতক্ষণ দু'জনেরই উপর ছিল, এখন সেটা আমার একলার উপর পড়েছে। আবার, আরোহীগণের মধ্যে দু'একজন এমনভাবে আমার প্রতি চাচ্ছিলেন যে, বোধ হচ্ছিল, যেন আমি না থাক্‌লে তাঁরাই এই সামান্য উপকার করার সুখটা পেতেন। আবার একজন মুখ-ফুটে একটা কুৎসিত রসিকতাই করে ফেল্লেন। এইরকমে যতক্ষণ না গাড়ী ধর্ম্মতলায় পৌছিল, ততক্ষণ আমি সকলেরই দৃষ্টি ও হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে পড়েছিলুম। যাক্, তা'তে আমার দুঃখ ছিল না; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, ভাগ্যিস সেই অপরিচিতার সুমুখে এই সব ব্যাপার ঘটেনি।' তা, হ'লে তিনি কি মনে ক'রতেন!

গাড়ী ধর্ম্মতলায় পৌছিল। কণ্ডাক্টার আমাকে নিয়ে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে সমস্ত ব্যাপারটি জানাইল। ধর্ম্মতলায় কর্ত্তৃপক্ষের যে সাহেবটি থাকেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলে, আমার নামের একখানা কার্ড তাঁকে দিলুম। নামটা পড়ে, আর আমি যে কলিকাতা বারের একজন ব্যারিষ্টার—তা ব্রিফশূন্যই হই না কেন—তা দেখে বোধ হয় তিনি আমার উপর নেক্‌নজর ক'রলেন। তৎক্ষণাৎ একজন মিস্ত্রি ছুটে গিয়ে দু'খানা কাঠ খুলে যখন একটা চক্‌চকে নতুন আধলা বা'র ক'রলে, তখন কণ্ডাক্টার প্রভৃতির মুখে একটা হাসির গুঞ্জন শোনা গেল। সাহেবও তাঁর গাম্ভীর্য্য ত্যাগ ক'রে আমাকে মিষ্ট-মিষ্ট দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি ভারি লজ্জায় পড়লুম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। তাই ত, অমন সরলতা-পূর্ণ চাহনি, অমন সুন্দর চেহারা যার, সে কখনও এমন নীচ কায করতে পারে! নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু আছে। সেইজন্যে আসবার সময় সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে এলুম যে, যদি সেই মহিলাটি কোন খোঁজ নিতে আসেন, তাহা হইলে যেন আমার কার্ডখানি তাঁকে দেওয়া হয়, আর ঘটনাটি বলা হয়। সাহেব একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন; ভাবটা—'তিনিও তোমার এসেছেন, আর আমিও বলেছি।'

আফিস থেকে যখন বেরিয়ে আসছি, তখন শুন্‌লুম, আমাদের সেই কণ্ডাক্টারটা অপর কর্ম্মচারীদের বল্‌ছে "ভায়া, দেখ, এই আবার আর একরকম জোচ্চুরি। বেচারাকে কেমন ঠকিয়ে গেছে; সাবাস্ মেয়ে যা'হোক।" ইচ্ছা হচ্ছিল গিয়ে গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলি, "বাপু, আমার টাকা গেছে, আমার গেছে—তোমার তা'তে কি?" কিন্তু ইচ্ছাটাকে দমন ক'রতে হ'ল; কারণ, জীবনে এমন বেকুব কখনও বনিনি। রাত্রি প্রায় আটটার সময় বাড়ী ফিরে এলুম। ব্যাপারটা আর কাহারও কাছে ভাঙলুম না; শু'নলে সকলে ঠাট্টাই ক'রবে বই তো নয়।

সকালে উঠে ট্রাম-কোম্পানীর চিঠির আশায় বা সেই

অপরিচিতার চিঠির আশায় রোজই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতুম, তারপর চা পান কর্‌তে-কর্‌তে খবরের কাগজের পার্শো-ন্যাল (Personal) অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের তালিকাটি দেখাও একটা কাজ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু কপালদোষে রোজই বিফল হ'তে হ'ত।

(২)

এইরকমে দু'বছর প্রায় কেটে গেছে। সেই ট্রামের কথাটাও প্রায় ভোলবার মধ্যেই। তবে ক্বচিৎ কখন এক্ একবার মনে পড়ে বই কি? এই সময় এক শনিবার প্রাতঃকালে মিসেস রায়ের একখানি চিঠি এল। আগামী রবিবারে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ। মিসেস রায়ের নিমন্ত্রণে একটু বিশেষত্ব আছে, যাহা প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়; সুতরাং পরদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর ওখানে যেতে হ'ল।

রাস্তায় যেতে-যেতে কি-জানি-কেন, দু'বছর পূর্ব্বের এমনি দিনের একটি কথা বারবার মনে পড়্‌তে লাগল। সেদিন বোধ হয় চাঁদ এমনিধারাই উঠেছিল, বোধ হয় ফুল এমনিধারাই ফুটেছিল।

মোটর গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ী-বারান্দার তলায় থামিল। তাড়াতাড়ি নেমে ড্রয়িংরুমে ঢুক্‌তেই মিঃ রায় অভ্যর্থনা করে বসালেন। দু'চার জন নবাগত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন।

পাশের ঘরে তখন মেয়েদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। মিসেস রায় এসে আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই অনেকের হাসি ঠাট্টা থেমে গেল। এটা মেয়েদের স্বধর্ম্ম এতে দোষ দেওয়া যেতে পারে না; বরং সুখ্যাতিই করা যেতে পারে। আমি ঢুকেই তাঁদের রসভঙ্গ করার দরুণ একদফা ক্ষমা চাইলুম; তারপর মিসেস্ রায় একটি ষোড়শীকে আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। ইনি তাঁর ভাগ্নি, এখানে অনেক দিন ছিলেন না, কাল সবে এসেছেন, আর এঁর জন্যেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ। সকল কথা শেষ করে মিসেস্ রায় যখন আমার পরিচয় দিয়ে লীলাকে একটা গান ক'রবার জন্যে বল্লেন, তখন আমি যে কি বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেব, তার ভাষা খুঁজে পেলুম না। লীলার কোমল কুসুম-পেলব আঙ্গুলগুলি যখন পিয়ানোর উপর প'ড়ছিল, যখন সে গান গাইতে-গাইতে মৃদু-মৃদু হাস্‌ছিল, তখন আমার ঠিক মনে হচ্ছিল, এঁকে আমি পূর্ব্বে দেখেছি; আজও এখানে আস্‌বার সময় এই মূর্ত্তির কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তবুও সাহস হচ্ছিল না যে, জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি সেই?

গান শেষ হল। সকলেই একটু-আধটু গল্প ক'রতে লাগ্‌লেন; আমি আমার সন্দেহ দূর ক'রবার এই সুযোগ ত্যাগ করলুম না। নানা অবান্তর কথার পর ট্রাম সম্বন্ধে নানা দোষ গুণ, কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার ইত্যাদি ব'লতে লাগ্‌লুম; কিন্তু সে তখন বোধ হয় আমার গল্পে কাণই দেয়নি; বরং তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম—যেন কেমন একটা বিরক্তিভাব। বোধ হয় সে ভাবছিল—কোথাকার লোক দেখ ত, বোধ হয় ট্রাম কোম্পানীর একটা বড় শেয়ারহোল্ডার হবে। আর গল্প পেলে না। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। খানিক পরে একটা হাই তুলে সে বলে উঠল "দেখুন, এই ট্রামগুলোর সঙ্গে আমার একটা স্মৃতি জড়িত আছে।"

"স্মৃতি! কি রকম?"

ব্যাপারটা এইবার দিনের মতন ফর্সা হয়ে গেল। সন্দেহ দূর হ'ল।

"দু' বছর পূর্ব্বে একটি ভদ্রলোক কালীঘাট থেকে ধর্ম্ম-তলার ট্রামে আমার সুমুখের বেঞ্চে বসেছিলেন—।"

"খুব ভাগ্যবান লোক বলুন।"

"হ্যাঁ, যা বলেছেন; তবে সেই সৌভাগ্য কিন্‌তে তাঁকে যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়েছিল।"

মিসেস্ রায় বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "লীলার ঐ ঠাকুর-মাদের মতন 'বেঙ্গমা বেঙ্গমীদের,. গল্পছাড়া আর পুঁজি নেই। ও গল্প শুনে-শুনে বাপু, আমাদের কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। থাম্ বাপু।"

"না—না—আমি শুনিনি, আপনি গল্পটা বলুন।"

পাশের ঘর থেকে লীলার ভাই শরৎ আমার কথা শুনে ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে বল্লেন, "মিঃ গুপ্ত, সেই ভাগ্যবান পুরুষটির জ্বালায় আমাদের দিনকতক টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল। প্রথম-প্রথম থিয়েটারে, বায়োস্কোপে, অপরিচিত লোক দেখ্‌লেই তাঁর খোঁজ নেবার জন্য লীলা তো আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তু'লত। ওর মনে হ'ত যে, সব লোকই যেন সেই ভাগ্যবান পুরুষ।" মিসেস্ রায় বল্লেন "হ্যাঁ—লীলার

ঐ একরকম—চিরকালই ওর ঐ রকম গেল। ও সকলকেই ওর 'তিনি' ভাবে—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওর 'তাঁকে' আর পাওয়া গেল না।" বেচারী লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। আমি তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রবার জন্যে বল্লুম, "আচ্ছা, আমাকে কি সেই ভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে হয়?" প্রথমটা সে কোন উত্তর দিতে পা'রলে না, কারণ তাকে এক বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে আর এক বিপদে ফেল্লুম। পরে ধীরে-ধীরে মুখটি নিচু করে, নখ দিয়ে কার্পেটের উপর দাগ কাট্‌তে-কাট্‌তে বল্লে "সেই তো হচ্ছে বিপদ। আমি এত ব্যস্ত ছিলুম যে, ভাল করে তাঁর দিকে চাইবারই অবকাশ পাইনি,—তাঁর নামটিও জিজ্ঞাসা করা হয়নি—তবে একবার মুহূর্ত্তমাত্র যে চেয়েছিলুম, তা'তে বোধ হয় আপনার—।" আর সে বল্‌তে পারলে না।

আমি বল্লুম "যদি আপনারা কিছু মনে না করেন, তা' হ'লে আমি ঐ সম্বন্ধে একটা গল্প বল্‌ব। অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার পর।"

আমার কথা শেষ হ'লে, একটা চাপা হাসির সুর যেন ঘরময় খেলে গেল। লীলা রেগে মুখ হেঁট করে গজ্‌-গজ্‌ ক'রতে-ক'রতে ঘর থেকে চলে গেল—তাকে ধরে রাখা গেল না। শরৎ আমার পিট চা'পড়ে বলে উঠল "You young gay dog! তোমার এই কাজ! আর আমরা রাজ্যিশুদ্ধ লোকের পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি!"

খাওয়া-দাওয়ার পর আমার গল্প শোন্‌বার আর শ্রোতা পাওয়া গেল না। লীলা যে কোথায় লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া দায় হ'ল। আমি ঘরে পাইচারি ক'রতে-ক'রতে লীলার একখানা ছবির কাছে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিলুম; শুনতে পেলুম,—কে একজন মিহিসুরে ব'লছেন, "মিঃ গুপ্তকে এখন খুব 'জলি' বলে বোধ হচ্ছে।" আর-একজন হাস্‌তে-হাস্‌তে উত্তর দিলেন, "ওটা পরশমণির গুণে।"

তারপর যা ঘটেছিল, তা' বোধ হয় ব'লতে হবে না। শুভদিনে, শুভক্ষণে, চারিচক্ষের শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এর জন্যে অনেক ঠাট্টা সহ্য ক'রতে হয়েছে; তবে সেগুলার শোধ মায় সুদ শুদ্ধ লীলার কাছ থেকে আদায় করে নিতুম। লীলার মান অভিমান ভাঙ্গবার অমোদ ছিল আমার এই গল্প। আমি আরম্ভ করতুম "থিয়েটার রোডের মোড়ে সে এসে উঠল, হাতে তার একটা ঝুলান ব্যাগ ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে যখন একটা নতুন চক্‌চকে আধলা কণ্ডাক্টারকে দিতে গিয়ে জান্‌লার মধ্যে ফেলে দিলে—অবশ্য সে সেটাকে একটা হাপ্‌গিনি মনে করেছিল ইত্যাদি।"—তখন লীলা মান ভঙ্গ করে তাড়াতাড়ি দু'হাতে আমার মুখ চেপে ধর'ত, আর বল'ত, "পুরুষ কি বলে' একটা 'অবলা, সরলা, ননীবালার' উপর অমন নজর দিয়েছিলে বল ত!" আমি তখন অন্য-মনস্কভাবে গান ধরতুম—

"তোমরা সবাই ভাল;
যার কপালে যেম্নি জুটে সেই আমাদের ভাল।"

ডাক

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

এরূপ তোমার স্বরূপ যদি, ভুল্‌ব না আর রূপ তোমার,
রূপের খোঁজে জনম যায়, ত কিছুই ক্ষতি নাই আমার।
অন্ধকূপের পঙ্ক হ'তে, উঠেই যদি পাই তোমায়,
কুরূপ আমার সুরূপ হবে প্রেম সাগরের সীমানায়।
প্রেম যদি পাই, ধন নাহি চাই, চাইনা রূপের খনি,
প্রেমই আমার হে রসময়, আমার মাথার মণি।
তোমার রূপে, তোমার প্রেমে মজাও আমার পাগল মন,
তোমার ধ্যানে বিভোর হ'য়ে কর্ম্ম করি সমাপন।

* * * *

ঠিক দেখেছি, ঠিক বুঝেছি, নিমেষ শুধু দরশন,
নিমেষ তরে করেছিলাম তোমার চরণ পরশন—
ক্ষণিক তুমি চেয়ে ছিলে মুখের পানে দয়াময়,
মোহন রূপে ভুলেছিলাম ভুলের ধরা করি জয়।
এস আমার ধ্যানের প্রভু, জ্ঞানের প্রভু দয়াময়,
পদস্পর্শে হর্ষে আমার হলই বুঝি জ্ঞানোদয়।
এস আমার প্রভু এস, চাই না আমি আলিঙ্গন,
ছুঁয়ে থাক্‌তে পারি যেন তোমার রাঙা শ্রীচরণ।
এস আমার প্রভু এস, চেয়ে দেখি রূপ তোমার,
অরূপ আমার, স্বরূপ আমার, কিরূপ নিয়ে থাকি আর।

যশোহর-খুলনার ইতিহাস

(সমালোচনা)

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

"যশোহর-খুলনার ইতিহাস" নামে পূর্ব্ব-ভারতের "ব"-দ্বীপের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে উপাদেয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গালাদেশের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিভাগের ইতিহাস নাম দিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে "District Gazetteer"। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়-প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস" ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "যশোহর-খুলনার" ইতিহাস সর্ব্বোত্তম। এক হিসাবে সতীশ বাবুর গ্রন্থ 'ঢাকার ইতিহাস' অপেক্ষাও উত্তম। সতীশ বাবুর গ্রন্থের প্রথমাংশ—যাহাতে "ব" দ্বীপের প্রাকৃতিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি মনোরম ও সুখপাঠ্য। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর প্রাকৃতিক বিবরণ পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই অংশে ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সাতটি পরিচ্ছেদে কেবল সুন্দরবনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে সুন্দরবনের উত্থান ও পতন বিবৃত হইয়াছে। এই স্থানে "অতলস্পর্শ, বরিশাল-গন্, ঝটিকাবর্ত্ত, জলপ্লাবন, জলস্তম্ভ, ভূমিকম্প, মগ ও ফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার" সম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্র মহাশয় যে সমস্ত তথ্য একত্র করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে অন্য কোন ভাষায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার—সুন্দরবনে মনুষ্যাবাসসম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত, অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। 'জটার দেউল' প্রভৃতি সুন্দরবনের ধ্বংসাবশেষসম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনেক উপকারে আসিবে। পর্ত্তুগীজ ইতিহাসবেত্তা ও পর্য্যটকগণ বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলের যে সমস্ত স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অধ্যাপক মিত্র মহাশয় তাহার অনেকগুলির বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থানে মিত্র মহাশয় বোধ হয় স্বদেশপ্রীতির জন্য একটু সাবধানতার অভাব দেখাইয়াছেন। Picaculi পেঁচাকুলি হইতে পারে, কিন্তু Cuipitavazকে খলিফতাবাদ, Noldyকে নলুয়া এবং Daparaকে দাপপাড়া বা দেবপাড়া অনুমান করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় নাই।

দ্বিতীয় অংশে ঐতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভৌগলিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদি-হিন্দুযুগের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। আদি-হিন্দুযুগ, জৈন-বৌদ্ধযুগ প্রভৃতি যুগ-বিভাগ মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থের একটি কলঙ্ক। বিংশতি শতাব্দীতে রচিত ইতিহাসে এই সকল কাল্পনিক নাম স্থান পাইবার যোগ্য নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের বিশ্বাস অতি প্রগাঢ়। তিনি মনে করেন, "বলির পুত্রগণ অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন আর্য্যেরাই এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গদেশের নানাস্থানে পবিত্র তীর্থস্থান এবং পীঠমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, এই উক্তিটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কতটুকু সত্যের তীব্র আলোক সহ্য করিয়া দাঁড়াইতে পারে, মিত্র মহাশয় তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, "গঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে গাঙ্গরাষ্ট্রের সভ্যতা বিস্তৃত হয়।" এই উক্তির উপরে মন্তব্য অনাবশ্যক। এই মাত্র বলিয়া রাখা উচিত যে, গ্রন্থকারের বিশ্বাস এই যে, সভ্য বৈদিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলে তবে গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। আর এক স্থানে মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন, "কালীঘাটে মহাকালীর ও যশোরেশ্বরীর, মূর্ত্তির পৌরাণিকতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ—এই সকল শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য। এ মূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন দেখিলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, ইহা বৌদ্ধ যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রচিত।" আমি ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি অনুসারে নির্ম্মিত সহস্র-সহস্র প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু কালীঘাটের মহাকালী এবং যশোরেশ্বরী অপেক্ষা কদর্য্য শিল্প-নিদর্শন কোথাও দেখি নাই। মিত্র মহাশয় কোন্ যুগকে বৌদ্ধযুগ বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু অনুমান করিতেছি যে, এই যুগ অন্ততঃ উত্তরাপথে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে গৌড়, বঙ্গ, মগধ যখন স্বাধীন ছিল, তখন এতদ্দেশীয় শিল্পে প্রাণ ছিল; এইরূপ কদাকার মূর্ত্তি কখনও তৎকালীন গৌড়ীয় শিল্পীর কলাকৌশলের নিদর্শন হইতে পারে না। মুসলমানের অত্যাচারে যখন গৌড়ীয় শিল্পরীতি বিনষ্ট হইয়াছে,—এইরূপ সময়ে শিল্প-শাস্ত্রানভিজ্ঞ, তক্ষণে অনভ্যস্ত কোন ব্যক্তি এই মূর্ত্তিদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে, "বাস্তবিকই

যশোরেশ্বরীর মূর্ত্তি ভীষণ হইলেও ইহা যে ভাস্কর্য্যের একটি চরম আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।" প্রমাণবিহীন অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতি ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

পরীমালা দেবীর মূর্ত্তি, পানিঘাটের অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি, মহেশ্বরপাশার বাসুদেব-মূর্ত্তি, ঈশ্বরীপুরের গঙ্গাদেবী প্রভৃতি মূর্ত্তির সহিত কালীঘাটের মহাকালী অথবা যশোরেশ্বরী মূর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। পরীমালা দেবী ও পানিঘাটের অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি কি কারণে আদি-হিন্দুযুগের মধ্যে স্থান লাভ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল মূর্ত্তি গুপ্ত সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বহুকাল পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং এইগুলি সপ্তম অথবা অষ্টম পরিচ্ছেদে বিবৃত হওয়া উচিত ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে জৈন ও বৌদ্ধযুগ বিবৃত হইয়াছে। কোন্‌টুকু জৈন এবং কোন্‌টুকু বৌদ্ধযুগ, গ্রন্থকার তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই। নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় ভাল হইত; কারণ এই শব্দের অর্থ এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারায় কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য উক্তি আছে :—

(১) "খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যৌধেয় বা যাদব জাতি বঙ্গাধিকার করে।" যৌধেয় এবং যাদবগণ যে একই জাতি, তাহা কোন ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জানিতেন না। এই জাতি বা বংশদ্বয়ের একত্বসম্বন্ধে ঐতিহাসিক মিত্র মহাশয় যদি কোন নূতন প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এই জাতিদ্বয় যে কোন কালে বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিল, তাহাও বোধ হয় না; কারণ, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) "অশোকের শিলালিপিতে যৌধের ও রাষ্ট্রকূট জাতির উল্লেখ আছে।" অশোকের যতগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই যৌধেয় অথবা রাষ্ট্রকূট জাতির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। মিত্র মহাশয় এই সকল সামান্য বিষয় স্বয়ং স্বল্পায়াসে জানিতে পারিতেন।

(৩) "সম্ভবতঃ বহু রাষ্ট্রকূট যে অংশে বাস করে, তাহারই নাম হয় রাঢ় বা লাঢ়।" এই উক্তি হইতে অনুমান হয় যে, মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশের বাহিরে রাঢ় নামক কোন প্রদেশ দেখিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদ তাঁহার সুন্দর গ্রন্থের কলঙ্ক। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষভাগে মিত্র মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যশোহরের প্রাচীন নাম 'সমতট'। এই সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। সমতটের অবস্থানসম্বন্ধে মতভেদ আছে, সুতরাং প্রমাণবিহীন উক্তি সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, বর্ত্তমান কুমিল্লা প্রাচীনকালে, সমতট নামে খ্যাত ছিল—এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদের কোন স্থানে যশোহরে জৈন প্রভাবের উল্লেখ পাইলাম না; সুতরাং মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থে জৈন-যুগের কথা কেন আসিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার অনেক বিষয় সম্বন্ধে বিচার না করিয়াই স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ছয় বৎসর রাজত্বের পর, ৩২৬ খৃষ্টাব্দে, তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন।" সমুদ্রগুপ্ত যে ঠিক ৩২৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,—বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহই এ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট এ স্মিথ্ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-উপলক্ষে মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন "যশোহর খুলনা (?) এই সমতটের অন্তর্গত। সমতট ভাগিরথী হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সমস্ত সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশই সমতট।" বিংশতি শতাব্দী যে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে ঐতিহাসিক আলোচনার যুগ, তাহা বোধ হয় মিত্র মহাশয় এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক আপ্তবাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করেন না। সুতরাং যশোহর-খুলনা যে সমতটের অন্তর্গত, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন না করিলে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। "ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বঙ্গ, এবং পদ্মার উত্তর পারে বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান লইয়া ডবাকরাজ্য গঠিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।" অনুমানটি কাহার, তাহা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তিনি কি কারণে এই অনুমান করিয়াছিলেন, তাহারও বিচার আবশ্যক। প্রাচীন বঙ্গদেশ যে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত, একথা স্বীকার করিয়া লইতে বোধ হয় কেহই প্রস্তুত নহেন। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদে "পূর্ব্ব" স্থানে "পশ্চিম" লিখিত হইয়াছে। দিল্লীতে কুতবমিনারের নিকটে লৌহস্তম্ভে যে চন্দ্ররাজার লিপি আছে, তিনি যে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত নহেন, তাহা মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "Indian Antiqury" পত্রে শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দে "প্রবাসী" পত্রে আমি এই প্রসঙ্গের বিচার করিয়াছি। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। সমতট ও ডবাকের বিস্তৃতিসম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের উক্তির মূল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি স্বনামধন্য কৌলশাস্ত্রিক ও পৌরাণিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বৈশ্যকাণ্ডের প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায়ে বসুজ মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটির নাম তখন সমতট ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য ইহার পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (পৃঃ ১৪৯)। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম যে সমতট, তৎসম্বন্ধে বসুজ মহাশয় কি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন? "এতদ্ব্যতীত

পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কামরূপ এবং দবাকের (বোধ হয় বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, কামরূপ ও সমতটের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গোত্তর প্রদেশের এই নাম ছিল) রাজাও তাঁহাকে কর প্রদান করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা একপ্রকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।" (১৪৯ পৃঃ)। "বোধ হয়" বলিয়া বসুজ মহাশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কখনও কোন অনুমানের স্বপক্ষে কারণ প্রদর্শনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই, এক্ষেত্রেও প্রমাণের ছায়া মাত্র নাই। মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আর একটি অদ্ভুত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, "সমুদ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা-পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশে যেখানে যে সকল সুন্দর চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার কতক এই যুগে, এবং কতক পরবর্ত্তী সেন-রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়।" বাঙ্গালাদেশে সেনরাজত্বকালের দুই একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্ত্তি পালবংশীয় সম্রাটগণের অধিকার কালের। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, অদ্যাবধি উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গুপ্তাধিকারকালের একটিও বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ নানাবিধ অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণার দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া মিত্র মহাশয় যদি একটি মাত্র পরিচ্ছেদে এই সকল যুগের যশোহরসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থের বিশেষত্ব পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর-খুলনার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বিদ্বৎ-সমাজে অজ্ঞাত ছিল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষভাগে বারবাজারের ধ্বংসাবশেষ বর্ণনে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্রার স্তূপ, ভরত ভায়নার স্তূপ, প্রভৃতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ শতদোষ সত্ত্বেও মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থ অমর করিয়া রাখিবে। ভবিষ্যতে "ব" দ্বীপে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি, ঈশ্বরীপুরের গঙ্গাদেবী, সেগহাটীর ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রভৃতি অতি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক সতীশচন্দ্র গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাঁহারা গৌড়ের প্রাচীন শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন,—এই সকল প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, মগধে, অঙ্গে, বঙ্গে, সমতটে, গৌড়ে ও রাঢ়ে মধ্যযুগে একই শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল। এই সকল আবিষ্কারের জন্য সতীশচন্দ্র মিত্রের নাম বঙ্গবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে মিত্র মহাশয় পাঠান রাজত্বকালের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই অংশে মুসলমান রাজত্বকালের প্রারম্ভের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পরিস্ফুট না হইলেও, ইহাতে গ্রন্থকারের বহু পরিশ্রমসাধ্য স্থানীয় অনুসন্ধানের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার দনুজমর্দ্দনদেবসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনায় অনেক স্থানে গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তা পরিস্ফুট হইলেও, শেষাংশে ময়মনসিংহে আবিষ্কৃত দেববংশ নামক গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত ইতিহাসের মর্য্যাদা হানি করিয়াছেন। 'দেববংশ' নামক গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা ঢাকা শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের বহু প্রাচীন মুদ্রার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মৎপ্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাসের" প্রথম ভাগে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 'দেববংশ' অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' রাঢ়ের দেববংশের যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়...দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন; ইনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূলে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৬—৬৭)।...শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ মহেন্দ্রদেবের যে সমস্ত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি এবং আমি একমত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী—পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন; সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দন-দেবের কোনও সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। বটুভট্টের 'দেববংশে' মহেন্দ্রদেব দনুজ-মর্দ্দনের পিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন। সুতরাং বটুভট্টের 'দেববংশে'র ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না"—বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ১৩১—১৩২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত অধ্যায়-পঞ্চকে খাঁজাহান আলির কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষের বিবরণ ও তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা সরল ও আখ্যায়িকার ন্যায় সুখপাঠ্য এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। যশোহর-খুলনার ইতিহাসের প্রথমভাগ রচনা করিয়া অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার হইবে।

"সাহিত্যের ভাষা ও চল্‌তি কথা"

(আলোচনা)

[শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

"উল্টা বুঝিলি রাম" গোছের হইয়া দাঁড়াইল! বিগত আষাঢ় মাসের "ভারতী"তে জনৈক প্রচ্ছন্ননামা লেখক আমার "ভারতবর্ষে"-প্রকাশিত "সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা" প্রবন্ধের দুইটি প্রতিকূল সমালোচনা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। মনোনিবেশপূর্ব্বক সমালোচনা দুইটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে, ইনিও সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁহাদের নিকট "জজিয়তি" অপেক্ষা "ওকালতি"ই অধিক প্রিয়; যাঁহাদের নিকট যুক্তি অপেক্ষা, প্রমাণ-প্রমেয় অপেক্ষা, বাঁধশূন্য অসম্বদ্ধ চল্‌তি ভাবই মুখরোচক। তাই, সাধারণ উকিলের ন্যায়, ইনিও "সাদাকে কালো" এবং "কালোকে সাদা" করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছি। সমালোচক মহাশয় আমার প্রবন্ধের "Bird's-eye view" লইয়া একেবারে লিখিয়াছেন, "লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, তিনি সাহিত্যিক ভাষায় চল্‌তি কথার পক্ষপাতী নন।" এ বক্তব্য আমার নহে, ইহা তাঁহার আরোপিত বক্তব্য। আমি প্রবন্ধে পুনঃ-পুনঃ লিখিয়াছি, "নিরবচ্ছিন্ন সাধু ভাষায় কেহ কখনও সাহিত্য-রচনা করিতে পারেন না, কেহ কখন করেনও নাই।" "ক্রিয়া ভিন্ন খাঁটি চলিত শব্দ ও প্রবচনগুলি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে বিশেষ শিল্পের প্রয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার বড়-বড় লেখকগণ এ শিল্পে অনেকটা সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন।" * ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়,—সমালোচক হয় আমার প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ পড়েন নাই (যেমন হইয়া থাকে!), না হয়, সমালোচনা করিবার খাতিরে আমার বক্তব্যটী ইচ্ছা করিয়াই বুঝেন নাই। তাহার পর, সমালোচক মহাশয় "চাষার ভাষা"র পক্ষ হইতে কৃষক কবি বারনস্ ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত নিরক্ষর গ্রাম্য-কবির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সব ভাষা কি Standard হইয়াছে, অথবা ইংরেজ লেখকগণ কি বারনসের, বাঙ্গালার লেখকগণ কি গ্রাম্য-কবির, ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন? কেহই বারনস্‌কে শুধু ভাষার জন্য শ্রেষ্ঠ কবি বলেন নাই। কাহাকেও সেক্সপিয়ার, মিলটন, টেনিসনের সহিত বার্ণস্‌কে তুল্যাসন দিবার সাহসিকতা করিতে দেখি নাই। বার্ণস্ কৃষকের ব্যথা সহানুভূতির সহিত জানাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার এত প্রশংসা; সে প্রশংসার দাবী কৃষকী-ভাষা নহে। অপর পক্ষে কৃষকী ভাষায় না লিখিয়াও একই কারণে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সকলের সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় আমার, আমি যাহা বলিয়াছি তাহার দ্বারাই, আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তার কপাল ভাঙ্গিয়াছে"র * পরিবর্ত্তে "তাহার ললাটদেশ ভগ্ন হইয়াছে" বলিলে কেমন শোনায়?" আমিও ত তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছি। আমি লিখিয়াছি, "আরও দেখুন চলিত কথাতেও কত উপমা, কত অলঙ্কার আছে। কিন্তু শুধু ভাষার, আটপৌরে দোষে আমরা সেগুলি গ্রাহ্য করি না। যথা * * 'তাঁদের কপাল ফেটেছে' 'বাজার যেন আগুন' ইত্যাদি।" এগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদ করিতে কে বলিয়াছে? তবে "মাথা খাও সেখানে যেয়ো না"—যেরূপ সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—তাহা শিক্ষিত পুরুষের আসরে কাহাকেও বলিতে শোনা যায় না। সমালোচক মহাশয়ের আর একটী আপত্তি,—কৃত্রিমতায় সাহিত্যের সৃষ্টি লইয়া। আমার সমস্ত প্রবন্ধটী আর এখানে পুনরুদ্ধৃত করিতে পারি না। ডাঃ সুয়িট, কার্ডিন্যাল নিউম্যান মহা-সাহিত্য-বিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের উক্তির সমালোচনা সমালোচক মহাশয় বাদ দিলেন কেন? তিনি শুধু সনাতন পদ্ধতিতে সমালোচ্য রচনার সুবিধামত অংশ-বিশেষের মাত্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সেগুলিও বিচার-সহ হইতে পারে নাই। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, স্বভাব-সরল আদিম জাতি ক্রমশঃ কৃত্রিমতার আশ্রয়ে কাপড় পরিতেছে, ক্রমশঃ দেহকে কৃত্রিম করিয়া রং ঢং দ্বারা উল্কি পরিতেছে। কৃত্রিমতা কি এতই হেয়?

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "লেখক তারপর বলিতেছেন, 'চল্‌তি ভাষা শিশুর ভাষা * * *'—এ এমন ছেলেমানুষী কথা যে, এর জবাব দিতে লজ্জা হয়।" কিন্তু আমি মাত্র বলিয়াছি, শিশুর কথাও প্রাকৃতের নিয়মাদির দ্বারা বুঝান যায়। তাহাতে "ছেলে-মানুষী" লিখিবার প্রয়োজন হইল কেন? সমালোচক এক নিশ্বাসেই বলেন, "মন যাঁর পরিণত, তাঁর ভাষাও পরিণত" "মানুষ শিশু-অবস্থা হইতে যখন পরিণত-অবস্থায় পৌঁছায়, তখন যে সে শৈশবের ভাষা ছাড়িয়া দেয়, তাহা ত নহে"। আবার শুনুন, "তখনও সে চল্‌তি ভাষাতেই কথা কয়; 'বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি' বলিয়া অভিধান খুঁজিয়া শব্দ-চয়ন করিতে বসে না।" প্রত্যেক লেখকই কি গোড়াতে শব্দ শিখেন নাই? তাঁহার মনেও কি একটা অভিধান নাই? অভিধানটা কেন হয়, কে সৃষ্টি করে, তাহার প্রয়োজন কি—সমালোচক একটু

* ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ৯২৪ পৃষ্ঠা।

* "ভাঙিয়াছে" কেহই বলে না, "ভেঙেছে"ই লোকে বলে। সমালোচক কি অসাবধান!

ভাস্করতীর্থ

Emerald Ptg. Works

ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? "চলিত কথায় উৎকৃষ্ট ধ্বনি হইতে পারে না"—সমালোচক মহাশয় এ যুক্তির প্রমাণ চাহিয়াছেন। প্রমাণ,—"গীতাঞ্জলী," ভাষা-হিসাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে—ইহা বহু সূক্ষ্মদর্শী কাব্য-সমালোচকেরও মত। বার্ণ্‌সও ভাষার হিসাবে টেনিসন, বায়রণের সহিত দাঁড়াইতে পারে না। আমি এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত মূল প্রবন্ধে দিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আরও দিতে চেষ্টা করিব। কাহারও কাহারও আবার মত, 'গীতাঞ্জলীর' বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজীই শ্রুতি-মধুর ও উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, "গীতাঞ্জলী"র অনুবাদও চলিত ইংরাজীতে হয় নাই। ধ্বনির খাতিরে তাহাতে অনুপ্রাস আছে ; কঠিন, শুদ্ধ শব্দ আছে ; কাব্যের ভাষা আছে। নমুনাস্বরূপ দেখুন, No. 53, "* * * It *quivers* like the one last *response* of life in *ecstasy* of pain at the final *stroke* of death ; * * * thy sword, O Lord of thunder, is *wrought* with *uttermost* beauty, terrible to *behold* or to think of." ইহার মধ্যে quivers স্থানে shakes, response—answer, ecstasy—joy, wrought—worked চলিত কথিত ভাষায় লেখা উচিত ছিল ; যদিচ তাহাতে অনেক মাধুর্য্য লোপ পাইত, সন্দেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—সমালোচক মহাশয় যে ভাষার উপর অধুনা হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, সমালোচনায় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ! আমাদের দুই নৌকায় পা' দিয়া দুই রকম কথা বলাই ত চাই।

'ভারতী'র ঐ সংখ্যায় আরও একটি প্রবন্ধ আছে ; তাহার নাম "চল্‌তি ভাষা"। একই বিষয়, তবে ইহার ভাষা চল্‌তি বটে ; ভাবও চল্‌তি—ত্বরিতে আসে ত্বরিতে চলিয়া যায়, লোকের মনে স্থায়ী কিছুই রাখিয়া যায় না। বেশী পাত্‌লা ও বেশী চল্‌তি হইলে—বাহিরের দিকে নবীন হইয়া—নেশার মত ছুটিলে প্রায় ether হইয়া, অবিরত "আফিঙ্‌ ফুলের রঙিন্‌ স্বপন" দেখিলে,—জগতে না থাকিলেও চলে, কাহারও লাভালাভ মোটেই নাই। এ প্রবন্ধ বিচারের জগত হইতে যেন লেখা নয়। একটানা স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে বাঁধা গৎ—চলা জিনিষটা ব্রাহ্মণ-কটাক্ষ, "ভাষা প্রাণ-বস্তু", নূতনের লাভ, ব্যাকরণ বিদ্বেষ, ইত্যাদি আছে। ভাষা ও 'চোলো'না', 'ভলিয়ে দিচ্ছে', 'রোসো', 'কোনো', 'মলুম', 'বাড়াচ্ছে', 'জোর করে নেব' ইত্যাদি কায়দা-মাফিক্‌ আছে। লেখক বলিতে চান, চলা জিনিষটা ভাল—খুব চল, বোঁ বোঁ করিয়া চল, আর নূতন হও। ভাষাও এইভাবে চল্‌তি হউক। চলার কথায়—আমাদের ছোট বেলায় "The slow and steady wins the race"—সেই শশক ও কূর্ম্মের গল্পটী মনে পড়িয়া যায়। লেখক কি মনে করেন, সাহিত্যিক ভাষা চলে না ? কালিদাস, সেক্সপিয়ার, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কি গতি ছিল না ? চলিত ভাষা হইলেই যে জোরে চলিবে, তাহার মানে নাই। বরং চলিত ভাষা দু'দিনে লোপ পায়, সাহিত্যিক ভাষা,—যেমন সংস্কৃত,—কালজয়ী হইয়া আজও চলিয়া আসিতেছে, কত প্রাকৃতই না ইহার মধ্যে ডুবিয়া গেল ! Bergson এর মতে চলা জিনিষটা আপেক্ষিক (relative)। তুমি যাহাকে অচল বলিতেছ, প্রকৃত পক্ষে—তাহা অচল নয়, তবে তোমার মত ভোঁ-দৌড় দিতেছে না, এই যা। এ প্রবন্ধে লেখক একটা প্রকাণ্ড হুকুম জারি করিয়াছেন, যথা, "আজকের দিনে কল্‌কাতার রাজপথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাংলা দেশ সেই দিকে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে আছে। * * * বর্ত্তমান সাহিত্যরথী যে-পথ তৈরি করে দিচ্ছেন, সে-পথে তোমার আমার মতো সামান্য কারবারিকে চল্‌তেই হবে। পূর্ব্ব অঞ্চল পশ্চিমের প্রতি অভিমান করে বসে থাক্‌লে চলবে না। এখন ঐ এক রাস্তা ! কারণ, আর-সব পথ অন্ধকারে ঢেকে আস্‌ছে, অব্যবহারে মরে আস্‌ছে। * * কাজেই যে-পথ তৈরি হাতে-হাতে চলেছে, সে পথের যাত্রী আমাদের হতেই হবে।" আবার ইনিই লিখিয়াছেন, "সাহিত্য কার ইঙ্গিতে চলে ? এক একজন প্রতিভাবান এসে সারথি হন, তাঁরাই সাহিত্যকে গতি দান করেন।" ইহার অর্থই হইল, এক সময়ে যদি চার-পাঁচ জন প্রতিভাবান ব্যক্তি স্ব স্ব পথ প্রস্তুত করেন, তবে আমাদের ন্যায় কারবারিকে একবার এ-রাস্তায়, আর একবার ও-রাস্তায় চলিতে হইবে ; ফল হইবে,—অগ্রসর হওয়া আর ঘটিবে না। সুখের বিষয় এরূপ কখনও হয় না।

কালিদাস কখন নিজের দশপুরী (মান্দাশোর) প্রাকৃতে, ভবভূতি পদ্মপুরী প্রাকৃতে, বঙ্কিমবাবু কাঁঠালপাড়ার ভাষায়, মধুসূদন যশোহরী ভাষায় গ্রন্থ লিখেন নাই বা অন্যের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। লেখক কি মনে করেন, "বর্ত্তমান সাহিত্য-রথীর" দোষগুলিও গুণ বলিয়া লোকে লইবে ? তাঁহার ত মতের স্থিরতা নাই, কোন্‌ পথে আমরা চলিব ? একবার বিচিত্র সাধুভাষা, একবার কলকাতার "কল্লুম" ! তিনি যে রাস্তা কাটিতেছেন, তাহা ত "তৈরি হতে-হতে চলেছে" সুতরাং Experimental। নূতন হইলেই হিতকর ও গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। নূতন পথ অনেক সময়ে প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ারের হঠকারিতারও পরিচয় দেয় ও পরিত্যক্ত হয়। গদ্য-সাহিত্যে আরও মহামহা সাহিত্যরথী আছেন। প্রবীণগণের মধ্যে যেমন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যাঁহার "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় শতমুখে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার যাঁহার রচনা বঙ্কিমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাঁহার "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি" বঙ্গদর্শনের পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাঁহার "বাল্মীকির জয়" দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি রাজ-রাজেশ্বরী ভাষা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। ইঁহারা সকলেই মহাজন-পন্থা রাজমার্গে চলিয়া থাকেন—ত্রিপথে চলিতে কখন দেখি নাই। তোমরাই নূতন ধর্ম্ম, নূতন আলোক, নূতন রাস্তা কর ও খেয়ালের স্রোতে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাও। দেশ তোমার কথা শুনিবে কেন ? এই পর্য্যন্তই আজ থাকিল।

সাময়িকী

আমাদের সার রবীন্দ্রনাথ জাপানে গমন করিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশ হইতেই তিনি নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে প্রাচ্যের নিমন্ত্রণই রক্ষা করিতে গিয়াছেন। তিনি জাপানে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন, এ ব্যবস্থা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বিগত ১১ই জুন তারিখে তিনি টোকিওর ইমপিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Imperial University) একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহার পর আরও একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয়—জাপানের নিকট ভারতের বাণী (Message of India to Japan)। সংবাদ-পত্রের মারফত তাঁহার এই দুইটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বক্তৃতার একস্থানে কবিবর একটি অতি সুন্দর ও পাকা কথা বলিয়াছেন। কথাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য; শুধু শুনিয়া রাখা নহে, সেই অনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য। সার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"I, for myself, cannot believe, that Japan has become what she is, by imitating the West. We cannot imitate life; we cannot stimulate strength for long; nay, what is more, imitation is a source of weakness. For it hampers our true nature, it is always in our way. It is like dressing our skeleton with another man's skin, giving rise to eternal feuds between the skin and the bones at every movement." সার রবীন্দ্রনাথের উপরিউদ্ধৃত কথাগুলির অনুবাদ না দিলেও হইত; কারণ যাঁহাদিগকে কথাগুলি শোনান প্রয়োজন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী জানেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে কথাগুলি প্রযুজ্য নহে, কারণ তাঁহারা কোন প্রকার অনুকরণের ধার ধারেন না। তবুও কবিবরের কথাগুলির সার-মর্ম্ম দিতেছি। তিনি বলিতেছেন—"আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে, জাপান যে এতবড় হইয়াছে, সেটা পশ্চাত্যের অনুকরণের ফল। আমরা জীবন অনুকরণ করিতে পারি না, আমরা শক্তিকে উত্তেজনার দ্বারা অধিকক্ষণ খাড়া রাখিতে পারি না। শুধু তাই নহে, আরও কথা আছে; অনুকরণ দুর্ব্বলতা। ইহাতে আমাদের প্রকৃত স্বভাবকে হীন করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পথের বিঘ্নস্বরূপ। ইহা যেন আমাদের কঙ্কালের উপর অপরের চর্ম্মের আবরণ; তাহাতে এই ফল হয় যে, অস্থি ও চর্ম্মের মধ্যে প্রতি পদবিক্ষেপে একটা চিরকালব্যাপী বিরোধ লাগিয়াই থাকে।" সার রবীন্দ্রনাথ ঠিক কথা বলিয়াছেন—we cannot imitate life—আমরা জীবন অনুকরণ করিতে পারি না। আমরা খোলসের অনুকরণ করি; তাই এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ সাহেবদের অনুকরণে গেঞ্জির উপর সার্ট, তাহার উপর ওয়েষ্টকোট, তাহার উপর কোট, নেকটাই, কলার পরিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হই; কিন্তু সাহেবের সেই গেঞ্জির নীচে হৃদয় বলিয়া যে একটি পদার্থ আছে, যাহা অক্লান্ত কর্ম্মের উৎস, যাহা কত মহত্ত্বের আধার, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখি না। জীবন গঠন করিতে হয়, তাহার জন্য সাধনা করিতে হয়; খোলস বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। সংস্কারক কি এখনও তর্ক তুলিবেন 'তবে কি অনুকরণ দূষণীয়?" দূষণীয় বই কি! উহা দুর্ব্বলতা—রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। অনুকরণ করিও না;—যাহা পরের ভাল, তাহা ঘরের মত করিয়া, আমাদের দেশ-কাল-পাত্রের মত করিয়া গ্রহণ কর, তাহাতে কেহই আপত্তি করিবে না। তাহাতে কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি সমাজতত্ত্ব, কি আচার-ব্যবহার সকলেরই উন্নতি হইবে। রবীন্দ্রনাথই ত বক্তৃতায় স্থানান্তরে বলিয়াছেন "The living ideals must not loose touch with the growing and changing life."

কলিকাতায় আর একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল। যে স্কুলকে সাধারণতঃ সকলে 'ডাক্তার করের

স্কুল' বলিত, সেই স্কুল এখন কলেজে পরিণত হইল; নাম 'আলবার্ট ভিক্টর কলেজ'। বেলগেছিয়ার এই কলেজে মেডিকেল কলেজের মতই পাঠ্য পড়ান হইবে; সেই সকল পরীক্ষাই হইবে; সেই রকম উপাধিই প্রদত্ত হইবে; সেই রকম ডাক্তারই প্রতিবৎসর পাশ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আমাদের দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা কম; হাতুড়েদিগকে গণনার মধ্যে আনিলেও ডাক্তারের সংখ্যা কম। এ অবস্থায় আর-একটা কলেজ হওয়াতে অধিক সংখ্যক ডাক্তার যে প্রতি বৎসর পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি পর্য্যাপ্ত? আমরা ত দেখিতে পাই, বড় বড় নগর বা সহর ছাড়া পল্লীগ্রামে মেডিকেল কলেজের পাশকরা ডাক্তার অতি কমই আছেন। সংখ্যার অল্পতার জন্যও কম এবং তাঁহাদের পোষায় না জন্যও কম; পল্লীর দরিদ্র লোকেরা কি বেশী দর্শনী দিয়া বড় ডাক্তার ডাকিতে পারে? তাহারা হয় বিনা চিকিৎসায়, আর না হয় হাতুড়ের হাতে প্রাণ-বিসর্জ্জন করে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়াই মাননীয় ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই বিলাতী চিকিৎসা-বিজ্ঞান দেশীয় ভাষায় পড়ান হউক। তাহাতে পড়া যে মন্দ হইবে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আর এক লাভ হইবে যে, দেশীয় ভাষায় বিলাতী চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা হইলে, অনেক ছাত্র চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য অগ্রসর হইবে, নানাস্থানে বিদ্যালয় খোলাও সম্ভবপর হইবে। আমাদের মনে হয় যে, বড়-বড় নগরে যদি দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত অধ্যাপক রাখিয়া ডাক্তারী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হয় এবং উপযুক্ত ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে গ্রামে-গ্রামে না হউক, চারি-পাঁচখানি গ্রাম লইয়া একজন ভাল ডাক্তার থাকিতে পারেন। তিনিও অল্প পারিশ্রমিকেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, গরিব দুঃখীরা আর হাতুড়ের হাতে প্রাণ দিবে না।

ডাক্তারদিগের কথা বলিতে গিয়া কবিরাজদিগের কথাও মনে হইল। কবিরাজ মহাশয়গণকে আমরা অনাদর করিতেছি না; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রটা যেন অনেকের নিকট খেলার সামগ্রী হইয়াছে। ঘাটে পথে, যেখানে সেখানে নানা উপাধিগ্রস্ত কবিরাজের সাইনবোর্ড দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকেন এবং নানা উৎকৃষ্ট ঔষধ সুলভ মূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। এই কবিরাজী চিকিৎসা কি এতই সহজ যে, অল্পায়াসেই সমস্ত শিখিয়া ফেলা যায়? যাঁহারা যথারীতি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহারা গাছ-গাছড়া কোনদিন দেখেন নাই, চিনেন না, যাঁহারা শারীর-তত্ত্বসম্বন্ধে সুধু শ্লোকই কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা কেমন করিয়া ভাল কবিরাজ হইবেন? আমাদের দেশের শিক্ষিত কবিরাজ মহাশয়েরা এ কথাটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ যথারীতি শিক্ষা দিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন। সেই প্রকার চেষ্টার একটী ফল "কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ"। এই কলেজটী যে ভাবে পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এখনই যে ভাবে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সম্বন্ধে যে যে অসুবিধার কথা আমরা বলিলাম, তাহা নিরাকৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। ওদিকে 'বেলগেছিয়া কলেজ', এদিকে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ'—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুইটী কেন্দ্র হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

কবিরাজী চিকিৎসা-প্রণালীসম্বন্ধে আর-একটী কথা আমাদের মনে হয়; বহুদর্শী চিকিৎসকগণ কথাটী আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ডাক্তারী চিকিৎসা-ক্ষেত্রে দুইটি শ্রেণীবিভাগ আছে—একদল চিকিৎসক (physician), আর একদল ঔষধ প্রস্তুতকারক (apothicary)। ইহাতে বড়ই সুবিধা হয়। যাঁহারা ঔষধ প্রস্তুতকারক, তাঁহারা ভাল ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন, নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, ক্রমে যাহাতে ঔষধের গুণ বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য গবেষণা করিতেছেন, নানা প্রকার চেষ্টা (experiment) করিতেছেন। এই কারণেই বিলাতী চিকিৎসা-বিজ্ঞান ক্রমেই উন্নত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়েরা চিকিৎসাও করেন, ঔষধও প্রস্তুত করেন। ঔষধের উপকরণ, গাছ-

গাছড়ার জন্য তাঁহারা অপরের উপর নির্ভর করেন, অনেক সময় তাঁহারা ঔষধ যথারীতি প্রস্তুত হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন করিবারও যথেষ্ট অবকাশ পান না। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেহ-কেহ মধু অভাবে গুড়ের দ্বারাও কার্য্য শেষ করেন। ইহাতে যে ঔষধের গুণের ও কার্য্যকারিতার তারতম্য হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এ অবস্থায় একদল শাস্ত্রজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল কবিরাজ যদি ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যেই মনোনিবেশ করেন, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া উৎকৃষ্ট উপকরণ ও গাছড়া সংগ্রহ করেন এবং যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রস্তুতই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

———

আমাদের দেশের যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা যুবকগণের জীবন-যাত্রার অনুকূল কি না, তাহাতে তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি হইতেছে কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে 'Modern Review' পত্রে শ্রীযুক্ত লালা লজপত্ রায় একটী অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই প্রবন্ধের একটা কথা তুলিয়া দিতেছি। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"I am sure, we want Sanskrit scholars and scholars of the English language. We want scientists, philosophers, doctors, jurists, historians, economists, scholars in every branch of human knowledge; but above all, what we want are sensible men who can look to their ordinary needs and comforts under any circumstances in which they may be placed; men who can depend on themselves when cornered; men who can turn a pie by laying their hands to anything which may come handy in time of need. That is the kind of education upon which the edifice of higher and a University education should be raised." শ্রীযুক্ত লালা লজপত্ রায় বলিতেছেন যে, "আমরা সংস্কৃত, ও ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত চাই; আমরা চাই বৈজ্ঞানিক দার্শনিক, চিকিৎসক, ব্যবহারাজীব, ঐতিহাসিক, আর্থনীতিক; আমরা মানবজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি চাই। কিন্তু সর্ব্বোপরি আমরা কি চাই? আমরা চাই এমন সব যুবক, যাঁহারা যে অবস্থায়ই পড়ুন না কেন, সেই অবস্থাতেই তাঁহাদের মোটামুটি সুখসাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা চাই এমন যুবক, যাঁহারা বিপন্ন অবস্থাতেও নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন। আমরা চাই এমন সব যুবক, যাঁহারা অভাবের সময় যে সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তাহা হইতেই একটা পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই সকলের জন্য প্রস্তুত হইবার উপযোগী যে শিক্ষা, তাহারই উপর আমাদের উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" এ কথাগুলি সকল দেশের পক্ষেই খাটে,—আমাদের দেশের পক্ষে ত আঠারো আনা খাটে; কারণ, আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানেরাই অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন; তাঁহারাই অধিক সংখ্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাঁহারাই অধিক সংখ্যায় চাকুরী করেন, উমেদারী করেন, এবং কোন স্থানেই কিছু করিতে না পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধিপত্রের উপর অশ্রুপাত করেন। তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পান, তাঁহাদের অধীত বিদ্যা কোন স্থানেই প্রবেশের অধিকার পায় না। আমরা জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র চাই বই কি; আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ চাই বই কি; আমরা হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, যদুনাথ চাই বই কি; আমরা রাসবিহারী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, ব্যোমকেশ চাই বই কি; আমরা সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, নীলরতন চাই বই কি; আমরা স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোস, চৌধুরী আশুতোষ, চাই বই কি; আমরা স্যার রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল চাই বই কি; আমরা মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র চাই বই কি; আমরা সমাজপতি, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় চাই বই কি। কিন্তু আমরা সর্ব্বোপরি চাই রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, কাঙ্গাল হরিনাথ; আমরা চাই রামদুলাল সরকার, আমরা চাই স্যার রাজেন্দ্র, আমরা চাই কাজের

লোক; আমরা চাই কর্ম্মক্ষেত্রে জয়ের অস্ত্র; আমরা চাই বড় শিল্পী, বড় বাণিজ্যবিদ্, বড় কারিগর, ব্যবসায়ী, বড় কৃষক, বড় **মানুষ**। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সকল বড় **মানুষ** গড়িয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস—ইত্যাদির পণ্ডিতও গড়িয়া দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই সকল হাতিয়ার প্রস্তুত করিয়া দিবেন, আর আমাদের দেশের 'কর্ণওয়ালিশের দশশালা-বন্দোবস্তেরা' সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই সকল দিকে কল্যাণ হইবে, অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। নতুবা, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া কি ফল হইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। সেই জন্যই বড় ক্ষোভে শ্রীযুক্ত লালা লজপত্ রায় বলিয়াছেন—'Oh! Our Education! Is it not tragic that we should at times feel that in the battle of life we might have done better without it?"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষালাভ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। এই যুবকগণের অভিভাবকেরা যে কি কষ্টে, কত অভাব সহ্য করিয়া, কত অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া, সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আজকালকার দিনে গরিব ভদ্রলোকের পক্ষে একটী ছেলের শিক্ষার ব্যয় প্রতি মাসে অন্ততঃ ৩০৲ টাকা যোগান বড় কম কথা নহে; দুই-তিনটী ছেলে থাকিলে ত তাহাদের ব্যবস্থা করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ উচ্চশিক্ষার ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। স্কুলের এবং কলেজের বেতন ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; সহরে বাসের ব্যয়ও বাড়িতেছে। ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়। সে সমস্ত ছাত্রাবাসের বিধিব্যবস্থা অতি উচ্চ অঙ্গের, ব্যয়সাধ্য। ভাল ঘর, ভাল আহারাদির ব্যবস্থা, ভাল পরিদর্শন, এ সকলই যে বহুব্যয়সাধ্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ছাত্রেরা যেথানে সেথানে না থাকিয়া এই সকল ছাত্রাবাসে থাকে, ইহাও নানা কারণে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয়টা কি কম করা যায় না? বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট ছাত্রাবাসগুলিতে যে সমস্ত ছাত্র রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারে ঘরভাড়া লওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কগণ বলিয়াছেন যে, বিগত দুই বৎসরে তাঁহাদিগকে ১৮০০০, আঠারো হাজার টাকা এই বাড়ীভাড়া হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হইতে দিতে হইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ীভাড়া বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং ভাল বাড়ী পাইতে গেলে অধিক ভাড়া ত দিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এমন বড়, এমন বৈদ্যুতিক আলোক সমন্বিত, এমন প্রাসাদতুল্য বাড়ী না লইয়া আলো-বাতাস খেলে, এই প্রকার ছোট-ছোট বাড়ী কম ভাড়ায় লইলে হয় না? যে সমস্ত ছাত্র এই সকল প্রাসাদতুল্য ছাত্রাবাসে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বলিতে গেলে পনরআনা ছাত্রই পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান; তাঁহারা দেশে সামান্য গৃহে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা মোটা ভাত, মোটা কাপড়ই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারা শত অভাবের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত; তাঁহাদের জন্য এত আয়োজন করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি করিবার ত কোন প্রয়োজন দেখি না। ছেলেরা ভাল ঘরে ভাল রকমে থাকে, ইহা কোন্ পিতামাতার অনিচ্ছা; কিন্তু ও দিকে যে কুলাইয়া উঠে না। আরও এক কথা; সহরের এই সকল ছাত্রাবাসের সুখসাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত হইয়া ছেলেদের যে বাড়ীতে যাইয়া মন টিকে না; তাঁহারা যে তাঁহাদের পল্লীভবনে, পল্লীকুটীরে সে সকল কিছুই দেখিতে পান না; সেথানে যে শত অভাব। আমরা জানি, অনেক দরিদ্রের ছেলের এমন চা'ল বদল হইয়া যায় যে, তাঁহারা বাড়ীতে যাইয়া মোটা চাউলের অন্ন, মটরের দাইল (যাহা পল্লীবাসী দরিদ্র পিতামাতার নিত্য আহার) খাইতে পারেন না; আমরা জানি, অনেক ছেলে এই ভয়ে অনেক সময় বাড়ীতে যান না। ছাত্রগণের দোষ দিতেছি না; অভ্যাস বড় জিনিস; বৎসরের অধিকাংশ সময় যে বালাম চাউলের ভাত খাইয়া আসিয়াছে, মোটা আউশের চাউলের রাঙ্গা-রাঙ্গা ভাত খাইলে তাহার সহিবে কেন? এ কথা কিন্তু কেহই ভাবিতেছেন না; যাঁহারা ছাত্রগণের নেতা, তাঁহারা ইনষ্টিটিউট গড়িতেছেন, তাঁহারা প্রাসাদোপম গৃহে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্ববিধ বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহারা ছাত্রাবাসগুলিতে অসংখ্য ভৃত্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু এত অধিক আয়োজন ত পল্লীবাসী গৃহস্থ-সন্তানের জন্য প্রয়োজন বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। যাহারা ধনী ও সম্পন্ন পিতামাতার সন্তান, তাঁহাদের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা প্রয়োজন; কিন্তু যে ছেলে বাড়ীতে মুড়িগুড় ব্যতীত অন্য জলখাবার খাইত না, তাহার জন্য লুচী-মোহনভোগের ব্যবস্থা না করিলেই ত হয়। শিক্ষার ব্যয়সঙ্কোচ কি ইহাতে হয় না? আমরা কয়েকটী সোজা কথা বলিলাম; বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার যাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে, তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি,—তাঁহারা এই কথাগুলি একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রত্যাগত বঙ্গ-সেবক-সৈন্যসঙ্ঘের প্রতি

[শ্রী———]
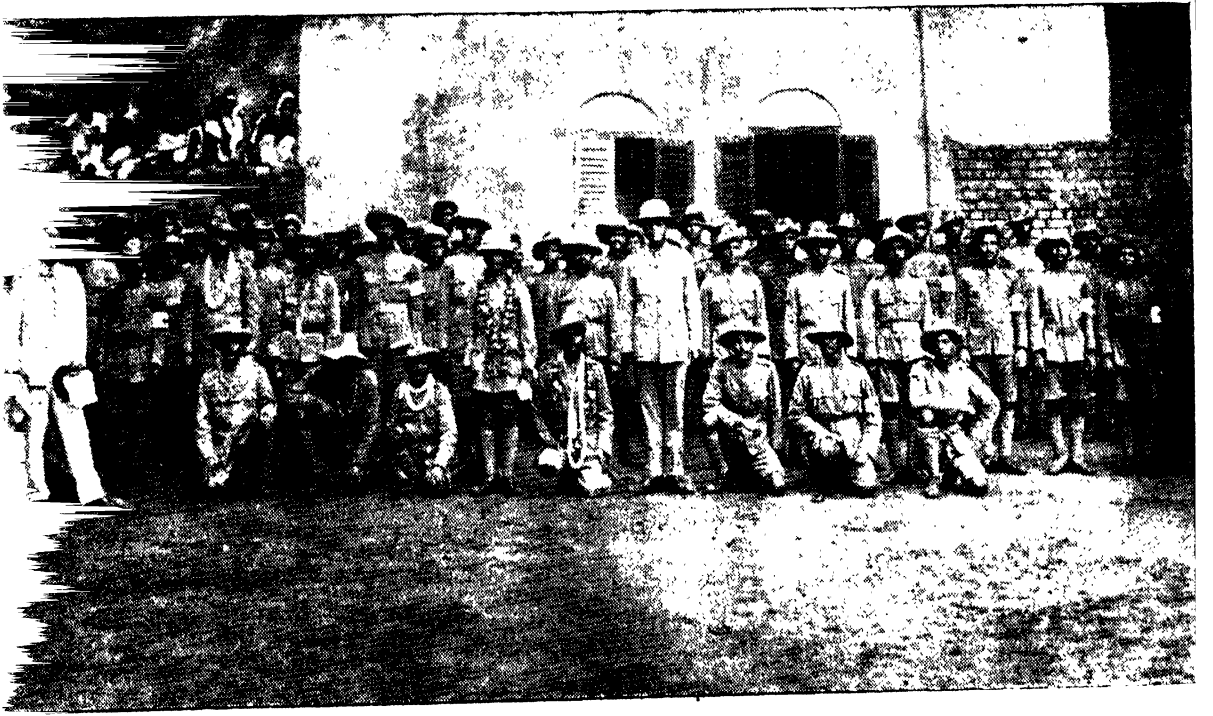
রাখিয়া ভক্তি পরমেশ-পদে সেবক সৈন্য যত,
শৌর্য্য-করুণা-সততাপূর্ণ হৃদে লয়েছিলে ব্রত।
বিধির বিধান—বাহুবল হ'তে ধর্ম্মই বলীয়ান,
তাঁহারি দত্ত ধর্ম্মরাজ্য তিনিই করেন ত্রাণ।
যাওনি' তোমরা ঝলসিত অসি করিতে আস্ফালন,
'যাওনি' তোমরা ভীষণ স্ফোরক করিতে নিক্ষেপণ।
সম্বল বিভু-কৃপা তোমাদের, সেই ত বর্ম্মসার,
রক্তিম 'ক্রস'—রক্ষাকবচ, সেবাই ধর্ম্ম যার।
তুচ্ছ গণিয়া গোলক বহ্নি-আহত যোদ্ধৃগণে,
করেছ রক্ষা, করেছ সুস্থ, শুশ্রূষা বিতরণে।
আছিল যেথায় রক্তপ্লাবিত দেহস্তূপ স্বজাতির,
কম্পিত কেহ, হিমাঙ্গ কেহ, কেহ বা কঠিন স্থির।
ধেয়েছিলে তথা স্তিমিত শিরায় সঞ্চারি নববল,
সার্থক তব সেবার কর্ম্ম, ফলেছে ব্রতের ফল।
যখন কাহারো জীবনপ্রদীপ হ'তো প্রায় নিরবাণ,
রক্ষা করিতেছিলেন কেবল দয়াময় ভগবান।
ঢেকে তার আঁখি জপিয়া অন্তে তারকব্রহ্ম নাম,
লয়েছিলে ধীরে যত্নে অচিরে বীরের শয়ন-ধাম।
যদি তোমাদের মুষ্টিমেয় এ পুণ্যসঙ্ঘ পাশে,
নির্দয় শমন জীবন-শুল্ক গ্রহণ করিতে আসে,
আনন্দে চির শান্তির মাঝে করিও আত্মদান,
রাজাধিরাজের আহ্বানে যারা ঢেলেছিলে মন প্রাণ।

এলবার্ট 'ভিক্টর মেডিক্যাল কলেজ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

এতদিন বঙ্গদেশে একটী মাত্র মেডিক্যাল কলেজ ছিল। তাহার দ্বারা এত বড় বঙ্গদেশের অভাব সম্যক প্রকারে দূর হইত না—এ কথা বলা বাহুল্য। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে সকলেই অবশ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। মোটের উপর, মেডিক্যাল কলেজ হইতে বর্ষে-বর্ষে যতগুলি কৃতবিদ্য চিকিৎসক বাহির হ'ন, সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এই কারণে, পাশ্চাত্য প্রণালীমতে শিক্ষিত কলেজে পরিণত হয়—এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সে পক্ষে কিছু-কিছু চেষ্টাও করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বিস্তর বাধাবিঘ্ন দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। দেশে যতগুলি বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ ছিল, তন্মধ্যে কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল এবং উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী সর্ত্তে এই স্কুলটিকে অর্থ-সাহায্য করিয়া
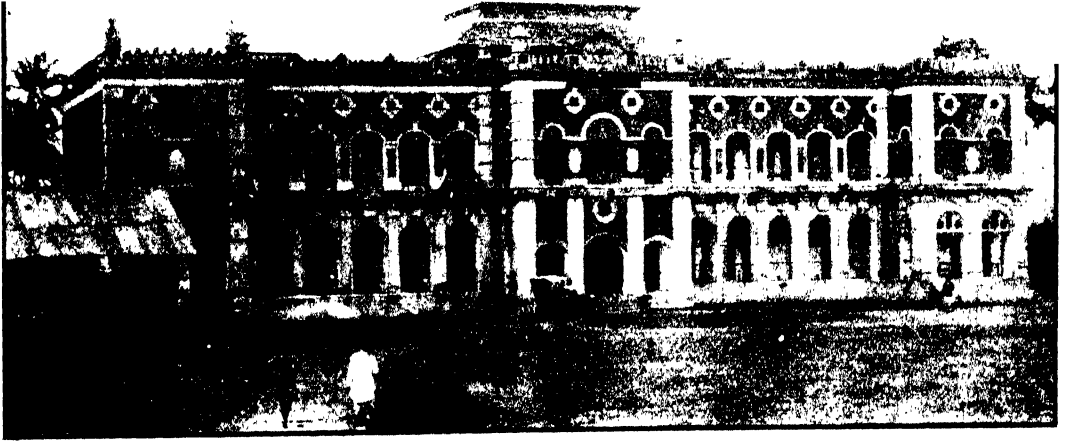
এলবার্ট ভিক্টর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

চিকিৎসকের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সরকারী মেডিক্যাল স্কুল এবং কয়েকটী বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল ও দুই-একটী বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। দুই-তিন বৎসর হইল, গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বেসরকারী স্কুলসমূহের উপাধি দানের অধিকার রহিত করিবার প্রস্তাব করেন; অথচ একটী মাত্র মেডিক্যাল কলেজ উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দানের পক্ষে যথেষ্ট নহে বুঝিয়া—সমস্ত বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ একত্র সম্মিলিত হইয়া একটী উপযুক্ত ও সুসজ্জিত মেডিক্যাল ইহাকে একটী উচ্চ শ্রেণীর মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করিবার প্রস্তাব করেন। কলেজটী যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং এখানকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে সরকারী মেডিক্যাল কলেজের সমতুল্যভাবে এম্-বি পর্য্যন্ত উপাধি লাভ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিতেও সম্মত হন। নিরতিশয় সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্টের এই সদভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে—কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল উচ্চ শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়া এলবার্ট ভিক্টর

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন হইতে এই কলেজের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এম্-বি পর্য্যন্ত উপাধি লাভ করিতে পারিবে এবং সরকারী মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের সমান সম্মান প্রাপ্ত হইবে। সেদিন বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মহাসমারোহে কলেজ-মন্দিরের উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এইখানে কলেজটীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, আশা করি, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল (মফস্বলে সাধারণতঃ কর সাহেবের স্কুল নামে পরিচিত) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিনা আড়ম্বরে অতি সামান্যভাবে স্থাপিত হয়। স্কুলের স্থাপনাবধি আজ পর্য্যন্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর কমিটীর অনারারী সেক্রেটারী আছেন। স্বর্গীয় ডাক্তার লালমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল কমিটীর সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানকালে মাননীয় ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জি ইহার প্রেসিডেণ্ট। সেক্রেটারী ডাক্তার কর সাহেবের সারাজীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্কুলটী সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং দিন দিন ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। স্কুলের সহিত ডাক্তার করের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, দেশে-বিদেশে এই স্কুলটী "কর সাহেবের স্কুল" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এত দিনে তাঁহার সাধনার ফল ফলিল। তিনি এবং তাঁহার সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ ও হিতৈষী বন্ধুগণ বিনা পারিশ্রমিকে কেবল labour of love' স্বরূপ এই স্কুলের জন্য পরিশ্রম না করিলে, আজ ইহার এরূপ উন্নত অবস্থা কল্পনারও অগোচর থাকিত।

ইহার প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্য ছিল; যথা, (১) দেশে পাশ্চাত্য মতের চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং (২) বেসরকারী চিকিৎসকগণকে অধ্যাপনা এবং হাসপাতালে রোগিগণের চিকিৎসার দ্বারা যথাসাধ্য তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রসার বৃদ্ধি কল্পে সাহায্য-দান। কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে এবং মফস্বলের সরকারী চিকিৎসা-বিদ্যালয়সমূহে যতদূর শিক্ষা দেওয়া হয়, এই বিদ্যালয়েও সেই পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়টী যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার নিজের গৃহ ছিল না, জমি ছিল না, হাসপাতাল ছিল না, নগদ টাকাও ছিল না। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে মেও এবং চাঁদনী হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ঐ দুই স্থলে হাসপাতালের কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিত। শিক্ষকেরা বিনা বেতনে কার্য্য করিতেন; সুতরাং ছাত্রগণের প্রদত্ত বেতন এবং সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানের বিদ্যালয়ের তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য মিতব্যয়িতার সহিত চলিতে থাকে। এইরূপে কিছু সঞ্চিত হইলে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের জন্য বেলগেছিয়ায় বর্ত্তমান ভূমি সংগৃহীত হয়। রাজকুমার এলবার্ট ভিক্টর এতদ্দেশে ভ্রমণ করিতে আগমন করিলে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য একটী কমিটী গঠিত এবং অর্থ সংগৃহীত হয়। অভ্যর্থনায় পর উদ্বৃত্ত ১৬০০০ টাকা উক্ত কমিটী অনুগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ দান করেন এবং এই দান উপলক্ষ করিয়া রাজকুমারের নামে বর্ত্তমান প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল স্থাপনের সূচনা হয়। এই সময় হইতে বেশ বুঝা যায় যে, স্কুলটীর দ্বারা একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে। বঙ্গের তদানীন্তন ছোট লাট সার জন উডবরণ এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং হাসপাতাল-গৃহ নির্ম্মিত হইলে ১৯০২ অব্দে তিনিই তাহার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পাদন করেন। তাহার পর হইতে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরেরা ক্রমান্বয়ে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ইহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়টী সাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত থাকে নাই। বহু রাজকর্ম্মচারী এই স্কুল ও হাসপাতালের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিষেক-দরবার উপলক্ষে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এবং মহারাণী মেরী ভারতে আগমন করিলে, মহারাণীর আদেশক্রমে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল চার্লস আসিয়া এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের পত্নী স্বয়ং আসিয়া স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া যান। মহারাণী মেরী হাসপাতালের সাহায্যার্থ ৫০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানার্থ "কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্ এণ্ড সার্জ্জন্‌স্ অব বেঙ্গল" নামে একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯০৪ অব্দে এই বিদ্যালয় কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সহিত সম্মিলিত হয়। তখন হইতে এই বিদ্যালয়ে দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। একটীতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পাঁচ বৎসরে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। ম্যাট্রিকুলেসন বা তদপেক্ষা উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকেই কেবল এই বিভাগে গ্রহণ করা হয়। আর অপরটী বাঙ্গালা বিভাগ। এই বিভাগে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইলে যতটুকু প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ এই বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত।

হাসপাতাল ও স্কুল যে জমির উপর স্থাপিত, তাহার পরিমাণ প্রায় ১৫ বিঘা এবং মূল্য তিনলক্ষ টাকারও অধিক। হাসপাতাল ও স্কুল-বাড়ীর মূল্যও প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। হাসপাতালের সাহায্যার্থ সাধারণের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। হাসপাতালে এখন একশত রোগীর শয্যা আছে। হাসপাতালসংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়ে বৎসরে ২৫০০০ রোগী ঔষধাদি ও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্থানাভাবে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। দেশে কৃতবিদ্য চিকিৎসকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর। এই সকল কারণে স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্কুলটিকে উচ্চশ্রেণীর সুসজ্জিত কলেজে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের

নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-সচিব মহোদয়কে স্কুলে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, স্কুলের বাঙ্গালা বিভাগ তুলিয়া দিয়া ইংরেজী বিভাগটিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করা হউক। স্কুল কমিটী এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজটিকে অনুমোদিত করিবার জন্য আবেদন করা হইলে ১৯১৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশ-অনুসারে ডাক্তার রুল ও বার্ষিক ৩০০০০ টাকা ও ১০০০০ টাকা সাহায্য লাভ করিতে হইবে। ১৯১৫ অব্দের এপ্রেল মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ৮৫৩ নং রেজোলিউসনে এই সকল সর্ত্তের কথা প্রকাশিত হয়। স্কুল-কমিটীর আবেদনের উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল গৃহ ও হাসপাতালের যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া ১৯১৫ অব্দের ৭ই মে তারিখে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হয়। ১৪ই মে তারিখে অধ্যাপকগণের নামের তালিকা এবং অধ্যাপনাসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা হয়। ৮ই জুন তারিখে ডাক্তার রুল এবং ডাক্তার ক্যালভার্ট

লর্ড কারমাইকেল ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ।

ডাক্তার ক্যালভার্ট কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল ও এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও হাসপাতাল-সংলগ্ন অতিরিক্ত ভূমি সংগ্রহার্থ পাঁচলক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম দফা ৩৮০০০ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৫ অব্দের মে মাসে গবর্ণমেণ্ট স্কুল-কমিটীকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারত-সচিব মহোদয় স্কুলের সাহায্যার্থ একযোগে পাঁচলক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৫০০০০ টাকা দান করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। এই দানের সর্ত্ত এই ছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং কলিকাতা, কাশীপুর ও চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে যথাক্রমে আসিয়া পুনরায় সমস্ত বাটী ও সাজসজ্জা পরিদর্শন করিয়া যান। তাঁহারা রিপোর্ট দেন যে, টাকার অবস্থা ছাড়া, আর সকল বিষয়ই সন্তোষজনক। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত কলেজের আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। কমিটী হিসাব পাঠাইয়া দেখাইয়া দেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণের পরামর্শানুসারে ৮৪০০০ টাকা অধিক ব্যয় করিয়া স্কুলের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। এই সঙ্গে বাৎসরিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবও দাখিল করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদনের জন্য আবেদন করিবার পর নিম্নলিখিত দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল :—

সার রাসবিহারী ঘোষ	... ...	৫০০০০ টাকা
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	...	২৫০০০ „

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর...		১০০০০	„
সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৫০০০	„
সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	...	৫০০০	„
মিঃ সি, আর, দাস	...	৫০০০	„
মিঃ বি, সি, মিত্র	...	৪০০০	„
মিঃ এন, এন, সরকার	..	১০০০	„
মিঃ বি, এল, মিত্র	...	৫০০	„
জনৈক জমিদার	...	৩০০০০	„
মোট	...	১৩৫৫০০	„

আর সার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের উইল অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে রক্ষিত ... ৫০০০০ „

এইসকল লেখালিখি ও আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বেলগাছিয়ার চিকিৎসা-বিদ্যালয়কে প্রিলিমিনারী সায়েন্টিফিক এম্ বি পর্য্যন্ত পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমতি প্রদান করেন।

কলেজের আর্থিক অবস্থা ক্রমে ভালই দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বোক্ত চাঁদা ব্যতীত পোস্তার কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী রাণী কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ৪০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া কলেজ ও হাসপাতাল-বাড়ী ফিটিংস করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন এই কলেজে বার্ষিক ৩০০০০ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলেজের উদ্বোধন-সভায় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, কলেজ-পরিচালনের জন্য বার্ষিক ১৩০০০০ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে গবর্ণমেন্ট দিবেন ৫০০০০, মিউনিসিপ্যালিটী ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৪০০০০ টাকা পাওয়া যাইবে এবং ছাত্রদের বেতন বাবদ ২৫০০০ টাকা আদায় হইবে। অবশিষ্ট টাকা চাঁদা করিয়া তুলিতে হইবে। আড়াই লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে কিঞ্চিদধিক দুইলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাকীটাও যে শীঘ্রই সংগৃহীত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মাংপু কুইনাইন ফ্যাক্টরী

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

ম্যালেরিয়া যে কি ভীষণভাবে বঙ্গদেশকে দিন-দিন ধ্বংসোন্মুখ করিতেছে, তাহা ভাবিলেও জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। এই ম্যালেরিয়া-শত্রুর বিরুদ্ধে নানারূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করা হইয়াছে। কুইনাইন তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বপ্রধান।

সম্প্রতি দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী মাংপু নামক স্থানে বেড়াইতে আসিয়া, এখানে গবর্ণমেন্ট কুইনাইন ফ্যাক্টরী দেখিতে যাই। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গবাসীর নিকট কুইনাইন সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রীতিকর হইবে না এই আশায়, কি প্রকারে কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

মাংপু দার্জ্জিলিং রেলের সোনাডা ষ্টেশন হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে গবর্ণমেন্ট অনেক সিনকোনা গাছ রোপণ করিয়াছেন এবং 'Govt. of Bengal; Cinchona plantations' নামেই উহা খ্যাত। ভারতবর্ষে সিনকোনার চাষ প্রথমে ডাঃ এ, কাম্বেল I. M. S. আরম্ভ করেন। তিনি দার্জ্জিলিং এবং সিকিমের Political Officer ছিলেন। তিনিই প্রথমে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রান্‌জু ও তিস্তা উপত্যকার উপরিস্থিত পর্ব্বতপার্শ্বে সিনকোনার চাষ আরম্ভ করেন।

তিন প্রকার সিনকোনা গাছ হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়—

(1) *Cinchona Succiruba* or Red Bark.

(2) *Cinchona officinelis* or "Loxa" or "Crown Bark."

(3) *Cinchona Ledgerina* or yellow Bark!

ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ "Red Bark" এরই চাষ করা হয়। ইহা হইতে পূর্ব্বে কুইনাইন প্রস্তুত করা হইত না। সিনকোনার ছাল হইতে যে ক্ষারজ পদার্থ পাওয়া যাইত, তাহার সহিত অপরিস্কৃত কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া—Cinchona Febrifuge নামে বিক্রীত হইত। এই সিনকোনা ফেব্রিফিউজ এখনও বহু পরিমাণে প্রাদেশিক চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সিনকোনা গাছের ছাল হইতে নিম্নলিখিত কয় প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়—

(১) Quinine.

(২) Quinidine.

(৩) Cinchonine.

(৪) Cinchonidine.

(৫) Amorphous alkaloid (which can also be obtained in the form of sulphate).

পূর্ব্বে এখানে একমাত্র 'Red Bark' বা প্রথমোক্ত প্রকারের সিনকোনা গাছের চাষ ছিল। পরে দেখা গেল যে Cinchona Ledgirena, ইহা অপেক্ষা অনেক অংশে ভাল। কারণ, সিনকোনা লেজেরিণা গাছের ছালে কুইনাইনের অংশ অন্যান্য ক্ষারজ পদার্থের অংশ অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে লেজেরিণা সিনকোনা গাছের চাষ আরম্ভ হয়, এবং বর্ত্তমান কালে ইহা সিনকোনা সাকিরুব্রার স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মাংপু ফ্যাক্টরীতে প্রথম কুইনাইন প্রস্তুত হয়। প্রথম বৎসরেই ৩০০ শত পাউণ্ড কুইনাইন তৈয়ারী করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে কুইনাইন অতি দুর্ম্মূল্য ছিল। মাংপু এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে সিনকোনা চাষ আরম্ভ হওয়াতে কুইনাইনের দর একেবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কুইনাইন প্রতি আউন্স ২০৲ ছিল; কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেই কুইনাইন একেবারে ১২৲ টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইল। জাভাদ্বীপ হইতেও প্রচুর পরিমাণে সিনকোনা ছাল প্রতিবৎসর প্রেরিত হইয়া কুইনাইনের দর অনেকটা কমাইয়া রাখিয়াছে। Kalimpong-এর নিকটবর্ত্তী Munseng

নামক স্থানেও প্রায় ৩০০০ একর জমির উপর সিনকোনার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

এখন সিনকোনা চাষের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। Major A. T. Gage I. M. S. of Botanic Survey in India, তাঁহার পুস্তিকায় এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই মর্ম্মাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

গবর্ণমেন্ট সিনকোনা ফ্যাক্টরীর পশ্চাদ্ভাগ

সিনকোনার বীজ অতি ক্ষুদ্র। ইহার গাত্রে পালকের ন্যায় আছে বলিয়া ইহা অত্যন্ত হাল্কা—এত হাল্কা যে, এক আউন্স বীজ সংখ্যায় প্রায় ৭০,০০০ হাজার। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে এই বীজ পরিপক্ক হয়। তখন ইহাদিগকে তৈয়ারী করা জমিতে বপন করিতে হয়। বীজ বপনের জন্য যে জমি তৈয়ারী করা হয়, তাহা সূর্য্যের তেজ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উত্তমরূপে বাঁশের ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। বীজাঙ্কুর যখন অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ হয়, তখন তাহাদের উঠাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র জমিতে ২ ইঞ্চ ব্যবধানে রোপণ করা হয়। পুনরায় যখন অঙ্কুরগুলি ৪ ইঞ্চ দীর্ঘ হয়, তখন তাহাদের উঠাইয়া স্বতন্ত্র জমিতে রোপণ করা হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যেই চারাগুলি প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ হয়। তখন তাহাদের বাঁশের ছাদ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং মার্চ্চ, এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যালোক ভোগ করিতে দেওয়া হয়।

অতঃপর ইহাদের এখান হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট চাষের জমিতে রোপণ করা হয়। ঘন রকম চাষ হইলে প্রতি একরে ২০০০, তাহা না হইলে প্রতি একরে ১০০০ চারা রোপণ করা হয়। ঘন চাষে তিন বৎসর বাদে কিছু গাছ তুলিয়া ফেলিতে হয়। প্রথম বৎসর চারাগুলিকে নিড়ান দ্বারা আগাছার হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়। পরে তাহারা আপনা-আপনি বাড়িতে থাকে।

গাছ রোপণ করিবার দশ বৎসর পরে তবে তাহা হইতে ছাল সংগ্রহ করা হয়। গাছের ছালের তারতম্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কারখানায় দুইজন রাসায়নিক আছেন। তাঁহাদের কুইনাইন-তত্ত্বজ্ঞ (quinologist) বলা হয়। তাঁহারা প্রথমে গাছের ছাল পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, কোন্ পদার্থের অংশ কি পরিমাণে ছালে বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা অনুমোদন করিলে তবে গাছ হইতে ছাল সংগ্রহ করিয়া কারখানায় আনা হয়।

ফ্যাক্টরীতে ছাল আনা হইলে, প্রথমতঃ—তাহায় কুইনাইনের অংশের অনুপাতে তাহার সহিত অন্যান্য ছাল মিশ্রিত করা হয় এবং তাহাদের শুখাইবার গুদামে পাঠান হয়। ছাল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহাকে গুঁড়া করিবার কলে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে উহা গুঁড়া হইয়া বাহির হয়। এই গুঁড়া ছালকে সর্ব্বাগ্রে দুইদিন ধরিয়া কলি চূণ ও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় ফেলিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে বাল্তি করিয়া তাহাকে (Extraction factory") নিষ্কাসন গৃহে লইয়া যাওয়া হয়।
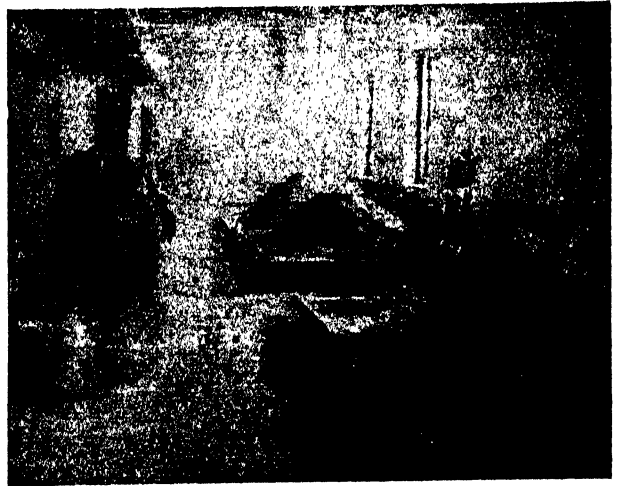
চূর্ণ করিবার ঘরের পার্শ্ব-দৃশ্য

Extraction factory বেশ বড়। বাড়ীটা প্রায় ১৪০ ফিট লম্বা, ৮০ ফিট চওড়া।

বাড়ীর মধ্যে প্রকাণ্ড হল। সেখানে সারি-সারি লৌহনির্ম্মিত গোলাকার স্তম্ভের মত চৌবাচ্চা আছে। সেগুলিকে Separator tanks বলে। প্রত্যেক চৌবাচ্চার মধ্যে ইঞ্জিন হইতে ষ্টীমের গরম পাইপ পাকাইয়া-পাকাইয়া রাখা হইয়াছে; এবং তাহার মধ্যস্থ জিনিষ

নাড়িবার জন্য একটা কল (Stirrer) আছে। প্রতি চৌবাচ্চায় ৩১০ শত পাউণ্ড সিনকোনা ছাল (গুঁড়া), ২০০ শত গ্যালন জল এবং শতকরা ২০ভাগ (Caustic soda) সোডা একত্র করিয়া ফেলা হয়। অতঃপর নাড়িবার যন্ত্র দ্বারা তাহাকে বেশ করিয়া মিশ্রিত করা হইতে থাকে। এইরূপে অনবরত নাড়ান দ্বারা সিনকোনা ছাল, জল ও Caustic soda ক্রমশঃ পুল্টিসের মত হইয়া আসে। জলের জন্য ঘন হইতে পায় না। বেশ পাতলা হইয়া সমস্ত মিশিয়া এক হইয়া যায়।

প্রত্যেক চৌবাচ্চায় অপর একটা নল আছে। সেটা তেলের। ছাল যখন বেশ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার সহিত তেল মিশ্রিত করা হয়। এই তেলের আবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। ফ্যাক্টরীর নীচের এক প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক তৈলপূর্ণ করিয়া ষ্টীম পাইপ দ্বারা ফুটান হইতে থাকে। এই ট্যাঙ্কে ১২০০ গ্যালন তৈল ধরে। তেল ফুটিয়া উঠিলে তাহাকে পাম্প (pump) করিয়া ফ্যাক্টরীর ছাদে অপর এক অপেক্ষাকৃত ছোট ট্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত ট্যাঙ্ক হইতে পাইপ লাগাইয়া প্রত্যেক চৌবাচ্চায় তেল লইয়া যাওয়া হয়।

চৌবাচ্চায় যখন ছাল মিশ্রিত হইয়া প্রস্তুত থাকে, তখন তেলের পাইপ খুলিয়া দেওয়া হয়; এবং প্রায় ৪৪৫ গ্যালন গরম তেল ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ই ষ্টীম পাইপের ষ্টীম খুলিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ৩ ঘণ্টা ৩॥ ঘণ্টা ধরিয়া সেই তেল ও মিশ্রিত ছাল ষ্টীমের উত্তাপে নাড়িবার যন্ত্র দ্বারা মিশ্রিত হইয়া গরম হইতে থাকে। উত্তাপ যখন ফুটিবার মত হয়, তখন ষ্টীম এবং নাড়িবার যন্ত্র উভয়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিলে সেই গুঁড়া ছাল চৌবাচ্চার তলায় জমা হয় এবং পরিস্কৃত তেল উপরে ভাসিতে থাকে।

এই প্রকারে তেল ও ছাল এবং Caustic সোডা একত্র গরম করিলে, ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে,—গাছের ছাল হইতে যে সমস্ত ক্ষারজ পদার্থ পাওয়া যায়, সে সমস্ত কষ্টিক সোডার সাহায্যে তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। উত্তাপ ও ঘন ঘন নাড়ান দ্বারা এই পরিবর্ত্তন শীঘ্র সংঘটিত হয়।

নিষ্কাসন-গৃহের অভ্যন্তরভাগ

নিষ্কাসন গৃহের ভিতরের দৃশ্য

প্রত্যেক চৌবাচ্চায় যাহা-যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া দুই-দুইটা করিয়া বহির্গমনের নল আছে। একটা চৌবাচ্চার তলদেশে অবস্থিত; এবং অপরটা, গাছের ছাল যে পর্য্যন্ত জমা হয়, ঠিক তাহার উপরে। যখন তৈল বেশ স্বতন্ত্র হইয়া যায়, তখন তাহাকে উপরিউক্ত নলদ্বারা অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। যেখানে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে এক প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক আছে। ট্যাঙ্কের ভিতর এবং গাত্র সিসাদ্বারা কলাই করা। মাপ এই ট্যাঙ্কের প্রায় ১৯০০ গ্যালন; এবং ইহাকেও separator বলে।

ক্ষারজ পদার্থ মিশ্রিত তৈল এখানে আসিয়া জমা হইলে পর, তাহার সহিত জল মিশ্রিত সালফিউরিক এসিড (H_2So_4 oil) মিশ্রিত করা হয়। এই ট্যাঙ্কেও পূর্ব্বের মত ষ্টীম পাইপের বন্দোবস্ত আছে। Sulphuric acid মিশাইবার পর ষ্টীম ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং মিশ্র পদার্থটীকে উত্তমরূপে গরম করা হয়। পূর্ব্বে যেমন caustic সোডার সাহায্যে ছাল হইতে ক্ষারজ পদার্থ তৈলে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, এখন তেমনি তৈলের সাহায্যে উত্তাপের দ্বারা সেই সমুদায় ক্ষারজ পদার্থ sulphuric acid এর সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। এইরূপে sulphate

প্রস্তুত হইলে, তৈল পুনরায় পরিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন তাহাকে নলদ্বারা পুনরায় factoryর নিম্নস্থিত ট্যাঙ্কে চালান করা হয়। সেখানে তাহাকে গরম করিয়া আবার কার্য্যে লাগাইবার জন্য ফ্যাক্টরীর উপরকার অপেক্ষাকৃত ছোট চৌবাচ্চায় পাঠান হয়। সেখান হইতে যাহা হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

এখন এই ক্ষারজ পদার্থসমূহমিশ্রিত এসিডকে অন্য এক পৃথক যায়গায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ইহাকে কেবল শোধন করা হয়। এই কার্য্য যেখানে হয়, তাহাকে purifying house বলে। এখানে গোলাকৃতি লম্বা-লম্বা অনেক লৌহপাত্র আছে। তাহাদেরও গাত্র ও তলদেশ পূর্ব্বের ন্যায় সীসা দ্বারা কলাই করা; এবং ষ্টীম পাইপ দ্বারা গরম করিবার বন্দোবস্তও আছে।

এইরূপ প্রত্যেক লৌহপাত্রের সম্মুখে ২৬ ফিট লম্বা, ৪ফিট ৩ইঞ্চ চওড়া এবং ১৬ফিট গভীর সীসা দ্বারা আবৃত এক-একটী পাত্র আছে। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি এমনভাবে রক্ষিত যে, উহাকে ক্রমশঃ একদিকে টলান যাইতে পারে (tilted)। ইহাদের প্রত্যেকের মাপ ৭৫ গ্যালন।

গরম ক্ষারমিশ্রিত এসিড এই লৌহপাত্রে ঢালা হয়। সেখানে তাহার সহিত পুনরায় Caustic সোডা মিশ্রিত করিয়া তাহার অম্লত্ব নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

ক্ষার Caustic soda এবং অম্ল sulphuric এসিড একত্র হইয়া পরস্পরের গুণ নষ্ট করিয়া ফেলে।

এখন এই মিশ্রিত এসিড ও ক্ষারপূর্ণ পাত্র ক্রমশঃ টলাইয়া টলাইয়া পূর্ব্বোক্ত লম্বা-লম্বা পাত্রগুলিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই লম্বা পাত্রে দুইদিন থাকিলে পর, ঐ পাত্রের তলদেশে অপরিস্কৃত কুইনাইন-সালফেট দানার আকারে জমা হয়। ইহার রং এখন পাংশু রকমের থাকে।

এখন এই কুইনাইনকে পরিস্কৃত করিলেই ব্যবহারের উপযোগী হইবে। পরিস্কৃত করিবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর।

দুইটা গোলাকার পাত্র (Centrifugal Separator) আছে। তাহার বাহিরের আবরণ লোহার; কিন্তু ভিতরে অর্থাৎ যাহাতে জিনিষ থাকিবে, তাহা তামার জালে প্রস্তুত। এই তামার জালের উপর প্রথমে একখানা কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর ঐ অপরিস্কৃত কুইনাইন (এবং তৎসহিত কিছু তরল এসিড ও ক্ষারের মিশ্রিত ভাগ বা Mother liquor) আনিয়া ফেলা হয়। এই পাত্রগুলি তখন এমন জোরে ঘোরাণ হয় যে, জালের ফাঁক দিয়া সমস্ত তরলাংশ বাহির হইয়া যায়, কেবল পাত্রমধ্যে কুই-নাইনের পিণ্ড পড়িয়া থাকে। যখন ইহা ঘুরিতে থাকে, তখন ইহার গতি প্রতি মিনিটে ১২০০ বার। এই পিণ্ড বিশুদ্ধ কুইনাইন নহে, কারণ, তরলাংশ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয়ই বর্ত্তমান। ইহাতে প্রায় শতকরা দশভাগ অন্য পদার্থ থাকে। ইহাকে পরিস্কার করিবার জন্য পূর্ব্বকথিত দুইটা পাত্রের অবশিষ্ট একটায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে লইয়া গিয়া ঠিক এই উপায়ে পরিস্কৃত করা হয়। সেখানে লইয়া গিয়া পরিস্কৃত করিবার পূর্ব্বে ৬০ পাউণ্ড মিশ্রিত কুইনাইন ৬২০ গ্যালন ফুটন্ত জলের সহিত মিশ্রিত করা হয়।

এই মিশ্রিত পদার্থকে কিছুক্ষণ রাখিলে, যাহাদ্বারা মিশ্রিত কুইনাইনের পিণ্ডের রং অপরিস্কৃত পাংশুটে রঙের ছিল, সেই পদার্থটি তলাইয়া পড়ে। তখন সেই উপরকার জলে মিশ্রিত কুইনাইন পুনরায় ২০ফিট লম্বা ২ফিট চওড়া ৯ইঞ্চ গভীর এইরূপ কতকগুলি পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

এইখানে কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিশুদ্ধ কুইনাইন সালফেট কৃষ্টল্‌স গঠিত হয়। তখন এই কৃষ্টালগুলি সেই অবশিষ্ট গোলাকৃতি ঘূর্ণায়মান পাত্রে লইয়া যাওয়া হয়; এবং সেখানে পরিস্কৃত হইয়া সাদা-সাদা কুইনাইন সালফেট রূপে বাহির হয়।

এখান হইতে এই কুইনাইন শুষ্ক করিবার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। লম্বা-লম্বা বারকোসের উপর কুইনাইন ছড়াইয়া দিয়া পাখা দ্বারা ষ্টীম পাইপের উপরকার গরম হাওয়া লাগান হয়। শুষ্ক হইতে প্রায় দশ দিন লাগে।

উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তখন কুইনাইন গুদামে পাঠান হয়। সেখানে অর্দ্ধ পাউণ্ড হইতে ৪ পাউণ্ড টিনে পুরিয়া কলিকাতা আলিপুর জেলে পাঠান হয়। আমাদের দেশে পোষ্টাপিসে যে কুইনাইন পাওয়া যায়, তাহা এই আলিপুর জেলের পয়সা-পয়সা মোড়ক। কুইনাইন প্রস্তুতের প্রণালী বলিলাম।

এই মহৌষধি কেমন করিয়া সেবন করিতে হয়, তাহা এই বঙ্গদেশে একজনকেও যদি বলিয়া দিবার অবসর লাভ করিতাম, তাহা হইলেও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতাম।

শোক-সংবাদ

৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরী

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গত ৩০শে জুন কটক নগরে অবস্থিতিকালে তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র-সেবা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তাঁহার

৺রায় নন্দলাল বাগ্‌চি বাহাদুর

সম্পাদিত, অধুনা-লুপ্ত, "ষ্টার অব উৎকল" অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতার সন্নিহিত বঁড়িশা গ্রামে। ধর্ম্মাবলম্বী তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। বঙ্গবাসীর প্রথম আবির্ভাবকালে, তিনি উক্ত সংবাদপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার "মানব-প্রকৃতি" বাঙ্গালাভাষায় অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ; ডারউইন সাহেবের অভিব্যক্তিবাদ ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ষ্টার অব উৎকলের সম্পাদকরূপে ক্ষীরোদবাবু উড়িষ্যাবাসীর সমূহ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন।

৺রায় নন্দলাল বাগ্‌চি বাহাদুর।

বগুড়ার জেলাম্যাজিষ্ট্রেট রায় নন্দলাল বাগ্‌চি বাহাদুর এম্-এ সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাগ্‌চি মহাশয় কৃতি রাজকর্ম্মচারী। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্ম গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি উলুবেড়িয়ার মত একটি বৃহৎ সবডিভিসনের ভার প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতার পরিচায়ক। উলুবেড়িয়া হইতে বদলী হইয়া তিনি যথাক্রমে তমোলুক ও কাঁথি মহকুমা শাসন করেন। কাঁথিতে অবস্থিতিকালে তত্রত্য জলপ্লাবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জ্জন করেন। পরে তিনি কিছুদিন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্টাণ্টের কার্য্য করেন। অতঃপর কিছুকাল তাঁহাকে আলিপুরে জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে হয়। তথা হইতে তিনি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন এবং ক্রমে কলিকাতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ১৯১৩ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে তিনি বগুড়ার জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺যোগেন্দ্রনাথ সেন বি-এস্‌সি

ফরাসী ভারত হইতে যে সকল দেশীয় লোক স্বেচ্ছা-সৈনিকরূপে গৃহীত হইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন তন্মধ্যে ফরাসী চন্দননগর-নিবাসী কয়েকজন বাঙ্গালীও আছেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বে আরও একজন বাঙ্গালী,—তিনিও ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী—যে বৃটিশ সেনাদলভুক্ত হইয়া ফ্রান্সে থাকিয়া জার্ম্মাণসেনার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সে কথা এতদিন বড় কাহারও জানা ছিল না। সম্প্রতি ফ্রান্স হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২২শে মে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পরিখা মধ্যে অবস্থিতিকালে এই বাঙ্গালী সৈনিক শত্রুর কলের কামানের গোলার আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

এই সৈনিকের নাম যোগেন্দ্রনাথ সেন বি-এস্‌সি। ইঁহার পিতার নাম ৺সারদাপ্রসন্ন সেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সেন। যতীন্দ্রবাবু বেঙ্গল নাগপুর রেলের ডাক্তার—কর্ম্মস্থল বিলাসপুর। যোগেন্দ্রনাথ যে সেনাদলে ছিলেন, তাহার অধ্যক্ষ যতীন্দ্র বাবুকে তাঁহার মধ্যম সহোদরের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সূত্রেই এই বাঙ্গালী সৈনিকের কথা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু না হইলে, এই বাঙ্গালী সৈনিকের কথা বোধ হয় এখনও কেহ জানিতে পারিতেন না। ইনি ছাড়া, আরও কোন বাঙ্গালী সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন কি না, তাহা জানা না থাকিলেও, থাকা একেবারে অসম্ভব নহে; কারণ, যুদ্ধারম্ভের সময় অনেক বাঙ্গালী যুবক শিক্ষালাভার্থ বিলাতে বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যে আহত ও আর্ত্ত সেনাগণের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, এ সংবাদ যথাসময়ে এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত যোগেন্দ্রনাথের ন্যায় আরও দুই একজন যে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

যাহা হউক, যোগেন্দ্রনাথ যে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে-করিতে রণশয্যায় বীরের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ লীড্‌স নগরের কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক বিভাগে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন এবং লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ অব্দে উক্ত কর্পোরেশনের শ্রমজীবিরা ধর্ম্মঘট করিয়া হাঙ্গামার উপক্রম করিলে যোগেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া অশান্তি নিবারণে কর্তৃপক্ষকে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। অবশেষে যুদ্ধারম্ভ হইলে যোগেন্দ্রনাথ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছুক হন। প্রথমে তিনি কোন সেনানীর পদ পাইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা সময়-সাপেক্ষ দেখিয়া অগত্যা প্রাইভেট সেনারূপে পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ওয়েষ্ট ইয়র্কসায়ার রেজিমেন্টে "ডি" কোম্পানীতে প্রবেশলাভ করেন। নয় মাস যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার পর তিনি এই সেনাদলের সহিত প্রথমে মিশরে গমন করেন। সেখান হইতে কয়েক মাস পরে এই সেনাদল ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। সেই অবধি যোগেন্দ্রনাথ ফ্রান্সে পরিখাতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৬ই মে তারিখে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে পত্র লিখেন, তাহাই তাঁহার শেষ পত্র। তাহার পর ২৭শে মে তারিখে উক্ত সেনাদলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন এফ, হারউড ডাক্তার যতীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন যে, "অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার ভ্রাতা প্রাইভেট জে, সেন গত ২২-২৩শে মে রাত্রিকালে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। আপনার ভ্রাতা এই দলের সকল সৈনিক ও সেনানীর প্রিয়পাত্র ছিলেন; এইজন্য সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। সৈনিক-বৃত্তিতে যোগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরিচয়-খোদিত ক্রস-চিহ্ন স্থাপিত দলের সকল সেনা ও সেনানীর পক্ষ হইতে আমি আপনার শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।" ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ-আপিস হইতেও তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন। ভারতসম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নিকট হইতেও যতীন্দ্রনাথের নিকট সমবেদনা-সূচক পত্র আসিয়াছে।

পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এস্‌ সি

পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটির মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটি দণ্ডেশ্বরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ পথ ব্যবধান।

দণ্ডেশ্বরের অনতিদূরবর্ত্তী অজয়ের উত্তর তটে 'বেতা' নামে গ্রাম। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভায় 'বেতাগ্রাম নিবাসিনঃ' অনেক বৈদ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যবংশের বীজিপুরুষ রাজা বিমলসেন ও কমলসেন শেখর-রাজবংশের অনুজ্ঞাক্রমে সেনভূমে আসিয়া বাস করেন। বেতা গ্রামে পূর্ব্বে বহু বৈদ্যের বাস ছিল। কে বলিবে, এই স্থান সেই বিমলসেন ও কমলসেনের পদরেণুতে পবিত্র হইয়াছে কি না? গ্রামের পূর্ব্বে 'বিল্বমঙ্গলের ঢিপি' নামে একটি ধ্বংসস্তূপ দেখাইয়া লোকে বলে, এই স্থান সেই কৃষ্ণকর্ণামৃতের মধুরহৃদয় ভক্ত কবি বিল্বমঙ্গলের বাসভূমি ছিল। অজয়ের উত্তর তটে যেমন বিল্বমঙ্গলের ঢিপি, দক্ষিণ তটে সেইরূপ আর-একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে লোকে 'চিন্তার বাটীর' ধ্বংসস্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাঁহারা এই প্রবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদের মতে এই স্থানেই চিন্তা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া বিরাগী বিল্বমঙ্গল তীর্থপর্য্যটন করিতে-করিতে সুদূর দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হন; এবং তথায় সোমগিরির শিষ্যত্ব গ্রহণে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। বিল্বমঙ্গলের স্বর্গীয় সাধনার মহিমায় পীঠতীর্থ জনসমাজে এতই প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, সাধারণে তাঁহার এই অখ্যাতনামা জন্মভূমিটির কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। সময়ান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই বিল্বমঙ্গলের ঢিপির পূর্ব্বে (অজয়ের উত্তরতটে) সেই ভারত-প্রসিদ্ধ কেন্দুবিল্ব গ্রাম। যাঁহার ভক্তিবারি-ভরা হৃদয়-সিন্ধু হইতে পদ্মাবতী-রোহিণীরমণ, শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রেম-পীযূষ প্রস্রবণ জয়দেব গোস্বামীর উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহার ললিত-লবঙ্গলতা পরিশীলীত কোমল মলয়সেবিত, মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জ-কুটীর হইতে ভক্ত হৃদি-রসায়ন শ্রুতিবিমোহন বাণী "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, যথায়—

"কবিজাত জলজের লইতে আসব
জয়দেব রূপ ধরি আপনি কেশব,
উপনীত হ'য়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজকরে পন্থ কিশলয়॥"
(সুরধুনী কাব্য)

ধন্য বীরভূমি, ধন্য কেন্দুবিল্ব গ্রাম, ধন্য কবি জয়দেব! আর শতধন্যা তুমি সতী পদ্মাবতী! কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"ধন্যা সতী পদ্মাবতী পতিপন্থবলে,
পীতাম্বর পদসেবা করিলা বিরলে।"

কেন্দুবিল্বের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বে "লাউসেন তলাও"। যথায় নিজ পিতৃরাজা উদ্ধারের জন্য ঢেকুরেশ্বর ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য-সজ্জা করিয়া গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত ধর্ম্মরাজ পূজা প্রবর্ত্তক লাউসেন আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানই এখন "লাউসেন তলাও" নামে বিখ্যাত। 'লাউসেন তলাওয়ের' সম্মুখেই অজয়ের দক্ষিণ-তটে প্রাচীন সুহ্মের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ত্রিষষ্টীগড় ঢেকুর বা শ্যামারূপার গড় ও ইছাই ঘোষের সুবিখ্যাত দেউল। গত বৎসর বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে এই শ্যামারূপার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অজয়ের উত্তরতটে দেবীপুর নামে একখানি গ্রাম। এই গ্রাম কেন্দুবিল্ব হইতে বেশী দূর নহে। সম্প্রতি এই দেবীপুর হইতে সুহ্মেশ্বরী নামে এক দেবীমূর্ত্তি আবিষ্কৃতা হইয়াছেন। মূর্ত্তিটির উদর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত উর্দ্ধাংশ-ভাগ ভগ্ন; লোকে বলে, কালাপাহাড় কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহা বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্ত জানুর উপর উত্তানভাবে ন্যস্ত এবং বাম হস্তে একটি সনাল কমল ধৃত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটির পাদপীঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—

"যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতাহ্যবদৎ।
তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদিমহাশ্রমণঃ।

এই পালি-বচনটী বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'মহাবগ্‌গ' নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব যে সময় রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় সঞ্জয় নামক এক নাস্তিক পরিব্রাজক তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে শারিপুত্ত ও মোদ্গল্যান অন্যতম। একদিন প্রভাতে বুদ্ধদেবের

শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বাহির হইলে পথে শারিপুত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শারিপুত্ত স্থবির অশ্বজিতের সৌম্য মূর্ত্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার গুরু কে? এবং তাঁহার মতই বা কি?" অশ্বজিৎ উত্তর করেন, "শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ আমার গুরুদেব। গুরুদেবের সম্যক্ মত সবিস্তারে বলিবার সামর্থ্য আমার নাই; তবে সেই মহাশ্রমণের ধর্ম্মমতের মূল তাৎপর্য্য এইমাত্র বলিতে পারি—

"যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং
তথাগতাহ্যবদৎ।
তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ॥"

অর্থাৎ—যে সকল ধর্ম্ম হেতু হইতে সমদ্ভূত, তাহাদের হেতু কি, তথাগত তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই সমূহের নিরোধ যেরূপ, মহাশ্রমণ তাহা এইরূপ বলিয়াছেন।

এই সুক্কেশ্বরী মূর্ত্তি ও বুদ্ধবিহার গ্রাম প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এতদঞ্চলে এক সময় বৌদ্ধ-প্রাধান্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্যামারূপার গড় বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সামন্ত-রাজারূপে পরিগণিত হইত। দণ্ডেশ্বরের বুদ্ধবিহার এবং সুক্কেশ্বরী প্রতিষ্ঠাদি তাঁহাদেরই কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। দণ্ডেশ্বর ও শ্যামারূপার গড় সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সুক্কেশ্বরীর অধিষ্ঠানভূমি দেবীপুর ও লাউসেন প্রভৃতি আমাদের বীরভূমির অন্তর্গত। (মধ্যে অজয় নদ মাত্র ব্যবধান থাকিয়া ইহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতেছে)। এই সুক্কেশ্বরী ও 'লাউসেন তলাও' প্রভৃতির সহিত দণ্ডেশ্বরাদির কাহিনী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। একটিকে ত্যাগ করিলে অপরটি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে; তাই দণ্ডেশ্বর ও শ্যামারূপার গড় প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সুক্কেশ্বরীর পূজা-বেদী-পার্শ্বে অপর একটি মূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। যদিও সুক্কেশ্বরীর মত তাঁহারও নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে, তথাপি তিনি যে পূর্ব্বগৌরব হারাইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র থাকে না। মূর্ত্তিটি সিংহবাহিনী, অসুরমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটিও বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস, ইহারই পূজা-বেদী সুক্কেশ্বরী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, সেই অবধি তিনি এক পার্শ্বেই পড়িয়া আছেন।

পঞ্চানন

একখণ্ড পাষাণে মহিষাসুর, সিংহ ও দুর্গার মূর্ত্তি অঙ্কিত। দুর্গার দশভুজে দশ-প্রহরণ। এ মূর্ত্তিটি অবিকৃত আছে।

দেবীপুর হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অজয়ের উত্তরতটে 'দেউলি' নামক একখানি গ্রাম। এই গ্রামে এক প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের উপর একটি শিব-

মন্দির আছে; এবং কয়েকটি দেবমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। একখণ্ড প্রস্তর দেখাইয়া দেউলির প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিলেন, "এই প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি লোচনদাস তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতেন।" দেউলির
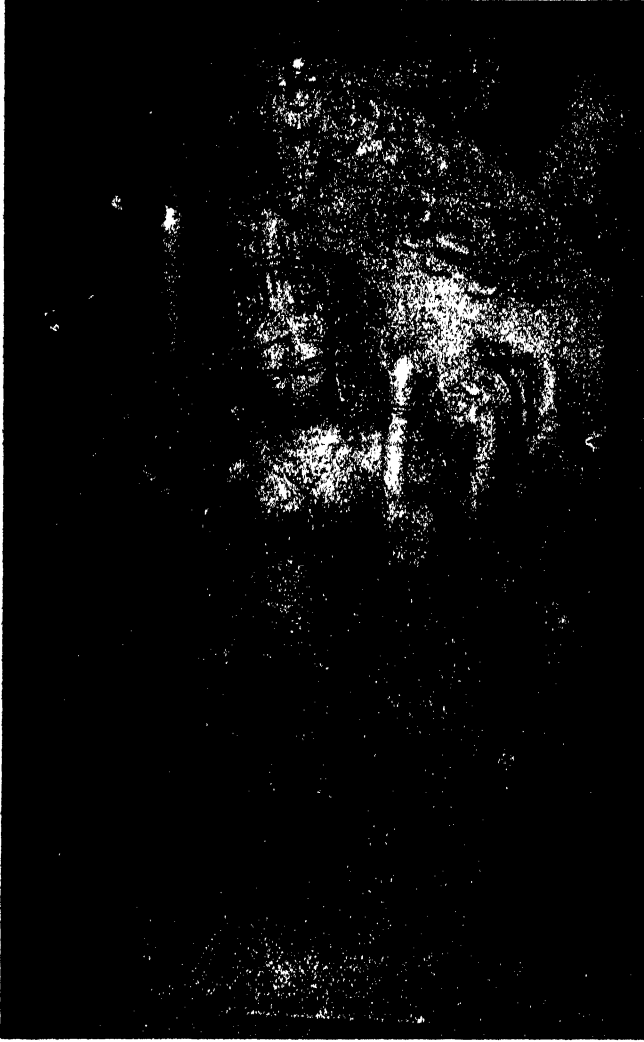
সাবিত্রী মূর্ত্তি

সমীপবর্ত্তী কাঁকুটিয়া গ্রামে লোচনের পাঠে এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহ তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।' লোচনদাস কাঁকুটিয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সুবৃহৎ শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় দিবানিশি দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। সেবাইতগণ দেববিগ্রহের স্বয়ং উত্থানকার্য্যাদি-সাধনে সমর্থ হন না—এত বড় সেই মূর্ত্তি! দেউলিতে এখনও সেই প্রস্তরখণ্ডের পূজা হয়।

দেবীপুরের যে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি, দেউলিতে সেই একই প্রকারের একটি সুবৃহৎ মূর্ত্তি আছে। লোকে তাঁহাকে "খাঁদাপার্ব্বতী" বলে; কারণ দশভুজা দুর্গাদেবীর নাসিকাটি কর্ত্তিত। নানাস্থানে "নাক্‌কাটা" বাসুদেবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নাক্‌কাটা মূর্ত্তিগুলি কালাপাহাড়ের কাটা বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। এতদঞ্চলের জনসাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তিও কালাপাহাড় কর্ত্তৃক নাসিকাহীনা হইয়াছেন। এই মূর্ত্তিটীও একখণ্ড প্রস্তরে খোদিত। মহিষের উদর হইতে নির্গত অসুর ও অসুরের হস্ত দংশন করিয়া অবস্থিত সিংহের উপর আসীনা দশভুজা দেবীমূর্ত্তি প্রায় চারিহস্ত পরিমিত উচ্চ। মূর্ত্তিটির সম্মুখে উপস্থিত হইলে, স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়, মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত হইয়া আসে। একটি পূর্ব্বদ্বারী ক্ষুদ্র মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া, আমরা এই মূর্ত্তিটির ফটো গ্রহণ করিতে পারি নাই। অবশ্য, এত ক্ষুদ্র মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। প্রথম প্রতিষ্ঠার সেই উৎসব-দিবসে যে মন্দিরে তিনি পূজিতা হইয়াছিলেন, কালের দুরতিক্রম্য প্রভাবে তাহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আজি আর তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। নতুবা, সেই দেবমূর্ত্তির মত সেই মন্দিরও যে একটা দেখিবার সামগ্রী ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

যে শিবমন্দির বর্ত্তমান আছে, তাহাও পুরাতন ভিত্তির উপর নূতন করিয়া গঠিত। এতৎ-সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এক রাত্রিতে অকস্মাৎ সেই প্রাচীন দেবমন্দির ভগ্ন হইয়া যায়। মন্দির এত বৃহৎ ছিল যে, তাহার পতন-শব্দ দেউলির ৪।৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বোলপুর, সুরুল,

প্রভৃতি স্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সুরুলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি কুঠী ছিল। কুঠীর তদানীন্তন দেওয়ান তিলকচন্দ্র বসাক মহাশয় হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেউলীতে সমাগত হন, এবং নিজব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। মন্দির-পতনের শব্দে উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি রজনী যোগেই চর প্রেরণে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ "দেওয়ান তিলকচন্দ্র বসাক" এই নাম উপরি-কথিত প্রবাদের সমর্থন করিতেছে।

দেউলিতে আর যে কয়েকটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি, একটি শিবমূর্ত্তি ও একটি সাবিত্রী-মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। বাসুদেব-মূর্ত্তি-সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। শিবমূর্ত্তিটি দশভুজ, পঞ্চবদন এবং নাগযজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা-বিভূষিত। হস্তে, কটিদেশে ও কণ্ঠে আরও নানাবিধ অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। কয়েকটি হস্ত এবং পদদ্বয় ভগ্ন। ইনিও নাসিকাহীন। ২।৩টি হস্ত ভগ্ন বলিয়া ধ্যানের সহিত মিলাইতে অসুবিধা হইতেছে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইঁহাকে পঞ্চানন শিব আখ্যা প্রদান করিয়াছি। ধ্যান যথা :—

"ঘণ্টা কপাল শৃণিমুক্ত কৃপাণ খেট
খট্টাঙ্গ শূল ডমরু অভয়ং দধানম্।
রক্তাম্বুমিন্দু শকনাভরণং ত্রিনেত্রম্
পঞ্চাননাঙ্ক মরুণাংশুক মীশমীড়ে॥"

দশভুজ শিবের অপর একটি ধ্যান আছে—

"মুক্তা পীত পয়োদ মৌলি জবাবর্ণৈ মুখৈপঞ্চভিঃ
স্ত্রক্ষৈঃ রঞ্জিত মীশবিন্দু মুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্
পাশন্ ভীতিহরণ দধানমমিতা কল্লোজ্জ্বলং চিন্তয়েৎ॥"

এই ধ্যানোক্ত শিব সদাশিব আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। অপরামূর্ত্তি সাবিত্রী দেবীর। সাবিত্রী-মূর্ত্তি অনুমান করিয়াছি এই জন্য যে, ইহার সর্ব্বনিম্ন দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা এবং সর্ব্বনিম্ন বাম হস্তে কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে। এই মূর্ত্তিটিরও তিনটি হস্ত ভগ্ন এবং নাসিকা কর্ত্তিত। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অবসরাভাবে এই মূর্ত্তিটিকেও ধ্যানের সহিত মিলাইয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারি নাই। অথচ ইঁহার নির্ম্মাণ-প্রণালী, ইঁহার সুঠাম সৌন্দর্য্য, ভীষণ-মধুরের একত্র সমাবেশ-নৈপুণ্যে উদ্ভূত ইঁহার মহিমান্বিত শ্রী, আমাকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, অযোগ্য হইয়াও আমি আপনাদের মত সুধিজন-সমক্ষে ইহার প্রসঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। একখানি আলোক-চিত্রও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, উদ্দেশ্য—আপনাদিগকে দেখাইয়া মনের সাধ মিটাইব। আপনারা দেখুন, বীরভূমির এক নিরালা পল্লীর নিভৃত নিকেতনে কি গরিমময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা লুক্কাইত রহিয়াছেন! হার-কেয়ূরাদি বিবিধ ভূষণ-ভূষিতা হইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বের মৃণালনিন্দিত ভুজ-পঞ্চে অসি, অঙ্কুশ ও অক্ষমালাদি ধারণ করিয়া, বামপার্শ্বের পঞ্চ ভুজবল্লী দণ্ড, চর্ম্ম, ধনু, ও কমণ্ডলু আদিতে শোভিত করিয়া, বিচিত্রাম্বরপরিহিতা যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিতা ষোড়শী মূর্ত্তি কটিদেশ ঈষৎ বাঁকাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে এক অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিলেই জীবিত বলিয়া ভ্রম হইবে। মনে হইবে যেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শ্যামা, বঙ্গ-জননীর মূর্ত্ত প্রতিমা, তাঁহার আদরিণী বীরভূমির অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপে সুপ্রকাশিতা হইয়াছেন। কিন্তু বীরভূমি কি করিতেছে? বীরভূমিকে দেখিলে মনে হয়, সেই এক-দিন, আর এই একদিন! সাবিত্রী দেবীর যে ধ্যানটি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই মূর্ত্তির সহিত মিলে না। ধ্যানটি উদ্ধৃত হইতেছে—

"মুক্তাহেমদ্রুমানীল ধবলগারৈর্মু খৈঃ স্ত্রিন্ধনৈঃ
মুক্তাবিন্দুনিবদ্ধরম্য মুকুটান্ তত্ত্বাত্ম বর্ণতিলকাম্
সাবিত্রীবরদাভয়াঙ্কুশকরাং পাশং কপালং গুণম্
শঙ্খংচক্র মুথার বিন্দযুগলং হস্তৈর্বহস্তিং ভজেৎ।"

বামপার্শ্বে চামরধারিণীর মত একটি নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়-মানা রহিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলি যে কতকালের পুরাতন, সে সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই। তবে দশভুজ শিবমূর্ত্তিটি দেখিয়া ইহা সেনবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। নিঃশঙ্ক শঙ্কর, বৃষভ শঙ্কর, মদন শঙ্কর প্রভৃতি উপাধিধারী সেনবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের তাম্র-শাসনে দশভুজ শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। বীরভূমের লক্ষৌর নগর বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত, ইহা ঐতি-হাসিকগণও বিশ্বাস করেন। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন মধ্যে-মধ্যে শ্যামারূপার গড়ে শুভাগমন করিতেন বলিয়া বীরভূমে প্রবাদ প্রচলিত আছে। বিজয়সেন রাঢ়ের অধীশ্বর ছিলেন। 'পবনদূতে' 'সেনরাজ' লক্ষ্মণসেনের গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিজয় নগরে জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, দেউলীর মূর্ত্তিগুলি সেনবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্যামারূপার গড় অধিকারের পর সুক্ষেশ্বরী প্রভৃতি বৌদ্ধমূর্ত্তির আধিক্য দর্শনে, তাঁহারা যে গড়ের অদূরবর্ত্তী দেউলীতে স্বীয় অভীষ্ট দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আশা করি, ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

গৃহ-প্রবেশ

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য]

(১)

"শিবু, এবার বিয়ের সব যোগাড় করি। আর ভাই তোমার কোনও আপত্তিই শুন্‌ব না। বিয়ের কথা যতবার বলেছি, তাতেই ব'লেছ, বি-এ, পাশের পর বিয়ে ক'র্‌বে, ভগবান্ ত আমাদের সে সাধ পূর্ণ করেছেন।"

"বৌদিদি, তোমার কি আর কোনও ভাবনা কি চিন্তা নাই? কেবল ঐ এক কথা বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে। তুমি আমাকে পাগল কর্‌বে দেখ্‌ছি। এই ত সবে মাত্র আজ পাশের খবর বেরিয়েছে। আগে পাশের পাকা খবরই পাই, তারপর যা হয় হবে।"

"না ভাই, লক্ষ্মীটি, আর অমত করো না! তোমার দাদার বড় সাধ, এই বৈশাখ মাসেই তোমার বিয়ে দেন; আর আমারও তাই ইচ্ছে।"

"দেখ বৌদিদি, বিয়েকে আমি বিশেষ ভয় করি। এমন ভয়ের জিনিস—সংসার-ভাঙ্গার জিনিস, আর দুটো নাই। তাই বড্ড ভয়েই বলি, বিয়ে কর্‌বো না। বিয়ে হলেই এই সব মানুষই—আর-এক মানুষ হয়ে যায়। দেখ না, পাশের বাড়ীর নগেন কত ভাল ছেলে ছিল, বিয়ের পর হতেই কেমন এক-রকম হয়ে গেল—এক রকম গোল্লায় যেতেই বসেছে। নগেন তার দাদাকে কি ভক্তির চক্ষেই দেখ্‌তো। এখন কি আর বল্‌বো—সব উল্টো। সে তার বৌকে নিয়ে তার কাজের জায়গায় চলে গেছে। এখানকার সংসার পানে আর চেয়েও দেখে না, কোনও খবরও লয় না। আজ তার দাদা তাই বড় দুঃখ করে বল্‌ছিলেন—'পাশ করেছ ভাই, বেশ। খুব ভাল কথা; কিন্তু তোমার এই পাশের ফল যেন আমার ভাইয়ের মত ভাইকে পর না করে। কি আর ব'ল্‌বো ভাই, লেখাপড়া শিখ্‌লেই হয় না। লেখাপড়ার সঙ্গে মনুষ্যত্বও অর্জ্জন কর্‌তে হয়। তা না হলে, তুমি যেমন লেখাপড়া শিখেছ—সে তেমনই শিখেছিল, বুদ্ধিও খুব ভালই ছিল; কিন্তু আমারই অদৃষ্ট-দোষে হয় ত তাকে এমন করে দিলে। তার শিক্ষার উচ্চ গতি চিরদিন লক্ষ্য করে এসেছি, কিন্তু তার হৃদয়ের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য কর্‌বার বড়-একটা সময় পাই নি। তাই বিয়ের পর হতেই, সে তার মনুষ্যত্বটুকু নষ্ট কর্ত্তে বসেছে। কত আশা করে, কত কষ্টে মানুষের মতন করে তুল্‌তে চেয়েছিলাম। মনে কখনও ভাবিনি যে, এমন হবে। এখন দেখছি, তাকে ত' মানুষ করিনি, তাকে অধঃপাতের শেষ সীমায় পাঠিয়েছি।' এই সব কথা বলছিলেন। তাই আমার বড্ড ভয় হয় বৌদি! আমার বিয়ের জন্য তুমি জেদ করো না।"

"তাও কি কখন হয় ভাই? হাতের পাঁচটা আঙ্গুলই সমান নয় যখন, তখন সব মানুষের মন কি এক মাপ-কাটিতে বাঁধা যেতে পারে? আর দেখ ভাই, মাহুত যদি শান্ত, ধীর, উদার হয়, তবে হাতীকেও সে বশ করতে পারে। নিজের মন ঠিক থাক্‌লে, অপরের অতি তুচ্ছ কথায় কি কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য—জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হতে সরে পড়ে? তোমার সম্বন্ধে আমাদের এখন যা প্রধান কর্ত্তব্য, তা ত আমাদের কর্ত্তেই হবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, তোমার বিয়ে দেওয়া। আর দেখ ভাই শিবু, —আমি চিরদিন এই সংসারে একলা,—কারও একটু সাহায্য পাবার উপায় নেই,—ছেলেপিলে নিয়ে সংসারের সব কাজ আর পেরে উঠি না। তোমার বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌লে তবু ত একজনের সাহায্য পাব। আর কেন কষ্ট কর্ব্বো ভাই, তোমা হতে আমাদের সব দুঃখই ঘুচবে, এই আশা বুকে নিয়েই ত সেই তিন বছরের তোমাকে—আজ এত বড় কর্ত্তে পেরেছি, তোমাকে মানুষ করে এসেছি। কত কষ্টের মাঝে পড়ে মা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। জানি না

তাঁর সেই শেষ আদেশ কতটা রক্ষে কর্ত্তে পেরেছি। সে দুর্দ্দিনের কথা কি আর বলবো বল ভাই! আজ যদি আমাদের ভাগ্যে মা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার্ত্তেন। তাঁর চির জীবনটাই একটা দুঃখের ঝাঁজে পড়ে, ঝল্‌সে পুড়ে-পুড়ে, বের হয়ে গেছে। আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদেই এখনও বেঁচে আছি।"

"বৌদিদি, মা যে মরে গেছেন—কষ্টের জ্বালায় যে মরে গেছেন—আমি ত তোমাদের দয়ায় সে সবের কোনও অভাবই বুঝ্‌তে পারিনি। মা কি এর চেয়েও যত্নে—যে আদরে তুমি আমাকে মানুষ কর্চ্ছো এর চেয়েও যত্নে—আমাকে রাখ্‌তেন, না মানুষ কর্ত্তেন? তা আমার বিশ্বাস হয় না। এর বেশী আদর যত্ন মানুষে মনে-মনে আঁকতেও পারে না। তুমি মার বাড়া যত্ন করেছ, আর দাদা, বাবার চেয়েও বেশী স্নেহে আমাকে মানুষ করে তুল্‌ছেন। লোকের মুখে যা শুনি, আর আমার অতি শৈশবের স্মৃতি যতটুকু আমার মনে আসে, তাতে মনে হয়—আমি দেবতার স্নেহ-করুণার মধ্যে থেকে এত বড় হয়েছি। ভগবান যদি দিন দেন,—আর কি বলবো, জীবন দিয়েও যতটুকু পারি সে ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করবার চেষ্টা করব।"

(২)

গ্রামের লোকের অনুরোধে ও গ্রামের জমিদার ভৈরব বসুর বিশেষ কাকুতি-মিনতিতে বাধ্য হইয়াই বুঝি হরিধন দত্ত নিজের শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জমিদার মহাশয়ের একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার সহিত তাঁহার আজীবনের দুঃখরাশির মধ্যে প্রতিপালিত বি-এ পাশ-করা ভাই শ্রীমান্ শিবধন দত্তের শুভ-বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহের কথা স্থির হইবার পর শিবধন অনেকবার তার বৌদিদিকে বলিয়াছিল, "বৌদিদি, তুমি দাদাকে বলে এ বিবাহ বন্ধ করে দাও। বড়লোকের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ স্থাপন না করাই ভাল। সমানে-সমানে কুটুম্বিতা না হলে অশেষ কষ্টের কারণ হবে।"

শিবধনের একথার উত্তরে তার বৌদিদি বলিয়াছিলেন, "ভাই, কি আর করবে বল্; আমি অনেক বলে-কয়েও পারিনি। তিনি বলেন, 'জমিদারের কথায় মত না দিলে—বিশেষ এই বিয়ের মত না দিলে, এ গ্রামের বাস ত্যাগ কর্ত্তে হবে।' তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন তাঁর কথারক্ষার জন্যও, তোমার নিজের দিকে না চেয়েই, তোমাকে এ কাজ কর্ত্তে হবে। আর, বড়মানুষের মেয়ে কি সবাই মন্দ হয়? তাদের মধ্যেও কত দেবী আছে।"

শিবধন নিজের দিকে না চাহিয়া, কেবলমাত্র দাদার কথা রক্ষার জন্যই, এই শুভোদ্বাহে স্বীকৃত হইয়া, বরবেশে সাজিয়া জমিদার-দুহিতার পাণিগ্রহণের জন্য যে সময় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, সেই সময় চিরপ্রথা অনুযায়ী কনকাঞ্জলি দিবার সময় পূজ্যের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে হয় যে, তাঁহাদের সেবার জন্য দাসী আনিতেই বরবেশে যাত্রা। কিন্তু শিবধন, তার বৌদিদিকে কনকাঞ্জলি দিবার সময় সেই চিরপ্রথার এমন একটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা আজ বঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহেই অভি-সম্পাতের মত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। "কোথায় যাচ্ছ ভাই?" শিবধন তার বৌদিদির এই প্রশ্নের উত্তরে যখন অতর্কিতভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিল—"বৌদিদি, তোমাদের জন্য দাসী আন্‌তে নয়—তোমাদেরই জন্য একটা শাসনদণ্ড আন্‌তে যাচ্ছি" তখন সকলেই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল।

ধনীর একমাত্র শিক্ষিতা কন্যাকে দরিদ্রের গৃহে বধূরূপে আনায় হরিধন ও তাহার পত্নী যে আশঙ্কায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সে ভ্রম ও আশঙ্কাটুকু সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য নূতনবৌ যেরূপ যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া গ্রামের সকলেই ধন্য-ধন্য করিয়া নূতন বৌর গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

(৩)

শিবধন নিজের অধ্যবসায়গুণে ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে, নিজের প্রাণপাত পরিশ্রমে যেরূপ কর্ম্মপটু হইয়া তাহার দাদার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহার সে চেষ্টা, পরিশ্রম, সর্ব্বসাধারণের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াও স্বার্থান্ধ আধুনিক বিলাসী বাবুদের প্রাণে একটা তীব্র কষাঘাত করিয়াছিল—এ কথা সকলেই এক বাক্যেই স্বীকার করিত। রাণীগঞ্জের একজন সওদাগরের কৃপাভাজন হইয়া শিবধন বিশেষ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছিল। শিবধন পরের কারবারকে নিজের কারবার ভাবিয়া পরিশ্রম করিত;—তাহার সেই পরিশ্রমের ফল ভগবানই তাহাকে হাতে তুলিয়া দিতেছেন বলিয়াই সওদাগরের অল্প মূলধনের কারবার আজ এমন বড় হইয়াছে।

শিবধনের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমেই সওদাগরের উন্নতি, এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়াতে সওদাগর নিজের পুত্রাধিক স্নেহযত্নে শিবধনকে প্রতিপালন করেন। শিবধনের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সওদাগর কারবারের অর্দ্ধেক লাভের একটা অংশ শিবধনকে দিয়াছেন, এবং সংসার-খরচের জন্য প্রতিমাসে তাহার জ্যেষ্ঠের নিকট দুইশত টাকা পাঠাইয়া দেন। হরিধন অতি সামান্য অবস্থায় পড়িয়া পিতৃমাতৃহীন এই কনিষ্ঠ ভাইটীকে বড় আশা করিয়াই মানুষ করিবার জন্য একটা মুদিখানায় দিবারাত্রি পরিশ্রমের বিনিময়ে মাসিক ছয়টাকা বেতনে যে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে সার্থক হইয়াছে বলিয়া তিনি এখন বড় সুখী। স্বামী-স্ত্রীতে অনেক দিন হইতে বহু অভাবের মধ্যে যে আশা বুকে করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে শিবধনকে মানুস করিয়াছেন—উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন, আজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় শিবধনের চেষ্টায় সেই আশা পূর্ণ হইয়া হরিধনের চির-আকাঙ্ক্ষিত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পূরণ করিতেছে বলিয়া সে বড় সুখী, বড় নিশ্চিন্ত। শিবধন চারি বৎসর কার্য্য করিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতেই এখন তাহাদের খুব স্বচ্ছল অবস্থা হইয়াছে—জমিজমাও কিছু হইয়াছে। পিতৃপুরুষের দারিদ্র্যের চিহ্ন সেই বহু পুরাতন খড়ো বাড়ীতে থাকিতে ছোট-বৌ জমিদার-দুহিতা এখন রাজী নহেন। তিনি পিতৃগৃহেই থাকেন। বাড়ীতে কোঠা ঘর হইলেই এ বাটীতে আসিবেন, এই প্রকার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, হরিধন বাড়ীটীকে পাকা করিবার জন্য শিবধনের মত চাহিয়া পত্র দেওয়ায় সে লিখিয়াছে, "আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; স্বতন্ত্র ইচ্ছা যেন হৃদয়ে কখনও পোষণ না করি, এমনই আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু আপনি বাড়ী পাকা করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন, তাহা জানিবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি।"

হরিধন পত্রে অন্য কোন কথা না লিখিয়া এইমাত্র লিখিলেন যে, শিবধন যেন পূজার সময় একবার বাড়ীতে আসে; সেই সময় উভয়ে পরামর্শ করিয়া গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা স্থির করা যাইবে।

(৪)

পূজার সময় শিবধন বাড়ীতে আসিল। তাহার বাড়ীতে পৌঁছিবার দুই-তিনদিন পূর্ব্বে বড়বৌ স্বামীকে বলিলেন,"ঠাকুরপো বাড়ীতে আস্‌ছে; তার আস্‌বার পূর্ব্বেই ছোট্‌বৌকে নিয়ে আসা উচিত। এতদিন না হয় বাপের বাড়ীতেই ছিল; কিন্তু এখন না আনাটা কি ভাল হবে?"

হরিধন বলিলেন,"ভাল নয়, তা জানি; কিন্তু এতকালের মধ্যে ত একদিনের জন্যও তাঁকে এ বাড়ীতে আন্‌তে পারলাম না। পূর্ব্বেও ত শিব দুই তিনবার বাড়ীতে এসেছে, একবারও বৌমাকে আন্‌তে পারি নি। তুমিই নানা রকম ব'লে শিবকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছ। তোমার কথা ত সে অমান্য কর্‌তে পারে না; তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় যেত; কিন্তু দুইএক দিনের বেশী থাক্‌ত না।"

বড়বৌ বলিলেন, "সেই জন্যই ত ঠাকুরপো বাড়ীতে আস্‌তে চায় না। এবার তুমি অনেক ক'রে লিখেছ, তাই আস্‌ছে। তা, ছোটবৌ আসুক আর না আসুক, তোমার কর্ত্তব্য ত তুমি কর। শেষে এ কথা না হয় যে, আমরা ত আন্‌তে যাই নি।"

হরিধন বলিলেন, "আমি গরিব মানুষ; আমার আর মান-অপমান কি। তুমি বলছ, আচ্ছা আমি বিকেলে একবার যাব।"

কিন্তু যাওয়ামাত্রই জমিদার মহাশয় মেয়েকে ত পাঠাইলেনই না; হরিধন কয়েকটি কড়া কথা শুনিয়া বিষণ্ন মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শিবধন বাড়ী আসিলে, তিনি এ অপমানের কথা তাহাকে বলিলেন না; পূর্ব্বেও কখন বলেন নাই।

শিবধন বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন; শিবধন গেল না।

পূজার কয়দিন পরে একদিন হরিধন বাড়ীখানি পাকা করিবার কথা শিবধনকে বলিলেন। শিবধন বলিল, "এখন ত বেশী টাকা হাতে নাই; এখন বাড়ী কর্‌তে গেলে ছোটখাট একটা বাড়ীই হতে পার্‌বে। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌লে হয় না?"

হরিধন বলিলেন "না, আমার বড় ইচ্ছা বাড়ীখানি পাকা করি। তা ছোটখাট একটা কোঠাই না হয় এখন দেওয়া যাক্; তারপর যা হয়, পরে দেখা যাবে।"

শিবধন বলিল, "বেশ, তাই হবে; কিন্তু আমার একটা কথা আছে।" এই বলিয়া সে চুপ করিল।

হরিধন বলিলেন, "তোমার কি মনের ভাব বল, তাই করা যাবে।"

শিবধন বলিল "আমার ইচ্ছা এই যে, আমাদের এ বাড়ীর ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলে পাকা বাড়ী না ক'রে, আমরা যে সকল জমি কিনেছি, তারই কোন একটা ভাল জমির উপর নূতন বাড়ী করা হোক। এ বাড়ী যেমন আছে, তেমনই থাকুক।"

হরিধন বলিলেন "তাতে লাভ কি? এ বাড়ীতে তা হ'লে কে থাক্‌বে?"

শিবধন বলিল, "সে কথা পরে ভাবলেই হবে। এ বাড়ীতে যায়গা ত বেশী নেই, যদি পাকা বাড়ীই করতে হয়, তা হলে একটু বেশী জায়গা দেখে বাড়ী কর্‌লেই ভাল হয়।"

হরিধন ভালমানুষ; তিনি সোজা যুক্তিটাই বুঝিলেন; বলিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক; বাড়ীতে যায়গা বড়ই কম। কিন্তু পৈতৃক বাড়ী, এটাকে ত কিছুতেই ছাড়া হয় না। তার কি?"

শিবধন বলিল, "সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। আমি হাজার তিনেক টাকা নিয়ে এসেছি। এই দিয়ে আপনি বাড়ী আরম্ভ করে দিন; তারপর যখন যেমন দরকার হবে, তা গুছিয়ে দেওয়া যাবে।"

এই কথাবার্ত্তার পর শিবধন যখন বাড়ীর মধ্যে গেল, তখন সে তাহার বৌদিদিকে বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, দাদা পাকা বাড়ী করবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন?"

বড়বৌ হাসিয়া বলিলেন "ব্যস্ত হবেন না; তুমি এখন দু-পয়সা আন্‌ছ, এখন কি আর আমরা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে পারি। এখন আমরা কোঠাঘর না হ'লে বাস কর্‌তে পারব না। আমরা কোঠাঘর করব, দশটা ঝি-চাকর রাখব, রাঁধুনী বামুন রাখ্‌ব। এসব করব না কেন? এতদিনই কষ্টে কাটিয়েছি, এখন তা করতে যাব কেন?"

শিবধন বিষণ্ণমুখে বলিল, "বৌদিদি, তোমার কল্যাণে লেখাপড়া ত কিঞ্চিৎ শিখেছি, সব বুঝতেও পারি। দাদা যে কেন পাকা বাড়ী কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তা তিনিও জানেন, তুমিও জান; আমিও যে না জানি তা মনে কোরো না। তুমি সত্যি কথা বল কি না, তাই বুঝ্‌বার জন্য কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।"

বড়বৌ এখনও হাসিয়া বলিলেন, "ভারি বুদ্ধিমান্ কি না। বল ত তোমার বুদ্ধিতে কি এসেছে।"

"না, সে কথা আর বল্‌ব না" এই বলিয়া শিবধন চলিয়া গেল। তিন-চারিদিন পরেই সে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। তাহার বৌদিদির অনেক অনুরোধেও সে এবার কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী গেল না। সেখান হইতে কত বার লোক আসিল; শিবধন গেল না।

(৫)

দু'দিন যাইতে না যাইতেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, শিবধন অন্যস্থানে পাকা বাড়ী করিতেছে। তখন নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "তাতে আর কি? শিবু রোজগার কর্‌ছে, সে পৈতৃক বাড়ীতে কোঠা দিয়ে ভাইকে তার ভাগ দিতে যাবে কেন?" যাঁহারা সেকেলে মানুষ, তাঁহারা বলিলেন, "কলি কাল কি না! হরি কত কষ্ট ক'রে ভাইটাকে মানুষ করেছে; আর এখন সে দু'পয়সা আন্‌তে শিখেছে; এখন আর ভাই কে?" কোন শুভানুধ্যায়ী হরিধনকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি শিব পৃথক হয়েই গেল।" হরিধন বলিলেন, "পৃথক হবে কেন? এ বাড়ীতে যায়গা কম, তাই আমরা বাইরে বাড়ী কর্‌ছি।" শুভানুধ্যায়ী বলিল, "তুমি এমনিই সোজা মানুষ বটে। শিবু যা বুঝিয়ে দিয়েছে, তাই তুমি বুঝে বসে আছ। আরে ভায়া, মতলবটা কি, তা সবাই জান্‌তে পেরেছে। এ সব জমিদারী চা'ল, বুঝেছ ভায়া! এখন তুমি তোমার পথ দেখ; ভাইয়ের মুখ চেয়ে থেক না।"

হরিধন বলিলেন, "আমার ত তা মনে হয় না।" তিন-চারিজন বলিয়া উঠিলেন, "খেটেখুটে বাড়ী তৈরী করে দেও, তারপর তুমিও দেখ্‌তে পাবে, আমরাও দেখ্‌তে পাব। আমরা ত আর মরছিনে। তখন বল্‌বে, 'হাঁ যা বলেছিলে, তা ঠিক!' এখনও সাবধান হও; কেন ভূতের বেগার খাট্‌তে যাবে?" হরিধন বলিলেন, "আমার যা কর্ত্তব্য, তা আমি ত করি। আমার শিবধন তেমন ভাই নয়!"

জমিদার বাড়ীতে যখন কথাটা পৌছিল, তখন সে বাড়ীর সকলেই শিবধনের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবধনের স্ত্রীই যে শিবধনকে এই সুবুদ্ধি দিয়াছে, সকলেই এই কথা বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবধনের স্ত্রী মনে-মনে বড়ই আনন্দ, বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিল।

(৬)

বাড়ীর অতি নিকটেই তাহাদের একটা জমি ছিল। সেইখানেই বাড়ী প্রস্তুত আরম্ভ হইল। খুব বড় বাড়ী নহে, সাত-আট হাজার টাকার মধ্যে যাহা হয়, সেই রকমের বাড়ী। কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া হরিধন বাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; সারাদিন তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। শিবধন, যখন দরকার তখনই টাকা পাঠাইতে লাগিল। বাড়ী প্রস্তুত শেষ হইতে অধিক সময় লাগিল না; ছয় মাসের মধ্যেই ছোট-খাট একটা পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গেল। হরিধন শিবধনকে লিখিলেন যে, বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে শুভদিন আছে; সেই দিনেই গৃহ-প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। শিবধনের তাহাতে অমত হইল না; সে এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়া বৈশাখের প্রথমেই বাড়ী আসিল। এবার আর তাহার স্ত্রীর আসিতে কোন আপত্তি হইল না। যদিও প্রথমে আসিয়া খড়ো বাড়ীতেই উঠিতে হইল; কিন্তু আর কয়েকদিন পরেই নূতন পাকা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে, নিজেই ঘরের গৃহিণী হইবে, এই আনন্দে সে অল্প কয়েকদিন সেই খড়ের বাড়ীতে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

নূতন গৃহে প্রবেশের যথাযোগ্য আয়োজন হইতে লাগিল। শিবধনের ইচ্ছা যে, এই উপলক্ষে একটু ধুমধাম করা হয়; হরিধন আনন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। পুরাতন বাড়ী এবং নূতন বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান অধিক ছিল না; রাস্তার এ পাশে পুরাতন বাড়ী, অপর পার্শ্বেই নূতন বাড়ী; সুতরাং দুই বাড়ীতেই আয়োজন চলিতে লাগিল।

শুভদিন সমাগত হইল। যথারীতি হোম-যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইল। গ্রামের সকলেই উপস্থিত ছিলেন; জমিদার মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। যাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সকলেই কয়েকদিন হইতে পরামর্শ দিতেছিলেন এবং যাঁহার যতটুকু সাধ্য ততটুকু সাহায্যও করিতেছিলেন।

ক্রমে গৃহ-প্রবেশের শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। তখন পুরোহিত মহাশয় শিবধনকে বলিলেন, "তুমি এবং তোমার স্ত্রী নববস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও; আর বিলম্ব নাই, গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে।"

শিবধন বলিল, "আমি প্রস্তুত হইব কেন? গৃহ-প্রবেশ করিবেন—দাদা ও বৌদিদি। তাঁহারা থাকিতে আমরা গৃহ-প্রবেশ করিব কেন? তাঁহাদের ডাকিয়া আনুন।"

হরিধন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "তাতে দোষ কি? তোমরা প্রবেশ করিলেই আমার প্রবেশ করা হইল; তোমরা প্রবেশ কর, দেখিয়া আমি চক্ষু সার্থক করি।"

শিবধন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না দাদা! আপনাকে আর বৌদিদিকেই গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে। আপনারা থাকিতে আমি তাহা কিছুতেই পারিব না, তাহা সঙ্গতও নয়।"

বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তা শিব যে কথা বলিতেছে তাহা সঙ্গতই বটে, জ্যেষ্ঠ উপস্থিত থাকিতে কনিষ্ঠ গৃহ-প্রবেশ করিবে কেন?"

শিবধনের শ্বশুর জমীদারমহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাড়ী ত শিবধনের; তাহারই গৃহ-প্রবেশ করা উচিত।"

শিবধন মাথা তুলিয়া একবার শ্বশুরের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। পুরোহিত শিবধনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "তা হলে শিবু, কি করবে বল?"

শিবধন দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আমি যা বলেছি, তাই হবে; দাদা আর বৌদিদিকেই গৃহ-প্রবেশ করতে হবে।"

তখন উপস্থিত সকলেই—অবশ্য জমীদার মহাশয় বাদ—শিবধনের কথায় সম্মতি দিলেন। হরিধন কি করিবেন; অগত্যা তিনি গৃহ-প্রবেশে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বলিয়া বসিলেন "ছোট-বৌকে না নিয়ে আমি নূতন ঘরে প্রবেশ করব না।"

শিবধন কি করিবে। সে তখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাহার বৌদিদির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বৌদিদি, তুমি এতকাল আমার কত অন্যায় আবদারও সয়ে এসেছ; আজ আমার এই শেষ আবদার। এ তোমাকে রক্ষা করতেই হবে, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না—কিছুতেই না। আমি তোমাকেই আমার মা বলে জানি। এই মাতৃহীন সন্তানের এই আবদারটা আজ তুমি রক্ষা কর, বৌদিদি!" এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে যাইয়া তাহার বাক্স

খুলিয়া, তাহার দাদার জন্য একটা গরদের জোড় এবং বৌদিদির জন্য একখানি বহুমূল্য গরদের সাড়ী বাহির করিয়া আনিয়া, তাহার বৌদিদিকে বলিল "বৌদিদি, এই কাপড়খানা পরে নেও। আমার কথা শোন।"

বড়বৌ আর কি করিবেন, অগত্যা কাপড়খানি পরিধান করিলেন; বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছোটবৌকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

শিবধন বলিল "বেশ ত।"

একজন লোক দিয়া নূতন বাড়ীতে হরিধনের গরদের জোড় পাঠাইয়া দিয়া শিবধন তাহার বৌদিদি ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নূতন বাড়ীতে গেল; অন্যান্য মহিলারাও তাহাদের অনুগমন করিলেন।

শুভমুহূর্ত্তে যখন হরিধন সস্ত্রীক নূতন গৃহের সোপানে পদার্পণ করিলেন, তখন শিবধন গললগ্নীকৃতবাসে দাদা ও বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বৌদিদি, আমরা তবে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে যাই।" এই বলিয়া সে একটুও লজ্জা না করিয়া অনতিদূরে দণ্ডায়মানা তাহার স্ত্রীর হাতে ধরিয়া বলিল "চল, আমরা আমাদের গৃহপ্রবেশ করি গিয়ে। এ গৃহ আমাদের নহে, আমাদের নূতন গৃহ-প্রবেশের জন্য রাস্তার ও-পাশের ঐ খড়ো ঘর রহিয়াছে। চল।" এই বলিয়া শিবধন তাহার স্ত্রীর হাতে ধরিয়া তাহাদের পুরাতন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মরিছে তারাই যারা চিরকাল মরে

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

মরিছে তারাই, যারা চিরকাল মরে;
মরিব না আমি, ভবে রব চির তরে।
পরের বিভব হয় কালেতে বিলীন,
আমার বিভব ভাবি, রবে চিরদিন।
কালস্রোতে স্রোতস্বিনী যায় শুকাইয়া,
কালে ধরাধর যায় ধরায় মিশিয়া,
যায় পুরাতন, হয় নবীন উদয়;
দেখিয়াও মোর তবু এই মনে হয়,—
মরিব না আমি, ভবে রব চিরতরে;
মরিছে তারাই, যারা চিরকাল মরে।
গেছে কত সসাগরা ধরা-অধিপতি,
কতশত দানবীর, কত মহারথী;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী, কোথায় শ্রীরাম?
ব্রজনাথ বিনা এবে শূন্য ব্রজধাম।
কত মহাপুরুষের হয়েছে বিলয়,
দেখিয়াও মোর তবু এই মনে হয়,—
মরিব না আমি, ভবে রব চিরতরে;
মরিছে তারাই, যারা চিরকাল মরে।
গেছেন ছাড়িয়া কবে জনক-জননী,
প্রাণসম প্রিয় সুত, নয়নের মণি;
স্নেহের পুতলী সেই গিয়াছে দুহিতা;
ছাড়িয়া আমায় গেছে কোথায় দয়িতা।
একে-একে সকলের হইতেছে ক্ষয়;
দেখিয়াও মোর তবু এই মনে হয়,—
মরিব না আমি, ভবে রব চিরতরে—
মরিছে তারাই, যারা চিরকাল মরে।
ছিল কত বন্ধু-জন তারা একে একে
সংসারের খেলা খেলি গেছে পরলোকে;
এ শরীরে আছে যত ইন্দ্রিয়-নিচয়
হইতেছে অনুদিন তাদের বিলয়;
অণু-অণু করি তনু হইতেছে ক্ষয়;
দেখিয়াও মোর তবু এই মনে হয়,—
মরিব না আমি, ভবে রব চিরতরে—
মরিছে তারাই, যারা চিরকাল মরে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

সাহিত্য-সংহিতা—বৈশাখ, ১৩২৩

সভাপতির অভিভাষণ— সাহিত্য-সভার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসনে বসিয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বৈশাখ মাসের 'সাহিত্য-সংহিতা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সামান্য স্ফীতিকরণ-দোষে দুষ্ট হইলেও সুস্পষ্ট, নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ। আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

'ভারতী' ও 'সবুজপত্র' প্রভৃতি কাগজে যে কালা-পাহাড়ী সাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, মহারাজ তাহারই উপর মিঠে কড়া চাবুক চালাইয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণের তিনটি প্রধান কথা আমাদের পাঠকবর্গকে আজ শুনাইয়া দিতেছি।

প্রথম, সমালোচনার কথা।—মহারাজ বলিতেছেন,—"অপ্রীতিকর হইলেও ইহার আলোচনা করিতে হইবে। যদি প্রকৃতই দোষ থাকে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সংশোধনের সম্ভাবনা অল্প।

"তোমরা সবাই ভাল,
কেউ দিব্যি গৌর বরণ, কেউ দিব্যি কাল"—

এ কথা অন্য যেথানেই সুসঙ্গত হউক, সাহিত্যে শোভনীয় নহে।"—রবীন্দ্রনাথের অতিভক্তগণ এ কথায় সায় দিবেন না জানি, কিন্তু তবু ইহা সত্য, ইহা যুক্তিপূর্ণ। রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক উপদেশ অনুযায়ী যাঁহারা অপ্রিয় সত্যকে সাহিত্যের আসর হইতে বহিষ্কার করিতে চাহেন, তাঁহারা লেখকজাতির সুহৃদ হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের সুহৃদ নহেন। লেখকজাতির প্রতি তাঁহাদের মায়া-মমতা থাকিতে পারে, কিন্তু মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নাই। সত্যই সাহিত্যের প্রাণ। প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সত্য-প্রচারই সাহিত্যসেবীর ধর্ম্ম। সত্য-গোপনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রাণ-বায়ুর পক্ষে বিষম বিষাক্ত, অতীব অস্বাস্থ্যকর।

তারপর, ভাষার কথা।—সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন,—"ভাষা ভাবেরই বাহ্য আকৃতি। মানবের আকৃতির যেমন একটি standard বা সাধারণ আদর্শ আছে, যাহার ন্যূন হইলে আকৃতি নিন্দনীয় বা উপহসনীয় হয়, সাহিত্যের ভাষারও সেইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা হইতে হীন হইলে ভাষা নিন্দনীয় ও উপহসনীয় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গালা ভাষার সেই আদর্শ ধীরে-ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে সেই আদর্শে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহা প্রকৃতির নিয়মে এমনি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে হইয়াছে যে, তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই।...আমার নিবেদন এই যে, যে সকল লেখক নূতন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের লেখনী সংযত করুন। আমি প্রবীণ, সুতরাং সংশয়াকুল ও বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, সবুজের লেশমাত্রহীন, "আধমরা," বিষম "পাকা" হইতে পারি, কিন্তু হে নবীন, আমি যে অনেক নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতার ফল মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। অতীতের অভিজ্ঞতা উন্নতির সোপান-পংক্তি; তোমরা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহ।"—কিন্তু মহারাজার এ নিবেদন কি 'কাঁচার' দল শুনিবে? যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, "কল্‌কাতার রাজ-পথে সাহিত্যের মহারথী আকাশে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন—সমস্ত বাঙ্গালাদেশ সেইদিকে অব্যক্ হয়ে চেয়ে আছে,"—তাহাদের সুখ-স্বপ্ন কি সহজে ভাঙ্গিবার!

তৃতীয়তঃ, ভাবের কথা।—সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"নবীন সম্প্রদায় আমাদের সাহিত্যে নূতন idea বা ভাব আনিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বদেশবাসিগণকে স্বতঃ-পরতঃ এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিধান সকল তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ...হে নবীন! বিধি-নিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন?

জগৎ একেবারেই প্রবীণ হইয়া উঠে নাই—সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোন বিধি-নিষেধ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংযমকে কাপুরুষতার নামান্তর ভাবিয়া পদদলিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সুখ পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধি-নিষেধের লৌহশৃঙ্খল গঠন করিয়া পায়ে পরিয়াছে। সেই দিনই তাহার উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা।"—সভাপতি মহাশয়ের উক্তিগুলি মূল্যবান্, সন্দেহ নাই। তবে যাঁহার উক্তির উত্তরে তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অত গুণ-গান করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতির নিতান্ত অল্প জয়গান নাই! তাঁহার 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই তাঁহার আধুনিক সামাজিক প্রবন্ধের উচ্চরবে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। মহারাজ যদি সেই সব লেখারই দুই একটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে নিজের কথা আর বেশী করিয়া বলিতে হইত না।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৩

পুরাতন প্রসঙ্গ—

বৈশাখ মাস হইতে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "পুরাতন প্রসঙ্গ" বাহির হইতেছে। রুসো বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হইতে না পারে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হইতে না পারে, সে যেন আত্ম-জীবন-কথা লিখিতে উদ্যত না হয়। একেবারে ভিতরটা খুলিয়া, বাহিরে উলঙ্গ হইয়া, তবে আত্ম-জীবন কথা লিখিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁহারা নিজের কথা বলিতে বসেন, তাঁহারা যেন নিজেকে খুব বড় বলিয়া পরিচয় দিবার জন্যই তাহা বলিয়া থাকেন। একমাত্র স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'আত্ম-জীবনী'তে কতকটা স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এদেশের যত কবি বা মনীষী 'আত্ম-কথা' বলিতে গিয়াছেন, প্রায় সকলের লেখাতেই 'অহং' টুকুই বড় বেশী রকম মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে। অমৃত বাবুর 'পুরাতন প্রসঙ্গ'ও মনে হয় এই দোষে দুষ্ট হইতেছে। যতটুকু প্রসঙ্গ বাহির হইয়াছে, তাহাতে 'আমি'র গন্ধই বড় বেশী।

অমৃত বাবু বলিতেছেন,—"পাছে তিনি (অভয় বাবু) আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটর করিতে যাইতাম।" কিন্তু তিনি পুলিশের চাকরী লইয়া আন্দামনদ্বীপে কখনও গিয়াছিলেন কি না, সে কথা আমরা তাঁহার প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি না। নিজের অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী অভিনেতা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত, যাঁহাদের নহিলে এদেশে থিয়েটর জিনিষটা হইত কি না সন্দেহ, সেই গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল ও বেল বাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে চাপা কয়েকটা কথায় সব গোল চুকাইয়া দেওয়া হইতেছে। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই "পরে বলিব" বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া যাইতেছেন। 'নীল-দর্পণের' অভিনয়ে চারিদিকে কিরূপ 'ধন্যি ধন্যি' পড়িয়া গিয়াছিল, সৈরিন্ধ্রী সাজিয়া তিনি কিরূপ 'বাহবা' পাইয়া-ছিলেন, সে সকল কথা অমৃত বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে-ছেন; কিন্তু এই 'নীলদর্পণের' অভিনয়-শিক্ষা-কার্য্যে গিরিশ-চন্দ্রের যে বিলক্ষণ হাত ছিল, তাহার কোথাও উল্লেখ করেন নাই। স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর কাগজে-কলমে উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও অর্দ্ধেন্দুর জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"নীলদর্পণ সম্প্রদায়ের অনেকেই—মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাপ্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন।" 'পুরাতন-প্রসঙ্গে'র এক স্থলে আছে,—"সেই সময়ে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরিশ বাবু লিখিয়া-ছেন।"—গিরিশ-সম্পর্কিত সন্দেহের কথাটাও অমৃতবাবু মনে করিয়া বলিয়াছেন। অথচ 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ে গিরিশবাবুকে না দেখিয়া দীনবন্ধু বাবু যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই! 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র আর একস্থানে আছে,—"ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবু নিজেকে a distinguished amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত করাইয়াছিলেন; কিন্তু তখন আমরা সকলেই amateur, তবে গিরিশবাবু অবশ্যই distinguished ছিলেন।"—কিন্তু কোন ভদ্রলোকেই এতটা আত্ম-সম্ভ্রমহীন, এমন অজগর কুষ্মাণ্ড হইতেই পারে না যে, সে নিজেকে

distinguished বলিয়া বিজ্ঞাপিত করাইতে পারে! বলা বাহুল্য, গিরিশবাবুও তাহা পারেন নাই। তিনি, তাঁহার নাম 'amateur' বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিবেন না বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'distinguished' কথাটা থিয়েটরের লোকেরাই বসাইয়া দিয়াছিল। গিরিশবাবু নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। আমি আমার নাম amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায়, ভীমসিংহ —by a distinguished amateur প্লাকার্ডে প্রকাশিত হয়।"—এটুকু বোধ হয় অমৃতবাবু জানিতেন না। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে দুইটি সংবাদ নূতন করিয়া বলিতে গিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি নূতন বটে, তবে ঠিক নহে। অপরটী সত্য, তবে নূতন নহে!

প্রথম সংবাদ 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক সম্বন্ধে। অমৃতবাবু বলিতেছেন,—"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জন-সাধারণে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটকখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রচনা করিয়া দেন।...বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমা'রও সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন—বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা নহে। আর একটা কথা—'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটকে পট পরিবর্ত্তন নাই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজিনাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে।"—কিন্তু এ সব কথা কি ঠিক? অগ্রজের মৃত্যুর পর তর্করত্ন মহাশয় 'রুক্মিণী-হরণ','রত্নাবলী' ও 'স্বপ্নধন' প্রভৃতি যে কয়খানি নাটক লিখেন, সেগুলির সহিত 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক মিলাইয়া পড়িলে অমৃত বাবুর 'বোধ' বা অনুমান সত্য বলিয়া ত মনে হয় না'। 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক রামনারায়ণের প্রথম বয়সের রচনা; অতএব সে লেখার সহিত তাঁহার পরিণত বয়সের লেখার যৎসামান্য অমিল থাকিতে পারে, এবং তাহা আছেও বটে; কিন্তু ঐ দুই লেখায় আবার মিলের ভাগও এত বেশী আছে যে, অমিলের অংশ তাহার তুলনায় গণ্যই হইতে পারে না। 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র স্থানে স্থানে 'সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা' আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার অধিকাংশ স্থলেই তর্করত্নের অন্যান্য নাটকের ন্যায় চল্‌তি ভাষাই দেখিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র রসপরিহাসাদির পরিচয়ও তাঁহার অন্যান্য নাটকে যথেষ্ট আছে। অমৃত বাবু বলিতেছেন বটে যে, রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকে গর্ভাঙ্কাদি আছে,—'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে' তাহা নাই—কিন্তু অমৃতবাবু যদি তর্করত্নের 'রত্নাবলী' ও 'রুক্মিণী-হরণ' প্রভৃতি নাটকগুলি ভাল করিয়া উল্টাইয়া একবার দেখেন, তাহা হইলে সহজেই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তা' ছাড়া, রামনারায়ণ এতটা হীন, এমন সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না যে, তিনি তাঁহার দাদার লেখাকে নিজের লেখা বলিয়া বরাবর চালাইয়া গেলেন। যিনি নিজের অধিকাংশ গ্রন্থমধ্যেই পরের ঋণ মুক্ত কণ্ঠেস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে দাদার ঋণ বেমালুম হজম করিলেন, বিশ্বাস হয় না।

তারপর গিরিশচন্দ্রের ছন্দ সম্বন্ধে অমৃত বাবু বলিতেছেন, —"বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবিগণ বোধ হয় অনেকে জানেন না, গিরিশবাবুর পদ্যের ছন্দ গিরিশবাবুর নিজের আবিষ্কৃত নহে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ।" কিন্তু কথাটা সাহিত্য-সেবিগণের নিকট নূতন নহে। বাঙ্গালা নাটক লইয়া যাঁহারাই এক-আধটু আলোচনা করেন, তাঁহারাই উহা জানেন। ১৩১৯ সালের 'অর্চ্চনা' কাগজে 'গিরিশচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়াই আলোচিত হইয়াছে।

পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত—

এদেশে একটা কথা আছে—'যে মাছটা যখন পালায়, তখন সেই মাছটাই সব চেয়ে বড় হয়।'—কথাটা মিথ্যা নহে। আমাদের দেশে কোন মনীষী বা কবির মৃত্যু হইলেই ঐ উক্তির যাথার্থ্য আমরা অক্ষরে-অক্ষরে উপলব্ধি করি। হেমচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয়, তখন সকলে বলিলেন, হেমচন্দ্রই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তারপর নবীনচন্দ্রের

যখন মৃত্যু ঘটে, তখন আবার সকলে বলিলেন, বাঙ্গালার কাব্য-কুঞ্জে নবীনচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। শুধু ইহাই নহে। উচ্ছ্বাসের মুখে আমরা সচরাচর এমনই তালকাণ্ড হইয়া বসি যে, অনেকস্থলে নিজের কথারই নিজে প্রতিবাদ করি। 'মানসী'র এই প্রবন্ধমধ্যে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। লেখক একস্থানে বলিতেছেন,—"তিনি (উমেশচন্দ্র) বঙ্কিম-দীনবন্ধুরও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক ছিলেন।" ইহার কয়েক ছত্র পরেই আবার লিখিতেছেন,—"১৮২৯ সালে জুন মাসে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। দীনবন্ধু মিত্রও ঐ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন।"—উপরি-উদ্ধৃত উক্তি দুইটির যিনি সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন, তিনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই। কিন্তু মাসিকের পৃষ্ঠায় কি অমন বিকট ধাঁধাঁ ছাপিতে আছে!

সবুজ পত্র—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৩।

জাপান-যাত্রীর পত্র—

ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। পাদ্রী সাহেবেরা যেমন সময় নাই, অসময় নাই, যখন-তখন হিন্দুর দেব-দেবীকে—হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, সম্প্রতি স্যর রবীন্দ্রনাথও তাহাই করিতেছেন। তিনি তাঁহার গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায় সীতাদেবীকে গালি দিতেছেন, রামচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেছেন, হিন্দুর আচার-পদ্ধতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেছেন।—এইটাই রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখার একটা মস্ত বিশেষত্ব। বলা বাহুল্য, তাঁহার "জাপান-যাত্রীর পত্র"ও ঐ বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি লিখিতেছেন,—"কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্যে আদব-কায়দা মুসলমানের। মনুতে পাওয়া যায়, মা, মাসী, মামা, পিসের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার কি রকম হবে;—কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্য জাত বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে।"—কথাটা আনকোরা নূতন, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু কথাটা কি জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ? সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্ত্রস্বরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "সর্ব্বভূতময়োহি সঃ" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য যে দেশ হইতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশের লোকের কাছে 'বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে', ইহা কি সম্ভব? যে দেশে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিকতার প্রবচন বহুকাল হইতে প্রচলিত, সেই দেশের লোক 'জাত বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য মুসলমানের নিকট সেলাম শিক্ষা করেচে', ইহা কি স্বাভাবিক?

রবীন্দ্রনাথকে এখন একবার তাঁহার পুরাতন পুঁথি উল্টাইয়া দেখাই।—পৃথিবীতে যখন মুসলমানের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না, তখন হিন্দু সভ্যতা 'বাইরের লোকের কাছে কিরূপ ভদ্রতা রক্ষা' করিয়া চলিত, তাহার পরিচয় তাঁহার পুরাতন পুঁথিতেই আছে। মনে পড়ে কি, তিনিই লিখিয়াছিলেন,—

"হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ—বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয়, জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশীয়, দ্রাবিড়ী তৈলাঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে।" "চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োনথ্‌সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখনো সেরূপ পারিতেন না। গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।"

ভগবান মনু "সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান দেন নাই' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অঙ্গে বিদ্রূপের বাণ মারিয়াছেন। কিন্তু মনু ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃশকাঃ।

পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥"

অর্থাৎ 'পৌণ্ড্রক', 'ঔড্র,' 'দ্রাবিড়,' 'কাম্বোজ,' 'জবন,' 'শক,' 'পারদ,' পহ্লব,' 'চীন,' 'কিরাত,' 'দরদ,' এবং 'খশ,'—এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্বলাভ করিয়াছেন। (বঙ্গবাসীর মনুসংহিতা)—এদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিতেছেন যে, "মনুতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কি রকম হবে।" অতএব, 'সাধারণ ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত, তার বিধান মনুতে নেই' বলিয়া দুঃখ করিলে যে বিষম ভুল বলা হয়!

এই প্রবন্ধের আর এক স্থানে শ্লেষের সুরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"আমাদের......অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যে রকম, অর্থাৎ দিগবসনের সুন্দর অনুকরণ।" অথচ এই রবীন্দ্রনাথই ইতিপূর্ব্বে একদিন লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষ সমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাত করি না।"—ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান—

এটি সম্পাদকের রচনা। ইহার ভাষা যদিও বিট্‌কেল, কিন্তু ইহার কথাগুলি আলোচনার যোগ্য। লেখকের একটি মত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

লেখক বলিয়াছেন,—"যিনি আমাদের মনের উপর জ্ঞানের আলো ফেলেন, তাঁর উপরেও আমাদের রাগ হয়,—আর যিনি হাসির আলো ফেলেন, তাঁর উপরে তার চাইতেও ঢের বেশি রাগ হয়, কেন না হাসির অন্তরে যে দাহিকা শক্তি আছে, জ্ঞানের অন্তরে তা' নেই। এ জাতীয় লেখকদের সমাজ প্রথমে শত্রু বলেই জ্ঞান করে। সুতরাং যে সমাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে সমাজের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল যে শুধু বাহবা ও করতালি লাভ করেছিলেন, এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"—কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে উহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের উপর হাসির আলো ফেলিয়াও যে আমাদের নিকট বাহবা পাইয়াছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহার তীব্র সহানুভূতি গুণ। চিত্র দেখাইবার সময়, "তিনি মুকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন না, তিনিও সকলের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। এমন অনুকম্পা, এতটা সমবেদনা আমি আর কোনও সাম্যদেশের ব্যঙ্গাত্মক কবিতে দেখিতে পাই নাই। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনিয়া কেহ কখনও ব্যথা পায় না, কেহ কখনও কাতর মুখে সরিয়া দাঁড়ায় না।"
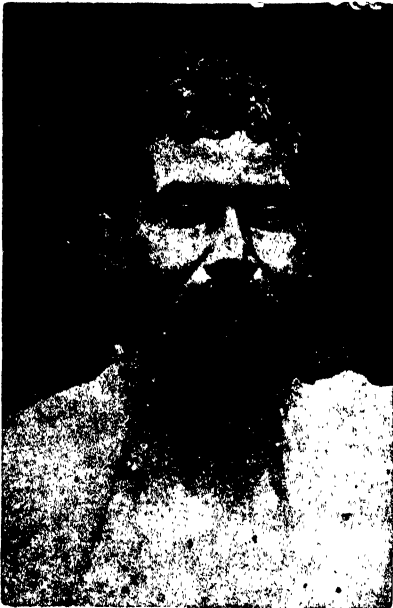
৺রসিকলাল রায়

৺রসিকলাল রায়

আমাদের প্রিয়বন্ধু, উদারহৃদয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ রসিকলাল রায় আর ইহজগতে নাই; গত ১৫ই শ্রাবণ তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবকে শোকার্ত্ত করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশের সময় রসিক বাবু বাঁকিপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই জ্বরে পড়েন। সে জ্বর যে পরিণামে 'কালা-জ্বরে' পরিণত হইবে, তাহা কে জানিত? এই কালা-জ্বরেই মাসাধিককাল কষ্ট পাইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন; ভারতবর্ষের 'বীণার-তান' অসময়ে থামিয়া গিয়াছে; আমরা একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাইয়াছি। রসিকবাবু পীড়িত হইলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ, সুধী, পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসেন এবং প্রাণপণে তাঁহার চিকিৎসা করান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; দেবীপ্রসন্ন বাবুর কোলে মাথা রাখিয়াই রসিকলাল চলিয়া গেলেন। ভগবান তাঁহার একমাত্র অনাথ পুত্রের হৃদয়ে শান্তিদান করুন।

বিশ্বদূত

উচ্চশিক্ষা ও বাঙ্গালী

সুশিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, চরিত্র গঠিত হইবে, শিক্ষিতের মেধা ও মনীষাপ্রভাবে দেশের দশজন প্রতিপালিত হইবে, কুপোষ্যের পাল অন্নমুষ্টি পাইবে—ইহাই ত সকল দেশের সকল সভ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বজনগ্রাহ্য শিক্ষার বিবৃতি। এই বিবৃতি অনুসারে তোমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিত হইয়াছে? কয়জন এমন একটা নূতন কিছু বাহির করিতে পারিয়াছে, যাহার কল্যাণে দেশের সহস্র-সহস্র নরনারীর অন্ন হইতেছে? এদেশে অর্থোপার্জ্জনের যে কয়টি নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সব-কয়টাই ইংরেজের কল্যাণে হইয়াছে। ইংরেজ না আসিলে এদেশে নীলের-পাটের চাষ হইত না, কয়লার খনির কাজ এমন বিস্তৃতভাবে চলিত না; রেললাইনে, কলকারখানায় এবং আসামের চা-বাগিচায় অসংখ্য কুলি-মজুর খাটিয়া খাইতে পাইত না। আমরা যা একটু-আধটু করিয়াছি, সে সবই হীন নকলনবিশী মাত্র; সে সকলের প্রভাবে দেশের টাকা বিদেশেই অধিক যাইতেছে, বিদেশের টাকা স্বদেশে আসিতেছে না। বরং এ পক্ষে কিছু কাজ বোম্বাই প্রদেশের পার্শী ভাটিয়াগণ করিয়াছেন। টাটার লৌহের কারখানা একটা কাজের মত কাজ হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এমনভাবের পরিচয় দিবার কাজও ত একটাও দেখিতে পাই না। আমেরিকা ও জর্ম্মণীতে যাহাকে Reproductive Education বলে, তাহার কোন পরিচয় ত বাঙ্গালাদেশে পাই না। কোন বাঙ্গালীই ত ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া স্বাবলম্বী—স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ হইতে পারে নাই।

—'নায়ক'।

ভারতের জন্য সদুপদেশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বক্তা অধ্যাপক সি, জে, হ্যামিল্টন জাপানের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করত: কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যানের" প্রতিনিধি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন:—"Lessons for India from Japan"। ভারতের যে সমস্ত মনস্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য রাজ্য-সমূহের ও জাপান অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন, তাঁহারা সকলেই বলেন যে রাজকীয় সাহায্যেই ঐ সমস্ত দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতি দ্রুতগামী হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমেরিকা এবং জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে স্বদেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, স্পষ্টভাবে তাহা বলিয়াছেন। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধারম্ভের পর ভারতের পণ্যশালায় জাপানের দ্রব্যজাত হু হু আমদানী হইতেছে; আমাদের নেতৃগণ তাহা দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন যে সরকারী সাহায্যে এদেশেরও শিল্পাদির উন্নতি করিয়া দিন। গত বৎসর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সদস্য মাননীয় মি: বিট্‌সন বেল বঙ্গে কয়েকটি শিল্পে আনুকূল্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তারপর গবর্ণমেণ্ট এক শিল্প-কমিশন বসাইয়াছেন এবং অধ্যাপক মি: হ্যামিল্টনকে জাপানের শিল্পবাণিজ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মি: হ্যামিল্টন আসিয়া "ষ্টেটস্‌ম্যানের" প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যদি তাঁহার রিপোর্টের মর্ম্মাংশ হয়, তবে বুঝা যাইতেছে, জাপানের শিল্পাদি গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যে কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিবেন না, কেবল তথাকার শ্রমজীবীরা কিরূপ, কিরূপে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গৃহশিল্প বড়-বড় কারখানায় পরিণত করিয়াছে, বিদেশের সহিত জাপান কি ভাবে ব্যবসা চালাইতে-ছেন, ইত্যাদি কথাই বলিবেন।—'জ্যোতিঃ'।

নিম্নস্তরের ডাক্তার

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন,—গ্রাম্য চিকিৎসকের অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাকল্পে বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক কি না, এবং বর্ত্তমান বে-সরকারী চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্য দিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষার প্রসার-বিধান কর্ত্তব্য কি না, ভারত গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ও বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত গ্রহণ করুন।—সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট সার্কুলার প্রচার করিয়া এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ দেশে চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব। কুড়ি হাজার রোগীর জন্য এক জনের অধিক ডাক্তার নাই। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ডাকা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। দেশের অধিবাসীর সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প—সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বে-সরকারী বিদ্যালয়সমূহের সৃষ্টির পর চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িতেছিল।—'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।' একবারে চিকিৎসকের সম্পূর্ণ অভাব অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত চিকিৎসকও প্রার্থনীয়।—শুধু পল্লীগ্রামে নয়, সহরে ও মহকুমাতেও দরিদ্রের সংখ্যা অল্প নহে। চারি টাকা বা দুই টাকা 'দর্শনী' দিয়া ডাক্তার ডাকা আজকাল মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের পক্ষেও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।—'বাঙ্গালী'।

পুস্তক-পরিচয়

রামানুজ

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য একটাকা।]

রামানুজ একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক। নাটকখানি বিশেষ সমারোহে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবুর 'আহুতি' ও 'শুভদৃষ্টি' নামক দুই খানি নাটকের পরিচয় প্রদান উপলক্ষে আমরা বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি উচ্চতর কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্য হইবেন। আমাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, অপরেশ বাবুর 'রামানুজ' একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমূলক নাটক হইয়াছে। যে মহাপুরুষের পবিত্র জীবনচরিত এই নাটকের প্রাণ, তিনি ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের একজন অধিনায়ক; তাঁহার অলৌকিক পুণ্যকাহিনী নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া অপরেশ বাবু একটী পবিত্র কার্য্য করিয়াছেন। নাটকখানির রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। লক্ষ্মণের মাতৃষ্বসৃপুত্র গোবিন্দ নাটককারের অতি সুন্দর সৃষ্টি; এই গোবিন্দ একাই, মনে হয়, নাটকখানিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। লক্ষ্মণ বা রামানুজের কথা না বলিলেও চলে, তিনিই ত নাটকের প্রাণ। এক অন্ধ ভ্রাতাকে লইয়া একটী বালিকা রঙ্গমঞ্চে আসিয়া একটি গানেই একেবারে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার পর কার্পাসারাম ও লক্ষ্মী—দুইই দেবতা, দুইই স্বর্গের মানুষ। অপরেশ বাবুর এই নাটকখানি পড়িবার মত, দেখিবার মত, শিখিবার মত। এই প্রকার নাটকের সংখ্যা যত অধিক হইবে, ততই দেশের মঙ্গল, ততই সমাজের কল্যাণ।

সমাজ-চিত্র

[শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।]

আমরা এই সুন্দর পুস্তকখানির লেখককে সর্ব্বপ্রথমেই ধন্যবাদ করিতেছি, কারণ তিনি কবিতার বই না লিখিয়া, নবেল না লিখিয়া 'সমাজ-চিত্র' লিখিয়াছেন এবং বেশ পাকা মুন্সীর মত জোর-কলমে লিখিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর-একখানি পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলাম; তাহার নাম "গোবর গণেশের গবেষণা', এই 'সমাজ-চিত্র'ও সেই জাতীয়; ইহাতেও তেমন চাবুক চলিয়াছে, গ্রন্থকার তেমনই অসঙ্কোচে, স্পষ্ট বাক্যে আমাদের সমাজের কলঙ্ক সকল চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই লেখকের তেজস্বিনী, সুন্দর ভাষা পাঠ করিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়াছি, ভাষা বেশ তরতর করিয়া চলিয়াছে, কোন স্থানে একটুও অস্পষ্ট নাই, একটুও আবিলতা নাই; এক একস্থান পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবরবি পরলোকগত কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা পড়িতেছি; বর্ত্তমান সময়ের একজন লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিতে চাই।

বঙ্কিম-জীবনী

[শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত, মূল্য তিনটাকা।]

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী এখনও প্রকাশিত হইল না; কতদিনে হইবে, কে সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাহা কিছু জানা যাইতেছে না। এ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশবাবুর লিখিত জীবনী যে বাঙ্গালী পাঠকগণ আগ্রহসহকারে পাঠ করিবেন, তাহার আর কথা কি। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। শচীশবাবু অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন; প্রথম সংস্করণে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তথ্য এই সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-কথা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণ ও যে শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চয়ন

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য বারআনা।]

নামটী পড়িবামাত্রই মনে হইবে, ইহা হয় কবিতা পুস্তক, আর না হয় ছোটগল্প সংগ্রহ। কিন্তু 'চয়ন' তাহার কিছুই নহে, অথচ তাহার সবই ইহাতে আছে এবং আরও কিছু আছে। এখানি গদ্যে লিখিত অমূল্য উপদেশাবলী; আর সেই উপদেশগুলি সূত্রবদ্ধ নহে; পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা আলোক-বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া অসংখ্য পাপতাপক্লিষ্ট নরনারীর পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও পবিত্র জীবনের এক অংশ, কাহারও দুইটা কথা, কাহারও গল্পচ্ছলে উপদেশ—এই সকলই গদ্যে লিখিত পদ্যে এই 'চয়নে' স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাটক-নবেল ও বাজেবইপ্লাবিত দেশে মধ্যে-মধ্যে এই রকম সুন্দর, প্রাণস্পর্শী ও পবিত্রতা মাখান 'চয়নের' প্রয়োজন; এই জড়বাদের মধ্যে যিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব এমন সুকৌশলে, এমনই সুন্দরভাবে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন, তিনি সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ। উপেন্দ্রবাবু সেই ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

[প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মূল্য পাঁচ টাকা।]

'কালিকা যন্ত্রের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এমন সুন্দরভাবে কালিদাসের তেরখানি গ্রন্থের মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কালিদাসের গ্রন্থাবলীর যে সকল সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের হইতে একখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, অনুবাদ বেশ সরল এবং প্রাঞ্জল; যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারা এই গ্রন্থাবলীর অনুবাদ-অংশ পাঠ করিয়াই কালিদাসের অপূর্ব্ব প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইতে পারিবেন এবং মূল পাঠ করিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ জন্মিবে। পুস্তকের আয়তন হিসাবে পাঁচ টাকা মূল্য কমই হইয়াছে।

সঙ্গীত-চন্দ্রিকা

[বৰ্দ্ধমানাধিপতির গায়ক—সঙ্গীত নায়ক] শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; ইহা একখানি হিন্দু সঙ্গীতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে সঙ্গীতের অর্থ ও উৎপত্তি ইত্যাদি উপক্রমণিকাতে বিষদভাবে বিবৃত হইয়াছে। ১ম পরিচ্ছেদে স্বরের উৎপত্তি, সপ্তস্বঃ, সপ্তক, শ্রুতি গ্রাম ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাগরাগিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদির বিষয়; ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাল ও মাত্রাদির বিবরণ; এবং এইস্থানে তালের সহিত সংস্কৃত ছন্দের যাহা মিল দেখান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাম্বুরা লিখন হিন্দী ভাষার উচ্চারণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর স্বরসাধন প্রণালী এবং প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী কতকগুলি সহজ গীত আছে। এই সকল যেরূপ সহজ ভাবে লিখিত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় লোকে সহজেই সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারিবেন। দিবা প্রথম প্রহর হইতে ৪র্থ প্রহর পর্য্যন্ত যে সকল রাগের ধ্রুপদ স্বরলিপি আছে, তাহার ভাষা এবং যতদূর সূক্ষ্ম স্বরলিপি হইতে পারে তাহা হইয়াছে। গ্রন্থকারের পিতা বিষ্ণুপুরের একজন প্রধান গায়ক ছিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুপুরের সকল গায়কই স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য; গ্রন্থকারও তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইজন্য গানের পুঁজি বিস্তর। বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ্ মহতাব্ বাহাদুরের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত; মহারাজ বাহাদুর এই লুপ্ত বিদ্যার প্রতি সুদৃষ্টি রাখিয়া যে, এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থ মহারাজ বাহাদুরের সুন্দর ফটো দেওয়া হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় ভাগও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন প্রণীত সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'কনকচাঁপা' প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'রবিয়ানা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, মহাশয়েরও "রামানুজ" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচসিকা।

কবি রসময় লাহার রসের উৎস এবার "মণিমুক্তা" প্রসব করিয়াছে এবং তাহাও মাত্র আটআনা দক্ষিণায় বিতরিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ সম্প্রতি সম্রাটকে পর্য্যন্ত জাল করিয়াছেন। মাত্র বার আনা ব্যয় করিলে, সরোজ বাবুর ডিটেকটিভ উপন্যাস "জাল-সম্রাটে"র দর্শন-পুণ্য লাভ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ প্রণীত "কালনেমী" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "ছিন্নহার" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল প্রণীত "জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নূরজহানে'র হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ হইতেছে; শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের 'সীতা ও সরমা' প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বামড়ারাজ "স্যর বাসুদেব জীবনী" বাহির হইতেছে; মূল্য দুই টাকা।

চণ্ডীবাবুর নূতন সচিত্র সামাজিক উপন্যাস "অমরধাম" ১॥০ টাকা মূল্যেই প্রাপ্ত হইবেন।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "পারিবারিক প্রবন্ধে"র উপহার দিবার উপযোগী একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। তাঁহারা "সামাজিক প্রবন্ধে"রও একটী নূতন সংস্করণ হইয়াছে। ইহারও মূল্য দেড় টাকা। উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের হাফটোন চিত্র আছে।

প্রতিধ্বনি

চীনে বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসিয়ান ধর্ম্ম

দেবতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, পাপতত্ত্ব, পুণ্যতত্ত্ব, স্বর্গ-নরকতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা বর্ত্তমান জগতের কোথাও নাই। বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেই নব্য মানবের চরম বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, ব্রহ্ম ইত্যাদি জীব শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত। ইহাঁদের প্রভাবে কোন ব্যক্তির বা জাতির জীবন বিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয় না। ধর্ম্মচর্চ্চা গতানুগতিক ভাবে চলিয়া যাইতেছে। তবে য়ুরোপ-আমেরিকার জাতিগুলি জীবিত, এইজন্য উহাদের মন্দির গির্জ্জা ইত্যাদিতে সকল প্রকার জীবন্ত অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়ে। এশিয়ার জাতিপুঞ্জ নির্জ্জীব, কাজেই এখানকার মসজিদ মন্দির মঠে অনেক সময়ে ঘর ঝাড়িবার লোকও দেখা যায় না। এই যা প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশীয় জনগণের জীবন হয় পর্লিয়ামেণ্টে, না হয় বিজ্ঞান-মন্দিরে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই; অবনত এশিয়ার জীবন না দেব-মন্দিরে, না বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রকটিত। য়ুরোপ-আমেরিকায় মানব-জীবনের ধারা কোন-না-কোন কেন্দ্রে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু পরাধীন এশিয়ার মানব জীবনহীন অস্থিকঙ্কালসার নিস্পন্দ "ফসিল" মাত্র। এই জনপদের যেখানে-যেখানে খানিকটা চৈতন্য, কর্ম্মপ্রবণতা, বা উদ্দীপনা বা জাগরণ লক্ষ্য করি, সেখানে য়ুরোপ-আমেরিকারই খানিকটা ছায়া দেখিতে পাই মাত্র। স্বদেশী এশিয়ার কোথাও জীবন-বত্তা নাই। নব্য জাপান এই হিসাবে এশিয়ার বহির্ভূত।—'প্রবাসী'।

বিভিন্ন ভাষার অনুশীলন

সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম যে, কোন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন যে, জর্ম্মণির সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র হইতেছে—তাহার ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন। জর্ম্মাণেরা কেবল বিভিন্ন জাতির ভাষা বলিতে পারে না, বিভিন্ন জাতিকে তাহাদের নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা দিতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের জন্য যাহা সামরিক জাহাজ করিয়াছে, জর্ম্মণির পক্ষে সেই কার্য্য ভাষাতত্ত্বের দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছে, জর্ম্মাণ দালালকে দোভাষীর অপেক্ষা করিতে হয় না। জর্ম্মাণির বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাবিষয়ে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষিত হয় এবং যে ব্যক্তি যত ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, সে ব্যক্তি তদনুপাতে শিক্ষিত বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক সোপেনহোর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যত ভাষা জানে, সে ব্যক্তি ততগুণ মানুষ। ভাষাজ্ঞানের ফলে জর্ম্মণির অনেক সুবিধা হয় দেখিতে পাইয়া, ইংরাজজাতিও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী হইতেছেন। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ফলে বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে চিনিতে পারিবে এবং বিভিন্ন জাতি ঐক্যসাধনের পথে অগ্রসর হইবে। ইহা জগতের উন্নতিরই পরিপোষক।—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

কচুরীর কথা

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গে 'ওয়াটার হিয়সিন্থ' নামে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্ খাল-বিল তড়াগাদিতে অজস্র জন্মিয়া নৌকা ও ষ্টীমারের যাতায়াত-পথ রুদ্ধ করিতেছে। দেশীয় ভাষায় এই গাছ-গুলিকে 'কচুরি' বলে। এই গাছ ইতিপূর্ব্বে মার্কিণ রাজ্যের অন্তর্গত ফ্লোরিডা প্রদেশে, অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যে ও ইণ্ডো-চায়না অঞ্চলে বহুবিস্তৃত হইয়া সেখানকার বাণিজ্য-ব্যাপারে বিষম বাধা জন্মাইয়াছিল। পাছে বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দশা ঘটে, এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়াছেন। কিরূপে এই গাছগুলিকে কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের কর্ত্তারা অধুনা নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা রাসায়নিক বিশ্লেষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই কচুরি গাছের পত্র-পল্লব হইতে 'পটাস' বা ক্ষারজাতীয় সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। এ বৎসর ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে এই গাছ ক্ষেত্রের সাররূপে ব্যবহার করিয়া দেখা হইবে। এদিকে কিন্তু অনেকের ধারণা, কৃষিবিভাগের পরীক্ষা লাভজনক বিবেচিত হইলেও কৃষকেরা সহজে কর্ত্তৃপক্ষের মতানুবর্ত্তী হইবে না। তাহা-দিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া কাজে লাগাইতে অনেক দিন লাগিবে। ইতিমধ্যে ঐ গাছের বহর দিন দিন যেরূপ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে কিছুদিন পরে হয় ত উহার বৃদ্ধি দমন সাধ্যাতীত হইয়া পড়িবে। এখন উপায় কি?—'কৃষক'।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

Emerald Ptg. Work
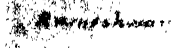
আশ্বিন, ১৩২৩।

াথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

আমন্ত্রণ

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

(১)

সন্তাপাকুল বঙ্গসন্ততিকুলস্বান্তানি সন্তোষয়ন্
বৃত্তোঽস্মিন্নভিভূয় সর্ব্বমশুভং ভূয়স্তবাবির্ভবঃ।
মাতঃ কাতরতাভিরাতুরতয়া ত্বস্মাসু দীনেষ্বপি
ত্বামভ্যর্থয়তে ধরা বরবপুঃ ফুল্লারবিন্দাননা ॥

তাপদগ্ধ বঙ্গবাসী সন্তানেরে মাতায়ে উল্লাসে,
বিনাশি' অশুভরাশি, আসিলে মা, পুন' এ আবাসে
কিন্তু মা এ দীন হীন সন্তানেরা নিতান্ত কাতর,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ি, তোমা' কি ভাবে মা, করিবে আদর!
তব অভ্যর্থনা-তরে তবু ওগো ত্রিলোক-ঈশ্বরি,
প্রফুল্ল কমল-মুখে সাজিয়াছে প্রকৃতি-সুন্দরী!

(২)

এহ্যেহি প্রতিদেহিগেহমসকৃৎ সৌখ্যেন সম্পূরয়
ত্বন্মাহাত্ম্যচয়ং তনুষ্ব ধরণৌ সর্ব্বত্র দুর্গে পুনঃ।
কারুণ্যামৃত ধারয়া ইতি মসৃণত্বন্নেত্রপাতৈর্মুহুঃ
সর্ব্বেষাং হৃদয়েষু শান্তিনিবহং দিষ্ট্যা প্রতিষ্ঠাপয় ॥

এস—এস, ওমা উমে, সন্তানের লহ আমন্ত্রণ;
অনাবিল প্রীতি-ভারে পূর্ণ কর প্রতি নিকেতন!
নাশি' পাষণ্ডের ভ্রম,—মোহাচ্ছন্ন ধরণী-মাঝার,
মা, তোমার সীমাশূন্য মহিমার কর গো বিস্তার!
করুণা-সুধার ধারে সিক্ত ওই নয়নে নেহারি',
তনয়ের তপ্ত হৃদিতলে ঢেলে দাও পুণ্য শান্তি-বারি।

(৩)

আম্নায়েষ্বতি ভীত ভীত ইব তে ব্রহ্মা যশো গীতবান্
শীর্ষেণাপি তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগস্পর্শে হরিঃ শঙ্কতে।
মাতস্ত্বং জনয়স্যহো কতি দিশামীশান্ দৃশোরিঙ্গিতৈ
র্মূঢ়ঃ প্রাকৃত মানুষঃ কথমিব ত্বাং স্তোতুমর্হাম্যহম্ ॥

'কি জানি হ'ল না বুঝি'—এই ভেবে ব্যাকুল হৃদয়ে,
চতুর্ব্বেদে গাহিয়াছে ব্রহ্মা তব গুণ ভয়ে ভয়ে!
তোমার কমল-পদ মস্তকেও করিতে ধারণ,
অয়ি বিশ্ব-প্রপূজিতে, শঙ্কা মনে করে নারায়ণ!
কত দিগীশ্বর তুমি সৃষ্টি কর অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
সামান্য মানব তব স্তুতি-গীতি পারে কি বর্ণিতে!

(৪)

দুর্গে শ্রীমদুদারপাদকমলদ্বন্দ্বেষু যাচামহে
ঘোরেঽস্মিন্ সময়ে ত্বয়া করুণয়া মাঙ্গল্যমিঙ্গীকুরু।
আস্মাকীন সমস্তভব্যমনিশং যস্যাস্তি হস্তে নৃপং
তং শ্রীপঞ্চমজর্জ্জমাশু বিজয়শ্রীভিঃ সমাশোভয় ॥

মাগো, তব পদযুগে যাচি মোরা হইয়া বিকল,
ঘোর এই দুঃসময়ে কৃপা করি' কর মা, মঙ্গল।
আমাদের শুভাশুভ নির্ভর করিছে যাঁর করে,
জয়শ্রীতে দীপ্ত করি দাও সেই ভারত-ঈশ্বরে!

———

চণ্ডী-উক্ত দেবাসুর-সংগ্রাম

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম-এ, বি-এল]

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

—চণ্ডী।

আমরা এক্ষণে চণ্ডী-উক্ত দেবাসুর-যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিব। কাল্পিক সৃষ্টির পর সমষ্টিভাবে দেবাসুর-যুদ্ধের দ্বারা যেরূপে জগতের পাশব বা তামসিক প্রকৃতি অভিভূত হইয়া রাজসিক প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, এবং রাজসিক প্রকৃতি হীনবল হইয়া যেরূপে সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিণতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কোন্ কাল্পিক সৃষ্টির পর কোন্ মন্বন্তরে কিরূপ দেবাসুর-যুদ্ধ হয়, আমাদের এই কল্পেই বা কোন্ মন্বন্তরে এই দেবাসুর-যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, কবে এ পৃথিবীতে আসুর শক্তি সংযত ও অভিভূত হওয়ায় মানুষের আবির্ভাবের সময় আসিয়াছিল, তাহা এস্থলে বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষের আবির্ভাবের পর কিরূপে প্রত্যেকের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে এই মহিষাসুর যুদ্ধ চলিতে থাকে, এবং তাহার পর মানুষের আরও বিকাশ হইলে তাহার মধ্যে কিরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ চলে, এবং সেই যুদ্ধ হইতে কিরূপে মানুষের ক্রম-বিকাশ হয়, তাহার ধর্ম্মের কিরূপে ক্রমোন্নতি হয়, এইবার তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে আমরা ইহার আভাষ পাইয়াছি। ইহারই বিস্তারিত বিবরণ চণ্ডী হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহাই চণ্ডীতে উক্ত মহিষাসুর-বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-বিবরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানুষের মধ্যে প্রথম দেবাসুর-যুদ্ধ—মহিষাসুর-যুদ্ধ। পুরাকালে, মানবের সৃষ্টি হইবার পরে—তদানীন্তন অসুরগণের অধিপতি মহিষের সহিত, দেবগণের অধিপতি পুরন্দরের বা ইন্দ্রের পূর্ণ একশত দেববৎসর ধরিয়া (অর্থাৎ প্রায় চারিলক্ষ মানুষী বৎসর ধরিয়া) যুদ্ধ হইয়াছিল। আধ্যাত্মিকভাবে এই যুদ্ধ মানুষের অন্তরেই চলিয়াছিল। জগৎ সৃষ্ট হইয়া বিশেষ পরিণত হইলে, দেবগণের অধিষ্ঠান জন্য স্রষ্টা প্রাণ-শক্তিবলে পৃথিবীতে মানুষীদেহ সংগঠিত করেন। তাহাতে মানুষীদেহ-গ্রহণের উপযুক্ত সংস্কারবিশিষ্ট জীবাত্মা প্রবেশ করেন; এবং সেই জীবাত্মার ক্রম-বিকাশের জন্য তাহাতে দেবগণ প্রবেশ করিলেন। দেবগণ দেখিলেন, তাঁহাদের প্রবেশের পূর্ব্বেই অসুরগণ মানুষদেহ অধিকার করিয়া আছে। তখন দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই মানুষের ইন্দ্রিয়-মনের নিয়ন্তা বা অধিপতি হইবার জন্য চেষ্টা করেন। কাজেই তখন সেই দেবগণ ও অসুরগণ মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তখন সবেমাত্র পশু বা তির্য্যক-সৃষ্টি শেষ হইয়া মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং তখন মানুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পশুভাবাপন্ন। তখন তাহার উপর তামসিক অসুরগণের পূর্ণ আধিপত্য; কাজেই তখন দেবগণ তাহাদের সহিত-যুদ্ধে পরাজিত হন। এই পরাজয়-ফলে, মানুষের মধ্যে যাহা স্বর্গরাজ্য—যাহা তাহার শুদ্ধ সাত্ত্বিক মনের রাজ্য—অসুরগণ অধিকার করিয়া লয়। কাজেই তখন তাহার মন তমো-অভিভূত হয়, তাহার বিকাশ হইতে পারে না। দেবগণ সেখান হইতে তাড়িত হইয়া, তখন মানুষের ইন্দ্রিয়-গণ মধ্যে আশ্রয় লইয়া, তাহাদিগের সেই মনোরূপ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত অসুরগণের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন; এবং সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে উপযুক্ত-রূপে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন। ইহাই দেবগণের মরণ-শীল জীবের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ।

তখন অসুরগণ মনকে মলিন কামনা-যুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছে। এই অসুরের অধিপতি স্বয়ং মহিষ। মহিষ পশু। মহিষের মোহাত্মক একগুঁয়ে প্রকৃতি প্রসিদ্ধ, মহিষে পাশবত্বের পূর্ণ বিকাশ। এজন্য মহিষ এই অসুরগণের রাজা। এই মোহযুক্ত এক-গুঁয়েভাবে সেই জন্য তখন আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ও অভিভূত

হয়। কাজেই তখন আমাদের চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য আমাদের চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে এবং বুদ্ধিকে প্রণোদিত করিতে পারেন না; ইন্দ্রদেব সমষ্টিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিতে পারেন না; বায়ু আর আমাদের প্রাণ-বৃত্তিকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত করিতে পারেন না; অগ্নি আর আমাদের বাগিন্দ্রিয়ের উপযুক্ত নিয়ন্তা হন না; ও আমাদের অভ্যুদয়কারক ত্যাগাত্মক যজ্ঞ-কর্ম্মের পুরোহিত বা হোতা হইতে পারেন না; চন্দ্র আর আমাদের মনের অধিপতি থাকেন না; তখন আর কোন অধি-দেবগণই আমাদের অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয়দিগের সম্পূর্ণ নিয়ন্তা হইতে পারেন না। তখন এই অসুরগণের আধিপত্যে আমাদের মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মোহযুক্ত, অপ্রকাশশীল, অস্পষ্ট থাকে। এই মোহযুক্ত প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের যজ্ঞাদি কিরূপ, তাহা গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার তমসাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়গণ অভিভূত অবস্থায় থাকে বলিয়াই, তখন আর দেবগণ তাহাদের নিয়মিত করিতে পারেন না; তাহাদিগকে বিকাশের দিকে, সুখানুভূতির দিকে, নির্ম্মলতার দিকে লইয়া যাইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা তথাপি এই ইন্দ্রিয়গণকে অসুরের অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন।

এই চেষ্টা হইতেই প্রথম দেবাসুর-যুদ্ধ বা মহিষাসুর-যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবতাগণের স্থান আমাদের অন্তরস্থ মনো-রাজ্যে। তাহাই তাঁহাদের স্বর্গরাজ্য। তাঁহারা যতক্ষণ এই স্বর্গ-রাজ্যের অধিপতি থাকেন, ততক্ষণ মন শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, নির্ম্মল, প্রকাশশীল থাকে। তখন আমাদের মনোবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত—শাস্ত্রোদ্ভাসিত থাকে। কিন্তু যখন দেবগণকে পরাজয় করিয়া অসুরগণ এই স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন, দেবগণ যখন স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া যান, তখন দেবগণ আমাদের মনকে পাপ বা মলাযুক্ত করেন। তখন অশুদ্ধ ও পাপযুক্ত কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অশাস্ত্র-পথে গিয়া মন কলুষিত হয়। বলিয়াছি ত, আমাদের প্রকৃতি যখন তামসিক থাকে, তখন তামসিক অসুর-চালিত হইয়া আমাদের মন তমোযুক্ত হয়—মোহযুক্ত হয়,—জঘন্য কামবৃত্তি প্রবল হয়। আর যখন মন রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত থাকে, তখন তাহা চঞ্চল, অস্থির, অবিবেক-যুক্ত, বিষয়-মলায় মলিন থাকে। আমাদের মন ইন্দ্রিয়-গণের রাজা। মন যখন যে ইন্দ্রিয়কে যে পথে চালিত করে, সে ইন্দ্রিয় তখন সেই পথে চালিত হয়। চক্ষু-গোলকে কোন বাহ্যবস্তুর ছাপ পড়িলেও, যদি মন তখন তাহা গ্রহণ করিতে না আসে, দেবগণ যদি মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মনকে সেই ইন্দ্রিয়াভিমুখে পরিচালিত না করেন, তবে আর আমরা সে বস্তু দেখিতে পাই না। অন্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা। জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, মন যদি ইন্দ্রিয়কে চালিত না করে, দেবগণ যদি তাহাতে তাহার সহায় না হন, তবে মন বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। দেবগণ মনের অধিপতি থাকিলে বা স্বর্গরাজ্যের রাজা থাকিলে, তাঁহারা মনকে কেবল শাস্ত্রানুসারে গ্রহণীয় বিষয়ের দিকে চালিত করেন; আর অসুরগণ মনের বা স্বর্গরাজ্যের অধিপতি থাকিলে, তাঁহারা মনকে অশাস্ত্রীয় বিষয় গ্রহণে চালিত করেন। তাঁহাদের পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গণও অগ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া মনকে উপহার দেয় এবং মন তাহা গ্রহণ করে। দেবগণ তাহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন; এ জন্য দেবাসুর-যুদ্ধ হয়। এই মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা বা পরিচালক বলিয়া মনকেও একাদশ ইন্দ্রিয় বলে। এই মন ও ইন্দ্রিয়-রাজ্যের অধিকার লইয়াই দেবগণের সহিত অসুরগণের সংগ্রাম হয়। আমাদের অন্তরে নিয়ত এ সংগ্রাম চলিতে থাকে। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক দেবাসুর-যুদ্ধ—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

বলিয়াছি ত, মানুষ প্রথমে তামসিক প্রকৃতিযুক্ত থাকে। প্রথমে তামসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা অসুরগণ দেবগণকে পরাভূত করিয়া মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিয়ন্তা হন। এই তামসিক অসুরগণের অধিপতি মহিষ। সুতরাং তখন মহিষের ন্যায় পাশববৃত্তির দ্বারা আমাদের মন অভিভূত থাকে। দেবতাগণ তাহাদিগকে সে অধিকার-চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াও পরাভূত হন। তখন তাঁহারা মুখ্য প্রাণশক্তি, বা পদ্মযোনি হিরণ্যগর্ভ, বা ব্রহ্মার নিকট গিয়া এই অসুরদের জয় করিয়া দিতে বলেন। মুখ্য প্রাণ তখন উদ্গীথ উপাসনা করেন। অথবা চণ্ডীর কথায়, ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া, যেখানে ঈশ্বর ও বিষ্ণু অবস্থিত, সেখানে গমন করেন। ভগবান বিষ্ণু আমাদের অন্তর্য্যামী। তিনি হৃষীকেশ—আমাদের ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর।

তিনি সমষ্টি সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আর ঈশ্বর—দেবাদিদেব মহাদেব—পরমপুরুষ,—তিনিও আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (গীতা ১৮।৬১)

আমাদের এই অধ্যাত্ম পরম দেবগণের নিকট গিয়া মুখ্য প্রাণপ্রমুখ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণ তাঁহাদের নিকট এই অসুর কর্ত্তৃক অভিভবের বিবরণ নিবেদন করেন এবং তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। চণ্ডীতে এই মহিষাসুর-যুদ্ধ-বিবরণ এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে,—

"পুরাকালে পূর্ণ বর্ষ শত মহাযুদ্ধ হয় দেবাসুরে,
মহিষ অসুর অধীশ্বর সহ সুররাজ পুরন্দরে।
সে রণে অসুর বীর্য্যবান পরাজয় করে দেববল,
হল ইন্দ্র মহিষ-অসুর জিনি সব অমরের দল।
অগ্রে করি ব্রহ্মা প্রজাপতি তবে পরাজিত দেবগণ,
করিলা গমন সেই স্থানে যেথা হর গরুড়বাহন।
অমরের মহা পরাভব মহিষ-অসুর আচরণ
যেইরূপ বাখান সকল কহিলা তাঁদের দেবগণ।
সূর্য্য চন্দ্র যম পুরন্দর বরুণ পবন হুতাশন
আর সব দেব অধিকার, সে অসুর করেছে গ্রহণ।
সে দুরাত্মা অসুরের বলে, স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবগণ
যত সব মর্ত্ত্যবাসী সম ভূমণ্ডলে করে বিচরণ।
কহিনু এ তোমা দুজনায় সুর-অরি কার্য্য সমুদায়,
মোরা তব লইনু শরণ কর চিন্তা তার বধোপায়।"

দেবগণের এই বাক্য শুনিয়া, যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে মধু-দৈত্য বা অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, আর যিনি শম্ভু অথবা আলোচনাপূর্ব্বক (শম্=আলোচনা) এই সৃষ্টি-বিকাশ করিয়াছিলেন, সেই আমাদের অন্তরাধিষ্ঠিত ঈশ্বর,—তাঁহাদের কোপ হইল। এই কোপ অসুরশক্তি অভিভূত করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প-মাত্র। তাহাতে তাঁহাদের শরীর হইতে মহৎ তেজঃ নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রকৃতিই ব্রহ্মের শরীর। এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই সমষ্টিভাবে বা ব্যষ্টিভাবে অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মার শরীর (বৃঃ আঃ ৩।৭) "যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" বৃঃ আঃ ৩।৭।১৫)। চণ্ডীতে দেবীর আবির্ভাব-বিবরণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"অতঃপর পূর্ণ মহাকোপে, চক্রধর ব্রহ্মা ধূর্জ্জটীর
বদনমণ্ডল হতে তবে মহাতেজ হইল বাহির।
ইন্দ্র আদি অন্য দেবতার দেহ হতে হইয়া নিঃসৃত,
দীপ্ত তেজঃপুঞ্জ সুমহৎ তা' সহিত হইল মিলিত।
* * *
তবে সর্ব্ব দেবদেহজাত সেই তেজঃপুঞ্জ নিরুপম
মিলি—পরিণত নারীরূপে রূপালোকে ব্যাপি ত্রিভুবন।"

এক এক দেবতার নিঃসৃত তেজ হইতে সেই দেবীর এক এক অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন সর্ব্বদেব-শক্তি-সমুদ্ভূত দেবীকে দেবগণ নিজ নিজ প্রেষণ ও অস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। এই দেবীই মহালক্ষ্মী, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপা, নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্তি, আত্মশক্তি দ্বারা এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত। তিনিই দেবী অম্বিকা ও তিনিই চণ্ডী; তিনিই শ্রী, লক্ষ্মী, বুদ্ধি, মেধা শ্রদ্ধা, লজ্জা,—সমস্ত জগতের হেতু, এই অখিল জগতের আশ্রয়; তিনি আদ্যা, অব্যাকৃতা, পরমা প্রকৃতি। তিনিই অন্তরূপে শব্দাত্মিকা, মন্ত্রাত্মিকা, ভগবতী পরমা বিদ্যা; তিনিই গৌরী, উমা, দুর্গা। চণ্ডীর গুপ্তবতী-রহস্য টীকায় আছে—

"মধ্যমং চরিতস্য বিষ্ণুঋষির্মহালক্ষ্মীর্দ্দেবতা উষ্ণিষ ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তিঃ দুর্গাবীজং বায়ুস্তত্ত্বং যজুর্ব্বেদস্বরূপ মহালক্ষ্মীঃ।"

এই মহালক্ষ্মীই জগতের স্থিতিকারিণী—তিনি সর্ব্বদেবের একীভূত শক্তি। অথবা তিনিই সকলেরই শক্তি—দেবগণের শক্তি তাঁহারই। দেবগণের মহৎ বল একই—ইহা শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "মহৎ দেবানাং অসুরত্ব একম্।" (ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত মধ্যে ২২ ঋকের প্রত্যেকের শেষে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।)

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, আমরা আমাদের নিজের চেষ্টায়, আমাদের তামসিক প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া রাজসিক বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ করিতে পারি না। আমাদের মধ্যে যে অসুরগণ আমাদের এই তামসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করে, তাহারা বড় বলবান। আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত অধি-দেবতাগণও তাহাদিগকে কেবল নিজ শক্তিতে পরাভূত

করিতে পারেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হৃষীকেশ এবং আমাদের হৃদয়াধিষ্ঠিত স্বয়ং ঈশ্বর এই অধিদেবগণকে অনুগ্রহ না করেন, যতক্ষণ তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি দিয়া দেবগণকে সাহায্য না করেন, ততক্ষণ দেবগণও সে অসুরদের জয় করিতে পারেন না ; আমাদের তামসিক প্রকৃতিকে অভিভূত করিয়া আমাদের উচ্চতর প্রকৃতির বিকাশ করিতে পারেন না।

যাহা হউক, এই দেবীর আবির্ভাব হইলে, মহিষাসুর এবং তাহার সেনাপতিগণ দেবীর প্রতি যুদ্ধার্থে ধাবিত হইল। তখন সে মহাদেবীর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সে সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর। কতদিন ধরিয়া, কত জন্ম ধরিয়া, কত যুগ ধরিয়া তাহা চলিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে! কতদিন ধরিয়া এই সংগ্রাম হইলে তবে আমাদের আসুরী প্রকৃতি অভিভূত হইয়া আমাদের উন্নত রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ হইতে পারে, তাহা কে বলিবে! এই মহিষাসুরের সেনা অসংখ্য—তাহার সেনাপতিগণও বিশেষ বলবান। পূর্ব্বে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি ত, মহিষ স্বয়ং পশু-প্রকৃতির —ঘোর তামসিক ভাবের বোধ হয় পূর্ণ আদর্শ। তাই সে এই অসুরগণের রাজা। তাহার সেনাপতিগণও আমাদের বিভিন্ন পাশব প্রকৃতি—বা তাহাদের নিয়ন্তা। তাহাদের নামই ইহার পরিচায়ক। চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোম, বাস্কল, বিড়াল, প্রভৃতিই মহিষের সেনানী। আর প্রত্যেকের সৈন্যও অসংখ্য। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন। সামান্যভাবেমাত্র—তাহাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি—এই তিন-রূপে বিভাগ করা যায়। এই তামসিক প্রকৃতি অসংখ্যরূপ। সাধারণতঃ, তাহার মধ্যে এক-একরূপ পশুভাবের প্রাধান্য থাকে। কেহ বিড়াল-প্রকৃতিপ্রধান, কেহ শৃগাল-প্রকৃতিপ্রধান, কেহ কুক্কুর-প্রকৃতিপ্রধান ইত্যাদি। আবার এই বিড়ালপ্রকৃতিরও ভেদ অসংখ্য। তেমনই বিভিন্নভাবে শৃগাল, কুক্কুর, গর্দ্দভ, ছাগ প্রভৃতি প্রকৃতিও অসংখ্য প্রকার। এই জন্য মহিষাসুরের সেনাপতিগণের প্রত্যেকের সেনাও একরূপ অনন্ত। সেই মহাদেবী একে-একে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সসৈন্যে নিহত করেন। দেবী একা, কেবল পশুরাজ সিংহ তাঁহার বাহন। তিনি শ্রেষ্ঠ পাশবশক্তির সহায়ে, সমুদায় নিম্নতর পাশব বৃত্তিকে পরাভূত করেন। আর

রণে রণরঙ্গিনী অম্বিকা যেই শ্বাস করেন মোচন,
সদ্য শত সহস্র প্রমথে পরিণত সে শ্বাস তখন।*

অর্থাৎ তাঁহার প্রতি উদ্যমে, নব-নব শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে; এবং তাহারাই দেবীর সে ঘোর যুদ্ধের সহায়। প্রাণশক্তিবলেই দেবী মানুষদেহ মধ্যে এই যুদ্ধ করিয়া এই তামসিক পাশব প্রকৃতিকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে আমাদের তামসিক প্রকৃতি ক্রমে-ক্রমে উন্নত ও রাজসিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মহিষের একগুঁয়ে মোহযুক্ত স্বভাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মহিষ-প্রকৃতি, কখন সিংহপ্রকৃতি, কখন মহাগজপ্রকৃতি, কখন খড়্গপাণি অসভ্য পুরুষপ্রকৃতি, কখন অর্দ্ধমহিষ-অর্দ্ধপুরুষ-প্রকৃতিতে পরিণত হইতে থাকে। যখন এই পাশব প্রকৃতি অভিভূত হয়, তখন তাহা হইতে তমোপ্রধান রাজসিক প্রকৃতি, কখনও প্রধানতঃ রাজসিক প্রকৃতি বিকাশিত হয়। এইরূপে আমাদের পাশব প্রকৃতি দেবীবলে অভিভূত হইতে থাকে। মানুষ যখন তামসিক প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া রাজসিক-তামসিক প্রকৃতি ও পরে রাজসিক-প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া রাজসিক-সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হইতে পারে, তখনই মহিষাসুরের বিনাশ হয়। তখনই আমরা পাশব প্রকৃতিকে প্রকৃতরূপে ত্যাগ করিতে পারি।

এই মহিষাসুর-যুদ্ধ প্রধানতঃ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মানুষের মধ্যে, অথবা অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজ মধ্যে হইয়া থাকে। সে মানুষে বা সে সমাজে শাস্ত্রজ্ঞান বড় বিকাশিত থাকে না। তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গণ মোহ বা অভিভূত ভাব ত্যাগ করিয়া প্রকাশশীল হইতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ তখন দেবগণ কেবল মন ও ইন্দ্রিয়গণকে মোহ ও কামাভিভূত অবস্থায় বিষয় উপযুক্তরূপে গ্রহণ করিবার অশক্তি বা অপটুতা হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; অজ্ঞান ও অধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিকাশ করিতে চেষ্টা করেন। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও মনের বিশেষ বিকাশ না হয়, ততক্ষণ তাহারা শাস্ত্রোদ্ভাসিত হইতে পারে না।

---

* এই অনুবাদ পরম কল্যাণাস্পদ শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রকাশিত বাঙ্গালা চণ্ডী হইতে গৃহীত হইল।

পূর্ব্বলিখিত শ্রুতিতে যে দেবাসুর-সংগ্রামের উপদেশ আছে, তাহা সাধারণভাবে ধরিলে মহিষাসুর-যুদ্ধ তাহার অন্তর্গত হইলেও, বিশেষভাবে তাহা শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভমধ্যে প্রভেদ এই যে, মহিষাসুরপ্রমুখ অসুরগণ পাশব-প্রকৃতি—আমাদের তামসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা; আর শুম্ভ-নিশুম্ভপ্রমুখ অসুরগণ আমাদের রাজসিক প্রকৃতির নিয়ন্তা—রাক্ষস-স্বভাব। মহিষাসুরগণ আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে মোহযুক্ত, জড়স্বভাব, উদ্যমহীন ও কামচালিত করে। শুম্ভ-নিশুম্ভের দল আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে চঞ্চল, ক্ষিপ্ত, অস্থির করে; অব্যবসায়ী, কামক্রোধাদির বশীভূত, দুঃখসংযুক্ত করে। ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই কারণে বলিতে হয় যে, শ্রুতি-উক্ত দেবাসুর-যুদ্ধ প্রধানতঃ শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। উন্নত মানুষের মধ্যে ও উন্নত সমাজের মধ্যেই এ যুদ্ধ সম্ভব হয়। যে সমাজ উন্নত হইয়া শাস্ত্র লাভ করিয়াছে, বেদ লাভ করিয়াছে,—যে মানুষ সেই সমাজের অন্তর্গত হইয়া, সেই শাস্ত্র জানিয়া, সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে চেষ্টাযুক্ত হইয়াছে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছে—তাহার মধ্যেই এই শ্রুতি-উক্ত দেবাসুর-যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই দেবাসুর-যুদ্ধ তামসিক প্রকৃতিযুক্ত, রাজসিক-তামসিক প্রকৃতিযুক্ত, রাজসিক-প্রকৃতিযুক্ত, এমন কি রাজসিক-সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত মনুষ্য-প্রধান সমাজ মধ্যে বড় সম্ভব নহে। কেবল যে সমাজ সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোকপ্রধান, যে সমাজ বিশেষ উন্নত ও শাস্ত্রজ্ঞান-চালিত, কেবল সেই সমাজের মধ্যেই এই দেবাসুর-যুদ্ধ সম্ভব হয়। সেই সমাজেই দেবগণ সাত্বিক মানুষের মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে শাস্ত্রোদ্ভাষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাভাবিক তামসিক ও রাজসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাহাতে বিশেষ বাধা জন্মায়। সেই বাধা দূর করিবার জন্য, মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া উদ্গীথ উপাসনা (অথবা প্রাণ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বা ওঁকার উপাসনা) করিতে যত্ন করেন, যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন, উদ্গাত্র কর্ম্ম বা স্বাধ্যায়ে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু উল্লিখিত বৃহদারণ্যকের উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাদের সে কর্ম্ম স্বার্থাভিনিবেশ-রূপ ছিদ্রযুক্ত ছিল। তাঁহারা কামনাযুক্ত হইয়া স্বর্গ বা অভ্যুদয় কামনা করিয়া এই যজ্ঞ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের এই সব কর্ম্ম সকাম হওয়ায়, অসুরগণ এই ছিদ্র দিয়া সেই স্বর্গকামী যজ্ঞাদি-কর্ম্মকারীর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের পাপযুক্ত করিয়া দিল। সুতরাং এই কর্ম্মের ফল যজমানরূপ দেবতাদের লাভ হইলেও স্বার্থ-ছিদ্রহেতু তাহারা পাপযুক্ত হইয়াছিল। সেই পাপযুক্ত হইয়া বাক্য "অসভ্য বীভৎস অনৃতাদি অনিচ্ছন্নপি বদতি" (ভাষ্য)। এইরূপে ঘ্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও মন—সকলে এই যজ্ঞ ও উদ্গাত্র কর্ম্মদ্বারা শোভন বা কল্যাণ-যুক্ত হইলেও, এই স্বার্থছিদ্রহেতু, এই ফলাকাঙ্ক্ষা জন্য অসুরগণ কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অসুরগণ সুতরাং প্রধানতঃ শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর।

এই অসুরদের জয় করিবার জন্য—বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়কে অপাপবিদ্ধ করিবার জন্য—দেবগণ মুখ্য প্রাণের (হিরণ্য-গর্ভের অথবা তাঁহার মহালক্ষ্মী শক্তির) শরণ লইয়াছিলেন; এবং তাঁহাকেই উৎগানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্গান 'আসঙ্গ' বা আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত। এ জন্য অসুরগণ চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিতে পারে নাই। সকল দেবতা-অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণই তখন পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। (বৃঃ আঃ ১৩,৭) বিশ্ববেতা নানাগতয়ো বিনেশুঃ (ভাষ্য)। অর্থাৎ নানা কুৎ-সিৎ যোনিতে গতিহেতু যে পূর্ব্ব-সংস্কারজ পাপ, তাহা তখন বিনষ্ট হয়। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে আমাদের পাপ বা অসুরত্ব নষ্ট হইয়া আমাদের দেবত্ব সংস্থাপিত হয়—শেষে মুক্তি হয়। এ তত্ত্ব এস্থলে আমাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব এই শ্রুতি-উক্ত দেবাসুর-যুদ্ধই প্রকৃত শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত দেবগণের যুদ্ধ। আমরা এক্ষণে চণ্ডী হইতে এই মহিষাসুর-যুদ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, সেই পরমা ব্রহ্মশক্তি দেবী ভগবতী গৌরীদেহা হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর বিনাশ করিয়া-ছিলেন। গৌরীদেহ—মূল লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপা প্রকৃতির শুক্ল বা সাত্বিক রূপ। এই গৌরীদেহ শুদ্ধ সাত্বিক পরা-বিদ্যারূপিণী। ইনিই সাক্ষাৎ মহাসরস্বতী।

"গৌরী দেহাৎ সমুৎপন্না যা সত্বৈক গুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুর নিসূদনী।"

ইতি জামলতন্ত্রে বৈকৃতিক রহস্য

ইনিই ব্রহ্মের জ্ঞান, চিৎ বা সম্বিৎরূপিণী পরাশক্তি। চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকায় আছে,

উত্তরচরিতস্য রুদ্র ঋষির্ম্মহাসরস্বতী দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো ভীমাশক্তির্ভ্রামরী বীজং সূর্য্যস্তত্ত্বং সামবেদস্বরূপম্ ..।"

এই পরাবিদ্যাকে লাভ করিতে গিয়া আমাদের শেষ অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিহত হইয়াছিল। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর মদবলযুক্ত। "মদ-অনুচিত আহরণের হেতু; ধনমদ বিদ্যামদ প্রভৃতি মদ বহুবিধ। বল সৈন্য বা শারীর তপঃ-প্রসূত (শিবদত্ত বররূপা) শক্তি।" (গুপ্তবতী টীকা)। শুম্ভের ধাতুগত অর্থ দীপ্তিযুক্ত। আধ্যাত্মিকভাবে, শুম্ভ—আমাদের অহঙ্কারের রাজসিক ভাব; আর নিশুম্ভ—অভিমান (self)। শুম্ভ আমাদের আমিত্বভাব, আর নিশুম্ভ আমাদের মমত্বভাব। চণ্ডী অনুসারে অহংত্ব আর মমতাই মূল অজ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের দেবাসুর-সংগ্রাম-বিবরণ হইতে দেখিয়াছি যে, দেবগণ যখন অসুর জয় করিবার জন্য বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গণের নিয়ন্তাদের যজ্ঞ ও উদ্গীথ উপাসনা করিতে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহাদের স্বার্থ ও ফলাকাঙ্ক্ষাজন্য অভিমান ও অহঙ্কার উপস্থিত হয়। তখন সেই অভিমান ও অহঙ্কার-রূপ অসুর সেই ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয়। যজ্ঞার্থ যাহা ত্যাগ করা হয়—ফলকামনা দ্বারা এক অর্থে তাহাই পুনঃ গৃহীত হয়। তাহার মূল্যস্বরূপ স্বর্গে বা ইহকালে সুখ ও অভ্যুদয়ের প্রাপ্তিজন্য ইচ্ছা হয়;—ইহাই আমাদের আসুরী প্রকৃতির সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ। আমরা এক-ভাবে যাহা ত্যাগ করিতে যাই—অন্যভাবে তাহাই গ্রহণের ইচ্ছা করি। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা অহঙ্কার ও অভিমানবশে মদ, ও বলের আশ্রয়ে, এইরূপে যে যজ্ঞফল কামনা করি, ইহাতেই আমাদের অন্ত-রস্থ মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির নিয়ন্তা দেবগণ পরাজিত হন। আর এই অহঙ্কার ও অভিমানরূপী অসুর আমাদিগকে অধিকার করে। তাহারা এইরূপে আমাদের মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অধিকার করিয়া সূর্য্যাদি দেবগণের পরিবর্ত্তে—তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া, আমাদের বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়। তখন আমাদের এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম-জন্য গর্ব্ব বা অভিমান হয়; আমরা পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ,জ্ঞানী—এইরূপ অভিমান হয়। আমাদের কথায়, কার্য্যে, ইন্দ্রিয়-কর্ম্মে—সর্ব্বত্র এই গর্ব্ব, অভিমান বা অহঙ্কার প্রকাশিত হয়। তখন আমাদের এই অধিদেবগণ তিরস্কৃত ভ্রষ্টরাজ্য হন,—

"ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যা পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।"

তখন দেবগণ মুখ্য প্রাণের নিকট গিয়া নিজেদের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করেন। আমাদের অন্তরস্থ মুখ্য প্রাণ তখন নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কামভাবে উদ্গীথ উপাসনা করেন,—সেই প্রণবরূপা মহাদেবী ভগবতীর স্মরণ ও স্তব করেন।

আমরা পূর্ব্বে কেনোপনিষদ হইতে দেখিয়াছি যে, অসুরগণকে জয় করিয়া দেবগণের গর্ব্ব হইয়াছিল। তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন যে, তাঁহারাই অসুরজয় করিয়াছেন। এই অভিমান-গর্ব্বই তাঁহাদের অন্তরস্থ এই শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর। দেবগণ প্রথম মুখ্য প্রাণের সহায়ে যে অসুরজয় করিয়া আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি দিয়া, আমাদের বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শাস্ত্রোদ্ভাষিত করিয়া, আমাদিগকে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, সেই কর্ম্ম হইতেই এই অহঙ্কারের, অভিমানের আবির্ভাব—সেই কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিযুক্ত বলিয়া, স্বার্থযুক্ত (selfish) বলিয়া—এই শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরের দ্বারা তাঁহাদের পরাভব হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে যখন তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, তখন মুহূর্ত্ত জন্য তাঁহাদের অন্তরে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াও, তাঁহাদের চিত্ত এই অহঙ্কার-আবরণযুক্ত থাকায়, আবার তখনই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্ত্তের দর্শনেই তাঁহাদের গর্ব্ব ও অভিমান খর্ব্ব হইয়াছিল। তখন দেবগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ জানিবার জন্য, তত্ত্বদর্শী হইবার জন্য, আরও ব্যাকুল হন। কিন্তু এই অভিমান ও অহঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্নজন্য তাহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহাদের হৃদয়াকাশে পরম শোভমানা হৈমবতী উমার আবির্ভাব হয়—তিনি তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান দেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উপাখ্যানে এই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা লাভের তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা এই মহাসরস্বতী দেবীর প্রসাদে এই পরাবিদ্যা লাভ করিতে পারি। ইনিই বাক্। হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া যে নামরূপময় জগৎ সৃষ্টি করেন,

তাহার মূল এই বাক্—এই শব্দ। শব্দ ব্যতীত জাতি-কল্পনা সম্ভব হয় না, ইহা দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাবনা, প্রত্যেক কল্পনার মূল এই শব্দময়ী বাক্। ইনিই শব্দব্রহ্ম; ইঁহা হইতেই মূলতঃ এই বিশ্বের বিকাশ হয়। ইনিই অনাদি মায়াশক্তি, মূল প্রকৃতি, ব্রহ্মের চিন্ময়ী শক্তি, জগন্ময়ী মা। জগত এই মূলবাকের (word বা sophia বা Logos) বিস্তার মাত্র। আর এই মূল বাক্ প্রণবরূপিণীদেবী সাবিত্রী, ইনিই গায়ত্রী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম স্রষ্টা বা হিরণ্যগর্ভরূপে বাক্যের দ্বারা এই সমুদায় সৃজন করিয়াছিলেন। "স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্ব্বং অসৃজৎ কিঞ্চ ঋগে যজুংসি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্...।" (বৃঃ আঃ ১।২।৫)। এই মহাবিদ্যার বা পরাবিদ্যার আরাধনা করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, তবে তাঁহার প্রসাদে আমাদের মুক্তি হয়।

যা মুক্তিহেতু রবিচিন্ত্যা মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্ত সমস্ত দোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥

চণ্ডী, ৪।৯

এই জন্য দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর জয় করিবার জন্য এই মহাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আমরা কেনোপনিষদ হইতে জানিয়াছি যে, এই দেবী বহু শোভমানা হৈমবতী উমা। শ্রুতির সেই হৈমবতী বা হেমাভবরণী তপ্তকাঞ্চন-জ্যোতিরূপিণী উমা, চণ্ডীতে গিরিরাজ হিমালয়-নন্দিনীরূপে আখ্যাতা। দেবগণ প্রথমে সেই দেবীর হিমালয়গৃহে অবতীর্ণ। শরীরি (বা সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানিনী) উমা রূপের আরাধনা করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবে হিমালয় আমাদের সহস্রারে অধিষ্ঠিত, সেই স্থানেই দেবীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ এই শরীরের অতিরিক্ত। তাহা শরীরকোষ বা অধ্যাত্মকোষ মধ্যে আবদ্ধ নহে। তিনি স্বরূপে আমাদের আনন্দময় কোষেরও বাহিরে অবস্থিতা। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।" (মুণ্ডক ২।২।৯) সুতরাং আমাদের শরীর অভিমান—আমাদের সমুদায় অভিমান দূর না হইলে, আমরা এই ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাদেবীর দর্শন লাভ করিতে পারি না। অভিমান আমাদিগকে ক্ষুদ্র করে, শরীরী করে, সীমাবদ্ধ করে। অভিমান, অহঙ্কার দূর না হইলে, আমাদের বিরাট পরিণতি হয় না, আমরা সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা হইতে পারি না। এজন্য শাস্ত্রে আমাদের অশরীরি হইবার উপদেশ আছে। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া প্রিয়ে স্পৃশতঃ। (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮।১২।১)। এইজন্য এই পরাবিদ্যারূপিণী দেবী উমা শরীরকোষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া দেবগণকে দর্শন দিয়াছিলেন।* তাই তাহার এক নাম কৌষিকী। আর তিনি যে শরীর ত্যাগ করিয়া আবির্ভূতা হন, সেই শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কালিকা। তিনি তামসিক গুণপ্রধান বলিয়া তাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ।

সেই পরমাদেবী ভগবতী দেবগণকে অনুগ্রহার্থে, তাহাদিগকে এই শুম্ভ-নিশুম্ভের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত করিবার জন্য, অথবা সেই দেবতাধিষ্ঠিত উন্নত প্রকৃতিরূপে যুক্ত মানুষকে, এই অভিমান ও অহঙ্কার এবং তাহাদের সহকারী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য এবং তাহাদের মূলবীজ বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানলাভের দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য, অতি শোভমানা পরাবিদ্যারূপে সেই অসুরগণকে দেখা দিলেন। প্রথমে চণ্ডমুণ্ড অসুর—পরংরূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরাং অম্বিকা দেবীকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহারা তাঁহার সেই অতি আশ্চর্য্য রূপে মোহিত হইল। বিদ্যার এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব—এমনই মোহিনী আকর্ষণী শক্তি! যখন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি বৃত্তিকে বা হ্লাদিনী বৃত্তিকে জাগাইয়া দিয়া এই পরাবিদ্যা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হন, তখন আমাদের প্রকৃতি এইরূপ অহঙ্কার ও অভিমান যুক্ত এবং রিপুর অধীন থাকিলেও আমরা তাঁহার সে অদ্ভুত সর্ব্বদিগোজ্জ্বলিত সর্ব্বপ্রকাশক রূপে মোহিত হইয়া যাই। এই জন্য যখন এই মহাদেবী চণ্ডমুণ্ড অসুরের সম্মুখে

* দেবশরীর ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ (গুপ্তবতী টীকা)। দেবী স্থূল সূক্ষ্ম (সমষ্টি) শরীর ত্যাগ করিয়া পরমরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অথবা তিনি "সত্ত্বপ্রধানাংশেন প্রাদুর্ভূতা"। (নাগোজী ভট্ট)। "এই শরীর কোষ হইতে সমুদ্ভূত দেবীর নাম 'শিবা'—'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সর্ব্বতেজোময়ী শিবানামাদ্যাশক্তিঃ।...জ্ঞানার্থ নিধিস্থেন সর্ব্বজগন্নিধিস্থেন পার্ব্বতী শরীরং কোশোপমীয়তে। পরমানন্দ-নিধিত্বেনেব কোশঃ। (চণ্ডীর ৫।৩৮ শান্তনবী টীকা দ্রষ্টব্য।)

আবির্ভূতা হইলেন, তখন তাহারা তাঁহার এই আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল।

এই চণ্ডমুণ্ড কাহারা তাহা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহারা কোপ বা ক্রোধবৃত্তি এবং সেই বৃত্তির কার্য্য, বা বিকাশাবস্থা। (শান্তনবী টীকায় আছে—"চড়ে কোপে; চণ্ডতে চণ্ড! মুড়ি খণ্ডনে; মুণ্ডতি মুণ্ড্যতি, বা মুণ্ড। কোপার্থক চন্ড্ ধাতু হইতে চণ্ড আর মণ্ডনার্থক মুন্ড্ ধাতু হইতে মুণ্ড।) অতএব চণ্ড—ক্রোধস্বরূপ; ইপ্সিত প্রাপ্তি পথে বাধা হইলে, এই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এজন্য কাম ও ক্রোধ গীতায় একত্র উল্লিখিত হইয়াছে—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

ইহাই আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপপথে লইয়া যায়। শ্রুতিতে আছে "নমস্তে রুদ্র মন্যব," এই চণ্ডমুণ্ড সেই রুদ্রের কোপ হইতে সৃষ্ট। চণ্ড—ক্রোধউপহত জ্ঞানবৃত্তি; আর মুণ্ড ক্রোধচালিত কর্ম্মবৃত্তি। এই কর্ম্মের রূপ ছেদন মর্দ্দন, মন্থন, বিশ্লেষণ।

চণ্ডীতে আছে—

"ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।"

ইহার ব্যাখ্যায় গুপ্তবতী টীকাকার বলিয়াছেন, ইত্যত্র পশুপদ দ্বিবচনয়োঃ স্বারস্যেন তূল মূল ভেদেন আবিদ্যাদ্বয় কথনেন—

"যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততোলোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি।"

ইত্যত্রাপি তূলমূলা বিদ্যয়ো বাদানমেব, গৃহীত্বেতি পদেনানুক্ত নির্ব্বচন কথনাং অখণ্ডব্রহ্মবিদ্যা ইত্যেব চামুণ্ডা পদস্যার্থো বর্ণিত, ইতি সূক্ষ্ম দৃশাং রহস্যাম্।

অতএব সূক্ষ্মদর্শী রহস্যকের নিকট এই চণ্ডমুণ্ড অসুর আমাদের বিক্ষেপ ও আবরণাত্মিকা তূলা-অবিদ্যা ও মূলা-অবিদ্যা। অখণ্ড ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যারূপিণী দেবী চামুণ্ডা ইহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন।

পাতঞ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে, অবিদ্যা পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা বা মূল অজ্ঞান আমাদের শুম্ভ; অস্মিতা বা অভিমান আমাদের নিশুম্ভ; আর এই রাগ-দ্বেষ আমাদের উক্ত চণ্ডমুণ্ড অসুর;—ইহারা এক প্রকার অবিদ্যা মাত্র। এই রাগ-দ্বেষ হইতেই আমাদের কাম ও ক্রোধ। অতএব চণ্ডমুণ্ড কে, তাহা আর অধিক বলিতে হইবে না।

এই চণ্ডমুণ্ড অসুর তখন তাহাদের প্রভু শুম্ভকে এই অদ্ভুত রূপবতী দেবীর কথা জানাইল। কহিল, মহারাজ, এমন রূপ ত কোথাও কখনও দেখি নাই। এই দেবী নিশ্চয়ই স্ত্রীমধ্যে সারভূতা রত্ন। ইনি কে—আপনি জানুন, এবং তাঁহাকে গ্রহণ করুন। তাহারা আরও বলিল, মহারাজ, আপনি রত্নভুক্; ত্রিলোকের সকল রত্ন ও শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বিষয় আপনার অধিকারস্থ। দেবগণই তাহাদের সকল শ্রেষ্ঠ রত্ন বাধ্য হইয়া আপনাকে দিয়াছেন। সুতরাং এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীরত্ন আপনি গ্রহণ করুন। বলিয়াছি ত, মূল অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন—অস্মিতার অবতার, অহঙ্কার ও অভিমানের আস্পদ—এই শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর। ইহাদের মধ্যে রাজসিক প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ। ইহাদের বশেই আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। ইহাদের বশে আমাদের ক্ষুধা—আমাদের কামনা—আমাদের ভোগ-লালসার কখন নিবৃত্তি হয় না। কামনা যত উপভোগ করা যায়, ততই কামনা বাড়িতে থাকে। তাহাদের বশে আমরা ধন, মান, অর্থ, কাম, যশ, সম্পদ, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য লাভের চেষ্টায় সতত চালিত হই। আর আমরা যতই সম্মান লাভ করি, ধন লাভ করি, ঐশ্বর্য্য লাভ করি, প্রভুত্ব লাভ করি—আমাদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। গীতায় আমরা এই আসুরী-প্রবৃত্তির স্বরূপ বিবৃত দেখিয়াছি। এই আসুরিক প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া আমরা যথেষ্ট ঐহিক উন্নতি করিতে পারি—আর এই দম্ভ-দর্প-অভিমান-অহঙ্কার ততই বাড়িয়া যায়। ইহাই আমাদের মধ্যে প্রকৃত শুম্ভ নিশুম্ভের রাজত্ব। কখন এ অবস্থায় এই অহঙ্কার বশে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ জন্য বা বিশেষ ফল কামনায় সমাজ-বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বা যজ্ঞাদি করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এই সময়ে যদি শুভাদৃষ্ট বশে আমরা সেই পরাবিদ্যারূপিণী দেবীর কথন সংবাদ বা দর্শন পাই, তখন জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ হয়।

এইরূপে পরাবিদ্যা লাভের ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার জন্য কামনা হয়, এবং প্রযত্ন হয়। সুগ্রীব সেই প্রযত্ন-রূপ দূত। সুগ্রীব শুম্ভ-নিশুম্ভের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ বলিয়া মধুর বাক্যে দেবীকে শুম্ভ-নিশুম্ভ পরিগ্রহণ

করিতে অনুরোধ করিল। মূর্খ সে,—ঐশ্বর্য্যে কি পরা-বিদ্যা লাভ হয়? যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন কে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে? দেবী বলিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা—যিনি তাঁহাকে সংগ্রামে জয় করিবেন, তিনি তাঁহার ভর্ত্তা হইবেন।

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যোমে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

শান্তনবী টীকায় আছে,—ইনি দেবী জয়ন্তী। ইহাঁকে জয় করে—সংসারে এমন শক্তি কাহারও নাই। লোকে দর্পাত্মা, গর্ব্বাত্মা, অহঙ্কাররূপা শক্তিযুক্ত, তাঁহার প্রতিরূপ শক্তিযুক্ত কেহই নাই। এজন্য তাঁহার প্রতিজ্ঞা—"যিনি সংসার গ্রামে—বা সংসার-চক্রে পরমা শক্তিরূপিণী আমার মহালক্ষ্মীরূপসম্পদ পরা-বৈরাগ্যযোগে অভিভব করিয়া (অমে) অলক্ষ্মীকে দৈত্যবর্ণবিষয়ক, দম্ভ, দর্প, গর্ব্ব, ধ্বংস করিতে পারিবেন—যিনি এই সমুদায় লোকের অনুকুল (অপ্রতিবল) বা পালক—সেই মহেশ্বরই আমার ভর্ত্তা বা ধারক—ইহাই দেবীর পরম অভিপ্রায়। দূত সুগ্রীব এই পরম অভিপ্রায় না বুঝিয়া শুম্ভের নিকট দেবীর অস্বীকার-বার্ত্তা নিবেদন করিল।

সহজে, সাধারণ প্রযত্নে পরাবিদ্যা লাভ হইল না দেখিয়া, শুম্ভের মোহ হয়। এই মোহই ধূম্রলোচন। মোহে লোচন আরক্তবর্ণ হয়। মূর্খ শুম্ভ! জোর করিয়া কি পরাবিদ্যা লাভ করা যায়! পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই এই মোহকে বলি দিতে হয়। তাহার মূল কামকে বলি দিতে হয়। তাই ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে আমাদের মহাশত্রু কাম মোহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"জহি শত্রুং মহাবাহু কামরূপং দুরাসদং।"

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা অনেক সাধনায় এই কাম মোহকে নষ্ট করিতে হয়। কিন্তু যদি একবার এই পরাবিদ্যারূপিণী মহাদেবীর দর্শন মিলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা ও প্রযত্ন হয়, তবে দেবী একমাত্র হুঙ্কারে মোহকে সসৈন্যে নষ্ট করিয়া দেন।

তাহার পর এই ক্রোধের ও কামের মূল—যে মূলা বিদ্যা ও তূলাবিদ্যা—যে রাগদ্বেষ—অথবা যে জ্ঞানবৃত্তিজাত ক্রোধ ও তাহা হইতে জাত কর্ম্মবৃত্তি—তাহাকে নষ্ট করিতে হয়। এই চণ্ডমুণ্ডনামা অসুরের কথা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেবী চামুণ্ডা বা ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদিগকে কিরূপে নাশ করিয়া আদ্যা দেবী মহাসরস্বতীকে উপহার দেন, তাহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। পরাবিদ্যারূপিণী দেবীকে পাইবার জন্য আমাদের সময় আসিলে, সেই পাইবার পথে অন্তরায় সমস্ত শক্তিকে বা বৃত্তিকে তিনিই ক্রমে-ক্রমে যুদ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়া দেন। একদিকে আমাদের পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, আর এক-দিকে তাহার অন্তরায় আমাদের মলিন প্রবৃত্তি। যতদিন প্রবৃত্তি কাম-ক্রোধ-অহঙ্কারাদি মলাযুক্ত থাকে, অবিদ্যা, অজ্ঞান জড়িত থাকে, তত দিন আর সে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে না। এ জন্য এই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের প্রকৃত প্রযত্ন হইলেই সেই মহাদেবী আমাদের অনুগ্রহ করেন; তিনি স্বয়ং আমাদের বা আমাদের অধিদেবগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহাদের নষ্ট করিয়া দেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে দেবগণের আন্তরিক প্রার্থনায় এই পরাবিদ্যা দেবীই আমাদের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ ও তাহাদের অনুচরদের অথবা অবিদ্যা ও তাহার সহচরদের ক্রমে বিনাশ করিয়া দেন।

চণ্ডমুণ্ড বধের পর তিনি রক্তবীজ অসুরকে বধ করেন। এই রক্তবীজ আমাদের বাসনা। বাসনা দুষ্পূর। এক এক বাসনাকে নষ্ট কর, আবার তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে আর একরূপ বাসনার উদয় হয়। বিষয়সম্বন্ধ হইতে এই বাসনা হয়। আমাদের পূর্ব্বসংস্কার এই বাসনাকে চালিত করে। বিষয়ভোগ হইতে এই বাসনার বৃদ্ধি হয়। এজন্য উক্ত হইয়াছে যে, রক্তবীজকে যতবার নিহত করা যায়, ততবারই যদি তাহার একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ে (বা বাসনার সামান্য বীজও বিষয়রূপ ভূমি লাভ করিয়া বিকাশের অবসর পায়) তবে তাহার ন্যায় তুল্যরূপ ও তুল্যবলশালী অসুর উৎপন্ন হন। সুতরাং এই অসুরকে বধ করিবার জন্য সকল মাতৃকাগণ—শিব, বিষ্ণু, কুমার, প্রভৃতি সকলের শক্তি—দেবীকে সাহায্য করেন।

এ রক্তবীজ বধ হইলেও যতদিন মূল অবিদ্যা থাকে, অহঙ্কার ও অস্মিতা, অহন্তা ও মমতা থাকে, ততদিন পরাবিদ্যা লাভ হয় না। এজন্য বাসনা-জয়ের পর, বৈরাগ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই অভিমানকে, পরে মূল অহঙ্কারকে ধ্বংস করিতে হয়। এই মহাদেবীই তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম

করিয়া তাহাদের নিহত করেন। কত কাল কত যুগ ধরিয়া সে যুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহা কে বলিতে পারে! তিনি একাই শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করেন। একা বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হয়। মাতৃগণ সহ দেবীকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যখন শুম্ভ দেবীকে উপহাস করেন, তখন সকল দেবীগণই তাঁহার অন্তরে অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেবী শুম্ভকে বলিয়াছিলেন

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥"

পরিশেষে যখন দেবী তাহাকে নিবৃত করিয়া সমস্ত অসুরদের পরাভব করেন, তখন জগতে আবার অধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, অজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয়, অখিল জগৎ প্রসন্ন হয়, সুস্থ হয়। আর অধ্যাত্মভাবে তখন আমাদের ধর্ম্ম ও জ্ঞান পূর্ণরূপে অধর্ম্মে ও অজ্ঞানের নিগড় ছেদ করিয়া পূর্ণরূপে বিকশিত হয়—আমাদের পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

চণ্ডীতে দেবী কর্ত্তৃক অন্য অসুরের বিনাশের কথা ইঙ্গিত করা আছে। সে সকল এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। অন্য পুরাণে নানা অসুরের সঙ্গে দেবগণের যুদ্ধ-বিবরণ আছে, তাহাও বুঝিবার প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উপাখ্যান হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের মধ্যে নিয়ত দেবাসুরে সংগ্রাম চলিতে থাকে। যখন আমাদের অধিদেবতাগণ হীনশক্তি হন, অসুর-পরাজয়ে অক্ষম হন, তখন স্বয়ং দেবী ভগবতী ইহাদের সহায় হইয়া অসুর জয় করিয়া দেন, আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তাই আমাদের ধর্ম্মের বিকাশ হয়।

এইরূপে আমরা মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী-উক্ত দেবাসুর-সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। আসুন, আমরা এই দেবীর শারদীয় মহোৎসবের দিনে চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও মননপূর্ব্বক এই দেবাসুর-যুদ্ধের আধিভৌতিক আধিদৈবিক অথবা ঐতিহাসিক ও যাজ্ঞিক অর্থের সহিত এই আধ্যাত্মিক অর্থ চিন্তা করি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি; আমাদের কাহার মধ্যে কোন্ অসুরের সহিত কোন্ অসুরের কোন্ সেনানীর সহিত এই দেবীর সংগ্রাম চলিতেছে ও কোন্ কোন্ অসুর নিহত হইয়াছে; তাহা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করি, এবং যাহাতে এই দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণ পরাভূত হইয়া আমাদের মুক্তিপথ সত্বর উদ্ঘাটিত হয়, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে দেবীর আরাধনা করি।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ (চণ্ডী ৫।৯)

মাতৃহীন

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়]

হেরিতে নারি যে তোরে!
শুষ্ক বদন, আঁখি ছল ছল, যেন রে খুঁজিছে কারে!
সারা সকালটি হেথায়-সেথায়,
যেন কার লাগি ঘুরিয়া বেড়ায়,
তবু নাহি পায়, ফিরে পুনঃ যায়,
বলে বাছা "মাগো কোথা"?
সকল ভুবন পুলকে অধীর—কে বুঝিবে তোর ব্যথা!

বড়ই অভাগা তুই,
জননী হারায়ে যে নিধি হারালি, কিসে সে তুলনা দিই!
সকল ভুবন ঘুরিয়া বেড়াও,
বন উপবন সব ভ্রমি যাও;
এতটুকু স্নেহ পাবিনি কোথাও—
যে স্নেহে জড়ায়ে ডোরে,
বর্দ্ধিত হায় করিল রে যাদু, বাঁধিয়া মায়ার ডোরে!

এখনও অনেক বাকী,
যত দিন ভবে রহিবি বাঁচিয়া, জ্বালা পাবি থাকি থাকি!
ঐশ্বর্য্যবান হবি তুই কত,
সম্মান, সম্পদ্, পাবি অবিরত;
চৌদিকে পুলক ছুটিয়া বেড়াবে,
কিন্তু একটি ব্যথা,—
সকল হৃদয় টুটিয়া বলাবে—"মাগো আজ তুমি কোথা?"

ভবানীশঙ্করের দুর্গাপূজা

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

ভবানীশঙ্কর যখন গ্রামের মধ্যে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উপর কয়েক দফা দাবী উপস্থিত করা হইল। মা বলিলেন—"আমার কাশীবাসের ব্যবস্থা কর।" পত্নী বলিলেন—"কোলকাতায় একখানা বাড়ী কর্‌তে হবে!" ছেলে আব্দার ধরিল—"আমায় বিলাত পাঠান্!" গ্রামের টেরিকাটা অকাল-কুষ্মাণ্ডের দল পাড়ায় একটা থিয়েটারের দল থাকার একান্ত আবশ্যকতা জানাইল; এবং পল্লীর নিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের দল উপদেশ দিলেন—"বাবাজীকে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতে হইবে; ও-পাড়ায় বৎসরে চারিখানি প্রতিমা হয়, এ-পাড়ায় একখানিও হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভবানীশঙ্কর মাতাকে কহিলেন—"মা, ছেলেকে কাঁদিয়ে কাশীবাস করলে দেবতা কি সন্তুষ্ট হবেন?" স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সহুরে হ'তে পার্ব্ব না!" ছেলেকে জবাব দিলেন "যে মানুষ হবার, সে বিলেত না গিয়েও মানুষ হ'তে পারে; সুতরাং বিলেত যাবার বাসনা ছাড়।" দশআনা-ছয়আনা চুলকাটা টেরির দলকে বলিলেন, "বিনা থিয়েটারেই যখন এতগুলি বাঁদরের সৃষ্টি হয়েছে, তখন আর থিয়েটার ক'রে পাড়ার অন্য ছেলেদের মাথা খাবার দরকার দেখি না।" ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন—"উত্তম! দুর্গোৎসবই করিব; কিন্তু সপ্তমী পূজার শেষ না হইলে আপনারা কেহ প্রতিমা দর্শন করিবার অভিলাষী হইবেন না, বলুন?"

কাশীবাস সম্বন্ধে ভবানীশঙ্করের উত্তরে মাতা কাশীবাসের অধিক শান্তি এবং উচ্চতর সুখ অনুভব করিলেন। পরে আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ রে, ছেলেপুলের বাপ হ'লি, আজও মার আঁচল ছাড়বিনি?" ভবানীশঙ্কর স্নেহ-ছলছল নয়নে মাতার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কলিকাতায় বাটী-নির্ম্মাণের প্রস্তাবে স্বামীর জবাব পাইয়া পত্নী কনকপ্রভা স্বামীর সহিত দিনদুই বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন! বিলাত যাওয়ায় ব্যাঘাত পাইয়া ছেলে পড়াশুন ছাড়িয়া দিবে বলিয়া শাসাইল; কিন্তু যখন শুনিল, পুত্র মুর্খ হইলে ভবানীশঙ্কর তাহার জন্য এক পয়সাও রাখিয়া যাইবেন না, তখন বেচারা পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দিল! টেরির দল কিন্তু হাড়ে-হাড়ে চটিয়া রহিল, এবং ভবানীশঙ্কর লোকটা যে নিতান্ত বে-রসিক, বর্ব্বর, তাহাতে তাহাদের অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহাদের মজলিসে কেহ-কেহ প্রস্তাব করিল—এই বে-রসিক, বর্ব্বর, কৃপণের নামে একখানা ফার্স লিখিয়া মুখুয্যেপাড়ার 'অবৈতনিক আর্য্য নাট্যসমাজে' প্লে করাইতেই হইবে।

দুর্গোৎসবের প্রস্তাবক দল—ব্রাহ্মণেরা শুধু যে সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা নয়; তাঁহারা দেখিয়া অবাক্ যে, এতদিন কলিকাতায় থাকিয়া, ইংরেজী শিখিয়া ভবানীশঙ্কর খৃষ্টান না হউক, ব্রাহ্মও হইয়া পড়ে নাই!

২

আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, ভবানীশঙ্করের দুর্গপূজায় যেরূপ উৎসব হইবে, তাহাতে জমীদার-বাড়ীর পূজার তো কথাই নাই, কলিকাতার বড়-বড় পূজাও হার মানিবে। ভবানীশঙ্করের বাটীর সম্মুখভাগে যে বিস্তৃত জায়গাটা পড়িয়া ছিল, তাহা প্রাচীর-বেষ্টিত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেই পূজার দালান নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবীপ্রতিমা গড়িবার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে কারিগর আসিয়াছে। সে সাধকের মত পূজাবাড়ীর মধ্যে লোকচক্ষুর অগোচরে বিরাজ করিতেছে। ভারে-ভারে খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত হইতে লাগিল। বলির উদ্দেশ্যে একশ' আটটী ছাগ আসিয়াছে।—কি সুন্দর পুষ্ট নধর দেহ! মাংসাশী নর-শার্দ্দূলদের রসনায় জলসঞ্চার হইল;—কেহ-কেহ ভাবিল—হায়, বলির মাংসে যদি পলাণ্ডু-সংযোগের নিষেধ না থাকিত! গ্রামের অমৃত

মিত্রের বাগানের সখ ছিল; সে ভাবিল—"এই একশ' আটটা পাঁটার ভুঁড়ী আঁবগাছের গোড়ায় পুত্‌লে গাছগুলোর যা তেজ হবে!"

ক্রমে পূজার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সকৌতূহল ব্যগ্র আনন্দের আতিশয্যে পল্লীর শিশু-বৃদ্ধ সকলের হৃদয় ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল—কবে সপ্তমী পূজা আসিবে!

এদিকে গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ তারিণী মুখুয্যে শুনিলেন, তাঁহার সহিত পাল্লা দিবার জন্যই এ বৎসর ভবানীশঙ্কর মহা-সমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করিতেছেন! এই জমীদারবংশের অধীনেই এককালে ভবানীশঙ্করের বাপ-পিতামহ নায়েবী করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভবানীশঙ্করের এই অভিসন্ধির কথা শুনিয়া তারিণীপ্রসাদ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত এক রকম মরেই রয়েছি; আমার সঙ্গে এ লড়াই কেন?" একজন পার্শ্বচর বলিল "মশাই!—ধনগর্ব্ব!"

"ধনগর্ব্ব?—আমায় দেখেও ধনগর্ব্ব কর্‌তে সাহস হয় মানুষের? আশ্চর্য্য!"

জমীদারের পুত্র মোহিনী বলিলেন—"তা' যাই হ'ক্—এ বছর আমাদেরও খুব ঘটা ক'রে পূজা কর্‌তে হবে—তাতে আর একখানা মহল বন্ধক পড়ে পড়ুক।"

তারিণীপ্রসাদ বলিলেন—"তুমিও অ-বুঝ হলে মোহিনী? মায়ের পূজায় গর্ব্বের উপচারে নৈবেদ্য সাজাতে কখ্‌খন যেও না!"

"তবে কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপমান সহ্য করব?"

"কিসের অপমান, মোহিনী?...মায়ের পূজা ভক্তির ফল্গুধারা—ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শনী নয়!"

"কিন্তু ভবানীশঙ্করের আস্পর্দ্ধাটা কত বড় দেখুন!... আমাদের অন্নে মানুষ হয়ে আমাদেরই সঙ্গে টেক্কা দিতে চায়!"

"কি করবে—কালধর্ম্ম! একবার যে অন্ধকার সূর্য্যের ভয়ে পলায়—আবার সেই অন্ধকারই অস্তগামী সূর্য্যকে গ্রাস করতে চায়!—উঠা-নামা জগতের রীতি!"

একজন পারিষদ বলিল—"একবার ভবানীশঙ্করকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে হয় না?—কি জবাব দেয়, দেখা যেত!"

"কি দরকার? বরং আমি না হয় তার ওখানে গিয়ে বুঝিয়ে বলে আসব—যে, মায়ের পূজায় অহঙ্কার দেখাতে নেই।" মোহিনী বলিয়া উঠিলেন—"না, তা কিছুতেই হতে পারে না—ভবানীশঙ্করের বাড়ী যাওয়াই অপমানের বিষয়।"

বৃদ্ধ তারিণীপ্রসাদ ধীরভাবে বলিলেন—"অপমান! আমি ত ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে তার কাছে যাচ্চি না। আমি যাচ্চি তার মঙ্গলের জন্য—তাকে একটা সদুপদেশ দিয়ে আস্‌তে—তাতে আমার মানের হানি হবে?"

"হবে না? লোকে বল্‌বে,—ভবানীশঙ্করের মঙ্গলের জন্যে আপনার এত ভাবনা কেন?"

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তার উত্তর এই—ভবানীশঙ্কর আজ যত ধনীই হ'ক, সে আমাদেরই নায়েবের পুত্র—নায়েবের পৌত্র! সুতরাং আমি যতই দরিদ্র হই না কেন, তার অমঙ্গল দেখ্‌লে আমি তাকে সাবধান করে দিতে ন্যায়তঃ—ধর্ম্মতঃ বাধ্য! বুঝলে?—সুতরাং আমি যাবই!"

(৩)

ক্রমে সপ্তমী পূজার দিন আসিল। পূজাবাড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সকলে বলিল "ভবানীশঙ্কর বাবু পূজাবাড়ীর দ্বার খুল্‌তে আদেশ করুন, দেখি আমাদের কেমন মা এসেছেন!" ভবানীশঙ্কর মৃদুহাস্যে বলিলেন "সন্তানের চোখে মা চিরকালই সমান সুন্দর!" হারাধন চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিল "প্রতিমা বেশ বড় হয়েচে ত?" নবীনদত্ত বলিল—"আরে, তুমি ত আচ্ছা আহাম্মক দেখ্‌চি—বাইরের ভাব দেখে বুঝতে পারচ না? যেখানে একশ'আট বলির ব্যবস্থা, আর এই পাহাড়-প্রমাণ জিনিসপত্রের আয়োজন—সেখানে প্রতিমার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়!" হারাধন ঘোষ বলিল "ভারা বেঁধে বোধ হয় 'চালচিত্তির' করতে হয়েচে—কিন্তু বিসর্জ্জনের সময়—" নিকটে সদাশিব ভট্টাচার্য্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে হারাধনকে ধমক দিয়া বলিল—"তুমি আচ্ছা তো হে—এখন বিসর্জ্জনের নাম কর্ত্তে আছে!"

এমন সময় পল্লী মুখরিত করিয়া একখানি পাল্কী ভবানী-শঙ্করের বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্কী দেখিয়া কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, উহা জমীদার-বাড়ীর। তারপর যখন তাহার মধ্য হইতে জমীদার

তারিণীবাবু বাহির হইলেন, তখন সকলের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। ভবানীবাবু তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত লইয়া গিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন। তারিণী বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ভবানীশঙ্করকে কহিলেন "ভবানী তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা কথা আছে।"

ভবানীশঙ্কর বলিলেন—"আজ্ঞা করুন।"

"এখানে নয়; একটু নির্জ্জনে চল।" ভবানীশঙ্কর তাঁহাকে একটা নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেলেন। তখন তারিণীবাবু বলিলেন, "ভবানী, আজ সপ্তমী পূজা, মা ঘরে এসেছেন; তাঁর সেবা ফেলে এ সময়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু তবু এসেছি কেন্ জান? শুনলুম তোমার ভারী বিপদ!"

ভবানীশঙ্কর বিস্মিত, কৌতূহলী, নির্ব্বাক হইয়া, তারিণীপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারিণীপ্রসাদ বলিলেন—"ভবানী, সেটা কি সত্য?"

ভবানীশঙ্কর উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন "কোন্ বিষয়ে বল্‌চেন?"

"তুমি নাকি গর্ব্বের উপচারে মায়ের নৈবেদ্য সাজিয়েচ?"

ভবানীশঙ্কর বলিলেন—"আপনি কি বল্‌চেন—বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

তারিণীপ্রসাদ বলিলেন "তুমি নাকি মায়ের পূজার ছলে আমায় অপমান করবার আয়োজন করেচ ভবানী? তাই যদি সত্য হয়, তবে শোন—আমার অপমান কিছুই হবে না, আমি যে ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিত্যক্ত, কঙ্কালসার জমীদার—একথা সকলেই জানে; সুতরাং আমার অপমান কর্‌তে গিয়ে তুমি শুধু নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আন্‌বে! ধনগর্ব্ব ভয়ানক জিনিস...এই ধনগর্ব্বই মুখুয্যে বংশের ভাগ্যলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিতে বসেচে। তুমি সে অকল্যাণ ডেকে এনো না! যদি বল—তোমাকে উপদেশ দেবার কি অধিকার আমার? অধিকার আছে, ভবানী! তুমি আমার কাছে শুধু ভবানীশঙ্কর বাবু নও,—তুমি আমার নিকট রাজীবলোচনের পুত্র, এবং সদাশিব চাটুয্যের পৌত্র। আবার বল্‌চি,—নিজের দৈন্য ঢাক্‌বার জন্য নয়—তোমার মঙ্গলের জন্যে বল্‌চি—ধনগর্ব্ব ত্যাগ কর, মায়ের পূজায় অহঙ্কারের উপচারে নৈবেদ্য সাজিও না। এ কথা আমার মোহিনীকেও বলেচি, তোমাকেও বল্‌চি! আমি চল্লুম—কিছু মনে করো না!—"

এই বলিয়া তারিণীপ্রসাদ গাত্রোত্থান করিলেন। ভবানীশঙ্কর বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে!"

"কি—বল?"

"অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে একবার পূজাবাড়ীতে যেতে হবে! আমি ধনগর্ব্বে মত্ত হয়ে অহঙ্কারের উপকরণে মায়ের নৈবেদ্য সাজিয়েছি কি না—সেইখানে গিয়ে তার বিচার করবেন!"

তারিণীপ্রসাদ কহিলেন—"চল!"

তখন ভবানীশঙ্করের আদেশে পূজাবাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। তারিণীপ্রসাদ দেখিলেন, পূজার দালানের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কাঙ্গালীরা ভোজন করিতে বসিয়াছে। সুব্যবস্থার গুণে কোনরূপ কোলাহল নাই! সমাগত জনমণ্ডলী প্রতিমা কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু পূজার দালানে প্রতিমা কই? গ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ হরনাথ চক্রবর্ত্তী ভবানীশঙ্করের দিকে বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া বলিলেন "এ কি!—প্রতিমা হয় নাই?"

ভবানীশঙ্কর ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—"দীন-দুঃখীরা তৃপ্তির সহিত সানন্দে ভোজন কর্‌ছে—এই-ই আনন্দময়ী মা'র জাগ্রত প্রতিমা!—তাই ঘটস্থাপনান্তর দেবীর এই জাগ্রত প্রতিমার পূজার ব্যবস্থা করেছি।—"

তারিণীপ্রসাদ সজল নয়নে বলিলেন—"তুমি আমার অপেক্ষা ঢের কনিষ্ঠ, নহিলে তোমার নিকট ক্ষমা চাইতাম!"

ভবানীশঙ্কর জিব কাটিয়া বলিলেন—"অমন কথা বলে আমায় অপরাধী কর্‌বেন না। আপনার মনের ক্ষোভ যে দূর হয়েছে—এই আমার পরম ভাগ্য!"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হরনাথ কিন্তু ভবানীশঙ্করের এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন—"এ নিতান্ত বালকের কার্য্য হইয়াছে! যাক্, প্রতিমা না হয় নাই করিলে, বলির জন্য ছাগ আনিয়া বলি প্রদান করা হইল না কেন?"

ভবানীশঙ্কর বলিলেন—"তাদের তো মায়ের কাছে নিবেদন করা হয়েছে—মা'র অভয়ও তারা লাভ করেছে। নর-রসনা পরিতৃপ্তির জন্য খড়্গের তলে মায়ের নামে আর তাদের আত্মদান কর্‌তে হবে না!"

হরনাথ ব্যঙ্গের ভরে একবার ঈষৎ মুখবিকৃত করিলেন,—আর ভাবিলেন "এ ইংরেজী শিক্ষার কুফল!"

হিমালয়ের কথা

[শ্রীজলধর সেন]

এই জীবন-সায়াহ্নে আর-একবার হিমালয়ের কথা বলিব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এতদিন পরে আবার সে কথা কেন? তাহা হইলে আমার একই উত্তর—হিমালয়ের কথা বলিতে আমার ভাল লাগে। এতকাল চলিয়া গিয়াছে—যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—আমি আর এক মানুষ হইয়াছি; তবু হিমালয়ের কথা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। যে দিন আমার ইহজগতের সমস্ত খেলা শেষ হইবে—যেদিন এই কলঙ্কিত, অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইবে,—সেদিন—সেই শেষের দিনে অন্তিম শয়নেও আমি বুঝি ভগবানের নাম করিতে পারিব না,—সে দিন হিমালয়ের কথাই আমার মনে হইবে। বলিতে পারি না, এখন যেমন ভাবিতেছি, তাহাতে মনে হয়, সেই শেষের দিনেও হয় ত হিমালয়ের দৃশ্য দেখিতে-দেখিতেই আমি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিব। এত যে অধঃপতন হইয়াছে—এমন যে স্বার্থের, কামনার, দাস হইয়াছি—এত যে ক্ষতিলাভগণনাপরায়ণ হইয়াছি—এত যে গ্লানি-নিন্দা-অসহিষ্ণু হইয়াছি—এই পতিত অবস্থাতেও যখন হিমালয়ের কথা মনে করি, তখন সেই সময়টুকুর জন্য আমি অন্য মানুষ হইয়া যাই। তাহার পর, যেই সে দৃশ্য আমার নয়ন-সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, অমনি চারিদিক হইতে সংসার, কামনা, বাসনা, অতৃপ্তি আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরে। তাই যখন-তখন জোর করিয়া হিমালয়ের কথা চিন্তা করিতে বসি।

অনেকদিন পূর্ব্বে আর-একবার হিমালয়ের স্মৃতি লিখিতে বসিয়াছিলাম। তখন কাতরহৃদয়ে বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গের এই সমতলভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া কর্ম্ম-কঠোর জীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য মস্তকে বহনপূর্ব্বক অন্ধ আবেগে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছি; সুখ, আশা, পরিতৃপ্তি কিছুই নাই; পক্ষদ্বয় ছিন্ন; বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত; হৃদয়ে আর সে সাহস নাই,—সে বিশ্বাস নাই;—মনের সে বল নাই; অনন্তদেবতার করুণায় নির্ভরের শক্তি নাই। তাই আজ জীবনের অবসানকালে, নিদারুণ ক্লান্তিনিপীড়িত বক্ষে, হতাশভাবে একবার চাহিয়া দেখিতেছি—কোথায়, কতদূরে আমার শান্তিসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; আমার জীবনের সেই সাধনা কোন্ দেবতার পদতলে চির-দিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় কতকগুলি পুত্তলিকা হইয়া খেলা করিতে বসিয়াছি। একবারও ভাবি না যে—

দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,
কেঁদে কেঁদে ডাকি কাহারে।

তবুও হিমালয়ের কথা বলিতে ইচ্ছা করে। যে বীণার সহায়তায় আমার পীড়িত হৃদয়ের হাহাকার একদিন উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিলাম, সে বীণা আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে আগ্রহ—সে আন্তরিকতা আমার নাই;—কেবল দগ্ধস্মৃতির অন্তর্জ্জ্বালা সেই বহু-দূরান্তরন্যস্ত হিমালয়ের অপরিবর্ত্তনীয়, চির-উদাসীন প্রস্তর-স্তূপের ন্যায় বক্ষের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ অবস্থায়, এই মোহান্ধকারের মধ্যে বসিয়া, হিমালয়ের কথা বলিতে কি আমি পারিব?

পারিব না, তাহা জানি—তাহা বুঝি। বুঝি যে—সে আমি আর নাই। এখন যে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করি যে, সেই হিমালয়বক্ষ-বিহারী, কম্বলধারী, কপর্দ্দকহীন, উদাসীন, লক্ষ্যহারা সন্ন্যাসী,—আর এই সংসার-জ্বালা-বিক্ষুব্ধ, বিষয়-লিপ্ত, অতি সাবধান, সাধনপথবিচ্যুত, কামনা-বাসনার দাস গৃহী,—এই উভয়েই কি একজন? কে জানিত, কোন্ নিভৃতে বসিয়া বিধাতা এই হতভাগ্য, গৃহহীন, উদাসী সন্ন্যাসীর জন্য এমন সুদৃঢ় পাশ-নির্ম্মাণে রত ছিলেন?

না—না, সে সব কথা আর তুলিব না। আজ একবার বর্ত্তমান ভুলিয়া, সেই ত্রিশবৎসর পূর্ব্বের 'আমি'র অনুসন্ধানে বহির্গত হইব। অনেকদিন এ সাধ হইয়াছে—অনেকবার

চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু একবারও, একদিনও বলিতে পারি নাই। কত চেষ্টা করিয়াছি যে, হিমালয়ের সেই দৃশ্যগুলি আর-একবার অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখি—প্রাণ ঢালিয়া দিয়া দেখি—নয়ন ভরিয়া দেখি। কিন্তু তাহারা যে অধিকক্ষণ থাকিতে চায় না;—বায়স্কোপের দৃশ্যের মত এক-একবার ঝলক্ দিয়া দূরে অন্তর্হিত হইয়া যায়;—আর, তাহার পর গভীর অন্ধকার—দারুণ অবসাদ!

এ অবস্থায়ও যে আজ লিখিতে বসিয়াছি, তাহার একটা কারণ আছে। আমার এক প্রিয় বন্ধুর কৃপায় আমি ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হিমালয় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাই লিখিতে বসিয়াছি—না লিখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার সোদরোপম শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয়-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তিনি শুধু নিজে দেখিয়াই তৃপ্ত হন নাই; আর দশজনকে দেখাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্য আলোকচিত্রের পাশে বদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই আলোকচিত্রগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যাহা এতদিন, এত আয়াসেও ধরিতে পারি নাই,—আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে,—সেগুলি আজ ঐ আমার সম্মুখে রহিয়াছে। আমি সেগুলি দেখিতেছি, আর পুরাতন স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। এ সব যে আমার বড়ই পরিচিত দৃশ্য;—এ সকল দৃশ্যের সহিত যে আমার কত সুখ-দুঃখের কথা বিজড়িত। এই দৃশ্যগুলিই আমাকে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতেছে। এ প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। পাঠকপাঠিকাগণ আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবেন। আমি যশের প্রত্যাশায় লিখিতেছি না;—আমি নূতন কথা বলিবার জন্য লেখনী ধারণ করি নাই; আমার অপেক্ষা যোগ্যতর মহাশয়গণ হিমালয়-কাহিনী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন; আমি তাঁহাদের পদরেণু পাইবারও যোগ্য নহি। আমি লিখিতেছি; আমার প্রাণের আবেগে। আমি আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতার কথা ভুলিয়া যাইয়াই লিখিতে বসিয়াছি; ভালমন্দের বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আলোকচিত্রগুলি দেখিয়া সেই-সেই স্থানের কথা যাহা আমার মনে উঠিতেছে, তাহাই আমি লিপিবদ্ধ করিব।

মুখবন্ধটা বড়ই দীর্ঘ হইয়া পড়িল—হয় ত বা অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই। এইবার আমি আমার পুরাতন স্মৃতি-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলাম।

এই স্থানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। আমি হয় ত—হয় ত কেন নিশ্চয়ই, বেশী কথা বলিতে পারিব না। যখন আমি 'হিমালয়' লিখিয়াছিলাম, তখনও বলিয়াছিলাম, এখনও সেই কথাই বলি—"হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্ত্তন কোরতে পারি নাই। যেটী যেমন কোরে বল্‌লে ভাল হোতো, যেটি যেভাবে বর্ণনা কোরলে ঠিক কথাটা বলা হোতো, আমার দুর্ব্বল লেখনী তা বোল্‌তে পারে নি। যে দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্ব্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হোয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ কোরে, সেই মহান্ দৃশ্যের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বোল্‌তে গিয়েছিলুম,—আমার স্পর্দ্ধা কম নয়! যে রকম কোরে দেখ্‌লে ঠিক দেখা হোতো, আমার তা হয় নি। আর হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাক্‌লে মানুষ গাছের ফল, নদীর জল, ফুলের সৌন্দর্য্য, নির্ঝরিণীর কলতান, বিহঙ্গের হৃদয়-মনোমোহন কূজন বর্ণনা কোরতে পারে, আমার সে কবিত্ব কোন দিনই ছিল না, আমার কবিত্বানুভবের অবকাশ বা সুবিধা কোন দিনই হয় নাই।" ১৯০১ অব্দে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ ১৯১৬ অব্দেও তাহাই বলিতেছি। তবে একটা কথা আছে। আমি কথা বলিতে পারিব না বটে, কিন্তু আলোকচিত্রগুলি ত কথা বলিবে। সেই আমার একমাত্র ভরসা। এখন আপনারা হিমালয়ের আলোকচিত্রগুলি দেখুন;—আমি ছবি দেখাইতে আসিয়াছি এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অমনি একটু স্মৃতি-চর্চ্চা করিব। পরে কোন কৈফিয়ৎ না দিতে হয়, সেই জন্য পূর্ব্বেই কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

উত্তরাখণ্ডে যাইবার সময় তীর্থশ্রেষ্ঠ হরিদ্বার ত্যাগ করিবার পরই প্রথম দ্রষ্টব্য স্থান হৃষীকেশ। হৃষীকেশ সত্যসত্যই হৃষীকেশেরই প্রিয়-নিকেতন। এত কাল পরে সে স্থানের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু আর যাহারই যাহা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকুক, পতিতপাবনী গঙ্গার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর পরিবর্ত্তন হয় নাই ভরতজীর মন্দিরের। হরিদ্বার ও হৃষীকেশের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে; হরিদ্বার তীর্থস্থান,—হৃষীকেশ

সাধনস্থান। হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিয়া লোকে পবিত্র হইবার বাসনা করে—আর হৃষীকেশে সাধনা করিয়া হৃষীকেশের দর্শন-লাভের জন্য যত সাধু-সন্ন্যাসী পড়িয়া থাকে। হরিদ্বার তীর্থ হইলেও সহর—হৃষীকেশ তপোবন। এখনও আমি মানস-নয়নে দেখিতেছি,—কত সাধু সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরের সেই অনাবৃত বালুকসৈকতে ইষ্ট-দেবতার আরা-

আয়, আয়!' সে ডাক যাহার কর্ণে একবার পৌছিয়াছে, সে কি আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে? তাহাকে সেই কলনাদিনী পতিতপাবনীর আহ্বানধ্বনি শুনিয়া হৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিতেই হইবে। তাহার পর অদূরেই হিমালয় দণ্ডায়মান; যোগিশ্রেষ্ঠ কতকাল হইতে সাধন-নিমগ্ন—কিছুতেই চেতনা নাই। পৃথিবী চলিতেছে—

হৃষীকেশের গঙ্গা

ধনায় নিরত। কোথাও শিষ্যগণ বেদপাঠ করিতেছেন, কোথাও গুরুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন; গুরু গভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন, আর শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সুধাপান করিয়া অমরত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এখনও মনে পড়ে হৃষীকেশের সেই গঙ্গাতীর! কেমন করিয়া এখানকার গঙ্গার শোভা—সে নয়নমনোমোহন দৃশ্যের বর্ণনা করিব,—কেমন করিয়া বুঝাইব যে; হৃষীকেশের গঙ্গা,—দিন নাই, রাত্রি নাই,—অবিশ্রান্ত ভাবে শুধু ডাকিতেছেন, 'আয়,

চন্দ্র-সূর্য্য উঠিতেছে ডুবিতেছে—মানুষ আসিতেছে যাইতেছে, বৃক্ষলতা জন্মিতেছে মরিতেছে—কিন্তু কতকাল হইতে হিমালয় ধ্যানমগ্ন তাপসের ন্যায় অটল অচল। হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে দাঁড়াইলে, গঙ্গা আর হিমালয় দুইয়েরই পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হৃষীকেশের এ পবিত্র দৃশ্য যে দর্শন করে নাই, সে একটা দেখিবার মত দৃশ্য দেখে নাই।

হৃষিকেশের পরই মনে হয় 'লছমনঝোলার' কথা। আমার এই স্থানটির কথা বিশেষভাবে **মনে হয়**;—কারণ,

এই স্থান হইতেই বহুবর্ষ পূর্ব্বে—সেই সুদূর অতীতে—একদিন আমি বদরিনারায়ণ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই লছমনঝোলার অপর তীরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমি রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। এখন যে ছবি দেখিতেছি, লছমনঝোলার যে আলোকচিত্র আমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বহুদিন পূর্ব্বের কথাটাই স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে —আর মনে হইতেছে—

লছমনঝোলা

"হায় রে সে দিন!
কু-দিন হ'লেও সু-দিন সে দিন!"

আমার ঠিক মনে হইতেছে—ঐ যে লছমনঝোলা পার হইয়া অপর পার্শ্বের গিরিগাত্রে জঙ্গল, ঐ জঙ্গলে—ঐ বৃক্ষতলে এক রাত্রির জন্য আমি অতিথি হইয়াছিলাম। আর এই শোককাতর অতিথিকে পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই রাত্রিতে কে একজন আমাকে দংশন-যাতনা অনুভব করাইবার অভিপ্রায়ে বৃশ্চিক প্রেরণ করিয়াছিলেন! তখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছিলাম,—কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে, যাত্রাপথে এমন পরীক্ষা না দিলে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইত। আরও এক কথা মনে হয়। মনে হয় যে, সাধু-সন্ন্যাসীসম্প্রদায় যে জগতের হিতের জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, নানাভাবে লোকের উপকার করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই সে দিন আমার জন্য বৃশ্চিক-দংশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল! সে কথা আর বিশেষ করিয়া বলিব না। আমাকে সবগুলি ছবি—সব দৃশ্য দেখাইতে হইবে। নিজের কথা যদি বলিতে বসি, তাহা হইলে ঐ একখানি—শুধু এই লছমনঝোলার দৃশ্যের কথা বলিতেই আমার সময় চলিয়া যাইবে;—সে যে অনেক কথা—সে যে অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি আমার মানস-সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। সে কথা থাকুক। এই লছমনঝোলার

সেতু পার হইয়াই তীর্থযাত্রী প্রাণ খুলিয়া জয়ধ্বনি করে—"জয় বদরিবিশালা কি জয়!"

আমি কিন্তু ধারাবাহিকরূপে কোন কথা বলিতেছি না; যে ছবিখানি সম্মুখে পাইতেছি, তাহারই কথা বলিতেছি। তবে পথটা ঠিক আছে। যে পথের কথা বলিতেছি, সেই পথে বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী সব দিকেই যাওয়া যায়। আমার এ বিবরণে পথের হিসাব কেহ পাইবেন না—এ একেবারেই স্মৃতি-চর্চ্চা!

পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। এটি একেবারে সাধারণ চটি নহে; আমাদের সময়ে তেমন বড় না থাকিলেও এখন, শুনিয়াছি, এই চটির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি দোকান বসিয়াছে; ডাক্তারখানা হইয়াছে; প্রতিদিন অনেক রোগী এখানকার ডাক্তারখানা হইতে বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া রোগের যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে এবং দুইহাত তুলিয়া সরকার-বাহাদুরের জয়গান করে।

কাণ্ডী-চটি

এখন আমি কাণ্ডী চটির কথা বলিব। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন একদল সন্ন্যাসী আমাদের পূর্ব্বে আসিয়া এই চটি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, আমরা আশ্রয়স্থান পাই নাই। কিন্তু চটির কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এই চটি হইতে সম্মুখের পাহাড়ের গায়ে যে একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন ঠিক একখানি ছবি। কে যেন

এইবার আমি দেবপ্রয়াগের কথা বলিব। দেবপ্রয়াগের কথা আমি কোন দিন ভুলিব না। দেবপ্রয়াগের চিত্র দেখিয়া আমার এখন যে সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা আমি 'হিমালয়ে' বলিয়াছি। এতদিন পরে চক্ষের সম্মুখে সেই দেবপ্রয়াগের ছবি দেখিতেছি—আর মনে হইতেছে ঐ আমার পাণ্ডা লক্ষ্মী-নারায়ণের বাড়ী—ঐ

খানটায়—বোধ হয় ঐ বাড়ীটাতেই—আমরা বাসা বাঁধিয়া ছিলাম—ঐ যে ঐটা ঠাকুরবাড়ী। আর মনে হইতেছে—এই দেবপ্রয়াগে আমি আমার পাথেয় মুদ্রাগুলি হারাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলাম। কি দুর্ভোগই সেদিন হইয়াছিল! যাঁহার নাম করিয়া বাহির হইয়াছিলাম—যাঁহাকে দেখিবার জন্য—যাঁহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য পথের ক্লেশ সহ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার উপর কিন্তু নির্ভর করিতে পারি নাই। তিনি যে রক্ষা করিতে পারেন, আহার দিতে পারেন, সে কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া গেঁজিয়াতে করিয়া টাকা আনিয়াছিলাম; টাকা ভাঙ্গাইয়া খাইব বলিয়া মনে-মনে একটা সাহস বাঁধিয়াছিলাম। হায়! অন্ধ মানব! কে যে খাইতে দেন, কাহার দয়ায় যে অন্ন মিলে, কে যে তৃষ্ণার জল জোগাইয়া দেন, মূঢ় আমরা তাহা একবারও ভাবি না;—ভাবি, টাকায় সব হয়। সেদিন, সেই দেব-প্রয়াগে, আমার সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য, সে স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার জন্য, আমার টাকার থলি অপহৃত হইয়াছিল। এই স্থানে একটি কথা বলি; কথাটি পরে আমাকে একজন বলিয়াছিলেন। সে একজন আর কেহ নহেন—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহাকে আমি একবার হিমালয়ের মধ্যে পাইয়াছিলাম। তখন তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ডে যান নাই; তখন তাঁহার নাম এমন করিয়া বাজিয়া উঠে নাই। কিন্তু তখনই তিনি আমার—কি ছিলেন, তাহা ভাষায় বলিতে পারিতেছি না। তিনি পরে কাহারও আদর্শ হইয়াছিলেন, কাহারও গুরু হইয়াছিলেন, কাহারও গুরুভ্রাতা হইয়াছিলেন; কতজন তাঁহাকে কত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আমি কিন্তু কোন দিন কোন বিশেষণ খুঁজিয়া পাই নাই। কি বলিয়া তাঁহাকে বিশেষিত করিব, তাহা ভাবিয়া পাই নাই। ভাই বলিয়াছি, দাদা বলিয়াছি, প্রভু বলিয়াছি, তুমি বলিয়াছি, তিনি বলিয়াছি, কিন্তু না, না—কিছুতেই মন উঠে নাই। কি বলিব তাহা ভাবিয়া পাই নাই;—যখন কেহ তাঁহাকে চিনিত না, তখনও পাই নাই, আর এখনও সেই বিশ্ববিজয়ী পুরুষকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। সে কথা থাক—সে সম্পূর্ণই আমার নিজের কথা। বিবেকানন্দ একদিন পাহাড়ের মধ্যে আমাকে বলিয়াছিলেন "ভাই যখন বাহির হইবে, তখন নিঃসম্বল অবস্থায় বাহির হইও,—এই আমার পরামর্শ; এই আমার উপদেশ।" আমি তাহার পর যখন যেখানে গিয়াছি, একটি পয়সাও সঙ্গে লইয়া যাই নাই। কিন্তু বলিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে যে, সে সময়ে কোন দিন আমি ক্ষুধায় কষ্ট পাই নাই; বিশ্বজননী যথাসময়ে আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল যোগাইয়া দিয়াছেন। আর যেবার টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম,—'অহংকে' কোমরে বাঁধিয়া যাত্রা করিয়া-ছিলাম, সেবার কত দিন অনাহারে গিয়াছে, কত কষ্ট পাইয়াছি;—সেবার যে নিজের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, —সেবার যে অন্নপূর্ণার স্থানে রৌপ্যচক্রকে বসাইয়াছিলাম। হিমালয়ের মধ্যে আমি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলাম। আর এখন—এখন সে সব ভুলিয়া গিয়াছি;—এখন যশের প্রত্যাশী, এখন মানের কাঙ্গাল, এখন নামের দাস, এখন পয়সার ভিখারী;—এখন একটা পয়সার জন্য বুঝি লোকের বুকে ছুরী বসাইতে পারি। সেদিন আর নাই—সে শিক্ষা অতলে বিসর্জ্জন দিয়া এখন—। থাকুক সে কথা। দেবপ্রয়াগের বর্ণনা দিই। বহুকাল পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরুক্তি করি।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই সুন্দর। এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম হইয়াছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী, তাই লোকে বলে গঙ্গায় অলকনন্দা মিশিয়াছে; কিন্তু ঠিক কথা বলিতে গেলে বলা উচিত, অলকনন্দার সঙ্গেই গঙ্গা মিশিয়াছে। অলকনন্দা ঘোররবে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ-কল্লোল, আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখিয়া তাহাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয়!

বদরিকাশ্রমের পথে যে কয়েকটি স্থান দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে দেবপ্রয়াগই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বোধ হইয়াছিল। সে যেন ঠিক একখানা ছবি। পর্ব্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট-ছোট ঘরবাড়ী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আঁকা-বাঁকা রাস্তা, অনুচ্চ মন্দির, যেন পর্ব্বতের গা খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। তাহার পর বৃক্ষলতা, নানারকম সুন্দর-সুন্দর ফুল, স্বচ্ছন্দচিত্ত গাড়োয়ালীদের নিঃশঙ্ক পদচারণা

ও বেশ-বিন্যাসশূন্য প্রফুল্ল বালক-বালিকাগণের ছুটাছুটি,—এ সকল দেখিয়া মনে হয় না যে, এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মবদ্ধ এবং দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীরই একটা অংশ। দেবপ্রয়াগ সম্বন্ধে আরও কত কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে; কিন্তু তাহা হইলে যে সকল কথা বলা হইবে না,—সকল ছবি যে দেখান হইবে না। কাজ নাই অত কথায়। আমি এখন হইতে সুধু না। উত্তর-কাশীর কথাটা একটু,—বেশী নহে—সামান্য একটু বিস্তৃত করিয়া বলি;—স্থানটি যে কাশী,—বিশ্বেশ্বরের নাম যে এ স্থানের সহিত জড়িত!

উত্তর-কাশী হিমালয়ের নিভৃত-বক্ষে ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে মনে হয়, বুঝি বারাণসীর আর-একটি অভিনব দৃশ্যপট এখানে উন্মুক্ত হইবে! সেই পাষাণ-সোপানবদ্ধ ভাগীরথীর তীর ও তরণী-শোভিত তটিনী-

দেব প্রয়াগ
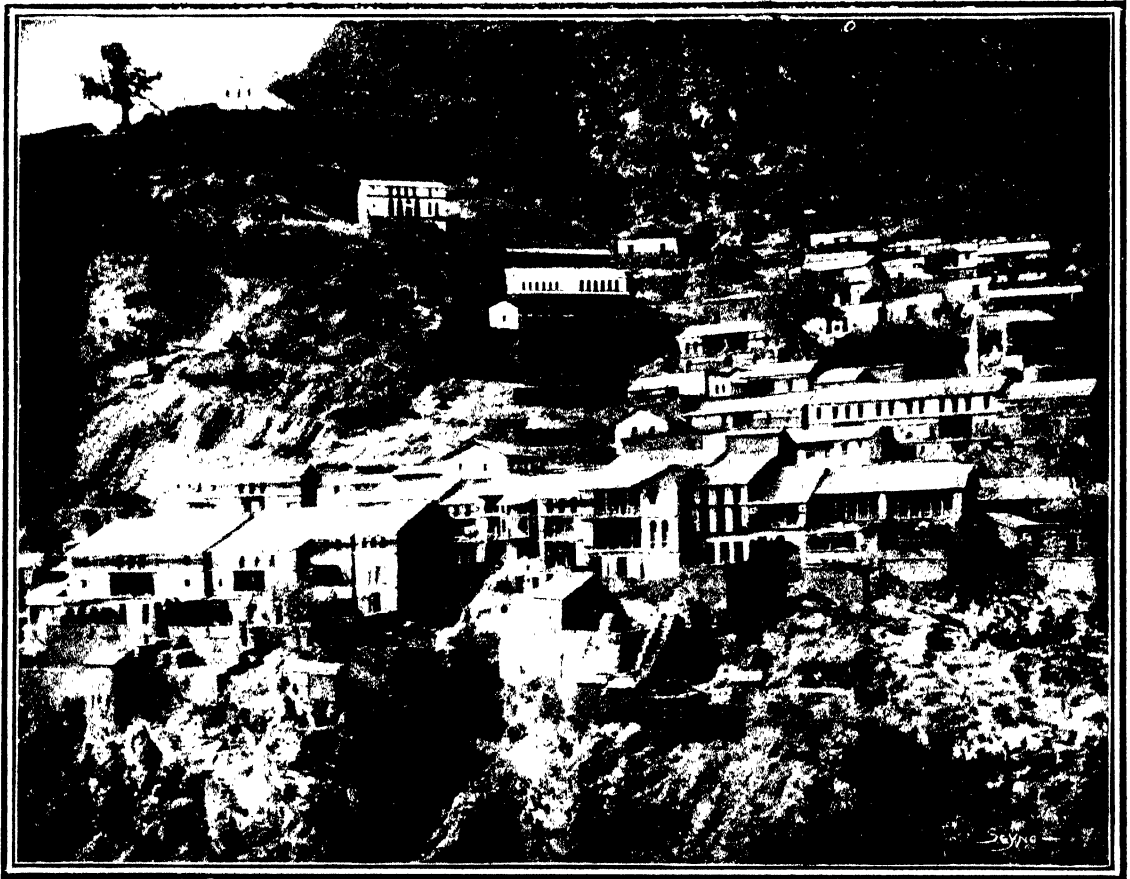
ছবিই দেখাইয়া যাই; এবং যেখানে নিতান্তই আত্মসংবরণ করিতে না পারিব, সেখানে অতি সংযতভাবে দুই একটি কথা বলিব।

এইবার 'উত্তরকাশীর' কথা বলি। এই এখনই বলিয়াছি যে, আমি অতঃপর সংযতভাবে লিখিব; অধিক কথা বলিব না, শুধু ছবিই দেখাইব। কিন্তু এই উত্তর-কাশী সম্বন্ধে আমি আমার কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি বক্ষ, সহস্র-সহস্র নরনারী-সঙ্কুল বায়ু-প্রবাহহীন প্রস্তরগৃহ, আবর্জ্জনা-দূষিত পণ্যবীথিকা-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ রাজপথ এবং সঙ্কীর্ণতর দুর্গন্ধময় শাখাপথসমূহ সেইরূপই ইতস্ততঃ প্রসারিত রহিয়াছে;—বুঝি এখানেও কাঁসর-ঘণ্টামুখরিত অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি, সাধু ও অসাধু, মুমুক্ষু ও অর্থলিপ্সু, সাধ্বী ও পতিতার তেমনি বিচিত্র সম্মিলন। কিন্তু এখানে উপস্থিত হইলে, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়

না। একটি সুন্দর, অপাপবিদ্ধ পুণ্যতীর্থ স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে অনতিবিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে উত্তরকাশী প্রতিষ্ঠিত। সেই পবিত্র পীঠতল প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রসন্ন-সলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। চিরতুষার-মণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি যেন মস্তকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ পরি-

উত্তর কাশী

ধানপূর্ব্বক শ্যামল তরুরাজিতে মধ্যদেশ আবৃত করিয়া কোন্ মহাপুরুষের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত অনুসারে এক স্মরণাতীত যুগ হইতে বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এই দেবভূমিকে রক্ষা করিতেছে।

উত্তরকাশী নগর নহে। নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মময় ভাব, আশা-নিরাশা ও সাফল্য-নিষ্ফলতার সংঘর্ষণে উৎপন্ন ঘোর আন্দোলন, আর্ত্ত ও পীড়িতের হৃদয়ভেদী ক্ষুব্ধ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, পুরুষাকারের বিজয়গর্ব্ব, জেতার দম্ভ এবং আভিজাত্যের অভিমান এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের ক্ষুধিত-তৃষিত কোলাহল কঠিন পর্ব্বতাবরণ ভেদ করিয়া এই শান্তিধামে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে; নীচতার ধূলি এবং হিংসাদ্বেষের জ্বালাময় বায়ুপ্রবাহ এই পবিত্র তীর্থ কলঙ্কিত করে নাই; বিলাস-প্রিয়তা এবং পার্থিব লালসার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে উপস্থিত হইলে শুধু বহুপ্রাচীন, নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গল কিরণানুরঞ্জিত শান্ত আর্য্য-জীবনের একটা সুকোমল পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এতকাল পরে এই কলঙ্ককালিমালিপ্ত নয়নের সম্মুখে উত্তরকাশীর চিত্রখানি ধরিয়া ভাবিতেছি, হায়, সে কতদূর! Oh! from what height fallen! এখন শুধু ভাবিতেছি, আরও কি অদৃষ্টে আছে। তখন বিজয়ানন্দের সেই গান মনে হইত—

"আর ত বাসনা নাহি, যাচিব না আর কভু।
এখন করমডোর খুলে দাও ওহে প্রভু॥

বুঝেছি শিখেছি ঠেকে, ঠেকেছি আসিয়া একে,
সে একে হৃদয়ে এঁকে, দেখি তুমি তাই প্রভু!"

আর এখন—এখন করমের ডোর পাকে-পাকে বন্ধন করিতেছে; বিষয়বাসনা একেবারে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; কাঙ্গাল হৃদয় পার্থিব সুখসম্পদের জন্য লালায়িত। আর কত দূরে—আর কত নীচে যাইতে হইবে, বলিয়া দাও প্রভু! এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? যে স্থান দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, যেখানে পথ আছে, তাহারই নিকটে যে সকল মন্দির আছে, তাহাই যাত্রীরা দেখে; তাহাদেরই কথা বলে। কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ পথে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা কোনদিনই কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই; তাঁহারা

ভাস্কর তীর্থ

থাকুক সে কথা। এখন আর-একখানি চিত্র দেখাই। এখানি ভাস্কর তীর্থের ছবি। কেদারনাথের পথে ভাটোয়ারা নামে একটা চটি আছে। সেই চটির নিকটেই ভাস্করেশ্বর শিবের মন্দির। এই শিবের নামানুসারেই এই স্থানের নাম হইয়াছে—ভাস্করতীর্থ।

হিমালয়ের মধ্যে আরও কতস্থানে কত দেবমন্দির যে

তীর্থভ্রমণ করিতে আসিতেন, দেবদর্শন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে আসিতেন, তাঁহারা ত ভ্রমণকাহিনী লিখিবার জন্য আসিতেন না। এখন আর সেদিন নাই; হিমালয়ের এই সকল কঠিন স্থানের বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এখন হিমালয় সম্বন্ধে কত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কত তথ্য জানিবার সুবিধা হইয়াছে।

'উত্তরকাশী'র পরেই গঙ্গোত্রীর কথা বলিতে হইতেছে! কিন্তু কি বলিব? বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাঁহারা কবি, যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা একবার দেখিয়া আসুন; তাহার পর বলিবার চেষ্টা করুন, কি সুন্দর, কি মনোরম দৃশ্য এই গঙ্গোত্রীর! সত্যসত্যই গঙ্গোত্রীর শোভা অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়। এ স্থানে প্রথম দর্শন দিতে হয়; এমন স্থান না হইলে কি তাঁহার আগমনের পথ হয়? দুর্ব্বল, অসমর্থ, জ্ঞানহীন পাপী লেখককে সকলে ক্ষমা করুন—আমি এ পবিত্র, অতুলনীয় দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারিলাম না। আপনারা চিত্র দর্শন করুন; তাহাতে তৃপ্তি না হয়, একবার গঙ্গোত্রীতে গমন করিয়া শোভা দেখিয়া আসুন;—জীবন সার্থক হইবে;—

গঙ্গোত্রী

আসিলে কেবলই মনে হয়, এটা কি আমাদেরই শোকতাপ-জরামৃত্যুজর্জ্জরিত পৃথিবীরই একটা অংশ? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই হিমালয় তাঁহার শোভা-সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার নয়নসম্মুখে ধরিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। হাঁ, পতিতের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবনীকে এই স্থানেই বলিতেই হইবে যে, "ধন্য—আমরা, ধন্য আমাদের দেশ! আমাদেরই এই দেশে এমন পবিত্র দৃশ্য সম্ভব হইয়াছে!"

এইবার একটা নগরের কথা বলি। স্থানটীর নাম শ্রীনগর;—কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর নহে—গড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর। রাজধানী বলিয়া আর এখন পরিচয়

দেওয়া যায় না—এখন শ্রীনগর গড়োয়ালের একটী প্রধান স্থান—পূর্ব্ব গৌরবের শ্মশানক্ষেত্র। গড়োয়ালের যিনি রাজা অর্থাৎ বৃটীসরাজের প্রভুত্বাধীনে যিনি এখন গড়োয়ালের রাজা, তিনি শ্রীনগর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রাজধানী তিহরি। শ্রীনগর এখন বৃটীশ গড়োয়ালের শাসনাধীন; ইহার প্রধান স্থান পাউরি। শ্রীনগর হইতে পাউরি দেখা যায়। সেখানেই আফিস আদালত; সেখানেই ভূষণ, চিরভিখারী শিবের সেবক হইলেও রাজার হালে থাকেন, বিলাসের সহস্র উপকরণে বেষ্টিত থাকেন। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়াই আমি শ্রীনগরের কথা বলিতেছি। এ স্থানের নিকটে ইন্দ্রাকিল পর্ব্বতে কালীমাতার যজ্ঞবেদী, আর অষ্টাবক্র পর্ব্বতে অষ্টাবক্র মুনির তপস্যার স্থান। এই শ্রীনগরে আমার কয়েকটি গাড়োয়ালী বন্ধু ছিলেন। আমি যখন এখানে গিয়াছিলাম, তখন—তাঁহাদের সহিত

গঙ্গোত্রীর দৃশ্য

সাহেবসুবার বাস; সেখানেই রাজকর্ম্মচারীরা থাকেন; আর এই শ্রীনগর অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া, পুরাতন রাজধানীর ভগ্নস্তূপ জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে পড়িয়া আছে।

শ্রীনগরের দৃশ্যশোভার মধ্যে মোটেই বিলাসের ভাব নাই। আমার মনে হইতেছে, এখানে এমন একটা স্থান দেখি নাই, যেখানে আধুনিক ভাবের প্রাবল্য বর্ত্তমান। অবশ্য এখানে যে কমলেশ্বর নামে শিব আছেন, তাঁহার সেবকের কথা আমি ছাড়িয়া দিতেছি। তিনি শ্মশানচারী, বিভূতি-

কত আনন্দে দুইদিন কাটাইয়াছিলাম—এখনও সে কথা মনে আছে। কিন্তু আজও তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন কি না, আর বাঁচিয়া থাকিলেও আমার কথা তাঁহাদের মনে আছে কি না, কে বলিতে পারে? তাঁহারা এখন আমার স্মৃতির বিষয় হইয়াছেন!

এইবার রুদ্রপ্রয়াগের ছবি দেখাইতেছি। আর, রুদ্রপ্রয়াগ সম্বন্ধে আমি 'হিমালয়ে' যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই একটু এখানে তুলিয়া দিই; তাহা হইলেই এ

স্থানের সম্বন্ধে অনেক কথা সংক্ষেপে বলা হইয়া যাইবে। "চারিদিকে সরল, সমুন্নত পর্ব্বত; সম্মুখে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর খর প্রবাহ পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে; সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত পর্ব্বতের কনককিরীট নদীজলে প্রতিফলিত হইতেছে; রক্তরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে-ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। জলের ধারে কতরকমের সুন্দর পাথর পড়িয়া আছে! আমি বসিয়া বসিয়া সেই সমস্ত উপলখণ্ড সংগ্রহ

শ্রীনগর

করিতে লাগিলাম। কোনটা ঘোর লাল, কোনটা দুগ্ধ-ফেনবৎ শ্বেত, কয়েকটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; কতকগুলির একদিকে এক রং অন্যদিকে আর এক রং। এই প্রকারের প্রস্তরখণ্ড নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—এগুলি যেন সুরনদী মন্দাকিনীর সৈকতে প্রস্ফুটিত প্রবাহ-পুষ্প!" এই রুদ্র-প্রয়াগের আর-একটা কথা আমার মনে হইতেছে—আমি এইস্থানে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম; আর আমার সঙ্গী স্বামীজি আমাকে জলপড়া খাওয়াইয়া সুস্থ করিয়াছিলেন; আমি একদিনের মধ্যেই বেশ সবল হইয়াছিলাম। আপনাদের মধ্যে কেহ-কেহ হয় ত কথাটাকে গাঁজাখুরী বলিবেন এবং এই হতভাগা লেখকের এই প্রকার কথা পাঠশালার পোড়ো এবং চাষার পাঠোপযোগী বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার উপর ত আর কথা বলা চলে না; আর কথা বলিলেই বা কে তাহা শুনিবে? ইহা ত তর্কের বিষয় নহে। রুদ্রপ্রয়াগে যাহা ঘটিয়াছিল, এবং যাহা এখনও আমার বেশ মনে আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি নীরব।

এখন 'গুপ্তকাশী'র কথা বলি। আপনারা আমাদের সর্ব্বজনপূজিত কাশী দেখিয়াছেন, তাঁহার কাহিনী পাঠও

করিয়াছেন। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে আর-একটা কাশীর কথা বলিয়াছিলাম; তাহা হিমালয়ের বক্ষস্থিত উত্তরকাশী। এবারেও সে কাশীর কথা বলিয়াছি। এখন আর-একটা কাশীর কথা বলিতেছি; ইনিই আমাদের গুপ্তকাশী। তবে সত্যের অনুরোধে এ কথা বলিতেই হইতেছে যে, যিনি ইঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন, তিনি হয় ত কোন বিশেষ কারণে ইঁহাকে 'গুপ্ত' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এখন আর ইনি 'গুপ্ত'ও নহেন, লুপ্তও নহেন; ইনি প্রকাশিত এবং স্ব-মহিমায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন।

এখানে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দ্দিনী, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মন্দির আছে। অর্দ্ধনারীশ্বর শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত এবং বৃষারূঢ়; গঠন অতি সুন্দর—দেখিলে ভক্তিভরে মস্তক অবনত হয়। এখানে একটি কুণ্ড আছে। তাহার নাম মণিকর্ণিকা কুণ্ড। সুতরাং গুপ্তকাশীতে কাশীর সবই আছে। গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরই চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

এইবার ত্রিযুগী-নারায়ণের কথা বলিব। আগে ঠাকুরের কথা বলিব, না পথের কথা বলিব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। বড় কঠিন পথ; ভয়ানক চড়াই-উৎরাই; এমন চড়াই যে উঠিতে গেলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়। তবে নারায়ণ দর্শন করিতে গেলে কি আর কষ্ট না করিলে চলে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, "কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ মিলে না"। কৃষ্ণ মিলে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু কষ্ট না করিলে যে নারায়ণ মিলে না, এ কথার প্রথম সাক্ষী বদরিনারায়ণ এবং দ্বিতীয় ও সর্ব্ব-প্রধান সাক্ষী এই ত্রিযুগী-নারায়ণ।

রুদ্রপ্রয়াগ

ত্রিযুগী নারায়ণ অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। নারায়ণ এখানে একটি অনেক দিনের প্রাচীন মন্দিরে বিরাজিত।

আমি যখন দেখিয়াছিলাম, তখনই মন্দিরটি অতিশয় প্রাচীন দেখিয়াছিলাম ; এখন তাহার কি অবস্থা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ছবি দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন হইলেও এই মন্দির শক্ত আছে। এখানে ত্রিযুগী নারায়ণ একাকী নাই ; পাণ্ডা কয়েকঘর পাণ্ডার বাড়ী আছে। তাহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না ; বোধ হয় এখনও তাহাদের সেই অবস্থাই আছে। ছবিতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে পাণ্ডাদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই ; কারণ

গুপ্তকাশী

মহাশয়েরা আরও ছোট-ছোট অনেক দেবদেবীকে এই মন্দিরের আশেপাশে ছোটখাট মন্দির প্রস্তুত করিয়া বসাইয়াছেন, এবং যাত্রীদিগের নিকট হইতে এই সকল ক্ষুদ্র দেবতারাও যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পাইয়া থাকেন। এখানে তাহাদের বাড়ীঘর, আমি যেমন দেখিয়াছিলাম, তেমনই আছে।

এই ত্রিযুগী-নারায়ণে আর একটি দ্রষ্টব্য আছে। ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখের প্রকোষ্ঠে দিনরাত আগুন

জ্বলিয়া থাকে। এখনও নিশ্চয়ই আগুন জ্বালান হয়। পাণ্ডারা বলেন, এই আগুন বিগত তিনযুগ ধরিয়া জ্বলিয়া আসিতেছে। এ কুণ্ড সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখিতে হয়, কখনও ইন্ধনের অভাব ঘটিতে দেওয়া হয় নাই, হইবেও না। পাণ্ডারা বলেন যে, এইস্থানে শিবের সহিত উমার বিবাহ হইয়াছিল। সেই বিবাহের সময় যে হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, তাহাকে আর নিবিতে দেওয়া হয় নাই; সেই শিবের বিবাহের দিন হইতে এতকাল পর্য্যন্ত সেই কুণ্ডের অগ্নি জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। জনশ্রুতি যাহা, তাহাই বলিলাম।

এইবার 'জয় কেদারনাথ জী কি জয়!'

কেদারনাথের মন্দিরের একটু পরিচয় দিই। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী। মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত মণ্ডপগৃহ। কেদারনাথ যে হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি নহে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। ইনি লিঙ্গমূর্ত্তি; উচ্চ প্রায় পাঁচ ফিট। অন্যান্য স্থানেও যেমন, এখানেও তেমনই,—মন্দিরের চারি পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট-ছোট দেবতা আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহারাও যথাযোগ্য পূজা ও প্রণামী পাইয়া থাকেন। এখানে অনেকগুলি কুণ্ড আছে; যথা—ব্রহ্মকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, সুফলকুণ্ড, হংসকুণ্ড, উদককুণ্ড ইত্যাদি। এই সকল কুণ্ডে যাত্রীরা পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া থাকে। এই দিক দিয়াই যুধিষ্ঠিরাদির 'মহাপ্রস্থানে'র পথ। আমার মনে পড়ে, আমি এই পথ খুঁজিতে গিয়াছিলাম। স্পর্দ্ধা কম নহে! কিন্তু তখন সে কথা মনে হয় নাই;—তখন আর-এক সুরে হৃদয় বাঁধা ছিল;—তখন অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস ছিল।—তখন ত আর নিজের উপর নির্ভর করিতাম না। যাঁহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তিনি না পারেন কি? তাঁহার ইচ্ছা হইল,—আর এত বড় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল! আর তিনি আমাকে মহাপ্রস্থানের পথে লইয়া

ত্রিযুগী-নারায়ণ

যাইতে পারিবেন না? মনে এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরিতে পারিয়াছিলাম; আর এখন তিন ক্রোশ পথ যাইতে হইলে একজন মানুষ সঙ্গীর অনুসন্ধান করি।

কেদারনাথের দৃশ্যশোভার বর্ণনা আর দিব না;—ইচ্ছা করিয়া দিব না, তাহা নহে; সে বর্ণনা দিবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। যাঁহারা সে সাধনা করিয়াছেন, যাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারা কেদারনাথের বর্ণনা করিয়াছেন;—আমি পূর্ব্বেও পারি নাই, এখনও পারিলাম না।

এখন যোশীমঠের কথা বলি। যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিমন্দির। শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা—'শঙ্করো শঙ্করোস্বয়ং'! এই যোশীমঠে তিনি অনেকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা একটি দেব-নিকেতন—ইহা একটি প্রকৃত তীর্থস্থান। এখানকার ধূলি পবিত্র।

যোশীমঠের ছবিখানি একবার সকলকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করি। বহুকাল পূর্ব্বে এই যোশীমঠ আমি যেমন দেখিয়া আসিয়াছিলাম, ঠিক তেমনই আছে—ঠিক তেমনই, একটুও পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। আমরা এই যোশীমঠে কোন্ বাড়ীটাতে ছিলাম, তাহাও দেখাইয়া দিতে পারি। ছবির ঠিক মাঝখানের দিকে একটু উপরে যে একটা দোতালা পাথরের ঘর দেখিতেছেন, উহারই দ্বিতলে আমরা একবেলার জন্য বাসা বাঁধিয়াছিলাম।

কেদারনাথ

যোশীমঠের কথা আর বেশী বলিব না। আমার হাতের কাছে আর-একখানি ছবি রহিয়াছে, সেইখানির কথা বলিবার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছি। সেখানি

বদরিকাশ্রমের চিত্র। এমন দৃশ্য আর নাই। পৃথিবীর কত স্থানের কত ছবি দেখিয়াছি; কিন্তু এ দৃশ্যের মত দৃশ্য কখনও কোথাও দেখি নাই। কি সুন্দর! কি পবিত্র! কি মহান্!

এই বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া আমার মনে এতকাল পরে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অনেক দিন পূর্ব্বে এই মহাতীর্থের যে কোলাহলময় পৃথিবীর অনেক উর্দ্ধে বরণীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি। ঐ তুষারমণ্ডিত, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অলকনন্দার শোভাময় উপকূল আমার কাছে সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবালে বাঁধনো সুরম্য তীর ব'লে বোধ হয়েছিল। চারিদিকে কেমন শান্তি, কত পবিত্রতা! দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম, সব ভুলে গেলাম। সমতলভূমির উপর মন্দির ও কতকগুলি ছোট-ছোট পাথরের ঘর। নদীর ধারে যেমন

যোশীমঠ
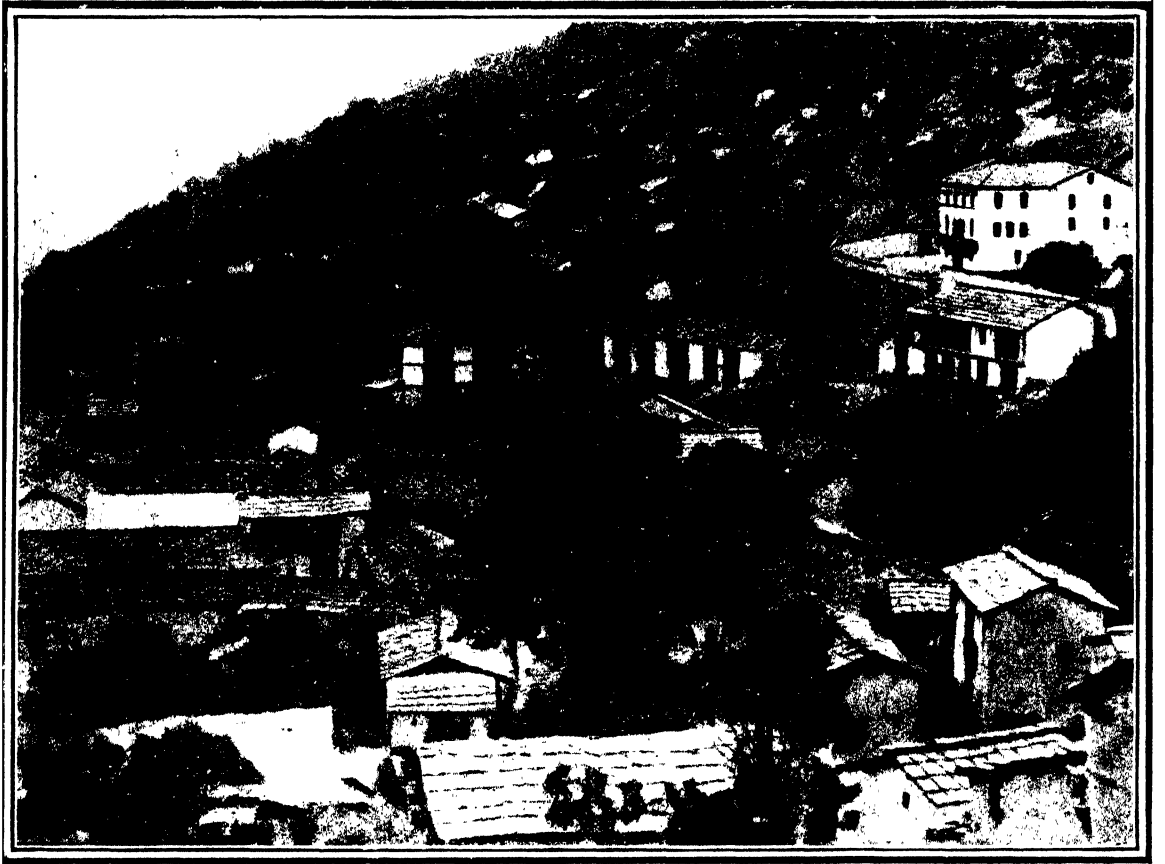
বর্ণনা লিখিয়াছিলাম, আমার দুর্ব্বল তুলিকা সে দৃশ্যের একটু ক্ষুদ্র অংশও অঙ্কন করিতে পারে নাই। তাহারই স্থলবিশেষ এখানে তুলিয়া দিতেছি; ইহার অধিক কিছু করা আমার পক্ষে অসাধ্য—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমি বলিয়াছিলাম—বদরিকাশ্রমের এই দৃশ্য দর্শন করিয়া "আমি মনে-মনে কল্পনা কল্লুম, শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে-ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্ব্বাদে দুঃখ-বালির ঘর বেঁধে মেয়েরা খেলা করে, এবং খেলা সাঙ্গ হ'লে তারা বাড়ী চ'লে গেলে যেমন ঘরগুলি সেই নির্জ্জন নদী-তীরে পড়ে থাকে, অলকনন্দার তীরে, এই শুভ্র সমতল প্রদেশে এই ছোট-ছোট ঘর ও মন্দির দেখে আমার মনে হ'ল, বুঝি দেববালারা এসে খেলাচ্ছলে এগুলি তৈয়েরী করেছিলেন, বেলা অবসান হওয়ায় খেলা সাঙ্গ ক'রে তাঁরা বাড়ী ফিরে গিয়েছেন।"

আর দুইটি দৃশ্য দেখাইতে পারিলেই আমার কার্য্য শেষ হয়। একটী বসুধারা, আর একটী নন্দপ্রয়াগ। আগে বসুধারার কথাই বলি। কথা বেশী বলিবার নাই, দেখিবার ও দেখাইবার আছে। তুষাররাশির মধ্য দিয়া বসুধারা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছে; আর সেই ধারায় স্নাত হইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে—মনের ময়লা কাটিতেছে কি না, বলিতে পারি না। দৃশ্য কিন্তু অতুলনীয়!

ইঁহারা এক বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণ দর্শন করিবার জন্য সুদূর বঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া এতদূর আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন যে, সে বৎসর কোন যাত্রী নারায়ণ দর্শন করিতে যাইতে পারিবে না। তাঁহারা যদি হরিদ্বারের পথে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর বিপন্ন হইতে হইত না; হরিদ্বার হইতেই তাঁহারা ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা এত দূর আসিয়াছেন,

বদরিকাশ্রম

সকলের শেষে আমি নন্দপ্রয়াগের ছবি দেখাইতেছি। শেষে দেখাইতেছি বলিয়া নন্দপ্রয়াগ আমার কাছে ছোট নহে; অনেককাল পূর্ব্বের একটা স্মৃতি এই নন্দপ্রয়াগের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।

আমরা যেবার বদরিকাশ্রমে যাই, সেইবার এই নন্দপ্রয়াগে পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

নারায়ণ দর্শন না করিয়া কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহারা এই নন্দপ্রয়াগে সেই বৎসর থাকিলেন। পরের বৎসর, অর্থাৎ আমরা যেবার যাইতেছিলাম, সেইবার তাঁহারা নারায়ণ দর্শন শেষ করিয়া দেশে যাইতেছেন। যেদিন তাঁহারা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্বদিন আমরা নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরের দিন তাঁহারা যখন

তাঁহাদের এই এক বৎসরের প্রবাসস্থান ত্যাগ করিয়া দেশে যাত্রা করেন, সেই যাত্রার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এতকাল চলিয়া গিয়াছে—এখনও সে দৃশ্য দশদিন যেখানে বাস করা যায়, সেখানকার লোকজন, এমন কি গাছপালার উপরও একটা স্নেহ জন্মে। আর এই পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ একবৎসরকাল এই পর্ব্বতে, ক্ষুদ্র

বসুধারা

আমার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য অনেক লোক সেখানে জমা হইয়াছেন। একটি বাজারে বাস করিয়া সকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হইয়া উঠিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে একজন এক পাহাড়ীর ধলাম-টা-মাথা মেয়েকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতেছেন। আর-একজন একটি যুবতীর গলা ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন। কোথায় সেই সুদূর পূর্ব্বের শস্যশ্যামলা সমতল বঙ্গদেশের অন্তঃপুরচারিকা, আর কোথায় এই হিমালয়ের

নন্দপ্রয়াগ

ক্রোড়স্থিত পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র স্থানের গাড়োয়ালী যুবতী! পরস্পরের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ! চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমার তখন মনে হইতেছিল, ইহারা তাঁহারাই সেই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে যাইতেছেন—ইহারা আমারই দেশে যাইতেছেন।—আর আমি—আমি কাহার উদ্দেশে, কোথায়—কোন্ অপরিচিত স্থানে চলিয়াছি। কখন হয় ত আর দেশে যাইব না! সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে? এই আকর্ষণেই আমি উপরে উঠিতে পারি নাই—নামিয়া আসিয়াছি। তাহার পর—তাহার পর এই ধূলিধূসর, পতিত 'আমি!'

হিমালয়ের কথা আমি আর বলিব না। আমার অক্ষমতার এই নিদর্শন দেখিয়া আমিই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাই অশ্রুপূর্ণনয়নে হিমালয়ের দেবতাকে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কক্সবাজার

[শ্রীইন্দুভূষণ দত্ত]

বহুদিন যাবৎ কক্সবাজারের প্রশংসা শুনিতেছি। পুরাতন যাত্রী অনেকেই ইহার বর্ণনা করিয়া লুব্ধ করিতেছিলেন। এমন কি, জনৈক উৎসাহী বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"পুরী ও বৈদ্যনাথের মিলনক্ষেত্র কক্সবাজার; এখানে সমুদ্র আছে,

চট্টগ্রাম জেটীতে "নীলা" ষ্টিমার

পাহাড় আছে, তদুপরি একটা নদী আছে;—প্রকৃতিদেবী কোনই অভাব রাখেন নাই।" এমন বর্ণনায় প্রলুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই দু'-তিন বৎসর যাবৎ সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু ভাল বাড়ী না পাওয়ায়, ও রাস্তার অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে আশাও পূরিতেছে না, সাধও মিটিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের লোক পদ্মায় 'পাড়ি' দিয়া চট্টগ্রামে আসাকেই ভয়াবহ মনে করেন,—কক্সবাজারে পৌছিতে হইলে যে আবার সাগর পার হইতে হয়! চট্টগ্রাম হইতে 'কর্ণফুলি' নদী বাহিয়া প্রায় ৬ মাইল গেলে তবে সমুদ্র; তারপর দুই ঘণ্টা অগাধ সমুদ্রে চলিয়া, ছোট-ছোট কয়েকটি সমুদ্রের চ্যানেল (channel) অতিক্রম করিয়া তবে কক্সবাজারে আসিতে হয়। এখানেও নিস্কৃতি নাই;—ষ্টীমার হইতে "সাম্পান্" নামক ছোট খোলা নৌকায় চড়িয়া "বাঘখালি" নদীতে ২।৩ মাইল গেলে পর অবশেষে কক্সবাজার,—Cox Bazar at last! স্বর্গের সিঁড়ি অনেকগুলিই ভাঙ্গিতে হয়। তবে রাস্তার হাঙ্গামা শুনিতে যত ভয়ঙ্কর, আসলে তত নয়। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির দিনে ভয়সঙ্কুল না হউক, কথঞ্চিৎ অসুবিধাজনক বটে। তা, সামুদ্রিক বায়ু সেবন করিতে হইলে, এই সামান্য অসুবিধার জন্য প্রস্তুত না হইলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ, সেই ভুবনবিখ্যাত পুরী সহরকে হার্ডিঞ্জ সাহেব বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করার পর, কক্সবাজারই যে আমাদের একমাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহর (Seaside resort)। এহেন স্থানে পৌছিতে হইবেই ঠিক করিয়া, ফাল্গুন মাসের সপ্তদশ দিবসে শুভতিথ্যাদিযোগে সমুদ্র অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চট্টগ্রাম হইতে সপ্তাহে ৪ দিন টার্নার মরিসন্ (Turner Morrison) কোম্পানীর জাহাজ "নীলা" ও "মেলার্ড" (Nilla and Mallard) কক্সবাজার যায়, প্রাতে ৮টার সময় ছাড়িয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পৌছে; ভাড়া তৃতীয়

খাস তহশীলদারের বাংলো

শ্রেণী ১।৵০ হইতে প্রথম শ্রেণী ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ;--'বেছে লও মনোমত যাহা খুসী যার।' তবে ভবিষ্যৎ যাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারেন ভালই ; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া শতগুণে ভাল, তবু কেহ যেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার জন্য বৃথা ৫৲ টাকা খরচ না করেন। আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে এই তৃতীয় শ্রেণীটিই বিশেষ সুবিধাজনক।

আমরা ৪নং ডাউন্ ট্রেণে (4 Down mixed train) চট্টগ্রামে আসিতেছিলাম ; প্রাতে ৬।২০ মিনিটের সময়

সমুদ্রতীরে সংগৃহীত কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি

"খেজারী" বীচ্ হাউস্—Khejari Beach House.

পৌছিবার কথা ; কিন্তু চট্টগ্রাম পৌছিতে ৭টা বাজিয়া গেল ; অনেকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে, জাহাজ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে, এই ষ্টীমারে ডাক যাইবে : আমাদের সঙ্গে ট্রেণে কলিকাতার ডাক আসিয়াছে। এগুলি পোষ্টাফিস্ হইয়া ষ্টিমার-ঘাটে যাইবে, অতএব এখনো যথেষ্ট সময় আছে। ভবিষ্যৎ যাত্রীদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, তাঁহারা যদি এই ট্রেণে আসেন, তবে ট্রেণ যত দেরীতেই চট্টগ্রামে পৌছাক্ না কেন, তাঁহারা সহজেই কক্সবাজারের ষ্টীমার ধরিতে পারিবেন ; কাহারো কথায় তাঁহারা যেন চিন্তিত না হন। চট্টগ্রামের স্থানীয় লোকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া

গোলদীঘি

কাছারী পাহাড়ের মাঠে "বলীখেলা।"

বলিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই ষ্টীমারের কোন খবরাখবর রাখা দরকার মনে করেন না।
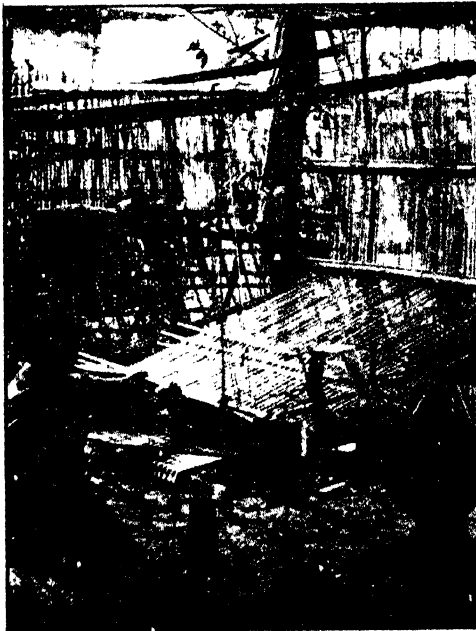
মগবাড়ীর তাঁত

কিন্তু আমরা তখনো অনভিজ্ঞ। ট্রেণ লেট হইয়াছে, স্থানীয় লোকেরাও ভয় দেখাইতেছেন; তাই হৈ হৈ, রৈ রৈ, ছুটাছুটি করিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া, কুলিগুলিকে তাড়া-দিয়া, গাড়োয়ানকে বক্সিসের লোভ দেখাইয়া, ভাড়া গাড়ীর দুর্ব্বল অশ্বগুলিকে নির্ম্মমভাবে কষাঘাত-নিপীড়িত করাইয়া (বোধ হয় তাহাদের ভাষাহীন অভিশাপ মাথায় লইয়া) ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিলাম, ও বিশেষ ব্যস্ততাসহকারে ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। সময় হিসাবে তৎপূর্ব্বেই ষ্টীমার ছাড়িবার কথা; কিন্তু আমাদের পৌঁছিবার কেবল-

ফ্ল্যাগ্ ষ্টাফ্ হিল্ (Flagstaff Hill) হইতে কক্সবাজারের দৃশ্য

মাত্র দেড় ঘণ্টা পরে ডাকের ব্যাগ লইয়া "নীলা" ষ্টীমার কক্সবাজার অভিমুখে রওয়ানা হইল।

"কর্ণফুলী" নদীর তীরে চট্টগ্রাম সহরটি দেখিতে বেশ সুন্দর। বিশেষতঃ, 'পল্টন' নামক সহরতলীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ছোট-ছোট পাহাড়ের উপরের বাড়ী ও আপিসঘরগুলি ঠিক যেন ছবির মতন দেখায়। আমরা চট্টগ্রাম ছাড়িয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হইলাম। কক্সবাজার-যাত্রীর এখানেই সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পূর্ব্বদিকের তীরের নিকট দিয়া যাইতেছি; কিন্তু পশ্চিমে অকূল সমুদ্র; আজ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

ষ্টীমার একেবারেই দুলিতেছে না; সামুদ্রিক পীড়ার (sea-sickness) কোন ভয় নাই। প্রায় দুই ঘণ্টা চলিবার পর, কুতুবদিয়া চ্যানেলে পড়িলাম। এখান হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত আর বিস্তৃত সমুদ্র নাই; শুধু কয়েকটা ছোট

বৌদ্ধমন্দির বা কিয়াংঘর

চ্যানেল্। অনেকগুলি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন ৩॥০ টার সময় সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান আদিনাথ তীর্থে উপস্থিত হইলাম। শিবরাত্রি উপলক্ষে আমাদের ষ্টীমারে প্রায় দুই শত তীর্থযাত্রী আসিয়াছিল; তাহারা অবিরাম উলুধ্বনি করিয়া আদিনাথে নামিয়া গেল। 'মহিষখালি' চ্যানেলের উত্তরে 'মহিষখালি' দ্বীপে আদিনাথ পাহাড়, দক্ষিণে বাঘখালি নদীর তীরে কক্সবাজার। আদিনাথ অতিক্রম করিয়াই 'বাঘখালি' নদীর মুখে উপনীত হইলাম। আমাদের জন্য সেখানে 'সাম্পান্' উপস্থিত ছিল। প্রথম পরিচয়ে 'সাম্পানের' চেহারা তত মনোরম বোধ হয় নাই। ছত্রিহীন ছোট নৌকা—বসিবার স্থান বেশী নাই; দুখানা চেয়ার মুখোমুখী করিয়া রাখা যায়, নতুবা নৌকার কাঠের উপরেই বসিতে হয়। মাঝি দাঁড়াইয়া দু'হাতে দুখানি দাঁড় টানিয়া যায়। দেখিতে যেমনই হউক, এগুলি কখনো ডুবে না বলিয়াই লোকের বিশ্বাস, এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ইহারা বেশ সহজে চলিতে পারে। ভাগ্যদেব এখানেও আমাদের প্রতি বেশ সুপ্রসন্ন ছিলেন; তাই জোয়ারের সঙ্গে 'ভরাপালে' আমাদের 'সাম্পান্' আধ ঘণ্টার পূর্ব্বেই কক্সবাজার পঁহুছিল। সমুদ্র হইতে নদী দিয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম, 'একি! আমরা যে সমুদ্র হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি; কক্সবাজার কি তবে একেবারে সমুদ্রের তীরে নয়?' কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়াই ভুল ভাঙ্গিল। সমুদ্র এই সহরের দুই দিক্ ঘুরিয়া গিয়াছে; উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে, কিন্তু পশ্চিমদিকে একেবারে সহরের পাদধৌত করিয়া গিয়াছে।

কক্সবাজার চট্টগ্রামের একটা মহকুমা; ছোটখাট সহরটি 'বাঘখালি' নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আমাদের 'সাম্পান্' একেবারে 'কস্তুরা' ঘাটে জেটার নিকট

কিয়াংঘর ও মঠ

উপস্থিত হইল। কক্সবাজারের কস্তুরা ঝিনুকের (oysters) খুব নাম আছে—এগুলি খাইবার জন্য সাহেবেরা ও স্থানীয় মগজাতীয় লোকরা দস্তুরমত লোভ করিয়া থাকে। আমাদের জনৈক বন্ধু কক্সবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার 'হাকিমের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে,

মগপ্রসেশনের একাংশ

আমরা "কাছারী" পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। এখানেই সব আপিস ও অফিসারদের বাড়ী। প্রথমেই "জর্জ্জ এণ্ড মেরী হল্"—টাউনহল্ ও লাইব্রেরী। ছোট সহরের পক্ষে লাইব্রেরীটি বেশ। তারপর মিউনিসিপ্যাল আফিস্। উকীল লাইব্রেরী, সবরেজিষ্ট্রারের আপিস, মুন্সেফি আদালত, খাস তহশীলদারের কাছারী, ও সবডিবিসন্যাল্ অফিসারের 'আপিস বাড়ী' কাছারী পাহাড়ের মাঠটী ঘেরিয়া আছে। এগুলি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রথমতঃ এখানকার সরল প্রাণ খাস তহশীলদার মহাশয়ের সুন্দর বাংলো-বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পুরীতে যেমন সমুদ্রের তীরে একটা বাঁধান রাস্তার উপরে বাড়ীগুলি প্রস্তুত হইয়াছে, কক্সবাজারে তেমন নয়। সমুদ্র হইতে প্রায় পাঁচ শত গজ পূর্ব্বদিকে ৩০।৪০ফিট উচ্চ একটি পাহাড় সমুদ্রের সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। এইটিই এখানকার ফ্যাসনেবল্ স্থান,—এখানেই যা কয়েকখানা ভাল বাড়ী আছে। প্রথমেই ফরেষ্ট বাংলো, তারপর সাহেব মহোদয় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—Well, how did you like the oysters there?" ("সেখানে কস্তুরা খেতে কেমন লাগ্‌ল?") আমাদের কিন্তু স্বাদ ও রুচি অন্য রকম; সাহেবেরা যাহা কাঁচা ও মগেরা যাহা পচাইয়া খাইতে ভালবাসে, আমরা যে তাহা রন্ধন করিয়াও খাইতে পারি না! বাস্তবিক ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

কক্সবাজারের এই ছোট নদীটি বড়ই সুন্দর। 'জেটিতে' বসিলে সম্মুখে আদিনাথ পাহাড়ের 'তরুচ্ছায়ামসীমাখা' দৃশ্যাবলী, বামেতে 'গরজে সিন্ধু অনন্ত অপার',—ডাহিনে দূরে—অতি দূরে পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের বিস্তৃত নীলাভ পর্ব্বতমালা আকাশের গায়ে মিশিয়া রহিয়াছে—কে যেন একটি চমৎকার প্রাকৃতিক চিত্রের নানাবিধ উপকরণ একই স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু সারাদিন পথশ্রমের পর শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন, বিশেষতঃ শরীরটি পরিতৃপ্ত হয় না; তাই আমরা তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

সহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই পোষ্টাল্ টেলিগ্রাফ আপিস, তারপর থানা। যিনি সহরটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা দরকার; কারণ সহরের প্রবেশদ্বারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ডাকঘর ও সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরূপ পুলিশ-ষ্টেসনটা দাঁড় করাইয়া বেশ ভালই করিয়াছেন। তারপর, বামদিকে কালীবাড়ী রাখিয়া,

মগবালিকাগণ

সবডিবিসন্যাল্ অফিসারের বাড়ী (এইটিই কক্সবাজারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একমাত্র পাকা দোতালা বাড়ী)। পরে ক্রমান্বয়ে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ইন্সপেক্‌শন বাংলো, ডাক বাংলো এবং সর্ব্বশেষে টার্ণার্ মরিসন্ কোম্পানীর বাংলো শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীগুলি ভালই; কিন্তু সমুদ্র হইতে কিছু দূরে বলিয়া, সমুদ্র-স্নান করার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়।

একেবারে সমুদ্রের ধারে "খেজারী বীচ হাউস্" (Khejari Beach house) বলিয়া একটি সুন্দর বাংলো আছে। প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল বাবু প্রফুল্লশঙ্কর সেন মহাশয় এখানে সবডিবিসন্যাল অফিসার থাকার সময়, 'খেজারী' নামক জনৈক মগ সওদাগরের অর্থ-সাহায্যে এটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সমুদ্র-স্নানার্থীর ও পরিশ্রান্ত পথিকের পক্ষে এটি বড় উপযোগী। শুধু তাহাই নয়; অন্য বাংলোতে স্থানাভাবে অনন্যোপায় হইলে, সবডিবিসন্যাল অফিসারের অনুমতিক্রমে এখানেও আগন্তুকদের থাকিবার স্থান হইতে পারে। সমুদ্রের ধারে আর বাড়ী নাই বলিলেও হয়; শুধু সাধারণ মুসলমানদের গৃহস্থ-পল্লী। এ স্থানটির প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। এখানে মাঝে একবার পার্ক করিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু উহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। যদি "দরিয়া" এ স্থানটিকে গ্রাস না করেন (আর গ্রাস করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না), তবে কালে ইহাই কক্সবাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পল্লী বলিয়া গণ্য হইবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরে আসিয়া যদি সমুদ্র হইতে এত দূরে বাস করিতে হয়, তবে দিবা-রাত্রি সমুদ্রের ওজোন্ (ozone) বায়ু সেবন করিবার সুবিধা কোথায়, লোণাজলের বাষ্পই (salt water spray) বা কোথায়—সমুদ্রস্নানেরই বা তেমন সুযোগ কৈ? দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো কেহই এ স্থানটির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া এখানে প্রথমে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করিতেছেন না। চট্টগ্রামের ধনী মহোদয়গণ যদি সমুদ্রতীরে কয়েকটি বাংলো-ঘর প্রস্তুত করাইয়া দেন, তবে তাঁহারা স্বাস্থ্যান্বেষী জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া নিজেরাও কথঞ্চিৎ লাভবান্ হইতে পারেন। বাস্তবিক, কক্সবাজারের প্রধান অসুবিধা এই যে, এখানে ভাল ভাড়াটিয়া বাড়ী পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। অল্প দিনের জন্য আসিলে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ইন্সপেক্‌শন্ বাংলোতে আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন সরকারী কর্ম্মচারীর স্থানাভাব হইলে, তখন আবার বাড়ীটি ছাড়িয়া "খুঁজে নেও যার যার নিজ নিজ পথ।" ফরেষ্ট বাংলো, ডাকবাংলো, টার্ণার মরিসনের বাংলো সাহেবদের প্রায় একচেটিয়া। তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে বাঙ্গালী সাহেবেরাও পাইতে পারেন। চট্টগ্রামের জমিদার ৺মাগন দাস বাবুর পুত্র সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের একটি বাংলো-ঘর আছে—উক্ত জমিদারবাবুরা অনুগ্রহ করিয়া কক্সবাজার-যাত্রী ভদ্রলোকদের ব্যবহারের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

আমরা ১লা মার্চ্চ তারিখে কক্সবাজার পৌঁছি। তখন পূর্ব্ববঙ্গের সবস্থানই বেশ গরম। কিন্তু এখানে গরম ত নাই-ই, কয়েকদিন লেপ ব্যবহার করারও দরকার হইয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলির বিশেষত্ব এই যে, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান;—শীতকালে বেশী শীত নয়, গ্রীষ্মকালেও বেশী গরম হয় না। চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত বলিয়া অনেকেই ভয় করেন যে, এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে; কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া এখানে জ্বর বা অন্য অসুখ খুব কম। জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানকার স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়; কিন্তু বাকী আট মাস—বিশেষতঃ নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত—জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। তাই ডাক্তার বাবুদের প্র্যাক্টিসের পক্ষে এ স্থানটি তেমন সুবিধাজনক নয়। এখানকার একমাত্র ডাক্তার সরকারী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহাশয়কে শুধু প্রাইবেট প্র্যাক্টিসের উপর নির্ভর করিতে হইলে, অনেক সময় সমুদ্রের হাওয়া ভিন্ন তাঁহার অন্য সম্বল জুটিত কি না সন্দেহের বিষয়!

সমুদ্রতীরে ভ্রমণ এখানকার নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। বালুকাময় সমুদ্রতীর—পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপ-সাগরের অপার জলরাশি। যতদূর দৃষ্টি যায়, রাশি রাশি নীলজল; সুদীর্ঘ সৈকতে ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া পড়িতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল-সন্ধ্যায়, সুদিনে, দুর্দিনে, জোয়ার-ভাটায়, এই ঢেউ বা ব্রেকার্সএর (Breakers) অবিরাম উত্থান-পতনের দৃশ্যে, ও অক্লান্ত গর্জ্জন শ্রবণে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। অনেক কবি ও অকবি জলন্ত ও নির্জ্জীব ভাষায় অনেক সমুদ্রের

বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব সমুদ্রের সাধারণ বর্ণনা ছাড়িয়া আমরা শুধু কক্সবাজারের কথাই বলিব। এখানে সমুদ্র-সৈকত ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়াছে—ভ্রমণের স্থান প্রশস্ত, স্নানের পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক। এখানকার Sea Beach অনেকটা বিলাতের Isle of Wightএর মত। জোয়ারের জল নামিয়া গেলে, বেলাভূমির জলসিক্ত বালুরাশি প্রায় সিমেণ্টের মতন শক্ত হইয়া জাগিয়া উঠে; তখন বালকবালিকার কথা দূরে থাকুক, অনেক যুবক-বৃদ্ধও এই বিস্তীর্ণ সৈকতে ছুটাছুটি করিবার প্রলোভন অতি কষ্টে সংবরণ করিতে পারেন। সমুদ্রতীরে নানা বিচিত্র বর্ণের কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক পাওয়া যায়; সেগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য নূতন আগন্তুক আমরা অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিতাম; এবং কাহার সংগ্রহ কত ভাল হয়, তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা চলিত।

কক্সবাজারের দক্ষিণপ্রান্তে একেবারে সমুদ্রের বক্ষ হইতে উন্নত পাহাড়শ্রেণী মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের অনাবৃত দেহে রেখার পর রেখা,—নানাবর্ণের বালুকাস্তর সজ্জিত রহিয়াছে; কোথাও কাল মাটীর স্তর; তা'র উপর লাল বালুর স্তর; তার উপর আবার হরিদ্রাবর্ণের বালুরেখা সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গমালা উত্তালভাবে নাচিয়া-নাচিয়া পাহাড়ের তলদেশে পড়িয়া কি যে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহা বর্ণনাতীত। কোনস্থানে তরঙ্গাঘাতে পাহাড় একটু-একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই সব ভগ্ন পাহাড়ের নিকটেই ফ্ল্যাগ্‌ষ্টাফ্ হিল্—Flagstaff Hill। ইহার গায়ে উঠিবার সিঁড়ি কাটা আছে। বিকালবেলা এই পাহাড়ে উঠিলে, পশ্চিমে সমুদ্রের বক্ষে সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা। উত্তরে কক্সবাজার সহরের দৃশ্য (Bird's-eye view)। দূরে 'বাঘখালি' নদী একটা সুনীল রেখার মত চলিয়া যাইতেছে,—আরো দূরে মহিসাখালি দ্বীপ ও আদিনাথ পাহাড়। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামের গিরিরাজি। প্রকৃতির এই অতুল সৌন্দর্য্য দর্শনে নয়ন-মন মুগ্ধ হইয়া যায়। বাস্তবিক, যে বন্ধুবর কক্সবাজারকে পুরী ও বৈদ্যনাথের মিলনক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি কোন-রূপেই অত্যুক্তির দোষারোপ করা যায় না।

সুন্দর দৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা-অসুবিধার কথা না বলিলে চলে না। ভাল হাওয়ার চেয়ে ভাল খাওয়ার দরকার কিছুমাত্র কম নয়। এখানে বাঙ্গালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থান হইতে সুলভ। আতপ চাউল ছাড়া অন্য চাউল দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু টাকায় সাত-আট সের খুব ভাল আতপ পাওয়া যায়। 'লোণাজলের' মাছ বহুবিধ ও যথেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে 'মিঠা' জলের মাছও পাওয়া যায়। তরকারী ও ফল—পেঁপে, কলা, আনারস, আতা, তরমুজ, বেল, লেবু ইত্যাদি অপর্য্যাপ্ত—এক-একটা তরমুজের ওজন ১৫।২০ সের, দেখিবার জিনিষ বটে। খাঁটি দুধ সারা বৎসর টাকায় ৵৫ পাঁচ সের; তবে রুটী, মাখন চট্টগ্রাম হইতে আনাইতে হয়। কাটা মাংস পাওয়া মুস্কিল, কিন্তু ডিম, ফাউল, পায়রা ও হাঁস যথেষ্ট ও সস্তা। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় (necessities) প্রায় সবই পাওয়া যায়; তবে সভ্যতার আলোক তত প্রবেশ করে নাই বলিয়া সখের জিনিষ (luxuries) পাওয়া দুর্ঘট।

এখানকার কূয়ার জল অতি পরিস্কার। Soil বালুময় বলিয়া কলের জলের মতন পরিস্কার অথচ সুস্বাদু। তা' ছাড়া এখানে কয়েকটা পুকুরও আছে। তা'র মধ্যে দুইটি রিজার্ভ করা; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে রিজার্ভ পুকুরের জল ব্যবহারের সপক্ষে মত দেওয়া সঙ্গত বোধ হয় না। আমাদের বাড়ীর পাশেই 'গোলদীঘি' নামে একটি রিজার্ভ্ পুকুর; চারিদিকে রেলিংঘেরা, পাকা বাঁধান ঘাট, কলিকাতার গোলদীঘির মতন চতুষ্কোণ নয়, বাস্তবিকই সার্থকনামা গোল; কিন্তু পুকুরটি কি রকম রিজার্ভ্, তাহা বোধ হয় মিউনিসিপাল্ কর্ত্তাদের অবিদিত নাই! প্রত্যহ শতাবধি লোক—মায় মেথর অবধি, দুবেলা ইহার শীতল জলে "আয়ান্" করিয়া থাকে। তদন্তে জানা গেল যে, 'রিজার্ভ্' লিখিত সাইন্‌বোর্ড্‌খানা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চুরী যায়, অথবা দীঘির তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে; তাই কর্ত্তারা দু-একবার চেষ্টা করিয়া এখন আর সাইন্‌বোর্ড দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করেন না। যথেষ্ট ভাল কূয়া আছে, তাই পুকুর রিজার্ভ্ রাখা বিষয়ে কেহই কড়া পাহারার দরকার মনে করে না।

যাহাদের শীকার করিবার সখ ও অভ্যাস আছে, তাহাদের নিকট কক্সবাজারের নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলির তীব্র

আকর্ষণীশক্তি আছে। হরিণ ও বন্য পাখী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিছু দূরে গেলে, বাঘ ও হাতীর দর্শনও দুর্লভ নয়। প্রায় ৩।৪ মাস হইল, কক্সবাজার হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে দুইটী খেদাতে প্রায় দশটী হাতী ধরা পড়িয়াছে।

এ স্থানটী এখনো যদিও বাঙ্গালীদের নিকট তেমন পরিচিত হয় নাই, কিন্তু চট্টগ্রামের সাহেব-মহলে ইহার খুব সুখ্যাতি আছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের ত কথাই নাই, তাঁহারা মফস্বল যাওয়ার সুবিধা পাইলেই কক্সবাজারে কয়েকদিন না কাটাইয়া যা'ন না। সমুদ্রস্নান ও শীকারের লোভে শীতকালে দলে-দলে সাহেব মেম এখানে আসিয়া থাকেন। এমন কি, আমাদেয় সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর কারমাইকেল্ সাহেবও এখানে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সেদিন মাত্র তিনি এখানে আসিয়া স্থানীয় পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীতে ২০০৲ দুইশত টাকা দান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কক্সবাজারের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান; সদাগর ও চাকুরে, তালুকদার ও গৃহস্থ, মুটে ও মজুর, মৎস্যজীবী ও নৌকাজীবি,—প্রায় সব কাজেই তাহাদিগকে দেখা যায়। সমুদ্রের উপকূলে থাকে বলিয়া ইহাদের একটা উদ্যম, সাহস ও জীবনীশক্তি আছে। সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া ইহারা দেশবিদেশে যায়, আবার ছোট-ছোট সাম্পানে চড়িয়াও অকুতোভয়ে সমুদ্রে চলিয়া যায়। "বলী" খেলা বা কুস্তির লড়াই চট্টগ্রাম জেলার একটি বিশেষত্ব; মুসলমানদের মধ্যেই বড়-বড় বলী বা কুস্তিগির পালোয়ান দেখা যায়।

কার্য্যোপলক্ষে অনেক হিন্দু এখানে বাস করিয়া থাকেন। আপিসের কেরাণীবৃন্দ, উকীল ও মোক্তারদের মধ্যে অধিকাংশই চট্টগ্রাম জেলার পটীয়া থানার অধিবাসী; পটীয়া থানা এই জেলার মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ও শিক্ষিত।

কক্সবাজারের অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু এখানকার মগ অধিবাসীদের কথা না বলিলে, সব কথাই যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাস্তবিক কক্সবাজার দেখিয়া আমাদের বর্ম্মা যাওয়ার সাধ অনেকটা মিটিয়াছে। কারণ, এখানে একটি বার্ম্মিজ সহরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিরাজ করিতেছে। এখানকার মগদিগকে প্রকৃতপক্ষে 'বার্ম্মিজ্' না বলিয়া 'আরাকানিজ্' বলা যাইতে পারে। তাহারা প্রায় শতাধিক বৎসর যাবৎ আরাকান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছে। জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহারে তাহারা ব্রহ্মদেশের লোকের মতনই। এখানে প্রায় ৬।৭ শত ঘর মগের বাস। "মগের মুল্লুক" বলিয়া আমরা তাহাদিগকে কত না বিদ্রূপ করিয়া থাকি; কিন্তু এখানে আসিয়া তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা, বিশেষতঃ মগরমণীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও কর্ম্ম-পটুতা দেখিয়া অনেক সময় লজ্জা পাইতে হইয়াছে।

মগেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার বা তাহাদের অন্য কোন পরিচয় পাওয়ার পূর্ব্বেই দেখি, আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া নানাবর্ণে চিত্রিত লুঙ্গি-পরিহিতা, ওড়্না-মাথায়, "কলসীকাঁখে" দলে দলে মগরমণী চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা দু'বেলাই এইভাবে পাহাড়ের গায়ে ঝরণা হইতে জল আনিতে যায়; তাহারা কূয়া বা পুকুরের বদ্ধ জল পান করে না। মগরমণীর পোষাক ব্রহ্মরমণীর মতনই লুঙ্গি ও কুর্ত্তা; তবে এখানে হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী আছে বলিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, তাহারা বাহিরে যাওয়ার সময় মাথা ও কাঁধ ঢাকিয়া ওড়্না পরিয়া থাকে।

মগরমণীদের এই প্রথম দর্শনেই তাহাদের কর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া গেল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় (বৃষ্টির সময়ও তাহাদিগকে ছাতা নিয়া জল আনিতে দেখিয়াছি) ভোর না হ'তে যাহারা পাহাড়ের ঝরণা হইতে জল আনিতে পারে, তাহারা যে আলস্যে দিনযাপন করে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; বাস্তবিক কাজেও তাই। ভোরে ৪টার সময় যখন তাহাদের ধর্ম্মমন্দির বা কিয়াংঘরে ঘণ্টা বাজে, তখনই তাহারা কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দেয়। তারপর সারাদিনই ব্যস্ত। তাহারা 'ঘরে-বাইরে'র সব কাজ করে, আবার সময় পাইলেই তাঁত লইয়া বসে। প্রত্যেক মগ-বাড়ীতে অন্ততঃ একটি করিয়া তাঁত আছে। মগরমণীরা নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় বয়ন করিয়া, বিক্রীর জন্য অনেক লুঙ্গি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা সারাদিনই মৌমাছির মতন ব্যস্ত—আর মগ-পুরুষেরা হচ্ছেন পুরুষ মৌমাছি, (Drones) প্রায় কোন কাজেই লাগেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ (অবশ্য with a few exceptions) চায়ের দোকানে চা পান করিয়া, অথবা বিশ্রামাগারে শুইয়া বসিয়া (পরিশ্রম করুন আর নাই বা করুন, প্রত্যেক মগপল্লীতে পুরুষদের জন্য একটি বিশ্রামাগার আছে), কেহ

মদের দোকানে মদ খাইয়া, আর কেহ বা বাড়ীতে আফিং সেবন করিয়া দিনযাপন করেন। মগপুরুষদের এ অবস্থা দেখিয়া, খবর লইয়া জানিলাম যে, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে ছয়মাস নানাস্থানে তামাক, সুপারী ও কাঠের কারবার করিয়া বাকী ছয়মাস বাড়ীতে বসিয়া এইভাবে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মগপুরুষদের মধ্যে মদের প্রাদুর্ভাব ও রমণীদের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কোনপ্রকার দুর্নীতির কথা শোনা যায় না—মগরমণীরা এমনই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ। কিন্তু ইহাদের সমাজে বিবাহভঙ্গ (Divorce) অতি সহজেই ঘটিয়া থাকে। শ্বশ্রু ও বধূর মনের মিল না হওয়াতে, স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন ঘটনা বিরল নহে। এই পরিত্যক্তা স্ত্রী পতিগৃহে ফিরিয়া গিয়া আবার বিবাহিতা হয়, তাহাতে সমাজে কোন দোষ হয় না।

চুরুট সেবন মগেদের একটা রোগবিশেষ। এক মগ-বাড়ীতে একদিন 'লুঙ্গি' অর্ডার দিতে গিয়াছি, এমন সময় দেখি ৪।৫ বৎসরের একটি ছোট মেয়ে মস্ত একটা মোটা চুরুট টানিতে-টানিতে নির্ব্বিকারভাবে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি ত অবাক! বাস্তবিক, পুরুষ-রমণী, বালক-বৃদ্ধ—সকলেই চুরুটের সমান ভক্ত।

মগপুরুষদের আলস্য ও রমণীদের কর্ম্মনিষ্ঠার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু আর একটা কথা না বলিলে চলে না। ধনী মগেরা মাঝে-মাঝে 'ঘরজামাই' আনিয়া থাকেন। তখন কন্যা পিতার ভবনে বসিয়া স্বামীর দ্বারা ঝরণা হইতে জল-আনা অবধি সমস্ত কাজই সুদে আসলে করাইয়া থাকেন। মগরমণীরা যখন দলে-দলে জল আনিতে যায়, তখন তাহাদের সঙ্গে দু' একটি পুরুষকেও ভারস্কন্ধে যাইতে দেখা যায়। এ হতভাগ্যেরা আর কেহই নহে—ইহারা বিধির বিড়ম্বনায় —পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগী—মগবাড়ীর "গৃহজামাতা"।

মগেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ। ধর্ম্মমন্দির বা কিয়াংঘর প্রতিষ্ঠা করা তাহাদের ইহজগতের চরম আকাঙ্ক্ষা। তাই কক্সবাজারের মতন ছোট সহরেও ৮।৯টি কিয়াংঘর আছে। এগুলি বড়ই সুন্দর প্যাটার্ণে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। কিয়াংঘরে বুদ্ধদেবের অনেক রকম মূর্ত্তি থাকে; কোনটা শ্বেত পাথরের, কোনটা পিতলের, কোনটা আবার কাঠের। প্রায় সবগুলিই ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত। প্রত্যেক মন্দিরে একজন ফুঙ্গি বা পুরোহিত আছেন; তিনি চিরকুমার, শিক্ষিত, গৈরিকবসনপরিহিত, মুণ্ডিতকেশ, সংসারত্যাগী, ব্রহ্মবাসী সন্ন্যাসী। যাহাতে কোনবিষয়েই তাঁহার সংসারের প্রতি আসক্তি না আসিতে পারে, সেইজন্য তাঁহার পানাহার হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়াংঘর পরিষ্কার রাখা অবধি সব কাজের ভার সেই কিয়াংএর অধীনস্থ গৃহস্থেরা পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতে দশ ঘটিকার সময় কিয়াংঘর হইতে কাঠের ঘণ্টা বাজান হয়। তখন মগরমণীরা বিচিত্র পাত্রে করিয়া ফুঙ্গি মহাশয়ের দিবসের আহার্য্য আনিয়া দেয়। কোন কোন মন্দিরের অধীনে প্রায় শতাধিক গৃহস্থ। বাস্তবিক, এক-এক কিয়াং লইয়া এক-এক গৃহস্থপল্লী। ফুঙ্গিরা ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া দীক্ষিত হইয়া আসেন। সকলের পক্ষেই ফুঙ্গি হওয়া সম্ভব; কিন্তু ফুঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হইতে হইলে পরিবার-পরিজন ছাড়িয়া, অবিবাহিত থাকিয়া বিশেষরূপে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে হয়। ফুঙ্গিরা প্রত্যহ স্ব স্ব পল্লীর বালকদিগকে কিয়াংএ বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা দান করেন। বিশেষ কাজ ব্যতীত তাঁহারা মন্দিরের বাহিরে যাইতে পারেন না। ব্রহ্মদেশসম্বন্ধে লিখিত অনেক পুস্তকে 'ফুঙ্গিদের' অনেক কুৎসা পড়িয়াছি। এমন কি 'A Bachelor Girl in Burma'—নামক পুস্তকের লেখিকা একস্থানে লিখিয়াছেন—"ফুঙ্গিরা যেভাবে চর্ব্ব্য চুষ্য-লেহ্য পেয় সম্ভোগ করিয়া অলস-জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের বিশেষ অনিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু অনেক ফুঙ্গি মহাশয় আমার পানে ফিরিয়া তাকাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তবে ইংরেজ রমণী বোধ হয় তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে রমণীপদবাচ্য নহে ইত্যাদি।"—আমরা কিন্তু কক্সবাজারের কোন ফুঙ্গির বিরুদ্ধে কোন কুৎসা শুনি নাই। মগেরা ফুঙ্গিদিগকে যেমন নরদেহে দেবতার মত পূজা করে, তেমনি আবার যাহাতে তাঁহাদের পদস্খলন না হয়, সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখে।

কোন-কোন ফুঙ্গি একটু-একটু ইংরেজী ও বাঙ্গালা জানেন; কেহ বা দু'এক পদ সংস্কৃতও আবৃত্তি করিতে পারেন। একদিন এক কিয়াংএ গিয়া ফুঙ্গি মহাশয়কে বলিলাম—"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।" অমনি তিনি পাদপূরণ
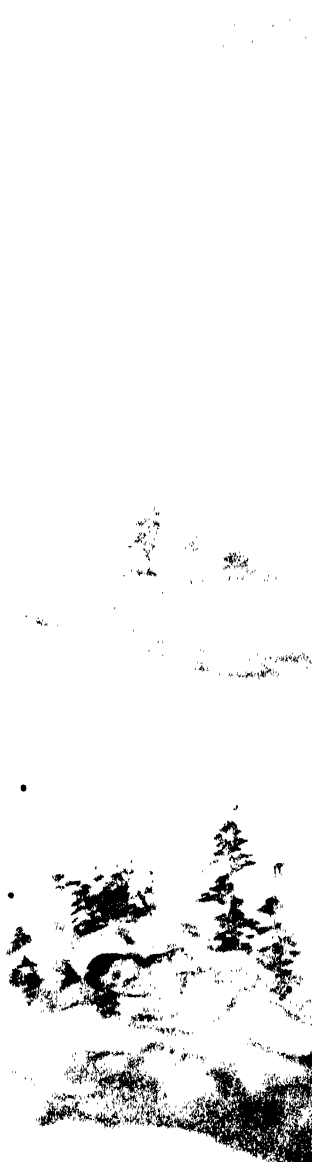
করিয়া বলিলেন "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। তারপর হাসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যা এই তিন পদেই সীমাবদ্ধ।

মগেদের মধ্যে অশিক্ষিত লোক নাই বলিলেও হয়। বালকেরা কিয়াংঘরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, বড় হইলে স্কুলে যায়। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় আছে। বালিকারা ফুল বড় ভালবাসে। বাজারে ফুল বিক্রয় হয়,—ছোট ছোট মেয়েরা ফুল দিয়া মাথায় বড় সুন্দর অলঙ্কারের মতন করিয়া পরিয়া থাকে।

মগেদের বাড়ীগুলি সব এক প্যাটার্ণে নির্ম্মিত। তাহারা কখনো মাটিতে ভিত নির্ম্মাণ করে না; বাঁশের বা কাঠের মাচার উপর তাহাদের ঘর। এই মাচাগুলি তিন ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। কোন-কোন বাড়ীর মাচার নীচে হাঁটিয়া বেড়ান বা বসিয়া কাজকর্ম্ম করা যায়, জিনিষ পত্র রাখা বা অন্য নানারকমে ব্যবহার করা যায়। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা কাঠের পাটাতন তৈয়ার করিয়া, কাঠের ঘর প্রস্তত করে; কখনও পাকাবাড়ী প্রস্তত করে না; সেগুন কাঠের বাড়ীগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি মজবুত। এরূপ এক-একটা ঘর করিতে প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা খরচ হয়।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের ৭।৮ তারিখ পর্য্যন্ত মগপল্লীতে বাৎসরিক উৎসবের ধূম পড়িয়া যায়। এই সময় বুদ্ধদেবকে স্নান করান উপলক্ষে, তাহাদের জলখেলা উৎসব হয়। পশ্চিমে যেমন 'হোলি' খেলার সময় আবালবৃদ্ধবনিতা মাতিয়া যায়, এখানেও তেমনি; তবে জলের সঙ্গে রং দেওয়া হয় না। তখন মগ-পল্লীতে বেড়াইতে গেলে প্রায় স্নান করিয়া আসিতে হয়। প্রত্যেক পল্লীতে একটী করিয়া কেন্দ্র; সেখানে একটী বড় নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া জলে পূর্ণ করা হয়। এই জল-পূর্ণ নৌকাতে মগরমণীরা বসিয়া সকল আগন্তুকের গাত্রে জল ছিটাইয়া দেয়। মগযুবকেরা দলে-দলে নৌকার সম্মুখে আসিয়া গান গায়, জল দেয়, আবার নিজেরাও জলাভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। এই সময়ে তাহারা প্রসেশনে সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে অত্যন্ত ভালবাসে। তাহাদের বিবাহে প্রসেশন, শবদেহের সঙ্গে প্রসেশন, উৎসবে প্রসেশন,—কোন একটা সুযোগ হইলেই প্রসেশন। প্রথমতঃ বালক-বালিকারা, তারপর কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, অবশেষে যুবক বৃদ্ধ—সকলেই উৎকৃষ্ট সাজে সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পল্লী হইতে কিয়াংঘরে, অথবা এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে চলিয়া যায়।

মগেদের নিকট মৃত্যুর কোন বিভীষিকা নাই। মৃত্যুতেই যে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাই মৃত্যুতে ইহাদের আনন্দ। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ, যখন কোন ফুঙ্গি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন। ফুঙ্গির সৎকারের জন্য বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি ঐ দিনের পূর্ব্বে ফুঙ্গি মহাশয় ইহলীলা সংবরণ করেন, তবে সৎকারের দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার এ পার্থিব দেহটীকে অতি যত্নে বিশেষভাবে রক্ষা করা হয়। ফুঙ্গিদেহের সৎকারের সময় মগেরা যে অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে মগ্ন হয়, এখানে তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে, সম্পাদক মহাশয় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' বলিয়া তাড়া করিবেন।

মগদের মত রক্ষণশীল জাতি খুব কমই আছে। একটা নূতন কিছু করিতে হইলে সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তাহারা নিজেদের "দাদা আদম" কালের তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে। তাই ডিষ্ট্রীক্‌ট্ বোর্ড তাহাদিগকে ফ্লাই-শাট্‌লের কাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা তাঁতের স্কুল খুলিয়াছেন। কিন্তু মগেরা শিক্ষা করিতে নারাজ। প্রথমে ত তাহারা উইভিং স্কুলের ছায়াও মাড়াইতে চাহে নাই; এখন যদিও কয়েকটি মগরমণী বৃত্তির লোভে তাঁতের স্কুলে 'শ্রীরামপুরী' তাঁতে কাজ শিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে, তথাপি নিজেদের বাড়ীর তাঁতে ফ্লাই শাট্‌ল্ (Fly shuttle) ব্যবহার করিতে চাহে না। তবে এই স্কুলের অক্লান্তকর্ম্মী শিক্ষক মহাশয় নিজে মগভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতেছেন, যে, তাহারা এখন আর স্কুলটীকে তত সন্দেহের চক্ষে দেখে না। তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই মগরমণীরা নিজেদের তাঁতে ফ্লাই শাট্‌ল্ ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

কক্সবাজারের কথা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথাও বলিলাম। এই সুন্দর সহরটীতে চিরনূতন দৃশ্য দেখিয়া সমুদ্রের হাওয়ায় প্রায় তিন মাস কাটাইয়া যখন গৃহাভিমুখে ফিরিতে চাহিলাম, তখন মনে কি এক বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস আরম্ভ হইয়াছে, কখন্ বর্ষাকালের মনসুন্ (monsoon) আরম্ভ হয় ঠিক্ নাই—এখানে থাকার জন্য আর থাকা সঙ্গত বোধ হয় না। তাই ইহার একটা মধুর স্মৃতি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৩৭)

ভোঁতা কাটারিখানা বাঁটনাবাটা শিলে ফেলিয়া বিহারি তাহা শানাইতেছিল, এমন সময় অপর্ণা কলসী-ভরা জল আনিয়া, দুম করিয়া পিত্তল কলস তাহার অদূরে নামাইয়া, রোষপূর্ণ তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "তোমার মতলব তো আমি কিচ্ছুই বুঝতে পারলাম না বেহারিদা; কি যে তুমি মনে-মনে ঠাউরে রেখেচ, তাই বলতো ?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে সম্ভাষিত হইয়া কার্য্যে তন্ময়চিত্ত বিহারি কিছু চমকাইয়া গিয়াছিল। প্রথমে সে কতকটা বিস্ময়ের সহিতই মুখ তুলিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বিশ্বাসী হৃদয় সন্দেহের ছায়া দূরে সরাইয়া লঘু হইয়া আসিল। মৃদু হাসিয়া সে আবার নিজের হাতের কাজ ফিরিয়া আরম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দিদি ?"

"'কেন দিদি' কি বেহারি-দা? কিছুই কি তুমি জানো না! সত্যি বলচি, তোমার ও ন্যাকামি আর আমার ভাল লাগচে না, বেহারিদা! সব্বাই যা জানে—তুমিই কি এমনি খোকা যে, তোমাকেই কেবল তা বুঝিয়ে দিতে হয় ?"

অপর্ণা ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া রহিল,—কাপড় ছাড়িবার জন্য শীঘ্র যে সরিয়া যাইবে, এমন তাহার গতিক দেখা গেল না। আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া-ঝরিয়া পায়ের তলার মাটি ভিজিতেছিল এবং সেই জলে লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্নের মতই ছোট দুটি পায়ের দাগ ভিজা মাটিতে আঁকিয়া যাইতেছিল। বিহারি চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানা খুব কঠিন, হাসি-তামাসার লেশও সেখানে নাই। দেখিয়া সে ঈষৎ ভীত হইল; মাথা নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"কি করেছি তাই বলো ?"

অপর্ণা এ প্রশ্নে আরও রাগিয়া গেল। সে আরও তীব্র ভাবে বলিল—"নাঃ! কিছুই তুমি করোনি! বল্‌বো আবার কি? লোকে কি তোমায় কোন দিন কিছুই বলে না? তোমার জন্যে আমি তো আর যেখানে যখন থাকবো, পাঁচজনের কাছে সেখানেই এত বাক্যযন্ত্রণা সইতে পারিনে। হয় একটা ঝি রাখ,—যাতে আমায় ঘাটে-পথে না বার হতে হয়—না হয়, এর যা হোক একটা কিছু বিহিত তুমি শীঘ্র করে' করো,—"

"আমার জন্যে তোমায় কথা শুনতে হয়!"

বিহারির মুখখানা পাংশু হইয়া গেল,—বেদনাহত-ভাবে সে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেওয়ালটা চাপিয়া ধরিল—সে যেন বেত্রাহত হইয়াছিল। অপর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া ছিল; সে তাহার এই অবস্থা দেখিল; কিন্তু তাহাতে সে একটুও নরম হইল না। তেমনি তীব্র কণ্ঠেই আবার কহিল—"হ্যাঁ,—তোমার জন্যে নয় তো কার জন্যে? কেন তুমি আমায় গলগ্রহ করে রেখেছ? নিশ্চয় তোমার নিজের এতে কিছু স্বার্থ আছে—তা না হলে, কি জন্য তুমি এমন চুপচাপ বসে আছ? আমারও এ আর ভাল ঠেকচে না।"

বিহারি এতক্ষণ পরে যেন হাঁপ লইতে গেল। একবার উচ্চ পরিহাসের হাস্যে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছাও তাহার মনে অতর্কিতভাবে জাগিয়া ছিল,—কিন্তু কণ্ঠ হইতে রুদ্ধশ্বাসটাও লঘু হইয়া বাহির হইল না; আর, সে হাসিটাও কোথা দিয়া যেন কোথায় চলিয়া গেল। অধিকন্তু, কণ্ঠ ঈষৎ বুজিয়া আসিল। কিছুক্ষণ সে অবরুদ্ধবাক্ হইয়া থাকিয়া পরে সকরুণ কণ্ঠে উত্তর দিল—"খুঁজচি তো দিদি, পাচ্চি কই? ভাল ঘর-বর পেলে কি আর দেরি করি? আমার কি অসাধ!"—বলিতে-বলিতে হঠাৎ তাহার যেন কান্না আসিতে লাগিল; সমস্ত পৃথিবীর লোকের উপর অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিতে লাগিল,—অপর্ণার উপরেও এই প্রথম দিন তাহার বড় অভিমান হইল। বিবাহটা এতই কি প্রয়োজনীয় যে, দেশ-বিদেশে সকল-কারই সে জন্য এতটা মাথাবাথা পড়িয়া গিয়াছে? আর,

অপরে না হয় যা বলিতে হয় বলুক, শেষে পাঁচজনের কথায় অপর্ণাও কি না সেই বিবাহের জন্য এমন করিয়া ত্বরা করিতে বসিল?

বিবাহ করিয়া সে পরের সংসারে চলিয়া গেলে, এই নিঃসহায় অভাগা বিহারির কি দশা হইবে? এ কথা অপর দশজনের মত তাহার কাছেও কি তা' হইলে তেম্‌নি কিছু না। কিন্তু তাহার এ মৌন অভিমানের গোপন ক্রন্দন অপর্ণার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিল না। সে খাপরার আগুনের মত তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়াই গনগনিয়া জ্বলিতেছিল। ঘাটে জল আনিতে গিয়া ইতঃপূর্ব্বেও মধ্যে-মধ্যে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছিল, কিন্তু আজ সে অপমানের অগ্নি প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বেহারির সহিত তাহার সম্বন্ধ লইয়া আজ এক ধনী-গৃহিণী বড় একটা কঠিন পরিহাস করিয়াছেন। তিনি আর-এক-জনকে শুনাইয়া বলিতেছিলেন, "বুড়োটার মনে মতলব,—এর পর ঐ ছবিছবি চেহারাখানির জোরে তেতালা কোটা-বালাখানা ওঠাবে! তা' বুঝ্‌চনি!" সে তখনও তাই দ্বিগুণ ঝাঁঝিয়া কহিল "কাকে তুমি বোকা বোঝাতে চাও, বেহারিদা? আমি কি এতই ন্যাকা যে, তোমার ঐ ছেলে-ভুলান কথায় গলে যাব? আমি সব বুঝি!"

এইটুকু শুনিয়াই বিহারির বুক ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল। অপর্ণা হয় ত তাহার এই গোপন দুর্ব্বলতাটি ধরিয়া ফেলিয়াছে। বুড়া হইয়া যে বিহারি নিজের কথা এতখানি ভাবিতে শিখিবে—ইহা এক সময় তাহার নিজের কাছেই যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! আর আজ অপরের [illegible] বুঝিতে পারা কঠিন হয় না? এতই তাহার অধঃপতন হইয়াছে? হায়, হায়! মানুষ কিসের লোভে তবে এ বুড়ো বয়স অবধি বাঁচিতে চাহে—যদি তাহার দীর্ঘ জীবন উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিরই কারণ হয়?

অপর্ণা আপনার আগুনে আপনি জ্বলিতে-জ্বলিতে, কোন কিছু না মানিয়াই কহিয়া যাইতে লাগিল,—"যথার্থ চেষ্টা করিলে না কি আবার কারু বিয়ে হতে আটকায়? কেন, বাংলাদেশে কি এখন আর কারু তৃতীয় পক্ষেও বউ মরে না না কি? এ দেশের মেয়েরা বুঝি আজকাল মার্কণ্ডের প্রমাই পাচ্চে? জাত-মানের ভয় থাকলে সবই হয়। ফরমাস দিয়ে গড়তে দিলে গড়া শেষ হতে অবশ্য যুগ উল্‌টে যেতে পারে। শোন বেহারিদা, এই আমি তোমায় সোজা কথা বলে দিচ্চি বাবু, আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি তুমি কোন ঘাটের মড়াই হোক—আর যা-ই হোক, একটি না যোগাড় করিতে পারো, তাহলে ভাল হবে না, বলে রাখলুম।"

এই কথা শেষ করিয়াই অপর্ণা দ্রুতপদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল; এবং অনেকক্ষণ দেরি করিয়া কাপড় বদলাইয়া আসিয়া দেখিল, যেখানে যে অবস্থায় বিহারি ইতঃপূর্ব্বে দাঁড়াইয়া ছিল—এখনও ঠিক তেমনি রহিয়াছে—একটুও নড়ে নাই। কাছে আসিয়া সে ঈষৎ দয়ার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল—"বেহারিদা?"

বিহারি বিষণ্ণ, শুষ্ক মুখে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু তাহার সেই সদানন্দ হাসিটুকুর সহিত সাগ্রহ—"কেন দিদি?" আজ তাহার বিমর্ষ অধর ভেদ করিতে পারিল না।

"আমাকে নিয়ে তোমার অনেক জ্বালা, তা জানি—বেহারিদা,—কিন্তু কি করবে? আর জন্মে নিশ্চয়ই আমরা তোমার পাওনাদার ছিলেম; তা না হলে কি কেউ কারু কাছ থেকে শুধু শুধু এমন করে আদায় করতে পারে? তা যাই হোক দাদা, এখন এ আপদের একটা শান্তি করে ফেল। তুমিও ঘাড়ের বোঝা ফেলে বাঁচো, আর লোকেও একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচুক।" নিজের কথা সে এই সঙ্গে কিছু উল্লেখ করিল না।

নিষ্ফল রোষে জ্বলিয়া মরিতে-মরিতে যদি একটা ঝাল ঝাড়িবার পাত্র মিলে, তবে অতিবড় নিরীহও তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। অপর্ণার কথায় বিহারি হঠাৎ তেম্‌নি ক্রুদ্ধ উৎসাহে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—"লোকের কেন এত মাথাব্যথা? বলুকগে লোকে যা বলতে হয়। যা'রা লোকের অবস্থা দেখে না, শুধু বলার সুখে বলে,—আমি তাদের মানুষ বলে মনে করিনে।" বলিতে-বলিতে তাহার শিরাসঙ্কুল শীর্ণ হস্ত মুষ্টি বাঁধিয়া উঠিল;—মনে হইল যাহারা অপর্ণাকে বাক্য-যন্ত্রণা দিয়া তাহার বিবাহ-বিতৃষ্ণ চিত্তকে বিবাহের সপক্ষে এতখানি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের হাতের কাছে পাইলে, সে বোধ করি গুলা টিপিয়াই মারিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মারিলে আর কি হইবে? তাহাদের উপ্ত বীজ অপর্ণার চিত্তোদ্যানে এমনি কঠিনভাবে অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছে যে, সে যে আর শুকাইয়া মরিবে—এমন আশা ভরসাই নাই। তাহার কথায়

অপর্ণা আবার একটু কঠিন হইয়া উঠিল। নীরস স্বরে সে কহিল—"তুমি লোকের কথা বড় মনে না করতে পারো—তুমি পুরুষমানুষ; তোমার তাতে ক্ষতিই বা কি? কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, আমি লোকের কথাকে অতটা তুচ্ছ করতে পারিনে। যে স্ত্রীলোক দুর্নামকে ডরায় না, সে এই স্বর্গে-মর্ত্তে আর কাকেই বা ভয়ডর করে? আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, বেহারিদা; তুমি যেমন করে হয়, এই মাসেই বিয়ের ঠিক করে ফেল। আর দেরি করোনা। দেখ না খবর নিয়ে,—কারু বউটউ এই এত বড় সহরের ভিতরে কি আর মরেনি? কত তো অমন আথসার শোনা যায়। খোঁজ নিলেই পাবে এখন; লক্ষ্মিটি, একবার যাও দেখি।" শেষ দিকটায় তাহার আদেশের স্বর অনুরোধের ভাব ধারণ করিয়া কতকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল। "কত ঘুরেছ, আরও একটু মনোযোগ করে দেখই না, হয়ে যাবে।"

বিহারি এবার বুঝি সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও কি বেহারিদা, বেটাছেলের চোক অমন পান্‌সে কেন? আচ্ছা বেহারিদা, আজ আমি দুটো উচিত কথা বলেচি বলে,—যেন তোমার পরে কতই অবিচার করা হয়েচে—এমনি ধরণটা করে যে তুমি কাঁদলে? কিন্তু তুমি নিজেই যখন না-হোক পঞ্চাশটে বর ধরে-ধরে বেড়িয়েছিলে, তখন তো কই তোমার চোক দিয়ে এক ফোঁটাও জল বার হয়নি? সাধ করে কি বলি, বেহারিদা, লোকে যা বলে তা হয় তো সবটা মিথ্যে না,—সত্যি হয় ত আজকাল তোমার সে গঙ্গাজলে ধোয়া মন আর নেই,—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকে বোধ হয় তোমার—"

"দিদিমণি! দিদিমণি! চুপ করো, চুপ করো; ছি ছি! কি বলতে যাচ্চো তুমি? ছি ছি, ও কি বলচো!" বিহারি অকস্মাৎ যেন সর্ব্বশরীরে কাঁপিয়া আপনার বুকখানা ফাটাইয়া বুকের ঝরা রক্তের মতই এই কথা কটার সঙ্গে বাহির করিয়া দিল। তাহার দাঁতে-দাঁতে ঘষিয়া শীতার্ত্তের মত তা' হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছিল। চোক-মুখ যেন তাহার এক মুহূর্ত্তে কোথায় বসিয়া গিয়াছে। পা-দুটা এমন কাঁপন কাঁপিতেছে—যেন চৌচাপটে এখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। অপর্ণা চুপ করিয়া তাহার সেই ছাইএর মত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—কিন্তু তা দেখিয়া সে যে লজ্জা পাইয়াছে, এমন তো কোন লক্ষণই বোধ হইল না! তাহার হাতের তীরটা যে অব্যর্থ-লক্ষ্যে তাহারই বুকের ভিতরে গিয়া বিঁধিয়াছে—ইহা বুঝিতে তাহার কিছুই অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু বুঝিলে কি হয়—শিকারে গিয়া আবার কাহার কোথায় ছিন্ন-পক্ষ, ভিন্ন-বপু শিকার করা পাখীর শোণিতাপ্লুত মূর্ত্তি দেখিয়া আদি কবির মত করুণা-বিগলিত চিত্তে অক্ষয় রত্নের স্রষ্টা পদ-প্রাপ্তি ঘটে? মারিবার জন্যই তো জল্লাদ ফাঁসের দড়ি টানিয়াছে,—তাহাতে মুমূর্ষুর চোক দুইটা কপালে উঠিল বলিয়া এখন চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিলে যে তাহার মত এত বড় হাস্যরস আর কিছুতেই সৃজন করিবে না! সে আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে-আস্তে রান্নাঘরের পানে ফিরিল।

বিহারি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। অপর্ণা যে তাহাকে এত বড় অবিচার করিতে পারে,—এ সন্দেহের কাঁটাটুকু তাহার মনের গোলাপের পাশে সে এতদিন অনুমান করিতেও পারে নাই। আজ সেই কাঁটা ভীম-রুলের হুলের মতই তখন তাহাকে বিঁধিয়া-বিঁধিয়া জর্জ্জর করিয়া দিল,—তখনও তাহার কেবলই সন্দেহ আসিতে লাগিল,—হয় ত এ হুলের বিষটা তাহার নয়,—এ হয় তো আর কাহারও। কিন্তু যাহারই সে ধার করা হউক,—সে বিষে বড় তীব্র জ্বালা এবং তাহাকে আজ ইহা যথার্থই বড় জ্বালাই দিয়াছিল।

সেদিন সমস্ত বেলা কাটাইয়া দিয়া, আফিস-ফেরৎ বাবুদের মতই, অভুক্ত বিহারি অপরাহ্নের দিকে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিলে—শোবার ঘরের দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া অপর্ণা তাহাকে আর একচোট বকিল। সে মুখ ভার করিয়া বলিতে-বলিতে আসিল,—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে, বেহারিদা? আজ আর হাঁড়ি হেনসেল কি উঠবে না না কি? তোমার দিন-দিন যে আক্কেল-বুদ্ধি কি রকমই হচ্চে,—তা যদি আমি কিছু বুঝতে পারি!"

সে দুম্ করিয়া একখানা পিঁড়ি পাতিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া সেইখানে ঠুকিয়া বসাইয়া দিল। "দুবেলার খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে নাও,—"

বিহারির এতক্ষণে ভাল করিয়া সব কথা মনে পড়িল। আজ সারাদিনটা তাহার উপবাস গিয়াছে বটে! তা যদি,—লজ্জায় তাহার শুষ্ক মুখ শুকাইয়া তুলসীপাতা হইয়া

গেল।—"তোমারও তো তা'হলে খাওয়া হয়নি? তুমি কেন—"

'তুমি কেন'র পর আর কি বলিবে—তাহা সে বেশ সঙ্গত করিয়া লইতে না পারিয়া ঐখানেই চুপ করিয়া গেল। কি বলিলে কি ঘটে, তাহা তাহার বেশ জানাই আছে।

আজ কিন্তু তাহা ঘটিল না। অপর্ণা ভাত বাড়িতে-বাড়িতে ঘরের মধ্য হইতে জবাব দিল "আমার কি, আমার অনেককাল খাওয়া হয়ে গেছে,—আমি তো আর নেশা-ভাঙ্ অভ্যাস করিনে,—যে কাণ্ডাকাণ্ডের মাথা খেয়ে বসে থাক্‌বো।"

অন্য দিন হইলে এ খবরটা হয় ত বিহারিকে একবার রান্নাঘরের দ্বারে উকি পাড়াইত; কিন্তু আজ তাহার মনের যেন সে পূর্ব্বশক্তি ছিল না, তাহার স্থানে এমনি প্রবল একটা অবসাদ জমিয়া উঠিতেছিল যে, যেন তাহারই শূন্যতায় তাহার প্রাণটা একটা পাখীর পালকের মতই লঘু হইয়া গিয়া কোথায় কোন অনির্দ্দেশ্যে ভাসিয়া চলিয়াছিল,—হাওয়ার সহিত যুঝিয়া আকর্ষণ-কেন্দ্র পৃথিবীর বুকে নিজের একটা জায়গা করিয়া লইতেও সে আজ যেন একান্ত অপারগ।

বিহারি বিশেষ কিছুই খাইতে পারিল না। ভাতের গ্রাস চিবাইয়া গলা দিয়া নামাইতে গেলেই, চোক দিয়া তাহার কেবলই জল বাহির হইয়া পড়িতে চায়। মেঘে যেন আকাশটা ভরা, থমথমে হইয়া রহিয়াছে; বর্ষণারম্ভ হইলেই হয়। অপর্ণা তাহার এই আহারে অপ্রবৃত্তি চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। অন্যদিন হইলে সে হয় ত এতক্ষণ [illegible] লইয়া একটা অভিমানের ঝাপটা না মারিয়া থাকিত না। হয় ত বলিত—"আমার হাতের রান্না খেয়ে বেহারিদা, তোমার অরুচি ধরে গেছে,—এইবার তুমি দু'দিন না হয় তোমার মুনিববাড়ী বামুনভোজন করে এসো; আমি কাল থেকে আর রাঁধবো না।"

বিহারির নূতন মনিব,—ঈশানচন্দ্র সারকেল আলিপুরের উকিল। বিহারি তাঁহার কাছে মুহুরিগিরি করিয়াই না তাহাদের দুজনকার এই নূতন সংসারটি চালাইতেছিল! ভগবানের ইচ্ছায় সংসারটিও যথাসাধ্য ছোট, এবং মানুষের কৃপায় ভবানীপুর ও কালীঘাটের মধ্যবর্ত্তী এই জেলেপাড়া ষ্ট্রীটের বাড়ীখানি স্থাপত্যবিদ্যার হাতেখড়ি বলিলেও চলে। মানুষের হাতে এমন কদর্য্য জিনিষ প্রায় গড়িয়া উঠে না। কিন্তু হইলে কি হয়; এই গৃহখানির একটি যে প্রধান গুণ ছিল, সেটিও ত অপর সকল ভাগীদারহীন কলিকাতা অঞ্চলের বাড়ীর থাকে না। তাহা এই যে, বাড়ীটির ভাড়া যথোপযুক্তরূপেই সস্তা। কিন্তু আজ সে হাসি-ঠাট্টার দিক দিয়া গেল না; ইচ্ছা,—শীঘ্র-শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া পড়া। কিন্তু তাহা হইল না। যেমন সেই না-খাওয়ার-নামান্তরমাত্র খাওয়া শেষ করিয়া সে জলের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলিয়াছে, অমনি প্রশ্ন হইল,—

"কি হলো বেহারিদা? কিছু খবর মিল্‌লো?"

তখনি বিহারির হাত কাঁপিয়া, জলশুদ্ধ গ্লাসটা থালায় উল্টাইয়া পড়িয়া, ভাতে-জলে চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া একসা' করিয়া দিল। অপর্ণা ইহাতে এবার আর না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না; হাসিবার জন্য তাহার বুকের মধ্যে—জলে বাতাস লাগার প্রথম হিল্লোলের মত—একটা উদ্বেলোৎক্ষেপ তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু সে যে আজ না হাসিবার প্রতিজ্ঞায় নিজেকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে; তাই দাঁতে-ঠোঁটে চাপিয়া সেটাকে কোন মতে নিজের ভিতর হজম করিয়া লইল।

বিহারি এই আকস্মিক বিপৎপাতে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও, কিছুক্ষণের জন্য যে এই বিবাহ-পাগলিনী কনের কঠিন সওয়াল হইতে রক্ষা পাইবে—এমন একটা ভরসা সে বড়ই আশার সহিত করিয়াছিল;—কিন্তু দেখিল, সেটা মনে করা মনের বিড়ম্বনাই। পর্ব্বত ছাড়িয়া সিন্ধুর উদ্দেশে প্রবাহিতা নদীর মতই এ মেয়ে নিজের সম্বন্ধে একটা কঠিন পণ করিয়া বসিয়াছে। দেরি যখন আর করিবে না বলিয়াছে, তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু আসিলেও করিবে না। পানদুটি হাতে দিয়া ডাগর চোখে মুখের দিকে চাহিতেই বিহারি আবার আপনাকে যেন অত্যন্ত অসহায় ও দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বুকের শব্দটা এমনি ভীষণ হইয়া উঠিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল—সেটা যেন প্রবল একটা ঝড়ের বেগে তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী তাহারই ওই সুন্দরী ঘাতুকটিকে এখনি কোথায় ঠেলিয়া ফেলিবে। ভয় হইতে লাগিল, হয় ত তাহার বুকের ইষ্টিমারের চাকা-চলার শব্দ সেও এমনি সুস্পষ্ট শুনিয়া, এতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া কি না জানি মনে করি-

তেছে! সেই সব কল্পনা করিতে তাহার মানসিক দুর্দ্দশার যেটুকু বা বাকি ছিল, তাহাও সে ঘটাইয়া তুলিল। তারপর অপর্ণা কিছু বলিতে যাইতেই এবার সে আর নিজেকে সহ্য করাইল না; তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "তুমি রাগ করো আর যাই করো, দিদি, যার তার হাতে দিয়ে আমি তোমায় জলে ভাসাতে পার্ব্বনা। এতে তুমি যতই কেন আমায় মন্দ কথা বল না।"

"কেন বেহারিদা, কি এমন আমি চমৎকার, যে, স্বর্গথেকে বিদ্যাধরকে আমার জন্য নেমে আস্‌তে হবে? কখনও তো তোমার তিনকুলে কেউ ছিল না! তাই একটা বানরী পুষে তার আদিখ্যেতাতেই তুমি অস্থির হয়ে গেলে"—বলিতে-বলিতেই অপর্ণা আবার বেশ স্পষ্ট-সুরে—"ওমা বেরাল না কি!" বলিয়াই তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে হাঁড়ির ভাতগুলায় একঘটি জল ঢালিয়া দিয়া, ব্যঞ্জনের বাটি ঢাকিয়া সেগুলাকে যথাস্থানে রাখিয়া সেদিনকার মত রন্ধনের সার্থকতা লাভ করিল। নিজে কলসীর জল একঘটি গড়াইয়া খুব খানিকটা গড়গড় করিয়া আলগোছে পেট পূরিয়া, ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে নিজের মাদুরটি বিছাইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া, বিহারিও বাড়ীর শেষ ঘরখানিতে ঢুকিয়া একটি ছিলিম তামাক সাজিতে না বসিয়া, তখনই আবার ছেঁড়া চাদরখানা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। আজ সকাল হইতে জীবন-সর্ব্বস্ব তামাকটুকুর কথা তাহার মনোজগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—কেবলমাত্র স্মরণে আছে যে, অপর্ণা নিতান্ত অকৃতজ্ঞার মত তাহার এই দুঃখের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোন অচেনা, অজানা—যে তাহার সম্বন্ধে ঐ বিরাট স্তব্ধ আকাশখানারই মত, ঐ প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বটগাছেরই মত উদাসীন,—তাহারই অপরিচিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত, সংসারে চলিয়া যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে; এবং সে যতক্ষণ এই নির্ব্বান্ধব নিরাত্মীয় বিহারিকে এই একমাত্র শেষ অবলম্বনের যষ্টিটুকু হারা না করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ তাহার মুখে আহার এবং চোখে নিদ্রা নাই এবং থাকিবেও না।

তা, দু'দিন পরে এই পরের ঘরে তো যাইতেই হইত,—বিহারিই তো এতদিন তাহার জন্য এই পরের ঘরখানি দশদিক উল্‌টাইয়া খুঁজিতেছিল। কিন্তু যাহা অতি অবশ্যই হইত,—তাহার জন্য এতই ত্বরা কেন? যে দিন কটা এই অভাগা বিহারির ভবিষ্যতের বাকি ক'টা দিনের নিঃসঙ্গ শূন্যতার জন্যই সে কৃপণের মত পরমোল্লাসে সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল,—তা হইতে একটুখানি কমাইবার এতই আগ্রহ কেন? অপর্ণার বিবাহের পরদিনের দৃশ্য কল্পনায় চোখে পড়িয়া বিহারিকে এ ক'মাস মধ্যে-মধ্যে কি রকম যে করিয়া ফেলে,—অপর্ণার বর খোঁজার পূর্ব্বের সেই পরমোৎসাহ, সেই নিরাশান্ধকারের তমিস্রায় কোথায় যে বিন্দু হইয়া লোপ পায়! এই দারুণ অপরাধের সন্দেহ হইতে নিজেকে অপর্ণার ঐ শানান খাঁড়ার মত ক্ষুরধার মনের কাছে গোপন রাখা—বিহারির সকল ভাবনাকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। 'অপর্ণার ভাল বরে, ভাল ঘরে বিয়ে হয়,—খুবই ভাল; নহিলে যাহার-তাহার দুঃখের ভাগ বহিতে তাহার কোনখানে গিয়া কাজ নাই'—এই রকম ভাবনাটা মনে জপিতে গেলেই এই ভাবনাটা যে শিকড়ের কাণ্ড—সেই কথাটাই স্মরণে আইসে। অপর্ণার মা'র শেষের চিন্তাধারা কোন্ পথে গিয়াছিল—বিহারি সে কথা জানিত, এবং সে সম্বন্ধে সে তাঁহার অনুজ্ঞাও পাইয়াছিল।—কিন্তু, উঃ—না,—ভগবন্, তুমি কি সত্যসত্যই এতবড় একটা অভিশাপ মার মুখ দিয়া মেয়েকে পাঠাইতে চাহিয়াছ? না না, এ হইতেই পারে না। সে তুমি না, তুমি না,—দুষ্টা সরস্বতী এমনি করিয়াই কুম্ভকর্ণকে ঘুমাইবার বর চাওয়াইয়া পৃথিবীটা ঠাণ্ডা রাখিয়াছিলেন। এ'ও সেই রকম,—এ'ও ঐ রকম একটা কাহার খেয়ালের খেলামাত্র! আর কিছু না। এ ঈশ্বরের পাঠান নয়। মায়ের অন্তিম শুভ আশীর্ব্বাদের পবিত্র মাঙ্গলিক এ নয়,—এ নয়।......অসম্ভব—সে অসম্ভব!

কিন্তু,—তবু এরমধ্যেও একটা "কিন্তু" কোথায় আছে। কিন্তু সে সেই—যা মনে ঠাঁই দেওয়াও চলে না। সে কথাটা না হয় থাকই না।—কিন্তু—তার স্থানে এ'ও তো হইতে পারে,—অপর্ণার মা যখন এই বিহারিকেই মেয়ের সমস্ত ভার দিয়া গেছেন,—আর বিহারির মতন অক্ষমও যখন বাঙ্গালা-দেশে দ্বিতীয় আর একটি জন্মগ্রহণ করে নাই,—তখন অপর্ণা আর কি করিবে? সে যেমন আছে, ঠিক এমনি করিয়াই থাকুক না কেন? যখন তোড়ার মাথায় তাহার জায়গা না হইয়াছে—তখন তাহার গাছের ডালটিই কি গৌরবের স্থান নয়? অনর্থক বৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া বালক-

নখর-ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়ায় লাভ কি? তাই বিহারি একরকম নিশ্চিন্ত হইয়া, মুহুরির কার্য্যের উপর আর কি করিলে তাহাদের সংসারে—এই পেঁচার কোটরে—লক্ষ্মীকে আনিতে পারে—তাহারই ভাবনায় নিজের পাকান চেহারা আরও পাকাইয়া তুলিতেছিল। উকিলবাবুর ছোট জামাই নূতন ডাক্তার হইয়া এ পাড়ায় পসার জমাইবার দুরাশায় 'জেঙ্কিন্স এণ্ড কো' নাম দিয়া এক ডিস্পেন্সারি খুলিয়া বসিয়াছেন। সেই যুবকটির সহিত বিহারির একটা কোন বন্দোবস্তের চেষ্টা চলিতেছিল। দু'চারিটা বিনা ভিজিটের রোগী সে ডাক্তারকে জুটাইয়া দিয়া ঔষধ বিক্রীর হিসাবে দেড়টি টাকা কমিসন পাইয়াছিল, এবং সেটি খরচ করিতেও তাহার বিলম্ব ঘটে নাই। কালীঘাটে অপর্ণাকে লইয়া মা কালী দর্শনে গিয়া সে একটাকা দিয়া একজোড়া ঢাকার সরু শাঁখা তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল। বাকি পয়সা অপর্ণার হাত দিয়া ঠাকুর এবং ভিখারীরই প্রাপ্য হইল।

কিন্তু আজ তাহার সকল স্বপ্ন টুটিয়াছে। অপর্ণা যে নিজের বিষয়ে সহসা এত বড় সজাগ হইয়া উঠিতে পারে, এ সন্দেহ কোন দিন তাহার কল্পনাতেও ছিল না বলিয়াই বুঝি সেটা এমন সহজভাবেই সম্ভব হইল।

(৩৮)

বিহারির 'দিদিমণি' সম্বন্ধীয় অগাধ সাধের মধ্যে একটি সাধ সে মিটাইতে পারিয়াছিল। কোন নবাবী আমলের মহৎ মর্য্যাদার মানদণ্ডস্বরূপ ধনীগৃহের শুদ্ধান্তঃপুর মধ্যে যদিচ অপর্ণাকে পট্ট-ভট্টারিকারূপে স্থাপন করার পরম সুখে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু অ সূর্য্যম্পশ্যা অবরোধবাসিনীর উচ্চ সম্মান হইতে তাহাকে একেবারেই বঞ্চিত করা হয় নাই। এই বাড়ী খানির উর্দ্ধে আর যা থাক না থাক, আকাশ ছিল কি না দেখা যাইত না। বাতাস, রৌদ্র এবং জ্যোৎস্না এ তিন সহচর-সহচরী সম্বন্ধে বলিতে গেলে 'ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকম্নেমা বিদ্যুত ভান্তি' ইত্যাদি রূপ এই শ্লোকটিকে এই বাড়ীটি সার্থক করিয়া তুলিয়াছে—ইহা জোর করিয়া বলা যায়। একদিকে লম্বালম্বিভাবে কাঠের পরদা দিয়া দুইখানি করা একখানি ঘর আর একটি রন্ধনশালা,—অথবা রান্নার চালা; আর দোতলায় একটি চিলের ছাদের ঘর। কল আনিয়া এই বাড়ীর উপর পয়সা নষ্ট করিতে কোন্ বাড়ী-ওয়ালার প্রবৃত্তি হয়? বিশেষ, সে বাড়ী যখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেও খালি পড়িবে না! সেই দিনের আলোর পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য, অর্দ্ধ-অন্ধকার বাড়ীর গৃহিণী অপর্ণার আর কোথাও অভাব বোধ হয় নাই,—কেবল এই জলের অভাবে বাড়ীর বাহির হইতে বাধ্য হওয়ার অপমানটাই তাহাকে প্রত্যেক দিন দুটি বেলাই বাজিত। পলাসডাঙ্গায়, বাকুলে, ত্রিবেণীতে—এ সকল স্থানেই সে ঘাটে-পথে বাহির হইয়াছে, আনন্দের সহিতই বাহির হইয়াছে। কিন্তু আজকাল যখন নিজের মনের কাছে সে একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া অসহায়-বেদনায় বিদ্ধ হইয়া মরিতেছে,—ঠিক সেই সময়েই—ঠিক সেই ব্যথার গোড়াতেই—কেহ খোঁচা দিলে, তাহাতে শুধু যন্ত্রণায় আড়ষ্টই করে না,—বড় রুষ্টও করে। পাশেই একজন মধ্যবিত্ত প্রতিবেশির ঘর; বৈঠকখানার জানালার দুই কবাট খোলা,—ঘরের মধ্যে টেরিকাটা চশমাচোকে বাবুর দল, তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই, যতদূর পারে নিজের-নিজের দুটো-দুটো চোকের দৃষ্টি দিয়া তাহার পিছনে-পিছনে ছুটিয়া চলে। ভাগ্যে ভগবান তাদের গতির সীমা বেশি দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রাখেন নাই, তাই রক্ষা! কিন্তু ভবানীপুরের গঙ্গাতীরের অনতিপ্রশস্ত রাস্তাটিতেও, নারী-সৌন্দর্য্যের ইস্পাতে শীলতার মাথা ঠুকিয়া ভাঙ্গিতে, স্বেচ্ছাব্রতী সেবকের কোন অভাবই দেখা যায় নাই। দ্রষ্টব্য করিয়া ভগবান যে বস্তুটাকে তৈরি করিয়াছেন, তাহার পানে, দেখিবার জন্যই সৃষ্ট যে চোখ, তাহাদের ফিরাইলে বিশ্বনিয়মের কোন্ আইনটা ভাঙ্গা হয়, সে কথা বুঝিতে পারাই যে কঠিন! যেদিন আদিগঙ্গার ঘোলা জলে হাসির ঢেউ তুলিয়া পাড়ার রূপসীরা তামাসার মাত্রা কিছু চড়াইলেন—সেদিন পাশের বাড়ীর বৈঠকখানায় বাড়ীর বাবু একাই ছিলেন, এবং এই একা থাকার সুযোগকে প্রত্যাখ্যান না করিতে পারিয়া, তিনি সরাসর জানালার ধার ছাড়িয়া, দরজার সামনে বাহির হইয়া আসিয়া, গলা খাঁকড়াইয়া, কাসিয়া, পথমধ্যবর্ত্তিনীর দৃষ্টি, এবং বুঝি মনটাও, তাঁহার এই কালো চুলের পরিপাটী করা, সাবানজলে ধোওয়া, লাবণ্যহীন মুখখানার দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একে সেই অপমানে মন ভিজা-কাঠের মত ধোঁয়াইতেছিল, তার উপর আবার তাহাতে একখানা শুষ্ককাষ্ঠের ইন্ধন চড়িল। কাজেই আগুনটা বেশ তেজের

সহিতই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! অপর্ণার একবার কান্না পাইয়াছিল,—কিন্তু কান্না তাহার স্বভাবের বিপরীত। পা ছড়াইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেই ত তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়! সে কাঁদিবে কিসের জন্য? না কাঁদিয়া, সেই অগ্নিমূর্ত্তি তাই সেদিন বেহারিকে দাহ করিতেই ছুটিয়া গিয়াছিল। তা ভিন্ন আর কাহাকে, কোন্ হৃদয়হীন পর, কোন্ অনাত্মীয়ের উপর উক্ত কার্য্য সে সমাধা করিতে যাইবে? তাহার আর আছে কে?

পরদিন ভোরের বেলা পথে দু'একখানা গোরুগাড়ির গাড়োয়ানের সাড়া পাওয়া যাইতেই, অপর্ণা জাগিয়া উঠিয়া, চুপি-চুপি পা টিপিয়া একটা ঘড়া-কাঁকালে ঘাটের পথে বাহির হইয়া পড়িল। পাশের বাড়ীর নির্লজ্জ দৃষ্টির অপমান তাহার সর্ব্ব শরীর-মনে এমনই কাঁটার মত ফুটিয়া রহিয়াছিল যে, তাহার ভয় করিতেছিল,—আর একবার তেমন প্রকাশ্যভাবে যদি সেই দৃষ্টির অধিকারী তাহার প্রাণপণে সঙ্কোচ-কাটান সহজ পথ-চলাটাকে শুদ্ধ বিশ্রী, বিজড়িত করিতে আসে, তা' হইলে বারুদের বস্তার মত সেইক্ষণেই ফাটিয়া পড়া হইতে-হইতে বা সে নিজেকে ঠেকাইয়া রাখিতে না পারিতেও পারে।

পথ খুব নির্জ্জন। মিউনিসিপ্যালিটির মাহিনা-করা মহিষযান, খানকতক গরুর গাড়ি—এম্নি কেহ-কেহ আসন্ন ঊষার বন্দনা-গীতি গাহিয়া উঠিয়াছে মাত্র। ঘাটও জনহীন। ওপারে আলিপুরের উদ্যান-নামধারী অরণ্যে অন্ধকার অতি নিবিড়,—অপর্ণার নির্ভীক চিত্তেও একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। পূবের আকাশপানে মুখ করিয়া, সোণার সূতায় বোনা, চেলিপরা, রাঙাচুণির মুকুট মাথায়, আকাশের সোণার মেয়ে ঊষাদেবীকে প্রণাম করিয়া, সে তাড়াতাড়ি একটা ডুব দিয়া, জলভরা ঘড়া কাঁখে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। তখন পথে অপর কেহই ছিল না; কেবল রাস্তা দিয়া একটা পুরাদস্তুর মাতাল টলিতে-টলিতে, বকিতে-বকিতে, 'রাজা উজির মারিয়া', সারা রাত্রির শেষে ঘরের দিকে চলিয়াছে। আতঙ্কে আপাদমস্তক কাঁপিয়া, অপর্ণা একরকম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াই বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। মাতালটা একটু বেশীরকম মাতাল,—তা না হইলে হয় ত তাহার কাছে একটু নিগ্রহভোগ করিতেই বা হইত!

"ভয় পেয়েছ?—ভয় কি? ও কিছু বল্‌বে না"—পিছনে কথার সাড়া পাইয়া আশ্বস্ত চিত্তে পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখা গেল—মাতাল নয়, কিন্তু পাশের বাড়ীর সেই বাবু! যাহার দর্প ভিন্ন আর কোন কিছুই থাকে না,—ভগবান তাহার সেই দর্পটিকে চূর্ণ করিতে, সকল যুগেই যেন একটু প্রীতির প্রাবল্য দেখাইয়া আসিয়াছেন। বাবুটি তাহারই সাড়া পাইয়া,—অথবা দৈবাৎ—সেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আসিয়াছিল কি না,—তা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অপর্ণা তাহার দত্ত ঐ অভয়বাণী—এবং তাহার দিকে একবারটি ফিরিয়া চাহিবার অনেকখানি আশাযুক্ত উৎসুক দৃষ্টি—দুইটাই আজ নিঃশব্দে নিজের মধ্যে সহিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটে নাই,—বিহারি তখনও ঘুমাইতেছে।

সে দিন প্রভাতে মা দুর্গার নাম লইতে গিয়া সব প্রথমই বিহারির তাঁহারই একটি নামান্তরের প্রতি বিশেষ একটু মনোযোগ পড়িয়া গেল। আজ আবার অপর্ণা কি করে, কি বলে, কালকের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে,—অথবা যেমন কিছুই ভোলা তাহার স্বভাব নয়—এটাও ঠিক তেমন করিয়াই মনে করিয়া বসিয়া রহিল; এই সব ভাবনাগুলায় তাল পাকাইয়া তাহার মনের ভিতর উদ্দাম-ভাবে যেন নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে,—অথবা ঘরের বাহিরে যাইতে—দুয়েতেই সে ভীত হইতেছিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ তো আর ভয় করিয়া বসিয়া থাকা চলে না—কাজেই ভয়ে ভয়ে তাহাকে বাহির হইতেই হইল। দেখিয়া বিস্ময়ে সে অবাক্ হইয়া গেল যে, ইতিমধ্যে অপর্ণার স্নান সারা হইয়া গিয়াছে,—পিছনে লম্বা চুলের শেষে গ্রন্থি বাঁধিয়া সেই পিঠভরা রাশিকরা কালো চুল কাপড়ের উপর দিয়া পশ্চাতে জড়াইয়া সেই রূপসী কিশোরী দরিদ্রের সুখস্বপ্নেরই মত এই অন্ধকার পুরীর ভিজা মাটিতে বসিয়া বাঁটনা বাঁটিতেছে। শিলের উপর নোড়া ঘসিলে যে মানুষের হাতের এমন বাহার খুলে, এ ধারণা লোকের প্রায়ই থাকে না,—তাই সেই সরু সাদা শাঁখা দুখানির বাঁধনে আঁটিয়া বাঁধা, মৃণালের মত আন্দোলন-চঞ্চল দুখানি হাতের পানেই যেন বিহারির প্রৌঢ় চোখের দৃষ্টি অনিমেষ হইয়া রহিল।

"বেহারিদা, অমন করে সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলে

কেন? বাজার আনতে হবে, না আজও তোমার অ-ক্ষিধে?"—এই কথা বলিতে-বলিতে অপর্ণা অন্য দিনের মত সহজভাবেই মুখখানা তুলিল। "ডাল কিছু এনো,—আর নুন, গুড়, হলুদ, এগুলোও সবই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।"

এই যে হুকুম বিহারি আজ সকালে উঠিয়াই পাইল,—ইহার বদলে আর কি পাইলে যে সে ঠিক এই রকম খুশী হইত, তাহা দুঘণ্টা ভাবিলেও সে আন্দাজ করিতে পারিত না! গামছা-হাতে হনহন করিয়া তখনই বাহির হইয়া গিয়া খানিকটা পরে কালিঘাটের বাজার হইতে আবশ্যক এবং অনাবশ্যক জিনিষ যা পারিল,—গামছা ভরিয়া কিনিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়াই সে একটু অনুচিত রকম খরচ করিয়া আসিল, যাহাতে করিয়া অপর্ণা তাহার বাঁকা ভ্রূযোড়ার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ধনুকের মত গুণ টানিয়া তাহার এই অপরিমিতব্যয়িতার জন্য ভর্ৎসনা করিতে পারে। কাল সেই সাঙ্ঘাতিক বিষবাণ ছুড়িবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সে আর তো তাহার সহিত কথার মত কথা একটাও কহে নাই।

অপর্ণারও আজ ইহাতে অনিচ্ছা ছিল না। চাবুকের ঘায়ে পিঠ ছিঁড়িয়া বুকের মাঝখানে আঘাত লাগিতে লাগিতে পাছে দণ্ডশেষের পূর্ব্বেই দণ্ডিতের প্রাণটা দণ্ড-দাতাকে ফাঁকে ফেলিয়া ছাড়িয়া পালায়, তাই পুলিস দণ্ডিত হতভাগ্যকে যেমন মধ্যে-মধ্যে একটু দম লইতে দিয়া সহাইয়া লয়,—সে-ও সেই ধরণের কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া, এই অভাগাকে আজ একটুখানি দয়া দেখাইতে চাহিতেছিল। বাজার দেখিয়া সে মনে মনে হাসিয়া, মুখে পূর্ব্বের ন্যায়ই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল—"এ করেছ কি বেহারিদা! মাছের বাজার যে উজোড় করে এনেচো! কাল উপোস করিয়েচ বলে কি আজ ঘটা করে পারণ করিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না কি?"

বিহারিকে এই সহাস্য অনুযোগ যেন ছুরির খোঁচা মারিল। ছলাৎ করিয়া বুকের রক্ত খানিক মুখে, মাথায় চড়িয়া বসিল। সে অকস্মাৎ ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সে কি! কাল তুমি কিছু খাওনি?—তবে বল্লে কেন? খেয়েচ বল্লে কেন?"

"কেন বল্‌বো না? তুমি কি একবার ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলে,—"অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া বড়-বড় দাঁড়াওয়ালা চিংড়ি কয়েকটা মাছের চুপ্‌ড়িতে তুলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে জীবন্তটা লাফাইয়া-লাফাইয়া চুবড়ি-সই হইতে যথেষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিতেছিল। বিহারির গলার কাছটায় যেন কিসের একটা পুঁটুলি ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার যে কি যন্ত্রণায় দিনরাত্রি কাটিতেছে, সে যে কেন তাহার খাওয়ার খবর অবধি ভাল করিয়া লইতে পারে নাই, তাহা—

রাস্তার বাহিরে অপরিচিত নারীকণ্ঠে কে একজন আর একজন কাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"হ্যাঁ, গা, এই না 'একের সাত' জেলেপাড়া ইষ্টিরিট?—এই বাড়ীতেই না চক্কবত্তি মশাই বাস করেন?" "'কি মশাই' তা ঠিক জানিনি,—'মহাশয়া' তো একজন থাকেন, তা দেখেচি। 'তা' তোমার তাদের খোঁজ কেন?"

"আমি চক্কোত্তি মশায়ের কাছে পাত্তরের খবর নিয়ে এয়েচি যে!"

"বটে, তা সেই সঙ্গে আমার খবরটাও তাঁ'দিগে একটু দিয়ে দিতে ভুল না,—আমিও একটি পাত্তর, তা দেখতেই তো পাচ্চো, এমন মন্দও তো নয়। দেখ দেখি মনে ধরে কি না?"

অপর্ণা মুখ তুলিয়া দেখিল, বিহারি কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। আগন্তুকার 'প্রাতঃ প্রণামে' সে তাহাকে বাহ্য ভদ্রতার খাতিরেও দস্তুরমত একটা আশীর্ব্বাদের ছল করিতেও পারিল না। বরং যেন তাহার মুখে এই ভাবটাই প্রধান হইয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল যে,—'তুমি কি মরিতে আর কোথাও একটু জায়গা পাও নাই, তাই হুট্ করিয়া একেবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?' যেটুকু গ্রহের কুদৃষ্টি কাটিয়া আসিয়াছিল, তাহা এই বৃদ্ধাকে আশ্রয় করিয়া যে আবার চাপিয়া আসিল—বিহারির মনে তাহাতে আর কোন সংশয়ই রহিল না।

ঘটকী ঠাকুরাণী—আসন, জল, পাদ্য এবং অর্ঘ্য, বহুদূরের কথা—মুখের একটা 'এসো' 'বসো' এই অভ্যর্থনা-বাক্য পর্য্যন্ত কাহারও মুখে না শুনিয়া প্রথমটা একটু থাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসার খাতিরে ইঁহাদেরও

অনেক রকম লোকের সহিত মেলামেশা করিতে হয়, সহিতেও হয় কিছু কিছু; তাই এই নির্লিপ্ত মৌনতার স্পষ্ট তাচ্ছল্য গায়ে না মাখিয়াই আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাগা বাবা ঠাকুর! এইটি বুঝি তোমার কনে? তা যা বলেচ, রূপসী বটে! লাখের মধ্যে একটা! তা দেখ, চক্কবত্তি মশাই, তুমি ঐ রাজার ঘরেই বে'টি দিয়ে ফেলো। ওতে আর দোমনা হয়ো না, ডাগোর-ডোগর মেয়ে—রূপের ডালি মেয়ে—হলোই বা সতীনে! সতীনটে তো নেহাৎ কালো, শুঁট্‌কো! তারা সুন্দর মেয়ে দেখিয়ে ঠকিয়ে ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েচে। তাই, সেই রাগে রাণীমা বউ বরণ করে ঘরেই তোলেন নি! আর কুমার বাহাদুরও এ পর্য্যন্ত একটি দিনের তরেও,সেই কালপেঁচাটার মুখ দেখেন না। এমন কি, পাছে চোক্ষের দেখাটুকুনও দেখা হয়ে যায়, সেইজন্যে আজকাল আর বাড়ির মধ্যে ঢোকেনই না। এই মেয়ে নিয়ে গিয়ে একবার তাদে'ঘরে দেখালে, এক্ষণি মা-বেটাতে লেচে ওঠে! মরি, মরি! যেন পোটোর হাতে এঁকে ফলানো রংটুকু! যেন কুঁদেকাটা নাক-চোক; আহা! যেন মা জগদ্ধাত্রির প্রতিমে!"

অপর্ণার এ আত্ম-প্রশংসায় যেটুকু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, তাহার আনীত তাহার 'বরের' খবরের প্রচ্ছন্ন বিরক্তি সেটুকু রাহুর মতই গ্রাস করিয়া ফেলিল। সে বারেক বিহারির পানে কটাক্ষ করিয়া, তাহার সহিষ্ণুতায় ঈষৎ উত্যক্তচিত্তে অধর দংশন করিল। কোথা হইতে এ মাগিকে আবার বেহারিদা জুটাইয়া আনিল! নিজে বুঝি আর অত মেহনত করিয়া উঠিতে পারিল না। কেন, গতরে তাহার হইয়াছে কি? সে কি পৃথিবীশুদ্ধ সবার মাঝখানে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিতে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল?

বিহারির ভাব দেখিয়া ঘটকী কিছু বিরক্ত হইতেছিল; কহিল—"কিগো, তুমি চুপ করেই রইলে যে? কি বল্‌বে উত্তর দাও; তাঁরা মেয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের চক্ষে দেখতে চায়।" বিহারি কুণ্ঠিত মুখে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল। এই ঘটকী মাগিকে তাহার—এমন কি মারিয়া বিদায় করিতেও ইচ্ছা যাইলে কি হয়—তাহারই ভয়ে সে এ পর্য্যন্ত মুখ বুজিয়া সমস্ত সহিয়া রহিয়াছে, পাছে সে এই ধনীঘরের সম্বন্ধ ভাঙ্গায় বিহারিকে দোষে। কিন্তু তা হইলেও, একবারেই এতটা কি করিয়া বেহারি সহিতে পারে? এমন একদিন ছিল—যেদিন অপর্ণাকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া পাত্র দেখার মতের জন্য মাথা খুঁড়িয়াও বিহারি তাহার কাছে সেটুকু আদায় করিতে পারে নাই। আর আজ? সেকরা-বাড়ীর অলঙ্কারের মত সে অন্যের বাড়ী-বহিয়া ওজন হইতে যাইবে—তার পর একটা কুচরিত্র, মাতালের হাতে—তাহার প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানে সে,—বিহারির এই পূজার ফুল—সে গিয়া হইবে একটা বিলাসের খেলানা! বিহারি বাঁচিয়া থাকিয়া এ দুইটা চোকের মাথা না খাইয়া এই সমস্ত দেখিবে? অপর্ণার মুখেও অসন্তোষের চিহ্ন! কিন্তু সেটা কিসের, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় না! বিপন্ন বিহারি শঙ্কিত কুণ্ঠার সহিত কহিতে লাগিল, —"তাঁরা যদি দেখেন—সেতো ভালই। তা—তা হলে সে কবে,—তার মানে কি, না কোন্ দিন—কখন তাঁদের বাড়ী আমাদের যেতে হবে,—সেটা—তুমি তা'হলে—তার মানে কি,—এই তুমি গিয়ে নিজেই ঠিক—" নিজেরই কাণে কথাগুলার অর্থবোধ কম হইতেছিল বলিয়াই, বিহারি 'মানে'টা অপরকেও বিশদভাবে বুঝাইবার অনর্থক চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এ গ্রহের ভোগ বেশীক্ষণের জন্য নয়,—অপর্ণা হঠাৎ চোক তুলিয়া সেই চোকের দৃষ্টি দিয়া, যেন বিহারিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ঘটক-কন্যার পানে সেই সন্ধ্যার উজ্জ্বল শুক্রতারার মত চোক দুইটি স্থির করিল; কহিল,—"এই জন্যেই বলে বুড়ো হয়ে বেশী দিন বাঁচ্‌তে নেই। দেখ গা, তুমি রাজার ঘরে অন্য বউ করে দাও গে,—আমাদের গরীবের ঘরে ওসব রাজারাজড়ার কাণ্ড পোষাবে না।"

ঘটকী এই বয়স পর্য্যন্ত অনেক বর-কনেরই ঘটকালী করিয়াছে; কিন্তু কোথাও স্বয়ং-অভিভাবিকা কন্যার বিবাহের ঘটকালি সে এখন পর্য্যন্ত করে নাই। বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া সে কহিল,—"তা, তা হলে কিন্তু মোহরের গদি পেতে বসতে! কি সুখ, কি ঐশ্বয্যি সেতো চক্কবত্তি মশাই নিজের চক্ষে কাল দেখে এয়েচে,—হয় না হয়, ওনার কাছেই সব তো শুন্‌তে পাবে। বাবাঠাকুর যে একেবারে সাঁজ জ্বালার পর বর দেখতে গেলেন। তা একে পুরুষ, বেটা-ছেলে, তায় ধনের অন্ত নেই। পাঁচটা বন্ধু নিয়ে বাইরে একটু আমোদ-আহ্লাদ আর করবে না গা? উনি তাইতেই

খাপ্পা হয়ে চলে এলেন। একি তোমার ডিপুটি-মুন্সোব, না, উকিল-ডাক্তার—যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে ছুটো 'মহারাণী'র মুখ দেখতে পাবে? এদের নোর সিন্দুকে টাকা নোট ছাতা ধরে। ধামা ভরে এরা পুকুরঘাটে টাকা ধুয়ে আনে। মস্ত বড় বনেদি ঘর! পুরাণো চাল,—দেশে দু'দুটো হাতী বাঁধা আছে। আর সতীন—তা, সেও তো ঐ বল্লাম,—একেবারে ত্যেজ্যি। যদি বলো তো কঠিন দিব্যি করতেও রাজী আছে।"

এত বড় জানোয়ার দুইটার লোভেও অপর্ণার এক-রোকা মন টলিল না। সে অনায়াসেই বলিয়া গেল—"শুধু সেই ছুটো যদি আমায় দিত। যাক্, কঠিন দিব্যি তাঁদের করে কাজ নেই,—ও আমার চলবে না। আর কোন খবর জানো তো বরং বলো।"

বিহারির এতক্ষণকার যম-যন্ত্রণা অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছিল, আবার একটু উদ্বেগের কম্প তাহার বক্ষের মধ্যে দেখা দিল। দ্বিতীয় খবরটাও তাহার অজানা নয়।

ঘটক ঠাকুরাণীর বিশেষ লাভ-লোকসান নাই, আজিকার পাত্র দুটির জন্যই তাহার হাতের এই কন্যে একটি ব্রহ্মাস্ত্র। যেথানেই ইহাকে সন্ধান করুক, দু'জনের অবস্থায় যত প্রভেদ—তাহার পাওনায় সেটা প্রকাশ পাইবে না! মুড়ি এবং মিছরি এক্ষেত্রে দুটির দরই প্রায় সমান হইবে। সে তাই বিহারিকে ছাড়িয়া দরকারী বোধে অপর্ণাকেই বিনাইয়া-বিনাইয়া এই বরটির খবরও অনেক ঘটা করিয়া দিল। বর মাত্র বৎসর চারপাঁচ সরকারের কাছে পেন্‌সন্ পাইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি বড় একটা 'কেও কেটা' ছিলেন না। সদরে-সদরে সবজজের কাজ করিয়া আসিতে-ছিলেন। বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে তো এতদিন ছিল না। স্ত্রী তো তাঁহার প্রায় আটদশ বৎসর হয় মারা গিয়াছেন। কিন্তু এই গত অঘ্রাণে তাঁহার কুড়ি বৎসরের একমাত্র পুত্র বিবাহের সাতদিন মাত্র পরেই যখন তাঁহাকে একেবারে জলপিণ্ডের আশায় হতাশ করিয়া মরণের কোলে উঠিয়া তাহার মায়ের কাছে চলিয়া গেল,—তখন কাজে-কাজেই দায়ে পড়িয়া নিরুপায়ে বংশরক্ষার জন্যই তাঁহাকে আবার একটি নববধূ ঘরে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। পাত্রের অবস্থা অত্যধিক ভাল। একে বড় চাকরে, তার উপর ঘরে এক বিপুল ধনবতী বিধবা কন্যা আছে—তাহার সমস্ত নগদ সম্পত্তিতে কেহ ভাগিদার নাই। সধবা অপর একটি মেয়েও পতিগৃহে বহু কন্যাপুত্রপরিবৃতা। জামাইএর অবস্থাও মন্দ নয়। অপর্ণা কি একটু ভাবিয়া লইল। সেকালের রাজকন্যারা যেমন স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়াইয়া মগধের অথবা উজ্জয়িনীর রাজপুত্রের কণ্ঠে সেই হস্তধৃত মাল্য অর্পণ করিবেন,—কঞ্চুকি-মুখ-নিঃসৃত রাজা-রাজকুমারগণের পরিচয়-কীর্ত্তি-গাথা শ্রবণান্তে, একবার সে বিষয়ে চিন্তা করিতেন—বোধ-করি তাহারও মনে এইরূপ একটি সমস্যাই উপস্থিত হইয়া-ছিল। সপত্নীযুক্ত বরটির বয়স কম, সতীন বেচারির মুখ চাহিয়া তাহার উচিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখের একটুখানি হ্রাস-চেষ্টায় সেই 'হস্তিপুরে'ই প্রবেশ করা! একটু হাসিও পাইল, তা'হইলে বেহারিদার রাজরাণী করার সাধটাও মেটে। কিন্তু ভোরবেলার সেই মাতালটাকে চোকে পড়িয়া মনটা সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। উঃ! ঐ দুরন্ত জীব লইয়া জীবন-যাপন! তার চেয়ে নিরীহ বৃদ্ধই বরং নিরাপদ!

সে বাক্যবিমুখ বিহারির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই ঘটকীকে বলিল, "আচ্ছা, আমার মত আছে; তুমি তাঁদের বলো।"

স্প্রিংএর মত লাফাইয়া উঠিয়া, তেমনি কম্পিতকণ্ঠে, বিহারি কহিয়া উঠিল, "না, না, না,—আমার একটুও মত নেই। আমি ওখানে বিয়ে দেবো না—কোন মতেই না। আমি ভাল পাত্তর খুঁজবো—"

"তুমি ওর কথা শুন্‌চো কেন বাছা, তুমি যাও। বলিনি কি তোমায় যে, বুড়ো হয়ে ওর মাথা বিগড়ে গেছে? দেখতে পাচ্চো না দশা!"

"তবে এই কথাই রইলো মা—দেখবেন। শেষটা আমায় জোচ্চোর হতে না হয়। আহা মা—'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মাগে' —এ'যে দেখ্‌চি ঠিক তাই! তোমার এই—রূপ!—এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় কি তোমায় মানায় মা! আজ তবে এখন আসি বাছা, দেখা-শোনা করবে না,—আমার কথাই তাঁদের বেদ। একেবারে এই আস্‌চে রবিবারে সাথে-করে আশীর্ব্বাদ করতে আন্‌বো। তা করবে মা,—একখান গয়না দিয়েই আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। সে সব গয়নাই বা কি। এক-একখান যেন পাথরের কুচি! আর তার বর্ণরই বা কিবে ছটা! এই তোমার গায়ের রংএরই মত। এমন রং নইলে কি কখন সোণা মানায়! বলে, 'সোণার অঙ্গে দিলে সোণা, তবেই সোণা অতুলনা'।"　　　　(ক্রমশঃ)

তর্পণ

[শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী]

মাতৃভক্ত বঙ্গসুত, পিতৃমাতৃহীনে
তর্পণ করিবে যবে মহালয়া দিনে ;
স্বর্গগত গুরুজনে
স্মরিয়া ভকতি-মনে
স-তিল-তুলসীপত্র গঙ্গোদক দিয়া
মুকতির মহামন্ত্র কণ্ঠে উচ্চারিয়া ;
মহান্ সে মন্ত্ররব
লোক লোকান্তরে সব
জাগাইবে পূর্ব্বস্মৃতি অমর আত্মার,
দেবলোকে ক্ষণতরে পৃথ্বীর মায়ার।
তর্পণের পুত ধারে
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকারে
সন্তানের শ্রাদ্ধ পূজা অন্তরীক্ষে ধায়,
ধ্রুবলোকে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত তায়।
একদিন বর্ষ-পরে
আত্মার কল্যাণ তরে
অঞ্জলি পূরিয়া অর্ঘ করিবে অর্পণ,
স্বরগ উদ্দেশে যাবে মুকতি তর্পণ ;
অভাগিনী পুত্রহারা
জননী আছেন যাঁরা
তাঁদের স্মরণ করি একাঞ্জলি জল
দিবে অন্তিমের দিনে তোমরা সকল।
তর্পণের গঙ্গোদকে
আমরাও পরলোকে
মোক্ষ পাব পুত্রগণ তোমাদেরি করে,
ভুলিবে না বর্ষ-অন্তে তর্পণ-বাসরে।

শোক ও সান্ত্বনা

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল]

যে রবির করে শুকায় ধরণী,
সেই নিয়ে আসে নীর ;
যে বিধাতা প্রাণে আনে হাহাকার,
তার (ই) নামে প্রাণ স্থির ;
জানি না বুঝি না কেমনে এ হয় ?
দেখি এ ভুবনময় ;
একদিকে যাহে অমার আঁধার,
অন্য দিকে চন্দ্রোদয়।
ওই আকাশেতে আলোক আঁধার
এক (ই) নিয়মের ফল ;
নিশিতে মুদিলে প্রভাতে মুদিবে
আবার কুসুমদল।
আনিয়াছ নিশি, আনিবে প্রভাত
তোমার (ই) নিয়ম হরি !
দিয়েছ সন্তাপ, দিবে শান্তি আনি
আবার সন্তাপ হরি'।
তুমি জ্ঞানাতীত চিন্তাধ্যানাতীত
আলো-আঁধারের ধারা,
নিত্য প্রকটিত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের
রাহু রবি শশী তারা ;
তুমিই আঁধার, তুমিই আলোক,
তুমিই দিবস নিশি,
দিবানিশিহীন তুমি মহাকাল
মহাকাশে আছ মিশি ;
সৃজন প্রলয়ে হ'তেছ প্রকাশ,
তুমি গুণাতীত স্থিতি ;
এই সুখ দুঃখে করিতেছ ভঙ্গ
আনন্দের পরানীতি ;
এসেছ আজিকে হৃদয় বিদারি'
এ দারুণ শোকশেলে ;
এস শোকমাঝে সান্ত্বনা আমার !
এই শেল দাও ফেলে।

বঙ্কিম-চর্চ্চরী

(বাজে তরকারী)

• [শ্রীআমোদর শর্ম্মার শ্রীহস্তের রন্ধন ও পরিবেষণ]

কয়েক বৎসর হইতে বিশালকায় 'ভারতবর্ষে'র বুকে বসিয়া শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক, এই তিন শতুরে—শ্রীবিষ্ণুঃ—এই তিন সূপকারে মিলিয়া গবেষণার জ্বলন্ত উনানে, বঙ্কিমের ডালনা, বঙ্কিমের ঘণ্ট ও বঙ্কিমের দম রাঁধিয়া পাঠক-সমাজে পরিবেষণ করিতেছেন। আমিও দুই বৎসর পূর্ব্বে পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্কিমের চ্যাঁচড়া * প্রস্তুত করিয়া এই শ্রীহস্তের গুণের পরিচয় দিয়াছি। এবারেও পূজার ভোজে কিঞ্চিৎ বঙ্কিম চর্চ্চরী রাঁধিয়া পাঠকবর্গের পাতে দিতেছি। জানি না, তাঁহাদের ডালনা ঘণ্ট দম-খেগো মুখে ইহা রুচিবে কি না।

আজকাল, সাহিত্যচর্চ্চার আকর্ষণে যত না হউক, ম্যালেরিয়ার বিকর্ষণে, মফস্বল হইতে চাটিবাটি তুলিয়া কলিকাতায় কায়েম মোকাম করিয়াছি। কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মফস্বলে, নিজ বাস্তুভিটায়, বাস করিতাম। কালেভদ্রে কলিকাতা আসিতাম। সাহিত্য-কণ্ডূয়ন তখন হইতেই ছিল। এখন ত, কলিকাতায় সাহিত্যের জোর হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া পুরাদস্তুর 'সাহিত্যিক' হইয়াছি। তাই চারিদিকে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] জল্পনা-কল্পনা দেখিয়া আমিও বঙ্কিম-স্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি। দেখি, সাহিত্যের হাটে বিকায় কি না। (এ সবও আজ-কাল না কি বড় বড় সম্পাদকেরা পয়সা দিয়া কেনেন!)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যদি কোন সুযোগে কলিকাতায় আসা ঘটিত, তাহা হইলে রাজ্যের জিনিশ কিনিয়া লইয়া যাইবার বরাত পড়িত। নিজেদের দরকারী জিনিশ ত কিনিতে হইতই, সঙ্গে-সঙ্গে পাড়াপড়শী-দিগের হরেক রকম ফরমায়েশ থাকিত। গৃহিণীগণের কাঁথা সেলাইয়ের মোটা সূঁচ হইতে সাঁচ্চার সূক্ষ্ম-কাজ-করা জ্যাকেট পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়িত না। সে-বার দুই বন্ধুতে মিলিয়া এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া মেডিক্যাল কলেজের সামনে হুঁকার দোকানে কলিহুঁকা কিনিতেছি, এমন সময়ে বন্ধু বলিলেন, 'এইখানে বঙ্কিমবাবু থাকেন।' (বন্ধুবর কলিকাতা-ঘাঁটা।) আমি তখন মফস্বলে একখানি খবরের কাগজ চালাই—'অকুতোসাহস'। বন্ধুকে তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'চল, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া আসি।' যে কথা, সেই কাজ। হুঁকা হাতে করিয়াই মহাপুরুষ দর্শনে গেলাম। তিনি আমাদের পরিচয় পাইয়া গম্ভীরমুখে উপরের বৈঠকখানায় বসাইলেন। এবং আমাদের হুঁকা হাতে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, 'বামাল-সমেত যখন দেখিতেছি, তখন আপনাদের অবশ্যই তামাক অভ্যাস আছে।' এই বলিয়া চাকরকে তামাক দিতে হুকুম দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'আজ্ঞে, ও অভ্যাস নাই। হুঁকাটি পিতৃদেবের জন্য কিনিয়াছি।' সঙ্গে-সঙ্গে একটু রসিকতার প্রয়াস করিয়া বলিলাম যে, 'পিতৃদেব যেরূপ তামাকুসেবন করেন, তাহাতে আমাদের তিন পুরুষ না খাইলেও সেই ধোঁয়াতেই বেশ চলিয়া যাইবে।' আমার রসিকতাটুকু শেষ হইলে বঙ্কিমবাবু পরম গম্ভীরভাবে, কি কি লক্ষণ দেখিয়া ভাল হুঁকা চিনিতে ও কিনিতে হয়, এই বিষয়ে অনেকগুলি সারবান্ উপদেশ দিলেন। তখন ডায়েরী লেখা বা নোট রাখা অভ্যাস ছিল না, আর এ সব কথার হুঁকার বাজারে মূল্য থাকিলেও সাহিত্যের বাজারে যে মূল্য আছে, তাহা তখন জানিতাম না; এখন দেখিতেছি, লিখিতে জানিলে এ সব কথাও সাহিত্যের বাজারে বেশ চড়া দরেই বিকায়। স্মৃতির

* 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ'—ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২১

† বৈঠকখানার বর্ণনা ও নায়কের রূপবর্ণনা করিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইলাম না। এসব আগেই সাহিত্যের বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে

উপর নির্ভর করিয়া এতদিন পরে লেখা চলে না। বানাইয়া বলিতেও সাহস হয় না, কেন না হুঁকাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একেবারে আনাড়ী, কি বলিতে কি বলিব, আর শেষে ধরা পড়িব। আহা! তখন যদি নোট রাখিতাম, তাহা হইলে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র (একটু ব্যাকরণ-বিভীষিকা হইয়া গেল) হুঁকার কিরূপ বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাহা বাঙ্গালীজাতিকে শুনাইয়া তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করিতাম, নিজেও কৃতার্থ হইতাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বঙ্কিমবাবু ফর্শীর নলের উল্টা দিক্‌টা মুখে দিতেন, তাঁহার এই মৌলিকতার কথা বাঙ্গালী পাঠক পূর্ব্বেই অপর একজন স্মৃতি-লেখকের মুখে জানিয়াছেন। [যদি এ বিষয়ে কেহ আজও অজ্ঞ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে খোলসা বলিব যে, তিনি প্রত্নতত্ত্ব বারিধিতে ডুবিয়া মরুন, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন করা তাঁহার কর্ম্ম নহে।] তামাকু সেবন-সম্বন্ধে তাঁহার আর-একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, তাহা আজও নরলোকে অপ্রচারিত আছে। তিনি ফরশী-গড়গড়া হুঁকায় জল পূরিতেন না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, জলের গড়গড় শব্দে তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, কল্পনা বাধা পায়, বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হয়। তিনি নিঃশব্দে তামাক টানিতে টানিতে মানসপটে তাঁহার কল্পনালীলাময় অমর আখ্যানগুলির নক্সা আঁকিতেন। তখন তাঁহার চক্ষুঃ মুদ্রিত, 'নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত', ভ্রূ আকুঞ্চিত, ও এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকিত। তখন মনে হইত, যেন সাক্ষাৎ ধ্যানী বুদ্ধ সন্দর্শন করিতেছি। এ আমার চোখের দেখা, অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

যাক্, এক্ষণে তাঁহার সহিত কথালাপের বিবরণ দিই। বঙ্কিমবাবু আমার সহিত আলাপে জানিলেন, আমি মফস্বলে একখানি কাগজ চালাই। কাগজের নাম 'মুগুর' শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অভিধানে এত ভাল-ভাল শব্দ থাকিতে এরূপ অদ্ভুত নামকরণ কেন?" আমি সপ্রতিভ-ভাবে বলিলাম, "ভবৎপ্রসাদাৎ। 'বঙ্গ-দর্শনে' আপনার 'ঢেঁকি' দেখিয়া আমি এই নাম পছন্দ করিয়াছি। যদি বড় লেখকের প্রকাণ্ড ঢেঁকি সাহিত্যের আসরে চলে, তবে আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র মুগুরই কি অচল থাকিবে?" কথাটা শুনিয়া, কি জানি কেন, বঙ্কিমবাবু অকস্মাৎ গম্ভীর হইলেন। যাহা হউক, একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাগজের কাট্‌তি কেমন?" আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে, যে সংখ্যায় গালাগালি থাকে, তাহা দুইবারও ছাপিতে হয়, এত খরিদদারের ভিড় হয়; কিন্তু যে সংখ্যায় তাহা থাকে না, সে সংখ্যা একেবারেই বিক্রী হয় না।" তিনি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এ ত বড় মুস্কিলের কথা।" আমি চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আজ্ঞে, সেই মুস্কিল-আসানের জন্যই ত আপনার কাছে আসা। গালাগালিতে কাগজ ভাল চলে, তাহা বেশ জানি। যেমন ঝাল-ঝাল তরকারী হইলে ভাত উঠে অনেক। কিন্তু কাহাকে, কখন্, কি ভাবে গালাগালি দিই, তাহা ঠিক পাই না। [পাঠকবর্গ মনে রাখিবেন, আমি তখন এ কার্য্যে নূতন ব্রতী। তখনও হাতের আড় ভাঙ্গে নাই, চক্ষুলজ্জা, লঘুগুরু জ্ঞান প্রভৃতি কুসংস্কার একেবারে বর্জ্জন করিতে শিখি নাই।] আর এক এক সময়ে গালাগালি দিয়া বিপদেও পড়িয়াছি। আমি ছাড়িলেও কম্‌লি ছাড়ে নাই। [যাক্, সে সব কথা খুলিয়া বলিয়া নূতন ব্রতীদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না।] আপনি যদি এসম্বন্ধে একটু সৎপরামর্শ দেন, তাহা হইলে চিরঋণী হইয়া থাকিব।" এই কথা বলিবামাত্র বঙ্কিমবাবুর সেই সুন্দর গৌরবর্ণ মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ অর্থাৎ inspiration হইতেছে। [সঙ্গের বন্ধু কিন্তু পরে আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে উহা ক্রোধের লক্ষণ। তাই না কি?] কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে ত কখন কিছু ভাবি নাই, আপনাকে ঝট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না। দেখিতেছি, ইহা একটা ভাব্‌বার কথা।" সমস্যাসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর অমূল্য উপদেশ পাইলাম না বটে, কিন্তু, সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন আমার তুলিবার শক্তি আছে, যাহা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমবাবুরও চিন্তার অতীত, ইহা দেখিয়া আমার বেশ একটু আত্মপ্রসাদ হইল। বুঝিলাম, আমিও সাহিত্যক্ষেত্রে বড় কেওকেটা নহি।

গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ।

কথায়-কথায় 'গীতা'র কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু

বলিলেন, "আমি যতই ভাল করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে 'গীতা' প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে বোঝাই। শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অর্জ্জুনও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমজাইলে আপনারাও ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে উপদেশদান, এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং 'গীতা' প্রথমে তত্ত্বোপদেশের আকারে লিখিত হয়। পরে যখন ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্র-কালিদাস-ভবভূতি-শূদ্রক-হনূমান্ প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখা সুরু করিলেন, তখন তদ্দৃষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা'খানির একঘেয়েত্ব দূর করিবার মানসে প্রশ্নোত্তরের আকারে (Catechism) উহা পুনর্লিখিত করিলেন। অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপ-স্তব আদিম ও অকৃত্রিম, কিন্তু উহা গ্রন্থকারকৃত স্তব-আকারে গ্রন্থারম্ভেই ছিল, অর্জ্জুনের নামগন্ধও ছিল না। বিশ্বরূপ-দর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা জমকালো দৃশ্য দেখাইবার জন্য, Scenic effect এর জন্য, বিশ্বরূপদর্শন প্রক্ষিপ্ত হয়। ব্যাসদেব মূল গ্রন্থখানি উপদেশের আকারেই লিপিবদ্ধ করেন। কলাকৌশলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের কথাবার্ত্তা, পরে বহুলোকের কথাবার্ত্তা, ইত্যাদি ক্রমবিকাশে নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। গ্রীসে এইরূপ হইয়াছিল, সুতরাং বুঝিতে হইবে, এদেশেও এইরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে এই থিয়েটারীভাব প্রবেশ করিলে 'গীতা'র প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ হইল। ইহাই 'গীতা'র ক্রমবিকাশের ইতিহাস।"

[আমি গীতার আদিম ও অন্তিম সংস্করণসম্বন্ধে ঐ . যুক্তিপূর্ণ তথ্য অবগত হইলাম, তাহাই ফলাইয়া লিখিয়া বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছি। দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, উক্ত তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবিষ্কৃত ইহা না জানাতে, কেহই আমার সে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পড়িলেন না। এইরূপ সামান্য কথাবার্ত্তায় তিনি যে কত লোককে কত তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল লোক তাঁহার কথাই নিজেদের নামে জাহির করিয়া একএকজন দিগ্গজ লেখক হইয়াছেন। তাঁহারা তাহা স্বীকার না করুন, আমার ঋণের কথা আমি অকপটে বলিলাম।]

* * * *

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্টাচার ও সরস বাক্যালাপে পরিতুষ্ট হইয়া আমরা বিদায় লইলাম। এতদিন পরে এই পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিতেছি, কেন না বাঙ্গালী এখন এ সকল প্রসঙ্গের আদর করিতে শিখিয়াছে, সম্পাদক ও পাঠক-সম্প্রদায় এ সকল তথ্য-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

এই শুভক্ষণে বঙ্কিম বাবুর সহিত যে পরিচয় হইল, সেই সূত্র ধরিয়া তাঁহাকে নিয়মিতরূপে 'মুদ্গর' পাঠাইতাম ও সাহিত্যের নানা কথার অবতারণা করিয়া লম্বা-লম্বা চিঠিও লিখিতাম। তিনি যদিও কখন পত্রের উত্তর দিতেন না, কিন্তু পত্রগুলি অপঠিত থাকিত না, কেন না সেগুলি কখন dead-letter office হইতে ফেরত আসে নাই। তাঁহার পুস্তক বাহির হইলেই কিনিয়া পড়িতাম ও তৎসম্বন্ধে আমার মতামত সবিস্তারে লিখিয়া পাঠাইতাম। তিনি কোন প্রতিবাদ করিতেন না; ইহাতেই বুঝিতাম, তিনি সেগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কথায় বলে, মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। এইভাবে তাঁহার সহিত এই নগণ্য লেখকের খুবই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। 'আজ এ সব কথা 'স্বপনের মত মনে হয়।' [একতরফা বলিয়া যদি কেহ ইহাকে ঘনিষ্ঠতা বলিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে না হয় ইহাকে 'ঘনতা' বলুন—ইংরেজীতেও আছে to be thick with—]

মূলের সন্ধান।

বঙ্কিম বাবুর রচিত আখ্যানগুলির ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মূল কোথায়, এই প্রশ্নের আলোচনা সম্প্রতি তাঁহার আত্মীয়গণ আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু-কিছু অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বোধ হয় তাঁহার আত্মীয়গণেরও অজ্ঞাত। কয়েকটির নমুনা দিতেছি। উৎসাহ পাইলে আরও দিতে পারি।

(১) রামচরণ।

মেডিকাল কলেজে প্রায়ই ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছাত্রদের মারামারি ঘুঁষাঘুঁষি হইত। বঙ্কিম বাবুর একজন সাহসী চাকর ছিল, সে ঐরূপ মারামারি আরম্ভ হইলেই ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া ফিরিঙ্গি ছাত্রদিগকে বিষম মারপিট করিত এবং এই উদ্দেশ্যে সামনের ফুটপাথে সর্ব্বদা ঘুরিত। একবার এইরূপ একটা দাঙ্গায় পা ভাঙ্গিয়া সে কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে ছিল।

এই চাকরই রামচরণের আদর্শ। বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পরও এ ব্যক্তি কয়েক বৎসর জীবিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে একটি দাঙ্গায় ইহার প্রাণবিয়োগ হয়।

চেষ্টা করিলে এইরূপ অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে সে উৎসাহ, সে অধ্যবসায়, সে শ্রমশীলতা, সে নিষ্ঠা, সে শ্রদ্ধা নাই। তাই আমরা শেক্স্পীয়ার-ডিক্‌ন্সের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মূল অনুসন্ধান করিয়া হায়রাণ হই, বঙ্কিম দীনবন্ধু সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে চাহি না।

*　*　*　*　*

কয়েকবার কাশী গিয়া বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছি। (দেখুন, কাশী গিয়াও এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি নাই।)

(২) যুগলাঙ্গুরীয়।

বঙ্কিম বাবু 'মৃণালিনী'র কাপি প্রেসে দিয়া কাশী যান। (পাণ্ডুলিপি ও ছাপাখানাও লিখিতে পারিতাম, কিন্তু আমি ইংরেজী জানি না অনেকে আমার নামে এই অপবাদ দেন; সেই জন্য ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ কিনা deliberately এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিলাম।) তথায় থাকিতে থাকিতে, একদিন দশাশ্বমেধ-ঘাটে যে সকল মজলিস বসে, সেইখানে তিনি গল্প শুনিলেন, (এ অধমও তথায় উপস্থিত ছিল) কোন্ বাড়ীতে চোখবাঁধা বর কনের বিবাহ হইয়াছে; এক সন্ন্যাসী বিবাহের উদ্যোগী ছিলেন। কাশীতে একটা-না-একটা আজগবী কাণ্ড অহরহই ঘটে। আজকাল অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখনকার দিনে খুবই বাড়াবাড়ি ছিল। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ কৌতূহলের বশীভূত হইয়া, পাত্রপাত্রী 'কি জাতি কি নাম ধরে কোথায় বসতি করে,' তাহাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল কি না, পরে দেখাশুনা হইয়াছিল কি না, বধূটীর কি গতি হইল, 'পরে সে হইল কা'র, এখন কি দশা তা'র' ইত্যাদি কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন না। বাস্তবিক সেরূপ করিলে, তাঁহার কল্পনাবৃত্তির অবমাননা করা হইত। পাঠকবর্গ বুঝিবেন, এই ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া অপূর্ব্ব কল্পনাবলে তিনি ভবিষ্যতে 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনা করিয়াছেন। ঐ চোখবাঁধা বরকনেই গল্পের বীজ।

(৩) ইন্দিরা।

কাশীতে থাকিতে-থাকিতে তিনি আর-একদিন ঐ মজলিসে শুনিলেন, (এই অধম বস্‌ওয়েল তাঁহার পিছনে-পিছনে থাকিতেন) একটি গৃহস্থের বধূকে শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে ডাকাতে লইয়া যায়। পরে সে ভাগ্যক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোন গতিকে কাশী আসিয়া পড়ে। শাস্ত্রেও আছে, যাসাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তাসাং বারাণসী গতিঃ। এখানে সে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। একবার ঘটনাক্রমে তাহার স্বামী কয়েকটি বন্ধু সঙ্গে পূজার ছুটিতে কাশীতে বেড়াইতে আসেন এবং ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁহাদিগের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। স্বামী মহাশয় পাচিকার উপর একটু কৃপাদৃষ্টির উদ্যোগ করেন। কিন্তু রমণী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া, কোন সুযোগে তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া আত্মপরিচয় দেয় ও পুনর্গ্রহণের জন্য অনুনয়-বিনয় করে। স্বামী মহাশয় কাশীতে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিয়া, তাহার হাতের অন্নজল খাইলেও, এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, দেশে জাতি যাওয়ার ভয়ে তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বধূটি সেই অবধি বিকৃত-মস্তিষ্ক হয় ও জপতপ লইয়া কখন দশাশ্বমেধ-ঘাটে, কখন কেদার-ঘাটে, কখন মণিকর্ণিকাঘাটে অবস্থান করিত। ইহাই 'ইন্দিরা'র ভিত্তি।

বঙ্কিমবাবু বিয়োগান্ত আখ্যান ভালবাসিতেন না, তাই তিনি সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, প্রফুল্লকে গৃহে ফিরাইয়াছেন, রাধারাণীর পলাতক আসামীর হদিস মিলাইয়াছেন; সুতরাং ইন্দিরাকেও শেষে ঘর বর দিয়াছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৪) ও (৫) সোণার মা ও গৌরী ঠাকুরাণী।

যখন বঙ্কিম বাবু কাশীতে ছিলেন, এক প্রবীণা ব্রাহ্মণ-বিধবা তাঁহার পাকসাক করিত। বঙ্কিম বাবু চলিয়া আসিবার সময়, সে, কি জানি কেন, বায়না ধরিল যে, বঙ্কিম বাবু যেখানে যাইবেন, সেও সেইখানে যাইবে ও তাঁহার পাচিকার কার্য্য করিবে। তাহাকে না কি বাবা বিশ্বনাথ স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে, কিছুদিন বঙ্কিম বাবুর চাকরি স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত কাশীর বাহিরে থাকিলে, তবে তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপ কাটিবে ও অন্তিমে বিশ্বনাথ তাহাকে চরণে স্থান দিবেন। (এ স্বপ্নের কথা সত্য কি না জানি না। তবে কুন্দনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির স্বপ্ন-বিচারক

ললিত বাবুর জ্বালায় ত স্বপ্নে অবিশ্বাস করিবার যো নাই!) বঙ্কিম বাবু তাহার কাকুতি-মিনতিতে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সঙ্গে আনেন। প্রবীণা কলিকাতায় আসিয়া একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। (সেই সময়ে বিধবাবিবাহের ঘোঁট চলিতেছে।)

এই প্রবীণাকে আদর্শ করিয়া বঙ্কিম বাবু 'ইন্দিরা'য় সোণার মা ও 'আনন্দমঠে' গৌরী ঠাকুরাণীর কল্পনা করিয়াছেন। বেচারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে চাহিয়াছিল বলিয়া, তিনি এই উভয় বিধবারই বিবাহের সাধ লইয়া রঙ্গ করিয়াছেন।

উক্ত প্রবীণার হাতের রান্না খাইয়া বঙ্কিম বাবুর পরিবারস্থ সকলেই হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়া গিয়া তাহাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিতে অর্থাৎ হাওড়া ষ্টেশনে রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে। বঙ্কিম বাবু এই প্রস্তাব শুনিয়া একটু বঙ্কিম হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছু করিতে হইবে না, আমি আমার পুস্তকে উহার এমন বর্ণনা করিব যে উহার রান্না জগদ্বিখ্যাত হইবে। ইহার অধিক শাস্তি আর ব্রাহ্মণকন্যাকে কি দেওয়া যায়?" (দেখুন বঙ্কিম বাবুর কতদূর নিষ্ঠা ছিল!)

*　　*　　*　　*

লাউএর খোলা, কুমড়ার খোলা, প্রভৃতি সাত-পাঁচ দিয়া গৃহস্থ-ঘরে চর্চ্চরী রাঁধে। ইলিশমাছের তেলে রাঁধিলে তাহা ত একেবারে অমৃত হয়। আমিও সাত-পাঁচ দিয়া বঙ্কিম-চর্চ্চরী পাকাইয়াছি, বঙ্কিম-ইলিশের তেল দিতেও কসুর করি নাই। জানি না, ইহা পাঠকের মুখরোচক হইবে কি না। শেষে সোণার মার হাওয়া আমার গায়েও না লাগে! *

* প্রবন্ধ ছাপা হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, লেখক কস্মিন্ কালেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই; এমন কি তাঁহাকে জীবিতমানে দেখেন নাই। তাঁহার সকল কথাই স্বকপোলকল্পিত। ছাপা হইয়া গিয়াছে, চারা নাই। পাঠক আপাততঃ একটু আমোদ অনুভব করুন। পরসংখ্যায় আমরা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রবন্ধটিকে আচ্ছা করিয়া গালি দিব। তাহা হইলে দুই কুলই বজায় থাকিবে। এ প্রবন্ধ ছাপা সম্বন্ধে আমাদের কৈফিয়ত—পূজার বাজারে চারিদিকেই জুয়াচুরি চলিতেছে, সাহিত্যের দোকানেই বা বাদ থাকিবে কেন? যাহা হউক, সাধু সাবধান!

—সম্পাদক

শিবের সংসার

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

বিরূপ বিমুখ যত তোমার সংসারে,
এমন সংসার আর নাহি এ সংসারে;
পতি ভোলানাথ যাঁর বলদ বাহন,
ময়ূরে মুষিকে চড়ে গুহ গজানন;
তোমার বাহন দেখি করাল কেশরী,
পিশাচ পিশাচী যত কিঙ্কর কিঙ্করী।
ধরেন সে ভোলানাথ পাঁচটি বদন,
অদ্ভুত হস্তীর মুখ ধরে গজানন,
দেব-সেনাপতি গুহ তোমার কুমার,
ছয়টি বদন আছে তাঁহার আবার;
তুমিও ত ইচ্ছামত নানা রূপ ধর
কভু দুই, কভু চারি, কভু দশ কর।
মা মা বলি কাঁদে যেবা কাতর-অন্তরে,
যা থাকে সংসারে তারে দাও দশ করে;
খাইয়া পরিয়া আর বিলাইয়া পরে,
তুমিই ত করিয়াছ ভিখারী শঙ্করে!
হইয়াছে ঝুলী সার, সার হাড়মালা,
বসন অভাবে কটিতটে বাঘছালা;
সুগন্ধ চন্দন চুয়া তাঁর অঙ্গে নাই,
বামদেবে তুমি বামা, মাখায়েছ ছাই।
বিরক্ত হইয়া আর হইয়া নিরাশ,
করেছেন সদাশিব শ্মশানে নিবাস।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাঁর পদতলে,
পাগল করেছ তাঁরে তোমরা সকলে।
অমিতব্যয়িনী হয় যাহার ঘরণী,
রন্ধ্রগত শনি তার রন্ধ্রগত শনি!
ডাহিনে টানিতে তার বামে না কুলায়,
দারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ কভু নাহি যায়।

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এম্-এ]

"সুরেন্দ্র, বাবা, প্রতিজ্ঞা কর।"

"তার কি অপরাধ, মা ?"

"তার অপরাধ আছে বৈ কি ! নইলে কি আমি শুধু-শুধু তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে বল্‌ছি ? তাকে আমি ছোট্ট-বেলা থেকে মেয়ের মত করে বুকে করে যে মানুষ করে আস্‌ছি, তবুও এ প্রতিজ্ঞা যে করতে বল্‌ছি, তার অপরাধ হয়েছে বলেই ত। তার অপরাধ নেই ? আছে বৈ কি ! খুব আছে। সে যে সেই বংশের মেয়ে, যে বংশের লোক এই অপমান, এই দাগা দিলে ! সুরেন, তোর যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তুই যদি আমার ছেলে হস্, এই মন্দার ভাই হস্, তবে তুই এই প্রতিজ্ঞা কর্ব্বিই কর্ব্বি। আমার গা ছুঁয়ে এই প্রতিজ্ঞা কর্।"

"মা, তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে আমি আমার স্ত্রী মনোরমাকে পরিত্যাগ কর্‌লাম। তাকে আর পত্নী বলে গ্রহণ কর্ব্ব না।" সেই নির্জ্জন গৃহে সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া নামিল। শোকাকুল দুইটি হৃদয়ের বিষাদ ঘনীভূত হইয়া পাথরের মত বুকে চাপিয়া বসিল।

সুরেন্দ্র মন্দার শবদেহ দাহান্তে যখন গৃহে ফিরিল, তখন প্রভাতের আলো আকাশ হইতে হাত বাড়াইয়া সুষুপ্ত ধরণীকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। নূতন উষার তরুণ শোভার দিকে সুরেন্দ্র দৃকপাতও করিল না। তাহার অন্তর তখন জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সে হা' হা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার নিরপরাধা স্ত্রী, তাহার প্রিয়তমারও যে আজ বিসর্জ্জন হইয়া গেল !

রহিয়া-রহিয়া, মনোরমার বিদায়-বাণীই কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই যে প্রায় মাস-চারেক হইল, পিত্রালয়ে যাত্রার দিনে সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, 'এ ক'মাস দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কেটে যাবে।' সেই যে দু'টি তরুণ আসন্ন-বিরহকাতর হৃদয় পরস্পর পরস্পরকে অতি নিকটে চাপিয়া ধরিয়া মিলনকে নিবিড়তর করিয়া তুলিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল, তখন কে জানিত যে সেই তাহাদের শেষ আলিঙ্গন ! ইহজন্মে আর এ দুটি বুভুক্ষু হৃদয়ের মিলন-ক্ষুধা তৃপ্ত হইবে না। কোথায় চার-পাঁচ মাস, আর কোথায় আমরণের এই বিরহ। হায় পাপ ! তোমার তপ্তনিঃশ্বাসে নির্দ্দোষীরও হৃদয়কুসুম শুকাইয়া গেল—শুধু ভাগ্যদোষে সে কাছে আসিয়াছিল বলিয়াই।

মনোরমা শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী, জননী ও ভগিনীসহ তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। কবে তাঁহারা ফিরিবেন এবং তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবেন, সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া সে তেমনই আগ্রহে বসিয়া ছিল,—অন্ধকারে পথহারা দূরদেশযাত্রী পথিক প্রভাতের পথপ্রদর্শক অরুণালোকের প্রতীক্ষায় যেমন করিয়া বসিয়া থাকে, সংশয়ী তাহার সংশয়-অপনোদনকারী সত্য জ্ঞানের প্রতীক্ষায় যেমন করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার প্রতীক্ষাই সার হইল,—তিমিরা রজনীর শেষ হইল না, সংশয়ের মাঝে সত্যের প্রকাশ দেখা গেল না।

নিদারুণ, মর্ম্মভেদ দুঃসংবাদ বক্ষে ধরিয়া, শুধু একখানি পত্র আসিল। মন্দা,—তাহার খেলার সঙ্গী, তাহার রসালাপের সখী, গৃহকর্ম্মের সাথী,—মন্দা আর নাই ! তাহারও আর পতিগৃহে স্থান নাই। স্বামী লিখিয়াছেন—"কারণ জানিতে চাহিও না ; এইটুকু মনে রাখিও যে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, বাধ্য হইয়াই তোমায় ছাড়িলাম।" তাহার হতভাগ্য স্বামী সুরেন্দ্রকুমার, সেই পুরাকালের হতভাগ্য স্বামী রামচন্দ্রেরই মত, সীতা-বিসর্জ্জন দিল।—কোন্ অপরাধে, কোন্ মিথ্যা কলঙ্কে সীতাদেবী নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন,তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ;—জানিতে পারিয়াছিলেন কোন্ দোষে তিনি পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। সে কিন্তু জানিতে পারিবে না, জানিতে চাহিবে না—কোন্ অপরাধে তাহার স্নেহময় স্বামী তাহার উপর এ

নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করিলেন। তাই হৌক! তাই হৌক! সীতার মত অভাগিনী সে, তাঁহারই মত একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের অধিকারিণী হৌক, তাহার স্বামীর গভীর ভালবাসাই তাহার সান্ত্বনা ও নির্ভর হৌক। হায় রে, সে যে সীতার চেয়েও অভাগিনী! তিনি যে পুত্ররত্নে ভাগ্যবতী হইয়াছিলেন; কিন্তু সে যে বক্ষের মাঝে স্বামীর প্রেমকে মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে দেখিবে না। ওগো, ভাগ্যবিধাতা, জন্মকালে এ ললাটে এই লিখনই কি লিখিয়া গিয়াছিলে?

মনোরমার পিতা কন্যার নির্ব্বাসন-দণ্ড শুনিয়া রোষে-ক্ষোভে আহত গোক্ষুরার মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু একদিন কন্যার শ্বশুরালয় হইতে ভগ্নবিষদন্ত, প্রায়-নির্জ্জীত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কোন্ মন্ত্রে বৈবাহিকা তাঁহার এই দংশনোদ্যত ভীষণ রোষকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন, তাহা কেহই জানিল না; শুধু সকলে দেখিল যে তাঁহার ললাট, আনন দারুণ বেদনায় ও লজ্জায় কালো হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর কত বৎসর কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। মনোরমা পিতামাতাকে হারাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার সংসারে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তাঁহারই সন্তান-সন্ততিকে দিয়া আপনার মাতৃহৃদয়ের দারুণ ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

আর সুরেন্দ্রনাথ! সে বিষয়োপার্জ্জনে সকল প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া বসিয়া আছে। শুক্তির মত কঠিন আবরণের তলায় কোথায় তাহার হৃদয়ের কোমল অংশটুকু, বিরহ-বেদনার ঢলঢল স্বচ্ছ মুক্তাটুকুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্ধান সে কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র,বংশের দুলাল,শিশিরকুমারকে সে আপনার হৃদয়ের অতি নিকটে রাখিয়াই মানুষ করিয়াছে; কিন্তু তাহাকেও জানিতে দেয় নাই—তাহার আপাতশুষ্ক বিষয়ী মনের নীচে স্নেহ-উৎসের সুধাধারা নিত্য কোথায় উৎসারিত হইতেছে। লবণাম্বু যেমন গোপনে আপন বক্ষে স্বাদুজলের উৎসধারা লুকাইয়া রাখিয়া দেয়, সেও তেমনি আপনার অন্তরের অন্তঃস্থলে তাহার স্নেহ প্রবণতাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

লোকে বলিত, "সুরেন্দ্রনাথ কি কঠিন হৃদয়!" শিশির কিন্তু তাহার এই কঠিন হৃদয় কাকাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। শৈশবে তাহার কতদিন ইচ্ছা হইত যে, ইহার নিকট হইতে জোর করিয়া, আব্দার করিয়া, ভালবাসা আদায় করিয়া লয়; কিন্তু তাঁহার গম্ভীর মুখের কাছ হইতে তাহার সকল বাসনা শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিত। সেও কাকার নিকট নিজের অন্তর খুলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিত। এমনই করিয়া সে বাড়িয়া উঠিল।

একদিন শঙ্খমুখর সন্ধ্যাকালে যখন ঘরে-ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, তখন লজ্জানত আরক্তমুখে শিশির তাহার কাকার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সেই আধ-আলো, আধ ছায়ার মধ্যে একাকী আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। বিরহবিধুরা সন্ধ্যার এই করুণ মনিমায় সে আপনার জীবনের নিঃসঙ্গতা যেন বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিল। গত জীবনের সুখের বিষাদ-স্মৃতিতে তাহার অন্তঃকরণ কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় তাহার স্বপ্নমোহ ভাঙ্গিয়া দিয়া শিশির ডাকিল "কাকা!"

শিশির সেইদিন মাত্র দার্জ্জিলিং-পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে সুরেন্দ্র কহিল "কি বাবা?" শিশির তাহার কাকার মুখে এ সম্বোধন কোনও কালে শুনিয়াছে কি না, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার কাকার কণ্ঠস্বরে এত মধু সে তাহার জীবনে ভোগ করিয়াছে কি না, তাহা তাহার মনেই পড়িল না। সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল। যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা আরও করিবার জন্য সে এতক্ষণ যে ভূমিকা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। অর্দ্ধভগ্নস্বরে কহিল "কাকা,—আমি, আমি দার্জ্জিলিং গিয়ে বিয়ে ঠিক করে এসেছি।" তাহার কান্না আসিতে লাগিল; কিন্তু কেন যে—তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

কাকাকে নিরুত্তর দেখিয়া, আবার কহিল "কাকা, আপনার অনুমতি না নিয়েই কথা দিয়ে ফেলেছি বলে রাগ কর্ব্বেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।" তাহার হাত-দুটা আপনাই যোড় হইয়া গেল। কিন্তু সেই ঝাপ্‌সা আলোয় সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। এবারে সে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় বিয়ে ঠিক কর্‌লে?"

"শ্যামকিশোর রায়ের কন্যা সুরমার সঙ্গে।" সুরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শ্যামকিশোর রায়? শ্যামকিশোর

রায় যে তাহার কনিষ্ঠ শ্যালকের নাম। সে বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে শ্যামকিশোর রায় ?"

"হরিহরপুরের জমীদার। খুড়ীমার ভাই!" সুরেন্দ্রনাথের চীৎকার করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল "ওরে হতভাগা! কি করলি। সেখানে যে তোর বিয়ে হতে পারে না রে, হতে পারে না!" বেদনায় তাহার শিরা দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু স্থিরকণ্ঠে সে কহিল, "সেখানে তোমার বিয়ে হতে পারে না।"

কাতরকণ্ঠে শিশির কহিল "কাকা, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি যে।"

"তা কি হবে! উপায় নাই, তোমায় কথা ফিরাতে হবে।"

"কাকা, ভদ্রলোক হয়ে—"

"উপায় নাই, শিশির!"

"কেন ?"

সুরেন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

"কেন, বলুন। তা নইলে—"

"কেন, তা বলতে পার্ব্ব না। তুমিও জানতে চেয়ো না। তবে এটা জেনে রাখ যে, সেখানে তোমার বিয়ে হতে পারে না।"

"আমি কথা ফিরোতে পার্ব্ব না। যদি ফিরোতে হয় ত কারণ জেনে ও জানিয়ে কথা ফিরোবো।"

সুরেন্দ্র কহিল, "বলছি, শিশির, সে বিয়ে হতে পারে না।"

শিশিরও রাগিয়াছিল, সে কহিল "কাকা, আমি কখনো আপনার অবাধ্য হইনি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমায় বাধ্য হয়ে আপনার বিরুদ্ধে যেতে হবে—আমায় ওখানে বিয়ে করতেই হবে। তবে যদি তেমন কোনো কারণ থাকে—"

"মনে কর না কেন যে, কোন কারণ নেই, এ শুধু তোমার কাকার একটা খেয়াল মাত্র যে, তোমার ও বাড়ীতে বিয়ে হতে পারে না।"

শিশিরের মনে পড়িল, সে যখন সুরমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা মনোরমার নিকট প্রকাশ করে, তখন মনোরমা কাঁদিয়া বলিয়াছিল "বাবা, সে ত সুরমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এত বড় কপাল কি হবে তার?" এ কি গভীর রহস্য কাকা তাঁহার জীবনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা জমাট অন্ধকারের মত এতদিন খুড়ীমাকে দূরে রাখিয়াছে এবং আজ তাহার ও তাহার প্রণয়পাত্রীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে? শুধু বোঝা যায় যে, সে একটা কালো কিছু. কিন্তু কি যে সেই কালো—তাহা বোঝা যায় না। এ যেন জগতের সেই সীমাবিহীন রহস্য—মানবের জ্ঞান যাহার নিকট আঘাত খাইয়া বারবার পরাস্ত হইয়া আসিতেছে। সে আর কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল।

খুড়া-ভাইপোর দুইদিন বাক্যালাপ হইল না। শিশির গুম হইয়া বসিয়া রহিল—কাকার উপর নিষ্ফল ক্রোধে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথও শিশিরকে কাছে ডাকিতে পারিল না। ডাকিয়া কি বলিবে? সান্ত্বনা দিবার ত তাহার কিছু নাই! ইহার চেয়েও গভীর বেদনা সে একদিন বহন করিয়াছে,—অন্তর তাহার কত বড় দহন-জ্বালায় পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে।

আবার সেই শান্ত সন্ধ্যা—আবার সুরেন্দ্রনাথ আপনার গৃহকোণে একাকী বসিয়া আছে। হৃদয়ে তাহার অশান্তির তুমুল ঝটিকা বহিয়া যাইতেছে। হঠাৎ তাহার পায়ের নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল—লালপাড় শাড়ী পরিহিতা এক রমণী-মূর্ত্তি। সুরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারেও সে সেই মুখখানি চিনিতে পারিল। এ যে তাহার পরিত্যক্তা পত্নী মনোরমা! তরুণীর নববিকশিত সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল লাবণ্য ও সলজ্জ আনন্দধারা আজ তাহার দেহে জোয়ার খেলিয়া যাইতেছে না, আজ সে মূর্ত্তিমতী বিষাদপ্রতিমা। কাল, ভাব, ঘটনা সকলেই সেই দেহে, সেই মুখে, তাহাদিগের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে; তবুও যে এ মুখ ভুলিবার নয়! বিস্ময়-বিমূঢ় সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া পড়িল। এ কি স্বপ্ন? সে কি নিদ্রিত, না জাগ্রত?

মনোরমা অতি কাতরস্বরে কহিল, "আমি না এসে থাকতে পারলাম না। আমায় যখন তুমি ত্যাগ করেছিলে, আমি কিছু বলিনি, নতশিরে তোমার আদেশ মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু, আজ, ওগো, আজ যখন আমার স্নেহের পুতলীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছ, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আমি তাই ছুটে এসেছি, এই তোমার পায়ের কাছে এসে বসেছি। তোমায় মিনতি করে বলছি, সে আজ্ঞা ফিরিয়ে নাও,—ওগো, তুমি ফিরিয়ে নাও।"

সুরেন্দ্র ক্লিষ্টস্বরে উত্তর দিল "তুমি বৃথা এলে, মনোরমা! সব বৃথা, সব বৃথা। আজ্ঞা আমার অপরিহার্য্য; আমি তা ফিরিয়ে নিতে ত পার্ব্ব না।"

"পার্‌বে না?"

"না।"

"এতই কঠিন ফিরিয়ে নেওয়া? ভাল করে বুঝে দেখ। দুটী তরুণ হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা, জীবনের সুখদুঃখ যে এর উপর নির্ভর কর্‌ছে!"

"ভাল করে ভেবে দেখেছি, সব বুঝেই এ কথা বল্‌ছি। না, না, ভাল করে ভাব্‌ব আর বুঝ্‌ব কি? এতে ভাব্‌বার বা বুঝ্‌বার কিছু নাই! এ যে নিয়তি, এ ভয়ানক নির্ম্মম, ভয়ানক কঠিন।"

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইল; নিরাশার সুরহীন ভাঙ্গা স্বরে কহিল, "আমার আসা তবে বৃথাই হ'ল? এম্‌নি তবে ফিরে যাব?"

সুরেন্দ্র দ্বিগুণ ব্যথিতস্বরে কহিল "হাঁ, মনোরমা, বৃথাই হল। বিমুখ হয়েই তোমায় ফির্‌তে হ'ল।" সেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমা যাইতে গিয়া হঠাৎ ফিরিল ও বসিয়া-পড়িয়া সুরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওগো, তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না। আজ তুমি দয়া কর, দয়া কর। কাতরতায় দেবতারও মন গলে; আর মানুষ তুমি—ওগো তুমি কি—! আমি এত কাঁদছি, এত সাধ্‌ছি!"

সুরেন্দ্রের হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্ত তাণ্ডব তালে নৃত্য করিতেছিল। তাহার অন্তরে মনোরমাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া আদরে-আদরে তাহার সমস্ত কান্না, সমস্ত দুঃখকে মুছিয়া দিবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা জাগিতেছিল। বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল,—"কেঁদো না, অমন করে' আর কেঁদো না; তুমি যা চাও তাই হ'বে, আমি তাই তোমায় দেবো।" কিন্তু সে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মনোরমা তাহার পায়ে মাথা খুঁড়িতে-খুঁড়িতে কহিল, "কেন তুমি এমন কর্‌ছ? কিসের এ প্রতিজ্ঞা তোমার? এতদিন জান্‌তে চাই নি, কিন্তু আজ জান্‌তে চাই।" অভিমানে, বেদনায় ভগ্নকণ্ঠে সে চেঁচাইয়া বলিল "বল আজ, কেন তুমি এমন কর্‌ছ।"

সুরেন্দ্র গম্ভীরকণ্ঠে কহিল "উঠে বস, বল্‌ছি।" নূতন মেঘের বজ্রধ্বনিও বুঝি এত গম্ভীর, এত ভয়ঙ্কর নহে! মনোরমা ভয়ে স্থির হইয়া গেল।

সুরেন্দ্র কহিল, "তবে শোনো। আজ ২৫ বৎসর হল, একদিন এম্‌নিধারা সন্ধ্যেবেলায় মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, হরিকিশোর রায়ের বংশের কন্যা, আমার স্ত্রী, মনোরমাকে আর গ্রহণ কর্ব্ব না। যে কারণে আমি সেই কন্যাকে গ্রহণ করিনি, ঠিক সেই কারণে শিশির এই কন্যাকে গ্রহণ কর্‌তে পারবে না।"

অজগরের দৃষ্টি-বিমুগ্ধা হরিণী যেমন করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, তেমনই করিয়া মনোরমা সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মৃত্যুর মত নির্ম্মম, বজ্রের মত ভীষণ কিছু তাহার উপর উদ্যত হইয়া আছে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল, সে তাহার দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রের কণ্ঠতালু যেন শুকাইয়া আসিতেছিল। সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল "কেন গ্রহণ করলাম না, শোনো। আমার এক বোন ছিল, মন্দাকিনী; সে বালবিধবা ছিল,—দেবতার পায়ে উৎসর্গীকৃত ফুলের মত পবিত্র, তেমনই সুন্দর। নিষ্পাপ, সরল ফুলটীর মত সুন্দর এই জীবনকে আমরা সকল প্রকার মন্দ থেকে দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তাম। কিন্তু মন্দ একদিন আমাদের ঘরে আত্মীয়েরই রূপ ধরে এল—আমরা কিছু বুঝ্‌তে পারি নি। সেই মন্দের স্পর্শে আমাদের মন্দাকিনী শুকিয়ে গেল। একদিন হঠাৎ তার লজ্জার কথা, তার কলঙ্কের কথা আমার মায়ের গোচরে এল। মা তাকে ভুলাবার জন্যে তাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বার হলেন, সঙ্গে আমিও গেলাম। কিন্তু মন্দা যখন বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, সে তার গৌরব হারিয়েছে, যা সে না বুঝে করে ফেলেছে, তা মর্ম্মান্তিক কথা, তা কলঙ্কের কথা,—তখন সে নিদাঘস্পর্শে শুভ্র যুঁইটীরই মত শুকিয়ে ঝরে গেল। আত্মীয় বলে, বন্ধু, বলে যাকে সাদরে ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সেই-ই বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌ল। কে সে বিশ্বাসঘাতক, বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি মনোরমা?"

মনোরমা এ বিবরণ শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদিয়া-

ছিল। তাহার আশঙ্কা-কাতর হৃদয় বার-বার বলিতেছিল, "হে ঠাকুর, আমার এ আশঙ্কা যেন অমূলক হয়।" কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে বিশ্বাসঘাতক, বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি?" তখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, সে যাহা আশঙ্কা করিতেছিল, তাহাই সত্য। তবুও সে দুই হাতে বুক চাপিয়া প্রাণপণে মনে-মনে ভয়ত্রাসহারীকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু আশঙ্কায়, লজ্জায়, তাহার মুখ প্রদোষাকাশের মত লাল হইয়া উঠিল। যে অন্ধকার তাহাকে ছাইয়া ফেলিতে উদ্যত, তার আগমনী প্রাণে বাজিয়া উঠিল।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সুরেন্দ্রনাথ কহিল, "সে তোমার দাদা নন্দকিশোর।"

মনোরমা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বজ্র যে তাহার পঞ্জরাস্থি চূর্ণ করিয়া দিতেছিল।

"কেন শুন্‌তে চাইলে, মনোরমা? যে বেদনার গুরুভারে জীবন আমার পিষে যাচ্ছে, সেই বেদনা তুমি বইতে এলে কেন?"

উঠিয়া বসিয়া আলুলায়িত কেশজাল মুখের পাশ হইতে সরাইয়া মনোরমা কহিল "এসেছি যে, ভালই করেছি। শুন্‌লাম যে, ভালই হ'ল। বেদনা ত কারণ না জেনে অনেকদিন ধ'রে বহন করে আস্‌ছি, আজ ত নূতন নয়। কারণ জান্‌লাম, ভালই হ'ল। কতদিন দারুণ বেদনায় অস্থির হয়ে ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌তাম; মনে হ'ত, শাস্ত্র মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা; এ জগতে পাপ-পুণ্যের বিধাতা কেহ নাই। কিন্তু আজ জান্‌লাম, আমার বিশ্বাসের পথ সহজ হ'ল, তুমি তার দৃঢ় হ'ল। জান্‌লাম যে, ভাইএর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছে বোন্ এবং বোনের পাপের—ভাই। ওগো, এ লজ্জায়, এ কলঙ্কে বেদনা আছে, দুঃখ আছে; যার সীমা-পরিসীমা নেই এমন সাগরের মত এ দুঃখ; কিন্তু তাতেও এতটুকু মাটির চড়ার মত এ সান্ত্বনা আমার জেগে রৈল যে পরিত্যক্তা হয়েও আমি পতি-সোহাগিনী পত্নীর মতই তোমার দুঃখ সমান ভাগে বেঁটে নিলাম। এ দুর্ব্বহ ভার আর তোমায় একা বইতে হবে না।"

দুইজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর অত্যন্ত মৃদুস্বরে মনোরমা কহিল "মার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?"

"তোমায় আর গ্রহণ কর্ব্ব না।"

"আর কিছু নয়?"

"না।"

মনোরমা কি ভাবিল, তাহার পর কহিল "তবে এই বিয়ের ত কোনো বাধা নেই, এ বিয়েটা হোক?"

"তা কি করে হবে, মনো?"

"তোমার প্রতিজ্ঞায় ত বাধ্‌বে না।"

"কথায় বাধ্‌বে না, কিন্তু মানেতে বাধবে।" মনোরমা জোর করিয়া কহিল "না মানেতেও বাধ্‌বে না। আমার সারাজীবন এই কষ্ট, এই লাঞ্ছনা ভোগেতেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। মন্দার কলঙ্কের বোঝা যে আমি নিজে তুলে নিয়েছি। আমায় পরিত্যক্তা দেখে, লোকে যে আমার চরিত্রে কালী লেপে দিয়েছে। কত ঘৃণা, কত অপমান যে মাথায় বয়ে আস্‌ছি, আজ এই ২৫ বচ্ছর। তাতে সে পাপ চাপা-পড়ে পিষে গিয়েছে, আমার মনের আগুন সে কোন্ কালে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তার তিলমাত্রেরও অস্তিত্ব নাই।"

সুরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, এই যে নির্দ্দোষী সুচরিতার এই কলঙ্ক—এই কি যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নহে? প্রতিশোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি, তাঁহার কি রক্তপিপাসা মিটে নাই? মিটিয়াছে, নিশ্চয়ই মিটিয়াছে।

এই দুটি তরুণ রোমিও-জুলিয়েটের মিলন-পথে বাধা হইয়া না দাঁড়াইলেই দুই বংশের মিলন হইবে না কি? কে বলিয়া দিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইবে?—মাগো, মা, আজ তুমি আমায় প্রতিজ্ঞামুক্ত করে দাও; না হয়, আমার উপায় একটা করে দাও।

মনোরমা আবার কহিল "আমি তোমার স্ত্রী! গ্রহণ না করলেও আমার দাবী যায় নি। আজ সেই জোরে আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা কর্‌ছি, শিশিরকে আমায় দিয়ে দাও, সে ত আমারও ছেলে। চির-বঞ্চিতাকে এটুকু থেকে বঞ্চিত কোরো না।" জননী যেন তাহার কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়াই মনোরমার মুখে উত্তর পাঠাইলেন। সুরেন্দ্র, মনে-মনে মার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, "তাই

হোক, মনোরমা শিশিরকে তুমিই গ্রহণ কর! সে আজ থেকে তোমারই ছেলে হোক।"

মনোরমা গড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। কিন্তু সে যখন উঠিতে যাইবে, তখন সুরেন্দ্র আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার হৃদয়-নদী ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে ভাসাইয়া, ছাপাইয়া গেল। মনোরমার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে সে কহিল "প্রায়শ্চিত্ত যদি হয়ে গেছেই মনোরমা, তবে তুমিও আমার ঘরে এসো।"

মনোরমা কাঁদিয়া কহিল, "না গো না, না! দেবতা তুমি, তোমার আসন থেকে তোমায় নামাতে আমি আসি নি। তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখ, আমায় গ্রহণ কোরো না। ত্যাগ তুমি করেছিলে, ত্যক্তই আমি থাকি। আজ তুমি যা দিয়েছ তাই—"

সুরেন্দ্রের নয়নে যে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়াছিল, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া, মনোরমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোঁফের আত্মকথা

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

শ্মশ্রু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি দাদার ছোট্ট ভাই,
দাদা কচি গালে গজান্ নাকের নীচে আমার ঠাঁই!
আমরা দুভাই আস্‌ছি চলে সেই সে আদিম যুগ থেকে;
পুরুষ তখন পুরুষ ছিল, চল্‌তো মোদের মান রেখে।
হত্যা করা জান্‌তো না কেউ, আমরা সুখে ছিলাম তবে;
লোক-দেখানো ধর্ম্ম তখন জন্মায় নিকো এই ভবে।
শিখা তিলক গজে ছিলেন, জান্‌তো না কেউ নষ্টামি;
মাতাল গেঁজেল নিশাচরের ছিল নাকো ভণ্ডামি।
মুনি ঋষির মুখে তখন গড়্‌তাম কালো কুঞ্জবন;
কাট্‌তো নাকো—ছাঁট্‌তো নাকো করতো নাকো উৎপাটন।
দাড়িদাদা বাদুড়-ঝোলা ঝুল্‌তো তাঁদের বক্ষ'পরে;
আমি চুলের 'পোল' রচিতাম ওষ্ঠ হতে বিম্বাধরে।

মোদের কদর জান্‌তো প্রাচীন মোগল পাঠান মুসলমান্;
আমার মাথা ছাঁট্‌তো বটে, দাদা কিন্তু লম্বমান!
কালের চাকা স্থির থাকে না, ফিরে পেলাম দিন পুরা;
দাদার দফা নিকেশ করে আমায় রাখেন হিন্দুরা!
আমার নাগাল পায় কে তখন, পেতাম যখন দুই চাড়া?
ঊর্দ্ধদিকে বাহু তুলে চোখ দুটোকে দিই তাড়া।

শর্ম্মারামের আদর কত—হায়রে এখন বুক ফাটে!
পুরুষগুলো হচ্ছে নারী নব্যযুগের ঝঞ্ঝাটে!
নিত্যি ভোরে উঠে তখন বসতো সবাই আহ্নিকে;
এখন ও-সব চুলোয় গেছে, সব সঁপেছে বহ্নিকে!
সর্দ্দি কাশি যুৎ পেয়েছে, নিত্যি ভোরে দেয় হাঁচি;
উচিত এখন আইন করে বন্ধ করা ক্ষুর কাঁচি।

নারীত্বটা নিচ্ছে পুরুষ, পুরুষত্ব লাঞ্ছিত;
চরণভরে ভুবন কাঁপা নয়কো এখন বাঞ্ছিত।
নারীর সুরটি বেরোয় যদি চাঁচাছোলা মুখ থেকে,
পাড়ায় পাড়ায় নাম রটে যায়, সবাই এসে যায় দেখে।
ছেলেগুলোর চ্যাঙড়ামিতে শরীর মোদের যায় জ্বলে;
ওরা আরো বিশেষ করে মুখটি চাঁচে ভোর হলে।
হাজার যদি চেষ্টা করিস্ পুরুষ কিরে হয় নারী?
দ্যাখ্ না তোদের কাণ্ড দেখে দিচ্ছে নারী টিট্‌কারি!
ওরা যত হত্যা করে, ঝ্যাঁটার মত হই দড়;
রক্তবীজের বংশ মোদের, ক্ষুরের চেয়ে ঢের বড়।
পুরুষগুলো নারী হতে আবার যদি সাধ করে,
সত্যি বল্‌ছি শুন্‌বো নাকো, বস্‌বো তেড়ে নাকে' পরে

কাশীর কিঞ্চিৎ *

(শ্রীনন্দিশর্ম্ম-প্রণীত)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

পঞ্জিকায় কোন-কোন মাসে রাশিবিশেষের 'কিঞ্চিৎ লাভ' লেখা থাকে। আমার জন্মরাশিতে এবার শুভ বৈশাখ মাসে বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু লেখা ছিল; তাই এবার কাশী গিয়া 'কাশীর কিঞ্চিৎ' লাভ হইয়াছে। তবে ইহা 'কাশীর কিঞ্চিৎ'—সুতরাং নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ নহে 'যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য'ও ইহার প্রকৃত দক্ষিণা হইবে কি না সন্দেহ,—পাঁচ আনা অর্থাৎ কুড়িটি তাম্রমুদ্রায় ইহা ত নিতান্তই সস্তা, একেবারে মাটির দর। গ্রন্থকার 'বৈষ্ণব বিনয়' দেখাইয়া পুস্তকখানিকে কাশীর 'গাইড' বলিয়াছেন। আমরা বলি, ইহা শুধু 'গাইড' কেন,—Guide, philosopher and friend! আজকাল সস্তা মাছতরকারী ও 'খাবারে'র লোভে অনেকেই পূজার বন্ধে কনসেশানের কল্যাণে সৌখীন তীর্থযাত্রা করেন; তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কাশী পৌঁছিয়া পাঁচ আনা পয়সা খরচ করিয়া এক একখানি 'গাইড' সংগ্রহ করিবেন; তাহা হইলে অনেক জিনিশ দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন। এক শ্রেণীর লোকে থিয়েটার প্রভৃতিতে দেখিবার সুবিধার জন্য অপেরা-গ্লাস লইয়া যান; এই পুস্তক অপেরা-গ্লাস কেন, যাত্রা-গ্লাসের কায করিবে। কাশীতে 'যাত্রা' করিয়া যাত্রিগণ বহু রহস্য এই পুস্তকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিবেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ দিয়াছিলেন, 'নন্দি-শর্ম্মা'ও আমাদিগকে দিব্যচক্ষুঃ দিয়াছেন। ইহার গুণে আমাদের কাছে কাশীর বহু গুপ্ত-তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার নাম গোপন করিয়া নিজেকে 'নন্দিশর্ম্মা' বলিয়া চালাইয়াছেন। গোপনের চেষ্টায়ও নামগোপন ঠিক হয় নাই। নামটি চক্ষুষ্মান্ লোকের চোখে ঠিক পড়ে, অন্ততঃ আমার চোখে ত পড়িয়াছিল। যাহা হউক, লেখক যখন 'বিনামা' হইতেই পছন্দ করেন, তখন আমি আর পাঠকবর্গের চোখ ফুটাইব না। কাশীতে মরিলে যখন সকলেরই শিবত্ব-প্রাপ্তি হয়, তখন কাশীতে বাস করিয়া ইঁহার 'নন্দিত্ব'-প্রাপ্তি হইয়াছে তাহা আর বিচিত্র কি? (অনেকের যে এখানে শিবের সান্নিধ্যে বৃষত্বপ্রাপ্তি হয়!) আর, যিনি এই আনন্দকাননে বাস করিয়া মনের আনন্দে কাশীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং পাঠককেও আনন্দ দান করিয়াছেন, তিনি 'নন্দী' নাম অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। কোন-কোন নামজাদা সমালোচক তীব্র ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে পুস্তকখানি আমার রচিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বোধ হয় আমার এই সমালোচনাকে আত্মপ্রশংসারূপ আত্মহত্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবেন।

এক্ষণে পুস্তকখানির বিশিষ্টতার কথা বলি। আজকাল আমাদের সাহিত্যে 'ভুবনসুন্দরী' বারাণসীর বহু উচ্ছ্বাসময়ী বর্ণনা দেখা যায়। কাশী পুণ্যতীর্থ; সুতরাং কাশী সম্বন্ধে এরূপ ভক্তিভরা কথা প্রকাশিত হইতেছে, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি ত কাশীর গোঁড়া, সুতরাং আমার ইহা খুবই ভাল লাগে। কিন্তু কাশীর আর-একটা দিক্ আছে, সেটা আজকালকার লেখকগণ একেবারে চাপিয়া যান। আমি নিজেও এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দলভুক্ত। কাশী তীর্থশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেখানেই আমাদের তীর্থ, সেখানেই তীর্থ-কলঙ্কও বর্ত্তমান। কাশী-বৃন্দাবন ত অনেক দূর, এই কলিকাতার কাণের কাছে কালীঘাটেই কত অপকীর্ত্তি আছে, কত দুশ্চরিত্র-দুশ্চরিত্রা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া নিজেদের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পুণ্যপীঠে যাতায়াত করে, 'সন্ধানী' লোকে তাহা জানেন। এ বিষয়ে কাশীর খোসনাম যথেষ্ট। এই তীর্থ-কলঙ্ককে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় বিবেচনা করিলে চলিবে না। কাশীর এই কুৎসিত দিক্‌টা আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রথম আমলে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন তাঁহার আট আনা দক্ষিণার 'অভাগী'তে কাশীর অনেক প্রলোভন, অনেক পাপাচার, অনেক বিপদ্, অনেক কদর্য্য ব্যাপারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার মানসকন্যার বিশুদ্ধিরক্ষার জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং তাঁহার বর্ণনায় কটু সত্য থাকিলেও—মজাও নাই, মিলও নাই। পক্ষান্তরে, 'কাশীর কিঞ্চিতে' মজাও আছে, মিলও আছে—কেন না, ইহা আগাগোড়া কাশীর কেচ্ছা এবং ছড়ার আকারে লিখিত। গুরুলোকের ন্যায় তীর্থস্থানের দোষ দেখিতে নাই, নিন্দা করিতে নাই—এইরূপ একটা শিষ্টাচারের কথা শুনি বটে; কিন্তু দোষ-কীর্ত্তন না করিলেও ত প্রতিবিধান হয় না, হিন্দুর এই কলঙ্ক হিন্দুকে চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইলে প্রতিকার হইবে কিরূপে? হিন্দু-সমাজ হইতে ইহার সংশোধন না হইলে কি শেষে সরকারের নিকট আইনের আবদার করিতে হইবে? 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে কে রাখিবে?' অন্ততঃ, সাধুকে সাবধান করিবার জন্য, নবাগতকে সতর্ক করিবার জন্য, এই প্রযত্নের প্রয়োজন। আর তীর্থনিন্দা-সম্বন্ধে

* ৩৬.৬ নং জঙ্গমবাড়ী, (কাশীধাম) বিশ্বনাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থকার যে সাফাই গাহিয়াছেন, তাহাতে আর তাঁহাকে কোন প্রকারেই দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন—

কাশী সে কাশীই আছে, থাক্‌বেও চিরদিন,
মানুষই স্বভাবদোষে হচ্ছে ক্রমে হীন।
সে দোষ কাশীর নয়—মানুষেরই সেটা,
হেথাও সে বিষয় খুঁজে বাধিয়েছে এই লেঠা।

লেথক বহুদিন তীর্থবাস করিয়া ভূয়োদর্শী ও ভুক্তভোগী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন—

ভারত ঝেঁটিয়ে যত ছিল—সেরা সেরা পাপ
শিবের রাজ্যে ছাইচাপা সব—হয়ে আছে গাপ।
কেউ বা ঢাকেন শাল-রুমালে, কেউ মুড়িয়ে মাথা!
কারুর খোলস অলষ্টার, কারুর বা কাঁথা।

আর এই সব দেখিয়া-দেখিয়া, মনে ব্যথা পাইয়া, তিনি তীব্র ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন, হাল্‌কাভাবে হাল্‌কা হাসি হাসেন নাই। তিনি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাশীর মঠ-মন্দির, অন্নসত্র হইতে ছাঁইচ-কানাচ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন এবং অনেক মিঠে কড়া কথা শুনাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে উপদেশও দিয়াছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিক্ত, কিন্তু সমাজ-শরীরের পক্ষে বড় উপকারী। Addison, Dickens বিদ্রূপব্যঙ্গ্যে সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, Locke On the Human Understanding এ তাহা করিতে পারে নাই। তবে হিন্দুসমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত,—টেকচাঁদ, পঞ্চানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের বৈদ্যুতিক ব্যাটারিতে ইহার কিছু করিতে পারে নাই,—'কাশীর-কিঞ্চিৎ'-কার পারিবেন কি?

এইবার পুস্তকের একটু খোলসা পরিচয় দিয়া সমালোচনায় 'ইতি' দিই। প্রথমেই উৎসর্গপত্র; উৎসর্গ কিন্তু বিদ্যালয়ের উপসর্গ পাঠ্যপুস্তক-লেখকদিগের মত মানুষ আশুতোষের শ্রীচরণেষু নহে, দেবতা আশুতোষ 'শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথ শ্রীপাদপদ্মেষু।' তাহার পর, অপরে লেখে 'ভূমিকা', ইনি লিখিয়াছেন 'জমিকা'- জমি ভূমির প্রতি-বাক্য (Synonym) বলিয়া নহে—গোড়াগুড়িই গ্রন্থকার রীতিমত জমাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া! গ্রন্থকারের কাশীযাত্রার কৈফিয়ত একে-বারে অকাট্য! যেথানে অনাদিলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর-কেদারনাথ বর্ত্তমান, তিলভাণ্ডেশ্বর দিনে-দিনে তিলে-তিলে বর্দ্ধমান, তৈলঙ্গস্বামী সুদীর্ঘ-জীবী, আর ষাঁড় ও বিধবার নিরামিষ খাইয়া আয়ুঃ ও স্বাস্থ্য অটুট, তাহার তুল্য স্বাস্থ্যকর আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর স্থান কোথাও নাই, অত্র সন্দেহো নাস্তি! তাহার পর, হাবড়ায় মেমের কাছে টিকিট কেনা ('মহিলা-প্রদত্ত পাশ') 'কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ১ নং রেলের কুলীর জুলুম, ২ নং চুঙ্গীর (Octroi) উৎপাত (গণ্ডস্যোপরিপিণ্ডঃ), এক্কার ৩ নং ধাক্কা হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত সাধু ও স্বামীদের কীর্ত্তি ও একশ্রেণীর কাশীবাসী ও কাশীবাসিনীদিগের অনন্তলীলা পর্য্যন্ত কিছুই গ্রন্থকারের চক্ষুঃ এড়ায় নাই। দু'চারটি নমুনা দিতেছি।

পুণ্যধামে—মামার দোকান, চাটের দোকান, সবই শোভা পায়;
যাত্রীদের কষ্ট না হয়—এইটে অভিপ্রায়।
পথে দেখি হেঁকে যাচ্ছে—জোরে উচ্চ রব—
"বিশুদ্ধ পবিত্র গরম কাবাব কাটলেট্ চপ্।"

বৈকালে গঙ্গার ঘাটে মেয়ে-মজলিসে 'ধর্ম্মচর্চ্চা' যথা:—

কোন্ স্যাকরা কেমন—কত নতুন গুড়ের দর,
পোড়ারমুখো ধোপা ছিঁড়ে দেছে নেপের ওড়;
ইত্যাদি সব ধর্ম্মচর্চ্চা—চলে সে আসোরে,
হাতে কিন্তু জপের মালা অবিশ্রাম ঘোরে!

আর অদূরে পুরুষ-মজলিসে 'বত্রিশ-সিংহাসন'—

কার্লাইল, এমারসন্, হক্‌স্লী টলষ্টয়—
এ ঘাটেতে সকলেরই মুণ্ডপাত হয়।
গল্প গুজব মকর্দ্দমা—বিষয়ের কথা,—
নিন্দা আর সমালোচন, এই শুনি তথা।
যার যেমন সংস্কার, তার তেম্‌নি ঠেকুর,—
সকাল থেকে সারাদিনটা—খেয়েছে যে মূলো,
সন্ধ্যায় কি এলাচের—উঠ্‌বে ঢেঁকুর গুলো?

(আবার)—পেনসনার আর বিপত্নীকের পিঁজরাপোলের মত—

কাশীধামের অনেক অংশই—হচ্ছে পরিণত।
সম্প্রতি এই দেখতে পাই—সংক্রামক হয়ে—
বাড়ী করা বাইটা ক্রমে, বোস্‌চে আসন ল'য়ে—
যে আসে এথানে, তারই চেগে ওঠে বাই,—
যত টাকা লাগুক না—বাড়ী করা চাই।

প্রথম দফাতেই এই ধরণের অনেক কথা আছে। আরও রকমারি ঢের আছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'দফারফা'র পরিচয় দিয়া আর পাঠকেরও দফারফা করিতে চাহি না। বরং পাঠককে অনুরোধ করি, সমালোচনায় ঔষধ-গেলা-গোছ পরিচয় না লইয়া তিনি একথানি পুস্তক কিনিয়া ধীরে সুস্থিরে পাঠ করুন ও কাশীরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া ধন্য হউন। তবু গ্রন্থকার শ্লীলতার খাতিরে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই।

রইল আর যে সব কথা—তাতে শর্ম্মা নাই,
যার মাথার উপর মাথা আছে,—লিখবে তারা তাই।

বলিয়া 'বিদায়' লইয়াছেন। আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় হইলাম।

অরক্ষণীয়া

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১

"মেজ মাসিমা, মা মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন—ধরো।"

"কে রে, অতুল? আয় বাবা আয়" বলিয়া দুর্গামণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। অতুল প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

"নীরোগ হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও। ওরে ও জ্ঞানদা, তোর অতুল দাদা ফিরে এসেচেন যে রে। একখানা আসন পেতে দিয়ে মহাপ্রসাদটা ঘরে তোল মা। কাল রাত্তিরে সাড়ে ন'টা-দশটার সময়, সদর রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ শুনে ভাবলুম, কে এলো। তখন যদি জানতুম, দিদি এলেন—ছুটে গিয়ে পায়ের ধূলো নিতুম। এমন মানুষ কি আর জগতে হয়! তা' দিদি ভাল আছেন বাবা? এখন পুরী থেকে আসা হ'ল বুঝি? কি কচ্চিস্ মা—তোর অতুল দা' যে দাঁড়িয়ে রইলেন।" মায়ের আহ্বানে একটি বারো-তেরো বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে হাতে একখানি আসন লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল; এবং যতদূর পারা যায়, ঘাড় হেঁট করিয়া, দাওয়ার উপর আসনখানি পাতিয়া দিয়া, অতুলের পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিল; কথাও কহিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, মহাপ্রসাদের পাত্রখানি হাত হইতে লইয়া, ধীরে-ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, যাবার সময় মেয়েটির চোখ-মুখ দিয়া একটা চাপা হাসি যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

আবার শুধু মেয়েটিই নয়। এদিকেও একটুখানি নজর করিলে চোখে পড়িতে পারিত, এই সুশ্রী ছেলেটিরও মুখের উপরে দীপ্তি ফেলিয়া একটা অদৃশ্য তড়িৎ-প্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

অতুল আসনে বসিয়া তীর্থ প্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল। তাহার বাপ একজন 'সেকেলে সদরআলা ছিলেন। অনেক টাকাকড়ি এবং বিষয়সম্পত্তি করিয়া পেন্সন লইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন; বছর চারেক হইল, ইহ-লোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বি-এ, একজামিন দিয়া অতুল মাস-দুই পূর্ব্বে মাকে লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি রামেশ্বরম্ হইয়া, পুরী হইয়া, কা'ল ঘরে ফিরিয়াছে।

গল্প শুনিয়া দুর্গামণি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর এমনি মহাপাতকী আমি, যে আর কিছু না হোক্, একবার কাশী গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করে আস্‌ব, এ জন্মে সে সাধটাও কখনো পুর্‌ল না।"

অতুল কহিল, "কাশীই বল, আর যাই বল, মেজ মাসিমা, একবার সব ছেড়ে-ছুড়ে জোর করে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর হয় না। আমি অমন জোর করে না নিয়ে গেলে, আমার মায়েরই কি যাওয়া হ'ত?"

দুর্গামণি আর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জানিস্ ত, বাবা, সব। জোর কোরব কি দিয়ে বল্ দেখি? তিরিশটি টাকা মাইনের ওপর খেয়ে-পোরে লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে, ডাক্তার-বদ্যির ওষুধের খরচ জুগিয়ে, কি থাকে বল্ দেখি? আর এই মেয়েটা। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তেরোয় পা' দিলে। তোকে সত্যি বল্‌চি, অতুল, ওর পানে চাইলেই যেন আমার বুকের রক্ত হুহু করে শুকিয়ে যায়। উঃ! এত বড় শত্রুকেও পেটে ধোরে মাকে লালন-পালন করতে হয়!" বলিতে-বলিতেই তাঁহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অতুল এত বড় দুশ্চিন্তা ও কাতরোক্তির সম্মুখেও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; কহিল, "মাসিমার সব বাড়াবাড়ি। আচ্ছা, মেয়ে কি আর কারু হয় না যে, তোমারই শুধু ওই একটা হয়েচে—আর রাজ্যের দুর্ভাবনা একা তোমারই?"

দুর্গামণি কহিলেন, "আমার এটা ঠিক ভাবনা নয়,

অতুল, এ আমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা। সমাজ আমি জানি ত! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে; কিন্তু দেব কি করে? টাকা চাই,—কিন্তু পাব কোথায়? এই ভদ্রাসনের একাংশ ছাড়া আপনার বল্‌তে ত আর কিছু নেই বাবা।” আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এই মেয়েটাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী—অর্দ্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া আফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যথা দুর্গামণির আলোড়িত হইয়া উঠিল, এবং টপ্‌ টপ্‌ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বাহিয়া কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, “আর-জন্মে কত স্ত্রী-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম, অতুল, যে এ-জন্মে মেয়ে পেটে ধরেচি।”

“নাঃ—মেজ মাসিমা, আমি উঠলুম। নইলে তুমি থাম্‌বে না।”

দুর্গামণি আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিলেন, “না বাবা, একটু বোস্‌। দু' দণ্ড তোর কাছে কাঁদ্‌লেও বুকটা হাল্কা হয়। তাই বলি, ভগবান্‌! হতভাগীকে আমার কোলেই যদি পাঠালে, রংটা একটু ফর্সা করেই পাঠালে না কেন? কালো বলে কেউ যে ওকে আশ্রয় দিতে চায় না! সবাই যে চায় সুন্দরী মেয়ে। ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুল, শীল, স্বভাব, চরিত্র কিছুই যদি দেখ্‌বিনে, মেয়ে শুধু কালো বলেই তাকে ঘরে ঠাঁই দিবিনে, তবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ-মাকে তুই দণ্ড দিবি কেন?” অতুল কহিল, “কালো মেয়ের কি বিয়ে হচ্চে না? ভোম্‌রাও কালো, কোকিলও কালো—তাদের কি আদর হয় না? এ সব ত চিরকালের দৃষ্টান্ত—মেজ মাসিমা।” দুর্গামণি কহিলেন, “ও সান্ত্বনায় এখন আর জোর পাইনে বাবা। গিরীশ ভট্‌চায্যির মেয়ের বিয়ে চোখের ওপর দেখে, হাত-পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেছে। ঠিক আমাদের মতই—না ছিল তার টাকার বল্‌, না ছিল মেয়ের রূপ—তাই পাত্রের বয়সও গেল ষাটের কাছাকাছি। তার মায়ের কান্নাটা আমি আজও যেন কাণে শুন্‌তে পাচ্চি, অতুল।” অতুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—“ষাটের কাছাকাছি? বল কি?”

“তা হবে বই কি বাবা। হরি চক্কোত্তির নাত-জামাই হ'ল ও পাড়ার নিতাই চাটুয্যে। তারই একটা আট দশ বছরের মেয়ে যে! হিসেব কোরে দেখ দেখি।”

খবর শুনিয়া অতুল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। দুর্গামণি বলিতে লাগিলেন,—“সে মেয়ে যদি মনের ঘেন্নায় বিষ খায়, কি গলায় দড়ি দেয়, কিম্বা কুলে কালী দিয়ে চলে যায়—মা হয়ে তাকে বুকের ভেতর থেকে অভিশাপ দিই কেমন করে, বল্‌ দেখি বাবা।”

অতুল চুপ করিয়া রহিল। দুর্গামণি হঠাৎ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “বাবা অতুল, আজকাল সবাই বলে তোদের ছেলেদের মধ্যে দয়া ধর্ম্ম আছে। দেখিস্‌নে বাবা, তোদের ইস্কুল-কলেজের কোন গরীব-দুঃখীর ছেলে যদি নিতান্ত দয়া করেই মেয়েটাকে তার পায়ে একটুখানি ঠাঁই দেয়। তাহ'লে তোদের কাছে আমি মরণ পর্য্যন্ত কেনা হয়ে থাক্‌ব।”

অতুল শশব্যস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—“কেন এত ব্যস্ত হচ্চ, মেজ মাসিমা? আমি কথা দিচ্চি—” কিন্তু কথাটা সে দিতে পারিল না। সহসা লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্গামণি যদিচ ইহা লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু আর কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে হয় ত সংশয় করিত, কি এমন কথাটা অতুল ঝোঁকের উপর দিতে গিয়াও এমন করিয়া থামিয়া গেল।

অতুল নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজভাবে কহিল, “আচ্ছা, খুব চেষ্টা করব। কই রে জ্ঞানদা, একটা পান-টান দে না—বাড়ী যাই।”

দুর্গামণি রাগিয়া চীৎকার করিলেন, “তোর অতুল দা'রে একটা পান দেনা গেঁনি। মুখপোড়া মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ। বলি, এ সব কথাও কি শেখাতে হবে? মহাপ্রসাদ নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুক্‌লি, আর বেরুলিনে। শীগ্‌গীর পান নিয়ে আয়।”

“আচ্ছা আমি নিজেই গিয়ে পান নিচ্চি। কোন্‌ ঘরে রে জ্ঞানদা?” বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া অতুল শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখে পানের সজ্জা লইয়া মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। অতুল ঘরে ঢুকিয়াই গম্ভীর হইয়া বলিল, “মেজ-মাসিমা বল্‌চেন, মুখপোড়া গেঁনির না আছে রূপ, না আছে গুণ। তাকে একটা ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।”

জ্ঞানদা জবাব দিল না। অবনতমুখে বাটা হইতে গোটাদুই পান লইয়া হাত উঁচু করিয়া ধরিল।

অতুল পিছনে আসিয়া হাত হইতে পান লইয়া কহিল, "কিন্তু পান সাজা ভাল হ'লে, এবার মাপ করা হবে। যাটকে কমিয়ে না হয় কুড়ি-একুশে দাঁড় করানো যাবে।" জ্ঞানদা লজ্জায় মাথাটা ঝুঁকাইয়া প্রায় বাটার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। অতুল গলা খাটো করিয়া বলিল, "মাসিমার কাছে আর-একটু হ'লে বলে ফেলেছিলুম আর কি! আচ্ছা, বেলা হ'ল, এখন চল্লুম।

জ্ঞানদা ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সেই যে জড়-সড় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, তেম্নি বসিয়া রহিল।

"কথা কওয়া হ'ল না? আচ্ছা"—বলিয়া অতুল মেয়েটির ভিজা এলো চুলের এক গোছা টানিয়া দিয়া বলিল—"কিন্তু, আস্‌চে হরি চক্কোত্তির মতন একটা বুড়ো—চল্লুম" বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু উঠানে পা দিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, "মেজ-মাসিমা, জ্ঞানোর জন্যে বোম্বাই থেকে মা একজোড়া চুড়ি কিনেছিলেন, বাইরে এসে দেখো—"

"কই, দেখি বাবা" বলিয়া দুর্গামণি পুনরায় রন্ধন-শালা হইতে বাহির হইলেন। অতুল পকেট হইতে দুগাছি চুড়ি বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল।

তাহার রঙ এবং কারুকার্য্য দেখিয়া দুর্গামণি অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে দাতার ভূয়োভূয়ঃ যশোগান করিতে লাগিলেন। চুড়ি দু'গাছি কাঁচের বটে, কিন্তু সেরূপ মূল্যবান বাহারে চুড়ি পাড়াগাঁয়ে কেন, কলিকাতাতেও তখনো আমদানি হয় নাই। বস্তুতঃ, তাহার গঠন, চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া মায়ের নাম করিয়া অতুল নিজের টাকাতেই বোম্বাই হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

মায়ের ডাকাডাকিতে জ্ঞানদা বাহির হইয়া আসিল; এবং নিঃশব্দ নত-মুখে স্নেহের এই প্রথম উপহার হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপিয়া গেল। তার পরে দাতার পায়ের কাছে নমস্কার করিয়া সে ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিল। সে একটি কথাও কহে নাই—কিন্তু আজ তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানিলেন। শুধু পিছনে দাঁড়াইয়া এই দুটি মানুষ ক্ষণকালের জন্য সস্নেহ মুগ্ধনেত্রে এই কিশোরীর অনিন্দ্যনীয় গঠন ও গতিভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

(২)

বড় ভাই গোলোকনাথ মারা গেলে, তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বর্ণ-মঞ্জরী নির্বংশ পিতৃকুলের যৎসামান্য বিষয়-আশয় বিক্রী করিয়া হাতে কিছু নগদ পুঁজি করিয়া কনিষ্ঠ দেবর অনাথ-নাথকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিষের অসহ্য জ্বালায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মেজ-ভাই প্রিয়নাথ গত বৎসর ঠিক এমন দিনে ছোট ভাই অনাথের সঙ্গে বিবাদ করিয়া যখন উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া পৃথগন্ন হইয়াছিল এবং মাঝখানে একটা কপাট রাখার পর্য্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করে নাই, তখন রঙ্গ দেখিয়া বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিয়াছিলেন। কারণ, একটা বৎসরও কাটিল না—প্রাচীরের সমস্ত উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিয়া দিয়া, সেদিন প্রিয়নাথ সাত দিনের জ্বরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর আগের দিনটায়—মরণ সম্বন্ধে যখন আর কোথাও কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না এবং তাই দেখিতে সমস্ত গ্রামের লোক পিল পিল করিয়া বাড়ী ঢুকিয়া, ঘরের দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া, অস্ফুট কলকণ্ঠে হা হুতাশ করিতেছিল, তখনও প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই। অতুল গ্রামে ছিল না। কলিকাতার মেসে এই দুঃসংবাদ পাইয়া আজ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া যখন সে রোগীর ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে-ছিল, কোথা হইতে জ্ঞানদা পাগলের মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই আর-একটা অভাবনীয় ফাউ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে-মনে বিতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু অতুল এত লোকের সমক্ষে দুঃখে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে যখন সে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেল, তখন জ্ঞানদা জোর করিয়া পায়ের উপর মুখ চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবার মরণকালে তুমি নিজের মুখে তাঁকে একটা সান্ত্বনা দিয়ে যাও;—আমার অদৃষ্টে পরে যাই থাক—এ সময়ে আমার মতন আমার ভাবনাটাকেও যেন তিনি এইখানেই ফেলে রেখে যেতে পারেন—আর

তোমার কাছে আমি কখনো কিছু চাইব না।” বলিয়া তেম্‌নি করিয়াই মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্ভাগা পিতা অত্যন্ত অসময়ে অকালে মরিতেছে—আজ আর তাহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না—এত লোকের সম্মুখে কি করিতেছে কি বলিতেছে, কিছুই ভাবিয়া দেখিল না,—ক্রমাগত একভাবে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু অতুল সংযমী লোক। জ্ঞানদার এই ব্যবহারে অন্তরে সে যত ক্লেশই অনুভব করুক, বাহিরে এতগুলি কৌতূহলী চক্ষের উপর কঠিন হইয়া উঠিল। জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া মৃদু তিরস্কারের স্বরে কহিল, “ছিঃ, শান্ত হও; কান্না-কাটি কোরো না—আমার যা বলবার তা আমি বল্‌ব বই কি।” বলিয়া মুমূর্ষুর শয্যার একাংশে গিয়া উপবেশন করিল। দুর্গামণি স্বামীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন, অতুলের মুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী নীলকণ্ঠ চাটুয্যে দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন; অতুলের বিলম্ব দেখিয়া কহিলেন, “প্রিয়নাথের এখনো একটু জ্ঞান আছে বাবা,—যা বলবে এই বেলা বেশ চেঁচিয়ে বল—তা’ হলেই বুঝ্‌তে পারবে।” বৃদ্ধের এই প্রস্তাব আরও দুই-একজন তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিল।

জনতা দেখিয়া অতুল প্রথমেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার উপর এই নিতান্ত অশোভন কৌতূহলে সে মনে-মনে আগুন হইয়া কহিল, “আপনারা নিরর্থক ভিড় করে থেকে ত কোন উপকার করতে পারবেন না,—একটুখানি বাইরে গিয়ে বসলেই আমার যা’ বল্‌বার বল্‌তে পারি।” নীলকণ্ঠ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, “নিরর্থক! প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশী এসেই থাকে। তুমিই কোন্‌ সার্থক উপকার করতে বিছানায় গিয়ে বসেছ বাপু?” অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়-স্বরে কহিল, “আমি উপকার করি না করি, এমন করে বাতাস আটকে অপকার করতে আপনাদের আমি দেব না। সবাই বাইরে যান।”

তাহার ভাব দেখিয়া নীলকণ্ঠ দু’পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “সে দিনকার ছোকরা—তোমার ত বড় আস্পর্দ্ধা দেখি হে!” কে-একজন তাঁহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, “এল-এ, বি-এ, পাশ করেচে কি না।” একটা দশ-বারো বছরের ছোঁড়া উঁকি মারিতেছিল। অতুল কাহারও কথার কোন জবাব না দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। সে গিয়া আর একজনের গায়ে পড়িল। যাহার গায়ে পড়িল, সে অস্ফুট-স্বরে, “সদরআলার ব্যাটা” প্রভৃতি বলিতে-বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভদ্রলোক অতুলের কথাটা শুনিবার বিশেষ কোন আশা না দেখিয়া, মনে-মনে শাসাইয়া, প্রস্থান করিল।

যখন বাহিরের লোক আর কেহ রহিল না, তখন অতুল মুমূর্ষুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, “মেসো মশাই!” প্রিয়নাথ রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অতুল পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল, “আমাকে চিন্‌তে পাচ্চেন কি?” প্রিয়নাথ চক্ষু মুদিয়া অস্ফুটে বলিলেন, “অতুল।”

“এখন কেমন আছেন?”

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া তেমনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, “ভালো না।”

অতুলের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল, “মেসো মশাই, একটা কথা আপনাকে জানাচ্চি।” প্রিয়নাথ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “কই জ্ঞানদা?”

দুর্গামণি স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন, “একবার দেখ্‌বে জ্ঞানদাকে?” প্রিয়নাথ প্রথমটা জবাব দিলেন না—শেষে বলিলেন, “না!”

দুর্গামণি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “অতুল কি বল্‌চে শুনেচ? সে তোমার জ্ঞানদার ভার নিতে এসেচে। আর তুমি ভেবো না—হতভাগীকে অনেক গালমন্দ করেচ; আজ একবার ডেকে আশীর্ব্বাদ করে যাও।”

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুর্গামণি আবার সেই কথা আবৃত্তি করার পর, তাঁহার চোখ দিয়া দু’ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অশক্ত হাতখানি অনেক কষ্টে তুলিয়া, অতুলের কপালে একবার স্পর্শ করাইয়া, পাশ ফিরিয়া শুইলেন। মুখে কোন কথাই কহিলেন না বটে, কিন্তু, তাঁহার হৃদয়ের একটা অতি গুরুভার এই আসন্ন-কালে তুলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে—নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া, অতুল অকস্মাৎ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাক্ষী রহিলেন শুধু দুর্গামণি আর ভগবান।

পরদিন সায়াহ্নকালে, শতকরা ৮০ জন ভদ্র বাঙ্গালী যাহা করে, প্রিয়নাথও তাহাই করিলেন; অর্থাৎ, আফিসের

৩০৲ টাকা চাকুরির মায়া কাটাইয়া, ২৬ বৎসরের বিধবা ও ১৩ বৎসরের অনূঢ়া কন্যার বোঝা তদপেক্ষা কোন এক দুর্ভাগ্য আত্মীয়ের মাথায় তুলিয়া দিয়া, ৩৬ বৎসর বয়সে প্রায় বিনা-চিকিৎসায় ৮৬ বৎসরের সমতুল্য একটা জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তুলসীবেদীমূলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।

(৩)

ছোট ভাই অনাথনাথকে বাধ্য হইয়া প্রাঙ্গণের প্রাচীরে একটা দ্বার ফুটাইতে হইল। অগ্রজের শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেলে পোনর-যোল দিন পরে একদিন তিনি আফিস যাইবার মুখে চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে-চিবাইতে বলিলেন, "আর না বল্‌লে ত নয়, বোঠান; বুঝ্‌তে ত সবই পারো—খেতে তোমাকে একবেলা একমুঠো দিতে আমি কাতর নই,—তা দাদা আমার সঙ্গে যতই কেন না কুব্যবহার করে যান। কিন্তু অত বড় মেয়ের বিয়ের ভার ত আমি আর সত্যি সত্যি নিতে পারিনে। শুন্‌তেই আমার দেড়শ' টাকা মাইনে; কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা ত কম নয়? তা' ছাড়া আমার নিজের মেয়েটাও বারো বছরে পড়্‌ল, দেখ্‌তে পাচ্চ ত? তাই, আমি বলি কি, মেয়ে নিয়ে এ সময়ে তোমার একবার হরিপালে যাওয়া উচিত।"

দুর্গামণি রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া ছিলেন; সভয়ে সসঙ্কোচে কহিলেন, "দাদার অবস্থা তুমি ত জানো ঠাকুরপো। কিচ্ছু নেই তাঁর। এত বড় বিপদের কথা শুনে একবার দেখা পর্য্যন্ত দিতে এলেন না। তা' ছাড়া, না নিয়েই গেলেই বা যাই কি করে?"

বড়বৌ স্বর্ণমঞ্জরী দেবরের পার্শ্বে প্রাচীরের আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল; একটুখানি গলা বাড়াইয়া কহিল, 'দাদার অবস্থা ভালো নয় জানি; কিন্তু তোমার দেওরটিই কোন্ লাট সাহেব মেজবৌ? আর ঐ শুন্‌তেই দেড়শ! কিন্তু যা করে আমি সংসার চালাই, তা' আমি ত জানি! আর তাও বলি—অত বড় ধুমসো মেয়ে তোমার ঘাড়ে—কে তোমাকে যেচে ঠাঁই দিতে যাবে, বল দিকি? কিন্তু তা' বলে মান-অভিমান করে বসে থাকলে চলে না!"

দুর্গামণি ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, দিদি, আমার আবার মান-অভিমান কি!"

স্বর্ণ দেওরকে বাঁ হাত দিয়া পিছনে ঠেলিয়া, নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "তোমাকে মন্দ কথা ত আমি বলিনি মেজবৌ, যে অমন করে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলি বল্‌লে? তা' রাগই কর, আর ঝালই কর বাপু,—তোমার ঐ ডানাকাটা পরীর বিয়ে দিতে আমরা পারব না। মেয়ে ত ঐ ছোটবৌটাও পেটে ধরেচে। কেউ একবার বাছাদের মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লে আবার না কি সে চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে! তা সত্যি কথা বলব মেজবৌ,—যেমন তোমার মেয়ের ছিরি, তেম্‌নি গিয়ে হরিপালে পোড়ে-হোড়ে থেকে যা-হোক্ একটা চাষা-ভূষো ধরে দাওগে—ন্যাটা চুকে যাক্। শুনেচি নাকি সেখানকার লোক সুচ্ছিরি-কুচ্ছিরি দেখে না—মেয়ে হলেই হ'ল।"

দুর্গামণি চুপ করিয়া রহিলেন। যে বিষের জ্বালায় একদিন তাঁহারা পৃথক হইয়াছিলেন, সেই বিষদন্ত পুনরায় উদ্যত দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন। স্বর্ণ কহিল, "যার যেমন। তোমাকে কেউ ত নিন্দে করতে পারবে না। হাঁ, পারে বটে বল্‌তে আমাকে। তিনটে পাশের কম যদি জামাই ঘরে আনি, দেশশুদ্ধ একটা ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বল্‌বে—এরা করলে কি! অত বড় একটা জ্যাঠাই ঘরে থাক্‌তে কি না দুর্গা-প্রতিমে জলে ভাসিয়ে দিলে! সত্যি কি না, কি বল ঠাকুরপো?" বলিয়া স্বর্ণ অনাথের প্রতি কটাক্ষ করিল।

"তা বই কি।" বলিয়া অনাথ তাহার মহামান্যা বড় ভাজের মর্য্যাদা রাখিয়া আফিসের বেলা হওয়ার অছিলায় প্রস্থান করিল।

স্বর্ণ বলিল, "তোমার ভাইকে ধোরে কোরে যা' হোক একটা ধরে-পাকড়ে দাওগে। তাতে তোমার লজ্জা নেই, মেজবৌ—কেউ নিন্দে করতে পারবে না। তিরিশটি টাকা ত সবে মাইনে ছিল। কেই বা তাকে জান্‌তো, কেই বা চিন্‌তো। এঁদের ভাই বলে যা' লোকে জানে। আমি বলি কি—কাল দিনটে ভালো আছে, কালই চলে যাও।"

দুর্গা মনে-মনে একবার অতুলের কথা ভাবিলেন; কিন্তু, বড় জা'য়ের সাক্ষাতে কোন কথা কহিলেন না। কারণ,

ইঁহারই সম্বন্ধে অতুলের সঙ্গে সম্বন্ধ। স্বর্ণ অতুলের মায়ের মামাত বোন্।

সেদিন যেমন করিয়া জ্ঞানদা অতুলের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদাকাটা করিয়াছিল, মা তাহা দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতবড় বিপদ মাথার উপর লইয়া ইহার বিশেষ কোন অর্থ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখীর ঘরে ত একান্তমনে শোক করিবারও অবসর নাই। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরের দিন হইতেই এই কথাটা চিন্তা করিতেছিলেন। ঘরে গিয়া দেখিলেন, মেয়ে চুপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া আছে। ধীরে-ধীরে তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, "দিদি যা' বল্‌লেন, শুনেচিস্ ত" ?

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। তারপরে যে তিনি কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু মেয়ে নিজেই তাহার সুবিধা করিয়া দিল। কহিল, "কখনো ত বাপের বাড়ী যাওনি, মা, এ সময়ে একবার কেন চল না ?"

মা বলিলেন, "মা বেঁচে নেই ; দাদা কোনদিন খোঁজ নিলেন না। এত বড় বিপদ শুনেও একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌লেন না। কেমন কোরে তাঁদের কাছে সেধে যাই, বল্ দেখি মা ?"

মেয়ে কহিল, "দুঃখীর খোঁজ কেউ সেধে কখনো নেয় না মা। তাঁরা নেন্‌নি—এঁরাও ত নেন্ না। এঁরা বরং যেতেই বল্‌চেন। আমাদের মান-অভিমান বাবার সঙ্গেই চলে গেছে, মা। চলো, আমরা সেখানে গিয়েই থাকিগে।"

মায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেয়ে সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিল, "আমি জানি, শুধু আমার জন্যেই তুমি কোথাও যেতে চাও না। নইলে, জ্যাঠাইমার কথা শুনে একটা দিনও তুমি এখানে থাক্‌তে না। আমার জন্যে একটুও ভেবো না, মা ; চলো, দিন-কতকের জন্যে আর কোথাও যাই। এখানে থাক্‌লে তুমি মরে যাবে।"

মা আর থাকিতে পারিলেন না, মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মেয়ে বাধা দিল না, শান্ত করিবার চেষ্টা করিল না ; শুধু নীরবে জননীর বুকের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দুর্গামণি নিজেই কতকটা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, "তোকে সত্যি বল্‌চি, জ্ঞানদা, তুই না থাক্‌লে—আমি যেখানে দু'চক্ষু যায়—সেই দিনই চলে যেতাম। শুধু তোর জন্যেই পারিনি।"

"তা' আমি জানি মা।"

"আচ্ছা, একটা কথা আমাকে সত্যি কোরে বল্ দেখি, বাছা ; সেদিন কেন অতুল ও কথা বল্‌লে ? না, জ্ঞানদা, অমন কোরে মুখ ঢেকে থাকিস্‌নে, মা, লজ্জা করবার সময় এ নয়। আমি জানি, মিছে কথা বল্‌বার ছেলে সে নয়। তবে, সেই বা কেন তাঁর মরণকালে অমন ভরসা দিলে, তুই বা কেন তার পায়ে পড়ে অমন কোরে কাঁদ্‌লি ?"

জ্ঞানদা মায়ের বুকের মধ্যে হইতে অস্ফুটে কহিল, "সে আমি জানিনে, মা।"

দুর্গামণি জোর করিয়া মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "তোমার বাবা বেঁচে থাক্‌তে আমার কখনো কিছু মনে হয়নি বটে, কিন্তু সেই দিন থেকে ভেবে ভেবে এখন যেন অনেক কথাই বুঝ্‌তে পারি। অতুলের মুখের কতদিনের কত ছোট-খাটো কথাই না আজ আমার মনে হচ্চে।" বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ ব্যগ্র হইয়া কন্যার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বল্, মা, আমি যা মনে করেচি তা' মিথ্যে নয় ? আমি এ ক'দিন শুধু স্বপন দেখিনি ?"

জ্ঞানদা তেম্‌নি মুখ ঢাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানি, মা ; তাঁর ধর্ম্ম তাঁর কাছে।"

দুর্গামণি আনন্দে, অধৈর্য্যে কাঁদিয়া কহিলেন, "আমাকে সংশয়ে ফেলে রেখে আর বিঁধিস্‌নে, মা ; একবার মুখ ফুটে বল্—আমি তোর বাপের জন্যে একটিবার প্রাণ খুলে কাঁদি। আমার এ কান্না তিনি শুন্‌তে পাবেন।"

মেয়ে চুপি-চুপি কহিল, "কাঁদো না মা,—আমি তো তোমাকে কাঁদ্‌তে বারণ করিনে। বাবাকে জানাতে বলেছিলাম—তিনি নিজেই ত জানিয়েছেন। এখন তাঁর ধর্ম্ম তাঁর কাছে।"

দুর্গামণি এবার আর বাধা মানিলেন না। জোর করিয়া মেয়ের আরক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, তাহাতে অজস্র চুম্বন করিয়া, পুনরায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া,

নীরবে বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিলেন। পরে চোখ মুছিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তাই বটে, মা, তাই বটে। অতুল আমার দীর্ঘজীবি হোক্—তার ধর্ম্ম তার কাছেই বটে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের কারু একদিনের তরে মনে পড়েনি, মা; তুই নিজেই যে তাকে মরা বাঁচিয়েছিলি। সে বছর লোকে বল্‌লে—বেরিবেরি রোগ। তা' সে যে রোগই হোক্,—ফুলে, ফেটে, ঘা হয়ে, আগে তার মা, তার পরে সে। তার ত কোন আশাই ছিল না। পচাগন্ধে, ভয়ে, কেউ যখন তাদের ও-দিক্ মাড়াতো না, তখন, এতটুকু মেয়ে হয়ে, তুই যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই কোরে, তাকে ফিরিয়ে এনেছিলি। সে ধর্ম্ম সে কি না রেখে পারে? সাবিত্রীর মত যাকে যমের হাত থেকে তুই ফিরিয়ে এনেছিলি, তাকে কি ভগবান আর কারু হাতে দিতে পারেন? এ ধর্ম্ম যদি না থাকে, তবে চন্দ্র-স্যির্যি এখনো উঠ্‌চে কেন?"

একটুখানি মৌন থাকিয়া, পুনরায় পুলকিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "এখন যেখানে আমাকে যেতে বলিস্, সেইখানেই যাবো। কিন্তু তুই ত তার মত না নিয়ে যেতে পারিস্‌নে বাছা। তাই বটে! তাই বটে! তাই বাবা আমার ফিরে এসেই, সকাল হ'তে না হ'তে দু'গাছি চুড়ি দেবার ছল্ কোরে মাকে আমার দেখ্‌তে এসেছিল। ওগো, আর একটা বছর কেন তুমি বেঁচে থেকে দেখে গেলে না!" বলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া রোধ করিলেন।

"বলি মেজবৌ?"

দুর্গামণি তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুক থেকে ঠেলিয়া দিয়া, চোখটা মুছিয়া লইয়া সাড়া দিলেন, "কেন দিদি?"

বড়বৌ একবার ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া কঠিন স্বরে বলিলেন, "তোমাদের না হয় শোকের শরীরে ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; কিন্তু, বাড়ীর আর সবাই ত উপোস করে থাক্‌তে পারে না। বেরিয়ে একবার বেলার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।"

দুর্গামণি শশব্যস্তে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলার দিকে চাহিয়া, লজ্জিত হইয়া, মেয়ের নাম করিয়া কি একটুখানি জবাবদিহি করিতেই, স্বর্ণমঞ্জরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, "বেশ ত। হেঁসেলটা চুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে কাছে বসিয়ে সারাদিন বোঝাও না—আমি কথাটিও ক'ব না। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েগুলো যে পিত্তি পড়ে মারা যায়। না বাপু, এমনধারা সব অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি সইতে পারবো না।" বলিয়া নিঃসন্তান বড়বৌ ছোটবধূর সন্তানদের প্রতি মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

অনাথের সংসারে পুনরায় প্রবেশ করা অবধি দুর্গাকেই রান্নাঘরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে বড়বৌ এবং ছোটবৌ উভয়েই সমস্তদিনব্যাপী ছুটি পাইয়া—একজন পাড়া-বেড়াইয়া এবং খরচপত্র অত্যন্ত বেশি হইতেছে বলিয়া কোন্দল করিয়া, এবং আর-একজন ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া, দিন কাটাইতেছিলেন।

অনাথ সাড়ে-আটটার ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরে উঠিয়া যথাসময়ে তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, এ বাটীতে একটা নিদারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল। এই লইয়া বড় এবং ছোট জায়ে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি এবং মন-কষাকষি চলিত। এ কয়দিন এই হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক দিনের পর আবার একটা ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধনের সূচনা হইয়াছিল। আজ সকালে হঠাৎ সেই বাঁধনটা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। বেলা সাতটা বাজে। ঝি আসিয়া সদ্য-নিদ্রোত্থিতা ছোট বধূকে জানাইল, কয়লার উনানের আঁচ উঠিয়া গিয়াছে, একটু তৎপর হইয়া রান্না চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ছোটবৌ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মেজদি' কি করচে? বেলা সাতটা বাজে—আজ বুঝি তার সে হুঁস্ নেই?"

ঝি কহিল, "হুঁস্ কেন থাক্‌বে না গা? ভোরে উঠে মায়ে-ঝিয়ে জিনিসপত্তর গোছ-গাছ বাঁধা ছাঁদা করচে—এই আটটার গাড়ীতে হরিপাল না কোথায় যাবে যে!"

ছোটবৌর কালকার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রসন্ন না হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, "যাবে বল্‌লেই যাবে না কি? বাবুর হুকুম নিয়েচে? দিদিকে জানিয়েচে?"

ঝি কহিল, "বাবুর কথা জানিনে, ছোটবৌমা। কিন্তু বড়মা ত নিজেই তাদের আজ যেতে বলেছিল।"

"তবে, তাকেই বল্‌গে সাড়ে-আট্‌টায় ভাত দিতে—আমি জানিনে" বলিয়া ছোটবৌ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া

খানিকটা গুলগুঁড়ানো ঠোঁটের ভিতর পুরিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া, খিড়কির দিকে হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

ঝি বলিল, "থাক্‌লে ত বোল্‌ব! তিনি গেছে গঙ্গাচ্চান করতে" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ছোটবৌকে ফিরিতে হইল; কারণ আফিসের সাহেব তাহার রাগের মর্য্যাদা বুঝিবে না। হয়, যাহোক্ ছুটা সিদ্ধ করিয়া দিতেই হইবে, না হয় স্বামীকে ঠিক সময়ে অভুক্তই যাইতে হইবে। দু'টার একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। ফিরিয়া আসিয়া দুর্গামণির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "যাবেই ত। কিন্তু এমন খোলোমি কোরে না গেলেই কি হোতো না মেজদি?"

এই অভাবনীয় আক্রমণে দুর্গামণি অবাক্ হইয়া গেলেন। ছোটবৌ কহিল, "আমরা কেউ জানিনে তোমরা সকালেই যাবে। তিনি গেছেন গঙ্গা নাইতে; আমি ত এই উঠ্‌চি।—টাইমের ভাত কি করে দিই বল দেখি?"

"প্রাতঃপেন্নাম হই মাসিমারা" বলিয়া অতুল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছোট বৌ ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, "তুমি হঠাৎ যে অতুল।"

অতুল কলিকাতায় মেসে থাকে। সেখানে চিঠি পাইয়া ছুটাছুটি করিয়া এইমাত্র আসিয়া জুটিয়াছে—এখনো বাড়ী যায় নাই। কহিল, "সকালেই মেজমাসিমা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর শেষ দেখাটা' একবার দেখ্‌তে আস্‌ব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালোরিয়ার ডিপো! তা' এই আশ্বিনের সুরুতেই এমন সুবুদ্ধিটা তোমাকে কে দিলে বল দেখি, মেজ মাসিমা? বাঃ—বাঁধাছাঁদা একেবারে কম্‌প্লিট্ যে!" বলিয়া সে সহাস্যে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই একপ্রান্ত হইতে একজোড়া জলেভরা আরক্ত চক্ষুর টেলিগ্রাফ পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল।

ছোটবৌ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি কোরে খবর পেলে, অতুল?"

"আমি? বাঃ—"বলিয়া অতুল তাহার জবাব শেষ করিল।

প্রাঙ্গণের কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠস্বর শব্দভেদী বাণের মত আসিয়া প্রত্যেকের কাণে বিঁধিল। অর্থাৎ তিনি গঙ্গাস্নানে শান্ত-শুচি হইয়া বাটীতে পা দিয়াই ঝির মুখে কয়লার উনানের খবর পাইয়াছিলেন। বলিতে-বলিতে আসিতেছিলেন, "চারপো পূর্ণ না হলে কি ভগবান কারু এমন সর্ব্বনাশ করেন? করেন না। এ তাঁর ধর্ম্মের সংসার—এখানে অধর্ম্ম হ'বার জো নেই।" সোজা চলিয়া আসিয়া ঘরের চৌকাটের ভিতরে একটা পা দিয়া কহিলেন, "মত্‌লবটা ত তোমার এই, মেজবৌ,—না খেয়ে উপোস্ কোরে ছোট কর্ত্তা আফিসে যাক্, আর সন্ধ্যাবেলা পিত্তি পোড়ে জ্বর হয়ে বাড়ী ফিরে আসুক। তারপরে নিজের যেমন হয়েচে, তেম্‌নি সর্ব্বনাশ আরো একজনের হোক্।"

দুর্গামণি মনে-মনে শিহরিয়া কহিলেন, "ঐ কপাল যার পুড়েছে, দিদি, সে অতিবড় শত্রুর জন্যেও কামনা করে না। কিন্তু কি করেচি তোমার যে, এত কটু কথা আমাকে বলচ?"

স্বর্ণ হাত নাড়িয়া, মুখ অতি বিকৃত করিয়া কহিলেন, "কচি খুকি যে! আমাকে বল্‌তে হবে—কি করেচ? সাড়ে-সাতটা বাজে—টাইমের ভাত রাঁধ্‌বে কে?"

অতুল এতক্ষণ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। তাহার বড়মাসিকে সে ভাল করিয়াই চিনিত; এইজন্য কথাবার্ত্তাও বড়-একটা কহিত না। কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই প্রশ্নের জবাব দিয়া বসিল—কহিল, "সত্যি কথা বল্‌লে তুমি রাগ করবে মাসিমা; কিন্তু কপাল নেহাৎ না পুড়লে আর কেউ তোমাদের ভাত খেতে চায় না, সে কথা তোমরাও জানো; কিন্তু আজ যাবার দিনটায় হতভাগিনীদের একটুখানি মাপ করলে তোমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না।"

অতুলের কথার ঝাঁজ দেখিয়া দুই জায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না মিনিটখানেক কাহারও মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। তার পরে স্বর্ণ কহিলেন, "কলকাতা থেকে তুই কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি নাকিরে?"

ছোটবৌ বলিল, "ঝগড়া করতে আস্‌বে কেন দিদি? ওর মেজমাসিকে আমরা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করাচ্চি, ও তাই যে শেষ দেখা দেখ্‌তে এসেচে।"

"ওঃ! তাই বটে?"

ছোট বৌ কহিল, "তাই, দিদি, তাই। তাইতেই আমি ভাব্‌চি, আমরা বাড়ীর লোক কেউ জানলাম না—তোমার

বোন্‌পোটী কলকাতায় বোসে জান্‌লে কি করে! তা হলে লোকে যা বলে, তা' মিথ্যে নয় দেখ্‌চি।"

স্বর্ণ ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চেঁচাইয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিলেন, "বেশ ত বাছা, এতই যদি দরদ জন্মে থাকে, তোমার শাওড়ী-মাসিকে গঙ্গাযাত্রা করাবে কেন, ঘরেই নিয়ে যাও না। গাঁশুদ্ধ লোক বাহবা বাহবা করবে এখন।"

বিষের জ্বালায় অতুলেরও মাথা বেঠিক হইয়া গেল। সেও বলিয়া বসিল, "বেশ ত মাসিমা, তোমরা আপনার লোক কথাটা যদি দুদিন আগেই জেনে থাকো, ভালই ত। উনি আমার ঘরে গেলে, আমি মাথায় কোরে নিয়ে যেতে রাজী আছি। তোমাদের গাঁয়ের গোরুগুলো তাতে বাহবা দেবে, কি ছি-ছি করবে, আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অতুল নিজেও যেম্‌নি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গুরুজনেরাও তেম্‌নি অসহ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ যেন অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ছুটিয়া আসিয়া লজ্জা সরম, আড়াল-আব্‌ডাল সমস্তই চক্ষের পলকে ভাঙিয়া, মুচড়াইয়া, উড়াইয়া লইয়া মস্ত একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে সবাইকে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল। কাহারো কাছে কাহারও আর গোপন করিবার, রাখিবার ঢাকিবার যায়গা রহিল না।

অতুল নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। যদু বাগ্‌দী গরুর-গাড়ী আনিয়া কহিল, "মা, সময় হয়েচে; জিনিসপত্তর কি দেবে দাও। এখন থেকে না বেরুলে ইষ্টিসানে গাড়ী ধরতে পারা যাবে না।" বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া নির্দ্দেশমত সুমুখের টিনের তোরঙ্গের উপর বিছানাটা তুলিয়া দিয়া ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বড় বৌ, ছোট বৌ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দুর্গামণি 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া, ঘরে তালা দিয়া, মেয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মেয়েটা মূর্চ্ছিতের মত মায়ের কোলের উপর চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

(৪)

এগারো বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপ্‌সা ধূঁয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানার উপর হুমড়ি খাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবা-মাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়ীতে বাপ-মা নাই—বড় ভাই আছেন। শম্ভু চাটুয্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালা-জ্বরের দিন। অতএব সূর্য্যাস্তের পরেই তিনি প্রস্তুত হইয়া বিছানা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া সুপ্রাচীন বালাপোষে মাথা এবং দুই কাণ ঢাকিয়া খড়ম পায়ে খট্‌-খট্‌ শব্দে বাহিরে আসিয়া চিনিতে পারিলেন।

"কে ও, দুর্গা এলি না কি? তা' আয় আয়।"

দুর্গা কাঁদিতে-কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া দাদার পদমূলে প্রণাম করিলেন।

জ্ঞানদা প্রণাম করিলে, কহিলেন, "এটি বুঝি মেয়ে? তা' বিয়ে দিলি কোথায়?"

দুর্গা কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "বিয়ে এখনো দিতে পারিনি দাদা—যেখানে হোক্‌ শীগ্‌গীরই—"

"অ্যাঁ—বিয়ে দিস্‌নি? এ যে একটা সোমত্ত মাগী রে দুর্গা?" বহুকাল অদর্শনের পর ভগিনীর প্রতি তাঁহার ঈষৎ করুণ কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত্তেই জমিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বলিলেন, "তাই ত—এখানকার আবার যে সব বজ্জাত লোক—তা' জানতে পেলে—তা' আমি বলি কি ওকে হেঁসেল টেঁসেল, ঠাকুরঘরদোরে ঢুক্‌তে দিয়ে কাজ নেই—জানিস্‌ ত এ দেশের সমাজ! বিশেষ হরিপাল—এমন পাজি যায়গা কি আর ভূভারতে আছে! তা আয়, বাড়ীর ভেতরে আয়। এত বড় মেয়ে—ওর কাকার কাছে রেখে এলে স্বচ্ছন্দে তুই দু'দিন জুড়িয়ে যেতে পারতিস্‌। এখানে থাকলে ত আর—বুঝলিনে দুর্গা? তা যা, এখন হাত-পা ধুগে—ওগো কই গো—" বলিতে বলিতে শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় খট্‌ খট্‌ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গা এবং তাঁহার কন্যা যেমন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া বাড়ী ঢুকিল, সে শুধু অন্তর্য্যামীই দেখিলেন।

শম্ভুর এটি দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষের বৌকে দুর্গা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে দেখেন নাই। উপস্থিত ইনি যেমনই কালো, তেমনিই রোগা এবং লম্বা। ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়া-কাঠের মত। তিন দিনের গোবর উঠানের মাঝখানে জমা করা ছিল; তাহা এইমাত্র নিঃশেষ করিয়া ঘুঁটে দিয়া, হাত-পা ধুইয়া, প্রদীপের জো করিতেছিল; স্বামীর আহ্বানে সম্মুখে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া

থমকিয়া দাঁড়াইল। শম্ভুর জ্বর আসিতেছিল। তাহার অভ্যর্থনার জন্য সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বৌয়ের নাম ভামিনী। মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। কথাগুলা একটু বাঁকা-বাঁকা। হাসিয়া উপরের এবং নীচের সমস্ত মাড়িটা অনাবৃত করিয়া ননদের হাত ধরিয়া রান্না-ঘরের দাওয়ায় লইয়া গিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইল। তাহার হাসি এবং কথার শ্রী দেখিয়া দুর্গার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। আসিবার সময় দুর্গা একহাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়াছিলেন, সেটা নামাইতে-না-নামাইতে একপাল ছেলে-মেয়ে কোথা হইতে যেন পঙ্গপালের মত উড়িয়া আসিয়া ছেঁকিয়া ধরিল। চেঁচা-চেঁচি ঠ্যালা-ঠেলি—সে যেন একটা হাট বসিয়া গেল। তাহাদের মা ইহাকে আধখানি, উহাকে সিকিখানি, আর দু'জনকে দু'টুক্‌রা বাটিয়া দিয়া, হাঁড়িটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া, শোবার ঘরের সিকায় টাঙাইয়া রাখিল। ছেলেগুলা যে যাহা পাইয়াছিল, অতঃপর গিলিয়া ফেলিয়া, হাতের রস চাটিতে চাটিতে প্রস্থান করিল।

দুর্গা এখানকার রীতি-নীতি কতক জানিতেন; কারণ, তিনি এই গ্রামের মেয়ে। কিন্তু জ্ঞানদা আট দশ বছরের ছেলেগুলাকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেট করিয়া রহিল। মেয়েগুলারও প্রায় ঐ দশা। ইতর-বিশেষ যাহা আছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের নিজেদের গ্রামটাও সহর নয় বটে, কিন্তু, সেখানে রাস্তা-ঘাট আছে; এমন আম-কাঁঠাল ও বাঁশঝাড়ে মাথার উপর অন্ধকার করিয়া নাই। এরূপ গোবর ও পাটপচা গন্ধ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ভারাক্রান্ত, ব্যাকুল করিয়া দেয় না। তখনও অন্ধকার হয় নাই। একটা শৃগাল উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই, বড় ছেলেটা তাড়া করিয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ-পোকা বিকট শব্দ সুরু করিয়া দিল। দেয়ালের গায়ে একটা আমড়া গাছ ছিল। তাহারই একটা শুকনা ডালে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব এক প্রকার বিশ্রী শব্দ শুনিয়া জ্ঞানদা সভয়ে চুপি-চুপি কহিল, "ও কি ডাকে মা?" মামী শুনিতে পাইয়া কহিলেন, "ও যে তোক্ষোপ্।"

জ্ঞানদা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোক্ষোপ কি? তক্ষক সাপ?"

মামী বলিলেন, "হাঁ, মা, তাই। ঐ যে কোন্ রাজাকে কামড়েছিল বলে। গাছে-গাছে একেবারে ভরা।" জবাব শুনিয়া জ্ঞানদা মায়ের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, "এখান থেকে চল মা,—এখানে আমি একদণ্ডও বাঁচব না।"

মামী আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, "ভয় কি গো, ওরা যে দেব্‌তা। কখ্‌খনো কারুর অপকার করে না। আর সাপ-খোপের কামড়ে কটা লোক মরে বাছা? বরঞ্চ, ভয় যা তা ঐ ম্যালোয়ারীর। একবার ধরলে, আর তাতে বস্ত রেখে ছাড়ে না। এ বছর দিনকুড়ি হোল তোমার মামাকে ধরেচে—এরই মধ্যে যেন শতজীর্ণ করে ফেলেচে। আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দিবে মা, এ গাঁয়ে তার ঠিক থাক্‌বে না।"

জ্ঞানদা মনে-মনে অতুলের মুখের কথাগুলা মিলাইয়া লইয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে সে একবারও ঘুমাইতে পারিল না। মায়ের বুকের কাছে মুখ রাখিয়া বারম্বার চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া প্রভাত হইল। নূতন স্থানে, নূতন আলো চোখে পড়ায়, বিন্দুমাত্রও তাহার আনন্দোদয় হইল না—বরঞ্চ সমস্ত আব-হাওয়া, আলো বাতাস যেন কালকের চেয়েও বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিল।

এতবড় আইবুড়ো মেয়ে দেখিয়া পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ দেশে মেয়ের বয়স ঠিক করিয়া বলার রীতি নাই। সবাই জানে বাপ-মাকে দু'এক বছর হাতে রাখিয়া বলিতে হয়। সুতরাং দুর্গা যখন বলিলেন, তেরো, তখন সবাই বুঝিল, পনেরো। এক'মেয়ে বলিয়া, নিজেরা না খাইয়া মেয়েকে খাওয়াইয়াছিলেন, পরাইয়াছিলেন,—সেই নিটোল স্বাস্থ্যই এখন আরও কাল হইল। তাহার বয়সের বিরুদ্ধে ইহাই বেশী করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

দুই দিন না যাইতেই, শম্ভু কথাপ্রসঙ্গে ভগিনীকে কহিলেন, "মেয়েটার জন্য ত পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হয়েছে। একটি ভারি সুপাত্র হাতে আছে, দিবি?"

দুর্গা বলিলেন, "না দাদা, জামাই আমার স্থির হয়ে আছে—আর কোথাও হ'তে পারবে না।" শম্ভু বলিলেন, "তা'হলে ত কথাই নেই। কিন্তু এমন সুপাত্র বহু ভাগ্যে

মেলে, তা বলে দিচ্চি। ২০।২৫ বিঘে ব্রহ্মত্ব, পুকুর, বাগান, ধানের গোলা—লেখাপড়াতেও—”দুর্গা কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, “না দাদা, আর কোথাও হবার জো নেই—এই বছরটা বাদে সেখানেই আমাকে মেয়ে দিতে হবে।”

শম্ভু বলিলেন, “কিন্তু, আমার বিবেচনায়—এই সাম্নের অঘ্রাণেই মেয়ে উচ্ছুগ্‌গু করা কর্ত্তব্য হয়েছে।” দুর্গা আর নিরর্থক প্রতিবাদ না করিয়া—কাজ আছে—বলিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, এই সুপাত্রটি শম্ভুরই বড় শ্যালক। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায়, প্রায় ছয় মাস যাবৎ বেকার অবস্থায় আছেন—আর বেশী দিন থাকা কেহই সঙ্গত মনে করে না। বিশেষতঃ, ঘরে অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা থাকায়, একটি ডাগর মেয়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এই সুপাত্রটি একদিন, দুর্গার বারম্বার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, সহসা আবির্ভূত হইয়া সম্মুখেই জ্ঞানদাকে দেখিতে পাইলেন; এবং বলা বাহুল্য যে, পছন্দ করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। সেই দিন হইতেই শম্ভুনাথের স্নেহের অনুরোধ দেখিতে দেখিতে কঠোর নির্যাতনের আকার ধরিয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, প্রিয়নাথের অবর্ত্তমানে তিনিই এখন ভাগিনেয়ীর যথার্থ অভিভাবক। সুতরাং, আবশ্যক হইলে, এই সাম্নের অঘ্রাণেই তিনি জোর করিয়া বিবাহ দিবেন।

দাদার সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া মেয়ের পানে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে সমস্ত শুনিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “আমি বেঁচে থাক্‌তে ভয় কি মা!” মুখে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁহার নিজের বুকের অন্তস্থল পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এ সব দেশে এরূপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া যে একটা সচরাচর ঘটনা, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া মেয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা তাহার কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরে গা ফাটিয়া যাইতেছে; চোখ মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন জ্বর হোল মা?”

“কাল রাত্তির থেকে।”

“আমাকে জানাস্‌নি কেন? আজকাল যে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার সময়।” মেয়ে চুপ করিয়া রহিল জবাব দিল না।

দাদার বৌয়ের সহিত দুর্গা এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন নাই। শুধু যে তাহার বিকট চেহারা ও ততোধিক বিকট হাসি দেখিলেই তাঁহার গা জ্বলিয়া যাইত, তাহা নহে; তাহার অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহে; কিন্তু বৌয়ের কথাবার্ত্তা একটু দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা তেমনি যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু তাহার একটা গুণ দুর্গা টের পাইয়াছিলেন—সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চাহিত না। তাহার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিলে, সে কাহাকেও কিছু বলিত না—ছেলে-পিলে, ঘর-সংসার লইয়াই থাকিত, পরের কথায় কাণ দিত না।

প্রথমে আসিয়াই দুর্গা এক দিন তাহার রান্নাবান্নার সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল—“তুমি দু’ দিনের জন্যে এসেচ ঠাকুরঝি, তোমাকে কাজ করতে হবে না। আমি রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর কাউকে দিতে পারব না।” সেই অবধি দুর্গা এ বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

আজ বেলা দেখিয়া সে দোর গোড়ায় আসিয়া স্বাভাবিক চীৎকার শব্দে প্রশ্ন করিল—“আজ খাওয়া দাওয়া কি হবে না, ঠাকুরঝি? হেঁসেল নিয়ে বসে থাক্‌ব?”

দুর্গা মুখ তুলিয়া বলিলেন, “মেয়েটার ভারি জ্বর হয়েচে, বৌ; তোমরা খাওগে, আমরা আজ আর কেউ খাব না।” বৌ কহিল, “মেয়ের জ্বর, তা তোমার কি হ’ল গো? জ্বর আবার কার না হয়? নাও, উঠে এসো।” দুর্গা কাতর-কণ্ঠে কহিলেন, “না বৌ, আমাকে খেতে বোলো না—মেয়ে ফেলে আমি মুখে ভাত তুল্‌তে পারব না।” “তোমাদের সব আদিখ্যেতা” বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, “জ্বর হয়েচে কোবরেজ ডেকে পাঁচন সেদ্ধ করে দাও। ম্যালোয়ারি জ্বরে আবার খায় না কে? আমাদের দেশে ওসব উপোস-তিরেসের পাঠ নাই বাপু।” বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অপরাহ্নবেলায় একবাটি পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া

কহিল, "ওলো ও গেঁনি, উঠে পাঁচন খা। ভাতে জল দিয়ে রেখেচি চল্‌, খাবি আয়।"

মামীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। বিনাবাক্যে উঠিয়া খানিকটা তিক্ত পাঁচন গিলিয়া বমি করিয়া ফেলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল। দুর্গা ঘরে ছিলেন না, বমির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মামী রাগ করিয়া উঠানে গিয়া সমস্ত পাড়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "এ সব বাবু-মেয়ে নিয়ে আমাদের গরীব-দুঃখীর ঘরে আসা কেন বাপু?"

সেই হইতে জ্ঞানদার জ্বর উত্তরোত্তর বাড়িয়া ক্রমশঃ তাহাকে যেন শয্যাগত করিয়া ফেলিতে লাগিল। কার্ত্তিকের শেষাশেষি একদিন দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, বৌ জ্ঞানদার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। একে ত সংসারের কাজ ছাড়িয়া এই সব বাজে কাজ করিবার তাহার অবসরই নাই, তাহাতে পরের মেয়ের প্রতি এই অযাচিত সেবাটা এম্‌নি একটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিসদৃশ কাণ্ড বলিয়া দুর্গার মনে হইল যে, তিনি দাদার প্রস্তাবিত সেই বিবাহ ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। এ যত্ন যে সেইজন্যই, তাহাতে আর সংশয়মাত্র রহিল না। বৌ গলাটা আজ একটু খাটো করিয়াই কহিল, "তারকেশ্বরে পাশ-করা ডাক্তার আছে—তোমার দাদাকে আনতে পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠাকুরঝি। জ্বর যেন রোজ-রোজ বেশীই হচ্চে—এ তো ভালো না।" দুর্গা অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না; কারণ, এই সুসংবাদ শুনিয়াও তিনি অন্তরের ভিতর হইতে প্রসন্ন হইতে পারেন নাই।

বৌ সংসারের কাজে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা বালিশের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিল, "জবাব দিয়েছেন।" "কৈ দেখি দেখি" বলিয়া মা সেখানি যেন কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অসহ্য আগ্রহ দমন করিয়া ফেলিয়া চিঠিখানি দুই মুঠার মধ্যে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার মনে হইল, খুলিয়া পড়ি। আবার ভাবিলেন, না, উচিত নয়। মেয়ে যেন হাতেই দিয়াছে, কিন্তু মা হইয়া তিনি পড়িবেন কি করিয়া? মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেচে অতুল?"

জ্ঞানদা ইতিমধ্যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। সংক্ষেপে কহিল, "আশা উচিত ছিল না—এই সব।" পত্রের এই দুটি কথা শুনিয়াই মায়ের দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, "আসা উচিত ছিল না—এই সব!" অতুলের মুখখানি স্মরণ করিয়া, তাহাকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া, দুর্গা মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া, মনে মনে বলিলেন, "না জানি বাছার কতই না অভিমান, কতই না মর্ম্মান্তিক ব্যথা, এই দুটি কথার মধ্যে লুকানো আছে। এখানে আসিয়া জ্ঞানদা জ্বরে পড়িয়াছে—তাইতেই ত বাছা সেদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'ইহাদের গঙ্গাযাত্রা দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি!' সত্যই ত!—আমার যে কোনমতেই মেয়ে লইয়া আসা উচিত ছিল না! যত কষ্টই হোক, সব সহ্য করিয়াই ত সেখানে পড়িয়া থাকা আবশ্যক ছিল।" কাগজখানি অপূর্ব্ব মমতার সহিত মুঠার মধ্যে নাড়া-চাড়া করিতে-করিতে কত কথাই আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যু-শয্যায় অতুলের প্রতিজ্ঞা;—সেই চুড়ি দুগাছি দিবার ছলে মহাপ্রসাদ লইয়া আসা; বিশেষ করিয়া আসিবার দিনটায় মাসির সহিত তাহার কলহ। এ কথা তাহার মা শুনিয়াছেন, পাড়ার লোকে শুনিয়াছে—এতদিনে সবাই জানিয়াছে—কেন সে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। আনন্দে, গর্ব্বে তাঁহার মাতৃবক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে-মনে বলিলেন, "কালো মেয়ে! আমার কালো মেয়ের গৌরব দেখুক সবাই! ওরে কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো যে!" ডাকিলেন,

"জ্ঞানদা, এখন কেমন আছিস্‌ মা?"

"ভালো আছি মা।"

"হাঁ রে, আমার কথা অতুল কিছু লিখেচে?"

"পোড়ে দেখ না।"

কৌতূহল আর তিনি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি মেলিয়া ধরিলেন। অত বড় কাগজের মধ্যে মাত্র দুইছত্র লেখা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহার মনে হইল, মেয়ে কি দিতে হয় ত কি দিয়াছে। পরক্ষণেই 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দেখিয়া মনে-মনে হাসিয়া বলিলেন, "তাইতেই পড়তে দিয়েছে—এ যে আমারই চিঠি।" লেখা আছে—'সেই সময়েই বলিয়াছিলাম, ও যায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো। জ্ঞানদার জ্বর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম

—আশা করি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে! আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি'—

দুর্গার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে একটু বাধিল, কিন্তু মায়ের প্রাণ—না বলিয়াও থাকিতে পারিলেন না; কাছে বসিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলি আঙুল দিয়া নাড়িতে-নাড়িতে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলেন "হাঁ মা, তোমার চিঠিটার মধ্যে বুঝি অতুল রাগ করেচে?" জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আমার চিঠি আবার কোন্‌টা মা? তোমাকেই ত লিখেছেন।" দুর্গা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "আমি দেখ্‌তে চাইনে, মা; শুন্‌লেই সুখী। রাগ করেচে, সেও আমি বুঝিতেই পারচি—"

'না মা, আমাকে তিনি আলাদা চিঠিপত্র কিছুই লেখেন-নি। যা লিখেচেন তা ওই।" বলিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

"সবে দু'ছত্র? আর কোন কথা নেই?" বলিয়া দুর্গা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার যে আঙ্গুলগুলা এতক্ষণ মেয়ের চুলের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র গতিতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেগুলাও যেন হাড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিল। এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আবার দিন কাটিতে লাগিল।

(৫)

প্রথম অগ্রহায়ণের শীতের বাতাস বহিতেছিল। দুর্গার এক ছেলেবেলার সাথী বাপেরবাড়ী আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা মেয়েকে একটু ভালো দেখিয়া দুর্গা তাহার সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে ডাক-পিয়নের সাক্ষাৎ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁ দাশু, আমার নামের চিঠি-পত্র পাচ্চিনে কেন?"

দাশু হাসিয়া কহিল, "চিঠি না এলে কি কোরে পাবে দিদিঠাকরুণ?

দুর্গা সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "আমার কিম্বা আমার মেয়ে জ্ঞানদা দেবী কারু নামেই কি চিঠি আসে না?"

দাশু কহিল, "এলে ত আমিই দিয়ে যেতাম দিদি-ঠাকুরুণ।"

দুর্গা বলিলেন, "না, দাশু, তোমার ব্যাগটা একটু ভাল কোরে দেখো—আসতেও পারে। তিন-তিনখানা চিঠির জবাব দেবে না,—আমার অতুল ত তেমন ছেলে নয়।"

দাশু বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিল, "না দিদি, নেই—এলেই পাবে," বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দুর্গা বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ দাশু, এমনও ত হতে পারে—তোমাদের পোষ্টাফিসেই পোড়ে আছে—আমাদের কেউ নাম জানে না? হয় ত বা টেবিলের তলায় খোঁজে-খাঁজে কোথাও পোড়ে আছে—পোষ্ট-মাষ্টার বাবু দেখ্‌তে পাননি! আমাকে ত এখানে সবাই জানে, আমি নিজে গিয়ে কি একবার খুঁজ্‌তে পাইনে?"

ব্যাকুলতা দেখিয়া দাশু সদয়চিত্তে কহিল, "কেন পারবে না, দিদিঠাকুরুণ—কিন্তু সে মিছে খোঁজা হবে। আচ্ছা, আমিই গিয়ে আজ একবার খুঁজে দেখ্‌ব। যদি পাই, দিয়ে যাবো—" বলিয়া সে আর সময় নষ্ট না করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গা ঠাকুর-দেবতার চরণে বিশ্বের ঐশ্বর্য্য মানত করিতে-করিতে চলিলেন। "হে দুর্গা, হে মা কালী, একখানি চিঠিও যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়।" জ্ঞানদার এত বড় অসুখ শুনিয়াও সে উত্তর লিখিবে না—এ কি কোন মতেই বিশ্বাস করা যায়! সে নিশ্চয়ই লিখিয়াছে; কিন্তু কোথাও গোলমাল হইয়া গেছে।

হায় রে মানুষের আশা! শত কোটী সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এ কথাটা একবারও দুর্গার মনে উদয় হইল না যে, ইতিমধ্যে অতুলের মনের গতি বদ্‌লাইয়া যাইতেও পারে। একবারও ভাবিলেন না—অতুলের যে কামনা একান্ত সঙ্গোপনে, সম্পূর্ণ আবরণের অন্তরে শুধু নির্ব্বিবাদেই বাড়িয়া উঠিতে পাইয়াছিল, তাহাকে এমন অসময়ে এত বড় অনাবৃত প্রকাশ্যতার মাঝখানে টানিয়া আনিলে, সে চক্ষের পলকে শুকাইয়া যাইতে পারে! এখন শত বিরুদ্ধ শক্তি সজাগ হইয়া তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে! মানুষ এমনিই অন্ধ!

দুর্গা একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিয়া, মেয়ের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "দাশু কোন চিঠিপত্র দিয়ে গেছে কি?"

মেয়ে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "না মা।" প্রত্যহ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে-দিতে সে লজ্জায়-সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছিল।

"কেন, দাশু যে আমাকে বল্লে, সে খুঁজে এনে দিয়ে যাবে?"

মেয়ে কথা কহিল না—একটা মলিন কাঁথার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

পরের তিন-চারি দিন দুর্গা অতুলের পত্রের প্রত্যাশায় অহোরাত্র যেন কণ্টক-শয্যায় বসিয়া কাটাইলেন—কিন্তু কিছুই আসিল না। হতাশ হইয়া তাহার জননীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে জানাইলেন, অতুল ভালো আছে এবং কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পূর্ব্ববৎ লেখা-পড়া করিতেছে। তাঁহার চিঠির মধ্যে একটা তাচ্ছল্যের সুরই যেন দুর্গার কাণে বাজিল। এমনি করিয়া অগ্রাণ গেল, পৌষ গেল, মাঘের মাঝামাঝি মেয়ে যদি বা একটু সারিয়া উঠিল, মা যেন দিন-দিন শুকাইয়া উঠিলেন। তা ছাড়া, বৌয়ের প্রতি দুর্গার বিদ্বেষের আর যেন অন্ত ছিল না। তাহার উল্লেখ করিতে হইলেই, ঘৃণা-ভরে কখনো বা 'পোড়া কাঠ' কখনো বা 'তাড়কা' বলিতেন, এবং যত দিন যাইতে লাগিল, ঘৃণা যেন অপরিসীম হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার একটা কারণ এই ছিল—'পোড়া কাঠ' নিজের ধরণে জ্ঞানদাকে বোধ করি তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্যের জন্য ভালবাসিয়াছিল; যত্নও করিত। কিন্তু এই যত্নের মধ্যে একটা উৎকট স্বার্থের গন্ধ পাইয়া দুর্গা বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেন। বড় দুঃখের দেহ, তাই অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। মাঘের শেষে তিনি শয্যা-আশ্রয় করিলেন। মেয়ে কাঁদিয়া কহিল, "আর না মা, এইবার বাড়ী চলো; যা হবার সেখানেই হোক্।" দুর্গা রাজী হইলেন। তাঁহার সম্মতির আর কোন আশাই ছিল না; শুধু এই 'পোড়া কাঠের' যত্ন-আত্মীয়তা হইতে বাহির হইবার জন্যই মন যেন তাঁহার অহরহঃ পালাই-পালাই করিতেছিল।

যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া শম্ভু বাঁকিয়া বসিলেন। তখন সকাল সাতটা-আটটা। শম্ভু সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খট্‌-খট্‌ শব্দে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন "দুর্গা?"

দুর্গা দাওয়ার এক প্রান্তে খুঁটি ঠেস দিয়া মুখ ধুইতে-ছিলেন। জ্ঞানদা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। দাদার আহ্বানে দুর্গা সাড়া দিলেন।

শম্ভু কহিলেন, "এখন ত তোমার যাওয়া হতে পারে না।"

"কেন দাদা?"

"কেন দাদা? আমি কি তোমার জন্যে কথা দিয়ে মিথ্যাবাদী হ'ব নাকি? সে জন্ম আমার নয়।" কথাটা না জানিয়াও দুর্গার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কথা, দাদা?"

শম্ভু কহিলেন, "গেঁনির বিয়ের। আর ত আমি রাখ্‌তে পারিনে,—কাজেই আমাদের নবীনের সঙ্গেই সামনের পাঁচুই ফাগুনে কথাবার্ত্তা পাকা করে ফেল্‌তে হ'ল। এদিকে গয়না-গাটিও মন্দ দেবে না বল্‌চে। দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকেই ভালো হবে, দেখলাম কি না!"

খবর শুনিয়া দুর্গার মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন, "আমাকে না বলে কেন কথা দিলে, দাদা? এ বিয়ে ত আমি প্রাণ থাক্‌তে দিতে পারব না।"

শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "পারব না বল্‌লেই হবে? আমি মামা—আমি যা বলব, তাই হবে। তোর জন্যে কথার নড়চড় কোরব, তেমন বাপে আমাকে জন্ম দেয়নি—তা জানিস?"

এইবার দুর্গা সত্য-সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "না দাদা, মেয়ের বিয়ে এখানে আমি মরে গেলেও দেব না—আমার জন্যে তুমি এতটুকু ভেব না দাদা—" কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া কথাটা তিনি শেষ করিতেই পারিলেন না।

শম্ভু এই কান্না দেখিয়া, মহা বিরক্ত হইয়া, দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, "শুভকর্ম্মে মিছে কাঁদিস্‌নে ভ্যান্‌ ভ্যান্‌ কোরে। যা হবার নয়, যা পারব না—"

রঙ্গস্থলে 'পোড়া কাঠ' দেখা দিলেন। দুই হাত গোবর-মাখা—বোধ করি তখনো গোয়াল-ঘরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙা কাঁশির মত খ্যান্‌-খ্যান্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিলেন—"বলি সুপাত্তরটি কে গা ঠাকুর? একবার শুন্‌তে পাইনে?"

শম্ভু স্ত্রীর ভাবগতিক দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিলেন, "যেই হোক্‌, তোর তাতে কি?"

'পোড়া কাঠ' গোবর-মাখা হাত দু'খানা নাড়া দিয়া অর্দ্ধেক উঠানটা যেন নাচিয়া আসিল। তেমনি সুমধুর কণ্ঠে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া কহিল, "মামা! মামাত্বি ফলাতে এসেচেন! নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেব! ত'হলে

একশ' টাকা সুদে-আসলে শোধ যায়, না? তাই সে সুপাত্তর? বটে? আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি-গাঁজা খেয়ে, পাঁচ-ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর নাথি মেরে মেরে ফেল্‌লে কি না,—তাই অমন সুপাত্তর আর নেই! গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোমার? ধিক্ ধিক্!" শম্ভু ভগিনী-ভাগিনেয়ীর সমক্ষে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পায়ের খড়ম হাতে লইয়া চীৎকার করিলেন, "চুপ কর্ বল্‌ছি, হারামজাদী!"

পোড়া কাঠ এইবার ক্ষেপিয়া উঠিল। সে এমনি একটা ভয়াবহ ভঙ্গী করিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে, সে বস্ত চোখে না দেখিলে লেখা পড়িয়া বোঝা যায় না। কহিল, "অ্যাঁ, আমাকে হারামজাদী? ফের মুখে আন্‌লে পোড়া কাঠ যদি না মুখে গুঁজে দি' তো পাঁচু ঘোষালের মেয়ে নই আমি। জোর কোরে বিয়ে দেবে? কেন, কে তুমি? ও এসেছে মেয়ে নিয়ে দু'দিন জুড়োতে, কেন তুমি ওকে রাত-দিন ভয় দেখাবে? আঁস-বঁটিটা আমার দেখে রেখো। শালা-ভগ্নিপোতের একসঙ্গে নাক-কাণ কেটে তবে ছাড়ব। আমার নাম ভামিনী, তা' মনে রেখো।"

সে মূর্ত্তির সাম্‌নে শম্ভু আর কথা কহিলেন না—ঘরে চলিয়া গেলেন। পোড়াকাঠ তখন দুর্গার পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, "ও কি সোজা চামার, ঠাকুর ঝি! তোমরা আসা পর্য্যন্ত মৎলব আঁটচে,—কি' কোরে অমন সোণার প্রতিমা বাঁদরের হাতে দিয়ে ধার শোধ কোরে জমি খালাস করে নেবে। আবার বলে—মামা আমি!" একটুখানি দম্ লইয়া কহিতে লাগিল—"বল্‌লে তুমি মনে কষ্ট করবে, আমি বলতাম না, ঠাকুরঝি। বললাম, মেয়েটা জ্বরে মরে যায়, একটা ভালো ডাক্তার আনো। বললে, অত পয়সা নেই আমার। সম্বলের মধ্যে সম্বল—একগাছি রূপার গোট ছিল আমার, তাই বাঁধা দিয়ে আমি ডাক্তার ডেকে আন্‌লাম—আর ও বলে কি না, যা খুসি করব—আমি মামা! মুখপোড়া! আমি বেঁচে থাক্‌তে ভয় কি ঠাকুরঝি? আজই আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্চি, তুমি বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দাওগে—দিয়ে যখন খুসি আবার এসো।"

দুর্গা খুঁসি ঠেস দিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া কেবল ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পোড়াকাঠ কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ খাটো করিয়া অদৃশ্য স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"অনাথা বলে ওর ওপর জুলুম কোরবে, কেন, মাথার ওপর ভগবান নেই কি? আমি বলি, যা নিজের আছে, তাই নিয়ে নাড়ো-চাড়ো খাও-দাও। পরের নিয়ে নিজের পেট মোটা কোরব কি জন্যে? ভগবান কখ্‌খনো তার ভাল করেন না।"

সে দিনই দুপুরবেলা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। গরুর গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দুর্গা 'পোড়া কাঠের' দু'পায়ের উপর মাথা পাতিয়া আজ সত্য-সত্যই তাহা অশ্রু-জলে ভিজাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "বৌ, বড় ভাজ তুমি, তোমাকে ত আশীর্ব্বাদ করতে পারিনে,—কিন্তু ভগবান তোমাকে যেন দেখেন। আমার জন্যে তুমি তোমার গোট-ছড়াটি পর্য্যন্ত নষ্ট করে ফেললে।"

পোড়াকাঠ আগুন্ত মাড়ি বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল—"ছাই গোটছড়া! এই বল ঠাকুরঝি, হাতের নোয়া নিয়ে স্বামী পুত্তুরের গো-ব্রাহ্মণের সেবা করে যেন যেতে পারি। নাও, রোগা শরীরে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—গাড়ীতে উঠে বোসো। গেনি, মামা-মামীর ঘরে অনেক কষ্ট পেয়ে গেলি, মা; কিন্তু আবার আসিস্—ভুলিস্‌নে যেন।" বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে জোর করিয়া দুটি টাকা গুঁজিয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দুর্গা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "না বুঝে অনেক অপরাধ তোমার চরণে করে গেলাম, বৌ—সে সব আমার মাপ কোরো।"

(৮)

সংবাদ দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই দুর্গা চিঠি না লিখিয়াই আসিয়াছিলেন। জ্ঞানদার চেহারা দেখিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়াই খুন—"ওলো, ও গেনি, গালদুটো তোর চড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে কে লো? ওমা কি ঘেন্না! মাথায় টাক পড়ল কি করে লো? ও ছোটবৌ, শীগ্‌গীর আয়, শীগ্‌গীর আয়—আমাদের জ্ঞানদাসুন্দরীকে একবার দেখে যা। গায়ের চামড়াটাও কি তোর মামা-মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েছে নাকি লো?" জ্ঞানদা নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ছোট খুড়ি আসিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

Emerald Ptg. Works

ছোটবৌ শিহরিয়া উঠিল—"ইস্, এ কি হয়ে গেছিস্ মা ?"

জ্যাঠাইমা নিতান্ত অত্যুক্তি করিলেন না; কহিলেন, "বাঁশবনের পেত্নী। অন্ধকারে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌তে হয়" বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আজ কিন্তু ছোটবৌ তাহাতে যোগ দিল না। সে আর যাই হোক্, সন্তানের জননী ত। মেয়েটির এই কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মায়ের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কাছে বসিয়া, তাহার মাথায়-মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, একটি একটি করিয়া রোগের কথা শুনিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া, কহিল, "কেন তবে তখ্‌খুনি চলে এলিনে মা। আমি ত তোদের আস্‌তে মানা করিনি। মেজদি কোথায় ?"

"মা'র গাড়ীতেই জ্বর এসেছিল—ঘরে শুইয়ে দিয়েছি।"

স্বর্ণ কহিলেন, "হবে না ? আমি হাজার হই বড় জা' ত! অত তেজ করে চলে গেলে কি সয় ?" ছোটবৌ জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাহার মাকে দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড় জায়ের এই নিতান্ত গায়ে-পড়া কটু কথাগুলা আজ তাহার এতই বিশ্রী লাগিল যে, সে সহিতে পারিল না; কহিল, "দিদি, বছর ভুই মধু সংক্রান্তির ব্রত কোরো—আর জন্মে মুখখানা যদি একটু ভালো হয়।" স্বর্ণ এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে ক্রোধে বিস্ময়ে হঠাৎ অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তীব্রস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তবু ভালো লো, ছোটবৌ, তবু ভালো। এতকালের পরেও যা'হোক্ মেজ জাকে দেখে শোকটা উথলে উঠেচে। মাইরি, কত ঢঙই তুই জানিস্!"

ছোটবৌ জবাব দিল না। জ্ঞানদার হাত ধরিয়া ও-বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সে যাওয়া জ্ঞানদার পক্ষে একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠিল! কারণ, তাহার ও তাহার মাতার বিরুদ্ধে স্বর্ণমঞ্জরীর এমনই ত বিদ্বেষের অবধি ছিল না; কিন্তু ছোটবৌয়ের ব্যবহারে আজিকার বিদ্বেষ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

হরিপালে থাকিতে দুর্গা জ্বর আসিলে শুইয়া পড়িতেন, ছাড়িলে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেন। সাধ্যে কুলাইলে স্নান-আহ্নিক করিয়া একবেলা একমুঠা ভাতও খাইতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আর-একপ্রকার ঘটিল। পাড়ার মেয়েরা অহোরাত্র সহানুভূতি করিয়া দু'পাঁচ দিনেই তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া দিল। নীলকণ্ঠ মুখুয্যে মশায়ের পরিবার মেজবৌকে দেখিতে আসিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "এ কি করেচিস্ মেজবৌ, মেয়ের বিয়ে দিবি কবে ? ওর পানে যে আর চাইতে পারা যায় না।"

দুর্গা শ্রান্ত চোখ দুটি নিমীলিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কি জানি পিসিমা, কবে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।"

"তা'ত জানি মা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ত ? ভগবান ত আর বর জুটিয়ে এনে বিয়ে দিয়ে যাবেন না।"

দুর্গা আর জবাব দিলেন না।

এক মিনিট প্রতীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "বলি বাপের বাড়ী গেলি, ভাই কিছু যোগাড়-সোগাড় করে দিলে না ? দেওর কি বলে ?"

"ভগবান জানেন" বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই আদরিণী বেড়াইতে আসিয়া চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়াই উঁকি মারিয়া কহিল, "বলি, এ বেলাটায় কেমন আছ, মেজবৌ ?"

জ্ঞানদা শয্যার একান্তে বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; কহিল, "জ্বর এখনো ছাড়েনি পিসীমা।" দুর্গা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "বোসো, ঠাকুরঝি।"

"না বৌ, বেলা গেল, আর বোসবো না। তা' বলি কি, মেজবৌ, যাকে হোক ধরে উচ্ছুগ্যু কোরে দাও, আর খুঁত্-খুঁত্ কোরো না। বল্‌তে নেই,—তখন তবুও মেয়েটার যাহোক্ একটু ছিরি ছিলো, কিন্তু ম্যালোয়ারি জ্বরে একেবারে যেন পোড়া কাঠটি হয়ে গেছে। হাঁলা গেনি, সুমুখের চুলগুলো বুঝি উঠে গেল ?"

জ্ঞানদা ঘাড় নাড়িয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। আদরিণী কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিল—"শুন্‌চি না কি, ও-পাড়ার গোবিন্দ গাঙ্গুলি আবার বিয়ে করবে। একবার অনাথদা'কে পাঠিয়ে খবরটা কেন নিলে না মেজবৌ ?"

"আচ্ছা, বোল্‌ব" বলিয়া দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন। এমনি করিয়া কত লোকে যে কত হিতোপদেশ দিয়া গেল, তাহার সংখ্যা

রহিল না। কিন্তু যাহাদের পথ চাহিয়া দুর্গা অনুক্ষণ কাণ খাড়া করিয়া রহিলেন, তাহারা দেখা দিল না। না আসিল অতুল, না আসিল তাহার মা।

ছোটবৌয়ের দেহতে দয়ামায়া ছিল; কিন্তু সে ভারি অলস, তাহাতে অন্তঃসত্ত্বা। সুতরাং, স্বর্ণ জ্ঞানদাকে ডাকিয়া যখন বলিলেন, "বাছা, রোগ বলে ত আর চিরকাল চলে না। তোমার মা যেন ধরলুম পারে না; কিন্তু তুমি বাপু সোমত্ত মেয়ে—সকালে কাকার ভাত দুটি কি আর রেঁধে দিতে পারো না?" ঘরের ভিতর হইতে ছোটবৌ কথাটা অন্যায় বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিল। পরের দুঃখে সে ব্যথা অনুভব করিত; কিন্তু তাই বলিয়া, নিজের পরিশ্রম দিয়া সে দুঃখ দূর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।

জ্ঞানদা তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমিই দেব জ্যাঠাইমা।"

যদিচ, এখনও প্রতিরাত্রেই তাহার জ্বর হইত, কিন্তু মায়ের যন্ত্রণা বাড়াইবার ভয়ে এ কথা সে প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। ফোঁপরা নির্জ্জীব দেহটাকে সে সকালে বিছানা হইতে যেন টানিয়া তুলিতেই পারিত না; তথাপি একবার ইতস্ততঃ করিল না—একটিবার মুখ ভারি করিল না। দুঃখী পিতামাতার কন্যা হইলেও সে একমাত্র সন্তান; তাঁহাদের আদরে-যত্নেই লালিত-পালিত হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই গুরুজনের আজ্ঞা,—ন্যায়-অন্যায় যাই হোক—নির্বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে, সেবা করিতে, মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে, সংসারে বোধ করি আর তাহার জুড়ি ছিল না। কিন্তু, সে যে কত বড় গুরু-ভার মাথায় করিয়া লইল, তাহা আর কেহ না বুঝুক ছোট-বৌ বুঝিল। সুতরাং বড়জায়ের এই অত্যন্ত অন্যায় আদেশে তাহার অন্তর জ্বলিতে লাগিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতেও পারিল না—পাছে, বলিতে গেলেই, পালার সর্ত্তমত তাহাকেও ভোরে উঠিয়া রাঁধিতে হয়।

পরদিন যথাসময়ে কাকাকে স্নান করিয়া ঘরে যাইতে দেখিয়া, জ্ঞানদা ভাতের থালাটি হাতে করিয়া দিতে যাইতেছিল,—কোথা হইতে জ্যাঠাইমা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন—"কোথা যাস্ লা গেঁনি?"

জ্ঞানদা থতমত খাইয়া বলিল, "কাকা স্নান করে এলেন যে!"

"তাতে তোর কি?" বলিয়া জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন। "মানা করে দিয়েছি না, ভাত বেড়ে নিয়ে যেতে? তোর হাতে পুরুষমানুষ খেতে পারে লা?"

দুর্গা সেইমাত্র উঠিয়া ঘরের সুমুখে বসিয়াছিলেন,—চেঁচামেচি শুনিয়া সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে, দিদি?"

স্বর্ণ কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"হাতে করে থালা নিয়ে গেলে কাকা খুসি হয়ে তোমাকে মাথায় কোরে নিয়ে নাচ্‌বে—রাজপুত্তুর এনে বিয়ে দেবে, না? এই বয়সে কি মন-যোগাতেই শিখিচিস্, মাইরি!" বলিয়া থালাটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্গা সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—"পোড়ারমুখী, গুরুজনের কথা শুন্‌বিনে যদি, তোর মরণ হয় না কেন!" জ্ঞানদা নীরবে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। একবার বলিল না, এ বিষয়ে তাহাকে কেহই নিষেধ করে নাই। মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে সে বোধ করি জানিতই না।

প্রতিবাদ যে করিতে পারিত, সে ছোটবৌ। কিন্তু সে বড়জাকে চিনিত বলিয়া কিছুই করিল না। বড়জা যেমন মুখরা, তেম্‌নি আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্যা। মুখের উপর সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও লজ্জা পাইবে না; বরঞ্চ অধিক-তর নিষ্ঠুর হইয়া যন্ত্রণা দিবে জানিয়াই ছোটবৌ নীরবে জ্ঞানদার অনুসরণ করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া সস্নেহে সযত্নে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, "কেন কথাটা শুনিস্‌নি, মা?"

এতক্ষণের এত কঠোর লাঞ্ছনা সে সহিয়াছিল; কিন্তু এই স্নেহের অনুযোগ সহিতে পারিল না। একটিবার মাত্র চোখ তুলিয়া ছোটখুড়ির মুখের পানে চাহিয়াই সে তাঁহার পদতলে ভাঙিয়া পড়িল—"আমাকে কেউ নিষেধ কোরে দেয়নি, খুড়িমা" বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছোটখুড়ি কাছে বসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারিল না।

এমনি করিয়া এই শ্রীহীনা হতভাগ্য অনূঢ়া কন্যার দিন কাটিতে লাগিল। ঘরে-বাইরে আত্মীয়-পর সবাই মিলিয়া অনুক্ষণ কেবল লাঞ্ছনা দিতেই লাগিল, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার কেহ চেষ্টামাত্রও করিল না।

(৭)

আজকাল ধরিয়া না তুলিলে দুর্গা প্রায় উঠিতেই পারিতেন না। মেয়ে ছাড়া তাঁহার কোন উপায়ই ছিল না। তাই সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও জ্ঞানদা যখন-তখন ঘরে ঢুকিয়া মায়ের কাছে বসিত। আজিকার সকালেও একটু-খানি ফাঁক পাইয়া, কাছে বসিয়া, আস্তে-আস্তে মায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সহসা একটা অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল।

দোলের দিন। ছুটির বন্ধে অতুল বাড়ী আসিয়াছিল। দুই-তিনজন পাড়ার সঙ্গী লইয়া রঙ মাখিয়া পকেট ভরিয়া আবির লইয়া 'মাসিমা' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বাড়ী ঢুকিল।

দুর্গা তন্দ্রায়-জাগরণে সারাদিন একপ্রকার আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিতেন। পাছে কণ্ঠস্বর কাণে গেলে মা সজাগ হইয়া উঠেন, এই ভয়ে জ্ঞানদা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মনে-মনে ইনি যে এই লোকটিরই প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা সে জানিত। অথচ, তাঁহার সেই স্বাভাবিক ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, আত্মসম্মান আর যেন ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনাও কেমন যেন দ্রুত বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার যে জননী কলহের ছায়া দেখিলেও শঙ্কিত হইতেন, তিনি আজ-কাল ইহাতেও যেন বিমুখ ন'ন—সে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে-ছিল। সুতরাং, উভয়ের দেখা হইলেই একটা অত্যন্ত অশোভন কলহ যে অনিবার্য্য, একথা তাহার অন্তর্যামী আজ বলিয়া দিলেন। কি করিলে যে এই বিপদ এড়াইতে পারা যায়, ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পা টিপিয়া উঠিয়া সে কবাট রুদ্ধ করিতেছিল; মা বলিলেন, "জ্ঞানদা, ও অতুল না?"

জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি জানি মা—তিনি ন'ন বোধ হয়।"

"হাঁ, সেই বই কি। উঠে একবার দেখ্ দিকি।"

তর্ক করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন—তাহা সে জানিত; তাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া উকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখা গেল না। বারান্দার ওধারে অনেকের মধ্যে তাঁহারও শব্দ তাহার কাণে গেল। এইটুকু খবর লইয়াই সে ফিরিতে পারিত; কিন্তু, অন্তরাল হইতে একবার তাঁহার মুখখানি দেখিয়া লইবার লোভ তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল। সে নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল, তিনি বড় মাসীর পায়ের উপর মুঠা করিয়া আবির দিয়া হাসিতেছেন। পাড়ার ছেলেরাও দেখাদেখি তাহাই করিতেছে। ছোটবৌ ছিল না। একটা ব্যথার মত হওয়াতে, আজ সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। ফিরিবে-ফিরিবে করিয়াও তাহার অজ্ঞাতসারে বোধ করি একটু বিলম্ব ঘটিয়াছিল; অকস্মাৎ বজ্রাহতপ্রায় হইয়া দেখিল, সে যে ভয় করিয়াছিল, ঠিক তাই,—মা ফেলিয়া-ঢুলিয়া সেই দিকেই চলিয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া, দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "যেয়ো না মা, ফেরো।" দুর্গা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—"কেন?"

"কেন, জানিনে মা, তুমি ফেরো। তার ত কোন আশাই নেই মা,—"

"আমাকে ছাড়্ হতভাগী—ছেড়ে দে" বলিয়া অমানুষিক বলে দুর্গা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। জ্ঞানদা কলের পুতুলের মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সবাই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল—মেজবৌ।

সেই কঙ্কালসার মুখমণ্ডলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের জ্বলন্ত চক্ষু দু'টার পানে চাহিয়া অতুল সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

দুর্গা বলিলেন, "অতুল, আমরা তোমার কি করে-ছিলাম যে, এমন ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ করলে?" অতুল জবাব দিবে কি, অপরাধের ভারে ঘাড় তুলিতেই পারিল না। সেই কাজটা করিলেন স্বর্ণ। হৃদয় বলিয়া তাঁহার কোন বালাই ছিল না; তাই অতি সহজেই মুখ তুলিয়া কহিলেন, "কেন, কি সর্ব্বনাশ করেছে, শুনি?"

দুর্গা বলিলেন, "তোমাকে তার কি জবাব দেব, দিদি? যাকে বল্‌চি সেই জানে, সে কি করেচে।" স্বর্ণ কহিলেন, "আমরাও ঘাস খাইনে, মেজবৌ। কিন্তু, ও কি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লেখাপড়া করে দিয়েছিল,

যে, এত লোকের মাঝখানে তেড়ে এসেচ? যাও, ঘরে যাও—পাল-পর্ব্ব আমোদ-আহ্লাদের দিনে আমার বাড়ীতে বোসে অনাছিষ্টি কাণ্ড কোরো না।"

"অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি করতে আসিনি দিদি।" বলিয়া অতুলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "যে কোরে আমাদের এই একটা বছর কেটেছে অতুল, সে তুমি জানো না—কিন্তু ভগবান জানেন। কিন্তু, এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তাঁর মরণকালে আশা দিয়াছিলে? কেন তুমি তখনি জানালে না?"

স্বর্ণ রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বাছাকে তুমি ভগবান দেখিয়ো না বল্‌চি, মেজবৌ, ভালো হবে না। আমরা বেঁচে থাক্‌তে, কথা দেবার কর্ত্তা ও নয়।"

এত লোকের সমক্ষে অতুল নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছিল; মাসির জোর পাইয়া কহিল, "আমি নিজে বিয়ে কোরব বলে কি কথা দিয়েছিলাম? আমার পা ছাড়ে না—পায়ের ওপর পড়ে মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল,—'বাবাকে নিজের মুখে কথা দাও।' করি কি? অত লোকের সাম্‌নে আমি লজ্জায় বাঁচিনে—তাই পা ছাড়াবার জন্যে যদি একটা কৌশল করে থাকি, তাকে কি কথা দেওয়া বলে?"

স্বর্ণ খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ওমা, কি ঘেন্নার কথা, অতুল,—তুই বলিস্‌ কি রে? নিজে পায়ে ধোরে বলে—আমায় বিয়ে করো? অ্যাঁ?"

অতুল কহিল, "সত্যি কি না, ওকেই জিজ্ঞেসা করো না? মেজ-মাসিমা নিজেই বলুন না, আমার পায়ের ওপর মাথা খুঁড়তে দেখেছিলেন কি না! নইলে ঐ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাবো? আমার কি মরবার দড়ি-কলসি জোটে না?"

অতুলের সঙ্গীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্গা উন্মাদের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ওরে নিষ্ঠুর! ওরে কৃতঘ্ন! দড়ি-কলসী আমি কিনে দেব রে, তুই মরগে। তোর যে মরাই উচিত।" চীৎকার শুনিয়া ছোটবৌ ব্যথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, স্বর্ণ লাফাইয়া উঠিয়াছেন—"তবে রে হতভাগী! বেরো আমার বাড়ী থেকে—বেরো বল্‌চি।"

জ্ঞানদা দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে অচেতন পাথর হইয়া গিয়াছিল। লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান, অপমান, ভাল-মন্দ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল না। এ সমস্তরই যেন সে একান্ত অতীত হইয়াই নীরবে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া ছোটবৌ সভয়ে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিল—"জ্ঞানদা?" সে ঘরের ভিতর হইতেই কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল। জ্ঞানদা জবাব দিল, "কেন খুড়িমা?"

"আর কেন দাঁড়িয়ে মা, তোর মাকে ঘরে নিয়ে যা।"

"মা চলো" বলিয়া জ্ঞানদা মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে-ধীরে তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেল।

স্বর্ণ কহিলেন, "দেখ্‌লি ছোটবৌ আস্পদ্ধা। একেই বলে, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত'।" অতুল হাসিবার মত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "শুন্‌লেন, ছোটমাসিমা কাণ্ডটা? কি ভয়ানক লজ্জা!"

স্বর্ণ থন্‌ থন্‌ করিয়া বলিলেন, "একফোঁটা সব মেয়ে,—এ কি ঘোর কলি!"

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া কহিল—, "ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি। নইলে আর কোনো হলে, মা বসুন্ধরা এতক্ষণ লজ্জায় দুফাঁক হয়ে যেতেন।" বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল। স্বর্ণ বিদ্রূপের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া খুসি হইয়া বলিলেন,—"সেই কথাই ত বল্‌চি, ছোটবৌ।" কিন্তু অতুলের মুখ কালো হইয়া উঠিল। ক্ষাণিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া যখন সে উঠিয়া গেল, তখন মনে হইল, এই হোলির দিনে কে যেন তাহার জামায়, কাপড়ে লাল রঙ এবং মুখে গাঢ় কালি লেপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আসল কথাটা এতদিন অপ্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু আর রহিল না। পাড়ার হিতাকাঙ্ক্ষিণীদের কৃপায় অচিরেই দুর্গার কাণে গেল যে, এই বাড়ীতেই অতুল আবদ্ধ হইয়াছে। অনাথেরই বড় মেয়ে মাধুরীর সঙ্গেই অতুলের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ঘটকালি স্বর্ণ করিয়াছেন, এবং মেয়ে দেখিয়া অতুলের ভারি পছন্দ হইয়াছে। মাধুরী শিশুকাল হইতেই কলিকাতায় মামার-বাড়ী থাকে। মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। ইংরাজি, বাঙলা, সংস্কৃত শিখিয়াছে। গাহিতে, বাজাইতে, কার্পেট-বুনিতেও জানে; আবার শিব গড়িতে, স্তোত্র আওড়াইতেও পারে। দেখিতেও অতিশয় সুশ্রী। এইবার পূজার সময় মাস-

দু'য়ের জন্য বাটী আসিয়াছিল; সেই সময়েই কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। অতুলের মত দুর্ল্লভ পাত্র চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় নাই; পাত্র আপনিই ধরা দিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ মাঝখানে ছিলেন।

ছোটবৌয়ের ভাইয়েরা অবস্থাপন্ন। মা বাঁচিয়া আছেন, আসন্ন-প্রসবা মেয়েকে তিনি বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, সঙ্গে মাধুরীও আসিল। মেজ-জ্যাঠাইকে সে অনেকদিন দেখে নাই; আসিয়াই প্রণাম করিতে আসিল।

"দীর্ঘজীবি হও মা" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া দুর্গা নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। একে সে সুন্দরী, তাহাতে মামী সাজাইয়া-গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে কলিকাতার মেয়ে - কেমন করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়, জানে। গায়ে গুটিকয়েক বাছা-বাছা স্বর্ণালঙ্কার; পরণে কোঁচানো চওড়া লালপেড়ে সাড়ী; পিঠের ওপর চুল এলো-করা; কপালে টিপ। চাহিয়া-চাহিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর পড়ে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—"আহা! মেয়ে ত নয়—যেন স্বর্ণপ্রতিমা!" এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার পদতলে উপবিষ্টা নিজের ঐ মলিন, শ্রীহীন মেয়েটার পানে চাহিয়া তাঁহার দু'চক্ষু যেন জ্বলিয়া গেল;—পাশ ফিরিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন—"আর আমি মেয়ে পেটে ধরেচি, যেন কাল্‌প্যাঁচা" মাধুরী ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাহার রূপ এবং সাজসজ্জার পানে চাহিয়া জ্ঞানদা নিজেই ত হীনতার সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল; মায়ের এই নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। মাধুরী কহিল, "দিদি, চল না একটু গল্প করিগে।" প্রত্যুত্তরে জ্ঞানদা অব্যক্ত স্বরে কি কহিল, বোঝা গেল না। কিন্তু সেই শব্দটামাত্র শুনিতে পাইয়াই দুর্গা তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ও পোড়ামুখ লোকের সাম্‌নে আর বার করিস্‌নে গেঁনি—বোসে থাক্।" জ্ঞানদা নীরবে বসিয়া রহিল।

মাধুরী চলিয়া গেলে দুর্গা বোধ করি নিতান্তই মনের জ্বালায় বারদুই আঃ উঃ করিলেন। জ্ঞানদা আস্তে আস্তে কহিল, "কপালটা একটু টিপে দেব মা?" "না।" "ওষুধটা একবার—" "ওলো, না, না, না। যা, আমার বিছানা থেকে উঠে যা, হারামজাদী! তোর মুখ দেখ্‌লেও আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে-পুড়ে যায়।" বলিয়া পা দিয়া তিনি সজোরে ঠেলিয়া দিলেন।

জ্ঞানদা অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু লাথিটা সহ্য করিতে পারিল না। নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল; এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার দু'চক্ষের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, মনে-মনে বলিতে লাগিল—'ভগবান! আমি কাহার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে, সকলেরই চক্ষুঃশূল! আমার রূপ নাই, বসন-ভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ত্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেহ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে—সেও কি আমার অপরাধে? প্রভু! এতই যদি আমার দোষ-অপরাধ, তবে, আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও—তিনি আমাকে কখনো ফেলিতে পারিবেন না।"

"জ্ঞানদা?" বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিলেন। মায়ের ডাকে সে চোখ মুছিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। "রোগা শরীর, ভিজে মাটির ওপর কেন মা?" বলিয়া দুর্গা উৎকণ্ঠায় নিজেই উঠিয়া বসিলেন। "ওঃ, বকেছি বুঝি মা?" বলিয়া চক্ষের পলকে দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অনাথ দুর্গামণির ঘরে ঢুকিয়া বিমর্ষমুখে কহিল, "আজ কেমন আছ, মেজ বৌ-ঠান? থাক্, থাক্, আর উঠো না। তা' ওষুধপত্র কিছুই খেতে চাও না শুন্‌লাম—অমন কর্‌লে ত আরাম হতে পারবে না!"

কথাটা সত্য। যদিচ, ঔষধ যাহা দেওয়া হইতেছিল, তাহা না দিলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সেও তিনি একেবারে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। কণ্ঠস্বর প্রতিদিন গহ্বরে ঢুকিতেছিল —খুব কাছে না আসিলে আজকাল আর শুনিতেই পাওয়া যাইত না। দুর্গা প্রত্যুত্তরে যাহা কহিলেন, অনাথ ঘাড়টা কাত করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া শুনিয়া বলিলেন, "সে তো সত্যি কথাই বৌঠান; বিধবা হয়ে আর বেঁচে লাভ কি,—কোন্ হিন্দুসন্তান এ কথার আর প্রতিবাদ করবে বল? তবে কি না, আত্মহত্যাটা না কোরে, কোন গতিকে কটা দিন সংসারে থাকা। তোমার আবার যে রকম দেহের

অবস্থা, তাতে এ সব কথা আমার না বলাই উচিত; কিন্তু না বল্‌লেও যে নয় কি না; তাই বলি কি,—নিজেও ত দেখ্‌তে পাচ্চ--চেষ্টার আমি ক্রুটি করচিনে; কিন্তু, কি হতভাগা মেয়ে—কোন মতেই কি একটা গাঁথচে না! ছ' সাতটা সম্বন্ধ—সব কটাই ভেঙে গেল।—মেয়ে দেখে আর কারুর পছন্দ হোলো না।"

দুর্গা কিছুই বলিলেন না। একটুখানি থামিয়া অনাথ পুনরায় কহিতে লাগিল, "মেজদা' মরে তুমি আবার আমার সংসারে এসেছ কি না! গোল হচ্চে ত তাই নিয়ে। নীলকণ্ঠ মুকুয্যেকে ত চেনই,—বাড়ী-বাড়ী গিয়ে বেশ তাল-গোল পাকাচ্চে, তোমার ছুতো কোরে আমাকে কি করে ঠেল্‌বে। আর, তাদের দোষই বা দিই কি কোরে,—নিজেরাও ত মেয়ের বয়সটা দেখ্‌তে পাচ্চি। সহরে এত নেই—পোড়া পাড়াগাঁয়েই আমাদের যত হাঙ্গামা, যত বিচার।" বলিয়া জোর করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দেবর যে কিসের ভূমিকা করিতেছেন, কোন্ দিকে ইহার গতি—তাহা ধরিতে না পারিয়া, দুর্গা তেম্‌নি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু শীর্ণ মুখের উপর একটা অনিশ্চিত শঙ্কার ছায়া পড়িল। একবার কাশিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাথ এইবার আসল কথা প্রকাশ করিল; কহিল, "তোমার এ অবস্থায় সত্যিই ত আর কোথাও যাওয়া-আসা চলে না—সে আমি বলিনে;—কিন্তু কি জানো মেজ-বৌ-ঠান—নিজের মেয়েটাও ত বিবাহযোগ্য হল,—তাই আমি বলি কি—কি জানো, সব দিক আমাকে বাঁচিয়ে চলা ত আবশ্যক;—আমি বলি কি—গেঁনিকে এ সময় আর কোথাও না পাঠা'লেই নয়। এ বাড়ীতে আর ত তাকে রাখা যায় না। বড্ড হৈ-চৈ হচ্চে।"

দুর্গার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ওষ্ঠাধরের মধ্যেই যেন মিলাইয়া গেল—"কোথায় সে যাবে ঠাকুর-পো?" অনাথ কহিল—"হরিপালেই যাক্।" "সেখানে কি কোরে যাবে? গিয়েই বা কি হবে ঠাকুর-পো?" অনাথ এবার রুষ্ট হইল; কহিল, "এ তোমার অন্যায়, মেজবৌ-ঠান। কেবল নিজেরটি দেখ্‌লেই ত চলে না? যার সংসারে আছো—অসময়ে যে তোমাদের ঘাড়ে নিলে—তার ভালমন্দও ত চেয়ে দেখা চাই।" দুর্গা জবাব দিতে পারিলেন না—শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এ নিঃশ্বাসে এইটুকু কাজ হইল যে, অনাথ গলাটা একটু কোমল করিয়া কহিতে লাগিল—"এ অবস্থায় তোমার একটু কষ্ট হবে বটে, তা' বুঝতে পারচি। কিন্তু উপায় কি? আর তোমার নিজের দোষও আছে, মেজবৌ-ঠান। তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম—তিনি ত স্পষ্টই লিখ্‌চেন,—সেখানে বিয়ের সমস্ত যোগাড় হয়েছিল, তুমি শুধু একটা অসম্ভব আশায় ভুলে, রাগারাগি কোরে মেয়ে নিয়ে চলে এলে। তা না করলে তো আজ স্বচ্ছন্দে—"

স্বচ্ছন্দে যে কি হইতে পারিত, সেটা আর অনাথ খুলিয়া বলিল না। কিন্তু দুর্গা বুঝিলেন—হঠাৎ কেন সে আজ জ্ঞানদাকে বিদায় করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিছুমাত্র হাঙ্গামা না পোহাইয়া, একটা পয়সা খরচ না করিয়া, এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সন্ধান যখন তাহার মিলিয়াছে, তখন এ লোভ ত্যাগ করিবে—সে লোক অনাথ নয়। সে চলিয়া গেলে, খানিক পরে কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, জ্ঞানদা ঘরে ঢুকিয়া, মায়ের অবস্থা দেখিয়া, ভয়ে চমকিয়া গেল। তাঁহার কোটরপ্রবিষ্ট, রক্তশূন্য চোখ দুটি আজ ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েকে দেখিবামাত্রই তাঁহার ক্রন্দনের বেগ একেবারে সহস্র মুখী হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া, মেয়ের বুকে মুখ রাখিয়া মা আজ ছোট্ট মেয়েটির মতই ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণে কান্না যখন থামিল, তখন মেয়ে কহিল, "আমাকে তুমি চেন না মা, যে কেউ আমাকে তোমার কাছছাড়া করতে পারে? এ তো কাকার বাড়ী নয় মা, এ আমার বাবার বাড়ী। তিনি খেতে না দেন, তখন ত আর লজ্জা থাক্‌বে না,—যা কোরে হোক্, তখন তোমাকে আমি খাওয়াতে পারব মা।" মা শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু মেয়ে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়াও স্থির করিতে পারিল না, এই 'যাহোক্'টা তখন কি হইবে।

ছোটবৌ কথাটা শুনিতে পাইয়া স্বামীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিল, "তোমার কি ভীমরথী হয়েচে যে, ভাজের পরামর্শে এই অসময়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে দূর করবার কথা বলে এলে? কসাই,—যাদের জবাই করাই ব্যবসা—তাদেরও তোমাদের চেয়ে দয়া মায়া আছে।"

কাজটা না কি একেবারেই অসম্ভব, তাই অনাথ চুপ করিয়া গেল; না হইলে, এ সকল ব্যাপারে সে স্ত্রীর বাধা, এতবড় দোষারোপ তাহার অতিবড় শত্রুরাও তাহার প্রতি করিতে পারিত না। এই আসন্নকালেও দুর্গা স্বয় ত মেয়ে লইয়া আবার হরিপালে যাইতে পারিতেন; কিন্তু, যে পাত্র তাহার ৫।৬টি সন্তানের জননীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লাথি মারিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহার কথা মনে হইলেই, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

পরদিন অনাথকে নিজের শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "ঠাকুর-পো, সম্পর্কে বড় না হলে, আজ তোমার পায়ে ধোরে ভিক্ষে চাইতাম, ভাই, তোমার যাকে ইচ্ছে হয়, একে দাও; কিন্তু মেয়েকে এ সময়ে আমার কাছছাড়া কোরো না।" বলিয়া জ্ঞানদার হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহার কাকার হাতের উপর রাখিলেন। অনাথ হাতটা টানিয়া লইয়া, বিরক্ত হইয়া, কহিল, "পরের দায়ে আমার জাত যায়। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করচি মেজবৌঠান? কিন্তু ঘাটের মড়াও যে এ শকুনিকে বিয়ে করতে চায় না! বলি, তোমার সেই বালা-জোড়াটা যে ছিল, কি করলে?"

"সে তো তোমার দাদার শ্রাদ্ধের সময়েই গেছে, ঠাকুরপো।"

"তা হলে আর আমি কি কোরব! একটা পয়সাও দেবে না, মেয়েও ছাড়বে না,—তার মানে, আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবোতে চাও আর কি!" বলিয়া অনাথ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে দুর্গা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ মেয়ের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বসে আছিস্, ঘরে সন্ধ্যা দিবিনে?" যে সমস্ত আলোচনা এইমাত্র তাহাকে লইয়া হইয়া গেল, তাহারি দহনে বোধ করি সে একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল; —জবাব দিবার পূর্ব্বেই মা নিরতিশয় কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"মরণ আর কি। রাজকন্যার মত আবার অভিমান করে বসে আছেন! হ্যাঁ লা গোঁনি, এত ধিক্কারেও তোর ত প্রাণ বেরোয় না! যদু ঘোষের একছেলে সেদিন তিনদিনের জ্বরে মলো—আর এই একটা বছর ধরে তুই নিত্যি জ্বরের সঙ্গে যুঝ্‌ছিস্, কিন্তু তোকে ত যম নিতে পারলে না। তুই বলে তাই এখনো মুখ দেখাস্; আর কোনো মেয়ে হলে মনের ঘেন্নায় এতদিন জলে ডুবে ম'রত। যা, যা, সুমুখ থেকে একটু নড়ে যা শকুনি,—একদণ্ড হাঁফ ফেলে বাঁচি। দিবারাত্রি আমাকে যেন জোঁকের মত কাম্‌ড়ে পড়ে আছে।"

বাস্তবিক মায়ের কথাটা সত্য যে, আর-কোন মেয়ে হইলে শুদ্ধমাত্র মনের ঘৃণাতেই আত্মহত্যা করিত;—এমন কত মেয়েই ত করিয়াছে;—কিন্তু এই মেয়েটিকে ভগবান যেন কোন নিগূঢ় কারণে মা বসুন্ধরার মতই সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়াছিলেন। সে নীরবে উঠিয়া গিয়া নিয়মিত গৃহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এত বড় নির্দ্দয় লাঞ্ছনাতেও মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল না,—"মা, মরিতে আমিও জানি; শুধু তুমি ব্যথা পাইবে বলিয়াই সব সহিয়া বাঁচিয়া আছি।" ঘরে প্রদীপ দিয়া, গঙ্গাজল ছড়া দিয়া, ধুনা দিয়া সে আর একটি ক্ষুদ্র দীপ হাতে করিয়া তুলসী-বেদীমূলে দিতে গেল। বাঙালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই এই ছোট গাছটিকে দেবতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। এইখানে আসিয়া আজ আর সে কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া আর উঠিতে পারিল না। দুই হাত সুমুখে ছড়াইয়া দিয়া কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। "ঠাকুর! দয়াময়! এইখানে তুমি আমার বাবাকে লইয়াছ,—এইবার আমার মাকে আর আমাকে কোলে লইয়া আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও ঠাকুর! আমরা আর সহিতে পারিতেছি না!"

৯

চৈত্রের শেষ কয়টা দিন বলিয়া ছোটবৌর বাপের-বাড়ী যাওয়া হয় নাই। মাসটা শেষ হইতেই তাহার ছোট ভাই তাহাকে এবং মাধুরীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ ভালো দিন—খাওয়া-দাওয়ার পরেই যাত্রার সময়। অতুল বাড়ী আসিয়াছিল বলিয়া, স্বর্ণ তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুপুরবেলা এই দুটি যুবক আহারে বসিলে, স্বর্ণ কাছে আসিয়া বসিলেন। সখ করিয়া তিনি মাধুরীর উপর পরিবেশনের ভার দিয়াছিলেন। সকাল বেলায় আঁষ রান্নাটা জ্ঞানদাকে দিয়াই করাইয়া লওয়া হইত, কিন্তু তাহা গোপনে। বাহিরের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই, স্বর্ণ অসঙ্কোচে কহিতেন, "মা গো! সে কি কথা! ওকে যে আমরা রান্নাঘরেই ঢুকতে দিইনে।" সুতরাং

পরিবেশন করা তাহার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তা'ছাড়া নিজের লজ্জাতেই সে কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইত না—যতদূর সাধ্য ঘরের-বাহিরের সকলের দৃষ্টি এড়াইয়াই সে চলিত। অতুলের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইবে। তাই, এই সুন্দরী মেয়েটি সর্ব্বাঙ্গে সাজসজ্জা এবং ব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা জড়াইয়া লইয়া, অপটু হস্তে যখন পরিবেশন করিতে গিয়া, কেবলি ভুল করিতে লাগিল—এবং জ্যাঠাইমা সস্নেহ অনুযোগের স্বরে, কখনো বা 'পোড়ামুখী' বলিয়া, কখনো বা 'হতভাগী' বলিয়া হাসিয়া, তামাসা করিয়া, কাজ শিখাইতে লাগিলেন--তখন এই বিশ্বের পায়ে-ঠেলা মেয়েটি তাহারি জন্য রন্ধনশালার নিভৃত একান্তে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য গুছাইয়া দিতে লাগিল।

স্বর্ণ মাধুরীর বিবাহের কথা তুলিতেই, সে ছুটিয়া রান্না-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই, ভাই ?"

"কিছু না দিদি ; আমি আর পারিনে।" বলিয়া হাতের খালি থালাটা দুম্‌ করিয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পরক্ষণেই স্বর্ণ চেঁচাইয়া ডাকিলেন, "একটু নুন দিয়ে যা' দেখি মা।" কিন্তু নুন লইবার জন্য মাধুরী ফিরিয়া আসিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, "কই রে—তোর ছোট মামা যে বসে আছে।" তথাপি কেহ ফিরিল না। এবার তিনি রাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"কথা কি কারু কাণে যায় না ? —এরা কি উঠে যাবে না কি ?" তবুও যখন কেহ আসিল না, তখন জ্ঞানদা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ভাবিল, নুন জিনিসটা ত আর ছোঁয়া যায় না—তাই বোধ-করি এ আদেশটা তাহারই উপরে হইয়াছে। তখন মলিন, শতছিন্ন পরিধেয়খানিতে সর্ব্বাঙ্গ সতর্কে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া, সে নুন হাতে করিয়া ধীরে-ধীরে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলে-দুটি তাহাকে দেখিতে পাইল না। জ্যাঠাইমা তাহার আপাদ-মস্তক বারদুই নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুকঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তোমাকে আন্‌তে কে বল্‌লে ? মাধুরী কৈ ?"

জ্ঞানদা ঘরের বাহির হইতেই প্রায় চুপি-চুপি বলিল, "কি জানি কোথায় গেল।"

"তাই তুমি এলে ? এক কথা তোমাকে কতবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তোমার মুখ দেখ্‌লে সাত পুরুষ নরকস্থ হয় ? আমার সুমুখে তুমি এসো না। ঐ যে অতুল খেতে এসেচে—তোমার সাম্‌নে আসাই চাই ? না ? নুনের পাত্রটা ঐখানে রেখে দিয়ে যাও।" জ্ঞানদা চলিয়া গেল, —কারণ, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন না।

স্বর্ণ স্বয়ং উঠিয়া নুন পরিবেশন করিলেন এবং স্বস্থানে বসিয়া অতুলের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"তুই ব্যাটাছেলে, পুরুষ মানুষ—তোর আবার লজ্জা কি যে, ঘাড় হেঁট করে বসে আছিস ? খা।"

মাধুরীর মামা প্রশ্ন করিল, "ও কে, দিদি ?"

স্বর্ণ একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "ও কিছু না—তোমরা খাও।"

কিন্তু অতুলের সমস্ত খাবার বিস্বাদ হইয়া গেল। লুচির টুক্‌রা কিছুতেই যেন আর তাহার গলা দিয়া গলিতে চাহিল না। মাধুরীকে দেখিয়া সে ভুলিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই ; কিন্তু জ্ঞানদাকে সে চিনিত। আজিও জ্ঞানদা তাহাকে ভালবাসে, কি ঘৃণা করে, তাহা সে ঠিক জানিত না ; কিন্তু একদিন সে যে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত তাহা ত জানে। কিন্তু সেদিনেও সে কখনো যে গায়ে পড়িয়া তাহার সুমুখে আসিবার চেষ্টা করে নাই, এ কথাটাও ত সে এত সত্বর ভুলিয়া যায় নাই।

ছোটবৌ যাবার সময় মেজ-জায়ের সহিত দেখা করিয়া গেল না। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া, জ্ঞানদার হাতে একখানি দশটাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া, অনেকটা যেন চোরের মত পলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া তাহার প্রণামটা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিল না। বাটীর মধ্যে শুধু এই একটা লোক,—যে এই দুর্ভাগা মেয়েটার ভিতরটা দেখিতে পাইয়াছিল,—সেও আজ, কি জানি কতদিনের জন্য, স্থানান্তরে চলিয়া গেল। থাকিয়াও সে যে বিশেষ কিছু করিয়াছিল, তাহা নয়—ব্যথা পাওয়া এবং ব্যথা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া কাজ করা, এক জিনিস নয়—তবুও ছোট-খুড়িমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিবিড় অন্ধকারে এই মেয়েটার সমস্ত বুক পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বৈশাখের মাঝামাঝি একটা দিনে অনাথের আফিস যাইবার সময় বড়বৌ মুখের উপর সংসারের সমস্ত দুশ্চিন্তা

লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনাথ ভীত হইয়া কহিল, "কি হয়েছে বৌ-ঠান ?" স্বর্ণ কহিলেন, "তুমি করচ কি ঠাকুরপো ? মেজ-বোয়ের যে হয়ে এলো।" অনাথ হাতের হুঁকাটা ঠক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া পাংশু মুখে কহিল, "বল কি ? কৈ আমি ত কিছু জানিনে।" স্বর্ণ বলিলেন, "না, না, তা'নয় ; আজই সে মরচে না ; কিন্তু বেশি দিন আর নেই, তা বলে দিচ্চি। বড়-জোর দশ-পনেরো দিন। তারপরে ছ'মাস, একবছর ছুঁড়িটার বিয়ে দেবার জো থাক্‌বে না—কিন্তু আমার মাধুরী মায়ের বিয়ে আমি এই আষাড়ের মধ্যেই দেব—তা' কারু কথা শুনব না। এমন পাত্র খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা'ছাড়া, দেবার-থোবার কামড় নেই। ছেলে নিজে পছন্দ করেচে,—মা মাগী যে বল্‌বেন—এ নেবো, তা নেবো, সে না হলে চল্‌বে না,—তার জো নেই। এমন সুবিধে কি আমি শেষকালে দেরি ক'রতে গিয়ে নষ্ট করে ফেল্‌বো ?"

অনাথ সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, সে কি হতে পারে ! তুমি হলে আমার সংসারের কর্ত্তা-গিন্নী সমস্তই। তোমার মেয়ের বিয়ে বোন্‌পোর সঙ্গে দেবে—যে দিন খুসী দিয়ো, যা ইচ্ছে কোরো, আমি কখনো ত তাতে না বোল্‌ব না, বৌঠান।"

স্বর্ণ সগর্ব্বে বলিলেন, "তাতো বোল্‌বে না, জানি। কখনো বলোওনি—আমার সে দেওর তুমি নও। তাতেই ত বল্‌চি, এখন যা বলি করো। আর গড়িমসি কোরো না, যাকে হোক্ ধরে-বেঁধে ওকে বিদায় করো। সে না করলে মাধুরীর বিয়ে কোন মতেই হতে পারবে না। এম্‌নিই ত পাড়ার ব্যাটা-বেটিরা নানা কথা কইচে,—তখন কি আবার একটা গোলমালে পড়ে যাবো ? মনে বেশ করে বুঝে দেখো, ও তোমারই ঘরের মড়া। ফেল্‌বে ফ্যালো না হয় গন্ধে মরো।"

কথাটা অনাথ ভাবিতে-ভাবিতে আফিসে গেল ; এবং পরদিন হইতেই ঘরের মড়া ফেলিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এমন দুই চারিজন পাত্র ধরিয়া আনিতে লাগিল, যাহাদের পরিচয় নিজেদের মুখে দিতে গেলে, বোধ করি স্বয়ং স্বর্ণমঞ্জরীকেও দুবার ঢোক গিলিতে হইত।

সেদিন দুপুরবেলা অনেক দিনের পর স্বর্ণ আসিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকিলেন—"বলি, আজ কেমন আছ, মেজবৌ ?"

দুর্গা কষ্টে পাশ ফিরিয়া হাতটা একটু উল্টাইয়া কহিলেন, "আর থাকা-থাকি দিদি ! আশীর্ব্বাদ কর, আর বেশি দিন না ভুগ্‌তে হয়।"

স্বর্ণ সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "না না, ভয় কি ? ভালো হয়ে যাবে বৈকি।"

দুর্গা চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতিবাদ করিলেন না। স্বর্ণ তখন কাজের কথা পাড়িলেন। কহিলেন—"তা মেয়ে বড় কি না ; পাত্তরটি নেহাৎ ছোঁড়া হলেও আর মানাবে না মেজবৌ। বাপ মা নেই, তাই নিজেই ওবেলা মগরা থেকে দেখ্‌তে আস্‌বেন, বলে পাঠিয়েছেন—" বলা বাহুল্য, বাপ-মা অমর না হইলে আর পাত্রটির ও-বয়সে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা চলে না। বলিতে লাগিলেন,—"এখন মা কালী করেন, মেয়ে দেখে তার পছন্দ হয়, তবেই ত ছোট-ঠাকুরপোর ছুটোছুটি, হাঁটাহাঁটি সার্থক হয়। তার পরে আবার দেনা-পাওনার কথা—তা' আমি বলি কি—"

কথাটা শেষ না হইতেই দুর্গা আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া ছল্‌-ছল্ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর দিদি, এ সম্বন্ধটি আর যেন ভেঙে না যায়। আমি যেন দেখে যেতে পারি—" বলিতে-বলিতেই তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বর্ণ বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করচি বই কি, মেজবৌ ; দিন-রাত ঠাকুরকে জানাচ্চি,—ঠাকুর, যা'হোক্ মেয়েটার একটা কিনারা করে দাও ;—তা' দেখ্‌বে বই কি মেজবৌ—আমি বল্‌চি তুমি জামাইয়ের মুখ দেখে তবে—"

দুর্গা নীরবে আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন। স্বর্ণ একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কহিলেন, "কাচ্চা-বাচ্চার বাপ—ঐ শুন্‌তে দেড়শ' মাইনে—নইলে কিছুই নেই, সব জানি ত। নিজের মেয়েটার কি করে যে দু'হাত এক করবে, তাই ভেবেই কাঠ হয়ে যাচ্চে। তার ওপর আবার এটি। বুঝ্‌তে সবই ত পারো, মেজবৌ ;—তাই বল্‌ছিল কি—লজ্জায় নিজে ত তোমাকে বল্‌তে পারে না—বল্‌ছিল যে তোমার অংশের এই বাড়ীটা বাঁধা না দিলে ত আর খরচপত্রের জোগাড় হয়ে উঠবে না—তোমাকে নিজে কিছুই করতে হবে না, শুধু একটা-ঢেরা সই করে দেওয়া। শুধু হাতে কেউ ত আর ধার দিতে চায় না

—পোড়া কলিকাল এম্‌নি যে, তুমি মরো আর বাঁচো, কেউ কারুকে বিশ্বাস করে না—”

দুর্গা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আমি আর ক’দিন দিদি,—তোমরা আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই কোরব। শুধু এইটুকু দেখো দিদি, ও আমার না একেবারে অকূলে ভেসে যায়।”

“না না, ভেসে যাবে কেন মেজবৌ? বাপ-খুড়ো, মা-জ্যাঠাই কি ভিন্ন? তা যদি হবে, আমরাই বা কেন ওর জন্যে ভেবে ভেবে আহার-নিদ্রে ত্যাগ করব বল? আমার জ্ঞানদাও যা, মাধুরীও সেই পদার্থ। দে না মা জ্ঞানদা, তোর মায়ের চোখ দুটো মুছিয়ে। মাথায় একটু পাখা কর্‌ না বোসো।”—বলিয়া একাধারে আশা ও ভরসা দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আজ বহুদিনের পর দুর্গার মৃত্যুমলিন মুখের উপর একটা আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল। মেয়ের হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া, নিজের শীর্ণ হাতখানি তাহার মাথায়, মুখে বুলাইয়া দিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “এইখানে, ওরে একটু ঘুমোদিকি মা।” বলিয়া জোর করিয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, “এমন পোড়া-কপালীর পেটে তুই জন্মেছিলি মা, যে, এই বয়সেই খেটে-খেটে আর ভেবে-ভেবে শরীর পাত করলি। যদি জন্মই নিয়েছিলি, ছেলে হয়ে কেন জন্মাস্‌নি মা!”

অনেক দিনের পর জননীর আদর পাইয়া মেয়ের দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই বোধ করি একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ মায়ের ঠেলা খাইয়া জ্ঞানদা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। “ওমা, ওঠ্‌ ওঠ্‌; বেলা যে আর নেই। আমার টিনের বাক্সটার মধ্যে বোধ করি একটুখানি সাবান আছে—যা’ দিকি মা, চট্‌ কোরে পুকুর থেকে মুখ হাত পা একটু ধুয়ে আয়। না বাছা, ঐ তোর বড় দোষ—তুই কথা শুনতে চাস্‌নে। বল্‌চি, যা শীগ্‌গীর।”

মাতার নির্দ্দেশমত জ্ঞানদা টিনের বাক্স খুলিয়া বহুদিন পূর্ব্বের এক-টুকরা সাবান বাহির করিয়া, গামছা লইয়া স্নান-মুখে পুকুরে চলিয়া গেল। মা বলিতে লাগিলেন—“বেশ কোরে একটু রোগড়ে-রোগড়ে ধুস্‌ মা, তাচ্ছিল্য করিস্‌নে। চট্‌ কোরে আসিস্‌ মা,—বলা যায় না ত, কখন্‌ তাঁরা সব এসে পড়বেন।”

পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানদা অবাক্‌ হইয়া গেল। মরণাপন্ন মা ইতিমধ্যে কখন্‌ বিছানা হইতে উঠিয়া, কেমন করিয়া কি জানি তোরঙ্গর কাছে গিয়া, সেটা খুলিয়াছেন এবং নিজের একখানি ছোপানো কাপড় এবং জামা বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। মেয়ে আসিতেই বলিলেন, “ভুল হয়ে গেল রে, মাথাটা বেঁধে দিলাম না, গা ধুয়ে এলি—তা হোক্‌, বোস্‌। চট্‌ করে চুলটা বেঁধে দিই।”

মেয়ে কাতর হইয়া বলিল, “না মা, তোমার পায়ে পড়ি; তুমি পারবে না মা, শোওগে; আমি আপনি বেঁধে নিচ্চি। দোহাই মা তোমার।” মেয়ের কথা শুনিয়া আজ মা একটু-খানি হাসিলেন; ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, “হুঁঃ—পারব না! জানিস্‌ গেনি, এই মেজ-বোয়ের হাতে চুল বাঁধবার জন্য পাড়ার মেয়ে ঝেঁটিয়ে আস্‌ত। আমি পারব না চুল বাঁধতে! নে, আয়, দেরি করিস্‌নে।” বলিয়া জোর করিয়া কাছে বসাইয়া সযত্নে সস্নেহে স্বহস্তে পরিপাটি করিয়া, বোধ করি এই তাঁহার শেষ সাজ, সাজাইয়া দিলেন। পায়ে আল্‌তা, কপালে খয়েরের টিপ, ঠোঁটে রংটুকু পর্য্যন্ত দিতে ভুলিলেন না। মুখখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি চুমা খাইয়া হঠাৎ মনে হইল,—কে বলে মেয়ে আমার দেখ্‌তে ভাল নয়! একটু কালো; কিন্তু কার মেয়ের এমন মুখ, এমন চোখ দুটি!

এটা তিনি ধরিতে পারিলেন না যে, কার মেয়ে মাকে এমন ভালবাসে? কার এমন মা-অন্ত প্রাণ? কোন্‌ মেয়ের হৃদয়ের এত বড় ভক্তি ও ভালবাসার দীপ্তি এমন করিয়া তাহার সমস্ত কুরূপ আবৃত করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে? এ সকল তিনি টের পাইলেন না বটে, কিন্তু মেয়ের গায়ে একখানি অলঙ্কারও পরাইতে পারেন নাই বলিয়া ইতি-পূর্ব্বে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, কেমন করিয়া কখন্‌ যেন তাহা মুছিয়া গেল।

তখনও অনেক বেলা ছিল, কিন্তু কোনমতেই আর তিনি শুইতে চাহিলেন না। সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া মেয়েকে সুমুখে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

গেঁনিকে দেখিতে আসিবে শুনিয়া পাশের বাড়ীর নীল-কণ্ঠের পরিবার আসিলেন, তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি আসিলেন।

যথাসময়ে মেয়ের ডাক্ পড়িলে, তাঁহারা গিয়া পাশের ঘর হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের অত্যন্ত কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে থাকিলে, বৃদ্ধ পিতা যেমন করিয়া সময় কাটান, তেমনি করিয়া দুর্গা একাকী তাঁহার মলিন শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন। পাত্র এবং ঘটক জলযোগাদি সমাধা করিয়া বাহির হইলেন—তিনি টের পাইলেন; তাঁহাদের ঠিকা-গাড়ি ছড়্-ছড়্, ঘড়্-ঘড়্ করিয়া চলিয়া গেল—তাহাও শুনিতে পাইলেন। তার পরে তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি ঘরে ঢুকিয়া একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জানাইলেন, "নাঃ—মেয়ে পছন্দ হোলো না।"

দুর্গা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন, একটা প্রশ্নও করিলেন না।

ঠাকুরঝি করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ঐ হাড় গোড় বার করা মেয়ে কি কারু পছন্দ হয়? বলি মেজবৌ, গৌনিকে দুদিন খাওয়াও-মাখাও—একটু তাউত করো। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌চি ত? এই মেয়ে কি এম্‌নিই ছিল? জ্বরে-জ্বরে বাছার হাড়-পাঁজরা বার করে ফেলেচে—একটা বছর সবুর কোরে যত্ন-আত্মী করে দেখ দিকি, ঐ মেয়ে আবার কেমন হয়? তখন্ পড়্‌তে পাবে না!"

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু কই সে সুযোগ? টাকা কই? একটা বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জর ঢাকা দিবার সময় কোথায়? মেয়ে যে পনেরোয় পড়িল! পিতৃপুরুষেরা প্রতিদিন যে নরকের গভীরতর কূপে নিমগ্ন হইতেছেন! গ্রামের লোক জাতি মারিবে বলিয়া যে অহর্নিশি চোখ রাঙাইয়া শাসাইতেছে! প্রতীক্ষা করিবার আর তিলার্দ্ধ অবসর নাই—বিদায় কর, বিদায় কর। যেমন করিয়া হোক্, যাহার হাতে হোক্—কাল তাহার বৈধব্য অনিবার্য্য জানিয়া হোক, অসহ্য দুঃখ ও চিরদারিদ্র্য চোখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়া হোক্, তাহাকে সঁপিয়া দিয়া, জাতিধর্ম্ম—পিতৃপুরুষের প্রাণ রক্ষা কর।

তখনো ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয় নাই। সেই অন্ধকারে লুকাইয়া জ্ঞানদা তাহার লাঞ্ছিত সাজ-সজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। দুর্গা মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন। খানিক পরে হতভাগ্য কঠিন অপরাধীর মত নীরবে পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল। জননী জানিতে পারিয়াও সাড়া-শব্দ দিলেন না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া অভুক্ত পীড়িত কন্যা শ্রান্তির ভারে সেই খানেই ঢলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত অনুভব করিয়াও মায়ের প্রাণে আজ লেশমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না।

(১০)

দুর্গার এমন অবস্থা যে, কখন্ কি ঘটে, বলা যায় না। তাহার উপর, যখন্ তিনি পাড়ার সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী প্রবীণাদের মুখে শুনিলেন, তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃ-পুরুষদিগেরই দিন-দিন অধোগতি করিতেছে, তাহা নহে,—তাঁহার নিজেরও মরণকালে সে কোন কাজেই আসিবে না,—তাঁহার হাতের জল এবং আগুন উভয়ই অস্পৃশ্য—শাস্ত্র শুনিয়া এই আসন্নপরলোকযাত্রীর পাংশু মুখ কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া রহিল। বহুদিন ধরিয়া অবিশ্রাম ঘা খাইয়া-খাইয়া তাঁহার স্নেহের স্থানটা কি একপ্রকার যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। যে মেয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না, সেই মেয়েকেই দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেছিলেন। আজ এই সংবাদ শোনার পর, তাঁহার পরকালের কাঁটা এই মেয়েটার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত চিত্ত একেবারে পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেল; মায়া-মমতার আর লেশমাত্র তথায় অবশিষ্ট রহিল না।

অনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, শুন্‌চি নাকি ও পাড়ার ঐ যে জগদীশ ভট্‌চায্যি, না কে, সে বুঝি আবার বিয়ে কোরবে। আমার মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌বে না, ঠাকুরপো?"

অনাথ কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, "না না, জগদীশ ভট্‌চায্যি আবার বিয়ে করবে কি! কে তোমার সঙ্গে তামাসা করেচে, বৌ'ঠান।"

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আর তামাসা কোরবে কে, ঠাকুরপো? তিনি পুরুষমানুষ, ব্যাটাছেলে, তাঁদের আবার বয়সের খোঁজ কে করে? না, না, ও-বয়সে অনেকে বিয়ে করে, ঠাকুরপো। আমি মিনতি কর্‌চি, একবার গিয়ে তাঁর সন্ধান নাও। বেঁচে থেকে ত কিছুই পেলাম না, মরণের পরে একটু আগুনও কি পাবো না!"

এ বিষয়ে অনাথের নিজের গরজও কম নয়। সে সেইদিনই খোঁজ্ লইতে গেল, এবং কথাটা সত্য শুনিয়া খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শুধু সত্য বলিয়াই নয়—ইহারই মধ্যে খবর পাইয়া চারিপাঁচজন কন্যাভার-গ্রস্ত পিতা আসিয়া তাহাকে সাধাসাধি করিয়া গিয়াছে বলিয়া।

এত কষ্টের বিয়ে, তবুও যে শুনিল,—জগদীশকে কন্যা-দান করা হইবে—সে-ই ছি ছি করিল। কিন্তু জননীর তাহাতে মন গলিল না। আবার সেই জগদীশ বলিয়া পাঠাইল, সে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবে। এ পোড়া দেশে তাহারও সখ আছে, এবং পাঁচটি দেখিয়া-শুনিয়াও বিবাহ করিবার সুযোগ আছে। গ্রীষ্মের শুষ্ক তৃণ একটা মেঘের বারিপাতেই যেমন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই এতটুকুমাত্র আশার ইঙ্গিতে দুর্গার মরা আশা চক্ষের পলকে মাথা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। তিনি অনাথের হাতটা ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, এইটুকু ছোট ভাইয়ের কাজ করো ভাই,—হতভাগীর হাতের আগুনটুকু যেন শেষ সময়ে পাই। সাম্নের পাঁচুইটা যেন আর কোনমতেই ফস্কে না যায়। তুমি বোলে এসো ভাই, আজকেই যেন তাঁরা মেয়ে দেখে কথাবার্ত্তা পাকা করে যান।"

বিয়ে না হইলে মায়ের শেষ কাজটাও তাহাকে দিয়া করানো হইবে না—শাস্ত্রে নিষেধ আছে—এ কথা শুনিয়া জ্ঞানদা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করিল। তাহার বুকের মধ্যে অবিশ্রাম যেন চিতার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

অপরাহ্ণবেলায় একাকী রান্নাঘরে বসিয়া সে মায়ের জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল;—রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য আর-একবার তাহার ডাক পড়িল। স্বর্ণ নিজে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওলো গেঁনি, ওটা নামিয়ে রেখে শীগ্‌গীর আয়—শীগ্‌গীর আয়—তারা দেখ্‌তে এসেচে। শুধু একখানা কাপড় পোরে আয়, তারা এম্‌নি দেখে যাবে।" বলিয়া তিনি তেম্‌নি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। অনাথ তখনও আফিস হইতে ফিরে নাই, সুতরাং আদর-অভ্যর্থনা করিবার ভার তাঁরই উপরে। দেখিতে আসিয়া-ছিল পাত্র নিজে এবং তাহার এক দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয়। ছেলে-ছোকরাদের পছন্দ আছে বলিয়া জগদীশ বুদ্ধি করিয়া তাহার এই ভাগিনেয়টিকে সঙ্গে আনিয়াছিল। ইহারই পরামর্শ মত, মেয়ে যেমন আছে তেমনি দেখাইবার আদেশ হইয়াছিল,—কারণ, সাজাইয়া দেখাইলে চোখের ভুল হইতে পারে।

ছেলেটি ছয়টার ট্রেণে কলিকাতায় যাইবে—সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। স্বর্ণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া গলা চাপিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্ঞানদা আর আসে না। শুদ্ধমাত্র একখানা কাপড় পরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহার অনেক বেশি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ঝি গিয়া যখন তাহাকে টানিয়া আনিল, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই জ্যাঠাইমা ক্রোধে আত্ম-হারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "খোল্ এ সব। কে বল্‌লে তোকে এমন কোরে সেজেগুজে আস্‌তে? যা শীগ্‌গীর খুলে আয়—"

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, হঠাৎ এই চেঁচামেচি শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন। ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "তবে এম্‌নিই নিয়ে আসুন, আমার আর দেরি করবার জো নেই।"

ঝি যখন তাহাকে আনিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইল, তখন কন্যার অপরূপ সাজসজ্জা দেখিয়া ছেলেটি বহুক্লেশে হাসি দমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং "কাল খবর দেব" বলিয়া মাতুলকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জলযোগের আয়োজন ছিল, কিন্তু ট্রেণ মিস্ করিবার ভয়ে তাহা স্পর্শ করিবারও তাঁহাদের অবকাশ ঘটিল না।

কাল খবর দিবার অর্থ যে কি, তাহা সবাই বুঝিল। জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া, গালি পাড়িয়া, চক্ষের পলকে সমস্ত পাড়াটা মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন। মেজবৌয়ের অবস্থা ভাল নয়। অনর্থ আশঙ্কা করিয়া পাশের বাড়ীর দুই চারিজন ছুটিয়া আসিয়া পড়িল, এবং ঠিক সেই সময়েই অকস্মাৎ কোথা হইতে অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও ছ'টার ট্রেণে কলিকাতায় যাইতেছিল, এবং পথের মধ্যে চীৎকার শুনিয়া, ঠিক এই আশঙ্কা করিয়াই বাড়ী ঢুকিয়াছিল। অতুলকে দেখিতে পাইয়া স্বর্ণর রোষ শতগুণ এবং ক্ষোভ সহস্রগুণ হইয়া উঠিল। শীর্ণ, সঙ্কুচিত, ভয়ে মৃতকল্প দুর্ভাগা মেয়েটার ঘাড়টা জোর করিয়া অতুলের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"ত্যাখ অতুল, একবার চেয়ে ত্যাখ্! হতভাগী, শতেকথাকী, বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে ত্যাখ্!"

বাস্তবিক, তাহার মুখের পানে চাহিলে হাসি সাম্‌লানো যায় না। তাহার ঠোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ দাড়িতে, অন্ধকার কোণে স্বহস্তে টিপ পরিতে গিয়া সেটা কপালের মাঝখানে লাগিয়াছে। রুক্ষ চুল বোধ করি তাড়াতাড়ি এক থাব্‌লা তেল দিয়া বাঁধিতে গিয়াছিল, তখনো দুই রগ গড়াইয়া তেল ঝরিতেছে।

দুই-একটা মেয়ে পাশ হইতে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজনের কোলে ছেলে ছিল—সে কহিল, "গিঁনিপিতি থঙ থেজেচে। পিতি, এম্‌নি কোলে দিব বার কলো।" বলিয়া সে হাঁ করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল। আর একবার সবাই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"মুখ্‌পোড়া ছেলে!" বলিয়া তাহার মাও হাসিয়া ছেলের গালে একটা ঠোনা মারিলেন। কিন্তু অতুলের বুকের ভিতরটা কে যেন তপ্ত শেল দিয়া বিঁধিয়া দিল। অনেকদিন হইয়া গেছে, এমন দিবালোকে, এত স্পষ্ট করিয়া সে জ্ঞানদার মুখের পানে চাহে নাই। শুধু পরের মুখে শুনিয়াছিল, রোগে বিশ্রী হইয়া গেছে। কিন্তু সে বিশ্রী যে এই বিশ্রী, তাহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। একদিন সাংঘাতিক রোগে নিজে যখন সে মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকেই সে ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নয়, কৃতজ্ঞতার মমতা নয়,—অকপটে, সমস্ত প্রাণ ঢালিয়াই ভালবাসিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ যখন চোখে পড়িল, সেই মুখখানার উপরেই যম তাঁহার ডিক্রীজারি করিয়া শেষ নোটীশ আঁটিয়া দিয়া গেছেন, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হইল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বর্ণর উচ্চকণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। "অ্যাঁ, থান্‌কির বেহদ্দ কর্‌লি লা? একটা ঘাটের মড়া, তার মন ভুলোবার জন্যে এই সঙ সেজে এলি? কিন্তু পারলি ভুলোতে? মুখে লাথি মেরে চলে গেল যে!"

কে একজন প্রশ্ন করিল, "কে এমন ভূত সাজিয়ে দিলে, বড়বৌ? বুড়োর পছন্দ হ'ল না বুঝি?"

স্বর্ণ তাহার প্রতি চাহিয়া, তর্জ্জন করিয়া, কহিলেন, "নিজে সেজেচেন—আবার কে সাজাবে? মা' তো অজ্ঞান, অচৈতন্য। বলে দিলাম, শুধু একখানি কাপড় পরে আয়। তা' পছন্দ হল না। ভাব্‌লেন, সেজেগুজে না গেলে যদি বুড়োর মনে না ধরে? আর সাজের মধ্যে ত ঐ ছোপানো কাপড়খানি, আর অতুলের দেওয়া এই দু'গাছি চুড়ি। তা' দিনের মধ্যে দশবার খুলে তুলে রাখ্‌চে, দশবার হাতে পরচে। কালামুখীর ও-চুড়ি হাতে দিয়ে বার হতে লজ্জাও করে না? বেরো সুমুখ থেকে—দূর হয়ে যা।" বেহায়া মেয়েটার এই নির্লজ্জ চরিত্রের সবাই সমালোচনা করিয়া, ছি ছি করিয়া চলিয়া গেল; শুধু যাঁহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, সেই অন্তর্যামীর চোখ দিয়া হয় ত এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। জ্ঞানদা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে পরের সমক্ষে কখনো কাঁদিত না। আজ কিন্তু অতুলের সম্মুখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অথচ, একটা কথারও কৈফিয়ৎ দিল না, কাহারো পানে চাহিয়া দেখিল না—নীরবে চোখ মুছিতে-মুছিতে চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাইবার আর গাড়ী ছিল না বলিয়া অতুল সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া গেল। পথে সব কথা ছাপাইয়া ছোটমাসির সেই শেষ কথাটাই বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন বাপের-বাড়ী যাবার সময় অতুলকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "অতুল, হীরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তার মনস্তাপের আর অবধি থাকে না বাবা!" সেদিন কথাটা ভালো বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজ তাহার যেন নিঃসংশয়ে মনে হইল, কথাটা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল।

তখনো ভোর হয় নাই, অনাথ ডাকিতে আসিলেন,—মেজবৌকে দাহ করিতে হইবে। 'চলুন যাই' বলিয়া অতুল বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, দেড় বৎসর পূর্ব্বে তুলসীমূলে মৃত পিতার পা-দুটি কোলে করিয়া যেমন বসিয়া ছিল, আজও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের পা-দুটি কোলে লইয়া জ্ঞানদা বসিয়া আছে। শুধু একটিবার ছাড়া জীবনে কেহ কখনো তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই—সেই যখন সে অতুলেরই পায়ের উপর পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়াছিল। সুতরাং, তাহার এই নিবিড় নীরবতায় কেহ কিছুই মনে করিল না। সেদিকে কাহারো দৃষ্টিই ছিল না, সৎকারের উদ্যোগ-আয়োজনেই পাড়ার লোক ব্যস্ত।

যথাসময়ে তাহারা মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাত্রা

করিল। সকলের পিছনে জ্ঞানদাও গেল। দুঃখীর মেয়ে বলিয়া পাড়ার কোন মেয়েই তাহার সঙ্গে গেল না ; যাবার কথাও কাহারো মনে হইল না! বর্ষার ভরা গঙ্গা শ্মশানের ঠিক নীচে দিয়াই খরবেগে বহিতেছিল। মাঁয়ের শেষ কাজ মেয়ে নীরবে সাঙ্গ করিল। চিতা যখন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে পুরুষের ভিড় হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া একেবারে জলের ধারে গিয়া বসিল। কেহই নিষেধ করিল না ; কারণ, নিষেধ করিবার কিছু ছিল না। বরঞ্চ, এই গভীর শোকের দৃশ্যটাকে চোখের আড়াল করিতেই সে যে নামিয়া গেল, তাহা নিশ্চয় অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের সমবেদনায় অনেকেই 'আহা'! বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল।

এই চিরদিন শান্ত, পরম সহিষ্ণু মেয়েটি উৎকট কিছু যে করিয়া বসিতে পারে, তাহা কাহারো মনেও উদয় হইল না। অতুলেরও না। তথাপি তাহাকে খরস্রোতের একান্ত সন্নিকটে গিয়া বসিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল, নিষেধ করে ; একবার ভাবিল, কাছে গিয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু লজ্জায়, কুণ্ঠায় কোনটাই পারিল না।

অগ্ন্যুত্তাপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বসিয়াছিল, অতুলও গিয়া সেখানে বসিল। সম্মুখের প্রজ্বলিত চিতার পানে চাহিয়া সহসা তাহার মনের মধ্যে সেই চিরদিনের পুরানো প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—কাল যে ছিল, আজ সে নাই ; আজিও যে ছিল, তাহারও ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে-ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে। আর তাহাকে চিনাই যায় না ; অথচ, ওই দেহটাকেই আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল! কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে, কি তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

সহসা তাহার নিজেরই বিগত জীবন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বছর তিনেক পূর্ব্বে সেও ত মরিতে বসিয়াছিল! কিন্তু মরে নাই। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের দৃষ্টি চিতার পিঙ্গল-ধূসর ধূমের তরঙ্গিত যবনিকা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মনে পড়িল, সেদিন মরিতে যে দেয় নাই—সে ওই। ওই যে জাহ্নবীর ঘোলা জলে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া মূর্ত্তিমতী শোকের মত বসিয়া আছে,—শুধু রুক্ষ কেশ ও মলিন অঞ্চল যাহার বাতাসে দুলিতেছে!

তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে-মনে বলিল, ছাই রূপ! রূপেরই যদি এত দাম, তবে, তিন বৎসর পূর্ব্বে সে নিজেই ত দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। সেদিন পরমাত্মীয়েরাও ত ঘৃণায় তাহার পানে চাহিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া যে সময় কাটিতেছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। কখন যে চিতা নিভিতেছিল, তাহাও সে দেখে নাই। সর্ব্বক্ষণ তাহার সমস্ত দৃষ্টি শুধু ওই নিশ্চল মূর্ত্তিটার প্রতিই নিবদ্ধ হইয়াছিল।

অনাথ কহিলেন, "অতুল, আর বোসে কেন? এসো শেষ কাজটা শেষ করে দিই।"

"চলুন" বলিয়া অতুল অপরাহ্ণ বেলায় স্বপ্ন ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সূর্য্য ঢলিয়া পড়িতেছিল। স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, সবাই গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলে, ঘাটের উপরেই দুগাছি ভাঙা চুড়ির পানে চাহিয়া অতুল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ সেই তাহারই-দেওয়া অতি তুচ্ছ মহামূল্য অলঙ্কার। শত লাঞ্ছনা, সহস্র ধিক্কারেও যে দুগাছির মায়া জ্ঞানদা কাটাইতে পারে নাই, আজ নিজের হাতে ভাঙিয়া রাখিয়া তাহার কৈফিয়ৎ দিয়া গেছে। যখন আর সকলে অগ্রসর হইয়া গেছে, তখন সেই দু'গাছি অতুল সস্নেহে, সযত্নে কুড়াইয়া লইল। অখণ্ড অবস্থায় যাহার কোন মর্য্যাদাই সে দেয় নাই, আজ তাহা ভগ্ন, তুচ্ছ, কাচ-খণ্ড হইয়াও তাহার কাছে একেবারে অমূল্য হইয়া উঠিল। সে মনে-মনে কহিল—'ভুল সকলেরই হয়, জ্ঞানদা, কিন্তু জোর করে ভাঙলেই ভাঙে না। আমিও জোর করে পারিনি, তুমিও পারবে না।'

ধর্ম্মে মতি

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

ভক্তিভাজন জ্যেঠা মহাশয়ের সহিত যখনই দেখা হইত, তখনই তিনি বলিতেন—"আর কেন, বাপাজী; এখন বয়স হইয়াছে,—শাস্ত্রপাঠ, তীর্থদর্শন, সদাচারপালন, পূজা-অর্চ্চা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে মন দাও, পরকালের ভাবনা ভাব। 'চতুর্থে কিং করিষ্যতি' * শ্লোকটা মনে আছে ত?" পূজনীয় জ্যেঠা মহাশয় হিতোপদেশের বৃদ্ধব্যাঘ্রের ন্যায়—[বিষ্ণুশর্ম্মার এই বৃদ্ধব্যাঘ্রই কি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের original?] 'প্রাগেব যৌবন-দশায়াং' বহু অনাচার-অত্যাচার করিয়া গলিতনখদন্ত অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে 'গঙ্গাতীরে নিত্যস্নায়ী নিরামিষাশী চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচারী' তপস্বী হইয়াছেন। বয়সের দোষে অগ্নির জোর কমিয়াছে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিস্ প্রভৃতি ডকারাদি রোগ খুব চাগিয়াছে, সাগু বার্লি খাইলেও চোঁয়া ঢেকুর উঠে; সুতরাং ধর্ম্ম ভাবিয়া নিষিদ্ধ মাংস ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপচার ত্যাগ করিয়া এক্ষণে এমন সদাচারপরায়ণ হইয়াছেন যে, কম্বলের আসন নিত্য কাচেন (কি ভাগ্যি লোম বাছেন না) এবং গঙ্গাজলও তিনবার ধুইয়া তবে খান!

পক্ষান্তরে, তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের দন্তপংক্তিদ্বয় অদ্যাপি অব্যাহত আছে; তবে তিন বৎসর পূর্ব্বে ল্যাংড়া আম অসম্ভব সস্তা হওয়াতে, আঁঠীর সঙ্ঘর্ষে একটি দন্ত ঈষৎ নড়িতেছে। ইহাতে যদি কেহ বলেন, দেহ-ইমারতের বনিয়াদ টলিয়াছে, তবে নাচার। ফলতঃ, যে দশকে † বাঙ্গালীর বল-বুদ্ধি-ভরসা ফরশা হইয়া যায়, সেই দশক উত্তীর্ণ হইয়া, যে দশকে সাধারণতঃ চক্ষুর জ্যোতিঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সেই দশকে পৌছিয়া আমার বয়স থমকিয়া আছে; যে দশকে বনবাসের ব্যবস্থা আছে, সে দশকে উপস্থিত হয় নাই। এখন পাঠকবর্গ বিচার করুন, আমার বয়সে ভাটা পড়িয়াছে কি না।

যাহা হউক, 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' কলেজের কেতাবে পড়া এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া পূজ্যপাদ জ্যেঠা মহাশয়ের উপদেশ-পালনে কৃতনিশ্চয় হইলাম। ভাবিলাম, এই বেলা দিন থাকিতে পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় করা, অথবা ধন-বিজ্ঞানের ভাষায়,—[বিংশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞানই নাকি ভারতের দুর্দ্দশা-নিবারণের একমাত্র পথ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়]—বৈতরণীর খেয়ার কড়ি সংগ্রহ করা সুবিবেচনার কার্য্য।

আর কালবিলম্ব না করিয়া, বাজে নভেল পড়া একদম ছাড়িয়া, শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলাম। 'বঙ্গবাসী'র সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের কল্যাণে কার্য্য অতি সহজ হইল। মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, হাতীমার্কা সালসার বিজ্ঞাপন—কিছুই ছাড়িলাম না। শাস্ত্রপাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম না, শাস্ত্রের উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতেও লাগিলাম। কোথাও-কোথাও নব অনুরাগে শাস্ত্রের উপদেশের এক কাঠি উপরেও উঠিলাম। যথা, শাস্ত্র বলিয়াছেন—আত্মানং রথিনং বিদ্ধি; আমি নিজেকে রথী কেন, মহারথী মনে করিতে লাগিলাম। 'সোঽহং'-জ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ হইল, জগতে আমি ছাড়া আর কিছুই নাই, জগৎ আমাতেই রহিয়াছে, এই তত্ত্ব—ফরাশী রাজার 'I am the State'এর মতই—আয়ত্ত করিলাম।

যেখানে খট্‌কা বাঁধিত, সেখানে ইংরেজীর সহিত মিলাইয়া লইতাম, সকল খট্‌কা দূর হইত। [ইংরেজীই আমাদের কষ্টিপাথর; ইংরেজীর সঙ্গে না মিলাইলে ভরসা পাওয়া যায় না,—জ্ঞান খাঁটি কি ঝুঁটা; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির শাস্ত্র ব্যাখ্যায় এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।] যখন শাস্ত্রে পড়িলাম, দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ, অমনই ইংরেজীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, ইংরেজীতেও রহিয়াছে—Ye are the temple

---

* প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং। তৃতীয়ে নার্জ্জিতঃ পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

† বল বুদ্ধি ভরসা। তিন দশকে ফরশা ॥

of the Lord; বুঝিলাম এটি খাঁটি সত্য। আবার শাস্ত্র-বচন 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' শুধু যে—আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে সর্ব্ব কর্ম্ম—এই চলিত বাঙ্গালা প্রবাদ-বাক্যের সহিত এক তাহা নহে, ইহা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ও গ্রীক জাতির অনুসৃত mens sana in corporae sano (Sound mind in sound body) এই প্রবচনের সহিতও অভিন্ন, সুতরাং অভ্রান্ত। দেহকে হেয় অবজ্ঞেয় মনে করা যে বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মৌলিক গবেষণার § সাহায্যে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

এই জন্য 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্' জানিয়াও দুর্লভ পরান্ন পাইয়া শরীরের উপর দয়া করি নাই; প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যম্, শ্বঃকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যম্, গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, প্রভৃতি নীতিবাক্য অবহেলা করি নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীর-পোষণও যে ধর্ম্মসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকাতে ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। ইহার জন্য 'এক দিন ঘি-রুটি, দশ দিন দাঁতকপাটি' বহুবার ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দমিয়া যাই নাই; কেন না, মতান্তরে, শরীর-নিগ্রহই নিঃশ্রেয়স-লাভের সোপান—ইহাও জানি। অতএব গুরুভোজনের পর সংযম উপবাসাদি অনুষ্ঠান সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ব্রাহ্মণ-জাতির ইতিহাসে উপবাসের পর যোড়শোপচারে পারণ এবং ভোজের পর লঙ্ঘন, বিধবার জীবনে দশমীর রাত্রির জলযোগের পর নিরম্বু একাদশী এবং নিরম্বু একাদশীর পর দ্বাদশীর প্রাভাতিক জলযোগের ন্যায়

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

যাহা হউক, শাস্ত্রার্থবোধে ও শাস্ত্রের নিদেশ-পালনেই আমার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি পর্য্যবসিত হইল না। শুভানুধ্যায়ী জ্যেঠা মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় পুণ্য-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর প্রবলতর হইতে লাগিল। অবশেষে তীর্থযাত্রা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদাৎ তীর্থদর্শন, পূজা অর্চ্চা প্রভৃতিকে ঘোরতর কুসংস্কার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। কথায়-কথায় যৌবনের প্রিয় কবির বাক্য উদ্ধৃত করিতাম:—'জপতপ আর দেব-আরাধনা, পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা, এসকলে এবে কিছুই হবে না।' ইংরেজী মেজাজের বশবর্ত্তী হইয়া কোন তীর্থক্ষেত্রে কখন পা দিই নাই। লম্বা ছুটি হইলে মধুপুর-শিমুলতলা বা পচম্বা-ঘাটশিলায় বায়ুসেবন করিয়াছি, দার্জ্জিলিং-শিমলার শৈত্যাবাপে মাথা ঠাণ্ডা করিয়াছি, কিন্তু গয়া-কাশী প্রয়াগ হরিদ্বার ত দূরের কথা, বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর, এমন কি, কলিকাতার কাণের কাছে কালীঘাট পর্য্যন্ত কখন দর্শন করি নাই। এত কথায় কাজ কি, নদীয়াজেলার লোক হইয়াও কখন নবদ্বীপমুখো হই নাই। মহাপ্রসাদের প্রয়োজন হইলে কসাই-কালীর শরণ লইয়াছি, মালপূয়ার প্রয়োজন হইলে বঙ্গীয় মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে ছুটিয়াছি, তথাপি শাক্তের পীঠে বা বৈষ্ণবের পাটে ধন্না দিই নাই।

কিন্তু এবার গুরুকৃপায় আমার সুবুদ্ধি হইল। 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং' হইল, তীর্থ-পর্য্যটনে মতি হইল, স্বর্গের সোপান-প্রণয়নের প্রবৃত্তি জাগরিত হইল, গুরুর গুরু জ্যেঠা মহাশয়ের উপদেশ-বীজ ফলিল। 'শনৈঃ পন্থাঃ' এই বাক্য স্মরণ করিয়া প্রথমেই পথখরচার পাঁচ আনা ও পূজার পাঁচ পয়সা পুঁজি লইয়া ট্রামযোগে কালীঘাটে প্রয়াণ করিলাম। নিকটে হইলেও কালীঘাট মাহাত্ম্যে কম নহে। ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম, সুতরাং শাক্তের ভক্তিকেন্দ্র। আবার প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রকট প্রমাণে কলিকাতার উপকণ্ঠ-স্থিত এই স্থানই প্রাচীন কপিলক্ষেত্র। পরন্তু এই কালীঘাট বা কালীঘাটা হইতেই ক্যালকাট্টা বা কলিকাতা নামের উৎপত্তি। যাক্, প্রত্নতত্ত্বের তর্ক না তুলিয়া এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে মাকে দর্শন করিলাম এবং পাঁচ পয়সার পূজা দিলাম। সামান্য হইলেও ইহা ভক্তির অর্ঘ্য, দেবী অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুর-প্রদত্ত ক্ষুদও সাদরে ভোজন করিয়াছিলেন। মন্দিরের বাহিরে রক্তমাংসনির্ম্মিতা সধবা ও কুমারীর ঝাঁক দেখিয়া দেবীর সঙ্গিনী যোগিনী-ডাকিনীদিগের কথা মনে হইল। মন্দিরের দেবীদর্শনে নয়নে ভক্তি-অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবীর প্রসাদ-দর্শনে জিহ্বায়

§ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এমএ সঙ্কলিত 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

জলসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হাতে ত ট্র্যামভাড়ার পয়সা কয়টি সম্বল। অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মার তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি, উভয়ই ইষ্টবস্তু—ইহা শাস্ত্রপাঠে আমার মজ্জাগত হইয়াছিল। তীর্থস্থানে গিয়াও দেবীভক্তির আতিশয্যে আসল কথা ভুলি নাই। কিন্তু উপায় কি? শেষে কোকেনখোর দোকানদারের কাছে চাদরখানি বাঁধা দিয়া * কষ্টেসৃষ্টে চারি আনা পয়সা সংগ্রহ করিলাম এবং এক ভাগা মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় যে, এত আয়াসলব্ধ মহাপ্রসাদ গৃহিণীর বহু চেষ্টায়ও তেমন সুসিদ্ধ হইল না। দেবীর প্রসাদ বলিয়া পিঁয়াজ রশুন না দেওয়াতেই এই অনর্থ ঘটিল, কি কলির প্রকোপে তীর্থমাহাত্ম্য লোপ পাইতে বসিয়াছে, সেইজন্যই পবিত্র মহাপ্রসাদে এই দোষ স্পর্শ করিল,—ঠিক ঠাহরাইতে পারিলাম না। তীর্থদর্শনে প্রথম উদ্যমের ফল এরূপ হওয়াতে মনটা কিঞ্চিৎ কাঁচিয়া গেল।

যাহা হউক, গুরুকৃপায় (ও পরমারাধ্য জ্যেঠা মহাশয়ের প্ররোচনায়) যখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছে, তখন আর সে স্থির-নিশ্চয়া মতির পথে বাধা দিলাম না। কালীঘাটে মাকে দর্শন করিয়া তারকেশ্বরে বাবাকে দর্শন করিতে গেলাম। এবার আর নিতান্ত সস্তায় ট্র্যামগাড়ীতে চলিল না, কিঞ্চিৎ রেলভাড়া লাগিল। ভক্তির অনুশীলনেই ভক্তির বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এবার পুণ্যার্থে কিঞ্চিৎ বেশী খরচ করিতে উৎসাহ হইল। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, শেষ পর্য্যন্ত খরচা পোষাইল না। বাবাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম, কিন্তু বাবার প্রসাদ যাহা মিলিল, তাহা নিতান্ত জলপানী 'খাবার'। বাবার উপর বেশ একটু রাগ হইল, আর লোকে যে মোহান্তের নিন্দা করে, তাহাও অসঙ্গত বোধ হইল না।

যখন বাবার উপর রাগ করিয়া ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইতে লাগিলাম, তখন হিতকামী পুরোহিত ঠাকুর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "বাবা তারকনাথের দর্শনে যদি তৃপ্তি না হইয়া থাকে, বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন কর, মনের ক্ষোভ ঘুচিবে।" "গুরুবাক্য অবহেলা করিতে নাই, শাস্ত্রালোচনায় এ শিক্ষা হইয়াছিল, আর পুরোহিত ঠাকুরও এ বিষয়ে ভুয়োদর্শী; অতএব তাঁহার আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিলাম ও 'শুভস্য শীঘ্রং' ভাবিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক রেলভাড়া দিয়া দেবগৃহ-যাত্রা করিলাম। (পুণ্যানুষ্ঠানের একটি সুফল হাতে-হাতে পাইতেছি; ক্রমেই অর্থের প্রতি মায়া ও তজ্জনিত ব্যয়-কুণ্ঠতা কমিতেছে, তীর্থপর্য্যটনের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে মুক্তহস্ত হইতেছি। ইহাও একটা কম আধ্যাত্মিক লাভ নহে।) তথায় পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, পুরোহিত ঠাকুর বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। বাবাকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক হইল, বাবার প্রসাদী পেড়া ও অন্যান্য খাবার খাইয়া রসনা পরিতৃপ্ত হইল, আর তীর্থগুরু পাণ্ডার প্রদত্ত দধি ভোজন করিয়া দগ্ধোদর জুড়াইল। বুঝিলাম, বাবা জাগ্রৎ দেবতা বটে!

বৈদ্যনাথ-দর্শনে তৃপ্তি পাওয়াতে সিদ্ধান্ত করিলাম, পোড়া বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখো যতই অগ্রসর হইব, (মক্কার কথা অবশ্য তুলিতেছি না) ততই তীর্থমহিমা প্রণিধান করিতে পারিব। রেলগাড়ীতে ফিরিবার সময় দুই-একজন মুণ্ডিতমস্তক যাত্রীর মুখে ৺গয়াধামের গদাধরের পাদপদ্মের মাহাত্ম্য ও তথাকার পেড়ার উপাদেয়তার কথা শুনিয়া গয়ংগচ্ছ না করিয়া অবিলম্বে গয়া যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু বাটী ফিরিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত ঠাকুরের মুখে আমার আজও গয়ায় গমনের অধিকার নাই—এই নিদারুণ বাক্য-শ্রবণে বড়ই উৎসাহভঙ্গ হইল এবং নিতান্ত 'ভাগ্যহীন' বলিয়া আত্মধিক্কারও জন্মিল! ফলতঃ, মনের বাসনা মনেই রহিয়া গেল! হায়, কবি যথার্থই বলিয়াছেন, উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ (অশ্লীলতা-আশঙ্কায় শেষ দুইটা চরণ চাপিয়া গেলাম)।

পুরোহিত ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া সঙ্কল্প করিলাম, এবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া শারদীয়া পূজার ছুটিতে কাশীযাত্রা করিব, 'কার সাধ্য রোধে মোর গতি'? মহালয়ার পর দেবীপক্ষ পড়িলেই বোম্বাই মেলে রওনা হইলাম, যাত্রিক দিন দেখাইবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরের শরণ লইতে হইল না। পরম্পরায় কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছিলাম এবং তথাকার রাবড়ী, মালাই, দধিদুগ্ধ প্রভৃতির সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলাম।

* চাদর-নিবারিণী সভার সভ্যদিগের এ সুবিধাটুকু নাই। মৃচ্ছকটিকের ব্রাহ্মণ-চোরের কথাগুলি সামান্য বদলাইয়া বেশ বলা চলে—উত্তরীয়ং হি নাম মহদুপকরণদ্রব্যম্। বিশেষতোঽস্মদ্‌বিধস্য।

এইবার দর্শনস্পর্শন ও আস্বাদনের সুযোগ ঘটিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থবাসকালে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কখনও শরীর-পোষণে শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই; আত্মার তুষ্টি ও দেহের পুষ্টি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা শাস্ত্র হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলাম। সুতরাং কাশীতে গিয়া যেমন নানা দেবস্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, তেমনই বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যপেয়েরও সন্ধান লইতে ছাড়িলাম না। একদিকে শিব, কালী, বিষ্ণু, সূর্য্য, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবী-দর্শনের জন্য এবং অপরদিকে নানাখাতাই, ঘিওর, পুরী, কচুরী, নিমকী হইতে চমচম, পানতোয়া, ক্ষীরমোহন, আবার-খাবো প্রভৃতি আস্বাদনের জন্য সমান উৎসাহী হইলাম। পাঠক-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-কল্পে নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।

এইস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখি। আজকাল অনেকে কাশীধাম ও অন্যান্য তীর্থ সম্বন্ধে পুস্তক ছাপাইতেছেন। কিন্তু কোথায় কিরূপ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা কেহই লেখেন না। এ সকল আবশ্যকীয় কথা লিখিলে যে পাঠকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগরিত হয়, এ কথা তাঁহারা বুঝেন না। আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অন্য যে দোষই থাকুক, এ বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই।

কাশীধামে পৌঁছিয়াই গঙ্গাস্নানান্তে বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিলাম। দর্শনান্তে বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য প্রণিধান করিলাম; পরন্তু বিশ্বেশ্বরের গলির দধি ও তৎসন্নিহিত কচুরী-গলির 'খাবার' উদরস্থ করিয়া ধন্য হইলাম। বুঝিলাম, শিবভক্তের তিন বাবার মধ্যে বাবা বিশ্বনাথই সবার সেরা। মা অন্নপূর্ণার দর্শনে জন্ম সার্থক করিলাম, আবার তাঁহার প্রসাদ পায়সান্ন ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলাম। ইহা মহাপ্রসাদ না হইলেও ফেল্‌না নহে। দেওয়ালীর দিনে মার অন্নকূটে নানারূপ রসনা তৃপ্তিকর চর্ব্বচূষ্যলেহ্যপেয় দ্রব্যও লোভনীয় বস্তু। তদুপলক্ষে মাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া ঘৃতপক্ক খাদ্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতির স্বাদগ্রহণ করিয়া ভক্তি-রসে পরিপ্লুত হইয়াছি। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা কাশীর বিশিষ্ট দেবতা হইলেও পুরুষানুক্রমে উপাসিতা শক্তির কালীমূর্ত্তির প্রতি ভক্তি অচলাই আছে। সুতরাং ভক্তি-ভরে বাঙ্গালীটোলার 'কালীমায়িকে দর্শন করিয়াছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে কালীবাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী কালিকা-ভাণ্ডারের দধি, দুগ্ধ, মালাই, রাবড়ী ও কাঁচাগোল্লা উপভোগ করিয়া বুঝিয়াছি যে, এগুলি দেবীর সান্নিধ্যে অমৃতের স্বাদ লাভ করিয়াছে। অদূরবর্ত্তী শশীর ও তাহার ভ্রাতার দোকানের খাবারও বোধ হয় এই কারণেই পরম উপাদেয়। দুর্গাবাড়ী দূর হইলেও তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হই নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা পুরুষানুক্রমে শাক্ত; বিশেষতঃ, মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা শিবপুরীতে অন্য কুত্রাপি নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, মহাপ্রসাদ-সংগ্রহে হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হইল। দেখিলাম, এই রামছাগলের মাংস কালী-ঘাটের বুড়া পাঁঠার মাংস অপেক্ষাও দাঁতভাঙ্গা। খোট্টার দেশের ছাগ মাংসও কাঠখোট্টা রকমের। এই প্রসিদ্ধ দুর্গাদেবী আসলে শক্তিমূর্ত্তি নহেন, প্রচ্ছন্ন বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যদি এইরূপ মীমাংসা করেন, তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না; যেহেতু মহাপ্রসাদের এরূপ দুর্দ্দশা বাস্তবিকই সন্দেহজনক!

কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি তীর্থবাসকালে মাংস-ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ-স্থলে আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত পুঁথি দেখিয়া ব্যবস্থা ঠিক করি। এক্ষেত্রেও পুঁথি খুলিয়া দেখিলাম 'ন মাংসভক্ষণে দোষো'—বাস্, পুঁথি বন্ধ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলাম। সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের সুবিধাই এই যে, কথায়-কথায় তৈলবট লইয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইতে ছুটিতে হয় না, নিজেই সব দেখিয়া-শুনিয়া-বুঝিয়া-সুঝিয়া স্বয়ংসিদ্ধ হওয়া যায়।

শাক্তবংশে জন্মিলেও বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতি আমার বিরাগ-বিদ্বেষ নাই। সাধনাক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিয়াই, হৃদয় হইতে বংশগত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দূর করিয়া উদারমতাবলম্বী হইয়াছি, শ্যাম ও শ্যামার অভেদ জানিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি যে, মৎস্য-মাংস রুচিকর ও পুষ্টিকর আহার্য্য হইলেও, মধ্যে-মধ্যে মুখ বদলাইবার জন্য, ক্ষীর-সর-ছানা-ননী-মাখন মন্দ জিনিশ নহে। সুতরাং বিন্দুমাধব, আদিকেশব, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ সাগ্রহে দর্শন করিয়াছি, এবং দক্ষিণার বিনিময়ে গোপালজীর দেবভোগ্য ভোগ আহরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

অবিমুক্ত-বারাণসী কাশীধামের এমনই মাহাত্ম্য যে, শুধু

প্রসাদ কেন, মাছতরকারী ফলমূল পর্য্যন্ত এখানে সুলভ ও অপর্য্যাপ্ত। তবে পূজার ছুটীতে বহু সৌখীন তীর্থযাত্রীর ভিড়ে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হয়, এবং এ সময়ে প্রধান-প্রধান তরকারী ও ফলমূল তেমন উঠে না। ইহাতে দৈহিক ও সঙ্গে-সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির (উভয়ে নিত্যসম্বন্ধ) ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া বড়দিনের ছুটিতে বিশ্বেশ্বর-দর্শন-লোলুপ হইয়া আবার সেখানে ছুটিয়াছিলাম এবং তাঁহার কৃপায় রামনগরের মূলা, বেগুন, কপি, কড়াইসুটি, কুল, পেয়ারা ধ্বংস করিয়া সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে ও ভক্তিভরা হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিয়াছি। আবার খরমুজা ও কাশীর লেংড়ার লোভে ভক্তিগদগদচিত্তে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে দীর্ঘ দিন বিশ্বেশ্বরের রাজধানীতে কাটাইয়াছি। শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ বিশ্বেশ্বরের আশ্রয়ে যাপন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, কাশীর আনন্দকানন নাম একেবারেই অতিশয়োক্তি নহে। [পাঠকবর্গের বিশ্বাস না হয়, এই পূজার বন্ধে কাশী গিয়া অধমের কথাটা পরখ করিয়া দেখিতে পারেন।] বহু দেবতার মন্দির ও বহুতর আহার্য্যের সমাবেশ দেখিয়া ইহাও বেশ বুঝিয়াছি যে, কাশী বাস্তবিকই সর্ব্বতীর্থময়ী। 'ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিকোটী সার্দ্ধ তীর্থ করে অবস্থিতি। কাশীতে সে সব তীর্থ করে প্রত্যক্ষে বসতি॥' 'অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম' এ কথা স্বয়ং ভগবতী তাঁহার পিতাকে বলিয়াছেন, মিথ্যা হইবার যো কি ?

কেবল একটা বিষয়ে প্রথম প্রথম বড় ধোঁকা লাগিত—বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার যুগল-মাহাত্ম্য সত্ত্বেও কাশীর ইলিশ বিস্বাদ কেন বুঝিতাম না। ধ্যানস্থ হইয়া জানিলাম, গঙ্গা উত্তরবাহিনী হওয়াতে এই দোষ স্পর্শিয়াছে।

কাশীর মহাপ্রসাদে অভক্তি প্রকাশ করাতে, একজন পেন্‌শনভোগী কাশীবাসী বৃদ্ধ বলিলেন, বিন্ধ্যাচলে সুললিত ছাগমাংস সুলভ। তিনি আরও বলিলেন, 'আমি পেন্‌শন লইয়া প্রথম কয়েক বৎসর এই সুবিধার জন্য বিন্ধ্যাচলেই ছিলাম, ইদানীং দন্তাভাবে পুষ্পদন্তেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি।' তাঁহার কথা শুনিয়া পরদিন প্রত্যূষেই মোটর-ট্রেনে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। তথায় যাইয়া গঙ্গাস্নান ও দেবী-দর্শনান্তে চক্ষুঃকর্ণের—শ্রীবিষ্ণুঃ, জিহ্বাকর্ণের—বিবাদভঞ্জন করিলাম। বুঝিলাম, 'বৃদ্ধস্য বচনং' ভোজনকালেও 'গ্রাহ্যম্'। যোগমায়া, ভোগমায়া, বিন্ধ্যবাসিনী, অষ্টভুজা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির উপর যে কি পরিমাণ ভক্তির উদ্রেক হইল, তাহার বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র লেখনীর অসাধ্য। এখানে অনুদ্গতশৃঙ্গ ছাগবলি দেওয়ার প্রথাকে কেহ-কেহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু কচি পাঁঠা যখন সমধিক মুখপ্রিয়, তখন দেবীর প্রীত্যর্থ এরূপ বলিদান কেন নিন্দনীয় হইবে বুঝি না (বিশেষ, ভক্ত যখন পরে প্রসাদ পাইবেন)।

কাশীতে থাকিতে ত্রিবেণীসঙ্গম প্রয়াগতীর্থের খুবই নাম-ডাক শুনিতাম। সুতরাং একবার সেখানেও গিয়াছিলাম। মস্তকমুণ্ডন, ত্রিবেণীস্নান, বেণীমাধব-দর্শন, সকলই করিলাম—কিন্তু আসল কার্য্যে তেমন সুবিধা পাইলাম না। স্থানটি কাশীর এত নিকট, অথচ খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কাশীর একেবারে ঠিক উল্টা,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। অলোকা দেবীর সঙ্গে-সঙ্গেই এখানকার খাদ্যসুখ অন্তর্ধান হইয়াছে, কি ব্রাহ্মস্পর্শের ন্যায় ত্রিবেণীতে বিভ্রাট ঘটাইয়াছে,—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

আর এক যাত্রা বৃন্দাবনে গিয়া গোপালের মনোমোহন মূর্ত্তিদর্শনে ও তাঁহার ভোগ-আস্বাদনে এবং বাজারে বিক্রীত লাচ্চাদার রাবড়ী-সেবনে হরিভক্তি সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আহা! সকলই প্রভুর কৃপা!

কাশীর গঙ্গার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া পরবৎসর সঙ্কল্প করিলাম, গঙ্গার অবতরণ-স্থান হরিদ্বার দর্শন করিব। ত্রিরাত্র বাস করিয়াই বুঝিলাম, হরিদ্বার প্রকৃতই স্বর্গদ্বার। সুরধুনীর ত্রিধারার সলিল কি শীতল, কি সুমধুর, কি তৃপ্তিকর! নৈষধকারের 'অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা' অন্যত্র খাটিলেও এক্ষেত্রে খাটেনা ; দেখিলাম, এই সদ্যোদ্ধৃত জল যতই খাই, ততই খাইতে ইচ্ছা হয় ; শুধু গলনালী কেন, হৃৎপদ্ম পর্য্যন্ত জুড়াইয়া যায়। বুঝিলাম, বৈশেষিক-দর্শনে যে জলের প্রাকৃতিক গুণ মাধুর্য্য লিখিয়াছে, তাহা অসত্য নহে। পৃথিবীর ধূলামাটি লাগিয়াই পবিত্র গঙ্গোদকের স্বাদুতা-মধুরতা নষ্ট হইয়াছে। পরন্তু, এখানকার ঘৃত ও রাবড়ী একেবারে ভেজাল-বর্জ্জিত। সাত্ত্বিক আহারে ধর্ম্মবৃদ্ধির এমন স্থান জগতে দুর্লভ।

হরিদ্বার-কনখল হইতে আরও উর্দ্ধে গোমুখী বদরিকাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিবার বাঞ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথম আড্ডা হৃষীকেশে খাদ্যদ্রব্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া তীর্থভ্রমণ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। দেবতাত্মা হিমালয়-ভ্রমণ

করিতে আর মন সরিল না। এ সকল দুর্গম স্থানে কেবল ছাতু ও লঙ্কা খাইয়া পথ চলিতে হয়, শুনিয়া পা আর উঠিল না। চালচিড়া বাঁধিয়া নৈমিষারণ্যের চিড়া খাইতে যাইতেও আর ইচ্ছা হইল না। তখন শাস্ত্র স্মরণ করিয়া জানিলাম, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মূর্খতার কার্য্য। সেই সঙ্গে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের গানটি মনে পড়িল—"কায কি আমার কাশী? ঘরে বসে' পা'ব গয়া গঙ্গা বারাণসী"॥ আহা, ইহা লাখ কথার এক কথা। [তবে রামপ্রসাদ সাধনার উচ্চতম স্তরে উঠিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, আর আমার না উঠিতেই এক কাঁদি—এই যা' তফাত।] আরও ভাবিলাম, চেষ্টা করিলে এই ভেজালের আমলেও কলিকাতায় বসিয়াই বড়বাজারের রাতাবী, আফিঙ্গের চৌরাস্তার রাবড়ী, বাগবাজারের রসগোল্লা, যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন, বহুবাজারের আধা-ছানার সন্দেশ, পোস্তার লেংড়া, ফজলী, বোম্বাই, কিষণভোগ প্রভৃতি খাস আম, হগ সাহেবের বাজারের মেওয়া ফল, ঘাটালের ও আলিগড়ের মাখন, gram-fed mutton; প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। আর বর্ষাকালে গঙ্গার ইলিশের ত তুলনা নাই। অতএব 'অর্কে চেন্ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?' ইহার জন্য গাঁটের কড়ি খসাইয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রেলগাড়ী চড়িয়া, হিল্লী-দিল্লী ঘুরিবার প্রয়োজন কি? *

* প্রবন্ধটি পড়িয়া

> 'ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
> ন চাপি বেদাধ্যয়নং—।
> স্বভাব এবাত্রতথাতিরিচ্যতে
> যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

ইতি শ্লোকটি মনে পড়িতেছে। প্রবন্ধের নাম 'ধর্ম্মে মতি' না হইয়া 'ঔদরিকের তীর্থ-পরিক্রমা' হইলেই সঙ্গত হইত।—তবে এক হিসাবে লেখক প্রকৃত ভক্ত, কেন না—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' ইনি সেই দেবীর আশ্রিত। এই অন্ন-অজীর্ণের দিনে ইহা দেবীর কৃপার পরিচায়ক বটে।—সম্পাদক।

বিশ্বনাথ দর্শনে

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

আজি দেব, আসিয়াছি একা;
ভাসি' নয়নের জলে, আসিয়াছি পদতলে,
পুণ্যহীন দীনজনে দিবে না কি দেখা—
আসিয়াছি একা।

আসে যায় কত যাত্রী—কে করে গনন;
তব পদতীর্থে আসি'— কিবা গৃহী, কি সন্ন্যাসী
কিবা চায়—কিবা পায়, পূরে কি মনন?
ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই— জানি না ক কিবা চাই,
পদতলে আত্মহারা—আমি অকিঞ্চন—
নিয়েছি শরণ!

মোক্ষনদী শিরে ধর', বামে গৌরী নিরন্তর,
পদপ্রান্তে অনির্ব্বাণ 'কর্ণিকা'—শ্মশান!
পাপ-ভস্ম লিপ্ত অঙ্গ, বিষ-কণ্ঠ—অহি-সঙ্গ,
এ কি মূর্ত্তি! কোন্ মন্ত্র ঘোষিছে বিষাণ?
কনক দেউল মাঝে, পুনঃ একি রূপ রাজে,
রাজ-রাজেশ্বর—ভোগ-সম্পদ্-নিদান—
দেখে ভাগ্যবান্।

দেখিব গোঁ, কোন রূপ— ভিখারী অথবা ভূপ,
ব'লে দাও হে যোগেশ,—নাহি আত্মজ্ঞান!
ব'লে দাও, বিশ্বনাথ, ভোগ-যোগ—এক সাথ,
দু'য়ের দেবতা তুমি—কিবা দিবে দান?
কি চাহিব নাহি জানি, 'নিষ্কাম'—নাহিক মানি,
জীবনের অপরাহ্নে পূর্ণ কর প্রাণ—
দাও এই দান।

ঘনা'য়ে আসিছে সন্ধ্যা, হে দেবতা, তাই,
আসিয়াছি তব দ্বারে, খুঁজিব না আর কারে,
দাও বৈরাগ্যের দীক্ষা—অন্য নাহি চাই!
মুছে দাও পাপ তাপ, জীবনের অভিশাপ,
জন্ম জন্ম যেন দেব, তব পদ পাই;—
অন্য ভিক্ষা নাই।

মণিকর্ণিকার তটে—বসিয়া শ্মশানে—
ভুলিলাম গৃহাশ্রম, কিবা শান্তি অনুপম,
কি আত্মবিস্মৃতি যেন হইল পরাণে!
পরাণে আত্মায় যোগ— যেন ক্ষণতরে ভোগ;
শূন্যদৃষ্টি—চাহিলাম দেউলের পানে—
স্বর্ণচূড়া ভাতিল নয়ানে।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৩)

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা মাইকেল মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের বিষাদময়ী কাহিনীর কতকাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও, মধুসূদন তিনটি য়ুরোপীয় ভাষাশিক্ষাকল্পে তাঁহার দুর্ব্বিষহ প্রবাস বাসের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মধুসূদন ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল, পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার কিরূপ অধিকার ছিল, তাহাও যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। য়ুরোপে আসিয়া ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় তিনি এতদূর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, ঐ দুইটি ভাষাতে সুন্দর কবিতা রচনা ও পত্র-বিনিময় করিতেন। শেষে তিনি জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। স্প্যানিস ও পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিবার তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অবকাশাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

তাঁহার নূতন নূতন ভাষাশিক্ষার কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মনোমোহন ঘোষ ও গৌরদাস বাবুকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

মধুসূদন ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে লিখিতেছেন;—

"Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe."

১৩ই জুলাই তারিখে ভরসেলস্ হইতে তিনি লিখিতেছেন;—

"I hope to be a capital sort of European scholar before I leave Europe. I am getting on well with French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied in English. I wonder why: I know he did a little Italian last year."

জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ৩রা নবেম্বর তারিখে মধুসূদন লিখিতেছেন;—

"You must not fancy, my good friend, that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on seemingly with German—all without any assistance from hired teachers. The alphabet as you know, I dare say is not Roman."

মনোমোহন ঘোষকেও তিনি তাঁহার জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ৩০শে অক্টোবর তারিখে লিখিয়াছিলেন;—

"As for my German studies, I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy! Fancy! I am going to read Gœthe, Schiller, and Webber

and other authors whose good fame has filled the world. Do you know the song of Dryden ?

"None but the brave
None but the brave
None but the brave
Deserves the fair."

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf."

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন ;—

"I am making the very best use of my unfortunate exile, and I think, I may, without vanity say, that I know more languages than any Bengali now living."

পরম বন্ধু গৌরদাসবাবুকেও উক্ত বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"You can scarcely conceive how Europe has changed me, in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging yourself, my boy ! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow ; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon."

উক্ত পত্রের আর একস্থানে লিখিতেছেন,—

"I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, *viz.*, Italian, German and French languages,—which were well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. * * * I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue, and his native land may animate all men of talent among us."

পাঠক ! সঙ্কলিত পত্রাংশসমূহ হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রমে ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত মধুসূদন য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু ভাষা শিক্ষা করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই,—দুই তিনখানি ইংরাজী কাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষায় 'সুভদ্রাহরণ' 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর' ও বীরাঙ্গনা (দ্বিতীয় অংশ) প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে সেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ, আইন অধ্যয়ন, ভাষাশিক্ষা, এবং সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার এত সময় ব্যয়িত হইয়াছিল যে, তাঁহার চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ ছিল না। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণের প্রকাশক-লিখিত মুখবন্ধ পাঠ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। কোন-কোন সমালোচক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষরছন্দের প্রবর্ত্তক ও রচয়িতা হইলেও বোধ হয়, বঙ্গদেশের চিরাদৃত পয়ার ছন্দ লিখিতে সমর্থ নহেন ! সেই কারণেই বোধ হয় মধুসূদন 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর' নামক কাব্যখানি পয়ার ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাকবি মধুসূদন কিরূপ সুন্দর পয়ার রচনা করিয়াছিলেন, পাঠক-পাঠিকার

কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদী স্বয়ম্বর

Versailles,

9th September, 1863.

"কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত ! এ ভিক্ষা চরণে
বাগ্দেবী ! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে !"

* * * *

"বিঁধিয়া লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয় গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতী,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি !
এতদিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল !
পেয়েছ সুন্দরি ! স্বামী ভুবনে অতুল
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি
কতগুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি ?"

এতদ্ভিন্ন, মধুসূদন সীতাচরিত্র অবলম্বন করিয়া 'Queen Seeta' নাম দিয়া একখানি ইংরাজী কাব্য য়ুরোপীয় সুধীসমাজকে উপহার দিবার নিমিত্ত, রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই অপূর্ব্ব কাব্য দুই তিন শত পংক্তিমাত্র লিখিয়া, তিনি অবকাশাভাবে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন একখানি পত্রে ফ্রান্সের তুষারপাত বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ ;—

"The winter, this year, is very severe and yet at times you have days that might be called "hot". A few days ago, it snowed the whole night and the sight was splendid in the morning. Streets, house-tops, trees, gardens were all covered over with snow ; one might say, if poetically disposed—that our "দুগ্ধ-সাগর" had overflowed its shores and inundated the country."

ফ্রান্সে অবস্থান-সময়ে মধুসূদন বঙ্গদেশের ভীষণ আশ্বিনে-ঝড়ের সংবাদ পাইয়া বন্ধুবর্গের নিমিত্ত সবিশেষ চিন্তিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন ;—

'I hope all our friends have escaped the terrible visitation'.

প্যারিসের একটি সিয়েনেতে (scene) একদিন একটি ফরাসী রমণী মৈস্মরী বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। মধুসূদনও সেক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। রমণীর চক্ষু দুটি বস্ত্রবেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ; তিনি উক্ত মৈস্মরী অর্থাৎ সম্মোহন বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন। মধুসূদন সেই মহিলাটিকে ফরাসী ভাষায় বলিলেন, 'আমার জননীর নামটি কি আপনি বলুন দেখি ?' তিনি উত্তরে বলিলেন 'জাহ্নবী দাসী।' মধুসূদন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় বলিলেন 'ও হইবে না, নামটি আপনাকে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে ?' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণজ্ঞানশূন্যা ফরাসী মহিলা সেই চক্ষুবাঁধা অজ্ঞানাবস্থায় তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা অক্ষরে 'জাহ্নবী দাসী' লিখিয়া দিলেন।

মধুসূদন অবকাশকালে প্রায়ই ভরসেল্‌স নগরে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজোদ্যানে গমন করিতেন। উদ্যানমধ্যে বাপীতটে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সঞ্চরণশীল মৎস্যকুল ও মরাল-মরালীদিগকে আহার্য্যপ্রদানে পুলকিত করিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেন।

একদিন প্যারিস নগরীর রাজপথে ভ্রমণকালে মধুসূদন দেখিলেন, ফরাসী-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। মধুসূদন তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "Vive l' Empereur ! Vive Napolean ! Vive l' Empererice". রাজা ও রাণী উভয়ে আনন্দে মধুসূদনকে অভিবাদন করিলেন !

ইংরাজী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত অর্থসাচ্ছল্য ঘটিলে মধুসূদন ফরাসীরাজ্য হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার নিমিত্ত আইন অধ্যয়নে নিরত হন। তাঁহার ইংলণ্ডে প্রবাসের কয়েকটি মধুর স্মৃতি এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

তিনি লণ্ডন হইতে রেলযোগে প্রায়ই নগরীর উপকণ্ঠে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। তন্মধ্যে উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের প্রিয় সুপ্রসিদ্ধ 'কিউ উদ্যানে' (Kew Gardens) প্রায়ই গমন করিতেন। পৃথ্বীবিখ্যাত কার্ডিনাল উল্‌সের (Cardinal Wolsey) হ্যাম্‌টন কোর্ট প্রাসাদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—

These places add an air of romantic reality to the dry historical facts we learnt in our younger days. I am quite in love with Hampton Court. It is as oriental as this rigourous climate would allow. The house is divided into what we would call 'mahals' (মহল) ; each division has its courtyards or উঠান। The pictures and the guilded ceilings are wonderful.

ইংলণ্ডের নিদারুণ শীতে তিনি প্রত্যহই হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করিতেন। শার্দ্দূলসদৃশ হেমন্ত ঋতুর উগ্রতায় তিনি কখনও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

একদিন তিনি বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে কিয়দ্দূরে একটি পল্লীগ্রামের সরাইএ গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রমণেও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া সরাইরক্ষককে (Inn-keeper) তাহার সেই দিবসের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদির তালিকা (Menu) দিতে বলিলেন। সরাইরক্ষক একটি তালিকা প্রদান করিলে, মধুসূদন সেটি আদ্যোপান্ত দেখিয়া বলিলেন, "ইহার মধ্যে একটি দ্রব্য নাই দেখিতেছি ?" সরাইরক্ষক বলিলেন, "কি দ্রব্য মহাশয় ?" মধুসূদন দুই হস্তে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'Roast Baby ?' সরাই-রক্ষক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আরও দু'একবার সেই কথাটি শুনিয়া রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রচুর আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগকে পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজকবি আলফ্রেড টেনিসন, ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার কবিবর ভিক্‌টর হ্যুগো, অদ্বিতীয় জার্ম্মাণ পণ্ডিত মাত্রে (Maitre) ও 'পণ্ডিতচূড়ামণি' থিওডোর গোল্ডষ্টুকরের সহিত মধুসূদন য়ুরোপ-ভ্রমণকালে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ সকলেই মধুসূদনের পাণ্ডিত্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আলফ্রেড টেনিসন্‌কে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—

> "কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
> শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ুভরে
> সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে !—"

ভিক্‌টর হ্যুগোকে লিখিয়াছিলেন ;—

> "পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
> গোকুল কানন যথা প্রফুল্লবকুলে
> বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
> অলিরূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে !"

মধুসূদনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে, ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে য়ুরোপের নানা প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুসূদনও ফ্রান্স হইতে দান্তের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়া, ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইটালীরাজ বিশ্ব বিশ্রুতকীর্ত্তি ভিক্টর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মধুসূদনকে স্বীয় স্বাক্ষর-(Autograph) সংযুক্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই দুর্লভ পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের নিকট ছিল। তাহাতে ভিক্টর ইমানিউএল লিখিয়াছিলেন ;— "It will be a ring which will connect the orient with the occident." অর্থাৎ "আপনার কবিতা গ্রন্থির ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।" ভিক্টর ইমানিউএলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে— মাইকেল মধুসূদনই স্বীয় প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ভিক্টর ইমানিউএলের উদ্ধৃত উক্তির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মহাসাহিত্যসাধনার 'সাঙ্কেতিক চিত্র' ও একটি শ্লোকার্দ্ধ নিজের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া, যুরোপ যাত্রার পূর্ব্ব হইতেই স্ব-রচিত প্রত্যেক গ্রন্থের উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সাঙ্কেতিক চিত্রের মর্ম্ম তখন অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, মধুসূদনের সেই 'সাঙ্কেতিক চিত্রের' একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সকলের অবগতির নিমিত্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"মহাশয়,

"আপনি যেরূপ আগ্রহের সহিত মধু-কথা আহরণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। ইহাতে যদি কিছুমাত্র মধুকণা থাকে, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

"বহুকাল পূর্ব্বে যখন আমি মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মধুসূদনের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের মলাটের উপর মুদ্রিত সাঙ্কেতিক চিত্রটি এবং তৎসংলগ্ন শ্লোকার্দ্ধটি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ শ্লোকার্দ্ধ—"শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্" তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বীজমন্ত্রস্বরূপ; এবং উহার উপরিস্থিত সাঙ্কেতিক চিত্রটি ঐ বীজমন্ত্রের দ্যোতক। মধুসূদনের কাব্য ও নাটকাদি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার ঐ কাব্যনাটকাদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। এই কার্য্য-সাধনই ঐ বীজমন্ত্রের—"কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"এর লক্ষ্য। এখন দেখুন যে, ঐ সাঙ্কেতিক চিত্রটি কবির ঈপ্সিত "কার্য্যের" কি সুন্দর দ্যোতক! একদিকে প্রাচ্য-নির্দ্দেশক হস্তী, অন্যদিকে প্রতীচ্য-নির্দ্দেশক সিংহ; এবং এই দুইএর মধ্যস্থলে থাকিয়া ভাস্বর কাব্য-প্রতিভা তাহার সহস্র-রশ্মি দ্বারা সাহিত্য-শতদলকে সুপ্রস্ফুটিত করিতেছে!

"এখানে আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কিছুকাল হইতে মধুসূদনের গ্রন্থের যে সব নানাবিধ সংস্করণ হইতেছে, তাহাতে এই সাঙ্কেতিক চিত্রটি বর্জ্জিত হইতেছে। বোধ হয় উহার মর্ম্ম না বুঝায় এরূপ ঘটিতেছে। যে জিনিষটি কবির সাহিত্য-জীবনের লক্ষ্যকে এমন সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার বর্জ্জন কোনমতেই সঙ্গত নহে।

নিবেদক—শ্রীদীননাথ সান্যাল।"

আমরা আশা করি, মহাকবির প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন-নির্দ্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন সযত্নে তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরবর্ত্তী সংস্করণে সুরক্ষিত হইবে। প্রখরবুদ্ধি ইটালীরাজ ভিক্টর ইমানিউএল মধুসূদনের প্রতিভার প্রকৃত গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মধুসূদনের লণ্ডনে অবস্থিতিকালে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতভাষাবিদ্ থিওডোর গোল্ডষ্টুকর (Theodore Goldstucker) মধুসূদনের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত বেতন ভিন্ন তাঁহার পক্ষে শুধু সম্মানের অবৈতনিক পদ লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি বিনয়ের সহিত উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

"I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. *Goldstucker* (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. * * * The doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus."

মধুসূদন নিম্নলিখিত কবিতাটি গোল্ডষ্টুকরকে লিখিয়াছিলেন;—

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যারূপ সিন্ধুর মথনে!

পণ্ডিতকুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরিজাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?

ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্ত ইংলণ্ডে গিয়া প্রথমতঃ কিছু-দিন মধুসূদনের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পত্নী হেন্‌রিয়েটাকে তিনি 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্ষেত্রমোহন দত্তের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা মধুসূদনের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত চিঠিপত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম ; তাহার মধ্যে কৌতুকাবহ কথাও আছে।

Loru Cottage, 14 Wood Lane, Shepherd's Bush. London W. 17th January, 1866.

"You will be pleased to hear that Dr. Khetter Mohan Dutt (who came to England last year) is living with us. * * Khetter has taken such a fancy to Mrs. Dutt that he calls her his mother ! * * I am glad he consented to live with us, because he has many comforts at a little expense, comforts which we Indians miss in Europe unless we come across some fellow-countrymen."

London W. 25th February, 1866.

"Dr. Khetter Mohan Dutt has left us and gone to live in Town, as he purposes to attend medical lectures and so on. I am afraid he does not know his own mind. He left us voluntarily and of his own accord. I see him now and then."

London W. 10th June, 1866.

"I have no news to give you of Khetter; he is living somewhere in London. * * * I understand that he is speculating in the matrimonial market ! At least, I was told something to this effect by an old Indian Colonel whom I see often and who has heard all this from the father of Khetter's "intended." Pray, regard this as a bit of *private news.* Perhaps Khetter wouldn't like your knowing anything of his affair at this stage of progress. He is a queer fellow."*

বিদ্যাসাগর মহাশয় য়ুরোপে মধুসূদনকে প্রতিবৎসর সাধ্যমত সময়োপযোগী অর্থ প্রেরণ করিয়াও সকল সময়ে তাঁহার অর্থসাচ্ছল্য ঘটাইতে পারেন নাই। আমরা বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে লিখিত পত্রাবলী হইতে মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা চয়ন করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিব।

12 Rue des-Chantiers, Versailles, France.
26th November, 1864.

"Knowing as I do, how your time is occupied, I feel reluctant to trouble you ; but my apology is that of a desperate man : I have no one who apparently cares for me ! If you abandon me, I must sink ! Unless called to the Bar, I could never return to India, for, in the first place what am I to do there ? My miserable income * is too small for a man of my habits to live comfortably upon ; in the second place, such a step would make my enemies laugh, and I am sorry to see that I have many. Who are

---

* ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্তের Mabel নাম্নী জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত বিবাহ করেন।

* মধুসূদনের মাসিক আয় তখন সর্ব্বপ্রকারে ৮০০ টাকার ন্যূন হইবে না। কিন্তু সে টাকা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত হইত না ; সুতরাং তাঁহার বিলাত প্রবাসের ব্যয় কিছুতেই সঙ্কুলান হইত না ; বরং ঋণ করিতে হইত।

the rascals that are constantly giving currency to lying reports about me at Calcutta! They cannot be friends—of that I am certain."

Loru Cottage, 14, Wood Lane,
Shepherd's Bush.
London, W. 17th. January, 1866.

"I have received your three letters, the last enclosing an order on the Agra and Mastermans Bank for £50. I scarcely know how to thank you for the tender solicitude you display for my welfare, and I humbly trust God will give me a day when I shall have it in my power to show you how grateful I am!"

"* * * I cannot conceal the fact from myself that I must yet have a great deal of money. My passage, my out-fit to India, the setting myself up there as a British Barrister, the expenses of living as a gentleman (in the European sense) till I get practice will cost a great deal, however economically we might manage these things.

"You tell me that you have borrowed Rs. 7000. I presume you have paid yourself the 1000 you lent me, because of this money, I have received 6000 including the 500 which I got by last mail."

মধুস্থদন তাঁহার পত্তনীদার মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছিলেন। মধুস্থদনের পত্রাবলী পাঠে প্রতীতি হয় যে, মহাদেবই সর্ব্বাপেক্ষা দোষী এবং তিনিই মধুস্থদনের সর্ব্বনাশের মূল। উপরিউক্ত পত্র লিখিবার ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরেই মধুস্থদন লিখিতেছেন ;—

London W. 25th. February, 1866.

"I have much pleasure in acknowledging the receipt of your kind letter with the order for £101 on the Oriental Bank Corporation. You always send money in good time. I am delighted to find that you have arranged the affair so satisfactorily with the *Sircar* of Rani Sarnamoye, and thereby defeated the machinations of Mahadeb Chatterjea and his clique to distress and ruin me. I am sure it was that * * who had the fact quietly whispered to your friend's ears in order to turn him away from us. * * But for him and the like of him, I should have been at Calcutta at this moment." *

উপরিউক্ত পত্রের অন্য এক স্থলে লিখিতেছেন ;—

"You may well imagine, my dear friend how full of anxious and troubled thoughts I am! But for my confidence in your wisdom, strength of mind and noble and disinterested friendship, I fancy, I should go mad! I need scarcely assure you that my trust is in God and after God in you!"

সেই বৎসর লণ্ডনে দ্রব্যাদি অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল ; তৎসম্বন্ধে মধুস্থদন লিখিতেছেন ;—

London W. 18th. April, 1866.

"I have received your kind letter and the draft for £151 etc. I assure you, the money came in good time, for as I have repeatedly written to you, living in London is somewhat frightfully dear this year. The "oldest inhabitant"—as people jocularly remark—"has no recollection of such dear times!" It costs

* ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখ, সম্বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লণ্ডন হইতে লিখিত, মধুস্থদনের পত্র পাঠে জানা যায় যে তিনি মহাদেব চট্টোর নিকট হইতে সর্ব্বসমেত ৫৯৩১ টাকা, ৯ আনা, ৮ পাই পাইয়াছিলেন। মহাদেবের নিকট সেই সময়ে তাঁহার আরও ১০,১০০ (দশ হাজার একশত) টাকা পত্তনী তালুকের খাজনার হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি উহা পান নাই।

us a great deal of money—indeed, much more than I had expected."

London W. 18th. June, 1866.

"I am aware that I have already had a very large sum of money; but it is *impossible* for a man—a gentleman, to live in England at the present moment on a little money with a wife and two children."

যদি কোন ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে গিয়া বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন, তাঁহার ব্যবসায়ে পসার না হওয়া পর্য্যন্ত বম্বের কোন ধনকুবের পার্শী ভদ্রলোক, নির্দ্দিষ্ট সুদে তাঁহাকে অর্থ হাওলাৎ দিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্তনীদার অর্থ প্রেরণ না করাতে মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অনেকের নিকট বহু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বম্বের সেই পার্শী ধনাঢ্যের নিকট, নিজের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া, ২৫০০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া, মধুসূদন সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া য়ুরোপের ব্যয়ভার বহন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজীর সহিত পরামর্শের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী তাঁহাকে বলেন যে, বাণিজ্য-জগতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়,' তাঁহার (মধুসূদনের) সেরূপ প্রার্থনা, বোম্বাই পার্শীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। দাদাভাইয়ের এইরূপ কথায় মধুসূদন হতাশ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন;—

London W. 18th. June, 1866.

"Immediately after the receipt of your letter I called on Mr. Dadabhai Naoroji—a Parsee merchant here and the President of the London-Indian Society, to consult him about the great Parsee of Bombay. Mr. Naoroji threw cold water on the project and told me that at the present monetary condition of the mercantile world all over the world, such a request as mine would not be attended to,—so that, that hope is gone! Unless you can save me I must go!

You cannot imagine what sleepless nights my poor wife and myself have of late passed --talking over our affairs and prospects, and we have come to the conclusion that it would be better that I should go out alone and that she should follow me some months after, when I have acquired a sort of professional footing."

লণ্ডন নগরের বাড়ীওয়ালাদিগের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহারা ভাড়া আদায়ের জন্য ভাড়াটিয়াদিগের সম্বন্ধে কিরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করে, তৎসম্বন্ধে মধুসূদন লিখিতেছেন;—

"I hope you will send me £ 300 in September, for I must get out of this house and the last quarter of the year ends with that month. The proprietors are hard-hearted people and if I am unable to pay and move out they, no doubt, will apply the hard enactments of English Law of Landlords and Tenants to my case, for I am a yearly tenant and if I remain one day after the expiration of the Term, they might compel me to keep the house another year at a higher rate of rent."

এই পত্রের সর্ব্বশেষে মধুসূদন লিখিতেছেন;—

"I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together!"

আহা! কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কথা! তখন মধুসূদনের মনের অবস্থা প্রকৃতই ঐরূপ হইয়াছিল।

য়ুরোপ-প্রবাসের শেষভাগে ঋণস্তূপের বিপুল গুরুভারে বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া মধুসূদন, ঋণমুক্ত হইয়া ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া-

ছিলেন, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুনের পত্রাংশগুলি পাঠ করিলে পাঠকেরা তাহা অবগত হইবেন।

London W. 26th June, 1866.

"I am quite aware that if you are compelled to sell off; certain people will look upon themselves as "true prophets" and indulge in quiet laughters at our *supposed* expense; but I am sure you are a stronger minded man than that. Besides, who cares for the stupid—unthinking multitude? If you and my other friends arrange this affair for me, I shall, when called to the Bar, enter life with a splendid profession and *without* a mountain in the shape of debts to weigh me down on my poor back.

আলফ্রেড (পরে লর্ড) টেনিসন

* * * *

I have every right to do what I like with my own. No sensible man would say that you have helped me to ruin myself. Surely a man who assists another to begin life as I hope to begin, it cannot be said to ruin that man. I must take my chance like millions of our fellow-creatures and either stand or fall according as the strength of my own heart and mind enables me!

উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠে অনুমিত হয় যে, মধুসূদনের হৃদয়ের তেজ সেই ভীষণ জীবন-পরীক্ষায় পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্ষুণ্ণ ছিল! তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অবসন্ন হন নাই। তিনি এই পত্রের শেষাংশে লিখিতেছেন;—

If you can command a sum large enough to answer my purpose, there would be no occasion to do anything in haste, and I shall see what is to be done about Chatterjea on my return home. If any good Samaritan should come forward to help us, well and good; if not, you must raise money on the sale of the property and you shall have my final instructions on that subject in October, if not earlier."

হায়, পর্ব্বত-প্রমাণ বিরাট ঋণস্তূপের প্রচণ্ড নিষ্পেষণেই তিনি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ঋণই তাঁহাকে অকালে কাল-কবলিত করিয়াছিল। তিনি জীবনের শেষ ছয়বৎসর

উহার বিষাক্ত ঘূর্ণিবাত্যায় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

প্রায় পাঁচ বৎসর য়ুরোপ-প্রবাসে বহু দুর্য্যোগ, বহু বাধা-বিঘ্ন, বহু ঝঞ্ঝাবজ্র এবং উত্তাল তরঙ্গময় দুঃখসমুদ্র

ভিক্টর হুগো
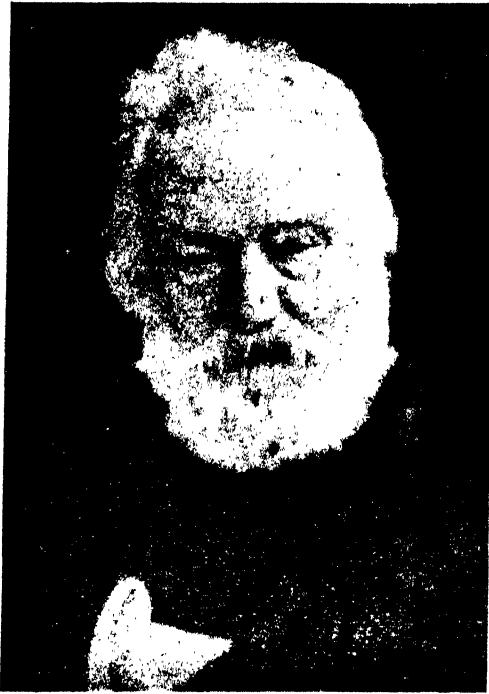
অতিক্রম করিয়া, যথার্থ মনুষ্যত্বের সহিত জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর গ্রেজ্ ইন্ হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফরাসীদেশ হইতে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা ঐ পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

5, Rue de Maurepas, Versailles—France.

9th Dec. 1866.

My dear friend

I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, brings money, I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well-settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money than, I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I choose :—the case would be

তৃতীয় নেপোলিয়ন

far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly ; but

in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When I reach Calcutta, I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till "briefs" begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I would rather that things went on this way till next winter."

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ নিষেধ সত্ত্বেও মধুসূদন পত্নী-কন্যা-পুত্রকে ফ্রান্সে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মধুসূদনের স্বদেশযাত্রার পর প্রায় তিন বৎসর ফ্রান্সে বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন প্যারিসের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। পত্নী

দান্তে

হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি প্রায়ই জলবায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিতেন! সেখানেও তাঁহার বাসের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে হইত। এই সকল কারণে প্রচুর অর্থব্যয় হইত। আমরা ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি পত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকটিত করিলাম। পাঠক তাহাতে মধুসূদনের বিপুল ব্যয়ের একটু আভাষ পাইবেন!

"I have let out to Mme. Dutt (Mrs. Henrietta Dutt) one room from 21st. August

ভিক্টর ইমানুয়েল

to 30th. September at the rate of 640 francs for board and lodging and two bottles of wine per day. 29 francs per month for a piano and 9 francs for sea-water.

Hotel Victoria, Dieppe.   For my mother,
23rd, August, 1867.   A. Grubrey.

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ সবিশেষ প্রয়োজনীয়। য়ুরোপে অর্থাভাবজনিত বিষাদে নিমজ্জিত থাকিলেও, মধুসূদনের স্বভাবজাত রহস্যপ্রিয়তা ও আমোদ-প্রমোদের বিরাম ছিল না। তিনি কবিজনোচিত উল্লাসে সতত উল্লসিত থাকিতেন। অধ্যয়নের অবকাশে প্রমোদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেন! তখন সাংসারিক কোন চিন্তাই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না। সংসারের নিবিড় বিষাদমেঘ

প্রথর প্রমোদপবনে অপস্থত হইয়া, প্রফুল্লতার ফুল্লশ্রী জ্যোৎস্না সদ্যঃ-বিকশিত হইয়া তরঙ্গপ্লাবনে প্রবাহিত হইত! মনোমোহন ঘোষ বলিতেন যে, যখনই অর্থসাচ্ছল্য ঘটিয়াছে, তখনই মধুসূদন লণ্ডন কিম্বা প্যারিসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলে

৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী বন্ধুদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন; সুবিখ্যাত নাট্যশালায় অভিনয় দর্শনে যাইতেন এবং অপেরা-হাউসে নৃত্যগীত শ্রবণ করিতেন; বন্ধুকে লইয়া ট্রেণে সেলুনে চড়িয়া নগরীর উপকণ্ঠে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। বিলাস-ব্যসনে তিনি ফরাসীর ন্যায়ই ছিলেন। প্যারিসেই তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত! ফরাসী জুতা ও বুট তাঁহার প্রিয় ছিল! ফরাসী সৌগন্ধেই তিনি বিমোহিত হইতেন! ফরাসী মদ্যেই তাঁহার পান-পাত্র পরিপূর্ণ হইত! ফরাসী পাচকের প্রস্তুত খাদ্যই সকল জাতির প্রস্তুত (বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত) খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল। তাঁহার মতে ফরাসী সমালোচকই সমালোচক-শ্রেষ্ঠ। আচারে ও ব্যবহারে তিনি নিজেও ফরাসী হইয়া-ছিলেন, ফরাসী রীতি অনুসারেই সকলকে সাদর-সম্ভাষণ করিতেন। জনৈক খ্রীষ্টীয় মিশনরীর মুখে শুনিয়াছিলাম, "বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর য়ুরোপীয় আদবকায়দা মাইকেল মধুসূদনে যেমন দেখিয়াছি, তেমন আর কাহাতেও দেখি নাই। বিনয়নম্র ব্যবহারে তিনি Saintকেও পরাজিত করিয়াছিলেন; কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন এতদূর ফরাসীতে দীক্ষিত ছিল যে তাহাদের নামও ফরাসী প্রণালীতে লিখিত হইত। তাঁহার চক্ষে প্যারিস নগরীই সসাগরা ধরিত্রীর বক্ষে অমরাবতীসদৃশ মনোহর এবং ফরাসী জাতিই ভূমণ্ডলে সভ্যতার আদর্শরূপে পরিগণিত হইত! Buckland সাহেব লিখিয়াছেন,—

"——Paris, which he regarded as the most splendid place in the world."

"This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few francs than the Rajah of Burdwan ever dreams of! I can for a few francs enjoy

সাঙ্কেতিক চিত্র
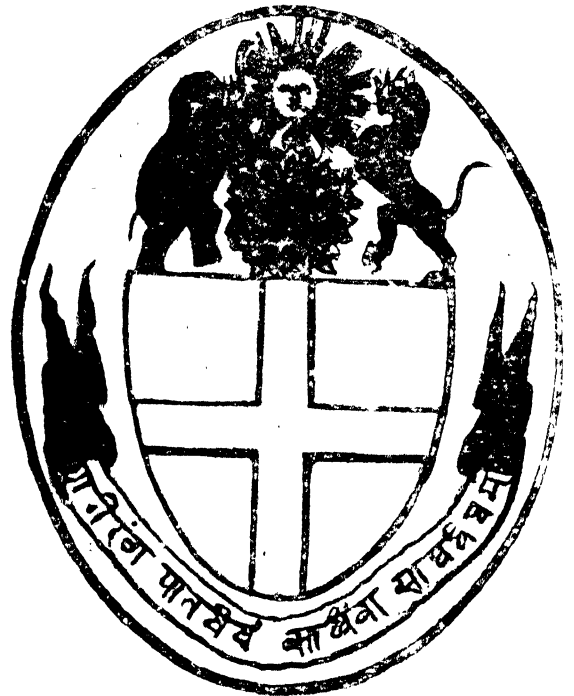
pleasures that would cost him *half* his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী

of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters. The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one whether high or low, will treat you as a man and not a d–d nigger. But this is Europe, my boy, and not India."

কিন্তু হায়, এতদূর বৈদেশিক আবরণে আবৃত হইয়াও আমাদের মধুসূদন-মধুসূদনই ছিলেন! সেই বৈদেশিক আড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যময় ফরাসীদেশেই ফরাসীভাবে অনুপ্রাণিত থাকিয়া, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মধুসূদন শ্যামকান্তিকোমলা গৌড়গৃহের চিরমধুর—চিরকরুণ স্মৃতিবিজড়িত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন! তিনি যে আমাদের আপনার—তিনি কি কখনও পর হইতে পারেন! বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি যথার্থই লিখিয়াছেন;—

"বিদেশী আকারে, সকল প্রকারে,
ইংরাজী বাহিরে, বাঙ্গলা অন্তরে,
দেহ পরবাসে, স্নেহ নিজ ঘরে,
মধু তব রীতি অতুল ভূতলে।"

মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও প্রীতিপ্রদ আখ্যায়িকা এক্ষণে আর জানিবার উপায় নাই। তাঁহার য়ুরোপে রচিত ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয় ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অনেক কবিতাও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonnerjee) মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামাধব রায়, ব্যারিষ্টার এন, এন ঘোষ, ও উকীল কিশোরীলাল হালদার মধুর অনেক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের একখানি ইংরাজি জীবন চরিত রচনা করিবার তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরাও বহু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অতীতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মহা-কবির য়ুরোপ-প্রবাসের বিদ্যুৎছ্যতিবৎ স্মৃতিরশ্মি যাহা আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই আমরা প্রকটিত করিয়াছি।

অবিরল অশ্রুবর্ষণে পত্নী হেনরিয়েটা, দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন এবং প্রবাসী বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী মার্শেলিসের জল-কল্লোল মুখর জন-কোলাহলধ্বনিত বন্দরে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, কাতরচিত্ত বিরহব্যথিত মধুসূদন, একাকী স্বদেশাভিমুখে সুদীর্ঘ সমুদযাত্রা করিলেন! য়ুরোপ পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বিপদতারণ, দুদ্দিনের বন্ধু মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের উদ্দেশে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

বঙ্গদেশে এক মান্যবন্ধুর উপলক্ষে।

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

বাঙ্গালীর কোষ্ঠীপত্র

[শ্রীজলধর সেন]

শ্রীশ্রী৺মহাপূজার সময় আমরা এক নূতন সওগাদ লইয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা একখানি কোষ্ঠীপত্র। এ অমূল্য রত্ন কেহ আমাদিগকে দিয়া যান নাই—আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছি।

একদিন রাত্রিতে ধর্ম্মতলায় শেষ ট্রাম ধরিয়া বাসায় আসিতেছিলাম। প্রথম শ্রেণীতে বেশী আরোহী ছিল না—মোটে তিন চারি জন। আমি একেলা একখানি বেঞ্চ দখল করিয়া বসিয়া ছিলাম। গাড়ীখানি যখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড় ঘুরিয়াছে, তখন চাহিয়া দেখি, আমার পায়ের কাছে একখানি মলিন রুমালে বাঁধা কি পড়িয়া রহিয়াছে। আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই রুমাল-বাঁধা জিনিসটা অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে-ভয়ে তুলিয়া লইলাম। কেহ যেন মনে করিবেন না যে,—উহার মধ্যে নোটের তাড়া রহিয়াছে ভাবিয়া, আমি সন্তর্পণে ভয়ে-ভয়ে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তুলিলাম। আমার ভয় হইল—কি জানি, যে দিন-সময় পড়িয়াছে—উহার মধ্যে বোমা কি ঐ রকম কিছুও ত থাকিতে পারে।

এই রুমাল-বাঁধা অমূল্য রত্ন কি,—দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। তখন খুব সাবধানে রুমালের গ্রন্থি-মোচন করিলাম। দেখি, কতকগুলি কাগজ। কাগজগুলিতে প্রায় হাজারখানেক দুর্গানাম লেখা—আর কিছুই নাই। দূর্ ছাই—এ দুর্গানাম আর কি পড়িব, এই মনে করিয়া কাগজগুলি যেমন ছিল, তেমনই করিয়া ভাঁজ করিতে যাইতেছি, এমন সময় তাহার মধ্য হইতে আর একখানি লম্বা কাগজ বেঞ্চের তলায় পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া দেখি, তাহার এক পৃষ্ঠায় সেই সারি-সারি দুর্গানাম লেখা, আর অপর পৃষ্ঠায় বহু-চিত্রাঙ্কিত একখানি কোষ্ঠীপত্র—কোষ্ঠীপত্রখানি সেকেলে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লিখিত।

এই অভিনব কোষ্ঠীখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বাঃ—বেশ ত কোষ্ঠী! অনেক কোষ্ঠী দেখিয়াছি, এমন ত কোথাও দেখি নাই। বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক কোষ্ঠীখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। কে এক শ্রীশ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বন্ধু রমাকান্তের পুত্র শ্যামাকান্তের এই কোষ্ঠী লিখিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যপ্রবর বেশ তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ; কোষ্ঠীখানিতে যে সমস্ত চিত্র দিয়াছেন এবং পয়ার ছন্দে চারি লাইন কবিতায় তাহার যে বিবরণ ও বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পড়িবার মত;—সুধু পড়িবার মত নয়—বুঝিবার মত। এখন যে ঘরে-ঘরেই ঐ দৃশ্য!

শ্রীশ ভট্টাচার্য্যকেও চিনি না, রমাকান্ত-শ্যামাকান্তকেও জানি না; কোষ্ঠীখানির কোনস্থলেই শ্রীশ ভট্টাচার্য্য বা রমাকান্ত শ্যামাকান্তের ঠিকানা ছিল না যে, সেখানি তাহার অধিকারীকে ফিরাইয়া দিব। অতএব, ভাবিলাম, ভারতবর্ষে কোষ্ঠিখানি ছাপাইয়া দিলে মালিক তাহা পড়িয়া কোষ্ঠির সন্ধান পাইয়া ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে আসিবেন এবং প্রমাণ দিয়া উহা লইয়া যাইতে পারিবেন। ট্রামের কনডাক্টরদের জিম্মা করিয়া দিই; নাই কারণ তাহারা হয় ত কোষ্ঠিখানি লইয়া তামাক মুড়িয়া উহার সদ্গতি করিবে। কুড়াইয়া পাওয়া কোষ্ঠিখানি ছাপাইবার আরও একটু গুরু প্রলোভন ছিল;—এই কোষ্ঠীখানিতে এবং চিত্রগুলিতে আমাদের বঙ্গ-গৃহের ছবি; বেশ উজ্জল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে;—এ সকল দৃশ্য ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি।

অতএব 'পরোপকৃতয়ে ময়া' এই অভিনব কোষ্ঠীখানি ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় যথাযথ ছাপিয়া দিলাম;—পূজার সওগাদ মন্দ হইল না। এই কোষ্ঠীর কোন কোন চিত্রের সহিত যদি পাঠক, তথা পাঠিকাগণের জীবনচিত্র সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ মিলিয়া যায়, তাহা হইলে এ গরীবের উপর 'খাপ্পা' হইবেন না;—ছবিও আমি আঁকি নাই;—কবিতা যে আমি লিখিতে পারি না, তাহার যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ আছে;—আর ঘরের কথা (তা নিজের ঘরেরই হউক, বা পরের ঘরেরই হউক) ছাপার হরফে তুলিয়া দিবার মত অহম্মুখও আমি

নহি। এই কৈফিয়তেও যদি কেহ আমার উপর বিরূপ হন, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া এই অভিনব 'কোষ্ঠীপত্রের' অবিকল নকল (True copy) দাখিল করিতেছি।

অবিকল নকল (True copy)

কোষ্ঠীপত্র।

শ্রীযুক্ত রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্রের

জন্ম—১৮৩৭ শকাব্দাঃ, ১লা ফাল্গুন রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ১১ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড।

নক্ষত্র—দিবাভাগে জন্ম জন্য অদৃশ্য।

রাশি—ব্যাঘ্র।

রাশিনাম শ্যামাকান্ত, ডাকনাম যাহার যদৃচ্ছা।

বিশেষ বিবরণ—

সংক্ষিপ্তসার (Synopsis)—

রমাকান্তের পুত্র, তাই নাম শ্যামাকান্ত।
ব্যাঘ্ররাশি, অতএব বড়ই দুর্দ্দান্ত॥
বিশেষ বর্ণনা বৃথা, রন্ধ্রগত শনি।
নাবিক পঞ্জিকামতে পাইলাম গণি॥

দফাওয়ারী নিঘণ্ট

'পেট-জোড়া পিলে'

তৃতীয় বৎসরে শিশু হাঁটিয়া বেড়ায়।
সুবোধ সুশীল অতি, যাহা পায় খায়॥
নাহিক বিচার কিছু, সব দ্রব্য গিলে।
অবশেষে দেখা দিল 'পেট-জোড়া পিলে'॥

'গলায় মাদুলী'

ডাক্তার, কবিরাজ, আর হোমোপাথী।
সকলে জবাব দিল, কেহ নাই বাকী॥
ভিজিট যোগাতে নিল 'কান্ত' কাঁধে ঝুলি
অগত্যা বাঁধিয়া দিল 'গলায় মাদুলী'॥

খাও বাবা খাও

'খাও বাবা খাও'

পুত্রকোলে রমাকান্ত বসিয়া আহারে।
দেখিছেন পুত্রমুখ চাহি বারে বারে॥
বলিতেছে শ্যামাকান্ত 'কৈ বাবা দাও'।
আনন্দে বলিছে কান্ত, 'খাও বাবা, খাও'

'খোকা নাহি দেয় সাড়া'

শ্যামাকান্ত প্রতিদিন পাঠশালে যায়।
মাষ্টারের কাছে রোজ বেত্রাঘাত খায়॥
হুঁকা-হাতে রমাকান্ত জিজ্ঞাসেন পড়া।
কাঁদিয়া আকুল 'খোকা, নাহি দেয় সাড়া'

খোকা নাহি দেয় সাড়া

সকলি বিফল

'সকলি বিফল'

সপ্তদশ বৎসরেতে শিরে হাত দিয়া।
পরীক্ষার পাঠ পড়া রজনী জাগিয়া॥
দুইমাস পরে যবে বাহিরিল ফল।
রাতজাগা, পরিশ্রম 'সকলি বিফল'॥

গলে বস্ত্র দিয়া

'গলে বস্ত্র দিয়া'

পরীক্ষায় ফেল, কিন্তু বিবাহেতে নয়।
প্রজাপতি তাহাতে ত হন না নিদয়॥
কুমারী কন্যার পিতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া।
করযোড়ে উপস্থিত 'গলে বস্ত্র দিয়া'॥

হুলুধ্বনি করে যত পুরনারীগণ

'হুলুধ্বনি করে যত পুরনারীগণ'

শুভদিনে শুভক্ষণে দ্বিজ শ্যামাকান্ত।
বিবাহ করিতে যায় হয়ে শিষ্ট শান্ত॥
পরিধানে রাজবেশ, ব্রুহাম-বাহন।
'হুলুধ্বনি করে যত পুরনারীগণ॥'

চলেছেন শ্বশুর-ভবনে

'চলেছেন শ্বশুর-ভবনে'

হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি, হাফ মোজা পায়।
কামিজ উপরে কোট কিবা শোভা পায়॥
অপরূপ বেশে সাজি' অতি হৃষ্ট মনে।
শ্যামাকান্ত 'চলেছেন শ্বশুর-ভবনে॥'

চাকুরীটি পাই

'চাকুরীটি পাই'

এইবার শ্যামাকান্ত চাকুরী-সন্ধানে।
দিন নাই রাত নাই ঘোরে নানা স্থানে॥
দরখাস্ত হাতে বলে "চাপড়াসী ভাই।
তব দয়া হ'লে আমি 'চাকুরীটি পাই'॥

যথাকালে হাজিরীটি চাই

'যথাকালে হাজিরীটি চাই'

হাতে কাগজের তাড়া, ছাতাটি বগলে।
তাড়াতাড়ি শ্যামাকান্ত আফিসেতে চলে॥
রোদ বৃষ্টি, রোগ শোক, কোন কথা নাই
প্রতিদিন 'যথাকালে হাজিরীটি চাই।'

যথা:ইচ্ছা তথা চ'লে যাও

'যথা ইচ্ছা তথা চ'লে যাও'

শ্যামাকান্ত বলে "বাবা, শোনো বলি স্পষ্ট
তোমার কারণে মোর স্ত্রীর নানা কষ্ট॥
চুপ করে বসে থাক, দুই বেলা খাও।
তা না পার, যথা ইচ্ছা তথা চ'লে যাও॥"

'ছেলে ছুটী কেঁদে হ'ল খুন'

হুঁকা হাতে শ্যামাকান্ত ভাবিছে বসিয়া।
সম্বল চাকুরী তার গিয়াছে খসিয়া॥
ঘরে যে নাহিক তার চা'ল ডাল নুন।
'বসে বসে ছেলে ছুটী কেঁদে হ'ল খুন'।

ছেলে ছুটী কেঁদে হ'ল খুন
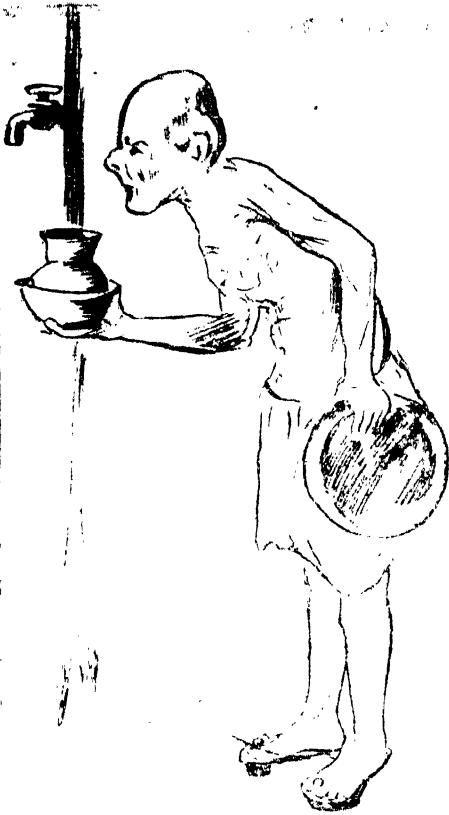
কোথা আছ যম

'কোথা আছ যম!'

অতি বৃদ্ধ রমাকান্ত, ঠেকিয়াছে দায়।
জল আনিবার তরে কল্‌তলায় যায়॥
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তার বন্ধ হয় দম।
দীর্ঘশ্বাস ফেলি বলে 'কোথা আছ যম'॥

উপসংহার—

দ্বিজ শ্রীশচন্দ্র বলে রমাকান্ত ভাই!
বাঙ্গালীর ইহা ছাড়া অন্য কোষ্ঠী নাই॥
ইতি শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রথম পুত্র শ্রীমান শ্যামাকান্তের শুভ (?) কোষ্ঠীপত্র সমাপ্ত।

রাঁচি-তীর্থ

[শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু রায় বাহাদুর]

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর উপাসনালয়

রাঁচি অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু আমি যে ভাবে আমার ভ্রমণ-সুখ উপভোগ করিয়াছি, সম্ভবতঃ সকলে সেভাবে করেন নাই; কিংবা, করিলেও, তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; তাই এই ক্ষুদ্র কাহিনীর অবতারণা।

বিগত ১৮ই এপ্রেল রাত্রি ৯॥টার সময় আমি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া, পরদিন বেলা ১১॥টার সময় গন্তব্য স্থানে উপনীত হই; এবং ৪ঠা মে বৈকালে সেখান হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে কলিকাতায়

প্রত্যাবর্ত্তন করি। মধ্যবর্ত্তী ১৫ দিন রাঁচিতে অবস্থান করিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি ও উপভোগ করিয়াছি, দৈনিক হিসাবে না লিখিয়া স্থূলভাবে তাহা পাঠকবর্গের গোচরে আনিব।

(শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত)
"মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি।"—রবীন্দ্রনাথ।

রাঁচিতে আমি—স্বর্গীয় মহারাজাবাহাদুর সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়ের দৌহিত্র, আমার অকৃত্রিম বন্ধু,—অতিথিবৎসল শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলি মহাশয়ের "সনি নুক্" (Sunny Nook) নামক সুরম্য ভবনে অবস্থান করি। সহরের উপকণ্ঠে মুক্তবায়ুমণ্ডিত "কোকার" নামক স্থানে সকলপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের আধার এই "সনি নুক্" আবাস প্রতিষ্ঠিত। রাঁচিতে এই আমার প্রথম গমন। গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যে ও সাহচর্য্যে আমি এখানে অনেক দর্শনীয় স্থানে গমন করিবার ও বরণীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট পরিচিত হইবার অবসর পাই।

একদিন অন্ধদিগের শিক্ষালয়ে গিয়া, তাহাদের হাতের তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর বেতের চেয়ার দেখিয়া আসি। আর একদিন রোমান ক্যাথলিক মিশন সম্পর্কিত কুমারীগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়া কেবল বালিকাগণের দ্বারা প্রস্তুত লেস, চিকন ও জরিরেশমের কাজ-করা কাপড়ের পাড় দেখিয়া আসি। ইহাদের বয়ন-নৈপুণ্য যথার্থই প্রশংসনীয়। শুনিলাম, কোন কোন পাড় গজ-প্রতি ২০।২৫ টাকা হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। সেই দিনে ক্যাথলিক-মিশন গির্জ্জায় গিয়া দেখিলাম, খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের সমক্ষে জনৈক বেল্‌জিয়ান পাদ্রী হিন্দুস্থানী ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন।

একদিন রাঁচির হাট দেখিতে যাই। হাট বুধ ও শনিবারে বসে। দূর গ্রাম হইতে কোলগণ (রমণীর ভাগই অধিক) এইখানে নানাদ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনে। স্থানীয়-নির্ম্মিত দ্রব্যের মধ্যে বেতের ঝাঁপি ও গামছার সুখ্যাতি আছে। হাটের নিকটেই রাঁচি পাহাড়। গাঙ্গুলি মহাশয়ের কর্ম্মকুশল আব্দালী কালার সাহায্যে অনেক কষ্টে পাহাড়ের শিরোভাগে উঠি। শুনিলাম, সেইখানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। শুনিলাম—কারণ তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দেখিতে কিছুই পাইলাম না। সুতরাং, বকাটে-লম্বমান ঘণ্টায় তিনবার ঘা দিয়া পুণ্যের ফল

(শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত)
"ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগর' পরি।"—রবীন্দ্রনাথ।

কিয়দংশে অর্জ্জন করিলাম,—এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এই পাহাড়ের অতি নিকটে রাঁচি হ্রদ। জলাশয়টি আয়তনে বৃহৎ, এবং ইহার গর্ভে স্থানে স্থানে বড় বড় গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সহর হইতে ৮ মাইল দূরে জগন্নাথ পাহাড়। এই পাহাড়ের শিখরদেশে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী বিরাজ করিতেছেন। হিন্দুস্থানী পূজারীর মুখে শুনিলাম যে, ছোটনাগপুরের জনৈক রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেবা-ব্যয়-নির্ব্বাহজন্য একটি মৌজা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। মন্দিরটি দর্শনযোগ্য। আর একদিন আমরা "কাঁকে" নামক গ্রামে যাই। এ গ্রাম সহর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে। এখানে ভারতের সকল স্থানের ইংরাজ বাতুলগণের থাকিবার জন্য বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, এবং একটি কৃষিশিক্ষা-ক্ষেত্র (Agricultural Farm) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জনশূন্য প্রান্তর; মধ্যে প্রকাণ্ড জনশূন্য অট্টালিকা; যেন রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসাধীনা রাজকন্যার নিভৃত-নিবাস।

বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়া একদিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত লাটভবনে যাই। বাহির হইতে বাড়ীটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু সুসজ্জিত কক্ষসমূহে প্রবেশ করিলে, এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয় যে, বাড়ীটি দেশী খোলায় আচ্ছাদিত একখানি বড় রকমের বাংলামাত্র। রাঁচি ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস; এবং এ প্রদেশের অন্যতম প্রধান কার্য্যস্থল বলিয়া অনেক সরকারী আফিস এখানে স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ ও দেশী কর্ম্মচারীদিগের জন্য ডোরুণ্ডা (Dorunda) নামক স্থানে অনেকগুলি বাসভবন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অল্প ভাড়া দিয়া তাঁহারা এই সকল বাড়ীতে বাস করেন। বাঙ্গালীরা এখানে "হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্" (Hindu Friends' Union) নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এটি সহরের কিছু বাহিরে। সহরের ভিতর রাঁচি ক্লাব নামক ইহা অপেক্ষা পুরাতন সমিতি বিদ্যমান। এখানেও সঙ্গীতচর্চ্চা ও মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। সঙ্গীতে আমার যৎসামান্য অনুরাগ আছে জানিয়া এই ক্লাবের সদস্যগণ একদিন আমাকে এখানে সঙ্গীতালোচনায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের অন্যতম মুসলমান ভূম্যধিকারী মিঃ ডব্‌লিউ পানে (Panee) মহাশয় "আটিয়া লজ" নামক তাঁহার ক্রীত ভবনে আর একদিন সঙ্গীত-চর্চ্চার আয়োজন করিয়া সেখানে আমায় সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই ভাবের নিমন্ত্রণ সর্ব্ব প্রথমে যাঁহার নিকট পাই, এইবার তাঁহার নাম করিব। শেষে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইলেও, গৌরবে তিনি প্রথম। তিনি—স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।
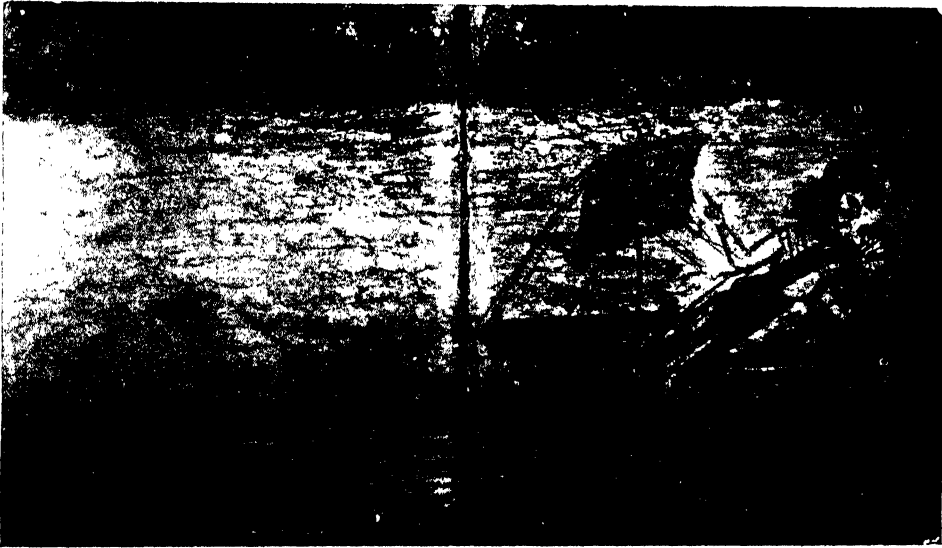
(শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত)
"কে যাবি পারে ওগো তোরা কে ?"—রবীন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর সহিত আমার বহুবর্ষব্যাপী বন্ধুত্ব হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া প্রথমে তিনি আমায়

চিনিতে পারেন নাই। চিনিবামাত্র তিনি যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সেই সঙ্গে আমার হৃদয়ে যে আনন্দ ঢালিয়া দিলেন তাহা অনুভূতির বিষয়—ভাষার অতীত। রাঁচিতে আসিয়া যিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিবেন, ও তাঁহার বাসস্থানে গমন না করিবেন, তাঁহার রাঁচিভ্রমণ সময় ও অর্থনাশ মাত্র। জ্যোতিঃ বাবু রূপ ত্রিবেণীতে সঙ্গীত,

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য ও চিত্রশিল্প এই ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। তাই এই বৃত্তান্তের নাম দিয়াছি "রাঁচি-তীর্থ"। জ্যোতিঃ বাবুর সহিত যে কয়েকদিন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে কয়দিন আমার রাঁচি-ভ্রমণের চিরস্মরণীয় দিন। নির্জ্জন-নিবাস জন্য তাঁহার পাঠাভ্যাস বাড়িয়াছে বই কিছুমাত্র কমে নাই। দেখিলাম, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান-প্রধান মাসিকপত্রগুলি তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া থাকেন; আবার অবসরমত এই সকল পত্রের জন্য মৌলিক বা ফরাসী হইতে অনূদিত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। তিনি কলিকাতা হইতে দূরে থাকেন বটে, কিন্তু সাহিত্য-জগতের সহিত তিনি একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি ছাড়িতে চাহিলেও, সাহিত্য-জগৎ তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়া বাংলা-ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন; নবাবিষ্কৃত ভাসের নাটকগুলির অনুবাদ করেন না কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমি মনে করেছিলেম এ কাজে হাত দিব; কিন্তু শুনেছি, অপর কেহ-কেহ অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন; তাই আমি ও-মতলব ছেড়ে দিয়েছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনার বিশেষ প্রিয় কার্য্য কি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বিশেষ কিছুই নাই; তবে অনেক দিন হ'তে একটা কাজ ক'রে আসছি, সেই কাজ এখনও মধ্যে-মধ্যে ক'রে থাকি।" জিজ্ঞাসিলাম—"সেটা কি?" উত্তর—"চিত্র দ্বারা গানের ব্যাখ্যা।" এই বলিয়া তাঁহার একখানি খাতা আমায় দেখাইলেন। দেখিলাম, তাহাতে নিজের, রবিবাবুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষের, এবং কাহার-কাহারও রচিত অনেকগুলি জন-প্রিয় গীত স্বরলিপি-সহযোগে লিখিত হইয়াছে। তাহার পরে প্রত্যেক গানের বর্ণনীয় বিষয় বা ভাব রঙ্গিন পেন্সিল দ্বারা ছবির আকারে প্রকটিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল চিত্রে জ্যোতিঃবাবুর যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্য ও কবি-সুলভ কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। আমি বলিলাম, "এই গুলির ফটোগ্রাফ করিয়া মাসিকপত্রে পাঠাইলে বঙ্গীয় পাঠক আনন্দিত হইবে।" তিনি বলিলেন—"চিত্র আঁকিয়া আমি তৃপ্তি পাই বটে, কিন্তু চিত্র দেখিয়া অপরে পাইবেন কি না, বলিতে পারি না।" তিনখানি চিত্র এই উপলক্ষে প্রকাশিত করিলাম।

সেক্সপিয়ার বলেন—

"The lunatic, the lover, and the poet
Are of imagination all compact."

জ্যোতিঃ বাবু একাধারে এই তিনই। তিনি ত কবি আছেনই। তিনি বিশ্বেশ্বর-প্রেমিক, সুতরাং বিশ্বপ্রেমিকও বটে। আর তিনি বাতুল। যেভাবে কথাটা ব্যবহার

করিলে ফৌজদারী আদালতের আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়াইতে হয়, অবশ্য সে ভাবে কথাটা প্রযোজ্য নয়। তবে তিনি যে একটু বাতিকগ্রস্ত, তত্র সন্দেহো নাস্তি। বাতিকটা আর কিছু নয়—যিনি তাঁহার সংস্রবে আসেন, তাঁহার মুখের রেখা-চিত্র পেন্সিল সহকারে অঙ্কন (Pencil Drawing)। এ পর্য্যন্ত তিনি চার-পাঁচশ এইরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি চিত্র বাছাই করিয়া বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী রথেন্‌ষ্টাইন (Rothenstein) সাহেব স্বরচিত উপক্রমণিকা সহকারে একটি এল্‌বামে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাঁচিতে যাঁহার সহিত জ্যোতিঃ বাবুর সাক্ষাৎ হয়, তিনি ছবি আঁকাইবার জন্য তাঁহার নিকট বসিতে বাধ্য হন। আমিও নিস্তার পাই নাই। সকলে দেখিয়া বলিলেন, আমার মুখাকৃতি ঠিক হইয়াছে। অঙ্কন-কুশলতা প্রদর্শন জন্য—অন্য কারণে নয়—চিত্রটি এই বৃত্তান্তের সহিত মুদ্রিত করা হইল। তবে আমার মুখ সম্বলিত হেড্‌টি ব্লকের সংস্রবে আসায় আমি কি অভিধা পাইবার যোগ্য হইলাম, তাহা নিজমুখে ব্যক্ত করিলে আত্মগরিমা প্রকাশ করা হয়।

এইবারে জ্যোতিঃ বাবুর বাসস্থান বর্ণন করিয়া কাহিনী সমাপন করিব। যে পাহাড়ে ইঁহার সুবৃহৎ রমণীয় ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম মোরাবাদি পাহাড়। বাস-ভবনের নাম "শান্তিধাম"। পাহাড়ের পাদমূলে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ বাবুর "সত্যধাম"। শান্তিধামের ইষ্টকালয়ের সমোচ্চ স্থানে কুসুমফুলগাছের নীচে একটি সিমেণ্ট-করা বেদি। প্রত্যূষে জ্যোতিঃ বাবু এইখানে উপাসনা করেন। পাহাড়ের শিখরদেশে বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত একটি হাওয়াঘর। সময়ে-সময়ে এখানেও উপাসনা করা হয়। পাহাড়ের অপর দিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে একটি গুহা; তাহার নিম্নে আরও একটি গুহা। নির্জ্জন-উপাসনার পক্ষে এমন একটি স্থান আর দেখা যায় না। অপর একটি স্থান "লতামণ্ডপ।" মোট কথা, জ্যোতিঃবাবুর অধিকৃত পাহাড়ে যত গুলি দেখিবার জিনিস আছে, রাঁচির অপর কোন স্থানে একসঙ্গে ততগুলি নাই। "শান্তিধাম" প্রকৃতই শান্তিধাম। এখানে আসিলে মন স্বতঃই শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। অপর পক্ষে, প্রাকৃতিক-দৃশ্যের প্রাচুর্য্য ও সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশে স্থানটি সংসারীরও বিশেষভাবে উপভোগ্য। জ্যোতিঃ বাবু স্থানটিকে এমনভাবে সাজাইয়াছেন, যেন এখানে স্বর্গের শ্রেয় ও পৃথিবীর প্রেয় সম্মিলিত হইয়াছে। তাই গেটের উক্তির অনুকরণে বলিতে ইচ্ছা হয়—

শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
(শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)

Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee hill Morabadi !
and all at once is said.

সোণার মল

(সমূলক)

[শ্রীদেব-দত্ত]

অস্মদাদির আধুনিক পেশা 'বেকার'। মধুপুরের ধূলিধূসর পথে স্বাস্থ্য-পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় প্রত্যূষে প্রদোষে সমলসমীরণ সেবন, অপ্রাপ্ত-বেতন এবং সহজ-সন্তুষ্ট সাঁওতাল-সর্দ্দার-হস্তে প্রাতে "মিশ্রিত খাঁটি সরিষার তৈল" মর্দ্দন, সন্ধ্যায় তথাকথিত হস্তে অতৈল অভঙ্গ-বিমর্দ্দন, "মা দিবা স্বাপ্সীঃ" নিষেধের বিশেষবিধি প্রদর্শন, বালুকা, কঙ্কর ও জোয়ার, ভুটাভূয়িষ্ঠ 'জাঁতাভাঙ্গা' টাট্‌কা আটা, "রহর দাইল" ও সজল গব্যরসের তিলতর্পণ প্রভৃতি স্বাস্থ্য-হিতকর নানাকার্য্যে অতিপাত করিয়া আট প্রহরের যে কয় দণ্ড বাঁচাইতে পারা যায়, তাহাতে শ্রান্তির সম্যক্ অপনোদন হয় না। সতেরো ঘণ্টা ঘুমাইতেছি। ২০।২২ খানার বেশী পত্র প্রত্যহ ডাকে যায় না। ইহার নাম 'রেষ্ট্ কিওর'।

এ চিকিৎসা ইচ্ছাকৃত নহে; বিধিবলে বাধ্য হইয়া—"Compulsory Volunteering।

চিরদিন কিন্তু "পদ্মাহারেই" কাটে নাই। Lotus-eating এর গণ্ডিতে পৌঁছিবার আগে আমি ছিলাম "জর্ণালিষ্ট" ও "প্রফেসার"। ফরক্কাবাদ গেজেটের প্রকাণ্ড স্তম্ভে সাদার উপর কালর আঁচড়ে অনেক সিভিল, আন্‌সিভিলের আতঙ্ক-জুগুপ্সার বহুবার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারাও সাধ্যপক্ষে আমার "স্থান গরম" করিবার প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই। ডিপোর্টেসন ও ইনটার্ণমেণ্ট আতঙ্ক তখনও জননীজঠরে।

বাড়াবাড়ি হইবার পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার দাবীতে হরিহরপুর স্বাধীন-রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের পদে আহুত, বৃত এবং নিযুক্ত হইলাম। সে অনেকদিনের কথা।

বাঙ্গালীর তখন এত দুর্দ্দশা হয় নাই। "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হলেও পরবাসে তাহার তখন খাতির ছিল। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহির করিয়া দিলেও সে "যথায় তথায় থাকি" অবস্থাতেই "তোমার রচনা মধ্যে তোমায় দেখিয়াই" ক্ষান্ত হইত না; অন্ন-বস্ত্র, ধন-ধান্য, মণি-সম্পদেরও প্রচুর অধিকারী হইত। এখনকার মত বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, নাগপুর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মান্দ্রাজ, বম্বে এবং স্বাধীন রাজ্যসমূহে বাঙ্গালীর তখন এত অখাতির, এত "দূর দূর", এত ফেরারী, পলাতক, দাগী আসামীর মত "ফেউ লাগা" ছিল না। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টার লালমোহন ঘোষ, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণের ন্যায় সুবাগ্মী, বাঙ্গালীর কৃতী সন্তান ভারতের যে প্রদেশে যখন গিয়াছেন, তখনই সেখানে প্রভূত সম্মান, সমাদর পাইয়াছেন এবং বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছেন। হ্যাট্‌কোট্ নয়, শুধু কোট-পরা বাঙ্গালীর তখন রেলে খাতির ছিল, দেশ বিদেশে "আধা সাহেব" বলিয়া সমাদর ছিল। ইংরাজীর চলন তখন বড়ই কম। ইংরাজী টেলিগ্রাম, চিঠি, দরখাস্ত পড়াইতে ও লিখাইতে প্রবাসী বাঙ্গালীর দরজায় অনেক রাজা-ওমরার দর্শন পাওয়া যাইত; "বাবুজী", "বাবু সাহেব" তখন এত হেয়, নগণ্য ছিল না।

কিন্তু "তেহি নো দিবসা গতাঃ।" গল্প করিতে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিব না। হরিহরপুরের রাজ-দরবারে বাঙ্গালীর প্রতাপ ও অধিকার তখন অক্ষুণ্ণ। হরিহরপুর আদর্শ রাজ্য হইবার চেষ্টায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। সকল উচ্চ পদেই বাঙ্গালী-কর্ম্মচারী; স্কুল-কলেজ বাঙ্গালীর আধিপত্যে পূর্ণ। রেসিডেণ্ট সাহেব নারাজ হইলেও বাঙ্গালীকে হটাইতে পারিতেছেন না।

(২)

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে বড় গণ্ডগোল গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব রাজার হঠাৎ কাল হয় ;—কেহ বলে সর্পদংশনে, কেহ বলে সর্পবিষে। যাঁহাদের চক্রান্তে এই সব গোল-যোগ ঘটে, তাঁহারা পাপের ফলভোগ করিতে পাইলেন না ; একজন দূর-কুটুম্ব আনিয়া গদীতে বসান হইল। বাঙ্গালীর সুশাসনে, সুকৌশলে হরিহরপুর "আদর্শ" রাজ্য হইয়া উঠিল। প্রজা সন্তুষ্ট, রেসিডেণ্ট সন্তুষ্ট, রাজা সন্তুষ্ট।

কাজেই বাঙ্গালীর বোলবোলা ;—আমারও চাকরী জুটিল। আরও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন। আমি ইংরাজীনবীশ ও সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ বলিয়া অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে শীঘ্র পসার জমিয়া গেল। কিন্তু কালও হইল তাহাতেই। একজন পাকা লোক চুপে-চুপে, কাণে-কাণে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতার কথা চাপিয়া গেলেই ভাল হয়।

কুক্ষণে সে কথায় কাণ দিই নাই। কিন্তু তারপর হইতেই সম্পাদকীয়-সমাজকে আমি জ্ঞাতি-শত্রুর ন্যায় মনে করি। সাধ্যপক্ষে তাঁহাদের ত্রিসীমানা মাড়াই না। আজ পেটের নিতান্ত দায়ে একজনের শরণ লইতে হইয়াছে। নতুবা তেলমাথানি সাঁওতাল চাকরের তিনমাসের "তঙ্কা" শোধ করিতে পারি না। না খাইয়া বাঁচিতে পারি, কিন্তু তেল না মাথাইয়া লইয়া ও গা না টেপাইয়া বাঁচিতে পারি না।

তাই "পূজার সংখ্যার" কলেবর যেন তেন উপায়ে পরি-পূরণ সংকল্পে সম্পাদকীয় শরণ-প্রয়াসী। তবে ইংরাজীতে লিখিয়াই আমার যত বিপদ, সেই জন্য ইংরাজী লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। ইংরাজীতে এককালে সিদ্ধহস্ত ছিলাম বলিয়া আমার ত পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাঙ্গলায় দখল তখনও ছিল না, এখনও হয় নাই। কিন্তু "পায়ে ব্যথা" হইলেও, এখন ইংরাজীতে পত্র-ব্যবহার পর্য্যন্ত করি না। ঘরপোড়া গরুর রোগে ধরিয়াছে।

তেলমাথার অভ্যাসটাও হরিহরপুরে বড়লোকের পাল্লায় পড়িয়াই হইয়াছিল। আজ পেটের দায়ে সেই গল্পই বলিতেছি।

শুনিতেছি, "আত্মকাহিনীর" আজকাল বড়ই কাটুতি। বাঙ্গালা কখনও লিখি নাই ; তবু পেটের দায়ে, স্বর্গীয় কালী-সিংহের "নিমন্ত্রণ বাড়ীর পচা ময়দা" কতকটা সংগ্রহ করিয়া আমার চাকরী যাওয়ার গল্পটা বলি। ইহার বলে সাহিত্যিক-সমাজে প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে। গল্পটা "বাস্তব" ;—"সম্রাট" বা "রথী" প্যাটার্ণের না হইলেও, খাঁটি "বাস্তব"।

যাঁহার কৃপায় হরিহরপুরের মরুময় কূলে এ দীনের ভগ্ন-তরী লাগিয়াছিল, তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ। মোটাসোটা গড়ন, সাদামাটা চাল, অগাধ বুদ্ধি ও সগাধ বিদ্যা। আট টাকার গ্রাম্য-পণ্ডিতি হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আট-হাজার টাকার দেওয়ানী পদে উঠিয়া-ছেন ; গৃহিণীর পায়ে সোণার মল উঠিয়াছে।

কথাটি ঠিক। বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালাদেশে পায়ে সোণা পরে না—পায় না বলিয়া ; "পড়ে পাওয়া" সোণা অবকাশমত বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজ হাসিল করিবার জন্য, বিদেশে পরে—চক্ষে দেখিয়াছি।

চক্রবর্ত্তী গৃহিণী গুণে সরস্বতী। গৃহস্থ বধূর অকারণ রূপের বর্ণনা করিতে নাই। নিতান্ত করিতে হইলে স্বর্ণ-লতার দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ফোটো ধার করিয়া আনিলে কার্য্য সহজ হইবে।

কর্ত্তার ন্যায় গৃহিণীর মোটা-সোটা গড়ন। খোঁপা বাঁধিবার অনেক যত্ন-আয়াস ছিল। রাজদরবারের কায়দা হিসাবে, "চুল-বাঁধুনী," "পান দিউনী", "পাখা-করুনী," "কাপড় ছাড়ুনী" সব হরেক-কিসিমের বাঁদী ছিল। ছিল না কেবল চুল। ছেঁড়া চুলের খোপা বাঁধিয়া ক্ষোভ নিবারণ করিতে হইত। স্থানীয় রেওয়াজ হিসাবেই হউক, আর বয়োধর্ম্মেই হউক, মাথায় কাপড় প্রায়ই থাকিত না। কাজেই বড়ির মত খোপাটা আমরা প্রায়ই দেখিতাম। চাকর-বাকর, আগন্তুক, মায় রাজাবাহাদুর পর্য্যন্ত দেখিতেন। দেখিতে পাইতেন না—অর্থাৎ প্রকাশ্যে—কেবল চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাঁহাকে দেখিলেই সেই ছেঁড়াচুলের খোঁপায় ঝটিতি ঢাকা পড়িত। আজকাল অনেক ইঙ্গবঙ্গ-গৃহেও—শুধু ইঙ্গবঙ্গ কেন, খাঁটি বঙ্গগৃহেও—এইরূপ লজ্জাশীলতার অভিনয় দেখিতে পাই। আমার সাধারণ খোলা মাথা, খোলা মুখ, দেখিতেছে, কর্ত্তার সাড়া পাইলেই যত লজ্জা।

ছেঁড়া চুলের খোপা বাঁধিতে, অন্য হিসাবে, ও অর্থে কর্ত্তা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নতুবা অরাজক হরিহরপুর সুশাসিত হইয়া আদর্শ রাজ্য গঠিত হইত না এবং অধীনেরও চাকুরী যাইত না।

দুঃখের কথা পরে বলিব। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর কথাটা শেষ করিয়া লই। নানাগুণে তিনি সমলঙ্কৃতা; দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহযত্ন করিতে এমন কেহ পারিত না। অতিথি-সৎকারে সিদ্ধহস্তা; অকাতরে অতিথি-সেবা করিতেন; অকাতরে পরোপকার করিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দরবারে সবাই ঘেঁসিতে পারিত না। স্ত্রীর সাহায্যে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর দরবারে অনেকেরই অবাধ-প্রবেশাধিকার ছিল।

সন্দেশ, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি গার্হস্থ্য-শিল্পে যাঁহার যে নৈপুণ্য ছিল, চাকুরে-পত্নীগণ সকলেই চক্রবর্ত্তী-গৃহে তাহার সর্ব্বদা "একজিবিশান" করিতেন। এটা যে খোসামোদ, তাহা তিনি জানিতেন এবং স্পষ্টই বলিতেন। কিন্তু হটিত না কেহ।

স্পষ্টবাদিত্ব তাঁহার একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ছিল। ঝামা দিয়া ঘসিয়া ময়লা সাফ করিয়া দিতে এমন আর দুটি দেখা যায় না। স্পষ্ট কথার সঙ্গে সত্য কথাও বলিতেন। বলিতেন "দেখ, সাত সমুদ্দার তের নদী পারে, সংসার ঘর ছেড়ে, বিদেশে এসেছি; খোসামোদ করেই বেড়েছি। আমার যে যেখানে আছে—মূর্খ হউক, পণ্ডিত হউক, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাদের চাকরি বাকরি, মাইনে-বাড়া—যা যা দরকার, তা হবার পর, তোমাদের যদি কোন উপকার কত্তে পারি—বলো, কর্ত্তাকে বল্‌বো!" এসব সঠিক, সটীক কথা মুখের উপর বলিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন, নতুবা ভাত হজম হইত না।

এই সব 'খোসামুদী'দের চক্রবর্ত্তী গৃহিণী অম্লানবদনে সর্ব্বদা বলিতেন, "দেখ, তোমাদের খোসামোদ আমি বেশ বুঝি। তোমাদের খোসামোদ কেন, খোসামোদ মাত্রেই বেশ বুঝি। খোসামোদের জোরেই কর্ত্তা আটটাকার পণ্ডিতি হইতে আট-হাজার টাকার দেওয়ানী পাইয়াছেন। শুধু বিদ্যা-বুদ্ধিতে নয়; বিদ্যাবুদ্ধির জোরে হইলে (মদ্‌গৃহিণীর প্রতি কটাক্ষে উক্তি) তুমি প্রফেসার-গৃহিণী, আজ আগে দাওয়ান-গৃহিণী হইতে। তা হয় না। তবে, কপাল বলিতে হয়, বল; তা না হলে, আমার এই গোদা পায়ে সোণার মল ওঠে!"

অস্মদ্‌গৃহিণীর সঙ্গে একজন মুখরা কায়স্থকন্যা ছিলেন। তিনি 'খোসামুদী' ক্লাসের অন্তর্গত নহেন, কারণ তিনি চাকুরের স্ত্রী বা উমেদারের স্ত্রী নহেন। হরিহরপুরে স্বামী-সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া আমাদের বাড়ী উঠিয়াছেন এবং অবশ্য দ্রষ্টব্য তীর্থ-হিসাবে ব্রাহ্মণীর সহিত চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী-দরবারে হাজির হইয়াছেন।

শ্লেষটা শুনিয়া গৃহিণী মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কথায় সম্মতি-অসম্মতি—যা বুঝিতে হয়, বুঝিয়া লও। প্রফেসার চাকরিটা তখন বজায় রহিল। কিন্তু গৃহিণী-সহচরী কায়স্থকন্যা ছাড়িবার পাত্রী নহেন; শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মাগো, বামুনের মেয়ের পায়ে সোণার মল! সইবে কেন?"

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী।—"কেন বাছা, সইবে না কেন? যার সয় না, তার সয় না। যে পায় না, তার সয় না! হিংসায় কি সওয়া বয়ে যাবে? তা যাবে না। কেন সয়ে ত বেশ গেছে? ছেলে-মেয়ে-জামাই-দৌহিত্র-পৌত্র নিয়ে সত্যিকার রাজার হালে রইছি। রাজা নিজে পায়ে সোণার মল পরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সে মল সইবে না ত কি তোমাদের মত কাঁসা-সীসা দস্তার মল সইবে? সোণার মল সয়েছে,—সইবে। স্বামী পুত্রের কোলে যাইব।"

কথাটি বাস্তবিক ঘটিল তাই। শেষ পর্য্যন্ত সেই পাঁচ সের ওজনের সোণার মল চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর পায় ছিল এবং স্বামীপুত্রের কোলে তিনিও গিয়াছিলেন।

প্রফেসার-গৃহিণীর সনির্ব্বন্ধ সকাতর "অন্তঃটিপুনীর" সঙ্কেতে, সখীর স্বামীকে বিপন্ন করিবার অনিচ্ছায় কায়স্থ-কন্যা আর উত্তর করিলেন না; চুপ করিয়া রহিলেন। কথা চাপা পড়িল।

(৩)

রাজার সোণার মল পায়ে পরাইয়া দেওয়ার কথাটাও ঠিক। সে কথাটাও এইখানে সারিয়া রাখি।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যখন প্রধান-মন্ত্রীত্বপ্রাপ্তির পালা, রাজা সাগ্রহে সে পদ তাঁহাকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু চতুর চক্রবর্ত্তী তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন,—"আমি সামান্য কর্ম্মচারী, আমার প্রধান-মন্ত্রীত্বের প্রয়োজন নাই, আমি সামান্যেই তুষ্ট।" কথাটা নিতান্ত শ্রুতিমধুর। অর্থ ও মতলব অন্যরূপ। প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য সব আদায় হইবে, অথচ নাম ও দায়িত্ব লইয়া লোকের "চোক টাটাইবার" অবকাশ দিতে ও রেসিডেণ্ট, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্পর্ক রাখিতে চক্রবর্ত্তী অসম্মত। ভিতরে আরও একটু কথা ছিল। প্রধান-মন্ত্রীত্ব জায়গীর মন্ত্রীত্বের

সঙ্গে-সঙ্গে তিরোহিত হয়। "সামান্য কর্ম্মচারীদের জায়গীর" পূর্ব্বেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদায় করিয়া "দরিদ্র ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর" করিয়া লইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। নামে প্রধান-মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া জায়গীরের স্থায়িত্বহানি করা তাঁহার 'প্রোগ্রামের' মধ্যে ছিল না। প্রধান-মন্ত্রীর পদের মর্য্যাদার চিহ্ন ও "খেলাৎ"—সুবর্ণ-বলয়। একদিন প্রকাশ্য দরবারে রাজা তাহা পরাইয়া দিতে আসিলে, বিনয়ী চক্রবর্ত্তী তাহা প্রভূত সৌজন্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজাকে সঙ্গে-সঙ্গে বলিলেন যে, "বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হাতে সোণার গহনা পরিলে হাস্যাস্পদ হইবে। আমাদের দেশে ইহা মেয়েরাই পরে, পুরুষে পরিলে নিন্দা হয়।" সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হইল। চতুর রাজা চতুর চক্রবর্ত্তীর টোপ গিলিলেন। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর দরবারে চক্রবর্ত্তীকে প্রসন্ন করিবার মানসে রাজার অবারিত গতি ছিল। রাজা যাইয়া দুঃখ জানাইলেন। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী-সাহায্যে দুঃখের উপশম-প্রার্থনা জানাইলেন, হাতে সোণার বলয় দিতে চাহিলেন। সোণার বালা, সোণার অন্যান্য গহনা রাজাকে দেখাইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী জানাইলেন, রাজার দৌলতে তাঁহার কোন অঙ্গে সোণার অলঙ্কারের অভাব নাই;—কেন—মহারাজ অকারণ খরচ করিবেন? রাজা দেখিলেন "মা-জীর" পায়ে সোণার অলঙ্কার নাই। মাড়ওয়ারী মেয়েরা সোণার গহনা পায়ে পরে; রাজা বাঙ্গালীর জন্য সে ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ সের ওজনের সোণার মল গড়ান হইল। রাজা নিজ-হাতে করিয়া লইয়া গেলেন। তাই চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর পায়ে রহিয়া গেল।

রাজা অতি সভ্য, বিনয়ী ও সদাচারব্রত; নিতান্ত বিলাসবর্জ্জিত। অনেক সময়ে উপাধান-বিহীন; ভূমিশয্যায় হাতে মাথা রাখিয়া, কিংবা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। অশন-বসন-ভূষণ সমস্তই দীনহীনের ন্যায়—ব্যবহারও দীনাদপি দীন। মুখে হরিনামের ন্যায় এক বুলি—"ভগবান চক্রবর্ত্তীকো হামারা আস্তে বনায়া।"

ক্ষত্রিয়-রাজার প্রণাম নিতান্ত আড়ম্বরের সহিত চক্রবর্ত্তী-মহাশয় প্রকাশ্য দরবারে পাইয়া এবং আদায় করিয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন - বড় হইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীর সাধনার মূলমন্ত্র ছিল—পরের অসাক্ষাতে রাজাসাহেব, রেসিডেণ্ট সাহেবের আকণ্ঠ তোষামোদ। "অন্নদাতার" "তোষামোদ" কিছু অশাস্ত্রীয় নহে; "জন্মদাতা" পিতা ব্যতীত অধুনা অন্যান্য সকল শ্রেণীর পিতাই—বিশেষ ষণ্ড কন্যা, বিবাহিতা—তোষামোদের যোগ্য। অতএব চক্রবর্ত্তীর দোষ ছিল না। একটু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, রাজাসাহেব স্বেচ্ছায় ও রেসিডেণ্ট সাহেব বন্দোবস্তমত প্রকাশ্যে চক্রবর্ত্তীর নিকট কিছু পরিমাণে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিলেন। রাজাকে চক্রবর্ত্তী বুঝাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "ডিঙ্গাইয়া" কোন কাজ করিলেই, রেসিডেণ্ট ও কর্ত্তৃপক্ষ বিশিষ্ট বিরূপ হইবেন; এবং রেসিডেণ্টকে বুঝাইয়াছিলেন যে, চক্রবর্ত্তীর সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজা ও প্রজাগণ সরকারের সম্পূর্ণরূপে বশে থাকিবে না। সরকারের মঙ্গলার্থেই চক্রবর্ত্তীর এরূপ প্রবল ও অখণ্ড প্রতাপের প্রয়োজন। "আসলে ঠিক থাকিলেই হইল" বলিয়া রেসিডেণ্টের ভাল না লাগিলেও সে সঙ্গীন সময়ে সে বন্দোবস্তে "সম্মতি লক্ষণ" জ্ঞাপন করিয়া তিনি চক্রবর্ত্তীর প্রতাপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন; সময়ে-সময়ে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়া সম্মানিত করিতেন। সে সব মাহেন্দ্রক্ষণেও চক্রবর্ত্তী রেসিডেণ্টের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাইতেন না—বিশেষ কোন আয়োজন করিতেন না,—বিশেষ কোন আদব-কায়দার অবতারণা করিতেন না। রেসিডেণ্টের পক্ষে তাঁহার বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা তাঁহার একটা নিত্য কর্ম্মেরই মধ্যে—নৈমিত্তিক নয়। প্রজারা ও রাজা তাহাতে বিশেষ মুগ্ধ।

আর রাজাও জড়ভরততুল্য। একদিন চক্রবর্ত্তীর তেলমাখান চলিতেছে, আমি দরবারে হাজির। "দরবারী" প্রথা আজকাল কলিকাতায় কোন-কোন দরবারে যে প্রণালীতে চলিয়াছে—দরবারীরা যথানিয়মে হুজুরে হাজির না হইলে যেরূপ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে শাস্তি-দণ্ডের প্রবর্ত্তন হয়—চক্রবর্ত্তী দরবারের নিয়ম তদপেক্ষা কঠোরতর ছিল। রীতিমত হাজিরার অভাবে কৈফিয়ৎ-তলব না হৌক, শ্লেষ-বিদ্রূপ-উপহাস অজস্র হইত; এবং সময়ে-সময়ে প্রকাশ্যে তলবও হইত। সে সব এড়াইবার জন্য, অথচ "দরবারীর নিয়মের অধীন হইয়া দরবারে হাজির হই না"—লোক-জানানি এইরূপভাবে দরবারে রীতিমত হাজির

হওয়াটাকে আমি অভ্যাস ও সাধনাবলে একটা Refined artএ পরিণত করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া, সহকর্ম্মচারিগণের ঈর্ষা ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলাম। যেন চক্রবর্ত্তীর "ভিজিট-রিটার্ণ" করিবার জন্য, সভ্যতার নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই, প্রত্যহ তদ্দরবারে হাজির—মনকে এইরূপে বুঝাইতাম, পরে বুঝুক্ আর নাই বুঝুক্।

তাহাতে ফলও হইয়াছিল। "সেলাম কখনও বৃথা যায় না"—এ ঋষিবাক্য সর্ব্বদা স্মরণপথে জাগরূক ছিল। চক্রবর্ত্তী এবং রাজা ও তদনুচরগণও খাতির করিতেন।

তেলমাখানর দরবারটা প্রায় "দরবার খাস।" চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা ও আত্মসম্মানের সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গামছা-পরিহিত চক্রবর্ত্তীর তৈল দরবারে উপস্থিতি অনেক সময়ে ধৈর্য্যের সীমার "পরপারে" লইয়া যাইত। তেল আমায় লইয়া যাইতে হইত, বা অঙ্গবিশেষে প্রয়োগ করিতে হইত—এ কথা যেন ভ্রমেও কেহ মনে না করেন; তৈলিক দরবারে আমি উপস্থিত থাকিতাম মাত্র।

"মর্দ্দনাৎ ন তু ভক্ষণাৎ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগে তৈল ব্যবহারের সমীচীনতা সম্বন্ধে অনেক লেক্‌চার ও ডিমনস্‌ট্রেশনের ফলে আমিও নিজ ক্ষুদ্র রাজ্যে তৈল আদায়ের দাবীদার হইয়াছিলাম; সে অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই। তাই আজ সাঁওতাল মালীর অপমান সহিতে হইয়াছে। লোকটা কাজই না হয় তিন মাস করিয়াছে, মাহিনাই না হয় তিন মাস পায় নাই, তা বলিয়া তৈলমর্দ্দনে পরাঙ্মুখ হইবে? ছোটলোকের এ অত্যাচার-অনাচার অসহনীয়। "ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাসের" উন্নতির জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহারা সাবধান হউন। যে সম্পাদক আমার এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ধন্য হইবার দুরাশা রাখেন, তিনি তিন মাসের সাঁওতাল মালীর বেতনের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়াও যদি "ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাশ" উন্নতির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী কয়েকটা আর্টিকেল ছাপান, তাহা হইলে আমি তাঁহার অবৈতনিক সহযোগী হইতে প্রস্তুত। অবৈতনিক অনেক কাজ অনেক সময়েই ত আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে;—দেশের হেন বড় মঙ্গলকার্য্যের জন্য যদি "শরীরং পাতয়েৎ", তাহা হইলে যথার্থ "মন্ত্রং সাধয়েৎ।"

তেল-মাখানর উৎকর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে আর্দ্দালী চোপদার হাঁপাইতে-হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "হুজুর সাহেব" আসিয়াছেন। 'হুজুর সাহেব' শব্দ নেটিভ-ষ্টেটে "বিদ্যাসাগর" "ন্যায়রত্ন" "সুরিরত্ন" "সরস্বতী", "ত্র্যম্বক" ইত্যাদির মত একজনকেই বুঝায়—"নাপরঃ"। তিনি স্বয়ং মহারাজ। মহারাজ দ্বারে উপস্থিত;—চক্রবর্ত্তী হাঁপাইলেন না, নড়িলেন না, উঠিলেন না; কাপড়—শ্রীবিষ্ণু, জেলে-গামছা—সামলাইলেন না; কেবল বলিলেন, "লেয়াও"। আমি ততক্ষণে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছি—চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের অভ্যাস মত ষ্টুডেণ্টস্ আসোসিয়েশানে "মিটিং আরেঞ্জ" করিবার ভাবে চৌকি টানিয়া গোছগাছ করিবার জোগাড় করিতেছি, দেখিয়া চক্রবর্ত্তী বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "কেন বাপু, তোমার অত ব্যস্তসমস্ত হবার দরকার কি? তোমার বাড়ীতে ত রাজা আসিতেছে না? 'সে' আমার কাছে আসিতেছে, 'তার' আদর-আপ্যায়ন, অভ্যর্থনার ভার আমার উপর। তুমি যেমন বসে আছ, তেমনি থাক।"

রাজা—রাজার মত রাজা—অন্নদাতা রাজা, চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপযাচক হইয়া উপস্থিত—তাঁহার অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের এই ত উদ্যোগ; তার উপর 'সে' 'তার' 'উস্কো' ইত্যাদি তাঁহার আখ্যা! আমি ত গলদ্‌ঘর্ম্ম। বিনীতভাবে বলিলাম, "যদি আপনাদের কোন গোপনীয় কথা থাকে, আমি না হয় সরিয়া যাই।" চক্রবর্ত্তী নাছোড়বান্দা, শুধু বলিলেন, "যেমন বসে আছ, তেমনি থাক।" বুঝিলাম, আমার সম্মুখে রাজার উপর আধিপত্য ও গৌরবটা আজ একবার দেখাইবেন। 'Taming of the Shrew'র নূতন সংস্করণ হইবে। ঝিকে মারিয়া বৌকে এবং রাজাকে মারিয়া প্রোফেসারকে শিখানর পালা। যেমন বসিয়া আছি, তেমনি থাকাটাতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি আসিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইব, কিংবা কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, অনুগ্রহ করিয়া শিখাইয়া দিন।" বিশেষ বিরক্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কতবার বলিব; ঠিক যেমন আছ, তেমনি থাক। তবে উপযাচক হইয়া, গায়ে পড়িয়া, রাজাকে জানান দিবার, পরিচিত হইবার, বড়লোক হইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকে, তবে এ সব আড়ম্বরের আয়োজন করিতে পার। রাজা তোমার কাছে আসে নাই, আমার কাছে আসিয়াছে।"

যাইবার অনুমতিও পাইব না, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্যও

করিতে হইবে—নিতান্ত বিপদে পড়িলাম; কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

"হুজুর সাহেব" হাজির। সামান্য পরিধান—বিনীত ভাব। মাটীতেই দেওয়ানের সম্মুখে মারওয়াড়ী শিষ্টাচার-সম্মতভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। মুখে চিন্তা-বিষাদের ছায়া। যেন বড় বিপন্ন।

বিশেষ কোন সম্ভাষণ না করিয়া, চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" উত্তর, "হেঁ বাবু সাহেব, পান্‌সাতঠো তার আয়া! কেয়া কর্‌নে হোগা কুছ্ নেই সমঝ্‌তা।"

বড়লাট রাজার এলাকায় শিকারে আসিবেন; এজেণ্ট বাহাদুর অকারণ তারের উপর তার দিয়া উদ্ব্যস্ত করিয়া নিজের চাকরি তামিল করিতেছেন। কাজ সামান্য—চতুর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ পাইয়া যথাকর্ত্তব্য সব করিয়া রাখিয়াছেন, রাজাকে জানিতে দেন নাই। কেবল এজেণ্টের তারগুলি পরের পর রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন মাত্র। কাজেই রাজা পাগল।

চক্রবর্ত্তী একটু ঘৃণাব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "লাট-সাহেব আয়েগা তো হোগা কেয়া। যো যো হোনেকা হায় সব হোগা। এতেনা ঘাব্‌ড়ানেকা কোন্ কাম হায়। যাও, অন্দরমে যাকে খাটিয়া পর আপনা পড়া রহো।"

রাজার সোয়াস্তি-শান্তি নাই। আবার কাঁদকাঁদস্বরে বলিলেন, "হেঁ বাবুসাহেব, সব বন্দোবস্ত্ ঠিক্ করিয়ে, যেইসন্ কুচ্ বখেড়া না হোয়।"

চক্রবর্ত্তী চটিয়াছেন; বলিলেন, "আচ্ছা হামারা উপর বিশ্বাস না হোয়—হামার বাত্ মান্‌নে কো মতলব না হোয়—যো খুসী হোয় করো, লেকেন হাম্‌কো ছোড় দেও।"

আমি কাষ্ঠাদপি কাষ্ঠ হইয়া বসিয়া আছি। রাজ্যেশ্বর রাজাকে "তোম" অভিধান বারংবার তৈলাভ্যঙ্গ চক্রবর্ত্তী-বদন-বিবর হইতে নিঃসৃত হইতে শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছি দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মুচকী মুচকী 'সারল্যের হাসি' হাসিতেছেন, দেখিলাম। বুঝিলাম, আজকার পালা এম্-এ উপাধিধারী ইংরাজীনবিশ জর্নালিষ্ট অধ্যাপককে দেখান, যে, বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়া বাঘ শাসন কি করিয়া করিতে হয়।

পালা সাঙ্গ হইল। আরও কাঁদকাঁদভাবে রাজা বলিলেন, "নেই বাবু সাহেব, খাপ্পা মৎ হোইয়ে, যো কুচ্ করনেকো করিয়ে, খরচাকা আস্তে কুচ ডর নেই।"

কথাটাই আসল তাই। 'খরচার' ব্যবস্থা হইল। সন্তোষের হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী রাজাকে অভয় দিলেন "খুচ্ ডর নেই। হাম মরা নেই, অন্দরমে খাটিয়া পর আপ্‌না পড়্ রহো।"

চক্রবর্ত্তী চান্ তাই। রাজা বিদায় হইলেন। চক্রবর্ত্তী উঠিলেন না, নড়িলেন না; বলিলেন, "ব্যাটারা আমার তেল মাখার সময় এসে মরে কেন? আমার স্বাস্থ্য আগে, না রাজার খাতির আগে। আপ্‌নি থাক্‌লে বাপের নাম।" চক্রবর্ত্তীর জয়জয়কার করিয়া নিঃশব্দে আমি স্থানত্যাগ করিলাম।

(৫)

তৈলশাস্ত্রে সেই অবধি আমার ব্যুৎপত্তি! দরবারের অভ্যাসটা হাড়ে-হাড়ে বসিয়া গিয়াছিল। কাজেই 'হাজরির' সময়টা বাড়ীতে আর কাটে না। হরিহরপুর মনোরম স্থান; রাস্তাঘাট সুন্দর; একটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা রাস্তার দুইদিকে সুন্দর সব বাড়ী; ভিতরে কিন্তু ময়লা গলি-ঘুঁজি যথেষ্ট। এইরূপ একটা গলির ভিতর আমার বাসা। কাজেই 'হাওয়া খাইতে' রোজ বৈকালে বাড়ী হইতে বাহির হইতেই হয়। গাড়ী একখানা রাখিয়াছিলাম। খেতে পাই না পাই, ঠাট বজায় রাখিতেই ত বরাবর বিপদ। সেই বিপদের বশবর্ত্তী হইয়া "হাওয়া-খেগো" বাবুদের দেখাদেখি মধুপুরে হবিবক্স মিঞার কাছে একটাকার জিনিস দশটাকায় ধারে লইতে রাজী হইয়া "কন্‌ট্র্যাক্ট" দিয়া বাড়ী করাইয়াছি। বাড়ীটা বেচিয়া ফেলিলে মালীর হাত হইতে নিস্তার পাই, তাহার দেনাও শোধ হয়। নূতন করিয়া ডবল্ ট্যাক্সর উপর মেথরের ট্যাক্স অকারণ দিতে হয় না। তা আর হইয়া উঠিতেছিল না। বেচিলেই বা "পূজার বন্ধে" যাইয়া থাকি কোথায়? ভুলিয়া যাইতেছি যে, আমার এখন বৎসরে ৩৬৫টা রবিবার।

দুঃখের কথা কথায়-কথায় উথলাইয়া উঠে; কহিয়া কিছু লাভ নাই।

সহরের হাওয়া ভাল লাগিল না। রেসিডেণ্ট সাহেব যে দিকে থাকেন, সে দিকটা ফাঁকা—হইতেই হইবে ফাঁকা। আবার সাহেবের ফটকের সম্মুখ দিয়া যার-তার

গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়াটাও সুযুক্তি নয়। "আইন," "নিষেধ" "বাধা" প্রকাশ্যে কিছু নাই বটে, কিন্তু না যাওয়া "ভাল।"

অতএব বুদ্ধিমানের মত গাড়ীখানা ফটক হইতে দূরে রাখিয়া ফাঁকা যায়গার দিকে খানিক বেড়াইয়া, বাড়ী আসিলাম। কয়েকদিন চক্রবর্তীর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। আজ একটু সুস্থবোধ হইল।

বাড়ী আসিয়া পূর্ণ বিশ্রাম লইবারও তখন অবকাশ হয় নাই। চক্রবর্তী-দূত আসিয়া "তলব" দিল। ইচ্ছা করিয়া গরহাজির এক জিনিষ, তলব অগ্রাহ্য করা দোস্‌রা। শিষ্ট-শান্তটির মত যাইয়া দরবারে উপস্থিত—বিলকুল "দেওয়ান-খাস"; কেহ উপস্থিত নাই। সে সময় বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য থাকে। অথচ আমার সম্মানার্থে বেবাক লোক সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি?

চক্রবর্ত্তী একটু ভাঙ্গা, ভারী গলায়, দীনহীন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে আমায় যেতে হচ্ছে কবে?" কথার মানে বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। চক্রবর্ত্তী বলিলেন "বলি, আগে একটু খবর পেলে ন্যাক্‌ড়াটা, বোচকাটা গুছাইয়া নিতে পারি। পথে খাবার, জলখাবারগুলাও ব্রাহ্মণী যোগাড় করিয়া লইতে পারে।"

ব্যাপার নিতান্ত লঘু নয় বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, "কি বল্‌চেন, বুঝ্‌তে ত পাচ্ছি না।" চক্রবর্ত্তী। "এমন কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; মাসের আজ ক তারিখ জান্‌বার জন্য অধ্যাপকের শরণাপন্ন সময়ে-সময়ে ত হতে হয়! তা এত দিন ছিলে কোথায়?" আমি বলিলাম, "শরীরটা ভাল ছিল না।" চক্রবর্ত্তী। "কলেজে যাওয়া কি বন্ধ? কই ছুটীর দরখাস্ত ত হুজুর-দরবারে পেশ দেখিনি।" আমি। "আজ্ঞে, কলেজ যাই বই কি, তবে শরীরটা ভাল ছিল না।" চক্রবর্ত্তী। "কলেজ যাও, আর এখানে আস্‌তেই যত দোষ! ভাল, ভাল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সব হয়। তা আর কোথাও যাও?" আমি। "আজ্ঞে না; এ কয়দিন আর কোথাও যাই নাই।" চক্রবর্ত্তী। "কলেজ আর বাড়ী—আর কোথাও যাওনি? সটান্ ব্রাহ্মণের সাম্‌নে মিথ্যা বল্‌লে? ঘোড়ার বাত ধর্‌বে বলে সহরের বাইরে ত গাড়ী-ঘোড়ার চলন-ফেরন দেখ্‌তে পাই।" আমি। "আজ একবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম বটে, সহরের বাহিরে। (নেটিভ-ষ্টেটে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি বলিয়া বেড়ান-চেড়ানটাও বাঁধাবাঁধির উপর রাখিতে হইবে, আর তৎসম্বন্ধে এত জেরা সহ্য করিতে হইবে—এ ত স্বপ্নেরও অতীত। যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম।) চক্রবর্ত্তী। "তার পর রেসিডেন্ট সাহেব বল্লেন কি—আমায় কর্ম্মে কবে ইস্তফা দিতে হবে?"

তখন ঘটনাটার আভাস একটু-একটু পরিষ্কার হইতে লাগিল। বুঝিলাম, গুপ্তচর রেসিডেন্টের ফটকের নিকটে আমার গাড়ী দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিয়াছে; আর ঝটিতি আমার তলব। কারণ তাঁহার ধ্রুব ধারণা হইয়াছে যে, আমি রেসিডেন্টের সহিত দেখা করার অনধিকার-চর্চ্চা পাপে পাপী!

বলিলাম, "রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নাই।" তপ্ত তেলে বেগুন পড়িলে যা' হয় তাই হইল! চক্রবর্ত্তী বলিলেন "দেখা হয় নাই কেন? সাহেব কি শুইয়া ছিলেন।"

আমি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর শুইয়া আছে, কি বসিয়া আছে, তার খবর আমি জানিব কি করিয়া। এ সব সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি ত দরবার হইতে গুপ্তচর পাই না।"

চক্রবর্ত্তী। বাপু চটো না—এ সব চট্‌বার কথা নয়। রেসিডেন্ট সাহেবের সঙ্গে তোমার কি দরকার, খুলে বল। সে দিন গরম হয়ে আমার ওখান থেকে উঠে গেলে; তারপর কি রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে আমার নামে চুক্‌লী কর্‌তে গিয়াছিলে?

বয়োবৃদ্ধ উপকারী এবং দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ব্রাহ্মণের কথার সমান উত্তর-প্রত্যুত্তর করা অবিধেয় বিবেচনায়, অপেক্ষাকৃত স্থিরস্বরে বলিলাম, "আমি রেসিডেন্ট সাহেব, কি কোন সাহেবের বাড়ীই যাই নাই। কেন বৃথা অনুযোগ করিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী অর্দ্ধপ্রসন্নভাবে বলিলেন "তবে গাড়ীখানা সাহেবের ফটকের অত কাছে ছিল কেন? প্রথম দিন ভরসা হয় না,—ভয় ভাঙ্গাতে গিয়েছিলে বুঝি? খবরদার, ও সকল মতলব করো না; বাঘের মুখে মাথা দিও না, বিপদ হবে।"

সাহেব যে এত ভয়ানক জীব, সে বিশ্বাস আমার ছিল না; কারণ, অনেক ভাল সাহেবের সঙ্গে কারকারবার

করিয়াছি। সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল বলিলাম, "ফটকের সাম্‌নে দিয়ে গাড়ী না হাঁকিয়ে, দূরে গাড়ী রেখে, ওদিকে একটু পরিষ্কার যায়গায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ইহার জন্য এত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, জানিতাম না।"

চক্রবর্ত্তী। "না হে, সে কথা হচ্ছে না। লোকের সহসা একটা সন্দ উপস্থিত হয়। রাজা সাহেবের কাণে এ কথা উঠলে, তিনিই মনে করতে পারেন, তুমিই বুঝি তাঁর নামে চুক্‌লী কর্‌তে গিয়েছিলে। সাবধান করবার জন্য কথাটা প্রণিধান করে দিলাম।"

দেখিলাম প্রয়োজনমত চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজাসাহেবকে আসরে হাজির করিয়া "জুজুর ভয়" দেখাইতেও বেশ জানেন। চুপ করিয়া রহিলাম।

খানিক বাদে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেখ, তুমি বড় সু ছেলে; শিষ্ট, শান্ত, ধীর, গম্ভীর। তোমার কলমের জোরও আছে, 'বুদ্ধি'ও আছে। এই যে কথাটা বল্লে,—সাহেবের ফটকের সাম্‌নে দিয়া গাড়ী না হাঁকাইয়া দূরে গাড়ী রেখে বেড়াতে যাওয়া ভাল, এটা বড় সুবুদ্ধির কথা। আর এম্‌নি বুদ্ধিই এখানে চাই। এই রকম বুদ্ধিটা যদি বরাবর রেখে চল্‌তে পার, আর আমারই সাক্‌রেদী কিছুকাল কর্ত্তে পার,—মানুষ হয়ে যাবে, আমার এই পদও চাই কি কালে পেতে পার্‌বে। কিন্তু রাতারাতি চেষ্টা করো না, সবুরে মেওয়া ফলে। আর নিতান্ত যদি সে তর্‌ না সয়, পূর্ব্বাহ্নে একটু খবর দিও। আমি মানে-মানে সরে পড়বার চেষ্টা করবো। কেন বুড়া বামনের অপমান করে তাড়াবে।"

"অপমান করে তাড়ানটা" কাকে হবে, বুঝিতে বাকী রহিল না। গ্রীষ্মে পচিয়া মরিয়া গেলেও রেসিডেন্ট সাহেবের বাগানের দিকে হাওয়া খাইতে যাইব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম।

চক্রবর্ত্তীর একটী মূর্খ সম্বন্ধী বহুকাল বাসায় বসিয়া আছেন। চাকরীর কোন সুবিধা না হওয়াতে, রাজা চক্রবর্ত্তীকে আপাততঃ খুসী রাখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা "পেন্সনের" বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। সুবিধা হইলেই চাকরী হইবে। সে সুবিধাটা বোধ হয় আমাকেই শীঘ্র করিয়া দিতে হইবে বুঝিলাম। কিন্তু চাকরী না হইয়াও পেন্সন হয়, জানিতাম না। সে দিন একজন "গুরু মহাশয়ের সর্দ্দারের" নিকট এই কথা পাড়াতে, তিনি আমার মুখ ছোট করিয়া দিলেন এবং চক্রবর্ত্তীর মূর্খ সম্বন্ধীকে মূর্খ বলা যায় না, প্রমাণ করিয়া দিলেন। "পেন্সন" কথাটার আভিধানিক অর্থ "টাকা দেওয়া"। "পেণ্ডুলাম" যে কথা হইতে উৎপন্ন, পেন্সনের উৎপত্তিও সেই কথা হইতে;—উভয়েরই অর্থ "ওজন করা"। আগে ওজন করিয়া টাকা দেওয়া হইত, তারই এটা জের। আমার ইংরাজীতে এম্‌-এ পাশ বৃথা হইয়াছে। এত ওজন করিয়া কথার মানে শিখি নাই। কিন্তু রাজা ওজন ঠিক্‌ জানেন, ঠিক রাখিতে পারেন। তাই চক্রবর্ত্তীর মূর্খ সম্বন্ধী "পেন্সন" পায়, এবং তাই তাহার শীঘ্র আমার শূন্য প্রফেসার-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে পেণ্ডুলামের মত ঝুলিয়া আছে, অবসরমত দোলও খাইতেছে। "পেণ্ডুলাম" ও "পেন্সনের" উৎপত্তি একই বটে। ওগীলবীর ডিক্‌সনারী বা "গুরুমহাশয়ের সর্দ্দারের" সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

(৬)

নিদেশবশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গলা দেশের উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদপত্রগুলা লওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ফরক্কাবাদ গেজেট, ইভনিং হোষ্ট প্রভৃতি প্রাণশূন্য নেটিভষ্টেট-পাঠোপযোগী যে কাগজগুলার সঙ্গে 'সম্পাদকীয় সম্পর্ক ছিল', তাহাই আসে! কাগজটা যখন পাঠায়, পূর্ব্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কিছু বা লিখিয়াও পাঠাই। একবার কালেজ-লাইব্রেরীর বিবরণ লিখিলাম,—বাড়ী আছে, আসবাব আছে, কিউরেটার আছে, ক্যাটালগ আছে, বই নাই ইত্যাদি—কিন্তু "কেট কেট্‌ গ্যাড়াম" ধরণের জিনিষ না হইলে সম্পাদকের মন ওঠে না। কখন বা হরিহরপুর-গেজেটের বর্ণনা লিখিলাম:—"ক্যাক্‌ষ্টনের আমলের হরফ যদি দেখিতে চাও, আদত চৈনিক সময়ের কাগজ যদি দেখিতে চাও, কিং ক্যানিউটের সিংহাসনারোহণের অকৃত্রিম বিবরণ যদি পড়িতে চাও, আর হরিহরপুর সংবাদ যদি কিছু জানিতে না চাও, তাহা হইলে হরিহরপুর-গেজেট নিয়মিতভাবে সংযত হইয়া পাঠ কর।" ইহাতেও সম্পাদকের মন উঠিল না। "শস্য" "পুষ্প" "বরাহ" "শিকার" প্রভৃতি কিছুতেই যখন সম্পাদকীয় মন উঠিল না—তখন হঠাৎ একদিন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন (?) হইল।

সহরের বাহিরে কোতোয়ালী; কোতোয়ালীর সম্মুখে ব্লাকী সাহেবের ফটো-ষ্টুডিও—"রাজার ফটোগ্রাফার"

২০০৲টাকা বেতন পান, করেন না কিছু, কেবল খান মদ। এ হেন শিল্পী—নিতান্ত "ব্ল্যাক" "বিমলিনবপু" ব্লাক সাহেব-বেশে হরিহরপুর দরবারে স্থান পাইয়াছেন। নানা দোষের মধ্যে অধমের সখের ফোটোগ্রাফীর নেশাও ছিল। মাঝে-মাঝে তাঁর ওখানে বেড়াইতে যাই—তবে মদের সেসন বসিয়াছে কি না, বুঝিয়া যাই।

কোতোয়ালীর" ভিতর "তুড়ুং" ছিল। চন্দননগরের তুড়ুং ঠোকার গল্প শুনিয়াছি, আর পিক্‌উইক্‌কে "ষ্টকস্"এ "তুড়ুং" ঠুকিয়া বসাইয়া রাখার গল্প পড়িয়াছি। হরিহরপুরে জীবন্ত তুড়ুং দেখিয়া 'হিষ্টরিকাল জর্ণ্যাল' কিংবা এই রকম একটা মৌলিক মাসিক পত্রিকায় প্রত্নতত্ত্ব সমালোচনা অবসরমত করিব, মনে করিয়াছিলাম। যে দিন সম্পাদকীয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন (?), সেই দিন ব্লাক সাহেবের বাড়ী চা খাইতে গিয়া দেখি যে, কোতোয়ালীর "তুড়ুং" সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবন্ত। কাঠ ক'খানা পড়িয়া ছিল—আজ তাহার গর্ত্তের ভিতর পা পূরিয়া প্যাচ বন্ধ চাবি বন্ধ করিয়া তিনজন বিশালকায় পাঠান "ইয়া আল্লা" "ইয়া আল্লা" বলিয়া গোঙ্গাইতেছে। পশ্চিমদিকে প্রচণ্ড সূর্য্য; সেই দিকে রৌদ্র-মুখ করিয়া তাহাদিগকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। অছিলা—নামাজের সুবিধা হইবে বলিয়া; কারণ ধর্ম্মচর্য্যায় বাধা হওয়া রাজদরবারের নিয়ম-বহির্ভূত। রৌদ্রের দিকে তাকাইতে না পারিয়া মুখ বাঁকাইতেছে, ঘুরিবার-ফিরিবার চেষ্টা করিতেছে,—পা বাঁধা বলিয়া পারিতেছে না। কখন হাত ঠেস্ দিয়া বসিতেছে, কখন ঝুঁকিতেছে, কখন শুইয়া পড়িতেছে, আবার পায়ে চাড় লাগাতে উঠিয়া পড়িতেছে। আরক্ত মুখ, গলদ্ঘর্ম্ম। তৃষ্ণা পাইলে খাইতে পারে বলিয়া পাশে ভাঙ্গা ভাঁড়ে জল,—পোকা ইজবিজ্ করিতেছে। কালগন্ধ চারটী ভাত পড়িয়া আছে, তাহাই বন্দীর আহার। মলমূত্র সেইখানেই ত্যাগ হইতেছে—চারিদিকে মাছি ভনভন্,—দুর্গন্ধে কার সাধ্য সে দিকে যায়।

উপস্থিত প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? "যা হোগ তা হোগ" হইলেও রাজকর্ম্মচারী বলিয়া সসম্ভ্রম সেলামে তাহারা জানাইল যে, তিন দিন বন্দীগণ এই অবস্থায়,—শীঘ্র বিচার হইবে। তাহাদের উপর সন্দেহ হয় যে, তাহারা বড় বদ্‌মাইস্।

বিচারে শাস্তি পাইয়াছে মনে করিয়াছিলাম; শুনিলাম, বিচারের পূর্ব্বেই এই বন্দোবস্ত। সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল। বিচারের পূর্ব্বেই এমন অমানুষ কাণ্ডের আচরণের কারণ জানিবার ইচ্ছা করাতে শুনিলাম, ইহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইতেছে না—কবুল করাইবার জন্য এই ব্যবস্থা।

ব্লাক সাহেবের সাম্‌নেই এই কাণ্ড হইতেছে তিন দিন, —তিনি নির্ব্বাক। চা খাইতে সে মাতালটার বাড়ীতে যাইতে আর ইচ্ছা হইল না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জানাইয়া প্রতীকার মানসে ফিরিলাম। পথে দুর্ভাগ্যক্রমে কল্পনা ফিরিয়া গেল। "তুষ্টুভিশ্চসাৎ" পত্রিকায় (থুড়ি, ইভ্‌নিং হোষ্ট কাগজে) আর্টিকেল লিখিয়া মনের জালা মিটাইতে ইচ্ছা গেল। সম্পাদক ভায়া এইবার প্রাণময় সংবাদ, জীবন্ত সংবাদ পাইয়া উত্তেজিত ও সুখী হইবার অবকাশ পাইবেন জানিয়া সুখী হইলাম।

রং-চং হইয়া সংবাদ 'ইভনিং হোষ্ট', 'ইভনিং হোষ্ট' হইতে 'আইরিশম্যান্,' তথা হইতে লাট দপ্তর, তথা হইতে হরিহরপুরে পৌছিল। আমার কাছে ছাড়া 'ইভনিং হোষ্ট' আর কারুর কাছে যায় না বলিয়া সংবাদটা ছড়াইয়া পড়িল না, কিন্তু গোপনও রহিল না।

চক্রবর্ত্তী স্বয়ং সকায়ে দীনাশ্রমে উপস্থিত। ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না। তবু যতক্ষণ পারি, ন্যাকা সাজিয়া রহিলাম।

চক্রবর্ত্তী।—"বলি, কি হে; ইভনিং হোষ্ট লইতে দাম দিতে হয় কত?" আমি।—"আজ্ঞে, দাম কিছু লাগে না। আমি ইভনিং হোষ্ট লই, কে বলিল?" চক্রবর্ত্তী।—"রাজ্যের মধ্যে তুমিই লও, আর কেউ লয় না, এ সংবাদ যদি রাজ ডাক-আপিশ না দিতে পারে, তবে রাজ্য চলিবে কিরূপে? তা দাম দাও না ত কাগজ গছাইয়া দেয় কেন?" আমি—"পূর্ব্বে সম্পর্ক ছিল, তাই দেয়।" চক্রবর্ত্তী।—"পূর্ব্বে সম্পর্ক ছিল, আর এখন নাই? তুড়ুং ঠোকার সংবাদ কে লিখিল?" আমি।—"ও সকল সম্পাদকীয় গুহ্য কথা আমি কেমন করিয়া জানিব, জানিলেই বা বলিব কি করিয়া?" চক্রবর্ত্তী।—"কেন, গুহ্য কথা যদি জান, ত প্রকাশে হানি কি? তুমি ত সম্পাদক নও যে, সম্পাদকীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে। আসল কথাটা খুলিয়া বল। এ লেখায়

তোমার ঢং, ছাপ, পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। এ ইংরাজী লিখিতে পাছে এমন ইংরাজীনবিশ হরিহরপুরে নাই।" আমি।—"হরিহরপুরের কেহ লিখিয়াছে, কোন ভ্রমণকারী লিখে নাই—কেমন করিয়া জানিলেন? আর ইংরাজীর এমন কি তারিফ আছে, কাগজ আনিয়া দেখি"—চক্রবর্ত্তী। —"বৃথা সে সাধনা। কাগজ তোমার বাড়ীতে নাই—রাজদপ্তরে গিয়া উঠিয়াছে।" আমি।—"এ বড় আশ্চর্য্য কথা; আমি জানিলাম না, আমার কাগজ আমার বাড়ী হইতে রাজদপ্তরে উঠিল কি করিয়া?" চক্রবর্ত্তী।—"নতুবা রাজ্য চলে না। কাগজ ত রাজদপ্তরে উঠিয়াছে, তুমি রাজঅতিথি হইয়া দিনকয়েক রাজখরচায় জামাই-আদর লাভ করিবে কি না, তারই তদ্বির হচ্ছে।—নিরপরাধ সাজবার চেষ্টা বৃথা। তুমি ছাড়া কেউ এ সংবাদ দেয় নাই। তোমায় বারবার বলেছি, ভূঁইফোড় হয়ে রাতারাতি বড়লোক হবার দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দাও। মাড়ওয়ারী রাজ্যে বাঙ্গালীর এ অখণ্ড প্রতাপ কি তোমার সচ্ছে না? স্বীকার করি, কাজটা বড় অন্যায় হয়েছিল। আমায় এসে বল্লেই ত প্রতীকার হত। খবরের কাগজে লেখা কেন? এসব কথা প্রকাশ হলে অন্নদাতার আর আমাদেরও অন্নসংস্থানের শেষ।"

সটান মিথ্যা বলিয়া ফল নাই; আর আমার তাহা সাধ্যও নয়। অতএব চুপ করিয়া দোষ স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকার করিতে হইল, সংবাদপত্রে আর লিখিব না। চক্রবর্ত্তী উপস্থিত বিপদ একরকমে কাটাইয়া দিলেন। কোতোয়ালের চাকরী গেল, আমারও কিন্তু চাকরী আর বেশী দিন নয়, বুঝিলাম।

(৭)

একদিন ক্লাশে পড়াইতেছি। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের কথা উঠিল। ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌টা কি,—ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম। এণ্ট্রান্স পাশ হইয়া তাহারা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেছে, এইবার এল-এ পরীক্ষা দিবে। হরিহরপুর কলেজ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার তখন প্রচলন হয় নাই। সুবিদ্বান অণ্ডারগ্রাজুয়েট্ কেহ বলিলেন,ইউনাইটেড-ষ্টেট একজন সেনাপতির নাম; কেহ বলিলেন, একটা নদী; কেহ বলিলেন, একটা হ্রদ। একজন বিকট আন্দাজে ভর করিয়া বলিলেন, ইহা একটা দেশ—তবে কোথা, কি বৃত্তান্ত, তাহা সে জানে না। শুনিয়াছি, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারেও এখন এরূপ ভৌগোলিক বিদ্যা অসম্ভব নয়।

শিক্ষকের দায়িত্বজ্ঞানের গুরুত্ব দুর্ভাগ্যক্রমে উপলব্ধি হইল। ম্যাপ আনাইয়া দেশটা দেখাইলাম। তাহার ইতিহাস কতকটা বুঝাইলাম। ওয়াসিংটন, আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, No taxation, no representation, Pilgrim Fathers প্রভৃতি সবই অল্প-বিস্তর আসিয়া পড়িল। ছেলেরা গো-গ্রাসে সেই সব ছাইভস্ম গিলিল—আনন্দিত ও উৎসাহিত হইল। গুরুর ধন্য-ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কেহ পড়ায় না, এমন কেহ বুঝায় না,—বিংশ কণ্ঠে শুনিলাম। প্রফেসার-জন্ম সার্থক হইল। বুক ফুলাইয়া বাড়ী আসিলাম।

আবার সন্ধ্যার সময় দরবারে তলব। অনেকদিন যাই নাই বলিয়া তলব মনে হইল। আজ কলেজের ব্যাপারে মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে। খ্যাতি-বিস্তার হইলেই শীঘ্র পদোন্নতি হইবে, আশা হইল। ফলিল বিপরীত।

চক্রবর্ত্তী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,"সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে তোমার কে হে?" বলিলাম, "তিনি বাঁড়ুয্যে, আমি ভট্টাচার্য্য, তিনি আমার কেহ ন'ন।" চক্রবর্ত্তী।—"সম্পর্কে কেহ না হউন, তুমি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বটে।" আমি।—"আজ্ঞে না, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মতান্তর।" চক্রবর্ত্তী।—অন্য বিষয়ে মতান্তর থাক্, No representation, no taxation বিষয়ে ত মতান্তর নাই। তা আমীর-ওমরার ছেলেদের কাণে এ সব বিষ ঢাল্‌লে চল্‌বে কি করে? ট্যাক্স-খাজনা বন্ধ হলে রাজাই বা চল্‌বে কি করে? আর, তোমার এই মোটা মাহিনাই বা চল্‌বে কি করে?"

দিনকয়েক পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কোন্ অধ্যাপক কিরূপ কাজ করেন, কে কি বলেন, ইত্যাদি। আমি সরলভাবে উত্তর করিয়াছিলাম, "আমার কাজ আমি করি, অপরের কাজের খবর রাখা, কি বলা, আমার অনধিকারচর্চ্চা হইবে; ও সব প্রিন্সিপালের কাজ।" আজ বুঝিলাম, সহযোগীদিগের মধ্যে সকলেই ডিটেক্টিভ কাজে নারাজ নন। সাহস করিয়া বলিলাম যে, "রাজার কলেজ হইতে যাহারা ইউনাইটেড্-ষ্টেটসের সংবাদ না রাখিয়া এল-এ পরীক্ষা দিতে যাইবে, তাহারা

কলেজের ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করিবে না, মনে করিয়া কর্ত্তব্য-বোধে সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কোন বিদ্রোহের কথা ত বলি নাই।”

চক্রবর্ত্তী।—“বিদ্রোহের কথা বল নাই বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সূচনা এই। ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌সের ম্যাপ দেখান, ইতিহাস-ব্যাখ্যা তোমার কাজ নয়। তুমি ইংরাজীর অধ্যাপক। ইতিহাস ভূগোলের অধ্যাপক তাঁহাদের কাজ করিবেন। এদিকে অনধিকার-চর্চ্চা করিতে যাও কেন? যদি চাকরি রাখিতে চাও, রেসিডেণ্ট সাহেবের কোপ হইতে বাঁচিতে চাও, খবরদার দ্বিতীয়বার এমন কাজ করিও না। রাজা সভ্যতা-প্রথানুমোদিত কাজ করিতেছেন, নতুবা ইংরাজের কাছে মান থাকে না। তাই দাতব্য-চিকিৎসালয়, পশুশালা, কালেজ ইত্যাদি করিতে হইয়াছে। আমীর-ওমরার ছেলেরা মূর্খ হইল, কি লেখাপড়া শিখিল, দেখিবার কাজ তোমার নয়। পড়াইতে হয় পড়াইয়া যাও। ছেলেরা বোঝে না বোঝে, সে খবরে তোমার দরকার নাই। কলেজের একজন ছেলে পাশ না হইলেও তোমায় এক পয়সা মাহিনা কাটা যাইবে না, তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। পড়াইবার কথা, পড়াইয়া যাও, ছেলেরা বুঝিল বা না বুঝিল, জানিল বা না জানিল, এ মাথাব্যথা নিষ্প্রয়োজন!”

নূতন শিক্ষা-সংস্কারপ্রণালীর ব্যাখ্যা শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। আমাদের পঠদ্দশায় এবং তৎপূর্ব্বে এ সকল উচ্চ তত্ত্ব, সার তথ্য শুনি নাই। কাজেই গলাধঃকরণ করিতে বিলম্ব হইল। দেশে আসিয়া পরে শুনিয়াছি যে এখন কলেজবিশেষে ইহাই সনাতন তন্ত্র। পূর্ব্বে এ শিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিলে কাজে লাগিত।

কাজটী গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধীকে এখন আর মূর্খ বলিতে পারি না; পেন্‌সনার হইতে অধ্যাপক-পদে উন্নীত হইলেন। আমি ‘যে তিমিরে সে তিমিরে’।

সোণার মলের সম্মুখে নতজানু হইয়া বিদায় লইলাম। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর চক্ষে জল দেখিয়াছিলাম। তাঁহার হৃদয় ছিল; কিন্তু ভাইয়ের চাকরী,—সে স্বতন্ত্র কথা। কলেজের উন্নতি শীঘ্রই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আশানুরূপ হইল। ফলে তাঁহার পদোন্নতি, সম্মানবৃদ্ধি, অর্থ-সুসার যথেষ্ট হইল। আমীর-ওমরা সন্তুষ্টমনে ট্যাক্স দিয়া যাইল।

দেশে আসিয়া পরে শুনিয়াছি, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং বর্ক প্রভৃতির লেখা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষাজগতের কোন কোন অধিনায়কের মত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত সম্পূর্ণ মিলে। তিনি অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ। সোণার মল বজায় থাকুক।

মালী মধুপুরের বাগান চষে। নিজের মহিষ আনিয়া বাগানে চরাইয়া সার বৃদ্ধি করে; গাছের আতা পিয়ারা পেঁপে হাটে বেচিয়া আমায় যা কিছু দেয়, অধিকাংশ নিজেই লয়; কারণ তিন মাসের মাহিনা বাকী।

কষ্টে চলিতেছে। বাঙ্গলা ভাষা অভ্যাস ত যথেষ্ট করিলাম—সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতাও পূর্ণমাত্রায় আছে। কিন্তু কিছুই লাগিতেছে না।

অলিগলি আবার অন্নদাতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সুবিধামত গ্রেপ্তার করিতে পারিতেছি না। যতদিন কোন একটা সুবিধা না হয়, সাহিত্য-চর্চ্চাই শ্রেয়ঃ। গল্পটী যদি তেমন তেমন চক্ষে পড়ে, কোন-না-কোন একটা উপায় হইতে পারিবে। আর আপাততঃ সম্পাদক মহাশয় গৃহিণীর জন্য হাটবারে দশ কাঁসা কি সীসার সাঁওতালী মল একজোড়া সংগ্রহের উপায় যদি নিতান্ত না করিয়া দেন, মালীর তিন মাসের বাকী বেতন ত নিশ্চয় দিবেনই। নতুবা অপর কোন সমূলক মাথামুণ্ড আবার মক্স করিয়া এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনের চড়া-দামে কেনা কাগজ ধ্বংস করিয়া “দরাজহাত” সম্পাদকান্তরের শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা শীঘ্রই করিতে হইবে। আশ্বিনের “জলধর-পটল সংযোগটা” নিতান্ত নিষ্ফল হইবে কি?

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া, সুমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়,—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "তুমি কি কোন দিন শান্ত-সুবোধ হবে না? তেম্‌নি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে—আমিও তা' হ'লে সঙ্গে যাবো" বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, "বেশ, চল।" আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল—"আহা! দেশ-বিদেশে তা' হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রাত্রে ভূত দেখ্‌তে গিয়েছিলেন! বলি, বাড়ীতে কি একেবারে আউট হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্না-পিত্তি-লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই?" বলিতে-বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, "কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি।" তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয় ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল, পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, "লোকের ভাবা-ভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জানো। তুমিই যে এত অধঃ-পথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?"

মুহূর্ত্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সজল হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ওই মুহূর্ত্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, "আমায় তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?"

"তুমি পিয়ারী।"

"সে তো সবাই জানে!"

"সবাই যা' জানে না, তা আমি জানি—শুন্‌লে কি তুমি খুসী হবে? হোলে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি, তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ কোরবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চল্‌লুম।"

পিয়ারী বিদ্যুৎগতিতে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?"

"কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?"

পিয়ারী কহিল,—"দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বল্‌লেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা' বলে দিচ্চি" বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক পা পিছাইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্ত্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না; কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে, জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্ত্তি করে; আবার দরকার হলে, ঘাড় মট্‌কেও খায়।" পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়াও পাইল না। তারপরে বলিল—"আমাকে তা' হলে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্ত্তি করে সত্যি, কিন্তু, ঘাড় মট্‌কাবার জন্যেই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে।" আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু, এ তো তোমার নিজের কথা; কিন্তু তুমি কি ভূত?"

পিয়ারী কহিল—"ভূত বই কি। যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা?"

একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, "এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু, সত্যি হোক্, মিথ্যা হোক্—নিজের মরণ আমি নিজে রটাইনি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুন্‌বে সব কথা?" তাহার মরণের কথা শুনিয়া, এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্ব্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কথনো যে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন্, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি—কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দ্দার-পোড়ো,—সেই সময়ে ইহার দুই-পুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী—দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন ৮।৯ বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেট্‌টা ধামার মত, হাত-পা কাটির মত, মাথার চুল গুলা তামার সলার মত—কতগুলি তাহা গণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোন দিন ছোট হইলেই, পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটা-ঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক্, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটু-খানি সংশয় হইল। তা সে যাক্। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্ত মশাই বাঁকুড়া হইতে বদ্‌লি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতি-রক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত, দত্তদের বামুন-ঠাকুর হাবা-গবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে জানা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল—"অত সস্তায় হবে না মশাই—বাজার যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা' জামাই খুঁজ্‌চেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে বোসে, আর-একবার ও-পিঁড়িতে বোসে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি। দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে, আর একশখানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না?" কথাটা অসঙ্গত নয়। তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর ৭০ টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে ৭০৲ নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, "তুমি কি ভাব্‌ছ, বোল্‌ব?"

"কি ভাব্‌চি?"

"তুমি ভাব্‌ছ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মার-ধোর করেছি। মার খেয়ে চুপ কোরে কেবল কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বল্‌চে, ত শুনিই না। না হয়, নাই গেলাম শ্মশানে। এই না?"

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, "হবেই ত। ছেলে-বেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা

যায়? সে একটা অনুরোধ করলে, কেউ কথনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে? চল, একটু বসিগে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুট্‌টা খুলে দিয়ে যা রে। হাস্‌চ যে?"

"হাস্‌চি, কি করে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।"

পিয়ারীও হাসিল; কহিল, "তাই বই কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আজই না হয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন ক'টা কথা কয়েছিলুম, শুনি? সে কি তোমার মারের ভয়ে নাকি? মনেও কোরো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে —দেখে চিন্‌তেও পারোনি!" বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কাণের হীরাগুলা পর্য্যন্ত দুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলাম যে ভুলে যাবো না। বরং, আজ চিন্‌তে পেরেচি দেখে, নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চল্‌লুম।"

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমিষেই একেবারে বিবর্ণ, ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, ভূত-প্রেত না মানো, সাপখোপ, বাঘ-ভালুক, বুনোশূয়ার এ গুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।"

আমি বলিলাম—"এ গুলোকে আমি মেনে থাকি, এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।"

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "তুমি যে ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল; তবু ভেবেছিলাম—কান্নাকাটি করে হাতে পায়ে ধরলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হল।" আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া, পুনরায় কহিল, "আচ্ছা যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা কিছু হলে, এই বিদেশ-বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বান্ধব কোন কাজেই লাগ্‌বে না, তখন আমাকেই ভুগ্‌তে হবে। আমাকে চিন্‌তে পারো না, আমার মুখের ওপর বলে তুমি পৌরষী করে' গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? আমি ত আর বল্‌তে পারব না,—এঁকে চিনিনে।" বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। আমি যাইতে-যাইতেও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, "বেশ ত, বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জান্‌তে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।"

পিয়ারী কহিল, "সে কি আর তুমি জানো না? একশ-বার 'বাইজী' বলে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনেমনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভাল হোতো। তোমাদের একটা শিক্ষা হোতো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা; একবার যদি ভালবেসেচে, ত মরেচে।"

আমি বলিলাম, "পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?" পিয়ারী বলিল, "জানি। কিন্তু, তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, আমাকে বেঁধে। এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।" আমি নরম হইয়া বলিলাম,—"বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা কিছু হবে। হলে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।"

পিয়ারী কহিল—"দুর্গা, দুর্গা! ছিঃ! অমন কথা বোলো-না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো,—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে, সেবা করে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুল্‌ব! তা হলে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম।" বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

"আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয় ত একদিন পূর্ণ করে দেবেন" বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম! তামাসা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠের "দুর্গা! দুর্গা!" নামের সকাতর ডাক কাণে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন্ যে আম-বাগানের দীর্ঘ, অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন্ নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলে রোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় সে জন্যও নয়। নভেল-নাটকেও বাল্য প্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই যে বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বর দত্ত ধন বলিয়া সগর্ব্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহার খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

"বাপ্!"

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর; এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলা যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশে সংখ্যাতীত গ্রহ-তারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই;—নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায় কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্য্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার "বাপ্" বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলা দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূর আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুটে প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে, তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জ্জীব হইয়া, যে প্রকারে রহিয়া-রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্ব্বে শুনে নাই,—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সে দিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু—অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে,—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে, দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে-ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন্ একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আওকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়,—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে, খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা সুরু হইবার আর বেশি দেরি নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর গিয়া চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া, প্রস্তুত

হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোনই সাহায্যই করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, "যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে, কষ্টভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তা' হইলে ভূত প্রেত থাক্ বা না থাক্, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।" সত্যই ত। এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচর ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত! সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙালী কার্য্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া-মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়। অন্ততঃ, আমার পক্ষে ত নয়; তবে কি না, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদি বা কাহারো হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি-জাগিয়া আমার এত দূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অপিচ, এম্‌নি একটা গুরুতর আশাই মাজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস কতকগুলা ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আরো একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড় মাস আছে, ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমক বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন-সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ, ধীরে-ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয় ত জানেন না, যে, মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা-গোছের শব্দ হয়। দেখিতে-দেখিতে আশে-পাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা হুতাশ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরাজিতে যাহাকে বলে "uncanny feeling" ঠিক সেই ধরণের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশী করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ, এরূপ ভয়ানক যায়গায় ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে সচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়াবহ স্থানে গিয়া-গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এই সব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভ্রম, এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুকরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই 'রাম' নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেত-ভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়া খেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কাণের উপর নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা এম্‌নি শীতল যে, তুষার-কণার মত সেই-খানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিঃশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, এক ফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্য্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার, স্তব্ধ, নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশে-পাশের হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল। কাণের উপর তেম্‌নি কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসে বিরাম নাই। এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের

ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এম্‌নি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চীৎকার কাণে পৌছিল—"বাবুজী! বাবু সাব্!" সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—"গুলি ছুড়বেন না যেন!" শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটাদুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সেই বটে। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমূলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিল,—"বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুড়বেন না—আমরা রতন।" রতন লোকটা যে সত্যই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু-একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটাদুই লণ্ঠন ও লাঠি সোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছট্টুলাল—সে তব্‌লা বাজায়; এবং আর-একজন পিয়ারীর দরওয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, "চলুন—তিনটে বাজে।"

"চল" বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল—"বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়েই এসেচি, তা বল্‌তে পারিনে।"

"এলি কেন?"

রতন কহিল, "টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি।" বলিয়া, আমার পাশে আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল—"বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে-বসে কাঁদ্‌চেন। আমাকে বল্‌লেন, 'রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-এক মাসের মাইনে তোদের বক্‌সিস্ দিচ্চি।' আমি বল্লুম, 'ছট্টুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি, মা; কিন্তু পথ ত চিনিনে।' এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বল্‌লেন, 'ওকে ডেকে আন্ রতন, ও নিশ্চয় পথ চেনে।' বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আন্‌লুম। চৌকিদার ছ' টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি ছেলের কান্না শুন্‌তে পেয়েছেন?" বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, "আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে,—"

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, "আজ কিছু দেখ্‌তে পেলেন, বাবু?"

আমি বলিলাম,—"না।"

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মা'র কান্না দেখ্‌লে কিন্তু—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।"

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ ও ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, "মা বলেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।"

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর-আগ্রহে, সজল চক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত উর্দ্ধশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, "আসুন?"

ক্ষণকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই। সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া কখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। ছি, ছি! এই পাগলের দল লইয়া যাব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতে পারিব না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "না রতন, এখন নয়—আমি চল্‌লুম।"

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—"

"পথ চেয়ে? তা' হোক্। তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়। আমার বড় ঘুম পেয়েছে, রতন, আমি চল্‌লুম" বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

জনসমারোহ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]
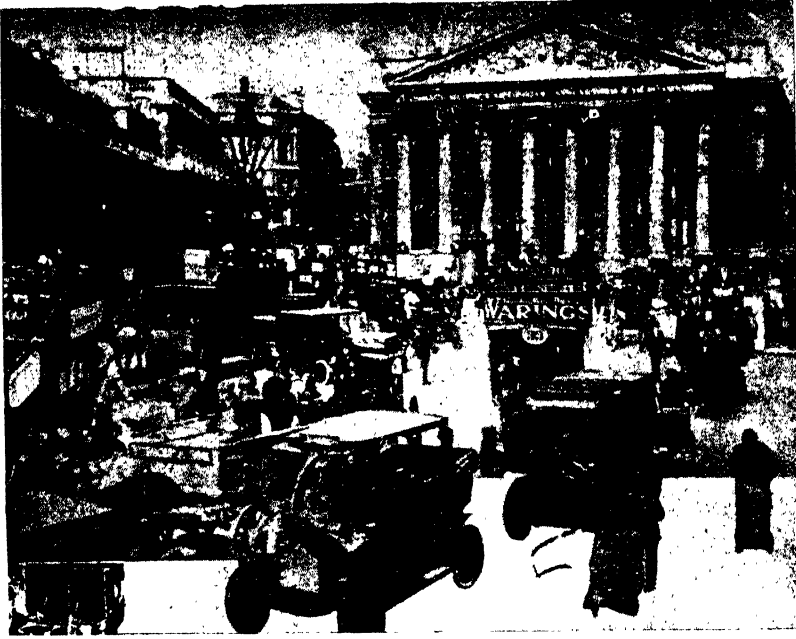
লণ্ডন—রয়েল এক্সচেঞ্জ। এই স্থান দিয়া প্রত্যহ ৫০০০০০ লোক যাতায়াত করে।

'স্বর্ণলতার' নীলকমল বিধুভূষণের সহিত সর্ব্বপ্রথম যখন কলিকাতায় পদার্পণ করে, তখন সে নগরের উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়া পথে জনকতক লোক ও খানকয়েক গাড়ী যাতায়াত করিতে দেখিয়াই, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—এত লোক! এত গাড়ী! তবে কি কলিকাতা কৃষ্ণনগরের মত বড় সহর!

আমরা আজন্ম কলিকাতা-বাসী; কিন্তু আমরা যদি কখনও লণ্ডনে যাই, লণ্ডনের রয়েল এক্সচেঞ্জ বা ম্যানসন হাউসের সম্মুখে অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করি, তাহা হইলে প্রথম-প্রথম আমাদিগকেও নীলকমলের মত বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিতে হয়,—"উঃ! এত লোক! এত গাড়ী!" বস্তুতঃ সপ্তাহের মধ্যে সাড়েপাঁচ দিন, অর্থাৎ যে কয়দিন ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, আপিস আদালতে কাযকর্ম্ম হয়, সেই কয়দিন লণ্ডন সহরের রয়েল এক্সচেঞ্জ, ম্যান্সন হাউস ও ব্যাঙ্ক এই সীমানার মধ্যস্থলে প্রত্যহ এত লোক ও এত গাড়ী যাতায়াত করে, যে পৃথিবীর অপর কোন স্থানে বোধ হয় এক এক দিনে এমন লোক-সমাবেশ হয় না। সরকারী হিসাবপত্রেই দেখা যায় যে, এইস্থানে পাঁচলক্ষ লোক
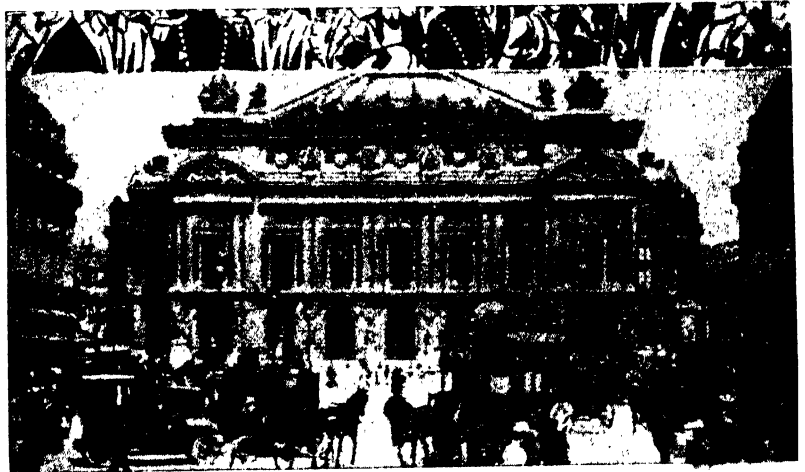
প্যারিস—'প্লেস ডি এল' অপেরা— ৪৫০০০০ লোক নিত্য গতায়াত করে।

সর্ব্বপ্রকারে ৫০০০০ গাড়ী নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকে। এই স্থানটুকুর পরিমাণ এক একার অর্থাৎ তিন বিঘা মাত্র!

ইহার মধ্যে আবার ম্যান্সন হাউসের ঠিক সম্মুখেই জনতা খুবই বেশী হয়। লণ্ডনের পুলিশ বৎসরকয়েক পূর্ব্বে একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল যে, এইস্থানে সাধারণতঃ গড়ে প্রত্যহ ১০০০০ গাড়ী ও ২৫০০০০ লোক যাতায়াত করে। অবশ্য যত দিন যাইতেছে, লোকজনের ও গাড়ীঘোড়ার চলাচল ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এখন সেখানে প্রতিদিন কত লোক যাতায়াত করে, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। এই যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা নিত্যনিয়মিত ঘটনা। পর্ব্বদিনে, কিম্বা জাতীয় উৎসব-দিবসে জনতার পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া যায়। সেই
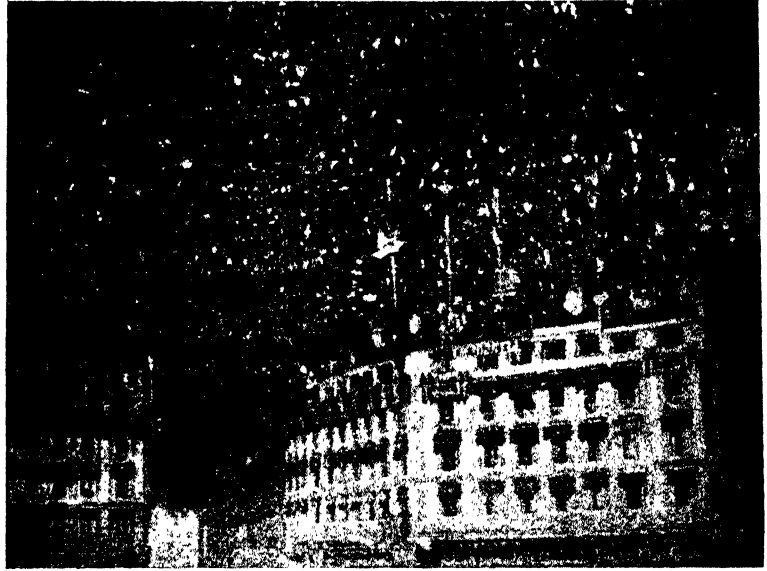
মাদরিদ—পোর্টো ডেল সোল। ৩৫০০০০ লোকের গতায়াত আছে।

বার্লিন—ফ্রেডরিকষ্ট্রাসি প্রত্যহ ৩০০০০০ পথিকের পদরেণু ধারণ করে।

পরিমাণ কত, আমরা তাহার নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম। পাঠক চিত্র দেখিয়া কিয়ৎপরিমাণে তাহার অনুমান করিতে পারিবেন। পূর্ণ একদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেবল দশ ঘণ্টা মাত্র এইরূপ জনতা দেখা যায়; অর্থাৎ ঘণ্টায় গড়ে ৪৫০০০ হইতে ৫০০০০ লোক পদব্রজে এইস্থান অতিক্রম করিয়া থাকে। রাত্রিতে কিন্তু এই স্থান সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য হয়, তখন এখানে ক্বচিৎ এক-আধজন লোক দেখা যায়।

লণ্ডনের পিকাডেলী সার্কাস নামক স্থানটীও নিতান্ত নগণ্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বেলা আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত দ্বাদশ ঘণ্টা কালের মধ্যে ১৬১৪০ খানা গাড়ী ও ৬৮৬৪০ জন লোক যাতায়াত করিয়াছিল। রাত্রি-কালেও জনতা সমানই থাকে; সুতরাং সমস্ত দিবারাত্রির হিসাবে ঘণ্টায় গড়ে বড় অল্প লোক এই স্থান দিয়া যাতায়াত করে না।

লণ্ডনের ন্যায় পৃথিবীর আরও কয়েকটি বড়-বড় নগরের রাজপথে জনতাবাহুল্য দৃষ্ট হয়। তবে ইহাদের কোনটিই লণ্ডনের সমান নহে। জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন নগরের অন্তর্গত ফ্রেডরিকষ্ট্রাসি নামক রাজপথটিও জনতাবহুল স্থান। এই রাজপথ, ও আণ্টারডেন লিণ্ডেন নামক রাজ-বর্ত্মের সংযোগস্থলে প্রত্যহ অপরাহ্ণকালে ও সন্ধ্যার সময়

ঘণ্টায় ৩০০০০ হিসাবে লোক চলাচল করিয়া থাকে। সমস্ত দিনে এইস্থান দিয়া তিনলক্ষ লোককে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরের গ্রাবেল নামক পথে প্রত্যহ ২৭৫০০০ লোক যাতায়াত করে। পেট্রোগ্রাড (ভূতপূর্ব্ব সেণ্টপিটার্সবার্গ) নগরের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। রুষিয়ানরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সর্ব্বপ্রধান রাজপথ দিয়া গতায়াত করিতেই ভালবাসে। পেট্রোগ্রাডে প্রস্পেক্ট নেভস্কী নামক রাজপথটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য তিন মাইল এবং ইহা অপর সকল রাজপথের অপেক্ষা প্রশস্ততর। ভ্লাডিমিরস্কি প্রস্পেক্ট নামক স্থানের নিকটে এই পথ দিয়া ঘণ্টায় ৩০০০০ এবং প্রতিদিন গড়ে ৩০০০০০ লোক গমনাগমন করে। রাস্তাটি এতখানি চওড়া যে ঘণ্টায় ৮০০০০ লোক যাতায়াত করিলেও কাহারও কোন অসুবিধা হয় না।

ভিয়েনা– দি গ্রাবেল। ২৭৫০০০ লোকে নিত্য যাতায়াত করে।

লণ্ডন, বার্লিন বা ভিয়েনা নগরের একটু বিশেষত্ব আছে। নগরগুলির প্রসার ও লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজপথে লোকের যাতায়াত কষ্টসাধ্য হওয়ায় জনতা কমাইবার উদ্দেশ্যে সহরের অন্যত্র অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সুন্দর রথ্যাসকল নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু মানব প্রকৃতির এমনই বৈচিত্র্য যে, লোকে এই সকল সুন্দরতর ও প্রশস্ততর রাজপথ অল্পই ব্যবহার করিয়া থাকে; যে সকল পথ দিয়া তাহারা পুরুষানুক্রমে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, যাতায়াতের অসুবিধাসত্ত্বেও, তাহারা সেই সকল পথের মায়া সহজে কাটাইতে পারে না। সুতরাং আধুনিক সুন্দর ও চওড়া রাস্তাগুলির অপেক্ষা প্রাচীন অপ্রশস্ত রাজপথগুলিতেই এখনও অধিক পরিমাণে জনসমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু রুষিয়ার রাজধানী

সেণ্টপিটার্সবার্গ—ভ্লাডিমিরস্কি। প্রত্যহ প্রায় তিন লক্ষ লোক এই পথ দিয়া চলে।

পৃথিবীর মধ্যে প্যারিস সুন্দরতম নগর, কিন্তু বাণিজ্যে প্যারিস লণ্ডনের সমতুল্য নহে। সেইজন্য দিবা-ভাগে কাযকর্ম্মের সময় প্যারিসের রাজপথে বিশেষ জনতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সৌখিনতায় অন্য কোন জাতি প্যারিসের নাগরিকদিগের সমতুল্য নহে। সেইজন্য

রাত্রিকালে নাট্যাভিনয়ের সময় প্যারিসের অপেরা হাউসের সম্মুখে অস্বাভাবিক জনতা দৃষ্ট হয়। প্যারিসের পুলিস হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, প্লেস ডি এল' অপেরা রাজপথ যেখানে বুলেভার্দ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় অভিনয়-রজনীতে ৬১০০০ খানা গাড়ী ও ৪৫০০০০ জন লোকের নিত্য সমাগম হয়।

রাজপথের জনতা হ্রাসের জন্য, লোকজনের যাতায়াতের সুবিধার জন্য, লণ্ডন ও প্যারিস নগরে রাজপথের নিম্নে, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ী চালানো হইতেছে। এই অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার এই দুই নগরের রাজপথে লোক ও গাড়ীর সংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু লণ্ডন ও প্যারিস নগরে ঠিক একরূপ ফল ফলে নাই। প্যারিসের রাজপথে হয় ত লোক-যাতায়াতের পরিমাণ কমিয়া থাকিতে পারে; অন্ততঃ পূর্ব্বের মতই আছে, বাড়ে নাই; কিন্তু লণ্ডনে হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, ভূগর্ভস্থ রেলপথে যাত্রীর যাতায়াত আরম্ভ হইলে, ভাড়াটিয়া গাড়ী সহরের রাজপথ হইতে অদৃশ্য হইবে; ফলে কিন্তু ঠিক উল্টা দাঁড়াইয়াছে; পাদচারীর ন্যায় ভাড়াটিয়া গাড়ীর সংখ্যাও বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। অথচ ভূগর্ভস্থ রেলপথ

জাপান, টোকিও—ও'ডোরি ষ্ট্রীট।
৩০০০০০ পথিক এই পথ ব্যবহার করে।

দিয়াও প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে ছাড়িতেছে না।

কেবল ইউরোপ নহে, এসিয়া এবং আমেরিকার নগর-সমূহেও এরূপ জনতাপূর্ণ রাজপথের অভাব নাই। জাপানের বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও নগরের ও ডোরি নামক রাজপথ জনবহুল স্থান বলিয়া গণ্য। সিম্বাসি রেলষ্টেশন হইতে স্পেক্টেকল্‌স ব্রিজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ জিনজা রাজপথের একাংশ ও-ডোরি রাস্তা বলিয়া পরিচিত। এই রাজপথ অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া এখানে প্রত্যহ তিন লক্ষের অধিক লোক যাতায়াত করিতে পারে না। রাস্তাটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত হইলে পথচারীর পরিমাণ নিঃসন্দেহ আরও বেশী হইত।

নিউইয়র্ক—ব্রডওয়ে। প্রত্যহ ৫০০০০০ লোক গমনাগমন করে।

স্পেনের রাজধানী মাদরিদ নগরের প্যুয়ের্টো ডেল সোল নামক পল্লীতে দশটী বিভিন্ন রাস্তা আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। সুতরাং এই দশ মুখে দশটী রাস্তা প্রত্যহ যে জনরাশি উদ্গীরণ ও

গ্রাস করিতেছে, তাহার পরিমাণ সাড়েতিন লক্ষের কম কিছুতেই নয়।

মার্কিন দেশের চিকাগো নগর লণ্ডনেরই ন্যায় জনবহুল

চিকাগো—ষ্টেট ষ্ট্রীট। ৪০০০০০ লোক নিত্য এই পথে ভ্রমণ করে।

কলিকাতা—হাবড়া সেতু। অনুমান ৩৫০০০০ লোক প্রতিদিন এই সেতু অতিক্রম করে।

স্থান। এথানকার ষ্টেট্ ষ্ট্রীট্ নামক রাজপথ দিয়া প্রতিদিন ৪০০০০০ লোক পদব্রজে গমনাগমন করে।

আবার নিউইয়র্কনগর লণ্ডনকে একেবারে হারাইয়া দিয়াছে। এথানকার ব্রডওয়ে নামক রাজপথ প্রত্যহ ৭ লক্ষাধিক লোককে বক্ষে ধারণ করিতেছে।

এইবার আমাদের খাস কলিকাতার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিলে, কলিকাতার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। পূর্ব্বে যে সকল নগরের নাম করিলাম, সেই সকল নগরের রাজপথে লোকসংখ্যা সরকারী বা বেসরকারীভাবে গণনা করা হইয়াছিল। কলিকাতায় কথনও এরূপ কোন গণনা হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে আমরা কলিকাতার হাবড়ার নৌসেতুর একাংশের একথানি চিত্র প্রকাশ করিলাম। তাহা হইতে পাঠকেরা অনুমান করিতে পারিবেন যে, হাবড়ার সেতু, চৌরঙ্গী ও লালবাজারের মোড়ে পাদচারীর সংখ্যা দৈনিক সাড়ে তিনলক্ষের কম নয়।

শ্রীশ্রীশিব-শক্তি

[মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীবিজয় চন্দ্ মহ্ তাব্ কে, সি, এস, আই ; জি, এম, ও]

দৃশ্য—কৈলাস।

(শঙ্কর যোগাসীন, পার্শ্বে উমা শিবপূজায় মগ্না—দূরে মদন ফুলশর নিক্ষেপ করিতেছেন ও তৎপশ্চাতে রতি ভীতা হইয়া দণ্ডায়মানা—এক প্রান্তে ব্রহ্মা ঋষিবেশে গান গাহিতেছেন—)

গীত।

রাগিণী নিশাসাথ—তাল ঝাঁপতাল।

পাবকে পড়িলে মলা, কভু কি থাকিতে পারে।
যোগীর চিতবিকার, রহে না নিমেষ তরে।
ভাবি নিজ ধৈর্য্যচ্যুতি, ধূর্জ্জটি কুপিত অতি,
কারণ অবধারণে, চাহিলেন চারিধারে।
হেরি ধৃত-ধনু দূরে ভীত-চিত পঞ্চ শরে,
রোষের বাড়বানল, জ্বলে মন-সিন্ধু নীরে।
তীব্র ভ্রূকুটি ভীষণ, হেরি ত্রস্ত ত্রিভুবন,
অধীর ধরণীধর, বারিধি ভীত অন্তরে।
শান্ত শ্বেত সুবদন, হয় লোহিতবরণ,
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কাঁপে ল'য়ে ওষ্ঠাধরে।
পিঙ্গল জটার ভার, ছোটে দ্রুত বারবার,
কালফণী সহ গর্জ্জে, সংসারবিনাশী স্বরে।
প্রভঞ্জন জিনি বলে, হারায়ে' তাপে অনলে,
বহিছে ভবনিঃশ্বাস, ভবনাশ করিবারে।
লোচনত্রিতয় ভালে, কোটী ভানু সম জ্বলে,
বিজিত তড়িত-তেজ, কেহ কি সহিতে পারে।
লোকচয় অনিবার, ভয়ে করে হাহাকার,
রুদ্রকোপে বিশ্ব কাঁপে, মদনে অতনু করে॥

(ত্রিলোচনের রোষকটাক্ষ—মদনান্ত—ভুবন কম্পিত—পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা—ব্রহ্মার প্রস্থান—ক্রমে শঙ্করের পার্ব্বতীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ও আধরুদ্ধ ও আধহাস্য বদনে পার্ব্বতীকে নিজপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গীত—)

গীত।

কীর্ত্তন।

আধ লাজ, আধ সাজ, শান্তা সুশীলা, অমলে।
আধ মধু, আধ বধু, শুভ্রা, সরলা, বিমলে॥
আধ গঙ্গা, আধ সিন্ধু, আধ ভানু, আধ ইন্দু,
আধ নাদ, আধ বিন্দু, স্বচ্ছ-সলিলা কমলে॥

(পার্ব্বতীকে গিরিশৃঙ্গে রাখিয়া শঙ্করের ভেরী ও ডমরু বাজাইতে-বাজাইতে নিম্নে অবতরণ—ভৈরবের ভেরী-শব্দে ভৈরব ভৈরবীদলের আগমন ও শঙ্করের তাহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য ও গীত—)

গীত।

ঝিঁঝিট কীর্ত্তন সুর।

বাজে, বাজে, বাজে, বাজে,
হৃদয়-তন্ত্রী বাজে রে,
(যবে) সাজে, সাজে, সাজে, সাজে,
মোহিনী বামা সাজে রে।
মাঝে, মাঝে, মাঝে, মাঝে,
ভামিনী মাঝে, মাঝে রে,
নাচে, নাচে, নাচে, নাচে,
মানসে রঙ্গে নাচে রে॥

(গাহিতে-গাহিতে নাচিতে-নাচিতে, শঙ্করের পার্ব্বতী-সকাশে গমন ও পার্ব্বতীর সম্মুখে নতজানু হইয়া গদগদ স্বরে গীত—)

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ-মিশ্র তাল কাশ্মিরী খেমটা।

অন্তঃসরোজে, বহিঃসরোজে
সরোজবাসিনি, কল্যাণি,
নিরুপমা বামা, ত্রিলোচনা শ্যামা,
ভবানি, পাষাণি, ঈশানি !

ভৈরব ভৈরবীগণ গাহিলেন—

জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর, ভবেশ, দেবেশ, হরে !

শঙ্কর পুনঃ গাহিলেন—

আনন্দরূপে আনন্দময়ী,
মঙ্গলালোকে মঙ্গলময়ী
সাধকপ্রাণে, পূর্ণ-প্রেমময়ী
ভকতি মুক্তি প্রদায়িনি !

ভৈরব ভৈরবীগণ গাহিলেন—

জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর, ভবেশ, দেবেশ, হরে।

(গীতান্তে শঙ্করের পার্ব্বতীর পদ-প্রান্তে শয়ন। আকাশ-মার্গে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব। শঙ্করের নাভিদেশ হইতে পার্ব্বতীর ষোড়শীরূপে শূন্যে অর্দ্ধ উত্থান, এবং ভৈরব ও ভৈরবীগণের গীত)

গীত।

রাগিণী দেশ-মিশ্র, তাল একতালা।

জ্ঞান-বিরহিতা শক্তি উন্মাদিনী কালী সম।
শক্তিহীন জ্ঞান তথা শবাকার শিবোপম ॥
এখনি ভীষণ স্বরে, মাখিয়া নর-রুধিরে,
কেবল মত্ত সংহারে, বিকট ক্রূর নির্ম্মম।
শিবে করি পরশন, হ'ল কি মূর্ত্তি মোহন,
প্রসন্ন হাস্য বদন, স্বভাব রুচির কম।
সংহারিণী বৃত্তিচয়, ক্রমে নিয়মিত হয়,
সর্ব্ব সদ্‌গুণ উদয়, নিবৃত্ত গুণ বিষম।
শক্তি জ্ঞান যুতা হ'লে, সাধুরা সুখী সকলে,
দুঃখ যায় অবহেলে, প্রচলিত সুনিয়ম।
তাই তারা শিব সনে, বিরাজ মা নিশি দিনে,
বিজয় হৃদয়াসনে, সবার বাসনা সম ॥

আগমনী

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি, এল,]

এসেছে জননী, ওই এসেছে জননী !
শ্যাম স্নিগ্ধ বরষার
বরিষণ নাহি আর,
সোণার রবির করে হাসিছে অবনী।
শুভ্র মেঘ থরে-থরে
ভেসে যায় নীলাম্বরে ,
পুলকে বিহগকুল গাহে আগমনী।

এসেছে জননী, ফিরে এসেছে আবার।
না পোহাতে বিভাবরী
শেফালি পড়িছে ঝরি'
ছেয়ে দিতে বনতলে পথখানি তাঁ'র ;
ধান্যক্ষেত্র ত্বরা করি'
সবুজ অঞ্চল ভরি'
নবীন মঞ্জরী আনি' দেয় উপহার।

এসেছে জননী—তাই পূজিতে চরণ
অতসী অপরাজিতা
রক্তজবা প্রস্ফুটিতা,
সরসী কমল দলে রচেছে আসন।
বায়ু বহে পরিমল,
ভরা নদী ছল-ছল
জননীর পদযুগ করে প্রক্ষালন।

জগত জননী আজি এসেছে ভুবনে ;
চারিদিকে কি উৎসব,
কি আনন্দ-কলরব,
তাই শুভ শঙ্খধ্বনি উঠিছে গগনে।
শুধু এ হৃদয়ে মোর
বরষার ঘনঘোর
টুটিবে না আজি কি গো শরৎ-কিরণে !

জননী, মিটিবে না কি বাসনা আমার ?
নাহি সে সাধনা-শক্তি
সে অচলা অনুরক্তি,
নাহি যে মা পূজিবার কোন উপচার ;
শুধু অশ্রুধারা দিয়া
ধৌত করিয়াছি হিয়া,
চরণ রাখিবে না কি সেথা একবার ?

merald Ptg. Works

স্বরলিপি

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নতুন কিছু করো। তাল—একতালা

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥॥
সা সা রে গা রে রে গা -রে সা সা রে গা রে রে
[নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু ক র]

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
॥ । । ॥ । ॥॥ ॥ । । ॥ । ॥॥
র্সা— র্সা র্সা র্সা নি নি ধা ধা ধা ধা পা পা
না ক গু লো সব কা টো কান গু লো সব ছাঁ টো,

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
॥ । । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥॥
পা পা পা পা পা পা ধা পা মা মা গা রে মা গা
পা গু লো সব উঁ চু কো রে মা থা দি য়ে হাঁ টো

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ॥ । ॥ ॥ । । ॥ ॥ । । । । । ॥॥
সা সা সা সা সা রে সা রে গা পা মা গা রে মা গা
হা মা গু ড়ি দা ও লাফাও ডিগ বাজী খা ও ও ড়ো ;

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
॥ । । । ॥ । ॥ ॥ । । ॥ । ॥॥
গা গা মা গা— রে— পা পা গা রে গা মা গা রে
কি ম্বা চি ৎ পাত হোয়ে— পা গু লো সব ছো ড়ো ;

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । । ॥ । ॥॥
সা সা সা সা সা সা সা সা— ধা— সা র্সা নিসারে রে রে
ঘো ড়া গা ড়ী ছে ড়ে এ খন বাই সি কি লে চ ড়ো ! [ ]

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
॥ । ॥ । ॥॥ । ॥ । ॥ । ॥॥
র্সা র্সা র্সা নি নি ধা ধা ধা ধা পা পা
ডাল ভা তের দ ফা ক র স বাই র ফা ;
কিম্বা স বাই ও ঠো টা উন হ লে জো টো ;
আর কি ছু না পা রো স্ত্রী দের ধ রে— মা রো ;
হ য়ে ছি অ ধী -র্ য ত ব ঙ্গ বী -র

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥॥
পা পা পা পা- পা পা ধা পা মা মা গা রে মা গা
ক র শিগ্ গির ধু তী চা দর নি বা রি ণী স ভা ;—
হি ন্দু ধ র্ম্ম প্রচার কর্ত্তে .আ মে রি কায় ছো টো ;—
কি ম্বা তাঁদের মাথায় তুলে না চো ভা লো আ রো ;—
এ খন ত বে কা টো সবাই নিজের নিজের শি র ;—

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
ধা সা সা সা ধা সা সা সা গা মা গা রে মা গা
প্যা ণ্ট প রো কো ট প রো নই লে নি ভে গে লে,
আম রা যে ন নে হাৎ খা টো হ্রয়ে— না যাই দে খো,—
একে — বা রে নিভে- যা চ্ছে দেশে— র স্ত্রী লো ক ;—

সা ধা সা সা সা রে রে রে গা মা গা রে— গা—
পা হা ড় থে কে— প ড়ো স মু দ্রে দাও ডুব ;

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
গা গা গা মগ রে রে পা পা গা রে গা মা গা রে
ধু তি চা দর হ'য়ে ছে যে নি তা স্ত সে কে লে,
খু ব খা নিক চেঁ চাও কি ম্বা খু -ব খা নিক লে খো,
বি, এ, এম, এ, ঘো ড়সো য়া রযা এ কটা কি ছু হো -ক্,
ম র্শে না হয় ম র্শ্বে এ কটা ন তুন হ বে খু -ব্,

সা— সা:সা সা সা সা সা ধ্সা— ধ্সরে— রে রে
কাঁ চ ক লা ছা ড়ো এ বং রো ষ্ট্ চ প্ ধ রো [ ]
বে ন্ মি ল্ ছা ড়ো আ বার ভা গ ব ৎ প ড়ো
যা হয় এক টা ক রো কি ছু রকম নূতন ত র [ ]
ন তুন র কম বাঁ চো কি ম্বা নতুন রকম ম রো [ ]

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্-এ মহাশয়ের "ফোয়ারার" নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়েছে। প্রাবৃটের বর্ষণে ফোয়ারার গর্ভে প্রচুর জল সঞ্চিত হইয়াছিল, শারদীয়া উৎসবের প্রারম্ভে অনেক নূতন মণি মুক্তা আসিয়াছে। কাযেই তাহাতে স্থানে স্থানে ঢল নামিয়াছে। মূল্য সেই একটী রৌপ্য মুদ্রা মাত্র।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের "পাষাণ" নামক নূতন কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইল। মূল্য আট আনা।

অন্ধকবি শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের "দুই ভ্রাতা" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ "পথহারা পথিক"এর পাথেয়—একটাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত "কুলবধূ"; বৌয়ের মুখ দেখিতে হইলে অন্ততঃ একটী টাকা চাই।

শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এই কন্যাদায় ও বরপণের বাজারে অতি সস্তায় (মাত্র আটআনায়!) "গায়ে-হলুদ" সারিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "সিরাজদ্দৌলার" চতুর্থসংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংস্করণে "অন্ধকূপ হত্যা" সম্বন্ধে অনেক নূতন-তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

আটআনা গ্রন্থমালার সপ্তম পুস্তক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত "দূর্ব্বাদল" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈকুণ্ঠের উইল" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর গল্প পুস্তক 'চিত্রপট" যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তের "ওথেলো" পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

হিন্দু-পত্রিকা—আষাঢ়, ১৩২৩

সম্বোধন—এ সংখ্যার 'হিন্দু-পত্রিকা'য় গত সাহিত্য-সম্মিলন সংক্রান্ত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। একটি—ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'সম্বোধন'। অন্যটি—প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'অভিভাষণ'। এ দুইটি রচনা সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বলিবার আছে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে একে একে তাহা বলিতেছি।

প্রথমেই স্বীকার করি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিকাংশ অভিভাষণই সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে,—অর্থাৎ তাহা শুনিতে যাইলে ঘুম আসে, এবং পড়িতে বসিলে মাথা ধরে,—নগেন্দ্রবাবুর 'সম্বোধন'টি ঠিক সে শ্রেণীর হয় নাই। ইহার প্রধান গুণ, ইহা অতিবিস্তৃতি-দোষে দুষ্ট নহে। ইহাতে তেমন উচ্ছ্বাস নাই—তেমন আড়ম্বরও নাই। দেশের ছোট-বড় সকল রকম প্রাচীন বিষয়ের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি প্রয়োগ করিবার জন্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ইতঃপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথাই আলোচ্য প্রবন্ধে অল্পের মধ্যে বেশ গুছাইয়া বলা হইয়াছে। কথাগুলি বাসি হইলেও মূল্যবান,—শুনিতে নেহাৎ মন্দ লাগে না।

তবে প্রবন্ধের প্রথমাংশে একটা কথা লইয়া সভাপতি মহাশয় কিছু গোলমাল বাধাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সে গোলমাল—ইতিহাস কথাটার অর্থ লইয়া। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝিতেন, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাও তাহাই বুঝিয়া থাকেন। তিনি বলিতেছেন, —"পাশ্চাত্য বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের মত ধরিলে, মহাভারতকেও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। আমাদের আদি ইতিহাসসমূহের সার মহাভারতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতে স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব, দেব-ঋষি-পিতৃ প্রভৃতি সকল প্রকার জীবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভারতের সকল প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ, দুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদায় জীবস্থান, ধর্ম্মরহস্য, কামরহস্য, বেদচতুষ্টয়, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ক নানা শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, প্রভৃতি লোকযাত্রাবিষয়ক শাস্ত্রসকল আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্ ইতিহাসের যেরূপ ব্যাপকতা বা বিষয়-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, মহাভারত-রূপ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সেইরূপ ব্যাপকতাই পাইতেছি।"—কিন্তু এ কথা কি ঠিক? যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বিবৃতি ধরিয়া নগেন্দ্র বাবু অত কথা বলিয়াছেন, তাঁহার লেখায় ত দেখিলাম আছে,—"It is evident that Freeman's definition of history as 'past politics' is miserably inadequate. Political events are mere externals. History enters into every phase of activity, and the economic forces which urge society along are as much its subject as the political result."—এ সংজ্ঞার দ্বারা কি ইতিহাসের এমন ব্যাপকতা বুঝায়, যাহাতে 'ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতে স্থাবরজঙ্গম সকল প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব' ও 'কামরহস্য' প্রভৃতি বিষয়কেও ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া গণনা করা চলে?

জানি না, নগেন্দ্র বাবু কি বুঝিয়া উহা লিখিয়াছেন। আমরা কিন্তু যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, উপনিষদে ও মহাভারতে ইতিহাসের যে সংজ্ঞা আছে, সে সংজ্ঞা পাশ্চাত্যেরা ত কোনকালে গ্রহণ করেনই নাই,—এদেশেও তাহা বহুকাল হইতে চলে না। নগেন্দ্র বাবু চাণক্য শ্লোকের দোহাই দিয়া ইতিহাস ও পুরাণকে এক কোঠায় ফেলিয়া ইতিহাসের ব্যাপকতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেশের পণ্ডিতেরাই বহুকাল হইল বলিয়া গিয়াছেন যে, ইতিহাস ও পুরাণ এক জিনিষ নহে। এ সকল উক্তির অনুকূলে আমাদের প্রমাণেরও অভাব নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ·· এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, উপনিষদের মধ্যে যে ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমাদের প্রস্তাবিত পুরাণ ও ইতিহাস—এ কথা কোনক্রমেই বলা যাইতে পারে না; কারণ, বেদভাষ্যে ও উপনিষদ্-ভাষ্যে মাধবাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টরূপে লিখিয়া গিয়াছেন এবং সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উপনিষদে ধৃত ইতিহাস ও পুরাণ স্বতন্ত্র; আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাস ও পুরাণ কোনক্রমেই ঔপনিষদিক ইতিহাস ও পুরাণ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, বেদের যে ভাগে দেবাসুরের যুদ্ধাদি বর্ণনা আছে, তাহার নাম ইতিহাস; এবং যাহাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত, তাহার নাম পুরাণ। যথা—'দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন।' অর্থাৎ, দেবতারা ও অসুরেরা পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বাক্য ইতিহাস। 'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ'। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই চরাচর বিশ্বের কিছুমাত্র ছিল না; এই সকল বাক্য পুরাণ।"

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু ইতিহাসের ও পুরাণের ব্যবধান মুছিয়া ফেলিয়া, ইতিহাস-সম্বন্ধীয় সকলের মতগুলিকে একসূরে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, তাহা এক নিতান্ত এলোমেলো খাপ্‌ছাড়া সুরে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাস বাহাকে বলে, তাহা তিনি ঠিক করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই।

পক্ষান্তরে, এই প্রসঙ্গে বলিতে আনন্দ বোধ হয় যে, প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেশেরই একজন বাঙ্গালী ইতিহাসের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতের অনেক মিল দেখিতে পাই।—রাজা রাজেন্দ্রলাল তখন লিখিয়াছিলেন, —"যে গ্রন্থে জন-সমাজের বা কোন ব্যক্তি বা রাজ-বিশেষের কোন ঘটনা-বিশেষের বা ঘটনা-সমূহের নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত অবিকল সত্য বর্ণনা লিখিত থাকে, তাহার নাম ইতিহাস। তথাপ্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে জনপদের আখ্যান ও রাজবর্গের রাজত্বকাল, রাজ্য-প্রণালী, বিচারের প্রথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধির জয়-পরাজয় প্রভৃতি আখ্যায়িকা, ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ব্যক্ত হইয়া থাকে।" —'বিবিধার্থ সংগ্রহ' অতি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ইতিহাসের এ সংজ্ঞাটুকু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক-সাধারণের ইহা প্রণিধানযোগ্য।

সভাপতির অভিভাষণ—"যাঁহারা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের উচ্চতম আসনে সমাসীন, এইরূপ একজনকে জাতীয় সভায় সভাপতির পদে বরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য"—এই কথা বলিয়া বর্দ্ধমান-অধিপতি যে পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, দশজনের মুখ চাহিয়া শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেই প্রধান সভাপতির আসনে বসিয়া মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যে 'অভিভাষণ' পাঠ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এমন বাজে কথায় পূর্ণ, এমন শৃঙ্খলাবিহীন 'অভিভাষণ' যে বাঙ্গালীকে কখনও কোনও সাহিত্য-সম্মিলনে বসিয়া শুনিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য এখন আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নহে। এখন সে বড় হইয়াছে,—বাহিরের পাঁচজনের সহিত এখন তাহার আলাপ-পরিচয় হইতেছে। এমন অবস্থায় এই সাহিত্যের সম্মিলনে যিনি বঙ্গের সাহিত্যিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন, তিনি যে অন্ততঃ দায়িত্বের খাতিরেও কিঞ্চিৎ মাথা ঘামাইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বীয় স্বাধীন গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবেন, ইহা সাহিত্যামোদী মাত্রেই আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু এমনই আমাদের অদৃষ্ট যে, সম্মিলন-ক্ষেত্র হইতে কেবল আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ লইয়াই অধিকাংশ সময়ে আমাদিগকে ঘরে ফিরিতে হয়। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রই, যেন মনে হয়, তাঁহাদের সাহিত্যিক ভূয়োদর্শনের সাহায্যে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের নাড়ী পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া, আর প্রায় সকল অভিভাষণেই 'ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত' শুনিয়া আসিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণটি এ হিসাবে সকলের সেরা হইয়াছে। 'যাস্ক, পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন', 'কালিদাস লঙ্কায় দেহত্যাগ করেন', 'সংস্কৃত সাহিত্য ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে' প্রভৃতি সংবাদে ইহা পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস, ছন্দস্ ও জেন্দ্‌ভাষার সম্বন্ধ, চীন, জাপান ও যবদ্বীপে সংস্কৃত-প্রচার, লঙ্কায় সংস্কৃত-চর্চ্চা, বাগ্‌দাদে সংস্কৃতের আদর, অশোকের সময়ের ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি—অর্থাৎ, যাহা কিছু সভাপতি মহাশয়ের জানা আছে, এবং যত-কিছু বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত, সেই সকল কথাই তিনি অম্লানবদনে সম্মিলিত সাহিত্যামোদীদের গলাধঃকরণ করাইয়াছেন। অথচ এ সম্মিলন যে সংস্কৃত সাহিত্যের নহে,—বঙ্গীয় সাহিত্য-বিষয়ক, তাহা বোধ করি তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই।

এ 'অভিভাষণে' বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা যে কিছু নাই, অবশ্য এমন বলি না। প্রবন্ধের শেষাংশে উহার যৎসামান্য আলোচনা আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ যৎসামান্য আলোচনাটুকু না থাকিলেই বরং ভাল হইত। কারণ, উহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কোনও বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর পক্ষেই প্রশংসার কথা নহে। যে নিধুবাবু টপ্পার রাজা বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"ভক্ত রামপ্রসাদ সেন ও নিধুবাবুর সাধন-সঙ্গীতে বঙ্গভাষার যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।" যে প্যারীচাঁদ মিত্র সংস্কৃতানু-সারিণী বঙ্গভাষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, এদেশে সর্ব্বপ্রথম কথনের ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভূদেব ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের সহিত এক 'ব্রাকেটে' ফেলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ইঁহারা "সংস্কৃতের প্রভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।" তারপর 'নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছেন' বলিয়া তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন, অথচ সে ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নামোল্লেখ করেন নাই।—এই রকম উদ্ভট মন্তব্য আরও আছে,—রচনা ভারাক্রান্ত হইবে, এই ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩২৩

কলিকাতার রঙ্গালয়—এদেশে একদল লোক আছেন, তাঁহারা কলিকাতার রঙ্গালয়গুলির উপর রাতদিনই খড়্গহস্ত।—রঙ্গালয়ের নাম শুনিলেই তাঁহারা তৈলে-বার্ত্তাকুবৎ জ্বলিয়া উঠেন। তাঁহাদের ধারণা, কলিকাতার রঙ্গালয়গুলি বরাবর দেশের ও দশের অনিষ্ট সাধনই করিয়া আসিতেছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা পেশাদারী রঙ্গালয়গুলিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, 'প্রবাসী' পত্রেরও এই মত। এ

সংখ্যার 'প্রবাসী' বলিতেছেন,—"অধ্যাপক পেড্‌লার যেরূপ কারণে আমাদিগকে যেখানে-সেখানে জ্বলনশীল দিয়াশলাই কিনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তার চেয়ে অনেক গুরুতর কারণে সর্ব্বসাধারণকে কলুষিত-চরিত্রা অভিনেত্রীদের অভিনয় না দেখিতে অনুরোধ করি।"

রঙ্গালয়ের যে কোনও দোষ নাই, অবশ্য এমন কথা বলি না। কিন্তু দোষ যে কিসের নাই, তাহাও দেখিতে পাই না। পৃথিবীতে প্রায় সকল জিনিষেরই ভাল ও মন্দ দুইটা দিক আছে। যাহার নিকট আমরা মন্দের চেয়ে ভাল বেশী পাই, তাহাকে আমরা ভাল বলি। আর যাহাতে ভাল অল্প,—দোষের ভাগই বেশী, তাহাকে আমরা মন্দ বলি। এই হিসাবে বিচার করিলে রঙ্গালয় জিনিষটাকে কি মন্দ বলা যায়? হয় ত দুই-চারিজন এই সংসর্গে মিশিয়া অধঃপতনের পথে গিয়াছেন, কিন্তু এই রঙ্গালয়ের দ্বারা দেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা কি 'প্রবাসী'র লেখক একবারও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

গিরিশচন্দ্রকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি,—'রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়। নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়। রঙ্গমঞ্চের কার্য্য—দেশের কার্য্য।'—ইহা শুধু শুনা-কথা নহে—জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতার রঙ্গালয়গুলি 'সৎনাম', প্রতাপাদিত্য', 'শিবাজী' ও 'মেবার পতন' প্রভৃতি নিত্য নূতন নাটক অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে। এ কথা অস্বীকার করিবার আদৌ উপায় নাই যে, "আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও তন্নিহিত স্বদেশহিতৈষণার অভিনব ও প্রাণময় আদর্শ—এতদুভয়ই বহু পরিমাণে বাঙ্গালা নাট্যশালা ও বঙ্গীয় রঙ্গালয় সকলের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফল। আরও অনেকে এক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গ রঙ্গালয়-সমূহ যেরূপভাবে যতটা বিস্তৃতরূপে ও যে পরিমাণ সফলতাসহকারে এ কার্য্য করিয়াছে, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। সর্ব্বপ্রথমে—সে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চই নীলদর্পণ, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, শরৎ-সরোজিনী, পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতমাতা প্রভৃতি নাটক ও রূপকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে এক উন্মাদিনী স্বদেশহিতৈষণা জাগাইয়া দেয়। সমাজ-সংস্কারেও তখন বঙ্গ-রঙ্গালয়-সকল অল্প সাহায্য করে নাই! কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রকটিত করিয়া সময়োপযোগী সংস্কার-কার্য্যেও জনগণকে ইহারা প্রচুর পরিমাণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।"

বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয় করা হয় বলিয়াই, কলিকাতার রঙ্গালয়গুলির উপর 'প্রবাসী'র অত আক্রোশ। কিন্তু এই বারাঙ্গনা ছাড়া অভিনয় করিবারও ত দ্বিতীয় সুবিধার পথ দেখিতে পাই না। কোন দেশের কোন রঙ্গালয়েই সতী সাধ্বী লইয়া কারবার নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না। এদেশে প্রথমে বালকের দ্বারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনীত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে গুরুতর পাপের পথ প্রশস্ত হওয়ায়, সে প্রথা পরিত্যক্ত হয়। মাইকেল মধুসূদন ও সত্যব্রত সামশ্রমীর উপদেশ-মত তখন বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা নিযুক্ত করা হয়। সেই হইতে ঐ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা এ প্রথা উঠাইয়া দিতে বলেন, তাঁহাদিগকে গিরিশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারি,—"সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের ভূমিকা (Part) স্ত্রীলোক অভিনয় করিতে থাকে। যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা বলিবেন যে—ন্যাশন্যাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত; কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া বহু-আয়াস সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। বালকের অভিনয়কার্য্যে যে কেবল সুন্দররূপে অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাহা নয়—বালকেরও সর্ব্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া, একরকম মেয়েলী ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন্ দেশে কে পাইয়াছে? অদ্যাপি নটী নামের সহিত উচ্চ নীতির সংযোগ কেহই করেন না। ব্যালেট ড্যান্সার নর্ত্তকীর সহিত সামান্যা গণিকার বড় কেহ প্রভেদ করেন না। কিন্তু তথাপি, থিয়েটারের কথা বলিতে হইলে, অনেক সুবিবেচক ব্যক্তিও সামান্যা গণিকাদের লক্ষ্য করিয়া রঙ্গভূমিকে ঘৃণা করেন।...এরূপ বিদ্বেষের কারণ বুঝা ভার।...সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকিব?—বারনারী লইয়া অভিনয়ে দেশের যাহা ক্ষতি হইতেছে, তদপেক্ষা উচ্চ-শিল্পের পতন কি দেশের শোচনীয় অবস্থা প্রমাণ করিবে না? শত-শত ব্যক্তি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিতেছে। চিত্রকর স্বভাব অনুকরণে বিশেষ চেষ্টিত, যন্ত্রী মুগ্ধকারী যন্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে। এ সকল স্থগিত থাকিলে দেশের কি বিশেষ মঙ্গল?"—কথাগুলি বড় সত্য।—ইহার উত্তর কি 'প্রবাসী-' দিতে পারেন?

'প্রবাসী' বলিতেছেন,—"যাঁহাদের নৈতিক শুচিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে, তাঁহারা ওরূপ জায়গায় অভিনয় দেখিতে যাইতেই পারেন না।"—কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও মহেন্দ্রলাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ 'ওরূপ জায়গায় অভিনয় দেখিতে যাইতে' কখনও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। অতএব বুঝিতে হইবে কি—তাঁহাদের মধ্যে নৈতিক শুচিতার বিশেষ অভাব ছিল? যে যুক্তি ধরিয়া 'প্রবাসী' থিয়েটার দেখিতে সকলকে নিষেধ করিতেছেন, সে যুক্তি মানিতে হইলে ত রাজপথ চলা সর্ব্বাগ্রে বন্ধ করিতে হয়! কালে-ভদ্রে স্ত্রীলোকের অভিনয় দেখিয়া যদি চরিত্র খারাপ হয়, তাহা হইলে রাজপথে নিত্য বারাঙ্গনার হাব-ভাব

দেখিয়া রুচি ও চরিত্র ত প্রথমেই বিগড়াইবার কথা! রঙ্গালয় অপেক্ষা কলিকাতার পথ অধিক সঙ্কটপূর্ণস্থল, অতএব সঙ্কটপূর্ণ স্থল 'বয়কট' করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে কলিকাতার পথ সর্ব্বপ্রথমেই 'বয়কট' করা উচিত। 'প্রবাসী'র লেখক তাহা পারিবেন কি?

ভারতী—ভাদ্র, ১৩২৩

অভিভাষণ না অতিভাষণ—এখনও পাঁচ মাস গত হয় নাই, এই 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই স্যর রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়াছিলেন,—"অন্য ক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

শুধু ইহাই নহে। গত আষাঢ় মাসের 'ভারতী'তেও রবীন্দ্রনাথের ঐ উপদেশকে শিরোধার্য্য করিবার জন্য, 'ভারতী'র সম্পাদক-মহল হইতেও একটা মহা হৈ চৈ রব উঠিয়াছিল।

কিন্তু সেই 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই আজ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্দেশে যে গালাগালি বৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেখিলে লজ্জায় ও ঘৃণায় মুখ লুকাইতে হয়! ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন,—"কটুবাক্যে অনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতাজ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা যায়। আমরা তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না; কেন না, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষ সিদ্ধি হইতেছে, কদর্য্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে।"—আজ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যদি জীবিত থাকিয়া এই 'ভারতী' পাঠ করিতেন, তবে তাঁহার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিত না।

মহারাজার 'অভিভাষণ'পাঠ করিয়া 'ভারতীর' লেখক বলিতেছেন,—

"রচনাটির নাম 'সভাপতির অভিভাষণ'; তা' না' হয়ে আনাড়ির অতিভাষণ হলেই ঠিক হত।" "উল্টে নিজের বুদ্ধির দোষ লেখকের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ একহাত মাতব্বরী করে নিয়েছেন।" "খেতাবী মহারাজের উম্মার দ্বিতীয় চোট্" ইত্যাদি ইত্যাদি।—কোন ভদ্রসন্তান অন্য কোন ভদ্রসন্তানের প্রতি বিনাদোষে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন, আমাদের তাহা ধারণা ছিল না।

গালাগালির উত্তরে গালাগালি দিতে অনেককে দেখিয়াছি। কিন্তু মহারাজকে কি অপরাধে এই গালি খাইতে হইল, বুঝিতে পারিলাম না। শাদাকে কালো বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে, সত্যটা দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা হয়। মহারাজাও তাঁহার 'অভিভাষণে' তাহাই করিয়াছিলেন। সেইজন্য কি তাঁহার উপর ঐ কটুবাক্যের বৃষ্টি? উচিত কথা বলিলে বন্ধু বিগড়ায় জানি, কিন্তু তাহাতে যে ঐরূপ গালাগালি চলিতে পারে, তাহা জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছিলেন, "তরকারিকে স্বাদু করিবার শক্তি যাহাদের নাই, তারা সকল রান্নাতেই খুব করিয়া লঙ্কা-মরিচ প্রয়োগ করে। তেমনি সাহিত্যিক রান্নায় যাদের হাতে আর কোনো মসলা নাই, তাদের একমাত্র ভরসা কটুকথা।"—এ কথার যাথার্থ্য 'ভারতী'র লেখকগণ আজ প্রমাণ করিতেছেন।

এ রচনাটিতে গালাগালির যেমন বাহুল্য, যুক্তির তেমনি অভাব। লেখক যেখানে মহারাজার উক্তির উত্তরে কিছু বলিতে গিয়াছেন, সেইখানেই যুক্তিহীন বৃথা তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। একস্থানে লেখক বলিতেছেন,—"পুরানো বঙ্গদর্শনের ফাইল উল্টে দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায়, বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রী দল কি রকম বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ ক'রে গেছেন।"—কিন্তু বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' খুলিয়া দেখিলে, এ কথা একেবারে মিথ্যা সপ্রমাণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অতি-সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার উপর চাবুক চালাইতেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষাকে তিনি বরাবর "অতি সুমধুর ও মনোহর" বলিয়া গিয়াছেন। লেখকের কোন্ কথাটা রাখিয়া কোন্ কথা বলিব!—এইরূপ অসার যুক্তি ও গালাগালিতে প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ!—সে কম্বলের লোম বাছিয়া দেখাইতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হইতেছে না। বিশেষতঃ যিনি ভদ্রভাষা ব্যবহার করিতে জানেন না,তাঁহার কথার উত্তর দিলে অভদ্রতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আশা করি, মহারাজ এই অসংযত লেখককে ক্ষমা করিবেন।

ঋষি রবীন্দ্রনাথ—ইহা ভারতীর আর-একটি গালাগালিপূর্ণ রচনা। বৈশাখ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে একজন লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' খেতাব দিলে 'ঋষি' কথাটার অপমান করা হয়। তাহা পড়িয়া 'ভারতী'র লেখক মহা চটিয়া উঠিয়াছেন এবং এই রচনায় 'সাহিত্যে'র লেখককে যথেষ্ট গালাগালি দিয়াছেন।

'ভারতী'র এই লেখক বলিতেছেন,—"যাঁহাদের শক্তির অভাব, গালাগালিই তাঁহাদের সম্বল।"—একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। কারণ, এই লেখাটিই তাহার বিশেষ প্রমাণ। এই রচনায় 'সাহিত্যে'র লেখকের প্রতি 'আনাড়ি', 'ভুঁইফোড়', 'ঘটে যদি সিকি ছটাক বুদ্ধি থাকিত' প্রভৃতি মিষ্ট কথার হরির-লুঠ করা হইয়াছে! যে 'ভারতী' দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে গড়া জিনিষ, যে 'ভারতী' একদিন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথের সেবার সামগ্রী ছিল, সেই 'ভারতী' আজ আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটা হইয়াছে!—দেখিলে দুঃখ হয় না?

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

উপেক্ষিতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

Emerald Ptg. Works.

কার্ত্তিক, ১৩২৩

প্রথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

ভীম

[শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ]

(১)

পবন-নন্দন ভীম, দৃপ্ত ভয়ঙ্কর,
মত্ত-মাতঙ্গম-বেগ উদ্দাম সুন্দর
গতি অব্যাহত, লীলায়িত ভুজ-দণ্ড
লোল শুণ্ড সম, মুহূর্ত্তেকে খণ্ড-খণ্ড
করি দেয়, বসন্তের বিলাস-তোরণ
আলিঙ্গিত দ্রুমলতা পুষ্প আভরণ !
সর্ব্বনাশ কীচকের তাই তব হাতে,
দীর্ণবক্ষ দুঃশাসন, ভগ্ন গদাঘাতে
দুর্য্যোধন রাজ-উরু ; পিতৃসম বলী
বিষ-নাশে, হলাহল নিজে যায় জ্বলি

জঠর-উত্তাপে তব, ভুজঙ্গ-গরল
পরাহত, ঢালে দেহে কান্তি অবিরল
সুধাপায়ী দেবতার মত, শক্তিমান
ভ্রমিতে আকাশে নীরে পবন সমান !

(২)

সাম্যবাদী, নিরপেক্ষ, উদার-হৃদয়
সমীরণ সম, তাই প্রসন্ন সদয়
হিড়িম্বার প্রেম-আবেদনে, প্রাণপণে
যুদ্ধ করি ক্ষুধাতুর রাক্ষসের সনে
দীন দ্বিজসুতে তুমি দিলে প্রাণদান ;
দুঃশাসন করে হেরি' সতী-অপমান,
গর্ব্বিত নিষ্ঠুর পাপ কৌরব-সভায়
গর্জ্জিয়া উঠিলে তুমি দৃপ্ত সিংহ প্রায় !
স্তব্ধ হেরি অন্ধ রাজে, হেরি বাক্যদীন
পিতামহ গঙ্গাসুতে, উদ্ধত স্বাধীন
ন্যায় বাক্যে বাজাইলে প্রলয়-বিষাণ,
দক্ষযজ্ঞ-নাশকারী ধূর্জ্জটি সমান !
অনিলের মত তব আত্ম-বিস্মরণ—
মাতা, ভ্রাতা, যত্নে সেবি' তৃপ্ত আমরণ

শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রচার

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ]

বঙ্গের লেখকচূড়ামণি, অতুল প্রতিভাশালী বঙ্কিমবাবু বিশেষ শাস্ত্রবিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রাসলীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে পুরাণকর্ত্তাদিগের কৃত 'রতি'শব্দের প্রয়োগ যেরূপ অশ্লীলার্থে গৃহীত হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ সেরূপ অশ্লীলার্থের বাচক নহে; তাহা রম্ ধাতুর মৌলিক ক্রীড়ার্থই মাত্র তত্তৎ স্থলে প্রকাশ করে। আমরা সে বিচার দেখিবার জন্য তদীয় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপর বরাত দিয়া, আধুনিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারাই বঙ্কিমবাবুর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইব। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ গীতি-কবি কৃষ্ণকমল্ গোস্বামী মহাশয় তদীয় "ভরতমিলন" যাত্রার গৌরচন্দ্রিকায় 'রতি' শব্দের যে সুন্দর একটি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মৌলিকার্থ পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে; যথা—

"কোথা হতে এল রে কেশব ভারতী,
শুনাল না জানি কি সব ভারতী;
সেই হতে বাছার ফিরে গেল রতি॥"

এইখানে 'রতি' শব্দের অর্থ ক্রীড়াময় ভাব বা স্ফূর্ত্তি; গৌণপক্ষে মতিও হইতে পারে। "বিরতি" শব্দ রতির বিপরীত ভাব; অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিহীনতা; তাহা হইতে নিরুৎসাহ বা নিবৃত্তিভাব বুঝায়। সুতরাং রাসলীলাতে কোন অশ্লীল ইন্দ্রিয়ভাবের সংস্রব নাই—ইহাই আমরা শব্দ-বিচারেও বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে রাস-লীলার কোন ঐতিহাসিক মূল আছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য। বিষ্ণুপুরাণে রাস-লীলার যে বিবরণ পাওয়া যায়, এবং শ্রীধর স্বামী ইহার যে পরিভাষা দিয়াছেন, তাহাতে পরস্পর গৃহীতহস্ত স্ত্রী-পুরুষের মণ্ডলাকার সগীত নৃত্যবিশেষই ইহার অর্থ; যথা—

"হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শ নিমলিত দৃশাং হরিঃ॥"—বিষ্ণুপুরাণ

পরে একে-একে গোপীদিগকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলে, তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমীলিত-চক্ষু হইলে, কৃষ্ণ রাস-মণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন॥"

"অন্যোহন্য ব্যতিষক্ত হস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলী-রূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম ইতি শ্রীধরঃ।

বিষ্ণুপুরাণে ইহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসোৎসবে কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই উপস্থিত হইয়াছেন; কৃষ্ণ বলরামের সহিত তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্রবাদন সহকৃত শরৎবিষয়ক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তৎপর কৃষ্ণ পরস্পর গৃহীতহস্ত হইয়া মণ্ডলাকারে গোপীদিগের সহিত নৃত্যোৎসব সম্পাদন করিলেন; যথা—

"সহরামেণ মধুরমতীব বণিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং সৌরির্নানাতন্ত্রীকৃত ব্রতম্॥"
"ততঃ সবব্রতে রাসশ্চলদ্বলয় নিস্বনঃ।
অনুযাত শরৎকাব্য-গেয়গীতিরণুক্রমাৎ॥
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রসমং কৌমুদীং কুমুদাকরং।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ॥"

"বলরামের সহিত শৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রী-সম্মিলিত মধুরপদ সঙ্গীত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চল-বলয়-শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎ-কাব্য গানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদসম্বন্ধী গান করিলেন। গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল।"

ইহা আমাদের নিকট সরল, নির্দ্দোষ আমোদ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। যে স্থলে অগ্রজ বলরাম উপস্থিত, তথায় কোনরূপ কুৎসিত আমোদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ, কৃষ্ণের বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র; এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে কোনরূপ কামভাবেরই বা অবসর কোথায়? সমপ্রাণ বয়স্য ও বয়স্যাদিগের এরূপ মিলিতোৎ-সব কি এরূপই বিসদৃশ ও রীতিবিরুদ্ধ, যে, তাহাতে কাম-ভাবের আরোপ না করিলেই চলে না? আমরা কি মনে

করিতে পারি না যে, কৃষ্ণ বিশেষরূপে নৃত্য-গীতনিপুণ ছিলেন বলিয়া, সকল বালিকাই তাঁহার সহিত নৃত্য করিয়া সুখী হইত; তিনিও তাহাদের বাসনা পূরণ করিতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন? তবে সম্ভবতঃ, রাধিকাও তাঁহারই সমতুল্য নৃত্যনিপুণা ছিলেন বলিয়া তাঁহারই প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্য May-pole (বসন্ত-চক্র) ও Ball (মণ্ডল নৃত্য) কি ইহারই অনুরূপ নহে? গ্রীসের Arcadia চিত্রে কি আমরা বৃন্দাবনেরই ন্যায় অকপট প্রীতি ও বিশ্বস্তভাবে যুবক-যুবতীর পরস্পর মিলন দেখিতে পাই না?

এখানে আমরা ইংরেজ কবির লিখিত গ্রাম্য-জীবনের চিত্র হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ আমাদের কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা ইহার সহিত মিলাইলে দেখিতে পাইবেন, আধুনিক পাশ্চাত্য-জীবনেও কিরূপ নির্দ্দোষ সরলভাবে সেই প্রাচীন বিশুদ্ধ স্বাভাবিক আমোদ-প্রমোদের আদর্শটি অবিকল প্রচলিত রহিয়াছে—

"For sports, for pageantry and plays,
Thou hast thy eves and holy days
On which the young men and maids meet
To exercise their dancing feet,
Tipping the comely country round,
With daffodils and daisies crowned.
Thy wakes, thy quintels, here thou hast
Thy May-poles too with garlands graced."

Country Life—Herrick.

এখানে রাত্রিতে উৎসব, নৃত্যামোদে যুবক-যুবতীর যোগদান, তাহাদের মনোরম ধীরমণ্ডল নৃত্য, কুসুমাপীড়, ললিত পুষ্পমালা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতিতে রাসলীলার মাধুরীই উচ্ছলিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে সকল গোপীকারই সহিত নৃত্য করিতেন বলিয়া যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার অর্থ এই বলিয়াই বোধ হয় যে, তৎসখাগণ তাঁহারই সহিত এক সাজে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করায়, তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য হইতে তাঁহারাও কৃষ্ণ বলিয়াই গোপীদিগের নিকট প্রতীয়মান হইতেন; অথবা কৃষ্ণ বিশেষ নৃত্যপটু বলিয়া, দ্রুতনর্ত্তনবেগে যথাক্রমে এক গোপীকার পার্শ্ব হইতে অন্য গোপীকার পার্শ্বস্থিত হইয়া প্রায় সমকালে সকলেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হরিবংশে রাসক্রীড়ায় নর্ত্তনকারীদিগের শৃঙ্খলাবন্ধনের যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় কৃষ্ণকে মধ্যে করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিত; যথা—

"এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥"

এরূপ হইলে একই সময়ে সকলের সহিত কৃষ্ণের নৃত্য সম্পূর্ণই সম্ভবপর হয়।

স্ত্রী-পুরুষদিগের পরস্পর নৃত্যই যখন রাস শব্দের প্রচলিত অর্থ, তখন পুরুষ এককৃষ্ণমাত্র সকল গোপীর সহিত নৃত্য করিলে প্রকৃত রাস কিরূপে হয়? তাঁহার সখাগণ তাঁহার সহিত রাসক্রীড়ায় যোগ দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তাহাই আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। শ্রীকৃষ্ণের "বনমালী" "দামোদর" নামই তাঁহার রাসসজ্জার পরিচয় প্রদান করে, আমরা মনে করি। হরি-বংশের বর্ণনা আমাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে; যথা—

সবদ্ধাঙ্গদ নির্ব্যুহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভমানোহি গোবিন্দ শোভয়ামাস তং ব্রজম্॥
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহব্রুবন্॥"
ভাবনিস্যন্দ মধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গত্বা সুখং চেরুর্দামোদর পরায়ণাঃ॥"

"অঙ্গদসমূহ ধারণপূর্ব্বক, বিচিত্র বনমালা দ্বারায় শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। দামোদরপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দ মধুর গান করতঃ ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন।" তাঁহার সখা শ্রীদাম, সুদামের নামেও আমরা সেই পরিচয়ই প্রাপ্ত হই; বিশেষতঃ তাঁহার যে দ্বাদশটি প্রিয়তম গোপসহচর "দ্বাদশ গোপাল" নামে সুপরিচিত, ইঁহারা তাঁহাদেরই প্রধান। এই বিশেষ অন্তরঙ্গ সখাদিগের ও বয়স্যা-গোপ-বালিকাদিগের দ্বারাই রাসচক্র গঠিত হইত। তাহাতে স্বয়ং বনমালায় বিভূষিত হইয়া, সখী ও সখাদিগকেও অনুরূপ সাজে সজ্জিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রাস-নৃত্যের আমোদে রত হইয়াছিলেন—ইহাই অধিক সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। যদি তাহাই হয়, তবে গোপসখাদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের কামক্রীড়া

কি নির্লজ্জতার একশেষ হয় না? এবং কৃষ্ণেরই যদি গোপীদিগের প্রতি কলুষিতভাব হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে গোপবালকদিগেরও কি তাহা হওয়া সম্ভবপর হয় না? অথচ হওয়াও কি নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে?

বৃন্দাবনলীলার সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা রাস-লীলারই অনুরূপ আদিরসঘটিত গোকুলের বস্ত্রহরণ-লীলার চিত্রটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। গোপীগণ কৃষ্ণকে পাইবার জন্য একমাস কাত্যায়নী বা গৌরীব্রতের নিয়ম পালন করিলে, অবশেষে ব্রত-সমাপ্তির দিন আসিল। গোপীগণ তীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নানার্থ জলে অবতরণ করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদের অলক্ষিতে বস্ত্র ও পূজাদ্রব্য লইয়া গেলেন ও গোপবালকগণসহ পূজাদ্রব্য ভক্ষণ করিলেন। পরে গোপীগণ জানিতে পারিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়াও বস্ত্র ফিরিয়া পাইলেন না। তখন শ্রীরাধা একান্তমনে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, সমস্তই কৃষ্ণময় এবং বস্ত্র ও পূজার দ্রব্যাদিও যমুনাতীরে যথাস্থানে স্থাপিত রহিয়াছে। তৎপর যথাবিধানে ব্রতসমাপ্তি হইলে "দশভুজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা" তথায় আসিয়া আবির্ভূতা হইলেন এবং রাধাকে এই বলিয়া বর দিলেন "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন হইবেন।" এই বলিয়া পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাধিকা গোপীকাগণসহ গৃহগমনের উদ্যোগ করিলেন। এরূপ সময়ে, কৃষ্ণ রাধিকাসমীপে উপস্থিত হইলে, রাধিকা দেখিলেন—"কিশোরবয়স্ক শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান, শরীর রত্নালঙ্কার-বিভূষিত।" ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনা। ইহার মধ্যে কৃষ্ণের দেবভাব-বিকাশের অতি সুন্দর একটি রূপক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। যে অজ্ঞানাবরণ কৃষ্ণ ও কালী বা দুর্গার মধ্যে প্রভেদ করিবার কারণ, বস্ত্রহরণ তদপসারণেরই রূপক। তাই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলিত হইলে রাধার নিকট কাত্যায়নীরই যেন কৃষ্ণরূপে স্ফুরণ হইল—তাহাতেই রাধা সমস্তই কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন। ইহাতেও রাধিকার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইল না; তাই তিনি পুনর্ব্বার গৌরীব্রত সমাপ্তির আয়োজন করিলেন; এবার পার্ব্বতী স্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বর দিলেন; কেবল তাহাই নহে,—কৃষ্ণ যে তাঁহারই সাক্ষাৎ বিকাশ, তাহা আপনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই রাধিকার আকাঙ্ক্ষিত রূপে কৃষ্ণের প্রকাশ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। এইখানে দুর্গার কালী-রূপেরই বিকাশ কৃষ্ণে হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি; কারণ রাধিকাতেই আমরা গৌরীরূপের বিকাশ দেখিতে পাই। তিনি যে গৌরীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার এক ফল যেমন তাঁহার কৃষ্ণলাভ, অন্য ফলও আবার বৃন্দাবনের রাসেশ্বরী হওয়া। সুতরাং আমরা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে, গৌরীই রাধারূপে গোকুলে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দুর্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনেও আমরা ইহার উল্লেখ প্রাপ্ত হই; যথা—"বৈকুণ্ঠেঽহং মহালক্ষ্মীর্গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্।" শব্দকল্পদ্রুমধৃতং "শঙ্করং প্রতি পার্ব্বতী বাক্যম্"। সুতরাং বৃন্দাবনের "রাধাকৃষ্ণ" ও "রাধাশ্যাম"রূপ যুগল-মিলনে কালী ও দুর্গা বা গৌরীরই যেন সংমিশ্রণ হইয়াছে। কালী কৃষ্ণরূপা ও কালী শ্যামা; সুতরাং "রাধাকৃষ্ণ" ও "রাধাশ্যাম" এই যুগল নামে কালী নামের কি আশ্চর্য্য মিলই পাওয়া যায়! কালী রাত্রিদেবতা; কারণ রাত্রিতেই কেবল ইঁহার পূজা হইয়া থাকে, ইঁহার "কালরাত্রিকা" নামও ইহার অন্যতর প্রমাণ! কৃষ্ণও রাত্রিদেবতা—রাত্রিকালেই রাসোৎসব সম্ঘটিত হইয়াছিল। দুর্গার ধ্যানে তাঁহাকে "অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা" বলিয়া স্তুতি করা হইয়া থাকে। ইহাতে দুর্গার সহিত চন্দ্রের যোগ পাওয়া যায়। রাধাকেও আমরা চন্দ্রস্বরূপিনী বলিয়াছি। অতএব রাধাকৃষ্ণের মিলনে যে কালীগৌরীরই সংমিশ্রণ হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তে অল্প সন্দেহ থাকিবারই কথা।

এক্ষণে বলরামের বিকাশও আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিব। বলরাম যে শিবের বিকাশ, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলরাম "সঙ্কর্ষণ" ও "হলধর" বলিয়া তাঁহার সহিত ক্ষেত্রকর্ষণের যোগ দেখা যায়। শিবের 'ক্ষেত্রপ' 'ক্ষেত্রপাল,' 'ক্ষেত্রজ্ঞ' প্রভৃতি নামের দ্বারা তাঁহারও সহিত কর্ষণ-ক্ষেত্রের বিশেষ যোগ প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহার বাহন বৃষটী কৃষিকার্য্যের সহিত তাঁহার যোগের আরও অধিক প্রমাণ। *

---

* বটুকভৈরব স্তব দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ কালীরই বিকাশ বলিয়া সেই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহাতেই বিন্যস্ত। বলদেব কালীর পদতলশায়িত ও দুর্গা-প্রতিমার ঊর্দ্ধ-অলক্ষিত বা তিরোহিত শঙ্করেরই ন্যায় সাক্ষীবৎ অবস্থিত। শঙ্কর যেরূপ প্রাচীন দেবতা হইয়াও দুর্গার নিকট নির্লিপ্তভাব প্রাপ্ত, বলরামও সেরূপ কৃষ্ণের অগ্রজ হইয়া অন্তরালে স্থিত। প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত কার্য্যতৎপরতা কৃষ্ণেই প্রকাশিত—কৃষ্ণই প্রকৃতির ন্যায় সর্ব্বত্র অভিনেতা ; বলরাম শঙ্করেরই ন্যায় যবনিকান্তরালবর্ত্তী। মহামায়া সৃষ্টিপ্রপঞ্চ করিতেছেন—শঙ্কর যোগনিমগ্ন ; কৃষ্ণ রাস-লীলা করিতেছেন —বলরাম উদাসীন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—কৃষ্ণও ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি। এই প্রকৃতিপ্রধান ধর্ম্মই তান্ত্রিক ধর্ম্ম—সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শক্তিপ্রধান বা প্রকৃতিপ্রধান তান্ত্রিক ধর্ম্ম হইতেই কৃষ্ণের বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে। এ স্থলে আমাদের মতের সমর্থনে বঙ্কিমবাবুর গভীর গবেষণা-পূর্ণ "কৃষ্ণচরিত্র" হইতে তাঁহার মত উদ্ধৃত হইল ; যথা—

"এই তান্ত্রিক ধর্ম্মে প্রকৃতি পুরুষের একত্ব অথবা অতি-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে, প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের সারাংশ এই বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার করিয়াছেন॥"

বৃন্দাবনের পর মথুরা-লীলা। নির্দ্দয় কংস আভিচারিক ধনুর্ম্মখ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বধ করাই উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত রাজগণমধ্যেই কংসকে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিহত করিলেন। বলা আবশ্যক যে, এই যজ্ঞ শঙ্করের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে কৃষ্ণ বিশেষ সাহস ও বলের পরিচয় দিলেন। তৎপর কৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার হয়। ইহাতেও সপ্রমাণ হয় যে, গোকুলে অবস্থানকালে তিনি বালকমাত্র ছিলেন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নার্থ তিনি সন্দীপনসমীপে গমন করেন। বেদাদি শাস্ত্রে তিনি যে লোকোত্তর পারদর্শিতা লাভ করেন, তাহা—রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহাকে প্রথম অর্ঘ্য-প্রদানকার্য্য সমর্থনকল্পে ভীষ্মের উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়—"ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গ-সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন।"

পশ্চিমভারতে নৃশংস কংসের যজ্ঞ কৃষ্ণ ধ্বংস করিলেন বটে, কিন্তু এ দিকে পূর্ব্বভারতে জরাসন্ধ পূর্ব্বেই একটী ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে একশত রাজাকে বলি দিবার সঙ্কল্প করিয়া ছিয়াশীজন রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। বলা আবশ্যক, এই ভীষণ নৃপমেধযজ্ঞে শঙ্করই উপাস্যদেবতা নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন-সাহায্যে দুরাত্মা জরাসন্ধকে নিহত করিয়া এই নৃপমেধযজ্ঞ পণ্ড করিলেন। এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ক্রমে-ক্রমে যে তিনটী যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নষ্ট করিলেন, সেই তিনটীর সহিতই জীববলির নৃশংসতা সংযুক্ত ছিল। জীববলি নিষিদ্ধ করাই যজ্ঞভঙ্গ করার প্রকৃত কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহার 'বলি ধ্বংসী' নাম ইহারই ইতিহাস প্রচার করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। মহাদেবের এক নাম "বলিভুক্" ; তাহারই বিপরীত প্রকৃতি বুঝাইতেই যেন কৃষ্ণের নাম "বলি-ধ্বংসী" হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে জীববলি নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইখানেই আমরা তাহার মূল পাই। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসংস্কার পশ্চিমভারত হইতে পূর্ব্বভারত পর্য্যন্ত যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরিষ্কার প্রমাণই আমরা এইখানে পাইলাম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত ও মহত্ব অনেকটা বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। এইজন্যই মহাত্মা ভীষ্ম নিমন্ত্রিত রাজাদিগের দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে কৃষ্ণের প্রাধান্য গৃহীত হইবে, এরূপ ভরসা করিয়া তাঁহাদিগের মত গ্রহণ না করিয়াই কৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজাদিগের মধ্যেও শিশুপাল ও অপর কয়েকটী রাজা ব্যতীত আর কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু সম্মিলিত রাজমণ্ডলী-সমক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় স্পর্দ্ধাকারী শিশুপালকে নিপাত করিয়া আপনার অমিত পৌরুষ-বিকাশের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই প্রকারে বৈদিকধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের গ্লানি দূর, জীব-বলিরূপ অধর্ম্মের নিবারণ এবং ধর্ম্মের ও সমাজের শত্রু কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশসাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মসংস্কারের ধ্বংসপ্রধান ভাগের কার্য্য শেষ হইলে পর, গঠন-প্রধানভাগের কার্য্যের সময় উপস্থিত হইল। রাজ-সূয় যজ্ঞ

হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মমতসকল সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে জগৎসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্ম্ম বিঘোষিত হওয়ার কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই গীতাতে কর্ম্মেরই মাহাত্ম্য প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফলাকাঙ্ক্ষানিরপেক্ষ হইয়া, একমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান—ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, যথা, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন॥" সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান সংসারবন্ধনের হেতু ও মুক্তির অন্তরায়; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই পরম শ্রেয়ঃ - ইহাই গীতার শেষ সিদ্ধান্ত। আমাদের কর্ম্মপথ-নির্দ্দেশের জন্য বাহিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, হৃদয়মধ্যেই প্রদর্শক রহিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি।" সুতরাং গীতার ধর্ম্মের জন্য অপর চালকের প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকেই স্ব স্ব চালক। ইহাতে গীতার ধর্ম্ম কেবল যে সার্ব্বজনীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, প্রতি লোকেরই ধর্ম্ম বলিয়া যথার্থ লৌকিক ধর্ম্ম হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

এরূপ বিশ্ব বিশাল ভাব আর কোনও ধর্ম্মেই পাওয়া যায় না। কোনও ধর্ম্মই সকলকেই এরূপ অবারিত অধিকার প্রদান করে না। কোনও ধর্ম্মই এরূপ সকলের জন্য মুক্তদ্বার নহে। কোনও ধর্ম্মই ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি এরূপ উচ্চ মর্য্যাদা প্রদর্শন করে নাই। তাই গীতা বলিতেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" বস্তু-সকলের সাধারণ স্বাভাবিক ভাব বুঝাইতে যে "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যবহার হয়, গীতার 'ধর্ম্ম' তদ্রূপ ব্যাপক অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ব-স্ব প্রকৃতির সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই স্বধর্ম্ম-পালন; তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। কামনালেশশূন্য হইয়া স্ব-স্ব প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসরণ করিলেই, ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়—ইহাই গীতাধর্ম্মের স্থূল তাৎপর্য্য। ইহারই ভাব আমাদের নিত্যস্মরণীয় ধর্ম্মনীতিতে প্রাঞ্জল ভাষায় এই প্রকারে পরিব্যক্ত হইয়াছে; যথা "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" বস্তুতঃ, কামনার সহিতই আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ বলিয়া, তন্মূলে পাপপুণ্যেরও সম্বন্ধ। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে, কামনাও তাঁহাতেই অর্পিত হয়। সুতরাং তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের লোপ হওয়াতে, আমরা পাপপুণ্যের অতীত নির্ব্বিকার ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি। আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্মাধিকরণের দণ্ডপ্রয়োগ-স্থলেও দেখিয়া থাকি যে, উদ্দেশ্যের সাধুতা-অসাধুতার দ্বারাই অপরাধের তারতম্য নিরূপিত হইয়া থাকে। বালক বা বাতুলের অপরাধজনক কার্য্য উদ্দেশ্যসম্ভূত নহে—আবেগেরই ফলমাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের কার্য্য নিরর্থক; ঈশ্বরার্থক কার্য্যই মাত্র সার্থক। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হওয়া সম্ভব; তাহাতেই সমস্ত কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম্ম-সাধনের সুগমতা আর কোনও ধর্ম্মে হয় নাই। ধর্ম্মের এরূপ স্বাভাবিক সরল পদ্ধতি আর কখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। বেদ-উপনিষদ-দর্শন-পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত মথিত করিয়া সারতত্ত্ব গীতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। গীতার ন্যায় উদার উচ্চ ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীর আর কোথায়ও প্রচারিত হয় নাই। খ্রীষ্ট পর্ব্বতোপরি ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্মের উপদেশ করিলেন। অবস্থাবিশেষে ঘোর যুদ্ধও ধর্ম্মকার্য্য—তাহাই এখানে ধর্ম্মোপদেশ-প্রসঙ্গে অর্জ্জুনকে বুঝান হইয়াছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণমুখে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব সারধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিলেন,—তাঁহার মধ্যে প্রধান পুরুষের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত মহিমার পূর্ণবিকাশ প্রকটিত দেখিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন। পাণ্ডবগণ এই পুরুষ-প্রধানকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই, যুদ্ধে 'নিমিত্তমাত্র'রূপে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র হইয়া পাণ্ডবদিগের সারথ্য গ্রহণ করিলেও, যুদ্ধের পরিচালন-কার্য্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই করিলেন। তাহাতেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ এইরূপে মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়া, আমাদের জীবনের সারনীতিরূপে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে; যথা—

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধৰ্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥"

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মের অপর একটি প্রভাব লক্ষ্য করি। তখন যে অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যদিগের বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই বিবাহজাত সন্তানগণ যে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষিত না হইয়া বরং অনার্য্য-সন্তানগণের সহিত তুল্য সম্মানের অধিকারী হইত, তাহা ঘটোৎকচ ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধনেতৃত্ব ও মহাভারতে তাহাদের বীরগৌরবকাহিনী হইতে প্রতিপন্ন হয়।

অনার্য্য জাতিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা-সাধনে শ্রীকৃষ্ণধর্ম্মের বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। তিনি স্বয়ং নরকাসুরের ষোড়শ-সহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভল্লুক-কন্যা জাম্ববতী তদীয় প্রধানা পত্নীদিগের অন্যতমা। কেবল স্বদেশে সম্বন্ধ সঙ্ঘটন করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই; বিদেশে সম্বন্ধ-বন্ধনেও তিনি বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। তৎপুত্র প্রদ্যুম্ন ভারতবর্ষের উত্তরে বজ্রপুরের অনার্য্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বজ্রপুরের অবস্থান বর্ত্তমান কোরিয়াতে ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে *। তৎপৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত শোণিতপুরের বাণরাজদুহিতা ঊষার পরিণয় হইয়াছিল। এই বাণরাজের রাজধানী শোণিতপুর ভারতবর্ষের পশ্চিমে আফ্রিকাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।‡ সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি কেবল নিজেই অনার্য্যসম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি ইহার প্রভাব স্থায়ী করিবার জন্য তিনপুরুষ পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে তিনি যেমন সমাজসংস্কারে ব্রতী হইলেন, তেমনই ধর্ম্মপ্রচারেও ব্রতী হইলেন। শোণিতপুরের বিবাহ-উপলক্ষে বাণরাজার সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে শঙ্করদেব বাণের পক্ষ হইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন হয়। ইহার তাৎপর্য্য আমরা এইরূপই বুঝি যে, এইখানেই শ্রীকৃষ্ণধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের পরস্পর বিরোধভঞ্জন হইয়া, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে শৈবযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শঙ্করের প্রতি কোনও অবজ্ঞাভাব প্রদর্শন করেন নাই, জীববলির প্রতিই মাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন দূরে থাকুক, প্রত্যুত শঙ্করকে নিজের বিশেষ প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতেই তাঁহাকে দেখা যায়।

অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে, শৈবধর্ম্ম অনার্য্যদিগের সংস্রবে থাকিয়া আর্য্যদিগের দ্বারা কৃত বৈদিক ধর্ম্মেরই সংস্কার; অর্থাৎ অনার্য্য পক্ষ হইতে বৈদিকধর্ম্মের সংস্কার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণধর্ম্ম আর্য্যপক্ষ হইতে বৈদিকধর্ম্মের সংস্কার। শৈবধর্ম্মের বলিপ্রধান প্রকৃতি দ্বারা মূল বৈদিক ধর্ম্মও বলিপ্রধান হইয়া পড়ায়, ধর্ম্মের নিরতিশয় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ধর্ম্মের অহিংসাভাগ হইতে প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মকে মূল করিয়া এরূপই সরল, সহজ, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত সংগঠিত করিলেন যে, তাহাতে আর্য্য-অনার্য্য সকলেরই ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইল। "জীবে দয়া, নামে ভক্তি" ইহাই সহজ কথায় তাঁহার ধর্ম্মের মূল সূত্র। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।" ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মান-দণ্ড। যিনি এরূপ উদার ধর্ম্মমতের প্রচারক, তাঁহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাই সম্ভবপর হইতে পারে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধের সামঞ্জস্য-বিধান ও বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয়সাধন করিতেই ব্যাপৃত। এই ধর্ম্ম-মহা সম্মিলনের ইতিহাস আমাদিগের শাস্ত্রীয় প্রচলিত পূজাবিধানে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শাক্তধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাক্তদিগের গৌরী বৈষ্ণবদিগের নারায়ণী শক্তিতে পরিণতা হইয়াছে; যথা "সর্ব্বমঙ্গল-মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্ততে।" আপনার বিরুদ্ধ-প্রকৃতিক শঙ্করকে কৃষ্ণ যেরূপ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। আপনার মূর্ত্তির সহিত হরমূর্ত্তির যোগ করিয়া তিনি আপনার এক অভিনব যুগলমূর্ত্তি গঠিত করিয়াছেন। ইহাই "হরিহররূপ"। ইহাতে কৃষ্ণ ও শঙ্কর উভয়ের এরূপ অভিন্নভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, "হরিহরাত্মা" একাত্মতার প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। যেখানে এই আশ্চর্য্য সম্মিলন সঙ্ঘটিত হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্রে "হরিহরক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

---

* Hindu Superiority

‡ Hindu Superiority

"শব্দকল্পদ্রুমে" ইহার স্থান পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, আমাদের বঙ্গদেশই ভারতীয় সকল ধর্ম্মের সম্মিলনক্ষেত্র বলিয়া গৌরব পাইবার অধিকারী। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বপ্রকৃতিক ধর্ম্ম—ইহাতে ধর্ম্মের সমস্ত ভাবই অনুপ্রবিষ্ট। এইরূপে ধর্ম্মসাম্রাজ্য সংস্থাপন দ্বারা তাঁহার অবতার-ব্রতের পূর্ণ উদ্‌যাপন হইয়াছে; এবং ভগবানের সমস্ত অবতারেরও তাঁহাতেই চরমোৎকর্ষ হইয়াছে।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, জীবে দয়া প্রবর্ত্তিত করিয়া, সমাজ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, জগতের পূর্ণমঙ্গল বিধান করিয়া, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আমাদের নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানকালে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

এই যে মন্ত্রপাঠ করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি, তাহা এই স্মৃতিই প্রতিদিন বহন করিয়া আসিতেছে।

গৃহী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ]

আমরা গৃহী, ছাড়তে নারি'
　　ভাঙতে নারি সুখের গৃহ ;—
হ'ক সে কারা শান্তিহারা,
　　হ'ক সে যতই নিন্দনীয়।
হেথা কোকিল ডাকার আগে
খোকা খুকি সবাই জাগে,
কমল-ফোটার আগেই ফোটে
　　বদন-কমল সবার প্রিয়।

(২)

মলয় ফুলের গন্ধ বয়ে
　　বেড়ায় কাহার অন্বেষণে ;
সার্থক হয় শ্রম যে তাহার,
　　কচি মুখের সম্ভাষণে।
ধরা তাহার স্নেহের ডালি,
হেথায় চাহে করতে খালি ;
ক্ষীরের ধারা আপনি ঝরে,
　　ইচ্ছা নাহি সম্বরণে।

(৩)

প্রেম যে আসে সবার আগে
　　আমাদেরই এইখানেতে,
রচে তাহার বিমল বাসা
　　মুখর মধু নির্জ্জনেতে।
রূপ যে তাহার রত্নমণি
পাঠায় হেথা ভাগ্য গণি,
ভক্তি আসে স্নিগ্ধ হতে
　　স্নেহ-দয়ার নির্ঝরেতে।

(৪)

তন্দ্রা বিহীন দিবস-নিশি
　　জাগ্‌ছি সদা কুটীরদ্বারে,
অন্যমনে ফিরাই পাছে
　　অতিথ্ কোনো দুর্ব্বাসারে।
পাদ্য এবং অর্ঘ্য লয়ে,
বসে আছি পথটি চেয়ে ;
হৃদয়নাথের পরশ পাব
　　হয় ত দুখের অন্ধকারে।

(৫)

জনম-জনন সাগর জলে
　　ঢেলে মোরা আস্‌ছি দেহ,
মার্জ্জনাতে পুণ্য করে
　　যুগে যুগে রাখ্‌ছি গৃহ।
আবার গোপাল রূপটি ধরি,
আসেন হেথায় যদিই হরি
পঙ্কে আবার ফুটবে কমল
　　তাইতে মোদের এতই স্নেহ

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম, এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিত্তানুসন্ধান প্রণালী

আমি উপন্যাস পড়িতেছি। আমার মনে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে। কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও বিরক্তি, কখনও ক্রোধ, কখনও সংশয় ইত্যাদি কত ভাবের উদয় হইতেছে; কিন্তু যখনই যেটি আমার মনে আসিতেছে, সেইটিকেই আমি চিনিতে পারিতেছি। তুমি আমাকে দুইটি ফল দিলে; ফল দুইটি আমি খাইয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। এখানে আমি ফলের দিকে—বাহ্যবস্তুর দিকে—দৃষ্টিপাত করিতেছি না। এখন আমার দৃষ্টি বাহিরে নয়—অন্তরে; এখন আমার দৃষ্টি ফলে নয়—মনে। ফল খাইয়া ফেলিয়াছি। ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি না—পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি আমার মন। ফলের আস্বাদন এখন ফলে খুঁজিতেছি না, জিহ্বাতেও খুঁজিতেছি না—খুঁজিতেছি আমার মনে। যখন একটি ফল খাইলাম, তখন জিহ্বার আস্বাদনহেতু আমার মনে এক ভাবের উদয় হইল; পরে আর একটি খাইলাম, আর এক ভাবের উদয় হইল। এক্ষণে মনের এই ভাব দুইটির পার্থক্য লক্ষ্য করিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম, একটি আর একটি অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সুতরাং আমি যে কেবল বাহিরের বস্তুই দেখিতে পাই তাহা নহে,—আমি আমার মনের বিষয়ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। আমার মনে যখনই যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আমি তাহারই সংবাদ রাখিতেছি। এ সংবাদ রাখিবার শক্তি আমার আছে। মনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, প্রাণের আবেগ, চিত্তের আকর্ষণ, চেষ্টার প্রয়োগ, মনের সুখ দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারগুলির উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরিণতির বিষয় অবগত হইয়া থাকি। এক কথায়, অন্তর্দ্দর্শন সম্ভব। অন্তর্দ্দর্শন সম্ভব বলিয়াই বলিতে পারি—

> "কেন আজি প্রাণ মোর হতেছে চঞ্চল ?
> যেন কিছু ভাল নাহি লাগে,
> কি জানি কি যেন মনে হয় !
> চুম্বকের আকর্ষণ, লৌহ যথা
> কোন মতে নাহি পারে হেলা করিবারে,
> সেই মতে শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল মোর,
> প্রাণ মোর নারিনু ফিরাতে।"

আমি যে কেবল আমার মনের কথাই জানিতে পারি, তাহা নহে,—অপরের মনের কথাও জানিতে পারি। কিন্তু যে উপায়ে আমার মন জানিতে পারি, অপরের মন সে প্রণালীতে জানা যায় না। আমার মন আমাতেই আছে; সুতরাং অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যে আমার মন আমি জানিতে পারি। কিন্তু অপরের মন আমার বাহিরে—সুতরাং এখানে বহির্দ্দর্শন আবশ্যক। আমি একখানি পুস্তক পড়িয়া বলিলাম পুস্তককর্ত্তা একজন 'জ্ঞানী' লোক; তুমি তোমার ভৃত্যকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ, দেখিয়া বুঝিলাম তুমি 'নিষ্ঠুর'; পাচক আজ তোমার ভাত দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াছে, তুমি ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে; আমি বুঝিলাম তুমি 'ক্রোধপরায়ণ।'

এই প্রকারে অপরের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, ইচ্ছা করিলে আমি তাহা বুঝিতে পারি। অতএব আমি যে কেবল নিজের চিত্তই অনুসন্ধান করিতে পারি, তাহা নহে, অপরের চিত্ত অনুসন্ধান করিবার শক্তিও আমার আছে। তোমার তারায়, তোমার নয়নে, তোমার অধরকোণে,

তোমার গণ্ডে আমি তোমার মনের ভাষা বুঝিতে পারি। সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইলে নিজের চিত্তই হউক বা অপরের চিত্তই হউক, সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব হইতে কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া জান, সে ভাল কাজ করিলেও তুমি তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; তাহার ব্যবহার ভাল হইলেও তুমি তাহার অভিপ্রায় মন্দ মনে করিতে পার। তুমি যাহাকে তোমার শত্রু বলিয়া জান, সে তোমাকে সৎ পরামর্শ দিলেও তুমি তাহার উদ্দেশ্য মন্দ মনে করিয়া তাহার পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পার। এইরূপে সন্দেহ, ভ্রান্তি, অলীক কল্পনা প্রভৃতি নানা বিপত্তির উৎপত্তি হইতে পারে।

অতএব কোন পূর্ব্ব ধারণা হইতে মনকে একবারে বিনির্ম্মুক্ত করিতে না পারিলে পরচিত্তানুসন্ধান-কার্য্য নির্দ্দোষ হইতে পারে না। সকলেই নিজের-নিজের পক্ষপাতী; সেই জন্য নিজের মনও আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। আমি অপরকে কুটিল, স্বার্থপর এবং সঙ্কীর্ণমনা বলি এবং সময় সময় তাহার নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আমিও হয় ত কুটিল, আমিও হয় ত স্বার্থপর, হয় ত আমার মনও সঙ্কীর্ণ; কিন্তু আমি আমার কুটিলতা, আমার স্বার্থপরতা, আমার সঙ্কীর্ণতার কথা মনে করিতে পারি না। আমি আমার পক্ষপাতী; তাই আমি আমার নিজের দোষ নিজে দেখিতে পাই না—দোষকেও হয় ত গুণ মনে করি। যদি আমার পক্ষপাতিত্ব দোষ না থাকিত, তাহা হইলে মনের গতিবিধি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতাম, দোষ-গুণের বিচার করিতে পারিতাম, চরিত্রের উন্নতি করিতাম। নিরপেক্ষতার অভাব বলিয়াই আমি আমাকে চিনিতে পারি না, অপরকেও বুঝিতে পারি না। নিজেকে চিনিতে পারি না বলিয়া নিজের প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারি না; অপরকেও চিনিতে পারি না বলিয়া অপরের প্রতিও আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নিরপেক্ষতার অভাবহেতু অনেক সময় আমরা সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। ইহার অভাবে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ভ্রান্তি অনেক স্থলে নৈরাশ্যের মূল। আবার যখন ভ্রান্তির মেঘ কাটিয়া যায়, প্রত্যেক জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন আবার আক্ষেপ বা অনুতাপের সৃষ্টি হয়। নিরপেক্ষতার অভাব হইতে যেমন সময়-সময় নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, তেমনই আবার অলীক আশার সৃষ্টি হইয়াও সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে।

মনের গতি-বিধি, মনের কার্য্যকলাপ সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে মনোযোগের আবশ্যক। যদি তুমি মনকে স্থির করিতে না পার, যদি তুমি মনকে সংযত করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। বাহিরের বস্তু সর্ব্বদাই আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা উৎপাদন করিতেছে। শিশুর ক্রন্দনে, পক্ষীর কূজনে, অশ্বের পদধ্বনিতে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইতেছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। মন যতক্ষণ এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ মানসিক ব্যাপারের পর্য্যালোচনা সম্ভব হইবে না। চিত্তের স্থৈর্য্য ব্যতীত চিত্তানুসন্ধান অসম্ভব। অবধান ব্যতীত চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিতে পারা যায় না; এবং বাহিরের উপদ্রব যতক্ষণ চিত্তকে আলোড়িত করিবে, ততক্ষণ কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ সম্ভবপর হইবে না। মনঃসংযোগ ব্যতীত অনুসন্ধান অসম্ভব। শরীর এবং মনের সুখ-স্বচ্ছন্দতাও চিত্তানুসন্ধানের বিশেষ সহায়। আমার শরীর যখন অবসন্ন, মন যখন অশান্তিপূর্ণ, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট মানস-ব্যাপারে চিত্তসন্নিবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন অবস্থায় মানস-ব্যাপারের পর্য্যালোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ সূক্ষ্ম হওয়া ত দূরের কথা, বরং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইবে। অতএব—

> "বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা,
> নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

আমার মন আমাতেই সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার তথ্য নিরূপণ বিশেষ সহজ সাধ্য নহে। সকল মনুষ্যেরই মন আছে; কিন্তু সকলেই নিজের মন বুঝিতে পারে না। অন্তর্দ্দর্শন সকলেরই সম্ভব নহে—শিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই পক্ষে সম্ভব। শিশুর মনে এবং নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কত চিন্তা, কত ভাবের উদয় হইতেছে; কিন্তু তাহারা কি সেই সকল ভাবের বা চিন্তার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হয়? বালক হউক, যুবা

হউক, বৃদ্ধ হউক—প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দূর হইতে নিজ গৃহ দেখিতে পাইলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে; কিন্তু চন্দ্রশেখরের মত কয়জন এই আনন্দের কারণ-নির্ণয়ে লিপ্ত হয়? "চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার-নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখী হইব?" অন্তর্দর্শন-কালে দৃষ্ট বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃত বস্তুর দর্শনলাভ হয় না। তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে; এখন তোমার মনে অনুভূতির প্রাধান্য। তুমি অন্তর্দ্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলে। ক্রোধের উপাদান, ক্রোধের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ চিত্তসংযোগ করিলে; কিন্তু ঐ দেখ, তোমার ক্রোধের রূপান্তর হইয়া গেল, অনুভূতির প্রাবল্য কমিয়া গেল, চিন্তার স্থির আলোকে ক্রোধের রক্তিমা অপসৃত হইয়া গেল! পুনশ্চ মনের ব্যাপারগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট—বড়ই জটিল; সুতরাং কোন একটি ব্যাপারের বিশেষ পরিচয় লওয়া কষ্টসাধ্য। একের ছায়া অন্যটির উপর পড়িতেছে, একের সঙ্গে অন্যটি মিশিতেছে।

'ভয়' একটি মানসিক ব্যাপার,—কিন্তু ইহা একটি ব্যাপার হইলেও ইহা জটিল—ইহাতে অনুভূতি আছে, ভাবনা আছে এবং ইচ্ছা আছে। আবার যাহাকে তুমি অনুভূতি বলিতেছ, তাহাতে ভাবনা আছে এবং ইচ্ছা আছে; যাহা ভাবনা বলিতেছ, তাহাতে অনুভূতি আছে এবং ইচ্ছা আছে; এবং যাহা ইচ্ছা বলিতেছ, তাহাতে ভাবনা আছে এবং অনুভূতি আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্তর্দ্দর্শনে মনোনিবেশ প্রয়োজন।

মানসিক ব্যাপারগুলি আদৌ স্থিতিশীল নহে—একটির পর একটি আসিতেছে, একটির পর একটি যাইতেছে;—সুতরাং ইহাদের কোন একটিকে অবধান করিতে হইলে সেটিকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও মানসপটে ধরিয়া রাখিতে হইবে। অতএব যদি আবির্ভাবমাত্রই ইহার তিরোভাব হয়, তবে অবধান করিবার সময় পাইলাম কৈ? মনের কোন একটি অবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন—সাধনার আবশ্যক।

অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যে আমি আমার নিজের মনের বিষয় সাক্ষাৎভাবে অবগত হইতে পারি; কারণ, আমার মন আমাতেই আছেন। কিন্তু বহির্দ্দর্শনকালে সেরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সম্ভব নহে। আমার মনে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, অবধান করিলে তখনই সে ভাবটির বিষয় অবগত হইতেছি। কিন্তু এরূপ সোজাসুজিভাবে পরচিত্ত অনুসন্ধান করিবার কোন উপায় নাই। চিত্তাভি-ব্যঞ্জক লক্ষণসমূহের সাহায্যেই পরচিত্ততত্ত্ব নিরূপিত হয়।

"সদা চিন্তাকুল সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ্গ নয়না
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে; সদা আতঙ্ক-বিহ্বল।"

মনের ভাব মনেই থাকিয়া যায় না, বাহিরেও প্রকটিত হয়। সীতা অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সহিত প্রাণ ঢালিয়া কথোপ-কথন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার "হাব ভাবে" তাঁহার মনের ব্যথা কাহারও অগোচর থাকিতেছে না। আবার দেখ—

* * "এই কতিপয় ছত্র।
কতিপয় ছত্র, পত্রে;—বটে সত্য—
কিন্তু কি বিকাশ, কি চরিত্র-মহত্ত্ব,
কি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, কি নিগূঢ় ব্যথা,
কি সংযম, ধৈর্য্য স্তব্ধ বিশালতা,
এই ক্ষুদ্র পত্রে।"

ক্ষুদ্র পত্রের সামান্য কয়েকটি ছত্র হইতে "চরিত্র-মহত্ত্ব", "কর্ত্তব্যনিষ্ঠা" "নিগূঢ় ব্যথা" "সংযম" "ধৈর্য্য" "বিশালতা" ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আবার শারীরিক গঠনপ্রণালীতেও মনের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

অন্তর্জ্জগতের ভাষা বাহ্যজগতে ব্যক্ত হইতেছে। তোমার যদি এই ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে, তুমি অন্ত-র্জ্জগতের যাবতীয় তথ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইবে। কবির মনের ভাষা কাব্য; শিল্পীর মনের ভাষা শিল্প; কর্ম্মীর মনের ভাষা কার্য্য; রাজার মনের ভাষা শাসনপ্রণালী; সমাজের মনের ভাষা ইতিহাস। তুমি এই সকল ভাষার আলোচনা কর—অপরের চিত্তে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে। অন্তর্জ্জগতে যখন যে ভাবটির উদয় হইতেছে, বহির্জ্জগতে—শরীরে হউক, ভাষায় হউক, কর্ম্মে হউক, তখনই সে ভাবটির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই বাহ্য-প্রতিবিম্ব হইতে আন্তরিক মানসব্যাপারের বিষয় অনুমান করিতে

হইবে। শরীর-ভাষা এবং কর্ম্ম মানস, ব্যাপারের অভিব্যঞ্জক। আমার শারীর-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর, আমার কথিত বা লিখিত ভাষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর, আমার কর্ম্মের আলোচনা কর, আমার মনের গতিবিধি তোমার অগোচর থাকিবে না।

"মরম যে গোপ্য মন্ত্র চাহিল লুকাতে
চীৎকারি প্রকাশ তাহা করিল বদন।
আত্মা যাহা বাঁধিবারে চাহে আপনাতে,
ইন্দ্রিয়-প্রহরী তার কাটিল বাঁধন।"

আমার মন তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং তুমি আমার মন সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতেও পার না। কিন্তু আমি তোমার শরীরে, তোমার ভাষায়, তোমার কর্ম্মে, তোমার মনের কথা বুঝিতে পারি। তোমার চক্ষু যখন রক্তবর্ণ হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে, হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়, যখন তুমি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কর, তখন আমি অনুমান করি তুমি ক্রোধপরবশ হইয়াছ। কারণ আমি যখন ক্রোধান্বিত হইয়াছি, তখন আমাতেও ঐ সকল বাহ্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান এবং ভাষা বুদ্ধিবৃত্তির, সমাজনীতি এবং রাজনীতি ইচ্ছাবৃত্তির, কলাবিদ্যা অনুভূতির এবং ধর্ম্ম ত্রিবিধ বৃত্তির প্রকাশক। এই সকল প্রকাশকের সাহায্যে অপরের মন পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অনেক সময় আমরা কৃত্রিম বাহ্য লক্ষণের দ্বারা প্রকৃত মনের ভাবকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি;—সুতরাং এই সকল বাহ্য-লক্ষণ যদি কৃত্রিম হয়, যদি সযত্ন-সিদ্ধ হয়, তবে আমাদের অনুমান ব্যর্থ হইতে পারে। আমি ক্রোধান্বিত না হইলেও ক্রোধের লক্ষণ দেখাইতে পারি; শোকান্বিত না হইলেও চক্ষের জলে এবং দীর্ঘশ্বাসে শোকপ্রকাশ করিতে পারি; হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইলেও হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারি; কপট হইয়াও সাধুতার ভাণ করিতে পারি; নাস্তিক হইয়াও সময়-বিশেষে দেবদেবীকে প্রণাম করিতে পারি। অতএব মনে রাখিও—

"মুখ হাসে, নাহি হাসে চোক,
তার নাম নয় হাসি,;
বুক না কাঁদিলে হয় না কান্না,
চোখে সুধু জলরাশি;
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান,
নাহি গাহে যদি প্রাণ;
আত্মা না দিলে, হাতে ক'রে দেওয়া,
নহে তাহা কভু দান।"

আমরা নিজের মন দিয়াই পরের মন বুঝিয়া থাকি। অন্তর্দ্দর্শনের সাহায্যেই বহির্দ্দর্শন সম্ভব। কিন্তু যিনি দয়ালু, তিনি অপরকেও দয়ালু মনে করিতে পারেন; যিনি স্বভাবতঃ কুটিল, তিনি অপরকেও ঐ স্বভাববিশিষ্ট মনে করিয়া থাকেন। যদিও এই প্রণালীদ্বয় প্রমাদশূন্য নহে, কিন্তু ভূয়োদর্শন এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনেক তথ্যের নিরাকরণ হইতে পারে। এই প্রণালীদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ—একটি অপরটি ব্যতীত অসম্পূর্ণ। অন্তর্দ্দর্শন অত্যাবশ্যক। অন্তর্দ্দর্শনের দ্বারাই আমরা মন ও মানসিক ব্যাপারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। মন জানিবার অন্য উপায় নাই। পরদর্শনও তদনুরূপ আবশ্যক। আত্মদর্শনে আমি আমার মনের বিষয় জানিতে পারি, তুমি তোমার মনের বিষয় জানিতে পার, সে তাহার মনের বিষয় জানিতে পারে। অতএব অন্তর্দ্দর্শনে তুমি একটি মনের বিষয় জানিতে পার, আমি একটি মনের বিষয় জানিতে পারি। কিন্তু একটি মনের জ্ঞান হইতে সার্ব্বজনিক সত্য নিরূপিত হয় না। একটি মনের পক্ষে যাহা সত্য, বহু মনের পক্ষে তাহা সত্য না হইতে পারে। অতএব সর্ব্ববাদিসম্মত মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে বহু মনের পরীক্ষা আবশ্যক এবং আত্মেতর মনের পরীক্ষা করিতে হইলেই বহির্দ্দর্শন প্রণালীর আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার মন না জানিলে পরের মন জানা যায় না। আপনার মন দিয়াই পরের মন জানা যায়। বাহ্যবস্তুর স্থিতি মনের বাহিরে হইলেও ইহার পরিচয় মনের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে।

"আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে?
আপন মন যদি বুঝিতে পারি,
পরের মন বুঝে কে কবে।"

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৯)

ক'দিন একরকম চুপচাপ কাটিয়া গেল। শনিবার বিকাল-বেলা অপর্ণা বিহারিকে ডাকিয়া বলিল—"বেহারিদা, আমারই সঙ্গে না হয় বাদ সাধা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু রাত পোহালেই যে দু'জন ভদ্রলোক তোমার বাড়ীতে আস্‌বে, তাদের তখন তুমি কি করবে—তাই আমায় বলো তো? তা' আমি নিজেই না হয় ধামা কাঁকালে করে এবা'র রাস্তায় বেরুই—কি বলো? তোমার হাতে পড়ে অনেক দুর্গতিই তো ঘটেচে; এটাই বা আর বাকি থাকে কেন?"

বিহারির মন এম্‌নি বিকল হইয়া পড়িয়াছিল—দিন-রাত ভাবিয়া-ভাবিয়া তাহার মাথা, বুদ্ধি এতই অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, হাজারবার স্প্রিং ঘুরাইলেও যেন তাহা যেমন তেমনি শিথিলই থাকে—দম আর তাহাতে লাগে না। সে মুখ তুলিয়া ধীরে-ধীরে উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় কি করতে হবে, বলো?"

অপর্ণা রাগিয়া উঠিল এবং ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—"আমি কি না পাঁচটা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়েচি, তাই জানি—কি করতে হয়, না হয়।"

বিহারি এ কথার কোন জবাব দিল না। জবাব দিতে ইচ্ছা করিলে, রহস্য করিয়া সে-ও তো বলিতে পারিত যে "আমিই বা ক'টার দিয়েছি, ভাই?" সে কিন্তু তা' বলিল না; একটু পরে বাহিরে চলিয়া গেল; এবং সন্ধ্যার পর দু'খানা এনামেলের রেকাব, দুইটা উক্ত দ্রব্যেরই জলের গ্লাস এবং একটা আনারস ও একটা ফজলি আম হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিল। কিনিয়া আনিল পৃথিবীর দুটি সুপক্ব, সুগন্ধ, শ্রেষ্ঠ ফল; কিন্তু তাহার চলন ও মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন সে আপনার একটি অতি প্রিয়তমের চিতা সাজাইবার জন্য নিজের হাতে কাঠ কিনিয়া আনিল।

রাত্রিতে আজকাল কয়দিন ধরিয়াই খাওয়া-দাওয়ার পাঠ নাই। দিনের বেলায় পূর্ব্বে রাত্রির রুটি তৈয়ারি থাকিত,—এখন কোন দিন থাকে, কোন দিন থাকে না; থাকিলেও—বাহির করিয়া দিতে, অথবা চাহিয়া লইতে, দু'পক্ষেরই দারুণ আলস্য অথবা অনিচ্ছা—কে জানে কি—বাধা দেয়। আবশ্যক-বোধ না থাকিলেই বোধ করি এমনটা ঘটিয়াই থাকে।

বিহারী রাস্তায়, পথে একটু ঘুরিল, মুনীব-বাড়ী একটু লেখাপড়ার কাজ ছিল—সেটুকু সারিয়া দিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক রাত্রি করিয়াই বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর ভিতর সব স্তব্ধ। দু'জন মানুষ, অথচ সেই দুইজনে আজকাল কেহ কাহারও সহিত বড়-একটা কথাবার্ত্তা কহে না। বিহারির প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এমন কঠিন প্রাণ তাহার যে, সে একবারে সকল ঝঞ্ঝাট চুকাইয়া-বুকাইয়া দিয়া যাইতেও তো কই পারে না? গেলে কিন্তু সে এখনকার মতন তবু বাঁচিয়া যায়!

পাশের বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রতিসন্ধ্যার মতই, সেদিনকার সন্ধ্যাতেও মজ্‌লিস চলিতেছিল। একজোড়া পাখোয়াজের সঙ্গে সস্তার বাজনা একটা হারমোনিয়মে—সেই কখন সন্ধ্যা হইতে অনবরত সুরের পর সুর বাজিয়াই চলিয়াছে। বাজনার ও বাদকের কিছু-মাত্র আলস্য নাই। আচ্ছা, তা নাই থাক; কিন্তু শ্রোতৃ-গণেরও কি শুনিতে-শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না? অল্প দূরে, আর-একটা বাড়ীর দ্বিতল হইতে একটি ছোট মেয়ের গান-বাজনার শব্দও শোনা যাইতেছিল। সেটা দূরত্ব প্রযুক্তও বটে, তা' ছাড়া হাজার হউক কচি গলা,—তাই মজ্‌লিসীদের চাইতে তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই সহনীয়। শোনা যাইতেছিল "এসো ফিরে—এসো ফিরে, মা,—" অপর্ণা উপরতলায় সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র কোটরটির

ক্ষুদ্র ঘুলঘুলির কাছে বসিয়া, উৎকর্ণ থাকিয়া, সেই গান শুনিল ; শুনিতে-শুনিতে, তাহার বুকের বসন কাঁপাইয়া, বক্ষস্থল ভেদ করিয়া, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত ও পতিত হইল। মা! হায় মা! যে জ্বালা হ'তে তুমি ত্রাণ পেয়ে গেছ, এমন কোন্ পাষণ্ড মাতৃগর্ভে জন্ম লইয়াছে যে,—আবার সেইখানে তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিতে অনুরোধ করিবে? না মা, না ;—ফিরো না,—যদি এ পৃথিবীর সহিত এখনও তোমার কোন যোগ থাকে—আজ এখনও যদি তুমি তোমার অপর্ণাকে দেখিতে পাচ্চো—এম্নি হয়,—তবু না, তবু না। তার মনে শক্তি দেবার জন্যেও না। শুধু দূরে থেকে আশীর্ব্বাদ করো,—যেন "কুলধর্ম্ম, জাত-মান বজায় রেখে" তোমার মত উঁচু মাথায় সেও চিতার আগুনে জ্বলতে পারে। এই তোমার শেষ আশীর্ব্বাদটুকুই,—তুমি যেখানে আছ, সেইখান হতে, সেই দূর হতে—অনেক, অনেক দূর হ'তেই সফল করো।

ক্ষুদ্র জানালাটি দিয়া আকাশের একটুখানি জ্যোৎস্না-ধৌত রজতমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। শুক্লপক্ষেরই সেদিন কি একটা বিশেষ তিথি। বাড়ীর পিছনে গলির মূর্ত্তি অন্ধকার, আর্দ্রতায় পঙ্কিল। গলির পাশেই কলার ঝাড়ে বাদুড় আসিয়া ডানা ঝট্‌পট্ করিতে লাগিল। নারিকেল গাছের মাথায় চিলের বাসা,—কোন নিশাচর পক্ষী চরিতে বাহির হইয়া, সেখানে হঠাৎ গিয়া পড়িয়া-ছিল—চিল শাবকের কর্কশ চীৎকার ও তাড়নায় দ্রুত উড়িয়া গেল। অপর্ণা হাতের উপর মাথা রাখিয়া সেই-টুকু আকাশের পানে চাহিল। 'কোথায় আছ মা? না না; তোমায় ডাকিনি, শুধু জান্‌তে চাইছিলুম। তোমার সুপ্তির, তোমার শান্তির, তাতে যেন ব্যাঘাত না ক'রে ফেলে থাকি! যেখানে থাক, এখানের চেয়ে নিঃসন্দেহ ভালই আছ। আমার সেই যথেষ্ট, আর কিছু জান্‌তে চাইবো না। থাক, তুমি থাক,—চিরদিন ঐ শান্তিতেই থাক। তোমার মতন জ্বলে জ্বলে আমিও তো একদিন তোমার মতই শান্তি কিনবো? মাগো! বল মা, যেন তাই পারি, যেন শীঘ্রই সে দিন আসে।'

সিঁড়ি ভাঙ্গা-চোরা এবং সেখানে রাত্রি-দিনে ঘোর অন্ধকারের একচ্ছত্রাধিকার প্রায় সমান। কাহার স্খলিত পদশব্দ যেন শোনা গেল। কে যেন পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া, পতন নিবারণ করিল। তা পড়িলেও সে খুব বেশি নীচেয় পড়িত না। দ্বিতল ও একতলায় মাত্র গোটা দশেক সিঁড়ির ব্যবধান। অপর্ণা সেই শব্দে মুখ ফিরাইল; বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিল;—দেখিল, সিঁড়িতে বিহারি।

অপর্ণার ঘরে প্রদীপের আলো ছিল না; কিন্তু জানালার ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়াছিল। সে সেই আলোতেই বিহারির মুখখানা দেখিতে পাইল। একটু দয়ার্দ্রকণ্ঠে নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্ষিদে পেয়েচে—বেহারিদা?"

বিহারির ক্ষুধার পরিবর্ত্তে তখন কান্না পাইতেছিল। সে তখন সিঁড়ির উপরে দরজার চৌকাঠে বসিয়া পড়িয়া রোদনরুদ্ধ কাতরস্বরে কহিয়া উঠিল—"আমায় মেরে ফেলিস্‌নে দিদি! আমার পরে তুই একটু দয়া কর—"

তাহার চোখের চাহনিটা যেন পাগলের চাহনির মত দেখাইল। অপর্ণা ঈষৎ সরিয়া গিয়া, যথার্থ বিস্ময়ের সহিত কিছুক্ষণ তাহার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, তারপর আবার একটু কাছে সরিয়া আসিয়া সহানুভূতির সহিত কোমল স্বরে কহিল "কেন বেহারিদা, তুমি অমন করচো কেন? বিয়ে কি কেউ বুড়োকে করে না? দেখ, অদৃষ্টে থাক্‌লে অল্পবয়সীর হাতে পড়েও তো মানুষ চিরজন্মটা ধরে একাদশী করে সারা হচ্চে। এ তো তবু—! সবকথা ভেবে দেখ;—সেরকম কিছু যদিই ঘটে, তবু তো ভাত কাপড়ের জন্য আমায় কারু দ্বারস্থ হতে হবে না—আর তুমিও তো আমার ভাবনায় নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে।"

বিহারি এইবার তার বয়সের বাধা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া, শিশুর মত হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"দিদি, তুই এত বড় নিষ্ঠুর!"

"কেন বেহারিদা, কি এমন আমি করেচি?" বলিতে-বলিতে অপর্ণা মুখ নত করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ দু'জনেই কোন কথা কহিতে না পারিয়া, নীরব হইয়া সেই-খানে সেইভাবেই বসিয়া রহিল। তখন আকাশের চাঁদও যেন গভীর আলস্যভরে ধীরে-ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্ব্বের আলো ক্রমেই পশ্চিমে সরিয়া আসিতেছে। কোলাহলমুখর জগতের বুকেও সেই চাঁদের জ্যোৎস্নার সহিত মিশ্রিত ঘুমের নেশা সংক্রামিত হইতেছিল।

প্রকৃতি তখন ঘুম-পাড়ানিয়া গান সেই জ্যোৎস্না-তরঙ্গের প্রাণে প্রাণে ঢালিয়া দিয়া প্রাসাদ-অট্টালিকা কুটীরের ছাদে-ছাদে, জানালায়-জানালায়, মর্ত্তবাসীর চোখে-চোখে মাখাইয়া দিবার জন্য প্রেরণ করিতেছিলেন। বাতাসের নিঃশ্বাসে, পাতার মর্ম্মরেও সেই ঘুমের নেশার আমেজ পাওয়া যায়! সেই ঘুমের সুরে, বাজনার সুর, গানের সুর, এমন কি, নিত্যকার কথা হাসির সুরশুদ্ধ ক্রমেই ঢাকিয়া আসিয়া, একটা বিরাট শান্তির স্তব্ধতা বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিতেছিল। বহুক্ষণ পরে চোক মুছিয়া, বিহারি সংশয়জড়িত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—বড় ভয়ে-ভয়েই কহিল,—"এর চেয়ে আর-এক সহজ উপায় আছে, তুমি যদি শোন—"

অপর্ণা সেই তরল অন্ধকারে কেবলমাত্র বারেক চাহিয়া দেখিল; মুখে কোন প্রশ্নই করিল না।

"এসো আমরা ব্রাহ্ম হই। শুনেছি, ব্রাহ্মর মেয়েদের বিয়ে না হলেও তেমন দোষ হয় না।" নিবিড় অন্ধকারে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিল। অপর্ণা এই প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহে কি যেন বলিয়া উঠিতে গিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই—যেমন করিয়া ঘরের জানালার সম্মুখ হইতে চাঁদের আলো সরিয়া যাইতেছিল—তেম্নি করিয়াই তাহার মুখেরও সেই আকস্মিক উজ্জ্বলতা অন্ধকারে মিলাইয়া আসিল। সে মৃদুশ্বাসে অতি অস্ফুটস্বরে উত্তর করিল—"মা যাবার সময়ে কি বলে গেছেন বেহারিদা? 'কুলধর্ম্ম, জাতি-মান বজায় রাখা' মার যে শেষ আদেশ! তা কি তোমার মনে নাই?"

"ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া নয়—এ আমি ভাল লোকেরই মুখে শুনেচি। তবে আচার-ব্যবহার বজায় রাখা—সে তো নিজেদের হাত—রাখ্‌লেই হবে।"

"বেহারিদা! দেখচি সাধ করে কর্ত্তাবাবু তোমায় গাল দিতেন না। তোমার মত স্বার্থপর আমি নই যে, মার আদেশ ভুলে, আপনার সুবিধা খুঁজে—চুরি করে, ঠাকুর-মন্দিরে লুকিয়ে বাঁচবার গর্ত্ত খুঁড়তে যাবো। সুবিধের জন্য, লোক-দেখানো ধর্ম্মের ভাণ হয় তো তুমি করতে পারো; আমি তা কিছুতেই পারিনে।"

এ কথার পর আর তর্ক চলে না; চলিলেও তাহা নিষ্ফল, ইহা নিশ্চিত। তাই অগত্যা শেষ আশা বিসর্জ্জন দিয়া বিহারি হেঁটমুণ্ডে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন তসরের ধুতি থস্‌মথ করিতে-করিতে একমুখ পানদোক্তার টেঁপর ও অনেকখানি গালভরা হাসি লইয়া ঘটক-ঠাকুরাণী মোক্ষদাসুন্দরী 'হন্তদন্ত'ভাবে বাড়ী ঢুকিলেন। সম্মুখে কাহাকেও না দেখিয়া, সরাসর তিনি উপরের সেই চোরকুটুরীটিতেই একেবারে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে আর একদিন আসিয়া এই কোটরটির সন্ধান তিনি পূর্ব্বেই পাইয়া গিয়াছিলেন।

নিজের সেই কুটরিটিতে অপর্ণা বিছানায় দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। মোক্ষদাসুন্দরীর গৃহপ্রবেশের পরেও সে ঠিক তেমনি রহিল, মুখ পর্য্যন্ত তাহার দিকে ফিরাইল না,—যেন ঘুমাইতেছে। মোক্ষদার মনটা তখন একটু বিশেষ রকম উৎফুল্ল এবং উৎসুক ছিল; কাজে-কাজেই বাধ্য হইয়া, সে এই অসময়ের নিদ্রাকে সম্মান না দিয়া, বরং নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে দুই হাতে নাড়া দিল—"ওঠো, ওঠো, বরকর্ত্তামশাই পুরুৎ সঙ্গে বাড়ী হতে বার হচ্চেন, দেখেই আমি এই ঘোড়ার মত একদৌড়ে খবরটা দিতে এসেচি। তোমাদের এখেনে সব জোগাড় হয়েচে তো? শাঁক, চন্দন, ধান, দুব্বো? চক্রবর্ত্তী মশাই তো দেখলুম দরজার গোড়ায় 'আও ভাও' করবার জন্যে তৈরি রয়েচেন। তা, তুমি এখন শুয়ে কেন? চট করে উঠে পড়ো। তারা এই এলো বোলে।"

অপর্ণা যেমন ছিল, তেম্‌নিই থাকিয়া গভীর অবসাদের ক্লান্ত স্বরে উত্তর করিল—"তুমি গিয়ে তাঁদের এখনই বারণ করোগে যাও বাছা,—মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্চি, আজ তো কোন মতেই আমি উঠতে পারবো না।"

সে কি? মোক্ষদার হাসিমুখ এককালে চূণপানা হইয়া গেল। "এও কি একটা কথা হলো বাছা? ভদ্দর লোক,—তায় যেমন-তেমন নয়, একটা লোকের মতন লোক আশা করে' আসচে; অপমান হবে, সে কি হয়? উঠে যেতে না পার, ওনারা এইখানে এসেই আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি হবে, বর নিজে তো আর এস্‌তে পারেন না। হাজার হোক সেকেলে পিরবীন মানুষ তো বটে। এখনকার বারফট্টকা ছোঁড়াগুলোর মতন ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত তো নন। তাই তাঁর একটি বড় অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাঠাচ্চেন। নাও, উঠে বস, কাপড়খানা ছাড়; আর-কিছু করো, না করো—বলে 'এনা চয়ন কে'না পরে, কপালগুণে

চন্নন ঝল্‌মল্‌ করে।' একখানা ছাতা কাপড়েই এই রূপ! এ আর সাজাবার দরকার কি? তা সাজাবে,—যে সাজাবার সেই ভাল করে' সাজাবে। ব্যাটার বউকে তো আর কম দেওয়া দেয়নি। মেয়েরও সিন্দুকভরা-ভরা হীরে-জহরত ঘরে পড়ে কাঁদচে,—উঠ্‌বে তো সবি এই সোণার অঙ্গে!"

মোক্ষদা প্রশংসায় গলানো চোখের দৃষ্টি দিয়া, সেই 'সোণার অঙ্গের' খানিকটা 'সোণা' যেন ছানিয়া তুলিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু তথাপি সেই 'স্বর্ণময়ীর' মন পাইল না। মোক্ষদার কথা শেষ হইতেই, খুব ভাল করিয়া পাশ-বালিস টানিয়া শুইয়া, অপর্ণা দৃঢ় স্বরে কহিল—"আমার আজ এখন মোটে উঠে বস্‌বার শক্তি নেই। কেন মিথ্যে ভদ্রলোকদের হায়রাণ করে ফেরাবে,—তার চেয়ে তুমি এখনি তাঁদের গিয়ে বলোগে,—আজ যেন তাঁরা আর না আসেন।"

ছ'দিনের দেখা-শোনা হইলে কি হয়, ঘটকঠাকুরাণী জাত-সাপ চিনিয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—"কবে আবার তা'হ'লে ওঁনাদের আস্‌তে বল্‌বো?"

"সে পরে তখন বিবেচনা করে দেখা যাবে,—এখন তো ছ'দিন যেতে দাও। উঃ! মাথা খসে গেল। আমি মরে গেলুম,—আর আমায় মিছিমিছি জ্বালিও না বাপু—তুমি এখন যাও।"

বড়মুখ করিয়া 'মুকি' আগের ভাগে বাবুর নিকট তসর আদায় করিয়াছে। সেই মুখ ভোঁতা করিয়া সে 'মচ্ছি-ভঙ্গ' হইয়া ফিরিয়া গেল। দ্বারের নিকট বিহারি হঠাৎ চট্‌কা-ভাঙ্গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কখন তাঁরা আস্‌চেন?"

"তাঁরা আর কই আস্‌তে পেলেন—তাঁদের মানা করতেই তো যাচ্ছি।" বলিয়াই মোক্ষদা কোন-প্রকার আলোচনার আরম্ভ না করিয়াই চলিয়া গেল। কি হইল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া—কিন্তু আপাততঃ যে আশীর্ব্বাদটা বন্ধ রহিল, ইহাতেই মনের মধ্যে অনেকখানি হাল্কা হইয়া—বিহারি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, অপর্ণা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। বিহারীকে সম্মুখে দেখিয়া সে ডাকিয়া বলিল—"আমার এখনও আজ চান হয় নি; তোমার সেই ঠিকে ঝি-মাগী তো কই আজ জল দিয়ে গেল না? রাস্তার কল থেকেই না হয় জল এক ঘড়া ধরে এনে দাও দেখি। চট্‌ করে স্নানটা করে নিই।"

বিহারি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"ওদের কি আজ আস্‌তে মানা করা হয়েছে?" অপর্ণা রাশিকরা চুলগুলা বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই একটা গুচ্ছ আঙ্গুলে জড়াইতে-জড়াইতে হাসিয়া কহিল,—"কর্‌বো না তো কি? তুমি তো সব খবরই রাখো; জ্বরে আমি মরে যাচ্চি, জ্বর-গায়ে কি কোন শুভকর্ম্ম হয়?"

বিহারিও তখন মৃদু হাসিল; কহিল,—"জ্বর হয়েছে, তবে চান্‌ কর্‌বে যে?" অপর্ণা তেলের বাটি পাড়িতে-পাড়িতে উত্তর করিল—"খুব কর্‌বো!"

(৪০)

রান্নাঘরে কয়লার চুলা গন্‌গন্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। হাঁড়ি চাপাইয়া তাহাতে দুটি চাউল জলে ছাড়িয়া দিলেই ঘণ্টাখানেকের ভিতর রাঁধা-ভাত নামাইতে পারা যায়। কিন্তু 'এইটুকুমাত্র' বলিলে কি হয়, 'এইটুকু' করিতেই যে সকল সময় মনে ইচ্ছা, অথবা শরীরে শক্তি দেখা দেয় না! কাজটা তো বড় নয়, কর্ম্ম-কারকই যে প্রধান!

মাথার উপরেই তাকে সাজান হাঁড়িকুঁড়িগুলা অপর কাহারও পাড়িবার অপেক্ষা না রাখিয়া, যদি আপনারা আপনা-হইতে হাতের কাছে নামিয়া আসিত, তাহা হইলেও না হয় যা হোক হইত। তা তেমন কোন মন্ত্র তাহাদের তো জানা নাই। কাজেই যথাস্থানে সবই যথাযথ রহিয়াছে; উনানের আঁচ বহিয়া যাইতেছে, আর অপর্ণাও চুপ করিয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেসিয়া বসিয়া আছে। আজ-কাল ক্রমশঃই তাহাকে এই আলস্য ভূতে দিনে দিনে যেন পাইয়া বসিতেছিল। পূর্ব্বের সেই চিরচাঞ্চল্যের স্থলে কোথা হইতে—তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—একটা পাষাণো-পম জড়তা তাহাকে যেন নিজের মধ্যে জড়াইয়া-জড়াইয়া নিবিড় আলিঙ্গনে আঁটিয়া ধরিতেছিল। কাজকর্ম্মে, ঘরকরণার পারিপাট্য-সাধনে যাহার সময়ে আঁটিত না, মাতৃবিয়োগের অত বড় শোকটা যে এই কর্ম্মের অন্তরালেই শুধু চাপা দিয়া গেল,—আজকাল সকল কাজেই যেন তাহার একটা তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাইতেছিল। চাল-ডাল ফুরাইলেও সে বলে না যে, আনাইয়া দাও। কোনদিন ভাতে-ভাত, কোনদিন এক-তরকারি-ভাত, তা'ও আবার এক-একদিন ধরিয়া-পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া অখাদ্য হয়। এক-একদিন শুধু জল ফুটিয়া-ফুটিয়া শেষ-

কালে জল শুকাইয়া চড়চড় করিয়া মাটির হাঁড়িতে ফাট ধরে, চাউল দিবার সময়ই ঘটিয়া উঠে না। এম্‌নি কত-রকমে কর্ম্মকর্ত্রীর মনের কত ক্রটিই যে তাহার হাতের কাজগুলা বাহির করিতেছিল, তাহার হিসাব রাখিলে নিঃসন্দেহ খাতার পাতা ভরিয়া উঠিতে পারিত। বিহারি উদ্বেগশঙ্কিতচিত্তে এই সবই লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু ইহাতে সে যে খুব দুঃখিত হইতেছিল, এমন বোধ হয় না। অপর্ণার এই তীব্র অবসাদ হয় ত তাহার এতদিনকার উন্মাদ-বিদ্রোহ-ঘোষণার প্রতিক্রিয়া;—ইহা,—মা-কালী করুন, তাহার যুদ্ধ-হারের লক্ষণই যেন হয়! সে মা-কালীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা মানত করিল। কিন্তু তা হইলে কি হয়, মনে তাহারও তো তিলপরিমাণ সুখশান্তি পূর্ব্ব হইতেই ছিল না; তার উপর আবার আরও একটা অশান্তি বর্দ্ধিত হইল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিতে তাহার সাহসে কুলাইয়া উঠে না। কি জানি, যদি এই সুস্পষ্ট আঘাতে তাহার মনের কোন আধ-চাপা অস্পষ্ট বেদনাকে ক্ষতের আকারে অকস্মাৎ ফুটাইয়া বাহির করে? সে নিশ্চয়ই কোন কিছু একটা প্রাণ-ঘাতী ভাবনার তরঙ্গে ডোবাউঠা করিতেছিল,—আপনার হৃদয়টাকে লইয়া, ছিঁড়িয়া খানখান করিয়া, তাহা কোন শ্যেনরূপী দেবরাজের প্রবঞ্চনার ক্ষুধা মিটাইবার জন্যই খড়্গ শানাইতেছিল। যাই হোক, ঠিক সেই ধরণেরই যে কোন একটা ভাবনার ধ্যানে সে রহিয়াছিল,—বুদ্ধির ধারে না গিয়াও, বিহারি সেটা বুঝিল। তাহার নিজের প্রাণে এই যে রাত্রিদিনের ব্যাকুলতার ব্যর্থ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে-ছিল,—অপর্ণাকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে! আর?—সেই পরের ঘর—তাহার বধ্যভূমি,—বাসরঘর নয়,—এই কষ্টেই তাহার হৃৎপিণ্ড ফাটিতেছিল;—কিন্তু অপর্ণা যে তাহাদের দু'জনেরই সুনামটুকুমাত্র বজায় রাখিবার জন্য এমন করিয়া নিজের মাথা হাড়িকাঠের মধ্যে হাসিয়া গলাইল,—এ যন্ত্রণা বুঝি, তাহার এই মূল্যহীন জীবনটা শতবার ধ্বংস হইবার পরও, তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে না। এ পৃথিবীতে, এই মানুষের দেহ পাইয়া, কত লোকে কত মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছে,—কত লোকের একটি তর্জ্জনি-হেলনে এ জগতের চির-নিয়ন্ত্রিত নিয়ম-পদ্ধতির আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত বিধাতৃ-বিধানেরই ন্যায় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। সেই মনুষ্যদেহ লইয়া—সেই পৃথিবীতেই জন্মিয়া, বিহারী এই একটিমাত্র মেয়েকে একটুখানি সুখী করিতেই পারিল না? ধিক্ এমন মানবজন্ম!

আবার তিনদিন পরে আশীর্ব্বাদের দিন স্থির হইয়াছে। বিবাহের দিন এ মাসে নাই—সেই ১৫ই শ্রাবণের শুভদিনটি। তা সেই বা কি এমন যুগান্তরের খবর? সেও তো আর সতের দিন পরের কথা।

আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বদিনে, অপরাহ্নের অস্তমান সন্ধ্যালোকে বসিয়া অপর্ণা কি স্থির করিয়া—কি বুঝিয়া,—হঠাৎ নিজের উপর হইতে সমুদয় গ্লানির অবসন্নতাটা টানিয়া ফেলিয়া দিল। খানকতক রুটি ও কুমড়ার ছক্কা তৈরি করিয়া, অনেকদিন পরে সেদিন সে পূর্ব্বের মতই ঠাঁই করিয়া, খাবার ধরিয়া দিয়া বিহারিকে খাইতে ডাকিল।

বিহারির খাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও, ক্ষুধা নাই বলিবার দুঃসাহসও তাহার ছিল না। সে আসনে বসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাবে না? তোমার আছে ত?"

"আছে, খাবো এখন; তুমি বসো,—" বলিয়া অপর্ণা সেইখানেই হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল। বিহারি তাহার এমন দ্বিধাগ্রস্ত অপ্রতিভভাব আর কখন দেখে নাই;—তাই কোন-কিছু একটা নূতনতর বিড়ম্বনা ঘটার প্রতীক্ষায়, শঙ্কিতনেত্রে, তাহার ঝড়ের আকাশের মত সর্ব্বনাশপ্রচ্ছন্ন মুখের দিকে চকিতে বারেক চাহিয়াই, না-দেখার ভাবে দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু মনের ভিতরে সে যেন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

বিহারীর খাওয়া হইয়া গেলে, সে যখন আঁচাইয়া ও-দিকে চলিয়া যায়—তখন অপর্ণা হঠাৎ ধ্যানভঙ্গের মতই চমকিয়া উঠিয়া, তাহাকে ডাকিল, "শোন।"

এমন ছোট করিয়া,—ভিতরে এমন গুপ্ত অর্থ নিহিত রাখিয়া—সে বুঝি এমন স্বরে আর কখন কাহারও সহিত কথা কহে নাই। এই অসাধারণ অপ্রচ্ছন্নতার বিশেষত্ব-টুকুই সে আজকাল বর্জ্জন করিয়া, যেন কি-এক গভীর রহস্যের মোটা ওড়নায় নিজেকে বিহারীর নিকট হইতে ঢাকা দিয়াছে; তাই না বিহারি মরিতে বসিয়াছিল।

বিহারি ফিরিয়া কোন-একটা অঘটনের জন্যই প্রস্তুত

হইল। সেটা যে নিশ্চিত ঘটিবে, এটা এখন বেশ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

অপর্ণা একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইল; কবাটের গায়ে দেহের ভর ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজের দুই পায়ে পূরা জোর দিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বিহারীর দিকে না চাহিয়া, আর-একদিকে চাহিয়া কহিল—"আমার মার অমত ছিল না—তুমি—তা জানো,—আমি—আমিও তাই মনে করচি—সেই সবার ভাল হবে। কি বলো? সেই ভাল—না? তুমিই তা হলে বিয়েটা করে ফেল, সব নেঠা চুকে যাক্।"

"অপর্ণা! আর যা তোমার খুসী, সব তুমি বলো; কেবল মাতামহের বয়সী বুড়োকে অপমান করো না! ও-রকম তামাসাও আমি কখন কারুকে করতে দিইনি।—"

অপর্ণা স্থিরচক্ষে বিহারির সেই ভূতাহতের মত বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইল। বিদ্রূপের কঠিন স্বরে নির্ম্মম ভাবে কহিল, "তোমার মত শ্রোত্রিয়, 'বেচা-কেনা'র ঘরে আমার মত কুলীনের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ায় যত অপমান,তা আমার অজানা নয়। মিথ্যে আর মানের কান্না কেঁদো না। শোন—এদিকে আমায় প্রাণ ধরে পরের ঘরেও তো পাঠাতে পার্ব্বে না, তাতেও তো দেখ্‌তে পাচ্চি রাত্রিদিন হিংসায় জলেপুড়ে থাক্ হয়ে যাচ্চো। আবার এও না। তুমি তবে কি চাও, স্পষ্ট করে তাই না হয় আমায় আজ বলো দেখি, আমি শুনি?"

ঘৃণায়, লজ্জায়, ধিক্কারে আকণ্ঠ আরক্ত হইয়া বিহারি কহিয়া উঠিল, "অপর্ণা,—তুমি যে এতখানি দেখ্‌তে পাও, তা' জান্‌তাম না। আমি সত্যিসত্যিই তোমায় ছেড়ে বেঁচে থাক্‌তে পারবো না। লুকুতে চাইনে—কথা খুব সত্যি! কিন্তু তোমায় আমি তো তা বলে স্বার্থের জন্য নিজের কাছে কখন ধরে রাখ্‌তে চাইনি। ভগবান্ জানেন,—না—শুধু তাই নয়—তুমিও জানো, আমার মনের কোণে কোথাও এতটুকুও পাপ নেই। আমি চাই, তুমি সুখী হও—সুখে থাকো। তোমায় ভাললোকের হাতে, বড়লোকের বাড়ী দিতে চেয়েচি এইজন্য যে, তুমি এতদিন যা কিছু দুঃখকষ্ট পেয়েচ, সয়েছ, ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসে তার শোধ নিতে পারবে। আর স্বীকার করি, সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থও ছাড়তে পারিনি। আমিও তোমার স্বামীর পায়ের কাছে, তাঁর মহত্ত্বের আশ্রয়ে,—তাঁর ঘাড়ে নয়,—আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির যে দর, সেই দরেরই একটি সামান্য চাকরি উপলক্ষে সকল সময় থাকতে পারবো। তা হলেই তোমায় সদাসর্ব্বদা দেখতে পাবো; তোমা থেকে দূরে যেতে হবে না। কল্পনার স্বপ্নে কতবার কতই গড়েচি, ভেঙ্গেছি। তোমার ছেলেমেয়ে কাঁধে-পিঠে নিয়ে, তোমাদের সমস্ত সুখে-দুঃখে, লাভে-ক্ষতিতে প্রাণ-পাত করে, শেষের ক'টা দিন কাটিয়ে দেবো। কেন? না —তোমরা আমার অন্নদাতার গায়ের রক্ত! তুমি আমার সৌদামিনী-মার মেয়ে; তিনি তোমায় মরবার সময় আমার হাতে দিয়ে গেছেন! কিন্তু, যদি তোমায় সুখী করতে না পারলাম, যদি তোমায় এক অভাবের কষ্ট হতে বা'র করে সহস্র দুঃখকষ্টের মাঝখানেই ঠেলে ফেলতে হলো—তবে কেমন করে তোমার বিহারিদার মুখে হাসি আসে দিদি? এতে কি তার বুক ফেটে ছিঁড়ে-গুঁড়িয়ে পড়ে যায় না? সে যে এই পৃথিবীতে এসে, সুধু এই একটীমাত্র ব্রত নিয়েছিল, সেটাও তার উদ্‌যাপন হলো না, 'পচে' গেল!"

বিহারীর দুই চোখ অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে হীরার মত ঝকিয়া উঠিয়াছিল। তাহার শীর্ণ, পাণ্ডুর মুখে বিগত-যৌবনের উচ্ছ্বাসময় তপ্তরক্ত আবীরের দীপ্ত লালিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সে ক্ষণেক নম্রমুখী অপর্ণার আনত মুখের যে অংশটুকু আলো-ছায়ার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল, তাহারই দিকে চাহিয়া, আবার তেমনি সুস্পষ্ট স্বরে, উঁচু গলাতে কহিতে লাগিল, "আমাকে তুমি যে অত অবিশ্বাস কর না, তা যেমন তুমি জান, তেমনি আমিও বেশ জানি। সে দিন তুমি যে আমায় অকথ্য কথাগুলা বলেছিলে,সে যে আমাকেই খোঁচা দিয়ে জাগাবার জন্যে—তা আমি বুঝেছিলুম। কিন্তু, তবুও বলি, আর তোমার যা খুসী সব বলো দিদি, শুধু ঐটুকু কাণে শুনতে পারিনে; ওটি মর্ম্মে গিয়ে মর্ম্মান্তিক বাজে।"

অপর্ণা সত্যসত্যই তখন আর কিছু বলিল না। যতই হোক সেও মানুষ তো,—মেয়েমানুষ। বিহারি গভীর নিঃশ্বাসে বুকে আট্‌কান হাঁফটা সহজ করিয়া লইল এবং একটুখানি পরেই আস্তে-আস্তে সরিয়া গেল।

এই দিনই একটু পরে মোক্ষদা আসিয়া পঁচিশটা টাকা অপর্ণার সাক্ষাতেই বিহারীর হাতে দিতে গেল; হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "বাবু দিলেন; আমি তোমাদের অবস্থার কথা সমস্তই তাঁকে বলেছিলুম কি না,

তাই তিনি দিলেন ; বল্লেন, একটা অন্য বাড়ী ভাড়া লও ; এ বাড়ীতে তো আর বে হতে পারে না। সাতপাক ঘোরাবার তো একরত্তি ঠাঁইও নেই। এখন এই নাও, তা' পর যা খরচপত্র হবে, সবই তিনি দেবেন। তাঁর সত্তর হাজার টাকা কোম্পানীতে খাটচে ; মাস-মাস একটি কলম লিখে দেন, আর কোম্পানী চারশো টাকা পেন্‌সিন পাঠিয়ে দেয়। সোজা তো বিদ্যেশেখা নয়, একটা গোটা জেলার বিচের করে ফাঁসি দেবার কর্ত্তা।"

বিহারির হাতের মুঠা ভিতরদিকেই আঁটিয়া রহিল, খুলিল না,—দেখিয়া সে অপর্ণার দিকে ফিরিয়া কহিলেন "যা বলেছিলে, তা সত্যি মা ; বাবাঠাকুরের একটু ছিট্ আছে।—তা তুমিই তবে ধরো—" টাকা-কয়টা একবার অপর্ণার হাতে ঠেকিয়াই তখনই ঝন্ ঝন্ শব্দে চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। "ও মা, লক্ষ্মীর শব্দ কি হ'তে দিতে আছে—লক্ষ্মী রাগ করেন,—" বলিয়া সোহাগে-গলান আড়চোকে চাহিতে চাহিতে ঘটকঠাকুরাণী টাকাগুলা কুড়াইতে লাগিলেন। সব কয়টা কুড়ান হইলে, তখন আবার বলিলেন, "কর্ত্তা বল্লেন, কালকের জন্যে কোন রকম ব্যস্ত হবার দরকার নেই ; তাঁরা সকালবেলা চা মুখে দিয়েই আসবেন। আমিও বলি, খাবারের নেঠায় আর কাজই বা কি ? এই ডটো দিন বাদ তো কাছে বসে 'এটা খাও', 'ওটা খাও' করে খাওয়াবেই।"

অপর্ণা কহিল "ও সব কথা থাক। ও টাকা ফেরৎ নিয়ে যাও। উনি তোমায় লজ্জায় বল্‌তে পারচেন না ; অন্য জায়গায় বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। অনর্থক তুমি কষ্ট পেলে বাছা, কিছু মনে করো না। এই টাকা চারটি দিচ্চি নাও, পান খেও। কি আর করবো বলো, এ মানুষটি যে ঐ এক রকমের, তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছো ? না পাগল, না সহজ। সেখানে পাকা দেখা হয়ে, সব ঠিক করে বসে আছে ; এমনই লোক।"

মোক্ষদা ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইল ; কিন্তু অম্‌নি অকস্মাৎ সে গেল না, দু'চার কথা শুনাইয়া এবং দু'দশ কথা শুনিয়াও গেল। তার পর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বজ্রাহত বিহারির পানে চাহিয়া অপর্ণা রূঢ়স্বরে কহিল, "বিধবা বউ, বিধবা মেয়ের গায়ের গয়না দিয়ে যে বাষট্টি বছর বয়সে নূতন বিয়ে করে কনে সাজায়—তার চেয়েও কি তুমি নিজেকে অধম মনে করো ? তা যদি করো, তা'হলে সত্যিই তুমি তাই। অতবড় পাষণ্ড একটা বুড়োর হাতে আমায় দিতে পারো, আর এইখানে একটু স্বস্তিতে পড়ে থাকতে দিতে পারো না ? এই ছাইভস্ম ভালবাসার তুমি আবার গুমোর করে বেড়াও ?"

"আমি তো বরাবরই ও সম্বন্ধর বিরুদ্ধে ; ওর জন্যে আধখানা প্রাণ তুমি আমার ক'দিনে বার করে দিয়েচ, তা' কি বোঝনি ?"

"হুঁ, তাই তো ! 'যত দোষ নন্দঘোষ !' আমিই তোমার যত মন্দ সব করচি ; তাই জন্যেই বুঝি ভাঙ্গাকুলো বাজিয়ে এই অলক্ষ্মী বিদায় করা হচ্ছিল ? ও সম্বন্ধ তুমি আননি তো কি আমি রাস্তা খুঁজে ওই ঘটকি মাগীকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে এসেছিলুম ? একটুও তোমার মুখে আট্‌কায় না ? আচ্ছা, সে যা হয়েচে হয়েচে ; আর ওসবে কাজ নেই, ক্ষমা দাও ! মা যা, বলে গেছেন, সেই উচিত ;—আর যা উচিত, তাই ভাল !"

[ক্রমশঃ]

আঁধারে

[শ্রীগণেশচন্দ্র রায়]

আজিকে পরাণ শূন্য—নাই কেহ নাই—
থেকে থেকে হিয়া কেঁদে উঠিতেছে তাই !
কোথা সে সুন্দর শ্যাম স্নিগ্ধ বসুন্ধরা ?
কোথা সে তটিনী মধু প্রফুল্ল অন্তরা ?
বিহঙ্গ-সঙ্গীত কোথা ? পল্লব মর্ম্মর ?
ফুল-গন্ধে আর নাহি জাগায় অন্তর।
বসন্ত-বাতাসে প্রাণে তুলে না কম্পন,
অন্তরে থামিয়া গেছে প্রাণের স্পন্দন।
লবণ সাগরে ডুবি' আকুল হুতাশে
শুকা'য়ে মরিয়া গেছে পিয়াসী বাসনা ;
তরঙ্গে-তরঙ্গে ভেসে' চলে'ছি—কোথা' সে
অসাড় নিঃস্পন্দসম বিলুপ্ত-চেতনা ?—
—চৌদিকে ঘিরিয়া আসে প্রলয়-তিমির ;—
পরাণ কাঁপিয়া উঠে কোথা—কোথা তীর ?

চুট্‌কী

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

(১) গুহ্য ও উহ্য

কাব্য যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা transcendental ; কর্ম্ম যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা আধ্যাত্মিক ; দর্শন যেখানে বুঝা যায় না, সেইখানেই তাহা চরম জ্ঞান ; যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন,—Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter অর্থাৎ যে গান শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা যে গান শুনা যায় না তাহা অধিক মধুর ; সেইরূপ যাহা বুঝা যায় তাহা অপেক্ষা যাহা বুঝা যায় না তাহা অধিক গভীর। অতএব গুহ্যতত্ত্ব চিরদিন উহ্যই থাকে। এইজন্যই বুঝি আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন না ; তিনি, উনি, সে প্রভৃতি সর্ব্বনামেই সারেন—কেননা তাঁহাদের প্রেম অতি মধুর, অতি গভীর। জগতে একমাত্র হিন্দুর দাম্পত্য-সম্পর্কই আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। সুতরাং সম্বোধনটাও আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা!

(২) কাব্য ও কাব্য-সমালোচনা

মিল্‌টনের কাব্যগ্রন্থাবলী পাঁচ শিকায় পাওয়া যায়, অথচ উক্ত কাব্যগ্রন্থাবলী-অবলম্বনে যে সমালোচনা পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল্য তিন টাকার উপর। এই-জন্য একটি ছাত্র বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম ;—"দেখ, যে খনি হইতে সোণা তোলে, তাহার মজুরি যৎসামান্য, কিন্তু যে সেই সোণার উপর কারুকার্য্য করে অর্থাৎ খোদার উপর খোদকারি করে, তাহার 'বাণী' অধিক। সুতরাং ভবের বাজারের ন্যায় ভাবের বাজারেও সোণার প্রকাশকের কার্য্য অপেক্ষা সোণার বিকাশকের কার্য্যের অধিক কদর হইবে, কাব্য অপেক্ষা সমালোচনার মূল্য অধিক হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?"

(৩) গদ্য ও পদ্য

পদ্যে লিখিত হইলেই কবিতা হয় না, তাহার সাক্ষী ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল, ইতিহাস, এমন কি আইনের ধারা ও ডাক্তারী ঔষধের ব্যবস্থা (prescription) পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পদ্যে লিখিত অথচ কবিত্ববর্জ্জিত সাহিত্যকে সাহিত্যভোজের 'ধোকার ঝাল' (বা ইংরাজী ডিনারের mock-turtle) বলিতে পারা যায়। আর গদ্যে লিখিত অথচ সরস কবিত্বপূর্ণ রচনাও বহু সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলি 'খাগড়াই মুড়কি' —হঠাৎ দেখিলে শুকনা খট্‌খটে মনে হয়, কিন্তু ভিতরে রসে ভরা। আর না-গদ্য না-পদ্য (neither fish nor flesh nor good red herring, prose run mad or verse run tame) দেখিলে আমার কলিকাতার ক্ষীর বা রাবড়ীর কথা মনে হয়—ইহাতে দুধের ভাগ অল্পই, নানারূপ ভেজাল মিশান জলের ভাগই বেশী।

(৪) অনুবাদের অনুবাদ

দীপ হইতে দীপ জ্বালিলে আলোকের উজ্জ্বলতার হ্রাস হয় না ; ছবি হইতে ছবি তুলিলে তাহা নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়ে না ; পাত্র হইতে পাত্রান্তরে জল ঢালিলে জলের স্বাদুতা কমে না ; তেজারতিতে সুদের সুদ তস্য সুদ হয়, জমিদারীতে পত্তনির উপর দরপত্তনি, দরপত্তনির উপর ছেপত্তনি হয়—কিন্তু অনুবাদের অনুবাদ, সে একেবারে সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া পড়ে। শালার শালার সঙ্গেও বরং সম্পর্ক থাকে, কিন্তু অনুবাদের অনুবাদের সঙ্গে অনেক সময় মূলের কোন সম্পর্কই থাকে না।

(৫) গন্ধকের গুণ

নরক পূতিগন্ধময় কৃমিকীটাকীর্ণ, অথচ নরকে মড়ক হয় না কেন ? অনেকদিন এই সমস্যার মীমাংসা করিতে

পারি নাই। তাহার পর, যখন মিল্‌টনের নরক-বর্ণনায় পড়িলাম, নরকে অফুরন্ত গন্ধক পুড়িতেছে (Ever-burning sulphur unconsumed) তখন বুঝিলাম সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত ভাল, এই গন্ধকের গুণেই সকল সংক্রামক রোগের বীজাণু বা জীবাণু (bacilli) নষ্ট হয়।

(৬) 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'

গীতা বলিতেছেন (৪।১৭) 'গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'। বাঙ্গালা দেশে গীতার চর্চ্চা খুব। সুতরাং বাঙ্গালী এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। চাকরিই করি আর ব্যবসাই করি, আমাদের সকল কর্ম্মের শেষ গতি গৃহিণীর গহনা গড়ান (অনুপ্রাসটুকু রসান লাগান)!

(৭) ইতিহাস

ইতিহাস যে হাস্যরসাত্মক, তাহা ইহার নামেই প্রকাশ। ইহার নামের তাৎপর্য্য—হাস্যেই যাহার ইতি অর্থাৎ শেষ; স্থূল কথা, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু, ইহাতে সার কিছু নাই। এই জন্যই একজন বিলাতী জ্ঞানী বলিয়াছেন, ইহাতে নাম ও তারিখ ছাড়া আর সবই ঝুটা (In history everything is false except the names and the dates)। এই বুঝিয়াই 'পৃথিবীর ইতিহাস'-লেখক (সাঁতারাগাছীর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী নহেন)—বিলাতের স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। অধুনা আমাদের দেশে যে ঐতিহাসিক গবেষণা ও মৌলিক অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা বেশ সপ্রমাণ হয়। দেখুন, বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উড়িয়াছে, অন্ধকূপ কলিকাতা হইতে উড়িয়াছে; আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আনয়ন, বিক্রমাদিত্য রাজা ও তাঁহার নবরত্ন, সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়, এ সবই পণ্ডিতগণ হাসিয়া উড়াইয়াছেন। Historic doubts about Napoleon নিতান্ত গাঁজাখুরি ব্যাপার নহে। সাধে কি বায়রণ বলিয়াছেন I've stood upon Achilles' tomb and heard Troy doubted: time will doubt of Rome.

(৮) নারীকবি

নারীর কোমলহৃদয়-প্রসূত ও কোমলকর-কলিত কবিতা-কুসুমের দর্শনে স্পর্শনে অনেকে 'কুসুমে কুসুমোৎপত্তি' প্রত্যক্ষ করিয়া উল্লসিত হয়েন। আমার কিন্তু ইহাতে আপশোষ হয়। আমার মনে হয়,—নারী কবিতার প্রেরণা দিবেন, পুরুষ সেই প্রেরণাবশে কবিতা লিখিবে; নারী দেবীর আসনে বসিয়া পূজা লইবেন, পুরুষ তাঁহার শ্রীপদে কবিতাকুসুমাঞ্জলি ঢালিয়া জীবন সার্থক মনে করিবে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

(৯) Love.

ইংরেজী Love কি সংস্কৃত 'লভ্' ধাতুর জ্ঞাতি? পঞ্জিকায় যখন 'মেষরাশির স্ত্রীলাভ' লেখা দেখি, তখন ত 'Love' ও 'লাভ' একই কথা বলিয়া মনে হয়। লভ ধাতু আত্মনেপদী, ভ্বাদিগণীয়; বিলাতী Loveটাও কেবল আত্মতৃপ্তি এবং নিতান্ত পার্থিব, of the earth, earthly; tiel death do us part,সম্বন্ধো জীবনাবধিঃ, একের মরণেই দাম্পত্যপ্রণয়ের অবসান, হিন্দুর ন্যায় পরকাল পরজন্ম পর্য্যন্ত পৌঁছে না।

আর 'লুভ্' ধাতুর সহিত যদি ইহার জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে কি দাঁড়ায়? শাস্ত্রে বলে, কামিনীর লোভ কাঞ্চনের লোভ অপেক্ষাও অধিকতর মোহকর। লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। পরস্ত্রীলোভে রাবণ সবংশে উৎসন্ন হইয়াছিল, ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের এই দোষে ট্রয় ভস্মসাৎ ও বহু বীর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, আলাউদ্দিন চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব দাঁড়াইল এই যে Lover=লুব্ধক, হরিণ-নয়নার প্রতি নয়নশরঘাতে সদাতৎপর। প্রেমিক তাহা হইলে রিপু-ষট্‌কের প্রথমের অধীন নহেন, তৃতীয়ের অধীন।

'লুভ্' ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী। অতএব মূলে ইহা লোভ বই আর কিছুই নহে বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাতে দিব্যভাব ও স্বার্থশূন্যতা বিরাজিত। ইংরেজ কবিগণ তাই ইহার জয়গান করিয়া বলিয়াছেন:—

'Love is Heaven and Heaven is Love.'

'For this the passion to excess, was driven—
That self might be annulled,'

স্বপ্ন-কথা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

বালক

আকাশের গায়ে শ্রাবণের কালো মেঘ স্তরে স্তরে সাজাইয়া উঠিয়াছে। আবার বুঝি বৃষ্টি নামিল।

সারাদিন বৃষ্টি পড়িয়াছে; গাছপালা, মাটী সবই আর্দ্র; বাতাস সিক্ত, মন্থর। এক কোণে অবিরাম তড়িৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে।

সম্মুখে একটি বাগান, তাহার মধ্যে খাদ; তাহাতে জল জমিয়াছে। সেই জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া কয়টা ভেক বিষম কলরব জুড়িয়া দিয়াছে।

নিকটে একটি কুটীর; তাহার চাল ফুঁড়িয়া ভিতরে জল পড়িতেছে। গৃহস্থেরা কেমন করিয়া রাত্রি কাটাইবে, তাহারই উপায় ঠিক করিতে ব্যতিব্যস্ত।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, তারপর বজ্রধ্বনি, তারপর বারিপতনের শব্দ। অবিরাম বর্ষণ!

বৃষ্টির বেগ একটু কমিয়া আসিল। দেখিলাম, সেই কুটীর হইতে একটি বালক বাহিরে আসিতেছে। সে অন্যমনে সেই খাদটির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটি উলঙ্গ, বয়স পাঁচ-ছয় বৎসর হইবে। সে নীরবে খাদের জলে হস্তপদ ধৌত করিল; তারপর ভেকেদের কাণ্ডকারখানা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল।

মাঝে-মাঝে এক-একটি মাছ মাথা তুলিয়া এদিকে-সেদিকে চাহিয়া আবার ডুবিয়া যাইতেছিল। কখনও বা দীর্ঘপদবিশিষ্ট একটা কীট জলের উপর দিয়া দ্রুত ছুটাছুটি করিতেছিল।

বালক অনেকক্ষণ নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া এই সব দেখিতে লাগিল। এমন সময় মা তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালক ফিরিয়া চাহিল না। মা তাহাকে ঘরে আসিতে বলিলেন; সে কিন্তু নড়িতে চাহিল না।

একটা কুকুর পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল; হঠাৎ সে একটি ইষ্টকখণ্ড লইয়া তাহাকে আঘাত করিল। তারপর একটি ফড়িংএর পিছনে-পিছনে ছুটিয়া যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে ধীরে-ধীরে আবার সেই খাদটির কাছে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আকাশের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দভাবে কি ভাবিতে লাগিল।

মা আবার ডাকিলেন; তবুও বালক নড়িতে চাহিল না।

ঘন নীল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কাহার অঞ্চল প্রসারিত রহিয়াছে। বর্ষণান্তে মেঘগুলি ক্ষীণ, পৃথিবী সিক্ত, শীর্ণ; প্রকৃতি প্রসূতির মত ম্লান, গম্ভীর।

বালক উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা আবার ডাকিলেন, বালক নড়িল না।

জননী ক্ষিপ্রপদে বাহিরে আসিয়া, পুত্রকে প্রহার করিতে করিতে গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন। বালক প্রথমে বাধা দিল; অবশেষে কাঁদিতে-কাঁদিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি যখন একটু ধরিয়া আসিল, তখন সে মাকে কোন কথা না বলিয়াই, বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

বালক আজ মায়ের কথা গ্রাহ্য করিল না।

মা তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন, ভয় দেখাইলেন; তবুও সে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বালক স্তব্ধ, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ আকাশ-বাতাস তাহাকে ডাকিয়াছে, বিশ্বজননী তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন;—সে আর কাহারও কথা শুনিবে কেন?

মা

সে মায়ের একমাত্র পুত্র;—মা-ছাড়া আর কাহাকেও জানে না।

মা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন। ছেলেটির সামান্য কষ্টও তিনি সহিতে পারিতেন না।

ছেলেটিও মাকে যত্ন করিত। একদণ্ড তাঁহার কাছ-ছাড়া হইত না। এমন শান্ত, মাতৃভক্ত পুত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্রমশঃ মা বৃদ্ধা হইলেন, জ্বরে তাঁহার সর্ব্বশরীর নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "আমার সময় হইয়াছে; আর আমি বাঁচিব না।"

পুত্র বলিল,"তাহা হইলে মা, আমাকেও মরিতে হইবে।"

মা বলিলেন, "তোর ভাবনা নাই, আমি মরিয়া গেলেও তোর সঙ্গ ছাড়িব না, তোকে যত্ন করিব।"

পুত্র কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। মাতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

অসহায় পুত্র দিনকতক মর্ম্মাহত হইয়া রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, আবার সে মায়ের দেখা পাইবে। কিন্তু কই? আশা মিটিবার সম্ভাবনা সে কোথাও দেখিতে পাইল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় নির্জ্জনে আপনার কুটীরে বসিয়া সে মায়ের কথাই ভাবিতেছে, এমন সময় দেওয়ালের গায়ে কাহার ছায়া পড়িল। বালক চমকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ছায়া যখন ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইল, তখন পুত্র দেখিল, তাহার মাতা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু মুদিয়া নিতান্ত ত্রস্তভাবে সে বাহিরে ছুটিয়া পলাইল।

মা বলিলেন, "ভয় কি? পলাইতেছিস্ কেন? আমি তোর মা, তোর দুঃখ নিবারণ করিতে আসিয়াছি।"

পুত্র উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। মাতৃমূর্ত্তি হঠাৎ তাহার নিকটে, অতি নিকটে, আসিয়া দাঁড়াইল। পুত্র বলিল, "মা, পথ ছাড়িয়া দাও; আমি তোমাকে চাই না।"

মা বলিলেন, "সে কি কথা! সে দিন তুই যে বলিয়াছিলি, আমি মরিলে তোকেও মরিতে হইবে?"

পুত্র বলিল, "এখন মা, তুমি মরিয়া পর হইয়া গিয়াছ।"

ছায়ামূর্ত্তি হাসিতে-হাসিতে অন্তর্দ্ধান করিল।

কবি

চারিদিকে গিরিশ্রেণী; জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর; দু'একটা পার্ব্বত্য-পক্ষীর, শীর্ণ ঝরণার ও উদ্দাম বাতাসের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই এখানে শোনা যায় না।

অপরাহ্ণে যখন রৌদ্র পড়িয়া আসিত, তখন প্রায়ই একজন কবি ধীরে-ধীরে আসিয়া ঐ শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিত। সে ঐখানে নিস্পন্দভাবে বসিয়া মৃদুস্বরে একটা অতি পুরাতন গান গুন্-গুন্ করিয়া গাহিত।

কেহ তাহার গান শুনিত না। একদিন একটি বালিকা ঝরণা হইতে জল আনিবার সময়, সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া কবির মুখপানে চাহিল। তারপর প্রতিদিন কবির নিকটে আসিয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

একদিন কবি বলিল, "বালিকা, তুমি কুসুম, বিশ্বের সব সৌন্দর্য্য তোমাতে আশ্রয় লইয়াছে; তুমি দেবী, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

বালিকা ভাবিল, সে কুসুমও নয়, দেবীও নয়; তবুও এ ব্যক্তি হঠাৎ ভক্তিবিহ্বল হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল কেন? তাহার বড় ভাবনা হইল; মাকে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি কি কুসুম, আমি কি দেবী?"

মা বলিলেন, "কে তোকে এ কথা বলিল?"

বালিকা উত্তর করিল, "ঝরণায় জল আনিতে গিয়াছিলাম; একটি লোক আমাকে দেখিয়া এই সব কথা বলিয়াছে।"

মা বলিলেন, "তুই আর কখনও একা ওদিকে যাস্‌নি।"

বালিকা দুইচারি দিন ঘর হইতে বাহির হইল না। সে দরিদ্র; মা ভিক্ষা করিয়া, কখনও বা জঙ্গলের কাঠ বিক্রয় করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেন; তাহাতেই দরিদ্র সংসার কোন মতে বাঁচিয়া আছে। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহিয়া-সহিয়া সে ক্লান্ত, শীর্ণ—তাহার দুঃখের অন্ত নাই, তবুও কবি বলে—সে কুসুম, সে দেবী।

বালিকা ভাবিল—লোকটা পাগল; অথবা তাহার সামান্য বুদ্ধিও নাই। এত বড় অসম্ভব কথা যে বলিতে পারে, সে অদ্ভুত লোক। তীব্র ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, বালিকা মাতার অজ্ঞাতে একদিন কবিকে দেখিতে চলিল।

আসিয়া দেখিল—কবি অদূরস্থিত অস্তমান সূর্য্যপ্রভায় অনুরঞ্জিত ঝরণার পানে চাহিয়া নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছে। কবি হঠাৎ বালিকার পানে চাহিল। তাহার

নয়ন দুটি মধুমুগ্ধ মধুকরের মত তাহার লাবণ্যরেণুর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

কাহারও মুখে কোন কথা নাই। হঠাৎ বালিকা বলিল, "তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ কেন?"

কবি বলিল, "তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়াও তৃপ্ত হইলাম না—তুমি দেবী—স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী তুমি ছাড়া আর কেহ কি হইতে পারে?"

বালিকা বলিল, "তোমার কথাটা কিন্তু মিথ্যা।"

কবি বলিল, "আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম।"

বালিকা বুঝিল—লোকটা নিশ্চয়ই পাগল; না হইলে সে এত বড় মিথ্যাটা কেমন করিয়া এত অসঙ্কোচে, এত জোরের সহিত, প্রচার করিতে পারে?

কবিকে শুধু পাগল ভাবিয়া সে দিনকতক নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিল—সে পাগল, কিন্তু অন্য কিছুও বটে।

একদিন সে ধীরে ধীরে কবির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কবি বলিল, "আমাকে পাগল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলে ত? আবার আসিলে কেন?"

বালিকা বলিল, "আবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

কবি বলিল, "এখন আমাকে কিরূপ দেখিতেছ?"

বালিকা বলিল, "দেখিতেছি তুমি পাগল; মিথ্যা বলিতে একটুও ভয় পাও না।"

কবি বলিল, "আমি মিথ্যা বলি নাই; সত্য সত্যই তুমি দেবী।"

বালিকা বলিল, "আমার ত তাহা মনে হয় না।"

কবি বলিল, "ফুল কি নিজের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে?"

বালিকা কবির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার পর বাড়ী ফিরিল। তখন সে গম্ভীর, নীরব।

একদিন অপরাহ্ণে আকাশে মেঘ জমিয়াছে। সমস্ত প্রকৃতি নীরব। মনে হইতেছিল—এখনই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিবে।

শীঘ্রই বৃষ্টি আসিল; সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। বালিকা এতক্ষণ কবির মুখপানে চাহিয়াছিল; এইবার বলিল, "এখন এই দুর্য্যোগ, যাইবে কোথায়?"

কবি বলিল, "আমি দেবতার নিকটে রহিয়াছি, আমার ভাবনা কি?"

বালিকা বলিল, "তুমি পাগল; চল, আমাদের ঘরে চল; ঐ আমাদের কুটীর দেখা যাইতেছে।"

কবি বলিল, "আমি ঘরে যাইতে চাই না; আমার দেবতা আমাকে এখানেই রক্ষা করিবেন।"

সহসা বৃষ্টি থামিয়া গেল। ঝড়ের বেগও একটু কমিল। বালিকা কবির মুখপানে চাহিয়া বলিল, "সত্যই কি আমি দেবতা?"

কবি বলিল, "তুমি দেবী, তুমি কুসুম; তুমি বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের আধার।"

বালিকা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে কবির দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কে তাহা জানি না; তবে তুমি যে আমার দেবতা, এ কথা এখন বুঝিয়াছি। আমি যদি কুসুম হই, আমি তোমারই চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিলাম।"

বালিকা কবির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কবি বলিল, "তোমার কথাটাও মিথ্যা, আমি ত দেবতা নই!"

বালিকা বলিল, "আমার কাছে তুমি দেবতা; এ কথা কখনই মিথ্যা নয়।"

কবি বলিল, "তুমিও আমার কাছে দেবী; এ কথাও কি মিথ্যা?"

বালিকা কথা কহিল না। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

অকবর-জননী হামিদা বানু

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল—তিনি শের শাহ্‌র নিকট পরাজিত হইলেন। যিনি সম্রাট্ ছিলেন,

শের শাহ্

ভাগ্যচক্রের ঘোর পরিবর্ত্তনে এখন তিনি পথের ভিখারী হইলেন। হুমায়ুনের জীবন যখন এইরূপ বিপজ্জালে বিজড়িত, তখন অন্যে ত দূরের কথা,—তাঁহার আত্মীয়গণ, এমন কি তাঁহার ভ্রাতৃগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হুমায়ুন আত্মরক্ষার্থ কেমন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা Erskine সাহেব তাঁহার "*History of India under Babar and Humayun*" গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বিষম দুর্দ্দিনে হুমায়ুন সিন্ধুপ্রদেশে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইল। এই সময়ে তিনি জনরব শুনিলেন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দাল না কি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কন্দাহারে যাইবার বাসনা করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র হুমায়ুন কালবিলম্ব না করিয়া, ভ্রাতাকে কন্দাহার-গমনে বিরত করিতে সিন্ধু প্রদেশের পাট্ নামক স্থানে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। হিন্দাল-জননী (হুমায়ুনের বিমাতা) দিলদার বেগম তাঁহার সম্মানার্থ একটি ভোজের আয়োজন করেন।

এই ভোজের সময় বালিকা হামিদা বানু ও তাঁহার ভ্রাতা খাজা মুয়জ্জম উপস্থিত ছিলেন। হামিদার পিতা, হিন্দালের শিক্ষক ছিলেন; এই কারণে হামিদা ও মুয়জ্জম প্রায়ই দিলদার বেগমের আবাসে আসিতেন। হুমায়ুন হামিদার রূপলাবণ্য-দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। হামিদা মীর বাবা দোস্তের কন্যা এই পরিচয় পাইয়া, তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে নিকট আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। হুমায়ুনের এইরূপ দাবী করিবার

কারণও ছিল। বাবা দোস্ত জামের * যে অহমদ বংশ হইতে উদ্ভূত, হুমায়ুনের মাতা মহমও সেই অহমদের বংশীয়া ছিলেন। ‡

পরদিন হুমায়ুন বিমাতার আবাসে আসিয়া মীর বাবা দোস্তের সহিত তাঁহার নিকট-সম্বন্ধের কথা জানাইলেন এবং হামিদার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য বিমাতাকে অনুরোধ করিলেন। হিন্দাল এই প্রস্তাব শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি হুমায়ুনকে জানাইলেন যে, তিনি হামিদাকে স্বীয় ভগিনী বা কন্যার মত দেখেন; তাহার শুভাশুভের চিন্তা তিনিই করিবেন। হুমায়ুনের যে অবস্থা তাহাতে তাঁহার সহিত তিনি তাঁহার দুহিতৃপ্রতিম স্নেহের পাত্রীকে বিবাহ দিতে পারেন না।

জৌহর লিখিয়াছেন, হিন্দাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি আমাকে সম্মানিত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন—বালিকা বধূ সংগ্রহ করিতে আসেন নাই। যদি আপনি এই কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব।" ভ্রাতার এই আচরণে ব্যথিত হইয়া হুমায়ুন অবিলম্বে তাঁহার আবাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু বুদ্ধিমতী দিলদার তাঁহাকে নানা মিষ্টবচনে পত্র লিখিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। হুমায়ুনকে সান্ত্বনাচ্ছলে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, হামিদার মাতা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। হুমায়ুন উৎফুল্লমনে দিলদারের আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। জৌহরের মতে † ইহার পরদিনই হুমায়ুনের সহিত হামিদার বিবাহ সম্পাদিত হয়।

পরন্তু গুলবদন এই বিবাহ ব্যাপারের অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—হামিদা সম্রাজ্ঞী হইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। (১) হুমায়ুন দ্বিতীয়বার বিমাতার আবাসে উপস্থিত হইয়া হামিদাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দিলদারকে অনুরোধ করেন। হামিদা এ অনুরোধপালনে অস্বীকার করিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বেই হুমায়ুনকে সম্মান-প্রদর্শন করিয়াছেন—পুনরায় তাঁহার যাইবার কোন প্রয়োজন তিনি দেখেন না। ইহাতে হুমায়ুন হিন্দালের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, তিনি যেন হামিদাকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দাল প্রত্যুত্তরে সংবাদ পাঠাইলেন যে, হামিদা কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে না,—তাহাকে পাঠাইবার অনুরোধ করা বৃথা। তবুও তিনি দূতকে হামিদার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দূত হামিদার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হুমায়ুনকে সংবাদ দিল যে, হামিদা বলিয়াছেন—'সম্রাট্ দর্শন করিতে যাওয়া একবারই উচিত ও ন্যায়সঙ্গত,—দ্বিতীয়বার গমন করা অনুচিত (না মহরম্)।' এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, এই 'না মহরম্' কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি অর্থ 'নীতিবিরুদ্ধ'; দ্বিতীয় অর্থ,—'যে লোকের (অপরিচিত বা বাহিরের) অন্তঃপুরে যাইবার অধিকার নাই।' হুমায়ুন হামিদার কথার দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া বেগমকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"তিনি যদি 'না মহরম্' (অপরিচিত) হ'ন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে 'মহরম' (পরিচিত) করিয়া লইব",—অর্থাৎ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পরমাত্মীয় শ্রেণীভুক্ত করিব। কিন্তু হামিদা কিছুতেই এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। এই বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় ৪০ দিন অতিবাহিত হইল। দিলদার হামিদার এই দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইলেন—"তোমাকে যখন একদিন না একদিন বিবাহ করিতেই হইবে, তখন সম্রাট্ অপেক্ষা ভাল স্বামী আর কোথায় মিলিবে?" হামিদা উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ইহা খুব সত্য; কিন্তু আমি এমন ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করিব, যাঁহার স্কন্ধে আমার হস্ত পৌছিতে পারে; কিন্তু আমি এমন লোককে বিবাহ করিব না, যাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিতে আমার হস্ত পৌছাইবে না।" সম্ভবতঃ উভয়ের অবস্থাগত ও মর্য্যাদাগত তারতম্যের কথাই উপরিউক্ত বাক্যে সূচিত হইতেছে; অথবা হুমায়ুনের দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া হামিদা এইরূপ বলিয়া থাকিবেন; কারণ হুমায়ুনের

* ইহা হিরাটের নিকটবর্ত্তী খোরাসানের একটি নগরী।

‡ *Akbarnama*, Bib. Ind. (Eng. Trans.), 1, 283.

† Jauhar's *Tezkereh Al Vakiat*, Trans. by Stewart, pp. 30–31.

(১) জৌহর লিখিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বেই অন্য এক ব্যক্তির সহিত হামিদার বিবাহের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল; তবে হামিদা বাগ্‌দত্তা হ'ন নাই। *Ibid.*

যে সমস্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে দীর্ঘাকৃতি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

যাহা হউক, দিলদার হামিদাকে অনেক বুঝাইবার পর, অবশেষে হামিদা বিবাহে সম্মত হইলেন এবং পাটু* নামক স্থানে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (৯৪৮ হিঃ) হুমায়ুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। হুমায়ুন ও

হামিদা বিবাহের পর তিন দিন পাটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তৎপরে নৌকাযোগে ভাক্করে গমন করেন।

এইস্থলে হামিদা বানুর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক।

(১) গুলবদনের সহিত হামিদার সৌহার্দ্দ বহুদিন যাবৎ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল; সুতরাং হামিদা বানু সম্বন্ধে গুলবদন (হামিদার ননদিনী) যাহা লিখিবেন, তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আর একটি কথা, গুলবদন তাঁহার মাতা দিলদার বেগমের নিকট হইতেও হামিদা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। হামিদার নিকট হইতেও তিনি যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 'হুমায়ুন-নামায়' অনেক-স্থলে লিখিত হইয়াছে—"হামিদা বানু বেগম আমাকে ইহা বলেন।" গুলবদনের মতে, **মীর বাবা দোস্ত** হামিদার পিতা এবং মুয়জ্জম তাঁহার 'বেরাদর' (অর্থাৎ ভ্রাতা; কিন্তু আপন ভ্রাতা কি না নির্দ্দিষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই।)

(২) মীর মাসুমের 'তারিখে সিন্ধ্' গ্রন্থে লিখিত আছে—হামিদার পিতা **শেখ আলি অকবর** মীর্জ্জা হিন্দালের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

(৩) জৌহরের 'তাজকিরাতুল-ওয়াকিয়ৎ' গ্রন্থে লিখিত আছে,—হুমায়ুন (সম্ভবতঃ দিলদারের নিকট) হামিদার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হ'ন যে হামিদা অহমদ্ জামীর বংশোদ্ভূত, এবং তাঁহার পিতা হিন্দাল মীর্জ্জার 'আখুন্দ' অর্থাৎ শিক্ষাগুরু। Erskine সাহেব (*B. & H.*, ii, 220) স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, **শেখ আলি অকবর জামী** হিন্দালের শিক্ষাগুরু এবং হামিদার পিতা ছিলেন; কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই প্রমাণটি পাইলেন তাহা লেখেন নাই। যাহা হউক, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে আলি অকবর হামিদার পিতা।

(৪) নিজামুদ্দীন অহমদ্ একজন বিচক্ষণ লেখক ছিলেন; তিনি যে ভুল করিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর একটী কথা, তাঁহার পিতামহ খাজা মীরাক্ হামিদার 'দেওয়ান' ছিলেন। এই কারণে আমাদের মনে হয়, নিজামুদ্দীন পিতামহের নিকট হইতে অনেক তথ্য জানিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নিজামুদ্দীন তাঁহার 'তবকাতে-অক্‌বরী' গ্রন্থে হামিদার পিতার নাম লেখেন নাই; তিনি হামিদার ভ্রাতা খাজা মুয়জ্জমকে অকবরের মাতুল ও

* পাটু, সিন্ধুনদীর ২০ মাইল পশ্চিমে এবং সেওয়ানের প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

আলি অকবর জামীর (অর্থাৎ জামের আলি অকবর) পুত্র বলিয়াছেন।*

এক্ষণে আমরা উপরিউক্ত বিবরণাদি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, 'বাবা দোস্ত' ও 'আলি অকবর', একই ব্যক্তি।

'মাসির-উল-উমারা' (Pers. Text, i, 618) মুয়জ্জমকে হামিদার 'বেরাদরে-অয়ানী' অর্থাৎ 'আপন ভ্রাতা' (Full brother) বলিয়া সমস্ত গোলের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তবে মাসির-উল-উমারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ (১৭৫০-১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত); ইহাকে প্রামান্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হইতে পারে। ব্লকমান সাহেবও * মুয়জ্জমকে হামিদার আপন ভ্রাতৃ-রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন।

যদিও আলি অকবর ও বাবা দোস্তকে একই ব্যক্তি মনে হয়, তথাপি এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের একটা প্রমাণ আছে। আবুল্ ফজল্ মুয়জ্জমকে হামিদার 'বেরাদরে-মাদারি' বলিয়াছেন।† ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে; একটী অর্থ,—মাতুল (maternal uncle), দ্বিতীয় অর্থ 'এক মাতার গর্ভে বিভিন্ন পিতার ঔরসজাত ভ্রাতা' (uterine brother)। এই শেষ অর্থেই এই কথাটি এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ অন্যত্র আবুল ফজল খাজা মুয়জ্জমকে হামিদার 'উথুয়াতে-অখিয়ফি' (uterine brother) বলিয়াছেন।‡

আলি অকবর যদি মীর বাবা দোস্ত হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হ'ন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি হামিদার মাতার প্রথম স্বামী ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, মীর বাবা দোস্ত হামিদার বিবাহের পূর্ব্ব বৎসর, ৯৪৭ হিজিরাতেও (১৫৪০-৪১ খৃঃ) হিন্দালের নিকট ছিলেন। (১) শুধু তাহাই নহে, আফগানেরা রাত্রিযোগে অতর্কিত আক্রমণে হিন্দালকে হত্যা করিলে (২০এ নবেম্বর ১৫৫১ খৃঃ) মীর বাবা দোস্তই হিন্দালের মৃতদেহ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।* অধিকন্তু আলি অকবর স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলে খাজা মুয়জ্জমও হামিদা অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; কিন্তু গুলবদনের 'হুমায়ুন-নামা' হইতে মুয়জ্জম যে হামিদাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া ডাকিতেন, এইরূপ মনে হয়। মুয়জ্জম হামিদাকে 'মা চীচাম' (অর্থাৎ 'Moon of my mother' এবং 'Elder Moon sister') বলিয়া ডাকিতেন।† আরও একটি কথা, মীর বাবা দোস্ত ও আলি অকবর নিশ্চয়ই অহমদ্ জামীর বংশীয় ছিলেন।

অকবরের জন্মোৎসবে নৃত্যগীত

যাহা হউক, উপরিউক্ত বিবরণাদি হইতে আমাদের মনে হয়, মীর বাবা দোস্ত ও আলি অকবর একই ব্যক্তি।

এক্ষণে আমরা মূল বিষয়ের অনুসরণ করি। স্বামীর সহিত অনশনে অর্দ্ধাশনে রাজপুতানা গমন করিতে ও সিন্ধু প্রদেশের উত্তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করিতে হামিদাকে

* *Elliot & Dowson*, V. 291; or Pers. Text, Lucknow Ed. P. 263.

* *Ain-i-Akbari*, i, 524.

† *Akbarnama*, Trans. by H. Beveridge, i, 44.

‡ *Ibid*, i, 447 & note.

(১) *Ibid*, i, 360.

* *Gulbadan's Humayun-nama*, Trans. by A. S. Beveridge P. 199.

† *Humayun-nama*, P. 175. এই তুর্কী শব্দ 'চীচার' বিভিন্ন অর্থ আছে। P. de Courteille তাঁহার Dictionaryতে 'চীচার' অর্থ 'জ্যেষ্ঠা ভগিনী' লিখিয়াছেন। হুমায়ুন-নামায় গুলবদন স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী গুলরং ও বৈমাত্রেয় ভগিনী মাহ্‌মা সুলতান বেগমকে 'চীচা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (*Humayun-nama*, P. 115)।

জন্য অকবরের নিকট মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়েই সম্রাটের নিকট হইতে উপঢৌকনাদি লাভ করিতেন এবং অকবর যেখানেই যাইতেন, তথায় হামিদা ও গুলবদনের শিবির পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইত। গুলবদনের শেষ সময়েও হামিদা তাঁহারই পার্শ্বে ছিলেন।

আবুল্ ফজল্ লিখিয়াছেন, যখন সুদীর্ঘ রোজা শেষ

সম্রাট্ অকবর

হইত, তখন হামিদাই সর্ব্বপ্রথমে পুত্র অকবরের জন্য মাংস পাক করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

অকবর মাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কথিত আছে, জীবনে একবারমাত্র তিনি মাতার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কয়েকজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের উত্তেজনায় হামিদা খৃষ্টধর্ম্মের অবমাননা করিবার জন্য অকবরকে ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল একটা কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

হামিদা খৃষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষিণী ছিলেন। ফাদার রোডোলফ্ একোয়াভাইভা যখন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থান করেন, সেই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য হামিদা বানু ও অন্তঃপুরের অন্যান্য বেগম অকবরের নিকট বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন—একথা একোয়াভাইভা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন। তিনি সিক্রি ত্যাগ করিয়া গোয়া গমনকালে, হামিদা বানুর নিকট হইতে তাঁহার মণ্ডলের মসকোর একজন রুস ক্রীতদাস ও তাহার পোলদেশীয় স্ত্রীকে লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করেন; কিন্তু বেগম ইহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে অকবর তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।*

বিবাহের ৬৩ বৎসর পরে, ৫০ বৎসর বৈধব্য জীবনের পর, ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১০১৩ হিঃ, ১৯ শহ্‌রিয়ার) হামিদার মৃত্যু হয়। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে বিবাহকালে তাঁহার বয়ঃক্রম যদি ১৪ বৎসর † হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবর যখন খানওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার জন্ম হয়, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর ছিল।

দিল্লীর নিকট হুমায়ুনের যে বিশাল সমাধি মন্দির আছে, তথায় স্বামীর পার্শ্বে হামিদা সমাহিতা হ'ন। হামিদা জীবদ্দশায় 'মরিয়ম মকানী' (গৃহবাসিনী মেরী) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'বিল্‌গিস্ মকানী' ‡ নামেও অভিহিতা হইতেন। হামিদা বেলুচিস্তানের মরুভূমির মধ্য

* Father Goldie's 'First Christian Mission to the Great Mughal,' 1897.

† Erskine (ii, 220) ও Stewart (Jauhar, 31 n) উভয়েই লিখিয়াছেন যে, বিবাহের সময়ে হামিদার বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর মাত্র ছিল।

‡ বিলগিস্, ভবিষ্যদ্বক্তা সলোমনের সময়ে ইয়মনের শেবা নগরীর রাজ্ঞী ছিলেন। রূপের জন্য ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বেভারিজ-পত্নী লিখিয়াছেন (*H. Nama*, note P. 83) বাবরের বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ্‌র্ বানুকে আবুল্ ফজল্ 'বিলগিস্ মকানী' আখ্যা দিয়াছেন।

দিয়া স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন বলিয়া, হুমায়ুন তাঁহাকে 'চিল্ বেগম' নামও প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে নবাব বিল্‌গিস মকানী মিরিয়ম বেগ-লিখিত তিনখানি মূল হস্তলিখিত পত্র আছে।* ইহা খুব সম্ভবতঃ হামিদাই স্বামীর পারস্যে অবস্থানকালে লিখিয়া থাকিবেন; কারণ পত্রগুলি শাহ্ তমাস্পের রাজত্বকালে লিখিত এবং ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, উহা বিদেশ হইতেই লিখিত হইয়াছিল। আরও একটা কথা, এই পত্রগুলির পরই হুমায়ুনের পত্রাবলী স্থান পাইয়াছে। 'তারিখে সিন্ধ্' গ্রন্থ হইতে হামিদার 'বিল্‌গিস মকানী' নাম পাওয়া যায়,—আর 'মিরিয়ম বেগ' হয় ত 'মিরিয়ম মকানী' হইবে। যাহা হউক, এই পত্রগুলির লেখিকা হামিদা হইলে, তিনি যে ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইহা জানা যায়।†

হামিদা বানুর চরিত্র আলোচনা করিলে, তিনটি বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ, তিনি কিশোরী অবস্থাতেও যথেষ্ট চরিত্রবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; হুমায়ুনকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পতিভক্তি অকপট ছিল; তিনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় বাদশাহের সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, উন্নতি অবনতিসময়ে, ছায়ার ন্যায় স্বামীর সহিত ছিলেন; কিছুতেই তিনি স্বামিসান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন নাই। তৃতীয়তঃ, তিনি আদর্শ জননী ছিলেন; তাই তাহার গর্ভে বাদশাহকুলতিলক অকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যেমন জননী, তেমনই তাঁহার সন্তান।

* B. M. MS. Add. 7088; also Or. 3842, 117 b

† *Akbarnama*, I, XVII, Addenda.

দাঁতের দশায়

[শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল]

(১)

ওরে রে চন্দনের দন্ত! ওরে আমার প্রাচীন দন্ত!
কাহার শাপে দেহ কাঁপে? আল্‌গা কেন গোড়া?
সাম্‌নে দেখ—তাজা অতাজা অবাক জলপান কড়াই-ভাজা,
কড় পাকের পেঁয়াজি আর কাঁটাল-বিচি পোড়া;

(২)

পার না'ক পান্‌টি পিষ্‌তে, এনেছি তাই হামান্‌দিস্তে,
কিন্তু লুচি দিস্তে দিস্তে চলে না ও-কলে!
উড়া-খই গোবিন্দে নম! (আমি এখন ভক্ততম),
হে বিশ্বেশ্বর ডাঁসা পেয়ারা দিচ্ছি চরণতলে।

(৩)

আমার সঙ্গে দাঁতের আড়ি! ফুলিয়ে এবং শূলিয়ে মাড়ি,
আমায় শুদ্ধ যমের বাড়ি টান্‌তে চাহে নাকি?
এত তোয়াজ্ এত যত্ন ভুলে গেলি, রে কৃতঘ্ন!
ক্রিয়সোটের ক্রিয়ার চোটে কিছুই নাহি বাকি।

(৪)

চিরটা কাল থাকবি—সত্বে, দিচ্ছিন্ন ইঁদুরের গর্ত্তে,
ঝড়ে পড়ে গেল যখন তোদের পূর্ব্বপুরুষ;
যাও পড়ে যাও হে অকর্ম্মা, ভীত তাতে নহেন শর্ম্মা;
আজ থেকে প্রতিজ্ঞা তবে করব নাক বুরুশ।

(৫)

দাদ্ তুলব কৃতঘ্নতার, ডাকিয়ে ডাক্তার রুদ্রাবতার
সাঁড়াসীতে টেনে তুলে ফেল্‌ব আঁস্তাকুড়ে।
কিন্‌ব নূতন মুক্তাপাঁতি (নয় সে তোদের দাদা নাতি,)
ধবলরূপে উজল করে' বস্‌বে পাটি জুড়ে।

(৬)

প্রাচীন গেলে নূতন আসে? সে কি সত্য? দীর্ঘশ্বাসে
শীর্ণ আশা কেঁপে উঠে জীর্ণ দাঁতের মত।
থাক সে কথা, প্রাণে লাগে এই ক'টা দাঁত যদিন থাকে
চিবিয়ে নে রে আখের টিকলি শশা আদি যত।

পারস্যে বঙ্গমহিলা

[শ্রীশরৎরেণু দেবী]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশরৎরেণু দেবী

মহামেরা ত্যাগের পূর্ব্বে মহামেরার কথা কিছুই লিখি নাই; তাই মহামেরাসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, মহামেরাতে নায়ার সাহেবের বাড়ীতে থাকিবার সময়, আমার খুব জ্বর হইয়াছিল। জ্বর হঠাৎ হয়, এবং "টেম্পারেচার" ১০৫ ১০৬ ডিক্রী হইয়াছিল। সুচিকিৎসায় এবং নায়ার সাহেব ও তাঁহার চাকর-বাকরের শুশ্রূষার গুণে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া পথ্য করিলাম। কিন্তু এই দুই-তিন দিনের জ্বরে আমাকে মাসাধিকের রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। যাঁহারা গরমের সময় এ প্রদেশে নূতন আসিবেন, তাঁহারা যেন কুইনাইন ও বিরেচক ঔষধাদি যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসেন—নবাগত ব্যক্তিদের প্রথমে আসিলে যে দুই-একবার জ্বর হইবে, ইহা নিশ্চিত। মহামেরাতে ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এখানে খুব কম লোক আছেন, যাঁহাদের ঐ রোগে দুই চারিবার ভুগিতে হয় নাই; কারণ এখানকার Creekএর জল অতিশয় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। সকলেই এই Creekএর জল পান করেন, এবং স্নান, শৌচ ও বস্ত্রাদি ধৌত হইতে আরম্ভ করিয়া জল অপরিষ্কার করিবার যত উপায় আছে—স্থানীয় অধিবাসিগণ সে সকল উপায়ের দ্বারাই Creekএর জলকে পূতিগন্ধময় করিতে ক্রটি করেন না। মহামেরাতে থাকিবার সময়, একদিন বেড়াইতে গিয়া রাস্তার যে দুর্দ্দশা দেখিলাম, তাহাতে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; এবং তৎসহিত ইংরাজশাসিত সুপরিচ্ছন্ন বঙ্গের রাস্তা-ঘাটের কথা মনে হইতে লাগিল। এখানে রাস্তা ও গলিতে বাড়ীর যত আবর্জ্জনা ফেলা হয়; সেইজন্য রাস্তাগুলি যে কেবল দুর্গন্ধময় তাহা নহে, স্থানে-স্থানে আবর্জ্জনার স্তূপগুলি মাথা তুলিয়া পার্শিয়ান রাজ্যের সুশাসনের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবর্জ্জনার কল্যাণে গলিগুলিতে যাতায়াতের পথ অত্যন্ত উঁচু নীচু ও অপরিসর হইয়াছে। Creek-এর উপর দিয়াও অনেকগুলি রাস্তা বাজার ও নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে রাস্তাগুলি এত অপরিষ্কার যে,

বর্ষার সময় বৃষ্টিতে পিছল হইলে, এক পা এদিক ওদিক হইলেই, একেবারে Creek এর জলে পতন এবং পূতিগন্ধ-পূর্ণ সলিলে অবগাহন-স্নান করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাওয়া যায়।

মহামেরাতে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা শোচনীয় হইলেও, এখানকার লোকসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। আরব, পার্শিয়ান, নস্‌রাণি, আরবেনিয়ান ইত্যাদির এখানে বাস। অল্প-সংখ্যক ভারতবাসী এখানে বাস করেন। তাঁহারা অনেকেই এঙ্গলো-পার্শিয়ান অয়েল কোং* এবং ষ্ট্রীক স্কট্† কোম্পানির কর্ম্মচারী। তাঁহারা প্রত্যেকেই ২।৩ বৎসরের চুক্তি করিয়া এখানে চাকরি করিতে আসেন এবং চুক্তিশেষে ছুটি লইয়া কিম্বা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। এখানে একজন British Consul থাকেন। প্রবাসী ভারতবাসিগণ কোনরূপে উৎপীড়িত হইলে, তাহার প্রতীকার করিবার জন্যই সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রতীকার করিবার মত কোন ব্যবস্থার পরিচয়ই ইঁহাদের সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

Consul ছাড়া, পারস্য সুলতানের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন সেক অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীও এখানে থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর ইঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ। বর্ত্তমান সেকের বসতবাড়ী মহামেরার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে "কারূণ" নদীর উপর অবস্থিত। বর্ত্তমান সেক একজন আরব; সেক হাজাল নামে সাধারণ্যে পরিচিত। তিনি ইংরাজি লেখাপড়া ভাল জানেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্রকে ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, বসোরা নগরীতে মিশনরি-বিদ্যালয়ে রাখিয়া ইংরাজি লেখা-পড়া শিখাইতেছেন। প্রধান মন্ত্রীর নাম হাজি রেইস, ইনিও এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইনি পার্শিয়ান; ইনি মহামেরাতে নদীর তীরে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়াছেন। ইঁহার দুই-চারিখানি ছোট ষ্টীমারও আছে। ইঁহারই "নসরথ" (Nasrath) নামক বাষ্পীয় তরণীই আমাদিগের মহামেরা হইতে বালুকা ও মরুভূমিময় আওয়াজে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিল।

মহামেরাতে দুই-তিনটি ছোট-ছোট বাজার এবং কাওয়াখানা (কাফিখানা) আছে। বাজারে কাপড়-চোপড় ইত্যাদির দাম ভারতবর্ষের চারিগুণ বেশী; তবে বাজারে খেজুর অনেক রকমের পাওয়া যায়। বাজার সব সময় কিন্তু খোলা পাওয়া যায় না; সকালে এবং বিকালেই দোকান খোলা থাকে; দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যার পর বাজারে কিছুই পাইবার উপায় নাই। গাছপালার মধ্যে খেজুর গাছই সব। মরুভূমির ন্যায় বিশাল মাঠ; আর মধ্যে-মধ্যে খেজুর বৃক্ষের শ্রেণী। কারূণ নদীর দুইধারেই খেজুর বৃক্ষ-শ্রেণী। এখানে প্রায় বারমাসই খেজুর পাওয়া যায়। ১০৮ রকমের বিভিন্ন প্রকারের খেজুর আছে। আরব, পার্শিয়ান, এমন কি বসরাণি, ইহুদি ইত্যাদি জাতিগণ খেজুর ও বড় বড় হাতে তৈয়ারি রুটি খাইয়া জীবনযাপন করে। আমাদের দেশে ধান না হইলে যেমন দুর্ভিক্ষের হাহাকার পড়িয়া যায়, খেজুর না হইলে এখানকার অধিবাসীদিগেরও সেইরূপ অবস্থা। মাংস এখানে মহার্ঘ্য বলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোক উহা রোজ খাইতে পায় না।

মহামেরাতে পার্শিয়ান অপেক্ষা আরবের সংখ্যাই বেশী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কি ধনী, কি গরীব, সকলের নিকটেই বন্দুক থাকে। রাস্তায় যখন তাহারা চলাফেরা করিয়া বেড়ায়, তখন বন্দুক তাহাদের সঙ্গেই থাকে। চুরি-ডাকাতির সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, খুব কম নহে। চোরের যে এখানে কি ভয়ানক শাস্তি হয়, তাহা পরে লিখিব।

২৮শে আগষ্ট সকালে আমরা বালামে করিয়া "নসরথ" নামক জাহাজে আসিয়া উঠিলাম। জাহাজের কামরার শ্রী দেখিয়াই আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল; অথচ এই জাহাজেই বাধ্য হইয়া আমাদের দুই দিন অতিবাহন করিতে হইবে। বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজে বাথরুম বা পায়খানার কামরাগুলি যত বড় হয়, ইহার Second class এর কামরাগুলি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সেই রকম। কামরার ভিতর একখানা অল্প-পরিসর কাষ্ঠাসন মাত্র আছে; গদি বা অপর কোন আস্‌বাবের নামমাত্র নাই। জাহাজখানির চারিপাশই এমন অপরিচ্ছন্ন যে, বাহিরে বসিলেই বমনোদ্রেক হয়। ভাড়া কিন্তু যথেষ্ট। ঐ সেকেণ্ড ক্লাসে মহামেরা হইতে আওয়াজ যাইবার ভাড়া ২০৲; তৃতীয় শ্রেণীর

* Anglo Persian Oil Co.

† Strick Scott & Co.

ডেকের ভাড়া ৭৷৷০। জাহাজখানি দুই-তলা; নীচের তলায় ছয় খানি ২য় শ্রেণীর কামরা বা কোটর ও একখানি ১ম শ্রেণীর সেলুন। ১ম শ্রেণীর কামরাখানি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও দুইচারিটি খড়খড়িবিশিষ্ট এবং কাষ্ঠাসনের উপর ভেলভেটের গদিও পাতা আছে। মিঃ নায়ার সাহেব ও স্থানীয় অন্যান্য পরিচিত ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে জাহাজে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

সকালেই জাহাজ ছাড়িবার কথা; কিন্তু ১২ টার পূর্ব্বে আমাদের জাহাজ গতিশীল হইল না। জাহাজে খাদ্যদ্রব্যের একান্তই অভাব; সেই জন্য ফল ইত্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলাম। আমরা যখন সব-প্রথমে জাহাজে উঠি, তখনই আমাদের কামরা লইয়া জাহাজের পার্শিয়ান কর্ম্মচারীর সহিত গোল যোগ হয়। দুইখানি ২য় শ্রেণীর কামরা আমরা ভাড়া করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে একখানিমাত্র কামরা আমাদের দিয়াছে। "জাহাজে কামরার অভাব" এই অজুহাতে আমাদের একখানি ২য় শ্রেণীর কোটরেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। আমার স্বামী কামরার বাহিরে ডেক-চেয়ারে রহিলেন। আমি দিনের বেলায় কোনরূপে সেই ক্ষুদ্র কামরাতেই সময় অতিবাহিত করিতাম; তবে রাত্রে একে দারুণ গ্রীষ্ম, তার উপর আবার মশকের কনসার্ট—কাজেই কামরায় থাকিতে পারিতাম না, ডেকের উপর ডেক চেয়ারেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতাম। জাহাজে নদী হইতে জল তুলিবার জন্য দুইটি কল ছিল, কিন্তু স্নান করিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তাহার কারণ ঐ দেশের অধিবাসীগণ "হামাম" ছাড়া অন্য স্থানে স্নান করে না। জাহাজের পায়খানাও অতি জঘন্য, স্ত্রী পুরুষ একই পায়খানায় গিয়া থাকে। জাহাজে দুই দিন বাস করিতে হয়; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পাইবার কোনই উপায় নাই। ঐ জাহাজের আর-একটি আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিলাম; জাহাজ সন্ধ্যা হইলেই এক স্থানে নঙ্গর করিয়া, তার পর দিন প্রভাতে আবার গতিশীল হয়। রাত্রে ষ্টীমার চলে না; তাহার কারণ এই শুনিলাম, আলস্যপ্রিয় আরবগণই জাহাজের সারেঙ্গ, খালাসি। সমস্ত দিন কার্য্যের পর রাত্রে একবার বিশ্রাম-সুখ ভোগ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না।

এই ত গেল জাহাজের শ্রী। কিন্তু Persian Ticket-Collector ঘন-ঘন Ticket check করিতে ত্রুটি করে না এবং সুবিধা পাইলেই অশিক্ষিত পার্শিয়ান ও আরবগণকে ঠকাইয়া মালের ভাড়া ইত্যাদি আদায় করিয়া নিজের উদর-পূর্ত্তি করিতে বিমুখ হয় না।

এইবার জাহাজের যাত্রীদের কথা কিছু বলিব। অধিকাংশ যাত্রীই পুরুষ; স্ত্রীলোক খুবই কম। সব সমেত প্রায় দুইশত যাত্রী আমাদের জাহাজে ছিল। তবে "নসরথ" দুই পার্শ্বে দুইখানি মালপূর্ণ 'বাজ্জ' লইয়া শরীরের ভারে শ্লথগতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। জাহাজের উপরেও বিস্তর মাল ছিল। আওয়াজ (যেখানে আমরা যাইতেছিলাম) পার্শিয়ানপ্রধান নগরী বলিয়া আমাদের জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীই পার্শিয়ান। বড়-বড় গড়গড়া ও তাওয়া ইত্যাদি গুড়ুকের সরঞ্জাম ও দুইচারিটা মুরগী, এই আসবাব লইয়াই পার্শিয়ান যাত্রীগণ সফরে আসিতেছিলেন। তাহার উপর তাঁহাদের আর-এক উৎপাত ছিল। সন্ধ্যার পরই পার্শিয়ানগণ আফিমের ধূমপান করিত। সে গন্ধ চারিদিকে এত পরিব্যাপ্ত হইত যে, জাহাজে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিত। ১ম শ্রেণীর সেলুনে একজন Custom Director Beegio সাহেব ছিলেন। তিনি আফিমের গন্ধে ত্যক্ত হইয়া দুই একটা ধমক দেওয়াতে একটু কমিয়াছিল।

২৬শে আগষ্ট বেলা আন্দাজ ১২টার সময় আওয়াজে পৌছিলাম। মিঃ ভাণ্ডারে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাহাজ ঘাটে লাগিবামাত্রই তিনি আমাদের নিকট আসিলেন। জাহাজ যখন ঘাটে লাগিল, তখন কামরার দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া আমি কাপড় চোপড় পরিতেছিলাম। একে ত বাহিরে আগুনের মত গরম; ক্যাবিনের দরজা-জানালা বন্ধ করায় আমার যেন সর্দ্দিগর্ম্মির মত হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, বমি হইতে লাগিল, দাঁড়াইবার সাধ্য রহিল না; আমি শুইয়া পড়িলাম।

আওয়াজে যেখানে আমাদের জাহাজ লাগিল, উহাও "কারূণ" নদী; তবে মহামেরা অপেক্ষা এখানে নদী কম চওড়া। জাহাজ হইতে নামিবার জন্য অপ্রশস্ত একখানি কাঠ পাতিয়া দেয়; অতি সন্তর্পণে পার হইতে না পারিলে জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আওয়াজে

গাড়ী-পাল্কী নাই ; মহামেরার মত creek ও নাই যে, বালামে করিয়া যাইব। সুতরাং দুপুর রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা মিঃ ভাণ্ডারেদের বাসায় গেলাম। আগষ্ট মাসের গরমও সেখানে অসহনীয় ; পায়ে জুতা না থাকিলে পা পুড়িয়া যাইত, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আওয়াজ মানে ধূলা ও বালি ; আওয়াজ বালির রাজ্য বলিলেই চলে। গাছ-পালার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। সমস্ত সহরে মোট তিন চারিটি'র বেশী বৃক্ষ নাই ; তাহাও খেজুর বৃক্ষমাত্র। চারিদিকেই বালিপূর্ণ মরুভূমি ধুধু করিতেছে। চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। Amulet glassই দিন বা Eye preserverই দিন, চোখে বালি ঢুকিবেই। দুপুরে একবার বাহির হইতে বাড়ী আসিলেই মাথা ও গা বালিময় হইয়া যায়। আওয়াজে আমার ২।৪ জন পার্শিয়ান ভদ্রপরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেখানকার মহরম ব্যাপার অতিশয় কৌতূহলপ্রদ। তাহা ছাড়া, পার্শিয়ানদের ও আরবদের ব্যবহার ও রীতিনীতি বিবরণ শুনিয়া আমাদের দেশের লোক বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। এই সংখ্যায়ই তাঁহাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিতে আমার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু আজ চারি বৎসর পরে আমি পিত্রালয় আক্রিগঞ্জে আসিয়াছি। 'ভারতবর্ষের' পাঠিকাগণের মধ্যে যাহারা সুদীর্ঘ কালের পর অল্প সময়ের জন্যে পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেই অত্যল্প সময় কত শীঘ্র গত হয়, এবং সেই সময়ে লেখনী ধরিতে ইচ্ছা হয় কি না। পারস্য ও আরব দেশে ঘটনাপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া, আক্রিগঞ্জের ন্যায় শান্তিপূর্ণ পল্লীগ্রামে এ কয়টা দিন বড় সুখেই কাটাইয়া গেলাম। জানি না স্বদেশে আবার কবে ফিরিব। সে যাহা হউক, আগামী বারে পারস্য বিবরণ আরও বলিবার অভিপ্রায় রহিল।

চক্রতীর্থ

বিপ্রলব্ধ
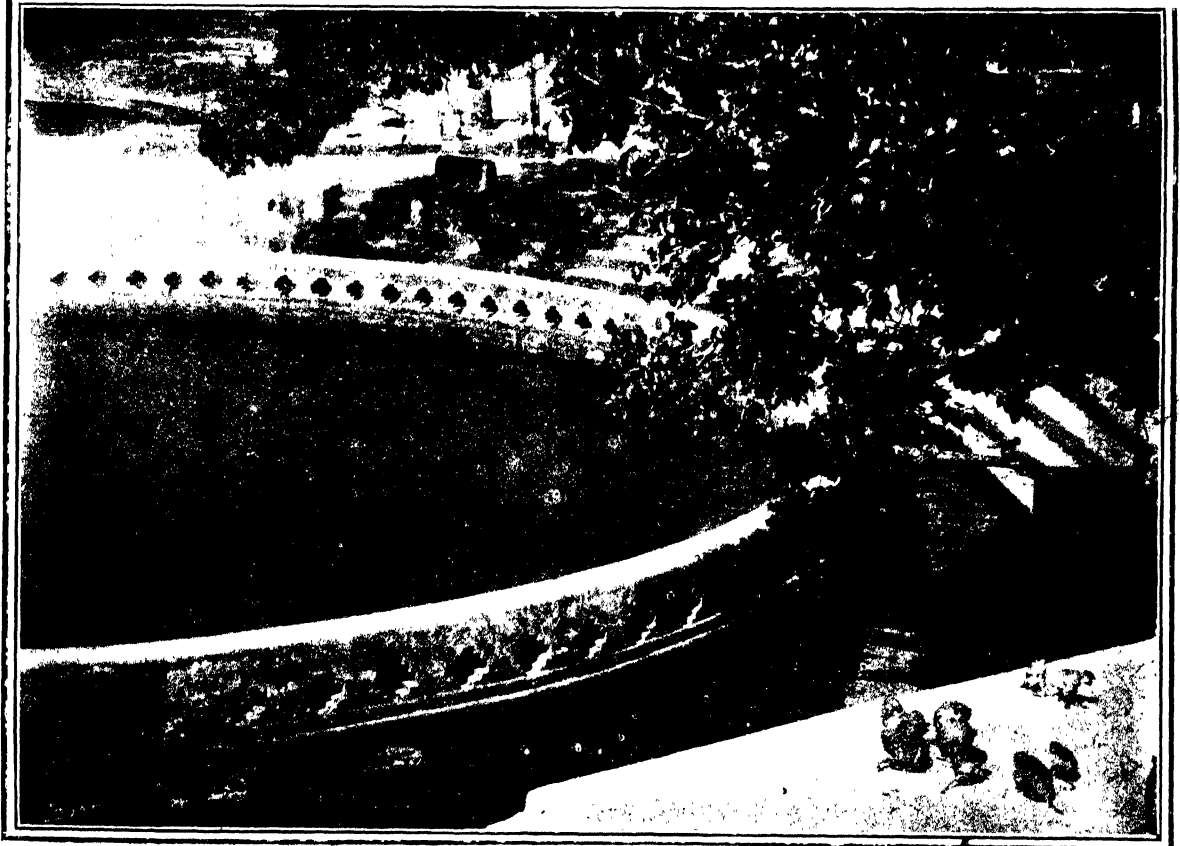
[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল সরস্বতী এম, এ, বি, এল]

আমি তখন দিল্লীতে পিয়ারীলাল-এণ্ড-সন্‌সের দোকানে কাজ করি। পিয়ারীলালের প্রাচীন মূর্ত্তি, অলঙ্কার, টুকিটাকি জিনিসের দোকান। বিদেশ হইতে যত সাহেব-সুবা ভারতবর্ষে আসেন, তাঁহারা দিল্লী দেখিয়া যাইবার সময় একবার করিয়া পিয়ারীলালের দোকানে আসিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন লইয়া যাইতে তাঁহাদের যেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাইতাম, তাহাতে প্রাচীন মূর্ত্তি, অলঙ্কার, খেলনা, কার্পেট, ছবি প্রভৃতি গছাইয়া দিতে আমায় আদৌ বেগ পাইতে হইত না। আমার ইংরেজী-জ্ঞান বড় বেশী ছিল না। কিন্তু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইত। পর্য্যটক সাহেবেরা অর্থের মায়া করেন না, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। দরদস্তুরও করিতে হয় না। সুতরাং সামান্য-সামান্য জিনিস ত অসম্ভব দরে বেচিতামই, অধিকন্তু বক্‌সিস্‌টাও প্রায় ফাঁক যাইত না।

মনিব পিয়ারীলাল সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আমার কাজে তিনি খুব খুসী ছিলেন। সাহেবেরা যে নিজেই বেকুব বনিয়া আধুনিক নিকৃষ্ট কার্পেট অধিক মূল্যে ক্রয় করিতেন, বা মির্জ্জাপুরে ও কাশীতে প্রস্তুত খেলনাগুলি আদর করিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা আমার মনিবের নিকট আমারই কৃতিত্বের পরিচায়ক হইত। মনিব ইংরেজী জানিতেন না। কাজেই আমার ভাঙ্গা ইংরেজীর সাধারণ বুলিগুলি তাঁহার পক্ষে ক্রেতা ভুলাইবার উপ-যোগী ও সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত; এবং এই বাঙ্গালী বাবুর কেরামতিতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিত। না হইবেই বা কেন? টাকা ত নেহাৎ কম রোজগার হইত না।

বিদেশী সাহেব ব্যতীত এদেশবাসী বড় বড় চাকুরে সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদনীর পোষাক-পরা সাহেবও বহু আসিতেন। কিন্তু ইঁহাদের কাছে জিনিস বেচিয়া বড় বেশী-কিছু সুবিধা ছিল না; দুই তিন ঘণ্টা হায়রাণ করিয়া হয় ত চার পাঁচ টাকা মূল্যে একটা জিনিস কিনিতেন, তার দর-দস্তুর আবার চীনের বাড়ীর জুতার দরদস্তুরের মতই হইতে থাকিত। তাই পারৎপক্ষে আমরা এই সকল খরিদদার আসিলে বেশী উৎসাহের ভাব দেখাইতাম না; নিতান্ত খেলো বা অল্প মূল্যের জিনিসগুলি মাত্র দেখাইতাম।

আর আসিতেন কদাচ কখন রাজারাজ্‌ড়ারা। ইঁহাদের নিকটও জিনিস বেচিয়া সুখ ছিল। একবার নজর লাগাইতে পারিলে দাম শুনিয়া কখনও ইঁহারা পিছাইতেন না। তাই আমরা ইঁহাদের বিশেষ খাতির করিয়া সকল দ্রব্য দেখাইতাম। তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেও কাতর হইতাম না। কারণ এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই পরিশ্রম কখনও বৃথা যাইবে না; অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তিনচারশত টাকার জিনিস না কিনিয়া আর ইঁহারা যাইতে পারিতেন না।

আমি মাহিনা পাইতাম মোটে কুড়িটি টাকা। তাহাতেই এক রকম চালাইয়া লইতাম। দোকানেই রাত্রিতে শুইয়া থাকিতাম। দোকানের পিছনে একটি চালা ছিল। দোকানের প্রহরী রামদীন মিশির রাজপুতানার লোক। তাহার বেতন ছিল দশ টাকা। সেই রাঁধিয়া আমায় দুবেলা ভাত খাওয়াইত। তাহাকে এজন্য টাকা-দুই দিতাম; অবশ্য তাহার নিজের আহারও ঐ সঙ্গেই প্রস্তুত হইত। খরচাটা যে যার নিজের। সে রুটি-ভক্ত ছিল, ভাত খাইত না।

বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া দিল্লীতে স্থায়ী হইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। না পাই মন-খুলিয়া বাঙ্গালা কথা কহিতে, না পাই আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিতে। তবে বাধ্য হইয়াই কিছুকাল দিল্লীতে থাকিতে হইয়াছিল। তাহার একটা কারণ ছিল। আমার বাড়ী বরিশাল

জেলায়। বাবা যখন মারা যান, তখন আমাদের ভিটামাটি সকলই বন্ধক ছিল। বাবার মৃত্যুতে চারদিক অন্ধকার দেখিলাম। পাওনাদারদের তাগাদা ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা কিছুদিন সবুর করুক, আমার এ প্রার্থনাতে তাহারা কিছুতেই রাজী হইল না। কাজেই শোধের উপায় করিতে হইল। দেনা ছিল প্রায় পাঁচশত টাকা। অপরের কাছে হয় ত এ টাকা অতি তুচ্ছ; কিন্তু আমি সারা-জীবনে ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল। একবার কোনক্রমে বাড়ী ও জমীগুলি খালাস করিয়া লইতে পারিলে আমার আর ভাবনা থাকিত না। আমার পরিবারের মধ্যে আর কেহ ছিল না। পিতা পৌরোহিত্য করিতেন। জমীগুলির ধান ও যজমানদের নিকট প্রাপ্তি হইতেই আমার সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে পারিত।

তাই প্রথমে দেনাশোধেই মন দিলাম। দেশে কিছু সুবিধা হইবে না বুঝিয়া কলিকাতায় আসিলাম। সেখানে আমাদের এক যজমান বড়বাজারে দোকান করিতেন। তাঁহার দোকানে গিয়া কিছুদিন আশ্রয় লইলাম। তাঁহার পাশের দোকান এক হিন্দুস্থানীর। পিয়ারীলাল এই দোকান-দারের আত্মীয়। সেই সময় পিয়ারীলাল একবার কলি-কাতায় কতকগুলি মূল্যবান জিনিষ কিনিতে আসিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মীয়ের দোকানের উপরতলের ঘরেই থাকিতেন। এইখানেই আমার সঙ্গে পিয়ারীলালের প্রথম পরিচয় হয়। আমার বিদ্যা ফোর্থ-ক্লাস পর্য্যন্ত ছিল। পাড়াগাঁয়ের স্কুলে লব্ধ এই বিদ্যাই পিয়ারীলালের কাছে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল। আমি দিল্লীতে তাঁহার দোকানে বিক্রেতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

সেই অবধি দিল্লীতেই চাকরী করিতেছিলাম। খরচ যতদূর সম্ভব কম করিয়া চালাইতাম, কিন্তু তাহাতেও বেশী কিছু জমিতেছে না। কারণ মাঝেমাঝে দেশে সুদ পাঠাইতে হইতেছে, নহিলে পাওনাদাররা থামে না। কুড়ি টাকা মাহিয়ানার মধ্যে খাওয়া-পরার খরচ দিয়া ছয় সাত টাকার বেশী আর বাঁচাইতে পারিতাম না। এক একবার অসুখে পড়িলে আবার কিছুই বাঁচিত না।

এইরূপ বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছিল। পাওনাদারের সুদ দিয়াও কিছু কিছু জমাইতেছিলাম, তার উপর খরিদদার সাহেবদের কাছে মাঝে-মাঝে যে বক্‌সিস্ পাইতাম, তাহাও জমাইতাম। দশ বৎসর পরে প্রায় তিন শত টাকা জমাইয়া ফেলিলাম। তখন মনে একটা ভরসা হইল। আর বেশী দিন নয়, তখন ঋণমুক্ত হইয়া আবার পৈতৃক ভিটায় বাস করিতে পাইব, এ মুল্লুক ছাড়িয়া বাঙ্গালীর সহিত দুটা কথা কহিয়া বাঁচিব।

একদিন দুপুরবেলা দোকানে একেলা বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম পায়জামা-চাপকান-পরা, মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ী এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত এক পুঁটুলি হাতে লইয়া আমাদের দোকানের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সেদিন আর কোন খরিদদার উপস্থিত ছিল না। মিশির-ঠাকুর একটা তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। আমি একলাই দোকান আগ্‌লাইয়া বসিয়া ছিলাম।

হিন্দুস্থানীটির দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। কপালে চন্দনের রেখা, গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা,—বোধ হয় লোকটা ব্রাহ্মণ। আমিও পুরোহিতের ছেলে;—একটু আকৃষ্ট হইলাম। তারপর যখন দেখিলাম যে, সে এই দোকানের দিকেই ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রে চাহিতেছে ও দোকানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেও যেন ভরসা করিতে পারিতেছে না, এই ভাব দেখাইতেছে, তখন আমিই উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"আপনার কি দরকার?"

লোকটি আগাইয়া আসিল। দোকানের সিঁড়িগুলির উপর একে-একে উঠিয়া একবার দোকানের ভিতরে উকি দিয়া দেখিল আমি ছাড়া দোকানে আর কেহ নাই। দেখিয়া বোধ হয় তাহার কিছু ভরসা হইল। আস্তে-আস্তে দোকানে ঢুকিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া পড়িল। এই টুলে বসিয়া মিশির দোকানে পাহারা দেয়।

আমি তাহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিলাম। লোকটি হাঁফাইতেছিল। সে যে অনেকদূর হইতে দুপুর-রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার ধূলিধূসরিত কেশ ও হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল। দিল্লীর ধূলার কথা আপনাদের জানাই আছে।

একটু জিরাইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি পণ্ডিতজী, আপনার কি দরকার?"

'পণ্ডিতজী' সম্বোধনে লোকটি প্রীত হইল। পরিষ্কার

উদ্দ্‌তে বলিল "বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার ছোট মেয়েটি মর মর। চিকিৎসা করবার টাকা নাই। যেখান থেকে হ'ক কুড়িটা টাকা আমার এখনি না হ'লেই নয়। যাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল, তাদের সকলের কাছেই কিছু-না-কিছু ধার করেছি। তাদের কেউ আর এখন এক পয়সাও দিতে চায় না। আমি স্কুলে পড়িয়ে খাই, অল্প মাহিয়ানা; তার উপর মেয়েটি প্রায় আজ ছ'মাস থেকে ভুগ্‌ছে। তাই বড় জড়িয়ে পড়েছি। বাবু, আপনি একটু দয়া না কর্‌লে আর মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি না।" বলিতে বলিতে লোকটা সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। আমার বড় দুঃখ হইল। ঋণের দায় যে কিরূপ, তাহা আমিও হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা, আমি কি কর্‌তে পারি?"

পণ্ডিতজী পুঁটুলি খুলিলেন। তাহার মধ্য হইতে কাপড়ে জড়ান একটি পদার্থ বাহির করিলেন। কাপড়ের ভাঁজ খুলিতেই দেখিলাম একটি মূর্ত্তি। পশ্চিমে যে হনু-মানের মূর্ত্তি 'মহাবীরজী' বলিয়া পূজিত হয়, ইহাও সেইরূপ।

পণ্ডিতজী বলিলেন "বাবু—এই একটি মূর্ত্তি এনেছি। আমাদের বাড়ীতে অনেকপুরুষ ধরে এই মূর্ত্তিটি আছে। এর পূজা আমরা করি না বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এ মূর্ত্তি আমাদের রক্ষাকবচ স্বরূপ। যতদিন এ মূর্ত্তি আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে, ততদিন আমাদের কোনও বিপদ ঘট্‌বে না। আপনারা ত এইরকম জিনিষ বেচেন। অনুগ্রহ করে কুড়িটা টাকা দিয়ে এই মূর্ত্তিটি বন্ধক রাখুন। পরশু মাসের পয়লা। সেইদিন আমি মহিয়ানা পাব। মাহিয়ানা পেলেই আগে এটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।"

আমাদের বন্ধকী কারবার ছিল না। বলিলাম "আমরা ত কোনও জিনিস বন্ধক রাখি না, একেবারে কিনে নিতে পারি। তা আমার মনিব আসুন। তিনি যা বল্‌বেন, সেই দর আপনি পেতে পারেন।"

পণ্ডিতজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "বিক্রী আমি কখনই কর্‌ব না।" বলিয়াই তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল; বোধ হয় রোগশয্যাগত কন্যার মুখ মনে পড়িল। কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন "বন্ধক রাখা আপনাদের ব্যবসা না হ'ক, একবার আমার এইটে বন্ধক রাখুন। একজনের প্রাণরক্ষা করুন। আমি দুদিন পরেই ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।"

আমার বড় দয়া হইল। পিয়ারীলাল কখনও বন্ধক রাখিতে স্বীকৃত হইবেন না, তাহা জানিতাম। আমি মূর্ত্তিটিকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিলাম। মূর্ত্তিটি দেখিতে অতি সুন্দর। আমার ভরসা হইল, যে কোন সাহেবকে ইহা আমি পঞ্চাশ টাকায় বেচিয়া দিতে পারি। আর যেরূপ শুনিতেছি, তাহাকে মূর্ত্তিটি যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম "দেখুন, পণ্ডিতজী, আমার মনিব বন্ধক রাখিতে কিছুতেই রাজী হইবেন না। তবে আপনি যেরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহাতে আমি আমার নিজের টাকা দিয়া মূর্ত্তিটিকে বন্ধক রাখিতে পারি। আপনি পরে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবেন।"

পণ্ডিতজী বলিলেন "ভগবান্ আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। এক ব্রাহ্মণের আপনি আজ প্রাণরক্ষা কর্‌লেন। আমার মেয়ে মারা গেলে আমিও বাঁচতাম না।"

আমি ভিতরে গিয়া বাক্‌স খুলিয়া আমার সঞ্চিত টাকা হইতে কুড়িটি টাকা আনিয়া পণ্ডিতজীর হাতে দিলাম ও একখানি কাগজে পণ্ডিতজীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম।

পণ্ডিতজী টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি মূর্ত্তি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া আমার বাক্‌সে তুলিয়া রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় একখানি জুড়ি-গাড়ী আসিয়া দোকানের দরজায় দাঁড়াইল। আমি তাড়াতাড়ি মূর্ত্তিটিকে একটা টেবিলের উপর রাখিয়া দরজায় ছুটিয়া গেলাম।

জুড়ি-গাড়ীখানি ভাড়াটিয়া। দিল্লীতে যে সব ভাল ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া যায়, তাহা ঘরের গাড়ীর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। গাড়ীখানি হইতে মূল্যবান পরিচ্ছদ-পরিহিত এক স্থূলকায় ভদ্রলোক নামিলেন। তাঁহার মাথায় বহুমূল্য সিল্কের পাগ্‌ড়ী। হাতে দুই-তিন আংটি ও মুষ্টিমধ্যে একখানি সোণা-বাঁধান লাঠি। তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন শুভ্রপরিচ্ছদ-ভূষিত ভদ্রলোক নামিলেন। গাড়ীর কোচবাক্সে তক্‌মা-পরা এক চোপদার বসিয়া ছিল। সে আগে নামিয়া পথে দাঁড়াইল। দেখিয়া

বুঝিলাম, কোনও ধনীলোক হইবে। সসম্ভ্রমে সেলাম বাজাইয়া দোকানে ডাকিয়া লইলাম।

সঙ্গী ভদ্রলোকটির কাছে শুনিলাম ইনি লছমীগড়ের রাজা। পুরাতন জিনিস সংগ্রহ করা ইঁহার বিশেষ সখ্। সমগ্র ভারত এই উদ্দেশ্যে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন ও জলের মত অর্থব্যয় করিতেছেন। এরূপ খরিদদার আমাদের বরাতে সচরাচর জুটে না। আমি আগ্রহের সহিত আমাদের সব জিনিস রাজাকে দেখাইতে লাগিলাম।

বাস্তবিকই রাজার পুরাতন জিনিস চিনিবার ক্ষমতা আছে দেখিলাম। আধুনিক পিত্তল ও প্রস্তরমূর্ত্তিগুলিকে তিনি 'রদি মাল' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমাদের সমস্ত দোকান দেখিয়া তাঁহার মনের মত জিনিস বেশী পাওয়া গেল না। একটা ভাঙ্গা বুদ্ধমূর্ত্তি আমি আসা অবধি পড়িয়া ছিল, কেহই তাহা কিনিতে চাহে নাই। রাজা তাহার দর জিজ্ঞাসা করিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, আমার নিজের নূতন বা পুরাতন ধরিবার ক্ষমতা বেশী ছিল না। মনিবের নিকট বা বিক্রেতাদিগের নিকট যাহা শুনিতাম, তদনুযায়ীই নূতন পুরাতন নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতাম। আমার মনিব বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "পাঁচ টাকা দর পাইলেই বুদ্ধমূর্ত্তিটা বেচিয়া দিতে।" কিন্তু রাজার আগ্রহ দেখিয়া আমি একেবারে বলিয়া দিলাম, "এটার দর ত্রিশ টাকা।"

রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র তাঁহার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ তিনখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিল। চোপদার আসিয়া মূর্ত্তিটিকে গাড়ীতে তুলিল।

রাজা চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় টেবিলের উপর স্থাপিত পণ্ডিতজীর সেই মূর্ত্তিটির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেটা বিক্রয়ের জন্য নয় বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখাই নাই। মূর্ত্তিটি দেখিয়াই রাজা অস্ফুট বিস্ময়ের ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে তাড়াতাড়ি টেবিলের নিকট গিয়া মূর্ত্তিটি হাতে করিয়া তুলিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার সঙ্গী হাসিয়া বলিল "মিল্ গিয়া মহারাজ।"

রাজা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ইস্‌কা কেয়া ভাও ?"

আমি বলিলাম—"ইহা বিক্রয়ের জন্য নয়। একজন লোক ইহা বন্ধক রাখিয়া গিয়াছে, দুইদিন পরে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে।"

রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই রকম একটা মূর্ত্তির জন্য আজ পাঁচবৎসর থেকে ঘুরছি। আজ যদিও পাওয়া গেল, তা আবার বেচ্‌তে চায় না।" বলিয়া ক্রোধের সহিত মূর্ত্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার সঙ্গী আমার নিকট আসিলেন। চুপি-চুপি বলিলেন "ঠিক্ বলছ বাবু, বন্ধক আছে? বন্ধক রেখেছে কে? বন্ধক যখন রেখেছে, তখন বেচ্‌তেই বা কতক্ষণ? আমরা পাঁচশত টাকা দিব—যদি এই মূর্ত্তিটা পাই।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার বিস্ময় বুঝিয়া লোকটি বলিল "তোমায় লুকাইবার দরকার নাই। কারণ জিনিস তোমার নয়। এ মূর্ত্তি ত্রিশ বছর আগে গড়া। জয়পুরের এক শিল্পী এ রকম মূর্ত্তি গড়ত। এ রকম মূর্ত্তি আজকাল আর পাওয়া যায় না। মহারাজ অমৃতসরের এক দোকানে পাঁচবছর আগে একটা কিনেছেন। তার জোড়া পাইবার জন্য আমরা এতদিন কত চেষ্টাই না করেছি। এইটে পেলেই আমাদের জোড়া মেলে যায়। কে বন্ধক দিয়েছে, আমায় নাম বল, পাঁচশ' টাকা পেলে সে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।"

আমার মন বলিল "কখনই নয়। পণ্ডিতজীর এটা পারিবারিক স্মৃতি। পাঁচশ' কেন হাজার টাকা পেলেও বোধ হয় তিনি এটা বেচবেন না।" আবার ভাবিলাম "এখন তাঁর যেরূপ টাকার অভাব, তাতে একেবারে এতগুলো টাকার লোভ হয় ত সামলাতে পার্‌বেন না।" সঙ্গে-সঙ্গে আমার ব্যবসাদারী বুদ্ধিও জাগ্রত হইয়া উঠিল। আমার কাছে যখন বন্ধক আছে, তখন আমিই বা মাঝ থেকে কিছু লাভ না করি কেন?

প্রকাশ্যে বলিলাম "পাঁচশত টাকা আপনারা দিতে রাজী ?"

লোকটি বলিল "এখনই। এই দশটাকা বায়না দিচ্ছি।" বলিয়া একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিতে গেল।

আমি বলিলাম "বায়না এখন নিতে পার্‌ব না, কারণ যার জিনিস, সে বেচবে কি না বল্‌তে পারি না। পরশু সে আস্‌বে। তাকে ব'লে দেখ্‌ব। তার পরের দিন আপনাকে ঠিক্ খবর দিতে পার্‌ব।"

লোকটা নোটখানা আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল "বায়না না হয়, তোমায় বক্‌সিস্‌ই দিলুম। তুমি বিশেষ চেষ্টা ক'রো, যাতে আমরা এটা কিন্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম "নিশ্চয়ই।" বিক্রয় করিতে পারিলে আমারও যে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা বোধ হয় লোকটি বুঝিতে পারে নাই।

রাজা গাড়ীতে উঠিলেন, লোকটি বলিল "পরশুর পরের দিন দুপুর-বেলা আমি পাঁচশ' টাকা নিয়ে আস্‌ব। যদি করে দিতে পার, ত তোমার আর দশ টাকা বক্‌সিস্‌। আমরা হিন্দু হোটেলে আছি। দরকার হলে খবর ক'রো।"

আমি সেলাম করিলাম। গাড়ী চলিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিকালবেলা পণ্ডিতজী আসিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি পণ্ডিতজী, খবর কি?"

বেচারা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শুনিলাম কন্যা সারে নাই। পীড়া সেইরূপই সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধে তাহার সব অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে; আজ যাহা মাহিয়ানা পাইয়াছে, তাহা ডাক্তারকে দিয়া আসিয়াছে। বাকী ভিজিট্‌ চুকাইয়া না দিলে ডাক্তার আর রোগী দেখিবেন না, বলিয়াছিলেন।

পণ্ডিতজী মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল "বাবু অনুগ্রহ ক'রে আর কিছুদিন মূর্ত্তিটা রাখুন। এ মাসে আর ছাড়াতে পার্‌লুম না, আগামী মাসে চেষ্টা কর্‌ব।"

আমি দেখিলাম, বিক্রীর কথাটা পাড়িবার এই সুযোগ; বলিলাম, পণ্ডিতজী, আপনি যে রকম জড়িয়ে পড়েছেন, তাতে এটা যে শীগ্‌গির ছাড়াতে পার্‌বেন, তা বোধ হয় না। আপনার দেনা হয়েছে কত?"

প। দুশো টাকা।

আ। তবে দুশো টাকা দেনা শোধ দিয়ে এটা ছাড়ান কি আর সম্ভব হবে? তার চেয়ে আমি বলি কি, আপনি এটা একেবারে বেচে ফেলুন। জিনিসটা ভাল আছে। দু'শো টাকা দিয়ে আমরা এটা কিনে নিতে পারি।

কিন্তু পণ্ডিতজী বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না; কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন "অমন কথা বল্‌বেন না। পূজা না কর্‌লেও এটি আমাদের গৃহদেবতা, এ আমি বেচতে পার্‌ব না।"

আমি অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। কন্যার এরূপ অসুখে আরও কত টাকা খরচ হইবে, কে জানে? কন্যার প্রাণ বাঁচান আগে, না এই মূর্ত্তি রাখাই আগে?

পণ্ডিতজী বলিলেন "দুশ টাকা ত আমার দেনা শোধ দিতে যাবে। বেচে আর আমার কন্যার চিকিৎসার সাহায্য কি হবে?"

আমি বলিলাম "না হয় আপনার জন্যে আমি একটু বিশেষ চেষ্টা করে আরও বেশী কিছু আপনাকে পাইয়ে দেব। অবশ্য সহজে হবে না। তবে আপনার বিপদ্‌ দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে। সাহায্য না করে থাক্‌তে পাচ্ছি না। আমি ব'লে-কয়ে ২৫০৲ টাকায় মূর্ত্তিটা বেচ্‌তে পারি।"

পণ্ডিতজী এ প্রস্তাবেও ততটা উৎসাহ দেখাইলেন না। মোটে পঞ্চাশটি! অনেক বুঝাইয়াও যখন রাজী করাইতে পারিলাম না, তখন বলিলাম "আচ্ছা, তিনশত টাকাই না হয় করিয়া দিব। আর ইতস্ততঃ করিবেন না। বেচিয়া ফেলুন।"

পণ্ডিতজী বলিলেন "বাবু, বেচিতে যে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, তাহা আর কি বলিব? গৃহদেবতা বেচিয়া আমার কি পরিণাম হইবে, কে জানে? তবে মেয়েটাকে বাঁচাবার আর কোন উপায় দেখ্‌ছি না বলেই বেচতে রাজী হ'চ্ছি। নইলে পয়সার লোভে কখনই এ কাজে রাজী হইতাম না।"

আমি বলিলাম "আপনার এই বিপদ দেখেই আমি বল্‌ছি। নইলে এমন কথা আমিও কখনও বল্‌তাম না। আমিও ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের ছেলে। এ রকম অবস্থায় বেচ্‌লে কোন দোষ হবে বলে মনে করি না।"

পণ্ডিতজী এই কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। আমি বাক্‌স খুলিয়া আমার সঞ্চিত সমস্ত টাকা বাহির করিয়া আনিলাম। কুড়ি টাকা ত আগেই দিয়াছিলাম। এখন ২৮০৲ টাকা গণিয়া দিলাম। বলিলাম "একখানা রসীদ লিখে দিতে হবে।"

পণ্ডিতজী আপত্তি করিলেন না। রীতিমত একখানা রসিদ লিখিয়া দিলেন। দোকান হইতে একখানা ষ্ট্যাম্প দিলাম। তাহাও রসীদে লাগান হইল।

টাকা লইয়া পণ্ডিতজী মূর্ত্তিটিকে প্রণাম করিলেন,—

যেন ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। পরে বিষণ্ণমুখে ধীরে-ধীরে দোকান পরিত্যাগ করিলেন।

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। আমার সঞ্চিত সমস্ত টাকাটা দিয়া মূর্ত্তিটা কিনিলাম বটে, কিন্তু কাল লছমীগড়ের রাজার লোক আসিয়া যখন আমার কাছ হইতে মূর্ত্তিটা কিনিবে, তখন আমার দুইশত টাকা লাভ হইবে। আমার ঋণ ত পাঁচ শত টাকা। সুদ যাহা হইয়াছিল তাহা এত দিনে শোধ করিয়া দিয়াছি। কেবল আসলটা বাকি। কাল পাঁচশত টাকা পাইলেই আর আমার দিল্লীতে থাকার প্রয়োজন হইবে না। দশটাকা বক্‌সিস্ পাইয়াছি। আরও দশটাকা কাল পাইব। তাহা হইলেই দিল্লী হইতে রেলভাড়া দিয়া বাড়ী পৌঁছিবার খরচটাও হইয়া যাইবে। আজ মাসের পয়লা। কাল কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার লোকসানও কিছু হইবে না।

এ কথাগুলি যে আজ এই প্রথম ভাবিলাম, তাহা নয়। লছমীগড়ের রাজা যে দিন আসিয়াছিলেন, সেই দিনই ভাবিয়াছিলাম। এই মৎলব করিয়াই পণ্ডিতজীর নাম ও ঠিকানা তাঁহাদের বলি নাই। পণ্ডিতজীকেও রাজার কথা বলি নাই। বলিলে ত মাঝখান হইতে আমার দুইশত টাকা লাভ হইত না। এখন বসিয়া-বসিয়া এই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম ও আমার বুদ্ধিকে তারিফ্ করিতে লাগিলাম।

তার পরের দিন সকাল হইতে আমি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কাহারও পায়ের শব্দ বা গাড়ীর শব্দ পাইলেই ছুটিয়া দোকানের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতে লাগিলাম। রামদীন মিশিরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—বাবুর আজ খরিদদারের প্রতি এত টান কেন ?

কিন্তু সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ হইল; লছমীগড়ের রাজা বা তাঁহার কোনও লোক আসিল না; কোনও সংবাদও পাইলাম না। কি হইল ? সমস্ত রাত্রি ভাবনায় ঘুম হইল না।

সকালে উঠিয়াই যে হোটেলে রাজা উঠিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গীর নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই হোটেলে গেলাম। হোটেলের মালিক দরজার সামনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে চিনিতেন। দেখিয়াই বলিলেন "কি বাবুসাহেব, কেন আসিয়াছেন বলিব ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লছমীগড়ের রাজাসাহেব কি এখানে আছেন ?"

হোটেলের মালিক হাসিয়া বলিলেন "ছিলেন বটে। কিন্তু দাঁও ফস্‌কেছে। পিয়ারীলালজীকে বল্‌বেন রাজা-রাজড়ার সঙ্গে তখনি-তখনি কারবার শেষ কর্‌তে হয়, ফেলে রাখতে নেই। আমীরি মেজাজ কখন কি রকম থাকে, তার ত ঠিক নেই।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; বলিলাম "কি রকম ?"

হোটেলের মালিক বলিলেন "আপনি একটা জিনিস বেচ্‌তে এসেছেন ত ? তা আর হচ্ছে না। রাজাসাহেব বলে গেছেন, যদি কেউ পিয়ারীলালের দোকান থেকে কোনও জিনিস বেচ্‌তে আসে, তাকে ব'লো আমাদের আর তা দরকার নেই।"

আমার পা টলিতে লাগিল। হোটেলের মালিক বলিলেন "কি বাবু! অমন হয়ে গেলেন কেন ? আপনার আর ক্ষতি কি ? আর পিয়ারীলাল সাহেবের যে রকম খরিদদারের ভীড়, তাতে অমন দু-দশটা দাঁও ফস্‌কালেও কিছু আসে যায় না। তবে বক্‌সিস্ যদি কিছু এঁচে থাকেন, তা আর হচ্ছে না। কি বলেন ? হাঃ—হাঃ—হাঃ।" এই বলিয়া তিনি উচ্চরবে হাসিতে লাগিলেন।

আমার মাথায় তখন বজ্রাঘাত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "রাজাসাহেব কবে গেলেন ?"

"পরশু রাত্রিতে।"

আ। কোথায় গেলেন জানেন কি ?

হো। না, তা বলিতে পারি না।

আমি ফিরিলাম। চাঁদনীচকের মাঝখানের ফুটপাথ দিয়া ফিরিতে লাগিলাম। আমাদের দোকান কাশ্মীর-গেটের নিকট। রাস্তায় ট্রামের ঝন্‌ঝনানি, এক্কার হুড়াহুড়ি, টঙ্গার দৌড়াদৌড়ি কিছুই চোখে পড়িতেছিল না। যমুনায় স্নান করিয়া রঙ্গীনা ঘাঘরা পরিয়া যে সকল রমণী ফুটপাথ দিয়া ফিরিতেছিলেন, মাঝে-মাঝে তাঁহাদের সম্মুখে পড়িয়া ধাক্কা লাগিবার উপক্রম হওয়ায় অপ্রতিভ হইতেছিলাম। চাঁদনী-চক দিয়া আসিয়া কোতয়ালীর সামনে চৌমাথা পার হইয়া পার্কে প্রবেশ করিবার সময় একবার গাড়ীচাপা পড়িতে-পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম। বাগানের ভিতর দিয়া পুনরায় রাস্তায় পড়িলাম। রাস্তা পার হইয়া রেলষ্টেশনের উপর

সুদীর্ঘ কাঠের পোলে উঠিলাম। পোলে উঠিবার সময় পাথরের সিঁড়ির উপর যে সব অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ বসিয়া থাকে, তাহাদের একজনের কাপড় মাড়াইয়া ফেলিলাম। সরু পোলটির উপর দিয়া যাইবার সময় দ্রুতগামী স্কুলের ছেলেরা ধাক্কা দিয়া আগাইয়া গেল। ডুলিবাহকেরা "হুসিয়ার, খবরদার" বলিয়া পথ করিয়া লইল। আমার চক্ষে তখন সকল অন্ধকার। দশ বৎসরের কঠিন শ্রমে যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা এক ভ্রমে উড়িয়া গেল। কি নির্ব্বুদ্ধিতাই করিয়াছি। বাবার কাছে শুনিতাম "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।" আমার পক্ষে ত তাহাই ঘটিল। ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কেন ব্রাহ্মণকে ঠকাইতে গেলাম ?

ভবিষ্যতের কথা আর ভাবিতে পারিলাম না। দেনা-শোধের আশা আর নাই। আবার অত টাকা সঞ্চয় করা—সে আর এ জীবনে নয়।

হঠাৎ মনে পড়িল মূর্ত্তিটার দামও ত নেহাৎ কম হইবে না। রাজা যখন অত দাম দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন জিনিসটা কখনও থেলো নয়। আজ দোকানে গিয়াই পিয়ারীলাল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এই কথা মনে হইতেই আমার গতি দ্রুত হইয়া গেল। তখন আমিই আমার অগ্রগামী লোকেদের ঠেলিয়া পথ করিয়া লইতে লাগিলাম। সাঁকো পার হইয়া অপরদিকের পাথরের সিঁড়ি নামিবার সময় স্কুল-কলেজের ছেলেদের মতই লাফাইয়া লাফাইয়া দুইতিনটি ধাপ একেবারে অতিক্রম করিতে লাগিলাম। সামনেই রাস্তা। অল্প সময়ের মধ্যেই দোকানে পৌছিলাম।

রামদীন মিশির দোকানের সামনের রকে ছেনি ও হাতুড়ি দিয়া একটা প্যাকিং-বাক্স খুলিতেছিল। পিয়ারী-লাল নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

আমি সেলাম করিয়া দোকানের ভিতরে গেলাম ও আমার তোরঙ্গ হইতে পণ্ডিতজীর মূর্ত্তিটি বাহির করিয়া লইয়া আসিলাম। প্যাকিং-বাক্সের ডালাটি তখন খোলা হইয়াছে।

আমি মূর্ত্তিটি পিয়ারীলালের হাতে দিয়া বলিলাম "এটার দাম কত হবে, বল্‌তে পারেন ?"

পিয়ারীলাল বলিলেন "এ তুমি কোথায় পেলে বাবু-সাহেব ? বেনারসে লছমীপৎ ব'লে এক কারিগর আজ-কাল ছাঁচে এই রকম পুতুল গড়াচ্ছে।" আমি দু ডজন অর্ডার দিয়েছিলুম। এই এসে পৌঁছেছে।"

এই বলিয়া পিয়ারীলাল হেঁট হইয়া প্যাকিং-বাক্স হইতে খড়-জড়ান একটা মূর্ত্তি তুলিয়া লইলেন। খড় ফেলিয়া দিয়া মূর্ত্তিটা আমার হাতে দিলেন। দুইটিই অবিকল এক রকম।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম "এর দর কত ক'রে ?"

পিয়ারীলাল বলিলেন "এগুলির ডজন ষাট টাকা, খুচরা একটা পুতুল সাত টাকা।"

আমি আর কথাটি কহিলাম না। 'সেয়ান ঠক্‌লে বাপকেও বলে না।'

মাঠের-গানে

[শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ]

কে তুমি মাঠের পরে, আকুল উদাস স্বরে
গাহিতেছ সকরুণ গান !
ওসুর মরম পরে কেন গো আঘাত করে
বেদনায় কেঁদে ওঠে প্রাণ।
মনে পড়ে কত কথা জীবনের দৈন্য ব্যথা
আর্ত্ত চিত্ত করে হাহাকার,
হারায়েছি সে জনারে মরণের পারাবারে
মনে পড়ে মুখখানি তার।

যত গর্ব্ব অভিমান ভেঙ্গে হয় খান্ খান্
মনে হয় সবই যেন ভুল,
সীমা হীন শূন্য মাঝে চিন্তার তরণী রাজে
কোন দিকে নাহি পায় কূল।
শ্যামল পল্লীর কোলে কে তুমি আদুরে ছেলে
দিবানিশি গাও এই গান !
তুমি ত ধরার নহ নন্দনের বার্ত্তাবহ
বিশ্বপরে বিধাতার দান॥

গঙ্গোত্রী

Emerald Ptg Works

মধ্যস্থের অরণ্যে-রোদন

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈঠকে কেউ ভুল বলিয়া ধরা পড়িলে, ভাঙ্গেন, কিন্তু মচ্‌কান না; বেশীর ভাগ, সেই ভুল চাপিতে গিয়া ভুলের উপর ভুল করিয়া বসেন।

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত কথা" এবং আষাঢ়ের "ভারতী"তে ঐ লেখাটির বিরোধী আলোচনা আমরা পড়িয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, ব্যাপার আর বেশীদূর গড়াইবে না। কিন্তু শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" দেখিতেছি, বৃন্দাবনবাবু হাঁড়ি থেকে আবার পুরাণো কাসুন্দী বাহির করিয়াছেন। ফলে, রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থরূপে আবির্ভাব।

আপনারা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, এক-একজন বেজায় সেয়ানা লোক আছেন, যাঁরা দশআনা ছ-আনা চুলও ছাঁটেন, আর চুলের ভিতরে সৌখীন ও মিহি একটি টিকিও লুকাইয়া রাখেন। পীরু মিঞার হোটেলে গেলে দেখিবেন, এঁদের টেড়ীর কি বাহার! কিন্তু সমাজে, যখন কারুকে একঘরে করিতে ঘোট পাকানো হয়, তখন দেখিবেন এঁদের 'সম্ভ্রান্ত ও সনাতন টিকি' দেমাকে-ডগমগ হইয়া বাতাসে উড়িতে-উড়িতে যেন বোকার দলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। এঁরা আর কেউ নন,—সেই সুবিধাবাদীর দল—যাঁরা 'ঘোপ্ বুঝে কোপ্' মারেন, যাঁরা শ্যামও রাখেন কুলও রাখেন, যাঁরা দুধও খান, তামাকও খান।

সাহিত্য-সংসারেও এই ধরণের দু-চারজন বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের দেখা পাই। এঁদের সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়া আর নিজের ঘাড় হেঁট করা একই কথা। কেন না, এঁরা দাঁড়াইয়া থাকেন, দু-নৌকায় পা দিয়া। এক নৌকা যেই ডুবুডুবু হয়, এঁরা অমনি অন্য নৌকায় উঠিয়া প্রাণ বাঁচান। প্রমাণ দেখুন—

"ভারতী"তে প্রকাশিত বিরোধী সমালোচনার উত্তরে শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" বৃন্দাবনবাবু লিখিতেছেন—"সমালোচক মহাশয় আমার প্রবন্ধের 'Bird's-eye-view" লইয়া একেবারে লিখিয়াছেন, 'লেখকের মূল বক্তব্য এই যে, তিনি সাহিত্যিক ভাষায় চল্‌তি কথার পক্ষপাতী নন।' এ বক্তব্য আমার নহে, ইহা তাঁহার আরোপিত বক্তব্য। আমি প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ লিখিয়াছি,—'নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষায় কেহ কখনও সাহিত্য রচনা করিতে পারেন না, কেহ কখনও করেন নাই।"

অথচ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' এই কথা বলিয়া ইনিই লিখিয়াছেন:—"আদর্শ বাঙ্গালার কাঠাম শুদ্ধভাষা, তাহাতে অধিকাংশই শুদ্ধ শব্দ রহিয়াছে। যিনি সাধুভাষার বিপক্ষে ও চলিত কথার পক্ষে যুক্তি দিতে যাইয়া আদর্শ বাঙ্গালায় 'সংস্কৃত চিনির চেয়ে চলিত শব্দের ছামা বেশী থাকিবে' লিখিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি নিজের সমস্ত রচনায় শতকরা নিরানব্বইটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্মের জয় হইবেই!"

উদ্ধৃত স্থানের শেষ দিকটায় লেখক স্পষ্টাস্পষ্টি বলিতেছেন, যে লেখক লেখায় 'শতকরা নিরানব্বইটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার' করেন, তাঁহার পক্ষেই ধর্ম্ম থাকেন; অর্থাৎ যাঁরা চল্‌তি কথায় লেখেন, তাঁহারা অধর্ম্মের কাজ করেন!

সাধুভাষার "মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা বা চুটকি"র জন্য "চলিত কথার বুক্‌নী থাকিবে" বলিয়াছেন বলিয়াই যে মনকে চোখ ঠারিয়া বুঝাইতে হইবে,—বৃন্দাবনবাবু চল্‌তি ভাষারই পক্ষপাতী,—এমন আজ্‌গুবি যুক্তি কেউ কখনও শুনিয়াছেন কি? একরাশি কুন্দকলির সঙ্গে গুটিদুই-তিন গোলাপফুল গুঁজিয়া মালা গাঁথিলেই যে তাকে গোলাপের মালা বলা চলিবে—এ কি একটা কথার মত কথা? আজকাল যে বাঙ্গলা লেখার মাঝে মাঝে ইংরেজী কথার বুকনি ঝাড়া এক মস্ত বালাই হইয়া উঠিয়াছে, তাতে কি এই প্রমাণিত হয়, ও লেখাগুলি বাঙ্গলা নয়—ইংরেজী? বাঙ্গলা ভাষায় "শতকরা নিরানব্বইটি সংস্কৃত শব্দের

ব্যবহার" দেখিলে যিনি গদ্গদকণ্ঠে বলেন,—"ধর্ম্মের জয় হইবেই,"—তিনি ত একরকম চোখে আঙ্গুল দিয়াই দেখাইয়া দেন যে, তাঁর প্রেম সংস্কৃতের সঙ্গেই! "অধিকাংশ শুদ্ধ শব্দ" নয়,—মাঝে মাঝে "চলিত কথার বুক্‌নী" নয়,—যে ভাষায় সকলের উপরে চল্‌তি কথার কদর দেখিব, তাহাই চল্‌তি ভাষা। যেখানে চল্‌তি চলে না, সেখানে মধুর অভাবে গুড়ের মত সংস্কৃত চালান,—মানা করিব না।

বৃন্দাবনবাবু যে কতবড় সংস্কৃতভক্ত, তার আরও প্রমাণ তাঁর লেখার সব জায়গাতেই আছে। পাঠকের ধৈর্য্য আর আমাদের স্থান,—দুই-ই কম; অতএব আর দু-এক জায়গা মাত্র তুলিলাম।

(১) "চলিত কথা যে সাহিত্যিক ভাষা নহে, তাহা একজন অশিক্ষিত লোকেও বুঝে।"—(২) "শুদ্ধভাষা ও প্রাকৃত কথার মর্য্যাদার তুলনা করা যাউক। এই দুই ভাষার নামগুলি হইতেই ত কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, কোন্‌টি অপকৃষ্ট, বুঝিতে বাকী থাকে না।" (৩) "সাহিত্যিক বা সংস্কৃত ভাষা স্থায়ী হয় কেন? চলিত কথা বদ্‌লাইয়া থাকে * * বলিয়া * * নিন্দনীয় আখ্যালাভ করিয়াছে, প্রভৃতি।" (৪) "সাহিত্যের ভাব যেমন আট্‌পৌরে নয়, সাহিত্যের ভাষাই বা কেন আট্‌পৌরে হইবে?"

এর পরও কি লেখক বলিতে চান, "ভারতী"র বক্তব্য তাঁহার উপরে "আরোপিত বক্তব্য?"

আবার, আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' বৃন্দাবনবাবু যে প্রতিবাদটি লিখিয়াছেন, সে লেখাটিও মন দিয়া যে-কেহ পড়িবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, বৃন্দাবনবাবু একেবারেই চল্‌তি ভাষার পক্ষ লইয়া কথা কহিতেছেন না!

এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন বিষম ফাঁসাদের জায়গায় কি করিয়া তর্ক চলে? যাদের নিজেদের মতের ঠিক নাই, যাঁরা একই লেখার এখানে এক কথা, ওখানে আর এক কথা বলেন, যাঁরা একবার শ্যামের বাঁশী বাজান, আর-একবার রামের ধনুক ধরেন, আবার কোন কথা বলিয়াও মানেন না, তাঁদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে হইলে মুখের যুক্তির চেয়ে দেহের শক্তির বেশী দরকার। কিন্তু সাহিত্যের আখ্‌ড়ায় মল্লযুদ্ধটা একেবারে নিষিদ্ধ!

তারপর।—"চলিত কথা সাহিত্যিক ভাষা নহে। তবে কেন এ আলোচনার বিড়ম্বনা? একজন মূর্খ কৃষকের ক্ষেত্রের বিবরণ ও বাগ্মীবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতা যে এক নহে, তাহা কে-না জানে?"

'ভারতী'তে এর জবাবে বলা হইয়াছিল—"যাঁহারা চল্‌তি ভাষা চালাইতে চান, তাঁহারা "মূর্খ কৃষকে"র ভাষা অবলম্বন করেন না। তবে চাষার ভাষাতেও তাঁহারা লিখিতেন বটে,—যদি তাহা বিজ্ঞান-সম্মত হইত,—যদি তাহাতে আর্ট থাকিত, সঙ্গতি থাকিত, সর্ব্ববিধ ভাব-প্রকাশের বাধা না ঘটিত। চাষার ভাষা অশিক্ষিতের শৃঙ্খলাহীন ভাষা,—সেইজন্যই তাহা অচল। কিন্তু প্রতিভা থাকিলে চাষার ভাষা হইতেও শ্রেষ্ঠ কবিত্ব সৃষ্টি হইতে পারে,—এর প্রমাণ কৃষক-কবি বারণ্‌স্‌। তাঁহার ভাষা চাষার ভাষা হইলেও তাঁহাকে চাষাড়ে বলিয়া কেহ নাক বাঁকান না।"

এই ক-লাইনে যে কথার জবাব দেওয়া হইয়াছে, বৃন্দাবনবাবু সেদিক না মাড়াইয়া ধাঁ করিয়া আর এক নূতন কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। এইতেই বেশ বোঝা যায় যে, 'ভারতী'র অবাধ্য লেখক তাঁর কথা শুনিয়া 'হ্যাঁ, তা বটেইত, তা বটেই ত' বলেন নাই বলিয়া তাঁর অবস্থাটা ঠিক তেমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাঁহার প্রিয় সাধুভাষায় যাকে বলা যায়, "ক্রোধপাবকে দগ্ধীভূত হইয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞানপরিশূন্য অতীব ভয়াবহ এবং শোচনীয় অবস্থা!"—যথা—'ভারতী'র উত্তরে বৃন্দাবনবাবু বলিতেছেন—"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সব ভাষা কি Standard হইয়াছে?"

এখানে আদর্শের কথা কি আছে? "ভারতী"তেও সে কথা তোলা হয় নাই। যে ভাষায় ভাল কবিত্ব থাকে, যাতে বিজ্ঞান, আর্ট, সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা থাকে, তা চাষার ভাষা হইলেও সভ্যসমাজে অনায়াসে চলিয়া যায়। লেখক বারবার "শুদ্ধ ভাষার সাত্ত্বিকগুণে"র বড়াই এবং "ইতর ভাষার" নিন্দা করিয়াছেন বলিয়াই দেখান হইয়াছে যে, প্রতিভার স্পর্শে চাষার ভাষাও সাত্ত্বিকগুণ পাইয়া ভদ্রের কাছে সভ্যবেশেই দাঁড়াইতে পারে। তা নহিলে চাষার ভাষা যে চলিতে পারে না, সেটা ত স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

আর এক কথা। আদর্শ আদর্শ করিতেছেন বটে, কিন্তু দুনিয়ায় কোন্ ভাষা বা কোন্ বস্তুর আদর্শ বরাবর বজায় আছে? অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকান্, দেখিবেন,

শত শত যুগের শত শত আদর্শ ধূলায় ময়লা হইয়া পিছনের পথে অনাদরে পড়িয়া আছে। আজ কে তাদের আদর করিয়া তুলিয়া নেয়,—তারা যে আজ কাল স্রোতে বাসি ফুলমালা! যাক্ সে কথা, এখন আসল কথাই হোক্! চাষার ভাব বার্ণ্‌স্ চাষার কথায়, মেঠো সুরে, চাষার গানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। চাষার গানে তিনি যদি চাষার ভাষা না দিতেন, তবে কি সে সুর কিছুতেই জমিতে পারিত? না, তা পারিত না। ধনীর বাগানে কাননের স্বভাবশোভা কোথায়? বার্ণ্‌স্ যে রাজ্যের কবি, সেই রাজ্যের হিসাবে তাঁর ভাষা আদর্শ ভাষা! সে রাজ্যে আর তেমন প্রতিভার উদয় হয় নাই বলিয়াই তাঁর আদর্শ ভাষা আর কেউ নেয় না। কিন্তু এখনও বার্ণ্‌সের কাব্য না পড়িলে কারুর ইংরেজী কাব্য-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আর, টেনিসন, মিল্‌টন, ও বাইরণের সঙ্গে বার্ণ্‌সের তুলনা যে কেউ করে না, এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, এক রাজ্যের কবির সঙ্গে অন্য রাজ্যের কবির Comparative method-এ সমালোচনা করা একটা মস্তবড় আহাম্মুকী। একালে সমস্ত বড় সমালোচকের এই এক মত।

বৃন্দাবনবাবু মূলপ্রবন্ধে চল্‌তি ভাষাকে শিশুর ভাষার সামিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। "ভারতী"তে তাই বলা হয়, "এটা ছেলেমানুষী কথা।" কেন না, চলিত ভাষায় লিখিলেও সাহিত্যে কস্মিন্‌কালেও বিজ্ঞ বয়স্কেরা শিশুর আধ-আধ এবং এলমেল ভাষায় ভাবপ্রকাশ করেন না; সুতরাং চল্‌তি ভাষার সঙ্গে যিনি শিশুর ভাষার তুলনা করেন, তাঁর ভাষাজ্ঞানের গোড়াতেই গলদ!

কিন্তু প্রতিবাদের সময় বেগতিক দেখিয়া বৃন্দাবনবাবু আবার শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা মূল-প্রবন্ধের যে অংশ তুলিতেছি, সেটি দেখিলেই সকলে বুঝিবেন, এখানে চল্‌তি ভাষাকেই শিশুর ভাষা বলা হইয়াছে কি না?

"প্রাকৃত ভাষা বা চলিত কথা যে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষমতা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তার প্রমাণের অবধি নাই। স্নান বলিতে পারে নাই বলিয়াই ত সিনান বা চান বলা হইয়াছে। আমি প্রাকৃতের তথ্যানুসন্ধানে শিশুর অসম্পূর্ণ ভাষা পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি, তাহাতেও প্রাকৃতের নিয়মাদি খাটে। শিশুর কথা মিষ্ট হইলেও, বিজ্ঞের কথার সঙ্গে উচ্চারণ পাইবে না। কোন্ মূর্খ শিশুর কথার অনুসরণ করিতে যায়? পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও সেই ভেদ। অর্থাৎ এককথায়, প্রাকৃত মেয়েলী ধরণের। শিশুর কথা মিষ্ট হইলেও অনুকরণীয় নহে, এক্ষেত্রেও তাহা অবশ্য অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলা যায়।"

চলিত কথাকে এখানে যে সুধুই শিশুর কথা বলা হইয়াছে, তা-নয়; বৃন্দাবনবাবু বলেন, তাহা মেয়েলী ধরণেরও বটে! আমাদের নাটকাদির ভাষা চল্‌তি বা প্রাকৃত। কিন্তু যে ভাষায় গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি এদেশে মরাগাঙ্গের শুকনো খাতে পৌরুষ ও বীরত্বের নূতন জোয়ার আনিয়াছেন, যে ভাষায় তাঁরা মেবারের প্রতাপ ও দুর্গাদাস, বাঙ্গলার সিরাজ ও মীরকাশিম ও প্রতাপাদিত্য, দক্ষিণের ছত্রপতি শিবাজীর সিংহনাদ জাগ্রৎ করিয়াছিলেন, যে ভাষায় তাঁরা বাঙ্গালীর ঘুমন্ত প্রাণকে স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন,—আপনারা বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, সে ভাষা চল্‌তি বলিয়া কি শিশুর ভাষা এবং মেয়েলী ধরণের? চল্‌তি ভাষার বিরুদ্ধে আর-একটি মস্ত নালিশ আছে। কলিকাতার চল্‌তি ভাষা নাকি বাঙ্গলার অন্য অন্য জায়গার লোকে বুঝিতে পারে না! বেশ, তাই যদি হয়, তবে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির নাটক যে বাঙ্গলার সকল জেলায় সকল দিকে অভিনীত হইতেছে, সে-সকল নাটকের ভাষা কি কেউ না বুঝিয়াও অভিনয় দেখিতেছে? চল্‌তি ভাষা চলে না, এটা হচ্ছে ভূয়ো কথা। হইতে পারে, আপনাদের মতে চল্‌তি ভাষা শুদ্ধ নয়,—তা-বলিয়া এর স্রোতও রুদ্ধ নয়। এর খরস্রোত যে গভীর কল্লোল তুলিতে পারে, সে কল্লোল-ধ্বনি বাঙ্গালীরই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি এবং তার টানের মুখে পড়িলে,—আমাদের ধাতে যা কৃত্রিম, সেই সমাসে-ভরা, দুরূহ শব্দের ঘেরাটোপ্-পরা এবং পণ্ডিতের হাতে-গড়া "সাহিত্যিক ভাষা" হাজার জোর থাকিলেও ঐরাবতের মতই কোথায় কোন্-অকূলে ভাসিয়া যাইবে!

বৃন্দাবন-বাবু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় এবং আরও কয়েকজনকে মুরুব্বি ধরিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী-মহাশয় যে অ-কথ্য ভাষাকে একেবারেই

আস্কারা দেন না, এ তথ্য অন্ততঃ তাঁহার অনুগত ভক্তের পক্ষেও জানা উচিত ছিল।

শাস্ত্রী-মহাশয় কথায় ও কাজে চল্‌তি ভাষারই পক্ষপাতী। এবং তাঁহার যে মত, সেইরকম কাজ হইলে সাধুভাষার মুখোজ্জল ত হইবেই না, বরঞ্চ সে ভাষার আশা-ভরসা একদম্ ফরসা হইয়া যাইবে। নজির দেখুন :—

"সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেকদূর। এখন বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। একদল লোক আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁট্‌কাইয়া উঠেন; বলেন, 'ওটা ইতুরে কথা।'—আমরা বলি 'ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল', তাঁহারা বলেন 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল'। এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও। যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই।"

দেখা যাইতেছে, বৃন্দাবন-বাবু যে ভাষাকে "ইতরভাষা" (ভারতবর্ষ, ৯৪১ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, শাস্ত্রী-মহাশয় সেই ভাষাই চালাইতে চান! সুধু চালাইতে চান না, তথাকথিত 'ইতরভাষা'তেই তিনি লিখিয়া থাকেন। আসল কথা, চল্‌তি কি অচল্‌তি,—কোন ভাষাই ইতর নয়। শব্দের প্রয়োগে ব্যভিচার ঘটিলে কোন ভাষাই ভদ্র হইতে পারে না। জীবনেই হোক্, সাহিত্যেই হোক্—শিষ্ট ভাব পাই মিষ্ট ব্যবহারে।

বৃন্দাবন-বাবুর রকম-সকম দেখিয়া সন্দেহ হয়, তিনি বোধ হয় চল্‌তি ভাষা কাকে বলে, সেটি ঠিক জানেন না। জানিলে, শাস্ত্রী-মহাশয়কে মুরুব্বি ধরিয়া নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িতেন না। অতএব, এখানে চল্‌তি ভাষার উপরে দু চারটি কথা বলা দরকার মনে করিতেছি।

সকলের আগে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বাঙ্গলার নূতন গদ্যসাহিত্য যে ভাষায় লিখিতেন, সে ছিল সংস্কৃতের প্রেতিনী,—নামে বঙ্গভাষা। কিন্তু তখনকার কালেও বিদেশী হাণ্টার ও কেরী-সাহেবের ভাষা অনেকটা আমাদের স্বদেশী চল্‌তি ভাষারই গা-ঘেঁষা ছিল,—তাতে লম্বা-লম্বা সমাস, অলঙ্কার ও বিশেষণের বিষম উৎপাত বড়-বেশী থাকিত না। তারপর বিদ্যাসাগর-মহাশয়-প্রমুখ সেকালের লিখিয়েরা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতেন। তারপর আসিলেন, টেকচাঁদ ও হুতোম। এঁরা লিখিতেন, একেবারে কথ্য ভাষায়। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া ভাষা-সংস্কারে হাত দিলেন। বঙ্কিম যে ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তা পুরোপুরি চল্‌তি বাঙ্গলাও নয়, সাধু বাঙ্গলাও নয়—অর্থাৎ এ-দুয়েরই মাঝামাঝি। তারপর সেই ভাষাতেই লেখা-পড়া চলে এবং এখনও চলিতেছে। ১৩০৮ সালে বা ঐ-সময়েরই কিছু আগে-পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় বাঙ্গলাকে একেবারে খাঁটি বাঙ্গালা করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁরা যা বলেন, মোটামুটি তার মানে এই—"সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাঙ্গলায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিতেছে, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ একবারেই ছাড়িয়া দিবার যো নাই। আমরা একথা স্বীকার করি না।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)—আমরা যেখানে চল্‌তি বাঙ্গলায় লিখিতে পারিব, সেখানে সংস্কৃতকে একেবারে আমোল দিব না। যেখানে চল্‌তি ভাষায় কুলাইবে না, সেখানে সংস্কৃত বলুন, পারসি বলুন বা ইংরেজীই বলুন—যে-কোন ভাষা হইতেই সকলে বোঝে এমন শব্দ লইয়া কাজ সারিব।

ইহাই হইল চল্‌তি ভাষা। এ ভাষারও এখন দুই চেহারা। একদল লেখেন লিখিত বাঙ্গলার ক্রিয়াপদগুলি ঠিক্‌ঠাক রাখিয়া; আর-একদল লেখেন 'হইতেছে' স্থলে 'হচ্ছে', 'খাইতেছে' স্থলে 'খাচ্ছে',—প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ দু-রকমেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁর লেখায় কথিত ভাষার দুই রূপ পাওয়া যায় বলিয়া, তিনি যে চল্‌তি ভাষায় লেখেন না,—এ-রকম সন্দেহ করা ঠিক নয়। কেন না, 'হচ্ছে' আর 'হইতেছে'—এ দুই-ই বাঙ্গলা। যদি কেউ লেখার আগাগোড়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া কেবল ক্রিয়ার বেলায় 'পেলুম-খেলুম' লেখেন, তবে সে ভাষা যেমন চল্‌তি ভাষা হয় না, তেমনি বরাবর চল্‌তি শব্দকে প্রাধান্য দিয় 'পাইয়াছি-খাইয়াছি' লিখিলেও সে ভাষা চল্‌তিই হইবে—বৃন্দাবন-বাবুর দল 'না-না' বলিয়া হাজার ঘাড় নাড়িলেও তাকে কেউ 'সাধুভাষা' বলিবে না। এইহিসাবে রবীন্দ্রনাথ

দু-রকমে লিখিলেও তাহা চল্‌তি বাঙ্গলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রী-মহাশয় এবং প্রমথনাথ চৌধুরী-মহাশয়ও তাই দু-দলের হইলেও আসলে দু-মতের লোক নন। তাঁদের উদ্দেশ্য এক,—পথই খালি আলাদা।

বৃন্দাবন-বাবুর আর দু-একটা ভ্রম দেখাইয়া আমরা বিদায় লইব। তিনি বলেন, "চলিত কথায় উৎকৃষ্ট ধ্বনি হইতে পারে না।" 'ভারতী'তে তার জবাবে এই কথা লেখা হয়, "রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্য-পুস্তকে এবং 'ঘরে-বাইরে'—নামক উপন্যাসে কি ধ্বনির অভাব আছে?"—বৃন্দাবন-বাবু এ-কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং "গীতাঞ্জলি' ভাষা-হিসাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে"—প্রভৃতি ছেলেমানুষের মত উড়ো কথায় কাজ সারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে খালি জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, ঐ বইগুলিতে ধ্বনির অভাব আছে কি না? তার জবাব দিন।

সুধু এই বইগুলি বলিয়া নয়—রবীন্দ্রনাথের "বধূ", "সোনার তরী" ও "সোনার বাংলা" প্রভৃতি মধ্য ও শেষ বয়সের অসংখ্য বিখ্যাত কবিতায়, দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি" প্রভৃতি অনেক সঙ্গীত ও কবিতায়ও কি ধ্বনির অভাব আছে? শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সরল লৌকিক (অর্থাৎ চল্‌তি) ভাষাতেই যথাসাধ্য লিখিতেন। উহা প্রাদেশিকত্ব-বর্জ্জিতও হয় নাই।"—বৃন্দাবন-বাবু বলুন, প্রাদেশিক ও চল্‌তি বলিয়া এঁদের ভাষাতেও কি ধ্বনির অভাব আছে? —"চলিত কথায় উৎকৃষ্ট ধ্বনি হইতে পারে না"—এ এমন কাঁচাকথা যে, প্রতিবাদের অযোগ্য। এতবড় ভুলটাকেও কোমর বাঁধিয়া দাঁড় করান, এমন লোকও আছেন!

আর এক-কথা। "গীতাঞ্জলি ভাষা-হিসাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে—ইহা বহু সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের মত।" এই 'সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরা' কোথায় থাকেন, কি নাম ধরেন? এমন কথাই বা তাঁরা কবে, কোথায়, কোন্ কাগজে বলিয়াছেন? বাঙ্গলা মাসিকের খবর কিছু-কিছু রাখিলেও এঁদের খবর আমরা ত কোথাও পাই নাই! অশ্বডিম্বের মধ্যে, না বৃন্দাবন-বাবুর মানস-লোকে, ইঁহারা পরমানন্দে বাস করেন?—আর যদি-ই-বা কোন ভুঁইফোঁড় ও শিশু সমালোচক গায়ের জোরে প্রচার করেন যে 'সূর্য্য উঠিয়াছে পশ্চিমে',—তবেই কি বৃন্দাবন-বাবু ভাবেন, 'সব-শিয়ালের সঙ্গে এক রা' হইয়া আমরাও বলিব,—'বাহবা সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টি'? সাহিত্য কি খোকার হাতের বালির ঘর যে, সে ভাঙ্গিলেই ভাঙ্গিবে—রাখিলেই থাকিবে?

"বঙ্কিম-বাবু কাঁঠালপাড়ার ভাষায়** গ্রন্থ লিখেন নাই, বা অন্যের প্রতি আজ্ঞাপ্রচারও করেন নাই।"—এ কথা কি ঠিক? লেখক কি বঙ্কিমের বই পড়িয়াছেন? এ যে ডাহা রটাকথা!—কাঁঠালপাড়া ত কলিকাতা-ছাড়া নয়,—কলিকাতার প্রভাবের বাহিরেও নয়। কলিকাতা রাজধানী। বঙ্কিম রাজধানীরই উপযোগী এক বিশেষ ভাষা নিজে তৈয়ারী করিয়া, সেই ভাষা আপনি লইয়াছেন এবং সকল বাঙ্গালীকেও লওয়াইয়াছেন। তাঁহার লেখায় এর এত প্রমাণ আছে যে, এখানে তা না তুলিলেও চলে। বঙ্কিমচন্দ্র আজ বাঁচিয়া থাকিলে কোন্ ভাষায় লিখিতেন, তা জানি না; কিন্তু তাঁহার প্রথমবয়সের "দুর্গেশনন্দিনী" হইতে শেষ বয়সের ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে পর্য্যন্ত ভাষার ক্রমবিকাশের দিকে চাহিলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি, বঙ্কিমের ভাষা ক্রমেই সংস্কৃত প্রভাব ছাড়িয়া চল্‌তি ভাষার কাছ-ঘেঁষিয়া আসিতেছে। ভাষা তাহার ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক ধারায় লিখিতের অচলতা ছাড়িয়া চলিতের সচলতায় আসিয়া পড়িতেছে—এ 'জলতরঙ্গ রোধিবে কে'? সারা বাঙ্গলাদেশের ভাষা অনেকদিন থেকেই রাজধানী কলিকাতার আদর্শেই গড়িয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে। প্রথমে পণ্ডিতেরা ভাষার আকার দেন। তারপর বঙ্কিম তাকে ভাঙ্গিয়া আবার গড়েন; এখন সেই আকারে আর একটু নূতনত্ব দিবার চেষ্টা হইতেছে এবং প্রতিভা-লক্ষ্মীও এখনও রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। সুতরাং কলিকাতার আদর্শ সকলকে লইতে হইবেই-হইবে—এ যে প্রতিভার আদেশ!

এতখানি জায়গা জুড়িয়া আমরা যে এত কথা বলিলাম,—এ কথাগুলি সাহিত্যের এমন পুরানো ও গোড়ার কথা যে, লিখিতেও হাত সরে না। লজ্জা এই, প্রকাশ্য কাগজে একজন সাহিত্যসেবীকেও এ-সব কথা আবার বুঝাইতে হইল! কিন্তু এতেও হয়ত ফল ফলিবে না; মধ্যস্থের এই আবেদনও হয়ত বৃন্দাবন-বাবুর কাছে অরণ্যে-রোদনের মত হইবে।—হউক্; কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি যদি আবার প্রতিবাদের আয়োজন করেন, তবে আমাদের আর-কিছু বলিবার নাই; কারণ তর্ক করা যায় তাঁহার সঙ্গেই,—সত্যের দিকে যাঁহার আসক্তি আছে, যুক্তির প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে।

হিমালয়ের অপর পার

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ]

(৩)

তাঙ ও সুঙ আমল

মাৎস্য-ন্যায় নিবারিত হইল। শি-হোয়াংতি এবং হান্-উতির গৌরবযুগ ফিরিয়া আসিল। সমগ্র চীনমণ্ডল অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল।

(১) সুই (suy) বংশ (৫৮৯-৬১৯)। এই বংশের প্রবর্ত্তক 'উতি' অর্থাৎ দিগ্‌বিজয়ী বা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই আমলে চীনে নাকি ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। একমাত্র এই তথ্য হইতেই হিন্দু-প্রভাবের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। এই আমলে দক্ষিণে আনাম ও টংকিন এবং উত্তরপূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত চীনের সেনা প্রেরিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এই আমলে পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণ লুপ্ত-কীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে যত্নবান্। তাঁহাদের মধ্যে শশাঙ্ক অন্যতম। শেষ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জের এক নূতন বংশ ধীরে-ধীরে মাথা তুলিতে সমর্থ হইলেন। হুন-বিজয়ী বর্দ্ধন-বীরের পুত্র হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তে এখন একরাট্ (৬০৬)। দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্দ্ধনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ৬২০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পর হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্ত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেন।

এদিকে আরবে মহম্মদের জন্ম হইয়াছে (৫৭০)। এক্ষণে এই যুগ-প্রবর্ত্তক বীরবর যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতল নূতন করিয়া গড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মুসলমানদিগের দিগ্‌বিজয় শীঘ্রই সুরু হইবে। আর, জাপানে শোতোকুতাইশি (৫৭৩-৬২১) চীনা ও ভারতীয় মাল আমদানি করিতেছেন। জাপানী সভ্যতার জন্ম হইল।

এখন ইয়োরোপে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং ইংলণ্ডেই সাত-সাতটা স্বাধীন রাজ্য। ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, স্কাণ্ডিনাভিয়া ইত্যাদি জনপদে নিত্যনূতন পরিবর্ত্তন, আর মধ্য-ইয়োরোপের বর্ব্বরমণ্ডল ত সকল প্রকার ঝটিকার কেন্দ্র। অধিকন্তু কনষ্টান্টিনোপলের জাষ্টিনিয়ান-স্থাপিত সাম্রাজ্যও এই সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র এশিয়ায়ই সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক বিরাট কাণ্ডের আয়োজন চলিতেছে—ইয়োরোপের এখন ঘোর অমানিশা বা "ডার্ক এজ্"। পূর্ব্বেও কয়েকবার দেখা গিয়াছে যে, এশিয়া ইয়োরোপের আগে-আগে চলে।

(২) তাঙ্ (৬১৮-৯০৫) বংশ

এই বংশের নাম ও বৃত্তান্ত না জানিলে চীনের কথা জানা হইল না। তিন শতাব্দী ধরিয়া এই বংশের রাজত্ব-কাল,—কিন্তু যথার্থ ক্ষমতাবান্ চীনেশ্বরের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর সকল নেপোলিয়ান-বংশেরই এই অবস্থা। দুই পুরুষ বা তিন পুরুষের অধিককাল কোন বংশে নামজাদা লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। একজন নেপোলিয়নের পর দশজন রামা-শ্যামার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই চীনা বিক্রমাদিত্যগণের বংশেও দু-একজনের বেশী বিক্রমাদিত্য জন্মেন নাই। তাঙবংশে একুশ জন সম্রাট্ হন—তাঁহাদের অধিকাংশই দুর্ব্বল ও নগণ্য ছিলেন। অশান্তি এবং অন্তর্ব্বিদ্রোহ ও শত্রুর আক্রমণ চীনে প্রায়ই দেখা দিত। অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রিবর্গ অথবা কর্ম্মচারিগণ কিংবা সেনাপতিরা সম্রাটের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

সর্ব্বপ্রসিদ্ধ তাঙ্ সম্রাটের নাম তাই-চুঙ্ (Tai Tsung)। ৬২৭ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত তাই চুঙের রাজত্ব-কাল। সমগ্র চীন-মণ্ডল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তিনি চীনের বাহিরে একটা "বৃহত্তর চীন" গঠনেরও প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে মধ্যএসিয়া চীনের অধীন

হয়। কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে পারস্য, দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হিমাচল, উত্তরে সাইবিরিয়া এবং পূর্ব্বে মহাসাগর তাই চুঙের সাম্রাজ্য-সীমা। কোরিয়া দখল করিবার জন্য তিনি সেনা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোরিয়া চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

শিহোয়াংতি চীনের আধখানা পাইয়াই চীনেশ্বর হইয়াছিলেন। চীনা-দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আদেশ স্বীকৃত হইত কি না, জানা যায় না। হান-আমলে চীনা দাক্ষিণাত্য বোধ হয় চীনা-আর্য্যাবর্ত্তের সামিল হয়। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান চীনের সকল প্রদেশই মোটের উপর চীন-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, বলা চলিতে পারে। মাৎস্যন্যায়ের যুগে এই জনপদে অনেকগুলি স্বস্বপ্রধান রাষ্ট্র ছিল সত্য, —কিন্তু বর্ত্তমান চীনের কোন অংশই তখন চীনা-সভ্যতার বাহিরে ছিল না। তবে দক্ষিণ অঞ্চলের পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিবাসিগণ পুরাপুরি চীনা হইতে পারে নাই ;—বস্তুতঃ আজও তাহারা সম্পূর্ণ চীনা নয়।

তাই-চুঙের আমলে চীন-মণ্ডল ত ঐক্যবদ্ধ হইলই—অধিকন্তু একটা বৃহত্তর-চীনও গড়িয়া উঠিল। চীন-সাম্রাজ্য বলিলে আমরা চীনমণ্ডলের বহির্ভূত তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়া এই পাঁচ প্রদেশও চীনের সামিল করিয়া থাকি। সেই চীন-সাম্রাজ্য তাই-চুঙের পূর্ব্বে কখনও ছিল না। তাঁহার বাহুবলেই চীন-সাম্রাজ্য প্রথম স্থাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কোরিয়া দখল হইলে, আজকালকার চীন-সাম্রাজ্য সম্বন্ধে পূর্ণ হইল। তাঙ্-আমলের ইহাই প্রথম গৌরব। তাঙ্-যুগের আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। চীনে সভ্যতার ধারা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ব্ব-অঞ্চল পশ্চিমের রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল ; কিন্তু দক্ষিণ-অঞ্চলকে চীনা করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। তাঙ্-যুগে সমুদ্রকূলের কোয়াংটুঙ্ প্রদেশ চীনের অন্তরতম চীনে পরিণত হইল। দক্ষিণের লোকেরা উত্তরের আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসারে জীবন-গঠন করিতে সুরু করিল ; এমন কি তাহারা তাঙ্-সন্তান বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিত।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই-চুঙ্ পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে ভারতে আসেন। তখন তাই-চুঙের রাজ্যকাল আরম্ভ হইয়াছে। ১৬ বৎসর পরে য়ুয়ান্ দেশে ফিরিয়া যান। তখন চীনের নেপোলিয়ান নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কার্য্যে লিপ্ত। য়ুয়ান্ মধ্য-এসিয়ার পথে ভারতে আসিয়াছিলেন,—এই পথেই আবার ফিরিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মধ্য-এসিয়া তখন বৃহত্তর চীনেরই অংশমাত্র,—কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার হিসাবে মধ্য-এসিয়া তখনও বৃহত্তর ভারতের অন্যতম কেন্দ্র।

তাঙ্-আমল ভারতবাসীরও গৌরব-যুগ। মৌর্য্য-ভারত ও গুপ্ত-ভারত আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই চুঙের সম-সাময়িক দুইজন হিন্দু নেপোলিয়ানের কথা য়ুয়ান-চোয়াঙ্ চীনাদিগকে জানাইয়াছিলেন। কারণ তিনি দুইজনেরই রাজ-অতিথি ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৪৭) এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৫৫) ভারতের তাই-চুঙ্। এসিয়ায় একসঙ্গে তিনজন নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

তাহার পর তাই-চুঙের বংশধরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—ভারতবর্ষে নবনব বংশে নবনব নেপোলিয়ানের জন্ম হইতেছিল। এই সময়ে ভারতীয় সমাজের পরদায়-পরদায় হিন্দুপ্রভাবান্বিত তাতার জাতির অস্থিমজ্জা মিশ্রিত ছিল। কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশ ৮১৬ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের সন্তানগণ আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঙ্-যুগের মধ্যে সম্রাট্ মিহিরভোজ (৮৪০-৯০) গুর্জ্জর-বংশের তাই-চুঙ্ পদবাচ্য হন। আর প্রাচ্য-ভারতের বরেন্দ্র-মণ্ডল হইতে বাঙ্গালী তাই চুঙ্ বা নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই নেপোলিয়ান বংশের নাম পালবংশ (৭৩০-১১৭৫)। তাঙ্ আমলের মধ্যে ধর্ম্মপাল এবং দেবপাল ৭৮০ হইতে ৮৯২ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে বঙ্গ-মণ্ডল স্থাপন করিয়াছিলেন। কবি সুব্রত চক্রবর্ত্তীর বচন উদ্ধৃত করিয়া সেই 'বৃহত্তর বঙ্গের' পরিচয় দিতেছি :—

"অবন্তি ভোজ গুর্জ্জর বীরবীর্য্যে যাহার নমিতশির,
মাৎস্যন্যায়ের কণ্টক যেবা উপাড়িল বলে ধরিত্রীর ;
কান্যকুব্জে খণ্ডিতারাতি বসালে যে পুনঃ সিংহাসন ;

কাশ্মীরে রামস্বামীর ধ্বংস করেছে যাহার পুত্রগণ,
হৈহয় আর রাঠোর ধন্য কন্যা যাহারে করিয়া দান ;
সে বীরমাতার"—

প্রভাব মণ্ডলে হিন্দুস্থানের নরনারীগণ চীনাতাঙ্-যুগে জীবনযাপন করিত। জাপানে তাই-চুঙের আমলে নানা নগরীতে চীনা ও হিন্দুসভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। (৭১০-৯৪)। পরবর্ত্তীকালে জাপানের রাষ্ট্রকেন্দ্র কিয়োতো নগরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানেও জাপানীরা ভারতীয় ও কন্‌ফিউশিয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিল। জাপান প্রথম হইতেই ভারত-চীনের শিষ্য। দুই দেশের সকল উৎকর্ষই জাপানী সমাজে পুঞ্জীকৃত। ক্ষুদ্র জাপানে তাঙ-যুগে রাষ্ট্রীয়-গৌরব বিশেষ কিছু নাই। জমিদারেরা লাঠালাঠি করিতেছে— মিকাডোর ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে জাপান এসিয়ার "জের" মাত্র।

এদিকে পশ্চিম-এসিয়ার মহম্মদ দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়। তখন তাই-চুঙ্, হর্ষবর্দ্ধন এবং পুলকেশীর গৌরব বিন্দুমাত্র কমিল না। বরং সত্তর আশী বৎসরের ভিতর আরব, পারস্য, সীরিয়া, মিশর, আফ্রিকার উত্তর কূল এবং স্পেন পর্য্যন্ত মহম্মদের নাম প্রচারিত হইল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই (৭১২) এক বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য এশিয়াবাসীর কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং ইয়োরোপীয়ানের আতঙ্কস্থল হইয়া পড়িল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে একটা ভাঙ্গিয়া তিনটা স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র দাঁড়াইয়া গেল। এসিয়ার মুসলমান-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইল বাগ্‌দাদ (৭৪৯)। ইয়োরোপে মুসলমান-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইল কর্ডোভা (৭৫৬)। আফ্রিকায় মুসলমানের কেন্দ্র হইল কাইরো (৭৮৫)। মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ "খলিফা" নামে পরিচিত। অষ্টমশতাব্দীর প্রথমভাগে হারুণ আল্‌রশিদ বাগ্‌দাদের জগদ্বিখ্যাত খলিফা। তাঁহাকে মুসলমানদিগের বিক্রমাদিত্য বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহার সমসাময়িক ভারত-বীরের নাম বঙ্গের ধর্ম্মপাল।

তাঙ্-যুগের মধ্যে (৬১৮-৯০৫) মুসলমানেরা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত হাম্‌লা চালাইয়াছেন। মুসলমান জাহাজ ক্যান্টন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। চীনের বন্দরে-বন্দরে মস্‌জিদ মাথা তুলিয়াছে। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টনে প্রথম মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। উহা আজও দণ্ডায়মান। প্রসিদ্ধ চীন সহরে মুসলমান-পাড়া বেশ জমকাল ভাবে দেখা দিয়াছে। ভারত-মহাসাগরের বাণিজ্যে মুসলমান জাতি এক্ষণে বোধ হয় অগ্রণী। এদিকে মধ্যএসিয়ার হিন্দুমণ্ডলও লুপ্ত হইয়াছে—স্থলপথে চীনের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গেল। চীনের রাজধানীতে অসংখ্য খৃষ্টান এবং জারাথুষ্ট্রাপন্থী পার্শী ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সমগ্র এশিয়ায় ভূমিকম্প উৎপন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে ইয়োরোপে ত ধূমকেতু উদিতই হইয়াছে।

ইয়োরোপে এতদিন অমানিশা ছিল; সর্ব্বত্রই মাৎস্য-ন্যায় অথবা বর্ব্বরগণের আক্রমণ। তাহার উপর মুসলমান উৎপাত আসিয়া জুটিল। ইয়োরোপের সীমা কমিতে থাকিল—মুসলমান প্রভাবে ইয়োরোপের বুকের ভিতর এসিয়ার সীমা বাড়িতে লাগিল।

কন্‌ষ্টান্টিনোপলের সম্রাটগণ প্রথমেই মুসলমানদিগের ধাক্কা খাইতে বাধ্য হইলেন—একে একে পরাজয়-স্বীকার করিতে থাকিলেন। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা কন্‌ষ্টান্টিনোপল দখল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে উদ্যম সফল হয় নাই। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সাত শতাব্দীরও অধিক পরে রুম মুসলমানের দখলে আসিয়াছে।

অপর দিকে খাঁটি ইয়োরোপে একমাত্র ফরাসীরাজ নামজাদা হইয়াছেন। তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত শার্লামান (৭৬৮-৮১৪)। ইনি হারুণ আল্‌রসিদ এবং ধর্ম্মপালের সমসাময়িক। ইঁহাকে নেপোলিয়ন, তাই-চুঙ্ বা বিক্রমাদিত্যের গৌরব প্রদান করা হইয়া থাকে। শার্ল্যম্যানের বড় সাধ, তিনি একবার ট্রাজানের সিংহাসনে বসিবেন—একবার "রোমেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" রূপে অভিনন্দিত হইবেন। অতবড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তবে আজকালকার গোটা ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজর্ল্যাণ্ড, গোটা জার্ম্মানি এবং আধখানা ইতালী তাঁহার বশে আসিয়াছিল। ইহাকেই তিনি ফরাসী 'রোমান সাম্রাজ্য' বিবেচনা করিতেন। তাঁহাকে মুসলমানের সঙ্গে লড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেই ইয়োরোপের পোড়া কপালে আবার মাৎস্যন্যায় আসিয়া জুটিল। তাঙ্ আমলের শেষভাগে ইংলাণ্ডে ঐক্য সবে-মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) মাৎস্যন্যায়ের দ্বিতীয় যুগে (৯০৭-৬০)
বংশ পঞ্চক

চীনে এখন আর একবার "ষ্টেট্ অব্ নেচার" বা অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় উপস্থিত। তাঙ-যুগের পরেই বহুসংখ্যক খণ্ড-চীন। এই যুগে তাতারেরা বারবার উত্তর-চীনে দৌরাত্ম্য করিতেছে। তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে সম্রাট্‌গণ অসমর্থ। সম্রাটেরা অতি দুর্ব্বল; সেনাপতিগণের অঙ্গুলিসঙ্কেতে উঠিতেছেন; বসিতেছেন। আর সাম্রাজ্যের এক্তিয়ার মাত্র ইয়াংসির উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার দক্ষিণের নবাবেরা রাজধানীতে কোন সংবাদ পাঠান না। অর্দ্ধশতাব্দীকালের মধ্যে নামে মাত্র চীন-সম্রাট হইবার জন্যই পাঁচটা বংশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলেন।

(ক) অর্ব্বাচীন-লিয়াঙ্ বংশ (৯০৭-২৩)।

(খ) অর্ব্বাচীন-তাঙ্ বংশ (৯২৩-৩৬)।

(গ) অর্ব্বাচীন-চীন বংশ (৯৩৬-৪৬)।

এই বংশের প্রবর্ত্তক অর্ব্বাচীন-তাঙ্ বংশ ধ্বংস করিবার সময়ে তাতারগণের সাহায্য লইয়াছিলেন। সাহায্যের মূল্য-স্বরূপ তিনি রাজা হইবার পর তাতারদিগকে রাজ্যের কিয়দংশ দান করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু তাতারেরা তাঁহার নিকট কিছু বার্ষিক করও আদায় করে। এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া, চীনা-সমাজে তিনি নিকৃষ্ট জঘন্য নরপতিরূপে আজও নিন্দিত হইয়া থাকেন।

(ঘ) অর্ব্বাচীন-হান্ বংশ (৯৪৭-৫১)

(ঙ) অর্ব্বাচীন-চাও বংশ (৯৫১-৬০)

এই যুগে আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম পাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাতার বা মঙ্গোলিয় তিব্বতী জাতি বরেন্দ্র দখল করিয়াছে। গুর্জ্জর-প্রতিহার-বংশের গৌরব কমিতেছে। দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন। পশ্চিম-প্রান্তে মুসলমান-বিজয় সুরু হইয়াছে। ফলতঃ ভারত-বর্ষেও দশমশতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মাৎস্যন্যায়েরই যুগ।

এদিকে মুসলমান কেন্দ্রের সর্ব্বত্রই ভাঙ্গন লাগিয়াছে। একরাষ্ট্রের স্থানে চারিরাষ্ট্র দেখা দিতেছে। কিন্তু স্পেনের মুসলমান খলিফা এক্ষণে খুব প্রবল। তাঁহার নাম তৃতীয় আবদুল রহমাণ (৯১২-৬১)। খাস ইয়োরোপে এই সময়ে একজন জার্ম্মাণ নরপতি ফরাসী শার্লামানের দৃষ্টান্তে একটা সাম্রাজ্য গড়িতেছেন। তাঁহার নাম প্রথম অটো (Othor I)। অটোর (৯৩৬-৭৩) সাম্রাজ্যের নাম জার্ম্মাণ-রোমাণ সাম্রাজ্য। ট্রাজানের ত্রিভুবনব্যাপী সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিবার সাধ সকলেরই! ভারতীয় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র কাহিনী মনে পড়ে।

(৪) সুঙ্-বংশ (৯৬০-১১৭৯)

তাঙ্-বংশের সমর-গৌরব ও রাষ্ট্র-গৌরব ছিল। কিন্তু সুঙ্-বংশের চীন-গৌরব প্রধানতঃ সাহিত্যে, দর্শনে ও শিল্পে। সুঙ্-বংশে নেপোলিয়ান বা নেপোলিয়ান-কল্প কোন সম্রাট্ জন্মেন নাই। বস্তুতঃ চীন সভ্যতার চরম বিকাশ চীনাদের অতি দুঃসময়ে দেখা দিয়াছিল। চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোপ এবং চীনপ্রতিভার পূর্ণ পরিণতি সমসাময়িক!

(ক) অখণ্ড চীনে সুঙ্-রাজত্ব (৯৬০-১১২৭)।

দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ব্বত্র শান্তি এবং শৃঙ্খলা ছিল। কিন্তু উত্তরে তাতার-উপদ্রবে সম্রাটেরা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য চীনেশ্বরগণ নিন্দাজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিলেন এবং বার্ষিক কর দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সময়ে তাতার-জাতীয় দুই বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। এক বংশ মোগল, অপর বংশ মাঞ্চু। মোগল তাতারদিগের সঙ্গে চীনাদের পরিচয় আজ নূতন নয়। মাঞ্চুরাই চীনের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন উৎপাত দাঁড়াইল। একজন সম্রাট্ মাঞ্চুদিগকে মোগলের বিরুদ্ধে লড়াইবার ফন্দি করিলেন। তাহাতে মোগলেরা হারিল বটে—কিন্তু মাঞ্চু-তাতারেরা চীন-সম্রাটকে পাইয়া বসিল। চীন-সম্রাট্ সত্যসত্যই "catch a Tartar" বা "হাম্ কমলি ছোড় দিয়া লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়তা" অবস্থায় পড়িলেন। ভারতের রাণা সংগ্রাম-সিংহও একবার এইরূপে তাতার-প্রেমে মজিয়াছিলেন। তাতারের পাল্লায় পড়িয়া উদ্ধার পাওয়া কঠিন। চীনের "আর্য্যাবর্ত্ত" মাঞ্চুদের দখলে আসিল। ১১২৭ হইতে ১২৪১ পর্য্যন্ত মাঞ্চুরা কর্ত্তৃত্ব করিলেন। সুঙেরা ইয়াংসির দক্ষিণে বসবাস করিতে বাধ্য হইলেন।

এই আমলের দুইজন চীনা-রাষ্ট্রবীর সুপ্রসিদ্ধ। এক-জনের নাম ওয়াঙ আন্ শি (১০২১-১০৮৬)। অপর জনের নাম ছি-মা-কিয়াঙ্ (১০১৯-৮৬)। এই দুইজনে সর্ব্বদা আড়াআড়ি চলিত। ছি (Sze) পুরাতন-পন্থী

ছিলেন—আর ওয়াঙ্ (Wang) ছিলেন নব্যতন্ত্রের প্রবর্ত্তক। ছি মান্ধাতার আমলের কন্‌ফিউশিয়-সংহিতার সূত্র আওড়াইয়া রাষ্ট্র-শাসন করিতে চাহিলেন। ওয়াঙ্ একদম নূতন প্রণালী চালাইতে চাহিলেন। ওয়াঙ্ কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার মত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ছি একজন সুকবি ছিলেন—তাঁহার প্রণীত ইতিহাসগ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ।

এই সময়ে প্রাচ্য-ভারতে প্রথম মহীপাল (৯৮০-১০২৬) দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে পাহাড়ী কাম্বোজ বা তাতারবংশ ধ্বংস করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। প্রাচ্য-ভারতের স্বাধীনতা টিকিয়া গেল—কিন্তু ইতিমধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ মুসলমানের অধিকারে আসিয়াছে। এই যুগে দাক্ষিণাত্যের চোল-বংশীয় রাজগণ (৯৮৫-১০১৮) এবং রাজেন্দ্র (১০১৮-৩৫) ভারতের নেপোলিয়ান-কল্প সম্রাট্। তাঁহাদিগের নৌশক্তি অতিশয় প্রবল ছিল।

দক্ষিণে চোল-সাম্রাজ্য ৯০০ হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকিল। এদিকে প্রাচ্য-ভারতে পালের গৌরব লুপ্ত করিয়া সেনবংশ মাথা তুলিল। মাঞ্চুরা যখন সুঙ্-সম্রাট্‌গণকে ইয়াংসির দক্ষিণ পলাইতে বাধ্য করে, তখন রণকুশল বিজয়সেনের (১০৬০-১১০৮) বঙ্গসাম্রাজ্যে পরাক্রান্ত লক্ষ্মণসেন উপবিষ্ট (১১২০-৭০)। বিজয়সেন বাঙ্গালীর শেষ সমুদ্রগুপ্ত, আর লক্ষ্মণসেন শেষ বিক্রমাদিত্য।

এই যুগে মুসলমান জাতির বিজয়গৌরব কিছুমাত্র কমে নাই—বরং এশিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু বহুসংখ্যক স্ব-স্বপ্রধান রাষ্ট্র মুসলমান-মণ্ডলে উৎপন্ন হইতেছে। মুসলমানেরা মাৎস্যন্যায়ের কুফলে ভুগিতেছেন। ইয়োরোপের সকল জাতীয় খৃষ্টান মিলিত হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে একবার ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হইলেন। (১০৯৫) তাহাতে খৃষ্টানদিগের জয় হইল।

এদিকে ইংলণ্ড ফরাসী নরমানজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে (১০৬৬)। জার্ম্মাণ—"রোমাণ" সাম্রাজ্য চলিতেছে। ইতালীর লোকেরা জার্ম্মাণ-সম্রাটগণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। রোমের ধর্ম্মযাজক পোপের সঙ্গে জার্ম্মাণ-সম্রাটের কলহ উপস্থিত হইয়াছে।

ফলতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় স্থানেই স্বাধীনতা নাই—এবং চিরস্মরণীয় নেপোলিয়ান-কল্প ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। দুনিয়া ভরিয়াই মাৎস্যন্যায় চলিতেছে বলিলেও দোষ হইবে না।

(খ) দক্ষিণ সুঙ (১১২৭-১১৭৯)।

সুঙরা প্রথমে নান্‌কিঙে রাজধানী প্রবর্ত্তন করেন, পরে আরও দক্ষিণে হাঙ্‌চাওয়ে রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। এদিকে চীনের আর্য্যাবর্ত্তে মাঞ্চুরা বারবার মোগল আক্রমণ ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের রাজধানী বর্ত্তমান পিকিঙের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। মোগল-দলপতি চেঙ্গির খাঁ উত্তর চীন বিধ্বস্ত করিলেন। (১২১১-২৭)। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরা মোগল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তাহার পর মোগলেরা চীনা-দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিল। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে কুবলা খাঁ মোগল-দলপতি হন। সুঙেরা কোনমতেই মোগলের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। হঠিতে-হঠিতে সাম্রাজ্যের দক্ষিণতম সীমায় উপস্থিত হইলেন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপে সুঙ্‌বীরগণের শেষ যুদ্ধ হয়। স্বদেশরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সেনাপতি লু সিন-ফু (Lu Sin fu) স্বকীয় পুত্রকলত্রের আত্মহত্যায় সাহায্য করিলেন—অবশেষে শিশু-সম্রাট্‌কে কোলে করিয়া সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া মরিলেন।

এই যুগে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের অধীন। দক্ষিণ ভারতে মুসলমান-প্রতাপ অগ্রসর হইতেছে। ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে পোপের সঙ্গে জার্ম্মাণ-সম্রাটের লড়াই (১০৫৬-১২৫৪) প্রধান ঘটনা। তুর্কীরা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটকে বিব্রত করিতেছে। বিলাতে স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের সঙ্গে লড়াই চলিতেছে। এদিকে মোগল বা তাতারবংশের প্রভাবে সমগ্র রুশিয়া কুব্‌লা খাঁর পদানত। বৌদ্ধ মোগল-আমলে চীনেরা পরাধীন—কিন্তু এই সময়ে "বৃহত্তর এশিয়ার" প্রতাপ ইয়োরোপখণ্ডে বিরাজমান।

এতদিন মুসলমানেরা দক্ষিণ দিক হইতে ইয়োরোপের চৌহদ্দি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার বৌদ্ধ-মোগলেরা পূর্ব্বদিক হইতে ইয়োরোপের ভিতর এশিয়ার সীমানা লইয়া গেল। বস্তুতঃ তুর্কীদিগের কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল দখলের (১৪৫৩) পর একশত বৎসর পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়েরা সর্ব্বদা এশিয়াবাসীর ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত।

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সর্ব্বসমেত সাতবার খৃষ্টানেরা মুসলমানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধ বা 'ক্রুজেড্'গুলির বৃত্তান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, ইয়োরোপীয় নরনারী এশিয়াবাসীর আক্রমণ হইতে কোনমতে আত্মরক্ষার জন্য যারপর নাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য এই।

অরণ্য-বিহার

[কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪ঠা মার্চ্চ, ১৯০৩।—এক বৎসর পরে আজ আমরা পুনর্ব্বার শিকারে বাহির হইলাম। হাতী ও গরুর গাড়ীগুলি দুইদিন পূর্ব্বে যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। এবার আমরা আমাদের এই অঞ্চলেই শিকার করিব, স্থির হইয়াছিল।

আমরা যে স্থানে শিকার করিতে যাইতেছি—সেখানে দুইদিক দিয়া যাওয়া যায়; একটি পথ সুসঙ্গ দিয়া, অপর পথটি নেত্রকোণা দিয়া;—আমরা সুসঙ্গের পথেই যাওয়া স্থির করিয়াছিলাম।

প্রভাতে তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া বেলা আট ঘটিকার সময় সদলবলে যাত্রা করা গেল। মুক্তাগাছা হইতে ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক ময়মনসিংহে উপস্থিত হইতে দেড় ঘণ্টা লাগিল। বেলা সাড়ে-নয়টার সময় ময়মনসিংহের প্রান্তবাহী নদরাজ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিয়া বেলা সাড়ে বারটার সময় শ্যামগঞ্জ বাজারে পদার্পণ করা গেল।

শ্যামগঞ্জ বাজারটি বেশ বড় বাজার। এই বাজার হইতে জেলা-বোর্ডের দুইটি রাস্তা বাহির হইয়াছে; একটি সুসঙ্গের দিকে ও অন্যটি নেত্রকোণার দিকে গিয়াছে। ময়মনসিংহ হইতে এই স্থানের দূরত্ব ১৪ মাইল। ইহার মধ্যে আমরা ছয়-সাত মাইল মাঠের ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছি। বঙ্গদেশের অধিকাংশ জেলা-বোর্ডের রাস্তার অবস্থাই সাধারণতঃ শোচনীয়। রাস্তার জীর্ণসংস্কারের জন্য বোর্ড অর্থব্যয়ে উদাসীন নহেন, মেরামতের কাজও বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হয়; কিন্তু পরিদর্শকের সংখ্যাধিক্য বশতঃই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, বৈদ্যসঙ্কটে রোগী মারা যায়, পথের দুর্গতি দূর হয় না। একে ত পথ এইরূপ দুর্গম, তাহার উপর তখন পথের নানা স্থানে মেরামত চলিতেছিল। মদন দাদার গাড়ীখানি একটু খারাপ ছিল, সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিতে হইল। মধ্যাহ্নরৌদ্রে বিশেষতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা সকলের পক্ষে সহজ নহে; তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল।

যাহা হউক, আমরা শ্যামগঞ্জে 'টিফিন' শেষ করিয়া বেলা দুইটার সময় পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা শ্যামগঞ্জের ডাকবাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সুতরাং সেখানে আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় নাই। দীর্ঘপথ পরিভ্রমণের পর এই বিশ্রাম বড়ই আরামজনক হইয়াছিল।

শ্যামগঞ্জের ১৬ মাইল দূরে লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে আমাদের তাঁবু পড়িবার কথা। লক্ষ্মীপুর পার হইয়া সুসঙ্গ পর্য্যন্ত জেলা-বোর্ডের যে পথ আছে—সে পথে গাড়ী যায়। লক্ষ্মীপুর হইতে সুসঙ্গ ছয় মাইল। কিন্তু আমরা স্থির করিয়াছিলাম—জেলা-বোর্ডের পথ দিয়া সেদিকে না গিয়া কোণাকোণি জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইব।

বেলা দুইটার সময় যাত্রা করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জারিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানেও একটি ডাকবাঙ্গলা আছে। এইস্থান হইতে লক্ষ্মীপুরের দূরত্ব তিন মাইলের অধিক নহে। এখানে আসিয়া দেখিলাম আমাদের গরুর গাড়ীগুলি নদীতীরে আটকাইয়া আছে, নদী পার হইতে পারে নাই। সুতরাং আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া জারিয়ায় অবস্থিতি করিতে হইল।

জারিয়ায় রাত্রিবাস করিতে আমাদের অসুবিধার সীমা রহিল না। গোরুর গাড়ীতে বিছানাপত্র কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; আমাদের অধিকাংশ বিছানাই হাতীতে ছিল, অথচ হাতী সঙ্গে নাই; অদ্যই তাহাদের লক্ষ্মীপুরে উপস্থিত হইবার কথা। লক্ষ্মীপুরেই

আমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা ছিল, তাঁবুও সেখানে; কিন্তু পথিমধ্যে যে আমাদিগকে এ ভাবে রাত্রি কাটাইতে হইবে, এ কথা পূর্ব্বে কে মনে করিয়াছিল? "সকল পথ তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি!" এ প্রবচনটা আমাদের পক্ষে বর্ণে-বর্ণে খাটিয়া গেল। কিন্তু অসুবিধায় বিচলিত হইয়া কোন লাভ নাই; নানা প্রকার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অসুবিধা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ত আমরা শিকারে বাহির হইয়াছি। অগত্যা গোরুর গাড়ীতে যে স্বল্প-পরিমাণ বিছানাপত্র ছিল—তাহাই নামাইয়া আনিয়া কোনরকমে যাত্রার দলের লোকের মত গাদাগাদি হইয়া শুইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দেওয়া গেল। তবে আমরা সেই রাত্রেই একটা কাজ শেষ করিয়া রাখিলাম; আমাদের সঙ্গে যে সকল গো-শকট ছিল—রাত্রিতেই তাহাদিগকে নদীর পরপারে প্রেরণ করা হইল। গাড়ী পারের জন্য সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে পরদিন প্রাতে অনেকক্ষণ সেইস্থানেই কষ্টভোগ করিতে হইত।

৫ই মার্চ্চ,—রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু এখনও ত হাতীগুলার দেখা নাই! নীতিশাস্ত্রকারদের বচনগুলার এক-একটার মূল্য লক্ষটাকা, কি তারও অধিক; "যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য—" কথাটা যে কত মূল্যবান, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। হাতীর আশায়, যে ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছিলাম—তাহা গতকল্যই বিদায় করিয়া দিয়াছি। ঘোড়ার গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, হাতীও অনুপস্থিত; এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলাম। গোরুর গাড়ীর সঙ্গে পদব্রজে লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। ভাগ্যে লক্ষ্মীপুর অধিক দূরে নহে, দূর পথ হইলে শিকারের আমোদ মর্ম্মভেদী হইত! যাহা হউক, বেকার ভবঘুরের মত আমরা পদব্রজে চলিয়া বেলা আটটার মধ্যেই গোরুর গাড়ী সহ লক্ষ্মীপুরে উপস্থিত হইলাম। তাহার প্রায় আধঘণ্টা পরে হস্তীযুথ গজেন্দ্রগমনে সেখানে উপস্থিত হইল। পথশ্রম ও অসুবিধাজনিত সমস্ত ক্রোধ হস্তীচালকগণের উপর নিক্ষিপ্ত হইল; এই অমার্জ্জনীয় বিলম্বের জন্য তাহাদের কৈফিয়ৎ চাহিলাম। কিন্তু কৈফিয়ৎ-দানে ইহারা চিরদিনই অভ্যস্ত; গালাগালিটা তাহারা নির্ব্বিকারচিত্তে পরিপাক করিয়া 'হেঁটমুণ্ডে করজোড়ে' নিবেদন করিল, পূর্ব্বদিন পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় অগত্যা তাহারা শঙ্করপুরে রাত্রিযাপনে বাধ্য হইয়াছিল। কৈফিয়ৎ শ্রবণ করিয়া শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল, রাত্রির কষ্ট ও পথশ্রম কিন্তু দূর হইল! যাহা হউক, আর অনর্থক তিরস্কারে সময় নষ্ট করা ভিন্ন অন্য কোনও লাভ নাই বুঝিয়া, আমরা স্বস্ব তাঁবু খাটাইতে ও জিনিসপত্রগুলি ঠিকঠাক করিয়া লইতে লাগিলাম। কারণ তাহাও সময়-সাপেক্ষ; এই পরিশ্রমের পর বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে মনঃসংযোগ করিলেন, উদরদেবের পরিচর্য্যার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিনটা যেন কি একটা বিরাট হট্টগোলেই অতিবাহিত হইল।

কিন্তু পথে বাহির হইয়া এই প্রকার হট্টগোল যে অনেক সময়েই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; পথে ত আর কেহ আমাদের জন্য সংসারে পাতাইয়া বসিয়া নাই, বিস্তর অর্থব্যয় করিলেও সকল অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। প্রথম দিনে প্রায়ই এ রকম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সমস্ত হাতী তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই। যেগুলি মুক্তাগাছা হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সেইগুলিই সকালে আসিয়া পঁহুছিল; যে সকল হাতীর 'হাওড়' হইতে আসিবার কথা, সেগুলি কোথায় আমাদের 'তাঁবু' পড়িয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারায় আজও তাঁবুতে উপস্থিত হইতে পারিল না। তাহাদিগকে জানাইবার জন্য যে পদাতিক প্রেরিত হইয়াছিল, সে বেচারাও নানা কারণে ঠিক সময়ে 'হাওড়ে' উপস্থিত হইতে পারে নাই, একদিন বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই এই বিভ্রাট।

৬ই মার্চ্চ—হাতীগুলি আজ আসিয়া পঁহুছিল।—কিন্তু আজও শিকার হইল না; খোঁজখবর লইতেই সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। দিনটা আজ বৃথা কাটিল।

৭ই মার্চ্চ,—অদ্য শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। একটি 'বয়ারের' (বন্য মহিষ) খবর পাওয়া গিয়াছিল; তদনুসারে আমরা নারায়ণ-ডহরের বাথানের নিকট উপস্থিত হইয়া, নারায়ণ-ডহরের সুরেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলাম, যেন আমরা বয়ারটিকে বধ না করি। সুতরাং আর বয়ার শিকার করা হইল না। আমরা ক্ষুণ্নমনে তাঁবুতে প্রত্যাগমন করিলাম, কিন্তু কাকা শূন্যহস্তে ফিরিলেন

না; তাঁবুতে প্রত্যাগমনকালে তিনি একটি ছোট হরিণ মারিয়াছিলেন।

৮ই মার্চ্চ,—আজ আমরা তাঁবু ভাঙ্গিয়া লক্ষ্মীপুর হইতে হরিপুর যাত্রা করিলাম।—যখন আমরা লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিলাম, তখন বেলা সাতটা; হরিপুরে উপস্থিত হইতে বেলা দশটা বাজিল। এ অঞ্চলে অনেক গারোর বাস। কেহ কেহ গারোদের বাড়ীতে, কেহ বা অন্য লোকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্নে গগনমণ্ডল ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইল; তাহার পর অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু বৃষ্টিতে আমাদের কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হইল না, কারণ গরুর গাড়ীগুলি বেলা দুইটার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ায় বর্ষণারম্ভের পূর্ব্বেই আমাদের তাঁবুগুলি উঠিয়া গিয়াছিল।

৯ই মার্চ্চ,—প্রভাতে শিকারে বাহির হইলাম।—এখানকার জঙ্গলে গাছ নাই, কেবল নল ও খাগের বন।

একটি ব্যাঘ্রের আশায় সমস্তদিন ধরিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিলাম, কিন্তু জঙ্গল ভাঙ্গাই সার হইল! ব্যাঘ্রের সন্ধান মিলিল না। অগত্যা সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর ক্ষুণ্ণমনে, রিক্তহস্তে তাঁবুতে প্রত্যাগমন করা গেল।

১০ই মার্চ্চ,—আজও সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলাম। প্রথম দিন সেই যে শিকারে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর এ কয়দিনের মধ্যে আর যাত্রা শুভ হইল না। আজ সমস্তদিনের গুরুতর পরিশ্রমেও তেমন কোন ফল-লাভ করিতে পারিলাম না, কেবল একটি 'মহিষী' মাত্র শিকার করা গেল। কাকার গুলিতেই এই 'মহিষী'টি অকালাভ করিয়াছিল; মন্দের ভাল, এবং ইহাতেই আমি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম; কারণ অন্য শিকারে আমিই তাঁহার পশ্চাতে ছিলাম!

১১ই মার্চ্চ,—আমরা হরিপুর হইতে 'চিলালা' যাত্রা করিলাম। আমাদের খুঁজির নিকট শুনিলাম, হরিপুর হইতে 'চিলালা' আড়াই-মাইল তিন-মাইলের অধিক নহে। হাতীগুলিকে পূর্ব্বরাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; যাত্রারম্ভে তাহাদের কতকগুলির সন্ধান পাওয়া গেল না; তাহারাও সুযোগ দেখিয়া দূরে 'বিহার' করিতে গিয়াছিল। যাহা হউক, সে জন্য বিশেষ কোন্ অসুবিধা হইল না; তাহারা অপরাহ্নে চিলালায় উপস্থিত হইল। আমরা চিলালায় যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু সকল হাতী সংগৃহীত না হওয়া চাকর-বাকরদের অগত্যা পদব্রজেই যাত্রা করিতে হইল তাঁবুর স্থানে উপস্থিত হইতে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্ট লাগিয়াছিল। 'খুঁজি' বলিয়াছিল, পথ আড়াই-মাইল তিন-মাইলের অধিক নহে; কিন্তু পথ আর ফুরায় না— পথ সাত-আট মাইলের কম নহে। বুঝিলাম এ অঞ্চলে সাধারণ লোকের ক্রোশ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই; দু মাইল যাইতে হইলেও বলে 'ঐ ত';—অর্থাৎ যেন বি গজ মাত্র তফাতে,—পা বাড়াইতে যে কিছু বিলম্ব শুনিয়াছি, উড়িষ্যা অঞ্চলে 'ডালভাঙ্গা' ক্রোশ আছে সে দেশের লোক গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া চলিতে আরং করে,—যতক্ষণ পাতাগুলা শুকাইয়া ঢলিয়া না পড়ে, ততক্ষ পর্য্যন্ত না কি এক ক্রোশ পূর্ণ হয় না! দেখিতেছি, ইহাদে ক্রোশও অনেকটা সেই রকম।

১২ই মার্চ্চ,—আমার আজ পৃথক হাওদা ছিল শৈলেন আমার পশ্চাতে ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি চ প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ শেষ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিলাম আমরা যখন জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা নয় দশ ঘটিকার অধিক নহে। প্রথমেই আমরা তিনা হরিণকে (গাউজ Samber) ভবপারে প্রেরণ করিলাম।

অতঃপর বেলা সাড়ে-বারটা কি একটার সময় আমর 'বিয়ারী সাড়ের' সন্নিহিত গভীরতর অরণ্যে প্রবে করিলাম। অবিলম্বে একটি মহিষের 'ভাঙ্গা খাওয়া' পায়ের দাগ আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। অল্পক্ষণ পরে কয়েকটি হরিণ আমাদের 'লাইন' কাটিয়া দ্রুতবেগে লক্ষ্যে বাহিরে গিয়া পড়িল; শিকারীরা খুব উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষ করিতেছিলেন,—মোহরের প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য, ক্ষু সিকিটা-দুয়ানাটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না! ইহাদে সেই ভাব। হরিণগুলাকে দেখিয়া তাঁহারা বিন্দুমাত্র প্রলু হইলেন না, কিন্তু আমার লোভ বাড়িয়া গেল। যে সক হরিণ লাইন কাটিয়া যাইতেছিল, আমাদের পশ্চাৎ হইতে লাইন কাটিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে গুলি করিবা জন্য আমি কাকার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। কাকা অনুমতিক্রমে আমি একটি হরিণকে গুলি করিলাম গুলিটি হরিণের পূর্ব্বের পার্শ্বে বিদ্ধ হইবামাত্র হরিণটি পড়ি গেল। কাকা সেটিকে হাতীর উপর তুলিয়া লইবা

অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অন্য শিকারীরা লাইন ভাঙ্গিতে বা পিছাইতে সম্মত হইলেন না। আমাদের এই সকল কথাবার্ত্তার মধ্যেই হরিণটা ভূমিশয্যা হইতে গা-ঝাড়িয়া উঠিল, এবং খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে খানিকটা অগ্রসর হইল। তাহার পর সে হঠাৎ একটি 'ছোপা'র ভিতর প্রবেশ করিল। আমি নির্লিপ্তভাবে তাহা দর্শন করিলাম, কিন্তু তিরস্কারের ভয়ে কোন কথা বলিলাম না। কারণ বড় শিকার পাইলে ছোট শিকারে লোভ করা শিকারনীতি-বিগর্হিত। তথাপি আমি পুনর্ব্বার আর একটি গুলি করিলাম; উহা লক্ষ্যভেদ করিল কি না, তাহার সন্ধান লইবার অবকাশ পাইলাম না, তখন আমাদের 'লাইন' সমবেগেই চলিতেছিল। শিকারটা এইভাবে হাত-ছাড়া হওয়ায় আমি দুঃখিতচিত্তে হাতীর পিঠে বসিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন মাহুত একটি মহিষের ভুল রাস্তা দেখাইয়া দিল; ইহা পুরাতন ভাঙ্গা, সুতরাং মিনিট কুড়ি আমরা বৃথা পরিশ্রম করিলাম। যাহা হউক, কিছু-কাল পরে মহিষের 'টাট্‌কা' রাস্তা পাওয়া গেল। কাকা একটা মহিষ দেখিতে পাইয়া গুলি করিলেন; কিন্তু মহিষটা অনেক দূরে ছিল বলিয়া সে সে গুলিতে পড়িল না। মহিষটা যেখানে আহত হইয়াছিল, আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রক্তের দাগ দেখিতে পাইলাম। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে জঙ্গল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় পনের মিনিট পরে অরণ্যান্তরালে সেই আহত মহিষটিকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলাম। এই মহিষটির সঙ্গে এবার একটি 'মহিষী' ছিল।

মহিষ ও 'মহিষীকে' একত্র দেখিয়া আমাদের লাইন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সেখানে আরও মহিষ ছিল। অন্যান্য শিকারীরা তাহাদের অনুসরণ করিলেন; কাকা, মহেশদা ও আমি সেই আহত বয়ারের পশ্চাতে রহিলাম। আমাদের সঙ্গে আট-নয়টি মাত্র হাতী রহিল। ইহাতে এই হইল যে, আহত মহিষটি পুনর্ব্বার 'লাইন' কাটিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মোটে আট নয়টি হাতী, অথচ প্রকাণ্ড জঙ্গল; কাজেই লাইনের ব্যবধান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল; বিশেষতঃ সেখানে জঙ্গল এতই ঘন সন্নিবিষ্ট যে, অল্পক্ষণ পরে মহিষের শরীরও আর আমরা দেখিতে পাইলাম না।

জঙ্গলের কম্পন দেখিয়া অনেক সময় বুঝিতে পারা যায়, কোন্ জানোয়ার জঙ্গল নাড়িতেছে; এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঘ বা সাপ একরকম করিয়া জঙ্গল নাড়ে; সাপ চলিবার সময় যে ভাবে জঙ্গল নাড়ে, মহিষ জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিবার সময়েও প্রায় সেইভাবে জঙ্গল ভাঙ্গে। বড় হরিণ, মহিষ হুড়-হুড় করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলে ও হঠাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু ছোট হরিণ ও শূকর একভাবে জঙ্গল নাড়িয়া থাকে। আমাদের দলস্থ অন্যান্য শিকারীরা ভিন্ন দিকে গমন না করিলে আমরা সেই 'বয়ারটিকে নিশ্চয়ই হস্তগত করিতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমরা নিরাশচিত্তে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় একটি 'গাউজ' দেখিয়া তাহাকে গুলি করিলাম; পরে মহেশদাও গুলি করিলেন। উপর্য্যুপরি দুই গুলি খাইয়া গাউজটা বসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই অবস্থাতেও সে পলায়ন করিতে পারে ভাবিয়া আমি আরও দুইটি গুলি করিলাম। ইহাতেই তাহার হরিণলীলার অবসান হইল।

হরিণটা তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছি, এমন সময় অদূরে ব্যাঘ্র-পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। টাট্‌কা দাগ, দেখিয়াই বুঝিলাম শার্দ্দূলরাজ অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই পদচিহ্ন রাখিয়া মহাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা হৃষ্টচিত্তে সেই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, নিবিড়তর অরণ্যের প্রবেশপথে ঘাসের উপর যে পদচিহ্ন রহিয়াছে, তাহা এত অল্পকাল পূর্ব্বের যে, তখন পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র পদদলিত তৃণগুলি মস্তকোত্তলন করে নাই। বুঝিলাম শার্দ্দূলরাজ আমাদের সাড়া পাইয়া তিনচারি মিনিট পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। নিকটে একটি 'মড়ি' পড়িয়া ছিল, তাহার কিয়দংশ অভুক্ত রাখিয়াই 'সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে অন্তঃপুর-পানে'। কিন্তু আট-নয়টি মাত্র হাতীর সাহায্যে সেই বিশাল অরণ্য সংক্ষুব্ধ করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া সে জঙ্গল আর তখন 'নাড়া' দেওয়া হইল না। অবশেষে আমরা সকল শিকারী যখন একস্থানে সমবেত হইলাম, তখন অপরাহ্ন—বেলা প্রায় চারিটা। সেই সময়ে আমরা সেই বৃহৎ অরণ্যে প্রবেশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। শিকারকার্য্য সে দিনের মত মুলতুবি রহিল।

১৩ই মার্চ্চ,—বাঘটার সন্ধান পাইয়াও তাহাকে ছাড়িয়া

আসিতে হইল বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। অদ্য প্রভাতে তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু পরিশ্রমই সার হইল। দেখিলাম বাঘ সে জঙ্গলে ফিরিয়া আসে নাই। সে যে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা একটা বড় 'নাতাড়ে' জঙ্গল; সেই জঙ্গলের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়াই আমরা বুঝিতে পারিলাম, সেই জঙ্গলে তাহার দর্শনলাভের আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং অল্পক্ষণ পরে তাহার আশা ত্যাগ করিয়া, সাধারণ শিকারের আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, তদনুসারে আরও খানিকটা জঙ্গল ভাঙ্গা গেল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে সেদিন এরূপ বৃহৎ জঙ্গলে একটি দুসকিও দেখিতে পাইলাম না। বেলা একটার পর সকলের মত হইল 'কাকৃনীমারা' বিলে মহিষের সন্ধানে ধাবিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আজ নিম্নলিখিত রূপে আমাদের হাওদার ব্যবস্থা হইয়াছিল;—পিতৃদেবের হাওদা 'ভোলানাথে'; মদনদার হাওদা 'মনোমতিতে'; আমার হাওদা 'কুসুমকলিতে'; কাকার হাওদা 'চমৎকতারায়'; শ্রীযুক্ত বরদাকিশোরের হাওদা 'চাঁদতারায়'; মহেশদার হাওদা 'প্যারীতে'।

শিকারীগণ স্ব স্ব হাওদায় আসীন হইয়া বিলের দিকে অগ্রসর হইলেন; বিল কিন্তু তখনও দূরে ছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গজরাজ 'ভোলানাথ' অতি বৃহৎ হস্তী। ১০ ফিট ১১ ইঞ্চি তাহার উচ্চতা। আমি 'ভোলানাথের' অপেক্ষা উচ্চ হস্তী আজ পর্যান্ত দেখি নাই। বাবার হাওদা তাহার উপর থাকায় তিনি সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। তখন চৈত্র মাস, বিলটি শুকাইয়া গিয়াছিল, কেবল মধ্যস্থলে অল্প কিছু জল ছিল; 'কান্দা' (বিলের বা নদীর কিনারাস্থিত উচ্চভূমিকে 'কান্দা' বলে) হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। কান্দা হইতে বিলের জমি ক্রমে ঢালু হইয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। আমরা কান্দার পারে উপস্থিত হইলে, বিলে মহিষ আছে কি না, কাকা বাবাকে তাহা দেখিতে বলিলেন। আমরা বায়ুপ্রবাহের অনুকূলেই যাইতেছিলাম; সুতরাং আমাদের শব্দ পাইয়াই হোক, বা অন্য কোন শব্দ শুনিয়াই হোক, কিংবা স্ব স্ব খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াই হোক, বিলের মহিষগুলি তখন বিল হইতে উঠিয়া অত্যন্ত চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ চাহিতেছিল। বাবা 'ভোলানাথের' পিঠে বসিয়া দূর হইতেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "ঐ ত মহিষ দেখিতেছি, কিন্তু উহারা বিল হইতে উঠিয়া সরিয়া পড়িতেছে!" পিতৃবাক্য শ্রবণমাত্র আর বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি, মদনদাদা, কাকা ও মহেশদা হাতীগুলিকে দ্রুতবেগে পরিচালিত করিলাম। কিন্তু আমরা আশানুরূপ ফল পাইলাম না; অতি কষ্টে একটিমাত্র 'কাকৃনী' বধে সমর্থ হইলাম। বয়ারেও গুলি করা হইয়াছিল; কিন্তু বহুদূর 'পাল্লা' বলিয়া তাহারা আহত হইল না, আহত হইলেও কেহ পড়িল না, দূরে পলায়ন করিল। আমরা সোৎসাহে আরও কিছুকাল বয়ারের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু 'যঃ পলায়তি স জীবতি'—তাহাদের সন্ধান মিলিল না। অগত্যা তাঁবুতে প্রত্যাগমন করা গেল। তখন বেলা চারিটা বাজে। মনে পড়িতেছে, সেদিন দোলযাত্রা, হোলি-উৎসব। বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল তখন ফাগ-কুঙ্কুম-আবীররাগরঞ্জিত; সর্ব্বত্র লালে লাল! দেখিলাম বাড়ী হইতে ডাকের চিঠিপত্র আসিয়াছে; 'সন্দেশবহ' এক হাঁড়ি সন্দেশ ও এক হাঁড়ি আবীর লইয়া আমাদের হোলির আনন্দোৎসব স্মরণ করাইতে আসিয়াছে। সেই নিভৃত অরণ্যান্তরালে, বন্ধুবান্ধবকে আর কি করিয়া হোলির উৎসব সম্পন্ন করা যায়? অগত্যা সকলে মিলিয়া মহাউৎসাহে মহেশদাকে আবীর মাখাইতে লাগিলাম। মহেশদাও ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনিও আমাদের ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গনদানে আমাদিগকে লাল করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শোধ গেল দেখিয়া কাহারও মনে কোন ক্ষোভ রহিল না; বিশেষতঃ মহেশদাদার মত সদানন্দ লোক সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা স্নানাদি দ্বারা হোলির লোহিতরাগ ধৌত করিলাম।

১৪ই মার্চ্চ—অদ্য হাওদা-শিকার বন্ধ। হস্তীগুলিকে আজ বিশ্রামদানের ব্যবস্থা হইল। প্রভাতে গদীর হাতীতে বাবা, কাকা, ও মদনদা জঙ্গলী বয়ারের উদ্দেশ্যে বাথানে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের যাত্রা বিফল হইল না, তাঁহারা একটি বয়ার শিকার করিলেন। অপরাহ্নে কাকা ও মদনদা দুইটি বয়ারের সন্ধানে ধাবিত হইলেন; কিন্তু এবার তাঁহাদিগকে বিফল-মনোরথ হইতে হইল।

বাথানরক্ষীদের ধারণা, বাথানের বয়ার মারিলে, বাথানের ক্ষতি হয়। যে সকল বয়ার বাথানের মহিষদলে

যোগদান করিয়া থাকে—তাহারা যূথ-বিতাড়িত বয়ার। কখন-কখন এই প্রকার দুই তিনটি বয়ারও একত্র বাথানে উপস্থিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক, মহিষের দলও অন্যান্য জানোয়ারের দলের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া থাকে; অর্থাৎ বন্য মহিষের পালে একটি মাত্র 'ভারি' বয়ার ও দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বয়ার থাকে; সেই বৃহৎ বয়ারটি যতদিন দলপতি থাকে—ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে সর্ব্বদাই সতর্কভাবে কালযাপন করিতে হয়; কারণ দল বিতাড়িত যূথভ্রষ্ট বয়ারেরা তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং দলপতি হইবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিয়া থাকে। যদি যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই দলপতি হয়, এবং যুদ্ধে দলপতি জয়লাভ করিলে তাহার আততায়ী বয়ারেরা পলাইয়া আসিয়া বাথানে যোগদান করে। এ যেন Paradise lost এর ব্যাপার! যাহা হউক, বয়ারের পালে যদি অধিকসংখ্যক 'নরবাচ্চা' থাকে, তাহা হইলে দলপতি তাহার নিজের পছন্দমত দুই একটিকে দলে রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে দল হইতে তাড়াইয়া দেয়।—ইহাদেরও দুই একটি নীচে বাথানে নামিয়া আসে। ইহারা কখন-কখন দীর্ঘকাল ধরিয়া বাথানে বাস করে; কিন্তু ইহাদিগকে পোষ মানিতে দেখা যায় না। এমনও দেখা গিয়াছে, কখন-কখন পুরাণো বয়ার আসিয়া পাঁচ সাতটি স্ত্রী-মহিষকে প্রলুব্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়—এবং নূতন জঙ্গলী দলের সৃষ্টি করে। উহাকে 'কোটি অরণ' বলে।—বাথানের বয়ার মারিলে বাথানের এই অনিষ্টের আশঙ্কা দূর হয়। একমাস ত দূরের কথা, উপর্য্যুপরি দুইদিন আমরা একই বাথানে দুইটি বয়ারও মারিয়াছি; কিন্তু তৃতীয় বয়ারটি ছোট বলিয়া মারি নাই, তথাপি বাথানের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আমাদের এই সকল যুক্তি-তর্ক অরণ্যে রোদনবৎ অনেক সময়েই নিষ্ফল হয়, বাথানস্বামীরা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত; তাহাদের বিশ্বাস, বাথানের বয়ার মারিলেই তাহাদের বাথান ক্রমে হীন হইয়া পড়িবে; নূতন তেজস্বী বয়ার মহিষবংশ বৃদ্ধির জন্য আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। "এক বয়ার যাবে পুনঃ অন্য বয়ার হবে, বাথানে 'বয়ারাসন' শূন্য নাহি রবে।" এ কথা ধ্রুব সত্য।

১৫ই মার্চ্চ,—আজ সাধারণ শিকার। আজ আর বিশেষ কিছু হইল না; তিনটি হরিণ ও একটি মহিষ পাওয়া গেল। ইহাতে গ্রামবাসীদের আনন্দের সীমা রহিল না। 'গো মড়কে মুচির পার্ব্বণ' কথাটা মিথ্যা নহে। হরিণ ও মহিষমাংসে তাহারা তৃপ্তিসহকারে উদরদেবের পূজা করিবার সুবিধা পাইল। তাহারা সানন্দচিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল কি না জানি না; তবে তাহাদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অনেক ভাল জিনিস আমরা লাভ করিলাম। আজ আমাদের দুগ্ধের পরিমাণ অন্যান্য দিনের অপেক্ষা অনেক বেশী হইল। সেই নির্জ্জলা, সুমিষ্ট, সুপেয় দুগ্ধ অমৃত-সমান।

১৬ই মার্চ্চ,—আজ আমাদের 'বিয়রপাড়ে' যাইবার কথা ছিল; কিন্তু দাদা মহাশয় ফোড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া যাওয়া হইল না। কাকা, মদন দা, ও মহেশ-দা গদিতে শিকার করিতে চলিলেন; শূন্যহস্তে ফিরিলেন না। দুইটি হরিণ ও একটি মহিষ মারা পড়িল। আগামী কল্য যাহাতে 'বিয়রপাড়ে' যাত্রা করা হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য সকলেই মন্ত্রণায় বসিলেন। একদিকে দাদা মহাশয়ের ফোড়ার যন্ত্রণা, অন্যদিকে আমাদের স্থানত্যাগের মন্ত্রণা, অনুপ্রাসে সামঞ্জস্য ছিল বটে! যাহা হউক, বিছানার হাতীতে মধ্যস্থলে দাদা মহাশয়ের জন্য শয্যা প্রসারিত করিয়া তাহার চারিপাশে অন্যান্য বিছানা বাঁধিয়া লইয়া তদ্বারা রেলিং প্রস্তুত করা হইবে, এবং দাদা মহাশয় সেই রেলিংএর মধ্যবর্ত্তী বিছানায় শয়ন করিয়া দিব্য আরামে 'বিয়রপাড়ে' যাত্রা করিবেন,—মন্ত্রণায় এইরূপ স্থির হইল; কিন্তু এই সংযুক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার ফোড়ার উৎকট যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র লাঘব হইল কি না সন্দেহ। তবে ফোড়াটা এইভাবে নাস্তানাবুদ হইবার ভয়েই হোক, বা আর যে কোন কারণেই হউক, সেইদিনই গলিয়া গেল; সুতরাং অতঃপর আশঙ্কার কোন কারণ রহিল না।

১৭ই মার্চ্চ,—আমরা চিলালা হইতে যাত্রা করিয়া 'বিয়রপাড়ে' উপস্থিত হইলাম। এবার এখানে তাঁবুর ভাল স্থান মিলিল না; তবে এখানে অনেক শিকার মিলিবে শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া গেল। আমোদ-আহ্লাদও চলিতে লাগিল। কথিত আছে—হাতে কাজ না থাকিলে লোকে 'জেঠা মশায়ের গঙ্গাযাত্রা'র ব্যবস্থা করে—কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। হাতে বিশেষ কোন কাজ নাই,—এদিকে এই রকম

দল; তাহার উপর হুজুগেরও অভাব নাই; এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

শিকারে বাহির হইলে, প্রায় সকলেরই মেজাজ একটু 'মিলিটারী' হইয়া থাকে। প্রায় সকলেরই বলিলাম; কারণ, দুইজনকে সে দলে ফেলিতে পারি না। একজন আমার পিতাঠাকুর মহাশয়—তাঁহার স্নানাহার, শয়ন, ভ্রমণ, গমন প্রভৃতির কোন হাঙ্গামা নাই; কিছু পাইলেন খাইলেন, কিছু না জুটিল—ক্ষতি নাই। এরূপ অনাসক্ত ভাব সর্ব্বদা দেখা যায় না। খাদ্যদ্রব্য পুড়িয়া গিয়াছে,—মুখে তুলিবার সাধ্য নাই; কিন্তু অন্য কেহ সে কথার উল্লেখ না করা পর্য্যন্ত, তাঁহার মুখে সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কোন দিনই শুনি নাই; মুখের বিকৃত ভাবটুকু পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করে নাই। এ দিকে ত এই অবস্থা; কিন্তু অন্যকে 'উস্কাইয়া' দিতে, এমন কি, মজা দেখিবার জন্য কোনও একটা হুজুগের সৃষ্টি করিতে, তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না! আর একজন, যাঁহাকে এ দলে ফেলিতে পারি না—তিনি 'সর্ব্বংসহ' মহেশ-দা। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিব।

আমরা 'বিয়রপাড়ে' উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিৎ আহারাদির পর বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছি,—মহেশ-দা একটি গাছের ডালে তাঁহার টুপিটা (hat) ঝুলাইয়া রাখিয়া আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। বাবা একটু মজা করিবার মতলবে, ইঙ্গিতে টুপিটার প্রতি মদনদার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। আর কি রক্ষা আছে? তৎক্ষণাৎ মজার সম্ভাবনায় সকলেরই চোখে-চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! ভূমিকাটি প্রথমতঃ মদন দাদাই গ্রহণ করিলেন। তিনি যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, শিকারে আসিয়া প্রথমে 'হাতসই' করা সকলেরই দরকার। অতএব সর্ব্বাগ্রে সেই প্রয়োজনীয় কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করা যাউক। মদনদার বক্তৃতা শেষ হইতে-না-হইতে আমরা Rook Rifleটি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তাহার পর এটা-সেটা দেখিতে-দেখিতে শেষে ফস্ করিয়া একটা 'জাঁঠা' (হাতীর বল্লম) দিয়া মহেশ দার টুপিটি বৃক্ষের একটি উচ্চ শাখায় রক্ষিত হইল। মদন-দা পরমুহূর্ত্তেই সেই টুপিটাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিলেন। টুপিটাই যে মদন-দাদার 'হাতসই' করিবার উপলক্ষ হইয়া লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে, মহেশ দা প্রথমটা তাহা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু, হঠাৎ তিনি তাহা দেখিতে পাইয়া কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং মদন-দাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মদন-দার কর্ণে যেন সে কথা প্রবেশ করে নাই—তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন! নিষেধ অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া মহেশ-দা একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, এবং একটু মৃদু তিরস্কার আরম্ভ হইল। ততক্ষণে সকলেরই এক-একবার 'নিশানা' হইয়া গিয়াছে,—টুপিতেও পাঁচ-সাতটি ছিদ্র হইয়াছে। এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মহেশ-দা বিলক্ষণ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বসিয়া পড়িলেন। মদন-দা তাঁহার সংশয়াপন্ন ভাব দেখিয়া বন্দুক রাখিয়া পুনর্ব্বার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"না হয়, আমরা তোমার দু'টাকা-ন'শিকের টুপিই নষ্ট করিয়াছি; সেজন্য এ রকম গালাগালি দেওয়া অন্যায়। টুপিটা নষ্ট হইয়া থাকে, ন্যায্য দাম নেও!" তিনি তৎক্ষণাৎ দুইটি টাকা purse হইতে বাহির করিয়া মহেশ দাদার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া মহেশ দা ক্রোধ-কম্পিত-দেহে আর একচোট বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের রাগ কি না! মিনিট দুই পরেই কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "রাগ কি সাধে হয়? এখানে এখন টুপি পাই কোথায় বল ত! তুমি ত টুপির দফা শেষ করে আমাকে তার দাম দিতে আস্‌চো, এই দুপুরের রোদে আমি কি টাকা মাথায় দিয়ে শিকারে যাব?" মদন-দা তৎক্ষণাৎ বিনয়-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "এইজন্যে তোমার এত দুশ্চিন্তা? তা, না হয় তুমি আমার টুপিটা মাথায় দিও, আমি খালি মাথায় যাব।" এই কথা শুনিয়া মহেশ-দা সেই মুহূর্ত্তে একেবারে জল—বরফজলের মত ঠাণ্ডা হইলেন; এবং তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অভিমান বিরক্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়া, মনটি বাণের জলে ধোয়া জলের মত হইয়া গেল! মহেশ-দাই যেন কত অপরাধ করিয়াছেন এইভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "না, না, তা কি হয়? তা' টুপিটা ছেঁদা করেছ, বেশ করেছ; যা' হয় হবে, ওর জন্যে কিছু মনে করো না।" যাহা হউক, ভবিষ্যতে টুপির অভাবে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই, অন্য সকলে তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমাদের তাঁবু আসিয়া পড়িল। তাঁবু খাটাইয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে প্রবেশ করিলাম। সেই বনভূমিতে বস্ত্রাবাস-বক্ষে রাত্রিটা সুনিদ্রায় অতিবাহিত হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়

[অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়]

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্‌, এই কয়েকটি প্রাণীর ইন্দ্রিয়। বাহিরের বস্তুর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আমরা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি। জীবনের যাহা কিছু আনন্দ, তাহা ঐ ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদিগকে দান করে;—কিন্তু এগুলির সহিত প্রাণীর জীবন-মরণের সম্বন্ধ দেখা যায় না। মস্তিষ্ক বা হৃদ্‌পিণ্ড বিকল হইলে যেমন প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে;—চক্ষুহীন, স্পর্শজ্ঞান রহিত বা বধির হইলে প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এবং বাহিরের অবস্থাকে অনুভব করানো চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রধান কার্য্য; এইজন্য শারীরতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এগুলিকে বহিরিন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-গুলি লইয়াই প্রাণীর জীবনের কার্য্য চলে না; ইহাদের সহিত যে কতকগুলি ভিতরের ইন্দ্রিয় আছে, তাহাই প্রাণীকে প্রাণবান্‌ করিয়া রাখে।

আমাদের সুপরিচিত পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়া আরো যে কতকগুলি ইন্দ্রিয় আছে, এই কথাটা নূতন নয়। কয়েক জাতীয় পায়রাকে তাহাদের আবাস-স্থান হইতে শত-শত মাইল দূরে ছাড়িয়া দিলেও তাহারা ঠিক পথ আবিষ্কার করিয়া আবাস-স্থানে উপনীত হয়। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতরপ্রাণীদেরও আবাস স্থান আবিষ্কারের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। কোকিল প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষীদের দেশান্তর গমনও (migration) একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যে দেশে বসন্ত-ঋতু দেখা দেয়, তাহারা দূর হইতে আসিয়া সেই দেশে কয়েক মাস বাস করে;—তার পরে বর্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ভিন্ন দেশে যাত্রা করে। গন্তব্য দেশে যাইতে হইলে যে পথটি সরল ও নিরাপদ, তাহা ইহারা অনায়াসে বুঝিয়া লইয়া চলিতে পারে,—পাখীর দল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ প্রকার দৃশ্য কখনই দেখা যায় না। পশুপক্ষীদের আবাস-স্থান আবিষ্কারের এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। সেই ইন্দ্রিয়টি প্রাণিদেহের কোন্‌ অঙ্গে থাকিয়া, কি প্রকারে কাজ করে, তাহা আজও জানা যায় নাই।

আজকাল টেলিপাথি (Telepathy) নামে একটি কথা প্রায়ই শুনা যায়। টেলিপাথির শক্তি সকল লোকের থাকে না। যাহার থাকে, সে নিকটস্থ ব্যক্তি মনে-মনে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে। প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন, সম্ভবতঃ ইহাও মানব-দেহের কোনও এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য; কিন্তু এই ইন্দ্রিয় দেহের কোথায়, কি প্রকারে লুক্কায়িত আছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন নাই।

বাহিরের আলোক-তরঙ্গ চক্ষুতে পড়িয়া কি প্রকারে তাহা চক্ষুর স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে এবং পরে সেই উত্তেজনা কি প্রকারে মস্তিষ্কের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশে পৌঁছিয়া দৃষ্টিজ্ঞান জন্মায়, আমরা তাহা জানি; শব্দ-তরঙ্গ কাণে প্রবেশ করিয়া কি করিয়া শব্দ-জ্ঞান জন্মায়, তাহারও আমরা পরিচয় গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গুলি কি প্রকারে প্রাণীর বিচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি করে, তাহা আমাদের জানা নাই; কাজেই ইন্দ্রিয়ের অনুরূপ কার্য্য দেখিতে পাইয়াও সেগুলি যে, প্রকৃতই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, তাহা এখনো নিঃ-সন্দেহে বলা যাইতেছে না। কিন্তু যেগুলিকে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া থাকেন, তাহা এত সুস্পষ্ট যে, সেগুলিকে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না বলিয়া থাকা যায় না। খাদ্যদ্রব্য প্রাণীর পাকাশয়ে প্রবেশ করিলেই আপনা-হইতেই পাকরস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের সহিত মিলিত হয়, এবং ইহাতে খাদ্য হজম হইয়া যায়। এই ব্যাপারটি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, খাদ্য পাকাশয়ে প্রবেশ করিলেই দেহের কোনো অংশ তাহা বুঝিতে পারে, এবং বুঝিতে পারিলেই পাকাশয়ে পাকরস নিক্ষেপের আয়োজন করে। ইহা কোনো ইন্দ্রিয়েরই সুস্পষ্ট কার্য্য নয় কি? প্রাণীর দেহাভ্যন্তরের নানা ক্রিয়ায় এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ধরা পড়ে। কিন্তু একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র কলেবরে সকলগুলির আলোচনা অসম্ভব। শারীরবিদ্‌গণ যে গুলিকে প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাদেরি মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করিব।

দেহরক্ষার জন্য জলপানের প্রয়োজন হইলে আমরা তৃষ্ণা অনুভব করি; কোনো ঘৃণাজনক বস্তু দেখিলে আমাদের বমনোদ্রেক হয়; লজ্জায় আমাদের গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া পড়ে; ভয়ে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়; এবং জনতার মধ্যে অধিকক্ষণ থাকিলে আমাদের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সুস্থ-শরীরে বিশেষ অবস্থায় যখন এই সকল অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সেগুলিকে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের মতই দেখায়। শারীরবিদ্‌গণ এগুলির প্রত্যেকটিকে এক বা ততোধিক অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।

মানুষ কোন্‌ অবস্থায় পড়িলে সুখী হয়, তাহা বলা বড়ই কঠিন।

দরিদ্র ধনসম্পত্তি লাভ করিলে সুখী হইবে মনে করে, কিন্তু ধন লাভ করিলে সে সুখী হইতে পারে না; তখন হয় ত একটা নূতন কাল্পনিক অভাব তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। রুগ্ন, ধনশালী ব্যক্তি মনে করে, নীরোগ হইলে বুঝি তাহার সুখ হইবে। সে হয় ত কালক্রমে আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারে না। গৃহ ধনজনে ও শান্তিতে পূর্ণ দেখিয়া এবং নিজের শরীরকে সুস্থ রাখিয়া সুখী হইতে পারে নাই, এ প্রকার গৃহস্থ অনেক দেখা গিয়াছে। সংসারে কিছুরই অভাব নাই, শরীরও সুস্থ, কেবল কাল্পনিক অস্বচ্ছন্দতা মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ প্রকার কখনো-কখনো দেখা গিয়াছে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে এই সকল ঘটনাকে মানসিক রোগের পরিণাম বলিয়া মনে হয়। কথাটা অমূলক নয়। কিন্তু গোড়ার খবর লইতে গেলে এইগুলিকে ইন্দ্রিয়-বোধের পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়। প্রাণীর দেহ নানাজাতীয় কোটি-কোটি কোষ দিয়া নির্ম্মিত। কোষগুলি দেহের যে স্থানে থাকে, তাহারা সেখানকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে। এই কারণে সকল কোষের কার্য্য এক নয়; মস্তিষ্কের কোষগুলি দেহে যে ক্রিয়া দেখায়, পেশী বা স্নায়ুর কোষ তাহা দেখায় না। কোষাবলীর কার্য্যে এই প্রকার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, এক স্থলে তাহাদের মধ্যে একতা দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভিতর হইতে বা বাহির হইতে কোনো আঘাত বা উত্তেজনা পাইলে উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং এই উত্তেজনার খবর স্নায়ু-পরম্পরায় মস্তিষ্কে পাঠাইতে থাকে। মস্তিষ্ক এই সকল খবর পাইয়া শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করে। মস্তিষ্কের সহিত কোষাবলির সংবাদ আদান-প্রদানের বিরাম নাই,—দিবারাত্রি নিয়ত সংবাদ চলা-ফেরা করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেহের ভিতরে এ সকল কার্য্য চলিতেছে, আমরা তাহার খবর পাই না,—খবর যখন নিতান্ত খারাপ হয়, তখনি তাহা ধীরে-ধীরে আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। কঠোর পরিশ্রমে প্রাণিদেহে এক প্রকার বিষ-পদার্থ উৎপন্ন হয়; ইহা দেহের সর্ব্বাংশে ও রক্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দেহস্থ প্রত্যেক কোষ উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার খবর মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছে। দেহস্থ কোষাবলির এই প্রকার বিকৃতিতে প্রাণিগণ ক্লান্ত ও অস্বচ্ছন্দতা বোধ করে। বিশেষ রোগের লক্ষণ নাই, অথচ শরীরটা অস্বচ্ছন্দ, ইহা আমরা প্রায়ই অনুভব করি। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, আমাদের দেহের কোষ-পরম্পরার অস্বাস্থ্যই ইহার কারণ; কোনো প্রকারে দেহের কোনো অংশে বিষ-পদার্থের সঞ্চয় হইলে আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহের প্রত্যেক কোষটি অপ্রকৃতিস্থ হইয়া অস্বচ্ছন্দতার সূত্রপাত করে। এই সকল কার্য্য আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যেরই অনুরূপ। আলোক বা শব্দের তরঙ্গ বাহির হইতে আসিয়া চক্ষু ও কর্ণের কোষ-গুলি উত্তেজিত করিলে মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের আলোকবোধ বা শব্দবোধ উৎপন্ন হয়;—পূর্ব্বোক্ত দৈহিক ব্যাপারগুলি কতকটা সেই প্রকারের নয় কি? পার্থক্যের মধ্যে এই যে,—চক্ষু-কর্ণাদিতে বাহিরের উত্তেজনা কার্য্য করে এবং দেহকোষে ভিতরের উত্তেজনা কাজ করিয়া আমাদের বোধশক্তিকে জাগাইয়া তুলে।

আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানে Kinaesthetic বলিয়া একটি নূতন কথা প্রবেশ করিয়াছে। কথাটি নূতন হইলেও বিষয়টি অতি পুরাতন। মোটামুটি ঐ কথাটিকে "পেশীর অনুভূতি" বলা যাইতে পারে। আমাদের চক্ষু বাহিরের বস্তুকে দেখায়, কর্ণ বাহিরের শব্দকে শুনায়, নাসিকাতে আমরা গন্ধ গ্রহণ করি; কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া আছি কি বসিয়া আছি, বা আমার হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিপ্রকার অবস্থায় আছে, তাহা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা বা ত্বক্ কেহই বলিয়া দেয় না; অথচ আমরা তাহা বুঝিতে পারি। যে ইন্দ্রিয়বোধ দ্বারা আমরা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অবস্থা বুঝিতে পারি এবং প্রয়োজন-অনুসারে তাহাদিগকে ঠিক-মত চালাইতে পারি, তাহাকেই শারীরবিদ্গণ পেশীর অনুভূতি বা kinaesthetic sensation নাম দিয়াছেন। এই অনুভূতি আছে বলিয়াই, অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া আমরা হাত দিয়া মুখে খাদ্য তুলিয়া লইতে পারি; ইচ্ছা করিলে হারমোনিয়ম্ বা পিয়ানো-যন্ত্রের ঠিক্ পর্দ্দাটিতে আঙ্গুল লাগাইয়া গান বাজাইতে পারি। লিখন, চিত্রাঙ্কন, সীবন প্রভৃতি কার্য্যে কি প্রকার জোরে আঙ্গুল চালাইতে হইবে, তাহা বহিরেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটিই আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না, পেশীর অনুভূতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেয়। দেহের মাংসপেশী যখন জরাপ্রযুক্ত বা অপর কোনো স্নায়বিক ব্যাধিতে এই বোধশক্তি হারাইয়া ফেলে, তখন আমাদের কি প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই অবস্থায় হাত পা আমাদের বশীভূত থাকে না,—লেখা, খেলা, চিত্রাঙ্কন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ দেহস্থ মাংসপেশীর এই অনুভূতিকেও একপ্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের কোঠায় ফেলিতে চাহিতেছেন।

তিন-পায়াযুক্ত টেবিলকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইবার জন্য কাঠের মিস্ত্রীকে অনেক হিসাবপত্র করিতে হয়; যাহাতে সমগ্র জিনিসটার ভারকেন্দ্র পায়া তিনটির ভিতরে পড়ে, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হয়; নচেৎ টেবিল উল্‌টাইয়া পড়ে। দুইটি পায়া দিয়া কোনো জিনিষ নির্ম্মাণ করা আরো কঠিন। যদি সুকৌশলে কেহ দুই-পায়া টেবিল নির্ম্মাণ করে, তবে সেটিকে খাড়া রাখা দায় হইয়া পড়ে; কোনা-দিকে একটু অধিক চাপ পাইলেই তাহা উল্‌টাইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মানুষ দিবারাত্রি কেবল দুই পায়েই ভর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে; কেবল বেড়ানো নয়,—কেহ দৌড়াইতেছে, কেহ লাফাইতেছে, কেহ হেলিয়া-দুলিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে চলিতেছে, কিন্তু কেহই দুই-পায়া টেবিলের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, মাথাটাকে উন্নত রাখিয়া ও পায়ের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইবার আমাদের একটা বিশেষ শক্তি আছে; কিন্তু এই শক্তিকে প্রয়োগ করিবার জন্য আমাদিগকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। শরীরটা কোন্ দিকে

হেলিয়া পড়িল, তাহা শরীরই বুঝিয়া লয় এবং খাড়া থাকিবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা শরীর নিজেই করে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় এই কার্য্যের সাহায্য করে না, আমাদের দেহাভ্যন্তরেরই কোন যন্ত্র দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখে। সুতরাং দেহের সাম্যাবস্থার জ্ঞানটিকেও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করা প্রয়োজন। যে ইন্দ্রিয় অবস্থা-বিচার করিয়া দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখে, শারীরবিদ্‌গণ প্রাণীদেহে তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। কর্ণকে আমরা কেবল শব্দগ্রহণের যন্ত্র বলিয়া জানি; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়; যে ইন্দ্রিয় প্রাণীর দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখে, তাহাও কর্ণে অবস্থিত। দীর্ঘকাল নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করিয়া গমন করিলে, মাথাঘোরা প্রভৃতি যে সকল পীড়া দেখা দেয়, তাহা ঐ অন্তরেন্দ্রিয়টিরই বিকৃতির ফলে ঘটিয়া থাকে। কর্ণে আঘাত লাগিলে বা তাহার ভিতরে কোনো পীড়া দেখা দিলে, মাথাঘোরা প্রভৃতি যে উপসর্গের উৎপত্তি হয়, ইহাও কর্ণস্থিত অন্তরিন্দ্রিয়টিরই বিকৃতির ফল বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণীর অভিব্যক্তির পরম সহায় হইলেও, দেহরক্ষার জন্য তাহাদের প্রয়োজন খুব অধিক নয়। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিহীন প্রাণী অদ্যাপি অনেক দেখা যায়। ইহারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছে। অন্তরেন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব না থাকিলে প্রাণীর প্রাণধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িত।

বুদ্ধ ও সংঘ

[শ্রীশরৎকুমার রায়]

বুদ্ধ-শিষ্যের তিনটি আশ্রয়। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। সাধন-জীবনের আরম্ভেই তিনি প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপান, অপরাহ্ণ ভোজন, নৃত্যগীত, মাল্যধারণ, গন্ধদ্রব্য-লেপন, কোমল-শয়ন এবং স্বর্ণারৌপ্য-প্রতিগ্রহ—এই দশটি বর্জ্জনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দশটি "শীল" তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন। দুঃখ-মোচনের নিমিত্ত বুদ্ধ-শিষ্য এই যে সাধনা গ্রহণ করেন, ইহা গভীর সংযমের সাধনা।

লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ স্বয়ং এই দুঃখ-মুক্তির সাধনা আপন জীবনে আচরণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধিলাভের পরে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার সদ্ধর্ম্মের অমৃতবাণী লোক-সমাজে প্রচার করিয়া আপন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। শিষ্যদগকে তিনি পদে-পদে সংযমের সূত্রে বাঁধিতেন, তথাপি দলে দলে লোক তাঁহার শরণ লইয়াছিল কেন? বুদ্ধ তাঁহার জীবনে কি লাভ করিয়াছিলেন? এবং তাঁহার পুণ্যপ্রভাব যে মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মণ্ডলী কোন্ লাভের আশায় সাংসারিক ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিল?

মানব-জীবনে দুঃখ আছে, তাহা একান্ত সত্য; এবং সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য গভীর সংযমের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহাও সত্য। এই অপরিহার্য্য দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাপুরুষ যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কি কেবল বাসনা বিলোপের সাধনা? বোধি লাভ করিয়া তিনি অমৃত বোধিমণ্ড পান করিয়াছেন। এই নির্ব্বাণ বা অমৃতলাভের নিমিত্তই তিনি দুঃখের মূলীভূত কারণ এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন,—

"জিঘচ্ছা পরমায়োগা সঙ্খারা পরমা দুখা"

গৃধ্নুতা পরম রোগ এবং রূপবেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই স্কন্ধগুলিই পরম দুঃখ। দুঃখের তথ্যটি যখন বোধগম্য হয়, তখনই দুঃখের উপশম হয়। ধম্মপদে উক্ত আছে, "এতং ঞাত্বং যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং" এই তত্ত্ব বুঝিয়াই পণ্ডিতেরা পরম সুখ লাভ করেন। ধম্মপদ বলেন,—

আরোগ্যা পরমলাভা সন্তুট্ঠী পরমং ধনং
বিস্সাস পরমা ঞাতী নিব্বানং পরমং সুখং

"আরোগ্য পরমলাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্ব্বাণ পরম সুখ।"

বুদ্ধ আপনার জীবনে এই পরম সুখ লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখোপশমে তিনি এমন সদাপ্রসন্ন সৌম্য কান্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া দর্শকমণ্ডলের হৃদয়ই শ্রদ্ধায় অবনত হইত। ঋষিপত্তনে আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার পঞ্চ শিষ্য পণ করিয়াছিলেন, গৌতমকে কিছুতেই গুরু বলিয়া সম্মান করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন না; তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মস্তক আপনা-আপনি অবনত হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্ব্বে গৌতম যখন একটি মহাভাবের প্রবল প্রেরণায় অন্তহীন উন্মুক্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রবল সত্যনিষ্ঠা এই পঞ্চ শিষ্যকে আকর্ষণ করিয়াছিল। নৈরঞ্জনা-তীরে উরুবিল্ববনে তপশ্চর্য্যার সময়ে তাঁহারা গৌতমের সেবা করিয়াছেন। অতঃপর যখন কৃচ্ছ্রসাধনা ত্যাগ করিয়া তিনি নিয়মিত পান-আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্যেরা তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপত্তনে গমন করেন।

শিষ্যেরা বিমুখ হইয়া গুরুকে ছাড়িয়াছিলেন বটে, গুরু কিন্তু অমৃতমণ্ড পান করিয়া তাহা একাকী গোপনে সম্ভোগ করিতে পারিলেন না,—ক্ষুধার্ত্ত শিষ্যদের সন্ধানে ঋষিপত্তনে আসিলেন। অনন্যসুলভ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া তিনি অমৃত পরিবেশনের নিমিত্ত শিষ্যদের সম্মুখে এমনিভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের মনের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা শূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহারা বুদ্ধকে ও ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সত্যের পতাকাহস্তে এই যে পঞ্চ বীর সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাঁদের নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিক, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

এই পাঁচটি সত্যানুরাগী সাধককে লইয়া বুদ্ধের আশ্রয়ে আপনা-আপনি যে মণ্ডলীর সূত্রপাত হইল, সেই মণ্ডলীটি একটু বাড়িয়া উঠিয়াই "সংঘ" নাম ধারণ করিয়াছিল। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া

দানা বাঁধিয়া এই দলটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল ? মহাপুরুষের অন্তর্নিহিত অপার প্রেমই নিঃসন্দেহ সেই মিলন সূত্র। এই প্রেমিক মহাত্মার মধুর ব্যবহারে, মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়াই, অনুগত শিষ্যেরা পরম সুখ নির্ব্বাণলাভের সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংঘের উদ্ভবকালে বুদ্ধের শিষ্যেরা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি প্রেমবান্ ও প্রাণবান্ শিক্ষক ;—শুষ্ক শাস্ত্র দিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান নহেন। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাণী কি, ব্যবহার কি, মানুষের সহিত এবং সমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি, লোক শিক্ষক বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের মূর্ত্তিমান সমাধান ছিলেন।

নির্ব্বাণের সুখ কি গভীর, কেমন পরিপূর্ণ—তাহা বুদ্ধের জীবনে একান্ত সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেশ দেশান্তরের সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ে যে অসীম করুণা ছিল, সেই করুণাই তাঁহাকে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। "সকলের দুঃখ দূর হউক, সকলে সুখী হউক" ইহাই তাঁহার সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানানলে তিনি অবিদ্যা ভস্মীভূত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, এমন নহে ; "জগতের সকল জীব সুখী হউক" এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা তাঁহার অন্তর-বাহির নিঃসন্দেহ প্রেমের পুণ্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সাধন সংগ্রামে এই মৈত্রীবলেই তিনি জয়লাভ করিয়া অমৃত লাভ করিয়াছিলেন।

"মৈত্রী বলেন জিহ্বা পীতো মেহ স্মিমৃতমণ্ড"

বিনয়পিটকে মহাবগ্গে বোধিলাভের পরে মহাপুরুষ বুদ্ধ তাঁহার নবলব্ধ মহাসত্য কিরূপে সম্ভোগ করিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুমমূলে সত্যের ধ্যানেই নিমগ্ন ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহ অজপালের ন্যগ্রোধতরুতলে মুক্তির বিমল আনন্দ সম্ভোগে যাপন করিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দতরুমূলে তিনি তাঁহার আনন্দ অমৃতময়ী বাণীতে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "তাঁহারই বিজনবাস সুখকর, যিনি সত্য ও আনন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। ঈর্ষার অপনয়ন ও আত্মসংযমই সুখের কারণ। কাম ও অভিলাষের নিবৃত্তিই সুখ। অহং-বোধের বিনাশেই সুখ।" এই উদানটির মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণই বলিয়া থাকিবেন। তিনি যে সত্যলাভ করিলেন তাহা লোক-সমাজে প্রচার করিবেন কি না পঞ্চম সপ্তাহে এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সংশয় দূর হইবার পরে, তিনি যখন তাঁহার অমৃতমণ্ড সকলকে পান করাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, তিনি যেন উপনিষদের ঋষির ভাষারই কহিলেন,

"অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে; যাহাদের কাণ আছে, তাহারা শোন। শ্রদ্ধাদ্বারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।"

এই বাণী ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মের যে মূলতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিজের নূতন সৃষ্টি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার নিজের কথায়ই মনে হয় তিনি হারানো ধন খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। সুত্তপিটকে সংযুক্ত-নিকায়ে তিনি বলিয়াছেন,

"পার্ব্বত্য পথে চলিবার সময়ে কোন ব্যক্তি প্রাচীনকালের একটি পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথে প্রাচীনকালে কত লোক যাতায়াত করিত। সেই পথে চলিতে-চলিতে, তিনি সেকালের একটি পুরী দেখিলেন। মনোহর সে পুরী, তথাকার প্রাসাদে উদ্যান, কুঞ্জ, সরোবরও প্রাচীরে বেষ্টিত; রমণীয় সেই স্থান। তিনি এখন কি করিবেন? ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে কিম্বা রাজমন্ত্রীকে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন এবং সেই প্রাচীন পুরী আবার নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিবেন। তাহা হইলে, সেই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন নগর আবার ধনেজনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুগণ, আমিও সেইরূপ একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি; পুরাকালে মহাজ্ঞানীরা এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ভিক্ষুদের ও শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।"

এইখানে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল—বুদ্ধ যে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্ত্বের দিক দিয়া তাহার মধ্যে তিনি কোন মৌলিকতারই দাবী করিতে চাহেন না। প্রাচীন সুরায় নূতন পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মহাপুরুষ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহাদের দার্শনিক নানা মত সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। তত্ত্বের দিক দিয়া বুদ্ধ তাঁহাদেরই পন্থানুসরণ করিয়া থাকিবেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। পণ্ডিত-প্রবর মোক্ষমুলর ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন, Never in the history of the world had a scheme of salvation been put forth so simple in its nature, so free from any superhuman agency,—পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত বর্জ্জন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই।

পিটক অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এই মুক্তি বা নির্ব্বাণকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। (১) নির্ব্বাণ—শূন্য—বিনাশ—মহাবিনাশ। অহংবোধের বিলোপ-সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন। (২) নির্ব্বাণ এক পরম রহস্য—স্বয়ং বুদ্ধ ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নাই। (৩) নির্ব্বাণ মানবজীবনের গৌরবময়, সুখকর ও কল্যাণকর পরিণাম। এই সকল বিভিন্ন মতের কোন সমাধান আছে কি না, তাহার আলোচনা করিবার অধিকার বিশেষজ্ঞ সুধীবর্গেরই আছে—সুতরাং সেই আলোচনার দিকে আমরা যাইব না।

সাধারণ বুদ্ধিতেই এই কথা মনে হয়, বিশেষ একটি আনন্দের আকর্ষণ ভিন্ন মানুষ কোনখানে দল বাঁধিতে চায় না। মহাপুরুষ যখন তাঁহার নবলব্ধ সত্যপ্রচারের জন্য লোকসমাজে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, তখন তাঁহার চারিদিকে ধীরে-ধীরে দল জমিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার বাণী মনুষ্যকে নিঃসন্দেহ অতুল আনন্দ দান করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নাম করেন নাই, আত্মা-পরমাত্মার জটিল তত্ত্বকে একেবারে আমলই দিলেন না, অতিপ্রাকৃত কোন কিছুর কথা কহিলেন না; অথচ ছোট-বড়, উচ্চ নীচ সকলেই তাঁহার ধর্ম্মকে ও সংঘকে আগ্রহ সহকারে স্বীকার করিলেন।

সংঘের আদিম শিষ্যেরা তাঁহার কাছে কি পাইলেন? যাহা পাইলেন, তাহা আর যাহাই হৌক "শূন্য" নহে, "না" নহে। তাহা আশা ও আনন্দ, তাহা অভয় ও অশোক। শিষ্যেরা যাহা পাইলেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়; কিন্তু তাহা এমন, যাহার জন্য তাঁহারা অনায়াসে সাংসারিক সুখভোগ বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ঋষিরা যাঁহাকে বাক্যের মনের অগোচর বলিয়াছেন, সেই পরম সত্য মহাপুরুষ বুদ্ধের স্তব-শান্ত উপলব্ধির গোচর হইয়াছিলেন। এই সত্যলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন—"অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে" এবং পৃথিবীর নরনারী এই অমৃত লাভের জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম বরণ করিয়াছে।

মহাপুরুষেরা মানবজাতির হৃদয় সরোবরের প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল। তাঁহারা অম্লান জ্যোতিঃতে মানব-হৃদয়ে নিত্যকাল বিহার করিতেছেন। মানুষের মন-ভ্রমর গন্ধ, বর্ণ এবং মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া এই কমলই আশ্রয় করিয়া থাকে। মহাপুরুষ বুদ্ধ সকল মানবের এমনি আশ্রয়স্থল ছিলেন। সিংহলী কবি মেধাঙ্কর তাঁহার "জিন চরিত" গ্রন্থে এই মহাপুরুষকে "নিব্বানমধুরং" বলিয়াই প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

এই নির্ব্বাণ-মধু লাভ করিবার জন্য ভিক্ষুকে সকল জীবের সুখ ও কল্যাণ ভাবনা করিতে হইবে, তাঁহাকে বুদ্ধের অনুশাসন প্রসন্নমনে মানিয়া চলিতে হইবে; এইরূপ জীবন-যাপন করিতে করিতে যখন তাঁহার বাসনার উপশম হইবে, তখন তিনি সুখকর, শাশ্বত, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ধম্মপদে উক্ত হইয়াছে—

মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধ সাসনে
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং

নির্ব্বাণ-মধু বা অমৃত লাভের জন্য, বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যকে সাধনার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয়ের কল্যাণ-পন্থা। সাধককে প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে সংযত হইয়া পথ চলিতে হয়। এই চলার পথেও তিনি আনন্দলাভ করিয়া থাকেন:—

"নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো ধম্মপীতি রসংপীব"

"ধর্ম্মপ্রীতিরস পান করিতে-করিতে সাধক নির্ভীক ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। নিষ্পাপ হইবার জন্য সাধক যে মানস-সংগ্রাম করেন, সেই সংগ্রামে আনন্দ আছে; এবং তিনি যখন জয়লাভ করেন, সেই বিজয়-গৌরবেও আনন্দ আছে। সাধন-পথে প্রত্যহ আনন্দরস পান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত বিকশিত হইয়া উঠে। তিনি সকল পাপ পরিহার করিয়া সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন। তিনি যে সুখ লাভ করেন, তাহা ভোগের সুখ নহে,—ত্যাগের সুখ, সংযমের সুখ। এই সুখকেই পরম আনন্দ বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনার শেষেই তিনি "নিব্বাণং পরমং সুখং" লাভ করেন। নির্ব্বাণ ও বিশ্বমৈত্রীর বক্তা ও প্রচারক ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে অষ্টাঙ্গিক সাধনা ও ধ্যানের কথা শুনাইয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি তাঁহার সংঘের ভিক্ষুদিগকে সংঘের নিকটে, লোক-সমাজে এবং আপনাদের অন্তরে-বাহিরে সত্য হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু এমন করিয়া সকল দিক দিয়া সত্য হইয়াই পরিণামে বৃহৎ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

বিনয়-পিটকে ভিক্ষুজীবনের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী, আহার-বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি এমন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সেগুলি কেহ-কেহ বাহুল্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। সংঘের যখন উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সুদূর অতীতকালের সহিত আমাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র এমন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, এখন আমরা সেকালের সকল কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে, বুদ্ধের মতাবলম্বী প্রাচীন সংঘের মধ্যে সভ্যতার এমন একটি উজ্জ্বল ছবি দৃষ্ট হয় যে, সে ছবির গৌরব কখনো ম্লান হইবে না।

নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের বাসনা ছোটবড়, পণ্ডিত-মূর্খ, সাধু-অসাধু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্য্য-অনার্য্য সকলের মনেই স্বভাবতঃ জাগিয়া থাকে। বুদ্ধ এইজন্য তাঁহার সাধনার পথটি এমন সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, সেখানে কাহাকেও অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না। তিনি স্বয়ং যাহাদের কাছে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই অনার্য্য ও অশিক্ষিত; সুতরাং তিনি সোজা কথায়, সাধারণের ভাষায়, কখনো বা সরস আখ্যান সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যেরা যাহাতে কথাগুলি মনে রাখিতে পারে, সেইজন্য তিনি এক কথার পুনরুক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেই পুনরুক্তি সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ শ্রোতার কাছে তাহা অত্যাবশ্যক ছিল। সংঘে প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিয়া, তিনি তথায় শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান যাহাদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা শোকে-তাপে জর্জ্জরিত বলিয়াই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া সংঘে প্রবেশাধিকার পাইলেই, কেহ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের হাত এড়াইলেন—এমন হইতেই পারে না। তাঁহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। সাধনার প্রভাবে একদিন বিষয়-বাসনা সংযত করিয়া তিনি উপশান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সেদিন তাঁহার দেহ শান্ত, বাক্য শান্ত ও চিত্ত শান্ত হইবে।

কিন্তু এই বাঞ্ছিত জীবন লাভের পূর্ব্বে সংঘের ভিক্ষু সাধারণ মানুষমাত্র; সুতরাং তাহার সাধনার পথের সমস্ত বাধা তাহার নিকটে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছেই। ছোট-ছোট দুর্ব্বলতা-

গুলি মানুষকে কতখানি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে-লোকশিক্ষক বুদ্ধ তাহা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই, তিনি গৃহত্যাগী ভিক্ষুককেও আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, কোন দিক দিয়া বিন্দুমাত্র অশিষ্ট বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিতেন না। ভিক্ষুর জীবনে কোন কার্য্যে শিথিলতা বা নিরুদ্যম প্রকাশ পাইবে না। ভিক্ষুকে সংঘের ও সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই সমভাবে ভদ্র হইতে হইবে।

ধর্ম্মনৈতিক উচ্চ উপদেশের সঙ্গে-সঙ্গে ভিক্ষুকে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, কোন ভিক্ষুর প্রতি দুর্ব্বাক্য-ব্যবহার, কাহাকেও নিন্দা করা, কাহারও প্রতি অযথা দোষারোপ, ভিক্ষুমণ্ডলীর সহিত অকারণ বাগ্‌বিতণ্ডা বা ছলনা, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও সংঘের আবাসস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা, কিংবা আঘাত করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যখন অপর ভিক্ষুরা কলহ করেন, তিনি আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের বিবাদ শুনিবেন না। কোন কার্য্যের আরম্ভে তিনি সম্মতি দিয়া পরে কখনো তাহাতে আপত্তি তুলিতে পারিবেন না। সংঘের ভিক্ষুরা যখন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সম্মিলিত হইবেন, তখন তিনি নিজের মত না জানাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। যাহাতে সংঘে ভিক্ষুদের মধ্যে ভেদ-সংঘটন হইতে পারে, তিনি স্বয়ং এমন আচরণ করিবেন না, কিম্বা অন্য কাহার দৃষ্টি তেমন কোন বিষয়ে আকর্ষণ করিবেন না।

সংঘের সমস্ত দ্রব্যাদি সংঘবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি। সেইগুলি রক্ষার সম্বন্ধে ভিক্ষুকে উদাসীন হইলে চলিবে না। শয্যা, আসন, পীঠ প্রভৃতি কোন জিনিষ যদি তিনি রৌদ্রে কিম্বা বাতাসে বাহির করেন, কিম্বা অন্যের দ্বারা বাহির করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেগুলি তুলিয়া না রাখিয়া, কিংবা তোলাইবার ব্যবস্থা না করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। সংঘের অভ্যন্তরস্থ গৃহের শয্যা ও আসনগুলির উপর ধপাস্ করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন বা উপবেশন নিষিদ্ধ। এইরূপ করিলে দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত গৃহ শ্রীহীন হইবার কথা।

গৃহত্যাগী ভিক্ষুকে তাঁহার বৃহৎ ধর্ম্মপরিবারের মধ্যে এইরূপ সংযত ও শিষ্ট হইতে হইবে। তাঁহার আহার প্রণালীও অশোভন বা অসংযত হইলে চলিবে না। ছোট গোলাকার গ্রাস তুলিয়া তিনি মুখে দিবেন, আহার্য্যদ্রব্য মুখের কাছাকাছি আসিবার পূর্ব্বেই মুখব্যাদান করিবেন না। খাবার জিনিষগুলি সমস্ত হাতে-মাখা, সমস্ত হাতটা মুখের ভিতর প্রবেশ করান, গ্রাসগুলি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া, খাইতে-খাইতে কথা বলা, গ্রাসগুলি মুখে পূরিয়া অনাবশ্যক নাড়াচাড়া, গাল ফুলান, আহার-সময়ে হাত-ঝুলান, ভাত ছড়ান, জিভ বাহির করা, হুসহাস্ শব্দ করা, আঙ্গুল, ওষ্ঠ, অধর কিম্বা ভোজনপাত্র লেহন, এবং উচ্ছিষ্ট হাতে জলপাত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

জনপদে যাতায়াত বা বাস করিবার সময়েও ভিক্ষুকে সর্ব্বতোভাবে ভদ্র হইতে হইবে। পরিশুদ্ধ বহির্ব্বাস ও অন্তর্ব্বাস দ্বারা তিনি সকল অঙ্গ আবৃত করিবেন, তাঁহার হাঁটু ও নাভি দেখা যাইবে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত হইবে; তিনি অধোদৃষ্টিতে চলিবেন। কি চলিবার সময়ে, কি স্থিরভাবে অবস্থান সময়ে—তিনি কখনো উচ্চহাস্য করিতে পারিবেন না, এবং মৃদুকণ্ঠে কথা কহিবেন। তাঁহার পক্ষে এই সময়ে, শরীর, মস্তক ও বাহু দোলান নিষিদ্ধ। কটিদেশে হাত রাখিয়া, কিম্বা মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া তিনি জনপদে বিচরণ করিতে পারিবেন না।

লোকালয়ে, নরনারীর সম্মুখে, তিনি সোজা হইয়া বসিবেন; কাৎ হইয়া, চিৎ হইয়া, বা জানুর উপর চীবর তুলিয়া বসিবেন না। তাঁহাকে পিণ্ডপাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদরপূর্ব্বক প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে পিণ্ডদাতা গৃহীর অসুবিধা ঘটিতে পারে, কিম্বা ভিক্ষুর মুখরোচক উপাদেয় আহার্য্য গ্রহণের প্রতি লালসা বাড়িতে পারে—ভগবান্ বুদ্ধ এমন অসংযত ব্যবহারের কদাচ প্রশ্রয় দিতেন না। নিয়ম আছে, সুস্থকায় ভিক্ষুরা পান্থশালায় একবেলামাত্র আহার করিতে পারিবেন, দিবা দ্বিপ্রহরের পরে পিণ্ডগ্রহণ নিষিদ্ধ, দল বাঁধিয়া পাঁচছয়জনে কাহারো গৃহে ভিক্ষায় যাইবেন না। গৃহী যেমনভাবে যেটির পরে যাহা খাইতে দিবেন, ভিক্ষুরা তেমনি আহার করিবেন, "আগে ইহা চাই" এমনভাবে ফরমাস করিতে পারিবেন না। সুস্থকায় ভিক্ষু কখন মধু নবনীতাদি চাহিয়া খাইতে পারিবেন না। কোন ভিক্ষু ভোজন সমাপ্ত করিবার পরে, অন্য কোন ভিক্ষু তাঁহাকে আবার আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না। সময়ান্তরে আহার করিবার জন্য ভিক্ষু কোন খাদ্যদ্রব্য সরাইয়া রাখিতে পারিবেন না; কোন গৃহী ভিক্ষুকে যত খুসী আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও, তিনি দুই তিন পাত্রের বেশী লইবেন না এবং ঐ খাদ্য অন্য ভিক্ষুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন। কোন ভিক্ষু ভোজবেলায় বলপূর্ব্বক কোন গৃহীর ঘরে প্রবেশ করিবেন না।

ভিক্ষুরা যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে বিনা প্রয়োজনে উপদেশ দিয়া বেড়াইবেন—লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের অনুশাসন তেমন হইতেই পারে না। যে ব্যক্তি বিলাসে মগ্ন, উপদেশ পাইবার নিমিত্ত যাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া উঠে নাই, অথবা যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ধর্ম্মকথা শুনান নিষিদ্ধ। ভিক্ষু কখনও ছত্রধারী, যষ্ঠিধারী, অস্ত্রধারী, পাদুকাপরিহিত, যানারোহী, শায়িত, হেলান দিয়া উপবিষ্ট, কিম্বা উষ্ণীষধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন না; পথিমধ্যে ধর্ম্মকথা শুনান বিধেয় নহে।

ছোটবড় এমন অনেক বিধি-নিষেধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মানিয়া চলিতে হইত। বৌদ্ধ গৃহী বা শ্রাবকেরও প্রতিপাল্য নিয়মের অভাব নাই। বৌদ্ধসাধনা বাসনা-বর্জ্জনের সাধনা হইলেও, প্রকৃত বৌদ্ধ ঘরে বাহিরে বিহারে-জনপদে কোনখানেই শিষ্টতা, ভদ্রতা ও লৌকিকতা বর্জ্জন করিতে পারেন না। বৈরাগ্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি সংসারের সাধারণ লোকের সুখ, সুবিধা উপেক্ষা করিয়া, সমাজের উপদ্রবের কারণ হইবেন, এমন ব্যবহার করিলে—তিনি অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতেন।

বৈরাগ্যের সাধক হইলেও বুদ্ধ-শিষ্যের আচরণে কোন শিথিলতা, অশিষ্টতা ও জড়তা স্থান পাইত না। ইহারই ফলে সংঘের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ-শিষ্যদের শিক্ষণীয় শিষ্টতা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট অন্ধকারমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও, উপেক্ষণীয় নহে *

দুগ্ধজাত খাদ্য
ঘোল

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন, বি-এল]

দধি মন্থন করিয়া উহা হইতে উহার মেদময় অংশ বা মাখন তুলিয়া লইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ ঘোল বলিয়া থাকি। গুরুপাক দধি যাঁহাদের সহ্য হয় না, তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত লঘুপাক ঘোল ব্যবহার করা উচিত। উদরাময় রোগে দধি সহ্য হয় না, কিন্তু ঘোল সহ্য হয়। রক্তামাশয়, আমাশয়, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি অন্ত্রঘটিত রোগে ঘোল কেবল সুপথ্য নহে, একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘোলের মধ্যস্থিত দধিবীজাণু এই সমুদয় রোগবীজাণু ধ্বংস করে। দধিও দুগ্ধের ন্যায় ঘোলও আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে। দুগ্ধ অপেক্ষা ঘোল নিরাপদ; কারণ দুগ্ধের ন্যায় ঘোলের মধ্যে টাইফয়েড্, যক্ষ্মা, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের বীজাণু প্রায়ই থাকে না। ঘোল ব্যবহার করিতে হইলে, বাজারের ঘোল না কিনিয়া, গৃহে দুগ্ধ হইতে দধি বসাইয়া, তাহা হইতে সদ্য ঘোল প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

খাঁটি গোদুগ্ধ, উত্তম গব্য দধি এবং ছানার জলের (whey) উপাদানসমূহের তুলনায় উত্তমরূপে মথিত এবং মাখন-তোলা, ঘোলের উপাদানসমূহ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ছানার জলের বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

দধির মধ্যে দুগ্ধের যে সমুদায় উপাদান আছে, ঘোলের মধ্যেও সে সমুদায় ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; কেবল মাখনের অংশ অতিশয় অল্প। উত্তমরূপে মথিত ঘোলের মধ্যে শতকরা ½ হইতে ১ অংশ পর্য্যন্ত মাখন থাকিতে পারে। ঘোলের এই মেদ-কণিকাগুলি আবার দুগ্ধ এবং দধির মেদ-কণিকা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। এই সমুদায় কারণে দুগ্ধ এবং দধি অপেক্ষা ঘোল বিশেষ লঘুপাক। দুগ্ধ এবং দধি অপেক্ষা ঘোলের মধ্যে মেদময় পদার্থ বা মাখন কম থাকিলেও, উহা পুষ্টিকারিতায় ন্যূন নহে। তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। মন্থন-দণ্ডের আলোড়নে ঘোলের মেদ-কণিকাগুলি সূক্ষ্মতম কণিকায় পরিণত হওয়ায়, উহা অতি শীঘ্র রক্তমধ্যে শোষিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত দুগ্ধ অথবা দধির মধ্যস্থিত মেদময় পদার্থ অপেক্ষা ঘোলের মধ্যস্থিত মেদময় পদার্থ অধিকতর শক্তিশালী। ঘোলের পনির কণিকাগুলির পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। পরন্তু, ঘোলের অতি সামান্য অংশই পরিপাকযন্ত্রসমূহ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মলাকারে বহির্গত হইয়া যায়। এই সমুদায় কারণে দধি প্রভৃতি অপেক্ষা ঘোল কম সারবান হইলেও, অধিকতর বলকারক। ইহাতে দধির গুণ সমস্তই বর্ত্তমান আছে, অধিকন্তু, তাহার সহিত তাড়িতানুকরণ (ironisation) নামক এক প্রকার নিগূঢ় বিশেষ ক্রিয়ার গুণে ঘোলের সারকণিকাগুলি অতি সহজে রক্তে পরিণত হওয়ায় উহা অধিক উপকারী। ঠিক এই কারণে খাঁটি দুগ্ধ অপেক্ষা মথিত মাখন-তোলা দুগ্ধ অধিকতর লঘুপাক এবং উপকারী। পল্লীবাসিনী বৃদ্ধাগণ দুগ্ধের বাটি, ঔষধের খল প্রভৃতি ধুইয়া খাইবার যে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাহার মূলেও এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এইরূপ বাটি ধোয়া জল, খল ধোয়া ঔষধ প্রভৃতির মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম দুগ্ধ অথবা ঔষধের কণিকাগুলি অতি শীঘ্র রক্তমধ্যে শোষিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা অবিলম্বে উপকার দর্শে।

উপাদান	খাঁটি দুগ্ধ	উত্তম দধি	উত্তম ঘোল যাহা টক নহে	ছানার জল	মাখন তোলা দুগ্ধ
পনিরময় পদার্থ ও দুগ্ধলাল প্রভৃতি অন্নসার	৪'০২৮	৪'৭৭	৪ ০৬	'৮৫	৩'১১
মেদময় পদার্থ	৩ ৫০	৩'৫৭	'৯৩	'২৩	'৭৫
লবণময় উপাদান	'৯৮	'৬২	'৬৭	'৬৬	'৭৪
দুগ্ধ-শর্করা	৩'৯০	২'৮০	৩'৭৩	৪ ৭০	৪'৭৪
দুগ্ধাম্ল (lactic acid)	নাই	'৪০	'৩৪	'৩২	নাই
জল	৮৭'৩৪	৮৭'৮৪	৯০ ২৭	৯৩'২৪	৯০ ৬৬
মোট	১০০'০০	১০০ ০০	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চতর ক্রমগুলি এইরূপে অধিকতর শক্তিশালী। অনেকের দুগ্ধের প্রতি একপ্রকার বিতৃষ্ণা আছে; অনেকে আবার দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারেন না। যাঁহারা এরূপ দুগ্ধ সহ্য

* ধম্মপদ, Sacred Books of the East, Vols. xiii. and xi. অবলম্বনে লিখিত।

করিতে পারেন না তাঁহাদের দুগ্ধ ব্যবহার না করিয়া সহমত দধি অথবা ঘোল ব্যবহার করা উচিত। যাঁহারা ঘোল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পাকস্থলীকে দুগ্ধের পনিরময় অংশ জমাইবার জন্য খাটিতে হয় না; উহা জমান অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত অবস্থাতেই পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত দুর্ব্বল-পাকস্থলীবিশিষ্ট অজীর্ণ রোগী দুগ্ধ ব্যবহার করিলে যে অসুস্থতা বোধ করেন, ঘোল ব্যবহার করিলে তাহা আদৌ অনুভব করেন না। ঘোল যে জরা বার্দ্ধক্যনিবারক এবং বহু ব্যাধিনাশক এ কথা, কি প্রাচ্য ঋষিকল্প চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতাগণ, কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতাগণ, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। দধি জমাট বাঁধিবার পর, অল্প সময় মধ্যে উহা মন্থন করিলে, যে ঘোল প্রস্তুত হয়, তাহাই গুণে শ্রেষ্ঠ। উহা টক নহে সুস্বাদু। এইরূপে ঘোলের মধ্যস্থিত রোগবীজাণুনাশক উদ্ভিদাণুগুলি সতেজ অবস্থায় থাকে বলিয়া, ইহা সমধিক উপকারী, অল্প টক হইলে ঘোলে জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সামান্য পরিমাণে লবণ ও চিনি দিলে অতিশয় সুতার হয়। কিন্তু অতিশয় টক ঘোল আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, ঘোলের মধ্যস্থিত অপেক্ষাকৃত বড় বড় পনির ও মাখনের কণিকাগুলি বাহির হইয়া যায়; এরূপ ঘোল অন্ত্রপ্রদাহ এবং টাইফয়েড্ জ্বরে সুপথ্য। এল্‌বুমেনোরিয়া বা অণ্ডলালমূত্র প্রভৃতি মূত্রাশয়ের (kidney'র) রোগে ইহা একমাত্র প্রশস্ত পথ্য এবং ঔষধও বটে। ইহার সমীকরণ-ক্রিয়া অতি সহজে সমাধা হয় বলিয়া, খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ বাহির করিয়া দিবার জন্য মূত্রযন্ত্রকে কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইতে হয় না, বরং উহা যথেষ্ঠ বিশ্রাম পাইয়া থাকে। অধিকন্তু ঘোলের জলীয়াংশ রোগোৎপন্ন দূষিত পদার্থগুলি শরীর হইতে ধৌত করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে শরীর রোগমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে থাকে। এরূপ স্থলে, যে ঘোল আদৌ টক নহে, এরূপ সদ্য ঘোল অথবা মাখন-তোলা মথিত দুগ্ধ একমাত্র পথ্যস্বরূপ ব্যবহার করা উচিত। খড়ির গুঁড়া দেওয়া দুগ্ধের দধি হইতে প্রাপ্ত ঘোলের মধ্যে ল্যাক্‌টোফস্‌ফেট্ অব লাইম নামক এক প্রকার চূর্ণ, ফস্‌ফরাস্ ও দুগ্ধাম্লঘটিত লবণময় উপাদান জন্মে। উহা আমাদের স্নায়ুমণ্ডল মস্তিষ্ক প্রভৃতির ক্ষয়পূরণ ও গঠনের সাহায্য করে বলিয়া স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণযুক্ত যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ঐরূপ ঘোল বিশেষ হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা—এই পাঁচ প্রকার ঘোলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ ঘোল ও তাহার গুণাবলির অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

ঘোলের প্রকারভেদ।

ঘোলস্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছি কাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতস্তসরোদকম্॥
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিদর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুর বারিকা॥

অর্থাৎ প্রকারভেদে ঘোল পঞ্চবিধ, ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে ঘোল; সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে মথিত, চতুর্থাংশ জলের সহিত মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে তক্র; অর্দ্ধাংশ জলের সহিত মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে উদশ্বিৎ এবং প্রচুর পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে ছচ্ছিকা বলে।

প্রকারভেদে ঘোলের গুণ ও ব্যবহার।

ঘোলস্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ॥
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্॥
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ।
কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্।
উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্॥
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রম তৃষাহরী।
বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥

চিনিসংযুক্ত ঘোল, দধি শর্করা কর্পূর লবঙ্গাদি মসলা প্রভৃতি সংযোগে প্রস্তুত রসালা* নামক পানীয়ের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিজনক, অগ্নিদীপক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, মধুর ও শীতল; এবং রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ ও সর্দ্দিনাশক। ঘোল বায়ু ও পিত্তনাশক, মথিত কফ ও পিত্তনাশক, তক্র ধারক, কষায়াম্ল মধুর রস, সুস্বাদু, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক। ইহা ধারক এবং লঘুপাক বলিয়া গ্রহণী প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে হিতকর এবং সুস্বাদু হইলেও পিত্ত-প্রকোপক নহে; তক্র কষায়, উষ্ণ, সংকোচক এবং রুক্ষ বলিয়া কফনাশক। উদশ্বিৎ কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অতিশয় শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা শীতল, লঘু, পিত্তশ্রম ও পিপাসানাশক। ইহা বায়ুনাশক ও কফবর্দ্ধক; কিন্তু লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপক। সুতরাং সর্ব্ববিধ ঘোলের মধ্যে তক্রই শ্রেষ্ঠতম। তক্র-সমুদ্ধৃত মাখনের পরিমাণানুসারে ইহার গুণের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। যে তক্রের মাখন সম্যক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

সমুদ্ধৃত-ঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্ গুরু বৃষ্যং কফাপহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্॥

যে তক্র হইতে ঘৃত সম্যক্‌রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অতিশয় হিতকর ও লঘু। যে তক্র হইতে ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে,

---

* কথিত আছে ভোজনবিলাসী ভীম এই সুমধুর রসালার উদ্ভাবন-কর্ত্তা এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ছিল।

তাহা উহা অপেক্ষা অধিক গুরুপাক, শুক্রজনক এবং কফবর্দ্ধক। যাহা হইতে ঘৃত আদৌ উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরুপাক, পুষ্টিকর এবং কফবর্দ্ধক।

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥
তত্তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দিপ্রসেকবিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শোমূত্রগ্রহভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্॥

অর্থাৎ শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে, অরুচিতে এবং স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। ইহা বিষদোষ, বমি, প্রসেক, (লালাস্রাব) বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদোরোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, জলোদরি, অরুচি, শ্বেতরোগ, কুষ্ঠ, কোষ্ঠগত রোগ, শোথ, পিপাসা এবং ক্রিমি বিনাশ করিয়া থাকে।

ফলতঃ ঘোলকে অমৃত বা Elexir of Life বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঋষিকল্প ভাবমিশ্র বলেন—

ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥

অর্থাৎ তক্রসেবনকারী ব্যক্তিদিগকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না, অথবা কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। কথিত আছে, অমৃত যেরূপ দেবগণের সুখাবহ, তক্র সেইরূপ মানবগণের সুখপ্রদ। ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? সদ্য দধির মধ্যে তাহার চতুর্থাংশ জল দিয়া উহা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লইলে এই তক্র প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভাষায় আদি নাটক

[শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ,]

২০৮৩ খৃষ্টাব্দ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনৈক সাহিত্যিক বলিতেছেন, "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলা জুয়াচুরি বিস্তর দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাঙ্গালা দেশের মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামক একজন কাব্যকার ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ঔপন্যাসিকের নামটা অত্যন্ত বেশী শুনা যায়। আমি গত ছয়মাসের অহোরাত্র গবেষণার ফলে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ প্রমাণে—(from external as well as internal evidence) পরিষ্কার-রূপে দেখাইয়াছি যে, উভয়ে একই ব্যক্তি।" শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু মহাশয় কল্পনায় যখন এই ছবি আঁকিতেছিলেন, তখন তিনি বোধ হয় ভাবেন নাই যে, 'Truth is stranger than fiction'।

১২৮৮ সালের 'কল্পনা' নামক পত্রিকার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন সম্বন্ধে লিখিত আছে—"যতদিন বাঙ্গালা নাটক থাকিবে, ততদিন তাঁহার নামের কিছুতেই লোপ হইবে না। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' বাঙ্গলার প্রথম নাটক, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন তাহার প্রণেতা"।

৩৫ বৎসর পার হয় নাই—১৩২১এর চৈত্রের 'নারায়ণে' শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তর্করত্ন মহাশয়ের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' বঙ্গভাষার আদি নাটক নহে; এবং গত বৈশাখের 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলিতেছেন যে, তাঁহার শোনা—'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন নহেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবে তাহা হইলে কুলীনকুলসর্ব্বস্বের রচয়িতা কে? এবং বঙ্গভাষায় আদি নাটকই বা কি?

অমৃতবাবু বলেন, তাঁহার ছেলেবেলা থেকে শোনা—পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত নাটক রচনা করিয়াছেন এবং বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া তাঁহারও সন্দেহ হয় যে, উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নয়। প্রথমতঃ ঐ বইয়ের বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটক এতটা সংস্কৃত ঘেঁসা নয়।

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পরবর্ত্তী নাটকেও সংস্কৃত-ভাঙ্গা শব্দ যথেষ্ট আছে; এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্বে 'বীরবলী' ভাষার অভাব নাই। তা'র পর, টুলো পণ্ডিত—চিরকাল সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়া আসিয়াছেন,—তিনি যদি সংস্কৃতের মায়াটা গোড়াতে একেবারে কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া থাকেন, সেটা কি একেবারে অস্বাভাবিক? আর, তখনকার দিনে কেই বা এই মায়াটা গোড়া হইতে একেবারে কাটাইতে পারিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী তাঁহার পরবর্ত্তী লেখার তুলনায় কি বেশী সংস্কৃত-ঘেঁসা নয়? অমৃতবাবুর দ্বিতীয় আপত্তি—'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি' এই ধরণের কবিতা তর্করত্ন মহাশয়ের অন্য কোন নাটকে পাওয়া যায় না। আমরা জানি, পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব প্রকাশিত হইবার বহুদিন পর অবধি জীবিত ছিলেন। অমৃতবাবুর মতে 'ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি'র রচয়িতা যদি তিনি হন, ত তিনিই বা কেন এক কুলীনকুলসর্ব্বস্ব লিখিয়া লেখায় ইস্তফা দিলেন? ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর তারিখে কেমব্রিজ হইতে মহামতি Cowell সাহেব তর্করত্ন মহাশয়কে যে পত্র লিখেন, তাহাতে আছে—"I remember, you published several interesting Nataks in Bengali when I was in Calcutta. I hope you still write Bengali poems for you used to be,

গৌড়দেশীয় কবীনাং মধ্যে চূড়ামণি স্বরূপঃ।"

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের রচয়িতা কে হওয়া সম্ভব—যিনি ভবিষ্যতে আর কলম ধরিলেন না সেই প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর—না, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বঙ্গদেশের কবিচূড়ামণি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন?

বসু মহাশয় আরও বলেন, কুলীনকুলসর্ব্বস্বে পটপরিবর্ত্তন নাই;

পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজি নাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে।

'নবনাটক' কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পরে রচিত;—এই নবনাটকে আমরা দেখিতে পাই, এক-একটী অঙ্ক শেষ হইলে, একটী করিয়া গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইল। ইংরাজি নাটকের বিভাগ কি এইরূপ? ইংরাজি নাটকের এক-একটী অঙ্ক কয়েকটি গর্ভাঙ্কের সমষ্টিমাত্র নয় কি?

অপরদিকে, যদি প্রমাণের জোর খুব বেশী না থাকে ত শোনা কথার অপেক্ষা লেখকের নিজের উক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। তর্করত্ন মহাশয়ের হরিনাভির বাটী হইতে কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি কাগজে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা আছে—

"সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্য-পদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

"১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।

"বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাখের বাটীতে অভিনীত হয়।

"রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৯ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

"নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯বার অভিনয় হয়।

"মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাটীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

"সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলানিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

"১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুদান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

"মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগ-বাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ...নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

"কেরলীকুসুম নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

"১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে অম্বাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।"

তা'র পর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক কি? 'নারায়ণে' ও 'বিজয়ায়' শরৎবাবু দেখাইয়াছেন, ৺তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জ্জুন এবং ৺হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' কুলীনকুলসর্ব্বস্বের একবৎসর পূর্ব্বে রচিত। ভদ্রার্জ্জুন বা ভানুমতী চিত্তবিলাসকে না হয় আদি নাটক বলিয়া স্বীকার করা গেল; কিন্তু উহারা নাটক কি না, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সাহিত্যিকেরা তাহার বিচার করিবেন; শুধু তৎকালিক সাহিত্যরথী-দিগের নিকট বঙ্গভাষার আদি নাটক বলিয়া কোন্ নাটক পরিগণিত ছিল, তাহাই এখানে নির্দ্দেশ করিব। নিম্নে প্রদত্ত certificateখানিও পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে।

THE BENGAL PHILHARMONIC ACADEMY.

PATRONS.

The Hon'ble Sir Ashley Eden. K. C. I. E.

Lieutenant-Governor of Bengal.

A. W. Croft. Esq. M. A.
Director of Public Instruction, Bengal.
Founder—Rajah Comar Sourindro Mohon Tagore,
Mus. Doc. Sangita-Nayaka.
Companion of the Order of the Indian Empire.
Diploma of Honour No. 14.

The Executive Council of the above named Academy has, at its sitting of the 9th March 1882, conferred upon Pandita Ramnarayan Tarkaratna of Harinavi the title of Kavyopadhayaya together with a gold Harakumar Tagore Kayura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Sourindramohon Tagore, Founder and President.

শ্রীচন্দ্রমোহন গোস্বামী Director.

Calcutta,
Pathuriaghata Rajbati
The 22*nd* August, 1882.

Baikunthanath Basu,
Honorary Secretary.

স্বর্ণকেয়ূরটি তর্করত্ন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নিকট এখনও আছে।

Academy যখন first writer of Bengali dramas in a systematic form বলিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে এই সনন্দ দেন, ভদ্রার্জ্জুন বা ভানুমতী-চিত্তবিলাস তখন কোথায় ছিল?

কীর্ত্তন

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ]

মম মানস-মাধবী-কুঞ্জে
(শ্যাম) বিহর গো নিশিদিন।
মোর পরাণ রাধারে পাগল করিয়া
বাজায়ো মোহন বীণ,
নাথ, বিহর গো নিশিদিন।

তব বীণার ছন্দে জাগিবে হিয়া,
উঠিবে কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া,
নয়ন-সলিলে যমুনা বহিয়া
লহরী উঠিবে ক্ষীণ—
তুমি বাজায়ো মোহন বীণ।

কবে বহিবে মলয় বায়ু মৃদুল
মর্ম্মরি' মন কদম্বকুল
মোর শ্রবণ অধীর পরাণ আকুল
চক্ষু তন্দ্রাহীন—
তুমি বাজাও মোহন বীণ।

আমি যতনে গেঁথেছি মালতী-মালা,
সাজায়ে রেখেছি অর্ঘ্য-ডালা,
কর গো নিখিল বিশ্ব আলা
কলঙ্ক-ধূলি-মলিন—
তুমি বাজাও মোহন বীণ।

যবে দিন-শেষে নামি' আসিবে নিশি,
নিবিড় জলদে ঘেরিবে দিশি,
আঁখির আলোক আঁধারে মিশি
পলকে হবে বিলীন—
তখন বাজায়ো মোহন বীণ।
মম মানস-মাধবী-কুঞ্জে
বিহর গো নিশিদিন।

বিশ্ব-কীর্ত্তি

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

অপ্রমেয় শক্তিশালী বীরপুরুষের জীবনে, বা কোন জাতির জীবনে, কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিলে—তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপনের জন্য মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃই অভিলাষ জন্মে। এইরূপ কীর্ত্তি চিহ্ন স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা জাতিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বিশ্বরাজ্যের সকল জাতি এবং সকল সমাজেই কখন-না-কখনও এমন কোন-না-কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহার চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য সেই সকল জাতির হৃদয়ে প্রবল বাসনা না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই। এইরূপে পৃথিবীর নানাস্থানে বহু স্তম্ভ, মন্দির, মিনার, টাওয়ার, মনুমেণ্ট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া এক একটি বিশেষ ঘটনার স্মৃতি মানব হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহামহা বীরপুরুষগণের সমরে জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত চিহ্নগুলিই সর্ব্বপ্রধান। কলিকাতার ময়দানে অক্টারলোনি মনুমেণ্ট, যুক্তরাজ্যের ওয়াসিংটন মেমোরিয়েল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কিন্তু কেবল যে অসাধারণ ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থই কীর্ত্তিমন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাও নহে; অনেক সময়ে খামখেয়ালি লোকের খেয়াল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেও কতকত উল্লেখযোগ্য স্মৃতি-চিহ্ন গঠিত হইয়া নানা স্থানে বিরাজ করিতেছে! আবার প্রিয়াবিরহ-বিধুর প্রেমিকেরা নিজনিজ প্রিয়জনের পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় এবং তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর প্রেম ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়েও অজস্র অর্থব্যয়ে এমন কীর্ত্তি চিহ্ন সকল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে, সেগুলি আজিও কৌতূহলী দর্শকের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছে। স্থলবিশেষে আবার প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার্থ রাজা-প্রজা সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিয়া এমন প্রাকারসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহা ক্রমে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য পদার্থসমূহের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সর্ব্ব-প্রকারের কীর্ত্তি মন্দির সকলের মধ্যে কয়েকটার বিবরণ অদ্য আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সকলের স্মৃতি-চিহ্ন বড় একটা দেখা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন দৃষ্ট হয়, দুই একটি ব্যতীত তাহার প্রায় সকলগুলিই ধর্ম্মোদ্দেশ্যে স্থাপিত। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ—এই তিন আমলে, ভারতেতিহাসের তিনটি স্বতন্ত্র যুগে—যুদ্ধ বিগ্রহ বড় অল্প হয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভারতের ইতিহাসে বহু যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল যুদ্ধজয় উপলক্ষে কেহ যে কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না; আর, করিয়া থাকিলেও, কালসংস্কারে সে সকল ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু এই সুবিশাল ভারতবর্ষে দেবমন্দির, মঠ, বিহার, স্তূপ, মসজিদ প্রভৃতির সংখ্যানির্ণয় করা দুরূহ। ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পঞ্চনদ প্রদেশের অন্যতম নরপতি অনঙ্গপাল মুসলমান-গণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার স্মৃতিস্থাপন জন্য একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্র এখন অবশিষ্ট নাই। কোথায় যে সেই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না; সেই স্মৃতি-স্তম্ভের কোন বিবরণই এখন পাওয়া যায় না; কেবল তাহার জনরব এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু অনঙ্গ-পালেরও সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লৌহস্তম্ভ এখনও দিল্লীর সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে। ভারত-বর্ষের লোকে যুদ্ধবিগ্রহে অপরাঙ্মুখ না হইলেও, এবং যুদ্ধে জয়লাভ গৌরবাত্মক বা সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন স্বর্গলাভের সোপান বলিয়া বিবেচনা করিলেও, তাহার জন্য

কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মলাভের অদম্য কামনায় প্রাণ মন ঢালিয়া তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালজয়ী ও অবিনশ্বর। উপরে যে অশোক-স্তম্ভের কথা বলিলাম, তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য এবং এক-একটী কারণে এক-এক শ্রেণীর লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

অশোক-স্তম্ভ

প্রথমতঃ ইহার প্রাচীনত্ব। মহারাজ অশোক খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৭২-২৩১ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং করিতে পারে, এমন উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত করিতে কতখানি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া বিংশ শতাব্দীর সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেরাও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালেও ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই; কারণ, এই স্তম্ভটী ভারতে বিজ্ঞানোন্নতির মূর্ত্ত সাক্ষীস্বরূপ দিল্লীর প্রান্তরে সগর্ব্বে এখনও দণ্ডায়মান।

তৃতীয়তঃ, স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ-লিপি প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে বহু অর্থ ও রহস্যপূর্ণ। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ চতুর্দ্দশটী আদেশ লিপিবদ্ধ করেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন
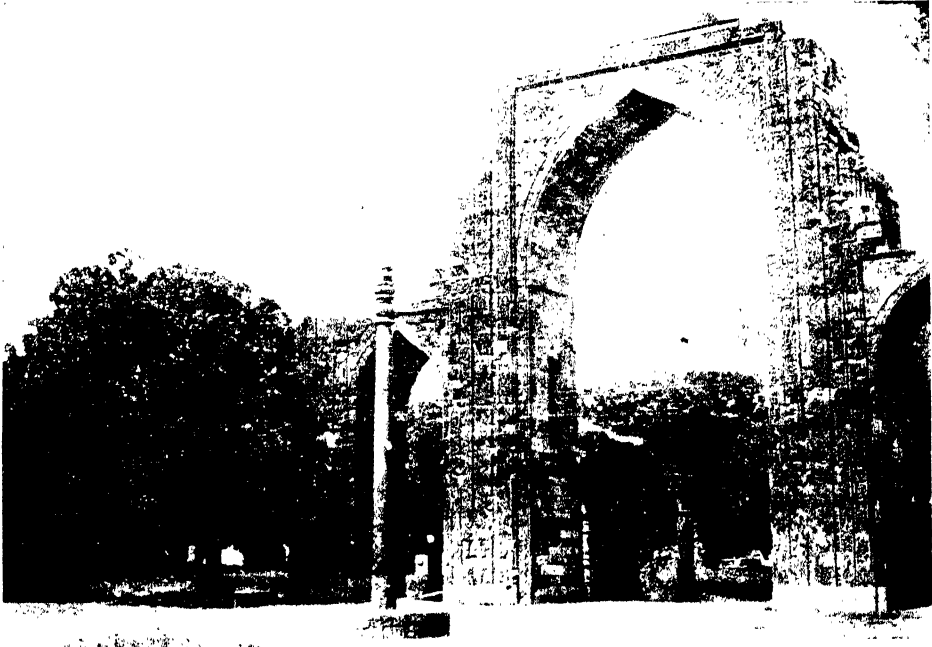
অশোক-স্তম্ভ—দিল্লী

স্তম্ভটীর বয়স ২০০০ বৎসরেরও অধিক। দ্বিতীয়তঃ স্তম্ভটী লৌহনির্ম্মিত; কিন্তু আজিও ইহার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই—২০০০ ষড়্‌ঋতু ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, অথচ ইহা কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার গাত্রে পালিভাষায় যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা এখনও বেশ সুস্পষ্টই রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং পরিধি দশ ফিট দশইঞ্চি। ইহা ঢালা লোহায় প্রস্তুত। এত প্রকাণ্ড স্তম্ভ ঢালাই করিতে কত বড় কারখানার প্রয়োজন, এবং ২০০০ বৎসরের প্রভাব ব্যর্থ স্থানে স্তম্ভগাত্রে ঐ আদেশগুলি উৎকীর্ণ করাইয়া প্রজাসাধারণকে ঐগুলি পালন করিতে উপদেশ দেন। দিল্লীর অশোক-স্তম্ভগাত্রেও ঐরূপ কতকগুলি আদেশ লিপিবদ্ধ আছে।

দিল্লীর পাঠান বাদশাহ ফেরোজ-শা দিল্লীর নিকটে ফেরোজাবাদ নামে একটী নগরের পত্তন করেন এবং যমুনা তীরবর্ত্তী তোপরা নামক স্থান হইতে ঐ স্তম্ভটি উঠাইয়া আনিয়া উক্ত ফেরোজাবাদ নগরের দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করেন। তদবধি উহা সেইখানেই রহিয়াছে। কিছুকাল

পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ পণ্ডিত পরলোকগত হেনরী প্রিন্সেপ ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সমূহ উপকার করিয়াছেন। ফেরোজাবাদ নগরটী অধুনা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত; কিন্তু স্তম্ভটী বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর প্রাচীর-বহির্ভাগে সেই ধ্বংসরাশির মধ্যে অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র-গুলি জানিতে পারা যায়। উহাতে নাগরী ভাষায় ১৫২৪
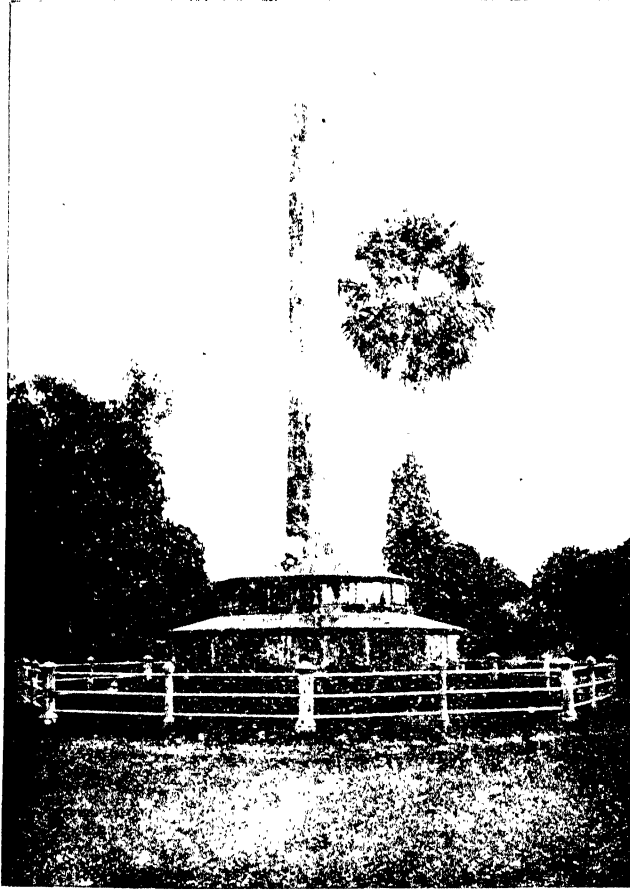
অশোক-স্তম্ভ—বারাণসী

অব্দে উৎকীর্ণ লিপিও দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্রাট বিশালদেবের হিমাদ্রি হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য-বিজয়ের কথাও উহাতে লিখিত আছে।

বারাণসী ধামেও একটী অশোক স্তম্ভ আছে।

ঐ দিল্লীতেই আরও একটী স্তম্ভ সর্ব্বসাধারণের—বিশেষতঃ, ভ্রমণকারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটী অধুনা সর্ব্বজনপরিচিত

কুতব-মিনার

কুতব-মিনারের কথা অনেকেই নানাগ্রন্থে বহুস্থলে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং এখানে তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইবে, তাহাই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইবে মাত্র। কিন্তু অন্যান্য কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় কুতব মিনারও একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ বটে; এবং যখন একে একে সকলেরই কথা হইতেছে, তখন কুতবকেও একেবারে বর্জ্জন না করিয়া, দুইচারি কথা বলা প্রয়োজন। নব্য দিল্লীর একাদশ মাইল দক্ষিণে কুতব মিনার প্রাচীন দিল্লীর দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পূর্ব্বে যেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর বিরাজমান ছিল, মোগল বাদশাহগণের আমলে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী তথা হইতে অনেকটা উত্তরে সরিয়া গিয়াছিল। এখন এই মিনারটী চারিদিকে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থলে অতীতের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, কত সম্রাটবংশের উত্থান-পতন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিশ্বজয়ী কালের সহিত সংগ্রামে নিরত রহিয়াছে।

কুতবও জয়স্তম্ভ বটে,—নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার গঠনে হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন জাজ্বল্যমান। সেই জন্য অনেকের বিশ্বাস কুতব হিন্দুর আমলে কোন হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সে যাহা হউক, দিল্লীর প্রথম মুসলমান ভূপতি, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, পাঠান জাতীয় দাস-উপাধিধারী কুতবউদ্দীনের নামেই এই স্তম্ভ কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত। তিনি ইহা নির্ম্মাণ না করাইলেও, দিল্লী জয় করিয়া তিনি ইহাকে বিজয়স্তম্ভরূপে নিজ নামে পরিচিত করেন। ইহার উচ্চতা ২৪০ ফিট। পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা উচ্চতর আর দুইটীমাত্র স্তম্ভ আছে। সেই দুইটী ফ্রান্সের ইফেল টাওয়ার ও আমেরিকার ওয়াসিংটন মেমোরিয়াল।

দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আগ্রার দিকে আসিলে, আর একটী স্তম্ভ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা

হিরণ-মিনার

নামে পরিচিত। ইহা কোন বিজয়স্তম্ভ নহে। বাদশাহ আকবরের প্রিয়তম হস্তীর মৃতদেহের সমাধির উপর তাহারই স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আগ্রা হইতে ২২ মাইল দূরে ফতেপুর শিক্রিতে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভটী প্রায় নূতনের মতই আছে, কাল ইহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যে হস্তীর সমাধির উপর এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সম্রাট আকবর শিকারে গমন করিতেন। এই হস্তীটী বিলক্ষণ সাহসী ছিল। কথিত আছে, ব্যাঘ্র-শিকারের সময় এই হস্তীর চতুরতা, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে, সম্রাট বহুবার ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে-হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণেই সে তাঁহার বড় প্রিয় ছিল; এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহার নামে এই স্তম্ভ গঠিত হয়। স্তম্ভটী জঙ্গলের মধ্যে স্থাপিত। বাদশাহের অনুচরবর্গ জঙ্গল ঘিরিয়া পশু, বিশেষতঃ হরিণ তাড়াইয়া স্তম্ভের নিকট আনয়ন করিত; এবং স্তম্ভশীর্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া সম্রাট হরিণ ও অন্যান্য পশু শিকার করিতেন।

হিরণ-মিনার প্রস্তরগঠিত। ইহার গাত্রে হস্তীদন্তের আকারে গঠিত বহুসংখ্যক প্রস্তর-কীলক প্রোথিত আছে। ইহার উচ্চতা ৭০ ফিট।

ফতেপুর শিক্রি হইতে যাত্রা করিয়া, আজমীর হইয়া চিতোরে গমন করিলে, একটী বিজয়স্তম্ভ দেখা যায়। এটী চিতোরের ভগ্ন, পরিত্যক্ত দুর্গমধ্যে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইহার নাম

চিতোর—বিজয়স্তম্ভ।

এই স্তম্ভের উচ্চতা ১২২ ফিট, কলিকাতার ময়দানে অবস্থিত অক্টার্লোনি মনুমেণ্টের অপেক্ষা দুই ফিট অধিক উচ্চ। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে একটী যুদ্ধজয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে রাণা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। মালব ও গুর্জ্জরের রাজগণ মিলিত হইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে, রাণা কুম্ভ তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধজয়ের ১১ বৎসর পরে এই স্মৃতিস্তম্ভের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ১০ বৎসরে শেষ হয়। স্তম্ভগাত্রে এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের ধর্ম্মজগতের কেন্দ্র বারাণসীধামে আগমন

কুতব মিনার
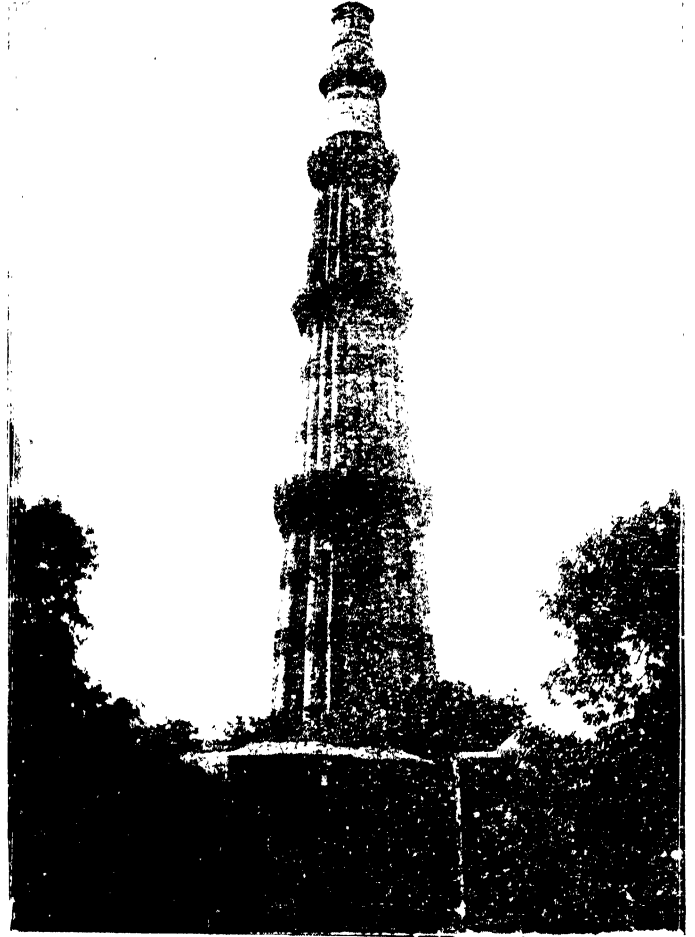
করিলে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী মসজিদের সুউচ্চ মিনারদ্বয় বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। কথিত আছে,

বেণীমাধবের ধ্বজা

নামে একটি মন্দির পূর্ব্বে এইখানে ছিল। সেই মন্দির ভঙ্গ করিয়া বাদশাহ আওরঙ্গজেব মন্দিরের ভিত্তির উপর এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মিনারদ্বয়ের উচ্চতা ১৫০ ফিট হইবে।

কাশী পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে একেবারে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে হইবে। কলিকাতার ময়দানে

অক্টার্লোনি মন্নুমেণ্ট

সকলেই দেখিয়াছেন। নেপাল-যুদ্ধ প্রত্যাগত বীর অক্টার্লোনির স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উচ্চতা অনুমান ১২০ ফিট।
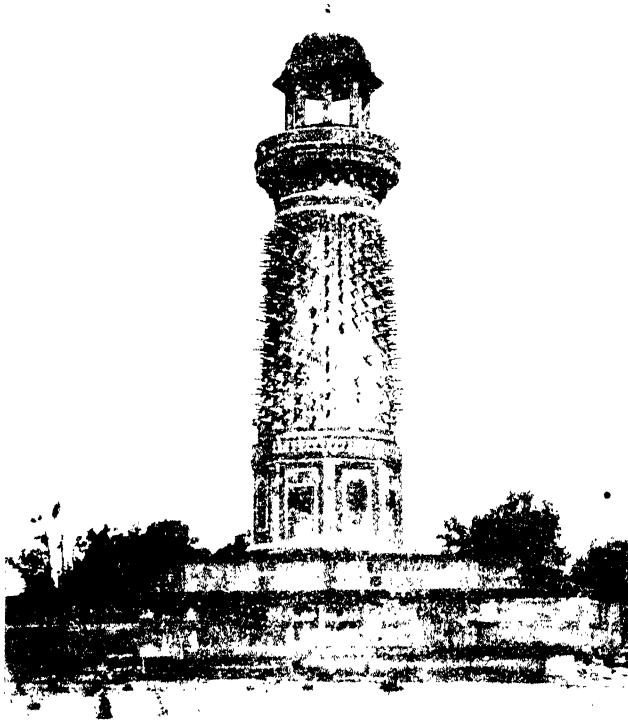
হিরণ মিনার

ইহার পর ভারতবর্ষের আর একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। হায়দরাবাদের নিজামের অধিকার মধ্যে

দৌলতাবাদ

নামক একটি গিরিদুর্গ আছে। ইহার প্রাচীন নাম দেবগিরি। দিল্লীর তোগলকবংশীয় বাদশাহ মহম্মদ তোগলক এই স্থানের নাম দৌলতাবাদে পরিবর্ত্তিত করিয়া দুইবার দিল্লী হইতে এখানে রাজধানী উঠাইয়া আনেন; কিন্তু দুইবারই দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই দৌলতাবাদ গিরিদুর্গের অভ্যন্তরে যে মিনারেট রহিয়াছে, উহারও উচ্চতা ১২০ ফিট। ভ্রমণকারীরা ইহা আগ্রহ-সহকারে পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

এইবার আমাদিগকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চীন দেশে গমন করিতে হইবে। চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত

সু-চো

নামক নগর চীনাদের চক্ষে অতি পবিত্র। এই নগরের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। চীনারা এই নগরে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে নিজেদের সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া থাকে। হো-লুওয়াং নামক এক মহৎ ব্যক্তি এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সমাধির উপর মাটি ফেলিয়া ফেলিয়া ব্যাঘ্র-পাহাড় নামে একটি কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ করা হয়। এই পাহাড়ের উপর নয়টী তলা বিশিষ্ট এই টাওয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১৩০ বৎসরের পুরাতন এবং নির্ম্মাণকাল হইতেই ঐরূপ তির্য্যকভাবে অবস্থিত আছে।

দামঘান টাওয়ার

স্মৃতিস্তম্ভের সন্ধানার্থী ভ্রমণকারীকে চীনদেশ হইতে পারস্যদেশে গমন করিতে হয়। তিহারাণে যাইবার পথের পার্শ্বদেশে দামঘান নামক একটি নগর এক সময়ে প্রচুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিরাজমান ছিল। কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী কাল এক্ষণে ইহাকে একটী বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই দামঘান টাওয়ার এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া নগরের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। পারস্যে মুসলমান-প্রভাবের প্রথমাবস্থায় এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে দুইটি দুর্ঘটনার ফলে নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। স্তম্ভটির কারুকার্য্য কিরূপ সুন্দর ছিল, তাহা চিত্র দর্শনেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। যে দুই কারণে নগরীর অধঃপতন ঘটে,

তন্মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ও অপরটি মানবকৃত। প্রথমে একটি প্রবল ভূমিকম্পের ফলে বহু গৃহ পতিত হইয়া ৪০০০০ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। তারপর আফগানেরা এই নগর আক্রমণ করিয়া ৭০০০০ লোককে নিহত করে। ফলে নগরটি ক্রমে-ক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কেবল স্তম্ভটি কোনরূপে টিকিয়া গিয়াছে।

মিনার কলান

মধ্য এসিয়ায় বোখারা রাজ্য রুষিয়ার আশ্রিত। এই রাজ্যের রাজধানীর নামও বোখারা। বোখারা নগরের সর্ব্বপ্রধান বাজারের এক পার্শ্বে বোখারা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মসজিদ। আগ্রা ও দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ন্যায় এখানেও প্রতি শুক্রবার দশ সহস্রাধিক লোক একত্র উপাসনা করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম মসজিদ ই-জমি। ইহারই সন্নিকটে মিনার কলান (বা মহামিনার) নামে একটা উচ্চ স্তম্ভ আছে। মিনারটি গোলাকার। ইহার নিম্নভাগের পরিধি ৩৬ ফিট এবং উচ্চতা ২১০ ফিট। সমগ্র মিনারটি খোদিত ইষ্টকে নির্ম্মিত বলিয়া ইহা দর্শকের চক্ষে অতি বিচিত্র দেখায়। সম্ভবতঃ, বোখারার সুবর্ণ-যুগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধিগণকে ইহার চূড়ার উপর লইয়া গিয়া তথা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী বাজারের উপর নিক্ষেপ করা হইত। ২১০ ফিট উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হতভাগাদের দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হইত। এই মিনার মসজিদের পার্শ্বে নির্ম্মিত হইলেও,—ইহার নির্ম্মাণের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক, পরে যে উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তদনুসারে—ইহাকে স্মৃতিচিহ্ন বা কীর্ত্তিস্তম্ভ বলা চলে না। তবে ইহা একটি উচ্চ স্তম্ভ বলিয়া সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ, সভ্যতা-বৃদ্ধির ফলেই হউক বা রুষিয়ার প্রভাব নিবন্ধনই হউক, ঐ বর্ব্বর প্রথা রহিত হয়। তাহার পর হইতে কাহাকেও আর এই স্তম্ভশীর্ষে আরোহণ করিতে দেওয়া হয় না; কারণ, ইহার চারিদিকেই গৃহস্থপল্লী এবং ইহার শীর্ষ-দেশে আরোহণ করিলে, গৃহস্থের অন্তঃপুরাবদ্ধা রমণীগণকে বে-আবরু হইতে হয়।

পম্পিজ পিলার

এইবার আমাদের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। এসিয়া হইতে আমরা আফরিকায় আসিলাম। আফরিকার উত্তর-পূর্ব্বাংশে ইজিপ্টের উত্তরপ্রান্তে ভূমধ্যস্থ সাগরতীরে আলেকজান্দ্রিয়া অতি প্রাচীন সহর। এই নগরে পম্পিজ পিলার নামে একটি স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। এই পম্পিজপিলার একখানি মাত্র প্রস্তর খোদিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ ফিট। মিশর রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন অস্তমিত, সেই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পতন হয়।
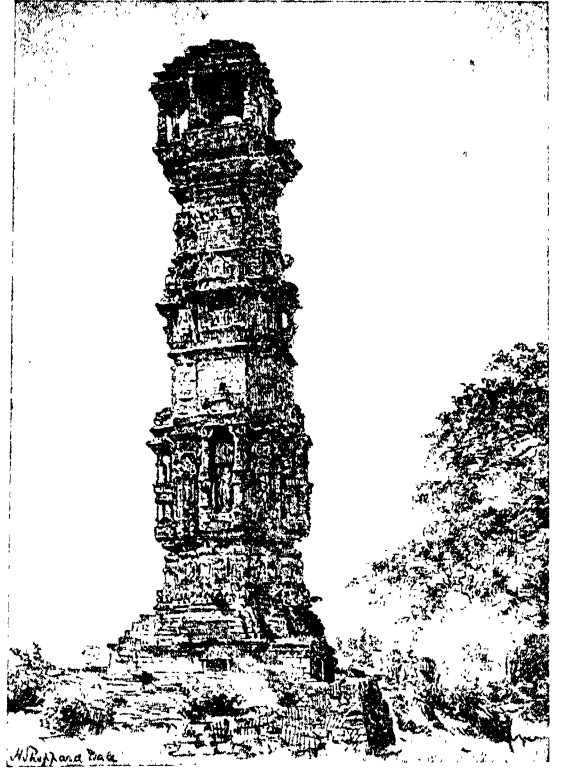
চিতোর স্তম্ভ

রোম সাম্রাজ্যের তখন পূর্ণ-পরিণতি ঘটিয়াছে; ইউরোপ আফরিকা এবং অন্যান্যস্থলে রোমের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান। পম্পি নামে একজন রোমীয় সেনাপতি সেই সময় নানা দেশ জয় করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পম্পিজ পিলার নাম শুনিলেই প্রথমে মনে হয়, উহা বুঝি ঐ রোমীয় সেনাপতিরই কোন কীর্ত্তি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই স্তম্ভের সহিত রোমান সেনাপতির নামসাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোনই সম্পর্ক নাই।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান আলেকজান্দ্রিয়া নগরের অস্তিত্ব-মাত্র ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে খৃষ্টানগণকে পরাজিত

করিয়া মুসলমানেরা মিশরে স্বীয় প্রভূত্ব স্থাপন করেন। বিজয়ী মুসলমান ভূপতি ও সেনাপতির আদেশানুসারে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের ভুবনবিখ্যাত পুস্তকাগারস্থিত, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সংগৃহীত, মহামূল্য গ্রন্থরাজি অগ্নিমুখে সমর্পিত হয়। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার গৌরবনাশের সঙ্গে-সঙ্গে নগরটিও ধ্বংসমুখে পতিত হয়। মুসলমানেরা কায়রো নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় একশত বৎসর হইল, মিশরের খেদিব মহম্মদ আলী স্থানটীর
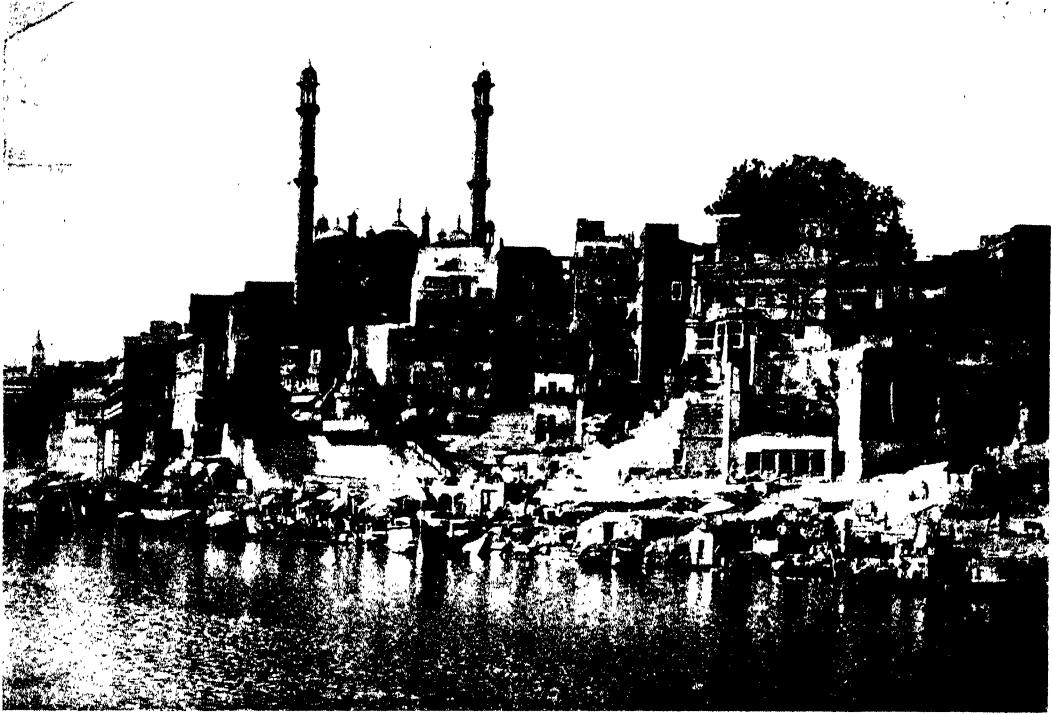
ভূতপূর্ব্ব বেণীমাধবের ধ্বজা।
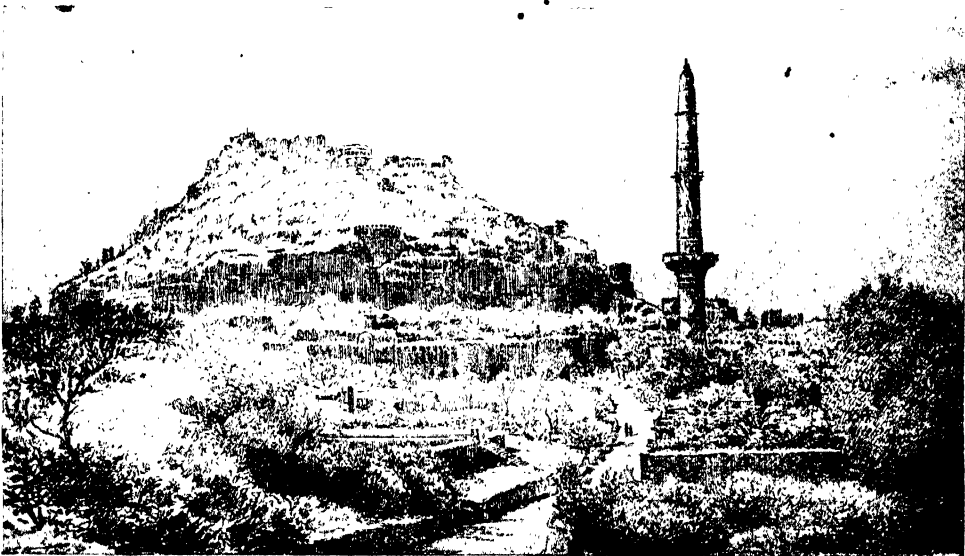
দৌলতাবাদ

সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুরাতন ধ্বংসস্তূপের পার্শ্বে নূতন আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের পত্তন করেন। গ্রীক বীর আলেক্‌জান্দার স্থানান্তর হইতে একটি ওবেলিস্ক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহার কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ওবেলিস্কই পম্পিজ পিলার নামে পরিচিত হইয়া আলেক্‌-জান্দারের শেষ চিহ্নটুকু বজায় রাখিয়াছে।

দামঘান টাওয়ার

ওবেলিস্ক।

কায়রো নগরের উপকণ্ঠে হেলিওপোলিস নামে ক্ষুদ্র একটি প্রাচীন নগর ছিল। হেলিওপোলিস শব্দের অর্থ বোধ হয় সূর্য্য-নগর; কারণ, এই নগরটির অন্যতম নাম ছিল "সূর্য্যনগর।" নগরটি প্রাচীন মিশরীয়দিগের দ্বারা স্থাপিত। মিশরীয়গণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। সূর্য্যদেবের নামে উৎসর্গীকৃত একখানি অখণ্ড গ্রানাইট প্রস্তরে গঠিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ প্রাচীন মিশরের স্থানে-স্থানে এখনও দৃষ্ট হয়। হেলিওপোলিস বা সূর্য্যনগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও দুই-একটি ওবেলিস্ক বা সূর্য্যস্তম্ভ বিরাজমান আছে। ইহার উচ্চতা ৬৬ ফিট। এখানে একটি বিরাট সূর্য্য-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন নগরের সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরটিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

উড়িষ্যার সূর্য্যস্তম্ভ।

সূর্য্যস্তম্ভের কথায় উড়িষ্যার সূর্য্যস্তম্ভের কথাও মনে
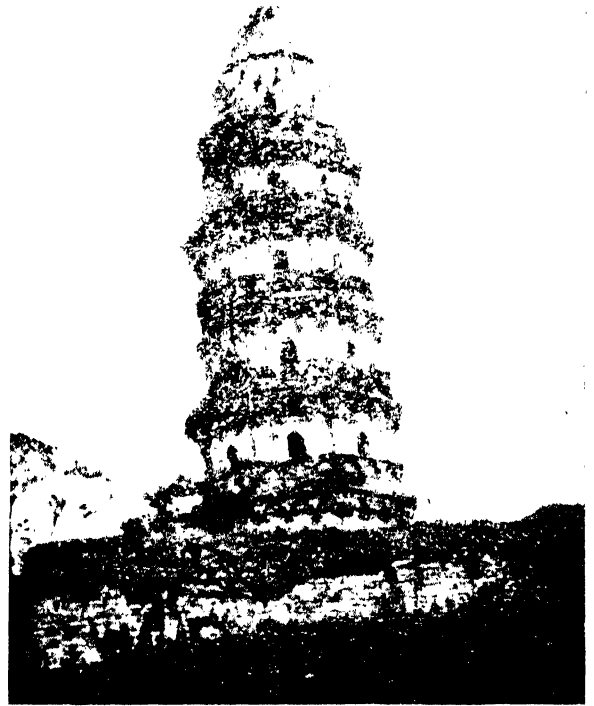
সু-চো টাওয়ার

পড়িয়া যায়। মিশরীয়গণের ন্যায় হিন্দুরাও সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত কনারকে একটি বিরাট সূর্য্যমন্দির এবং একটি সূর্য্যস্তম্ভ ছিল। স্তম্ভটি এক্ষণে পুরীধামে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের নিকটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাও একখানি মাত্র অখণ্ড প্রস্তরে গঠিত। সুতরাং মিশরীয় ওবেলিস্ক এবং উড়িষ্যার সূর্য্যস্তম্ভের মধ্যে নামে, উদ্দেশ্যে, গঠনে এবং ব্যবহারে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মিশরীয় ওবেলিস্কের গাত্রে তদানীন্তনকালে মিশর-

পম্পিজ পিলার
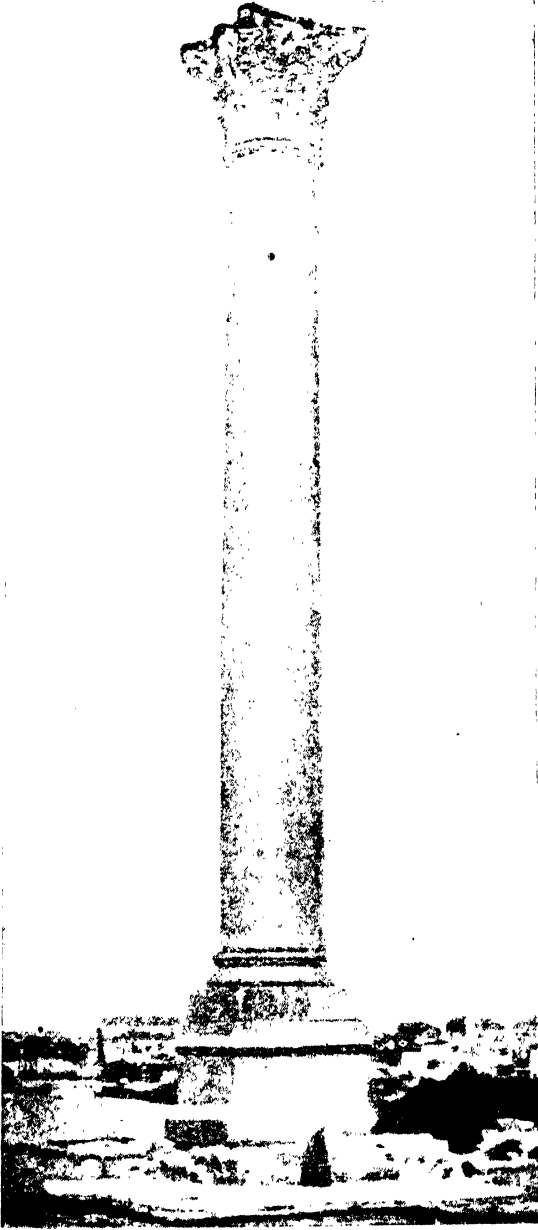
ট্রাজানস কলম

দেশপ্রচলিত ভাষায় (হায়ারোগ্লিফিক) স্তম্ভগঠনের কাল, উদ্দেশ্য, নির্ম্মাণকারীর নাম, প্রভৃতি লিখিত আছে। এই ওবেলিস্ক অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল।

কনারকের অরুণস্তম্ভের নির্ম্মাণ কাল এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই স্তম্ভ কনারক হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত করেন। ইহার উচ্চতা ৩৩ ফিট ৮ ইঞ্চি। ইহা সম্ভবতঃ চতুষ্কোণ আকারে প্রথমে গঠিত হয়; কিন্তু এখন ইহা ষোড়শ কোণবিশিষ্ট।
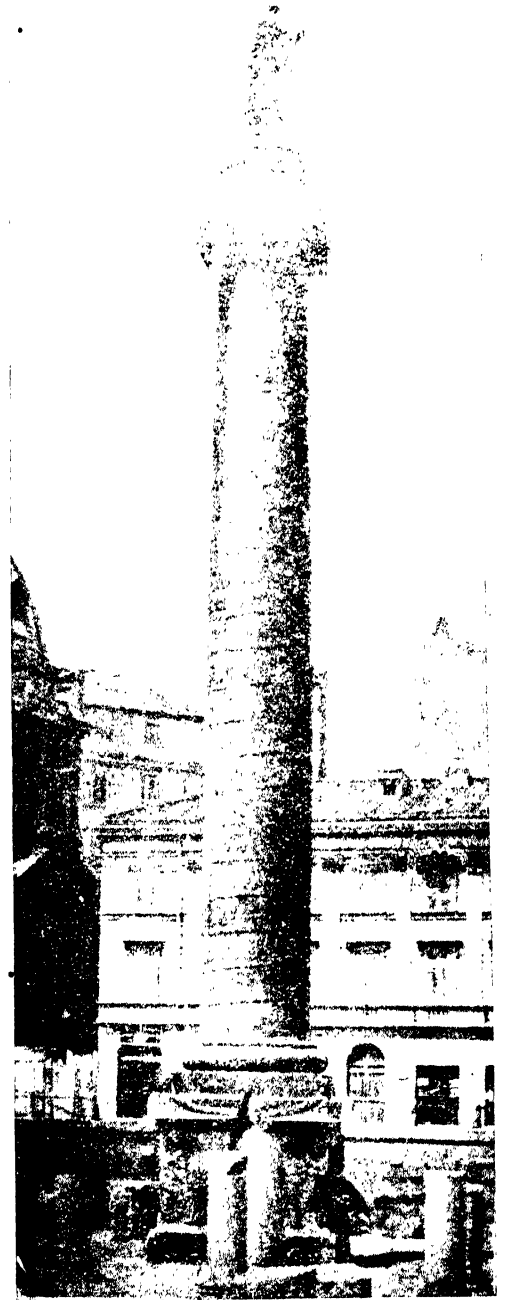
ইজিপ্টের আলেক্জান্দ্রিয়া নগর হইতে ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইয়া আমাদিগকে ইটালীর রাজধানী রোম নগরে

আসিতে হইবে। পুরাতন রোম নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে

ট্রাজান্‌স কলম

(Trajan's Column) উল্লেখযোগ্য। ট্রাজান রোমের একজন সম্রাট। রুমিয়ানদের সহিত যুদ্ধের স্মৃতি-রক্ষার্থ

উড়িষ্যার জয়-স্তম্ভ

ক্যাম্পানাইল
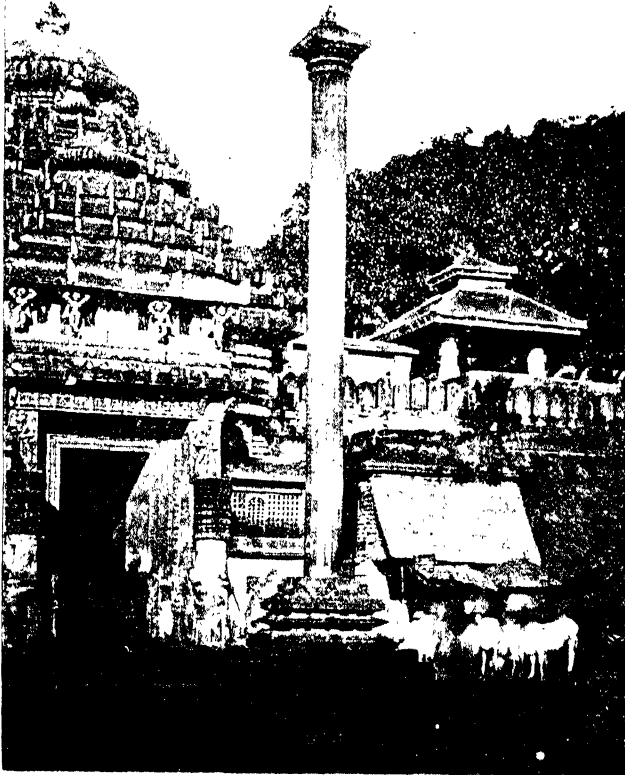
তাঁহার নামে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ইহা প্রায় ১৮০০ বৎসরের পুরাতন। ট্রাজানের নামে একটি ফোরাম বা বাজার ছিল। স্তম্ভটি সেই বাজারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

পিশা নগরের তির্য্যক টাওয়ার অপূর্ব্বদর্শন পদার্থ। এটী অষ্টতল, সম্পূর্ণ গোল এবং প্রত্যেক তল স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা ভূষিত। সমগ্র টাওয়ারটি মার্ব্বেল-প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উচ্চতা ১৮০ ফিট। ১২৭৪ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। যখন ইহা প্রথম নির্ম্মিত হয়, তখন ইহা অবশ্য ঠিক খাড়াই ছিল; কিন্তু যে ভূমির উপর ইহা দণ্ডায়মান, তাহা তাদৃশ দৃঢ় নহে বলিয়া, টাওয়ার ক্রমশঃ ঝাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাকে সোজা করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হওয়ায় এখন কেবল উহা যাহাতে আরও ঝাঁকিয়া ভূমিসাৎ না হয়, তাহারই যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।
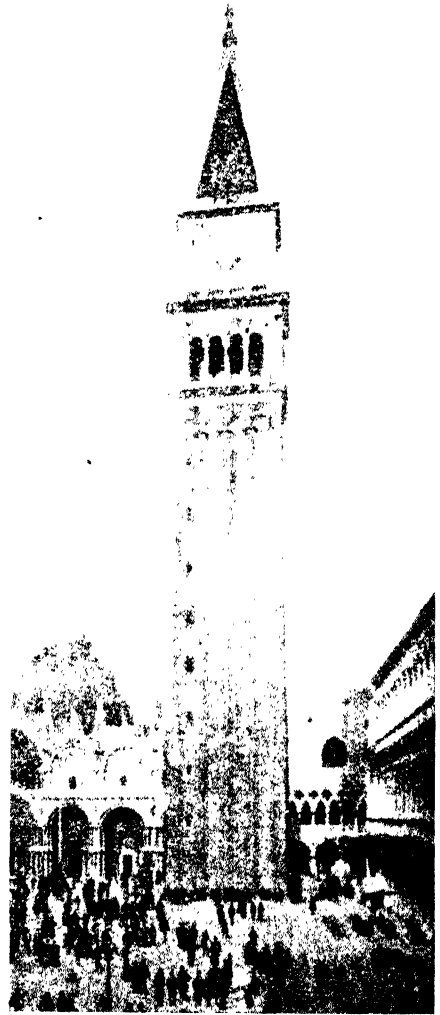
ভিনিস নগরের সেণ্ট মার্ক গির্জ্জা পৃথিবীবিখ্যাত। এই গির্জ্জার সম্মুখে পিয়াজা বা চতুষ্কোণভূমি সন্ধ্যাকালে ভদ্রসাধারণের ভ্রমণের স্থান। ইহার এক কোণে

ক্যাম্পানাইল

একটি উন্নত চতুষ্কোণ স্তম্ভ। স্তম্ভটি গির্জ্জারই অংশবিশেষ। ১৯০২ অব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ ইহার সংস্কার হইতেছে।

তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের যে অংশ সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রাচীন, তথায় হিপোড্রোম নামে এক সার্কাস ছিল। ঐ স্থানটির চতুর্দ্দিকে মর্ম্মরাসনে উপবিষ্ট হইয়া লোকে জীবজন্তুর ক্রীড়াকৌতুক দেখিত। এই হিপোড্রোমের দৃশ্য কৌতূহলোদ্দীপক। এই হিপোড্রামের মধ্যে যে দুইটি স্তম্ভ রহিয়াছে, উহারা
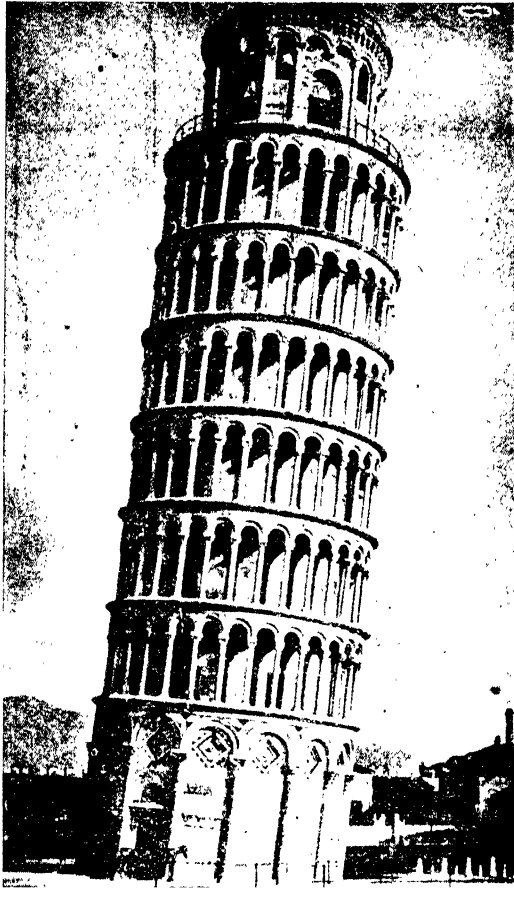
পিশানগরের তির্য্যক টাওয়ার

ওবেলিস্ক নামে পরিচিত। যেটা নিকটেই দেখা যাইতেছে, উহা হেলিওপোলিসের অন্তর্গত অন নামক স্থান হইতে আনীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ঐটা যতদিন অক্ষত থাকিবে, ততদিন তুরস্ক-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে; উহার ধ্বংসের সহিত তুরস্ক-সাম্রাজ্যের পতনও অবশ্যম্ভাবী। তুরস্কের মৃত্যুবাণ কি তাহা হইলে ঐ স্তম্ভমধ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে?

ইফেল টাওয়ার

১৮৮৯ অব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরীর শাম্প দে মার নামক স্থানে একটি বিরাট শিল্প প্রদর্শনী স্থাপিত হয়। সেই প্রদর্শনীর শোভা সম্পাদনার্থ ইফেল টাওয়ার নির্ম্মিত হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ এবং প্রকৃতই বিশ্বকীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। প্রদর্শনী শেষ হইয়াছে, তাহার অন্যান্য সকল দ্রব্যই স্থানান্তরিত হইয়াছে; কেবল এই স্তম্ভটী প্রদর্শনীর স্মৃতি গৌরব মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৯৮৪ ফিট। ইতঃপূর্ব্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স রাজ্যের অন্তর্গত ওয়াসিংটন নগরে যুক্তরাজ্যের সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম
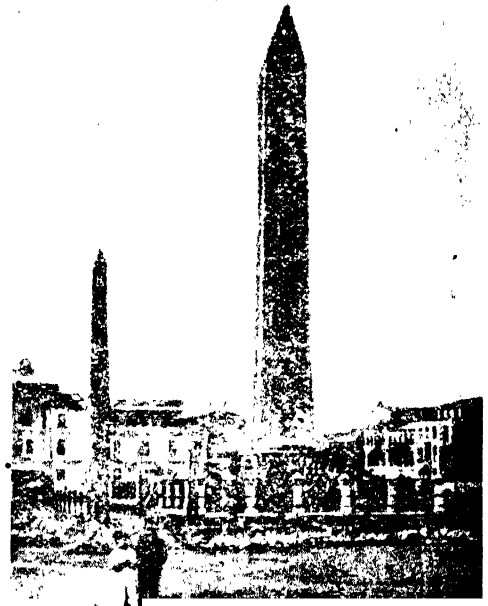
ওবেলিস্ক—কনষ্টাণ্টিনোপল

প্রেসিডেণ্ট জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্মৃতিরক্ষার্থ যে চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়া পরিচিত ছিল। উহার উচ্চতা মাত্র ৫৫৫ ফিট। সুতরাং এফেল টাওয়ার তদপেক্ষা ৪২৯ ফিট অধিক (অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ) উচ্চ। এই টাওয়ারে উঠিবার জন্য বৈদ্যুতিক 'লিফ্‌ট' এবং সোপান উভয়ই আছে। ১৮৮৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৮৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে শেষ হয়।

ওয়াসিংটন মেমোরিয়েল

উচ্চতার অনুপাতে, গণনায় দ্বিতীয় হইলেও মর্য্যাদায় ওয়াসিংটন মেমোরিয়েল ইফেল টাওয়ারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে ৩৭ বৎসর লাগিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ওয়াসিংটন স্বয়ং ইহার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার শীর্ষদেশে উঠিবার জন্য ৯৮০ ধাপযুক্ত একটি অধিরোহণী আছে; আবার (elevator or lift) কলের সাহায্যেও উঠা যায়।

ইফেল টাওয়ার

ওয়াসিংটন মেমোরিয়েল

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত উন্নত হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যে ইফেল টাওয়ার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। তাহার ঠিক নিম্নেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে, জর্জ্জ ওয়াসিংটনের স্তম্ভ। এইরূপ উচ্চতার হিসাবে আমরা ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি হর্ম্ম্যের নামোল্লেখ করিতেছি।

১।	ইফেল টাওয়ার	... ...	৯৮৪ ফিট
২।	ওয়াসিংটন কলম	... ...	৫৫৫ „
৩।	কলোন ক্যাথিড্রাল	... ...	৫১২ „
৪।	রুয়েঁ ক্যাথিড্রাল	... ...	৪৯৮ „
৫।	গিজার পিরামিড	... ...	৪৮০ „
৬।	ষ্ট্রাসবার্গ ক্যাথিড্রাল	... ...	৪৬৫ „
৭।	সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা—রোম	...	৪৫০ „

৮।	লণ্ডন—সেণ্টপল গির্জ্জা	...	৪০৫ „
৯।	প্যারী—ইনভ্যালিডেস...	...	৩৪৮ „
১০।	কুতবমিনার—দিল্লী ...	...	২৪০ „
১১।	নোটারডেম—প্যারী ..	...	২২৫ „

অক্টারলোনি মনুমেণ্ট
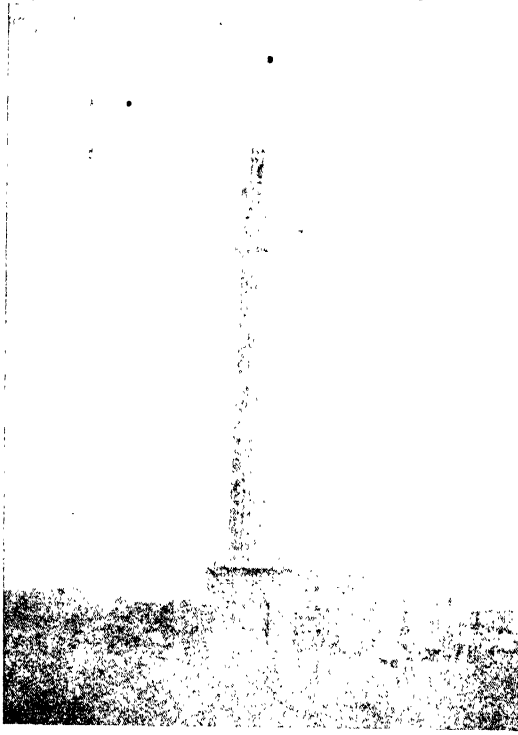
১২।	প্যান্থিয়ন প্যারী ...	...	১৭৩ „
১৩।	অক্টারলোনি মনুমেণ্ট ...	...	১৬৫ „

উচ্চতায় যেমন ইফেল টাওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার বয়স তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মানবের 'উচ্চাভিলাষ' (অর্থাৎ উর্দ্ধে উঠিবার ইচ্ছা) ক্রমশঃই বর্দ্ধিত প্রাপ্ত হইতেছে। অতঃপর পৃথিবীর কোথাও যদি নূতন স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাহা যে ইফেল টাওয়ারের অপেক্ষা উচ্চতর হইবে, সে পক্ষেও কোন সন্দেহ নাই। লঙ্কার অধিপতি রাবণ একবার স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া পৃথিবীর জীবনিচয়ের সহজেই স্বর্গগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। জীবকুলের দুর্ভাগ্যক্রমে রাবণ তাঁহার এই সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই রামের হস্তে নিহত হন। সিঁড়ি দিয়া স্বর্গে উঠিবার ইচ্ছা যে একমাত্র রাবণেরই হইয়াছিল, তাহা নহে। গগনচুম্বি, অভ্রভেদী স্তম্ভ নির্ম্মাণের চেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, এই ইচ্ছাটি সকল মানবের হৃদয়েই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ইজিপ্টের পিরামিডের কথা কিছুই বলা হইল না—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দুই চারি কথায় তাহা বলা সম্ভবপরও নহে। ইজিপ্টের পিরামিডগুলি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যজনক পদার্থের মধ্যে অন্যতম। ইজিপ্সিয়ান পিরামিডের সংখ্যা একটি নহে, অনেকগুলি, এবং নির্ম্মাণকারীর শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে উহার আকারগত তারতম্য দেখা যায়। অতি প্রাচীনতম কালের মিশরীয় রাজগণ স্ব স্ব সমাধিস্বরূপ এক-একজনে এক-একটি পিরামিড নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন এবং সেই রাজগণের 'মমি' গর্ভে ধারণ করিয়া পিরামিডগুলি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মরুবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভ্রমণকারীদের হৃদয়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভীতি প্রভৃতি কত না ভাবের উদ্রেক করিতেছে। এই পিরামিডের বিবরণ লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র একটী প্রবন্ধ সঙ্কলন না করিলে চলে না। সেইজন্য এ যাত্রা পিরামিডের উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

পৃথিবীর উদ্ভাবকগণ

ফক্স ট্যালবট

আধুনিক ছায়াচিত্রের উদ্ভাবক।

ফ্রাঙ্ক স্প্রেগ

ট্রেন শাসনে রাখিবার অভিনব উপায়ের আবিষ্কারক

লুই ড্রাগুয়ার

স্বনামখ্যাত ফটোগ্রাফির উদ্ভাবন করেন।

যোসেফ নাইসফোর নাইস

ফটোগ্রাফির উদ্ভাবনকর্ত্তা
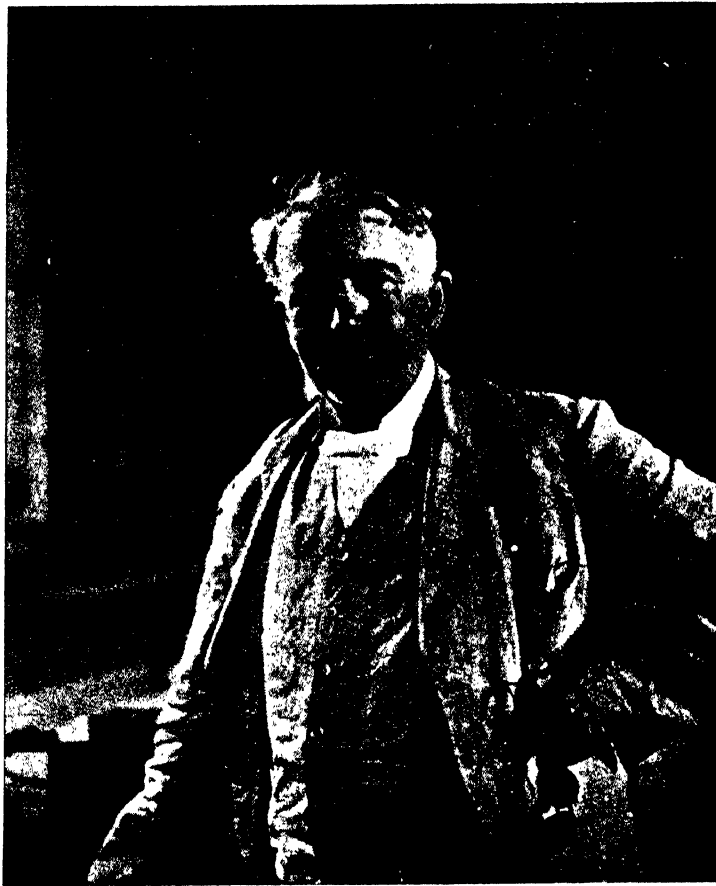
টমাস এ, এডিসন
ফনোগ্রাফির আবিষ্কর্ত্তা
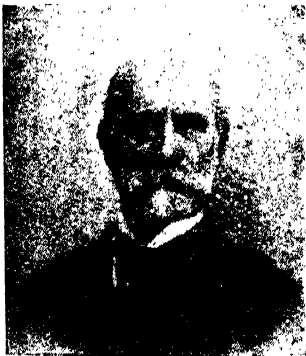
গর্ডন ম্যাক্‌কে
স্বনামখ্যাত জুতা তৈয়ারীর কলনির্ম্মাতা।
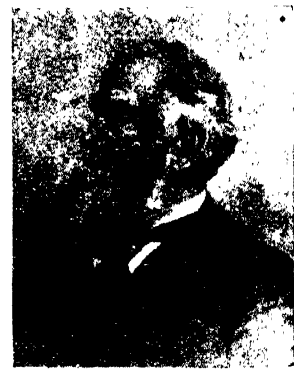
চার্লস গুডিয়ার
স্বনামখ্যাত যন্ত্রের উদ্ভাবক

ডক্তার রুডলফ্ ডাইসেল
অভিনব ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন।
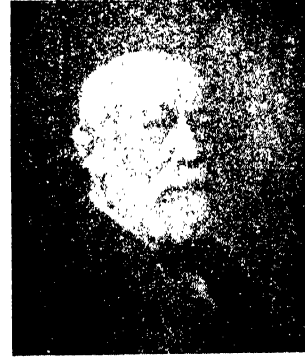
জে, এস, হায়াত
রাসায়নিক শিল্পী

লাইম্যান ই, ব্লেক
জুতা প্রস্তুত করিবার কল-নির্ম্মাতা।

আইজাক সিঙ্গার
বিশ্ববিখ্যাত সেলায়ের কলওয়ালা
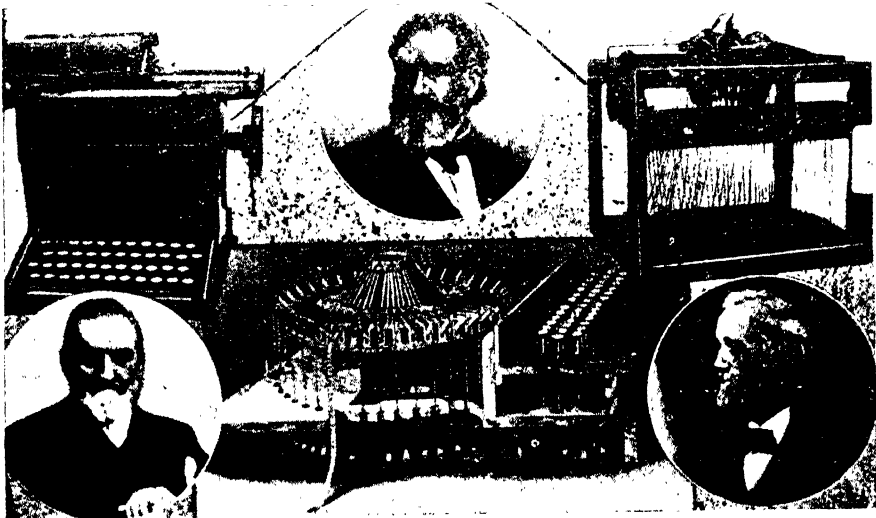
পি, রেমিংটন
টাইপরাইটার-নির্ম্মাতা

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না,—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আবার শুধু নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহারা কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোন মতেই ও রূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনোও সেরূপ করিতে পারে না,— এম্‌নি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে "বাঃ রে বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজ্‌ম্‌! একেই ত বলে চরিত্র সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্ত্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুল-ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে!" তা' দিক্‌। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, 'হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কাণা-কড়ির মূল্য নাই! তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্ত্তে গুঁড়া না করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না! এ ও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!'

এই ত, আমি অন্নদা দিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি! তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্ত্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তব্ধরাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে-মনে বলিয়াছি, 'দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমাণিক স্পর্শে আমার অন্তর বাহিরের সব লোহা সোণা হইয়া গিয়াছে; কোথাকার কোন জল হাওয়ার দৌরাত্ম্যই' আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! আর কাহাকেও এ সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।' কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই, ত অন্নদা দিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই; বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশে-বিদেশে লইয়া বেড়াই। এম্‌নি কত কি যে উদ্ভট আকাশ-কুসুমের মালা গাথা—সে সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখের জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে এমন নারী ইহলোকে ত নাই-ই, পরলোকে আছে কি না, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এম্‌নি অপরূপ আভা, চোখে এম্‌নি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এম্‌নি সতী, এম্‌নি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এম্‌নি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে; এমনি করিয়া সে-ও যেন সংসারের

স্বীকার করিয়া ও বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এত দিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্য্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই। অথচ, ব্যথার পরিবর্ত্তে খুসিই হইলাম। কেন তাহা জানি। যদিচ, যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্ব্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই—কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরঞ্চ প্রণয় অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি ইহারই গোপন ইসারায় এ কথাটার উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইয়াছিল। এবং সেও তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু, অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-রাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুর বেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া-দিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম; কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র লেখা—যাহোক্ একটা, গোপনে হাতে গুঁজিয়া দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। সে কোন্ একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্ত্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরাণো ভাঙা ঘাট ছিল; তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় ও মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক রশ্মিচ্ছটা ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালোজলে সোণা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া গেল, দীঘির কালোজল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল ভয়ে-ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে,—যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না,—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে পড়িল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়া আছি, সেইখানে পা দিয়া কতলোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন,

"ভ্রমর * * খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল"

কৃষ্ণকান্তের উইল—১৯শ পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

Emerald Ptg. Works.

তখন কত মুমূর্ষু হয় ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয় ত, তাহাদের পিপাসিত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, 'বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না।' এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আরও কত তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, 'সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ো না। তোমাকে আর কখনো সেস্থানে যাইতে বলি না; কিন্তু, যাহারা এ কাজ পারে, তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না।"

তখন সকাল-বেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলা শুধু নিছক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথা-গুলাই এই নির্জ্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবন-ব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজসরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবারই জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে, মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? — তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না!

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার— কেহ কোথাও নাই। একটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কাণের উপর নিঃশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কাণের উপর সুরু করে দেয়, ত সে বড় সোজা হয় না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি— সেই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না! এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড়ে দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্‌ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাধাইয়া দিয়াছে। তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যায়গাটা এম্নি অন্ধকার যে, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর-গুর করিয়া উঠিল — এ যাইতেছি কোথায়? চোক-কাণ বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুল-তলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায় ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু যায়গাটা কি? নদীর ধারের সরকারী বাঁধ নয় ত? বাঁধই ত বটে! পা দুটা যেন ভাঙিয়া আসিতে লাগিল; দেহ টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া-টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারই পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী

[শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

আমার চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত ৪০ জনেরও অধিক মুসলমান বৈষ্ণব-কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের রচিত পদাবলী ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, রাজসাহী—ঘোড়ামারা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় আমার ও পরলোকগত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংগৃহীত মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদসমূহ ভিন্ন-ভিন্ন খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন।

মুসলমান কবিগণ এক-সময়ে কবিতাকারে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—এখন এই ভেদবুদ্ধির দিনে এ কথা নিতান্তবিচিত্র বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু বিচিত্র বোধ হইলেও, তাহা একান্ত সত্য কথা,—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মুসলমান কবিগণ সত্য-সত্যই রাধাকৃষ্ণের প্রেমসুধা-পানে বিভোর হইয়াছিলেন। সেই সুধাপানে কেহ-কেহ অমরতাও লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লীলারস প্রকটনে অনেকে এমনই তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন যে, ভণিতাটুকু উঠাইয়া দিলে—কবিতাটি হিন্দুর, কি মুসলমানের রচনা, তাহা চিনিয়া লওয়া অসম্ভব বিবেচিত হইবে। জাতিধর্ম্মের ব্যবধানে থাকিয়া একজন কবির এরূপ প্রশংসা-লাভ করা সামান্য গৌরবের কথা নহে। সৈয়দ মর্ত্তুজা, নাছির মোহাম্মদ, মীর্জ্জা ফয়জুল্লা প্রভৃতি কবিগণের পদাবলী কবিত্বে ও মাধুর্য্যে যে-কোন হিন্দু বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর সহিত তুলনীয়। কিন্তু এরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্যে আজ আমাদের এ প্রবন্ধের অবতারণা হয় নাই।

প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করিতে-করিতে, সম্প্রতি একখানি অতি প্রাচীন "রাগনামা" (সঙ্গীত-গ্রন্থ) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান বহু কবির বহু পদ সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে সঙ্কলন করিয়া আজ আমরা কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব-কবির কয়েকটি পদ "ভারতবর্ষের" পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

যে পাঁচ জন কবির পদাবলী এখানে প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের নাম এই,—মীর ফয়জুল্লা, ফতন, সৈয়দ আইনদ্দিন, মোহাম্মদ হাসিম ও মনোয়ার। তাঁহারা একজনও নূতন কবি নহেন,—সকলেই আমাদের পূর্ব্বাবিষ্কৃত কবি; তবে পদগুলি নূতন বটে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন-রূপ পরিচয় আমরা পাইতে পারি নাই। তাঁহাদের যে সকল পদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাহা চট্টগ্রামেই পাওয়া গিয়াছিল; অধুকার পদগুলিও চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি, তাঁহারা সকলে চট্টগ্রামেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। চট্টগ্রামে কোনকালেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল না। অথচ তথায় হিন্দুমুসলমান বৈষ্ণব কবির এত আধিক্য যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা অন্য সময়ে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। নিম্নে, যেমন পাইয়াছি, পদগুলি তেমনই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

রাগ—কেদার।

রাধামাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু।
ব্রহ্মা জারে স্তুতি করে চারি বআনে।
হেন হরি নারাঅন দেখিবা নআনে॥
পুষ্প চন্দন লৈআ গোপী সব ধাএ।
মেলি মেলি মারে পুষ্প গোবিন্দের গাএ॥
পুষ্প চন্দনের ঘাএ জর্জ্জরিত হরি।
মাধবী লতার তলে লুকাএ মুরারী॥
মাধবী লতার তলে নন্দসুত রৈলা।
শ্রীকৃষ্ণ বুলিআ গোপী কাঁদিতে লাগিলা॥

মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লীলা।
শ্যামরূপ দরশনে দরবএ শিলা॥

রাগ—রামগরা।

কার ঘরের নাগর তুহ্মি কালিআ সোণা।
কার ঘরের নাগর তুহ্মি।
আউলাই কুন্তল মু'খানি ঝাপিআ রৈছে
ভালে চিনিতে নারি আমি॥ ধু।
নঅনের কাজল বঅানে লাগিছে
কথাএ আছিলা পরবাসী।
ঘুমের আলসে ঢলি ঢলি পড়ে
শুতি না ছিলা আজু নিশি॥
প্রেমের আনলে সকল শরীর জ্বলে
কি হৈল জঞ্জাল দিআ।
হীন ফতনে কহে ওরে সোণার বন্ধু
কঠিন তোহ্মার হিআ॥

রাগ—পাহিরা।

মলআনিল বন্ধুতে কহিঅ পরণাম।
জাইতে না পারি ডরে রিপুগণ আছে ঘরে
দগধএ হিআ বাণ কাম॥ ধু॥
সোআমী দুর্জ্জন অতি শাশুড়ি চঞ্চল মতি
দেঅরিআ বড়হি চতুর।
ভাই শ্বশুরে ন ভাসে ভাল জালের বিষম জ্বাল(১)
নিতি কহে বচন কঠোর॥
সতিনী রিসাল(২) অতি ননদী চাণক্য(৩) ভাতি
নেপুর আছএ মোর পাএ।
পদ অনুসারি জবে ঝুনাঝুনি বাজে তবে
কোলের ছাঁবাল(৪) কান্দে রাএ॥
জদি বন্ধু আইস এথা বিরলে কহিমু কথা
খণ্ডিব মনে দুঃখর ভার।
ছৈঅদ আইনদ্দিনে কহে কিরূপে জীবন রহে
সুজন বিচ্ছেদ হএ জার॥ ১॥

তুরি রাগ।

না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে হিআ।
মুই নারী পাগল কৈল নজানি কি দিআ॥ ধু।
মনের আরতি মোর ন পুরাএ পিআ।
হামো ছাড়ি দূরে জাএ পিয়া নিঠুরিআ॥
মুঞি ভাবম্ পিউ পিউ পিয়া ভাসে ভিন।
সহজে হইলু দাসী প্রেমের অধীন॥
পিয়ার উদ্দেশে দিমু জীউ বলিহার।
পিয়া বিনে মন্দিরে ত না রহিমু আর॥
কহে আইনদ্দিনে সখি স্থির কর মন।
সহিচিন (?) হৈআ ভার হইব মিলন॥ ২॥

রাগ—মালসী।

খোশ* না লাগে মোর মনে গৃহ বেবহার।
রাজপন্থে বিনোদিআ দিছে আখি ঠার॥ ধু।
একে ত তরুণ কালা আর বিনোদিআ।
ঠাকে মোহিত কৈল অবলার হিআ॥
তড়িত চমক ছিনি ঐরূপ ভঙ্গিমা।
অরুণ নিন্দিআ আছে অধর রঙ্গিমা॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে ধৈরজ ধরিআ।
গোপত মন্দিরে নাগর লঅত ভরিয়া॥ ৩।

রাগ—পূরবী।

অগো রাই কি করিমু রে কালা লাগিল
মোর মনে॥ ধু।
কালিআ কালিআ করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
কালা হইল প্রাণের বৈরী।
আখির পোতলী করি বন্ধুরে রাখিতে নারি
অঝরণে ঝরে দুইটি আখি।
কহে আইনদ্দিনে রাই চলরে ধেনুরে জাই
রাধা আর নন্দের নন্দন পাই। ৪।

---

(১) জাল—জা, স্বামীর ভ্রাতৃ-জায়া। জ্বাল—জ্বালা।
(২) রিসাল—ঈর্ষা-পরায়ণা।
(৩) 'চাণক্য' স্থলে মূলে 'চানাক্য' আছে।
(৪) ছাবাল—ছাওয়াল; ছেলে।

* খোশ—সুখ, আনন্দ।

পরছ—কামোদ।

বন্ধুআ মোর পরাণের পরাণ।
বিরলে পাইআ রূপ জৌবন দিমু দান ॥ ধু।
দেখিছি অবধি রূপ মন ভেল ভোলা।
প্রেমগুণ গুণি গুণি হিআ করোঁ (করে?) জ্বালা ॥
গোকুল কলঙ্ক বড় লোক উপহাস।
গোপত বন্ধুর লাগি জাতি কুল নাশ ॥
আইনদ্দিনে বোলে সখি মরম বেদনা।
কালা বিনে নিবারিতে নাহি আন জনা ॥ ৫।

তুরি গুঞ্জরী কেদার।

যশোমতি নিরোধ নন্দন আপনা।
কুলের বৌআরি লৈআ বাটে বাটে রৈআ রৈআ
না করএ জেন চেঙ্গপানা ॥ ধুআ।
ব্রজ রামা জলে জাএ পন্থে আবরিআ তাএ
মাগে আলিঙ্গন রস ডালি।
সঙ্গিআ বালক কথ চঞ্চল চঙ্গিআ মত
হাসি হাসি নাচে দিআ তালি ॥
কালিআ কাজল আঁখি কালিন্দী কুলেত থাকি
মুররি আলাপে অনুপাম।
গোপী আসিব আশে বাঁশী সানে নানা ভাবে
একে একে ধরি নামে নাম ॥
শুনি ও বাঁশীর নাদ রাধিকার পরিবাদ
গোকুলে হৈআছে জানাজানি।
আইনদ্দিনে বোলে রাই বাঁশিআর দোষ নাই
ভোলাইছে ওহি সোহাগিনী ॥ ৬।

রাগ—গান্ধার।

ন জানো ন চিনো কেবা জমুনার কুলে।
দুরে থাকি বাজাএ বাঁশী ফুলের মালা গলে ॥ ধু।
খেলে হাটে খেলে বাটে খেলে তরুমূলে।
খেলে খেলে তার বাঁশী রাধা রাধা বোলে
খেলে খেলে বান্ধে চূড়া খেলে খেলে খোলে।
খেলে খেলে বাঁশীর নাদে জল তোলে কুলে ॥
মোহাম্মদ হাসিমে কহে ভুবন মোহিলে।
কার বাঁশী হেন হি বুলিবে ব্রজকুলে ॥ ১।

রাগ—দেশকার।

সহিমু কথ বিরহ আগুনি। ধু।
জবে করি রোস তবে হৈবে দোষ
তেকারণে বসি শুনি।
কহিলে এ হএ আনলে বাহিরে দহএ
পিছে লাগি আছে শনি।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে
মুখে ন আইসএ বাণী।
কহিলে এ কথা মনে লাগে বেথা
অকীর্ত্তি হইবে জানি ॥ ২।

তুরি পরছ।

রূপ দেখি কেবা জাইব ঘরে।
চিত্ত কাড়া* কালার বাঁশী লাগিছে অন্তরে ॥ ধু।
কিবা দিনে কিবা খেনে বন্ধুর সনে দেখা।
জেবা ছিল জাতি কুল ন জাইব রাখা ॥
সে সে জানে কালার বাঁশী লাগিআছে জারে।
ছাড়িব জগত মায়া তরাইবে কারে ॥
মোহাম্মদ হাসিমে কহে রূপের নিছনি।
কিবা আছে কিবা দিমু সবে সুধা † প্রাণি ॥ ৩।

রাগ—মালসী ভৈরব।

রৈআ রৈআ উঠে মনে ঐহি বিনোদিআ।
দেখিআছি অবধি রূপ পাসানেরি হিআ ॥ ধু।
কদম্বের তলে থাকি নিতি আখি ঠারে।
কুলের কামিনী দেখি রৈতে নারি ঘরে ॥
কিএ হাস লাস গৃহবাস অকারণ।
ঐরূপ কালার ভাবে লাগিআছে মন ॥

---

* চিত্ত কাড়া—চিত্ত-হরণ-কারী; যে চিত্ত কাড়িয়া নেয়।
† সুধা—শুধু।

সুবর সুন্দর কান্ত রসিআ নাগর।
অবিলম্বে ভুজ ধনি ভণে মনুঅর ॥ ১।

রাগ—নট গান্ধার।

ও কি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিন্দীর
ন জানি কি হৈল আজু মরম অন্তরে ॥ ধু।
সুন্দর ললিত অঙ্গ পরসিছে সাপে।
জর জর হৈল তনু থর থর কম্পে ॥
কনক কমল মুখ ঝাপিল চিকুরে।
ক্ষীণ কটি লতা জেন বাএ হালি পড়ে ॥
গগনের শশী জেন ভূমিতলে গড়ে।
হাতে ধরি শ্যামে আসি তুলি লএ কোরে ॥
মনুঅরে কহে এহি ডংসিছে মদনে।
করিছে সন্ধান রাধে কেলির কারণে ॥ ২।

নটরাগ। দীর্ঘছন্দ।

আকি মাধব আর রোস খেমা কর মোহে।
জানি কি কৈরাছি দোস তাত নাকি কর রোস
কর পুটে নিবেদহো তোহে ॥ ধু।
হামো কুল বিহীনি তুআ নাম গুনি গুনি
রহল জানিনী বর জাগি।
এ নব জোবন ভার সহিমু কথেক আর
সতত দহএ মন আগি ॥
এ চুআ চন্দন মোহে গরল সে উগহে
তুআ বিনে আন নাহি জাগে।
করিআ জুগিনী ভেস জাইমু মথুরা দেশ
পুরিবে মানস থাকে ভাগে ॥
শবদ শুনিআ হাটে ধাই আইনু জমুনা ঘাটে
তাত নাহি মাধবের দেখা।
হীন মনোঅরে ভাণ ভজ গুরুপদ জ্ঞান
ভাবিলে পাইবে থাকে লেখা ॥ ৩।

নট সিন্ধুরা।

নিল মোর নাগর কে হরিআ।
কিরূপে রহিমু ঘরে কালারে না দেখিআ ॥ ধু।
জীবের জীবন নাগর মোর সেই বন্ধুআ।
জুগল নআন কালা মোর ভাল বন্ধুআ ॥
বল বুদ্ধি জ্ঞান নাগর এ রঙ্গ রঙ্গিআ।
রসের রসিআ নাগর কে নিল ভাড়িআ ॥*
জেন জদি জানি নাগর জাইবে ছাড়িআ।
মনোঅরে কহে হৈতুম তার সঙ্গে সঙ্গিআ ॥ ৪।

রাগ—আহির পরছ।

আজু সই কি দেখিনু স্বপনে।
বিদিত বিমল হরি মিলিন আপনে ॥ ধু।
শারদ সময় জেন জামিনী উঝল।
ঝলকিত ভেল আভা চমকে চপল ॥
নআনে লাগিল রূপ আসি আচুম্বিত।
জাগিতে হারাইলু হরি শোকে দহে চিত ॥
কি দেখিনুং কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পানি কহে মনুঅর ॥ ৫।

বারান্তরে অবশিষ্ট পদাবলী প্রকাশ করা যাইবে

---

*ভাড়িআ—প্রবঞ্চনা করিয়া।

সাময়িকী

বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে একটী কথা লইয়া বড়ই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। 'আন্দোলন' কথাটা বোধ হয় সুপ্রযুক্ত হইল না; সাহিত্যিকগণ যদি অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে বলিতে চাই যে, 'আন্দোলন' নহে, 'শান্তিভঙ্গে'র সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। কথাটা আর কিছুই নহে—বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধুভাষা চলিবে, না, চলিত ভাষা চলিবে। এই বিরোধে বাদী-প্রতিবাদী—অথবা আইন-অনুসারে ঠিক কথা বলিতে হইলে—ফরিয়াদী-আসামী—উভয় পক্ষই প্রবল। এক পক্ষ বলিতেছেন, সাধুভাষাই সাহিত্যে চলিবে; অপর পক্ষ বলিতেছেন, চলিত ভাষাই চলিবে। তর্কবিতর্ক শেষ না হইতেই, আমাদের দেশের দস্তুর-অনুসারে ব্যাপারটা গালাগালি ও ব্যক্তিগত আক্রমণে যাইয়া পৌছিয়াছে; আর একটু—সামান্য একটু অগ্রসর হইলেই—"শান্তিভঙ্গ" হইবে।

— ——

আমরা কিন্তু এই সকল তর্কবিতর্ক, বাদ-বিসংবাদ, গালাগালি, ব্যক্তিগত আক্রমণ,—কিছুরই প্রয়োজন অনুভব করিতে পারিতেছি না; অথচ দেখিতেছি, সাহিত্য রণক্ষেত্রে অনেক মহারথীই নানা হাতিয়ার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কাহারও হস্তে শাণিত তরবারি, কাহারও হস্তে লাঠিসোটা, কাহারও হস্তে বা আমিষের বঁটি। কিন্তু এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া যে এখনকার দিনে কিছুতেই সম্ভবপর নহে, এ কথা কেহই বুঝিতেছেন না—কেহই সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা একটা মোটা কথা বলিতে চাই। আমরা বলি যে, আজকালকার দিনে যুক্তিতর্ক খাটিবে না—যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিবেন; কাহারও 'স্বাধীন মতেই' কেহ বাধা দিতে পারিবেন না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে যাঁহার যাহা খুসী, তাহাই লিখিবেন; সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ কাহারও কথায় চলিবে না। সুতরাং তর্কবিতর্ক নিতান্তই নিষ্ফল। যাঁহার যাহা মরজি, তিনি তাহাই লিখিয়া যান; একজন আছেন, যিনি একদিন ইহার মীমাংসা করিবেন। তিনি—কাল। তিনি কাহারও মুখের দিকে চাহিবেন না, তিনি কাহারও যুক্তি মানিবেন না তাঁহার হাতে পড়িয়া যিনি টিকিয়া থাকিবেন, তাঁহারই জয়

———

আমাদের এ কথায় হয় ত কেহ তর্ক তুলিবেন বলিবেন "ও কি রকম কথা হইল? 'কালের' উপ ফেলিয়া রাখিলে ত কথাই চলে না। আপনাদের কথ কেহ মানুক, আর নাই মানুক—আপনারা স্বাধীনভাবে ম প্রকাশ করিবেন না কেন? 'কাল' ত করিবেনই আপনারা কি করিতে চান, তাহাই বলুন। তাহা ন পারেন, চুপ করিয়া থাকুন।" চুপ করিয়া থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু কথাটা যখন তুলিয়াছি, তখন মতটা না হয় দিই। তবে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিচারকে আসন কিন্তু শূন্যই থাকিবে—সে আসন 'কালের' জ রহিল। আমরা একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয়। তিনি তাঁহার 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা'য় বলিয়াছেন,—"স দিক দেখিয়া 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' এই মামলা মীমাংসা করিতে হইলে, আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্ ছাড় উপায় নাই। বাস্তবিক, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র যে কাজী বিচার করিয়া দিয়াছেন, যিনি যাহাই মুখে বলুন, সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। রোখের মাথায় টেকচাঁদ ঠাকুর যে আলালী ভাষা চালাইয়াছিলেন, তাহার পুনঃ প্রচলন বোধ হয় এখনকার দিনে কেহই চাহেন না নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষায় রচনা-নীতির প্রাণবস্ত বিদ্যাসাগর তারাশঙ্করের ও অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে-সঙ্গেই উড়িয় গিয়াছে, এখন তাহার কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতির বায়ুশূন্য টানের কৌটায় রক্ষিত। মুষ্টি মেয় লেখক প্রাচীন রীতি আঁকড়াইয়া আছেন, ফলে তাহাদের পাঠক যুটিতেছে না। পক্ষান্তরে মনীষী ৺ ভূদে মুখোপাধ্যায় গম্ভীর প্রবন্ধেও চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাই বলিতেছিলাম

বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব রচনারীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী ; সকল সুলেখকই সেই মহাজনের পথ ধরিয়াছেন।" আমাদেরও এই মত ; কোনদিকেই ইহার বাড়াবাড়ি আমরা ভাল মনে করি না। কালের এই মীমাংসা বাঙ্গালা-সাহিত্য মানিয়া লইয়াছিল। ইহার পর যদি 'প্রতিভার আদেশ'-মোতাবেক 'কাল' হুকুম করেন, তাহা হইলে 'আবার নতুন ধরণে মৌনের মতো লিখ্‌বো' অথবা দীনবন্ধুর হেমচাঁদের অনুকরণে লিখিব 'উষ্ট্রেরা মরুভূমিতে চরিয়া বেড়ায় ব্যতীত পান করিয়া এক ফোটা জল অনেকক্ষণ।'

এবার বড়দিনের সময় বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সময় ত বেশী নাই, কাজেই এখন হইতেই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মিলনের প্রধান সভাপতি এবং শাখা-সভাপতিগণের মনোনয়ন শেষ হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় প্রধান সভাপতি হইয়াছেন ; তাহার পর সাহিত্য-শাখায় ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, ইতিহাস শাখায় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দর্শন-শাখায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়গণ সমাসীন হইবেন। এক দফা নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছে ; ইহা সম্মিলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ নহে, প্রবন্ধ লিখিবার নিমন্ত্রণ। আমরা এই প্রবন্ধ-প্রেরণ সম্বন্ধেই দুই-চারিটী কথা বলিতে চাই। প্রবন্ধ লিখিবার জন্য কতজনকে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক না জানিলেও—তাহা যে চারি শতের কম নহে, ইহা বলিতে পারি। এখন, যদি এই তিন-চারি শতের মধ্যে দেড়শত জন প্রবন্ধ লেখেন, তাহা কি সম্মিলনে পড়িবার সময় হয়? এতদিন দেখিয়া আসিতেছি, অনেকগুলি প্রবন্ধই কবন্ধ করিয়া পঠিত হয় ; যিনি ৫০পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, তিনি পাঁচ মিনিট সময় পান ; সুতরাং তাঁহাকে পাচ পৃষ্ঠা মাত্র পড়িতে হয়। অনেক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এ কথাটার অর্থই আমরা বুঝিতে পারি না ; এই 'taken as read' কথাটা কি? প্রবন্ধগুলির ছাপা-কাপি যদি বিতরিত হয়, তাহা হইলে কথাটার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না—অথচ 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' হয়! সাহিত্য-সম্মিলনে প্রেরিত প্রবন্ধগুলির এমন সদ্গতি হইতে দেখিয়াও যে অনেকে প্রবন্ধ প্রেরণ করেন, ইহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার!

প্রবন্ধের ত এই গতি হইল। তাহার পর, যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহা লইয়া আলোচনার অবসর দেওয়া হয় না। সভাপতি মহাশয়েরা যে ইচ্ছা করিয়া দেন না, তাহা নহে ; সময়াভাবই ইহার কারণ। ইহাতে প্রবন্ধ-পাঠের কোনই ফল হয় না। আরও এক কথা ; যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া আনেন, তাঁহারা গুরু বিষয়েরই অবতারণা করিয়া থাকেন ; সেই সম্বন্ধে তখন দশকথা বলা বড় সহজ নহে, অনেকেই তাহা পারেন না। মনে করুন, কেহ ইতিহাস সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সে বিষয়ে তখন তখনই কথা বলা অতি কম ঐতিহাসিকেরই সাধ্যায়ত্ত ; সুতরাং অনেক সময়ে আলোচনারও সুবিধা হয় না। অমুক বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হইবে,—এ কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, অনেকে সে বিষয়ে কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারেন। সে সুযোগও হয় না, সময়ও পাওয়া যায় না। সভা-সমিতিতে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবার ব্যবস্থা হইলে,পূর্ব্বেই প্রবন্ধের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয় ; এবং বিশেষজ্ঞগণ সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া সভায় গমন করেন ; সুতরাং প্রবন্ধ-পাঠের ফলও হয়। কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনে ত তাহা হয় না, হইবার উপায়ও নাই। সুতরাং সম্মিলনে কিছু জানিবার, শিখিবার কোনই সুবিধা হয় না।

আমাদের মনে হয়, এতাবত-কাল যে ভাবে সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পঠিত হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এমনভাবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সাহিত্যিকবৃন্দকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করা ঠিক নহে। সম্মিলনের বিভিন্ন শাখায় আলোচনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে দুইটি বিষয় স্থির করা হউক এবং সেই কথা সম্মিলনের অধিবেশনের বহু পূর্ব্বে —পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনেই বিজ্ঞাপিত হউক। যাঁহারা সেই-সেই বিষয়ে এতদিন বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সেই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হউক এবং সেই বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকেও প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য বলা

হউক। তাঁহারা লিখিয়াই আসুন, বা স্মারক-লিপি লইয়াই আসুন,—যাহা তাঁহাদের সুবিধা হয়, তাহাই করুন। প্রথম দিনের অধিবেশনে এখন যেমন হইতেছে, তেমনই ভাবে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও প্রধান সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইয়াই সভার কার্য্য শেষ হইবে। দ্বিতীয় দিনে একবারমাত্র চারি শাখার অধিবেশন হইবে। তাহাতে প্রত্যেক শাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন। তাহার পরেই সে দিনের নির্দ্দিষ্ট লেখক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তৎপর সেই প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা হইবে। এই আলোচনার ফল এই হইবে যে, প্রবন্ধ-লেখকের স্বপক্ষে বিপক্ষে সমস্ত কথাই জানিতে পারা যাইবে; কারণ সকলেই ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যাইবে—একটা কাজের মত কাজ হইবে; সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয় দিনেও ঐ ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট লেখক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এবং অন্যান্য সকলে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবেন; লিখিয়া হউক, বা বক্তৃতা করিয়া হউক, সকলেই এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন। এ-বেলা, ও বেলা সম্মিলনের অধিবেশনও করিতে হইবে না, রাশি-রাশি প্রবন্ধকে কবন্ধ করিয়াও পাঠ করিতে হইবে না; এবং বিশেষ-বিশেষ বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বিরক্ত হইয়া এ-শাখা, ও-শাখা করিয়াও বেড়াইবেন না। এ দিকে পরস্পর দেখাশুনা, আলাপ-পরিচয়, ভাব-বিনিময়েরও যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে—যথার্থ সম্মিলন হইবে।

আর একটী কথা বলিলেই সম্মিলনের কথা এবার-কার মত শেষ হয়। এখন যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান-শাখা-তেই পর বৎসরের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মনোনীত হইয়া থাকেন, অন্য তিন শাখাতেও সেই নিয়ম প্রচলিত করিতে হইবে; এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে কোন্ দুইটী বা তিনটী বিষয়ের আলোচনা হইবে এবং কে কে মূল প্রবন্ধ লিখিবেন, তাহাও পূর্ব্ব অধিবেশনের বিভিন্ন শাখাতেই স্থিরীকৃত হইবে। ইহাতে কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইবে; সভাপতি-মনোনয়ন লইয়া কোন গোলযোগই হইবে না। যেবার যেখানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতি কেবল প্রধান সভাপতি মনোনয়ন করিবেন। আমাদের মনে হয়, এই ভাবে সম্মিলন পরিচালিত হইলে, সম্মিলনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে; নতুবা, এখন যাহা হইতেছে, তাহাতে কোন ফলই হইতেছে না;—লাভের মধ্যে ত দেখিতেছি—দলাদলি, গালাগালি, হিংসা, দ্বেষ; এখন সম্মিলন অমিলনেরই নামান্তর হইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষাসম্বন্ধে আমরা ক্রমাগতই আমাদের অভিমত পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি। এবার আমরা আমাদের দেশের একজন প্রধান ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরী "হিন্দুরমণীর শিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দেশের লোককে আহ্বান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাঁহারা এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রধান-প্রধান মহোদয়গণের নিকট হইতে বিবেচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই সকল মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ-লেখক-দিগকে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই সম্বন্ধে চৈতন্য-লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকাগণ এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিবেন এবং তীক্ষ্ণধী সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সসম্মান নিবেদন—আপনার ৩১এ জুলায়ের পত্র পাইলাম। চৈতন্য-লাইব্রেরীর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি "'হিন্দু রমণীর শিক্ষা ও গৃহকর্ম্ম' সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত প্রবন্ধে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত, এ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। এতাদৃশ গুরুভার-কার্য্যে আমার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান।

এ বিষয়ে দেশের সকলেই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইতেছেন। চৈতন্য-লাইব্রেরীর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সে সকল চিন্তার ফল সংগ্রহ করিয়া দেশের

কাজে লাগাইবার উপযোগী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা বিশেষ আশাপ্রদ।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও সমাজগত শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—ইহাও আশাপ্রদ।

১। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধকার সেই রিপোর্টকে তাঁহার প্রবন্ধের ভিত্তি করিতে পারেন। হিন্দু-রমণীর শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কমিটি যে সকল মন্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা হিন্দুসমাজের বাস্তবিক কতদূর উপযোগী এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সমাজের পক্ষ হইতে তাহার বিচারও বিশদ-ভাবে প্রয়োজন।

২। রমণীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষা হইতে কোন্-কোন্ বিষয়ে কতদূর স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব ও উচিত, তাহাও বিচার্য্য।

৩। হিন্দুরমণীর শিক্ষা অন্যান্য রমণীর শিক্ষা হইতে কোন্-কোন্ বিষয়ে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব ও উচিত, তাহাও বিবেচ্য।

৪। হিন্দু-সমাজের আচার ব্যবহারগত পার্থক্যও বাল্যবিবাহের অনতিক্রমনীয় নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া কি উপায়ে সে শিক্ষা-প্রণালীর প্রসার সম্ভব, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ কিরূপে হইতে পারে, তাহাও বিচার্য্য।

গভর্ণমেণ্ট ও সমাজের এ বিষয়ে দায়িত্বের অংশ কিরূপ এবং কি উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্ভব, তাহাও বিচার্য্য।

৫। বিবাহের পরে পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে আরব্ধ শিক্ষা-ক্রমচ্যুতি না হইবার উপায় বিবেচ্য।

৬। স্থানীয়, সাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রসারের উপায় বিবেচ্য।

পল্লীগ্রামে ও সহরে এ সকল বিষয়ের যে পরিমাণে পার্থক্য ঘটিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পল্লীসমাজের ও নগরসমাজের শিক্ষাপ্রণালীর পার্থক্যও বিচার্য্য।

৭। এই সকল পার্থক্যবশতঃ আচার-ব্যবহার ও বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন যে পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তন্নিবন্ধন সমাজের যথার্থ ও স্থায়ী ক্ষতি কিসে না হয়, তাহাও চিন্তনীয়।

৮। রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন গৃহধর্ম্মচর্য্যা পরস্পর বিরোধী নহে, বরং পরস্পরের সম্পূর্ণ অনুকূল ও প্রয়োজনীয়,—ইহা অবশ্য প্রতিপাদ্য। কি উপায়ে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

সনাতন ধর্ম্মে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা, পারিবারিক সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, সর্ব্বাঙ্গীন মিতাচার এবং সংযম উচ্চতম শিক্ষার বিরোধী নহে, বরং যথার্থ উচ্চ-শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ সহায়ক—ইহা প্রমাণ-প্রয়োগ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে হইবে।

৯। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রণালীর তিরোভাবের সহিত সমাজে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রমণীর শিক্ষা-প্রণালীকে তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে হইবে। অনেককেই বাল্যবয়সেই বিদেশে সংসার ভার লইতে হয়। গৃহকর্ম্ম ও শিক্ষা তদুপযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বাল্যে ও কৌমারে ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনীপতি, শিক্ষক ও ভৃত্যবর্গের প্রতি আচরণ, যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় পতিগৃহে পরিজনবর্গের প্রতি আচরণ, সন্তান-পালন, শ্বশ্রূ শ্বশুরের ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা, পতির বন্ধুগণের, প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের ও ভৃত্য-গণের প্রতি ব্যবহার, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা রোগীচর্য্যা, গৃহচর্য্যা, ইত্যাদি সম্বন্ধে সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থার প্রয়োজনীয় কথা আলোচ্য। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা ও গৃহধর্ম্মের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। এক সময়ে, এক অবস্থায় যাহা প্রযোজ্য, অন্যত্র তাহা নহে।

অতি পূর্ব্বে, "ব্রতকথা" শুনিয়া, ব্রতচর্য্যা করিয়া, তার-পর "সুশীলার উপাখ্যান" ও ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ"; মধ্য অবস্থায় শিবনাথ বাবুর "মেজ বৌ" ও তারক বাবুর "স্বর্ণলতা" পাঠ করিয়া যে উপদেশ লাভ হইত—এখন ভয়াবহ প্রকাণ্ড "করিকুলা" (curricula) গ্রাস করিয়াও তাহা হয় না কেন, তাহাও বিবেচ্য। বালক-বালিকা উভয়ের শিক্ষার মধ্যেই এক শ্রেণীরই "ধ্বংস কীটের" আবির্ভাব হইয়াছে। অভিনব কোন পাষ্টিওর

(Pasteur) তাহার বিনাশ সাধন না করিতে পারিলে নিস্তার নাই।

সম্প্রতি "গার্ল গাইড" (Girl Guide) সম্বন্ধে লেডি ষ্টুয়ার্ট (Lady Stewart) টাউন হলে (Town Hall) এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। কোন-কোন বক্তা "বাঙ্গালিনী গার্ল গাইডের" পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করাতে, বাধ্য হইয়া আমায় বলিতে হইয়াছিল "গার্ল" ত' আজীবন আমাদের "গাইড" ছিলেন,—আছেন,—হইবেন। গত পূজার পর "মর্ম্মবাণীতে" "ত্রয়ী" নামে কয়েক ছত্রে যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম, টাউনহলেও সে ভাব বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম "বিলাতী প্রণালীর 'গার্ল গাইড মুভমেণ্টে (girl guide movement) আমাদের উপকার হইবে না, বরং অপকার হইবে; এবং সে "মুভমেণ্টের" মূলমন্ত্র এদেশে বহুদিন পরিচিত। সেই মূলমন্ত্রেরই পুনরুদ্ধার প্রয়োজন, নতুবা এদেশে অবিকল "কিণ্ডারগার্টেনের" (kindergarten) দশা হইবে। পুরাতনকে একটু ঝালিয়া-মাজিয়া, সাময়িক কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টার ভার আপনাদিগের হস্তে।

লেডি ষ্টুয়ার্টকে তাঁহার বক্তৃতার নকলের জন্য লিখিয়াছি। তাহা পাইলে পাঠাইয়া দিব। প্রবন্ধকার সে প্রবন্ধটিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা কতদূর কি ভাবে গ্রহণীয়, তাহার বিচার করিতে পারিবেন। সেই প্রবন্ধ হইতে দেখিবেন যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান (Anglo-Indian) জগতে হিন্দুরমণীর শিক্ষা ও গৃহধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে উভয় সমাজের মঙ্গল-সম্ভাবনা। এ কথা সেদিন টাউনহলে বলিয়া কাহার কাহারও বিরাগ ভাজন হইয়াছিলাম।

এ কথা যদি আপনাদিগের গ্রহণীয় মনে হয়,তাহা হইলে প্রবন্ধকার এ বিষয়েও আলোচনা করিতে পারেন।

হিন্দুর গৃহ তাহার ধর্ম্মচর্য্যা, সাহিত্যচর্য্যা, সমাজচর্য্যা, সুখচর্য্যা, আমোদচর্য্যা ও রোগচর্য্যার স্থান। আহারের জন্য, বন্ধুচর্য্যার জন্য যাহাতে হোটেলে যাইতে না হয়, আমোদের জন্য থিয়েটারে কিম্বা বন্ধুভবনে যাইতে না হয়, কাজ করিবার জন্য পলাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে না হয়, ধর্ম্মচর্য্যার জন্য নিত্য মন্দিরে বা মঠে যাইতে না হয়, রোগসেবার জন্য হাঁসপাতাল কিম্বা বাটীতেই নার্শের (nurse) আশ্রয় লইতে না হয়, এবং সাহিত্যের বা সমাজ-নৈতিক আলোচনার জন্য সভাসমিতি অপরিহার্য্য না হয়, সাফল্যপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন সামাজিক জীবনের এই আদর্শের পরিপুষ্টির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন—সেই শিক্ষাই পুরুষ ও রমণী, উভয়ের পক্ষেই প্রকৃষ্ট। উভয়ের মধ্যে প্রণালীভেদ অবশ্যম্ভাবী। টেনিসনের (Tennyson) প্রিন্সেসের (Princess) পূর্ব্বে ও পরে তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

তবে সামাজিক নানা পরিবর্ত্তনের কৃপায় কোন-কোনও রমণীর পক্ষে স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়েরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা-সামঞ্জস্য-বিচার সময়ে এ বিষয়ও বিবেচ্য। এ শ্রেণীর শিক্ষা পাইলেই যে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রীলোককে স্বাধীনভাবে শ্রম করিতেই হইবে, তাহা নহে। জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় আয়ত্ত থাকিলে, অনেক সাংসারিক সাধারণ উপকার সম্ভব। সুকুমার কলা ও পারিবারিক শিল্পের প্রসার এই উপায়েরই অন্তর্গত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অতি অল্প পরিসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন; এবং তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা যাহা শুনিতে আশা করি, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সকল কথায় সায় দিবেন না; তাঁহারা পাশ্চাত্য উজ্জ্বল আলোকে অন্ধ হইয়া আমাদের দেশটাকেও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন করিতে চান। তাঁহারা ভুলিয়া যান 'East is east and West is west' উভয় প্রদেশে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই প্রভেদের জন্যই হিন্দুসমাজ টিকিয়া আছে এবং টিকিয়া থাকিবে। যাঁহারা এই প্রভেদ, এই সামাজিক-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চান, তাঁহারা দূরদর্শী নহেন; তাঁহাদের চেষ্টার ফলে তাঁহারাই বিপন্ন হইবেন।

কল্পতরু

একটী বিচিত্র দেশ

[শ্রীচুণীলাল মিত্র]

আজকাল বায়স্কোপ দেখা যেন আমাদের দেশে একটা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এক সময়ে বালকবালিকাগণের শিক্ষার্থ 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই শিক্ষা-প্রণালী এখনও প্রচলিত। সম্প্রতি বিলাতে এবং য়ুরোপের কোন-কোনও দেশে 'সিনেমা'র দ্বারা বা বায়স্কোপ দেখাইয়া শিক্ষা প্রদান চলিতেছে। এই শিক্ষা-প্রণালী অতি অল্পকালেই সুফল প্রদান করাতে এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, মনে হয় শিশু শিক্ষা-জগতে ইহা শীঘ্রই যুগান্তর আনয়ন করিবে। কলিকাতায় অনেকে Lectureএর সহিত Lantern demonstration দেখিয়াছেন, তাহাতে বক্তৃতাগুলি স্পষ্টতর ও হৃদয়গ্রাহী হয় এবং অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল যে 'সিনামেটোগ্রাফ' প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি বিচিত্র। শতশত হস্ত প্রমাণ সুদীর্ঘ 'সেলুলয়েড'-নির্ম্মিত (Celluloid) Filmএর উপর সুন্দর-সুন্দর আলোক-চিত্র প্রতি-ফলিত করিবার নিমিত্ত এই Filmকে দ্রুতগতি ক্যামেরার সম্মুখ দিয়া চালান হয়। তখন ঐ ছবিগুলি উহাতে অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রতি সেকেণ্ডে অন্যূন পঞ্চাশখানি ছবি লওয়া হয়। এই গুলিকে বড় পিপার উপর রাখিয়া develop করা হয়। Ruby Lampএর সাহায্যে এই কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। তৎপরে negativeগুলি হইতে positive তোলা হয় এবং সেইগুলি optical lantern ও objective Lensএর মধ্য দিয়া ঐ পর্দ্দার উপর নিক্ষেপ করিলেই বেশ ছবি দেখা যায়। এক ঘণ্টায় অন্ততঃ অর্দ্ধলক্ষ হইতে দেড়লক্ষ ছবির দরকার হয়। এই ছবি প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেক বলিবার কথা ছিল, কিন্তু সেগুলি জটিল technicalities তে পরিপূর্ণ। পাঠকের চিত্তরঞ্জক হইবে কি না, এই আশঙ্কায় তাহা বিবৃত করিতে বিরত হইলাম।

পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন যে, বায়স্কোপের ছবিগুলি এক-এক সময়ে এত কাঁপিতে থাকে যে, দেখা কষ্টকর হইয়া উঠে। পুরাতন হইলে Cinemaর এই দোষ ঘটে। Cinema দেখাইবার আর একটি উপায় আছে। ইহাতে ছবিগুলি একখানি বইএ সাজান থাকে; এবং পরে এই ছবিগুলি হাতের কিম্বা যন্ত্রের সাহায্যে খোলা হয়। এই উপায়ে ছবিগুলি পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত করিয়া দেখান হয় না, একেবারে চক্ষের উপর ফেলা হয়।

এইবার আমরা Cinema প্রস্তুত করিবার একটা প্রধান কারখানা বা আড্ডার কথা বলিব। আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে 'লস এঞ্জেলিসের' উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর সান্ ফারনান্দো উপত্যকায় একটা অত্যাশ্চর্য্য নগরী স্থাপিত হইয়াছে। কেবল সিনেমা প্রস্তুত করিবার জন্য এই নগরীর সৃষ্টি। এই স্থানটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, গভীর অরণ্যানী, ও তন্মধ্যে রজত-রেখার ন্যায় বিস্তৃত মনোহর নদনদীসমন্বিত। এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য হইতে আবার কত সুন্দর মনুষ্যহস্ত-নির্ম্মিত দৃশ্যাবলি নয়নগোচর হয়। এই নগরীটা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইলেও ইহারই মধ্যে জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে; এবং যদিও ইহার সরকারী নাম "বিশ্বনগরী", তথাপি ইহা পাগলামীর সহর বলিয়াই সাধারণের নিকট বেশী পরিচিত। 'বিশ্বনগরী' নামটী কেন দেওয়া হইয়াছে, বলা যায় না; কারণ, ইহার অধিবাসীর সংখ্যা দুই সহস্রের অধিক নহে। তাহারা সমগ্র পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের চিত্ত-বিনোদনের জন্য জীবন অতিবাহন করে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত কত নাটক-প্রহসন এখানে অভিনীত হইতেছে; কিন্তু দর্শক একটী মাত্র; সেটী ক্যামেরা বা ফটো লইবার যন্ত্র। তাহারই সাহায্যে এই সকল অভিনয়ের আলোকচিত্র লওয়া হয়। এখানকার সমস্ত অধিবাসী 'সিনেমা'র জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করেন; এবং এই 'বিশ্বনগরীর' সীমানার মধ্যে এমন কেহ বাস করেন না, যিনি কোনও প্রকারে এই কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ন'ন। এখানকার প্রধান রাজপুরুষ, পুলিশ কর্ম্মচারী হইতে মেথর, ধাঙ্গড় পর্য্যন্ত সকলেই অভিনয়ে ব্যাপৃত। এমন কি দর্শকগণও আসিলে তাঁহাদিগকেও ইঁহারা নিজের দলভুক্ত করিয়া ল'ন। তাঁহারাও প্রয়োজনানুসারে এই অভিনয়ে যোগদান করেন।

এখানকার প্রধান রাজপথ দিয়া চলিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুন্দর, সুবিস্তৃত রাস্তাগুলি সুবিখ্যাত প্যারী নগরীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছু দূর অগ্রসর হইলে আবার বীথিশোভিত শিকাগো সহরের এক নূতন চিত্রের আবির্ভাব হয়। ডানদিকে অগ্রসর হউন; দেখিবেন, আপনি কাইরো সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন; কোথাও উষ্ট্রগণ রোমন্থন করিতেছে, মুর ও আরব জাতীয় মুসলমানগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আবার বামদিকে ফিরিয়া দেখুন, শতবর্ষ পূর্ব্বে লণ্ডন সহরের, ডিকেন্সের চিত্রিত সেই তখনকার লণ্ডনের জাফ্রী সমন্বিত জানালা, পুরাতন ঢালু ছাদসমন্বিত গৃহসমষ্টি, ফুলকাটা দেওয়াল, সেই

সময়ের স্থাপত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; খানিকক্ষণ ঘুরিলে মনে হয়, যেন গোলকধাঁধার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি; এবং নিজেকেও বহুরূপী বলিয়া মনে হইবে। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র সহরটীকে সদাসর্ব্বদা ক্যামেরার উপযোগী করিয়া লইবার জন্য ভাঙ্গাগড়া ক্রমাগত চলিতেছে।

প্রত্যেক নগরের ন্যায় এটারও সৃষ্টির সহিত একটী সুন্দর রহস্য-পূর্ণ উপন্যাস বিজড়িত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন অজ্ঞাতনামা দরজী জাহাজ হইতে নিউইয়র্ক সহরে নামিলেন। জীর্ণ ও পুরাতন বস্ত্র সংস্কারে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত জিনিষগুলির ক্রেতার যোগাড় করিতে তাঁহাকে প্রায় অর্দ্ধেক আমেরিকা ঘুরিতে হইয়াছিল। তিনি একদা রাত্রিকালে সহরের এক ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি শ্রেণীবদ্ধ একটী জনতার উপর নিপতিত হইল। লোকগুলি একটী পুরাতন বাটীতে প্রবেশ করিবার জন্য ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং সকলেই অগ্রে প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল। সেই বাড়ীতে বায়স্কোপ দেখান হইতেছিল। তখন এই ছায়া-চিত্র সবেমাত্র প্রচলিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সেই দরজীর মনে এক চিন্তার উদয় হইল; তিনি সহরময় ঘুরিয়া দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকেই বায়স্কোপ প্রদর্শিত হইতেছে। এক জায়গায় ঢুকিয়া দেখিলেন অসম্ভব ভীড় এবং সকলেই মুগ্ধ হইয়া ছবি দেখিতেছে।

তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই ছায়া-প্রদর্শনী জগতে স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করিতে আসিয়াছে। তখন এই ব্যবসায় করিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। তিনি শীঘ্রই বুঝিলেন যে, বায়স্কোপ দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে বটে, কিন্তু Film তৈয়ার করিতে পারিলে খুব বেশী লাভ হইবে। এইবার তিনি বন্ধুবর্গ, পরিচিত, আত্মীয়—সকলের নিকট এই ব্যবসায়ের প্রস্তাব করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু দুই-চারিজন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। সেই কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে তিনি এই মহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন; একটী সিনেমার কারখানা স্থাপিত হইল।

এই সময় দরজীর নামটী আমরা বলিয়া রাখি—তাঁহার নাম কার্ল॥ কার্ল তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও সুদূরদর্শিতার প্রভাবে সেই কারখানাটীকে ক্রমে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম 'ষ্টুডিও'তে পরিণত করিলেন। শেষে এই স্থানে সপ্তাহে ২৫০০০ ফিট করিয়া Film তৈয়ারী হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কুলাইয়া উঠিল না। তাঁহারা যে প্রদর্শনী স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ২৫০০০ ফিটের অপেক্ষা অধিক Film এর প্রয়োজন হইল। তখন কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিবার জন্য তাঁহারা মন্ত্রণার জন্য নিউইয়র্ক সহরে সমবেত হইলেন। মন্ত্রণা-সভায় কার্লের উপর এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। কার্ল সেই রাত্রের ট্রেণেই ফিরিয়া আসিলেন। কারখানায় আসিয়া ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া ও নিজে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, সে স্থানে আর কারখানা বাড়াইবার উপায় নাই।

ইতোমধ্যে তাঁহার মনে এক অভিনব চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছিল—এখন তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তাঁহাদের ব্যবসায়ের জন্য একটী ক্ষুদ্র নগর স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। এই প্রকারে 'বিশ্বনগরীর' জন্মের সূচনা হইল। পুরাতন কারখানাটী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পূর্ব্বকথিত San Fernando উপত্যকায় এই নগরীর স্থাপনার জন্য তৎক্ষণাৎ সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল। পুরাতন কারখানায় ৫০০ লোক খাটিত; এখন ১৫০০ লোক নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা হইল। পুরাতন কারখানাটীতে সহর হইতে ভাল-ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রী-বর্গকে আনাইয়া Film তৈয়ারী করা হইত—তাহাতে অত্যধিক ব্যয় হইত। এখানে তিনি একেবারে তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিলেন। দেখিতে-দেখিতে কাব্যসৌন্দর্য্যসম্পন্ন Fernando উপত্যকায় আলাদিনের প্রাসাদের ন্যায় সুন্দরী বিশ্বনগরী দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। অভিনয়ে যত প্রকার দৃশ্যের প্রয়োজন হইতে পারে, এই স্থানের নিকটে সেই সকল দৃশ্যই বর্ত্তমান। পশ্চাৎভাগে উচ্চচূড় পর্ব্বতশ্রেণী মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; পাদদেশে সুবিস্তৃত বনস্থলী বিরাজমান। বনভূমি যত পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, ততই ক্ষীণকায় হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মোটরে চড়িয়া কয়েক মিনিট যাইলেই উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র, সুবিস্তৃত উন্মুক্ত বেলাভূমি। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতচূড়া ও জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আর-একদিকে অগ্রসর হইলে, বিস্তীর্ণ সূর্য্যতপ্ত মরুপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। এইরূপ অপরূপ দৃশ্যের সমাবেশ দেখিয়া কার্ল সেই স্থানে বিশ্বনগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিশ্বনগরীর অবস্থান প্রায় ৩০০০ বিঘা পরিমিত ভূমি। ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম এবং বৃহত্তর অংশে প্রকাণ্ড নাট্যশালা, কারখানা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহসকল, পান্থ-নিবাস, যন্ত্রাগার, কর্ম্মচারীগণ ও অভিনেত্রীদিগের বাসস্থান এবং সরকারী আপিসঘর অবস্থিত। এই শেষোক্ত বাড়ীটী এমনভাবে নির্ম্মিত যে, সে স্থান হইতে প্রত্যেক অধস্তন বিভাগে যাতায়াত অতি সহজসাধ্য। ইহার পশ্চাদ্ভাগে অপরার্দ্ধে সুন্দর-সুন্দর বাগান, ফোয়ারা ও সুখসেব্য লতাবিতানসমন্বিত দর্শক, নিমন্ত্রিত ও অভিনয়কারীগণের বেড়াইবার ও বিশ্রাম করিবার স্থান।

এই সকল দর্শনযোগ্য জিনিষগুলির মধ্যে ষ্টেজগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা দেখিবার উপযুক্ত। বড়টী ৯০,০০০ বর্গ ফীট ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। সিনেমার জন্য সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত ষ্টেজটীর মাপ ৪০ বর্গ ফুটের অপেক্ষাও কম; সেটী এখন একটী ঐতিহাসিক দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ষ্টেজগুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, বায়স্কোপে যত রকম অভিনয় সম্ভব হইতে পারে, সমস্তই এখানে অভিনীত হইতে পারে।

কোনও ষ্টেজ ইচ্ছা করিলেই ঘুরিতে থাকিবে, কোনটী বাঁ দুলিতে থাকিবে। আর সব ষ্টেজের মেজের নিম্নভাগ কলকজায় পরিপূর্ণ। তা' ছাড়া, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা আছে, যাহা অবিলম্বে জলে পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া জলের দৃশ্যের ফটো লইতে পারা যায়। এই ষ্টেজে এমন বড়-বড় অভিনয়ের চিত্র লওয়া হইয়াছে, যাহাতে দুই সহস্রের অধিক লোক নিয়োগের আবশ্যকতা হইয়াছিল। আবার হইয়াছে। নিকটেই দর্জ্জী-বিভাগ। পৃথিবীর সকল দেশের এবং সকল যুগের পোষাক এখানে প্রস্তুত আছে। তা' ছাড়া, প্রতিদিন নূতন-নূতন ফ্যাসানের পোষাক প্রস্তুত হইতেছে। লোকজন এবং জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত এমন ভাল যে, ছয় ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ লোকের একরকমের পোষাক তৈয়ারী হইতে পারে।

দর্শকগণের সমালোচনা দিন-দিন কঠোর হইয়া উঠিতেছে। সেই

ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ

অস্ত্রে সজ্জিত মোটরশ্রেণী

এমন সুন্দর বন্দোবস্ত যে, এক সময়ে ১০।১৫টী অভিনয় করা চলিতে পারে। প্রত্যেক অভিনয়ের জন্য ষ্টেজের উপর খানিকটা করিয়া স্থান মাপিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়; তাহারই মধ্যে অভিনয় হয় এবং Film তোলা হয়।

ষ্টেজের পাশেই 'মালখানা'। সেখানে অভিনয় প্রদর্শনে যত প্রকার জিনিসের প্রয়োজন সম্ভব হইতে পারে, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা জন্য একটী নাটক Filmএর উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করিতে অনেকগুলি সম্পাদকের প্রয়োজন হয়। এই জন্য রীতিমত একটী সম্পাদকীয় আফিস আছে। মনে করুন, একজন সম্পাদক নাটকটি Filmএ দেখাইবার উপযুক্ত করিয়া অদল-বদল করিয়া লিখিলেন। তাহার পর, দৃশ্য কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য আর একজন সম্পাদকের নিকট গেল। তিনি দৃশ্য সম্বন্ধে একজন Specialist।

সেখান হইতে আবার পরিচ্ছদ-বিভাগের সম্পাদকের নিকট গেল। তিনি আবার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে Specialist। এইরূপে প্রত্যেক অতি সামান্য খুঁটিনাটী পর্য্যন্ত রীতিমত সেই-সেই বিষয়ে দক্ষ সম্পাদকের নিকট পরীক্ষিত হইয়া অবশেষে ষ্টেজে দেখাইবার উপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর অভিনয়ের অধ্যক্ষ বা Directorএর পালা। এই সম্পাদকীয় আপিসেও এত কাজ যে, দিন রাত কাজ চলিতেছে। যাহার কাছে যে অংশটুকু যাইতেছে, সে সেই অংশটুকু অতিশয় দক্ষতার সহিত অতি সুন্দরভাবে নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া দিতেছে। কাজের নগরীর একটী সুন্দর রাজপথের দৃশ্য দেখান প্রয়োজন; রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে শত-শত লোক মিলিয়া কাজে লাগিয়া গেল। আপনি প্রাতে সেখানে গিয়া দেখুন, সত্যসত্যই আপনি প্যারীর একটী বিখ্যাত রাজপথে দণ্ডায়মান। পরদিন আবার গিয়া দেখুন, তাহার কোন চিহ্নই নাই। Film তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, আর দরকার নাই—তাই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। সে স্থানে আর একটী নূতন দৃশ্যের সমাবেশ হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যহই ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। এইরূপে, এখানে আসিলেই, পৃথিবীর প্রধান-প্রধান
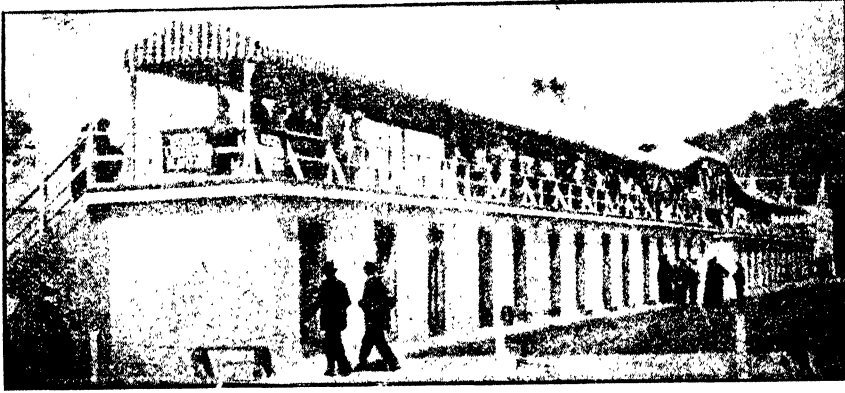
রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ

ইউনিভারসিটি নগরে লেম্‌লি বুলেভার্ড

যে কত রকম বিভাগ আছে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একটী বিভাগে নূতন-নূতন দৃশ্য প্রস্তুত ও উদ্ভাবিত হইতেছে; আর একটীতে কেবল Scene paint করা হইতেছে; এক জায়গায় খালি Design তৈয়ারী হইতেছে; এক স্থানে ছুতারের কারখানায় শত শত মিস্ত্রী ব্যস্ত রহিয়াছে। রাস্তায় যাইতে-যাইতে দেখিতে পাইবেন, একটী সুন্দর প্রাসাদ দণ্ডায়মান; কিন্তু তাহার পিছনে গিয়া চাহিয়া দেখুন, সেটা কেবল একটা কাঠের দেওয়াল, ঠেস দিয়া খাড়া রাখা হইয়াছে। ইহা এমন সুনিপুণভাবে প্রস্তুত যে, সম্মুখে আসিলেই কাহার সাধ্য যে রাজপ্রাসাদ নহে বলিয়া বুঝিতে পারে! প্যারী দর্শনীয় বস্তুসকল দেখা হইয়া যায়; আসল জিনিস দেখার সাধ সকলই পরিতৃপ্ত হইয়া যায়—এমন সুন্দর ও আশ্চর্য্য নকল!

একবার লক্ষ্ণৌ অবরোধের একটী দৃশ্য Filmএ প্রস্তুত হইতেছিল তাহাতে দুর্গ-প্রাকারের উপর যুদ্ধ এমন সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছিল যে, সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড, উচ্চ প্রাচীর হইতে হত বা আহত সৈন্যগণ নীচে পড়িয়া যাইতেছে—সত্য-সত্যই দেখান হইয়াছিল। অত উচ্চ প্রাচীরের উপর হইতে পড়িলে বাঁচিবার কোনও আশাই নাই; কিন্তু নীচে ক্যামেরার অধিকারের বাহিরে একটী জাল ভূমি হইতে ৬ ফীট উচ্চে এমনভাবে টাঙ্গান হইয়াছিল যে, যতগুলি

লোক নীচে পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে একজনেরও আঙ্গুল পর্য্যন্ত মচ্‌কায় নাই। যে দুর্গ-প্রাকার প্রকাণ্ড ও চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইতে ছিল, তাহা যুদ্ধ শেষ হইবার ঘণ্টাখানেক পরে আর দেখিতে পাওয়া অস্ত্রাগার রহিয়াছে; তাহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত গদা হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়িইঞ্চি হাউইজার কামান পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রই মজুত আছে। এক-একটী যুদ্ধের দৃশ্য দেখাইতে পঞ্চাশ হাজার টাকার পর্য্যন্ত বারুদ
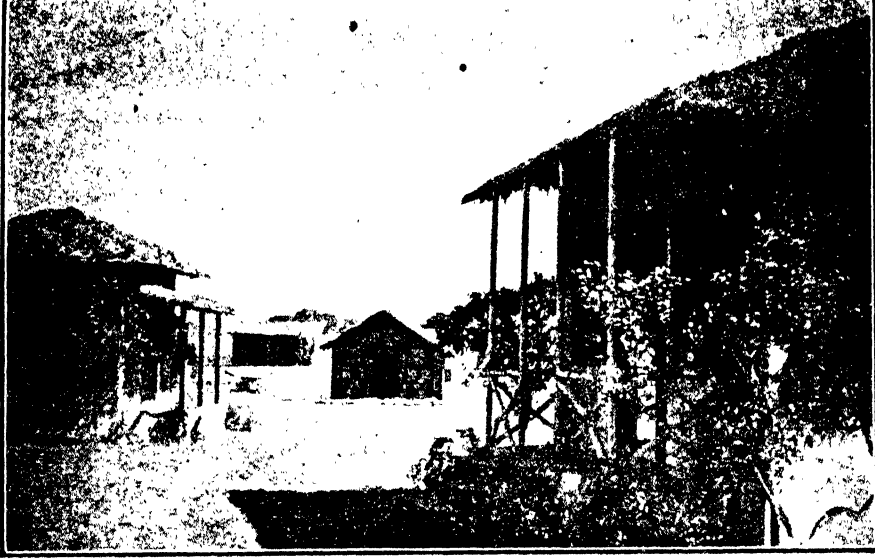
র‍্যাঞ্চ অভিনয়ের (Ranch play) আয়োজন

ইউনিভারসেল নদীর দৃশ্য

যায় নাই। অভিনয়টী এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, তাহা অভিনয় বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। এমন কি, এক-একটী ঘটনায় দর্শকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন। যুদ্ধ-দৃশ্য দেখাইবার জন্য প্রকাণ্ড খরচ হইয়া গিয়াছে; এবং কামানের গর্জ্জন বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

'ক' নামক একটী পাহাড়ের গাত্রে খানিকটা জায়গায় বহু যুদ্ধের

অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতের পাদদেশে ঘন বনরাজি; যত উপরে যাওয়া যায়, ততই পাহাড়টী ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইয়া শেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ ও পাথর ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বনের মধ্যে মাঝে-মাঝে এক-একটী ক্ষুদ্র বাক্স বসান আছে; তাহার ডালা খুলিলেই একটী টেলিফোঁ দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় এক-একজন দলপতি আজকালকার প্রথা অনুসারে টেলিফোঁ করিয়া সৈন্য-চালনা

কায়রো নগরের একটি পথের দৃশ্য

পর্ব্বতের দৃশ্য

করেন। প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক-একজন ফটোগ্রাফার থাকে; তাহারা ক্রমাগত ফটো লইতে থাকে।

সহরের একপাশে বড় চিড়িয়াখানা; তাহাতে যতপ্রকার গৃহ-পালিত ও বন্য পশু-পক্ষী ইত্যাদি আছে। যাইতে যাইতে হঠাৎ এক-দিকে মোড় ফিরিয়া দেখিবেন যে, একটী ভীষণমূর্ত্তি সিংহ যেন শিকারের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে; অথবা একটী প্রকাণ্ড চিতা-বাঘ নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল,—যেন কোনও হতভাগ্য হরিণের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সকল দেখিয়া হয় ত আপনার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভয়ে রুদ্ধ হইবার যোগাড় হইবে; কিন্তু পথিপ্রদর্শক আপনাকে সেই দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিবেন যে, ঐ অবস্থায় উহাদে[র] আলোক-চিত্র লওয়া হইতেছে। তিনি আশ্বাস দিবেন যে, বিশে[ষ] ভয়ের কারণ নাই; প্রত্যেক সিংহ, ব্যাঘ্র বা যে-কোন হিংস্র পশু[র] নিকটেই দুই-তিনজন করিয়া লোক সাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং পশুটীও এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত। আপ[নি] ক্রমাগত ঘুরিলে পৃথিবীতে যত জাতীয় লোক আছে, সকলেরই সহি[ত] আপনার সাক্ষাৎ হইবে। এক স্থানে দেখিবেন, একটি ক্ষুদ্র নীগ্রো অবস্থিত। আফ্রিকার নীগ্রোরা যে-ভাবে বাস করে, ঠিক সেইভাবে মহিষ, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি লইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের [ভরণ]-পোষণের ভার সিনেমা-কোম্পানী লইয়াছেন। কোথাও দেখি[বেন] একদল আরব ঠিক আরব-দেশের ন্যায় উট, ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া ভূমিতে তাঁবুর ভিতর বাস করিতেছে। কেবল সিনেমা [তৈয়ারী] করিবার জন্য, কর্ত্তৃপক্ষ অকাতরে অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া এই অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

রেলগাড়ীর দৃশ্য দেখাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ গাড়ী ভাড়া না

নিজের রেল ও গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা বায়স্কোপে সাধারণতঃ যে সকল রেলের দৃশ্য দেখিয়া থাকি, তাহার বেশীর ভাগই—একটী গাড়ীকে দোলায়মান ষ্টেজের উপর রাখিয়া এবং তাহার সম্মুখ দিয়া অঙ্কিত দৃশ্যগুলি খুব দ্রুতগতিতে চালাইয়া তাহার আলোকচিত্র লওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বনগরীর প্রথা আসল জিনিষ দেখান। এই দৃশ্য দেখাইবার জন্য দুই মাইল রেল আছে এবং তাহার ধারে-ধারে খুব কাছে-কাছে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ষ্টেশন, গ্রাম, সহর, মাঠ, বাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী

রঙ্গমঞ্চ

সেতুর দৃশ্য

করা হইয়াছে। এই উপায়ে ৫০ মাইল রেলে ভ্রমণের ফল দুই মাইলের মধ্যেই দেখাইতে পারা যায়। প্রথম-প্রথম ইহা সাধারণকে দেখান হইত না, কিন্তু অধ্যক্ষ কার্ল বলিলেন, "ওরা সকলে দেখুক; দেখ্‌লে পরে ওদের আগ্রহ বাড়বে"। এমন কি সাধারণের দেখিবার সুবিধার জন্য এমন একটী মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার উপর দাঁড়াইয়া এই সমস্ত ব্যাপার বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের দেখিবার এই সমস্ত সুবিধা করিয়া দিবার ফল এই হইয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা অনেক সময় অনেক টাকা খরচ বাঁচিয়া যায়; তা ছাড়া লাভও রীতিমত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক এই সহর দেখিতে আসেন। ইহাদের সাহায্যে বড়-বড় সহরের জনতার দৃশ্য লওয়া হয়। তা' ছাড়া, দোকান-পাট, হোটেল ইত্যাদিতে সে সময় খুব বিক্রয় হয়, তাহাতেও বেশ লাভ হয়। কিন্তু আবার সময়ে-সময়ে এই জন্য অনেক কষ্টও পাইতে হয়। একবার একটা যুদ্ধের অভিনয় হইতেছে; যখন ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তখন একজন দর্শক দূর হইতে দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়া নিজের মোটর চালাইয়া দিলেন! আর-একবার একখানি নাটক অভিনীত হইতেছিল; তাহাতে নায়িকার উপর কঠোর অত্যাচারের দৃশ্য দেখান হইতেছিল; সেই দৃশ্য দেখিয়া একটী দর্শক এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের অভিনয়ে বাধা দিয়াছিলেন এবং অধ্যক্ষকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়াছিলেন।

সিনেমায় বিপজ্জনক অভিনয় দেখাইবার সম্বন্ধে রীতিমত আইন-

কানুন আছে। অনেক সময়ে এইরূপ অভিনয় দেখাইতে গিয়া ভাল-ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রাণ হারাইয়াছেন বা চির-জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। আইনানুসারে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোনও বিপজ্জনক অভিনয় করিতে বাধ্য ন'ন। অধ্যক্ষগণও এ বিষয়ে খুব সাবধান। যাহাদিগের এইরূপ অভিনয়-দক্ষতার উপর তিলমাত্র সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে অভিনয় করিতে দেওয়া হয় না। কোনও জীবন-সঙ্কট বা ভীষণ বিপজ্জনক দৃশ্য দেখাইতে হইলে, আজকাল তাহা পুত্তলিকা (Dummy) সাহায্যে অতি সুচারুরূপে দেখান হয়। কেহই বুঝিতে পারে না—কোথায় বাস্তব মানুষের অভিনয় শেষ হইয়া পুত্তলিকার অভিনয় আরম্ভ হইল, বা পুত্তলিকার অভিনয় শেষ হইয়া বাস্তব মানুষের পালা আরম্ভ হইল।

এই সিনেমা কোম্পানীর Film পৃথিবীময় বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে কেবল Negativeগুলি তৈয়ারী হইয়া নিউইয়র্ক সহরে প্রেরিত হয়। সেখানে তাহা হইতে প্রয়োজনমত 'Copy' করিয়া লওয়া হয়। পৃথিবীর প্রধান-প্রধান স্থানেই ইহাদের 'agent' আছেন। ইহাদের প্রস্তুত দৃশ্যগুলি এত বেশী বিক্রীত হয় যে, ইঁহারা প্রতি সপ্তাহে পাঁচ মাইল দীর্ঘ Film প্রস্তুত করিয়াও বাজারের সমস্ত টান মিটাইতে পারিতেছেন না। বর্ষাকালে বাহিরে কাজ করা সম্ভব নহে। তখন ঘরের ভিতরে অবস্থিত ষ্টেজগুলি বিদ্যুতালোকিত করিয়া অভিনয় করা হয়। তা' ছাড়া, সকল সময়েই দিবারাত্রি অভিনয় হইতেছে। একঘণ্টা অভিনয় স্থগিত থাকিলে, প্রায় ৩৪ হাজার টাকা লোকসান। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ!

এই ক্ষুদ্র সহরটীতে কোনও জিনিসের অভাব নাই। বড়-বড় হোটেল, সুন্দর-সুন্দর বাগান, সাঁতার দিবার জন্য পুষ্করিণী, অসংখ্য স্নানাগার—কিছুই বাদ যায় নাই। ছেলেদের জন্য একটি ভাল বিদ্যালয় আছে। জেল আছে, পুলিশ আছে; কিন্তু সৌভাগ্যর বিষয় তাহারা সিনেমার অভিনয় ভিন্ন আর কোনও কাযে লাগে না। একটি বৃহৎ হাসপাতাল, ও তৎসংলগ্ন ঔষধালয়, অসুস্থদের অভাব দূর করিবার জন্য অবস্থিত। দমকল, জলের কল, ইত্যাদি একটি পাশ্চাত্য নগরের প্রয়োজনীয় যে-কোন বস্তু—সবই এখানে বর্ত্তমান। ফলের বাগানে অপর্য্যাপ্ত ফল; গোশালায় প্রচুর পনির, দুধ, মাখন; কি যে নাই, তাহা বলিতে পারি না। অথ কর্ত্তৃপক্ষ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য অধিবাসিগণের এই সকল সুবিধা করিয় দেন নাই। ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই নহে।

তুলাপুরুষ-দান-কীর্ত্তিচিহ্ন—হাম্পি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলারী জেলায় হাম্পি নামক

তুলাপুরুষ-দান কীর্ত্তিচিহ্ন
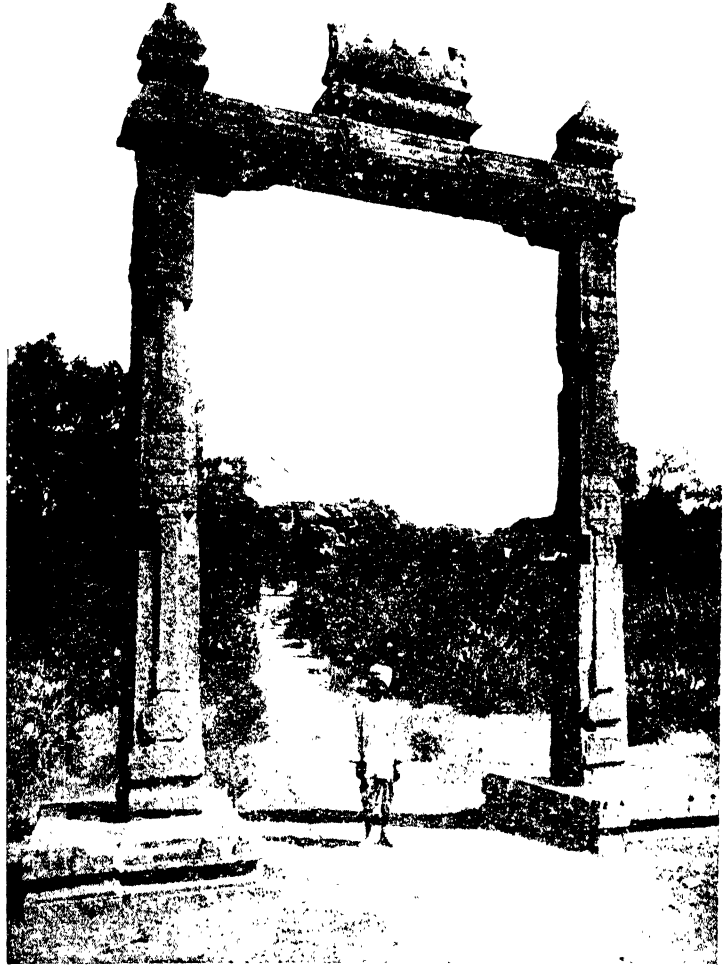
স্থানে বিঠ্‌ঠল দেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনতিদূরে একটি বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এটি একটি শিলাময় তোরণ। সম্ভবতঃ ইহার চিত্র পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণ্যে ইহা "রাজকীয় তুলাদণ্ড" নামে পরিচিত; কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম "তুলাপুরুষদান-কীর্ত্তিচিহ্ন;" অর্থাৎ, রাজগণ বিশেষ-বিশেষ দিবসে যথা, অভিষেক দিবস, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ-কাল কিম্বা নববর্ষের প্রথম

দিনে আপনাদের দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু এবং মণিরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন।

দুইটি গ্র্যানাইট প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃশ্য ও সুদীর্ঘ স্তম্ভের উপর একটি গুরুভার প্রস্তরের কড়ি স্থাপিত। ইহার গঠন অনেকটা মন্দিরের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ গোপুর, কিম্বা পুরদ্বার, বা নগর-তোরণের ছাদের ন্যায়। এই প্রস্তরময় কড়ির নিম্নদেশে তিনটি প্রস্তরের বলয়াকৃতি খোদিত আছে। তাহারই মধ্যমটি হইতে একটি সুবৃহৎ তুলাদণ্ড বিলম্বিত হয়। তুলাপুরুষদান উৎসবের সময় এই তুলাদণ্ডের একদিকে রাজা উপবেশন করেন, এবং অপরদিকে তাঁহার সমান ওজনের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, ইত্যাদি স্থাপিত হয়।

তোরণটির সম্মুখভাগ পূর্ব্বমুখে অবস্থিত; এই সম্মুখের দিকে স্তম্ভ দুইটির মধ্যে একটির নিম্নভাগে নানাপ্রকার চিত্র খোদিত আছে। চিত্রগুলির মধ্যে একজন রাজা ও তাঁহার দুইটি মহিষীর চিত্র এখনও অনেকটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় এবং সিংহলদেশের রাজগণ তাঁহাদের অভিষেকের সময় এই তুলাপুরুষদান অনুষ্ঠিত করিতেন। বিজয়নগরের খোদিত-লিপি হইতে জানা যায়, তাঁহারাও এই অনুষ্ঠানটি পালন করিতেন। সকলেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে তুলাপুরুষ দান করিতেন। বিজয়নগর-রাজগণের একটি ফলকে লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রধান বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে গণ্টুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ কণ্ডাভেড়ুর গিরিদুর্গ অধিকার করেন। সেই বৎসরই তিনি চিন্নাদেবী আম্মা এবং তিরুমলদেবী আম্মা নাম্নী তাঁহার দুইজন মহিষীকে (অনুমান হয়, ইঁহারাও দুর্গবিজয়-যাত্রাকালে রাজার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন) সঙ্গে করিয়া ধরণীকোটার (ইতিহাসে ধান্যকাটক নামে প্রখ্যাত) নিকটবর্ত্তী অমরেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন, এবং তথায় সস্ত্রীক তুলাপুরুষ-দান, রত্নধেনু-দান এবং সপ্তসাগর-দান প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং উক্ত মন্দিরস্থিত বিগ্রহের সেবার্থ কয়েকখানি গ্রাম অর্পণ করেন [১]। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রস্তরস্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে একটির তলদেশে একজন রাজা ও তাঁহার দুইজন মহিষীর মূর্ত্তি খোদিত আছে; সম্ভবতঃ ইঁহারাই সেই রাজা ও রাণী। কারণ, খোদিত-লিপিতে রাজা কৃষ্ণরায় এবং তাঁহার এই দুইজন মহিষীর কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণরায়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী অচ্যুতরায় (খৃঃ অঃ ১৫৩০-১৫৪২) ব্রাহ্মণদিগকে এবং দেবমন্দিরাদিতে দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। একটি খোদিত লিপিতে দেখা যায়, একবার অচ্যুতরায় যখন তুলাপুরুষ-দানের অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি স্বীয় দেহের ওজনের সমপরিমাণ মুক্তা দান করিয়াছিলেন। খোদিত-লিপিসমূহের সহকারী তত্ত্বাবধারকের বার্ষিক বিবরণীতে এই লিপির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে [২]।

সম্প্রতি মিঃ এ, এইচ, লংহার্ষ্ট তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত কুম্ভকোনম্ নামক স্থানে প্রস্তরে খোদিত তুলাপুরুষ-দানের একটি সম্পূর্ণ চিত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। (দ্বিতীয় চিত্রে তাহার অবিকল প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।) কুম্ভকোনমে মহামাগম নামে একটি সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত তড়াগ আছে। তাহারই উত্তরদিকে ক্ষুদ্র অথচ মনোহর একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হয়। ইহার ছাদ প্রস্তরে গঠিত এবং সুদৃশ্য খোদিত চিত্রাবলিতে বিভূষিত। যে সকল প্রস্তরময় কড়ি এই ছাদটিকে ধারণ করিয়া আছে, তাহারই মধ্যে একটিতে তুলাপুরুষ-দান অনুষ্ঠানের পূর্ণাবয়ব চিত্র খোদিত আছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের খোদিত-লিপিসমূহের সহকারী তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় এই চিত্রের বিবরণ এবং নিম্নলিখিত উৎসব-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও একটী কড়ি দুইটি উন্নত প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত; এবং সর্ব্বতোভাবে হাম্পির কীর্ত্তিস্তম্ভের সমতুল্য। ঐ কড়ির নিম্নভাগে ঠিক মাঝখান হইতে একটি আংটা ঝুলিয়া রহিয়াছে। তুলাদণ্ডটি তাহা হইতে বিলম্বিত হয়। তুলাদণ্ডের দক্ষিণদিকের পাল্লায় রাজা তাঁহার সমস্ত রত্নালঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক উপবেশন করেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্তে তরবারি ও বামহস্তে চর্ম্ম থাকে। অপরদিকের পাল্লায় প্রচুর পরিমাণে (সম্ভবতঃ স্বর্ণ) মুদ্রা রক্ষিত হয়। দাঁড়ির মধ্যস্থলে আংটা হইতে বিলম্বিত একটি পাত্রে বাসুদেব (বিষ্ণু) মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানের বিধি-অনুসারে এই

তুলাপুরুষদান অনুষ্ঠানের খোদিত চিত্র

১। A, S, R, 1908—09. P. 178.

২। 1899—20. P. 29.

দানের সাক্ষীস্বরূপ বিষ্ণুকে উপস্থিত থাকিতে হয়। ওজন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেবদেবীর আরাধনা করিতে হয় এবং তাঁহারা আসিয়া ঐ কড়ির উপর আসন গ্রহণ করেন। দেবগণের মধ্যে গণপতি ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকেন। গণেশের বামদিকের তিনটি দেবতা যথাক্রমে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। আর তাঁহার দক্ষিণদিকের দেবগণ অষ্টদিকপাল বা লোকপাল। তোরণের বামদিকের দৃশ্যে হোম-অনুষ্ঠান চিত্রিত; চারিজন ব্রাহ্মণ হোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন। তুলাদণ্ডের উভয়দিকে যে সকল স্ত্রী-পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহারা রাজার চৌরিবাহক ও পার্শ্বচর।

দানসাগর নামক ব্রতানুষ্ঠানেও পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য বিবৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তুলাপুরুষ দানের অনুষ্ঠান পবিত্র দিনে সম্পাদন করা উচিত। অর্থাৎ, উত্তরায়ণ, বা দক্ষিণায়ণ যে দিনে আরম্ভ হয়, সূর্য্যগ্রহণ দিন, কিম্বা যুগারম্ভের বা যুগশেষের দিনই এই কার্য্যের পক্ষে সমধিক প্রশস্ত। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ দিবসে, সংক্রান্তি অথবা অমাবস্যা তিথিতেও তুলাপুরুষ দানের অনুষ্ঠানের বিধি আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে "কোন পবিত্র ক্ষেত্রে অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্রে, দেবমন্দিরে, উদ্যানে, গোশালায়, গৃহে, অরণ্যে, কিম্বা নদীতীরে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথমে ব্রহ্মা, শিব এবং অচ্যুত (বিষ্ণু) দেবের অর্চ করিতে হইবে। কড়ির মধ্যভাগে বাসুদেবের সুবর্ণময়ী প্রতি[illegible] স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—এই চারিদি[illegible] ঋক, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদে অভিজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হইবে। ইঁহারা অষ্টদিকের অধিপতি অষ্টলোকপা[illegible] অর্চ্চনার্থ হোম যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। দাতা তাঁহার সমস্ত ম[illegible] ধারণ করিবেন, বর্ম্ম পরিধান করিবেন এবং খড়্গ ও চর্ম্ম [illegible] করিবেন। তৎপরে একদিকের পাল্লায় উপবেশনপূর্ব্বক প্র[illegible] বদনে বিষ্ণুমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। ওজন লওয়া শেষ হই[illegible] সুবর্ণমুদ্রাগুলি ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিতে হইবে।" কারণ, শ[illegible] মহাশয়ই বলিতেছেন, "কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই, এইরূপ দানের [illegible] নির্দ্দিষ্ট অর্থ অধিকক্ষণ নিজ গৃহে রক্ষা করিবেন না। যিনি এই নিজের ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণগণকে দান করেন, তাঁহার বর্ত্ত ও অতীত দশপুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হয়।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ তুলাপুরুষ দা[illegible] অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই অপূর্ব্ব [illegible] ভারতের কোন কোন স্থলে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

শোক-সংবাদ
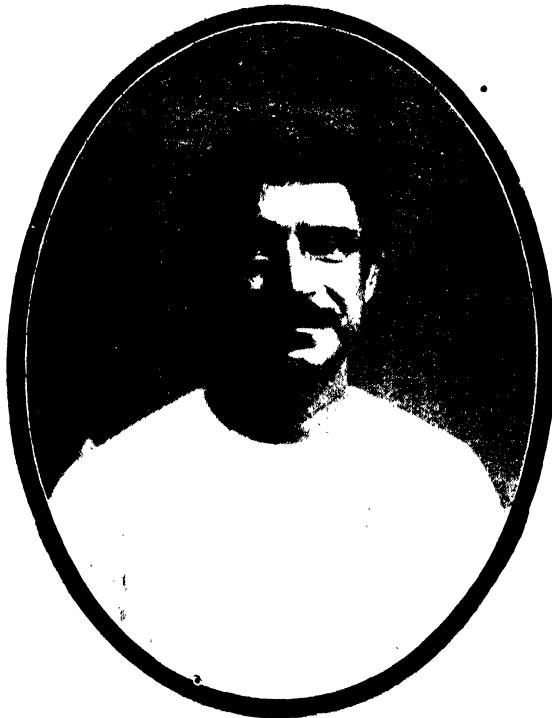
৺এইচ্ বসু

৺এইচ্ বসু

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতে[illegible] সুপ্রসিদ্ধ এইচ, বসু অর্থাৎ বাবু হেমেন্দ্রমোহন [illegible] অকালে—মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে—হৃদ্‌রোগে পরলো[illegible] প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার কুন্তলীন অধুনা জগদ্বিখ্যা[illegible] দেলখোস প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের কারবারেও তিনি যথেষ্ট [illegible] অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্র বাবু মৈমনসিংহের সুবি[illegible] বসু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্ব[illegible] আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। মিঃ এইচ, [illegible] কেবল যে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া বঙ্গ[illegible] স্মরণীয় হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি ব[illegible] সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। কুন্তলীন-পুরস্কার দিয়া তিনি প্রতিবৎসর কয়েকটী গল্পের একখানি ক[illegible] পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন এবং এই [illegible] গল্পলেখককে নগদ টাকা বা তাঁহার গন্ধদ্রব্য পু[illegible] দিতেন। বিক্রেয় পণ্যের সংশ্রবে পুরস্কার দানের [illegible] করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহদানের প্রথা বোধ হয় [illegible]

সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। গন্ধদ্রব্য ব্যতীত আরও কয়েকটী ব্যবসায়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কুন্তলীন, দেলখোসের প্রচার-সূত্রে পাশ্চাত্য ধরণে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সফলতা লাভ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন 'সেকেলে' সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি এক-সময়ে বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত একালের সাহিত্যের সংযোগস্থলস্বরূপ যে কয়জন সাহিত্যিক এখনও বর্ত্তমান আছেন, ভুবন বাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বর্ত্তমানকালে সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষার যে সংগ্রাম চলিতেছে, ভুবন বাবু তাঁহার অগণ্য গ্রন্থ-রাজিতে এই বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি এই দুই ভাষাতেই রাশি-রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার হরিদাসের গুপ্তকথা, তাঁহার জোসেফ উইলমট্ একধরণের (চলিত ভাষায়) ভাষায় লিখিত, আবার আশাপ্রতীক্ষা প্রভৃতি গম্ভীর ভাবের রচনাগুলি অন্য এক ধরণে (সাধু ভাষায়) লিখিত। বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাষা ব্যবহার করিতে জানিতেন বলিয়া ভুবন বাবু সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই পাঠক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা যেরূপ, তাঁহার গম্ভীর ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহের পাঠক-সংখ্যা তদপেক্ষা অল্প নয়। বিশুদ্ধ সরল খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার ইংরেজীর তরজমায় ভুবন বাবু অদ্বিতীয় ছিলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকেরা মহা আড়ম্বরে যে ভাষায় ইটলীন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থের কদর্য্য অনুবাদ করিয়া উহাদের সৌন্দর্য্যহানি করিতেছেন, তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিহীন ভুবন বাবুর সরল প্রাঞ্জল ভাষার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভাষায় অধিকার থাকিলে ভাব ও সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইংরেজীরও কেমন সুন্দর অনুবাদ করা যাইতে পারে, ভুবন বাবুর রচনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

পুস্তক-পরিচয়

সীতা ও সরমা

[শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম বি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত; মূল্য একটাকা।]

কবিবর মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি সীতা ও সরমার যে অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সান্যাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে তাহার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই পত্রান্তরে প্রকাশিত এই সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম এবং তখনই ব্যাখ্যাকার মহাশয়ের অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলাম। এখন সেই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় মধুসূদনের এই অপূর্ব্ব অধ্যায়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। আমরা জানিতাম, তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক; তিনি মানব-শরীর-ব্যবচ্ছেদেই সিদ্ধহস্ত; কিন্তু এখন দেখিলাম, এই অবসর-প্রাপ্ত চিকিৎসক মহাশয় মানবহৃদয়েরও ব্যবচ্ছেদে সিদ্ধহস্ত। তিনি কেবল চতুর্থ সর্গের ব্যাখ্যা দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে, রসগ্রাহী পাঠক তাঁহাকে ছাড়িবেন না; তাঁহাকে সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যখানিরই ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। পুস্তকখানি যে যথেষ্ট আদর লাভ করিবে, আমরা এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারি।

রবিয়ানা

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য বারআনা]

কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আজ চল্লিশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন; তাঁহার প্রতিভায় বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; বর্ত্তমান পুস্তকের লেখকও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে পুস্তকখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে, লেখক সার রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত নহেন; তিনি কবিবরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মতের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। কবিবর এক সময়ে যাহা বলিয়াছেন, অন্য সময়ে ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন; বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; পুস্তকখানি পাঠ করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সার রবীন্দ্রনাথকে

উপহাস করা লেখকের উদ্দেশ্য হইতেই পারে না; তাঁহার অন্ধ-ভক্তগণের অন্ধত্ব দূর করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

মন্দির

[লেখক—কিরণচাঁদ দরবেশ, মূল্য একটাকা আটআনা]

এই মন্দিরের পূজারী নিজের নাম গোপন করিয়া 'কিরণচাঁদ দরবেশ' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ আত্মগোপনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তিনি এই বাণী-মন্দিরের পূজারী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। আজকাল কবিতা-পুস্তক দেখিলেই গায়ে জ্বর আসে; অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির অনেক কবিতা হীনবুদ্ধি আমরা অনেক সময়ই বুঝিয়াও উঠিতে পারি না; কিন্তু দরবেশের সহিত আমাদের অনেকদিনের পরিচয়; তাই তাঁহার পূজামন্দিরে প্রবেশ করিতে আমরা ভীত হই নাই; এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই মন্দিরে পবিত্রতা ও শুদ্ধশান্ত ভাব ক্ষণেকের জন্য উপভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাণীসেবকমাত্রেরই এই মন্দিরে একবার প্রবেশ করা কর্ত্তব্য।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি-এল প্রণীত মূল্য আটআনা।]

পৃথিবীর থিয়জফিষ্টগণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, সত্বরই জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইবে। দার্শনিকপ্রবর, মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, শুধু থিয়জফিষ্টগণই নহেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং সত্বরই যে জগদ্‌গুরুর আগমন হইবে, তাহারও সূচনা দেখা যাইতেছে। পণ্ডিতবর হীরেন্দ্র বাবু যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সত্বরই জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হউক, পৃথিবীর দুঃখ দুর্দ্দিন কাটিয়া যাউক।

ব্রতকথা-মালা

[শ্রীহরিশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত, মূল্য একটাকা।]

এই পুস্তকে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীশ্রীশিবরাত্রি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীসুবচনী ও শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী, এই পাঁচটি ব্রতের কথা ও পূজাপদ্ধতি অতি বিশদ ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে; হিন্দুর ঘরে এই পুস্তকখানি থাকা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি সুন্দর ছবি এই পুস্তকে আছে; বাঁধাই ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট, সুতরাং মূল্য অধিক হয় নাই।

বৈকুণ্ঠের উইল

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর এই উপন্যাসখানি আমাদের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আমাদের পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শরৎ বাবুর গল্প এখন সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, এই 'বৈকুণ্ঠের উইল'খানিও যথেষ্ট জনাদর লাভ করিবে। শরৎ বাবুর লিপিকুশলতা ও মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থে বিদ্যমান। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

চিন্তাপ্রবাহ

[৺শশীমোহন বসাক এম-এ প্রণীত, মূল্য বারআনা।]

এই পুস্তকের লেখক এখন নিন্দা-প্রশংসার অতীত স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানিতে যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ইতঃপূর্ব্বে নানা পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যেই লেখকের চিন্তাশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং তিনি যে একজন প্রগাঢ় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা' 'সমাজ ও শক্তি' 'প্রীতি ও উন্নতি' প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতে পারি। লেখক আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধাবলী তাঁহাকে অনেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

দূর্ব্বাদল

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত।]

এখানি আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তম গ্রন্থ। ইহাতে কমলা, পণের টাকা, কালো, আরতির শেষ, সরকার-ঝি, জীবন নৈবেদ্য, মিলনাশ্রু, ব্যথিত ও ত্রিবেণী, এই কয়েকটী ছোট গল্প আছে। গল্প কয়েকটীই সুন্দর। যতীন্দ্র বাবু ছোট গল্প লিখিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা এই দূর্ব্বাদলে অক্ষুণ্ণ আছে।

শাশ্বত-ভিখারী

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস প্রণীত।

এই 'শাশ্বত-ভিখারী' আটআনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টম গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাধাকমল বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক, তাঁহার অনেক উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অর্থনীতি-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার 'দরিদ্রের ক্রন্দন' অনেকেই শুনিয়াছেন। এই পুস্তকেও দরিদ্রের ক্রন্দন আছে, পল্লী জীবনের ইতিহাস আছে, অনেক হৃদয়ভেদী দৃশ্য আছে।

কর্ম্মযোগের টীকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, মূল্য একটাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছোট গল্প লেখায় যে সিদ্ধহস্ত, এ কথা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। তিনি মাসিক পত্রিকাদিতে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত গল্প লিখিয়াছেন, তাহারই এগারটী এই সংগ্রহে স্থান দিয়াছেন। ইহার আরম্ভ 'কর্ম্মযোগের টীকায়' এবং শেষ 'আনন্দলাড়ুতে'। সুরসিক লেখকের উপযুক্ত গল্প-বিন্যাসই হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রত্যেক গল্পের মধ্যে এমন সুন্দর হাস্যরসের অবতারণা করেন যে, সকলকেই ধন্য-ধন্য করিতে হয়। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই পুস্তকে রহিয়াছে।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ] *

হিন্দী

১। সরস্বতী—জুন, ১৯১৬।

"হিন্দু ও মুসলমান"; লেখক—"শ্রীপ্রকাশ"।

লেখক বলিতেছেন, "এই যুগটা জাতীয়তার যুগ। পূর্ব্বে জাতীয়তার ভাবটা আদৌ ছিল না; যুদ্ধ হইত—রাজার জন্য, কিংবা ধর্ম্মের জন্য। দেশভক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও দেশের লোক দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু আজকাল জাতীয়তার একটা স্রোত য়ুরোপ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বদেশের তটে অবিশ্রান্ত আঘাত করিতেছে। এখন সামান্য আচারের পার্থক্য দেখিয়া একই দেশবাসীকে দূরে রাখিলে চলিবে না। স্পর্শবিচারের অর্থ ছিল—শুদ্ধতা। এখন ওটা পরস্পরের মধ্যে একটা বিরাগের সৃষ্টি করিতেছে। লেখক বলিতেছেন—"আজকাল অনেক হিন্দুর ধর্ম্মটা 'চৌকা' অথবা রান্নাঘরেই আবদ্ধ থাকে। হিন্দু আচার রাখুন, কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে। এ কথা বলিতেছি না যে, সকল হিন্দুই নিরামিষ ছাড়িয়া একদিনে আমিষভোজী হইয়া উঠুন; কিন্তু তাঁহারা যেন ভিতরের ধর্ম্মটা ভিতরে রাখিয়া, বাহিরের ব্যবধান মুছিয়া ফেলিয়া, মিলনের শক্তিকে উদ্বোধিত করেন।"

"গুল্ দেনা"; লেখক—তারিণীপ্রসাদ মিশ্র।

আমাদের দেশে পূর্ব্ববঙ্গে পায়ে গুল দিয়া বাতের চিকিৎসা হয়। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, নিম্নলিখিত উপায়ে গুল দিলে প্লীহারও উপশম হয়। শনিবার বা রবিবারে গুল দিতে হয়। প্রথমে রোগীকে মাটিতে একখানা কম্বল বা চাটাইয়ের উপর পশ্চিম-শিয়রে শয়ন করাইতে হয়। তাহার পর প্লীহার উপরে একইঞ্চি জায়গায় গব্যঘৃত লেপন করিতে হয়। এই প্রলেপের উপর একটি পান রাখিয়া, তাহার উপর ষোল-ভাঁজ মোটা নূতন কাপড় ভাল করিয়া ভিজাইয়া স্থাপন করিতে হইবে। ইহার উপরে একটুকরা জ্বলন্ত কাঠের অঙ্গার রাখিয়া দিয়া—যে ব্যক্তি গুল দিতেছে, সে তিনটি কাঁচা-কলা লইয়া মন্ত্র পড়িতে-পড়িতে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিতে আরম্ভ করে; কাটিবার সময় রোগী জ্বালা অনুভব করিতে থাকে এবং ছটফট করে। সেই সময় রোগীকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। তিনটি কলাই কাটা শেষ হইলে, পেটের উপর হইতে সব জিনিষ উঠাইয়া লওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাপড়খানি শুধু গরম হয়—একটুও পোড়ে না। কিন্তু পেটের উপর ফোস্কা পড়িয়া যায়। শুনা যায়, কখন-কখন গুল দিবার সঙ্গে-সঙ্গে প্লীহা কমিয়া যায়। লেখক ভাগলপুর হইতে লিখিতেছেন। সেইখানেই এই প্রথা প্রচলিত।

"আধুনিক হিন্দী কবিতা"—লেখক, কামতাপ্রসাদ গুরু।

অনেকে বলেন, এ যুগটা কবিতার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু লেখক বলেন, হিন্দী কবিতার অবনতির কারণ তাহা হইতে পারে না। লেখক অন্যান্য প্রদেশের কথা জানেন না; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে রবীন্দ্রনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্য এ যুগটা যে বিজ্ঞানেরই একচেটিয়া যুগ, কবিতার নহে—এ কথা হইতেই পারে না। লেখকের মতে হিন্দুস্থানীদিগের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই হিন্দী কবিতার অবনতির প্রথম কারণ। দ্বিতীয়তঃ, রাজাশ্রয়ের অভাব। আজকাল দেশীয় রাজন্যবর্গ সাহিত্যচর্চ্চা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের দরবারে আজকাল রাজ-কবিদের দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিনষ্ট স্বাস্থ্য সাম্লাইয়া রাখার জন্য কবিরাজদের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা কবিতা লেখেন, তাঁহারাও কবিতা কি, তাহা বুঝেন না; কুইনাইন, মশক ও ছারপোকাও কবিতার বিষয় হয়—দেখা গিয়াছে। হিন্দী কবিগণ মনের দেশটা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। "শব্দালঙ্কারকো ছোড় উন্‌হে অর্থালঙ্কার বুঝ্‌তা নহি।"

২। সরস্বতী—জুলাই, ১৯১৬।

"ফিলিপাইন দ্বীপোঁ কে উন্নতি"—লেখক, সেণ্ট নিহালসিংহ।

প্রশান্ত মহাসাগরে এসিয়ার পূর্ব্ব-উপকূলে এই দ্বীপপুঞ্জ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ১১টি দ্বীপ ব্যতীত অন্যগুলি অতি ক্ষুদ্র। লুজন (Luzon) সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তাহার পরেই মিণ্ডনো (Mindanao); লোকসংখ্যা ৭৫ লক্ষ।

* আবার 'বীণার তান' প্রকাশিত হইল; কিন্তু যিনি 'ভারতবর্ষে' এই 'তান' ধরিয়াছিলেন, সেই রসিকলালের, সেই আমাদের বড় আপনার জন রসিকলালের সুকোমল হস্ত হইতে অকালে—বড়ই অসময়ে 'বীণা' খসিয়া পড়িয়াছে; তিনি আমাদের ন্যায় হতভাগ্য লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লোকেশ্বরকে তাঁহার 'তান' শুনাইতে গিয়াছেন। এত শোকের মধ্যেও আমাদের আনন্দের কথা এই যে, পিতার উপযুক্ত পুত্র—রসিকলালের একমাত্র বংশধর শ্রীমান সুধীন্দ্রলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত 'বীণা' হস্তে লইয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান সুধীন্দ্রলাল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বাণীমন্দিরে পিতার ন্যায় একনিষ্ঠ সাধকভাবে বীণা বাজাইতে থাকুন।—'ভারতবর্ষ-সম্পাদক।'

এখানে নানাজাতি বাস করে। তিনটি জাতিই প্রধান—নিগ্রেটো (Negreto), ইণ্ডোনেশিয়ন (Indonesian) এবং মালয়ান (Malayan)।

নিগ্রেটোগণ আদিম অধিবাসী না হইলেও অন্যান্য জাতির বহু পূর্ব্ব হইতেই আছে। ইণ্ডোনেশিয়নগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা যে-কোনও সভ্য সমাজের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য হইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফর্ণাণ্ডো মেগালিন নামক একজন পর্ত্তুগীজ এই দ্বীপশ্রেণী আবিষ্কার করেন। তিনি ফিলিপিনোগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাহার পর স্পেনীয়গণ এই দ্বীপ দখল করে। দ্বীপের অধিবাসিগণকে খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়ন করা হইত। শুধু মালয়ানগণই সমস্ত অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইয়া স্বধর্ম্মে দৃঢ় হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজগণ রাজধানী ম্যানিল্লা (Manilla) দখল করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরেই আবার তাহা স্পেনকে প্রত্যর্পণ করেন। স্পেনীয়গণ স্থানীয় অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। রাজা ও প্রজার মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ চলিত, অনবরতই বিদ্রোহ হইত, আদিম অধিবাসিগণ সকল স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইত। ১৮৯৮ খৃঃঅব্দে কিউবা লইয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের বিবাদ হয়। সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া ফিলিপিনোগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। আমেরিকাও সুবিধা পাইয়া দ্বীপ দখল করেন। আমেরিকা দ্বীপ দখল করিয়াই এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহাতে অধিবাসিগণকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, শ্বেতাঙ্গদের সহিত সমানভাবে কৃষ্ণাঙ্গগণ সমস্ত অধিকার ভোগ করিবেন। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে যদি দেশ সভ্য হইয়া উঠে তবে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে। আমেরিকা অক্ষরে-অক্ষরে সে কথা পালন করিয়াছে। আমেরিকানগণ এদেশে আসিয়াই ফিলিপিনোদের শিক্ষিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। কারণ, শিক্ষাই রাষ্ট্রীয় উন্নতির জীবনী শক্তি।

এখানে বিদ্যালয় তিন প্রকার—প্রাথমিক, মধ্যম এবং স্পেশাল হাই স্কুল। প্রাথমিক স্কুলে চারিটি শ্রেণী থাকে। এখানে সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে প্রতিদিন ৪৷৷০ ঘণ্টা পড়ান হয়। এই শ্রেণীতে নক্সা ও কিণ্ডারগার্ডেন দ্বারা ছেলেদের বর্ণবোধ, উচ্চারণ, বানান শিখান হয়। ২য় শ্রেণীতে ৫ ঘণ্টা পড়ান হয়। ইহাতে লেখা এবং কিছু-কিছু অঙ্ক ও সঙ্গীতও শিখান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বালকদের সাহিত্য, ভূগোল, অঙ্ক, ড্রইং, সঙ্গীত ও অল্পাধিক গৃহকার্য্য শিখান হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকগুলিই শেষ হয় এবং তাহার উপর ড্রইং, নাগরিক বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, এবং ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়।

মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের যে কোনও একটি লইতে হয়—(১) সাধারণ শিক্ষা। (২) অধ্যাপনা কার্য্য। (৩) গৃহ পরিচালনা। (৪) ব্যাপার বা দোকান চালান। (৫) কৃষিশিক্ষা (৬) ব্যবসায় শিক্ষা। মধ্যম স্কুলগুলিতে তিন শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। স্পেশাল হাইস্কুলের পাঠ চারি বৎসরে শেষ হয়। এই স্কুলগুলির প্রথমশ্রেণীতে বীজগণিত, সাহিত্য, প্রবন্ধরচনা এবং সাধারণ ইতিহাস শিখান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেখাগণিত, সাহিত্য, ভূগোল, রাজ্যশাসন পদ্ধতি, সাধারণ ইতিহাস ও যুক্তরাজ্যের ইতিহাস. তৃতীয় বৎসর—অঙ্ক, উচ্চ বীজগণিত, সাহিত্য, চিকিৎসা, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং ইকনমিক ভূগোল। চতুর্থ বৎসর—রেখাগণিত, ল্যাটিন, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যবসায়োপযোগী ইংরাজীভাষা, পদার্থবিদ্যা। এই শ্রেণীতে অধ্যাপনা-কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়।

শুধু বড় বড় বিদ্বান প্রস্তুত করাই এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। লোকে যাহাতে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে—নিজ-নিজ শক্তির সুব্যবহার করিতে পারে, এইটাই আমেরিকান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাল্যকাল হইতেই পুরুষগণকে কৃষিকাজ, এবং কামারের কাজ সামান্য পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং সেলাই শিখান হয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি করিয়া সুদীর্ঘ ময়দান না থাকিলে এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনের অনুমতি দেন না। ব্যায়াম-ক্রীড়াকে লোকপ্রিয় করার জন্য ফিলিপাইন সরকার চীন ও জাপান হইতে ভাল-ভাল খেলোয়াড় আনিয়া এসিয়ার ক্রীড়াগুলিকে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন।

১৮৯৮ খৃঃঅব্দ হইতে ফিলিপিনোগণ শিক্ষা, শাসন ও রাজনীতি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য উন্নতি দেখাইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ আমেরিকানদের উদারতা।

৩। মনোরমা—বৈশাখ

নাস্তিকবাদকা মূল ইতিবৃত্ত—লেখক, শ্রীচুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী।

লেখক চার্ব্বাকের কথা বলিতেছেন। চার্ব্বাকদর্শনই নাস্তিকদর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ।—"বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিক শিরোমণিনা চার্ব্বাকেণ" ইতি মাধবাচার্য্য। চার্ব্বাক শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—

চারুঃ আপাতমনোরমঃ বাকোবচঃ যস্তুতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুরয়ং শব্দ ইতি।

অর্থাৎ যার বাক্য লোকের চিত্তরঞ্জন করে সেই চার্ব্বাক। কেহ-কেহ এইরূপ অর্থও করেন—চার্ব্বঃ বুদ্ধঃ তৎসম্বন্ধাৎ চার্ব্বাকঃ।

মহাভারতে চার্ব্বাকনামে এক রাক্ষস পাওয়া যায় যথা—

নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্ব্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ॥
ততো দুর্য্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ
সাক্ষঃ শিখী ত্রিদণ্ডী চ ধৃষ্টো বিগত সাধ্বসঃ॥

এই রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে দুর্ব্বাক্য বলিবার সময় অন্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। মহাভারতে এই রাক্ষসের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত লেখা আছে (মহা-১২.৩৯ ও ১৯ শ্লোক)। তাহাতে যদিও চার্ব্বাকের নাম নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চার্ব্বাকের উপর ব্রাহ্মণদের রোষ অনায়াসে বুঝা যায়। ব্রাহ্মণদের অপমান করিয়াছিল বলিয়াই

তাঁহারা চার্ব্বাককে রাক্ষস সাজাইয়াছেন। চার্ব্বাক বৈদিক ব্রাহ্মণদের পরম শত্রু ছিলেন।

বেণীসংহার নাটকে ভট্টনারায়ণ চার্ব্বাককে অশুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা হইতে চার্ব্বাকের নাস্তিকতা প্রমাণিত হয় না। স্থায় কুসুমাঞ্জলীতে ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধকে চার্ব্বাক বলা হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাক বৌদ্ধ নয়; কারণ, দুই মতই বিভিন্ন।

কাব্যবেত্তাগণ জানেন, নাস্তিকদের জন্যই প্রথম "পাষণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত হয়। নৈষধ-চরিত্রে একজন নাস্তিককে "পাষণ্ডপাশ" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণও এই নামে অভিহিত হইতেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের নাস্তিক, পাষণ্ড প্রভৃতি কটুবাক্যে অভিহিত করিতেন। নাস্তিকবাদের মূল—পাণিনি নাস্তিক শব্দের উৎপত্তি-বিচারে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে হইতেই নাস্তিকতা বিদ্যমান ছিল। মহাভারতে স্থানে-স্থানে, ও রামায়ণে যেখানে জাবালিমুনি রামকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, সেখানেও নাস্তিকের কথা আছে। মৈত্র্যুপনিষদে ও ছান্দোগ্যোপনিষদেও নাস্তিকের বর্ণনা আছে। কঠোপনিষদে আছে—"যেয়ং প্রেতে বিচিকৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।" ১.১.২০। ইত্যাদি বাক্যে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের সময় নাস্তিকবাদ অবশ্যই ছিল। মন্ত্রভাগেও দেখা যায়, যেখানে মুনিগণ স্তুতি করিয়াও অভীষ্টলাভ করিতে পারেন নাই, সেখানে তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছেন। একটি মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"যদি তোমরা সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত যজ্ঞ কর—যদি "ইন্দ্র আছে" এ কথা সত্য হয়। নেমর্ষি, ভার্গব বলিলেন—"ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই। কে ইন্দ্রকে দেখিয়াছে? আমরা কার স্তুতি করিব? অতএব ইন্দ্র আছে, এ কথা প্রবাদ মাত্র সত্য নহে।"

ইহাতে বুঝা যায়, ইন্দ্রের অস্তিত্বসম্বন্ধে কেহ-কেহ সন্দিহান ছিলেন। মন্ত্রের সময়েই দেবতায় অবিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সূত্র সময়ে তো অনেকে মন্ত্রের নিরর্থকতা সপ্রমাণ করিতে ব্যগ্র ছিল। যাস্কীয় নিরুক্তে কৌৎস মুনি মন্ত্রের নিষ্ফলতা সপ্রমাণ করিতে যাইয়া যাস্ক মুনি কর্ত্তৃক পরাভূত হন।

৩। চিত্রময় জগৎ। জুন, ১৯১৬।

স্ত্রীশিক্ষা—লেখক শ্রীযুত গো, মা, চিপলুনকর এম্‌ এ।

যে শিক্ষায় সামাজিক জীবনের একটা আদর্শ নির্ণয় করিয়া দিতে পারে তাহাই বাস্তবিক শিক্ষা। শিক্ষাশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইলেই সমাজশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান জানা প্রয়োজন। কারণ এই দুই বিষয়ের দ্বারাই শিক্ষার রূপ, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়।

জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য-পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া মনে করা হইত। আজ সেটা সাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। মানবজাতি বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে একটা মানসিক অভাব বোধ করে। তাই আজ পাশ্চাত্য-শিক্ষা শুধু শাস্ত্রপাঠ, লেখা-পড়া ও হিসাব রাখায় সন্তুষ্ট থাকে না—তাহারা নৈতিক, শারীরিক, ব্যবসায়িক প্রভৃতি সকল বিষয়ই শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়াছে।

শিশুদের মধ্যে বিগত মানববংশের অনুভূতি ও জ্ঞান সুপ্ত রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য শিক্ষাটা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই দরকার। যেমন জল, বাতাস ও অন্ন না পাইলে স্ত্রীপুরুষ বাঁচিতে পারে না—সেইরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উভয়েরই শিক্ষার প্রয়োজন।

কিন্তু শিক্ষার প্রকৃতি বিভিন্ন হইবেই। যেমন ভিন্ন-ভিন্ন রোগে ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন, সেইরূপ স্ত্রীপুরুষের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় শিক্ষার প্রকারভেদ করিতে হইবে। আমাদের দেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপাখানার ডিগ্রীরূপ মোহরের ছাপই শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য; তাতে অস্থি মজ্জা বিচূর্ণ হইয়া বুদ্ধির বিকাশের পথ বন্ধ হয় হউক, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই।

মনকে চারিদিকের অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া—পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু পুস্তক পড়িলেই তাহাকে শিক্ষা বলে না। মনের আনন্দের জন্য যেমন কাব্যের দরকার, আবার উদ্বোধিত চিন্তাশক্তি হইতে ফল পাইবার জন্য Industrial trainingও দরকার। আমাদের দেশে আমরা বই পড়ি কিন্তু জগতের বৃহৎ পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। একজন আমেরিকান লেখকের কথা আমাদের দেশের সম্বন্ধেই খাটে—Our concept of culture is still tainted with inheritance from the period of the aristocratic seclusion of a leisure class. The present idea of culture is a survival of the time when the mind was conceived as an independent entity living in an elegant isolation from its environment. আমেরিকার উচ্চস্কুলে বিদ্যার্থীর ভাবী-জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়—স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই।

আসামী।

১। আলোচনা—শ্রাবণ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ। লেখক শ্রীসোণারাম চৌধুরী। "প্রাচীন কামরূপের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। অহোম রাজাদিগের পর হইতে ইহার "গুয়াকহটা" বা গুয়াহাটী নাম পাওয়া যায়। এই নগর ব্রহ্মপুত্র নদীর দুই পারে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রাচীন আয়তন আজকালকার সীমা হইতে অনেক বেশী ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে বড় বড় গড় ও প্রশস্ত খাত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউয়ন থ সং ভাস্করবর্ম্মার সময় এদেশে আসিয়া খাতসমন্বিত গড়গুলি দেখিয়া গিয়াছিলেন।

অহোম রাজগণ কয়েকটী গড় নূতন করিয়া পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মোমাইকটা গড় স্বর্গদেব চক্রধ্বজ সিংহ রাজার সময়ে মুসলমানের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এই গড়ের যে অংশ আধুনিক রংমহালগাঁওর দক্ষিণে আছে, তাহাকে বঙ্গনা গড় বলে। লেখক ১৬৫৪ খৃঃ অব্দের একখানা শিলালিপি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, শিবসিংহ রাজার সময় গুয়াহাটীর প্রত্যেক দুয়ার এক একটি সুন্দর বড় ঘরে সজ্জিত হইয়াছিল। এই রাজার সেনাপতি দিহিঙ্গিয়া বরফুকণর অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত শত্রুহস্ত হইতে গুয়াহাটী রক্ষা করেন।"

ত্রুটি

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার এম-এ, বি-এল

(১)

জীবনে সে কত কষ্টই না পাইয়াছে! সেই দুরন্ত বিসূচিকার বৎসরে, দুই বৎসরের শিশু পৌত্র হরকিষণের লালন-পালনের ভার দিয়া তাহার স্বামী, একমাত্র পুত্র কানাইলাল ও লক্ষ্মী-প্রতিমা পুত্রবধূ—সকলেই তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। শিশু-পৌত্রের মুখ দেখিয়া বৃদ্ধা সে দুঃসহ যন্ত্রণাও বুঝি কতকটা ভুলিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর দুরন্ত বসন্তপীড়া তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া হরকিষণের স্নেহময় মুখ-সন্দর্শনের সুখ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল! বৃদ্ধা কিন্তু তাহাও অম্লানবদনে সহিয়া আসিতেছিল; পৌত্র হরকিষণের বিবাহ দিয়া, তাহাকে সংসারে সুখী দেখিয়া জীবনের শেষ কয়টা দৃষ্টিহীন দিন কোনরূপে শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিলেই, সে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিত। নানারূপ ভাগ্য-বিড়ম্বনার জন্য বিধাতার উপর সে কোনদিন দোষারোপ করে নাই; বরং সকল ঘটনার মধ্যেই ভগবানের মঙ্গলময় শুভহস্তের কার্য্যতৎপরতা দেখিতে চেষ্টা করিয়া, সে অশান্তিকে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় যথাসম্ভব সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিত। বিধাতার মঙ্গল-বিধানের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতায় তাহার জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা, এবং হৃদয়ের অসীম ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার নিমিত্ত তাহার বদনে যে একটা শান্ত, সুবিমল সন্তোষের আভা ফুটিয়া উঠিত—কোন দিন তাহা ম্লান হয় নাই। যখন সে সক্ষম ছিল, নিজের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্মাদির জন্যও যখন তাহাকে এইরূপ অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত না, তখন নানা দৈব-দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও সে গ্রামের সকলের নিকট মঙ্গল-ময়ের করুণার কাহিনী বহন করিয়া তাহাদের রোগ-শোক-তাপের যন্ত্রণা অনেকটা উপশম করিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে সে গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সম্মুখে ও সাহচর্য্যে নিত্য একটা সুবিমল শান্তি ও সন্তোষ বিরাজ করিত।

কিন্তু জীবনের এই অন্তিম মুহূর্ত্তে, মাঝে-মাঝে অশান্তির উদ্বেগতরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তাহার হৃদয়কে বিচলিত করিতেছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাহার জীবনের একমাত্র আশা-ভরসা, অন্ধের যষ্টি পৌত্র হরকিষণকে সমরক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছে। দেশের আহ্বানে, রাজার আহ্বানে, দেশের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে গিয়াছে। যাইবার আগে সে গ্রামের সকলের উপর বৃদ্ধা পিতামহীর ভার দিয়া গিয়াছে। সকলেই বৃদ্ধাকে সাতিশয় যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, সর্ব্বদা সকল কার্য্যেই তাহার সাহায্য করিতেছে। প্রতি সপ্তাহেই হরকিষণের সংবাদ আসিতেছে। বৃদ্ধা এ দুঃসহ বিপাকও যেন সহ্য করিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু কয়েকদিন হইতে তাহার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। সারাজীবন কত কষ্ট সে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এতদিনে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসক আসিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। শুশ্রূষাকারিণী প্রতিবাসিনীরা সর্ব্বদা সাবধানে তাহার সেবা করিতেছে; হরকিষণ আবার অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিবে, দেশের শত্রুনাশ করিয়া বীরত্বের বহুমানাস্পদ গৌরবমুকুটে মণ্ডিত হইয়া বীরের সন্তান পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিবে, সর্ব্বদাই এইরূপ প্রবোধ দিয়া বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। যেন কি-একটা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা, নিদ্রা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ দুই দিন হইতে মতিবিভ্রমের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

রবিবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিবার দিন; গত রবিবারে হরকিষণের সংবাদ আসিয়াছে, সে বেশ ভাল আছে, মনের আনন্দে আছে, লিখিয়াছে। বার-বার সে চিঠিখানা বৃদ্ধাকে পড়িয়া শোনান হইয়াছে। শুনিয়া-শুনিয়া সেই দুই ছত্রের চিঠি সে আবার শুনিতে চাহিয়াছে। এইরূপে সে শতবার তাহা শুনিয়াছে। আজ শনিবার। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পুনরায় সংবাদ আসিবার সময় এখনও হয় নাই, কিন্তু সে আজ দুই দিন হইতে সর্ব্বদা পিয়নের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। দূরে কোন শব্দ হইলেই বৃদ্ধা চকিতে কুটীরের দ্বারদেশে আসিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। পার্শ্বে প্রতিবাসিনী বালিকা বসিয়াছিল, সে বলিল "কোথা যাও, ঠাকুরমা?"

"ঐ পিয়ন আস্‌ছে, নয়? চিঠি কি এল?"

"ঠাকুরমা, আজ তো শনিবার। আজ তো চিঠি আস্‌বার কথা নয়। কাল রবিবারে চিঠি আস্‌বে।"

বৃদ্ধা কথাটা যেন বুঝিতে পারিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় শয্যাগ্রহণ করিল। কয়েক ঘণ্টা পরে দূরে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বৃদ্ধা সচকিতে ত্রস্ত হইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিয়া বলিল "দেখ তো, ঐ বুঝি পিয়ন এল; আমার হরকিষণের চিঠি—"

"না, ঠাকুরমা, আজ তো হরকিষণের চিঠি আস্‌বার দিন নয়, আজ যে শনিবার।"

"না আজ রবিবার। আজ চিঠি এসেছে, তুই দেখ।"

পিয়ন ভকতরাম সে পথ দিয়া তখন গ্রামে চিঠি বিলি করিতে যাইতেছিল। তাহারই পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়াছিল। পিয়ন কুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(২)

ভকতরাম বৃদ্ধার শোচনীয় অবস্থার কথা সবই জানিত। প্রতিমুহূর্ত্তেই যে সে চিঠির অপেক্ষা করিয়া উতলা হইয়া আছে, তাহা সে জানিত। আজ তাহার পকেটের মধ্যে বৃদ্ধার ঠিকানায় একখানা চিঠি আছে; কিন্তু তাহা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নহে, তাহা তাহার সহপাঠী হরকিষণের লেখা নহে। তাহা সমরবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে বৃদ্ধার নামে আসিয়াছে। সেই দীর্ঘ সরকারী লেফাপার উপর পরিচিত নির্ম্মম চিহ্ন দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কি হৃদয়-বিদারক ভয়ানক সংবাদই সে চিঠিতে আছে! এরূপ কয়েকখানি চিঠি সে ইতঃপূর্ব্বেও বিলি করিয়াছে। যে গৃহে যে দিন এরূপ চিঠি সে বিলি করিয়াছে, সেখানে সেদিন ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধাকে সে ভাল করিয়া জানিত, বৃদ্ধার আজীবনের শেষ ক্ষীণ আশাস্থল যে হরকিষণ, তাহা সে বিশেষরূপেই অবগত ছিল,—হরকিষণ যে তাহার সহপাঠী ছিল। বৃদ্ধার বর্ত্তমান অবস্থার কথাও সে শুনিয়াছিল। এতদিন সে পিয়নগিরি করিতেছে; কতবার কত আনন্দের সংবাদ—কতবার কত বিপদের সংবাদ—সে বহন করিয়া আনিয়াছে। মন্ত্রচালিতবৎ সে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। হৃদয়ের দিক দিয়া চিঠির মূল্য যে কি প্রকার, তাহা সে একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাহার নিকট চিঠি, চিঠি মাত্র; যথাসময়ে তাহা বিলি করাই তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ এই চিঠিখানি পাইয়া অবধি তাহার মর্ম্মের এক গুপ্ত, কোমল স্থানে আঘাত লাগিয়াছে; তাহার মন নিতান্ত বিচলিত হইয়া গিয়াছে। পিয়ন-জীবনের নির্ম্মম কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাহার হৃদয় আজ আর চাহিতেছে না। সে ভাবিল, 'এই ভয়ানক চিঠিখানা এখন কয়েকদিন বিলি করিব না। এ চিঠি পাইলে বৃদ্ধা যে আর বাঁচিবে না! আজীবন দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও তাহার হৃদয়ে যে নির্ভরতা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল, অন্তিমকালে তাহা লোপ পাইবে; মৃত্যুতে সে গভীর অশান্তি পাইবে।' এই ভাবিয়া সেই চিঠিখানা চিঠির থলিয়া হইতে বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিয়াছিল। এতদিন পিয়নগিরির মধ্যে আজ সে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিবার সঙ্কল্প করিল।

(৩)

পদশব্দ কুটীরের সম্মুখীন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা বলিল—"ও কে—ভকতরাম?"

"হাঁ ঠাকুরমা, আমি।"

"হরকিষণের চিঠি আছে?"

"না ঠাকুরমা, আজ তো যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ডাক আস্‌বার দিন নয়।"

সে সত্যকথাই বলিল—হরকিষণের তো চিঠি নাই। বৃদ্ধা হতাশ হইয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিল। ভকতরাম স্বীয় গন্তব্যপথে চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে বৃদ্ধা পুনরায় উঠিয়া বসিল। বালিকাকে বলিল "ভকতরাম আসিয়াছে ?"

"সে তো এইমাত্র এদিক দিয়া গেল। আজ তো চিঠি আসে নাই ব'লে গেল।"

"সে এসেছিল—চলে গেছে! ডাক তা'কে আবার, আমি একবার শুধিয়ে দেখব।"

বালিকা ভকতরামকে ডাকিতে পাঠাইল। ভকতরাম আসিয়া পৌছিলে বৃদ্ধা বলিল,—"ভকতরাম,—চিঠি ?"

"চিঠি তো নাই, ঠাকুর মা।"

"কোন চিঠিই নাই ?"

"না, ঠাকুরমা !"

এবার সে মিথ্যা বলিল। কর্ত্তব্য-সম্পাদনে আজ প্রথম সে স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যার আশ্রয় লইল। বৃদ্ধা নিরাশ হইয়া শুইয়া পড়িল। ভকতরাম চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন রবিবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ডাক আসিল। বৃদ্ধার নামে চিঠি আসিয়াছে। ভকতরাম দেখিল, চিঠি হরকিষণের লেখা। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ডাক আসিতে সাধারণতঃ দেরী হইয়া থাকে, কারণ সামরিক কর্তৃপক্ষগণের দ্বারা নানাবিধ পদ্ধতিতে সবিশেষ পরীক্ষিত হইয়া তবে তাহা বহির্জ্জগতে আসিতে পায়। এই চিঠিখানা ডাকে দিবার পরে যে বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ সমর-বিভাগের সেই নির্দ্দয় লেফাপাখানার মধ্যে নিহিত আছে। সেখানা এখনও ভকতরামের পকেটেই আছে।

আজ চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধার জীবনদীপ নির্ব্বাণপ্রায়, যে-কোন সময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারে। ভকতরাম হরকিষণের চিঠিখানি লইয়া বৃদ্ধার কুটীরের দিকে চলিল।

ধীরপদে কুটীরে গিয়া ভকতরাম ডাকিল —"ঠাকুরমা !"

"কে ? ভকতরাম ? চিঠি এসেছে ?"

"হাঁ, ঠাকুরমা ; চিঠি এসেছে।"

বৃদ্ধার ম্লানমুখে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তাহার নিকট কয়েকজন প্রতিবেশী উপস্থিত ছিল। একজন সাগ্রহে চিঠিখানি খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহা পড়িয়া শুনাইল। হরকিষণ বেশ আনন্দে আছে। সে লিখিয়াছে, "কিছু ভাবিও না ঠাকুরমা, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া যাইব।" একবার দুইবার করিয়া অনেকবার চিঠিখানি পড়া হইল। চিঠি শুনিয়া বৃদ্ধার বিষাদমলিন, রোগশীর্ণ ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল "হায়, বাছা কবে আসিবে, তখন কি আর ঠাকুরমা বাঁচিয়া থাকিবে !" বৃদ্ধার ভাবান্তর দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। ভকতরাম এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। এই আনন্দদৃশ্যের অন্তরালে কি নির্দ্দয় ব্যঙ্গ নিহিত আছে, তাহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় ক্ষণেকের জন্য কম্পিত হইয়া উঠিল; চক্ষুপ্রান্তোত্থিত অশ্রু-রেখা সে গোপনে মুছিয়া ফেলিল।

আজ বৃদ্ধার অশান্তভাব দূর হইয়াছে। সে সকলের সহিত শান্ত, সহজভাবে দু'একটি করিয়া কথা কহিল। তাহার জীবনসম্বন্ধে সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল। বৃদ্ধা বলিল—"ভগবান মঙ্গলের আধার। তিনি কখনও অমঙ্গল করেন না। তাঁহার রাজত্বে অবিচার হইবার যো নাই।"

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধার অবস্থা খারাপ হইল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন "আজ রাত্রি পার হওয়া সংশয়স্থল; হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।"

সে রাত্রি কাটিল না। গভীর রাত্রিতে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিতে বৃদ্ধার আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অমরধামে গমন করিল।

(৫)

পরদিন সমর-বিভাগের সেই চিঠিখানা লইয়া ভকতরাম পোষ্ট-মাষ্টারবাবুর নিকট যাইয়া তাহার প্রথম কর্ত্তব্য-ত্রুটির বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়া বলিল—"এই ত্রুটির জন্য যাহা উচিত দণ্ড হয়, তাহার বিধান করুন।"

পোষ্টমাষ্টারবাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "পিয়নের কর্ম্মে এরূপ ত্রুটি অতিশয় গুরুতর—তাহার মার্জ্জনা নাই। কিন্তু এবার তোমার নামে রিপোর্ট করিব না। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ করিও না।"

ভকতরাম চলিয়া যাইতেছিল। পোষ্ট-মাষ্টারবাবু তাহাকে ডাকিলেন; বলিলেন—"ভকতরাম, তুমি ধন্য। নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে তোমার এই ত্রুটির নিমিত্ত বৃদ্ধা শান্তিতে মরিতে পারিয়াছে। এই ত্রুটিটি না করিলে, তাহার হৃদয়ের সহিত তাহার আজীবন-পোষিত ভগবানের মঙ্গল-ময়ত্বে বিশ্বাস হয় তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।—কিন্তু আর কখনও এরূপ ত্রুটি করিও না।"

তীর্থ-ভ্রমণ

আলোচনা

[ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র, এম্-এ, বি-এল]

খানাকুল কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা মুন্সী রামনারাণের চারি পুত্র ছিল; মদনমোহন, মথুরমোহন, শ্যামমোহন ও গুরুদাস। মদনমোহনের পুত্র রাজা সীতানাথ। মথুরমোহনের চারি পুত্র—যদুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রজনাথ, ও কেদারনাথ। জ্যেষ্ঠ যদুনাথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি খৃঃ ১৮০৬ সনে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের গৌরব অক্ষুণ্ণ। তৎকালে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বড় চলন ছিল না; ভদ্রলোকমাত্রেই পারস্যভাষায় কৃতবিদ্য হইতে যত্ন করিতেন। অনেকে সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত শিখিতেন, সঙ্গীতবিদ্যা ভদ্রমাত্রেরই অলঙ্কার ছিল। যদুনাথ পারস্যভাষা জানিতেন; কিন্তু তিনি সংস্কৃতভাষা ও শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার "সঙ্গীত-লহরী" উচ্চ অঙ্গের রচনা। "উষাহরণ"ও তাঁহার রচিত গীতিকাব্য। তিনি প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রুচি মার্জ্জিত ছিল; দেবভক্তি অচল ছিল। তাঁহার কৃতবিদ্য যশস্বী পুত্রেরা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন; তিনিও অনায়াসে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে সেরূপ প্রবৃত্তি অসম্ভব ছিল। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার ভক্তি ও পরোপকার ব্রতের কথা মনে করিলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যসেবা পর্য্যালোচনা করিলে ইংরাজ কবি গ্রে'র কথা স্মরণ হয়—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

তবে এ কথা সত্য নহে যে যদুনাথের জীবনের অপ্রতিমেয় সুগন্ধ মরুভূমিতে নষ্ট হইয়াছে। তিনি জন্মভূমির প্রকৃত উপকার করিয়া গিয়াছেন; সে উপকারের কোন অংশই অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই, অলক্ষিতভাবে নষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রশস্ত ধর্ম্মজীবন চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগরিত হইত।

১২৬০ সালের ফাল্গুন মাসে (খৃঃ ১৮৫৪) সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থগমনের উদ্দেশ্যে রাধানগর হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। তখনও লর্ড ডালহাউসী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। তিন বৎসর পরে যে বিদ্রোহ আর্য্যাবর্ত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল, যাহার উৎপাতে ভারতবর্ষে বৃটিস-সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত হইতে পারিত, যাহার বিভীষিকাময় ব্যাপারে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের প্রদর্শনের অভাব হয় নাই, তাহার কোন প্রকার চিহ্নই তখন পরিলক্ষিত হয় নাই। তখনও ভারতভূমিতে প্রকাশ্য শান্তি বিরাজমানা ছিল। লর্ড ডালহাউসী যে দিন তাঁহার পরবর্ত্তী সুযোগ্য গভর্ণর লর্ড ক্যানিংকে ভারতরাজ্যের ভার দেন, সে দিন কেহই মনে করে নাই যে, অচিরে আর্য্যাবর্ত্ত শ্বেত ও শ্যামবর্ণধারী যোদ্ধৃবৃন্দের শোণিতে প্লাবিত হইবে। তখনও ভারতবর্ষে রেলের গাড়ী চলে নাই। তিন বৎসর পরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের গাড়ীতে যাতায়াতের পথ হয়। কিন্তু পথে শান্তি ছিল, বৃটিসশাসনে চোর-ডাকাতের ভয় বড় একটা ছিল না। যাতায়াতের ব্যয়ও অধিক ছিল না; সামান্য ব্যয়েই তীর্থদর্শন হইতে পারিত। তখন তীর্থদর্শনে আরও একটি বিশেষ সুবিধা ছিল; কাহারও এক দৌড়ে গয়া-কাশী যাওয়ার উপায় ছিল না; অনেক দেশ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইতে হইত; পথে অনেক ভালমন্দ স্থান দেখিতে হইত; অনেক ছোট বড় তীর্থদর্শন হইত। একালে ছোট ছোট তীর্থের গৌরব নাই বলিলেই হয়, তথাকার পাণ্ডারা অর্থাভাবে হতশ্রী হইয়াছেন। রেলের পথে না পড়িলে ছোট ছোট তীর্থের দর্শন উঠিয়া গিয়াছে। সেকালের তীর্থদর্শন ও দেশভ্রমণ আর এক রকমের ছিল। অনেকেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রা-বিবরণ বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবতে" ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃতে" পড়িয়া থাকিবেন। গোবিন্দের "কড়চায়" ততটা আদর ছিল না। "মুরারি মুরলী ধ্বনিসদৃশ" মুরারির সংস্কৃত কড়চা সকলে পাঠ করিতে পারিতেন না, তাহাও তখনও মুদ্রিত হয় নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ গ্রন্থ সাবেক ছাঁচে হইলেও তাহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা গদ্যে ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত ও ইহাতে তারিখ প্রভৃতি সকলই পাওয়া যায়। সেই সময়ে পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়" ও "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; অক্ষয়কুমার ও তারাশঙ্কর-প্রমুখ লেখকগণের সাধুভাষার তখন আদৌ প্রচলন ছিল না। তখনকার বাঙ্গালা ভাষা কৃত্তিবাসের রামায়ণের, কাশীদাসের মহাভারতের, কবিকঙ্কণের চণ্ডীর, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ও বৈষ্ণব কবিগণের

ভাষা; গদ্য-রচনা অতি কমই ছিল। "কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-চরিত" বা "তোতাকাহিনীর" ন্যায় গ্রন্থই তখনকার গদ্যের আদর্শ ছিল; কিন্তু তখনকার ভাষার সারল্য ছিল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ভাষা খুবই সরল, অথচ স্থান-বর্ণনায়, ঘটনা-বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বিশেষ গুণপনা এই যে, তিনি কোন কথা গোপন করেন নাই; তাঁহার দৈহিক, মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা সমস্তই যথাযথ বর্ণিত; এমন কি, মনে হয়, যেন তিনি নিজের জন্যই তীর্থভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, সাধারণের পাঠের জন্য নহে। সাধারণের পাঠের জন্য লিখিত হইলে হয় ত একটু-আধটু সংকোচ থাকিত, হয় ত ভাষার একটু গুরুত্ব থাকিত।

ফাল্গুনের ১৫ তারিখে তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল। কালীপুর, গৌরহাটী, কোতলপুর, সোনামুখী, অণ্ডাল, নিয়ামতপুর গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রী সকলে পরেশনাথের পাহাড়ের অধিত্যকায় মধুবনে উপস্থিত হইলেন। পথ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক্‌রোড; এখনও সেই রাস্তা। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের গ্রাণ্ডকর্ড (Grand-chord) সেই পথের অনুসারী। পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটেই মধুবন ও তাহার পর ডুমরির চটী, গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডের উপরেই। চটির চতুর্দ্দিকে পাহাড়, স্থান রমণীয়; এখন সেখানে ডাক বাংলাও আছে। তাহার পর বগোদরের চটি; এখানকার ডাক-বাংলা খুব ভাল। এখান হইতে পশ্চিমে গয়া যাইবার রাস্তা, দক্ষিণে হাজারিবাগ যাইবার রাস্তা। হাজারিবাগ রোড ষ্টেশান উত্তরে পাঁচ ক্রোশ।

বোধগয়া হইয়া রাস্তা; তাহার পর গয়াধাম। এখন গয়ায় রেলওয়ে ষ্টেসন; বোধগয়ায় মোহন্তের ধর্ম্মারণ্য দেখিতে কেহ যায় না। ভাদ্রমাসে পিণ্ডদানার্থে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুমের ছায়ায় কোন কোন হিন্দু যাইয়া থাকেন; বোধগয়ার প্রত্নতাত্বিক দৃশ্যও লোককে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তখনও বোধগয়ার উদ্ধার হয় নাই; তথায় গোতমবুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করায় বৌদ্ধজগতে স্থানের ও বোধিদ্রুমের অসীম আদর ছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধগণের যাতায়াত কমই ছিল। তথায় রাজাধিরাজ অশোক ও অন্যান্য বৌদ্ধমতাবলম্বী নৃপতিগণ যে ভক্তির ও ধর্ম্মপ্রাণতার চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তখনও আবিষ্কার হয় নাই। তখন বোধগয়া মাটির বড় ঢিপি ছিল, বড় মন্দিরের নিম্নের তলা মৃত্তিকা-প্রোথিত ছিল। অনেক পরে কানিংহাম সাহেবের যত্নে ভারতবর্ষের সেই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং তীর্থভ্রমণে এই ভারতকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। গয়া ও পুনপুনার বিবরণ এখনকার বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত মনে হইবে। এখনও সেই গয়া,-পরিবর্ত্তন কমই; সেই সবই এখনও আছে।

তাহার পর বারাণসী। "দেখিতে কিবা শোভা হয় তাহা বর্ণনের বহির, সুবর্ণময় যে কাশীপুরীর বর্ণনা আছে, তাহার সংশয় কি? অতি মনোরম স্থান।" কাশীধামের বিশেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দিরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যান্য মন্দির যাহা ছিল প্রায় তাহাই আছে। কাশীধামের পরিবর্ত্তন রাজপথে ও অট্টালিকায় মিউনিসিপ্যালিটীর কয়েকটি বাগানে। যাহা হউক, বিশেশ্বরের জীবন্ত আরতির বিবরণ তীর্থভ্রমণ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "আরতি চমৎকার। পাঁচজন ব্রাহ্মণ দুইদিক্ বেষ্টিত করিয়া বৈসে। পূর্ব্ব-দিকের দ্বারে যে ব্রাহ্মণ বৈসেন তেঁহ সর্ব্বমান্য। প্রথমে দুগ্ধ অভিষেক। এক পোয়া দুগ্ধ অভিষেকের ঘটীতে থাকে। ঐ ঘটীর নীচে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারা ঐ দুগ্ধ বিশেশ্বরের মস্তকে ধারা পড়ে। পরে একসের গঙ্গাজল ঐরূপে ধারা দেওয়া হয়। তদন্তে ঘৃত ও চিনি দিয়া মর্দ্দন করিয়া ধারা দেওয়া হয়। তাহার পর চন্দন লেপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করে। মস্তকে রক্ত চন্দন, আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা, বিল্বদলে অর্ঘ্য দিয়া নানা পুষ্পের মালা দিয়া ভূষিত করিয়া আরতি আরম্ভ হয়। আরতি দেখিতে চমৎকার বোধ হয়। পাঁচজন ব্রাহ্মণে একেবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া শিঙ্গা, ডুম্বুরের বাদ্য ও ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর একতালে বাজাইয়া শম্ভু শম্ভু শম্ভু এই শব্দে আরতি প্রথম আরম্ভ করিয়া পরে স্তুতিপাঠ হয়। চতুঃপার্শ্বে সকলে দাঁড়াইয়া সে সকল বাদ্যধ্বনি, স্তুতিপাঠ, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদির ব্যজনে কি চমৎকার দেখিতে হয় তাহা কি কহিব। যে দেখিয়াছে সেই জানিতে পারে।" নির্ঘোষপূর্ণ শব্দাড়ম্বর অপেক্ষা এরূপ বর্ণনা যে অনেক মূল্যবান্ তাহার সন্দেহ কি।

যাত্রিগণ ১২৬১ সালের ১২ বৈশাখে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া প্রয়াগ ও শ্রীবৃন্দাবন তীর্থদর্শনার্থ অগ্রসর হইলেন। বৈশাখের রৌদ্র ও উত্তাপ তাঁহারা গ্রাহ্য করিলেন না। দেবভক্তিতে পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হইয়া সকলেই বৈশাখের উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিলেন। ১৭ বৈশাখ তাঁহারা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে বেণীঘাটে উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী তখনও গুপ্তভাবে, এখনও গুপ্তভাবে; সরস্বতীর বহুকালই তিরোভাব হইয়াছে। অনেকেই বলেন বৈদিক কালের সরস্বতী রাজপুতানার মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দুর্গের তখন বিশেষ গৌরব ছিল। তখনও সিপাহী-বিদ্রোহের কোন সূচনা ছিল না; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অকাতরে নিশ্চিন্তমনে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। তিন বৎসর পরে ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় এই দুর্গে থাকিয়া লর্ড ক্যানিং চিন্তা-কুলহৃদয়ে নিদ্রাশূন্য রাত্রিযাপন করিতেন। এখন এলাহাবাদের দুর্গ নাম মাত্র, অক্ষয়বট ও অশোকস্তম্ভই এখানে দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনপথে কানপুর, বিঠুর, কান্যকুব্জ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া মহাবন ও নূতন গোকুলে যাত্রিগণ উপস্থিত হইলেন। মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন ও তত্রস্থ শ্রীমন্দিরাদির তীর্থদর্শনের বর্ণনা সকলেরই পাঠ্য। জয়পুর ও পুষ্কর শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার অঙ্গীভূত। যাত্রি-গণের পুনরায় মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন গমন এবং বৃন্দাবন বাস। কয়েক-মাসের পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ক্রমশঃ বিবিধ গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া সকলে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে বৎসর মহাকুম্ভমেলা। দ্বাদশ কুম্ভের পর যে কুম্ভ হয় তাহা মহাকুম্ভ। বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিস্থ হইলে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ৩০ চৈত্রে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

হইয়া থাকে। গত বর্ষে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়াছে। তীর্থভ্রমণে জীবন্ত মেলার বর্ণনা বিশেষ পাঠ্য। গত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাঁহারা হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণের বর্ণনা পাঠে সহজেই সাদৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। এখন আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দ্বারা সহজে হরিদ্বারে যাওয়া যায়; যাতায়াতের সুবিধা অধিক, পরন্তু ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিদর্শন তখনকার ও এখনকার কুম্ভমেলার তুলনায় বুঝিতে পারা যায়; সেকালে একালে অন্য কোন প্রভেদ বিশেষ লক্ষণীয় নহে।

বৈশাখে হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ দর্শনার্থ ঝাপানে যাত্রা। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী গমন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ তীর্থের দর্শন দুরূহ। এখনই দুরূহ, তখন আরও ছিল। কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মন্দিরদ্বার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর হইতে ও অক্ষয়া তৃতীয়ার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ থাকে। সে সময়ে তথায় গমন করা যায় না; যাত্রিগণ দেখিয়াছিলেন, ২৪ বৈশাখেও মন্দিরের ভিতরের সমস্ত বরফ গলিয়া যায় নাই; তুষারাবৃত স্থানে যাত্রা অসম্ভব; তুষার গলিয়া যাওয়ার পরও কষ্ট কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেদারনাথ হইতে বদরীনারায়ণ তিন ক্রোশ উত্তরে, কিন্তু পৌছিতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে তিন চারি দিন লাগিয়া থাকে। শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ নরনারায়ণরূপ, পরশপাথর নির্ম্মিত অতি চমৎকার মূর্ত্তি। বদরী-নারায়ণ আমাদের একটী প্রধান তীর্থস্থান; পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়; অন্নপ্রসাদ সকলে সকলকে দিয়া থাকে, মনোবিকার কিছুমাত্র হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অন্নছত্র ও মহাপ্রসাদে জাতিভেদের অভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবের চিহ্ন; কিন্তু এরূপ মনে করার কোন কারণ দেখি না। সত্য বটে, পুরী এককালে বৌদ্ধতীর্থ ছিল, কিন্তু বৈদিক মতাবলম্বিগণ যে বৌদ্ধদিগকে অনুকরণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমানের ভিত্তি কোথায়? বৈদিক মত পুরাতন, পুরাতন মত নূতনকে সহজে অনুকরণ করে না; ঘৃণাই করিয়া থাকে। এখন অনেকেই "বৌদ্ধ, বৌদ্ধ" করিয়া বিকৃতমনা হইয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদিক ও পৌরাণিক, আচার ব্যবহারে ও পূজাপাঠে গৌতমবুদ্ধের বা মহাযান মতের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কার্য্য-কারণের পরম্পরাগতি বিপরীত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নহে, একটি মত বা দর্শন মাত্র। বৈদিক ও ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রভেদ বড়ই কম ছিল, আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ একতা ছিল। কেবল মুক্তির পন্থার মতে কোন-কোন বিষয়ে প্রভেদ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তৎকালে কেবলমাত্র একটি দার্শনিক মত ছিল এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গৌরব ছিল না। বর্ণভেদ ছিল, ব্রাহ্মণদিগের আদর ছিল, ভারতবর্ষে বর্ণভেদ কখন উঠিয়া যায় নাই; কিন্তু যে কোন জাতি শ্রমণ বা ভিক্ষু হইতে পারিত, এটী ব্রাহ্মণদিগের নিজস্ব ছিল না। আমাদের বড় বড় তীর্থে মহাপ্রসাদে জাতিভেদ ছিল না। বস্তুতঃ মহাপ্রসাদে জাতিভেদজনিত অভক্তি ও দেবতার প্রতি ভক্তির অভাব একই কথা, ভক্তের জাতিভেদ কি?

পাণিপথ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; অনেকেই তথায় যাইয়া থাকেন। এক্ষণে বঙ্গবাসীদের জলন্ধরে গমন বড়ই কম। দিল্লী হইতে জলন্ধরের পথে অনেক তীর্থ স্থান। জলন্ধর পীঠ স্থান। স্তনপীঠ আমাদের একটি প্রধান তীর্থ। তীর্থভ্রমণের বর্ণনাও জীবন্ত, তথায় না যাইয়াও তীর্থ ভ্রমণের বর্ণনায় সবই জানিতে পারা যায়।

যাত্রিগণ বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনর্ব্বার প্রয়াগে আসিলেন এবং বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন করিয়া পৌষ মাসে বারাণসীতে আসিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। সেকালের তীর্থদর্শন একালের পূজার ছুটীতে তীর্থদর্শন নহে, ফাঁকি দর্শন নহে। তাঁহারা কাশীতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত রহিলেন। এবার কাশীধামের তীর্থ ও দেবদেবী ও মন্দির তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তীর্থভ্রমণের এই অংশ বারাণসী-পরিক্রমা বলা যাইতে পারে।

এই সময়ে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী গাজীপুরে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। তিনি কলিকাতায় অনেক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হন এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সহস্র সহস্র গুণবর্ণনার ইহা স্থান নহে, বঙ্গদেশের অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। আমার নিজেরও কথাই নাই। সূর্য্যকুমার পিতাকে গাজীপুরে আসিতে লিখিলেন।

গাজীপুরে যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু ১২৬৪ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠে বারাণসীতে সংবাদ আসিল, মীরাট ও দিল্লীতে অঘটন ঘটিয়াছে—কলিকাতা গমনাগমনের পথ শীঘ্রই রুদ্ধ হইবে। ১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহীবিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। বিদ্রোহানল হইতে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের প্রিয়তম স্থানও একেবারে রক্ষা পাইল না। সিক্রোলের ছাউনীতে একটি ছোট খাট যুদ্ধ ৪ জুনে হইয়া গেল। তীর্থভ্রমণে যুদ্ধের বর্ণনা অতীব প্রাঞ্জল, পাঠে মনে হয় যেন যুদ্ধ চক্ষে দেখা যাইতেছে। আমরা ইতিহাসপাঠে বিগ্রহের বিবরণ দেখিতে পাই; কিন্তু যুদ্ধের যথাযথ বর্ণনা আমরা কমই পাঠ করিতে পাই। বায়স্কোপের সাহায্যে কতকটা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহা সহরে। একালে আবার বড় বড় ইতিহাস পাঠ করা উঠিয়া গিয়াছে; অধিকাংশ ছাত্রই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া পরীক্ষা দেন। ছাত্রজীবন অবসানের পর ইতিহাস পাঠ নাই।

প্রায় চারি বৎসর কাল আর্য্যাবর্ত্তে পরিভ্রমণ এবং বড় বড় সকল তীর্থ ও ছোট ছোট অধিকাংশ তীর্থ দর্শন করিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গে প্রত্যাগমন করিলেন। তখনও বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয় নাই; তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহুদিন শাসন চলিবে কি না সন্দেহের বিষয়; পথেও বিভীষিকা বহুবিধ। তখন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছিল; পশ্চিমাঞ্চল হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডে আসিয়া রাণীগঞ্জে

রেলের গাড়ীতে উঠিতে হইত। প্রাণ হাতে করিয়া বঙ্গদেশে যাত্রিগণ পৌঁছিলেন।

তীর্থভ্রমণের ভাষা সে কালের ভাষা, হয় ত অনেকে পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু কালাত্যয়ে ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। আবার শেষ ষাটি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, সংস্কৃত শব্দ, প্রত্যয় ও সমাসের সমাবেশ ও ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণনিবন্ধন বঙ্গ ভাষার সমধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন কি অক্ষরেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রীতির কথাই নাই। আর পেট কাটা ব নাই, ঙ্ক স্থলে কু হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে উপকার বা অপকার হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে; কিন্তু সকল দেশেই এরূপ পরিবর্ত্তন ও মতভেদ লক্ষিত হয়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা এক কালে প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষাই ছিল। কনসটাণ্টিনোপল (স্তাম্বুল) তুরস্কদিগের হস্তগত হওয়ার পর প্রাচ্য রোমরাজ্যের কৃতবিদ্য মহাত্মগণ ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যসমূহে বাস করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে লাটিন ভাষারও প্রসার বৃদ্ধি হইতেছিল এবং বিবিধ কারণে লাটিন ও গ্রীক ভাষার পাশ্চাত্য ইউরোপে আদর বাড়িতেছিল। ক্রমশঃ লাটিন ও গ্রীক শব্দ-ব্যবহার প্রচলিত হইতে লাগিল এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সকল প্রদেশের লিখিত ভাষা লাটিন ও গ্রীক শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। আমাদেরও তাহাই, আমাদেরও গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভাষা সংস্কৃতশব্দ-বহুল হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে; গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাও বুঝিতে হইবে যে, মনের ভাব ভালরূপে প্রকাশ করিতে হইলে অনেক সময়েই সংস্কৃত ভাষার আবশ্যকতা হয়। এক্ষণে ইংরাজী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, আর তাহাতে ক্ষতিই বা কি? অধিকাংশ সভ্য জাতির ভাষা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। তীর্থভ্রমণের ভাষা ভাল বাঙ্গালা, সরল, প্রাঞ্জল ও সকলেরই বোধগম্য। আভিধানিক শব্দের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, অথচ ওজস্বিতার অভাব নাই। এ ভাষা সকলেরই পছন্দ হওয়া উচিত। অবোধগম্য আভিধানিক শব্দপরিপূর্ণ সমাসবহুল ভাষার বিশেষ আবশ্যকতা না হইলে ব্যবহারই অকর্ত্তব্য। আমরা শব্দের আড়ম্বর চাহি না, শব্দের মেঘগর্জ্জন চাহি না। এ কথা সত্য যে, বেশ ভূষণে বিশ্রীকেও একটু সুশ্রী দেখায়; কিন্তু প্রকৃত সুশ্রীর অলঙ্কারের অভাবে ক্ষতি হয় না। শকুন্তলা বল্কলপরিহিতা হইলেও পরমা সুন্দরী।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং,
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

উপমা, অনুপ্রাস ও শব্দবিন্যাস অপেক্ষা অর্থ-গৌরব অধিক আদরের জিনিস। কাদম্বরীরও শব্দ ও সমাসের বিন্যাস সকল সময়ে ভাল লাগে না।

তীর্থভ্রমণে রসাত্মক বাক্যের অভাব নাই; বস্তুতঃ রচয়িতা কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গীতিসমূহ ও গীতিকাব্য তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে। বিশেষতঃ তিনি ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন; তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আভ্যন্তরিক ভক্তিরস সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইত। শান্তি তাঁহাতে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। প্রসন্নকুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার, রাজকুমার, অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার-প্রমুখ পুত্রগণ তাঁহার ভক্তি ও ভাবুকতা অনেক পরিমাণেই প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্ত প্রকৃতই পুণ্যভূমি ও সাত্ত্বিক ভাব এবং ভক্তিরসের নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এত তীর্থস্থান, এত দেবমন্দির, এত দেবমূর্ত্তি কোন দেশেই ছিল না ও কোন দেশেই নাই। সনাতনধর্ম্মেতরধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন। সে কথা সত্য কি না, তাঁহারাও পৌত্তলিক কি না, তাহার বিচারস্থান অন্যত্র; কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভক্ত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে ধর্ম্মপ্রাণতাকে কেহ কেহ কুসংস্কার বলিয়া থাকেন; বলুন তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু ইহাও স্থির যে, আত্মার উন্নতি ভক্তি ভিন্ন অসম্ভব। তীর্থভ্রমণের প্রতি পত্রে সেই অসীম ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারা কেবল ভৌগোলিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ পাঠে আমোদ পাইয়া থাকেন, তীর্থভ্রমণ তাঁহাদের পক্ষে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এত দেশ ও স্থানের বর্ণনা একত্রে পাওয়া সুকঠিন। ইহাতে উড়িষ্যার জাজপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরুষোত্তমের, দাক্ষিণাত্যের রঙ্গনাথ রামেশ্বর প্রভৃতির, পাশ্চাত্য ভারতের বেঙ্কটেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতির বর্ণনা নাই বটে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তই বৈদিক সনাতনধর্ম্মের আদিস্থান, এখানেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী ছিলেন, এখানেই গঙ্গা ও যমুনা। এখানেই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান নাট্য স্থান; এখানেই প্রাচ্য আর্য্যজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত। নগাধিরাজ হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত নদীসনাথ পুণ্যভূমি পরিভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠার্থ কাহার না ঔৎসুক্য হয়? তীর্থভ্রমণে সেই ঔৎসুক্য উত্তেজিত হয়; সম্পূর্ণ পাঠে তৃপ্তি হয়। সকল কথা আয়ত্ত করিতে অনেক বার পাঠ আবশ্যক; কিন্তু কেহ আর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে তীর্থভ্রমণ নিশ্চয়ই তাঁহার সেতো হইবে। বারাণসী প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় সহরের বর্ত্তমান কালে কিয়দংশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু দেবস্থানের ও দেবমন্দিরের পরিবর্ত্তন নাই; পূজা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন নাই। সনাতনত্বই ইহাদিগের লক্ষণ।

মাটীওয়ালী

[শ্রীশরৎ মুখোপাধ্যায়]

"মাটী নেবে গো" "মাটী নেবে গো" ব'লে একটী বুড়ী দুপুরবেলায় পাড়া দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে। দুপুরবেলায় তার কর্কশ সুর যেন একটু বেশী কর্কশ লাগ্‌ছে। উনুন করার জন্য মাটীর দরকার। ঠাকুর-মা তাই মণিকে বল্লেন, "মাটি-উলিকে ডাক্‌ ত, দাদা।" মণিও অমনি "মাটীউলি, আমার ঠাকুরমাকে মাটী দিয়ে যাও" ব'লে জানালা থেকে ডাক দিল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মাটীউলি উপস্থিত। ঠাকুরমা সে ঝুড়ী নিলেন, ও আর-এক ঝুড়ী আবার দিয়ে যেতে বল্লেন। বৌমাকে পয়সা দিতে ব'লে, নিজে মাটীর উপর শুয়ে পড়লেন।

মাটীউলি এদিকে দু'এক কথায় মণিকে কোলে তুলে নিয়ে ব'সেছে; নিজের একটী পয়সাও তার হাতে দিয়েছে। পাছে ছোটলোকে চুমু দিলে জাত যায়, তাই চুমু দেয় নি। একমনে মণির মুখের দিকে চাইছে, আর মাঝে-মাঝে ঠাকুরমাকে মণিসম্বন্ধে দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করছে। ঠাকুরমা শুয়ে-শুয়ে দেখ্‌লেন, বুড়ীর চোখে ফোঁটা-ফোঁটা জল; ভাব্‌লেন, বুঝি বা গরমে হবে। বুড়ী যেন কতই অন্যায় ক'রেছে,—কেউ পাছে দেখ্‌তে পায়, তাই তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে দিল।

একটু পরেই মণির মা পয়সা দিতে এলেন। মণিকে বুড়ীর কোলে দেখে, তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌ল। "ওমা, বলা নেই, ক'হা নেই, ছেলেটাকে একেবারে কোলে টেনে তুলেছে। কে জানে কার চোখে কি আছে? এই সে দিন বাছা আমার রোগ থেকে উঠ্‌ল; আবার কোথা থেকে হতচ্ছাড়া মাগি এসে ওকে খেতে ব'সেছে।" নানা রকম ভাষায় বুড়ীর চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ শেষ ক'রলেন। বুড়ী ত একেবারে মরার মত হ'য়ে গিয়েছে। মুখে কথা নেই। প্রাণে ভয়, লজ্জা যতদূর হোতে পারে। চোখ দিয়ে তার আরও দু' ফোঁটা জল পড়ল। দেখে শুনে, ঠাকুরমা উঠে ব'স্‌লেন। মণিকে ডেকে তাঁর কাছে যেতে ব'ল্লেন। অমনি কর্কশস্বরে তার মা বলে উঠ্‌ল "সে কি মা? তুমিও কি পাগল হোলে? কি-না-কি জাত তার নেই ঠিক—মুচী হোতে পারে, মুদ্দফরাস হোতে পারে; ছেলেটাকে একেবারে কোলে নেওয়া! যাই, আমি ওকে চান্‌ করিয়ে দিই গে; তবে ত ও তোমায় ছোঁবে—হতভাগা ছেলে।" মায়ের ভয়ে মণির হাতের পয়সাটী পর্য্যন্ত প'ড়ে গেল। বিপদ যেন মিলে-মিশেই আসে। মণির মা তার মুখে একটী চড় মেরে, তখনই সে পয়সা মাটীউলিকে ফিরিয়ে দিয়ে, ছেলেটাকে নিয়ে কলতলায় গেলেন। মাটীউলি কাঁদতে-কাঁদতে সে দিন বিদায় নিল। ঠাকুরমা নিঃশব্দে তাকে বিদায় দিলেন। তাঁর যেন কেমন হ'য়েছিল; কেন যেন সেই বুড়ীকে দুটা মিষ্ট কথা ব'ল্‌লেন না; তাঁর যেন বেধে গেল—বৌমা ভাব্‌বে অনাচার।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। সে গলিতে আর কেউ সে মাটীউলিকে "মাটী নেবে গো" ব'লে হাঁক্‌তে দেখ্‌তে পেত না। আগে, যাদের মাটীর দরকার না থাকৃত, তারা দুপুরবেলায় কর্কশ "মাটী নেবে গো" শুনে বড়ই বিরক্ত হোত; এখন আর তাদের কেউ বিরক্ত করে না। বুড়ী আর এখন "মাটী নেবে গো" ব'লে হাঁকে না; "মা—টী—নেবে গো" ব'লে চুপে-চুপে ঘুরে বেড়ায়। যারা তাকে চিন্‌ত, তারা দেখ্‌তে পেত,—বুড়ী চুপে-চুপে এসে সেই গলির মধ্যের বাড়ীটার দরজা-জানালার দিকে চেয়ে আবার চুপে-চুপে ফিরে যেত,—যেন কত অপরাধ ক'রেছে। বেশী বয়স না হোলে, হয় ত পুলিশে চোর ব'লেও ধরত। কিন্তু সে কিছু চুরি করত না, বা হয় ত করার মতলবও ছিল না। শুধু নিজের মনে নিজে এসে, দু'-ফোঁটা চোখের জল ফেলে, আবার চ'লে যেত। এইভাবে একদিন তার বড় বেশী কষ্ট হওয়ায়, আর রোদটাও খুব বেশী থাকায়, সে সেই বাড়ীর দরজার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। কেউ জানে না, বাড়ীর বাবুরা আপিসে গেছে—বাকী অনেকে ঘুমিয়েছে না অগত্যা একটু শুয়েছে। ঘুমপাড়ান মাসীপিসিরা বুঝি দিনের বেলায় ছোট ছেলেমেয়েদের

কাছে আসে না। মণি পাশের বাড়ীর লিলির সঙ্গে জানালায় বসে গল্প করছে। মণি-লিলির কথা শুনে আর কারও ঘুমও ভাঙ্গল না—বা কিছু এসে গেল না—শুধু আমাদের মাটীউলির আনন্দ-নিরানন্দ দুইই হোল। কতবার তার মনে হোল, "আর একবার যদি মণিকে কোলে পেতাম!" কিন্তু হায়, মণির মা যে উগ্রচণ্ডী—তার যে' হিন্দুয়ানী যাবে! তার যে ছেলের জাত যাবে! মাটী-উলি যে ছোটলোক! অস্পৃশ্য!!!

তিনটা না বাজ্‌তেই মাটীউলি চোখ মুছে, গলি ছেড়ে চলে যায়—এ যেন তার দৈনিক কাজের মধ্যে একটী; মাটী বিক্রী করা আর যেন তার কাজ নয়। যে টাকা সে জমিয়েছে, তা থেকে তার দুটো খাওয়া কোনও রকমে চ'লে যায়। কিই বা সে খায়! দিনের শেষে যদি সে একবার মণির মুখখানা দেখতে পায়, তার আর কিছু দরকার হয় না।

এক দিন দুপুরে মাটীউলি দেখে—নীচের ঘরে তার নয়নমণি মণি ও লিলি খেলছে—সেখানে আর কেউ নেই। দৌড়ে যদি একটী রসগোল্লা এনে মণির হাতে দিতে পার্‌ত। এই তার বড় ইচ্ছা; কিন্তু পয়সা যে সঙ্গে নাই। বাড়ী থেকে নিয়ে আস্‌তে আস্‌তে যদি মণিকে তার মা উপরে নিয়ে যায়! এই সব ভেবে সে অগত্যা তার কাণের সোণার ফুল ময়রার দোকানে বাঁধা রেখে রসগোল্লা আন্‌তে গেল। ময়রা সোণা দেখে রাজি হোল; কয়টী নেবে জিজ্ঞাসা করলে। একটি? না। দু'টি? না,—তাই বা কেন? যখন সোণাই দিলুম, তবে মণিকে বেশী রসগোল্লা দেব না কেন? আর কে আমার খাবে? এই ভেবে সে একসের চায়। ভাব দেখে ময়রাও ফাঁকি দিতে গেল; ব'ল্‌লে, "না এ সোণা ত সোণাই না; এর আবার দাম কি? ইচ্ছা হয় আধ সের নিয়ে যা, নইলে নিয়ে যা তোর সোণা।" মাটীউলী মণিকে দেবে বলে অগত্যা তাতেই রাজি হোল। দেরী হলে পাছে মণির সর্ব্বনাশী মা তাকে উপরে নিয়ে যায়, এই ভয়ে সে রসগোল্লা নিয়ে দৌড়ে এল।

কে বেশী লম্বা দেখার জন্য তক্তপোশের উপর উঠে, মণি ও লিলি এর মধ্যে একখানা ছবি ভেঙ্গেছে। উপর থেকে মণির মা রুক্ষ স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন "মণে, আমি যাচ্ছি"। কথাটী না ব'লে চোর দুটী একেবারে খাটের নীচে। এমন সময় হতভাগিনী মাটীউলিও দৌড়ে এসে জানালায় উপস্থিত। সে জানে না যে মণির মা নীচে আস্‌ছে। "মণি, চাঁদ আমার, রসগোল্লা খাবে" ব'লে জানালায় দিতেই মণি মায়ের ভয় ভুলে গেছে; না হয় দু'টো চড় খাবে,—কিন্তু মা ত আর রসগোল্লা দেবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রসগোল্লা হাতে নিয়েছে। লিলিও সঙ্গে। এমন সময় মণির মা এসে উপস্থিত।

"কিরে মণে, তোর হাতে কি?" মণি অবশ। লিলি বল্লে, "কাকী মা, ঐ বুড়ী ওকে রসগোল্লা দিয়েছে; আমায় একটী দিতে বল না।" মায়ের প্রবেশে—ভিতরে মণি, বাইরে বুড়ী—দু'জনেই নিশ্চল। বুড়ী দেখ্‌লে—তার সম্মুখে যেন জ্বলন্ত আগুন—মণি দেখ্‌লে যেন দুস্তর সমুদ্র। বুড়ী দেখ্‌লে, এ আগুনে তার সব আশা ভস্ম হয়ে যাবে; মণি দেখ্‌লে, এ সমুদ্রে তার সব রসগোল্লা তলিয়ে যাবে, খাওয়া আর হবে না। মণির মা যতদূর সম্ভব, বা তার চেয়েও একটু বেশী গালাগালি দিয়ে, বুড়ীর চৌদ্দপুরুষ নরকে পাঠালেন। এই সব গোলমাল শুনে ঠাকুরমা নীচে এলেন। মণি পাছে বুড়ীর হাতের ছোঁয়া খায়, এই ভয়ে রসগোল্লা-গুলো কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। চোখের সাম্‌নে তার এত সাধের রসগোল্লার এই পরিণাম মাটীউলি নীরবে দেখ্‌তে পার্‌লে না, হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গলি ছেড়ে চ'লে গেল।

মণির শরীর অসুস্থ। সে ঠাকুরমার কাছেই থাকে। তার বাবা, মা কত যত্ন করেন। ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেছে। অনেকে দেখ্‌তে আসে, লিলি আসে, তার মা আসে, আরও পাড়ার কত লোক আসে। মণির অসুখ কমে না, বরং বাড়ছে। তার মার ধারণা, সেই বুড়ীই তাকে কি করেছে। তার বাবা এ সব কিছু বড় বিশ্বাস করেন না। ঠাকুরমাও প্রায় করেন না—কিন্তু আবার না কোরেই বা যান কোথায়। তাঁর বৌমা ত বড় সহজ পাত্র ন'ন। লিলি মণির পাশে আসে। মণি তাকে বলে, "ভাই, তুমি মাটীউলিকে ডেকে নিয়ে এসো; মা যখন রাঁধ্‌তে যাবেন, তখন এনো; সে যেন দু'টী রসগোল্লা আনে—একটী তোমার, একটী আমার।" লিলি কিন্তু অত সাহস করে না।

বুড়ী শুনেছে মণির অসুখ। বাড়ীর কারও কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস করে না। পাড়ার একটী ছেলের

কাছে জিজ্ঞাসা করায়, সে তাকে ধম্‌কিয়ে দিলে। একটী মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে অসুখ খুব বেড়েছে। বুড়ীর চোখে দর্‌দর্‌ ধারে জল গড়াল। দরজার কাছে যেতে সাহস হয় না, তাই জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা প্রায় তিনটা বাজে। তার যাওয়ার সময় হয়েছে, পাছে বাড়ীর বাবুরা কেউ তাকে দেখ্‌তে পায়। সে চ'লে যাবে। চোখ মুছেই হন্‌ হন্‌ ক'রে চলে যাবার ইচ্ছা ক'র্‌ছে, এমন সময় দেখে,—লিলি দরজা দিয়ে তার মার সঙ্গে বেরুচ্ছে। লিলি ব'ল্লে "মাটীউলী, মণি তোমাকে কত ডেকেছে। তাকে একটা, আর আমাকে একটা রসগোল্লা দেবে ত?" মাটীউলি ভয়ে-ভয়ে "হ্যাঁ দেব" ব'লে তার মায়ের কাছে সরুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটী আজ কেমন?" "একই ভাব" ব'লে তিনি ঘোমটা টেনে পাশের বাড়ীতে ঢুকে প'ড়্‌লেন। বুড়ী তখন কি করবে ঠিক করতে না পেরে, গলি ছেড়ে চ'লে গেল। বাড়ী যেয়ে বিছানায় শুয়ে নানা রকম ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার ধারণা, মণি তাকে দেখ্‌লেই সেরে যাবে। আর তার নিজেরও যে মণিকে না দেখে বড় কষ্ট হ'চ্ছে, আর যে সে পারে না। সে ঠিক ক'রলে, আগামী কাল দুপুর-বেলায় যাবে—কিন্তু সে যে অনেক দেরী! যদি মণির অসুখ আরও বাড়ে? যদি মণির কোনও অমঙ্গল হয়?

রাত্রি তখন ১২টা বাজে। বুড়ী বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। বিছানা তুলে, তার নীচে একখানা তক্তা ছিল, তা তুল্‌লে। তার নীচে গর্ত্তের মধ্যে একটী ঘড়া ছিল, তার মধ্যে একটী ছোট পুঁটুলীতে চারগাছা রূপার মল ও একখানা সোণার পদক ছিল। বুড়ী সযত্নে সেই পুঁটুলীটী কোমরে বেঁধে, কাপড় গায়ে দিলে। দরজাটী বাইরে থেকে বন্ধ করে' চাবীটি নিয়ে রাস্তায় বেরুল। তাড়াতাড়ি বুড়ী পূর্ব্বেকার সেই গলিতে উপস্থিত। চারি দিকে গ্যাস্‌ জ্ব'ল্‌ছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম, মাঝে-মাঝে গরম ব'লে দু'একজন হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে। আর সব নিস্তব্ধ। বুড়ী সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত। দরজায় শব্দ ক'র্‌তে সাহস করলে না, পাছে মণির মা জান্‌তে পারে! ডাক্‌তে সাহস পেলে না, পাছে বাবুরা তাকে তাড়িয়ে দেয়! ফিরে যেতেও ইচ্ছা করল না—পাছে মণির অসুখ বাড়ে! আর গিয়েই বা কি ক'রবে? শান্তি ত পাবে না! তার এ সব অশান্তির কারণ আর কিছুই নয়—'সে যে ছোট জাত—ছোট লোক।'

বড় অশান্তিতে বুড়ী সময় কাটাতে লাগ্‌ল। রাস্তায় কাউকে দেখ্‌লে তার ভয় হয়, পাছে তারা মণির মা-বাবাকে ডেকে দেয়। কি করবে, বা করা উচিত—ভাব্‌তে-ভাব্‌তে প্রায় ১০।১৫ মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ গলির মোড়ে একটী পাহারাওয়ালা দেখা দিল। বুড়ীর প্রাণ অস্থির হোয়ে উঠ্‌ল। যে বিপদের আশঙ্কা করেছিল, তাই এসে উপস্থিত। তবে বুঝি আর তার মণিকে দেখা হোল না। ভয়ে-ভয়ে পালাতে চেষ্টা ক'রতেই, পাহারাওয়ালার সন্দেহ হোল; সে এসে বুড়ীর হাত ধর্‌লে। "কোথা যাবে শালী, তোম্‌কো হামি ধরিয়ে লে যাবে।" বুড়ী কোন কথা বল্‌তে সাহস করতে পারল না—পাছে মণির মা শোনে! তাই সে নিঃশব্দে রাস্তায় এলো। পাহারাওয়ালার আরও সন্দেহ বাড়্‌ল। মোড়ে এসে সে অপর একজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে দু'জনে বুড়ীকে কর্কশভাবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলে—মারের ভয় পর্য্যন্ত দেখালে। শেষে সোণা-রূপার জিনিষ দেখে তারা বুড়ীকে চোর ব'লেই সাব্যস্ত কর্‌লে। "কার জিনিষ" "কোথা থেকে চুরি কর্‌লি" এ সব কথার উত্তরে বুড়ী কিছুই বলে না,—শুধু কাঁদে, শুধু চোখের জল মোছে। পুলিশের প্রহার বরং ভাল, তবু মণির মা ত জান্‌তে পারবে না যে, তার ছেলেকে ছোটলোক গহনা দিতে চায়! মণির মা এবার জান্‌লে যে সে আর কখনও মণির দেখা পাবে না, তাও সে জানে। জেনে-শুনেই বুড়ী কোনও কথা বলে না। অগত্যা পাহারাওয়ালারা ধাক্কা দিতে দিতে বুড়ীকে থানায় নিয়ে গেল। বুড়ী ব'লে বেশী ধাক্কা দেয়নি; তবু যা দিয়েছিল, সেও তার পক্ষে কম নয়। বুড়ীর কেমন হিষ্টিরিয়া রোগের মত অজ্ঞান ভাব দেখা দিল। দারোগা রাত্রে চোরকে ছাড়া কোনও মতেই ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত মনে ক'রলেন না। ছোটজাত ব'লে মাটীই তার বিছানা হোল—দুর্গন্ধপূর্ণ কোণই তার ঘর হোল। কিন্তু রোগের লক্ষণ দেখে একজন পাহারাওয়ালাকে তার কাছে রাখা হোল।

মণির অসুখ খুব বেড়েছে। এখন আর শুধু লম্বা টাইটেলওয়ালা হোমিওপ্যাথের হাতে রাখ্‌তে সাহস হচ্ছে না, তার বাবা বীরেন্দ্রবাবু কবিরাজ ও ভাল ডাক্তার

ডাক্‌লেন। মণি শুধু রসগোল্লা খেতে চায়। শুধু মাটীউলিকে দেখ্‌তে চায়। সকলেই এগুলি প্রলাপ' মনে করেছেন, শুধু তার ঠাকুরমা কবিরাজকে মাটীউলির ঘটনা খুলে বল্‌লেন। কবিরাজ সমস্ত ঘটনা বুঝ্‌তে পেরে, বীরেন-বাবুকে তখনই মাটীউলির খোঁজ নিতে ব'লে, চ'লে গেলেন।

রাত্রি শেষ হোল। মণির অবস্থা আরও খারাপ। সমস্ত বাড়ীটা যেন কেমন একটা গভীর আঁধারে ঢাকা র'য়েছে। সকলেই ভেবেছিল মাটীউলি দুপুরবেলায় আবার আস্‌বে। বীরেনবাবু ছেলের অসুখের জন্য আপিসে যাবেন না, ঠিক করেছিলেন; কিন্তু না গেলে হয় ত চাকুরিটী যাবে, ভয়ে অগত্যা গেলেন। ডাক্তার একজন অনবরত আছেন। কবিরাজের উপদেশ মতই চিকিৎসা হ'চ্ছে। মাটীউলি না এলে রোগ সার্‌বে না, এই তাঁর মত। রোগের কিছুই কম নাই। ১২টা, ১টা, ২টা, ৩টাও বেজে গেল, মাটীউলি আর আসে না। ঠাকুরমা একবার বাহিরে আস্‌ছেন, আবার উপরে যাচ্ছেন। আবার ভাব্‌ছেন, এই বুঝি মাটীউলি এসেছে—তাই আবার নীচে আস্‌ছেন। পাড়ার অনেকে এসেছে। এ বাড়ীতে আজ রান্না হয়নি। মণি ক্রমেই বড় অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছে। তার মায়ের প্রাণও বড় অস্থির। মনে-মনে মাটীউলির উপর তাঁর বড় রাগ হচ্ছে। তাঁর ধারণা, মণির এ রোগ শুধু মাটীউলীর বিষ মুখের জন্যই।

৩টা বাজে, এমন সময় হঠাৎ দরজার কড়া নড়্‌ল। মাটীউলি এসেছে ভেবে মণির মা দৌড়ে দরজা খুল্‌তে যেয়ে দেখেন, এ মাটীউলি নয়—এ যে তার চেয়ে বেশী বিপদজনক, আরও বেশী অশান্তিজনক "পাহারাওয়ালা।" মাটীউলি জ্ঞান হোলে ব'লেছে যে, যে বাড়ীর দরজায় সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বাড়ীর ছেলেটির ঐ গহনা, তার কাছে ছিল। বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে হবে ব'লে যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাত্রি বেশী হওয়ায়, ডাক্‌তে সাহস করেনি। পাহারাওয়ালা তাই অনুসন্ধান করতে এসেছিল। গহনার কথা সকলে অস্বীকার করলেন। তবে ছেলেটীর খুব বলবৎ অসুখ ও মাটীউলিকে একবার আনা দরকার, এ কথা পাহারাওয়ালাকে জানান হোল। জামিন ব্যতীত চোর ছাড়া অসম্ভব; সুতরাং বীরেনবাবুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত দেরী করা দরকার। পাহারাওয়ালা ফিরে গেল।

মণির অসুখ খুব বেশী শুনে, বুড়ী থানার ইনস্পেক্টরকে তার জীবনের দু'একটী কথা বল্‌তে আরম্ভ করলে। তার একটীমাত্র পুত্রসন্তান হওয়ার পর, তার স্বামীর মৃত্যু হয়। ছেলেটি চার বছরের হোলে, হঠাৎ হামজ্বরে মারা যায়। 'তার মুখখানা ঠিক মণির মুখের মত ছিল। সংসারে তার আর কেউ ছিল না। সে কোনও রকমে দিন কাটিয়ে দিত। জাতিতে সে ডোম। বাড়ী বীরভূম জেলায়। ঝিয়ের কাজ ক'রে তার কিছু পয়সা জমা হ'য়েছিল। তবু শেষ বয়সে মাটী বিক্রী করত, পয়সার জন্য নয়—সময় কাটাতে; আর পরের ছেলে দেখে একটু শান্তি পেতে। সে দিন মাটী বিক্রী ক'রতে যেয়ে মণিকে দেখে, শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সে তার যথাসর্ব্বস্ব সেই মণিকে দিয়েছে। আজ তার ধারণা যে, হতভাগিনীর কপালে বুঝি এ মণিও থাকে না। তার আরও বেশী দুঃখের বিষয় যে, ছোট লোক ব'লে, মণিকে সে জীবনে দু'দিন বা দুটী বারও কোলে নিতে পেলে না। তবু সে তাকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসে। তার যা' কিছু আছে, সবই মণির। পাছে আবার তার হতভাগ্য কপালে কোনও অশুভ ঘটনা ঘটে, তাই সে মরবে। ভগবানও যেন তাকে ডাক্‌ছেন, সে যাবে, যাবে। এ মরণে তার আনন্দ। থানার সকলে স্তম্ভিত; তখনই ডাক্তার ডাক্‌তে লোক গেল।

"আমার যা কিছু আছে, সব মণিকে তোমরা দিও" ব'লে, বুড়ীর ক্ষীণ শরীরে শেষবার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। আর কারও ঝগড়া, গালাগালি, গঞ্জনা বা মণির মায়ের তীব্র উক্তি তাকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না।

চারিটা বাজে। বীরেনবাবু থানায় উপস্থিত। মাটী-উলিকে তখনই নেওয়া দরকার—নইলে ছেলে বাঁচান দায়। বীরেন-বাবুর সঙ্গে মাটীউলির কথা হোল না—আর হবেও না। ছোট লোক, বড় অভিমান ক'রে চলে গেছে। তিনি সেই হতভাগিনীর শোকজীর্ণ, শীর্ণ, মৃতদেহ দেখে, নিরাশ মনে থানা ছেড়ে, বাড়ী ফিরে গেলেন।

গলির মোড়ে এসে যে শব্দ শুন্‌লেন, তাতে তিনি আর এগোতে পারলেন না। পাড়ার লোকে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল।

এর পর সে পাড়ার আর কেউ "মাটী নেবে গো" হাঁক শুন্‌তে পেত না। মা-টির আদর ক'জনে বোঝে!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ-ফেলের সংখ্যা

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, এফ-সি-এস, পি-আর্-এস্]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলীর (Regulations) প্রবর্ত্তনের পর হইতে, পরীক্ষার্থীদের পাশের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া জনসাধারণের মনে এই একটা ধারণা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, বোধ হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তি আজকাল অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা শিক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কাহারও-কাহারও মনে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ঢাকা-কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াটসন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে, এই পাশের সংখ্যাধিক্য শুভসূচক নহে ; পরন্তু, উহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শঙ্কিতই হওয়া উচিত (the Senate views with alarm)। অনেকে ওয়াট্‌সন সাহেবকে ভারতবিদ্বেষী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাঁহারা কেহই এ মতের পোষকতা করিবেন না।

বস্তুতঃ—স্বদেশীয় অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যেও ডাক্তার ওয়াট্‌সনের মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমার মনে হয় যে, পরীক্ষার্থীদের পাশের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইবার কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলীর প্রণয়নের পর হইতে কলেজের পঠনপাঠন-পদ্ধতি এত উন্নত হইয়াছে যে, পাশের সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে, সেইটাই শঙ্কার কারণ হইত। তবে গলদ যে না আছে, তাহা নহে। বস্তুতঃ, নানা বিষয়ে উন্নতি সম্ভবপর ; বিশেষতঃ, ম্যাট্রিকুলেশন ও এম এ, পরীক্ষা যেরূপভাবে গৃহীত হয়, তাহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। তাহা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলীর প্রণয়নের পর হইতে শিক্ষাপ্রণালীর নানা বিভাগের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। একে-একে সেগুলি বিবৃত করিতেছি।

বিজ্ঞান-শিক্ষা

দশবৎসর পূর্ব্বেকার বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রণালীর সহিত এখনকার বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রণালীর তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুই পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন বিজ্ঞানশিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যা ছিল। যন্ত্রের মধ্যে, একখানা করিয়া ব্লাকবোর্ড ও একখণ্ড খড়ি। অধ্যাপক মহাশয় আসল যন্ত্রাবলীর অভাবে খড়ির সাহায্যে ব্লাক-বোর্ডে হিজিবিজি ছবি আঁকিয়া ছেলেদের যন্ত্রের সাধ ছবিতে মিটাইতেন। থার্ম্মিটার দেখাইতে হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া (যেমন দুষ্ট বালকেরা কদলী প্রদর্শন করে) বলিতেন "suppose this is a thermometer"। ছেলেরা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বি-এ পাশ করিয়া গ্রাজুয়েট হইত ; কিন্তু এই সকল গ্র্যাজুয়েটেরা কখনও টেষ্ট টিউব বা থার্ম্মিটার চক্ষে দেখে নাই। এক প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া কোনও কলেজে লেবরেটারী একরকম ছিল না বলিলেই হয়। বস্তুতঃ, এই নিতান্ত অসঙ্গত উপায়ে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া—বাঙ্গালাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে,—বিজ্ঞান শিক্ষা নামে একটা পুঁথিগতবিদ্যা ছাত্রদিগকে মুখস্থ করান হইত। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক শাস্ত্র। বিজ্ঞানশালার পরীক্ষার মধ্য দিয়া হাতে-কলমে উহার শিক্ষা প্রয়োজন। সেইজন্য এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দুই-একজন ভিন্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই।

আর এখন? এখন সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক কলেজে-লেবরেটারী হইয়াছে। এখন প্রত্যেক বিজ্ঞানশিক্ষার্থীকে, ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত, হাতে-কলমে বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে হয়। এই রাজসাহী কলেজে প্রায় পঞ্চাশহাজার

টাকা ব্যয় করিয়া পুরাতন কেমিকেল লেবরেটারী বদ্‌লাইয়া নূতন করা হইয়াছে; প্রায় সত্তরহাজার টাকা ব্যয় করিয়া নূতন ফিজিক্যাল লেবরেটারী নির্ম্মিত হইয়াছে। সব কলেজেই এইরূপ। এখন বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতেছে। তজ্জন্য বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা অনেকেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে। পূর্ব্বে বি, কোর্সের বি-এ পরীক্ষায় শতকরা বিশ বা পঁচিশজন পাশ হইত; এখন বিজ্ঞানশিক্ষা প্রকৃত প্রণালীতে পরিচালিত হয় বলিয়া, আই-এস্‌সি পরীক্ষায় শতকরা ষাট-সত্তরজন পাশ হইয়া থাকে। যদি এইরূপ পাশই না হইত, তাহা হইলে এত অর্থব্যয়ই যে বৃথা হইত।

একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষাসম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এখনও উদাসীন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি তাবৎ বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র (astronomy) এখনও বঙ্গের প্রত্যেক কলেজে সেই মামুলি ধরণেই পঠিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য, এক প্রেসিডেন্সী কলেজ ভিন্ন অন্য কোনও কলেজে মানমন্দির নাই। শিক্ষার্থীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নভোমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্ররাজির বিচিত্র আকৃতি ও গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা না পাইয়া, ব্ল্যাকবোর্ডে অধ্যাপক-অঙ্কিত রেখাচিত্রের মধ্যে তারকামণ্ডলীর আকৃতি ও গতি নিরীক্ষণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতই পরীক্ষামূলক। তবে কোন্‌ যুক্তিবলে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উহার পঠন-পাঠন পরীক্ষামূলক করিতেছেন না, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কুলায় না। কাশী, উজ্জয়িনী, জয়পুরের মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় যে, ভারত এককালে পরীক্ষামূলক জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দেশেই আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষিকগণ এককালে তাঁহাদের আবিষ্কারের দ্বারা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পুনরাবির্ভাব ভারতে এখন আর সম্ভবপর নহে। যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মানমন্দিরের সাহায্যে হাতে-কলমে আধুনিক জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা না করিবেন, ততদিন ভারতে জ্যোতিষিকের আবির্ভাব অসম্ভব। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য সত্বর স্থির করিবেন।

পাঠ্য-বিষয় নির্ব্বাচন (Selection of Subjects)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী অনুসারে ছাত্রেরা এখন তাহাদের মনোমত পাঠ্য বিষয় (subjects) নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। পূর্ব্বে এ সুবিধা ছিল না। পূর্ব্বে যে ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে তিনবার ফেল হইয়াছে, তাহাকে সেই শাস্ত্রে পাশ করিতেই হইবে, নহিলে তাহার নিস্তার নাই। যাহার সংস্কৃত পড়িবার আগ্রহ নাই, যে ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন নহে, বা যে লজিক বুঝে না—সকলকেই তত্তৎ বিষয়ে পাশ করিতে হইত; নহিলে আদৎ পরীক্ষায় ফেল। এফ-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত, বিষয়-নির্ব্বাচন করিবার অধিকার ছাত্রদের পূর্ব্বে ছিল না; বি-এ পরীক্ষায় এ কোর্স ও বি কোর্স বলিয়া দুইটি ভাগ ছিল। কিন্তু এখন তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকলকেই পড়িতে হয়। তাহার উপর দুইটি কি তিনটি বিষয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাহারা বাছিয়া লয়। এ সুবিধা বড় কম নয়। অপ্রীতিকর বিষয় জোর করিয়া পড়ানর দরুণ, পূর্ব্বে অনেক ছাত্র ফেল হইত। এখন সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, অনেক ছাত্র পাশ হইতেছে। অধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাশ হওয়ার এইটি একটা প্রধান কারণ।

এই বিষয়-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে। তাহাতে বহু অপকার হইতেছে বলিয়া আমার ধারণা। এ বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করিব।

কলেজ-পরিদর্শন

পূর্ব্বে কলেজসমূহের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কটা ছিল, অনেকটা অন্তঃসলিলা নদীরই মত। সেটা অনুভব করা যাইত—কেবল পরীক্ষার সময়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রগুলিকে কয়েকখানি প্রশ্নের কাগজ বণ্টন করিয়া দিত এবং বিনিময়ে কতকগুলি উত্তরের খাতা ফিরিয়া পাইত। আবার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে তাহাদিগকে ছাপমারা কয়েকখানি সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দান করিত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মাত্র কতকগুলি কাগজের টুক্‌রার (scraps of paper) আদান-প্রদান

লইয়া কলেজের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিল। কলেজসমূহের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত তাহার সম্পর্ক এক-প্রকার ছিলই না। কলেজে কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা আছে কি না, উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক আছে কি না, উপযুক্ত পুস্তকাগার আছে কি না, উপযুক্ত যন্ত্রাগার আছে কি না, ব্যায়াম অনুশীলনের বন্দোবস্ত কলেজ করিতেছে কি না, মফস্বল হইতে আগত ছাত্রদের বাসের কোনও সুব্যবস্থা আছে কি না—এইরূপ প্রত্যেক অত্যাবশ্যক বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রত্যেক কলেজ করিতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধান বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বে আদৌ করিত না। ফলে, যে কলেজ যেমন-ইচ্ছা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিত। এই শৈথিল্যের ফলে অধিকাংশ কলেজেই উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক, বসিবার স্থান, উপযুক্ত পুস্তকাগার, যন্ত্রালয়, ব্যায়ামশালা, হোষ্টেল প্রভৃতি ছিল না। অনেক বেসরকারী কলেজের আয় হইতে প্রতিষ্ঠাতা-দের সংসার-খরচ দিব্য চলিত। যেখানে তিন জন অধ্যাপকের প্রয়োজন, সেখানে একজনকে সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা বক্তৃতা করিতে হইত। কেমিষ্ট্রির এম্‌ এ'কে অনেকস্থলে ইংরাজী বা লজিক পড়াইতে দেখিয়াছি। ইতিহাসশাস্ত্রে এম, -এ'কে পদার্থবিদ্যা ও সংস্কৃতও পড়াইতে হইয়াছে। পুস্তকাগার অনেক কলেজেই ছিল না। ছেলেরা যে ফেল হইত, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু এখন সব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন অধীন কলেজসমূহের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক কতকগুলি scraps of paper লইয়া নহে। এখন কলেজের শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ বেতন দিয়া একজন উপযুক্ত কলেজ-পরিদর্শক (Inspector of Colleges) নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর অপর দুইজন অবৈতনিক বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে লইয়া প্রত্যেক কলেজ পরিদর্শন করিয়া তত্তৎ কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির তাবৎ বিভাগ তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অধীন কলেজসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সম্পূর্ণ পালন করিতেছে কি না, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান এই পরিদর্শকগণের কার্য্য। তাঁহাদের সন্তোষজনক রিপোর্টের উপর কলেজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। তাঁহারা যদি পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পান যে, কোন পাঠ্য বিষয় পড়াইবার সুবন্দোবস্ত কোন একটি কলেজে নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্ব-বিদ্যালয় সেই কলেজকে সেই বিষয় পড়াইবার সুবন্দোবস্ত করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন; এবং সেই কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আদেশ প্রতিপালন না করিলে, সেই বিষয় পাঠ্যতালিকা হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়। এই পরি-দর্শনের ফলে, এখন কলেজগুলির ভোল সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন কলেজ হইতে প্রতিষ্ঠাতার আর সংসার-খরচ উঠে না, কলেজগুলি এখন আর লাভের জিনিষ নহে। এখন আর কেমিষ্ট্রির এম-এ'কে লজিক বা সংস্কৃত পড়াইতে হয় না—যিনি যে বিষয়ে নিয়োজিত তাঁহাকে সেই বিষয়ই কেবল পড়াইতে দেওয়া হয়। অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আমি যখন ১৯০৭ সালে রাজসাহী কলেজে আসি, তখন মাত্র ৯।১০ জন প্রফেসার দেখিয়া-ছিলাম। এখন এই কলেজে ২৬ জন প্রফেসার নিযুক্ত হইয়াছেন। আগে ক্লাসে জায়গা না থাকাতে, ছেলেরা বাহির হইতে present sir বলিয়া পলায়ন করিত। এখন পরিদর্শকেরা প্রত্যেক ক্লাস মাপিয়া স্থান সংকুলান হইবে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। কোন ক্লাসে দেড়শতের বেশী ছাত্র লইবার পদ্ধতি নাই। ছাত্রেরা যেখানে-সেখানে থাকিতে পায় না—হয় তাহারা অভিভাবক-দিগের সঙ্গে, না হয় উপযুক্ত সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের পর্য্যবেক্ষণে ছাত্রাবাসে, বাস করে। এখন কলেজে-কলেজে পুস্তকাগার, কমন রুম, যন্ত্রাগার, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। এই বাৎসরিক পরিদর্শনের ফলে কলেজে আর ভেজাল চলিবার বড়-একটা উপায় নাই। শিক্ষাপদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে—তাহার ফলও ছাত্রদের পাশের সংখ্যাধিক্যে প্রতিফলিত।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনায় কলেজের অনেক অধ্যাপক যোগদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কলেজ পরিদর্শনের ফলে এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তত্তৎ বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; এবং অধ্যাপকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায়, অধ্যাপকেরা গবেষণা ও আলো-

চনার জন্য অনেক অবসর লাভ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, কেবল অধ্যাপনাই অধ্যাপকের একমাত্র কার্য্য নহে। মৌলিক গবেষণা ও আলোচনাও তাঁহার কর্ত্তব্যর মধ্যে। এত দিবস দৈনিক কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারিতেন না; এখন তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অবসর থাকাতে মৌলিক গবেষণায় অনেকে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছেন।

বাস্তবিক, বিশ্ববিত্থালয় কলেজের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার লওয়াতে, এখন উহা পূর্ব্বের ন্যায় কেবল পরীক্ষাকেন্দ্র নহে, এক্ষণে উহা শিক্ষা-কেন্দ্রও হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিত্থালয় মুখ্যতঃ শিক্ষা না দিলেও, শিক্ষার নিয়ামক বলিয়া এক্ষণে Teaching University নামের দাবি করিতে পারে। উহা অধীন কলেজের মারফৎ শিক্ষা দিয়া থাকে (It teaches through its colleges)। বাস্তবিক, আমাদের দেশ এত সুবিস্তৃত, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা এত অসচ্ছল, যে, কলিকাতার মত একটিমাত্র বড় সহরে কতকগুলি কলেজ একত্র করিয়া বিলাতের অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের ন্যায় Teaching University স্থাপন করিলে দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার সম্যক সাধিত হইবে না। পরন্তু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একাধারে teaching এবং examining বিশ্ববিত্থালয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, দেশের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত, উপযুক্ত কলেজের দ্বারাই দেশের জনসাধারণের দ্বারে উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা পঁহুছাইয়া দেওয়াতে, স্বল্পব্যয়ে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতেছে।

পাঠ্য বিষয়ের কঠিনতা

তাহার পর জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বেকার অপেক্ষা এখন পাঠ্য বিষয়গুলি সহজ হইয়াছে কি না? কেহ-কেহ এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে,আজকাল পাঠ্য বিষয়ের আদর্শ বা মান (standard) ইচ্ছা করিয়া নীচু করিয়া দেওয়াতেই অনেক ছেলে পাশ হইতেছে। বাস্তবিক, এ বিষয়ে যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই জানেন যে, পাঠ্য বিষয় আজকাল সহজ না হইয়া বরং কঠিনতর হইয়াছে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের পাঠ্য বিষয় অনেক কঠিন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—রসায়ন-শাস্ত্র। 'পূর্ব্বে এফ-এ পরীক্ষায় কেবল পুঁথিগত বিত্থা অধীত হইত; এখন ছেলেরা তাহার উপর হাতে-কলমে রাসায়নিক পরীক্ষা (practical work) করিয়া থাকে। বি-এ পরীক্ষায় পূর্ব্বে ছেলেরা কেবল অজৈব-রসায়নের (Inorganic Chemistry) একখানি পুস্তক পাঠ করিত; এখন তাহার উপর তাহাদিগকে জৈব-রসায়ন ("Organic Chemistry) পড়িতে হয়, এবং পরীক্ষামূলক রসায়নে (Practical Chemistry) শতকরা চল্লিশ নম্বর রাখিয়া পাশ করিতে হয়। পূর্ব্বে এম-এ'তে যাহা পড়া হইত, এখন তাহার অধিকাংশই ছেলেরা বি-এ অনার্স কোর্সে পড়িয়া থাকে। পুনশ্চ এম-এ'তে পরীক্ষামূলক রসায়নের পরীক্ষা পূর্ব্বে মাত্র তিন দিবস হইত,—এখন বারো-তেরো দিনের কম হয় না। বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পাঠ্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কঠিন হইয়াছে।

অবৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে তত্তৎ বিষয়ের অধ্যাপকবৃন্দের সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছি যে, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, সংস্কৃত প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রেরই পাঠ্য বিষয় এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর এবং পূর্ণতর হইয়াছে। কেবল ইংরাজির অধ্যাপকেরা অনুযোগ করিয়া থাকেন যে, আজকাল ছেলেরা পূর্ব্বেকার অপেক্ষা ইংরাজি কম শিখিতেছে। তাহার কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ইংরাজির আদর্শ নিম্ন থাকার দরুণই এইরূপ ঘটিতেছে। বাস্তবিক, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আদর্শ আরও উচ্চ হইলে, আর অভিযোগের কারণ থাকে না।

পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে আর একটা কথার আলোচনা প্রয়োজন। এখন পূর্ব্বেকার অপেক্ষা পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা কমিয়াছে। পূর্ব্বে এফ-এ পরীক্ষায় সকল ছেলেই ইংরাজি, সংস্কৃত বা ফার্সি, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিত্থা ও রসায়ন-শাস্ত্র এই সাতটি বিষয় অধ্যয়ন করিত; কিন্তু এখন ছেলেরা ইংরাজি ও বাঙ্গালা ছাড়া আর তিনটি (সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচটি) বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। অবশ্য এখন প্রত্যেক পাঠ্য বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর ও পূর্ণতর হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রেরা অনেকগুলি বিষয় অল্প অল্প না শিখিয়া, কতকগুলি বিষয় ভাল করিয়া শিখুক। এ ক্ষেত্রে মতদ্বৈধ থাকাই সম্ভব এবং আছে। কেহ-কেহ মনে করেন যে, এফ-এ বা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে পূর্ব্বেকার ন্যায় অনেকগুলি বিষয় অল্প

"দূর হ' কালামুখো !"

কৃষ্ণকান্তের উইল ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

Emerald Ptg. Works.

করিয়া পড়াইয়া ছাত্রদিগকে অনেক বিষয়ের সহিত পরিচিত করান উচিত; অপর দিকে, অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, এইরূপে শক্তি ক্ষয় না করিয়া কতকগুলি বিষয় ভালো করিয়া শিখানো উচিত। দুই পক্ষের মতেরই মূল্য আছে। আমার নিজের মত এই যে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় এখন যেমন নিরূপিত আছে, সেইরূপই থাকা শ্রেয়; উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যই পঠিতব্য হওয়া উচিত। তবে তিনটি optional বিষয়ের পরিবর্ত্তে চারিটি বিষয় (সর্ব্বসমেত ছয়টি) পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাল হয় বলিয়া মনে করি।

প্রশ্ন-নির্ব্বাচন

পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার পর জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন পরীক্ষা কঠিন হইয়াছে, না, সহজ হইয়াছে? এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা কঠিন। প্রশ্নপত্রের কঠিনতা প্রশ্নকর্ত্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কোন-কোন বৎসর প্রশ্নপত্র কোন কোন বিষয়ে কঠিন হয়; আবার কোন-কোন বৎসর সহজ হইয়া থাকে। মোটের উপর প্রশ্নপত্র আজকাল খুব কঠিনও হয় না, সহজও হয় না—মাঝামাঝি রকমের হয়।

প্রশ্নপত্রসম্বন্ধে একটা বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। পূর্ব্বে কোনও প্রশ্নপত্রে যতগুলি প্রশ্ন থাকিত, পরীক্ষার্থীরা সকলগুলিরই উত্তর লিখিতে বাধ্য থাকিত—তাহাদিগকে প্রশ্ন-নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা দেওয়া হইত না। এই নিয়মের দরুণ পূর্ব্বে অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত। এখন এই নিয়ম বদলাইয়া গিয়াছে। এখন কোন প্রশ্নপত্রে যদি পরীক্ষার্থীদিগকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলা হয়, তা হইলে সেই প্রশ্নপত্রে দশটি কি বারটি প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার্থীরা সেই দশবারটি প্রশ্নের মধ্যে যে ছয়টির ভালরূপ উত্তর লিখিতে সমর্থ, তাহারা সেই ছয়টিই বাছিয়া লইয়া থাকে। পরীক্ষায় বেশী পাশ হইবার এই নূতন নিয়ম একটি প্রধান কারণ। বাস্তবিক, এই নিয়মটি খুব সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখে স্মরণশক্তির সাহায্যে; তাহাদের সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া রাখা হয় না। সেইজন্য তাহাদিগকে প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিবার সুবিধা না দিলে, যদি তাহারা বাঁধা প্রশ্নগুলির মধ্যে দুই বা ততোধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর স্মরণ করিতে না পারে, তাহা হইলেই তাহারা ফেল হয়। পরীক্ষার্থীদিগকে ঠকানো যখন পরীক্ষার উদ্দেশ্য নহে, তখন অনেকগুলি প্রশ্ন দিয়া—তাহার মধ্য হইতে যেগুলি তাহারা ভাল জানে, সেইগুলি বাছিয়া লইতে তাহাদিগকে সুবিধা প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বেকার নিয়মে পরীক্ষার্থীরা অন্যায়রূপে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত।

সাহেব ও বাঙ্গালী পরীক্ষক

কেহ-কেহ মনে করেন যে, এখন বাঙ্গালী পরীক্ষক অনেক হওয়াতে পাশ বেশী হইতেছে। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী পরীক্ষক বেশী পরিমাণে নিযুক্ত হইতেছেন সত্য (এবং তাহা হওয়াই উচিত); কিন্তু এ কথা সত্য নহে যে, বাঙ্গালী পরীক্ষকেরা স্বভাবতঃ সাহেব পরীক্ষক অপেক্ষা বেশী নম্বর দিয়া থাকেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফলে বলিতে পারি, এবং আমার বিশ্বাস অনেক পরীক্ষকই একথা স্বীকার করিবেন, এমন সাহেব পরীক্ষক অনেক আছেন—যাঁহারা খুবই "কোমল"; এবং এমন বাঙ্গালী পরীক্ষক অনেক আছেন,—যাঁহারা খুবই কঠিন। বাস্তবিক, পরীক্ষকের কাঠিন্য বা কোমলতা ব্যক্তিগত দোষ-গুণ, জাতিগত নহে। অতএব আশা করি, কেহই যেন এই অপ্রীতিকর জাতিগত কাল্পনিক বৈষম্যের কথা উঠাইয়া বৃথা মনোকষ্টের সৃজন না করেন।

তাহার উপর আর একটা কথা হইতেছে এই যে, প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পরীক্ষা-প্রণালী পরীক্ষকগণ সকলে মিলিয়া একটা সভা (Examiners' meeting) করিয়া ঠিক করেন। সেই নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে সকলকে পরীক্ষা করিতে হয়; এবং সেই জন্য এই দুইটি পরীক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথাই আইসে না। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় পরীক্ষকের সংখ্যা কম বলিয়া, এইরূপ পরীক্ষক-সংঘের ব্যবস্থা নাই। সেখানে অবশ্য ব্যক্তিগত বৈষম্যের অবসর আছে সত্য, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার পরিচালনে পরীক্ষকগণকে ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী নম্বর দিবার কতকটা ক্ষমতা দেওয়াই উচিত।

এতক্ষণ সাধারণ কলেজ-শিক্ষার কথাই আলোচনা করিতেছিলাম। সেই আলোচনান্তে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ন্যায্য এবং সঙ্গত কারণেই এই সকল পরীক্ষার

ফল সন্তোষজনক হইতেছে। এখন প্রবেশিকা ও এম-এ পরীক্ষার কথা পাড়িব।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ম্যাট্রিকুলেশন ও এম-এ পরীক্ষা যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ কলেজসমূহে পঠিতব্য আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা এবং এম-এ পরীক্ষায় যে এখন খুব বেশী পাশ হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। আমরা এই দুইটি পরীক্ষার বিষয় পৃথক-পৃথকভাবে আলোচনা করিব।

ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার আদর্শ বা মান (standard) বাস্তবিকই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নীচু হইয়া গিয়াছে; এবং তজ্জন্যই এখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা এত বেশী। প্রবেশিকা শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রদিগকে উচ্চধরণের সাধারণ শিক্ষায় পারদর্শী করিয়া কলেজ-শিক্ষার উপযোগী করা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচনের অধিকারের কথাই আসিতে পারে না। একটা সাধারণ ধরণের উচ্চ শিক্ষাই প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। পূর্ব্বে তাহাই ছিল। কিন্তু পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও আমদানি করাতে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্র ইংরাজি, সংস্কৃত বা ফার্সি, অঙ্ক-শাস্ত্র, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল এবং কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান পাঠ করিত। এখন ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের তালিকা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল পড়িতে সকলেই বাধ্য নহে, উহারা ইচ্ছাধীন (optional) পাঠ্য বিষয় হইয়াছে। সংস্কৃত আবার খানিকটা বাধ্যকরী (compulsory) খানিকটা ইচ্ছাধীন পাঠ্য বিষয়। অঙ্কশাস্ত্রও তাই। ইংরাজি সাহিত্য আর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পড়ান হয় না, কেবল বাঙ্গালা হইতে ইংরাজিতে তর্জ্জমা ও ইংরাজি ব্যাকরণের উপরই প্রশ্ন করা হয়। ফলে, ইংরাজিতে ছেলেরা খুব কাঁচা থাকিয়া যায়। বাস্তবিক, শুধু তর্জ্জমা ও ব্যাকরণের দ্বারা কোনও ভাষা শিক্ষা করা যায় না, সাহিত্যেও পাঠ করিতে হয়।

বাস্তবিক, প্রবেশিকা পরীক্ষায় এখন যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেরূপ নিয়ম কোনও সভ্য দেশে আছে কি না সন্দেহ। ইতিহাস ও ভূগোল ইচ্ছাধীন বিষয়রূপে কোনও দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আছে কি না, জানি না। সত্য বটে, এই দুইটি বিষয়ের কতক-কতক নিম্নশ্রেণীতে পড়ান হয়,—কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, নিম্ন-শ্রেণীতে এই দুই বিষয় পড়ান, আর না পড়ান, প্রায়ই সমান; কারণ, নিম্নশ্রেণীতে কেবল মুখস্থ বিদ্যারই প্রসার বেশী। তাহার পর ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাঠন প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। বাস্তবিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রথম শ্রেণীর এম-এ, পাশ-করা যুবককে আমি "শিক্ষিত ব্যক্তি" নামে অভিহিত করিতে পারি না, যিনি কোনও দিন ইংলণ্ডের গৌরবময় ইতিহাস পড়েন নাই। তাহার পর, আরও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ না করিলে যুবকেরা ইংরাজি সাহিত্য কেমন করিয়া বুঝিবে? বলা বাহুল্য, কোনও দেশের সাহিত্য তাহার ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ-রূপে জড়িত।

বাস্তবিক, প্রবেশিকা পরীক্ষা উচ্চ শিক্ষার বনিয়াদ-স্বরূপ। উহা খুবই প্রশস্ত হওয়া উচিত। নহিলে উহার উপরিস্থিত উচ্চ শিক্ষার অট্টালিকার স্থায়িত্বসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ। আমি এ বিষয়ে অনেকের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি—তাঁহারা প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত। সকলেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব্বেকার আদর্শ পুনরানয়ন করিতে অভিলাষী। কেবল বাঙ্গালা পাঠ্য বিষয় তালিকাতে স্থান দান করিতে সকলে উৎসুক। বাস্তবিক—ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা ফার্সি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ও কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান—এই সকল-গুলিই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে আর পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন চলে না। পাঠ্য নির্ব্বাচন উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষাতেই আবদ্ধ থাকা উচিত। অবশ্য এই সকল বিষয়ের শিক্ষা-প্রণালী প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুযায়ী ও সহজ হওয়া উচিত। উচ্চতর ও পূর্ণতর শিক্ষা কলেজে হইবে।

এ বিষয়ে আমার একটা প্রস্তাব আছে। সেটি হইতেছে এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরাজি সাহিত্য ছাড়া সকল বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষায় পঠিত হওয়া উচিত; এবং তাহাদের পরীক্ষাও কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই গৃহীত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বে পথ দেখাইয়াছে। এখনকার নিয়ম অনুসারে ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা ভাষায় কেবল ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে পারে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় আরও খানিকটা অগ্রসর হউন। শুধু ইতিহাস কেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাবৎ বিষয়েরই পরীক্ষা কেবল মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য বিষয় সরল। সেরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট আছে। কোনও বিষয়ে না থাকিলে, সদ্য সদ্যই রচিত হইতে পারে। এখন এই সকল বিষয় ইংরাজীতে শিখিতে হয় বলিয়া, ছাত্রেরা অনর্থক অনেক সময় বৃথা অপব্যয় করিতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের অনেক ইংরাজি পুস্তক দেখিয়াছি, যাহার ভাষা ছেলেরা বুঝিতেই পারে না। আমার মনে হয় যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যেমন একদিকে পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া উচিত, সেইরূপ সেগুলি সরল ও সহজ করিবার জন্য মাতৃভাষায় পঠিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও সম্মিলন এ বিষয়ে মাঝে-মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

এম-এ পরীক্ষা

এম-এ পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ও উচ্চতম পরীক্ষা। মাত্র এক-একটি বিষয়ের উচ্চতম জ্ঞানার্জ্জনই এম-এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই পরীক্ষায় সাফল্যলাভের উপর বহু যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। সেইজন্য এই পরীক্ষার বিষয়গুলি এরূপভাবে পঠিত হওয়া উচিত, যাহাতে শিক্ষার্থীর মনে তত্তৎ বিষয়ের প্রতি একটা অনিবার্য্য আসক্তি চিরকালের জন্য বদ্ধমূল হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে।

কলিকাতার এম-এ শিক্ষা এখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে নিজহস্তে লইয়াছেন। ঢাকা, পাটনা ও গৌহাটি কলেজে দুই-একটা বিষয়ে এম-এ শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলেও, কলিকাতাই এম-এ শিক্ষার কেন্দ্র। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ শিক্ষার ভার লইয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য কোনও স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করেন নাই। এই শিক্ষার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন পুরা-বেতনে অধ্যাপক, আর কয়েকজন এক বা দুইশত টাকার মুনফার লেক্‌চারার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা অধিকাংশই হপ্তার মধ্যে চারি-পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াই খালাস। অনেকে হয় ত ব্যারিষ্টারি, ওকালতি বা অন্য কলেজে কাজ করেন; এবং ফুরসত-মত ট্রামে করিয়া আসিয়া দুই-এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া আবার ট্রামের জন্য ছোটেন। ক্লাস হয় সেনেট হাউস বা দারভাঙ্গা বিলডিংসের এ-ঘরে—সে-ঘরে। প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুভারগ্রস্ত বৃদ্ধ রেজিষ্ট্রার মহাশয়ই কতকটা দেখাশুনা ও নোটিশ বিলি করেন। ছেলেরা কিন্তু খুব পাশ হয়। তা হইবারই কথা। যাঁহারা অধ্যাপক তাঁহারাই পরীক্ষক। শুনিয়াছি, তাঁহাদের নোট মুখস্থ করিয়াই অনেক ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

বাস্তবিক, এই উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। দুইটি এম-এ উপাধিধারী যুবকের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মের পার্থক্য অনেকটা এই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। বাস্তবিক, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই উচ্চতম শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র রীতিমত College for Post-Graduate Studies স্থাপন করিতে হইবে। তাহার একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ থাকিবেন। সেখানে যাঁহারা অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা পুরা-বেতনের লোক হইবেন; এবং ছাত্রদিগকে স্বীয় গবেষণা ও মৌলিক আলোচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবেন। দুই-এক ঘণ্টার জন্য, ট্রামে যাতায়াতকারী, অন্য কার্য্যে ব্যস্ত ব্যক্তি সুযোগ্য হইলেও, স্বীয় আদর্শ ও কার্য্যের দ্বারা ছাত্রদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার সুযোগ পাইবেন না। দুই-এক ঘণ্টার বক্তৃতাই এম-এ শিক্ষার্থীর চরম লাভ নহে। সে চাহে—মহাজনের সাহচর্য্য; সে চাহে—আজীবনব্যাপী পাঠাসক্তি; সে চাহে—প্রকৃত গুরুর সাধনার আস্বাদ। এ সাহচর্য্য ও সাধনার আস্বাদ ছাত্রেরা

ত পাইতেছে না। সেইজন্য দেখিতে পাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবামাত্র, অধিকাংশ যুবক আর জ্ঞানান্বেষণে পরিশ্রম করিতেছেন না।

সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যদি ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীন একটি রীতিমত কলেজ স্থাপনা করিতে হইবে, এবং এমন সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে, যাঁহারা মৌলিক গবেষণার দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। এখনকার মত হট্টগোলের মধ্যে এম-এ পড়ানর ব্যবস্থা, সস্তায় হইলেও সঙ্গত নহে।

তাহার উপর এ বিষয়ে আর একটি কথা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুন্দর নিয়ম আছে যে, যিনি যে বিষয় কলেজে পড়ান, তিনি সেই বিষয়ে সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিতে পারেন না। কিন্তু এ নিয়ম এম্ এ পরীক্ষার বেলা খাটে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এম এ পরীক্ষায় যাঁহারা অধ্যাপক তাঁহারাই পরীক্ষক। বাস্তবিক, প্রত্যেক অধ্যাপকেরই কোনও পাঠ্য বিষয়ে কতকগুলি বাছা-বাছা বিষয়ে আসক্তি থাকে; এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে দিলে, প্রায়ই সেই সকল বিষয়েই প্রশ্ন দিয়া থাকেন। এখন, তাঁহাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে দিলে, তাঁহার ছাত্রেরা কোন্-কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন থাকিবে, তাহার অনেকটা আভাস, পাইয়া থাকে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম হইয়াছে যে, —যিনি যে বিষয়ের অধ্যাপক, তিনি সে বিষয়ের পরীক্ষক হইতে পারিবেন না। কিন্তু এম-এ পরীক্ষায় এ নিয়ম না থাকাতে, স্বভাবতঃই পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন সম্বন্ধে পরীক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাসত্বে অনেক সুবিধা পাইয়া থাকে। আমাদের পুরাতন ছাত্রদের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বিষয়ে পরীক্ষকদিগের নোট মুখস্থ করিয়াই, পুস্তকাদি ভাল করিয়া না পড়িলেও, পাশ হওয়া যায়।

ইহার প্রতিকার ইচ্ছা করিলেই বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক প্রশ্নপত্র একজন এম-এর শিক্ষক ও একজন বাহিরের (external) লোকে মিলিয়া করেন, তাহা হইলে আর কোনও গোল হয় না। অর্দ্ধেক Internal এবং অর্দ্ধেক external পরীক্ষক নিয়োগ করিলে, আর কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। যাঁহারা এম-এ শিক্ষা দেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে Internal পরীক্ষক এবং অপর-অপর কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী হইতে Externa পরীক্ষক অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। আ করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে পড়িবে।

বক্তব্যের সারাংশ

এ বিষয়ের আলোচনা এইস্থানেই সমাপ্ত করিলাম বলিবার অনেক কথা রহিল। আমার বক্তব্য সাধার ভাবেই নিবেদন করিলাম—খুঁটিনাটি ধরিয়া বলিলে পুঁ অনেক বাড়িয়া যাইত। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আম প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকি। আমা বক্তব্য এই যে, সাধারণ কলেজ শিক্ষার বহু উন্নতি বি বিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী প্রণয়নের পর হইতে সাধি হইয়াছে; কেবল প্রবেশিকা ও এম-এ পরীক্ষায় এখন গলদ আছে। আমার বক্তব্য মোটামুটি এই :—

আই-এ, আই-এস্‌সি, ও বি-এ, বি-এস্‌সি পরীক্ষা

(১) এই কয়েকটি পরীক্ষার জন্য শিক্ষাই সাধা কলেজ-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম বলীর প্রচলনের পর কলেজ-শিক্ষার, বিশেষতঃ বিজ্ঞা শিক্ষার বহু উন্নতি সাধিত হওয়াতেই, পাশের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রা হইয়াছে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানশিক্ষার একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক কলেজে অধ্যাপকের সংখ্যা অনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং যিনি যে বিষয়ে কৃতবিদ্য, তি কেবল সেই বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। প্রত্যেক কলে এখন বিজ্ঞানাগার, পুস্তকাগার, ছাত্রাবাস, ব্যায়ামাগ কমন-রুম প্রভৃতি হইয়াছে। এই উন্নত শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য ছাত্রেরা বেশী পাশ হইতেছে।

(২) পাশের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার দ্বিতীয় কারণ যে, এই সকল পরীক্ষায় ছাত্রেরা স্বীয় মনোমত পা বিষয় বাছিয়া লইতে পারে। অনভিপ্রেত বিষয় অধ্য করিতে বাধ্য হয় না বলিয়া, ছাত্রেরা স্বীয় অভিপ্রেত বি ভাল করিয়া শিখিতে পারে। যদিও এখন প্রত্যেক বি পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর হইয়াছে, তাহা হইলেও পাঠ্য বিষ সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমাতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

(৩) পাশের সংখ্যার বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ এই এখন প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে অনেকগুলি alternate থাকে। তাহাতে ছাত্রেরা যে প্রশ্নগুলির ভাল উ

লিখিতে পারে, সেইগুলিই বাছিয়া লইবার সুবিধা পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সুবিধা না থাকাতে অনেক ছাত্র বিনাদোষে ফেল হইত।

(৪) এ কথা সত্য নহে যে, এখন বাঙ্গালী পরীক্ষক পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকাতে পাশ বেশী হইতেছে। সাহেব ও বাঙ্গালী এই দুই শ্রেণীরই পরীক্ষকের মধ্যে "কঠিন ও কোমল" পরীক্ষক আছেন। তাহার উপর প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষায় পরীক্ষক-সংঘের (Examiners' Board) দ্বারা নির্দ্ধারিত পন্থা অনুসারে প্রত্যেক পরীক্ষক পরীক্ষা করিতে বাধ্য হওয়াতে, "কঠিন ও কোমল" পরীক্ষকের কথা আইসে না। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষকের সংখ্যা কম বলিয়া এইরূপ সংঘের প্রয়োজন হয় না।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ পাঠ্য-বিষয়ের লঘুতা। প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপই হওয়া উচিত। বিষয়-নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্থান পাইতে পারে না। ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা ফার্সি, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ও কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পাঠ্য-বিষয় হওয়া উচিত; এবং বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিষয়গুলির পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা হওয়া উচিত।

এম-এ পরীক্ষা

(১) এম-এ শিক্ষার পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র কলেজে উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীনতায় এবং উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহচর্য্যে এম-এ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অধ্যাপকেরা স্বীয় গবেষণায় যশস্বী হইবেন এবং স্বীয় আদর্শে ও কার্য্যের দ্বারা ছাত্রদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবেন।

(২) এখন যে নিয়ম আছে যে, যাঁহারা এম-এর শিক্ষক তাঁহারাই পরীক্ষক,—সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করা উচিত। অর্দ্ধেক Internal এবং অর্দ্ধেক External পরীক্ষকের দ্বারা এম-এর প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষা সম্পন্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

লুকোচুরি

[শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য]

লুকোচুরি কেন এত আর,
চোখে চোখে সদা রাখি, তবু দিতে চাও ফাঁকি,
আমি কি বুঝিনে কিছু তার!

তুমি বটে ভাব মনে মনে,
মনোভাব রেখেছ গোপনে—
হৃদয় সে নিরজন, সেথা রম্য ফুলবন,
সন্ধান করিবে সাধ্য কার;
কিন্তু সে তোমার ভুল, সেথা যে ফুটেছে ফুল,
প্রতি শ্বাসে আসে গন্ধ তার,
সেথা যে গাহিছে পিক, কাণে বাজিতেছে ঠিক
দূরাগত সঙ্গীত সুধার!

অয়ি মুগ্ধে, অয়ি সঙ্কুচিতে,
পারিবে না আমারে ছলিতে;
তোমার হৃদয় মাঝে, যে সুর যখনি বাজে,
ঝঙ্কারে তা হৃদয়ে আমার;
তবে যে বলিনে ফুটে, ছল ছল আঁখি-পুটে
পাছে কর মুখখানি ভার!

নিষ্কৃতি

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৫)

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে সুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না, তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া, কর্ত্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবং কহিলেন, "আমি বেশ করে ধম্‌কে দেব'খন।" বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্ব্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুতঃ, গিরীশের স্বভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত এবং মকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে,—কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে কিছুই তিনি তত্ত্ব লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন, এবং ভালমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যাহোক্ একটা মতামত প্রকাশ করিয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধমকে দেব'খন' বলিয়া কর্ত্তা যখন কর্ত্তার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না; কাহাকে ধম্‌কাইবেন, কেন ধমকাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি-পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল; ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "অমন ক'রে বসে কেন দিদি—বেলা হ'ল, যাহোক্ চাট্টি মুখে দেবে চল।" সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, "বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা।"

"এগারোটাই কি সোজা বেলা, দিদি? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।"

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া-দাওয়ার কথাবার্ত্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন, "তা হোক্, মেজবৌ; আমি কোনদিনই এত শীগ্‌গীর খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।" নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "এই জন্যেই ত পিত্তি-পড়ে দেহের এই আকার। আমার হাতে হেঁসেল থাক্‌লে কি আমি ন'টা পেরুতে দিই? তুমি না বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্ব্বনাশ। নাও চলো, যা'হোক্ দু'টো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।"

নয়নতারা একমাসের অধিককাল এখানে আসিয়াছে; এবং বড়জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দারুণ অস্থিরতা ভোগ করা সত্ত্বেও কেন যে এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতববাদের এম্‌নি মহিমা, সমস্ত বুঝিয়াও, আর্দ্রচিত্তে কহিলেন, "তুমি আপনার জন বলেই এ কথাটি আজ বল্‌লে, মেজবৌ; নইলে, কে আর আমার আছে বল।"

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল, এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া, পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুন ঠাকরুণের রান্না ভাত বাড়াইয়া, আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ-দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত; মেজবৌ লীলাকে ডাকিয়া কহিল, "তোর ছোটখুড়িকে বল্‌গে, ও হেঁসেলে কি আছে এনে দিতে।" মিনিট খানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল,—তিনি মেজজা'কে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কণ্ঠে চিঁচি করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা এই সঙ্গে কেন বস্‌লে না, মেজবৌ?" মেজবৌ কহিল, "আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বস্‌ব।" শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে

কহিল, "না, দিদি; আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না, তা' বলে দিচ্ছি।" একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কতদূরে আছে দেখিয়া লইয়া, কহিল, "এঁরা দু'জন যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন্। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মরব, আর কি কেউ তেম্‌নি করে কাঁদবে? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে; কিন্তু আমি করব ভিতর থেকে। তুমি এই যে বল্‌লে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকার আপনার জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেয়োনা।"

সিদ্ধেশ্বরী বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন—"এ কি ভোল্‌বার কথা, মেজবৌ? এতদিন যে তোমাকে চিন্‌তে পারিনি, তার শাস্তিই ত ভগবান আমাকে দিচ্চেন।" মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল,—"শাস্তি যা' কিছু, ভগবান যেন আমাকেই দেন, দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি।" একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল,—"আজ যদি বা জান্‌তে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধূলোর যোগ্য নই, কিন্তু, জানাবো সে কথা কি করে দিদি? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করব,ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েছি যে ছোটবৌর দু'চক্ষের বিষ।" সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা' হ'লে সে যেন তার ছেলেপিলে নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাত-গুষ্টিকে দুধেভাতে খাওয়ারো কি নিজের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে? খুড়তুত ভাই, ভাজ, আর তাদের ছেলেপুলে—এই ত সম্পর্ক? ঢের খাইয়েছি, ঢের পরিয়েচি—আর না। দাসী-চাকরের মত মুখ-বুজে আমার সংসারে থাক্‌তে পারে, থাক্; না হয় চলে যাক্।"

অদূরে চৌকাট ধরিয়া শৈল যে দাঁড়াইয়া ছিল, সিদ্ধেশ্বরী স্বপ্নেও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই, তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন—ঠিক পাশের কবাটের চৌকাট ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারে রুচি চলিয়া গেল; এবং এই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ-যাত্রা রক্ষা পান—তাঁহার এম্‌নি মনে হইল। মেজবৌ মহা উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "ও কি দিদি, শুধু ভাত নাড়্‌চ—খাচ্চ না যে?" সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "না।" মেজবৌ কহিল, "আমার মাথা খাও, দিদি, আর দু'টী খাও—" তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন মিছে কতকগুলা বকুচ মেজবৌ, আমি খাবো না—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে" বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি, দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাক্‌লে, আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।" সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া, যা' পারিলেন নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু, নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি কারণে? এবং ইহার অনিবার্য্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাঁহার সেই অতি কঠোর উপবাস সুরু করিয়া দিবে,ইহাতেও তাঁহার অনুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়িমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদ কতটুকু হইল বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল, তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্র জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ম্লানমুখে বসিয়া ছিলেন—আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হউক, রমেশকে বকিতে হইবে—তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল;—তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন্, নীলা।" সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "তাকে আবার কেন?" "কেন? তাকে রীতিমত ধম্‌কে দেওয়া দরকার। বসে-বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।" হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, "অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা।" সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না—না, বোঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না—সে আর ছেলেমানুষটি নয়।" সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না, রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল,—দাদার আহ্বানে ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেছিস্ কেন?" রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ঝগড়া করেচি।" গিরীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আল্‌বাৎ করেচিস্।" বলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বড়গিন্নী বলেছিলেন, তুই যা' মুখে আসে তাই বলে তাকে গালমন্দ করেচিস্। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বল্‌লে?" রমেশ অবাক্ হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তোমার কি ভীমরতি ধরেচে? কখন্ তোমাকে বল্লুম—ছোট-ঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেচে?" হরিশ ভ্রম-সংশোধন করিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, "না—না, সে ছোট-বৌমা।" তখন গিরীশ বলিলেন, "ছোট-বৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন শুনি?" সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, "সে-ই বা কেন অতুলকে গালমন্দ করবে! সে ও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বল্‌ব আমি। তুমি ছোট-ঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্ছ কেন?" গিরীশ কহিলেন, "আচ্ছা তাই যেন হল; কিন্তু, তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি। আর দেখ্‌গে যা বাগ্‌বাজারের খাঁদের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।" হরিশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "খড়ের দালালি?" রমেশ কহিল, "আজ্ঞে না, পাটের।" গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, "তারা আমার মক্কেল—আমি জানিনে, তুই জানিস খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।"

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, না হয় পাটই হ'ল। এই পাটের দালালি করে তুই কি দু'শ একশ'ও ঘরে আন্‌তে পারিস্ নে? তোমাদের আমি চিরকালটা বসে-বসে খাওয়াতে পারব না। 'যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুছ পরওয়া নেই—আবার চার হাজার দাও না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা' বলে, আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে-বসে খাবে?" হরিশ মনে-মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এ সব কাজ শিখ্‌তে হয়; নইলে, পাটের দালালি ত কর্‌লেই হয় না। বার-বার এত টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।" গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, "নয়ই ত। আমি পাটের দালালি টালালি বুঝিনে—তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে সুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট-হাজার টাকার চেক দেব। চার-হাজার টাকা খড় কিন্‌বে, চার হাজার জমা থাক্‌বে। এটা নষ্ট হলে তবে ও টাকায় হাত দেবে,—তার আগে নয়। বুঝ্‌লে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না—যাও।"

রমেশ নীরবে চলিয়া গেলে, হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এই আট-আট হাজার টাকাই জলে গেল, ধরে রাখুন। কি বল বৌ-ঠান?" সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবে না কি?" গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সত্যি কি রকম?" হরিশ বলিলেন, "এই সেদিন চার-হাজার টাকা জলে দিলে; আবার আট-হাজার সেই জলে ফেল্‌তে দেবেন, এ যেন আমি ভাব্‌তেই পারিনে।"

গিরীশ কহিলেন, "তা'হলে তুমি কি রকম করতে বল?" হরিশ বলিলেন, "রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা? আট-হাজারই দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না—সে আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি। এই টাকাটা উপার্জ্জন করে জমাতে ক

সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি।" গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক; ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা। ঠিক্ ত। ও কি আবার একটা মানুষ?" হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, "তার চেয়ে বরং একটা চাকৃরি-বাকৃরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা, তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে-মাসে ২৫৲ টাকা মাষ্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়ে ত ও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে। কি বল বৌ-ঠান?" কিন্তু, বৌ-ঠান জবাব দিবার পূর্ব্বেই গিরীশ খুসি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক, ঠিক; ঠিক কথা বলেছ, হরিশ। কাঠবেরাল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে।" স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখেচ, বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেচে। আমি বরাবর দেখেচি কি না, ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারি প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখ্‌তে পারে, এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক্। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।" সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "টাকাটা কি তবে দেবে না, না কি?" "নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার না কি আমি টাকা দিই তাকে?" "তবে এমন কথা বলাই বা কেন?" হরিশ কহিলেন, "বল্‌লেই যে দিতে হবে, তার কোন মানে নেই, বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারের টাকা নষ্ট হলে আমারও ত গায়ে লাগে?" "সেইটেই তোমার আসল কথা, ঠাকুরপো" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

স্মৃতি

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

মনে হয় সে দিন বলিয়া;
সেই সিঁড়িটীর পাশে
রচা তব বহু আ'সে
ছোট খেলাঘরখানি ঘেরা ইট দিয়া;
বিজনে দুপুর বেলা
সেই 'বউ-বউ' খেলা
দাঁড়াইতে কচিমুখে ঘোমটা টানিয়া।—
কি আনন্দে ভরা ছিল হিয়া।

তার পর দেখিতে-দেখিতে
তনু তনুলতা তব
উছলিল অভিনব
সৌন্দর্য্যে, সৌষ্ঠবে, রূপে, অকলঙ্ক শ্রীতে;
রহিল না সে চাঞ্চল্য
যৌবনের জয়মাল্য
একদিন শুভক্ষণে হইল পরিতে;
সুলভ দর্শন আর
যথাতথা অনিবার
রহিলে না তুমি মোর দিবসে, নিশিতে
লাজে, ভয়ে মিলন-নিভৃতে।

করে কর, নয়ন নয়নে—
মনে পড়ে তব, রাণি!
সে দৃঢ় শপথ বাণী,
আমারি রহিবে চির জীবনে, মরণে;
সেই দোতালার ছাতে
লুকায়ে বিজয়া-রাতে—
তোমার প্রণাম,—মোর আশিস চুম্বনে;
রুদ্ধকণ্ঠ, শুষ্ক বুক
স্কন্ধে লুকাইয়া মুখ
বিদায়ের দিনে সেই কাঁদিনু দু'জনে;
বিরহ কি বেদনা ভুবনে!

অবশেষে সেই বজ্রাঘাত!
তব পাণি-প্রার্থী, হায়!
কত আশা, বাসনায়
তোমারে ভেটিতে গেনু, ভাবি' সুপ্রভাত;
কি দেখিনু হরি! হরি!
সীমন্তে সিন্দুর পরি'
তুমি দাঁড়াইলে যেন প্রলয়-সম্পাত;
হা বিধাতঃ, এ অদৃষ্ট—
এও কি তোমারি সৃষ্ট?
তার আগে, হৃদি-পিণ্ড কেন অকস্মাৎ
দল নাই, করি' উল্কাপাত!

দেবোত্তর বিশ্বনাট্য

[শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা প্রণীত নূতন নাট্য]

সমালোচনা।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ]

মানুষ যখন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ব্যক্তিগত বিরোধের দ্বারা ব্যক্তির মঙ্গল নাই, তখন হইতে সে আপনাকে সমাজবন্ধনে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তির একটা বিরোধ আছে, সেটা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে জড়িত; তাহাকে কেহ বিলোপ করিতে পারে না, মানুষের স্বরূপের মধ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। কাযেই সমাজবন্ধনের মধ্যে মানুষের বিরোধবৃত্তি ধ্বংস পায় নাই, শুধু তার মুখটা ফিরিয়া গিয়াছে মাত্র। মানুষ যখন বুঝিতে পারিল যে, পরস্পরের অধিকারের উপর অযথা আক্রমণের দ্বারা যদি মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সফল করিতে হয়, তবে তাহাতে যে সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাতে মানুষের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়; কাযেই তাহাতে যেমন স্বার্থ-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তেমনি বিরোধ-বৃত্তিরও চরিতার্থতা নাই। তখন মানুষ কতক সুবুদ্ধিতে, কতক স্বভাবের তাড়নায়, আপনার বৃত্তি-নিচয়ের অসংযত বেগের হাত হইতে আপনাকে ও আপনার অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য, একটী সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা মা হিংসীঃ"—আমরা পরস্পরকে হিংসা করিব না। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা প্রত্যেকে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার স্বীকার করিব, যেখানে আমরা কাহাকেও আঘাত দিতে পারিব না। ব্যক্তিত্বের যে একটা বাধাহীন, সংযমহীন, নিয়মহীন দাবী ও অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে, সে অধিকারকে আমরা কখনই আমাদের ন্যায্য অধিকার বলিয়া মানিতে পারি না; কারণ এ অধিকার হইতে যে প্রলয়ের বজ্রশিখা জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে সমস্ত অধিকার ধ্বংস হইয়া যাইবে। এ নির্ব্বাধ অধিকারে কাহারও অধিকারই সফল হইতে পারে না। কেবল অধিকারে-অধিকারে দ্বন্দ্বই ইহার পরিণাম। এই বিরোধের হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মানুষ যাতে তার নিজের অধিকারকে সবচেয়ে বড় মনে না করে, সকলের অধিকারকেই সমান চোখে দেখতে শেখে। ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি এমন কোনও অধিকারের দাবী রাখতে পারবে না, যার থেকে সে অন্য কাহাকেও বঞ্চিত করতে সাহস পায়। মানুষ হিসাবে একের যা অধিকার তা সকলেরই অধিকার। কোনও অধিকারই কাহারও একলার নয় যে, সে সেই অধিকারকে যেমন খুসী চালাবে। এমনি করে এই যে মানুষের অধিকার, এটা মানুষের থেকে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ হয়ে দাঁড়াল। এর কাছে মানুষ তার নির্ব্বাধ, অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বলিদান করিল। সে বল্লে যে, মানুষের অধিকার বলে যে এই জিনিসটি প্রবল সত্য হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে, একে অস্বীকার করা চলবে না। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তি হিসাবে এ অধিকারের উপর আমাদের কাহারও কোনও দাবী নাই; এ অধিকার আমার একার নয়—সকলের; এ অধিকার দেবতার। প্রত্যেকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার এমন করে চালাব, যাহাতে কাহারও অধিকার কোনও রকমে ক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ কাহারও অধিকারের উপর হাত দেওয়ার ত আমাদের সাধ্য নাই, অধিকার ত দেবতার। সকল মানুষেরই তাতে সমান স্বত্ব, সমান দাবী। এই "দেবত্র" অধিকারের মর্য্যাদা যে লঙ্ঘন করবে, তার মতন পাপী আর নাই। এই দেবত্রকে নিজস্ব মনে করাই সমস্ত পাপের মূল, সমস্ত পাপের চরম। যে ব্যক্তিগত বিরোধ অসংযত হয়ে মানুষকে সর্ব্বনাশের পথের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, অধিকারের যথার্থ অধিকারীর সন্ধান পাওয়াতে, সে বিরোধ আর মানুষকে হনন করতে পারলে না। মানুষ সরিয়ে-সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, এই দেবত্র অধিকারের চারিদিকে তাকে কণ্টকাকীর্ণ করে দেবত্র ভূমির বেড়া নির্ম্মাণ করলে। মানুষ বল্লে যে, যে-কেউ এই দেবত্র ভূমিকে নিজস্ব মনে করে দখল করতে চাইবে, আমাদের সমূহ শক্তির বিপুল বিরোধের কণ্টকে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। মানুষ আর তার প্রত্যেকের নিজের-নিজের জমিতে বেড়া দিলে না,—ব্যক্তিগত স্বার্থ রাখবার জন্য আর ব্যক্তিগত বিরোধের প্রয়োজন হোল না; সমস্ত মানুষের যে দেবত্র ভূমি রহিয়াছে, তাহারই চারিদিকে তাহাদের সম্মিলিত বিরোধকে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল। এইখানেই দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতির সৃষ্টি। এইটিই Ethics ও Law এর ক্ষেত্র। এই অবস্থায় এসে মানুষ বুঝতে পারলে যে, এই দেবত্র অধিকারের প্রজা হইয়াছে বলিয়াই সে তার অধিকার রাখতে পারছে। কাহাকেও পীড়া দেবার দাবী ছাড়িয়াছে বলিয়াই তাহাকে পীড়া ভোগ করিতে হইতেছে না। যে সংসার ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত তাহাকে একদিন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আজ তাহাকে সে এই বিরাট ব্যক্তি-পরিবারের দেউড়ীর দ্বারী করিতে পারিয়াছে। বিরোধের মধ্য থেকে সংহারের দিকটা যখন দূরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন মানুষের মধ্যে মানুষের বিরোধের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাতে আর ভয়ের কিছু রইল না। যেটুকু রইল, সেটুকু কেবল লীলা, কেবল

আনন্দ। নাটকের মধ্যে যেমন বিবিধ পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের বিরুদ্ধ-সমাবেশে ও বিভিন্ন রসের অনুকূল প্রতিকূল আকর্ষণ-বিকর্ষণে একটী স্থায়ী রস পরিপুষ্ট ও পরিপক্ব হইয়া একটী আনন্দের লীলানাট্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে, এখানেও তেমনি মানবের দেবত্র অধিকারের মধ্যে প্রতি মানবের পরস্পরের সহযোগে আপন-আপন অধিকারের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের ও লীলার মধ্যে একটী নাট্যরস নিয়ত উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ নাটকের মধ্যে আমরা যে লীলা দেখ্‌তে পাই, তার মূলেও এই ব্যক্তি-নাট্য। তবে এর সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, এখানে আমরা দেবত্র অধিকারের মধ্য দিয়া ব্যক্তি-নাট্যটিকে দেখিতে চেষ্টা করি, আর সেখানে আমরা ব্যক্তি-নাট্যের মধ্য দিয়া দেবত্র অধিকারের বিচিত্র সার্থকতা দেখিয়া থাকি। এই শ্রেণীর লীলাকে (action) অবলম্বন করে যদি কেউ কোনও নাটক লেখেন, তবে তাকে আমরা "দেবোত্তর ব্যক্তিনাট্য" নাম দিতে পারি।

বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে, যখন বিভিন্ন দেশে, এম্‌নি করে দেবত্র অধিকারের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন সমাজ গড়ে উঠল, তখন সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তারা ব্যক্তির মতন করে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হতে আরম্ভ করলে। একজন মানুষ যেমন তার বিভিন্ন রকমের মনোবৃত্তির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তারমধ্যে এমন একটি একত্বক উপলব্ধি করে—যার দ্বারা সে তার মধ্যের সমস্ত বিরোধকে একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত করিতে পারে, একটা জাতিও তেম্‌নি তার বহু ব্যক্তিসত্ত্বেও নানা বিরোধের মধ্যে কালের পরিণতিতে একটা অখণ্ডতা পাইয়া থাকে। তার অভ্যন্তরস্থ নানা লোকের নানা মত, নানা ধারণা, নানা বিশ্বাসের বিরোধসত্ত্বেও এমন একটা মিল, এমন একটা গ্রন্থি থাকে, যাতে সে অন্য-অন্য জাতির তুলনায় নিজের একটা স্বতন্ত্রতা অনুভব করতে পারে। কতকগুলি জাতি যেমন ব্যক্তিত্বের পরম সাফল্যে এমনি করে এক-একটা স্বতন্ত্র আত্মগোষ্ঠী বা আত্ম-পরিবারের সৃষ্টি করে, তখন তাদের মধ্যে যে একটা স্বতন্ত্রতা আসে, সেটা ঠিক প্রাচীন যুগের ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্রতার মতনই তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মম। সে মনে করে যে, অন্য জাতির সঙ্গে তার কোনও বন্ধন নেই। অন্য জাতির অধিকারের মধ্যে দেবত্রের পবিত্রতা নাই। ব্যক্তি হিসাবে কিন্তু মানুষ তখনও অন্য জাতির এই অধিকারকে অস্বীকার করে না। কিন্তু যখন সমগ্রভাবে আপন জাতির মধ্যে আপনাকে সে অভিন্ন করে দেখে, তখন জাতি হিসাবে সে অপর জাতির অধিকারকে স্বীকার করতে পারে না। যে হিংসা, যে বিরোধকে সে ব্যক্তিত্বের দিক্ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, মানুষের জাতীয় স্বরূপের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরোধ আবার নূতন রূপে উপস্থিত হয়। যে মানুষ অন্যায়ভাবে অপরের সামান্য স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপটুকুও সহ্য করিতে পারে না, সেই মানুষই বিনা ক্রোধে, বিনা অপরাধে, বিনা উত্তেজনায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণবধ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যে নরহত্যার নামে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরাইত, সেই নরহত্যা তখন তাহার কাছে পরম গৌরবের বিষয় হইয়া উঠে। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে যাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়াও সাধ মিটিত না, তাহাকে অতুল রাজসম্মানে বিভূষিত করে। যুদ্ধক্ষেত্রকে বলে ধর্ম্মক্ষেত্র। নিহত ব্যক্তিগণের তালিকার নাম দেয় "Roll of honor"। নরহত্যার জয়োল্লাস বর্ণনা করিয়া উৎসাহের সহিত বলে—"হত্বা বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং"। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের শৈশবাবস্থায় মানুষ যেমন পরস্পরের হিংসার দ্বারা আপন অধিকার বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, জাতিত্ব বিকাশের শৈশবাবস্থায়ও আপন অধিকারের জন্য জাতিতে-জাতিতে হিংস্রজন্তুর মতন ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপের জাতিনিচয় মনে করিয়াছিল যে, তাহারা জাতিত্বের এই শৈশবাবস্থা পার হইতে চলিয়াছে। সেই বুদ্ধিতে, তখন যে উপায়ে ব্যক্তিত্বের বিরোধ জাতিত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, সেই উপায়ে জাতিত্বের মধ্যের বিরোধ দূর করিবার জন্য "অন্তর্জাতীয় সম্মিলনী"র সৃষ্টি করিয়া জাতীয় অধিকারকেও দেবত্র বলিয়া স্বীকার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন য়ুরোপীয়েরা জাতি বলিতে কেবল শ্বেতাঙ্গ জাতিই বুঝিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় অধিকারকে তাহারা কিছুতেই দেবত্রের মধ্যে আনিতে পারিবে না। য়ুরোপীয় বর্ত্তমান রাষ্ট্রসঙ্কট—ইহা আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে সুপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান জাতিনিচয়ের মধ্যে, জাতিত্বের অধিকারকে ব্যক্তিত্বের অধিকারের মতন দেবত্রের দিকে অগ্রসর করাইয়া, একটা চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, শুধু ব্যক্তিত্বের অধিকারকে দেবত্র করিলে চলিবে না। কালের নিয়মে, ব্যক্তিত্বের পরিস্ফূর্ত্তিতে, ব্যক্তিত্ব এখন জাতিত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তার যে জাতিস্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, সেটী তার একটী নূতন রূপ, নূতন সত্ত্বা, নূতন অস্তিত্ব। কাযেই, ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রের অধিকারের দেবত্রীকরণে, এ ক্ষেত্রের বিরোধের কোনও সামঞ্জস্য হইবে না। এই সত্তাটি যেমন নূতন, এর অধিকারও তেম্‌নি নূতন, এর বিরোধও তেম্‌নি নূতন। এ ক্ষেত্রের অধিকারকে দেবত্র করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, সে সাধনা ও তাহার সিদ্ধিও তেম্‌নি সর্ব্বতোভাবে নূতন হইবে। এই স্তরের অধিকারের বিরোধ লইয়া কেমন করিয়া সেই বিরোধের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণে, জাতীয় যত অধিকারের অনির্দ্দিষ্ট রূপহীনতার লয় হইয়া জাতীয় অধিকার দেবত্র হইয়া দেখা দিতে পারে, সে সম্বন্ধে যদি কেহ নাট্য লেখেন, তবে তাহাকে আমরা "দেবোত্তর জাতিনাট্য" নাম দিতে পারি।

পৃথিবীতে ভোক্তার সংখ্যা অন্নের পরিমাণে অনেক বেশী; ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে আদিম বিবাদ, তাহারও মূলে এই অন্ন; আর জাতিতে-জাতিতে যে বিরোধ, তাহার মূলেও এই অন্ন। এই অন্নময় ব্রহ্মের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানুষের সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ যে তাহার অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার ফলে এই অন্নের ব্যাপকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে; প্রাচীনকালে কৃষি-

বৃত্তিই মানুষের প্রধান অভাব ছিল, অন্ন বলিলে তাহাই বুঝা যাইত। এখন মানুষের এমন আরও অনেক জিনিষের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যাহার পরিপূরণ ক্ষুন্নিবৃত্তির মতনই তাহার নিকট একান্ত প্রয়োজনীয়। কাযেই, অন্ন বলিতে এই সমস্ত প্রকারের পার্থিব অভাবকেই বুঝিতে হইবে। এইভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই যে জাতিতে-জাতিতে বিরোধ হইতেছে, ইহার মূলও এই অন্নের মধ্যেই রহিয়াছে। এই অন্নের বিরোধ যে শুধু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বা সমষ্টিতে সমষ্টিতে দেখা দিয়াছে, তা নয়; সমষ্টিতে ব্যক্তিতেও এর একটা নূতন প্রকাশ দেখা দিয়া চারিদিক্ দিয়া বিরোধটাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রমের দাবী লইয়া কৃষক যেমন একদিকে তার লাঙ্গলখানা নিয়ে মাঠে দাঁড়াইয়াছে, অপরদিকে তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নানাবিধ ধনবল, জনবল, শিক্ষাবল নিয়ে পরিচালক, যূথাধিপ মদমত্ত গজের মতন তার কলকারবারের প্রবল শুণ্ড তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষকের সাধের কানন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কৃষক বলে, আমার জমী আমি চাষ করি—অন্ন আমার। পরিচালক বলে, আমি যূথাধিপ, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছি, বিজ্ঞান আমার সহায়, ধনী আমার অঙ্গরক্ষক, আমি নানা দেশ থেকে ধন আহরণ করে নিয়ে আস্‌চি, শুধু এ দেশের কেন, সমস্ত পৃথিবীর অন্নই আমার। পরিচালক যখন তার বুদ্ধির গর্ব্বে রৌদ্রমূর্ত্তিতে অন্যদেশের তার সমশ্রেণীর যূথাধিপদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, আমাদের এই বৈশ্য সভ্যতার দিনে তাহার ফলে জাতিতে-জাতিতে বিরোধ বাধিয়া যায়। আর যখন সে তার নিজের দেশের ব্যক্তিগত পরিশ্রমের ন্যায্য অধিকারকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন অন্নঘটিত মহান্ অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। কারণ, সমূহের যে শক্তি, সে ত ব্যষ্টির মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে। যে আত্মদ্রোহী সমূহশক্তি ব্যষ্টিশক্তিকে গ্রাস করিতে চায়, কালক্রমে তাহার বিরাট ক্ষুধা খাদ্যাভাবে তার নিজ শরীরকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়ায়ে ব্যক্তিত্বটুক পর্য্যন্ত ধ্বংস পাইতে বসিয়াছিল। সমষ্টি ও ব্যষ্টির লড়াইতেও তেমনি সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়েই ধ্বংসের মুখে বসিয়াছে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হইলে কাহারও মুক্তি নাই; এখানেও দেবত্র ছাড়া গতি নাই। এখানে ব্যক্তিত্বের অধিকারের দেবত্রত্ব নয়, সমষ্টিত্বের অধিকারেরও দেবত্রত্ব করিতে হইবে "অন্নের"। অন্ন কৃষকেরও নয়, পরিচালকেরও নয়; অন্ন সর্ব্বসাধারণের—অন্ন দেবতার। অন্নে যার যেটুকু অধিকার, সেটুকু শুধু ভোগের, সত্বের নয়। এই অন্নকে প্রচুর করে বাড়িয়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে প্রত্যেকের দায়িত্ব। অন্নের সম্বন্ধে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, কৃষক, পরিচালক, জমিদার, বৈজ্ঞানিক, সকলেরই সমান অধিকার; অর্থাৎ কাহারই ইহাতে কোনও নিজস্ব দখল নাই। সকলে মিলে একত্রযোগে এই অন্নের দেবত্র সম্পত্তির [illegible] বর্দ্ধিত হও ও ইহাকে বাড়াইয়া তোল। এইখানেই হচ্ছে অন্নের দেবত্রত্ব। এ না হলে, এ বিরোধের পর্য্যবসান নেই। ব্যক্তিত্বের বিরোধ বল, জাতিত্বের বিরোধ বল, যেখানে যত বিরোধ হচ্ছে—সমস্তই প্রায় এই "অন্ন"কে নিয়ে। অন্নকে নিয়েই struggle for existence, অন্নকে নিয়েই economic and industrial war, অন্নকে নিয়েই national war, অন্নই সমস্ত বিরোধের বিধায়ক। কাযেই, ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্বের মত একে আর ছোট করে দেখা যায় না। সেই জন্যই, অন্ন লইয়া এই যে সার্ব্বজনীন বিরোধ চলিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন নাট্য রচনা করিলে, তাহাকে বিশ্বনাট্য নাম দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা এই নাটকে—অন্নকে লইয়া যে বিশ্বব্যাপী বিরোধ চলিয়াছে,—তাহারই একদিকের একটা ছায়া-চিত্র দিয়াছেন। সেই জন্যই ইহার 'বিশ্বনাট্য' নামটি খুব সুসঙ্গত হইয়াছে। যে সমস্ত নাটকে "নির্বহণ সন্ধি" বা Return এর প্রাধান্য থাকে, সেখানে তাহার নামটা নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলং (অর্থাৎ অভিজ্ঞানের দ্বারা শকুন্তলা যে পুনরায় পরিজ্ঞাত হয়েছিলেন সেই সম্বন্ধের নাটক) মুদ্রারাক্ষস (নাম মুদ্রার দ্বারা যে রাক্ষস পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, তদবলম্বনে লিখিত নাটক)। এ সমস্ত নাটকেই "নির্বহণ" (অর্থাৎ যেটা নাটকের শেষ ঘটনা—যেমন শকুন্তলার স্মরণ বা রাক্ষসের পরাজয়) অংশটি নাটকের নামের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অভিজ্ঞান এবং মুদ্রা এ দুটিই ঐ বিষয়ের দ্যোতক। এ নাট্যেও "অন্ন বিশ্বের" অন্তর্নিহিত বিরোধ একটি নূতন দেবত্রের সংস্থাপনে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "দেবোত্তর বিশ্বনাট্য" রাখা হইয়াছে।

জমিদার দেনার দায়ে মহাজনের কাছে চাষের জমিগুলো বিক্রী করে দিতে বাধ্য হলেন। পরিচালকেরা এসে সেখানে রেলের লাইন বসাবার, কলকারখানা স্থাপন কর্‌বার উদ্যোগ আরম্ভ কর্‌লে। কৃষকের ভিটামাটি উচ্ছন্ন যেতে আরম্ভ কর্‌লে। তারা বাধা দিতে চেষ্টা কর্‌লে, ঠেকাতে পারলে না। প্রকৃতির নিভৃত লীলাকুঞ্জের লোকোত্তর সুষমা বিনষ্ট হোল, চাষাদের সুখ-শান্তি দূর হোল। কৃষক চায় মাটী, বৈজ্ঞানিক চায় কল, শিল্পী চায় রংএর গুঁড়া; আর জনমানব চায়—অন্নে প্রাণশক্তি। বস্তুতঃ, সকলেই বিভিন্ন ভাবে অন্নের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে আরাধনা করুচে। সকলেই বল্‌তে চায় যে, অন্ন আমার। তাই সকলের মধ্যেই বিরোধ লেগে উঠেছে। তার প্রথম স্তরে দেখ্‌তে পাই যে, বিরোধের প্রথম অগ্নিকণা স্পর্শেই, কৃষককে গৃহহীন প্রবাসী হতে হোল। এই জন্য লেখিকা নাম দিয়েছেন—প্রবাসের পথে। এই অধ্যায়ের মধ্যে "কবিদাদা" "রাণু" ও 'কৃষক-বালকের' প্রাসঙ্গিক চিত্রের দ্বারা লেখিকা গ্রাম্য-জীবনের কবিত্বময়, সুখময় রমণীয় ছবিকে আমাদের সম্মুখে পরম লোভনীয় ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রাসঙ্গিক বস্তুটি বহুদূর নীত হয় নাই; সেই জন্য সংস্কৃত অলঙ্কারের ভাষায় ইহাকে আমরা প্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। মূল আধিকারিক ঘটনার প্রথমোন্মেষে কৃষকদের প্রবাস-যাত্রায় যে করুণ রসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে পরিপোষণ করাতেই ইহার সার্থকতা। ছবিটি চোখের সামনে ধর্‌লেই মনে হয় যেন পল্লীলক্ষ্মীর সমস্ত প্রাণ এই দ্বন্দ্বের সংঘাতে আছাড়িয়া-আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত

পল্লীর দুঃখ মূর্ত্তিমান হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং অলক্ষ্যে তাঁর চক্ষু জলসিক্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় অঙ্কটি প্রথম অঙ্কটীর ঠিক antethesis। চাষীরা গিয়ে এখন শ্রমী হয়েছে, কলের কাযে যোগ দিয়েছে। পরিচালক শ্রমীদের জীবিত-যন্ত্রের সামিল করে নিয়ে কল চালাতে আরম্ভ করেছে। তাদের দুঃখ দারিদ্র্যের সীমা নাই। যে সব লোক নূতন কায আরম্ভ করেছে, তাদের দুবেলা অন্ন জোটে না; তারা মনে-মনে—ওস্তাদ কারিকরেরা যে তাদের নিপুণতার জন্য বেশী পাচ্ছে সেই জন্য—ঈর্ষ্যান্বিত হচ্ছে। আবার দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তাদেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হোল। বৈজ্ঞানিকের নূতন কলের সৃষ্টিতে তারা ক্রমে অনাবশ্যক হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত কারিকর, তাঁতি, মজুর মিলে দীনু মোড়লকে প্রধান করে, পরস্পরের রোগ, শোক, অকর্ম্মণ্যতা, কর্ম্মহীনতা প্রভৃতির সময় তাদের সুবন্দোবস্ত করবার জন্য সমিতি সংগঠন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। দীনু মোড়ল দলের নেতা হয়ে সকলকে শেখাচ্ছে যে, সর্ব্বসাধারণের জীবনের মূল্য বাড়াতে হবে,—'চাই না চাই না' বল্লে চল্‌বে না; বল্‌তে হবে,"চাই চাই" "আয় বৃদ্ধি চাই।" পরিচালক, মহাজন, বৈজ্ঞানিক সকলেই সাধারণ শ্রমীর শত্রু। মহাজন কলের মালিক—চাষীদের যন্ত্রের সামিলে ব্যবহার করে লাভটা সব নিচ্ছে। পরিচালক মাঝখেকে হাত-চালাচালি করে সবটুকু ফুঁকে নেয়। বৈজ্ঞানিক তার জ্ঞানের গরিমায় নূতন-নূতন কল আবিষ্কার কর্‌ছে। দেখ্‌ছে শুধু তার নিজের সম্মানটা; শ্রমী-সাধারণের ভালমন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তার নূতন কলের সৃষ্টির ফলে কত কারিকর বরখাস্ত হোল। এ অবস্থায় চাই "শ্রমের দাবী।" কল শুধু মহাজনের নিজস্ব হবে না, প্রতি শ্রমজীবীই তার অংশীদার হবে। বল্‌তে হবে "চাই! কলযৌথ চাই"! পঞ্চম দৃশ্যে তাঁতিনীর চিত্রে এই সময়কার দারুণ দুরবস্থার আমরা একটা পরিচয় পাই। আমাদের দেশের বর্ত্তমান কৃষকসমাজ ও শ্রমী-সমাজের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা এ সমস্ত জায়গা পড়্‌লেই মনে হবে যে, দুরবস্থার একবিন্দুও কবিপ্রৌঢ়োক্তি নয়, কাল্পনিক নয়, অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। তার পরে ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখ্‌তে পাই যে, মহাজনের অর্থে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হয়েছে ব'লে, পরিচালক বৈজ্ঞানিকের কাছে দাবী কর্‌ছে যে, সে তার সমস্ত আবিষ্কারের রহস্য তাদেরই কাছে প্রকাশ কর্‌তে বাধ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ত কোনও যৌথ-ব্যাপার বা organised movement এর ফল নয়; সে যে প্রকৃতির বোধিস্বরূপ, কোটী-কোটী বৎসরের সাধনায় জড় আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য বৈজ্ঞানিকের আধারে চিন্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে ত কাহারও ভৃত্য হতে পারে না। জ্ঞান প্রকৃতিমাতার সাধনের ফল, জ্ঞান সকলের; তাকে টাকায়ও কেনা যায় না, ক্ষেত্তেও ফলান যায় না; সে স্বয়ংসিদ্ধ, সে সকলের। পরিচালক অনেক তর্কাতর্কির পর দেখ্‌লেন যে বৈজ্ঞানিককে যে, তিনি করতলামলকবৎ করিবেন, সে সাধ্য তাঁহার নাই। এর পরই সপ্তম দৃশ্যে দীনু মোড়ল ও বৈজ্ঞানিক-সংবাদ। সেখানে দেখ্‌তে পাই যে, দীনু মোড়ল বুঝ্‌তে পেরেছে যে, বৈজ্ঞানিক তার শত্রু; বৈজ্ঞানিক ও শ্রমী উভয়েই প্রায় এক ভূমিতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে তফাৎ এই যে, শ্রমী যেমন তার নিজের শ্রমের ফল নিজেই ভোগ কর্‌তে চায়, বৈজ্ঞানিক তা চায় না; সে চায়, তার শ্রমের দ্বারা যে সত্য দিন-দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে—সমস্ত পৃথিবী যুগ যুগান্তর ধরে তার ফলভোগ করুক। তার সম্পত্তিতে কাহারও কোনও মৌরসী স্বত্ব নাই। বৈজ্ঞানিকও শ্রমীপ্রধান দীনু মোড়লের সংসর্গে এসে বুঝ্‌লে যে, তার যে সাফল্য, সেটা ব্যক্তিত্বের সাফল্য। কাযেই, অভিজাতবর্গের মধ্যে তার কোনও স্থান নাই, শ্রমীদের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা। তখন সে দীনু মোড়লের কন্যার সহিত নিজের পুত্রের বিবাহ দিয়া উভয়ের মধ্যে রক্তসংসর্গ স্থাপন করিয়া উভয়কে আরও দৃঢ়ভাবে এক ভিত্তিতে আনিবার উদ্যোগী হইল। নবম দৃশ্যে দেখতে পাই যে, দীনু মোড়লের মেয়ে কামিনী শ্রমী-পল্লীর মধ্যে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে এই নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে শ্রমীদের গার্হস্থ্য-জীবন কি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে, তাই দেখ্‌ছে। স্ত্রীলোকের উপর পুরুষ কত অত্যাচার কর্‌ছে, অথচ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক তাহাদের ভাগ্যবন্ধনের অতুল সর্ব্বনাশের মধ্যে আপনাদিগকে বাঁধিয়া দিয়াছে। কামিনী দেখ্‌ছে যে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মধ্যে দুটো বিরুদ্ধ দিক্ রয়েছে; একটা হোল বিশুদ্ধ প্রেম, ভালবাসা, যুগল-সম্বন্ধ; আর একটা হোল Procreating instinct, Race preservation instinct। প্রথমটা উন্মুক্ত, স্বাধীন; দ্বিতীয়টী হোল সমাজের বিধায়ক। প্রথমটা ব্যক্তিত্বের চরম সফলতা, দ্বিতীয়টী সমূহের আত্মপ্রতিষ্ঠা। একদিকে দেখ্‌লে, বিবাহ ব্যক্তিজীবন; অপর দিকে, সামাজিক-প্রথা ও প্রতিষ্ঠা। দশম দৃশ্যে পরিচালক বৈজ্ঞানিককে হাত কর্‌বার জন্য আবার একটা বৃথা চেষ্টা করে, বিফল হয়ে, স্থির কর্‌লে যে, মহাজন, পরিচালক ও জমিদার এই তিনে মিলে ত্রিসন্ধি স্থাপন করে সমস্ত ব্যক্তিশক্তিকে জব্দ কর্‌বে। জমিদার দেবে জমি, মহাজন দেবে টাকা, পরিচালক যোগাবে বুদ্ধি। একাদশ হইতে ত্রয়োদশে কামিনীর মন কেমন করে বৈজ্ঞানিকের পুত্রকে ছেড়ে জমিদার-পুত্রে সংক্রামিত হোল, তারই একটি জীবন্ত ছবি দেখতে পাই। কামিনীর মধ্যে নারী-জীবনের ব্যক্তিত্ব চরম সফলতা লাভ করিয়াছে, সে নিজেকে আর-কিছুরই বাহন করিতে চায়; সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিকের পুত্রের যে কামিনীর সংসর্গলোভ, সেটা শুধু শ্রমের মাহাত্ম্যের অনুরোধে, কামিনীর অনুরোধে নয়। কামিনী চায় এমন একজন, যে শুধু তার জন্যই তাকে চাইবে; তাই সে আলগা হয়ে জমিদার-পুত্রের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নর-নারীর যুগল সম্বন্ধ সার্থক করিতে উদ্যত হইল। চতুর্দ্দশ দৃশ্যে পরিচালক-সম্প্রদায় ও শ্রমী-সম্প্রদায়ের দারুণ বিরোধে দেশের দুর্গতি এবং বিরোধ কি করে মেটান যায়, সে সম্বন্ধে ত্রিসন্ধির পরামর্শ। পঞ্চদশ দৃশ্যে জমিদার-পুত্র ও কামিনীর ব্যক্তিত্বের সন্ন্যাস। ষোড়শ দৃশ্যে আবার পরিচালক-দীনু-মোড়ল-সংবাদ। পরিচালক দেখছে যে, ব্যক্তিত্বের দিক্ থেকে একটা সাহায্য না পেলে ব্যক্তিত্বকে জব্দ করা দুরূহ। একবার সে বৈজ্ঞানিককে হাত কর্‌তে চেষ্টা করেছিল; বলেছিল, তোমার পরীক্ষাগার প্রভৃতি

সবই আমরা করে দিয়েছি, তোমার শক্তি আমাদের সাহায্যে নিয়োগ কর; কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। এবার সে দীনু মোড়লকে বোঝাতে চায় যে, সে শ্রমীরই বন্ধু। জমিদার ও মহাজন বসে-বসে লাভ করবে, আর শ্রমীরা অনাহারে মারা যাবে—এ সে কখনই সহ্য করতে পারে না। শ্রমীর পক্ষ হতে শ্রমজীবি সমিতি দাবী করুক যে, একটি নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর যখনই কারখানায় বা কারবারে লাভ লাভ হবে, উদ্বৃত্ত অংশ শ্রমীদের মাহিয়ানার অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে। সে এ প্রস্তাবের পরিপোষণ করে শ্রমীদের প্রতি তার বন্ধুত্ব দেখাতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দীনু মোড়ল তাতে রাজি হোল না; কারণ সে চায়, যৌথ-কারবারে শ্রমীদের অধিকার, শ্রমীদের স্বত্ব। লাভ লোকসান করান ত পরিচালকের হাতে। কাযেই লাভ লোকসানের সঙ্গে তারা তাদের ভাগ্যসূত্র বেঁধে দিতে চায় না। ওরকম করতে গেলেই, তারা সকলে গিয়ে জমিদার ও মহাজনের সহিত পরিচালকের হাতে গিয়ে পড়বে। দীনু মোড়ল চায় প্রজাশক্তির জয়, ব্যক্তিশক্তির জয়।

তৃতীয় অঙ্ক হচ্ছে, ধর্ম্মরাজ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের Synthesis নাট্যের নির্বহণ সন্ধি বা Return. এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা ও মন্ত্রী সংবাদ। ত্রিসন্ধির সহিত শ্রমী সম্প্রদায়ের বিরোধে, মন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন যে, পাছে এই বিরোধ এসে রাজশক্তিকে আশঙ্কিত করে তোলে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই যে, উভয় দলে যে দাঙ্গা করবার উপক্রম হয়েছিল, সেটা একজন সন্ন্যাসী এসে কি এক নূতন ধর্ম্মে তাহাদের মৈত্রী স্থাপন করে দিয়ে মিটমাট করে দিয়েছেন। সকলে আহূত হয়ে রাজদরবারে দাঁড়িয়েছে। দীনু মোড়লের মুখ দিয়ে প্রথম এই নূতন ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রকাশিত হোল। সে বল্লে, সাগর যেমন সর্ব্বসাধারণের, অন্নময়ী পৃথিবীও তেমনি সর্ব্বসাধারণের; সকলেরই সমান অধিকার, সমান দাবী। মাটী রাজার দখলে, এবং রাজার দখলে থেকেই তা সর্ব্বসাধারণের দখলে থাকবে। যে সন্ন্যাসী সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি এসে সমস্ত সন্দেহ পরিষ্কার করে দিয়ে বল্লেন যে, সমাজের মধ্যে রাজা, কৃষক, পরিচালক, মহাজন প্রভৃতি যারা-যারা আপন আপন অধিকার নিয়ে মারামারি করবার উদ্যোগ করচে, এদের কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ আপন অধিকার বজায় রাখিতে পারে না। প্রত্যেকের জন্যই প্রত্যেকে আবশ্যক। রাজা চাষ করতে পারেন না; সেখানে কৃষক নইলে তাঁর চলে না। চাষী যদি জমি না চষে, শ্রমী যদি কলে না যায়, তবে রাজার রাজপদ কোথায় থাকে? রাজকর্ম্মে যেমন প্রজা পারদর্শী নয়, তেমনি জগতের যত শ্রম, যত কলা, বিজ্ঞান—এ সমস্ত বিষয়েও রাজা পারদর্শী ন'ন। রাজার অযোগ্যতা প্রজা বহন করে, প্রজার অযোগ্যতা রাজা বহন করেন। যত কর্ম্ম-অকর্ম্ম, আশা-নিরাশা, বন্ধন-মুক্তি জগতে বর্ত্তমান, তাহার প্রত্যেকটিতেই প্রত্যেকের অংশ আছে, প্রতি মানব দিয়েই প্রতি মানবের বিকাশ। শুধু ভগবৎ-প্রদত্ত স্বীয় ধর্ম্ম ও কৌশল, স্বীয় বাহুবল ও মস্তিষ্কই যে তার, আর বাকী জগতটা যে অপরের—এ ধারণা ভুল। সকল মানব নিয়ে এক বিশ্বমানব আছেন। সেই বিশ্বমানবের সিদ্ধিতেই সকলের সিদ্ধি, তাঁর অসিদ্ধিতেই সকলের অসিদ্ধি। অতিমানব আকাশের দিকে ছুটলেও তার ভিত্তি একবিন্দু মাটী। তাই মানবের অধিকার অতিমানব হওয়ায় নয়, বিশ্বমানব হওয়ায়। এই বিশ্বমানবের সিদ্ধির জন্য জড় ও চিৎ, কর্ম্মজীবন ও জ্ঞানের আদর্শ উভয়ে পরস্পরে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া ছুটিয়াছে। কর্ম্ম জ্ঞানের আদর্শকে ধরিতে পারে না, অথচ তাহাকেই ধরিতে ছুটিয়াছে। তার যে অশক্তি, তার যে এই "পারি না,"—ইহাই তাহাকে অসীমের দিকে টানিয়া লয়। যাহা পারি, তাহা অল্প; যাহা পারি না, তাহা ভূমা। এমন করিয়া সমস্ত মানবপ্রাণ একটা পরম আদর্শের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই বিরাট্ অভিযানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহায়, প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই প্রত্যেকের সাফল্য।

চাষী, জমিদার, রাজা—প্রত্যেকেই সেই বিশ্বমানবের রূপ। সকলের ব্যক্তিগত অধিকার রাজার কাছে ফিরে গিয়ে, আবার রাজাপ্রজা সকলেই মাটীর উপর সমান অধিকার পেল। কাহারই একচেটিয়া কিছু নাই। জমি কোন জমিদারের নয়, সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। জমিদারি উত্তরাধিকার-সূত্রে সংক্রামিত হবে না। যে যোগ্যতম, তাঁকেই রাজা জমিদারী দিবেন। যে আপন শ্রম ও দক্ষতায় জমি চষবে, জমি তার কাছে গচ্ছিত থাকবে। প্রতি চাষীই হবে ভূস্বামী ও মহাজন, জমিদার ও ভূস্বামী। সকল চাষীর প্রতিনিধি ও তত্ত্বাবধারক হিসাবে তাঁর স্থান। তাঁর কর্ম্ম হচ্ছে, সকল চাষীর সুখ-সুবিধা দেখা, তাদের উন্নতি-বিধানে সহায় হওয়া। চাষীর কর্ম্ম মা অন্নপূর্ণার চাষ! জমি কাহারও নয়—তাহা অন্নপূর্ণার "দেবত্র"। কি চাষী, কি জমিদার, কি রাজা, সকলেই তাঁর সেবায়েৎ মাত্র। শ্রমীর প্রতিনিধি পরিচালক। তিনিই শ্রমীর পক্ষ থেকে দাবী করবেন। বিশ্বমানবের দেবত্রে একস্বামিত্ব ও বহুস্বামিত্ব যুক্ত হয়ে গেছে। বিশ্বমানবই বিশ্বকর্ম্মা, বৈজ্ঞানিক, শ্রমী, পরিচালক;—প্রত্যেকেই বিশ্বকর্ম্মার ভিন্ন রূপ। ধনী হিসাবে মহাজনের কলে স্থান নাই; তবে কলের আয়-ব্যয় যে তত্ত্বাবধান করবে, সেই একজন অংশীদার; তিনিই নূতন ব্যবসায়ে মহাজন। নবযুগে অকর্ম্মীর কোনও স্থান নেই। জমি, সঞ্চিত ধন, বা শ্রমশক্তি জনসাধারণের ব্যবহারে না যোগাইয়া কাহারও একাধিকার স্বত্বে ভোগের অধিকার নাই। এমন সময় রাণী এসে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে, নারীত্বের প্রতিনিধি হয়ে, স্নেহের দিক থেকে, দয়া ও মমতার দিক থেকে, মানব-সমাজে কর্ম্ম ছাড়াও যে একটা প্রেমের দাবী রয়েছে,—সেইটি জানিয়ে গেলেন। শুধু কর্ম্মের দাবী যদি স্বীকার করবে, তবে অকর্ম্মীর কি হবে? শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন পঙ্গু, অনাথ, অক্ষমের কি হবে? তাদেরও ত বিধান চাই! নইলে সমাজ কেমন করে পূর্ণ হবে? দৃশ্যটির শেষে রাজা বলচেন,—"এ মুকুট আমার নয়—বিশ্বমানবের। আমার রাজ্য দেবোত্তর, আমার সন্তান-সন্ততি নাই। ভবিষ্যতে প্রজাসমিতির নির্ব্বাচিত ব্যক্তিই এই পদে সেবায়েৎ নিযুক্ত হবে। পরের দুটি দৃশ্যে

মহাজন, জমিদার পুত্র ও মন্ত্রী—যে তিনজনের এই বিশ্বমানব-সম্প্রদায়ে স্থান হোল না, তাঁরা এসে তাঁদের দিক থেকে এই ব্যাপারের অপূর্ব্বতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ও সেই সঙ্গে বাস্তবিক নাট্যাংশের শেষ হয়ে গেল।

সাধারণ নাটকের আখ্যায়িকাভাগের সঙ্গে এর আখ্যায়িকাভাগের একটু তফাৎ আছে। এখানে যে ঘটনা লইয়া নাটকের পাত্র পাত্রীর চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্যান্য নাটকের বর্ণিত প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য-ঘটনাবলীর অনুরূপ নয়। কোন যুদ্ধ বা রাজবিদ্রোহ নাই, কোনও প্রণয়ী-প্রণয়িনীর অভিশপ্ত প্রণয়-কাহিনী নাই; ধনীসমাজের কলঙ্কময় জীবনের ছবি দ্বারা একটা সামাজিক প্রতিকৃতি দেওয়ার কোনও চেষ্টা নাই। কাজেই, সাধারণ নাট্যের আখ্যানভাগের সহিত ইহার আখ্যানভাগের প্রভেদটুকু সহজেই চোখে পড়ে। অন্নের জন্য পৃথিবীর মধ্যে যে সার্ব্বজনীন্ বিরোধ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, তাহারই বর্ত্তমান-কালের একটি ছবি দেওয়াতেই ইহার সার্থকতা। সকল রকমের নাটকই কোনও-না কোনও রকমের বিরোধকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গড়িয়া উঠে। তবে অন্যান্য নাটকের বিরোধগুলি, রাজ্যলোভ, ধনলোভ, দেশরক্ষা, সামাজিক সজ্ঘর্ষ বা নায়ক-নায়িকার বিঘ্নিত প্রেম লইয়াই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এখানে প্রাণশক্তির আদি সঞ্চারক অন্নকে লইয়া সমাজের বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষরূপে যে বিবাদ প্রত্যহ চলিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই কাব্যখানি গঠিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের ন্যায় বর্ত্তমান যুগে শুধু instinctএর বিরোধই মানুষের সামনে বড় হইয়া দাঁড়ায় নাই, আরও নানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকমের বিরোধ রহিয়াছে, মানুষের দৃষ্টি দিন-দিনই সেগুলির দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রবীন্দ্রবাবুর রাজা প্রভৃতি নাট্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিতও ইহার পরিচয় ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানকালের সমস্ত নাট্য-সাহিত্যে নূতন-নূতন বিরোধের আবিষ্কারের দিকে যে প্রবণতা রহিয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে "দেশোত্তর বিশ্বনাট্যে"র নূতনত্বটুকুকে আর তেমন আকস্মিক বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। অথচ এই সমস্ত বর্ত্তমানকালের নাট্যের ভাবপ্রবণতা বা idealism যে দিকে ছুটিয়াছে, তাহারই ছাঁচেই যে বইখানা ঢালা হয়েছে, এমনও বলা যায় না; কারণ, এই যে নাট্যটি একদিকে যেমন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের সন্ধিকালে লিখিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে এটি যেন বর্ত্তমান যুগের নাট্যসম্প্রদায় ও অতীত যুগের নাট্যসম্প্রদায়—এই উভয়ের একটি অনির্ব্বচনীয় Synthesis. কারণ অন্নের আকাঙ্ক্ষা ও তাহার স্বাধীন অধিকার লইয়া মানুষের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে,—সেটি কি রাজ্য লাভ, কি বিজয়লিপ্সা, কি প্রেম,—কোন instinctএর চেয়েই কম বলবান্ নয়। বলিতে কি,ইহাই মানবের আদি instinct—সহজমূঢ় প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" বা "ডাকঘর" কাব্যে যে আকাঙ্ক্ষার চিত্র রয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষা ত সকলের মনে উদয় হয় না; কাযেই তা চিরকালই সহৃদয় ব্যক্তিবিশেষের উপভোগের সামগ্রী হয়ে থাকবে। কিন্তু এই নাটক যে অন্নের সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য স্বাভাবিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত এবং সেই হিসাবে প্রাচীন কালের নাটকের সগোত্র; অথচ এই বিরোধের [illegible] "দেশোত্তরের" মধ্যে এসে যে ভাবে গড়ে উঠেছে, সেটী সম্পূর্ণ [illegible]নক। ইহার বিরোধ ও পর্য্যবসানের মধ্যে প্রাচীন ও বর্ত্তমান [illegible]লের নাট্যসম্প্রদায়ের মূলসূত্রদ্বয় একত্র গ্রথিত হইয়াছে এবং সেই হিসাবেও ইহার 'বিশ্বনাট্য' নামটি সার্থক হইয়াছে। ইহার বাহ্যিক চেহারা অনেকটা গ্রীক্ Trilogyর মতন; কিন্তু ইহার ভিতরটা একেবারে দেশী। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতে এ শ্রেণীর কোনও নাট্য ছিল না। কিন্তু নাট্য বলতে তাঁরা যা বুঝতেন, তার যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তার কোনটিরই এখানে অভাব নাই। লোকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যের অবলম্বনীয় বিষয় বদলে যায়; কিন্তু বিষয় নিয়ে ত নাট্যের নাট্যত্ব নয়, বিষয় নিয়ে নাট্যের যে ভেদ সেটা প্রকারভেদ মাত্র। আমাদের দেশের নাট্যের ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই যে, সমাজের অবস্থার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে কত বিভিন্ন প্রকারের নাট্য গড়ে উঠেছিল। ভাণ, সমবকার, বীথি, অঙ্ক ঈহামৃগ, ডিম, নাটক, প্রকরণ, নাটিকা, প্রহসন। যে অবস্থার অনুকরণের মধ্যে একটি মূল ঘটনা রসের সহিত ধীরে-ধীরে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিত, তাহাকেই আমাদের দেশের প্রাচীনেরা নাট্য বলিতেন। এই প্রাচীন লক্ষণানুসারে এই নাট্যখানি আমাদের দেশীয় নাট্যেরই অনুরূপ। অন্ন লইয়া চাষী ও শ্রমী সম্প্রদায়ের সহিত পরিচালক ও মহাজন প্রভৃতির যে বিরোধ, তাহাই ইহার মূল আধিকারিক বস্তু। রঘু ও কবিদাদা-সংবাদ, কামিনী জমিদারপুত্র-সংবাদ প্রভৃতি ইহার সহায়ক, প্রাসঙ্গিক বস্তু। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জমিদার ও মহাজনের আলাপে ইহার "মুখ"-সন্ধি, দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে প্রথম অঙ্কের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাতেই ইহার "প্রতিমুখ"সন্ধি, সমস্ত দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়িয়া "গর্ভসন্ধি" ও তৃতীয় অঙ্কে "নির্ব্বহণ"-সন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্নের জন্য আকাঙ্ক্ষা, তাহার অধিকার লইয়া বিবাদ, ও সেই সজ্ঘর্ষের উৎকট ফল, সকল লোকেরই অনুভবসিদ্ধ। কাযেই আধুনিক Idealistic নাটকগুলির মতন বিষয়ের লোকোত্তরত্বপ্রযুক্ত এখানে রস প্রতীতির কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই। নানাদিক হইতে নানা ধারা আনিয়া একটি মূল ধারাকে সকলের সম্মুখ দিয়া লেখিকা এমন বিমল ও মধুরভাবে বহাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার সুধাস্নিগ্ধ আস্বাদে অনেকেই বঞ্চিত হইবেন না।

যে ঘটনাটি লইয়া নাট্যটি আরম্ভ হইয়াছে, সে ঘটনাটি পৃথিবী জুড়িয়াই নানাভাবে চলিয়াছে; আমাদের দেশেও যে তাহার অভাব আছে, তা ত নয়ই; বরং আমাদের দেশেই সমস্যাটা সমধিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ এ নাটকে দেখান হইয়াছে যে, স্বদেশের কলকারখানার ক্ষুদ্র যৌথ-আয়োজনে, শ্রমজীবীরা মারা যাইতেছে—তাঁতীর তাঁত নষ্ট হইতেছে, এবং আমরা বিদেশের যৌথ-আয়োজনে মারা যাইবার দশায় দাঁড়াইয়াছি। আমরা এখন একদিকে চাই

আমাদের শ্রমী সম্প্রদায়ের উন্নতি; অন্যদিকে চাই নিজেদের যৌথ-কারবারে কৃতকার্য্যতা। কাযেই, এই নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর প্রতিই আমাদের একটি সহজ সহানুভূতি জন্মিয়াই রহিয়াছে। কাযেই, এ বিষয় লইয়া যে কোন তর্ক উঠিবে এরূপ মনে হয় না। তবে কেহ-কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যেভাবে সাম্যতন্ত্রটি সম্পন্ন করা হইল, এটা সম্পূর্ণই Utopian এবং অসম্ভব। এ কথার উত্তরে একদিকে বলা যায় যে, "অসম্ভব" হইলেই বা ক্ষতি কি? প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ত কবির কায নয়; যে বিষয়টি মানুষের মনে স্বতঃই উঠিয়া থাকে, সেইটিকে রসে পূর্ণ করে, হৃদয়গ্রাহি করে, আনন্দপ্রচুর করে, মানুষের ভোগের সম্পদ করে তোলাই কবির কায। এ কাযে যদি কবি সফল হয়ে থাকেন, যদি তিনি এই দেবতন্ত্র-বিধানের রসমাধুর্য্যে আমাদের মনকে প্রলুব্ধ করে থাকেন, তা হলেই তিনি আপ্তকামা হয়েছেন এবং আমরাও ধন্য হয়েছি। কিন্তু বর্ত্তমান কাব্যখানিতে আমরা দেখতে পাই যে, লেখিকা যে শুধু কবি, তা ন'ন; তিনি যেমন কবি, তেমনই তত্ত্বদ্রষ্টা; এবং তিনি যে একটি কল্পনার সাম্যমৈত্রী সংস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন, সেটি একেবারে অসম্ভবও নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জাতিবিশেষে ঠিক্ সর্ব্বাংশে এই রকম না হোক্ এই উপায়েই সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও শান্তির বিধান হয়েছে। নবোদিত অরুণের ন্যায় জগতের বিস্মিত দৃষ্টিকে তারা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। আমি জাপানের কথা বলছি। জাপানের নবোন্মেষের ইতিহাসের গোড়াতেই আমরা দেখতে পাই যে, যে সমস্ত জমিদার (Feudal Lords) সহস্র-সহস্র প্রজাবর্গের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত অধিকার রাজার নিকট প্রত্যর্পণ করলেন। বল্লেন, চাই না আমাদের অধিকার; রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁর নূতন বিধানে তার বিভাগ করে দিয়ে দেশের মধ্যে সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করুন।

* "The young reformers induced the feudal chiefs of Satsuma, Chosier, Tosa and Hizen, four most powerful classes in the south, publicly to surrender their fiefs to the Emperor praying his Majesty to reorganise them, and to bring them all under the same system of law......Out of the whole 276 feudatories, only seventeen hesitated to imitate the example of the four southern fiefs.........Thus the first steps taken after the surrender of the fiefs were to appoint the feudatories to the position of governors in the districts over which they previously ruled.".........

এই পর্য্যন্ত দেখতে পাই যে জমিদারদের, তাদের স্ব স্ব জমিদারীর শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা হোল; কিন্তু তার পরই দেখতে পাই, নূতন বিধানে সেটুকুও তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হোল—

'On August 1871 an Imperial Decree announced the abolitions of the system of local autonomy and the removal of territorial nobles from the posts of governors; all officials were to be appointed by the Imperial Government.........As for the feudal chiefs, who had now been deprived of all official status and reduced to the position of private gentlemen, without even a patent of nobility to distinguish them from the ordinary individuals, they did not find anything specially irksome or regrettable in their altered position," শুধু তাই নয়; এদিকে সামুরাইরা অনেকেই বংশানুক্রমে রাজসরকার হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন, কেহ কেহ বা জীবনব্যাপী বৃত্তি বা life-pension ও পাইতেন। কিন্তু এ রকম থাকলে ত রাজকোষের অর্থহানি হয় এবং প্রজাবর্গের মধ্যেও সাম্য সংরক্ষিত হয় না; তাই সামুরাইরা নিজ হইতেই শ্রম-জীবন আরম্ভ করিবার মত সামান্য অর্থ-বিনিময়ে সমস্ত বৃত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। "By degrees public opinion began to declare itself with regard to the Samurai. If they were to be absorbed into the bulk of the people and to lose their fixed revenues some capital must be placed at their disposal to begin the world again. The Samurai themselves showed a noble faculty of resignation. Many of them voluntarily stepped down into the company of the peasant or the tradesman and many others signified their willingness to join the ranks of common bread-winners if some aid were given to equip them for such a career. A decree announced in 1873 that the treasury was prepared to commute the pensions of the Samurai at the rate of six years' purchase for hereditary pensions and four year's for life-pensions – one half of the commutations to be paid in cash and one half in bonds bearing interest at the rate of 8 per cent. Reducing this to arithmetic, it will be seen that a perpetual pension of £10 would be exchanged for a payment of £ 30 in cash together with securities giving an income of £2. 8s. and that a £ 10 life-pensioner received £ 20 in cash and securities yielding £1. 12s annually. It is to be noted, however, that the Government's measures with regard to the Samarai were not compulsory. Men laid aside their swords and commuted their pensions at their own opinion. যে নূতন রাজা হইলেন, তিনিও রাজস্ব

* From the "Historians' History of the World."

গ্রহণের সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি রাজধর্ম্মের অপব্যবহার করিবেন না, এবং প্রজা-সাধারণের মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। "The youthful sovereign was made to say, that wise counsels should be sought, and all things determined by public discussion."............In other countries such concessions were always the outcome of long struggles between the ruler and the ruled. In Japan the Emperor freely divested himself of a portion of his prerogatives and transferred them to the people............Freedom of conscience of speech and of public meeting, inviolability of domicile and correspondence, security from arrest or punishment except by due process of law, permanence of judicial appointments, and all the other essential elements of civil liberty were guaranteed. Without the consent of the diet, no tax could be imposed, increased or remitted; nor could any public money be paid out except the salaries of officials which the sovereign reserved the right to final will." এমন কি বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থের বশবর্ত্তিতায় ও রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন মতের পরিপোষকতায় যে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারা পরস্পরের মধ্যের হিংসা, দ্বেষ, মতভেদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পরম মৈত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এক মিত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলে মিলিত হইল। "They actually dissolved their party (Aug. 1900) and enrolled themselves in the ranks of a new organisation which did not even call itself a party, its designation being Rikken Seiyu Kai (Association of the friends of the constitution)। ধন্য জাপান, ধন্য তোমার স্বদেশ-হিতৈষণা! এ যদি সম্ভব হইল ত "দেবত্র বিশ্বনাট্যের" নাট্য-সাধনায় কি এমন অসম্ভাব্যতা রহিল?

এখন আর-একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই যে ব্যক্তিস্বার্থ ও সঙ্ঘস্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ে উভয়ে আপন-আপন স্বার্থ পরিহার করিয়া একটি সাম্যের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল, ইহাতে ব্যক্তিত্বের দাবী মিটিল কই? ব্যক্তিত্বের যে দিকটা অন্যের সহিত রফা করিতে রাজি হয়, সেটা ত বাস্তবিক ব্যক্তিত্বই নয়। ঐ যে আজন্ম-ব্যক্তিত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দীনু মোড়ল, তার সম্প্রদায়ের সুবিধার খাতিরে কন্যা কামিনীর সহিত বৈজ্ঞানিকের পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে দেখতে গেলে, সেটা ত এক রকম আত্মদ্রোহিতা—ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জন। কাযেই "দেবোত্তরের" মধ্যে সকল বিরোধ পরিহার করা সম্ভব হইলেও, ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে, তাহাকে কোন ক্রমে পরিহার করা যায় না। সে চায় আপন অবাধ মুক্তি,—এ রকম রফার বন্ধন ত তার পক্ষে উদ্বন্ধনতুল্য। বস্তুতঃ, লেখিকারও ইহাই অভিমত বলিয়া মনে হয়। তিনি এই দেবত্রের বাহিরে কামিনী ও জমিদার পুত্রের মিলন-সাধন করাইয়া, নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজেই সমালোচনা করিয়াছেন। কামিনী ও জমিদার-পুত্রের প্রণয় সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক ঘটনাটির মূল আধিকারিক ঘটনার সহিত অঙ্গ হিসাবে কোনও যোগ নাই; কাযেই, সে ভাবে দেখিলে, এটিকে নাট্যের অনুপযোগী অনর্থক বস্তু-বিন্যাস বলিয়া সাধারণতঃ মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহার মূল তাৎপর্য্য হচ্ছে, লেখিকার নিজের সমাধানের উপর তাঁর একটি তীব্র শ্লেষ প্রকাশে। এটিকে এই ভাবে বসিয়ে লেখিকা যে কি অদ্ভুত নিপুণতা ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সমাজের গতির সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের সমস্যাগুলিরও জটিলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। তাহাদের পরিপূরণের জন্য যে কোনও রকমের সমাধানই উপস্থিত করি না কেন, তাহার ভঙ্গের কারণটিও ঠিক তেমনি ভাবেই গুরুতর হইয়া তাহার ধ্বংস-সাধন করিবে। এই ভাঙ্গা-গড়া লইয়াই জগৎ চলিয়াছে। চিরকালই সমাজের রথ ছুটিয়া চলিবে; চিরকালই কালধর্ম্মে নূতন-নূতন সমস্যা, নূতন-নূতন বাধা আসিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবে; চিরকালই মানুষ নূতন-নূতন সমাধানে বিপদ উত্তীর্ণ হইবে। এই শেষ সমাধান করিলাম, ইহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, ইহা বলিয়া কোনও কালেই কেহ বিশ্রাম করিতে পারিবে না। একদিকে দেখিলে সত্যকে যেমন আপাততঃ এক বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে দেখিলে বুঝা যায়, সেইসত্যই বহুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাযেই আমরা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে,—যে সত্যকে একের মধ্যে পাইয়াই তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করে, সে তাহাকে পায় নাই। সত্যের অনন্ত মুখকে কেহ একের মধ্যে শেষ করিতে পারে না। হে এক! তোমাকেও নমস্কার, হে অনন্ত অসংখ্য! তোমাকেও নমস্কার! তোমাদের উভয়কে কেহ সম্মিলিত করিতে পারিবে না।

এই এক ও বহুর লীলা মানুষের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যুগ-যুগান্তর ধরে নানা তরঙ্গ তুলে মানুষকে বিভোর করচে। মানুষ যখন একের দিকে চায়, তখনই ভাবে একই সত্য; যখন বহুর দিকে চায়, তখন মুগ্ধ হয়ে যায়; ভাবে,—এর চেয়ে আর সত্যসুন্দরের প্রত্যক্ষ রূপ কোথায় দেখ্‌তে পাব? যখন উভয়ের দিকে চায়, তখন একবার ভাবে,—"এক" থেকেই বহু হয়েছে; আবার ভাবে,—"সমস্ত বহুই ত সেই একে গিয়ে মিলেছে।" এক থেকে বহুতে এবং ও বহু থেকে একে, মানুষ অনবরত আবর্ত্তিত হচ্ছে। এই আবর্ত্তনই তার স্বভাব, ইহাতেই তার চরম সার্থকতা। এই যুগল রূপের মধ্যেই সত্যের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই এর কোনটির মধ্যে কোনটির সমাপ্তি নাই। পুনঃ-পুনঃ একের মধ্যে বহুতে, আবার বহুর মধ্য দিয়ে একে ফিরিয়া আসা চাই, নচেৎ পরিতৃপ্তি নাই। তাই একের অরূপকে আমরা বহুর বিচিত্র রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চাই। আবার সেই বহুর মধ্য দিয়ে সেই "একে" ফিরে যেতে চাই; এবং এই ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু

নূতন সঞ্চয়ও করে নিতে চাই। এমনি করে প্রতিবারই আমাদের "চাওয়াটি" "পাওয়ার" মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়ে না গিয়ে, প্রতিবারই নূতন নূতন "পাওয়ার" মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ স্ফুটতর ও বিশিষ্টতর হয়ে ওঠে। এম্‌নি করে যুগ-যুগান্তর ধরে "চাওয়ার" শতদলটি, সহস্রদল, কোটিদল হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে; এবং তাতে সমস্ত জীবব্যাপার সার্থকতা লাভ করচে। এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার লেখার মধ্যেও আমরা ঠিক এম্‌নি একটি "চাওয়ার" ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি। "বসন্ত প্রয়াণে"র বাসন্তীরঙে মনপ্রাণ ছুপিয়া, লেখিকা যখন জগতের সমক্ষে প্রথম আপনাকে প্রকাশ করেন, আমরা দেখেছি যে তাঁর ভিতর দিয়ে একটি দক্ষিণা বাতাস ধীরে-ধীরে বয়ে যাচ্ছে; এবং প্রতি স্পর্শে তাঁর হৃদয়ের রন্ধ্রে একটি গীতধ্বনি বেজে উঠ্‌ছে। "এক ও দুই"এর মধ্যে একটি অব্যাহত প্রেমলীলা, পরস্পরের দান প্রতিদানের প্রাণময় ব্যাপারে আপনাকে সার্থক করিতেছে।" এই ছিল সে গানের মূল সুর। এই বিরাট আকাশে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের চক্রচারী নৃত্যের প্রতি পাদক্ষেপে তিনি এই প্রেমের সুরটি শুনিয়াছেন। প্রতি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মধ্যে ইহারই প্রকাশ অনুভব করিয়াছেন। দেখিয়াছেন যে জ্ঞানে, অজ্ঞানে, একটি প্রেমের নিষ্কাম লীলা নানা গতিভঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেখানে "বিশ্বের পথে"র বিশ্বমাতার মাতৃশক্তির সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, সন্তানের উপর নিজের কিছুমাত্র দাবী না রাখিয়া যে স্নেহরসে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অবিরাম, অজস্র বর্ষণেই বিশ্বমাতার মাতৃশক্তি আপ্তকাম হইয়াছে। সন্তানের কাছে কিছুই চাইব না, কেবলই তাহার জন্য ত্যাগ করিব, এই বাসনাতেই বিশ্বমাতার মাতৃত্বের সন্ন্যাস। আবার "বিশ্বাতীতের পথে"র মধ্যে এক অদ্ভুত প্রেমের বিবর্ত্তবিলাসের মধ্যে আমাদের ভিতরে প্রত্যাগাত্মস্বরূপে বিশ্বশক্তির প্রতিরূপ যে একটি আত্মপ্রত্যয় ও দ্রষ্টৃস্বরূপে যে ক্ষুদ্র আর-একটি আত্মপ্রত্যয় রহিয়াছে,—এই উভয়ের মিথুন ভাবকে উপলব্ধি করিয়াছেন। "আমি" ও "বঁধু"র লীলারস বিচিত্র ধারায় পান করিয়াছেন। বঁধুর সহিত অদ্বয় সম্পর্কে এক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই যে প্রেমের প্রথম স্পর্শে জগৎময় একটি অব্যক্ত প্রেমের "আকাঙ্ক্ষা" মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে, এ চাওয়ার মধ্যে শক্তি আছে, বেগ আছে, কিন্তু রূপ নাই। যতটুকু রূপ আছে, সেটুকুও আত্মার রূপ, বিশ্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। তাই, এই যে প্রেমের প্রথম "চাওয়া", এটি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আপনার মধ্যে পাক খাইয়াছে, বাহিরে যাইতে পারে নাই। বঁধুর সহিত অদ্বয় হইয়াছে, আবার প্রাণশক্তির তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুর মধ্যে কোনও বিরোধকে প্রত্যক্ষ করে নাই বলিয়া ইহার নাট্য-ব্যাপারের মধ্যে সন্ধির ক্রমবিকাশ নাই। Trilogyর মতন আকার থাকিলেও এটি নাট্-হিসাবে "ভান" বা "Monologue" জাতীয়।

প্রেমের প্রথম প্রাণনায় আপনার মধ্যে যে আবর্ত্তটির সৃষ্টি হইল, সে যখন আপনার মধ্যে আপনাকে পাইয়া তৃপ্ত না হইয়া বাহিরে আপনাকে দেখিতে চাহিল, তাহারই প্রথম স্তরে "ত্রিবেণী-সঙ্গমের উৎপত্তি।" ত্রিবেণী-সঙ্গমে লেখিকা বুঝিয়াছেন যে, এক ও দুইয়ের মধ্যে যে লীলা, তাতে গভীরতা আছে, ব্যাপ্তি নাই; তৃতীয় ছাড়া কিছুরই বিস্তৃতি হইতে পারে না। তৃতীয় আছে বলিয়াই তাহার সম্পর্কে এক ও দুইয়ের স্ফূর্ত্তি সম্ভব। দর্পণদ্বয়গত বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ধারার মত এক লোকাতীত অদ্বৈতের, ভগবান ও জীবের মধ্যে রূপ ও প্রতিরূপ দেখিয়া উভয়ের ভবলীলা সম্ভোগ করিয়াছেন। আবার ব্যষ্টি সৃষ্টির দিক দিয়াও "বিচিত্র বিশ্বধারার সহিত অন্তরের আদর্শের সামঞ্জস্যে দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্ব পরম্পরার মত একটি জীবনধারার সৃষ্টি চলেছে।" "বসন্তপ্রয়াণের" বসন্তের মত এটা অবিমিশ্র প্রেম ও আনন্দের বসন্ত নয়। নবীন চেতনা ও জাগরণের বসন্ত। তাই এখানে প্রেম শুধু আত্মরসে, আত্মসম্ভোগে তৃপ্ত নয়। সে চায় আত্ম-সার্থকতা। তিনি ছাড়া সার্থকতা নাই। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম সন্তানে সার্থক, ভ্রাতা ভগ্নীর প্রেম পিতামাতায় সার্থক। কাযেই দুইয়ের প্রেম-গ্রন্থির সম্পূর্ণতার জন্য তৃতীয় আবশ্যক। মায়া ও যোগমায়া উভয়েই জীবের নিত্য সহচরী জীবের সাহচর্য্যেই উভয়ের সার্থকতা ও তাহাদের সাহচর্য্যেই জীবের সার্থকতা। তিনের সঙ্গমেই রসমূর্ত্তি সম্পূর্ণ হয়; পৃথগ্‌ভাবে তাদের মধ্যে কেবল অপূর্ণতা ও দৈন্য। যেখানে কেবল দুই, সেখানে একটি মাত্র যুগ্ম একটি মাত্র রস। যেখানে যুগ্মের সম্পর্কে তৃতীয় আছে, সেখানে কোনও-না-কোনও ছাঁদে দুই-দুই করিয়া তিন যুগ্ম, তিন রস সম্ভবপর হয়। আবার তিন রসে তিন যুগ্ম রস; আবার তাহা হইতেও তিন। এইরূপে তিন-তিন অনন্ত ধারায় চলিতে থাকে। এ বিগ্রহের কোনও একটি রসমূর্ত্তি হয় বিম্ব, অপর দুইটি যেন তার দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ তিনেই অসংখ্যের বীজ।

কিন্তু এই যে প্রেমের রূপলাভের ও বহু হইবার চেষ্টা, তিনের মধ্যে ত ইহার প্রতিষ্ঠা নাই, তিনের মধ্যে আসিয়া সে কেবল দেখিতে পায় যে এই পথেই বহুত্বের সাধনা সফল হবে। কিন্তু এখানেও ত বহুত্বের আরম্ভ নাই। এখানে শুধু বহুত্বের বীজ। কাজেই এ স্তরে শুধু "বহুত্বে"র জন্য চাওয়াটি একটি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া স্ফুট হইয়া উঠিল মাত্র, সার্থক হইতে পারিল না। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমবেদনা কেবল মাত্র "ত্রিবেণী"তে আসিয়াছে, এখনও "বিশ্বে" আসিয়া পৌঁছে নাই; তাই তাঁহার "বহু" কামনা ত্রিবেণী সঙ্গমে সফল হইতে পারিল না; একেবারে অনন্ত "আমি"র প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের মধ্যে আসিয়া তিনি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। "বসন্ত প্রয়াণে" যে প্রয়াণ আরম্ভ হইয়াছিল, বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চে আসিয়া তাহা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। এককে বহুর মধ্যে দেখিব জীবের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটি স্তরে-স্তরে ফলোন্মুখী হইয়া বিশ্বনাট্যের মধ্যে অন্তরগত বিরোধকে উপলক্ষ করিয়া বহুত্বের রক্তমাংসের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই নাট্যে প্রতি অঙ্কের সঙ্গেসঙ্গেই এক একটি ছায়া দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। তাই একস্থানে লেখিকা বল্‌ছেন —"প্রলয়ের যুগধর্ম্ম এসেছে। এমন একদিন ছিল যখন প্রজায়-প্রজায়

কারবারে রাজার চরিতার্থতাই ছিল লক্ষ্য, রাজার স্বার্থেই প্রজার অর্থ নিয়মিত হ'ত। রাজা ছিল তৃতীয়, দুইয়ের বাহিরে, আর সেই তৃতীয়ই দুইয়ের সার্থকতা। তারপর এল অন্যযুগ। এবার প্রজায় প্রজায় কারবারে প্রজার সার্থকতা। রাজা কেবল তটস্থ বিচারক। এখানেও তৃতীয় দুইএর বাহিরে। বাহির হতে দুইএর সামঞ্জস্য বিধান করে।...এক ও বহুর মধ্যে বহু ও একের মধ্যে। সন্ন্যাসী—সেই একই বিশ্বমানব। আজ আর ত্রিবেণী সঙ্গম নয়, বিশ্ব-সঙ্গম!"

এই বহুত্বের মধ্যে এসে মানব জাগ্রত হয়েছে এবং তার সাধনা পূর্ণতার ক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে। এই যে বহুত্বের মধ্য দিয়ে মানবের আত্মপ্রতিষ্ঠা, এইটি তার বাস্তবিক সফলতা, রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকেও বহুত্বের মধ্যে রূপের মধ্যে এককে লাভ করিবার একটি চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সেখানে এই রূপের মধ্যে অরূপকে লাভের সাধনায় তদুপযোগী যেটুকু "আত্মসংস্কার" ঘটিয়া থাকে, সেইটুকুই মাত্র দেখান হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমতী সরযূবালা চান রূপের মধ্যে অরূপের প্রত্যক্ষ বিলাস। তাই তিনি প্রকৃতি মাতার ক্রোড় থেকে "আমি"কে চিরপ্রবাসী করে আমিত্বের প্রবল দ্বন্দের আমিত্বকে রসে, রক্তে রূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। "বসন্তপ্রয়াণ" "সঙ্গম" "বিশ্বনাট্য" এই তিনটি দিয়া একটি সম্পূর্ণ নাট্যের সমাবেশ হইয়াছে, তার নাম দিতে পারি "অদ্বৈতের বিশ্ববিলাস"। একটি হচ্ছে Philosophy of the Dual একটি হচ্ছে Philosophy of Trinity, একটি হচ্ছে Philosophy of the many তিনটি জড়িয়ে একটি Dram a of the Absolute.

কাব্য উপভোগেই সময় গেল প্রশংসা করিবার সময় পাইলাম না। দুই একবার ইচ্ছা হইতেছিল, দেশী ও বিদেশী কাব্য সম্প্রদায়ের সহিত একটু তুলনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না; কারণ এই তিনখানি কাব্যের মধ্য দিয়া যে ভাবে "অহং বহু স্যাম" মন্ত্রটি উদ্‌যাপিত হইয়া এই নবসৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে ইহার সহিত এতাবৎ কালের কোনও দেশীয় কোনও সৃষ্টির সহিতই যথার্থভাবে তুলনা করা যায় না। ইহার উপমা নাই। ইহা নিরুপম। ইহা দেবোত্তর কিনা জানি না; তবে ইহা যে লোকোত্তর তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

সবুজপত্র—শ্রাবণ, ১৩২৩

জাপান-যাত্রীর পত্র—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত "জাপান যাত্রীর-পত্রে" রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে' বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে।" আজ আবার শ্রাবণ মাসে সেই "জাপান-যাত্রীর পত্রে"ই কবিবর লিখিতেছেন,—"কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না।...প্রাচ্যদেশে মানব-সমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়াছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।...ইংরেজ কাজের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবী মানতে অভ্যস্ত।"

উপরের একটি মত অপর মতের প্রতিবাদ করিতেছে না কি? "মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে' বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে"—এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পশ্চিমদেশে—যেখানকার লোক 'জাতে বাঁধা নয়'—"সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না," একথা কেমন করিয়া বলা চলে? আবার তাঁহার এই অভিমত—"কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে"—যদি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে, "আমাদের আত্মীয়তার জাল বহু বিস্তৃত," "ইংরেজ কাজের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবীকে মানতে অভ্যস্ত" প্রভৃতি উক্তিগুলাই বা তাঁহার কেমন করিয়া দাঁড়ায়? 'সবুজপত্রে'র বীরবল, ও 'ভারতী'র দল ঐ দুইটা মতের কি একটা সামঞ্জস্য করিতে পারেন না? কোনওরূপ 'টীকা-টিপ্পনি'র সাহায্যে, ঐ দুইটা মতকে কি একই মতের অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না?

বুঝি তাহা অসম্ভব! কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ খুঁজিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ দুইটা মত এমন দুই ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে, উহাদের ইহজীবনে মিল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই! মুসলমানের 'প্রসন্ন-মুখের সেলাম' হইতে প্রথম তত্ত্বের আবির্ভাব। আর জাপানী কর্ম্মচারীর 'ব্যবহার-কুশলতা' হইতে দ্বিতীয় তত্ত্বের উদ্ভব। কাজেই দুই দিক হইতে দুইটা তত্ত্বের 'কলিসন' লাগিয়াছে।

তবে পূর্ব্ববাসীরা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভাল 'সার্টিফিকেট' যে এই প্রথম পাইল, তাহা নহে। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের লোকের উপর তাঁহার ধারণা ভাল ছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন,—"গ্রীক হউক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।" কিন্তু মুসলমান-যাত্রীর সেলাম, এই প্রশংসা-পত্রটুকু হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তাঁহাদের সেলাম পাইয়া রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয় যে, "বাইরের লোকের কাছে কিরূপ ভদ্রতা রক্ষা" করিয়া চলিতে হয়, তাহা আমরা মুসলমানের কাছেই শিখিয়াছি। কিন্তু জাপানী ভায়ারাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সহিত ভাব করিয়া সেই পুরাণ তত্ব, সেই হারান-সার্টিফিকেট পুনরুদ্ধার করিলেন!—তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। পরিষদে একটা সভা করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন দেওয়া উচিত।

শুধু এইটুকু নহে। আরও একটা আনন্দের কথা আছে।—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আজ গালাগালি খাইতেছেন, তাহাও বুঝি বা সফল হইল! তিনি বলিয়াছিলেন,—"যে মুখে 'চেঙ্গমুড়ী কানী' বলিয়াছ, সেই মুখেই 'জয় বিষহরি' বলিবে।"—রবীন্দ্রনাথের এই মত-সংঘর্ষ ব্যাপারে তাহারই যেন পূর্ব্বাভাষ দেখিতেছি!

টীকা ও টিপ্পনি—

এটি বীরবলের বাজে বকুনি। ইহাতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্দেশে লেখক কেবল শূন্যে ঘুঁষি ছুড়িয়াছেন। ইহাতে যুক্তি নাই, আস্ফালন আছে। মীমাংসা নাই, বিতণ্ডা বিলক্ষণই আছে।

তবু এই রচনা লইয়াও আমাদের নাড়াচাড়া করিতে হইবে। কেন না, যে 'শিক্ষা দীক্ষা' লইয়া এই লেখক মহাশয় "এ কালের অনেক লেখকের শিক্ষা দীক্ষার" অভাব দেখিতেছেন, তাঁহার সে শিক্ষা দীক্ষাটা এই লেখার মধ্যে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একবার পাঠক-সাধারণকে দেখাইয়া দেওয়া উচিত;—নহিলে ধর্ম্মহানি হয়।

বীরবল বলিতেছেন,—"শাস্ত্রে বলে 'অধিকন্তু ন দোষায়', ইংরাজিতে বলে 'The more the merrier'। সুতরাং পূর্ব্ব-পশ্চিম যে দিক্ থেকেই দেখ, মাসিক পত্রের এই আধিক্যে আমাদের খুসী হবারই কথা" —কিন্তু একথা বলিয়া রচনা ফাঁদিবার সার্থকতা কি, বুঝিলাম না। লেখকের জানা উচিত, শাস্ত্রে আবার ইহাও বলে 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্', ইংরাজিতে বলে 'Too much of everything is bad'। অতএব ইহাও বলা যায়, 'পূর্ব্ব-পশ্চিম যে দিক্ থেকেই দেখ, মাসিক পত্রের এই আধিক্যে আমাদের খুসী না হইবারই কথা।

লেখক বলিতেছেন,—"বঙ্গ সরস্বতীর জনৈক ধনাঢ্য পৃষ্ঠপোষক সম্প্রতি কলিকাতার সাহিত্য-সভায় প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষায় দৈন্য এবং ভাবের দৈন্য গোপন করবার জন্যই মৌখিক ভাষায় আশ্রয় অবলম্বন করেছেন।"—এ সত্য বীরবল কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, বলিতে পারি না। আমরা কিন্তু এ সংবাদ এই সর্ব্বপ্রথম শুনিলাম।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার 'অভিভাষণে' রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনার একটু নমুনা দেখাইয়া বলিয়াছেন বটে যে,—"ঐ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা ও ভাবদৈন্যের সূচক।" কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার দৈন্য গোপন করবার জন্যই মৌখিক ভাষার আশ্রয় অবলম্বন করেছেন।"—কাহারও উপর ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহার কথাকে একটু বাঁকাইয়া লইতে পারিলে অবশ্য অনেক সময় সুবিধা হয় জানি, কিন্তু সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে সে সঙ্কীর্ণতা আদৌ শোভা পায় না।

সাহিত্য-সভায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখার দোষ দেখাইয়া একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন বলিয়া বীরবল বলিতেছেন, —"উক্ত সভায় সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী যে পূর্ব্বোক্ত অত্যুক্তির কোনও প্রতিবাদ করেন নি, তার থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সভ্যদের কারও বিশেষ পরিচয় নেই।"—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা বীরবলের যেমন ভাল লাগে, অন্যেরও যে তেমনি ভাল লাগিবে, এমন কোনও আইন আছে? তাঁহার নিকট যাহা অত্যুক্তি বোধ হইতেছে, 'সাহিত্যিক সভ্যদের' নিকট যে তাহা স্বাভাবিক বোধও হইতে পারে, এ কথা তিনি কেন অসম্ভব ভাবিতেছেন? গত জ্যৈষ্ঠমাসের 'সাহিত্য' কাগজে সমাজপতি মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—"রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্য, ভাষায় দৈন্য, রচনায় কষ্ট কল্পনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া দুঃখ হয়।" কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর লেখার সহিত সুরেশ বাবুর পরিচয় নাই, এ কথা বলিতে কি বীরবল সাহস করেন? তাঁহার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা নির্দ্দোষ। কিন্তু প্রতিভা যত বড়ই হউক, তাঁহার কার্য্যে দোষ থাকিতে পারে না, একথা ত আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। পণ্ডিতেরা বলেন,—সৃষ্টজীব পূর্ণপ্রজ্ঞ হইতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ একদিন কোনও গোঁড়া সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আজ বীরবলের লেখা পড়িয়াও অনায়াসে তিনি তাহা বলিতে পারেন —"তোমরা আমাকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড় করিয়া না তুলিলেও আমার বিশেষ ক্ষতি হইত না! বাপু হে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনা পূর্ব্বক, একটু সংযতভাবে কথা বল! পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই ভালও থাকে মন্দও থাকে—তোমরা যতই কূটতর্ক কর না, অসম্পূর্ণতা হো হো দ্বারা ঢাকা পড়ে না।"

বীরবল লিখিয়াছেন,—"অনেকে লিখ্‌তে পারলেও যে 'লিখ্‌তে' পারে না—এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি। 'হারিয়ে বসে আছি' বলবার কারণ এই যে, সঙ্গীতের মত লেখা জিনিষটেও যে একটি আর্ট—এ জ্ঞান আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ছিল। আলঙ্কারিক একবাক্যে বলে গেছেন যে, কাব্য রচনা করবার জন্য দুটি জিনিষ চাই

—প্রথমতঃ প্রাক্তন সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা।"—রবি-ভক্তিতে লেখক এমনই মশগুল্ যে, লেখা জিনিষটার সহিত কাব্য জিনিষটাকে ঘুলাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু লেখামাত্রেই কাব্য নহে। কাব্য-রচনা করিবার জন্য প্রাক্তন-সংস্কারের দরকার থাকিতে পারে, কিন্তু যে-সে প্রবন্ধ লিখিবার জন্যও যে উহার প্রয়োজন, একথা কোন আলঙ্কারিকই বলেন নাই। বীরবলও যে রচনাটির আলোচনাকল্পে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, সেটিও মোটে কাব্য নহে—সামান্য একটি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ মাত্র। অতএব, তাঁহার উপদেশটি এ ক্ষেত্রে কেবল ব্যর্থ নহে—বেতালাও বিলক্ষণ হইয়াছে।

লেখক বলিতেছেন,—"আমাদের মাসিকপত্র সকল যে এই সব অকথা-কুকথা প্রচারের সহায়তা করেন—তার থেকে বোঝা যায় যে, বাঙ্গালার বন্দেমাতরং যুগ চলে গিয়েছে।"—কথাটা অন্য মাসিকের পক্ষে ততটা সত্য না হউক, 'সবুজপত্রে'র পক্ষে যে বর্ণে বর্ণে সত্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, এই 'সবুজ-পত্রে'র পৃষ্ঠাতেই রাম-চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হইতে দেখিয়াছি। ইহাতেই দেখিয়াছি—"সীতা সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজা করত"—একথা ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে! 'বন্দেমাতরং যুগ' চলিয়া না গেলে কি 'এই সব অকথা কুকথা প্রচারের সহায়তা' করিয়াও 'সবুজপত্র' এদেশে আজিও টিঁকিয়া থাকিতে পারিত?—বীরবল এখানে পরের দোষ ধরিতে গিয়া নিজেদের দোষই ধরাইয়া দিয়াছেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক ছোট গল্পের যে 'তত্ত্বনির্ণয়' করিয়াছেন, তাহা শুধু উদ্ভট নহে—বিলক্ষণ হাস্যজনকও বটে। তিনি বলিতেছেন,—"আমার মতে ছোট গল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তারপরে ছোট হওয়া চাই,—এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাইনে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে 'গল্প' কাকে বলে—তার উত্তর 'লোকে যা শুনতে ভালবাসে'। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন 'ছোট' কাকে বলে—তার উত্তর 'বড় যা নয়'।"—চমৎকার Definition! সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের এমন সহজ উপায় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকেই বলে,—'নবনব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।'—ইহাকেই বলে প্রতিভা। ইচ্ছা করিলে, যে-কেহ এখন যে-কোনও বিষয়ের অনায়াসে এক সংজ্ঞা তৈয়ারী করিতে পারেন!—বিদ্যা-বুদ্ধির খরচ করিতে হইবে না। আমাদের যদি কেহ রসগোল্লার 'তত্ত্বনির্ণয়' করিতে বলেন, আমরা বলিব, রসগোল্লা প্রথমে গোল্লা হওয়া চাই, তারপর রস হওয়া চাই—এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাই না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে 'গোল্লা' কাহাকে বলে—তাহার উত্তর 'লোকে যাহা খাইতে ভালবাসে।' আর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 'রস' কাহাকে বলে—তাহার উত্তর 'রসহীন যাহা নয়।'—কেমন Definition হইল? বীরবল চটিবেন না;—আমরা তাঁহার মৌলিকতা হজম করিবার চেষ্টা করিতেছি না। শুধু তাঁহারই শিক্ষিত-বিদ্যার কেরামতী পাঠকদের একটু দেখাইয়া দিলাম। বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহারা "কলকাতার রাজপথে আকাশে যে ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন, তাহা অবাক্ হয়ে চেয়ে" দেখিবার মতন ব্যাপারই বটে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—ভাদ্র, ১৩২৩।

দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ—

ইহা একটি আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল ঈশ্বরবাদী ছিলেন কি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, তাহারই আলোচনা করিতে যাইয়া লেখক এক স্থানে বলিতেছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত-ব্যাখ্যা সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে দুঃখবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন।......রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল বুঝিয়াছিলেন। যিনি দুঃখকে ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
　তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা
　নিবিড় করে ধরিব হে।"

তিনিও দুঃখবাদী নহেন।"

লেখক এক নিশ্বাসে অনেকগুলি কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কথাগুলি ভ্রমে ও অসত্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রবাবু দুঃখবাদী নহেন, এ কথা কি তাঁহার ঐ চারি ছত্রের কবিতা হইতেই সপ্রমাণ হয়? ঈশ্বরবিশ্বাসী কি দুঃখবাদী হইতে পারেন না? ওমর-খাইয়ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহার মত দুঃখবাদী কবি কে? রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বর বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁহার অনেক কবিতায় দেখা যায় 'পেসিমিজমে'র প্রবাহই প্রখর বহিয়াছে। তাঁহার অনেক কবিতাই,—

"অলক্ষ্যেতে শোণিতের ফল্গু বহে যায়
　যাস্ রে সেথায়,
খুঁড়িয়া বালুকারাশি অস্থিখণ্ড দিয়া
　শোণিত উঠিবে উথলিয়া।"

এই সুরে গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথের "দুঃখ"শীর্ষক প্রবন্ধেও আছে,—"দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল।...জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।......মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত।"—অতএব, 'রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী নহেন', এ মন্তব্য প্রকাশ করা চলে কি? দ্বিজেন্দ্রলালের ভুল ধরিবার পূর্ব্বে লেখক যদি রবীন্দ্রনাথকে একটু অধ্যয়ন করিয়া আলোচনা করিতে বসিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। না পড়িয়া কবিতা লেখা যায়, গল্প লেখা যায়, কিন্তু সমালোচনা লেখা যায় না।

নব্যভারত—শ্রাবণ, ১৩২৩।

উপন্যাসে ধর্ম্মপ্রচার—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তাঁহার নিকট হইতে এমন বাজে রচনা পাইব, আশা করি নাই।

শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি নিজেই বলিতেন যে, "দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' এই তিনখানি বই আমি পাঠকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছি—কোনও রূপ নীতি বা ধর্ম্মকথা প্রচারকল্পে লিখি নাই।" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"বঙ্কিমবাবু তাঁহার উপন্যাসাবলীতে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন যে, সংযম—শান্তি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ, অসংযম—অশান্তি, অধর্ম্ম ও নরক।"—এই বলিয়া লেখক দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও রজনী হইতে বঙ্কিমের ধর্ম্ম প্রচার-উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র গোড়াতেই আমরা যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা সংযমের চিত্র বলিয়া ত একটুও মনে হয় না। প্রথমেই দেখি, হিন্দুর দেবমন্দিরে হিন্দু জগৎসিংহ ও হিন্দু-কন্যা তিলোত্তমা দুইজনে দুইজনের রূপে মুগ্ধ। ইংরাজী-সমাজে 'চর্চ্চে'ই অনেক বিলাতী দাম্পত্য প্রেমের সূত্রপাত হয়। 'চর্চ্চে' স্ত্রী পুরুষে একসঙ্গে বারংবার যাতায়াতে যুবক যুবতীগণের প্রথমে দেখাদেখি, হাসাহাসি এবং নানা ভাবভঙ্গীর আরম্ভ হইয়া চক্ষের নেশা জন্মায়। ক্রমে সেই নেশা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বঙ্কিমবাবু তাই দেখাদেখি, হিন্দুর দেবমন্দিরকে সেইরূপ 'চর্চ্চ' বানাইতে গেলেন, কিন্তু তিনি হয়ত তখন ভুলিয়া গিয়াছিলেন হিন্দুর দেবমন্দির বিলাতী 'চর্চ্চ' নহে। কোন হিন্দু এ পর্য্যন্ত দেবালয়ে আসিয়া কখন 'পীরিতি' করিতে সাহসী হয় নাই। প্রত্যক্ষ দেবতার সম্মুখে কাহারও সে ভাব মনে আসে না। হিন্দুর দেবমন্দির বড়ই ভক্তিপূর্ণ স্থান, বড়ই পবিত্র। সেখানে কি বালিকা, কি বৃদ্ধা, কি সধবা, কি বিধবা, সকলেই গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া একান্ত ভক্তিপূর্ণচিত্তে দেবারাধনায় প্রবৃত্ত। সেরূপ পবিত্র স্থানের পবিত্রতা কলুষিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেবালয়ে শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে দুইজনকে গুপ্তপ্রণয়ের সূত্রপাতে লিপ্ত করিয়াছেন। এ চিত্র যদি সংযমের হয়, তবে অসংযমের চিত্র কি, জানি না।

লেখক খুব গম্ভীরভাবে আর একটী কথা বলিতে গিয়া আমাদের কিছু হাসাইয়াছেন। সে কথাটি এই—"আমরা দেখি, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা ও রমা সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল—তিনজনেরই উদ্দেশ্য উত্তম, পরোপকার।......রমা নিজের পুত্রের জীবনরক্ষা প্রয়াসে গঙ্গারামকে তৃতীয়প্রহর রাত্রিতে অন্তঃপুরে নিজের কক্ষে আনিয়াছিলেন।" ইহাকেই বলে—সমালোচনা! জননী নিজ সন্তানের জীবনরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন,—সমালোচকের মতে তাহাও 'পরোপকার।' আসল কথা আমাদের দোষ, আমরা ভাষার ওজন এবং ভাবের মাত্রা ঠিক রাখিয়া সমালোচনা করিতে পারি না। আমরা আজ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করিতে বসিয়া এত বাড়াবাড়ি করিতেছি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বড় একটা তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রাণের বন্ধু দীনবন্ধুর লেখাতেও দোষ ধরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তাঁহার সাহিত্য-গুরু ঈশ্বর গুপ্তেরও দোষ-গুণ সমভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন—এ সত্যপ্রিয়তা,—এ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কি আমাদের ভিতর আসিবে না? বঙ্কিমের আদর্শে বঙ্কিমের সমালোচনা করিয়া কি আমরা বঙ্কিম-ভক্তির পরিচয় দিতে পারিব না?

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৩।

ভাষায় ও সাহিত্যে বিদ্রোহিতা—

বাঙ্গালা ভাষার বানানের নিয়মগুলা 'প্রবাসী' কেন ভাঙ্গিতেছেন, ইহা তাহারই একটা কৈফিয়ৎ। লেখক বলিতেছেন,—"যাহারা কুলি-মজুরের মত কেবল ভাঙে, স্থপতির মত গড়িতে পারে না, তারাও অকেজো নয়, নিছক নিন্দার পাত্র নয়। সাহিত্যক্ষেত্রে কখন কখন, প্রতিভা না থাকিলেও, কেবল বাজে নিয়মের দাসত্ব ভাঙিবার জন্যই বিদ্রোহিতা দরকার হয়। প্রবাসীতে আমরা এ কাজ মাঝে মাঝে করিয়া থাকি।"

কথা কয়টি বিনয়ের হিসাবে শুনিতে মন্দ নহে, কিন্তু তেমন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। লেখক মহাশয় কুলি-মজুরের উপমা দিয়া নিজের কাজকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় তাঁহাকে বলি, তিনি "যেন মনে রাখেন যে, তর্কে উপমা লেখককে পদে-পদে প্রমাদপূর্ণ যুক্তিতে টেনে নিয়ে ফেলে, আর এই উপমাপূর্ণ যুক্তি বালককেই বোঝাতে পারে, বিজ্ঞকে বোঝাতে পারে না। উপমা প্রায় কখনই একটা যুক্তিস্বরূপ গ্রাহ্য হ'তে পারে না। অতএব প্রবন্ধে যত উপমা বর্জ্জন করা যায়, তত তাহার নিষ্প্রমাদ হবার সম্ভাবনা।"

এই কথাগুলা বলিবার হেতু এই যে, 'প্রবাসী'র লেখকও যুক্তির পরিবর্ত্তে উপমা প্রয়োগ করিতে গিয়া ভ্রমের কূপে পা দিয়াছেন। তিনি যদি নিজেকে সত্যসত্যই সাহিত্যিক কুলি-মজুর বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, রাস্তার কুলি-মজুরেরা যাহা ভাঙ্গে, তাহা কি তাহারা কেবল নিজেদের খেয়ালমত ভাঙ্গে, না কাহারও নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ভাঙ্গে? স্থপতি বা অন্য কাহারও আদেশ না পাইয়া কুলি-মজুরেরা কিছু ভাঙ্গিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত কি 'প্রবাসী'র লেখক কখনও কোথাও দেখিয়াছেন? যদি তাহা না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজের খেয়ালমত সাহিত্যের নিয়ম ভাঙ্গিতেছেন কেন? শুধু তাহাই নহে। 'প্রবাসী'তে এক কথারই নানা বানান দেখিতে পাই। 'মত' ও 'মতো', 'কি' ও 'কী' প্রভৃতি 'প্রবাসী'র বুকে সমানভাবে বিরাজ করিতেছে। যখন যেটা মনে আসে, তখন সেইটাই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্রোহিতার কাজের ভঙ্গী কি ঠিক এইরূপ? 'বিদ্রোহিতা' কি ঠিক উচ্ছৃঙ্খলতা বা পাগলামীর নামান্তর মাত্র?

জানি না, 'প্রবাসী' সম্পাদক কি বুঝিয়া 'বিদ্রোহিতা' কথাটার ব্যবহার করিয়াছেন! কিন্তু শুধু ভাঙ্গিব বলিয়া সে কিছু ভাঙ্গে না। প্রয়োজনীয়তার অনুরোধে, দুঃখোপশান্তির চেষ্টায় তাহার আবির্ভাব। সেও নিয়মের দাস।—খামখেয়ালীর সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই নাই। কিন্তু 'প্রবাসী' যখন-তখন খেয়ালের বশে বানানের নিয়ম ভাঙ্গিতেছেন,—ভাষাকে লইয়া তুলাধুনা করিতেছেন।—'পাওয়া'কে 'পাও'য়া

রূপান্তরিত করিলে লাভ কি হয়, বুঝিতে পারি না। 'প্রবাসী'র দল সোজা কথাটা ভুলিয়া যাইতেছেন যে,—"There is no appeal against the decree of usage." অর্থাৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন আপিল নাই।—সাধারণের পক্ষে কথাটা সত্য। প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন "বাঙ্গালা বর্ণমালা নূতন করিয়া সংশোধিত ও পুনর্গঠিত করা আবশ্যক" বোধে পরিষদে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, তখন তাহা উপেক্ষার ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছিল। যুক্তির সাহায্যে ইন্দ্রনাথ যাহা পারেন নাই, 'প্রবাসী' আজ নিছক্ খেয়ালের নেশায় তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন কি?

বেদান্তের চাষ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ—

গত ভাদ্রমাসের 'প্রবাসী'তে "বেদান্তের চাষ" নাম দিয়া যে দুই ছত্রের একটি পদ্য ছাপা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে 'প্রবাসী' সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক দুইজনে মিলিয়া দুইটা 'কৈফিয়ৎ' দিয়াছেন। 'কৈফিয়ৎ' দুইটা একসঙ্গে পড়িলে অর্থের গোলমাল হয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায়।

পদ্যটি এই,—

"বরোজে না ফলে' পান ফলিলে বেদান্ত
বারুই হইত বিজ্ঞ, কাব্যের প্রাণান্ত।"

আসলে কিন্তু পদ্যটি ছিল এইরূপ—

"বরোজে না হয়ে পান হইলে বেদান্ত
ব্যসনীর দুঃখ, কিন্তু দেশ ধন্য হত।"

'প্রবাসীর' সহঃ সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"আমি ঐ কবিতাটিকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম।"—মাত্র দুই ছত্রের কবিতার দেড়ছত্র পরিবর্ত্তন এবং মূল অর্থেরও সম্পূর্ণ বিকৃতিকরণকে যে "একটু পরিবর্ত্তন" বলে, জীবনে এই প্রথম শুনিলাম। অঙ্কশাস্ত্রেও দেখা যায়, দুইএর দেড় অংশকে 'একটু' না বলিয়া বরং ঠিক তাহার উল্টাই বলে। কিন্তু 'প্রবাসী' সম্পাদক "বিবিধ প্রসঙ্গে" যে একটি কথা বলিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নিকট অঙ্কশাস্ত্রও মূক! তিনি বলিয়াছেন, "প্রতিভা বিদ্রোহী, কারণ সে নিজের আত্মার নিয়ম ছাড়া অন্য নিয়ম মানিতে পারে না।...কেবল বাজে নিয়মের দাসত্ব ভাঙ্গিবার জন্যই বিদ্রোহিতা দরকার হয়। প্রবাসীতে আমরা একাজ মাঝে মাঝে করিয়া থাকি।"—অতএব, সহঃ সম্পাদক অনায়াসেই বলিতে পারেন, —অঙ্কশাস্ত্রই বলুক, আর যে শাস্ত্রই বলুক, আমি নিজের আত্মার নিয়ম ছাড়া অন্য নিয়ম মানিতে পারি না।"

কিন্তু কথার হের ফেরে অনেক অসম্ভব সম্ভব হইলেও এ পদ্যটির কলঙ্ক-ভঞ্জন করা কঠিন ব্যাপার! আসল কথা, ইহার ভালরূপ অর্থই হয় না। 'বেদান্ত' কথাটির সহিত 'প্রাণান্ত' কথাটির মিল হইয়াছে ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু বেদান্তের চাষের সহিত কাব্যের প্রাণান্ত হওয়াটার কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারা বোধ করি, অতি বড় বৈদান্তিকেরও অসাধ্য। তাই লোকে মনে করিয়াছিল যে, এ অর্থহীন দুইছত্র কবিতার যখন কোনও গুণ নাই, তখন ইহা 'বারুই' ও 'বেদান্ত' শব্দ দুইটির লোভেই ছাপা হইয়াছে। এবং ইহার লক্ষ্য—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি। কিন্তু এই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক সে অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ঐ দুইছত্র পদ্যের জন্য তিনকলমব্যাপী কৈফিয়ৎ লিখিয়াছেন।—ইহাকেই বলে গ্রহের ফের! সহঃ সম্পাদক বলিতেছেন,—"মহাকবি মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন—

"বরোজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।"

"মধুসূদন নিশ্চয় কোনো জাতিবিদ্বেষ হইতে উহা লিখেন নাই।"—এ কথা সত্য। কিন্তু মাইকেলের ইহা একটি পদ্য নহে,—একটি উপমা মাত্র। আর, ইহার জন্য মাইকেলকে প্রবাসীর মতন কখনও কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতেও হয় নাই, এবং কেহ কখনও এ সম্বন্ধে সন্দেহও করে নাই।

'প্রবাসী'র কর্ত্তৃপক্ষও যে এ কথাটা না বুঝেন, এমন মনে করি না। কারণ, তাহা এই 'গোলে হরিবোল' দিবার চেষ্টার মধ্যেই—স্বয়ং সম্পাদকের এক বেফাঁস কথাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কোন কোন সংবাদপত্রে যাঁহাকে এই কবিতার লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, খবরের কাগজে আন্দোলনের অনেক পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছি, এবং তিনি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে কবিতা-সংসৃষ্ট সকলকে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার চিত্তে কোন বিকার হয় নাই।" অথচ সহঃ সম্পাদক এদিকে বলিতেছেন যে, তিনি এ পদ্যের 'দ্ব্যর্থ সম্ভাবনা আন্দাজ' করিতে পারেন নাই। যদি তাহাই হয়, তবে খবরের কাগজ-ওয়ালাদের নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই সম্পাদক মহাশয় ঐ 'ব্যক্তি বিশেষের' নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন?—ইহাকেই চলিত কথায় বলে, 'শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা।'

ঢাকা শ্রমশিল্প-প্রদর্শনী

লর্ড কার্মাইকেল ঢাকার প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। তাহার শিল্পবিভাগে প্রদর্শিত দ্রব্যের নিম্নলিখিত বিবরণ 'ঢাকা প্রকাশ' হইতে গৃহীত হইল—

ঝিনুক ও শৃঙ্গশিল্প

এ জিলার নদী, খাল, বিল, ঝিল ও পুকুরে যে সকল ঝিনুক পাওয়া গিয়া থাকে, দশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা সেগুলিকে পোড়াইয়া চুণ করিয়া ফেলিতেন! এ জিলার নদীনালার ঝিনুক দ্বারা যে বোতাম ও নানাবিধ চিত্তাকর্ষক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, এমন একটা কথা কাহারও মনে বড় আসিত না। তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে যখন স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের একটা হুজুক উঠে, সেই সময় বিক্রমপুর-অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামের জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক এ জিলার ঝিনুক দ্বারা বোতাম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই নূতন উদ্যম দেখিয়া এ জিলার নানাস্থানেই ঝিনুকের নানারূপ ব্যবহার আরম্ভ হয়। নিজ ঢাকা সহরেও অনেক গৃহস্থঘরের মেয়েরা ঝিনুকের বোতাম, মেয়েদের চুলে গুঁজিবার ফুল ও আংটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে থাকেন। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় ঝিনুক-শিল্প আজ এ দেশের অনেক অনাথা বিধবার উদরান্নের উপায় করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু যাহারা ঐ সকল বোতামের কারবার করিতেছেন, তাঁহারাও দু'পয়সা লাভ করিতে পারিতেছেন। আমরা সেদিন এই শিল্প প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০ প্রকার ছোটবড় ঝিনুকের বোতাম দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আর ঐ সকল বোতামের মূল্যও খুব কম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমরা ছোট বেলায় বিদেশের আমদানী যে নমুনার ঝিনুকের বোতাম একটা এক পয়সায় খরিদ করিতাম, 'ঢাকা বোতাম ফ্যাক্টরী' আজ তাহা এক পয়সায় তিনটী বিক্রয় করিতেছেন।

প্রদর্শনীর এই ঝিনুকশিল্পের পরেই ঢাকার কারিগরগণের নির্ম্মিত মহিষ-শৃঙ্গের নানাবিধ মনোমুগ্ধকর বোতাম দেখিয়া আসিয়াছি। ঢাকায় পূর্ব্বে মহিষশৃঙ্গ দ্বারা কেবল চুড়ি, চিরুণি, ও কাষ্ঠ পাদুকার খুঁটি বা বলি প্রস্তুত হইত; কিন্তু আজ ঢাকার বোতামের কারখানায় কারিগরেরা শৃঙ্গ দ্বারা যে সকল চিত্তাকর্ষক বোতাম প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা আমাদের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।

গজদন্তশিল্প

গজদন্ত নির্ম্মিত জিনিষের মধ্যে চিরুণী, বলো, চুড়ি, ঘড়ীর চেইন্, খড়মের বলি বা খুঁটিই বেশী। ঢাকা বিভাগে হস্তীদন্ত শিল্পের ইহা আরম্ভ মাত্র বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যদি দেশের লোকের এ দিকে শুভদৃষ্টি পতিত হয়, তবে এ জিলায়ও হস্তীদন্ত দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

শঙ্খশিল্প

ঢাকার শঙ্খশিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। শাঁখার কাজে ঢাকার শঙ্খকারগণ জগতে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমরা সে দিন এই প্রদর্শনীতে শঙ্খনির্ম্মিত যে সকল জিনিষ দেখিয়া আসিয়াছি, নিম্নে সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটী জিনিষের নাম উল্লেখ করা হইল—দালান, পুতুল, পেয়ালা, প্লেট, বোতাম, আংটা, বিবিধ নমুনার বালা, চুড়ি, চেইন, নেকলেস্, জড়ির চুড়ী, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তর-খচিত নানাবিধ অলঙ্কার, নানারূপ কারুকার্য্যসমন্বিত জলশঙ্খ ও বাদ্যশঙ্খ।

সূচীশিল্প

ঢাকার কারচুপীর কার্য্য একদিন জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল। ঢাকায় আজিও দুইচারিটী মহিলা কারচুপীর কার্য্য করিয়া থাকেন। সে দিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের সূচীশিল্পের কয়েকখানি নমুনা দেখিতে পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি কার্পেটের আসন ও কয়েকখানি সুজনীও দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।

বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্পে ঢাকার তন্তুবায়কুল আজিও যে জগতে অদ্বিতীয় রহিয়াছেন, প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি। তবে কথা এই যে, এখন আর সে-প্রাচীন কালের হাতে-কাটা সূক্ষ্ম সূত্রের মলমল প্রস্তুত হইতে পারে না। বিলাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্ররাজি—যাহা কলে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহাতেই এখন ঢাকাই মলমল প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে প্রাচীন ও বর্ত্তমান উভয় কালের মসলিনই দেখিয়াছি। কিন্তু এই দুইয়ের প্রভেদ রাত্রি দিন। সে কালের ৪০ গজ একখান মলমলের ওজন ছিল সাড়েতিন তোলা, আর বর্ত্তমান কালের কলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্রনির্ম্মিত ঐ পরিমাণ দীর্ঘ মলমলের থানের ওজন প্রায় ৬ তোলা। অবশ্য এই দুইটা থানের মূল্যের পার্থক্যও তদ্রূপ। যাহা হউক, আমরা সেদিনকার প্রদর্শনীতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের যে একখান ঢাকাই মলমল দেখিলাম, তাহার মূল্য ১০০০৲ টাকা। ঐ বস্ত্রখানি প্রস্তুত করিতে কারিগরের পূর্ণ এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সম্প্রতি এতদঞ্চলে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সর্ব্বনিম্ন প্রমাণ ধুতি বা শাড়ীর মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের কার্য্য

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ঢাকার নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার ও তৈজসপত্র দেখা গিয়াছে। ঢাকার চিরপ্রসিদ্ধ আতরদান, গোলাবপাস ও তারের ফুল ইত্যাদি ব্যতীত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে রৌপ্য-নির্ম্মিত নবাব সাহেবের 'আসান মঞ্জিল' ভবন এবং একটা রূপার 'হংস' দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল।—বসুমতী।

বঙ্গের জন্ম-মৃত্যু

১৯১৫ সাল বঙ্গের বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে জলপ্লাবন জনিত ও পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষে লোকের শক্তিহ্রাস হইয়াছে। ১৯১৪ সালে জলের দরে পাট বিক্রয় হওয়াতে লোকে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। একে অন্নাভাবে কাতর; তাহার উপর ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও বসন্ত প্রবল হইয়া বহু লোকের জীর্ণ দেহ ধ্বংস করিয়াছে।

১৯১৫ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হইয়াছে। গত ..২ বৎসরের মধ্যে এমন দুরবস্থা আর হয় নাই। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৪৬২৩৯ বেশী হইয়াছে। গত ৪ বৎসর ক্রমশঃ জন্মসংখ্যা হ্রাস হইয়া অবশেষে ১৯.৫ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হইয়াছে। ১৯১১ সালে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মসংখ্যা ৩,৬৩,৬৭৯ বেশী ছিল; ১৯১২ সালে ২,৫০,৫৫৬; ১৯১৩ সালে ১,৯৮,০৫৩ ও ১৯১৪ সালে ১,০৩,৯৯২ বেশী ছিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৪৬,৯৩৯ বেশী হইয়াছে। ঐ তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। দরিদ্রতাবশতঃ অপর্য্যাপ্ত আহার, পঙ্কিল জল, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় করিতেছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সী, বৰ্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের জনসংখ্যা কমিয়াছে; কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। গত ৫ বৎসরে জ্বর রোগে বৰ্দ্ধমান বিভাগের লোক সংখ্যা হাজারকরা ২ জন কমিয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে হাজারকরা ৪ জন ও রাজসাহীতে হাজারকরা ১২ জন, কমিয়াছে। ঢাকা বিভাগে ৭৪ জন ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৯ জন বাড়িয়াছে। যেখানে হিন্দু বেশী, সেখানে লোকক্ষয় হইতেছে, আর যেখানে মুসলমান বেশী সেখানে লোকবৃদ্ধি হইতেছে। চিন্তাশীল লোকদের ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

১৯১৪ সালে বঙ্গদেশের জনসংখ্যা হাজারকরা ৩৩.৬ ছিল কিন্তু ১৯১৫ সালে ২১.৮০ হইয়াছে। পর্য্যাপ্ত খাদ্যাভাব ও পীড়ার প্রাদুর্ভাব হেতুই জন্মসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। উহাই আবার মৃত্যুরও কারণ। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে বটে, কিন্তু আজও শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা দেখিলে হৃৎকম্প হয়। বঙ্গের ৫ জেলায় শতকরা ২৫ জনের বেশী শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সহরেই শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। ভদ্রেশ্বরে শতকরা ২৬ জন ও মাণিকতলায় শতকরা ৬৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় শতকরা ২৯ জন মারা গিয়াছে।

১৯১৪ সালে যত লোক জ্বরে মরিয়াছে, ১৯১৫ সালে তাহা অপেক্ষা ৩১১৮ জনের বেশী মৃত্যু হইয়াছে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জ্বরে উজাড় হইতেছে। বীরভূমের সিবিল সার্জ্জন লিখিয়াছেন, ১৯১২ সাল হইতে জ্বরের প্রকোপ অবিরাম চলিয়াছে।

এখন উপায় কি? শিশু-মৃত্যু, ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া সবই নিবার্য্য, কিন্তু উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করাতে বাঙ্গালা দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে। বাঙ্গালী যদি আপনাকে আপনি বাঁচাইতে চেষ্টা না করে, তবে এ দেশের অনেক পল্লী জনশূন্য হইবে।—সঞ্জীবনী।

ওজন-পদ্ধতি

এই বিশাল ভারতে জিনিষাদি মাপিবার জন্য যে কত বিভিন্ন প্রকারের ওজন-পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এক প্রদেশে কিম্বা এক জেলাতে কত প্রকার ওজন-পদ্ধতি বর্ত্তমান, তাহা নির্ণয় করা সামান্য আয়াস-সাধ্য নহে। অনেক সময় দেখা যায়, একটা নগরেই ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ওজন ব্যবহৃত হইতেছে, জিনিষ ভিন্ন-ভিন্ন মাপে ওজন হইয়া বিক্রীত হইতেছে, এবং কখনও কখনও এই নগরে একই জিনিষ ভিন্ন-ভিন্ন দোকানদার ভিন্ন-ভিন্ন ওজনে বিক্রয় করিতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের ঘোরতর অসুবিধা ও ক্ষতি হয়; এবং অসাধু দোকানদারগণ লোককে ঠকাইবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই ব্যবস্থার প্রতীকার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বহুদিন যাবত সংকল্প করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কখনও এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েন নাই। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিশন এই সম্বন্ধে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্তির পর গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে দেশের সভা সমিতি ইত্যাদির মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। দেশের প্রায় সমস্ত সভা-সমিতিই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, দেশের সর্ব্বস্থানে একই প্রকার ওজন-পদ্ধতি প্রচলিত থাকা আবশ্যক। তদ্দ্বারা বাণিজ্যে বা অন্য প্রকারে লোকের অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে টাকা প্রচলিত আছে, তাহার এক টাকার ওজনকে এক তোলা ধরিয়া লইয়া এবং ৮০ তোলায় সের ধরিয়া লইয়া সমস্ত দেশে এক ওজন-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে কোথায়ও কোনও অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বরং তাহাতে সাধারণের সুবিধা ও উপকার হইবে। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা নিমিত্ত প্রথম-প্রথম কোনও বিশেষ স্থানে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আরও বেশী অসুবিধা সৃষ্টি করা হইবে। কারণ, বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য প্রথার উপরে আরও একটী নূতন প্রথা স্থান বিশেষে প্রচলিত হইয়া আরও অধিক গোলমাল প্রসব করিবে মাত্র।—চারুমিহির।

প্রতিধ্বনি

PER CENT এর প্রতিশব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে ২২শ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয় 1 Per cent. 2 Per cent এর প্রতিশব্দ রূপে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত 'একোত্তর', 'দুয়োত্তর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত হইতে পারে।

(১) পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে একোত্তর প্রভৃতি শব্দের ঐরূপ ব্যবহার থাকিলেও, বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ঐ সকল শব্দের এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সেখানকার লোককে এই শব্দগুলি নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

(২) 'শতকরা এক' বলিলে যে ব্যক্তি উহার অর্থ না জানে, তাহার পক্ষেও উহার অর্থ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না; কিন্তু 'একোত্তর' বলিলে যে ব্যক্তি ইহার বিশেষ অর্থ না জানে, তাহার পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। শব্দশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে শতকরা শব্দটি যৌগিক এবং প্রস্তাবিত একোত্তর প্রভৃতি শব্দ রূঢ়।

(৩) ইংরাজীতে যেরূপ স্থানে 'per' শব্দ ব্যবহৃত হয়, উক্ত শব্দ '—করা' প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালাতেও আমরা অনেক স্থলে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারি, যথা,—

Per Mille—হাজারকরা।

Per Maund—মণকরা।

Per Seer—সেরকরা ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে হাজারকরা প্রভৃতি শব্দের অবস্থা কি হইবে? 40 per Mille হাজারকরা ৪০ এর স্থানে শতকরার পরিবর্ত্তন করিয়া 'চারোত্তরা' বলা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকিবে না। ইহাতে অসুবিধা অনেক।

(৪) শতকরা শব্দটি মূলতঃ যে খাঁটি বাঙ্গালা নহে, ইংরেজী per cent শব্দ হইতে অনুবাদিত, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই। শুভঙ্করের আর্য্যায় শতকরা শব্দের ব্যবহার আছে; যথা,—

শতকরা তঙ্কার বাটা বুঝহ সুশীল।

তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥

(৫) শতকরা শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখন এই শব্দটিকে ভাষা হইতে নিষ্কাসিত করা সহজ হইবে না।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

চলতি কথা

মানুষের জীবনের ন্যায় মানুষের ভাষাও পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে। পূর্ব্বের প্রাকৃত ভাষা ও এখানকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ব্যবধান—ভাবে নহে, ভাষায়। যায়েন, খায়েন, লয়েন, আইস প্রভৃতি শব্দ লেখকবিশেষের পক্ষে শ্রুতিসুখকর না হইতেও পারে, কিন্তু গেলুম, গ্যালাম, গেলেম, গেনু, গেচে প্রভৃতি শব্দসৃষ্টির আবশ্যকতা বুঝি না। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষাগত অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় মিশিয়াছে, আরও মিশিবে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার মূল আকৃতি—তাহার নিজস্ব, তাহার বিশেষত্ব—হইতে বঞ্চিত করিব কেন? দেশবিদেশের নিত্যনূতন ভাব সংগ্রহ করিবার শক্তির মূলে ভাষা পরিবর্ত্তনের পথে চলিবে, কিন্তু ভাষা গড়িয়া শক্তিসৃষ্টির চেষ্টা করিলে, সে সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য হইবে না। কলিকাতার লেখককে ঢাকার পাঠকের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কারণ, বাঙ্গালা ভাষা কেবল কলিকাতার নহে, কেবল ঢাকার নহে, কেবল মুর্শিদাবাদের নহে, কেবল বাঁকুড়ার নহে। বাঙ্গালা ভাষা—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টিয়ান সাধারণ বাঙ্গালীর সম্পত্তি। মানুষ যেমন ঘরে ও বাহিরে দুইভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে, ভাষার মধ্যেও তেমনই দুই রূপ চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে। কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিলে ভাষার উলঙ্গ চিত্রই লোকে দেখিবে। উলঙ্গ চিত্রেও সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আজকালকার অনেক বাবুর খানসামার মত। খানসামা বাহ্যিক বেশভূষার পারিপাট্যসাধন করিয়া বাহিরে বুক ফুলাইয়া বেড়াইলেও, তাহাকে মনিবের পাছু-পাছু ছুটিতেই হয়। ভালবাসার অত্যাচার, স্নেহের বন্ধন, আচারব্যবহারে সংযমরক্ষা যতই কঠোর, যতই ভীষণ হউক, সংসারীর পক্ষে তাহা যেমন প্রয়োজনীয়, সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে হইলে ভাষাকেও যথাসম্ভব সংযম ও বন্ধনের মধ্যে রাখিতে হইবে,—পুরাতনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেই মহারথী নহেন; সুতরাং সাধারণ লেখক "ব্যাকরণরূপ বাতির আলোর" সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আর কি করে! কিন্তু যিনি মাত্র "হা-হুতাশময়" প্রেমের গল্প লিখিয়া, এবং "বীণার তার ছেঁড়া" কবিতা লিখিয়া তথাকথিত উদীয়মান লেখক ও কবি নামে বিঘোষিত হইবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; যেহেতু তিনি সাধারণ হইয়াও অসাধারণ!—উপাসনা।

শিক্ষার্থীর দৃষ্টিশক্তি

মেডিক্যাল কলেজের "চশমা-ঘরে" বা অন্যান্য বেসরকারী চক্ষু-পরীক্ষাশালায় গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চক্ষু-পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে অল্পবয়স্কগণের বয়ঃক্রম অধিকাংশ স্থলে ১৫ হইতে ২০ বৎসর; এবং তাহারা সকলেই কোন-না-কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র। একমাত্র

শিক্ষার্থী-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের কিশোরবয়স্কগণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। যে কিশোরবয়স্কগণ পাঠাভ্যাস করে না, তাহাদের চক্ষুর দোষ হয় না। শুধু শিক্ষার্থীর চক্ষু খারাপ হইতেছে দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, পাঠের সহিত নিশ্চয়ই দৃষ্টি-শক্তির কোনও সম্বন্ধ আছে। পাঠে শুধু দৃষ্টিশক্তি ব্যবহৃত হয় মাত্র, তবে চক্ষু খারাপ হয় কেন? যাহারা পড়ে না তাহারাও দেখে, তাহাদেরও দৃষ্টিশক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহারাও কাজ করে,—তবে তাহাদের চক্ষু খারাপ হয় না কেন? অতএব অন্য জিনিষ দেখায় এবং পুস্তক দেখায়, নিশ্চয়ই কিছু পার্থক্য আছে। শিক্ষার্থীকে দেখিতে হয় পুস্তকের পৃষ্ঠা। প্রাচীনকালেও শিক্ষার্থীকে পুস্তকের পৃষ্ঠা দেখিতে হইত, অথচ শিক্ষার্থীর চক্ষু নিরাপদ থাকিত। অতএব প্রাচীনকালের পুস্তকের পৃষ্ঠার ও অধুনাতন কালের পুস্তকের পৃষ্ঠার নিশ্চয়ই তারতম্য আছে। বর্ত্তমান পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি অতিশয় চকচকে (glossy)। কাগজের যত দোষ চকচকে হইলেই ঢাকিয়া যায় বলিয়া, অতি অল্পমূল্যের কাগজও বেশ চকচকে হয়। অথবা কাগজের দাম কমাইতে হইলে, তাহাকে চকচকে করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। একটি সুমসৃণ পালিশ করা ধাতুপৃষ্ঠে আলোক পড়িলে আলোক যেরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়, চকচকে কাগজ হইতে ঠিক তদনুরূপ-ভাবে আলোক প্রতিফলিত হয়—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিফলনকে আমরা ধাতব প্রতিফলন বলিব। নয়নে এইরূপ আলোক প্রতিফলিত হইলে দৃষ্টিশক্তি আহত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে যদি ধাতব প্রতিফলন আদৌ না ঘটে, তবে তাহাই আদর্শ পাঠ্য পৃষ্ঠা। যাহাদের আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে, তাহারাও জানে যে আলোক-রশ্মি কোন সুমসৃণ পালিশ করা তল হইতে প্রতিফলিত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করে। কিন্তু যে তল মসৃণ নহে, তাহাতে যেরূপভাবেই আলোক পতিত হউক না কেন, তাহা হইতে আলোক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন ধোপদস্ত কাপড় ইস্ত্রি করিবার পূর্ব্বে যেরূপ ধবল থাকে, সেরূপ ধবল তল হইতে আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এরূপ শুভ্র কাপড়ের দিকে চাহিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু মার্জ্জিত ধাতু-তলের দিকে চাহিতে, বিশেষতঃ প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিমুখে চাহিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। চকচকে শাদা পুস্তকের পৃষ্ঠার দিকে চাহিলেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোকে এইরূপ পুস্তক পাঠ করিলে চক্ষু আরও অধিক ঝলসিয়া যায়। বিলাতে বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন যে, কিরূপ কাগজে পুস্তক মুদ্রিত হইলে শিক্ষার্থীর চক্ষু নির্দ্দোষ থাকিতে পারে।—বিজ্ঞান।

বাঙ্গালী সেনাদলের জন্য নির্ব্বাচিত যুবকগণ।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত "কুল-পুরোহিত" ছোটগল্পের বই; প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি গৃহস্থ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। গৃহস্থ ঘরের কুলপুরোহিতের দক্ষিণা পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষের গল্প সংগ্রহ "আপেল" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য একটাকা মাত্র। পূজার পরই বড়দিনে খুব কাযে লাগিবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস "সৌধরহস্য" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় যে সাহিত্য-পঞ্জিকা (Bengali Literary Year-Book) প্রণয়ন করিতেছেন, বাঁকিপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে সমুপস্থিত প্রত্যেক সাহিত্যিককে ঐ পুস্তকের এক-একখণ্ড উপহৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফল "রামপ্রসাদ" যন্ত্রস্থ; প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। ১০.১২ খানি ভাবচিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মোতি-মহল" ও "লাল চিঠি" শীর্ষক দুইখানি নূতন উপন্যাস যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মাধুরী" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ওথেলো" নাটক যন্ত্রস্থ— শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের মহলা চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি-এ প্রণীত "জ্যেঠা মহাশয়ের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আটআনা মাত্র।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় অন্তর্গত—শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত—সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক "বড় বাড়ী" প্রকাশিত হইয়াছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ সম্পাদিত "কৃত্তিবাসী রামায়ণ" সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত "চরিত কথা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাচ সিকা।

শর্ম্মা ও বর্ম্মা প্রণীত নূতন গল্পের বই "দু' অবতার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আটআনা। "শর্ম্মা" ও "বর্ম্মা" দুই অবতারকেই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক প্রবন্ধের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত "হরিদ্বারে কুম্ভমেলা" আট আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "বারাণসী" ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। একটাকায় (অভিনয় নহে, শুধু) "বারাণসী" দর্শন হইবে।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ প্রণীত "ডায়ারীর দৌত"—মূল্য একটাকা।

শ্রীমতী বনলতা দেবীর "লক্ষ্মী শ্রী" মাত্র একটাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "দশ দিন" দশ দুয়ানী দক্ষিণায় দশের সেবা করিতে প্রস্তুত।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে দেড়টাকা দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠকগণকে "ওপারের কথা" শুনাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত নূতন উপন্যাস "ইন্দুমতী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত প্রণীত ভক্তিমূলক সুখমণী শিখগ্রন্থ মূল্য পাঁচসিকা। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ নূতন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের পত্র

কৃষ্ণকান্তের উইল—২৩শ পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

Emerald Ptg. Works

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

প্রথম খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

সিন্ধু-বন্দনা

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

এসেছি আবার কাছে, হে অপার মহাপারাবার,
বহুকাল পরে পুনঃ, লহ প্রভু, প্রণতি আমার!
নিরন্ধ্র কারায় হায়, নিয়তির প্রচণ্ড পীড়নে
সহেছি কতই জ্বালা জর্জ্জরিত দেহে ক্ষণে-ক্ষণে!
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে আপনারে রাখি' অর্গলিয়া!
অবশেষে রুদ্ধ-শ্বাসে প্রাণি বুঝি যে'ত বাহিরিয়া।
নাহি আলো, নাহি বায়ু; শুষ্ক তালু, বিন্দু বারি নাহি,
মুহুর্মুহুঃ এ জীবনে জাগিত যাতনা মর্ম্মদাহী।

যা'দেরে জড়ায়ে বুকে ভেবেছিনু সুখে যাবে দিন ;
কোথা তারা ? সে তিমিরে স্বপ্নসম সবি যে বিলীন !
চারিধারে অবিচ্ছিন্ন, সূচীভেদ্য, স্তব্ধ অন্ধকার !
একা আমি অসহায় ! কই, সেথা কেহ নাহি আর !
নিরাশায় রুদ্ধশ্বাসে, মহাত্রাসে, প্রাণপণ বলে
উল্লঙ্ঘি' গণ্ডীর বেড়া, ভগ্ন করি' কারার অর্গলে,
এসেছি ধাইয়া আজি পদ-প্রান্তে !

—রক্ষা কর মোরে !

ও অনন্তবাহী বায়ু দেহ এহি বক্ষখানি ভরে' ;—
নিঃশ্বসিয়া বাঁচি আমি ! মুমূর্ষু এ দেহ-মনঃ-প্রাণ
আলোকে, বাতাসে আজি মহা হর্ষে হোক্ ভাসমান ।
গাহ গান, হে মহান, লুপ্ত করি' ক্ষুদ্র কোলাহল ;
তরঙ্গে-তরঙ্গে মোরে ধৌত কর,—কর হে নির্ম্মল ।
হে বিরাট, আর্ত্ত হিয়া বড় আশে এল পদে যদি,
দেহ তাহে বরাভয়, হে অনন্ত অমৃত-জলধি !
পূর্ণ কর আজি তা'রে, চূর্ণ কর সর্ব্ব দুঃখরাশি ;
মগ্ন কর ভূমানন্দে, দেহ জ্ঞান দিব্য, অবিনাশী !
ক্ষণে-ক্ষণে এ জীবনে সঞ্জীবন করিয়া সঞ্চার,
বিন্দু আমি, ওগো সিন্ধু, তোমা'মাঝে কর একাকার ।

চার্ব্বাক-দর্শন ও তাহার সমালোচনা

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন]

কতপূর্ব্বে ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা আসিয়াছিল, দার্শনিক জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল ও সেই সকল চিন্তা-প্রসূত বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া সূত্রাকারে, পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছিল,—বলিতে পারি না, বলিবার কোন উপায়ও নাই। ভারতীয় কাব্যনাটকে ইতস্ততঃ দার্শনিক ভাবের কথা দেখিতে পাই। মহাভারতে, মহাপুরাণে ও উপপুরাণে ওতপ্রোতভাবে দার্শনিক-জ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে,—রামায়ণে রহিয়াছে—স্মৃতিতে রহিয়াছে, তন্ত্রে রহিয়াছে,—উপনিষদে রহিয়াছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে পর্য্যন্ত রহিয়াছে,—এমন কি বেদসংহিতারও নানা অংশে দার্শনিক ভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসার, অর্থ, কাম, নীতির, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও স্থাপত্যের এবং অন্যান্য কলাবিদ্যার একদিন ভারতেই জন্মগ্রহণ হইয়াছিল, বর্দ্ধন হইয়াছিল, উন্নতিলাভ হইয়াছিল। পরে অন্যান্য দেশবাসীরা ভারতে আসিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া নিজের-নিজের দেশে সেই সকল বিদ্যা লইয়া গিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি। কিন্তু সেই-সেই কথা বলিয়া ভারতের আর গৌরব করিবার কিছুই নাই, ভারত তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সুসভ্য দেশ সেই সূত্র অবলম্বনে বিজ্ঞানের বলে এক্ষণে সেই-সেই বিদ্যার চরম উন্নতিবিধান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিতেছে। ভারতের গৌরব করিবার আছে, একমাত্র দার্শনিক-বিদ্যা; তাহাও বুঝি আর থাকে না। পূর্ব্বে নব্যন্যায়ে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা প্রাচীন ন্যায় ও অন্যান্য দর্শন অধ্যয়ন করিত, এক্ষণে প্রায়ঃ তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেহ বা কাব্যের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কেহ বা ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও দর্শন পড়িতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, ব্যাকরণ অধ্যয়নের সময়ে ছাত্রদিগের নানারূপ আপত্তি ও প্রশ্নের মীমাংসা ও উত্তর করিতে অধ্যাপকের প্রায়ঃ ২।৩ দিন অতিবাহিত হইত, অনেক সময়ে চিন্তা করিতে-করিতে অধ্যাপক সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। এক্ষণে আর ছাত্রের মস্তিষ্কপ্রসূত নিত্যনবীন গুরুতর আপত্তি শুনিতে পাই না, অধ্যাপককেও সমাধিস্থ দেখি না, স্নানান্তে পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে, তন্মনস্ক অধ্যাপককে শুধু জলে হাতে হাত দিয়া রগড়াইয়া রগড়াইয়া কাপড়-কাচার অভিনয়ও দেখি না। এক্ষণে স্কুল কলেজের ছাত্রের মত চতুষ্পাঠীর ন্যায়ের ছাত্রেরাও দুই বৎসরে নোট মুখস্থ করিয়া উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

যে ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় অন্য দর্শনশাস্ত্র প্রতিভাত হয়, সেই ন্যায়ের অনুশীলনাভাবে অন্যান্য দর্শনের দার্শনিক তত্ত্বগুলিও অধ্যাপক ও ছাত্রের মনে পূর্ব্ববৎ পরিস্ফুট হয় না। সেইজন্য মনে করি, মৌলিক চিন্তার অভাবে ভারতের বুঝি আর সেই পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না, দার্শনিক-বিদ্যা লইয়া ভারতের বুঝি স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই থাকিতেছে না।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সংখ্যা অনেক। যাঁহারা বেদ-বাক্যে শ্রদ্ধা করেন না ও জন্মান্তরে আস্থা প্রদর্শন করেন না, তাঁহারাই ভারতে নাস্তিক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধ ও আর্হতেরা জন্মান্তর স্বীকার করিয়াও বেদবাক্যে অবিশ্বাসী বলিয়া নাস্তিক আখ্যায় আখ্যাত। চার্ব্বাক বেদবাক্যে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী, দেহাতিরিক্ত আত্মায় অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; সুতরাং তিনি নাস্তিকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। পুরাণকার বলিয়াছেন, স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতিই চার্ব্বাক-শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই লৌকায়তিক দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন; আবার স্বয়ং বিষ্ণু বুদ্ধ শরীর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষভদেব অবতীর্ণ হইয়া আর্হতমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কি কারণে ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও ঋষভদেব হইয়া আর্হতমত

প্রচার করিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতিই বা কি কারণে চার্ব্বাক সাজিয়া লোকায়ত মতবাদের সৃষ্টি করিলেন, পুরাণকার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যদি পুরাণের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, পুরাণের কথায় বিশ্বাস না জন্মে, তবে আমরা বলিতে পারি, হিন্দুর উদারতা একবার বুঝিয়া লউন। যে বুদ্ধ, যে অর্হৎ, যে চার্ব্বাক তিন দিক হইতে যুগপৎ হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বেদ-মহাতরুর মূলে সবলে শাণিত কুঠারাঘাত করিতেছেন, হিন্দু তাঁহাদিগের সেই-সেই মতবাদে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াও তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার ও বৃহস্পতির অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর উদারতা কি হইতে পারে? শত্রুর প্রতিভার পূজা করিতে হিন্দু পরাঙ্মুখ নহে। যে দিন জগৎ হিন্দুর এই উদারতা বুঝিবে, সেই দিন সমগ্র জগৎ আসিয়া হিন্দুর চরণে লুটিয়া পড়িবে।

এই প্রবন্ধে আমরা কেবল চার্ব্বাক-মতের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব। যদি কখনও সময় পাই, তবে অন্যান্য দর্শনের মতবাদ লইয়া পাঠক-পাঠিকার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

চার্ব্বাক মতে—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটিই মূল ভূত। এই চারিটি ভূত হইতেই সমস্ত ভৌতিক জগতের উৎপত্তি হয়। চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থই এই ভূত-সমূহের সংযোগে উৎপন্ন। আত্মা বলিয়া কোন পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব নাই। কিণ্বাদির মিশ্রণে যেমন মাদকতা-শক্তি আপনা হইতে তাহাতে জন্মে, সেইরূপ শুক্র ও শোণিতের সংযোগে সেই সংযুক্ত উৎপন্ন দেহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্য সমস্ত দেহব্যাপী হইয়া থাকে, অন্য কেহ চেতন নাই। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে, কাষ্ঠদ্বয়ের শক্তি অনুসারে ও ঘর্ষণের তারতম্য অনুসারে বহ্নি যেমন অল্পকাল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়,—শুক্র-শোণিতের বলের তারতম্য অনুসারে চৈতন্য সেইরূপ দীর্ঘকাল ও অল্পকাল স্থায়ী হয়। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ নাই; তন্ত্রান্তরে অনেক প্রকার প্রমাণ আছে। নৈয়ায়িকেরা অনুমান নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, চার্ব্বাক তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এই প্রত্যক্ষে যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়করণ সে, ইন্দ্রিয়গুলি শরীরের অবয়ব। ব্যাপ্তি (১)-জ্ঞান অনুমিতির করণ, এ ব্যাপ্তিজ্ঞান চক্ষুরাদির মত অঙ্গ নয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানও জ্ঞানের বিষয়। যে সময়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় কালান্তরে ব্যাপ্য দর্শনে, সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। সেই স্মরণটী অনুমিতির প্রতিকরণ। এখন দেখ, ব্যাপ্যের প্রত্যক্ষ হইল, ব্যাপ্তির স্মরণ হইল, আবার পরামর্শ (২) আসিয়া তাহার মধ্যে উপস্থিত হইল; তবে অনুমিতি হয়, একটী অনুমিতির জন্য ব্যাপ্যের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপ্যের পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞানের অপেক্ষা করিতেছে। আবার উপাধি বারণের জন্য অনুকূল তর্কের আবশ্যক; অনুকূল তর্কও একটী অনুমিতি। অনুকূল তর্কের উদাহরণ—ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হেতু হইত, তবে ধূম বহ্নিজন্য হইত না। আবার এই অনুকূল তর্করূপ অনুমিতির হেতু ব্যভিচারী কি না, তাহার বারণের জন্য অন্য অনুকূল তর্কের প্রয়োজন হইবে; আবার সেটীও যখন অনুমিতি, তখন তাহার ব্যভিচার বারণের জন্য অনুকূল তর্কান্তরের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং একটী অনুমান করিতে হইলে, তাহার রক্ষার জন্য সহস্র-সহস্র অনুমান করা আবশ্যক। এই অনুমানের যে কোথায় শেষ হইবে, চিন্তা করিয়া তাহার

(১) এই ব্যাপ্তির লক্ষণেই চিন্তামণি, দীধিতি ও দীধিতির টীকা, পত্রিকায় রাশি-রাশি গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ধরিতে গেলে, সেই প্রণালীতে লক্ষণ না করিলে প্রকৃত লক্ষণ হয় না। ন্যায়ের ভাষায় ব্যাপ্য, ব্যাপক ও ব্যাপ্তির লক্ষণ লিখিলে, সর্ব্বসাধারণের তাহা অবোধ্য হইবে; এইজন্য অগত্যা আমার সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইল। সাধারণের অবগতির জন্য বলিতেছি, একের স্থান মাত্রে যে দ্বিতীয় অবস্থিতি করে, সেই ব্যাপ্য; যেমন বহ্নির ব্যাপ্য ধূম। বহ্নিজন্য বাষ্পের নাম ধূম; সুতরাং বহ্নিভিন্ন ধূম থাকিতে পারে না। আর ব্যাপ্যের স্থানে যে থাকে, তাহার নাম ব্যাপক। এ স্থলে "মাত্র" পদ দেওয়া হইল না, কারণ ব্যাপক ব্যাপ্য যে স্থানে থাকে, সে স্থলেতে থাকে; অন্যত্ও থাকিতে পারে; যেমন ধূমের ব্যাপক বহ্নি; বহ্নি ধূম যেখানে থাকে, সেখানে থাকে, অন্যত্রও থাকে। এই ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের নিয়ত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে। অনুমাতা এইরূপ ব্যাপ্য দর্শনে ব্যাপ্তির স্মরণ করে; পরে ব্যাপকের উপলব্ধি করে। অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্যকে হেতু করিয়া ব্যাপকের সাধন করা হয়; এইজন্য ব্যাপ্য হেতু ও ব্যাপক সাধ্য।

(২) পক্ষে ব্যাপ্যের অবস্থিতি-বিষয়ক জ্ঞানের নাম পরামর্শ। যাহাতে অনুমান করা যায়, তাহার নাম পক্ষ—যথা 'পর্ব্বতে বহ্নি আছে' কারণ ধূম দেখা যাইতেছে, এই পর্ব্বত পক্ষ।

শেষ হয় না। এই ব্যাপ্তির স্থিরতা করিবার জন্য ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা। নয় স্থানে দেখা গেল, ব্যাপ্তি ঠিক আছে; কিন্তু দশম স্থানে হেতুর ব্যভিচার হইয়াছে। কিন্তু অনুমাতার চক্ষে দশম স্থান পড়ে নাই। তাহার মতে এই অনুমিতিটি নির্দ্দোষ; সে তাহাকে নির্দ্দোষ অনুমিতি মনে করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; এবং তাহার দ্বারা প্রতারিত হইয়া সেই প্রতারণার ফল ভোগ করিতে পারে। নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে যে, অনুমাতারা ব্যাপ্যদর্শনে ব্যাপকের অনুমান করিতেছে—তাহার হেত্বাভাস দোষ নাই। এই সকল কারণে অনুমানের প্রামাণ্য নাই। যাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিব, সেই ব্যক্তিটি বঞ্চক কি না, ভ্রমপ্রমাদশূন্য কি না, কি করিয়া জানিব। তাহাতে বঞ্চকতা নাই, ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই—এইগুলি প্রমাণ করিতে হইলে প্রমাণান্তরের আবশ্যক। ব্যক্ত্যন্তরের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় না; সুতরাং অনুমানের অপেক্ষা। অনুমানে প্রামাণ্য নাই, পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অনুমান ও আপ্তবাক্যের বলে তোমরা ঈশ্বর আছে স্বীকার কর। অনুমান খণ্ডিত হইয়াছে, শব্দ-প্রমাণও নিরাকৃত হইয়াছে; তখন আর কোন্ প্রমাণের বলে, ঈশ্বর আছে—সমর্থন করিতে চাও? এই জন্য, প্রমাণ নাই জন্য, আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি না।

পুরাণকার মহারাজ বেণের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, চার্ব্বাকেরও সেইরূপ চিত্র দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ যেমন বৈদিক ধর্ম্মের উপরে খড়্গহস্ত হইলেন; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী ও আত্মায় অবিশ্বাসী হইলেন;—চার্ব্বাকের মতবাদেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। মহারাজ বেণ রাজশাসনে ঘোষণা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছিলেন ও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা আমরা কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারি, হয় চার্ব্বাক বেণের উপদেষ্টা বা সভাপণ্ডিত ছিলেন; নয় বুদ্ধদেবের মত শিষ্যদিগের নিকট নিজের মতবাদ মুখে-মুখে প্রচার করিয়াছিলেন, অথবা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে মহারাজ অশোকের ন্যায় মহারাজ বেণও সেই মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বেণ কৃষিবিদ্যা-প্রবর্ত্তক ও প্রচারক মহারাজ পৃথুর পিতা। এই বেণ ও পৃথু উভয়ের নাম সুপ্রাচীন মনুসংহিতায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা পাঠক-পাঠিকা অনুমান করিতে পারেন, চার্ব্বাকের মতবাদ কত প্রাচীন। মহারাজ বেণের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি, চার্ব্বাকের মুখেও তাহাই শুনিতেছি। চার্ব্বাক বলিতেছেন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান বেদপাঠ, তাহার ব্যাখ্যা ও যজ্ঞাদিতে সেই সকল বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ, দণ্ডধারণ ও ভস্মদ্বারা সমস্ত অঙ্গের আচ্ছাদন—এগুলি কি? যাহাদিগের বুদ্ধি ও পুরুষকার নাই, এগুলি তাহাদিগেরই জীবিকা। প্রতিভা ও পৌরুষ থাকিলে বুদ্ধিবলে পুরুষকারের সহায়তায় জগতের হিতসাধক অনেক বস্তুর আবিষ্কার করিতে পারে, নিজের বা অন্যের সেই আবিষ্কৃত বস্তুর বহুল প্রচারে জগতের হিতসাধন করিতে পারে, ও বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ তাহার বিনিময়ে যাহা পাইবে, তাহা দ্বারা অনায়াসে সুখেস্বচ্ছন্দে নিজের ও কুটুম্বের ভরণপোষণ করিতে পারে। যাহার বুদ্ধি নাই, পৌরুষ নাই, তাহার জীবিকার নিমিত্ত এগুলি বিধাতার সৃষ্টি। চার্ব্বাক ঈশ্বর মানেন না, বিধাতা মানেন না; তবে এ স্থলে "ধাতৃনির্ম্মিতা" পদের অর্থ কি? হয় ত চার্ব্বাক ব্যঙ্গ করিবার জন্য এস্থলে ধাতৃ পদের কীর্ত্তন করিয়াছেন; নয় ত ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন চতুরচূড়ামণি ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য সঙ্কেত করিয়াছেন। চার্ব্বাক আরও বলিয়াছেন,—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস, এই তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া বেদের রচনা করিয়াছে। দুরন্ত শীতঋতুতে রাত্রিশেষে উঠিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শীতে আড়ষ্ট হইয়া গঙ্গার কন্‌কনে ঠাণ্ডাজলে চোখ-কাণ বুজিয়া পুনঃপুনঃ অবগাহন স্নান, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতোপলক্ষে নানাবিধ উপবাসের আচরণ, তিথি-নক্ষত্রবিশেষে, তিথি-নক্ষত্র-বারবিশেষের যোগে, গ্রহণে, সংক্রান্তিতে শ্রাদ্ধাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃস্পন্দভাবে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রের জপ, —প্রত্যেক কর্ম্মই পাত্র হইতে পাত্রান্তরে জলসেচনের ন্যায়, —কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কর্ম্মবাহুল্যদ্বারা অনর্থক আড়ম্বর, ও অভক্ষ্য বলিয়া কতকগুলি বস্তু বর্জ্জন এবং ভক্ষ্য বলিয়া কতকগুলি বস্তুর ভক্ষণ,—এগুলি ভণ্ডামি ভিন্ন আর কি বলিব? যে রাজমহিষী অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়া জগতে চিরবিদিত ও চিরপরিচিত, ঋত্বিক্‌দিগের সমক্ষে সেই মহিষীর সহিত রাজাকে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে।

যজমানের প্রত্যেক কার্য্যেই যজমান-পত্নীর বিদ্যমানতা চাই। আবার যজ্ঞে এমন কার্য্য আছে—যাহাতে যজমান-রাজার প্রয়োজন নাই, একাকিনী যজমান-পত্নী রাজমহিষীর প্রয়োজন আছে। সে সময়ে রাজমহিষীর সহিত ঋত্বিগ্‌-বৃন্দের ঠাট্টা-তামাসা মন্ত্রের ভাষায় বেদে লিখিত। ঋত্বিগ্‌বৃন্দ কলসে-কলসে জল ঢালিয়া, মন্ত্রপূত জলে রাজ্ঞীকে পুনঃ-পুনঃ স্নান করাইবে। এগুলি একমাত্র ধূর্ত্ততার নিদর্শন! অধিকাংশ যজ্ঞেই পশুচ্ছেদ আছে। সেই যজ্ঞ-নিহত পশুর কণামাত্র যজমানের ভক্ষ্য, আর অবশিষ্ট সমস্ত মাংসই ঋত্বিকের ভক্ষণীয়; যজমান-পত্নীর মাংসে অংশ নাই। এমন কি, অশ্বমেধের অশ্বমাংস পর্য্যন্ত ঋত্বিকের পরিত্যজ্য নয়; এত মাংসাশী হইয়া কেবল উদরতৃপ্তির জন্য ঘোড়ার মাংসে পর্য্যন্ত অন্যের অংশ বন্ধ করিয়াও যদি তাহারা রাক্ষস না হয়, তবে আর কাহাকে রাক্ষস বলিব?

দেহ ভিন্ন আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত্ব ও মৃতব্যক্তির আত্মার পরলোক-প্রাপ্তি—এই দ্বিবিধ কল্পনাতেও ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্যরূপ জীবিকা নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে। পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজনের মৃত্যুর পরে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ-তর্পণের আর বিরাম নাই, পুরোহিতের প্রাপ্য দান-দক্ষিণারও আর বিশ্রাম নাই। জিজ্ঞাসা করি, মৃতব্যক্তি যদি পরলোকে গিয়া পুত্রাদির প্রদত্ত অন্ন জল পান-ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তবে আর আত্মীয়-অন্তরঙ্গ বিদেশগমনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগের জন্যই বা পাথেয়-কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রত্যহ ভোজনের সময়ে তাহাদিগের নামে পিণ্ড দিলেই ত হয়। আবার যজ্ঞে যে পশ্বালম্ভনের বিধান আছে, কোন দয়ালু ব্যক্তি সেই পশুর হত্যা দেখিয়া ও হত্যাকালীন তাহার ক্লেশ দেখিয়া যদি তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ও সেই দৃষ্টান্তে এইভাবে ক্রমশঃ যদি জগতে দয়ালুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে জগৎ হইতে একেবারে যজ্ঞ উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। যজ্ঞ উঠিয়া গেলে, পরের স্কন্ধে আশ্রয় করিয়া মাংসাশী দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের মাংসাহারের আর ব্যবস্থা থাকে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রে লিখিয়াছে, যজ্ঞে যেমন যজমানের স্বর্গলাভ হয়, সেইরূপ যজ্ঞ-নিহত পশুরও স্বর্গবাস হয়। পশু, পশু-শরীর লাভ করিয়া কেবল নিয়ত ক্লেশভোগ করে, সবল-দ্বারা দুর্ব্বল অত্যাচারিত হয়, প্রপীড়িত হয়। মুহূর্ত্ত-কালের ক্লেশে পশুর যদি দেবত্ব লাভ হয়, তবে সকলের পক্ষে তাহাই ত কর্ত্তব্য; ইহা অপেক্ষা পশুর উপরে আর দয়া-প্রদর্শন কি আছে? আমি চার্ব্বাক বুঝিলাম, তোমরা পশুর উপরে দয়া করিয়াই যজ্ঞে তাহার হত্যা-সাধন করিতেছ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পশুর স্থানে পিতাকে লইয়া যজ্ঞে তাহার কেন হত্যা কর না? পিতার স্বর্গবাস ত তোমাদিগের অভিলষিত। তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পরে আর কষ্ট করিতে হইবে না, পথে নানারূপ কষ্ট ভুগিয়া সুদূর গয়ায় যাইয়া পিতার সদ্গতির নিমিত্ত বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান ও নানাস্থানে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে অনশনে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে না, এবং বাঁচিয়া থাকিলে সেই উপার্জ্জনবিমুখ, নিষ্কর্ম্মা, জরাজর্জ্জরিত পিতাকে যথাসময়ে আহার দিয়া অসচ্ছল সংসারের ব্যয়ভার বৃদ্ধি ও তাঁহার ফলশূন্য সেবায় সময়ক্ষেপ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে সময়ের সংক্ষেপ করিতে হইবে না।

যে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে তাহাকেই পূজা করে, তাহাকেই প্রণাম করে। তোমরা যখন গো-পূজা কর ও গরুকে প্রণাম কর, তখন আর তোমাদিগকে গালি দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

সুখ দুঃখ—সম্মিশ্র বলিয়া সেই সাংসারিক সুখের পরিহার করিতে হইবে, এই তোমাদিগের ব্যবস্থা। সুখের পরিহারেই যেন দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া হইল। এ যে কোন্ যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠাপিত, বুঝিতে পারা যায় না। সংসার ছাড়িয়া উদরান্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে যে ঘুরিতে হয়, তাহাতে বুঝি দুঃখ হয় না? মৎস্য-ভক্ষণ করিলে কখনও গলায় কাঁটা ফুটিতে পারে, পুষ্প-চয়ন করিতে গেলে কখনও বস্ত্রে বা শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইতে পারে, এই ভাবিয়া যে মৎস্য ভক্ষণ ও পুষ্প-চয়ন ত্যাগ করে, সে যেমন মূর্খ, দুঃখ সম্মিশ্র ভাবিয়া যে সুখের বর্জ্জন করে, সেও সেইরূপ মূর্খ। যথাশক্তি তুষের উৎসাদন করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সাল্যোদন ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শুক্র-শোণিতের সংযোগে যে দেহ উৎপন্ন হয় সেই দেহে শুক্রশোণিতজনিত চৈতন্যেরও উৎপত্তি হয়। চার্ব্বাক্ কি চৈতন্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? প্রত্যক্ষ-সর্ব্বস্ব চার্ব্বাকের আর ত প্রমাণান্তর নাই। আরও আশ্চর্য্যের

বিষয়, সেইটি প্রমাণ করিতে যাইয়া কিম্বাদির সংযোগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। প্রত্যক্ষে কি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়? ঘটের সহিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলে, অমনি ঘটের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়; আর কাহারও অপেক্ষা করে না। চার্ব্বাক মুখে অনুমান মানিতেছেন না, অথচ অনুমানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের উৎপত্তির অবধারণ করিতেছেন। তিনি অনুমান খণ্ডন করিতে যাইয়া কি কি বলেন, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। যেমন চক্ষুরাদির ন্যায় ব্যাপ্তি অঙ্গ নহে, ইহার অর্থ কি? চক্ষুরাদির অবধারণও প্রমাণদ্বারা করিতে হয়। বরং ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, চক্ষুরাদির প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষুরাদি অনুমানগম্য; অনুমান প্রমাণ নয়,—এই মাত্র বলিলে লোকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সুতরাং যুক্তির অবতারণা করা আবশ্যক। চার্ব্বাকও অনুমান-প্রমাণের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি ও অন্যান্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং অনিচ্ছাতেও চার্ব্বাক অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এই অনুমান প্রমাণ নয়, এই বাক্যে 'অনুমান' পক্ষ, প্রমাণ নয় সাধ্য ও প্রদর্শিত যুক্তিগুলি হেতু। কাজেকাজে অনুমানের খণ্ডন করিতে যাইয়া, চার্ব্বাক প্রকারান্তরে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। আবার পক্ষ উভয়বাদি-সিদ্ধপদার্থ; সুতরাং, চার্ব্বাক অনুমান স্বীকার করেন, কেবল তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। অনুমানের প্রামাণ্য নাই, 'শাব্দ প্রমাণ নয়, ঈশ্বরে শরীরাতিরিক্ত আত্মায়, পরলোক ও জন্মান্তরে প্রমাণ নাই। চার্ব্বাকের এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি, প্রয়োজন কি, বুঝিলাম না। চার্ব্বাক কি করিয়া জানিলেন, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাস করি; পরলোক ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করি! পরকীয় জ্ঞানের ত প্রত্যক্ষ হয় না! হয় চার্ব্বাক অনুমানবলে জানিতেছেন, নয় ত আমরা মুখে বলিতেছি বলিয়া তাহা বিশ্বাস করিতেছেন। অনুমানবলে জানিলে অনুমানের প্রামাণ্য মানিতে হয়। আমাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলে শব্দপ্রমাণে আস্থা স্থাপন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতেছি, চার্ব্বাক্ মুখে কেবল অনুমান অস্বীকার করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহার অনুমানে আস্থা আছে।

আমরা যদি বলি, চার্ব্বাক, আপনার মস্তক নাই! আমরা ত স্পষ্ট বুঝিতেছি, চার্ব্বাকের মাথা নাই। মাথা থাকিলে কেহ কি অনুমান অস্বীকার করিতে পারে? চার্ব্বাক তাহার উত্তরে কি বলিবেন, কেহ কি নিজের মাথার প্রত্যক্ষ করিতে পারে? হয় অনুমানবলে মস্তক আছে, অনুমান করিতে হইবে; নয়, অন্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মাথা আছে বলিতে হইবে। অন্যের কথায় বিশ্বাস করিলে শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। অনুমান-প্রমাণ ও শব্দপ্রমাণ অস্বীকার করিয়া চার্ব্বাকের একপদও চলিবার শক্তি থাকিতে পারে না; রন্ধন, ভোজন, গমন, শয়ন কিছুই তিনি করিতে পারেন না। একটি ভাত টিপিয়া যে সকল ভাতগুলি সিদ্ধ হইয়াছে ঠিক করা হয়, তাহাও যে কেবল অনুমানের বলে। পত্নীর আহ্বানে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া যে চার্ব্বাক ভোজন করিতে অন্তঃপুরে গমন করেন, তাহাও যে কেবল শব্দ-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। যে চার্ব্বাক শতবার প্রতারিত হইয়াও সামান্য ভৃত্যের কথায় নির্ভর করিয়া দৈনিক-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনি যে শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না, বুঝিতে পারা যায় না। বুদ্ধিমান চার্ব্বাকের অনাপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, কেবল আপ্তবাক্যেই বিশ্বাস নাই।

অনুমানে বিশ্বাস না করিলে গণিত, জ্যোতিস, চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য, স্থাপত্য, কলা সমস্তই উড়িয়া যায়। আগাগোড়া গণিত যে এক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূর্য্য যে একখানি তামার থালার ন্যায় দেখা যাইতেছে, চন্দ্র যে একখানি কলঙ্কিত রজতস্থালীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত চক্ষের উপরে যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে সমস্ত কি বস্তুতঃ সেই সেই পরিমাণের? পৃথিবী হইতে ততদূরে অবস্থিত স্থালীবৎ ও হীরকখণ্ডবৎ ক্ষুদ্রতম পদার্থ কি পৃথিবীপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে পাইতাম? অনুমানের বলে প্রত্যক্ষ এখানে বাধিত। একমাত্র অনুমানের সহায়তায় আমরা গ্রহনক্ষত্রের পরিমাণ স্থির করিতেছি, কতদূরে অবস্থিতি তাহার নির্ণয় করিতেছি, তাহাদিগের গমন ও ভ্রমণের অবধারণ করিতেছি, ও তাহা দ্বারা কবে কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ গ্রহের গ্রহণ হইবে, সাহসে নির্ভর করিয়া বলিতেছি।

চিকিৎসক যে রোগীর নাড়ী টিপিয়া জ্বরের অস্তিত্ব ও

তাপের পরিমাণ বলিতেছেন, ও কফ, পিত্ত, বায়ুর মধ্যে কাহার প্রকোপে রোগ উৎপন্ন, অবধারণ করিতেছেন; দেহ-কান্তি অবলোকন করিয়া, স্বেদ-মূত্র-পুরীষের পরীক্ষা করিয়া ও যন্ত্রের সহায়তায় শরীরের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অপুস্থ রোগের নির্দ্ধারণ করিতেছেন; এবং রোগবিশেষে যে চিকিৎসাবিশেষের ব্যবস্থা করিতেছেন, চার্ব্বাক কি বলিতে সমর্থ, এগুলি কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হইতেছে। কালবিশেষে ক্ষেত্রবিশেষে ফল-শস্যবিশেষের উৎপত্তি জানিয়া কৃষক (কর্ষক) যে সেইকালে সেইক্ষেত্রে সেই ফলশস্যের বীজ বপন করে ও কিসে সেই বীজে অঙ্কুরোৎপাদন, কিসে তাহার বর্দ্ধন; কিসে বা তাহা হইতে ফল শস্যের উদ্গম ও প্রাচুর্য্য হয়, তাহার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করে, তাহার মূলে কোন্ প্রমাণ অবস্থিত?

পর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ডের ধারণ-সামর্থ্য দেখিয়া, গুরুত্বের তারতম্যানুসারে ভারসহত্বের অবধারণ করিয়া, আমরা যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর, ইষ্টকের উপরে ইষ্টক চাপাইয়া-চাপাইয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি, নদ-নদী হ্রদ দেখিয়া ভূগর্ভে জলস্রোতের অবধারণ করিয়া আমরা যে কূপ-তড়াগের খনন করিতেছি, এগুলির মূলেই বা কোন্ প্রমাণ অবস্থিত? আজ যে আমরা শীতে, আতপে অবসন্ন না হইয়া, পথক্লেশে জর্জরিত না হইয়া ছয় মাসের পথ অনায়াসে ছয় দিনে উত্তীর্ণ হইতেছি, নিকটে নদ-নদী কূপ-তড়াগ কিছুই নাই, ঘরের দেওয়াল টিপিয়া সমস্ত গৃহ-কর্ম্মের উপযুক্ত নির্ম্মল জলধারা নিঃসারণ করিতেছি, ভিত্তি-লগ্ন অঙ্কুশ টানিয়া জলদরাজমহিষী সৌদামিনীকে আনিয়া তাহার অচঞ্চল দেহের উজ্জ্বল কান্তিপ্রবাহে নিবিড় নৈশ অন্ধকারকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেছি, নৈদাঘতাপে স্বেদজলে স্নাত হইয়া চপলাচালিত ব্যজন মারুতের শৈত্যে শরীর শীতল করিতেছি ও নিশীথিনীর শীতলক্রোড়ে শীতল শরীর রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছি—এই সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধাতা, এই সকল যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা কাহার সহায়তায় এই সকল যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন? বলিতে কি, পরমকারুণিক মহর্ষিদিগের উদ্যম যত্ন চেষ্টায় যদি চার্ব্বাক-মত প্রতিহত না হইত, জনসঙ্ঘ যদি চার্ব্বাক মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল প্রত্যক্ষে ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট-বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিত, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ হইত না; মানবজাতির উন্নতি হইত না; এমন কি অনেক পূর্ব্বেই জগৎ হইতে মানবের সত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

চার্ব্বাক অনুমানের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইগুলির সমাধানে আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য যে, যেমন একটী অনুমানের সাধনের জন্য ও তাহার রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ, স্মরণ ও অনুকূল তর্কের উদ্ভাবনের প্রয়োজন আছে, চার্ব্বাকের স্বীকৃত প্রত্যক্ষের কি তেমন কিছু নাই? ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই কি বিশেষণ-বিশিষ্ট বিষয়ের বোধ হয়? বিশেষণ জ্ঞান না হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে না; যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ সেই পদার্থদ্বয়কে প্রথমে না জানিলে সেই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ কি করিয়া বুঝা যাইবে? এই কারণ ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে প্রথমে পরস্পর অসম্বদ্ধ কতকগুলি টুক্‌রা-টুক্‌রা জ্ঞান জন্মে। ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটজ্ঞান হয় না। ঘট-মাত্রের জ্ঞান হয় ও ঘটত্ব মাত্রের জ্ঞান হয়; শুক্লরূপ মাত্রের জ্ঞান হয়, শুক্লত্ব মাত্রের জ্ঞান হয়; পরে ক্রমে ঘটত্ববিশিষ্ট, ঘট-শুক্লত্ববিশিষ্ট, শুক্লরূপ ও শুক্লরূপবিশিষ্ট ঘট এইরূপ জ্ঞান হয়, আবার ইহার মধ্যে একবার জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি-বলে একটি ঘট দেখিয়া নিখিল ঘটের বোধ হইয়া যায়। ইহার মধ্যে আরও একটুকু নিগূঢ় রহস্য আছে। ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ না হইলে ত ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না! সুতরাং বলিতে হইবে, সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটজ্ঞান হইবে কি করিয়া? ঘটত্বের সহিত চক্ষুর সংযোগসম্বন্ধ হয় না, ঘটের সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ঘটত্বের সহিত চক্ষুর ঘটঘটিত পরম্পরাসম্বন্ধ; এই পরম্পরাসম্বন্ধে ঘটত্বের বোধ হইয়া যাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেই ঘটের জ্ঞান হয় কি করিয়া? বিশেষণ জ্ঞান ভিন্ন বিশেষ্যজ্ঞান হয় না; ঘটত্ব বিশেষণ, ঘট বিশেষ্য; এইরূপ ঘটগত রূপাদি গুণকর্ম্মের সহিতও চক্ষুঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না।

অনুমানে যেমন ব্যাপ্তির স্মরণ আছে স্বীকার কর বা না কর, প্রত্যক্ষেও সেইরূপ স্মরণের প্রয়োজন আছে। বৃদ্ধদিগের ব্যবহারে তুমি ঘট কি,—পূর্ব্বে চিনিয়াছ; পরে ঘট দর্শনে তোমার ঘটাকার বুদ্ধি জন্মিতেছে; তোমার স্মরণ না থাকিলে তুমি ঘট বলিয়া ঘটকে কখনই বুঝিতে পার না। সুতরাং ঘটে তোমার চক্ষুঃ-সংযোগ হইলেও তোমার

ঘটাকারে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল চক্ষুর সংযোগেও পদার্থের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় না, মনঃসংযোগের আবশ্যকতা আছে। উন্মনস্কভাবে কত পদার্থ দেখিতেছি—সে সকল পদার্থের কি প্রত্যক্ষ হইতেছে? বায়ু মৃদুমন্দ বহিয়া শরীর শীতল করিতেছে; উপবন হইতে সুরভি কুসুমের সৌগন্ধ আনিয়া নাসিকায় উপহার দিতেছে; আবার ভীষণ ঝঞ্ঝামূর্ত্তিতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া শত-শত পোতকে সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত করিতেছে; নদীর আবর্ত্তে তরীমালাকে আবর্ত্তিত করিয়া ডুবাইয়া দিতেছে; শত-শত বনস্পতিকে উন্মূলিত করিতেছে; গৃহরাশিকে উড়াইয়া অট্টালিকার চূড়াকে ভূমিসাৎ করিতেছে। কখনও কি আমরা এই বায়ুর চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ করিতে পারি? ভর্জ্জন-কপালস্থ বহ্নিও কি কখনও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়? অথচ সেইরূপ কপালে হস্তার্পণ করিলেই হস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। এই-এই কারণে আবার কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়।

অনুমানের আশঙ্কা নিবারণের জন্য যেমন অনুকূল তর্কের আবশ্যকতা, প্রত্যক্ষেও সেইরূপ ভ্রম-নিবারণের জন্য প্রমাণান্তরের প্রয়োজন;—অস্বীকার করিলে চার্ব্বাক পদে-পদে প্রতারিত হইবেন। পিত্তদূষিত চক্ষুর সহায়তায় শঙ্খ দেখিলে শুভ্র বলিয়া তাহার বোধ হয় না, পীত বলিয়া প্রতীতি হয়। তখন তুমি বলিবে জগতে সকল বস্তুই পীত নয়। আমি যখন সকল বস্তুকে পীত দেখিতেছি, তখন বুঝিতে হইবে—আমার চক্ষুঃ রোগদুষ্ট; সেই চক্ষে শঙ্খ দেখিতেছি বলিয়া শঙ্খকে পীত বলিয়া বুঝিতেছি। আমি পূর্ব্বেও শঙ্খ দেখিয়াছি; তখন তাহার শুভ্রবর্ণেরই উপলব্ধি হইয়াছে; এখন যে শঙ্খে পীতিমা দেখিতেছি, এটী আমার ভ্রম। তোমার এই সকল কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, তুমি একমাত্র অনুমানের আশ্রয়ে প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দিতেছ। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি দক্ষিণকে উত্তর ঠিক করিয়া সেই অভিমুখে গমন করে, কখনই সে তাহার উত্তর দিগ্‌বর্ত্তি নিজ নিকেতনেও উপস্থিত হইতে পারে না। কাজে-কাজে তাহার হয় শব্দ, নয় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আকাশ অমূর্ত্ত ও বিভু এইরূপ দ্রব্যের রূপ নাই। এইরূপ দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয় না। রূপ থাকিলেও যদি সেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহার রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। একজন নয়, দুইজন নয়—আমরা সকলে অনন্তকাল হইতে নিয়ত সেই আকাশের দূরবর্ত্তী নীল রূপ বিলোকন করিতেছি। আকাশের এই নীলরূপ কি ঠিক? একমাত্র অনুমানের বলে আমরা সকলে আকাশের এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট নীল রূপ উড়াইয়া দিতেছি। এই-এই কারণে বলিতেছি, অনুমানকে সবল করিবার জন্য, সুদৃঢ় করিবার জন্য, যেমন নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষকেও রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহরচনার আবশ্যকতা আছে। এই ব্যূহরচনা করিতে হয় বলিয়া কি প্রত্যক্ষেও অপ্রামাণ্য খ্যাপন করিব? তাহা যেমন পারি না, অনুমানকেও সেইরূপ অনাদর করিতে পারি না।

বক্তায় বঞ্চকতা নাই, ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব নাই, অন্য প্রমাণ দ্বারা এই গুলির নির্দ্ধারণ করিতে হইবে বলিয়া শাব্দ-প্রমাণের উপরেও আমরা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারি না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—আবশ্যক হইলে আবার শতবার বলিব, একটী প্রমাণকে সবল ও প্রবল করিবার জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। যে আমরা বালকের কথায় পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই আমরা কোন্ সাহসে বলিব, শাব্দ-প্রমাণে প্রামাণ্য নাই? ষড়দর্শন-প্রণেতা ঋষিদিগের মধ্যে যদিও একমাত্র মহর্ষি কণাদ শব্দের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, তথাপি চার্ব্বাকে ও তাঁহাতে এ বিষয়ে প্রভূত বৈলক্ষণ্য আছে। চার্ব্বাক শব্দের প্রামাণ্য একেবারে স্বীকার করেন নাই; কণাদ শব্দকে অনুমানের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চার্ব্বাক বেদশাস্ত্রশাসিত ভারতের বুকে দাঁড়াইয়া যে বেদকে স্বার্থ-প্রণোদিত, ভণ্ড, ধূর্ত্ত নিশাচরের কল্পিত ও বিরচিত বলিয়া নির্লজ্জভাবে উচ্চৈঃস্বরে সমর্থন করিয়াছেন, সেই বেদকে গৌতম-দ্বৈপায়নের ন্যায় ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া কণাদ ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বেদের প্রামাণ্য স্থাপনের নিমিত্তই শব্দের প্রামাণ্য স্থাপনের প্রয়োজন। বেদ-প্রামাণ্যের মূলে ঋষিদিগের উদ্ভাবিত গ্রন্থকারদিগের প্রতিভা-প্রদর্শিত যুক্তিতর্ক অনেক আছে। সেইগুলির অবতারণা করিলে প্রবন্ধের অত্যধিক কলেবর বৃদ্ধি হইবে। সময় পাইলে বারান্তরে, প্রবন্ধান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব।

চার্ব্বাক দেহাতিরিক্ত আত্মার খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুক্রশোণিত-সংযোগজন্য দেহে সেই শুক্র-শোণিতসংযোগজন্য আগন্তুক চৈতন্যের উৎপত্তি হয়,—চার্ব্বাক কি তাহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? চার্ব্বাক ত প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ মানেন না; তবে আর কোন্ প্রমাণের বলে তিনি শুক্রশোণিতসংযোগ-জন্য চৈতন্যের উৎপত্তির সমর্থন করিতেছেন। শুক্র-শোণিত-জন্য দেহে শুক্র-শোণিতসংযোগজন্য চৈতন্যের উৎপত্তি হয়—এই কার্য্য-কারণ ভাবেরও উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অবয়বিগত রূপাদির অবয়বগত রূপাদিই অসমবায়ি কারণ। শরীর যখন সাবয়ব অবয়বী, তখন তাহার অবয়ব হইতেছে শুক্র-শোণিত। এই শুক্র-শোণিতগত রূপাদিই এই শরীরগত রূপাদির প্রতি অসমবায়ি-কারণ। চৈতন্যও যখন চার্ব্বাকমতে শরীরের একটী গুণ; তখন সেই শরীরের কারণ, শরীরের অবয়ব শুক্র শোণিতেও চৈতন্যান্তরের সদ্ভাব থাকা চাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই দেহগত চৈতন্যের শুক্র-শোণিতগত সেই চৈতন্য অসমবায়ি কারণ হইতে পারিত। শুক্রশোণিতে যখন চৈতন্য নাই, তখন কি করিয়া দেহে চৈতন্য জন্মিবে? চার্ব্বাকের দৃষ্টান্ত—চূর্ণেও শুক্লরূপ আছে, হরিদ্রাতেও পীতরূপ আছে—একেবারে রূপ নাই এরূপ নয়। সুতরাং চূর্ণ-সংযুক্ত হরিদ্রায় যে রক্তরূপের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার অসমবায়ি কারণ চূর্ণগত শুক্লরূপ ও হরিদ্রাগত পীতরূপ। শরীরগত চৈতন্যের প্রতি সেরূপ অসমবায়ি কারণ আমরা কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কি করিয়া শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করিব? চার্ব্বাকের অপর দৃষ্টান্ত কিন্বাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কিন্বাদিতে যে মদশক্তি জন্মিয়াছে, চার্ব্বাক কি তাহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আশ্চর্য্যের বিষয়, চার্ব্বাক কেবল মুখেই অনুমানের উৎসাদন করিতেছেন; অথচ সমস্ত সিদ্ধান্তই তাঁহার অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্ত উভয়বাদি-সিদ্ধ হওয়া চাই। কে বলে কিন্বাদিতে মহাশক্তি জন্মে? আমরা মিলিত কিন্বাদিতে মদশক্তির উৎপত্তি স্বীকার করি না। মদ্যপায়ীর যে মত্ততা জন্মে, তাহার প্রতিকারণ সেই পীত পাকাশয় হইতে হৃৎপিণ্ডে উত্থাপিত মনে বা মস্তিষ্কে পরিচালিত কিন্বাদিরূপ বিলক্ষণ কারণসামগ্রী। বিলক্ষণ কারণসামগ্রী হইতে কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয়—এই আমাদের সিদ্ধান্ত। সঙ্গতিহীন শৃঙ্খলাশূন্য জ্ঞানধারার উৎপত্তি হইলে, তদনুযায়ি প্রলাপ বকিলে, অকারণ হাসিলে, কাঁদিলে, নাচিলে—লোকে তাহাকে পাগল বলে। বিজাতীয় উত্তেজনায়, মনে বা মস্তিষ্কের এইরূপ বিকার হয়; রোগে হইলে এই বিকার দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হয়; মদ্যাদিপানে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। মনে বা মস্তিষ্কে বিজাতীয় উত্তেজনা বা অবসাদের জন্য আর মদশক্তি কল্পনার প্রয়োজন করে না, মিলিত কিন্বাদির উপরে কারণতা স্বীকার করিলেই উপপত্তি হয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে উৎস্বেদনক্রিয়া (Fermentation) দ্বারা সুরাসার (Alcohol) প্রস্তুত হয়। আমরা বলি, আর মদশক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? সুরাসারই (Alcohol) মত্ততার প্রতিকারণ; মিলিত কিন্বাদিতে নবোৎপন্ন মদশক্তি উভয়বাদিসিদ্ধ পদার্থ নয়; সুতরাং দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

মদশক্তিকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চার্ব্বাক যখন চৈতন্যের উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষে দৃষ্টান্তের স্থান নাই। চার্ব্বাকের যখন এটি অনুমান, তখন আমরাও এই অনুমানটি দোষদুষ্ট কি না, তাহার সমালোচনা করিতে অধিকার লাভ করিতেছি। জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই অনুমানে হেতু কি? বুঝিলাম, শুক্রশোণিতজনিত দেহ-পক্ষ চৈতন্যের উৎপত্তিসাধ্য হউক বা না হউক, মিলিত কিন্বাদিতে মদশক্তি দৃষ্টান্ত। কিন্তু চার্ব্বাকের এই সংক্ষিপ্ত বাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হেতু প্রদর্শন করা একান্ত দুঃসাধ্য। শুক্রশোণিতসংযোগকে হেতু করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; কিন্তু চূর্ণ হরিদ্রা সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় নাই, উৎপত্তি হইয়াছে রক্তরূপের। কিণ্বাদি সংযোগেও চৈতন্যের উৎপত্তি হয় নাই, উৎপত্তি হইয়াছে মদশক্তির; সুতরাং দৃষ্টান্তমুখে এই দুইটীর প্রদর্শন একান্ত অনুপযোগী। শুক্রশোণিতসংযোগকে হেতু করিয়া চৈতন্যের উৎপত্তির সাধন করিলে—জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মৃত শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না কেন? মৃতশরীরে হয় না বলিয়া, এই অনুমানটী ব্যভিচার-দোষদুষ্ট। যদি বল মৃতশরীরে শুক্রশোণিতসংযোগ নাই—প্রত্যেক সাত বৎসর পরে-পরে একেবারে সমস্ত শরীর বদলিয়া যায়—

পূর্ব্বশরীর থাকে না, পূর্ব্বশরীরের একটী পরমাণুও পরশরীরে থাকে না; তাহা হইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সাত বৎসর পরে সেই নবোৎপন্ন শরীরে আবার চৈতন্যের উৎপত্তি হইল কি করিয়া? শুক্রশোণিত-সংযোগই ত চৈতন্যোৎপত্তির প্রতি-কারণ। নবশরীরে যদি শুক্রশোণিত-সংযোগ না থাকে, কারণাভাবে চৈতন্য-রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় কি করিয়া?

যদি চূর্ণ-হরিদ্রাসংযোগে রক্তরূপের ন্যায়, কিণ্বাদি-সংযোগে মদশক্তির ন্যায়, দ্রব্যে দ্রব্যান্তরের সংযোগকে হেতু করিয়া কারণগত গুণ ভিন্ন বিজাতীয় গুণের উৎপত্তি সাধন কর, তাহা হইলেও চার্ব্বাকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না। শুক্লসূত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিলে, সে বস্ত্রও যে শুক্ল হয়। সুতরাং এ হেতুও ব্যভিচারদুষ্ট। কৃষ্ণের দুই পুত্র—রাম ও শ্যাম। রামের সহোদর শ্যামকে দেখিয়া, হরির একমাত্র পুত্র বনমালী—তাহারও সহোদর আছে—যদি সিদ্ধান্ত করি, তবে সে সিদ্ধান্ত যেমন অপসিদ্ধান্ত হইবে, সকলের নিকটে উপহাসের সামগ্রী হইবে, চূর্ণ-হরিদ্রাসংযোগে রক্তরূপের উৎপত্তি দেখিয়া, কিণ্বাদির সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তি দেখিয়া, শুক্রশোণিতসংযোগে চৈতন্যোৎপত্তির অবধারণও যে সেইরূপ হইবে, তাহা বোধ হয় আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। চূর্ণ-হরিদ্রাসংযোগে যে চূর্ণগত শুক্লবর্ণের উৎপত্তি না হইয়া হরিদ্রাগত পীতবর্ণ হইতে পীতবর্ণের উৎপত্তি না হইয়া, রক্তবর্ণের উৎপত্তি হয়, কিণ্বাদির সংযোগে যে নূতন মদশক্তি উৎপন্ন হয়, এই রক্ত-বর্ণ ও মদশক্তি কেবল সেই-সেই সংযুক্ত দ্রব্যে পাই। অন্যত্রও সেই সেই দ্রব্যের স্বাভাবিকরূপে দেখিতে পাই। মদশক্তি গাঁজাতে আছে, ভাঙে আছে, আফিংএ আছে। রক্তবর্ণ জবায় আছে, করবীরে আছে, বাঁধুনী ফুলে আছে। সুতরাং বলিতে পারি, যে গুণ ও শক্তি কারণগত গুণ-শক্তির বিজাতীয়—সেই গুণ ও সেই শক্তি অন্যদীয় স্বাভাবিক গুণের ও স্বাভাবিক শক্তির স্বজাতীয়। চৈতন্য যে অন্যদীয় স্বাভাবিক গুণ ও স্বাভাবিক শক্তির স্বজাতীয় নয়, শরীর মাত্রই যে পক্ষ, চৈতন্যমাত্রই যে সাধ্য; সুতরাং স্বাভাবিক চৈতন্য আর কোথায় পাইবে! কাজে-কাজেই অন্যদীয় স্বাভাবিক গুণ ও স্বাভাবিক শক্তির স্বজাতীয়ত্ব উপাধি হইয়াছে। এই উপাধি দ্বারা ব্যভিচারের আশঙ্কা জন্মিতেছে। এই ব্যভিচারের আশঙ্কা আছে বলিয়া ও মৃতশরীরে ব্যভি-চার হইয়াছে বলিয়া, চার্ব্বাকের কল্পিত এই সিদ্ধান্ত আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। সেই উদ্ভাবিত অপসিদ্ধান্ত একেবারে উৎসাদিত হইয়া যাইতেছে।

য়ুরোপীয় শারীরযন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ আবার নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে, যে শুক্রশোণিতের অংশবিশেষ হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা জড় নয়। ডিম্বাশয় হইতে শোণিতের সঙ্গে চেতন-রজো-ডিম্ব (ovum) বাহির হইয়া পড়ে। চেতন শুক্রকীটাণু (Spermatozoa) সেই রজোডিম্বের (Ovum) দিকে ধাবিত হয় ও রজোডিম্বের (Ovum) নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার উদরে প্রবেশ করে। রজোডিম্বও (Ovum) তাহাকে গ্রাস করে। পরে উভয়ের মিলনে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। এই নব-উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তেরও উপলব্ধি করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। শুক্রকীটাণুতে ও রজোডিম্বে যে চৈতন্য (বোধ) আছে, তাহা কি করিয়া সমর্থিত হয়? স্পন্দন, ধাবন, গ্রহণ, মিলন ও ভক্ষণ দ্বারা কি চৈতন্যের সাধন হইতে পারে? বায়ুতে স্পন্দন, ধাবন, গ্রহণ, মিলন আছে; অগ্নিতে স্পন্দন, ধাবন, গ্রহণ, মিলন, ভক্ষণ আছে; পৃথিবীতে ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও এ সমস্ত আছে। তাহারা কি চেতন? চুম্বক-লৌহের সন্নিধি-বশতঃ অন্য লৌহ যে সেইদিকে ধাবিত হয় ও তাহাতে মিলিত হয়, সে লৌহ কি চেতন? দুইটী চেতন মিলিত হইয়া এক হইয়া কি করিয়া একবিধ চৈতন্যের আশ্রয় হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। তোমরা হয় ত বলিবে—শুক্লতন্তুদ্বারা বস্ত্র উৎপাদন করিলে, যেমন শুক্লবস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তন্তুগত শুক্লরূপ যেমন বস্ত্রগত শুক্লরূপের কারণ, সেইরূপ শুক্রকীটগত ও রজোডিম্বগত চৈতন্যও শরীরগত চৈতন্যের কারণ। তোমরা নৈয়ায়িক, শরীরাতিরিক্ত পৃথক্ আত্মা স্বীকার কর বলিয়া গোলে পড়িয়াছ ও সেই-রূপ গোলে পড়িয়াই আত্মবিশেষগুণের অসমবায়ি-কারণতা অস্বীকার করিয়া শাকে মাছ ঢাকার ব্যবস্থা করিয়াছ। আমরা শরীরাতিরিক্ত আত্মা স্বীকারও করি না, আমা-দিগের কোনরূপ গোলে পড়িবার আশঙ্কাও নাই। য়ুরোপীয় শারীরযন্ত্রবিৎ বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতেরা এইরূপ আপত্তি করিবেন কি না, জানি না। যাঁহারা নিজের ঘরের ছিদ্র

পরের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিবার জন্য ব্যস্ত, ও তজ্জন্য পরের নিকট হইতে বাহাদুরী পাইবার জন্য লালায়িত, হয় ত তাহারাই এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করিবেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এ আপত্তি একবারেই টিকিতে পারে না। চৈতন্য কি? বোধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, বোধ জন্মে, তাহাকেই ত আত্মা বলা যাইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে শরীরই আত্মা। এই শরীররূপ আত্মার ত পুনঃ পুনঃ জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি জন্মিতেছে। তাহাদিগের কি পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি অসমবায়ি কারণ? পরবর্ত্তী জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতির পূর্ব্বেই যে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতির ধ্বংস হইয়া যায়; অসমবায়ি কারণ ধ্বংসে কার্য্যের ধ্বংস হয়। এই নিয়ম যে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। কার্য্য না জন্মিতে যে বিনষ্ট, সে কি অসমবায়ি কারণ হইতে পারে? কাজে-কাজেই শুক্রকীটগত ও রজোডিম্বগত চৈতন্যও শরীরগত চৈতন্যের কারণ হইতে পারে না। জীবিত-শরীরের যাদৃশ পরিমাণ, যাদৃশ গুরুত্ব ও যাদৃশ রূপাদি থাকে, মৃতশরীরেও তাদৃশ পরিমাণ, তাদৃশ গুরুত্ব ও তাদৃশ রূপাদি থাকে। মৃতশরীরে জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে না কেন? জীবিত-শরীরে যখন জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি ছিল, তখন সেই জীবিতশরীরগত জ্ঞানাদি মৃতশরীরে জ্ঞানাদির উৎপাদক হয় না কেন? একখানি শুক্লবস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিলে, তাহার সেই খণ্ডগুলিতেও শুক্লরূপ থাকে। একটী জীবিত-দেহকে যদি তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন-মস্তক করা যায়, তবে কি তাহার মস্তকে ও অবশিষ্ট দেহাংশে চৈতন্য থাকে? সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা আবশ্যক যে রূপাদির ন্যায় জ্ঞান. গুণ নয়।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, জ্ঞান কারণগত;—পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বা অন্য কোন গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। আমরা এক্ষণে অনুমান-প্রমাণের বলে আত্মার সাধন করিতে পারি। জ্ঞান যখন পাকে উৎপন্ন নয়, কর্ম্মজন্য নয় ও সমবায়ি-কারণগত গুণজন্য নয়, তখন সে সাবয়বের গুণ নয়। যে যে সাবয়বের গুণ, সে হয় পাকজন্য, নয় কর্ম্মজন্য; নয় ত কারণগত-গুণজন্য। যেমন আত্মা ভূত বা ভূতজন্য নয়; কারণ, তাহাতে কারণগত-গুণজন্য নয় এরূপ বিশেষগুণ আছে। যাহাতে এরূপ বিশেষগুণ থাকে, সে ভূত বা ভৌতিক হয় না; যে তাহা হয়, না, সে তাহা হয় না; যেমন শরীর ও পৃথিবী প্রভৃতি। জ্ঞান একটী বিশেষ গুণ। অস্মদীয় জ্ঞানের অন্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সুতরাং সে অতীন্দ্রিয়; আবার জ্ঞান কারণগত গুণজন্য নয়। বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকের আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, আমরা এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণকে হেতু করিয়া জ্ঞান যে বিভুগুণ, তাহার সাধন করিতেছি। আশ্রয় নাশে রূপাদি গুণের নাশ হয়; জ্ঞান সেরূপ নয়; আশ্রয়-নাশ নাশ্য নয়। আশ্রয়-নাশের অপেক্ষা না করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার কোন ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞানের একেবারে নাশই হয় না। এ উভয়ই আশ্রয়-নাশ নাশ্য নয়। এই আশ্রয়-নাশ নাশ্য গুণ নয় বলিয়া, জ্ঞান বিভু-বিশেষগুণ—নির্ভয়ে আমরা এইরূপ অনুমানও করিতে পারি। সমস্ত মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত যাহার সংযোগ আছে, তাহাকেই বিভু বলে। জ্ঞান যদি শরীরের গুণ হইত, তবে শরীরের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানেরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইত; অথবা অন্য বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা তাহাতে থাকিত। যখন তাহা নয়, তখন কি করিয়া জ্ঞানকে শরীরের গুণ বলিব! শরীরের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তদ্গত রূপাদির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ; গন্ধের ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ, স্পর্শের স্পর্শেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অথচ তদ্গতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ গুণ ত কুত্রাপি দেখি না। সুতরাং অনুমান করিব, জ্ঞান শরীরের গুণ নয়; আশ্রয়ের বহিরিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয়তা সত্ত্বেও তাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অবিষয়তা আছে। এইটী হেতু। যে শরীরের গুণ তাহার বহিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবিষয়তা আছে; যেমন শরীরগত রূপাদি। জ্ঞান অমূর্ত্তের গুণ হেতু, জ্ঞানে ক্ষণিকত্ব আছে।

ইত্যাদি, ইত্যাদি অনুমানে আমরা শরীরাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ করিতেছি। আত্মা মূর্ত্ত নয়, প্রমাণ করিতেছি; আত্মা বিভু, সর্ব্বব্যাপী, তাহারও প্রমাণ করিতেছি। ইহাদ্বারা যে কেবল চার্ব্বাকমত খণ্ডিত হইতেছে, তাহা নয়; শরীর-যন্ত্রবিৎ পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকদিগের মত নিরাকৃত হইতেছে; যাঁহারা আত্মাকে স্বশরীর-পরিমিতমাত্র বলিয়া মহর্ষিপূজ্য উপনিষদের উপরে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই

আর্হতদিগের, আর যাহারা আত্মার অণুত্ব ব্যবস্থা করিয়া কেবল ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্করের উপরে নয়,—মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, জৈমিনির উপরেও অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা দেখাইয়াছেন—সেই মধ্বাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির মতবাদও দূরে অপসারিত হইতেছে।

যিনি গর্ভের অঙ্কুরোদ্‌গমের সঙ্গে-সঙ্গে জননীর হৃদয় হইতে স্নেহের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছেন, ধাত্রীর হৃদয়কে স্নেহসিক্ত করিয়া বাহুতে বল দিয়া বালককে নিয়ত ক্রোড়ে ধারণ করাইয়াছেন, অঙ্গুলি ধরাইয়া গতিশিক্ষা দেওয়াইয়াছেন, পিতাকে ভীমকান্ত গুণে মণ্ডিত করিয়া, স্নিগ্ধ ও গম্ভীর করিয়া আদর্শ শিক্ষার পথে বালককে দাঁড় করাইয়াছেন, উপাধ্যায়কে কল্পতরু সাজাইয়া—কিছুই অদেয় নাই, এইভাবে—বিশ্বজিৎ যাগে দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার হাতের চাবি দিয়া তাঁহার হাতে তাঁহার আয়ত্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা বালকের সম্মুখে খুলিয়া ধরাইতেছেন, স্নেহের সেই অসীম অমৃত-পারাবার মাতা বল, ধাত্রী বল, পিতা বল, গুরু বল, সেই অচিন্ত্য-মহিম পুরুষের সত্তার প্রমাণ দিতে যাওয়ার তুল্য বোধ হয় আর ধৃষ্টতা নাই। যিনি আছেন বলিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র আছে, বায়ুমণ্ডল আছে, বিস্তীর্ণ পৃথিবী আছে, নদ-নদী-গিরি-কানন আছে, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম আছে, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ আছে, তুমি আছ, আমি আছি,—তাঁহাকে প্রমাণ করিতে যাইবে কে? কীটাণু কীট আমি! এই বড় আনন্দের দিনে, দশভুজা মায়ের মহাপূজার পরে, মহামুনি মেধসের মুখে ভর করিয়া মা শ্রীমুখে যাহা বলিয়াছেন, অর্জ্জুনের রথে দাঁড়াইয়া বন্ধুভাবে যাহা দেখাইয়াছেন, সেইটুকু মাত্র বলিব। মহর্ষিরা যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, আচার্য্যেরা যে সকল প্রমাণের উপন্যাস করিয়া নিবন্ধ লিখিয়াছেন,—সেই সকল যুক্তিতর্ক-প্রমাণ-প্রবন্ধ বুঝাইবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই। চণ্ডীতে আছে, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ!" ভগবদ্গীতায় আছে, "বিশ্বরূপদর্শনম্"। পাঠক-পাঠিকা কিছু কি বুঝিলেন, নিজ-নিজ শরীরে ব্যাপ্তি স্থির করুন। আত্মার ইচ্ছা হয়, যত্ন হয়,—অমনই শরীরে চেষ্টা হয়, কর্ম্ম হয়। মৃতশরীর নিশ্চেষ্ট। তাহাতে কর্ম্ম নাই; স্পন্দন, গমন প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহা দ্বারা বুঝিলাম, আত্মার ইচ্ছা না হইলে, শরীরে কর্ম্ম হয় না। শিলনোড়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছি; সে নিস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। আত্মার ইচ্ছা হয় বলিয়া, আত্মাধিষ্ঠিত শরীরে কর্ম্ম হয়। এই যে অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবীর পরিস্পন্দন হইতেছে, এই যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে,—এ কাহার অধিষ্ঠানে? আমাদিগের দেহে যেমন দেহীর অধিষ্ঠান আছে, সেই দেহীর ইচ্ছায় যেমন এই সকল দেহে কর্ম্ম চলিতেছে,—সেইরূপ এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেও যখন ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডও কোন দেহীর দেহ; সেই দেহীর অধিষ্ঠানে, তাঁহারই ইচ্ছায়, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেহ ও দেহাবয়ব নিত্য ভ্রাম্যমান, সেই অধিষ্ঠাতাই ঈশ্বর। আর কিছু বলিব না ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া এই কঠমঠ প্রবন্ধের শেষ করিলাম; এইরূপ দুর্ব্বোধ জটিল প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠক-পাঠিকার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নির্ভর

[শ্রীইন্দিরা দেবী]

অনেক সওয়ালে নাথ
তবু আমি জানি তোমারি সে দয়া সে তব দণ্ডাঘাত।
তুমি যা দিয়েছ সেই মোর ভাল
হো'ক না কঠোর হো'ক না সে কালো
শ্মশানের দাহ হৃদে যদি জ্বালো
জ্বালাবে তোমারি হাত।

ভালবেসে মোরে যাহা দিবে স্বামী
তাহারেই যেন ভালবাসি আমি
হো'ক সে তোমার পরম সোহাগ হো'ক বা বজ্রাঘাত।
মৃত্যুর নবলীলা নর্ত্তনে
কি ভয় প্রলয়ভেরী গর্জ্জনে
অমা রজনীর অবসানে পুনঃ আসিবে সুপ্রভাত!

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪১

একটা গল্পে আছে ঃ—একজন গৃহস্থের এক পোষা ভূত ছিল। গৃহস্থের সঙ্গে ভূতের এই সর্ত্ত ছিল যে, গৃহস্থ তাহাকে চব্বিশঘণ্টা কাজে যুড়িয়া রাখিবে ; নতুবা, যদি মুহূর্ত্তের অবসর পায়, তা'হইলে তন্মুহূর্ত্তেই সে গৃহস্থের ঘাড় ভাঙ্গিবে। গৃহস্থ বুদ্ধি করিয়া তাহাকে,—তাঁহার বাড়ির উঠানে খোঁটা গাড়িয়া সেই খোঁটা বাহিয়া রাত্রিদিন ওঠা এবং নামার কাজ দিয়া—জব্দ রাখিয়া, নিজেও রক্ষা পাইয়াছিলেন। এ গল্পের ব্যাখ্যা এইরূপ শোনা যায়, ঐ গৃহস্থ শরীরী এবং ভূত—দেহাশ্রিত মন। অজপাজপের সহিত প্রাণায়ামাভ্যাস দ্বারাই এই মনরূপী ধ্বংসকারী ভূতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। মন ক্ষণ চঞ্চল ; সে এক মুহূর্ত্তও চুপ করিয়া থাকিতে জানে না। ভাল কাজ না পাইলে সে দেহীকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া উচ্ছন্ন যাওয়াইবে। গল্পটি শুধু কপোল-কল্পিত নয়, ইহা বিশেষ-রূপেই পরীক্ষিত।

যে শরীরে কোন-একটা তীব্র বিষ ঢুকিয়াছে, তাহাকে চিকিৎসকেরা সমস্তক্ষণ ঘুরাইয়া, নাড়াইয়া, পিটাইয়া, বিরেচক ঔষধ গিলাইয়া, নানা রকমেই সজাগ রাখিতে চেষ্টা করেন। বিছানা পাতিয়া শোয়ানর ব্যবস্থা তাহাদের জন্য নয়।

নির্ম্মলের মাথার আঘাত তাহার মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া থাকিতে পারে ; এবং সেজন্য হয় ত তাহার শরীরের বিশ্রামও আবশ্যক হইয়াছিল ; তাহাকে নামা-ওঠার হুকুম দিতে-দিতে গৃহস্থ হয় ত কাহিল বোধ করিতে পারেন ; কিন্তু তাই বলিয়া ভূত তাহার সর্ত্ত ভঙ্গ হইতে দিবে কেন ? সে হয় কাজ, না হয় অকাজ, একটা তো করিবেই। নির্ম্মলেরও ফাঁক পাইয়া, তাহার মনটা তাহাকে যেন ভূতের মতই পাইয়া বসিল। যাহারা সাধু নয়, তাহাদের জন্য স্বয়ং ভগবানও বিশ্রাম তৈরি করিয়া রাখেন নাই। আবর্ত্তনের পর আবর্ত্তনের স্রোতে আবর্ত্তিত হওয়াই তাহাদের বিধি-লিপি। সরকার বাহাদুর যদি জেলখানা ও পাগলা-গারদের ভিতর খাটিবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত রাখিতে আলস্য করিতেন, তাহা হইলে চোর এবং পাগলগুলাকে লইয়া সরকার বাহাদুরকেও বড় মুস্কিলে পড়িতে হইত।

ইরাবতীর বক্ষে সুন্দর সুবৃহৎ বজরা ইচ্ছাসুখে ভাসিয়া চলিয়াছিল, দু'ধারের তীরের রেখা সকল সময়, সব জায়গায়, সুপরিদৃশ্যমান নয়। কোথাও যেন অকূল সমুদ্রেরই মত এক দিকে কেবল সীমাহীন শুভ্র সলিলরাশি ধূধূ করিতেছে। অন্য তীরের সবুজ রেখাও এত সরু—যেন মনে হয়, সাদা সাড়ির সবুজে ফিতার পাড়ের মত নীল ওড়নার নীচে প্রকৃতি দেবীর বুকের উপর স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। মাঝ-নদী হইতে তাঁহার বক্ষ স্পন্দনের তালে উহাদের ওঠা-পড়ার কম্পনটিও যেন সুগোচর হয় না। নদী বৃহৎ, কোথাও সে সুপ্রশস্তবক্ষ, কোথাও শীর্ণাঙ্গী। স্থানে-স্থানে ইহার নামেও কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই অজ্ঞাতকুলশীলা নিজের উৎপত্তির মতই রহস্যময়ী! তিব্বতের একটি চঞ্চলা বালিকা—'ঙাই' উচ্চব্রহ্মে মালি প্রভৃতি সখী-সঙ্গিনী পরিবৃতা হইতে-হইতে প্রায় সমস্ত ব্রহ্ম-রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক একাগ্র সাধনায় মহাশক্তি সঞ্চয় করিতে-করিতে, পরিশেষে মহাশক্তিশালিনী যোগৈশ্বর্য্য-যুক্তা হইয়া বঙ্গোপসাগরে মহাসমুদ্রের কণ্ঠলগ্না হইয়াছেন। মহতের ধর্ম্মই মহত্বের পুরস্কার। শুধু একনিষ্ঠ সাধনাতেই এই মহিমময়ের আশ্রয়লাভ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্কিলেরও ঘটে। এখানে জাতি, নীতি, কুল, গোত্র সমস্তই দূরগ—কিছুরই

বিচার নাই, বিভাগ নাই। যে আসিতে পারো, এসো ;—সেই উদার, অসীমহৃদয় সমুদ্র অনন্ত বিস্তৃতই রহিয়াছে ; ঝাঁপাইয়া পড়ো, নিজেকে মিলাও—এক হইয়া মিশাইয়া যাও !

আরাকান পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিবার পর নদীর এই প্রশস্ততা লাভ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেক স্থলে এমনও ঘটিয়াছে যে, এই পরিপূর্ণ বর্ষাশেষেও সেই সুবিখ্যাত নদীবক্ষে স্থানে-স্থানে বজরার গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেখানে নদীর প্রশস্ততা হয় ত পঞ্চাশ-ষাট গজ মাত্র; আবার তাহার পরেই ৩০০।৪০০ হইতে-হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া আসিয়াছে। এ যেন আকাশের বক্ষে চাঞ্চল্যময়ী বিদ্যুতের খেলা ; এ যেন নৃত্যকুশলা নটীর নুপুরসিঞ্জনের তালে-তালে নৃত্যলীলা প্রদর্শন ! কোথাও সে নিজে অচল ; সঙ্গীতের ভাব-প্রকাশক কলাসহ তাহার করাঙ্গুলী ও মৃণালবাহুর নর্ত্তনলীলা চলিতেছে। কোথাও ঋজু, কুটীল ভঙ্গিসহকারে মঞ্জীরের মুখর রবে চরণ-যুগলের সঙ্কোচগতি ; আবার কখন বর্ণের তরঙ্গে রূপের জ্যোতিতে দর্শকদলকে চমকিত করিয়া পেশোয়াজ ছড়াইয়া, পাখোয়াজ মৃদঙ্গ চড়াইয়া দিয়া, ঘূর্ণন ! নৈসর্গিক শোভাও—কোন-কোন স্থানে নির্ম্মলের মনে হইতে লাগিল—যেন অনৈসর্গিক। কোথাও ধূর্জ্জটীর ধূসর, পিঙ্গল, জটাজালের মত ধূম্রবর্ণ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া শিবললাটস্থিত শশিকলার ন্যায় প্রথম শরতের নির্ম্মল চন্দ্রখণ্ড হাসিয়া উঠে ; সেই জটাভারচ্যুত জাহ্নবী-তরঙ্গের মতই নদীজল পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া কল-কল কুলু-কুলু রব করিয়া বহিয়া যায় ; কোনখানে সূর্য্যজ্যোতিঃ-প্রজ্জ্বলিত শুভ্রালোকে শুভ্রতরমূর্ত্তি পাষাণ শিবলিঙ্গে সবুজপত্র সম্ভারে ও পার্ব্বত্য বন্যকুসুমে শ্যামদূর্ব্বাদলে অর্ঘ্যের রাশি ঢালিয়া দিয়া জলের ধারা দিতে-দিতে যেন ভক্তিমতী প্রকৃতি-বালা তরঙ্গের সুরে, পাখীর গানে, বাতাসের হিল্লোল-মর্ম্মরে তাঁহারই স্তব গাহিয়া বর মাগিয়া লয়। মধ্যাহ্নের কনক-চূর্ণ-ক্ষেপে নদীর জলের গলিত স্বর্ণে হীরার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া কোন জনপদবাসি বর্ম্মী নারী ও পুরুষ জলের মধ্য হইতে কৌতুক-বিস্ময়ে তাহাদের বজরার দিকে চাহিয়া থাকে। তীরের কাছে সন্ধ্যায়-সকালে তরি ভিড়াইয়া রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা চলে। সেই সময় সে কোন-কোন দিন তীরে নামিয়া কিছুদূর অবধি নগরে গ্রামে বা নির্জ্জন বনে বেড়াইয়া আসে। সে সব গ্রাম, সহর বা বন সবই নির্ম্মলের নিকট সম্পূর্ণ অজানা ; কল্পনায়ও কোন দিন তাহার কাছে ইহাদের পরিচয় স্পষ্ট ছিল না। বনে কত রকম গাছ, কত যুগের কত বৃক্ষ-সমাজের গোষ্ঠীপতি, সমাজপতিকে দেখিয়া আসে। কতই না অচেনা ফুলের, পাখীর সহিত পরিচয় হয়। কতবার তাহার পদশব্দে চকিত হইয়া বনের তরুণী বনসুন্দরী হরিণীরা তাহার পানে বারেক চকিত কটাক্ষ-শরক্ষেপ করিয়াই ঘন নিবিড় শাখা-পত্রান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সেই চোখের ছবি যেন আর কোন্ ছায়াচিত্র মনের ভিতর ফুটাইয়া তোলে,—সেও আজ অমনি করিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে ! ইহাদেরই মত সেও আজ তাহাকে এতটুকু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে না। অমনি তাহার চোখের সাম্‌নে প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য কয়লার খনির মত কালিমাখা হইয়া উঠে, বুকের মধ্যে একটা অকরুণ বেদনা দুই হাতে পাঁজরগুলা মড়্‌মড়িয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে থাকে। তাহারা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—শুধু এই খবরটুকু যদি কেহ তাহাকে জানাইয়া দিতে পারিত ! আর কিছু না, শুধু ঘৃণার্হের হেয় স্মৃতির মাঝখানে কাঁটার মত ফুটিয়া থাকার পরিবর্ত্তে একেবারেই চিরদিনের মত মুছিয়া যাওয়া তাহার একমাত্র কাম্‌না !

তাহার নিজের মনের মাঝখানে যে ব্যথাটা একটা জোড়ালাগা ভাঙ্গা হাড়ের মতই রাত্রিদিন খট্-খট্ করিতে-ছিল, কাজে-কর্ম্মে চাপা দিতে-দিতেও যেটা কোনমতে এতদিনেও চাপিয়া গেল না, অন্যের গায়েও ইহার জোড়-না-লাগার বেদনা যে অবসান হইয়া গিয়াছে, এমন ধারণা কেমন করিয়া সে মনে আনিবে ? সে নিজেকে আজকাল এই যে এমন করিয়া কর্ম্মহীন অবসরের ফাঁকে চিন্তা-সমুদ্রে তলাইয়া যাইতে দিয়াছিল—তথাপি সে এই অবস্থা হইতে বাঁচিয়া, ভাসিয়া থাকিবার দিকের অনুকূল চিন্তাকেই শুধু সেখানে প্রশ্রয় দিত, প্রতিকূলতার আশ্রয় একদিনের জন্য দেয় নাই। সে মনকে কতরকমে জবরদস্তি করিয়া বুঝাইয়াছে, অপর্ণা এখন নিশ্চয় খুব সুখেই আছে। তাহাকে বিধাতা দুঃখে ফেলিয়া রাখিবার জন্য যে গড়েন নাই, তাহা তাঁহার গড়িবার 'ধাঁজ' দেখিয়াই অনুমান করা অসম্ভব নহে। সে সুখে আছে,—খুবই সুখে আছে। হয় ত মেয়ের

এই সুখসাচ্ছন্দ্যের দিনে যে তাহাকে এমন সুখী হইতে দিয়াছে, সৌদামিনী তাহাকে মনে মনে ক্ষমাও করিয়াছেন। সে সুখে থাক, চিরসুখী হোক্।

কিন্তু এ সান্ত্বনা মনকে বেশীক্ষণ শান্ত রাখিতে পারে না। সে সুখী হইয়াছে, ভালই হইয়াছে; সুদূর ভবিষ্যতেও তাহার সুখ-শান্তি যেন অটুটই থাকে; কিন্তু সে যে তাঁহাদের চক্ষে এই বিশ্বাসহন্তার কলঙ্কে কালো হইয়া গিয়াছে, সে কালি যে সপ্ত-সমুদ্রের জলেও ধুইবার নয়,—তাহার জন্য ক্ষমা কোথায়?

মানুষ যে চোখ দিয়া সত্যকার দেখা দেখে, তাহা আমাদের এই কপালের নীচেকার কালো-তারা দেওয়া, কৃষ্ণপক্ষে ঢাকা বাহিরের এই চোখ দুটোই না। এ চোখ দিয়া শুধু সাম্‌নের বস্তুর প্রতিবিম্ব মনোদর্পণে বিম্বিত করিয়া দেয়। আমাদের ঋষি-কল্পনায় যিনি ত্রিকালজ্ঞ তিনি ত্রিলোচন এবং যে আস্থা বা অনাস্থা প্রকৃতি তাঁহার নিত্য সঙ্গিনী, তিনিও ত্রিলোচনা। ধীরার সেই তৃতীয়নেত্র,—জ্ঞান-চক্ষু, বড় সহসাই খুলিয়া গিয়াছিল।

আজকাল এক ধুঁয়া উঠিয়াছে,—'মানুষ নিজেই সত্য, তাহার জন্য পুঁথির শ্লোক, বা গুরুর বাণী নিষ্প্রয়োজন।' তা' যদি হইত, তবে ভগবান জননীর গর্ভে সন্তান দিতেন না, তাহাদের ভুঁইফোঁড় করিয়াই জন্ম দিতেন। যাদের শাস্ত্র-শাসন নাই, গুরু নাই, মন্ত্র নাই, সেই ভবঘুরে বেদে, দুর্দ্দমনীয় আদিমজাতি অথবা আর একটু নামিলে—পশু-জগৎই কি যথার্থ সত্য! তা হইতে হয় হোক, আপত্তি নাই। কিন্তু অপর জীবের জন্য যে ব্যবস্থাই থাক, মানুষের জন্য বাপ-মায়ের নীতিশিক্ষা, পুঁথির বচন, গুরু-উপদেশ এই যে চিরদিন ধরিয়া আছে, এ সবই হুট্ করিয়া হঠাৎ উঠিয়া গিয়া, মানুষের সত্য-মূর্ত্তির একটা বীভৎস নগ্নতা বাহির হইয়া পড়িবে—এ কথা ভাবিলে ভয় হয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই ঘটিবে এমন আশঙ্কাটা মনে জাগে না। মানবশিশুর শিক্ষকের, মন্ত্র-উপদেষ্টার প্রয়োজন চির-দিনেরই। আর সেই গুরুর বাস যদি ভাটপাড়ায় না হইয়া লণ্ডনে বা বার্লিনেই হয় তা'হোক, কিন্তু তাই হইলেই যে তাঁহার গুরুত্বে আর কোন খুঁৎ থাকিবে না, এমনও ভরসা করা যায় না। কারণ, শিশু যেমন মানুষ, তাহার গুরুও ঠিক তাই, এবং ইউরোপীয় গুরুদের মতে 'To err is human'—ভ্রম মানবধর্ম্ম। এই কথা স্বীকার করিতেও না কি তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না।

যে গুরুদত্ত 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা' দ্বারা ধীরার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত' হইয়াছিল, তাহা প্রেম! আর সেই মন্ত্রের ঋষি ছিল পাতিব্রত্য ধর্ম্ম! অনেক জিনিষ একটু-একটু করিয়া, দিনে-দিনে ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া, মায়ের কোলে শিশুর মত, শুক্লপক্ষের তরুণ চন্দ্রের মত বর্দ্ধিত হয়। আবার কিছু-কিছু সূর্য্যের মত একেবারে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়াই দেখা দেয়। সন্তানের প্রতি মায়ের অতুল্য, অমূল্য, স্বর্গীয় স্নেহের উপমা শুধু এক সৃষ্টি-কর্ত্তার করুণার ভিতরেই খুঁজিয়া মেলে, আর কোথাও না। কিন্তু সেই স্নিগ্ধ-মধুর, অমৃতময় মাতৃস্নেহ এই দাবানলসদৃশ জ্বলন্ত সতীপ্রেম নয়—যাহা তাহার প্রাণে জ্বলিয়া স্বামীর চিতাগ্নিতে তাহাকে পুড়াইয়া ভস্মও করে। 'চাঁদ কিছু নয়'—এ কথাটা আর কেমন করিয়া বলা যায়? দিন-রাত যদি ঐ আলোর সমুদ্র উথলাইয়া দিয়া আকাশের উপর সূর্য্য জ্বলিত, তা হইলে হয় ত দুর্ব্বলদৃষ্টি মানবমাত্রের পক্ষে তা' খুব সুখের হইত না;—কিন্তু তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, চাঁদ এবং সূর্য্য ঠিক এক নয়; আবার যেটা অল্পে-অল্পে আসে, তাহার গতি মৃদু, এবং স্থায়িত্বও বোধ করি বেশিই। বন্যার বেগে উচ্ছ্বসিত পাহাড়ে জলের ধারা বাড়ীর উঠানকে একেবারে পুকুর করিয়া দেয়, উঠানের পর নৌকা চালায়, কিন্তু চিরদিন থাকে না;—গরীবের ঘর ভাসাইয়া, সন্তান খাইয়া, নিজে ঘোলা হইয়া ফিরিয়া যায়।

ধীরার মধ্যেও যে সুপ্ত নারীপ্রেম জাগিয়াছিল, সেও অম্‌নি উচ্ছ্বাসের বন্যায় দুকূল ছাপাইয়া জাগিয়াছিল। তাহার ঘুমন্ত জগৎ প্রভাতের মার্ত্তণ্ডের অরুণ আলোয় যখন জাগিল, একেবারে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ক্রিয়ার মধ্যে সমস্ত আলস্যের জড়তা মুছাইয়া ফেলিয়া জাগিল। তাহার জীবনের সেই অতলস্পর্শ অন্ধকার ভেদ করিয়া সৃষ্টির প্রথম কালের মতই স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা ভাস্কর হইয়া দেখা দিল, তাহারই সেই সহস্র শিখার অগ্নিময় উজ্জ্বলতায় তাহার সমুদয়টা যেন তেমনি জ্যোতির্ম্মণ্ডিত করিয়া তুলিল সেই তাহার মৌন, পর্ব্বত-পাষাণরুদ্ধ হৃদয়ধারাটুকু যেন দেখিতে-দেখিতে কোথাকার কোন্ সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বসিত বন্যাজলের জোগান পাইয়া হুহু করিয়া বাড়িয়া উঠিতে

লাগিল। তাহাতে তখন কি উন্মাদ তরঙ্গ, কি প্রচণ্ড আবেগ, কত বড় ক্ষুধা! তাহা লইয়া সে কি কখন আর নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে? তাহার চারি পাশের পর্ব্বত-প্রাচীর যত দৃঢ়ই হোক, তাহার প্রলয়কারী শক্তিও তো তখন কম নয়। সে যেন তখন আপনাকে ছাপাইয়া, ছড়াইয়া দিবার জন্য পাগল হইয়া পথ খুঁজিতেছে। তাহার ভিতরে যতখানি অন্ধকারের কালো ছিল, যেন ঠিক তাহারই সমান তৌলে ওজন করা আলোর আভায় ভিতরটা তাহার রঙিয়া উঠিল। সে রং শুধু আলোর রং, ইন্দ্রধনুর সব ক'টা বর্ণ তাহার মধ্যে সূর্য্যের আলোর পাশাপাশি মেশামেশি হইয়া ফুটিয়াছিল। তাহার খানিকটা ছটা তাহার বাহিরের দেহটার প'রেও যেন নূতনতর একটা সৌন্দর্য্যের বাতি জ্বালিয়া দিল। যেন শরতের প্রথম অভ্যুদয়ে আকাশের মেঘের সমুদয় কালি ধুইয়া ফেলা উজ্জ্বল শুকতারাটির মতই তাহার সমস্ত শরীর, মন আলোকে-পুলকে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

ধীরা আর সে ধীরা নয়। কেহ তেমন করিয়া শিখাইয়া না দিলেও, সে আপনার মনের ভিতরকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছেই শিখিয়াছিল, তাহার স্বামী তাহার আপনার—বড় আপনার। সে তাই নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার জন্য পূজার অর্ঘ্য রচনা করিল; এবং সমস্ত হৃদয়মনের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম একত্র করিয়া সেটি তাঁহারি চরণে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। দিবার বেলায় কোন প্রকার সঙ্কোচ করিল না, বা কিছুমাত্র দিতে বাকি রাখিল না।

কিন্তু, ওরে ও অবোধ! শুধু দিতে পারিলেই হয় না রে! নিতেও আবার তেমনই করিয়া জানা চাই! হয়, যা দিবে তা নিষ্কাম ভাবেই, ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়াই, দিয়া ফেল; না হয় যেমন-যেমন দিতে থাকিবে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে দামটাও চাহিয়া লইও। চাহিয়া যদি না পাইলে, তবে পাইবার জন্য সদা সর্ব্বদা খাতককে তাগিদ দিতে ভুল করিও না। মনের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফেনিল বাসনায় ফেনাইয়া গর্জ্জিতেছে; অথচ এমনভাবে তাহাকে বাঁধের পর বাঁধ বাঁধিয়া মুখটি বুজিয়া দু'হাতের মুঠা ভরিয়া-ভরিয়া দিয়া যাইতেছ—যেন ভগবানের ফলাকাঙ্ক্ষার নিষেধটাই তোমার কাছে অত্যন্ত বড়, তুমি নিজে কিছুই ফেরৎ চাহ না! জানিও, ভগবান অনেক বুঝিয়া, বিবেচনা করিয়াই এই কামনা-বর্জ্জনের মন্ত্রটি মানুষকে পড়াইয়াছিলেন। কামনা করিলেই যে কাম্যবস্তু সকল সময় পাওয়া যায়, এমন নিয়ম প্রকৃতির আইনের কড়া ধারায় নাই। যা' পাইবে না, তাহার প'রে বৃথা লোভ না করাই সুবুদ্ধি-সঙ্গত। কিন্তু এ পৃথিবীটার নিজেরও তো গোটাকত বাঁধা নিয়ম আছে। কামনার তীব্র মদিরা এখানে ভারি সস্তা; আর সে মদের যে নেশা, সেও বড় মিঠে। এই কঠিন, কর্কশ, সত্যকার পৃথিবীর হাড়ভাঙ্গা পেষণের মধ্যে মানুষ বাঁচিতে পারিত না, যদি না সে এই বাসনার মদে একটু-একটু চুমুক দিত। চাহিব, পাইব, হইবে,—এই রকম কয়েকটা কল্পনাতেই তাদের এই মাটি-পাথরের রাজ্যে আকাশ-কুসুমের স্বর্গোদ্যান রচনা করায়। ধীরাও রক্ত মাংসে-গড়া এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বরাজ্যেরই একটি প্রজা; এই বাসনা, কামনার পাকে-পাকে ঘেরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রা মানবী। সেও যা দিল, তাহা কল্পনা রাখিয়াই দিতে পারিল। সে আকাঙ্ক্ষা মোক্ষের নয়, এমন কি স্বর্গেরও নয়; শুধু যাহাকে অনেক দিতেছে, তাহার কাছ হইতেই খানিকটা ফিরাইয়া পাওয়ার। ঠিক মাপে-মাপ না হইলেও হয় ত তাহার চলিতে পারিত; কেন না, মাপের নিক্তি সে কখনও দেখে নাই, এবং তাহার হিসাব সম্বন্ধে অঙ্কজ্ঞানও তাহার খুব প্রখর নয়।

কিন্তু ঐটুকুই মুস্কিল! মানুষ নিজের বেলায় যাই করুক, পরের বেলায় তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বড়ই সজাগ। তখন সে অপরের 'হিতার্থায়' বলে, যা দিতেছে, ওর জন্য কি আর দাম লইবে? 'মাফলেষু কদাচন' এ যে স্বয়ং ভগবানের মুখের বাণী, সেতো ও-ও জানে!

নির্ম্মল ঠিক এই কথাটিই যে মনে করিত, তাহার প্রতি এত বড় অবিচার হঠাৎ করিতে পারা যায় না। কিন্তু খানিকটা কাজ মানুষ নিজে জানিয়া, বুঝিয়া করে, আর কতকটা তার প্রকৃতি তাহাকে না জানাইয়াও করাইয়া লয়। ধীরা তাহাকে দিয়াছে,—তাহার খবর তাহার নিকট অজ্ঞাত নয়; কিন্তু সে যে কতখানি, আর তা কি হিসাবে,—সেই দিকেই সে দৃষ্টি রাখে নাই। তাই ধীরা যে পৌরাণিক যুগের দান-বীর রাজাদের মতই, দিতে-দিতে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, রঘুর মত, মৃত্তিকার জলপাত্র,—এই মাটির দেহখানাই—শুধু সম্বল করিয়া বসিয়াছে, বলির ন্যায়

স্বর্গ, মর্ত্ত্য বাঁধা দিয়াও দানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে, সে খবর সে জানিল না। দাতা দু' হাত ভরিয়া দান করিল, সে নিজের অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিল,—ধন্যবাদ দিল, কিন্তু নিজেকে ধন্য মানিল কই?

৪৩

কিন্তু নির্ম্মলও যে তাহাকে কম দেওয়াটা দেয় না, ইহা ধীরাও বোঝে। সে সর্ব্বদাই তাহার জন্য, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সন্ত্রস্ত থাকে। 'ঐ ঠাণ্ডা বাতাস বহিল, ঝি গরম কাপড়টা দাও,' এ কি! ধীরা এখনও তুমি ঘুমাও নাই? অসুখ করেনি তো?' 'অমন করে বসে আছ যে? কেন, কেন? মাথা ধরেচে কি? ওডিকলম্ কি মেন্থল দিয়ে দিই?' 'এসো ছাতে যাই, সেখানে বড় সুন্দর হাওয়া দিচ্চে, দেখবে এসো' 'আকাশটা আজ কি সুন্দর!—আঃ, না—না, এসো একটা বই পড়ে তোমায় শোনাই গে।' এমনি কত রকমেই তাহার প্রতি সর্ব্বদাই তাহার করুণা, প্রীতি, স্নেহ, ব্যক্ত হয়। ধীরা জানিতে পারে, তাহার খাওয়া না হইলে নির্ম্মল খায় না। ধীরা বড়-কামরার মধ্যস্থলে-আঁটা ভাল খাটে শুইলে অতগুলা দাসদাসীসত্ত্বেও নিজের হাতে মসারিটির চারিধার গুঁজিয়া দিয়া বিছানায় পাখা আছে কি না, জানালার পাখী টানা আছে কি নাই, পরীক্ষা করিয়া—তবে নিজে পাশের ছোট কামরাটায় শুইতে যায়।

এরও পর কেমন করিয়া বলা চলে যে, সে তাহাকে ভালবাসে না? বাসে, খুবই বাসে; বরং সে তাহাকে এত বেশী যত্ন করে যে, সেই লজ্জায় এই নিরুপায় বালিকার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কারণ, কেহ তাহাকে শিখাইয়া না দিলেও, সে নিজের বিবেকের কাছ হইতে ইহা বুঝিতে পারিত যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ঠিক এই রকম নয়। দৃষ্টান্ত সে চোখ দিয়া অবশ্য কিছুই দেখে নাই; কিন্তু পিতার নিকট স্বদেশী, বিদেশী অনেক সতী, পতিব্রতাদের পুণ্য-কাহিনী শুনিয়াছে। তাঁহারা যে তাঁ'দের স্বামীর পোষা ময়না, অথবা 'গুরুপুত্র' ছিলেন না, তর্ক তুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই ইহা প্রমাণ হইয়া যায়। সে বাড়ী হইতে আসিবার পূর্ব্বে ক্ষমার-মার নিকট খুঁটিয়া-খুঁটিয়া নিজের মায়ের যে পরিচয়টুকু পাইয়াছিল, সে'ও সেই সেবা-কুশলা সতী নারীরই একটি পবিত্র, সংযত, সাধারণ চিত্র। মা তাহার বাবার জন্য নিজের হাতে একটি-দু'টি ব্যঞ্জন বাঁধিতেন; ভাতগুলি রূপার থালায় নিজে বাড়িতেন; শ্বেত-পাথরের রেকাবে নিজে তাঁহার পছন্দসই জলখাবারগুলি সাজাইয়া, নিজের হাতে ফুল-কাটিয়া-তৈরি-করা আসন পাতিয়া, নিজে কাছে বসিয়া কত যত্নেই খাওয়াইতেন। তাঁহার বাবা আপত্তি করিলে বলিতেন—"দেখ, এগার বছর বয়স হতে এই ব্রতটি করে এসেচি বলেই, সেই পুণ্যে আজ আমার কলাপাতা সোণা রূপোর হয়েচে,—তুমি আমায় মানা করো না। এই করতে করতে যেন মরতে পারি, বরং এই আশীর্ব্বাদই করো।"

শুনিয়া সেদিন ধীরা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; এবং তারপর হইতে কতবারই তাহার মনে হইয়াছে, সে যদি তার মায়ের মত দেখিতে পাইত,—তবে সেও তাঁর মত অম্‌নি সব করিত; ঐ কথাগুলিকেই নিজের করিয়া লইয়াই বলিত। কিন্তু হায়, সে যে দেখিতে পায় না! সে জানে না, নির্ম্মল কি খায়, কি ভালবাসে! সে জানে না, কেমন করিয়া খাবার তৈরি করিতে হয়, কেমন করিয়া তাহা সাজাইতে হয়। কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া যে চক্ষু সার্থক করিবে, সে শক্তিও তাহার নাই!

তাই নির্ম্মল—যতই নিজের মনের অশান্তির অপরাধে পাছে ইহার প্রতি ভুলিয়াও কোন ত্রুটি হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে অধিকতর আগ্রহে তাহার প্রতি যত্নশীলতা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়—ধীরার মনের ভিতরটা ততই বেশী ব্যথিত হইয়া উঠে। সে বেশ দেখিতে পায়, সে অন্ধ বলিয়াই নির্ম্মল তাহাকে এমন করিয়া স্নেহের সেবায় ডুবাইয়া রাখিতে চায়। স্বামী-স্ত্রীর একাত্ম-প্রেম ইহা নয়।

এই কথা মনে হইলেই তাহার সারা প্রাণ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে; কি যেন একটা অভিমানের যন্ত্রণায় বুকখানি পিষিয়া দেয়। হইলই বা সে অন্ধ! অন্ধকে কি শুধু দয়া করিতে হয়,—তাহাকে ভালবাসা কি বড় কঠিন? সে যে তাহার এই বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল আলোক-শিখার ন্যায় তেজে, পুণ্যে অগ্নিময় সতীপ্রেম তাহার এই তৃষিত বক্ষের পঞ্জরে-পঞ্জরে জ্বালাইয়া লইয়া আর-একটি হৃদয়-মণ্ডপের বাতি-গুলি সেই আগুনে জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় আজ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, এর চেয়ে কোন্ যাদুবিদ্যাময় মায়ার আগুন সত্য? কেন সে তাহাকে—তাহার স্ত্রী, তাহার সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গিনী বলিয়া—হাতে ধরিয়া তাহার

রান্নাঘরের চুল্লীপার্শ্বে বরণ করিয়া লইবে না? কেন তাহাকে তাহার পূজার দেবী করিয়া মণ্ডপের মধ্যে খাড়া করিবে? কেন, এ কেন? সবার ভাগ্যে যা হয়, তাহার ভাগ্যে তা ঘটিবে না, কেন? ভিতর হইতে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা গর্জ্জিয়া উঠে; ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ চিত্ত ঘাড় বাঁকাইয়া বলে—কেন আমি দূরে থাকিব? যা সীতা, সাবিত্রী, সতী, আমার মা, পাইয়াছেন, আমি কেন তা পাইব না? কি আমি করিয়াছি, আমার কি অপরাধ?

কিন্তু—কেন,—কেন,—কেন? কেন সে পাইবে? দুঃখের বন্যা বক্ষের' প'রে আছাড় খাইয়া বলে, কেন তুমি পাইবে? তুমি যে অন্ধ! তাঁহারা তাঁদের স্বামীর স্ত্রী ছিলেন, সচিব ছিলেন, সখী ছিলেন, তুমি কি গো, এর কি তুমি? কোন্‌টা তুমি? স্বামী কেমন, কি রকম তাঁর আকার, কেমন বর্ণ? মুখের চেহারা কিরূপ? একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবার জন্য দুঃখে ফাটিয়া মরিতেছ,—তাই যা পারিলে না, তুমি আবার কিসের জোরে অতবড় পদটার দাবী করিতে যাও? স্ত্রী হইলে, সহধর্ম্মিণী হইলে, তুমি তাহার জন্য ভাত বাড়িতে পারিবে। হাত ধরিয়া কেহ লইয়া না গেলে, তাঁর ঘরে গিয়া আপনি তাঁর রোগের সেবা করা তোমার পক্ষে সম্ভব? এই যে তিনি তোমায় তাঁর সঙ্গে তীরে উঠিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে চান, তাঁহাকে বৃথা ক্লেশ দিবার লজ্জায় তুমি যে সঙ্গেই যাও না। কেন গো! কেন যাও না? যাও, সাবিত্রীর মত কাঠের বোঝাটা দরকার হইলে স্বামীর নিকট হইতে লইয়া বহিতেও পারিবে তো!

ওরে লোভি, তুই যে অন্ধ রে!' অন্ধ, অন্ধ! অন্ধ কি এই আলোকময়ী ধরণীর জীব? না, সে অন্ধকার রাজ্যের পথভ্রষ্ট পথিক মাত্র! আঁধারের নিকৃষ্ট কীটাণু! এখানে তোর কেহ নাই, তুইও এদের কারো নোস্‌। শুধু একজন, একজন একদিন তোর ছিল, যাঁহাকে সর্ব্বশরীর দিয়া নিঃসঙ্কোচ অধিকারে তুই আপনার বলিয়া অনুভব করিতে পারিতিস। যাঁহার উত্তপ্ত স্নেহের দৃঢ়বদ্ধ বাহুপাশে তোর ঐ ক্ষুদ্র শরীরটুকু তুই পুলক-কণ্টকিত করিয়া লইয়া, তোর এই দুর্ব্বল ছোট দুটি হাতে বক্ষে আলিঙ্গন করিতে কোথাও তোর বাধিত না। এই যে কথন-কখন একটিমাত্র সংযত স্পর্শ আজ,—ওরে নিঃস্ব ফকির!—তোর সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মলয়-লঘু দৈবাৎ স্পর্শটুকুই তোর সারা-দেহের সমস্ত সঞ্চিত রক্তের মধ্যে ফেনাইয়া-ফেনাইয়া পুলকের ঢেউ তোলে, সেই রক্তরাঙা ঢেউএর তালে-তালে রঙিন আলোর আবীর-মাখা রাঙা হাওয়া চারিদিককে যেন রাঙিয়া দেয়; কিন্তু কই, তখনকার অতি-প্রাপ্তির দিনেও যে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের বদল দিতেও তোর কোথাও কোন দ্বিধা ছিল না, এখন এই তৃষা-শুষ্ক চিত্তও তো নিজেকে নিজের প্রচণ্ড কামনার প্রতিরোধ করাইতে পাগল হইয়া তাহাকে চাপিয়া রাখে। সবাই যা পারে, তুই তেমন কই পারিস না তো! কেন পারিস না? কেমন করিয়া পারিবি? তুই যে অন্ধ! প্রতিদিন,—সারাদিন, ক্ষণে ক্ষণে,—কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়া, কত সোহাগ, আদর, মান, অভিমানের মালা গাঁথিতে চাহিস্,—কত ধমকে, তাড়নায়, তোষামোদে নিজের মনকে সহজ করিতে চাহিস,—তাহার একটি মুখের কথা, এতটুকু হাতের ছোঁয়া, একটু পায়ের শব্দ তোর বুকের মধ্যে ফুলের মত কোমল হইয়া ফুটিয়া ওঠে, জলের মত শীতল হইয়া বহিয়া যায়, ফলের মত সরস হইয়া পাকিয়া আসে; তাহার গায়ের গন্ধ ঘ্রাণে আসিলে প্রভুভক্ত পোষা জীবের মতই আনন্দে তুই বোবা হইয়া যাস্ কেন? মুখে তোর একটিও কথা যোগায় না কেন, দাবী আসে না কেন? মনে তোর জোর করিবার জোর কই? রাত্রে সে যখন তোকে করুণায় গলাইয়া, যত্নে ভরাইয়া দিয়া, চলিয়া যায়,—কত রাত্রি অনাথার মত চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া, তোর কক্ষের অদূরেই তাঁহারই সুপ্তিশান্ত নিঃশ্বাসের সম তাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে-শুনিতে অভিমানে কেন চোখে জলও আসে না? কেন, উঠিয়া গিয়া, ডাকিয়া, জাগাইয়া, নিজের অধিকার সগৌরবে গ্রহণ করিতে কিসের তোর এত দ্বিধা? কিসেরই বা এমন সঙ্কোচ? কেনই বা এই স্বভাবদত্ত, বিধিদত্ত, মানবদত্ত স্থান হইতে তুই নিজের হৃদয়-জাত একটু সামান্য ভীরুতায় দূরে-দূরে সরিয়া থাকিস্? জোর করিয়াই তো লইতে পারিতিস্! কেন সে জোর করিস না?

কেন? তার কারণ তুই অন্ধ। সে আলোর মানুষ, তুই অন্ধকারের! সে তোকে স্নেহ করিতে, দয়া করিতে, এমন কি ভালবাসিতেও পারে; তুই তাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে—সেই ভালবাসার পায়ে

আপনাকে বিসর্জ্জন দিতেও পারিস,—তবু দু'জনেই দুজনকে আপনার নিজের করিয়া লইতে পারিস্ না—তা হয় না। তার কারণ,' তুই অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ!

অব্যক্ত বিষাদের বাষ্পে তাহার আঁধারের নিবিড়তা অসহনীয় করিয়া নবোন্মেষিত হৃদয়-পদ্মটি আবার যেন সঙ্কোচে মরিয়া মুদিয়া আসে। তবে,—কেন দিলে? যদি তাহার এই অন্ধকারের অন্ধ প্রেম চক্ষুষ্মানের যোগ্যই নয়, তবে বৃথা ইহাকে জন্ম দিয়া জিয়াইয়া তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই যে পূজার জন্য ব্যাকুলতা—এ কি নিজে পূজার অঞ্জলি লইয়া শান্ত হয়? বেশ; যদি জগতে এই সব চেয়ে বড় পাওনাটারই সন্ধান তাহাকে দিবার বড় দরকারই হইয়াছিল, তা' হইলে তাহার গায়ে ঐ তাহার স্বামীর গায়ের মত,—আরও সমস্ত পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত রক্ত-মাংস খরচ না করিলেই তো হইত? পাষাণ-প্রতিমার মতই যে দৃষ্টিহীনা, সবদিকে সেই রকম পাষাণী করিয়া তাহাকে সৃজন করিলে, মানব-জগত তো নিজেকে কিছুমাত্র ক্ষতি-গ্রস্ত বোধ করিত না! যে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে,—কেবল মানব-সুলভ একটি জিনিষ নাই বলিয়াই—সে কেমন করিয়া আজ এই আশা-তৃষ্ণাভরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রা মানবী ব্যতীত -দেবী হইয়া উঠিতে পারে? ভগবান্, ভগবান্, ওগো, তুমি একি করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিলে, কিসের জন্য তাহাকে এখানে পাঠাইলে? সবই যদি দিলে, তবে তাহা এত বড় বঞ্চিত করিয়া দিলে কেন? চোখের সামনে তাহার,—আকাশে কত বাহার খোলে, শুধু এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর বাতি নয়—একটি গোটা সৌরজগতের আলোর যোগান যে আলোয়,—সেই আলো তাহার চোখের সম্মুখে উদয়াস্ত জ্বলিতেছে। সে তাহার তীব্র তাপ অনুভব করে; কিন্তু অত বড় আলোর তেজ যার, সেও তাহার নিকট একটা ঘনীভূত অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু হইল না।

শোনা আছে, সূর্য্যাস্তের পরও পৃথিবী একেবারে তমসায় ভরিয়া উঠে না; তখনও এ পৃথিবীর আকাশে চাঁদ বাঁচিয়া থাকে। সেও নাকি আর এক রকমের আলো,—বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর! জ্যোৎস্না তাহার কিরণ, সেও আলো! চাঁদ না থাকিলেও, সূর্য্য-চন্দ্রের ছোট ছেলেমেয়েদের মত হীরের কুচি নক্ষত্রগুলিও না কি খানিকটা আলো মানুষকে দেয়। আবার তার উপরেও মানুষের আগুনের আলোর অভাব নাই। শুধু তাহার বিশ্বেই প্রভাত নাই। সন্ধ্যা নাই, সূর্য্যোদয় হয় না, চাঁদ উঠে না, নক্ষত্র জ্বলে না। সে যেন এক মহানিশা;—এক অফুরন্ত মেঘান্ধকার-মধ্যরাত্রি! অন্ধকার! শুধু সূচিভেদ্য, রাশি রাশি বিরাট অন্ধকার।

বরফের মতই কঠিন, পাষাণের মতই নিরেট, একটা অভেদ্য কালো পাথরের দুর্গপ্রাচীরেরই মত। তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি কিছু না হোক, কিছুই না দেখ যাক, বিশেষ ক্ষতি ছিল না। শুধু তাহার জীবনের সকল আলোরও শ্রেষ্ঠ—তাহার স্বামীর মূর্ত্তিটি যদি একটিবার তাহাকে কেহ দেখাইত! যদি একবার শুধু তাঁহাকে,—তাহার সেই আপনার হইতেও আপনাকে,—সে জীবনের মধ্যে একটি দিনও এই অন্ধ দু'চোখের আকুল দৃষ্টি ভরিয়া দেখিতে পাইত! তাহার এই বুকভরা অন্তরের গোপনবার্ত্তা সেদিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার দুটি পায়ের তলায় তাহার সেই কাতর দৃষ্টির ভিতরে উজাড় করিয়া দিবার পরক্ষণেই যদি সেই প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে প্রাণপণে সুর চড়ান বীণার অকস্মাৎ-ছিন্নতন্ত্রীর মতই তাহারও হৃদয়ের সকল তার-কটা একসঙ্গে ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়া যাইত,—তা'তেই ব এমন ক্ষতি কি ছিল? শুধু একবার! ওগো দাও, নিমিষের মত একটিবার চোখের দেখা দেখিতে দাও! কাহার জন্য এ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলাম,—কাহাকে ইহজীবনের দেবতা করিলাম,—কাহাকে এত কাছে পাইয়াও শুধু এতটুকু নেত্রস্পন্দনের অভাবেই পাইলাম না? কে আমার স্বপ্নদৃষ্টের মতই, নিকটে থাকিয়াও এত বড় সুদূর? দেখাও, দেখাও একবার, একদণ্ড, একপল, আরও কম, আরও কম, যা অল্প সময়ের জন্যই হোক—তবু দেখাও গো, দেখাও তাহাকে দেখাও—একেবারে বঞ্চিত করো না!

৪৪

রজতাম্বরা নিশীথিনী অগণ্য নক্ষত্রভূষণে আপাদ-মস্ত বিভূষিতা। কিন্তু মহৎ যে, সে শুধু নিজে লইয়া, নিজে ভোগ করিয়াই, তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই উদার আকা নিজের বক্ষভূষণ তারা-হার, তাহার নিম্নস্থ সেই পৃথিবী অনতিপ্রশস্ত নদীবক্ষেও পরাইয়া দিয়া তাহার বাত্যান্দোলন-হীন বীচিবিক্ষেপপরিশূন্য স্থির সলিলরাশিকে শোভিত করিয়াছিলেন। উপরে আকাশ ভরিয়া তার

ফুল ফুটিয়াছে, নীচে নদীর জলে অসংখ্য নক্ষত্রমালা দুলিতেছে, আবার অন্ধকারময়, বনাকীর্ণ তটভূমেও সহস্র-সহস্র জ্বলন্ত খদ্যোত সেইরূপ জ্যোতির্বিন্দু নক্ষত্র-মণ্ডলীরই ন্যায় পরিশোভিত। সমস্ত বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়াই উল্কাক্রীড়া চলিতেছিল।

বজরার ছাদে গালিচাবৃত শয্যাতলে অর্দ্ধশায়িতা ধীরা উৎকর্ণ হইয়া বংশীবাদন শুনিতেছিল। তাহার অদূরে সেই প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল—নির্ম্মল। নির্ম্মল বংশী-বাদনে বিশেষ নিপুণ না হইলেও, অজ্ঞ নহে। বাঁশী তাহার কাছে বড় মন্দ বাজে না। কলিকাতায় থাকিতে সে একটা সখের কনসার্ট পার্টির পাল্লায় পড়িয়া এই বাজনাটা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখানে আসিয়া একটা বাঁশী কিনিয়াছিল, কিন্তু কখনও বড়-একটা বাজাইবার সময় পায় নাই। আসিবার সময় বাঁশীটা সঙ্গে আনিয়াছিল এবং হঠাৎ সেদিন কি মনে করিয়া বাজাইতে বসিয়া গিয়াছিল। সেই হইতে এখন প্রায়ই সে বাজায়। বাজায় যে,—তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহার ইহাতে নিজের অনেকটা সময় ভাবনাশূন্যভাবে কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সে বুঝিতে পারে, ধীরা তাহার বাজনা শুনিতে ভালবাসে,—সম্ভবতঃ সকল অন্ধই প্রায় গীত-বাদ্যপ্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু কথা এই,—মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবটা যখন প্রবল, তাহার সৃষ্টির মধ্যেও তখন সেই ভাবকেই অভিব্যক্ত হইতে হইবে। দুঃখে যে পুড়িয়া মরিতেছে—সে অন্যের জন্য আনন্দের সৃজন করিবে কি দিয়া? তাহার বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান মনই যে তাহার দুঃখার্ত্ত! উপাদানের যে গুণ তাহা সৃষ্ট পদার্থে সংক্রামিত না হইয়া,—এ পদার্থ অপর গুণশালী হয় কি? মৃৎ-কলস মৃত্তিকা-গুণযুক্ত না হইয়া কেমন করিয়া সুবর্ণ-গুণশালী হইবে? নির্ম্মলের উদ্দেশ্য পত্নীর মনোরঞ্জন করা; কিন্তু সে আপন মনে বাজাইয়া চলিয়াছে,—অশ্রুপুঞ্জসৃজনকারী, দুঃখ-দারুণ হতাশারই সুর!

ধীরার মর্ম্মে-মর্ম্মে এ সুরের রোদন—একটা সান্ত্বনাহীন, আশাপরিশূন্য, করুণ ক্রন্দনের মতই কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার নদীজলের মত স্থির, স্বচ্ছ—তেমনইতর নিস্তরঙ্গ দুটি মেঘচ্ছায়াবিভাষিত নীলনেত্রে পত্রানুগামী সলিলবিন্দু টলটলায়মান হইয়া রহিয়াছিল—যেন একটু নাড়া পাইলেই পড়ে। বর্ষার জলে শীর্ণ স্রোতস্বতী কুলপরিপ্লাবিনী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেই উচ্ছ্বসিত সলিল-তরঙ্গ—সামান্য বায়ু বহিলে শুধু আন্দোলন-চঞ্চলই হয় না,—তরঙ্গে-তরঙ্গে তট প্রহত হইতে থাকে। সে মন্ত্রবীর্য্যবশীভূতা নাগিনীর ন্যায় মুগ্ধ, রুদ্ধ চিত্তে তদাঅহৃদয়ে শ্রবণাশ্রয়ী হইয়া সেই বংশীরব শ্রবণ করে। শুনিতে-শুনিতে কান্নার বেগে বুক তাহার সাগর-তরঙ্গের মত ফুলিতে থাকে। আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের কল-কল্লোলে কর্ণ তাহার বধির হইয়া আসে। গঙ্গোত্রীর ন্যায় প্রবল অশ্রুপ্রবাহের দুরন্ত নির্ঝর দুর্ব্বল অপহৃতশক্তি দর্শনেন্দ্রিয়কে বিদীর্ণ করিয়া বহির্ম্মুখী হয়;—তথাপি সেই সুরের আলো হইতে সে তাহার পতঙ্গ হৃদয়কে সরাইয়া লইতে পারে না। তাহার মনে হয়, যেন তাহারই অপরিতৃপ্ত প্রাণের কাতর তৃষ্ণা—এমন করিয়া বাঁশীর সুরে বাহিরে মূর্ত্তরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে।

কতক্ষণ বাঁশী বাজিয়া চলিল। অল্পক্ষণস্থায়ী চন্দ্র সেদিনের মত জ্যোৎস্নাজাল সংবরণ করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। নক্ষত্রালোকে নীল আকাশ, নীল জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তীরের সেই বৃক্ষশ্রেণী কাতারে-কাতারে পৈশাচী সেনার ন্যায় অন্ধকার আকাশে মাথা তুলিয়া স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া ছিল। জোনাকীগুলার চাকচিক্যময় উত্থান-পতন যেন সেই নিশাচর-দলের স্তিমিত নেত্রের ঈক্ষণপাতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বাঁশী থামিল। বাতাস একবার মন্দ-মন্দ ভাবে বহিয়া গেল। ঝিঁঝিঁর ঐক্যতানে ঝিঁঝিঁট রাগিণী বারেক জোরে বাজিল, নদীতে একটু ঢেউ উঠিল—বজরার তলায় জল তাই গাহিয়া উঠিল কুলু-কুলু-কুলু। সবাই মিলিয়া যেন অনুরোধ করিয়া বলিল, থামিলে কেন? আবার বাজাও! নির্ম্মল ঈষৎ চমকিয়া উঠিয়া যেন কোন্ সুদূর জগৎ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল। দেখিল,—ধীরা কখন তাহার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া, তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, বলিতেছে,—"আবার বাজাও।" তাহার স্বর অস্ফুট, অশ্রু-মথিত, স্বপ্নবিজড়িত। নির্ম্মল বাম হস্তে নিজের বাষ্প-বিজড়িত উভয়নেত্র মার্জ্জনা করিয়া নীরবে, আবার বাঁশী তুলিয়া লইল। আবার সেই ক্রন্দন! নীরব, নিস্পন্দ, বিশ্ব-সংসার সেই বাজনার সুরে ব্যথাজড়িত বিস্ময়ানন্দে কাণ পাতিয়া রহিল। নিদ্রাহীনা বিশ্ব-প্রকৃতির বৈতালিকের

দল, সেই মানবচিত্তের ভাষাহীন সুরের বেদনায় নিজের প্রাণের প্রতপ্ত সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়া, তাহার সহিত সুর মিলাইতে লাগিল। আর ইহার একটিমাত্র মানবী শ্রোত্রী এই হতাশ-করুণ সুরের সমস্ত নৈষ্ঠাশ্যটুকু নিজের দুঃখ-দৈন্য-পূর্ণ প্রাণের মাঝখানে টানিয়া লইয়া ইহার সহিত মিশিয়া গিয়া, কখন কেমন করিয়া নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

(৪৫)

অপরাহ্নের মন্দ-মধুর আলোকে, বাতাসে, নদীর জল প্রিয়করস্পর্শে সরমবতী নবোঢ়ার ন্যায় পুলকে রঞ্জিত এবং কম্পিত হইতেছিল। বজরার চিত্রিত অঙ্গে মন্দ-মন্দ জলোচ্ছ্বাস যেন শুধু আদরভরেই মৃদু-মৃদু আঘাত করিয়া, অর্দ্ধস্ফুট কলতানে কতই সোহাগ-বাণী শুনাইতেছিল। বজরার সঙ্গের ছোট পানসীতে রান্নার উদ্যোগ হইতেছে। বজরার মাঝি-মাল্লারা নদীতীরের সুপরিস্কৃত বালুকায় পশ্চিমাস্য হইয়া 'নমাজ' করিতেছে। নির্ম্মল বজরার ছাদে চুপ করিয়া বসিয়া নদীজলের অফুরন্ত চলা দেখিতেছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে,—আবার নূতন তরঙ্গসকল জন্মিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। তাহার পর আবার—আবার—আবার উঠিতেছে, আবার চলিতেছে। এ চলার যেন মুহূর্ত্তকালের জন্য বিশ্রাম নাই। পর্ব্বত-বক্ষ হইতে নির্ঝর-ধারারূপে পৃথিবীর বক্ষে ঝরিয়া পড়িয়া—তারপর হইতে তটিনী, সরিৎ, নদী ইত্যাদি নানা রূপে অযুত বাধা ঠেলিয়া শতসহস্র যোজন দূরদূরান্তর পথে চলিতে-চলিতে তাহার সাগরসঙ্গম। কিন্তু ইহাতেই কি সে চলার নিবৃত্তি আছে? সাগররূপেও তাহার সেই অসীম গতি! কিন্তু তখন আর সে একা নয়, ক্ষুদ্র নয়,—পূর্ণ, বৃহৎ, তাই নিশ্চিন্ত, নির্ভয়!

মৃদু শব্দ হইল। ধীরা এক হাতে একখানি জলখাবারের রেকাব, এবং অপর হস্তে এক গ্লাস সুবাসিত সরবৎ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দৃশ্যে অতি-ব্যস্ততায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর-হারা না হইলে, নির্ম্মল দেখিতে পাইত—কি আনন্দের দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্ সে মুখ!

নির্ম্মলের কর্ত্তব্যবোধ সে আনন্দের অংশ লইতে পারিল না। সে উঠিয়া তাহার হাত হইতে রেকাব ও গ্লাস গ্রহণ করিয়া ভর্ৎসনার ভাবে কহিল—"এ কি ধীরা! সিঁড়িতে দু'হাত জোড়া করে উঠ্‌তে যদি পড়ে যেতে! আমায় তো নীচে ডাক্‌লেই হতো! না হয়, নতুন ঝিকে বল্লে না, কেন সে-ই দিয়ে যেত!"

হায়, ধীরারই শুধু মনে থাকে না,—কিন্তু তদ্‌ভিন্ন আর সবারই সকল সময় স্মরণ থাকে, সে অন্ধ! কিন্তু কেন? অন্ধের কি চক্ষুষ্মানের ন্যায় কোন সেবারই অধিকার নাই? নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর করিল,—"আমার সিঁড়িতে ওঠা বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।" আজ সে অনেক কথাই বলিবে,—নিজের যে অধিকারের মধ্যে সে এ পর্য্যন্ত কোন দিক দিয়া প্রবেশপথ পায় নাই, আজ সে অসঙ্কোচে সেই নিজের রাজসিংহাসনে উঠিয়া বসিবে,—এই আশা করিয়া সে আসিয়াছিল। কিন্তু সে সুযোগ তাহাকে কেহই দিতে চাহে না। তবে কেমন করিয়া নিজের এই গভীর সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া সে স্বস্থানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে?

কতকগুলা দিন এমন করিয়া কাটিয়া গেল। আজ-কাল সারারাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময় ধীরা নিজের বিছানায় শুইয়া, জাগিয়া ছট্‌ফট্ করে। কয়েকদিন হইতে মধ্যরাত্রে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। ঝড় যদিও খুব প্রবল নয়, এবং বৃষ্টিরও বেগ ততদূর ভয়ানক নহে,—তথাপি জলের উপর বজরার দোলায়, বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে এবং জল-রাশির অশ্রান্ত কলকল্লোলে ধীরার দুর্ব্বল বক্ষ এইটুকুতেই আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহার মনে হয়, দুর্দ্দান্ত ঝটিকা হয় ত কোন্ সময় তাহাদের বজরার ছাদখানা বজ্রদাপটে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ঐ ভীষণ জলোচ্ছ্বাসের তীব্ররোষ-গর্জ্জন হয় ত কোন্ সময় তাহাদের এই আশ্রয়তরীখানি নিজের ক্ষুধিত উদর-গহ্বরে আশ্রয়দান করিয়া ফেলিবে। তা' নিজের জন্য ইহাতেও তাহার খুব ভয় হয় না; কিন্তু আর একটা কথা মনে হইলেই তাহার সর্ব্বশরীরে কম্প দিয়া উঠে। ধীরার কঠিন প্রাণ; সে জলে পড়িলেও হয় ত ভাসিয়া উঠিতে পারে,—কিন্তু—? আর কোনক্রমেই তাহার চোখের পাতা একত্র হইতে চাহে না; অধীর-উৎকণ্ঠায় সে কাণ পাতিয়া ঝড়ের প্রলয়-সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে ভয়ে মরিয়া থাকে। ভোরের দিকে ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে, তখন হয় ত ঘুমাইয়া পড়ে।

তৃতীয় রাত্রে বৃষ্টিটা খুব চাপিয়া আসিলেও ঝড় থামিল

না। মত্ত বায়ু ক্রোধভরে বজ্র হানিয়া, বিদ্যুৎ নাচাইয়া, রুদ্র-তাণ্ডবের অনুকৃতিতে বড়ই মাতামাতি করিতে লাগিল। নির্ম্মল মাঝিদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজের কামরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মাঝিরা বলে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ডবল নোঙ্গর ফেলা হইয়াছে, কাছি খুব শক্ত। নির্ম্মল নিজের বিছানায় শুইয়া ছিল—কিন্তু ঘুমায় নাই। সহসা সে খুব নিকটে কাহার ভয়ার্ত্ত দ্রুত শ্বাস অনুভব করিল। কে যেন তাহার মশারির ভিতর খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, বোধ হইল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। প্রথমটা নির্ম্মলের মনে হইল, হয় ত বাতাসেরই শব্দ। কিন্তু আবার সেই দ্রুত শ্বাস! যেন কোন ভীত বালক আশ্বাসলাভাশায় অনেক দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে! নির্ম্মল বিস্ময়ের সহিত শয্যার উপর উঠিয়া বসিল;—বলিতে গেল, "ধীরা!"—কিন্তু তাহা না বলিয়া, তাহার জিহ্বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহারই ক্ষণ-পূর্ব্বের চিন্তাধারার অনুবর্ত্তন করিয়া, উচ্চারণ করিল,—"কে, অপর্ণা!"

শয্যাপার্শ্ববর্ত্তিনী মৃদুনিক্ষিপ্ত ঘনশ্বাসে উত্তর করিল, "আমি ধীরা।" ব্যস্ততাবশতঃ স্বকৃত উচ্চারণ-ভ্রান্তি নির্ম্মল জানিতে পারে নাই। সে অন্ধকারে দুই হাত বাড়াইতেই ধীরার দেহে তাহার হস্তস্পর্শ হইল। অমনি, নীড়ভ্রষ্ট ভয়ত্রস্ত পক্ষীটির ন্যায় ভীতা ধীরা দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ঝাঁপাইয়া তাহার বক্ষলগ্ন হইল। গভীর স্নেহে নিজের বুকের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "ধীরা, তোমার ভয় করচে?"

ধীরার মুখ নির্ম্মলের বুকের ভিতর—সেইখানের সেই ইন্দ্রালয়ে। সে সকল ভয়-ভাবনা, সকল অস্বাচ্ছন্দ্য সেই মুহূর্ত্তেই চিরদিনের মত যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত শরীর তাহার সেই সহানুভূতিপূর্ণ, উত্তপ্ত হৃদয়ের সান্নিধ্যপ্রাপ্তিতে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তিতে মোহমুগ্ধ স্থির, শান্ত হইয়া গিয়াছিল। সে হর্ষ-কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে রুদ্ধবাক্ হইয়া নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল "না।"

নির্ম্মল একহাতে সহকারাশ্রয়ী ক্ষুদ্র মাধবীলতার ন্যায় তাহারই এই বক্ষলীনা বালিকাকে ধরিয়া রাখিয়া, অপর হস্তের অঙ্গুলীগুলা তাহারই মাথার চুলের মধ্যে ধীরে-ধীরে চালনা করিতেছিল। সে এই উত্তর বিশ্বাস করিল না,—মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, তোমার ভয় করছিল; তা' তুমি তোমার ঘর থেকেই আমায় কেন ডাকলে না?"

একটুখানি পরে আবার বলিল, "তোমার কিছু ভয় নেই, তুমি এমনি করেই ঘুমিয়ে পড়ো।"

গভীর সুখে ধীরার চোখের দুখানি পাতা স্বতঃই নামিয়া আসিল।

পরদিন প্রভাতে আকাশ পরিস্কার হইয়া গেল। ঝড়-বৃষ্টির কোন চিহ্নই রহিল না। সন্ধ্যায় বজরার ছাতে বসিয়া নির্ম্মল ধীরাকে একজন বিখ্যাত লেখকের রচনা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিল। ইদানীং মধ্যে-মধ্যে সে তাহাকে এইরূপে অনেক ভাল-ভাল বই পড়িয়া শুনাইত।

রাত্রিতে ধীরা নিয়মমত তাহার শয়ন-কামরায় নিজের বিছানায় শয়ন করিলে নির্ম্মল তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া এই বড় কামরার পাশে নিজের ক্ষুদ্র কুঠরিটিতে শুইতে যাইত। ধীরা আজ না শুইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। নির্ম্মল বলিল, "ধীরা, শুয়ে পড়ো, রাত হয়েছে।"

ধীরা শুইল না। তখন নিকটে আসিয়া নির্ম্মল তাহার হাত ধরিয়া আদরের সহিত বলিল, "কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, শুয়ে পড়ো।"

ধীরা সেই স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল; কহিল, "আজও যদি ঝড় হয়?"

নির্ম্মল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "আজ আর বোধ হয় ঝড় হবে না; আকাশ খুব পরিস্কার আছে। আর যদিই হয়, তুমি আমায় ডেকো।"

ধীরা সেই ধৃত হস্তখানায় জোর দিয়া চাপিয়া ধরিল; সমুদয় সঙ্কোচ, দ্বিধা মন হইতে সরাইয়া ফেলিয়া, কহিয়া উঠিল—"না, তুমি আমার কাছে শোও।"

এইটুকু বলিতে তাহাকে যে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে,—কি লজ্জা সংবরণ করিতে হইয়াছিল, তাহা শুধু সেই জানে। ঝড়ের শব্দের আতঙ্ক, অথবা গত রজনীতে সেই যে এক অনাস্বাদিত সুধারস সে তাহার এই তৃষিত চিত্ত ভরিয়া পান করিতে পাইয়াছে, তাহারই লোভ—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে আজিকার এ অভিব্যক্তির মূল—তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ করি প্রথমটার অপেক্ষা

দ্বিতীয় কারণটাই কিছু প্রবলতর। কাল অভাগী ধীরা তাহার স্বামীর সেই বিকারহীন স্নেহালিঙ্গনে সেই যে ক্ষণকাল নিজেকে সংবদ্ধ রাখিতে পাইয়াছিল, সেই হইতে তাহার এই অন্ধকারে ভরা অন্ধ জগৎ যে নবরবি-কিরণ-সম্পাত-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আজিকার সারা দিনমান যে তাহার একটা স্বর্গীয় সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া গিয়াছে! কেবল সেই স্বপ্নসুখের মধ্যে অনাগত রজনীর সদা-সমাগমের জন্য একটা অধীর প্রতীক্ষামাত্র সে সুখের কিছু-কিছু ব্যাঘাত করিয়াছিল। স্বামীর সেই আবরণহীন তপ্ত বক্ষ সে থাকিয়া-থাকিয়া নিজের দুরুদুরু কম্পিত বক্ষতলে অনুভব করিয়া, আজ গোপন-আনন্দে শতবার পুলককম্পনে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মৃদু নিঃশ্বাস নিজের মুখের উপর অনুভব করিয়া তাহার মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুতা ক্ষণে-ক্ষণে ঘুচিয়া তাহাকে প্রেমময়ী নববধূর ন্যায় লজ্জারাগে আরক্ত আভা প্রদান করিয়াছিল। সে আজ অনুভব করিতেছিল, তাহার এই নিভৃত বনের শুষ্ক কুঞ্জবিতানে গত রজনীর ঝড়ের সময় অকস্মাৎ কোথাকার দুয়ার ঠেলিয়া নব-বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহার 'অরুণ-রাঙা বরণ'-পাতে তাহার সমস্তটাকে রঙ্গিন করিয়া দিয়াছেন। তাহার অন্তর-বাহির ভরিয়া আজ তাই সেই নবজীবনের জন্মতিথি-পূজার মহামহোৎসব চলিতেছিল। সে বুঝিয়াছে,—নদীর সেই একঘেয়ে, কল-কল, ছল-ছল, আজ আর নাই,—তাহারও সুর আজ নূতন। তীরে যখন পাখী ডাকিতেছিল, সেও নিত্যকার সেই পুরাতন সুরের ডাক ডাকে নাই! নির্ম্মলের যে কথাটি, যেটুকু হাসি, আজ সারাদিনের মধ্যে তাহার তৃষিত কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে,—তাহার মনে হইয়াছে—সে যেন কোন্ গন্ধর্ব্বলোকের তালেমানে বাঁধা সঙ্গীতের ঝঙ্কার! বড় আশার প্রচণ্ড লোভে সে রাত্রির প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সে কাল প্রকৃতির অশান্ত তাণ্ডবের মুহূর্ত্তে ক্ষণেকের মত যে অমৃতপানের সুখলাভে চরিতার্থ হইতে পাইয়াছে,—সে তাহার চুরির ধন নয়, এ তাহার নিজের জিনিস, গৌরবের সম্পত্তি। তবে কেন সে এই সুধা-সমুদ্রের তীরে বসিয়া এমন বুভুক্ষিত? নিজের এই স্বর্ণ-মন্দির ত্যাগ করিয়া সে এই যে ধূলায় লুটাইতেছে,—এ কাহার অভিশাপে?

নির্ম্মল তাহার এই ভয় দেখিয়া হাসিল। তাহার মাথাটা সস্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল—"বজরার খাটে তো দু'জনকে শুতে কুলবে না,—এই তো আমি তোমার পাশেই রইলুম, একটু ডাকলেই হলো। কেমন, না? তা হ'লে যাই?"

ধীরা তাহার যে হাত ধরিয়াছিল, সে হাত সে ছাড়িল না, নতমুখে কেবল ঘাড় নাড়িল—"না।" তাহার কণ্ঠে তখন আকস্মিক জ্বালাভরা অশ্রু-সাগর মথিত হইতেছিল; তাই সে কথা কহিতে পারিতেছিল না।

"যাবো না? আচ্ছা, তবে যাবো না, তুমি শোও,—আমি তোমার কাছে বসে তোমায় ঘুম পাড়াই; কেমন, এই তো?"—এই বলিয়া সে ধীরার শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। তখন ধীরা তাহার হাত ছাড়িয়া দিল।

"তবু আবার কেন দাঁড়িয়ে রইলে? এসো, শোবে এসো, আমি তোমায় বাতাস করি।—গল্প বল্‌বো? কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে,—আজকের মত ঘুমুলেই ভাল হয়। কাল তোমায় তখন একটা খুব ভাল দেখে গল্প বল্‌বো; আজ থাক। আজ শুধু বাতাস কর্‌ছি, তুমি লক্ষ্মীটির মতন ঘুমিয়ে পড়ো দেখি।"

ধীরার চিত্তে তখন দুর্জ্জয় অভিমান নিঃশব্দে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি পোড়াইয়া ভিতরে-ভিতরে ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার শান্ত নিস্তরঙ্গ হৃদয়-নদীতে সহসা বন্যার বেগে একটা বিদ্রোহের বাণ ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। একবার সে মনে করিল,—সে তাঁহার কথা শুনিবে না, কিছুতেই এখন শুইবে না, তাঁহার নিকট গল্প শুনিবে না, বাতাস খাইবে না, কিছু না। কেন, সে কি কচি খুকি, যে, তাহাকে কেবল "গল্প বলিয়া—বই পড়িয়া—বাতাস খাওয়াইয়া—রাত্রিদিন পুতুপুতু করিয়া রাখিতে হয়? এরই নাম স্বামীর ভালবাসা,—স্বামীর আদর এই! ইহারই জন্যে এমন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া!

বহুক্ষণ পরে ধীরাকে নিদ্রিতবোধে নির্ম্মল পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তখন সেই নির্ম্মল কক্ষ-মধ্যে বিনিদ্র শয্যাতলে একা পড়িয়া ধীরা তাহার প্রাণপণে-রুদ্ধ-করা এতক্ষণকার বেদনায় পরিপূর্ণ অভিমানাশ্রুরাশি তেমনই নিঃশব্দে অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিল। অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া দীনের সহায়কেই নালিশ জানাইয়া মনে-মনে বলিতে লাগিল,—"যদি এমন করিয়া আমায় বঞ্চিত করিবে, তবে আমায় দিলে কেন?

যদি দিলে, তবে সবাইকে যেমন করিয়া দাও, তেমন করিয়া দিলে না কেন? আমি কি করিয়াছি যে, আমায় সব দিয়াও এমন, সর্ব্ববঞ্চিত করিতেছ? এমন করিয়া আমি আর বাঁচিতে পারি না।"

তাহার মনে হইল, নির্ম্মল তাহাকে ভালবাসে না। না, বাসে না। ভালবাসিলে কি মানুষ তাহার ভালবাসার বস্তুকে এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে? ভালবাসিলে কি মানুষ ভুলিয়া যায় যে, যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভগবান আমার মত দৃষ্টি দেন নাই!—তাহাকে দেখা দিতে হইলে তাহাকে আমার একেবারে আপনার চেয়েও আপনার হইতে দিতে হইবে! স্পর্শই যে অন্ধের দৃষ্টি,—এই এতবড় কথাটায় তা হইলে কি ভুল হয়?

সে না হয় অন্ধ; হতভাগ্য অন্ধ!—কিন্তু, ওগো অন্ধের দেবতা! তুমিও কি তাই! তুমি কি তোমার এই অধম সেবিকার মত দেখিতে পাও না? যে পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়া হা-হা করিতেছে, তাহার সেই পূজার সুখ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া তুমি তাহাকে এ কি প্রতিদান দিতেছ? পূজারীকে দেবতা সাজাইয়া এ কি তোমার নির্ম্মম পরিহাস! ওগো! না—না, আর না,—আর সহ্য হয় না। এ খেলার এইখানেই সমাপ্তি কর। যেখানে যাহার স্থান, সেইখানেই স্থাপন করিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দাও। তাহাকে তাহার ছন্দভ্রষ্ট করিও না। ওগো বাঁচাও! এ অন্ধ কাঙ্গালের মুখে যে অনাস্বাদিত সুধাপাত্র মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়া ধরিয়াছিলে, তাহা হইতে—ওগো মহাজন তোমরা—তোমাদের অভাব কিসের—এই সর্ব্ব-বঞ্চিতাকে আর বঞ্চিতা করিও না। কিন্তু অন্ধের এ দুঃখ তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে?

মৃত্তিকা

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

ধূসর-বরণা, মলিন-বসনা জয়জয় চির ধাত্রী গো,
অঙ্কে রেখেছ, বক্ষে টানিছ, সস্নেহে দিবা-রাত্রি গো।
সন্তান তরে জননীর চেয়ে সহিতেছ তুমি যন্ত্রণা;
একটি পলক-ও তব কোলছাড়া হয় না জীবন-কল্পনা।
তব পদ চুমি, শতবার নমি—জয় মা জননী মৃত্তিকা!
আদিকাল হতে বসে আছ তুমি শিয়রে জ্বালিয়া বর্ত্তিকা।
অঞ্চল ঢাকা সুধা দিয়ে তুমি ক্ষুধা হর' নিতি অন্নদা;
কনক-হীরক হার গলে দিয়ে চুমা খাও মাগো রত্নধা।
স্তন্য তোমার গিরি পয়োধরে শতকোটি ধারে উচ্ছ্বলে,
চিকুরের ছায়া চিরশ্যামমায়া দুলায় শীরষ হিন্দোলে।
তবপদ চুমি শতবার নমি জয় মা জননী মৃত্তিকা,
কোটি কোটি আলো যুগে যুগে জ্বালো হে বিরাট প্রাণ-বর্ত্তিকা
তব ধূলি মাথা বাল্য আশীষ নীরবে শতায়ু প্রার্থনা—
শোকের বাসরে তব বুক ছাড়া কোথাও মিলে না সান্ত্বনা।
অভিমান করি তব বুকে পড়ি দেই গড়াগড়ি শৈশবে,
সবি দিতে পারি ছাড়িবারে নারি তব গৌরবে বৈভবে।
পদধূলি চুমি শতবার নমি, হে আদি জননী মৃত্তিকা,
আছ বিনিদ্রা, শিয়রে বসিয়া জ্বালি মৃণ্ময় বর্ত্তিকা।
হরিপ্রেমে মাতি গড়াগড়ি দেই তব দেহে তাঁরি সন্ধানে;
সবার প্রণাম বহি যথা ঠাঁয়ে বিতর আশীষ সন্তানে।
তিলক চুম্ব দাও মা ললাটে, বুলাও হস্ত মৃণ্ময়ী—
মূর্ত্তিতে তুমি মৃণ্ময়ী মাতা, চিত্তে দেবতা চিন্ময়ী।
তোমারি অঙ্গে গড়ি দেবদেবী, হে আদি জননী মৃত্তিকা
তব রোমাঞ্চে পূজি তাঁহাদেরে, তব স্নেহে জ্বালি' বর্ত্তিকা।
তোমার মাংসপিণ্ডে জনম, অন্ধা জননী গান্ধারী,
শত নাড়ীপথে জীব রসদানে রেখেছ জীবন সঞ্চারি'।
পাপে তাপে শাপে চারিদিক হতে লভি যবে শত লাঞ্ছনা,
অঞ্চল-তলে লুকাইয়া তুমি শক্রুরে কর বঞ্চনা,
তব ধূলি গণি, শিরে মহামণি, হে আদি জননী মৃত্তিকা;
দেহের দশায় জ্বালাও নিভাও, চির প্রাণালোকবর্ত্তিকা।

দিদি

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত আখ্যায়িকা।

(গুণ-বিবেচন—Appreciation.)*

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্যানি বার্নি, জেন অষ্টেন, শার্লট ব্রন্টি, এমিলি ব্রন্টি, 'জর্জ্জ এলিয়ট' প্রভৃতি আখ্যায়িকা-রচয়িত্রীর নাম সুবর্ণ-অক্ষরে উৎকীর্ণ। আজকাল উক্ত সাহিত্যের এই বিভাগে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অনুপাত ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। মিসেস্ হেনরী উড, মিসেস্ হম্ফ্রে ওয়ার্ড, মিসেস্ ব্রাডন, ওইডা ('Ouida'), মেরি করেলি, ভিক্টোরিয়া ক্রস্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর হালের লেখিকাগণ পাঠকবর্গের সুপরিচিত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ লেখকদিগের রচিত আখ্যায়িকাগুলি ইংরেজী সাহিত্যের ছাঁচেই ঢালা; সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় আমাদের সাহিত্যের এক্ষেত্রেও মহিলাকুল আখ্যায়িকা-রচনায় শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন,—ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নাই। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও 'স্নেহলতা'-রচয়িত্রী বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভাগে পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই বিভাগে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ছোটগল্প-রচয়িত্রী শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী, প্রভৃতি মহিলাগণ পাঠকবর্গের সুপরিচিত। ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় আমাদের সাহিত্যেরও এই বিভাগে লেখিকার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা বড় আহ্লাদের কথা। আরও আহ্লাদের কথা যে, ইঁহারা প্রায় সকলেই অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলা।

নারীজাতি যে এই বিভাগে লিপিকুশলতা দেখাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা সকলেই ছেলেবেলায় মা, মাসিমা, পিসিমা, ঠাকুমা, দিদিমার মুখে তন্ময় হইয়া রূপকথা শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। বুড়া ঠাকুরদাদা বা দাদামহাশয় রসিকতায় পঞ্চমুখ; কিন্তু তাঁহারা গল্প-বলার কায়দা দিদিমা-ঠাকুমাদের মত আয়ত্ত করিতে পারেন না। সুতরাং নারীজাতি, আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে, গল্প-বলা ছাড়িয়া গল্প-লেখা ধরিলে যে সহজেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে হইতেছেও তাহাই।

আখ্যায়িকা-রচনায় নারীজাতির কৃতিত্বলাভের আর একটি কারণ আছে। সে কারণটি ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ আখ্যায়িকার প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। আখ্যায়িকা, নাটকের ন্যায়, সমাজের দর্পণ, মানবজীবনের চিত্র। নরনারীচরিত্রের অঙ্কন, মানবহৃদয়ের রহস্যোদ্ঘাটন, মনোভাবের বিশ্লেষণ, উচ্চশ্রেণীর আখ্যায়িকার প্রকৃত কার্য্য। এই বিশ্লেষণ-কার্য্যে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পটুতা অধিক। কেন না, স্ত্রীলোকে যেমন সূক্ষ্মভাবে, যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। ( ) সত্য বটে, শুধু আমাদের পর্দ্দানসীন নারীসমাজে কেন, সভ্য বিলাতী সমাজেও নারীজাতির পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্র পুরুষের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। সভ্যসমাজেও তাঁহারা যুদ্ধ, রাষ্ট্রনীতি, বিচার, শাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান প্রবেশ-অধিকার পান না; সুতরাং পুরুষের সমান পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পান না। এমন কি, সামাজিক জীবনেও ডিনারের পরে পুরুষেরা যখন বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া বসেন, তখন তথায় নারীজাতির

* রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর সাহিত্য-শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত। (২৩এ জুলাই ১৯১৬)।

(১) এই জন্যই আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে বরের প্রবীণ অভিভাবক বা পাঁচ ইয়ারে কনে দেখার পরিবর্ত্তে বরের আত্মীয়াদিগের গঙ্গার ঘাটে কনে-দেখার রেওয়াজ হইতেছে।

প্রবেশ-নিষেধ। কিন্তু পরিধি সঙ্কীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা অধিক। অথবা পরিধি সঙ্কীর্ণ বলিয়াই তাঁহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; কেন না, ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিলে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির অসাধারণ সূক্ষ্মতা জন্মে। এই জন্যই অবরোধ-বাসিনী নারী সুযোগ পাইলে ঘোমটার ভিতর হইতে এক নিমেষের চাহনিতে যতটা দেখিয়া লয়েন, পুরুষ হাটে-বাজারে বাহির হইয়াও তাহার শতাংশের একাংশ পারে না। এই তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সহিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য আছে। বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের চরিত্র-বৈচিত্র্য, স্ত্রীলোকের হৃদয়-রহস্য, যেরূপ সত্য ও সহজভাবে অঙ্কিত করিতে পারিবে, পুরুষের পক্ষে সেরূপ পারিবার কথা নহে। (২) উক্ত উভয় শক্তির সমন্বয়ের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্যানি বার্নি, জেন অষ্টেন, শার্লট ব্রন্টি ও 'জর্জ্জ এলিয়টে'র এত উচ্চ আসন। বিশেষতঃ, মনোভাব-বিশ্লেষণে ও চরিত্রের ক্রমবিকাশ-প্রদর্শনে 'জর্জ্জ এলিয়টে'র সমকক্ষ কেহ আছে কি না সন্দেহ।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পদিন হইল গড়িয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এই নবীন সাহিত্যে এত শীঘ্র 'জর্জ্জ এলিয়ট' বা জেন অষ্টেন, এমন কি মিসেস্ হেনরি উড বা মেরি করেলির আবির্ভাবের আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রবন্ধের শীর্ষে যে লেখিকার নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তিনি আলোচ্য পুস্তকে 'জর্জ্জ এলিয়টে'র প্রণালীতে কয়েকটি চরিত্রের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাহাদিগের মনোভাব-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার ভাষা ও রচনারীতি 'জর্জ্জ এলিয়টে'র মত জটিল ও গুরুগম্ভীর নহে; ইহা সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর, পরন্তু বড় মিঠে ও মোলায়েম। মনোভাব বিশ্লেষণে তিনি 'জর্জ্জ এলিয়টে'র মত শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, বর্ণনা সাধারণ পাঠকের অপ্রীতিকর করিয়া তোলেন নাই। তাঁহার মিঠে হাত 'ইষ্টলীন'-রচয়িত্রী মিসেস্ হেনরি উড ও 'থেল্‌মা'-রচয়িত্রী মেরি করেলিকে পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়। দাম্পত্যপ্রেম এই গ্রন্থের কেন্দ্রস্থানীয়, তজ্জন্য আলঙ্কারিকগণ ইহাকে হয়ত আদিরসাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, কিন্তু বহু স্থলে ইহার হৃদয়দ্রাবী করুণরস আদি-রসকে ছাপাইয়া উঠে; ইহাতে অঙ্কিত কয়েকটি নারী-চরিত্রের (নায়িকা সুরমা, প্রতিনায়িকা চারু, চারুর বিধবা মাতা, উমা ও মন্দাকিনীর) সম্পর্কে যখনই আসা যায়, তখনই হৃদয় করুণরসে ভরিয়া যায়; বিশেষতঃ, সুরমার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনা-দর্শনে চোখের জল নিরোধ করা কঠিন হইয়া উঠে। সুরমা বাস্তবিক সন্তানজননী না হইলেও তাহার মাতৃভাব অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত। গ্রন্থের মধ্যে-মধ্যে দম্পতীর (চারু-অমরের) প্রেমালাপের যে খণ্ডচিত্র-গুলি প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিও বড় সুন্দর, বড় মনোরম। কিন্তু আদি, করুণ ও বাৎসল্যরসের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও আমরা বলিব, মনোবৃত্তি নিচয়ের দ্বন্দ্ব-বর্ণনাই গ্রন্থকর্ত্রীর বিশিষ্টতা। 'জর্জ্জ এলিয়টে'র 'রোমোলা'র ন্যায় এই গ্রন্থেও একাধিক হৃদয়ের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত। অমরের পিতার, অমরের, সুরমার, উমার, প্রকাশের—হৃদয়ের দ্বন্দ্ব অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত, অতি নিপুণভাবে প্রদর্শিত। ফলতঃ, গ্রন্থকর্ত্রী এই পুস্তকে যেরূপ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। সেই কারণেই এই পুস্তকের গুণবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গ্রন্থখানি বিপুলায়তন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহত্তম আখ্যায়িকা 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' ইহার তুলনায় ক্ষুদ্র। বোধ হয় রবিবাবুর 'গোরা' ব্যতীত এমন বিপুলায়তন গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে গার্হস্থ্য আখ্যায়িকার মধ্যে সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয় না। তবে ইংরেজী সাহিত্যে এরূপ স্থূলকলেবর আখ্যায়িকা অসাধারণ ব্যাপার নহে। আখ্যায়িকাটি প্রথমে মাসিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সূত্র ধরিয়া সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ হয় ত বলিবেন যে, ক্রমশঃ-প্রকাশ্য আখ্যায়িকা অনেক সময় এইরূপ বিপুল আকার ধারণ

---

(২) ইংরেজী সাহিত্যে পুরুষ আখ্যায়িকাকারদিগের মধ্যে এক রিচার্ডসন নারীর মনোভাব-বিশ্লেষণে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কারণ উক্ত সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, তিনি কিশোর বয়স হইতেই স্ত্রীলোকদিগের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছিলেন। নিরক্ষর নারীদিগের জোবানী প্রেমপত্রে তাহাদের মনের কথা লিখিয়া দেওয়া তাঁহার কিশোর বয়সের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। এইভাবে তালিম হওয়াতে তাঁহার এবংবিধ অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

করে—কেন না গ্রন্থকারগণ মাসের পর মাস চালাইবার জন্য পাক দিয়া সূতা লম্বা করেন ; এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ডিকেন্‌সের কয়েকখানি নভেলের নজির খাড়া করিবেন। 'তারিণী-দাদা'র মত বিষয়ী লোকে হয় ত বলিবেন,—বইখানির এরূপ ধেড়ে চেহারা, শুধু দর'বাড়াইবার জন্য। 'দেবেনে'র মত 'ইয়ং বেঙ্গল' হয় ত রসিকতার প্রয়াস করিয়া বলিলেন,—'দিদি' একটু মোটা-সোটা, একটু দলে পুরু, একটু জাঁদরেল চেহারা, একটু হৃষ্টপুষ্ট না হইলে মানাইবে কেন? আর আমরাও এরূপ মোটা বইয়ের মোটা সমালোচনা করিতে বসিয়াছি (তা' মোটা যে অর্থেই লউন)—সেজন্যও টিটকারী দিতে ছাড়িবেন না। যাহা হউক আমরা এ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে চাহি যে, সুরমার চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও তাহার মনোভাব-বিশ্লেষণ গ্রন্থে যে প্রণালীতে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ বিপুল আয়তনের প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থের আয়তন বৃহৎ হইলেও ইহার একটি ছত্রও নীরস নহে, ক্ষুদ্রতম অংশও নিরর্থক নহে।

গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড বিয়োগান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড মিলনান্ত। প্রথম খণ্ড নায়িকা সুরমার পতিগৃহ-ত্যাগে শেষ, দ্বিতীয় খণ্ড সুরমার পতিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে ও পতির নিকট আত্মসমর্পণে (self-surrender of the soul) শেষ। সুরমার গৃহত্যাগ সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের ও ভ্রমরের পিতৃগৃহগমনের সহিত তুলনীয় ; রোমোলার গৃহ-ত্যাগের সহিত ইহার সম্পর্ক দূর। সুরমা পতিগৃহ হইতে পিতৃগৃহে ফিরিলেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শোভন। পক্ষান্তরে, পিতৃহীনা রোমোলার স্বতন্ত্র পিতৃগৃহ ছিল না ; আর সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহের ত বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখই করেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের করুণ রস (pathos) বড় মর্ম্মস্পর্শী। সুরমা কিরূপে হৃদয়ের দ্বন্দ্বে ক্রমেই ক্ষীণবল হইল, কিরূপে নারীর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি পতিপ্রেম শেষে জয়ী হইল, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হইল, এই খণ্ডে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে উমা, প্রকাশ ও মন্দাকিনী—এই তিনটি নূতন চরিত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি সুন্দর, পূর্ণায়তন চিত্র। সুরমা যখন 'বিচিত্র বৈধব্যের বিড়ম্বনা'য় স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে স্নেহময়ী সপত্নী চারু ও তাহার শিশুপুত্র অতুলের মায়া কাটাইয়া পিত্রালয়ে নিরানন্দে নিরবলম্বে বাস করিয়া ক্রমেই 'পাষাণ' হইয়া যাইতেছিল, তখন তাহার মাতৃভাবের অনুশীলনের জন্য, মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, গ্রন্থকর্ত্রী উমারাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। এইটুকু বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বলিয়াছেন যে, সুরমা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালবিধবা সরলা উমাকে 'মাসিমা' বলিতে না দিয়া 'মা' বলাইতেছে ও তাহার কণ্ঠস্বরে শিশু অতুলের কণ্ঠস্বর অনুভব করিতেছে। ['তোর গলা ঠিক যেন তার মত—আমার অতুলের মত।'] কিন্তু শুধু উমারাণীর সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, গ্রন্থকর্ত্রী আবার দুইটি নূতন চরিত্রের (প্রকাশ ও মন্দাকিনীর) সৃষ্টি করিয়া এবং প্রকাশ-উমা-মন্দাকিনীর প্রণয়-বৃত্তান্ত এই আখ্যায়িকায় অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন এবং অনর্থক পুঁথি বাড়াইতেছেন, এই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আখ্যান মূল আখ্যানে গছাইয়া দিয়া থলির ভিতর হাতী পূরিয়াছেন—কোন কোন সমালোচক এইরূপ দোষ ধরিতে পারেন। উমাকে কুন্দনন্দিনীর ভাগ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য, উমা ও প্রকাশের মোহ অপসারিত করিবার জন্য, সুরমা কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইল, গ্রন্থ-কর্ত্রী যদি সমাজের হিতার্থে এই কথাই সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইলে এতদবলম্বনে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লিখিলেই কার্য্য সুসিদ্ধ হইত এবং আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষে'র পার্শ্বে 'অমৃতবৃক্ষ' রোপিত হইত—কোন-কোন সমালোচক এইরূপ মন্তব্যও করিতে পারেন।

ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, শুধু সুরমার হৃদয়ের শূন্যতাপূরণের জন্য, সুরমাকে একটি উপযুক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত করিবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে সুরমার চরিত্রের একাধিক দিক্ দেখাইবার জন্য, গ্রন্থকর্ত্রী এই নূতন আখ্যান মূল আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যায় প্রকাশ-উমা-মন্দাকিনীর বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত করার একটি প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা, সার্থকতা আছে। এই অপ্রধান আখ্যানের চরিত্রত্রয় ও ঘটনাপরম্পরা পরোক্ষভাবে প্রধান আখ্যানের নায়িকা সুরমার হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কথাটা বুঝাইয়া বলি। বিধবা উমা সুরমার উপদেশ ও শিক্ষায় প্রকাশের প্রতি অবৈধ প্রণয় হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া, পুণ্যধাম বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া, ক্ষমা ও শান্তি পাইল; কিন্তু সধবা সুরমা তাহা পাইল না। 'যেখানে পতিপুত্রহীনা সংসারের সর্ব্বসার্থকতায় বঞ্চিতা হতভাগিনীরাও শান্তি পায়' সেখানেও সুরমা শান্তি পাইল না, কেবল সেখানে নিজের ভুল, জীবনের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ, বুঝিতে পারিল। 'দেবী-চৌধুরাণী'তে যেমন প্রফুল্লর হৃদয়ে স্বামী ব্রজেশ্বর দেবতা বৈকুণ্ঠেশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তেমনি সুরমার হৃদয়ে স্বামী 'অমর' দেবতা বিশ্বেশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুরমা উমার ব্যাপার হইতে বুঝিল, উমার সহিত তাহার কোথায় প্রভেদ—সধবার স্বামীই সর্ব্বস্ব। আবার প্রকাশ পত্নী মন্দাকে যখন ভালবাসিত না, তখনও মন্দা সমস্ত হৃদয় দিয়া স্বামীকে ভালবাসিত। ক্ষুদ্র বালিকার এই আত্মবিসর্জ্জন, 'স্বামীর সুখেই তাহার সুখ, তাহার সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,' 'এই অসীম সুখ অসীম তৃপ্তির জীবন্ত আভায়', দেখিয়া সুরমা বুঝিল, রমণীর রমণীত্বের রহস্য কোথায় নিহিত। আবার,—প্রকাশের তিরস্কার—'তুমি জেনেছ কেবল আবেগহীন শুষ্ক দয়া আর মায়া, আর কর্ত্তব্য-ভরা অহঙ্কারপূর্ণ দৃঢ় অভিমান'—সুরমার চক্ষুঃ ফুটাইল, তাহাকে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ করিল: এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রকাশ-উমা-মন্দাকিনী ঘটিত বৃত্তান্তের পরোক্ষ প্রভাবে সুরমার হৃদয়ের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল, সুরমার চরিত্রের অচিন্তিতপূর্ব্ব বিকাশ হইল; তাহাদের প্রণয়-দর্শনে সুরমার হৃদয়ের নিভৃতকন্দরে, প্রথমে অন্তঃসলিলা হইয়া পরে দু-কূল ছাপাইয়া—প্রেমের মন্দাকিনী ছুটিল; যাহারা তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তাহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহাদিগের কাছ হইতেও আত্মবলে দৃপ্তা সুরমার শিক্ষালাভ হইল—ইহাই এই অপ্রধান আখ্যানের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও সার্থকতা।

আবার, মূল আখ্যানের সহিত এই অপ্রধান আখ্যানের বিরোধিতাও (Contrast) লক্ষ্যণীয়। মূল আখ্যানে, সুরমা, চারুর সুখের জন্য, নিজেকে স্বামীর সংস্রব হইতে দূরে লইয়া গেল, নিজের বৈধপ্রণয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করিল। অপ্রধান আখ্যানে, সুরমা, উমার সুখের জন্য, প্রকাশকে উমার সংস্রব হইতে দূরে সরাইয়া দিল, তাহাদিগের অবৈধপ্রণয়ের পথে বাধার সৃষ্টি করিল। প্রকাশ-মন্দাকিনীর বৃত্তান্তে, স্বামী প্রকাশ পত্নী মন্দাকিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, এই ঘটনায় অপ্রধান আখ্যানের শেষ। মূল আখ্যানে, পত্নী সুরমা স্বামী অমরের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, এই ঘটনায় মূল আখ্যানের শেষ।

বলা বাহুল্য, একাধিক আখ্যান একই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে, এই প্রণালী আধুনিক সাহিত্যে বহু নাটক ও আখ্যায়িকায় পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকর্ত্রী এ ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, 'একটা নূতন কিছু' করেন নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে পুস্তকখানির গুণ-বিচার করিলাম। এক্ষণে বিশেষ করিয়া আখ্যানবস্তু (plot) ও চরিত্রগুলির আলোচনা করিব। যাঁহারা আজও পুস্তকখানি পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য গল্পের প্রথম অংশের সংক্ষিপ্তসার দিতেছি।

সংক্ষিপ্তসার

পুস্তকের নায়ক অমরনাথ (ধনী জমিদারের একমাত্র সন্তান) ছুটিতে সহাধ্যায়ী দেবেনের বাসগ্রামে বেড়াইতে গিয়া একদিন শিকার করিয়া ফিরিবার পথে চারুলতা বলিয়া একটি ১১।১২ বৎসরের সুন্দরী মেয়েকে দেখিল। মেয়েটি তাহার বড় ভাল লাগিল। পরদিন মেয়েটি পীড়িত হইলে দুই-বন্ধুতে মিলিয়া তাহার চিকিৎসা করিল (উভয়েই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র)। তাহাতেও মেয়েটির উপর অমরের একটু মমতাবৃদ্ধি হইল। অমর জানিতে পারিল, মেয়েটি তাহার সজাতীয়া। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী রোম্যান্স লিখিতেছেন না, তিনি ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকত্ব প্রদান করিতে উৎসুক। তিনি বুঝেন—'দেখিল আর মজিল', প্রথম দর্শনেই উদ্দাম প্রণয়, বাস্তব জগতে আকসার ঘটে না; ঘটিলে তিলোত্তমা-রাধারাণীর জ্বালায় সংসারে তিষ্ঠান ভার হইত! এই জন্যই, অমর একেবারে প্রণয়সাগরে নিমগ্ন হইল, বন্ধুর নিকট প্রেমের প্রসঙ্গ, হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিল,—গ্রন্থকর্ত্রী এরূপ কল্পনা করেন নাই। বরং দেখাইয়াছেন, অমর কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে, ক্রমে এ ঘটনা 'অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে স্বপ্নের ন্যায় মনের এক কোণে সরিয়া গেল।' (অতএব ব্যাপার ঠিক প্রভাত

বাবুর 'রমাসুন্দরী'র মত নহে)। পরে আবার পূজার ছুটিতে দেবেন যখন অমরকে নিজগ্রামে টানিয়া আনিল, তখন প্রথমে ত অমর চারুকে চিনিতেই পারিল না। পরে, চিনিতে পারিলে—অমরের মনে আবার সেই পূর্ব্ব-ভাবের উদয় হইল। বন্ধুবর—ইয়ং বেঙ্গল—দেবেন কিন্তু একটু রোম্যান্সের আঁচ পাইয়াছিল। সেই জন্য সে, কতকটা গম্ভীরভাবে, এবং কতকটা দুষ্টামি করিয়া, অমরকে দরিদ্রা বিধবার কন্যার জন্য একটি সুপাত্র খুঁজিতে বলিল; এবং অমরের মত ধনিসন্তান বিবাহে টাকা খোঁজে, এটুকু টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। অমর তাহাতে একটু অভিমান করিয়া বলিল, 'আমি ত এখনো বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করিনি, (৩) করব যখন তখন ব'লো!' এবং মেয়েটির সম্বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইল। দেবেন অমরের শেষ কথাটির উত্তরে হাসিয়া বলিল, 'তা জানি।' দেবেন মনে-মনে যে রোম্যান্সের আঁচ করিতেছিল, এ হাসিটুকু তাহারই নিদর্শন।

এবারও অমর চারুর কথা, চারুর সম্বন্ধ করার কথা—সব ভুলিয়া গেল; এবং কিছুদিন পরে সত্য-সত্যই এক জমিদারের একমাত্র কন্যা—সুরূপা সুরমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহ-প্রস্তাবে তাহার 'মন কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল' কিন্তু সে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ না পাওয়াতে অসম্মতও হইতে পারিল না। দেবেনের কথাই ঠিক হইল দেখিয়া, লজ্জায় সে আর দেবেনকে এ সংবাদ দিতে পারিল না। এদিকে দেবেন সে কথা না জানাতে, রোম্যান্স-রচনার পথে আর-এক পদ অগ্রসর হইল। সে চারুর মাতাকে অমরের সহিত চারুর বিবাহ দিতে উৎসাহিত করিল; এবং তিনি সঙ্কট-পীড়ায় শয্যাশায়িনী হইলে জোর তলব দিয়া অমরকে আনাইল; দরিদ্রা বিধবা মৃত্যুশয্যায় অমরের হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দিলেন! 'বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত' অমর চারুর মাতাকে জানাইল, 'আমি বিবাহিত'; কিন্তু সে বাক্য মরণাহতা বিধবার কর্ণে প্রবেশ করিল না। দেবেন একটু অপ্রস্তত হইল; কিন্তু তথাপি গ্রামে কেহ চারুর ('হিন্দুর ঘরের বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা! এত বড় বালাই আর নাই।')

(৩) পরে কিন্তু ঠিক তাহাই ঘটিল। এই রচনাকৌশলটুকু Dramatic Ironyর সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ভার লইতে চাহে না (৪) বলিয়া, অমরকেই কলিকাতায় লইয়া গিয়া চারুর সম্বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। ভিন্নজাতীয় বলিয়া দেবেন তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না। অমর নিজ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই কর্ত্তব্য-সাধনে সম্মত হইল। (এই ভার লওয়া কতকটা নগেন্দ্র-নাথ-কুন্দনন্দিনীর ব্যাপারের মত। তবে নগেন্দ্রনাথ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ভার লইয়াছিলেন এবং তাঁহার বেলায় অবশ্য এরূপ বাগ্দান হয় নাই। প্রণয়সঞ্চার-ব্যাপারেও কিছু মিল আছে।)

অমর চারুকে কলিকাতায় আনিল; কিন্তু পিতা বা পত্নীকে এ কথা জানাইল না। প্রথম-প্রথম অমর তাহার জন্য পাত্রের চেষ্টা করিল; কিন্তু চারু তাহার প্রতি এত অনুরক্তা হইয়া পড়িয়াছিল, অমরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না,—এ বিষয়ে এত কাতরতা দেখাইতে লাগিল যে, অমর অগত্যা কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এবং কতকটা স্নেহবশে, তাহাকে বিবাহ করাই স্থির করিল। সে-ও মোহে পড়িয়া নগেন্দ্র দত্তের মত ভাবিল, বহুবিবাহ আমাদের সমাজে দোষের নহে। (এইখানে তাহার মনের প্রথম দ্বন্দ্ব।)

এখন অমর এই বিবাহ করিবার পূর্ব্বে, একবার পিতার অনুমতি ও পত্নীর সম্মতি লইতে বাড়ী গেল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইলেও এই তাহার প্রথম পত্নী-সম্ভাষণ। ফুলশয্যার রাত্রে সে লজ্জায় পত্নীর সহিত আলাপ করে নাই; পরেও যে কয়দিন নববধূ পতিগৃহে ছিল, 'অমরনাথ সে কয়দিন পাশ কাটাইয়া' বেড়াইয়াছিল। পরে, ঘটনাচক্রে, আর পরস্পরের দেখাশুনা হয় নাই। এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে পত্নীর দৃপ্ত ব্যবহারে অমর চটিল। পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিবেন বলিয়া শাসাইলেন। অমর রাগে, অভিমানে, গৃহত্যাগ করিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে, চারুর রোগশয্যার পার্শ্বে আবার তাহার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব প্রবল হইল। একদিকে পিতার প্রতি ভালবাসা, ভক্তি ও কর্ত্তব্য

(৪) পরে চারুর তারিণী দাদার (পিস্তুতো ভাই) দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে তিনি চারুর ভার লইতেন না,—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ইহারই শাস্তি, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজের কন্যাও এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল। উভয়ত্রই অমর আশ্রয়স্থান হইয়াছিল।

বোধ, অন্যদিকে চারুর মাতার নিকট প্রতিশ্রুতি ও চারুর প্রতি স্নেহ। সুরমা যে বিবাহের প্রস্তাবে বলিয়াছিল, 'এখন তাহাকে (চারুকে) ভালবাস' তাহা ঠিক। সুরমা তখনও পর্য্যন্ত অমরের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সুতরাং এই দ্বন্দ্ব-দ্বিধা শীঘ্রই ঘুচিল, চারুরই জয় হইল। পিতার অবাধ্য হইতে হইল বলিয়া, অমরের হৃদয় যাতনায় কাতর হইল, কিন্তু তথাপি বিবাহই স্থির হইল। (৫) (অবশ্য ব্রজেশ্বর ইহা অপেক্ষা অধিক মনের বল ও পিতৃভক্তি দেখাইয়াছিল।) গ্রন্থকর্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'হায় যৌবন! হায় একীভূত সুধা ও গরল!' প্রাচীন কবি ভবভূতিও বলিয়াছেন:—'বিকারি চ যৌবনম্। ললিতমধুরাস্তে তে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাম্॥' মৃচ্ছকটিক-কারও অল্প কথায় বলিয়াছেন:—যৌবনমত্রাপরাধ্যতি ন চারিত্র্যম্।

বিবাহের পর চারুর সঙ্গে honeymoon-কালীন সুখ দুঃখের জীবনের আর পরিচয় না দিলেও চলে। এই বিবাহের পর পিতার ব্যবহার মোটের উপর কঠোরই থাকিয়া গেল; কিন্তু দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমানের অন্তরালে পিতার স্নেহেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, শেষে পিতা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অমর চারুকে লইয়া গৃহে যাইতে আহুত হইল। পিতার হৃদয় তখন পুত্রস্নেহে কাণায়-কাণায় পূর্ণ। তিনি অমর-চারুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সুরমাকে তাহাদিগের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে অন্তিম অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, পুত্রই পিতার উত্তরাধিকারী হইল।

মন্তব্য।

এতক্ষণে গ্রন্থের নায়ক (অমর), নায়িকা (সুরমা) ও প্রতিনায়িকা (চারু) একগৃহে একত্র হইল; এবং এতক্ষণে অর্থাৎ দশম পরিচ্ছেদে—ঠিক ১০০র পৃষ্ঠায়—গল্পের প্রকৃত আরম্ভ হইল। এখন নায়িকা ও নায়কের মনের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইবে; ইহাই আখ্যায়িকার প্রকৃত আখ্যানবস্তু। পূর্ব্ব নয়টি পরিচ্ছেদ বা ৯৯ পৃষ্ঠা উদ্যোগপর্ব্ব, অথবা গল্প-সৌধের সোপান। (৬) এই সোপান অতিক্রম করিয়া সৌধে প্রবেশ করিতে হয়।

সুরমা ও অমরের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব আখ্যায়িকাখানির প্রাণ এই দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্তসার দিয়া ইহার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বুঝান যায় না। অতএব আমরা সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুস্তকের প্রধান-প্রধান পাত্রপাত্রীদিগের চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

পুস্তকখানি নায়িকা-প্রধান (ইহার নামেই তাহা বুঝা যায়), নায়িকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন ও নায়িকার মনোভাব-বিশ্লেষণ পুস্তকের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। অতএব প্রথমে নায়িকার প্রসঙ্গই উত্থাপন করি।

নায়িকার চরিত্র

সুরমার সঙ্গে যখন অমরের সম্বন্ধ হয়, তখন দেওয়ান অমরকে বলিয়াছিলেন 'বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।' অমরের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, 'জমিদারী-সেরেস্তার কাজও জানে না কি?' কিন্তু আমরা পরে দেখিব, শ্বশুরের নিকট ক্রমে সুরমার সে শিক্ষাও হইয়াছিল। (অমরের এই প্রশ্নও Dramatic Irony'র দৃষ্টান্ত।) যাহা হউক, সে সুন্দরী, বয়ঃস্থা, বিদুষী, বিবাহকালে এই পর্য্যন্ত জানা গেল। তাহার পর আমরা যখন অমরের সঙ্গে-সঙ্গে সুরমার সম্মুখীন হই, তখন দেখি যে সে লজ্জাজড়িতা নবোঢ়া অজ্ঞাতযৌবনা কিশোরী নহে,—'সঙ্কোচহীনা' তেজস্বিনী, প্রগল্‌ভা, নবযুবতী। এই পতিপত্নীর প্রথম সম্ভাষণে মধুরতা কোমলতা নাই। চারুর সহিত অমরের বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে সুরমার কথাবার্ত্তায় বেশ-একটু 'কর্ত্তৃত্ব ও তিরস্কারের ভাব মিশানো।' সুরমা দর্পিতা, আত্মনির্ভরে অভ্যস্তা। তাহার চরিত্রের এই দিক্ বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সে ধনী পিতার একমাত্র কন্যা, আদরে প্রতিপালিতা, শৈশব হইতেই তাহার প্রবল ইচ্ছায় কেহ বাধা দেয় নাই। বিপত্নীক শ্বশুরের ঘরে আসিয়াও তাহার আদর বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সে প্রথম হইতেই শ্বশুরালয়ে ঘরণী-গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা একাধারে বিপত্নীক শ্বশুরের কন্যা, বধূ ও মাতৃস্থানীয়া। পর-পরিচ্ছেদে ও যে পরিচ্ছেদে শ্বশুরের সাংঘাতিক পীড়া ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরিচ্ছেদে,

(৫) প্রভাত বাবুর 'রমাসুন্দরী'তে নায়ক নবগোপালের মনে এরূপ দ্বন্দ্ব ঘটে নাই, পিতার জন্য কোন কষ্টের চিহ্ন দেখা যায় না।

(৬) সমালোচনা-শাস্ত্রে ইহার কটমট বিলাতী পারিভাষিক নাম Protasis, Introduction বা Exposition'। আমরা রূপকের আশ্রয় লইয়া 'সোপান' বলিলাম। 'সূচনা' বলিলেও চলে।

দেখা যায়, শ্বশুর-বধূর সম্পর্ক কত স্নেহমধুর। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী-চৌধুরাণী'র শেষ পরিচ্ছেদে প্রফুল্লর বেলায় যে স্নেহময় সম্পর্কের আভাসমাত্র দিয়াছেন, এখানে তাহার পূর্ণায়তন চিত্র পাওয়া যায়। বিন্দি ঝী পর্য্যন্ত বুঝে—"কর্ত্তাবাবুর তো উনি প্রাণ ছিলেন। তিনিও 'মা' 'মা' করে একেবারে গলে যেতেন। ওঁরই কর্ত্তা বাবুকে বা কত ছেদ্দাভক্তি। ঠিক ছেলের মতন যত্ন করা।" আমরা পরে সুরমার মাতৃভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইব। ইহা যেন তাহার পূর্ব্বাভাস।

শ্বাশুড়ী না থাকাতে সুরমা শ্বশুরের সঙ্গে কথা ত কহেই, পরন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া সময়-সময় শ্বশুরের সঙ্গে এমন কথারও আলোচনা করিতে হয় যাহা সাধারণতঃ নিতান্ত বিসদৃশ। পূর্ব্বোক্ত দুইটি পরিচ্ছেদ-পাঠকালে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। যাহা হউক, অমরের চারুকে বিবাহ করার প্রস্তাবে সুরমার শ্বশুরের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে তাহার আত্মসংযম, হৃদয়ের বল, স্পষ্টবাদিতা, তেজস্বিতা ও অমরের উপর অভিমানের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্পষ্টবাদিতার জন্য—'মনে একভাব রেখে মুখে আর একরকম ব্যবহার' তাহার অসাধ্য বলিয়াই, তাহাকে এ ক্ষেত্রে 'নির্লজ্জের মত ব্যবহার' করিতে হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত সুরমার চরিত্রের আংশিক পরিচয় পাওয়া গেল। শ্বশুরের মৃত্যুশয্যায় সে প্রথম অমর চারুর সংস্পর্শে আসিল। এ সময়ে শ্বশুরের উপদেশে ও তাঁহার তৃপ্তির জন্য সে তাহাদিগের সহিত খুবই সদ্ব্যবহার করিল। অবশ্য অমরের প্রতি অভিমান তখনও ষোল আনাই আছে। (শ্বশুরের পীড়াসংবাদ সে সপত্নীকে লিখিল, তবু স্বামীকে লিখিল না, এখানেও সেই অভিমান।) সে শ্বশুরের প্রীতির জন্যও অমরকে ক্ষমা করিতে পারিল না, কেবল যাহাতে কখনও ক্ষমা করিতে পারে, তাহার জন্য শ্বশুরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই, সুরমার হৃদয়ে ধীরে-ধীরে দারুণ দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হইল। (পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইখানেই আখ্যায়িকার প্রকৃত আরম্ভ।) শ্বশুরের অভাবে এই গৃহে তাহার কোন অধিকার নাই, সে অমরের কেহ নহে, এই দুঃখে ও অভিমানে, সুরমা প্রথম-প্রথম সংসারের কর্ত্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিল। অমর সেজন্য অনুযোগ করিলে, রূঢ়ভাবে অসম্মতি জানাইয়া, তাহাকে জব্দ করিয়া, অপমান করিয়া, 'বিজয়ানন্দে' পূর্ণ হইল। ইহা যেন এতদিন পরে অমরের উপর তাহার অবহেলার জন্য প্রতিশোধ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই এই কর্ম্মহীন, কর্ত্তব্যহীন জীবন তাহার নিতান্ত 'আনন্দহীন' লাগিল। সে আবার সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিল, এমন কি জমিদারী সম্বন্ধেও অমরের নিযুক্ত 'তারিণী দাদা'কে পরামর্শ দিতে লাগিল।

সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াও সুরমা অমরের প্রতি দুর্জ্জয় অভিমানে প্রথম-প্রথম অমর ও চারুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চারুর বালিকার মত সরলতা, অমায়িকতা, স্নেহশীলতা, ঈর্ষাহীনতা প্রভৃতি গুণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না। চারুর পীড়ায় সে স্নেহময়ী মাতার মত বা 'দিদি'র মত তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল; শীঘ্রই তাহাকে ছোট বোনটির মত দেখিতে লাগিল। ইহাতে সুরমার উদার, স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। চারুর দৃষ্টান্তে সুরমার হৃদয়ের নিভৃত কোণে নিহিত ঈর্ষার তিরোধান হইল। তখনও সুরমা অমরের সহিত মিশিতে সঙ্কোচবোধ করিত। কিন্তু ক্রমে সে মনকে বুঝাইল যে, অমর যখন তাহার কেহ নহে, তখন এই সঙ্কোচটুকু রাখিলেই যেন অমরের উপর সে নিজের দাবি ভুলে নাই—এই কথাটিই জাগাইয়া রাখা হয়। এই বুঝিয়া সে অমরকে চারুর বর অতএব ভগিনীপতির মত, বন্ধুর মত, দেখিতে লাগিল,—নিঃসঙ্কোচে, হৃদ্যতার সহিত তাহাদের উভয়ের সহিত মেলামেশা করিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভব করিত না, তাহা নহে। এই পর্য্যন্ত হইল সুরমার চরিত্রের প্রথম বিকাশ।

এদিকে চারুর একটি পুত্র হওয়াতে সুরমার চরিত্রের আর একভাবে বিকাশ হইল। তাহার হৃদয় মাতৃভাবে বিভোর হইল। সে, মা-যশোদার মত, সন্তানজননী না হইয়াও ঐ সন্তানকে নিজের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিল। তাহার মায়ায় সুরমা অমর-চারুর সংসারে আরও জড়াইয়া পড়িল। সে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পিত্রালয়ে গিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিল না, এবং পরে পিতার পুনঃপুনঃ অনুরোধেও সেখানে চিরকালের মত

থাকিতে সম্মত হইল না; এমন কি, পিতার অতুল সম্পত্তি অপেক্ষা সপত্নী-সন্তান 'অতুল'কে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পিতাকে পোষ্যপুত্র লইতে বলিল। সুরমার (৭) এই মাতৃভাবের পরিচয় আবার দ্বিতীয় খণ্ডে উমার (ও মন্দাকিনীর) সম্পর্কে পাওয়া যাইবে। ইহা তাহার চরিত্রের একটি উজ্জ্বল অংশ। তাহার এই মাতৃভাব বাস্তবিক সমস্ত পুস্তক যুড়িয়া আছে।

কিন্তু এই অবাধে মেলামেশায় একটি অচিন্তিতপূর্ব্ব ফল হইল। অমর ক্রমে সুরমার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং সেই আকর্ষণ প্রণয়ে পরিণত হইল। অমর বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে ভাব দমন করিতে পারিল না। শেষে রোগ-শয্যায় ও স্বাস্থ্যলাভের পর সুরমার নিকট সে ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সুরমা অমরের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সুরমার উপর অমরের কোন দাবি নাই, পরন্তু চারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইলে অমর সুরমার ঘৃণার পাত্র হইবে। সুরমা অমরের মনের এই অবস্থা দেখিয়া চারুর ও অমরের মঙ্গলের জন্য (এবং আত্মরক্ষার্থ) পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সে চারুকে বলিল, 'আমি তোর শুভার্থিনী দিদি—সতীন নই।' (ইহাই গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য্য।) সুরমা যদিও বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, যাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার উপর সে অভিমান করিবে কিসে, তথাপি এ কথাটাও অভিমানের। সে স্বামীকে বলিয়া গেল যে, তাহার উপর স্বামীর অধিকার নাই এবং কোনদিন ছিল না, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কাছে স্বীকার করিল যে, তাহা মিথ্যা কথা, শুধু অহঙ্কার-অভিমানের কথা।

অমর ও সুরমা ক্রমে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল, উভয়ের হৃদয়ে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল; এবং তাহার ফলে 'সূচনা'র সময়কার অবস্থার সহিত তুলনায় এখনকার অবস্থা (situation) অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় সমালোচনা-শাস্ত্রে এই অবস্থার কটমট পারিভাষিক নাম Imbroglio, Entanglement বা Complication; আমরা ইহাকে 'সমস্যা' বলিতে পারি।

কমলমণি সূর্য্যমুখীকে বলিয়াছিল, 'তোমার হৃদয়ের আধখানা এখনও আস্ত্রিত ভরা।' ভ্রমরের ননদ শৈলবতী যদি কমলের মত স্নেহময়ী, সমবেদনাময়ী ও সেই স্নেহ-সমবেদনার অধিকারে স্পষ্টবাদিনী হইত, তাহা হইলে সেও ভ্রমরকে এ কথা আরও জোর করিয়া বলিতে পারিত। সুরমা সূর্য্যমুখী-ভ্রমরের সজাতীয়া। (৮) তাহারও হৃদয় অভিমানে ভরা। সংস্কৃত নাটকে রাজা অন্যার প্রণয়াসক্ত হইলে, পাটরাণীদিগের প্রবল অভিমান, ঈর্ষ্যা দেখা যায়, তাঁহারা প্রণয় ও পরিণয়ে বাধা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে বেশ বনিয়া যায়, অন্ততঃ সপত্নী-বিরোধের উল্লেখ শেষ অঙ্কে দেখা যায় না। বহুবিবাহ যে সমাজের মজ্জাগত, সেখানে ইহাই স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু ইংরেজী সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবে আমাদের মধ্যে এখন (individualism) ব্যক্তিতন্ত্রতা প্রবল হইতেছে, সুতরাং সাহিত্যে (ও সমাজে) সূর্য্যমুখী-ভ্রমর-সুরমার উদ্ভব হইতেছে। এখন লক্ষহীরার গল্পের আদর্শ-পত্নী চাহিলে সহজে মিলিবে না।

যাহা হউক, সুরমার হৃদয় অভিমান-অহঙ্কারে পূর্ণ হইলেও, সুরমা আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসবতী, আত্মনির্ভর-শীলা হইলেও, সে যে শুধু অমরের মনোভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে, আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য, চারু ও অমরের দাম্পত্য-জীবনের সুখস্বস্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য, তাহাদিগের সঙ্গত্যাগ করিল, তাহা নহে। ভিতরে-ভিতরে নারীর স্বাভাবিক পতিপ্রীতি তাহার অভি-মান-অহঙ্কারের মূলক্ষয় করিতেছিল। সে মানিতে না চাহিলেও, আমল না দিলেও, আমরা সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারি যে, প্রথম খণ্ডেই এই দ্বন্দ্বের আরম্ভ হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছে। এই

(৭) তাহার পত্নীভাবের বিকাশে বিলম্ব আছে। মাতৃভাব ইহার পূর্ব্বেই বিকশিত হইল। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়মের বিপরীত। শকুন্তলার যে কুমারী-অবস্থাতেই মৃগশিশুর উপর অপত্য-স্নেহ জন্মিয়াছিল।

(৮) তিনজনেই কায়স্থকন্যা, শুধু সেই সুবাদে নহে। রমেশচন্দ্র সুধাকে দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীর বৃত্তান্ত পড়াইয়াছেন। এই গ্রন্থকর্ত্রী সুরমাকে দিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়াইয়াছেন। উভয়ত্রই ইঙ্গিতটুকু প্রণিধানযোগ্য।

দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে সুরমার নারী-প্রকৃতির জয়—গ্রন্থের সর্ব্বোত্তম সামগ্রী (৯)। ('নারীর দর্প, তেজ, অভিমান কিছু নেই,—আছে কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব।')

সুরমা যতদিন পারিল, এই প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যুঝিল; অমর-চারু-অতুলকে দূরে রাখিল, চারুর পত্রের উত্তর দেওয়া বন্ধ করিল; চারু যাচিয়া আসিলে, অতুলের স্নেহে বিভোর হইয়াও তাহাদের সহিত পতিগৃহে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃতা হইল; কাশীতে ঘটনাচক্রে দেখা হইলে, তাহাদিগকে, বিশেষতঃ অমরকে, যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—এত দৃঢ়তা সতর্কতা, আত্মদমনচেষ্টা, সবই বিফল হইল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বামীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া তাহার সব ওলটপালট হইয়া গেল। স্বামীকে আর-একবার দেখিবার প্রলোভন সে বহু চেষ্টায় জয় করিল বটে, কিন্তু এই অবিশ্রান্ত আত্মযুদ্ধে ক্রমে তাহার তেজ, অহঙ্কার, আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মনির্ভর, শিথিলমূল হইল; ক্রমে সে বালিকার মত আত্ম-শক্তিতে অবিশ্বাসিনী, আত্মদমনে অসমর্থা হইল। পাষাণ গলিল, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' উপস্থিত হইল। শেষ দৃশ্যে অমরের নিকট তাহার আত্মসমর্পণ টেনিসনের মনোরম কাব্যের নায়িকার আত্মসমর্পণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় 'Ask me no more ..for at a touch I yield.' উভয়ত্রই প্রকৃতির প্রতিশোধ, নারী-প্রকৃতির জয়। সুরমার শেষ বাক্য—'আমায় কোথা যেতে বল, আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না'—এই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের (agonising cry) করুণরস (Pathos) অবর্ণনীয়। (১০)

একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইংরেজী সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবে আমাদের মধ্যে ব্যক্তিতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিতেছে; তাই আমাদের সাহিত্যে সূর্য্যমুখী-ভ্রমর সুরমার উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু আশার কথা, তথাপি হিন্দু-সাহিত্যের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইতেছে, হিন্দুপত্নীর নারীত্ব, পত্নীত্ব জয়লাভ করিতেছে, শেষ রক্ষা হইতেছে। দেবেন ঠিকই বলিয়াছে:—'এ কি জলের দাগ? এ যে ঈশ্বরদত্ত বন্ধন।" আর একজন হিন্দুমহিলাও আর একভাবে তাঁহার 'মন্ত্রশক্তি'তে এই কথাই বুঝাইয়াছেন, এই শিব-সুন্দর-সত্যই প্রচার করিয়াছেন। উভয়েই প্রকৃত হিন্দুনারীর ন্যায় এই ভাবে এই পবিত্র আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দীর্ঘ-কাল সাহিত্যসেবা করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

চারু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নায়িকা সুরমার চরিত্রের ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন ও মনোভাব-বিশ্লেষণ গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। কিন্তু গ্রন্থে ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি উজ্জ্বল চিত্র আছে। সুরমার সপত্নী (প্রতিনায়িকা) চারুর চরিত্র-চিত্রণ অতি মনোহর হইয়াছে। চারুও সুরমার মত সুরূপা, পরন্তু 'মেয়েটির রূপের চেয়েও গুণ এত বেশী, এত নরম, সরল স্বভাব' যে তাহাকে 'দেখিলেই মায়া হয়'। সুরমা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী, আত্মনির্ভরক্ষমা, চারু 'সাংসারিক বুদ্ধিলেশমাত্র-হীনা' এবং পরের উপর নিতান্ত নির্ভরশীলা। (১১) তাহার সরলতা, মধুরতা, স্নেহশীলতা কমলমণি সুভাষিণীর মতই সুন্দর, কিন্তু তাহাদিগের ঝাঁঝ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কৌতুক-প্রিয়তা তাহার প্রকৃতিতে নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে হিসাবে এই প্রকৃতিই আমাদের ভাল লাগে।

১২ বৎসরের মেয়ে একেবারে 'অমর'ময়-জীবিতা হইয়া পড়িল, অথচ সে অকালপক্ব জ্যেঠা মেয়ে নহে,—এইটুকু কেমন কেমন লাগে বটে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাধারাণী ও শৈবলিনীর বেলায় ইহার নজির রাখিয়া গিয়াছেন। আর

(৯) কেহ কেহ সুরমার তীব্র অনুভূতি ও সূক্ষ্ম আত্ম বিশ্লেষণ আমাদের সমাজে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিবেন। কিন্তু একজন বাঙ্গালী নারী যদি ইহার কল্পনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আর একজন বাঙ্গালী নারী ইহা প্রকৃত অনুভব করিতে বা না পারিবেন কেন?

(১০) ইউরোপীয় সমালোচনাশাস্ত্রে এই শেষ-পরিণামের নাম catastrophe বা denouement বা Solution (সমস্যাপূরণ)।

(১১) চারুর যেরূপ মধুর প্রকৃতি, তাহাতে তাহাকে 'চারুশীলা' বলা বেশ চলিত। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী নামের ইঙ্গিতে বুঝাইতে চাহেন, সে লতার মত আশ্রয়তরুর উপর নিতান্ত নির্ভরশীলা। তাই তাহার নাম 'চারুলতা'। 'নিরাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।' সুরমা যাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাকেই মুগ্ধ করিয়াছে, সে সকলেরই মনোরমা, তাই তাহার নাম 'সুরমা'। সুরমার উমার উপর বাৎসল্য যেন মেনকারাণীর উমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই তাহার নাম 'উমা'। আর মন্দাকিনীর পতিপ্রেম মন্দাকিনীধারার ন্যায়ই নির্ম্মল ও পবিত্র।

এ ক্ষেত্রে তাহার মাতার সহিত দেবেনের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে সে অমরই যে তাহার ভাবী স্বামী ইহা ভাবিতে, বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাহার সরল হৃদয়ে এই ভাবটি গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। আর জগতে চারু কেবল জননীকেই জানিত; সুতরাং যখন তিনি কন্যাকে অমরের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, তখন হইতে চারু জানিত যে, অমরই তাহার স্বামী, অন্য স্বামী সে কল্পনা করিতেও পারিত না। গোঁড়াদিগকে ইহাও বলা যায় যে, সে অমরের বাগ্‌দত্তা, বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী বা পৌরাণিক সাবিত্রীর ন্যায় মনে-মনে পতিকে বরণ করিয়াছিল।

চারু এমন সরলা ও স্নেহময়ী যে সে সুরমাকে দেখিবামাত্র ভালবাসিল; সুরমার সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের উত্তাপ সে অনুভব করিল না; সপত্নীর কার্য্য দেখিয়া তাহার হৃদয় সপত্নীবিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সপত্নীর প্রতি শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ও ভালবাসায় ভরপূর হইল। সে সপত্নীর জন্য (প্রফুল্লর মত) স্বামীর সহিত ঝগড়া করিত, সপত্নী নিজের অধিকার লয় না বলিয়া আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করিত। দ্বিতীয়খণ্ডে তাহার চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। ক্রমে ছেলেমানুষী কাটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিবিবেচনা হইলে, প্রকৃতিও কতকটা গম্ভীর হইল; কিন্তু তাহাতে তাহার চরিত্রের এ সমস্ত গুণের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যত্যয় হয় নাই। সে সুরমার (আপাতদৃষ্টিতে) নির্ম্মম ব্যবহারে একদিনের তরেও তাহাকে ভালবাসিতে ভুলে নাই। সুরমা দূরে গেলে চারু যাচিয়া চিঠি লিখিয়াছে, সুরমার উত্তর না পাইলেও ক্ষান্ত হয় নাই; যাচিয়া সুরমার সহিত দেখা করিয়াছে, পতিগৃহে ফিরিবার জন্য, নিজের ন্যায্য অধিকার লইবার জন্য, তাহাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছে। শেষ দৃশ্যে (সাগরের ন্যায়) জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে স্বামি-সম্ভাষণে পাঠাইয়া সে যেন কৃতার্থ হইল।

ফলতঃ, আমরা সুরমাকে শ্রদ্ধা করি, তাহার বেদনায় সমবেদনা অনুভব করি, তাহার অন্তরের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হই,—কিন্তু সত্য-সত্যই এমন পত্নী লইয়া ঘর করিতে গেলে ত সশঙ্ক থাকিতে হয়—বিশেষতঃ আমাদের কুলীনের ঘরে! (অথচ এ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবারও যো নাই—অনেকখানি বিষয় হাতছাড়া হয় যে!) চারুই ঠিক ঘরোয়া ধরণের স্ত্রী—'চারুশীলা, পতিব্রতা, মধুরতাময়'।

অন্যান্য নারীচরিত্র

গ্রন্থের আর দুইটি স্ত্রী-চরিত্রও (স্নেহপ্রতিমা উমা ও মন্দা) সুন্দর, মধুর। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। বিস্তৃত সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ১ম পরিচ্ছেদে চারুর মাতার চিত্র ('মুখে যেন একটা মাতৃভাব মাখানো') ক্ষুদ্র হইলেও মনোরম। নায়িকা সুরমার মাতৃভাব সমস্ত পুস্তক যুড়িয়া আছে। চারুর মাতার চিত্র যেন ইহারই (prelude) আভাস।

অমর

এইবার পুরুষ চরিত্রগুলির আলোচনা করিব। সর্ব্বাগ্রে নায়ক অমর উল্লেখযোগ্য (১২)। অমর সরলহৃদয়, স্নেহময়, প্রণয়প্রবণ, অমায়িক যুবক। তাহার বন্ধুপ্রীতি হইতে তাহার হৃদয়ের সরসতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর চারুর প্রতি ক্রমশঃ বিকশিত প্রণয়ও এই সরসতার পরিচায়ক। ঘটনাচক্রে পিতার অবাধ্য হইতে হইলেও, তাহার পিতার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা গভীর ও অকৃত্রিম। চারুকে বিবাহ করা স্থির করিতে তাহার মনে কিরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, পিতার স্নেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইল বলিয়া তাহার হৃদয়ে কিরূপ বেদনা জাগিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা 'সংক্ষিপ্তসার'-প্রদানকালে করিয়াছি। পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইলে তাহার সকল অভিমান, সকল দ্বিধা, অপমানের ভয়, লজ্জা, সমস্ত তিরোহিত হইল। শৈশবে-মাতৃহীন পুত্রের, পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জয়ী হইল। 'বাবা ডেকেছেন' এই আকুল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের কাছে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন তারিণী দাদার সকল আপত্তি ভাসিয়া গেল।

অমরের চরিত্রের মজ্জাগত দোষ—একটু দুর্ব্বলতা, একটু (lethargy of the will) ইচ্ছাশক্তির জড়তা, একটু আত্মসুখপরায়ণতা, একটু আরামপ্রিয়তা। তথাপি অমরের চরিত্র রোমোলার দ্বিপত্নীক স্বামী Tito Melema

---

(১২) নায়িকার এত পরে নায়কের কথা তুলিলাম বলিয়া কেহ কেহ বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু চারুর ও উমা-মন্দাকিনীর পরোক্ষপ্রভাবে যখন সুরমার হৃদয় অমরের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন তাহাদের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া অমরের প্রসঙ্গের অবতারণা করাই প্রশস্ত।

বা 'সাইলাস মার্ণারের' অনেকটা [illegible] ...চলে, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই')। 'কিন্তু অদৃষ্ট বিরোধী হইয়া আবার সেই আবর্ত্তের মধ্যেই তাহাকে টানিয়া ফেলিল।' তথায় অমর পীড়িত হইলে চারুর অনুরোধে সুরমা আসিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। 'জ্বরের ঘোরে আত্মদমনে অক্ষম অমর তাহাকে বলিল, 'আমার রোগের পাশেও সেই তুমি! সেই তেমনি করে যত্ন দিয়ে, সেবা দিয়ে, প্রাণপাত করে সুস্থ করবে? কিন্তু, কেন?·· যাকে কিছু দিই নি... আমার আর ঋণ বাড়িও না।' 'প্রলাপ অথচ প্রলাপ নয়!' আরোগ্যলাভ করিয়াও অমর মনের বেগ সংবরণ করিতে পারিল না। 'অমর কি একদিনে এই আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছে? দণ্ডে-দণ্ডে, দিনে-দিনে, মাসে-মাসে, বৎসরে-বৎসরে, অহরহঃ এই বিচিত্র স্নেহময়, প্রেমময়, রহস্যময় হৃদয়ের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, অস্থিতে-অস্থিতে, মজ্জায়-মজ্জায় তাহার উদার হৃদয়ের মহিমা অনুভব করিয়া, তবেই সে এমন জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাই এইটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। চারুর প্রতি তাহার স্নিগ্ধ প্রেমের সহিত, সেই কল্যাণময়ী স্নেহধারার সহিত, এ দুর্দ্দান্ত, প্রচণ্ড, আবেগময় বক্ষোরক্তশোষণকারী জ্বালাময় প্রেমের কোন সংস্রব ছিল না।' শেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া, অমর ও চারুর মঙ্গলের জন্য (এবং আত্মরক্ষার্থ) সুরমা অমরের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া, পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। প্রথম খণ্ডের শেষেই এই ব্যাপার ঘটিল।

সুরমা-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অমর মর্ম্মাহত হইল। সুরমা ভাবিয়াছিল, সে দূরে থাকিলে 'অমর ক্রমে তাহাকে ভুলিবে। কিন্তু সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডে অমরের সে বেদনা, সে অশান্তি যায় নাই, তাহার আভাস পাওয়া যায়। তবে এই খণ্ডে অমরকে যথাসম্ভব backgroundএ রাখা হইয়াছে।

অমরের এই দুর্ব্বলতা কি নিন্দার্হ? ইহার জন্য অমর-সুরমা চারু কেহই অপরাধী নহে। গ্রন্থকর্ত্রীর কথায় বলি:—'স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে পুষ্পে মধু-সঞ্চারের ন্যায় এই মধুসম্বন্ধের যে সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অপরাধী।' আর, 'ইহা ঈশ্বরের প্রতিশোধ, মানবের ক্ষমতার বহির্ভূত।'

কেহ-কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত নায়ক গুরুণ নায়িকার উপযুক্ত নহে। কিন্তু এ আপত্তি

[Left column]

[illegible] অনেক উচ্চ।

চারুকে বিবাহ করার ব্যাপারে অমরের হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, বিবাহিত জীবনে তাহা অপেক্ষাও কঠিন দ্বন্দ্ব ক্রমে তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের ফলে ধীরে-ধীরে সুরমার প্রতি তাহার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অমরের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সুরমার হৃদয়ের দ্বন্দ্বের ন্যায় পাঠকের তত চিত্তাকর্ষক না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতেও গ্রন্থকর্ত্রী যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। বন্ধু দেবেনের কাছে—নিজের জীবনটা 'রোম্যান্টিক নভেল, ট্রাজেডি বা কমেডি' নহে, 'একখানা ফার্স বই আর কিছুই নয়'—বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, সত্য-সত্যই তাহার সুরমার প্রতি অন্যায় 'অন্তরাকাশকে একটা অনুশোচনার সূক্ষ্ম অথচ সুদীর্ঘ রেখাপাতে ভেদ করিয়া' দিয়া ট্রাজেডিতে পরিণত করিত—যদি সুরমা শেষরক্ষা না করিত।

চারুকে বিবাহ করিবার সময় অমরের মনে সুরমার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং উক্ত বিবাহ-প্রস্তাবে সুরমার রূঢ় ব্যবহারে তাহার মনে একটু ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। পরে পিতার কঠোর ব্যবহারের মূলে সুরমা, এই বুঝিয়া সুরমার প্রতি অমরের 'একটা বিদ্বেষভাব মনের মধ্যে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল।' কিন্তু সুরমার সহিত একত্র বাসকালে তাহার চারুর প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে, ক্রমে নিজের প্রতিও আত্মীয়ার ন্যায় ব্যবহারে, তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা, কার্য্যকুশলতা, ক্ষমতা ও স্নেহমমতার পরিচয়ে, অমরের হৃদয় সুরমার প্রতি 'ভক্তি, (১৩) শ্রদ্ধা, পূজা, আগ্রহে' এবং তাহার প্রতি অবিচার করার জন্য দারুণ আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায় পরিপূর্ণ হইল। পরন্তু, এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এইখানেই থামিল না। ক্রমে সে বুঝিল, সুরমার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের উপযোগী মনোভাব তাহাকে অতিক্রম করিয়া বসিতেছে। সুরমার এত কাছে থাকিলে পাছে শেষে চারুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে হয়, এই আশঙ্কায় অমর শুধু চারুকে লইয়া, চারুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় একান্তভাবে মিশিবার জন্য, অন্যত্র গেল। ('চল

---

(১৩) [illegible] হয় বলিয়া 'ভক্তি' লিখিলে আমরা ইতস্ততঃ করিতাম, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী সে 'ইতস্ততঃ'র অবসর রাখেন নাই!

"রোহিণী কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

শিল্পী শ্রীভবানীচরণ লাহা। কৃষ্ণকান্তের উইল — ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Emerald Ptg. Works.

বিখ্যাত আখ্যায়িকাকারের [illegible] যেহেতু [illegible] পীয়ারের অনেক নায়ক [illegible] পারেন, ব্রুটাসের 'O ye gods, render me worthy of this noble wife' বলিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না তিনি সর্ব্বাংশে পত্নীর উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু Bassanio, Posthumus প্রভৃতি বহু নায়কের দেবতাদিগের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাস্তবিক, আমরা পুরুষজাতি অহঙ্কার করিয়া যাহাই বলি না কেন, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগের উপযুক্ত স্বামী পুরুষের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। বহু স্থলেই ব্রুটসের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আর একটি কথা। টেনিসনের মনোরম কাব্য 'প্রিন্‌সেসে'র মত এখানেও এইরূপ নায়কের প্রয়োজন। কেন না উভয়ত্রই, পুরুষের গুণগ্রামের আকর্ষণী শক্তিতে নারী-হৃদয় জিত হয় নাই,—প্রকৃতির অমোঘ প্রভাবে হইয়াছে, এই তত্ত্বপ্রকটনই কাব্যের উদ্দেশ্য। নায়ককে একেবারে আদর্শ-পুরুষ করিলে, কাব্যের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না।

অন্যান্য পুরুষ-চরিত্র

অমরের পিতার চরিত্র-দৃঢ়তা ও স্নেহশীলতার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে গোবিন্দলালের জ্যেঠা মহাশয় কৃষ্ণকান্ত রায়ের চরিত্র অপেক্ষা না হইলেও প্রভাত বাবুর 'রমাসুন্দরী'তে নায়ক নবগোপালের পিতার, এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্টচক্রে' নায়ক যতীশচন্দ্রের পিতার, চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে। অমরের পিতার কঠোরতার মূলে কতকটা স্নেহের অভিমান এবং কতকটা পুত্রের প্রকৃত মঙ্গলকামনা। তাঁহার কঠোরতার অন্তরালে গভীর স্নেহ বর্ত্তমান। যাহা হউক, শেষে স্নেহের সম্পূর্ণ [illegible] কঠোর সেই [illegible] করুণ, [illegible] করিলেন না—পুত্রকে পিতা [illegible] সম্পত্তি উইল করিলেন না, পুত্রকে [illegible] অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন না। (১৪)

সুরমার বৃদ্ধ পিতাও স্নেহশীল, কিন্তু অমরের পিতার সহিত তাঁহার বেশ প্রভেদ আছে। তিনি নিরীহপ্রকৃতি, নির্ভরশীল। আদর্শ দেওয়ান পিতৃপ্রতিম, স্নেহশীল রামাচরণ রায়, বিষয়ী (worldly-wise man) 'অতিশয় প্রাণভারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও মজবুত লোক' তারিণী [illegible] বেঙ্গলের সন্দেশ নমুনা দেবেন, প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রিত প্রকাশের [illegible] সম্বন্ধে ঐ খণ্ডের আলোচনা-কালে যে ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করি। শিশু অতুলের 'অব্যক্ত-বালভাষিতম্' বড় মধুর। সুরমার হৃদয়ের উপর তাহার প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শেষ কথা

এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ সমালোচনা শেষ হইল। যথাশক্তি ও যথাজ্ঞান আখ্যায়িকাখানির গুণ-বিচার করিলাম। কিন্তু কাব্যসৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে অপরকে বুঝান যায় না; সৌন্দর্য্য-বোধ সকলেরই নিজের-নিজের অনুভূতি-সাপেক্ষ। সমালোচক সেই অনুভূতির সহায়তা করিতে পারেন—ইহার অধিক শক্তি তাঁহার নাই।

---

(১৪) পিতার অমতে পুত্রের বিবাহ জন্য পিতার বিষম ক্রোধ ও পরে 'স্নেহের জয়' ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি নাটকে চিত্রিত হইয়াছে। টেনিসনের 'ডোরায়' স্নেহের জয় বহু বিলম্বে হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে দুই চারিটি ছোট গল্পেও এই চিত্র দেখিয়াছি স্মরণ হয়।

যদু মাষ্টার

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

সে অনেকদিনের কথা। বাড়িশুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে-ছিলাম ; আমাদের ভাটপাড়ার চটকলের ডাক্তার কুইনাইন ও আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে বলিলেন যে, বায়ুপরিবর্ত্তন না করিলে রোগ আরাম হইবে না। শিয়ালদার ট্রাফিক আফিসে কর্ম্ম করি। আমাদের মুনিব পি, ডি, বারক্লে সাহেবের সুপারিসে, এবং ম্যানেজার আফিসের বাবুদের খোসামোদ করিয়া, ফরেণ রেলের দুষ্প্রাপ্য পাস্ একখানি সংগ্রহ করিয়া দুই মাসের ছুটিতে কাশী যাত্রা করিলাম। দুইটি শিশুসন্তানসহ স্ত্রীও সঙ্গে চলিলেন।

তাহার পূর্ব্বে আমার পশ্চিমের দৌড় হুগলি পর্য্যন্ত ছিল ; আমার স্ত্রীও তাঁহার জন্মস্থান নিমতা ও আমাদের ভাটপাড়া গ্রাম ছাড়া অন্য কোন দেশ দেখেন নাই ; কেবল জুবিলির সময়, আলো ও আতসবাজি দেখিতে দুই দিনের জন্য একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের নিকট কাশী প্রকৃতই ভূস্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। কাশীর ছোটবড় সকল ব্যাপারই—নূতন প্রকারের বাড়ীঘর ও লোকজন, নানা ধরণের সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম, দেবালয়ে ব্রহ্মচারিগণের পাঠাভ্যাস, বাবা বিশ্বনাথের রোমাঞ্চকারী আরতি, অসংখ্য ছোটবড় পীঠস্থান, গঙ্গাতীরে প্রকাণ্ড পাথরের প্রাসাদ ও ঘাটের শ্রেণী, সারি-সারি দোকানে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, নির্ব্বিবাদী মহাকায় ষাঁড়ের দল, দুর্গাবাড়ীতে বানরের আড্ডা, সঙ্কীর্ণ, আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি—সমস্তই আমাদের নিকট নূতন, অদ্ভুত ও মনোহর বোধ হইত। আর নানাবিধ তরিতরকারী, ফলমূল, মাছ ও মিষ্টান্নাদি আমাদের দেশের অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও সস্তা—তাহা আমাদের নিকট নিত্যই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের জ্বর কোথায় পলাইল এবং দেখিতে-দেখিতে দেহে যেন নব স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তির জোয়ার আসিল।

কেদারঘাটের নিকটে বাসাভাড়া করিয়াছিলাম। দোতলার উপর ক্ষুদ্র দুইটী ঘর ও তাহার কোলে রাস্তার উপর ছোট একটি বারান্দা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে বাসায় ফিরিলে, ছেলেমেয়ে দুটিকে ঘুম পাড়াইয়া এই বারান্দায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতাম, এবং প্রায়ই জল্পনা করিতাম যে, এবার হইতে সুবিধা পাইলেই কাশীতে আসিতে হইবে।

একদিন দুপুরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া গা মুছিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, কিছুদূরে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া কটমট করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, লোকটির চেহারা অত্যন্ত শ্রীহীন, কাপড়-চোপড় ময়লা ও ছেঁড়া, চুল ও দাড়িগোঁফ দীর্ঘ ও রুক্ষ, এবং শরীর শীর্ণ। চোখের শাঁস বাহির করিয়া সেইরূপ চাহনি, পূর্ব্বে কোথা দেখিয়াছি, এই কথা কাপড় নিংড়াইতে-নিংড়াইতে ভাবিতেছি, এমন সময় লোকটি দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া অস্বাভাবিক মোটা গলায় বলিল, "পাঁচু যে ! চিন্‌তে পারছ না ? আমি তারক।"

তারকই তো বটে। হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে সে আমার সহপাঠী ছিল। সে একটু উত্তেজিত হইলে, চারুপাঠের ছবির সিন্ধুঘোটকের চক্ষুর ন্যায় তাহার চক্ষু বিকট দেখাইত বলিয়া, আমরা আড়ালে তাহাকে সিন্ধুঘোটক বলিতাম। স্কুলে তারক স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিল। ইদানীং মোহন-বাগানের কীর্ত্তি যেমন ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি সে সময়ে 'জিতেন বাঁড়ুয্যে' বিলাতে সাহেব-বালকদিগকে কিরূপ উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন, সেই কাহিনী এক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা ও অনুকরণের বিষয় ছিল। হুগলী স্কুলের সেই শ্রেণীর ছাত্রদের নেতা ছিল তারক। তারক ও তাহাদের দলের অনেকের বাড়ী ছিল হুগলীর পরপারে হালিসহর-বলদে-

ঘাটায়। হালিসহরে এণ্ট্রান্স স্কুল থাকিলেও, যে সকল ছাত্র দুই-চারিবার ফেল হইত, অথবা প্রোমোশন না পাইত, তাহাদের অভিভাবকেরা তাহাদের গ্রামস্থ স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গঙ্গার অপরপারে হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন। তাহারা দুইবেলা নৌকায় স্কুলে যাতায়াত করিত। তারকের দল যখন নিজেরা নৌকা বাহিয়া, গাঢ় তামাকের ধূম উড়াইয়া, হর্‌রা করিতে-করিতে স্কুলে যাইত, তখন, ছাত্রের দল স্কুলে যাইতেছে কি ইয়ার বাবুদের দল স্ফূর্ত্তি করিতে দ্বাদশগোপালে যাইতেছে বুঝা যাইত না। তাহাদের আচরণ ও বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের "বলদেঘাটার বলদ" নামে অভিহিত করিতেন। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি বলদেঘাটানিবাসী না হইলেও, সেই বলদ সম্প্রদায়ের একজন ছিলাম।

সে সময়ে আমরা নিতান্ত বালক ছিলাম না। আমি বুঝিতে পারিতাম যে, দলের অন্য সকলের দুষ্টামিটা খেলার সামিল; কিন্তু তারকের প্রকৃতিই যেন হিংস্র ও দুষ্ট ছিল। দেখিতাম, সে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বা দুর্ব্বল বালকদিগের নির্য্যাতন করিয়া আনন্দ বোধ করিত; এবং কেহ তাহার প্রতি সামান্য অপরাধ করিলেও, সে তাহা অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়া, প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিত। নিজের গুণের তো সীমা ছিল না, অথচ মুরুব্বিয়ানা করিয়া নীচের ক্লাশের ছাত্রদের দোষ সংশোধনের ছুতায় শাসন করা, তারকের প্রিয় কর্ম্ম ছিল। স্কুলের ছুটির পরে সে গেটের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং গৃহাভিমুখী কোন কোন ছাত্রকে ডাকিয়া "তুই আজ ক্লাসে last ছিলি কেন?" "বাঁদর, এত ছুটে চলেছিস কিসের জন্য" "রাস্কেল, কাল যে বড় ডাকলে পালিয়ে গেছলি?" ইত্যাদি অভিযোগে কাণমলা, চপেটাঘাত, গাঁট্টা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিত। যদি কোন বালক পরে মাষ্টারদের নিকট নালিশ করিত, অথবা যদি কোন বয়স্ক বালক কোন নির্য্যাতিত বালককে প্রহার হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলেই অনর্থ বাধিত; সময়-সময় এই সূত্রে রীতিমত দাঙ্গার সৃষ্টি হইত।

তারক যে কেবল নিজে দুষ্ট ছিল, তাহা নহে; যাহারা শিষ্টশান্ত, স্কুলে যাহারা "ভাল ছেলে" বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদের প্রতি সে জাতক্রোধ ছিল,—সুবিধা পাইলেই তাহাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিত। সঙ্গদোষে আমার যথেষ্ট অধঃপতন হইলেও, তারকের এই প্রবৃত্তিটি এবং দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, আমার আদৌ ভাল লাগিত না; অথচ তাহার প্রতিবাদ করিতেও সাহস হইত না, কারণ কেহ বাধা দিলে তাহার গোঁ আরও বাড়িয়া যাইত। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আমি এক-একবার ভাবিতাম যে, তাহার পাগলামির ছিট আছে; কিন্তু অন্যদিকে তাহার টন্‌টনে বুদ্ধি দেখিয়া, আবার মনে হইত, হয় ত গাঁজা খাইয়া তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। সে যে গাঁজা খাইত, সে কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতাম।

পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, আমি স্কুল ছাড়িয়া চাকরির-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সে অবধি আর তারকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম যে, তাহার পরে আরও তিনচারি বৎসর সে স্কুলে ছিল; তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। সুতরাং তারকের অভিভাবকেরা তাহাকে যতদিন সম্ভব স্কুলে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তবে সে যে পাস্‌ টাস্‌ কিছু করে নাই, করিতে চেষ্টাও করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদিন পরে দেখা হওয়ায়, আমি একনিঃশ্বাসে তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম। সে কাশীতে কোথায় থাকে, কি কাজকর্ম্ম করে, সন্তানাদি কি, পরিবারবর্গ কোথায়, ইত্যাদি। তারক সে সকল কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আমাকে ছুটি খেতে দেবে, পাঁচু?"

সে যদি বলিত, "ওহে, আজ তোমাদের বাসায় খাব"—তাহা হইলে বোধ হয় আমার কিছু মনে হইত না। কিন্তু তাহার কথার ধরণে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে তাহার কদর্য্য বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হইল; বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহার অত্যন্ত দৈন্যদশা। এ অবস্থায় নানা অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া হয় ত, তাহার মনে ব্যথা দিয়াছি ভাবিয়া, স্ফূর্ত্তির ভাণ করিয়া বলিলাম, "তুমি খাবে, সে তো আমার সৌভাগ্য; আজ 'বহুৎ দানাদার মিলা মুসাফের'।

তারক বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সহিত চলিল। ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কি করিয়া ইহার এরূপ দুরবস্থা হইল, এ কথা বারবার আমার মনে হইলেও, সে সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তারকও আমার সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না; এমন কি, বাসায় পৌঁছিয়া আমার পুত্রকন্যা দুইটিকে একবার কাছে ডাকিলও না। আরও দেখিলাম, সে যেন সর্ব্বদাই অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

খাইতে বসিয়া, তারকের আহারে রুচি দেখিয়া বুঝিলাম, বেচারি বিলক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত ছিল। আহারের শেষাশেষি আমার স্ত্রী অবগুণ্ঠিতা হইয়া দরজার বাহির হইতে হাত বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে দুধ ও মিষ্টান্ন রাখিয়া গেলেন। তারক একমনে খাইতেছিল,—বাটি রাখার শব্দে দরজার দিকে দেখিয়াই হঠাৎ খাড়া হইয়া বসিল। তাহার হাত মুখে উঠিতে অর্দ্ধ-পথে থামিয়া গেল; বিবর্ণমুখে আমার দিকে ফিরিয়া চাপা-গলায় কহিল "কেও? রাঙ্গাপাড় সাড়ী পরে ও কে?"

আমি আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কে আবার? আমার স্ত্রী, আর কে?"

"ওঃ ঠিক তো" বলিয়া যেন পরম আশ্বস্ত হইয়া তারক আবার আহারে মনঃসংযোগ করিল। আমি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়া, আবার নিবৃত্ত হইলাম; ভাবিলাম, পরে সুবিধামত জিজ্ঞাসা করিব।

কিছুক্ষণ হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; আমরা ভোজনান্তে অন্য ঘরটিতে যাইয়া বসিতেই, সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারক "আঃ! শরীর স্নিগ্ধ হল, একটু ঘুমান যাক" বলিয়া একখানা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িলে, আমি তামাক সাজিয়া আনিতে গেলাম। কাশীতে-কেনা জারমান সিলভারের গড়গড়াটি মাজিয়া, জল ফিরাইয়া, তামাক তৈয়ারি করিয়া আনিয়া দেখি, তারক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন একখানা আসন পাতিয়া বসিয়া, তামাক খাইতে-খাইতে আমি হিসাব লিখিতে লাগিলাম। ইতোমধ্যে আমার শিশু পুত্র ও কন্যাটি সেই ঘরসংলগ্ন বারান্দায় আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি এবং নীচের রাস্তায় পথিকদের দুর্দ্দশা দেখিতে-দেখিতে তারস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"আইকম্ বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ী
রেল্ কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।"

হঠাৎ "অ্যাঁ, অ্যাঁ, থাম্, থাম্, ওরে থাম্" বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া তারক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং চক্ষু পাকাইয়া বিকট দৃষ্টিতে ভোঁদা ও নেড়ির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার হঠাৎ হুঙ্কারে আমার হাত হইতে গড়গড়ার নলটা পড়িয়া গেল, ভোঁদা হতবুদ্ধি হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; এবং মেন্তি ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি অবাক হইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি? অমন করে উঠ্‌লে যে?" কিন্তু তাহার হুঁস ছিল না; সে একদৃষ্টে বারান্দার দিকে তাকাইয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল। এদিকে শিশু দুইটি তারকের দিকে সভয়ে তাকাইতে-তাকাইতে, যতদূর সম্ভব তাহাকে দূরে রাখিয়া, এক-পা এক-পা করিয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া, সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি তারকের গা ঠেলিয়া আবার দুই-একবার ডাকিতে, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিলাম, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও দৃষ্টি উদাস। তখন তাড়াতাড়ি একঘটি জল আনিয়া তাহার মাথায় ও মুখে সেচন করিলাম; এবং পাখা দিয়া বাতাস করিতে-করিতে ভাবিতে লাগিলাম, "ভাল এক আপদ জুটেছে দেখ্‌ছি।" কপাটের অন্তরাল হইতে চাবির শব্দে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া স্ত্রী উদ্বিগ্নমুখে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" এবং আমি মাথা নাড়িয়া 'কিছু জানি না, বলায় তিনি হস্ত সঞ্চালন করিয়া তারককে বিদায় দিতে বলিলেন। আমি মনে মনে হাসিলাম—তাঁহার নীড়টিতে ক্ষণেকের জন্য শান্তিভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তিনি এই অসুস্থ অবস্থাতেই তারককে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রস্তত। করুণা ও স্নেহমমতার বশে নারী সর্ব্বদাই আত্ম-বিসর্জ্জন করে বটে, কিন্তু যাহার দ্বারা প্রিয়জনের তিলমাত্র অনিষ্ট বা অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, সে হাজার অনুকম্পার পাত্র হইলেও তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে, স্নেহের পাত্রকে নারী হৃদয় উজাড় করিয়া এত দিয়া ফেলে যে, অপরের জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কিছুক্ষণ বাতাস করার পর, তারক আস্তে-আস্তে বলিল, "থাক, আর হাওয়া করতে হবে না।" তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিয়া, তাহার অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিতে চাহিলাম। কিন্তু সে সংক্ষেপে "থাক" বলিয়া চুপ করিয়া

রহিল। আমি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, সে দুই চারিবার মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, অবশেষে কাতর-ভাবে বলিল, "আমার বুকের ভিতর কেমন করছে, এক ছিলিম খাওয়াতে পার?" আমি গড়গড়ার নল আগাইয়া দিতে, সে তাহা না লইয়া এক হাতের মুঠার মধ্যে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলা ধরিয়া গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গী দেখাইল। তাহার ইঙ্গিত বুঝিয়া আমি প্রথমে বড়ই রাগিয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু তারক বড়ই কাকুতি-মিনতি করিতে নরম হইয়া ভাবিলাম যে, আমি বারণ করিলেই সে কিছু আর পুরাতন নেশা ছাড়িয়া দিবে না; তাহা ছাড়া, গাঁজা খাইলে হয় তো তাহার মন খুলিয়া যাইবে,—তখন সকল কথা শুনিতে পাইব। ইহা ভাবিয়া আমাদের গলির মোড়ে, গণপতি মিশ্রের কুস্তির আড্ডা হইতে, সাধুসেবার নাম করিয়া, দুই টিপ গাঁজা ও একটি কলিকা আনিয়া তারককে দিয়া বলিলাম, "বারান্দায় গিয়ে খেয়ে এস, নইলে দুর্গন্ধে বাড়ীতে টিক্‌তে পারব না।"

আপনার মনে অল্প অল্প হাসিতে-হাসিতে, যখন সে বারান্দা হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, শূন্য কলিকাটি সন্তর্পণে একধারে রাখিয়া বসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তাহার সেই ভয়াকুল অস্থির ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। কর্কশ নিরানন্দ হাসি হাসিয়া সে আপনা হইতেই বলিল "ওঃ, হঠাৎ ভারি অসামাল হয়ে গিয়েছিলাম।" আমি সুবিধা বুঝিয়া ব্যাপারটা কি বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে, সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "আরে ভাই, সে অনেক কথা; তা তোমার যখন শোনবার ইচ্ছা হয়েছে তখন বলছি শোন।"

এই বলিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া তারক যাহা অম্লানবদনে বলিয়া গেল, তাহা তাহারই অপকর্ম্মের কাহিনী; কিন্তু সে সকল দুষ্কৃতির জন্য তাহার লজ্জা বা অনুতাপ দেখা গেল না; বরং তাহার বর্ণনার ভঙ্গীতে বেশ বাহাদুরির ভাব প্রকাশ পাইল। আবার, স্থানে-স্থানে হঠাৎ থামিয়া, সে আপনার মনে অল্প-অল্প হাসিতে লাগিল,—যেন সেই কথাটার স্মৃতিতে সে আমোদ উপভোগ করিতেছে। সকল কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না; এবং যাহা বলিল, তাহা কয়েকটি অসংলগ্ন ঘটনা মাত্র। সে সকল ঘটনার উৎপত্তি কোথায় না জানিলে, ব্যাপারটা ভাল বুঝা যাইতেছে না দেখিয়া, আমি তারককে নানা প্রশ্ন করিয়া গোড়ার কথাটা বাহির করিয়া লইলাম, এবং তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলাম। এই গোড়ার কথাটা আমি আমার নিজের ভাষায় বলিব; পরে তারকের বর্ণিত ঘটনাগুলি সে যেমন-ভাবে বলিয়াছিল, ঠিক সেইভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইয়া গেলেও সেই বাদলা দিনের অপরাহ্নে তারক ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষে কর্কশ কণ্ঠে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহা আজও আমার কাণে বাজিতেছে।

* * * *

তারকদের পাড়ার বনিয়াদি মুখোপাধ্যায়-বংশের শেষ বংশধর ধার্ম্মিক মাধবচরণ পারের কড়ি সংগ্রহের চেষ্টায় ঐহিক কড়ি নিঃশেষে ব্যয় করিয়া স্বর্গারোহণ করার পর, তাঁহার একমাত্র কন্যা সৌদামিনী স্বামীর সহিত কলিকাতায় যাইয়া বাস করিতেছিল; এবং মুখোপাধ্যায়দের পুরাতন ভদ্রাসন অনেক দিন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সৌদামিনীর স্বামী সিটি কলেজে মাষ্টারি করিত, এবং কুলীন সন্তান হইলেও, পয়সার অভাবে দায়ে পড়িয়া, সিটি কলেজের একজন ব্রাহ্ম মাষ্টারের বাসার এক অংশ ভাড়া করিয়া, সপরিবারে থাকিত। তাহার পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সুতরাং হঠাৎ অসময়ে তাহার মৃত্যু হইলে, সৌদামিনী গত্যন্তর না দেখিয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আটদশ বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত পিতৃ-ভিটায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং স্বামীর জীবন-বীমার টাকার উপস্বত্বে কোনরকমে সংসার চালাইতে লাগিল।

সৌদামিনী দেখিল, আটদশ বৎসরে গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহার সমবয়স্কাদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা ঘোর সংসারী হইয়া কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন-প্রাচীনারা অন্তর্ধান করিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে সৌদামিনীর অপরিচিতা বধূরা কত সংসারে গৃহিণী হইয়াছে। এই সকল কারণে সে প্রতিবেশীদের নিকট প্রথম-প্রথম বিশেষ সহানুভূতি পাইল না, বরং দুইএকটা নির্দ্দোষ অভ্যাসের জন্য তাহাদের বিরাগভাজন হইল। কলিকাতায় ব্রাহ্মপরিবারের সহিত অনেকদিনের ঘনিষ্টতায় তাঁহাদের কোন কোন বাহ্য চালচলন সৌদামিনীর অভ্যাস হইয়া

গিয়াছিল, তাহাতেই বিপত্তি ঘটিল। দুইদিন না যাইতে-যাইতে, পাড়ার নারীবৈঠকে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকারের সমালোচনা হইতে লাগিল:—"মরণ আর কি, কপাল পুড়েছে, এখনও সেমিজ পরে বাহার দেওয়া হয়!" "হ্যাঁ লো, ব্যাটাছেলেদের মত দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করা কি ঢং লো?" "দেখ্‌লি ভাই, কামিনী ছুঁড়ির ঢলাঢলির কথাটা বলতে 'পরের কথায় দরকার কি দিদি' বলে মুখখানা কি রকম করলে? দেমাকে উলটে আছেন।" "আর মজার কথা শোন্; কাল ঘাটে গিয়ে দেখি ও পাঁচজন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে চান করছে। আমি দু'বার 'যদুর মা' 'যদুর মা' বলে ডাকলুম, যেন শুনতেই পেলে না; যখন ক্যাঁট্‌ক্যাঁট্ করে শুনিয়ে দিলুম, তখন বল্লে কি,—'রাগ কর না পদ্মপিসি, সেখানে আমায় যদুর মা বলে তো কেউ ডাক্‌তো না—সাণ্ডেল বাবুর বৌ আমার নাম ধরেই ডাকতেন...তাই বুঝ্‌তে পারি নি যে তুমি আমায় ডাকছ'; শোন কথা, ওঁকে সোহাগ করে সৌদামিনী বলে ডাকতে হবে—তবে সাড়া দেবেন।"

ব্যাপারটা সৌদামিনীর কর্ণগোচর হইতেই, সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ সতর্ক হইল—যাহাতে কলিকাতার কোন অভ্যাস তাহার চালচলনে প্রকাশ না পায়। সুতরাং তাহার অখ্যাতিটা আর অধিক দূর গড়াইল না; লোষ্ট্রপাত-ক্ষুব্ধ জলাশয়ের চঞ্চলতার ন্যায়, তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল। কিন্তু এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া পল্লীবালকদের হস্তে তাহার পুত্রের যে নিগ্রহ আরম্ভ হইল, তাহার নিবৃত্তি হইল না। রাজারাজড়াদের মধ্যে, বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, যেমন সামান্য সৈনিকেরা হুকুম পাইলেই, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া মহোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ পল্লীগ্রামে বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে দলাদলি হইলে, বালকেরা ভালমন্দ না বুঝিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়; তবে তাহারা কাহারও অনুমতি বা উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। সৌদামিনীর ঢং ও দেমাকের কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইলে, তাহা বালকদেরও জানিতে বাকি রহিল না। ফলে, সৌদামিনীর পুত্রকে তাহারা শত্রুভাবে গ্রহণ করিল।

বসন্দেঘাটায় পৌছিবার দুইএকদিন পরে যদু গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া দেখিল, তাহার সমান ও অধিক বয়স্ক কয়েকজন স্নানার্থী বালক ঘাটে বসিয়া জটলা করিতেছে। তাহাদের সকলেরই কোঁচার কাপড় দৃঢ়ভাবে কোমরে বাঁধা, গামছা এরূপভাবে কোমরে জড়ান যে তাহার একটা কোণ পশ্চাতে ঝুলিতেছে। স্নানের পূর্ব্বেও মাথায় উচ্চ এলবার্টতোলা টেরি বর্ত্তমান, এবং কাহারও-কাহারও গলায় জিউলি আঠার মাজা পৈতা অতি শুভ্র তারের মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই ছোকরাদের আকার-প্রকার দেখিয়া তাহাদের প্রকৃতি অনুমান করিবার ক্ষমতা যদুর ছিল না। মাষ্টারদের ছেলেরা সচরাচর যেরূপ লেখাপড়ায় মনোযোগী ও সুবোধ হয়, যদুও সেইরূপ ছিল। অধিকন্তু, তাহার স্বভাব বড় সরল ছিল। মন্দসংসর্গে খারাপ হইয়া যাইবার ভয়ে, যদুর পিতা তাহাকে বড় একটা সমবয়স্কদের সহিত মিশিতে দিতেন না; এবং জিনিসটা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, বোধ হয় তাহার প্রতি যদুর লোভ ছিল। ঘাটে ছোকরাদের দেখিয়া, তাহাদের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে সে স্মিতমুখে তাহাদের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল।

যদু নিকটে আসিতেই, ছোকরারা হঠাৎ নীরব হইয়া পরস্পরের মুখ-তাকাতাকি করিতে লাগিল। পরে একজন বলিয়া উঠিল "এক্ আভি?" (১); দুই একজন উত্তর দিল "নাজি এন্" (২), এবং একজন বলিল "সোর সোর, লাক্ এয্ গামির থকা হ্ছিল, ধোব ছহে রাত এল্‌ছে, আন্ রাতক?" (৩); ইহাতে সম্বোধিত তারক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "কিঠ, এসি টবে, কসালে উখউম্‌খেরদ ড়াবির রোদের ছাকে ড়াঁদিয়ে লিছ।"(৪); ছোকরার দল এই কথা শুনিয়া রীতিমত আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

উক্ত ভাষা কলিকাতার সন্নিহিত গ্রামসমূহের বালক-শ্রেণীতে প্রচলিত উল্টা কথা—সাত-আট বৎসরের বালকেরাও এইভাবে এত দ্রুত কথা বলিতে পারে যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মন দিয়া শুনিলেও তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারে না। এই অদ্ভুত ভাষা শুনিয়া এবং ছোকরাদের

---

(১) কে ভাই?

(২) জানি নে।

(৩) রোস রোস, কাল যে মাগীর কথা হচ্ছিল, বোধ হচ্ছে তার ছেলে, না তারক?

(৪) ঠিক বলেছিস, সেই বটে; সকালে মুখুয্যেদের বাড়ীর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

রকম-সকম দেখিয়া যদু বড় দমিয়া গেল। গতিক ভাল নহে বুঝিয়া, সে সেখান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তারক "জরা থ্যাদ্, ক্যোএ খিশ্‌শা ইদে ইদ্"(৫), বলিয়া আস্তে-ব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া নিজের বামহস্ত যদুর মুখে বুলাইয়া দিল এবং ইহাতে ছোক্‌রার দল মহা উল্লাসে অট্টহাস্য সহকারে হাত-তালি দিতে লাগিল। সাহেব-গ্যালাণ্ট সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে দস্তানা দ্বারা আঘাত করার মত, বখাট-বালকসমাজে কাহারও মুখে বাঁ হাত বুলাইয়া দেওয়াটা ঘোর অবজ্ঞা ও অপমানের পরিচায়ক। যদু এই তথ্য না জানিলেও, অপরিচিত বালকদের এই প্রকার অপ্রত্যাশিত কুব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

"তারকা, ও কি হচ্ছে" হাঁকিয়া একজন ভদ্রলোক খড়ম পায়ে খটখট করিয়া ঘাটের উপরের সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন। তিনি তারকের পিতা, উপরে দাঁড়াইয়া তাহাদের সকল কীর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সোজা তারকের নিকটে আসিয়া তাহার কাণটি ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার! লেখাপড়া চুলোর দোরে গেছে, এখন পথেঘাটে গুণ্ডামী করে বেড়াতে আরম্ভ করেছ? ফের যদি এরকম দেখতে পাই কি শুনি, ত'াহলে বাড়ী থেকে দূর করে দেব।" তাহার পর যদুর দিকে ফিরিয়া তাহার পরিচয় লইয়া বলিলেন "ওঃ, আমাদের যদুর ছেলে তুমি? আরে, তুমি এর মধ্যে এত বড় হয়ে উঠলে কি করে? তোমার ভাতের সময় মাধবদাদা ভারি ধুমধাম করেছিল, সে তো সেদিনকার কথা মনে হচ্ছে। তোমার বাবা আমায় হালদার-খুড়ো বলত; আহা! বড় ভাল ছোকরা ছিল সে। তার নাম রাখা চাই ভায়া। তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়? সেকেন্ ক্লাসে উঠেছ? এণ্ট্রান্স ইস্কুলের সেকেন্ ক্লাসে? বেশ বেশ, এই তো চাই।" তাহার পর তারকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দ্যাখ হতভাগা, এ তোর প্রায় সমান বয়সী; কিন্তু তোর চেয়ে উঁচুতে পড়ে।" অবশেষে যদুকে সম্বোধন করিয়া তিনি সাবধান করিয়া দিলেন, যেন এই সকল ছোকরাদের সঙ্গে সে কখনও না মেশে; তাহা হইলে খারাপ হইয়া যাইবে।

যদুকে অপমান করিতে যাইয়া যদুরই চক্ষের উপর এবং বন্ধুবর্গের সমক্ষে পিতার দ্বারা শাসিত ও তিরস্কৃত হইয়া তারকের মাথা কাটা গেল। তাহার উপর আবার যে লেখাপড়ার জন্য সে চিরকাল তাড়না ও গালি খাইয়া আসিতেছে, সেই লেখাপড়ায় যদুকে তাহার অপেক্ষা ভাল বলাতে তারক মনে-মনে আক্রোশে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদুকে নখে করিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলে। তারকের মনে যদুর বিরুদ্ধে এই যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহা সহজে নিবিল না; মধ্যে মধ্যে নূতন ইন্ধন পাইয়া নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। পিতার ভয়ে সে প্রকাশ্যে যদুর প্রতি অত্যাচার করিতে বড় একটা সাহস পাইত না,—কলে-কৌশলে তাহাকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিত।

তারক তখন হালিসহর স্কুলে পড়িত। তাহার পিতা তখনও গ্রামের স্কুলে তাহার বিদ্যালাভের সম্ভাবনায় হতাশ হইয়া তাহাকে হুগলী স্কুলে পাঠান নাই। যদুও হালিসহর স্কুলে ভর্ত্তি হইল। স্কুলে নবাগত বালকমাত্রেই অপরিচিত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করে; যদুরও সেই অবস্থা হইল। তাহা ছাড়া কলিকাতার স্কুলে পুরাতন ও ভাল ছাত্র এবং মাষ্টারের পুত্র বলিয়া যদুর যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহার অভাব সে এখানে সর্ব্বদাই অনুভব করিতে লাগিল। একটু সহানুভূতির জন্য যখন তাহার মন ক্ষুধিত, সেই সময়ে তারক তাহার নূতন নাম আবিষ্কার করিল "লাইন মশাই," অর্থাৎ length without breadth। যদু বড় রোগা ও লম্বা ছিল; এবং তাহার দেহের বৃদ্ধি বিবেচনা না করিয়া, বয়সের হিসাবে কেনা, ধুতি খাটো হইত বলিয়া, তাহাকে আরও লম্বা দেখাইত। সুতরাং তাহার "লাইন মশাই" নামটি বালকদের নিকট ভারি মানান-সই বোধ হইল। নিজের চেহারা মনোমত না হইলে, অথবা কোন অঙ্গ কুশ্রী বা বিকৃত হইলে, অনেক ভাবপ্রবণ বালক বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়। যদু নিজের বেমানান শরীরের জন্য বরাবর কুণ্ঠা বোধ করিত। তাহার উপর যখন ছোট-বড় বালকেরা যেখানে-সেখানে তাহাকে "লাইন মশাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে মরমে মরিয়া গেল। ইহার পর আর একটি ঘটনায় সে আরও মর্ম্মপীড়া পাইল। সে একদিন স্কুলে আসিয়া দেখিল, কয়েকটি সহপাঠি মহা

(৫) মজা দ্যাখ, ওকে শিক্ষা দিয়ে দি।

কৌতুকের সহিত ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত কি পড়িতেছে। যদুকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। সে দেখিল বোর্ডে লেখা রহিয়াছে—

"মুখুয্যেদের সদু,
বলে বাছা যদু
ঢ্যাঙ্গা হচ্ছ শুধু
খাও একটু দুদু
হবে নাদুস নুদু।"

যদুর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল,—স্কুলের মধ্যে তাহার দুঃখিনী মাকে লইয়া ঠাট্টা! সজলচক্ষে কম্পিতকণ্ঠে সে হেডমাষ্টারের নিকট যাইয়া নালিশ করিতে, তিনি আসিয়া তদন্ত করিলেন; কিন্তু কে উহা লিখিয়াছে, তাহার প্রমাণ না পাইয়া, সকলকে শাসাইয়া প্রস্থান করিলেন। যদুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা তারকের কীর্ত্তি। তারক এবং যাহারা এই লেখা লইয়া কৌতুক করিতেছিল, তাহাদের সকলের প্রতি ঘৃণায় তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

যদু পূর্ব্বে কখনও সমবয়স্কদের সহিত মিশিতে পায় নাই। হালিসহরে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে সমবয়স্ক ও সহপাঠীদের দ্বারা বিনা কারণে বারবার লাঞ্ছিত হওয়ায়, মিশিবার ইচ্ছাও লোপ পাইল। সঞ্চরণশীল শামুক যেমন আঘাত পাইলে নিজের খোলার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। সে আর বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহির হইত না; পথে সমবয়স্কদের সহিত দেখা হইলে, ত্রস্তভাবে পাশ কাটাইয়া যাইত; এবং ক্রমে আর লোকের সহিত সহজভাবে মিশিতে পারিত না। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, গ্রামের সকলের সহিত জানাশুনা হইয়া গেলেও, কাহারও সহিত তাহার বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা জন্মিল না;—অতি অল্প লোকেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাহার মেধার পরিচয় পাইলেন বটে, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীদের তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; তাহার বাহ্য আকার-প্রকারেও তাহার কোন লক্ষণ ছিল না; বরং তাহার বেমানান দেহ, ঈষৎ হাঁ-করা মুখ এবং নিরীহ ও মুখচোরা প্রকৃতির জন্য তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই বোধ হইত।

সেই যদু প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করিলে, সকলে বিলক্ষণ বিস্মিত হইল; এবং পরে যখন খবর আসিল যে, সে জলপানী পাইয়াছে—তখন গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সৌদামিনী কাহারও অপ্রিয় না হইলেও, সহায়-সম্পত্তিহীন, বিধবা প্রতিবেশীদের মধ্যে বড় একটা খাতির-যত্ন পাইত না। কিন্তু সেদিন পাড়ার মুরুব্বিরা ও প্রবীণারা তাহার বাড়ীতে আসিয়া কতই আত্মীয়তা জানাইলেন—আনন্দের দিনে উদ্বেলিত স্বামীশোকে সৌদামিনীকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, মিষ্ট তিরস্কারদ্বারা নিরস্ত করিলেন; এবং যদুর প্রশংসায় এবং তাহার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনায় তাঁহারা গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

যদুর কৃতকার্য্যতায় তারক তুঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিল; কিন্তু কি করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। স্কুলই যদুকে উৎপীড়ন করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল, সে তো সে গণ্ডি পার হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তারকের সঙ্গীরা এখন যদুর সহিত 'লাইন মশাই' সম্বোধনের মত তুচ্ছ ফষ্টিনষ্টি করিতে লজ্জা বোধ করিবে।—ইহা বুঝিয়া তারক নূতন প্রকারে শত্রুতাচরণের ফিকির খুঁজিতে লাগিল; এবং শীঘ্রই একটা সুযোগ পাইল।

তখন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু কলিকাতায় নূতন বাঙ্গালীর সার্কাস সৃষ্টি করায় স্কুলবয়মহলে জিম্‌নাষ্টিকের একটা হাওয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার অলিতে-গলিতে এবং সহরের বাহিরে গ্রামে-গ্রামে জিম্‌নাষ্টিক্-চর্চ্চার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। বলদেঘাটায় এতদিন এ হাঙ্গাম ছিল না, কিন্তু চৌধুরীপাড়ার জিম্‌নাষ্টিক্ ক্লাব যখন বিশ্বনাথ বাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে 'পারফর্ম্মান্স' করিয়া 'ডেড্‌পয়েণ্ট্' 'গ্রেট সার্কল্' প্রভৃতি 'বার প্লে', এবং থ্রি-ব্রাদার্সের' কাঁধের উপর নিশান হস্ত 'ফেয়ারি' ইত্যাদি অন্যান্য চটক্‌দার খেলা দেখাইয়া পাঁচখানা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের বাহবা লাভ করিল, তখন নিজেদের জিম্‌নাষ্টিকের আখড়া খুলিবার জন্য তারকের দল আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেল। তাহারা স্কুল কামাই করিয়া একখণ্ড পতিত জমি হইতে সেওড়া ও ভেরেণ্ডার জঙ্গল সাফ করিল এবং গঙ্গার চড়া হইতে বালি আনিয়া সেখানে ছড়াইয়া একদিনেই 'গ্রাউণ্ড্', প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পয়সা তো নাই, প্যারালেল ও হরাই-জণ্টাল্ বারের জন্য কাঠ ও লোহার দণ্ড, বারের খুঁটি খাড়া রাখিবার জন্য তার ইত্যাদি আসে কোথা হইতে? যুক্তি

করিয়া তাহারা রাত্রিকালে রেলওয়ে লাইনের বেড়া হইতে তার কাটিয়া আনিল; এবং তারকের প্রয়োচনায় স্থির করিল যে, মুখুয্যেবাড়ীর অর্থাৎ যদুদের বাড়ীর এক অংশে যে কয়েকটী অব্যবহৃত ঘর পতনোন্মুখ হইয়া আছে, অন্ধকার রাত্রে তাহার জানালা ভাঙ্গিয়া আনিয়া, সেই কাঠ ও গরাদে দিয়া 'বার' নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রস্তাবে দলের কেহ-কেহ প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু কাছাকাছি অন্য কোন ভাঙ্গা বাড়ীতে এত বড়-বড় জানালা নাই, দূর হইতে ভারী কাঠ ইত্যাদি বহিয়া আনা মুস্কিল এবং তাহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অধিক,—এইরূপ নানা যুক্তি প্রয়োগে তারক তাহাদের সম্মত করাইল।

ভাঙ্গা দেওয়াল হইতে জানালাটা খসাইয়া লইবার চেষ্টায় সজোরে দুই তিন ঝাঁকানি দিতেই তাহা প্রাচীরের অর্দ্ধাংশ লইয়া হুড়মুড় করিয়া প্রচণ্ড শব্দে ভূমিসাৎ হইল; এবং চমকিত তারকের দল সামলাইয়া উঠিতে-না-উঠিতে "কি হ'ল, কি হ'ল" করিয়া যদু ও দুই একজন প্রতিবেশী বাহির হইয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া তারক প্রভৃতি ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল; কিন্তু তাহাদের একজন যদুদের উঠানের উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠিয়া পাহারা দিতেছিল,—তাড়াতাড়ি পলাইতে সে উঠানের মধ্যে বেকায়দায় পড়িয়া গিয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল, এবং যদু ও প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল।

এই ছোকরার দ্বারা জানালা চুরির বৃত্তান্ত ফাঁস হইয়া গেলে, জিম্‌নাষ্টিক্ যশোলিপ্সুদের লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না; এবং বুড়া বয়সে তারক বাপের দ্বারা খড়মপেটা হইল। এই ঘটনার ফলে যদুর বিরুদ্ধে তারকের শত্রুতা আর এক গ্রাম উপরে উঠিল।

যদু হুগলী কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত এল্‌-এ পাশ হইলে, চৌধুরীপাড়ার বিশ্বনাথ বাবু তাহার সহিত নিজের কনিষ্ঠা কন্যা রাসমণির বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিশ্বনাথ বাবু কুলীন, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং দারুণ কৃপণ; তিনি বিবাহে বিশেষ কিছু টাকাকড়ি না দিতে চাহিলেও অপুত্রক বলিয়া তাঁহার কন্যারাই তাঁহার উত্তরাধিকারী; উপরন্তু তাঁহার মেয়েটি সুন্দরী। দরিদ্রা বিধবার পুত্রের এই অসহনীয় সৌভাগ্যের সূচনায় গ্রামের কতজন কুৎসাবিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল; এবং বিশ্বনাথের নিকট পাত্রপক্ষের দারিদ্র্যের কতই ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু চতুর বিশ্বনাথ এই সাপের হাঁচি সহজেই চিনিলেন; যদুর মত বিদ্বান ও সচ্চরিত্র পাত্র কুলীনের ঘরে সহজে মেলে না, তাঁহার মেয়েটিও বড় হইয়া উঠিয়াছে, ও বিবাহ সস্তায় হইবে বলিয়া বিশ্বনাথ কোন কথায় টলিলেন না; এবং শিরঃপীড়াগ্রস্ত হিতাকাঙ্ক্ষীদের বুঝাইলেন, "আমি জেনেশুনেই গরিবের ঘরে মেয়ে দিচ্ছি। মেয়ে এখন আমার কাছেই থাক্‌বে, পরে বাবাজি লেখাপড়া শেষ করে যখন উপার্জ্জন করবেন তখন, আমার রাসমণি মাকে শ্বশুরঘরে পাঠাব।"

যথাকালে শুভকার্য্য সমাধা হইয়া গেলেও নিন্দকেরা নিবৃত্ত হইল না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, বিশ্বনাথবাবু পয়সা খরচের ভয়ে মেয়েটার হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন; কুশ্রী যদুর টুক্‌টুকে বৌ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা হইল। বাড়ীর উঠানের লাউ ও শাক ব্যতীত অন্য খাদ্য যাহার জোটে না, সে পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া নিশ্চয়ই ফেন খাওয়াইবে, ইত্যাদি। এই বিবাহে সকলের অপেক্ষা জ্বালা ধরিল তারকের। সে কোন রকমে যদুকে আঘাত করিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল; এবং আপাততঃ অন্য কিছু করিতে না পারিয়া নিম্নলিখিত ছড়াটি রচনা করিয়া পাড়ার শিশুদের শিখাইল; তাহারা পথেঘাটে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"যদু খায় কদুর বিচি
রাসমণি খায় ফেন,
যদুনাথের দাড়ী ধরে
নাচে কোলা ব্যাং"।

বিশ্বনাথবাবু একে কৃপণ তায় ইংরাজী-অনভিজ্ঞ গ্রাম্য লোক; টাকা ঢালিয়া জামাতাকে ওকালতি প্রভৃতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। যদুরও একমাত্র সাধ ছিল, পিতার ন্যায় শিক্ষকতা করে। সুতরাং, সে যথাকালে বি-এ পাস হইয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষদের বলিয়া-কহিয়া হুগলী স্কুলেই একটি অস্থায়ী মাষ্টারি কর্ম্ম পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। তখনকার হুগলী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার খ্যাতনামা বিষ্ণুচন্দ্র রায় মহাশয় যেমন উপযুক্ত, তেমনি কড়া শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শিক্ষক ঢিলা প্রকৃতির হইলে ছাত্রদের অপকার হয়; এবং সেজন্য তিনি শিথিলস্বভাব শিক্ষক নিজের অধীনে রাখিতে চাহিতেন না—এ কথা

সকলেই জানিত। যদু একে মুখচোরা; তাহার উপর স্কুলের অনেক ছাত্র তাহাকে সেই কলেজেই পড়িতে দেখিয়াছে—এ অবস্থায় সে ক্লাস শাসনে রাখিতে পারিবে না সন্দেহ করিয়া, তিনি তাহার কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। মক্ষিস্বভাব ছাত্রদের একথা জানিতে বাকী রহিল না।

ইহার বৎসর-দুই পূর্ব্বে, গ্রামের স্কুলে তারকের বিদ্যার চূড়ান্ত হইয়াছে বুঝিয়া, তাহার পিতা তাহাকে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সেই স্কুলেই যদু এখন মাষ্টার হইল—নীচের ক্লাসের শিক্ষক হইলেও মাষ্টার তো বটে। অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর কষাঘাতে অস্থির হইয়া তারক একবার স্কুলের বন্ধন হইতে চিরমুক্তির জন্য দড়ি-দড়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পিতার কঠিন শাসনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে চুপচাপ করিয়া রহিল। তখন হইতে সে সাবধানে যদুকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত; কিন্তু মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিল, কিসে যদুর মাষ্টার হইবার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিবে। সে বুঝিল যে, ভালমানুষ যদুকে সে একদিন না-একদিন হেড্‌মাষ্টারের নিকট জব্দ করিতে পারিবে।

যদু উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বনাথবাবু কন্যাকে স্বামীগৃহে রাখিতে তত্টা রাজী নহেন বুঝিয়া, এবং সুখের ক্রোড়ে পালিত বালিকা দরিদ্রের সংসারে বড় কষ্ট পাইবে ভাবিয়া, সৌদামিনী এ পর্য্যন্ত বড় সাধের বধূকে একক্রমে বেশিদিন কাছে রাখে নাই; তাহাকে মধ্যে মধ্যে আনিয়া আবার দুইচারি দিন পরে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিত। বধূ রাসমণি ইদানীং সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল; আজকাল স্বামীগৃহে দুইচারিদিন থাকার পরেই যখন তাহার যাইবার কথা উঠে, তখন তাহার ভারি অভিমান হয়—কেন হয়, কাহার উপর হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সেদিন সারাদিন তাহার মনটা রাত্রে স্বামীসাক্ষাতের প্রতি পড়িয়া থাকে; যেন কত কথা বলিবার আছে; কত অনুযোগ করিবার আছে। কিন্তু কৈ, দেখা হইলে তো কোন কথাই মুখে আসে না,—কেবল চক্ষু ছাপাইয়া জল আসে, বুকের মধ্যে কি ঠেলিয়া উঠে—তখন আবার বড় লজ্জা হয়। "উনি" যদি জিজ্ঞাসা করেন, চোখে জল কেন, গলা ভার কেন, তখন কি জবাব দিবে? তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া শাশুড়ী যখন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, "বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছে মা? এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে?" তখন সে প্রকাশ্যে আস্তে-আস্তে বলে "আমার তো মা নেই, এর মধ্যে সেখানকার জন্যে মন-কেমন করবে কেন? এখানে আমার তো কোন কষ্ট হয় না মা"। কিন্তু তাহার মন বলে "মাগো, আমার এখানকার জন্যেই মন-কেমন করে, তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না।" পালকীতে তুলিয়া দিয়া যখন তাহার শাশুড়ী চিবুক ধরিয়া বলেন "আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমায় পাঠিয়ে আমার ঘর অন্ধকার হয়ে থাকবে; তোমায় আবার শীগ্‌গিরই আনব মা।" তখন সে আনতমুখে কোন রকমে অশ্রু লুকাইয়া রাখে। পালকী চলিতে আরম্ভ করিলে, চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া লয়; আবার তখনই চাহিয়া দেখে, পালকীর দরজায় ফাঁক আছে কি না—যদি কেহ তাহার কান্না দেখিতে পায়, তাহা হইলে ভাবিবে, "মেয়েটা কি বেহায়া, বাপের বাড়ী যেতে কাঁদছে"—ছি!

বয়স্থা বৌ লইয়া ঘর করিতে না পারায়, সৌদামিনীর বড় ক্ষোভ ছিল। তাহার উপর বধূ সমস্থা শুনিয়া অবধি তাহাকে আনিয়া কাছে রাখিবার জন্য সে বড় ব্যাকুল হইয়াছিল—"আহা বৌটার মা নেই, কেই বা তাকে দেখে, কেই বা এটা-সেটা খাওয়ায়।" যদুর চাকরিটি হইতেই, সৌদামিনী কাল-বিলম্ব না করিয়া বৌ আনাইল। বৈবাহিকের সহিত কথা রহিল, এখানেই পঞ্চামৃত সম্পন্ন করিয়া তাহার মাস-দুই পরে বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইবে। এখন হইতে তিনটি প্রাণী বড় শান্তিতে কাটাইতে লাগিল। তবে বধূর বিরুদ্ধে সৌদামিনীর স্নেহের অভিযোগের অন্ত ছিল না;—বধূর সহিত আর পারিয়া উঠা যায় না; ভাত খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিলে, সে শাশুড়ীর সহিত অধিক বেলায় খাইবার অভিপ্রায়ে পলাইয়া বেড়ায়; পই-পই করিয়া বারণ করিলেও শ্রমসাধ্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে বসিয়া যায়; সারাদিন পা মুড়িয়া বসে না, ও ভাল জিনিস খাইতে বলিলে বাঁকিয়া বসে; কাজেই তাহার কণ্ঠার হাড় বাহির হইতেছে এবং কাঁচা সোণার মত রং কালি হইয়া যাইতেছে। বৌমার যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড, বাপের বাড়ী হইতে যে পয়সা আনিয়াছিল, তাহা খরচ করিয়া বোকা মেয়ে, শাশুড়ীর জন্য সন্দেশ-রসগোল্লা আনায়—এইরূপ বধূর নানা দোষের জন্য সৌদামিনী যত বকাবকি করে, তত মুগ্ধ হয়।

দম্পতি-হৃদয়ে পূর্ব্বের প্রেম এখন অবাধ ঘনিষ্টতায় গাঢ়তর হইল, এবং বন্ধুহীন যদুর গভীর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সুন্দরী স্নেহময়ী স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হইল। সে চটুল কথায় বা আদরে সোহাগে ভালবাসা দেখাইতে জানিত না, কিন্তু রাসমণিকে দেখিলে তাহার চক্ষে হৃদয়ের নির্ব্বাক পূজা ফুটিয়া উঠিত। রাসমণির সহিত কথা কহিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরে অসীম স্নেহ ঝরিত, তাহার সহিত ব্যবহারে গভীর কোমলতা প্রকাশ পাইত এবং রাসমণির সামান্য অসুখে যদুর সন্ত্রস্ত ব্যবস্থা ও ব্যাকুল প্রশ্ন অন্তরের ব্যথা ও করুণার পরিচয় দিত। রাসমণিও স্বামীপ্রেমে এরূপ তন্ময় হইয়া উঠিল যে, একদিন তাহার মত শান্ত লাজুক বধূও পাড়ার অনেকগুলি যুবতীর সাক্ষাতে প্রগল্‌ভভাবে স্বামীর প্রতি টান দেখাইয়া পরে বিষম লজ্জা পাইয়াছিল। সেদিন তাহাদের বাড়ী ঐ সকল যুবতীরা মিলিয়া কথায়-কথায় পরস্পরের স্বামী-সৌভাগ্যের আলোচনা করিতে-করিতে একজন বলিয়া উঠিল, "তোরা বিন্দির ভাতারের নিন্দে করছিস, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে আমাদের চেয়ে দেখতেও ভাল, রোজগারও করে বেশি। হ্যা বৌদিদি, রাগ কর না ভাই, কিন্তু তোমার বাপ কি দেখে বিয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পারিনে।" রাসমণি এই কথায় আত্মহারা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর মত দেবতুল্য স্বামী হালিসহর গ্রামে কাহারও নাই; এরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়া সে নিজেকে রাজ-বধূর অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে করে এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে যেন জন্মজন্মান্তরে ইহাকেই স্বামীরূপে পায়। রাসমণির এই আচরণ লইয়া মেয়েমহলে দিনকয়েক নিন্দা ও টিটকারির ধূম পড়িয়া গেল।

ইতোমধ্যে বিধাতা এই ক্ষুদ্র সুখী পরিবারের অদৃষ্টসূত্র জটিল করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামে অবরোধ-প্রথার বাঁধা-বাঁধি নাই। তারক ঘটনাক্রমে দুইচারিবার রাসমণিকে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হইয়া পড়িল! তারক অভিসন্ধি করিয়া এই কাণ্ডটি বাধাইয়া বসে নাই! তাহার অন্য নানা দোষ থাকিলেও চরিত্রদোষ ছিল না। পাড়ার বৌঝিদের কাহারও প্রতি সে প্রলুব্ধ হয় নাই। কিন্তু রাসমণির সৌন্দর্য্য কেমন তাহার চোখে লাগিয়া গেল, তাহাকে দুই-চারিদিন দেখিয়াই সে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িল। প্রথমটা সে নিজের মনোভাবে বিস্মিত হইয়া তাহা সামলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু এই প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় তাহার উদ্দাম স্বভাব ক্ষীণ ইচ্ছা-শক্তির শাসন মানিল না। ক্ষণে ক্ষণে রাসমণির করুণ চক্ষুদুটি ও মধুর মুখখানি তাহার মনে উদয় হইয়া চোখেদেখার স্পৃহা জাগাইয়া তোলে। তাই সে সর্ব্বদা রাসমণিকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রেমিকসুলভ অনুসন্ধিৎসায় সে অচিরে যদুর পরিবারস্থ সকলের গতিবিধি আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।—সকাল ৬টা বাজিতেই সৌদামিনী বধূর সহিত গঙ্গাস্নানে যায়, সাড়ে নয়টার সময় যদু কার্য্যে বাহির হইলে রাসমণি জানালায় দাঁড়াইয়া স্বামীকে দেখে এবং সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। বেলা তিনটার সময় জানালা খুলিয়া দিয়া যখন সে ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা করে, তখন তাহাকে রাস্তা হইতে দেখা যায়। ছুটির দিনে সারাদিন জানালা খোলা থাকায় রাসমণিকে যখন-তখন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার কাছে প্রায়ই যদু থাকে—ইত্যাদি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে বুঝিয়া লইল, কখন ও কি প্রকারে রাসমণিকে লুকাইয়া দেখিতে পারিবে।

গোড়ায় চোখের দেখার অধিক কোন আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাহার পিপাসা অন্যরূপ দাঁড়াইল। সে যে ভালবাসে তাহা একবার জানাইবার জন্য, একবার রাসমণির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তদ্দূর সাহস তারকের নাই। প্রেমের গতিই অন্তঃসলিলা। তাহার উপর সে চিরকুটিল প্রকৃতি এবং এখনও তরলবুদ্ধি। বয়স হইলেও সে স্কুলের ছাত্র মাত্র। সুতরাং সে অগ্রসর হইতে না পারিয়া মনেমনে গুমরাইতে লাগিল। সে যদি এটুকুও বুঝিতে পারে যে, রাসমণি বিরক্ত হইলেও তাহাকে ঘৃণা করিবে না, অথবা তাহার কথা প্রকাশ করিবে না—তাহা হইলে সাহস হয়, কিন্তু কৈ সেরূপ কোন লক্ষণই তো সে দেখিতে পায় না। বরং প্রেমিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পদে-পদে রাসমণির পতি-পরায়ণতার পরিচয় পায় এবং তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যায়। যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রাসমণি স্কুলযাত্রী স্বামীর প্রতি চাহিয়া থাকে, তাহা তারককে তপ্তশলাকার মত বিদ্ধ করে। রাসমণির সিঁথিতে সিন্দুরের আড়ম্বর তাহার চক্ষে সূচ ফুটায়। কাহার গৌরবে রাসমণি প্রায়ই চওড়া লালপাড়

সাড়ি পরে, তাহা ভাবিলে, রাসমণির প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়া যায়। কচিৎ কখনও তারকের ক্ষুধিত চক্ষুর উপর চক্ষু পড়িলে রাসমণি যেরূপ শিহরিয়া, সঙ্কুচিত হইয়া, নিমেষে সরিয়া যায়—তাহাতে হঠাৎ তারকের মাথায় খুন চড়িয়া যায়; তাহার একটা উন্মত্ত ইচ্ছা হয়—লম্ফ দিয়া ঐ জানালাটা ভাঙ্গিয়া চুলের ঝুঁটি ধরিয়া রাসমণিকে টানিয়া আনিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া মুখ ফিরাইলে কি হয়! আর যে যদুর জন্য সে তারককে উপেক্ষা করে, তেমন দশটা যদুর সাধ্য নাই তারকের বিক্রম হইতে তাহাকে রক্ষা করে;—ভাবিতে ভাবিতে তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয় ও বাহুর মাংসপেশী এবং চোয়াল শক্ত হইয়া উঠে। পরক্ষণেই আবার করুণায় তাহার মন গলিয়া যায়; আহা, কোন্ প্রাণে রাসমণিকে ব্যথা দিবে? নিজের নিষ্ঠুর চিন্তার জন্য অনুতাপ সারাদিন তাহাকে চাবুক মারিতে থাকে।

মনের আগুন হইতে পরিত্রাণের জন্য তারক গাঁজার আগুনের রীতিমত উপাসনা আরম্ভ করিল। গাঁজার প্রসাদে তাহার সকল প্রকার দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়, আসন্ন মন সতেজ হইয়া উঠে, অভিযোগ উষ্মায় পরিণত হয় ও জ্বালা জিঘাংসার আকার ধারণ করে। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে রাসমণিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; তখন কল্পনায় তাহাকে নির্ম্মমভাবে ভজনা করে; ও যদুকে রাসমণির চক্ষের উপর বিধিমতে বিপর্য্যস্ত করিয়া—সে যে একটা অপদার্থ, হেয় জীব—তাহা প্রতিপন্ন করিয়া পরম আরাম অনুভব করে। মানসিক অশান্তির উপর ঘন ঘন গাঁজা-সেবন করিয়া তারকের স্বভাব কতকটা বিকৃত হইয়া গেল; কথা বলিলে মারিতে আসে, এইরূপ রুক্ষ মেজাজ হইল।

রাসমণির প্রতি আর তাহার চক্ষুলজ্জা রহিল না—রাসমণি জানালার বাহিরে তাকাইলে প্রায়ই দেখিতে পায়, কে-একজন জ্বলন্তচক্ষে কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে ভয়ে আর জানালা খুলে না। চোখের দেখায় বঞ্চিত হইয়া, তারক দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার উদ্দেশ্যে, বাড়ীর মেয়েদের নিকট কৌশলে যদুদের কথা উত্থাপন করিয়া রাসমণির খবর লইতে লাগিল; কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টক্রমে ইহাতে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল লাভ হইল। সে দুই একদিনের মধ্যেই শুনিল, রাসমণি কিরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া স্বামীর গর্ব্ব করিয়াছিল; এবং এই খবরের জ্বালা কমিতে-না-কমিতে, একদিন তাহার ভগিনী বলিল, "আর শুনেছ দাদা, যদুদা'র বৌ চুপি-চুপি আমাদের বলছিল যে, যমদূতের মত কে-একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঘের মত চোখে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে দু'তিন দিন দুপুরবেলা দেখেছে। যদুদার গোঁ হয়েছে, সেই মিন্সেটাকে ধরবে। কিন্তু আমার তো বাপু মনে হয়, এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড; পোয়াতি-মানুষের ঠিক দুপুরবেলা ও-রকম বিকট চেহারা দেখা বড় অলক্ষণ—বড় অলক্ষণ; বৌটার ভালমন্দ কিছু না হয়।"

রাগে অপমানে, অভিমানে ও নৈরাশ্যে তারক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু বাঘের মত, তাহার চেহারা যমদূতের মত! এই কথা যত মনে হয়, ততই সে অধীর হইয়া উঠে। আবার রাসমণি স্বামী ও সাথীদের কাছে তাহার কথা বলিয়া দিয়াছে—ব্যস্, সব শেষ। বলিয়া দিবার মত তারক কি করিয়াছে? সে তো কেবল কাঙ্গালের মত চাহিয়া থাকে—এটুকুও রাসমণির অসহ্য হইল! এইরূপ এক একটা চিন্তা শত বৃশ্চিকের মত তারককে দংশন করিতে লাগিল। তাহার পর কি হইল, তাহা তারকের ভাষায় বলিতেছি।

তারকের কথা

আমার বোনের কথা শুনে, সারাদিনটা হন্যে কুকুরের মত কাটালুম। রাত্রে খেতে ডাকলে, খেতে বসলুম; কিন্তু খাব কি, ভাত উগ্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত রাত চোখের পাতা বুজতে পারলুম না। বর্ষাকাল, ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, সবাই আরামে ঘুমুচ্ছে, কেবল আমি ছটফট করছি—সে বড় কষ্ট। শেষরাত্রে মনে হল, বাঃ আমার এমন ওষুধ রয়েছে এতক্ষণ ভাবিনি। উপরি-উপরি দু'তিন ছিলিম খেতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল, বাঁচলুম। তখন মনে হল, যা' হবার হয়ে গেছে, আর ভুলেও তার কথা ভাবব্ না। ইস্, যদুর জন্যে এত গুমোর! যদু আবার আমায় ধরবে বলেছে। যদুটা মরে না? যদুর মার খুব জ্বর শুনেছি, সে মাগি মরে, তা'হলে যদু খুব একটা ঘা খায়, বেড়ে মজা হয়। রোস, যদুর মা তো বিছানায় পড়ে,—তা'হলে যদুর বৌ নিশ্চয়ই একলা গঙ্গাস্নানে যায়; আজকাল সেই সময়টা তো তাকে দেখবার খুব সুবিধে। সুবিধের কথা মনে হইতে তাকে আর-একবার দেখবার বড় ইচ্ছা হল—কদিন

যে তাকে দেখতে পাইনি। ঠিক করলুম, এই একবারটি তাকে দেখে নিয়ে, বাস্—আর এ জন্মে তার কথা ভাব্‌বো না। এই কথা মনে হতেই, আর থাকতে পারলুম না,—বেরিয়ে পড়লুম।

তখন ভোর হয়ে গেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে; কিন্তু আকাশ মেঘে অন্ধকার, পথে জনপ্রাণী নেই। যদুদের গলির মোড়ে একটা বড় তেঁতুল-গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম। একবার হুঁস হল, মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে—গাছপালা, পথ—যেন সব নেচে-নেচে উঠছে; কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না;—হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেখি, সে আসছে। আমার বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় দিতে লাগ্‌ল। সে তেঁতুল গাছটার সামনাসাম্‌নি আসতেই, আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়লুম—কেন বেরুলুম জানি না—মাইরি বলছি। আড়াল থেকে তাকে একবার দেখা ছাড়া, আমার অন্য মৎলব ছিল না। আমি হঠাৎ বেরুতেই, সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে চাইলে;—ভয়ে তার মুখ পাঙ্গাসপানা হয়ে গেল। তার পর তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে, ফস্ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার মাথার ভিতর কি একটা খট্ করে উঠ্‌ল; চারিদিক যেন লালে-লাল হয়ে গেল—কেন জানি না, ভয়ানক চেঁচাতে চেঁচাতে তাকে তাড়া করলুম। সে একবার পিছন ফিরে আমাকে দেখেই দৌড়াতে আরম্ভ করলে; কিন্তু পথ বড় পিছল ছিল, খানিক দূর যেতেই পা পিছলে "মা গো" বলে চীৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ল। আমি কাছে পৌছে দেখি, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, আর গ্যাঙ্গাচ্ছে।—আমি ইচ্ছা করে তাকে তাড়া করিনি, কোথা দিয়ে চক্ষের নিমেষে কি হয়ে গেল।

তার পর সবকথা আমার ঠিক মনে নেই। সেখান থেকে কখন পালিয়েছিলুম, কি ভেবেছিলুম—কিছুরই হুঁস ছিল না। যখন হুঁস হল, দেখি—আমাদের আঁব-বাগানে বসে আছি, আর বুকের ভিতর থেকে গুরগুর করে হাসি ঠেলে-ঠেলে উঠছে। একবার চাপতে না পেরে, হা-হা করে খুব একচোট হেসে নিলুম; তার পর মুখে কাপড় গুঁজে দিলুম। আবার বোধ হল, বুক ফেটে যাচ্ছে,—খুব খানিকটা চেঁচালে ভাল হয়ে যাবে। "ওরে, প্রাণ যায় রে" বলে প্রাণপণে চেঁচালুম। তার পর শুনলুম, কারা যেন সব কাঁদছে। বড় কান্না পেলে। কাঁদতে-কাঁদতে ভাবলুম, আমি এমন করছি কেন? ভয় হল; ছুটে বাড়ী গেলুম। সেখানে মনে হল, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে! তার চেয়ে ইস্কুলে চলে যাই। তখনই বেরিয়ে পড়লুম। নৌকোতে মেঘা-মাঝি পাল মুড়ি দিয়ে খাচ্ছিল,—আমায় বল্লে, "একটু বস, দাদাঠাকুর, খেয়ে নি; আজ যে বড় সকাল-সকাল?" দেখি সে আলুর দমের মত কি তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। চাঁচিমাখা সেই আলু দেখে, যদুর বৌ সেই যে কাদা মাখামাখি হয়ে পথে পড়েছিল—তাই মনে পড়ে গেল। আলুর দম দেখ্‌লেই এখনো আমার যদুর বৌয়ের সেই কাদামাখা মূর্ত্তি মনে পড়ে। আমি আলুর দম খাই না, তা জান?

তুমি ভাবছ, আমি পাগল হয়ে গেছলুম, না? আমি পাগল? কখনো না। পাগলের কখনও অত কথা মনে থাকে? দেখলে তো, আমি সব কথা ঠিকঠাক বলে গেলুম,—মায় মেঘা-মাঝির কথা পর্য্যন্ত। আচ্ছা, পাগল কখনও চালাকি করতে পারে? আমি পাগল হলে কখনও পালিয়ে বাগানে গিয়ে বসে থাকতুম কি? না হয় পালাবার সময়ে খেয়াল ছিল না; তাতে কি? তারপর সেদিন ইস্কুলে কেমন এক প্ল্যান খাটিয়েছিলুম,—পাগল হলে পারতুম কি? আমাদের ক্লাসের পাশেই একটা ক্লাসে যদু পড়াত; সেদিন সাড়ে দশটা বেজে গেলেও, শুনতে পেলুম—সে ক্লাসে ভারি হট্টগোল হচ্ছে। শুনলম, যদু আসেনি। ঝাঁ করে প্ল্যান মাথায় এলো,—ও ক্লাসে হট্টগোল শুনে তো এখনই হেডমাষ্টার মশাই ছুটে দেখতে আসিবেন, ব্যাপার কি। সেই সময় তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আজ বাদলার দিন পেয়ে, যদু ইস্কুল কামাই করে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বসে আছে। চুপি চুপি ও ক্লাসে গিয়ে, ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে, বোর্ডে বড়-বড় করে লিখে রাখলুম—

I come, you come তাড়াতাড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুর-বাড়ী।
Rain come ঝমাঝম—
পা পিছলে আলুর দম।

অর্থাৎ তুমি আমি জলকাদা ভেঙ্গে ইস্কুলে এসেছি, কিন্তু যদু মাষ্টার বাদলার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করছে। শেষ

ছুটো লাইন যদুর বৌয়ের সম্বন্ধে—তার সেই কাদামাখা মড়ার মত চেহারা কেবলই মনে পড়ছিল; তাই বোধ হয় ও ছুটো লাইন লিখেছিলুম।

তার পর? হাঁ, তার পর—কৈ, আমি তো অন্যমনস্ক হইনি.. সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরিতে—নৌকো থেকে আমাদের ঘাটে নেবে দেখি, খানিক দূরে কার চিতা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর সেইখানে কাদার উপর বসে চিতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে—যদু!

না না, আর বসতে পারছিনে, আমি চল্লুম। কি বলছ? রাসমণি কি করে মরল? লোকে বল্লে, গঙ্গাস্নান করতে যেতে, পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পেটে চোট লেগেছিল; সেই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর তার জ্ঞান হয়নি—ও-পার থেকে ডাক্তার আন্‌তে আন্‌তে, সব শেষ।

এক গ্লাস জল খেতে দেবে? চুপি-চুপি একটা কথা বলি শোন। যখন জল আনতে গেলে, তখন একটা গ্যাঙ্গানি শুনতে পাচ্ছিলে কি? তা হবে, আমারই ভুল হয়েছিল। একলা থাকলেই সেই রাসমণির গ্যাঙ্গানির মত আওয়াজ শুনতে পাই; অন্ধকারে থাকলে তার সেই লালপাড় সাড়ি-পরা কাদায় লুটোপুটি মূর্ত্তি সামনে দেখিতে পাই; চোখ বুজ্‌লেই তার পালাবার সময় সেই ভয়-মাখান অসহায় চাহনি দেখিতে পাই। ভোলবার জন্যে কেবলই ঘুরে বেড়াই, কোথাও তিষ্ঠতে পারি না, কিন্তু ভুলি না তো। আচ্ছা, এসব কি পাগলামির চিহ্ন বলে তোমার মনে হয়? পাগল হলে কি ভুলতুম না? আমি পাগল নই। ওরে এ-এ-এ—প্রাণ যায় রে এ-এ-এ—আচ্ছা, চেঁচালুম কেন?

কবীর-কসৌটী

[শ্রীযামিনীকান্ত সোম]

সাধো ভাঈ জীবত হী করো আসা ॥
জীবত সমঝে জীবত বুঝে জীবত মুক্তি নিবাসা।
জিয়ত করম কী ফাঁস ন কাটা মুএ মুক্তি কী আসা ॥
তন ছুটে জিব মিলন কহত হৈ সো সব ঝুঠী আসা।
অবহুঁ মিলা সো তবহুঁ মিলেগা নহিঁ তো জমপুর বাসা
দূর দূর ঢূঁঢ়ে মন লোভী মিটে ন গভ তরাসা।
সাধ সন্ত কী করে ন বন্দগী কাটেঁ করম কী ফাঁসা ॥
সত্য গহে সতগুরু কো চীন্হে সত্য নাম বিশ্বাসা।
কহৈঁ কবীর সাধন হিতকারী হম সাধন কে দাসা ॥

থাকিতে জীবন ভাই সাধুজন কর হে মুক্তির আশ।
জীবন থাকিতে বুঝে সুঝে লও জীবনেই তার বাস ॥
জীবন থাকিতে না কাটিল যদি করমের দৃঢ় ফাঁস।
মরণের পর মুক্তি মিলিবে—কেমনে কর সে আশ?
তনুত্যাগ হ'লে হইবে মিলন, সে সকল বৃথা আশ।
এখন মিলিলে তখনো মিলিবে—নহে যমপুরে বাস ॥
দূরে দূরে ভ্রমে লোভী এই মন না ঘুচিল গর্ভত্রাস।
সাধু সন্ত জনে না করে পূজন না কাটিল কর্ম্মফাঁস ॥
সত্য পথ ধরি' সদ্‌গুরু চিনি' (কর) সত্য নামে বিশ্বাস
কহেন কবীর সাধনেই হিত আমি সাধনের দাস ॥

জিন কে নাম না হৈ হিয়ে ॥
ক্যা হোবে গন মালা ডালে কহা সুমিরণী লিয়ে।
ক্যা হোবে পুস্তক কে বাঁচে কহা সঙ্খ ধুন দিয়ে।
ক্যা হোবে কাসী মেঁ বস কে ক্যা গঙ্গা জল পিয়ে।
হোবে কহা বরত কে রাখে কহা তিলক সির দিয়ে।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাঈ সাধো জাতা হৈ জম লিয়ে।

সত্য গুরুর সত্য নাম নাইক যাহার হৃদয়ে।
কি হবে তার মালা পরি', মৌখিক নাম স্মরিয়ে ॥
কি হবে তার শাস্ত্রপাঠে, কি ফল শঙ্খ বাদনে।
কাশীবাসে কি হবে তার, কি ফল গঙ্গাজল পানে ॥
কি হবে তার ব্রত রাখি, ভালে তিলক ধরিয়ে।
কহেন কবীর হেন জনে, যম ধ'রে যায় লয়ে ॥

রাফেল শান্তি

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

অধুনা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের, বিশেষতঃ, সচিত্র মাসিক-পত্রের পাঠকদের নিকট রাফেল শান্তির নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। ধনী-গৃহে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র (মূল না হউক নকলও) থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার জীবনী, বা, স্বতরাং, এরূপ একজন লোকের জীবন-চরিতের আলোচনায় ক্ষতি নাই, বরং কিছু লাভ থাকিতে পারে।

মধ্যযুগে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালী দেশে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সে সময়ে তথায় ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি চিত্রকর জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। রাফেল শান্তি বা সানজিও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম (অনেকেই বলেন, সর্ব্বপ্রধান)। রাফেল ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ উর্ব্বিনো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা-মাতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। শিল্প বা কলাবিদ্যায় যাঁহারা বংশানুক্রমের প্রভাব স্বীকার করেন না, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কলাশিল্পে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কৃতিত্বের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের উদ্ধতন পিতৃপুরুষগণের নিকট ঋণী। রাফেলের জীবনেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। রাফেলের পিতা জিওভান্নি শান্তি সুদক্ষ ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান ছিলেন। চিত্রকর বলিয়াও তিনি কিয়ৎপরিমাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পায়েট্রা ভেন্নুসি নামক একজন বিখ্যাত চিত্রকর প্রায়ই উর্ব্বিনোতে আসিয়া শান্তি-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। জিওভান্নি তাঁহারই নিকট চিত্রবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। অতঃপর

রাফেল শান্তি বা সানজিও

[যে] গুণে তিনি উত্তরকালে দেশবিদেশে পরিচিত ও সমাদৃত [হ]ইয়াছিলেন, তাহা হয় ত অনেকেরই জানা নাই। বস্তুতঃ, [ই]টালীর একজন চিত্রকরের খ্যাতি যে সুদূর বঙ্গদেশ [প]র্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে—তাহা তাঁহার কোন-একটা [অ]সাধারণ গুণ না থাকিলে কিছুতেই ঘটিতে পারিত না।

তিনি অন্য একজন চিত্রকর—মেলোজো ডা ফোরলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং উর্ব্বিনোর তদানীন্তন ডিউকের লাইব্রেরী-গৃহ চিত্রিত করিবার সময় গুরুকে সহায়তা করেন।

রাফেলের জননী মাজিয়া সিয়ার্লা চরিত্র-মাধুর্য্যের জন্য

সর্ব্বত্র প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাফেলের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর জিওভান্নি পুনরায় বিবাহ করেন বটে, কিন্তু প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের প্রতি কখনও স্নেহবিমুখ হ'ন নাই। পুত্র পিতার নিকটই চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং পিতৃপদবীর অনুসরণে পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উর্ব্বিনো প্রদেশের ডিউক ফেডারিগো এবং গুইডো বলডো ডি মন্টিফেলট্রো কলা-শিল্পের, বিশেষতঃ, চিত্র-বিদ্যার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। সকলশ্রেণীর শিল্পীই তাঁহাদের উভয়েরই নিকট যথেষ্ট আদর ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। ডিউক ফেডারিগো জিওভান্নির গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; এবং তৎপুত্র ডিউক গুইডোবলডো জিওভান্নির পুত্র রাফেলের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। এইরূপ মহদাশ্রয় লাভ করিতে না পারিলে আজ বোধ হয় জগতের কেহই পিতাপুত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেন না। সপ্তদশ বৎসর বয়সে ডিউক গুইডোবলডোর অনুগ্রহে রাফেল ডিউকের চিত্র-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। রাফেলের সৌভাগ্যক্রমে তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর টীমোটিও ভিটি ডিউকের আহ্বানে বলোনা নগরের ফ্রান্সিয়ার চিত্রশালা পরিত্যাগ করিয়া ডিউকের চিত্র-বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে ছাত্রের প্রতিভার স্ফুরণ হইতে লাগিল। গুরু-শিষ্য পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মধ্যে এই ভাব আজীবন অবিচলিত ছিল।

ডিউকের বিদ্যালয়ে যতদূর শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আয়ত্ত করিয়া, রাফেল ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য সহপাঠীর সহিত পেরুজিয়া নগরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার পিতৃবন্ধু পেরুজিনো, সালা ডেল কাম্বিও বা ব্যাঙ্কার্স এক্সচেঞ্জ নামক বাড়ীখানি চিত্রিত করিতেছিলেন। এই প্রাচীন চিত্রকরের যশঃ দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেই খ্যাতি শ্রবণ করিয়াই রাফেলপ্রমুখ ডিউকের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পেরুজিয়া নগরে আগমন করেন। তথায় তাঁহারা পেরুজিনোর চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হন; এবং রাফেল অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। উর্ব্বিনো নগর পরিত্যাগের পূর্ব্বেই চিত্রাঙ্কনে রাফেলের একরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ডিউকের লাইব্রেরীতে ঘেণ্ট

কুমারীর বাগ্‌দান

নগরনিবাসী জাষ্টাস নামক একজন চিত্রকরও চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। রাফেল পেনশিলের সাহায্যে এই চিত্রকরের অঙ্কিত "দার্শনিক" শীর্ষক কয়েকখানি চিত্রের নকল এবং মেলোজো ডি ফোর্লির অঙ্কিত 'আর্টস্' ও 'সায়েন্সেস' শীর্ষক দুইখানি চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। সেই যদৃচ্ছাক্রমে পেনশিলে অঙ্কিত নকলেই তরুণ চিত্রকরের প্রতিভা ফুটিয়া

উঠিয়াছিল। এই নকলগুলি অধুনা রোম, লণ্ডন ও বার্লিনে রক্ষিত আছে।

পেরুজিনোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর এক বৎসরের মধ্যেই রাফেল এক্সচেঞ্জ-বাটীর সৌষ্ঠব-সম্পাদনে গুরুকে সাহায্য করিতে সমর্থ হ'ন। গুরুও শিষ্যের কার্যতৎপরতা দর্শনে চমৎকৃত হ'ন। ক্রমে তিনি স্বাধীনভাবে শিষ্যকে স্থানে-স্থানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনের অনুমতি প্রদান করেন। রাফেলের স্বহস্ত-লিখিত চিত্রের কোন-কোন অংশ এখনও সেই বাটীতে দৃষ্ট হয়। ইহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে ধর্ম্ম ও যুদ্ধদৃশ্যমূলক অন্যান্য চিত্রের মধ্যে রাফেলের বিশ্ববিখ্যাত "ম্যাডোনা"র চিত্রও অঙ্কিত হয়। চিত্রবিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে, স্বাধীনভাবে নিজের উদ্ভাবিত চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরগণের চিত্রের নকলও করিতে হয়। রাফেলের অঙ্কিত এই দুই শ্রেণীরই বহু চিত্র পৃথিবীর নানা স্থানে এক-একখানি রত্নস্বরূপ সমাদৃত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

রাফেলের অঙ্কিত সর্ব্বপ্রথম তৈলচিত্র বোধ হয় সলি ম্যাডোনা। সেখানি এখন বার্লিন নগরে রক্ষিত হইতেছে। এই চিত্র ১৫০২ খৃষ্টাব্দে পেরুজিনোর চিত্রশালায় অঙ্কিত হয়। ইহাতে রাফেলের ব্যক্তিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়; এবং তাঁহার তুলিকা ভবিষ্যতে কিরূপ ধরণের চিত্র প্রসব করিবে, তাহারও কতকটা আভাষ ইহা হইতে পাওয়া যায়। ইহার পরে রাফেল ক্রমে-ক্রমে আরও কয়েকখানি "ম্যাডোনা"-চিত্র অঙ্কিত করেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে রাফেল "কুমারীর অভিষেক" নামে একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। তাহাতে কেবল যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে; তিনি যে অদূর ভবিষ্যতে শক্তিশালী চিত্রকর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন, তাহার পরিচয়ও এই চিত্রেই পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পরে রাফেল ক্রমান্বয়ে "নাইটের স্বপ্ন", "দাম্পিক পরিবার" এবং "দেবদূতগণের প্রতিমূর্ত্তি" নামে কয়েকখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। "নাইটের স্বপ্ন" নামক চিত্রখানি সম্ভবতঃ তাঁহার সিয়েনা নগরে অবস্থান কালে অঙ্কিত হইয়াছিল। এখানি এখন লণ্ডন নগরের ন্যাশানাল গ্যালারীতে রক্ষিত।

সেণ্টপিটারের কারামোচন

রাফেল সিটা ডেল কাষ্টেলো নগরে আগমন করিলে, তত্রত্য সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী সিগনোরেলি এই নবীন প্রতিভাবান চিত্রকরকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বোধ হয়, এইস্থানে অবস্থিতি কালেই রাফেল "বাগ্‌দত্তা কুমারী"র চিত্র অঙ্কন করেন। অনেকের মতে এই চিত্রখানি রাফেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র। তাঁহাদের বিবেচনায় চিত্র-

করের তুলিকা হইতে ইহার অপেক্ষা সুন্দরতর ও মধুরতর চিত্র আর কখনও অঙ্কিত হয় নাই। ইহার কল্পনাও রাফেলেরই অনন্যসাধারণ প্রতিভারই উপযুক্ত। এই চিত্রখানি এখন মিলান নগরে ফে্বার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

ইহার পর রাফেল বলোনা, ফ্লরেন্স প্রভৃতি নগরে একাধিকবার ভ্রমণ করিয়া, এবং কিছুদিন করিয়া অবস্থিতির
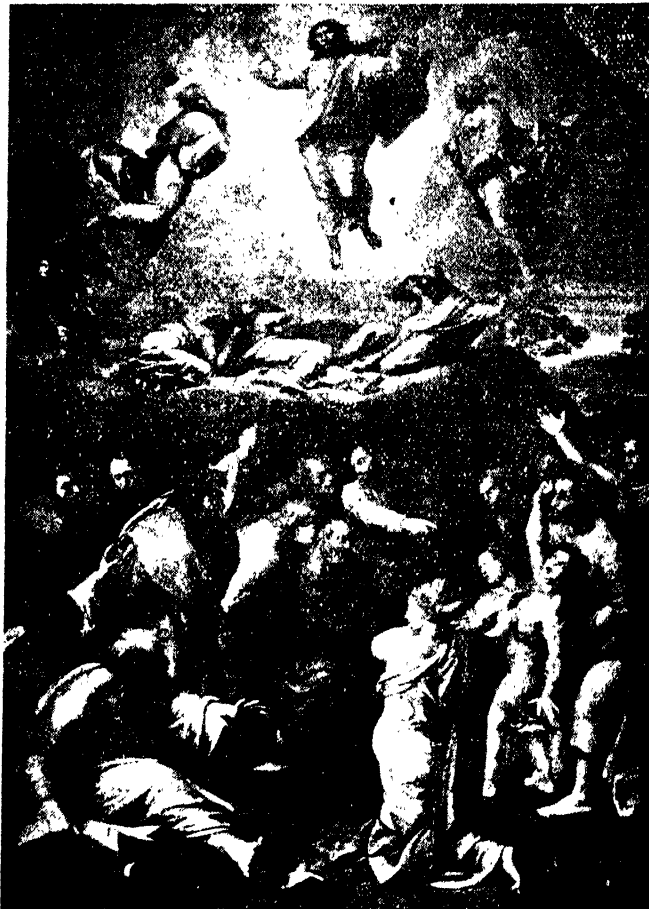
"ট্রান্সফিগারেশন" বা খৃষ্টের রূপ-পরিবর্ত্তন

পর, ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার জন্মভূমি উর্ব্বিনো নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীর বেশে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এই চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি বিজয়ীর বেশে, গৌরবমণ্ডিত, উন্নত মস্তকে উর্ব্বিনো নগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ডিউক গুইডোবল্‌ডো তাঁহাকে সসম্মানে, সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে ডিউকের রাজসভা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার ন্যায় সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক প্রভৃতি শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণে পূর্ণ ছিল। এই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে সকলের সঙ্গে রাফেল সমান আসন প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১-২২ বৎসরের অধিক নহে। তাঁহার প্রত্যাগমনে ডিউকের রাজসভা যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যে উর্ব্বিনো নগরীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আলোক দর্শন করেন, সেই নগরও যেন গুণবান পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া রাফেল নিজেও অল্প আনন্দিত হন নাই। তাহার ফলে তাঁহার তুলিকা "সেণ্ট মাইকেল" ও "সেণ্ট জর্জ্জ" নামক যে দুইখানি চিত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহাদের উজ্জ্বলতা ও বর্ণবিন্যাস তাঁহার তৎকালীন মানসিক প্রফুল্ল অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছিল। কবিতায় যেমন অনেক সময় কবির হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হয়, চিত্রকরের তুলিকাও সেইরূপ শিল্পীর মনোভাব ক্যানভাসে প্রতিফলিত করে। অনেক বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রেই ইহার নিদর্শন বিদ্যমান। রাফেলের এই দুইখানি চিত্র সেইরূপ শিল্পীর তৎকালীন মনোভাব পরিস্ফুট করিয়াছে। এই সময়ে রাফেলের আর-একজন স্তাবক জুটিয়াছিল। ডিউকের ভগিনী ডাচেস্ জিওভান্নি ডেল্লা রোভারী তরুণ শিল্পীর প্রতিভার অনুরাগিণী এবং গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিউকের ন্যায় তিনিও রাফেলকে সর্ব্বদা উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন।

ইতোমধ্যে ফ্লরেন্স নগরে একটী কলাশিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছিল। এই প্রদর্শনীতে বিশ্বের চিত্রশিল্পীগণ তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে লিওনার্ডো ডা ভিনিসি এবং মাইকেল এঞ্জেলো ব্যুনারোটির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য বিষম প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। আল্‌প্‌সের পর্ব্বত-প্রাকার অতিক্রম করিয়া

এই মহাপ্রদর্শনীর সংবাদ উর্ব্বিনো নগরের ক্ষুদ্র একটী চিত্রশালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিশ্বশিল্পী-সমারোহে যোগদান করিয়া স্বীয় শিল্প-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গৌরবলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা রাফেলের তরুণ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। প্রতিভা-প্রদর্শনের এই সুযোগ লাভে তাঁহার হৃদয় যেমন একদিকে আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, পক্ষান্তরে, অকৃতকার্য্যতার আশঙ্কাতেও তিনি তদ্রূপ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আশা-নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্ব তাঁহার হৃদয়ে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রকৃত হৃদয়-ভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া, বহুসংখ্যক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সমাবেশস্থলে যদি কিছু নূতন শিক্ষা লাভ করিতে পারেন এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, ফ্লরেন্স নগরের প্রদর্শনীক্ষেত্রে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই কল্পনার কথা শুনিয়া তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী রাজভগিনী ডাচেস জিওভান্নি তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রাফেলের একজন পুরাতন শিক্ষক তৎকালে ফ্লরেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন। ইহাও রাফেলের টাস্কানী প্রদেশের রাজধানীতে গমন করিবার পক্ষে অন্যতম আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে বিলম্ব ঘটিল না। ১৫০৪ অব্দের গ্রীষ্ম ঋতুর শেষভাগে রাফেল তাঁহার তল্পীতল্পা গুটাইয়া উর্ব্বিনো নগরীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ফ্লরেন্স নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে ডাচেস জিওভান্নি ফ্লরেন্স নগরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে একখানি পরিচয়পত্র লিখিয়া রাফেলের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন,—পত্রবাহক যুবকের নাম চিত্রকর রাফেল। ইনি উর্ব্বিনো নগরের অধিবাসী এবং প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী। ইনি স্বীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছুদিন ফ্লরেন্স নগরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইঁহার পিতা নিজগুণে আমার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্রও আমার পরম স্নেহভাজন। ইনি বিনয়ী, প্রিয়দর্শন যুবক। আমার বিশ্বাস, সুযোগ পাইলে ইনি চিত্রশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন। ইত্যাদি। পত্রখানিতে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরের তারিখ ছিল।

ফ্লরেন্স নগরের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া রাফেল দেখিলেন, পূর্ব্বোক্ত দুইজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচিত—একটি যুদ্ধের কৌতুকাবহ চিত্র পালাজো ভেকসিও নামক স্থানে প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের পাশাপাশি বিলম্বিত রহিয়াছে এবং এই চিত্র দুইখানি উপলক্ষ করিয়া সমবেত শিল্পিগণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ফ্লরেন্স নগরের এখন পূর্ণ গৌরবের অবস্থা। ফ্লরেন্স য়ুরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র। শ্রমশিল্পে, কলাশিল্পে, বিজ্ঞান

কুমারীর অভিষেক

ও সাহিত্য চর্চ্চায় ফ্লরেন্স অদ্বিতীয়। উর্ব্বিনো রাজ্যের ডিউকের রাজসভার আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত রাফেলের চক্ষে বিস্ময়কম্পে সদাব্যস্ত, জনকোলাহলে মুখরিত ফ্লরেন্স নগরী একটা নূতন দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। কবিত্বময় পেরুজিয়া ও সায়েনা নগরের সহিতও কর্ম্মময় ফ্লরেন্স নগরের কত প্রভেদ! চারিদিকে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া
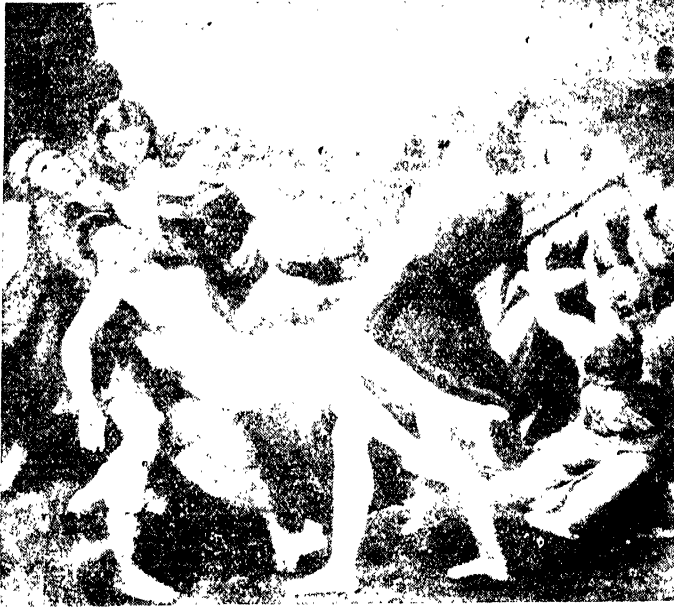
খৃষ্টের সমাধি

উঠিল। তিনি দৃঢ় হস্তে পেনসিল ও তুলিকা ধারণ করিয়া গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিরাট কলাশিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষে সেই সময়ে ফ্লরেন্স নগরে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের সমাগম হইয়াছিল। রাফেল বয়সে নবীন হইলেও, তাঁহার চিত্রাকলা কৌশলের খ্যাতি সেই সময়েই সমগ্র ইটালীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ চিত্রকরের সহিত চাক্ষুষ আলাপ না থাকিলেও, সুনিপুণ চিত্রকর বলিয়া রাফেলের নাম তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। রাফেল ফ্লরেন্স নগরে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহার সমব্যবসায়িগণ-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। সহসা নূতন, অপরিচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার
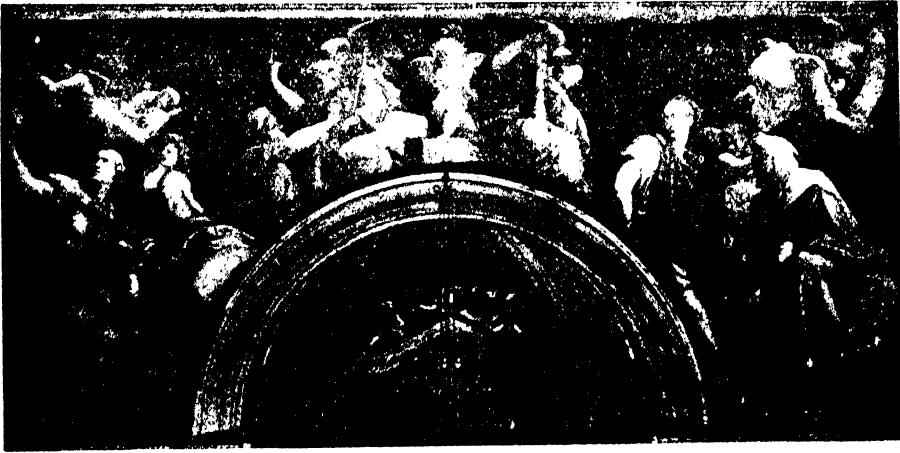
ভবিষ্যদ্বাদিনী চতুষ্টয়

রাফেলের স্বপ্নাবেশমাখা ডাগর চোখ দু'টীতে ধাঁধা লাগিয়া গেল।

তার পর, বাণিজ্য-সূত্রে এবং শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সুকুমার-কলার চর্চ্চায় আকৃষ্ট হইয়া ফ্লরেন্সে তৎকালে য়ুরোপের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইত। এই সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মাঝখানে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া রাফেলের চক্ষের সমক্ষে একটি নূতন জগতের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া

মধ্যে আসিয়া পড়িয়া রাফেল প্রথমে যে একটু বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, স্বনামখ্যাত চিত্রকরগণের সমাজে বন্ধুভাবে গৃহীত হওয়ায় তাঁহার সেই বিস্ময়ের ভাব অচিরে অপনীত হইল।

দেখিয়া-শুনিয়া, মনে-মনে বিচার-বিতর্ক করিয়া, তিনি লিওনার্ডো ডা ভিন্‌সি, বার্টোলোমিও ডেল্লা পোর্টা, এবং এণ্ড্রিয়া ডেল সার্টোকে তাঁহার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতোমধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো আসিয়া, যেন কত কালের পরিচিত বন্ধুর মত, তাঁহার হস্ত-ধারণ করিলেন। পরে আরও অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সকল লোকের নিকট হইতেও তিনি কিছু না-কিছু শিক্ষা লাভ করেন।

দুইজন প্রধান চিত্রকরের যে দুইখানি বাঙ্গ চিত্র পালাজো 'ভেকসিও প্রাসাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে বিলম্বিত ছিল, তাহাদের গুণাগুণ বিচারের জন্য তথায়

ভিনাস, জুনো ও সেরেস

সমস্ত দিন ধরিয়া চিত্রকর, ছাত্র ও চিত্রশিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের মহাজনতা হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে রাফেলই চিত্র দুইখানির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই চিত্র দুইখানির অনুকরণে তিনি যে সকল স্কেচ ও অন্য চিত্র অঙ্কন করেন, তাহার কিয়দংশ "ভিনিস স্কেচ বুক" নামে এখনও রক্ষিত হইতেছে।

ইহার পর রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো-লিখিত "ডেভিড" নামক চিত্রখানির আদর্শে বহু চিত্র অঙ্কন করেন। লিও- নার্ডোর "মোনালিসা" নামক চিত্রখানিও তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের লিখিত বহুবিধ চিত্রের একত্র সমাবেশে রাফেলের সম্মুখে যেন একটি স্বপ্ন-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। উপযুক্ত আদর্শ দেখিলেই, তিনি তাহার নকল করিয়া হাত পাকাইতেছিলেন।

অপরের চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াই রাফেল তাঁহার কার্য্য শেষ করেন নাই। এতদিন তিনি কেবল সৌন্দর্য্য-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। কল্পনাবলে চিত্রে যতদূর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করা যাইতে পারে, এতদিন ইহাই কেবল রাফেলের লক্ষ্য ছিল। ফ্লরেন্সে আগমন করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিত্রকরগণের চিত্রশালা দর্শন করিয়া, তিনি বাস্তব জীবনেও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিলেন। ইহার ফল—তাঁহার "ম্যাডোনা—দি গ্রান' ডুকা"। অনেকেই বিবেচনা করেন, এইখানি তাঁহার চিত্রাবলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী; কারণ, এখানি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চিত্রখানি একটি জননী ও তাঁহার শিশু সন্তানের। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ এই চিত্রে যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তদ্রূপ, মা ও ছেলে—উভয়েরই বদনে স্বর্গীয় সুষমার সমাবেশ দেখা যাইতেছে। চিত্রখানি দেখিলেই, চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তি দুইটিকে সজীব বলিয়া ভ্রম হয়।

ফ্লরেন্স নগরে রাফেল চারি বৎসর বাস করেন। এই সময়ে তিনি বহু মৌলিক চিত্র অঙ্কিত করেন। সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনি লোকপ্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকখানিই বহুমূল্য। এই সময়ে তিনি নিজের একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ লোক প্রসিদ্ধি আছে যে,রাফেল চল্লিশখানি মাতৃমূর্ত্তি (ম্যাডোনা) অঙ্কিত করেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফ্লরেন্স নগরে অবস্থিতি কালে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে, মাতৃস্নেহে এবং শিশুর পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল। এই মাতৃ-মূর্ত্তিগুলি, এবং রোম নগরে পোপ মহোদয়ের প্রাসাদে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া-

অঙ্কিত না করিতেন, তথাপি তিনি স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সম্মানের দাবী করিতে পারিতেন, এবং করিলে, কেহই তাঁহাকে এই সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত হইত না।

কি গুণে রাফেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? চিত্রবিদ্যা সাধনার বস্তু। বিশ্বের কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—"সুন্দরম্!" সেই এক, সেই অদ্বিতীয়,—সেই সত্য, শিব, সুন্দরই—চিত্রকরেরও সাধনার ধন, ভাস্করেরও কাম্য বস্তু। সৌন্দর্য্য-সাধনা করিতে-করিতে চিত্রকর যেদিন সেই পরম-সুন্দরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, এবং চিত্রে সেই 'সুন্দর'কে ব্যক্ত করিতে পারিলেন—সেই দিনই তাঁহার সাধনা সফল হইল; সেই দিনই তিনি হইলেন—মুক্ত। ভাস্কর যেদিন প্রস্তরে তাঁহার সাধনার ধন—সুন্দরকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন, সেই দিন তাঁহার ভাস্কর্য্যের চরম পরিণতি হইল। কি চিত্রকর, কি ভাস্কর—যিনিই চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যের প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সেই সুন্দরকে চিত্রে বা প্রতিমূর্ত্তিতে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন; এবং যিনি যে পরিমাণ নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সহিত সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

রাফেলও সেই সুন্দরের—সেই সুন্দরতরের—সেই সুন্দরতমের সাধনায় জীবনপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একাগ্র সাধনার ফল,—তাঁহার চিত্রগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সৌন্দর্য্যের সাধক তাহাতে সেই আদর্শ সুন্দরের আভাস পাইয়া থাকেন—ইহাই রাফেলের ভক্ত ও চিত্রানুরাগিগণের মত। ফ্লরেন্স নগরে অবস্থিতি কালেই রাফেল সেই সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান

এজেকিয়েলের স্বপ্ন

তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল; কেন না, এই সময়েই তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শের সন্ধান লাভ করিয়া তাহার সাধনায় আত্ম-বিনিয়োগ করেন।

রাফেল ফ্লরেন্স নগরীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। সে ভালবাসার প্রতিদানও তিনি পাইয়াছিলেন। ফ্লরেন্সবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ প্রকাশ করিতে কৃপণতা করেন নাই। রাফেলের আকৃতি অনেকটা স্ত্রীজনসুলভ ছিল। তিনি যখন পথ দিয়া যাইতেন, তখন পথিকেরা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একে অপরকে বলিত, "ঐ যে প্রিয়দর্শন তরুণ যুবকটি দেখিতেছ, উনিই প্রতিভাবান শিল্পী—রাফেল শান্তি।"

ফ্লরেন্স নগরে রাফেল জনকয়েক অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেও চিত্রশিল্পী। প্রতিদিন অপরাহ্ণে

কালে রাফেল, ডা ভিন্সি ও বুওনারোটির সহিত পিয়াজা সিগনোরিয়া অতিক্রম করিয়া মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র-শালায় গমন করিতেন। সেখানে এই বন্ধু-চতুষ্টয় শিল্প সম্বন্ধে নানা প্রকার আলাপ করিতেন। কখনও চিত্রশালাতেই বসিয়া মহোৎসাহে তর্কবিতর্ক চলিত; কখনও বা চারিজনে একত্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে-করিতে শিল্পী-জগতে নবপ্রকাশিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

লা ডোনা ভেলাটা

এইরূপে শিক্ষায়, আমোদে-প্রমোদে, আলোচনায় দিন যাইতেছে, এমন সময়ে রাফেল রোম নগরে আহূত হইলেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে রোমের সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁহার প্রাসাদের কোন কোন অংশ চিত্রিত করিবার জন্য রাফেলকে আহ্বান করিলেন। রাফেল এখনও অপরিণতবয়স্ক যুবকমাত্র, এখনও তিনি শিক্ষানবীশ; কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশবিদেশে এমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পোপ মহোদয় সহস্র-সহস্র শিল্পীর মধ্যে রাফেলকেই মনোনীত করিলেন।

ধর্ম্ম মানবের হৃদয়বৃত্তি। ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের সংস্রবে যে সকল আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা প্রধানতঃ সামাজিক ব্যাপার; প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ই ধর্ম্মের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল কার্য্যই একান্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু হৃদয়ের প্রিয়, তাহাই লোকে দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। এ সংসারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই হৃদয়-দেবতার অর্ঘ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যাহা সুন্দর, তাহা লোকে দেবতাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। গাছের প্রথম ফল লোকে ঠাকুর-দেবতাকে প্রথমেই অর্পণ করিয়া থাকে।

য়ুরোপে পোপের প্রতাপ তখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানে থাকিয়া পোপ মহোদয় যাহাকে যে আদেশ করিতেন, রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইলেও তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘনের সাধ্য ছিল না। সেই পোপ ফ্লরেন্স নগরে সমাগত সহস্র-সহস্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরের মধ্যে তরুণবয়স্ক রাফেলকে নির্ব্বাচিত করায়, তাঁহার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ জন্মিল। রাফেল সানন্দে পোপের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পোপের ভাটিকান নামক প্রাসাদ ঠিক ধর্ম্ম মন্দির না হইলেও, ধর্ম্মের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরুর বাসস্থান বলিয়া ভাটিকান দেবমন্দিরের প্রায় সমতুল্য ছিল। এই প্রাসাদের সৌষ্ঠব সাধনে নিযুক্ত হইয়া রাফেল যে তাহাতে প্রাণমন ঢালিয়া দিবেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এইখানে তিনি যে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে বিনিয়োগ করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ফলেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

রাফেল যথাসম্ভব সত্বর রোম নগরে উপস্থিত হইলেন।

এখানে তিনি যে সমাদর-অভ্যর্থনা লাভ করিলেন, তাহা যে-কোন প্রবীণ চিত্রকরের পক্ষেই আশাতীত—রাফেলের ন্যায় অল্পবয়স্ক শিক্ষানবীশের পক্ষে ত বটেই।

উর্ব্বিনোর ডিউক গুইডোবলডোর সহিত পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের আত্মীয়তা ছিল। সেই সূত্রে পোপ রাফেলের বংশবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং রাফেলের চিত্রনৈপুণ্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ফ্লরেন্স নগরে অবস্থিতিকালে রাফেল যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহাদের খ্যাতি রোম নগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকে ফ্লরেন্স নগরে ভ্রমণ উপলক্ষে রাফেলের অঙ্কিত চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রোম নগরীর প্রাচীন চিত্র-সম্পদের যদি কেহ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন, তবে একমাত্র রাফেলই সেই ভাগ্যবান পুরুষ।

উর্ব্বিনো নগরের ব্রামান্টি নামক একজন চিত্রকর সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা এবং ফ্লরেন্স নগরের বুয়োনারোটি ভাটিকানের কিয়দংশ চিত্রিত করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫০৮ অব্দের শেষভাগে রাফেল আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। পেরুজিনো, সোডোমা, সিগনোরেলি, ব্রামানটিনো, পিয়েরো ডেল্লা ফ্রান্সেস্কা এবং পেরুজি ইতঃপূর্ব্বে ভাটিকানের দেওয়াল ও ছাদ সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পোপ মহোদয়ের আদেশে সেই সকল চিত্র মুছিয়া ফেলা হইল। সেই স্থানগুলি পুনরায় চিত্রিত করিবার ভার রাফেলের উপর অর্পিত হইল। এখানে রাফেল যে সকল চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাদের প্রতিলিপি মিলান, লীলে, লুভার, আলবার্টিনা, উইণ্ডসর এবং অক্সফোর্ডের চিত্রশালায় রক্ষিত হইতেছে। উর্ব্বিনো নগরবাসী রাফেলের যে সকল বন্ধু তৎকালে রোম নগরে বাস করিতেছিলেন, রাফেল প্রায় সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এই মহৎকার্য্যে রাফেল্ আরিয়োষ্টো নামক অপর এক ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাফেলের জীবনী-লেখকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভাষায় এই সকল চিত্রের বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব। বহুদর্শী বিজ্ঞ চিত্রকরের চক্ষু লইয়া

সেণ্ট সিসিলিয়া

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে, ইহাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করাও দুরূহ। এই সমস্ত চিত্রাঙ্কনের সময় রাফেল—পরমার্থতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য ও ন্যায়নিষ্ঠা—এই চারিটি বিষয়কে তাঁহার চিত্রের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন। এই চারিটি বিষয়কে দেবীরূপে কল্পনা করিয়া তিনি প্রথমে তাহাদের চিত্র অঙ্কন করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিতে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সৃষ্টির সহিত তাঁর

সমন্বয়সাধনে একমাত্র রাফেলই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উর্ব্বিনো এবং পেরুজিয়াতে তিনি অমানুষিক, অলৌকিক আদর্শের সাধনা করিতে আরম্ভ করেন, ফ্লরেন্সে তিনি বাস্তব সমাজের সহিত পরিচিত হন এবং realismকেই তাঁহার চিত্রের আদর্শে পরিণত করেন। রোমে তিনি যে শ্রেণীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা এই দুইটি আদর্শের

ম্যাডোনা অ ডায়াডেম

সম্মিলন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকেই এই সম্মিলন-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'ন নাই। প্রেম, দর্শন ও ধর্ম্ম—এই যে তিনটি মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া জগতের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, রাফেল এই তিনটিকে তাঁহার নিপুণ তুলিকার সাহায্যে চিত্রে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

ভাটিকান প্রাসাদে কাল্পনিক পৌরাণিক চিত্রের সহিত রাফেল আধুনিক বাস্তবজগতের বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রাফেলের তুলিকায় চিত্রে প্রতিফলিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'পারনাসাস' নামক চিত্রব্যূহে আরিয়াষ্টো, বোকাসিও, পেট্রার্চ্চ, টেবালডো ও অন্যান্য ব্যক্তির চিত্র দৃষ্ট হয়। 'স্কুল অব এথেন্স' নামক অপর একখানি চিত্রে জোরোয়াষ্টাররূপে কাষ্টি-গলিয়ানো, উর্ব্বিনোর ডিউক ফ্রান্সেস্কো, ফেডারিগো গনজাগা সোডোম এবং রাফেলের নিজের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। "ডিস্পিউটা" নামক চিত্রে দান্তে এবং সাভোনা-রোলার চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরের পরিশ্রমের ফলে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হয়। এই চিত্রাঙ্কনের পারিশ্রমিক স্বরূপ রাফেল ১২০০ ডুকাট অর্থাৎ ২৫০০ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তখনকার দিনে একটি যুবকের পক্ষে ইহা বড় সামান্য নহে। ইত:পূর্ব্বে আর কোন চিত্রকরের ভাগ্যে এইরূপ কার্য্যের জন্য এত টাকা পারিশ্রমিক লাভ ঘটে নাই।

পোপ জুলিয়াস চিত্রদর্শনে পরম সন্তোষ-লাভ করেন। রাফেলের কৃতকার্য্যতার ফল স্বরূপ তিনি তাঁহাকে কেবল অর্থদান করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, তাঁহাকে প্রচুর সম্মানে ভূষিত করিলেন এবং বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। একটি মাত্র 'ষ্টাঞ্জা' এইরূপে সুচিত্রিত হওয়ায় তাঁহার চিত্রকর-নির্ব্বাচন সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া, তিনি অপর দুইটি ষ্টাঞ্জা চিত্রিত করিতে রাফেলকে আদেশ প্রদান করিলেন। এইবার রাফেলকে একটু চিন্তিত হইতে হইল। প্রথম ষ্টাঞ্জার চিত্রাঙ্কনের সময় পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র মুছিয়া ফেলিয়া রাফেলকে স্বাধীনভাবে চিত্রাঙ্কন করিতে দেওয়া হইয়াছিল; এবার তাহা হইল না; এবার তিনি অপরের কল্পিত 'কাঠামো'র উপর চিত্র অঙ্কনে আদিষ্ট

হইলেন। কিন্তু তিনি পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। উপযুক্ত সহকারী ও শিষ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া এবং বন্ধুগণের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক রাফেল নবোত্তমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই দুইটী ষ্টাঞ্জায় যে চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে, ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য, পোপ স্বয়ং তাহাদের বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দির হইতে হেলিওডোরাসের বহিষ্কার, সেণ্ট লিও কর্ত্তৃক আটিলার পরাভব, সেণ্ট পিটারের উদ্ধার, বলসেনার গির্জ্জায় সাধারণ জনগণের উপাসনা প্রভৃতি চিত্রের বিষয় ছিল। এই শেষোক্ত চিত্রের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, এবং স্থানটীর গঠনও চিত্রাঙ্কনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। তথায় প্রচুর আলোকেরও সমাবেশ ছিল না। রাফেল শিষ্য ও সহকারিগণকে অন্যত্র কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া, এই শেষের চিত্রখানি স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন। রাফেলের হাতে পড়িয়া চিত্রের প্রতি বর্ণবিন্যাসে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার প্রতিভা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে, ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে, রাফেলের বন্ধু, উৎসাহদাতা, অভিভাবক পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের মৃত্যু হইল এবং দশম লিও পোপের পদ গ্রহণ করিলেন।

নূতন পোপ তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন কি না, এই ভাবিয়া রাফেল কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। পোপ দশম লিও রাফেলকে কেবল যে চিত্রাঙ্কন কার্য্যে বাহাল রাখিলেন, তাহা নহে; তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাফেল যখন ফ্লরেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন, তখনই পোপ লিও রাফেলের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি নিজেও কলাশিল্প ও শিল্পিগণের অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং প্রতিভাশালী চিত্রকর রাফেল পোপ দশম লিওর স্নেহে বঞ্চিত হন নাই। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ব্রামান্টির মৃত্যুর পর পোপ লিও রাফেলকে সেণ্ট পিটারের গির্জ্জার সর্ব্বপ্রধান স্থপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্ব্যতীত, রোম নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ মাইলের মধ্যে যাবতীয় কীর্ত্তিচিহ্ন, পুরাতন ঐতিহাসিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত অট্টালিকা এবং তাহাদের ধ্বংসাবশেষ রক্ষার্থ রাফেলের হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইল।

রাফেলের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। চিত্রাঙ্কন

দেবদূতাগমন

কার্য্য করিতে করিতেই তিনি ভিট্রুভিয়াস নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ যাবৎ রোম নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সে যথেচ্ছভাবে মূল্যবান মর্ম্মরপ্রস্তরসমূহ এবং প্রতিমূর্ত্তিসমূহের ভগ্নখণ্ড সকল স্থানান্তর করিতেছিল। রাফেল কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া এই অপহরণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। উৎকীর্ণ শিলার অনুসন্ধানে তিনি লোক নিযুক্ত করিলেন।

তাহারা যে সকল শিলা তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে লাগিল, তাহা তিনি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেণ্টপিটারের গির্জ্জায় দুইটি প্রধান ত্রুটি ছিল। তাহার ভিত্তি তাদৃশ দৃঢ় ছিল না; তাহার গম্বুজটীও পতনোন্মুখ হইয়াছিল। প্রথমে তিনি গির্জার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া ফেলিলেন। তার পর অতিরিক্ত স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়া গম্বুজটীর পতন নিবারণ করিলেন। ক্রমে তিনি সমগ্র গির্জাটির এমনভাবে সংস্কার করাইলেন যে, সেটি প্রায় নূতন গির্জাতেই পরিণত হইল।

এদিকে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাটিকানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষ্টাঞ্জা চিত্রিত করিতে নিযুক্ত হইলেন। কেবল তাঁহার গুরু পেরুজিনোর অঙ্কিত মূল চিত্রগুলি রক্ষা করিয়া তিনি অপর সমুদায় স্থলে নূতন করিয়া চিত্রাঙ্কন করিলেন।

ক্রমে বাহির হইতে অনেক কার্য্য রাফেলের হাতে আসিতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অর্থ ও সম্মান প্রচুর পরিমাণে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে লাগিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজের বাসের জন্য রোম নগরে ভাটিকানের অনতিদূরে বোর্গো নিউওভো নামক স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া উর্ব্বিনোর দুর্গের অনুকরণে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁহার নিকট চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য বিদ্যা, খোদাই কার্য্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ আগমন করায় তাঁহার গৃহখানি 'টোলে' পরিণত হইল। রাফেল রাজারাজড়ার ন্যায় দাসদাসী, লোকজন-পরিবৃত হইয়া, মহাসমারোহে ও আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন বটে, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ছাত্রগণের শিক্ষাকার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। তিনি যখন সেণ্টপিটার্স গির্জ্জা বা ভাটিকানে কায করিতে যাইতেন, তখন আমাদের দেশের প্রাচীন কালের মুনিঋষিগণের ন্যায় বহুসংখ্যক শিষ্য ও ছাত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। ১৫১৭ অব্দে ভাটিকানে তৃতীয় ষ্টাঞ্জার অঙ্কন-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

এ যাবৎ আমরা রাফেলের পারিবারিক জীবনের কোন পরিচয় পাই নাই। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের প্রথা আছে। রাফেলের সম্বন্ধে এরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে রাফেলের জীবনী লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে জনশ্রুতি এই যে, তিনি একবার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

চিত্রাঙ্কনের জন্য সকল সময়ে কল্পনার উপর নির্ভর করা চলে না; সময়ে-সময়ে জীবিত ও প্রত্যক্ষ আদর্শের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ নারীচিত্রাঙ্কনের সময়ে নারী-জাতির হাবভাব, উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মানা অবস্থায় তাঁহাদের বিশেষ-বিশেষ অঙ্গভঙ্গির হুবহু অনুকরণ এবং চিত্রে সেগুলিকে প্রতিফলিত করিতে হইলে, অনেক সময়ে জীবিত আদর্শের সাহায্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। য়ুরোপে চিত্রকরেরা এই কারণে পারিশ্রমিক দিয়া সুন্দরী রমণী-গণকে নিজেদের সম্মুখে বসাইয়া বা দণ্ডায়মানা রাখিয়া চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত হন; এবং দক্ষ চিত্রকরের হস্তে ক্যানভাসের উপর ঐ নারীমূর্ত্তির অবিকল নকল ফুটিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, রাফেলকেও বহুবার এইরূপ আদর্শের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহারা পারিশ্রমিক লইয়া চিত্রকরের আদর্শ হয়, তাহারা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রা স্ত্রীলোক। কিন্তু কখন-কখনও উচ্চ, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রশ্রেণীর মহিলারা সখ করিয়া চিত্রকরের আদর্শ হইয়া থাকেন। এইরূপ চিত্রাঙ্কনের সময় আদর্শগণকে দিনের পর দিন—প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। আদর্শ ও চিত্রকর অবিবাহিত এবং সমাবস্থাপন্ন হইলে এইখানেই প্রেমের অবকাশ ঘটে। রাফেলের এই প্রণয়পাত্রীর নাম প্রকাশ পায় নাই; রাফেল নিজেও তাঁহার একটি সনেটে লিখিয়াছেন যে, এই কুমারীর নাম তিনি এ মরজগতে কোন লোকের নিকট প্রকাশ করিবেন না—হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রাখিয়া গোপনে পূজা করিবেন। এই মহিলার সহিত তাঁহার মিলনের কোন আশাই নাই; কারণ সামাজিক হিসাবে এবং রূপে, গুণে এই মহিলা তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চতর স্তরে অবস্থিতা। রাফেল ইঁহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার নিম্নে লিখিয়া দেন, "অবগুণ্ঠিতা"। বলোনা নগরে "শান্তা সিসিলিয়া" নামে আর একখানি চিত্র আছে; রাফেল তাহাতেও এই মহিলার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে সেণ্ট মেরী ম্যাগডালেন

নামে অভিহিত করিয়াছেন। ম্যাডোনা ডি সান সিষ্টো নামক অপর একখানি চিত্রেও রাফেলের এই প্রণয়পাত্রীর চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এই কুমারীর নাম মার্ঘেরিটা; অনেকে অনুমান করেন, ইনি বড়-ঘরানা।

রাফেলের সম্বন্ধে আরও একটি প্রেমের অভিনয়-কাহিনী শুনা যায়। এই দ্বিতীয়টা অনেকটা প্রকৃত...প্রথমটীর মত অতটা সন্দেহজনক নহে। ইনি উর্ব্বিনোনিবাসী রাফেলের অন্যতম বন্ধু কার্ডিনাল বিবিয়েনার ভ্রাতুষ্পুত্রী মেরিয়া বিবিয়েনা। সম্ভবতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু পোপ এই বিবাহে সম্মত ছিলেন না। তিনি রাফেলকে কার্ডিনালের পদে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। বিবাহ করিলে, কার্ডিনালের পদ প্রাপ্তি ঘটে না; এবং কার্ডিনালের পদ গ্রহণ করিলে বিবাহের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। একদিকে মনোমোহিনী পত্নী ও সুখময় গার্হস্থ্য জীবন, অপর দিকে কার্ডিনালের মহাসম্মানজনক কৌমার জীবন ..এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া রাফেল যখন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মেরিয়ার মৃত্যু হয়। রাফেলের একান্ত অনুরোধে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ মেরিয়ার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হয়। মেরিয়ার মৃত্যুর পর রাফেল কার্ডিনালের পদ লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। রাফেল তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাফেল স্বয়ং বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবন চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভের পরিপন্থীস্বরূপ।

চিত্র বিদ্যায়, বিশেষতঃ ভাস্কর্য্যে, প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে, শারীর-স্থান-বিদ্যা (anatomical studies) কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিতে হয়। রাফেলও শারীরস্থান-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, চিত্রের ন্যায় তাঁহার স্বহস্তখোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলিও শিল্পসৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত।

রাফেল তাঁহার চিত্র-বিদ্যায় সাফল্যলাভ সম্বন্ধে নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, "সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কন করিতে হইলে আমাকে বহু সুন্দরী রমণীর আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে হইত; তাহার পর আমি আমার অন্তরের মধ্যে আমার আদর্শ সুন্দরীর আকৃতির কল্পনা করিয়া লইতাম।" ইহারই ফলে রাফেল তাঁহার মানবী-মূর্ত্তিতে স্বর্গীয় সুষমার সমাবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

রাফেল সর্ব্বশেষ যে ছয়খানি ম্যাডোনা-চিত্র অঙ্কিত করেন, তন্মধ্যে ম্যাডোনা ডি সানসিষ্টো সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। অনেকে বিবেচনা করেন, এইখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র।

রাফেলের অসংখ্য চিত্রের সকলগুলির পরিচয় দিই, আমাদের এমন স্থান নাই। সেইজন্য এইখানেই ইতি করিতে হইল। রাফেলের জীবন আগাগোড়া পবিত্র ছিল। নিষ্পাপ শরীরে পূত চিত্তে ১৫২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল গুডফ্রাইডের পুণ্য-দিবসে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্য্যের সাধনায় সফলতা লাভ করিতে হইলে, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকা আবশ্যক। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার মধ্যে অতি নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে সৌন্দর্য্য সাধনা নিষ্ফল।

রাফেল শেষ জীবন রোম নগরেই অতিবাহিত করেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে আসিবার পর তিনি আর কখনও অন্যত্র গমন করেন নাই। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের জন্য প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত রোমের চিত্র-বিদ্যালয় সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

—

চীনের "তাও"-সাধক কবিবর চু-কুঙ্*

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ]

সাধক কবি, ভক্ত কবি, ধ্যানী কবি, যোগী কবি, তত্ত্বদর্শী কবি, ঋষি কবি, ইত্যাদি শ্রেণীর কবি ভারতবর্ষে হাজার-হাজার। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর কবিকে "মিষ্টিক" কবি বলা হইয়া থাকে। ইঁহারা দুনিয়ার চরম তত্ত্বের আলোচনা করেন—কেবল আলোচনামাত্র নয়, জীবনে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এবং শেষ কথা এইরূপ :—"আমি ও ভগবান্ এক বস্তু। সেই ভগবানে আমি ডুবিয়াছি—অথবা ভগবান্ আমার মধ্যে দেখা দিয়াছেন। আমার আত্মা সেই বিরাট আত্মায় লয় প্রাপ্ত হইল। আমি অনন্ত সুখে ভাসিতেছি। আমি মুক্তি-লাভ করিয়াছি।" এই মুক্তির ব্যাখ্যা, এবং এই মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনা করা, সাধক কবিদিগের রচনায় স্থান পায়। কখনও বা দেখি যে, "মুক্ত" জীব নিজের অবস্থাটার বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। মুক্ত অবস্থার খেয়াল, ধারণা এবং চিন্তাপ্রণালী সেই সকল বর্ণনায় আমাদের নিকট খানিকটা বোধগম্য হয়।

বাঙ্গালী অন্যান্য সকল সাধককে ভুলিলেও, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদকে কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। সেইরূপ চীনারাও তাহাদের হাজার-হাজার সাধক কবির নাম ভুলিলেও, চু-কুঙ্-তুর নাম ভুলিবেন না। এই চু-কুঙ্ নবম শতাব্দীর লোক (খৃঃ ৮৩৪-৯০৮)। ইঁহাকে চীনা সাহিত্যে "তাঙ্ আমলের শেষ কবি" বলা হইয়া থাকে।

সাধনার নানা সাম্প্রদায়িক নাম দুনিয়ার সকল দেশেই আছে। মোটের উপর, সকল সম্প্রদায়ই শেষ পর্য্যন্ত একই সাধনতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। চু-কুঙ্ "তাও"-ধর্ম্মের অনুমোদিত সাধন-প্রণালীর প্রচারক। "তাও" শব্দের অর্থ "পথ"। আমরা "পন্থাঃ" শব্দ আধ্যাত্মিক সাহিত্যে যে অর্থে ব্যবহার করি, "তাও" শব্দের অর্থও তাহাই। রামপ্রসাদকে "কালী"-সাধক বলিয়া জানি। চীনের কবিবর সেইরূপ "তাও" সাধক। ইনি "তাও" বা পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

"আমার আমার করি' মত্ত হই অনিবার ;
ইন্দ্রিয়াদি দারা-সুত কেহই নহে কার !
কিন্তু আমি কোন্‌খানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোন্ পথেতে গেলে, দে মা বলে, 'আমি' মেলে
দীন রামে আর ভ্রমে রেখো না নিস্তারিণি !
তনয়ে তার তারিণি !"

এইরূপ সকল সাধকই কাঁদিয়া থাকেন—"কোন্ পথেতে গেলে, দে মা বলে' 'আমি' মেলে"। কেহ 'মা' 'মা' করিয়া হা-হুতাশ করেন, কেহ বা আর কোন নামে সেই অজানা, অবুঝা বস্তুকে ডাকিয়া থাকেন। চু-কুঙ্ সেই "আমি" খুঁজিতেই বাহির হইয়াছিলেন। চীনাদের অন্যান্য বড় কবিদের মত ইনিও মহাপণ্ডিত, এবং দরবারের বড় চাকুরে ছিলেন। কিন্তু সংসার ভাল লাগিল না—ঘরবাড়ী ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। এই ধরণের সন্ন্যাসী হওয়া ভারতবর্ষেই একচটিয়া নয়। চীনে হাজার-হাজার গৃহত্যাগী, ধ্যাননিরত, চোখবুজা, সাধক, ভক্ত, ধ্যানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর তাঁহাদের অভিজ্ঞতায়-পাওয়া সত্যসমূহ সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছে। চু-কুঙের বাণী শুনিলেই যে-কোন ভারতবাসীই বলিবেন—"এ যে হিন্দুর যোগের কথা! অথবা "এ যে কবীরের উন্মাদ!" অথবা "এ যে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!" অথবা "এ যে বৈদান্তিক একত্ব!" ইত্যাদি। বস্তুতঃ, উহা বৈষ্ণবও নয়, শাক্তও নয়, শৈবও নয়,—উহা সাধনপ্রণালী। দুনিয়ার চরম তত্ত্ব সর্ব্বত্রই এক প্রকার। তুমি-আমি চরম তত্ত্ব পছন্দ না করি—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু চরম তত্ত্ব ভাবিতে গেলে,

* "হিমাচলের অপর পার" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

খৃষ্টান মিষ্টিক আর বৈষ্ণব প্রেমিক, চীনা তাও-পন্থী আর মুসলমান সুফী—এক ঘাটেই জল খাইবেন। কেহ হয় ত এই জলের নাম দিবেন, 'সিরাজি সরাব'; কেহ হয় ত বলিবেন, উহা 'প্রেম'; কেহ বলিবেন, "উহা ভগবান্ বা অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুবিশেষ"; কেহ বলিবেন, "উহা তাও"; কেহ হয় ত বলিবেন—"উহা আমি"; কেহ বা বলিবেন—"উহা শূন্য"; আর কেহ বলিতে পারেন—"ব্রহ্ম, ওভার সোল বা ঐ জাতীয় কিছু।" নানা নাম দেওয়ার ফলে, ব্যাখ্যায় এবং "মুক্তির" স্বরূপ বর্ণনায় কিছু-কিছু পার্থক্য আসিয়াও জুটে।

ছু-কুঙের চব্বিশটা কবিতা পড়িলেই মনে হইবে—"তাই ত, এ ত ঠিক আমারই কথা! তবে কিছু যেন প্রভেদ আছে!" কবিতাগুলি জাইল্‌সের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে। কয়েকটার অনুবাদ ক্র্যান্মার বিঙ্ও দিয়াছেন।

(১)

ছু-কুঙ্ অসীম শক্তির কেন্দ্রে পৌঁছিতে চাহিতেছেন।

শক্তিরে উড়াও কেন বাহিরের কাজে?
অন্তরের দুনিয়ারে কর ভরপুর।
যেতে হবে মহাশূন্যের রাজ্যে বন্ধনহীন;
তার তরে জমাও শক্তি সর্ব্বদা প্রচুর।
কেন্দ্র সে মুল্লুক গোটা দুনিয়ার;
জবরদস্ত আঁধারে সে ঢাকা;—
এ আঁধার মেঘে ভরা; আর হেথা
তুফানের জোরে খাড়া না যায় থাকা।
বুদ্ধি ধারণার মুল্লুক নয় সে স্থান;
নিজের সাথে লয়ে মাল চরম জ্ঞানের;
পৌঁছে সেথা বসিব খাতির জমা,
মস্‌গুল্ রোজ পেয়ে ভাগ অসীম ভাণ্ডারের।

(২)

ছু-কুঙ্ নিবিড় শান্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

শান্তি সে রহে নীরবতায়;
গিরিতে, মাঠে সে না রয়;
অনন্ত সুরে সে ধোয়া;
উড়া একক পাখীর সঙ্গ সে লয়।
শান্তি ঠিক যেন বসন্তের বায়
পোষাক যে ফুলায় ফুৎকারে;
শান্তি বাঁশীর আওয়াজ যেন
নিজের করতে চায় হৃদয় যারে।
না ছুঁয়ে পেলে, কাছে সে
অতি; ছুঁলে না দেয় ধরা;
রূপ তার বদল হয় অনিবার,
ছেড়ে পলায় শান্তি ত্বরা।

(৩)

বসন্তের সমাগমে কবি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত হইতে দুনিয়ার রূপের সনাতন প্রভাব সম্বন্ধে কয়েক কথা বাহির হইল।

ভর্‌ল দুনিয়া বসন্তের দানে;—
জঙ্গলা দেশের দীঘির ভিতর
কুমুদ, কমল জলের শোভা,
অতি রূপবতী বালিকা তায়।
ঝুঁকেছে পীচ গাছ সব পাতার ভারে,
ঝোঁপে নিঃশ্বাস ফুরফুরে হাওয়া,
নদী কিনারায় উইলোর ছায়া,
চিড়িয়া সোণার বরণ সেথায়।
হিয়া মাতোয়ারা রূপের বশে;
সুন্দরের পানে ছুটল দিল্;
অমনি চিত্ত উঠল ভরে'
রোজ তাজা এই পুরানা কথায়।

এই পুরা'না অথচ তাজা কথাটা কি? প্রতি বৎসর বসন্তের আগমন? না চিত্তের উপর বসন্তের প্রভাব? যাহা হউক, এই কয় লাইনে বুঝা গেল যে, কবি-সাময়িক ভোগে মগ্ন থাকিতে-থাকিতেই ধাঁ করিয়া "সনাতনে"র কথা ভাবিলেন। এইটুকুই মিষ্টিসিজ্‌ম্। প্রতি বৎসরই বসন্ত আসিয়া থাকে; এই উপায়ে জগতে চিরযৌবন বিরাজ করে। অথবা মানুষমাত্রেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। এই সনাতন কথাটার মধ্যে তেমন মারাত্মক গূঢ় "রহস্য" বিশেষ কিছু নাই, বলা বাহুল্য।

(৪)

প্রেমমুগ্ধ মানুষমাত্রেই বিরহেও মিলনের সুখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রেমিকমাত্রেই এই হিসাবে ধ্যানী, বা যোগী, বা মিষ্টিক। প্রেম-সাহিত্য এই কারণে রহস্যময় বা মিষ্টিক সাহিত্য। সকল স্থলেই ভগবানে-মানুষে প্রেমের কথা বুঝিবার আবশ্যকতা নাই। চামড়ার শরীরওয়ালা মানুষে-

মানুষে প্রেমের ধর্ম্মও এই। ছু-কুঙ্ এইরূপ প্রেম-"যোগ" সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখিয়াছেন। রাধার প্রেমযোগ, কবীরের প্রেমযোগ, সুফীর প্রেমযোগ, আর দান্তের প্রেম-যোগও এই বস্তু।

সবুজ "পাইনে"র কুঞ্জমাঝে খ'ড়ো কুটীর,
সূর্য্য ডুবে ঝরঝরে হাওয়ায় গড়িয়ে;
পায়চারি কর্‌ছি একলা অনাবৃত শির,
কচিৎ দু'একটা পাখী গায় র'য়ে র'য়ে।
কত দূরে আছে মোর প্রিয়া সুন্দরী!
হংসীর দল সেথা যেতে পারে না উড়ে;
রয়েছে সে কিন্তু মোর গোটা হৃদয় ভরি
যেমন সেই সোণার কালে; সে যায়নি ছেড়ে!
কালো মেঘ দরিয়ার উপর আঁধার বাড়ায়;
চাঁদিনী-মাথান দ্বীপ ভাস্‌ছে জলে;
(কিন্তু) বারিধারার বিরোধেও প্রেম না ভুলায়;
মধুমাখা কথা মোদের এখনও বলে।

(৫)

একজন "আদর্শ" পুরুষ বা অসীম শক্তিসম্পন্ন বা অমর ব্যক্তির কথা বলা হইতেছে। তিনি মহাউচ্চ স্থানে বিরাজ করেন। আর তিনি অতি পুরাতন লোক। কোন "সত্য-যুগে"র অবতার বিশেষ আর কি।

অমর সে যায় আত্মার বলে
করে ল'য়ে কমল,
অনন্ত কালে গতি তার
পথহীন শূন্যে তার চল্‌।
'সপ্তর্ষি' হ'তে চাঁদ আর সে
বেরিয়ে হাওয়ায় বেড়ায়;
হুয়া-পাহাড় আঁধার ভরা,—
তায় ঘণ্টা বাজে ধরায়।
মূর্ত্তি তার আর দেখা না যায়
মর-মুল্লুকের পার;
নামদার বাদশা হুয়াঙ্ আর য়াও
ছাঁচে ঢালা তাহার।

হুয়াঙ্ বাদশাকে "পীত" সম্রাট্ বলা হইয়া থাকে। ইনি মান্ধাতার আমলের একজন নরপতি। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭০৪ হইতে ২৫৯৫ পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার রাজত্বকাল। চীনা সভ্যতার অনেক গোড়ার জিনিষ তাঁহারই উদ্ভাবিত বলিয়া পরিচিত। য়াও (খৃঃ পূঃ ২৩৫৭—২২৫৮) চীনের রামচন্দ্রবিশেষ। রাজা ত রাজা য়াও রাজা! কাজেই এই দুইজন পুণ্যশ্লোক বাদশা সেই "অমর" পুরুষেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রণাং মাত্রাভিনির্ম্মিতো নৃপঃ।"

(৬)

ছু-কুঙ এইবার একজন প্রকৃতিনিষ্ঠ ব্যক্তির জীবন চিত্রিত করিতেছেন। এই বর্ণনাটা যে-কোন ভাবুকের জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এখানে গভীর তত্ত্ব কিছুই নাই। তবে প্রকৃতি-পূজাটাই গভীর রহস্যময়!

জেড্‌পাথরের কেট্‌লিভরা বসন্তবাহার সরাবে,
কুঁড়ে ঘরের খ'ড়ো চালা ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিস্রাবে।
নীরবে বসিয়া আছে কুটীরের ভিতর ভাবুক ধীর,
ডাইনে-বাঁয়ে শোভা পায় তার বাঁশগাছ সরল দীর্ঘ
সুস্থির।
বাদ্‌লা-কাটা আকাশের গায়ে
সাদা সাদা মেঘের বাস,
গাছের ঘন ঝোপের মাঝে
পাখীদের এখন মহোল্লাস।
সবুজ তরুর ছায়ার তলে
মাথা তাহার বীণার উপর,
শুনা যাচ্ছে ঊর্দ্ধ দিকে
নির্ঝরিণীর জলের ঝর্‌ঝর্‌।
মর্ম্মরিয়ে পাতা পড়ে,
রা করবার নাই কেহ সেথা,
নিবিড় ধ্যানে মগ্ন কবি
"কৃষ্ণানৃথিমাম্" শান্ত যথা।
মাসের মাসের ফুলের গৌরব
চিত্ত তাহার ভরে' আছে,—
প্রকৃতির এই গ্রন্থ পাঠেই
জীবনের মূল্য তার কাছে।

(৭)

ছু কুঙ্ "চিত্ত-শুদ্ধি'র প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, প্রণালীটা সবিশেষ বলা হয় নাই। "চিত্ত শোধন কর"—এই পর্য্যন্তই যেন দেখিতেছি।

ঝেড়ে নিতে হয় খনির লোহা ;
সীসা ফেল্‌তে হয় রূপা হ'তে ;
হৃদয় তোমার কর পরিষ্কার,—
ঝুটা ছেড়ে রাখো সাচ্চা অমল।
সরোবর ময়লাহীন বসন্তের,—
সে যেন আর্শী তুনিয়ার ;
আত্মারে কর দাগহীন খাঁটি
চাঁদের কিরণে ছেড়ে যাও ধরাতল।
তাকাবে কেবল তারার পানে ;
হামেশা গায়িবে সন্ন্যাসীর গান ;
আজ্‌কার জীবন জেনো—ভাসা জল,
গত কল্যই ছিল চাঁদ উজ্জ্বল।

'গতকল্য' শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্ম। তখন আত্মা বিরাট আত্মার সঙ্গে বা মধ্যে ছিল। কাজেই, সেই জীবনটাই আসল জীবন। আর এই জন্মটা কিছুই না,—গড়িয়ে যাওয়া জলমাত্র। এই জন্যই কেবল তারার দিকে উঁচুতে তাকাতে হবে। এখানে মিষ্টিসিজ্‌মের মাত্রা দস্তুর মতই আছে। সীমায় সুখ নাই, অসীমেই সুখ। যদি মাতিতে হয় ত অনন্ত, চিরস্থায়ী, সনাতনে মাতো। ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইবার তাৎপর্য্য এই। নির্ম্মল সরোবরের দৃষ্টান্তটা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে পরিচিত বস্তু। আর চাঁদের কিরণে আসা-যাওয়া আমাদের ধ্যানীদের মহলে খুবই জানা আছে। মোটের উপর, কবিতাটা হিন্দু জনসাধারণের মন মাফিক।

(৮)

ছু-কুঙ্‌ মানুষের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। আদর্শটা এই—"শক্তি অর্জ্জন কর ; শক্তিমান হও ; সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্‌ হও। ভগবানের সাহায্যকারী হও। বিশ্বেশ্বরের পারিষদ্‌বর্গের অন্যতম হও।" অর্থাৎ যদি কিছু হ'তে হয়, ত হও তুনিয়ার ঈশ্বর ; অন্ততঃ পক্ষে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম বা ইঁহাদেরই একজন। এই আদর্শ ও লক্ষ্যই হিন্দুর চিন্তায় বিরাজ করিয়া থাকে। শক্তিপূজক হিন্দু অন্য কোন মন্ত্রে বেশী মাতে নাই।

বাড়াও চিত্ত ঐ শূন্যের সমান ;
কেড়ে লও বিরাট রামধনুর প্রাণ ;
উড়ে যাও উ-পাহাড়ের চূড়ায়
মেঘ সনে ; দৌড়ে পিছে ফেলে বায় ;
পান কর আত্মার রস, তেজ কর ভোগ,
রোজ জমাও এই আর কর প্রয়োগ।
হও হর্ত্তা-কর্ত্তা বিশ্বশক্তির,
জগদীশ-প্রায় রাখ শক্তি স্থির।
আকাশ-পৃথিবীর হও জুড়িদার,
মালিক—তুনিয়ার ভাঙ্গা-গড়ার।
সবারই তেজ তুমি কর মজুত,
নিজ জীবন সদা রাখ্‌তে মজবুত।

শক্তি সাধারণতঃ "স্থির" থাকে না। খরচ করিতে-করিতে তেজ কমিয়া যাইবারই কথা। কিন্তু জগদীশ্বরের শক্তি কমে না, যতই খরচ হউক। কাজেই মানুষের আদর্শও তাই। শক্তি খরচ করিতেই হইবে। রোজই উহার প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত—যেন উহা না কমে। শক্তি জমাইয়া রাখিবার উপদেশ ছু-কুঙ বারবার দিতেছেন। এই জন্যই ইনি নীরবতা, নিবিড় শান্তি ইত্যাদির তারিফ্‌ এত করেন। শক্তি-সঞ্চয়ের অবস্থায় নীরব সাধনাই আবশ্যক। এইজন্যই প্রকৃতি নিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠে। সংসারের নরনারীর প্রেম হইতে চরম ভগবৎ-প্রেম পর্য্যন্ত সকল প্রেমযোগের সাধনই এইরূপ। হট্টগোলের ভিতর বাজারে দাঁড়াইয়া প্রেমিক, সাধক, ভক্ত বা যোগী কাজ হাঁসিল করিতে পারেন না।

(৯)

ছু-কুঙ বুঝাইতেছেন :—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তৎ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

চীনা কবিবরের চিন্তায় সন্তোষ কি, এখন দেখা যাউক।

দিল্‌টা যদি থাকে ভরা রত্নে, খেতাবে,
চক্‌চকে সোণার ঝলকের কথা কে ভাবে ?
ধনী সাউকারদের আমোদ ফুরায় ত্বরা,
কাঙালের সোজা জীবন সদা সুখে ভরা।
দরিয়ার কিনারায় টুক্‌রা এক কুয়াশার,
গাছের শাখায়, ফুলে ফেরোজা রঙের বাহার ;
ফুলবাগানে ঘেরা কুটীর চাঁদিনী-মাখা,
সাঁকো এক চিত্রে আঁকা ছায়ায় আধা দেখা ;

প্রেমের পেয়ালায় ভরা অমর লাল মদিরা,
সখা এক সহৃদয় বীণা হাতে করা ;—
এই সবে মাতে যে তারে বলি সুখী,
হৃদয় বাড়াবার উপায় আর ত না দেখি।

কবিতাটি "কথামালায়" স্থান পাইতে পারে। বস্তুতঃ, দুনিয়ার সকল সাহিত্যেই নীতি-কথাগুলি একমাত্র শিশু-জীবনের উপযোগী। বাইবেল, কোরাণ, মনুসংহিতা, কন্‌ফিউসিয়াসের উপদেশ—এই সব বালক-বালিকাদিগের জন্যই রচিত। বয়স বাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সমুদয় বচন মানুষের আবশ্যক হয় না। ঐ সমুদয় তখন হয় শিকায় তোলা থাকে, আর না হয়, ঐগুলির মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য বড়-বড় বই লেখা সুরু হয়।

(১০)

কবি বলিতেছেন যে, মহাকষ্ট কল্পনা করিলেই চরম সত্য লাভ করা যায় না। সহজে, সরলভাবে, অতি স্বাভাবিক উপায়েই জীবনের উচ্চতম, দুরূহতম কাজগুলি শেষ করিতে পারি। হাড়ভাঙা খাটুনি, বুকফাটান হা-হুতাশ, ভ্রুকুটি-পূর্ণ বদনমণ্ডল, খিট্‌খিটে মেজাজ, শশব্যস্ত ভাব ইত্যাদি বড়-বড় কাজের আনুসঙ্গিক নয়। কবিরা, শিল্পীরা এই কথা বেশ বুঝিবেন। উচ্চতম শিল্প সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি একপ্রকার বিনা আয়াসেই সম্পন্ন হয়। সাধকেরাও ঠিক এই কথাই বলিবেন। প্রেমিকও এই কথাই বলিবেন। "যতন করিলে রতন মিলে, ছিল যে মনে ধারণা ;—
জেনেছি জেনেছি প্রণয়েরই রীতি,
যতনে রতন মিলে না, মিলে না।

ছু-কুঙ্ বলিতেছেন—"ওহে বাপু, যতনে রতন মিলে না, মিলে না। স্বভাবের উপর নির্ভর কর—হৃদয়ের খাঁটি বিকাশের উপর নির্ভর কর—বিধিদত্ত শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর কর। তাহা হইলেই অসাধ্যসাধন করিতে পারিবে। "রাত্রি জাগিয়া এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটিলেই কবি ও শিল্পী হওয়া যায় না। রাস্তায় হাঁটিতে-হাঁটিতে পথ ভুলিয়া যাইতে অভ্যাস করিলেই, ধ্যানী ও মিষ্টিক হওয়া যায় না।"

রত্ন—সে ত পদতলে !
ডাইনে-বাঁয়ে ঢুঁরা বৃথা।
সকল পথেই পাবে তারে ;
এক আঁচড়েই বসন্ত হেথা।
হয়েছে ফুল ফুট'-ফুট',
নববর্ষ আসে-আসে ;
হাত দিব না তাদের গায়ে,
জোর করলে তারা পড়বে খসে'।
থাক্‌ব আমি মুনি হ'য়ে
কিম্বা শেওলা পুকুর ধারের
আবেগে ভ'রে উঠ্‌লে মন,
তারে মিশাব বিশ্বসুরে।

কবিতাটা গভীরতম অভিজ্ঞতার ফল। যে-সে লোক এই কয় লাইন লিখিতে পারিবেন না। এক আঁচড়ে বসন্ত ফুটাইবার ক্ষমতা ওস্তাদ চিত্রকরদিগের থাকে। হাজার ঘসিয়া-মাজিয়াও যে জীবন বাহির করা গেল না, ওস্তাদ মহাশয় একবার তুলি লেপিয়াই তাহা বাহির করিলেন। মূলে এই কবিতাটার দাম নিশ্চয়ই লাখ টাকা। যতগুলি রূপকের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আমাদের দেশে বড়-বড় সাধক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের গভীরতম অভিজ্ঞতার ফল আমরা হিন্দীতে, মারাঠিতে, বাঙ্গালায় পাইয়াছি। কিন্তু সেই সমুদয় অধিকাংশ স্থলই অশিক্ষিত-পটুত্বের নিদর্শন। চীনা কবিতায় শিক্ষিত সাধকের হৃদয় পাইতেছি। শেওলার কথায় বুঝিতে হইবে যে, কবি নিজেকে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট-ভাবে রাখিতে চাহিতেছেন। দুনিয়া তাঁহাকে দিয়া যাহা করাইতে চাহে করাউক। বিলাতের শেলী "পাগলা পশ্চিমের বাতাসে"র বীণা হইতে চাহিয়াছিলেন। শেওলা হওয়া, আর বীণা হওয়া—একজাতীয় হওয়া। "আবেগে ভ'রে উঠ্‌লে মন, তারে মিশাব বিশ্ব-সুরে"—কথাটা অমূল্য। আমার নিজের আবেগ দুনিয়ার সকল আবেগের সঙ্গে মিশুক। আমি দুনিয়ার বীণা হই—অথবা দুনিয়াই আমার বীণা হউক। জগতের প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ গাঁথিয়া উঠুক। এই ভাবের গান ভারতীয় সাহিত্যে অনেকই আছে। সহজ কথায় সাধকগণকে বলা হইয়া থাকে—"ছটফট ক'রো না। অন্ধকার যখন ঘুচ্‌বে, তখন এক মুহূর্ত্তেই ঘুচ্‌বে। এক মুহূর্ত্তের পরশে জীবন বদলাইয়া যায়। নব জীবন লাভ করিতে দিন, সপ্তাহ, মাস বা বৎসর লাগে না। এক মুহূর্ত্তেই বড়-বড় কাজের প্রেরণা

হৃদয়ে জন্মে। ভারতীয় "আদি" কবির মুখ এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তের সাক্ষী—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এই মুহূর্ত্তে বিরাট রামায়ণের সূত্রপাত।

(১১)

মুক্ত অবস্থার চিত্র প্রদত্ত হইতেছে। মুক্তিলাভের অর্থ অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়া।

ফুলে হংমেশা ঘুরে' না হই হয়রাণ,
নিঃশ্বাসে নিজের ক'রে ফেলি আশ্মান্।
"তাও" পেয়ে আত্মা মিশে সূক্ষ্মলোকে,
সেথায় জীবনের গতি কেউ না রোকে।
দুনিয়া জুড়ে' বেড়াই হাওয়ার মত,
সাগর-শিখর সম উঁচু সতত।
তাঁবে মোর দুনিয়ার শক্তি সহস্র,
ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছি স্থষ্টি সমগ্র।
রবি, শশী, তারা আমার চোপদার সব,
অমর ফ্রীনিক্স্ পাখী বরকন্দাজ নীরব।
সকালে লাগাই চাবুক তিমিঙ্গিলে
চরণ ধুয়ে আসি ফুসাঙের জলে।

বাহবা মুক্তি। মুক্ত অবস্থা এইরূপ হইলে দুনিয়ার সকলেই মুক্তি পাইতে রাজি। আমরা নির্ব্বিকার মুক্তি চাই না। চাই এইরূপ দুনিয়ার উপর এক্তিয়ারওয়ালা বাদশাহী মুক্তি। ছু-কুঙ্ জবরদস্ত মিষ্টিক, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, সকল পাকা মিষ্টিকই এই ধরণের শক্তি-মন্ত্রের প্রচারক। মুক্তি পাইয়া ভগবানে ডুবিয়া যাইবার কথায় অনেক সময়ে ডুবার দিকেই নজর বেশী থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে, ভগবান্ও হওয়া যাইতেছে—এই দিকটা মনে রাখা আবশ্যক। ভগবান্ হওয়ার অর্থ দুনিয়াকে ভাঙ্গিবার-গড়িবার ক্ষমতা পাওয়া। ভারতীয় মুক্তিপন্থীরা যুগে-যুগে এই ক্ষমতার অনুশীলনই প্রচার করিয়াছেন। বেকুবেরা ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জনটা লইয়াই মাতামাতি করে—শেয়ানারা ভগবান্ হইয়া স্থষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মোসাবিদা সুরু করে।

ফুসাঙ্ শব্দে চীনাদের বিবেচনায় কোন সুদূরবর্ত্তী মুল্লুকবিশেষ বুঝিতে হইবে। সাগরের শিখর কি বস্তু? ঢেউগুলি? ওসব এমন কি উঁচু? বুঝা গেল না। তিমিঙ্গিল শব্দে কোন পর্ব্বতপ্রায় বিশাল সমুদ্রজীব বুঝিতে হইবে। চীনারা কোন্ জানোয়ার বুঝে, বলিতে পারি না। ইংরেজ অনুবাদক দুইজনেই "লিভিয়াথান" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের হিসাবে বলা উচিৎ, "তিমি-ঙ্গিলাঙ্গিল"!

(১২)

কবি সংযমের তারিফ করিতেছেন। বাজে খরচের বিরুদ্ধে এই কয় লাইন।

লেখাপড়া না ক'রেও
বুদ্ধি লাভ হয়;
কথার চটক্ থাক্‌লেই
শোক হৃদে না রয়।
মাত্রা চড়লেও সরাবের
চাঙ্গা হয় না দিল;
ফুল ন'লেই ঠাণ্ডা শীতে
প্রাণে লাগে না খিল্।
ধুলার অণু হাওয়ায় ভরা,
কণা তরঙ্গ-বুদ্বুদের
ছোটয়-বড়য় ধরতে গেলে
একটা রইবে দশহাজারের।

(১৩)

কবি সাংসারিক জীবনের সুখ অফুরন্তভাবে চাহিতেছেন। উহা অসংখ্য প্রকারের হউক এবং অনন্ত কালের জন্য থাকুক। মিষ্টিক মহাশয়েরা এই ধরণের "অনন্ত" প্রচার করিলে, তাঁহাদের মক্কেল জগতের সকল লোকই হইবে।

চাঙ্গা-করা সুখের বান যেন না থামে,
হরদম্ দিল্ ভরে থাক্ আনন্দ রসে;—
সুগভীর স্রোতস্বতীর রূপার হাসি,
ফুট'-ফুট' ফুল যাতে বায়ু উড়ে বসে।
আর আসুক তোতা পাখী সখা বসন্তের,
দাওয়া-সোপানের বৈঠক, উইলো তরুর সার,
পার্ব্বত্য দিয়ারা হতে বন্ধু একজন,
পেয়ালা-রঙিন-করা সরাবের বাহার।
বেড়ে যাক্ জীবনের সীমানা এইরূপে,
লেখাপড়ায় জান্ যেন চাপা না পড়ে;
খোলা-প্রাণ থাকি সদা প্রকৃতির মাঝে,
হিয়ায় আনন্দ বিরাট তোলা যাক্ গড়ে'।

(১৪)

কবি বলিতেছেন যে, বড়-বড় যাহা কিছু দুনিয়ায় দেখা যায়, সবই মহা ছোট জিনিষে গড়া। চু-কুঙ অণুর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। লম্বাচৌড়া বোল্‌চালে এবং আন্দোলনে না মাতিয়া ধরা-ছোঁয়া-যায়-না-যাহা আর দেখা-শুনা-যায়-না-যাহা এইরূপ কাজে লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভগবান্ এই ধরণের অদৃশ্য ক্ষুদ্রের সাহায্যেই বিরাট অসীম ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছেন।

সকল জিনিষেই আছে অণুকণা,
চোখে কাণে বুঝা না যায়;
রূপ তাদের উঠ্‌ছে সতত গড়ে'
ভগবানের আজব কারখানায়!
দরিয়া গড়ায়, ফুল ফুট'-ফুট',
শিশির বিন্দু শুকায়ে যায়,
লম্বা সড়কের সীমানা বড়,
গলি ঘোঁচে পা ঠেকে পায়।
কথার চটক্ ছেড়ে দাঁড়াও ভাই,
ছুড়ে ফেলে চিন্তা অসার,
হও সবুজ বসন্ত যে থাকে কণায় ভরা
আর জ্যোৎস্না-মাখা তুষার।

(১৫)

জীবনে সিদ্ধিলাভ কাহাকে বলে চু কুঙ তাহার আলোচনা করিতেছেন। আমরা গাহিয়া থাকি :—

বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবন না হেরে।
সুখ-ডালে বসি ডাকিছ পাখীরে,
ডাকিতেছ কি সেই পরম পিতারে?
কি বলে ডাকিছ বলে দে আমারে
ডেকে দেখি, পাই কি না পাই তারে?
গুঞ্জরি ভ্রমর করে গুণ-গুণ
গাহিতেছ কি সেই গুণাকর গুণ?

চু-কুঙ্ প্রায় এই আদর্শেরই একাকী নির্জ্জন জীবন যাপন করিতেছেন।

থাক্‌ব নিজের খেয়াল মত
সখী হবে প্রকৃতি,
অল্পে তুষ্ট, অবাধ জীবন,
বিশ্বেশ্বরে ডাক্‌ব নিতি।
পাইন-তলায় কুঁড়ে বেঁধে
কাব্যচর্চ্চা রাতদিন;
সকাল-সন্ধ্যার রাখ্‌ব খবর,—
মাস-বছরের জ্ঞানহীন।
এতেই যদি সুখ পাওয়া যায়,
আর কিছু কেন চাইব?
নিজের ভিতর এই ধন পেলে
পাওয়া হল না কি সর্ব্ব?

ঠিক্ যেন—"গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?"!

(১৬)

চু কুঙ্ প্রকৃতি-সুন্দরীর আবেষ্টনে থাকিতে থাকিতে এক খেয়াল দেখিতেছেন।

সুন্দর পাইনের কুঞ্জ হেথা,
গিরি-নদী বহে গড়িয়ে,
তুষারে নীল আকাশ হাসে
জেলে-ডিঙ্গি যায় দূরে বেয়ে।
লাল-ঝোপে ধীরে, থেমে,
জেড্-বরণী সুন্দরী যায়
আমি চলি পিছে-পিছে;
মিশিল সে উপত্যকায়।
কায় ছেড়ে মন দূর অতীতে
উড়ল অজানা ভুলা দেশে,—
যেথা শরতের সোণার হাসি
কিম্বা চাঁদ বেড়ায় ভেসে!

জেড্ সবুজ রঙের পাথর। জেডের কথা চীনা সাহিত্যে যখন-তখন শুনা যায়।

(১৭)

চু-কুঙ্ পাহাড়ী পথে চলিতেছেন। চলিতে কষ্ট হইতেছে। এই কষ্টে একটা রূপক দেখা গেল। "তাও"-য়ের নানা রূপ। তিনি কখনও সহজ, সরল—কখনও বক্র; জটিল। তিনি লীলাময়।

যাচ্ছিলাম তাই-সিং পাহাড়ে
সবুজ বাঁকা পথ ভেঙ্গে;—
গাছরাশি যেন জেড্-সাগর
ফুল্-গন্ধ বাতাসের অঙ্গে।

পাহাড়ে উঠা কষ্টকর,
আওয়াজ বেরুল মুখ থেকে ;
অমনি ফিরে এল সেটা—
লুকানো যেন না ঢেকে' !
জলের ঘূর্ণিপাক নীচেতে,
আশ্‌মানে বাজের দৌড় খেলা ;
একরূপে "তাও" দেন না দেখা,
এই চতুর্ভুজ, এই গোল লীলা ।

প্রতিধ্বনি লুকানো অথচ ঢাকা নয় ।

(১৮)

কবি যেন আবার বলিতেছেন যে, বিনা যতনেই রতন মিলে। মানুষের "গুরু" লাভ এইরূপ "দৈব" ঘটনারূপে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। চু-কুঙ্‌ তাঁহার এক অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতেছেন।

ছোট-ছোট সোজা কথায়
আমার মন খুলে দিতে চাই ;
হঠাৎ দেখ্‌লাম এক যোগীরে,
"তাও"য়ের হৃদয়ই যেন তাই ।
আঁকা-বাঁকা নদীর ধারে,
ছায়াতলে কালো পাইনের,
বিদেশী এক লকড়ী-হাতে,
বীণার তানে কাণ আর-একের ।
এইরূপে পাই খেয়াল বশে,
ঢুঁড়্‌লে হয় ত তা পাব না,—
তাল, মান, লয় দুনিয়া হ'তে,
শুনি তায় অনন্যমনা ।

(১৯)

চু-কুঙ্‌ এইবার মুক্তি-পাগল হইয়াছেন। উৎকট বৈরাগ্যে আর উৎকট প্রেম-বিরহে মানুষের অবস্থা একরূপ হয়। মুমুক্ষুর বচনেও বিরহীর ভাষাই বাহির হইয়া থাকে। চু-কুঙ্‌ ঠিক বিরহীর মত হা-হুতাশ করিতেছেন। বীণা-মিষ্টিক মহাশয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে প্রেয়সী রমণীরূপে আহ্বানও করিতেছেন। সুফী ও বৈষ্ণব মুল্লুকে আসা গেল দেখিতেছি। তবে এ ক্ষেত্রে মাত্রা খুব অল্প ও সংযত। চু-কুঙের আধ্যাত্ম-চিন্তায় শৃঙ্গার রসের রূপক নাই বলিলেই চলে। কাজেই অর্থ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে হয় না। কিন্তু সুফী ও বৈষ্ণব সাহিত্যে কতখানি শৃঙ্গার, আর কতখানি অধ্যাত্ম—তাহার মীমাংসা সহজ নয়।

তুফানে নদীরে উতলা করে,
শাঁ-শাঁ ফাট্‌-ফাট্‌ গাছে, বনের ভিতরে ;
মন আমার নীরস বড় মরার মত,
প্রাণপ্রিয়া মোর আজও না সমাগত।
একুশ বছর বয়ে গেল, জল সমান ;
ঠাণ্ডা ছাই যেন ধন-খেতাবের প্রাণ।
আমা হ'তে "তাও" রোজ দূরে সরে যায়
দুঃখ নিবৃত্তির পথ কে দেখাবে হায় ?
সৈনিক, বীর, সাহসী খোলে তলোয়ার,
অমনি সুরু হয় অশ্রু অনিবার।
জোরে বয় বাতাস, পাতা পড়ে ধরায় ;
ভাঙ্গা চালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি গড়ায়।

কবিতাটা বোধ হয় ভাল বুঝা গেল না ?

(২০)

চু-কুঙ্‌ পূর্ব্বে একবার চিত্রকলা হইতে রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে একটা গোটা কবিতাই এই রূপকের ব্যাখ্যা। ইনি বলিতেছেন যে, চিত্রকর গাছ, পাতা, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতাদির আসল "স্বরূপ" আঁকিয়া থাকেন। সেই আসল স্বরূপই "তাও"। এই তাও বাহির করিবার জন্য চিত্রকরকে এক প্রকার ধ্যানমগ্ন থাকিতে হয়। পদার্থগুলির বাহ্য রূপ দেখিতে-দেখিতে শিল্পী এই সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ করেন। শেষে যখন ছবি আঁকা হয়, তখন দেখা যায় যে, বাহ্য রূপটা প্রকটিত হয় নাই—প্রকটিত হইয়াছে তাহারই অনুরূপ আর-কিছু। এই "আর কিছু"তে তাও-'য়ের প্রভাব বুঝিতে হইবে। কবিবরের এই মতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের কোন-কোন ওস্তাদও সায় দিবেন। "শুক্র-নীতি"তে এই ধরণের ধ্যানে-পাওয়া রূপের কথা আছে। শিল্পী এবং যোগীর কার্য্য-প্রণালী একপ্রকার। এই জন্য চু-কুঙ্‌ যোগীর তাও-সাধনের বর্ণনা করিতে যাইয়া শিল্পীর কথা পাড়িয়াছেন।

স্থিরনেত্রে বস্তুটার রূপ দেখলে অনেকক্ষণ,
তাহার সূক্ষ্ম মূর্ত্তি লাভ করে শিল্পীর মন ;—
লহরমালার ভঙ্গী, শ্রী—চায় সে যখন,
অথবা আঁকিবে সে বসন্ত রতন।

বাতাসে তাড়ানো মেঘ রূপ পায় কত,
উদ্ভিদের বিকাশে শক্তি খেলে শত ;
সাগরের কূল-ভাঙ্গা তরঙ্গরাশি,
আর গিরির ঘাড়ে-পীঠে শৃঙ্গের হাসি ;—
সকলেরই ভিতর বিরাট "তাও" বিরাজে,
"তাও" লাগে দুনিয়ার বস্তু-গঠন কাজে।
রূপ ছাড়া "অনুরূপ" পাওয়া যদি যায়,
আত্মা পাওয়া হ'ল না কি শিল্প-কলায় ?

(২১)

কবি এইবার অসীম বা অতীন্দ্রিয়ের স্বরূপ বুঝাইতেছেন। ধরা-ছোঁয়া যায় না—সেই বস্তুটা কি ? বলা বাহুল্য, বর্ণনাটাও ধরা-ছোঁয়া না যাইবারই কথা।

সূক্ষ্ম মনের তৈরি নয় সে,
বিশ্বের অণুতেও নয় তার প্রাণ,
রয় সে যেন সাদা মেঘে
নিয়ে যায় তারে বায়ুর টান।
দূরে যখন, যেন কাছে,
কাছে গেলে উড়ে যায় ;
"তাও" যে বস্তু সেও তাই
রয় না সে নশ্বরের সীমায়।
পাহাড়ে, তরুশিখরে,
শেওলায়, রবি-কিরণে সে ;
"তাও" তায় গোপনে ধ্যান কালে,
ধ্বনি তার কাণে না পশে।

আমরা গাহিয়া থাকি—

"আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায়, গহনে।"

(২২)

কবি সিদ্ধিলাভের পথের এক স্তর দেখাইতেছেন। একাকী নির্জ্জন সাধনায় মগ্ন থাকিবার পর, যোগীরা এই ধরণের কথাই বলেন। "ঠিক যেন পেয়েছি অথচ পেলুম না।" এই সুরেই আমরা গাহিয়া থাকি—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।
হারাই হারাই সদা ভয় হয়
হারাইয়ে ফেলি চকিতে।"

চীনা সাধক প্রায় এই কথাই বলিতেছেন। যে কোন লক্ষ্য এবং আদর্শ লাভ করিবার প্রয়াসেই সাধকেরা এই অভিজ্ঞতা পাইবেন।

পথ চেয়ে তার, বসি বিরলে,
একাকী, সঙ্গীহীন ;—
হাও-পাহাড়ের সারসের মত ;
যেন বা হুয়াপাহাড়ের মেঘ।
বীরের প্রতিকৃতি চিত্রে
জীবনের তেজ যায় দেখা ;
অসীম সাগরে ভাসে পাতা
বয়ে নেয় তারে হাওয়ার বেগ।
ধরা যেন পড়্‌বে না সে,
সদাই হয় ধরা পড়'-পড়'।
তারাই পেয়েছে যারা বুঝে এই,
পাবে না তারা যাদের বেশী আবেগ।"

অর্থাৎ পূরাপূরি দেখ্‌তে চাওয়াটাই বেকুবি। চীনা কবি বলিতেছেন—"অত্যধিক আশা করিও না। মাঝে-মাঝে যাহা পাইতেছ, তাহাই চরম।" ছু-কুঙের মতে "কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে" বলিয়া কাঁদা অনাবশ্যক। ভিতরকার চারলাইন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে কি ?

(২৩)

একটা কবিতায় ছু-কুঙ্ মানুষের আয়ু অল্প দেখিয়া দুঃখ করিতেছেন। তাহার তুলনায় পাহাড় অমর।

এক-শ' বছর মানুষ বাঁচে,
জীবন কত শীঘ্র ফুরায় !
সুখের ভাগ ত অল্প বিশেষ
দুঃখের হিস্যাই বিরাট হয় !
পরম সুখ ত মদের পেয়ালা,
আর রোজই কুঞ্জে আসা-যাওয়া,
দেখতে "ইষ্টোরিয়া" নেতার ফুল
পশ্‌লায় যখন আকাশ ছাওয়া ;
তার পর খুস্ হ'লে দিল সরাবে,
ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়া ;

সবাই একদিন হবে প্রাচীন—
কেবল দখিণ পাহাড় রইবে খাড়া।

এই শেষ লাইনের জন্যই কি কবিতাটা সাধন-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে? না—জীবনের দুঃখের কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া?

(২৪)

চু-কুঙ্ এইবার জীবনের শেষ অবস্থার কথা বলিতেছেন। তাহাতেই নাকি তাঁহার সমগ্র সাধন-তত্ত্বের সঙ্কেতও রহিয়াছে। এই চাবির সাহায্যে তাঁহার "তাও"-রহস্য খোলা যাইবে।

জল তুল্‌বার চাকা যেটা ঘুরছে সতত
অথবা গড়িয়ে যাওয়া মুক্তার দানা,—
জীবনের শেষ অবস্থা কি এদেরই মত?
এ সব রূপক মূর্খের তরে—সকলের জানা।
ধরিত্রীর ব্যাস দণ্ড বিরাট,
সদা চঞ্চল মেরু আকাশের,—
এ সকলের তত্ত্ব বুঝে ল'য়ে,
সবাই মিশি ভিতরে মহা একের।
স্বপ্ন চিন্তার অতীত হ'ব,
গ্রহের মত ঘুরব শূন্যে,
হাজার বছরে এক চক্কর দিব,—
চাবি এই মোর রহস্যের জন্যে।

বোধ হয় আত্মার শেষ অবস্থাটা—চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে, গ্রহলোকে অমর জীবন।

এই চব্বিশটা কবিতায় তাও ধর্ম্মের অনেক কথা জানা গেল। মোটের উপর বুঝিলাম, এই ধর্ম্ম অন্য নামে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে।

যাঁহারা তাও-ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, তাঁহারা চু-কুঙ্-প্রচারিত তত্ত্বের মত তত্ত্বাংশ লোকের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দার্শনিকতাই তাও ধর্ম্মের একমাত্র অঙ্গ নয়। ইহার একটা ভুতুড়ে-কাণ্ডের অংশও আছে। হাঁচি, টিকটিকি, তিথি নক্ষত্র, মঘা, অশ্লেষা ইত্যাদির অসংখ্য জুড়িদার তাও-ধর্ম্মীদিগের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। যাঁহারা তাও-ধর্ম্মের নিন্দা করেন, তাঁহারা লোকের সম্মুখে এইগুলি দেখাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মা, যোগ, ধ্যান, মুক্তি, অতীন্দ্রিয়, শূন্য, সাধন, ভগবৎপ্রাপ্তি ইত্যাদি পছন্দ করেন না, তাঁহারা চু-কুঙের মত সাধকেরও নিন্দা করিয়া থাকেন। আর ভুতুড়ে-কাণ্ডে ত তাঁহাদের সহানুভূতি থাকিতেই পারে না। এই শ্রেণীর লোকের নিকট তাও-ধর্ম্ম আগাগোড়াই নিন্দনীয়। অর্থাৎ তাঁহারা ভারতীয় অথর্ব্ব বেদেরও শ্রাদ্ধ করিবেন, আর কবীর, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদিকেও বেকুব বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের চিন্তার একদিক গেল খাঁটি কুসংস্কার, আর একদিক অকেজো কাণ্ডজ্ঞানহীন মাথাপাগলা লোকের খেয়াল। যাহা হউক, তাও-ধর্ম্মের নাম শুনিয়া ভারতবাসী হয় ত ভাবিতে পারেন—একটা নূতন কিছু বুঝি। সত্য কথা, ভারতীয় হিন্দু গৃহস্থেরা সকলেই তাও-ধর্ম্মী। আমরা উপনিষৎ বেদান্তের পন্থাও খুঁজিয়া থাকি, আবার পাজী-পুঁথি ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও কাটাই না।

চীনে আর-একটা ধর্ম্মের প্রচলন আছে। জগতে তাহাকেই লোকেরা খাঁটি চীনাধর্ম্ম বলিয়া জানে। তাহার নাম কন্‌ফিউসিয় ধর্ম্ম। দু'এক কথায় একটা ধর্ম্মের বিষয়ে স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। এই ধর্ম্মেও ভুতুড়ে-কাণ্ড আছে; উহা তাও ধর্ম্মীদেরই সুপরিচিত বস্তু। দু'-এক বিষয়ে উনিশ বিশ আছে কি না, বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, চীনারা কন্‌ফিউসিয়ই হউক, বা তাও-পন্থীই হউক, সকলেই এ সম্বন্ধে খাঁটি ভারতবাসী। ইহারা আমাদেরই মাসতুত ভাই।

সাধারণতঃ কিন্তু কন্‌ফিউসিয়-ধর্ম্মীরা নিজেদের তাও-পন্থী হইতে তফাত করিবার জন্য নিজেদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বলে—"তাও ধর্ম্মীরা আত্মা, মুক্তি, পরকাল লইয়া ব্যস্ত। আমরা ও-সবের ধার ধারি না। আমরা এই জগতের সাংসারিক নীতি-পালনকেই জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করি।" এক-কথায় বলিতে পারি যে, এই নীতির সূত্র—"পিতামাতা গুরুজনে সেবা কর কায় মনে।" অর্থাৎ এই হিসাবে "মনুসংহিতা" যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজ কন্‌ফিউসিয়-ধর্ম্মী। বস্তুতঃ, কন্‌ফিউসিয়-পন্থীরা ভগবানে বিশ্বাসও করে, মূর্ত্তিপূজাও করে। তাও-পন্থীদের বহু দেবদেবীও কনফিউসিয়-মহলেও পুরা মাত্রায় বিরাজ করিয়া আসিতেছে।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৪)

ইংরাজি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স-রাজ্যের অন্তর্গত ভরসেল্‌স (Versailles) নগরে, মধুসূদন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা-গ্রন্থ "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রণয়ন করেন। সুবিখ্যাত ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেট্রার্কার (Francisco Petrarch) ইতালীয় কবিতার আদর্শে ইহা লিখিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতার (sonnet) অস্তিত্ব কেহ জানিতেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় মাইকেল মধুসূদনই ইহাও বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভরসেল্‌স হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া উক্ত বৎসরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের শেষাংশে তিনি 'সুভদ্রাহরণ' ও পুনর্লিখিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার সহিত 'নীতিগর্ভ কাব্য' নাম দিয়া 'ময়ূর ও গৌরী' 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক তিনটি খণ্ড কবিতাও সংযোজিত ছিল। পরে মনোনীত না হওয়াতে তিনি ঐ কবিতাগুলি পরবর্ত্তী সংস্করণে অপসারিত করেন। পুনর্লিখিত তিলোত্তমাও তাঁহার মনোনীত হয় নাই। আমরা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণ হইতে প্রকাশক-লিখিত ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ইংরাজি ১৮৬২ সালের জুন মাসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার হইবার মানসে ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। যাত্রাকালে মাতৃভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে একটি কবিতা লিখিয়া যান, তাহা সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বাদপত্রে এবং ১ম ভাগ মেঘনাদবধ কাব্যের মুখবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে; অতএব সেটি এখানে উদ্ধৃত করা আর আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড়বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সরাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স, নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশমাত্র পদবিশিষ্ট। ইয়ুরোপ খণ্ড হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন বাঙ্গালা কবিতা লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হয় নাই; এইজন্য বন্ধুদিগের এবং সাধারণের সন্তোষার্থে কবিতাগুলির উপক্রম ভাগটি মুদ্রাক্ষরে না ছাপাইয়া যেরূপ লিখিত ছিল অবিকল তদনুরূপ হস্তাক্ষরে ছাপাইলাম। উপক্রমটি দেখিয়া পাঠকবৃন্দ কবিবরের হস্তাক্ষর বুঝিতে পারিবেন এবং যেরূপে কবিতাটি লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবেন।

*　　*　　*

দত্তজ মহাশয় বিদেশে গিয়া এবং বিদেশে থাকিয়াও মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে বিরত হন নাই। তিনি দেড় মাসের পথ হইতেও প্রিয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অবকাশ কিছুই মাত্র ছিল না।"

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এক অভিনব সুন্দর সৃষ্টি; মধুসূদনের কবি-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে হইলে, এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে কবি-চিত্তের মহান্ আলেখ্য স্বচ্ছ ভাব-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, যে সকল কবিতায় মহাকবির জীবনের কুলিশ-কঠোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলি তুলনারহিত। মধুসূদনকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, সেই কবিতাগুলির আলোচনা অপরিহার্য্য।

আমরা তাই কতকগুলি কবিতা ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের মহান্ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিব।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রায় সমস্ত কবিতাই মধুসূদন তাঁহার শ্যামাজন্মদা বঙ্গজননীর ও হিমাদ্রি-কিরীটিনী, সুনীল সাগরাম্বরা ভারতভূমির গৌরবচিত্র ও পুণ্যকীর্ত্তির স্মৃতিমাল্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কেবল পাঁচটি কবিতা য়ুরোপের বিষয় লইয়া লিখিত। তন্মধ্যে চারিটি য়ুরোপীয় মনস্বী ও কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ও অপরটি 'ভর্‌সেল্‌স নগরের রাজপুরী ও উদ্যান' দেখিয়া লিখিত। এতদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ই পৃথিবীর অপর কোন স্থানের চিত্র বা বিষয় লইয়া লিখিত হয় নাই। য়ুরোপ-প্রবাসে নির্ব্বাসিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের পক্ষে, ইহা যে কতদূর মহানুভবতা ও গৌরবের পরিচায়ক, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

কবি প্রথমেই সুদূর য়ুরোপ হইতে তাঁহার দেশবাসীকে কিরূপে স্বরচিত কাব্য চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা উপক্রমে' অতি সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

> যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
> কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
> সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
> তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে ;—
> কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
> গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
> নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র লঙ্কার সমরে,
> দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
> কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
> শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
> (বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
> বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
> যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
> সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

মধুসূদন, বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তিত করিয়া, উহা কোন্ দেশে, কোন্ ভাষায়, কোন্ কবি কর্ত্তৃক প্রথমে উদ্ভাবিত ও লিখিত হইয়াছিল, তাহারই বৃত্তান্ত তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়া একটী সনেট উপহার দিতেছেন ;—

> ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
> বহু-বিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
> সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
> বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
> সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
> ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
> বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
> রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
> কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
> স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
> কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
> (মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
> ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
> উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আজন্ম প্রতীচ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন, আশৈশব বঙ্গজননীকে অবহেলা করিয়া, পরধন-লোভে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, বহুদিন পরদেশে যাপন করিয়াছিলেন। পরে স্বপ্নে কুললক্ষ্মীর আদেশে মাতৃ ভাষার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি 'বঙ্গভাষাকে বলিতেছেন ;—

> স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
> "ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
> এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
> যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
> মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

'সাহিত্য'-সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—"মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পরতন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। * * এমন স্বপ্ন ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? এমন ভাবে পরদেশমুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ

মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয়জন লাভ করে ?”

'সমাজ-দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ;—“তিনি কবি-গণের বা গুণিগণের অবমাননা করিতেন না। অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় আপনার অলোকসামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা তাঁহাকে ভারতের অপেক্ষা মহান্ বলিতেন, অথচ তিনি আপন চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণীদিগের অন্তরের সহিত স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন। * * পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিত বটে, চারিদিকে যশঃসৌরভ নিঃসারিত হইতেছে, অথচ অভিমান নাই, কেবল গোলাপ ফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে।”

উপরি-উদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তিগুলি বর্ণে-বর্ণে সত্য। 'কমলে কামিনী' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদন আমাদের বাঙ্গালার আদিকবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে লিখিতেছেন ;—

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।

'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'তে মধুসূদন, কবি রায়গুণাকর ভারত চন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

তব বংশ-যশঃ ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

বাঙ্গালার চিরাদৃত কবি, মহাভারতের পদ্যানুবাদক, কাশীরাম দাসকে মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

—ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

কবি কৃত্তিবাসকেও মধুসূদন বলিতেছেন ;

জনক জননী তব দিল শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে !

* * * *

পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

“জয়দেব” কবিতায় 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'-প্রণেতাকে বলিতেছেন ;—

—আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

তৎপরে মহাকবি কালিদাসকে বন্দনা করিতেছেন ;—

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি।
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?

ফরাসীদেশে কোন ফরাসী সুন্দরীকে মধুসূদন ফরাসী ভাষায় একটি কবিতা রচনা করিয়া কবিরূপে আপনার আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই স্ব-রচিত ফরাসী কবিতা তিনি বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া 'পরিচয়' নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারত-প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আছে। আমরা সেই কবিতাটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)

শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে-দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুৎ, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ?

স্বদেশের বিষয়সমূহের বর্ণনায় মধুসূদনের মহান্ হৃদয় সতত বিভোর হইয়া থাকিত। তিনি প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ তরল কবিতা লিখিতে একেবারেই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'দেবদোল' 'কবিতা' 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির' 'ছায়াপথ' 'বটবৃক্ষ' 'মহাভারত' 'সরস্বতী' 'কপোতাক্ষ নদ' 'ঈশ্বরী-পাটনী' 'রাশিচক্র' 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির' 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' 'সীতা-বনবাসে' 'উর্ব্বশী' 'কেউটিয়া সাপ' 'শ্যামাপক্ষী' 'সংস্কৃত' 'রামায়ণ' 'বাল্মীকি' 'শ্রীমন্তের টোপর' এবং মহাভারতীয় ও পৌরাণিকী বিবিধ-বিষয়ক কবিতায় হিন্দু-ভাবপ্রবণতা ও অসীম স্বদেশপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। য়ুরোপীয় উদ্যান হইতে তিনি ডেইজি, টিউলিপ, ড্যাফোডিল, ভায়োলেট, কাউস্লিপ, প্রিমরোজ, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি পুষ্পচয়ন করেন নাই ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় উদ্যান হইতে রক্তজবা, শ্বেতচম্পক, কলিকা, করবীর, মালতী, মল্লিকা, বেলা, যূথী, স্থলপদ্ম এবং মানস সরোবর হইতে কুমুদ, কহ্লার, নলিনী প্রভৃতি দেবপূজার পবিত্র প্রসূনচয় চয়ন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় না যে, কবি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নামে মাইকেল—কাজে দেবার্চ্চনার নির্ম্মল মধু! আকারে মাইকেল—প্রকারে মধুসূদন!

'সাহিত্য'-সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—"পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত, পরসমাজলুব্ধ মাইকেল, সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দুসমাজ ভ্রূকুটীকুটিলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?"

কোন্ শক্তির দ্বারা মধুসূদন অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও দুইটি কথায় বলিলেই হয় ;—সে শক্তি তাঁহার মহতী সাহিত্য-সাধনা ! সে শক্তি তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ ! উক্ত সম্পাদক মহাশয় আর একস্থানে লিখিয়াছেন ;—"মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব ; * * মাইকেল উদার, অকুতোভয় ও সমবেদনায় নির্ব্বিচার। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর কবিজীবনের অভিজ্ঞতাব্যঞ্জক মনোমুগ্ধকর কবিতাসমূহ হইতে আমরা কয়েকটি কবিতা ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করিব। পাঠকপাঠিকা তাহা হইতে মধু হৃদয়ের মধুবর্ষণে স্নাত ও স্নিগ্ধ হইবেন।

'শ্রীপঞ্চমী' নামক কবিতায় 'বাণীবরপুত্র' কবির বাণীবন্দনা কি মনোহর !

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূতারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবলমূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যতদিন এ মর ভবনে

মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে।—
কি কাজ মাটীর দেহে তবে, সনাতনে?

'আশ্বিন মাস' শীর্ষক কবিতায় তিনি গৌড়গৃহের চিরানন্দ-বিজড়িত শরতের সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন ;—

—পূর্ব্বকথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

সসাগরা ধরিত্রীর সতীকুলরাণী জনকতনয়া বৈদেহীর সকরুণ স্মৃতি মধুসূদনের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত ছিল। এই মহিয়সী ললনার চিরপুণ্যকাহিনী তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা নানা কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে তাঁহার অতুল্য চরিত্র বর্ণনা করিয়া, তিনি বঙ্গবাসীকে যে সুবিমল তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ য়ুরোপবাসীকেও সেই চরিত্র-মহিমা জ্ঞাত করিতে তাঁহার প্রবল অভিলাষ জন্মিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব কাব্য ইংরাজি ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কতকাংশ রচিত হইবার পরে, তিনি গ্রহবৈগুণ্যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই সতীত্বের শুদ্ধপ্রতিমা সীতাদেবীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; সুদূর য়ুরোপেও নানাবিষয়িণী ব্যস্ততার মধ্যেও সীতার কথা সতত তাঁহার মনে পড়িত। ফরাসী প্রদেশের নিভৃত নিবাসে বসিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন ;—

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি সতী, অশোক কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!

সুদূর য়ুরোপে থাকিয়াও তাঁহার স্বদেশপ্রান্তবাহী কপোতাক্ষ নদের মৃদুকলধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত; তিনি লিখিয়াছেন ;—

————তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!

য়ুরোপে থাকিতেই তিনি 'সুভদ্রা-হরণ' নামে একখানি কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যথিত চিত্তে লিখিয়াছেন ;—

তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফুটে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?

ফ্রান্সের ভরসেল্‌স্ নগরের রাজপুরী ও উদ্যান দেখিয়া লিখিয়াছেন ;—

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে;
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত সম ধাম এ মর্ত্ত-নন্দনে
শোভিল?————

সুদূর প্রবাসের নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে বঙ্গগৃহের বিজয়া-দশমীর সকরুণ চিত্র কবির স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। কবি লিখিয়াছেন ;—

'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
'গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
'উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
'নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
'বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
'পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
'তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
'এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?

শ্যাম-বঙ্গের পূর্ণচন্দ্র-কিরীটিনী শারদকৌমুদীবিধৌত কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পৌর্ণমাসী নিশীথে কমলার উদ্দেশে বলিতেছেন ;—

হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে!

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-নিচয় পাঠ করিয়া, আমাদের মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ কথা কে প্রত্যয় করিবে? বৈদেশিক আচরণের অভ্যন্তরে হিন্দুভাব

কিরূপ নিগূঢ়ভাবে নিহিত ছিল, তাহা এ স্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। ঠিক যেন য়ুরোপের ওকতরু(Oak)-পরিবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যস্থলে বটতরু, বিল্বকানন ও তুলসীকুঞ্জ সুশোভিত!

'নূতন বৎসর' নামক কবিতায় কবি-চিত্তের বিষাদময় অভিব্যক্তি কি মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী! তখন জীবনের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; তিমির-কুন্তলা নিশীথিনী চিরান্ধকার ঢালিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে—বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, জলবিম্বের ন্যায় কত আশা হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়া নৈরাশ্যে অবসান হইয়াছিল; তাই নৈরাশ্যের করুণ—অস্ফুট মৃদুঝঙ্কার মনোমদ মোহন সুরে কবিতায় ঝঙ্কৃত হইতেছে,—

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
—নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

'যশঃ' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিতেছেন;—

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জলরাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

উপরি-উক্ত কবিতাপংক্তি পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সম্পাদক লিখিয়াছেন;—"কবি, তুমি লিখিয়াছিলে, সন্দিগ্ধ-চিত্তে ভাবিয়াছিলে,—*

* "লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে,—ইত্যাদি।

বাঙ্গালার মহাকবি, বাঙ্গালীর মধুসূদন! না, তোমার লেখা 'জলের লেখা' নয়, তোমার 'লিখন' মুছিবার নহে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যে রচনা 'ক্লাসিক' হইয়াছে, মহাকালও তাহা মুছিতে পারিবে না।"

"ভাষা" নাম্নী কবিতায়, মধুসূদন যে বঙ্গভাষার প্রতি কতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত নিদর্শন প্রকটিত।

"O matre pulchrâ—
Filia pulchrior!"
HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা!—

মূঢ় সে, পণ্ডিত-গণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?

* * * *

নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার স্বদেশবাসী, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, কেহই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে মনোযোগী হন নাই। তাই মহানুভব মধুসূদন আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,

মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

মধুসূদন কখনও অর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না; নিজেও ধনবান্ পিতার সন্তান ছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে অপরিমিত ব্যয়ে সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল; নিজেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অসাধারণ অমিতব্যয়িতানিবন্ধন একেবারে রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ভাষার উন্নতি-সাধনে তিনি যে অবিনশ্বর কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী, তাহার তুলনায় পার্থিব অর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণস্থায়ী! তাই ভাষার উন্নতির গৌরবে চিরগৌরবগত-প্রাণ কবি অতুলনীয় আত্মগৌরব উপলব্ধি করিয়া 'অর্থ' নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতায় লিখিতেছেন ;—

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তার ধন অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

কঠোর সত্যে পরিপূর্ণ অতি প্রকৃত কথা উপরি-উক্ত কবিতার ছত্রে-ছত্রে প্রকটিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বহুবিধ প্রাচ্যভাষাবিদ্ মধুসূদন সংস্কৃত ভাষার একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষা তখন ধীরে-ধীরে পুনর্জ্জীবন লাভ করিতেছিল। পক্ষান্তরে "সংস্কৃত দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে" এই কথা লিখিয়া কবি লিখিতেছেন ;—

রাজাশ্রম আজি তব ! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে,
এতদিনে প্রভাতিল দুখ বিভাবরী,
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরসে।

জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক লিখিয়াছেন "আজন্ম বিদেশীতন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়, সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্য্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা-বুদ্ধির—'চোখের জলের বাঁধন দিয়ে' মাইকেল বাঙ্গালীকে "মায়াডোরে বাঁধিয়া-ছিলেন !"

"ভারত-ভূমি" নামক কবিতা তাঁহার সেই অকৃত্রিম স্বদেশবাৎসল্যে পরিপূরিত !

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !"

FILICAIA

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !

*　　*　　*　　*

কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

মধুসূদন বহুকাল দক্ষিণ-ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন; দক্ষিণ ভারতবর্ষের বহুভূভাগব্যাপী নভশ্চুম্বী মন্দিরমালা হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত করে। যাঁহারা এ-হেন

মন্দির-মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শোচনীয় অধঃ-পতনে বিস্মিত হইয়া "আমরা" নামক কবিতায় মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?

কবিগুণমুগ্ধ মধুসূদন সৌন্দর্য্যের মানসী-প্রতিমা শকুন্তলার চিত্রে মোহিত হইয়া মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন ;—

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস ! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি !—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে ;—

'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' নামক কবিতায় মধুসূদন কোন এক লেখকের ঔদ্ধত্য ও ভাষা-গঠনে অক্ষমতা দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ;—

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !
করি ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা-জলে !—

উপরি-উদ্ধৃত দুই পংক্তি বাঙ্গালার প্রবাদ-বচনে পরিণত হইয়াছে। সম্পাদকবর্গ কোন পুস্তকের রচনায় বিরক্ত হইলেই উহা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

অমিত্রছন্দের প্রবর্ত্তক মধুসূদন মিত্রাক্ষর ছন্দের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই 'মিত্রাক্ষর' নামক কবিতায় ভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—

* * * * *

প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

'ব্রজবৃত্তান্তে' ব্রজধামের অতীত-কথা স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন ;—

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রুধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?

কৈশোরসুলভ চাপল্যে স্বদেশের সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ক্ষণস্থায়ী অসংযত বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া, আত্মহারা কবি-জীবন স্বপ্নবৎ ব্যয়িত হইয়াছিল ; তাই অনুতাপে আকুল হইয়া তিনি লিখিতেছেন ;—

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
— কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণিজালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ, কোন দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—

সুদিনে-দুর্দ্দিনে, জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে নিম্নোদ্ধৃত একমাত্র কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন। পাঠক দেখিবেন, যে মধুসূদন কৈশোরে কেবলমাত্র প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাই রচনা করিতেন মধ্যাহ্নের প্রোজ্জ্বল কবিজীবনে, সেই মধুসূদন তাঁহার প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া কোন কবিতাই রচনা করেন নাই। তাই জীবন-সন্ধ্যায় হেনরিয়েটাকে লিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইল—

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেইরূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;

যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

মধুসূদন কুহকিনী আশার ছলনায় চিরদিনই প্রতারিত হইয়াছিলেন—তাঁহার জীবনের কোন পার্থিব অভিলাষই পূর্ণ হয় নাই। আশা তাঁহাকে মরুভূমিতে মরীচিকা-ভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের দূরে স্নিগ্ধ জলপ্রবাহ দর্শনের ন্যায়—ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া বিষবাত্যাতাড়িত সংসার মরুভূমিতে পাতিত করিয়া অবশেষে নৈরাশ্য-অনলে দগ্ধ করিয়াছিল। তিনি আশাকে বিশেষরূপেই চিনিয়াছিলেন; তাই এবার তাহার কুহকে মুগ্ধ না হইয়া,—আপনার মন্দভাগ্যের এবং পার্থিব অন্ধ-তমসার পরিণামের ইঙ্গিত করিয়া,—'আশা' শীর্ষক কবিতায় লিখিতেছেন;—

বাহ্যজ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা! নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্ রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

'সমাপ্তে' নামক কবিতায় চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত। এই কবিতায় মধুসূদনের কবি-জীবনের যবনিকা-পতন হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার কাব্য-কুঞ্জের শেষ বংশীধ্বনি। ইহার পরেই তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল! দিনান্ত-কিরণে তাহার নিবন্ত-রশ্মি মুহুর্মুহু জ্বলিতেছিল! যজ্ঞ-অন্তে নির্ব্বাণোন্মুখ যজ্ঞপাবক পদ্মরাগমণির রক্তরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া স্তিমিত তেজে নিবিয়া আসিতেছিল! তখন আর কমলবিলাসীর ন্যায় কমল শয়নে অৰ্দ্ধসুপ্তি অৰ্দ্ধজাগরণের তন্দ্রাময় অবসাদের অবস্থা নাই। জীবন সংগ্রামের কঠোর অগ্নিময় কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তবের অগ্নিরাশি ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে! সৌন্দর্য্যরাজ্যের 'মধুমত্ত' সম্রাট মধুসূদনের মদালসমুদিত নয়ন অৰ্দ্ধযুগস্থায়ী কবিলীলার রঙ্গভঙ্গের পর প্রকৃতির সুতীক্ষ্ণ কুলিশাঘাতে উন্মীলিত হইয়াছিল! স্বপ্নমগ্ন হৃদয় সহসা স্বপ্নাবসানে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছিল! য়ুরোপে তিনি যেরূপ শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন, যেরূপ বিরাট ঋণভারে অবনত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর শান্তচিত্তে ভবিষ্যতে কবিতার আলোচনা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, মধুসূদন বাণীপ্রতিমা 'বিস্মৃতির জলে' বিসর্জ্জন দিয়া, কবিজননীর কীর্ত্তিদীপান্বিতা পাদ-পীঠতলে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, 'ইন্দ্রপ্রস্থ' পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাণপ্রস্থীবেশে 'দূরবনে' গমন করিতেছেন এবং বিদায়কালে বাগ্‌দেবীর নিকট তাঁহার দেশমাতৃকাকে 'ভারতরত্নে' জ্যোতির্ম্ময়ী করিবার বরপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিক্লান্ত কবিজীবনের চিরাবসান করিতেছেন; সেই চিরস্মৃতিময়ী 'সমাপ্তে' কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা মহাকবির য়ুরোপ-স্মৃতি সমাপন করিলাম!—

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল যে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

বুদ্ধির মূল্য

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

সাতকাঠা তিন ছটাক জমির মোকদ্দমায় সাড়েচারি হাজার টাকা খরচ করিয়া, শিবনাথ গাঙ্গুলী পাঁচ বৎসর পরে ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণ মহামান্য হাইকোর্ট হইতে বিজয়লক্ষ্মীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন, তখন ঢাক-ঢোলের উচ্চ শব্দে গ্রামবাসীদের কর্ণ বধির, এবং দুধ সিদ্ধি বিল্বপত্রের ভারে বুড়া শিবের মস্তক ভারাক্রান্ত হইলেও, তিনি মনে-মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, বিজয়লক্ষ্মীর আগমনের পুর্ব্বেই তাঁহার ঘরের লক্ষ্মী অন্তহিতা হইয়াছেন। ৭৫ বিঘা নিষ্কর জমির মধ্যে জয়লব্ধ এই সাতকাঠা তিন ছটাক পতিত জমি ছাড়া বাকী সকল জমিতেই তিনখানা বন্ধকী কোবালার জোরে হেয়াতপুরের মহাজন বংশীধারী ঘোষের মালিকানী স্বত্ব জন্মিয়াছে। গৃহিণীর অলঙ্কারগুলা এতদিনে পোদ্দার বোধ হয় গলাইয়া তাহার সুদ-আসল মিটাইয়া লইয়াছে।

শিবনাথ যতদিন মোকদ্দমার নেশায় ছিলেন, ততদিন মোকদ্দমার কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই দেখিবার অবকাশ পান নাই; সাক্ষীর জবানবন্দী এবং উকীলের বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই শুনিবার সময় হয় নাই। এখন সে নেশা ছুটিয়া গেলে তিনি দেখিলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উন্নত সংসারের মধ্যে এমন-একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহা তিনি কখনও কল্পনাতেও আনেন নাই। উঠানের মাঝখানে যে তিনটা প্রকাণ্ড ধানের মরাই ছিল, তাহা কবে, কোন্ কুহকমন্ত্রে উড়িয়া গিয়াছে; কেবল তাহাদের বাঁধান তলা-তিনটা বর্ষার জলে অর্দ্ধভগ্ন হইয়া নষ্টস্মৃতি পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিতেছে। যে গোয়ালে ছয়টা বলদ ও তিনটা গাই গাদাগাদি হইয়া থাকিত, এখন সেখানে মাত্র একটা কঙ্কাল-সার গাভী একপাশে দাঁড়াইয়া শূন্য ডাবার দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চারিজন চাকরের মধ্যে বৃদ্ধ স্বরূপ ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের ঘরের দেওয়ালে এমন একটা ফাট ধরিয়াছে যে, তাহা এই বর্ষায় টিকিবে কি না সন্দেহ।

সকলের উপর আশ্চর্য্য এই যে, শিবনাথ প্রথম মোকদ্দমা রুজু করিবার জন্য যখন মহকুমায় যান, তখন আট বছরের মেয়ে রেণু তাঁহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য কত কাঁদাকাটা করিয়াছিল; আর আজি যখন তিনি মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি লইয়া হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সেই রেণু তাঁহাকে রাঁধিয়া ভাত দিল। সর্ব্বনাশ! সেই এতটুকু মেয়ে রেণু,—সে কবে এত বড় হইল? রেণুর বিবাহ যে না দিলেই নয়!

চারিদিকেই অসম্ভব পরিবর্ত্তন! শিবনাথের বোধ হইল, তিনি যেন দ্বাপর যুগের রাজা মুচকুন্দের মত কোন্ এক নিভৃত পর্ব্বতগুহায় দীর্ঘ-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে জাগিয়া উঠিয়া সংসারের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

জয়লব্ধ জমিটা দখল করিতে গিয়া শিবনাথ দেখিলেন, ঘেঁটু ও কালকাসুন্দার জঙ্গল এবং দুইটা খেজুরগাছ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নাই। শিবনাথ সেইদিনই স্বরূপকে দিয়া খেজুরগাছের পাতা কাটাইয়া আপনার দখলীস্বত্ব সাব্যস্ত করিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে পতিত খেজুরপাতাগুলির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া-চাহিয়া শিবনাথ দীর্ঘশ্বাসের সহিত যখন মনে-মনে তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিতেছিলেন, তখন জীবন মুখুয্যে আসিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া, মোকদ্দমা তো চুকে গেল; এখন মেয়েটার বিয়ের চেষ্টা দেখ।"

শিবনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "হাঁ, তা দেখ্‌তে হবে বৈ কি।"

জীবন বাবু ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, "দেখ্‌তে হবে নয়, দেখ। মেয়ে বিয়ের বয়স ছাড়িয়ে উঠেছে, তা জান তো?"
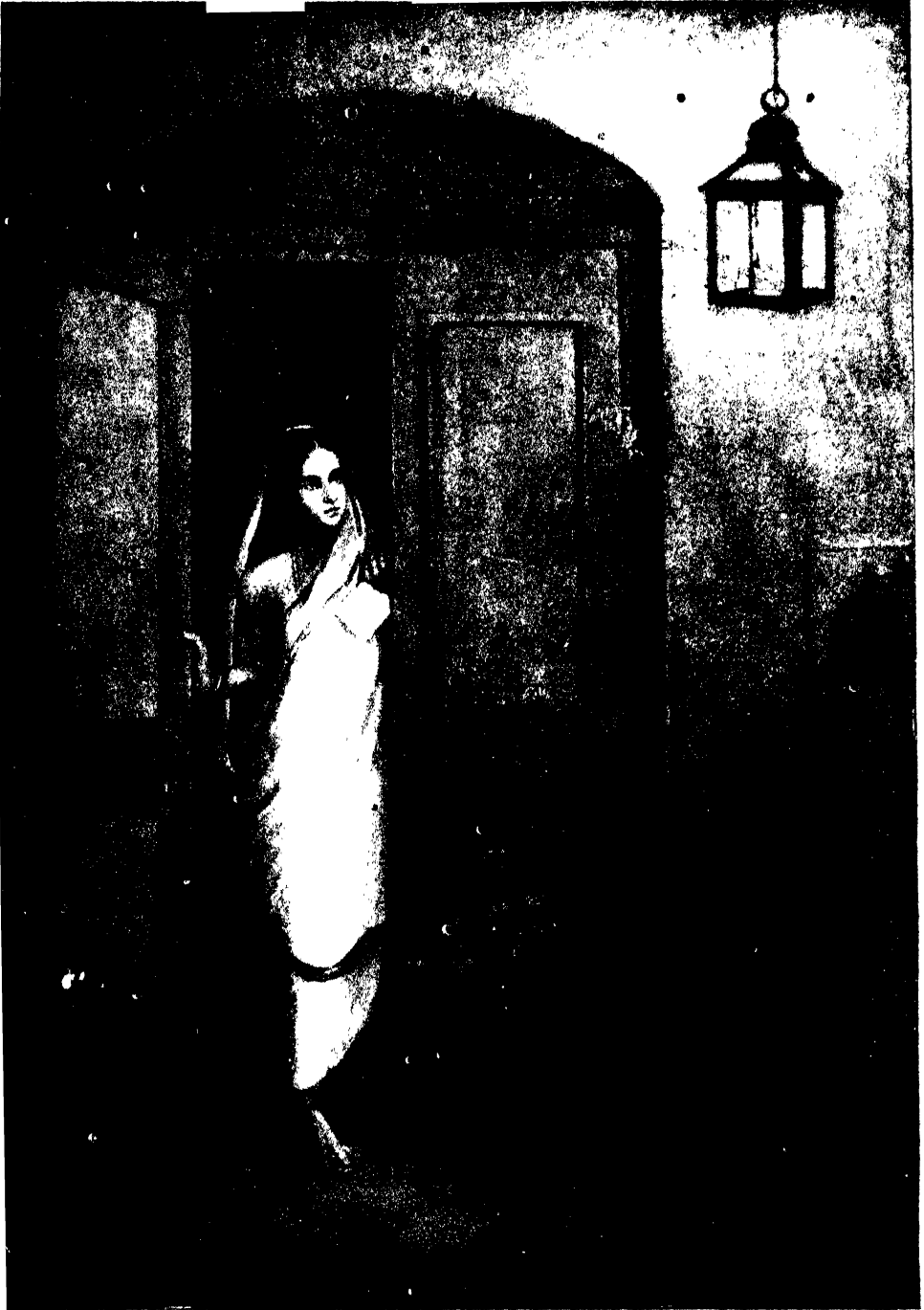
"তখন ধীরে ধীরে উইলচোর বিনাশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।"

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

কৃষ্ণকান্তের উইল—নবম পরিচ্ছেদ।

Emerald Ptg. Works

শিবনাথ মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "তা তো জানি, তবে পয়সা চাই তো।"

জীবন বাবু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "পয়সা চাই, তার যোগাড় দেখ। চুরি-ডাকাতি, জাল-জুয়াচুরি, যেমন ক'রে হোক, মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—জাতিরক্ষা করা চাই।"

শিবনাথ সংক্ষেপে বলিলেন, "দেখি।"

জীবন বাবু বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা দেখ। পাঁচজনে কত কি বলে, তা তো জান না। আমি সব চেপে রেখিছি। কিন্তু আর যদি দেরী কর, তা হ'লে বলছি ভাই, আমিও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তখন যেন আমায় দোষ দিও না।"

জীবন বাবু চলিয়া গেলেন। শিবনাথ সেই খেজুর-পাতাগুলার পাশে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মেয়ের বিবাহ না দিলেই নয়, অথচ হাতে কিছুই নাই; ঋণও কেহ দিবে বলিয়া বোধ হয় না। মোকদ্দমার খরচা-বাবদ প্রতিবাদীর নিকট হইতে সাড়েতিন শত টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। উহাই এখন সম্বল। শিবনাথ ভাবিলেন, "হায় রে মোকদ্দমা! হায় রে জেদ!"

২

সন্ধ্যার পর আহ্নিক সারিয়া শিবনাথ বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলেন, এক নব্য যুবক দাওয়ায় বসিয়া গৃহিণী ও রেণুর সহিত গল্প করিতেছে। শিবনাথকে দেখিয়াই যুবক উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শিবনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

যুবককে উত্তর দিতে হইল না; গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, চিনতে পাচ্চ না! ও যে আনন্দ।"

এবার চিনিতে পারিয়া শিবনাথ অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন, "আনন্দ? জীবনদা'র ছেলে? বোসো বাবা, বোসো। আমি চিনতেই পারি নাই।"

গৃহিণী। চিনবে কেমন ক'রে? ও তো এখানে থাকে না, কলকেতায় থেকে পড়াশোনা করে।

শিব। বেশ, বেশ; তা পড়াশোনা কতদূর হ'লো, বাবাজি!

আনন্দ মুখ নীচু করিয়া নম্রস্বরে বলিল, "এবার এম্-এ দিয়েছি।"

গৃহিণী যেন আনন্দচন্দ্রের বিদ্যাটা সম্যক্ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে শিবনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওর আর পড়ার বাকী নাই, সব পড়ে ফেলেছে। এবার, সেই যাতে উকীল হয়, তাই পড়বে।"

শিবনাথ আনন্দের মাথায় হাত বুলাইয়া হর্ষ-গদগদ স্বরে বলিলেন, "বেশ বাবা, বেঁচে থাক; বংশের, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

আনন্দ লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না। তার পর গৃহিণী তাহার এমনই প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন যে, তাহাকে "আজ আসি" বলিয়া বাধ্য হইয়া বিদায়-গ্রহণ করিতে হইল। সে চলিয়া গেলে শিবনাথ আপন মনে বলিলেন, "বেশ ছেলেটী।"

গৃহিণী। তা আর বলতে। আমাদের রেণুকে বড্ড ভালবাসে। যখনই আসে, রেণুর জন্য খেলানা, সাবান, চিরুণী, ফুল, কত কি নিয়ে আসে। এবারেও কত জিনিষ নিয়ে এসেছে। দেখা তো রেণু।

লজ্জায় রেণুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে সব কা'ল দেখবো। এখন একটু তামাক নিয়ে আয় মা!"

রেণু তামাক আনিতে চলিয়া গেল। শিবনাথ তখন গৃহিণীর দিকে আর-একটু সরিয়া আসিয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিলে? আনন্দ রেণুকে ভালবাসে?"

গৃহিণী। খুব ভালবাসে। আর রেণুও—

শিব। রেণুও কি?

গৃহিণী। রেণুও ওকে দেখলে যেন জ্ঞানহারা হয়। দু'জনে খুব ভাব।

শিবনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ।"

গৃহিণী। হাসলে যে?

শিব। বেশ একখানি উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে।

গৃহিণী। কি হয়েছে?

শিব। উপন্যাস গো, উপন্যাস। সে তুমি বুঝবে না। তবে উপন্যাসের এই উপক্রমণিকা; উপসংহারটা কি রকম হবে, তা আমিও বুঝতে পাচ্ছি না।

গৃহিণী এই উপক্রম-উপসংহারের কিছুই বুঝিতে

পারিলেন না। তিনি স্বরটাকে একটু নীচু করিয়া বলিলেন, "দেখ, এক কাজ করলে হয় না?"

শিব। কাজটা কি?

গৃহিণী। ওর সঙ্গে রেণুর বিয়ে দিলে হয় না?

শিবনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গিন্নি, ক্ষেপেছ?"

গৃহিণী। ওমা, ক্ষেপব কেন?

শিব। তোমার কথা শুনে তাই বোধ হচ্চে। এম্-এ পাশের দর কত জান?

গৃহিণী। তা জানি; কিন্তু হ'লে বড় ভাল হ'তো।

কথার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহিণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় রেণু তামাক সাজিয়া আনিয়া বাপের হাতে হুঁকা দিল। শিবনাথ চুপ করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। রেণু কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ স্বামীকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি ভাবছ?"

শিবনাথ বলিলেন, "ভাবছি, চারপাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'রে এত দিন কি কেবল মোকদ্দমাই করলাম, বুদ্ধিটা কি একটুও পাকে নাই?"

(৩)

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে শিবনাথ "যা করেন মা কালী" বলিয়া জীবন বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বুক-ঠুকিয়া আনন্দের সহিত রেণুর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। এমন অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া জীবন বাবু প্রথমতঃ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তার পর আত্মসংবরণ করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "তা হ'তে পারে না ভাই।"

শিবনাথ বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি দয়া করলেই হ'তে পারে।"

জীবন। আমার হাত নাই; ছেলে এখন বিবাহে রাজী নয়। তা নইলে কি এতদিন বাকী থাকে? এই সেদিন একটা সম্বন্ধ এসেছিল। তিন হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, খাটবিছানা, আরও কত কি। কিন্তু আনন্দ রাজী নয় ব'লে হ'লো না।"

তিন হাজারের কথা শুনিয়া শিবনাথের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝিয়ে বললেই বোধ হয় আনন্দ রাজী হ'তে পারে।"

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া জীবন বাবু বলিলেন, "বল কি হে, এম্-এ পাশ ছেলে, তাকে আমি বোঝাব, না, সে আমায় বোঝাবে।"

অনুরোধ বৃথা বুঝিয়া শিবনাথ নিরস্ত হইলেন। জীবন বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "গিন্নি, শিবনাথটা পাগল হয়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী শিহরিয়া বলিলেন, "বল কি গো?"

জীবন। সাধে কি বলি? সে এসেছিল, আনন্দর সঙ্গে তার মেয়ের সম্বন্ধ করতে।

গৃ। তা মেয়েটী বেশ। কত দেবে বলে?

জীবন। ওর আছে কি যে দেবে।

গৃ। বটে। মেয়েটী কিন্তু চমৎকার। বৌ করতে হ'লে, ঐ রকম বৌ ই করতে হয়।

জীবনবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "ওর চেয়েও ভাল বৌ আসবে, আর তার সঙ্গে আসবে চারটী হাজার। বুঝেছ? আনন্দ কি আমার যেমন-তেমন ছেলে!"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আনন্দ বেড়াইতে আসিলে, শিবনাথ তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। লজ্জা কোরো না, ঠিক ঠিক উত্তর দিও। কেন না, সে কথার উপর তোমার এবং রেণুর সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

আনন্দ চমকিত হইয়া স্বাভাবিক নম্রস্বরে বলিল, "বলুন।"

শিব। আমি শুনেছি, তুমি রেণুকে ভালবাস, রেণুও তোমায় ভালবাসে।

লজ্জায় আনন্দর মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের এই ভালবাসা চিরস্থায়ী হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি রেণুকে তোমার হাতে দিতে চাই। এতে তোমার মত আছে?"

আনন্দ ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু হাসিল। শিবনাথ বলিলেন, "বুঝলাম, তোমার মত আছে। কিন্তু বাপু, আমি কেবল মেয়েটী দিব, একটী পয়সাও দিতে পারব না।"

আনন্দ লজ্জাবিজড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল, "স্ত্রীর জন্যই বিবাহ, অর্থের জন্য নয়।"

শি। শুনে সুখী হলাম; দীর্ঘজীবী হও। আজ-কালকার শাস্ত্রে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত বলে।

আ। কিন্তু এ সকল কথা আমার সঙ্গে কেন?

শি। প্রয়োজন আছে। আমি নিঃস্ব, অথচ তোমার মত ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা কর্‌ছি। আমি শুধু জেনে রাখলাম, তুমি এ বিবাহে সুখী; তুমি স্বেচ্ছায় রেণুর পাণিগ্রহণ কর্‌ছ। এর পর জগৎশুদ্ধ তাকে পরিত্যাগ করলেও, তুমি ত্যাগ করবে না। এইটুকু জানাই আমার দরকার।

আ। কিন্তু বাবার সম্মতি না হ'লে—

শি। অবশ্য, আমি যে উপায়ে পারি, তাঁকে সম্মত করাবো। সে জন্য আমাকে চুরি-জুয়াচুরী কর্‌তে হয়, জেল খাট্‌তে হয়, তাও স্বীকার। কিন্তু তুমি শেষ রক্ষা কোরো, আমার রেণুকে ভাসিয়ে দিও না।

শিবনাথের চক্ষু দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আনন্দ বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি বাবাকে সম্মত করতে পারেন, তবে আর সকল ভার আমার।"

শিবনাথ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরদিন শিবনাথ প্রত্যুষে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

(৪)

প্রায় একপক্ষকাল পরে শিবনাথ ফিরিয়া আসিলেন। জীবন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কোথায় গিয়েছিলে? মেয়ের বিয়ের কিছু হ'লো?"

শিবনাথ হর্ষপ্রফুল্লমুখে উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম ঠিক ক'রে এসেছি।"

জীবন। কোথায় হ'লো?

শিব। নলদার রাসুবাবুর নাম শুনেছেন?

জীবন। শুনেছি বই কি। তিনি তো জমিদার?

শিব। তাঁরই ছেলে। ছেলেটী বি-এ পড়্‌ছে।

জীবন বাবু বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল কি হে? কত দিতে হবে?"

মৃদু হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, "এমন বেশী কিছু নয়; নগদ তিনহাজার, আর বরাভরণ, দান-সামগ্রী।"

জীবন বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একেবারে জমিদারের ছেলে, তাহার উপর তিনহাজার টাকা। এত টাকা শিবনাথ কোথায় পাইবে? কষ্টে বিস্ময় দমন করিয়া জীবনবাবু বলিলেন, "তা হ'লে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে?"

শিব। একরকম ঠিকই বই কি। তারপর বিধাতার ভবিতব্য। মেয়ে দেখে পছন্দ হলেই একেবারে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। তা আমার মেয়ে তো দেখ্‌তে মন্দ নয়।

জীবন। সে কথা ঠিক। তাঁরা আস্‌বেন কবে?

শিব। আমার সঙ্গেই আস্‌তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকদের এনে বসাই কোথায়? বৈঠকখানা তো ভেঙ্গেচুরে রয়েছে। কাজেই দিনকতক সময় নিয়ে এসেছি। কালই রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে ওটাকে সারিয়ে নেব। তবে একটু দোষ স্বীকার করতে হলো, দোজবর।"

জীবন বাবু অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, "সেই ভাল, সেই ভাল।"

শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, "জমিদার হ'লেও রাসুবাবু লোক খুব ভাল। অতি অমায়িক, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই; বেশ শিবতুল্য লোক।"

জীবন বাবু ভাবিতে-ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। পরদিন দেখিলেন, দুই-তিনজন রাজমিস্ত্রী বালি, চুণ, শুরকী লইয়া বৈঠকখানা মেরামত করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তিনি আপন মনে বলিলেন, "তবে কথাটা মিথ্যা নয়।"

মদন মুদী তাম্রকূটসেবনরত শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আর শুনেছ, শিবু গাঙ্গুলী নাকি যকের টাকা পেয়েছে।"

রামু চক্রবর্ত্তী হাসিয়া উত্তর করিল, "ওর বাবা তিনু গাঙ্গুলীও না পেয়েছিল?"

মদন। হাঁ, পেয়েছিলই তো; সেটা এখন ওর হাতে এসেছে।

রামু। শিবু তোমায় ব'লে গেল বুঝি?

মদন। বল্‌তে হবে কেন? ওর চাল-চলন দেখে বুঝতে পার্‌ছ না? ও কথা কি কেউ মুখ-ফুটে বলে?

দামু মণ্ডল বলিল, "তা হ'তেও পারে। কার কখন বরাত ফেরে, তা কি বলা যায়।"

ঈশান বারুই বলিল, "আমরা কিন্তু বরাবরই ও-কথাটা শুনে আসছি।"

রামু। তাই বংশী ঘোষের কাছে তিনচার হাজার টাকা দেনা।

মদন। আহা, বুঝ্ছো না দাদাঠাকুর, ওটা লোক-দেখানো দেনা। আর সে দেনা কি আছে? কড়ায় গণ্ডায় শোধ হ'য়ে গেছে।

রামু। কে বল্লে?

মদন। বল্বে আবার কে? দেনা যদি শোধ না হবে তো জমি বিলি করচে কেমন ক'রে? জমি তো সব বাঁধা ছিল।

দামু। আবার নাকি কোথাকার জমিদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে।

মদন। সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা মেরামত হচ্ছে।

তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, শিবু গাঙ্গুলী নিশ্চয়ই যকের টাকা পেয়েছে। তবে কত টাকা,—তিন কলসী কি চার কলসী, এবং কলসীগুলা বড় কি ছোট, এ বিষয়ে এক-আধটু মতভেদ রহিয়া গেল। রাম চক্রবর্ত্তীকেও শেষে সকলের মতে মত দিতে হইল।

৫

প্রত্যূষে শিবনাথ জামা-জুতা পরিয়া জীবন বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন;—জীবন বাবু ডাকিলেন, "তামাক খেয়ে যাও, ভায়া!"

শিবনাথ আসিলে জীবন বাবু তাঁহার হাতে হুঁকাটা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে কোথায় চলেছ?"

শিব। একবার হেয়াতপুরের দিকে যাচ্ছি।

জীবন। বংশী ঘোষের কাছে বুঝি?

শিব। হাঁ, সেখানেও যাব বটে। তা ছাড়া আরও একটু বিশেষ কাজ আছে।

জীবন। আর কি কাজ হে? আর কোথাও পাত্তর-টাত্তর আছে নাকি?

শিবনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, পাত্র নয়। আর একটু কাজ—ফিরে এসে বলব।"

শিবনাথ কথাটা চাপিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, তাহা শুনিবার জন্য জীবন বাবুর বড়ই আগ্রহ হইল। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "ফিরে এসে যখন বলবে, তখন এখন বল্তেই বা দোষ কি?"

শিবনাথ গম্ভীরভাবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। জীবন বাবুর কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি একটু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কথাটা কি শুনিই না। আমি তো আর কাউকে বল্তে যাব না।"

শিবনাথ হুঁকায় একটা জোর-টান দিয়া মুখের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে হুঁকাটা জীবন বাবুর হাতে দিলেন, এবং সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন, "কথাটা যেন এখন প্রকাশ না হয়। হেয়াতপুরের চৌধুরীরা রাইপুর মহালটা ইজারা দেবে।"

জীবন। হাঁ, সে কথা শুনেছি বটে। তা তুমি ওটা নেবে না কি?

জীবন বাবু নিঃশ্বাস রোধ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিবনাথ মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "এখন ঠিক বল্তে পারি না, তবে ইচ্ছাটা আছে বটে।"

জীবন বাবু হাঁ-করিয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন;—বিস্ময়ে তাঁহার বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। একটু পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "বল কি হে, তার তো আট দশ হাজার টাকা দাম হবে।"

চাপা-হাসি হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, "সাড়েসাত হাজার টাকা দর ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। মহালটা ভাল; খরচখরচা বাদে তিনহাজারের উপর লাভ।"

জীবন বাবু হুঁকা হাতে বসিয়া রহিলেন, তাহাতে টান দিবার কথা মনে রহিল না। শিবনাথ বলিলেন, "এখন আসি, বেলা হয়ে যায়।"

জীবন। হাঁ এস, দুর্গা দুর্গা। ওঁরা মেয়ে দেখ্তে আসবেন কবে?

শিবনাথ যাইতে-যাইতে বলিলেন, "আগে এই কাজটা সেরে তবে ওটায় হাত দেব। এটার উপর অনেকের ঝোঁক আছে।"

শিবনাথ চলিয়া গেলেন। জীবন বাবু বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি? এত টাকা কোথায় পেলে? জমিদারী নেবে। তবে লোকে যা বল্ছে, তা মিথ্যা নয়, নিশ্চয়ই যকের টাকা পেয়েছে। আনন্দর সঙ্গে ওর মেয়েটার বিয়ে দিলে মন্দ হ'তো না। সেখানে যখন দোজবরে তিন হাজার স্বীকার পেয়েছে, তখন আমি

সহজেই চার হাজার নিতে পারব। কিন্তু সে দিন জবাব দিয়েছি। তাতে ক্ষতি কি? বলব, এখন ছেলের মত হয়েছে।"

এতক্ষণে হাতের হুঁকাটার উপর জীবনবাবুর লক্ষ্য হইল। তিনি তাহাতে দুইচারিটা টান দিলেন; কিন্তু আর ধোঁয়া বাহির হয় না দেখিয়া, বিরক্তির সহিত সেটাকে রাখিয়া দিলেন। তার পর চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, চটী জুতাটা পায়ে দিয়া, নিতাই ঘটকের বাড়ী চলিলেন।

৬

যদিও জমিদারবাড়ী কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল, তথাপি গাঁয়ে-ঘরে, ছেলেটি ভাল, ঘরও জানা-শুনা,—এই সকল বিবেচনা করিয়া, শিবনাথ ঘটকের প্রস্তাবে রাজী হইলেন। তখন আদান-প্রদানের কথা চলিতে লাগিল। জীবনবাবু নগদ তিনহাজার এবং একহাজার টাকার গহনা চাহিলেন। শিবনাথ বলিলেন, "আমি ওসব গহনার হাঙ্গামে যেতে পারব না, মোটের উপর চারহাজার দেব।"

জীবনবাবু পস্তাইয়া গেলেন। এক কথায় চারহাজার—আরও একটু চাপ দিলে ভাল হইত। কিন্তু একবার যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অন্যথা করা যায় না। তবে প্রকারান্তরে কিছু আদায়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। তখন তিনি ফুলশয্যা, দানসামগ্রী, গৃহব্যাপার প্রভৃতির এক লম্বা ফর্দ্দ জারি করিলেন। অনেক দর-কসাকসির পর শিবনাথ এই সকল বাবদ আর পাঁচশত টাকা চুক্তি করিয়া শেষে বলিলেন, "ইহার বেশী আর একটি পয়সা চাহিলে আমি অন্যত্র চেষ্টা দেখিব।"

সম্মুখেই চৈত্রমাস। সুতরাং সেই মাসেই ৭দিন পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

সন্ধ্যারাত্রেই লগ্ন। বর আসিয়া আর সভায় বসিবার সময় পাইল না, একেবারে ছাঁদলাতলায় গিয়া বসিল। বিবাহের পরই খাওয়ান-দাওয়ানর হাঙ্গাম। সে হাঙ্গাম মিটিতে রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বেই প্রাপ্যগুলা হস্তগত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জীবনবাবু তাহা লইবার সুযোগ পাইলেন না। সম্প্রদানের সময় একবার কথাটা তুলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিলেন না। এমন সময়ে সম্প্রদানের কাজ ফেলিয়া শিবনাথকে টাকা আনিবার জন্য উঠিয়া যাইতে বলিলে লোকের কাছে নীচতা প্রকাশ পাইবে,—ছেলেই বা কি মনে করিবে? আর শিবনাথের উপর তাঁহার তেমন অবিশ্বাসও ছিল না। তথাপি মনটা যেন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। "শুভস্য শীঘ্রমাগতম্"।

পরদিন যখন বর বিদায় হইতেছিল, তখন শিবনাথ একখানা কাগজ আনিয়া জীবনবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনার প্রাপ্য বুঝে নিন।"

জীবনবাবু পকেট হইতে চসমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একবার কাগজখানায় চোখ বুলাইলেন; তার পর শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা কি, বেহাই?"

শিবনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ওটা আমার ওই সাত-কাঠা জমির দানপত্র। ওর দাম সাড়েচার হাজার টাকা। মোকদ্দমায় ঐ টাকাই স্থির হয়েছে।"

জীবনবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জুয়াচুরি, জুয়াচুরি! আনন্দ, আনন্দ!"

আনন্দ নববধূর হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া জীবনবাবু বলিলেন, "ভয়ানক জুয়াচোর, সব ফাঁকি, এক পয়সারও প্রত্যাশা নাই।"

আনন্দ বলিল, "তা আমি জানি।"

জীবন। জান? তবে আমায় বল নাই কেন?

আনন্দ। আপনি তো আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

একটু অপ্রতিভভাবে জীবনবাবু বলিলেন, "বেশ, যা হবার হয়েছে, এখন চল; এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকা নয়।"

পিতার আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্র রেণুর হাত ধরিয়া আনন্দ অগ্রসর হইল। জীবনবাবু বলিলেন, "আর মেয়েটাকে কেন? ওকে রেখে যাও।"

প্রশান্তদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ বলিল, "আপনার বৌকে জুয়াচোরের ঘরে রেখে যাবেন?"

জীবনবাবু পুত্রের আনন্দপ্রফুল্ল মুখখানা দেখিয়া আর কিছু প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "না, না;—আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে চল।"

তারপর শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেহাই, তোমারই জিত; দেখ্‌ছি সব দিক্ বেঁধে কাজ করেছ। আমি তো তোমায় সাদাসিদা লোক বলেই জানতাম। তুমি এ সব জুয়াচুরি বুদ্ধি পেলে কোথায়?"

শিবনাথ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, শিখ্‌তে হয়েছে। এই বুদ্ধিটুকুর দামও সাড়েচার হাজার টাকা।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হোরা-বিজ্ঞান

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

আমাদের হিন্দু জ্যোতিষ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) এবং অপর ভাগের নাম ফলিত জ্যোতিষ বা হোরা-বিজ্ঞান (Astrology)। "আদ্যন্ত বর্ণলোপাৎ হোরাস্মাকং ভবত্যহোরাত্রাৎ" অর্থাৎ 'অহোরাত্র' শব্দের পূর্ব্ব ও অন্ত বর্ণের (অ ও ত্র) লোপ পাইয়া হোরা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে গ্রহ-ভগনাদি করিয়া এই হোরা-শাস্ত্রদ্বারা মানবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যাবতীয় সদসৎ কর্ম্মের ফল জানিতে পারা যায়। কথিত আছে ব্রহ্মা, সূর্য্য, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, ভৃগু, যবন, বৃহস্পতি ও শৌনিক এই অষ্টাদশ মুনি জ্যোতিঃ-সংহিতার রচয়িতা। এই অষ্টাদশ সংহিতার দুইচারিখানি ব্যতীত অন্যগুলির নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে যবন রাজার অধিকার সময়ে হিন্দুগণের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মীভূত হয়। এই সময়েই বোধ হয় জ্যোতিঃ সংহিতাগুলি নষ্ট হইয়া থাকিবে। পরাশর, ভৃগু ও নারদ মুনি প্রণীত কয়েকখানি সংহিতাই অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফূর্জিধ্বজ যবন কর্ত্তৃক সংস্কৃতভাষায় রচিত 'যবন-জাতক' ও 'তাজিক' নামক দুইখানি জ্যোতিষগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে 'হায়ন রত্ন' এবং 'নীলকণ্ঠ তাজক' নামক যে দুইখানি পুস্তক প্রচলিত আছে,—যদ্দ্বারা বর্ষপ্রবেশ গণনা করা হয়, তাহা যবন প্রণীত 'তাজিক' জ্যোতিষ হইতেই উদ্ভূত। জ্যোতিঃশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে এতদ্দেশে প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ এই জ্যোতিঃশাস্ত্রের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং ভারতবাসিগণ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়েও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ভারতকেই গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের উৎপত্তির মূলস্থান বলিয়া একবাক্যে সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! কালের বিচিত্র গতি! অধুনা এই ভারতবর্ষেই উক্ত শাস্ত্রের চরম অবনতি ঘটিয়াছে।

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি না, এই বিষয় লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। বিজ্ঞানবিদেরা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন না; কেন না, তাঁহারা যেরূপ প্রমাণ চান, ঠিক সেইরূপ প্রমাণ পান না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে কতকগুলি কুযুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। সূর্য্যের বিষুব-সংক্রমণ হেতু দিবারাত্র যখন সমান হয়, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে যখন জোয়ার হয়, তখন চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিস্থ হওয়ায় ভোলার মা কেন না পাগল হইবে, ইত্যাদিরূপ উদ্ভট যুক্তিতে ফলিত-জ্যোতিষ বিশ্বাস করা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ অভাবে ফলিত-জ্যোতিষ একেবারে অবিশ্বাস করা উচিত নহে। জগতে আজ যাহা অসম্ভব বোধ হইতেছে, কাল তাহা সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্বে কে জানিত যে বাষ্প-সাহায্যে 'ছয় দণ্ডে ছয় দিনের পথ' অতিক্রম করা যায়? পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে, বিদ্যুৎ-সাহায্যে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নিমেষের মধ্যে বার্ত্তা প্রেরণ করিতে পারা যায়? ফলিত জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ; সুতরাং পরোক্ষ প্রমাণের আবশ্যক করে না। জগতের অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তির জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া, তাঁহাদের জীবনের শুভাশুভ ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখা গিয়াছে যে, হোরা-শাস্ত্রোক্ত গ্রহগণের শুভাশুভ ফল প্রত্যক্ষ। সাহিত্যরথী ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মপত্রিকায় 'বুধাদিত্য' ও 'ভৌমাচার্য্য' যোগ সংঘটিত হইয়াছে এবং তৎফলে তাঁহাকে শাস্ত্র-বিশারদ, সাহিত্যানুরাগী, তেজস্বী, স্বদেশহিতৈষী ও কীর্ত্তিশালী করিয়াছে। কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের জন্মপত্রিকা বিচার করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে শুক্র, বৃহস্পতি ও চন্দ্র এই তিনটী শুভগ্রহ কেন্দ্রগত এবং তৎসঙ্গে দ্বিতীয় ও একাদশ ভাবাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নের সপ্তমে অবস্থিত। ইহার ফলে তিনি যশস্বী, বহুশাস্ত্রপাঠী, বিবেকী এবং আমাদের নিকট একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হরিপদর কোষ্ঠিতে লিখিত আছে—তিনি রাজা হইবেন; কই এ যাবৎ তাঁহাকে ত রাজা হইতে দেখিলাম না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কোনও শিরঃপীড়াগ্রস্ত রোগীকে 'কুইনাইন' সেবন করাইলে যদি তাহার রোগের উপশম না হয়, তজ্জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে যেমন দোষ দেওয়া যায় না, তদ্রূপ হরিপদর রাজ্য-প্রাপ্তি না ঘটায় এ স্থলে হোরা-শাস্ত্রকেও দায়ী করা যাইতে পারে না। এরূপ চিকিৎসক অনেক আছেন, যাঁহারা রোগ-নির্ণয় করিতে সক্ষম না হইলেও, একটী ঔষধের

ব্যবস্থা করিয়া দেন ;—একবারও ভাবেন না, রোগী ইহাতে বাঁচিবে কি মরিবে। সেইরূপ এমন জ্যোতিষীও অনেক আছেন, যাঁহারা গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় করিতে পারুন আর নাই পারুন, জন্মপত্রিকায় একটা পুঁথির বাঁধি গদ লিখিয়া দেন, একবারও ভাবেন না জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত কোষ্ঠি-লিখিত ফলাফলের ঐক্য থাকিবে কি না। প্রকৃত ঘটনার সহিত কোষ্ঠী-লিখিত ফলাফলের অনৈক্য হইলে, সাধারণে ভাগ্যগণনার প্রতি আস্থা হারায়। কিন্তু সেজন্য ফলিত জ্যোতিষ অবিশ্বাস্য, এ কথা বলা চলে না।

এই হোরাশাস্ত্রে মানবের অদৃষ্ট গণনা করিবার প্রধান অবলম্বন এক দিকে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহের সঙ্গে চন্দ্রপাতদ্বয় রাহু ও কেতু এবং অপর দিকে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই বারটী রাশি। রাহু ও কেতু বস্তুতঃ কোনও গ্রহ না হইলেও, পৃথিবীর জীবগণের উপর ইহাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় বলিয়া, আর্য্য ঋষিগণ ইহাদিগকে গ্রহশ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যগণনা করিতে হইলে, গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে জন্মকালীন গ্রহগণ যে যে রাশিতে অবস্থান করিতেছে, তাহা গণনা করিয়া লইয়া, জাতকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে হয়। পৃথিবীর আহ্নিক-গতি হইতে বোধ হয় যেন, প্রতিদিন নভোমণ্ডল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে একবার করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশরাশিযুক্ত সৌর কক্ষাও সেই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তিত হয় বলিয়া, দ্বাদশটী রাশির প্রত্যেকটী গড়ে দুইঘণ্টা কাল ক্ষিতিজ বৃত্তের উপর (on the Horizon) অবস্থান করে। যে সময়ে যে রাশি পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে ক্ষিতিজ বৃত্তের উপর অবস্থান করে, সেই সময়ে সেই রাশিকে লগ্ন (Ascendent) বলা হইয়া থাকে। জন্মকালীন এই লগ্ন অতি সতর্কতার সহিত গণনা করা আবশ্যক; কেন না, ইহাই ভাগ্যগণনার মূল অবলম্বন। এই ত্রিশ অংশাত্মক (30 degrees) লগ্নোদিত রাশিকে প্রথমে দুই, তিন, নয়, দ্বাদশ ও ত্রিশ ভাগ ইত্যাকারূপে বিভক্ত করিয়া, কোন্ ভাগ জন্মকালীন ক্ষিতিজ বৃত্তের উপর ছিল, তাহা স্থির করিয়া লইতে হয়। এই কয় ভাগকে যথাক্রমে হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিশাংশ বলা হয়। গ্রহগণ কোন্ রাশির কত সংখ্যক অংশে অবস্থিত, তাহাও নিরূপণ করা আবশ্যক; কেন না, এক রাশির সর্ব্বস্থানে গ্রহগণ সমভাবে ফলদায়ক হন না।

এই দ্বাদশরাশিস্থিত—গ্রহগণের সাহায্যে ভাবফল, যোগফল এবং দশাফল নামক প্রধানতঃ তিন প্রকার ভাগ্যফল গণনা করা হইয়া থাকে। সমগ্র রাশিচক্রকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অংশকে ভাবগৃহ নামে অভিহিত করা হয়। জন্মলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, এই দ্বাদশ ভাবগৃহে মানবের ভাগ্যগণনার যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম—লগ্ন বা তনুভাবে শরীরসম্বন্ধীয় রূপগুণাদি, দ্বিতীয়—ধনভাবে ধনরত্নাদি, তৃতীয়—সহজভাবে সোদর, জ্ঞাতি ও পরাক্রম প্রভৃতি, চতুর্থ—বন্ধুভাবে মিত্র, মাতা ও ভূসম্পত্ত্যাদি, পঞ্চম—পুত্রভাবে অপত্য ও বুদ্ধি-বিদ্যাদি, ষষ্ঠ—রিপু ভাবে শত্রু, চিন্তা ও পীড়া প্রভৃতি, সপ্তম—জায়াভাবে স্ত্রী, কাম ও বাণিজ্যাদি, অষ্টম—নিধনভাবে মৃত্যু, পরাক্রম ও বিপদাদি, নবম—ধর্ম্মভাবে ধর্ম্ম, ভাগ্য ও চরিত্রাদি, দশম—কর্ম্মভাবে কর্ম্ম, পিতা ও উচ্চপদাদি, একাদশ—আয় ভাবে আয় ও যান-বাহনাদি এবং দ্বাদশ—ব্যয় ভাবে ব্যয়, ঋণ ও অভাবাদি সম্বন্ধে শুভাশুভ ভাগ্যফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। দ্বাদশ ভাবগৃহের মধ্যে লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম ভাবগৃহকে কেন্দ্র এবং পঞ্চম ও নবম গৃহকে কোণ নামে অভিহিত করা হয়। কেন্দ্র ও কোণ শুভ এবং অপর ভাবগুলি অশুভ। দ্বিতীয় প্রকার ভাগ্যগণনার নাম যোগফল বিচার। জন্মকালীন বিশেষ-বিশেষ গ্রহের বিশেষ-বিশেষ রাশিতে অবস্থান বা যোগাযোগ হইতে যে সকল ভাগ্যফল গণনা করা হয়, তাহাকে যোগফল বিচার কহে। যেমন, "কুম্ভে চ মীনে মিথুনাভিধানে শরাসনে স্যুর্যদি পাপখেটাঃ। কুচেষ্টিতঃ স্যাৎ পুরুষো নিতান্তং বজ্রেন নূনং নিধনং হি তস্য॥" অর্থাৎ জন্মসময়ে যদি কুম্ভ, মীন, মিথুন ও ধনু এই চারিটী রাশি পাপগ্রহযুক্ত হয়, তবে সে জাতকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঘটিবে। এই যোগফল বিচার অন্যান্য ভাগ্যগণনা অপেক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ; কেন না, গ্রহগণের যোগাযোগসম্ভূত ফলের ব্যতিক্রম হইতে প্রায় দেখা যায় না। মানব-জীবনে কোন্ সময়ে কিরূপ শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহা যে গণনাদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম দশাফল-গণনা। জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্ব্বসমেত ৪২ প্রকার দশা-গণনা করিবার বিধি আছে। তন্মধ্যে অষ্টোত্তরী, যোড়শোত্তরী এবং বিংশোত্তরী এই তিনি প্রকার মতে গণনা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া এতদ্দেশে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। মানব-দেহ সত্ত্ব রজঃ-তমঃ, এই গুণত্রয়ে গঠিত হইলেও, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের তারতম্য এবং দেশকালপাত্রভেদে ব্যক্তিবিশেষে সত্ত্বরজাদি গুণের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। অষ্টোত্তরী দশা সত্ত্বপ্রধান, যোড়শোত্তরী দশা রজঃ প্রধান এবং বিংশোত্তরী দশা তমঃপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর ফলদায়ক হয়। বর্ত্তমান যুগে তমোগুণেরই প্রাবল্য অধিক; এজন্য, প্রায় সকল ব্যক্তিতেই অন্যান্য দশা অপেক্ষা বিংশোত্তরী দশা অধিক ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। এই সকল দশা নক্ষত্র হইতে গণনা করা হয় বলিয়া ইহাদিগকে নাক্ষত্রিকী দশা বলা হয়। সমগ্র রাশিচক্রে সর্ব্বসমেত সাতাইশটী নক্ষত্র আছে। প্রত্যেক রাশি সওয়া-দুই নক্ষত্রে গঠিত। জন্মকালীন চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্রকেই জাতকের জন্মনক্ষত্র বলা হয়। প্রত্যেক নক্ষত্র এক-একটী গ্রহের দশাফলদাতা হয়েন এবং প্রত্যেক গ্রহ কোন এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দশাফল প্রদান করিয়া থাকেন। জাতক জন্মকালে কোন্ গ্রহের দশা প্রাপ্ত হইল এবং তাহার ভোগ্য কালই বা কত, তাহা জন্মনক্ষত্র ও তাহার ভোগ্য মানদণ্ডাদি হইতে গণনা করিয়া লইয়া, পরে তাহা হইতে পর্য্যায়ক্রমে জীবনের যাবতীয় গ্রহের দশা-ভোগ-কাল গণনা ও তৎফলাফল বিচার করা হইয়া থাকে। এই দশাফল

সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে পারিলে কোন্ দিন, কোন্ মুহূর্ত্তে মানব কিরূপ ঘটনার অধীন হইবে, তাহা বলিতে পারা যায়। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উক্ত কয় প্রকার ভাগ্যগণনা নভোমণ্ডলস্থ গ্রহগণের শুভাশুভত্ব ও বলাবলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল ও শনি পাপ বা অশুভগ্রহ। শরীর সবল থাকিলে চিত্ত যেমন প্রসন্ন থাকে এবং ক্ষীণ হইলে যেমন অপ্রসন্ন হয়, চন্দ্রগ্রহও সেইরূপ কলার বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে শুভ ও অশুভ ভাবাপন্ন হয়েন। শুক্লাষ্টমী হইতে কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র অন্যূন অর্দ্ধাংশ-কায় থাকায় শুভগ্রহ এবং তদ্ব্যতীত সময়ে অর্দ্ধাংশের ন্যূনকায় থাকায় পাপ বা অশুভগ্রহ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। বুধ শুভগ্রহ কিন্তু তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায়। সৎবালক অসৎবালকের সংস্পর্শে যেমন অসৎ হইয়া যায়, বুধগ্রহও সেইরূপ পাপগ্রহযুক্ত হইলে পাপগ্রহ হইয়া পড়েন। রাহু ও কেতু উভয়েই পাপভাক্।

হোরাশাস্ত্রে গ্রহগণ বিম্বাকার জ্যোতিঃ পদার্থ নহেন; তাঁহারা মানবের ভাগ্যনিয়ামক, সুতরাং দেবমূর্ত্তিবিশিষ্ট। এক-একটী গ্রহ হইতে এক-একটী বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। সেই সকল বিষয় লইয়া গ্রহগণের স্বরূপ ও স্বভাবাদি কল্পিত হইয়াছে। যেমন, রবি রক্তশ্যাম বর্ণ, পিত্তাধিক-প্রকৃতি, প্রতাপশালী ও গম্ভীর। চন্দ্র গৌরবর্ণ, মেধাবী, বাত-কফ-প্রকৃতি, ও শান্তমূর্ত্তি। মঙ্গল রক্ত-গৌরবর্ণ, বলশালী ক্রোধী, সাহসী ও পিত্তাধিক-প্রকৃতি। বুধ দূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ, রজোগুণী, স্পষ্টবক্তা, পিত্ত বায়ু ও কফ-প্রকৃতি এবং বালস্বভাব। বৃহস্পতি গৌরবর্ণ, গম্ভীর, শ্লেষ্মাধিক-প্রকৃতি ও সত্ত্বগুণী। শুক্র দূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ, কামী, বাত-কফাধিক-প্রকৃতি এবং ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়। শনি—কৃশাঙ্গ, বায়ুপ্রধান-প্রকৃতি, খলস্বভাব, ও তমোগুণী। রাহু ও কেতু নীলতনু, অতি ভয়ঙ্কর এবং বায়ুপ্রধান-প্রকৃতি। গ্রহগণের এই সকল স্বরূপ ও স্বভাব অর্থে বলিতে হইবে যে, গ্রহগণ হইতে মানবের স্বরূপ ও স্বভাব জ্ঞান।

রাশিচক্র গ্রহগণের বিহারভূমি। গ্রহগণ প্রতিনিয়ত দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তন্মধ্যে কোনও গ্রহের একটী এবং কাহারও বা দুইটী রাশি স্বগৃহ বা স্বক্ষেত্র অর্থাৎ সেই-সেই রাশির তাঁহারা অধিপতি বা গৃহস্বামী। যেমন রবির সিংহরাশি, চন্দ্রের কর্কটরাশি, মঙ্গলের মেষ ও বৃশ্চিকরাশি, বুধের মিথুন ও কন্যা-রাশি, বৃহস্পতির ধনু ও মীনরাশি, শুক্রের বৃষ ও তুলারাশি এবং শনির মকর ও কুম্ভরাশি স্বগৃহ বা স্বক্ষেত্র। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া স্বগৃহাগত হইলে মানব যেমন প্রফুল্ল হয়, গ্রহগণও তেমনি রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে-করিতে স্বক্ষেত্রস্থ হইলে, প্রসন্নভাব ধারণ করেন এবং তৎফলে শুভফলপ্রদ হন। এই স্বগৃহের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ স্থান গ্রহগণের যেন শান্তিনিকেতন। ইহাকে হোরাশাস্ত্র 'মূল ত্রিকোণ' স্থান কহে। এই স্থানে গ্রহগণ বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেন; এবং তদনুযায়ী শুভফলপ্রদ হন। যেমন, সিংহরাশির ২০ অংশ পর্য্যন্ত রবির, মেষ রাশির ১২ অংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলের, কন্যারাশির ১৬ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের, ধনুরাশির ১০ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির, তুলার ১৫ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের, এবং কুম্ভরাশির ১০ অংশ পর্য্যন্ত শনির 'মূল ত্রিকোণ' স্থান। এ সম্বন্ধে চন্দ্র কিছু ভিন্ন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। স্বক্ষেত্র কর্কট রাশিতে ইঁহার 'মূল ত্রিকোণ' স্থান নাই। পুরাণে কথিত আছে যে, রোহিণী চন্দ্রের পত্নী। রোহিণী নক্ষত্র বৃষরাশিতে অবস্থান করেন। তাই বোধ হয় বৃষরাশির ৪ হইতে ২০ অংশে থাকিলে ইনি বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেন। রাশিচক্রের কোনও স্থানে গ্রহগণ পূর্ণবলশালী এবং কোথাও বা একেবারে হীনবল হইয়া পড়েন। যে স্থানে তাঁহারা পূর্ণবলশালী হন, সেটী তাঁহাদের 'তুঙ্গ' স্থান। যেমন রবির মেষরাশি, চন্দ্রের বৃষরাশি, মঙ্গলের মকররাশি, বুধের কন্যা-রাশি, বৃহস্পতির কর্কটরাশি, শুক্রের মীনরাশি এবং শনির তুলারাশি 'তুঙ্গ' স্থান। তুঙ্গ স্থান হইতে গণনায় সপ্তম রাশিতে গ্রহগণ একেবারে হীনবল হইয়া পড়েন। এই রাশিকে তাঁহাদের 'নীচ' স্থান কহে। সৎ ব্যক্তির অবস্থা ভাল হইলে সে যেমন সাধ্যানুসারে লোকের উপকার করে এবং হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, উপকার না করিতে পারুক, কথনও কাহারও অপকার করে না, শুভগ্রহগণও সেইরূপ তুঙ্গস্থানগত হইলে বিশেষ শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন; এবং নীচস্থানগত হইলে, শুভপ্রদ না হউন, অশুভকর হন না। পাপগ্রহগণ কিন্তু ইহার বিপরীত। ইঁহারা তুঙ্গগত হইলে অশুভপ্রদ হয়েন না বটে, কিন্তু নীচগৃহগত হইলে সাধ্যানুসারে অপকার সাধন করিয়া থাকেন। ভাগ্যগণনাকালে রাহু ও কেতুর স্বক্ষেত্রাদি স্থানের বিচারের প্রয়োজন করে না। ইঁহারা যে গ্রহের সহিত যুক্ত, অথবা যে গ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তাঁহারই বলাবল প্রাপ্ত হন। কেহ-কেহ গ্রহগণের বলাবল নির্ণয়কালে রাহু গ্রহের স্বক্ষেত্রাদিরও পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। রাহুর কন্যারাশি স্বগৃহ, কুম্ভরাশি মূল ত্রিকোণ এবং মিথুন রাশি তুঙ্গস্থান। কেতু গ্রহের স্বক্ষেত্রাদি ক্বচিৎ আলোচিত হইয়া থাকে।

গ্রহগণের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা, মিত্রতা ও মমতা এই তিন প্রকার সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার এক অতি সহজ উপায় দৃষ্ট হয়। যে গ্রহের শত্রু মিত্রাদি নিরূপণ করিতে হইবে, সেই গ্রহের পূর্ব্বোক্ত 'মূল ত্রিকোণ' স্থান হইতে গণনায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এবং সেই গ্রহের 'তুঙ্গ'স্থান রাশির যে সকল গ্রহ অধিপতি হইবেন, তাঁহারা সেই গ্রহের মিত্র এবং তদ্ভিন্ন রাশির অধিপতিগণ তাঁহার শত্রু বলিয়া বুঝিতে হইবে। রবি ও চন্দ্র ব্যতীত সকল গ্রহেরই দুইটী করিয়া স্বক্ষেত্র আছে বলিয়া কোন কোনও গ্রহ এবম্বিধ গণনায় শত্রু ও মিত্র উভয়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেন। সেই স্থলে তাঁহাদিগকে সেই গ্রহের সমগ্রহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কোনও প্রবল শত্রুর গৃহে গমন করিলে, বা দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, আমাদের মনে যেমন উদ্বেগ আসিয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিকে তিরোহিত করিয়া দেয়, এবং পক্ষান্তরে মিত্রগৃহে

গমন করিলে, বা কোনরূপে তাহার সংস্পর্শে আসিলে আমরা যেমন চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করি, গ্রহগণও তদ্রূপ শত্রু গ্রহের সহিত কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইলে, অপ্রসন্নতা হেতু অশুভফলপ্রদ এবং মিত্র সম্পর্কে প্রসন্নতা লাভ করিয়া শুভফলপ্রদ হইয়া থাকেন।

জীবগণের ন্যায় গ্রহগণেরও যেন দৃষ্টিশক্তি আছে। কিন্তু তাঁহারা রাশিচক্রের সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের অধিষ্ঠিত রাশি হইতে তৃতীয় ও দশম রাশিতে একপাদ, নবম ও পঞ্চম রাশিতে দ্বিপাদ, চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ, এবং সপ্তম রাশিতে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। জগতে সকলের দৃষ্টি এক প্রকার নহে। কেহ-কেহ বক্র দৃষ্টিতেও ভালরূপ দেখিতে পান। গ্রহগণের মধ্যেও তদ্রূপ শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রাহু সপ্তম রাশি অপেক্ষা অন্যরাশিতে ভালরূপে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন, শনি তৃতীয় ও দশম রাশিতে, মঙ্গল চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে, বৃহস্পতি পঞ্চম ও নবম রাশিতে এবং রাহু পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশ রাশিতে পূর্ণদৃষ্টি করিয়া থাকেন। গ্রহগণের মধ্যে কেতুই কেবল অন্ধ। ইহার দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নাই! গ্রহগণ শুভগ্রহ বা মিত্রগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে শুভপ্রদ এবং অশুভগ্রহ বা শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে অশুভপ্রদ হইয়া থাকেন।

প্রথমে গ্রহগণের শুভাশুভত্ব ও বলাবল নির্ণয় করিয়া লইয়া, পরে মানবের ভাগ্যগণনা করিতে হয়। গ্রহগণের বলাবল নির্ণয়কালে দেখিতে হয়, গ্রহগণ কোন্ কোন্ ভাবের অধিপতি হইয়া কোন্ কোন্ ভাবগৃহে অবস্থিত, অথবা কোন্ কোন্ ভাবগৃহের অধিপতির সহিত যুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রহগণের শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধ, তাহাদের স্বগৃহ, তুঙ্গ, নীচ ও মূল ত্রিকোণ স্থানের অবস্থিতি, এবং তাহাদের স্বভাব ও স্বরূপাদি বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে, তাহারা কোন্ ভাবের কিরূপ ফলদাতা হইবেন, তাহার বিচার করিতে হয়। গ্রহগণের শুভাশুভত্ব ও বলাবল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। হোরাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং এ বিষয়ে বহুদর্শিতা না থাকিলে, বিশুদ্ধরূপে ভাগ্যফল বিচার করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ভাগ্যফল গণনার মধ্যে ভাবোত্থফল বিচার সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। যিনি সম্যক্‌রূপে ভাবোত্থফল বিচারে সমর্থ, তিনিই ফলিত জ্যোতিষে সুপণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

"কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"; বর্ত্তমান কলির মানবগণের অদৃষ্টফল বিচারে পরাশর মুনির মতই প্রবল ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ। পরাশর-সংহিতায় উক্ত আছে, "গ্রহাঃ ক্রূরাঃ খলা নাত্র শুভাঃ সৌম্যাঃ কদাচন। তৎস্থানাধিপত্যেন ভবন্তীহ খলাঃ শুভাঃ।" অর্থাৎ নৈসর্গিক পাপগ্রহ (রবি, মঙ্গল ও শনি) পাপগ্রহ বলিয়া এবং নৈসর্গিক শুভগ্রহ (চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র) শুভগ্রহ বলিয়া গণ্য হইবে না; লগ্নাদি দ্বাদশ স্থানের আধিপত্য অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভত্ব নিরূপিত হইবে। যথন, নৈসর্গিক শুভ বা অশুভ যে কোনও গ্রহ লগ্ন, পঞ্চম ও নবম স্থানের অধিপতি হইলে শুভগ্রহ, আর তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানের অধিপতি হইলে অশুভগ্রহ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। নৈসর্গিক শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থানের (লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানের) অধিপতি হইলে অশুভপ্রদ এবং পাপগ্রহ শুভপ্রদ হইয়া থাকেন। অনেকে কোষ্ঠীবিচারকালে গ্রহগণের নৈসর্গিক শুভাশুভ ফলের অবতারণা করিয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্যকালে অনেক সময় উহার বিপরীত ফল ফলিতে দেখা যায়। জগতের সকল লোক যখন এক প্রকৃতির নয়, তখন একই গ্রহ সকলের নিকট একই ফলদাতা কিরূপে হইতে পারেন? পরাশর মুনির মতে একের প্রতি শনিগ্রহ অশুভ ফলদায়ক, কিন্তু অন্যের প্রতি তিনি শুভপ্রদ হইতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায় যে, জন্ম মুহূর্ত্ত বিশুদ্ধরূপে নিরূপিত না থাকায়, কোষ্ঠীর বিচার-লব্ধ ফলাফলের অনৈক্য হইতেছে। সেক্ষেত্রে সামুদ্রিক বিজ্ঞানের সাহায্যে করতলাদির রেখা পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধরূপে বয়স নির্ণয় করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। অশ্বাদির দন্ত, বৃক্ষাদির গ্রন্থি পরীক্ষা করিয়া যদি সূক্ষ্মরূপে উহাদের বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়, তবে মনুষ্যের করতলাদির রেখা পরীক্ষা করিয়া বয়স কেন না নিরূপণ করা যাইবে? বয়স সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইলে জন্মক্ষণ জানিতে পারা যায় এবং সেই সঙ্গে গণিত জ্যোতিষের সহায়তায় বিশুদ্ধ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সাধারণের মধ্যে নিজ-নিজ ভাগ্যফল জানিবার জন্য একটা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কোনও কঠিন সমস্যায় পড়িয়া ব্যাকুল হইলে, যদি তাহাকে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে এবং কিরূপে চলিলে মঙ্গল হইতে পারে বলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাস্তবিকই সে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিয়া থাকে। অতএব ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, ফলিত জ্যোতিষে লোকের আস্থা প্রসারিত হইলে, অদৃষ্টবাদ উপস্থিত হইয়া জীবনের বিধিবদ্ধতা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়, পুরুষকারের লোপ সাধন করে, এবং এইরূপে উন্নতির পথ সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। পুরুষকারের লোপ সাধন করিয়া অদৃষ্টবাদ প্রচার করা ফলিত জ্যোতিষের উদ্দেশ্য নহে। "পুরুষকারেন বিনা দৈবং ন সিধ্যতি"—পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখনও সিদ্ধ হয় না। "দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকং। স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্॥" অর্থাৎ পূর্ব্ব দেহে আত্মকৃত যে কর্ম্ম তাহারই নাম দৈব (যাহাকে ভাগ্য বা অদৃষ্ট নামে অভিহিত করা হয়); এবং ঐহিক আত্মকৃত যে কর্ম্ম তাহারই নাম পুরুষকার। দৈব ও পুরুষকারের একত্র সংমিশ্রণে ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষকারের সাহায্যে অশুভভাগ্যফলের হ্রাস এবং শুভভাগ্যফলের বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞাত হইয়া, পুরুষকারের দ্বারা লোকে যাহাতে জীবনে উন্নতি সাধন ও সুখে কাল কাটাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আর্য্য ঋষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টমুখাপেক্ষী হইয়া জড়ের ন্যায় জীবনধারণ করিতে শিক্ষা দিয়া যান নাই।

বাঙ্গালা তারিখে লা, রা, ঠা, ই, এ যোগ

[ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল]

অঙ্ক এবং অঙ্কবাচক শব্দে প্রভেদ আছে বলা যায়; প্রভেদ নাইও বলা যায়। ৫ এবং পাঁচ (পঞ্চ) দৃশ্যে প্রভেদ আছে—উচ্চারণে ও অর্থে প্রভেদ নাই। ৫—৬—১৩২৩ কোন পত্রে লেখা থাকিলে, আমরা পাঁচুই আশ্বিন, তেরশত তেইশ সাল বুঝিয়া থাকি; মুখে বলিতে হইলেও পাঁচুই আশ্বিন তেরশত তেইশ বলিয়া থাকি। একটী অঙ্ক, অপরটী শব্দ; উভয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রভেদ নাই। কেবল কালী, কলম ও কাগজের ব্যয়ের এবং লেখার পরিশ্রমের হ্রাসের নিমিত্ত অঙ্ক সৃজিত হইয়াছে। অঙ্ক সৃজনের পূর্ব্বে কেবল খড়ীর বা কালীর দাগ অথবা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইত। এখনও আমাদের অনেক অশিক্ষিত লোক পুরাকালের রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। গোয়ালা একসের দুগ্ধ দিল—দেওয়ালে কয়লায় । অঙ্কিত হইল; দুই সের দিল, ।। অঙ্কিত হইল, পাঁচসের দিল, ।।।।। অঙ্কিত হইল। মুখে বলিবার সময় একসের, দুইসের, পাঁচসের বলা হইয়া থাকে। অঙ্ক লেখার ইতিহাস অনেকেই জানেন, এখানে এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট হইবে।

পঞ্চ ও পঞ্চম এই দুইটী শব্দে প্রভেদ আছে। একটীকে আমরা সংখ্যাবাচক বলি, অপরটীকে পূরণবাচক বলি। অঙ্ক লেখার সময় পার্থক্য রাখা কর্ত্তব্য কি না? "আশ্বিনস্য পঞ্চম দিবসে" অথবা "পাঁচুই আশ্বিনে" জানাইতে হইলে ৫ই আশ্বিন লেখা কর্ত্তব্য বা আবশ্যক কি না? পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" প্রথম প্রকাশের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ১লা, ২রা, ৫ই প্রভৃতি প্রচলিত ছিল কি না; এবং না থাকিলে নূতন নিয়ম প্রচলনের প্রয়োজন ছিল বা আছে কি না, এই বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আমার রচিত একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। সে দিন সেই বৎসরের স্থায়ী সভাপতি বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতির আসনে ছিলেন। তাঁহার পুরাতন বিষয়ে বেশ অধিকার আছে—তাহা স্বীকার না করিলেও, তাঁহার কথা নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নহে। আমি অর্ব্বাচীন, বড়-একটা পড়াশুনা নাই; পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথির সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় আমার কথার সমর্থন করেন। আমার কেবল বয়সের ও নিজ জ্ঞানের উপর নির্ভর। শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথির কীট; কিন্তু তিনি পুঁথিরক্ষা করেন, নষ্ট করেন না। তাঁহাকে পুঁথির কীট (book-worm) বলিলে বলিতে হইবে যে, তিনি good bacilli; যেমন দধিম bacilli. সংস্কৃত ভাষায়ও সকল গ্রন্থে পৃষ্ঠা-গণনায় ১, ২, ৩ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, ১ম, ২য়, ৩য় ব্যবহৃত হয় না। শব্দ লেখার সময়, উচ্চারণের সময়—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়; কিন্তু অঙ্কপাতে সেই ১, ২, ৩।

পুঁথি অনেক সময় অনেকেরই দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং দুইএকখানি মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া পুরাতন রীতির নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধগণের কথায় বিশ্বাস না হইতে পারে; বর্ত্তমান নিম্ন বা মধ্য প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষিত নয় এরূপ ব্যক্তিগণের,—বর্ব্বরগণের, লেখায় আস্থা না হইতে পারে; কিন্তু "A book's a book, wherever is met." বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "তীর্থ ভ্রমণ" প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সাধারণে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহা সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত। "বোধোদয়" তখনও প্রকাশিত হয় নাই। তীর্থভ্রমণে কোন স্থানেই 'লা, রা, য়, ই' তারিখের পর দেখিতে পাই নাই। ১১ পৃষ্ঠায় ১৮ ফাল্গুন, ২০ ফালগুন, ১৩ পৃষ্ঠায় ২১ ফাল্গুন; ১৬৮ পৃষ্ঠায় ৮ শ্রাবণ, ৯ শ্রাবণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্যান্য মুদ্রিত পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থেও এই রীতি দেখিয়াছি। কোথাও ১লা, ২রা ইত্যাদি দেখি নাই। যদি কেহ প্রতিবাদ করেন, তিনি আমার ও শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদ করিতে পারেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধলেখক প্রমাণ দিয়া আমাদের কথার প্রতিবাদ করিলে বাধিত হইব। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপ্রাসঙ্গিক। প্রবন্ধলেখক সংস্কৃত ভাষারও দোহাই দিয়াছেন; কিন্তু তিনি অঙ্কের ও অঙ্কবাচক শব্দের প্রভেদ আলোচনা না করিয়াই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যাহা হউক, কথিত আছে, দাশমিক সংখ্যাবাচক শব্দ ও অঙ্কের ভারতবর্ষে উৎপত্তি। সে উৎপত্তির কাল আধুনিক ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের গঠনের পূর্ব্বে। আমার সংস্কৃত-জ্ঞান সামান্য ছিল, এখন সে জ্ঞান সময়স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তবে এখন তাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও, এ কথা বলিতে পারি, আমি কোথাও পঞ্চম স্থলে ৫ম দেখি নাই; একসপ্ততি স্থলে ৭১তি দেখি নাই। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধলেখক প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথিতে সংখ্যাবাচক বা পূরণবাচক অঙ্কের পর কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন তিনি কি দেখিয়াছেন? একটা প্রমাণ দিলে বড়ই বাধিত হইব। পণ্ডিতপ্রবর দেবোপম বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি পিতৃবৎ ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রতি আমার অচলা ভক্তি; কিন্তু তিনি যে য়ুরোপের অনুকরণে নূতন রীতি প্রচলন করেন, তাহা বলায় তাঁহার প্রতি ভক্তির ও শ্রদ্ধার হ্রাস দেখায় না। তাঁহার প্রদর্শিত নিয়মমত চলা কর্ত্তব্য কি না, তাহা পৃথক কথা।

সকলই পরিবর্ত্তনশীল। সমাজ পরিবর্ত্তনশীল। সাহিত্য ও ভাষাও পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের অনুকরণের আদর্শ য়ুরোপে পরিবর্ত্তনের অভাব নাই। সকল দেশেই সেই অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান সাহিত্যিক বঙ্গভাষার স্রষ্টা; তাঁহার "সীতার বনবাস" আমাদের বড়ই আদরের গ্রন্থ; কিন্তু "সীতার বনবাসের" ভাষা এখন পুরাতন ভাষা—সেকালের ভাষা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাপ্রণালী-সম্বন্ধে "সেকালের ভাষা" বলিলে তাঁহার

প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ হয় না। নূতন ধরণের আবশ্যকতা থাকিলে, নূতন ধরণই অবলম্বন করিতে হইবে।

৫দিন লিখিত থাকিলে, পাঁচ দিনই পড়িতে হইবে; ৫ আশ্বিন ৫—৬ লিখিত থাকিলে পাঁচুই আশ্বিনই পড়িতে হইবে। অঙ্ক ৫ কোথায় সংখ্যাবাচক ও কোথায় পূরণবাচক, তাহা জানিতে বা পড়িতে আয়াস আবশ্যক করে না, অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ১৩২৩ সাল লিখিতে ১৩২৩শ লেখার আবশ্যকতা নাই; কোথাও দেখিতেও পাই না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ লিখিলেই যথেষ্ট। বস্তুতঃ অঙ্কের সৃষ্টি সংক্ষেপের জন্য; তাৎপর্য্য-বোধ হইয়া যত সংক্ষেপ হয়, ততই ভাল। ভাষার গতিই তাহাই। আবার, কাগজের দর ও কালীর দর এত বাড়িয়াছে যে, যদি মুদ্রাঙ্কনে বা লেখায় একটা অক্ষর কম হয় তাহাই লাভের। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্মৃতির অধ্যাপক পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় বলিতেন যে, এখন সংক্ষেপের কাল পড়িয়াছে; এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলিতেন যে, সেকালে "লবঙ্গ" কথা চলিত ছিল, এখনও আছে; কিন্তু অনেকে লবঙ্গ না বলিয়া "লঙ্গ" বলেন, আবার অনেকে কেবল "লং" বলিতেছেন; এবং বোধ হয় কিছুকাল পরে, কেবল শিরঃ-কম্পনেই লবঙ্গ বুঝাইবে। বস্তুতঃ, ভাষার গতিই এইরূপ। আলস্যের জন্যই হউক, বা, জঞ্জালবর্জ্জনের জন্যই হউক, ভাষার বিকার অপরিহার্য্য; আমাদেরও সময়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে হইবে। পুরাতনের জন্য মায়া হয় বটে, অভ্যস্ত জিনিষ ত্যাগ করা সহজ নয় বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্ত আমরা তাহা করিতেছি; তবে অলক্ষিতভাবে। পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বলিলেই মুস্কিল; কিছু না বলিলে, তর্ক ব্যতীত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

আমার দোষ—আমি পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, সাহিত্য-পরিষদে আমার প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রথিতনামা, টেক্‌ষ্ট-বুক-কমিটী ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সুদৃষ্টিভাজন লেখক নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালার জন্য লিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তকে নিঃশব্দে অঙ্কের পরে লা, রা, য় প্রভৃতি উঠাইয়া দিলে, তাহাই চলিয়া যাইবে। কিছুদিন পরে বোধোদয়ের প্রণালীও লোকে বিস্মৃত হইবে। তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমার ক্ষীণ বুদ্ধির ও ক্ষীণেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পল্লীগ্রামে আমার প্রথম শিক্ষা। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হয় নাই। গুরুমহাশয় ১লা, ২রা, ৩রা, ৪ঠা জানিতেন না; আমিও উপদেশ পাই নাই। পরে স্কুলে পড়িয়া লা প্রভৃতি শিক্ষা করি। যে লা প্রভৃতি ব্যবহার করিত না, তাহাকে বর্ব্বর মনে করিতাম। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে বালকত্ব হয়; বাল্যের কথা, ব্যবহার প্রভৃতি মনে পড়ে; তাহাতে আস্থাও হয়। বোধ হয় তজ্জন্যই অনেকে বহুকাল শাস্ত্রদর্শিত আচার পরিত্যাগ করিয়া শেষে সেই আচারের পক্ষপাতী হন। তাঁহারা তখন শাস্ত্রানুগমনের যুক্তিও দেন। কিন্তু বহুকালের প্রচলিত ব্যবহার কেবল পঞ্চাশ বৎসরের পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া ভালই মনে হয়, যদি তৎপূর্ব্বের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হয়।

নৈষধীয়-চরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী কি না?*

[শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি-এল]

নৈষধীয়-চরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ একজন অতি অসাধারণ কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার রচনা ও প্রতিভা দেশবিশ্রুত। এ হেন পণ্ডিত বাঙ্গালী হইলে যে বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের কথা, তাহাতে সন্দেহ কি?

এই প্রবন্ধে দেখাইব—তিনি বাঙ্গালী। এ কথা এখন অনেকেরই কর্ণে নূতন শুনাইবে। কথাটা কিন্তু নূতন নহে—অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা প্রচলিত ছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সুতরাং নৈষধীয়-চরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী—এ কথায় কেহ বিস্মিত হইলে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, রত্নাবলী-নাটক-প্রণেতা শ্রীহর্ষের কথা বলিতেছি না। নৈষধীয়-চরিত, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীহর্ষের কথা এই প্রবন্ধে বলিতেছি।

শ্রীহর্ষের কাল-নির্ণয়সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, তিনি দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের লোক। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে তিনি দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। আমি কালনির্ণয়সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে অধিক কিছু আলোচনা করিব না।

আমি দেখাইব যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইতে—তিনি যে গৌড়দেশবাসী ছিলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৈষধীয়-চরিতের সপ্তম সর্গের শেষে তিনি আত্মপরিচয়স্থলে বলিয়াছেন—"শ্রীহর্ষ কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং শ্রীহীর সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্ল দেবী চ যম্। গৌড়োর্বীশ কুল প্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্যয়ং তন্মহাকাব্যে চারুণি বৈরসেনি চরিতে সর্গোগমাৎ সপ্তমঃ॥"

তিনি যে গৌড়দেশ ভূপাল বংশের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, ইহা এস্থলে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। গৌড় দেশের সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখিয়া গৌড়েশ্বরের প্রশস্তি লেখা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কবি যে গৌড়দেশের লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচনা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

"শরদিজ জ্যোৎস্নাচ্ছ সূক্তে" চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তিনি নল ও দময়ন্তীর বিবাহে দময়ন্তী কর্ত্তৃক মাল্য দিবার সময় উলুলু ধ্বনির অবতারণা ভিন্ন এই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। বিদর্ভনগরে বিবাহ; সেখানে উলুলুধ্বনি কোথায় পাইবেন? সেইজন্য কবি লিখিয়াছেন—

---

* পাবনা সাহিত্য-পরিষদের গত শ্রাবণ মাসের অধিবেশনে পঠিত।

"কাপি প্রমোদাস্ফুট নির্জিহান বর্ণেব যা মঙ্গল গীতিরাসাম্। নৈষাল-লেভ্যঃ পুরসুন্দরীণাং মুচ্চৈরুলুলুধ্বনি রুচ্চ রাং।"

প্রসিদ্ধ টীকাকার নারায়ণ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন ;—

প্রমোদাৎ হর্ষবশাৎ কণ্ঠস্য সগদ্গদত্বাৎ অস্ফুটা অপ্রকটা নির্জিহানা নির্গচ্ছন্তো বর্ণা অক্ষরাণি যস্যাং এবংবিধৈব যা বিলোকয়িতুম্ আগতানাং পুরসুন্দরীণাং আননেভ্যঃ কাপি লোকোত্তরা মঙ্গলরূপা ধবলাদি গীতি রাজৎ। নৈবোচ্চৈঃ উলুলু ধ্বনি রুচ্চচার উদগদৎ। বিবাহাদ্যুৎসবে প্রাণাং ধবলাদি মঙ্গলগীতি বিশেষা গৌড়দেশে উলুলু। ইত্যুচ্যতে সোপ্যব্যক্তবর্ণ উচ্চার্যতে। স্বদেশ রীতি কবিনোক্তা॥

পাঠকগণকে এই শ্লোকের উপর মনোনিবেশ করিতে বলি। কবি বলিতেছেন—"দম্পতিকে দেখিবার জন্য পুরসুন্দরীগণ আগত হইলে তাহাদের হর্ষবশতঃ সগদ্গদ মঙ্গলগীতি অস্ফুটভাবে যে নির্গত হইয়াছিল, তাহাই উচ্চ উলুলু ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, শ্রীহর্ষ নিজ দেশীয় উলুলুধ্বনি ভিন্ন মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন বোধ করেন নাই এবং উলুলুধ্বনি কোনরূপে আনীত করিয়া মঙ্গলাচরণের সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (১)

প্রাচীন টীকাকার নারায়ণ উলুলুধ্বনির অর্থ করিতে বলিয়াছেন, "বিবাহাদি উৎসবে ধবলাদি মঙ্গলগীতি বিশেষ গৌড়দেশে উলুলু বলিয়া কথিত। উহাও অব্যক্ত বর্ণ। কবি স্বদেশ-রীতির উক্ত করিয়াছেন।" টীকাকার উলুলু শব্দের অর্থ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, বিবাহাদি উৎসবে তাঁহার দেশে প্রসিদ্ধ ধবলাদি গীতি যেরূপ হয়, গৌড়দেশে উলুলুধ্বনি সেই প্রকার পদার্থ। টীকাকার অন্য দেশীয় রীতি না বলিয়া, গ্রন্থকার স্বদেশপ্রসিদ্ধ রীতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ টীকাকারের সময় শ্রীহর্ষ যে গৌড়দেশবাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে? টীকাকার নারায়ণ বঙ্গদেশীয় নহেন। এই টীকাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতিও এই কবিকে গৌড়দেশবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও তৎসময়ে তিনি এই দেশবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তৎকৃত পুরুষ পরীক্ষা নামক গ্রন্থে "মেধাবী কথায়" নিম্নলিখিত গল্প আছে। আমি মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুবাদ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। (২)

"* * * গৌড়দেশে শ্রীহর্ষ নামা এক পণ্ডিত। তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নল-চরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম ও গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিদের যশের নিমিত্ত হয়। * * * পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিতসমাজের উদ্দেশে বারাণসী গেলেন।"

পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, নল-চরিত্র লেখক শ্রীহর্ষ গৌড়দেশ-বাসী—এ কথা ৫০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে সুবিজ্ঞাত ছিল।

রাজশেখর সূরি ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে যে প্রবন্ধ-কোষ রচনা করেন, তাহাতে শ্রীহর্ষ বিদ্যাধর জয়চন্দ্র প্রবন্ধ হইতে হরিহর প্রবন্ধ পর্য্যন্ত স্থলে শ্রীহর্ষকে গৌড় দেশীয় ও শ্রীহর্ষ বংশে গৌড় দেশে হরিহর তৎকালে বর্ত্তমান থাকার কথা জানা যায়। (৩)

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইলাম যে, শ্রীহর্ষ আত্মপরিচয়ে যাহা বলিয়াছেন, ও উলুলুর কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়াই বোধ হয়; এবং বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তিনি গৌড়দেশবাসী বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিজ্ঞাত ছিলেন; এবং ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বংশের হরিহর গৌড়দেশে জীবিত ছিলেন।

নৈষধীয় গ্রন্থশেষে শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি কান্যকুব্জাধিপতির নিকট সকল পণ্ডিতাধিক্যব্যঞ্জক তাম্বুলদ্বয় ও বিদ্বৎ-যোগ্যাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (তাম্বুলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ)। কেহ-কেহ ইঁহাকে কান্যকুব্জের আশ্রিত পণ্ডিত এবং সেই কান্যকুব্জাধিপতিকে জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্র নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে তাঁহার গৌড়দেশীয় হওয়ার কোন বাধা দেখি না। শ্রীহর্ষের ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্ন বিদ্বান গৌড়দেশের বাহিরে পূজিত হইয়াছিলেন এবং তাহা আশ্চর্য্য কি? এখানে "লভতে" এই ক্রিয়াপদ বর্ত্তমানকালসূচক বলিয়া কেহ কেহ তর্ক করেন যে, নৈষধীয়চরিত প্রকাশকালে শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কান্যকুব্জ বাস ভিন্ন অন্যত্র বাস কালে তাম্বুলদ্বয় লাভ করা সম্ভবপর নহে। এই তর্কের উত্তরে একই কথা। শ্রীহর্ষ কবি তাঁহার কাব্যকে কোন স্থানে নৈষধীয়-চরিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ষোড়শসর্গের ও একোনবিংশ সর্গের শেষ শ্লোক দেখুন)। "নল-চরিত্র" "নৈষধ-চরিত্র" হইতে পৃথক গ্রন্থ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। বিদ্যাপতির উল্লিখিত শ্রীহর্ষ কবি পৃথক ব্যক্তি ও তাহার রচিত নলচরিত্র পৃথক কাব্য মনে করিবার কোন কারণ দেখি না।

(১) আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশ ও কটক ও বালেশ্বর ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশীয়গণ বিবাহাদি উৎসবে উলুলুধ্বনি করে না। কটক ও বালেশ্বরে উড়িয়াদিগের মধ্যে এই যে রীতি আছে, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে গৃহীত। এ সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়গণের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করি।

(২) নৈষধীয়-চরিত, নলীয়-চরিত বা নল চরিত বা নল-চরিত্র

(৩) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত নৈষধীয়-চরিতে লিখিত আছে "শ্রীরাজশেখর সূরিণা ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বিরচিতে প্রবন্ধ কোষে শ্রীহর্ষ বিদ্যাধরজয়চন্দ্র প্রবন্ধাৎ "গৌড় দেশীয়" ইতি "শ্রীহর্ষ বংশে হরিহর গৌড় দেশ্য" ইত্যেতদুত্তর হরিহর প্রবন্ধতোঽবগম্যতে। প্রস্তাবনপৃষ্ঠা,৩।

নিবেদন এই যে, শ্রীহর্ষের কান্যকুব্জের রাজার নিকট হইতে প্রতিদিন তাম্বুলদ্বয় লাভ ও আসন লাভ করা ঐ শ্লোকে ব্যক্ত হয় না। তিনি যখন কান্যকুব্জ যাইতেন, তখন ঐ তাম্বুলদ্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইতেন। এই অর্থে তিনি "লভতে" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; উহাতে কোন দোষ হয় না। কোন পণ্ডিত সম্বৎসরের মধ্যে কোন স্থান হইতে "বার্ষিক বা বৃত্তি" প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন আমি অমুকের নিকট "বৃত্তি পাইয়া থাকি;" ইহাতে ভাষা-প্রয়োগের দোষ হয় না। শ্রীহর্ষ যদি ঐরূপ ভাবে "লভতে" পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে কান্যকুব্জদেশীয় বলিবার কোন কারণ দেখি না।

নৈষধীয় চরিতে কবি নিজ পরিচয়স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিতের পুত্র ও তাঁহার মাতার নাম মামল্ল দেবী। কেহ-কেহ তর্ক করেন যে, এই প্রকার নাম বাঙ্গালা দেশে অপ্রচলিত সুতরাং শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন ঘটক মহাশয়দিগের কুলগ্রন্থে নামগুলি দেখেন, কত বিকট ও উৎকট নাম পাইবেন। মনুসংহিতার টীকাকার প্রসিদ্ধ কুল্লুক ভট্ট যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নামটী কেমন উৎকট! অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। উপসংহারে বক্তব্য এই যে নৈষধ-চরিত, খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, বিজয়-প্রশস্তি, স্থৈর্য্য নিবারণ প্রকরণ, গৌড়োর্বীশ কুলপ্রশস্তি; সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি প্রণেতা অসাধারণ দার্শনিক পণ্ডিত ও কবি শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী বলিয়া সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত-সমাজে যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে; এবং তাঁহার গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার বাঙ্গালী হওয়াও প্রতিপন্ন হয়।

সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালার বিস্তৃতি

[শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, বি-এল্]

অনবধানতাবশতঃ ও মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ "সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালার বিস্তৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে (তৃতীয় বর্ষ—২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) ফুটনোট (৯২০ পৃষ্ঠা) লক্ষ্মণ সেনের চাটুশ্লোকের অর্থের কয়েক স্থানে ভ্রম রহিয়াছে। শ্লোকটী সুন্দর। উহা দ্বিতীয়বার প্রচার করা অসহনীয় নহে; এবং উহার অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নিম্নে যাহা লেখা গেল, ভরসা করি তাহাতে স্বল্প সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের অর্থবোধের সহায়তা করিবে। শ্লোকটী এই:—

ভাবাদভাবাদ্ যদি নাতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভিঃ স্বীক্রিয়তে পদার্থঃ।
জন্মাবিনাশি প্রতিযোগি শূন্যং শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষৌণিপতেযশঃ কিম্॥

এই শ্লোকে কবির বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে। নৈয়ায়িক মহাশয়েরা সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত:—যথা সংযোগ সম্বন্ধ, সমবায় সম্বন্ধ; এইজন্য তাঁহাদিগকে "সম্বন্ধী" বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, ভাব ও অভাব ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই। ভাব পদার্থ দুই প্রকার—এক প্রকার অজন্য, যথা ব্রহ্ম;—অপর প্রকার "জন্য" অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বা জন্ম হইতে পারে। শেষোক্ত অর্থাৎ "জন্য" ভাবপদার্থ, বিনাশশীল। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে অভাব পদার্থের প্রতিযোগী আছে—যথা ঘটের অভাবের প্রতিযোগী 'ঘট'। এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ভাব ও অভাব এই দুই পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থ যদি সম্বন্ধী মহাশয়েরা (নৈয়ায়িকেরা) স্বীকার না করেন, তবে লক্ষ্মণসেনের যশঃ কি পদার্থ? যশঃ জন্য ভাবপদার্থের ন্যায় তাহার উৎপত্তি আছে, অথচ তাহার ন্যায় বিনাশশীল নহে। অতএব উহা ভাবপদার্থ বলিতে পার না। আবার উহাকে অভাব পদার্থও বলিতে পার না—যেহেতু অভাব পদার্থের প্রতিযোগী আছে কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের যশের প্রতিযোগী নাই। বলা বাহুল্য প্রতিযোগী শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক সমস্যা

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১। মুমতাজ-মহলের কয় বিবাহ?

আজকাল যাঁহারাই মুমতাজের কথা লিখিতে বসেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, মুমতাজের দুই বিবাহ ছিল। মুমতাজের বিবাহ-ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ বলেন:—

"সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লীতে একবার নৌরোজার রূপের-হাটে জামাল খাঁ পত্নী বানু উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ খুর্রম লক্ষ মুদ্রা মূল্য দিয়া বানু বেগমের নিকট হইতে একখণ্ড মিছরী ক্রয় করেন। সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা হয়। যুবরাজ সেই চতুরা রমণীর বাকপটুতার আত্মহারা হইলেন। তিনি অর্জ্জুমন্দ বানুকে সেদিন নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন। অধিক রাত্রে নৃত্যগীতাদির পর অর্জ্জমন্দ গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু জামাল খাঁ পত্নীকে কলঙ্কিনীবোধে গৃহে লইতে অস্বীকৃত হইলেন। এইকথা, যুবরাজ খুর্রমের কাণে উঠিল। তিনি জামাল খাঁকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। পত্নীর চেষ্টায় জামাল খাঁ রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি অর্জ্জুমন্দকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবরাজও সেই সুযোগে পতি-পরিত্যক্তা অর্জ্জুমন্দকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনিলেন ও কিছুদিন পরে তাঁহাকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করিলেন।"

মুমতাজের এই দুই বিবাহের কথা সর্ব্বপ্রথমে ১২৯৯ সালের "জন্মভূমিতে", তৎপরে ১৩০৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা "উৎসাহে" 'রোশনারা জাহানারা' প্রবন্ধে, এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "গৃহস্থের" 'তাজমহল' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোন লেখকই, কোথা হইতে এই সংবাদটী পাইলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে কি মুমতাজের দুই বিবাহ ছিল?

সমসাময়িক কোন ফার্সী ইতিহাস বা অন্য কোন ইতিহাসে-আমরা এই তথ্যটী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Beale Keeneএর Oriental Biographical Dictionary পুস্তকের ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় "জামাল খাঁ" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিতে হইয়াছে যে, সম্রাট্ শাহ্জহান স্বীয় রাজত্বকালে একবার একটী নূতন বাজার সংস্থাপন করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকেরা এই বাজারের বিক্রয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর কেমন করিয়া জামাল-খাঁর পত্নী মুঘল অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করেন ও সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হন, সে সমস্ত কথা উপরে লিখিত বিবরণের অনুরূপ।

এখন দেখা যাইতেছে যে, Beale-Keeneএর পুস্তকে লিখিত বিবরণের সহিত উপরিউক্ত বিবরণের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে; কেবল দু'একটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। Beale-Keeneএর পুস্তকে মুমতাজের নামগন্ধ নাই;—জামাল-খাঁ পত্নীরই উল্লেখ আছে। আর সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যুবরাজ খুর্রম নৌরোজার রূপের-হাটে জামাল-খাঁর পত্নীকে লাভ করেন নাই—সম্রাট্ শাহ্জহান স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নূতন স্ত্রীলোকের হাট হইতে জামাল-খাঁর পত্নীকে লাভ করেন।

সম্রাট্ জহাঙ্গীরের ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়; তাঁহার জীবদ্দশাতেই খুর্রমের (পরে শাহ্জহানের) সহিত অর্জ্জুমন্দ বানুর (মুমতাজ) বিবাহ সংঘটিত হয়; পরে কিন্তু Beale-Keeneএর পুস্তক হইতে জানা যাইতেছে যে, শাহ্জহান স্বীয় রাজত্বকালে জামাল-খাঁর পত্নীকে নিজ অন্তঃপুরে আনিয়া পরে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জামাল খাঁর পত্নী, আর অর্জ্জুমন্দ এক নহেন। কাজেই যাঁহারা এই দুইটী ঘটনা একত্র সংযোজিত করেন, তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন;—তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় রাজন্য-বৃন্দ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আজ এই দুই বৎসরের অধিককাল য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই যোগ দিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতীয় সেনাগণের, বিশেষতঃ, ভারতের দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সসৈন্যে যোগদান বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোধপুরের মহারাজের ভূতপূর্ব্ব অভিভাবক লেপ্টেনাণ্ট-জেনারেল মহারাজা সার প্রতাপ সিংহ

যোগ্য। এই য়ুরোপীয়-মহারণের সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ অতি অল্প। তবে আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয় এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন; সেই কারণে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফরিকা ও কানাডা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া, এই যুদ্ধে সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত

রটলামের অধীশ্বর লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেল রাজা সার সজ্জন সিং

যুদ্ধের সম্বন্ধ হইতে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের সহিতও যুদ্ধের সম্বন্ধ হইয়াছে। তাই যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র

ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজগণ, অনুরুদ্ধ না হইয়াও, কেবল যে অর্থ ও সৈন্য দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতেছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, অথবা, পুত্র, ভ্রাতা কিম্বা নিকট আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতের দেশীয় রাজগণের মধ্যে অনেকেই অতি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর। তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ

যোধপুরের মহারাজা লেপ্টেনাণ্ট সুমের সিংহ

সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে স্ব-স্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। তন্মধ্যে আবার কাহার-কাহারও পূর্ব্ব-পুরুষ দ্বাপরযুগে মহাভারতীয়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, এ কথাও প্রচলিত আছে। আজ আবার সেই সকল বংশের কোন-কোন বংশধর কলিযুগে বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা!

যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই, এবং তাঁহাদের সেনাগণও, প্রায়শঃ ক্ষত্রিয় বর্ণ। যুদ্ধ ইঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম,—বর্ণগত পেশা। এই সকল রাজপুত রাজা এবং রাজপুত সেনা বংশানুক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত। বিক্রমে ইঁহারা সিংহসদৃশ, ধৈর্য্যে ধরিত্রীতুল্য; ইঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য তুলনারহিত।

রাও রাজা কানওয়ার হনওয়াৎ সিংহ

আমাদের শাস্ত্রানুসারে রাজা দেবতার অংশ। দেশীয় রাজগণ স্ব-স্ব রাজ্যে নিজ নিজ প্রজাবর্গের নিকট দেবতুল্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাজার আদেশে, রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, অনুরক্ত প্রজাগণ হাসিতে-হাসিতে অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। সেই সকল রাজা

সেইরূপ অনুরক্ত, ভক্ত প্রজাদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন।

আপাততঃ আকালকোট, বারিয়া, বারওয়ানি, বিকানীর, ইদর, জামকান্দি, কিষেণগড়, লোহারু, মাড়োয়ার, নবনগর, রাজকোট, রতলাম, সচিন, সাভানুর ও বাঙ্গানের এই পঞ্চদশটী রাজ্যের রাজা, রাজকুমার ও রাজার আত্মীয়স্বজন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। এই সকল রাজ্যের মোট পরিমাণ ৮৭৬৬০ বর্গ মাইল; এবং লোকসংখ্যা ৪০৮৪৬৫০। ভারতের চক্রবর্ত্তী সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের এই সামন্ত-রাজগণ মন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার উপর রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। তাহাতেও তাঁহাদের নিস্কৃতি নাই। দেশীয় রাজ্যের শাসন-ব্যাপারের অধিকাংশ কার্য্যই খোদ রাজ্যেশ্বরের হুকুম ব্যতীত চলে না। এই কারণে, প্রতি সপ্তাহে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত রিপোর্ট তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হয়; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়াই জরুরি বিষয় সকল সম্বন্ধে তাঁহারা হুকুম দিয়া থাকেন। রাজকার্য্যে সাহায্যলাভের জন্য রাজগণের প্রত্যেকে একজন করিয়া এডিকং পাইয়াছেন। ইঁহারা একাধারে এডিকং, মন্ত্রী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী। এরূপ ব্যবস্থা না করিলেও চলে না; কারণ, রাজারা যেখানেই থাকুন, রাজ্য সুশাসনের জন্য কেবল তাঁহারাই দায়ী। একদিকে সম্রাটের প্রতি আনুরক্তি ও কর্ত্তব্য, অপর দিকে সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও রাজ্য সুশাসনের বন্দোবস্ত করা—এই দুই গুরু কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইতেছে। সুতরাং, সাধারণ সেনানীগণের অপেক্ষা দেশীয় রাজগণের দায়িত্বভার যে অনেক অংশে অধিক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাই কি তাঁহাদের বৃটিশ-রাজের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় নহে?

হায়দরাবাদ পদাতি সেনাদলভুক্ত সেনাগণ

রাজগণের মধ্যে অনেকেই বহুদিন হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ত্তমান। রতলামের রাজা লেপ্টেনান্ট-কর্ণেল সার সজ্জন সিংহ প্রায় ১৯ মাস ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। যোধপুর মাড়োয়ারের, নাবালক মহারাজের অভিভাবক লেপ্টেনান্ট-জেনারেল মহারাজা সার প্রতাপ সিংহ ফ্রান্সে এক বৎসরের অধিককাল যাপন করিয়াছেন। মাড়োয়ারের মহারাজ লেপ্টেনান্ট সুমের সিংহ কয়েকমাস যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতির পর, সাবালক হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের একান্ত অনুরোধে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, স্বরাজ্যে ফিরিতে বাধ্য হ'ন। তাঁহার অভিভাবক মহারাজা সার প্রতাপসিংহও ভ্রাতুষ্পুত্রের সিংহাসনারোহণ উৎসব উপলক্ষে ভারতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু অভিষেক-উৎসব শেষ হইবামাত্র তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিকানীর, ইদর ও কিষণগড়ের মহারাজগণ এবং জামনগরের জামসাহেব ১৯১৪।১৫ অব্দের শীতঋতু ফীল্ড মার্শাল সার জন (অধুনা লর্ড) ফ্রেঞ্চের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে শিবিরে যাপন করিয়া রাজ্যসম্পর্কিত গুরু কারণে ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য

হন। তাঁহারা কার্য্য শেষ করিয়াই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হন।

যোধপুর, ল্যান্সার সেনাদলের একজন সৈনিক

মহারাজা সার প্রতাপসিংহের রণোৎসাহ একাধিক কারণে সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বয়স এখন ৭৩ বৎসর—বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনের উপযুক্ত কাল। কিন্তু এই বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহে পূর্ণ; তাঁহার দৈহিক সামর্থ্যও কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার অশ্বারোহণ-নৈপুণ্য অসাধারণ। অতি শৈশবকাল হইতেই তিনি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত হ'ন। সেই সময় হইতে এ যাবৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠে কালাতিপাত করিয়াছেন, বলিলেই হয়। তিনি যখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালকমাত্র, সেই সময়ে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহার পিতা, মাড়োয়ারের অধীশ্বর তখ্‌ত সিংহ তাঁহাকে আজমীর হইতে বিপন্ন, নিরাশ্রয় ইংরেজ মহিলা ও বালকবালিকাগণকে মাড়োয়ারে আনিবার জন্য আদেশ করেন। সে সময় গো-যান ভিন্ন অপর কোন যান সুলভ ছিল না। বীর বালক পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন—আজমীরস্থিত সমস্ত ইংরেজ মহিলা ও শিশুগণকে গো-যানে চড়াইয়া, বিদ্রোহী সিপাহীগণের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া, নিরাপদে যোধপুরে আনয়ন করেন। মহারাজ তখ্‌ত সিংহ যোধপুরের দুর্গ-অভ্যন্তরস্থ রাজপ্রাসাদ ঐ সকল ইংরেজ মহিলা ও তাঁহাদের শিশুসন্তানগণের বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়া, সপরিবারে অন্যত্র গমন করেন। বালক সার প্রতাপসিংহ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে যেরূপ উৎসাহে বৃটিশ-রাজের সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই উৎসাহ এখনও অটুট রহিয়াছে। মাড়োয়ারের বর্ত্তমান মহারাজ সুমের সিংহ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অভিপ্রায়ে বোম্বাই বন্দরের জাহাজে আরোহণ করেন, তখনও তিনি নাবালক - তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষের ন্যূন ছিল। তাঁহার সঙ্গে মাড়োয়ার রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ক্যাভেলরী (Imperial Service Cavalry) নামক রাজপুত (রাঠোর) অশ্বসাদী সেনাগণ গমন করিয়াছিল। চারিটী স্কোয়াড্রনের (squadron) প্রত্যেকটীর জন্য একখানি করিয়া জাহাজের প্রয়োজন হইয়াছিল। লোহারুর নবাব প্রায় বর্ষাধিককাল পারস্য উপসাগরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর। অপর সকল সামন্ত-রাজই যুবক।
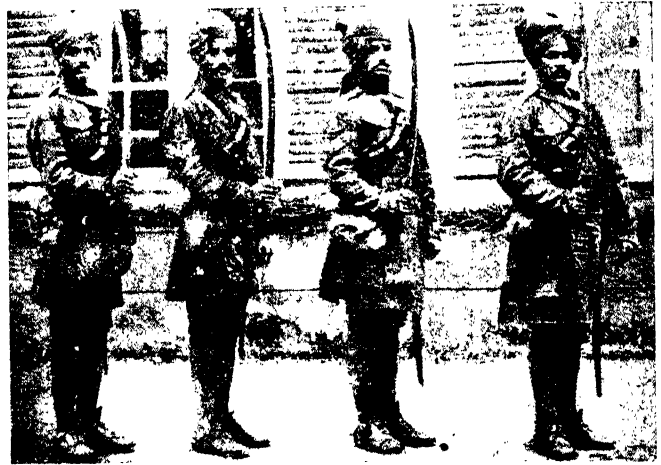
যোধপুর ল্যান্সার সেনাদল—নন্‌কমিসণ্ড অফিসারগণ ও একজন সৈনিক

যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত রাজন্যবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম, সম্প্রদায়

ও সমাজের লোক আছেন। অনেকের দেহে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত প্রবহমান। সাচিনের নবাব হাব্সীজাতীয়। সাচিন, সাভানুর ও লোহারুর নবাবগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; অপর সকলে হিন্দু। পাতিয়ালার মহারাজা লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেল মহারাজাধিরাজ সার ভূপেন্দ্র সিংহ পীড়িত থাকায় যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই; নচেৎ আমরা একজন শিখ-ধর্ম্মী মহারাজকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাইতাম। তিনি এডেন পর্য্যন্ত গিয়া অসুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিরা অভিযানকালে তাঁহার পিতা বৃটিশ রাজের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পুত্রেরও উৎসাহ অল্প নহে, কিন্তু বিধি বাম। জামকান্দির আপ্পাসাহেব পটবর্দ্ধন ব্রাহ্মণবংশীয়। পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী হইলেও ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বীরধর্ম্মীর অভাব কোন কালেই ছিল না—এখনও নাই। ত্রেতাযুগে পরশুরাম, দ্বাপরে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামার কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৃটিশরাজের ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে রাজপুত, শিখ, পাঠান, মারাঠি, গুর্খা, তেলিঙ্গা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত সিপাহীও বিস্তর আছেন। আকারে, গঠনে, বল বীর্য্যে, সহিষ্ণুতায় তাহারা কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। জামকান্দির ব্রাহ্মণ রাজা সমুদ্র-যাত্রার বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সসৈন্যে সুদূর ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন,—বৃটিশ-রাজের প্রতি গভীর অনুরাগই ইহার কারণ। আকালকোটের মহারাজ কয়েক মাস যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়া অসুস্থ অবস্থায় স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়, এবং সুপ্রসিদ্ধ ভোঁসলাবংশীয়। অপর সকল রাজাই রাজপুত। তন্মধ্যে রটলামের রাজা ও ইদরের মহারাজাধিরাজ মাড়োয়ার রাজবংশের শাখাভুক্ত এবং রাঠোর কুলোৎপন্ন। ইদরের মহারাজা মিশরের যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। মহারাজা সার প্রতাপ সিংহের দুই পুত্র—রাও রাজা কানওয়ার লেপ্টেনাণ্ট সগৎসিংহ ও রাও রাজা কানওয়ার হনওয়াৎ সিংহ ফ্রান্সে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। মাড়োয়ার রাজবংশীয়, মাড়োয়ারের প্রধান সেনাপতি, সের সিংহ মহারাজ এবং যোধপুর ল্যান্সার সেনাদলভুক্ত কয়েকজন সেনানীও ফ্রান্সে আছেন।

লেপ্টেনাণ্ট রতনজী, লেঃ পানে সিং, রাজকুমার কাপ্তেন সর্দ্দার সিং, রটলামের রাজা বাহাদুর, কাপ্তেন গজ সিং, রাও রাজা কানওয়ার লেঃ সগৎ সিং

ইঁহারা সকলেই হয় মাড়োয়ার রাজবংশীয়, না হয় উক্ত বংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের খাস রাজপুত সেনাদলেও মাড়োয়ার রাজবংশীয় অনেক সিপাহী আছেন।

পারস্য উপসাগরের তীরে যে সকল ভূমি তুরস্কের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, লোহারুর নবাব তথায় পোলিটিকাল এজেণ্টের কার্য্য করিতেছেন। অপর সকলেই সাধা-

ভাবে যুদ্ধের সহিত লিপ্ত। তাঁহাদের কেহ বা ভারতীয় সেনাদলের ষ্টাফের অন্তর্ভুক্ত, কেহ বা কোন কোন বিশেষ পল্টনের সামরিক কর্ম্মচারী। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের কেহই বেতনভোগী নহেন—কেবলমাত্র সখের খাতিরে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাদের লোকজনের এবং সৈনাগণের বেতনাদিও তাঁহারা নিজ তহবিল হইতে দিয়া থাকেন। জন্য সংগৃহীত না হয়। সুতরাং, তাঁহারা যে ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত, তাহাতে তাঁহাদের বিলাসী হইবারই কথা। কিন্তু, যাঁহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ সেনাগণের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন, শীত ঋতুতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে সেনাগণকে কি ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝড়বৃষ্টি, তুষারপাতও যে না হইতেছে, এমন নহে। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা কিরূপ, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আমরা দূর হইতে মনে করিতে পারি যে, রাজারা খুব সুখে, ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া জীবন কাটাইয়া দেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। একটা রাজ্য সুশাসন করা বড় সহজ

মহীশূরের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস সেনাদলের সেনানীগণ

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের নানা তহবিলে ইঁহারা এবং অন্যান্য রাজগণ বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। বিকানীরের উষ্ট্রারোহী সৈন্য এবং মহীশূরের মহারাজের খুল্লতাত কর্ণেল দেশরাজ উর্স পরিচালিত মহীশূরের সিপাহী দল ইজিপ্টে মহা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ইঁহাদের বেতনও ঐ ঐ রাজদরবার হইতে প্রদত্ত হইতেছে।

যোধপুর ইম্পিরিয়াল সার্ভিস সেনাদল

ভারতবর্ষের সামন্ত-রাজগণের ধনৈশ্বর্য্যের সীমা নাই। তাঁহারা সাধারণতঃ উষ্ণ প্রধান দেশের সমতল ভূমির অধিবাসী। তাঁহাদের সুসজ্জিত, সুপ্রকাণ্ড প্রাসাদসমূহ দর্শনীয় সামগ্রী। তাঁহাদের লোক-লস্কর ও ভৃত্য অসংখ্য। তাঁহাদের কথা খসাইতে না-খসাইতে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালিত হয়। অর্থের বিনিময়ে সংগৃহ করিতে পারা যায়—এমন ভোগ বিলাসের সামগ্রী নাই, যাহা তাঁহাদের কথা নহে। উদ্বেগ, চিন্তা, আশঙ্কা প্রভৃতি মানসিক কষ্ট ত রাজাদের নিত্যসহচর। কিরূপে শাসন করিলে প্রজারা বশীভূত থাকিবে, অথচ সুখেও থাকিবে, ইহাও বড় কঠিন চিন্তা। তাহার উপর, তাঁহাদিগকে সকল প্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যাস করিতে হয়। নচেৎ ফ্রান্সের দুরন্ত শীত সহ্য করিয়া শিবিরে বাস করা কোন ক্রমেই তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত হইত

না। অথচ, তাঁহারা সমস্তই সহ্য করিতেছেন; কিঞ্চিৎ-মাত্র অসন্তোষ, বিরক্তি বা অনুযোগের কথা কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে না। অনেক রাজার মাথার উপর দিয়া দুই-দুইটা প্রচণ্ড শীতঋতু কাটিয়া গিয়াছে, অথচ কেহই একটুও কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ, লক্ষ-লক্ষ প্রজার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হওয়া বড় সোজা কথা নহে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাদের মধ্যে কেহ-কেহ শিবিরে বাস করেন; অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিয়া থাকেন। কোন-কোন কুটীরে দুইজন রাজাকেও বাস করিতে দেখা যায়। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—"একটা রাজ্যে দুইজন রাজার স্থান সঙ্কুলান হয় না।" কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে, যুদ্ধক্ষেত্রে একটী কুটীরের ক্ষুদ্র একটী কক্ষে দুইজন প্রতাপশালী রাজা স্বচ্ছন্দে পরম সুখে বসবাস করিতেছেন; এবং সামান্য খাদ্য দুইজনে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন। অথচ নিজ-নিজ রাজ্যে এক-একটা প্রকাণ্ড নগরের মত প্রাসাদেও তাঁহাদের কুলাইয়া উঠে না। যুদ্ধক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট রাজভোগ্য খাদ্য দুর্ল্ভ বটে, কিন্তু সাধারণ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়। দেশীয় রাজগণ নিজ-নিজ জাতি ধর্ম্ম অনুসারে আপনার-আপনার পাচকের দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া লয়েন। তবে নদীমাতৃক দেশের অধিবাসী বলিয়া তাঁহারা নিত্য স্নানে অভ্যস্ত হওয়ায়, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্নানের জন্য প্রচুর জলের সংস্থান না থাকায় তাঁহাদিগকে কিছু কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে। *

* এই প্রবন্ধের উপকরণ ও ছবিগুলি 'The Windsor Magazine' এ প্রকাশিত সন্ত নিহাল সিংহের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

সাগর-সঙ্গীত

[শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ.]

(পুরীতে সমুদ্র-দর্শনে)

(১)

যে দিন ব্রহ্মা করিল সৃষ্টি, ছুটিল বারিধি! তোমার অশ্ব,
কল্লোলে তোমার, করিছে ধ্বনিত, আপন বিষাণ, শঙ্কর শম্ভু;
ঊর্ম্মি তোমার রচিল শয়ন, যাহাতে বিষ্ণু লভিল সুপ্তি;
মন্থনে তোমার উঠিল অমৃত, মৃত্যু হইতে করিতে মুক্তি।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(২)

আপন হর্ষে উঠিছে নামিছে, শুভ্র লহরী অযুত লক্ষ;
হাসিছে যেমন কৌস্তুভ রতন উজ্জ্বল করিয়া মাধব-বক্ষ।
শ্যাম সলিল নেহারি নেত্রে, ভাবিয়া শ্যাম মোহন কান্তি—
পশিল তোমার অতল গর্ভে, গৌরচন্দ্র লভিতে শান্তি।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(৩)

কৃষ্ণশেখর ঈষৎ উচ্চ করিতে স্পর্শ স্বর্গ-প্রান্ত,
মানব মর্ত্তে করিতে প্রহার রজত-চরণ নহে ত শ্রান্ত;
আলোকপুষ্প ফুটিছে বক্ষে আবৃত যখন তিমিরপুঞ্জে;
বহুলে যেমন তারকাবৃন্দ শোভিত সুনীল আকাশপুঞ্জে।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(৪)

বিশ্বের 'এ জন' আপন চিত্র দেখিছে তোমার বিশাল বক্ষে;
তোমার প্রবাহ দিতেছে শিক্ষা কামনাশূন্য কর্ম্মমন্ত্রে।
প্রেমিক প্রাণের মধুর শক্তি নিহিত তোমার হৃদয়ে, সিন্ধু!
প্রভাবে তাহার হইছ স্ফীত উদিলে গগনে পূর্ণ ইন্দু।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

(৫)

শব্দে ব্রহ্ম প্রথম ব্যক্ত, করিছে প্রকাশ পুণ্য শাস্ত্র,
তারি প্রতিধ্বনি করে কি ধ্বনিত তোমার মন্দ্র দিবসরাত্র;
ত্যজিয়া তোমার মহান্ মূর্ত্তি চাহে না নয়ন অন্য দৃষ্টি;
নমিছে কেবল তাহার চরণে যাঁহার ইচ্ছায় তোমার সৃষ্টি।
অনিত্য জগতে শুধুই সত্য তোমার নৃত্য ভীষণ রঙ্গে,—
কালের চিহ্ন হয় না অঙ্কিত কেবল তোমার সুনীল অঙ্গে।

বঙ্কিম-প্রতিভা

[অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, এম.এ.]

সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ প্রত্যেক দেশের সাহিত্যকেই সচরাচর কতকগুলি যুগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। বিগত শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিত্যেও এই প্রথানুসারে কয়েকটী যুগ-নির্দ্দেশ করা যায়। বাঙ্গালা ১২৭৯ সনের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। সেইদিন হইতে ১৩০০ সনের ২৬শে চৈত্র পর্য্যন্ত যতদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিত ছিলেন, ততদিন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহারই যুগ,—এ কথায়, আশা করি কাহারও আপত্তি নাই। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্য-জগতে সরাজকতা বা অরাজকতা বিরাজ করিতেছে, অথবা কাহার যুগ চলিয়াছে—সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিরাপদ নহে—উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজনও বটে। বর্ত্তমান যুগ কাহার যুগ—এ কথা যদিও স্থিরীকৃত হয় নাই,—তথাপি যাঁহারা বর্ত্তমান-প্রেমিক তাঁহারা বলিতেছেন—এ যুগ আর যাহাই হউক, আর নাই হউক—ইহা বঙ্কিম-যুগ অপেক্ষা উচ্চতর, শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি Popeএর দুইছত্র আমার মনে পড়িতেছে—

We think our fathers fools, so wise we grow,
Our wiser sons, no doubt, will think us so.

এই সকল বর্ত্তমান-প্রেমিকেরা বঙ্কিম-যুগের হীনতা-ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। ইহাঁরা অধিকন্তু বলেন যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত সময়ের পক্ষে প্রাচীন ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার আদর্শকে আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি; তাঁহার বাণী এখন আর আমাদিগকে আকৃষ্ট, মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিতে পারে না; তাঁহার পদ্ধতি, তাঁহার মতবাদ, আধুনিক সময়োপযোগী আর নাই। এ অবস্থায়, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা প্রবীণ ও অগ্রণী—বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ও সমসাময়িক—তাঁহাদিগের বঙ্কিমচন্দ্রসম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি প্রকার ও কত গুরুতর—তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তাঁহারা কি স্বেচ্ছায় অবহেলা করিতেছেন না? বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যাঁহারা পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা যদি সে সৌভাগ্যের গৌরব করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দেশবাসী তাঁহাদিগকে নির্ভয়ে বলিতে পারে যে, এ সৌভাগ্যের অপব্যবহার করা তাঁহাদিগের পক্ষে শোভন নহে—লোকতঃ ও ন্যায়তঃ সমর্থনীয় নহে। তাঁহাদিগের নিকট বঙ্কিম-জীবনী সম্বন্ধে এরূপ ইঙ্গিত বা আভাষ আমরা প্রত্যাশা করি না, যাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যূনতা ঘটিতে পারে। আমরা চাহি যে, এই সকল বঙ্কিম-সহচর—কিংবা সত্য-মিথ্যা ভগবান্ জানেন—বঙ্কিম-সাহচর্য্যের শ্লাঘাকারীরা—যদি সামর্থ্য রাখেন—তবে তাঁহার অসাধারণ মনীষার ব্যাখ্যা করুন, তাঁহার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার মাত্রা যাহাতে বৃদ্ধি পায়—এরূপ সকল সত্য ঘটনা প্রচার করিতে থাকুন। বঙ্কিম-জীবন-চরিত এখনও অপূর্ণ ও অপুষ্টাঙ্গ;—ঘটনা-সন্নিবেশে তাহা পূর্ণায়তন করিতে হইবে। ফলাফলের চিন্তায়, অথবা অখণ্ড সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষার অজুহাতে তাঁহাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। বাঙ্গালী আজ Emersonএর ভাষায় বলিতেছে—

"Never mind the taunt of Boswellism; the devotion may easily be greater than the wretched pride which is guarding its own skirts."

সুখের বিষয়, সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মনে বঙ্কিম-সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের ভাব এখনও সঞ্চারিত হয় নাই,—আজও তাহারা ঘনসংস্থিত সৈন্য-ব্যূহের মত বঙ্কিমপতাকার তলে দাঁড়াইয়া আছে। এদেশে পাঠকের বাহুল্য দেখিয়া এযাবৎ কবিত্বের মূল্য ও সার্থকতা নিরূপিত হইত। এখন আর সে মানদণ্ড—একমাত্র মানদণ্ড হইলে চলে না। অন্য প্রমাণেরও অপেক্ষা থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক তাঁহার 'What is a

Classic?' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বভাবসিদ্ধ বিচক্ষণতা সহকারে বলিতেছেন—

"A true classic is an author who has enriched the human mind, increased its treasure, and caused it to advance a step; who has discovered moral and not equivocal truth, or revealed some eternal passion in that heart where all seemed known and discovered; who has spoken to all in his own peculiar style, a style which is found to be also that of the whole world, a style new without neologism, new and old, easily *contemporary with all time.*"

আপ্তবাক্য যে দেশে প্রমাণের অন্যতম বলিয়া দর্শনশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, সে দেশে classic বা চিরন্তন সাহিত্যের উদ্ধৃত লক্ষণটী মানিয়া লওয়া, ভরসা করি, গুরুতর অপরাধ হইবে না। এই সূত্র ধরিয়া আমরা প্রমাণ করিতে চাহি যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হইয়া যান নাই; কারণ, তাঁহার সৃষ্টি—classic সৃষ্টি; তাঁহার মনীষা অসাধারণ ও দেশকালের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মত দীপ্তির ছটায় পরিবৃত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একছত্র সম্রাটের মত বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিরাজ করিতেছিলেন—তখন তাঁহার রচনাকে চিরন্তন প্রমাণ করিবার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন ছিল, এবং সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবার জন্য বর্ত্তিকার প্রয়োজনের মত হাস্যকর হইত। কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, এরূপ ওকালতীও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাই Sainte Beuveএর উদ্ধৃত মতকে সম্মুখে রাখিয়া, আজ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্যে, অথবা শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে কোন নূতন সৌন্দর্য্য, কোন নূতন রত্নের সংগ্রহ করিয়াছেন কি না;—দেখিতে হইবে—নব নব সৌন্দর্য্য-লিপ্সু মানব-মনকে কোন নূতন স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন কি না;—বুঝিতে হইবে—মনুষ্য-হৃদয়ের অবিকাশিত কোন সনাতন বৃত্তিকে তিনি জাগ্রত করিয়া আকার দিয়া লোক-চক্ষুর গোচর করিয়াছেন কি না;—কোন অবিসংবাদিত নৈতিক তত্ত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কি না। আর পরীক্ষা করিতে হইবে—তিনি তাঁহার নিজস্ব যে রীতির উদ্ভাবন করিয়াছেন,—সে রীতি সমস্ত লোকের সাধারণ আদর ও উপভোগের সামগ্রী কি না,—তাহা নবীন হইলেও পরিণত ও পরিপক্ক কি না;—নবীন হইলেও তাহা শাশ্বত কি না—তাহা সর্ব্বকালের সহযোগী কি না।

এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি—চৌদ্দখানি উপন্যাসের দিকে দৃক্‌পাত করিতে হয়। এই চৌদ্দখানি উপন্যাস বা আখ্যায়িকা যেন নিপুণ শিল্পি-চিত্রিত চৌদ্দখানি আলেখ্য। আলোক ও ছায়াপাতের দক্ষতার জন্য চিত্রগুলির প্রত্যেক অংশ যথাযথ পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পাংশের কোথাও অনাবশ্যক অতিদৈর্ঘ্য দেখিতে পাই না; অনাবশ্যক অতিসঙ্কোচে কোন অংশ প্রহেলিকাময় হইয়া দাঁড়ায় নাই। সকলই সুসংস্থিত, সুবিন্যস্ত, পরিমিত ও মনোহর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-পাঠে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে—এ কথা শুনি নাই;—যাঁহার একবার পড়িয়া পুনরায় পড়িতে ঔৎসুক্য হয় নাই—বরং বিরক্তি ঘটিয়াছে—এরূপ পাঠক আছেন কি না সন্দেহ। সমগ্র সমাজ আজ উপন্যাসে প্লাবিত হইয়াছে ও হইতেছে;—কিন্তু অত্যন্ত অল্পসংখ্যক আখ্যায়িকা সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অমূল্য উপন্যাসরাজিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এই ত্রিধা বিভাগ আধুনিক সমালোচকগণের মনঃপূত হইবে কি না বলিতে পারি না—কারণ এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর কতকটা সঙ্করতা রহিয়াছে। কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য বিবেচনায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথমতঃ—সামাজিক, দ্বিতীয়তঃ—আধ্যাত্মিক বা আদর্শমূলক, তৃতীয়তঃ—রমন্যাসজাতীয়। এই রমন্যাস নামটী কোন অংশেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে—ব্যাকরণতঃও নহে, অলঙ্কারশাস্ত্রতঃও নহে। তথাপি আমরা Romanceএর প্রতিশব্দরূপে ইহার প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে করি। কোন-কোন গল্পলেখক—নূতন অভিধা হইলেও ইহাতে নিজ আখ্যানের স্বরূপ সুচারুরূপে ইঙ্গিত হয় বলিয়া—ইতঃপূর্ব্বেই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা এ ক্ষেত্রে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। "রমন্যাস" বা Romance বলিতে কি বুঝি, এ স্থলে তাহা

কতকটা বিবৃত করা প্রয়োজন। রমন্যাসের উদ্দেশ্য ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য,—মনোরঞ্জন বা মনোরমণ। বলিতে পারেন, কাব্যমাত্রেরই সেই উদ্দেশ্য। তবু একটু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য—কতকটা পাঠকের মনে উপভোগের মাত্রার তারতম্যে; আবার কতকটা প্রণালীর ইতর-বিশেষে উৎপন্ন হইতেছে। সামাজিক উপন্যাস পাঠেও রসবোধ হয়—সত্য; কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, আমরাই—বর্ত্তমান সমাজের পরিচিত জীবেরাই—তাহার গণ্ডীর ভিতর ছায়া-রূপে—মুকুরের অন্তরে যেমন আকৃতি তেমনই—ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কারণ, সামাজিক উপন্যাস, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, আচার-ব্যবহার, প্রথা ও বিশ্বাসসমন্বিত সাময়িক সমাজকে যথাযথ চিত্রিত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার আধ্যাত্মিক বা আদর্শমূলক উপন্যাসে রসসৃষ্টির প্রয়াসের সহিত কোন বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য লেখকের ইচ্ছানুসারেই ধরা দেয়। অতএব তাহাতে তৃপ্তি দিবার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও—শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য সমানভাবে, কোথাও বা অধিকতরভাবে প্রকট থাকে। পক্ষান্তরে, রমন্যাসের প্রথম, প্রধান এবং ফলতঃ একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে—আনন্দ দান—রসের সৃষ্টি। রমন্যাসের আর একটী লক্ষণ ইহাও মনে করি যে, তাহাতে চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম পারিপাট্যের পরিবর্ত্তে, ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে একটা আকর্ষণী ও মোহিনী ক্ষমতা থাকিবে। চরিত্র-অঙ্কনে লেখক নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন না—অদ্ভুত ও চমৎকার ঘটনার জাল বুনিয়াই লেখক পাঠকের মন ফাঁদে ফেলিতে চাহেন। এক কথায়, রমন্যাস হইতেছে মন-ভুলানো গল্প। যখন রমন্যাস পড়ি, তখন বিচার-বুদ্ধিকে কিছু-কালের জন্য ছুটি দিতে হয়; সম্ভব-অসম্ভবকে নিক্তির ওজনে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি থাকে না; ইচ্ছা হয়, কল্পনাকে গল্প-লেখকের হাতে সঁপিয়া দিয়া, সুখস্পর্শে নিমীলিতাক্ষ হইয়া পড়িয়া থাকি। ঐতিহাসিক-উপন্যাসও রমন্যাসের অন্তর্গত। বিশেষতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে, শুধু "রাজসিংহের" খাতিরে এই তিনশ্রেণীর অতিরিক্ত আর একটী শ্রেণী খাড়া করিলে, ন্যায়শাস্ত্রানুসারে "গৌরব" দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। "রাজসিংহের" বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক-উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী, বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক-উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক-উপন্যাস লিখিলাম।" শুধু প্রথম নহে, ইহাই তাঁহার শেষ এবং একমাত্র ঐতিহাসিক-উপন্যাস। উক্ত বিজ্ঞাপনের আর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন যে, "উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা-প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" গল্পাংশে এরূপ কাল্পনিক ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও রাজসিংহ যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়, Sir Walter Scottএর সকল রমন্যাসই তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে—ঐতিহাসিক-উপন্যাস রমন্যাসেরই ভেদবিশেষ—দু'য়ের মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নাই—বরং মূলগত ঐক্যই রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ঘটনার বৈচিত্র্যই রমন্যাসের প্রাণ। এই সকল বিচিত্র ঘটনা ঔপন্যাসিক নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাবন করিতে পারেন—অথবা কতকাংশে ইতিহাস হইতে ধার করিতে পারেন। কথায় বলে—Truth is stranger than fiction—ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে ঔপন্যাসিকের কল্পিত ঘটনা হইতে অনেক সময়ে বিচিত্র, ইহা সবাই জানেন। সে যাহা হউক, কাব্য জগতে, ঐতিহাসিক-উপন্যাস-জাতীয় স্বতন্ত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার্য কি না—এ বিষয়ের চরম মীমাংসা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলিতে চাহি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগের জন্য পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীই যথেষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের এই তিন পর্য্যায়েই লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন এবং তিনেতেই অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত এমন কতকগুলি উপন্যাস আছে—যাহা এই তিন শ্রেণীর একাধিক শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। আমরা সকলেই বুঝি যে, দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা কপালকুণ্ডলা সামাজিক নহে—শুধু রমন্যাসজাতীয় উপন্যাস। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল—আধ্যাত্মিক বা আদর্শাত্মক নহে—সামাজিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে—যাহার স্বরূপ এত সহজে নির্দ্ধারিত করা যায় না; যথা—ইন্দিরা। ইহাকে সামাজিক উপন্যাসের পর্য্যায় হইতে একেবারে

বাহির করিয়া দিতে মন চাহে না—ইহাকে অনেকটা সামাজিক রমন্যাস বলিতে হয়। রমন্যাস বলি এই কারণে যে, ইহার প্রাণ হইতেছে ঘটনার বৈচিত্র্য। আবার ইহাকে সামাজিকও বলিতে হয়,—যেহেতু পাত্র, পাত্রী ও পরিবেশের এরূপ সংযোগ শুধু আধুনিক বাঙ্গালী-সমাজেই সম্ভব। আদর্শমূলক উপন্যাসের শ্রেণীতে আনন্দমঠের স্থান অবিসংবাদিত,—কারণ ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—শক্তি-পূজাকে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা। কিন্তু এই সঙ্গে দেবীচৌধুরাণীকে আদর্শাত্মক ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যবর্ত্তী না বলাও অযৌক্তিক। ললিতবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে বহু বিবাহরূপী সামাজিক প্রশ্নের অবতারণাই মুখ্য কল্প।

সামাজিক উপন্যাস অনেকটা আলোকচিত্রশিল্প বা Photographyর অনুরূপ। আলোকচিত্র যেমন নৈসর্গিক দৃশ্য বা প্রকৃত মনুষ্যকে যথাযথ অঙ্কিত করিতে সচেষ্ট—সামাজিক উপন্যাসও তদ্রূপ বর্ত্তমান সমাজকে প্রতিবিম্বিত করিতে চাহে। এই কারণে সামাজিক উপন্যাস বর্ত্তমানকে লইয়া ব্যাপৃত। যাহা ঘটিতেছে, যাহা স্বাভাবিক, যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি—তাহাকেই আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করা সামাজিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য। অতএব সামাজিক উপন্যাস বাস্তবানুগত বা realistic ; এবং তাহার সার্থকতার বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, এই প্রতিবিম্বন-কার্য্য কি ভাবে তাহাতে সম্পাদিত হইতেছে। উক্ত মানদণ্ডের প্রয়োগ করিয়া দেখি যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন বা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়েন নাই—তিনি বাঙ্গালার পারিবারিক জীবনের যে সকল চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—তাহারা এখনও মিথ্যা হইয়া যায় নাই—বিপর্য্যস্ত হয় নাই। হিন্দু-সমাজে **ভ্রমরের** মত পত্নী দুর্ল্ভ নহে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বা লোকাচারসমূহ পুরাকালে হিন্দু-সহধর্ম্মিণীকে যেরূপ আদর্শে গড়িয়া তুলিতেন—সেই আদর্শে নিভ্রান্ত অতীতপন্থী হিন্দু পরিবারেও আধুনিক মহিলাগণ নির্ম্মিত হইতেছেন না। একানধিক পরিণয়কে যৌন-সম্বন্ধের আদর্শ বলিয়া বর্ত্তমান সমাজ মানিয়া লইয়াছে। প্রাচীন কবি বলিয়াছেন—"ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমং।" কিন্তু এখনকার সামাজিকেরা বলিতেছেন—ইহা শুধু মানিনীর ধর্ম্ম নহে—পরিণীতা রমণী মাত্রেরই ইহা ন্যায্য অধিকার। এই জন্য স্বামীর যথেচ্ছাচারিতাকে পত্নী নিজের অধিকারের বিরোধী বলিয়া মনে করে এবং তাহাতে আমরা দোষ দেখি না। এই সকল কারণে আদর্শ হিন্দু-পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলেও, সমাজ ভ্রমরকে প্রবর্ত্তমান হিন্দু-পত্নীর অবিকল প্রতিচ্ছবি বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না।

কুন্দনন্দিনী বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেও, শুনিয়া থাকি, তাহার প্রেতাত্মা আজকাল অনেক হিন্দু-নারীকে আত্মহত্যা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে। বিষবৃক্ষের অনেক কুফল ফলিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাতে আত্মহত্যার প্ররোচনা মিলিবে—ইহা যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদৌ ঈপ্সিত ছিল না—তাহা নিঃসন্দেহ। আবার, আত্মহত্যা ভিন্ন কুন্দজীবনের আর একটা দিক্ আছে—যাহা মরে নাই এবং মরিতে পারে না। শাস্ত্রবাক্যের অনুশীলনে মানুষের প্রবৃত্তি যে লুপ্ত হইয়া যায় না—কুন্দনন্দিনীর জীবন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নীতিবিৎ বা শাস্ত্রকারের আসন আমরা এস্থলে গ্রহণ করিবার প্রয়াসী নহি। তাই, কুন্দনন্দিনীর প্রণয়-তৃষার আলোচনায় অম্লান-বদনে, অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে শুধু তুষানলেরই ব্যবস্থা করিতে পারি না। এই কারণে, কুন্দনন্দিনীর ক্লেশভোগের কাহিনী যখন আমরা পাঠ করি, তাহার অন্তরের সরলতা ও সৌকুমার্য্য যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের মনে সহানুভূতি বা করুণার সঞ্চার একেবারেই হয় না—তাহাও বলিতে পারি না। স্বামীহীনার ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্ম—এ আদর্শ আমরা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারি না—সত্য; কিন্তু এমন অভাগিনী রমণীর অন্তরে, যে নৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—তাহাও ত ভুলিতে পারি না। যেখানে দ্বন্দ্ব নাই—সেখানে জয়ের মূল্য অতি অল্প। বিরোধিবৃত্তির তাড়না আছে বলিয়াই সংযমের এত মাহাত্ম্য। প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াও প্রবল প্রতিকূল ঘটনার সহিত এই দ্বন্দ্বে যদি কেহ জয়ী হইতে না পারে—সে অমানুষ, সে পশু,—তাহাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, এই দণ্ডে মানব সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে—এরূপ ধারণা এ যুগের নহে—এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল না। **ইন্দিরার** মত চটুলা, চতুরা, মুখরা রমণী ঘরে-ঘরে বিরাজ করিলে, অপর্য্যাপ্ত বুদ্ধি

ও বিবেচনা ব্যতিরেকে, পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহশাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে—তা নিশ্চিত। তথাপি ইন্দিরার মত রমণীর মাঝে-মাঝে দেখা পাই না—বা পাইতে চাহি না—তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। **শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণি**ঘটিত দাম্পত্য চিত্র—এ সমাজের চিত্রপটে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই মনোরম ছবি পরিহার করিতে বা পশ্চাতে ফেলিতে এখনও আমরা সমর্থ হই নাই —বিশ ত্রিশ বৎসরে যে পারিব তাহাও সম্ভব নহে। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর সংস্কারকের অভাব নাই। তথাপি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পুণ্যস্মৃতিজড়িত এদেশে এমন কি শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির গৃহস্থালির উচ্ছেদ করিয়া Suffragette মহিলাশাসিত সংসার স্থাপিত হইবে -ইহা এখনও কল্পনার মধ্যে আসে না। এই সকল চরিত্র ও তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তাহাদের পার্শ্বচর ও back-ground সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক হিন্দুসমাজের মর্ম্মকথা যে ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—যেরূপ নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন—তাহা যথার্থই অপরাজেয় ও চিরনূতন।

এইরূপে তাঁহার রমন্যাসগুলিতে কয়েকটা অতি সুন্দর নারীচরিত্র আমরা দেখিতে পাই। যথা দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা। আয়েষার নিঃস্বার্থ আত্মবিক্রয় যথার্থই মহনীয়। রমন্যাসের চতুঃসীমানার মধ্যে বর্ণিত হইলেও -মোগল-সাম্রাজ্যের সময়ে এরূপ ঘটনা একেবারেই বিরল ছিল না। কল্পলোকের অবাস্তব সৃষ্টি বলিয়া রাজপুতাসক্তা এই বিধর্ম্মিণী হইতে আমরা মুখ ফিরাইয়া লইতে পারি না। এই চরিত্রে এমন একটা মোহ, এমন একটা উন্মাদন আছে, যাহা যৌবনকে অভিভূত করে। রমন্যাসগ্রথিত চরিত্র-রাজির মধ্যে কপালকুণ্ডলা ও রজনী যথার্থই অপূর্ব্ব। তৈল ও জলে যেরূপ মিশে না—কপালকুণ্ডলার মনও সেইরূপ সংসারে আসক্ত হয় নাই। বিজন প্রান্তরে ভীষণ-স্বভাব তান্ত্রিক কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতা হইয়া সুকুমার-বৃত্তি-সম্পন্না মানুষকন্যা কিরূপ বন্য-সৌম্যতার মূর্ত্তি ধারণ করে, কপাল-কুণ্ডলা তাহারই প্রতিকৃতি। এ প্রতিকৃতি একখানি অনবদ্য সৃষ্টি—ইহার স্বাভাবিকতায়, সরলতায় ও মধুরতায় আমরা সবাই মুগ্ধ। এ চিত্র—মিরান্দা, দেস্‌দিমোনা, সিকেয়া, শকুন্তলা প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত নায়িকা-চিত্রের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহা কাব্য-জগতের যে সার সামগ্রীসমূহ তাহার অন্যতম—ইহা একটি Classic রচনা; সর্ব্বকালের সম্পদ—কালের স্রোতে ইহা তলাইয়া যাইবে না। কপালকুণ্ডলা ও রজনীতে—বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-চরিত্রের অপরিচিত দিক্‌গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রমন্যাসের গণ্ডীর ভিতর যদিও ইঁহাদের জন্ম—তথাপি ইহারা অপ্রাকৃত নহে। জটিল মনস্তত্ত্বের এক-একটি অধ্যায় এই দুই চরিত্রে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে এরূপ চরিত্র এদেশের কল্পনাতেই আসিত না। Psychological বা মনস্তত্ত্ব-ঘটিত নভেলে দেশ ছাইয়া যাইলেও এই দুই চরিত্রের বৈচিত্র্য এখনও অপরাভূত। এই জাতীয় আখ্যান ক্রমশঃ সংখ্যা ও আকারে বাড়িয়া চলিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার ফল যে সকল সময়ে উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে—তাহা মনে করিবার সমুচিত যুক্তি দেখি না। বর্ত্তমানে যাঁহারা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন—তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মত রাজবর্ত্মে না চলিয়া, অনেক সময়ে অলিগলিতে পথ হারাইয়া থাকেন; —যেরূপ চরিত্র মানবমাত্রেরই ধারণার অন্তর্গত ও বোধগম্য —তাহার অবতারণা না করিয়া যাহা ক্বচিৎ-কদাচিৎ—কষ্টকল্পিত সঙ্কীর্ণ পরিবেশের প্রভাবে উদ্ভূত হয় বা হইতে পারে- সেইরূপ সমস্যা লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। ফলে জিনিসটা—universal বা সার্ব্বজনীন না হইয়া সাম্প্রদায়িক, সার্ব্বকালিক না হইয়া, সাময়িক, সার্ব্বদেশিক না হইয়া প্রাদেশিক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, আধুনিক Psychological novel এ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যেন ক্রমশঃ জটিলতর, জটিলতম হইয়া দাঁড়াইতেছে। উপন্যাস-নিবদ্ধ চরিত্র বুঝিতে যদি দর্শনশাস্ত্রের কূটশক্তির ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইতে হয়—তাহা হইলে হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার না হইয়া পরিশ্রমের অবসাদ আসিয়া জুটে—সহানুভূতি ও আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে একটা সজাগ সমালোচকতা হৃদয়কে অধিকার করে। বর্ত্তমান Psychological novel এর তৃতীয় লক্ষণ ইহাই যে, তাহাতে কার্য্যের ক্ষীণ ভিত্তির উপর বাগাড়ম্বরের সুবিশাল প্রাচীর উঠিতে থাকে; ফলে, চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতা স্পষ্ট হয় না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, অত্যধিক বিশ্লেষণের প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই artটুকু,—এই কলাশিল্পটুকু আজকাল লেখকগণ কেন যে হেলায় হারাই-তেছেন—কেন যে শ্লথকল্প হইয়া চিন্তাকে যথেচ্ছ পথে বিচরণ করিতে দেন—এবং পরিণামে পাঠকের প্রীতির ব্যাঘাত করেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সকলের উদাহরণ উল্লেখ উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। দ্রষ্টব্য ইহাই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শিল্পী হইলেও, পথ-প্রদর্শক হইলেও, এ ক্ষেত্রে 'আপন গৌরবে আপনি উন্নত'।

(ক্রমশঃ)

ছয়জন বৌদ্ধ-তীর্থিকাচার্য্যের ইতিবৃত্ত

[শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম, এ, এম, আর, এ, এস]

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কিরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া জীবন-যাপন করিতেন, তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাধারণের উপযোগী করিয়া বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে তীর্থিকগণ যে সকল ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন, এবং যে প্রণালীতে তাঁহারা পরিচালিত হইতেন, তৎসম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক বিবরণ প্রদানের চেষ্টা এপর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পূরণ কশ্যপ, মস্করি গোশাল, অজিত কেশকম্বলি, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ও নিগণ্ঠনাথপুত্ত এই ছয়জন তীর্থিকাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে "Spence Hardy ও Rockhill তাঁহাদিগের "Manual of Buddhism" এবং "Life of Buddha" নামক পুস্তকদ্বয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত সামঞ্ঞফল সুত্তে এবং দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে এই বিশিষ্ট তীর্থিকাচার্য্যের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই ছয়জন আচার্য্যের মধ্যে মস্করি গোশালের বিবরণ Rudolf Hoernle সম্পাদিত উবসিক-দশাও' নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

যোনকরাজ মিলিন্দের সহিত পূরণ কশ্যপ ও মস্করি গোশালের তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। মিলিন্দ প্রশ্নে এই তর্ক-প্রসঙ্গ যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্তে, বিনয়পিঠকের অন্তর্গত মহাবগ্গে দীঘনিকায়ের সুপ্রসিদ্ধ টিকা সুমঙ্গল-বিলাসিনী পুস্তকে এবং সদ্ধর্ম্মালঙ্কার পুস্তক প্রভৃতিতে ছয় জন তীর্থিকাচার্য্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। দিব্যাবদানের মতানুসারে ছয়জন আচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে রাজগৃহে বাস করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের এইরূপ ধারণা ছিল ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও শ্রেষ্ঠীরা একমাত্র তাঁহাদিগকেই অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন; কিন্তু গোতমের আবির্ভাবের পরে সে সম্মান তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। তাঁহারা গোতমের মতের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মার তাঁহাদিগের এই অসৎকর্ম্মে লিপ্ত হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মগধ সম্রাট্ বিম্বিসারের নিকট তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিম্বিসার বুদ্ধের একজন পরম সেবক; তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে যদি তাঁহারা এরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে রাজগৃহ হইতে তিনি তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। তাহার পর তাঁহারা কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট গমন করিয়াছিলেন; এবং মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ করিবার জন্য প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অমানুষিক কার্য্য সঙ্ঘটন করিয়া তীর্থিকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত Spence Hardy বলেন যে, রাজগৃহে একজন ধনাঢ্য বণিক বাস করিতেন। স্নান করিবার সময় তিনি ঘটনাক্রমে একটি ভিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই পাত্রটি তিনি একটি বংশদণ্ডে সংলগ্ন করিয়া, ঐ দণ্ডটিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যিনি ঋদ্ধিবলে আকাশের মধ্য দিয়া আগমন করিয়া বংশদণ্ড ও ঐ ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বিশ্বাস করিবেন; অধিকন্তু তিনি সকলের সম্মানভাজন হইবেন। ঋদ্ধিবলে এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিতে অনেকে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন কি যে ছয়জন তীর্থিক বহু ঋদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও একার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই।

১ পূরণ কশ্যপ

কশ্যপ নামে এক ব্যক্তি ম্লেচ্ছ রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছকন্যার উদরে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে

ইঁহাকে আরও ৯৯ বার মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান জন্মে ইনি শতজন্ম পূরণ করিলেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ইঁহাকে পূরণ কশ্যপ বলিয়া অভিহিত করিলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সামান্য উদরপূর্ত্তির জন্য এই নীচবৃত্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন তস্কর আসিয়া তাঁহার বস্ত্র অপহরণ করিল; তদবধি তিনি উলঙ্গ অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি এইরূপ নগ্নাবস্থায় একটী গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার তিনটি নাম ও নামের কারণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞানপূর্ণ বলিয়া তাঁহার একটি নাম পূরণ; যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ, তাই তাঁহার অপর একটি নাম কশ্যপ; তিনি সর্ব্বপাপশূন্য হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর একটি নাম পূরণ কশ্যপ বুদ্ধ। অনন্তর গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার পরিধানের জন্য বস্ত্র অনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বস্ত্র লজ্জানিবারণের জন্য; লজ্জা পাপের ফল; আমি অর্হৎ, আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত; আমি কোন লজ্জা জানি না।" সমাগত ব্যক্তিরা পূরণ কশ্যপের উক্তি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৫০০ জন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধ এবং তাঁহার বহু শিষ্য, এই কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধগণ বলেন যে, পূরণ কশ্যপ তাঁহার সমস্ত শিষ্যসহ অবীচি নরকে গমন করিয়াছিলেন। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত সামঞ্ঞ ফল সুত্তে বর্ণিত আছে যে, পূরণ কশ্যপ বলিতেন যে, অসৎকর্ম্ম করিলে কোন পাপ হয় না; এবং সৎকর্ম্ম করিলেও কোন পুণ্য হয় না। ভবিষ্যৎকালে কৃতকর্ম্মের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের যে বিশ্বাস ছিল, তাহাতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না। মিলিন্দ প্রশ্নে আমরা দেখিতে পাই যে, যখন সম্রাট মিলিন্দ সৈন্য-পর্য্যবেক্ষণে নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বাক্‌বিতণ্ডা করিতে ব্যগ্র হইয়া মন্ত্রীগণকে বলিয়াছিলেন, "দিবা এখনও অনেক আছে; এত শীঘ্র নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে কোন ফল নাই। এমন কোনও পণ্ডিত নাই, যাঁহার সহিত আমি বাদানুবাদ করিতে পারি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া যবনেরা ছয়জন তীর্থিকাচার্য্যের নাম করিয়াছিলেন, এবং সম্রাট্‌কে বলিয়াছিলেন, "আপনি ইঁহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া আপনার সন্দেহ দূর করিতে পারেন।" সম্রাট তখন পূরণ কশ্যপের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে মাননীয় কশ্যপ, কে পৃথিবী শাসন করেন?" তদুত্তরে কশ্যপ বলিলেন, "হে মহামান্য রাজন্, পৃথিবীকে বসুন্ধরা শাসন করেন।" রাজা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন "হে বহুমানাস্পদ কশ্যপ, যদি পৃথিবী বসুন্ধরাকে শাসন করেন, তাহা হইলে কতক লোককে কেন পৃথিবীর সীমার বহির্গত হইয়া অবীচি নরকে যাইতে হয়।" পূরণ কশ্যপ সম্রাটের এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

২। মস্করি গোশাল।

উবাসক দসাওর মতে মস্করি গোশাল শ্রাবস্তীর অন্তর্গত শরবণের উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতাকে মস্করি বলা হইত; কারণ তিনি ভিক্ষুক ছিলেন। তিনি তাঁহার হস্তস্থিত চিত্র দর্শন করাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল ভদ্রা। একদিন ভ্রমণ করিতে-করিতে মস্করি শরবণের সন্নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং অপর কোন বাসস্থান না পাইয়া বর্ষাকালে গোবহুল নামক একজন ধনী ব্রাহ্মণের গোশালায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গোশালায় তাঁহার স্ত্রী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, এবং শিশুটী গোশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোশাল হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গোশাল ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাবীর ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে ভিক্ষুকের জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং নালন্দায় একজন তাঁতীর আবাসে ধর্ম্ম-জীবনের দ্বিতীয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মিলিন্দ পঞ্‌হ পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে, সম্রাট মিলিন্দ মস্করি গোশালকে বলিয়াছিলেন যে, "হে গোশাল, ভালমন্দ কর্ম্ম আছে কি? ভালমন্দ কর্ম্মের ফল আছে কি?", গোশাল উত্তর করিলেন, "হে সম্রাট, ভালমন্দ কর্ম্মও নাই, তাহার ফলও নাই। Spence Hardy সাহেব বলেন যে, মস্করি গোশালকে ঐ নামে অভিহিত করিবার

কারণ, তিনি জনৈক ক্রীতদাসের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তে এক দিবস তাঁহার প্রভু তাঁহাকে একপাত্র ঘৃত মস্তকে বহন করিতে দিয়াছিলেন। একটি কর্দ্দমময় স্থানে আসিয়া তিনি পিছ্‌লাইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে ঘৃতপাত্র ভগ্ন হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার প্রভু অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহার বস্ত্র সজোরে কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তিনি উলঙ্গ অবস্থায় একটি গ্রামে গমন করিয়া আপনাকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য হইয়াছিল।

বৌদ্ধগণ বলেন যে, তিনি তাঁহার শিষ্যগণ সহ অবীচি-নরকে গমন করিয়াছিলেন। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত সামঞ্ঞফল সুত্তে আমরা দেখিতে পাই যে, মক্ষলি গোশালির মতে প্রাণী সকল বিনা কারণে ভাল হয়, মন্দ হয়। তিনি বলেন শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি পদার্থ জগতে নাই। জীবগণ তাঁহাদের অদৃষ্টের প্রভাবে ইতস্ততঃ চালিত হয়; তাহাদিগের সুখ দুঃখ ভোগ তাহাদিগের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। মক্ষলি গোশাল বলেন যে, ১৪০০,০০০ প্রধান জন্ম ও ৫০০ রকম সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ কর্ম্ম ৬২ প্রকার জীবনের পথ ৮ প্রকার জন্মের স্তর ৪৯০০ প্রকার কর্ম্ম, ৪৯০০ ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী, ৩০০০ নরক, ৮৪০০,০০০ কাল আছে এবং এই কালের মধ্যে মূর্খ এবং পণ্ডিতগণের কষ্টের অবসান হয়। জ্ঞানী এবং পণ্ডিত কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; জন্মের গতিতে সুখ এবং দুঃখের পরিবর্ত্তন হয় না; তাহাদিগের হ্রাস এবং বৃদ্ধি হয় না।

৩। অজিত কেশকম্বলি।

Spence Hardy সাহেব বলেন যে, অজিত কেশকম্বলি একজন ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। তিনি একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং তাঁহার মস্তক সর্ব্বদা মুণ্ডিত রাখিতেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারকালে বলিতেন যে, মৎস্য বধ করায় এবং তাহা ভক্ষণ করায় যে পাপ, পরিবর্দ্ধমানা লতাকে নষ্ট করায়ও সেইরূপ পাপ করা হইয়া থাকে। তাঁহার ধারণা ছিল যে, কালে সমস্ত বস্তুই নাশপ্রাপ্ত হইবে; কোন কিছু চিরস্থায়ী নয়; জগতে ভাল কিছুই নাই, মন্দও কিছুই নাই; ইহলোক বা পরলোক কিছুই নাই; পিতা মাতা নাই; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এই চারিটি মূল উপাদানে মনুষ্য জীবন গঠিত; মনুষ্যের মরণকালে মানবদেহের ক্ষিতির অংশ ক্ষিতিতে, জলের অংশ জলে, তেজের অংশ তেজে এবং মরুতের অংশ মরুতে মিশিয়া যায়। দান করিয়া কখন কোন লাভ হয় না। যাঁহারা বলেন দানে পুণ্যসঞ্চার হয়, তাঁহারা অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানী হও বা মূর্খ হও, দেহের অবসানের সঙ্গে তোমারও চিরাবসান হইবে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।

৪। পকুধ কচ্চায়ন।

পকুধ কচ্চায়ন দরিদ্র বিধবার সন্তান ছিলেন। কম্বুক বৃক্ষের তলদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নিকট তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের নামানুসারে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করেন; তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার কেহ ছিল না, অগত্যা তিনি একজন ভিক্ষু হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যখন শীতল জল পান করি, তখন অনেক জন্তু মরিয়া যায়, তজ্জন্য উষ্ণ পানীয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শিষ্যেরা কখনও শীতল জল পান করিতেন না, এমন কি পাছে জীবহিংসা ঘটে—তজ্জন্য গাত্রমার্জ্জনা পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতেন না। তাঁহার মতে পদার্থ তিনটি, শান্তি, কষ্ট এবং আত্মা; ইহারা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্ব্বতের ন্যায় তাহারা অনুর্ব্বর এবং অটল। তাহারা অচল এবং সুখ দুঃখের কারণ হয় না। তিনি বলেন যে, যদি কেহ তরবারির দ্বারা হত্যা করে, তাহা হইলে পাপ নাই, কারণ তরবারি কেবল মাত্র ৭টী মূল পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

৫। সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত।

সঞ্জয়কে বেলট্‌ঠি বলা হয়, কারণ তাঁহার মস্তকে বৈরটির মত অর্থাৎ আপেলের ন্যায় একটি স্ফোটক ছিল। তাঁহার মতে, এখন আমরা যেমন আছি, অপর লোকে তেমনই থাকিবে। ইহলোকে যে দেবতা, পরলোকেও সেই দেবতাও থাকিবে। "অপর লোক আছে কি না? ভালমন্দের ফল আছে কি না?" এই সকল প্রশ্নের যথাযথ কোন উত্তর তিনি দিতেন না।

৬। নিগণ্ঠনাথ পুত্ত।

নিগণ্ঠনাথ পুত্ত কৃষকনাথের পুত্র। তাঁহাকে নিগণ্ঠ বলা হইত, কারণ তিনি সকল গ্রন্থী অর্থাৎ পাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি সেই সন্দেহ দূর করিবেন। ডাক্তার Leumann এবং Rockhill সাহেবের মতে নিগণ্ঠনাথ পুত্ত মহাবীরের অপর নাম; কিন্তু বৌদ্ধ-সাহিত্যে নিগণ্ঠনাথ পুত্ত একজন তীর্থিকাচার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছেন। জল, পাপ, পাপমোচন এবং সংস্তম্ভ এই চারি প্রকার সংযম তিনি মানিয়া চলিতেন।

কল্পতরু

সামরিক শিরস্ত্রাণ

সৃষ্টির প্রথম হইতেই পশুজাতির ন্যায় মানবও পরস্পরের সহিত ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি করিয়া আসিয়াছে। খাদ্য লইয়া, স্ত্রী লইয়া, ভূমির স্বত্ব লইয়া এবং অন্য নানাবিধ স্বার্থের খাতিরে তখন হইতেই কাটাকাটি চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে ব্যষ্টিভাবে, পরে মানব সমাজবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিলে, সমষ্টিভাবে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও, সভ্যতার চরম উন্নতির দিনেও, মানবের এই পশু প্রবৃত্তির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহার হিংস্র স্বভাব সমানভাবে অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

শত্রুনাশের নব-নব উপায় আবিষ্কার করাই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা। অতএব, একপক্ষ যেমন আত্মরক্ষার একটী নূতন পন্থা আবিষ্কার করে, অপর পক্ষ অমনি সেটীকে নিষ্ফল করিবার জন্য নূতন অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করে। এইরূপে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং দুর্গধ্বংসী কামানসকলও আবিষ্কৃত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুর্গ আত্মরক্ষার উপায় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত কামানের নিকট দুর্গ অতি পুরাতন, অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন সেজন্য ভূগর্ভে পরিখা ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া

সাহজাহানের উষ্ণীষ

প্রথম প্রথম অবশ্য হাতাহাতি লড়াই হইত। অথবা বড় জোর, খাঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া কামড়ি, মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাতেই যুদ্ধের অবসান হইত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জড়জগতের সহিত মানবের যতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল, ততই প্রস্তর, বৃক্ষশাখা, এবং ক্রমে লৌহফলক ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ সকলই আক্রমণের অস্ত্র (offensive weapon) ছিল; বহু দিন পর্য্যন্ত মানব আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র ব্যবহার করিতে বা অপর কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে শিক্ষা করে নাই। সভ্যতা-বৃদ্ধি, তথা জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিবিধ মারাত্মক অস্ত্রের সৃষ্টি হইতে লাগিল, সেইরূপ আত্মরক্ষা করিয়া শত্রু-হননের উপায়ও অবলম্বিত হইতে লাগিল। যুধ্যমান উভয় পক্ষেরই যখন আত্মরক্ষা ও শত্রুহননের দিকেই লক্ষ্য হইয়াছে, তখন প্রতিপক্ষের আত্মরক্ষার উপায়কে ব্যর্থ করিয়া

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও কিছুদিন অতীত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পরিখাও তেমন নিরাপদ নহে—তখন trench warfareও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িবে।

দুর্গ, পরিখা প্রভৃতি সমষ্টির হিসাবে জাতি বা দেশরক্ষার উপায়; তদ্ব্যতীত, ব্যষ্টির হিসাবে সৈন্য বা সেনানীদিগের দেহরক্ষার জন্য বর্ম্ম, চর্ম্ম, উষ্ণীষ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। যখন মানবের জ্ঞান ধনুর্ব্বিদ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল, সেনারা যখন কেবল ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি, প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত, তখন বর্ম্ম, চর্ম্ম ও উষ্ণীষ আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ম্ম ও চর্ম্মের ব্যবহার রহিত হয়। এখন কেবল মস্তক-রক্ষার্থ উষ্ণীষ বা শিরস্ত্রাণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কারণ হৃদয় ব্যতীত দেহের অন্যান্য স্থানে আঘাত লাগিলে তাহা সকল-সময় মারাত্মক হয় না; কিন্তু গোলাগুলি মস্তক ভেদ করিলে সম্ভবতঃ তাহা সাংঘাতিক না হইয়া যায় না। মোট

কথা, যে কারণেই হউক, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগেও যুদ্ধকালে দেহের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মস্তক রক্ষার অধিকতর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতেছে এবং দেশভেদে সেনাগণের জন্য নানা প্রকার শিরস্ত্রাণও ব্যবহৃত হইতেছে।

বর্ম্ম, চর্ম্ম বা উষ্ণীষাদি আত্মরক্ষার উপায় ঠিক কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যখন যুদ্ধকালে সেনারা ঐ সকল সাজ-সজ্জা ব্যবহার করিত, তখন ইহা অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে। অনুমান হয়, মানুষ বন্য-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। এখনও যে সকল অসভ্য আদিম অবস্থার জাতি পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই শান্তির সময় যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে, যুদ্ধের সময় সেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে না; তাহাদেরও যুদ্ধকালীন পরিচ্ছদ অনেকটা আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়াই নির্ম্মিত হয় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে প্রথম অবস্থায় লোকে যুদ্ধের সময় পশু চর্ম্ম অথবা বৃক্ষ বল্কল হইতে শিরস্ত্রাণের মত কোন একটা কিছু প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত, এরূপ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। পরে অবশ্য যে জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়াছে, যতটা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুরূপ দৃঢ় ও কৌশলসম্পন্ন শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে।

আমাদের দেশে যুদ্ধকালে বর্ম্ম, চর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হইত এ কথা কাব্য, পুরাণ ইতিহাসাদিতে পাঠ করা যায়; কিন্তু সেগুলি কি ধরণের ছিল, কিরূপে তাহা নির্ম্মিত হইত, তাহার কোন বিবরণ প্রায় পাওয়া যায় না; অর্থাৎ এ সম্বন্ধে যদি কোন লিখিত বিবরণ থাকে, তবে তাহা এখনও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। আমাদের বোধ হয় এরূপ কোন বিবরণ নাই। কারণ, আমাদের দেব-দেবী এবং পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের যে সকল চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের পরিচ্ছদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা স্থানীয় আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদধারণপ্রণালী ও রুচি অনুসারে কল্পনা করিয়া লইয়া থাকেন। এই কারণে, ভারতের পৌরাণিক কালের যোদ্ধৃগণের সামরিক পরিচ্ছদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোদ্ধৃ-পুরুষগণের শিরস্ত্রাণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভারতের শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম সাধারণতঃ একত্র নির্ম্মিত হইত। ইস্পাতের তার গোল করিয়া মুড়িয়া পরস্পর সংযুক্ত করিয়া শৃঙ্খলের ধরণে এই বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করা হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝিন্দের রাজা স্বরূপ সিংহ যে বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, তাহার একটী প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে, শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্মের গঠনের প্রণালী ও আকার অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। তৎকালীন ভারতীয় রাজগণের মধ্যে একমাত্র রাজা স্বরূপ সিংহ সসৈন্যে বৃটিশ সেনার পার্শ্বে থাকিয়া অবরুদ্ধ দিল্লী নগরীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করেন।

মিঘফার বা পারস্য দেশীয় শিরস্ত্রাণ

পর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় চিত্রে অপর এক প্রকার শিরস্ত্রাণের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ ইস্পাতের এবং উপরিভাগ মখমল ও তুলাভরা জামার দ্বারা আবৃত। জামার নাম "চিলুটা"। এই জামা ও টুপির সর্ব্বত্র পিতলের পেরেক বসানো আছে। পেরেকগুলি যেমন শত্রুর অস্ত্রের নিবারক, তদ্রূপ পোষাকের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনেও সহায়তা করে। এক একটী পোষাকে সহস্রাধিক পেরেক ব্যবহৃত হয়। ইহা মুসলমানী পোষাক।

"তাসফারি" আর এক শ্রেণীর তুলাভরা, অথচ সুরক্ষিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ। বিকানীর রাজ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

"মিঘফার" পারস্য দেশীয় 'হেলমেট'। ইহা স্বর্ণ ও মণি মুক্তা-খচিত। ইহার চূড়ায় একটী করিয়া বর্শা-ফলক সংযুক্ত।

মোগল সম্রাট সাহজাহানের উষ্ণীষ গোলাপী রঙ্গের বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং রৌপ্য নির্ম্মিত তার ও পুষ্পে খচিত।

তাজ বা দরবারি মুকুট। অযোধ্যার রাজগণ ইহা ব্যবহার করিতেন।

য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথমে গ্রীস দেশে সভ্যতা বিস্তৃত হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীকরাই প্রথমে আধুনিক ধরণের শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করেন।

বিকানীরের তাস সারি বা সুচিত্রিত তুলাভরা বর্ম্মাচ্ছাদন ও শিরস্ত্রাণ

তাহাদের এই শিরস্ত্রাণ দেখিতে অতি সুন্দর। যোদ্ধারা যখন যুদ্ধ [illegible] করিয়া এই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত, তখন তাহাদিগকে প্রকৃতই [illegible]রূপ বলিয়া মনে হইত এবং তাহাদের হৃদয়েও বোধ করি বীর-[illegible] সঞ্চার হইত। গ্রীসদেশে চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি ও উন্নতির সঙ্গে-[illegible] প্রাচীনকালের গ্রীক যোদ্ধৃগণের বীরবেশে সুজ্জিত মূর্ত্তির চিত্র [illegible]ত হইতে আরম্ভ হয়। এমন কি, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য নানাবিধ পাত্র ও আধারে কলাকুশলী শিল্পী গ্রীক যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন। ৯১৭ পৃষ্ঠায় ১নং চিত্রে যে শিরস্ত্রাণ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ সেনারা ব্যবহার করিত; এবং দ্বিতীয় চিত্রে লিখিত শিরস্ত্রাণ পদস্থ সেনানী-দিগের ব্যবহার্য্য ছিল। দ্বিতীয় প্রকারের শিরস্ত্রাণ কিন্তু দেখিতে তেমন সুন্দর নহে; তবে হয় ত তাহা অধিকতর কার্য্যোপযোগী ছিল।

গ্রীকদিগের নিকট হইতে রোমানরা সভ্যতা শিক্ষা করে এবং এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে ও আফরিকার উত্তর উপকূলে রোমান অধি-কার বিস্তৃত এবং রোমান সভ্যতার প্রচার করে। তাহারাও যুদ্ধকালে

চিল্‌টা বা মুসলমানী তুলাভরা কোট ও শিরস্ত্রাণ

এক প্রকার শিরস্ত্রাণ (৩নং চিত্র) ব্যবহার করিত। "রোমান হেলমেট" "গ্রীসিয়ান হেলমেটের" অনেকটা সদৃশ হইলেও, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও বর্ত্তমান। রোমান হেলমেটের দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত হইত; গ্রীসিয়ান হেলমেটের এ সুবিধা ছিল না। রোমান হেলমেট দেখিতে মন্দ নহে। রোমানরা যখন বৃটেন জয় করিতে যায়, তখন তাহারা এইরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত। পরে, রোমান সাম্রাজ্যের যখন অবনতি ঘটে, রোমানরা যখন ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, আচার-ব্যবহারের সরলতা বর্জ্জন করিয়া আড়ম্বরপ্রিয় ও অলস হইয়া

উঠে সেই সময় হইতে অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যোদ্ধৃগণের শিরস্ত্রাণের গঠনের পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু তাহা সুদৃশ্য ও সৌখিন হইলেও তাহার উপযোগিতা কমিয়া যায়।

রোমানরা বৃটেন দেশ পরিত্যাগ করিবার পর য়ুরোপের পশ্চিমাংশে অনেক দিন ধরিয়া রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। বৃটেন দেশ নানা অংশে বিভক্ত হয়; এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক-একজন স্বতন্ত্র রাজা রাজত্ব করিতে থাকেন। সে সময়ে বৃটেন দেশের যোদ্ধৃপুরুষগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শিরস্ত্রাণ প্রচলিত ছিল। অবশেষে নর্ম্মাণ জাতি বৃটেন অধিকার করে।

(৫ নং চিত্র)। উহার নাম "বাসিনেট"। উহাতে কেবল গলার পিছন দিক অথবা নাসিকা নহে, সমগ্র মুখমণ্ডল আবৃত করিবার ব্যবস্থা ছিল। মুখের সামনের দিকের অংশটী কপালের উপর তুলিয়া রাখা যাইত; এবং প্রয়োজন হইলে নামাইয়া সমস্ত মুখমণ্ডল ঢাকা দেওয়া যাইত। কেবল চক্ষের সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত।

দ্বিতীয় হেনরীর সময়ে একপ্রকার নূতন ধরণের শিরস্ত্রাণ প্রবর্ত্তিত হয় (৬নং চিত্র)। সাধারণ শিরস্ত্রাণের উপর ইহা পরিহিত হইত। ইহার আকৃতি অনেকটা পিপার ন্যায় ছিল। তবে কেবল যুদ্ধের সময়েই ইহা ব্যবহৃত হইত; কুচকাওয়াজ বা প্রদর্শনীর সময় ইহার

ইস্পাতের শৃঙ্খলনির্ম্মিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ
(ঝিন্দের রাজা স্বরূপ সিংহের ব্যবহৃত)

তাজ বা দরবার-মুকুট

নর্ম্মাণদের হেলমেট (৪ নং চিত্র) প্রথম তিনটী হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহা যেমন সাদাসিধা, তদ্রূপ ব্যবহারোপযোগী। তৎকালে ঘর সাজাইবার পর্দ্দা প্রভৃতিতে এই হেলমেট-পরিহিত নর্ম্মাণ যোদ্ধৃগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইত। দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই ধরণের শিরস্ত্রাণ প্রচলিত ছিল। মূল শিরস্ত্রাণ হইতে যে সরু অংশটী বাহির হইয়াছে, উহার দ্বারা নাসিকা পর্য্যন্ত আবৃত হইত। তবে ২ নং চিত্রে গ্রীকদিগের যে উন্নত প্রণালীর শিরস্ত্রাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহাতে যেমন গলা ও ঘাড় ঢাকা পড়িত, নর্ম্মাণ হেলমেটে সেরূপ কোন সুবিধা ছিল না। মধ্যে, নাসিকাবরণটুকু বাদ দেওয়া হয়; পরে, ক্রমওয়েলের আমলে উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। ক্রমওয়েলের সময়ের আর এক প্রকার শিরস্ত্রাণের চিত্র তৎকালীন পিত্তল মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়

ব্যবহার ছিল না। ক্যান্টারবেরীতে ব্ল্যাক-প্রিন্সের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ তাঁহার সমাধির উপর বিলম্বিত আছে। ইহা কিছু পরিবর্ত্তিত আকারের। এই শিরস্ত্রাণে সমগ্র মুখমণ্ডল গলা পর্য্যন্ত আবৃত হইত এবং চক্ষু ও নাসিকার সম্মুখে ছিদ্র থাকায় দর্শন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হইত না। ৭ নং চিত্রে প্রদর্শিত tilting helmet গুরুভার বলিয়া উহার ব্যবহারে কিছু অসুবিধা সহ্য করিতে হইত। ৬নং চিত্রে প্রদর্শিত হিউম (Heaume) নামক শিরস্ত্রাণের উপরিভাগে একটী সিংহ মূর্ত্তি দেখা যায়। উহা সম্ভবতঃ শিরস্ত্রাণের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের উপকরণ ছিল। ক্রমে শিরস্ত্রাণের সৌন্দর্য্য-বিকাশের জন্য পাখীর পালক প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশে রাজা-রাজড়ার শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীষে পালক ব্যতীত মণিরত্নাদিও

য়ুরোপীয় ২৩টী শিরস্ত্রাণ

ব্যবহৃত হইত। এই মণিরত্ন-খচিত উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজগণ পরস্পর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। কথিত আছে, উষ্ণীষ পরিবর্ত্তনের ফলে মহামূল্য (পক্ষান্তরে 'পাঁচজুতি' মূল্যের) কোহিনুর হীরক পাঠানদের অধীশ্বর বীর রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়।

স্যালাড (Salade, অষ্টম চিত্র) দেখিতে অনেকটা নাইট ক্যাপের মত। উহার ব্যবহার চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। মরিয়ন (Morion ; নবম চিত্র) স্যালাডের প্রকারভেদ।

বন্দুক ও গুলি বারুদের প্রসার বৃদ্ধির ফলে যেমন বর্ম্ম অব্যবহার্য্য

বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, রণনীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ শিরস্ত্রাণেরও আকার ও গঠনের পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। ডিউক অব মার্লবরোর সময়ে শিরস্ত্রাণ টুপিতে (দশম চিত্র) পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সময় গ্রেনেডিয়ার সেনাদল যেরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়াছিল, একাদশ চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। তৎকালে অশ্বারোহী সেনাদের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণও (দ্বাদশ চিত্র) অনেকটা ঐ ধরণেরই ছিল। অশ্বারোহী গ্রেনেডিয়ার সেনাদিগের শিরস্ত্রাণ ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত না, ভল্লুকের চর্ম্মে (Bear skin, ত্রয়োদশ চিত্র) প্রস্তুত হইত। ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় অশ্বসাদী গার্ড সেনাদল "সাকো" (Sako, চতুর্দ্দশ চিত্র) নামক এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়াছিল। পদাতি সেনাদলের সাকো (পঞ্চদশ চিত্র) গঠনে অনেকটা এক প্রকারের হইলেও আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর ছিল।

প্রাচীন কালে "আরমেট" (Armet, ষোড়শ চিত্র) নামক এক রকম শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হইত। তাহা দেখিতে অনেকটা মুখোসের ন্যায়; কিন্তু খুব দৃঢ় ও ভারী ছিল। ক্রমওয়েলের সময়ে আরও এক প্রকার শিরস্ত্রাণ (সপ্তদশ চিত্র) ব্যবহৃত হইত। হর্স গার্ডস (Horse Guards' Helmet, অষ্টাদশ চিত্র) সেনাদল অতি সুন্দর শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত। ড্রাগুন সেনাদল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যেরূপ শিরস্ত্রাণ (উনবিংশ চিত্র) ব্যবহার করিয়াছিল, এখনও তাহা প্রচলিত রহিয়াছে। বিংশসংখ্যক চিত্রে ল্যান্সার সেনাদলের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের পক্ষে যে ইউলান (Uhlans) সেনাদের নাম মধ্যে-মধ্যে শুনা যায়, তাহাদের মস্তকেও এইরূপ শিরস্ত্রাণ থাকে। একবিংশ চিত্রে জার্ম্মাণ সাধারণ সেনাদের শিরস্ত্রাণ অঙ্কিত হইয়াছে। ফরাসী কুইরাসিয়ার্স (French Cuirassiers) সেনাদের শিরস্ত্রাণ (দ্বাবিংশ চিত্র) অনেকটা প্রাচীন গ্রীক সেনাদের শিরস্ত্রাণের মত এবং দেখিতেও বিলক্ষণ সুন্দর। ত্রয়োবিংশ চিত্রে বুস্‌বি (Busby) নামক যে শিরস্ত্রাণ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে।

যে সকল শিরস্ত্রাণের চিত্র প্রদর্শিত হইল, তন্মধ্যে অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। বৃটিশ পদাতি সেনারা অন্য প্রকার শিরস্ত্রাণের উপর "পাগড়ী"র ধরণের এক প্রকার উষ্ণীষও ব্যবহার করিয়া থাকে।

১ Grecian Helmets. ২ Grecian Helmets. ৩। Roman Helmet. ৪। Norman Helmet. ৫। Basinet. ৬। Heaume. ৭। Tilting Helmet. ৮। Salade. ৯। Morion. ১০। Hat—Time of Marlborough. ১১। Grenadier Caps. ১২। Grenadier Caps. ১৩। Bearskin. ১৪। Shako. ১৫। Small Infantry Shako. ১৬। Armet. ১৭। Head Piece—Cromwell Period. ১৮। Helmet—Horse Guadr.' ১৯। Dragoon Helmet, 1795. ২০। Lancer's Cap. ২১। German Helmet. ২২। French Cuirassiers' Helmet ২৩। Busby.

বীণার তান।

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

প্রোফেসার লক্ষ্মণদাস মুনীম

পরলোকগত দাজীসাহেব খরে

পাতিয়ালার রিয়াসৎ সর্দ্দার গহিল সিং

১। সরস্বতী—আগষ্ট, ১৯১৬।

নেপালী ভাষা, লেখক—দীপকেশ্বর শর্ম্মা লোহনী। নেপালে সাধারণতঃ অনেক প্রকার ভাষা কথিত হয়; তন্মধ্যে এই তিনটি প্রধান—নেওয়ারী, ভোটিয়া, এবং গোরখা। নেপাল নগরেই নেওয়ারী ভাষাটা বিশেষরূপে প্রচলিত। নেপালের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তবাসীগণ ভোটিয়া ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু ভদ্রসমাজে এই ভাষাটা অসভ্যদিগের ভাষা বলিয়া বিবেচিত হয়।

গোরখা ভাষাই নেপালের রাজভাষা। সকল প্রকার লেখাপড়ার কাজ এই ভাষাতেই হয়। গোর্খালিগণ যখন নেপাল জয় করিয়া

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তলাল জী অগর-ওয়াল

কাটামণ্ডুতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় হইতে এই ভাষা গোরখা ভাষা নামে পরিচিত। সংস্কৃত হইতেই এই ভাষার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। প্রচুর শব্দসম্ভার না থাকায় এই ভাষা সাহিত্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেই জন্য আমরা ইহাতে অনেক বাঙ্গলা, উর্দ্দু, হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দ পাইয়া থাকি।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই ভাষায় কোনও পুস্তক ছিল না। ১৯১১ বিক্রমাব্দে মহারাজা সার জঙ্গবাহাদুর কতকগুলি আইনের পুস্তক নেপালী ভাষায় অনুবাদ করান। এই সময় নেপালের আদি কবি ভানুভক্তাচার্য্য নেপাল-রাজের রোষনেত্রে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। সেই সময় ইনি রামায়ণের তিনকাণ্ড নেপালী ভাষায় সানুপ্রাস শ্লোক বদ্ধ করিয়া নেপালের তৎকালীন চীফ সাহেব কৃষ্ণবাহাদুর জঙ্গ রাণাকে উপহার দেন। চীফ সাহেব কবির রচনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করাইয়া দেন। মুক্তির পর ভক্তাচার্য্য রামায়ণের অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করেন। এই সময় এই গ্রন্থের মুদ্রণ অসম্ভব ছিল। পরে ১৯৪৮ বিক্রমাব্দে উদার কবি মোতিরাম ভট্ট ইহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিলে ইহার বহুল প্রচার হয়। এই মোতিরাম ভট্ট নেপালী সাহিত্যের একজন প্রতিভাশালী কবি। ইনিই প্রথম নেপালে গদ্য রচনা ও সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রচার করেন। দুঃখের বিষয় অতি অল্প বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার পর নেপালে পাশুপত প্রেস হইতে কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়। কাশী হইতে "সুন্দরী" নামে একটি মাসিকপত্রিকা বাহির হইল। তিন বৎসর পরেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সেই সুযোগে নেপালে একদল লেখকের সৃষ্টি হইল।

বোম্বাই নগরে পণ্ডিত হরিহরজী গোরখা-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া 'মাধবী' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন; কিন্তু তাহাও বেশী দিন বাঁচিল না।

নেপালী ভাষা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাকরণ অথবা কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধে একেবারেই কোন পুস্তক না থাকায় নিরঙ্কুশতা ও যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচার করিলেন যে, যতদিন ভাল ব্যাকরণ প্রস্তুত না হইবে, ততদিন নেপালীভাষা বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্থান পাইতেছে না। ফলে দুইখানা ব্যাকরণ দেখা দিয়াছে (১) শ্রীহেমরাজ পণ্ডিত লিখিত "চন্দ্রিকা" নামক বৃহৎ ব্যাকরণ ও (২) পণ্ডিত বিশ্বমণি প্রণীত গোরখা ভাষার ব্যাকরণ। মহারাজা সার চন্দ্র-শমশেরজঙ্গ বাহাদুর রাণা একটি সাহিত্য-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ব্যাকরণ-সঙ্গত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে।

কাশীতে একটি নেপালী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। নেপালী ভাষায় চারিখানি সাময়িক পত্রিকা বাহির হইতেছে—(১) নেপাল হইতে 'গোরখা' (২) বেনারস হইতে 'গোরখালি', (৩) "গোরখে" এবং (৪) "গোরখাসাথী" দাৰ্জিলিঙ হইতে। নেপালের আটটি ছাপাখানা হইতে অনেক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে।

বিবিধ বিষয়।

(১) মির্জ্জাপুরের বসন্ত বিদ্যালয়।

পাঁচ বৎসর হইল এই বিদ্যালয়টি মির্জ্জাপুরের ধনী শ্রীযুক্ত বসন্তলাল

শ্রীনগরের অদূরবর্ত্তী পহলগাম (কাশ্মীর) নামক স্থানে লিদর নদীর দৃশ্য

অগরওয়াল কর্তৃক স্থাপিত হয়। প্রথম বৎসর মাত্র ২১ জন ছাত্র ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা হইল ২৫২। অধ্যাপক মাত্র ৯ জন। প্রথমে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে সনাতন ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়, Book-keepingও শিখান হয়। বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হয় না। ইহার সমস্ত ব্যয় বাবু বসন্তলাল বহন করেন। এবার তিনি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা এবং ঐ পরিমাণ আয়ের সম্পত্তি বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি এবার এণ্ট্রান্সে পরিণত হইয়াছে। বাবু বসন্তলাল মির্জ্জাপুরের কয়েকটি দাতব্য-সমিতির পৃষ্ঠপোষক।

(২) বিহারে রেডিয়াম আবিষ্কার।

গয়ার নিকটে সিঙ্গর নামক স্থানে অবরখি নামে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের যেখানে-সেখানে অভ্র পাওয়া যায়। দু'-একটি ছোট ছোট খনিও আছে। চার বৎসর পূর্ব্বে একটি খনি হইতে রেডিয়মযুক্ত একটি পদার্থ পাওয়া যায়। দু' একটি খনি খুব গভীর করিয়া খনন করা হইলে পিচ-ব্লেণ্ডি (Pitch-blende) নামক খনিজদ্রব্য পাওয়া গেল। এই Pitch-blende হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রেডিয়ম বাহির করা হয়। ভারতের ভূমি যে সত্যই রত্নগর্ভা, তাহা এই আবিষ্কার হইতে বুঝা যায়।

Pitch-Blende বাহির করিবার জন্য একটি কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কার্য্যারম্ভ হয় নাই। Dr. W. Chowdhury Ph. D. শীঘ্রই এই পাহাড়জাত খনিজ পদার্থগুলির একটি রিপোর্ট বাহির করিবেন। তাহা হইতে আমরা বিশদ বিবরণ পাইব, আশা করা যায়।

২। চিত্রময় জগৎ—আগষ্ট, ১৯১৬।

প্রোফেসার লক্ষ্মণদাস মুনীম—লেখক শ্রীযুক্ত রমাশঙ্কর অবস্থী।

প্রোঃ লক্ষ্মণদাস মুনীম একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। আমাদের দেশে কালোয়াতী বিদ্যার অবরুদ্ধ প্রবাহে সঙ্গীতবিদ্যা উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সঙ্গীতে কোনও বিশেষ রীতি বা প্রবৃত্তি দেখা দেয় নাই। ক্রমোন্নতিই যদি মানব-ধর্ম্ম হয়, তবে সঙ্গীতে তাহা খাটিবে না কেন? মুনীমজি আমাদের নবযুগের সঙ্গীতাচার্য্য। ইঁহার নিবাস প্রয়াগে। ইনি বৈশ্যজাতীয় অগ্রবাল। ইঁহার পিতা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পিতা একদিন বালক মুনীমকে নিভৃতে গান গাইতে শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন, এবং পুত্রের সঙ্গীত-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

প্রোঃ মুনীম 'সরস্বতী সঙ্গীত সমিতি' ও "সরস্বতী সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মুনীমজি গীতবিশারদ্ বিষ্ণুনারায়ণ ভাওখণ্ডে মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত সরল স্বরলিপি আপনার বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। সাময়িক পত্রিকার উপর ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্র দেশে আজকাল সঙ্গীতবিদ্যার যে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা ইনি বিশেষরূপে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ উকীল ও নেতা এবং কনভেনসন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীদাজী সাহেব খরে ৮ই আগষ্ট পরলোকে গমন করিয়াছেন।

কাশ্মীর সোপুর নগর ও বিতস্তা নদীর সেতু

সর্দ্দার গাহিল সিংহ শিখ সমাজের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি পাতিয়ালা রাজসরকারের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট। এরূপ ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা বিচারক খুব বিরল। মিঃ মেকলককে ইনি গ্রন্থ-সাহেবের অনুবাদে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

৩। মর্য্যাদা—ভাদ্র ১৯৭৩ বিক্রমাব্দ।

সাহিত্য ও সমাজ।

লেখক বলিতেছেন যে, যেমন ধনী ব্যক্তি দানশীল হইলে সমাজের দশজন দীন দরিদ্রের উপকার হয়, সেইরূপ যাঁহার চিন্তার ও ভাবের ঐশ্বর্য্য আছে, তিনিও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। উন্নত হৃদয়ের সাহিত্যধারা সমাজে সদ্ভাব, পবিত্রতা, প্রীতি ও বিশ্বাসের বীজগুলিকে পরিপুষ্ট ও সবল করিয়া তোলে। সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুখ। ইহা জাতীয় হৃদয়ের উর্ব্বরতা সাধন করে।

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আছে। সাহিত্য সমাজ-জীবনের উন্নতি বা অবনতির সাক্ষ্য দেয়। সমাজের গতির সঙ্গে-সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে সাহিত্যও নিজের পথ কাটিয়া যায়। আবার ওদিকে সমাজও অনেক পরিমাণে সাহিত্যের মুখাপেক্ষী। সেইজন্য সমাজের অভাব ও ত্রুটিগুলির প্রতি সাহিত্যের নজর থাকা উচিত। সাহিত্যিকগণ সমাজের অভাব বুঝিয়া সেগুলি দূর করিবার পন্থা সাধারণকে বুঝাইবেন। সাহিত্য যে সমাজের পথপ্রদর্শক। সাহিত্যের প্রভাবের উপরই সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির সকল আশা ও শক্তি নির্ভর করে।

৪। ইন্দু—সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

"ভাষাকী মধুরতাকা কবিতাপর প্রভাব"—লেখক শ্রীকৃষ্ণবিহারী মিশ্র, বি-এ,। হিন্দী কবিতায় আজকাল মাধুর্য্য ও পদলালিত্যের অভাব হওয়াতে, মিশ্রপণ্ডিত মহাশয় এই লেখার অবতারণা করিয়াছেন। চিত্রকর আমাদের নেত্রেন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করিয়া আমাদের মনকে তুষ্ট করেন। কবি আমাদের কাণের কাছে ঝঙ্কার তুলিয়া মনের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল জাগাইয়া তোলেন। কবি যদি এখন এই মধুর ঝঙ্কারটুকু বাদ দেন, তাহা হইলে কাব্যের অর্দ্ধেক উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া গেল। ব্যাকরণ-সঙ্গত হইলেই যে সেটা মিষ্টা হইল, তাহা নহে। বৈয়াকরণী বলিলেন—"শুষ্কং বৃক্ষং তিষ্ঠত্যগ্রে" কবি বলিলেন—"নীরস-তরুবর নিবসতি পুরত!" দু'জনে একই কথা বলিলেন—দু'জনেরই প্রতিনিধি শব্দ, দু'জনেই ব্যাকরণসঙ্গত;—অথচ এতটা প্রভেদ কেন? Music of words কি কবিতা হইতে বাদ দেওয়া চলে? আমাদের দৈনিক জীবনের সাধারণ কাজগুলিতেই মিষ্ট কথা ও মধুর বাণী কতটা আনন্দ দেয়। মিশ্রপণ্ডিত মহাশয় ব্রজভাষার পুনরালোচনার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ব্রজভাষা যে এখনও পুরাতনের আঁচলে ঢাকা থাকার জন্য নহে, তাহা বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। তিনি এই বিংশ শতাব্দীর নবীনতার যুগেও কতকগুলি সঙ্গীত বিশুদ্ধ ব্রজভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি পারসীনবীশগণও এই ব্রজভাষাকে মাধুর্য্যে সকল ভাষার উপর স্থান দিয়াছেন। হিন্দীসেবীগণ যেন এই কথাটি মনে রাখেন।

সংস্কৃত

বিদ্যোদয়—জুলাই—আগষ্ট, ১৯১৬।

বারেন্দ্র রাঢ়ীয়-মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ নামির্ণিবৃত্তঃ; লেখক—শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত বিজয়সেন ভূপতির তাম্রশাসন দেখিয়া মনে হয় বল্লালসেন শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন; তাঁহাকে সোমশূরের ভাগ্নে-দৌহিত্র বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। কুলতত্ত্বার্ণবে আছে—

> আদীশূরস্য যশসঃ পশ্চাদবর্ত্তি যশা মম
> যথাক্রমাৎ সতাং গেহে ভবেত্তদ্ বিদধাম্যহম্॥
> ইত্যেকদৈব সঞ্চিন্ত্য বল্লালো বৈদ্যকুলজঃ
> কৃতপ্রতিজ্ঞোঽভবদ্ দ্বিজানাং কুলবন্ধনে॥

ইহা হইতে মনে হয়, বৈদ্যবংশজ নৃপতি বল্লাল ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দোষগুণ সম্যক বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে মুখ্যকুলীন—গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মহারাজ বল্লালসেন দ্বাবিংশতি গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে কুলীন বলিয়া তাম্রশাসন প্রদান করেন। অবশিষ্ট চৌত্রিশটি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কুলবন্ধনকর্ম্মে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বল্লালসেনকে বলিলেন—তপঃবিদ্যাসম্পন্ন ভগবদ্দেহস্বরূপ ব্রাহ্মণদের দোষ গুণ তুমি বিচার করিতেছ শুধু তাঁহাদিগকে অপমান করিবার জন্য। অতএব যদি ভাল চাও ত এরূপ করিও না।" নৃপতি তাঁদের কঠোর বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করেন। এই চৌত্রিশ গ্রামিদের বংশধরগণ এখন চট্টগ্রামে অবস্থান করিতেছেন।

আসামী

১। বাহী—আশ্বিন, ১৮০৮।

'আসাম এচোচিয়েনের আগত এটি প্রস্তাব'। লেখক শ্রীদুর্গানাথ বড়ুয়া।

লেখক বলিতেছেন—বছর-বছর একটি স্থানে শুধু মিলিত হইয়া কতকগুলি resolution প্রস্তাবনা পেশ করাই যেন আমাদের উদ্দেশ্য না হয়। আমরা সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের নিকট কান্নাকাটি করি—দয়ালু গবর্ণমেণ্টও আমাদের যতদূর সম্ভব সহায়তা করিতেছেন। তাই বলিয়া সব কথাতেই যে গবর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে বা সব কাজই যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য গুছাইয়া দিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে—সম্ভবপর ত নহেই। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজের কাজ যতটা পারি করিতে হইবে।

লেখক একটি National Fund বা জাতীয় ভাণ্ডার খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন। প্রত্যেক স্থান হইতে, প্রত্যেকের নিকট হইতে, অন্ততঃ চারি আনা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একটি Fund সৃষ্টি করা

হইবে। এই ফণ্ডের আয় হইতে আসামের লোকদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কাপড় বোনাটা আসামের জাতীয় বৃত্তি। ইহাতে কাহারও জাতি যায় না—কেহই এ কার্য্যটাকে হেয় মনে করেন না। লেখক তাই বলিতেছেন যে, ছেলেদের এণ্ট্রান্স পাস না করাইয়া বয়ন কার্য্য শিখান হউক। নূতন স্কমে নূতন ফ্যাসনে এণ্ডি প্রভৃতি প্রস্তুত হউক—দেখি কাট্তি হয় কি না।

আসামে বনজঙ্গলে অনেক ঔষধি পাওয়া যায়। দেশের ছেলেদের তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে কবিরাজী শাস্ত্রের চর্চ্চায় উৎসাহিত করা হউক। এইজন্য টাকার দরকার; কিন্তু চেষ্টা করিলে কি একটা National Fund হয় না? সেই Fundএর টাকা হইতে পারিতোষিক বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা—সাধারণকে উৎসাহিত করা উচিত। এণ্ট্রান্স, বি-এ পাশ করিয়া সামান্য চাকুরে হওয়া অপেক্ষা ইহা শতগুণে শ্রেয়।

রোদন না প্রহসন?

[শ্রীসুহাসচন্দ্র রায় বি-এ]

গত কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' কাগজে "মধ্যস্থের অরণ্যে রোদন" নাম দিয়া যে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বড়ই হাসি আসিল। রোদন দেখিয়া হাসি আসাটা অনেকের নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে পারে; কিন্তু এ কথা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের এ হাসির কারণটুকু যিনি অবগত হইবেন, তিনিই না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। সেই কারণটুকু এখানে বিবৃত করিতেছি।

এই প্রবন্ধে আছে,—"চল্‌তিভাষা চলে না, এটা হচ্ছে ভুয়ো কথা।...এর খরস্রোত যে গভীর কল্লোল তুলিতে পারে, সে কল্লোলধ্বনি বাঙ্গালীরই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি এবং তার টানের মুখে পড়িলে,—আমাদের ধাতে যা কৃত্রিম, সেই সমাসে ভরা, দুরূহ শব্দের ঘেরাটোপ পরা এবং পণ্ডিতের হাতে গড়া 'সাহিত্যিক ভাষা' হাজার জোর থাকিলেও ঐরাবতের মতই কোথায় কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে।......রবীন্দ্রনাথ দুরকমে লিখিলেও তাহা চল্‌তি বাঙ্গলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রীমহাশয় এবং প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ও তাই দুদলের হইলেও আসলে দু মতের লোক নন। তাঁদের উদ্দেশ্য এক,—পথই খালি আলাদা।"

কিন্তু এই লেখকই ইতিপূর্ব্বে, ১৩২১ সালের 'প্রবাহিনী' কাগজে "সবুজপত্রে"র সমালোচনা-প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"সম্পাদক-রচিত 'সাহিত্য সম্মিলন'। ইহাতে ভাষার উপরে যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে দেশের সাড়ে পনের আনা তিন পাই লোক সায় দিবে না।...তাঁহার প্রবন্ধ দেখিয়া কোন ভরসা হয় না, তবে ভয় হয় বটে। ভরসা হয় না এইজন্য, সকলে যে ভাষায় লিখে, তিনিও সেই ভাষাতেই লিখিতেছেন, প্রভেদ্ এইটুকুমাত্র যে, তিনি কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার ওলট-পালট করিয়াছেন; আর আমরা লিখি 'জানি না' 'বুঝি না', তিনি লিখেন, 'জানিনে, বুঝিনে'। আমরা লিখি 'হইতেছে যাইতেছে', তিনি লিখেন 'হচ্ছে যাচ্ছে' প্রভৃতি। অর্থাৎ তিনি কথোপকথনের ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করেন। ভয় হয় এইজন্য যে, তাঁহার নীতি মুখস্থ করিয়া যদি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লোক সকলেই এইরূপ নিজস্ব দেখাইতে আরম্ভ করেন, তবে অবিলম্বেই বঙ্গের প্রতি প্রদেশে এক একটি নূতন ভাষার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিব। কিন্তু সেই সেই সৌভাগ্যের দিনে প্রমথবাবু কোন্ প্রদেশের ভাষাকে যথার্থ বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবেন? আসল কথা, প্রমথ বাবুর মতানুবর্ত্তী হইলে বাঙ্গলাভাষার সার্ব্বত্রিকতা একেবারে নষ্ট হইবে।...তিনি ভাষা-বিজ্ঞানের যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একান্ত বৈচিত্র্যহীন ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।...... একে ত কর্ম্ম ও কর্ত্তার ওলট-পালট, তাহার উপর "হচ্ছে"র জ্বালায় প্রাণ আমাদের অস্থির 'হচ্ছে'।...খাঁটি বাঙ্গালা অর্থে তিনি যদি 'হচ্ছে' ও 'উঠছে' প্রভৃতি বুঝেন, তবে তিনি ভুল বুঝেন।...এক্ষেত্রে বাঙ্গলা শব্দের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া দিবার এক 'নতুন কিছু' করার চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন দরকার দেখি না।...তাঁহার ভাষা একটা কিম্ভূতকিমাকার ভাষা—ইহার না আছে নির্দ্দিষ্ট জাতি, না আছে পিতার ঠিক, না আছে মাতার ঠিক—ইহাতে জারজ সন্তানের সর্ব্বলক্ষণ পূর্ণ প্রকট।"

সমালোচক সাজিয়া লেখক একদিন যে বিষয়ে 'না' বলিয়াছিলেন, 'মধ্যস্থ' সাজিয়া সেই বিষয়েই আজ আবার 'হাঁ' বলিতেছেন। যে 'হচ্ছে'র জ্বালায় প্রাণ তাঁহার একদিন অস্থির হইয়াছিল, সেই 'হচ্ছে'ই এখন তাঁহার লেখার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!—এ সব দেখিয়া না হাসিয়া কি থাকা যায়! রোদনের মতন করুণ-রসাত্মক ব্যাপার কিছুই নাই সত্য, কিন্তু উহা যখন আবার ফরমায়েসী হয়, তখন উহার ন্যায় হাস্যরসও আর কিছুতে উদ্রেক করে না!

আরও মজা আছে! এই লেখকই আবার অন্যের লেখা হইতে পরস্পর-বিরোধী মতের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"যাঁদের নিজেদের মতের ঠিক নাই,...তাঁদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে হইলে মুখের যুক্তির চেয়ে দেহের শক্তির বেশী দরকার।"—চালুনী সূচের ছিদ্র দেখিয়া হাস্য করিতেছেন,—এ নির্লজ্জ অভিনয় বুঝি বাঙ্গালাদেশেই সম্ভবে! প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত অপর ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে।"—কিন্তু বঙ্কিম বাবু যদি আজ জীবিত থাকিয়া এই সব রচনা পড়িতেন, তাহা হইলে মনে হয়, তাঁহার মত একটু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি লিখিতেন,—"এদেশে অন্ধ চক্ষুষ্মান্‌কে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত বিজ্ঞকে উপদেশ দিতেছে।"

সাময়িকী

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর এই দুই দিন দ্বারবঙ্গে 'বিহারী ছাত্র-সম্মিলনের' (The Biharee Students' Conference) অধিবেশন হইয়াছিল। পাটনা কলেজের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন সম্মিলনের সভাপতি হইলেই অভিভাষণ পাঠ করিতে হয়, বক্তৃতা করিতে হয় না; অধ্যাপক যদুনাথও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, ঐতিহাসিক সভাপতি মহাশয় গভীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করিবেন; নানা অবোধ্য, দুর্বোধ্য লিপি প্রদর্শিত হইবে,—মোট কথা তিনি তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিবেন। কিন্তু অধ্যাপক যদুনাথ তাহা করেন নাই; তিনি নিতান্ত সহজভাবে ছাত্রদিগকে কয়েকটী সদুপদেশ দিয়াছেন;—এবং তাহাতে না আছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, না আছে দার্শনিক বিবৃতি, না আছে উচ্চতম আদর্শের কথা। এই কারণেই অধ্যাপক মহাশয়ের অভিভাষণ আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তিনি সোজা কথায় বলিয়াছেন—"I am exactly in the position of a *Sardar mistri* speaking to his apprentices in the workshop. It is a message from the old to the young craftsman" অর্থাৎ "আমি এখানে ঠিক সর্দ্দার মিস্ত্রীর আসনে বসিয়া শিক্ষানবীশগণের সহিত কথা বলিতেছি; বৃদ্ধ কারিগর যুবক কারিগরদিগের সহিত কথা বলিতেছে।" এই সর্দ্দার মিস্ত্রী আজ ১৭ বৎসর বিহারের যুবকগণকে মিস্ত্রীগিরি শিখাইতেছেন এবং ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন; তিনি আরও বহুকাল সর্দ্দারী করুন এবং তাঁহার সাগরেদগণ বড় বড় সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের এবং ওস্তাদের গৌরব বর্দ্ধন করুন।

এই 'সর্দ্দার মিস্ত্রী' বিহারী ছাত্রগণকে, তাঁহার সাক্ষাৎ সাগরেদদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহার বাঙ্গালী সাগরেদগণেরও সে কথা শোনা উচিত;—শুধু শোনা নহে, এই সর্দ্দারের উপদেশ-অনুসারে কাজ করা উচিত। সর্দ্দার বলিতেছেন—"Everything that interferes with their training, everything that prematurely calls them away from their workshop into the outer world of pleasure or action, is a deflection from their true goal; it is an evil." কথাটার সারমর্ম্ম এই যে, যাহাতে ছাত্রদিগের লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে, যাহাতে তাহাদিগকে অসময়ে তাহাদিগের কারখানা হইতে ডাকিয়া লইয়া আমোদ-আহ্লাদ বা কাজকর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহাকেই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইতে বিপথগমন মনে করিতে হইবে, তাহাই তাহাদের পক্ষে অমঙ্গলকর। যদুনাথ বাবুর এই উক্তিটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দেশে যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, আমাদের স্কুল-কলেজের ছাত্রগণই সকল কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন। অবশ্য, তাঁহারা যে সকল কার্য্য করেন, তাহা অতীব সৎ কার্য্য; কিন্তু ছাত্রগণ তাঁহাদের পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদিগের কি ক্ষতি হয় না? দামোদরের বন্যার সময় আমাদের যুবকগণ, স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমাদিগের স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে যাহা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ইহাতে কি তাঁহাদিগের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় নাই? যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন আমাদিগের স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ সেই ব্যাপারে যে কতদূর মাতিয়া গিয়াছিলেন, আমাদিগের নেতৃস্থানীয় মহোদয়গণ সেই সময় ছাত্রগণের কার্য্যে যে প্রকার উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা

এখনও ভুলি নাই ; কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও ভুলি নাই যে, সেই মত্ততায় কত ভাল ছেলের পরকাল একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছিল। এই কথা ভাবিয়াই অধ্যাপক যদুনাথ বলিয়াছেন, এ সকলই deflection from their true goal—এ সকলই ছাত্রগণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল।

এই উপলক্ষে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, ছাত্রগণই ভবিষ্যতে, দুই দশ দিন পরে দেশের নেতা হইবেন ; আজ যিনি পুত্র, দশ বৎসর পরে তিনিই পিতা হইবেন ; তাঁহার উপর তখন দেশের ও দশের কাজের ভার প্রদত্ত হইবে। এখন হইতেই সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য। এই 'এখন' কথাটা বুঝিতেই আমরা গোল করিয়াছি এবং করিতেছি। সেই জন্যই প্রবীণ অধ্যাপক যদুনাথ তাঁহার কথার মধ্যে 'অসময়ে' (prematurely) শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। যে সকল ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনের বিমল আনন্দের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে কার্য্যেই নিযুক্ত কর না কেন, তাঁহারা তাঁহাদের আসল কার্য্যের কথা বিস্মৃত হইবেন না, তাঁহারা তাঁহাদের true goal হইতে বিচ্যুত হইবেন না। কিন্তু আমাদের দেশে ত তাহা হয় না ; আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেরা অনেকেই এই সকল হুজুগে মাতিয়া তাঁহাদের পড়াশুনার অবহেলা করেন এবং পরিণামে তাহার ফলভোগ করেন ; ইহার শত-শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের উপর রহিয়াছে।

এ কথার উত্তরে কেহ বলিবেন, তবে কি আমাদের ছেলেরা কেতাবকীট হইয়া পড়িবেন, বাহিরের কিছুই তাঁহারা দেখিবেন না, শিখিবেন না, দশটা কাজ হাতে-কলমে করিয়া পরিপক্ক হইবেন না? একজন বিখ্যাত পত্র সম্পাদক ত স্পষ্টই বলিয়াছেন "We cannot say, however, how far it would be possible for our youngmen to act up to this ideal under modern conditions" অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের আদর্শ অনুসারে 'অধ্যাপক সরকারের এই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করা ছাত্রগণের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি না ; কারণ they are being every day moved by the breath of a new life and are feeling within them a new energy to serve their motherland—অর্থাৎ এখন আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে একটা নবজীবনের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহারা মাতৃভূমির সেবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করিতেছে। কথাটা আমরাও অস্বীকার করি না ; কিন্তু ইহার কারণ কি? এই অনুপ্রাণনা কাহারা জাগাইয়া দিতেছেন? ইহাতে ছাত্রগণের পড়াশুনার কি বিঘ্ন হইতেছে না? দেশের সেবা করিতে হইবে, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য আত্মশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু সে কখন? পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি, যখন ছাত্রগণ শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবেন, যখন তাঁহারা ভালমন্দ বিচারক্ষম হইবেন, তখনই তাঁহাদিগকে এক সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে ; নতুবা গরিবের ছেলেরা অভিভাবকের কষ্টোপার্জ্জিত শরীরের রক্ত-জল-করা পয়সায় বিদ্যা-উপার্জ্জন করিতে সহরে আসিল ; আমরা তাহাদিগকে বক্তৃতা শোনাইয়া দিলাম যে, তাহারাই দেশের আশা-ভরসা, তাহারাই কাজ করিবে, তাহারাই মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন করিবে। তাহারা এই উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িল ;—আসিয়াছিল লেখা-পড়া শিখিতে—পিতামাতার কষ্ট দূর করিতে, তাহা না হইয়া সেই সকল অপরিপক্কবুদ্ধি যুবকগণ ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি হইবার জন্য মাতিয়া গেল! তাহার পর—তাহার পর, ক্রমাগত পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া ভবিষ্যৎ-ভারতের 'আশাভরসা'গণ সামান্য কেরাণীগিরি বা দূরগ্রামের মাইনর স্কুলের মাষ্টারীতে জীবন-শেষ করিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে হাজার হাজার ছেলে পাশ হয়, তাহাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের বিবরণ অনুসন্ধান করিলে সকলেই আমাদের এই কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। যে অল্পসংখ্যক ছাত্র এই তরঙ্গ কাটাইয়া উঠে, তাহারাই লেখাপড়া শেখে এবং পরে মাতৃভূমির কাজে লাগে। এই সকল কথা ভাবিয়াই অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে—"I deprecate the prevailing custom of appealing to the students as if they were the saviours of society and must act as drudges at every work of

রোহিণী বলিল, "এত কেশ… ……. আমি যে সকলের চুলের দাড়ি বিনাইবার জন্য……… কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

কৃষ্ণকান্তের উইল—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

Emerald Ptg Works

social utility" অর্থাৎ—'হে ছাত্রগণ তোমরাই সমাজের উদ্ধারকর্ত্তা, তোমরা দেশের সমস্ত কার্য্যে যোগদান কর' ইত্যাদি প্রকারের বক্তৃতা করিয়া ছাত্রগণকে পড়াশুনা হইতে টানিয়া লওয়াটাকে অধ্যাপক সরকার মহাশয় দোষাবহ বলিতেছেন।

এই ত গেল কাজের (action) কথা। অধ্যাপক মহাশয় আমোদ-প্রমোদের (pleasure) কথাও বলিয়াছেন। ছাত্রেরা আমোদ-প্রমোদ করিবে না, সুধু দিনরাত পড়াশুনাই করিবে, এ কথা আমরাও বলি না, সরকার মহাশয়ও বলেন না। সবই করিতে হইবে,—খেলা করিতে হইবে, ব্যায়াম করিতে হইবে, আমোদ করিতে হইবে;—কিন্তু আসল কাজ যেন ঠিক থাকে। তাহা অনেক সময় থাকে না বলিয়াই আমরা ক্ষুব্ধ হই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কথা বলি। এই যে কলিকাতায় এবং কলিকাতার দেখাদেখি অন্যান্য স্থানেও কলেজের ছেলেরা মধ্যে-মধ্যে নাটকাভিনয় করিয়া থাকেন, ইহাতে লাভের অপেক্ষা ক্ষতি কি অধিক হয় না? অনেকে বিলাতের নজীর দেখাইবেন। কিন্তু বিলাতে যাহাতে সুফল হয়, আমাদের দেশে কি তাহাতে সুফল হইবেই? যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণের সহিত অধিক মিশিয়া থাকেন, যাঁহারা বর্ত্তমান ছাত্রাবাসগুলিতে মধ্যে-মধ্যে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এই সকল নাটকাভিনয়ে যে সকল ছাত্র যোগ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া পড়েন, দিনরাত কেবল ঐ আলোচনাই করেন। ইহাতে কি পড়াশুনার ক্ষতি হয় না? এই যে, যখন ফুটবল খেলার সময় আসে, তখন আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেরা যেন গাজনের সন্ন্যাসীর মত হইয়া পড়েন; চারিটা বাজিতে না বাজিতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ময়দান-অভিমুখে গমন করেন, আর রাত্রি সাড়ে-সাতটার সময় গৃহে বা বাসায় প্রত্যাগমন, এবং তাহার পর রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সেই আলোচনা, আন্দোলন! প্রতিদিন এই ভাবে অতিবাহিত হয়। ইহাতে কি পড়াশুনার ক্ষতি হয় না?

তবে কি এ সকল বন্ধ করিতে হইবে? বন্ধ করিতে হইবে না, কিন্তু এ সকল গুলিকেই যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। ছাত্রগণ যাহাতে লেখাপড়ার কথা না ভুলিয়া যায়, যাহাতে তাহারা পথভ্রষ্ট না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা করা যদি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকগণের অসাধ্য হয়, যদি তাঁহারা কলেজে বা স্কুলে একঘণ্টা 'হরিনাম' শোনাইয়া দিয়াই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাসমস্যা যে গুরুতর, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সেই উপলক্ষে একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; সমস্ত কথার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তিনি চিত্রশালা (Museum) সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে প্রাচীনকালের কলাশিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন বহুবিধ মন্দির, ইষ্টকগৃহ ও প্রস্তরখণ্ড পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছু নিদর্শন আপনারা ঢাকা মিউজিয়ামে স্থাপন করিয়াছেন। দেববিগ্রহের সংখ্যা নাই। দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর বৌদ্ধ তারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে ধ্যানী বুদ্ধ, হরদুর্গা, সরস্বতী, শ্রী, সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্য্য এবং গণেশাদির প্রস্তরমূর্ত্তি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। আপনারা সেই সকল মূর্ত্তির ইতিহাস জানিতে ব্যস্ত। মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের সন, তারিখ, তাহার নাম, এবং খুব বেশী হইলে পূজার ধ্যানটি জানিতে পারিলেই Society Journalএর জন্য একটা বড় প্রবন্ধের খোরাক হয়। তাহার পর দেবতারা মিউজিয়ামের এক কোণে বিশ্রামসুখ লাভ করুন, তাঁহাদের আর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। দৈবাৎ আবার কোন কলাশিল্পের অনুরাগী বিশেষজ্ঞের পরিদর্শন-উপলক্ষে বিশুদ্ধ শিল্প ও ইতিহাসের অনুরোধে এই বিশ্রামাগার আক্রান্ত হয়, এবং বিগ্রহদিগের গাত্রসঞ্চিত ধূলি মার্জ্জিত করিয়া

গজকাটির দ্বারা তাঁহাদের নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির মাপ গ্রহণ করা হয়। * * * * প্রাচীন ইতিহাসের মন্দিরে বিনম্রভাবে প্রবেশ করিবেন, প্রাচীনকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহা হইলেই শুধু মৃদুস্বরে তাঁহার গুপ্তমন্ত্র বলিয়া দিবেন, সেই মন্ত্রে নূতনের সঙ্গে প্রাচীনের পরিচয় হইবে। তখন বুঝিবেন, প্রাচীন প্রস্তরীভূত জীব-কঙ্কাল নহে; শতশত কোমল স্বরে আপনার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে; এবং দেখিতে পাইবেন প্রাচীনেরা যে পুষ্প ও ফলের ডালি লইয়া দেবতার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বাসি হইয়া যায় নাই।"

শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর এই কথাগুলি বড়ই সুন্দর। আমরা ঢাকা মিউজিয়াম দেখি নাই; কলিকাতার মিউজিয়াম দেখিয়াছি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়াম দেখিয়াছি, সারনাথের মিউজিয়াম দেখিয়াছি, বুদ্ধগয়ার মিউজিয়ামও সেদিন দেখিয়া আসিয়াছি। এগুলি দেখিয়া সাধারণতঃ আমাদের মনের মধ্যে একটা গৌরবের ভাব উদিত হয়; যাঁহারা এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এমন উৎকৃষ্ট কলাকৌশল ও স্থাপত্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদেরই পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষ, এই কথা মনে করিয়া আমাদের হৃদয়ে গর্ব্বের সঞ্চার হয়। কিন্তু ইহাই কি এ সকলের একমাত্র সার্থকতা? যে সমস্ত দেবদেবী মূর্ত্তি এক সময়ে, সেই সুদূর অতীতে লক্ষলক্ষ নরনারীর ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি এখন সুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ইন্ধন যোগাইবার জন্যই এতকাল পরে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছেন? কেহ হয় ত বলিবেন, তবে কি তাঁহাদের জন্য পূজা, নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে? তাহা নহে; শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিয়াছেন, ভক্তিভরে এই সকল দেব-দেবীর সমীপবর্ত্তী হইতে হইবে, তাঁহাদের নিকট হইতে নীরবে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইবে; তখন বুঝিতে পারিবেন এ স্থানগুলি মিউজিয়াম নহে—দেবমন্দির! তখন ঐ সকল পাষাণে কথা ফুটিবে; এবং তাহাই এ কার্য্যের সার্থকতা।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধুভাষা চলিবে, কি চল্‌তি ভাষা চলিবে, এই কথা লইয়া যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের মাটির গুণে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া 'শান্তিভঙ্গের' কাছাকাছি পৌছিয়াছে। কথাটা আমরা বাড়াইয়া বলি নাই; বন্ধুবিচ্ছেদ ত হইয়াই পড়িয়াছে, আরও বা কি হয়। সকল কথারই একটা আলোচনা হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি যে, আলোচনা করিতে বসিয়া সত্যনির্ণয়ের কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই; আমরা প্রথমে কথা-কাটাকাটি করি, তাহার পর ব্যক্তিগত আক্রমণ করি; তাহার পর কি করি, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। যে সাধুভাষা ও চল্‌তি ভাষা লইয়া কথা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কোথায় সরিয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন কলহ-কোলাহলই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কোন উপকারই হয় না;—সাহিত্যেরও না, সাহিত্যিকেরও না। যাথার্থ সমালোচনা যেমন সাহিত্যের পক্ষে উপকারী, 'কলহ-কোলাহল তেমনই অপকারী। অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রভৃতিতে সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, প্রকৃত সাহিত্যের ক্ষতি হয়'; আমাদের সাহিত্যসমালোচক-গণ এ কথা বিস্মৃত হইলে বড়ই পরিতাপের কথা।

হরিধ্বনি

[শ্রীরাধারাণী ঘোষ]

কেন এ করুণ স্বর দিকে-দিকে প্রবাহিত;
নহে ত এ প্রাণহরা পাপিয়ার সাধা গীত;
এ যে গো ভীষণ কথা, পরাণ চমকি উঠে,'
প্রতিধ্বনি কি দারুণ গগনে উঠে গো ছুটে!

এ যে হৃদি চূর্ণ করা বিষাদের হাহারোল,
প্রকৃতির বক্ষে বাজে 'বল, হরি, হরিবোল।"
অকালে সকালে এ যে নব ফুল ঝরি হায়,
কঠিন কালের স্রোতে কোথা যে ভাসিয়া যায়!

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং, কেমন করিয়া যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এই মাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার এ দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেম্‌নি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনী স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কারণ, নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ী-বাড়ী ভাত চাহিয়া খাইত; আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুক্‌নো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ, কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই; এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘৃণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর, এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়,—আট দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায়; এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয় ত তেম্‌নি কিছু ছিল,—হয় ত ছিল না। কিন্তু যাক্‌গে।

বলিতেছিলাম যে, সেই ধূল-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে-ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছি ছি; ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ-দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয়, আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি, অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একান্তে বসিস্ না,—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্। কথাগুলা কাণে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু, তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ,—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্‌নি একরকম করিয়া থাকে; একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু'চোখ মেলিয়াই চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ একরকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে। এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টাও করিতাম; কিন্তু, মনে হইল সব বৃথা।

এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ-দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু-শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে।

সুতরাং, চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া, কোন প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া, যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোন দিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্ত-হীন কালো আকাশ তলে পৃথিবী জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার! অগাধ বারিধি মসি-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্ব্ব-লোকাশ্রয়, আলোর-আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাব? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দু' চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয় ত, মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এম্নি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভাগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্ব্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অন্তাজ হীন অন্তবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন!

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়াছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্ত্তার কোলাহল কাণে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশে-পাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্ব্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দু'খানা গরুর গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে ষ্টেসনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ, আগন্তুকের দল যত

বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হৌক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-চৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলাম; এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দু'খান গো-শকট ৫।৬ জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক দু'টা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের ধারের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এম্নি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সুউচ্চ কণ্ঠের ডাক কাণে গেল, "শ্রীকান্ত বাবু—"

সাড়া দিলাম—"কে রে, রতন ?"

"আজ্ঞে, হাঁ, বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।"

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, "রতন, তোরা কি বাড়ী যাচ্চিস ?"

রতন উত্তর দিল, "হাঁ বাবু, বাড়ী যাচ্চি—মা গাড়ীতে আছেন।"

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়ীতে উঠে এসো, কথা আছে।"

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা ?"

"উঠে এসো, বল্চি।"

"না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে।"

পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, "চাকর-বাকরের সাম্‌নে আর টানাটানি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠে এসো—"

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিয়া দিয়া কহিল, "আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে ?"

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, "জানি না।"

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, "জান না ? আচ্ছা, বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন ?"

বলিলাম, "এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।"

"মিথ্যে কথা।"

"না।"

"তার মানে ?"

"মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে ? আমি লুকিয়েও আসিনি, আস্‌বার ইচ্ছেও ছিল না।"

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "তা'হলে তাঁবু থেকে তোমাকে ভূতে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বল্‌তে চাও।"

"না, তা বল্‌তে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজেই পায়ে হেঁটে এসেচি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন্ এলুম, বল্‌তে পারিনে।"

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু, বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য।" এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে-শুনিতে আমার হাতের মধ্যে তাহার হাতখানা বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দ্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, "এইবার আমি যাই।"

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, "না।"

"না কি রকম ? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান ?"

"জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে ?" বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "কান্ত দা' সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্চি, তুমি বাড়ী চলে যাও—কিম্বা, যেখানে খুসি যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।"

আমি বলিলাম, "আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে!"

পিয়ারী কহিল, "থাক্ পড়ে। তাদের ইচ্ছে হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে; না হয়, থাক্‌গে। তার দাম বেশী নয়।"

আমি বলিলাম, "তার দাম বেশী নয় সত্য; কিন্তু, যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়।"

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী এই সময়ে মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সমুখের ওই পূর্ব্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নি-পিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে,—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, "চুপ করে রইলে যে?"

পিয়ারী অত্যন্ত একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি জানো কান্তদা', যে কলম দিয়ে সারা জীবন শুধু জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরচে না। যাবে? আচ্ছা, যাও। কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?"

"আচ্ছা।"

"কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?"

"না।"

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, "তবে যাও—বোধ করি ক্রোশদেড়েক পথ তোমাকে বেশী হাঁটতে হবে।"

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, "আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখ্‌তে হবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।"

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে কিম্বা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলাম, দু'টী চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারম্বার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলা চোখে পড়িবামাত্র একটা নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হয়েছিলেন।"

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়াছিলাম,—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করেই নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল, যাহা আমি আজিও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হৌক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপ্‌সা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার মাঝে-মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা 'চাপা সর্দ্দির' মত দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচ্-খচ্ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত, বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু, কেন যে দোর খুলিয়া সোজা ষ্টেসনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসিলাম,—তাহা মনে পড়ে

না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম, সেটা 'বাড়' ষ্টেসন, এবং পাটনার আর দেরি নাই—তখন হঠাৎ সেইখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুসি হইয়া দোকানের সন্ধানে ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুঁড়া, দহি এবং শর্করা-সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক্। জীবনে অমন কত যায়—সে জন্য ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টাখানেক ঘুরিতে-না-ঘুরিতে টের পাইলাম যায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরি-ভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ডও উচিত নয় মনে করিয়া স্থান-ত্যাগের কল্পনা করিতেছি,—দেখি, অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়-শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ্।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্দ্ধ-মুদ্রিত-চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন;—তাঁহার আশে-পাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা'-সেবায় লাগিবে। গোটা দুই উট, গোটা দুই টাটু-ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছা-কাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটী ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুঠাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে-মনে বলিলাম, "ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক্‌গে পিয়ারী;—এই মুক্তিমার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়।"

সাধুজী বলিলেন, "কেঁও বেটা?"

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, "আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।"

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দি করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "বেটা, ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।"

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, "বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।"

সাধুজী খুসি হইয়া বলিলেন, "বাত তেরা সচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা, রামজীকা খুসি।" যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া 'বাবাকে' দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারি হইতেছিল সন্ধ্যার জন্য। তখনও বেলা ছিল; সুতরাং, অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্ব্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার অতি উপযুক্ত পাত্র।"

আমি পরমানন্দে আর একবার 'বাবার' পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

ব্রজবেণু

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

ব্রজবেণু "মরমে পশিল মোর আকুল করিল সারা প্রাণ"। যখন সাময়িক পত্রে এর এক-একটি কবিতা বাহির হইত, তখন রোমাঞ্চিত-প্রাণে পাঠ করিতাম; কিন্তু আজ একটির পর একটি সজ্জিত, গ্রথিত হইয়া এক নূতন জিনিসের নবীনতা লইয়া আমায় সম্ভাষণ করিয়াছে। ফুল যখন বিচ্ছিন্ন, বিস্রস্ত, তখনও সে ফুল বটে, কিন্তু মালা নহে; কবির এ কাব্য-কণ্ঠহার আজ বক্ষে—বক্ষের তলে যে সোনার সিংহাসন—যেখানে দেবতাকে সে বসায়—সেইখানে চলিয়া গিয়াছে—আধুনিক কবিকুলে কালিদাসই একমাত্র ব্রজকবি। ব্রজের ভাব যুগ-যুগ হইতে কত সাধক, কত শিল্পী, কত কবি তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে—এ কবির 'বিশেষত্ব এই যে ইনি ব্রজের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন। ব্রজেশ্বর শুধু গোপিকার নন—কবি সেই রাখালরাজকে নিখিল-রাজরূপে দেখিয়াছেন। কবির কবিতায় আধ্যাত্মিকতার রূপক আছে মানি—কিন্তু উহা বক্তৃতা নহে—কবিতা। কবি—বেমালুম জালিয়াৎ। ধর্ম্মকে এমন কর্ম্মজগতের উপযোগী সরস সরল স্বাভাবিক করা উচ্চ শ্রেণীর কবির কাজ—এ কবি তাই। কিন্তু কবির মনে রাখা উচিত—এইখানেই শেষ নহে—শুধু first division এ পাশ হইলে হবে না—বৃত্তি পাওয়া চাই। পথের শেষ নাই—অগ্রসর হইতে হইবে। কবির 'পর্ণপুটে', কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর যোগ্যতার বীজাণু বা জীবাণু দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম—তেমনি গতানুগতিক দেখিয়া ক্ষোভে আঘাতও করিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য ঘা' দিয়া কবিকে জাগান'। কবি স্নেহভরে অনেকবার কনিষ্ঠের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে "পথ কোথায়?" আমি বলিয়াছিলাম—"পথ বাছিয়া লও।" কিন্তু এ কি? এত শীঘ্র এমন সুন্দর ভাবে কবি নিজের বাঁশীটি কুড়াইয়া আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে—এতে শুধু আমাকে আকুল করে নাই—অবাক্ করিয়াছে।

এ কবির আধ্যাত্মিকতা নীরস যোগীর আত্মগত ধ্যান নহে—উহা মানবতার বিচিত্র রসে সরস, সজীব ও সার্থক। কবির "নরোত্তমে" উহা পরিস্ফুট ও প্রকট। অন্যান্য কবিতায়ও এ মহামানবতার ভাবই পরিস্ফুট।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত

শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক; তিনি পরম ভক্ত। তিনি ভক্তির প্রেরণায় প্রেম-ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির আবার সমালোচনা কি? শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা যেমন করিয়াই লিখিত হউক, তাহাই মধুময়। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় সুলেখক, সুবক্তা, সুধী; তাঁহার এই পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার ন্যায় ভক্তের লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে; ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নানক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি কবিতা পুস্তক। বর্ত্তমান সময়ে কবিতা পুস্তকের নাম শুনিলেই অনেকে ভীত হইয়া উঠেন; এখানি সে শ্রেণীর নহে; ইহা মহাপুরুষ নানকের পবিত্র জীবন-কাহিনী। ক্ষিতীশ বাবু এই জীবন কাহিনী গদ্যে না লিখিয়া পদ্যে লিখিয়াছেন। বেশ সরল সুন্দর কবিতা, কবিতার মধ্যে কষ্টকল্পনা নাই, মিলের জন্য চেষ্টা নাই; গতি অবাধ; পড়িতে বসিলে ধৈর্য্যচ্যুত হয় না; অর্থগ্রহণের জন্য গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয় না। নবীন লেখকের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আট আনা মূল্যে এমন সুন্দর কাগজ, এমন নানা সজ্জায় ছাপা এবং এমন বাঁধাই বই ক্ষিতীশ বাবু কেমন করিয়া দিতেছেন?

হামির

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

লেখক বলিতেছেন এখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস; কিন্তু আমরা পড়িয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে এই পুস্তকে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনাই অধিক স্থান দখল করিয়াছে। তাহা হইলেও এই উপন্যাস-খানির লেখা ভাল, দুই তিনটি চিত্রও বেশ সুচিত্রিত হইয়াছে। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে হইলে যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এই উপন্যাসে তাহার অভাব আছে।

সৌধ-রহস্য

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নাম গল্প সাহিত্যে অপরিচিত নহে; তাঁহার 'নির্ম্মাল্য,' 'কেতকী' প্রভৃতি গল্পপুস্তক অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। এই সৌধরহস্য একখানি উপন্যাস। লেখিকা সুপ্রসিদ্ধ

ঔপন্যাসিক স্যর, এ, কোনান ডয়েলের 'দি মিষ্ট্রি অব ক্লুম্বার' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসখানির অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদের বাহাদুরী আছে; কোন স্থানে অনুবাদের গন্ধমাত্রও নাই, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। বেশ তরতরে ঝরঝরে ভাষা; কোন প্রকার ওস্তাদী ফলাইবার চেষ্টা নাই। এমন সুন্দর অনুবাদ অতি কম লেখকেই করিতে পারেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে লেখিকার প্রশংসা করিতেছি।

আকাশ-প্রদীপ

শ্রীসুখরঞ্জন রায় এম্, এ, প্রণীত, মূল্য আট আনা।

'আকাশ প্রদীপ' নামটি বেশ সুন্দর; লেখক ভাবুক, তাঁহার কল্পনাও মর্ম্মস্পর্শী, তাঁহার কবিতাগুলিও আকাশ-প্রদীপের মতই কবিত্ব-পূর্ণ। পল্লীচিত্র অঙ্কনে কবির দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়; যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর অতুলনীয় শোভা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই আকাশ-প্রদীপ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন; সহরের বাবুরা সকল কথা বুঝিবেন কি না, সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

ডালি

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বাবু তেরটি ছোট গল্প দিয়া এই 'ডালি' সাজাইয়াছেন। ইহার মধ্যে দশটি গল্প বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনটি গল্প নূতন। প্রথম গল্প 'তীর্থের পথে' 'ভারতবর্ষেই' প্রকাশিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ বাবুর এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে কয়েকটি গল্প স্থান পাইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ভাল; আর্টের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু লিখনভঙ্গী ভাল; গল্পের আখ্যান ভাগও ভাল। চরিত্র-চিত্রণেও গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ছবি, ছাপা, বাঁধাই বেশ।

গিরি-কাহিনী

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য বার আনা।

এখানিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিলেও হয়, কাহিনী বলিলেও হয়। এই পুস্তকখানিতে শিলং সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায় এবং খাসিয়াদিগের মধ্যে প্রচলিত অনেক উপকথাও এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। খাসিয়া-জাতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি এই পুস্তকপাঠে অবগত হইতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার বাবুর লিপিকৌশলগুণে পুস্তকখানি বড়ই সুপাঠ্য হইয়াছে; তাঁহার চেষ্টা, অর্থব্যয় ও যত্নে পুস্তকখানি সুদৃশ্যও হইয়াছে। ফটোগ্রাফগুলি অতি সুন্দর। এই কাহিনী পাঠ করিয়া সকলেই শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিবেন।

অহোম-সতী

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'নব্যভারত' পত্রিকায় অহোম সতী জয়মতীর ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, এই সতীর মহিমা যথাযথভাবে কীর্ত্তিত হয় না কেন? শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই প্রাতঃস্মরণীয় সতীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সতীর কাহিনী পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। প্রিয়কুমার বাবু যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর অহোম জাতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে; প্রিয়কুমার বাবু নিজেও 'ভারতবর্ষে' অহোমজাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমরা আশা করি তিনি এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে অহোম জাতি সম্বন্ধে আরও অধিক কথা এবং সতী জয়মতীর সম্বন্ধেও আরও অনেক তথ্য প্রকাশিত করিয়া পুস্তকখানিকে অধিকতর মূল্যবান করিবেন।

বেণীরায়

শ্রীসত্যরঞ্জন রায় এম, এ প্রণীত, মূল্য পাঁচসিকা।

এখানি উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক বেণীরায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি; তিনি রাজা দেবীদাসের সমসাময়িক; গৌড়-বাদশাহ দাউদখাঁর সময় তাঁহার বিশেষ প্রতাপ ছিল। বেণীরায় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, সে সমস্তই কিংবদন্তী। সেই সকল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই লেখক এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দুই চারিটী ঐতিহাসিক কথাও আছে। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি; বেণীরায় ও যুগলের চরিত্রাঙ্কন বেশ হইয়াছে, জয়ার দেবী চরিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখক ধন্য হইয়াছেন। লেখকের ভাষানৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

জড়ভরত

রায় সাহেব শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি নাটক। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে এই জড়ভরতের উপাখ্যান আছে; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গদ্যে জড়ভরতের উপাখ্যান লিখিয়াছেন; রায় সাহেব রক্ষিত মহাশয় নাটকাকারে এই উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক রক্ষিত মহাশয়ের এই নাটক-খানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল; যাঁহারা সে অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমরাও নাটকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ধর্ম্মমূলক নাটকাদি যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

ভারতী—আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৩

১২৮৪ বঙ্গাব্দে, 'ভারতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার একস্থানে লিখিত হইয়াছিল—"সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই।...এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক-একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয়, সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন।"—এই কথাগুলি লিখিবার সময় ভারতীর প্রতিষ্ঠাতাগণ বোধ করি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, তাঁহাদের হাতে-গড়া বড় সাধের 'ভারতী' একদিন তাঁহাদেরই সকল উদ্দেশ্য—সকল উক্তি পদদলিত করিয়া ঠিক তাহার উল্টা পথে ছুটিবে। ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহারা তখনকার পাঠকজাতির মুখে যে কলঙ্ক-কালিমা দাগিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজ 'ভারতীর' নিজ-মুখই অঙ্কিত করিতেছে! তাঁহাদেরই ভাষা একটু বদ্‌লাইয়া আজ অনায়াসে বলিতে পারি, 'এখনকার 'ভারতীর' স্বভাব এই যে, সে রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পায় না, অথবা কেহ যদি তাঁহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয়, সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও 'ভারতী' সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে।'

কেবল ঐ টুকু নহে। ঐ কলঙ্কের উপর আরও কলঙ্ক আছে।—'ভারতী' তাহার বীণা হারাইয়া এখন ঝাঁটা হাতে করিয়া বেড়াইতেছে। গালি-গালাজে তাহার নিকট মনে হয় মেছোহাটাকেও মাথা হেঁট করিতে হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র হইতে যতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখকের প্রতিই সে যে রকম অকথ্য ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহার তুলনা হয় না!

এক-আধবার নহে—এই কয়মাস ধরিয়া 'ভারতী' অবিশ্রান্তভাবেই গালাগালির বৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। উত্তরোত্তর উহার মাত্রা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। লেখা জিনিষটার উপর পাঠকদের যদি অকৃত্রিম অনুরাগ ও সর্ব্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে ভারতী অবশ্য অতটা বাড়াবাড়ি করিতে কিছুতেই সাহস করিত না। কিন্তু তাহার এই ধারাবাহিক অত্যাচার এদেশের পাঠকজাতির অচল ও অসাড় প্রকৃতিরই পরিচয় দিতেছে। সেই অচল ও অসাড় প্রকৃতি যদি একটুও সচল ও সাড়যুক্ত হয়, সেই আশায় ভারতীর আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়া তাহা লোক-লোচনের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি;—নহিলে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়া ইহার মান বাড়াইতে নাই।

অতি পাণ্ডিত্যের উপদ্রব—

এটি ভারতীর প্রথম প্রবন্ধ। ইহার আগাগোড়া গলদে ও গালি-গালাজে পরিপূর্ণ। গোড়াতেই লেখক বলিতেছেন,—"ময়রার দোকানে যে রস তৈরী হয় তার একটি মাপকাঠ আছে, তার নাম তাড়। কি রকম রসে খাজা-গজা পাক করতে হয়, আর কি রকম রসেই বা রসগোল্লা জীইয়ে রাখতে হয়, তাড় তা সমস্ত জানে।"—কথা কয়টি লেখকের কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু একটুও সত্য নহে। 'কি রকম রসে খাজা-গজা পাক করিতে হয়, আর কি রকম রসেই বা রসগোল্লা জীইয়ে' রাখিতে হয়, তাড় তাহার কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি রস পাক করে, তাহারই উহা জানিবার কথা,—তাড়ের নহে। তাড় রস নাড়িবার হাতা-বিশেষ। ময়রারা উহা দ্বারা রস নাড়াচাড়া করিয়া থাকে মাত্র।

যাহারা নিজেদের মত সমর্থনের জন্য মনীষিদের মত উদ্ধৃত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লেখক বিদ্রূপের সুরে বলিতেছেন,—"পরের মতামত রসনাগ্রে লোফালুফি করে' আসর সরগরম করা আর পরচুলো মাথায় পরে মাথা গরম করা সমান কথা।"—কিন্তু মজা এইটুকু যে, লেখক ঐ কথা বলিয়া ঠিক উহার তিন লাইন পরেই নিজের উক্তি সমর্থনের জন্য Schopenhawer হইতে নয় লাইন ইংরাজী লেখা উদ্ধৃত করিয়া ভারতীর 'আসর সরগরম' করিয়াছেন! কথা ও কার্য্যে এমন চমৎকার সামঞ্জস্য সচরাচর দেখা যায় না!

কাব্যে যাহারা নীতি জিনিষটার অনুসন্ধান করে, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া লেখক বলিতেছেন,—"এঁরা আবার কান্তাস্থানীয়া কাব্যসুন্দরীকে গুরুমহাশয়ের মতন কাণমলা দিতে অনুরোধ করে কাব্য কুঞ্জবন পাঠশালার হট্টগোলে সরগরম করে তোলেন।"—অবশ্য 'কাণমলার' কথাটা লেখক বোধ করি এখানে রসিকতা করিবার লোভেই লিখিয়াছেন;—নহিলে এমন পাগল কে আছে, যে অমন কথা মুখে আনিতে পারে! তবে কাব্যের গুরুগিরি করিবার কথা শুনিয়া লেখক হাসি-ঠাট্টাটুকু না করিলেই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন। কারণ, আমাদের দেশেরই অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে

যে, কাব্য-রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—"কান্তাসম্মিত তয়োপদেশযুজে অর্থাৎ কান্তার স্থায় মধুরভাবে উপদেশ দান করা। তারপর, 'সাহিত্য-দর্পণে'ও আছে—"চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিঃ কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদি কৃত্যাকৃত্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উপদেশ, দ্বারৈণ সুপ্রতীতৈব।" আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন;—"অধিকাংশ কাব্যে চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।...কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা।" তারপর গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন,—"কেবল আনন্দ দানে কলাবিদ্যা-বিশারদের তৃপ্তি নহে। তাঁহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতিসাধন করিতে পারে।" পাশ্চাত্য কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থও বলিয়াছেন,—"I wish to be considered a teacher or as nothing."—এইরূপ কথা ডিকুইন্সি প্রভৃতি আরও অনেক কবির কলম হইতেই বাহির হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সব উক্তি আর উদ্ধৃত করিলাম না। কেবল কাগজে-কলমে বলা নহে, নিজেদের সুন্দর সৃষ্টি দ্বারাও তাঁহারা বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, 'কবিরাই জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা।' অতএব, কাব্যের গুরুগিরি করিবার কথা শুনিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিলে যে শুধু মুরুব্বিয়ানা করা হয়, তাহা নহে—বিষম ভুল করাও হয়।

লেখক বলিতেছেন—"এঁরা রসগঙ্গাধর রবীন্দ্রনাথের রস-রচনার ভিতর থেকেও "বিকলা রস লক্ষণা রসাঃ" অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরসের নমুনা আবিষ্কার করবার স্পর্দ্ধা রাখেন, কিন্তু রসাভাস শব্দের পারিভাষিক অর্থ জানেন বলে বোধ হয় না।"—রসাভাসের পারিভাষিক অর্থ কাহারও জানা আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু রসাভাসের লক্ষণ যে এই লেখকের জানা নাই, তাহা তাঁহার ঐ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াই বুঝিয়াছি। অলঙ্কার-শাস্ত্র বলে, কাব্য মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন তির্য্যক-জাতিগত প্রেমের অভিব্যক্তি দেখাইলে, সেইখানে রসাভাস অর্থাৎ অপ্রযুক্ত রসের অবতারণা করা হয়। কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগী মকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

এই যে ভ্রমরের সস্ত্রীক মধুপান আর স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী কুরঙ্গীকে শৃঙ্গদ্বারা কণ্ডুয়ন করিতে কৃষ্ণসারের যে ভাবাবেশ ফুটিয়াছে, আলঙ্কারিক উহাকেই রসাভাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ লেখক রবি-ভক্তিতে এতই মশগুল যে তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না।

লেখক এ প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"রাগরাগিণী যেমন কোন নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি, খাঁটি সুরের খেলায় যেমন সমাজ বা ধর্ম্মের ধুলো বা ধোঁয়া কিছুই নেই, তা হলেও তাতে চিত্তে রসের আবেশ হয়, খাঁটি সাহিত্যও তেমনি।"—রাগ-রাগিণীর কথা জানি না, কিন্তু সমাজ যে সাহিত্যের আধার,—সমাজ-ক্ষেত্রেই যে সাহিত্যের চাষ হইয়া থাকে, এ কথা বহুকাল হইতেই লোকে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধবৎ মানিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'বঙ্গ-দর্শনে' বহুবার বহুরকমে বুঝাইয়া গিয়াছেন—সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। সেদিনও ফরাসী সাহিত্য-সেবী মসিয়ে ফাজী (M. Faguet) বাল্জাকের সমালোচনা শেষ করিয়া সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও ঐ মত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সেই সন্দর্ভের এক স্থানে আছে,—"সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করা যায় না। যে কালের যে সাহিত্য, সেই কালের সমাজধর্ম্ম ও সাধনধর্ম্ম সেই সাহিত্যে জড়ান মাখান থাকিবেই। সাহিত্য জাতি-বিশেষের এক একটা যুগের ইতিহাস, ধর্ম্মমতের আলেখ্যস্বরূপ। যিনি যে জাতির যে যুগের সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহাকে সেই জাতির সেই যুগের ধর্ম্মমতের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতেই হইবে।"—এই সব মনীষীর মতামতকেও লেখক যদি সামান্য বোধ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার—যাঁহার বাক্যকে ভারতীর দল বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন—সেই রবীন্দ্রনাথের অভিমত হইতেও দেখাইতে পারি যে, যে সাহিত্য সমাজ সম্পর্কচ্যুত, সে সাহিত্যে তাঁহার "চিত্তে রসের আবেশ হয়" নাই। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন,—"চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাষাটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গলাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে, তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে।"

লেখক বলিতেছেন,—"হঠাৎ-ক্রিটিকদের আরেকটি অদ্ভুত বিশ্বাস হচ্চে এই যে, সাহিত্য নাকি যুগ ও জাতিধর্ম্মের অনুগমন করে' থাকে।" কিন্তু এ "অদ্ভুত বিশ্বাস' শুধু হঠাৎ ক্রিটিকদের নহে—রবীন্দ্রনাথেরও একদিন ছিল। তিনি একবার 'সাধনার' পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—"সব সময়ই সাহিত্যে সেই সময়ের মূলতত্ত্ব এবং লেখকের নিজের মূলতত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পাবেই। মানুষ বর্ণনা করতে গেলেই তাকে সমাজের অঙ্গীভূত রকমে বর্ণনা করতে হবে। সুতরাং কি ভিত্তির উপর সে সমাজ স্থাপিত এবং তখনকার কি আইডিয়াল, তা কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত হবে। লেখকও তার নিজের আইডিয়াল নিজের বিশ্বাস নিজের মূলতত্ত্ব তার মনে থানিকটা প্রকাশ না করে' থাকতে পারে

---

* সাহিত্য—২৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

না। এই জন্তই এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের দর্পণ "—এই কথাটা ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিমও তাঁহার বঙ্গদর্শনে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। 'মানস-বিকাশ' নামক পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, দেশভেদে, কালভেদে ও জাতিভেদে সাহিত্য রূপান্তরিত হইয়া যায়। কিন্তু এ জানা কথা এই লেখকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছে! হইবারই কথা! 'অতি পাণ্ডিত্যের উপদ্রব' সপ্রমাণ করিতে হইলে ঐ রকম বিট্‌কেল মত প্রচার না করিলে চলিবে কেন?

প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক বলিতেছেন,—"দ্রৌপদীর দেখাদেখি পাঁচের উপর ছয়ের কামনাই বা কে করেছে?"—এ কথার উত্তরে কিছু বলিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই। শুধু লেখকের রুচির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই উহা উদ্ধৃত করিয়া ভারতবর্ষের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিলাম। অন্তঃপুরে যে কাগজের গতিবিধি আছে, ছয়মাস পূর্ব্বেও যে কাগজ মহিলা-সম্পাদিত ছিল, সেই কাগজে এই বটতলার রসিকতা!—ইহা দেখিয়া দুঃখ ও লজ্জা হয় না?

সত্যং ব্রুয়াৎ—

রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালবাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেল্কী খেলাইতে থাকেন।"—কথাটা খুব সত্য। এই লেখাটি পড়িবার সময় উহার যাথার্থ্য আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছি।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক বলিতেছেন,—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।" —এ কথাটা পুরোনো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আমাদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে আমাদের মধ্যে অনেকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।"—লেখকের এই 'অনেকের' খবর আমরা বলিতে পারি না, তবে এটুকু জানি যে, রবীন্দ্রনাথের ঐ উপদেশ যখন ছাপার অক্ষরে বাহির হয়, তখন তাহা পড়িয়া এদেশের অনেকেরই মনে যুগপৎ হাস্যরসের ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল। বিস্ময়—রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত মত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া। আর হাসি—যে লেখায় রবীন্দ্রনাথ বাক্-সংযমের অত উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার সেই লেখার মধ্যেই আবার সমালোচকদের গোঁফ ছাগল বলিয়া গালাগালিও আছে!

লেখক বলিতেছেন,—"রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত বাক্যটির আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন-নি, সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে শিশু সাহিত্যের পক্ষে শাসনের চাইতে লালন-পালন বেশী কল্যাণকর।"—কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত অভিমতও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে অনেক পাওয়া যায়।—সে সম্বন্ধে ভারতীর লেখক নীরব কেন? শুধু রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়াই যদি তাঁহার এখনকার বাক্য শিরোধার্য্য করিতে হয়, তবে তাঁহার পূর্ব্বের মতগুলিই বা উপেক্ষণীয় কেন হইবে? তাঁহার পূর্ব্বেকার কথাগুলি যদি ভারতীর লেখকের নিকট ভুল বলিয়া মনে হয়, তবে সেটা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। নহিলে, তাঁহার এ খাঁজে কয়তা—এ যুক্তিহীন ওকালতী কে শুনিবে?

রামছুঁচায়ন—

ইহা একটি গালাগালিপূর্ণ ছড়া। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যাঁহারা দোষ দেখিতে পান, এই ছড়ায় তাঁহাদিগকে 'রামছুঁচা' বলা হইয়াছে। তারপর, 'মাসকাবারী'তেও তাঁহাদের 'বাদুড়' 'চামচিকে' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। এই রাগান্ধ লেখকদের বোধ হয় ধারণা যে, কাহাকেও কিছু বলিতে গেলে ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জন করিতে হয়! এ ছড়া সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না। যাঁহারা গালিকে ব্যঙ্গ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া বুঝাইব যে, গালি ভদ্রের পরিহার্য্য!

সমালোচনার কথা—

ভারতীতে প্রকাশ—ইহা একজন পাঠকের লিখিত পত্র। পাঠক উপদেশ দিয়াছেন,—"সবাই যে এক মতের হবে এমন কথা নয়। তাই বলে ভিন্নমতাবলম্বীকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিতে হবে?"—হাসির কথা এই যে, ঐ উপদেশটুকু দিয়াই পাঠক মহাশয় একদল সমালোচকের প্রতি "ভুঁইফোড় লেখক," "ধুরন্ধর সমালোচক" ও "সমালোচক অবতার" প্রভৃতি ভদ্রোচিত ভাষা (?) ব্যবহার করিয়াছেন! শুধু ঐ কথা কয়টা বলিয়াই পাঠকের তৃপ্তি হয় নাই,—পত্র-শেষে তিনি সমালোচকদের সহিত কুকুরের তুলনাও করিয়াছেন! পাঠকের লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিজেদের গালিগুলাকে রসিকতা, আর বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে গালাগালি বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন! আশ্চর্য্য এই যে, এমন লেখাও ছাপার অক্ষরে বাহির হয়!

এই পত্রখানিতে আরও কেলেঙ্কারী আছে। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাহিরে" উপন্যাসে সীতাদেবীর সতীত্বের প্রতি যে বক্র কটাক্ষ আছে, তাহার পক্ষ লইয়াও এ পাঠক মহা রুখিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, —"রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের একজন নায়ক (সন্দীপ) সীতাদেবীর উপর কটাক্ষ করে কথা বলেছে। তাতেই কোন ধুরন্ধর সমালোচক সিদ্ধান্ত করে বসেছেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সীতাদেবীকে গালমন্দ দিয়েছেন। বাহবা যুক্তি! এই যুক্তি নিয়ে বোধ হয় কেবল বাঙ্গলা দেশেই সমালোচনা চলতে পারে।"—বটেই ত! কিন্তু একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রনাথ যেমন সন্দীপের মুখ দিয়া সীতাকে গালি দিয়াছেন, তেমনই যদি আর কোনও কবি এক মাতালের চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার মুখ দিয়া তোমাদেরই ঘরের কোন বিশিষ্ট মহিলাকে গালি দেন, তাহা হইলে ভাল লাগিবে কি? সন্দীপের মুখের কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যদি উদ্ধার পান, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকা লিখিয়া নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন কেন? বিশারদ 'ফুল' নামক কবিতা ছাপিয়া ব্রাহ্মদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সে সময়ে এই লেখকদের এত উদারতা —এত ওকালতী কোথায় ছিল? কিন্তু বুঝাইব কাহাকে? যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদের ঘুম কে ভাঙ্গাইবে?

খেজুরওয়ালা

[শ্রীইন্দিরা দেবী]

"খেজুর চাই—খেজুর! ভাল, ভাল কাব্‌লী খেজুর!"

মোড়ের মাথায় খেজুরওয়ালার আবির্ভাবে ছেলেমহলে খুব একটা ছুটাছুটি, সোরগোল পড়িয়া গেল। আমার ছোট ছেলে নানুও টলিতে-টলিতে আসিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া, ছোট হাতখানি গরাদের বাহিরে রাখিয়া, আধ-আধ ভাষায় কহিল "খেজুল, বায়ো খেজুল!"

বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে ঢালা-বিছানায় তাকিয়া মাথায় দিয়া রবিবারের অলস মধ্যাহ্নটিকে নিশ্চিন্ত উপভোগের জন্য সংবাদপত্র লইয়া পড়িয়াছিলাম। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া খানিকটা রোদ আমার চোখে মুখে আসিয়া পড়ায়, জানালা বন্ধ করিবার জন্য সবেমাত্র উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় নানুর কলকণ্ঠের সাড়া পাইয়া জার্ম্মাণদের সবমারিণের বিভীষিকা ভুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম।

জানালার বাহিরে রকের উপর খেজুরের ঝুড়ী নামাইয়া, বুড়া খেজুরওয়ালা তাঁহার বালক-ক্রেতাদের লইয়া মহা-বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ঝুড়ীতে রাশিকৃত খেজুর; তাহার অধিকাংশই তাল বাঁধিয়া পিণ্ডাকৃতি হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা মহা-উৎসাহে পয়সা দিয়া তাহাই কিনিয়া খাইতেছে। যে হতভাগ্য বালক অর্থাভাবে কিনিতে পারে নাই, সেও সঙ্গীদের তৃপ্তিপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আস্বাদনের আনন্দ কল্পনাতেই উপভোগ করিয়া লইতেছে। ক্রেতাদের সহিত দরদস্তুরের গোলযোগ নাই। কোন বিশেষ দিনের সভা-সমিতিতে এ সম্বন্ধে কোন আইন-কানুন স্থির হইয়া-ছিল কি না, জানি না;—উপস্থিত বিক্রেতা পিণ্ডাকৃতি তাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের হাতে এক-এক টুকরা যাহা দিতেছিল, ক্রেতা অনেক চেষ্টায় সংগৃহীত তাম্রখণ্ডটি ঘোর তাচ্ছিল্য-ভরে ফেলিয়া দিয়া তাহাই পরমানন্দে গ্রহণ করিতেছিল। কোন পক্ষে কোন তর্কাতর্কি শোনা গেল না। ক্রেতাদের খুসী করিয়া, প্রাপ্ত পয়সা কয়টি মলিন বস্ত্রখণ্ডের অভ্যন্তর-বাসী তদপেক্ষা মলিন একটি সূতার গেঁজেয় ভরিয়া, তাহা পুনরায় কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া এইবার সে নানুর পানে ফিরিয়া চাহিল। নানুও এতক্ষণ চুপ করিয়া দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আমূল মুখে ভরিয়া নির্নিমেষনেত্রে ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছিল, এইবার খেজুরওয়ালাকে নিজের প্রতি মনোযোগী দেখিয়া কহিল "খেজুল—বায়ো খেজুল!"

"এই যে বাবা, তোমার খেজুর" বলিয়া বুড়া তালবাঁধা খেজুরের ভিতর হইতে গুটি-চার ভাল খেজুর বাছিয়া লইয়া নানুর প্রসারিত ছোট হাতখানি নিজের হাতের মুঠির ভিতর চাপিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া তাহার হাতে খেজুর-গুলি দিতে গিয়া, সহসা আমায় দেখিয়া যেন একটুখানি সঙ্কুচিতভাবে অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া, কহিল "বাবুজী, সেলাম।" তাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া কহিলাম, "দাঁড়াও, খোকার খেজুরের দাম নিয়ে যাও।" সে তাহার স্খলিত চর্ম্মের কুঞ্চন-রেখা-পূর্ণ মুখে আনন্দের হাসি হাসিয়া কহিল, "খোখাবাবু হামার বন্ধু আছে। কি বোলেন খোখা বাবু, বন্ধু আছেন?" খোকাবাবু আমাকে বন্ধুত্বের মধ্যস্থ দেখিয়া প্রাপ্ত খেজুর কয়টির নিরাপদাকাঙ্ক্ষায় তখন সেগুলি এক-সঙ্গে কেমন করিয়া মুখের ভিতর ঠাসিয়া দেওয়া যায়, তাহারই কৌশল প্রদর্শন করিতেছিলেন। বাক্য নিঃসারণে অসমর্থতা-বশতঃ ঘাড় কাত করিয়া কোনমতে বন্ধুবাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিলে, বুড়া একমুখ হাসিয়া কহিল, "দেখুন বাবু, খোখা বাবু কি বোলচেন্।" তারপর নানুর পানে ফিরিয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিল, "জীতা রহ্ বেটা"!

অলস-মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য হাতে কোন কাজ ছিল না; সংবাদপত্রটাও প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি; খেজুর-ওয়ালার সহিত একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। তাহার নাম ভাগবৎ। বয়সের কথা সে হিসাব করিয়া বলিতে পারে না; তাহার আন্দাজ, পাঁচকুড়ি-গণ্ডা হইবে।

আমরা যখন মথুরাবাবুর সিটি-ইনষ্টিটিউসন স্কুলে পঞ্চম

মানের ছাত্র, মনে পড়ে, তখনও ঐ বুড়া খেজুরওয়ালা অমনি সিংহনাদে "চাই খেজুর" হাঁকিয়া যাইত। স্কুলের ছুটির পর বা টিফিনের সময় জলখাবারের পয়সা দিয়া আমরাও ঐ অমৃত ফলের আস্বাদ পরম আরামে উপভোগ করিয়াছি। এখন আমার ছেলে উহার ক্রেতা। কালের সহিত তাহার দেহের পরিবর্ত্তন ঘটলেও, কণ্ঠস্বরের তেজ সমান আছে।

আমি কহিলাম "অত হবে না; তোমার বয়েস ষোল-সতের-গণ্ডা হবে বোধ করি।" সে কহিল, "বাবু-সাহেব, আমার ছেলে খুন্নু যদি বেঁচে থাক্‌ত, তার বয়সই উনিশ-বিশ গণ্ডা হোত।" সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলেও, কহিলাম, "দেশে তোমার কেউ নেই না কি? দেশে যাও না?" সে কহিল, "আছে বই কি, আমার নাতি বলদেও আছে; তারও সব কাচ্ছা-বাচ্ছা হয়েচে। বুড়া হয়েচি বাবুজী, আর শরীরে শক্তি নেই। দেশে বড় আর যাই না; খুন্নু আমার চলে গেলে আর ঘরে যাইনি।" বুড়া অক্ষি-গহ্বরের দুই বিন্দু অশ্রু হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল কহিল "বলদেওএর কথা বল-ছিলুম; বলদেও—খাসা ছেলে সে। আহা বেঁচে থাক্; বাবুজী, এই যে কলকাতা সহরে এত ন্যাসপাতি বিক্রী হয়, এ চালান আসে কোথা থেকে জানো? এর তিন ভাগ জিনিষ পাঠায় আমার বলদেও। বাবুজী, হাজার লোক তার তাঁবেদারীতে খেটে খায়; মস্ত মান তার,—সে ত টাকার গদি করে ফেলেচে।" বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত কহিলাম, "তবে তুমি এই বুড়মানুষ খেজুর বেচে খাও কেন? তারা খেতে দেয় না?" সে তাড়াতাড়ি বাধা দিল, "না, না; আমি তাদের খাই না। বাবুজী, আশীর্ব্বাদ কর—নিজের রুটি যেন নিজের রোজগারে খেতে-খেতেই যেতে পারি।" বুড়ার স্বাবলম্বন-স্পৃহায়, অসীম শক্তিমত্তায় আমার মনটা খুসী না হইয়া রাগ ধরিল; কহিলাম "সে ত ভাল কথা। তা' বলে' সে তার কাজ করবে না,—বল কি? এই বুড়া ঠাকুদ্দাকে রোদে জলে হিমে নিজের পেটের ধান্ধায় ফিরে-ফিরে বেড়াতে দিয়ে, এতে তার পাপ হচ্চে না?" ভাগবত ব্যস্তভাবে বাধা দিল, "না, না; অমন কথা বলবেন না। তার কোন অপরাধ নেই। তার দানা আমার ছোঁবার যো নেই, বাবুজী! আমার নসীব।" সে তাহার খেজুরের ঝুড়ীতে মলিন গামছাখানা চাপা দিয়া ঝুড়ী উঠাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাহাকে, কিছু খেজুর কিনিব বলায়, বুড়া ভিতরে আসিয়া উঠানে ঝুড়ী নামাইল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে যেন ধুঁকিতেছিল। আমি তাহাকে ঘরের ভিতর আসিতে বলিলে, সে চৌকাটের উপর বসিল; কহিল "কত খেজুর নেবেন?". আমি তাহাকে একসের ফরমাইস করিলে, সে ওজন করিয়া খেজুরের পিণ্ডটা কাগজে মুড়িয়া আমার কাছে রাখিয়া দিল। আমি কহিলাম, "ভাগবত, এ রোদ্দুরে আর না ঘুরে একটু বসে তোমার দেশের গল্প কর। তোমার নিজের কথা সব বল। কেন তুমি নাতীর রোজগার খাও না, বল্‌তে কোন বাধা না থাকে ত সেই সব গল্প কর।" সে কিছুক্ষণ তাহার ঘোলা-পড়া স্তিমিত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থির করিয়া বোধ করি আমার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিল। আমি যে তাহাকে পরিহাস করিতেছি না, আমার মুখে বোধ করি তাহার কিছু প্রমাণ সে দেখিতে পাইয়াছিল; তাই আশ্বস্তভাবে কহিল, "গরীবের কথা—এর আর কি শুনবে! বাবুজী বুঝি কেতাব-টেতাব লেখেন?" আমি হাসিয়া কহিলাম, "লিখি না; এইবার লিখ্‌ব মনে কচ্চি।" তাহার কুঞ্চিত-চর্ম্ম, রৌদ্র-ঝলসিত মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া মিলাইয়া গেল; কহিল, "ওঃ।"

ভাগবত উঠানে খেজুরের ঝুড়ী রাখিয়া, চৌকাটের উপর চাপিয়া বসিয়া, গল্প বলিতে সুরু করিল।

ভাগবত কহিল "বাবুজী, আমার আজ সারাদিনে দু'গণ্ডা পয়সাও হয় নি; কিন্তু এমন মিষ্টি কথাও অনেকদিন শুনিনি। আমার কথা কেউ ত কখনও শুন্‌তে চায়নি, তাই আমিও ভুলে গেছি। সে কি আজকের কথা! একটা প্রকাণ্ড যুগ কেটে গেছে—দেখি যদি কিছু মনে পড়ে।" ভাগবত তাহার ভাঙ্গা হিন্দী-বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় যাহা বলিয়াছিল, তাহার সংশোধিত মর্ম্মটুকু আমি আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"গোরক্ষপুর জেলার বসারৎপুরে আমার জন্মস্থান। আমি জ্ঞান হইবার আগেই মাকে হারিয়েছিলুম। সংসারে বাবার আমি, ও আমার বাবা—আমরা দুজনে পরস্পরের অবলম্বন ছিলুম। শুনেছি, মায়ের মৃত্যুর পর অনেকেই বাবাকে "সাঙ্গা" করিতে অথবা বিবাহ করিতে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু কোন মতেই সে কাজে রাজী

হয় নি; আর একই কথা, "ছেলে পর হয়ে যাবে।" বাবা শুধু আমাকেই ভালবাসত না, তার রোজগারের পয়সাগুলিকেও আমার মত ভালবাসত। নীল-কাঁটা আর বৈঁকারীর বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড জমীর মাঝখানে আমাদের ছোট বাড়ী-খানি; তার সুন্দর মাটির দেওয়াল; উপরে সর-কাটি আর আর কুশের ছাউনি দেওয়া চাল। জমীটা সবুজপাতা ন্যাসপাতি গাছে ভরা। যখন ফুল ফুটত, শুধু সাদা ফুলে চারিদিক আলো করে দিত; একখানা পাতা পর্য্যন্ত দেখা যেত না। সে যেন একটা পরীর দেশ বলে মনে হোত। বাবা খুব গর্ব্ব করে তার জমীর দিকে চেয়ে থাকত। সে জমীতে ছিল—নিছক ন্যাসপাতি গাছ। বর্ষায় সাদা ফুলে—শীতে কতক কাঁচা কতক ডাঁসা কতক কাঁচাসোণার রংয়ের পাকা ফলে শুধু মানুষের চোক নয়—মনকেও মাতিয়ে রাখত। কি চমৎকার ছিল তার 'তার'। ন্যাসপাতির জন্য গোরক্ষপুর জেলা বিখ্যাত। হাজার-হাজার ফলে গাছগুলো যেন ভেঙ্গে পড়ত; কিন্তু এমন 'সুতার', এমন সুডৌল ফল যেমন আমাদের বাগানে ফলত—এমনটি আর সহর খুঁজে কোথাও মিলত না। আমাদের বাগানের মালী ছিলুম আমরা নিজেরা। এক-একটি করে কাঁকর বাছতুম; ইঁদারা থেকে জল তুলে-তুলে গাছের গোড়ায় জল ঢালতুম; সারাদিন কাক, পক্ষী, বানর তাড়িয়ে ফল রক্ষা কর্ত্তুম; নিজেরাই ফল পেড়ে আনতুম। বিক্রীর জন্য আমাদের বাজারে যেতে হোত না। খুঁচরা বিক্রী, ধারে বিক্রী ছিল না। খদ্দের ঘরে এসে নগদ দাম দিয়ে জিনিষ নিয়ে যেতো। তখন রেলগাড়ী ছিল না। উটের গাড়ী, গরুর গাড়ীতে বিদেশের জিনিষ লেন-দেন হোত। তাই সহরের লোক অত মান্য করে এই সব ফল কিনত। এখনও গোরক্ষপুরে "ঢেবুয়া" পয়সার চলন আছে। পাইকার আমাদের কাছে যে জিনিষটা ঢেবুয়ায় "জোড়া" কিনত, তাই আবার সহরে এসে ।৵০ জোড়া বিক্রী হোত। তবু পথের কষ্টে লাভ থাকত কতটুকু! আমরা কোথাও যেতুম না, কারু সঙ্গে মিশতুম না, নিজেদের ঘরে রাজার মতন ক্ষেতের কাজ করতুম। পয়সা যেমন বাড়ছিল, আমাদের জমীও তেমনি বাড়ছিল। সে সব নূতন জমীতে আমরা রবিশস্য আবাদ করতুম। মজুরে বলতে একটি পয়সাও আমরা নষ্ট করতুম না, সে কাজ আমরা নিজেরাই চালিয়ে নিতুম। বুঝতেই পাচ্ছেন, দেড়শো বছরের ঝড়েও যে পুরোন গাছের শেকড় তুলতে পারেনি—কম বয়সে সে গাছের তেজ ছিল কত! বাবা আমার চওড়া বুক, আর ন্যাসপাতি গাছের ঝোপের মত কোঁকড়া গোঁফ-দাড়ীভরা গোলগাল মুখের দিকে চেয়ে, অহঙ্কার করে বলত, "আমার বাগানের মত গাছ, আর আমার ছেলের মত ছেলে—এ সহরের মধ্যে এমন তেজী আর এমন বাড়ন্ত আর কারও ফল নাই।" ফল-পাড়া, বাঁদর-তাড়ান, ফল চালান দেওয়ার কাজ যখন ফুরিয়ে যেত, আমি তখন বাবাকে ছুটি দিয়ে সারাদিন খেতে মাটি কুপতুম, জল ঢালতুম, আগাছা তুলতুম, লাঙ্গল মেরামত কর্ত্তুম, আবার সময় পেলে দেওয়ালে নূতন করে মাটি লেপতুম, চালের খড় সরে গেলে নূতন করে চাল ছাইতুম। এ সব কাজে আমার সাহায্য করবার জন্যে একজন ইচ্ছে করেই আসত। সে ভুজাউলির নাতনী—নান্‌কী। আমাদের বাড়ীর খুব কাছে ভুজাউলী নান্‌কীর দিদিমার দোকান। নান্‌কী ঘর-সংসারের কাজ সারা হলেই আমাদের বাড়ী আসত। আমি রান্না করতুম—সে জল তুলে, চাল বেছে, ভিজা কাঠ শুকনা পাতা কুড়িয়ে এনে, চুলা জেলে, সব জোগাড় করে দিত। আমিই জেদ করে উনন নিভিয়ে ফেলতুম—সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করত। আবার ধোঁয়ায় ফুঁ পেড়ে-পেড়ে, চোখের জলে ভেসে চুলা জেলে দিত। বাবাকে লোকে কৃপণ বলত; কারণ বাবা টাকা-পয়সাগুলিকে ভারী ভাল-বাসত। ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে, কখন গাছের তলায়, কখনও চালের বাতায়, কখনও বা বালিসের ভিতর টাকা লুকিয়ে রাখত। দুপুরবেলা আমি যখন ক্ষেতে থাকতুম, বাবা তখন ঘরের মেঝেয় তার চেটাইখানি বিছিয়ে, টাকার রাশ সামনে রেখে গণে-গণে থাক দিত; চুপ করে বসে-বসে দেখত! আমি জানি সে সময়ও বাবা আমার কথাই ভাবত। বাবা জানত, এ টাকা তার ছেলের হাতে পড়লে সেও অপব্যয় করবে না। টাকাগুলিকে সে নিজের ইষ্টি কবচের মত যত্ন করত—কি করে আরো বেশী টাকা হবে রাতদিন কেবল সেই ভাবনাই ভাবত। টাকাগুলো গর্ত্ত খুঁড়ে, ঘরের বাহিরে সাধারণের ব্যবহারের পথে কত সময় পুঁতে রাখত; জানত, লোকে এমন সব জায়গায় সন্দেহ করবে না। তবু সে সময় তার দিনগুলো কত-ভয়ে-ভয়েই

কাটত। এক জায়গায় সে পাঁচদিন রাখত না। বাবা যখন টাকার থাক সাজিয়ে তার ছেলের ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখত, তখন কত অল্পেই সে ভয় পেত। একটা গাছের পাতা নড়লে, একটা কাঠবিড়ালী ছুটে গেলে, বাবা তার টাকার উপর বুক দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকত। ধারাল কাটারি, আর তার নিজের হাতের খোদাইকরা কাঠের বাঁটওলা বড় ছুরীখানা তবু তার হাতের কাছেই ঠিক করা থাক্‌ত। কত সময় ঘুম ভেঙ্গে দেখেচি, সে চুপ করে বসে আছে;—রাতে চোরের ভয়ে সে ঘুমুতে পারত না- খাওয়ায় রুচি ছিল না। অনেক সময় আমার প'রেও বাবার সন্দেহ হোত। পাছে তার ধনরত্ন আমি দেখে ফেলি—তাই চোখ যেন তার আমার কাজের উপর ভয়ে ভয়ে চৌকী দিত। বাবাকে নির্ভয় রাখ্‌বার জন্যেই আরো আমি বাইরে-বাইরে কাজ নিয়ে থাক্‌তে ভালবাসতুম। সন্ধেবেলা রামনাদের ধারে পাথরের উপর বসে আঁধারে সুমুদ্দর কেমন করে নীচু জমীটাকে গিলে ফেল্‌ত, তাই দেখতুম। কখনও নান্‌কী এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত; কখনও বাবা নিজেই আস্‌ত। আমার মাথায়, পিটে হাত বুলিয়ে, আদর করে বল্‌ত "ঘরে চল্‌—তুই না থাক্‌লে বাইরের চেয়েও ঘরের অন্ধকার বেশী লাগে।"

বাবা কিন্তু যখন কাজে লাগ্‌ত, তখন তার মুখে কোন ভয়-ভাবনার এতটুকু দাগটি পর্য্যন্ত দেখা যেত না। তার কাছে পরামর্শ নিতে কত ভিন্ গাঁয়ের লোক আসত। তার মতন চাষা কেউ ছিল না।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি বাবার জন্যে তামাক সেজে কল্‌কেয় ফুঁ দিচ্চি—বাবা চেটাই পেড়ে উঠানে শুয়ে আছে। সে দিন ভারী গুমট—এতটুকু হাওয়া নাই। আমায় ডেকে বল্লে, 'ভাগবত, আমার কাছে আয়। তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।' আমি হুঁকাটা তার হাতে দিয়ে, কাছে গিয়ে বসলুম। বাবা বল্লে 'এইবার তোর বিয়ে দিতে হবে; বড় হয়েচিস, আর বৌ না হলে ঘর মানাচ্চে না।' বাইরে আলো ছিল না, তাই বাবা আমার মুখ দেখতে পেলে না। বিয়ের কথা শুন্‌লে সকল আইবুড় ছেলেরই আহ্লাদ হয়—আমারও হয়েছিল। একটি কথাও না বলে আমি চুপ করে বসে রইলুম। বাবা বল্লে 'সহরের মেয়ে আমি নেব না; তারা ভারী আয়েসী, বাবু, কুঁড়ে। তাদের খরচ জোগাতে তোমার যা ধনগুঁড় থাক্‌বে, তা কর্পূরের মত উপে যাবে। হরিদ্বারের উদিকে আমার একটি জানা লোকের মেয়ে আছে —বেশ কাজে কর্ম্মে ভাল মেয়ে। তাদের সঙ্গেই কথা পাকা করি—কি বলিস্?' বাবার কথা শুনে আমার বিয়ের আমোদ ঘুরে গেছল। আমি বল্লুম, 'আমাদের ক্ষেত-খামার, গাছপালা, আর তোমায় নিয়েই বেশ আছি—বিয়ে করব না।' বাবা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বল্লে 'বোকা ছেলে, বাপের সঙ্গে লুকোচুরী? তোর মন কি আমি জানি না। যদি নান্‌কীর সঙ্গে বিয়ে দিই, তা হলে করবি ত?' ভাগবত যুক্ত কর একবার ললাটে স্পর্শ করাইল। বোধ হয় তাহার অন্তর্যামী মৃত পিতার উদ্দেশে এই প্রণাম। তার পর গল্পের খেই পুনরায় তুলিয়া লইল।

বাবার কথায় লজ্জা পেলেও অস্বীকার করতে পারলাম না। নান্‌কীকে বিয়ে করবার কথা কখনও ভেবে না দেখ্‌লেও, তাকে যে আমি কত ভালবাস্‌তুম, তা বাবা গোরক্ষনাথই জানেন। বাবার নীচে যদি আমার ভালবাস্‌বার কিছু থাকে ত সে নান্‌কী। সেও আমায় ভালবাস্‌ত; কিন্তু সে ছেলেমানুষ—তার বেরালবাচ্ছা, কাঠবিরালী, মাটীর পুতুলের চেয়ে বোধ করি আমায় বেশী ভালবাস্‌ত না। তবু সময় পেলেই সে আগে আমার কাছে ছুটে আস্‌ত; আমার আদর, তাড়না নির্ব্বিচারে ভাগ করে নিত। বাবা তাকে তেমন পছন্দ কর্ত্ত না। তার দোষ—সে ভারী সাজ-গোজ ভালবাসত। বাপ-মা-মরা নাত্‌নীকে তার ঠাকুমা ভাল-ভাল চুনুরী সাড়ী; গালার চুড়ী, মাটীর কানপাশা কিনে দিত। পেটের ভাত না থাক—মাথায় তেল, চুলের বাহার, কপালে টিকুলী; সুবিধে পেলেই ছুট বুনো-গোলাপ বা কল্‌কেফুল তুলে মাথায় গুঁজ্‌ত। বাবা বল্‌ত, 'নান্‌কীকে গোরক্ষনাথ যদি কখনও পয়সা দেন—ও কাপড়ে-গহনায় দুইদিনে ওর স্বামীকে দেউলিয়া করে ছাড়্‌বে।' এখন বুঝ্‌তে পাল্লুম কারজন্যে বাবা সাবধান হতো।

অনেক চেষ্টায় নান্‌কীকে বৌ করতে বাবা রাজী হোল— —কিন্তু একটা কড়ারে। বাবার পয়সায় আমার কোন দাবী থাক্‌বে না। নান্‌কীর ঠাকুমা যে দোকান-পাট উঠিয়ে দু'দিন পরে নাত্‌নীর কাঁধে চড়ে বস্‌বে, আর দু'জনে মিলে বাবার চিরকালের পরিশ্রমের পয়সাগুলি অপব্যয় করে'

উড়িয়ে দেবে—তা হবে না। আমি খুশী হয়ে বল্লুম "নিজের রোজগারে নিজের রুটি আমি করে খাব।" নান্‌কীকে ঘরে এনে আমাদের দিন বেশ্‌ সুখেই কেটেছিল। কাজ-কর্ম্ম, সেবা-যত্নয় বাবাকে দু'দিনেই সে বশ্‌ করে ফেলেছিল। কোন কাজে সহরে যেতে হলে, বাবা তার জন্যে নিজেই চুমুরী সাড়ী, রূপার খাড়ু, রঙ্গিন টিকুলী কিনে আন্‌ত। বাবা কাকে বেশী ভালবাসে—এই নিয়ে আমাদের ভেতর নিত্যি ঝগড়া হোত। বাবা বল্‌ত "দুজনকে সমান"। আমি বল্‌তুম "তা হবে না। পরের বেটীকে আমার বাপের ভাগ সমান কেন দোব।" এম্‌নি করে পাঁচ বছর কেটে গেল। আমার ছেলে খুন্নু জন্মাবার দু'মাস পরে বাবা আমায় তার টাকাকড়ি দিয়ে একদিন বল্লে, "আমার আর সময় নেই, ডাক্‌ এসেচে। এ সব খুন্নুর, এতে তোর কোন দাওয়া নেই তা জানিস্‌?" আমি কিছু না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ বলে ফেল্লুম, "জানি। আমার ইষ্টিদেবতা গোরক্ষনাথও জানে—ও টাকা আমার গোরক্ত-ব্রহ্মরক্ত। তোমার নাতীর পয়সা আমি কখনও খাব না।" বাবা নিশ্বাস ফেলে দুঃখু করে বল্লে, "রাগ্‌ করে এত বড় দিলেসা নিলি?" লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট কল্লুম। রাগ ত করিনি—তবে এমন কথা কেন মুখ দিয়ে বেরুল!

বাবা চলে গেল! সে দিনের সে কথা আমি কিন্তু আর ভুল্‌তে পাল্লুম না। বাবার যা কিছু—সব খুন্নুর। আমার ত কিছুই নেই। নান্‌কীকে কোন কথা খুলে বল্লুম না। সে মেয়েমানুষ—বুঝ্‌বে না; শুধু কেঁদে-কেটে হাট বসাবে। যতদিন বাবা ছিল, কোন কথা ভাবিনি—এখন বাবা নেই; তাই নিজের ভাব্‌না ভাব্‌তে আমায় দেশ ছেড়ে যেতে হবে। নান্‌কীর ঠাকুমা আর দেশের পাঁচজনের উপর জোৎ-জমীর ভার দিয়ে কল্‌কাতায় এলুম। তখন রেলগাড়ী হয়নি—পথে যে কত কষ্ট, আর কত সময় লেগেছিল—সে আর কি বল্‌ব। তখনকার কল্‌কাতা এখনকার সঙ্গে আন্দাজ কর্ত্তেও পারবে না। তখন এখানে জায়গায় জায়গায় এমন জঙ্গল ছিল যে, রেতের বেলা বাঘ বেরুত; দিনের বেলা শেয়াল দেখা যেত। আমার দেশের লোক আরও দু'চার-জন সঙ্গে এসেছিল। আমরা কিছুদিন মজুরের কাজ করে—তার পর নদীর পাড় রাখবার জন্যে পাথর তোলার কাজ নিলুম। আমার গায়ে তখন অসুরের বল। দু'মোণ তিনমোণ পাথর অনায়াসে আমি তুলে আনতুম। তখন হাবড়ার পুল তৈরী হয়নি, পাথর ফেলে-ফেলে খিদিরপুরের আর হাবড়ার গঙ্গার ধার ভরাট করা হচ্ছিল। ট্যাকশাল ত সেদিন হোল। তখন ওখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল ছিল। দিনের বেলা চুরি-ডাকাতী বড় কম হোত না। বড়-বাজারে কালীমন্দিরে তখন নরবলি দেওয়া হোত বলে শুনতে পেতুম। গোরাদের জন্যে যখন কেল্লা তৈরী হোল, আমি তখন সেখানে জোগাড়ের কাজ কত্তুম। তার পর কত হোল, গেলও কত। বাবুজী, বেশী দিন বেঁচে থাকলে বেশী দেখ্‌তেও হয়—অনেক সইতেও হয়। নান্‌কী গেল, খুন্নু গেল,—চেনা মুখ আরও কত গেল; বুড়োর দিন আর ফুরাল না।

রেলগাড়ীর দয়ায় দেশে অনেকবার গেছি। যখন যেতুম, কিছু পয়সা করেই যেতুম। দু-দশ মাস ঘরে বসে হাত খালি হলেই ফিরে আস্‌তুম। নিজের পয়সায় খেতুম, ছেলে রাগ করত—স্ত্রী কাঁদ্‌ত; বলতুম আমার গুরুর হুকুম, নিজে কামিয়ে নিজের রুটী করতে হবে। লোকে ভাবত, সহরে গিয়ে নূতন কোন রকম মন্ত্র-তন্ত্র শিখেচি। আমার গুরু আমার বাপ্‌। রামলীলায় দেখেছিলুম বাপের হুকুমে ভগবান্‌ রামজী বনে-বনে গাছের ছাল পরে বেড়িয়েছিলেন;—আর একবার যাত্রা দেখেছিলুম, অযোধ্যার এক রাজার বেটা বাপের বিয়ের জন্যে দিব্বি করে নিজে আইবুড় রইল—সংমার ছেলেকে রাজ্যি দিলে। আম্‌রা গরীব, মুখ্যু, চাষা; অত জানি না, তবু বাপের কাছে যে বড় দিব্বি করেচি, তা' চিরকাল মনে থাক্‌বে। 'মরদ কী বাৎ' কথাই আছে। যে পুরুষ নিজের কথা রাখ্‌তে না পাল্লে, সে এ দুনিয়ায় এসে পাল্লে কি? খুন্নু মরে গেলে আর দেশে যাইনি। আমার বইসী কেউ ত আর বেঁচে নেই। এ ফোঁপরা, লোনাধরা হাড় ক'খানায় এখন আর কারই বা দরকার, চিন্‌বেই বা কে? তাই আর দেশে যাই না। খুন্নুর বেটা বলদেও এখন "বাবু বলদেও।" সে তার খেজুরওলা বুড়া ঠাকুর্দ্দাকে দেখে লজ্জা পাবে—কাজ কি আর সে বিড়ম্বনায়? এখন গঙ্গামায়ীর দয়া চেয়ে পথে বসে আছি—কবে পার হব, তা জানি না।"

সূর্য্য কখন ডুবিয়া কলিকাতার নিয়তল-গৃহে সন্ধ্যার অন্ধকার ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, জানিতেও পারি নাই। খেজুরওয়ালা ঝুড়ী উঠাইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "বাবুজী, গরীবের কথায় অনেক সময় নষ্ট করিয়ে গেলুম।"

তাহার খেজুরের উচিত মুল্য দিয়া, কিছু বক্‌শীসও দিলাম; কহিলাম, "ভাগবত, বড় ভাল লোক তুমি; ভগবান্‌ তোমার ভাল করুন।" সে আবার সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেল। বার্দ্ধক্যজীর্ণ, ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ সেই অশিক্ষিত খেজুরওয়ালার অষ্টাবক্রের মত গমনশীল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া গভীর শ্রদ্ধায় আমার চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। আমার সময় সে নষ্ট করিয়া গেল, কি সার্থক করিয়া গেল, তাহাই ভাবিতেছিলাম। দূরে,—মোড়ের মাথায় বুড়ার সিংহনাদ বাজিয়া উঠিল "খেজুর—চাই—খেজুর—ভাল ভাল কাবুলী খেজুর।"

প্রতিধ্বনি

চিত্রশিল্পের বিচার

এখনকার কালে আমাদের দেশে যে জাতীয় শিল্পের অভ্যুত্থান হচ্ছে—এই শিল্পের বিষয় যদি আজ আমরা বিচার করিতে বসি তা হ'লে এটা জোর করে আমরা বলব যে আমরা মোগলশিল্পীদের প্রদর্শিত পথ বা অজন্তার শিল্পীদের প্রদর্শিত পথ ধরে চলব বলে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে যদি শিল্পপথে যাত্রা সুরু করি তা হ'লে অচিরেই ভাঙাপথের খানার মধ্যে পড়ে আমাদের বিনষ্ট হ'তে হবে। এখন যদি আমরা কেহ মনে করি সমস্ত জীবন ধ'রে মোগলশিল্পীদের মত একখানি কোরাণ বা একখানি ছবি তুলি দিয়ে মক্স করে করে সম্পূর্ণ করে রেখে যাব—অথবা ভাবি যে অজন্তাগুহার চিত্রের ন্যায় পাহাড়ের কোলে গুহা তৈরী করে ছবি এঁকে রেখে যাব, তা হ'লে সেটা কতদূর [illegible] দাঁড়ায় তা অনুমান করিলেই বোঝা যায়। মোগল আমলের সে সমঝদারও নেই, সে বাদশাও নেই, আর সে আব হাওয়াও নেই—বৌদ্ধ আমলের সে গুহাবাসের রীতিও নেই, আর সে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই নেই—এখন আছে আমাদের Winsor and Newtorএর রং, কার্টিজপেপার, আর আছে বিলাতি তুলি। এখন আমাদের আধুনিক শিল্পের বিচার করিতে হলে এই সব নানান দিক বিবেচনা করে তবে বিচার করতে হবে। এখন আমাদের শিল্পের বিচার করতে হ'লে এই যুগের স্বাভাবিক আসক্তির মধ্যেও জাতীয়-শিল্পের প্রাণটি বজায় আছে কি না দেখতে হবে। এখনও যদি কলের জলে জাত্ যাবে বলে জ্ঞাতসারে কোন ডোবার অপরিষ্কার জলকে পবিত্র বোধে পান করি তা হ'লে যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তেমনি শুধু প্রাচীন শিল্প অবলম্বন ক'রে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে গেলে বিপদে পড়বার খুবই সম্ভাবনা। যদি মোগল বা অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের বৃহৎ ছায়ায় আধুনিক শিশুশিল্পের চারাটিকে রোপণ করা যায়, তা হ'লে যেমন অত্যধিক আওতায় মারা পড়বার সম্ভাবনা, তেমনি ক্ষুদ্র চারার পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপও বাঞ্ছনীয় নয়। মোগল ও বৌদ্ধ শিল্পের আওতাও চাই, আবার বাহিরের রোদ বৃষ্টি ঝড়ও লাগান চাই। তবে একদিন এই শিল্পকলার কাণ্ডটি শক্ত ও কায়েমি হ'য়ে মাথা তুলে উঠতে পারবে—

—প্রবাসী।

আচার

বেদপন্থীরা আচারকে এতদূর আবশ্যক মনে করেন যে, বালকের শিক্ষার আরম্ভ হইতেই তাহাকে প্রধানত আচারই শিক্ষা দিয়া তাহার সহিত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আচারই তাহার প্রধান শিক্ষণীয় থাকে। ব্রহ্ম বা বেদগ্রহণের জন্য তাহাকে বরাবর আচারই শিখিতে হয় (ব্রহ্মচর্য্য); যিনি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিও আচারপরায়ণ, স্বয়ং আচরণ করিয়া বালককে শিক্ষা দেন, এই জন্যই তিনি আচার্য্য। উপনীত বালককে আচার্য্য পুঁথি পড়াইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথমত শৌচ, আচার অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা, এই কয়টি শিখাইতে আরম্ভ করেন (মনু, ২ ৬৯)। বচন তুলিয়া পুঁথি বাড়াইয়া লাভ নাই। বেদপন্থীরা আচারকে এতদূর আবশ্যক মনে করেন কেন, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, সদাচার ধর্ম্মের মূল (মনু, ৪ ১৫৬)। ধর্ম্ম কেবল পুঁথিতে পড়িয়া, বা উপদেশকের নিকট শুনিয়া লাভ নাই, তাহাকে অনুষ্ঠান বা অনুভব করিতে হইবে। সদাচার অবলম্বন না করিলে এই অনুষ্ঠান বা অনুভব দুই একটি মহানুভব ব্যক্তির হইলেও সাধারণ লোকের হয় না, শক্তি বা যোগ্যতাই জন্মে না। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন, আচার দ্বারা দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারা যায়; অপর পক্ষে যাহারা সদাচার পালন করে না,—যাহারা দুরাচার, তাহারা সংসারে নিন্দিত হয়, দুঃখভাগী হয়, ব্যাধিত হয়, এবং অল্পায়ু হয় (মনু, ৪-১৪৬-১৫৭)। যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাত হৃদয়ে বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতে উপদিষ্ট সদাচার বিষয়ক অধ্যায়গুলি পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা সদাচারের ফলসম্বন্ধে উক্ত কথা কয়টির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। না পড়িয়া, না দেখিয়া-শুনিয়া তর্ক করিলে ঐ তার্কিকের সহিত আলোচনা করা বৃথা।—ভারতী

শ্রুতি-স্মৃতি

ধরিত্রীর উদ্বেলিত অশ্রুরাশির ন্যায় আশ্বিনের পরিপূর্ণা তরঙ্গিণী যে দিনে তোয়সম্পদের উচ্ছ্বসিত নৃত্যোৎসবে পল্লী-কুলায়ের পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে, শরৎ শেফালির বৃন্তানুবিদ্ধ কাশ-শুভ্রাঞ্চলা বঙ্গসুন্দরী যে দিনে তাঁহার বর্ষাবিধৌত শ্যামসম্পদে সপ্তকোটি নর-নারীর নয়ন-মন বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছেন, মেঘনির্ম্মুক্ত গগনাঙ্গনের প্রাচীমূলে হৈমবতী শারদউষার হেমচ্ছটা যে দিনে জলস্থল অন্তরীক্ষ সমস্তই স্বর্ণানুরঞ্জিত করিয়াছে, পরিণত শরচ্চন্দ্রিকার স্নিগ্ধানুসিঞ্চনে সম্বৎসরের বিয়োগ-বেদনাতুর মানব মানবীর মন যে দিনে সমাসন্ন-প্রায় প্রিয়মিলনের মধুস্বাদনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সে দিনে সে হতভাগ্যকে একান্ত ইপ্সিত-লাভের আশায় আগ্রহাকুল অন্তরে দৈবশক্তির আরাধনা করিতে হয়, সে দিন তাহার কি দুর্দ্দিন গিয়াছে, তাহা বলিবার ভাষা কি খুঁজিয়া পাওয়া যায়?—মানসী

ধর্ম্মের প্রয়োজন

ইহা সত্য—খুব সত্য যে, মানবসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি আসল ধর্ম্মলাভের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে না। তথাকথিত অনেক ধর্ম্মকর্ম্মই বাহ্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য—ভোগসুখের জন্য,

ধন মান যশের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মের নামমাত্র লইয়া ধর্ম্মের ছায়ামাত্র লইয়া সমাজে ঘোরতর অধর্ম্ম—নানাবিধ দুষ্ক্রিয়া, অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এমন কি, মানব নিজ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির দোষে—যেমন পাড়াগাঁয়ে লোকে এক গঙ্গাকে ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা ইত্যাদিরূপে বিভাগ করে—তদ্রূপ এক সনাতন, শাশ্বত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি নানা কাল্পনিক নাম দিয়া পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি করিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞান-হীনতারই পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ হইবে, মানবসমাজে ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই? যদি এই বিপুল মানবসমাজের মধ্যে এক ব্যক্তিও এই প্রয়োজন বোধ করিয়া ইহার জন্য অনন্যমনা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, আজ সকলের প্রয়োজন বোধ না হইলেও কালে হইবে এবং ঐ প্রয়োজন বোধের জন্যই নানাবিধ সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা। শরীর হইতে ব্যাধি দূর করিতে হইবে, তবেই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে—তবেই আহারে রুচি হইবে। আমাদের ত অরুচি লাগিয়াই আছে।—উদ্বোধন।

প্রাণীর স্বাভাবিক সংস্কার

বুদ্ধিপ্রয়োগ দ্বারা অভ্যস্ত ব্যবহারগুলি পুরুষান্তরে সংক্রমিত হইয়া সংস্কারে পরিণত হয়, এই সিদ্ধান্তটিতে গত শতাব্দীতে অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত উইস্ম্যান (Weismann) ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কোন প্রাণী যদি বুদ্ধির চর্চ্চা করিয়া সেই শ্রেণীর সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান হয়, তবে তাহার বংশে বুদ্ধিমান সন্ততির জন্ম সম্ভবপর; কিন্তু যদি কোন প্রাণী বুদ্ধিবিয়োগে তাহার চালচলনে কোন বিশেষত্ব আনিয়া ফেলে, তবে তাহা ঠিক সেই আকারে সন্ততিতে সংক্রমিত হয় না। মনে করা যাউক, কোন ব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রমে এমন হারমোনিয়ম বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছে যে, বাজাইবার সময়ে তাহার যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয় না, হাতের কুড়িটা অঙ্গুলি ঠিক পরদার কলের মত পড়িয়া যায়। লামার্কের শিষ্যগণের সিদ্ধান্ত সত্য হইলে বলিতে হয়, এইপ্রকার একজন ওস্তাদের সন্তানবর্গ হারমোনিয়ম বাজান গুণটী সংস্কাররূপে লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না; বড় ওস্তাদের পুত্রকেও কষ্ট করিয়া গান-বাজনা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জীবনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাভ করে, তবে অনেক সময়েই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সন্তানে সংক্রমিত হয়। পণ্ডিতের পুত্র খুব প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া নষ্ট না হইলে প্রায়ই মূর্খ হয় না।—

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

বিশ্বদূত

ব্যবসায় শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় গোটাকতক সোজা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন য়ুরোপীয়দিগের সহযোগিতার আশা নাই; বরং যাহাতে তাঁহাদের ঈর্ষ্যার অনিষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারও য়ুরোপীয়দিগের পক্ষসমর্থন করেন। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি আমাদের যুবকদিগের পক্ষে আবশ্যক ব্যবসা-শিক্ষার স্বরূপ-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া স্বাতন্ত্র্যহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তবে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। সে শিক্ষা সার্থক করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের ব্যবসার বাজারের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া—সে বাজারের প্রয়োজন বুঝিয়া যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার দ্বারা এ দেশে শিল্পের বিস্তার সাধিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই তাহার

ভবিষ্যতের মানুষ

বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বলে, মানুষের যে অঙ্গ যত অধিক ব্যবহার হয়, তাহার আকার ও শক্তি তত বৰ্দ্ধিত হয়, এবং অপর দিকে যে অঙ্গের যত কম ব্যবহার হয়, তাহা ক্রমে শক্তিহীন ও সঙ্কুচিত হয় ও কালে লোপ পায়। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানালোচনা-কারীগণ বলেন, সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের মস্তক এখনকার অপেক্ষা বড় হইবে, দাঁতের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, হাতের দৈর্ঘ্য কমিবে, সুতরাং দেখিতে এখনকার অপেক্ষা বিশ্রী হইবে। পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আরও ছোট হইবে এবং কালে হয় ত একেবারে অদৃশ্য হইবে। বক্ষপঞ্জরের প্রথম, একাদশ ও দ্বাদশ অস্থিও সম্ভবতঃ লোপ পাইবে।

—সময়।

জন্ত আবশ্যক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। রায় মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ভারতের ব্যবসা-বাজারের অবস্থা—শিল্পের প্রকৃতি অন্য দেশের বাজারের অবস্থা ও শিল্পের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং বিদেশী ব্যবস্থা বাঙ্গালায় বা ভারতে প্রয়োজ্য হইতে পারে না। যে ভ্রমে এদেশে আমাদের অবস্থার অনুপযোগী শিক্ষার পত্তন করিয়া আমরা ব্যর্থকাম হইয়াছি, সে ভ্রম যাহাতে পুনরায় অনুষ্ঠিত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কাজ করিতে হইবে। রায় মহাশয় সে কথা যেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের অবস্থার ও অন্তরায়ের সব কথাও তেমনই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। —বসুমতী।

সূতা ও কাপড়ের ব্যবসায়

কলে কাপড় নির্ম্মাণের ব্যবসা আরম্ভ হওয়ায় পূর্ব্বে ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি প্রত্যেক পল্লীতে কাপড়ের কোন না কোন ব্যবসায় চলিত। ঘরে ঘরে মেয়েরা সূতা কাটিয়া তাঁতিদের যোগাইতেন। কাপড়ের কলের কল্যাণে দেশীয় লোকের জীবিকানির্ব্বাহের এই সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়টি উঠিয়া গিয়াছে। বোম্বাই নগরে ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে পার্শী ও খোজা প্রভৃতি বিদেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ধনী ব্যবসায়ীরাও কলের সুযোগ ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। গত ৩১শে আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে বোম্বাই নগরে ৩১, ৩৮, ৫২৮ গাঁট সূতা যায়। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৪, ৫০, ১২৫ গাঁট বেশী। তাহা হইতে বিদেশে রপ্তানি হয় ১৯, ৯৩, ৯১৮ গাঁট। বোম্বাইর কলসমূহে ১১ লক্ষ গাঁট কাটে ৫, ৪০,০০০ গাঁট মজুত থাকে। গত বৎসর বোম্বাইর সূতা ও কাপড়ের দর চড়া ছিল, যুদ্ধ না থামিলে তথাকার কলওয়ালারা অপেক্ষা বেশী লাভবান হইবেন বলিয়া আশা করেন। লঙ্কাসায়ার বা ইউরোপের অন্যান্য স্থানের বস্ত্রব্যবসায়ীরা ভারতে প্রচুর বস্ত্র যোগাইতে পারিতেছে না। সুতরাং বোম্বাইর কলওয়ালারা দ্বিগুণ জোরে কাজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত সনে বোম্বাইতে ৮৩টি কাপড়ের কল ছিল। ঐ সমস্ত কলে প্রত্যহ গড়ে ১,১৩,৪৯৫ জন লোক খাটিয়াছে। বোম্বাইর কলওয়ালারা লাভবান হইতেছেন, আর আমাদের বাঙ্গালা দেশে যে দু' একটা কল স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলি পরিচালনার দোষে লোকসান দিয়া দেউলিয়া হইতেছে। —জ্যোতিঃ।

ক্রোড়পতির উপদেশ

আমেরিকায় বহু ক্রোড়পতির বাস। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় বাহুবলে, অসাধারণ পরিশ্রম-প্রভাবে অর্জ্জিত ধনগৌরবে বড়লোক হইয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক ক্রোড়পতির একটি সারগর্ভ উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় সহস্রাধিক কর্ম্মচারী এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রদিগকে একত্র করিয়া একদা এক সভা আহ্বান করেন। সভাক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আপনাদের মধ্যে কাহারো নিকট যদি আমার পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে কেহ চাকুরী গ্রহণ করে, তাহা হইলে আপনারা তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন ইহাই আমার একটি বিশেষ অনুরোধ। তৎপর তিনি তাঁহার পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! আমার উপদেশ হয়ত তোমাদের অপ্রীতিকর বোধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও, আমি তোমাদের ন্যায় বিলাসী আমীর পুত্রগণের নিকট হইতেই আমার এসকল ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বে আমি নিতান্ত শ্রমশীল সামান্য কর্ম্মচারী ছিলাম। পরিশ্রমের কল্যাণেই আমি এই অগাধ অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তোমরা বর্ত্তমানে যেমন শ্রমবিমুখ বিলাসী হইয়া পড়িয়াছ, তোমাদের এ অবস্থা যদি কিছুকাল স্থায়ী হয়, আর আমার কর্ম্মচারিগণ যেরূপ শ্রমস্বীকারে কর্ত্তব্যপালন করিতেছে, তাহারা বরাবর যদি এরূপভাবে খাটে, তাহা হইলে অচিরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তাহারা তোমাদের প্রভু হইবে, তোমরা আলস্য ও বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া তাহাদের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইবা। ইহা স্মরণ রাখিও, স্বভাবধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। যাহারা পরিশ্রম করিবে, তাহারা কৃতকার্য্য হইবে, যাহারা শ্রমবিমুখ যাহারা বিলাসী তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।—মোহম্মদী

তীর্থকুমার

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

একজনকে চিরকাল, স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য আমার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম দিয়াছি—তীর্থকুমার। তীর্থ যখন সময়ে-সময়ে আমার হাত ধরিয়া বলে,—"কাকা, বাড়ী এস," তখন সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণবারিসিক্ত পরিম্লান কুসুমের মত একটি বালকের করুণ মুখচ্ছবি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে।

সে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। রত্নপুরে নূতন গিয়া অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। একটি ছয় বৎসরের এমনি শিশু ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল—"কাকা, বাড়ী এস।" ইহার পূর্ব্বে তাহাকে আমি কখন দেখি নাই; কিন্তু বিদেশের সেই অপরিচিত বালকের দ্বিধাশূন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বালক একটি ঝির সঙ্গে পথে বাহির হইয়াছিল; ঝি একটু পিছাইয়া ছিল। আমার কাছে বালককে আসিতে দেখিয়া সে নিকটে আসিয়া বলিল,—"এস খোকাবাবু, বাড়ী যাই।"

বালক বলিল—"না, আমি কাকার সঙ্গে যাব।" পরে হাতদুখানি উঁচু করিয়া বলিল—"কাকা, আমায় কোলে নেও।" তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। কোলে উঠিয়া সে দুটি হাত দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। বোধ হইল, আমাকে দেখিয়া তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে।

ঝি অবাক্ হইয়া, একবার আমার পানে, একবার বালকের পানে চাহিতে লাগিল।

খানিক পরে আমি বলিলাম—"এবার বাড়ী যাও খোকা।" বালক বলিল—"না, তুমি চল; তুমি এতদিন আসনি কেন?" বলিতে বলিতে তাহার পাতলা ঠোঁট দুখানি কাঁপিয়া উঠিল, চোখে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। ভাবিলাম, আমার সঙ্গে ইহার কাকার হয় ত কোন সাদৃশ্য আছে, তাই আমাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না।

ঝি বলিল,—"বাবু, ঐ নিকটেই আমাদের বাড়ী; খোকাকে দয়া করে ঐ পর্য্যন্ত পৌছে দিন। এখন ও আর আপনার কোল থেকে নামবে না।"

ঝির মুখ দেখিয়া বোধ হইল, এতক্ষণে সে ব্যাপারটার বেশ সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লইয়াছে।

বালককে কোলে করিয়া তাহাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। "আপনি এখানে একটু বসুন; বাবু কাছারী থেকে ফিরেছেন, আমি এখনি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি" বলিয়া ঝি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে বালকের পিতা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বালক বলিল—"বাবা, এই দেখ কাকা এয়েছে।"

তিনি ঝির মুখে সম্ভবতঃ সমস্ত শুনিয়াছিলেন; বলিলেন, —"হাঁ দেখেছি; তুমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাকার জন্যে ভাল করে রাঁধতে বলে এস।"

বালক আমার পানে মিনতিপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া বলিল—"কাকা, তুমি চলে যাবে না?"

আমি বলিলাম—"না।"

তখন সে কোল হইতে নামিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"বাবা, কাকাকে যেন যেতে দিও না।"

তিনি বলিলেন,—"না, দেব না; তুমি ঠাকুরমার কাছ থেকে খাবার খেয়ে এস।"

বালক চলিয়া গেলে, আমরা পরস্পর পরিচয়াদি করিলাম। ইঁহার নাম প্রভাসচন্দ্র মিত্র। এখানকার রাজষ্টেটে ৬০ টাকা মাহিনার এক কাজ করেন। তাঁহার বিভাবতী নামে এক নয় বৎসরের কন্যা এবং পুত্রটি ছয় বৎসরের, নাম তীর্থকুমার। প্রভাস বাবু আমাকে বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আজ বড় বিরক্ত হয়েছেন।"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে না, সামান্য কারণে বিরক্ত হব কেন? তবে এর কারণটা ভাল বুঝতে পারিনি।"

প্রভাস বাবু বলিলেন, "সেই কথাই বল্‌ব বলে' তীর্থকে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিলাম। আমার ছোট এক ভাই ছিল, আপনার সঙ্গে তার চেহারার কিছু সাদৃশ্য আছে; তেমন যে ভ্রম হবার মত সাদৃশ্য, তা নয়। কিন্তু ছেলেমানুষের মন, ও আপনাকে সেই ভেবেছে। তার নাম ছিল প্রকাশ। আমার ছেলেটি তার বড় অনুগত ছিল। তার একটা কারণও ঘটেছিল। তিন বছর হ'ল আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকে তীর্থ প্রায় সব সময়ে প্রকাশের কাছেই থাক্‌ত; বল্‌তে গেলে সে-ই একে মানুষ করেছে। গেল বার এফ্‌-এ পাশ করে ডাক্তারী শেখবার তার ভারি ঝোঁক হ'ল। অবস্থা যদিও তেমন নয়, তবু তাঁর মতেই মত দিলাম। সব স্থির হয়ে গেল। ক্রমশঃ তার কলিকাতায় যাবার দিনও এগিয়ে এল। একদিন হঠাৎ প্রকাশ বল্লে—'দাদা, আর না হয় পড়্‌ব না। আমি গেলে তীর্থ বোধ হয় বড় কাঁদ্‌বে।' আমি বল্‌লাম—'পাগল, তা কি হয়? এক-রকম যখন সব স্থির করা হ'ল, তখন আর অন্যমত কর্‌তে নেই। ছেলেমানুষ—দু'একদিন একটু কাঁদ্‌বে-কাট্‌বে, তার পর ক্রমে সব ভুলে যাবে।' প্রকাশের চোখ ছলছল কর্‌ছিল; সে আর কিছু বল্‌লে না।

"তারপর কল্‌কাতা যাওয়ার দিন দু'জনের যা কান্না! প্রকাশ একবার ক'রে রাস্তায় যায়, আবার তীর্থের কান্না শুনে ফিরে এসে তাকে কোলে করে। 'আমি আবার আস্‌ব; তোর জন্য কত খেল্‌না নিয়ে আস্‌ব' বলে, আর চোখ দিয়ে টস্‌-টস্‌ করে জল পড়ে। শেষে মা জোর করে তীর্থকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন। প্রকাশ চোখ মুছ্‌তে-মুছ্‌তে গাড়ীতে উঠ্‌ল। সেদিন সমস্ত বেলাটা তীর্থ—'কাকার কাছে যাব, কাকার কাছে যাব' বলে' কেঁদেছিল।

"মাসকয়েক পরে আশ্বিন মাসের প্রথমে একখান টেলিগ্রাম পেলাম—প্রকাশের কলেরা হয়েছে। মাকে বল্লাম—'প্রকাশের জ্বর হয়েছে খবর এসেছে; তাকে আজ দেখ্‌তে যাব।' মা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—'তা'হ'লে আমাকেও নিয়ে চ; সেখানে কেবা তাকে সেবা-যত্ন করবে!' নানা ওজর করে মাকে নিরস্ত করলাম। এখন অনুতাপ হয়, কেনই বা অমত করেছিলাম; নিয়ে গেলে তবু মার সঙ্গে একবার শেষ দেখা হ'ত।

"সন্ধ্যার গাড়ীতে কল্‌কাতা পৌঁছুলাম। আমাকে একা দেখে সে বল্লে—'মা, তীর্থ, এদের সব আননি দাদা? আর যদি দেখা না হয়!'

"তার কথাই সত্য হ'ল। সেই দিনই শেষরাত্রে তার মৃত্যু হ'ল।"

আমাদের দু'জনের চোখেই জল আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ দু'জনেই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় তীর্থকুমার তাহার দিদিকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তীর্থ আমার কোলে আসিয়া বসিল। বিভা তাহার পিতার কাছে গেল। তীর্থ বলিল—"কাকা, তুমি এয়েছ শুনে ঠাকুমা কাঁদছে; তুমি ঠাকুমার কাছে গিয়ে বস্‌বে, এস।"

অনেক ভুলাইয়া তাহাকে ক্ষান্ত করিলাম। সে রাত্রে আমার আর বাসায় যাওয়া ঘটিল না। কোন ক্রমেই সে আমার কাছ হইতে নড়িল না। সেই মাতৃহীন বালককে কাঁদাইয়া যাইতেও আমি পারিলাম না। আমি যে বন্ধুর বাসায় ছিলাম, তিনি প্রভাস বাবুর পরিচিত, লোক দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল।

আহারাদির পর তীর্থ আমার নিকটেই শয়ন করিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সে আমার সঙ্গে কত কথা কহিল। একবার বলিল—"দিদি বলে, তুমি নাকি আস্‌বে না। দিদি মিথ্যা কথা কয়, নয় কাকা?"

আমি বলিলাম—"হাঁ।"

আর একবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার জন্য খেল্‌না এনেছ?"

আমি বলিলাম—"ভুলে গিয়েছি; এবার গিয়ে তোমার জন্যে অনেক খেল্‌না নিয়ে আস্‌ব।"

তীর্থকুমার ব্যাকুল হইয়া বলিল—"না কাকা, তুমি যেও না; আমি ত আর খেল্‌না নিয়ে খেলিনে। ওপের মলিন খেলে, সে ছেলেমানুষ কি না।"

তার পর স্নিগ্ধ চক্ষু দু'টি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে মুদিয়া আসিল।

পরদিনই আমার বাড়ী রওনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু প্রভাস বাবুর নিতান্ত অনুরোধে আরও দু'দিন আমাকে সেখানে থাকিতে হইল। প্রভাস বাবু অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন—"ভাই, তুমি আমার প্রকাশের মত মাঝে-মাঝে আমাদের দেখা দিও।"

তৃতীয় দিন অনেক কৌশলে তীর্থকে লুকাইয়া রঙ্গপুর হইতে রওনা হইলাম। ট্রেণে উঠিয়া মনে হইল, আর না হয় দুই-একদিন থাকিয়া যাই। আবার ভাবিলাম,—তখনও, যে যাইবার দিন এমনি হইবে; চিরকাল ত এখানে থাকিতে পারিব না।

আমার চিন্তাকে চমকিত করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। কয়দিনের সেই পরিচিত লোকালয়, পথের দুই ধারের সুশ্যাম বনরাজি, অদূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডগুলি ধীরে-ধীরে আমার নেত্রান্তরালে চলিয়া গেল। সুধু মনে রহিল, একটী ক্ষুদ্র বালকের অযাচিত প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও তাহার অভিমান-মণ্ডিত করুণ-কোমল মুখশ্রী!

২

তাহার পর মাসচারেক অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে প্রভাস বাবুর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি সে পত্রে লিখিয়াছিলেন—তীর্থকুমারের জন্য তিনি বড়ই ভাবিত আছেন। সে সর্ব্বদাই যেন কি ভাবে ও কেমন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে; দিন দিন বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে।

মাস পাঁচ-ছয় পরে তাঁহার আর-একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আড়াই মাস হইতে তীর্থকুমার পীড়িত। চিকিৎসায় এ পর্য্যন্ত কোন উপকার হয় নাই। আপনার সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, আপনাকে দেখিলে রোগ অনেকটা কমিবার সম্ভাবনা। তীর্থকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইতাম; কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। আপনার কাজের ক্ষতি হইবে বলিয়া বেশী বলিতে পারি না; যদি দয়া করিয়া একবার আসিয়া হতভাগোর পুত্রকে রক্ষা করেন।"

দুইতিন দিনের মধ্যে হাতের কাজ মিটাইয়া রঙ্গপুর যাত্রা করিলাম।

তীর্থকুমারকে দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখ, শীর্ণ দেহ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকে দেখিয়া অবধি বালক উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। তাহার কাছে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতে হইত। বাড়ীতে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও রঙ্গপুরে আমাকে প্রায় একমাস বাস করিতে হইল। ক্রমে তীর্থ একটু-আধটু বেড়াইতে সক্ষম হইল। প্রভাস বাবু বলিলেন—"ভাই, তোমারই দয়ায় তীর্থকে এবার ফিরে পেলাম।" ঘনিষ্ঠতাবশতঃ এবং আমার অনুরোধে ইদানীং তিনি আর আমাকে 'আপনি' বলিতেন না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এবার খোকাকে লইয়া পুরীতে মাস তিনেক বেড়াইয়া আসুন।" আমি তখন প্রভাস বাবুর নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি হাত যোড় করিয়া বলিলে—"ভাই, আর দুটো দিন থাক।"

যথাসম্ভব শীঘ্র প্রভাসবাবু তিন মাসের ছুটী মঞ্জুর করাইয়া সকলে মিলিয়া পুরী রওনা হইলেন। কথা রহিল, আমি ব্যাণ্ডেলে নামিয়া পড়িব। বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছিল, আমার শীঘ্র বাড়ী যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

সন্ধ্যার সময় ট্রেণ ব্যাণ্ডেলে পৌঁছিল। ট্রেণের কষ্টে ক্লান্ত হইয়া তীর্থ আমার পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হায়, জাগিয়া উঠিয়া যখন সে দেখিবে, আমি তাহার পার্শ্বে নাই, তখন তাহার ক্ষুদ্র স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে না জানি কত ব্যথা বাজিবে!

বেশী সময় ছিল না। প্রভাস বাবু ও তাঁহার জননীর নিকট বিদায় লইয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ট্রেণ—একটু পরেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল। মনে-মনে বলিলাম,—"বালককে রক্ষা করিও, ঠাকুর! আমার অভাবে এবার যেন সে কোন কষ্ট অনুভব না করে।"

গাড়ী প্রস্তত ছিল; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাহাতে গিয়া বসিলাম।

(৩)

পুরী গিয়া তাহারা আমাকে কোন পত্রাদি দিলেন না। একমাস কাটিয়া গেল, তবু কোন সংবাদ নাই। আমিও প্রথমে পত্র লিখিতে পারি নাই। লিখিতে গেলেই যেন একটা আশঙ্কা ও সঙ্গে-সঙ্গে একটা লজ্জা আসিয়া জুটিত। ভাবিতাম, আমিই একপ্রকার তীর্থের অসুখের কারণ; যদি শুনি, সে আবার আমার জন্য পূর্ব্বেকার মত কাতর হইয়াছে, তাহা হইলেও ত এখন গিয়া সেখানে থাকিতে পারিব না। আরও একমাস কাটিয়া গেল। তখন পুরীতে পত্র লিখিলাম; কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তিনচারিখানি পত্র লিখিলাম, সবগুলির ফল সমান হইল।

শেষে, এতদিনে তাঁহারা রত্নপুরে ফিরিয়াছেন মনে করিয়া, সেখানে রেজেষ্ট্রী করিয়া এক পত্র দিলাম। পত্র ফেরৎ আসিল।

আরও মাসতিনেক কাটিয়া গেল। রত্নপুরের বন্ধুকে এক পত্র দিলাম। শুধু লিখিলাম—প্রভাস বাবুরা ওখানে আছেন কি না? তিনি উত্তর দিলেন—দিন ১৫ হইল তাঁহারা দেশে ফিরিয়াছেন। তখন প্রভাস বাবুকে অনুযোগ করিয়া এক পত্র লিখিলাম। বলিলাম—"পত্র পাঠমাত্র তীর্থকুমারের সংবাদ দিবেন।"

এইবার উত্তর পাইলাম। কিন্তু না পাইলেই বুঝি ভাল হইত। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"তীর্থকুমারের কথা আর কেন ভাই? সে ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে! দিন-রাত্রি তাহার কাকার পথপানে চাহিয়া-চাহিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল; এখন সে তাহার কোলে গিয়া শান্তি পাইয়াছে।

"সেই সন্ধ্যার সময় তুমি ব্যাণ্ডেলে নামিয়া গেলে। হাওড়ায় গিয়া তীর্থ জাগিল। প্রথমেই তোমাকে খুঁজিল। বলিলাম—'কাকা ও-গাড়ীতে আছে, এখনি আস্‌বে।' সে কি সে কথা শোনে? অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। পুরীতে আসিয়া দুইদিন পরেই সে আগেকার মত অসুস্থ হইয়া পড়িল। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা বলিলেন, আবার তোমাকে খবর দিতে। আমি দেখিলাম, এই তুমি একমাস কাজ ক্ষতি করিয়া রহিলে, আবার কোন্ মুখে তোমাকে আসিতে লিখিব। কাজেই আর লেখা হইল না। ভাবিলাম, ভগবানের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।

"সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। কিন্তু কোনই ফল হইল না। প্রতিদিন সে তাহার শীর্ণ শীতল হস্ত দু'খানি আমার কোলের উপর রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জিজ্ঞাসা করিত—'বাবা, কাকা আর আস্‌বে না?' আমি কি উত্তর দিব? বহু কষ্টে বলিতাম—'আস্‌বে বৈ কি বাবা।' শেষে হতাশ হইয়া একদিন সে বলিয়াছিল—'না বাবা, কাকা আর আস্‌বে না; আমি কাকার কাছে যাব।'

"সেই দিন সন্ধ্যার সময় সব শেষ হইল। কাঙালের সর্ব্বস্বধন সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়া রিক্তহস্তে শূন্য-গৃহে ফিরিলাম।

"তখনও ছুটীর দেড়মাস বাকী ছিল; কিন্তু দেশে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। বৃদ্ধবয়সে মার বুকে শোকটা বড়ই বাজিয়াছিল। আরও তিন মাসের ছুটী বৃদ্ধি করাইয়া তাঁহাকে লইয়া এদেশ-ওদেশ বেড়াইতে লাগিলাম।

"দিন কুড়িক হইল, এখানে ফিরিয়াছি। আবার তেমনি আফিস্ করিতেছি। কিন্তু সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া যাহার মুখ দেখিয়া সমস্ত কষ্ট দূর করিতাম, সে আর নাই! সে তাহার মা ও কাকার কাছে গিয়া জুড়াইয়াছে। ভাবিতেছি, আমি কবে তাহাদের কাছে গিয়া জুড়াইব?"

সাহিত্য-সংবাদ

কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত "ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে প্রাচীন সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "কর্ম্মফল" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত "আকার ইঙ্গিত" নামে একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। দক্ষিণা মাত্র একটী টাকা।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "নেপালী ছবি" প্রকাশিত হইয়াছে। এক টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

বিগত আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষে' যে 'বাঙ্গালীর কোষ্ঠী' প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কোষ্ঠীর সুনিপুণ চিত্রকরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় সন্ধান দিয়াছেন যে, ঐ কোষ্ঠীতে যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার চিত্রকর শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম, বি মহাশয়। ল্যান্সেট ও ষ্টেথস্কোপ লইয়া যাহার কারবার, তিনি যে চিত্রকরের তুলিকাও এমন ওস্তাদের মত ধরিতে পারেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীযুক্ত কপিঞ্জলের "চূণকালী" আট আনা মূল্যে কিনিয়া গালে মাখিতে হইবে। পাঠক-সমাজের কি বিড়ম্বনা!

সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন কবিতা পুস্তক "সন্ধ্যামণি" যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই 'সন্ধ্যামণি'র দুই চারিটী 'ভারতবর্ষে' ফুটিয়াছিল। পুস্তক প্রকাশিত হইলে লেখক ও পাঠক সকলেই দেবপূজার উপকরণ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'হিমালয়ের' পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তাঁহার 'বিশুদাদা' 'দুঃখিনী' ও 'নূতন গিন্নীর' পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মনোবিজ্ঞান

(অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম'এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনের অবস্থা

আমি অনুভব করিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি এবং ইচ্ছা করিতে পারি। অনুভূতি—চিন্তা এবং ইচ্ছা এই তিনটি মনের প্রধান অবস্থা। ইহারা মনের এক-একটি অংশ নহে—একই মনের ত্রিবিধ অবস্থামাত্র। আমি চ্যায়ারে বসিয়া আছি। চ্যায়ারটির চারিটি পা আছে। আমি যদি বলি, 'এই পা চারিটি চেয়ারে আছে', তাহা হইলে আমার ভুল হইল; কারণ, পা চারিটি লইয়াই চ্যায়ার। চ্যায়ার এবং চ্যায়ারের পা পৃথক বস্তু নহে। তেমনি যদি বলি—আমার মনে চিন্তা আছে, অনুভূতি আছে, ইচ্ছা আছে—তাহা হইলে আমার ভুল হইল; কারণ, অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা লইয়াই আমার মন। মন এবং মনের অবস্থাকে পৃথক করিতে পারা যায় না।

মনের অবস্থাত্রয় পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ। একটি বালক দৌড়িতেছে। সহসা তাহার পদস্খলন হইল। সে আর দৌড়িতে পারিল না; ভূতলে পড়িয়া গেল। দ্রুতপদে তাহার নিকট যাইলাম; দেখিলাম, বালকটি অজ্ঞান হইয়াছে; দর-দর ধারায় রুধির বহিতেছে। আমার বড়ই দুঃখ হইল (অনুভূতি)। ক্ষতস্থান বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম; বুঝিলাম, ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন (চিন্তা)। তদনন্তর ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম এবং ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলাম (ইচ্ছা)। আমার বন্ধু অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার শীঘ্র একটি চাকুরি হওয়া আবশ্যক। শুনিলাম, তাঁহার চাকরি হইয়াছে (চিন্তা)। এখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল (অনুভূতি)। তৎপরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলাম (ইচ্ছা)। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই অবস্থাত্রয় এমন সুন্দর সখ্যভাবাপন্ন যে, কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। যেখানে একটি সেইখানেই অপর দুইটি।

> "নিয়ত করিছ হাহাকার
> কল্পনাতে বাড়াইয়া দুখ
> কহ তুমি। হোয়ো না উন্মুখ—
> আপনারে ধিক্কারিতে হেন।
> এ সংসারে সখা, স্থির জেনো—
> বাড়ায় মানব দুঃখ যত
> নিজে ইচ্ছা করি'; —অনিবার
> যা'রে ধ্যান কর, মনে তা'র
> পড়িবেই ছায়া।"

অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা কিংবা ইচ্ছা, ইচ্ছা ব্যতীত অনুভূতি কিংবা চিন্তা, এবং চিন্তা ব্যতীত অনুভূতি কিংবা ইচ্ছা থাকিতে পারে না। কল্পনা-প্রভাবে তুমি সুখের হিল্লোলে সন্তরণ দিতে পার, আবার দুঃখের পারাবারে নিমজ্জিতও হইতে পার। ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে তোমার সুখ-দুঃখের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পার। অনবরত ধ্যান-ধারণার দ্বারা সুখ-দুঃখের বিষয়কে হৃদয়ে সজাগ রাখিতে পার।

একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া কলম কাটিতেছ। অসাবধানতা হেতু অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিলে; যন্ত্রণায় অস্থির হইলে। অবশ্য এখানে তোমার অনুভূতি প্রবল; কিন্তু তথাপি তোমার চিন্তা বা ইচ্ছাশক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার হাত কাটে নাই, পা কাটে নাই বা অন্য কোন অঙ্গ কাটে নাই; কিন্তু কাটিয়াছে একটি আঙ্গুল। সুতরাং তোমার চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান। এখন তুমি ছুরির কথা ভাবিতেছ না, কলমের

কথা ভাবিতেছ না—এখন সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গিয়া কেবল সেই ক্ষতস্থানেই মনোনিবেশ করিয়াছ। মনোনিবেশে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন—তোমার সে শক্তিও আছে। ক্ষতস্থানে তৈলসিক্ত ন্যাকড়া বাঁধিতেছ—ইহাতেও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। যেখানে অনুভূতি সেইখানেই চিন্তা এবং ইচ্ছা। চিন্তার সাহায্যেই অনুভূতির অস্তিত্ব বুদ্ধির গোচর হয়। আমার চিন্তাশক্তি আছে, তাই আমি বুঝিতে পারি যে, আমার অনুভূতি আছে। শোক, তাপ, ভয় প্রভৃতি নানা প্রকারের অনুভূতি আছে। প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যে আবার পরিমাণগত পার্থক্য আছে। চিন্তাই এই প্রকার এবং পরিমাণগত পার্থক্যের বিচারক। অনুভূতি হয় সুখদায়ক, না হয় দুঃখদায়ক। সুখদায়ক অনুভূতিকে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, এবং দুঃখদায়ক অনুভূতিকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত মানুষ স্বভাবতঃই প্রয়াস পাইয়া থাকে। প্রয়াসে শক্তি সুতরাং ইচ্ছার প্রয়োজন। সূর্য্যসিংহ যোধমলের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল। যোধমল ধরাশায়ী হইল; যন্ত্রণায় অস্থির হইল। এখানে অনুভূতির প্রাবল্য, কিন্তু চিন্তা-শক্তির লোপ হয় নাই—এখনও মহারাজ পৃথ্বির কথা বিস্মরণ হয় নাই, এখনও ভারতভূমি,জন্মভূমির কথা ভুলিয়া যায় নাই, এখনও যমুনাকে দেখিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

"যমুনে! বড় খেদ রহিল জীবনে
নারিলাম উদ্ধারিতে পৃথ্বি মহারাজে
হায় হায়! নির্ম্মূল সকল আশা,
ভারতের সুখরবি গেল অস্তাচলে!
হায় হিন্দ্!
কেন সবে ভুলে গেলে একতা-বন্ধন?
যমুনে! প্রাণেশ্বরি!
শেষ দেখা দেখে নিই জনমের মত!
দেহ মোরে চরম বিদায়।"

একজন যুবক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে। যুবকটির এখানে চিন্তার প্রাধান্য অধিক হইলেও অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। যুবক মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে জ্ঞানের জন্য না জীবিকার্জ্জনের জন্য? যে জন্যই হউক, ইহার মূলে অনুভূতি। যুবক মনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞতানিবন্ধন দুঃখ নিবারণের জন্য, জ্ঞানের অভাব-মোচনের জন্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছে। দুঃখ এবং অভাব—অনুভূতি। অথবা যুবকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের আবশ্যক। হয় ত সেই জন্যই যুবক মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছে। দুঃখ নিবারণের জন্য কিংবা সুখ সম্ভোগের নিমিত্তই যুবক জ্ঞানালোচনা করিতেছে। অতএব এখানেও অনুভূতি। অনুভূতি ব্যতীত চিন্তা থাকিতে পারে না। চিন্তার ক্রিয়া অনুভূতির উপর। অনুভূতিই চিন্তার উৎপাদক। যুবক নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে। চিত্ত নিবিষ্ট করিতে হইলে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া আবশ্যক। বাহিরের উপদ্রব হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পাঠ্য বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইবে; চিন্তাস্রোতের গতিকে অন্যান্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আলোচিত বিষয়ের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। চিন্তাস্রোতের গতিকে সংযত করিবার নিমিত্ত, কোন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালন করিবার নিমিত্ত এবং কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ কাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, ইচ্ছাশক্তির নিয়োগ আবশ্যক। তুমি যখন বলিতেছ—

"ক্ষুদ্র মানবের স্বার্থ নিয়া
এ বিশ্ব রচনা নহে; তাই,
অহর্নিশি যত ব্যথা পাই,
হয় ত বা আছে গো ইহার
গূঢ় অর্থ কোন; বিধাতার
হয় বা এ বিধি জগতের
শুভ তরে!
ক্ষুদ্র মানবের
বুদ্ধি—ঠিক!—পারিবে কেমনে
অনন্ত এ বিধি বিশ্লেষণে।"

তখন তোমার চিন্তার প্রাবল্য অধিক হইলেও ইহার মূলে এই প্রশ্ন,—

"এরি তরে কহে—ন্যায়বান্
তোমারে এ মূঢ় বিশ্বজনে!
কোথা তুমি? যবে প্রতিক্ষণে
অধর্ম্মের অদম্য প্রতাপে
এ পৃথিবী 'থর থর' কাঁপে;
কপটতা, তীব্র ছলনায়,
মিথ্যাচার, বিদ্বেষ হিংসায়
ভরি' ওঠে যবে এ সংসার;
তখনো কি চেতনা তোমার
নাহি জাগে? কোথা তুমি?—কোথা"

দুঃখের কশাঘাতে চিন্তার উদ্রেক হইল এবং তখনি ইচ্ছার প্রবৃত্তি জন্মিল। প্রবৃত্তি ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র।

শোক-সংবাদ

৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ

স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ

পূর্ববঙ্গের সুসঙ্গ—দুর্গাপুরের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহের লোকান্তর-সংবাদ আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পাঠকগণের গোচর করিতেছি। সুসঙ্গের রাজবংশ বাদশাহী ও নবাবী আমলের জমিদার এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও অতুলনীয় শারীরিক বলবীর্য্যের জন্য নবাবদত্ত সিংহ উপাধিধারী। মহারাজ কুমুদচন্দ্র আধুনিক ধরণে শিক্ষিত—বি এ উপাধিধারী ছিলেন। তাঁহার সহিত যিনি আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বর্গীয় মহারাজ কতদূর বিনয়ী ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠাও তাঁহার বিনয়েরই অনুরূপ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। যে রোগে বঙ্গের অনেক শিক্ষিত মনীষাসম্পন্ন সন্তান অকালে প্রাণ হারাইতেছেন, সেই কাল বহুমূত্র রোগই মহারাজেরও মৃত্যুর কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করিয়াই মহারাজ মা সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন নাই; তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগের পরিচায়ক, মৌলিক প্রবন্ধগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

বিদায় *

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

তুমি, নীরবে, নিভৃতে, সাধনা করেছ, গোপনে, হে "প্রিয় কবি"!
তবু আঁকি' গেছ প্রতি হিয়ায় হিয়ায় কত না মোহন ছবি।
কভু, "দিবার" তীব্র প্রচণ্ড আলোক চাহনি জীবনে তুমি,—
তাই, আঁধারে-আলোকে গিয়াছ মিলায়ে প্রভাত-গোধূলি চুমি';
তব আগে আগে কোন ফিরেনি নকীব ফুকারিয়া যশ-বাণী,
তবু, জনে জনে কত ভক্ত আজিও ফিরিছে অর্ঘ্য দানি।
তব, পূজা মণ্ডপে যে বেদ-মন্ত্র উঠেছিল মুখে ফুটি'—
আজি, সে ধ্বনি মহান এখন কাঁপিছে দেউলে দেউলে লুটি'।
ছিলে, বাণী মন্দিরে সরল পূজক, নম্র, নয়ন নত,
সদা লক্ষ্যবিহীন যশ-গৌরবে, দেবীর আরতি-রত।
তব কোমল পরশ মরম মাঝারে গিয়াছ যে ক'টী দিয়ে,
মোরা সহিব এ বাজ, হে কবি! ভাবুক! সে স্মৃতি বক্ষে নিয়ে।

৺প্রিয়নাথ সেন

* প্রবীণ সাহিত্যিক ও সুকবি প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।

স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত, আই-সি-এস, সি-আই-ই

বাঙ্গলার যে সকল সুসন্তান সর্ব্বপ্রথম বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের শাসন-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। গত ২০শে অক্টোবর সিমুলতলায় অবস্থিতিকালে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। সার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং পরে পাঁচ বৎসর বরোদা রাজ্যের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। ১৯১৫ অব্দে তিনি সি আই ই উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত এবং রাজ সরকারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীভগবান গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.